প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৩৯শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৪৬

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী



প্রবাসী

"শিবম্ সত্যম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৪৬

১ম সংখ্যা

পরিচয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বয়স ছিল কাঁচা,
বিদ্যালয়ের মধ্যপথের থেকে
বার হয়েছি আই-এ-র পালা সেরে।
মুক্ত বেণী পড়ল বাঁধা খোঁপার পাকে,
নতুন রঙের সাড়ি দিয়ে
দেহ ঘিরে যৌবনকে নতুন নতুন ক'রে
পেয়েছিলুম বিচিত্র বিস্ময়ে।

অচিন জগৎ বুকের মধ্যে পাঠিয়ে দিত ডাক
কখন থেকে থেকে,
দুপুর বেলায় অকাল ধারায় ভিজে মাটির আতপ্ত নিঃশ্বাসে,
চৈত্ররাতের মদির ঘন নিবিড় শূন্যতায়,
ভোর বেলাকার তন্দ্রাবিবশ দেহে
ঝাপসা আলোয় শিশির-ছোঁওয়া আলস জড়িমাতে।
যে বিশ্ব মোর স্পষ্ট জানার শেষের সীমায় থাকে
তারি মধ্যে কবি তুমি অচিন সবার চেয়ে
তোমার আপন রচন অন্তরালে।

কখনো বা মাসিক পত্রে চমক দিত প্রাণে
অপূর্ব এক বাণীর ইন্দ্রজাল ;
কখনো বা আলগা-মলাট বইয়ের দাগী পাতায়
হাজারো বার পড়া লেখায় পুরানো কোন্ লাইন
হানত বেদন বিদ্যুতেরি মতো,
কখনো বা বিকেল বেলায় ট্রামে চ'ড়ে
হঠাৎ মনে উঠত গুনগুনিয়ে
অকারণে একটি তোমার শ্লোক।

অচিন কবি তোমার কথার ফাঁকে ফাঁকে,
দেখা যেত একটি ছায়াছবি,
স্বপ্ন-ঘোড়ায় চড়া তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ
তোমার মানসীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরে,
রাজপুত্র তুমি যে রূপকথার।
আয়নাখানার সামনে সেদিন চুল বাঁধবার বেলায়
মনে যদি ক'রে থাকি সে রাজকন্যা আমিই,
হেসো না তাই ব'লে।
তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগেভাগেই
ছুঁইয়েছিলে রুপোর কাঠি,
জাগিয়েছিলে ঘুমন্ত এই প্রাণ।
সেই বয়সে আমার মতো অনেক মেয়ে
ঐ কথাটাই ভেবেছিল মনে ;
তোমায় তারা বারে বারে পত্র লিখেছিল
কেবল তোমার দেয় নি ঠিকানাটা।

হায় রে খেয়াল ! খেয়াল এ কোন্ পাগলা বসন্তের ;
ঐ খেয়ালের কুয়াশাতে আবছা হয়ে যেত
কত দুপুর বেলায়
কত ক্লাসের পড়া,
উছল হয়ে উঠত হঠাৎ
যৌবনেরি খাপছাড়া এক ঢেউ।

রোমান্স বলে এ'কেই
নবীন প্রাণের শিল্পকলা আপনা ভোলাবার।
আর কিছু দিন পরেই
কখন ভাবের নীহারিকায় রশ্মি হোত ফিকে,
বয়স যখন পেরিয়ে যেত বিশ-পঁচিশের কোঠা,
হাল আমলের নভেল প'ড়ে
মনের যখন আব্রু যেত ভেঙে
তখন হাসি পেত
আজকে দিনের কচিমেয়েপনায়।

সেই যে তরুণীরা
ক্লাসের পড়ার উপলক্ষ্যে
পড়ত ব'সে "ওড্‌স্ টু নাইটিঙ্গেল",
না-দেখা কোন্ বিদেশবাসী বিহঙ্গমের
না-শোনা সংগীতে
বক্ষে তাদের মোচড় দিত,
ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে
ফেনায়িত সুনীল শূন্যতায়,
উজাড় পরীস্থানে।
বরষ কয়েক যেতেই
চোখে তাদের জুড়িয়ে গেল দৃষ্টিদহন
মরীচিকায় পাগল হরিণীর।
ছেঁড়া মোজা শেলাই করার এল যুগান্তর,
বাজারদরের ঠকা নিয়ে চাকরগুলোর সঙ্গে বকাবকির,
চা-পান সভায় হাঁটুজলের সখ্যসাধনার।
কিন্তু আমার স্বভাববশে
ঘোর ভাঙে নি যখন ভোলা মনে
এলুম তোমার কাছাকাছি।

চেনাশোনার প্রথম পালাতেই
পড়ল ধরা একেবারে দুর্লভ নও তুমি,
আমার লক্ষ্য সন্ধানেরই আগেই
তোমার দেখি আপনি বাঁধন মানা।

হায় গো রাজার পুত্র
একটু পরশ দেবামাত্র পড়ল মুকুট খসে
আমার পায়ের কাছে,
কটাক্ষেতে চেয়ে তোমার মুখে
হেসেছিলুম আবিল চোখের বিহ্বলতায়।

তাহার পরে হঠাৎ কবে মনে হোলো
দিগন্ত মোর পাংশু হয়ে গেল
মুখে আমার নামল ধূসর ছায়া ;
পাখির কণ্ঠে মিইয়ে গেল গান
পাখায় লাগল উড়ুক্ষু পাগলামি।
পাখির পায়ে এঁটে দিলেম ফাঁস
অভিমানের ব্যঙ্গস্বরে,
বিচ্ছেদেরি ক্ষণিক বঞ্চনায়,
কটু রসের তীব্র মাধুরীতে।

এমন সময় বেড়াজালের ফাঁকে
পড়ল এসে আরেক মায়াবিনী ;
রণিতা তার নাম।
এ কথাটা হয়তো জানো
মেয়েতে মেয়েতে আছে বাজিরাখার পণ
ভিতরে ভিতরে।

কটাক্ষে সে চাইল আমায়, তারে চাইলুম আমি,
পাশা ফেলল নিপুণ হাতের ঘুরুনিতে,
এক দানেতেই হোলো তারি জিত।
জিত ? কে জানে তাও সত্য কিনা।
কে জানে তা নয় কি তারি
দারুণ হারের পালা।

সেদিন আমি মনের ক্ষোভে
বলেছিলুম কপালে কর হানি,
চিনব ব'লে এলেম কাছে
হোলো বটে নিংড়ে নিয়ে চেনা
চরম বিকৃতিতে।

কিন্তু তবু ধিক আমারে, যতই দুঃখ পাই
পাপ যে মিথ্যে কথা।
আপনাকে তো ভুলিয়েছিলুম যেই তোমারে এলেম ভোলাতে,
ঘুলিয়ে দেওয়া ঘূর্ণিপাকে সেই কি চেনার পথ?
আমার মায়ার জালটা ছিঁড়ে অবশেষে আমায় বাঁচালে যে;
আবার সেই তো দেখতে পেলেম আজো তোমার স্বপ্ন-ঘোড়ায় চড়া
নিত্যকালের সন্ধান সেই মানসসুন্দরীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরের মাঠে।

দেখতে পেলেম ছবি,
এই বিশ্বের হৃদয়মাঝে
বসে আছেন অনির্বচনীয়া,
তুমি তাঁরি পায়ের কাছে বাজাও তোমার বাঁশি।
এ সব কথা শোনাচ্ছে কি সাজিয়ে বলার মতো,
না বন্ধু, এ হঠাৎ মুখে আসে,
ঢেউয়ের মুখে মোতির ঝিনুক যেন
মরুবালুর তীরে।
এ সব কথা প্রতিদিনের নয়;
যে তুমি নও প্রতিদিনের, সেই তোমারে দিলাম যে অঞ্জলি,
তোমার দেবীর প্রসাদ র'বে তাহে।
আমি কি নই সেই দেবীরই সহচরী,
ছিলাম না কি অচিন রহস্যে
যখন কাছে প্রথম এসেছিলে?

তোমায় বেড়া দিতে গিয়ে আমায় দিলেম সীমা।
তবু মনে রেখো
আমার মধ্যে আজো আছে চেনার অতীত কিছু।

১৭।৬।৩৯

পিতা-পুত্র

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আহ্নিক গতিতে পৃথিবী আবর্ত্তিত হয়, দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর হয় দিন, যুগের শেষে হয় যুগান্তর, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির কত রূপান্তর হয়। এই রূপান্তরের মধ্য দিয়া জগৎ চলে,—যুগের পথ-চলা। নিয়তির লীলার আকর্ষণেই হউক আর মানুষের ভবিষ্যৎ-সন্ধানী মনের চালনাতেই হউক, সমষ্টিগতভাবে মানুষ চলে, সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও চলিতে হয়। কিন্তু বিপ্রনান্দী গ্রামখানি যেন ইহার ব্যতিক্রম। অবশ্য গতিশীল জগতের সঙ্গে গ্রামখানির যোগসূত্রও যে অত্যন্ত ক্ষীণবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বোলপুর রেল-ষ্টেশন বারো মাইল দূরে, মোটর-বাস বা ট্যাক্সি আসিবার রাস্তা পর্য্যন্ত নাই; কাঁচা রাস্তায় যানের মধ্যে সনাতনী পদ্ধতিতে গরুর গাড়ী কোন রকমে চলে, আর বাহনের মধ্যে চলিতে পারে ঐ এক গরুই, ক্ষুর জোড়া বলিয়া কাদায় ঘোড়াও চলে না। কিন্তু গরুর উপর মানুষের চড়া চলে না, কাজেই আপন চরণ-জোড়া ছাড়া অন্য বাহনও অচল। কিন্তু এই যোগসূত্রের ক্ষীণতাই ইহার হেতু নয়। কারণ এই অচলতার মধ্যে জড়তা গ্রামখানিকে স্পর্শ করে নাই, একটি অটল মহিমায় সে সূর্য্যকরদীপ্ত পাহাড়ের চূড়ার মত দাঁড়াইয়া আছে। আশপাশের গতিশীল জগৎ অহরহ তাহাকে টানিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু বিপ্রনান্দী গ্রাম নড়ে না। বারো মাইল দূরে ট্রেন চলিয়া যায়, নিশীথ রাত্রে তাহার শব্দ-তরঙ্গে গ্রামের শূন্যমণ্ডলে শিহরণ উঠে, মাটির বুকে সঞ্চারিত কম্পনবেগে গৃহ-প্রাচীর কাঁপে, মধ্যে মধ্যে গ্রামের যুবকেরা দশ জনে মিলিয়া দশমুণ্ড রাবণের মত কুড়ি হাতে জীবনকে নাড়া দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ফল হয় না। সামান্য একটু কম্পন অনুভব করিলেই, কৈলাস-শিখরাসীন বিশ্বম্ভরের মত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ বিপ্রনান্দীর বুকে পদনখাগ্র চাপিয়া ধরেন, সঙ্গে সঙ্গে সব স্থির হইয়া যায়।

ন্যায়তীর্থ মানুষটি খর্ব্বকায় ছোটখাট; গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর, সর্ব্ব অবয়ব একটি অনমনীয় দৃঢ়তার দীপ্তিতে ভাস্বর, অথচ তাঁহার মুখে চোখে কপালে ঠোঁটে একটি হাস্যময় প্রশান্তি ঝলমল করে। পরনে ক্ষারে-ধোয়া ধবধবে থান ধুতি, অনাবৃত বুকের উপর আঠায়-মাজা শুভ্র উপবীত, গলায় সোনার তারে গাঁথা ছোট রুদ্রাক্ষের একগাছি মালা পরিয়া ন্যায়তীর্থ আপনার টোলের বারান্দায় ছোট একখানি চৌকির উপর বসিয়া থাকেন—তাঁহারই একটি অখণ্ড এবং প্রগাঢ় প্রভাব গ্রামখানিকে নিষ্কম্প দীপালোকের মত আলোকিত এবং আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। গ্রামে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেও তিনি চঞ্চল হন না; হাসিমুখেই তিনি কথা বলেন, কিন্তু তাঁহার খড়মের শব্দ তখন একটু উচ্চ ও কঠোর হইয়া উঠে, দাঁড়ান ঈষৎ দৃঢ়তর ঋজু ভঙ্গিতে—খড়মের চাপ যেন একটু বেশী পড়ে। তাহাতেই কাজ হইয়া যায়, চঞ্চল গ্রাম-জীবন স্থির হইয়া শান্ত হয়। তাই বলিতেছিলাম, কৈলাসবাসী বিশ্বম্ভরের মতই পদনখাগ্রে গ্রামের বুকখানিকে চাপিয়া ধরেন।

শিবশেখর ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু ভাগবতেই তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ়। এই প্রগাঢ় অনুরাগের জন্যই তিনি প্রাচীন ধর্ম্মজীবনকে গ্রামখানির মধ্যে প্রাণপণ শক্তিতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন। মাত্র গ্রামের মধ্যেই তাঁহার প্রভাব অখণ্ড এবং প্রগাঢ় হইলেও খ্যাতি তাঁহার বহুবিস্তৃত—বাংলা দেশে একজন মনীষী বলিয়া তিনি বিখ্যাত। বিশেষ করিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য, আলোচনা করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে মধ্যে মধ্যে অনেক পণ্ডিত এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াও তাঁহার নিকট আসিতেন। সেবার এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন অধ্যাপকের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসিয়া তাঁহার সন্ধান পাইয়া

এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তিনিকেতন বিপ্রনান্দী হইতে মাইল দশেক পথ।

আলোচনা শেষ করিয়া ইউরোপীয় ভদ্রলোক হাসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকটিকে আপন ভাষায় কি বলিলেন। অধ্যাপক ঈষৎ হাসিয়া ন্যায়তীর্থকে বলিলেন, ইনি কি বলছেন জানেন?

ন্যায়তীর্থ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

অধ্যাপক বলিলেন—গ্রীক বীর আলেকজান্দার আমাদের দেশে এসে এক যোগী পুরুষকে দেখে বলেছিলেন, আমি যদি আলেকজান্দার না হতাম তবে এই ভারতের যোগী হ'তে চাইতাম। ইনিও ঠিক সেই কথাই বলছেন। বলছেন—ইউরোপে না জন্মালে আমি ভারতবর্ষে এমনি পণ্ডিত হয়ে জন্মগ্রহণের কামনা করতাম।

ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন—আমার এ ব্রাহ্মণ জন্ম না হলেও আমি কিন্তু এই দেশের কীটপতঙ্গ হয়েই জন্মাতে চাইতাম, অন্যত্র জন্ম-কামনা করতাম না।

ইউরোপীয় পণ্ডিতটি ন্যায়তীর্থের কথার মর্ম্ম শুনিয়া অতি মৃদু হাসিয়া অধ্যাপককে ইংরাজীতে বলিলেন—একে আমরা বলি ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

অধ্যাপকটির মুখ লাল হইয়া উঠিলেও ভদ্রতার খাতিরে কোন রূঢ় প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ন্যায়তীর্থ ইংরাজী বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু বক্তার হাসির রূপ ও ভঙ্গি হইতে ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সুরটুকু বেশ বুঝিলেন। তবুও তিনি কথাগুলির মর্ম্মার্থ বুঝিবার কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, প্রশান্ত হাসিমুখেই সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু ন্যায়তীর্থের বড়ছেলে শশীশেখর দৃঢ়স্বরে ইংরাজীতে বলিয়া উঠিল—না, ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নয়, এই তাঁর অন্তরের বিশ্বাস। তোমাদের পাশ্চাত্য বিদ্যায় মনকে তোমরা বুঝতে পার, কিন্তু তার বেশী কিছু পার না, আত্মাকে তোমরা চেন না। আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল চিত্তজয়, আত্মোপলব্ধি, আমাদের মন আত্মাকে পরিচালিত করে না, আত্মার নির্দ্দেশে মনকে চলতে হয় বাহনের মত।

ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; অধ্যাপকটি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন পাছে পরিণতিতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটিয়া যায়। ন্যায়তীর্থ বিপুল বিস্ময়ে বিস্মিত হইয়া শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তিনিই সে বিস্ময়কে জয় করিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—শশী, তুমি ওকে কি বলছ তার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু যা বলছ সেটা ভঙ্গিতে এবং স্বরে বড় রূঢ় ব'লে মনে হচ্ছে আমার। উনি আমাদের অতিথি, তুমি গৃহস্থ, আপন ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘন করছ।

শশিশেখর চুপ করিল। বক্তব্য তাহার শেষই হইয়াছিল, তবুও তাহার অবনত সঙ্কুচিত ও লজ্জিত ভঙ্গির মধ্যে ন্যায়তীর্থের আজ্ঞাপালনে আনুগত্যটুকু বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি শশিশেখরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—এই তরুণ বন্ধুটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

অধ্যাপক বলিলেন—ইনি ন্যায়তীর্থের পুত্র, শশিশেখর ন্যায়তীর্থ। এই বৎসরই ন্যায় উপাধি পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

—উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। বলিয়া শশিশেখরকে অভিবাদন করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিলেন—আমি বড় আনন্দ লাভ করলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। সকলের চেয়ে বেশী আনন্দ হ'ল আপনি ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেছেন। সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বার আপনার কাছে এখন উন্মুক্ত। আশা করি, নিতান্ত সংস্কারবশেই আপনি সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না।

শশিশেখর তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—সহস্র ধন্যবাদ আপনাকে। পাশ্চাত্য দর্শন পড়ব ব'লেই আমি ইংরেজী শিখেছি।

গ্রামের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইউরোপীয় পণ্ডিতটির সঙ্গে গিয়া বিদায় দিয়া শশিশেখর বাড়ী ফিরিল। খানিকটা আসিতে আসিতেই মন তাহার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তাহার গোপন কথা আজ উত্তেজনার অসতর্ক অবস্থায় পিতার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত ইংরেজী পড়িতে

ন্যায়তীর্থ বাধা দেন নাই। স্বীকার করিয়াছিলেন, রাজভাষা, সাংসারিক প্রয়োজনেও একটু দরকার। ইস্কুলের পড়াটা শেষ করাই ভাল।

শশিশেখর প্রথম বিভাগে বেশ কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিল। তাহার স্কুলের এক জন শিক্ষক ন্যায়তীর্থকে অনুরোধও করিল, আপনি শশীকে কলেজেই পড়তে দিন। ভবিষ্যতে ও খুব ভাল ফল করবে। অঙ্কে কাঁচা বলেই শশী বৃত্তি পেলে না, নইলে সংস্কৃতে ইংরেজীতে ও খুব ভাল ফল করেছে।

ন্যায়তীর্থ প্রসন্ন হাস্যের সহিত বলিয়াছিলেন, আপনি ভালবাসেন শশীকে, আপনার কল্যাণ হোক। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, সে হয় না মাষ্টার মশায়।

—কেন? ইংরেজী খারাপ কিসে?

তেমনি হাসিয়াই ন্যায়তীর্থ বলিলেন—না না, ইংরেজী বিদ্যার উপর আমার বিদ্বেষ নেই কিছু, তবে আস্থা নেই। আর আমাদের বংশগত বিদ্যার উপর একটা বিশেষ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস দুইই আছে। ইংরেজী জ্ঞানের দৃষ্টিটা নিতান্তই ইহলৌকিক, চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টির ওপারে আর তার গতি নেই। অথচ অবাঙ-মনস-গোচরের সাধনা আমাদের কুলধর্ম্ম। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়; সুতরাং ও অনুরোধ আর করবেন না।

মাষ্টার ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—আমাদের ইচ্ছা ছিল শশিশেখর সংস্কৃত এবং ইংরেজী দুইয়েই পণ্ডিত হয়।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—ওটা নিতান্তই বিলাতী ধরণে পিণ্ডরাঁধার ব্যবস্থা মাষ্টার মশাই। জীবনের সাধনা একমুখী হওয়াই ভাল। মন দ্বিধা বিভক্ত হ'লে অবস্থা হবে গরুর ক্ষুরের মত, দ্রুত চলার শক্তি হারিয়ে যাবে। জন্মান্তরের ফের বেড়ে যাবে।

মাষ্টার মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন শুধু, মুখে কিছু বলিলেন না। ন্যায়তীর্থ বলিলেন—আর শিখলেও তো খানিকটা। কাজ অনেকটা ওতেই চলে যাবে। মাষ্টার হাসিলেন, বলিলেন—ও যা শিখেছে তাতে ভাল করে কথা কওয়াও চলে না, ন্যায়তীর্থ মশাই!

এ অনেক দিনের কথা। ইহার পর শশিশেখর ন্যায়তীর্থের কাছেই কয়েক বৎসর পড়াশুনা করিয়া ব্যাকরণ পরীক্ষা দিল, তার পর সাহিত্য-অলঙ্কার পড়িয়া দর্শন পড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময়েই ন্যায়তীর্থ তাহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, চিকিৎসকের যেমন আপনার পরমাত্মীয়ের চিকিৎসা করা উচিত নয়, এও তেমনি আর কি! আমার অনেকগুলি ছাত্র, শশী এখানে পড়লে শিক্ষা আমার পক্ষপাতদুষ্ট হ'তে পারে।

শশিশেখর নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায় পড়িতে পড়িতে পিতার চোখের আড়ালের সুযোগ পাইয়া সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে ইংরেজীর চর্চ্চাও আরম্ভ করিল। মনীষী পিতার মেধাবী সন্তান সে, তাহার উপর ছিল জ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই সে পাশ্চাত্য দর্শন মোটামুটি পড়িয়া ফেলিল। শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও তাহার আয়ত্ত হইয়াছে। এ সংবাদ ন্যায়তীর্থের কাছে অতি যত্নে সে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাহা এমনি এক অভাবনীয় ঘটনা-সংস্থানে উত্তেজনাময় অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

শশিশেখর মনে মনে শঙ্কিত হইয়াই বাড়ী ফিরিল।

প্রশান্ত মুখেই ন্যায়তীর্থ বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া ইতিমধ্যেই একটি ক্ষুদ্র জনতা জমিয়া উঠিয়াছে। এক দিকে টোলের ছাত্রেরা দাঁড়াইয়া আছে, ন্যায়তীর্থের কয়েক জন বন্ধু ও মুগ্ধ ভক্ত একখানি কম্বল বিছাইয়া আসর করিয়া সম্মুখেই বসিয়াছে, গ্রামের কতকগুলি কিশোর ও যুবক ছেলেও আসিয়াছে, এমন কি সদ্গোপ-পাড়ারও জন তিনেক মণ্ডল আসিয়া বারান্দার নীচে উপু হইয়া বসিয়া আছে।

কোন একটা কথা হইতেছিল। শশিশেখর আসিয়া দাঁড়াইতে কথাটার যেন মোড় ফিরিয়া গেল। ন্যায়তীর্থের বন্ধু হিরণ্যভূষণ চক্রবর্ত্তী শশীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—এস, বাবাজী এস। তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছ। মহৎ থেকেই মহত্তের উদ্ভব হয়, উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান তুমি। তোমা হ'তে বিপ্রনান্দীর গৌরব বজায় থাকবে। বলিহারি

বলিহারি! ইংরেজী ব'লে গেলে তুমি, একবারে ঝর ঝর ক'রে! খাজা বিলিতী সাহেবের সঙ্গে!

প্রৌঢ় হরিশ চাটুজ্জেও ন্যায়তীর্থের বন্ধু, গ্রামের মধ্যে তিনি বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি, তিনি বলিলেন—কথাটা তোমার ঠিক হ'ল না হিরণ্য। শশিশেখর হ'তে গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি হবে। ন্যায়তীর্থের বংশের মুখ আরও উজ্জ্বল হবে। পুত্রের কাছে পরাজয় মহাভাগ্যের কথা। শিবশেখর ধার্ম্মিক জ্ঞানী, জ্ঞানবান পুণ্যবানের বংশ, এমন ভাগ্য শিবশেখরের হবে না তো কি হবে তোমার আমার? পুণ্যবল না থাকলে কি ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়?

শশিশেখরের শঙ্কা ইহাতেও দূর হইল না, সে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ন্যায়তীর্থের মুখ প্রসন্ন, এতক্ষণে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, দশের আশীর্ব্বাদই হ'ল ভগবানের আশীর্ব্বাদ। এ সমস্তই হ'ল তোমাদের দশ জনের স্নেহের ফল হরিশ। এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন শশী স্বধর্ম্মচ্যুত না হয়।

হরিশ চাটুজ্জে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—সহস্র বার লক্ষ বার সে আশীর্ব্বাদ করি এবং আজও করছি শিবশেখর।

হরিশের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ বাক্যকে সমর্থন করিয়া একটি মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তুলিয়া ফেলিলেন। শশিশেখর অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, এমন ভাবে প্রশংসার অজস্র বর্ষণের মধ্যে চোখ তুলিয়া সে যেন দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। ন্যায়তীর্থ বলিলেন, প্রণাম কর শশী। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন আর তুমি প্রণাম করতে ভুলে গেলে! ইংরেজী শিক্ষা না ক'রে যদি শুধু সংস্কৃত শাস্ত্র পড়তে, তবে এ ভুল তোমার কখনই হ'ত না!

শশিশেখর অতিমাত্রায় লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি সকলকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। হরিশ কিন্তু বলিলেন, এটা তোমার বক্রোক্তি হ'ল ভাই ন্যায়তীর্থ! শুধু বক্রই নয় তীক্ষ্ণও যথেষ্ট পরিমাণে।

ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন, অলঙ্কৃত করতে গেলেই নাক কান সূচ দিয়ে ফুঁড়তে হয় হরিশ। সূচ তীক্ষ্ণ এবং অলঙ্কারগুলি এ ক্ষেত্রে বক্রই হয়ে থাকে।

ঠিক এই সময়েই সকলকে প্রণাম শেষ করিয়া শশিশেখর ন্যায়তীর্থকে প্রণাম করিল। ন্যায়তীর্থের অসাধারণ সংযম সত্ত্বেও চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখে তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু হাতখানি ছেলের মাথার উপরে রাখিলেন।

হিরণ্যভূষণ বলিলেন—কিন্তু তুমি এমন ইংরেজী কেমন ক'রে শিখলে শশী? একেবারে ঝর ঝর ক'রে জলের মত ব'লে গেলে! কি বলে, এনটেরান্স-না-ম্যাট্রিক পাস তো হামেসাই দেখছি হে, বি. এ. এম. এ. পাস করা উকীলের বহরও দেখেছি। একবারে ঝর ঝর ক'রে জলের মত, অ্যাঁ!

শশী কুণ্ঠিত ভাবে সংক্ষেপে ইংরেজী শেখার ইতিহাস প্রকাশ করিয়া বলিয়া অপরাধীর মতই ন্যায়তীর্থের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিশ শশীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা খানিকটা অনুমান করিয়া লইলেন, শিবশেখর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন—শশীকে এর জন্যে তোমার পুরস্কৃত করা উচিত শিবশেখর। শশিশেখরের এ সাধনা একলব্যের সাধনার সঙ্গে তুলনীয়।

শিবশেখর হাসিয়া বলিলেন—পুরস্কৃত না করলেও তিরস্কার করব না হরিশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছি।

হরিশও হাসিয়া বলিলেন—বুঝবে বইকি শিবশেখর, আমাদের পরস্পরকে জানা যে অনেক দিনের! বাল্যকালে চীৎকার ক'রে ডাকলে তুমি চীৎকার ক'রে সাড়া দিয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে, আবার আম-জাম চুরির মতলব নিয়ে যখন চুপি চুপি জানলার ধারে দাঁড়াতাম তখন তুমিও বেরিয়ে আসতে চুপি চুপি, খিড়কির দোর দিয়ে। আমাকে বুঝতে কোন দিনই তোমার ভুল হয় না। যে-দিন ভুল হবে সে-দিন বুঝব তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছ, মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়েছে তোমার। সে-দিন তুমি তোমার গৃহিণীকেও বুঝতে পারবে না।

শিবশেখরের অন্তরঙ্গের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শশিশেখর এবং অল্পবয়স্কেরা লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিল; শিবশেখরও লজ্জিত হইলেন, মৃদু

হাসিয়া বলিলেন—রসের আধিক্য হ'লে বিকার হয় হরিশ। তুমি বৈদ্যের শরণাপন্ন হও।

হরিশ বলিলেন—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও তো তোমার পড়াশোনা আছে ন্যায়তীর্থ; আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে তোমার আহ্বান রইল। ষড়রস আস্বাদন করতে করতে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে। বাবাজীকেও নিয়ে যেতে হবে। বাবাজীকে খাইয়ে দাইয়ে তার পর দুজনে ব'সে একসঙ্গে খাব। বুঝলে!

* * * *

মজলিস শেষ করিয়া ন্যায়তীর্থ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, গৃহিণী যেন প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে তাঁহার শঙ্কার ছায়া। ব্যস্ত হইয়া ন্যায়তীর্থ প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছে শিবরাণী, তুমি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে?

শিবরাণী কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—হ্যাঁ গো, শশী না কি তোমাকে না জানিয়ে ইংরেজী শিখেছে?

হাসিয়া শিবশেখর বলিলেন—হ্যাঁ। সায়েবটির সঙ্গে চমৎকার ইংরেজীতে কথা কইলে। তুমি রত্নগর্ভা।

—তুমি রাগ করেছ? সত্যিই শশী অন্যায় করেছে।

—না না না, রাগ করব কেন শিবরাণী, শশী আমাদের বংশগৌরব উজ্জ্বল করেছে। এ কি রাগ করবার কথা?

এতক্ষণে শিবরাণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন—আমার কিন্তু ভারি ভয় হয়েছিল। তার উপর খড়মের শব্দ শুনে—আজ তোমার খড়মের শব্দ টোলের বারান্দা থেকে শোনা যাচ্ছিল!

শিবশেখর শিবরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—রাগ নয়, দুঃখ আমার হয়েছিল শিবরাণী; শশিশেখরের এ কথাটা এতদিন ধরে আমার কাছে গোপন ক'রে রাখাটা উচিত হয় নি।

সন্তানের অপরাধ শিবরাণীই যেন মাথায় করিয়া লইলেন, মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন—সত্যিই এ শশীর অপরাধ! আমি শশীকে বলব।

—না না না। উপযুক্ত ছেলে, তা ছাড়া—শশী আজও পর্য্যন্ত কোন দুঃখ আমাদের দেয় নি। এ নিয়ে তাকে কিছু বললে, সে কি মনে করবে! তা ছাড়া বউমা কি মনে করবেন?

—কি মনে করবেন? শশীই বা কি মনে করবে? কেন করবে? শিবরাণী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবশেখর বলিলেন—নাঃ, অপরাধের চেয়ে গুণের পরিচয়ই শশীর বেশী। তাকে আমার পুরস্কৃত করাই উচিত। তুমি অনিরুদ্ধ স্বর্ণকারকে একবার ডাকাবে তো, বউমার জন্যে একজোড়া রুলি গড়তে দেব, শশীর জন্যে একটি আংটি আর চন্দ্রশেখরের জন্যে বিছেহার।

চন্দ্রশেখর শশিশেখরের এক বৎসরের খোকা।

শিবরাণী হাসিয়া বলিলেন, আর ছেলের মা বুঝি বাদ যাবে?

ন্যায়তীর্থও হাসিলেন, বলিলেন—স্ত্রীলোকের ঈর্ষা সাহিত্যকারদের মিথ্যা কল্পনা নয়; অলঙ্কারের বিষয়ে মাতা কন্যার ঈর্ষা করে—কন্যা মাতার ঈর্ষা করে।

শিবরাণী ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—আর পুরুষেরা?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—পুরুষেরা যা নিয়ে বিবাদ করে, ঈর্ষা করে, ভগবান তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। সাম্রাজ্য দূরের কথা—সামান্য বিষয়ও আমার নেই শিবরাণী! ক-বিঘে ব্রহ্মত্র, তাও নারায়ণের। দাও, এখন আমার আহ্নিকের জায়গা ক'রে দাও!

পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মাটির ঘর, দেয়ালগুলি রাঙা মাটির গোলা দিয়া নিকানো; প্রদীপের মৃদু আলোয় চারি দিকে একটি নম্র পরিচ্ছন্ন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পিলসুজের উপর প্রদীপটি জ্বলিতেছিল, তাহারই সম্মুখে আসনের উপর বসিয়া শশিশেখর কি লিখিতেছিল। ঘরের ভেজান দুয়ার ঠেলিয়া শিবশেখর ঘরে প্রবেশ করিলেন। শশিশেখর কিন্তু মুখ ফিরাইল না, পিছন দিক হইতেও শিবশেখর পুত্রের একাগ্রতার গভীরতা সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করিলেন। একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই ডাকিলেন—শশী!

শশী সে আহ্বানে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া গেল।

তাহার বিবাহের পর ন্যায়তীর্থ কখনও তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করেন নাই। শিবশেখর কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, কোন আলোচনা করছ বুঝি?

শশী ততক্ষণে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাপের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল—আমাকে কিছু বলছেন?

হাসিয়া শিবশেখর বলিলেন—আমাকে দেখে এত চঞ্চল হচ্ছ কেন শশী! তুমি উপযুক্ত হয়েছ, পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছ। এখন আমরা পিতাপুত্রে আলোচনা করব, তর্ক করব।

শশী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তোমার কাছে আমার কিছু শিক্ষার বিষয় আছে শশী। পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমি তোমার কাছে পেতে চাই, ইংরেজী ভাষা আমি জানি না। তুমি আমায় অনুবাদ ক'রে বলবে, আমি শুনব।

শশিশেখর এবারও মুখে কথায় জবাব দিল না, নীরবে বাপের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় স্পর্শ করিল। স্নেহের উচ্ছ্বসিত আবেগে ন্যায়তীর্থের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, তুমি আমার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র। তুমি দীর্ঘজীবী হও, ধর্ম্মে জ্ঞানে নিষ্ঠা তোমার অটুট থাক।

শশী নীরবে মাথা নত করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। শিবশেখর বোধ করি শশীর একাগ্রতার কথা এখনও ভুলিতে পারেন নাই, তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—এমন একাগ্রভাবে কি লিখছিলে শশী? কোন পত্র কি?

শশী কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বলিল—আজ্ঞে না। আমি বেদান্ত ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করছি।

ন্যায়তীর্থের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি কোনও কথা না বলিয়া বিপুল আগ্রহে শশীর আসনে বসিয়া খাতাখানি টানিয়া লইলেন। পরক্ষণেই বলিলেন, আমার চশমা জোড়াটা আন তো শশী।

শশী চশমা আনিয়া হাতে দিতেই গভীর মনঃসংযোগ করিয়া শশীর লেখার উপর তিনি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলেন।

শব্দস্পর্শাদয়োবেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততোবিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপান্ন ভিদ্যতে॥

ন্যায়তীর্থ শ্লোকের নীচে টীকায় মনোনিবেশ করিলেন। অদ্ভুত! এত চমৎকার টীকা করিয়াছে শশিশেখর! ন্যায়তীর্থ শ্লোকের পর শ্লোক, পাতার পর পাতা পড়িয়া চলিলেন।

রাত্রি প্রায় দু-পহর হইয়া আসিল। গৃহিণী শিবরাণী আসিয়া সাড়া দিয়া কাশিয়া স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন। ন্যায়তীর্থ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পড়িতে পড়িতেই বলিলেন—কি, হ'ল কি?

—রাত্রি যে দুপুর গড়িয়ে এল।

—কি হয়েছে তাতে। আমার শুতে বিলম্ব আছে।

—তা থাকুক। বউমা চাঁদকে কোলে ক'রে দাওয়ায় ব'সে ব'সে ঢুলছেন। মশায় যে খেয়ে ফেললে! শশীও যে শুতে পাচ্ছে না!

—ও! বলিয়া তিনি খাতার পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া আবার বলিলেন, এই দুখানা পৃষ্ঠা হয়ে গেলেই তত্ত্ব-বিবেক অধ্যায়টা শেষ হবে। একটু অপেক্ষা কর।

অধ্যায়টি শেষ করিয়া তিনি খাতাখানি হাতে করিয়া উঠিয়া আপনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। শিবরাণী প্রশ্ন করিলেন, শশী গ্রন্থ রচনা করেছে?

বেদান্তের প্রভাব হইতে তখনও ন্যায়তীর্থ মুক্ত হন নাই; তবুও একাগ্র গম্ভীর মুখে অল্প একটু হাসি টানিয়া বলিলেন—হুঁ।

স্নেহ-গৌরবে পুলকিত শিবরাণী বলিলেন—কেমন হয়েছে?

—সুন্দর, চমৎকার! কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—সঠিক এখন বুঝতে পারি নি, তবে মনে হচ্ছে যেন জ্ঞানের শুষ্কতা একটু প্রকট হয়ে উঠেছে।

শিবরাণী তেলের বাটি, জল ও গামছা লইয়া স্বামীর পায়ের তলায় বসিয়া বলিলেন—সে তুমি দেখে-শুনে দিয়ো।

ন্যায়তীর্থ চিন্তা-বিভোর অবস্থাতেই বলিলেন—দেব।

স্বামীর একটি পা টানিয়া লইয়া শিবরাণী বলিলেন—এত ভাবছ বল তো?

মৃদু হাসিয়া এবার যেন কতকটা সচেতন ভাবে তীর্থ বলিলেন,—বড় কঠিন চিন্তা করছিলাম শিবরাণী। ভোগের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে মনে।

শিবরাণী রহস্যের সুরেই হাসিয়া বলিলেন—আমার মুস্কিল হয়েছে বাপু, স্বামী পণ্ডিত, ছেলে পণ্ডিত, কে কি বলছে মূর্খ মানুষ আমি বুঝতেই পারি না! আবার চাঁদটা, সেও এক পণ্ডিত হবে আর কি!

গম্ভীর মুখে ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এইবার সংসার ত্যাগ র ভগবানের শরণ নেওয়া উচিত হয়েছে শিবরাণী। প্রলোভনও হচ্ছে এমন ছেলে নিয়ে ঘর করি। -বেটায় মিলে আগেকার কালের মত পাণ্ডিত্যে জয় ক'রে আসি। কিন্তু বর্ত্তমানের সুখের মধ্যেই ক ভবিষ্যতের দুঃখ লুকিয়ে থাকে, সেই হেতু ফলভোগের কোর গীতায় নিষিদ্ধ। চল, এইবার আমরা কোনও র্থ গিয়ে বাস করব।

শিবরাণী অবাক হইয়া গেলেন। ন্যায়তীর্থের এমন ল্পর কথা তাঁহার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত, র পূর্ব্বে কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও ন্যায়তীর্থ প্রকাশ রন নাই, শিবরাণীও আভাসে পর্য্যন্ত অনুমান করিতে রন নাই।

কিছুক্ষণ পর বিস্ময়ের ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়া তিনি লেন—তোমার যত উদ্ভট কল্পনা! সুখের মধ্যে খ লুকিয়ে থাকে! আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া াটা যেন ভাবিয়া বুঝিয়া দেখিলেন, তার পর বলিলেন, কে তো থাক। এই যদি বিধানই হয় তবে মাথা পেতে তেও হবে তা।

ন্যায়রত্ন চুপ করিয়া রহিলেন। এমনই ধারার উদ্ভট স্থায় মন তাহার উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে।

* * *

প্রগাঢ় যত্নের সহিত সমস্ত খাতাখানি পড়িয়া অনেক স্তা করিয়া শশিশেখরের রচনার কয়েকটি স্থান ন্যায়তীর্থ শোধন করিয়া দিলেন। শশিশেখর খাতাখানি লইয়া ঘরে আসিয়া সংশোধন করা জায়গাগুলি দেখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম সংশোধন শশী দেখিল—'সুস্পষ্ট' শব্দটিকে কাটিয়া ন্যায়তীর্থ লিখিয়াছেন 'বিস্পষ্ট'। আবার সে পাতা উল্টাইল। বেলা অনেক হইয়াছিল, শশিশেখরের বধূ চারু আসিয়া বলিল—মা স্নান করতে বললেন। বেলা কত হয়েছে দেখ তো!

শশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খাতাটির সংশোধিত পাতাগুলিতে কাগজ দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল। শিবরাণী নিজেই ততক্ষণে আসিয়া হাজির হইলেন, বলিলেন—বাবা, তোমাদের বাপ-বেটার বিদ্যের আঁচে আমাদের শাশুড়ী-বউয়ের হাড়ে কালি পড়ল। গরম ভাত যে কেমন, তা ভুলেই গেলাম।

শশিশেখর অপরাধ বোধ করিল—তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—কই, এর আগে তো ডাক নি তুমি!

শিবরাণী হাসিয়া বলিলেন—দোষ হয়েছে বাবা! তোমাদের ক্ষিদে পেয়েছে, সেটা আমার মনে ক'রে দেওয়া উচিত ছিল! ক্ষিদে-তেষ্টা বুঝতে না-পারা পণ্ডিতদের একটা লক্ষণ, ওটা আমি জানতাম না! ব'স আমি পিঠে তেলটা দিয়ে দিই। ছেলের পিঠে তেল দিতে দিতে শিবরাণী বলিলেন—হ্যাঁরে, কর্ত্তা তোর খাতা দেখে কেটেকুটে ঠিক ক'রে দিলেন?

শশিশেখর চিন্তান্বিত হইয়াই তেল মাখিতেছিল, মায়ের কথা তাহার কানে ঢুকিলেও মনকে যেন স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না, সে চিন্তা-বিভোর ভাবেই উত্তর দিল—হ্যাঁ, দিয়েছেন।

শিবরাণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কি ভাবছিস এত?

শশী উত্তর দিল—ভাবি নি। এমনি আর কি!

রাত্রেও শশী এমনি চিন্তান্বিত ভাবে খাতাখানি খুলিয়া বসিয়াছিল। চারু আসিয়া ছেলেকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বামীকে এমনি ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—হ্যাঁ গো, তুমি সারাদিন এমন ক'রে কি ভাবছ বল তো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল—বড় সমস্যায়

পড়েছি চারু! বোধ হয় এমন সমস্যায় জীবনে কখনও পড়ি নি।

চারু বলিল—বেশ! ঠাকুরের কাছে যাও না। দেশ-বিদেশের লোক এসে তোমার বাপের কাছ থেকে মুস্কিলের আসান ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি ঘরে ব'সে মুস্কিল নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছ!

শশী কথার উত্তর দিল না, একটু হাসিল।

চারুর মনে হইল শশী তাহাকেই অবজ্ঞা করিয়া হাসিল, ই জন্য সে রাগ করিয়াই প্রশ্ন করিল—হাসলে যে?

শশী আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—রজাটা বন্ধ ক'রে দাও। তার পর বলছি। চারু দরজা বন্ধ রিয়া দিল, শশী বলিল—ব'স এইখানে, একটা পরামর্শ ও দেখি। তুমি আমার সচিব, সখী, অনেক কিছু। কথা তুমি ছাড়া আর কাউকে বলার আমার উপায় নেই, 'কে পর্য্যন্ত না। কথা যে বাবাকে নিয়েই।

কথাটার ভূমিকা শুনিয়াই চারু ভয় পাইয়া গেল, সে স্কৃত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শশী বলিল অত্যন্ত মৃদুস্বরে—বাবা যে সংশোধন-লি করেছেন, সেগুলি ভাষার দিক দিয়েই তিনি সংশোধন রছেন, দু-এক জায়গায় বৌদ্ধ-শূন্যবাদ সম্পর্কে মন্তব্যে নি অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়েছেন। কিন্তু দুই-ই মার মতে অন্যায় হয়েছে। ভাষার দিক দিয়ে প্রাচীন া অনুযায়ী আধুনিক লেখার সংশোধন খাপ খায় না; হয় শুনতে, আরও অনেক দোষ হয়। আর বৌদ্ধ-বাদ কেউ গ্রহণ করতে না পারে, কিন্তু বিদ্বেষ নিয়ে ক বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে গ্রন্থকারকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ; হবে।

চারুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, ভয়ার্ত্ত অথচ মৃদুস্বরে সে ল—না না, ওগো বাবাকে তুমি অমান্য ক'র না। শশী চিন্তিত ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে কারের ভঙ্গীতে ধীরভাবে বার কয় মাথা নাড়িয়া রে বলিল—না। জ্ঞান হ'ল সত্য, সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারি না চারু।

দিনের রঙ-করা মাটির পুতুলের মতই চারু বসিয়া

কয়েক দিন পর সে দিন প্রাতঃকালেই টোলের একটি ছাত্র বাড়ীর ভিতর আসিয়া শশিশেখরকে ডাকিল, অধ্যাপক মশায় ডাকছেন আপনাকে।

শশী সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া আসিল। টোলের ছেলেরা বারান্দায় বসিয়া পড়িতেছে, ন্যায়তীর্থ অভ্যাসমত ছোট চৌকীটির উপর বসিয়া আছেন, শশী আসিয়া বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিল, আমাকে ডেকেছেন?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—হ্যাঁ। ব'স। তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে। ব'স কম্বলের উপর ব'স। দেখ, কয়েক দিন ধরেই আমি একটা কথা ভাবছি। ন্যায়তীর্থ চুপ করিলেন, শশীও প্রশ্ন না করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ন্যায়তীর্থ বলিলেন, ভাগবতধর্ম্মের তত্ত্বব্যাখ্যা বোধ হয় আমার লিপিবদ্ধ ক'রে যাওয়া উচিত। কি বল তুমি?

শশী উৎসাহিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। এটা আপনার কর্ত্তব্য ব'লে আমার মনে হয়।

—তা হ'লে আরম্ভ ক'রে দেওয়াই উচিত, কি বল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবার মৃদু হাসিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—দেখ, কাজটা আমি আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। অপেক্ষা কর, আমি আসছি। বলিয়া তিনি উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া খালি পায়েই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। শশী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাপের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও তাঁহার আজিকার এই উৎসাহ দেখিয়া সে মনে মনে কৌতুক বোধ না করিয়া পারিল না। চারি দিকে ছাত্রেরা মৃদুগুঞ্জনে পড়িতেছে; তাহারই মধ্য হইতে সহসা একটা কথা যেন তাহার কানে আসিয়া খট্ করিয়া বাজিল। কথাটা—বিস্পষ্ট। শশী ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিল—শোন। 'বিস্পষ্ট' না ব'লে 'সুস্পষ্ট' বল। 'বিস্পষ্ট' কথাটা ধ্বনির দিক দিয়ে রূঢ় আর ব্যবহারেও প্রায় অপ্রচলিত।

ছেলেটি বলি—আজ্ঞে না, ওটা বিশেষ রূপে স্পষ্ট কিনা। সু-শব্দে সুন্দরদ্যোতক—ওতে কাব্যের মাধুর্য্য আছে।

হাসিয়া শশী বলিল—তা হ'লে সুকঠিন প্রয়োগ বিধিটা ভুল হ'ত। প্রচলনভেদে ধাতুগত অর্থের তারতম্য হয়ে

যায়, সেটাকে স্বীকার ক'রে নিলে শব্দের মধ্যে অর্থের ব্যাপকতা বাড়ে; তাতে ভাষার গৌরব বৃদ্ধিই হয়।

ঠিক এই সময়েই গলার সাড়া দিয়া ন্যায়তীর্থ বাহির হইয়া আসিলেন।

আসনে বসিয়া খাতাখানি কোলের উপর রাখিলেন, তার পর বলিলেন, তুমি 'বিস্পষ্ট' স্থলে 'সুস্পষ্ট' ব্যবহারের পক্ষপাতী শশী?

শশী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। শব্দের ধ্বনি—

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তোমার যুক্তি শুনেছি আমি। তারপর ছাত্রটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, ওটা তুমি এখন 'বিস্পষ্ট'ই পড়ে যাও, পরে আমি বিচার ক'রে দেখব।

ছাত্রটি চলিয়া গেল। ন্যায়তীর্থ নীরব হইয়াই বসিয়া রহিলেন, খাতাখানি কোলের উপরেই পড়িয়া রহিল; তিনিও শশীর হাতে তুলিয়া দিলেন না, শশীও নিজে হাত বাড়াইয়া লইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শশী বলিল—তা হ'লে—

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—হ্যাঁ, যেতে পার তুমি। মনে খানিকটা উত্তাপ জমা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে যেন তাঁহার কোন হাত ছিল না। ধীরে ধীরে সে উত্তাপ কমিয়া আসিলে মনে মনে তিনি শশীর যুক্তিকে স্বীকার করিয়া লইলেন। ছাত্রটিকে ডাকিয়া এ কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি শশীকে কথাটা জানানো প্রয়োজন মনে করিলেন। শশীর রচনার মধ্যেও তিনি প্রথমেই 'সুস্পষ্ট'কে কাটিয়া 'বিস্পষ্ট' করিয়াছেন। সেটিও নিজে হাতে কাটিয়া দিবার সঙ্কল্প লইয়া শশীর ঘরের দুয়ারে আসিয়া ডাকিলেন—শশী।

ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিল পুত্রবধূ চারু। ন্যায়তীর্থ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শশী নাই। চারু ঘর পরিষ্কার করিতেছিল। ন্যায়তীর্থ বাহির হইতে গিয়া আবার ফিরিলেন, শশীর কলমটি তুলিয়া লইয়া খাতাখানি খুলিলেন। দেখিয়াও তিনি যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার লেখা 'বিস্পষ্ট' শব্দ কাটিয়া আবার "সুস্পষ্ট' লেখা হইয়া গিয়াছে! কলমটি তিনি রাখিয়া দিলেন। তারপর একে একে পাতা উল্টাইয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত সংশোধন শশী কাটিয়া দিয়াছে! ন্যায়তীর্থের হাত কাঁপিতেছিল, খাতার লেখা সেই কম্পনহেতু আর পড়া যায় না; তিনি খাতাখানি রাখিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেওয়ালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—বউমা, খড়ম জোড়াটা এগিয়ে দাও তো।

চারু খড়ম জোড়াটি আনিয়া একরূপ পায়ে পরাইয়া দিল। ন্যায়তীর্থ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। চারু শঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া গেল, নীচে রান্নাঘরে শিবরাণীর হাতের দ্রুত সঞ্চালিত খুন্তি স্তব্ধ হইয়া গেল। এ কেমন খড়মের শব্দ! এত উচ্চ কঠিন অথচ অপটু পায়ের চালিত খড়মের শব্দের মত অস্বচ্ছন্দ অথবা পায়ের অস্থিরতা হেতু অসমছন্দ!

ন্যায়তীর্থ যেন অতিমাত্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন, অথচ সেই স্তব্ধতার মধ্যে তাঁহার নিকটে আসিবার অবসরও কেহ পায় না। পুঁথির সাগরে তিনি ডুব দিয়াছেন। যে সময়টা পড়েন না, সে সময় তিনি ঠিক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। কথা বলিলে দুই-একটার উত্তর দেন; বাকীগুলি নিরুত্তরই রহিয়া যায়। সেদিন তখন তিনি বসিয়াই ছিলেন, বন্ধু হরিশ চাটুজ্জে একখানি কাগজ হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ন্যায়তীর্থ সংক্ষেপে আহ্বান করিলেন—এস!

হরিশ স্থূল দেহখানি লইয়া ধপ করিয়া কম্বলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—হ্যাঃ, হাঁপ ধরে গেল, মোটা শরীর নিয়ে ছোটা কি সোজা কথা! জিভ বেরিয়ে গেল। ক'টি মেয়ে দেখে যা হাসলে শিবশেখর, লজ্জায় আমি থেমে গেলাম।

ন্যায়তীর্থ অল্প হাসিলেন, নিতান্ত ভদ্রতা রক্ষার জন্য শুষ্ক হাসি। হরিশ কাগজখানি ন্যায়তীর্থের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—নাও দেখ!

—কি?

—সেই সায়েবের কাণ্ড। 'ভারতে কি দেখিলাম' তাই লিখেছে খবরের কাগজে। এখানকার কথা তোমাদের পিতা-পুত্রের খুব প্রশংসা ক'রে সব লিখেছে। অমর আমাকে পত্র লিখেছে, কাগজও পাঠিয়ে দিয়েছে। অমর হরিশের বড় ছেলে—কলিকাতায় চাকরি করে।

কাগজখানি হাতে লইয়া ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন - দুধ বলে পিটুলি গোলা খাওয়াচ্ছ যে! এ যে ইংরাজী!

হরিশ বলিলেন—বাবাজী কই, আমাদের পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিতপ্রবর? পড়ুক, পড়ে শোনাক আমাদের! তবে অমর লিখেছে আমাকে মোটামুটি। সায়েব বলেছে, বলিয়া পকেট হইতে অমরের পত্র বাহির করিয়া পড়িলেন—একটি বন্য দুর্গম গ্রামের মধ্যে এমন প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার। সমুদ্রের তলদেশের মণিরত্নের মতই এর তুলনা করা যায়। অথচ দেশের গভর্ণমেণ্ট এঁদের খোঁজ রাখেন না, এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু হ'তে পারে না। পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ ভারতীয় ধর্ম্ম-সংস্কৃতিতে মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পুত্র সংস্কৃত এবং ইংরেজী উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত, প্রাচ্য-প্রতীচ্য দর্শনে ইনি পিতার মতই সুপণ্ডিত। ভাবীকালে এঁর ভবিষ্যৎ—

বাধা দিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—থাক। প্রশংসার কামনায় শাস্ত্র-চর্চ্চা করি নি হরিশ, ওতে আমার প্রয়োজন নাই। ওটা বরং শশীকে পাঠিয়ে দাও। তরুণ বয়স—তাতে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাব কিছু আছে—সে পড়ে খুশী হবে।

হরিশ হাসিয়া বলিলেন—সেই ভাল, ওহে, এটা আমাদের বাবাজীকে দিয়ে এস তো; কি নাম তোমার?

একটি টোলের ছেলের হাতে কাগজখানি শশীকে পাঠাইয়া দিলেন।

হরিশ বলিলেন—কিন্তু তোমার এমন ভাবান্তর হ'ল কেন বল দেখি? তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ!

শিবশেখর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তোমার কাছে গোপন করব না হরিশ। আমি বড় অশান্তি ভোগ করছি; ভবিষ্যতের চিন্তায় একটু ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। এই টোল দেবসেবা চলবে কি ক'রে?

হরিশ বলিলেন—তোমার এমন পণ্ডিত পুত্র—

বাধা দিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—এ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তো অন্নবস্ত্র হয় না হরিশ! অর্থের প্রয়োজন, দিন দিন সংসার বাড়ছে! কিন্তু শশী বাড়ী থেকে বেরোবে না। আমি তাকে বলতেও পারছি না। তুমি যদি তাকে একটু বুঝিয়ে বল হরিশ!

হরিশ কিছু বলিবার পূর্ব্বে শশীই কাগজখানি হাতে বাহির হইয়া আসিল। প্রসঙ্গটা তখনকার মত বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু অপরাহ্ণে শশী নিজেই প্রসঙ্গটা তুলিয়া, বলিল, আমি এইবার বাড়ী থেকে বের হতে চাই বাবা; উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে চাই আমি।

পলকের জন্য ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া সম্মুখে নিবদ্ধ করিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—বেশ!

মাইল কয়েক দূরে মঙকুমা শহরে শশিশেখর এক টোল খুলিয়া বসিল। চাকরির চেষ্টা সে করিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপকটির কাছেও সে গিয়াছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অভাবে সেখানে সম্মানজনক কোন পদ লাভ সম্ভব হয় নাই। স্কুলে চাকরির ব্যবস্থা হইতে পারিত, কিন্তু শশী নিজেই তাহা প্রত্যাখান করিল, হাসিয়া বলিল—ষড়দর্শন পড়ে অবশেষে 'কালোৎপাটীব-বানর কথা' পড়াতে পারব না আমি, মাপ করবেন।

দেশে ফিরিয়া এই শহরটির কয়েক জন সরকারী কর্ম্মচারীর উৎসাহে সে টোল খুলিয়া বসিল। সেই ইউরোপীয় পণ্ডিতটির লেখার কথা ইহারই মধ্যে দেশে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীরা শশিশেখর সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, আপনি আরম্ভ করুন টোল; সরকারী সাহায্য আমরা যেমন ক'রে হোক ক'রে দেব।

শশী টোল খুলিয়া প্রচার করিল প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্য দর্শনের মর্ম্মও সে ছাত্রদের শিক্ষা দিবে।

অকস্মাৎ সেদিন পিতৃবন্ধু হরিশ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে অমর শশীর টোলে আসিয়া হাজির হইল। কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার পথে ষ্টেশনে নামিয়া গাড়ী না পাইয়া শশীর শরণাপন্ন হইল। পরম সমাদরে শশী অভ্যর্থনা করিয়া তাহার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল

অমর বলিল—তুমি. ভাই, এমন খাতির করলে তো আমাকে বিদেয় নিতে হয় এখুনি।

শাস্ত্রজ্ঞ. পণ্ডিতটি অপ্রতিভের মত হাসিল মাত্র, উত্তর দিতে পারিল না। অমর বলিল—তুমি শুধু বন্ধু নও। তুমি আমাদের গৌরব। সেদিন কাগজে যখন ঐ লেখাটা পড়লাম শশী, তখন বলব কি তোমাকে, আনন্দে আমার চোখে জল এল। আমাদের মেসের প্রত্যেককে আমি কাগজখানা দেখিয়েছি, আর বলেছি—দেখ, আমাদের গ্রাম কেমন দেখ!

শশীর চোখমুখ এবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেও লজ্জিত ভাবে বৃষ্টিধারনমিত ফলবান বৃক্ষের মতই মাথা নত করিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শশী বলিল—তোমাকে পত্র আমি লিখতাম অমর, তা দেখা হয়ে গেল ভালই হ'ল। কিছু চাঁদা তোমাকে লাগবে!

—তোমার টোলের জন্যে?

—না না। আমাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর সুধাকৃষ্ণ মুখুজ্জে মশায় উদ্যোগ ক'রে জেলাতে এবার পণ্ডিত-সভা আহ্বান করেছেন, আমায় করেছেন সম্পাদক। অবশ্য টাকাকড়ি সায়েবের ঠেলাতেই উঠবে। তবু সম্পাদক যখন হয়েছি তখন আমি দু-দশ টাকা যা পারি তুলবার চেষ্টা করছি।

অমর একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বলিল—নিশ্চয় দেব। আর কলকাতায় আমাদের জেলার যে-সব লোক আছেন—তাঁদের কাছেও যাব আমি। তুমি বরং সায়েবের সই-করা কয়েকখানা চিঠি আমায় দিয়ো। জ্যেঠামশায় নিশ্চয় সভাপতি হবেন?

—না, তাঁকে অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি করা হয়েছে। কাশীর মহামহোপাধ্যায় শ্যামাচরণ তর্করত্ন হবেন সভাপতি।

—বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে! তার পর নীরবে কিছুক্ষণ অমর যেন কল্পনায় সভার ভাবী রূপ দেখিয়া লইয়া আবার বলিল—তোমরা বাপ-বেটায় একদিকে দাঁড়ালে যেখান থেকেই যিনি আসুন শশী, আমাদের জেলারই জয় হবে এ একেবারে নিশ্চিত।

শশী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পরাধীন দেশে পাণ্ডিত্যের কোন অর্থ হয় না অমর। আর্থিক ব্যর্থতার কথাই শুধু বলছি না আমি; পরাধীনতার জন্যে এমন মনোভাব হয়েছে যে প্রাচীন পণ্ডিত ভুল বললেও তার প্রতিবাদ করাটা পর্য্যন্ত অন্যায়ের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েছে।

অমর বলিল—তার জন্যে ভাবনা কি তোমার, জ্যেঠামশায় তোমার পাশে থাকবেন, তিনি তো আর নবীন নন। কথাটা শেষ করিয়া অকস্মাৎ সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল, নবীন বলতে একটা কথা মনে হ'ল। তোমার বউ কোথায়?

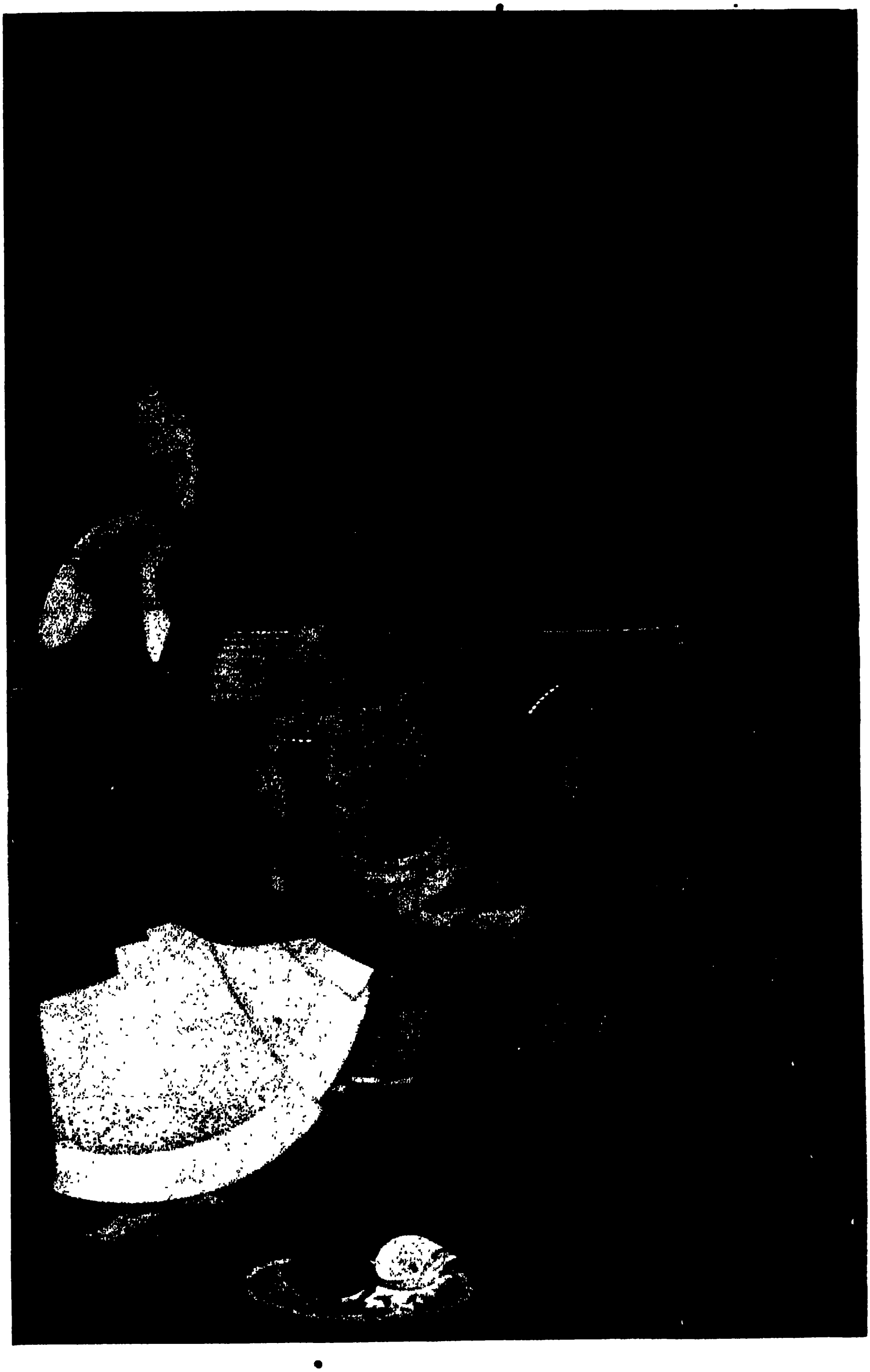
হাসিয়া শশী বলিল—বাড়ীতে।

—এখানে নিয়ে এস। কত আর হাত পুড়িয়ে খাবে?

—তোমারও তো তাই। ঐ যে বললাম, ও স্বাধীনতা পর্য্যন্ত আমাদের নেই। অমর সরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কথাটা বড় ভাল বলেছ শশী!

এই বিংশ শতাব্দীতেও জেলার সদর শহরটি পণ্ডিত-সভার অধিবেশনে চঞ্চল-উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর সুধাকৃষ্ণবাবু বয়সেও প্রাচীন এবং হিন্দুধর্ম্মেও অনুরাগী ব্যক্তি। দীর্ঘকাল শাসন-বিভাগে কাজ করিয়া মধুচক্র হইতে মধুনিষ্কাশনের কৌশলেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল প্রচুর। তিনি নিজে অধিবেশনে উপস্থিত থাকায় জেলার ধনী জমিদার, রায়সাহেব, রায়বাহাদুর, এমন কি জেলার একমাত্র রাজাসাহেব পর্য্যন্ত সভা অলঙ্কৃত করিয়া হাজির ছিলেন। সাহেব হাসিলে তাঁহারা হাসিতেছিলেন, গম্ভীর হইলে গম্ভীর হইতেছিলেন আর কোন পণ্ডিতের বক্তব্য শেষ হইলে হাততালি দিতেছিলেন—সজোরে।

অধিবেশন প্রারম্ভে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সভার উদ্বোধন করিলেন, বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন—এই জেলায় এখনও সংস্কৃত-চর্চার গৌরব অটুট আছে। বিশেষ ক'রে পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ ও তাঁর পুত্র পণ্ডিত শশিশেখর ন্যায়তীর্থের গৌরবে এ জেলা গৌরবান্বিত। পণ্ডিত শশিশেখরকে এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারছি



অর্জুন ও সুভদ্রা

শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

[illegible]

না। তিনি না থাকলে এ-সভা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব হ'ত। তিনি নবীন এবং পাশ্চাত্য ভাবা পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন ক'রে প্রাচীন কালের রক্ষণশীলতার প্রভাব হ'তে অনেকাংশে মুক্ত। আজ যুগধর্ম্মকে স্বীকার ক'রে সংস্কৃত সাহিত্য এবং শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির উপর নূতন আলোকপাতের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন। সেই জন্যই তাঁর এ আন্তরিক প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। এ প্রয়োজনের পূরণের জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্যামাচরণ, পণ্ডিত শিবশেখর প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এখানে মিলিত হয়েছেন। আজ তাঁদের কাছে আমাদের নিবেদন উপস্থাপিত ক'রে আমি সবিনয়ে সভা আরম্ভ করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পণ্ডিতদের সাধুবাদ এবং রায়বাহাদুরগণের হাততালির মধ্যে সুধাকৃষ্ণবাবু উপবেশন করিলেন। পরমুহূর্ত্তেই সভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ন্যায়তীর্থ শিবশেখর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গম্ভীর প্রশান্ত মুখে কঠোর দৃঢ়তা, গায়ে গরদের চাদর, পরণেও দুধের মত সাদা গরদ, অনাবৃত দক্ষিণ বাহুতে সোনার তারে তাগায় একটি প্রবাল ও রুদ্রাক্ষ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বাঁ হাতে আপনার অভিভাষণটি ধরিয়া বলিলেন—সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করবার জন্যই আমি দণ্ডায়মান হয়েছি। আমি প্রাচীন, কিন্তু বর্ত্তমান এই সভার রীতি-পদ্ধতি সমস্তই নবীন; সত্য বলতে কি এ ধরণের সভা আমাদের দেশে প্রচলিতই ছিল না। এ রীতি বৈদেশিক। প্রাচীন কালে সভা আহ্বান করতেন রাজা, ধনী, জমিদার যাঁরা তাঁরাই এবং তারও উপলক্ষ্য ছিল সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠান। এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে, সে পার্থক্য সূক্ষ্ম হ'লেও শূন্যমণ্ডলের মত অনতিক্রম্য ব'লেই আমার মনে হয়। সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত করতে হয় যজ্ঞেশ্বরকে। তাঁকে অনুভব ক'রে অনুষ্ঠানের সর্ব্বত্র বিরাজ করে ভক্তিসিক্ত নিষ্ঠা এবং সদাচার; যে প্রভাব এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রভাবিত করা অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। এ হ'ল গুরুজ্ঞান প্রকাশের ক্ষেত্র।

এক দল প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ধ্বনি তুলিলেন—সাধু সাধু!

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—সুতরাং সেই ত্রুটি পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আমাদের করা উচিত। সেই জন্যই আপনাদের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ উচ্চারণ করবার পূর্ব্বে যজ্ঞেশ্বরকে এই যজ্ঞস্থলে অধিষ্ঠিত হবার প্রার্থনা আমি জানাব।

সমগ্র সভাস্থল এবার সাধুবাদে মুখর হইয়া উঠিল। সুধু শশিশেখর বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কলরব প্রশমিত হইতেই তাহার পিতার কণ্ঠস্বর আসিয়া তাহার কানে পৌছিল। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু শশী তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না।

তাহার পর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় রচিত শ্লোকে শ্লোকে ন্যায়তীর্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া বসিলেন। মহামহোপাধ্যায়ের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সভা ভরিয়া উঠিল।

পরদিন ছিল বিচার-সভা।

সভার প্রারম্ভেই শশিশেখর উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। প্রসন্ন হাসি হাসিয়া মহামহোপাধ্যায় বলিলেন—জ্যোতিষ্কের ভগ্নাংশ থেকেই জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি, জ্যোতি হ'ল তার জন্মগত সম্পত্তি। কোন্ গুহাতে সে জ্যোতি ব্যাহত হ'ল, ছোট ন্যায়তীর্থ? বল শুনি!

—অদ্বৈত-পরমব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপে ভাসমান কিনা?

—নিশ্চয়ই।

—এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত ক'রেই ভাসমান?

—অবশ্য।

—চৈতন্যে যিনি সর্ব্বদা বিরাজিত, আহ্বান ক'রে তার চৈতন্য সম্পাদন প্রচেষ্টা সুতরাং ভ্রমাত্মক।

এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া মহামহোপাধ্যায় বলিলেন—স্বীকার করলাম।

ন্যায়তীর্থ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—আমি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বীকার করলাম না। স্বপ্নাতুর অবস্থাতেও মা

ভ্রমাত্মক চৈতন্য অনুভব করে। সেখানে আহ্বানের প্রয়োজন আছে।

শশিশেখর বলিল—জ্ঞানযোগীর ধ্যান নিদ্রাও নয়, স্বপ্নও নয়। যদি স্বপ্ন হয় তবে সে জ্ঞানযোগী নয়, অন্যথায় আহ্বানকারীই ভ্রান্ত—সেই স্বপ্নাতুর চৈতন্যের প্রয়োজন তারই।

মহামহোপাধ্যায় গম্ভীর মুখে বলিলেন—পণ্ডিত শশিশেখর, সভাপতি হিসাবে তোমাকে আমি নিবৃত্ত হ'তে আদেশ করছি। ন্যায়তীর্থ, আমি আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

উভয়েই নিরস্ত হইলেন; কিছুক্ষণ পর ন্যায়তীর্থ বলিলেন—মহামহোপাধ্যায় যদি অনুমতি করেন তবে আমি উঠতে পারি। শরীর বড় অসুস্থ ব'লে মনে হচ্ছে আমার।

মহামহোপাধ্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ন্যায়তীর্থ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পর পণ্ডিত শশীশেখর যুগধর্মকে স্বীকার করিয়া বৌদ্ধ দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত সমন্বয় করিয়া দর্শনের নূতন অধ্যায় রচনার প্রস্তাব উত্থাপন করিল। তীক্ষ্ণব্যঙ্গে গণ্ডীবদ্ধ মনোভাবকে বিদ্ধ করিয়া অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া স্খলিত ভাষায় অনর্গল সে বলিয়া গেল।

মহামহোপাধ্যায় তাহাকে স্বীকার করিয়া বলিলেন—তোমার প্রস্তাব সাধু। তোমাকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু সে ভার নিতে হ'বে তোমাদেরই। আমরা প্রাচীন, আমাদের সে আর সাধ্যাতীত।

* * *

বাসায় আসিয়া ন্যায়তীর্থ বসিয়া ছিলেন স্তম্ভিতের মত। জ্বরগ্রস্তের মত মাথার মধ্যে একটা প্রদাহ তিনি অনুভব করিতেছিলেন। পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতেও পারিপার্শ্বিককে তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। রাজপথে মানুষ গাড়ী ঘোড়া যাইতেছে আসিতেছে, কলরবের কথা কানে আসিতেছে, কিন্তু চিত্তের স্পর্শানুভূতি যেন হারাইয়া গিয়াছে।

মুখ দিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, মাথা নাড়িয়া তিনি যেন জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন। হ্যা—তিনিই স্বপ্নাতুর, তাঁরই চৈতন্যের প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া তিনি বালতি হইতে জল লইয়া বার-বার মাথাটা ধুইয়া ফেলিলেন। মাথা ধুইয়া তিনি খানিকটা সুস্থ বোধ করিলেন। নিজেই বিছানাটা বিছাইয়া লইয়া শুইয়া পড়িলেন। প্রায় সমস্ত দিনটা আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া অপরাহ্ণে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ছাত্র মণিভূষণ বলিল—শশীদাদা এসেছিলেন দু-বার। কিন্তু আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে ফিরে গেছেন।

ন্যায়তীর্থ গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন, সে-শব্দের উচ্চতায় এবং অস্বাভাবিকতায় ছেলেটি চমকিয়া উঠিল। ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এবার এলেও তাকে নিষেধ ক'রে দিয়ো, কোন প্রয়োজন নাই। ব'ল—চৈতন্য আমার হয়েছে, আহ্বানে প্রয়োজন নেই।

খড়ম জোড়াটা পায়ে দিয়া তিনি ঘরের মধ্যেই পদচারণা আরম্ভ করিলেন, উচ্চ কঠোর শব্দ—অস্বচ্ছন্দ বা অসমচ্ছন্দ নয়, অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠিন সে শব্দ।

কিছুক্ষণ পর আবার ছাত্রটি আসিয়া শঙ্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া ন্যায়তীর্থের মুখের দিকে চাহিল। ন্যায়তীর্থ আবার তেমনি ভাবে গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—কি?

—রায় বাহাদুর জ্ঞানরঞ্জন বাবু এসেছেন দেখা করবেন।

ব্যস্ত হইয়া ন্যায়তীর্থ বাহিরে আসিয়া সম্ভ্রমভরেই রায় বাহাদুরকে আহ্বান করিলেন—আসুন, আসুন।

হে-হে-হে শব্দে এক বিচিত্র হাসি রায় বাহাদুর হাসিয়া থাকেন, সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন—সায়েব পাঠালে আপনার কাছে। যেতে হবে আমার সঙ্গে। বাপ রে বাপ—খাটিয়ে মেরে ফেললে মশায়, আর বলবেন না; আমার দফা রফা, সব তাতেই বেটার আমাকে না হ'লে চলবে না। চলুন, গাড়ী আছে আমার।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এখুনি?

হে-হে করিয়া আবার হাসিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন. হ্যা, হ্যা। খেতাব দেবে মশায়—আপনি তো নেবেন না তাই আপনার ছেলেকে খেতাব দেবে মহামহোপাধ্যায় তবু আপনাকে এক বার জিজ্ঞেস করা তো দরকার। চলুন, চলুন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন, মণি, আমার চাদরখানা দাও তো।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সুধাকৃষ্ণবাবু শশীকে সত্যই স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনি মানুষও ছিলেন সত্যকার গুণ-গ্রাহী ব্যক্তি। আজিকার এই আহ্বানের মধ্যে আরও একটু উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল। পিতা-পুত্রের এই আকস্মিক মতদ্বৈধের রূঢ়তাটুকু মুছিয়া দিয়া উভয়ের সম্বন্ধের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিষ্ঠাও ছিল গোপন সঙ্কল্প। শশীকেও তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন। ন্যায়তীর্থকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিলেন—আপনার সঙ্গে পরিচয় ক'রে আমি গৌরব অনুভব করছি ন্যায়তীর্থ। পরম আনন্দ লাভ করলাম।

ন্যায়তীর্থ সবিনয়ে বলিলেন—আপনি জেলার রাজ-প্রতিনিধি; আপনার সঙ্গে পরিচয় আমার পরম সৌভাগ্য। রাজা-রাজপ্রতিনিধিরাই আমাদের রক্ষক, আপনারাই তো আমাদের ভরসা।

সুধাকৃষ্ণবাবু বলিলেন—অতি সত্য কথা। ত্রুটি আমাদেরই—আমরাই আপনাদের সন্ধান রাখি না, সম্মান করি না। সেই সায়েবের লেখার প্রতি এবার সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আপনাদের সম্মান সরকার করতে চান।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—আমাদের সৌভাগ্য।

—সম্মান অবশ্য উপাধি দিয়ে। তা সরকারের পত্র পেয়ে আমি হাসলাম। উপাধি মহামহোপাধ্যায়ে ন্যায়-তীর্থের গৌরব বৃদ্ধি আর কি হবে! নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—অকিঞ্চিৎকর হ'লেও যখন রাজার দান এবং আমার প্রাপ্য তখন না নিলে উপায় কি, বলুন! অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।

সুধাকৃষ্ণবাবু চুপ করিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পর বলিলেন—খুব সুখী হলাম আপনার কথা শুনে। সরকারকে আমি জানাব। শশিশেখরকেও আমরা দু-এক বছরের মধ্যেই উপাধি দেব। আর একটা কথা, শশী আজ বড়ই অন্যায় করেছে—তাকে আপনাকে মার্জ্জনা করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে অনুতপ্ত হয়েছে।

কঠিন হাসি হাসিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তা হ'লে বলছেন, অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে। স্বপ্নাতুর বা তন্দ্রাতুর অবস্থা থেকে জাগ্রতাবস্থায় অবস্থান্তর। আহ্বানের তা হ'লে প্রয়োজন আছে!

সুধাকৃষ্ণবাবু হাসিলেন, বলিলেন—তরুণ বয়সের ধর্ম্মকে সহ্য ক'রে নিতে হবে ন্যায়তীর্থ মশাই, না নিলে উপায় কি?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—দু-দিন পরে, দু-দিন পরে, আজ আদেশ করবেন না, পারব না। আজ আমি যাই। ন্যায়তীর্থের খড়ম ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ন্যায়তীর্থ চলিয়া যাইতেই সুধাকৃষ্ণবাবু পাশের ঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিলেন—পণ্ডিত! শশীকে তিনি পাশের ঘরেই বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। সুধাকৃষ্ণবাবু উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন, ওপাশের দরজা খোলা, ঘরে কেহ নাই।

শশী সমস্তই শুনিয়াছিল। সে উদ্‌ভ্রান্তের মতই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সে স্পষ্ট অনুভব করিল তাহার প্রতিষ্ঠায় তাহার পিতার ঈর্ষা; জীবনের প্রতিটি ঘটনা আজ নূতন আলোকে আলোকিত হইয়া নূতন রূপে তাহার চোখে দেখা দিল। সহসা তাহার মাকে মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার সম্মুখে সে দাঁড়াইবে কেমন করিয়া! চলিতে চলিতে সে হুঁচোট খাইল, চটিটা ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ধিক্কারে লজ্জায় তাহার মন ছি ছি করিয়া সারা হইতেছে। মাথার ভিতরটা কেমন করিতেছে! মনে ইচ্ছা হইল—দুই হাতে দলিয়া পৃথিবীর সব কিছু যদি সে মুছিয়া দিতে পারিত!

চারি দিকে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে, সে বিভ্রান্তের মত লোকালয় ছাড়িয়া চলিল। 'কে' যেন তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে! সে তাহার পিতা—দাম্ভিক ন্যায়তীর্থ। শহর পার হইয়া ঘন জঙ্গল—জঙ্গলের

পরে রেল-লাইন। শশিশেখর সেই জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

শশিশেখরের আর সন্ধান মিলিল না, সন্ধান করিয়া পরদিন মিলিল—রেল-লাইনের উপরে কোন অসতর্ক পথিকের খণ্ড খণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহের মাংস অস্থি মেদ অন্ত্র! মাথাটা পর্য্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চিনিবার উপায় ন'ই।

* * *

মাস-ছয়েক পর।

ন্যায়তীর্থ টোলের বারান্দায় অভ্যাসমত বসিয়া ছিলেন। ইহারই মধ্যে তিনি স্থবির হইয়া গিয়াছেন। পৌত্র চন্দ্রশেখর কাছেই দাওয়ার উপর বসিয়া একটা কাগজ চুষিতে ব্যস্ত ছিল। ন্যায়তীর্থ উদাস দৃষ্টিতে দিক্‌চক্রবালের দিকে চাহিয়াছিলেন।

একটি ছাত্র সহসা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া চন্দ্রশেখরের হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল—এ-হে-হে, উপাধি-পত্রখানা নষ্ট ক'রে ফেললে!

কাগজখানি সরকার-প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধি-পত্র, আজই—কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই সেটা আসিয়াছে। চন্দ্রশেখর এমন উপাদেয় ভোজ্য বস্তুটি হইতে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণে ন্যায়তীর্থের চমক ভাঙিল। তিনি পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—কি হ'ল, কাঁদছ কেন দাদু?

ছাত্রটি শঙ্কিত স্বরে বলিল—খোকা উপাধি-পত্রখানা মুখে পুরে নষ্ট ক'রে ফেলেছে। ওটা নেওয়াতেই ও কাঁদছে।

ন্যায়তীর্থ ছাত্রের হাত হইতে উপাধি-পত্রখানা লইয়া খোকার হাতে তুলিয়া দিলেন

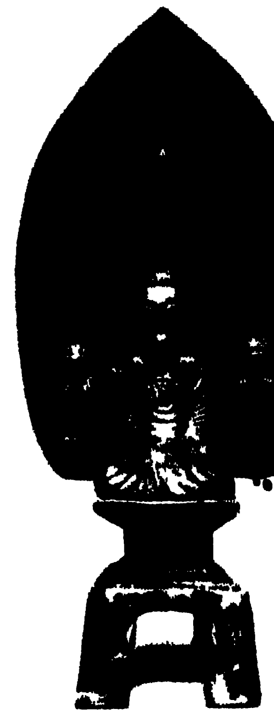


বলিদ্বীপে গামেলান বাদ্যের সাহায্যে নৃত্য

বিচিত্র বুদ্ধমূর্ত্তি

শ্রীরমেশ বসু

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। বহু দিন ধরিয়া বৈদিক যুগের প্রচলনের পর ধর্ম্ম যাগযজ্ঞ ও আচার-বিচারে ও নানা অদ্ভুত মতবাদে পরিণত হইয়াছিল ও সমাজ নানা জাতির মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। উপনিষৎ যুগের রসানুভূতি ও আনন্দবাদ যেন মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল। তখন বুদ্ধ আসিয়া মানুষের চিন্তা ও সাধনার ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধ যে দুঃখবাদ প্রচার করিয়াছিলেন ও নির্ব্বাণের তত্ত্ব শুনাইয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল মানুষের আত্মপ্রত্যয় জন্মান, কেন না তিনি মানুষকে 'আত্মশরণ' শিখাইয়াছিলেন ও 'আত্মদীপ' হইতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে মানুষের মনের রুদ্ধ দরজা খুলিয়া গিয়াছিল এবং অনেকের মন সাড়া দিয়াছিল। এই দুই তত্ত্বের দ্বারা মানবজীবন ভাবাক্রান্ত ও বিপন্ন হইয়া না উঠিয়া ধর্ম্মের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং জীবনকে শুভ্র, সুন্দর ও উন্নত করিবার অজস্র চেষ্টা হইয়াছিল। বোধ হয় এই জন্যই বৌদ্ধধর্ম্মের একটি বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র দেখা যায় তাহার শিল্পচর্চ্চায়। প্রাচীন বৈদিক দেবতাদের নানা রকম রূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, কিন্তু সেই দেবতাদের মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা হইত কি না বলা যায় না। যাহা হউক, বৌদ্ধেরা বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী ও অতীত বহু জন্মের কাহিনীগুলির মধ্যে নিহিত মহামানবতার ভাব দ্বারা এত দূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সেগুলিকে পাথরের উপর খোদাই করিয়া স্থায়ী আকার দিতে ভালবাসিত। ঐতিহাসিক যুগে ইহাকেই ধারাবাহিক শিল্পচর্চ্চার আদিযুগ মনে করা হয়। এই যুগের ভরহুত, সাঁচী, মহাবোধি ও অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের স্তূপে আমরা এই প্রচেষ্টার নিদর্শন পাই। বুদ্ধের জীবন জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের আদর্শ এবং তাঁহার প্রচারিত আর্য্যসত্যগুলির সাধনার দ্বারা মানুষের জীবনে সৌন্দর্য্য আসে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ কঠোর তত্ত্বকে শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল।



বুদ্ধ, চীনদেশ, ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ
পশ্চাতের প্রভামণ্ডল ও খোটানী প্রভাব লক্ষণীয়।

বুদ্ধ শিল্পকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, শিল্পও বুদ্ধকে গৌরব দান করিয়াছিল। সেকালের শিল্প যেন বুদ্ধের মহান্ আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর যাহা কিছু সবই ক্ষণধর্ম্মী, কিন্তু মানুষের মহান্ আদর্শ ও অন্তরের মাধুর্য্য ক্ষণিকের জন্য নয়, তাহা একবার প্রকাশিত হইলে নিত্য-কালের বস্তু হইয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহারি



বুদ্ধ, চীনদেশ
মুণ্ডিতশির, শ্মশ্রুগুম্ফবিশিষ্ট

এশিয়াব্যাপী বিস্তৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মক্ষেত্রের এই যে শিল্প-জাগরণ তাহার একটি প্রধান লক্ষণীয় কথা এই যে, ইহাতে আর্য্য, দ্রাবিড়, হেলেনীয়, ইরাণীয়, মঙ্গোলীয় ও দ্বীপান্তরীয় জাতিসমূহ যে যার নিজের ভাব প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়াছিল। বৌদ্ধ সঙ্ঘ অবশ্য নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া শিল্প-শাস্ত্র রচনা করিয়াছিল, কিন্তু বিচিত্র দেশের বিচিত্র জাতি তাহাদের বিচিত্র মনোভাবকে সম্পূর্ণভাবে শিল্পশাস্ত্রদ্বারা প্রভাবিত হইতে দেয় নাই। তাহাদের মনের মুক্তিদাতাকে তাহারা মনের মত করিয়া গড়িয়াছিল। আমরা যদি এশিয়া মহাদেশের বহু অঞ্চলের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি আলোচনা করি তবে এই কথাই আমাদের মনে জাগে যে বুদ্ধ দেশগত ও জাতিগত বিচিত্রতাকে দমন না করিয়া বরং ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—যদিও এই বিচিত্রতার মধ্য দিয়া জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যগত ঐক্যের বাণীই প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিয়াছে। শিল্পীর হাত বিভিন্ন ধরণে কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু বুদ্ধ এশিয়ার হৃদয়কে এক করিয়া দিয়াছিলেন। আর বুদ্ধ যে ব্যক্তিত্ববাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা শিল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ফলে বুদ্ধ-কল্পনায় শিল্পস্বাধীনতা চরম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। শিল্পহিসাবে ভালমন্দের তুলনা অপেক্ষা প্রকাশের আকৃতিই হইল লক্ষ্য করিবার অতীত ও বর্ত্তমানের উজ্জ্বল ও মধুর ভাব ও ঘটনা শিল্পের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল, সুন্দরকে প্রকাশ করিতে সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা আবশ্যক হইয়াছিল। অন্য দেশের মত ইহা বাহিরের রূপসাধনা নয়, মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে যে সৌন্দর্য্য ও সুসঙ্গতি আছে তাহাই প্রকাশিত করিবার এই চেষ্টা। বুদ্ধ ছিলেন গৃহত্যাগী মহাশ্রমণ, এই কারণে শিল্প ব্যাহত হইবার কথা, কিন্তু তাঁহার জীবনে যে রূপাতীত সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছিল তাহার সুষমা ও সৌরভ শিল্পীকে মুগ্ধ করিয়াছিল—সে মাটি, কাঠ, পাথর ও ধাতুতে তাহাকে রূপ দিতে চাহিয়াছিল, রেখা ও বর্ণদ্বারা তাহাকে অঙ্কিত ও রঞ্জিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।



বুদ্ধ, কোরিয়ার পথের ধারে এইরূপ মূর্ত্তি দেখা যায়

বিষয়, কারণ বৌদ্ধশিল্পের মূলগত ধ্যানের ভাব ভারতবাসী শিল্পী ছাড়া আর কাহারও হাতে তেমন ফুটিতে পারে নাই।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধশিল্প আবির্ভূত হইল তখন দেখা গেল বুদ্ধের জাতক কাহিনীগুলির দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। বুদ্ধের নিজের কোন মূর্ত্তি শিল্পী গড়িতে চায় নাই বা গড়িতে সাহস করে নাই। বুদ্ধকে তখন রূপাতীত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল। অবশ্য এমন কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধ জীবিত থাকিতে রাজা উদয়ন বা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের মূর্ত্তি করাইয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় মানুষের মত করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়িবার পক্ষে তখন বাধা ছিল। বুদ্ধহীন এই বৌদ্ধশিল্প এক বিচিত্র ব্যাপার। রূপশিল্পীর পক্ষে ইহা এক অভাবনীয় ঘটনা যে তাহাকে রূপ দিতে হইবে অথচ মানুষ বুঝাইতে মানুষের আকার দেওয়া চলিবে না। রূপাতীতকে রূপায়িত করিতে গিয়া তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া প্রতীকের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই আদিযুগে যেখানে যেখানে বুদ্ধের অবস্থান বুঝান দরকার হইয়াছে সেখানে বুদ্ধের কোনই মূর্ত্তি নাই, তাহার জায়গায় কতকগুলি প্রতীক মাত্র ব্যবহার করা হইয়াছে—যেমন, বোধিবৃক্ষ, ধর্ম্মচক্র, চক্রযুক্ত স্তম্ভ, পদ্ম, স্তূপ ইত্যাদি। কোথাও কোথাও চরণ-চিহ্ন দেখান হইয়াছে। কোথাও কোথাও চক্রের উপর ত্রিশূলের মত চিহ্ন বসান আছে। অনেকে এই চিহ্নকে বৌদ্ধ ত্রি-রত্নের প্রতীক মনে করেন। শুধু যে ভাস্কর্য্যে ও মুদ্রায় আমরা এই ত্রি-রত্ন চিহ্ন দেখিতে পাই তাহা নয়, সেকালের অলঙ্কারেও আমরা এই-রূপ নক্শা পাইয়া থাকি। কোন কোন জায়গায় ত্রিভুজ চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদের ধারণা এই যে, বুদ্ধ যখন ধ্যানে উপবিষ্ট তখন তাঁহার শরীর দেখিলে এইরূপ একটি ত্রিভুজ বলিয়া মনে হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু ∴ (তিনটি বিন্দু) অথবা ∴(তিনটি শূন্য) দ্বারা বুদ্ধ বা ত্রি-রত্নের একটা ধারণা দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে বুদ্ধের আসন মাত্র দেওয়া আছে, কিন্তু সে আসন খালি পড়িয়া আছে। এই ভাবে বুদ্ধের মূর্ত্তি বাদ দিয়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধ শিল্প আরম্ভ হইয়াছিল। অতি প্রাচীন প্রাক্-মৌর্য্য মুদ্রায়ও এইরূপ চিহ্নমাত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, যেমন কুনন্দ বা কুণন্দের মুদ্রায় (*J. R. A. S.*, 1865)।



উপবাসী বুদ্ধ, গান্ধার

বুদ্ধের জীবনকালে কোন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে তাহার একটা ধারা চলিয়া আসিত। কিন্তু সেরূপ না হওয়াতে পরবর্ত্তী যুগে যখন বুদ্ধের মানুষ-মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল তখন শিল্পীদের নিজের কল্পনা খেলাইবার সুবিধা হইয়াছিল। এইরূপ মূর্ত্তি অভারতীয় জাতি দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। গ্রীক বা কুষাণগণই এইরূপ মূর্ত্তি গড়িতে আরম্ভ করে।

গ্রীকদিগের দ্বারা বৌদ্ধ শিল্পের যে যুগ প্রবর্ত্তিত হয় তাহা গান্ধার শিল্প নামে পরিচিত। এই সময়ে ভারতের কোন কোন অংশে ও ভারতের বাহিরে

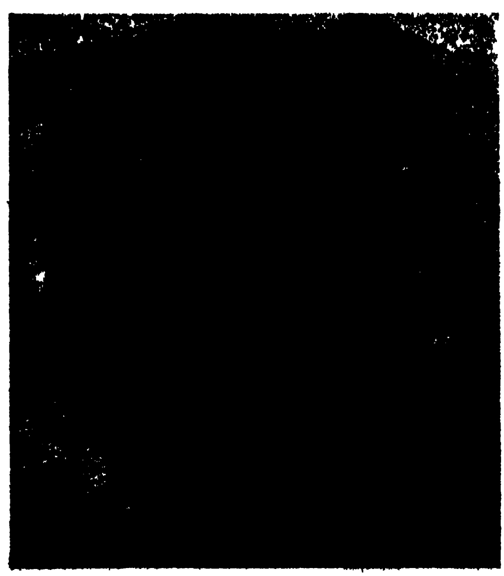


বুদ্ধ, চীনদেশ

—চৌনা গুম্ফ, উষ্ণীষ পদ্মাকার ও কীলকযুক্ত,—পরিচ্ছদের নীচের অংশ উন্টান পদ্মের মত কল্পিত

গ্রীকদের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কালক্রমে ইহারা বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং বৌদ্ধ শিল্পের একটি নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া বুদ্ধের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের চোখের সামনে বুদ্ধমূর্ত্তির কোন আদর্শ ছিল না, তাই তাহারা নিজেদের শিল্পধারা ও কল্পনা অনুসারে তাহাদের দেবতা অ্যাপোলোর মূর্ত্তির মত করিয়া বুদ্ধের মূর্ত্তি গড়িল, কিন্তু অ্যাপোলোর শারীরিক সৌন্দর্য্য ও বলিষ্ঠ ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই ভারতীয় যোগী বুদ্ধের মূর্ত্তি হইতে পারে না। ভারতীয় অনুশাসনে বুদ্ধমূর্ত্তিতে ধ্যানের ভাব ফুটাইতে হইবে। গ্রীক শিল্পী নিজের দেশের পদ্ধতিতে বুদ্ধমূর্ত্তি গড়িয়া তাহার মধ্যে সাধ্যমত ভারতীয় ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিত। ইহাতে ভারতের মন সাড়া দেয় নাই, কেন না ইহার বিদেশী ধরণ-ধারণ ভারতকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। উত্তর-পশ্চিম ভারতেই এই শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই শিল্পের মূলভাবে এবং পরিচ্ছদে গ্রীক-প্রভাব পরিস্ফুট। এই যুগে যে-সব বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কতকগুলি লক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল এবং সেগুলি পরবর্ত্তী যুগেও চলিয়াছিল। যেমন মাথায় উষ্ণীষ, কপালে ঊর্ণা এবং লম্বকর্ণ ও জালহস্ত লক্ষণ। গ্রীকদের মধ্যে মুণ্ডিতমস্তক কোন মূর্ত্তি নাই, তাই যোগীবুদ্ধকে তাহারা তাহাদের অ্যাপোলোর মত চূড়ায় বাঁধা চুল দিয়াছে, তাহাই শিল্পশাস্ত্রে উষ্ণীষ নাম পাইয়াছে। বৌদ্ধ শিল্পের সমালোচকগণ বলিয়াছেন যে, গান্ধারে স্লেট পাথরের মূর্ত্তি হইত, উহা অত্যন্ত ভঙ্গুর বলিয়া বুদ্ধের উত্তোলিত হাতের অঙ্গুলিগুলি যাহাতে সহজে ভাঙিয়া না যায় তাহার জন্য পাথর কুঁদিবার সময়ে অঙ্গুলিগুলির মধ্যে মধ্যে পাথরের কিছু অংশ রাখিয়া দেওয়া হইত—ইহা হইতেই জালহস্ত লক্ষণের উদ্ভব হইয়াছে।

মধ্য-এশিয়া হইতে আগত কুষাণগণ একটি যুগ প্রবর্ত্তন করেন। এই যুগে প্রথম দিকে ভরহুত ও সাঁচীর সাদৃশ্য আছে কিন্তু পরের দিকে আর একটি শিল্পধারা প্রবর্ত্তিত হয়। মথুরায় ও অমরাবতীতে এই যুগের বহু মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যুগে যেন একটা স্থূলতার আদর্শ দেখা



কামাকুরার বুদ্ধ, জাপান



বুদ্ধ, মূর্তি, চীনদেশ। শুধু মুখখানিই দশ ফুট-উচ্চ—তাহার উপর বিচিত্র মুকুট। স্বাভাবিক মুখের মত নয়।



বুদ্ধ, চীনদেশ। ষষ্ঠ শতাব্দী। পশ্চাতের প্রভামণ্ডলে অসংখ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি আছে।

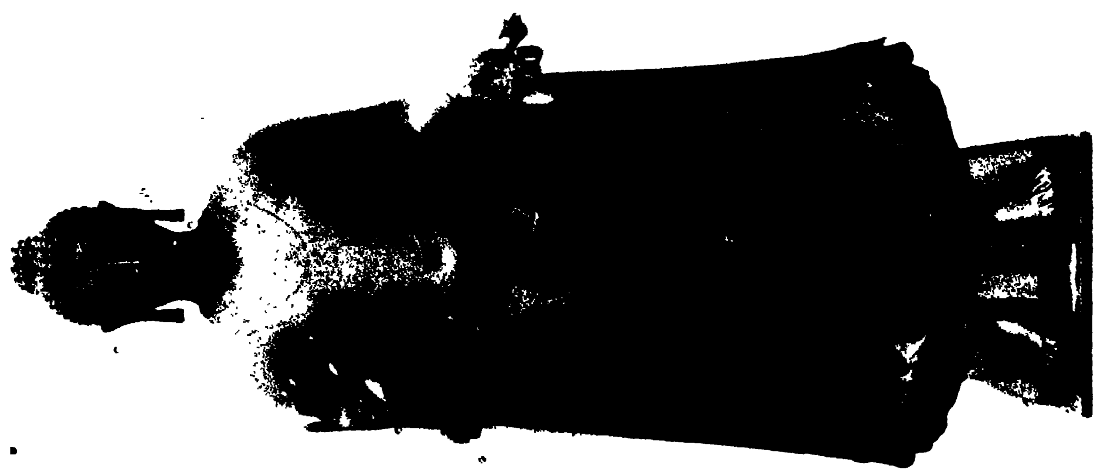


বুদ্ধ, চীনদেশ। ষষ্ঠ শতাব্দী।



বুদ্ধ, চীনদেশ। পঞ্চম শতাব্দী।





যায়। কনিষ্কের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে নির্ম্মিত একটি বিশাল বুদ্ধমূর্ত্তি মথুরা হইতে সারনাথে আনীত হইয়াছিল। তারিখযুক্ত মূর্ত্তির মধ্যে এইটিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রাচীন। এই মূর্ত্তি এখন সারনাথের যাদুঘরে আছে। এই মূর্ত্তির মত মূর্ত্তি সারনাথেও গঠিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিগুলি চেপ্টা ও স্থূল। মধ্য-এশিয়া হইতে নবাগত রাজগণ তাঁহাদের নিজেদের আদর্শে এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গান্ধার শিল্প ও কুষাণ শিল্প বিদেশী ভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া জন্ম লাভ করিয়াছিল। পোষাক ইত্যাদিতে গ্রীক-প্রভাব আছে। গ্রীক-শিল্পের দৈহিক সুষমা বা ভারত-শিল্পের ধ্যানপরতা ইহাতে নাই। প্রথম দিকে যে স্থূলতা দেখা গিয়াছিল তাহা ক্রমে কান্তির দিকে আসিয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় সম্পূর্ণ ভারতীয়তা লাভ করিতে পারে নাই।

ভারতবর্ষের চরম ও সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ হইয়াছিল গুপ্ত-যুগে। গুপ্ত-যুগকে অন্যান্য দিক্ দিয়া যেমন স্বর্ণযুগ বলিয়া মনে করা হয়, বৌদ্ধ শিল্পের দিক্ দিয়াও ইহা সেইরূপ। এই যুগের প্রসিদ্ধ সারনাথ বা সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিলে স্পষ্টই মনে হয় এত দিন পরে ভারতবর্ষ তাহার শিল্পী আত্মার চরম বিকাশ দেখাইয়াছে। গান্ধার-যুগের সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা, কুষাণ-যুগের স্থূলতা পার হইয়া বৌদ্ধ শিল্প এখন ভারতীয় শিল্পরীতির প্রধান ও শেষ লক্ষ্য যে ধ্যানময়তা তাহা প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। সুডৌল গড়নের সঙ্গে এই ধ্যানপরতা যোগ হওয়াতে শিল্প তাহার উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছিল। পূর্ব্বে ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা বেশী ছিল, এই যুগে চিত্রশিল্পও উহার সঙ্গে সমানে পা ফেলিয়া চলিয়াছে দেখা যায়, যেমন অজন্টায়। ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং ইহার প্রভাব বহুদূরব্যাপী হইয়াছিল।

বুদ্ধমূর্ত্তি আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে এই গুপ্ত-যুগের ভারতীয় মূর্ত্তিকে আদর্শ ধরিয়া অন্যান্য দেশের ও কালের মূর্ত্তিগুলির বিচার করিতে হইবে। দেশ-বিদেশের সকল শিল্পীই মহাশ্রমণের মূলভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু গুপ্ত-যুগের শিল্পীর হাতে বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে যে দেহ ও ভাবগত পরিপূর্ণতা সাধিত হইয়াছিল তাহা আর কোন সময়েই হয় নাই। এই যুগের বুদ্ধমূর্ত্তির প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহাতে আড়ম্বর নাই, খুঁটিনাটি ও পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের দিকে দৃক্‌পাত নাই, এমন কি পরিচ্ছদ এমন স্বচ্ছ যে উহা গায়ের সহিত লাগিয়া আছে, কিন্তু যাহা শিল্পের প্রাণ তাহা এমন ভাবে ফুটিয়াছে যে ইহা হইতে উচ্চতর ও সুন্দরতর অথচ অনায়াসকৃত আর কিছু ভাবা যায় না। দেহ ও আত্মার মহামিলনের এরূপ নিদর্শন পৃথিবীর অন্যত্র দেখা যায় না।

ইহার পর ভারতের নানা প্রদেশে বৌদ্ধ শিল্পের চর্চ্চা হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বেশী হইতে থাকায় বৌদ্ধ শিল্প সর্ব্বত্র পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই। পাল-যুগে গৌড়-মগধে একটি নিজস্ব ধারা চলিয়াছিল। এই ধারায় বোধ হয় বুদ্ধমূর্ত্তি অপেক্ষা বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তির দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া হইয়াছিল।

ভারতের বৌদ্ধ শিল্প শুধু ইহার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। ইহা ভারতের বাহিরে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণ সকল দিকেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে-দেশে শিল্পের চর্চ্চা ছিল না সে-দেশে ইহা শিল্পের জন্মদান করিয়াছিল, যে-দেশে ছিল সেখানে ইহা নূতন ও উন্নত আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল।

গান্ধার-যুগের সময় হইতেই বৌদ্ধ শিল্প আফ্‌গানিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার পথে চীনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। বহু পণ্ডিতের বহু বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় এখন বামিয়ান, কাসগড়, কুচ, করাশহর, তুরফান, খোটান, মিরণ, এমন কি সীস্তান ও দণ্ডান-উইলিক প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধশিল্প যে এই সব স্থানের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ ইহা হইতেই পাওয়া যায় যে, প্রথম প্রথম গান্ধার শিল্পের গ্রীক ধরণ-ধারণ অনুকৃত হইলেও পরে উহাদের নিজেদের অন্তর হইতে একটা নিজস্ব শিল্পধারা উৎসারিত হইয়াছিল। পরে আমরা দেখিতে পাই তুর্কিস্তানে বুদ্ধকে আর গ্রীক পোষাকে সজ্জিত করা হয় নাই—তাহাদের নিজেদের পোষাক দিয়াছে। ভারতীয় লক্ষণযুক্ত মূর্ত্তি বা চিত্রও এই সব অঞ্চলে দেখা যায়।

মধ্য-এশিয়ার শিল্পধারা চীনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। চীনের সর্ব্ব-পশ্চিম প্রান্তে টুন-হুয়াঙে বৌদ্ধগুহা আবিষ্কৃত

হইয়াছে, তাহাতে এই প্রভাব দেখা যায়। ঐ গুহায় প্রাপ্ত জিনিষগুলির মধ্যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে অঙ্কিত বুদ্ধের দুই শত চিত্রের মধ্যে কয়েকখানা পাওয়া গিয়াছে। মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়াতেও বুদ্ধের মূর্ত্তি বা চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ক্রমে কোরিয়া ও পরে জাপান পর্য্যন্ত বৌদ্ধ শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিল্প প্রবর্ত্তিত হয়, এখানকার প্রাচীন শিল্পে স্পষ্ট ভারতীয় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সব দেশের চেয়ে ভারতের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইলেও নেপাল, তিব্বত, সিকিম ও ভুটান অঞ্চলে অতিপ্রাচীন বৌদ্ধনিদর্শন পাই না। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে এই সব অঞ্চলে বৌদ্ধপ্রভাব দেখা যায়। ক্রমে নেপালে একটি নিজস্ব শিল্পধরণ জন্মলাভ করে। তিব্বতের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, তিব্বতের এক রাজা চীন ও নেপাল এই দুই বৌদ্ধ দেশের দুইটি রাজকুমারীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের প্রভাবে বৌদ্ধ ভাব ও শিল্প সেখানে আরম্ভ হয়। আগে তিব্বতে বন নামে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস (animism) প্রচলিত ছিল। তাহার প্রভাব দমন করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এক নূতন বিচিত্রতার সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার ছাপ আমরা তিব্বতের বৌদ্ধ শিল্পে বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই।

ভারতের দক্ষিণ-অঞ্চলে ও সিংহলে অতিপ্রাচীন কালেই বৌদ্ধ শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছিল। অশোকের সময়ে তাঁহার সাম্রাজ্যের বাহিরেও বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সিংহলে আমরা খুব প্রাচীন বৌদ্ধমূর্ত্তির কথা জানিতে পারি।

বৃহত্তর ভারতের পূর্ব্ব অঞ্চলে আমরা যে কত বিচিত্র ধরণের বুদ্ধমূর্ত্তি দেখি তাহার অন্ত নাই। ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ, বলি, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও, চম্পা, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশে হিন্দুধর্ম্মের মত বৌদ্ধধর্ম্মও বিশেষ ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল এবং বহু মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইগুলির মধ্যে বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন হিসাবে যবদ্বীপের বোরোবুদুর ও প্রাম্বানানের বিরাট প্রতিষ্ঠান পৃথিবীখ্যাত। প্রাম্বানানের অতি সিউ নামে পরিচিত মন্দিরশ্রেণী প্রায় সওয়া দুই শত মন্দিরের সমবায়। বোরো-বুদুর ত এক বিরাট্ শিল্প-প্রদর্শনী। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ফলে যে এই বিভিন্ন দেশে নূতন প্রাণ ও প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় উহাদের বিভিন্ন জাতীয় শিল্পের জাগরণের দ্বারাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই সব সমুদ্রান্তরিত দেশে যেখানে ভারতীয় উপনিবেশে ভারতীয় শিল্পীরা গমন করিয়াছিল সেখানে আমরা ভারতীয় শিল্পরীতির চরম বিকাশ দেখি, যেমন বোরোবুদুরে এবং বহু বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তিতে।

ভারতের চারি দিকের এই সব অ-ভারতীয় দেশে শিল্পবোধ জাগরিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলে শিল্পীরা তাহাদের নিজের নিজের জাতীয় ধারায় ও ধরণে শিল্পচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পরিচয় এই সব দেশের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখিলে ও আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক দেশ তাহার জাতীয় লক্ষণ বজায় রাখিয়া বুদ্ধের মূর্ত্তি বা চিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে—অবশ্য এই শিল্পকর্ম্মে প্রাণ জোগাইয়াছে ভারতের ধ্যানভাব। তাই আমরা দেখি যেন ভারতীয় মহাশ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব দেশের বিশিষ্ট লক্ষণান্বিত বুদ্ধেরাও ধ্যানে লীন হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতে বুদ্ধমূর্ত্তিতে অজস্র বৈচিত্র্যের উদ্ভব হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দণ্ডান-উইলিকের একটি বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি একবারে খাঁটি ইরাণীয়। কোন্ দেশ বা কোন্ শৈলী সার্থক হইয়াছে, কোন্‌টিতে প্রকৃত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে তুলনা করিয়া তাহার সমালোচনা করিবার আগেই এই কথা আমাদের মনে জাগে যে ইহারা সকলেই একযানের যাত্রী, ইহাদের প্রাণ একই সঙ্গীতে সাড়া দিয়াছে, শুধু হাত গড়িয়াছে বিভিন্ন ও বিচিত্র করিয়া। শুধু রূপ নয়, অনেক দেশ বুদ্ধকে তাহাদের প্রিয় নাম না দিয়া তৃপ্ত হয় নাই, যেমন সাইবেরিয়াতে বুদ্ধ বুরখান্-বখ্‌শী হইয়া গিয়াছেন!

এতক্ষণ বৌদ্ধ শিল্পের ধারা এবং প্রসার সম্বন্ধে অতি সামান্যভাবে কিছু বলা হইল। এই বহুধারায় বিভক্ত বৌদ্ধ শিল্পে বুদ্ধমূর্ত্তির বিচিত্রতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণের পরিচয় লওয়া দরকার।

অতি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে যে বুদ্ধকে মাত্র নানা

প্রতীক দ্বারা বুঝান হইত তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

প্রথমতঃ, আমরা সচরাচর দৃষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির বর্ণনা করিব। সাধারণতঃ আমরা পাঁচ প্রকারের বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাই, তিনটি বসা অবস্থার, একটি দাঁড়ান এবং একটি শয়ান মূর্ত্তি। এইগুলি ধ্যানীবুদ্ধ (ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় স্থিত), প্রচারক (ব্যাখ্যান মুদ্রায়), যাত্রী বুদ্ধ ও মহাপরিনির্ব্বাণের অবস্থায় স্থিত মূর্ত্তি নামে পরিচিত। এইগুলি স্বতন্ত্র মূর্ত্তি। অনেক সময় একই পাথরে বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী যেমন জন্ম, মহাভিনিষ্ক্রমণ, বোধিলাভ, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন প্রভৃতি—খোদিত দেখা যায়। এইগুলি একটি বড় মূর্ত্তির তিন দিকে সাজান থাকে। এইগুলিকে বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে যখন বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত করিবার প্রথা প্রচলিত হইল তখন কতকগুলি লক্ষণ মানিয়া চলা হইত। এইগুলিই পরে নানা শিল্পশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ ও বিস্তারিত-ভাবে আলোচিত হয়। শারিপুত্র শিল্পশাস্ত্র জিনালঙ্কার, বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্ প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধমূর্ত্তি কিরূপ হইবে তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। হিন্দু শিল্পশাস্ত্রে বা অন্যান্য গ্রন্থেও বুদ্ধমূর্ত্তির কতকগুলি লক্ষণ দেওয়া আছে, যেমন অগ্নিপুরাণ, বৃহৎসংহিতা। বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধের বত্রিশটি মহাপুরুষলক্ষণ এবং আশীটি অন্যান্য লক্ষণের কথা বলা আছে। তাহার কয়েকটি রাজা মহারাজার পক্ষেও প্রযোজ্য। বুদ্ধমূর্ত্তির প্রধান লক্ষণের মধ্যে উষ্ণীষ, ঊর্ণা ও জালহস্ত। রাজাদের যে উষ্ণীষ থাকিবে তাহা ত স্বাভাবিক। আর বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আমরা পাই যে রাজমূর্ত্তিতেও ঊর্ণা ও জালহস্ত দিবার বিধান ছিল। বুদ্ধ যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহার মাথায় উষ্ণীষ থাকিতে পারে না, অথচ তাঁহার সমস্ত মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে উষ্ণীষের কথাই প্রথম স্থান পাইয়াছে এবং মূর্ত্তিতেও সব সময় দেখি। বুদ্ধ গৃহত্যাগ করিবার'পর নিজের চুল কাটিয়া ফেলিয়া-ছিলেন ও উষ্ণীষ দিয়া দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার চুল খাটো হইয়াছিল। এই জন্যই কি বুদ্ধমূর্ত্তিতে "সুনীচ-কেশের" কথা আমরা পাই (বৃহৎসংহিতা—৫৮।৪৪)? বুদ্ধমূর্ত্তির আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, কান লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিপুরাণে (৪৯ অঃ) বুদ্ধমূর্ত্তি "লম্বকর্ণঃ" হইবার নির্দ্দেশ আছে। আর শ্রমণের মত ত্রি-চীবর পরিবার ধরণেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। অধিকাংশ ভারতীয় মূর্ত্তিতে বুদ্ধের দক্ষিণ স্কন্ধ খোলা, উত্তরীয় বাম স্কন্ধের উপর দিয়া দেওয়া। কিন্তু দুই স্কন্ধ ঢাকা মূর্ত্তিও নানা শৈলীতে দেখা যায়। ভারতীয় মূর্ত্তিতে বুদ্ধের চক্ষু নিমীলিত, কিন্তু কোন কোন দেশে বা শৈলীতে তাঁহার চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত বা সম্পূর্ণ খোলা।

বুদ্ধমূর্ত্তি সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, শাক্যমুনিকে সমস্ত গুণের আধার বলিয়া ভাবিলেও কোথাও তাঁহাকে দুইটির বেশী হাত দেওয়া হয় নাই। হিন্দু দেবতার সঙ্গে এই পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। আকারের দিক্ হইতেও বুদ্ধমূর্ত্তিতে বৈচিত্র্য আছে, অতি ছোট এবং অতি বৃহৎ মূর্ত্তি অনেক দেখা যায়। বুদ্ধের বর্ণ সোনালি হইবার কথা, কিন্তু মরকত ও ফিরোজা মণির মত রঙের বুদ্ধও আছেন।

এইবার আমরা কতকগুলি বিচিত্র মূর্ত্তির পরিচয় দিব। মূর্ত্তি হিসাবে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও অলৌকিক শক্তি দেখাইবার জন্য কতকগুলি দৃশ্য মূর্ত্তিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের তলায় বসিয়া আছেন ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু নাগরাজ মুচলিন্দের কুণ্ডলীর উপর উপবিষ্ট এবং মস্তক তাহার ফণা দ্বারা আচ্ছাদিত এরূপ দৃশ্য কাব্যে ফুটিলেও মূর্ত্তিতে যেন কিরূপ লাগে। উপরি-উক্ত লক্ষণগুলিতে কিছু কিছু বৈচিত্র্য ঘটাইয়া এবং তাহার সঙ্গে নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সংযোগ করিয়া অ-ভারতীয় শিল্পীরা বুদ্ধমূর্ত্তি এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে তাহাতে বুদ্ধভাবের মূল মহিমা ও গাম্ভীর্য্য হ্রাস হইয়াছে মনে হয়, যদিও শিল্পকর্ম্ম হিসাবে এগুলির কতক খুব উঁচুদরের বলিতেই হইবে। ভারতীয় যোগ ও বুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্ব বোধ হয় সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারাতেই এই সব অদ্ভুত মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছে।

গান্ধারের গ্রীক-শিল্পীরা যোগরত বুদ্ধকে এমন ভাবে কল্পনা করিয়াছেন যে তপস্যায় ক্লেশে ও অনাহারে তাঁহার শরীর শুকাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। কুষাণ-যুগেও এই ধরণের মূর্ত্তি দেখা যায়। তাহারাও বিদেশী ছিল।

কিন্তু ইহা ভারতীয়ের চোখে কখনও ভাল ঠেকে নাই এবং কেন ভারতীয়েরা বুদ্ধকে ঐরূপভাবে কল্পনা করে নাই তাহা হ্যাভেল অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত হইতে পদ উদ্ধার করিয়া সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে জাপানী কানো শৈলীর শিল্পী জেন্‌-অর্থাৎ ধ্যান সম্প্রদায়ের ধারণা অনুযায়ী যে বুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার কথা। এই চিত্রে উদাসীনের মত অযত্নবিন্যস্ত চুল, মাথার মাঝখানে টাক, গোঁফ দাড়ি এবং খোঁচা খোঁচা পায়ের নখ দেখানো হইয়াছে।

এই ধারণা অনুযায়ী কতকগুলি জাপানী মূর্ত্তি আছে তাহাতে তপঃক্লিষ্ট কঙ্কালসার বুদ্ধ বসিয়া উত্তোলিত ডান বা বাম হাঁটুর উপর দুই হাত রাখিয়াছেন। মাথায় টাক আছে, কপালে রেখা আছে। কোন কোনটিতে গোঁফ-দাড়ি আছে।

কোন কোন মূর্ত্তিতে বুদ্ধ যেন সংসারের দুঃখরাশির জন্য অভিভূত হওয়াতে বিমর্ষ হইয়া গিয়াছেন এইরূপ ভাব ফুটানো হইয়াছে। ইহাকে ইংরেজীতে নাম দেওয়া হইয়াছে "The Sorrowing Buddha."

ঠিক ইহার উল্টা রকম মূর্ত্তিও আছে। বুদ্ধের মূর্ত্তিতে গাম্ভীর্য্যের স্থান আছে, কিন্তু তিনি হাস্য করিতেছেন এরূপ কল্পনাও খুব স্বাভাবিক নয়। বুদ্ধকে আমরা বিমর্ষ মনে করি না, কিন্তু তাঁহার এ রকম হাসিও কল্পনা করি না। এইরূপ হাস্যবদন বুদ্ধমূর্ত্তি আমরা ইন্দো-চীনে দেখিতে পাই। কুষাণ-যুগে এবং মধ্য-এশিয়ায়ও এরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিনির্ব্বাণ মূর্ত্তির মত ... রকম মূর্ত্তি চীনদেশে দেখা গিয়াছে। ইহা নিদ্রিত বুদ্ধের মূর্ত্তি। উয়ো ফুস্সু মন্দিরে জমকালো পোষাক পরিহিত এইরূপ নিদ্রিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। সেখানকার ভক্তেরা তাঁহার খালি পায়ের জন্য জুতা দান করে।

কোরিয়ায় কয়েক রকম অদ্ভুত বুদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়। একটি মূর্ত্তিতে বুদ্ধের মুখ চেপ্টা, সমগ্র মূর্ত্তিটি দেখিতে মিশরীয় মামীর মত এবং আড়ষ্ট। আর এক ধরণের মূর্ত্তি কোরিয়ার পথের ধারে দেখা যায়। উহা দণ্ডায়মান প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি। ইহার মাথায় ছাতা দেওয়া থাকে। পর্য্যটকেরা বলিয়াছেন যে দূর হইতে এইরূপ মূর্ত্তিকে আলোকস্তম্ভ বলিয়া ভুল হয়।

ভারতীয় শিল্পে আমরা শিশুবুদ্ধের মূর্ত্তি দেখি না। কিন্তু চীনদেশে এইরূপ মূর্ত্তি আছে। জন্মের পরই বুদ্ধ নাকি সপ্তপদ গমন করিয়াছিলেন এবং ডান হাত দ্বারা আকাশের দিকে ও বাম হাত পৃথিবীর দিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি শেষবারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ মূর্ত্তি কিন্তু নবজাত উলঙ্গ শিশুর নয়, পরিধানে অল্পবয়স্ক বালকের পোষাক আছে।

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আমরা কোথাও কোথাও শিব-বুদ্ধ মূর্ত্তির কথা জানিতে পারি। এমন কি কোন কোন পর্য্যটক বলিয়াছেন তাঁহারা যবদ্বীপে বুদ্ধমূর্ত্তির মাথায় শিবলিঙ্গ দেখিয়াছেন (*Asiatic Researches*, 1820, p. 365, foot-note), কিন্তু ইহা প্রকৃতই লিঙ্গ কিনা বলা যায় না। ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের বুদ্ধমূর্ত্তির মাথায় উষ্ণীষের জায়গায় কয়েকটি থাক যুক্ত মন্দিরের মত একটা লক্ষণ দেখা যায়। কোথাও এই রকম তিনটি জিনিষ পাশাপাশি থাকে, মাঝেরটি বড়, দুই দিকের দুইটি ছোট। পুরীর জগন্নাথকে মধ্যযুগের লেখকগণ স্পষ্টই বুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কোন কোন প্রাচীন মূর্ত্তিতে ব্রহ্মার সঙ্গে বুদ্ধের সারূপ্য দেখা যায়।

জাপানের কোন কোন চিত্রে বুদ্ধকে মেঘের মধ্যে দেখানো হয়। কোথাও কোথাও বুদ্ধ ফুল হাতে করিয়া আছেন এবং যেন কথা না বলিয়াও জীবন-সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন।

চীনে কোন কোন মূর্ত্তিতে বুদ্ধকে বোধিবৃক্ষের নীচে না বসাইয়া উহার মধ্যে বসানো হইয়াছে। তিব্বত ও চীনের মন্দিরে কোন কোন স্থানে "নাগতরু" (অষ্টশাখা-যুক্ত প্রবাল দ্বারা নির্ম্মিত) উপরে আটটি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখানো হয়।

ভারতীয় মূর্ত্তিতে বুদ্ধ পদ্মাসনে বসিয়া থাকেন। কিন্তু বৃহত্তর ভারতের পূর্ব্ব অঞ্চলের বহু স্থানে বুদ্ধকে এমন ভাবে বসানো দেখা যায় যেন চেয়ারে বসিয়া নীচে পা ঝুলাইয়া দিয়াছেন। ইহাকে সাহেবরা ইউরোপীয় ধরণে ব...

বলেন। কোন কোন প্রাচীন মূর্ত্তিতে যে মহারাজলীলা-আসন করিয়া বসা দেখা যায়, এই সব মূর্ত্তি সে ধরণের নয়। ব্রহ্ম, সুমাত্রা, চম্পার অনেক জায়গাতেই এইরূপ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সুমাত্রার একটি মূর্ত্তিতে পা রাখিবার জন্য আসনের নীচে ভূমির উপর পদ্ম রহিয়াছে।

বুদ্ধকে মহারাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণযুক্ত মনে করা হয় এবং তাঁহার মৃতদেহের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবার আদেশ ছিল। কিন্তু তাঁহার যোগীভাবের সঙ্গে ইহার খাপ খাওয়ান মুশকিল। তবু এই ধরণের মূর্ত্তিও আছে। ব্রহ্মদেশের পাগান স্থিত সোয়ে জিগোন মন্দিরে বুদ্ধের জম্বুপতি বা মহারাজচক্রবর্ত্তী মূর্ত্তি আছে। ইহাতে তিনি মাথায় মুকুট পরিয়া ও গলায় অলঙ্কার পরিয়া ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বসিয়া আছেন।

বুদ্ধ যে-দেশে পূজিত হইয়াছেন সে-দেশের লোকের নিকট হইতে জোর করিয়া পূজা আদায় করেন নাই বা তাহাদের প্রিয় কোন ভাবকে নির্ব্বাসিত করেন নাই। অনেকে মনে করেন যে গান্ধার শিল্পে বুদ্ধের সঙ্গে যে বজ্রপাণির মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা ভারতীয় ইন্দ্রের মূর্ত্তি নয়, ইরানীয় ধারণা অনুযায়ী ফ্রাবাশীর মূর্ত্তি। চীন দেশের কোন কোন পাত্রে অঙ্কিত একটি বিশেষ নক্‌শা আছে, তাহাতে পাইন, বাঁশ ও প্রিউনাস্ গাছ একসঙ্গে দেখানো হয়, ইহা তিন বন্ধু অর্থাৎ কন্‌ফিউসিয়াস, বুদ্ধ ও লাওটসের প্রতীক। জাপানের কানো শৈলীর একটি চিত্রে এরূপ অঙ্কিত আছে যে, একটি মদ্যপাত্রের তিন দিকে বুদ্ধ, কন্‌ফিউসিয়াস ও লাওটসে দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাদের মুখের চেহারা হইতে শিল্পী এই তিন জনের দার্শনিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এইরূপ ভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন—বুদ্ধ যেন বলিতেছেন, "জীবন-মদ্য তিক্ত, উহা দূরে সরাইয়া দাও"; কনফিউসিয়াস যেন বলিতেছেন, "জীবন-মদ্য কটু, বোধ হয় উহাকে মধুর করিয়া তোলা যায়"; আর লাওটসে যেন বলিতেছেন, "জীবন-মদ্য মধুর"। তিব্বত ও চীনে আমরা সাত জন ভৈষজ্যগুরুর সঙ্গে এবং জাপানের শিঙোন-সম্প্রদায়ে তের জন বুদ্ধের সঙ্গে শাক্যমুনিকে দেখি।

"আলো নির্ব্বাক রহিল লাজে"

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

অরণ্য কত কেঁদেছিল মাগো, শৈবাল কত দুঃখ পেল
যেদিন তোমার স্নেহের কোলে মা, আদিম মানুষ প্রথম এল!
সে কি জানে নাই, স্তন্য তোমার একা লবে নর নিঃশেষিয়া,
সে কি বোঝে নাই, শ্যামলিমা তার শুষ্ক করিবে এ কাঠুরিয়া!
জলের দুলাল, বনের কুমার, বিরাট আকার পশুর পতি,
হাজার বছর যুবক থাকিত এমন বিশাল বনস্পতি
ভাবে নি কি তারা, সব চলে যাবে একটি প্রাণীর আবির্ভাবে?
মাগো, সেদিনের বেদনার কথা ভুলে গেলি তুই কার প্রভাবে!
এল মানুষের আদিম যে যুগ, সেও ছিল ভাল, তাহারও পরে
দাবানলে তুই ক্রীড়নক ক'রে দিলি তার হাতে কেমন ক'রে!
কেমন ক'রে মা, ভাই দিয়ে ভাই ধ্বংস করিলি—কি লাভ হ'ল,
ভাইয়ে ভাইয়ে আজ হানাহানি ক'রে তোর... সকলে ম'ল
তোর কাছে ওরা আগুন পেয়েছে, তোর কাছে নিল উপকরণ,
তোর বক্ষের এতটুকু ঠাঁই, তারই তরে করে মরণ-রণ!
প্রথম পুত্র অরণ্য আর শৈবালে করি মহা শ্মশান
সভ্য হলি মা, সভ্যতা তোর শেষ পুত্রের শ্রেষ্ঠ দান!
সেদিন কেঁদেছে অরণ্য আর শৈবাল মাগো, নির্ব্বাক যে,
মানব-ভ্রাতার বর্ব্বরতায় আজো নির্ব্বাক রহিল লাজে!

কবি মনোহর দাস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সম্মুখে নদী, উপরে আকাশ, পিছনে বনচ্ছায়া—এমন পরিবেশ থাকিলেই যে মানুষ কবি হইয়া উঠিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অথচ বিখ্যাত কবি মনোহর দাসের স্মৃতি বর্ণন করিতে আসিয়া শহরের সাহিত্যিক-মণ্ডলী প্রতি বৎসরই ঐগুলিকে কবি-জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। ঘোষণা যে তাঁহাদের অমূলক, এমন কথা বলিবার সাহস অবশ্য কাহারও নাই। কারণ, কবির কাব্য হইতে এমন অনেক অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—যাঁহাতে মাঠ, বন, নদী, আকাশ ইত্যাদির অপরূপত্ব মনকে স্পর্শ করিবারই কথা। কিন্তু কেন স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ জিনিষের মধ্য দিয়া অপ্রত্যক্ষীভূত দ্রব্যসমূহে কবি আত্মসমর্পণ করেন—যে-তথ্য পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা অল্পজনেই করিয়া থাকেন। অধিকাংশ মানুষই বাহিরটাকে দেখিয়া ভুল যুক্তির পথে বিভ্রান্ত শকটখানিকে চালাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। স্মৃতি-পূজা তাই স্তুতি-পূজার নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়! কবি যখন একাগ্র সাধনার বলে অপরিমিত খ্যাতি লাভ করেন—তাহার পূর্ব্বেকার মানুষ তখন নিঃশেষিত। মানুষের চিতার অঙ্গারে কবির নবজন্ম—একথা তোমরা জান কি? না জান তো শোন।

নদীর ধারেই ছিল গ্রাম—জনবহুল গ্রাম। গ্রামবাসীদের আন্তরিকতা—বিবাদে এবং মৈত্রীতে—যেমন প্রবল আবহমান কাল হইতে চলিতেছে—তেমনই হয়তো ছিল। অর্থহীন মনোহর দাসকে প্রতিবেশীদের সক্রিয় শক্তির আস্বাদ কিছু-না-কিছু লইতেই হইত। কিন্তু রমার প্রসাদ-পরিপুষ্ট নহেন বলিয়া সে অবজ্ঞা তাঁহার মর্মভেদ করিতে পারে নাই। বাল্যকাল হইতে যে পারিপার্শ্বিক তাঁহার কোমলতম বৃত্তিগুলিকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছিল—সে ঐ নদী, আকাশ, মাঠ বা লতাগুল্ম নহে—সে অভাবগ্রস্ত সংসারের নানান দিক হইতে নানা ভাবে আঘাত দিবার পটুতা। আঘাত পাইলেই মনোহরকে নদী ডাকিত হাতছানি দিয়া, মৌন আকাশে ফুটিয়া উঠিত অসীম রহস্য; তিনি মাঠের তৃণাঙ্কুরে অপরূপ শোভা দেখিতেন ও পাখীর কাকলীতে সান্ত্বনা লাভ করিতেন। গ্রাম্য পাঠশালার সঙ্গে মাত্র তাঁর পরিচয়। পয়ার ছন্দে মনোহর দাস সেই বিদ্যার পরিচয় দিতে অধীর হইতেন। তাঁহার কাঁচা হাতের ভাঙা ছন্দের বিন্যাসে ধরা পড়িত—মাঠ, নদী, আকাশ। অন্তরালে বসিয়া দুঃখজয়ী মন তাহা উপভোগ করিত।

দারিদ্র্য জন্মসঙ্গী হইলেও মনোহর দাস বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ করিয়াছিলেন বলিলে ভুল বলা হইবে; বারো বৎসরের ছেলের সঙ্গে আট বৎসরের বালিকার যে বিবাহ তাহাতে ইহলৌকিক সুখসাধ ও পারলৌকিক ধর্ম্মরক্ষার হেতুটিরই প্রাবল্য দেখা যায়।

সে চিন্তা যাঁহারা করিবার তাঁহারাই করিয়াছিলেন। অবশ্য মনোহর দাসের তাহাতে আপত্তি করিবার এতটুকু কারণ ঘটে নাই। চিরস্থায়ী একটি খেলিবার সঙ্গিনী পাইলে, কোন্ কিশোর না কলহে ও সৌহার্দ্দ্যে পুলক-চঞ্চল হইয়া উঠে! উমার কালো মুখখানিও মনোহর দাসের ভাল লাগিত। গৌরবর্ণ মনোহরের পাশে কৃষ্ণা উমাকে দেখিলেই অনেকে বলাবলি করিত, 'আহা, রাধাকৃষ্ণ যেন রূপ বদলে ধরায় এসেছে! হোক কালো, তবু কি শ্রী!'

তার পর আসিল সংসারের পুরা দায়িত্ব। মনোহর দাস তখন কুড়ি বৎসরের যুবক, উমা ষোড়শী। স্ত্রীর সঙ্গে খুনসুটি করিবার বয়স এক মুহূর্ত্তে মনোহর পার হইয়া গেলেন, উমার মুখেও গৃহিণীর গাম্ভীর্য্য নামিল। জমি যা ছিল সামান্যই; দোকানের খাতা লিখিয়া মনোহরের পিতা সংসার চালাইতেন। অনভিজ্ঞ মনোহর জানেন খাতা দুই একটি ভাঙা ছন্দের পয়ার লিখিবার জন্যই,

হিসাবের অঙ্কপাত তাহাতে করিবে কোন্ বেরসিক! কাজেই অপটু মনোহরের পিতৃস্মৃতিটুকু বজায় রহিল না।

উমা পাকা গৃহিনীর মত বলিল,' 'বাবার শ্রাদ্ধে সবই তো খরচ করলে, সংসার চলে কিসে?'

মনোহর দাস নির্লিপ্ত ভাবে উত্তর দিলেন, 'সে তুমি জান আর জানেন ভগবান।'

আট বছর বয়স হইতে যাহাকে সংসার চিনাইবার জন্য মনোহরের পিতা কত দিন পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন, সে ভগবান্ ভরসা করিয়া ভক্তি গদগদ্ চিত্ত হইবে কোন্ সান্ত্বনায়? মুখের রেখা কয়টি তাহার চক্ষুর দৃষ্টির সঙ্গে কঠিন হইয়া উঠিল। ঈষৎ বেগের সহিত উমা উত্তর দিল, 'হুঁ, তা না হ'লে আর পুরুষ বলেছে কেন। উপায় করব আমি!'

মনোহর দাস শিস্ দিয়া গান ধরিলেন,

'আমার দে মা তবিলদারী—'

'থাম, লজ্জা করে না।'

হাহা করিয়া হাসিয়া মনোহর দাস বলিলেন, 'লজ্জা! লজ্জা কিসের!' পরে সুরে বলিলেন,

বলো বলো ননানন্দী বলো নাগরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।

রাগ করিয়া উমা চলিয়া গেল, মনোহর দাস খাতা খুলিয়া বসিলেন।

কিন্তু খাতা খুলিয়া তিনি হিসাব দেখিতেই বসিলেন। নীরস কঠিন অঙ্ক, মনোহর দাস ঘামিয়া উঠিলেন। ইচ্ছা হইল, এক বার নদীর ধারে বেড়াইয়া আসেন। কাছেই নদী। এ-পারের নিম্ন বালুতট ঝাউবনের সীমানায় মাথা রাখিয়াছে, ঘাসের উপর ছলছলাৎ শব্দে জলতরঙ্গ বাজিতেছে। মনোহর দাস ধূসর আকাশের পানে চাহিলেন। আশ্চর্য্য, সেখানে কবিতা লেখার কোন উপকরণ নাই, নীরস অঙ্কের ব্যূহ রচনা করিয়া গৃহিণী উমার সংসার ক্রমশ দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিতেছে। বিভ্রান্ত মনোহর আর বার চাহিলেন নদী তরঙ্গের পানে। বাধা-হীন অসংখ্য ঢেউয়ে নদী অবাধে বহিয়া চলিয়াছে। না, এখানেও দুরূহ উমার দুষ্প্রবেশ্য সংসার। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার সঙ্গে সঙ্গে মনোহর দাস গৃহে ফিরিলেন।

কিশোরী উমা মান করে নাই, হাসিমুখে সন্ধ্যাদীপ হস্তে মনোহরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। স্নিগ্ধ কল্যাণী মূর্ত্তি। চোখে মুখে আসন্ন রাত্রির প্রসন্নতা, দেহভঙ্গিতে রাত্রির রহস্যের অনেকখানি ধরা পড়ে। মনোহর তাহার আঁচল টানিয়া হাসিমুখে বলিল, 'কি গো কল্যাণী?'

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উমা বলিল, 'এক বেলায় এত ভুল! কল্যাণী নয়, উমা।'

অঞ্চলের আড়াল অন্তর্হিত হওয়াতে দমকা বাতাসে প্রদীপ নিবিয়া গেল। মনোহর দাসের বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়িয়া উমার আর তুলসীতলায় যাওয়া হইল না।

উমার সংসারে মেঘরৌদ্রের খেলা কিন্তু বেশী দিন চলিল না। মনোহরের বিষয়বুদ্ধিতে ঘা দিয়া উমা কূটবুদ্ধি সাংসারিক মনোহরকে সংসার অঙ্গনে দাঁড় করাইতে পারিল না। তিনটি বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম উমার ব্যর্থ হইয়া গেল। সংসারে মনোহর দাস পা দিলেন না। কিন্তু কবিতাও তো মনোহর এই তিনটি বৎসরে বেশী লিখিতে পারেন নাই। নাতিবৃহৎ খাতাখানির অর্দ্ধেকের উপর পাতাগুলিতে কালির রেখা নাই; বাহিরের কোন ব্যক্তিকে শুনাইবার জন্যও তিনি খেয়ালের ছন্দ সাজাইয়া বসেন নাই। যেদিন সংসারের চক্রে তৈলাভাব ঘটিত, উমার মুখ ভার ও কিস্তের অর্দ্ধাশনে কুটীরের চারি দিকে বিষণ্ণ গম্ভীর হাওয়া নামিত, সেই দিনই উমাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য মনোহর দাস খাতা খুলিয়া বসিতেন। বলিতেন, 'শোন উমা, কেমন লিখেছি।'

প্রথমটা রাগ, কিছু অমনোযোগ এবং সর্ব্বশেষে পরম মুগ্ধার মত মনোহরের কবিতা শুনিতে শুনিতে উমা প্রশ্ন করিত 'তার পর, তার পর?'

'তার পর নেই, উমা।'

উমা প্রফুল্ল মুখে বলিত, 'এমন সুন্দর তুমি লেখ!'

'খুব সুন্দর লাগে, উমা?' মনোহর দাসের মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

'এক কাজ কর না কেন গো। যাত্রার পালা লেখ, পয়সা হবে—নাম হবে।'

মনোহরের মুখের ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হইয়া উঠিত, তিনি

বলিতেন, 'দূর! সেখানে যত ভাল ভাল লোক পালা লিখছেন—আমার লেখা ঠাঁই পাবে কেন। আমি যা লিখব, তা শোনাব শুধু তোমাকে।'

'না, পালা-গান লিখতেই হবে তোমাকে।'

উমার জিদ দেখিয়া মনোহর দাস হাসিতেন এবং এক সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিতেন, পালা-গান তিনি লিখিবেন।

কিন্তু উমা যাহাতে মুগ্ধা হইয়া যায়, জনসাধারণ তাহার ঠিকমত মূল্য দিল না। নূতন কবির অপটু বাণী সুর-সজ্জতের সঙ্গে খাপ খাইল না।

মনোহর দাস ম্লান হাসিয়া বলিলেন, 'দেখলি উমা।'

উমা ক্রুদ্ধ মুখের দৃষ্টি বাহিরের পানে হানিয়া বলিল, 'ওরা বোঝে তো ছাই!'

দুঃখের বর্ষাধারায়ও অনেক জীবন এক রূপ কাটিয়া যায়, মনোহর দাসেরও হয়তো কাটিত। উমার কোমল মনে দুঃখের রেখাগুলি ক্রমশ গভীর ভাবে দাগ কাটিতে লাগিল। নিজের ছেঁড়া ময়লা কাপড়, রুক্ষ চুল ও অলঙ্কারবিহীন দেহের পানে চাহিয়া মাঝে মাঝে সে বলিত, 'হ্যাগা, তোমার মুখেই তো শুনি—মানুষের দুঃখ বা সুখ কিছুই চিরকাল সমান ভাবে থাকে না। আমাদের কি এমনি ভাবেই দিন কাটবে?'

হাসিয়া মনোহর দাস বলিতেন, 'কাটলই বা, উমা। ভগবানের যা দেওয়া তা তো মাথা পেতে নিতে হবে।'

মূঢ়ের মত উমা প্রশ্ন করিত, 'তা ভগবান্ এক জনকেই বা এত দুঃখকষ্ট দেন কেন?'

'কর্ম্মফল।'

'কর্ম্মফল কি?'

বুঝাইতে গেলেও উমার সহজ বুদ্ধিতে জন্মান্তর-রহস্য প্রহেলিকা বলিয়াই বোধ হইত।

একটু থামিয়া হয়তো বলিত, 'আচ্ছা এ কথা কি সত্যি যে যারা ভগবান্‌কে ডাকে তাদেরই তিনি বেশী বেশী করে দুঃখ দেন!'

'হ্যাঁ, সত্যিই তো।'

'কেন দেন?'

'সুখে থাকলে মানুষ যে সব ভুলে যায়—তাঁকে পর্য্যন্ত। তাই তিনি তাঁর ভক্তকে দুঃখ দিয়ে তাঁর উপর ভালবাসা ভুলতে দেন না।'

'ইস, তা বই কি! ধর, আমাদের চালাখানা যদি কোঠা হয়, আমরা যদি রাজভোগ খেতে পাই, তাহলেও তাঁকে মনে রাখব।'

'মনে রাখবে না বলেই তো তিনি আমাদের এত দুঃখ দিচ্ছেন।'

কোনদিন বা আকাশের পানে চাহিয়া নির্ব্বোধ উমা প্রশ্ন করিত, 'আচ্ছা, ঐ আকাশের উপরে তো দেবতারা রয়েছেন—তাঁরা কেন আমাদের দুঃখ দূর করছেন না?'

'কি জানি, হয়তো তাঁদের খেয়াল।'

এ-কথায় উমা খুশি হইত না। মুখ ঘুরাইয়া প্রসঙ্গান্তরে আসিত, 'আজ মিত্তিরদের ন-বউয়ের গলায় সোনার চিক দেখে এলাম; চমৎকার গড়েছে।'

মনোহর দাস বলিতেন, 'মনে কষ্ট হ'ল না—তোমার অমন চিক নেই বলে?'

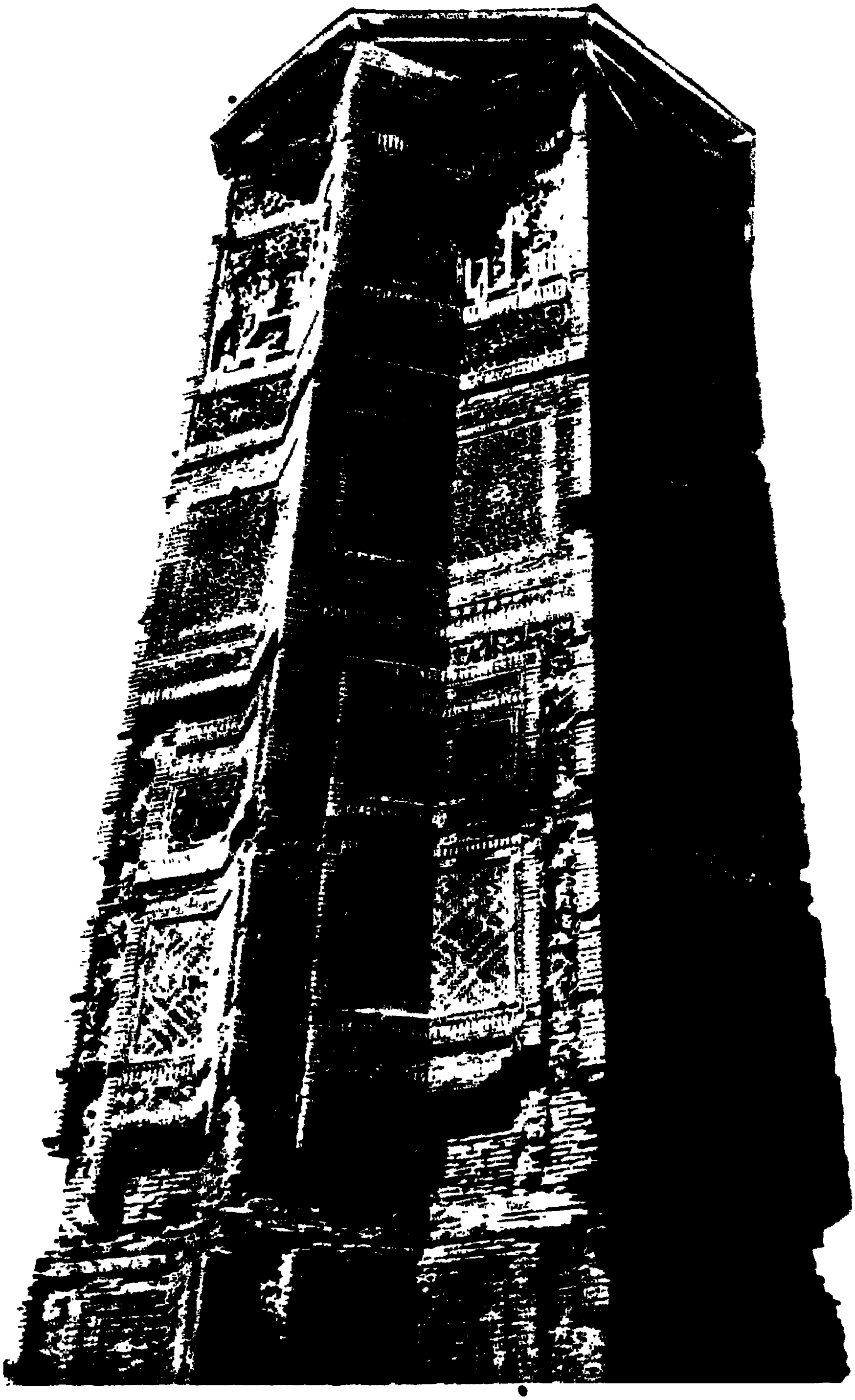
উমা বলিত, 'দূর—তা কেন হবে। মিত্তির-বউ আমার গলায় এক বার পরিয়ে দিয়েছিল; সবাই বললে চমৎকার মানিয়েছে।'

'শুধু আমিই দেখিতে পেলাম না।' কপট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনোহর দাস চুপ করিতেন।

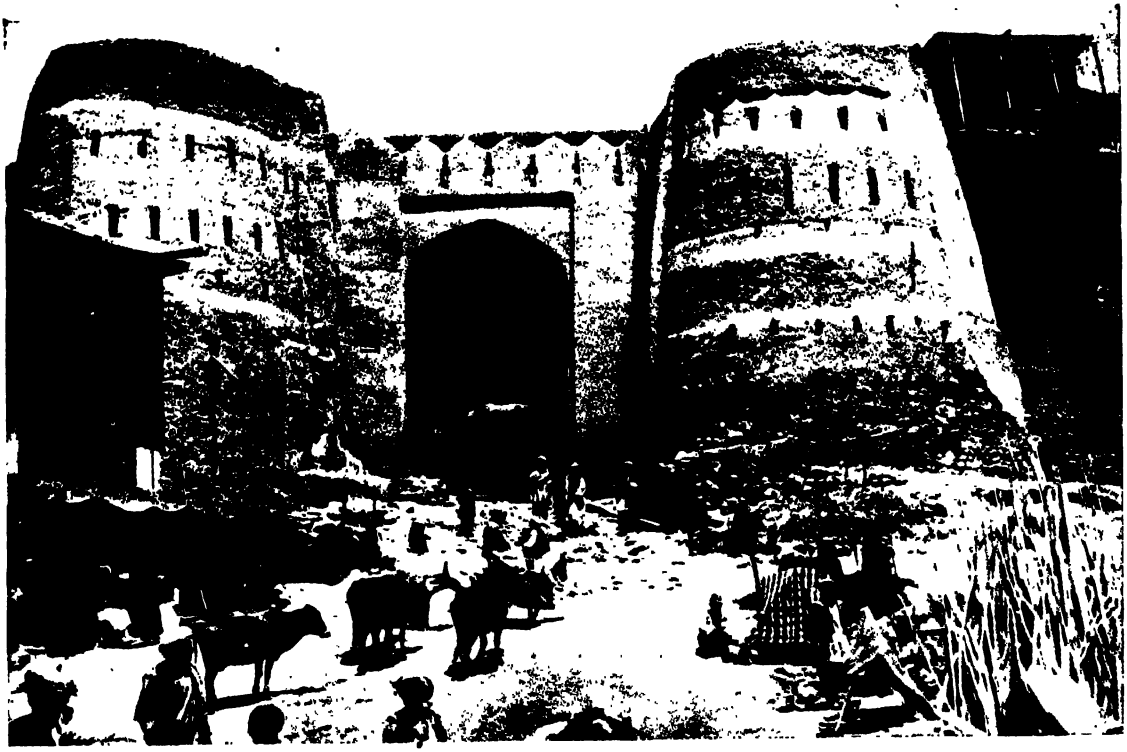
উমা বলিত, 'তা যাই বল, চিরদিন সমান যায় না। আমাদেরও এক দিন সুখের দিন আসবে, সেদিন গড়িয়ে দিও চিক।'

কে জানে কবে আসিবে সেদিন? সন্তর্পণে, উমার শ্রবণকে লুকাইয়া মনোহর দাস একটি অকৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন।

ক্রমশ উমার ধারণা হইল, তাহাদের দুঃখের রাত্রি বুঝি শীঘ্রই প্রভাত হইবে। কোন এক সকালে সুখের সূর্য্য কিরণ তাহাদের কুটীর-অঙ্গনে ফুটিয়া উঠিবে। পাড়া প্রতিবেশী সকলের কথায় সেই ধারণা তাহার দৃঢ়তর হইতে লাগিল। মিত্রদের, ভট্টাচার্য্যদের, দাসেদের অবস্থা তুলনামূলক সমালোচনা সে করিতে বসিল। বাউটি, চিক, রতনচূড়ের স্বপ্ন তাহাকে পাইয়া বসিল। সকলের



গজনীর মিনার



গজনীর প্রবেশ-তোরণ



চাকার তলায় ঘোরে সুখদুঃখ, আর তাহাদের চাকা কি একটি দিকেই,—দুঃখের দিকেই, নিশ্চল হইয়া থাকিবে? পুরাণে, মহাভারতে, রামায়ণে একথা তো কোথাও লেখা নাই। দ্রৌপদীর দুঃখ, সীতার বেদনা, সাবিত্রী দময়ন্তী চিন্তা ইত্যাদি সব মহীয়সী মহিলার উপাখ্যান সে মুখে মুখে শুনিয়াছে। দুঃখ যে শরতের লঘু মেঘ—এ-ধারণা বদলাইবার কোন হেতু নাই।

মনোহর দাস উমার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া মাঝে মাঝে বলেন, 'দিনরাত এত কি ভাব, উমা?'

হাসিয়া উমা বলে, 'দেখ—দুঃখ চিরকাল থাকে না।'

মনোহর দাস বলেন, 'যদি সুখ না-ই আসে?'

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া দৃঢ় কণ্ঠে উমা প্রতিবাদ করে, 'তাহলে রামায়ণ-মহাভারত মিথ্যে? রাতের পর দিন হয় কেন! তুমি দেখো।'

দিন কাটিয়া যায়, রাত্রিও কাটে; মাস এবং বৎসর পরে পরে আগাইয়া চলে; উমার ভাগ্যদেবতার মুখখানি প্রসন্ন হাস্যে ভরিয়া উঠে না। চন্দ্র-সূর্য্যের মত রামায়ণ-মহাভারতও সত্য; পৃথিবীর কত নরনারী সুখদুঃখের উত্থানপতনের কাহিনী রচনা করিয়া চলিয়াছে; উমাদের ভাগ্যাকাশের মেঘখানিই শুধু চিরদিনের জন্য সে-কাহিনীকে অন্তরাল করিয়া রাখিবে?

মনোহর দাস যেমন উমাকে আদর করিয়া সম্বোধন করেন, উমা অধীর কণ্ঠে দ্রুত প্রশ্ন করিতে থাকে, 'হ্যাঁগা রামায়ণ মহাভারত সত্যি তো? সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—'

মনোহর বলেন, 'সবই সত্যি, উমা, কিন্তু:

চির রাহুগ্রাসে ডুবেছে যে জন
তার দুঃখ বল কে করে মোচন।

আমাদেরও হয়েছে তাই।'

উমা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলে, 'ভাল লাগে না তোমার ছড়া। পুরুষমানুষ ব'সে থাকলে কখনো লক্ষ্মীশ্রী থাকে?'

'কিন্তু উপায় কি?'

'তোমার চেয়ে কিছু জানে না এমন লোকেরও তো দু-বেলা দু-মুঠো জুটছে, তাদের বউরাও বাজু-পৈঁছে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করছে।'

হো হো করিয়া মনোহর দাস হাসিয়া উঠেন। তীব্রস্বরে উমা বলে, 'হাসলে যে?'

'তোমার বাজু-পৈঁছে আর সুখে ঘরকন্নার কথা শুনে। বাঃ রে, উমা:

সোনার জলুষ দেখে চোখে লেগেছে যে ঘোর।
সোনার দুঃখে তাই সেখানে বইছে অঝোর ঝোর।

বাঃ রে, উমা!'

'যাও। কথায় কথায় মস্করা ভাল লাগে না। যে-পুরুষের রোজগারের যোগ্যতা নেই—তার জীবনে ধিক।'

হাসিয়া মনোহর দাস বলেন, 'ঠিক বলেছ:

সোনাদানা আনে না যে কিসের বড়াই তার।
মুখখানি সে নাড়ে যদি পুড়ুক তাতে খার।'

কল্যাণী বধূ কলহমুখরা হইয়া উঠিল। অন্তরে তার সোনার অগ্নিশিখা হয়তো জ্বলিয়াছিল, বাহিরে ক্রমশ সে-আগুনে তপঃক্লিষ্টা উমার মতই সে শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু শুধু চিন্তায় মানুষ শুকাইয়া যায় না; অর্দ্ধাশনও তার হেতু বটে। মনোহর দাস মুখের হাসির মধ্যে ব্যথাকে ঢাকিয়া রাখিলেন। ব্যথার তার একটি হৃদয়ে যেমন বেসুরো বাজে আর একটি মনে তার ঝঙ্কার তুলে; সুতরাং দু-জনের ব্যথা দু-জনকেই ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল।

একদিন অর্দ্ধাশনক্লিষ্টা উমা রাগের মুখে বলিয়া ফেলিল, 'হা-ঘরের হাতে পড়ে আমার এই দুর্দ্দশা। বাবা যদি আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে দিতেন!'

মনোহর দাস ম্লান হাস্যে বলিলেন, 'তাহলে সত্যিই তুমি সুখী হতে, উমা।'

'হতামই তো।'

মনোহর দাস কহিলেন;

'সুখ যদি রে হাটের বেগুন হ'ত।
তারে দর করে আর পয়সা দিয়ে সবাই কিনে নিত।'

গান-শেষে মনোহর দাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। উমা তখন সেখানে ছিল না।

ইহার পর যে-অধ্যায় মনোহর দাসের জীবনের পাতাগুলিকে রহস্যময় করিয়াছে তাহা এই—

এক দিন হঠাৎ উমা মিত্র বাড়ীতে দাস্যবৃত্তি গ্রহণ করিল। না করিলে মানুষ কি আর উপবাস দিয়া মরিয়া যাইতে পারে? দেশে হইয়াছে অজন্মা; মনোহরের জমিতে এক মুঠা ধানও নাই যে, দিনকতক অর্দ্ধাশন চলিতে পারে; আলস্যের কাঁথাখানি বহু চেষ্টা করিয়াও উমা মনোহর দাসের গা হইতে ছাড়াইয়া লইতে পারে নাই। প্রাণের চেয়ে যাহারা মানের দাম যাচাই করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই দিনের পর দিন অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকিয়া তাহার ঠিক মহিমাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে জানে না। উমা জানে, কাজেই দাস্যবৃত্তি গ্রহণ করিতে সে ইতস্তত করে নাই।

তার পর এক দিন মিত্রদের মেজবাবু সস্ত্রীক তীর্থভ্রমণের উদ্যোগ করিলেন। বাহিরে যাইতে হইলে এক জন পরিচারিকার প্রয়োজন—উমাকে সে-কথা জানাইলেন। মনোহরকে ছাড়িয়া যাইতে উমার মন চাহিল না, কিন্তু প্রলুব্ধা নারীর মনের এক দিকে পুণ্যসঞ্চয়ের মেঘখানিও সেই সঙ্গে ঘনাইয়া উঠিল। মনোহর তো আছেনই, চিরকাল থাকিবেনও; কিন্তু এ-সুযোগ হাতছাড়া হইলে জীবন ভোর হা-হুতাশ করিতে হইবে যে!

রাত্রিতে বহুদিন পরে মনোহরের গা ঘেঁষিয়া উমা কোমল কণ্ঠে বলিল, 'শুনছ?'

'ঘুমুই নি, বল।'

'কাল মেজ বৌমা কি বলছিলেন জান? ওঁরা নাকি তীর্থ করতে যাবেন; আমায় বললেন, "সঙ্গে চ"।'

'যাবে তুমি?'

'তুমি যদি বল তো—'

'আমি বললেই তুমি যেতে পার? পার উমা?'

উমা কোমল কাতর কণ্ঠে বলিল, 'অমন করে ব'লো না গো।'

উমার পিঠে একখানি হাত রাখিয়া মনোহর দাস বলিলেন, 'না, উমা, থাক।'

উমা আনন্দিত হইল, ক্ষুণ্ণও হইল। বলিল, 'কেন? আমায় বিশ্বাস কর না?'

ব্যথিত কণ্ঠে মনোহর দাস বলিলেন, 'বিশ্বাসের কথা নয়। না হ'লে নিরুপায় হয়ে ওদের বাড়ী তোমাকে কাজ করতে দিই।'

অন্ধকারে মনোহর দাসের কণ্ঠস্বর থামিয়া গেল। গাঢ় থমথমে আওয়াজ—কখন বুঝি কান্নায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

উমা বলিল, 'তবে?'

মনোহর দাস বলিলেন, 'কখনও তো ছেড়ে থাকি নি। হাজার দুঃখ পাই—তবু তুমি কাছে রয়েছ।' একটু থামিয়া বলিল 'আর—'

বলি-বলি করিয়াও মনোহর দাস সে-কথা বলিতে পারিলেন না।

উমা অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'আর কি?'

ধরা গলায় মনোহর দাস বলিলেন, 'মরণ-বাঁচনের কথা কিছুই তো বলা যায় না, উমা।'

উমা সে-কথা শুনিতে পারিল না। ঝাঁপাইয়া তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া দুই চক্ষের জলে বান ডাকাইয়া ছাড়িল। মনোহর দাসের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না।

অনেক ক্ষণ পরে উমা বলিল, 'আচ্ছা যদিই যাই, একটা ছড়া বল না গো।'

মনোহর দাস বুকে হাত দিয়া বলিলেন, 'এখানে যে ঝড় বইছে, ছড়া আসবে কি?' হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা, শোন:

তোমার মুখের পরে নেমেছে যে চাঁদ।
আমার হৃদয় জুড়ে পেতেছে সে ফাঁদ।
সে-চাঁদ ডুবিলে পরে নেবে যদি আলো
আমারে স্মরিয়া, সখি, হৃদি-দীপ জেলো।'

জাগিয়াই সে রাত্রি প্রভাত হইল।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উমাকে তীর্থযাত্রিণী হইতেই হইল। রাত্রির দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের চিহ্ন দিনের আলোয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সেই মুহূর্ত্তগুলি দিনের আলোকেও যদি প্রকট হইয়া উঠিত তাহা হইলে আজ আমরা কবি মনোহর দাসকে খুঁজিয়া পাইতাম না।

উমার বিরহে মনোহর দাসের পালাগানের খাতাখানি সত্যই দ্রুত ভরিয়া উঠিতে লাগিল। প্রত্যেক মাসের শেষে মেজবাবুর তীর্থভ্রমণের সংবাদ মিত্র-বাড়ীতে আসিত। সে কুশল-সংবাদের সঙ্গে স্বতন্ত্র উমার কোন উল্লেখ থাকিত না যদিও, তবু সার্ব্বজনীন

কুশলটির মধ্যে উমার শারীরিক তত্ত্ব মনোহরের কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। প্রত্যেক মাসে লিপি আসিলে মনোহর দাস নদীর ধারে গিয়া বসিতেন, আনন্দে গলা ছাড়িয়া গান গাহিতেন, কিংবা কয়েকটি ছেলে জুটাইয়া বালু ছিটাইয়া খেলা করিতেন। দূরে গিয়াও প্রিয়া যে প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভরিয়া দিতে পারে—কবির এ মধুর কল্পনার সঙ্গে এত দিনে মনোহরের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিল।

দীর্ঘ দিন পরে তীর্থযাত্রীরা ফিরিয়া আসিল।

মিত্র-বাড়ীর বর্ষীয়সী গৃহিণীরা, স্থবিরা বৃদ্ধারা, বিধবা, বালক ও যুবতী স্ত্রীরা সকলেই ফিরিয়া আসিল, আসিল না শুধু উমা। কেন আসিল না উমা? মনোহরের দুর্ব্বল মনের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করিতে সে বুঝি দূরে রহিয়া গেল? বুঝি কৌতুকপ্রিয়তা তার দেশভ্রমণের সঙ্গে বাড়িয়াছে; তাই মনোহরকে পরীক্ষা করিবার জন্য অন্তরালে কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে?

অবশেষে নিষ্ঠুর সত্যই প্রকাশ পাইল। উমা মরিয়াছে। তীর্থের পথে মৃত্যু তাহাকে মুক্তি দিয়া স্বর্গ-অভিমুখী করিয়াছে। সে-মৃত্যু নাকি শত জন্মের তপস্যাতেও মিলে না। উমার ভাগ্য ভাল, তাই স্বামীকে রাখিয়া—হিন্দুর পরমকাম্য তীর্থের পথে দেহরক্ষা করিয়াছে। সে-জন্য শোক কেন? মনোহর দাস না পুরুষমানুষ!

ভাল লাগিল না গ্রাম; জন্ম-পল্লীর টান এক দণ্ডে ঢিলা হইয়া গেল। উমা যেন সেই সুদূর তীর্থপথ হইতে তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সেই কলহমুখরা নারী, সেই ছোট্ট সরলা উমা সোনার মোহ যার চোখে রং ধরাইয়াছে, অদৃষ্টকে যে সুখদুঃখের পাল্লায় মাপিয়াছে চিরকাল, যে দুঃখের বোঝা বহিয়াছে হাসিমুখে সুখের স্বাদ পাইবে বলিয়া, সেই দিনে-হারানো এবং রাত্রিতে ফিরিয়া-পাওয়া উমাকে স্মরণ করিয়া মনোহর দাস ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সংসার বলিতে তাঁহার কিছু ছিল না। এক দিনেই সেখানে সব কিছুর বন্দোবস্ত করা চলে। গোয়ালের দুগ্ধবতী গাভীটি ও উমার বিরহে লেখা পালাগানের খাতাখানি সখা সুবলকে দিয়া মনোহর দাস অজানা তীর্থের পথে পা বাড়াইলেন।

এক দিন সতীবিরহে মহেশ্বর কি এমনই উদ্‌ভ্রান্তের মত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন?

কত বাউল-ফকির, কত বৈষ্ণব-মহাজন, কত সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিতে করিতে মনোহর দাস অবশেষে কাশী পৌছিলেন। কে জানে এখানে উমা দেহ রাখিয়াছে কি না!

কাশী তাঁহার ভাল লাগিল। মনস্থ করিলেন, কিছু দিন এখানে থাকিবেন। অপরাহ্ণে দশাশ্বমেধ ঘাটের জনসমারোহ, কীর্ত্তন, কথকতা, পাঁচালির আসর মনোহর দাসকে বাঁধিয়া রাখিল। দৈবী প্রেমের মধ্যে মানুষের ভালবাসাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি যেন খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

তার পর এক দিন অতর্কিতে—যাহা কখনও ভাবেন নাই—তেমনই এক অভাবিত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বিশ্বনাথের সঙ্কীর্ণ গলি-পথে মুখোমুখি যাহার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল—সে উমা। প্রেতিনী নহে, শরীরী উমা। দুঃখক্লিষ্টা ম্লানমুখী উমা নহে। তার বসনে মালিন্য নাই, চুলে নাই রুক্ষতা, কপোলে বা গণ্ডে নাই পাণ্ডুরতা। সুখের রৌদ্রে পিঠ রাখিয়া বসিলে মানুষকে যেমন দেখায় তেমনই রূপ উমার।

মনোহর দা[illegible]নন্দে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উমা নিষ্পলকে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। নিমেষে তাঁহার মুখের সমস্ত রক্ত চলিয়া গেল, পরমুহূর্ত্তেই রক্তোচ্ছ্বাসে সে-মুখ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া অচৈতন্যের মত মনোহর দাস উমাকে সাপটাইয়া ধরিতেছিলেন, উমা সরিয়া গেল। কৌতুহলী জনতা রঙ্গ উপভোগ করিতেছে বোধ হইল। উমা সঙ্কেতে মনোহরকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে বলিয়া অগ্রসর হইল। দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া সে মনোহরকে একটি প্রণাম করিল। মাথাটি মাটিতে লুটাইয়া দিল, কিন্তু মনোহরের পাদস্পর্শ করিল না। মনোহর আবার ব্যাকুল বাহু বাড়াইলেন, উমা ত্বরিতে নিরাপদে ব্যবধান রচনা করিয়া প্রশ্ন করিল, 'ভাল আছ?'

মনোহর শুধু ডাকিলেন, 'উমা।'

উমা হাসিয়া বলিল, 'উমা তো মরেছে, কেন বার বার তাকে ডাকছ! একটি কথা শোন। শুনবে?' একটু থামিয়া বলিল, 'রামায়ণ-মহাভারত যে মিথ্যে নয় সে-কথার নজির রেখে গেলাম। কিন্তু, উঃ, বুকে বড্ড ব্যথা গো।'

মনোহর দাস বলিলেন, 'আমি এত পথ ভেঙে কষ্ট করে ছুটে এলাম, তুমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলে? সবাই বললে, তুমি মরেছ, আমার বিশ্বাস হয় নি।'

'কেন হয় নি?'

'কি জানি। আমি জানতাম যে, আমায় যে সত্যিকারের ভালবেসেছে—সে আমায় না জানিয়ে কোথাও যেতে পারে না, এমন কি পরলোকেও না।'

'তুমি জানতে?' উমার স্বর আগ্রহকম্পিত।

'জানতাম বই কি, উমা। তাই তো আবার দেখা হ'ল আমাদের।'

উমা আনন্দ-আপ্লুত স্বরে বলিল, 'আমিও এই আশায় বেঁচে আছি। নইলে দেহ যেদিন নোংরা হ'ল সেদিনই তো মরতাম।'

মনোহর দাস চমকিত হইলেন।

উমা তাঁহার চমক লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'তুমি কেন আমায় শিখিয়েছিলে দুঃখের পর সুখ আছে, রামায়ণ-মহাভারত মিথ্যে নয়? কেন পুণ্যির লোভ আমার মনে জাগল? দেখ দেখি আমাকে—এই কাপড়, দেহ, এই গহনা—কোথাও দুঃখকষ্ট আছে কি আজ?'

সোনার পৈছায় অপরাহ্ণের সূর্য্য-কিরণ পড়িয়া জ্বলিয়া উঠিল।

মনোহর দাস একদৃষ্টিতে বহুক্ষণ উমার মুখের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে কহিলেন, 'না উমা, তোমার বড় দুঃখ।'

উমার দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল। আকুল ভাবে সে কাঁদিয়া বলিল, 'আমি অবুঝ, আমায় কি তুমি মাপ করবে?'

আবার মনোহর দাস বাহু বাড়াইলেন, ছিন্নমূল পাদপের মত উমা তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

তার পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। বহুদিন পরে মনোহর দাস গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উমা সঙ্গে নাই। এবারের মৃত্যু-সংবাদ অলীক নহে। উমা নাকি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। সে-কালের রূঢ় সমাজের ভয়ে নহে, আত্ম-গ্লানিতে ও মনোবিকারে সে সত্যই দেহত্যাগ করিয়াছে।

বিদায়কালে সুবলকে যে পালা-গানের খাতাখানি দিয়া গিয়াছিলেন, সে পালা গান মনোহর দাস বাংলায় পা দিয়াই এক অপরিচিত পল্লীর বারোয়ারিতলায় শুনিলেন। সহস্র লোককে তাঁহার নায়ক-নায়িকার ব্যথায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিলেন। মনোহর দাসের মুখের জ্যোতি প্রখর হইয়া উঠিল। যে ব্যথা একদিন তাঁহার হৃদয়ে আবদ্ধ ছিল, আজ দেশময় তাহা ছড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন। তাঁহার যে-বেদনা—সে তো শুদ্ধমাত্র তাঁহারই নহে। বিশ্বব্যাপী সে-বেদনার আস্বাদ বহু নরনারীই যে লাভ করিয়াছেন। তিনি ও উমা ভালবাসার হোমাগ্নি জ্বালিয়া বহুর তপস্যাকে আজ সফল করিতে পারিয়াছেন। ধন্য তিনি—আর ধন্যা উমা।

উমাকে হারাইয়াও মনোহর দাস আবার তাহাকে নূতন করিয়া পাইলেন। ভালবাসার অদৃশ্য শক্তিতে মনোহর দাস আজ শক্তিমান। হাতে তিনি আবার শরের কলম তুলিয়া লইলেন, সম্মুখে মেলিয়া ধরিলেন বৃহৎ খাতা।

মানুষ মনোহর দাসের মৃত্যু হইল, কবি মনোহর দাস বাঁচিয়া উঠিলেন।

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩

জ্যৈষ্ঠের শেষে কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, মাটি ভিজিয়া সরস হইয়া উঠিয়াছে। চাষীর দল হাল-গরু লইয়া মাঠে গিয়া পড়িল। ধানচাষের সময় একেবারে মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, কাজেই নবীন ও রংলাল ধানের জমি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ধানের বীজ বুনিবার জন্ম হাফরের জমিতে আগে হইতেই চাষ দেওয়া ছিল, এখন আবার তাহাতে দুই বার লাঙল দিয়া তাহার উপর মই চালাইয়া জমি কয়খানির মাটি ভুরার মত গুঁড়া করিয়া বীজ বুনিয়া দিল। অন্য জমি হইতে বীজের জমিগুলিকে পৃথক্ ভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিবার জন্ম একখানা করিয়া তালপাতা কাটিয়া তাহাতে পুতিয়া রাখিল। ঐ চিহ্ন দেখিয়াই রাখালেরা সাবধান হইবে, এই জমিগুলিতে গরু-বাছুর নামিতে দিবে না।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি আবার এক পশলা জোর বৃষ্টি নামিল; ফলে মাটি অতিরিক্ত নরম হওয়ায় চাষ বন্ধ হইয়া গেল। নবীন আসিয়া বলিল—মোড়ল, এইবারে চরের উপর এক বার জোটপাট ক'রে চল। এখন এক বার চ'ষেকুঁড়ে না রাখতে পারলে আশিন-কাতিক মাসে কি আর ওখানে ঢোকা যাবে! একেই তো বেনার মুড়োতে আঁদার হয়ে আছে।

রংলাল বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিল, সে বলিল—এই ব'সে ব'সে আমিও ঐ কথাই ভাবছিলাম লোহার। ওখানে তো একা একা কাজ সুবিধে হবে না, উ তোমার 'গাঁতো' ক'রে কাজ করতে হবে। এক বারে পাঁচ জনার হাল—আমার দুখানা—তোমার দুখানা—আর উ তিন জনার তিনখানা—এই সাতখানা হাল নিয়ে এক ধারে পড়তে হবে। ওদের জমিতে এক দিন ক'রে আর আমাদের দুখানা ক'রে হাল—আমরা দু-দিন ক'রে লোব। বলিয়া সে হুঁকা হইতে কল্কে খসাইয়া নবীনকে দিয়া বলিল—লাও, খাও।

কল্কেতে টান মারিয়াই নবীন কাশিয়া সারা হইয়া গেল, কাশিতে কাশিতে বলিল—বাবা রে, এ যে বিষ! বেজায় চড়া হয়ে গিয়েছে হে!

হাসিয়া রংলাল বলিল—হু—হু, বর্ষার জন্যে তৈরি ক'রে রাখলাম। জলে ভিজে হালুনি যখন লাগবে, তখন তোমার একটান টানলেই গরম হয়ে যাবে শরীর!

—তা বটে। এখন কিন্তু এ তোমার বিষ হয়ে উঠেছে। বলিয়া সে কল্কেটি আবার গোষ্ঠকে ফিরাইয়া দিল।

রংলাল বলিল—তা হ'লে কালই চল সব জোটপাট ক'রে। মাঠানে তো এখন তোমার দু-তিন দিন হাল লাগবে না।

—তাতেই তো এলাম গো তোমার কাছে। বলি, মোড়লের ঘুম ভাঙিয়ে আসি এক বার। এই নরম মাটিতে বেনা-কাশ বেবাক উঠে যাবে তোমার।—কিন্তু একটা কথা আমি ভাবছি হে। ভাবছি, চক্রবর্তি-বাড়ী থেকে যদি হাঙ্গাম-হুজ্জোত করে তো কি হবে! জমি তো বন্দোবস্ত ক'রে দেয় নাই!

—ক্ষেপেছ তুমি! হাঙ্গামা করবে কে হে বাপু? কর্তা তো ক্ষেপে গিয়েছে। আবার নাকি শুনছি, বড় রোগ হয়েছে হাতে। বড় ছেলে তো কালাপানি, ছোটজনা তো পড়তে গিয়েছে ক-দিন হ'ল। মজুমদারের জবাব হয়ে গিয়েছে। আর মজুমদারই তো তোমার হাঁ ক'রে আছে, আবার এক বার বাগ পেলে হয়! থাকবার মধ্যে গিন্নীমা—আর মানদা ঝি। হুকুম দেবে গিন্নীমা আর লড়বে তোমার মানদা ঝি, না কি? বলিয়া রংলাল হো হো করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

নবীন আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু। ছোটজনা ভারি হুঁসিয়ার ছেলে হে, সে ভারি এক চাল চেলে গিয়েছে। সেই যি পঞ্চাশ বিঘে জমি—আমাদিকেও দিলে না, সাঁওতালদিগেও দিলে না, সেই জমিটা ভাগে বন্দোবস্ত ক'রে গিয়েছে—যত ছোকরা মাঝিদিগে। এখন যা হয়েছে তাতে গিন্নীঠাকরুণ হুকুম দিলে, গোটা সাঁওতাল-পাড়া হয়তো ভেঙে আসবে।

এবার রংলাল বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল, নীরবে বসিয়া মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া মুঠায় ধরিয়া চুল টানিতে স্বরু করিল। নবীন আপনার পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ টিপিতেছিল। কিছু ক্ষণ পর সে ডাকিল, মোড়ল!

—উঁ!

—তা হ'লে?

—সেই ভাবছি।

—আমি বলছিলাম কি, গিন্নীঠাকরুণের কাছে গিয়ে বন্দোবস্তের হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেলাই ভাল। কাজ কি বাপু, লোকের ন্যায্য পাওনা ফাঁকি দিয়ে! তার উপর ধর, জমিদার ব্রাহ্মণ!

—উঁহু, সে হবে না। যখন বলেছি, সেলামী দেব না, তখন দেব না।

—তা হ'লে?

—তা হ'লে আর কি হবে; হাল-গরু নিয়ে চল তো কাল—তার পর যা হয় হবে।

—উঠিয়ে দিলে তো মান থাকবে না, সে কথাটা ভাব।

রংলাল এবার খানিকটা মুচকি হাসিল, তার পর বলিল—তখন মেজেষ্টারীতে দরখাস্ত দেব যে, আমাদের জমি থেকে জোর ক'রে আমাদের তুলে দিয়েছে।

নবীন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অনেক দিনের চাকর, উপস্থিত চাকরি না থাকিলেও এই পুরাতন মনিব-বাড়ীর জন্য সে খানিকটা মমতা অনুভব করে। সেই প্রভুবংশের সহিত এই ধারায় বিরোধ করিতে তাহার মন সায় দিল না। সে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল বলিল—কি হ'ল, চুপ ক'রে রইলে যে! চলই তো জোটপাট ক'রে, দেখাই যাক না কি হয়!

নবীন এবার বলিল—সে ভাই আমি পারব না। লোকে কি বলবে এক বার ভাব দেখি!

রংলাল হাসিল, তার পর দুই হাতের বুড়া আঙুল দুইটি একত্র করিয়া নবীনের মুখের কাছে ধরিয়া বলিল—কচু! লোকে বলবে কচু! তুমি ঘরে তুলবে আলু গম কলাই গুড়, আর লোকে বলবে কচু!

নবীন তবুও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রংলাল এবার তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, চল, এক বার ঘুরে ফিরে ভাবগতিকটা বুঝে আসি। সাঁওতাল বেটাদের কি রকম হুকুম-টুকুম দেওয়া আছে, গেলেই জানা যাবে। আর তোমার জমিটার অবস্থাও দেখা হবে। চল, চল।

নবীন ইহাতে আপত্তি করিল না, উঠিল।

কালী নদীতে ইহার মধ্যে জল খানিকটা বাড়িয়াছে, এখন হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। কয়েক দিন আগে জল অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, উপরের বালুচর পর্য্যন্ত ছিল্‌ছিলে রাঙা জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। জল এখন নামিয়া গিয়াছে, বালির উপরে পাতলা এক স্তর লাল মাটি জমিয়া আছে। রৌদ্রের উত্তাপে এখন সে স্তরটি ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে, পা দিলেই মুড় মুড় করিয়া ভাঙিয়া বালির সহিত মিশিয়া যায়। তবুও এই লক্ষ টুকরায় বিভক্ত পাতলা মাটির স্তরের উপর এখনও কত বিচিত্র ছবি জাগিয়া আছে। কাঁচা মাটির উপর পাখীরা পায়ের দাগ রাখিয়া গিয়াছে, আঁকাবাঁকা সারিতে নক্সা আঁকা কাপড়ের চেয়েও বিচিত্র ছক সাজাইয়া তুলিয়াছে যেন। তাহারই মধ্যে প্রকাণ্ড চওড়া মানুষের দুইটি পায়ের ছাপ চলিয়া গিয়াছে। এ বোধ করি ঐ কমল মাঝির পায়ের দাগ! একটা প্রকাণ্ড সাপ চলিয়া যাওয়ার মসৃণ বঙ্কিম রেখা একেবারে চরের কোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। ইহারই মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় অতি সূক্ষ্ম বিচিত্র রেখায় লক্ষ লক্ষ পতঙ্গের পদচিহ্ন।

বেনা ও কাশের গুল্মে ইহারই মধ্যে সতেজ সবুজ পাতা বাহির হইয়া বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, বন্য লতা-গুলিতে নূতন ডগা দেখা দিয়াছে, ভিতরে ভিতরে শিকড় হইতে কত নূতন গাছ গজাইয়া গিয়াছে, সাঁওতালদের

পরিষ্কার করা পথের উপরেও ঘাস জন্মিয়াছে, কুশের অঙ্কুরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে।

তীক্ষ্ণাগ্র কুশের উপর চলিতে চলিতে বিব্রত হইয়া রংলাল বলিল—এ বেটারাও বাবু হয়ে গিয়েছে নবীন, রাস্তাটা ক'রে রেখেছে দেখ দেখি!

নবীন বলিল—ওদের পা আমাদের চেয়ে শক্ত হে!

পল্লীর প্রান্তে সাঁওতালদের জমির কাছে আসিয়া তাহারা কিন্তু অবাক হইয়া গেল। ইহারই মধ্যে প্রায় সমস্ত জমি সবুজ ফসলে ভরিয়া উঠিয়াছে। চষিয়া খুঁড়িয়া নিড়ান দিয়া তাহারা ভুট্টা, শন, অড়হর বুনিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে, জমির ধারে ধারে চারায় চারায় তাহাতে সীম, বরবটী, খেঁড়ো, কাঁকুড়ের অঙ্কুর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধানের জমিগুলি চাষ দিয়া সার ছড়াইয়া একেবারে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। বাড়ীঘরের চালে নূতন খড় চাপানো হইয়া গিয়াছে, কাঁচা সোনার রঙের মত নূতন খড়ের বিছানি অপরাহ্নের রৌদ্রে ঝকমক করিতেছে। ইহাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ সত্ত্বেও রংলাল এবং নবীন মুগ্ধ হইয়া গেল। রংলাল বলিল—বা-বা-বা! বেটারা এরই মধ্যে ক'রে ফেলেছে কি হে! অ্যাঁ! ঘাস-টাস ঘুচিয়ে বিশ বছরের চষা জমির মত সব তক তক করছে!

নবীন হেঁট হইয়া ফসলের অঙ্কুরগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। সে বলিল—অড়হরের কেমন জাত দেখ দেখি! একটি বীজও বাদ যায় নেই হে! তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আর আমাদের জমিতে হয়তো ঢুকতেই পারা যাবে না। দেখলে তো বেনা আর কাশ কি রকম বেড়ে উঠেছে!

আরও খানিকটা আসিয়া অহীন্দ্র যে জমিটা খাসে রাখিয়াছে সে অংশটার ভিতর তাহারা আসিয়া পড়িল। তখনও সেখানে কয়জন জোয়ান সাঁওতাল মাটি কোপাইয়া বেনা ও কাশের শিকড় তুলিয়া ফেলিতেছিল। এ অংশটারও অনেকটা তাহারা সাফ করিয়া ফেলিয়াছে, তবুও নূতন বলিয়া এখানে ওখানে দুই-চারিটা পরিত্যক্ত শিকড় হইতে ঘাস গজাইয়া উঠিয়াছে, এখনও জমির আকারও ধরিয়া উঠে নাই, এখানে ওখানে উঁচু নীচু অসমতল ভাবও সমান হয় নাই। তবু তাহারই মধ্যে যে অংশটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইয়াছে তাহারই উপর ভুট্টা বুনিয়া ফেলিয়াছে। সে জমিটা অতিক্রম করিয়া আপনাদের জমির কাছে আসিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সত্যই বেনা ঘাসে কাশের গুল্মে নানা আগাছায় সে যেন দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে। বেনা ও কাশ ইহার মধ্যে প্রায় এক কোমর উঁচু হইয়া বাড়িয়া গিয়াছে। এই জঙ্গলের মধ্যে লাঙল চলিবে কেমন করিয়া!

নবীন বলিল—ঘাস কেটে না ফেললে আর উপায় নেই মোড়ল।

রংলাল চিন্তিত মুখে বলিল—তাই দেখছি।

নবীন বলিল—এক কাজ করলে হয় না মোড়ল? সাঁওতালদিগেই এ বছরের মত ভাগে দিলে হয় না! এবার ওরা কেটেকুটে সাফ করুক, চ'ষে খুঁড়ে ঠিক করুক, তার পর আসছে বছর থেকে আমরা নিজেরা লাগব।

যুক্তিটা রংলালের মন্দ লাগিল না। সে বলিল—তাই চল, দেখি বেটাদের ব'লে।

সেই পরামর্শ লইয়াই তাহারা আসিয়া সাঁওতালদের পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ঝকঝকে তকতকে পল্লী, পথে বা ঘরে আঙিনায় কোথাও এতটুকু আবর্জনা নাই। পল্লীর আশেপাশে তখনও গরু মহিষ ছাগলগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে। সারের গাদার উপর মুরগীর দল খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার সংগ্রহে ব্যস্ত। আঙিনার পাশে পাশে মাচার উপর কাঠসীম, লাউ, কুমড়ার লতা বাসুকির মত সহস্রফণা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে যেন। বাড়ীগুলির বাহিরে চারি দিক্ ঘিরিয়া সরল রেখার মত ছোট একটি বাঁধ তৈরী করিয়াছে, তাহারই উপর এখানে ওখানে দুই-চারিটা জাফরি বসানো। ভিতরে আম কাঁঠাল মহুয়ার গাছ পুঁতিয়া ফেলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সজিনার ডাল এবং মূল সমেত বাঁশের কলম লাগাইয়া চারি পাশে কাঁটা দিয়া ঘিরিয়া দিয়াছে।

রংলাল বলিল—বাকী আর কিছু রাখে নাই বেটারা, ফল ফুল সজনে বাঁশ একেবারে ইন্দ্রভুবন ক'রে ফেলাইছে হে! জাত বটে বাবা!

প্রথমেই সেই পুতুলনাচের ওস্তাদ চূড়া মাঝির ঘর; মাঝি ছুতারের যন্ত্রপাতি লইয়া উঠানে বসিয়া লাঙল

তৈয়ারী করিতেছিল। একটি অল্পবয়সী ছেলে তাহার সাহায্য করিতেছে। একখানা প্রায়-সমাপ্ত লাঙলের উপর হাল্কা ভাবে যন্ত্র চালাইতে চালাইতে মাঝি গুন গুন করিয়া গান করিতেছে। নবীন লাঙলখানার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—দেখেছ এদের লাঙলের ধাঁচা দেখেছ। কেমন পাতলা আর কতটা লম্বা!

রংলাল দেখিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—বাজে। এত সরুতে পাশের মাটি ধরবে কেনে? ওর চেয়ে আমাদের ভাল। যাক গে, এখন আমাদের কাজের কথা। এই মাঝি, মোড়ল কোথা রে তোদের?

ওস্তাদ কথার কোন উত্তর দিল না, আপন মনেই কাজ করিতে লাগিল। রংলাল বিরক্ত হইয়া বলিল—এ-ই, শুনছিস?

মুখ না তুলিয়াই এবার চূড়া বলিল—কি?

—তোদের মোড়ল কোথা?

—মোড়ল?

—হ্যাঁ।

—মোড়ল?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ।

চূড়া এবার হাতের যন্ত্রটা রাখিয়া দিয়া কোন কিছুর জন্য আপনার ট্যাঁক হইতে কাপড়ের খুঁট পর্য্যন্ত খুঁজিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে বস্তুটা না পাইয়া অত্যন্ত হতাশ ভাবে বলিল—পেলম না গো!

রংলাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—ওই এ বেটা বলছে কি হে?

চূড়া সকরুণ মুখে বলিল—রেখেছিলাম তো বেঁধে। পড়ে গেইছে কোথা?

রংলাল অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া বলিল—দেখ দেখি বেটার আস্পর্দ্ধা, ঠাট্টা-মস্করা আরম্ভ করেছে!

চূড়া এবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল—মানুষ আপনার ঘরকে থাকে। তুরা তার ঘরকে যা। আমাকে শুধালি কেনে?

রংলাল কোন কথা বলিল না, নবীনের হাত ধরিয়া টানিয়া ক্রুদ্ধ পদক্ষেপেই অগ্রসর হইল। চূড়া পিছন হইতে অতি মিষ্টস্বরে ডাকিল—মোড়ল—ও মোড়ল!

রংলাল বুঝিল লোকটা অনুতপ্ত হইয়াছে, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কি?

চূড়া কোন কথা বলিল না, তাহার সমস্ত শরীরের কোন একটি পেশী নড়িল না, শুধু বড় বড় কাঁচা-পাকা গোঁফ জোড়াটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচিয়া উঠিল। গোঁফের সে নৃত্যভঙ্গিমা যেমন হাস্যকর, তেমনই অদ্ভুত। রংলালও সে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—বেটা আমার রসিক রে!

চূড়া এবার বলিল—বুলছি, রাগ করিস না গো!

মোড়ল মাঝির উঠানে খাটিয়ার উপর একটি আধা ভদ্রলোক বসিয়াছিল। কমল মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া কথা বলিতেছিল। লোকটির গায়ে একখানি চাদর, পায়ে একজোড়া চটিজুতা, হাতে মোটা একটা বাঁশের ছড়ি, চোখে পুরু একজোড়া চশমা, সুতা দিয়া মাথা বেড়িয়া বাঁধা। রংলাল ও নবীনকে দেখিয়া চশমাসুদ্ধ চোখ একরূপ আকাশে তুলিয়া দেখিয়া লোকটি বলিল—ওই, পাল মশাই যে, লোহারও সঙ্গে! কি মনে ক'রে গো!

রংলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল—বলি, আপুনি কি মনে ক'রে গো!

লোকটি বলিল—আর বল কেনে ভাই, এরা ধরেছে বর্ষার সময় ধান দিতে হবে। তাই এক বার দেখতে শুনতে এলাম। তা, এরা করেছে বেশ, এরই মধ্যে গেরামখানিকে বেশ ক'রে ফেলেছে হে! তার পর শুনলাম, আপনারাও জমি নিয়েছেন। তা আমাদিগে বললে কি আর আপনাদের জমি আমরা কেড়ে নিতাম? আমরাও খানিক-আধেক নিতাম আর কি!

নবীন বলিল—বেশ ঘোষ মশায়, বললেন ভাল! আমাদিগেই কি আর দেয় জমি! কোন রকম ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে তবে আমরা পেলাম। তার উপর কে চন্দ্র রাজা কে চন্দ্র মন্ত্রী কোন হদিসই নাই।

লোকটি হাসিয়া বলিল—তা দেখছি। চার কোণে চার কোপ দিয়ে গেলেই হ'ল। ব্যস জমি দখল হয়ে গেল! কই, এখনও তো কিছু করতে পারেন নাই



দেখলাম। এবার আর ওতে হাত দিতেও পারবেন না। এ দিকে আবার ধানচাষ এসে পড়ল হু-হু ক'রে!

রংলাল বলিল—এবার ভাবছি সাঁওতালদিগেই ভাগে দিয়ে দোব। ওরাই চাষ খোঁড় করুক, যা পারে লাগাক, যা খুশি হয় আমাদের দেবে। তাই এলাম একবার মোড়লের কাছে। শুনছিস মোড়ল?

কমল মাঝি দুই হাতে মাথা ধরিয়া বসিয়াছিল, সে বলিল—তা তো শুনলম গো!

—তা কি বলছিস?

—উঁ-হু—সি আমরা লারব। তুরা তো আবার কেড়ে লিবি। আমরা তবে কেনে তুদের জমি ঠিক ক'রে দিব? আমাদিগে পয়সা দিয়ে খাটায়ে লে কেনে।

—কেনে, গরজ বুঝছিস না কি?

—তুরাই তো দেখাইছিস গো। আমরা খাটব, জমি করব, আর তুরা তখন সিটি কেড়ে লিবি।

নূতন লোকটি এবার বলিল—তা হ'লে আমি উঠছি মাঝি। ওই কথাই ঠিক রইল।

মাঝি বলিল—হুঁ, সেই হ'ল; আপুনি আসবি তো ঠিক?

—ঠিক আসব আমি। তার পর রংলাল ও নবীনকে বলিল—বেশ তা হ'লে কথাবার্ত্তা বলুন আপনারা, আমি চললাম।

লোকটি চলিয়া গেলে রংলাল বলিল—হ্যাঁ মাঝি, তোরা ওর কাছে ধান লিবি? তোদের গলা কেটে ফেলাবে। খবরদার খবরদার! এক মণ ধানে ও আধ মণ সুদ নেয়, খবরদার!

মাঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু, উ সুদ লিবে না বললে। উ আমাদের পাড়াতে দোকান করছে। একটি খামার করছে। আমাদিগে জমি দিলে ভাগে। আমরা উয়ার জমি কেটে চষে ঠিক ক'রে দিব।

রংলাল বিস্মিত হইয়া বলিল—পাল এখানে জমি নিয়েছে নাকি?

—হঁ গো। ওই তো তুদের জমিটোই উ লিলে। বাবুদিগে টাকা দিলে, দলিল ক'রে লিলে, চেক লিলে! কাল সব আমরা পাড়াসুদ্ধ ওই জমিতে লাগব। উয়ার আসবে লোক জন নিয়ে।

রংলাল নবীন উভয়েই বিস্ময়ের আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া মাটির পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কমল পাড়ার এক প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা খড়ের চাল দেখাইয়া বলিল, উই দেখ কেনে—উ দোকান করেছে উইখানে। উয়ার কাছে যা কেনে তুরা।

রংলাল নবীন উভয়েই হতাশায় ক্রোধে অস্থির চিত্তে দোকানের দিকে অগ্রসর হইল। লোকটি সোজা লোক নয়। এখানে সদ্‌গোপদের মধ্যে শ্রীবাস পাল বর্দ্ধিষ্ণু লোক। বিস্তৃত চাষ তো আছেই, তাহার উপর নগদ টাকা এবং ধানের মহাজনীও করিয়া থাকে। বড় ছেলে করে নটকোনার দোকান, মেজ ছেলে একটা মনিহারীর দোকান খুলিয়াছে।

সাঁওতাল-পল্লীর এক প্রান্তে বেশ বড় একখানি চালা তুলিয়া তাহার চারি পাশ ঘিরিয়া ছিটা-বেড়ার দেওয়াল দিয়া কয় দিনের মধ্যেই শ্রীবাস দোকান খুলিয়া ফেলিয়াছে। এক পাশে নটকোনার দোকান, মধ্যে একটা তক্তপোষের উপর, দস্তার গহনা, কার, পুঁতির মালা, রঙীন নকল রেশমের গুছি, কাঠের চিরুণী, আয়না—এই সব লইয়া কিছু মনিহারীও সাজানো রহিয়াছে, এ-দিকের এক কোণে তেলে-ভাজা খাবার বিক্রয় হইতেছে। পল্লীর মেয়েরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া জিনিষ কিনিতেছিল।

রংলাল আসিয়া ডাকিল—পাল মশাই!

পালের ছোট ছেলে মুখ তুলিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, বাবা তো বাড়ী চ'লে গিয়েছেন।

রংলাল সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, পথ বাছিল না—জঙ্গল ভাঙিয়াই গ্রামের মুখে ফিরিল। পালের ছেলে বলিল—এই রাস্তায় রাস্তায় যান গো, বরাবর নদীর ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তা পড়ে গিয়েছে। সত্যই সবুজ ঘাসের উপর একটি গাড়ীর চাকার দাগ-চিহ্নিত পথের বেশ বেশ পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহারই মধ্যে, কিছু জঙ্গল কাটিয়াও ফেলা হইয়াছে।

পথ বাছিয়া চলিবার মত মনের অবস্থা তখন রংলালের নয়, সে জঙ্গল ভাঙিয়াই গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল।

১৪

রংলাল মনের ক্ষোভে রক্তচক্ষু হইয়াই শ্রীবাসের বাড়ীতে হাজির হইল। শ্রীবাস তখন পাশের গ্রামের জন কয়েক মুসলমানের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। ইহারা এ অঞ্চলের দুর্দান্ত লোক, কিন্তু শ্রীবাসের খাতক। বর্ষায় ধান, হঠাৎ প্রয়োজনে দুই-চারিটা টাকা ধার দেয়; সুদ অবশ্য লয় না, কারণ মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সুদ লওয়া মহাপাতক।

কেহ কেহ হাসিয়া শ্রীবাসকে বলে—ঘরে তো টিন দিয়েছেন ঘোষ মশায়, আর ও বেটাদের সুদ ছাড়েন কেন?

শ্রীবাস উত্তর দেয়—কিন্তু দরজা যে কাঠের হে ভাই, রাত্রে ভেঙে ঢুকলে রক্ষা করবে কে? তা-ছাড়া ও রকম দু-দশটা লোক অনুগত থাকা ভাল। ডাকতে-হাঁকতে অনেক উপকার মেলে হে।

রংলালের মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীবাস হাসিল, কিন্তু এতটুকু অবজ্ঞা বা বিরক্তি প্রকাশ করিল না। মিষ্ট হাসিমুখে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন আসুন। কই, দরকার ছিল তো ওখানে কই কোন কথা বললেন না! ওরে তামাক সাজ, তামাক সাজ দেখি!

বিনা ভনিতায় রংলাল কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিল—এর মানে কি ঘোষ মশায়?

শ্রীবাস একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল—সে কি, ওই জমিটাই আপনারা নেবার জন্যে কোপ মেরে রেখেছেন না কি? কিন্তু আমার বন্দোবস্ত যে আপনাদের অনেক আগে পাল মশায়। আপনারাই তা হ'লে আমার জমি নিতে গিয়েছিলেন বলুন।

রংলাল সবিস্ময়ে বলিল—তার মানে? আমরা ছোট দাদাবাবুর সামনে সেদিন—

বাধা দিয়া শ্রীবাস বলিল—আমার বন্দোবস্ত বড় দাদাবাবুর কাছে পাল মশায়। ননী যেদিন বিকেলে খুন হ'ল, সেই দিন সকালে আমি বন্দোবস্ত নিয়েছি। কেবল, বুঝলেন কিনা—এই ঝগড়া-মারামারির জন্যে ওতে আমি হাত দিই নাই।

রংলাল উত্তেজিত হইয়া উঠিল—এ কি ছেলে ভোলাচ্ছেন ঘোষ—না, পাগল বোঝাচ্ছেন? আমি ছেলে-মানুষ, না, পাগল? বড় দাদাবাবু আপনাকে জমি বন্দোবস্ত ক'রে গিয়েছেন?

শ্রীবাস শান্ত ভাবে বলিল—বসুন বসুন। বলি, পড়তে শুনতে তো জানেন আপনি! কই দেখুন দেখি এই চেক-রসিদ খানা। তারিখ দেখুন, সন সাল দেখুন। তার পর উল্টো পিঠে জমির চৌহদ্দি দেখুন; সে সময়ের নায়েব আমাদের মজুমদার মশায়ের সই দেখুন। তার পরে, তিনিও আপনার বেঁচে রয়েছেন, তাঁর কাছে চলুন! তিনি কি বলেন শুনুন! বলিয়া শ্রীবাস একখানি জমিদারী সেরেস্তার রসিদ বাহির করিয়া রংলালের সম্মুখে ধরিল।

শ্রীবাসের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, অন্ততঃ রসিদখানা সেই প্রমাণ দিল। কিন্তু রংলাল বলিল—আমরাও ধান-চালের ভাত খাই ঘোষ, এ আপুনি মজুমদারের সঙ্গে ষড় ক'রে করেছেন। এ আপনার জাল রসিদ। আমরা ও-জমি ছাড়ব না, এ আমি আপনাকে ব'লে দিলাম।

শ্রীবাস হাসিয়া বলিল—ব'লে না দিলেও সে আমি জানি পাল মশায়। বেশ, তা হ'লে কাল সকালে যাবেন চরের উপর, কাল ঘাস কেটে জমি সাফ করতে আমার লোক লাগবে, পারেন উঠিয়ে দেবেন। তার পর তাহার অনুগত মুসলমান কয়জনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—এই শুনলে তো মামুদ, তা হ'লে খুব ভোরেই কিন্তু তোমরা এস! বুঝছ তো, তোমরাই আমার ভরসা!

মামুদ শ্রীবাসকে কোন উত্তর না দিয়া, রংলালকে বলিল—তা হ'লে তাই আসব পাল! ভয় নেই, পুরু ঘাসের উপর পড়লি পরে—দরদ লাগবে না গায়ে। বলিয়া সে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রংলাল নির্ব্বাক হইয়া রহিল, কিন্তু নবীন এবার হাসিল।

* * *

নবীন সমস্ত ক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রংলালের অনুসরণ করিতেছিল। শ্রীবাসের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে বলিল—পাল, আমি তোমাদের এই সবের মধ্যে নেই কিন্তু!

রংলালের বুকের ভিতর অবরুদ্ধ ক্রোধ হু-হু করিতেছিল, শ্রীবাস ও মজুমদারের প্রবঞ্চনার ক্ষোভ, সঙ্গে সঙ্গে

চরের উর্ব্বর মৃত্তিকার প্রতি অপরিমেয় লোভ—এই দুয়ের তাড়নায় সে যেন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে মুখ বিকৃত করিয়া ভেঙাইয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে জানি। যা যা, বেটা বাগ্দী, ঘরে পরিবারের আঁচল ধরে বসে থাক গে যা!

নবীন জাতে বাগ্দী, আজ তিন পুরুষ তাহারা জমিদারের নগ্দীগিরিতে লাঠি হাতেই কাল কাটাইয়া আসিয়াছে, কথাটা তাহার গায়ে যেন তীরের মত গিয়া বিঁধিল। সে রূঢ় দৃষ্টিতে রংলালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি পরিবারের আঁচল ধ'রে ব'সে থাকি আর যাইকরি, তুমি যেন যেয়ো। চরের উপরেই আমার সঙ্গে দেখা হবে বুঝলে! শুধু আমি নয়, গোটা বাগ্দীপাড়াকে ওই চরের ওপর পাবে। বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কথাটা রংলাল রাগের মুখে বলিয়া ফেলিয়া নিজেই অন্যায়টা বুঝিয়াছিল, এ ক্ষেত্রে বাহুবলের একমাত্র ভরসাস্থল ওই নবীন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে বাগ্দীদের দলে না লইলে উপায়ান্তর নাই। নবীন সমস্ত বাগ্দী পাড়াটার মাথা। তাহার কথায় তাহারা সব করিতে পারে। মুহূর্ত্তে রংলাল আপনা হইতেই যেন পাল্টাইয়া গেল—একেবারে স্বর পাল্টাইয়া সে ডাকিল—নবীন নবীন! ও নবীন! শোন হে শোন!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নবীন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বল!

রসিকতা করিয়া অবস্থাটাকে সহজ স্বচ্ছন্দ করিয়া লইবার অভিপ্রায়েই রংলাল বলিল—এ রাগের চোটে য পথই ভুলে গেলে হে! ও দিকে কোথা যাবে!

—যাব আমার মনিব-বাড়ী। অনেক নুন আমি খেয়েছি, তাদের অপমান লোকসান আমি দেখতে পারব না পাল। আমি হুকুম আনতে চললাম, তোমাদিকেও জমি চষতে দাব না, ও শ্রীবাসকেও না। গোটা বাগ্দীপাড়া আমরা মনিবের হয়ে যাব। এ তোমরা জেনে রাখ!

রংলাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল—চল, আমিও যাব। টাকা দিয়েই বন্দোবস্ত আমরা ক'রে নেব।

নবীন খুশী হইয়া বলিল—সে আমি কতদিন থেকে বলছি বল দেখি!

নবীন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পুরানো চাকর। শুধু সে নিজেই নয়, তাহার ঠাকুরদাদা হইতে তিন পুরুষ চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কাজ করিয়া আসিয়াছে। এই জমি-বন্দোবস্তের গোড়া হইতেই মনে মনে সে একটা দ্বিধা অনুভব করিয়া আসিতেছিল। সেলামী না দিয়া জমি বন্দোবস্ত পাইবার আবেদনের মধ্যে তাহার একটা দাবী ছিল, কিন্তু অহীন্দ্র তাহাতে অসম্মতি জানাইলে রংলাল যখন আইনের ফাঁকে ফাঁকি দিবার সংকল্প জ্ঞাপন করিল, তখন মনে মনে একটা অপরাধ-বোধ সে অনুভব করিল। কিন্তু সে-কথাটা জোর করিয়া সে প্রকাশ করিতে পারিল না দলের ভয়ে। রংলাল এবং অন্য চাষী কয়জন যখন এই সংকল্পই করিয়া বসিল, তখন সে একা অন্য অভিমত প্রকাশ করিতেও কেমন যেন সঙ্কোচ অনুভব করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা লোভও ছিল। অন্যকে ফাঁকি দেওয়ার আনন্দ না হইলেও তাহাদিগকে খাতির বা স্নেহ করিয়া এমনি দিয়াছেন, ইহার মধ্যে যে একটা আত্মপ্রসাদ আছে, তাহার প্রতি একটা আসক্তি তাহার অপরাধ-বোধকে আরও খানিকটা সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছিল। সর্ব্বশেষ রংলাল যখন বলিল—ঐ সাঁওতালদের চেয়েও কি আমরা চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পর?—তখন মনে মনে সে একটা ক্রুদ্ধ অভিমান অনুভব করিল, যাহার চাপে ঐ সঙ্কোচ বা দ্বিধাবোধ একেবারেই যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল যাহার জন্য অসঙ্কোচে রংলালদের দলে সে মিশিয়া গেল, উচ্চকণ্ঠে না হইলেও প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া উঠিয়া আসিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার সেই দ্বিধা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। সেই জন্যই মামলা-মোকদ্দমায় সম্মতি সে দিতে পারে নাই। তাহার পর শ্রীবাসের এই ষড়যন্ত্রের কথা অকস্মাৎ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল চারি দিক্ হইতেই এই চক্রবর্ত্তী-বাড়ীকে ফাঁকি দিবার আয়োজন চলিতেছে, ওরা, শ্রীবাস, মজুমদার—সকলেই ফাঁকি দিতে চায় ঐ সহায়হীন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীকে—তাহারই পুরোনো মনিবকে। এক মুহূর্ত্তে

মনের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া গেল, তিন পুরুষের মনিবের পক্ষ হইয়া সমগ্র বাগ্দীবাহিনী লইয়া লড়াই দিবার জন্য তাহার লাঠিয়াল-জীবন মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পুরাতন চাকর হিসাবে অন্দরে যাতায়াতের বাধা তাহার ছিল না, সে একেবারে সুনীতির কাছে আসিয়া অকপটেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে তাহার ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। রংলাল দাঁড়াইয়াছিল দুয়ারের বাহিরে রান্তাঘরে।

সমস্ত শুনিয়া সুনীতি কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। কথা বলিল মানদা, সে তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল—ছি নপ্দী ছি! গলায় একগাছা দড়ি দাও গিয়ে।

সুনীতি এবার বলিল—না না মানদা; দোষ নবীনের নয়, দোষ অহির। সাঁওতালদের যখন সে বিনা সেলামীতে জমি দিয়েছে, তখন নবীনকেও দেওয়া উচিত ছিল। সত্যিই তো নবীন কি আমাদের কাছে সাঁওতালদের চেয়েও পর?

নবীন এবার ছোট ছেলের মত কাঁদিয়া ফেলিল। দুয়ারের ওপাশ হইতে রংলাল বেশ আবেগ ভরেই বলিল—বলুন মা, আপুনিই বলুন! আমাদের অভিমান হয় কি না হয় আপুনিই বলুন। মনে ক'রে দেখুন—আমিই বলেছিলাম সর্ব্বপ্রথম যে, এ চর আপনাদের ষোল আনা। তবে ধর্ম্মের কথা যদি ধরেন তবে আমরা পেতে পারি। আপুনি বলেছিলেন, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে কি কিছু করা যায় বাবা, তোমরা নিশ্চিন্তি থাক। তাতেই মা, সেই দাবীতে আমরা আবদার ক'রে বলেছিলাম—আমরা দিতে পারব না সেলামী!

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সবই বুঝলাম বাবা, কিন্তু এখন আমি কি করব বল?

নবীন বলিল—আমাকে হুকুম দেন মা, আমি কাউকেই জমি চষতে দেব না। গোটা বাগ্দীপাড়া লাঠি হাতে গিয়ে দাঁড়াব! থাকুক জমি এখন খাস-দখলে।

—রংলাল বাহির হইতে গভীর ব্যগ্রতা-ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল—এখুনি আমি আড়াই-শ টাকা এনে হাজির করছি নবীন—জমি আমাদিকে বন্দোবস্ত ক'রে দেন রাণীমা।

নবীন বলিল—সেই ভাল মা, ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় আমরাই পোয়াব। আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না।

সুনীতি অনেক কিছু ভাবিতেছিলেন। তাহার মধ্যে যে কথাটা তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা পীড়িত করিতেছিল সেটা নবীন ও রংলালের কথা। নিজের স্বার্থের জন্য কেমন করিয়া এই গরিব চাষীদের এমন রক্তাক্ত বিরোধের মুখে ঠেলিয়া দিবেন! তাঁহার বোধ হইল—স্বার্থটা ষোল আনা তো তাঁহারই!

মানদা কিন্তু হাসিয়া বলিল—সস্তায় কিস্তি মেলে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে গায়ে লাগে না, না কি গো নপ্দী? আমিও কিন্তু বিঘে পাচেক জমি নেব মা! আমারও তো শেষকাল আছে। আমিও টাকা দেব। নপ্দী যা দেবে তাই দেব। নপ্দীর চেয়ে তো আমি পর নই মা!

মানদার কথার ধরণটা শুধু ধারালোই নয়, বাঁকাও খানিকটা বটে, নবীন অসহিষ্ণু হইয়া নড়িল, দুয়ারের ও-পাশে রংলাল দাঁতে দাঁত টিপিয়া নিরালা অন্ধকারের মধ্যেই নীরব ভঙ্গিতে তাহাকে শাসাইয়া উঠিল। সুনীতি কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বাহির-দরজার ও-পাশে কে গলার সাড়া দিয়া আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিল। গলার সাড়া সকলেরই অত্যন্ত পরিচিত। সুনীতি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, মানদা সবিস্ময়ে বলিল—ওমা, নায়েব বাবু যে!

পর-মুহূর্ত্তেই শান্ত বিনীত কণ্ঠস্বরে মজুমদার বাহির হইতে ডাকিলেন—বউঠাকরুণ আছেন না কি?

নবীন খানিকটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িল, দরজার আড়ালে রংলালের মুখ শুকাইয়া গেল। মানদা মৃদুস্বরে সুনীতিকে প্রশ্ন করিল—মা?

সুনীতি মৃদুস্বরেই বলিলেন—আসতে বল।

মানদা ডাকিল—আসুন, ভিতরে আসুন।

সুনীতি বলিলেন—একখানা আসন পেতে দে মানদা।

প্রশান্ত হাসিমুখে যোগেশ মজুমদার ভিতরে প্রবেশ

করিয়া বলিল—ভাল আছেন বউঠাকুরুণ? কর্ত্তা ভাল আছেন?

অবগুণ্ঠন অল্প বাড়াইয়া দিয়া সুনীতি বলিলেন—উনি আছেন সেই রকমই। মাথার গোলমাল দিন দিন যেন বাড়ছে ঠাকুরপো!

মজুমদার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আহা-হা! কণ্ঠস্বরে ভঙ্গিতে যতখানি সমবেদনার আভাস প্রকাশ পাইতে পারে ততখানিই প্রকাশ পাইল। তার পর মজুমদার আবার বলিল, একবার বৈদ্য-পারুলিয়ার কবিরাজ দর দেখালে হ'ত না? চর্ম্মরোগে, বিশেষ তো কুষ্ঠ ইত্যাদিতে ওঁরা ধন্বন্তরি!

সুনীতির মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, মজুমদারের কথায় তিনি মর্ম্মান্তিক আঘাত অনুভব করিলেন। তিনি কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—না না ঠাকুরপো, সে তো সত্যি নয়! সে কেবল ওঁর মাথার ভুল!

উত্তরে মজুমদার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মানদা ঠক্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, তবু ভাল, নায়েব বাবুকে দেখতে পেলাম। আমি বলি—মথুরাতে রাজা হয়ে নন্দের বাদার কথা বুঝি ভুলেই গেলেন। তা নয় বাপু—পুরানো মনিবের ওপর টান খুব!

মজুমদারের মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে বার দুই অস্বাভাবিক গম্ভীর ভাবে গলা ঝাড়িয়া লইল, কিন্তু মানদা বলিয়াই গেল—নায়েববাবু আমাদের ভোলেন নি বাপু! কর্ত্তাবাবুর খবর-টবর সবই রাখেন!

সুনীতি লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন, মুখরা মানদা এ বলিতেছে কি? কিন্তু তাহাকেই বা কেমন করিয়া তিনি নিরস্ত করিবেন? মুখের দিকেও একবার চাহে না যে, ইঙ্গিত করিয়া বারণ করেন! মজুমদার নিজেই ব্যাপারটাকে ঘুরাইয়া লইল, আরও এক বার গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—বিশেষ একটা জরুরি কথা যে বলতে এসেছিলাম বউঠাকরুণ!

সুনীতি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাসিমুখেই বলিলেন—বলুন।

—বলছিলাম ঐ চরটার কথা। ঐ চরের উপর এক-শ বিঘে জায়গা মশাই শ্রীবাস ঘোষকে বন্দোবস্ত করেছে। আমিই চেক কেটে দিয়েছি মশায়ের হুকুমমত। টাকা অবিশ্যি মশাই নিয়েছিল। ছ-শ টাকা! পাঁচ-শ টাকা সেলামী—এক-শ টাকা খাজনা।

সুনীতি মৃদুস্বরে কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—আমি তো সে-কথা জানি নে ঠাকুরপো!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মজুমদার বলিলেন—জানবেন কি ক'রে বলুন; এ কি আপনার জানবার কথা! তা ছাড়া সেইদিনই বেলা তিনটের সময় ননী পাল খুন হ'য়ে গেল। বলবার আর অবসর হ'ল কই বলুন! এখন শ্রীবাসের সেই জমি থেকে পঞ্চাশ বিঘে জমি রংলাল নবীন এরা দখল করতে চাচ্ছে। ওদের অবিশ্যি জবরদস্তি। সেলামীর টাকা পর্য্যন্ত দেয় নি!

সুনীতি বলিলেন—না-না ঠাকুরপো, ওদের আমি জমি দেব বলেছিলাম।

—বেশ তো! চরে তো আরও জমি রয়েছে—তার থেকে ওরা নিতে পারে।

অকস্মাৎ মানদা আক্ষেপ করিয়া বলিয়া চলিল, আঃ হায় হায় গো! ছ—ছ-শ টাকা চিলে ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল গো। আমার মনে পড়েছে নায়েববাবু, দাদাবাবুর হাতটা পর্য্যন্ত ছড়ে গিয়েছিল নখে। সেই টাকাই তো?

মুহূর্ত্তের জন্য মজুমদার স্তব্ধ হইয়া গেল, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই হাসিয়া বলিল—টাকাটা আমাকেই দিয়েছিলেন মশাই; সেটা মামলাতেই খরচ হয়েছে। বুঝলেন বউঠাকরুণ, জমাখরচের খাতায়—খসড়া রোকড় খতিয়ান তিন জায়গাতেই তার জমা আছে। দেখলেই দেখতে পাবেন। তা ছাড়া চেক-রসিদও তাকে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে হাতে লিখে দিয়েছি। শ্রীবাস এসেছে—সেই চেক নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ-বছরের খাজনাও সে দিতে চায়!

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে শ্রীবাসের সাড়া পাওয়া গেল—খাজনার টাকা আমি নিয়ে এসেছি, মজুমদার মশায়! এক-শ টাকা আমি এক্ষুনি দিয়ে যাব। বলিয়া সে ভিতর-দরজা পার হইয়া অন্দরে আসিয়া দেখা দিয়া দাঁড়াইল।

মাথার ঘোমটা আর-খানিকটা বাড়াইয়া দিয়াও সুনীতি নিজেকে বিব্রত বোধ করিলেন, শুধু তাই নয়—হঠাৎ তাঁহার চোখে জল আসিয়া গেল। এমন ভাবে কেহ যে স্বেচ্ছায় আসিয়া এই অন্দরে প্রবেশ করিতেও পারে, এ-ধারণা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। শ্রীবাসের অন্দর-প্রবেশ যেমন অতর্কিত, তেমনি ঐ এক-শ টাকার উষ্ণতায় উত্তপ্ত। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, একমাত্র আশ্রয়স্থলের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তিনি দ্রুতপদে উপরে স্বামীর ঘরের উদ্দেশে উঠিয়া গেলেন।

কিছু ক্ষণের জন্য সকলেই ঘটনাবর্ত্তের এমন আকস্মিক জটিলতায় হতবাক্ হইয়া রহিল। মানদা ফুলিয়া উঠিল ক্রুদ্ধ ক্রূর সাপিনীর মত। তাহার পূর্ব্বেই মজুমদার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, বউঠাকরুণ চ'লে গেলেন যে!

মানদা দংশনের সুযোগ পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল, বলিল—আমি তো রয়েছি বলুন না, কি বলছেন!

হাসিয়া মজুমদার বলিল—তুমি আর শুনে কি করবে বল!

—কেন, যা হুকুম দেবার আমিই দেব। অন্দরই যখন কাছারি হ'য়ে উঠল—তখন আর আমার নায়েব ম্যানেজার হ'তে ক্ষতিটা কি বলুন?

মজুমদারের মুখের হাসি তবু মিলাইয়া গেল না, সে বলিল—মানদার দাঁতগুলি বড় চকচকে আর তেমনি কি পাতলা ধার! তুমি শিলে শান দিয়ে দাঁত পরিষ্কার কর বুঝি?

মানদা হাসিয়া বলিল—এই দেখুন, নায়েববাবু কি বলছেন দেখুন? বেজীর দাঁতে কি শিল লাগে, না, শান লাগে? সাপ কাটবার মত ধার ভগবানই যে তার বজায় রাখেন গো! সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক এই সময়েই উপরের বারান্দা হইতে সুনীতি ডাকিলেন—মানদা!

মানদার রূপ পাল্টাইয়া গেল, সম্ভ্রমভরা মমতাসিক্ত স্বরে বলিল—কি মা?

সুনীতি বলিলেন—মজুমদার ঠাকুরপোকে কালকের দিনটা অপেক্ষা করতে বল। কাল ছোটবাড়ীর দাদার কাছে এর বিচার হবে; যা হয় তিনিই ক'রে দেবেন।

মজুমদার উঠিয়া পড়িল। মানদা বলিল—শুনলেন তো? এখন কি বলছেন, বলুন।

মজুমদার বলিল—তোমাদের প্রজা শ্রীবাসকে বল মানদা। যা হয় ঐ উত্তর দেবে।

মানদা বলিল—উকীলের বুদ্ধি নিয়েই তো মক্কেলে উত্তর দেবে নায়েববাবু! তাতেই এক বারে খোদ উকীলকেই জিজ্ঞেসা করছি।

শ্রীবাস কিন্তু বিনা পরামর্শেই উত্তর দিল, বলিল—অপেক্ষা আমি করতে পারব না, সে তুমি গিন্নীমাকে বল। তাতে খুনখারাপী হয় হবে।

বারান্দার রেলিঙে মাথা রাখিয়া সুনীতি দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটা গভীর অবসন্নতা তিনি অনুভব করিতেছিলেন, আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছেন না। আগামী প্রভাতের চরের ছবি তাঁহার চোখের উপর ভাসিতেছে। চরটা যেন রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহারই উপর পড়িয়া আছে রংলাল, নবীন, শ্রীবাস আরও কত মানুষ। ঝর ঝর করিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনে হইল সমস্ত কিছুর জন্য, অদৃশ্য লোকের হিসাব-নিকাশে দায়িত্ব পড়িতেছে তাঁহারই স্বামীর উপর, সন্তানদের উপর। অস্থির হইয়া তিনি এবার স্বামীর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

শুদ্ধ রামেশ্বর খাটের উপর বসিয়া আছেন পাথরের মূর্ত্তির মত, খোলা জানালার মধ্য দিয়া রাত্রির আকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সুনীতি কঠিন চেষ্টায় আত্ম-সম্বরণ করিয়া নিরুচ্ছ্বসিত ভাবেই বলিলেন—দেখ, একটা কথা বলছিলাম, না ব'লে যে আমি আর পারছি না!

রামেশ্বর ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া সুনীতির মুখের দিকে চাহিলেন, যেন কোন অজ্ঞাতলোক হইতে তিনি এই বাস্তব পরিবেষ্টনীর মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তার পর অতি মিষ্ট স্বরে বলিলেন—বল, কি বলছ বল!

খুব ভাল করিয়া গুছাইয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত কথা বলিয়া সুনীতি বলিলেন—তুমি একবার মজুমদারকে ডেকে একটু বল। তোমার অনুরোধ তিনি কখনই ঠেলতে পারবেন না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রামেশ্বর ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিলেন—না।

সুনীতি আর অনুরোধ করিতে পারিলেন না, শুধু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। রামেশ্বর অভ্যাস মত মৃদুস্বরে বলিলেন—'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে,—নাধমে লব্ধকামা'। সুনীতি, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা যদি ব্যর্থও হয় সেও ভাল, তবু অধমের কাছে ভিক্ষা ক'রে লব্ধকাম হওয়া উচিত নয়। তাঁহার কথা শেষ হইতেই প্রদীপের আলোকে মৃদু আলোকিত ঘরখানা অস্বাভাবিক রূপে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহারই মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী—মাটির পুতুলের মত এক জন বসিয়া, এক জন দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার কিছুক্ষণ পর রামেশ্বর বলিলেন, সুনীতি, আমার মাথায় একটু বাতাস করবে? আর একটু জল!

সুনীতি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি জল আনিয়া গ্লাসটি রামেশ্বরের হাতে দিয়া বলিলেন—শরীর কি কিছু খারাপ বোধ হচ্ছে?

চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িয়া রামেশ্বর বলিলেন—মাথায় যেন আগুন জ্বলছে সুনীতি!

—জল দিয়ে মাথা ধুয়ে দেব?

—দাও।

সুনীতি সযত্নে মাথায় জল দিয়া ধুইয়া আপনার আঁচল দিয়া মুছিয়া দিলেন, তারপর জোরে জোরে বাতাস দিতে আরম্ভ করিলেন। উৎকণ্ঠার আর তাঁহার সীমা ছিল না। উন্মাদ পাগল হইয়া গেলে তিনি করিবেন কি?

সহসা রামেশ্বর বলিলেন—শ্রীবাস ঘোষ অন্দরের মধ্যে চলে এল সুনীতি!

—না, না! দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

—দরজার মুখে!

আবার কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন—সন্ধ্যের পর আমি একটু ক'রে বাইরে বেরুব। দিনে পারব না। আলো চোখে সহ্য করতে পারি না। তা ছাড়া, হাতে এই কদর্য্য ব্যাধি, লোকে দেখবে! সন্ধ্যের পর আমি বরং একটু ক'রে কাজ-কর্ম্ম দেখব।

সুনীতির চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, অতি সন্তর্পণে বাঁ হাতে আঁচল তুলিয়া সে জল তিনি মুছিয়া ফেলিলেন।

* * * *

সমস্ত রাত্রি কিন্তু সুনীতির ঘুম হইল না। তাঁহার চিত্তলোকের কোমলতা অথবা দুর্ব্বলতা এতই ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম যে নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয় দূরান্তরের বহু মানুষের দুঃখের তরঙ্গ আসিয়া তাহাতে কম্পন তোলে, তাহাদের জন্য উদ্বেগে তিনি আকুল হইয়া উঠেন। আপনার দুঃখে তিনি পাথরের মত নিস্পন্দ, কিন্তু পরের জন্য না কাঁদিয়া তিনি পারেন না। আজ আগামী কালের ভয়াবহ দাঙ্গার কথা ভাবিয়া তাঁহার উদ্বেগের আর অবধি ছিল না। ভোর হইতেই তিনি ছাদে গিয়া উঠিলেন। ছাদ হইতে চরটা বেশ দেখা যায়। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু ঘন ঘাসের জঙ্গলের একটানা গাঢ় সবুজ রেশ আর তাহারই মধ্যে সাঁওতাল-পল্লীর ঘরের ছাউনির নূতন খড়ের হলুদ রঙের চালাগুলি ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তিনি দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বদিগন্ত হইতেই সোনালী আলো ছড়াইয়া পড়িয়া চরখানাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অপরূপ করিয়া তুলিতেছিল। মৃদু বাতাসে ঘাসের মাথা নাচিয়া নাচিয়া দুলিতেছে!

সহসা মনে হইল একটা ক্রুদ্ধ বাদানুবাদের উচ্চ ধ্বনি তিনি শুনিতে পাইতেছেন। সামান্য ক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, চোখে জল আসিল। চোখের জল মুছিয়া আবার তিনি চাহিলেন, এবার দেখিলেন কাশের বন যেন একটা দুরন্ত ঘূর্ণিতে আলোড়িত হইতেছে! চরের ভিতর হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ত্রস্ত কলরব করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। কতকগুলা চতুষ্পদ-কয়েকটা শেয়াল, আরও কতকগুলা অজানা জানোয়ার ঘাসের বন হইতে বাহির হইয়া নদীর বালিতে বালিতে ছুটিয়া পলাইতেছে! সুনীতি বাড়ীর ভিতরের দিকের আলিসার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মানদাকে ডাকিয়া

বলিলেন, খবর নে মা মানদা, চরের উপর বোধ হয় ভীষণ দাঙ্গা বেধেছে!

মানদাও ছুটিয়া বাহির হইল। কিন্তু সংবাদ কিছু পাইল না, লোকে ছুটিয়া চলিয়াছে নদীর দিকে, চরে দাঙ্গা বাধিয়াছে, তাহার অধিক কেহ কিছু জানে না। দুয়ারের উপর মানদা উৎকণ্ঠিত ঔৎসুক্য লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আরও কিছুক্ষণ পর একটি শীর্ণকায় মানুষকে তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মানদা আরও একটু আগাইয়া পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

লোকটি অচিন্ত্যবাবু। প্রাণপণে দ্রুত বেগে পলাইয়া বাড়ী চলিয়াছেন। শ্বাস-প্রশ্বাসে ভদ্রলোক ভীষণ ভাবে হাঁপাইতেছেন, আর মুখে বলিতেছেন—উঃ উঃ! বাপ রে বাপরে। ভীষণ কাণ্ড!

মানদাকে দেখিয়া তাঁহার কথার মাত্রা বাড়িয়া গেল; তিনি এবার বলিলেন—ভীষণ কাণ্ড। ভয়ঙ্কর দাঙ্গা! রক্তাক্ত ব্যাপার! খুন—খুন—এক জন মুসলমান খুন হয়ে গেল। নবীন লোহার, দুর্দ্দান্ত লাঠিয়াল, মাথাটা দু-টুক্‌রো ক'রে দিয়েছে! তাঁহার কথা শেষ হইতে হইতেই তিনি মানদাকে পিছনে ফেলিয়া অনেকটা চলিয়া গেলেন।

উপর হইতে সুনীতি নিজেই সব শুনিলেন, হু হু করিয়া চোখের জল ঝরিয়া তাঁহার মুখ-বুক ভাসিয়া গেল। ওই অজানা হতভাগ্যের জন্য তাঁহার বেদনার আর সীমা ছিল না। [ক্রমশঃ

মানুষের পৃথিবীতে ক্ষমা তার নাই

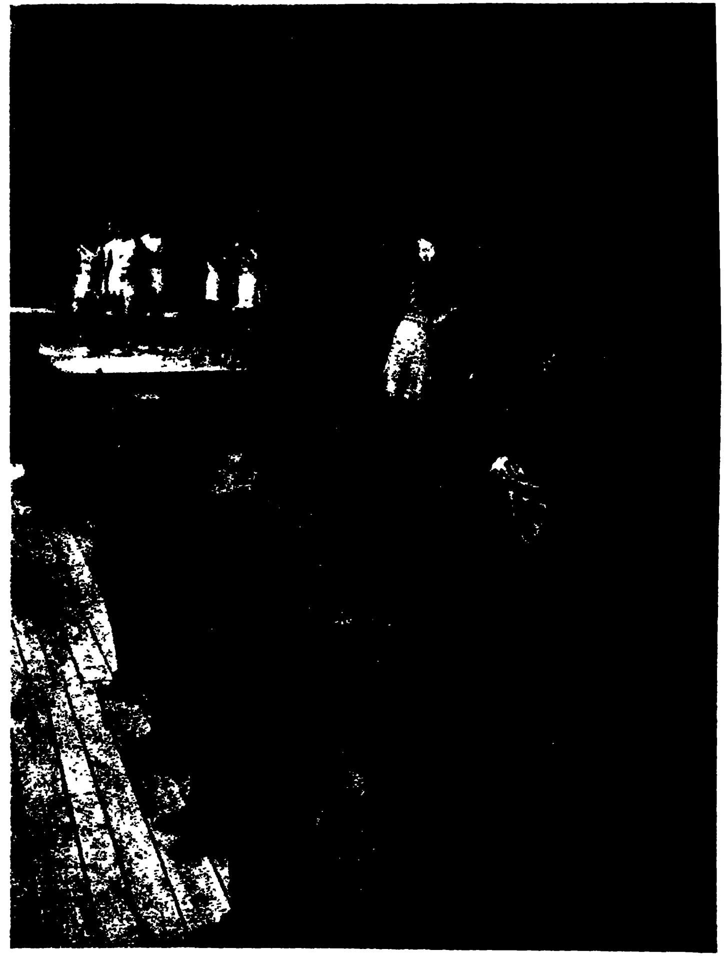
শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

তুমি কবি!
মানুষের মানসলোকের আঁক ছবি;
অরূপ চেতনাহীন বাস্তবের অন্তরালে নিত্য তব খেলা,
কল্পনার ভেলা
বয়ে চলে রাত্রিদিন ক্লান্তিহীন বেদনা-উল্লাসে,
শিহরণে ত্রাসে।
মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে বেজে ওঠে তারই প্রতিধ্বনি,
জীবন-মরণ রণে ওঠে রণরণি
অস্পষ্ট ঝঙ্কার তার;
বেদনার তিক্ত হাহাকার
কেঁদে মরে; লক্ষ্যভ্রষ্ট পাশুপাত
মানুষের হাতে-গড়া শাণিত শায়ক হানে মরণের
নির্ম্মম আঘাত
মানুষেরি হৃৎপিণ্ডে রক্তাক্ত উদ্যমে।
কভু মাল্যভ্রমে—
ভুজঙ্গের অভুজবল্লরী,
কল্পসহচরী—
জড়ায় ঘিরিয়া গ্রীবা বিলোল ভঙ্গীতে,
চিতাভস্মে বিরচিত কাননের বিকশিত মাধবী সঙ্গীতে।
সে তোমার কল্পনার ছায়া,
রূপহীন কায়া
বয়ে চলে ভাষার প্রবাহে নব নব।
সে নয় নূতন কথা; তবু অভিনব।

কল্পনার আছে তবু ক্ষমা, অপরাধ নহে সে বাস্তব;
জীবন্তের শয্যাপাশে করে না সে মরণের স্তব।
যাদের উদ্দাম চিন্তা রূপায়িত অগ্নি-অস্ত্রপাতে,
সহস্র আঘাতে—
পৃথিবীর শান্তিকুঞ্জে হানে হাহাকার,
অসহ দুর্ব্বার—
স্পর্দ্ধিত বিমানগর্ব্বে শঙ্কাকুল সুনীল আকাশ,
বিষবাষ্পে কলুষিত ধরিত্রীর সুরভি নিশ্বাস—
সৃজন-প্রয়াসী সেই মানুষের ক্ষমা নাই মানুষের কাছে,
তারই শিরে লক্ষ ফণা উৎসারিয়া আছে
আগামী কালের অভিশাপ;
কল্পান্তের ক্ষমাহীন পাপ।
তার কাব্য কল্পনার রহে রূপান্তর;
সে-সৃষ্টির কল্পলোকে গরজিছে ক্ষুধিত বর্ব্বর।
মানুষের রক্তস্রোতে ধৌত করি পৃথিবীর শ্যাম তৃণদল,
যার বাহুবল—
চাহে নিত্য বিরচিতে স্বপ্নলোক শ্মশানের দগ্ধ মৃত্তিকায়,
মানুষের পৃথিবীতে ক্ষমা সে কি চায়?



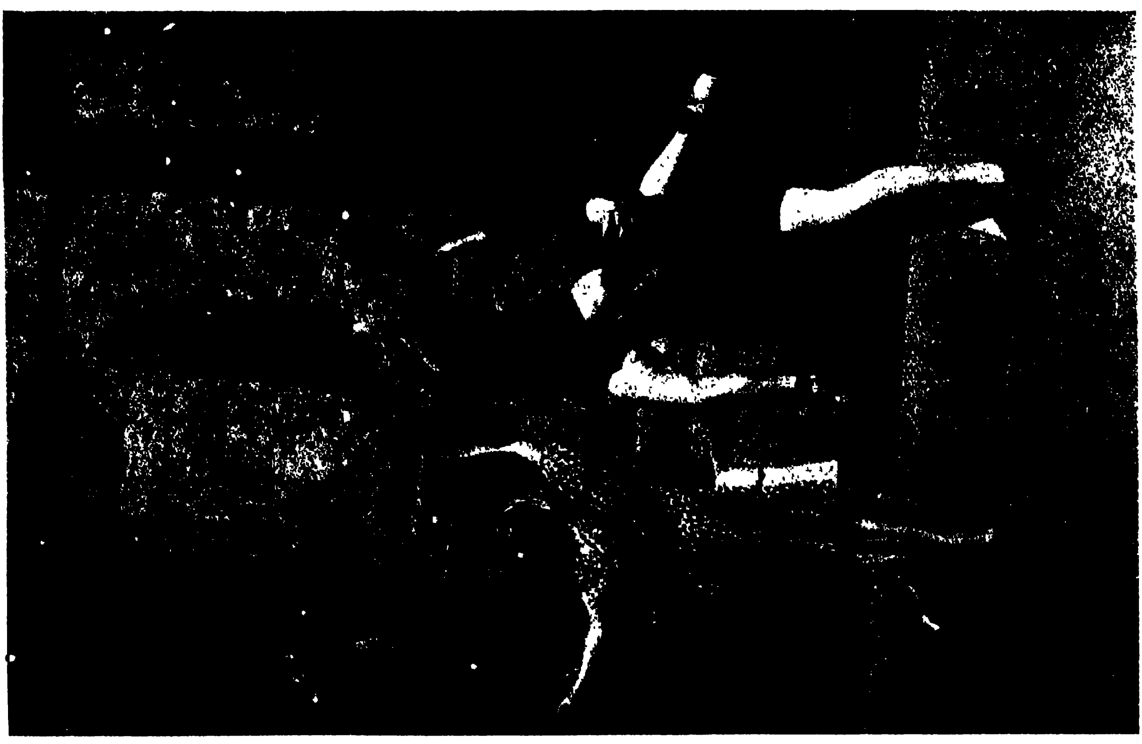
ফ্রান্সের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়শিক্ষার দৃশ্য



ফ্রান্সের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে প্রাচীন নাট্যের অভিনয়ের দৃশ্য

[ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকটি উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে প্রাচীন গ্রীক নাট্যাদি অভিনয় হইয়া থাকে। তাহার একটিতে অভিনয়-শিক্ষা ও অভিনয়ের কয়েকটি চিত্র প্রকাশিত হইল]





প্রাগৈতিহাসিক ড্রাগনের বর্ত্তমান বংশধর

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

'ড্রাগন' বলিতে আমরা বিভিন্ন দেশের উপকথায় বর্ণিত পক্ষবিশিষ্ট, ভীষণাকৃতি এক প্রকার অতিকায় সর্প অথবা চতুষ্পদ সরীসৃপের কল্পনা করিয়া থাকি। উপকথায় বর্ণিত ড্রাগন মানুষের নিছক কল্পনা হইলেও ইহার মূলে কিছুমাত্র সত্য নিহিত নাই, এমন কথা বলা যায় না। অবশ্য ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে পক্ষবিশিষ্ট (পালক-সমন্বিত নহে) 'ড্রাগন' নামে এক জাতীয় বৃহদাকার টিকটিকি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহারা উপকথায় বর্ণিত 'ড্রাগন'-পর্য্যায়ভুক্ত নহে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, কোন স্মরণাতীত কালে অধুনালুপ্ত কোন বিরাট্‌কায় সরীসৃপের দেহাবশেষ অথবা লুপ্তপ্রায় ক্ষুদ্র সংস্করণের কোন অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা হইতে কাহারও মনে এই ড্রাগনের কল্পনা সুরু হইয়াছিল। কালক্রমে তাহা অতিরঞ্জিত হইতে হইতে বর্ত্তমানে উপকথায় পরিণত হইয়াছে। কারণ বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে যে-সকল অভাবনীয় বিরাট্‌কায় জীবের দেহাবশেষ ও কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এরূপ ধারণা করা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তর হইতে যে-সকল অতিকায় জীবের কঙ্কাল সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশ জীব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও কাহারও কাহারও বংশধরেরা আজও পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে। অধুনালুপ্ত সেই অতিকায় প্রাণীদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অথবা পূর্ণাবয়বের ছাপ আবিষ্কৃত না হইলে তাহাদের কাহিনীও রোমাঞ্চকর উপকথায় পরিণত হইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সকল ভীষণদর্শন অতিকায় জন্তুর অনেকেই ছিল টিকটিকির মত আকৃতি-বিশিষ্ট সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণী। ব্রন্টোসোরাস্‌, ষ্টেগোসোরাস্‌, টাইর‍্যানোসোর, ট্র্যাকোডন, পোলাক্যান্থাস্‌, প্লেসিওসোর প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর বিরাট্‌ দেহায়তন ও আকৃতির ভীষণতা উপকথার কল্পনাকেও হার মানাইয়া দেয়। জীবতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কোন কোন প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ হইতেই অভিব্যক্তির ধারায়, ক্রমবিকাশের ফলে পক্ষবিশিষ্ট প্রাণীরা বিবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ স্বীয় বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও লক্ষ লক্ষ যুগের জীবনসংগ্রাম ও



গোসাপ মাথা উঁচু করিয়া চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে

পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া বর্ত্তমানে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত অথবা অনেকাংশে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ এক জাতীয় প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় ড্রাগনের বংশধরেরা আজও ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে। ইহারা কুমীর ও টিকটিকির মাঝামাঝি এক জাতীয় প্রাণী। ইহাদিগকে অতিকায় টিকটিকি নামে অভিহিত করা



গোসাপের মুখ। বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে

সাপের জিবের মত দুই ভাগে বিভক্ত এবং সাপ যেমন কিছু ক্ষণ পরে পরেই জিব বাহির করিয়া থাকে, ইহাদের স্বভাবও ঠিক সেইরূপ। ইহাদের গলাও টিকটিকি বা কুমীরের মত খাটো নহে। সাপ যেমন ফণা বিস্তার করিবার সময় মাথা উঁচু করিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতে পারে, ইহারাও সেইরূপ লম্বা গলা উঁচু করিয়া মাঝে মাঝে চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। এই দুইটি বিষয়ে সাদৃশ্যের জন্যই

যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতীয় অতিকায় টিকটিকি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন অতিকায় টিকটিকির গাত্র-চর্ম্ম বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। কাহারও গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ, আবার কাহারও বা বর্ণ ধূসর, বৈচিত্র্যবর্জ্জিত। বিভিন্ন শ্রেণীর অতিকায় টিকটিকিরা প্রায় দুই ফুট আড়াই ফুট হইতে আঠারো-উনিশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। সুণ্ডা-দ্বীপই বোধ হয় এই জাতীয় বৃহত্তম জানোয়ারদের আবাসভূমি। ঐ দ্বীপপুঞ্জের কমোডো নামক স্থানে মাঝে মাঝে আঠারো-উনিশ ফুটেরও বেশী লম্বা এক-একটা অতিকায় টিকটিকি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ এক-একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার দেখিয়া সে-দেশীয় লোকের মনে অস্বাভাবিক ভীতিসঞ্চার হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এইরূপ আতঙ্কের ফলেই হয়ত ইহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার অলৌকিক কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। আকৃতি যতই ভীষণ হউক না কেন, ইহারা সাধারণতঃ অতি নিরীহ প্রকৃতির জীব। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে উগ্র প্রকৃতির দুই-এক জাতের অতিকায় টিকটিকিও বিরল নহে।

আমাদের দেশেও এই অতিকায় টিকটিকির অভাব নাই। এদেশে ইহারা গোসাপ বা গোধিকা নামে পরিচিত। কেবল জিবটি ছাড়া সাপের সঙ্গে ইহাদের দৈহিক কোন সামঞ্জস্য নাই। গোসাপের জিব ঠিক

বোধ হয় ইহারা গোসাপ নামে পরিচিত হইয়াছে। আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে নালা-ডোবায় সচরাচর দুই জাতের গোসাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ধূসর বর্ণের এক জাতের গোসাপ বনে-জঙ্গলে, এমন কি লোকালয়ের আশেপাশেও অহরহই নজরে পড়িয়া থাকে। ইহারা স্থলচর জীব এবং সাধারণতঃ তিন-চার ফুটের বেশী লম্বা হয় না। আর এক জাতের উভচর গোসাপ আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আকৃতি সত্য সত্যই ভীতি-উৎপাদক। লম্বায় ইহারা ছয়-সাত ফুটেরও বেশী হইয়া থাকে। ইহাদের শরীরের রং হরিদ্রাভ। পিঠের উপর ঘন কৃষ্ণবর্ণের ছাপ। লেজের আগাগোড়া কালো ও হলদে রঙের



গোসাপ পাখী শিকার করিয়াছে। পালক-সমেত পাখীটাকে আস্ত গিলিয়া ফেলে।



গোসাপ আহারান্বেষণ করিতেছে

ডোবা কাটা। দিবসের অধিকাংশ সময়ই ইহারা নালা-ডোবা অথবা এঁদো পুকুরের মধ্যে শিকারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের উজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্য এবং বিশাল আকৃতি দর্শনে প্রাণে একটা অস্বাভাবিক অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হয়। অথচ ইহাদের স্বভাব মোটেই উগ্র নয়; সর্ব্বদা ভয়চকিত দৃষ্টি এবং লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেই ব্যস্ত। ইহারাই 'শল-গুইল' বা স্বর্ণ-গোধিকা নামে পরিচিত। কোন কোন জাতের লোকেরা ইহাদের মাংস উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করিয়া থাকে। চণ্ডিকা-মঙ্গলে ব্যাধ কালকেতুর মাংস সংগ্রহার্থ স্বর্ণ-গোধিকা শিকারের কথা উল্লিখিত আছে। ইহারা সাধারণতঃ মাছ, জলচর পাখী, জলঢোঁড়া প্রভৃতি সাপ ও ডিম খাইয়া উদর পূর্ণ করিয়া থাকে।

পাড়াগাঁয়ে লোকেরা মাছ ধরিবার জন্য ঘুনি পাতে। এই উভচর গোসাপেরা সুকৌশলে ঘুনির ভিতর হইতে মাছ চুরি করিয়া খায়। মাছ চুরি করিতে গিয়া অতি লোভের ফলে সময় সময় যে বেকায়দায় না-পড়ে এমন নহে। কখনও কখনও দেখা যায়, মানুষের সমান উঁচু বড় বড় ঘুনিতে এই গোসাপ আটকা পড়িয়া গিয়াছে। অনেক দিন আগের একটা ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। জঙ্গলের পার্শ্ববর্ত্তী একটা ডোবার জলে ঝাপটা-ঝাপটির শব্দ শুনিয়া কয়েক জন ছুটিয়া গেলাম। ডোবার উপর অনেকগুলি বেতের গাছ নুইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কতকগুলি কণ্টকাকীর্ণ সুদীর্ঘ আঁকড়া লম্বা চুলের গোছার মত এক স্থানে জলস্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল। মাঝারি আকৃতির একটা স্বর্ণ-গোধিকা কেমন করিয়া যেন সেই আঁকড়ার গোছার অগ্রভাগ গিলিয়া ফেলিয়া বড়শীর মত গাঁথিয়া গিয়াছে। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ব্যর্থ আক্রোশে সে তাহার বিরাট্ লেজের আস্ফালনে জল তোলপাড় করিয়া ফেলিতেছিল। লোকসমাগমে ভীত হইয়া সে আরও প্রবল বেগে ঝাপটা-ঝাপটি সুরু করিয়া দিল এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ নির্জ্জীব হইয়া প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। অনুসন্ধানে জানা গেল, কেহ একটা কর্ত্তিত পাখীর পালক ও পরিত্যক্ত চর্ম্ম ন্যাকড়ায় পুঁটুলি করিয়া ঐ স্থানে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল। খুব সম্ভব সেটা বেতের আঁকড়ায় আটকাইয়া যায় এবং সেই পুঁটুলি গিলিতে গিয়াই গোসাপটার ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।

আমাদের দেশে চার-পাঁচ ফুট লম্বা ধূসর বর্ণের স্থলচর গোসাপই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সারাদিন আহারান্বেষণে বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং পায়ের ধারালো নখের সাহায্যে স্থানে স্থানে মাটি খুঁড়িয়া কেঁচো, পোকামাকড়, সাপ প্রভৃতি ধরিয়া খায়। সাপের ইহারা ভয়ানক শত্রু। কোন এক পাড়াগাঁয়ে এক বার ইহাদের সর্প-শিকার প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। একটা বাগানের পাশ দিয়া যাতায়াতের রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে।



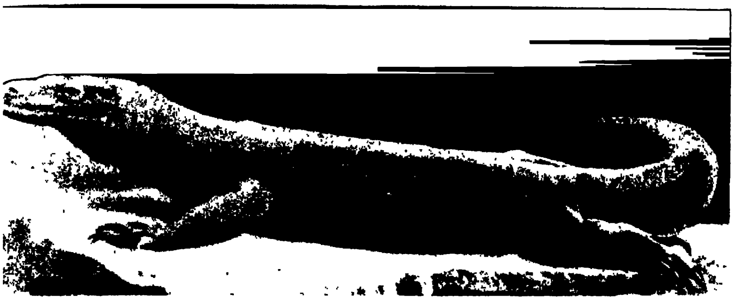
গোসাপের লড়াই



স্বর্ণ-গোধিকা। কোন কোন স্থানে এই জাতীয় গোসাপ প্রায় ১৮।১৯ ফুট লম্বা হইয়া থাকে

রাস্তার বিপরীত পার্শ্বে গৃহস্থের বসতবাটীর একখানা বড় ঘর। ঘরের মাটির দেয়ালটি ভূমি হইতে প্রায় দেড় হাত উচ্চ। সকালবেলা প্রায় আটটা নয়টায় রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইলাম, একটা ধূসর বর্ণের গোসাপ সেই দাওয়ার নীচে হইতে মাটি খুঁড়িয়া একটি গভীর গর্ত্ত করিয়াছে। কাছে যাইতেই সে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে ছুটিয়া পলায়ন করিল। প্রকাণ্ড একটা গর্ত্ত আর স্তূপাকার মাটি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়িল না। গৃহস্থ বলিল - কয়েক দিন যাবৎ গোসাপটা রোজই দাওয়ার এখানে-সেখানে গর্ত্ত খুঁড়িতেছে। দাওয়া পড়িয়া যাইবার ভয়ে আমরাও রোজই মাটি দিয়া গর্ত্ত বুজাইয়া দিতেছি; কিন্তু দেখিতেছি, ওটাকে মারিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে আর নিষ্কৃতি নাই। যাহা হউক প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক পরে সেই পথ দিয়া ফিরিবার মুখে দেখিতে পাইলাম গোসাপটি ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তের পাশেই আর একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে মনোনিবেশ করিয়াছে। ব্যাপারটা কি—দেখিতে বড়ই কৌতূহল হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া একটা নারিকেল-গাছের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। আরও প্রায় আধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। গর্ত্ত ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবশেষে সে গর্ত্তের মধ্যে শরীরের অর্দ্ধাংশ প্রবেশ করাইয়া চুপ করিয়া রহিল। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনর মিনিট অতিক্রান্ত হইল—একটুও নড়াচড়া নাই। পিছনের পা ও লেজটি গর্ত্তের বাহিরে নিষ্পন্দভাবে পড়িয়া আছে। ইতিমধ্যে আমাকে তদবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আরও দুই-এক জন লোক আসিয়া জুটিয়াছে। সকলকেই নিঃশব্দে থাকিতে পরামর্শ দিয়া দুই-এক পা অগ্রসর হইবামাত্রই থমকিয়া দাঁড়াইলাম। গোসাপটা তখন লেজটাকে ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক নাড়িতে সুরু করিয়া দিয়াছে। সকলেই বলিল ও কিছু নয়, বাসা বাঁধিবার জন্য গর্ত্ত খুঁড়িতেছে। কিন্তু আরও পাঁচ-সাত মিনিট অতিবাহিত হইবার পর গর্ত্তের মধ্যে তাহার শরীরটা যেন প্রবল বেগে নড়িয়া উঠিল। তার পরই লেজের প্রবল আস্ফালন সুরু হইয়া গেল। যেন সপাং সপাং করিয়া চাবুক মারিতেছে। গর্ত্তের ভিতরে কি ব্যাপার ঘটিতেছিল বাহির হইতে তাহা কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। প্রায় মিনিট দশেক পর্য্যন্ত এরূপ আস্ফালন চলিবার পর গোসাপটা গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিল—মুখে তাহার প্রায় আড়াই হাত লম্বা একটা গয়েরী রঙের সাপ। সাপটার গলায় কামড়াইয়া ধরিয়াছে। মুখটা তাহার একেবারে পেঁচাইয়া গিয়াছে। তথাপি সে থাকিয়া থাকিয়া নানা ভঙ্গীতে মোচড় খাইতেছিল। সেই অবস্থায়ই কামড়াইয়া রাখিয়া গোসাপ সাপটাকে চাবুকের মত করিয়া বার-বার মাটিতে আছাড় মারিতে মারিতে নির্জ্জীব করিয়া ফেলিল এবং মুখের দিক হইতে ধীরে ধীরে গিলিতে আরম্ভ করিল। খানিকটা গিলিয়া আবার খানিকক্ষণ মাটিতে আছাড় মারে, আবার খানিকটা গিলে, আবার আছাড় মারে। এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই সাপটাকে সম্পূর্ণ উদরস্থ করিয়া ফেলিল।

সাপ ও কচ্ছপের ডিম গোসাপের অতি প্রিয় খাদ্য



বিরাটকায় 'কমোডো' গোসাপ

সাপ ও কচ্ছপ উভয়েই মাটির নীচে ডিম পাড়ে। এক বার ডিমের সন্ধান পাইলে রোজই সেই স্থানে গিয়া তাহার আশেপাশে বহু গর্ত্ত খুঁড়িয়া জমি যেন একেবারে চষিয়া ফেলে। ডিম পাড়িবার সময় হইলে কচ্ছপ রাত্রির মধ্যভাগে জল হইতে উঁচু জমিতে উঠিয়া আসে এবং গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়িয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিয়া যায়। গোসাপও সর্ব্বদাই সন্ধানে থাকে। রাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতেই তাহারা জলের পার্শ্ববর্ত্তী উঁচু জমিতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ডিম বাহির করিয়া খাইয়া ফেলে। আশ্বিনের রাত্রিশেষে একবার কোন এক পাড়াগাঁয়ের বড় রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। রাস্তার সঙ্গে সঙ্গেই বরাবর প্রকাণ্ড খাল চলিয়া গিয়াছে। খাল হইতে রাস্তা প্রায় ছয় সাত হাত উঁচু। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই রাস্তার পাশে একটা উইয়ের ঢিবি নজরে পড়ে। ঢিবিটার চতুর্দ্দিকে আসশ্যাওড়া ও ভাঁটগাছের জঙ্গল। ঢিবিটার কাছে আসিতেই খুব একটা ধস্তাধস্তির শব্দ শুনিতে পাইলাম। মাঝে মাঝে ফোঁস-ফোঁস শব্দও কানে আসিতেছিল। তখন পূর্ব্বদিক বেশ ফর্সা হইয়া উঠিতেছে। গাছপালার আড়ালে অস্পষ্ট আলোকে কেবল একটা গোসাপের লেজের দিকটা দেখিতে পাইলাম। গোসাপটা কিছুক্ষণ পরে পরে গাছপালার উপর সপাং সপাং করিয়া লেজের আঘাত করিতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই পরিষ্কার আলোকে দেখিতে পাইলাম—প্রকাণ্ড একটা কচ্ছপ গোসাপটার কানের কাছে মরণ-কামড় দিয়া ধরিয়াছে এবং তাহাকে জলের দিকে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিয়াছে। গোসাপ মাথা নাড়িতে না পারিলেও প্রাণপণে মাটি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে এবং যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া লাঙ্গুল আস্ফালন করিতেছে। সে কিছুতেই জলের দিকে যাইবে না। আরও কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর কচ্ছপই জয়ী হইল। সে অতিকষ্টে হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে গোসাপকে জলের ধারে লইয়া আসিল। কিছুক্ষণ দম লইবার পর গোসাপটা নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে আস্ফালন করিতে করিতে উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রায় দুই-তিন মিনিট কোন সাড়াশব্দ নাই। তার পরেই গোসাপের লেজের আন্দোলনে জল তোলপাড় হইতে লাগিল। মিনিট-দুই এরূপ চলিবার পর হঠাৎ দেখি, গোসাপ কচ্ছপের কামড় ছাড়াইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে। খালের অপর পাড়ে উঠিয়া, বনজঙ্গল ভাঙিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। সময় সময় চলন্ত গাড়ীর বোম ছিঁড়িয়া ঘোড়া যেমন বরাবর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে, এই দৃশ্যও হুবহু সেইরূপ মনে হইল। রাস্তার পাশেই ঘাসের মধ্যে এক স্থানে ভিজামাটির প্রলেপ দেখিতে পাইলাম। ইহাই কচ্ছপের ডিমের গর্ত্তের পরিষ্কার চিহ্ন। সেই স্থানের মাটি সরাইতেই ২৭টি ডিম বাহির হইল। খুব সম্ভব ডিম পাড়িবার অব্যবহিত পরেই গোসাপ ডিমের সন্ধানে সেখানে উপস্থিত হওয়ায় কচ্ছপ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

গোসাপ পুরাতন গাছের গুঁড়ির ফাটলে, ঘনসন্নিবিষ্ট শিকড়ের নীচে অথবা ঝোপঝাড়ের আড়ালে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। গর্ত্তের মধ্যে ডিম পাড়িয়া সযত্নে রক্ষা করে। বাচ্চাগুলি একটু বড় হইলেই মা তাহাদিগকে লইয়া আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। ইহাদের মাতৃস্নেহ এবং প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। অবশ্য বাচ্চার প্রতি অত্যাচার হইলেই প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। অন্যথা আক্রমণকারীর নিকট হইতে সর্ব্বদাই পলায়ন করিতে ব্যস্ত থাকে।

আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিবার সুযোগ না পাইলে গোসাপ আক্রমণকারীর প্রতি রুখিয়া দাঁড়ায় এবং ফোঁস ফোঁস শব্দ করিয়া ঘন ঘন লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে থাকে। গোসাপ দেখিলেই কুকুরেরা তাড়া করিয়া যায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কুকুরকে ইহারা মোটেই গ্রাহ্য করে না। কুকুর দেখিলেই ইহারা গলা ফুলাইয়া, মাথা উঁচু করিয়া এমন ভাবে রুখিয়া দাঁড়ায় যে, তাহারা ভয়ে আর অগ্রসর হইতে চাহে না। দূরে থাকিয়াই প্রাণপণে ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। চার-পাঁচ ফুট লম্বা একটা গোসাপ লেজের এক আঘাতেই একটা প্রকাণ্ড কুকুরকে ঘায়েল করিয়া ফেলিতে পারে।

মহালয়া

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

দেবতা রইলেন কোথায় কোন্ ভক্তের সরল হৃদয়ে—
মানুষের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলাম সেদিন
মহালয়ায় কালীঘাটের দেবায়তনের পথে।

চলেছে ভিক্ষুকের দল,
খঞ্জ, অন্ধ, বিকলাঙ্গ—
লাঠি ভর ক'রে,
কারো বা শুধু দুটো হাত
কোনো রকমে চলেছে মাজা ঘষে ঘষে।
অদ্ভুত তারা, অদ্ভুত তাদের বেশ,
আর অদ্ভুত তাদের আচরণ।
জলন্ত রোদ্দুরে দু-পাশে ভিক্ষুকের সার
মাঝখানে চলেছে যাত্রীর স্রোত
নদীর স্রোতের মত।

বটের স্নিগ্ধ ছায়ায়
শিলাস্তূপে পড়ছে পুষ্পাঞ্জলি—
উঠছে বেদমন্ত্রধ্বনি,
ভক্তিনত অসংখ্য-ঘোমটাঘেরা মুখ।
ধূপের গন্ধে, পুষ্প-বিল্বপত্রের গন্ধে
সংশয়হীন সরল বিশ্বাসের প্রণাম।

কত দিন ত আসি আর যাই—
কিন্তু সেদিন মনে ছিল রং,
বিচিত্রকে দেখবার, গ্রহণ করবার অনুভূতি।
মনে হ'ল এ আরেকটা জগৎ,
সিনেমা-রেডিও-গ্রামোফোন্
আর পেশাদারী বক্তৃতায় ক্লান্ত কল্‌কাতা
অপব্যবহৃত, অতিব্যবহৃত মননশীলতার ঔজ্জ্বল্য থেকে
এ আর কোনো একটা জগৎ
অথচ এ এত কাছে—
কত দিন ত আসি আর যাই!

মাঝে মাঝে এক একটা অতি দীর্ঘ নারকেল-গাছ
আশ্বিনের দিগ্‌বিজয়ী আকাশে ঝলমল করে।
কোনো শিল্পীর আঁকা যেন এই আকাশ,
মেঘের আঁজি দেওয়া দেওয়া—
কল্‌কাতার অরণ্যবিরল দিগন্তের ইঙ্গিত।
কল্‌কাতার ক্লান্ত মনের শরৎ-স্বপ্ন আমার
সফল হ'ল সেদিন মহালয়ায়
কালীঘাটের দেবায়তনের পথে।

কত ছায়া আর কত মায়া!
চেয়ে রইলাম শুধু পায়ের দিকে—
কত মানুষ আর কত মুখ!
চলমান মুহূর্ত্ত যেন থেমে রইল ক্ষণকাল।
কত পায়ে পায়ে কত মনে মনে
বেজে চলেছে এই চল্‌বার সুর
মনুষ্যজন্মের আদি সূচনা থেকে সুমহান্ ভবিষ্যতের দিকে।

কেউ স্নান ক'রে পট্টবস্ত্র প'রে
ফিরছে মন্দির থেকে,
ভক্তি আর তৃপ্তির রেখা মুখে—
হয়ত মনে।
কেউ বা সিন্দুর আর চন্দনলিপ্ত দেহ—
কারো বা সর্ব্বাঙ্গে ঝরছে ঘাম,
ফুলের সাজি আর নৈবেদ্য নিয়ে চলেছে
কত তরুণী, প্রৌঢ়া, যুবতী, বিধবা—
কত পাণ্ডা, পুরোহিত, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী!
আলোছায়া-মেশা শরৎ-মধ্যাহ্নের এই প্রবাহটি নিলাম মনে।

কত মানুষ আর কত মুখ!
কত পায়ে পায়ে কত মনে মনে
বেজে চলেছে এই চলবার সুর!

নির্মোক

"বনফুল"

৩

পরদিন সকালে উঠিয়াই বিমল নিজের বাসাটা দেখিতে গেল। গঙ্গার ধারে ছোটখাট বাসাটি বেশ চমৎকার—একটু দূর হইতে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বিমল দেখিতে লাগিল। পরেশ-দা সঙ্গে ছিলেন, বলিলেন—পাগলা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবে না কি এখুনি।

বিমল একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, ভাবিতেছিল মণির এ-বাসাটা পছন্দ হইবে কি না। মণি আবার একটু খুঁৎখুঁতে ধরণের। এই মফস্বল জায়গায় হয়তো তাহার—

পরেশ-দা পুনরায় বলিলেন—দেখা করবে না কি! এখনও হয়ত ওঠেই নি পাগলা।

বিমল বলিল—বেশ তো চলুন না,—সত্যিই পাগল নাকি?

—ছিট আছে।

কাছে আসিয়া দেখা গেল, বাড়ীর দরজাটা খোলা রহিয়াছে।

—প্রকাশবাবু, ও প্রকাশবাবু।

শব্দ শুনিয়া একটা লোম-ওঠা কুকুর বাড়ীর ভিতর হইতে সুট করিয়া বাহির হইয়া গেল; পরেশ-দা একটু হাসিলেন।

—প্রকাশবাবু—

—কে—

রক্তচক্ষু বিরাট্‌বপু প্রকাশবাবু অসম্বৃত বসনটা সামলাইতে সামলাইতে আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। কুচকুচে কালো রং, প্রকাণ্ড ভারি মুখ, সদ্যনিদ্রোত্থিত বলিয়া চোখ দুটি লাল লাল।

—কি চান?

—ইনিই নতুন ডাক্তার, বিমলবাবু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন,—কাল রাত্তিরে এসেছেন।

প্রকাশবাবু ক্ষণকাল বিমলের মুখের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিলেন ও তৎপরে বলিলেন—ও আসুন, নমস্কার।

—নমস্কার।

বিমল ভিতরে প্রবেশ করিল।

পরেশ-দা বলিলেন—বিমল তুমি তাহলে আলাপ-টালাপ ক'রে এস আমার ওখানে। আমি যাই ডাকগুলো কাটতে হবে—

—আচ্ছা।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন। ভিতরে ঢুকিয়াই বিমলের চোখে পড়িল উঠানের উপর একটা দড়ির খাটিয়ায় বাঁখারি-সহযোগে একটি মশারি—টাঙানো আছে ঠিক বলা চলে না—কোনক্রমে ঝুলিয়া আছে। খাটের এক ধারে একটা হাতলবিহীন চেয়ারে ধূমাঙ্কিত একটা লণ্ঠন বসান রহিয়াছে এবং তাহার পাশেই বিখ্যাত ডাক্তারি কাগজ 'ল্যান্‌সেট্‌' একখানা। উঠানের মাঝামাঝি একটা তার খাটানো, তাহাতে একখানি গামছা শুকাইতেছে।

বিমল বলিল—আপনার বুঝি বাইরে শোয়া অভ্যেস?

চকিতে একবার খাটিয়াটার পানে চাহিয়া প্রকাশবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, কি শীত কি গ্রীষ্ম। আসুন ভেতরে বসা যাক্।

ঘরের ভিতর গিয়াও বিমল দেখিল প্রকাশবাবুর আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই। ঘরের ভিতর একটি চৌকি, একটি টেবিল এবং আর একখানি চেয়ার রহিয়াছে।

—একাই ছিলেন নাকি এত দিন এখানে?

—না, ফ্যামিলি জিনিষপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছি, এই

যার আপনার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ ক'রে আমিও রওনা হয়ে পড়ব—হা-হা-হা—বসুন, বসুন।

প্রকাশবাবু চৌকিটাতে উপবেশন করিলেন, বিমল চেয়ারে বসিল। বিমল একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে প্রশ্নটা করিয়াই ফেলিল—আপনি চলে যাচ্ছেন কেন এখান থেকে?

—আপনি ঐ কথা জিজ্ঞেস করছেন আর আমি ক-দিন থেকে ভাবছি আমি ছিলাম কেন এখানে এত দিন? নষ্ট করবার মত সময় সত্যিই তো নেই—হা-হা-হা হা—

—কতদিন ছিলেন আপনি এখানে?

—ছ-মাস, তার আগে ছিলাম চা-বাগানে, কিছু দিন জাহাজে জাহাজেও ঘুরেছি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেও ছিলাম কিছু দিন। কিন্তু এখন দেখছি নষ্ট করবার মত সময় সত্যিই আর বেশী নেই, এইবার ডিসেন্টলি যা হোক একটা কিছু করতে হবে।

—কোথাও ঠিক করেছেন না কি কিছু?

—ঠিক? ঠিক কি কখনও কিছু হয় মশাই। জনসমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে কোথাও না কোথাও ভিড়ে পড়ব আবার। তবে এবার ডিসেন্ট কিছু না দেখলে আর সহজে ভিড়ছি না। গান শুনব অক্রূর-সংবাদ পয়সা দেব একটি—ওর মধ্যে আর নেই আমি—হা হা-হা-হা—

বিমল অনুভব করিল এই বিকট হাসির জন্যই বোধ হয় সকলে ইহাকে পাগল আখ্যা দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে ভদ্রলোকের চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বারপ্রান্তে ভৃত্য জাতীয় এক ব্যক্তি দর্শন দিল।

—বাবু, কাল আবার আপনি কপাট খুলে রেখে শুয়েছিলেন, কুকুরে সব খেয়ে গেছে—

—আবার।

চকিতের মধ্যে প্রকাশবাবুর মুখের হাসি নিবিয়া গেল, দারুণ ক্রোধে সমস্ত মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল। বিমলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—দেখুন, কতকগুলো লোম-ওঠা খেঁকি কুকুর আছে এ পাড়ায়, এ পাড়ায় কেন সর্ব্বত্রই—মিউনিসিপালিটিকে ব'লে ব'লে আমি হার মেনে গেলুম মশাই, এক ধার্ম্মিক চেয়ারম্যান জুটেছে সে কিছুতেই কুকুর মারতে দেবে না। অথচ প্রতি বছরেই পাগলা কুকুরে লোককে কামড়াচ্ছে। আর আমি তো নাস্তানাবুদ হয়ে গেলাম—দিজ্ ডগ্স্ আর প্লেইং হেল্ উইথ্ মি—জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে! ব্যাটাচ্ছেলে ভণ্ড কোথাকার!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

ভৃত্যটি ইতস্ততঃ করিতেছিল। প্রকাশবাবু বলিলেন ভৈরব, ইনিই নূতন ডাক্তারবাবু, চা-টা খাওয়াও এঁকে, কিছু খাবারও নিয়ে এস।

ভৈরব ঝুঁকিয়া বিমলকে প্রণাম করিল।

প্রকাশবাবু বলিলেন—ও ঘরের তাকে একটা খালি সিগারেটের টিনে কিছু পয়সা আছে দেখো—

ভৈরব চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই খালি সিগারেট-টিনটি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

—কই, একটি পয়সাও তো নেই এতে বাবু।

—নেই? সে কি, এই তো পরশুদিন একটা টাকা ভাঙিয়ে রেখেছিলাম।

নিরীহের মত মুখ করিয়া ভৈরব বলিল—খরচও তো হয়েছে, কাল তেল আনালেন, সিগারেট আনলাম, আরও সব যেন কি কি—

প্রকাশ বাবু যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন।

—ভাল কথা মনে পড়েছে, সিগারেট খান আপনি, ওরে আমার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে আয়।

ভৈরব চলিয়া গেলে একটা স্যুটকেস তিনি চৌকিটার তলা হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। বিমল দেখিল স্যুটকেসে চাবির বালাই নাই। ডালাটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রকাশবাবু বিমলের দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিলেন—আর একটি মাত্র বাকি রইল, তার পর স্যুটকেসটা পুনরায় চৌকির তলায় ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—একেবারে নিঃস্ব হবার আগে সরে পড়তে চাই—হা-হা-হা-হা—চলুন আজই আপনাকে চার্জটা দিয়ে দিই—

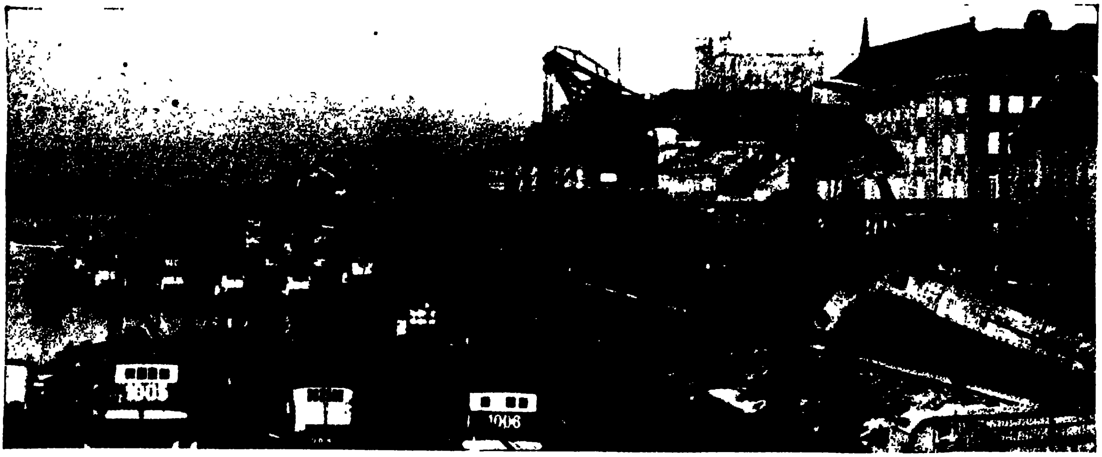
ভৈরব সিগারেট ও দিয়াশলাই লইয়া আসিতেই প্রকাশবাবু তাহার হাতে দশ টাকার নোটটি দিয়া বলিলেন—এইটে ভাঙিয়ে চট্ ক'রে কিছু খাবার আনো গিয়ে।



সাব-কার্পেথিয়ান রাশিয়ার দারুময় গির্জ্জা



কার্লস্টিন প্রাসাদ



ব্রাটিস্লাভা, স্লোভাকিয়ার প্রধান শহর



বোহেমিয়ার লৌহময় দ্রব্য নির্ম্মাণের একটি বিখ্যাত কারখানা



মোরাভিয়ার প্রসিদ্ধ জুতার কারখানা

বিমল বলিল—কেন ও-সব হাঙ্গামা করছেন।

প্রকাশবাবু বিমলের দিকে এক বার মাত্র চাহিয়া পুনরায় ভৈরবকে বলিলেন—ওই চণ্ডীর দোকান থেকে নিও না যেন, একের নম্বর স্কাউণ্ড্রেল ব্যাটা, দেরি ক'রো না, চা করতে হবে, যাও।

বিমল পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু প্রকাশবাবু সে অবসর দিলেন না, কাপড়ের কসিটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিলেন—এই জায়গাটার কুকুর বেড়াল মানুষ বাঁদর সব পাজি, আপাদমস্তক পাজি—

—তাই নাকি ?

—উফ্ !

একটু পরে বিমল যখন পরেশ-দার বাসায় ফিরিয়া গেল তখন তাহার প্রকাশবাবুর সম্বন্ধে ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। লোকটার পড়াশোনা অদ্ভুত, এ-রকম স্থানে তাঁহার বিদ্যাবত্তা বুঝিবার লোক না থাকাই সম্ভব। বায়োকেমিস্ট্রি সম্বন্ধে যেরূপ বক্তৃতা দিলেন ভদ্রলোক, বিমলই সব কথা ভাল বুঝিতে পারিল না। এ-রকম লোকের কোথাও অধ্যাপক হওয়া উচিত। কিন্তু—। ঐ 'কিন্তু'তেই আমাদের দেশে সব কিছু আটকাইয়া যায়। ঐ 'কিন্তু'টা যে কি জটিল বস্তু তাহা বোঝানো শক্ত

সমস্ত শুনিয়া পরেশ-দা বলিলেন—হ্যাঁ এদিকে বেশ লেখাপড়া জানেন ভদ্রলোক, এম. এসসি, এম. বি—কিন্তু ঐ এক দোষ। ঠিক সময়ে হাসপাতালে যেত না, বকছে ত বকছেই, হাসছে ত হাসছেই, চটলে ত রক্ষে নেই খুনই করে ফেলবে। বিমল কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—চল তোমাকে এইবার বদিবাবুর সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিই, কাছেই বাড়ী। ওহে হরেন, তুমি ততক্ষণ থেকো একটু এখানে, আমি আসছি একটু বদিবাবুর বাসা থেকে—আমি এলে তার পর যেরিও—

হরেন বলিল—আজ্ঞে আচ্ছা!

হরেন পিওন। পরেশ-দা এখানে পোস্টমাস্টার হইয়া আসাতে হরেন বেচারারই বিপদ হইয়াছে। পরেশ-দার চিরকালকার স্বভাব নিজের চরকাটি ছাড়া আর সকলের চরকায় তৈল প্রদান করা। আশেপাশের সকলের সব খুঁটিনাটি খবরটি তাঁহার রাখা চাই, সমস্ত লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেশা চাই, প্রত্যেক ব্যাপারেই সুযোগ পাইলে মুরুব্বিয়ানা করা চাই। পরেশ-দা এখানকার ফুটবল ক্লাবের রেফারি, সারস্বত মন্দির অর্থাৎ বাংলা লাইব্রেরির সেক্রেটারি, কংগ্রেসী বদিবাবুর সহচর, স্থানীয় যুবক-সমিতির পৃষ্ঠপোষক, আঢ্যিদের টেনিস ক্লাবের কর্ণধার। সুতরাং যেরূপ অখণ্ড মনোযোগের সহিত তাঁহার নিজ কর্ত্তব্য করা উচিত তাহা তিনি করিতে পারেন না। হরেনকেই অর্দ্ধেক কাজ করিয়া দিতে হয়। ... রাত্রে ক্যাশ লইয়া দুর্ভাবনা হয়, কিছুতেই মেলে না। অথচ পরেশ-দার উপর সকলেই খুশী। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি এখানে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন।

পথে যাইতে যাইতে পরেশ-দা বিমলকে বলিলেন—এই বদিবাবু লোকটির ভয়ানক ইনফ্লুয়েন্স এখানে, মাড়োয়ারি-মহল ওঁর কথাতেই ওঠে বসে। বদিবাবুকে যদি খুশী করতে পার মাড়োয়ারি-মহলে তোমার এক-চেটে প্রাক্‌টিস হয়ে যাবে।

তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া পরেশ-দা বলিলেন—তোমাকে না-দেখেই তুমি চাটুজ্যে শুনেই তোমার উপর একটা টান হয়েছে। এদিকে বদিবাবুর একটু, যাই বল তুমি, হয়ে আছে। উনিই তো হাসপাতাল কমিটির সেক্রেটারি, তুমি চাটুজ্যে ব'লে উনি কি কম লড়েছেন তোমার জন্যে!, তোমাদের কমিটিতে হরেন বোস ব'লে এক ভদ্রলোক আছেন তাঁরও এক জন নিজের লোক ছিল ক্যাণ্ডিডেট্, কিন্তু বদিবাবুর সঙ্গে হরেন বোস পারবে কেন, ভোটে হেরে গেল! বদ্যিনাথ চাটুজ্জের সঙ্গে পারা বড় চাট্টিখানি কথা নয়।

বিমল বলিল—তাই না কি!

—নিশ্চয়! পুরুষসিংহ যাকে বলে! গিয়েই প্রণাম ক'রো, খুশী হবেন! ভারি অমায়িক লোক এদিকে।

—কি করেন ?

—ওকালতি, বেশ ভাল প্রাক্‌টিস ক্রিমিনাল সাইডে—

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ওঁর বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হ'লে কে চিকিৎসা করে ?

—জগদীশবাবুর সঙ্গে ওঁর ভাব আছে যথেষ্ট, কিন্তু উনি ডাক্তারি ওষুধ বিশেষ পছন্দ করেন না, উনি কবরেজি কিংবা হাকমি ওষুধের পক্ষপাতী—

—ও, তাই না কি ?

বিমল ভাবিয়া পাইতেছিল না কি উপায়ে এই পুরুষসিংহটিকে খুশী করিতে পারিবে। ডাক্তারি ঔষধই যে ব্যক্তি পছন্দ করে না তাহাকে খুশী করা তো সহজ হইবে না! নিজের হাত-ঘড়িটা দেখিয়া বিমল বলিল—পরেশ-দা, বেশী দেরি করা চলবে না, প্রায় সাতটা বাজে, হাসপাতালে যেতে হবে। প্রকাশবাবু সাড়ে সাতটায় যাবেন বলেছেন, তাছাড়া কালকের সেই রুগীটা কেমন রইলো জানবার জন্যে মনটা ছটফট করছে—

পরেশ-দা বলিলেন—না বেশী দেরি হবে না।

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আটঘাট বেঁধে নিয়ে তার পর কাজ সুরু ক'রে দাও না তুমি! এ-বেলা বদ্যিবাবু তো হয়ে গেল ও-বেলা চেয়ারম্যান আর জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই আপাতত নিশ্চিন্দি! বাকী মেম্বারদের সঙ্গে তার পর ধীরেসুস্থে দেখা করলেই চলবে—

—চেয়ারম্যান কে ?

—রাখাল নন্দী, ধর্ম্ম-ধর্ম্ম বাই, কিন্তু টাকার কুমীর। তোমাদের হাসপাতালের ইনডোর রুগীদের খাওয়ার খরচ ওই একা দেয়।

একটু থামিয়া বিমল বলিল—জগদীশবাবু ডাক্তারও কি হাসপাতাল কমিটির মেম্বার না কি ?

—নিশ্চয়ই, বেশ শাঁসালো মেম্বার। ও লোকটিকেও হাতে রাখতে হবে, বড় গভীর জলের মাছ—

বিমল মনে মনে একটু চিন্তিতই হইয়া পড়িয়াছিল। এই সব বিভিন্ন প্রকৃতির লোকগুলিকে সে একা কি করিয়া খুশী করিয়া রাখিবে! ইহা তো রীতিমত সমস্যার আকার ধারণ করিতেছে! আরও কিছুক্ষণ চলিবার পর পরেশ-দা বলিলেন—ঐ যে বদ্যিবাবু বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন।

বিমল দেখিল একটা বড় বাড়ীর গেটের সম্মুখে দীর্ঘাকৃতি এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। গায়ে একটি খদ্দরের ফতুয়া, খদ্দরের একটি কাপড় লুঙ্গির মত করিয়া পরা, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, হস্তে একটি নিমের দাঁতন।

—পরেশবাবু যে, আসুন আসুন! সঙ্গে ওটি কে ?

বিমল অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইল।

পরেশ-দা বলিলেন—বিমল চাটুজ্যে, আপনাদের নতুন ডাক্তার—

—আরে, তাই নাকি বাঃ বাঃ বাঃ—আসুন ভেতরে আসুন।

তাহার পর বিমলের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—সব খবর পেয়ে গেছি ভোরেই।

বিমল বুঝিতে পারিল না কিসের খবর। বদ্যিবাবু সামনের দাঁতে দাঁতনটাকে বার-দুই ঘষিয়া বলিলেন—আপনার রুগীকে দেখেও এসেছি, ভাল আছে বুড়ী।

তাহার পর বিমলের পিঠটা চাপড়াইয়া বলিলেন—বাঃ, এই তো চাই! চাটুজ্যে না হ'লে কি এ আর কারও দ্বারা সম্ভব হ'ত? কি বলেন পরেশবাবু, আসুন ভেতরে, আমি ততক্ষণ মুখটা ধুয়ে আসি।

বদ্যিবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন। পরেশ-দার সহিত বিমল ভিতরে ঢুকিয়া একখানি চেয়ারে বসিল। একটু পরেই বদ্যিবাবুর দুই জন মক্কেল, তিন জন কংগ্রেস-কর্ম্মী, সাহায্যপ্রার্থী একটি যুবক, মিউনিসিপালিটির কেরাণী মহেশবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলেরই বদ্যিবাবুর সহিত প্রয়োজন।

প্রকাশবাবু সেদিনই চার্জ দিলেন। সমস্তই এমন এলোমেলো ও অগোছালো অবস্থায় ছিল যে, আইনতঃ চার্জ লইতে গেলে অন্ততঃ পাঁচ-ছয় দিন লাগিত, প্রকাশবাবুও বিপন্ন হইতেন। খাতাপত্রের কিছুই ঠিক ছিল না। বে-আইনী ভাবে কোনক্রমে গোঁজামিল দিয়া বিমল প্রকাশবাবুকে রেহাই দিয়া দিল। প্রকাশবাবু সেই দিনই দুপুরের ট্রেনে চলিয়া গেলেন।

যাইবার সময় বিমলকে বলিয়া গেলেন—আমার ঐ নড়বড়ে চৌকিটা আর হাতল-ভাঙা চেয়ার দুটো আপনাকে দান ক'রে গেলাম বিমলবাবু। ওগুলো ভাল কাঁঠাল-কাঠে তৈরি, কব্জাগুলো ঠিক নেই খালি—অর্থাৎ আমার মতই অবস্থা—হা-হা-হা-হা—

বৈকালে চেয়ারম্যান রাখাল নন্দীর সঙ্গেও দেখা হইল। নন্দী মহাশয় নিজের বাগানের একটি ছায়া-শীতল স্থানে শ্বেতপাথরের চৌতারার উপর বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন—অম্বরি তামাকের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। নগ্নগাত্র, ক্ষৌরিকৃত মুখমণ্ডল, ভাসা-ভাসা আরক্ত নয়ন, মাংসল নাকের উপর সূক্ষ্ম একটি তিলক, গলায় কণ্ঠী, দক্ষিণ বাহুমূলে মাদুলি, মেদবহুল অতিপুষ্ট-দেহ নন্দী মহাশয় গরমে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। পিছনে দুই জন ভৃত্য দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাওয়া করিতেছিল। বিমলের সঙ্গে পরেশ-দাও গিয়াছিলেন। পরিচয় দিতেই অর্থাৎ বিমল চাটুজ্যে ব্রাহ্মণ-সন্তান এই বোধ মনে স্পষ্টভাবে জাগরূক হইতেই নন্দী মহাশয় শরীরের গুরুভার সত্ত্বেও উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন এবং বেশ একটু ঝুঁকিয়া বিমলকে নমস্কার করিলেন। পরেশ-দা বলিলেন—বসুন, বসুন, আপনি বসুন!

—ওরে দুখানা চেয়ার নিয়ে আয় শীগ্‌গির—ব্রাহ্মণ-সন্তান দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনারা আর আমি বসব, সে কি একটা কথা হ'ল!

নন্দী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বেশীক্ষণ অবশ্য তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইল না,—দুইখানি চেয়ার শীঘ্রই আসিয়া পড়িল এবং সকলে উপবেশন করিলেন।

নন্দী মহাশয় পুনরায় আদেশ করিলেন—ডাব নিয়ে আয়, বরফ দিয়ে আনিস।

পরেশ-দা বলিলেন—আপনার বাড়ীতে বরফ!

নন্দী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—আপনাদের জন্যে রাখতে হয়, আমার মত সকলেই ত আর বাতুল নয়!

পরেশ-দা বলিলেন—আপনি খান না তা শুনেছি।

গড়গড়ার নলে একটি সুদীর্ঘ টান দিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে নন্দী মহাশয় বলিলেন—আমার কেমন যেন প্রবৃত্তি হয় না! সংস্কার ব'লে ত একটা জিনিষ আছে—

কিছুক্ষণ তামাকে টান দিয়া নন্দী মহাশয় বলিলেন—তাব, আগে আমরা ইলেকট্রিসিটিটা এনে ফেলি, নিজের বাড়ীতে রেফরিজেরেটারে বরফ বানিয়ে তার পর খাব। দাড়ান না,—

পরেশ-দা বলিলেন—ইলেকট্রিসিটি হবে না কি টাউনে?

—চেষ্টা তো করছি, একটা স্কীমও খাড়া করেছি, বাগড়া দিচ্ছেন আমাদের মথুরবাবু—লোকটিকে ত জানেন—অবগুণ নেই বরগুণ আছে—

পুনরায় গড়গড়ায় টান দিতে লাগিলেন।

আবার সহসা বলিলেন—ইলেকট্রিসিটি না হ'লে এই দারুণ গ্রীষ্মে কি কষ্ট বলুন তো—এই চাকর দুটো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তবু দেহ শীতল হচ্ছে না! ওদেরও তো কষ্ট হয়।

আবার কিছুক্ষণ গড়গড়ায় টান দিলেন। তাহার পর সহসা বিমলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—আপনাদের হাসপাতালেও ত ইলেকট্রিক হ'লে সুবিধে হয়।

বিমল বলিল—তা হয় বইকি!

নন্দী মহাশয় পুনরায় তাম্রকূটে মন দিলেন। সেদিন রাত্রে ডিট্‌জ লণ্ঠন-ধরিয়া অপারেশনের কথাটা বিমলের মনে পড়াতে সে পুনরায় বলিল—ইলেকট্রিসিটি হ'লে খুব সুবিধে হয়। রাত্রে ইমারজেন্সি অপারেশন ইলেকট্রিসিটি না থাকলে হওয়া অসম্ভব।

নন্দী মহাশয় চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতেছিলেন। তামাক টানিতে টানিতেই বলিলেন—ঐ পয়েণ্টটা টুকে দেবেন ত আমাকে—

হঠাৎ এই পয়েণ্টটা টুকিয়া লইয়া কি হইবে বিমল ঠিক বুঝিল না, তথাপি বলিল—আচ্ছা!

ডাব আসিল। দুই-চারি কথার পর পরেশ-দা ও বিমল গাত্রোত্থান করিলেন। আসিবার প্রাক্কালে নন্দী মহাশয় বলিলেন—হাসপাতালটার বড় বদনাম হয়ে গেছে মশাই আগের ডাক্তারের আমলে। আপনি একটু সামলে-সুমলে নিন আবার!

—আচ্ছা

জগদীশ বাবু ডাক্তারের সহিতও আলাপ হইল।

লোকটি অতিশয় মিষ্টভাষী। দেখিয়া মনে হয় তিনি কখনও কাহারও মনে ব্যথা দিতে পারেন না। কাহারও কথার প্রতিবাদ করা, এমন কি ইঙ্গিতেও কাহারও মনে

আঘাত দেওয়া যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মুখে হাসি সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। সামনের দিকে নীচে গোটা দুই দাঁত নাই, হাসির ফাঁকে ফাঁকে ফোকলা দাঁতের ভিতর দিয়া লাল টুকটুকে জিবের ডগাটি প্রায়ই দেখা যাইতেছে। বিমলের পরিচয় পাইয়া একমুখ হাসিয়া বলিলেন—আসুন আসুন—আপনার কথাই হচ্ছিল একটু আগে! থামুন এই কটা সেরে নিই, তার পর কথা কইছি আপনার সঙ্গে—সমবেত কয়েক জন রোগী-রোগিণীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—আসুন আপনারা ঘরের ভেতর—

পরেশ-দা বিমলকে বলিলেন—আমার ডাকের সময় হ'ল, আমি চললাম, হরেন বেচারা একা সামলাতে পারবে না। তুমি আলাপ-টালাপ ক'রে এস—বুঝলে?

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন, বিমল একা বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে জগদীশবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি ছোকরা বলিতে বলিতে বাহির হইল—তেতো ওষুধ আমার বউ খেতে পারবে. না ডাক্তারবাবু, এ ওষুধটা মিষ্টি হবে ত?

জগদীশবাবু সহাস্য দৃষ্টিতে তাহার পানে এক বার চাহিলেন। ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবের ডগাটুকু বার-দুই উঁকি দিয়া গেল। বলিলেন—আমি তোমার বউকে চিনি না? ঠিক ওষুধ দিয়েছি। আজ দেখো, ঠিক খাবে—

ছোকরা পুলকিত হইয়া চলিয়া গেল। জগদীশবাবু সস্মিত মুখে বিমলের দিকে চাহিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিমল একটু হাসিয়া বলিল—এলাম আপনাদের আশ্রয়ে—

জগদীশবাবু কিছু না বলিয়া তেমনই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

বিমল একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, তাহার পর বলিল—দেখছেন কি অমন ক'রে?

জগদীশবাবু বলিলেন—আশ্চর্য্য চওড়া ত আপনার কপাল!—তাহার পরই তাঁহার মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিব উঁকি মারিতে লাগিল।

এ পর্য্যন্ত বিমলকে কপাল লইয়া কেহ প্রশংসা করে নাই। সে হাসিয়া বলিল—এ-কথা আর তো কখনো শুনি নি!

জগদীশবাবু বলিলেন—আমি বলছি, খুব চওড়া কপাল আপনার—

বিমল কি বলিবে চুপ করিয়া রহিল। জগদীশবাবু বলিলেন—কেমন লাগছে জায়গাটা?

—মন্দ কি।

—হাসপাতাল কেমন দেখলেন?

—এখনও দেখবার সময় পাই নি, চার্জ্জ নিতেই আজ সমস্ত সকালটা গেল। কাল থেকে দেখা যাবে ভাল ক'রে। আজ বিকেলটা আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতেই কাটল—

—বেশ, বেশ—ভূধরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না, কে তিনি?

—তিনি আমাদেরই এক জন—এখানেই প্র্যাকটিস করেন। বাজারের ভিতর তাঁর ডিসপেনসারি।

বিমল প্রশ্ন করিল—এখানে ফিল্‌ড্ কেমন?

—ঐ কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন হয়ে যায় আর কি আমাদের ক-জনের। এবার উঠতে হবে আমাকে, তিনটে কল বাকী আছে এখনও—

জগদীশবাবু উঠিতেছিলেন, বিমলও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এমন সময় একটি যুবক আসিয়া প্রবেশ করিল। ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের পাম্পশু, সাবান দেওয়ার জন্য মাথার চুল উস্‌কোখুস্‌কো, হাতের আঙুলে দামী পাথর-বসানো আংটি। বেশ সভ্যভব্য সুন্দর চেহারা।

—আসুন, আসুন অমরবাবু, তার পর খবর কি, কেমন আছেন—

বিমল অমরকে এখানে দেখিবে প্রত্যাশা করে নাই। সে সবিস্ময়ে বলিল—অমর তুই এখানে!

অমর বলিল—বিমল যে, আরে তুই কোথা থেকে?

—আমি যে এখানকার হাসপাতালে ডাক্তার হয়ে এসেছি!

—তাই নাকি,—যাক বাঁচা গেল! তোরই কথা ভাবছিলাম আজ ক'দিন থেকে!

তাহার পর জগদীশবাবুর দিকে ফিরিয়া অমর বলিল—এ আমার অনেক দিনের বন্ধু, ম্যাট্রিক, আই-এস্‌সি সব একসঙ্গে পড়েছি। ও মেডিকেল কলেজে ঢুকল, আমি জেনারেল লাইনেই থেকে গেলাম। তুই এখানে এসেছিস।

বিমল বলিল—তুই এখানে এলি কোথা থেকে?

—কি মুশকিল, এইখানেই যে আমাদের বাড়ী—ওপারে।

বিমল জানিত অমর কোন বড়লোক জমিদারের পুত্র কিন্তু এইখানেই যে তাহার বাড়ী তাহা সে এই প্রথম শুনিল। জগদীশবাবু প্রশ্ন করিলেন—মথুরবাবু আছেন কেমন?

অমর হাসিয়া কহিল—বাবার কথা আর বলবেন না, আমেরিকা থেকে কি এক ওষুধ আনিয়েছেন তাই খাচ্ছেন! আমার ওষুধটা বদলাবেন না কি?

জগদীশবাবু বলিলেন—কেমন আছেন আপনি?

—সমান্য একটু ভাল।

—ওই ভবে চলুক।

—চ গঙ্গার ধারে একটু বসা যাক কোথাও—

জগদীশবাবুকে নমস্কার করিতে গিয়া বিমল সহসা লক্ষ্য করিল তাঁহার মুখের হাসিটা কেমন যেন নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটা নড়িতেছে না।

বাহির হইয়া বিমল প্রশ্ন করিল—হয়েছে কি তোর?

কথাটা শুনিয়া কেমন অপ্রতিভ হইয়া অমর বলিল—ন্ সং ছি,—তুই এসেছিস ভাল হয়েছে।

নিকটেই গঙ্গার ধারে একটা নির্জ্জন জায়গা বাছিয়া ভয়ে উপবেশন করিল। দামী সিগারেট-কেস হইতে গারেট বাহির করিয়া বিমলকে একটি দিয়া নিজে একটি াইতে ধরাইতে অমর বলিল—সব কথা খুলে ছি তোকে, কিন্তু ভাই কিছুতে যেন প্রকাশ না হয়। ফোকলা ছাড়া আর কেউ জানে না—

বিমল একটু হাসিল, অমর বলিতে লাগিল। প্রত্যাশিত কিছু নয়, বিমল এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। বড়লোকের ছেলেদের পদস্খলনের সেই সনাতন কাহিনী। সঙ্গদোষে পড়িয়া পদস্খলন, সংক্রামক ব্যাধি, মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য আজীবন মনস্তাপ এবং জলের মত অর্থব্যয়। ডাক্তারি পড়িতে পড়িতে এরূপ অনেক কাহিনীই সে শুনিয়াছে। কাহিনী শেষ করিয়া অমর বলিল—মুশকিল হয়েছে ভাই এখন বিনুকে নিয়ে।

—বিনু কে?

—সব ভুলে গেছিস দেখছি। লরেটোর বিনুকে ভুলে গেলি?

—তাকে বিয়ে করেছিস নাকি?

—হ্যাঁ।

—শুনেছিলাম তোর বাবা-মা'র অমত আছে, বিয়ে হবে না—

—তাঁদের অমতেই লুকিয়ে বিয়ে করেছিলুম, সে অনেক কাণ্ড, তার পর বাবা-মা সব ক্ষমা করেছেন; বিনু এখন আইডিয়াল হিন্দু বধূ, টিপিকাল গৃহলক্ষ্মী যাকে বলে, ব্রত উপোস, পূজো-মানত ধূপধুনো গঙ্গাজল গোবরজল নিয়ে বিনু সকলের উপরে টেক্কা দিয়েছে! মা-বাবা বউমা বলতে অজ্ঞান! কিন্তু আমি ভাই মহা মুশকিলে পড়েছি! বিনু ঘুণাক্ষরে একথা জানে না এখনও!

বিমল বলিল—তার মানে?

—মানে, ভণ্ডামি করছি। বিনুর কাছে 'পোজ' করেছি যে আমি কোন সন্ন্যাসীর কাছে নিয়েছি এবং গুরুর আদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য পালন করছি। তুই ভাই একটা উপায় বলে দে আমাকে—অনেষ্ট ওপিনিয়ন চাই।

বিমল বলিল—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

অমর প্রশ্ন করিল—তুই বিয়ে করিস নি এখনও?

—করেছি বইকি।

—বউ কোথা?

—পড়ছে—এবার তার আই-এ পরীক্ষা।

—তার মানে, কি নাগাদ আসবে এখানে?

—পরীক্ষা হয়ে গেলেই—হচ্ছে পরীক্ষা—

—বিনুর সঙ্গে তাহলে জমবে ভাল, এ-অঞ্চলে কলেজে-পড়া মেয়ে আর একটিও নেই—

বিমল হাসিয়া বলিল—ভালই হবে। কত দূর তোর বাড়ী এখান থেকে—

—ওপারে,—যাস এক দিন—কালই আয় না। ফেরি-ঘাটে পেরিয়ে মথুরবাবুর বাড়ী কোন্ দিকে বললেই দেখিয়ে দেবে সবাই। কোন্ সময় আস্‌বি ?

—কাল বিকেলের দিকে চেষ্টা করব। চল্ এখন ওঠা যাক। তুই সকালে হাসপাতালে আসিস না ?

—আচ্ছা।

সেদিন রাত্রে বিমল মণিমালাকে দীর্ঘ একটি পত্র লিখিল। মনের আবেগে ভবিষ্যৎ জীবনের মনোরম একটি চিত্র আঁকিয়া দিল। হাসপাতালের বর্ণনা, তাহার প্রথম রোগী সেই বুড়ীটার বর্ণনা, পরেশ-দার অতিথি-পরায়ণতা, অমর ও অমরের স্ত্রীর কথা, নন্দী মহাশয়, জগদীশ বাবু, বদিবাবু, গুপি কম্পাউণ্ডার, হাসপাতালের অ্যাপ্রেণ্টিস ড্রেসার দুলু, ভৈরব চাকর, শিবু ঠাকুর, জানকী মেথর, এমন কি রুকমি মেথরাণীর কথা পর্য্যন্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া অবশেষে বিমল লিখিল—আমার জীবনের পথে তুমিই সঙ্গিনী, তুমি না এলে কিছুই ভাল লাগছে না!

পরেশ-দা আসিয়া বলিলেন—আর এক তা কাগজ দেব ? উঃ একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের চার পিঠ ভরিয়ে ফেললে যে হে তুমি!

বিমল হাসিয়া বলিল—ক্যাশ মিলল আপনার ?

—মিলেছে, যোগে ভুল হচ্ছিল।

—চলুন আমার হয়ে গেছে।

উভয়ে গিয়া খাইতে বসিল। পিওন হরেনই রাঁধিয়াছে আজ।

তাহার পরদিন সকাল হইতে-না-হইতেই বিমল হাসপাতালে গিয়া হাজির হইল। সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে, সাতটা হইতে হাসপাতালের কাজকর্ম আরম্ভ হওয়ার কথা। বিমল গিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, কেবল জানকী ঘর ঝাড় দিতেছে। বিমল প্রথমেই গিয়া বুড়ীটাকে দেখিল, বুড়ী ভাল আছে। তাহার পর কালাজ্বর রোগীটাকে সে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, ইহার রক্ত, মলমূত্র সমস্তই পরীক্ষা করা দরকার, তাহার তো নিজেরই মাইক্রসকোপ আছে, সহজেই করিতে পারিবে। জানকীকে ইহার মলমূত্র রাখিতে আদেশ করিল।

—তোমার কষ্ট কি হয় ?

—আমার পেটটা বড্ড ব্যথা করে বাবু, পিলেটা কামড়ায় বড্ড।

—সেই জন্যে বুঝি সন্ধ্যের সময় চেঁচাচ্ছিলে সেদিন।

—না, চেঁচাই না তো কোন দিন আমি, জানকীকে জিজ্ঞেস করুন আপনি। পিলেটা বড্ড কামড়ায় থেকে থেকে, তাই একটু উঁ আঁ করি।

—আচ্ছা, সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি তোমার, ভাল হয়ে যাবে।

—আমার পেটের ব্যথার একটুকুন ভাল ওষুধ দিন বাবু—

—আচ্ছা।

দ্বারপ্রান্তে দুলু—এ্যাপ্রেণ্টিস ড্রেসার—আসিয়া দর্শন দিল এবং বিমলকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দুলু আঠার-উনিশ বছরের ছোকরা, শ্যামবর্ণ, চোখে মুখে বেশ একটা বিনীত অথচ সপ্রতিভ ভাব। প্রথম দিন দেখিয়াই বিমলের ইহাকে ভাল লাগিয়াছিল।

বিমল প্রশ্ন করিল—কম্পাউণ্ডার বাবু কোথা ?

—গঙ্গা নাইতে গেছেন।

—তাঁকে খবর পাঠাও, সাতটা তো বাজে! ঠিক সময় কাজ আরম্ভ করতে হবে!

দুলু বলিল—আচ্ছা।

সে বাহিরে চলিয়া গেল এবং সম্ভবতঃ কম্পাউণ্ডার বাবুর বাসাতেই গেল।

বিমল হাসপাতালটা আর একবার ভাল করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। ছোটখাট হাসপাতালটি বেশ সুন্দর।

সাতটার সময় কাজ আরম্ভ হইল না। গুপিবাবু ঠিক

সময়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারিলেন না। তিনি গঙ্গাস্নানাদি সারিয়া টিকিতে ফুল বাঁধিয়া ও কপালে চন্দনের তিলক কাটিয়া যখন হাজির হইলেন তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

বিমল মনে মনে চটিয়াছিল, তথাপি সে ভদ্রভাবেই বলিল—বড্ড দেরি হয়ে গেল আপনার। কাল থেকে কিন্তু ঠিক সময়ে আসতে হবে।

গুপিবাবু তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে চশমার কাচের উপর দিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এই কথা শুনিয়া কোন উত্তর দিলেন না, হাসপাতালের রেজিস্টার-খানা লইয়া ঘস্ ঘস্ করিয়া রুল টানিতে লাগিলেন। বারান্দায় ভুলু জানকীর সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ পাকাইতেছিল, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল—এখানে ন-টার আগে কোন রুগীই আসে না।

বিমল দৃঢ়স্বরে বলিল—রুগী আসুক না-আসুক, সকালে সাতটা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত, আর বিকেলে তিনটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত হাসপাতাল খুলে রাখতে হবে।

গুপিবাবু রুল টানিতে টানিতে চশমার ফাঁক দিয়া আর একবার বিমলের মুখের পানে চাহিলেন, কিছু বলিলেন না।

বিমল নীরবে বসিয়া বসিয়া একটি সিগারেট ধ্বংস করিল এবং তার পর উঠিয়া নিজেই বুড়ীর ঘা-টা ড্রেস করিল। সত্যই ন-টার আগে কোন রোগী আসিল না। যাহারা আসিল, তাহারাও অতিশয় বাজে রোগী। দাদ, খোস, কানে পুঁজ, কয়েকটা ম্যালেরিয়া—অতিশয় সাধারণ রকম জন-পনর দীনদরিদ্র রোগী। বিমল তাহাদেরই যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিল। তাহার প্রেসক্রপশন দেখিয়া গুপিবাবু অবাক হইলেন। এসব ঔষধ হাসপাতালে থাকে নাকি! বিমলকে কয়েক বারই প্রেসক্রপশন পরিবর্ত্তন করিতে হইল। সে মনে মনে দমিয়া গেল। ঔষধ না থাকিলে চিকিৎসা করিবে কিরূপে! সে হাসপাতালের ঔষধের স্টক-বহিটা লইয়া উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল, কিছুই ঔষধ নাই। অসাধারণ ঔষধের কথা দূরে থাক, অতি সাধারণ ঔষধই নাই। কুইনাইনই যৎসামান্য আছে। প্রকাশবাবুর একটা কথা মনে পড়িল—থাকুন এখানে কিছু দিন, সব বুঝতে পারবেন ক্রমশঃ। আপনি অনেক উৎসাহ নিয়ে এসেছেন, আপনাকে হতাশ ক'রে দিতে চাই না!

একটু পরে কিন্তু আরও হতাশ হইতে হইল। হাসপাতালের সেক্রেটারির নামে বি. কে. পালের এক চিঠি আসিল। চিঠির মর্ম্ম এই যে, হাসপাতালের নিকট বি. কে. পালের এখনও প্রায় পাঁচ শত টাকা পাওনা আছে, তাহা যেন অবিলম্বে শেষ করিয়া দেওয়া হয়। বিমল সত্যই অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। যে-হাসপাতালের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয়, যেখানে প্রয়োজনীয় ঔষধ পর্য্যন্ত নাই, সেখানে সে ডাক্তারি করিবে কি লইয়া? টং টং করিয়া এগারোটা বাজিল। বিমল প্রত্যাশা করিয়াছিল অমর আসিবে, কিন্তু আসিল না। সে উঠিতে যাইবে, এমন সময় ঊর্দ্ধশ্বাসে একটি লোক আসিয়া বলিল—ডাক্তারবাবু, নন্দী-মশায় ডাকছেন আপনাকে এক বার।

—কেন?

—তাঁর বাড়ীতে ডেলিভারি কেস আছে, লেডী ডাক্তার এসেছেন, ভূধরবাবু এসেছেন, জগদীশবাবুকে পেলাম না, আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বললেন।

—চলুন।

বিমল গিয়া দেখিল নন্দী মহাশয়কে দুই জন ভৃত্য পূর্ব্ববৎ বাতাস করিয়া চলিয়াছে। তিনি ঘরের মধ্যে চৌকিতে একটি শীতলপাটির উপর উপবেশন করিয়া ক্রমাগত ঘামিতেছেন। নিকটে ভূধরবাবুও বসিয়াছিলেন। ভূধরবাবুকে বিমল ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই, নন্দী মহাশয় পরিচয় করিয়া দিলেন। বিমল দেখিল, ভূধরবাবুর বয়স খুব বেশী নয়, খুব ফরসা রং, বেঁটেখাটো মানুষটি, দেখিলেই কেমন যেন দাম্ভিক বলিয়া মনে হয়। নাসারন্ধ্র সর্ব্বদাই যেন স্ফীত, ভ্রূযুগল সর্ব্বদাই যেন ঈষৎ উত্তোলিত, অধরে কেমন যেন একটা ব্যঙ্গ-তিক্ত হাস্য। অদূরে আর একটি চেয়ারে প্রৌঢ়া লেডী ডাক্তার মিসেস্ মল্লিকও বসিয়া আছেন। বিমল তাঁহাকেও নমস্কার করিয়া আর একটি চেয়ারে বসিল।

নন্দী মহাশয় বলিলেন—জগদীশবাবু এসে পড়লেও বেশ হ'ত!

—জগদীশবাবুকে পাওয়াই মুশকিল, তাঁর নাইবার-খাবার অবসর নেই।

ভূধরবাবু বলিলেন—নাইবার-খাবার আমারও অবসর নেই! কিন্তু আপনার বাড়ীতে অসুখের খবর পেয়ে আসতেই হ'ল! ওপারে দু-দুটো আর্জেন্ট কেস ব'সে আছে আমার জন্যে, তাছাড়া এই দেখুন না—

ভূধরবাবু পকেট হইতে একটা ফর্দ বাহির করিয়া গণিতে লাগিলেন, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—এটা না হয় ও-বেলা গেলেও চলবে, ছয় সাত; আট—এটা তো এ-বেলা যেতেই হবে—নয়—দশ—

বিমলের কেমন অস্বস্তি হইতে লাগিল, বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিত ইহা আর কিছু নয় হিংসা।

বিমল নির্ব্বিকার হইবার ভান করিয়া বলিল—পেনটা হচ্ছে কতক্ষণ থেকে

নন্দী মহাশয় বলিলেন—ঘিনঘিনে ব্যথা কাল সকাল থেকে হচ্ছে, মেয়েরা বলছে জিরেন ব্যথা, আপনারা দেখুন।

ভূধরবাবু বলিলেন—ফরসেপস্ দিয়ে টেনে বের ক'রে দিলেই চুকে যায়, অনর্থক কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

বিমল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বলে কি! তাহার শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী ফরসেপস্ তো শেষ উপায়। ফরসেপস্ দেওয়ার হাঙ্গামা তো আছেই, বিপদও কম নয়।

সে বলিল—আমার মনে হয় ঘুমের একটা ওষুধ দিয়ে দেখা যাক প্রথমে। এইটেই কি প্রথম বার?

নন্দী মহাশয় বলিলেন—না এটি তৃতীয়।

—এর আগের দু-বার ত কোন গোলমাল হয় নি?

—না।

ভূধরবাবুর দিকে চাহিয়া বিমল বলিল—একটা ব্রোমাইড মিকশ্চার দিয়ে দেখা হয়েছে কি?

ভূধরবাবু একটু বিচিত্র রকমের হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমি কি সেকথা ভাবি নি ভাবছেন? এসেই এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি দিয়েছি আমি। এঁদের আবার বৈষ্ণবী ধাত কি না?

বিমল হাসিয়া বলিল—ও তাই নাকি,—কিন্তু ব্রোমাইডে ত কোন আমিষ নেই—

লেডী ডাক্তার মিসেস্ মল্লিক এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন—ব্রোমাইড দিয়ে দেখতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় ফরসেপ্স্ দিতে হবে শেষ পর্য্যন্ত!

বিমল বলিল—দেখা যাক না ডাইলেটেশন কত দূর হয়েছে?

মিসেস্ মল্লিক বলিলেন—তা প্রায় পুরো হয়ে গেছে।

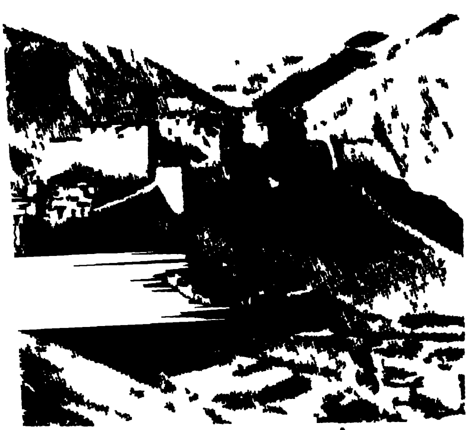
নন্দী মহাশয় চুপ করিয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন—জীবনের কোন আশঙ্কা নেই ত?

মিসেস্ মল্লিকই রোগী পরীক্ষা করিয়াছিলেন, বলিলেন—না সে কোন ভয় নেই!

—তাহলে আমাদের নতুন ডাক্তারবাবু যা বলছেন তাই দিয়েই দেখা যাক না, ফরসেপ-মরসেপ আসুরিক ব্যাপার পরেই হবে না-হয়, যদি দরকার হয়। আপনি বিমলবাবু যান এক বার দেখে আসুন নাড়িটা। ভূধরবাবু আপনিও আর এক বার যান—ভূধরবাবুর সহিত বিমল ভিতরে প্রবেশ করিল। রোগী দেখিয়া তাহার মত আরও দৃঢ় হইল, ফরসেপ্স্ দেওয়া উচিত নয়। বাহিরে আসিয়া সে ব্রোমাইডেরই ব্যবস্থা করিল এবং নন্দী মহাশয়ও সেদিকে ঝুঁকিয়াছেন দেখিয়া ভূধরবাবুও তাহা সমর্থন করিলেন। লেডী ডাক্তার যদিও মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে মনে মনে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ফরসেপ্স্ লাগানো হইলে অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশেক টাকা তাঁহার প্রাপ্য হইত। পঞ্চাশ টাকার বদলে মাত্র চারটি টাকা লইয়া তাঁহাকে আপাততঃ উঠিতে হইল। লেডী ডাক্তার চলিয়া গেলে ভূধরবাবু চলিয়া গেলেন। বিমল লক্ষ্য করিল, ভূধরবাবু ফীর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তুলিলেন না। বিমল যখন উঠিতে যাইতেছে, নন্দী মহাশয় মুখে একটা বিনীত ভাব ফুটাইয়া বলিলেন—আপনার দক্ষিণেটা কত বলুন, আনিয়ে দি—



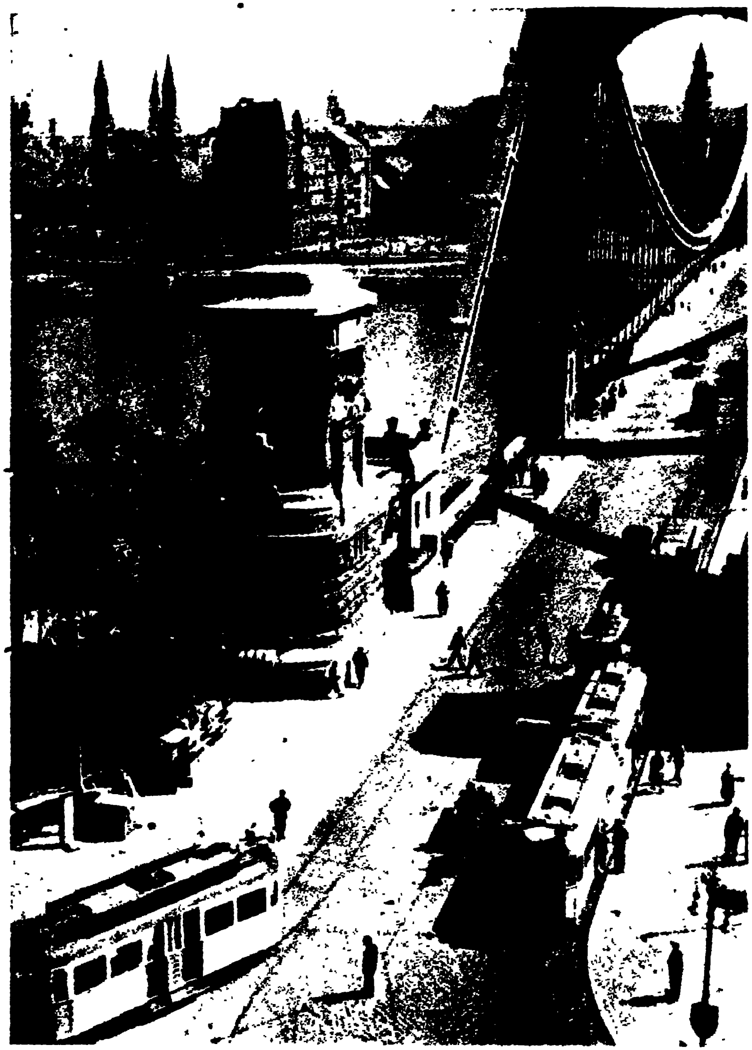
উত্তর দিক হইতে নেপাল ও তিব্বতের পথে সেবু লা গিরিসংকট।
বছরের অধিকাংশ সময় এই গিরিসংকট তুষারাবৃত থাকে।



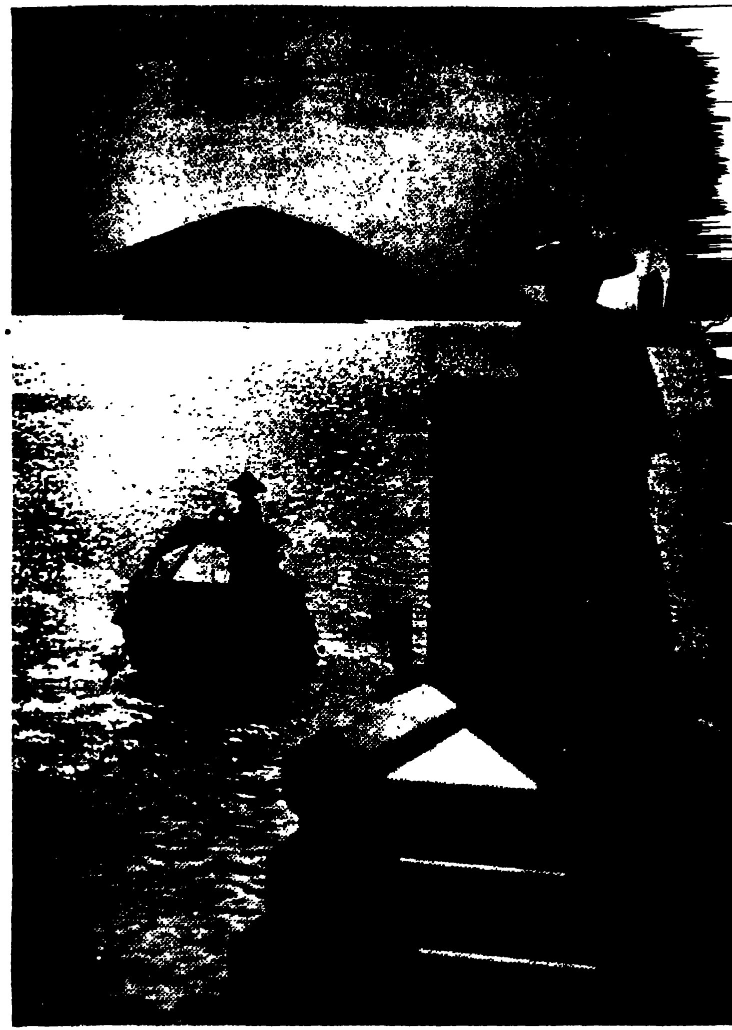
রোং উপত্যকার দুর্গ



'গিয়াংচের দুর্গ'



হাঙ্গেরীর প্র   হর বুডাপেস্ট   এলিজাবেথ ব্রিজ



হংকং বন্দর

বিমল হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক সে পরে হবে এখন—

এক মুখ হাসিয়া নন্দী মহাশয় ঝুঁকিয়া নমস্কার করিলেন।

বিমল চলিয়া যাইবার একটু পরেই ব্যস্তসমস্তভাবে জগদীশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

—শুনলাম নাকি রমেনের স্ত্রীর কাল থেকে বড় কষ্ট হচ্ছে!

নন্দী মহাশয় বলিলেন—হ্যাঁ কষ্ট হচ্ছে বৌমার, আপনি এলেন বাঁচলাম। দু-দুবার লোক পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে। লেডী ডাক্তার, ভূধরবাবু আর আমাদের হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু, সব এসেছিলেন। লেডী ডাক্তার আর ভূধরবাবু ফরসেপ লাগাতে চাইছিলেন, নতুন ডাক্তারবাবু বললেন আগে একটা ওষুধ দিয়ে দেখা যাক, এই লিখে দিয়ে গেছেন তিনি দেখুন—

নন্দী মহাশয় বিমলের প্রেসক্রপশনটি জগদীশবাবুকে দিলেন।

জগদীশবাবু প্রেসক্রপশনটি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেখিলেন ও গম্ভীর ভাবেই ফেরত দিলেন।

নন্দী মহাশয় পিছনের ভৃত্যদ্বয়কে ধমক দিলেন—ঢুলছিস নাকি ব্যাটারা, জোরে বাতাস কর—জগদীশবাবু, এই এইখানটায় বসুন আপনি হাওয়া পাবেন, তার পর কি রকম দেখলেন প্রেসক্রপশনটা—

—আমাদের কেতাব-কোরাণ অনুসারে ঠিকই। তবে বউমার ধাত আমি চিনি কি না, তাই এই ওষুধটার ডোজটা আমি একটু কমিয়ে দিতে চাই।

—দিন।

জগদীশবাবু ব্রোমাইডের ডোজটা একটু কমাইয়া দিলেন। তাহার পর সহসা তাঁহার মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটা উঁকি মারিতে লাগিল।—বুড়ো মানুষের একটা কথা শুনবেন?

—কি বলুন।

—চণ্ডীতলা থেকে একটু মাটি নিয়ে এসে পানাপুকুরের জলের সঙ্গে গুলে পেটে বেশ ক'রে একটি প্রলেপ দিইয়ে দিন। বড় বড় দেবার কেস যেখানে কিছুতে হালে পানি মেলে না, সেখানে ঐ চণ্ডীতলার মাটি মুখ রক্ষে করেছে! ওষুধটা চলুক, কিন্তু প্রলেপটাও দিন।

চণ্ডীতলার মাটি আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক ছুটিল।

[ক্রমশঃ

ভাষাহারা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'ভালবাসি, ভালবাসি'—
দূরে যেতে কাছে আসি'
নিরালায় বলে চলেযাই।
আসা-যাওয়া শুধু সার,
বলা কি হবে না আর?
প্রকাশের ভাষা কোথা পাই!
দিনের আকাশে মোর
জাগরণ সুকঠোর,
স্বপনতারকা রূপহারা,
রয়েছে তবুও
হৃদয়ের ভাষা তাই
দ্বারে দ্বারে মাথা কুটে সারা।
দিবসের অবসান,—
লক্ষ তারার গান,
রাত্রির পুলকিত ভাষা;
এ হৃদয় উন্মুখ,
সে ভাষার কণাটুক
পেলে পূরে জীবনের আশা॥

সংস্কৃতসাহিত্যের পাখী ও তাহার নামতালিকা

শ্রীসত্যচরণ লাহা

অ

অর্দ্ধসহ—পেচক (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অলজ—ভাসপক্ষী (তৈত্তিরীয় সংহিতা, সায়ণভাষ্য); কক্ষের মতে ইহা শ্যেনের অবান্তর জাতিভেদ, কক্ষের শির মণ্ডলাকার, অলজের পা বিশিষ্ট লক্ষণান্বিত—"পাদস্থানীয়াসু সিতাসু দ্বাদশসংখ্যামপোদ্যচতুঃ সংখ্যাং ক্রতে"।

অলি—কাক। কোকিল। "অলতি কূজিতে শব্দিতে বা সমর্থো ভবতি ইতি। কাকে, কোকিলে চ" (বাচস্পত্য অভিধান)।

অলিক্লব—আমিষাশী পক্ষী (অথর্ব্ববেদ); এই অর্থেই ম্যাকডোনেল ও কীথ-এর বেদিক ইনডেক্স গ্রন্থে, এমন কি মনিয়র উইলিয়মস্-এর অভিধানে "a kind of carrion bird" বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের ইংরাজি টীকায় হুইট্‌নি কিন্তু ইহাকে Buzzard বলিয়াছেন, যদিও তিনি লিখিয়াছেন যে ইহা তাঁহার অনুমান মাত্র। বাস্তবিক বেদোক্ত প্রসঙ্গ বিচার করিয়া দেখিলে Buzzard পাখীকে মনুষ্যাশবভুক্ গণ্য করা চলে না।

অলিপক—কোকিল। "কুৎসিত বর্ণেন লিপ্যতে ইতি" (বাচস্পত্য অভিধান)।

অলিমক—অলি ; কোকিল।

অলিম্পক—কোকিল।

অলিম্বক—অলিমক ; কোকিল।

অল্পবর্ত্তক—তিত্তির (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অবয়বী—পক্ষী (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অশ্বক—কুলিঙ্গ (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু) ; মনিয়র উইলিয়মস্ ইহাকে sparrow বলিয়াছেন। সুশ্রুত সংহিতায় দুই প্রকার কুলিঙ্গ—কুলিঙ্গ ও গৃহকুলিঙ্গ পাওয়া যায় ; টীকায় ডহ্বন ইহাদিগকে বন্য এবং পুষ্য বা গ্রাম-চটক বলিয়াছেন।

অসিতগ্রীব—ময়ূর (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)।

অসিতাপাঙ্গ—চকোর (মহাভারত, বনপর্ব্ব)।

অস্থিতুণ্ড—পক্ষী।

অস্থিভক্ষ—হাড়গিলা পক্ষী (বাচস্পত্য অভিধান)।

অহরদৃক্—গৃধ্র (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অহিকুটী—ভরদ্বাজ পক্ষী (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অহিদ্বিট্—ময়ূর।

অহিভুক্—ময়ূর।

অহিমার—অহিদ্বিট্।

অহিরিপু—অহিদ্বিট।

অহিবিদ্বিট্—অহিদ্বিট্।

অ (পরিশিষ্ট)

অগ্ন্যা—তিত্তির পক্ষী (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অঞ্জলিকর্ণ—সুশ্রুত সংহিতায় এই পাখীর মুখের অনুকরণে গঠিত যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পাখীটির পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না, এমন কি সংস্কৃত কোন অভিধানের মধ্যেও নয়।

অণ্ডীরক—বৃহৎ সংহিতায় দিবসচারী পক্ষী হিসাবে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কণ্ঠস্বরের পরিচয় দেওয়া আছে—'টী' এই শব্দ পূর্ণ বা স্বাভাবিক, কিন্তু 'টিট্টিটি' এইরূপ স্বর দীপ্ত।

অন্নদূষক—সুশ্রুত সংহিতার বোম্বাই সংস্করণে এই শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ সংস্করণে "দূষক" দৃষ্ট হয় ; উভয় সংস্করণেই কিন্তু ডহ্বনের টীকা এইরূপ দেওয়া আছে—"দ্বিতীয় ফেঞ্চাতকঃ, অন্যে সন্ধানচক্রাকৃতি-চঞ্চুভাগঃ দীর্ঘপুচ্ছাদিলক্ষণেন প্রতুদং বিহঙ্গমাহঃ"।

অর্কী—ময়ূর (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অবভঞ্জন—সুশ্রুত সংহিতায় পাখী বলিয়া ইহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, অন্য পরিচয় নাই ; কেবল ইহার মুখের অনুকরণে গঠিত একরূপ স্বস্তিক যন্ত্রের উল্লেখ আছে।

আ

আকলী—চড়াই পাখী (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

আর্থনিক—বারিচর পক্ষী (নানার্থার্ণবসংক্ষেপ)।

আটক—চটক, বর (বৈজয়ন্তী)।

আটি—"আতি, শরাটিকা" (বৈজয়ন্তী)।

"শরারি, আড়ি" (অমরকোষ); ভাণ্ডারকর-সম্পাদিত অমরকোষে দেখা যায় শরারিঃ "শরাতিঃ শরালিঃ শরালী শরাটিঃ শরাড়িঃ। আড়িঃ শরালির্বরটী গন্ধোলী বানরী কপী" ইতি স্ত্রীলিঙ্গকাণ্ডে রত্নকোশঃ। আটিঃ "আটী" আড়িঃ "আড়ী" ত্রয়ং স্ত্রীলিঙ্গম্। আড়ীতি খ্যাতস্য পক্ষিণঃ। আটিঃ পুংলিঙ্গোঽপি কচিৎ।'

এখানে যতগুলি নামান্তর দেওয়া আছে তন্মধ্যে 'আটী' অন্যতম; ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—জলচর পক্ষী (পারস্করগৃহ্যসূত্র, কর্ক ও গদাধর ভাষ্য); প্লববিশেষ (ঐ, জয়রাম ভাষ্য); "বন্যপদায়ুধোবন্যকুক্কুটঃ। বনে জলে ভবো জলকুক্কুট ইত্যন্যে" (ঐ, জাবালোক্তি); "জলবর্দ্ধনী নাম পক্ষিবিশেষঃ" (সুশ্রুত সংহিতা, ডহ্বন-বিরচিত নিবন্ধাখ্যটীকা)।

'শরালি' নামান্তরের পরিচয়ে কোলব্রুক (অমরকোষ) লিখিয়াছেন—"Perhaps Turdus Ginginianus"। ম্যাকডোনেল ও কীথ প্রণীত বেদিক ইন্‌ডেক্স গ্রন্থেও এই পরিচয় দেখা যায় এবং ইহা 'আতি' বা 'আড়ি' বিহঙ্গ সম্পর্কে। যদিও অবশ্য আতি, আটি অভিন্ন এবং একই বিহঙ্গের নামান্তর, কিন্তু পক্ষিবিজ্ঞানের দিক হইতে আপত্তি এই যে *Turdus ginginianus* (আধুনিক নামকরণ *Acridotheres ginginianus* Lath.) বা 'গাংশালিক'কে জলচর বা aquatic bird বলিলে বিষম ভুল করা হয়।

বৈদ্যকশাস্ত্রে "আটীমুখ" শব্দ পাওয়া যায়, ইহা একরূপ শস্ত্রকে বুঝায় যাহার গঠন 'আটী' বিহঙ্গের চঞ্চুর ন্যায়। সুশ্রুতের টীকায় ডহ্বন লিখিয়াছেন—"আটী জলবর্দ্ধনী নাম পক্ষিবিশেষঃ, তন্মুখবন্মুখং যস্য তৎ আটীমুখম্, তথাচোক্তং, —'বৃন্তং সপ্তাঙ্গুলং বিস্তাৎ তস্যাগ্রে ফলমিষ্যতে। আটীমুখপ্রকারং হি ফলমঙ্গুষ্ঠমায়তম্' ইতি।" এই পরিচয়ে বিহঙ্গটির চঞ্চুর আয়তনের আভাস যাহা পাওয়া গেল তাহা বৃদ্ধাঙ্গুলির সদৃশ। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'আটীমুখ' একটি তীক্ষ্ণ কণ্টকমুখ বিস্রাবণ শস্ত্র। অতএব 'আটী' পক্ষীর চঞ্চু তীক্ষ্ণাগ্র ইহা অনুমিত হয়। 'আটী' বা 'আটি'র অপর একটি সংজ্ঞা 'আতি' ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বেদিক ইন্‌ডেক্স গ্রন্থে 'আতি' সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"an aquatic bird"। আরও লিখিত হইয়াছে—"probably swans"। পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে swan জলচর বিহঙ্গ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার চঞ্চু কখনই তীক্ষ্ণাগ্র বলা যায় না।

আটী—আটি দ্রষ্টব্য।

আড়ি—আটি দ্রষ্টব্য।

আড়ী—আতি (শুক্লযজুর্ব্বেদ, উবট ও মহীধর ভাষ্য)। আটি দ্রষ্টব্য।

আড়িকা—শরালি পক্ষী (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

আশু—পক্ষী।

আশুজ—পক্ষী।

আতাপী—চিল্লী, চিল্লিক, চিল্ল।

আতায়ী—চিল্লী।

আতি—"আটিরাতিঃ শরারিঃ স্যাৎ" (অভিধান-চিন্তামণি)। আটি দ্রষ্টব্য।

আতী—"চাষ ইত্যন্যে" (তৈত্তিরীয় সংহিতা, সায়ণ ভাষ্য)। বেদিক ইন্‌ডেক্স গ্রন্থে কিন্তু সায়ণের এই ব্যাখ্যা 'আতি' সম্বন্ধে প্রদত্ত হইয়া লিখিত হইয়াছে—"Sāyaṇa quotes a view, according to which the Āti was the Cāṣa, or blue jay (*Coracias indica*)"। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, কারণ 'আতি' জলচর বিহঙ্গ, 'চাষ' জলচর নহে।

আত্মঘোষ—কাক। কুক্কুট।

রাজনিঘণ্টুতে দেখা যায় ইহা কাকের অষ্টাদশ নামের অন্যতম।

"আত্মানং ঘোষয়তি স্বশব্দৈঃ। কাকে, কুক্কুটে" (বাচস্পত্য অভিধান)।

আত্মজ—কুক্কুট (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

আত্যূহ—অত্যূহ; দাত্যূহ (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)। ডাহুক বা ডাকপাখী। বৈজ্ঞানিক নাম *Amaurornis phoenicurus* (Pennant.)।

আপতিক—শ্যেন। ময়ূর (নানার্থার্ণবসংক্ষেপ)

আমিষপ্রিয়—কঙ্ক।

আরণী—কুক্কুট (বৈজয়ন্তী)।

আরণ্যকুক্কুট—বনকুক্কুট।

আরা—বারিচারী পক্ষী (চরক সংহিতা)।

আলু—পেচক।

আলু—টিট্টিভ (নানার্থার্ণবসংক্ষেপ)।

আবি—পক্ষী।

আম্বর—কৃষ্ণকাক, কাকোল (বৈজয়ন্তী)। 'ঐন্দ্রি' দ্রষ্টব্য।

ই, ঈ

ইন্দ্রাভ—কঙ্কপক্ষিভেদ (চরকের টীকা)। মনিয়র উইলিয়মস্ এ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—species of fowl।

ঈশ্বরপ্রিয়—তিত্তিরি পক্ষী।

উ, ঊ

উজ্জ্বলাক্ষী—রাজসারিকা (রাজনিঘণ্টু); এ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"পীতপাদাহ্যুজ্জ্বলাক্ষী রক্তচঞ্চুশ্চ সারিকা।
পঠন্তী পাঠবার্ত্তা চ বুদ্ধিমতী ভূসারিকা॥
গোরাটিকা গোকিরাটী গোরিকা কলহপ্রিয়া॥"

শব্দকল্পদ্রুমে কিন্তু দেখা যায় যে গোরাটিকা, গোকিরাটী, গোরিকা এই তিনটি সংজ্ঞা সাধারণ সারিকার নামান্তর।

উৎক্রোশ—কুরর, মৎস্যনাশন। সাধারণ ইংরাজি নাম Osprey; বৈজ্ঞানিক নাম *Pandion h. haliaetus* (Linn.)।

সুশ্রুত সংহিতায় 'উৎক্রোশ' প্লব বিহঙ্গের অন্তর্গত দেখা যায়, কিন্তু 'কুরর' প্রসহ বিহঙ্গের অন্যতম। ডহ্বন মিশ্রের টীকায় এ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"কুররঃ নদ্যোত্থাপিত মৎস্যঃ" অর্থাৎ নদী হইতে মাছ উঠাইয়া খায়। আবার প্লবান্তর্গত উৎক্রোশের পরিচয় তিনি দেন—"উৎক্রোশঃ কুররভেদঃ মৎস্যাশীঃ"। ডহ্বন আরও লিখিয়াছেন—"কুররঃ (প্লবান্তর্গত) তস্য প্রসহেষ্বপি পাঠঃ তত উভয়েষামপি গুণা বোধব্যাঃ" অর্থাৎ প্লব এবং প্রসহ এই উভয়বিধ গুণ কুররে দৃষ্ট হয়। প্রসহ পাখীর লক্ষণ এই যে সে বলপূর্ব্বক চঞ্চু অথবা পাদনখর সাহায্যে আততায়ীর মত আক্রমণ করিয়া শিকার সংগ্রহ করে। প্লব বিহঙ্গের লক্ষণ এই যে সে জলে বা জলের সান্নিধ্যে থাকে। কুররকে প্লব বলা যাইতে পারে এই হিসাবে যে সে জলাশয়প্রিয়—নদী হইতে তাহার আহার্য্য মৎস্য তাহাকে সংগ্রহ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে আমার "কালিদাসের পাখী" গ্রন্থে (১৬৭-১৬৮ এবং ২৬৬-২৬৯ পৃষ্ঠা) আমি বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

উৎপত—পক্ষী।

উৎপাদশয়ন—টিট্টিভ। বৈজ্ঞানিক নাম *Lobivanellus indicus* (Bod.)।

মৎপ্রণীত "জলচারী গ্রন্থ হইতে (৫১-৫২ পৃষ্ঠা) এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা উদ্ধৃত করিলাম—

"যাদবের বৈজয়ন্তীতে ইহার ধ্বনি ও শয়নভঙ্গীর নির্দ্দেশ আছে—'টিট্টিভস্তু কটুক্বাণ উৎপাদশয়নোঽশুকঃ'।* * * উৎপাদশয়ন সংজ্ঞার ব্যাখ্যা দিবার পূর্ব্বে পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত টিট্টিভ-টিট্টিভীর কথা পাঠকসমক্ষে উত্থাপন করিতে চাই। সমুদ্রতীরে টিট্টিভী আসন্নপ্রসবা; সাগরতরঙ্গে পাছে তাহার অণ্ডগুলি নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় সে দূরে কোন উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করিতে তাহার স্বামীকে বলিল। পুংপক্ষী কিন্তু তাহাতে এই বলিয়া অভয় দিল যে সমুদ্র তাহার অনিষ্ট করিতে সাহসী হইবে না। পক্ষিদম্পতির কথোপকথন শুনিয়া অম্বুনিধি চিন্তা করিতে লাগিল—

'উৎক্ষিপ্য টিট্টিভঃ পাদৌ শেতে ভঙ্গভয়াদ্দিবঃ।
স্বচিত্তকল্পিতো গর্ব্বঃ কস্য নাম ন বিদ্যতে॥'

কথা ১৭। শ্লোক ৩২৯।

এখন উৎপাদশয়ন আখ্যার অর্থ পাওয়া গেল,—উৎক্ষিপ্য পাদৌ শেতে; আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার ভয়ে টিট্টিভ পদদ্বয় উৎক্ষেপ করিয়া শয়ন করে। পঞ্চতন্ত্রকার তাঁহার উপাখ্যানবর্ণিত টিট্টিভটির নাম রাখিয়াছেন 'উত্তানপাদ'। এই নামের সার্থকতা বাস্তবিক আছে কিনা, বিহঙ্গটা সত্যসত্যই ঊর্দ্ধপদ হইয়া শয়ন করে কিনা সে সম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মনিয়র উইলিয়মস্ বোধ করি উপাখ্যানটির প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই; উৎপাদশয়নের অর্থ তিনি করিয়াছেন—sleeping while standing on the legs অর্থাৎ পায়ের উপর ভর দিয়া নিদ্রা যায়।"

বাস্তব পক্ষিজীবনের দিক হইতে কিন্তু বিচার করিলে

জলচারী পাখীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে সে এক পা উৎক্ষেপ করিয়া (সেই পাটি তাহার গাত্রে গুটাইয়া রাখিয়া) অপর পায়ের উপর ভর দিয়া আরামে নিদ্রা যায় ?

উৎপিব—চকোর। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম—*Alectoris græca chukar* (Gray.)।

উদাত্যুহ—জলকাক (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

উদ্রথ—তাম্রচূড় পক্ষী (মেদিনী)।

উপচক্র—"চকোরভেদঃ" (চরক সংহিতা, গঙ্গাধর ও চক্রপাণির টীকা)।

"ক্রকরভেদঃ কৃশচঞ্চুর্মাবিলঃ" (সুশ্রুত, ডল্বনের টীকা)। "কৃকণক্রকরৌ সমৌ" (অমরকোষ); কোলব্রুকের টীকায় এ সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যায়,—Caer. Perhaps Perdix Sylvatica। 'কৃকণ' অর্থে মনিয়র উইলিয়মস্ ঐ কথাই লিখিয়াছেন : kind of partridge commonly Kaer, Perdrix sylvatica)। বৈজয়ন্তীর টীকায় অপার্টও অর্থ করেন—kind of partridge এবং হলায়ুধের টীকাকার অউফ্রেক্ট ক্রকরের অর্থ করিয়াছেন—sort of partridge। এই সমস্ত ব্যাখ্যায় 'ক্রকর' partridge-বিশেষ বুঝাইতেছে। পক্ষিতত্ত্ব হিসাবে *Perdix sylvatica* (যাহার আধুনিক নামকরণ *Francolinus gularis* (Temm.) বুঝায় Swamp Partridgeকে ; ইহার একটি দেশীয় নাম "কয়" Koi)। সুশ্রুতের টীকায় ডল্বনের ব্যাখ্যা দেখা যায়—ক্রকরঃ লাবাকৃতিঃ কপিঞ্জলাৎ স্থূলঃ, 'কয়' ইতি লোকে"। অতএব 'উপচক্রের' পরিচয় পাওয়া যায় এই ক্রকর বা Swamp Partridge-এর জাতিভেদ হিসাবে। চকোরভেদ ভাবেও চরকের টীকাকার ইহার পরিচয় দিয়াছেন।

পক্ষিবিজ্ঞান মতে ক্রকর, চকোর, লাব, কপিঞ্জল প্রভৃতি সকলেই partridge-অন্তর্বংশের পাখী এবং ইহারা 'বিষ্কির' পর্য্যায়ভুক্ত। 'উপচক্র'ও বিষ্কির পাখীদের অন্যতম (চরক ও সুশ্রুত সংহিতা)। "বিকীর্য্য ভক্ষয়ন্তীতি বিষ্কিরাঃ" (সুশ্রুত, ডল্বনটীকা) অর্থাৎ আহারকালে খাদ্য ছড়াইয়া খায়। এই লক্ষণ পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে partridge বিহঙ্গে বিদ্যমান দেখা যায়।

মনিয়র উইলিয়মস্-এর অভিধানে 'উপচক্র' অর্থে লিখিত আছে—Species of duck (Cf. *Cakra* and *Cakra-vaka*); শব্দকল্পদ্রুম অভিধানেও এরূপ অর্থ দেখা যায়—"চক্রবাকপক্ষিবিশেষঃ"। এরূপ অর্থ ভ্রমাত্মক, কারণ তু হংস বিষ্কির পাখীর অন্তর্ভুক্ত নহে।

উদ্গারি—ক্রৌঞ্চপক্ষী (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

উরগাশন—সংস্কৃত অভিধানগুলিতে 'গরুড়' ব্যতীত অন্য অর্থ দেখা যায় না, মাত্র মনিয়র উইলিয়মস্-এর অভিধানে এ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—a species of crane।

উলূক—প্রসহপাখীর অন্যতম (চরক ও সুশ্রুত-সংহিতা)। পেচক। ইহার বহু নামান্তর আছে—বায়সারাতি, দিবান্ধ, কৌশিক, ঘূক, দিবাভীত, নিশাটন, (অমর); কোষ্ঠ, কাকারি, হরিলোচন, নক্তঞ্চর, ঘর্ঘরক, নিশাদর্শী, বহুস্বন (বৈজয়ন্তী); তামস, কুবি, নিশাট, ক্রূরঘোষক (রাজনিঘণ্ট); শক্রাখ্য, বক্রনাসিক, হরিনেত্র, নখাশী, পীযু, ঘর্ঘর, কাকভীরু, নক্তচার (ত্রিকাণ্ড); পীযুবাক্, কুশিক, পিঙ্গলাসংজ্ঞপক্ষী (নানার্থার্ণবসংক্ষেপ) ধ্বাংক্ষারাতি (হলায়ুধ); মহাপক্ষী, মহাশকুন (ননার্থার্ণব সংক্ষেপ)।

উলূকচেটী—"উলূকচেটী হিকা স্যাৎ কনকাক্ষী চ পিঙ্গলা" (বৈজয়ন্তী)। মনিয়র উইলিয়মস্ ইহার অর্থ দিয়াছেন—species of owl।

উলূকজিৎ—কাক। মনিয়র উইলিয়মস্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'conquering the owl', the crow।

উলূকারি—বলিপুষ্ট, কাক (বৈজয়ন্তী)।

উষাকল—কুক্কুট ; কুক্কুটের পঞ্চনামের অন্যতম (ত্রিকাণ্ড)।

উষ্ট্ররথ—বৃহৎ সংহিতার টীকায় (Viziaragram Sanskrit Series) পরাশরকৃত উক্তির মধ্যে এই পাখীর নাম দেখা যায়। ইহার অন্য পরিচয় পাওয়া যায় না, মাত্র লিখিত আছে বসন্ত ইহার মদকাল।

উক—বিহঙ্গ (বৈজয়ন্তী)।

উল—"উলঃ কাকঃ। উলূক ইত্যন্যে।" (তৈত্তিরীয় সংহিতা, সায়ণভাষ্য)।

উলূক—উলূক (মনিয়র উইলিয়মস্-এর অভিধান) পেচক (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

উষাকর—কুক্কুট (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

এ, ঐ

একদৃক্—কাক।

একাক্ষ—বায়স, কাক।

ঐন্দ্রি—কাক (মেদিনী); কৃষ্ণকাক (নানার্থার্ণব-সংক্ষেপ); কৃষ্ণকাক, বৃদ্ধকাক, কাকোল, আসুর (বৈজয়ন্তী)। এই সংজ্ঞা সাধারণতঃ 'কাক' বুঝাইলেও বিশেষভাবে বৃহৎকায় কাক অর্থাৎ Ravenকে সূচিত করে। ইংরেজ টীকাকারগণ বৃদ্ধকাক, কাকোল ইত্যাদিকে Raven বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।*

* এই প্রবন্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের জন্য প্রবাসী (কার্ত্তিক, ১৩৪৪) ২৯-৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাকা-দেখা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

শিবপুরের ষ্টীমারঘাট। কাল সন্ধ্যা।

গনশা, রাজেন, কে-গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচন জেটির রেলিংএ ঠেস দিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাতটা একুশের ষ্টীমার—চাঁদপালঘাট হইতে আসিয়া জেটিতে ভিড়িল, লোকজন নামাইয়া দিয়া বাঁশী বাজাইয়া তক্তাঘাটের অভিমুখী হইল।

ত্রিলোচন বলিল, "এ ষ্টীমারেও এল না ঘোৎনা, পুল পেরিয়ে ট্রামে ক'রে চ'লে আসে নি তো ওদিক দিয়ে?"

গনশা ঘোৎনাকে উদ্দেশ করিয়া কি একটা খুব রূঢ় কথা বলিতে গিয়া তোৎলাইয়া গিয়াছে, এমন সময় মাঝ-বয়সী একটি ভদ্রলোক পণ্টুন বাহিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইল এবং প্রশ্ন করিল, "শিবপুরে গোলোক চাটুজ্যের বাড়ীটা কোথায় বলতে পার?"

লোকটি ঈষৎ কুঁজো, দাড়িতে গোঁফে মুখটি লুপ্তপ্রায়, গলাবন্ধ কোটের উপর একটি কোঁচান চাদর মুরুব্বিয়ানা-পদ্ধতিতে ঝোলান। হাতে একটি ছোট স্যুটকেস। গলার আওয়াজ কতকটা শ্লেষ্মাজড়িত, শুনিলে কেমন যেন মনে হয় অন্য কাহার কণ্ঠস্বর ধার করিয়া ব্যবহার করিতেছে।

গোলোক চাটুজ্যে গনশার মামা। গনশাই উত্তর দিতে যাইতেছিল, রাজেন এক হাতে তাহার গা চাপিয়া থামিতে ইসারা করিয়া মার্জিত ভাষায় [illegible]ন, "কোথা থেকে আগমন হচ্ছে মশায়ের?—কি প্রয়োজন?"

আগন্তুক উত্তর করিল, "পাতুরেঘাটা থেকে। শুনলাম তাঁর একটি ভাগনে আছে,—বিবাহের উপযুক্ত..."

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো সামনেই রয়েছে। বড় ভাল ছেলে। সারা শিবপুরটায় এমন একটা ছেলে খুঁজে পাবেন না।"

গোরাচাঁদ রেলিং ছাড়িয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, "জামাই যা হবে..."

গনশা আদর্শ জামাইয়ের মত মুখটা খুব নিরীহ এবং নির্লিপ্ত গোছের করিয়া হাওড়ার পুলের দিকে চাহিয়া ছিল, ত্রিলোচন তাহার পাঁজরায় একটা গুঁতা দিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "একটা প্রণাম ঠুকে দে গনশা এই তালের মাথায়।"

মাস-ছয়েকের মধ্যে উপর-পড়া হইয়া কেহ তাহাকে বড়-একটা দেখিতে আসে নাই, গনশা প্রণামের জন্য হাত দুইটা তুলিতে যাইতেছিল এমন সময় আগন্তুক হঠাৎ সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া হাতের এক সাপটে দাড়ি-গোঁফমুক্ত হইয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সকলে হকচকিয়া গিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বিশেষ করিয়া গনশা। একে প্রায় ঠকে না সে, তায় একেবারে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাও আবার ঘোৎনাকে,—দলের মধ্যে সে তাহার সঙ্গে একটু সমকক্ষতার দাবি রাখে। সামলাইয়া লইয়া বলিল, "টে-ট্রেনে ফেলতে হাত উঁচিয়েছিলুম, ভাগ্যিস নি-নিজে খুলে ফেললি।...দেখি, কি কি পরচুলো সব আনলি,—চল ওদিক পানে।"

ঘোৎনা হাত হইতে স্যুটকেসটা লইয়া অগ্রসর হইল। সকলে গিয়া বার্ড কোম্পানীর জেটির কাছে বরাবর একটা নির্জন স্থান বাছিয়া লইল।

২

কথাটা আরও একটু পূর্ব্ব হইতে না বলিলে রহস্যটা পরিষ্কার হইবে না।

গনশা মামার আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে চোখের সামনে ত্রিলোচনের বিবাহ হইয়া গেল, গোরাচাঁদের বিবাহ হইয়া গেল, ঘোৎনার সম্বন্ধ প্রায় পাকা হইয়া আসিয়াছে—রাজেনের প্রীতি-উপহার লেখা পর্য্যন্ত

.প্রায় শেষ হইয়া আসিল, মামা এদিকে নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছে। মুখের এক কথা হইয়াছে—আগে চাকরি হোক।...ওদিকে দীনু ঘটক হাত গুনিয়া বলিয়াছে—স্ত্রীভাগ্যে ধন গন্‌শার। গন্‌শার মামা বলিতেছে, "বেশ তো, কনে যেখানে আছে সে তো গন্‌শারই পরিবার হয়ে আছে, তার ভাগ্যি তো গন্‌শার ওপর অর্শাবেই এক সময় না এক সময়—স্ত্রীভাগ্যে হবেই চাকরি—সেই সময় ঘটা ক'রে বউমাকে ঘরে আন্‌লেই চলবে—তাড়াতাড়ি কিসের ?"

রাজেন, ঘোৎনা এরা সব বলিতেছে, "ও তোকে শুকিয়ে মারবার ফন্দি গন্‌শা, শুনিস নি।"

গন্‌শা অবশ্য শোনে না, কিন্তু উপায়ই বা কি ?

এই রকম অবস্থা, এমন সময় একটি কনের সন্ধান পাওয়া গেল।

সন্ধান হাজির করিল ত্রিলোচন। এক দিন এইখানেরই ন্ধ্যার আড্ডায় বলিল, "আমার মাস্‌-শাশুড়ীর বাড়ী পানিশহর। মাস্‌-শাশুড়ীর মেজ-ননদের বিয়ে হয়েছে ড়শে-বেহালায়। মেজ-ননদের বড়জায়ের বাপের াড়ী জোড়াসাঁকোয়, সেই বড়জায়ের সেজভাই চাকরি রে ই-বি-আর-এর গোয়ালন্দ-ফরিদপুর লাইনে..."

গন্‌শা অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "তুই শুধু গো-গ্‌গোলোক-াধায় ঘোরাবি, না কোথাও আটকাবি তিলে ?"

রাজেন বলিল, "যাকে নিয়ে বিষয় সে কোথায় বল না ক কথায়, লেঠা চুকে যাক।"

গোরাচাঁদ একটা হাঁপ ছাড়িয়া বলিল, "আমার শ্বশুর-ড়ী দিব্যি বাবা, অত ফিকড়ির বালাই নেই; তিলে র হিষ্ট্রির শিশুনাগ ডাইনেষ্টি আউড়ে গেল।"

ত্রিলোচনের চরিত্রে শ্বশুরবাড়ীর খুঁটিনাটি সম্বন্ধে একটু বলতা আছে। একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "বাঃ বউয়ের আপনার লোক মেয়েটি, বুঝিয়ে না বললে চলবে কেন ? ইতো ভাবনায় ঘুম হয় না, বউয়ের দূরসম্পর্কের হ'লে র ব'য়েটি গেছে।...সেই সেজভাইয়ের ন-মেয়ে—কত এল, কোন মতেই গাঁথছে না। নয় গণে মিলছে না, নয় ত্র মিলছে না, নয় মেলে আটকাচ্ছে। এদিকে বড়জায়ের ভাই বেচারা একলা মানুষ, তায় বিদেশে থাকে..."

রাজেনের কবি-হৃদয় এসব ব্যাপারে—অর্থাৎ কনের বিবাহ হইতেছে না শুনিলে—সহজেই গলিয়া যায়, ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "বড় ভাবনার কথা তো,—মেল হচ্ছে না ব'লে মেয়ের বয়েস তো কমবে না।..."

"কত হ'ল বয়েস রে তিলে ?"

ঘোৎনা বলিল, "অনেকটা গন্‌শার মত ব্যাপার।... তোর কুমারটুলির সম্বন্ধটা গণে মিলল না ব'লে ভেঙে গেল না রে গন্‌শা ?"

গন্‌শা উত্তর দিল না, মুখটা বিকৃত করিল মাত্র। গোরাচাঁদ সেইটুকুরই টিপ্পনী হিসাবে বলিল, "গণ, না ওর মামার খাঁই। এক রাক্ষস-গণের মামা জুটেই তো বেচারির মাথাটা খেলে।"

রাজেন হঠাৎ উচ্চকিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "দাঁড়া, হয়েছে;—এর মধ্যে একটা গূঢ় ব্যাপার রয়েছে।...সেই তোর বউয়ের কে হয়, সে মেয়েটির গোত্র, মেল—এসব জানিস তিলে ?"

ত্রিলোচন মুখস্থ-করা পড়ার মত বলিয়া গেল, "ভরদ্বাজ গোত্র; ফুলের মেল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, চার-পুরুষে ভঙ্গ; মেয়ের শূদ্রবর্ণ, নরগণ, বৃষরাশি..."

গোরাচাঁদ শ্বশুরবাড়ী গেলে আহারাদি সম্বন্ধেই একটু বেশী অবহিত থাকে বলিয়া পরিচয় প্রভৃতিতে বেশী সময় দিতে পারে না; ত্রিলোচনের জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া একটু ঈর্ষার দৃষ্টিতে একবার আড়চোখে চাহিল। রাজেন গন্‌শার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "তোর গুনো বল্‌তো গন্‌শা এবার।"

এত সামনাসামনি এরূপ খোলাখুলি আলোচনা হইলে গন্‌শারও লজ্জা হইয়া পড়ে, এড়াইবার জন্য বলিল, "কাব্যি ছেড়ে ঘটকালি সুরু করলি নাকি ?"

ত্রিলোচন বলিল, "গন্‌শার কুষ্ঠীর খবরও আমার কাছে শোন্‌ না,—ওর তো কাশ্যপ গোত্র, বিপ্রবর্ণ, দেবগণ..."

রাজেন গম্ভীর ভাবে বিজয়গর্বের সহিত বলিল, "এই তো হয়েছে। ও মেয়ের বিয়ে অন্য জায়গায় কোথা থেকে হবে ? ও তো অব্যর্থ গন্‌শার মেয়ে—মানে, ইয়ে—গন্‌শার ক'নে। রাজজোটক মিল হয়ে যাচ্ছে, না বিশ্বাস হয়—দীনু ঘটকের কাছে চল—কিংবা স্মৃতিরত্ন মশাইয়ের কাছে

চল। ও মেয়ে যদি গন্‌শার কনে না হয় তো কি বলেছি। ওর আর গন্‌শার বিয়ে অন্য জায়গায় হ'তেই পারে না; না বিশ্বাস হয় ওর ওদিকে বের সম্বন্ধ করতে থাক, গন্‌শার এদিকে করতে থাক, দু-জনেরই চুলদাড়ি না পেকে যায় তো ..."

আর কেহ বক্তৃতার তোড়ে অত খেয়াল করে নাই, গন্‌শা বলিল, "তারও দা-দাড়ি পাকবার যদি ভয় থাকে তো আমার রাজজোটক কাজ নেই বাপ!"

রাজেন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কি বললাম আর কি বুঝলি, যাঃ!"

ত্রিলোচন ভাবগম্ভীর স্বরে বলিল, "তাই যদি হয়—গন্‌শাই যদি তার একমাত্র স্বামী হয় ..."

গন্‌শা, রাজেন, ঘোৎনা তিন জনেই ঘুরিয়া মুখের দিকে চাহিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া ত্রুটি-সংশোধন হিসাবে, গন্‌শার অসন্তুষ্ট দৃষ্টির পানে চাহিয়া বলিল, "বলছিলাম—তুই-ই যদি ওর জন্মজন্মান্তরের পতি-দেবতা হ'স তো এ একটা সমিস্যে নয়?—ও বেচারি রইল কোথায়, তুই রইলি কোথায়..."

রাজেন বলিল, "সমিস্যে নয় আবার?" তাহার পর বিষয়টিকে সমুচিত কাব্যের রূপ দিবার জন্য বলিল, "ধর—এই ধর তোমার গিয়ে,—একটি জায়গায় যদি একটি লতা থাকে আর অনেক দূরে তার সেই—তার সেই অচিন-প্রিয় গাছটি দাঁড়িয়ে থাকে তো কি হবে?"

অনেক কিছুই হইতে পারে।—জায়গাটার কাছে-পিঠে অন্য গাছ থাকিলে লতাটি তাহাই আশ্রয় করিবে, না থাকিলে ভূমে লতাইয়া ফিরিতে পারে,—ছাগলে মুড়াইতে পারে, গরুতে নিঃশেষ করিতে পারে,—রাজেন ঠিক কেমনটি উত্তর চায় বুঝিতে না পারায় সবাই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কে-গুপ্ত আবার 'অচিন-প্রিয়' কথাটাও বুঝিতে না পারায় আরও বিমূঢ় ভাবে চাহিয়া ছিল, রাজেন বেশ একটি পরিষ্কার রূপক খাড়া করিতে না-পারায় আক্রোশটা তাহার উপর মিটাইয়া এক দাবড়ি দিয়া বলিল, "শুকিয়ে যাবে না লতাটা মশাই?—হাঁ করে রয়েছেন উজবুকের মতন!"

কে-গুপ্ত একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ও!"

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি বুদ্ধিমানের মত বলিল, "তা তো যাবেই।...তাহ'লে উপায় কি এখন গণেশের এই পাত্রীটি নিয়ে?"

রাজেন বলিল, "উপায় মিলন, আর কি?"

বৃক্ষ-লতার উদাহরণটা মনে তখনও টাটকা থাকায়—মিলনটা কি ভাবে হইতে পারে কেহ ভাল রকম ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, রাজেনের কাছে বোকা হইবার ভয়ে ঘোৎনা বলিল, "ঠিকই তো, মিলনই তো এখন ঘটাতে হবে।"

রাজেনকে ছাড়িয়া সকলের দৃষ্টি ঘোৎনার উপর গিয়া পড়িল। গোরাচাঁদ প্রশ্নও করিয়া বসিল, "কিন্তু কি ক'রে?"

ঘোৎনা একটু থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু আখের ঘোৎনাই তো? গোরাচাঁদের কথাটা প্রতিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি ক'রে!...আরে কি ক'রে সে তো পরের কথা, আগে মেয়ে দেখাই হোক্, কুষ্ঠীতে মিলুক, গন্‌শার পছন্দ হোক। ওরই কনে যদি হয় তো কি ক'রে মিলন হবে সেইটেই সবচেয়ে ভাবনার কথা হ'ল? তোর কপালে যদি দিল্লীতে চাকরি লেখা থাকে তো কি ক'রে যাবি সেইটেই বেশী ভাবনার কথা?—আগে দেখ্ চাকরিটা কত মাইনে, পছন্দ কিনা।"

রাজেন বলিল, "এক বার চারি চক্ষুর মিলনটা তো হয়ে যাক, বাকী আর সব তো পরে কথা; ধর যদি কোন নদীর এক তীরে ..."

আবার কোন দুর্বোধ্য রূপকের অবতারণা হইতেছে বুঝিয়া গোরাচাঁদ বলিল, "চল্ উঠি এবার, অনেক রাত হ'ল।"

৩

তাহার পরদিন সন্ধ্যায় সবাই ঘাটে বসিয়াছিল। মিলন-সমস্যার আলোচনা হইতেছিল, এমন সময় ত্রিলোচন আসিয়া বলিল, "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে; একটা মস্ত বড় সুবিধে হয়ে গেল। আজ সকাল থেকে জোড়াসাঁকোতেই ছিলাম কিনা;—সেখান থেকেই আসছি।



সকলে প্রয়োজন-মত ঘেঁষিয়া আসিয়া ত্রিলোচনকে ঘেরিয়া বসিল, প্রশ্ন করিল, "কি রকম ?"

ত্রিলোচন বলিল, "যখন থেকে শুনলাম রাজযোটক, তখন থেকে কি আর আমার মনে শান্তি আছে ? সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, সকাল বেলা উঠেই জোড়াসাঁকোয় বেরিয়ে গেলাম। গিয়ে যা শুনলাম তাতে চক্ষু চড়কগাছ !"

রাজেন প্রশ্ন করিল, "মানে ?"

"মানে বিয়ের প্রায় সব ঠিক হয়ে গেছে, চুঁচড়োয় ; শীগ্‌গির এক দিন পাকা দেখা। উপরে উপরে যেমন খুশী হয়েছি দেখাতে হ'ল, ভেতরে ভেতরে তেমনি গেলাম দ'মে। সমস্ত দিন ভেবে ভেবে অনেক কষ্টে একটি মতলব খাড়া করেছি।"

রাজেন ঘোৎনা একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কি ?"

ত্রিলোচন কোন কথা বলিল না। গম্ভীর ভাবে পকেট হইতে একটি পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া রাজেনের হাতে দিয়া বলিল, "এই। একটু চেঁচিয়ে পড়্‌, সবাই শুনুক।" নিজে পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া অগ্নি সংযোগ করিল। সবাই চিঠিটার উপর হুমরি খাইয়া পড়িল। রাজেন পাঠ করিল—

নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমেতৎ

অত্রপত্রে নিবেদন এই যে পণ্ডিত মহাশয়ের পরামর্শ অনুযায়ী আগামী রবিবার সন্ধ্যা সাতটা একান্ন মিনিট হইতে রাত্রি নয়টা দুই মিনিট পর্য্যন্ত পাকা-দেখা ও আশীর্ব্বাদের দিন ধার্য্য হওয়ায় আমরা জন পাঁচ ছয় উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় মোকাম কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া উক্ত শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবার মানস করিয়াছি। যদি মহাশয়ের কোনরূপ আপত্তি থাকে তো পূর্ব্বাহ্ণেই জানাইয়া বাধিত করিবেন। অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় কথা সাক্ষাতেই হইবে। আশা করি বাটীর সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল। নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনয়াবনত
শ্রীঅখিলচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ

পুনশ্চ।

দাদা কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে যাওয়ায় এবং বিনোদবাবু অসুস্থ হইয়া পড়ায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আমার অবস্থা দেখিয়াই গেছেন, বাতে শয্যাধরা। কিন্তু সেজন্য কোন চিন্তা নাই ; দাদার ভায়রাভাই অর্থাৎ পাত্রের মেসোমহাশয় কয়েক জন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া যাইবেন, যেহেতু সামনের শুভদিনটা ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি না। ইতি

চিঠি পড়া হইলে সকলে ত্রিলোচনের পানে চাহিল। ত্রিলোচন তাহাদের হেঁয়ালিটা বুঝিবার খানিকটা সময় দিয়া মাতব্বরি চালে খানিকটা বিড়ি টানিয়া সংক্ষেপে বলিল, "এক জন গিয়ে এই চিঠিটি চুঁচড়োয় পোষ্ট ক'রে দেওয়া। গোরাচাঁদ যাবে এখন।"

ঘোৎনা বলিল, "গেল গোরে, তার পর ?"

—আজ বিকেল কি কাল সকাল পর্য্যন্ত জোড়াসাঁকোয় চিঠি এসে পৌঁছুক, পরশু রবিবার সন্ধ্যে পর্য্যন্ত আমরা সদলবলে মোটর থেকে নামি,—চুঁচড়ো থেকে পাকা দেখতে এসেছি।"

গন্‌শা সবচেয়ে পূর্ব্বে ছকটা বুঝিয়াছিল, শিষ্যের পানে আড়চোখে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার হাত হইতে বিড়িটা লইয়া টানিতে লাগিল। অনুমোদনের এ রকম স্পষ্ট নিদর্শন পাইয়া ত্রিলোচন মনের উল্লাসটা চাপিয়া শান্ত সহজ কণ্ঠে বলিল, "দাদা মানে ছেলের বাপ, তাকে, তার বন্ধু বিনোদবাবুকে সরিয়ে দিলাম, তারা দু-জনেই প্রথম বার দেখতে এসেছিল—চেনা লোক। আর ছেলের কাকা অখিলবাবুও এদের দেখা, খবর পেলাম বেতো রুগী, সে ব্যাটাকে—বিছানা থেকে আর উঠতে দিলাম না।"

ত্রিলোচনের পেটে যে এত বুদ্ধি ইহাতে সকলে আশ্চর্য্য হইল। গন্‌শা বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়া বলিল, "কো-কোথাকার বিড়ি রে তিলু ? ভারী মিষ্টি তো !"

"ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের"—অবহেলার সহিত কথাটা বলিয়া ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "মনে ধরল তো কথাটা ? দেখ ভাই ভেবেচিন্তে, কোন খুঁৎখাৎ আছে কিনা ; ত্রিলোচনের বুদ্ধিটা একটু মোটা কিনা..."

প্রস্তাবটার মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল, ত্রুটিগুলা কাহারও নজরে পড়িল না ; এমন কি গন্‌শারও নয়,—সে একেবারে অন্য লোকে ছিল।

একটু থামিয়া ত্রিলোচন বলিল, "পেলে না তো কিছু ? এই মোটাবুদ্ধি ত্রিলোচনের কাছেই শোন তবে, ফাঁক-তালে পাকা দেখার প্ল্যাট-ফর্ম হয় মেরে এলে, কিন্তু বিয়ে

তাদের সঙ্গে বন্ধ করবে কি ক'রে? তাদের একেবারে না সরাতে পারলে তো গন্‌শার চান্স নেই?"

সকলে তাহার মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহাদের ভাবিবার সময় দিয়া ত্রিলোচন আর একটা বিড়ি ধরাইল; দু-এক টান দিয়া বলিল, "হ'ল না তো?"

সকলে পূর্ব্ববৎই চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, "অমন 'ভাংচি' কথাটা কি করতে রয়েছে? এসা ভাংচি ঠিক ক'রে রেখেছি যে বরপক্ষ আর এ বাড়ীর ছাওয়া মাড়াবে না। এমনি একখানি ছোট্ট পোষ্টকার্ডের ওয়াস্তা।...তার পর ঐ মোকায় গন্‌শার সম্বন্ধ নিয়ে হাজির হওয়া; অবশ্য যদি ওর মেয়ে পছন্দ হয়।...হুঁ, কতকগুলো জিনিষের কিন্তু সবচেয়ে আগে দরকার—কতকগুলো পরচুলো, গোঁফ, দাড়ি, বাবরি..."

সকলে বিস্মিত ভাবে চাহিল। এত খুঁতের প্ল্যানে খুঁৎ না বাহির করিতে পারায় ঘোৎনা মনে মনে চটিয়াছিল, ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "পাকা দেখে ওদের আবার থিয়েটার দেখিয়ে আসতে হবে নাকি?"

আজ ত্রিলোচনের বুদ্ধির জয়জয়কার। বিদ্রূপটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "থিয়েটার! খুব বুঝেছিস তাহ'লে, হুঃ!—ধর যদি ভগবান করেন ও গণেশেরই ক'নে হয়, একটা যোগাযোগ হবেই তো ভগবানের ইচ্ছেয়? তখন, যখন টের পেয়ে যাবে এরাই ফাঁকি দিয়ে একবার পাকা দেখার খাওয়া খেয়ে গিয়েছিল!...বল—দরকার নেই পরচুলের?"

কে-গুপ্তের একটা কথা মনে আসিয়াছিল, তাহার প্রায় সব কথাগুলাই ভুল হয় বলিয়া বলিতে পারিতেছিল না; অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া শেষে বলিল, "কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি গন্‌শার মামা রাজী না হয়? যদি বলে—আগে ও চাকরিতে ঢুকুক?"

সবাই একেবারে চুপ করিয়া গেল, এমন কি ত্রিলোচন পর্য্যন্ত। গন্‌শা তাহার কাছে এ-সমস্যার উত্তরের জন্য খানিকটা অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত ভাবে কে-গুপ্তের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "কি-কিরকম লোক মশাই আপনি?—ভ-ভ ভগবানে বিশ্বাস নেই?"

ত্রিলোচন গভীর নির্ভরতায় কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া বলিল, "তিনি না থাকলে আমায় পোষ্টকার্ড ছাড়বার বুদ্ধিটা কে জুগিয়ে দিলে?"

৪

জোড়াসাঁকো। ত্রিলোচনের অনিশ্চিত সম্পর্কের শ্বশুরবাড়ী।

সম্পর্কটা জটিল হইলেও শ্বশুরবাড়ীর এই শাখাটিই সবচেয়ে কাছে থাকার দরুন বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা আছে। ঠিক হইয়াছিল রবিবার দিন সকাল হইতেই ত্রিলোচন ঐখানেই থাকিবে এবং চুঁচুড়া হইতে আদত বরের বাড়ী হইতে কোন চিঠিপত্র আসে কিনা লক্ষ্য রাখিবে। গোরাচাঁদ বলিয়া দিয়াছিল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটার দিকেও একটু নজর রাখিতে,—কাছেই বাগবাজার ·· তাহা ভিন্ন আলোরও বেশী বাড়াবাড়ি যাতে না হয় সে দিকেও তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে বলা হইয়াছিল।

ত্রিলোচন বাহিরের রকে অপেক্ষা করিতেছিল, মোটর হর্ণ দিয়া দাঁড়াইতেই "এসে গেছেন ওঁরা।" বলিয়া সবার আগে নামিয়া গেল এবং মোটরের দোরের সামনে দাঁড়াইয়া গভীর বিনয়ের সহিত অঞ্জলি বাড়াইয়া বলিল, "আসুন, আসুন, আজ্ঞে হোক, পথে কোন ক্লেশ হয় নি তো?"

"আজ্ঞে না...এই তো ছটাক-খানেক পথ চুঁচড়ো থেকে, ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়..." বলিতে বলিতে একে একে সবাই নামিল।

আমরা জানি তাই, নহিলে চেনা একটু দুরূহ, অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গন্‌শার কারিগরি সবার স্বরূপ একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিয়াছে।

গোরাচাঁদ বরের বন্ধু, একেবারে হালফ্যাশানে সজ্জিত। পায়ে লপেটি জুতা, তাহার অর্দ্ধেকটা ঢাকিয়া ঢিলা করিয়া পরা ধুতি, গায়ে কাঁধঢাকা খাটো স্পোর্টিং শার্টের উপর বুকখোলা কোট, নাকের নীচে কোণ-কামান গোঁফ, মাথার চুল নীচে চার আনা উপরে বারো আনা,—বারো আনার ভাগ চিতাইয়া আঁচড়ান।

কে-গুপ্ত পুরুত। ছোট ছোট করিয়া সমস্ত মাথাটি

এক রকম করিয়া চুল ছাঁটা। জমি কাটিলে মাঝখানে কুলিরা যেমন একটি ছোট স্তম্ভ রাখিয়া দেয় সেই রকম মাঝখানে একটি টিকি, তাহাতে একটি অপরাজিতা ফুল বাঁধা; গায়ে নামাবলি, পায়ে কটকী চটি। দলের মধ্যে তাহার মুখটা সবচেয়ে কাঁচা, দাড়ি-গোঁফেও পরিপক্বতা আনা চলিবে না। সুতরাং ও-হাঙ্গাম করা হয় নাই। তাহাকে পুরুত-মহাশয়ের বড় ছেলে বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইবে;—পুরুত মহাশয় সম্প্রতি গতায়ু হইয়াছেন, এই বড় ছেলেই এখন যজন-যাজন করিতেছেন।

চুঁচুড়ার বরের নাম গোত্র ইত্যাদি ও কন্যারও সব খুঁটিনাটি তাহাকে শিখাইয়া রাখা হইয়াছে।

গন্‌শাই আসল বলিয়া তাহাকে যথাসাধ্য ঢাকাঢুকি দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। মুখ কোঁকড়ান কোঁকড়ান দাড়ি গোঁফে লুপ্তপ্রায়। সে চুলে বাঁধিয়া ভারোত্তোলন শিখিতেছে সম্প্রতি, বড় চুল ছিলই, বেশ মানাইয়া গিয়াছে, শুধু চিটচিটে সাদা রং দিয়া কাঁচা-পাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চোখে ধোঁয়াটে চশমা, গায়ে কালো চীনে কোট। সম্পর্কে সে বরের এক দাদা-মহাশয়।

সবচেয়ে পরিবর্ত্তন হইয়াছে রাজেনের। মাথায় বাঁকা সিঁথি, এলো খোপা; কানে মাঝারি সাইজের সামুদ্রিক চাঁদামাছের মত একজোড়া রূপার কানবালা; হাতে রিষ্টওয়াচ আর রুলি। বক্ষের উপর একজোড়া গার্ড-চেন। জর্জ্জেট শাড়ী, পায়ে হীলতোলা জুতা।

—বরের পিসীমা।

মতলবটা গন্‌শার।—একে রাত্রে মেয়ে দেখা, তায় কলিকাতা জায়গা। মেয়ের রঙের উপর কোনরূপ কারচুপি হইল কিনা খোঁজ রাখা দরকার। এদিকে আধুনিক রীতি অনুযায়ী পাকা দেখায় এক জন মেয়ে থাকিলে অন্যায়ও হয় না। রাজেন তো চায়ই,—অন্দরমহলে ঢুকিতে পারিলে তাহার কবিতার প্রচুর খোরাক জোগাড় হয়। তবে তাহার ইচ্ছা ছিল পিসীমা না হইয়া বরের মামাতো বোন হওয়া। গন্‌শা বলিল, "পিসীই সুবিধে, বয়েস হাজার কম হ'লেও সম্বন্ধটা ভারিক্কে হয়, একটু বেশী খাতির হয়, বাপের বোন গা-গার্জ্জেনদের দলে পড়ল কিনা।"

ত্রিলোচন খাতির করিয়া সবাইকে নামাইতে নামাইতে এদিকে গৃহকর্ত্তা, এক জন নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক দু-এক জন ছোকরা ও সাজগোজপরা কতকগুলি কৌতূহলী ছেলে-মেয়েও ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গোরাচাঁদ ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া "খ্যাটের কত দূর?" এই প্রশ্নটিকে ইঙ্গিতের রূপ দিতে যাইতেছিল, সবাই আসিয়া পড়িতে তাড়াতাড়ি সেটাকে হাই আর তুড়ির আকার দিয়া সামলাইয়া লইল। গৃহকর্ত্তা প্রবীণ লোক, আদর-আপ্যায়নের পর প্রথমেই একটি ছোকরাকে রাজেনকে দেখাইয়া বলিলেন, "অ—, এঁকে তুমি বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও। বাঁও তো মা-লক্ষ্মী।"

রাজেন প্রমাদ গণিল। শিবপুর থেকে যে-ব্যাপারটা অমন লোভনীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল, একেবারে সামনে আসিতে সেটা হঠাৎ এমন বিভীষিকার রূপ ধারণ করিল যে তাহার পা উঠিতে চাহিল না। একবার উৎকণ্ঠিত ভাবে গন্‌শা প্রভৃতি সবার দিকে চাহিয়া আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "বাইরেই থাকি না আমি না-হয় সবার সঙ্গে।"

সবাই একটু বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল, গৃহকর্ত্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, বাইরে থাকবেন কেন? সে কি হয়?"

রাজেন নিরাশার মধ্যে আর এক বার চেষ্টা করিল, "ভেতরটা বড্ড গুমোট হবে মনে হচ্ছে যেন।"

এদের সকলেরও মুখটা শুকাইয়া গিয়াছে; গোরাচাঁদ বলিল, "না সেজপিসীমা; বাইরে থাকবে কোন্ দুঃখে? গরম?—সে তো একটি গ্লাস ঘোলের সরবতের মামলা। আর বাইরে আমরাই কি দার্জ্জিলিঙে রইলাম?"

ঘোৎনা দুই জন মুরুব্বির মধ্যে এক জন, কোমরের কোঁচান চাদরটা খুলিয়া আবার জড়াইতে জড়াইতে হাসিয়া বলিল, "তুমি হচ্ছ বরের ঘরের পিসী, এবার কনের ঘরের মাসী হয়ে ঢোকো, এ তো তোমার নিজেরই ঘর গো।" বলিয়া কন্যাপক্ষীয়দের নিকট রাজেনের পরিচয়টা দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা ভিন্ন আমার সঙ্গে সম্বন্ধটাও বড় মিষ্টি, না ব'লে থাকতে পারলাম না।"

ততক্ষণে একটি মেয়ে আসার খবরটা চারাইয়া গিয়াছে। বাড়ী হইতে এক জন বয়স্থা জন-তিনেক যুবতীর

সঙ্গে আসিয়া রাজেনকে পিঠে হাত দিয়া লইয়া গেলেন। রাজেন ফাঁসির আসামীর মত এক বার গন্‌শার পানে ফিরিয়া চাহিল।

গৃহকর্ত্তা পূর্ব্বকথার সূত্র ধরিয়া ঘোৎনাকে প্রশ্ন করিলেন, "তাহ'লে আপনি—?"

"ছেলের মেসোমশাই।"

নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ বলিলেন, "বাঃ, পরম সৌভাগ্য আমাদের। ছেলের মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ দুই-ই উপস্থিত; এখানেই তো আর একটা বিবাহের জোগাড় রয়েছে।" সকলে হাসিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন, "আর এঁরা ?"

ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া সকলে উপরে উঠিয়াছে। ঘোৎনা গন্‌শা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের পরিচয় দিল, "ইনি ছেলের সম্পর্কে দাদামশাই হন। ইনি ছেলের বন্ধু। আর ওঁর পরিচয়ের তো সাইনবোর্ডই রয়েছে গায়ে মাথায় টাঙান"—বলিয়া মজলিসী প্রথায় হাসিয়া উঠিল।

গৃহকর্ত্তা গন্‌শাকে আর একবার করজোড়ে নমস্কার করিয়া বলিল, "বাঃ, পরম সৌভাগ্য, আপনি পর্য্যন্ত যে কষ্ট ক'রে..."

গোরাচাঁদ একটু গলাটা বাড়াইয়া ঈষৎ চাপা স্বরে বলিল, "একটু বড় ক'রে বলতে হবে; উনি আবার কানে বেশ একটু খাটো।"

এ মতলবটা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গন্‌শাই বাহির করিয়াছে। আর সবার স্বরূপ ছদ্মবেশের মধ্যে ঢাকা পড়িবে, কিন্তু তাহার তোৎলামি, কোন মতেই ঢাকা পড়িবার নয়। বিবাহরাত্রে প্রবঞ্চনাটা ধরাইয়া দিবেই। তাই তাহার কথার হাঙ্গামটাই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কালা মানুষ, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিতে যাইবে না, উত্তর দিবারও প্রয়োজন থাকিবে না; গোঁফ, দাড়ি, চোখের ধোঁয়াটে চশমা আর কানের তালার অন্তরালে দিব্য নিশ্চিন্ততায় সে সব দেখিতে শুনিতেও পারিবে।

গৃহকর্ত্তা হাতজোড় করিয়া তাঁহার কানের কাছে মুখটা একটু সরাইয়া লইয়া বেশ তারস্বরে কথাটার পুনরুক্তি করিলেন, "বলছিলাম, আপনি পর্য্যন্ত আসবেন এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। কর্ত্তা নিজে আসতে পারলেন না ব'লে একটা দুঃখ ছিল, তা..."

গন্‌শা মুখের পানে চাহিয়া মূঢ়ের মত এক বার হাসিল মাত্র। ঘোৎনা বরকর্ত্তার পানে চাহিয়া হাসিয়া টিপ্পনী করিল, "কানে পৌঁছয় নি। শুধু ওঁর স্ত্রীর কথা শুনতে পান, তাও যখন খুব বেশী গালমন্দ দিয়ে বলেন। অন্য কেউ সে রকম নিজের পরিবারের মত আপন জেনে গালও দিতে পারে না, শুনতেও পান না উনি।"

গন্‌শার ব্যবস্থাটা পাকা হইয়া গেল।

৫

গোরাচাঁদের পক্ষে 'থ্যাটের' সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা এবং ঔৎসুক্য আর চাপিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। অত স্পষ্ট করিয়া সরবতের কথাটা তুলিল, তাহারও দেখা নাই। ওদিকটাই একেবারে ফাঁকি নয় তো? ত্রিলোচনের সঙ্গে যত বারই চোখোচোখি হইয়াছে, সে কেবল অপেক্ষা করিবার ইসারা করিয়াছে। আর ধৈর্য্য না রাখিতে পারিয়া বলিল, "আমার ভাবনা হচ্ছে খালি সেজপিসীমার জন্যে;—তাঁকে ঘোলের সরবৎ দেওয়া হ'ল কি না। তাঁর আবার টপ্ করে মাথা গরম হয়ে ওঠে কিনা...উফ্, কি গরমটাই পড়েছে! আমাদের মাথাই..."

গৃহকর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "সত্যিই তো, সরবৎ এল না তো বাবাজী এখনও! ভুলেই গেছলাম গল্পগুজবে, দেখ। আমি তোমার উপরই সব ছেড়ে নিশ্চিন্দি আছি বাবাজী।"

ত্রিলোচন গোপনে গোরাচাঁদের দিকে একটা ব্যঙ্গ-কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেলে ঘোৎনাকে বলিলেন, "চৌকস্ ছোকরা, শিবপুরে বাড়ী। একাই সব সামলাচ্ছে সকাল থেকে!"

ঘোৎনা সুযোগটা ছাড়িল না। বলিল, "আমাদের এই হাওড়া শিবপুর তো? হ'তেই হবে; কি রকম সব বনেদী ঘরের জায়গা। জামাই করতে হয় তো শিবপুরে, আমি আমার শালীর মেয়ের জন্যে একটি ছেলে ঠিক ক'রে রেখেছি, ভাবছি হাতছাড়া না হয়ে যায়।"

এক বার গন্‌শার পানে চকিতে চাহিয়া লইল।

গোরাচাঁদও গন্‌শার পানে আড়চোখে এক বার চাহিয়া ঘোৎনাকে প্রশ্ন করিল, "আপনি গোকুল চাটুজ্জের ভাগ্‌নে গণেশচন্দ্রের কথা বলছেন, মেসোমশাই?...হীরের টুকরো..."

'হীরের টুকরো'—এত প্রশংসায় গোঁফদাড়ির অন্তরালে রাঙিয়া উঠিতেছিল, মুখটা ফিরাইয়া লইল।

একটি ট্রের উপর গুটিচারেক কাঁচের গেলাস ও একটা এনামেলের জাগের এক ভাগ ঘোলের সরবৎ আসিল। ত্রিলোচন নয়, অন্য একটি ছোকরা আনিয়াছে।

গোরাচাঁদ যখন চতুর্থ গ্লাসে চুমুক দিয়াছে, ত্রিলোচন আসিয়া বলিল, "নিন্। আপনারা গা তুলুন এবার একটু।" গোরাচাঁদের হাতের গ্লাসটা আর একটু হইলে পড়িয়া টেবিলে আছাড় খাইত, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া ত্রিলোচনের পানে উদাসভাবে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন গৃহকর্ত্তার পানে চাহিয়া বলিল, "খালি মালাইকারীটা বাকী ছিল, গিয়ে দেখি হয়ে গেছে। পরিবেশন করিয়ে এলাম।"

একটা ধিক্কারের দৃষ্টিতে গোরাচাঁদের পানে চাহিল,—অর্থাৎ এই জন্যেই সরবৎ এতক্ষণ আটকে রেখেছিলাম, কিন্তু কপাল মন্দ তোর ..

গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "বেশ করেছ, অত দূর থেকে আসা, আবার ফিরে যেতে হবে।...তা হ'লে এবার উঠতে হবে একটু।" তিন জনে উঠিল, গোরাচাঁদ উঠিয়া কোমরের কাপড়টা আলগা করিয়া দিল। গন্‌শা শুনিতে না পাইবার কথা বলিয়া বসিয়াছিল, ঘোৎনা ঝুঁকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "উঠুন, একটু মিষ্টিমুখ করার জন্যে এঁরা বড় পীড়াপীড়ি করছেন।"

শুনিতে পায় নাই, শুধু আন্দাজে বুঝিয়াছে এই ভাবে একটু হাসিয়া গন্‌শা উঠিয়া পড়িল। নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ বলিলেন, "খুব অল্প কথা কন দেখছি।"

ঘোৎনা বলিল, "যেমন মিতভাষী, তেমনি মিতাহারী, তেমনি অমায়িক..."

গোরাচাঁদ আহার্য্যের এত কাছাকাছি হওয়ায় সব ভুলিয়া গিয়াছে, অন্যমনস্ক হইয়া বলিল, "জামাই যা হবে..."

ত্রিলোচনের কনুইয়ের গুঁতা খাইয়া থামিয়া গেল। বেখাপ্পা কথাটা শুনিয়া সবাই ঘুরিয়া দেখিয়াছে, ঘোৎনা গৃহকর্তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বর এ-বিষয়ে ঠিক তার ঠাকুরদাদার মতই হবে। এ আপনি মিলিয়ে নেবেন। গোরাচাঁ...মানে, আমাদের অসীমকুমার বাবাজী কিছু ভুল বলেন নি।"

সবার অলক্ষ্যে "অসীমকুমার বাবাজী"র দিকে একটা অগ্নিকটাক্ষ হানিল।

তিন জনে আসিয়া আসনে বসিল। গোরাচাঁদের জলাতঙ্কের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, অন্যমনস্ক ভাবে গেলাসটা সরাইয়া রাখিল।

কে. গুপ্তকে শিখাইয়া রাখা হইয়াছিল, সে সোজাসুজি একেবারে না বসিয়া ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া বলিল, "একটু জল প্রয়োজন যে; পদপ্রক্ষালন করতে হবে।"

সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "তাই তো, পুরুতমানুষ... মনেই ছিল না কথাটা...আর আজকালকার যা সব পুরুত...যাও শীগ্‌গির এক ঘটি জল..."

ত্রিলোচন দিব্যি সরঞ্জামটি দাঁড় করাইয়াছে। লুচি, পটলভাজা, ডালনা, মুড়া দিয়া মুগের ডাল, মাংসের কোর্মা, গলদাচিংড়ির মালাইকারী,—চাটনি; ওদিকে দই, রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, ল্যাংড়া আম।

ঘোৎনা হাতে আচমনের জল লইয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "এ যে এলাহি কাণ্ড করেছেন! এত খাওয়া যায় কখনও? না খাবার আর আমাদের সে বয়স আছে?"

"অতি সামান্য, বিদুরের আয়োজন"—বলিয়া বিনয় করিতে গিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ চকিত হইয়া বলিলেন, "এঃ, এ যে মস্ত ভুল হয়েছে,—পুরুতঠাকুর ঐ এক সাটে বসবেন?—না, ঐসব খাবেন? দেখছ সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, এ কি তোমাদের কলকাতার হোটেল-মারা পুরুত? আলাদা ঠাঁই ক'রে কিছু ফল আর একটু সন্দেশ এনে দাও।"

কে. গুপ্তকে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে নিষ্ঠা এবং শুচিতা সম্বন্ধে একটা শ্লোক মুখস্থ করান হইয়াছিল, মনে মনে ভাল করিয়া ভাঁজিয়া সবে বেচারা আওড়াইতে যাইবে, মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সে মুখটা ফ্যাকাশে

করিয়া নিজের দলের, বিশেষ করিয়া গন্‌শার, পানে এক বার চাহিল। কিন্তু "পদপ্রক্ষালন"-এর পুণ্য যে এমন করিয়া এত সত্ত সত্ত ফলিবে, তালিম দিবার সময় উঁহারা কেহই এতটা আন্দাজ করিতে পারে নাই। কেহ আর কে. গুপ্তের দিকে চাহিতে সাহস করিল না। গোরাচাঁদ বরং, অমন সাত্ত্বিক পুরোহিতের সহযাত্রী বলিয়া সেও বিপদগ্রস্ত হইতে পারে এই ভয়ে পটলভাজা, ডালনা ডিঙাইয়া একেবারে কোর্মায় হাত ডুবাইয়া দিল।

জলের ি ছুনে ফলাহার উপস্থিত হইল।

নাকে মালাইকারী আর মোগলাই কোর্মার গন্ধ আসিতেছে; কলা, শাঁকালু, শশা, আম যেন বিষবৎ মনে হইতেছে। যত অত্যাচার কে. গুপ্তের উপর ;— ছোট করিয়া চুল ছাঁটিতে হইবে, কে. গুপ্ত ; টিকি রাখিতে হইবে, কে. গুপ্ত ; নামাবলী গায়ে দিতে হইবে, কে.গুপ্ত ; পা ধুইয়া আহার করিতে হইবে, কে-গুপ্ত ; শেষে শশা, কলা খাইতে হইবে সেই কে. গুপ্তকে।—ইচ্ছা হইতেছিল সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া আসনে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সব কথা ফাঁস করিয়া দেয় একবার।

মাথা নীচু করিয়া দাঁতে শশা কাটিতেছে, মুখটা অন্ধকার, অশ্রু ঠেলিয়া আসায় রগের শিরাগুলা দপ্‌দপ্ করিতেছে। কন্যাপক্ষীয়দের সকলেও যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে,—ব্যাপারটা কি ?

ব্যাপারটা যে কি, বৃদ্ধ বলিলেন। একটু রাগিয়াই বলিলেন, "এই প্যাজ-রস্থনের গন্ধের মধ্যে কি ওঁর খাওয়া হয় ? তোমাদের যেমন সব ছেলেমানুসি !"

গৃহকর্তা হইতে সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "তাহ'লে ওঁকে অন্য ঘরে…"

তাহা হইলেও বাঁচা যায় যেন, এত কাছে বসিয়া এই রোগীর পথ্য অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

বৃদ্ধ আরও রাগিয়া উঠিলেন, "আরে অন্য ঘরে !… সাত্ত্বিক মানুষ, উনি এক ঠাঁই ছেড়ে অন্য ঠাঁইয়ে বসতে পারেন কখনও ? কি রকম অশাস্ত্রীয় কথা তোমাদের !…"

গোরাচাঁদের কোর্মা এদিকে অর্দ্ধেকের বেশী শেষ হইয়াছে, ঘোৎনাকে লক্ষ্য বলিল, "মেসোমশাই, আমাদের চুঁচড়োর কোর্মায় আর জোড়াসাঁকোর কোর্মায় তফাৎটা দেখেছেন তো ?—আপনাকে বলছিলাম না ?"

পুরোহিতের 'খাওয়ার প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য সবাই ব্যস্ত ছিল, গৃহকর্ত্তা একটি ছেলেকে কোর্মা আনিতে ইসারা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কোন্‌টা ভাল আপনার মতে ?"

গোরাচাঁদ প্রবল উৎসাহে অভিমত দিতে যাইতেছিল, ঘোৎনা অন্তরের ক্রোধ কোন রকমে চাপিয়া হাসিয়া বলিল, "যুগ উল্টে গেছে,—গোড়া থেকেই নিজেদের ছোট ক'রে কন্যাপক্ষদের বড় করছ বাবাজী ?—বেহাই মশাইয়ের নুনের জোর আছে বলতে হবে।"

সকলে সমস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। পাশের ঘরে মেয়েদের চাপা হাসি উঠিল।

ঘরের অস্বচ্ছন্দ ভাবটা কাটিয়া বেশ হাস্যকৌতুকের মধ্যে আহারটা চলিতে লাগিল। কে. গুপ্তও নিরুপায় হইয়া আম সন্দেশ রসগোল্লা হইতে যতটা সম্ভব-সান্ত্বনা সঞ্চয় করিতে লাগিয়া গেল।

সমস্ত দিনটা গুমোট ছিল, হঠাৎ এক ঝলকা শীতল হাওয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং গুরুগুরু করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "হয় বৃষ্টি একটু বাঁচা যায়—যা গেছে সমস্ত দিন !…আপনাদের চুঁচড়োর দিকে…"

ঘোৎনা মুখ তুলিয়া বলিল—"এক বিন্দু বৃষ্টি নেই।"

বৃদ্ধ একটা ডেক-চেয়ারে বসিয়াছিলেন, বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "সে কি ! আমার বড় নাতি আজ সকালে গেছল, ভিজে চুপসে এসেছে যে !"

সমস্ত ঘরটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

গন্‌শা এই আকস্মিক বিপদের মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঘোৎনার মন্তব্যটা তাহার একেবারে না শুনিবারই কথা এটা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সামলাইতে গিয়া বিষম লাগিয়া কাশিতে লাগিল।

গোরাচাঁদ তখন বাগবাজারের রসগোল্লায় হাত দিয়াছে, কথাটা যে অতিরিক্ত রকম বেফাঁস হইয়া গিয়াছে সেদিকে অতটা হুঁস নাই। গন্‌শার দিকে একটু ঝুঁকিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "ঠাকুর-দা, বিষম লেগেছে,—আরও

গোটাকতক রসগোল্লা নামিয়ে দিন না গলা দিয়ে; জিনিষটা চমৎকার হয়েছে, কষ্ট হবে না।"

কর্ত্তার ইসারায় এক জন তাড়াতাড়ি গোরাচাঁদের জন্ম রসগোল্লা আনিতে গেল।

ঘোৎনা ততক্ষণ চুঁচুড়ার বৃষ্টি সম্বন্ধে একটা কাটান খাড়া করিয়াছে, বলিতে যাইবে এমন সময় যে ছেলেটি রসগোল্লা আনিতে গিয়াছিল, ভীত সন্ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া আসিয়া কর্ত্তা ও ত্রিলোচনকে বলিল, "আপনাদের ডাকছেন বাড়ীতে একবার, শীগ্‌গির আসুন।"

৬

তাহার পিছনে পিছনে ত্রস্তগতিতে বাঁড়ীর মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিল। ছোট ছেলেমেয়েগুলি এবং আরও সবাই তাহাদের অনুসরণ করিল।

চারি জনে ভীতভাবে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেছিল, এমন সময় একটি ছোকরা ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধকে বলিল, "আপনাকে ডাকছেন বড়কাকা—শীগ্‌গির।"

বৃদ্ধ উদ্বিগ্নই ছিলেন, উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "তাহ'লে এঁরা ··?"

ঘোৎনা তাড়াতাড়ি বলিল, "আপনি যান, আমাদের জন্ম চিন্তা নেই।"

গোরাচাঁদ বলিল, "আমরা তো আর পর নয়।" বৃদ্ধ চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "ধ'রে ফেললে না তো রাজেনকে?"

আর সব বাদ দিয়া তাড়াতাড়ি সবচেয়ে বড় ল্যাংড়া আমটায় নাক পর্য্যন্ত ডুবাইয়া একটা কামড় দিল।

ঘোৎনা বিরক্তির সহিত গন্‌শার পানে চাহিয়া বলিল, "এই জন্যেই বারণ করেছিলাম—ওর আবার একটা পিসীমা না ঢুকিয়ে চলল না। এখন নাও পিসীমা!"

ঘরটা অন্দর থেকে একটু আলাদা, তবু চাপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে। একটা গুরুতর কিছু যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গন্‌শা বলিল, "রাজু ধরা পড়লে তো এতক্ষণ মা-মার আর কান্নার শব্দ আসত··· ক-জনের ফিট হয়ে যায় নি তো?"

ঘোৎনা সেইরূপ বিরক্তির সহিতই তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "তোকে দেখবার আগেই?"

ক্রমাগতই খাবা খাইয়া গন্‌শা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ত্রিলোচন চক্ষু ছানাবড়া করিয়া ঘরে ঢুকিয়া ঘাড়টা ডাইনে কাৎ করিয়া একটা টুস্কি দিল। সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কি ব্যাপার?"

"রাজু সটকেছে!"

একটা চাপা ভয়ের শব্দ করিয়া তিন জনেই উঠিয়া পড়িল। গোরাচাঁদ একটা আম হাতে করিয়া চৌকাঠের বাহিরে পা দিয়াছে, ত্রিলোচন বলিল, "তোরা সব উঠলি কেন? ওরা চুঁচড়োর বৃষ্টির কথা নিয়ে সন্দেহ করছিল বটে, আমি সামলে এসেছি কতকটা; বললাম, 'একটু পাগলাটে পাগলাটে ছিলই যেন, একটু খুঁজুন ভাল ক'রে আগে।'···আর সত্যি, গোরার সেই 'মাথাগরমের' কথা বলা থেকে সর্ব্বদা ও-বেচারার কাছে যেমন এক জন না এক জন সরবতের গেলাস নিয়ে ঘুরছিল, তাতে সুস্থ মানুষই পাগল হয়ে যায়।···ওরা পাগলাটে মেয়েকে সামলে রাখতে পারে নি ব'লে যেন ফাঁপরে পড়েছে—আমায় বললে, 'আমরা ততক্ষণ খুঁজছি চারি দিকে, তুমি বাবাজী ভদ্রলোকদের দেখ তো একটু।'"

গোরাচাঁদ এদিকে কান ও বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শুনিতেছিল, ফিরিয়া পা বাড়াইতেই ত্রিলোচন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "গোরা তোর গোঁফ?"

এরা তিন জনেই বলিয়া উঠিল, "সত্যি! তোর বাটারফ্লাই গোঁফ কোথায় রে?···সারলে দফা।"

গোরাচাঁদ মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া হতভম্ব হইয়া রহিল, বলিল, "তাই তো, গোঁফ!"

খোঁজ—খোঁজ···

ত্রিলোচনকে বাড়ীর দিকে পাহারা দিতে বলিয়া ইহারা গোঁফের খোঁজে লাগিয়া গেল;—আসনের চারি ধার, যে-পথ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে;···গোঁফের দেখা নাই! গোরাচাঁদ এক-এক বার নাকের নীচে হাত বুলাইয়া হাতটা দেখিয়া বলিতেছে, "তাই তো!" শূন্য ওষ্ঠ, শূন্য করতল কোনটার সাক্ষ্য যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

এ রকম করিতে করিতে হঠাৎ একবার সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হয়েছে রে, ধরেছি।"

সকলে তাহার হাতের দিকে চাহিল, কে. গুপ্ত বলিল, "কই ?"

গোরাচাঁদ বলিল, "পেটের মধ্যে চ'লে গেছে, তাই তো বলি—পেটটা গুলিয়ে গুলিয়ে ওঠে কেন ?"

সকলে নির্বাক্ বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিল। গোরাচাঁদ বলিল, "তখন তাড়াতাড়ি ল্যাংড়া আমটায় কামড় দিতেই মনে হ'ল শাঁসের সঙ্গে খানিকটা আঁশও যেন গলা দিয়ে নেমে গেল;—তাই তো বলি—অমন হারভাঙার ল্যাংড়ার আঁশ এল কোথা থেকে!...এদিকে যে স্টিকিং প্লাস্টার আলগা ক'রে গোঁফটাকেই সাফ ক'রে নিয়ে সেঁদিয়ে গেছে..."

সকলে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া বলিয়া উঠিল, "তাহ'লে ?"

এমন সময় দুই-তিনটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "জামাই বাবু, শীগ্‌গির আসুন, বরের পিসীর খোঁপা পাওয়া গেছে, বাকী পিসীটা বাথ-রুমের ভাঙা জানলা দিয়ে..."

অসমাপ্ত রাখিয়াই আবার হুড়াহুড়ি করিয়া বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গেল।

ত্রিলোচন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "বাথরুমের একটা গরাদ ভাঙা ছিল, নির্ঘাৎ গ'লে পালাতে গিয়ে চুলটা খুলে আটকে গেছে! মজালে।" সবাই একসঙ্গে অনিশ্চিতভাবে প্রশ্ন করিল, "এখন—?"

ভয়জনিত সতর্কতায় শ্রবণশক্তি যেন চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে—ভিতরে গোলমালের মধ্যে চাপা গলায় ত্রস্ত পরামর্শ—"না, এখন নয়—আগে ভাল ক'রে ঘেরে ফেল ...কে জানে পকেটে পিস্তল-টিস্তল—ছোরা-টোরা..."

চারি দিকে...হ্যাঁ, লাগছিল কেমন কেমন যেন... চুঁচড়োয় অমন বিষ্টি আর...নাঃ, জামাই ঠিক আটকে আছে ...খিড়কির দিক দিয়ে...সামনের রাস্তায় গিয়ে তার পর লোক ডাকা...আঃ, ছেলেমেয়েগুলো ওপরে যাক্ না.. "একটা ফোন..."

গৃহকর্তা চেঁচাইয়া বলিলেন, "ওঁদের একটু দেখো বাবাজী; রসগোল্লা নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এলাম ব'লে" বাড়ীর খিড়কি দিয়া যেন কয়েক জন দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্দরমহলটা হঠাৎ মারাত্মক রকম নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ইহাদেরও সবার যেন বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে।

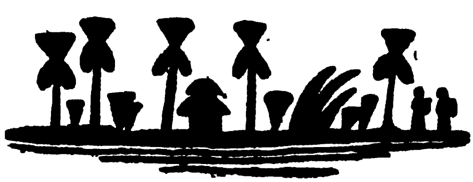
হঠাৎ গন্‌শার চৈতন্য হইল। নিজের দাড়ি-গোঁফ টানিয়া ফেলিয়া বলিল, "তো-তোদেরও সব দে—চটপট—চে-চেহারা বদলে পালাতে হবে।"

গোরাচাঁদ বাবরিটা টানিয়া ফেলিয়া বলিল, "এমনি পালালে তিলেকে সন্দেহ করবে না? তাকে আমাদের আগলাতে বসিয়ে রেখেছে..."

ত্রিলোচন চিন্তিত ভাবে বলিল, "সত্যি, এ এক সমিস্তে তো! আর সময়ও তো নেই, ঘিরে ফেললে ব'লে..."

গন্‌শা ক্ষিপ্রহস্তে দাড়ি, গোঁফ, বাবরি, গালপাট্টা, কোট, চাদর চৌকির নীচে ছুড়িয়া ফেলিল। বিপদের মুখে তাহার দলপতির মাথা দ্রুত পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। গোরাচাঁদের কথায় ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল, তাহার পর হঠাৎ ত্রিলোচনের পানে চাহিয়া বলিল, "বলবি আচমকা মে-মেরে পালিয়ে গেল।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে একটা বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় বসাইয়া, দলটাকে ঠেলিয়া লইয়া হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল।



বলীদ্বীপের লেগং নাচ



পাখা-হাতে লেগং নাচ



লেগং নাচের ভঙ্গীতে তিনটি বালিকা ['বলীদ্বীপের লেগং নৃত্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯০



লে   নাচের বিচিত্র সজ্জায় ভূষিত বালিকা



রজ্‌জাং নাচ। মন্দির-প্রদক্ষিণ।



লেগং নাচের ভঙ্গী

পশ্চিম-বঙ্গে জলসেচনের সমস্যা

রায় বাহাদুর শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., এম. বী. ঈ.

মানবসভ্যতার আরম্ভ হইতে, কৃষিই অধিকাংশ লোকের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকার্যের সফলতা বৃষ্টিপাতের উপরে নির্ভর করে। বৃষ্টির পরিমাণ যথেষ্ট ও সময়োপযোগী না হইলে কৃষকের সমস্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম বিফল হয়। তাই মেঘদূতের কবি যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞ জনপদবধূগণ প্রীতিস্নিগ্ধনয়নে বর্ষার মেঘের দিকে চাহিয়া আছে, কারণ "ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলং"।

প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে কৃষির এই অনিশ্চিততা আরও কঠিন, আরও ভীষণ ছিল। তখন পণ্যদ্রব্য এক দেশ হইতে আর এক দেশে লইয়া যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, সময়-সাপেক্ষ ও বিপৎসঙ্কুল ছিল। এখনকার মত রেঙ্গুন হইতে চাল ও সুদূর কানাডা হইতে গম আমদানী হইয়া দেশজাত শস্যের অভাব পূর্ণ করিত না। এমন কি, রাজভাণ্ডারের সমস্ত সম্পত্তি দিয়াও ক্ষুধার্তের অন্নসংগ্রহ করা কঠিন হইত। আনন্দমঠে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের এই ভয়াবহ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

সেই জন্য, অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি এই সমস্যার সমাধানে প্রযুক্ত হইয়াছে, কেমন করিয়া খাদ্যশস্যকে প্রকৃতির খেয়ালের বন্ধন-শৃঙ্খল হইতে কিয়ৎপরিমাণে মুক্ত করা যায়। মিশর দেশের প্রাচীন ইতিহাসে বোধ হয় ইহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে নীলনদের বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত বিধ্বস্ত, আবার অন্য সময় জলাভাবে মাঠের উপর সোনার ফসল শুকাইয়া যায়। ইহা নিবারণের জন্যই নীলনদের স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া হয়। সেই সকল বাঁধ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ভারতবর্ষেও কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য নানা ব্যবস্থা ছিল। তাহার মধ্যে বর্ষার জল সঞ্চিত করিবার নিমিত্ত বিবিধ প্রকারের জলাশয় নির্মাণই বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন দেবর্ষি নারদ সেখানে আগমন করিয়াছিলেন। প্রশ্নজিজ্ঞাসার ছলে, রাজ্যশাসনের মূলনীতি বিষয়ে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, মহাভারতের সভাপর্বে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন এই :—

কচ্চিদ্রাষ্ট্রে তড়াগানি
পূর্ণানি চ বৃহন্তি চ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি—
ন কৃষির্দেবমাতৃকা॥

"আপনার রাজ্যে স্থানে স্থানে জলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় আছে ত?—এবং কৃষিকার্য্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না ত?" (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত অনুবাদ)

অনাবৃষ্টিজনিত শস্যহানি নিবারণকল্পে জলাশয় খনন তখন রাজকর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। শুক্রনীতি* ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। পরবর্তী যুগে হিতোপদেশকার ধনীর অর্থের সদ্ব্যবহারের উপমা দিয়া বলিয়াছেন—"তড়াগোদরসংস্থানাং পরীবাহ ইবাম্ভসাম্"—চারিদিকে (শস্যক্ষেত্রে) জলপ্লাবনেই তড়াগমধ্যস্থ জলের সার্থকতা।

প্রাচীন ভারতে লোকেরা যে সর্বদা অদৃষ্ট ও দৈবের উপর নির্ভর করিয়া অলস ও কর্মবিমুখ ছিল, একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

বাংলার পশ্চিম অংশে, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় যাহারা কৃষিকার্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্বীয় পুরুষকার ও উদ্যমের দ্বারা এই প্রকারে প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতিকূলতা জয় করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। ভূমিভাগ অসমতল বলিয়া বর্ষার প্লাবন ক্ষণস্থায়ী হয়। বর্ষণের পরক্ষণেই, বৃষ্টির

* শুক্রনীতিসার, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ প্রকরণ—৬০ শ্লোক।

জল নদীনালা দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিছুদিন অনাবৃষ্টি হইলে, ক্ষেত্রের আলিতে যে জল আবদ্ধ থাকে তাহাও শুকাইয়া যায়। এই জন্য জলসেচন ব্যবস্থার প্রয়োজন।

এই স্থানে যাহারা প্রথম জঙ্গল কাটিয়া কৃষির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা এই প্রাকৃতিক বিঘ্নের প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও করিয়াছিল। সেচনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সংরক্ষণ করিতে না পারিলে এতদঞ্চলে কৃষিকার্য যে নিষ্ফল ও নিরর্থক হইবে, তাহা ইহারা যে ভাবে হৃদয়ংগম করিয়াছিল, অদ্যাপিও সর্বত্র তাহার প্রভূত নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে।

বাঁধ ও পুষ্করিণীর অবস্থান ভূমির বন্ধুরতার উপর নির্ভর করে। এই সকল জলাশয়ে উচ্চভূমি হইতে নিম্নগামী বৃষ্টির জলকে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করা হয়। সুতরাং জলাশয়ের স্থান এমন কৌশলসহকারে নির্ণয় করা প্রয়োজন যাহাতে অল্লায়াসে যথেষ্ট পরিমাণ জল সংগৃহীত হয় এবং প্রয়োজনকালে অতি সামান্য পরিশ্রমেই জলাশয় হইতে কৃষিক্ষেত্রের সেচনকার্য সম্পন্ন হইতে পারে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভ না করিয়াও এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে, এই প্রকার স্থান নির্ণয়ে তাহাদের যে বিচক্ষণতা ও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বর্তমান যুগের শিক্ষিত এঞ্জিনিয়ারগণের বিস্ময় উদ্রেক করে।

ধানই এই অঞ্চলের প্রধান কৃষি। বৃষ্টির অভাব হইলে, এই সকল জলাশয় হইতে ধানের জমিতে জলসেচন করা হইত। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেই চলে, তখন জমিতে রস থাকে না। বাঁধা-পুষ্করিণীতে জল থাকিলে, তাহাদের সমীপবর্তী ক্ষেত্রে সেচনদ্বারা ইক্ষু, সরিষা, গম ইত্যাদি মূল্যবান রবিশস্য আবাদ হইত।

অধিক দিনের কথা নহে, এই সকল স্থলে অনেক তাঁতির বাস ছিল। তাহাদের প্রস্তুত বস্ত্র বহুপরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। বীরভূম জেলার পুরাবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, শ্রীনিকেতনের সমীপবর্তী গ্রামসমূহ বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, এবং চীপ নামক এক জন ইংরাজ ব্যবসায়ী এই সকল বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিদেশে চালান দিতেন। তাঁহার বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান রহিয়াছে।

বস্ত্রবয়নের জন্য যে তুলার প্রয়োজন হইত, তাহা এই জেলার ক্ষেত্রেই জন্মিত। জলসেচনের ব্যবস্থা ব্যতীত তুলার চাষ সম্ভব নহে।

কেবল কৃষির উন্নতি বিধান নহে, এই সকল জলাশয়ের দ্বারা পল্লীবাসিগণ নানা প্রকারে উপকৃত হইত। যখন এই সকল জলাশয় পরিপূর্ণ ছিল, তখন স্নানপানাদির জন্য নিত্যব্যবহার্য জলের অভাব হইত না। জলাশয়সমূহের অবনতির সহিত কেবল যে অন্নাভাব ঘটিয়াছে তাহা নহে, স্বাস্থ্যেরও অবনতি হইয়াছে। কুষ্ঠরোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মুইর জলাভাবকে এই রোগের বিস্তৃতির অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

যত দিন গ্রামে প্রাণ ছিল, পল্লীবাসীদের মধ্যে একতা ও উৎসাহের অভাব ঘটে নাই, তত দিন এই সকল জলাশয়ের প্রয়োজনমত সংস্কার হইত। কালক্রমে সেই জীবনীশক্তির অভাব হইল। দ্বেষহিংসা, কলহ, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা আত্মপ্রকাশ করিল। তখন গ্রামের প্রাণস্বরূপ, কৃষককুলের সুখ ও সমৃদ্ধির ভিত্তিস্থানীয় এই সকল জলাশয়ের প্রতি মনোযোগ রহিল না, সংস্কারের যথোচিত ব্যবস্থা হইল না।

সকল জলাশয়েরই পঙ্কোদ্ধার করা প্রয়োজন হয়। না করিলে, জলাশয় অব্যবহার্য হইয়া যায়। যে সকল বাঁধ-পুষ্করিণী সেচনের জন্য নির্মিত হয়, তাহা দ্রুতগতিতে মজিয়া যায়। বর্ষার জলের সহিত উচ্চভূমি হইতে প্রচুর বালি, মাটি ও প্রস্তরখণ্ড আসিয়া জলাশয় ভরাট হইতে থাকে। বর্ষার জলে পাড় ধুইয়া যায়। সেচনের জন্য পাড় কাটিয়া যে প্রণালী প্রস্তুত করা হয়, তাহা সময়মত বন্ধ করা হয় না। এই সকল কারণে বাঁধ ও পুষ্করিণী নষ্ট হইয়া যায়।

এই সকল জলাশয়ের অবনতিতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে বাঁকুড়া, বীরভূমের সহিত শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষের এক প্রকার নিত্যসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে বলিলেই চলে। যখন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হয়, বা উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি হয় না, তখন ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া বাহির হওয়া ব্যতীত আর উপায় থাকে না।

এই সকল জলাশয় যখন নির্ম্মিত হয়, তখন জলাশয়ের মালিক ও জমির মালিক অভিন্ন ছিল। যে সকল জমিতে জলসেচন হইত তাহা হয় ভূস্বামী নিজেই চাষ করিতেন, নতুবা তাঁহার প্রজাগণ চাষ করিয়া তাঁহাকে খাজনা দিত। সুতরাং প্রজার হিতসাধনের জন্য না হউক, স্বার্থসংরক্ষণের জন্যও, ভূস্বামিগণ জলাশয়ের সংস্কারকার্যে উদাসীন ছিলেন না।

ক্রমশঃ এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। পত্তনিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হইয়া, জমীদারের সহিত কৃষকের সাক্ষাৎ সম্পর্ক রহিত হইল। দান, বিক্রয়, উত্তরাধিকার, নীলাম ইত্যাদি কারণে কৃষিক্ষেত্রের হস্তান্তর হইতে লাগিল। এই সকল কারণে, বর্ত্তমান সময়ে জলাশয়ের মালিকদের সহিত কৃষকগণের পূর্ব্বের সম্বন্ধ লোপ পাইয়াছে এবং জলাশয়ের সংস্কার-কার্যে মালিক-গণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ নাই বলিয়া, এ-বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগের অভাব ঘটিয়াছে।

কোনও কোনও জলাশয়ে মাছের আয় আছে। কিন্তু সাধারণতঃ, যে সকল বাঁধপুকুরের জল সেচনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাতে মাছের আয় কম এবং সেই সামান্য আয় বহু সরিকের মধ্যে বিভক্ত হইয়া, প্রত্যেকের অংশে এত কম পড়ে যে, ইহার জন্য মালিকগণের সংস্কারকার্যে আগ্রহ হওয়া সম্ভবপর নহে।

সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় পশ্চিম-বঙ্গের জলাশয়-সমূহের সংস্কারসাধন করিতে হইলে, সেচনের দ্বারা যে সকল কৃষক উপকৃত হয় তাহাদিগকেই সংস্কারের ব্যয় বহন করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একতা ও সামর্থ্যের অভাব। কে তাহাদের অগ্রণী হইয়া সকলকে একত্র করিবে, কেমন করিয়া এই সকল অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র কৃষক অর্থসংগ্রহ করিয়া সংস্কারকার্যে প্রবৃত্ত হইবে?

মানবসভ্যতার আধুনিক ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমবায়-প্রণালীর প্রয়োগে সহজে এই প্রকার কঠিন সমস্যার সমাধান হইতে পারে। যাহা খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন ও বলহীন, তাহার সমষ্টি ও সংহতির দ্বারা ঈপ্সিত ফল সহজসাধ্য হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পশ্চিম-বঙ্গের জলসেচনসমস্যার প্রতীকারের জন্যও সমবায়-নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

যে প্রণালীতে জলসেচন-সমবায়-সমিতি গঠিত হয়, তাহা অতি সহজ। জলাশয়ের আয়তন ও বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া সংস্কারকার্যের আনুমানিক ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়। এই জলাশয় হইতে যে সকল কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন হইবে তাহার তালিকাও প্রস্তুত করা হয়। জমির পরিমাণ অনুসারে, কোন্ কৃষকের কত দেয়, তাহাও নির্ণীত হয়। অতঃপর যথারীতি গঠিত ও সমবায়-আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত হইলে, কৃষকগণ প্রয়োজনীয় অর্থের কিয়দংশ আপনারা সংগ্রহ করিয়া, অবশিষ্ট অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (Central Co-operative Bank) নিকট ঋণ করে।

এই প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সমিতি জলাশয়ের সংস্কারকার্যে প্রবৃত্ত হয়। সংস্কার সম্পন্ন হইয়া গেলে, পরবর্ত্তী বৎসর হইতে শস্যহানির সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তখন উৎপন্ন শস্যের মূল্য হইতে কর্জের টাকা পরিশোধ করা কৃষকগণের পক্ষে সহজসাধ্য হয়।

গত ১৫ বৎসর ধরিয়া বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলাতে এই প্রণালীতে কাজ হইয়াছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার আশানুরূপ ফল হয় নাই, ইহার কারণ অনেক। ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর, পল্লীগ্রাম হইতে শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন সম্প্রদায় শহরে চলিয়া আসিয়াছেন, পল্লীগ্রাম ও পল্লীজীবনের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। যাঁহারা স্বদেশপ্রীতির অনুপ্রেরণায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের দৃষ্টিও সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি নিবদ্ধ; তাহার তুলনায়, এই সকল স্থানীয় সমস্যা নগণ্য মনে হয়।

যাহারা গ্রামে বাস করিয়া কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, তাহাদের শিক্ষা, ক্ষমতা ও সহায় নাই, তাহারা কথা বলিতে জানে না, কথা বলিলেও তাহাদের বিলাপবাক্যে কেহ কর্ণপাত করে না। যাঁহারা গ্রামের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাঁহাদের অভাবে পল্লীসমাজ দ্বেষ, হিংসা ও কলহের রঙ্গভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

এই সকল কারণে, দেশের লোকের পক্ষে চেষ্টা ও উৎসাহের অভাব ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ, সমবায়-প্রণালীতে সাধারণের অজ্ঞতা ও অবিশ্বাস। অবস্থাভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া সমবায়-নীতি পৃথিবীর অর্থনৈতিক জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের অধিকাংশ সমিতি ঋণগ্রহণের উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। সমবায়-আইনের বিধান অনুসারে পল্লীবাসীগণের ঋণগ্রহণ-সমিতি (Rural Credit Societies) পরস্পরের অসীম দায়িত্বমূলে (joint unlimited liability) গঠিত, সমিতির এক জনের দেনার জন্য অপর সকলে সম্পূর্ণভাবে দায়ী। গত দশ বৎসর ধরিয়া যে অর্থনৈতিক বিপ্লব (world trade depression) চলিয়াছে, তাহার ফলে অনেক ঋণদান-সমিতির অত্যন্ত অবনতি ঘটিয়াছে, অনেক সমিতির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, এবং পূর্বোক্ত বিধানমত এই সকল সমিতিতে একের দেনা অপরের নিকট আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জলসেচন-সমিতি সসীমদায়িত্বমূলক (limited liability), সুতরাং এই সকল সমিতিতে এক জনকে অপরের দেনার দায়িত্ব বহন করিতে হয় না। সাধারণ লোকের পক্ষে, এই তারতম্য বুঝা কঠিন। সমবায় ঋণদান-সমিতির সংস্রবে আসিয়া এক বার যাহারা ঠকিয়াছে, তাহারা ও তাহাদের পরিচিত লোকেরা আর কোনও প্রকার সমিতির সম্পর্কে থাকিতে চাহে না।*

কিন্তু আরও অন্তরায় আছে। কোনও জলাশয়ের সংস্কারের জন্য সমবায়-সমিতি গঠন করিতে হইলে সেই জলাশয় হইতে যে-সব কৃষিক্ষেত্রে সেচন হয়, তাহার সকল কৃষককে একত্র করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে নানা মতের নানা প্রকৃতির লোক আছে, সুতরাং অনেক স্থলে তাহাদের সকলকে একত্র করা সম্ভব হয় না। সমবায়-নীতির মধ্যে বাধ্যতার স্থান নাই এবং একের অসম্মতির জন্য বহুর স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

* "For some time, Co-operation stank in their nostrils."—M. L. Darling : *Punjab Peasantry in Prosperity & Debt*, p. 262.

বাঁকুড়া-বীরভূমে অনেক বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। প্রতি বারেই গবর্ণমেণ্টের সনাতন রীতি অনুসারে কৃষি ঋণের (agricultural loan) ব্যবস্থা হইয়াছে, পরীক্ষামূলক পূর্তকার্যের (test relief works) অনুষ্ঠান হইয়াছে। কিন্তু কখনও শস্যহানির মূল কারণ নির্ধারণ করিয়া, তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা হয় নাই।

গত বারে ১৯৩৫-৩৬ সালের দুর্ভিক্ষে, আর্তত্রাণের ভার ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মিঃ মার্টিনের (Mr. O. M. Martin, I. C. S.) উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি ইহার প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

বাঁকুড়া, বীরভূমে শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের যে ব্যবস্থা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, তাহার সংস্কার দ্বারাই সেচনকার্য সহজে ও স্বল্পায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, এই বিশ্বাসে তিনি দুই বৎসর পূর্বে জলাশয়-সংস্কার ব্যবস্থার একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার প্রণীত পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় আইন পরিষদ ও আইন সভায় গৃহীত হইয়াছে।

এই আইন বাধ্যতামূলক। সংক্ষেপতঃ ইহার বিধান এই যে, সেচনের উপযোগী কোনও জলাশয় নষ্ট হইয়া থাকিলে, জেলার কালেক্টর তাহার সংস্কারের নিমিত্ত মালিককে নির্দেশ করিবেন। জলাশয়ের মালিক সেই নির্দেশমত কার্য্যে অবহেলা করিলে, কালেক্টর জলাশয়ের দখল লইবেন এবং হয় নিজের অধীনস্থ কর্মচারীর দ্বারা তাহা সংস্কার করাইবেন, নতুবা তাঁহার বিশ্বস্ত অন্য কোনও ব্যক্তি বা সমিতির হাতে সংস্কারের ভার অর্পণ করিবেন। পরে যাহাদের জমিতে জলসেচন হইবে, তাহাদের নিকট নির্দিষ্ট হারে ব্যয়ের টাকা আদায় হইবে।

এই আইন প্রয়োগ করিবার উপযোগী নিয়মাবলী ও কার্যপদ্ধতি এখনও প্রণীত হয় নাই। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে ইহার ফল কি হইবে, তাহা বলা কঠিন।

প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু জেলা শীর্ষক প্রবন্ধে বাঁকুড়া ও বীরভূমের অবনতির বিবরণ প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। জলসেচনের অভাবই এই অবনতির প্রধান ও মূল কারণ। এই অঞ্চলের অধিবাসিগণের আগ্রহ, উদ্যোগ ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত এই অভাব দূর হইবে না।

ওবাৎস্থয়ামা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জাপানের প্রাচীন যুগের কাহিনী।

ওবাৎস্থয়ামা একটি পাহাড়ের নাম। তাহারই পাদমূলে এক দরিদ্র কৃষক তাহার বিধবা বৃদ্ধা মাতার সঙ্গে বাস করিত। সম্পত্তির মধ্যে ছিল এক টুকরা জমি, তদুৎপন্ন শস্যেই তাহাদের অন্নসংস্থান হইত। তুচ্ছ জীবনযাত্রা, তবুও তাহা সুখশান্তিময় ছিল।

জাপান তখন খণ্ড খণ্ড প্রদেশে বিভক্ত, প্রত্যেক প্রদেশ ছোটবড় নানা সামন্তরাজের অধীনে। শিনানো প্রদেশের রাজা যথেচ্ছাচারী। লোকটি সাহসী যোদ্ধা, কিন্তু স্বাস্থ্য ও শক্তির অবসান কল্পনা করিতে ভয়ে শিহরিয়া উঠে—এই ছিল তার দুর্বলতা। সে রাজ্যে এক নিষ্ঠুর নিয়ম ঘোষণা করিল—কোনো বুড়ামানুষের বাঁচিবার অধিকার নাই, সকল বুড়াবুড়ীকেই অবিলম্বে শমনসদনে পাঠাইতে হইবে!

তখন বর্বর যুগ। বুড়াদের মরার জন্য বর্জন করার রীতি অপ্রচলিত না থাকিলেও, বর্জন করিতেই হইবে, এমন কোনো আইন ছিল না। অনেক অসহায় বৃদ্ধ আদর-যত্নে সুখের সংসারে বাস করিত। বুড়ো মাকে গরীব কৃষক যেমন ভালবাসিত তেমনি ভক্তি করিত, তাই রাজার আদেশে তার হৃদয় দুঃখভারে বিবশ হইল। 'দাইম্যো' বা সামন্তরাজের আদেশ অমান্য করার চিন্তা কল্পনাতীত, সুতরাং গভীর নিরাশার দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া যুবক, সে-যুগে সর্বাপেক্ষা আরামের মৃত্যুর যে-উপায় ছিল, তাহারই ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইল।

এক দিন সূর্যাস্তসময়ে দিবসের কর্মাবসানে সে দরিদ্রের প্রধান খাদ্য কিছু লাল আঁকাড়া চাল সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া লইল। তার পর উহা এক খণ্ড চৌকোণা বস্ত্রে বাঁধিয়া গলায় ঝুলাইল, আর সঙ্গে লইল একটি তুম্বী পাত্র শীতল পানীয় জলে পূর্ণ করিয়া। অনন্তর অসহায় বৃদ্ধা মাতাকে পিঠে তুলিয়া লইয়া সে অতিকষ্টে শৈলারোহণ সুরু করিল।

দীর্ঘ বন্ধুর পথ সে একটানা উঠিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল, অবশেষে গিরিশিখরে নির্মল সুগোল চাঁদ উঠিয়া তরুপল্লব ভেদ করিয়া যেন করুণাভরে যুবকের পানে উঁকি মারিতে লাগিল!

শ্রান্তিভারে যুবকের মাথা হেলিয়া পড়িয়াছে, দুঃখভারে তার হৃদয় পীড়িত। অপ্রশস্ত পথকে কাঠুরে আর শিকারীর চলা পথগুলা বারম্বার কাটাকাটি করিয়াছে, কোথাও বা নানা পথ মিলিয়া মিশিয়া একটা গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু যুবকের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহার মরিয়া অবস্থা: এ-পথ সে-পথ একটা পথ হইলেই চলিবে, কিই বা আসে যায়! স্নেহময়ী মাতাকেই সে বিসর্জন দিতে চলিয়াছে! অবিরাম অন্ধের মত সে উঠিয়া চলিল কেবলই উপরে সমুচ্চ অনাবৃত শৈলশিখরের উদ্দেশে—অধুনা যার নাম 'ওবাৎস্থয়ামা' বা 'বৃদ্ধদের বর্জন করার পাহাড়'!

বুড়ো হইলেও মাতার দৃষ্টিশক্তি তেমন ক্ষীণ নহে। পথে পথে পুত্রের বেপরোয়া আনাগোনা লক্ষ্য করিয়া মায়ের প্রাণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পাহাড়ের কত পথ, ছেলে ত আর সব চেনে না, ফেরার সময় পথ ভুলিয়া পাছে সে বিপদে পড়ে সেই ভয়ে মাতা হাত বাড়াইয়া পথের ধারের ঝোপঝাড় থেকে সরু সরু ডালপালা ছিঁড়িয়া পথের মাঝে মাঝে মুঠো মুঠো ছড়াইতে লাগিল। এইরূপে পাহাড়ে ওঠার সময়, পশ্চাতের সরু পথ বরাবর ছোট ছোট ডাল-পালার স্তূপে চিহ্নিত হইয়া উঠিল।

অবশেষে তাহারা গিরিশিখরে গিয়া পৌঁছিল। শ্রান্ত দেহে অবসন্ন মনে যুবক ধীরে ধীরে তার 'বোঝা'টি নামাইল, তার পর স্নেহময়ী মাতার প্রতি তার শেষ কর্তব্য সম্পাদনে উদ্যোগী হইল। যতটুকু সম্ভব, মায়ের জন্য একটু আরামের ব্যবস্থা করা দরকার। ভূপতিত দেবদারুর ঝুরি সংগ্রহ করিয়া সে একটি কোমল

উপাধান রচনা করিল। তার উপর সযত্নে বুড়ো মাকে তুলিয়া তুলোভরা আলখেল্লা তার ঝুঁকিয়া-পড়া কাঁধের চারি দিকে বেশ করিয়া জড়াইয়া দিয়া সাশ্রুনেত্রে কাতর হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিল।

পুত্রকে শেষ উপদেশ দিবার সময় মায়ের গলা কাঁপিতে লাগিল, সেই কম্পিত কণ্ঠস্বরের ফাঁক দিয়া সন্তানের জন্য মাতার নিঃস্বার্থ স্নেহ যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—

"এস বাবা! দেখেশুনে চলবে, পাহাড়ের পথে কত বিপদ জান ত! লক্ষ্য ক'রে দেখো, যে-পথে কচি কচি ডালপালা ছড়ানো আছে সেই পথ ধ'রে চ'লো, তা হ'লেই তুমি নীচেকার চেনা পথে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছতে পারবে!"

তখন পুত্রের বিস্মিত দৃষ্টি পিছন পানের পথের উপর গিয়া পড়িল, তার পর পড়িল বুড়ো মায়ের শীর্ণ কোঁচকানো হাতের উপর—ধুলোকাদামাখা হাতে আঁচড়ের দাগ সুস্পষ্ট হঠাৎ বেদনায় তার বুকের মাঝটা টনটন করিয়া উঠিল, আভূমি প্রণত হইয়া অধীর কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল—

"মাগো আমি তোমার অধম সন্তান—আমার জন্যে তোমার এত দয়া! তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না! চল দু-জনে নেবে যাই ওই কচি ডালপালার চিহ্ন ধ'রে ধ'রে, চলো ঘরে ফিরে দু-জনেই গিয়ে মরি!"

আবার সে তাহার 'বোঝা' তুলিয়া লইল (এখন সে-বোঝা কত হালকা বোধ হইতেছে!) এবং চিহ্নিত পথ ধরিয়া দ্রুতগতিতে নামিয়া চলিল। ছায়া ও জ্যোৎস্নার মাঝ দিয়া চলিয়া চলিয়া অবশেষে তাহারা উপত্যকার চিরপরিচিত কুটীরে আসিয়া পৌঁছিল।

রান্নাঘরের তক্তার মেঝের তলায় একটি চোরাকুঠরি ছিল। উহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকিত। এই কুঠরির চারি পাশ বন্ধ থাকায় সেটি ছিল দৃষ্টির অগোচর, তাই তাহারই মধ্যে পুত্র মাতাকে লুকাইয়া রাখিল। মায়ের যা-কিছু দরকার সমস্ত সেখানেই গুছাইয়া রাখিয়া সতর্কতার সহিত সে সর্বদা সশঙ্কচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

এমনি করিয়া দিন যায়, কৃষক নিরাপদ বোধ করিতে সুরু করিয়াছে, এমন সময় সেই পাষণ্ড আবার একটা আজব আদেশ জারি করিয়া বসিল—তার মধ্যে না আছে কোনো যুক্তি, না আছে অার কোনো মানে—মনে হয় শক্তি-গর্বে মত্ত হইয়া। প্রজাবর্গ তাহাকে এক গাছ ছাইয়ের দড়ি উপহার দিবে! এই অসম্ভব আবদার শুনিয়া সারা দেশ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। আদেশ পালন করিতেই হইবে, কিন্তু শিনানো-দেশে এমন কে আছে যে ছাইয়ের দড়ি তৈয়ার করিতে পারে?

ভাবিয়া ভাবিয়া কোন কূল না পাইয়া দারুণ দুশ্চিন্তার শেষে এক দিন রাত্রে পুত্র তার লুকানো মাতার কানে কানে খবরটা বলিয়া ফেলিল।

শুনিয়া মাতা বলিল—আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি।

পরদিন মাতা উপায় বলিয়া দিল—

পাকানো খড় দিয়া একগাছা দড়ি তৈরি করিতে হইবে, তার পর সেই দড়ি পাশাপাশি রাখা এক সারি সমান উঁচু চ্যাপ্টা পাথরের উপর টান করিয়া বিছাইয়া তাহাকে নির্বাত রাত্রে পোড়াইতে হইবে!

প্রতিবেশীদের ডাকিয়া জড়ো করিয়া মাতার নির্দেশ সে পালন করিল। আগুন যখন নিবিয়া গেল, তখন সকলে দেখিল পাথরের উপর সাদা ছাইয়ের এক গাছা দড়ি পড়িয়া আছে—দড়ির প্রতিটি পাক আর প্রতিটি আঁশ একেবারে নিখুঁত স্পষ্ট।

সামন্তরাজ যুবকের বুদ্ধির পরিচয়ে খুশী হইয়া তাহার প্রচুর তারিফ করিল, শেষে জানিতে চাহিল কাহার কাছে সে এই জ্ঞানলাভ করিয়াছে।

কৃষক বিলাপ করিতে লাগিল—হায় হায় মাকে আর বাঁচানো গেল না! আমি নিরুপায়—সত্য কথা বলতেই হবে!

সামন্তরাজকে বার বার বিনীত অভিবাদন করিয়া সে সভয়ে সব কথা খুলিয়া বলিল।

দাইম্যো মনোযোগ সহকারে শুনিল, তার পর নীরবে মাথা হেলাইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে সে মুখ তুলিল।

"কেবল যৌবনের শক্তি নয়, তার চেয়েও বেশী আরও কিছু শিনানো-দেশের প্রয়োজন", সে গম্ভীর ভাবে কহিল। "প্রসিদ্ধ প্রবাদ-বাক্য আমি ভুলে গিয়েছিলুম—'পক্বকেশের সঙ্গে আসে বিজ্ঞতা'!"

অতঃপর অবিলম্বে সেই নিষ্ঠুর নিয়ম রহিত করা হইল। আজ সেই বর্বর রীতি সুদূরপরাহত, তার স্থান অধিকার করিয়া আছে কেবল এই কিংবদন্তী।

পত্রালাপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

মংপু

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

এ যেন বিশ্ব জুড়ে একটা দুঃস্বপ্ন। চোখের সামনে মানুষের ভদ্রনীতির মূল কাঠামোটা দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রকমে তেড়ে বেঁকে যাচ্ছে। আর কিছু কাল আগে এই চেহারার বীভৎস ব্যঙ্গবিকৃতি ভাবতেই পারতুম না। কখন ভিতরে ভিতরে সভ্যতার মূল্য বদল হয়েছে, সেটা প্রধানত দাঁড়িয়ে গিয়েছে জীবনযাত্রায় বস্তু ব্যবহারের যান্ত্রিক নৈপুণ্যে। বহুবস্তুপ্রসূতি যন্ত্রশালার মালখানায় ব'সে মারাত্মক লোভ-রিপুর লোল রসনা অহরহ লালায়িত হয়ে উঠছিল। তার সম্বন্ধে শক্তিলুব্ধ গৃধ্র-জাতিদের লজ্জা-সংকোচ ক্রমশই আসছিল ক্ষীণ হয়ে। এই রক্তপিপাসু বসে থাকে পুলপিটের পিছনেই, কলেজ-ক্লাসের আঙিনায়। এর চার দিকে বুদ্ধির উৎস থেকে ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতিতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্বের বাক্য-প্রবাহ বয়ে চলেছে, সে রয়েছে অস্নাত, তাকে ধৌত করতে পারছে না। সে কেবল অন্ধ উৎসাহে ভিৎ খুঁড়ে চলছে রাজ্য-সাম্রাজ্যের নিচের তলায় বসে, জয়স্তম্ভগুলো টলমল করছে, সেই সঙ্গে ভেঙে পড়ছে মনুষ্যত্বের বাঁধনগুলো। এর কোন প্রতিকার আছে ব'লে ভেবে পাই নে। ঢালু গর্তের দিকে সেই রিপুর চলেছে ধাক্কা যে রিপু বহু যুগ ধরে এশিয়া ও আফ্রিকার দুই দুর্বল মহাদেশ থেকে আপন অশুচি খাদ্য জুগিয়ে নিরাপদে পরিপুষ্ট হয়েছে; তার মুরুব্বিরা ভাবতে পারে নি এক দিন এর শোধ তুলবে তাদের সুযোগবঞ্চিত স্বগোত্রীয়রাই। মারের ঘূর্ণিপাক চলেছে, অস্ত্রের পিছনে অস্ত্র, চলেছে অন্তহীন গণিতের পথে, এ থামবে কোথায়? তাদের ভোজের উচ্ছিষ্টের পিচ্ছিল পথে চলছে হানাহানি, দেখতে হয়েছে কুৎসিত। সংকটের দিনে এরা শান্তি চায় কিন্তু ক্ষেত্র পরিষ্কার করতে চায় না।

আমাকে তোমরা বলছ কিছু লিখতে, কোন্ পক্ষের মনের মতো কথা বলি ভেবে পাই নে। এদিকে আমার শরীর অপটু, কলম চলেছে খুঁড়িয়ে। মনে যে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়েছে তার ধাক্কা খেয়ে মনে ভাবছি ব্যক্তিগত জীবনের যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে তারি চারি দিকে কাব্যের প্যাটার্ন্ গেঁথে নিভৃতে একাধিপত্য করব নিজের মনোজগতে, তার সাহায্য করবে চারি দিকের গাছপালা, ঋতুপর্যায়। এ'কে কি বল্‌বে আত্মকৈন্দ্রিক জীবন? ঠিক তা নয়। এর কেন্দ্র আছে সেই বিরাটের মধ্যে যা সমস্ত মলিনতা, জটিলতা, আবিলতার মধ্যে থেকেও তাকে অতিক্রম ক'রে বিরাজ করছে। হাজার বছর কেটে গেছে কিন্তু পৈশাচিক ইতিহাসে মানুষের দুঃখ আজকের দিনের চেয়ে কম ছিল না, যখন মধ্য-এশিয়ার তুরাণী লুঠকারীর দল অগণিত নরকঙ্কাল বিছিয়ে চলেছিল দুর্দান্ত দস্যুবৃত্তির পথে, যখন এসীরিয়ার নিষ্ঠুরতা মানব-পীড়নের কোনো সীমা মানে নি, যখন খ্রীষ্টীয় ধর্মাধ্যক্ষেরা ধর্মের নামে মানুষকে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছিঁড়ে কেটে পুণ্য উপার্জন করছিল—তখন এই বিরাট্ ছিলেন অবিচলিত, কিন্তু নিঃশব্দে তাঁর হিসাবনিকাশ চলছিল—কেউবা গেল লুপ্ত হয়ে কেউবা রইল সুপ্ত হয়ে, নতুন নতুন চেনা-অচেনার ঠাঁই বদল চলল, আরম্ভ হোলো মনুষ্যত্বের নতুন নতুন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় নাম লেখাব যে সে রাস্তা বন্ধ। ভাগ্য অনুকূল হ'লে ইতিহাসের চতুরঙ্গে আমরা হ'তে পারতুম খেলোয়াড়, কিন্তু হয়েছি ব'ড়ে। স্বাতন্ত্র্য খুইয়েছি শনৈঃ শনৈঃ, আজ ধর্মের নামেই হোক অধর্মের নামেই হোক, বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে যাব এ কোন পঙ্গুতা নিয়ে? অঘাসুরকে ঠেকাবার ভঙ্গী করতে পারি

যেমন ভঙ্গী করেছিল বকাসুরকে মারবার জন্তে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের শিশুপুত্রটি ভাঙা কাঠি হাতে নিয়ে, তার চেয়ে তোমরা যাকে বলো এস্‌কেপিজ্‌ম্‌, আমার সেই কবিত্বই ভালো। দেখলুম দূরে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্তের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বার-বার স্বীকার করল যা তার প্রাচ্যসাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটে নি। দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকার চিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালির হাঁ-করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মনির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোস্লোভিয়াকে, দেখলুম নন্-ইণ্টরভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপবলিককে দেউলে ক'রে দিতে, দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলরের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ ক'রে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনফা তো কিছুই হোলো না— পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ ক'রে তুলে আজ নামতে হোলো দারুণ যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্কপ্রলেপ আর সহ্য হয় না। কিন্তু সবচেয়ে বেদনা পাই চীনের জন্তে, কেন না সাম্রাজ্যিকদের অফুরন্ত অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, আর সহায়শূন্য চীন লড়ছে প্রায় শূন্য হাতে, কেবল তার নির্ভীক বীর্যে ভর করে।

কিন্তু ভেবে দেখো, ঐতিহাসিক বিপ্লবে কবির আল্‌টিমেটম্‌ আমি ইতিপূর্বেই দিয়ে দিয়েছি—সন্ত তার সাড়া পাওয়া যাবে না—তার মেয়াদের শেষ তারিখ হয়তো বহু শতাব্দী পরে। কবি ঘোষণা করেছে,

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে,—বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পূরিতে চায় বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ
তখন গর্জিয়া নামে রুদ্র, তব বাজ।

কবি একদা বলেছে,

ওরে ভাই, কার নিন্দা করো তুমি, মাথা করো নত—
এ আমার, এ তোমার পাপ,
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হ'তে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

আমার যা বলবার আমি শেষ ক'রে ব'লে দিয়েছি। এরা বলে মীটিং করতে। মীটিঙের কতটুকু পরিধি, কতটুকু প্রাণ, কতটুকু কণ্ঠস্বর? কবি কি খবরের কাগজের প্রতীক। বলাকা আর একবার প'ড়ে দেখো, আমার এই কবিতা হয়তো ভুলে গেছ। যদি না ভুলতে তাহলে বলতে আমি শেষবারের মতো যা বলেছি তাতে জল মিশিয়ে নূতন ক'রে পরিবেশন করা সাহিত্যিক দুর্নীতি। ইতি ২০।৯।৩৯।

দ্বিতীয় পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে গেল চিঠি লেখার পরে আজ Time and Tide কাগজে সার নর্মান এঞ্জেলের লেখা প্রবন্ধ থেকে দুই-এক জায়গা তর্জমা করে দিই।

গত সপ্তাহে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স বলেছেন, যে সকল দেশ উপলব্ধি করেছে যে তাদের রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্য আশু বিপদগ্রস্ত তাদের স্বাধীনতারক্ষার জন্য আমরা যে প্রস্তুত এ আমরা কাজে ও কথায় সুস্পষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমরা পোলাণ্ডের পক্ষ নিতে প্রতিশ্রুত। অন্যের স্বাধীনতা রক্ষার সমর্থন যদি না করি তাহলে মূলেই স্বাতন্ত্র্য-নীতিকে বঞ্চনা করা হয় এবং সেই সঙ্গেই বঞ্চিত হয় নিজেদের স্বাধীনতা।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের এই উক্তিকে সাধুবাদ দিয়ে সার নর্মান বলছেন, এই স্বাতন্ত্র্যনীতি যেমন আক্রান্ত হয়েছে পোলাণ্ডে তেমনি হয়েছিল মাঞ্চুরিয়া, এবিসীনিয়া, চীন, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়ায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ব্রিটেন অত্যাচরিতকে রক্ষা করার দায়িত্ব কাজে ও কথায় অস্বীকার করেছে।

সার নর্মানের সমস্ত আলোচনাটা পড়ে দেখো। এর থেকে দেখা যাবে ইংরেজের বড়ো এবং ছোটোর মধ্যে উঁচু নিচুতে কত তফাং। এই ছোটো যখন বড়ো আসনে বসে দেশকে চালিত করে তখন শুধু যে দেশের গৌরব নষ্ট হয় তা নয়, দেশের প্রকৃত স্বার্থেও আঘাত লাগে।

সার নর্মানের লেখার একটা জায়গা পড়ে শঙ্কিত হলুম। তিনি বলছেন এমন কথা এদিকে ওদিকে একটু আধটু শোনা যাচ্ছে যে, যেহেতু জাপান জর্মনি সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়েছে আমাদের উচিত এখনি জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে চীনকে ঠেলা দেওয়া। যদি এমন কাজ করি তাহলে তো আমরা মরেছি। তিনি বলছেন, Now to sacrifice China to Japan would be to revert to appeasement in its most evil form. And we are in danger of doing it from sheer moral obtuseness.

আমরা এই কথা বলি, জাপান সম্বন্ধে নিরাপদ মৈত্রী-স্থাপনার ইচ্ছা যদি ইংলণ্ডের কোনো সম্প্রদায়ের মনে আজ জাগে তাহলে বুঝব দুর্বল হয়ে গেছে ইংলণ্ডের আত্ম-সম্মানবোধ। ইতি ২৮।৯।৩৯



বলীদ্বীপের লেগং নৃত্য

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

সপ্তাহ-কয়েক হ'ল বালিতে এসেছি। মানুষের জীবনে আর্ট কতখানি স্থান গ্রহণ করতে পারে তা এদেশে এসে এখানকার মানুষের পরিচয় লাভ ক'রে বুঝতে পেরেছি। এখানে আর্টের স্থান সকলের কাছে সমান। এরা যদিও জাভার অধিবাসীদের তুলনায় অনেক দরিদ্র, তবু নানা প্রকার শিল্প ও নৃত্যগীত এখানে সকলের বিশেষ আনন্দের বস্তু; এর জন্যে রাজার সাহায্য, বিদেশী শাসনকর্ত্তার সাহায্য, কিছুই দরকার করে না—প্রত্যেক গ্রামে আপনার মনের আনন্দে আপনা থেকেই এসব গড়ে উঠছে। জাভাতে নৃত্যগীত দরবার কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত, রাজদরবারের অনুগ্রহ লাভ করলে তবে জনসাধারণ আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায়;



বলীদ্বীপের দু-জন বিখ্যাত লেগং নাচিয়ে বালিকা, নাচের ভঙ্গীতে। বামে, চাওয়ান; দক্ষিণে সার্দি

বালিতে ঠিক তার উল্টো। দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত কোন নাচের দল দেখা যায় না, কারণ প্রত্যেক গ্রামেই নাচের ও বাজনার দল থাকবেই, সেই নাচ ও বাজনা হ'ল বালির অধিবাসীদের প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার একান্ত আবশ্যক অঙ্গ; আনন্দ-উৎসবে, পূজাপার্ব্বণে, জন্মমৃত্যুবিবাহ প্রত্যেক উপলক্ষে নাচ ও বাজনা না হ'লে কোন অনুষ্ঠানই এদের সম্পূর্ণ হয় না। গ্রামে কোন বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব হ'লে, এরা গ্রামের দেবতার কাছে সকলে মিলে পূজো দেয়, নাচ সেই পূজোর প্রধান অর্ঘ্য।

এক দিন দেনপাশার শহরে সন্ধ্যাবেলায় খবর পেলাম, নিকটেই পাশের গ্রামে রাত নটার সময় দুটি কিশোরীর নাচ



বলীদ্বীপের বিখ্যাত লেগং-নাচিয়ে চাওয়ান ও সার্দি, অন্য ভঙ্গীতে

হবে। নাচের নাম স্যাংয়াং। নাচের উপলক্ষ গ্রামে অসুখ দেখা দিয়েছে, গ্রামের অধিবাসীরা রোগনিবারণের উপায়-স্বরূপ এ নাচের ব্যবস্থা করেছে। বালিদ্বীপবাসী বন্ধুর সঙ্গে তখনি বেরিয়ে পড়লাম, মাইল-দুয়েক পথ। দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম, গামেলান সঙ্গীতের টুংটাং শব্দ, এদেশের ঢোলকের দ্রুত লয়ের বাজনা ও করতালের ঝকমক শব্দ। সেখানে গিয়ে দেখি, একটি ছোট দেবালয়ের প্রাঙ্গণে জন-পচিশেক স্ত্রী-পুরুষ স্তিমিত আলোকে চারি দিকে ঘিরে ব'সে আছে। যে-ঘরটিতে পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল সে-ঘরে পূজারী বসে, সেই ঘরটির দিকে মুখ ক'রে সুন্দর সাজে সজ্জিত দুটি গ্রামের মেয়ে তন্ময় হয়ে নাচছে। আলোর ক্ষীণ আভায় মেয়ে দুটির মুখের দিকে প্রথমে আমার দৃষ্টি

পড়ে নি। একটু পরেই আবছা আলোয় দেখি মেয়ে দুটির চোখ মুদ্রিত—আমি অবাক হলাম, কারণ চোখ বুজে এত দ্রুত লয়ে, বাজনার তালে সমানে ছন্দ ঠিক রেখে, নানা প্রকার দুরূহ ভঙ্গিতে নাচতে পারে তা একেবারেই ভাবতে পারি নি।

কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, এরা পূজারী কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত; যতক্ষণ মন্ত্রের দ্বারা আবৃত থাকে, ততক্ষণ বাইরের জগতের বিষয়ে এদের কোন জ্ঞান থাকে না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, এদের দেহের ভিতর দিয়ে মন্দিরের দেবীই নৃত্য করেন। পূজার সফলতা নৃত্যের উপরে নির্ভর করে। মেয়ে দুটি যতক্ষণ নাচল, মুহূর্ত্তের জন্যেও দেখলাম না তাদের কোন রকম অসুবিধাবোধ করতে; কোন রকম পদস্খলন, এক জনের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ, বা নাচতে নাচতে নিজেদের গণ্ডির বাইরে চলে যাওয়া, কিছুই হয় নি, নিখুঁত ভাবে তারা নেচে গেল।

ক্ষীণ আলোর মধ্যে এ রকমের নাচ দেখে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম। সমস্ত আবহাওয়াটা এমন মনে হয়েছিল যেন সত্যি স্বপ্ন দেখছি। ছোট মেয়ে দুটির



চাওয়ান ও সার্দি, অন্য ভঙ্গীতে

মুখের ভাব সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যেন ফুটে বেরচ্ছিল। নাচ যে এতখানি সুন্দর হ'তে পারে, তা এদেশে না এলে হয়ত আর কখনো জানতেই পারতাম না—কেবল সেটা গল্পের সামগ্রী হয়ে থাকত।

এর পরে আর একটি নাচ দেখি, এদেশের বিখ্যাত "কুনিংগান্" উৎসব উপলক্ষে, পূর্ব্ব-বালির এক



রজ্‌জাং নাচ

শহরে। এ নাচটির নাম "রজ্‌জাং"। বালির এই অঞ্চলে এ নাচের বিশেষ খ্যাতি। নাচের কারুকার্য্যের দিক্ থেকে এ নাচ খুব উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু উপলক্ষটা ছিল অতি সুন্দর।

শহরটির ছোট মন্দিরে সেদিন অপরাহ্ণে ছিল পূজার দিন। মন্দিরটি রাজবাটীর সংলগ্ন। সাড়ে পাঁচটায় সময় সেখানে পূজা আরম্ভ হবে, কিছু আগেই সেখানে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি, মন্দিরের মাঝখানে প্রধান দেবতার বেদীতে, সেখানকার মন্দিরের রক্ষক ও আর একটি যুবতী নানা প্রকার অর্ঘ্য সাজাতে ব্যস্ত। এক দিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনেক মহিলা জড় হয়েছেন। সেই সঙ্গে এক দল ছোট ছোট মেয়ে, ফুলের মুকুট মাথায়, অতি গম্ভীর মুখে, রঙীন কাপড়ে সেজে এক দিকে ব'সে আছে। শুনলাম এরাই হচ্ছে এ বৎসর দেবতার মন্দিরের নাচিয়ে। এদের নাচই এবারে দেবতার কাছে পূজার অর্ঘ্যরূপে উপস্থিত করা হবে।

বন্ধুটি আরও বললেন, এই কয়টি মেয়ে এই শহরেরই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছে। একটি মেয়ে রাজপরিবারের, একটি মেয়ে এ-রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তার কন্যা, একটি মেয়ে কোন এক গ্রামের

মোড়লের দ্বারা প্রেরিত। একটি এ শহরের প্রধান পুরোহিত-পরিবারের ও অপরটি জনসাধারণ থেকে বেছে পাঠান হয়েছে। এরা সকলে এ রাজ্যের নানা অংশের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে নাচের অর্ঘ্য নিবেদন করতে এসেছে। এবং সঙ্গে আছে আরও কয়েকটি মেয়ে যারা এই দেবতার কাছে কোন অসুখে বা বিপদে মানত করেছিল যে, এই উৎসবের দিনে তারা দেবতার কাছে তাদের নাচের অর্ঘ্য নিবেদন করবে।



বালক-নর্ত্তক, রেগং নাচে দাঁড়কাকের ভঙ্গীতে

অল্পক্ষণ পরে সারি বেঁধে এক দল মেয়ে নানা প্রকার অর্ঘ্য মাথায় ক'রে এসে উপস্থিত, পিছনে তাদের বাজনার দল। একে একে, তাদের মাথার অর্ঘ্য মন্দিরের সামনে সাজানো হ'ল। অল্প দূরে অপর একটি মঞ্চে প্রধান পুরোহিত তার পূজার সামগ্রী নিয়ে বসলেন। স্থানটি নানা প্রকার অর্ঘ্যের দ্বারা পূর্ণ।

পুরোহিত এক মনে, আমাদের দেশের পূজারীদের মত ফুল, ঘণ্টা পবিত্র জল প্রভৃতি দ্বারা পূজার কাজ আরম্ভ করলেন। শৈব পূজারীদের মত আঙুলের নানা প্রকার ভঙ্গী। ইতিমধ্যে অপর পূজারী, এক হাতে ঘণ্টা অপর হাতে ধূপ ও নাচিয়ে মেয়ে কয়টিকে নিয়ে প্রধান দেবতার মন্দিরের চারি দিকে প্রদক্ষিণ সুরু করলেন। শান্তমূর্ত্তি পূজারী আপন মনে ধ্যানস্থ চিত্তে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন, পিছনে চলেছে নাচের ভঙ্গীতে মেয়ে কয়টি। নাচটি ছিল অতি সহজ অথচ সুন্দর। প্রত্যেক মেয়ের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা সকলে অত্যন্ত চিন্তিত, যেন তাদের নাচে কোন বিঘ্ন না আ[illegible] এই রকম শঙ্কিত মনোভাব। এই ভাবটিই এই নাচে দর্শনীয় বা উপলব্ধি করার বিষয়। পাশেই এই নাচে সঙ্গে মিল রেখে অতি সহজ সুরের একটি বাজনা বাজছি[illegible] কয়েকটি গামেলান-যন্ত্রে, তার মধ্যে দুটি কাঁসার পাতে ও বাকীগুলি বাঁশের।

তিন বার প্রদক্ষিণের পর বালিকারা সকলে মন্দিরে[illegible] সামনে দেবতার দিকে মুখ রেখে হাতজোড় করে প্রণা[illegible] করল। পূজারী মঙ্গলঘটের পবিত্র জল তাদের মাথা[illegible] প্রথমে ছিটিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপর জনতার দিকে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন।

এই দুটি ঘটনা আরম্ভেই উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এখানে নাচগানকে এরা যে কতখানি একান্ত আবশ্যক ব'লে গ্রহণ করেছে এদের জীবনে, তা দেখানো। ছবি আঁকায়, মূর্ত্তি গড়ায়, মন্দির-রচনায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় সেই আদর্শ। প্রত্যেকটি শিল্প এখনও এদেশে জীবন্ত। হয়ত অনেকে বলবেন, আজকাল শিল্পধারায় অনেক অবনতি হয়েছে। তাহলেও এই দরিদ্র পল্লীবাসীদের চিত্তে যে সরসতা আছে, অন্য কোন দেশের দরিদ্র অধিবাসীদের ভিতর তা আছে কিনা জানি না।

নাচ বাজনা এদেশের সকলেরই আনন্দের বস্তু—এ কথা আরম্ভেই বলেছি। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ ক'রে মাঝরাত পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই শুনতে পাওয়া যাবে গামেলান-সঙ্গীত। বিদেশীরা শুনে হয়ত ভাববে, বোধ হয় কোথাও কোন বিশেষ উৎসবের আয়োজনে গানবাজনা বা নাচ হচ্ছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা নয়; হয়ত দেখা যাবে গ্রামের নৃত্যশালায় বা সাধারণের কোনো সম্মিলন-স্থলে আমাদের দেশের চণ্ডী-মণ্ডপের মত গ্রামের বালক ও যুবকেরা আপন মনে গামেলান-সঙ্গীত অভ্যাস করছে, না-হয় নাচ অভ্যাস চলেছে।

এখানে বলা প্রয়োজন প্রত্যেক গ্রামেই একটি একত্র হবার স্থান গ্রামবাসীরা সকলে মিলে তৈরি করে। এটি

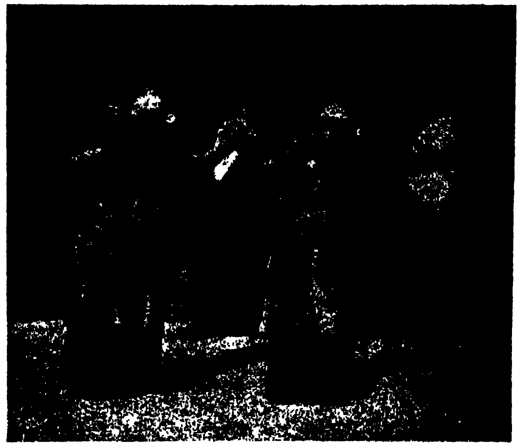
গ্রামের একান্ত আবশ্যক স্থান। গ্রামের যাবতীয় কাজ-কর্ম্মে, বিচার-আলোচনায় সকলে এখানে একত্র হয়। এই স্থানটি নৃত্যগীতের একটি প্রধান আড্ডা। গ্রামের গামেলান যন্ত্র, নাচের সাজ ইত্যাদি এখানে একটি ঘরে সব সময় মজুত থাকে। এ সবই গ্রামের সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি, সকলের সাহায্যেই এসব তৈরি হয়েছে। গ্রামে ভাল নাচিয়ে তৈরি করা, গামেলান-সঙ্গীতের ভাল দল থাকা সব গ্রামেরই একটি বিশেষ গৌরবের বস্তু।

সন্ধ্যাবেলায় সারাদিনের পরিশ্রমের পর, গ্রামের চাষী মজুর ইত্যাদি থেকে উচ্চবংশের ছেলে পর্য্যন্ত সকলে একসঙ্গে জড় হয় এই সঙ্গীতশালায়, বাজনা অভ্যাস, নাচ অভ্যাস, নূতন কিছু করার আলোচনা চলে। এইখানে এরা এই গানবাজনা ও নাচের ভিতর দিয়ে দিনের সব পরিশ্রম যেন সম্পূর্ণ ভুলে যায়।



বলীদ্বীপের বিখ্যাত লেগং-নাচিয়ে বালিকা, সাদি

দেনপাশার শহর থেকে কত রাত্রে গেছি পাশের গ্রামে, তাদের এই নৃত্যগীতের অভ্যাস দেখতে। দেখেছি, বালক ও যুবকরা তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে। এইখানে বৃদ্ধেরা থাকে না, এক জন দলপতি আছেন দেখলাম। তিনি নানা ভাবে শিক্ষার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। কোন রাত্রে নৃত্যাভিনয়ের কোন বিশেষ অংশের অভ্যাস হ'ল, প্রায় সব প্রধান প্রধান প্রবীণ নাচিয়েরা উপস্থিত। নানা ভাবে পরামর্শ চলেছে কি ভাবে গল্পটিকে খাড়া করতে পারা যায়। কোন রাত্রে দেখি বালক-বালিকাদের কোন বিশেষ নাচ গামেলান-সঙ্গীতের সঙ্গে শেখানো হচ্ছে। যদিও তারা বেশ পটু,



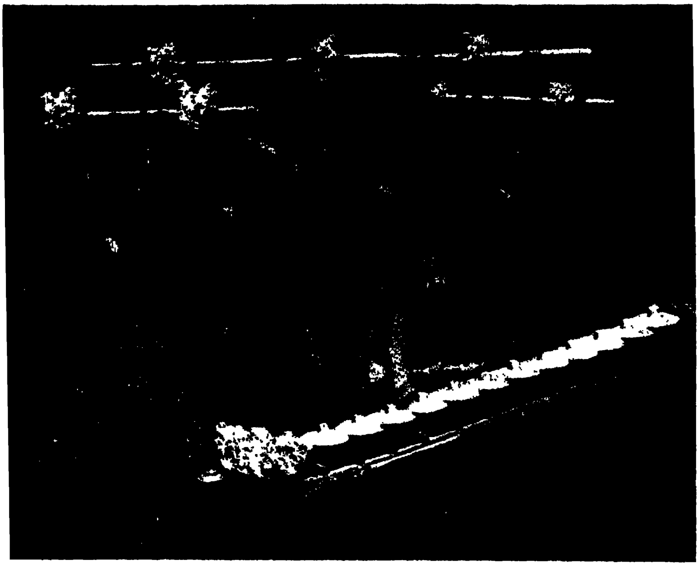
পাখা-হাতে দু-জন বালিকার লেগং-নৃত্যভঙ্গী

তবু এতটুকুও খুঁৎ রাখতে দিতে প্রবীণেরা রাজী নন।

এখন এদেশের প্রসিদ্ধ লেগং নৃত্য সম্বন্ধে লিখি। নাচ হিসাবে এইটি কি দেশী কি বিদেশী সকলেরই উপভোগের বস্তু। এ নাচটি এদেশের একটি প্রাচীন নাচ। সাধারণতঃ জনসাধারণের আমোদের উদ্দেশ্যেই এর সৃষ্টি। এ দেশের সকলের বিশ্বাস, এ নাচটি পূজা-নৃত্য "শ্যাংয়াং", "রজ্‌জাং", ও "গাম্বু" নামে একটি প্রাচীন নৃত্যাভিনয় থেকে উৎপত্তি। এই তিনটি নাচের ধরণ থেকে যা সুন্দর তাই যেন ছেঁকে নিয়ে লেগং নাচ তৈরি হয়েছে।

এ নাচের উৎপত্তির বিষয়ে একটি গল্প এদেশের বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়। কোন এক সময়ে এ দেশের এক নৃপতির কয়েকটি নৃত্যকুশলী রাণী ছিল। এক বার রাজার হঠাৎ ইচ্ছা হ'ল তিনি তাঁর রাণীদের নাচ দেখবেন। তৎক্ষণাৎ সেইরূপ আদেশ করলেন। এই নাচতে বলাকে এদেশের প্রাচীন ভাষায় বলে "লেগং"। এই নাচে রাণীরা চেষ্টা করেছিল রাজার মনোরঞ্জন করতে, রাজার মনও শোনা যায় রাণীদের সুন্দর নৃত্যে মুগ্ধ হয়েছিল।

এ নাচটি যে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যে সে দেখলেই বোঝা যায়। চোখের বঙ্কিম দৃষ্টি, মুখের



গামেলান বাদ্য

হাসি, দ্রুত লয়ে ঘাড়ের কাজ, এ নাচে আছে; কোমরের দোলা দেখলাম এদেশের সব নাচেই প্রায় চলতি। শোনা যায়, এইটি নাকি অতিআধুনিক কালে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নাচটি দেখতে ভাল লাগে। তার কারণ, এই নাচ যারা দেখায় তারা বালিকা, নাচের প্রচলিত অঙ্গভঙ্গীগুলিকে তার সাধারণ নৃত্যরীতি হিসাবেই দেখিয়ে যায়, তার বিশেষ অর্থ সম্বন্ধে তারা সজাগ বা সচেতন নয়, কাজেই দর্শকের কাছে নৃত্যই সর্ব্বপ্রধান হয়ে থাকে।

এই লেগং নাচে সাধারণতঃ তিনটি মেয়ে নাচে। এ নাচের ধরণ সাধারণতঃ কোণাকাটা (angular) হাতের ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে সব সময়ই তা প্রকাশ পায়; এদিকে দেহের ভিতর দিয়ে সব সময়েই যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মণিপুরী নাচের মত হাতের ভঙ্গী, দেহের ভঙ্গী ও মাথা সব যেন এক হয়ে চলতে থাকে। পায়ের তাল বা কাজ সহজ, কিন্তু খুব দ্রুত লয়ে পা ফেলে নাচতে হয়। হাতের দেহের ও মাথার ভঙ্গী দিয়ে সে-দিকটা তারা ফুটিয়ে তুলেছে। দেখে মনে হয় তাদের কাছে যেন এটা অতি সাধারণ খেলার মত।

এই নাচটা বিশেষভাবে ভ[...] প্রধান। পা, হাত, দেহ, মাথা ও সব মিলিয়ে যে যতখানি ভালো সাম[...] রেখে নিখুঁতভাবে নাচতে পার[...] সেই হবে সবচেয়ে ভাল নর্ত্তক নর্ত্তকী। শিক্ষকেরা ভঙ্গির দি[...] প্রখর দৃষ্টি রাখেন, যেন কোথ[...] শৈথিল্য প্রকাশ না পায়। প্রত্যে[...] অঙ্গ অন্য অঙ্গের সঙ্গে সুন্দর সামঞ্জ[...] রেখে চলে।

কথাটা আর একটু বিশদ ভা[...] বলা প্রয়োজন। আজকাল আমাদে[...] দেশের প্রায় সব আধুনিক নর্ত্ত[...] নর্ত্তকীরা শিব-নৃত্য দেখান। এক ব[...] অন্ততঃ তাঁরা নটরাজের বিখ্যাত নাচে[...] ভঙ্গীটি দর্শকদের না দেখিয়ে খু[...] হন না। কিন্তু সেই মূর্ত্তিকে নিখুঁত ভাবে অনুসরণ কর[...] প্রায় কাউকে দেখা যায় না। কেউ হয়ত দাঁড়ান বে[...] খাড়া হয়ে, কেউ হয়ে যান বেশী কুঁজো; কারু অপর [...] যতটা লম্বা করা প্রয়োজন তা করেন না। যদি আম[...] মেনে নি যে নাচের ভঙ্গী হিসাবে, নটরাজের ভঙ্গী ব্যালান্স নিখুঁত, তাহলে বলতে হয় এখনও পর্য্য[...] একটি নাচিয়েও পারেন নি নিখুঁত ভাবে নটরাজে[...] ভঙ্গীকে অনুসরণ করতে।

এই ব্যালান্সের দিক্ থেকে এরা অত্যন্ত সতর্ক বালির সর্ব্বত্রই লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—নাচিয়ের প্রত্যেকা ভঙ্গী সেই নাচের দিক্ থেকে নিখুঁত। কি ভাবে পা ফেলে দাঁড়ালে দেহ হাত ও মাথা সামঞ্জস্য রাখতে পারে, সেদিকে এরা বিশেষ লক্ষ্য রাখে। দ্রুত ছন্দের তালে যখন নাচছে তখনও এর ব্যতিক্রম হ'তে দেখা যায় না। এতখানি পাকা শিক্ষা তারা পায় অল্প বয়সেই। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে এরা কখনও পায়ে ঘুঙুর ব্যবহার করে না।

এ নাচের গঠনপদ্ধতি হ'ল গামেলান-সঙ্গীতকে লক্ষ্য ক'রে, আমাদের দেশের কথক নাচিয়েরা যেমন তবলা অথবা পাখোয়াজের তালের সঙ্গে মিল রেখে নাচ দেখায়।



লেগং-নাচে রাজা লাসেম রাজকুমারীর কাছে বিদায়-নিবেদন জানাচ্ছেন

এদের নাচ হ'ল সমগ্র গামেলান-সঙ্গীতের সঙ্গে মিল রেখে, গামেলান-সঙ্গীতকে নাচের ভিতর দিয়ে এরা ফুটিয়ে তোলে।

গামেলান-বাজনার পদ্ধতিতে নূতনত্ব আছে। সুর বা রাগিণী মাত্র একটি। কতকটা আমাদের দেশের বেহাগের আভাস তাতে আছে। শুনতে গ্রাম্য সঙ্গীতের মত বেশ মিষ্টি। বাজনার পদ্ধতিতে দেখি বৈচিত্র্য; কখনও দ্রুত লয়ে, কখনও ঢিমা লয়ে, কখনও খুব মৃদু শব্দে, কখনও প্রচণ্ড জোরে, কখনও একটি যন্ত্র, আবার কখনও অনেকগুলি একসঙ্গে বাজে। বাজনার ছন্দ এক লয় থেকে অন্য লয়ে প্রায়ই বদল হচ্ছে। কখনও হঠাৎ দ্রুত লয়ে চলে গেল ঢিমা লয় থেকে জোরের সঙ্গে, আবার তখনি একেবারে সব যন্ত্র একসঙ্গে চুপ, কোন শব্দ নেই, এবং পর-মুহূর্ত্তেই সশব্দে আবার আর এক লয়ে বাজনা সুরু হ'ল। সবচেয়ে শুনতে ভাল লাগে, যখন এক দল বাজিয়ে তাদের যন্ত্রে কেবলমাত্র সুরে ছন্দ বেঁধে চলে, দুই অথবা তিনটি সুরের উপরে; ও অপর দল, আমাদের দেশের যন্ত্রসঙ্গীতের ঝালাতে আলাপ করার যে রীতি, কতকটা সেই ধরণে নানা প্রকার ছন্দে একই রাগিণী বাজিয়ে যায়। এদিকে এই বৈচিত্র্যের মূল হচ্ছে এদের কাঠের ঢোল। এই দুই ঢোলের বাজনাই সব বাজিয়েদের ঠিক রাখছে। সঙ্গে আছে বড় বড় কাঁসার করতাল, ঢোলের বাজনার ছন্দে মিলিয়ে সেগুলি ঝম্‌ঝম্ শব্দে বাজে। কিন্তু তাই ব'লে যদি একে আমরা তুলনা করি আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে চলতি করতালের বাজনার সঙ্গে, তাহলে অন্যায় করা হবে। এরা গামেলান-সঙ্গীতের বাজনার সঙ্গে মিল রেখে শব্দকে জোর করে বা মৃদু করে। সঙ্গে একতারের রবাব ও বাঁশের বাঁশীও বাজে, কিন্তু এ-দুটি যন্ত্র কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গেই বেশী ব্যবহৃত হয়, নৃত্যসঙ্গীতে বড় দেখা যায় না।

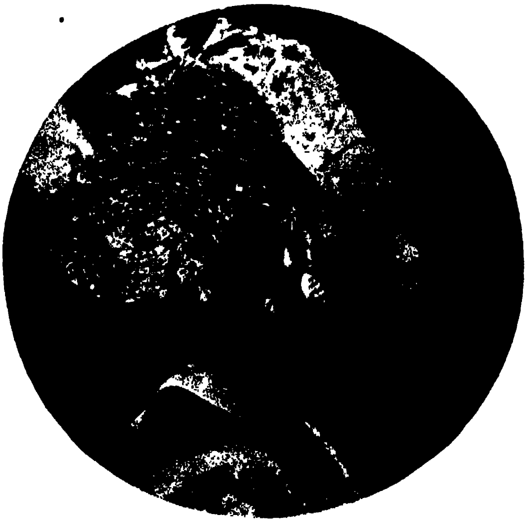
এদের সব নৃত্যসঙ্গীত বা নাচ কাওয়ালী ছন্দে এবং সাধারণতঃ দ্রুত লয়ের নাচ ও বাজনা। মধ্য লয়ে মাঝে মাঝে আসে, কিন্তু ঢিমা লয় এই নাচে কখনও দেখি নি।

এ নাচের সঙ্গে এদেশের একটি আধা-ঐতিহাসিক গল্প জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিনেতাদের সাজের



গ্রামের চাষী, গামেলান-বাদ্যনিরত

পার্থক্য বা বেশী অভিনেতার প্রয়োজন, বা কোন প্রকার সজ্জিত রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন এরা একেবারেই বোধ করে না। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, সন্ধ্যাবেলায়, কেরোসিনের



লেগং-নর্ত্তকীর মাথার চামড়ার মুকুট, ও কানের অলঙ্কার

আলোয় চারি দিকে গ্রামের দর্শকরা ঘিরে ব'সে গেছে, চারি দিকের অন্ধকার গাছপালার মধ্যে নাচ যেন ছবির মত দেখতে লাগে। সুন্দর কারুকার্য্য-করা নাচের সাজ-গুলি তখন যেন আরও সুন্দর নানা রঙের খেলা দেখায়।

আগে থেকে বিদেশী দর্শকরা এ গল্পের বিষয়বস্তু ভাল ক'রে না জেনে রাখলে কোন প্রকার মিল খুঁজে পাবে না। এই নাচের গল্পটা অবশ্য উপলক্ষ মাত্র।

গল্পটি হচ্ছে, "কেদরী" নামে একটি রাজ্যের রাজকুমারী "রংকেশরী"কে বিবাহ করবার জন্য "লাসেম" নামে এক দুর্দ্দান্ত নরপতি জোর ক'রে নিয়ে আসে তার পিতার কাছ থেকে। রংকেশরী বিবাহে নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করে, লাসেমের প্রেমে ধরা দিতে রাজী হয় না। এই রকম যখন অবস্থা তখন রাজার ডাক পড়ে যুদ্ধযাত্রায়। বিদায়ের পূর্ব্বে রাজা পুনরায় রাজকুমারীকে অনুরোধ করে তার প্রতি সদয় হ'তে; যুদ্ধযাত্রার পথে রাজকুমারীর প্রেমকে শুভ ব'লে মনে করবে (চিত্র দ্রষ্টব্য, পৃ ৯৫)। তবু রাজকুমারী রাজার প্রেমে ধরা দেয় না, আবেদন ব্যর্থ হয়। ক্রোধে রাজা ভয় দেখায়, রাজকুমারীর পিতাকে সে হত্যা করবে। যুদ্ধযাত্রার পথে, এক বিরাট দাঁড়কাক তার পথ আগলিয়ে তার যাত্রার অশুভ লক্ষণের কারণ হয় (চিত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯২)। রাজা পাখীকে হত্যা ক'রে যুদ্ধে যায়, কিন্তু সেই অশুভ লক্ষণই রাজার যু[দ্ধে] মৃত্যুর কারণ হয়।

নৃত্যাভিনয়ের আরম্ভে, চুপ ক'রে তিনটি মেয়ে ব'[সে] আছে গামেলান-বাজনার সামনে। সকলের সাজই খু[ব] উজ্জ্বল। মাথায় সোনালী রঙের চামড়ার মুকুট, কাঠে[র] কারুকার্য্য-করা ছোট ফ্রেমে নানা প্রকার রঙের কা[চ] বসানো। পিছনের চামড়াটি ত্রিকোণ হয়ে উপরের দি[কে] উঠেছে। মাথার দু-পাশের মুকুটে নানা রঙের ফুল ছো[ট] ডালসুদ্ধ লাগান। কখনও কখনও সোনার পাতে তৈ[রি] ফুলও দেখা যায়। পিছন দিকে খোলা চুল ঝুলিয়ে দে[য়], তাতে থাকে কাঠচাঁপা ফুল আটকানো। বুকে ও কাঁ[ধে] থাকে একসঙ্গে একটি চামড়ার নক্সাকাটা, একই পদ্ধতি[র] সোনালী সাজ, হাতেও তাই। পরনে থাকে রঙী[ন] কাপড়ের উপর এদেশী প্রথায় সোনালী রঙের নক্সাকাট[া] আঁটসাঁট লুঙ্গীর মত কাপড়, বেশ মোটা। কোম[র] থেকে বুক পর্য্যন্ত, চার আঙুল চওড়া একই ধরণের নক্সাকাটা রঙীন কাপড়ের বেশ লম্বা একটি ফিতে, খুব আঁট করে পেঁচানো থাকে। কোমরে[র] দু-পাশ থেকে দুটি আলাদা রঙীন চাদর ঝুলতে থাকে। কোমরে আলাদা একটি চামড়ার গয়না থাকে। বুক



লেগং নাচ। মাঝখানের মেয়েটি অন্য দু-জনকে দুটি পাখা দিতে যাচ্ছে।

থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত আর একটি চামড়ার নক্সাকাটা সাজ ঝুলছে থাকে। হাতে গায়ে থাকে আঁট নক্সাকাটা জামা,

গায়ের অংশটা দেখা যায় না চামড়ার সাজের দরুন। আমার হাতা হাতের সঙ্গে সম্পূর্ণ লেগে থাকে।

এরা মুখে এদেশী এক রকম ঈষৎ হলুদে রং মাখে, ভ্রু কালো রঙে ভাল ক'রে আঁকে, ঠোঁটে অল্প লাল রং লাগায়, দুই ভ্রুর মাঝখানে দেয় সাদা রঙের মোটা একটি টিপ্। এদেশে সব মেয়ের ভিতরেই কানের গয়না পরার রীতি আছে। গয়নাগুলি সাধারণ বেশ মোটা নলের মত দেখ্তে, দু-তিন ইঞ্চি লম্বা। অবস্থাপন্ন লোকেরা সোনার তৈরি ব্যবহার করে, গরিবরা করে শুক্‌নো সাদা নারকেল-পাতার তৈরি নলের মত। এই নাচিয়েদের কানের ফুটোতে সোনার কাজ করা নল থাকে, দেখতে সেটি বেশ সুন্দর।

এই তিনটি বালিকার সাজের মধ্যে মাঝেরটির সাজ অপেক্ষাকৃত সাধারণ। এই মেয়েটি নাচের সূত্রধার। একে এরা বলে "চন্ডং"। গামেলান-বাজনার সঙ্গে এ খালি-হাতে একটি উদ্বোধন-নৃত্য করে। তার পর কিছু দূরে মাটি থেকে এদেশী প্রথায় নক্সাকাটা ও কাপড়ে তৈরি দুটি জাপানী হাতপাখা তুলে নেয়। ইতিমধ্যে বাকী দুটি মেয়ে নাচ আরম্ভ করে। একসঙ্গে নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে এসে দুটি পাখা দু-জনে অপর বালিকার দু-হাত থেকে তুলে নেয়। (চিত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯৬১) এ দেশের মেয়েদের নাচে দাঁড়াবার একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে যা ভারতে বা ব্রহ্মদেশে কোথাও দেখি নি। এদের দাঁড়াবার ভঙ্গী অর্দ্ধেকটা হাঁটু মুড়ে এবং যতটা সম্ভব পিঠের মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে। এই ভাবেই তাদের সব সময় নাচতে হয়। একেবারে পা বা শরীর সোজা ক'রে নাচতে কখনও কোথাও দেখি নি। কটিদেশ থেকে দেহ ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে।

পাখা-হাতে এই মেয়ে দুটি নাচতে সুরু করলে, একই নিয়মে এক পদ্ধতিতে। প্রথম মেয়েটি কিছুক্ষণ অন্য দুটির সঙ্গে নাচবার পর বিদায় নেয়। এ দুটি মেয়ে পাখী-হাতে যত প্রকারে সম্ভব ঘুরে এপাশে-ওপাশে দ্রুত পদক্ষেপে নেচে যায়। এই নাচ পর্য্যন্ত উদ্বোধন-নৃত্য চলতে থাকে। এর পরে সুরু হয় গল্পের অংশ। যেখানে, যে-গ্রামের দলেরই নাচ দেখেছি, সেখানেই লক্ষ্য করেছি দুটি মেয়ের নাচের মিল এত চমৎকার যে মুখের পার্থক্য না থাকলে হয়ত মনে এক বার সন্দেহ হ'ত যে একই নাচিয়ে দুই হয়ে নাচছে, শিক্ষাদানের পদ্ধতি এমনই নিখুঁৎ।

দুটি মেয়েই গল্পের রাজা ও রাজকুমারী সাজে; নাচের পদ্ধতির কোন বিশেষ পার্থক্য হয় না, এবং এবারে অভিনয়ের দিকেই ঝোঁক দেয় বেশী। নৃত্যাভিনয় আরম্ভ হয় রাজা লাসেমের রাজকুমারীর কাছ থেকে বিদায় নেবার অভিনয় থেকে। রাজকুমারী বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বিদায় নেয় রঙ্গভূমি থেকে ও গামেলান-দলের মধ্যে বিশ্রাম নেয়।

এর পরে আসে প্রথম মেয়েটি, চামড়ায় আঁকা দুটি পাখীর পাখা হাতে নিয়ে। এই হচ্ছে গল্পের দাঁড়কাক। পাখীর পাখা হাতে নাচটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। দেনপাশার শহরের পাশের গ্রামের দলের "রেনৃডি" নামে একটি ছেলে এই পাখীর নাচ করে অতি চমৎকার (চিত্র দ্রষ্টব্য)। মাটিতে হাঁটু মুড়ে পা পিছনে দিয়ে বসে, লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। দুই হাতে পাখীর মত পাখা ঝাপ্‌টে যা নাচ দেখায় তা রীতিমত দুঃসাধ্য।

এই পাখীটি রাজাকে আক্রমণ ক'রে পাখার ঝাপটায় রাজাকে অস্থির ক'রে তোলে, রাজা অস্ত্রের দ্বারা পাখীর সঙ্গে যুদ্ধ করে, হাতের পাখা তখন হয় রাজার তলোয়ার। পাখীর মৃত্যু আর দর্শককে দেখানো হয় না, পাখী পলায়ন করে। এইখানে নৃত্যাভিনয়ের শেষ।

গল্পটিকে দুই ভাগ ক'রে নাচের মধ্য দিয়ে তা বর্ণনা করে। গল্পের সমস্ত ঘটনা, বর্ণনা ও কবিত্ব শ্রোতাদের কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এক বৃদ্ধ কথক থাকে গামেলান-সঙ্গীতের দলে, তার কাজ হ'ল আগাগোড়া গল্পটি নানা প্রকার কবিত্বপূর্ণ কথার দ্বারা প্রকাশ করা। এই কারণেই কথকের কথা ও নাচ উভয়ে মিলিয়ে না দেখলে এ নৃত্যাভিনয়ের ব্যাপার বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এখানে রাজার সাজ ও রাণীর সাজে কোন পার্থক্য নেই, পাখীর সাজেও নেই, কেবল হাতের দুটি পাখা ছাড়া। এ নাচের কোন পর্দ্দা নেই, আড়ালের দরকারও এরা বোধ করে না।

এটি নৃত্যাভিনয় ব'লে স্বভাবতই মনে হ'তে

পারে যে, কথক গানের সুরে সব ব'লে যাচ্ছে। আসলে কথক সাধারণ ভাবে উচ্চকণ্ঠে ব'লে যায় যাতে দর্শক সব শুনতে পায়। এই কথকই ঠিক অভিনেতাদের মত নানা প্রকার স্বরে প্রত্যেক অভিনেতার কথা ব'লে যাচ্ছে। যেখানে করুণ সেখানে সে নিজের গলায়ও সে কোমলতা আনতে চেষ্টা করে, এই রকম ভাবে বিভিন্ন ভাব কণ্ঠস্বরে প্রকাশের চেষ্টা করে। এদেশের অন্যান্য-নৃত্যাভিনয়ে অভিনেতারা নিজেরাই গান গায়, কথা বলে, এমন কি প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারতের গল্পেও তাই, কিন্তু এই নাচে সে-রকম হয় না। এখানে উল্লেখ করতে পারি যে, বালির কণ্ঠসঙ্গীত খুব ভাল মনে হয় নি। এদের নৃত্যাভিনয়ের গানগুলি ঠিক যেন কথা ব'লে যায় একই সুরে, কোন পরিবর্ত্তন নেই। আমাদের দেশের গ্রামের মেয়েদের বা পূজারীদের পাচালি পড়ার মত।

এ দেশে মেয়েদের মধ্যে সাধারণতঃ অঙ্গাবরণ ব্যবহারের রীতি বহুপ্রচলিত না হ'লেও, নৃত্যের সময় এরা এক-এক নাচে এক-এক রকমের অঙ্গাবরণ ব্যবহার করে।

বালির হিন্দুদের একটা গুণ, এরা নূতন কিছু গ্রহণ করতে কখনও নারাজ নয়। নৃত্যের মধ্যে সে মনোভাবের প্রকাশ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি। গ্রামের যারা নাচ-গান নিয়ে চর্চ্চা করে তারা প্রায় সকলেই সাধারণ চাষী বা মজুরশ্রেণীর লোক, অথচ সর্ব্বদা তারা ভাবছে কি ক'রে তাদের নাচ ও বাজনায় নূতনত্ব সঞ্চার করতে পারে। তাদের এই চেষ্টায় সজীব শিল্পী-মনের পরিচয় সুস্পষ্ট। তারই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা শেষ করি।

দশ-বারো বৎসর হ'ল এদেশে সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির একটি নাচের প্রচলন হয়েছে, তাকে বলে এরা "কবিয়ার"। এ নাচের প্রবর্ত্তক একটি গ্রাম্য চাষীর ছেলে। আজকাল সর্ব্বত্র এ নাচের বিশেষ চলন হয়েছে। দেশী-বিদেশী সকলের কাছেই এই নাচ প্রশংসা লাভ করেছে। এই অশিক্ষিত বালক যে-নৃত্যের রচনা করেছে তাতে তাকে অনায়াসে এক জন বড়দরের শিল্পী বলা যেতে পারে।

দেনপাশার

দার্জিলিঙে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জানালা খুলিয়া আছি, কুয়াশায় চারিদিক্ ছাওয়া,
সুমুখের গাছপালা সাদা হয়ে গেছে কুয়াশায়,
মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে, বহে আসে কন্‌কনে হাওয়া,
ঘরবাড়ী মুছে গেছে, ঢেকে গেছে ঘন আব্‌ছায়।

শীতের রাত্রির মত ঘনাইছে অলস আবেশ,
দিনের দুপুরবেলা বাষ্পমাঝে আপনা হারায়,
চেনা সে পৃথিবী নহে, অপরূপ স্বপনের দেশ,
এ কোন্ নূতন রাজ্য, ঘিরিয়াছে ছায়ার মায়ায়।

কুয়াশা সরিয়া যায়, ঘরবাড়ী ছবির মতন,
উঁচু নীচু পাহাড়ের কতদূর সোপানের মালা,
ফুল-পাতা, মেঘমালা ছবি আঁকে শতেক বরণ,
প্রকৃতি সাজায় নিতি অপরূপ সুষমার ডালা।

কত উঁচু ঢেউ জাগে, কত নীচে ঢেউ ভেঙে যায়,
আকাশের গায়ে হাসে পাথরের কঠিন সাগর,
তুষার-গিরির শির রুপালি মেঘেতে মিশে যায়,
আবার কুয়াশা এসে ঘিরে ফেলে দিক্‌দিগন্তর।

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ। সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। দেবী চৌধুরাণী, লোকরহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে এক টাকা, বারো আনা, চারি আনা, বারো আনা।

এই সংস্করণের পূর্ব্বে প্রকাশিত পুস্তকগুলির মত এই চারিখানিও ভাল কাগজে সুমুদ্রিত এবং সাবধানতার সহিত সম্পাদিত। প্রত্যেক পুস্তকে পূর্ব্ববৎ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "বিজ্ঞপ্তি" আছে।

'দেবী চৌধুরাণী'র ভূমিকায় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার গ্রন্থখানি কি অর্থে ঐতিহাসিক নহে, কি অর্থে বটে, তাহার আলোচনা এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ডাঙ্গা ও জলের সন্ধিস্থলে যে লাঠির কাছে সঙ্গীনের পরাজয় হইতে পারে, তাহার দুটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন। সম্পাদকীয় ভূমিকায় পরলোকগত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত দেবী চৌধুরাণীর মূলগত বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ দেওয়া হইয়াছে।

'লোকরহস্যে'র ভূমিকায় ইহার কোন্ রচনাটি বঙ্গদর্শন বা প্রচারের কোন্ সংখ্যায় ছাপা হইয়াছিল, তাহা বলা হইয়াছে। এই 'কৌতুক ও রহস্য' পুস্তকে আছে—

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল, ইংরাজ স্তোত্র, বাবু, গর্দ্দভ, দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন, বসন্ত এবং বিরহ, সুবর্ণ গোলক, রামায়ণের সমালোচন, বর্ষসমালোচন, কোন "স্পেশিয়ালে"র পত্র, Bransonism, হনুমদ্বাবুসংবাদ, গ্রাম্যকথা (প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা), বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর, এবং New Years Day। গ্রন্থের শেষে প্রথম ও শেষ সংস্করণের পাঠভেদ দেওয়া আছে। ভূমিকায় *Indian Magazine and Review* পত্রে প্রকাশিত "সুবর্ণ গোলকের" অনুবাদের উল্লেখ আছে। *The Modern Review*তে প্রকাশিত ডাঃ জে ডি এণ্ডার্সন কৃত "ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূলের" অনুবাদের উল্লেখও করা যাইতে পারে। তাহা পুস্তকাকারে প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "Indira and Other Stories" নামক পুস্তকে আছে।

"মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা; বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হইবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে পুস্তকাকারে ইহার একটিমাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

"গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক" বহিখানিতে যে সকল কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা যে কবিতা হিসাবে উৎকৃষ্ট নহে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র নিজে জানিতেন। তাহা হইলেও তাঁহার জীবনের ইতিহাস এবং তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশের ইতিহাসের দিক দিয়া এগুলি অবজ্ঞেয় নহে। আজকাল অনেকে "গদ্য কবিতা" লিখিয়া থাকেন। ইহার যে উপযোগিতা আছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অবগত ছিলেন। তিনি "গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক" বহির বিজ্ঞাপনে লিখিয়া গিয়াছেন:—

"কবিতা পুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি অনেকেই জানেন যে কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য্য। নহিলে কেবল কবি নাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা একপ্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ স্বরূপ তিনটি গদ্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। অনেকে বলিবেন, এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর এই যে, এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য, আমার পদ্যও সেইরূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।"

বঙ্গীয় মহাকোষ—প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, ১৭০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

এই সংখ্যায় "অধ্যাত্মবিজ্ঞান" সম্বন্ধীয় দীর্ঘ প্রবন্ধটি শেষ হইয়াছে। অন্য দীর্ঘ প্রবন্ধ "অধ্যাস"।

অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ (প্রণব অবলম্বনে ব্রহ্মচর্চা)—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় রচিত ভাষ্য অনুসরণে সম্পাদিত। সম্পাদক শ্রীমথুরনাথ গুহ, ৩ নং ফল্ডার ষ্ট্রীট, উয়ারী, ঢাকা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এই পুস্তিকার গোড়ায় সম্পাদকের লেখা একটি ভূমিকা আছে। ভূমিকা-সমেত পুস্তিকাটি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের কাজে লাগিবে।

পথের সঞ্চয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম সংস্করণ। মূল্য আট আনা মাত্র। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইয়া ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই পুস্তকের অধিকাংশ পত্রই সেই সময়ের মধ্যে লিখিত।...'পথের সঞ্চয়ে' সেগুলি পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।"

মূল বহিটির প্রত্যেকটি পত্র প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির নাম:—যাত্রার পূর্ব্বপত্র, বোম্বাই শহর, যাত্রা, জলস্থল,

সমুদ্রপাড়ি, লণ্ডনে, বন্ধু, ভাবুক সমাজ, সুটপকোর্ড, ব্রুক্স, কবি য়েটস্, ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি, অন্তর বাহির, বিচিত্র, সংগীত। পরিশিষ্টে যে সাতখানি চিঠি আছে, সেগুলি চিঠির আকারেই আছে। তাহার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিঠি দুটি আমাদের দেশের ধনী ও সচ্ছল অবস্থার মধ্যবিত্ত ঘরের ঘরণীদিগকে পড়িতে বলিতে ইচ্ছা হইল।

গাম্ভীর্য ও হাস্যকৌতুকের সুসমঞ্জস একত্র সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের অন্য বহুরচনার মত ইহাতে বহু স্থানে থাকায় ইহা সুখপাঠ্য। এরূপ গ্রন্থের একটি সুবিধা এই যে, ইহা যেখানে ইচ্ছা খুলিয়া পড়িলে আনন্দ পাওয়া যায় এবং বিনা উদ্বেগে অনেক জায়গায় থামা যায়। তাঁহার সমুদয় চিঠিপত্র তাঁহার বহির্জীবনের ও অন্তর্জীবনের ইতিহাসের এক-একটি টুকরা, এবং তাঁহাকে বুঝিবার উপায়ও বটে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী—প্রথম খণ্ড। বিশ্বভারতী, ২১০, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বাঁধাইয়ের প্রকারভেদে মূল্য ৪৷৹, ৫৷৹, ৬৷৹ ও ১০৲ টাকা।

পাঠকগণ অবগত আছেন, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিবার আয়োজন হইয়াছে। প্রায় পঁচিশ খণ্ডে সবগুলির প্রকাশ সমাপ্ত হইবে। প্রতি খণ্ডে ৬২০ হইতে ৬৬০ পৃষ্ঠা থাকিবে। অর্থাৎ প্রায় ১৬০০০ পৃষ্ঠার অধিক লেখা সমগ্র রচনাবলীতে থাকিবে। তদ্ভিন্ন কবির ইংরেজী রচনাবলী আছে। তাহা কয় হাজার পৃষ্ঠা গুনিয়া দেখি নাই। কবির প্রতিভার কথা ছাড়িয়া দিয়া, শুধু লিখিতে যে দৈহিক পরিশ্রম তাঁহাকে করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

২৫ খণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠা লম্বায় প্রবাসীর সমান, চৌড়ায় কিছু কম। পৃষ্ঠার সংখ্যা ৬৪৫+২৸৹। প্রথম খণ্ডে চিত্র আছে—রবীন্দ্রনাথ (বয়স ১৪), বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয় (সমুদয় অভিনেতার একত্র তোলা ফোটোগ্রাফ), রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহধর্মিণী, বিলাতে যুবক রবীন্দ্রনাথ, এবং ১৮৮০ সালের রচনার পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা।

প্রথম খণ্ডে যে সকল রচনা আছে তাহার আগে আছে—নিবেদন, ভূমিকা, প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞপ্তি, ও অবতরণিকা। রচনাগুলি চারি ভাগে বিভক্ত। কবিতা ও গান বিভাগে আছে—সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান; নাটক ও প্রহসন বিভাগে আছে—প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী; উপন্যাস ও গল্প বিভাগে আছে—বউ-ঠাকুরাণীর হাট; প্রবন্ধ বিভাগে আছে—য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। ইহার পর গ্রন্থপরিচয়ে রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, ও রচনাবলী সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ণতর তথ্য সংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।

প্রথম খণ্ডের মুদ্রাঙ্কণ অতি পরিপাটি হইয়াছে।

রবি-রশ্মি—পশ্চিম ভাগে [ক্ষণিকা হইতে তাসের দেশ পর্যন্ত।] পরলোকগত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, কর্তৃক বিশ্লেষিত। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লেখা নাই। ইহার পৃষ্ঠার আয়তন রবীন্দ্র-রচনাবলীর সমান। পৃষ্ঠার সংখ্যা ৩৮২+৸৹

রবি-রশ্মির প্রথম খণ্ড ছাপিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস পাঁচ বৎসর সময় লাগাইয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ড অপেক্ষাকৃত সত্বর ছাপিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় তাহা প্রকাশিত হইয়া উঠে নাই। ছাপা বেশ ভাল হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিয়াছেন। চারুবাবু তাঁহার বন্ধু ছিলেন, কিন্তু বন্ধু বলিয়া খগেন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন অত্যুক্তি করেন নাই, যতটুকু প্রশংসা না করিলে চলে না তাহাই করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) কাব্য ও কবিতার পারম্পর্য—তাঁহার চিত্তবিকাশের স্তরগুলি বুঝিবার পক্ষে রবিরশ্মি অনেক সহায়তা করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি। চারুচন্দ্র যে ভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্লেষণ, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ কাব্যানুরাগের ফল। তিনি একাধারে কবি, রসজ্ঞ ও সমালোচক ছিলেন। কাজেই রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভা বুঝিবার ও বুঝাইবার যোগ্যতা তাঁহার যেমন ছিল তেমন আর অধিক লোকের নাই। তিনি যে প্রণালীতে এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা অন্য অনেকের পক্ষে পথপ্রদর্শক হইবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় তাঁহার আরও সুযোগ হইয়াছিল কবির নিকট হইতে অনেক বিষয় যাচাই করিয়া লইবার। কাজেই রবি-রশ্মিকে নানা দিক্ হইতে প্রামাণিক মনে করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না; কারণ আমরা জানি যে গ্রন্থকার যে সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন অপরের পক্ষে তাহা সুলভ নহে। চারুচন্দ্র বিশ্বস্ত বন্ধু, সহযোগী সাহিত্যসেবী এবং অনুরাগী ভক্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।"

"পরিশেষে বলা আবশ্যক যে গ্রন্থকার রবি-রশ্মির পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন। পরিশিষ্টের আলোচনাগুলি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ কনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইয়াছে।" (সেগুলিও চারুবাবুর লেখা, ও হৃদয়গ্রাহী।)

তুঁহু মম জীবন—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ, ১৮।২ নং বাজে শিবপুর রোড, হাওড়া। মূল্য দুই টাকা।

ইহা একটি উপন্যাস। বড় অক্ষরে সুমুদ্রিত। পড়িতে আরম্ভ করিলে কৌতূহলের উদ্রেক হয় এবং তাহা নিবৃত্তির জন্য শেষ পর্যন্ত পড়া যায়। দু-একটা জায়গা ডিঙাইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেরূপ জায়গার সংখ্যা কম। শুনিয়াছি, আজকালকার কোন কোন উপন্যাস দুর্নীতির পরিপোষক। ইহা সেরূপ বহি নহে। ইহা পড়িয়া কাহারও অধোগতি হইবে না। অথচ ইহা উপদেশের ভারে ভারাক্রান্ত নহে। ইহার নৈতিক ঐকান্তিকতা (moral earnestness) এবং আত্মার স্বাধীনতার দিকে ঝোঁক লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার পাত্রপাত্রী সকলের আচরণ ও কথাবার্তা সকল স্থলে স্বাভাবিক মনে হয় না। ভ্রাতা আপন ভগিনীকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনার্থ এক জন পুরুষকে প্রলুব্ধ করিতে প্ররোচিত করিতেই পারে না বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা কেমন বিসদৃশ মনে হয়। টুসি ১৭ বৎসরের বালিকা বা যুবতী। সে পার্থের বাগ্‌দত্তা। পার্থের বয়স ২৫। উভয়েই পরস্পরের ভাবী দাম্পত্য-সম্পর্কের বিষয় অবগত। তথাপি যে পার্থের টুসির সহিত খুনসুড়ি, তাহা স্বাভাবিক মনে হয় না। অবশ্য তাহা অনাবিল ছেলেমানুষি। টুসি "উমা-মহেশ্বর" ব্রত উদযাপনের

পর তাহার আচরণ খুব স্বাভাবিক এবং তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। উপন্যাসটির শেষ বড় বেদনাদায়ক।

গল্পটিতে চা-খাওয়ার বড় বাড়াবাড়ি, ঠিক যেন চা-ব্যবসায়ীদের প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞাপন মনে হয়। সত্যই কি বাঙালী সমাজে চা-খাওয়ার এত আধিক্য হইয়াছে?

পাত্রপাত্রীদের কয়েক জনের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পার্থের মত চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

বলা বাহুল্য, গ্রন্থে অভিব্যক্ত সব মতের সঙ্গে আমরা একমত নহি। কোনও রাজনৈতিক দলের সব লোককে বা সব নেতাকে "বুদ্ধিজীবী ধূর্ত্ত" (৯৩ পৃঃ) বলা যায় না, কেহ কেহ বা অনেকে তাহা হইতে পারে। ২৪১ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অনেক কথাই তাঁহাকে ঠিক্ বুঝিতে না পারার এবং তাঁহার রচনাবলীর অযথেষ্ট জ্ঞানের ফল।

গ্রন্থকার বলেন, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আদর্শ রক্ষিত হচ্ছে না।" ইহা কোন কোন লেখকের রচনা সম্বন্ধে সত্য হইলেও সকলের পক্ষে সত্য নহে। অনেকের লেখায় আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কর্তৃক শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা।

এই বৃহৎ অভিধানের ১১তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। তাহার শেষ শব্দ "কেল" এবং পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯৪০।

ড.

আত্মজীবনী—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ., বি. এল. প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকার কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁহার 'দেবনাথ', 'লজ্জাদেবী', 'শ্রমিকের ছেলে' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহাকে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট পরিচিত করিয়াছে। এই 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে তিনি তাঁহার ঘটনাপূর্ণ জীবনের কাহিনী অকপটে বিবৃত করিয়াছেন। তাই এ কাহিনী বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

মনস্বী এমারসন্ Individual Uniqueness-এর কথা বলিতেন—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। মানুষ যে কত বিচিত্রতাপূর্ণ—সেই একমেবাদ্বিতীয়মের প্রতিচ্ছবি হইলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে কত প্রভেদ—অকপট আত্মকাহিনী হইতে তাহা জানা যায়। সেই জন্য autobiographyর এত সমাদর।

প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকারের পিতার কথা আছে। দুঃস্থ অনাদৃত অবস্থা হইতে স্বকীয় পুরুষকার দ্বারা তিনি কিরূপে নিজেকে সম্মানের পদবীতে উন্নীত করিয়াছিলেন, এ বিবরণ বেশ মনোহর। আমার মনে হয় গ্রন্থকার ঐ বিবরণ আর একটু বিস্তৃত করিলে পারিতেন।

গ্রন্থকারের নিজের উদ্যোগ ও উদ্যমের কাহিনীও কম শিক্ষাপ্রদ নয়। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাঁহাকেও অনেক সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। পিতা হইতে পুত্রে অর্জ্জিত গুণের সংক্রমণ ডারবিনের এই থিওরি যদি সত্য হয় তবে গ্রন্থকারের অধ্যবসায়ের উৎস কোথায় আমরা তাহা সহজে খুঁজিয়া পাই। জীবনসংগ্রামে গ্রন্থকারের পত্নী বস্তুতঃই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার পারিবারিক জীবনের পরিচয়ে বলিয়াছেন—'স্ত্রীর সঙ্গে জীবন কাটাইয়া যেরূপ সুখী হইয়াছি, এইরূপ সুখী কেবল ভাগ্যবান্ লোকেরাই হইয়া থাকে।' একেই বলে 'স্ত্রীভাগ্য'। বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে আমরা যাহাকে 'শুভবিবাহ' বলি গ্রন্থকারের বিবাহ ঐ শুভবিবাহই বটে।

এই আত্মজীবনীর সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ ('সাহিত্যচর্চা' ও 'তত্ত্বানুসন্ধান') আমার বেশী ভাল লাগিয়াছে। উকীল ও অধ্যাপক হইলেও গ্রন্থকার মর্ম্মতঃ সাহিত্যিক ও দার্শনিক। তাঁহার আর সব প্রচেষ্টা খোলস মাত্র—সাহিত্য ও দর্শন-চর্চাই তাঁহার অন্তঃসার। সেজন্য ঐ চর্চার বিবরণ বেশ মনোমদ হইয়াছে। কি উদ্দেশ্যে, কোন্ প্রেরণায় তিনি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন এবং 'ডটার অব হিন্দুস্থান' লিখিয়া ভারতমহিলার প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন—ইহা স্বভাবতই পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপিত করে। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রধান অবদান তাঁর ইংরাজীতে লিখিত 'ফিলজফি অব দি উপনিষদ্‌স্' (এই গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেন নাই কেন?)। উপনিষদের প্রতি আমার নিজের প্রচুর পক্ষপাত আছে। শোপেনহাওয়ারের সহিত আমিও বলিতে পারি উপনিষদই আমার জীবনে শান্তি ও মরণে স্বস্তি। অতএব এই আত্মজীবনীর যে অধ্যায়ে তিনি উপনিষৎতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও বিবরণ করিয়াছেন তাহা আমার বেশ মনঃপূত হইয়াছে। গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন—'মূল উপনিষদে বিষয়গুলি এরূপ সরলভাবে বলা হইয়াছে, পাঠকের বুঝিতে গোল একেবারেই হয় না; কিন্তু যত গোলের সূত্রপাত হয় সাম্প্রদায়িক টীকাকারের ভাষ্য পড়িবার সময়।' সেজন্য তিনি টীকারূপ মাকড়সার জাল ছিন্ন করিয়া উপনিষদের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমিও আমার গ্রন্থাদিতে ঐরূপ চেষ্টাই করি। আমার বিশ্বাস, যদি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গভীর ভাবে উপনিষদ্-বাণীর মনন ও নিদিধ্যাসন করা যায় তবে ধীরে ধীরে বুদ্ধির অন্তস্তমস নির্ভিন্ন করিয়া বোধির শুভ্রালোক ফুটিয়া উঠে। গ্রন্থকারের Philosophy of the Upanisad ঐ প্রণালীর গ্রন্থ। তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্তের সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই, তবে ঐ গ্রন্থের অনেক স্থল যে উপনিষদের আলো দ্বারা উদ্ভাসিত, একথা আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

যাহা হউক, এ বিষয়ের বিস্তার করিতে চাই না। এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক যে একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিবেন এখানে ইহাই আমার শেষ বক্তব্য।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সুশান্ত সা—শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত। কাত্যায়নী বুকষ্টল, ২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৫১২, মূল্য তিন টাকা।

বাংলা সাহিত্যে শরৎ-উত্তর যুগ ছোটগল্প-সাহিত্যের যুগ। এ যুগে ছোটগল্পের মধ্য দিয়া মহৎ সৃষ্টি যাহা হইয়াছে তাহার পরিমাণ প্রচুর না হইলেও হতাশাব্যঞ্জক নয়, দেশবিদেশের গল্প-সাহিত্যের আসরে প্রবেশপত্র পাইবার মত শক্তি বাংলা ছোটগল্প সঞ্চয় করিয়াছে। কিন্তু বৃহৎ সৃষ্টি এ যুগে আজ পর্য্যন্ত সম্ভবপর হইল না, যে কয়খানি হইয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত এক হাতের আঙ্গুলের চেয়ে বেশী নয়। শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় প্রথমেই সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করিয়াছেন—

একখানি ৫১২ পৃষ্ঠার বই হাতে লইয়া, একখানি বৃহৎ সৃষ্টি তাঁহার প্রথম দান।

বাংলার পল্লীর এক বন্ধিষ্ণু জমিদারের ঘরের ছেলের মর্ম্মান্তিক জীবন-কথা বইখানির কাহিনী। প্রথম পর্ব্বে সুশান্তের বাল্যস্মৃতির কাহিনী অতি সুন্দর—যাহাকে বলে মনোরম তেমনি মনোরম; হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুশান্তের সঙ্গেই বাংলার পল্লীর ছবি নূতন দৃষ্টিতে পাঠককে দেখিতে হয়, আপনার বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠে, তার পর সুশান্তের যৌবন ও বিবাহিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাজেডির সূত্রপাত হইল। শেষ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইবার পথে ধীরে ধীরে জীবনের গতিবেগের সহিত সমতা রাখিয়া লেখক দক্ষতার সহিত চলিয়াছেন। কিন্তু এইখান হইতে লিখন-পদ্ধতি বা ভঙ্গির ঈষৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আত্মকাহিনীর ভঙ্গি উপন্যাসের ভঙ্গিতে রূপ লইয়াছে, অর্থাৎ পরের কথা অত্যন্ত দরদের সহিত নিজের করিয়া লইয়া বলা হইয়াছে। মর্ম্মান্তিক দুঃখকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অবশেষে গভীর বিয়োগান্ত পরিণতিতে বইখানি সুসমাপ্ত। নায়কের চরিত্র অসাধারণ নয় কিন্তু ঘটনার চক্রে চক্রে আবর্ত্তিত হইয়া সে সর্ব্বহারা আত্মহারা পরিশেষে খুনীর মূর্ত্তিতে যখন কাঠগড়ায় উপনীত হইয়াছে তখন সে অসাধারণ। পার্শ্বচরিত্রগুলিও সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ। সুশান্তের দাদা একটি চমৎকার চরিত্র। তাহার বউদিদি বাঙালীর ঘরের ঘর-আলো-করা বড় মঙ্গললক্ষ্মী, এই মেয়েটি থাকিলে এমন ঘটনা ঘটিত না ইহা নিশ্চিত। দুঃখিনী মেয়ে সাবিত্রীও সুন্দর হইয়াছে। সুশান্তের স্ত্রী রূঢ় বাস্তবের প্রতিমূর্ত্তি। আলি মিঞা সুন্দর। ত্রুটিবিচ্যুতি খুব অল্পই, কিন্তু এত বড় বইয়ের মধ্যে তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং নগণ্য।

আয়তি—শ্রীপ্রবোধ ঘোষ। লেক বুকষ্টল, ৫১ বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। ১৪৪ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

গল্পগুলি সব দিক দিয়া বৈশিষ্ট্যযুক্ত। প্রথম বৈশিষ্ট্য ইহার আয়তন—তিন পৃষ্ঠা চার পৃষ্ঠায় সুন্দর সুসমাপ্ত এক-একটি গল্প, সকলের চেয়ে বড় গল্পের পরিধি সাত পৃষ্ঠা। তাহার পর পড়িতে গেলেই চোখে পড়ে লেখকের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকাশভঙ্গি। অত্যন্ত ছোটখাট ঘটনা অহরহ সর্ব্বত্র ঘটিতেছে, কেহ লক্ষ্য করে না, এমন কি যাহার জীবনে ঘটে সেও মনে রাখে না, সেইগুলি শিল্পীর মনে ধরা পড়িয়াছে এবং নিষ্ঠার সহিত অকপটে তাঁহার সত্য রূপ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—তবুও তাহা অসাধারণ হইয়া পাঠকের চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভূমিকা লিখিয়াছেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট মনীষী বীরবল শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। ভূমিকায় দেখিলাম লেখক 'সবুজ পত্রে'র লেখক। সুতরাং ভরসা করিয়া প্রবীণ বলিতেছি, প্রবীণ লেখকের পরিণত মনের দান পাইলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন ব্যবধান—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৭৪। মূল্য ২৲।

প্রথম জীবনে মনীষী নীলিমাকে ভালবাসে। রূপ-যাচাইয়ের কষ্টিপাথরে নীলিমা নিখুঁৎ প্রমাণিত না হওয়ায় মনীষীর মাতার অমতের জন্য বিবাহ হইল না। মনীষী স্থির করিল ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি লইয়াই সে জীবনটা কাটাইয়া দিবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মায়ের আগ্রহাতিশয্যে তাহাকে ইন্দুমতীকে বিবাহ করিতে হইল। এই নূতন জীবনের একা প্রবাহে হঠাৎ একটি আবর্ত্ত সৃষ্টি করিল নীলিমার মনীষীকে লেখা এক চিঠি—নীলিমার বিবাহ হইয়াছিল, বিধবা হইয়াছে, এই খবর। এ অসাবধানতার জন্য চিঠিখানি ইন্দুমতীর হাতে পড়ে। তাহার নানা জটিলতার সৃষ্টি।

এই যে প্রথম জীবনের ব্যর্থ প্রেম উত্তর-জীবনে মনীষী আর ইন্দুম নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যেও একটা দুরত্ব সৃষ্টি করিয়া রাখিল, গ্রন্থক এর করুণ রূপটি ভালভাবেই ফুটাইয়াছেন। তবে বইয়ের স্থানে প্রয়োজনাতিরিক্ত বাগ্‌বিস্তারের দোষ আছে; যেমন, শুধু লইয়া দীর্ঘ অধ্যায়টি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। এই সব স্থানে কলম এ সংযত করিলে বইটি আরও সুখপাঠ্য হইত।

পথিক মানুষ—শ্রীসুদর্শনম্। সাহিত্য-বিহার, ৪৬।৪ হ্যারি রোড, কলিকাতা।

শরৎচন্দ্রের জীবনের কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে অল্পবিস্তর কল্পনা সংযে করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি লিখিত। পত্র-সংখ্যা লেখা নাই; গুনি দেখিলাম ৩১ পৃষ্ঠা। এও একটা নূতনত্ব আরম্ভ হইল নাকি?

অল্প পরিসরের মধ্যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবনের মূল সুর ফুটিয়াছে মন্দ নয়। বড়দের পরিচিত করিবার জন্য সস্তা সংস্করণে এ-রকম বইয়ের প্রয়োজন আছে। তবে চার আনা মূল্যের মধ্যে ছাপা কাগজ আর একটু ভাল আশা করা যায়।

মরূদ্যান—বিশ্ব বিশ্বাস। আর্য পাবলিশিং কোং, ২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য দশ আনা।

চুরাশি পাতার একখানি উপন্যাস। একরাশ 'চরিত্র' এবং তদনুরূপ ঘটনার অবতারণা করিয়া অল্প পরিসরের মধ্যে বইখানি শেষ কর হইয়াছে, সুতরাং কিছু ভাল করিয়া ফুটিবার অবসর পায় নাই মনে হয় আরও একটু ধৈর্য্যের সঙ্গে বিস্তারিত করিয়া লিখিলে লেখক কতকটা সফলকাম হইতেন। কেন না, অধৈর্য্যই তাঁহার সবচেয়ে বড় দোষ বলিয়া মনে হইল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কোণার্ক মন্দির—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়। পুরী বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ্ হইতে গ্রন্থকার। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৪৬+১৯ চিত্র।

ইহাতে মন্দিরটির সম্বন্ধে অনেক সংবাদ দেওয়া আছে। ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার স্থানে স্থানে নূতন খবর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ছবিগুলি থাকায় মন্দিরের বর্ণনা বুঝিতে পাঠকের কোনও অসুবিধা হয় না। একটি ছবিতে সামান্য ভুল দেখিলাম। ৩৫ পৃষ্ঠায় যাহা "কোণার্কের মন্দির দেওয়ালের একপার্শ্ব" বলিয়া ছাপা হইয়াছে তাহা যথার্থ ভুবনেশ্বরে রাজারাণী মন্দিরের পশ্চিম ভাগের চিত্র।

যাত্রীদের উপযোগী অনেক সংবাদ আছে বলিয়া ইহা সকলের উপকারে আসিবে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ১০ই আশ্বিন পার্লেমেণ্টের লর্ড সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিতর্ক পুনরায় আরম্ভ হইলে লর্ড স্নেল অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

"কংগ্রেসীরা যে বর্ত্তমান সঙ্কটের সুযোগ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের রাজনৈতিক দাবীগুলি আদায়ের ইচ্ছা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। এই দাবীগুলি নূতন নহে। এগুলি একটি খুব পুরাতন কর্ম্মসমষ্টির একটা অংশ এবং এগুলি এখন কেবল পুনর্ব্বার বিবৃত করা হইতেছে।...ভারতীয়দের নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ আমরা বুঝি। ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসনের বৃদ্ধি আমরা চিরকালই ইচ্ছা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কখন কখন এমন সময় আসে যখন, যে-অবস্থায় পথ স্পষ্ট দেখা যায় না তাহাতে তাড়াতাড়ি করা অপেক্ষা, দাবী করিতে থামিলেই বেশী অগ্রসর হইতে পারা যায়।...আমাদেরও অনেক সামাজিক পরিকল্পনা আছে; সেগুলি আমাদিগকে এখন স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।"

অর্থাৎ শান্তির সময়ে ভারতবাসীদের কথা হয় কানেই তুলিব না কিংবা বলিব, "থাম থাম, রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই", এবং যুদ্ধের সময় বলিব, "এখন ওসব কথা তোলা কি ভাল? দেখিতেছ না, আমরাও আমাদের অনেক সামাজিক পরিকল্পনা স্থগিত রাখিয়াছি।" কিন্তু যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা পোল্যাণ্ডের যে জিনিষটির (অর্থাৎ স্বাধীনতার) জন্য লড়িতেছেন, ভারতীয়েরা সেই জিনিষটিই চায়। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য লড়িব, অর্থব্যয় লোকক্ষয় অজস্র করিব, কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা তুলিলেই বলিব, "এখন না," ইহার রস আমাদের উপভোগ্য নহে। অ-স্বাধীনকে অপরের স্বাধীনতার জন্য লড়িতে বলার অসঙ্গতি ইংরেজরা কেন বুঝিতে পারেন না বা চান না তাহা বুঝা কঠিন নহে। লর্ড স্নেল বলিতেছেন, তাঁহারাও তাঁহাদের অনেক **সামাজিক** পরিকল্পনা স্থগিত রাখিয়াছেন। কিন্তু পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা জার্ম্মেনী কায়েমী রকমে লুপ্ত করিতে পারিলে ইংলণ্ডের স্বাধীনতাতেও আঘাত লাগিতে পারে বলিয়া, ইংলণ্ড নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পরোক্ষভাবে আবশ্যক যুদ্ধ-রূপ এই **রাজনৈতিক** পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখেন নাই। ভারতবাসীরাও তাহাদের **রাজনৈতিক** পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখিতে চায় না। তাহাদেরও **সামাজিক** অনেক পরিকল্পনা স্থগিত আছে। ইংলণ্ডের সহযোগিতা করিব না, ভারতবর্ষ ত ইহা বলিতেছে না, ...বরং ইহাই বলিতেছে, "আমাকে এরূপ অবস্থায় স্থাপিত কর, যাহাতে আমি পূর্ণমাত্রায় সোৎসাহে সহযোগিতা করিতে পারি।" বস্তুতঃ প্রকৃত সহযোগিতা সমান অবস্থাপন্ন পক্ষদিগের মধ্যেই হয়, কিন্তু অধীন যে সে শুধু স্বাধীনের অনুবর্ত্তন করিতে পারে—যদিও স্বাধীন পক্ষ তাহাকে সহযোগিতা বলিতে পারেন।

লর্ড স্নেল বলিতেছেন তাঁহারা ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসনের **বৃদ্ধি** চিরকালই ইচ্ছা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহার **পূর্ণতাপ্রাপ্তি** কোন্ সময়ে চান? কখনও চান কি?

লর্ড স্নেল আরও বলেন :—

"যখন সময় আসিবে তখন আমরা তৎসমুদয় (অর্থাৎ সামাজিক পরিকল্পনাগুলি) ভুলিয়া থাকিব না, কিন্তু প্রথম কাজ প্রথমে করিতে হইবে। অতএব, পৃথিবীর যে-সকল অংশে স্বাধীন মানুষেরা বিদ্যমান আছে তাহাদের সম্মুখে প্রথম কৃত্য রহিয়াছে অবৈধ আক্রমণের প্রতিরোধ করা, যাহাতে সর্ব্বত্র স্বাধীন লোকেরা অনুভব করিতে পারে যে, তাহারা স্বাধীন জগতে বাস করিতে সমর্থ হইবে। ভারতবর্ষ এই মহৎ উপকারগুলির অংশী হইবে...।"

লর্ড স্নেল যখন তাঁহার বক্তৃতার এই অংশে পুনঃ পুনঃ 'স্বাধীন' কথাটি ব্যবহার করিতেছিলেন তখন তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন জগতের অংশ বলিয়া মনে করিয়া-ছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত শেষ বাক্যটিতে ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহারে মনে হইতেছে যে, তিনি ভুলিয়া যান নাই যে ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে স্বাধীন জগতের অংশ নহে; তিনি এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, ভারতীয়েরা **ভবিষ্যতে** অনুভব করিতে পারিবে তাঁহারা

স্বাধীন মনুষ্য ও স্বাধীন জগতে বাস করিতে সমর্থ হইবে। ঐ ভবিষ্যৎটা কখন আসিবে আমরা তাহাই জানিতে চাই। এখন যাহারা স্বাধীন, তাহাদের অনুভূতি এখনই অনেকটা ঐ প্রকার। নিশ্চিত বর্ত্তমান ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে এই প্রভেদ বোধ হয় লর্ড স্নেল তুচ্ছ মনে করেন।

ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড লর্ড সভায় ঐ দিন অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

"লর্ড স্নেল বলিয়াছেন, ইহা স্বাভাবিক, যদিও ইহা সময়ের অনুপযোগী যে, কংগ্রেসের নেতারা, তাঁহারা বর্ত্তমানে যে প্রকার স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী, তাহা অপেক্ষা পূর্ণতর* রূপের স্বশাসনের প্রতি লক্ষ্যের পুনর্ঘোষণা এই সুযোগে করিয়াছেন। ইহা যে স্বাভাবিক, তাহা আমি পূর্ণ উপলব্ধি করি। কংগ্রেস প্রচেষ্টার অনেক নেতাকে আমি জানি। তাঁহারা জ্বলন্ত দেশ-হিতৈষণা দ্বারা অনুপ্রাণিত মানুষ; তবে, আমি মনে করি, তাঁহারা নক্ষত্রের দিকে চক্ষু উত্তোলন করিয়া থাকিবার সময় কখন কখন তাঁহাদের পায়ের নীচের মাটির বাধাবিঘ্নের কথা কিঞ্চিৎ ভুলিয়া যান। কিন্তু যদিও আমি ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, তাঁহাদের দাবীগুলি জোর করিয়া বলিতে এই সংকট সময়ের সুযোগ গ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে, তথাপি আমার মনের এই ভাব প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, তাঁহারা যে তাঁহাদের দাবী পুনর্ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত এই সময়টা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। একাধিক কারণে আমি ইহা বলিতেছি। আমি মনে করি, ব্রিটিশ জাতি কোন বিশেষ সময়ের উপযোগী ও সম্মানকর ("অনারেবল্") ব্যবহারের গুণগ্রাহী।"

তাহা গত যুদ্ধের পর ভারতের প্রতি ব্রিটেনের ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। এখানে ভারতসচিব কি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, 'এখন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী করা ভারতবর্ষের পক্ষে "ডিস্-অনারেব্‌ল্" হইয়াছে?

লর্ড জেটল্যাণ্ড আরও বলেন :—

"জীবন-মরণ সংগ্রামকালে যাহাতে ব্রিটিশ জাতি বিব্রত হয় সেরূপ দাবী উপস্থিত করায় তাহাদের মন ক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট থাকিলে তাহারা যথাসময়ে ভারতবর্ষের দাবীতে ততটা কান দিবে না, যতটা বিপরীত অবস্থায় (অর্থাৎ এখন দাবী উপস্থিত না করিলে) দিবে।"

লর্ড জেটল্যাণ্ড এইরূপ আরও অনেক কথা বলেন। যুদ্ধের অবসানে ভারত পূর্ণ স্বরাজ পাইবে, এইরূপ ঘোষণা করিতে ব্রিটেনকে কেন বিব্রত হইতে হইবে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

এইরূপ বক্তৃতা দ্বারা ভারতসচিব ভারতীয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা, অতএব সেই জাতিকে চটান উচিত নয়; তাঁহাদিগকে তুষ্ট রাখিতে পারিলে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন দিতে পারেন। এই সুরের কথা ইহার আগেও অনেক ব্রিটিশ রাজনীতিক বলিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের স্বশক্তিবোধ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু ভারতীয়দের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে এরূপ প্রভুজনসুলভ ভাষার পরিহার কর্ত্তব্য। এরূপ ভাষা দ্বারা ভারতবাসীরা আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করে না।

ভারত-সচিবের কথায় মহাত্মা গান্ধীর জবাব

সুতরাং ভারতবর্ষের আত্মসম্মানবোধের প্রতীক ও মুখপাত্ররূপে মহাত্মা গান্ধী যে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব না করিয়া ভারতসচিবের কথার নিম্নলিখিত রূপ জবাব দিয়াছেন, তাহা মানব স্বাধীনতার প্রকৃত প্রেমিক ইংরেজরাও, আশা করি, স্বাভাবিকই মনে করিবেন :—

"লর্ড সভায় ভারতীয় ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কের রয়টার-প্রেরিত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আমাকে দেখান হইয়াছে। এ সময়ে আমি চুপ করিয়া থাকিলে হয়ত তাহা দ্বারা ভারতবর্ষ ও ব্রিটেন উভয়েরই সেবার বিপরীত কাজ করা (অর্থাৎ ক্ষতি করা) হইবে। আমি এই মত পোষণ করি যে, কংগ্রেস দেশের সব ধর্ম্মসম্প্রদায় জাতি ও শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। কাহাকেও বিরক্ত করিবার অভিপ্রায় না রাখিয়া, কংগ্রেস সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই প্রতিষ্ঠান অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন ভাবে শ্রেণী ও ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে। মুসলমানদের অথবা দেশী রাজ্যের প্রজাদের স্বার্থের বিরোধী ইহার কোনই স্বার্থ নাই। সম্প্রতি কয়েক বৎসরের কার্য্য দ্বারা অভ্রান্তভাবে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কংগ্রেস নিঃসন্দেহ দেশী রাজ্যের লোকদের স্বার্থরক্ষণশীল প্রতিনিধি।

এই প্রতিষ্ঠানই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা চাহিয়াছে। যদি ব্রিটিশ জাতি বাস্তবিক সকলেরই স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে, তাহা হইলে তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে যত দূর সম্ভব স্পষ্ট ভাষায় ইহা বলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবীরূপে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। এই ভারতীয় স্বাধীনতার উপাদানভূত বস্তু কেবল ভারতীয়েরা এবং একমাত্র তাহারাই নির্দ্ধারণ করিতে পারে। লর্ড জেটল্যাণ্ড যে অভিযোগ করিয়াছেন—যদিও মোলায়েম ভাষায় করিয়াছেন—যে, এই সঙ্কট

* কংগ্রেস-নেতারা বর্ত্তমান অপেক্ষা "পূর্ণতর" স্বায়ত্তশাসন চান না, "পূর্ণ স্বরাজ" বা স্বাধীনতা চান।

কালে, যখন ব্রিটেন জীবন-মরণের সংগ্রামে ব্যাপৃত, তখন কংগ্রেস ব্রিটিশ অভিপ্রায়ের স্পষ্ট ঘোষণা চাহিয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার পক্ষে অন্যায়। আমি বলিতে চাই যে, এইরূপ ঘোষণা দাবী করিয়া কংগ্রেস অদ্ভুত বা আত্মমর্য্যাদাসঙ্গত অপেক্ষা অপকৃষ্ট কিছু করে নাই। কেবল স্বাধীন ভারতের সাহায্যই মূল্যবান্ এবং কংগ্রেসের ইহা জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, ইহা ভারতবর্ষের লোকদের নিকট গিয়া বলিতে পারিবে যে, যুদ্ধের শেষে স্বাধীন দেশ বলিয়া ভারতবর্ষের পদবী ও মর্য্যাদার নিশ্চয়তা ব্রিটেনের স্বাধীন দেশ বলিয়া পদবী ও মর্য্যাদার নিশ্চয়তার সমান হইবে।

অতএব, আমি ব্রিটিশ জাতির বন্ধুরূপে ব্রিটিশ রাজনীতিকদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন বুলি যেন ভুলিয়া যান এবং সকলের জন্য নূতন অধ্যায় আরম্ভ করেন।"

বস্তুতঃ তাঁহারা তাহা না করিলে, বড়লাট যত নেতার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা চালান না কেন, সমস্তই সময় ও শক্তির অপচয় হইবে।

—

গান্ধীজীর স্বাধীনতার দাবী

গান্ধীজী তাঁহার জবাবে স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা সঙ্গত ও ন্যায্য মনে করি। সেই মর্ম্মের কথা আমরা আশ্বিনের প্রবাসীর জন্য ১৮ই ভাদ্র ৪ঠা সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিলাম। যথা—

"যে-কোন বিদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। সেই জন্য এই যুদ্ধে ব্রিটেনের সাহায্য করিতে ভারতবর্ষের আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু অন্যকে স্বাধীন রাখিবার জন্য ভারতের মানুষেরা প্রাণ দিতে ধন দিতে প্রস্তুত হইবে অথচ তাহারা নিজে অধীনতায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক নহে। এই জন্য আমরা চাই, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট আক্রান্ত স্বাধীন বিদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত স্বাধীন ভারতীয়দিগকে স্বাধীন ভাবে সাহায্য করিতে অনুরোধ করুন, ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে অনুরোধ করুন।

"অনেকে উপদেশ দিতেছেন, ব্রিটেনের এই সঙ্কটের সময় কি সর্ত্তে ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে সাহায্য করিবে সে বিষয়ে কোন দরদস্তুর না করিয়া তাহাকে সাহায্য করুন। দরদস্তুর করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু উপদেশ, অনুরোধ, বা হুকুমে মানবপ্রকৃতি বদলায় না। যে অধীন, তাহাকে অপরের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে আহ্বান করিলে সে মানব ধর্ম্মের খাতিরে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু স্বভাবতই উৎসাহবোধ না করিতে পারে।" (আশ্বিনের প্রবাসী, ৮৬১-৬২ পৃষ্ঠা।)

গান্ধীজী যে ধাঁচের কথা বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতৃবর্গ তাঁহাদের গত ৮ই সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতে ব্রিটেনের সহযোগিতা করার সমর্থন করিয়া সেই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন। যথা—

"সকলকেই, কথায় নহে, কার্য্যে ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হইতে হইবে যে, তাহারা যেমন অন্যদের সেইরূপ তাহাদের নিজেদের দেশ রক্ষার জন্য এবং নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে।"

"এই সঙ্কটকালে ব্রিটেনের প্রতি ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য যদি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহাও কম সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।" "ব্রিটেনের পক্ষে নূতন দিক্ হইতে নূতন ভাবে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা নাই। যে জাতি পরাধীন, সে জাতি যদি এ কথা বুঝিতে না পারে যে, যুদ্ধ করিলে তাহার স্বাধীনতা অর্জিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অন্য কোনও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে আগ্রহ বোধ করা স্বাভাবিক নহে।"

"গণতন্ত্র-রক্ষাকল্পে স্বাধীন ভারত যাহাতে স্বাধীন ভাবে সর্ব্ব প্রকার সম্ভাব্য সাহায্য করিতে পারে, তজ্জন্য ব্রিটেন জগতের শান্তির খাতিরে ভারতবর্ষে স্বশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের এই মহা সুযোগ যেন না হারান।"

—

লর্ড স্নেলের অতি-চাতুর্য্য ও মুরুব্বিয়ানা

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বিলাতের লর্ড-সভায় ভারতীয় ব্যাপার সমূহের আলোচনার সময় অন্যান্য কথার মধ্যে লর্ড স্নেল বলেন :—

"কংগ্রেসওআলারা যেরূপ মনোভাব অবলম্বন যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।"

অর্থাৎ কিনা, কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, তাহাকে উপেক্ষা করিলেই হইবে। এই রূপ ভাব দেখাইয়া ব্রিটিশ রাজনীতিকরা ভারতীয় নেতাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে চান। কিন্তু কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটিকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে যে কিঞ্চিৎ বিভ্রাট ও অসুবিধা ঘটিতে পারে, সেই আশঙ্কা লর্ড জেটল্যাণ্ডের মুরুব্বিয়ানাপূর্ণ নিম্নমুদ্রিত কথাগুলির মধ্য দিয়া উঁকি মারিতেছে।

আমি আর এক কারণে দুঃখিত। শাসন-ব্যাপারে বাস্তব-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বহু অগ্রগণ্য ভারতীয় স্বাজাতিক ('ন্যাশন্যালিষ্ট') এখন প্রাদেশিক গবর্মেণ্টে থাকায় ভারতের খুব সুবিধা হইয়াছে, লর্ড স্নেলের এই কথা আমি মানি। এই সময় এই সকল লোক যদি প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট হইতে সরিয়া যান,

তাহা হইলে উহা অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইবে। তাঁহারা প্রমাণ দিয়াছেন যে, তাঁহাদের দেশের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের যোগ্যতা তাঁহাদের আছে এবং তাঁহারা গবর্ণরদের সহিত চমৎকার সহযোগিতা করিয়াছেন। যুদ্ধ বাধায় যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন হইয়াছে, সে সকল বিষয়ে তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত যে ভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের প্রশংসা করি। অতএব আমি বলিতেছি যে, কংগ্রেস-নেতারা তাঁহাদের দাবী পুনর্ঘোষণার সময় ভাল নির্ব্বাচন করেন নাই।

অর্থাৎ ভারতসচিবের আশঙ্কা এই যে, কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রায়ের যেরূপ ঘোষণা চাহিয়াছেন, তাহা না পাইলে আটটি প্রদেশের মন্ত্রীরা ইস্তফা দিতে পারেন। তাঁহাদের প্রশংসারূপ পিঠ চাপড়াইবার ইহা একটি কারণ। লর্ড স্নেলও এইরূপ মুরুব্বিয়ানা করিয়াছিলেন। যথা—

"ভারতশাসন-আইন পাস হওয়ার পর যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমরা সকলেই আশান্বিত হইয়াছি। ইহাতে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রসার হইয়াছে এবং শাসনকার্য্যের অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষ এবং সাম্রাজ্যের পক্ষে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে।...ভারতীয়গণ সক্ষম, রাজভক্ত এবং অকপট।"

তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বাধীন হইতে দিতে বাধা কি?

অন্য দুই লর্ডের উক্তি

লর্ড-সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনার সময় লর্ড ক্রু বলেন,

"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যতই তিনি বেশী জানিতে পারিতেছেন ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি ততই বাড়িয়া যাইতেছে।" (অহো!) "যে নীতির জন্ত আমরা বাধ্য হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছি, ভারতবাসিগণ তাহা সমর্থন করায় আমি কিম্বা আমার মত যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানবান, তাঁহারা কেহ তাহাতে বিস্মিত হন নাই। ভারতীয় রাজন্যবর্গও এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন।" "লর্ড ক্রু বিশ্বাস করেন যে, বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকারের ফল শুভ হইবে। বড়লাটকে যে গুরু দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতে হইতেছে, লর্ড ক্রু তজ্জন্ত তাঁহার প্রতি সহানুভূতি জানান। তিনি আরও বলেন, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সহিত সর্ত্তাধীনে অর্থাৎ ভবিষ্যতে কিছু রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়া হইবে এই সর্ত্তে একটা চুক্তি করার জন্ত কোন কোন মহলে একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে বলিয়া লর্ড জেটল্যাণ্ড উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ভবিষ্যতের ব্যাপার লইয়া এইরূপ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। গত মহাযুদ্ধের সময় যাঁহারা এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সুবিধা হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না।"

গত মহাযুদ্ধে যে-ভারতীয়েরা ব্রিটেনকে সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের চেয়ে যাহারা বিনা সর্ত্তে ধনপ্রাণ দিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা শতসহস্রগুণ বেশী। এই বিনা-সর্ত্তে-সহায়কদিগের সদাশয়তায় ব্রিটেন কি প্রতিদান করিয়াছিলেন তাহা লর্ড ক্রু বলেন নাই।

অতঃপর লর্ড সল্জবেরির পালা।

লর্ড সল্জবেরি বড়লাটের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি জানান এবং তাঁহার চেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "ভারতবর্ষ বিশেষ করিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং পাঞ্জাব ও বাঙ্গালার প্রধান-মন্ত্রিদ্বয় যেরূপ রাজানুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, লর্ড জেটল্যাণ্ডের এই উক্তি আমি গতকল্য কিরূপভাবে সমর্থন করিয়াছি, এখানে আমি তাহা পুনরুল্লেখ করিতে চাই।

"অতীতের মনোমালিন্য দূর হইয়া যাইবে, ইহাই আমি কামনা করি।"

তাহা আমরাও কামনা করি। কিন্তু তাহা আপনা-আপনি হইবে না, ব্রিটেনের ন্যায়ানুগত আচরণের দ্বারা হইতে পারে।

—

কংগ্রেসের স্বরূপ ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্তি

লর্ড-সভায় ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড ২৭শে সেপ্টেম্বর যাহা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের যে দাবী করিয়াছেন, তাহা অতীব ন্যায়সঙ্গত এবং তাহার উপর কিছু বলা অনাবশ্যক। অবান্তর ভাবে কেবল এই কথাটি মনে হইতেছে যে, মহাত্মাজীর দাবীর সহিত সুভাষ বাবুর দাবীর স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ দেখিতেছি না।

ভারতসচিবের কথার উত্তর দিতে গিয়া গান্ধীজী কংগ্রেসের স্বরূপ ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই অর্থে সম্পূর্ণ সত্য যে, ভারতীয় যে-কোন জাতির যে-কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে-কোন শ্রেণীর লোক কংগ্রেসের মূল মতগুলিতে বিশ্বাস করেন, তিনিই ইহার সভ্য হইতে পারেন, এবং এই অর্থে ইহা সমুদয় ভারতবাসীর প্রতিষ্ঠান। এই কারণে এবং ইহার বৃহত্ত্ব, কৃতিত্ব ও শক্তিমত্তায় ইহা প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত প্রতিষ্ঠান। ইহাও সত্য যে, মুসলমান-সম্প্রদায়ের এবং দেশীয় রাজ্যগুলির লোকদের স্বার্থের

সহিত কংগ্রেসের কোন মত, কোন অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বা কোন সংকল্পের বিরোধ নাই। কিন্তু একটি বিষয়ে মহাত্মাজী কিছু বলেন নাই। তাহা হিন্দুদের ন্যায্য স্বার্থ সম্বন্ধে।

কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত কার্য্যতঃ গ্রহণ করায় হিন্দুদের শুধু যে স্বার্থে আঘাত পড়িয়াছে তাহা নহে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার খর্ব্ব হওয়ায় ও সরকারী নানা চাকরীতে তাহাদের দাবী কৃত্রিম ও অন্যায় উপায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ায় তাহারা তাহাদের যোগ্যতা, শক্তি ও আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ দেশ-সেবা করিতে পারিতেছে না।

এইরূপ এবং ইহার মতন অন্যান্য কারণে, কংগ্রেসের সকল মতকে সমুদয় ভারতীয়ের মত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

—

পূজার বাজারে বাঙালীর ক্রেতব্য কাপড়

বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' পুস্তকে "কোন 'স্পেশিয়ালে'র পত্র" নামক একটি রচনা আছে। ইহা ১২৮২ সালের কার্ত্তিকের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম বাহির হয়। ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে এটি লিখিত হইয়াছিল। এই রচনাটির গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"যুবরাজের সঙ্গে যে সকল 'স্পেশিয়াল' আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন কোন বিলাতীয় সম্বাদপত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি।"

এই কল্পিত পত্রের কল্পিত লেখক এক স্থানে বলিতেছে : —

দেখিলাম, অধিকাংশ বাঙ্গালি মাঞ্চেষ্টরের তন্তুপ্রস্তুত বস্ত্র পরিধান করে। অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভারতবর্ষ মাঞ্চেষ্টরের সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত। এক্ষণে মাঞ্চেষ্টরের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি প্রকারে বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, তাহা এখনও ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেহ কেহ আমাদিগের মত পেণ্টুলন পরে, কেহ কেহ তুর্কদিগের মত পায়জামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে।

অতএব দেখ, ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গলদেশে একশত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের যে কি পরিমাণে ধন এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাহা ইংরেজেই জানে। বাঙ্গালিতে বুঝিতে পারে, এত বুদ্ধি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে।

এক জন ইংরেজ "স্পেশিয়াল" অর্থাৎ বিশেষ-সংবাদ-দাতা যাহা বিলাতী কোন কাগজে লিখিয়াছিল বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল, এখন বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে কল্পনা করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে সেইরূপ কথা জাপানী, বোম্বাইয়া ও আহমদাবাদী বিশেষ সংবাদদাতার পত্রে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিতেন। কারণ, এখনও বাঙালী বহুকোটি টাকার বিদেশী ও বি-প্রদেশী কাপড় ক্রয় করে এবং "তদ্দ্বারা [বঙ্গের] যে কি পরিমাণে ধন এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না"। বঙ্গের লোকদের যত কাপড় আবশ্যক হয়, বাঙ্গালী এখনও তত কাপড় হাতের তাঁতে ও মিলে প্রস্তুত করিতে পারে না, অল্প অংশ মাত্র করে। বাকী কাপড় বিদেশ ও ভিন্ন প্রদেশ হইতে আসে। বাঙালীদের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশী, এইজন্য বঙ্গে উৎপন্ন খদ্দর, বঙ্গে উৎপন্ন হাতের তাঁতের কাপড় এবং বাঙালীদের মিলে উৎপন্ন কাপড় পাওয়া গেলেও, অনেকে অনেক স্থলে তাহা না কিনিয়া বিদেশী ও বি-প্রদেশী জিনিষ কিনিয়া থাকেন।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "আমি যে-গ্রামে থাকি, তথাকার উৎপন্ন জিনিষ আমার স্বদেশী।" ভারতবর্ষের অন্যত্র প্রস্তুত জিনিষ তাঁহার স্বদেশী নহে, এরূপ কথা তিনি বলেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, স্বদেশী জিনিষ কিনিতে হইলে (এবং স্বদেশী জিনিষ কেনা ও ব্যবহার করা যে উচিত, তাহা নিঃসন্দেহ) প্রথমেই সন্ধান লইয়া কিনিতে হইবে নিজের গ্রামের বা শহরের জিনিষ, আবশ্যক দ্রব্য তথায় উৎপন্ন না হইলে নিজের জেলার জিনিষ, সেখানে না মিলিলে নিজের প্রদেশের, তাহা না মিলিলে নিজের দেশের যে-কোন জায়গার জিনিষ।

পূজা উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ লোক কাপড় কিনিবেন। তাঁহারা অভিরুচি ও সামর্থ্য অনুসারে বঙ্গে উৎপন্ন খদ্দর,

বঙ্গে উৎপন্ন হাতের তাঁতের কাপড়, এবং বঙ্গে বাঙালীর মিলে উৎপন্ন কাপড় কিনিতে পারেন। সুন্দর ও টেকসই এই তিন রকমেরই কাপড় নানা দামের পাওয়া যায়।

যাঁহারা রেশমী কাপড় চান, তাঁহাদিগকেও বাংলার বাহিরে উৎপন্ন কাপড় কিনিতে হইবে না। তাঁহারা বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতির কাপড় কিনিতে পারেন।

কলিকাতায় ওএলিংটন স্কোয়্যারের সম্মুখে বাংলার হাতের তাঁতের কাপড়ের প্রদর্শনী হইতেছে, তাহাতে অল্প ও অধিক মূল্যের বহুবিধ বস্ত্র বিক্রীত হইতেছে।

—

লবণের মূল্যবৃদ্ধি

বাংলা-গবর্মেণ্টের মূল্য-নিয়ন্ত্রক (প্রাইস কণ্ট্রোলার) লবণের সর্ব্বোচ্চ পাইকারি দাম প্রতি এক শত মণের ১২২ টাকা এবং খুচরা দাম সের-করা পাঁচ হইতে ছয় পয়সা নির্দ্ধারণ করায় অসন্তোষের উদ্রেক হইয়াছে এবং তাহা ক্রমেই বিস্তার লাভ করিবে। অল্প দিন আগেও নূনের পাইকারি উচ্চতম দাম ১০০ মণ প্রতি পঁয়ত্রিশ টাকা ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র বাংলা-গবর্মেণ্ট উহা বাড়াইয়া ৭০ টাকা করেন। এখন করিয়াছেন ১২২। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এরূপ প্রায় চারিগুণ মূল্য বৃদ্ধির কোন ন্যায্য কারণ দেখা যাইতেছে না। নূন ধনী দরিদ্র উভয়কে সমান ভাবে—বরং দরিদ্রকেই অধিক পরিমাণে—ব্যবহার করিতে হয়। তাহার দাম যথাসম্ভব কম রাখাই গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

বঙ্গে যাঁহারা লবণ উৎপন্ন করেন, তাঁহারা এখন দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহাদের উৎপন্ন লবণের পরিমাণ বাড়াইতে পারিলে ভাল হয়।

—

বাংলা সাহিত্যের আপেক্ষিক সমৃদ্ধি ও বাস্তবিক দারিদ্র্য

সংস্কৃত একটি বচন আছে, যাহার তাৎপর্য্য, "নিজের নীচে এবং তার চেয়েও নীচে দৃষ্টিপাত করিলে কাহার মহিমা প্রতীয়মান হয় না? কিন্তু উপরে এবং তাহারও উপরে দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই নিজের দারিদ্র্য উপলব্ধি করিতে পারে।" বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এই বচনটির যাথার্থ্য বাঙালীদের বুঝা উচিত। সত্য বটে, বর্ত্তমানে প্রচলিত ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার সাহিত্যই সমৃদ্ধতম। কিন্তু বিদেশী যে-সব ভাষা বাংলা ভাষা অপেক্ষা সমৃদ্ধতর, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য বুঝিতে পারা যায়।

বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ পদ্য ও গদ্য কাব্য বিভাগেই সমৃদ্ধ, কিন্তু এ বিভাগেও বাংলা ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় কম সমৃদ্ধ। ইংরেজীর কথা বলিলাম এই জন্য যে, অন্য বিদেশী ভাষা জানি না। কাব্য ছাড়িয়া দিলে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য মৌলিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি গ্রন্থ বিরল—নাই বলিলেও বেশী ভুল হইবে না। ইহার জন্য বাঙালীদিগকে সম্পূর্ণ দোষী করা যায় না বটে; কিন্তু দোষ যাহার যাহারই হউক না কেন, আমাদের সাহিত্যের যাহা অপূর্ণতা তাহা আমাদিগকেই দূর করিতে হইবে। আশা হয় ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা ও পরীক্ষাও বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া হইতে থাকিলে, আমাদের সমুদয় মনন ও অনুভূতি বাংলার মধ্য দিয়া হইবে এবং প্রকাশও পাইবে বাংলা ভাষায় বাংলা সাহিত্যের আকারে।

এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার একটি দুর্ব্বলতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাংলা ভাষার বিস্তর ক্রিয়াপদ "করা"র কোন-না-কোন রূপের সাহায্যে গঠিত হয়। আমরা বলি, "তিনি ঘরে ঢুকিলেন," কিন্তু সাধুভাষায় বলি, "তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন"—"প্রবেশিলেন" বলি না। কথিত ভাষায় বলি, "সুধাইব," "সুধাইল" ইত্যাদি; কিন্তু কেতাবী ভাষায় লিখি, "জিজ্ঞাসা করিব," "জিজ্ঞাসা করিল"। ইংরেজীতে বলা হয়, "দে ডিফীটেড দি এনিমি"; তাহার বাংলা, "তাহারা শত্রুকে পরাজিত করিল"—"পরাজিল" বলিতে পারি না।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার পদ্য কাব্যসমূহে বাংলা ভাষার এই দুর্ব্বলতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তুল্য-প্রতিভাশালী ও সাহসী কোন লেখক গদ্যে এইরূপ চেষ্টা করিবেন কিনা বলা যায় না।

—

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে গবেষণাবৃত্তি

শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু মহোদয়া আচার্য্য বসু মহাশয়ের ইচ্ছা অনুসারে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে গবেষণাবৃত্তি স্থাপনার্থ প্রেসিডেন্সী কলেজকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছেন। এই সংবাদের সহিত খবরের কাগজে এই খবরও বাহির হইয়াছে যে, বাংলা-গবন্মেণ্ট এই টাকা লইবেন কিনা বিবেচনা করিতেছেন।

প্রথমে অনুমান করিতে পারি নাই, ইহার মধ্যে বিবেচনা করিবার কি আছে। জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত লোকদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, এরূপ উদ্দেশ্যে দান ত যত পাওয়া যায় লুফিয়া লওয়াই উচিত। পরে গুজব শুনিলাম, এই দানের এই সর্ত্ত আছে যে, কেবল হিন্দু গবেষকদিগকে এই টাকা হইতে বৃত্তি দিতে হইবে, এবং তাহাতে সেক্রেটেরিয়েটের কোন কর্মচারী নাকি আপত্তি তুলেন, এরূপ সাম্প্রদায়িক সর্ত্ত বাংলা-গবন্মেণ্টের নীতির ("পলিসির") বিরুদ্ধ। বটে! বাংলার রাজস্বের অধিকাংশ টাকা দেয় হিন্দুরা; কিন্তু শুধু হিন্দুদের শিক্ষার জন্য যত সরকারী টাকা খরচ হয়, শুধু মুসলমানদের শিক্ষার জন্য নানা বাবতে তাহার অন্ততঃ পনর-ষোল গুণ বেশী সরকারী টাকা খরচ হয়। ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীদের জন্যও সরকারী টাকা আলাদা করিয়া ব্যয় হয়। এই সাম্প্রদায়িকতা গবন্মেণ্টের পলিসির বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু কেহ নিজের টাকা, সরকারী টাকা নহে, হিন্দুদের সুবিধার জন্য দান করিতে চাহিলে তাহা লওয়া গবন্মেণ্টের পলিসির বিরুদ্ধ! ধন্য পলিসি! আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা নির্ভুল খবর হইলে এবং গবন্মেণ্ট-পক্ষ হইতে সত্য সত্যই ঐরূপ আপত্তি হইয়া থাকিলে আমরা আশা করি লেডী বসু মহোদয়া প্রেসিডেন্সী কলেজকে টাকা দিবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবেন এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের গবেষণায় উৎসাহ দিবার জন্য অন্য ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবেন।

যুদ্ধ চালাইতে ব্রিটেনের প্রতিজ্ঞা

কিছু দিন পূর্ব্বে খবর বাহির হইয়াছিল যে, ব্রিটেন মোটামুটি তিন বৎসর যুদ্ধ চালাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। তখন পোল্যাণ্ড লড়িতেছিল। তাহার পর রাশিয়া যুদ্ধে নামে, এবং তদনন্তর রাশিয়া ও জার্মেনী পোল্যাণ্ড ভাগ করিয়া লইয়াছে, এবং পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্স অসাধারণ দেশভক্তি সাহস ও শৌর্য্যের সহিত অনেক দিন লড়িয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এ অবস্থায় মনে হইতে পারে যে, যে-দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডত্ব রক্ষার নিমিত্ত ফ্রান্স ও ব্রিটেন যুদ্ধে নামিয়াছে, তাহা যখন পরহস্তগত হইয়াই গিয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করিয়া কি ফল? প্রকাশ, রাশিয়া ও জার্মেনীও ঐরূপ কথা বলিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে যুদ্ধে বিরত হইয়া শান্তি-স্থাপন করিতে বলিবে, এবং ইটালীরও মত সেইরূপ। যদি কোন দস্যুদল কোন গৃহস্থের অনেক লোককে মারিয়া সর্ব্বস্ব লুটিয়া লয় ও ঘরবাড়ী দখল করে এবং তাহার পর বলে, আমাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া মানিয়া লও, ডাকাতি ও নরহত্যার কোন প্রতিকার অনাবশ্যক ও অসম্ভব, তাহা হইলে ব্যাপারটা যেমন হয়, ইহাও সেইরূপ।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স বলিয়াছে, হিটলারির (Hitlerism-এর) উচ্ছেদ না করিয়া তাহারা থামিবে না। ইহা প্রশংসনীয় প্রতিজ্ঞা।

ব্রিটেন যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, তাহার প্রমাণ তাহার বজেটে পাওয়া যায়। এবার যেরূপ উচ্চ হারে সে দেশে ইন্‌কম্‌-ট্যাক্স বসিয়াছে, তাহা সে দেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। পৌণে সাড়ে সাত শিলিং ইন্‌কম্‌ ট্যাক্স ইতিপূর্ব্বে কখনও বসে নাই।

বিলাতী প্রধান প্রধান অনেক কাগজে হিটলারের বিরুদ্ধে যেরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, স্টালিনের বিরুদ্ধে সেরূপ নহে। তাহাতে অনুমান হয়, ইংরেজরা এখনও মনে করে যে, স্টালিন যদিও পোল্যাণ্ডের একটা অংশ গ্রাস করিয়াছে, তথাপি জার্মেনীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়িবে না। কি হইবে বলা যায় না। কিন্তু যদি রাশিয়া, এবং ইটালীও জার্মেনীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া লড়ে, তাহা হইলে যুদ্ধটা আরও ঘোরতর ও অধিকতর দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে। (১৪ই আশ্বিন, ১লা অক্টোবর।)

পরে ১৫ই আশ্বিন সংবাদ আসিয়াছে, যে, মুসোলিনি একটি শান্তি-প্রস্তাব পেশ করিবেন।

য়ুরোপীয় যুদ্ধে জাপান ও ইটালীর যোগ না-দেওয়া

জাপান যে য়ুরোপীয় যুদ্ধে এখনও কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই, তাহার অনেক কারণ থাকিতে পারে। একটা কারণ, সে চীনের অনেকটা দখল করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেখানে সুশৃঙ্খল শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে পারে নাই এবং চীন হা'র না মানিয়া এখনও লড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় নূতন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া সুবুদ্ধির কর্ম্ম হইবে না। কিন্তু অনুমান হয়, আরও একটা কারণ আছে। য়ুরোপীয় যুদ্ধে যাহারা এখন লিপ্ত, তাহাদের মধ্যে ইংরেজ ও জার্ম্মান এবং কতকটা ফ্রান্সও পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রসর জাতি। যুদ্ধের সময় তাহারা কারখানায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং পৃথিবীর নানা দেশের বাজারে তাহা বিক্রীর চেষ্টা যথেষ্ট করিতে পারিবে না। এই সুযোগে জাপান পৃথিবীর নানা দেশে ঐ য়ুরোপীয় জাতিদের ব্যবসাটা যথাসম্ভব দখল করিবার চেষ্টা করিবে, এবং তাহা দ্বারা চৈনিক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও ভবিষ্যতে তাহার নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে গত মহাযুদ্ধেও জাপান এইরূপ সুযোগসন্ধানিতার পরিচয় দিয়াছিল।

ইটালী যে এখনও যুদ্ধে নামে নাই, তাহারও নানা কারণ থাকিতে পারে। একটা কারণ এই যে, যুদ্ধে নামিলে হিটলার ও স্টালিন তাহাকে ভাগ-বখরা কি দিবে? ইয়োরোপে তাঁহারা পোল্যাণ্ড ত ভাগ করিয়া লইয়াছে, অন্য কিছু দিবার নাই। আফ্রিকায় ইটালী যাহা চায় তাহা ত সে নিজের শক্তিতেই লইতে পারে—অন্ততঃ সে মহাদেশে রাশিয়া বা জার্ম্মেনী তাহাকে কিছু দিতে পারিবে না। ইটালী যুদ্ধে যোগ দিলে তাহার যে ক্রমিক বাণিজ্য বাড়িতেছে এবং সমুদ্রে যাত্রী ও পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া সে যে লাভ করিতেছে, তাহাতে বাঁধা পড়িবে। যুদ্ধে যোগ না দিলে সেও জাপানের মত ইংরেজ ফরাসী ও জার্ম্মানদের অনেক বাজার দখল করিতে পারিবে।

যুদ্ধকালে পণ্যের কারখানা ও ব্যবসা বৃদ্ধির চেষ্টা

বিদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া প্রাচ্য দুই মহাদেশ ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে, যত রকম জিনিষ ভারতবর্ষে আমদানী হয়, ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধায় ভারতে সেগুলির আমদানী যথেষ্ট হইবে না, যাহা আসিবে তাহা বিলম্বে আসিবে ও আনিবার খরচ বেশী পড়িবে, এবং কোন কোন জিনিষ আসিবেই না। এই সকল সামগ্রীর মধ্যে অনেকগুলি ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারে। শান্তির সময়ে আমদানী পাশ্চাত্য দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রথম বাণিজ্যশুল্কের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই সমুদয়ের বড় বা ছোট কারখানা স্থাপন ও পরিচালন কঠিন হইলেও, এখন যুদ্ধের সময় তত কঠিন নহে। অতএব, ভারতবর্ষের ও বঙ্গের যে-অঞ্চলে যে-যে জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে, এখন উদ্যোগী লোকেরা তাহার সন্ধান লইয়া তাহা প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতে তৎপর হউন। অনেক জিনিষ বড় বা ছোট কারখানা স্থাপন না করিয়া শিল্পীদের নিজের নিজের বাড়ীতেও প্রস্তুত হইতে পারে। এ বিষয়ে শিল্পীরা সচেতন হউন। যাঁহারা স্বয়ং কারিগর নহেন, তাঁহারা যুদ্ধকালীন এই সুযোগের প্রতি শিল্পীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

গ্রামের বাড়ী ও বোমার ভয়

কলিকাতা শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন দ্বারা আক্রান্ত হইবার আপাততঃ খুব সম্ভাবনা না থাকিলেও ইহা একান্ত অসম্ভব নহে। সেই জন্য, যদি আকাশ হইতে কলিকাতার উপর বোমা পড়ে তাহা হইলে নাগরিকদিগকে কি করিতে হইবে তাহার মহড়া হইয়া গিয়াছে এবং পরেও হইবে। মাটির নীচে আশ্রয়স্থান বানাইবার পরামর্শও চলিতেছে।

যাঁহারা খবরের কাগজ পড়েন তাঁহারা জানেন, লণ্ডনের বহু লক্ষ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাকে সেখান হইতে ইংলণ্ডের নানা গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কারণ লণ্ডনের উপরই বোমাবর্ষণের সম্ভাবনা অধিক। কলিকাতায় বোমাবর্ষণের সম্ভাবনা ঘটিলে এখান হইতেও নারীগণকে ও শিশুদিগকে গ্রামে গ্রামে পাঠাইতে হইবে।

প্রবাসীর পাঠকদিগের মনে থাকিতে পারে, আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে একাধিক বার, কলিকাতার যে সকল নাগরিকের মফঃসলে, বিশেষতঃ গ্রামে ঘরবাড়ী আছে, তাঁহাদিগকে তাহা বাসোপযোগী করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছি। কারণ, কলিকাতা আকাশ হইতে আক্রান্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কা ইয়োরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও, চীন-জাপান যুদ্ধের জন্ত ছিল, এখনও আছে।

—

বিঠলভাই পটেলের উইল

স্বর্গীয় বিঠলভাই পটেল জেনিভায় দেহত্যাগ করেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে উইল করিয়া যান। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। উইলে যাহাকে যাহা দিবার তাহা দিয়া বাকী লক্ষাধিক টাকা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে দিতে বলিয়া যান। এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, সুভাষবাবু ঐ টাকা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়নের, বিশেষতঃ বিদেশে তদর্থ প্রচারের, নিমিত্ত ব্যয় করিবেন। উইলের ট্রষ্টিগণ এই আপত্তি তুলেন যে, তাহার সুভাষবাবুকে টাকা দিবার অংশটা আইনসংগত নহে। সুভাষবাবু টাকাটা পাইবার নিমিত্ত বোম্বাই হাইকোর্টে নালিশ করেন। জজ তাঁহার বিরুদ্ধে রায় দেন। তিনি আপীল করেন। তাহার ফলও পূর্ব্ববৎ হইয়াছে। আইনের কূটব্যাখ্যা অনুসারে হাইকোর্টের দুটা রায় ঠিক্ হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু সোজা বুদ্ধিতে মনে হয়, ঠিক্ হয় নাই। জজেরা পোলিটিক্যাল আপ্‌লিফটের (রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়নের) ঠিক্ মানে নাকি বুঝিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টও, বর্ত্তমান ভারতশাসন-আইনের খসড়ার আলোচনার সময়ে, অনেক নামজাদা সদস্য ডোমীনিয়ন স্টেটস কথা দুটির স্পষ্ট সংজ্ঞা হয় না বলিয়াই নাকি ঐ জিনিষটি ভারতবর্ষকে দিবার অঙ্গীকার আইনটার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই! ইংরেজী যাঁহাদের মাতৃভাষা, ইংরেজী কথার মানে লইয়া তাঁহাদের সহিত তর্ক করা যে একেবারেই চলে না, এমন নয়; কিন্তু তর্ক যাঁহাদের সঙ্গে করিব, শেষ সিদ্ধান্ত করিবার ভারও যদি তাঁহাদেরই উপর থাকে, তাহা হইলে তর্ক করিতে উৎসাহ না হইবারই কথা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাও ইংরেজী, এবং তাহার লোকসংখ্যা ব্রিটেনের প্রায় তিনগুণ। সকলের চেয়ে বিখ্যাত ইংরেজী আভিধানিক ওএবস্টার আমেরিকান। ইংরেজী ভাষার শব্দাবলীর অর্থ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কোন অরাজনৈতিক আমেরিকানকে মধ্যস্থ মানিয়া তর্কের ব্যবস্থা হইলে বরং তর্ক করিতে প্রবৃত্তি হয়। যাহা হউক, এ সব অবান্তর কথা। কাজের কথায় আসা যাক্।

বিঠলভাই পটেল মহাশয়ের উইলে যে সুভাষবাবুকে টাকা দিবার কথা আছে, মানিয়া লওয়া যাক যে, আইনের তর্কে তাহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন যে, পটেল মহাশয় তাঁহার সম্পত্তির লক্ষাধিক টাকা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক কল্যাণের নিমিত্ত ব্যয়িত হউক এবং ভারতের কল্যাণার্থ ভারতবর্ষের বাহিরে প্রচার-কার্য্য হউক, এই ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন? সুভাষবাবুর দ্বারা এই কার্য্য হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু যদি অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির দ্বারা এই কাজ হয়, তাহা হইলেও তাঁহার ইচ্ছার সার অংশ অনুসৃত হইবে। অতএব, সুভাষবাবু যদি প্রিভি কৌন্সিলে আপীল না করেন, কিম্বা আপীল করিলেও যদি তিনি হারিয়া যান, তাহা হইলে বিঠলভাই পটেল মহাশয়ের উত্তরাধিকারীদিগের তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে কাজের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার ভাই সর্দার বল্লভভাই পটেল ত সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা। তিনি টাকাটার সুব্যয়ের ব্যবস্থা না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও অপযশের ভাগী হইবেন।

—

বিহারের বাঙালী-সমিতির "গঠনমূলক কার্য্যতালিকা"

গত ৮ই এপ্রিল জামসেদপুরে বিহারের বাঙালী-সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে যে-সকল সিদ্ধান্ত হয় তাহার মধ্যে একটি অনুসারে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, বিহারে বাঙালীরা যাহাতে সম্মানের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এইরূপ একটি কার্য্যতালিকা বা পরিকল্পনা প্রস্তুত

করিবার ভার দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা মুদ্রিত হইয়াছে। ধানবাদের রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তাহা পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, কার্য্যতালিকার কার্য্যগুলি মোটামুটি নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১। একটি ব্যাঙ্ক। ২। বীমা-প্রতিষ্ঠান—(ক) সাধারণ জীবন বীমা, (খ) প্রভিডেণ্ট বীমা। ৩। কল—(ক) পশম কল, (খ) কাপড়ের কল, (গ) চট-কল। ৪। কারখানা (ক) বিহারের বিভিন্ন স্থানে বাঙালী যুবকদের দ্বারা পরিচালিত মোটরগাড়ী মেরামতি কারখানা ও বিক্রয়ের কেন্দ্র, (খ) বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে ঢালাই ও কর্ম্মশালা, (গ) লণ্ঠনবাতি প্রস্তুতির কারখানা, (ঘ) রাসায়নিক কারখানা, ৫। খনি শিল্প—(ক) কয়লা, (খ) অভ্র, (গ) লৌহ, (ঘ) বক্সাইট, (ঙ) চূণ-পাথর ও ডলোমাইট, (চ) অন্যান্য খনিজ পদার্থ। ৬। কাষ্ঠব্যবসায় ও কারখানা। ৭। গৃহশিল্প—(ক) বৈদ্যুতিক টর্চ বাতি ও ব্যাটারি প্রস্তুতি, (খ) ইলেক্ট্রোপ্লেটিং (রৌপ্য, স্বর্ণ, নিকেল, তাম্র, ক্রোমিয়ম)। ৮। বিবিধ ব্যবসায়—(ক) পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন মিষ্টান্নের দোকান স্থাপন করিয়া বাংলার মিষ্টান্নকে সমগ্র ভারতবর্ষে এবং তাহার বাহিরেরও জনপ্রিয় করা ও তাহার চাহিদা বৃদ্ধি করা; (খ) বিশুদ্ধ খাদ্যভাণ্ডার পরিচালন করা (জামালপুরের আদর্শে); (গ) বিভিন্ন প্রকারের দোকান, ভাণ্ডার ও গুদাম।

এই কার্য্যতালিকায় ব্যাঙ্ক যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক। তাহার পর বীমা-প্রতিষ্ঠান। অন্য কাজ ও ব্যবসাগুলি যেরূপ পরে পরে লেখা হইয়াছে, সেই ক্রম অনুসারেই যে করিতে হইবে, এমন নয়। প্রদেশের যেখানে যেটি আবশ্যক ও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, সেটি সেখানে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

ব্যাঙ্কের ও বীমাকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা পরিকল্পনা-পত্রে বুঝান হইয়াছে। অন্য প্রত্যেকটি কাজও আলোচিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কটিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপসিলভুক্ত করিবার সঙ্কল্প আছে।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস বিহারের বাঙালী-সমিতির সভাপতি। তিনি এবং আরও কয়েক জন প্রত্যেকে ব্যাঙ্কের দশ হাজার টাকার শেয়ার, এবং কেহ কেহ পাঁচ হাজার বা তন্ন্যূন টাকার শেয়ার লইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মোট প্রতিশ্রুতির পরিমাণ একানব্বই হাজার টাকার উপর। তদ্ভিন্ন অন্য অনেক ভদ্রলোকের গৃহীত শেয়ারের পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা।

বাঙালী-সমিতি নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় মহৎকার্য্যে হাত দিয়াছেন। তাঁহাদের পরিকল্পনাটি ব্যাপক। সমস্তটি সদ্যসদ্য কার্য্যে পরিণত করিতে না-পারিলেও, অনেকগুলি ছোট ছোট কাজ আলাদা আলাদা কোম্পানী গঠন করিয়া, ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপসিলভুক্ত হইবার আগেই, আরম্ভ করা যাইতে পারে। কোন আড়ম্বর ও অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য না করিয়া শ্রমশীলতা সততা বুদ্ধিমত্তা ও সমষ্টির কল্যাণ চিন্তা সহকারে কাজ চালাইলে সব কাজেই সাফল্য লাভ করা যায়। আকস্মিক দুর্ঘটনা অবশ্য কেহ নিবারণ করিতে পারে না।

পরিকল্পনাটিতে বিহার প্রদেশের বাঙালীদের "কেজো" শিক্ষার বিষয়ও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। শিক্ষা বিষয়ে পরিকল্পনাটিতে বলা হইয়াছে :—

(১) প্রাথমিক শিক্ষা, (২) শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা, (৩) ব্যবসা ও বাণিজ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা :—এইরূপ ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে সেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে বা শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হয়।

শিল্প শিক্ষা :—যত দূর সম্ভব ছেলেদের শিল্পবিদ্যায় শিক্ষিত করিতে হইবে। ৫০০০৲ হাজার টাকা প্রাথমিক খরচ ও মাসিক ২৫০৲ টাকা চলতি খরচের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়-গুলিতে শিক্ষা দান আরম্ভ করা যাইতে পারে :—(১) সাব-ওভারসিয়র এবং ওভারসিয়র। (২) খনি জরিপ হইতে খনি ম্যানেজার পর্য্যন্ত।

এই সকল শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হইবে ঠিকাদার ও ব্যবসায়ী সৃষ্টি করা। অবশ্য ইহাদের মধ্যে যদি কেহ স্থায়ী ভাবে কিম্বা ব্যবসায়ের নিমিত্ত মূলধন সংগ্রহের নিমিত্ত অস্থায়ী ভাবে চাকুরী গ্রহণ করেন, তাহাতেও ক্ষতি নাই। ইংরাজী পরিভাষাসহ বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে এই শিক্ষা দিতে হইবে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য শিক্ষা :—সমিতির সহযোগিতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সকল ব্যবসা পরিচালিত হইবে সেই সকল প্রতিষ্ঠানে হাতে-কলমে এবং পুস্তকের সাহায্যে এই বিষয়ে কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

—

বিহারে বাংলা ভাষার প্রচার

বিহার প্রদেশের মধ্যে খাস বিহার ছাড়া আরও কয়েকটি অঞ্চল ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে যেগুলি বাংলা দেশের অংশ। তাহার প্রমাণ, সেই অঞ্চলগুলিতে বাংলা ভাষার সমধিক প্রচলন। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটির একটি প্রস্তাব অনুসারে, যে অঞ্চলগুলি বঙ্গের অংশ,

সেগুলিকে আবার বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাটের ঘোষণা অনুসারে এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে সীমা-কমিশ্যন ("বাউণ্ডারি কমিশ্যন") বসাইয়া এইরূপ কাজ করিবার আশা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে বঙ্গের সঙ্গে আবার জুড়িয়া দিলে বিহারের আয় কমিয়া যাইবে এবং অনেক বাঙালীর উপর প্রভুত্ব করিবার সুখ হইতে বিহারীরা বঞ্চিত হইবে। এই জন্য বিহারী কংগ্রেস-গবর্ন্মেণ্ট বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থায় বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দী চালাইয়া প্রমাণ করিবার আয়োজন করিতেছেন যে, বাস্তবিক বাংলাভাষী অঞ্চল বলিয়া অভিহিত স্থানগুলিতে বাংলা বেশী চলিত নয়। মানভূমের কুড়মিরা যে বাঙালী নয় এবং তাহাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, ইহাও তাহাদের কতকগুলি লোকদের দ্বারা বলাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৪১ সালের সেন্সাসে বিহার প্রদেশের বাঙালীদের সংখ্যা কম করিয়া দেখাইবার চেষ্টাও যে হইবে, এই আশঙ্কারও কারণ আছে। এই সকল অপচেষ্টা সফল হইলে ১৯৪১ সালের সেন্সাসের রিপোর্টে বিহার প্রদেশে বাঙালীর সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাস অপেক্ষা কম দেখা যাইবে।

এই সব অপচেষ্টা ব্যর্থ করা উচিত। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-রঞ্জন দাস লিখিয়াছেন, মানভূমে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে, বিশেষতঃ কুড়মিদের মধ্যে, বাংলা পড়া ও লেখার বিস্তার করিবার নিমিত্ত একটি কমীটি গঠিত হইয়াছে। এই কমীটি মনে করেন মাসিক এক হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিলে তাঁহাদের কাজ সুসম্পন্ন হইবে। দাস মহাশয় স্বয়ং মাসিক দুই শত টাকা দিবেন। বাকী টাকা তুলিবার চেষ্টা তিনি করিতেছেন। বঙ্গের বাংলাভাষানুরাগী ব্যক্তিদিগের সাহায্য কমীটি আশা করেন এবং সাদরে গ্রহণ করিবেন।

—

মানভূমআদিতে বাংলায় সাক্ষরতা বিস্তার চেষ্টা

বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহে বাংলায় সাক্ষরতা বিস্তারের অন্য চেষ্টাও হইতেছে। যাঁহারা এই চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস মহাশয়ের কমীটির যোগ আছে কিনা জানি না। হয়ত আছে। উভয়ের মধ্যে যোগ না থাকিলে অবিলম্বে যোগ স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

> পূজার বন্ধে গ্রামে গ্রামে গিয়া বঙ্গভাষার প্রচারের জন্য ও নিরক্ষর জেলাবাসীদিগকে বঙ্গভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থার জন্য আমরা প্রত্যেক বাঙালা ছাত্রকে আমাদের বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি। যে-সমস্ত ছাত্র অন্ততঃ কুড়ি জন নিরক্ষরকে বাংলা প্রথম ভাগ শেষ করাইতে পারিবেন, তাঁহাদের এক-একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। ২০টি ছাত্রের প্রথম ভাগ শেষ হইয়াছে তাহার প্রমাণ জন্য স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা বিশিষ্ট ব্যক্তির সার্টিফিকেট আনিতে হইবে।
>
> শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী
(সম্পাদক, "সংগঠন", পুরুলিয়া)
শ্রীসুনীল কুমার মল্লিক
(হাজারিবাগ)
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার
(প্রভাতী-সংঘের পক্ষে)

অন্নদাবাবু কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন দুই শত বাঙালী ছাত্র পূজার ছুটিতে গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর লোকদিগকে বাংলা শিখাইয়া বেড়াইবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ইহা অবগত হইয়া বিশেষ উৎসাহ বোধ করিয়াছি। ছাত্রেরা যথেষ্টসংখ্যক বর্ণ-পরিচয়ের পুস্তক পাইলে এক লক্ষ শিক্ষার্থীকে তাহা দিতে পারিবে। প্রকাশকদিগের নিকট হইতে পুস্তক সংগ্রহ করা অন্নদাবাবুর কলিকাতা আসিবার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

বিহার প্রদেশের অন্তর্গত বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিতে যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা, তাহাদের মধ্যে যে অধিকাংশ লোক বাংলা-লিখনপঠনক্ষম নহে, তাহার জন্য বাঙালীরা স্বয়ং কি পরিমাণে দায়ী, তাহা মানভূমের "সংগঠন" কাগজে পাটনার শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> আজকাল অনেকেরই মুখে শোনা যায়, "ওঃ, বেহারে বাংলা ভাষার যে দুরবস্থা।" এ দুরবস্থার জন্য তাঁরা দায়ী করেন

বর্ত্তমান কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টকে। এই গবর্ণমেণ্ট না হয় আজ বছর খানেক হল হয়েছে, হয়ত কংগ্রেস থেকে হিন্দুস্থানী প্রচলন প্রচেষ্টা বা শিক্ষার বাহনরূপে হিন্দুস্থানী ভাষাকে গ্রহণ করা এই অবস্থার বড় দুটি কারণ। কিন্তু তাই বলে কি এর জন্ত আমাদের বিন্দুমাত্রও দোষ নেই বলতে হবে বা বলতে পারা যায় ?

আমার তো মনে হয় যে বেহারে বাংলা ভাষার যদি দুরবস্থা হয়ে থাকে, তবে তার জন্ত দায়ী আমরাই। আমাদের দায়িত্ব নানান রকম।

প্রথমতঃ আমরা বেহারে বাংলা ভাষার প্রচারের কোনও চেষ্টা করি নি। খাস বেহারের কথা ছেড়ে দি—পূর্ণিয়া অঞ্চল, ভাগলপুরের রাঢ়ীদের মধ্যে বা মানভূম প্রভৃতি স্থানে আমরা বাংলা ভাষার প্রচারের কি ব্যবস্থা করেছি ? অথচ এই সব অঞ্চল যে বাঙালীপ্রধান অঞ্চল, এই নিয়ে আমরা বড়াই করি। তবুও এদিককার নিরক্ষর বাঙালীদের আমরা সাক্ষর ক'রে তুলতে চেষ্টা করি নি। আবার খাস বেহারের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রচার-চেষ্টা হয়ত অপরাধ বলে গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে বাংলা ভাষা বজায় থাকে, বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী ছেলেরাও যাতে ভাল করে বাংলা পড়ে, তারই বা কি চেষ্টা আমরা করেছি !

দ্বিতীয়তঃ, প্রচার তো দূরের কথা, আমরা যা আছে তাই বজায় রাখবার কোনই চেষ্টা করি নি বলতে হয়। সেনসাসের মারপ্যাঁচে যে বাঙালীদের বা বাংলাভাষাভাষীদের সংখ্যা কত কমিয়ে ফেলা হচ্ছে তার কোনও প্রতিবাদ আমরা করেছি কি ? বা ভবিষ্যতে তার প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা আমরা করছি কি ? বাংলার জায়গায় যে বাঙালী ছেলেদের হিন্দী শিখতে হচ্ছে বা ভবিষ্যতেও হবে, সে সম্বন্ধে আমরা কি ব্যবস্থা করছি ?

মানভূমে হিন্দী প্রচলনের বিরাট আন্দোলন চলছে। চলুক তাতে ক্ষতি নাই। কারণ বাংলা ভাষার যদি নিজস্ব কোনও জোর থাকে, তবে তা টিকে থাকবেই। কিন্তু আমি এই কথাটিই জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, হিন্দী প্রচলনকে বাধা দেবার চেষ্টা না করেও আমরা বাংলা প্রচলন (এবং সেটা বাঙালীদের মধ্যে !) করতে পারি তো ? কিন্তু সেটা করছি কি ?

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন সমারোহ ও সাফল্যের সহিত হইয়াছিল। ইহাতে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। উদ্বোধক, সভাপতি, ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণগুলি ব্যতীত কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হয়, ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হয়, এবং তদ্ভিন্ন নৃত্যগীতাদি দ্বারা সমাগত পুরুষ ও মহিলাদিগের চিত্তবিনোদন করা হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিল।

"যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, স্কুলের ছাত্র এবং ছাত্রীদিগকে উর্দ্দু এবং হিন্দী ভাষার সাহায্যে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিতে হইবে; স্থান এবং অবস্থা বিশেষে অবশ্য ইংরাজী ভাষার সাহায্যে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষা এবং সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ না হয় ইহা কংগ্রেসের নীতি। তদনুসারে এই সম্মেলন দাবী করিতেছে যে, যুক্তপ্রদেশের স্কুলসমূহের বাঙ্গালী ছাত্র এবং ছাত্রীদিগের পক্ষে তাহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গলা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় করা হউক এবং সেই ভাষার সাহায্যে তাহাদের পরীক্ষা গৃহীত হউক এবং যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যদি কোন শাসন-সংক্রান্ত কারণবশতঃ ইহা প্রতিপালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে বাঙ্গালী ছাত্র এবং ছাত্রীদিগকে হিন্দী, উর্দ্দু অথবা ইংরাজী—এই তিন ভাষার মধ্যে যে-কোন ভাষার সাহায্যে উত্তর লিখিবার অনুমতি দেওয়া হউক।"

"এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পণ্ডিত অমর নাথ ঝা মহাশয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করায় এই সম্মেলন তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিতেছে এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।"

"এলাহাবাদ বহু বিশিষ্ট ও স্বনামধন্য বাঙ্গালীর জননী ও কর্ম্ম-ক্ষেত্র। শুধু এই দেশে নয়—দেশদেশান্তরে তাঁহাদের অনেকেরই নাম পরিচিত।—ইঁহাদেরই উদ্যম ও পরিশ্রমে এলাহাবাদ নব রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি ইঁহাদের নাম স্থায়ী করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটি কয়েকটি রাস্তা বা পার্কের নাম ইঁহাদের নামানুসারে করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি জাগরিত রাখুন। যথা :—

মেজর বামনদাস বসু, স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যার্ণব শ্রীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি।

উপরের নামগুলির পরে 'প্রভৃতি' আছে। এই 'প্রভৃতি' দ্বারা কাহার কাহার নাম সূচিত হইয়াছে, বলা যায় না। আমরা এমন তিন জন পরলোকগত বাঙালীর নাম উল্লেখ করিতেছি, যাঁহাদের নাম অনুসারে এলাহাদের কোন কোন রাস্তা বা পার্কের নাম রাখা যাইতে পারে।

এলাহাবাদের মিওর সেণ্ট্র্যাল কলেজ যুক্তপ্রদেশের অন্যতম প্রধান কলেজ। উহা যদিও সরকারী কলেজ,

কিন্তু উহা স্থাপিত হইয়াছিল প্রয়াগের কয়েক জন নাগরিকের উদ্যোগে। গত শতাব্দীতে আমি যখন এলাহাবাদে চাকরি করিতাম, তখন (বর্ত্তমানে বাঙ্গ-কা-বাগ পাড়ার অধিবাসী) অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেবের সৌজন্যে মিওর কলেজের একটি সচিত্র ইতিহাস দেখিয়াছিলাম। তাহা এখন অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য। যত দূর মনে পড়ে, তাহাতে দেখিয়াছিলাম উক্ত কলেজ স্থাপনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন বাঙালী রামেশ্বর চৌধুরী এবং ('যোদ্ধা মুন্সেফ' উপনামে পরিচিত) প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহাদের অন্যবিধ কৃতিত্বও ছিল। তাহা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে লিখিত আছে।

তৃতীয় যে বাঙালীর নাম করিতে চাই, তিনি চিন্তামণি ঘোষ। তিনি এলাহাবাদে বৃহত্তম এবং যুক্তপ্রদেশে অন্যতম বৃহত্তম ইণ্ডিয়ান প্রেস নামক বেসরকারী ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশালয়ের স্থাপনকর্ত্তা হিসাবে পৌর সম্মান পাইবার অধিকারী। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহার কেবল ব্যক্তিগত সুবিধা হইয়াছে—যদিও তাহা সত্য নহে, সেই জন্য তাঁহার অন্য দুটি জনহিতকর কার্য্যের উল্লেখ আবশ্যক। তিনি সর্ব্বপ্রথম আধুনিক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দী মাসিক পত্রিকা "সরস্বতী" স্থাপিত করেন। বিখ্যাত হিন্দী লেখক পরলোকগত পণ্ডিত মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীকে তিনি উহার সম্পাদক নিয়োগ করেন। দ্বিবেদীজীর সম্পাদকতাকালে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দী মাসিক পত্রিকা ছিল। চিন্তামণিবাবু কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভার সাহিত্যিকদিগের দ্বারা সম্পাদিত তুলসীকৃত রামায়ণের প্রথম প্রামাণিক সংস্করণ বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে প্রকাশ করেন। কাশীনরেশ ঐ রামায়ণের পুঁথি লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে যে-সকল চিত্রে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, চিন্তামণিবাবু তাহার অনেকগুলির প্রতিলিপি ইণ্ডিয়ান প্রেসের সংস্করণে দিয়াছিলেন।

উপরে উদ্ধৃত শেষ প্রস্তাবটিতে প্রয়াগকে যাঁহাদের "জননী" বলা হইয়াছে, তাঁহাদের অন্ততঃ অধিকাংশের জন্ম প্রয়াগে হয় নাই। অবশ্য তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। শ্রীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামনদাস বসুর জন্ম ও শিক্ষা হয় লাহোরে। প্রমদাচরণের জন্ম হয় বালী উত্তরপাড়া বা জনাইয়ে। তিনি বাংলা দেশেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ও আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। ইত্যাদি।

যুক্তপ্রদেশে বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বৃদ্ধির নিমিত্ত উপায় সূচিত করিয়া একটি প্রস্তাব অধ্যাপক অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থাপিত করেন। তাহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে ইহাও বলা হয়, যে, নিখিল-ভারতীয় কোন সাধারণ ভাষা নির্ব্বাচনের সময় ইহা নহে; সমুদয় প্রদেশের প্রতিনিধিগণের মধ্যে আলোচনা ও বিচারের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু যদি কোন একটি ভাষাকে নিখিল-ভারতীয় ভাষা করিতেই হয়, তাহা হইলে বাংলাকেই নির্বাচন করা উচিত, যেহেতু ইহা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যিকদিগের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

"নিখিল-ভারত বাংলাভাষা ও সাহিত্য-প্রচার সমিতি"

গত ১লা আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে এই সমিতির একটি অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সভাপতি। সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে নীচে কয়েকটি মুদ্রিত হইল।

সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি—পণ্ডিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ, বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারের জন্য এবং বাঙ্গালা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী সমর্থনের জন্য সংবাদপত্রে আন্দোলনের ব্যবস্থা করা হউক। ভারতের বিভিন্ন সাহিত্য সঙ্ঘ ও অনুষ্ঠানগুলিকে এই আন্দোলনে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

বাঙ্গালা ভাষায় ইংরেজী ও বিভিন্ন বিজাতীয় ভাষার শব্দের প্রতিশব্দ প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিয়া একটি প্রামাণিক অভিধান প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হউক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতিকে এই বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হউক।

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষকে এই প্রকার অভিধান সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

দেবনাগরী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী ও তামিল অক্ষরে বাঙ্গালার বর্ণপরিচয় পুস্তক মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হউক। অ-বাঙ্গালীদিগের বাঙ্গালা ভাষার সহিত পরিচয় ও তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার বৃদ্ধির জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন।

কংগ্রেস সম্বন্ধে অ-কংগ্রেসী নেতাদের বিবৃতি

লর্ড-সভায় ভারতসচিবের কতকগুলি মন্তব্যের উত্তরে গান্ধীজী কংগ্রেসকে সমগ্রভারতের প্রতিনিধি বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী জানাইয়াছেন। কংগ্রেসের এই সমগ্রভারতীয় প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করিয়া বোম্বাইয়ের কয়েক জন প্রধান অ-কংগ্রেসী নেতা একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে ব্যক্ত একটি প্রধান মত—

(২রা অক্টোবর, বোম্বাই।) "কংগ্রেস এবং মুস্লিম লীগ সমস্ত ভারতের, এমন কি ভারতের কোন বড় অংশেরও, প্রতিনিধি নহে, এবং কেবলমাত্র সরকার, কংগ্রেস এবং মুস্লিম লীগের মধ্যে কোন গঠনতন্ত্র বা শাসনতন্ত্রগত ব্যবস্থা হইলে তাহা সমগ্র ভারতবাসীদের নিকট গ্রহণীয় হইতে পারে না"—স্যার চিমনলাল শীতলবাদ, স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, মিঃ ডী. এন. চন্দাভরকর (উদারনৈতিক), মিঃ ভি. ডি. সাভারকর (হিন্দু মহাসভা), মিঃ এন. সি. কেলকার, মিঃ যমুনাদাস মেহতা এবং ডাঃ আম্বেদকর এক যুক্ত বিবৃতিতে উক্ত মত ব্যক্ত করেন।

—এসোসিয়েটেড্ প্রেস।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতের এবং কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মপন্থার সহিত বিরোধ না থাকিলে সকল ভারতবাসীই জাতিধর্ম্মশ্রেণীনির্বিশেষে ইহার সভ্য হইতে পারেন, কংগ্রেস কেবল এই অর্থে সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহা বৃহত্তম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিষ্ঠানও বটে; কিন্তু ইহা ভারতীয় জনমতের অবিসংবাদী মুখপাত্র বা প্রতিনিধি নহে। হিন্দু সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান ও প্রতিপত্তিশালী একটি অংশ ইহার নেতৃত্ব অস্বীকার করে। কংগ্রেসের নিজের মধ্যেও স্পষ্ট মতভেদ লক্ষিত হইতেছে।

—

পূর্ণ-স্বরাজ ও বাংলা দেশ

আমাদের নিজের মত এই যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা রদ না-হইলে স্বরাজের মাত্রা বৃদ্ধি বা পূর্ণ-স্বরাজ দ্বারা বাংলা দেশের কোন ইষ্ট ত হইবেই না, বরং এখন যত অনিষ্ট হইতেছে তাহা অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট হইবে। বাঙালী হিন্দুদের বর্ত্তমান দাসত্বের মাত্রা পূর্ণ-স্বরাজের আমলে আরও বাড়িবে, যদি তাহার পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার উচ্ছেদ না হয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা দ্বারা অল্পসংখ্যক মুসলমানের আর্থিক সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু বাঙালী মুসলমান জনসাধারণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই, আমাদের ধারণা এইরূপ। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এরূপ মত কাহারও আছে কি না, বা থাকিলে কতগুলি লোকের আছে, জানি না।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা রহিত না হইলে অধিকতর স্বরাজ বা পূর্ণ-স্বরাজ বাংলা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে, এইরূপ মত অনেক বাঙালী কংগ্রেসওআলাও পোষণ করেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা প্রকাশ করেন না—হয়ত দলীয় নিয়মানুগত্যের ("পার্টি ডিসিপ্লিনের") খাতিরে। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, সত্য এবং দেশহিত দলীয় নিয়মানুগত্য অপেক্ষা বড়। বাঙালী কংগ্রেসওআলাদের এবং অন্য সব বাঙালীর স্পষ্ট করিয়া এবং বারংবার বলা উচিত, "আমরা পূর্ণ-স্বরাজ নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা-বিহীন স্বরাজ চাই। যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা-যুক্ত পূর্ণ-স্বরাজ দেওয়া হয় বা দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহা আমরা নিশ্চয়ই চাই না।"

এরূপ কথা এখন বলিবার বিশেষ আবশ্যক এই যে, অবিলম্বে ভারতবর্ষকে স্বরাজ-সম্বন্ধীয় একটা কিছু সরকারী প্রতিশ্রুতি-দান শীঘ্রই ঘোষিত হইবে। সম্ভব হইলে তাহার পূর্ব্বেই বঙ্গের এই মত স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হওয়া আবশ্যক। সরকারী ঘোষণা যদি আগেই হইয়া যায় এবং তাহাতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার উচ্ছেদের কথা না থাকে, তাহা হইলে বঙ্গের এই মত প্রতিবাদ রূপেও কায়েম থাকা চাই। (১৬ই আশ্বিন ৩রা অক্টোবর।)

সাম্প্রদায়িক-বাঁটোআরা-সমন্বিত পূর্ণস্বরাজ আমরা চাই না এই জন্য যে, তাহা পূর্ণস্বরাজ বা স্বাধীনতাই নহে, তাহা সাম্প্রদায়িক রাজ। তাহা দ্বারা কোথাও মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে, যেমন বঙ্গে হইয়াছে; কোথাও বা হিন্দুর প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে। বঙ্গে মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের কুফল দেখা গিয়াছে এই জন্য যে, এখানকার মুসলমানদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক সার্বজনিক

হিতৈষণার যথেষ্ট বিকাশ হয় নাই। অন্যত্র হিন্দুর সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের কোন কুফল দেখা যায় নাই এই জন্য যে, হিন্দু কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট অসাম্প্রদায়িক সার্বজনিক হিতৈষণার বিকাশ হইয়াছে। তাহা না-হইলে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিরও অনিষ্ট হইতে পারিত।

আরও একটি কারণ আছে। তাহা বলিব না।

—

বঙ্গের আইসোলেশ্যনের জুজু

এইরূপ একটা মত মধ্যে মধ্যে শুনা যায়—বিশেষ করিয়া অবাঙালী কংগ্রেস-নেতাদের প্রমুখাৎ, যে, বাংলা দেশ যদি ভারতবর্ষের বাকী অংশের মতে সায় না-দিয়া নিজের মত আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আইসোলেটেড অর্থাৎ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। এই বিচ্ছিন্নতা-জুজুর ভয় আমরা করি না। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মতন কংগ্রেসও ত বাংলা দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াইছেন। যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বা অ-গ্রহণের বিষয় আলোচিত হইতেছিল, তখন আমরা এই মর্মের কথা বলিয়াছিলাম, "কংগ্রেসের বলা উচিত, সমুদয় প্রদেশে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব বা আংশিক স্বরাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ সমান না-হইলে, সব প্রদেশে (বঙ্গেও) কংগ্রেসী মন্ত্রিদল গঠন সমান সম্ভব না হইলে, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবে না; 'Every one for himself and the Devil take the hindmost', 'প্রত্যেকেই নিজের সুবিধা দেখিবে এবং যে সকলের পিছনে পড়িয়া যাইবে সে শয়তানের দ্বারা কবলিত হউক,' কংগ্রেস এই নীতি অনুসরণ করে না।" এইরূপ কথা বলিলে এবং তদনুসারে চলিলে এখন কংগ্রেস অধিকতর শক্তিশালী হইত, সম্ভবতঃ সকল প্রদেশেই কংগ্রেসী শাসন প্রবর্ত্তিত হইত, এবং সমগ্র ভারত পূর্ণ স্বরাজের নিকটতর হইত। কিন্তু কংগ্রেস বঙ্গের (ও পঞ্জাবের) মুখের দিকে তাকাইলেন না। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট বঙ্গের যে শাস্তি মঞ্জুর করিয়াছিলেন, কংগ্রেসও তাহাতে সায় দিয়াছেন।

সমগ্র-ভারতের কংগ্রেস যদি মনে করেন যে, বাংলা দেশকে তাঁহারা একঘরে ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন নাই এবং বাংলা দেশ এখনও ভারতবর্ষের অবশিষ্ট বৃহত্তর অংশের সহিত এক রাজনৈতিক পরিবারভুক্ত আছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, বঙ্গের জন্য কংগ্রেস কি করিয়াছেন, বঙ্গের কোন্ অভিযোগে তাঁহারা মন দিয়া তাহা দূর করিয়াছেন বা করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছেন। গান্ধীজী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, বাস্, ঐখানেই শেষ।

সুতরাং বাংলা দেশ অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া কংগ্রেসের কৃপা যতটুকু পাইয়াছে, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে খুব বেশী বঞ্চিত হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, বিচ্ছিন্নতা-জুজুর ভয় করি না।

অবশ্য বিচ্ছিন্নতা যে প্রার্থনীয় মনে করি, তাহাও নহে। সমগ্র ভারতের প্রকৃত সংহতি চাই। কেহ বাংলা দেশকে দয়া করিয়া নিজেদের দলে রাখিবেন, ইহাও চাই না। কৃপা যে মানুষেরই হউক, কৃপা অসহ্য ও ও অবাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র আন্তরিক ভ্রাতৃত্বই মূল্যবান্ ও আদরণীয়।

আমাদের যেমন বুঝা আবশ্যক যে, আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সাহচর্য্যনিরপেক্ষভাবে স্বাধীন হইতে ও থাকিতে পারি না, সেইরূপ তাঁহাদেরও বুঝা উচিত যে বাংলাকে বাদ দিয়া তাঁহারা স্বাধীন হইতে ও থাকিতে পারেন না।

হিন্দু নেতৃদ্বয়ের বঙ্গে ভ্রমণ

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দু-সংহতি আন্দোলন সম্পর্কে সম্প্রতি যে উত্তর-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের ও নেতাদের সহিত আলোচনা করিয়া তথাকার মত ও সমস্যা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক সুফলের আশা করা যায়। তাঁহারা ঐ সকল স্থানে বহু সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন এবং এক লক্ষেরও অধিকসংখ্যক লোক ঐ সকল সভায় যোগদান করিয়াছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি, সর্ব্বত্র হিন্দুদের মধ্যে অসাধারণ উৎসাহ ও আগ্রহ তাঁহারা দেখিয়াছেন। উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে ব্যাপক ভ্রমণের

পর তাঁহারা ইংরেজীতে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন, নীচে তাহার সংক্ষিপ্ত কিছু তাৎপর্য্য দেওয়া হইল।

বিভিন্ন জেলার যে-সকল নেতা ও কর্ম্মীদের দয়া ও আন্তরিক সৌজন্যের জন্য আমরা পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমাদের সফর শেষ হইবার পর আমরা সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদিগকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যাঁহারা বাঙ্গলার হিন্দুসংহতি আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট, আমরা তাঁহাদিগকে সানন্দে জানাইতেছি যে, আমাদের আবেদন আশাতীত ভাবে জনসাধারণের ব্যাপক ও আন্তরিক সমর্থন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। খুলনা, বরিশাল, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, জামালপুর, সেরপুর ও পাবনা ইত্যাদি যে-সকল স্থানে আমরা গিয়াছি সেই সকল স্থানেই আমরা জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়াছি। জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণ মনোভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না এবং আমরা হিন্দুদের জন্য কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধার দাবী উত্থাপনও করি নাই। আমরা কেবল এই বিষয়টির উপরই বিশেষ জোর দিয়াছি যে, একমাত্র স্বাজাতিকতা রক্ষাকল্পেই বাঙ্গলার হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত আক্রমণ হইতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার জন্য যে কোন প্রকার কার্য্যকর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা ঐ সকল স্থানে কেবল মাত্র বিভিন্ন জনসভায়ই বক্তৃতা প্রদান করি নাই, অধিকন্তু সর্ব্বদাই বিভিন্ন দলের সহিত ঘরোআ আলোচনা করিয়াছি।

বরিশাল জেলার হিন্দু সম্মেলন ও মহিলা সম্মেলন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দুইটি সম্মেলনে বরিশাল জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত বহু প্রতিনিধি বাঙ্গলার হিন্দুদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণই এই সম্পর্কে সবিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বরিশালে এবং কুমিল্লায় সামান্য কয়েক জন বিপথগামী মুসলমান আমাদের বিরোধিতা করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের আন্দোলন আরও অধিক প্রবল ও বেগবান্ হইয়াছে। সিরাজগঞ্জে এবং নোয়াখালীতে আমাদের সফর নিষিদ্ধ হয়। আমরা ইহার তীব্র নিন্দা করিতেছি। যদি বাঙ্গলার কোন অংশে হিন্দু-আন্দোলন আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে তাহা ঐ সকল অঞ্চলেই। যাহা হউক, আমরা স্থানীয় নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে সকল অঞ্চলের অবস্থার কথা জ্ঞাত হইয়াছি। নোয়াখালী এবং সিরাজগঞ্জে যে অবস্থা বিদ্যমান, অবিলম্বে সে সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করা কর্ত্তব্য।

হিন্দু সমাজের মধ্যে যে অসাম্য রহিয়াছে, তাহার মূলোচ্ছেদ না হইলে হিন্দুসংহতি আন্দোলন ফলপ্রদ হইবে না। বিভিন্ন স্থানের তথাকথিত তপসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সং- আসিয়া তাঁহাদের মতামত জ্ঞাত হইতে আমরা বিশেষ (করিয়াছি। এই সমস্যা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মূর্ত্তি পরি- করিয়াছে। আনন্দের সহিত আমরা বলিতেছি যে, বিভিন্ন স্থ- এই হিন্দুসংহতি আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে। চাঁদপু- প্রসিদ্ধ গৌর-নিতাইয়ের মন্দির এবং সেরপুরে রঘুনাথজিউর ম- হিন্দুসমাজের সমুদয় শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়া-

নেতৃদ্বয় শেষে বলিতেছেন :—

আমাদের বিবৃতির উপসংহারে বলিতে ইচ্ছা করি, । বর্ত্তমান সর্ব্বজাতিক সংকটের বিষয় মনে রাখিলে শু- সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন বা স্থানীয় সমস্যাসমূহের উপর যে অযথা অনাবশ্যক জোর দেওয়া উচিত নহে তাহা আমরা জানি। আম- অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস করি—বিশেষতঃ আমাদের সম্প্রতি-সমা- ভ্রমণের পর, যে, আমাদের সমস্যাটি ক্ষুদ্র নহে। আমরা যখ- বঙ্গের হিন্দুদিগকে সংহত হইতে এবং তাহাদের বৈধ অধিকা- সমূহের জন্য সংগ্রাম করিতে ও তৎসমুদয় রক্ষা করিতে আহ্বা- করিতেছি, তখন আমাদের দায়িত্বের পূর্ণ বোধ সহকারে তা- করিতেছি, এবং আমাদের স্বদেশবাসীদিগকে এরূপ এক- পরিস্থিতি ও সমস্যার সম্মুখীন হইতে ও তাহার সমাধান করি- বলিতেছি যাহার অভিজ্ঞতা বঙ্গের কচিৎ ঘটে। হিন্দুদিগে- সংহতির নিমিত্ত বৈধ প্রচেষ্টা বন্ধ করিতে বা তাহার সঙ্কোচনা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে কোন চেষ্টা হওয়া উচিত নহে।"

—

নোয়াখালিতে হিন্দুদের অবস্থা

আমরা সম্প্রতি নোয়াখালির এক জন প্রতিষ্ঠাবা- কংগ্রেস-কর্মীর নিকট হইতে নোয়াখালির হিন্দুদের অবস্থ- সম্বন্ধে ইংরেজীতে লিখিত একটি বিবৃতি, তথাকার এব- জন ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সদস্যের হিন্দুদের প্রতি- বিদ্বেষ-উত্তেজক ও ভয়প্রদর্শক একাধিক বক্তৃতার রিপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র পাইয়াছি। লেখক স্বয়ং আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আরও অনেক কথা জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি কলিকাতার প্রধান প্রধান কাগজের সম্পাদকদিগকে এবং কোন কোন কংগ্রেস-নেতাকে এই সকল কাগজপত্র দিয়াছেন। বিষয়টি মহাত্মা গান্ধীরও গোচর করিয়াছেন। যদি সমুদয় কাগজ গান্ধীজী দেখেন, তাহা হইলে তিনি কি বলেন ও করিবেন, জানিতে ইচ্ছা হয়।

ব্যবস্থাপক সভার জনৈক মুসলমান সদস্যের বক্তৃতার যে নমুনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রবাসীতে ছাপিবার যোগ্য নহে। এরূপ বক্তৃতার কথা জেলার ও ডিবিজনের

...পক্ষ অবগত থাকা সত্ত্বেও সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকার-হইতে কোন মোকদ্দমা বা অন্য ব্যবস্থা হয় নাই, ...দিগকে প্রদত্ত কাগজগুলিতে ইহা লিখিত আছে। ...হাতে নানাবিধ ভয়প্রদর্শনের ও তদনুরূপ অত্যাচারের ...র্ণনাও আছে। ব্যবস্থাপক সভার উল্লিখিত মুসলমান ...দস্য প্রকাশ্য বক্তৃতায় ইহা বলিয়াছে বলিয়া কাগজগুলিতে ...দেখিলাম যে, তাহার প্রভাবে নোয়াখালির এক জন হিন্দু ...জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে বদলী হইয়া রাইটার্স বিল্ডিঙে কেরানী (অর্থাৎ সেক্রেটরী) হইতে হইয়াছে! ইহা কি সত্য? এই ...সমুদয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত প্রকাশ্য তদন্তের ...জন্য কমিশন নিযুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

দৈনিক কাগজে দেখিলাম,

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি প্রমুখ হিন্দু নেতাদের কুমিল্লা সফর ...লে তথায় যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে—যাহার মধ্যে কতিপয় ...সলমান ছাত্রও জড়িত আছে, ঐ সম্পর্কে তদন্তের জন্য বাঙ্গলার ...ধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক ২রা অক্টোবর রাত্রিতে কুমিল্লা রওনা ...ইয়া গিয়াছেন।

—এ, পি

ইহা সত্য হইলে, বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী কিসের তদন্ত ...করিতে গিয়াছেন? হিন্দু নেতাদের এক জন সঙ্গী যে ...আহত হইয়াছিলেন, সেই বিষয়ের? না, শান্তিভঙ্গকারী ...মুসলমান জনতাতে যে পুলিস তাড়া করিয়াছিল, তাহার? ...নোয়াখালির সব ব্যাপার কুমিল্লার ঘটনাটার চেয়ে সহস্রগুণ ...অধিক সঙ্গীন ও গুরুতর; অতএব তাহার তদন্ত অবিলম্বে ...হওয়া আবশ্যক। অন্যান্য মন্ত্রীরাও এই বিষয়টিতে ...মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

অবশ্য কুমিল্লার ঘটনাটার জন্য দোষী ব্যক্তিদের ...সম্বন্ধেও সমুচিত ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

—

গান্ধী জয়ন্তী

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর বয়স ৭০ বৎসর ...র্ণ হইয়াছে এবং তিনি একাত্তরে পা দিয়াছেন। তিনি ...সুস্থ দেহমনে আরও দীর্ঘজীবী হউন, এই কামনা ...করিতেছি।

তাঁহার সপ্ততিপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত ...একখানি ইংরেজী বহি তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। ইহার সম্পাদক সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং প্রকাশক লণ্ডনের য্যালেন এণ্ড আন্‌উইন; মূল্য সাড়ে সাত শিলিং। ইহাতে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত এবং অপেক্ষাকৃত অবিখ্যাত পুরুষ ও মহিলার তাঁহার সম্বন্ধে বড় ও ছোট অনেক রচনা একত্র করা হইয়াছে। তাঁহাকে কত মানুষ কত দিক হইতে দেখিয়াছেন, এই বহিখানি পড়িলে বুঝা যায়।

মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অন্যতম অসাধারণ পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগতভাবে অহিংস আচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং স্বয়ং তদনুযায়ী আচরণ করিয়াছেন অতীতের মহাবীর বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি কতিপয় মহাপুরুষ। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সমষ্টিগত ভাবে সমুদয় জাতিকে অহিংস থাকিতে বর্ত্তমানে মহাত্মা গান্ধী উপদেশ দিয়াছেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কিংবা উদ্ধারের জন্যও যুদ্ধের সমর্থন করেন না; মনে করেন, উভয়ই অহিংস সত্যাগ্রহ দ্বারা সাধিত হইতে পারে। সাধিত যদি না হয়, তাহা হইলেও তিনি স্বাধীনতা অপেক্ষা অহিংসতাকে অধিকতর মূল্যবান্ মনে করেন। ইহা তাঁহার উপদেশের বিশেষত্ব। অহিংস উপায়ে কোন দেশের স্বাধীনতার রক্ষা কিম্বা উদ্ধার হইতে পারে, ইহা এখনও বাস্তব দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং মহাত্মাজীর উপদিষ্ট অহিংস সত্যাগ্রহ থিওরিতে দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের বাঞ্ছিত যুদ্ধের পরিবর্ত্তে অবলম্বনীয় নৈতিক উপায় হইলেও, বাস্তবিক সেরূপ উপায় বটে কিনা, এখনও বলা যায় না। কিন্তু মহাত্মাজীর বিশ্বাসের তাহাতে কিছু ক্ষীণতা হয় না; কারণ, যদি হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা রাখিতে বা পুনরুদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি বরং স্বাধীনতাহীন থাকিবেন, তথাপি অহিংসা ত্যাগ করিবেন না। তিনি অহিংসাকে এত বড় মনে করেন যে, নারীর সতীত্ব রক্ষাকল্পেও আততায়ীর প্রতি সশস্ত্র বা অন্যবিধ বলপ্রয়োগ তিনি বৈধ মনে করেন না।

তিনি ব্যক্তিগত ব্যবহারে এবং সমষ্টিগত সমুদয় ব্যাপারে সত্য ভাষণ ও সত্য আচরণ একান্ত আবশ্যক মনে করেন।

স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে গান্ধীজী অপকৃষ্ট মনে করেন, তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক বা শ্রেষ্ঠ তিনি কিছু দেখেন না।

বিবাহকে যে হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মে সংস্কার বলা হইয়া থাকে, তাহাকে তিনি মানুষের দুর্ব্বলতার প্রতি কৃপা প্রদর্শন মনে করেন। ব্রহ্মচর্য্য অর্থে তিনি চির-কৌমার্য্য বুঝেন। এ বিষয়ে তাঁহার মত চিরকুমার সন্ন্যাসীদিগের মতন।

তিনি বর্ত্তমান ভারতে অস্পৃশ্যতাদূরীকরণের নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহান্বিত ও সচেষ্ট—যদিও তিনি এই কু-সংস্কার ও কুপ্রথা দূরীকরণের চেষ্টা কংগ্রেসের কৃত্য-তালিকার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন পুণা ও বোম্বাইয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক বিঠলরাম শিন্দের সূচনায়।

গান্ধীজী কুটীরশিল্প—বিশেষতঃ চরকায় সুতা কাটা—প্রচলন জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছেন। খাদি প্রচলন দ্বারা অনেকের জীবনযাত্রাপ্রণালী অনাড়ম্বর ও সরল হইয়াছে। চরকায় সুতা কাটা সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর মধ্যে—বিশেষতঃ কৃষিজীবীদের মধ্যে—প্রচলিত হইলে দেশের অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়া অনলসতা বৃদ্ধিও হইতে পারে। তাহা খুব বড় নৈতিক লাভ।

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে মহাত্মাজীর দ্বারা সকলের চেয়ে বড় কাজ এই হইয়াছে যে, দেশে বিস্তর লোকের মনে ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনায় বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং স্বাধীনতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও বদ্ধমূল হইয়াছে। আগে লোকে মনে করিত, সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সংগ্রাম ভিন্ন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ বিশ্বাসবান্ প্রায় সকলেই মনে করিত, এরূপ বিদ্রোহের কোন উপায় নাই। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-প্রচারে ও সত্যাগ্রহ-অনুষ্ঠানে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, অহিংস উপায়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে। ভারতীয় মহাজাতির মনের উপর যে নৈরাশ্যের গুরুভার চাপিয়া বসিয়াছিল, এইরূপ বিশ্বাসের উদ্রেক হওয়ায় তাহা অপসৃত হইয়াছে এবং অবসাদের পরিবর্ত্তে উৎসাহ ও উদ্যমের আবির্ভাব হইয়াছে। মহাজাতি নিজের শক্তি আবিষ্কার করিতেছে।

মহাত্মাজীর কয়েকটি মত যেরূপ বুঝি, উপরে বিনা সমালোচনায় তাহা বিবৃত করিলাম।

—

কংগ্রেসের দাবীতে লর্ড স্নেলের গুরুত্ব আরোপ না-করিবার কারণ

পার্লেমেণ্টের লর্ড-সভায় লর্ড স্নেল বলিয়াছেন, কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে রাজনৈতিক ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাতে ব্রিটেন যেন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে। তদ্দ্বারা মোলায়েম ভাষায় ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, তাহা উপেক্ষণীয় বিবেচনা করিলেও ক্ষতি নাই। লর্ড স্নেলের এরূপ ধারণার একটা কারণ অনুমান করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের সেনাদলের উপর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নাই। তাঁহারা ইহার এক জন সৈন্যও বাড়াইতে কমাইতে পারেন না। সৈন্যদিগকে কোথায় রাখা বা পাঠান হইবে, কোথায় যুদ্ধ ঘোষিত হইবে বা হইবে না, এ রকম বিষয়েও ব্যবস্থাপক সভার কিছু বলিবার অধিকার নাই। সৈন্যদলে নূতন লোক ভর্ত্তি করিতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বাধাদান দণ্ডনীয় বে-আইনী কাজ; সুতরাং ব্যাপকভাবে সেরূপ কাজ হইতে পারে না। সিপাহীদিগকে সৈন্যদল ত্যাগ করিতে বা সেনাপতিদের ও নায়কদের হুকুম তামিল না করিতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে প্ররোচিত করাও দণ্ডনীয় বে-আইনী কাজ। তাহাও ব্যাপকভাবে হইতে পারে না। সৈন্যদলের জন্য যে ব্যয়ের বরাদ্দ হয়, সে-বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা বক্তৃতা করিতে পারেন বটে, কিন্তু ভোট দ্বারা সেই বরাদ্দ এক পয়সাও কমাইবার অধিকার ও ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। নূতন ট্যাক্স বসানর বা পুরাতন ট্যাক্সের হার বাড়ানর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা অমত করিতে পারেন বটে, কিন্তু বড়লাট সার্টিফিকেট দ্বারা তাঁহাদের সে অমত ব্যর্থ করিতে পারেন।

অতএব, কংগ্রেস সহযোগিতা করুন বা না করুন, সৈন্যদল দ্বারা যাহা কিছু কাজ ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট করাইতে চান, তাহা করাইতে গবর্ন্মেণ্ট পারিবেন। কংগ্রেস সহযোগিতা করিলে অতিরিক্ত সুবিধা কিছু হইবে বটে, কিন্তু লর্ড স্নেল বোধ হয় মনে করেন যে, তাহা না হইলেও চলিবে। প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগ ঘটিলেও

গবর্ণরেরা সব ক্ষমতা নিজের হাতে লইয়া কাজ চালাইয়া লইতে পারিবেন, লর্ড স্নেল বোধ হয়, এইরূপ মনে করেন।

—

ব্রিটেনে কংগ্রেসের দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার

কয়েক জন লর্ড ও ভারতসচিব যাহাই বলুন, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়্যান প্রমুখ বিলাতী কয়েকটি সংবাদপত্র এবং মিস্টার য়্যাটলী প্রভৃতি ব্রিটিশ নেতারা কংগ্রেসের দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করেন এবং তাহা মানিয়া লওয়া সঙ্গত ও আবশ্যক মনে করেন।

—

সর্ত্তাধীন মুক্তি পঁচিশ জন রাজনৈতিক বন্দী দ্বারা অগৃহীত

গত ৩রা অক্টোবর বাংলা-গবন্মেণ্টের প্রচার-বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে :—

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর এই মর্মে এক আদেশ জারি করা হয় যে নিম্নলিখিত সন্ত্রাসবাদী বন্দিগণ যদি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহারা সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ত্রাস ও হিংসামূলক কার্য্যকলাপে লিপ্ত হইবেন না এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যে-সমস্ত দল বা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসবাদ ও হিংসামূলক কার্য্যকলাপে লিপ্ত হয় বা উৎসাহ দেয় সেই সমস্ত দল বা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবেন না বা উহাদের সদস্য থাকিবেন না, তাহা হইলে ইঁহাদিগকে মুক্তিদান করা হইবে। এই সমস্ত সর্ত্ত কাহারও পক্ষেই পাঁচ বৎসরের অধিক কালের জন্য বলবৎ থাকিবে না। বন্দিগণের নাম :—(১) ননীগোপাল দাসগুপ্ত, (২) প্রমোদরঞ্জন বসু, (৩) শরৎচন্দ্র ধুপী, (৪) বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (৫) যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (৬) পরেশচন্দ্র গুহ, (৭) জীবনকৃষ্ণ ধুপী, (৮) তেজেন্দ্রলাল সেন, (৯) প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল, (১০) সরোজকুমার বসু, (১১) সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী, (১২) হিতেন্দ্রনাথ তলাপাত্র, (১৩) সুরেন্দ্রমোহন কর রায়, (১৪) কালীকিঙ্কর দে, (১৫) কুমুদবিহারী মুখার্জ্জি, (১৬) দীনেশচন্দ্র দাস, (১৭) যতীশচন্দ্র মজুমদার, (১৮) রমেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি, (১৯) প্রিয়দারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, (২০) রজতভূষণ দত্ত, (২১) কামাখ্যাচরণ ঘোষ, (২২) সুকুমার সেনগুপ্ত, (২৩) শান্তিগোপাল সেন, (২৪) হেমচন্দ্র বক্সী, (২৫) পূর্ণেন্দুশেখর গুহ।

গবর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে যে, উল্লিখিত বন্দিগণের প্রত্যেকেই এই সমস্ত সর্ত্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই মুক্তির আদেশ কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই।

পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, বিভীষিকাপন্থী বন্দীরা সন্ত্রাসনবাদে আর বিশ্বাস করেন না বলিয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধীও তাঁহাদের পক্ষ হইতে ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। তদনুসারে বহুসংখ্যক বন্দীকে আগেই বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। এখন সর্ত্তের কথা কেন উঠিল, বুঝিলাম না। যাঁহারা বলিয়াছেন সন্ত্রাসনবাদে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও চুক্তিবদ্ধ হইতে স্বভাবতঃ অপমান বোধ করিতে পারেন। তা ছাড়া, গবন্মেণ্ট যে কখন্ কোন্ সভা সমিতি বা দলকে সন্ত্রাসনবাদী মনে করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং, "সন্ত্রাসনবাদীদের সহিত সম্পর্ক রাখিব না," এরূপ অঙ্গীকার করায় বিপদও আছে।

—

বঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংকোচন

ভারত-গবন্মেণ্ট যে-সব অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন, তাহার উপর বাংলা সরকার এরূপ একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন যাহাতে জনসভার অধিবেশন শোভাযাত্রা প্রায় বন্ধ করা হইয়াছে বলিলেও চলে—বিশেষতঃ সাক্ষাৎ ভাবে (এমন কি পরোক্ষভাবেও) যে-সকল সভা ও শোভাযাত্রার সহিত রাজনীতির সম্পর্ক আছে। ইহার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (civil liberty) বঙ্গে আগেকার চেয়েও কমান হইয়াছে। কংগ্রেস-শাসিত কোন প্রদেশে এইরূপ অর্ডিন্যান্স জারি হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি।

—

রাজা রামমোহন রায়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও গত ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় এবং অন্য অনেক স্থানে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তিনি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ও জাতীয় জীবনের যে সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ ভারতবর্ষের লোকদের ও জগতের লোকদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার উপযোগিতা এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। পুরাকালের কথা ও ভারতের বাহিরের কোন দেশের কথা এস্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। আধুনিক সময়ে ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন রায় মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে

বিভাগে ও দিকে সমঞ্জসীভূত উন্নতি ও অগ্রগতির আদর্শ স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাহা নিজের রচনা ও আচরিত নানা কার্য্য দ্বারা জনসমাজের গোচর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সমুদয় দিকের উন্নতি ও অগ্রগতি পরস্পর-সাপেক্ষ এবং পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। ধর্ম্ম তাঁহার অন্তর্জীবনের, এবং বহির্জীবনের কার্য্যাবলীর, নিয়ামক ছিল। বিশ্বের বিধান অনুসারে সত্য ও ন্যায়ের জয় হইবেই এইরূপ বিশ্বাস থাকায় তিনি বহু বাধা উৎপীড়ন ও নিন্দা সত্ত্বেও নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকিয়া কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। "যুগপ্রবর্ত্তক" কথাটি আজকাল মামুলি ও সস্তা হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহাকে যুগ-প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে। তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শৈক্ষিক এবং অন্য নানাবিধ প্রচেষ্টার যে সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, দেশে তৎসমুদয় ব্যাপক ভাবে প্রচালিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার মত কেবল অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা গৃহীত ও অনুসৃত হইয়াছে। তাঁহার কিম্বা অন্য কোন উপদেষ্টার ধর্ম্মমতের আলোচনা প্রবাসীর উদ্দেশ্যবহির্ভূত। কিন্তু পরমাত্মার উপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার একটি ব্যবস্থার উপযোগিতার উল্লেখ এখানে করিতে পারা যায়।

কলিকাতায় চিৎপুর রোডে আদি ব্রাহ্মসমাজের যে ব্রহ্মমন্দির আছে, তাহাতে উপাসনা সম্বন্ধে রামমোহন রায় যে ট্রস্ট-ডীড রাখিয়া যান, তদনুসারে সেই উপাসনায় সকল আস্তিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক যোগ দিতে পারেন। ভারতবর্ষের মত যে দেশে বহু ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান, সেখানে এরূপ ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যাহারা ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ধর্ম্মকে জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু মনে করেন। ধর্ম্মে মিলিত হইতে না-পারিলে, মিলন প্রগাঢ় ও আন্তরিক হয় না। অথচ, দেখা যায় যে, ভারতীয় অনেক ধর্ম্মেরই লৌকিক অনুষ্ঠানে অন্য ধর্ম্মের লোকদের যোগদানে বাধা আছে। হিন্দুর প্রতীকোপাসনায় মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি যোগ দিতে অসমর্থ। আবার গোহত্যা যেখানে হয়, সেখানে হিন্দু কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন না। অন্যবিধ কারণেও হিন্দুদিগকে মসজিদে যাইতে বা যাইতে দিতে দেখা যায় না। খ্রীষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাসহীন হিন্দু বা মুসলমান গির্জার উপাসনায় যোগ দিতে পারেন না।

কিন্তু হিন্দুর বহু শাস্ত্রে যেমন প্রতীকোপাসনার বিধান আছে, সেই রূপ ব্রহ্মের উপাসনাও শাস্ত্রবিহিত। সুতরাং পরমাত্মার উপাসনায় যোগ দিতে হিন্দুর বাধা নাই। সেই রূপ এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান ও শিখেরও ইহাতে যোগ দিতে বাধা নাই। আস্তিক-বৌদ্ধেরাও ইহাতে যোগ দিতে পারেন। কবীরপন্থী প্রভৃতি অন্যান্য আস্তিকও ইহাতে যোগ দিতে পারেন।

মানবজীবনের সারভূত বস্তু ধর্ম্ম; পরমাত্মার উপাসনা তাহার প্রধান অঙ্গ। তাহাতে একটি প্রধান বিষয়ে মিলিত হইবার যে উপায় ও ব্যবস্থা রাজা রামমোহন রায় করিয়া গিয়াছেন, তাহার দ্বারা সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন ও মহাজাতি গঠনের সাহায্য হইতে পারে। ইহার জন্য ব্রাহ্মসমাজের কোন মন্দিরেই যে যাইতে হইবে এমন নয়, যদিও ব্রাহ্মসমাজের সকল মন্দিরের দ্বার পরমপুরুষের উপাসনার নিমিত্ত সকল মানুষের জন্যই উন্মুক্ত; যে-কোন স্থানে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগের দ্বারা একত্র শান্তসমাহিত ভাবে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন ও মহাজাতি গঠনের অন্য যত প্রকার উপায় প্রস্তাবিত ও অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহার কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। আমরা যেটির উল্লেখ করিলাম, ধর্ম্মে বিশ্বাসবান গম্ভীর প্রকৃতির লোকেরা তাহাও বিবেচনার অযোগ্য মনে না-করিতেও পারেন।

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি নূতন আবিষ্কৃত তথ্যের উল্লেখ এখানে করি। তিনি ইংলণ্ড-প্রবাসকালে, ভারতীয়দিগের জন্য ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে প্রবেশ ও তাহার কার্য্যে যোগদান সুগম করিবার নিমিত্ত স্বয়ং পার্লেমেণ্টের সভ্য হইতে চাহিয়াছিলেন। বিশেষ বৃত্তান্ত প্রমাণ সহ বর্ত্তমান অক্টোবর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে।

—

১৯৪১ সালের লোকসংখ্যা-গণনার আইন

দশ বৎসর অন্তর অন্তর ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা গণিত

হইয়া থাকে। ১৯৩১ সালে শেষ সেন্সস হইয়াছিল। ১৯৪১-এ আবার গণনা হইবে। তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইন পাস হইয়া গিয়াছে। সভ্য দেশসকলে সেন্সস রিপোর্টে শুধু যে দেশের প্রদেশের জেলার শহরের ও গ্রামের মানুষের সংখ্যা লেখা থাকে, তাহা নহে; অন্য নানাবিধ তথ্যও তাহাতে থাকে। সেন্সস রিপোর্টে যে-সকল তথ্য লিখিতে থাকে, তাহা প্রামাণিক ও নির্ভুল বলিয়া সভ্য দেশসমূহে বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সকল তথ্য সাধারণতঃ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে সকল স্থলে তাহা না-হওয়ায় এদেশের অন্ততঃ কোন কোন রিপোর্টে অদ্ভুত ভুল থাকে। ১৯৪১ সালের সেন্সস সম্বন্ধীয় আইনের খসড়া যখন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতেছিল, তখন ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল জর্ন্যালে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত কর্ত্তৃক উল্লিখিত বাংলা দেশের ১৯৩১ সালের সেন্সস রিপোর্টের এইরূপ একটি অদ্ভুত ভুলের কথা বলেন। তাহাতে আছে যে, কিশোরগঞ্জ মহকুমায় ইংরেজী লিখনপঠনক্ষম মানুষ একটিও নাই! অথচ সেখানে দুটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, এক জন সব্-ডিবিজন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, বিচার ও শাসন বিভাগের একাধিক হাকিম আছেন, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও সভ্যেরা আছেন। সেন্সস রিপোর্টটি অনুসারে ১৯৩১ সালে ইঁহারা কেহই ইংরেজী লিখিতে পড়িতে জানিতেন না!

বাংলা দেশে হিন্দুদের মধ্যে সাধারণতঃ এই ধারণা প্রবল যে, ১৯৩১ সালের সেন্সসে বঙ্গে হিন্দুদের যে সংখ্যা দেখান হইয়াছে তাহা প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। এইরূপ, বিহার প্রদেশে বাঙালীদের সংখ্যা কম দেখান হইয়াছে বলিয়াও বাঙালীদের ধারণা।

এবম্বিধ নানা কারণে ১৯৪১ সালের সেন্সসে যাহাতে কোন ভুল না থাকে, তাহার ব্যবস্থা আগে হইতেই হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, সেন্সস বিলটি সিলেক্ট কমীটিতে প্রেরিত হউক। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট তাহা না করিয়া বিলটিকে আইনে পরিণত করিয়াছেন। তাহাতে উহার মধ্যে খুঁৎ থাকিয়া গিয়াছে।

কোন কোন প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল আগামী সেন্সসের কোন কোন সংখ্যা তাঁহাদের মনের মতন হইলে খুশী হইবেন মনে করিবার কারণ আছে। যেমন, বঙ্গদেশে গত সেন্সসে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের সংখ্যা যত বেশী ছিল দেখান হইয়াছে, আগামী সেন্সসে তার চেয়েও বেশী পার্থক্য—অন্ততঃ তাহার সমান পার্থক্য—প্রদর্শিত হইলে বঙ্গের মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিমণ্ডল খুশী হইতে পারেন। কেননা, তদ্দ্বারা বঙ্গে মুসলমানদিগের ব্যবস্থাপক সভায় বর্ত্তমান-সংখ্যক বা তদপেক্ষাও অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি প্রাপ্তির দাবী সমর্থিত হইতে পারিবে। সেইরূপ, বিহার প্রদেশে যদি বাংলাভাষীর সংখ্যা আগেকার চেয়ে কম প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে বিহারী মন্ত্রীরা আহ্লাদিত হইতে পারেন। কারণ, বিহারপ্রদেশে বাঙালীদের সংখ্যা যত কম দৃষ্ট হইবে, তাহার কোন কোন অঞ্চল বঙ্গের ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা তত কমিবে।

সেই জন্য সেন্সসের নিয়ন্ত্রক সমুদয় কর্ম্মচারীর নিয়োগ ভারত-গবর্ন্মেণ্টের দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সেন্সস-ঘটিত সব ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের ক্ষমতা যত কম থাকে ততই ভাল। কিন্তু ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন এবং আমরাও ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত আইনটিতেও দেখিলাম যে, উহার দ্বিতীয় ধারায় সেন্সসে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের মধ্যে দ্বৈরাজ্য, অর্থাৎ যেন ক্ষমতার ভাগাভাগি, করা হইয়াছে। ইহাতে ফল ভাল হইবে না।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একাধিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বঙ্গে সর্ব্বত্র এক এক জন হিন্দু ও এক এক জন মুসলমান গণনাকারী একত্র কাজ করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ইহাতে কিছু খরচ বাড়িবে। কিন্তু গণনার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াইবার ও সন্দেহের কারণ কমাইবার অন্য উপায় দেখা যাইতেছে না।

পেশা সম্বন্ধীয় তথ্য নির্ভুল ও অধিকতর বিস্তারিত ভাবে

সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। বেকারদের সংখ্যাও যথাসম্ভব সঠিক নির্ণীত হওয়া উচিত।

—

বড়লাটের সহিত নেতাদের সাক্ষাৎকার

যুদ্ধজনিত সংকট অবস্থায় দেশের লোকদের সহযোগিতা কিরূপ ঘোষণা দ্বারা বা অন্য উপায়ে বেশী পাওয়া যাইতে পারে, সম্ভবতঃ তাহার আলোচনার নিমিত্ত বড়লাট কোন কোন নেতার সহিত দেখা করিয়াছেন এবং আরও করিবেন। কাহারও সহিত কোন আলোচনার বৃত্তান্ত বাহির হয় নাই। আলোচনার ফল কয়েক দিন পরে প্রকাশিত হইতে পারে।

বড়লাট মুসলীম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নার সহিত দেখা করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে আহ্বান করেন নাই, ইহা সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী এবং অন্য কোন কোন কংগ্রেস-নেতাও মিঃ জিন্নাকে খুশী করিতে ব্যস্ত, কিন্তু হিন্দু মহাসভার সভাপতি বা অন্য কোন নেতাকে তাঁহারা পুঁছেন না। অথচ, হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসের মত সংঘবদ্ধ ও ক্ষমতাশালী না হইলেও তাহার সভ্যসংখ্যা ও হিন্দুদের মধ্যে প্রতিপত্তি মুসলীম লীগের সভ্যসংখ্যা ও মুসলমানদের মধ্যে প্রতিপত্তি অপেক্ষা কম নহে—বোধ হয় বেশী। হিন্দু কংগ্রেস-নেতারা হয়ত মনে করেন, তাঁহারা হিন্দু মহাসভাকে গ্রাহ্য করিলে তাঁহাদের নিজের হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্বে সন্দেহ পড়িবে। কিন্তু কংগ্রেস ত মুসলমান সমাজের (এবং অন্যান্য সমাজেরও) প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন; মিঃ জিন্নার মুসলিমনেতৃত্ব সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার দ্বারা কংগ্রেস যে মুসলমান সমাজের কেহ নহেন, এইরূপ সন্দেহের কারণ জন্মে না কি?

[১৯শে আশ্বিনের দৈনিক কাগজগুলিতে দেখিলাম, বড়লাট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত সাভারকরকে আহ্বান করিয়াছেন। ইহা সন্তোষের বিষয়।]

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

ভিয়েনার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের লণ্ডনে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি জাতিতে ইহুদী ছিলেন। এই জন্য অষ্ট্রিয়া যখন জার্মেনীর হস্তগত হয়, তখন তিনি জার্ম্যানদের ইহুদীবিদ্বেষের ফলে অষ্ট্রিয়া ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিতে বাধ্য হন। তিনি মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis) বিদ্যার জনক। এ-বিষয়ে তিনি প্রথম প্রথম যে-সকল মত প্রকাশ করেন, পরে নিজেই তাহার কোন কোনটি পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহার শিষ্য ও সমালোচকগণও কিছু কিছু ভুল দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়পরায়ণতার খোরাক জোগান যে-সব গল্প-লেখকের প্রধান উপজীব্য, তাহারা ফ্রয়েডের কতকগুলি থিওরির দোহাই দিতে এখনও ছাড়ে নাই।

—

অভেদানন্দ স্বামী

অভেদানন্দ স্বামীর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে পরমহংস রামকৃষ্ণের শেষ সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্যের তিরোভাব ঘটিয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল আমেরিকায় বেদান্ত মত প্রচার করিয়াছিলেন। ইয়োরোপেও ঐ মত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ স্থাপন করেন, এবং সভাপতি রূপে তাহার পরিচালক ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি কর্ত্তৃক তাঁহার যে গস্পেল্স অব্ রামকৃষ্ণ নামক ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহা তিনি সংশোধনপূর্ব্বক দি মেময়ার্স অব্ রামকৃষ্ণ নাম দিয়া মাস দুই পূর্ব্বে এদেশে পুনর্মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও পঁচিশ-ছাব্বিশখানি পুস্তক-পুস্তিকা আছে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে, যখন শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব ও তাঁহার ভ্রাতা বামনদাস বসু জীবিত ছিলেন, তখন এলাহাবাদে তাঁহাদের বাড়ীতে অভেদানন্দ স্বামীকে একবার দেখিয়াছিলাম। তাহার পর আর তাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই।

—

হিন্দুদিগকে রাজা নরেন্দ্রনাথের সতর্কীকরণ

রাজা নরেন্দ্রনাথ লাহোর-নিবাসী কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। তিনি এম্-এ উপাধিধারী। বয়স ৭০-এর উপর। তিনি মহারাজা রণজিৎ সিংহের এক প্রধান অমাত্যের বংশধর। সিবিলিয়ান না হইয়াও তিনি নিজের যোগ্যতার গুণে

ডিবিজন্যাল কমিশনার হইয়াছিলেন। সরকারী পেন্স্যন-ভোগিতা তাঁহার স্পষ্টবাদিতা ও স্বাধীনচিত্ততা কমাইতে পারে নাই। তিনি হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি নিখিলভারতীয় সভার সভাপতিত্ব করিয়াছেন। এলাহাবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের উদ্যোগে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনের প্রয়াস হইয়াছিল রাজা নরেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ পঞ্জাব ব্রাহ্মণ কন্ফারেন্সে সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করেন, তাহার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

"You aim at the *sangathan* of Brahmins. Allow me to give you a warning that you should do nothing to put an obstacle in the way of the higher *sangathan* which is aimed at by the Hindu Shabha, a *sangathan* of all the Hindus to whichever caste they belong."

"আপনাদের লক্ষ্য ব্রাহ্মণ-সংগঠন। আপনাদিগকে সাবধান করিতে দিন্ যে, হিন্দুসভা হিন্দুসমাজের সকল জাতির যে উচ্চতর সংগঠন করিতে চান, তাহাতে কোন বাধা উপস্থিত হয় এরূপ কিছু করা আপনাদের উচিত নহে।"

তাঁহার বক্তৃতার পরবর্ত্তী অংশের রিপোর্ট লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকায় নিম্নলিখিত আকারে দেওয়া হইয়াছে।

"His personal opinion," said Raja Sahib, "was that the Hindu Sabha itself should do nothing to obstruct the progress of that still higher organisation, called the National Congress, which aims at developing political nationalism in all the castes and creeds living in India. He was in the Hindu Sabha to oppose the view that union was or could ever be promoted by separatism. He would do his best to obliterate such separatism in order to achieve self-government."

"রাজা সাহেব বলেন, তাঁহার ব্যক্তিগত মত এই যে, হিন্দু-সভার নিজেরও এমন কিছু করা উচিত নহে যাহার দ্বারা ন্যাশন্যাল কংগ্রেস নামক আরও উচ্চতর সেই সংঘের অগ্রগতিতে বাধা জন্মে, যাহার লক্ষ্য ভারতবর্ষনিবাসী সমুদয় জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাজাতিকতার বিকাশ সাধন। ভেদবাদ (separatism) দ্বারা কখনও একতা সাধিত হইয়াছে বা হইতে পারে, এই মতের বিরোধিতা করিবার নিমিত্ত তিনি হিন্দুসভাতে আছেন। স্বশাসন লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ ভেদবাদ নিশ্চিহ্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।"

পঞ্জাবের হিন্দুদের সমস্যা অনেকটা বঙ্গের হিন্দুদের সমস্যার সদৃশ। পঞ্জাবের হিন্দুদিগকে পরামর্শ দিবার যে অধিকার রাজা নরেন্দ্রনাথের আছে, বঙ্গের হিন্দুদিগকে পরামর্শ দিবার সে অধিকার আমাদের নাই। তথাপি আমাদের মত বলিতেছি। আগেও বলিয়াছি। বঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা চান এবং হিন্দু-সমাজের কল্যাণও চান, তাঁহাদের কংগ্রেস ও বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা উভয়েরই সভ্য হওয়া উচিত এবং কংগ্রেসকে ও হিন্দু মহাসভাকে ঠিক পথে রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। যে-কেহ ইচ্ছা করিলে উভয়েরই সভ্য হইতে পারেন। শুনিয়াছি, কংগ্রেসের কোন কোন চাঁই হিন্দু মহাসভার সভ্যদিগকে পাকেপ্রকারে কংগ্রেসের সভ্য হইতে দেন না। এরূপ কৌশল ব্যর্থ করিতে পারা উচিত।

বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মালবীয়জীর অবসর গ্রহণ

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় নানা ভাবে ভারতবর্ষের সেবা করিয়াছেন। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। একমাত্র না-হইলেও তিনি ইহার অন্যতম ও প্রধান প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহার সমান প্রভূত অর্থ-সংগ্রহ কেহ করেন নাই। দীর্ঘকাল তিনি ইহার ভাইস্-চ্যান্সেলার থাকিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবচ্চিন্তায় ও শাস্ত্রাধ্যয়নে তিনি এখন শান্তিতে থাকুন, এই কামনা করিতেছি।

পণ্ডিত, দক্ষ লেখক ও বাগ্মী সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। ভাইস্-চ্যান্সেলার হইবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহার আছে।

কাগজের মূল্য-বৃদ্ধি

যুদ্ধের জন্য কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এবং অদূর ভবিষ্যতে রীলের আকারে জড়ান কাগজ দুষ্প্রাপ্য হইবে বলিয়া দৈনিক কাগজগুলির পৃষ্ঠার সংখ্যা কমিয়াছে।

তাহাদের কাট্‌তি যুদ্ধের খবরের জন্য খুব বাড়িয়াছে বলিয়া কাগজের মূল্যবৃদ্ধির দরুন লোকসানটা কতক পোষাইয়া যাইতেছে, পৃষ্ঠার সংখ্যা কমাইয়াও কতক ক্ষতিপূরণ হইতেছে। তাজা খবর জোগান মাসিক কাগজের কাজ নহে বলিয়া তাহাদের কাট্‌তি খুব বাড়িতে পারে না। সে সুবিধা না থাকিলেও প্রবাসীর পৃষ্ঠাসংখ্যা কমান হয় নাই।

—

"রবীন্দ্র-রচনাবলী"

"রবীন্দ্র-রচনাবলী"র প্রথম খণ্ডে বিশ্বভারতীর গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের সম্পাদক অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার নিবেদনে লিখিয়াছেন:—

[রবীন্দ্রনাথ] তাঁহার প্রথম বয়সের অনেক রচনা অত্যন্ত অপরিণত বলিয়া বর্জন করিতে ইচ্ছা করেন, এই রচনাবলীতে সেগুলিকে স্থান দিতে চাহেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"ভূরিপরিমাণ যে সকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলে গণ্য করি আপনাদের সম্মিলিত নির্বন্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবী কালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারব না। আপনারা তর্ক করে থাকেন ইতিহাসের আবর্জনা দিয়ে যে গাধার টুপিটা বানানো হয় ইতিহাসের খাতিরে সেটা মহাকালের আসরে পরে আসতেই হবে। কবির তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ইতিহাসও বহু অবাস্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মানুষের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের দেহে যে একটা [illegible] ন প্রত্যঙ্গ ছিল সেটাকে সর্বদা পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয় না, একথা মানব-সন্তানমাত্রেই স্বীকার করে থাকে।"

'উপমা রবীন্দ্রনাথস্য', ইহা আমরা মানি। কিন্তু উপমা সকল স্থলে যুক্তির আসন গ্রহণ করিতে পারে না। কবি নিজের বাল্যরচনাগুলি সম্বন্ধে যেরূপ কৌতুকজনক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। কিন্তু বাল্যরচনা মাত্রেই গাধার টুপি, ইহা স্বীকার্য্য নহে। তাঁহার মত জয়মাল্য পাইলে কেহই এরূপ গাধার টুপি পরিতে অসম্মত হইবে না।

যাহা হউক, চারুবাবু আশ্বাস দিয়াছেন, কবির সহিত একটা রফা হইয়াছে এবং তাঁহার বর্জিত অধিকাংশ রচনা পরিশিষ্টে স্থান পাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কাঁচা বয়সের যে-সব কবিতা বর্জন না করিয়া স্বয়ং পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার সহিত তুলনীয় নহে।

—

"পটুয়া সঙ্গীত"

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রণীত "পটুয়া সঙ্গীত" লোক-সাহিত্য ও লোক-চিত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত ইহার সমালোচনা মুদ্রিত হইবে বলিয়া ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু লেখা এখন অনাবশ্যক।

—

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী-কার্য্যালয় ১লা কার্ত্তিক, ১৮ই অক্টোবর হইতে ১৪ই কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গের লেখা ১৭ই আশ্বিন সমাপ্ত হইল।

বুদ্ধাবতার চৈতন্যদেব

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধের নামটিতে বৈচিত্র্য আছে। চৈতন্যদেব যে বুদ্ধের অবতার রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, এ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিবেন না। চৈতন্যচরিতামৃতের এক স্থানে স্বয়ং মহাপ্রভুই বৌদ্ধদের নিন্দা করিতেছেন—

শ্রীবিগ্রহ না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী।
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়েত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক।

অথচ উড়িষ্যার বৈষ্ণব সাহিত্যে সত্যসত্যই তাঁহাকে বুদ্ধের অবতার বলা হইয়াছে। বুদ্ধাবতার-কল্পনা যাঁহাদের গ্রন্থে দেখিতে পাই, তাঁহারা মনে প্রাণে বৈষ্ণবই ছিলেন—বৌদ্ধ নহে। অনেকে এই ধরণের লেখকদের "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ধারণার সারবত্তা নাই। তাঁহাদের গ্রন্থে বুদ্ধ ও বৌদ্ধদের বহুল উল্লেখ সত্ত্বেও, তাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন না এরূপ বলা ঠিক হইবে না। কথাটি আরও বুঝাইয়া বলা দরকার।

উড়িষ্যার চৈতন্য-পূর্ব্ব বৈষ্ণব-সাহিত্য জগন্নাথকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্য-বর্ণনায় এই সাহিত্য ছিল পঞ্চমুখ। নীলাচলই নিত্য বৃন্দাবন বা নিত্য-স্থল। কাজেই এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বৃন্দাবনের অপেক্ষা বেশী। যশোবন্ত দাসের 'প্রেমভক্তি-ব্রহ্মগীতা'র শেষ অধ্যায়ে দেখি

দেখ রে নিত্য নীলাচল　　সকল তীর্থঙ্কর আল
গোপমথুরা বৃন্দাবন　　দ্বারকা আদি যেতে স্থান
*　*　*　*　*
কোটিএ তীর্থ এ ক্ষেত্ররে　　মহিমা কহিলে ন সরে

পরবর্ত্তী কালে দিবাকর দাসের 'জগন্নাথচরিতামৃতে'ও এই কল্পনা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দিবাকর দাসের মতে

যেহু গোলক নিত্যস্থল　　সেহুটি গিরি নীলাচল
কোটিএ যুগ যেবে যাই　　এথির লীলা ন সরই
শ্রীজগন্নাথে ষোলকলা　　এথু কলাএ নন্দবলা
কলাকে ষোলকলা হোই　　বেনি অঙ্গিলে গোপে যাই

[যেহু = যে ; সেহুটি = সেটি ; ন সরই = শেষ হয় না ; কলাকে = এক কলা ; বেনি = লইয়া]

জগন্নাথকে দিবাকর দাস শ্রীকৃষ্ণেরও উপরে স্থান দিয়াছেন। ক্রমে চৈতন্যদেব মহামহিমান্বিত জগন্নাথের অবতার বলিয়া কল্পিত হইলেন। এ কল্পনা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাপ্রসূত নহে। জগন্নাথের মাহাত্ম্য এরূপ বিরাট্ হইয়া দাঁড়াইল যে, তাঁহার অবতারস্বরূপ বিবেচিত হইয়াও মহাপ্রভুর মহিমা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অন্ততঃ বুদ্ধাবতার মত যাঁহারা পোষণ করিতেন, মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ছিল অসীম ও আন্তরিক। জগন্নাথ বুদ্ধরূপে কল্পিত হওয়ায় গণিতের নিয়ম অনুযায়ী চৈতন্যদেব বুদ্ধাবতার হইলেন। উড়িষ্যায় প্রচলিত জগন্নাথের আবির্ভাব-কাহিনী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে জগন্নাথ নামে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই কল্পনায় যা কিছু স্থানমাহাত্ম্য, সবই উড়িষ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখি। অষ্টাবক্র প্রভৃতি ঋষিরা শাপ দিলেন, যদুবংশ ধ্বংস হইবে। শোকবিহ্বল শ্রীকৃষ্ণকে পুরীর নীলকণ্ঠেশ্বর শিব প্রবোধ দিলেন যে ভবিষ্যতে "বউদ্ধ রূপে মহোদধি কূলে" তিনি অধিষ্ঠান করিবেন ও যদুবংশ তাঁহার সহিত প্রপঞ্চে বিহার করিতে আসিবেন। (অচ্যুতানন্দ দাস-রচিত শূন্যসংহিতা ২৭শ অধ্যায়)। শিবঠাকুরের ভবিষ্যৎ-বাণী ফলিয়া যাওয়ায় আমরা দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ "নিজ বংশ বেনি বউদ্ধ রূপরে নীলাচলে অছি রহি" (শূ. স. ৩০শ অধ্যায়)। শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর তাঁহার দেহটি, জগতে পবিত্রতম স্থান বলিয়া, যমনিক বা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দাহ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। (জগন্নাথদাস-কৃত 'দারুব্রহ্মগীতা', প্রথম অধ্যায়)। চিতা-অগ্নিতে কেবল হস্তপদ দগ্ধ হইল। ("বউদ্ধ রূপ হেবা পাই পাদপাণি ছাড়িলে তহিঁ"—দারুব্রহ্ম গীতা) দেহ সমুদ্রে ভাসিয়া নীলাচলে আসিয়া লাগিল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত

বিগ্রহগুলি অঙ্গহীন দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। রাত্রে জগন্নাথ তাঁহাকে স্বপ্ন দিলেন।

ঠাকুরে বোইলে রাজা হোইলু কি বাই
কলিযুগে বসিবু বউধ রূপ হোই
—কৃষ্ণদাস-বিরচিত 'দেউলতোলা'
[বাই=পাগল]

সর্ব্বপ্রথম বোধ হয় ধর্ম্ম-পূজা বিধানে জগন্নাথ বুদ্ধরূপে বন্দিত হইয়াছেন।

"জলধির তীরে স্থান বোদ্ধরূপে ভগবান হয়্যা তুমি কৃপাবলোকন" (পৃ. ২০৮)। পরবর্ত্তী কালে বহু উৎকলীয় গ্রন্থে জগন্নাথ বুদ্ধস্বরূপ কল্পিত হইয়াছিলেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, দুষ্টদমন ও ধর্ম্মরাজ্য প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হইবেন। (৪।৭-৮) কলিযুগে জগন্নাথেরও হইল সেই কাজ। কিন্তু দুষ্ট লোকগুলা নীলাচলে জগন্নাথ অধিষ্ঠিত হইবার পরেও জন্মিতে লাগিল। কাজেই বুদ্ধ-জগন্নাথের অবতার অর্থাৎ সচল সংস্করণের প্রয়োজন হইতে লাগিল।

স্বয়ং গৌতম-বুদ্ধ জগন্নাথ-বুদ্ধের অন্যতম অবতার হইলেন। তিনি কিন্তু পৃথিবীতে এক শত বৎসরও থাকিলেন না। কারণ জগন্নাথের অন্ত না থাকিলেও বুদ্ধের ছিল। চৈতন্যদেবও জগন্নাথের অবতার

কলিযুগে দারুব্রহ্মরূপ মো হোইব।
নয়নরে দেখিলে পাপরু মুক্ত হেব।
তহি মধ্যরে অর্দ্ধ অবতার যে হোইব।
কিঞ্চিৎ দিনরে যে চৈতন্য নাম হেব।
নিরাকার দাসের ঝুমর সংহিতা, ২২শ অধ্যায়
[তহি=তার ; হেব=হইবে]

তিনি বুদ্ধ-অবতাররূপে কল্পিত হইলেন, তাঁহার তিরোভাবের পরে। পরবর্ত্তী কালে আরও কয়েকটি বুদ্ধ-অবতার দেখা দিয়াছিল। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে দেখি, রামানন্দ ঘোষ হইয়াছেন "কলিযুগে জীব লাগি বুদ্ধ-অবতার"। এই বুদ্ধাবতারের উদ্দেশ্য ছিল—

যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব
একচ্ছত্র রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব।
("বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ" : হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা)

'যশোমতী মালিকায়' গরুড়কে জগন্নাথ বলিতেছেন, রাজা মুকুন্দদেবের একচল্লিশ রাজ্যাঙ্কে "বুদ্ধ রূপকু তেজি থিবু গুপতরে" উনবিংশ শতকেও অলেখ বা মহিমা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহিমা স্বামীর উদয় হইয়াছিল। মহিমা স্বামী :—

বুদ্ধ রূপকু ধরি গুরুরূপে জ্ঞান দেবে
কুম্ভীপট দেই বানা প্রকাশ করিবে।
[কুম্ভীপট=কুম্ভী গাছের ছাল ; বানা=পতাকা]

শ্যামঘনের 'অলেখ-লীলা' ও শ্রীধর দাসের 'সিদ্ধচন্দ্রিকায়' মহিমা স্বামীকে বুদ্ধ-অবতার বলা হইয়াছে।

এখন দেখা গেল, বুদ্ধ-অবতার-কল্পনা জগন্নাথের মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্যই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণদাসের 'বউদ-ব্রহ্ম-গীতিতে' ইহাও দেখি যে, দশ অবতারের বাকী নয় জনকেও জগন্নাথ-বুদ্ধ কুক্ষিগত করিয়াছেন।

বউদ রূপে নীলগিরি	শ্রীজগন্নাথ বিজে করি
বউদ নীলাদ্রি গোসাই	বসিছি যোগারূঢ় হোই।
কাঠ পাষাণ রূপ ধরি	দারু ব্রহ্মরে বিজে করি।
কেতেহেঁ যুগত বাইছি	বউদ অবতার অছি।
বউদ প্রভু নিরাকার	হোইলে দশ অবতার।
মানবরূপ দেহ ধরি	সন্থ পালিন দুষ্ট মারি।
সে দশ অবতার ক্ষয়ে বিজয়ে	বউদ রূপে গোপ্য হএ।
অনেক অবতার যিব	বউদ সবু দিনে থিব।

[বিজে করি=অধিষ্ঠান করিয়া ; সন্থ=সাধু ব্যক্তি]

আগেই বলিয়াছি, যেখানে জগন্নাথের মহিমা এত বিরাট্ সে ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের পক্ষে অবতার হইয়া যাওয়া অশ্রদ্ধেয় কল্পনা নহে। বুদ্ধ-অবতার-কল্পনা অচ্যুতানন্দ দাস-রচিত শূন্যসংহিতা ও গুরুভক্তিগীতা এবং ঈশ্বর দাস-কৃত চৈতন্যভাগবতে স্থান পাইয়াছে দেখি।

অচ্যুতানন্দ দাস (খুন্টিয়া), ভাগবত, দারুব্রহ্মগীতা-লেখক জগন্নাথ দাস ও প্রেমভক্তিব্রহ্মগীতা-লেখক যশোবন্ত দাস (মল্লিক) মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। অচ্যুতানন্দ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় তিনি বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করেন (শূ. স. প্রথম অধ্যায়)

বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাব উড়িষ্যার চৈতন্য পূর্ব্ব বৈষ্ণব ধর্ম্মে দেখিতে পাই। কিন্তু অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি বুদ্ধ-কল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম-মতের অংশীভূত ভাবিয়াই। কাজেই অচ্যুতানন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা সমীচীন হইবে না।

শূন্যসংহিতার দশম অধ্যায়ে দেখি শ্রীকৃষ্ণ সুদামকে



পারাবত-ভবন
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত তৈলচিত্র হইতে

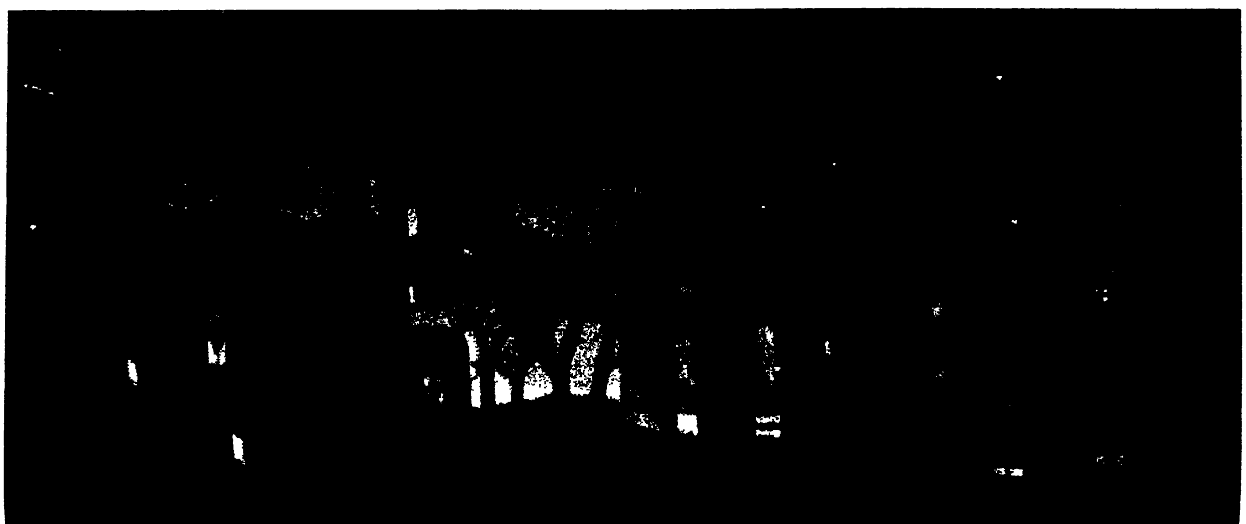


পথের ধারে পটুয়া
শ্রীরমে .নাথ চক্রবর্ত্তী কৃত এচিং হইতে



হ্যাম্পস্টেড হীথ

এচিং : শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী



বলিতেছেন যে, কলিযুগে তিনি বুদ্ধরূপে প্রকট হইবেন। সুদাম সুন্দরানন্দ নামে জন্মগ্রহণ করিবেন ও তাঁহার নির্য্যাণ প্রাপ্তির পর অচ্যুতানন্দ নামে পুনরায় জন্মিবেন। সুন্দরানন্দ ব্রজলীলায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুদাম সখা ছিলেন (গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, ১২৭ শ্লোক)। তিনি শ্রীনিত্যানন্দের প্রধান পার্ষদ ছিলেন (চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৬ষ্ঠ)। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন

> প্রভুঙ্কর আজ্ঞা হেলা শুণ হে সুদাম
> তুম্ভ আম্ভ ভেট নাহিঁ কলিযুগে পুণ।
> বউদ্ধ রূপরে আম্ভে হোইবুঁ প্রকাশ
> সিন্দুরানন্দ যে নাম তুম্ভর প্রকট।
> আম্ভ কলা পুণ নাহিঁ নদিয়া দ্বাপরে
> চৈতন্য রূপে প্রকাশ হোইবুঁ যে থরে।
> (ভেট সাক্ষাৎ; থরে একবার)

শ্রীকৃষ্ণ কেন যে জগন্নাথ-বুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে-কথা আগেই বলা হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জানাইতেছেন,

> কলিযুগে বউদ্ধ রূপে প্রকাশিবু পুণি।
> কলিযুগে বউদ্ধ রূপে নিজরূপ গোপ্য।
> এণু যে সকল মুনি মানে দেলে শাপ।
> (এণু এই প্রকার)

চৈতন্যভাগবতকার ঈশ্বর দাসের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তাঁহার রচিত ভাগবত ও নল-রামচরিত দুই খানিই দুষ্প্রাপ্য ও কোন গ্রন্থেই তিনি আত্মপরিচয় দেন নাই। ভাগবতটি পঁয়ষট্টি অধ্যায়ে সমাপ্ত প্রকাণ্ড পুঁথি। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে চৈতন্যদেবকে বুদ্ধাবতার বলা হইয়াছে। উড়িয্যার চৈতন্য-পূর্ব্ব বৈষ্ণব-মতবাদ এই গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বাংলা অক্ষরে এই উড়িয়া বইখানি প্রকাশিত হইলে চৈতন্য-সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। বইখানি ষোড়শ শতকের শেষভাগে রচিত, কারণ বই লেখা শেষ হইবার পরেও মহাপ্রভুর লীলাবসান সম্বন্ধে মুক্তিমণ্ডপে আলোচনা চলিতেছিল। বুদ্ধ-অবতার কথাটির তাৎপর্য্য শুনুন—

> অচেত হেউথিবে প্রাণী — তেণু চইতন্য নাম ভণি
> পণ্ডিতপণে বোধ কহি — বউধাবতার নাম বহি
> (চৈ. ভা. তৃতীয় অধ্যায়)

[অচেত অচেন; তেণু—তাই; পণ্ডিত…কহি—পাণ্ডিত্যের অধিকারে জ্ঞানের কথা বলিতেছি]

গুরুভক্তি গীতার তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পটলে পাই, বউদ্ধ রূপ গ্রহণ করিয়া চৈতন্যদেবের ভক্ত হইতে অচ্যুতানন্দ আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

> ওড় রাষ্ট্রে জাত হোই — চৈতন্য রূপকু যে ধ্যাই।
> বউদ্ধ রূপ আবোরি — এ খোল করতাল ধরি।
> উদ্ধার করিবা নিমন্তে — আজ্ঞা কলে জগন্নাথে।
> (ধ্যাই ধ্যান করিয়া, আবোরি গ্রহণ করিতে; নিমন্তে জন্য)

মহাপ্রভু তাঁর জীবদ্দশাতেই জগন্নাথের সহিত অভিন্ন বিবেচিত হইয়াছিলেন। (কবিকর্ণপূর—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৬।৪৭; ৮।৭ ও চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য ১৬।৪৭ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-অনূদিত।) ঈশ্বরদাস, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতির মতে তাঁহার তিরোভাবও হইয়াছিল জগন্নাথের মধ্যে। ষোড়শ শতকে রচিত শূন্যসংহিতা, প্রথম অধ্যায় ও চৈতন্যভাগবত, ৬৫ অধ্যায়। সপ্তদশ শতকে রচিত জগন্নাথচরিতামৃত, সপ্তম অধ্যায়।

"শ্রীচইতন্য ভাগবতে বউধাবতারে শ্রীচইতন্য চন্দ্র জন্ম স্বর্গ আরোহণে সবস্তচী নামো পঞ্চষষ্ঠীতমোঽধ্যায়" অনুসারে বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন তিনি জগন্নাথের মধ্যে লীন হইলেন। জগন্নাথের সান্নিধ্যে শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণের ব্যাখ্যা করিতে বুদ্ধাবতার কল্পনা গড়িয়া উঠিল। চৈতন্যদেব জগন্নাথ-বুদ্ধের অবতার, কাজেই জগন্নাথের মধ্যে লীন হওয়াই হইল স্বাভাবিক পরিণতি। তাই অচ্যুতানন্দ লিখিতেছেন,

> শঙ্খ শঙ্খ প্রকাশিলে শীব্রহ্ম মর্ত্ত্যে করিবাক লীলা
> তম বিনাশি তত্ত্বজ্ঞান বুঝাই মিশিগলা আসি, কলা
> অগ্নিরে অগ্নি মিশিলা যেমনে, বারণ সুহৃত জাণি
> কলারে কলা পশিলে মিশিলা, দেখিন দেখিলে প্রাণী
> (মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্যলোক; তম তামসিক দোষ; যেমনে যেমন; কলা কলা অংশে অবতীর্ণ চৈতন্যদেব ষোলকলাময় জগন্নাথের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।)

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের এরূপ ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রীতিকর হয় নাই। ষোড়শ শতকের শেষ দিক হইতে চৈতন্যধর্ম্মের আধিপত্য পাকাপাকি হইল। জগন্নাথের প্রভাব হ্রাস পাওয়া ইহার এক কারণ। কালাপাহাড় দ্বারা নিগ্রহের পর জগন্নাথ আর রাজশক্তির

প্রতীক রহিলেন না। জগন্নাথের মধ্যে লীন হওয়া ও বুদ্ধাবতার-কল্পনা—এই দুই মতবিরুদ্ধ তথ্যের পাল্টা জবাব দিলেন অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নরহরি চক্রবর্ত্তী। ভক্তিরত্নাকর-অনুসারে মহাপ্রভু গোপীনাথের বিগ্রহে সঙ্গোপন হইলেন (অষ্টম তরঙ্গ)। কৃষ্ণবিরহের রূপ ধরিয়া আগত গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীবর্ষভানবী গোপীনাথের মধ্যে লীন হইলে নীতিগত ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে "বুদ্ধাবতার শ্রীচৈতন্য" কল্পনা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল। তাই গৌড়ীয়পন্থী বৈষ্ণব সদানন্দ কবিসূর্য্য ব্রহ্মা তাঁহার মাতৃসাহিত্যে বর্ণিত তিরোভাব প্রসঙ্গ গ্রহণ না করিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তীর বর্ণনা মানিয়া লইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন মহাপ্রভুকে উদ্দেশ করিয়া :—

অগোচর রসামৃত কৃপা করি পিআইলে ভক্তজনে
অষ্ট চালিশ বরষ অন্তর্দ্ধান তোটা গোপীনাথ স্থানে।

(প্রেমতরঙ্গিণী, ৬৩ ছন্দ)

উনবিংশ শতকের হরিদাস তাঁহার 'ময়ূরচন্দ্রিকা'য় প্রভুকে শ্রীরাধার অবতার বলিয়াছেন,

শ্রীরাধা সুবর্ণকু করি স্বীকার
অদ্ভুতে কলিযুগে হেলে প্রচার গো।



হিটলারের জন্মস্থান, ব্রানাও, অষ্ট্রিয়া

সঞ্চয়ন

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে যে ছোটবড় অসংখ্য দ্বীপ রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশেরই উৎপত্তি আগ্নেয় উৎপাতের ফলে। আবার এই কারণেই কখনও কখনও কোন কোন দ্বীপ সমুদ্রের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়, অথবা আকারে আমূল পরিবর্তিত হয়।



ভলকানের অগ্ন্যুদ্গীরণ
অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইবার পাঁচ মিনিট পরে

নিউগিনির পাশে নিউ ব্রিটেন দ্বীপ মৃত ও জীবিত আগ্নেয় পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ইহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত রাবাউল শহরের পোতাশ্রয় পূর্ব্বকালের কোন অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই হয়ত সৃষ্টি হইয়াছিল। এই দ্বীপ যখন প্রথম শ্বেতজাতির হাতে আসে, তখন এ-অঞ্চল ম্যালেরিয়া-উৎপাদক মশকে পূর্ণ ছিল। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া, ও অন্যান্য উপায়ে এনোফেলিস্ মশার জন্মের পথ রুদ্ধ করিয়া ১৯২৫ সালে রাবাউলকে সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে মুক্ত করা হয়।

সাধারণতঃ প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশের দ্বীপগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য খ্যাত। ১৯৩১ সালের মে মাস পর্যন্ত রাবাউলের সে খ্যাতি পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। অন্যান্য গাছের মধ্যে সেখানে ছিল প্রচুর আমগাছ এবং অত্যুচ্চ ঝাউগাছ। মে মাসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এ সৌন্দর্য্যের অনেক অংশেরই



ভলকানের অগ্ন্যুদ্গীরণ
অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইবার কুড়ি মিনিট পরে

ব্যতিক্রম ঘটে। অবশ্য এই ঘটনার ছয় মাসের মধ্যেই রাবাউল তাহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পায়, কেবল নগরের দক্ষিণ অংশ, যাহা আগ্নেয়গিরির নিকটতম প্রতিবেশী, দগ্ধ কুশ্রী অবস্থায় থাকে।

এদেশে সর্ব্বপ্রথম যে অগ্ন্যুৎপাতের সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের। অবশ্য তাহার অর্থ এই নয়, যে ইহার পূর্ব্বে আর অগ্ন্যুৎপাত ঘটে নাই। কিন্তু স্থানীয় আদিম নিবাসিগণের



রাবাউলে ১৯৩৭ সালের অগ্ন্যুৎপাতে একটি জাহাজকে ডাঙায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

নিকট হইতে এইটির খোঁজই সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায়। তখনও নিউ ব্রিটেনে শ্বেতজাতির আগমন হয় নাই। শ্বেতজাতির উপনিবেশ স্থাপনের কয়েক বৎসর পরে, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে "মাটুপি" আগ্নেয়গিরি হইতে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হয়। মাটুপি উচ্চতায় ৭৫০ ফুট। প্রায় সমান উচ্চ, প্রতিবেশী আগ্নেয়গিরি "ভল্‌কান্" হইতেও এই সময় কিছু কিছু অগ্নিস্রাব নির্গত হয়, কিন্তু মাটুপির তুলনায় তাহা কিছুই নহে।

১৮৭৮ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত এই আগ্নেয়গিরিগুলির জীবনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। শুধু মাটুপি উপসাগরের পূর্ব্ব উপকূল হইতে গরম জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস মধ্যে মধ্যে নির্গত হইতে থাকে। ভল্‌কানের অগ্ন্যুৎপাতের শেষ চিহ্নও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং কুড়ি বৎসরের মধ্যেই পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ ঘন-সন্নিবিষ্ট সুউচ্চ ঝাউগাছে ভরিয়া যায়।

১৯৩৭ সালের অগ্নিস্রাবের কোন লক্ষণ পূর্ব্ব হইতে টের পাওয়া যায় নাই। অবশ্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকিলে জলীয় বাষ্প ও গ্যাস নির্গমনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া হয়ত কিছু বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কিছু সন্দেহ করে নাই। আসন্ন অগ্ন্যুৎপাতের প্রথম যে প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহা ২৮শে মে তারিখের দ্বিপ্রহরের অর্দ্ধমিনিটব্যাপী ভূমিকম্প।

ইহার ফলে কোকোপো উপকূলে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি ধস্ নামে, এবং "ভল্‌কান্" দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের মাটি স্থানে স্থানে ফাটিয়া যায়। কিন্তু রাবাউল শহরের তখন পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি হয় নাই।

কিন্তু এই ভূমিকম্পের পরেই প্রকৃতির শান্তভাব ফিরিয়া আসে। পরদিন শনিবারের প্রত্যূষে আবার ভূমিকম্প হয়, তাহাতে অধিবাসীদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

তাহার পরে সারাদিন ধরিয়া থাকিয়া থাকিয়া তীব্র ভূমিকম্প চলিতে থাকে। বেলা দশটার সময়ে ইহার তীব্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ফলে স্থির হইয়া বসিয়া লেখা অসম্ভব হইয়া উঠে।

পূর্ব্বদিন বৈকালে ভূমিকম্পের ফলে রাবাউল পোতাশ্রয়ের জলের স্থিরতার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ভল্‌কান্ দ্বীপে জল ধীরে ধীরে নামিয়া যায় এবং সহসা সাধারণ উচ্চতা অপেক্ষা দেড় শত ফুট উপরে উঠিয়া আসে। ফলে জল যখন আবার ফিরিয়া যায়, তখন স্থানটি মাছে পূর্ণ হইয়া যায়। আদিম নিবাসীদের অনেকে মাছ কুড়াইতে গিয়া অগ্ন্যুৎপাতের ফলে মারা পড়ে।

আসল অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয় ২৯শে মে তারিখে শনিবার বৈকাল ৪টার কিছু পরে। ৭৫০ ফুট উচ্চ আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে উষ্ণ বাষ্প ও বড় বড় প্রস্তরখণ্ড প্রায় ২৫০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত বিপুল বেগে উত্থিত হয়। বাতাসের গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাবাউল নগর চূর্ণ প্রস্তরে আবৃত হইয়া যায়। ধূলিকণার সংঘর্ষে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া প্রচণ্ড বিদ্যুৎঝটিকার সৃষ্টি হয়, এবং ক্রমাগত বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত হয়।

শনিবার সারারাত্রি অগ্নিস্রাব চলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিদ্যুৎচমক ও বজ্রগর্জ্জনও থামিল না। ক্রমান্বয়ে ২৭ ঘণ্টা ধরিয়া এই অবস্থার এতটুকু পরিবর্ত্তন হইল না।

রবিবার দ্বিপ্রহর হইতে নিকটস্থ "টাভুরভুর" (অথবা মাটুপি) পর্ব্বত হইতে অগ্নিস্রাব আরম্ভ হইল। সেই সঙ্গে টাভুরভুরের হইতে ১,১০০ গজ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে কতকগুলি ছোট ছোট আগ্নেয় মুখের সৃষ্টি হইল। এই গুলি হইতে ক্রমাগত বিষাক্ত গ্যাস বাহির হইয়া বহু পশুপক্ষীর মৃত্যু ঘটায়।

রবিবার সারারাত্রি ধরিয়া উষ্ণবাষ্প, কর্দ্দম ও প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া সোমবার সকালে টাভুরভুর কিছু শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। কিন্তু ভল্‌কানের অগ্ন্যুৎপাত তখনও শেষ হয় নাই। রবিবার সমস্ত রাত গন্ধকপূর্ণ কর্দ্দমে শহর ভরিয়া যায়, এবং ভূমিকম্প, বজ্র ও বিদ্যুৎ সমানভাবে চলিতে থাকে।

মঙ্গলবারে বিস্ফোরণের মাত্রা কমিয়া যায়, এবং বুধবার পর্য্যন্ত উভয় আগ্নেয়গিরিই ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে।

এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে স্থানীয় স্থলভূমির রূপ আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে নিক্ষিপ্ত ধূলি ও প্রস্তরখণ্ড স্থানে স্থানে নূতন নূতন দ্বীপের সৃষ্টি করে, এবং স্থলভাগের অনেক অংশের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়।

সর্ব্বসমেত ৫০৫ জন আদিমনিবাসী এবং দুই জন শ্বেতাঙ্গের এই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু ঘটে।

—

বিমান-আক্রমণ হইতে স্থায়ী আত্মরক্ষা

বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধে বিমান-আক্রমণকে সর্ব্বপ্রধান উপকরণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কাজেই যুদ্ধের অণুমাত্র সম্ভাবনাতেই বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করা স্বাভাবিক।

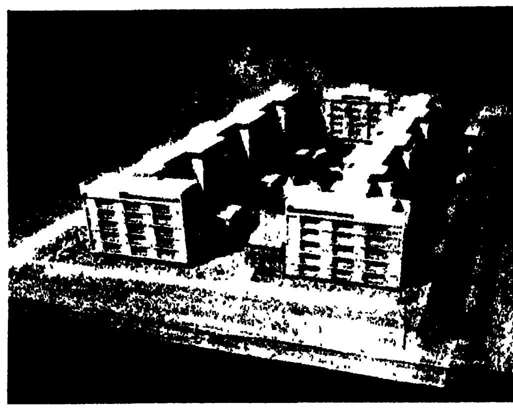
প্রতিরোধের জন্য আছে পাল্টা বিমান আক্রমণ ও ভূপৃষ্ঠ হইতে বিমান-ধ্বংসী কামান। কিন্তু এসময়ে সাধারণ অসামরিক নগরবাসীর করিবার মত কাজ আছে মাত্র একটি, তাহা হইতেছে বিনা বাক্যব্যয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লওয়া।



ভবিষ্যতের নগর-পরিকল্পনা। বর্ত্তমানের ঘিঞ্জি মহানগরীগুলি এই ভাবে পুনর্নির্ম্মিত হইলে শান্তির সময়ে অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল হইবে, যুদ্ধের সময় আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত বোমার হাত হইতে আত্মরক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, ফরাসী পরিকল্পনাকারী এইরূপ অভিমত পোষণ করেন।

সভ্যমানুষ ধরিত্রীমাতার কোল ছাড়িয়া জ্ঞানগর্ব্বে ক্রমাগত উপরে উঠিতেছে; কিন্তু সকলের চেয়ে মজার কথা, আধুনিক অতিসভ্যতা, যাহা চরম বর্ব্বরতার নামান্তর মাত্র, তাহাই আবার তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য ধরাপৃষ্ঠে ও ধরার অভ্যন্তরে নামাইয়া লইয়া আসিতেছে। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের দৈত্যের মত মানুষের নিজের হাতে গড়া দৈত্য মানুষের বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। বিপন্ন খরগোসের মত তাড়িত মানুষ গুহাভ্যন্তরে ঢুকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে।

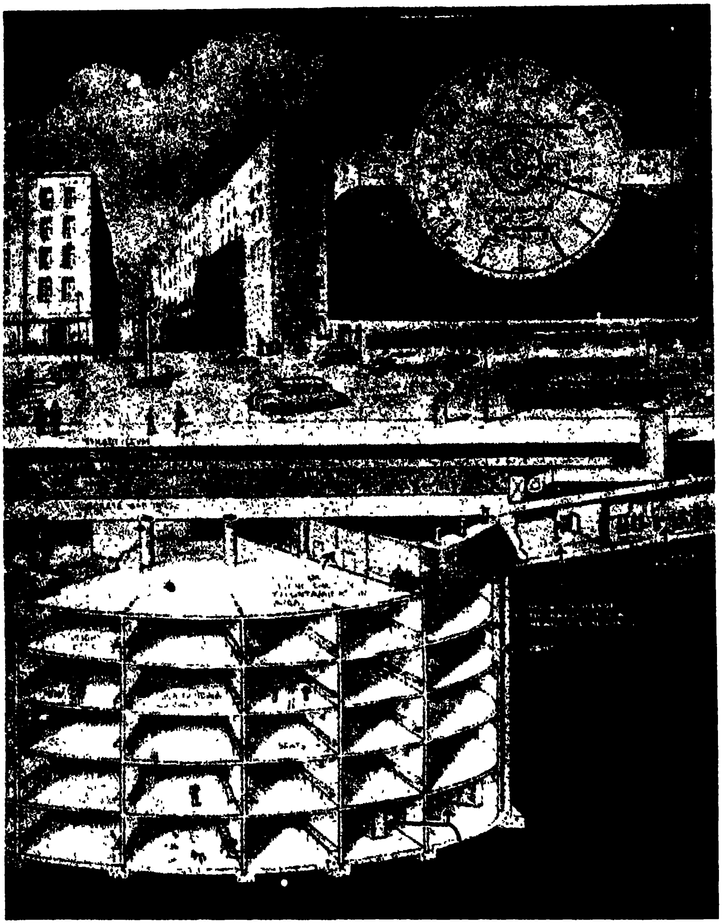
সভ্যযুগে ও সভ্যজগতে যাহা হইতে পারে, সাংহাই ও নানকিন, মাদ্রিদ ও ওয়ারসতে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অগত্যা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভূগর্ভে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে।



জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী নগর-পরিকল্পনা। এক জন ইংরেজ বাস্তুশিল্পী এই নকশাটি প্রস্তুত করিয়াছেন।

ভূগর্ভে আত্মরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা পরপৃষ্ঠায় চিত্রে দ্রষ্টব্য। সাধারণতঃ বিমান আক্রমণে নানাপ্রকার ওজনের বোমা ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ্রতম বোমার ওজন প্রায় দেড়মণ,—ইহা নয় ফুট পর্য্যন্ত মাটি ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে। বৃহত্তম বোমার ওজন এক টন, অর্থাৎ সাড়ে সাতাশ মণ, ইহা ত্রিশ ফুট মাটি ভেদ করিতে পারে। মাটির নীচের নিরাপদ গৃহের গভীরতা ৮৭ ফুট; কাজেই সর্ব্বনিম্নতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিপদের কোনোই ভয় নাই।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যে কোনো বড় শহরই প্রায় যথেচ্ছ জমির ও বাড়ীর মালিকের প্রয়োজনমত গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং গৃহ-নির্ম্মাণের সময় বিমান-আক্রমণের সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া দেখা হয় নাই। এই ধরণের পায়রার খোপের মধ্যে যাহারা বাস করে, সাইরেন বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিবার আশা



বোমার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম ভূগর্ভস্থিত আশ্রয়শালার পরিকল্পনা। রাজপথের নীচে দুই ফুট মাটি, তাহার নীচে আড়াই ফুট কংক্রিট, তাহার নীচে পাঁচ ফুট বালুকাস্তর, তাহার নীচে চার ফুট কংক্রিট, তাহার নীচে আশ্রয়-গৃহ।

তাহাদের কম। কাজেই বোমাবর্ষণের ফলে আঘাতজনিত মৃত্যু যদি নাও হয়, বহির্গমন ও উন্মুক্ত বায়ুর অভাবে খাঁচার পশুর মত মরা খুবই স্বাভাবিক।

কোনো শহরের বৃহত্তম রাস্তায় কয়েকটি বোমা নিক্ষেপের ফলে তিন-চার সপ্তাহের জন্ম যানবাহন-চলাচল বন্ধ থাকিতে পারে। তাহাতে শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য ও দৈনন্দিন কাজের কি প্রকার অসুবিধা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইউরোপের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে বিমান-আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধরিয়া লইয়া শহরের আমূল পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। বার্লিনে এই সম্বন্ধে যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত বড় বড় শহরেরই অনুকরণযোগ্য।

শহর যাহাতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া চারিদিকে বিস্তীর্ণ স্থান লইয়া ছড়াইয়া থাকে, তাহার চেষ্টা বার্লিনে চলিতেছে। বর্ত্তমান বার্লিনে চল্লিশ লক্ষ লোকের বাস। কিন্তু আগামী দশ বৎসরের মধ্যে বার্লিনের কেন্দ্রীভূত জনতা নাকি এমনভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া হইবে যে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে খাস বার্লিনে দশ লক্ষের বেশী অধিবাসী থাকিবে না, এইরূপ প্রকাশ।

কলকারখানা ঘনসন্নিবিষ্ট না রাখিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে তফাতে তফাতে থাকিবে, যাহাতে একটি আক্রমণের ফলেই অধিকাংশ কারখানা বিনষ্ট হইয়া নগরের শ্বাসরোধ না ঘটে।

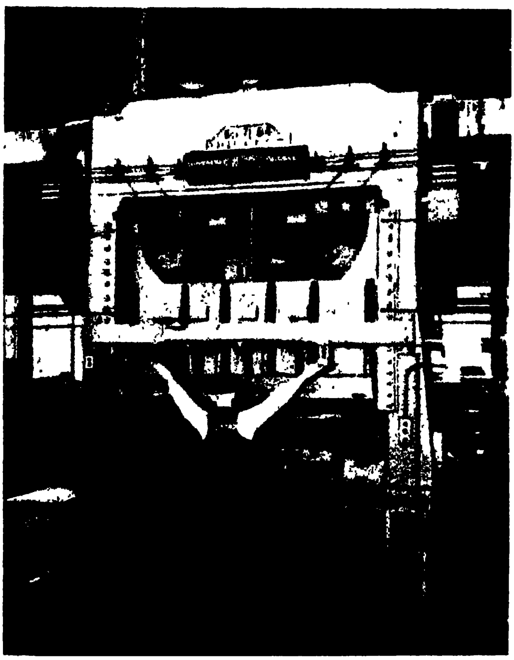
সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন উন্মুক্ত প্রশস্ত রাজপথ। কারণ বর্ত্তমান কালের শহরের রাস্তা যথেষ্ট চওড়া না হওয়ায় একটি বোমা যথাস্থানে নিক্ষিপ্ত হইলেই যানবাহন-চলাচল বিকল হইতে পারে। ভবিষ্যতের নগরে যাহাতে তাহা না হয়, তাহার অগ্রিম বন্দোবস্ত স্থির করা প্রয়োজন।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে ভবিষ্যতের নগরের সহিত বর্ত্তমানের মহানগরীগুলির কোনো মিল থাকিবে না। সঙ্কীর্ণ রাস্তার দুই পাশে জীর্ণ পুরাতন বাসগৃহ এত দিন ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধত্রস্ত নগরবাসীর নির্বিঘ্নতা সাবেকী নিয়মে আর রক্ষা করা চলিবে না। এখন পল্লীর উন্মুক্ত ক্ষেত্রের সহিত নগরের

সমন্বয় ঘটাইতে হইবে। নগরের ঐশ্বর্য্য পল্লীর অভ্যন্তরে লইয়া গেলেই চলিবে না, পল্লীকে নগরের মধ্যে লইয়া আসিতে হইবে।

আধুনিক কলকারখানায় শ্রমিক-মঙ্গল ব্যবস্থা

কলকারখানায় যেখানে নানারকম বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিতে হয়, সেখানে সামান্য অসাবধানতায় দুর্ঘটনা ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই ভাবে কলকারখানায় বহু শ্রমিক প্রতিবৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, নয়ত বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। যুক্তরাজ্যের বড় বড় কারখানায় এই ধরণের দুর্ঘটনা কমাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে, এবং সে-চেষ্টা বহুলাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এক জন শ্রমিক যখন বাড়ীতে থাকে, তখন যতটা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে, কারখানাতে আজকাল আর ততটাও থাকে না; তাহার পক্ষে বাড়ী অপেক্ষা কারখানাই অনেক সময় বেশী নিরাপদ।



এই প্রেসটি চালাইতে হইলে দুই হাতই ব্যবহার করিতে হয়। ফলে এক হাত সরাইলেই প্রেস বন্ধ হইয়া যায়; এবং বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

ওয়েষ্টিংহাউস আমেরিকার বৃহত্তম যন্ত্রপাতির কোম্পানী-সমূহের অন্যতম। এখানে ১৯৩৭ সালের তুলনায় গত বৎসরে দুর্ঘটনা শতকরা ৬৩ ভাগ কমিয়াছে এবং বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে আরও ২৬ ভাগ কমিয়াছে।



কারখানায় বর্ম্মপরিহিত কর্ম্মী।
ধুলা ও আঘাত হইতে রক্ষার উপায়।

দুর্ঘটনার সংখ্যা কমাইতে হইলে প্রথম প্রয়োজন শ্রমিক-দিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া নিজেদের নির্বিঘ্নতার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে ওয়েষ্টিংহাউস হইতে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করা হয়, তাহাতে এই কোম্পানীর অধীনস্থ নানা কারখানা হইতে নির্বিঘ্নতা বৃদ্ধির নানারূপ প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করা হয়। শ্রমিক ও ফোরম্যান্‌দিগকে নানাভাবে এই বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোলা হয়, মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরস্কারের বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে।

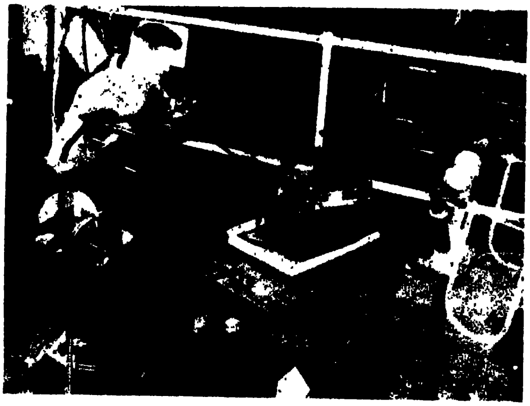
বড় বড় পোষ্টারে সাবধানতার উপকারিতা ও অসাবধানতার বিষময় ফল চিত্রিত করিয়া শ্রমিকগণ যাহাতে যখন-তখন দেখিতে পায় এমন জায়গায় রাখা হয়।

বিপজ্জনক বিভাগের শ্রমিকদিগের জন্য বিশেষ পোষাকের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে অসহ্য উত্তাপের মধ্যে কাজ করিতে হয়, সেখানে অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ নির্ম্মিত টুপি ও পোষাক দেওয়া হয়।

অবশ্য শুধু বিশেষ ব্যবস্থা করিলে এবং বড় বড় পোষ্টার টাঙাইয়া দিলেই নির্বিঘ্নতা বিভাগের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় না। যাহাতে সকল শ্রেণীর শ্রমিক স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হয়। এজন্য শ্রমিকদিগকে সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা, এবং যে-ক্ষেত্রে বিষাক্ত পদার্থ লইয়া কাজ করিতে হয় সে-সব ক্ষেত্রে কি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

বিদ্যুৎশক্তির কারখানায় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা খুব বেশী।

যে বিদ্যুৎস্রোত এক জনের শরীরের মধ্য দিয়া অসাবধানে বহু বার চলিয়া গেলেও কোন বিপদ ঘটে নাই, যে কোন এক দিন, শারীরিক সুস্থতার সামান্যতম ব্যতিক্রমেও এইটুকুতেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে।



রঞ্জন-রশ্মির কারখানায় লেড-গ্ল্যাস পরিহিত কর্ম্মী—এই চশমায় দেখাও চলে অথচ দৃষ্টিশক্তির ক্ষতির সম্ভাবনা দূর হয়।

ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির মধ্যে পরিধেয় বস্ত্রের এক অংশ অথবা চুলের এক গুচ্ছ ঢুকিয়া বহু দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে; এই সকল কারণে মিস্ত্রীদিগকে কাজের সময় আংটি পরিতে দেওয়া হয় না। মেয়েদের লম্বা চুল সমস্তক্ষণ রুমাল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

পূর্ব্বে যে সকল কারখানায় দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, আজকাল সেখানে শ্রমিকদিগকে বিশেষ চশমা পরিতে বাধ্য করায় এ ধরণের দুর্ঘটনা প্রায় লোপ পাইয়াছে। রঞ্জনরশ্মি লইয়া যাহাদের কাজ করিতে হয় তাহাদের জন্য লেড-গ্ল্যাস নির্ম্মিত চশমার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, যাহাতে রঞ্জনরশ্মি চশমা ভেদ করিতে না পারে, অথচ দেখারও কোন অসুবিধা না হয়।

দুর্ঘটনার সংখ্যা কমাইবার জন্য বর্ত্তমানে অসংখ্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে একটি যন্ত্র চালাইতে হইলে দুইটি হাতই ব্যবহার করিতে হয়, যাহাতে একটি হাত সরাইলেও কলটি বন্ধ হয়, এবং হাতখানি বিপজ্জনক স্থানে পড়িতে না পারে। ফোটো-ইলেকট্রিক সেলের সাহায্যে একটি যন্ত্রকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে, যে, যন্ত্রচালকের হাত বিপজ্জনক-স্থানের কাছে আসিলে যন্ত্র আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে।

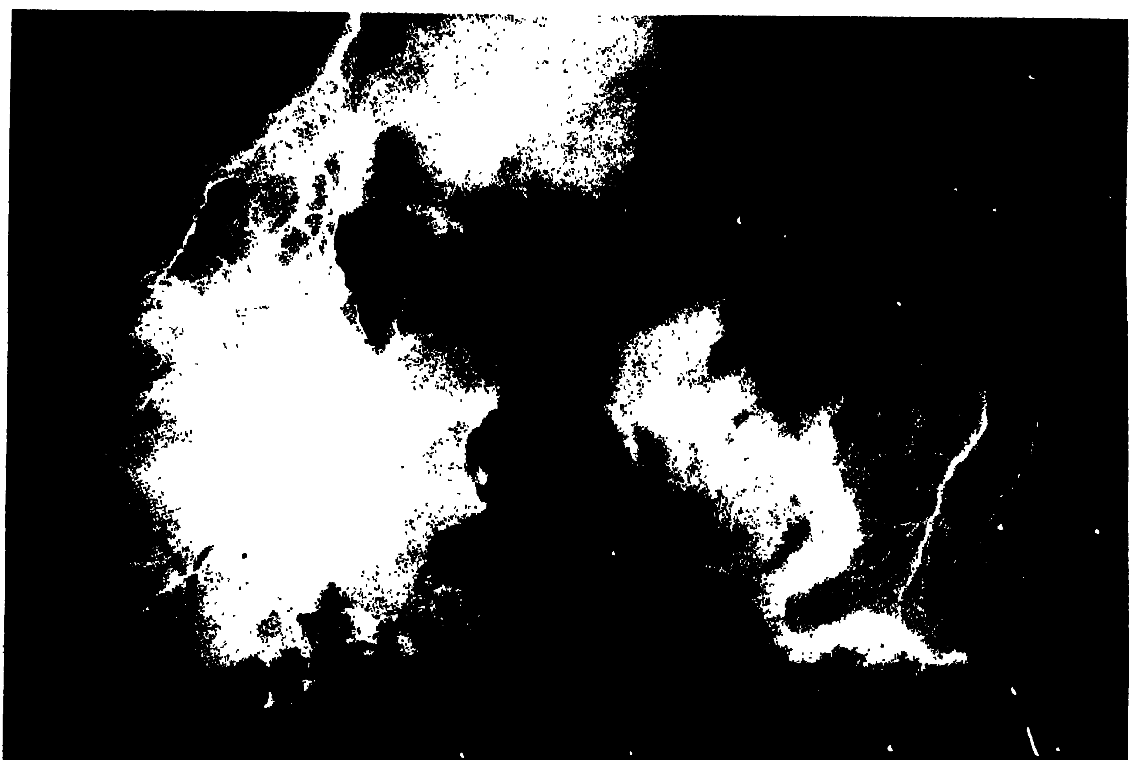
স.



বেলজিয়মের আত্মরক্ষার আয়োজন। "মাজিনো" দুর্গে ভূগর্ভের অস্ত্রাগারে ছোট কামান ও মেসিনগান্ সাজান রহিয়াছে।



ভলকানের দৃশ্য । অগ্ন্যুৎপাত প্রায় শেষ হইবার পরে গৃহীত চিত্র ।



রাবাউলে অগ্নিনিস্রাবকালে বিচিত্র তড়িৎছটা



ত্রিবাঙ্কুরে অস্পৃশ্যদের মন্দির-প্রবেশ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী গঠিত মূর্তি হইতে

বাণীহারা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

অমন করিয়া চেয়ো না ক' আর, করিও না কৌতুক,
আজ তোমা' তরে আনিয়াছি মোর সব-শেষ যৌতুক।
বাঁধি' ফুলহারে ও চারু কবরী,
লোল মোতিমালা পয়োধরে পরি'
ওই ভুরুযুগে বাঁকায়ো না আর কামনার কার্ম্মুক;
আজ হাতে নয়—অধরে সঁপিব অন্তিম যৌতুক!

ও রূপ-সাগরে মিলাইয়া যাক্ এ বাণী-স্রোতস্বিনী;
সুপ্তি-নিশীথে বাজায়ো না আর নূপুরের কিঙ্কিণী।
যে বিষ-পাত্রে পিয়ালে অমিয়া—
তার ভয় আজি ভুলিয়াছি, প্রিয়া!
এ মন-ভ্রমর ভ্রমিবে না আর, ঠাঁই তার লবে চিনি'—
সুপ্তি-নিশীথে কি কাজ বাজায়ে কঙ্কণ কিঙ্কিণী?

আধেক রজনী রূপের শিখায় প্রাণের প্রদীপ জ্বালি',
তব নয়নের কাজলের লাগি', পড়াইনু তায় কালি!
সে দীপ-বহ্নি আজ নিবে আসে,
সে কালি তোমার আঁখিতারা-পাশে
ঘনাইল কোন্ সাগরের নীল—মোর চোখে ঘুম ঢালি'!
আমি সে ঘুমের কাজল রচিনু প্রাণের প্রদীপ জ্বালি'।

চেয়ে তোমাপানে যামিনী হ'ল যে একটি পলকে ভোর,
এইবার, সখি, নিমেষ লভিবে অনিমেষ আঁখি মোর।
আর রহিবে না রূপের পিপাসা,
এই বাণী মোর হবে যে বিপাশা—
হারাইয়া যাবে গানের মুকুতা খুলিয়া শ্লোকের ডোর;
এইবার, সখি, নিমেষ লভিবে অনিমেষ আঁখি মোর!

আলোর বন্যা নিঃশেষ হ'ল—কেটে গেছে কোজাগরী,
কুঞ্জে আমার শরতের শেষ শেফালি পড়িছে ঝরি'।
ওগো অকরুণা রূপসী প্রেয়সী!
এখনো অধরে মধুর বিহসি'
শিশিরের মাসে ফুটাইবে কোন্ কামনার মঞ্জরী?
কুঞ্জে আমার শরতের শেষ শেফালি পড়িছে ঝরি'।

রূপ-অন্ধের আঁখি যে র'বে না চিরনিশি জাগরূক,
নূপুর-কাঞ্চী-কঙ্কণে আর ধ্বনিবে না সুখ-দুখ।
আঁখি রাখি' ওই আঁখির তারায়
এবার বুঝি বা চেতনা হারায়!
আজি অ-ধরার অধরের লাগি' সারাপ্রাণ উৎসুক,
সে রসে বিবশ ঘুমাইবে মোর বাণীহারা সুখ-দুখ।



বিমান-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা

আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে যে অংশ নূতন তাহাই এখন অসামরিক লোকজনের পক্ষে অতিশয় সমস্যাপূর্ণ। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের সৈন্যবল নাশ বা ক্ষীণ করিবার চেষ্টায় সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতে চলিত রীতি। কোন্ অস্ত্র অযথা ক্লেশদায়ক, বা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, কোন্‌টি তাহা নহে,—এ-বিষয়ে বিচার-বিবেচনা। শান্তির সময়ে অবশ্য চলে কিন্তু যুদ্ধকালে দেখা যায় যে দুই পক্ষই প্রথমতঃ প্রতিপক্ষকে ঐরূপ অস্ত্র-ব্যবহারের অভিযোগে দোষী করিয়া পরে নিজেরাও তাহা ব্যবহার করেন। এইরূপে 'দমদম' গুলি, বিষাক্ত গ্যাস, অগ্নিক্ষেপক অস্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার দুই পক্ষেই চলে এবং জলপথে সাবমেরিনের ব্যবহারের উচ্ছেদ-চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সাবমেরিন-জাহাজ নির্ম্মাণও দুই পক্ষেই বাড়িতে থাকে।



চীনের নগরে জাপানের বিমান-আক্রমণ

জলপথ ও স্থলপথের যুদ্ধে অসামরিক জনতার ভয়ের কারণ কিছু-না-কিছু থাকেই, কেননা যুদ্ধক্ষেত্র রঙ্গমঞ্চের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা সময়ে হয় না, কিন্তু এই অতি সভ্যযুগের পূর্ব্বে সমর-অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিপক্ষের সমরবল সম্মুখযুদ্ধে নষ্ট করা। অসামরিক লোকজন যুদ্ধচালনার পথে পড়িলে হতাহত হইত বটে, কিন্তু সাধারণভাবে দুই পক্ষের সেনাদলই তাহাদের উপর অন্য অত্যাচার করিলেও যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করিত না। এখন অত্যাধুনিক সমরবিশেষজ্ঞদিগের মতে যুদ্ধ-অভিযানের প্রধান লক্ষ্য, শত্রুপক্ষের যুদ্ধক্ষমতা ভিতর হইতে নষ্ট করা, অর্থাৎ সম্মুখ-সংগ্রামে বিপক্ষ-সৈন্যকে পরাজিত করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সৈন্যদলের সহায়ক অসামরিক লোকজনকে অতর্কিত আক্রমণ ও

অবরোধকারী ভীত, বিপন্ন এবং বিচলিত করিয়া তোলা যাহাতে অন্তর্বিপ্লবের ফলে আক্রপক্ষের সৈন্যদল ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই অতর্কিত আক্রমণের প্রধান অস্ত্র বোমা-ক্ষেপক এরোপ্লেন। এরোপ্লেন কোথায় আক্রমণ করিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে জানা যায় না, কখন আক্রমণ করিবে তাহারও স্থিরতা থাকে না এবং এখন পর্য্যন্ত ঐরূপ আক্রমণ নিরোধের কোন অব্যর্থ উপায়ও পাওয়া যায় নাই; সুতরাং আক্রমণের ফলে বাস্তব ক্ষতি সামান্য হইলেও আতঙ্ক ও উদ্বেগ অতিশয় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।



চীনের সমরকালীন রাজধানী চুংকিঙে মেথডিষ্ট মিশনে বোমা-আক্রমণকালীন আশ্রয়

আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত জাতি উৎকণ্ঠিত হওয়ায় সমর-সংকল্প ক্ষীণ হইয়া পড়ে, সামরিক রসদ সরবরাহ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থার প্রতিকারের জন্যই নানা দেশে নানা প্রকারে বিমান-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ও সতর্কতা সামরিক ও অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অবলম্বন করিতেছেন; এবং দেশবাসিগণকে প্রথম হইতেই ঐরূপ আক্রমণের ফলাফল সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেশব্যাপী আতঙ্ক ও অশান্তি যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থাও করিতেছেন।

এইরূপ আয়োজনের সাফল্য নির্ভর করে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা সম্প্রতি স্পেন ও চীন এই দুই দেশে হইয়াছে—চীনে এখনও চলিতেছে।

বর্ত্তমানে চীনদেশে জাপানী সামরিক অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য চীনবাসীদিগের যুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প নষ্ট করা; সুতরাং সেখানে এরোপ্লেনের আক্রমণ এখন ব্যাপক-ভাবে নিরস্ত্র অসামরিক লোকজনের উপরই চলিয়াছে। এই আক্রমণ বিশেষভাবে চলিয়াছে চীনদেশের নূতন শাসনকেন্দ্র চুংকিঙের উপর। চুংকিং নগর পর্ব্বত-মালায় ঘেরা এবং ইয়াং-সি-কিয়াং নদ ও কিয়ালিং নদীর সঙ্গমস্থলে স্থিত। এই নগরে দুই বৎসর পূর্ব্বে মাত্র দুই লক্ষ লোক ছিল; কিন্তু শাসনকেন্দ্র ঐখানে স্থানান্তরিত হওয়ায় এখন সেখানে প্রায় আট লক্ষ লোক।

প্রথমে চীনা কর্ত্তৃপক্ষ এরোপ্লেন-নাশক কামান এবং সামরিক এরোপ্লেনের উপর বিমান-আক্রমণ নিরোধের ভার দেন। দেখা যায়, ইহাতে বিপক্ষের এরোপ্লেনকে বাধা দিতে পারে না, ফলে নগর বিধ্বস্ত ও হাজার হাজার নিরস্ত্র নাগরিক হতাহত হয়। তাহার পর অন্য উপায় অবলম্বন করা হয়। এই উপায় প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত।

প্রথমতঃ, নগরের মধ্যে অত্যাবশ্যক কাজকর্ম্ম যাহারা করে তাহাদের জন্য পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ কাটিয়া এবং সুড়ঙ্গ-মুখে বালির বস্তা ঢাকা দিয়া তাহাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অন্য লোকজনকে নগর হইতে দূরে নদীর ওপারে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ফলে নগরে মাত্র



জাপানে বোমা-প্রতিরোধক আশ্রয়স্থল। স্বেচ্ছাসেবীগণ তিন ঘণ্টা যাবৎ ইহাতে আবদ্ধ থাকিয়া ইহার কার্য্যকারিতা পরখ করিয়া দেখিতেছেন।

দুই লক্ষ লোক দিবারাত্র থাকে, অন্যেরা প্রয়োজনমত আসে যায়। ইহার ফলে ভিড় কমিয়া যাওয়ায় বোমাবর্ষণে পূর্ব্বেকার মত হাজার হাজার হতাহতের স্থলে দশ-বিশটি মাত্র যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ, সতর্কতার সঙ্কেত-ব্যবস্থা আরও সুনিয়ন্ত্রিত করা হইল। আক্রমণের কয়েক মিনিট মাত্র পূর্ব্বে সতর্কীকরণ-সঙ্কেত পাওয়ায় পথে-ঘাটে লোকে ছুটাছুটি করিয়া নিজের উপর বিপদ ডাকিয়া আনিত; এখন যথেষ্ট সময় পাইয়া লোকজন সংযত ও দ্রুতভাবে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থলে চলিয়া যায়, পথঘাট খালি করা সহজ হয় এবং বিস্ফোরক-বোমা খোলা জায়গায় পড়িলে প্রায়ই কেহ হতাহত হয় না। আগ্নেয় বোমায় কোথায়ও আগুন লাগিলে দমকল ও উদ্ধারকারীদল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাইতে পারে। এই দ্বিতীয় ব্যবস্থাই বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে।

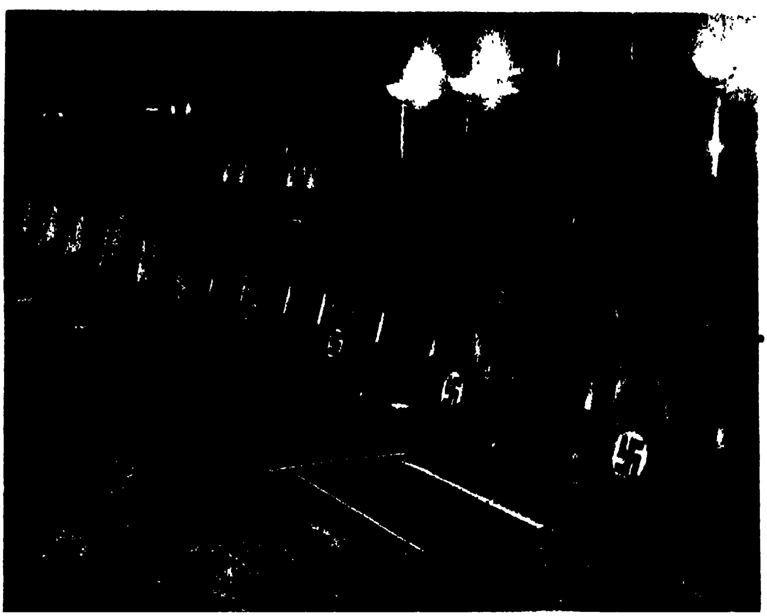
তৃতীয়তঃ, নগরের ও নগরপ্রান্তের লোকজনকে বোমা-ক্ষেপণের ফলাফল সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। প্রত্যেকবার আক্রমণের পরে পূর্ব্বের মত আর ভিড় হয় না, সুতরাং আহতদিগের উদ্ধার, শুশ্রূষা এবং অগ্নিনির্ব্বাপণ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক পাড়ায় যথেষ্ট স্বেচ্ছাসেবক ও ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আগুন নিবাইবার ও আহতদিগের প্রাথমিক সেবার ব্যবস্থা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে রাখা হইয়াছে। ইহাতে আগুন ছড়াইয়া পড়া বা হতাহতের আর্ত্তনাদে ও বীভৎস দৃশ্যে আতঙ্কের প্রবাহ বহা সম্ভব হয় না।

চতুর্থ ব্যবস্থা সামরিক। নূতন কামান, মেশিনগান ও দ্রুতগামী এরোপ্লেন আনা হইতেছে। ইহাতে এখনও বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই, কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, এখন বৈমানিক আক্রমণ পূর্ব্বেকার মত দীর্ঘকালব্যাপী বা ব্যাপক হইতেছে না।

স্পেনে দেখা গিয়াছে যে, বিস্ফোরকপূর্ণ বোমার প্রচণ্ড আঘাত নিরোধ করিতে হইলে দুইটি তিন ফুট ফেরো-কংক্রিট স্তর ও তাহার মধ্যে পনর ফুট মৃত্তিকার ব্যবধান দরকার। তাহার কমে ঐরূপ বোমার সাক্ষাৎ আঘাত রোধ করা যায় না। কিন্তু বিস্ফোরক বোমার প্রধান কাজ শুধু যেখানে পড়ে সেই স্থান ধ্বংস করা নয়, আশেপাশে প্রায় ৩০০ হইতে ৫০০ ফুট ব্যাসের মধ্যে স্থিত যাবতীয় বাড়ীঘর বিস্ফোরণের প্রবল ধাক্কায় ফাটিয়া টলিয়া যায়। বোমার লৌহখণ্ডও আগ্নেয়াস্ত্রের মত চারি দিকে ছড়াইয়া লোকজন হতাহত করিয়া, ইট-কাঠ-কাচ ভাঙিয়া সর্ব্বনাশ করে। এই জন্য সে-সময় উন্মুক্ত জায়গায় থাকা বিশেষ বিপজ্জনক হয়। দেখা গিয়াছে, আধুনিক ফেরো-কংক্রিটের বাড়ী এইরূপ দূরের বিস্ফোরণে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সুতরাং আক্রমণের সঙ্কেত পাইলেই লোকজন ঘর বা সুড়ঙ্গের ভিতর গিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। স্পেনে দেখা গিয়াছে যে, বোমা সোজাসুজি বাড়ীর উপর পড়ায় যত ক্ষতি হইত বিস্ফোরণের ফলে আশেপাশে তাহার দশ গুণ অধিক লোক হতাহত হইত।

বোমা প্রধানতঃ তিন রকমের। বিস্ফোরকপূর্ণ, অগ্নি-সঞ্চারক থের্‌মিটপূর্ণ ও গ্যাসপূর্ণ। এইগুলির মিশ্রণে অন্য প্রকার বোমাও ব্যবহৃত হয়। দেখা গিয়াছে, এই সকল প্রকার বোমাই অসংযত ভিড়ের উপর পড়িলে অতি ভয়ানক ক্ষতি হয়। সংযত ভাবে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় থাকিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে বিমান আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য যে আতঙ্ক-বিস্তার তাহা সম্ভব হয় না এবং হতাহতের সংখ্যাও বিশেষ কমিয়া যায়।

ক. চ.



জার্ম্মেনীর রাষ্ট্রভবনে অমাত্যদিগের মন্ত্রণা-কক্ষ

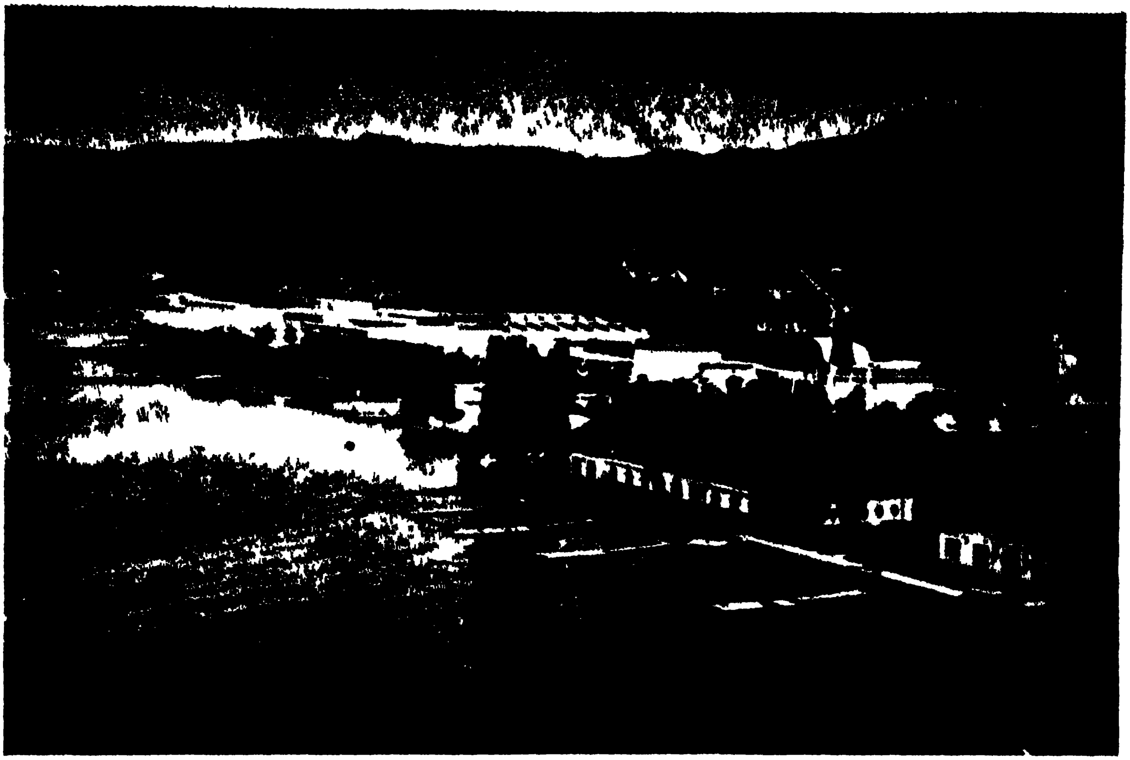
বেলজিয়মের আত্মরক্ষার আয়োজন

নৃপতি এলবার্ট বিগত মহাযুদ্ধে বেলজিয়ম ও বেলজিক জাতির ইতিহাস গৌরবময় করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধের প্রারম্ভেই জার্ম্মানীর বিরাট্ সেনাবাহিনী ফ্রান্সে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য বেলজিয়মের দ্বারে আসিয়া পথ চায়। তাহাদের ধারণা ছিল যে, ক্ষুদ্র বেলজিক জাতি প্রবল-প্রতাপ জার্ম্মান কাইসারের সেনাদলের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করিতে সাহস করিবে না। নৃপতি এলবার্ট জার্ম্মান সৈন্যকে পথ ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিয়া বীরের মত অস্ত্র লইয়া দাঁড়ান। ফলে তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্যদল জার্ম্মান সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণে হটিতে হটিতে স্বদেশের অধিকাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, বেলজিক জাতি এইরূপে পথ না আটকাইলে জার্ম্মান সেনাদল অতর্কিতে ফ্রান্সের সীমানা পার হইয়া ফরাসী সৈন্যের ব্যূহের পাশে অভিযান করিতে পারিত—যাহার ফলে গত মহাযুদ্ধের পরিণাম হয়ত অন্যরূপ হইত। নৃপতি এলবার্টের শৌর্য্যে এবং তাঁহার সেনাদলের অদম্য সাহসের ফলে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রস্তুত হইবার সময় পায় এবং তাহাদের সৈন্যব্যূহের পার্শ্বচ্ছেদের প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে পারে।



ট্যাঙ্ক-নাশক কামানের বর্ম্মাবরণ। ইহা সাধারণ গোলায় নষ্ট হইতে পারে না সুতরাং ইহা বিনষ্ট করিয়া অগ্রসর হওয়া ট্যাঙ্কের পক্ষে অসম্ভব। বেলজিয়মের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা।

যুদ্ধের পরে, বেলজিয়ম যখন বিধ্বস্তপ্রায় এবং তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারখানাগুলি লুপ্তপ্রায়, তখন নৃপতি এলবার্ট দেশগঠনে মনোনিবেশ করেন এবং তাঁহার চেষ্টার ফলে সমস্ত ইয়োরোপের যত জাতি যুদ্ধে লিপ্ত



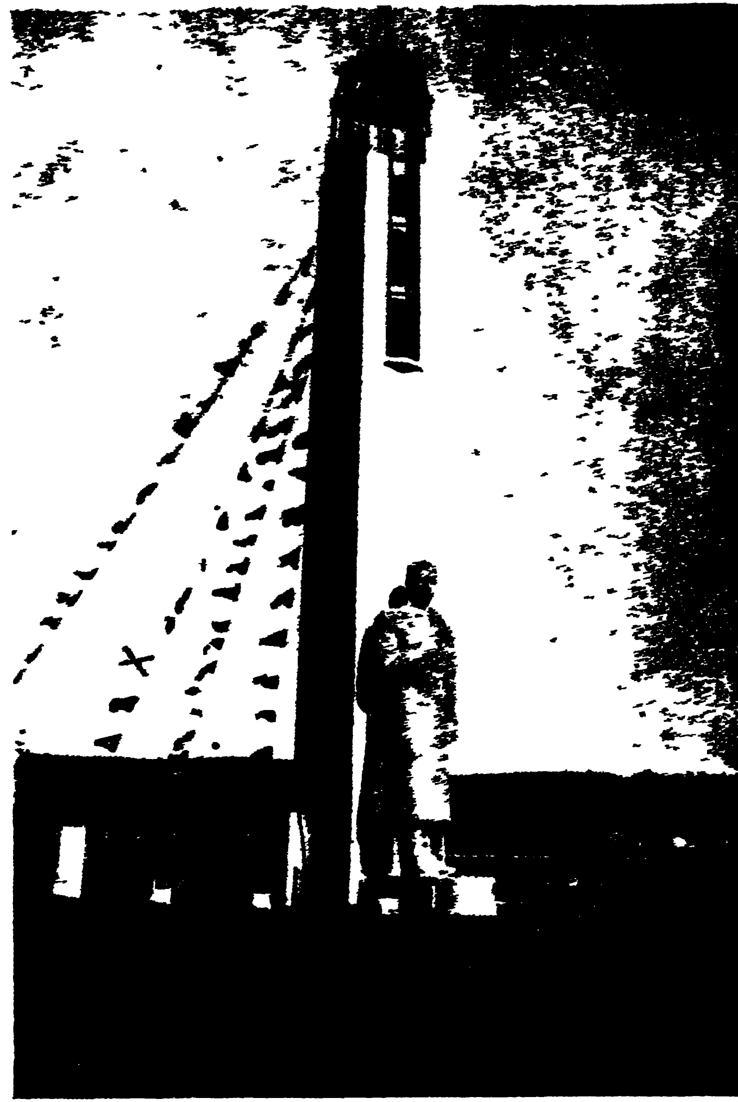
সুইজারল্যাণ্ড। জুরিকের হ্রদতটে সমবৎসরা প্রদর্শনী



বেলজিয়মের নবনির্মিত আলবার্ট খাল, ম্যয়জ নদীর সহিত মিশিয়াছে। উভয়ের সম্মিলনস্থলে লিয়েজ প্রদর্শনী



বেল্‌জিয়ম প্রদর্শনীতে ম্যয়জ নদীতে জললীলা



আলবার্ট খালের মুখে নৃপতি আলবার্টের স্মারক স্তম্ভ ও মূর্তি



বেলজিয়মের "মাজিনো" দুর্গে রক্ষীদল। সৈন্যদল ভূগর্ভ হইতে উপরে উঠিয়া আসিতেছে।

হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বেলজিয়ামই সর্ব্বপ্রথমে ব্যবসাবাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। নৃপতি এলবার্ট দেশগঠনের জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা এবং অনেক নূতন পরিকল্পনা করেন। তাহার একটি পরিকল্পনা পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে, যদিও এলবার্ট নিজে তাহার শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

গতবারে বেলজিয়ম আক্রমণ লিয়েজ নগরের উপরে হয়, ফলে লিয়েজ নগর এবং উহার আশপাশের কলকারখানা খনি ইত্যাদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই অঞ্চলের নিকট বেলজিয়ামের সর্ব্ববৃহৎ কয়লার খনির ক্ষেত্র এবং লোহা-ইস্পাতের কারখানা ছিল। যুদ্ধের পর দেখা যায় যে, ঐ স্থানের তৈরি লোহা-ইস্পাত ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করিতে হইলে হয় রেলপথে পাঠাইতে ও দাম চড়াইয়া দিতে হয়, নয় হল্যাণ্ডের শরণাপন্ন হইয়া তাহার খালপথে মাল সরবরাহ করিয়া লাভের অংশ হল্যাণ্ডকে দিতে হয়।

অন্য দিকে, রাজ্যরক্ষার ব্যাপারেও দেখা যায় যে, যদি কোন শত্রু উত্তর দিক্ হইতে বেলজিয়মে প্রবেশ করে, অর্থাৎ যদি হল্যাণ্ড নিজে শত্রু হয় বা কোন প্রবল শক্তিকে, যথা জার্ম্মানীকে, পথ ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে দেশরক্ষা অসম্ভব। জার্ম্মানী ও বেলজিয়মের সাক্ষাৎ সীমান্তে সে-সময় যেরূপ "মাজিনো" দুর্গমালা নির্ম্মাণ করিবার কথা হইতেছিল (এখন তাহা সম্পূর্ণ), হয় সেইরূপ দুর্গমালা হল্যাণ্ড-সীমান্তে করিতে হয়, নয় অন্য কোনও রূপে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়।

এই দুই সমস্যার সমাধান একই ব্যবস্থায় করিবার জন্য নৃপতি এলবার্ট একটি অতি প্রশস্ত খাল কাটিবার প্রস্তাবনা করেন। এই খাল লিয়েজ ও বেলজিয়মের প্রধান বন্দর এণ্টওয়ার্প পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রসারে প্রায় ৬২ গজ। ইহা এত গভীর যে ২০০০ টনের ষ্টীমার অতি সহজে চলিতে পারে। খাল কাটা আরম্ভ হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এবং এই বৎসর তাহা শেষ হইয়াছে।

এই খালের দ্বারা লিয়েজ নগর ও অঞ্চল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশ উপকৃত হইবে; কেননা ইহার সাহায্যে জলপথে অল্প খরচে লৌহ-ইস্পাত বন্দরে পাঠাইয়া বিদেশে রপ্তানি করা চলিবে। অন্য দিকে এই বিরাট জলপূর্ণ পরিখা শত্রুর যুদ্ধ-অভিযানের পথে বিশেষ অন্তরায় হইল। এই খালের কার্য্যারম্ভ উপলক্ষ্যে লিয়েজে একটি জলপ্রদর্শনী হয়। সেখানে নানা সমারোহের সহিত নৃপতি এলবার্টের স্মৃতিস্তম্ভ ও মূর্ত্তি উদ্ঘাটিত হয়। ক. চ.

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষাপ্রণালী

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, এম. এ.

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমরা ক্রমশঃ সজাগ হইয়া উঠিতেছি। এই শিক্ষা-বিস্তারে জনসাধারণ নানা দিকে নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, দেশের বহু প্রতিষ্ঠানও সাধ্যমত এই কার্য্যে তাঁহাদের শক্তি নিয়োগ করিতেছেন। এই সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশগুলিতেই যে-বাংলা পাঠ্য পড়ান হয় এবং যে-শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করা হয় তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং আমাদের অনেক বিষয়ে বিধি-বিধান মানিয়া একই নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, নিজেদের ইচ্ছামত কোন পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু এই শিক্ষাপ্রণালীর যে আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সে বিষয়ে অনেকেই একমত।

এই সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের কি ভাবে বাংলা শিক্ষা দিতে হইবে সে-বিষয়ে কিছু বলিতে চাই। তাহার পূর্ব্বে সাধারণভাবে বাংলা শিক্ষা-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

আমাদের দেশে যে-কোন বিষয়েই আমরা ছেলেদের শিক্ষা দিতে চাই না কেন তাহা আমাদের নিজেদের মাতৃভাষার সাহায্যেই দিতে হইবে। চক্ষুর সাহায্যে আমরা যেমন বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারি, সেইরূপ যে-কোন বিষয় মাতৃভাষার ভিতর দিয়া আসিলে তাহা যত সহজে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, অন্য কোন বিদেশী ভাষার সাহায্যে তাহা হওয়া সম্ভবপর নহে। বিদেশী ভাষায় আমরা যতই পারদর্শিতা লাভ করি না কেন, তাহাদের রীতিনীতি, জাতীয় প্রকৃতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেই ভাষার মর্ম্মস্থলে প্রবেশাধিকার আমাদের ঘটে না।

আমরা শৈশব হইতে যে-ভাবে বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করি তাহাতে পরবর্ত্তী জীবনে সাহিত্য-রসবোধের শক্তি জাগ্রত হয় না। অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকেও বলিতে শুনিয়াছি, কোন কোন কবিতা তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়, অথচ কাব্যহিসাবে কিংবা রসপ্রকাশে সে-কবিতাগুলি হয়ত অতুলনীয়।

শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ভিতরেও সাহিত্যরস উপভোগ করিবার এই যে অক্ষমতা, ইহার কারণ, শিশুকাল হইতেই আমাদের চিত্ত উপবাসী রহিয়া গিয়াছে। সেই জন্য উচ্চশিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও আমরা মনে পঙ্গু। মৃত্তিকার সহিত রসযোগে অরণ্যের জীবন। ভাষার রসেই সেইরূপ জাতীয় চিত্ত পুষ্ট হয়। জাতির যাহা কিছু আশা ও আকাঙ্ক্ষা, যাহা কিছু মহৎ ভাব তাহার অনুপ্রেরণা সে মাতৃভাষার ভিতর দিয়া পূর্ণভাবে লাভ করে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিশুকাল হইতেই আমরা তাহাতে বঞ্চিত, তাই আমরা বাংলাও শিখি, পরীক্ষা পাসও করি অথচ ভাষার প্রতি প্রাণের টান জাগে না।

আমাদের দেশে সাহিত্যচর্চ্চা যেন কতকটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজ জাতির সাহিত্যসাধনা বহু পরিমাণে তাহাদের জাতিগত। ইংরেজী ভাষায় কোন একখানি ভাল গ্রন্থ রচিত হইলে তাহার পাঠকের অভাব হয় না, অথচ বাংলা ভাষায় কত উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে আমরা তাহার নামও জানি না। সে-দেশে জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসার তাগিদই লেখকদের নিত্য নূতন নূতন পুস্তক প্রণয়নে উৎসাহিত করে, আর আমাদের দেশে লেখকরা যেন জোর করিয়া তাঁহাদের লেখা পাঠকদের পড়াইতে চাহেন। দেশবাসীর সাধারণ সাহিত্যবোধ যদি জাগ্রত করিতে চেষ্টা না-করা হয়, তাহা হইলে এমন এক দিন আসিবে যখন বাংলা-সাহিত্যের সহিত জনসাধারণের চিত্তের কোন যোগ থাকিবে না।

শিশুকাল হইতেই আমাদের ভাষা-শিক্ষা অসম্পূর্ণ হয়—যে-ভাবে পড়িলে ভাষার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার

হইতে পারিত আমরা সে শিক্ষা পাই না। কয়েকখানি গদ্য ও পদ্য জাতীয় পুস্তক আমরা অবশ্যপাঠ্য হিসাবে পাঠ করি এবং কোন রকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। বাল্যকাল হইতে যথার্থ সাহিত্যরসে রসিক এমন শিক্ষকের আমরা সাহচর্য্য পাই না যিনি নিজেও যেমন সাহিত্যরসপিপাসু তাঁহার ছাত্রদের ভিতরেও তেমনি রসপিপাসা এবং রসবোধের শক্তি জাগ্রত করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ছাত্রজীবনের একটি বিশেষ সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করি। শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় আমরা এমন এক জন গুরুকে অধ্যাপকরূপে পাইয়াছিলাম, যাঁহার সাধনায় বাংলা ভাষা বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আমরা তখন অতি শিশু। কিন্তু শিশু বলিয়া তিনি কখনও আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করেন নাই। বাংলা সাহিত্যের রসবোধে তিনি সর্ব্বদা আমাদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি স্বয়ং আমাদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতেন, ভাল ভাল কবিতা আবৃত্তি করিয়া আমাদের শুনাইতেন এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন। তিনি নিজে যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেন, আমাদেরও ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপযোগী করিয়া তাহার ভাগ দিতে চেষ্টা করিতেন। আমাদের শিশুচিত্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাব-সম্পদে মুগ্ধ হইত এবং সজীব ও নবীন হইয়া নূতন এক কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিত।

আমরা যাহারা এই বাংলা ভাষার অধ্যাপনাকার্য্যে নিরত, আমাদেরও মনে রাখিতে হইবে বাংলা সাহিত্যের রসগ্রহণে যদি আমরা বঞ্চিত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের দ্বারা বাংলা ভাষা শিক্ষাদান অসম্পূর্ণ হইবে। বাংলা সাহিত্যের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু মহৎ তাহাতে শিশুদের মনকে যদি উদ্বুদ্ধ করিতে না পারি, এই ভাষার মোহিনী শক্তিতে যদি শিশুচিত্তকে মুগ্ধ করিতে না পারি, তবে আমাদের শিক্ষাদান ব্যর্থ হইবে।

বাল্যকাল হইতেই আমাদের দেশবাসীর সাহিত্য-রসবোধস্পৃহা বর্দ্ধিত করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা হইতেই ইহার সূত্রপাত হওয়া চাই। অনাবিল শিশুচিত্ত সব বিষয় গ্রহণ করিতে সততই উন্মুখ। যে-পথে, যে-ভাবে ইচ্ছা আমরা তাহাকে চালনা ও গঠিত করিতে পারি। এই বয়সে জ্ঞানপিপাসা প্রবল থাকে বলিয়া শিশুর মনের গ্রহণশক্তিও অসীম। যে-কোন কঠিন ছন্দ ও ভাব তাহাদের নিকট উপস্থিত করুন, দেখিবেন তাহারা নিজেদের মত করিয়া কেমন সহজে তাহা উপলব্ধি করিয়াছে এবং আনন্দ পাইতেছে।

এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে নিম্নতম শ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত কি-ভাবে বাংলা পড়ান যাইতে পারে তাহার মোটামুটি আলোচনা করিতেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সবচেয়ে ছোট যে শিশুশ্রেণী, তাহারা বর্ণপরিচয় হইতেই শিক্ষা আরম্ভ করে। বৎসরের প্রথম ভাগে দুই-তিন মাস তাহাদের নানা চিত্রের সাহায্যে শিক্ষাদান করা যাইতে পারে। তিন-চারিটি চিত্রে অঙ্কিত একটি ছোট গল্প সম্পূর্ণ আকারে তাহাদের নিকট ধরিতে হইবে। নানা জনে নানারূপে তাহা প্রকাশ করিবে। শিক্ষক পরে গল্পটি বলিয়া দিবেন। দেখিবেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ কল্পনাবলে চিত্রগুলিকে লইয়া এক একটি নূতন গল্প রচনা করিয়াছে। এই চিত্রগুলি তাহাদের পরিচিত বস্তু বা প্রাণীকে অবলম্বন করিয়া অঙ্কিত হওয়া চাই। অধ্যাপক বিশেষভাবে শিশুদের উপযোগী করিয়া গল্পগুলি রচনা করিবেন এবং নিজে কোন চিত্রকরকে দিয়া তাহা আঁকাইয়া লইবেন। ইহার পরে প্রথম ভাগ আরম্ভ করিলেই চলিবে। বর্ণপরিচয় সম্বন্ধে আমাদের দেশে বর্ত্তমানে নানা প্রণালীর পরীক্ষা চলিতেছে। অধ্যাপক সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিশুদের বর্ণশিক্ষা দিবেন। বর্ণশিক্ষা ও 'আ'কার 'ই'কার যোগ প্রভৃতি সমাপ্ত হইলে ছোট ছোট বাক্য যাহাতে তাহারা পড়িতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। পরিচিত ছোট ছোট কথা—যেমন 'বাবা', 'কাকা' প্রভৃতির বানান মুখে মুখে বলিতে উৎসাহ দিবেন। শিশুরা দেখিয়াছি নিজেরাই অনেক সময় কথাগুলি বানান করিয়া বলিয়া আমোদ পাইয়া থাকে। প্রথম ভাগ শেষ হইলে দ্বিতীয় ভাগ পড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। 'টুনটুনির বই' প্রভৃতির ন্যায় সহজ বই ধরাইতে হইবে। এই বইগুলি পড়িয়া শিশুরা আনন্দ পাইবে এবং পড়ার প্রতি তাহাদের তখন স্বাভাবিক আকর্ষণ আসিবে। এই

সময়ে মুখে মুখে নানাজাতীয় ছড়া ইত্যাদি মুখস্থ করাইতে হইবে। এই ছড়াগুলি একত্রে কোথাও পাওয়া যাইবে না, নানা কবির লেখা হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে। সকল সাহিত্যেই প্রারম্ভে পদ্য পরে গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্য শিশুচিত্তেরও ছড়ার প্রতি চিরন্তন প্রাণের টান দেখিতে পাই। এই সময় হইতেই শিশুর স্বাভাবিক গল্পস্পৃহা দিন দিনই বর্দ্ধিত হয়। রূপকথা জাতীয় নানা গল্পের দ্বারা শিশুচিত্তকে কল্পনার রাজ্যে বিচরণের সুযোগ দিতে হইবে।

প্রথম শ্রেণী—ইহাদেরও শিশুশ্রেণীর ন্যায় শিক্ষা দিতে হইবে। শিশুদের কল্পনাশক্তির যাহাতে সম্যক্ বিকাশ হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। নিয়মিত হস্তলিপি লেখাইতে হইবে। সরল গদ্য ও পদ্য এই সময় হইতেই তাহারা পড়িতে শিখিবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—হস্তলিপি, শ্রুতিলিপি লেখান, নানা ঘটনা বা আখ্যান বর্ণনা করিতে বলা। ঘটনা বিষয়ে খুব সহজ ভাবে মুখে মুখে আলোচনা করান উচিত। কারণ ইহাদের দিয়া লেখান কঠিন। নিজেরা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছে তাহা মুখে বলিয়া যাইবে। তার পর ঠিক লেখার মত ভাষায় বলাইতে হইবে যেন লেখাই হইতেছে। অধ্যাপককে এ-বিষয়ে একটু সাহায্য করিয়া তাহাদের দ্বারা পুরা ছোট ছোট বাক্য রচনা করাইয়া লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে শিশুদের মন সর্ব্বদা যেন সজাগ থাকে। কোন বিষয় তরল করিয়া বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের দিয়া সেটি নিজের ভাষায় বলাইয়া লইতে হইবে। বাক্যরচনাতে যে ভুল হইবে, শিক্ষক বারংবার তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। একই ভাব যে কত প্রকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহা দেখাইতে হইবে। ভাষা যে ব্যবহারে সম্পূর্ণ তরল পদার্থ তাহা ইহা হইতেই শিশুরা বুঝিতে পারিবে। অধ্যাপক এই জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিবেন। কারণ একই বাক্য নানা ভাবে প্রকাশ করা সহজ নহে। বাক্যগুলির বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ অভ্যাস করান প্রয়োজন। গল্প, চিন্তা বা চিত্র বিষয়ে নিজের ভাষায় বলিবার সময় ছেলেদের খুব দ্রুত বলান উচিত। তাহাদের তাড়া দিয়া শব্দ জোগাইয়া চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। শিশুদের বিচারশক্তিও যাহাতে এই বয়স হইতে জাগ্রত হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

তৃতীয় শ্রেণী—শ্রুতিলিপি, হস্তলিপি, বর্ণনা, আখ্যান, পত্র ও ঘটনা নিজের ভাষায় সহজে লেখান। চিন্তাগুলি গুছাইয়া লেখান। কোন একটি গল্পাংশের একটুখানি বলিয়া সবটা পূরণ করিয়া লেখান। মুখে না বলাইয়াই লেখান। অধ্যাপক একটু একটু সাহায্য করিবেন। শব্দের অর্থ ও সংযুক্ত অক্ষরের বানান শিক্ষা দিতে হইবে। ব্যাকরণের স্বরসন্ধি ও বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধে মুখে মুখে সূত্রগুলির উল্লেখ করিয়া পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে অন্যান্য দৃষ্টান্তের উদাহরণ সহ শিক্ষা দিতে হইবে। পৃথক্ ভাবে ব্যাকরণ পড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই।

চতুর্থ শ্রেণী—হস্তলিপি, শ্রুতিলিপি রচনা, স্বরসন্ধি ও বিশেষ্য-বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়গুলি তৃতীয় শ্রেণীর ন্যায় শিক্ষা দিতে হইবে। এই শ্রেণী হইতে দুই প্রকার চিত্তবৃত্তিপ্রধান ছাত্র আমরা দেখিতে পাই। এক দল কল্পনাপ্রবণ ও অপর দল পর্য্যবেক্ষণশক্তিসম্পন্ন। প্রথম দল দৃষ্ট বস্তুর রচনা কালে কি কি বিষয় গ্রহণ ও বর্জ্জন করে ও কোথায় মন হইতে পূরণ করিয়া লয় ইহা দেখিয়া অধ্যাপক তাহাদের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাইবেন। দৃষ্টিমান ছাত্রদের জন্য অধ্যাপক দৃষ্ট বস্তুর তুলনা করিবেন। যেমন আম ও মহুয়ার ছাল, পত্র, পুষ্প ও বীজ ইত্যাদির সাদৃশ্য ও পার্থক্য—যেমন দুই প্রকার শালিখ পাখী আছে তাহাদের তুলনা। যে-ছেলে বেশীসংখ্যক ঐক্য ও অনৈক্যের তালিকা দিবে সে পুরস্কারযোগ্য। রচনা হয় পর্য্যবেক্ষণমূলক, নয় কল্পনামূলক। পর্য্যবেক্ষণমূলক রচনার নির্ভুলতাই প্রধান লক্ষ্য। এজন্য লেখায় কোথাও যেন অসামঞ্জস্য না থাকে, অধ্যাপক সে-বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন। কবিতা পড়াইতে হইলে ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ছন্দ সম্বন্ধে বলিয়া, ছন্দের বিভিন্ন স্বরূপ বুঝাইয়া, তার পর সেইরূপ ছন্দের অনেকগুলি কবিতা শিশুদের উদাহরণস্বরূপ দেখাইতে হইবে। ভাষার কাজ করাইবার জন্য কবিতা নহে। কবিতার সমগ্র ভাবার্থটি ছেলেরা যাহাতে

বুঝিতে পারে তাহা করিতে হইবে। প্রতিশব্দ করিয়া বা গদ্য করিয়া কবিতা পড়ান হয় না। সম্পূর্ণ ভাব শিশুর মানস নেত্রের নিকট প্রত্যক্ষ করান চাই। প্রকৃতির প্রতি শিশুর প্রাণের টান সমধিক বলিয়া প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক কবিতাই বেশী পড়ান উচিত। কবিতার মধ্যে যে-ভাবের প্রাধান্য সেই ভাবকে অবলম্বন করিয়া আবৃত্তি শিক্ষা দিতে হইবে। অভিনয়াত্মক কবিতাগুলি অভিনয়ের আকারে শিক্ষা দিবেন। ছেলেদের দিয়া ছোট ছোট অভিনয় করান বিশেষ প্রয়োজন।

সর্ব্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে, শুধু ক্লাসের পড়ার উপর ছেলেদের বাংলা শিক্ষা নির্ভর করে না। তাহাদের অন্যান্য পুস্তক পাঠে আগ্রহ জাগাইতে হইবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। শিক্ষক নিজেও ইহাতে যোগ দিবেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি শিশু-লাইব্রেরি থাকা চাই এবং বিদ্যালয়-গুলিতে তর্কসভা, সাহিত্য-সভা ও হস্তলিখিত পত্রিকা প্রচলন করিতে হইবে। সম্ভব হইলে এক-এক জেলার সমুদায় প্রাথমিক বিদ্যালয়-পরিচালিত পত্রিকা হইতে উৎকৃষ্ট রচনা লইয়া একটি ছাপা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহাতে শিশু ছাড়া আর কাহারও লেখা ছাপা হইবে না।

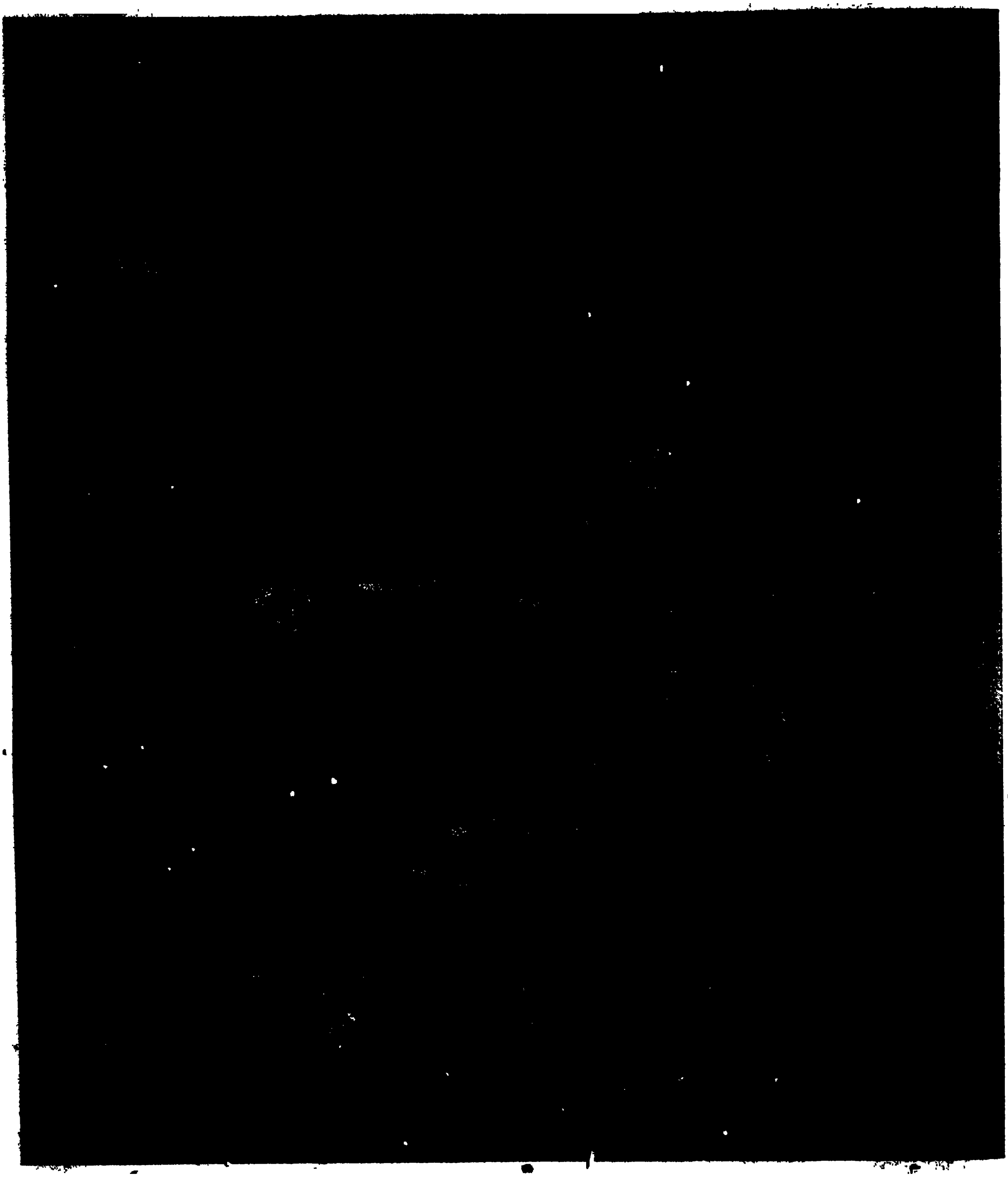
মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী মনীষা সেন এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আর কোন ছাত্রছাত্রী এবার ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই।

শ্রীমতী কমলা দেবী ও শ্রীমতী প্রতিমাময়ী দেবী এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় ভারতীয় ভাষাসমষ্টি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।



শ্রীমতী মনীষা সেন



দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

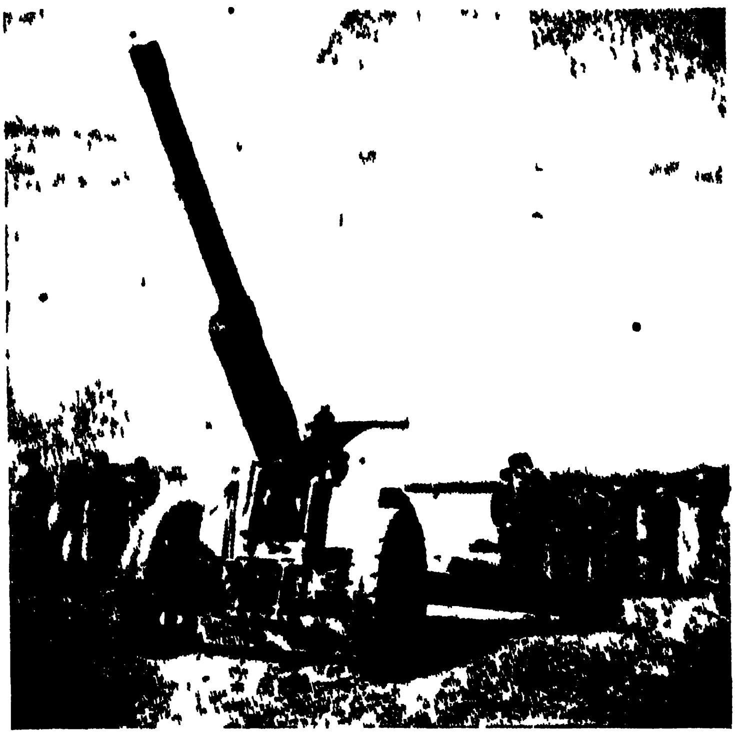
শ্রী গোপাল হালদার

অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

'অবশেষেই' বলিতে হয়। কারণ, অনেক দিন যাবৎই যুদ্ধের কারণগুলি জমিয়া উঠিতেছিল, অথচ যুদ্ধ কিছুতেই বাধিতেছিল না। ইহাতে মনে হইয়াছিল, পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিপুঞ্জ যে করিয়াই হউক, যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিবে; বড় জোর বিশেষ বিশেষ ঘটনাস্থলে যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ (localized) করিয়া তাহারা রক্ষা পাইবে। মাঞ্চুরিয়া, আবিসিনিয়া বা স্পেন লইয়া এই কারণেই মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হইল না; এই কারণেই অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়ার পতনও ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ নীরবে দেখিল।

ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন

যুদ্ধের কারণ তো পুঞ্জিত হইয়াছিল কবে হইতেই—১৯১৮ সনের ভার্সেঁই সন্ধিপত্র দ্বারাই প্রথম সেই যুদ্ধের বীজ বপন করা হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। ইহার পরে রুশ বিপ্লব ও ইতালীর ফ্যাশিস্ত বিপ্লব ঘটিল। তাহার পরে, ভার্সেঁইর গ্লানি ও জার্ম্মান-জাতির ক্ষুব্ধ অভিমানের প্রতীক স্বরূপ উঠিলেন—হের হিট্‌লার। বড় বড় গণতন্ত্রী শক্তি তখনও তাঁহাকে রুশিয়ার শত্রু বলিয়া বুঝিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু মস্কো চুক্তি প্রমাণ করিয়া দিল—সে একটা ভুল ধারণা—হিট্‌লারের



সুইজারল্যাণ্ডের আত্মরক্ষার আয়োজন
বিমান-বিধ্বংসী কামান

জার্মানী কাইসারের জার্মানীরই নূতন রূপ। সে-ও তেমনি সাম্রাজ্য চায়, উপনিবেশ চায়, কাঁচা মালের জোগানদার চায়, মালবিক্রয়ের বাজার চায়—পৃথিবীকে পুনর্বণ্টনের দাবি করে। অতএব আবার জার্মান যুদ্ধ অনিবার্য্য।

যুদ্ধের নানা দিক

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে—কিন্তু চারি সপ্তাহে আমরা তাহার সম্পূর্ণ রূপটিও বুঝিতে পারি নাই। তাহার একটি কারণ এই যে—সংবাদ আসিতেছে অল্প। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যুদ্ধ সম্বন্ধে সত্যই আমরা অজ্ঞ। যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধ-বিজ্ঞান, দুই-ই আমাদের নিকট নিষিদ্ধ শাস্ত্র। অতএব, এই কালের যুদ্ধের অতি সামান্য কথাই আমরা ঠিক রূপে বুঝিতে পারি। তাই, এই জোয়ার-ভাঁটার ঢেউ গণিয়া অনেক সময়ে আমরা লাভ পাইব না। সম্ভব হইলে উহার দুই একটি বিশেষ তরঙ্গাঘাতের খোঁজ লইতে পারিব। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে আজ যুদ্ধের এত বিপুল ও বিচিত্র আয়োজন—আজিকার যুদ্ধ এত ভয়ানক ও এত দুর্বোধ্য, এত বিস্তৃত ও এত দূরপ্রসারী, যে, তাহার সম্পূর্ণ রূপ সহজে বুঝা অসম্ভব। আবার, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক গণনায় আমরা হিসাব লইলে দেখিব—যুদ্ধের আসল ক্ষেত্র পোল্যাণ্ডও নয়, পশ্চিম প্রান্তও নয়, সমুদ্র ও বাণিজ্যপথ। যদি জার্মানী গৃহাবদ্ধ (blockade) হয়, প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বাহির হইতে না পায় তাহা হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য। আবার আরও এক দিক হইতে দেখিলে হয়ত মনে হইবে, অন্যান্য বিষয়ে যেই শক্তিশালী হউক, যে দেশে জনগণ যত অধিকারসম্পন্ন সে-দেশই দীর্ঘদিনের যুদ্ধে তত বেশী টিকিয়া থাকিবারও সম্ভাবনা, এক-নায়কত্বের দেশ নায়কের বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্রোহ করিয়াও বসিতে পারে। এইরূপে নানা দিক হইতে এই যুদ্ধ দেখা চলে।

যুদ্ধের গতি

চারি সপ্তাহের যুদ্ধে যে কথাটি প্রথমত চোখে পড়ে—তাহা পোল্যাণ্ডের পতন। তাহা ছাড়া, যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই 'এথেনিয়া' নামক যাত্রী জাহাজের নিমজ্জনে আমরা বুঝিতে পারি—যুদ্ধ কিরূপ



সুইজারল্যাণ্ডের সমরসজ্জা
জুরিকে মেশিনগান চালনার মহড়া

হইবে। বিমানবাহী ব্রিটিশ নৌতরী 'কারেজিয়াসে'র সমাধিতেও তাহাই আবার বুঝিলাম। এদিকে পশ্চিম সীমান্তের দুর্ভেদ্য দুই সংরক্ষিত রেখার মধ্যে সারব্রুকেন অঞ্চলে যে ভাবে দুই দিকের সৈন্যদল সমবেত হইতেছে, তাহাতে বুঝিতে পারি, যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে এইখানে নির্ণীত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই—প্রত্যেক প্রান্তই আজ এত সুরক্ষিত যে, যুদ্ধ যত ভয়ঙ্করই হউক কেহই দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে না; এবং মানুষের পক্ষে ইহা একটা বড় আশার কথা যে, আক্রমণাস্ত্র অপেক্ষা রক্ষাস্ত্র আজও ভাগ্যক্রমে বেশী ফলপ্রদ। পশ্চিম প্রান্তে অবশ্য এই কারণেই ইংরেজ ও ফরাসী অগ্রসর হইবে অত্যন্ত ধীরে ধীরে, কিন্তু বিলম্ব ঘটিলে তাহাদেরই মোটের উপর লাভ। কারণ, অর্থনৈতিক কারণে জার্মানী চাহে "বিদ্যুৎ ত্বরিত সংগ্রাম"; আর ঠিক ঐ কারণেই ফরাসী ও ইংরেজ চাহিবে সুদীর্ঘ, বিলম্বিত সংগ্রাম। ইহা ছাড়া, সারব্রুকেনের উচ্চ ডাঙাগুলি ফরাসী সেনাপতি গেমেল্যাঁ অধিকার করিয়া সিগফ্রিড রেখা আক্রমণের পক্ষে একটু সুবিধা পাইতেছেন বেশী। অতএব, জার্মান সেনাপতি ব্রাউশিচ্ ও জার্মান রাষ্ট্র-নায়ক হের হিট্লার দুই জনই এখন পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। এদিকে বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডের সীমান্তে জার্মান-বাহিনী যেরূপ সমবেত হইতেছে, তাহাতে জার্মান আক্রমণের পথ হিসাবে যে জার্মানি আবার বেলজিয়মের বা হল্যাণ্ডের উপরে চড়াও করিবে না, তাহাও বলা অসম্ভব। ক্ষুদ্র বেলজিয়মের 'মাজিনো' লাইনে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে।

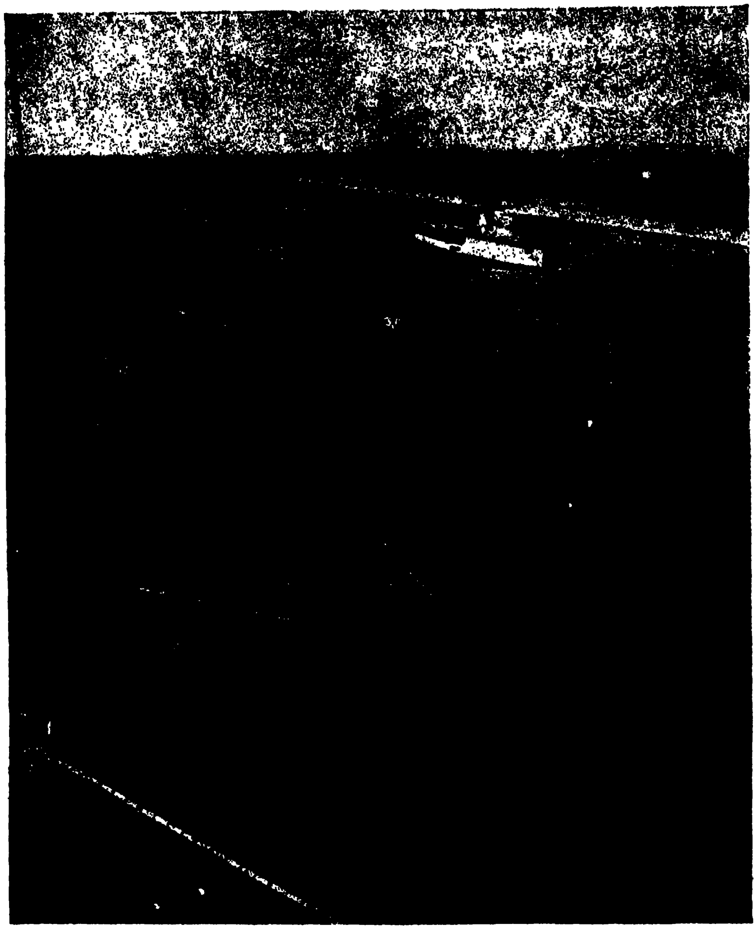
পোল্যাণ্ডের পতন

কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়াছিল পূর্ব্বপ্রান্তে—হিট্লারের পোল্যাণ্ড আক্রমণে। জার্মান সেনা-নায়কদের প্ল্যান ছিল তিন সপ্তাহে পোল্যাণ্ড বিজয় সম্পূর্ণ হইবে। সত্য সত্যই তিন সপ্তাহেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে—কেবল ভারস'র (Warsaw) ভস্মস্তূপ জার্মানদের হাতে আসিয়াছে আরও এক সপ্তাহ শেষে। কিন্তু পোল্যাণ্ড জার্মানির করতলগত হইল না;—জার্মানির হাত ছাড়াইয়া পোল্যাণ্ডের দশ আনা গিয়া পড়িল সোভিয়েট রুশিয়ার কবলে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেই পূর্ব্ব-প্রান্তে যুদ্ধের সূচনা সেই পূর্ব্ব-প্রান্তেই এমন এক নূতন অবস্থার উদ্ভব হইল যে, ইউরোপ-এশিয়ার শক্তিপুঞ্জ ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিতেছে না—এ যুদ্ধ কাহার, কে ইহাতে লাভবান হইতেছে, কোথায় উহার শেষ। সংগ্রাম-কৌশলের দিক হইতে জার্মানী অবশ্য পোল্যাণ্ডে এবার তাহার 'উভয়পার্শ্ববেষ্টনের' (double envel-

opment) নীতির সার্থকতা দেখাইতে পাইয়া খুব খুশী হইয়াছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে তিন দিক হইতে পোল্যাণ্ড বিপুল জার্মান-বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। পূর্ব্বপ্রুশীয় বাহিনী ব্রেষ্ট-লিটভস্ক-এর পথে এবং মোরাভিয়ার বাহিনী খণ্ড (লেমবের্গ)র পথে অগ্রসর হইয়া মার্শ্যাল স্মিগলি-রীজ-এর পোলবাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলিয়া বিনষ্ট করিতে চেষ্টিত হয়। গতবার টেনেনবের্গের যুদ্ধেও হিণ্ডেনবুর্গ রুশদের বিরুদ্ধে এত সৈন্যের সহায়তা পান নাই, এমন সার্থকতা দেখাইবার সুযোগ লাভ করেন নাই—এবার পোল্যাণ্ড নির্ম্মূল হইবার কথা। এমন সময় পোল্যাণ্ড ভাঙিয়া পড়িল—রাষ্ট্রনায়ক মশ্‌চিকি সদলবলে রুমানিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আর রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল রুশিয়া।

সোভিয়েট-আবির্ভাব

নিরপেক্ষ সোভিয়েট এবার পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানকে বিপর্য্যস্ত করিবে—এই ছিল সকলের ধারণা। হঠাৎ জানা গেল মঙ্গোলিয়ায় এক পেয়ালা চা খাইতে খাইতে রুশ-জাপানে দুই দেশে একটা বুঝাপড়া হইয়াছে। চক্ষের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে শোনা গেল—পোল্যাণ্ডের প্রান্তে ৬০ লক্ষ সোভিয়েট সৈন্য সজ্জিত। জার্মানী চমকিত, পৃথিবীও জিজ্ঞাসু। তার পরেই সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মলোটোভ ঘোষণা করিলেন পোল্যাণ্ডে আজ রাষ্ট্র নাই; পোল্যাণ্ডের সংখ্যায় হোয়াইট্ রুশীয় ও লিট্‌ল্ রুশীয়দের আজ অত্যাচারী পোল সামন্তদের হাত হইতে রক্ষা করা দরকার, শান্তি দরকার, শৃঙ্খলা দরকার—দরকার "পৃথিবীর মুক্তিদাতা" সোভিয়েটের। পোল্যাণ্ড বোমায়-কামানে জয় করিয়াছিলেন হিটলার। কিন্তু ভাগ বসাইলেন ষ্টালিন। ভিস্তুলা, সান নদীর তীর হইতে নারো ও পিসা নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ আজ সোভিয়েট ব্যবস্থায় সমর্পণ করিয়া জার্মানী বাকী অংশ গ্রহণ করিল। তাই রুমেনিয়াও হাঙ্গেরির সঙ্গে পোল্যাণ্ডের যে অংশসংযুক্ত তাহাও সোভিয়েট অধিকারে গেল—এই দিক দিয়া জার্মানী আর ঐ দুই রাষ্ট্রের দিকে পা বাড়াইতে পারিবে না,—পোল্যাণ্ডের খনিজ অঞ্চলও পড়িল সোভিয়েট-হস্তে। অথচ, জার্মানীর খাদ্য চাই, তেল



সুয়েজ খাল

চাই—সেই তেল ও শস্যের জন্ম রুমেনিয়া ছিল ভবিষ্যৎ পথ—সে পথও কি রুদ্ধ হইল ?

সোভিয়েট-অধিকৃত পোল্যাণ্ডের হোয়াইট রুশীয় অঞ্চল সোভিয়েট হোয়াইট্ রুশিয়ার, এবং লিট্‌ল্ রুশীয় অঞ্চল সোভিয়েট উক্রেইনের সঙ্গে মিশিতেছে, বাকী অংশে একটি পোলিশ সোভিয়েট স্থাপিত হইতেছে। এই ভাবে এই একটি কৌশলে সোভিয়েট রুশিয়া নাৎসী জার্মানীকে অনেকটা দূরে সরাইয়া দিয়াছে; নাৎসীদের সোভিয়েট উক্রেইন কাড়িবার স্বপ্ন একেবারে ব্যর্থ করিয়াছে, তাহাকে পোল্যাণ্ডের খনিজ অঞ্চল হইতে বঞ্চিত করিয়াছে; আর তাহাদের বল্‌কান-অঞ্চলে প্রবেশের পথ রোধ করিয়াছে—অথচ, ব্রিটিশ-ফরাসী-বৈরিতায় লিপ্ত জার্মানীর মুখব্যাদানের সময় নাই—জার্মান-বৈরিতায় লিপ্ত ফরাসী ও ইংরেজ একেবারেই নির্ব্বাক।

সোভিয়েট কোথায় চলিয়াছে ?

যুদ্ধ চলিতেছে—জার্মানীতে ও ইংরেজ-ফরাসীতে; কিন্তু সোভিয়েট চলিয়াছে কোথায় ? পোল্যাণ্ডের এই নূতন 'বণ্টন' সে সমর্থন করিবে—পোল জনগণের নামে, সেখানকার সংখ্যাল্প জাতিদের ও উৎপীড়িত পোল কৃষক ইহুদীদের স্বাধীনতা দিয়া—তাহাদের সোভিয়েট-রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া। সত্যসত্যই এদিকে পোল্যাণ্ডের ত্রুটি ছিল অনেক; কিন্তু সোভিয়েট অধিকার জনগণের সত্যকার মুক্তির পথ করিয়া দিবে কি ? তাহাই সোভিয়েটের অন্ততঃ দাবী। সম্ভবত সেই দাবির জোরেই সে বল্‌কান ও বাল্‌টিক অঞ্চলে আজ অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। তুর্কীয়া তাহার আহ্বানে নূতন চুক্তি করিতেছে, বুলগেরিয়াও তাহার আবির্ভাবে আগ্রহান্বিত, রুমেনিয়া হাঙ্গেরি তো স্বভাবতই

সাড়,—সমস্ত বল্‌কান-অঞ্চলের কানে সে জাবের আমলের মন্ত্রটি আবার ধ্বনিত করিতেছে—"মাভৈঃ, নিখিল-স্লাভ মিলনের দিন আমি আনিতেছি।" কিন্তু এ কি স্লাভ-মিলন না বল্‌কানে বল্‌শেভিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সূচনা? তাহা হইলে ইতালি কি করিবে? কি করিবে জার্মানি? পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরের তীরে এত আশা এত স্বপ্ন যে তাহাদের। এদিকে বাল্‌টিক্ সমুদ্রের তীরেও রুশ নৌ-বাহিনী হানা দিয়াছে—এস্তোনিয়ার নিকট তাহার দাবি দুইটি নৌ-ঘাঁটি। এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের নিকটও নিশ্চয় এইরূপ দাবী প্রকাশ পাইবে। এই সব ঘাঁটির অভাবে এই সমুদ্রে রুশিয়া এত দিন পথ পায় নাই। আর এত দিন এই সব অঞ্চলে যে নাৎসি-প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহাও সোভিয়েট এই সুযোগে বিলোপ করিয়া নিজের প্রভাব পাকা করিয়া লইবে।

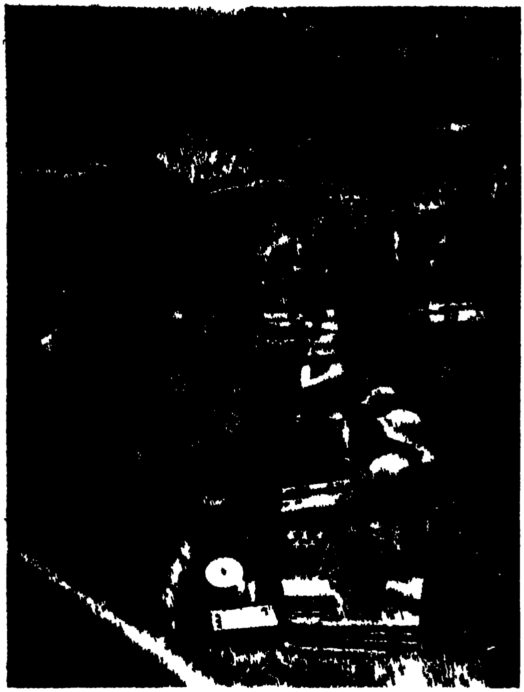
বাল্‌টিক সমুদ্র হইতে কৃষ্ণসমুদ্র পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের অবকাশে ষ্টালিনের পতাকা-ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু বড় বেশী তাড়াতাড়ি হইতেছে। ধীরে, কম্‌রেড্‌ ষ্টালিন, আর একটু ধীরে।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯।

জনৈক বাঙালী লৌহশিল্পী

শ্রীবিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম. এ, বি. এল,

শ্রীযুক্ত তুলসীদাস কর্ম্মকার মহাশয় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এসসি.। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিহার-উড়িষ্যা সরকার ধাতু-বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য সরকারী ব্যয়ে তাঁহাকে বিলাত পাঠান। শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি বি. মেট. (B. Met.) উপাধি লাভ করেন। ইহার পরও তিনি এক বৎসরকাল তথায় অবস্থান করেন এবং কয়েকটি কারখানায় হাতে কলমে কাজ করিয়া পারদর্শিতা লাভ করেন।



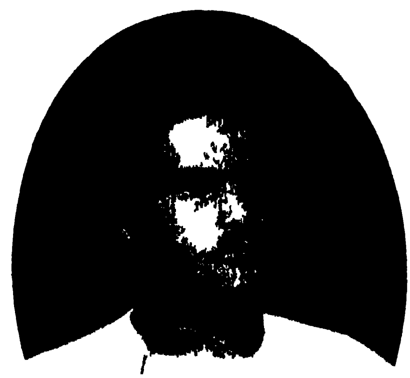
সুইজারল্যাণ্ডের সমরসজ্জা। জুরিকে ট্রেঞ্চ খোড়ার মহড়া

এই সময় তিনি তীক্ষ্ণধার হাতিয়ারের (edge tools-এর) ব্যবসায়ও বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করেন।

ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ-এর অধীনে মেটালাজিষ্ট হিসাবে যোগদান করেন। তখন উক্ত কোম্পানীতে লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রপাতিতে টেমপারিং (tempering) বিষয়ে যে রকম কাজ হইত শ্রীযুক্ত তুলসীদাস কর্ম্মকার মহাশয় তাহা উন্নততর করিয়াছিলেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিতে প্রয়াস পান। বিহার উড়িষ্যা সরকারের শিল্পবিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর তাঁহাকে যন্ত্রাদি কিনিবার বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার কারখানার প্রতিষ্ঠা হয়। কুটীরশিল্পের আকারে লৌহ শিল্পও যে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে নিজের অধ্যবসায় এবং কৃতিত্বের দ্বারা তুলসীবাবু তাহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই দুর্দ্দিনেও তাঁহার কারখানার প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিদেশী কারখানার প্রস্তুত মালের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইয়াছে। তীক্ষ্ণধার হাতিয়ার বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি তাহার সবগুলিই প্রায় এই কারখানায় তৈয়ার হইয়া থাকে। কারখানাটির কাজ কুটীরশিল্প-প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচালিত হওয়ায় এবং ফোর্জিং ও ফিটিং-এর মোটা কাজগুলি কারখানার বাহিরে পুরুলিয়া, ঝালদা, তানাসি, বেগুনকোদের প্রভৃতি অঞ্চলের কামারদের দ্বারা করান হইয়া থাকে। কারখানাতে উহাদের ফিনিশিং-এর কাজই সাধারণতঃ করা হইয়া থাকে এবং তথা হইতে উহা বাজারে প্রেরিত হয়।

বৎসরের যে সময় কাজ থাকে না সে সময় এখানে মাত্র দশ-বার জন এবং কাজের সময় পঞ্চাশ ষাট জন শ্রমিক কাজ করেন। কুটীরশিল্প হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানে লাভও হয় প্রচুর। অবশ্য সরকারী কণ্ট্রাক্ট এখনও ইহার ভাগ্যে জোটে নাই, জুটিলে আরও অনেক লোক কাজ পাইতে পারে।



শ্রীতুলসীদাস কর্ম্মকার

এখন এখানে কি কি জিনিষ তৈয়ারী হইতেছে এবং কিরূপে বাজারের উৎকৃষ্ট বিদেশী জিনিষগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া আছে তাহা বলিতেছি। চা-বাগানের জন্য ছাঁটাই-ছুরি, চটকলে ব্যবহৃত ছুরি, ছুতারদের বেঁদা, এবং বাটালি, কসাইদের ছুরি, কাঁচি এবং দা উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় কৃষিযন্ত্র এবং গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য তৈজস এখানে প্রস্তুত হয়।

কিছুদিন হইল তুলসীবাবু রবার-সংগ্রহের ছুরি তৈরির কাজে হাত দিয়া সফল হইয়াছেন। সুদূর রেঙ্গুনে ইহার আদর

হইয়াছে ইহার জন্য কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্ল্যাকউড এণ্ড ব্ল্যাকউড এণ্ড কোং ধন্যবাদার্হ। এই কোম্পানীটি সুদূর জাভা, সুমাত্রা এবং পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জেও এই কারখানাটির যন্ত্রপাতি প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। সিংহলের ব্যবসায়ীগণও কিছুদিন হইতে কারখানাটির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। সম্ভব হইলে এখানে ছুতারের যন্ত্রপাতি, কুঠার প্রভৃতির আর একটি বাজার খোলা হইবে।

—

বিদেশে এক জন বাঙালী শিল্পীর সমাদর

শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্ত্তমানে কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের প্রধান সহকারী শিক্ষক শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কলাকুশলতা প্রবাসীর পাঠকগণের নিকট এবং বঙ্গের ও ভারতের শিল্পরসিকসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের বিস্তারিত পরিচয় অনেক বার প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছে। কিছু দিন আগে ইউরোপে গিয়া নানাস্থানে চিত্রপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া কলিকাতায় ভাস্কর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের ষ্টুডিয়োতে তিনি একটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। ইউরোপে রমেন্দ্রবাবুর অঙ্কিত চিত্রাবলীর যে সমাদর হইয়াছিল, এই উপলক্ষ্যে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

লণ্ডনে রমেন্দ্রবাবুর চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় বিখ্যাত এচার (etcher) সর্ মুয়ারহেড বোন্ বলেন:

The artist's work, as everyone could see, was full of grace and charm As a personal friend of Dr Rabindranath Tagore he had been afraid at one time that mythology would engross modern Indian art, but it had been saved by its fervent elements of patriotism and its devotion to the home and village life of the Indian people

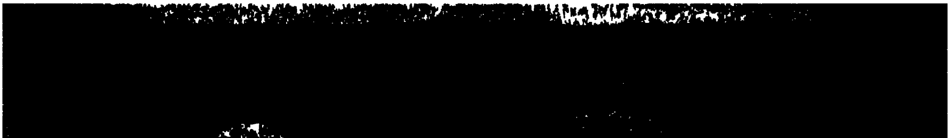
The exhibition consists of about 70 pieces of work and its chief value would seem to lie in its beautifully simple portrayal of Indian life Sir Muirhead Bone, for example, mentioned an Indian kitchen scene, observing that few English artists could convey such a sense of the beautiful in a portrayal of an English kitchen.

(মর্ম্মার্থ) ..."এই শিল্পীর রচনা সুষমা ও মাধুর্য্যে পূর্ণ। এক সময় আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা পুরাণ-কাহিনীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে; কিন্তু [এই শিল্পীর রচনা দেখিয়া মনে হয়] ভারতবাসীর ঐকান্তিক স্বাদেশিকতা এবং পল্লীজীবন ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি অনুরাগের বলে শিল্পকলা মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই প্রদর্শনীর প্রধান দ্রষ্টব্য, ভারতীয় জীবনযাত্রার সহজ সৌন্দর্য্যময় আলেখ্যাবলী। এই শিল্পী ভারতের এক রন্ধনশালার চিত্রে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, এমন সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় কোন ইংরেজ শিল্পী কোন ইংরেজের রান্নাঘর আঁকিতে দিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ"

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্র এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে রমেন্দ্র বাবুর চিত্র সম্বন্ধে বলেন:

Mr Chakravorty is versatile not only in his use of media but also in his choice of subjects. Traditionally Oriental in his use of line and flat colour, he is by no means traditional in his sympathetic way of depicting scenes from every-day life in India Boys and girls at play, gipsies in their encampments, and domestic scenes, are just as much his subjects as the more usual religious or mythological themes Sir Muirhead Bone paid a warm tribute to the artist at the opening, pointing out that art marched on through the artist's love of the ordinary things of life. Since coming to England, Mr Chakravorty has found time to look at the ordinary things of London life too There are aquatints of Hampstead Heath and of a London fog in Camden Town.

(মর্ম্মার্থ) "চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুধু শিল্পরচনার বিভিন্ন উপাদান নির্ব্বাচনে নয়, বিষয়-নির্ব্বাচনেও বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন। রেখা- ও বর্ণ- সম্পাতের পদ্ধতিতে তিনি প্রাচ্যধারানুবর্ত্তী, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কনে তিনি গতানুগতিক পন্থার অনুবর্ত্তী নহেন, শিশুদের খেলাধুলা, গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার চিত্র, বেদেদের চিত্র প্রভৃতি তিনি যেমন আঁকিয়াছেন, সেইরূপ তিনি পৌরাণিক চিত্রও আঁকিয়াছেন সাধারণ ও সামান্য বিষয়ের প্রতি শিল্পীর অনুরাগ দ্বারাই শিল্পের প্রগতি সাধিত হইয়া থাকে, সর্ মুয়ারহেড বোন্ এই কথা বলিয়া শিল্পীকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।"...



শীতের প্যারিস — শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

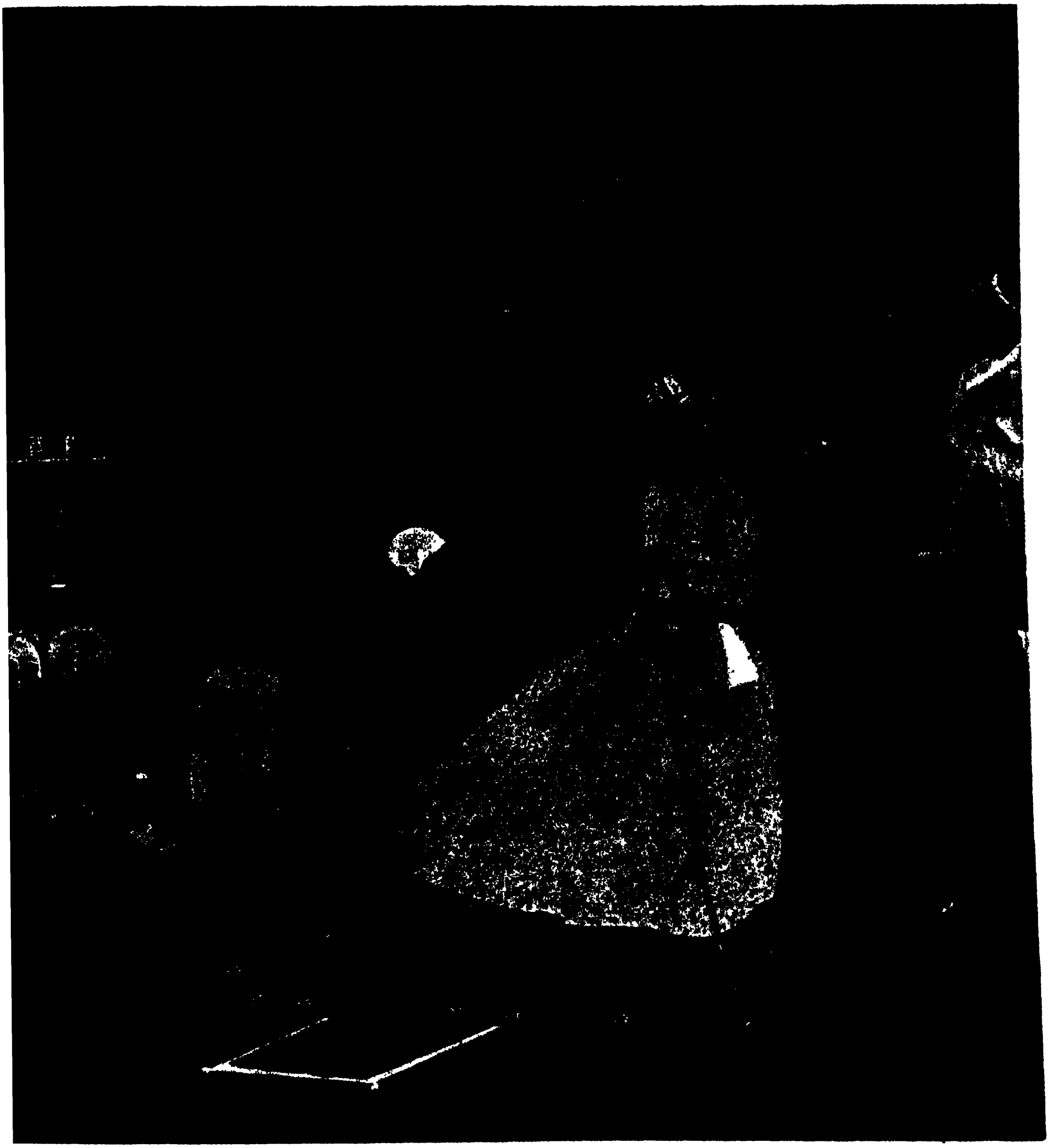
টাইম্‌স্‌ বলেন :

As a rule the work of contemporary Indian artists, when it is not rather awkwardly Westernised, declines into sentimentalized illustrations of traditional themes. Mr. Chakravorty keeps to the native tradition, and illustrates a certain number of classical themes, but, for the representation of everyday life and scenery, he has, so to speak, stiffened his style by Western example without losing the essential character of Indian art. It is a real fusion of styles. A special feature of his work is the extremely sympathetic handling of engraving methods; the flat tones with the emphasis on decorative patterning of aquatint, and the limitation of colour in prints from wood, for example, "Sisters" and "The [illegible] Mother", in water-colour; "Chitrangada and Arjun", in colour woodcut; "The Post and the Dan[illegible]" and "Ducks," in black and white woodcuts; and "Hampstead Heath" and "Winter Fog and Chickens," in aquatint, may be picked out from an exhibition which makes a more encouraging impression than any of contemporary Indian art that we have seen.

(মর্ম্মার্থ) আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের অনেক চিত্রেই দেখি, নয় সেগুলি অদ্ভুত রকম পাশ্চাত্যভাবাপন্ন [illegible] পৌরাণিক কাহিনীর ভাবালু চিত্রণ। চক্রবর্ত্তী মহাশয় [illegible] পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অনেকগুলি পৌরাণিক চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার দৃশ্যগুলি আঁকিতে গিয়া তিনি পাশ্চাত্য ধারাও গ্রহণ করিয়াছেন, তবে ভারতীয়তা বিসর্জ্জন দেন নাই।.. এ পর্য্যন্ত আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের যে-কয়টি প্রদর্শনী আমরা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রদর্শনীটিই সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ আকর্ষণ করে।"

স্থানাভাবে অন্য [illegible] উল্লেখ করা গেল না। রমেন্দ্রবাবু ইউরোপে ভ্রমণকালে [illegible] তৈলচিত্রাঙ্কনের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ইউরোপে অঙ্কিত তাঁহার একখানি তৈলচিত্র ও তিনখানি [illegible] বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

১৯৩২, আষাঢ় [illegible]



শাজাহানের তাজ-নির্ম্মাণ পরিদর্শন

শ্রীপরিতোষ সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

২য় সংখ্যা

লীলা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওগো কর্ণধার
সৃষ্টি তোমার ভাসান খেলায়
লীলার পারাবার।
আলোক-ছায়া চমকিছে
ক্ষণেক আগে, ক্ষণেক পিছে,
পূর্ণিমারে ফুটিয়ে তোলে
অমার অন্ধকার।
ছুটির খেলা খেলাও কর্ণধার,
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার॥

লীলার কর্ণধার
জীবন নিয়ে মৃত্যু ভাঁটায়
চলেছ কোন্ পার।

নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝংকার॥

অলস ক্ষেতের পোড়ো ভূমে
আগাম ফসল মগন ঘুমে।
অগোচরে মাটির নিচে
সোনার স্বপন অঙ্কুরিছে
আলোর পানে কান্না ওঠে,
খবর না পাই তার।
তুমি করো লীলার কর্ণধার
শ্যামল ঢেউয়ের তাল সাধনা
দিগন্ত দোলার॥

তাকিয়ে থাকে নিমেষহারা
দিনশেষের প্রথম তারা।
ছায়াঘন কুঞ্জবনে
মন্দমৃদু গুঞ্জরণে
বাতাসেতে জাল বুনে দেয়
মদির তন্দ্রার।
তুমি তখন লীলার কর্ণধার
গোধূলিতে পাল তুলে দাও
ধূসরচ্ছন্দার॥

অস্তরবির ছায়ার সাথে
লুকিয়ে আঁধার আসন পাতে ;

লীলা

ঝিল্লিরবে গগন কাঁপে,
দিগঙ্গনা কী জপ জাপে,
হাওয়ায় লাগে মোহ-পরশ
রজনীগন্ধার ॥
তুমি তখন লীলার কর্ণধার
নীরব সুরে বেহাগ বাজাও
বিধুর সন্ধ্যার ॥

রাতের শঙ্খকুহর ব্যেপে
ওংকার রব ওঠে কেঁপে।
বিশ্বকেন্দ্র গুহা হোতে
প্রতিধ্বনি অলখ স্রোতে
শূন্যে করে নিঃশবদের
তরঙ্গ বিস্তার।
তুমি তখন লীলার কর্ণধার
তারার ফেনা ফেনিয়ে তোলো
আকাশগঙ্গার ॥

মংপু
১৪।১০।৩৯



আমাদের অবস্থা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

কল্যাণীয়েষু

আমার কাছে মাঝে মাঝে অনুরোধ আসছে আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে। অর্থাৎ একটা পথ দেখাতে হবে অসাধ্য জটিলতার মধ্য দিয়ে। আমি তো কিছুই ভেবে পাই নে।

আমাদের অবস্থাটা এই :— শাসনশক্তি এক দিকে মারণ-উচাটনের সমস্ত তোড়জোড় নিয়ে কড়া আইন আর লাল পাগড়ির বেড়া তুলে কেল্লা ফেঁদে বসে আছে। দেশকে বশীকরণের এই একমাত্র উপায়ের প্রতিই তার চরম বিশ্বাস। আর এক দিকে আছে রিক্ত হাতে নিঃস্ব পকেটে নিঃসহায়ের দল। তারা অহিংস্র শক্তিকেই পরম পরিত্রাণ ব'লে আশ্রয় করবার উপদেশ পায় কিন্তু তার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারছে না। কেননা এই বিশ্বাসমতে সমস্ত জগতে কাজ কিম্বা অকাজ কিছুই চলছে না। হিংস্রতার জোরেই মানুষের মতো পরমহিংস্র জীবের হাত থেকে মানুষকে বাঁচতে হবে এই শিক্ষার উদ্যোগ বিচিত্র উপকরণ সমেত প্রবলভাবে চার দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সকল শিক্ষা হ'তেই যারা বঞ্চিত এ শিক্ষার আয়োজনও তাদের ঘরে নেই। তারা শ্বাপদ মানুষের শিকারের দলে চিরকালের মতো গণ্য। হরিণের মতো পালাবার অধিকারও তাদের নেই, চার দিকে বেড়া দেওয়া। তারা মৃগয়াজীবী রাজন্যের রিজার্ভ ফরেস্টে বাস করে।

মনে পড়ছে একটা গল্প শুনেছিলুম কোনো এক জন বিশ্বাসপরায়ণা ভল্টেয়রকে জিজ্ঞাসা করেছিল, পালকে-পাল ভেড়ার দলকে মন্ত্র পড়ে কি মারা যায়? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, মাডাম, নিশ্চয়ই যায়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আর্সেনিক চাই। এই আর্সেনিক প্রয়োগে মারাত্মক আয়োজন আজ বিশ্ব জুড়ে এমন পরিব্যাপ্ত যে যারা মরছে আর যারা মারছে এই দুই পক্ষের কারো চোখে আর কোনো রাস্তাই পড়ছে না।

বলিদানের রক্তে দেবতাকে তৃপ্ত করবার হিং পূজাবিধি মানুষের বর্বর অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত চ আসছে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো উপদেষ্টা বলেছে একমাত্র প্রেমের দ্বারাই এই পূজা সার্থক হতে পারে। শু মানুষের মনে হয়েছে কথাটা পারমার্থিক ভাবে সত ব্যাবহারিক ভাবে নয়। অর্থাৎ জীবনের যে বিভাগে আ ফললাভকে উপেক্ষা করা যেতে পারে সেই বিভাগেই তা মূল্য আছে কিন্তু ফললাভ যেখানে লক্ষ্য সেখানে দেবতা প্রসন্নতা পাবার জন্য চাই বলির রক্ত। এর মূল মনস্ত হচ্ছে এই যে তীব্র কটুস্বাদ ওষুধের পরেই রোগীর বিশ্বা সম্পূর্ণ নির্ভর করবার জোর পায়, সন্দেহ থাকে না এ ওষুধের মতো ওষুধ বটে। তাই আজ বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্র দাওয়াইখানায় ঝাঁঝালো ওষুধের আমদানি বেড়েই চলেছে শক্তিলাভের টনিক রক্তবর্ণ শক্তির উৎকট রঞ্জনে প্রকটিত কথায় বলে সহস্রমারী চিকিৎসকঃ, বিস্তর মরতে মর তবে চিকিৎসাবিধিতে বিশ্বাসের বদল হয়। সেই মরণে শিক্ষালয় খুলে গেছে সর্বত্র। এই মরণ-শিক্ষালয়ে কো কোটি ছাত্রদের মারতে মারতে শিক্ষার শেষ পরিণা মানুষ কবে ও কোথায় পৌঁছবে বলতে পারি দেখতে পাই ক্লাস চলেইছে কিন্তু শিক্ষার শেষে ঠেকছে না। পুনরাবর্তনই হচ্ছে উত্তরোত্তর বে জোরে। এই অবস্থায় আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞা করে কোন্ পথে চলব, কোনো উত্তর ভেবে না চুপ করে থাকি।

আমরা যে সনাতন বড়ো রাস্তার ধারে

আগল-দেওয়া ঘরে বাস করি সেখানে শত শত শতাব্দী ধরে বাইরে থেকে এসেছে সৈনিক, এসেছে বণিক, পড়েছে আমাদের পিঠের উপরে, ঢুকেছে আমাদের ভাঁড়ারে, অবশেষে আমাদের মেরুদণ্ড পড়েছে বেঁকে, ভাঁড়ারে বাকী আছে খুদকুঁড়ো। অতএব সনাতন শিক্ষাবিধির সাহায্যে ঐতিহাসিক পরীক্ষায় আমরা যে পাস করেছি সম্মানের সঙ্গে, এ-কথা বলবার মুখ নেই আমাদের। কেউ কেউ গর্ব করে বলেন আজও তো আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু এমন বাঁচা আছে যা বিলম্বায়মান মৃত্যু। এই তো আমাদের দশা। এখন, যাঁরা হিংস্র শক্তির প্রধান চেলা অথবা অধ্যাপক তাঁদের কাছে আমার বলবার কথা এই যে, অনেক কাল দেখলুম তাঁদের সিদ্ধিলাভের চেহারা, তার ভার অনেকটা আমরাই বহন করে এসেছি কিন্তু আজ কি তাঁরা জয়লাভের সীমানায় এসে পৌঁছলেন? পাস করলেন কি মনুষ্যত্বের পরীক্ষায়। মেতেছেন যাঁরা প্রতিযোগিতায় তাঁরা জয়ের আশা করছেন কার? হিংস্র শক্তির। এ শক্তি সর্বনাশ-সাধনের পূর্বে কোনো কালেই তো শান্তিতে পৌঁছতে পারে না। এ যে শুধু মানুষের জীবিকা ধ্বংস করছে তা নয় তার চিত্তশক্তিতে দিচ্ছে বিষ মিশিয়ে—যা কিছু তার শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় বোমা ফেলে দিচ্ছে তাকে ধূলোয় গুঁড়িয়ে। আমাদের লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে কিন্তু আজ এই যে দুর্গতির নাগরদোলায় নিরন্তর ঘুরপাক দেখতে পাচ্ছি এই লজ্জা কার?

হিংস্র শক্তির পাদপীঠ মানুষের দৌর্বল্যে, আর মাটি চৌচীর করে তার চাষ লাগাবার ক্ষেত্র দুর্বলের অসহায়তায়। এই নিয়েই তার ব্যবসায়। অনেক দিন থেকে এই ব্যবসায়েই পৃথুল হয়েছে শক্তিমানের কলেবর—তার প্রতাপের পরিধি। বহুকাল থেকে বহুসংখ্যক মানুষকে সে অতলে নামিয়ে এসেছে, দাবিয়ে রেখেছে ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে আমরা তা জানি। তার প্রভাবের সীমানার মধ্যে পাছে কারো বললাভের সূচনা হয় এ জন্য তার সুদূর প্রসারিত সতর্কতা। নরহত্যার বিপুল আয়োজনে ও ব্যয়ভারে ক্লান্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্যে যেই ভারলাঘবের চেষ্টা করে অমনি চমকে উঠে দেখে ভুল হয়েছে। চৈতন্য হয়েছে আপন মহিমার পরে বিশ্বাস রাখবার জন্যে তার দরকার অপরিমিতসংখ্যক খাঁড়া ও খর্পর। হিংস্র শক্তির যে নিদারুণ জাগরূকতা আজ জলস্থলশূন্যে মৃত্যুর বিভীষিকা বিস্তার ক'রে রেখেছে এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখা যায় না। মানব-হননের অসংখ্য তোরণ নির্মাণ করতে করতে পাশ্চাত্য সভ্যতার এই বিজয়-অভিযান কুচকাওয়াজ করে চলেছে। কেউ কোথাও থামতে পারছে না পাছে আর কেউ এগিয়ে যায়।

১৯৩১ খৃষ্টশতকে গিয়েছিলুম জর্মনিতে। জেতা যে নিশ্চিত জিতেছে এই কথাটাকে সে নানা রকমে দেগে দিচ্ছিল বিজিতের মনে। চিরস্থায়ী কালো কালিতে অপমানকে এঁকে দিচ্ছিল ঐতিহাসিক স্মৃতিপটে। বিজিত দেশগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন করে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করছিল যাতে তাদের পঙ্গুতা অবিস্মরণীয় হয়। রাষ্ট্রস্বার্থবুদ্ধির পক্ষে এমন মূঢ়তা আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু হিংস্র শক্তির এইটে প্রকৃতিসিদ্ধ; অহংকারকে সে সম্ভোগ করতে চায়। ক্ষমাহীন প্রতিহিংসুক নীতি তার সুবিচার এবং শ্রেয়োবুদ্ধিকে অন্ধ ক'রে দেয়। দেখা গেল জয়ের দ্বারা হিংস্রতার উষ্মা শান্ত হয় না, উত্তরোত্তর তার উগ্রতা বাড়িয়ে উঠতে থাকে। তখন জর্মনির তরুণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আমার সমস্ত মন আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের দিকে। তারা তখন স্বজাতির ভবিষ্যৎকে একটা মহৎ সফলতার দিকে নিয়ে যাবে সংকল্প করেছিল। তার মধ্যে ক্রোধ ছিল না, দ্বেষ ছিল না, ছিল নূতন সৃষ্টির আবেগ। বর্বরতার উপরে সভ্যতার জয়লাভ নির্ভর করে এই সফলতার পরে। কিন্তু হিংস্র শক্তিই বর্বর। সার্থকতার পথ থেকে মানুষকে সে করে ভ্রষ্ট, মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমানিত করায় তার আনন্দ। সেই তো খোঁচা দিয়ে দিয়ে তরুণ জর্মনিকে অবশেষে হিংস্র ক'রে তুললে, তাকে বর্বরতার পথে টেনে নিলে। য়ুরোপের মাঝখানে হিংস্র শক্তির প্রকাণ্ড একটা অনাসৃষ্টি দেখা দিল। যে নির্মম শাসনশক্তি আমাদের দেশে যোগে দিয়েছে নির্জীব তামসিকতা, সেই শক্তিই য়ুরোপে জাগিয়ে তুলেছে উগ্রকঠোর তামসিকতা। আমাদের ক্ষীণ রেখার ছবি

কারও চোখে পড়বে না, কিন্তু য়ুরোপে হিংস্র শক্তির অক্লান্ত লীলা আজ উৎকটভাবে দেখা গেল। দেখলুম একবারকার যুদ্ধের ফসল যখন সে ঘরে তোলে তখন আর-একবারকার যুদ্ধের বীজ বপন করতে সে ভোলে না।

এবার যুদ্ধের বান ডেকে এসেছে, প্রলয়ের ঝোড়ো হাওয়া লেগেছে হিংস্র শক্তির হাজার হাজার পালের উপর। যে পক্ষই হোক উপস্থিতমতো একটা ফল পাবে যাকে সে বলে জিত। তার পর চলবে সেই কাঁটাগাছের চাষ যা মনুষ্যত্বকে বিক্ষত করবার জন্তে। সেই জন্যেই বলি, এ-পক্ষেরই হোক আর ও-পক্ষেরই হোক জয়কামনা করব কার। জয় যে হিংস্র শক্তির।

আমি পোলিটিশান নই। যাঁরা আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতা তাঁরা কল্পনা করছেন যুদ্ধে যদি রাজশক্তির সহায়তা করি তা হলে বরলাভ করব। এই যে সহায়তার সম্বন্ধ এটা দরকষাকষির হাটে। এটা আন্তরিক মৈত্রীর নয়, দীর্ঘকাল হয়ে গেল সেই সম্বন্ধ-সাধনার অবকাশ এ-দেশে আজ পর্যন্ত ঘটে নি। আমাদের পক্ষে শাসনকর্তাদের বিশ্বাসপরতা অনুভব করি নি, অনুভব করেছি সন্দিগ্ধ শক্তির কটাক্ষপাত। যুদ্ধের যখন অবসান হবে তখন শক্তির জয় হবে মৈত্রীর নয়। শক্তির পক্ষে কৃতজ্ঞতা একটা বোঝা, তাকে স্বীকার করার দ্বারা যে নম্রতা এবং দায়িত্ববোধ আনে সেটা তার স্বভাবের পক্ষে পীড়াজনক। গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ তার পরিচয় পেয়েছে। ঠিক যে সময়টাতে হিসাবনিকাশের অবকাশ এসেছিল ঠিক সেই সময়টাতেই প্রভূত পরিমাণে ঘনিয়ে এল বেত চাবুক জেল জরিমানা গোরা গুর্খা ও প্যুনিটিভ পুলিস।

শক্তির পরে যে-দেশের শাসনভার, স্বতই সে-দেশের চেহারা কী রকম দাঁড়ায় তা আমাদের সামনে শোচনীয় ভাবে স্পষ্ট। নিঃসন্দেহ সেটা তাঁদেরও সুস্পষ্ট গোচর যাঁদের রাজছত্র সমস্ত দেশের দিকে দিকে ছায়া বিস্তার করেছে। সেখানে কোটি কোটি লোক অর্ধাশনে ক্লিষ্ট, অশিক্ষিত, আরোগ্যবিধানহারা, তাদের পানীয় জল কোথাও শুষ্ক কোথাও দূষিত, তাদের রাস্তাঘাটের অভাব চলাচলের প্রয়োজনের মাঝখানে, এ সমস্ত যদি উচ্চাসনবাসীর চোখে প'ড়েও না পড়ে হয় তাহলে বুঝব এইটেই শক্তির শাসনের লক্ষণ। দেশে কি নেই তা বললুম, কিন্তু যা আছে সর্বত্রই, সে হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিচ্ছেদ। দুর্বলতা থেকেই এর উদ্ভব, দুর্বলতাকেই এ পোষণ করে রাখে। নিজের দায়িত্ব যাদের হাত থেকে নিঃসহায়ভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদেরই ঘটে এই দুর্বলতা। শক্তিশাসনের এই বাহনটা দানাপানি খেতে রইল রাজার আস্তাবলে, আমাদের অন্নবস্ত্র অনেক কিছুর ক্ষয় হবে কিন্তু এর বিনাশ হবে না।

মৈত্রীর দ্বারা শাসিত যাদের নিজের দেশ এক বার তাদের সঙ্গে আমাদের দশার তুলনা ক'রে দেখা যেতে পারে। সেখানে বহুদিন ধরে বহুসংখ্যক বেকারদের অন্নপথ্য চলছে রাষ্ট্রভাণ্ডার থেকে, কেননা মানুষের উপবাসজনিত দুর্বলতা সইবে না যেখানে রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা শাসনে নয় মিলনে। দেহে মনে জ্ঞানে কর্মে আনন্দসম্ভোগে সেখানে সকল প্রকার আনুকূল্যই প্রচুর পরিমাণে। স্বল্প অভাবও সেখানে দৃষ্টিতে পড়ে। স্বভাবের কার্পণ্যবশত মৈত্রী যেখানে তিরস্কৃত সেখানে সমস্ত অধ্যবসায় রাষ্ট্রপ্রতাপকে অপ্রতিহত ক'রে তোলবার দিকে। কিন্তু ক্ষমতার অন্ধ ঔদ্ধত্য বুঝতে পারে না মানুষে মানুষে নির্মমতার নীরস ও অসম্মানজনক সম্বন্ধ কখনই টেঁকে না চিরকাল, সময় আসে যখন ভিতরের তাপ দুঃসহ হয়ে ওঠে এবং বাইরের বন্ধনজাল বিদীর্ণ হয়ে যায়। শক্তির থেকে মৈত্রীর রাস্তাবদল কোন্ সত্যের আঘাতে ঘটবে তা বলবার ক্ষমতা আমার নেই কেবল এইটুকু অনুমান করতে পারি যে, শক্তির হাত থেকে আমাদের বরলাভ আরো দুঃসম্ভব হবে যখন সেই শক্তি জয়লাভে দৃপ্ত হয়ে কর্তৃত্বের অধিকারে নিজেকে ধ্রুবপ্রতিষ্ঠ কল্পনা ক'রে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হবে।

আর্ল বল্ড্‌উইন সম্প্রতি আমেরিকায় একটি বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি, অর্থাৎ যেটা ইংরেজের, সেটা সমষ্টিতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি, অর্থাৎ যেটা জর্মনির, তার চেয়ে আইডিয়ালে অধিকতর উচ্চদরের। তিনি বলেন গণতন্ত্র এবং সমষ্টিতন্ত্রের মধ্যে মূলগত প্রভেদ এই যে, গণতন্ত্র স্বীকার করে মানুষের সেই মর্যাদা এবং সেই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য যা সে

দাবী করতে পারে ঈশ্বরের আপন সন্তান ব'লেই। তাঁর মতে গণতন্ত্রের মধ্যে ঐশ্বরিক বিধানের যে একটি ঐক্য-নীতি আছে সংকটের দিনে সকল প্রকার বাহ্য তাড়নার চেয়ে সেইটেই আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

রাষ্ট্রঘটিত আলোচনার সঙ্গে রাষ্ট্রনেতারা ঐশ্বরিক বিধানের একত্রে উল্লেখ প্রায় করেন না। কেননা ঐশ্বরিক বিধানকে যদি মানতে হয় তা হলে দেশে কালে তাকে বিশ্বভূমিকার উপরে স্থাপিত করা চাই। ব্রিটনের রাষ্ট্রনীতি যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছানুকূল ধর্মনীতির অন্তর্গত হয় তা হলে সেই নীতির মধ্যে কেবল ইংরেজের নয় আমাদেরও সমান স্থান আছে। আমরাও মানুষ, আমরাও ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং আমাদেরও মানব-মর্যাদা আমাদেরও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ধর্মনীতির ক্ষেত্রে সম্মানের যোগ্য; রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবহারে তাকে যদি অস্বীকার করা হয় তা হলে সমষ্টিতন্ত্রীয় রাষ্ট্রনীতিকে অন্তত ঈশ্বরের নাম ধরে নিন্দা করা উচিত হয় না। রাষ্ট্রিক ইচ্ছার প্রভাবকে স্বরাষ্ট্রের সীমায় সংকীর্ণ করে দেখবার প্রথা চলে আসছে কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রভাবকে সেই সীমার মধ্যেই একান্ত ক'রে দেখা তো চলে না। আর্ল বল্ড্উইন তাঁদের আইডিয়াল সম্বন্ধে বলেছেন "These ideals require men of their own free will to co-operate with God himself in the raising of mankind." যে স্বাজাতিক অধিকারের মধ্যে মৈত্রীর প্রাধান্যই প্রবল সেখানে মানুষের উৎকর্ষ-সাধনের জন্যে ঈশ্বরের সহযোগিতার কথা স্বভাবতই মনে আসে কিন্তু পরজাতীয় অধিকারে যেখানে শক্তির শাসনতন্ত্রই প্রবল সেখানে মানুষকে উপরে তোলবার জন্যে ঈশ্বরের সঙ্গে হাত মেলানোর কথা মনে আনা কখনই সহজ হ'তে পারে না। বস্তুত আমরা তার উল্টো পরিচয়ই পেয়েছি। অতএব আমাদের শাসনকর্তারা স্বগোত্রীয় মণ্ডলীর মধ্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির উচ্চ আদর্শের অনুগত এ কথা শুনে আমাদের উৎসাহের কোনো কারণ ঘটে না, কিন্তু এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের নাম নিলে সেটা আমাদের কানে দুঃখ দেয়।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন রয়ে গেল আমাদের গতি কী। যে পথে বড়ো বড়ো দেশ আজ উন্মত্তের মতো ধাবমান সে পথ আমাদের অবরুদ্ধ তাতে সন্দেহ নেই। সে পথে শক্তিশালীরাও যে কোথায় পৌছবেন সেটা সন্দেহজনক। এইটুকুই বলতে পারি ইতিহাসের গতি রহস্যময়। দুর্বলের দুঃখও প্রবলের জাহাজে ছিদ্র ক'রে দিয়েছে তার প্রমাণ আছে। ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহই একমাত্র সুযোগ নয়, বঞ্চিতের নৈরাশ্যও কোথা থেকে সুযোগ আকর্ষণ করে আনে এখনি তা বলতে পারি নে। বলতে পারি নে ব'লেই তার আকস্মিক আবির্ভাব বলশালীকে এক দিন অভিভূত করবে। যে অভাগাদের পক্ষে মৈত্রীর পথেও কাঁটা, যুদ্ধের পথেও বাধা তারাই একান্ত আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের অভাবনীয় বিধানের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষেত্রে যারা পরজাতীয় মানুষকে চিরকালের মতো নাবিয়ে রাখে, আর যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ-মারা কলের সংখ্যা বাড়িয়ে চলে তাদের মুখে হরিনামের দোহাই শুনলে মন আশ্বস্ত হয় না। ঈশ্বরের নাম নিয়েই বলব বাইরের থেকে আমাদেরকে দেখায় নিঃসহায় তবু আমরা নিঃসহায় নই। আমরা বাস করি যে মানবমণ্ডলীর মধ্যে, তারা সকলেই সাম্রাজ্যলুব্ধ নয়, আমাদেরও আপন বলে গণ্য করবে এমন নিস্পৃহ মনুষ্যত্ব কোন একটা জায়গা থেকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। নইলে ঈশ্বরের বিধানের অর্থ কী।

৫।১১।৩৯

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

সর্ব্বনাশা চর!

উহার বুকের মধ্যে কোথায় যেন লুকাইয়া আছে রক্তবিপ্লবের বীজ। দাঙ্গায় খুন হইয়া গেল একটা; তাহার উপর জখমের সংখ্যাও অনেক। চরের ঘাস বাহিয়া রক্তের ধারা মাটির বুকে গড়াইয়া পড়িল। কিন্তু এইখানেই তো শেষ নয়; ইহার পর মামলা-মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়া গেল। দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমা—দায়রা আদালতে দাঙ্গা ও নরহত্যার অপরাধে শেষ পর্য্যন্ত নবীন বাগদী ও তাহার সহচর দুই জন বাগদীর কঠিন সাজা হইয়া গেল। নবীনের প্রতি শাস্তি বিধান হইল ছয় বৎসর দ্বীপান্তরবাসের আর তাহার সহচর দুইজনের প্রতি হইল দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ।

প্রথমে অবশ্য চালান গিয়াছিল উভয় পক্ষই; শ্রীবাস ও তাহার পক্ষীয় কয়েক জন লাঠিয়াল এবং এ-পক্ষের রংলাল, নবীন ও আরও চার-পাঁচ জন। কিন্তু মজুমদারের তদ্বিরে, শ্রীবাসের অর্থের প্রাচুর্য্যে শ্রীবাসের পক্ষই আইনের চক্ষে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। শ্রীবাসের ন্যায্য অধিকারের উপর চড়াও হইয়া নবীনের দল দাঙ্গা করিয়াছে, যাহার ফলে নরহত্যা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে—এই অপরাধে তাহারা দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়া গেল। রংলাল অনেক দিন পর্য্যন্ত দৃঢ় ছিল, কিন্তু শেষের দিকে সে ভাঙিয়া পড়িল। রাজসাক্ষীরূপে শ্রীবাসের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিয়া সে নবীনের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। তবু ঘরে মুখ লুকাইয়া সে কাঁদিত, বার বার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিত—ভগবান, নবীনকে বাঁচাইয়া দাও, শ্রীবাসের অন্যায় তুমি প্রকাশ করিয়া দাও! কিন্তু ভগবান হয় বধির নয় মূক।

দণ্ডাদেশের সংবাদ শুনিয়া সুনীতি কাঁদিলেন। নবীনের জন্য তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল। এই বাড়ীর তিন পুরুষের চাকর এই নবীনের বংশ, তাঁহারাই তাহার চাকরি ছাড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু সে তাঁহাদের ছাড়ে নাই। নবীনই ছিল এ-বাড়ীর শেষ বাহুবল। সেও চলিয়া গেল। সর্ব্বনাশা চর!

•

ঐ চরটার কথা ভাবিতে বসিয়া সুনীতি এক-এক সময় শিহরিয়া উঠেন। মনশ্চক্ষে তিনি যেন একটা নিষ্ঠুর চক্রান্তের ক্রুর চক্রবেগে চরখানাকে এই বাড়ীটিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতে দেখিতে পান। এ আবর্ত্ত হইতে সরিয়া যাইবার যেন পথ নাই। মহীকে বলি দিয়াও সরিয়া যাওয়া গেল না! প্রাণপণ শক্তিতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেও সরিয়া যাওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে চক্রান্তের চক্রের পরিধি বিস্তৃত হইয়া যায়; এ-বাড়ীর সংশ্লিষ্ট জনকে আবর্ত্তে ফেলিয়া সেই নিমজ্জমান জনের সহিত বন্ধনসূত্রের আকর্ষণে আবার টানিয়া আনিয়া আবর্ত্তের মধ্যে ফেলিতেছে। নবীনের মামলায় সেটা যেন সুনীতি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছেন। দায়রার মামলায় তাঁহাকে পর্য্যন্ত টানিয়া প্রকাশ্য আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছে। অহীন্দ্রকেও সাক্ষী দিতে হইয়াছে। যাহার ফলে রামেশ্বরের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, এখন তিনি প্রায় বদ্ধপাগল। ভাবিতে ভাবিতে সুনীতি আর কূলকিনারা দেখিতে পান না, তাঁহার অন্তরাত্মা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। ভবিষ্যতের একটা করাল ছায়া যেন ঐ কল্পিত আবর্ত্তের ভিতর হইতে সমুদ্রমন্থনের শেষ ফল গরল বাষ্পের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে থাকে। সে বিষবাষ্পের উগ্র তিক্ত গন্ধের আভাস যেন তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছেন।

জীবনে তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডার, অক্ষয় ভাণ্ডার, কোনটি ভুলিবার উপায় নাই। এই সাক্ষী দেওয়ার কথাটাও অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

আদালতের পিয়ন একেবারে অন্দরের দরজার মুখে আসিয়া সমন জারী করিয়া গেল। মানদা দারুণ ক্রোধে অগ্রসর হইয়া গিয়া সরকারী চাপরাশযুক্ত লোক দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল, এত বড় মুখরার মুখেও কথা সরিল না। পিয়নটাই বলিল—দায়রা মামলার সাক্ষী মানা হয়েছে সুনীতি দেবীকে। সাত দিন পর ১৮ই আষাঢ় দিন আছে। হাজির না হ'লে ওয়ারেণ্ট হবে।

লোকটা চলিয়া গেল। মানদা কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আত্মসম্বরণ করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। তাহার অনুমান সত্য! বাড়ীর ফটকের বাহিরে তখন লোকটি আরও দুইটি লোকের সহিত মিলিত হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের এক জন যোগেশ মজুমদার, অপর জন শ্রীবাস। সে প্রতিহিংসাপরায়ণা সর্পিণীর মতই প্রতিপক্ষকে দংশন করিবার জন্য অন্ধকার রাত্রির মত একটি সুযোগ কামনা করিতে করিতে ফিরিল।

সাক্ষীর সমন পাইয়া সুনীতি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা হইল দুর্য্যোগভরা অন্ধকার রাত্রে দিগ্‌-ভ্রান্ত পথিকের মত। এ কি করিবেন তিনি? কেমন করিয়া প্রকাশ্য আদালতে শত চক্ষুর সম্মুখে তিনি দাঁড়াইবেন? আপন অদৃষ্টের উপরে তাঁহার ধিক্কার জন্মিয়া গেল। এ যে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। দায়রা আদালতের সমন অগ্রাহ্য করিলে ওয়ারেণ্ট হইবে, গ্রেপ্তার করিয়া হাজির করাই যে বিধি! আদালতের পিয়নের কথা তাঁহার কানে যেন এখনও বাজিতেছে!

ছি, ছি, ছি! আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া তিনি ছি-ছি করিয়া সারা হইয়া গেলেন। ছিল, পথ ছিল, একমাত্র পথ। কিন্তু সেও তাঁহার পক্ষে রুদ্ধ। মরিয়া নিষ্কৃতি পাইবারও যে উপায় নাই তাঁহার। অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ অসহায় স্বামীর কথা মনে করিয়া প্রতিদিন দেবতার সম্মুখে তাঁহাকে যে কামনা করিতে হয়, 'ঠাকুর, আমার অদৃষ্টে যেন বৈধব্যের বিধানই তুমি ক'রো। সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে কঙ্কণ নিয়ে মৃত্যুভাগ্য আমি চাই না, চাই না, চাই না।' এই দুর্ভাগ্যের ভাগ্যই তাঁহার জীবনের যে একমাত্র কামনা!

মানদা ক্রোধে ক্রূর হইয়া ফিরিয়া আসিতেই তিনি দিশাহারার মত বলিলেন—এ আমি কি করব মানদা?

মানদা উত্তর দিতে পারিল না। মর্ম্মান্তিক দুঃখে অসহ্য রাগে সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পর সে চোখের জল মুছিয়া উপর দিকে মুখ তুলিয়া বলিল—মাথার উপরে তুমি বজ্রাঘাত করো। নির্ব্বংশ করো। তবেই বুঝব তোমার বিচার; নইলে তুমি কানা—কানা—কানা!

সুনীতি এত দুঃখের মধ্যেও শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—ছি মা, আমার অদৃষ্ট; কেন পরকে মিথ্যে শাপ-শাপান্ত করছিস?

—মিথ্যে? আমি তো আমার চোখের মাথা খাই নি মা—মুখপোড়া ভগবানের মত! আমি যে নিজের চোখে দেখে এলাম।

—কি? কার কথা বলছিস?

—মজুমদার আর শ্রীবাস চাষা! দু-জনে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল গো। এ যে তাদের কীর্ত্তি গো!

—মজুমদার-ঠাকুরপো! না না, এতখানি ছোট কি মানুষ হ'তে পারে?

মানদা ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল, সে দুই হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—নাও, দু-হাত তুলে তুমি আশীর্ব্বাদ কর মজুমদারকে! কর! সে আবার অকস্মাৎ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুনীতি উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে মূর্ত্তিমতী হতাশার মত চাহিয়া রহিলেন। সর্ব্বনাশা চর! অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল—ওদিকে ঠাকুরবাড়ীর দরজায় কে যেন আঘাত করিয়া ইঙ্গিতে আগমনের সাড়া জানাইতেছে! কোন মেয়েছেলে নিশ্চয়। এ-দিকের দুয়ার দিয়া যাওয়া-আসার অধিকার কেবল মহিলাদেরই। তিনি বলিলেন—দেখ্‌ তো মা মানদা কে ডাকছেন!

মানদাও শুনিয়াছিল, সে কিন্তু বেশ বুঝিয়াছিল, আসিয়াছেন রায়বাড়ীর কোন বধূ বা কন্যা। আজিকার এই ঘটনা লইয়া লজ্জা দিতে আসিয়াছেন। সে বলিল—ডাকবে আবার কে? রায়গুষ্টীর কেউ এসেছে, তোমাকে বলতে এসেছে—ছি, ছি, ছি, তোমাকে আদালতে সাক্ষী মেনেছে! কি ঘেন্নার কথা! খুলব না, আমি দরজা। চুপ ক'রে থাক তুমি।

উত্তেজনায় মানদা এমন জ্ঞান হারাইয়াছিল যে, সুনীতিকে সে বার-কয়েক 'তুমি' বলিয়াই সম্ভাষণ করিয়া ফেলিল।

সুনীতি বলিলেন—না, দরজা খুলে দেখ্‌ কে এসেছেন। খবরদার, কোন কড়া কথা বলিস নে যেন মা। গজগজ্‌ করিতে করিতেই গিয়া দরজা খুলিয়াই

মানদা বিস্ময়ে সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত হইয়া গেল। এই শুভ বিগ্রহরে তাহাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছোট-রায়বাড়ীর গিন্নী হেমাঙ্গিনী—সঙ্গে তাঁহার এগার-বার বৎসরের মেয়ে উমা!

মানদা প্রসন্ন হইতে পারিল না। সুনীতি কিন্তু পরম আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—দিদি! মনে মনে যেন আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম দিদি!

হেমাঙ্গিনী সুন্দর হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমি কিন্তু কিছু জানতে পারিনি ভাই। দেবতা-টেবতা ব'লো না যেন। আজ আমি তোমার দাদার দূত হয়ে এসেছি। তিনিই পাঠালেন আমাকে।

সুনীতি ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—কেন দিদি?

—বলছি। আরে উমা গেল কোথায়? উমা, উমা! উমা ততক্ষণে বাড়ীর এদিক ওদিক দেখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কোথায় কোন্ কোণ হইতে সে উত্তর দিল—কি?

হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—করছিস কি? এখানে এসে ব'স।

উত্তর আসিল—আমি সব দেখছি।

সুনীতি হাসিয়া বলিলেন—অ উমা, মা এখানে এস না, তোমায় এক বার দেখি!

উমা আসিয়া দরজায় দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইল, বলিল—আমাকে ডাকছেন?

সুনীতি বলিলেন—বাঃ, উমা যে বড় চমৎকার দেখতে হয়েছে, অনেকটা বড় হয়ে গেছে এর মধ্যে ওকে কলকাতায় আপনার বাপের বাড়ীতে রেখেছেন, নয় দিদি!

—হ্যাঁ ভাই, এখানকার শিক্ষা-দীক্ষার উপর আমার মোটেই শ্রদ্ধা নেই। ছেলেকে অনেক দিন থেকেই সেখানে রেখেছি, মেয়েকেও পাঠিয়ে দিয়েছি এক বছরের উপর। তার পর মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, উনি কিন্তু ভারী চঞ্চল আর ভারী আদুরে, সেখানে গিয়ে কেবল বাড়ী আসবার জন্যে ঝোঁক ধরেন। অমল কিন্তু আমার খুব ভাল ছেলে, সে এখানে আসতেই চায় না। বলে, ভাল লাগে না এখানে।

উমা ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তা লাগবে কেন তার, দিনরাত্রিই সে কলকাতায় ঘুরছেই ঘুরছেই! বন্ধু কত তার সেখানে! আর আমাকে একা মুখটি বন্ধ ক'রে থাকতে হয়। সে বুঝি কারও ভাল লাগে!

সুনীতি হাসিলেন, বলিলেন—আপনি ভারি দিদি! এই সব ছেলে-মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন কেমন ক'রে? ছেলেকে অবশ্য পাঠাতেই হয়—কিন্তু এই দুধের মেয়ে, একেও পাঠিয়ে দিয়েছেন?

হেমাঙ্গিনী কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মেয়েকে বলিলেন—যা তুই দেখে আয়, এঁদের বাড়ীটা ভারি সুন্দর। কিন্তু কাল দুপুরের মত বাইরে পড়িস নে যেন!

উমা চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী এতক্ষণে সুনীতিকে বলিলেন—জান সুনীতি, এই বাড়ীর কথাই আমার মনে অহরহ জাগে। আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, ঠাকুরজামাইয়ের এই অবস্থার কারণ, এ বাড়ীর এই দুর্দশা এর একমাত্র কারণ হ'ল রাধারাণী, রায়-বংশের মেয়ে। এত বড় দাম্ভিক-মুখরায় বংশ আর আমি দেখি নি ভাই! আমার ছেলে বিশেষ ক'রে মেয়েকে আমি এর হাত থেকে বাঁচাতে চাই। রাধারাণীর অদৃষ্টের কথা ভাবি আর আমি শিউরে উঠি।

সুনীতি চুপ করিয়া রহিলেন, হেমাঙ্গিনী একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—তোমার দাদাই আমাকে পাঠালেন, তোমার কাছেই পাঠালেন।

সুনীতি ইন্দ্র রায়ের বক্তব্য শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, হেমাঙ্গিনী বলিলেন—দায়রা মামলায় মজুমদারের চক্রান্তে যে তোমাকে সাক্ষী মানা হয়েছে, সে তিনি শুনেছেন।

মুহূর্তে সুনীতি কাঁদিয়া ফেলিলেন, সে কান্নায় কোন আক্ষেপ ছিল না, শুধু দুটি চোখের কোণ বাহিয়া দুটি অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী সস্নেহে আপন অঞ্চল দিয়া সুনীতির মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—কাঁদছ কেন? সেই কথাই তো তোমার দাদা ব'লে পাঠালেন তোমাকে, সুনীতি যেন ভয় না পায়, কোন লজ্জা-সঙ্কোচ না করে। রাজার দরবারে ডাক পড়েছে—যেতে হবে, কিসের লজ্জা এতে!

আবার সুনীতির চোখের জলে মুখ ভাসিয়া গেল, তিনি নিজেই আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—কিন্তু ওঁকে কার কাছে রেখে যাব দিদি? সেই যে আমার সকলের চেয়ে বড় ভাবনা। তার পর আমিই বা কার সঙ্গে সদরে যাব?

হেমাঙ্গিনী চিন্তাকুল মুখে বলিলেন—প্রথম কথাটাই আমরা ভাবি নি সুনীতি! শেষটার জন্যে তো আটকাচ্ছে না। সে তোমার ছেলেকে আসতে লিখলেই হবে, অহীনই তোমার সঙ্গে যাবে। কিন্তু—।

সুনীতি বলিলেন—আরও ভাবছি কি জানেন? ওঁর

এই মাথার গোলমালের উপর এই খবরটা কানে গেলে কি যে হবে, সেই আমার সকলের চেয়ে বড় ভাবনা। এই দাঙ্গার আগের দিন, মজুমদার-ঠাকুরপো ঐ শ্রীবাস পালকে সঙ্গে ক'রে একেবারে বাড়ীর মধ্যে চ'লে এলেন। আমি কি করব ভেবে না পেয়ে ছুটে গেলাম ওঁর কাছে। কথাটা ব'লেও ফেলেছিলাম। সেই শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন, বললেন—আমায় একটু জল দিতে পার সুনীতি? আমি বুঝলাম—বুঝে মাথা ধুয়ে দিলাম, বাতাস করলাম—কিন্তু তবু সমস্ত রাত্রি ঘুমোলেন না। তাই ভাবছি, এই কথা কানে গেলে উনি কি তা সহ্য করতে পারবেন?

হেমাঙ্গিনী চুপ করিয়া রহিলেন, তিনি উপায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর বলিলেন—তুমি ব'লে রাখ এখন থেকে—তুমি ব্রত করেছ, তোমায় গঙ্গাস্নানে যেতে হবে। ঠাকুরজামাইয়ের সেবাযত্নের ভার আমার উপর নিশ্চিন্ত হয়ে দিতে পারবে তো সুনীতি?

সুনীতি বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক হইয়া হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আবার অজস্র ধারায় তাঁহার চোখ বাহিয়া জল ঝরিতে আরম্ভ করিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন—অহীনকে আসতে চিঠি লেখ। সে রাত্রে ওঁর কাছে থাকবে; আমি তাহলে এ-বাড়ী ও-বাড়ী দু-বাড়ীই দেখতে পারব। আর তোমার সঙ্গে আমার অমলকে পাঠিয়ে দেব। কেমন?

সুনীতির চোখে আর অশ্রুধারাপ্রবাহের বিরাম ছিল না। হেমাঙ্গিনী আবার তাঁহার চোখমুখ সযত্নে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—কেঁদ না সুনীতি। আমিও যে আর চোখের জল ধ'রে রাখতে পারছি নে। আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন—উমা! উমা!

উমার সাড়া কিন্তু কোথাও মিলিল না। হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—বংশের স্বভাব কোথাও যায় না। মুখপুড়ী কলকাতা থেকে এসে এমন বেড়াতে ধরেছে। বলে, দেখব না, কলকাতায় এমন মাঠ আছে? আকাশে মেঘ উঠেছে, এখুনি বৃষ্টি নামবে—মেয়ের সে খেয়াল নেই।

সুনীতি ডাকিলেন—মানদা! উমা-মা কোথায় গেল রে? দেখ্ তো।

মানদারও সাড়া পাওয়া গেল না, সুনীতি ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন—দিবানিদ্রায় পরম আরামে মানদার নাক ডাকিতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল উপরে কোথায় যেন কলকণ্ঠে কেহ গান বা আবৃত্তি করিতেছে। হেমাঙ্গিনীও বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহারও কানে স্বরটা প্রবেশ করিল, তিনি বলিলেন—ওই তো।

সুনীতি বলিলেন—ওঁর ঘরে।

সন্তর্পণেই উভয়ে রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন উমা গভীর একাগ্রতার সহিত ছন্দলীলায়িত ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া সুমধুর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করিতেছে—

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘন বনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে স্নিগ্ধ সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

সম্মুখে রামেশ্বর বিস্ফারিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে আবৃত্তিরতা স্বচ্ছন্দ-ভঙ্গি উমার দিকে চাহিয়া আছেন। হেমাঙ্গিনী ও সুনীতি ঘরে প্রবেশ করিলেন; তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। বালিকার কলকণ্ঠের ঝঙ্কারে, নিপুণ আবৃত্তিতে শব্দার্থে স্বপ্নসৃজনে, কবিতার ছন্দের অন্তর্নিহিত সঙ্গীত-মাধুর্যে একটি অপূর্ব আনন্দময় আবেশে ঘরখানি যেন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারাও নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্লোকে শ্লোকে আবৃত্তি করিয়া উমা শেষ শ্লোক আবৃত্তি করিল—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
ঝরে ঘন ধারা নব পল্লবে
কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর রবে
তীর ছাপি নদী কল কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।

আবৃত্তি শেষ হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে সেই আনন্দময় আবেশ তখনও যেন নীরবতার মধ্যে ছন্দে ছন্দে অনুভূত হইতেছিল। রামেশ্বর আপন মনেই বলিলেন—নাচে—নাচে—হৃদয় সত্যিই ময়ূরের মত নাচে।

হেমাঙ্গিনী এবার প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—ভাল আছেন চক্রবর্তী-মশাই?

—কে? স্বপ্নোত্থিতের মত রামেশ্বর বলিলেন—কে?

তার পর ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—রায়-গিন্নী! আসুন, আসুন, কি ভাগ্য আমার!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—ও রকম ক'রে বললে যে লজ্জা পাই চক্রবর্ত্তী-মশাই! আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। তার পর কন্যাকে বলিলেন—তুমি প্রণাম করেছ উমা? নিশ্চয় কর নি। তোমার পিসেমশায়।

সবিস্ময়ে রামেশ্বর প্রশ্ন করিলেন—আপনার মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—সাক্ষাৎ সরস্বতী। আহা 'ময়ূরের মত নাচে রে' 'হৃদয় নাচে রে' কি মধুর!

উমা এই ফাঁকে টুপ করিয়া রামেশ্বরের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া লইল। পায়ে স্পর্শ অনুভব করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া উমাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া রামেশ্বর চমকিয়া উঠিলেন, আর্ত্তস্বরে বলিলেন—না না, আমাকে প্রণাম করতে নেই! আমার হাতে—

হেমাঙ্গিনী বাধা দিয়া সকরুণ মিনতিতে বলিয়া উঠিলেন—চক্রবর্ত্তী-মশাই, না, না!

রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, আকাশে মেঘ করেছে, দিকহস্তীর মত কালো বিক্রমশালী জলভরা মেঘ। মহাকবি কালিদাসকে মনে প'ড়ে গেল। আপনার মনেই শ্লোক আবৃত্তি করছিলাম মেঘদূতের। এমন সময় আপনার মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। আমার মনে হ'ল কি জানেন, মনে হ'ল চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর লক্ষ্মী বুঝি চিরদিনের মত পরিত্যাগ ক'রে যাবার আগে আমাকে এক বার দেখা দিতে এসেছেন। আমি আবৃত্তি বন্ধ করলাম। আপনার মেয়ে—কি নাম বললেন—

হেমাঙ্গিনী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই উমাই উত্তর দিল—উমা দেবী।

—উমা দেবী! হ্যাঁ তুমি উমাও বটে—দেবীও বটে। উমা আমায় বললে—কিসের মন্ত্র বলছিলেন আপনি? আর এক বার বলুন না। আমি বললাম মন্ত্র নয় শ্লোক, সংস্কৃত কবিতা। কবি কালিদাস মেঘদূতে বর্ষার বর্ণনা করেছেন তাই আবৃত্তি করছিলাম। আমায় বললে উমা—আপনি বাংলা কবিতা জানেন না? কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি কি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর খুব ভাল কবিতা আছে। আমি বললাম, তুমি জান? ও আমায় কবিতা শোনালে। বড় সুন্দর কবিতা, বড় সুন্দর! বাংলায় এমন কাব্য রচিত হয়েছে!...ভাগ্য, আমার ভাগ্য! পৃথিবীতে বঞ্চনাই আমার ভাগ্য! বাঃ, 'নীল অঞ্জন লেগেছে, নয়নে লেগেছে'!

সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। উমা কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, কয়েক মুহূর্ত্ত কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল—আপনি কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক আমায় শোনাবেন বলেছেন।

রামেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—তোমার মত সুন্দর ক'রে কি বলতে আমি পারব মা?

উমা হাসিয়া বলিল—ওটা আমি আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার জন্যে শিখেছিলাম কি না! কিন্তু আপনিও তো খুব ভাল বলছিলেন, বলুন আপনি!

রামেশ্বর কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া লইয়া বলিলেন—বলি শোন—

তাং পার্ব্বতীত্যাভিজনেন নাম্না, বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।
মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্ত পুষ্পস্য মধোর্হি চূতে, দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা।

এর মানে জান মা? পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের এক কন্যা হ'ল, গোত্র ও উপাধি অনুসারে আত্মীয়বর্গ বন্ধুজনপ্রিয় সেই কন্যার নাম রেখেছিল পার্ব্বতী। পরে হিমাদ্রি-গৃহিণী সেই কন্যাকে তপস্যাপরায়ণা দেখে বললেন—উ মা! অর্থাৎ বৎসে, ক'রো না, তপস্যা ক'রো না! সেই থেকে সুমুখী কন্যার নাম হ'ল উমা। তারপর কবি বলছেন, পর্ব্বত-রাজের পুত্রকন্যা আরও অনেকই ছিল, কিন্তু বসন্তকালে অসংখ্যবিধ পুষ্পের মধ্যে ভ্রমর যেমন সহকার-পুষ্পেই অনুরক্ত হয় তেমনি পর্ব্বতরাজের চোখ দুটি উমার মুখের পরেই আকৃষ্ট হ'ত বেশী—সেইখানেই ছিল যেন পূর্ণ পরিতৃপ্তি। তুমি আমাদের সেই উমা! আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তুমি প্রচুর বিদ্যাবতী হবে। আজ যা তুমি আমায় শোনালে—আহা! সেই উমারই মত বিদ্যা তোমার আপনি আয়ত্ত হবে।

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং, মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে, প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।

হেমাঙ্গিনী ও সুনীতির চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই এক মানুষ—আবার এই মানুষই ক্ষণপরে এমন অসহায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িবেন—নিজের প্রতি নিজেরই অহেতুক ঘৃণায় এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিবেন যে অন্যের ইচ্ছা হইবে আত্মহত্যা করিতে!

উমা বলিল—আমায় সংস্কৃত কবিতা শেখাবেন আপনি? এখানে যে ক'দিন আছি আমি রোজ আপনার কাছে আসব।

—আসবে? তুমি আসবে মা?

—হ্যাঁ। কিন্তু এমন ক'রে ঘরের মধ্যে দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে থাকেন কেন আপনি? ওগুলো খুলে দিতে হবে কিন্তু।

মুহূর্ত্তে রামেশ্বরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন, বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—রায়-গিন্নী, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

১৬

সেই বন্দোবস্তই হইল।

অহীন্দ্র কলেজ কামাই করিয়া আসিল; সুনীতি অহীন্দ্রকে লইয়া একটু শঙ্কিত ছিলেন। রামেশ্বরের সন্তান মহীর ভাই সে! অহীন্দ্র কিন্তু হাসিয়া বলিল—এর জন্য তুমি এমন লজ্জা পাচ্ছ কেন মা? এ সংসারে সত্যকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্ম—এতে রাজা-প্রজা নেই, ধনী-দরিদ্র নেই। বিচারক মানুষ হ'লেও তিনি তখন বিধাতার আসনে ব'সে থাকেন।

সুনীতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, শুধু তাই নয়, বুকে যেন তিনি বল পাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে বুকখানি পুত্রগৌরবেও ভরিয়া উঠিল। তিনি ছেলের মাথার চুলগুলির ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে বলিলেন—মুখ-হাত ধুয়ে ফেল বাবা, আমি দুখানা গরম নিমকি ভেজে দি। ময়দা আমার মাখা আছে।

মানদা নীরবেই দাঁড়াইয়াছিল, সে এবার বলিয়া উঠিল—আপনি ভালই বললেন দাদাবাবু; কিন্তু আমার মন ঠাণ্ডা হ'ল না। বড়দাদাবাবু হ'লে—, অকস্মাৎ ক্রোধে সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিয়া উঠিল—বড়দাদাবাবু হ'লে ঐ মজুমদার আর শ্রীবাসের মুণ্ডু দুটো নখে ক'রে ছিঁড়ে নিয়ে আসতেন।

সুনীতি শঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া গেলেন; অহীন্দ্র কিন্তু মৃদু হাসিল, বলিল—আমিও নিয়ে আসতাম রে মানদা—যদি মুণ্ডু দুটো আবার জোড়া দিয়ে দিতে পারতাম।

সুনীতির চোখে এবার জল আসিল, অহীন তাহার মর্ম্মকে বুঝিয়াছে, সংসারে দুঃখ কি কাহাকেও দিতে আছে! আহা, মানুষের মুখ দেখিয়া মায়া হয় না!

মানদা কি উত্তর দিতে গেল, কিন্তু রান্নাঘরে কাহার জুতার দ্রুত শব্দে সে নিরস্ত হইয়া দুয়ারের দিকেই চাহিয়া রহিল। একা মানদাই নয়, সুনীতি অহীন্দ্র, সকলেই। পরমুহূর্ত্তেই ষোল-সতর বৎসরের কিশোর ছেলে একটি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। স্নিগ্ধ গৌর দেহবর্ণ, পেশীসবল দেহ—সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বপরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন তারুণ্যের একটি সুকুমার লাবণ্য যেন ঝলমল করিতেছে।

সুনীতি সাগ্রহে আহ্বান করিয়া বলিলেন—অমল, এস—

সুনীতির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অমল অহীন্দ্রের হাত দুটি ধরিয়া বলিল—অহীন?

অহীন্দ্র স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ অহীন। তুমি অমল?

অমল বলিল—উঃ কত দিন পরে দেখা বল তো? সেই ছেলেবেলায় পাঠশালায়। কত দিন যে আমি তোমাকে চিঠি লিখব ভেবেছি! কিন্তু ইংলণ্ডের রাজা আর ফ্রান্সের রাজায় যুদ্ধ হ'ল—ফলে দুটো দেশের দেশবাসীরা অকারণে পরস্পরের শত্রু হ'তে বাধ্য হ'ল। বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

অহীন্দ্রও হাসিয়া বলিল—ইউ টক ভেরী নাইস্!

অমল বলিল—ইউ লুক ভেরী নাইস্। ব্রাইট ব্লেড অফ এ শার্প সোর্ড! কবির ভাষায় খাপখোলা বাঁকা তলোয়ার!

সুনীতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দুইটি কিশোরের মিতালির লীলা দেখিতেছিলেন। তিনি এইবার মানদাকে বলিলেন—মানদা, দে তো মা একখানা ছোট সতরঞ্চি পেতে। ব'স বাবা তোমরা, আমি নিমকি ভাজব, খাবে দু-জনে তোমরা! উমাকে আনলে না কেন বাবা অমল?

অমল বলিল—তার কথা আর বলবেন না পিসীমা। অকস্মাৎ সে কাব্য নিয়ে, যাকে বলে ভয়ানক মেতে ওঠা, সেই ভয়ানক মেতে উঠেছে। অনবরত রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করছে আবৃত্তি করছে! আমায় তো জ্বালাতন ক'রে খেলে।

সুনীতির সেই দিনের ছবি মনে পড়িয়া গেল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, আহা তাহার যদি এমনি একটি কন্যা থাকিত—সে এমনি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিত!

অমল বলিল—এই দেখুন পিসীমা, কাল তো আপনাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি সদরে; কিন্তু ফিরে এলেই যে অহীন পালাবে—সে হবে না।

অহীন হাসিয়া বলিল—আমার প্রাক্‌টিক্যাল ক্লাস কামাই হবে ব'লে ভাবনা কিনা!—

অমল বলিল—তুমি বুঝি সায়েন্স স্টুডেণ্ট? আই সী!

•

সুনীতি কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। লোকে আদালতটা গিসগিস করিতেছিল। অমল তাঁহার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—ভয় ।ক পিসীমা, কোন ভয় করবেন না! পরমুহূর্ত্তেই সে আত্মগতভাবেই বলিয়া উঠিল—এ কি, বাবা এসে গেছেন দেখছি!

সুনীতি দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল—ঘর্ম্মাক্ত পরিচ্ছদ, রুক্ষ চুল, শুষ্ক মুখ—অস্নাত অভুক্ত ইন্দ্র রায় আদালতে প্রবেশ করিতেছেন, সঙ্গে এক জন উকীল। উকীলটি আসিয়াই জজের কাছে প্রার্থনা করিল—মহামান্য বিচারকের দৃষ্টি আমি একটি বিশেষ বিষয়ে আকৃষ্ট করতে চাই। আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়ায় এই যে সাক্ষী—ইনি এই জেলার একটি সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বংশের বধূ। উভয় পক্ষের উকীলবৃন্দ যেন তাঁর মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও জেরা করেন। মহামান্য বিচারক সে ইঙ্গিত তাঁদের দিলে সাক্ষী এবং আমরা—শুধু আমরা কেন সর্ব্বসাধারণেই চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ইন্দ্র রায় সুনীতির কাঠগড়ার নিকট আসিয়া বলিলেন—তোমার কোন ভয় নেই বোন, আমি এই দাঁড়িয়ে রইলাম তোমার পিছনে।

সাক্ষ্য অল্পেই শেষ হইয়া গেল; বিচারক সুনীতির মুখের দিকে চাহিয়াই উকীলের আবেদনের সত্যতা বুঝিয়াছিলেন, তিনি অতি প্রয়োজনীয় দুই-চারিটা প্রশ্ন ব্যতীত সকল প্রশ্নই অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। কাঠগড়া হইতে নামিয়া সুনীতি সেই প্রকাণ্ড বিচারালয়ের সহস্র চক্ষুর সম্মুখে গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্র রায়কে প্রণাম করিলেন। রায় রুদ্ধস্বরে বলিলেন—ওঠ বোন, ওঠ! তার পর অমলকে বলিলেন—অমল নিয়ে এস পিসীমাকে। একটা গাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি—দেখি আমি সেটা।

দেখিবার কিন্তু প্রয়োজন ছিল না। রায়ের কর্ম্মচারী মিত্তির গাড়ী লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। সুনীতি ও অমলকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া রায় অমলকে বলিলেন—তুমি পিসীমাকে নিয়ে বাড়ী চ'লে যাও। আমার কাজ রয়েছে সদরে, সেটা সেরে কাল আমি ফিরব।

সুনীতি লজ্জা করিলেন না—তিনি অসঙ্কোচে রায়ের সম্মুখে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিত মুখে বলিলেন—আমার অপরাধ কি ক্ষমা করা যায় না দাদা?

রায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তার পর ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—পৃথিবীতে সকল অপরাধই ক্ষমা করা যায় বোন, কিন্তু লজ্জা কোন রকমেই ভোলা যায় না।

পরামর্শ-অনুযায়ী অতি যত্নে সংবাদটি রামেশ্বরের নিকট গোপন রাখা হইল। কথাটা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন হেমাঙ্গিনী। তিনি বলিলেন—সুনীতি আপনাকে রেখে কিছুতেই যেতে চায় না। আমি বলছি যে, আমি আপনার সেবা-যত্নের ভার নেব; ব্রত কি কখনও নষ্ট করে। আপনি ওকে বলুন চক্রবর্ত্তী-মশায়!

রামেশ্বর বলিলেন—না না না! রায়-গিন্নী ঠিক বলেছেন সুনীতি, ব্রত কি কখনও পণ্ড করে! আমি বেশ থাকব।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় সুনীতি অমলের সঙ্গে রওনা হইয়া গেলেন। রাত্রির খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তিনিই করিয়া গিয়াছিলেন। অহীন্দ্র রামেশ্বরের কাছে থাকিল। পরদিন হেমাঙ্গিনী সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন, দ্বিপ্রহরে খাবারের থালাখানি আনিয়া আসনের সম্মুখে নামাইয়া দিতেই রামেশ্বর স্মিতমুখে বলিলেন—সুনীতির ব্রত সার্থক হোক রায়-গিন্নী; তার গঙ্গাস্নানের পুণ্যেই বোধ করি আপনার হাতের অমৃত আজ আমার ভাগ্যে জুটল।

হেমাঙ্গিনী সকরুণ হাসি হাসিলেন; সত্যই সেকালে রামেশ্বর হেমাঙ্গিনীর হাতের রান্নার বড় তারিফ করিতেন। আজ রাধারাণী গিয়াছে বাইশ-তেইশ বৎসর—

এই বাইশ-তেইশ বৎসর পরে আজ আবার তিনি রামেশ্বরকে রাঁধিয়া খাওয়াইলেন। খাওয়া হইয়া গেলে হেমাঙ্গিনী বাসন কয়খানি উঠাইয়া লইবার উপক্রম করিতেই রামেশ্বর হাত জোড় করিয়া বলিলেন—না না রায়-গিন্নী—না!

অহীন্দ্র বলিল—আমি মানদাকে ডেকে দিচ্ছি।

মানদা উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি লইয়া গেলে হেমাঙ্গিনী বলিলেন—তা হ'লে এইবার আমি যাই চক্রবর্তী-মশাই।

রামেশ্বর সকরুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—চ'লেই তো গিয়েছিলেন রায়-গিন্নী, এ-বাড়ীতে আর যে কখনও পায়ের ধুলো দেবেন, এ স্বপ্নেও ভাবি নি। আবার যখন দয়া ক'রে এসেছেনই, তবে 'যাই' ব'লে যাচ্ছেন কেন—বলুন 'আসি'। যদি আর নাও আসেন তবু আশা করতে পারব—আসবেন রায়-গিন্নী, এক দিন না এক দিন আসবেন।

কথাটা নিছক কৌতুক বলিয়া লঘু করিয়া লইবার অভিপ্রায়েই রায়-গিন্নী বলিলেন—আপনার সঙ্গে মেয়েলি কথাতেও কেউ পারবে না, চক্রবর্তী-মশাই। আচ্ছা তাই-ই বলছি, আসি। কেমন, হ'ল তো? তার পর তিনি অহীন্দ্রকে বলিলেন—তুমি এইবার আমার সঙ্গে এস বাবা অহীন, খেয়ে আসবে।

উভয়ে নীচে আসিয়া দেখিলেন, উমা মানদার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। হেমাঙ্গিনী বলিলেন—চিনিস অহীনদাকে?

উমা বলিল—হ্যাঁ। অহীনদা যে ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছেন!

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—সেই জন্যে চেন আমাকে? কিন্তু সে তো কপালে লেখা থাকে না।

মৃদু মৃদু হাসিয়া উমা বলিল—থাকে।

—বল কি?

—হ্যাঁ। যে সায়েবদের মত ফরশা রং আপনার; দেখলেই ঠিক চেনা যাবে যে এই স্কলারশিপ পেয়েছে। সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অহীন্দ্র এই প্রগল্‌ভা বালিকাটির কথায় লজ্জিত না হইয়া পারিল না। হেমাঙ্গিনী খাবারের থালা নামাইয়া দিয়া বলিলেন—ওর সঙ্গে কথায় তুমি পারবে না বাবা, তুমি খেতে ব'স।

ও ওদের বংশের—কথাটা বলিতে গিয়া তিনি নীরব হইয়া গেলেন। উমা বসিয়া থাকিতে থাকিতে হুট করিয়া উঠিয়া একেবারে উপরে রামেশ্বরের দরজাটি খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক আবির্ভাবে রামেশ্বর পুলকিত হইয়া উঠিলেন, আপনার বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত রোগ-কল্পনার কথাও সে-আকস্মিকতায় তিনি ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন—উমা? এস এস, মা এস।

উমা আসিয়া পরমাত্মীয়ের মত কাছে বসিয়া বলিল—বলুন, সংস্কৃত কবিতা বলুন।

রামেশ্বর অল্প হাসিয়া বলিলেন—তুমি বল মা বাংলা কবিতা, আমি শুনি। সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটি বল তো। তোমার মুখে, আহা, বড় সুন্দর লাগে। জান মা, মধুরভাষিণী গিরিরাজতনয়া যখন অমৃতস্রাবী কণ্ঠে কথা বলতেন তখন কোকিলদের কণ্ঠস্বরও বিষমবিদ্ধা বীণার কর্কশধ্বনি ব'লেই মনে হ'ত।

> স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব, প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
> অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা, শ্রোতুর্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা।

তার চেয়ে তুমি বল, আমি শুনি।

উমাকে আর অনুরোধ করিতে হইল না, সে আজ কয়েক দিন ধরিয়া এই কারণেই শেখা কবিতাগুলি নূতন করিয়া অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছে।—

> রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি
> এসেছে দুয়ার ভেদিয়া;
> বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
> স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।
>
> ভৈরব তুমি কি বেশে এসেছ,
> ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী;
> রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল
> সুপ্রভাতের রাগিণী?
> মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে,
> কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে?
> বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
> অমানিশা গেল কাটিয়া
> তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে
> দুখানা করিল কাটিয়া।

রামেশ্বর বিস্ফারিত নেত্রে উমার মুখের দিকে চাহিয়া

শুনিতেছিলেন। আবৃত্তি শেষ করিয়া উমা বলিল—কেমন লাগল বলুন?

রামেশ্বর আবেশে তখনও যেন আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, তবু অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব! বাঃ—'তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে দুখানা করিল কাটিয়া'—তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

উমা বলিল—আমি তবু বেশী জানি নে, ঐ দু-চারটে শিখেছি কেবল। জানেন আমার দাদা—খুব জানেন। রবীন্দ্রনাথ একবারে কণ্ঠস্থ। আর ভারি সুন্দর আবৃত্তি করে। আপনি তাঁকে দেখেন নি, না?

—না, সে তো আসে নি, কেমন ক'রে দেখব বল।

—দাঁড়ান, আসুক ফিরে, পিসীমাকে নিয়ে। আমার পিসীমা কে, জানেন তো?

—তোমার পিসীমা? তুমি তো ইন্দ্রের মেয়ে! তোমার পিসীমা?

—হ্যাঁ। অহিদার মা-ই যে আমার পিসীমা। নন তো পিসীমা—আমরা বলি।

—ও। ঠিক ঠিক, আমার মনে ছিল না।

—আমার দাদাই তো তাঁকে নিয়ে সদরে গেছেন। আচ্ছা, পিসীমাকে কেন সাক্ষী মানলে বলুন তো? কে কোথায় চরের উপর দাঙ্গা করলে, উনি তার কি করবেন? ঐ যে কে মজুমদার আছে—সেই খুব শয়তান লোক—ঐ এ-সব করছে। এ কি, আপনি এমন করছেন কেন? পিসেমশাই!

রামেশ্বরের দৃষ্টি তখন বিস্ফারিত, সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কম্পমান, দুই হাতের মুঠি দিয়া খাটের মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—একটু জল দিতে পার মা—একটু জল!

পরক্ষণেই তিনি দারুণ ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন। উমা ত্রস্ত বিব্রত হইয়া বারান্দায় ছুটিয়া গিয়া ডাকিল—মা, ও মা! পিসেমশাই যে প'ড়ে গেলেন মেঝের উপর। অহিদা!

জ্ঞান হইলে রামেশ্বর হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে তিরস্কার-ভরা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—আপনি আমায় মিথ্যে কথা বললেন, রায়-গিন্নী!

হেমাঙ্গিনী কথাটা বুঝিতে পারিলেন না, রামেশ্বর নিজেই বলিলেন—মজুমদার সুনীতিকে দায়রা-আদালতের কাঠগড়াতে দাঁড় করালে শেষ পর্য্যন্ত!

হেমাঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন, তবু তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—না না, কে বললে আপনাকে?

রামেশ্বর উমার দিকে চাহিলেন—উমার মুখ বিবর্ণ পাংশু! তিনি চোখ দুটি বন্ধ করিয়া যেন ভাবিয়া লইয়াই বলিলেন—এই দিকে নীচে কাছারির বারান্দায় কে বলছিল, আমি শুনলাম।

হেমাঙ্গিনী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অহীন পাখা দিয়া বাপের মাথায় বাতাস দিতেছিল, রামেশ্বর অকস্মাৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—দেখ তো অহি, আমার বন্দুকটা ঠিক আছে কি না! দেখ তো!

অহীন নীরবে বাতাস করিয়াই চলিল; রামেশ্বর আবার বলিলেন—দেখ অহি, দেখ।

অহি মৃদুস্বরে বলিল—বন্দুক তো নেই।

—কি হ'ল? অকস্মাৎ যেন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তিনি বলিলেন—মহী, মহী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। জান তুমি অহি—মহী দ্বীপান্তর থেকে কবে ফিরবে? জান?

হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া বলিলেন—একটু ঘুমোন দেখি আপনি! যা তো উমা বাক্স থেকে অডিকলোনের শিশিটা নিয়ে আয় তো!

অনেক শুশ্রূষায় রামেশ্বর শান্ত হইয়া ঘুমাইলেন। যখন উঠিলেন তখন সুনীতি ফিরিয়াছেন।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামেশ্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুনীতির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—তুমি রাধারাণী, না সুনীতি?

ঝর ঝর ধারায় চোখের জলে সুনীতির মুখ ভাসিয়া গেল। রামেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—তুমি সুনীতি, তুমি সুনীতি। সে এমন কাঁদত না। কাঁদতে সে জানত না!

অকস্মাৎ আবার বলিলেন—শোন, শোন। খুব চুপি চুপি। জজ-সায়েব কি আমার খোঁজ করছিল? আমাকে কি ধ'রে নিয়ে যাবে?

সুনীতি কোন সান্ত্বনা দিলেন না, কথার কোন প্রতিবাদ করিলেন না, নীরবে তিনি জানালাটা খুলিয়া দিলেন।

আবছা অন্ধকারের মধ্যেও চরটা দেখা যায়! যাইবেই তো, চক্রান্তের চক্রবেগে সেটা এই বাড়ীটিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। ক্রমশঃ



সুপ্তোত্থিতা

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

জীবন

সম্বুদ্ধ

হরিচরণ মরিয়াছে।

বাঁচিয়াছি। আর সে আমাকে উত্যক্ত করিবে না। আমি আবার নিঃসংকোচে বরিশালের রাস্তায় বেড়াইতে পারিব।

তাহাকে আমি প্রথম দিন আবিষ্কার করি কালেক্টরি রোডে।

বরিশালে আমার বাড়ী, কিন্তু নিজে আমি বহুকাল বরিশাল-ছাড়া। ইহারই মধ্যে হঠাৎ বরিশাল কলেজে চাকরি পাইয়া সেখানে গিয়াছিলাম।

কাজে যোগ দিবার দিন-কয়েক পরে। সন্ধ্যার দিকে যথারীতি নিরুদ্দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। সদর রোডে ফার্স্ট ইয়ারের ছুটি ছেলে আমার সঙ্গে জুটিয়া গেল। তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে কালেক্টারি রোড ধরিলাম, নদীর পাড়ে যাইব। যাওয়া কিন্তু হইল না।

অন্ধকার পথ। চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময় একটা কান্নার শব্দ কানে আসিল। অস্পষ্ট একটানা হুঁউউউ করিয়া সুর টানিয়া কেহ কাঁদিতেছে। দাঁড়াইলাম। প্রথমটা কিছু দেখিতে পাই না। শেষে অন্ধকার ফুঁড়িয়া নজর হইল, রাস্তার ধারে কাপড় মুড়ি দিয়া এক প্রাণী শুইয়া আছে।

কৌতূহল হইল, কাছে গিয়া ডাকিলাম—এই।

বার-দুই ডাকার পর তাহার কান্না থামিল, উত্তর করিল—উ। কহিলাম—হইছে কি তোমার? কান্দো ক্যান্?

সে কহিল—খিদা লাগ্‌ছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর। পথে ঘাটে ক্ষুধার্ত ভিখারীর অভাব শস্যশ্যামলা বাংলা দেশে নাই, বরিশালেও তাহারা থাকে এবং ক্ষুধাও তাহাদের পায়। উত্তরটায় কাজেই নূতনত্ব ছিল না। কিন্তু তবু একটু নূতনত্ব লাগিল তাহার স্বরে! সে খাবার চায় নাই, প্রশ্নের উত্তর মাত্র দিয়াছে। পেশাদার ভিখারীর পক্ষে এটা স্বাভাবিক নয়। মনে হইল, লোকটা হয়ত ভিক্ষুক নয়। অন্তত হইলেও নূতন, অনভ্যস্ত। আপনারা আমাকে যা খুশী ভাবিতে পারেন; কিন্তু তখন তাহার উত্তরের মধ্যে, তাহার বুভুক্ষার করুণতা অপেক্ষা তাহার সরল ভাষার অনাড়ম্বর মাধুর্য্য আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বেশী, এ-কথাটা স্বীকার না করিলে মিথ্যা বলা হইবে। কি জানি কেন, লোকটিকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। কহিলাম—কিদা লাগ্‌ছে? ক্যান্, খাও নায়?

সে ঠিক তেমনই সহজ ভাষায় উত্তর দিল—খাইছি কাইল সকালে।

শুনিয়া তাহার অবস্থাটা কিছু বুঝিলাম। কহিলাম—হেয়ার পর আর খাও নায়?

—না।

—আইজও না?

—না।

ভাল। পকেট হাতড়াইয়া দেখিলাম। পয়সা নাই। থাকলে একটা-দুটা পয়সা দিয়া পলানো যাইত। এখন ইহাকে খাওয়াইতে হইলে বাসায় লইয়া যাইতে হয়। কহিলাম—খাবা? ভাত?

সে কহিল—খামু।

কহিলাম—ওডো।

সে উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে চক্ষে পড়িল, শীর্ণ ক্ষুদ্র তাহার আকৃতি। কহিলাম—কান্‌তে লাগ্‌ছিলা, খিদায়?

সে কহিল—খালি যেন্ খিদায় হেয়োও না, প্যাডে ব্যাদ্‌না ধর্‌ছে বুলিয়া।

এই তাহার প্রথম দীর্ঘ কথা। স্বরটা কচি অথচ কথার ঢংটা বুড়োমানুষের মত। শুনিয়া মনে হইল গ্রাম্য দরিদ্র পরিবারের ছেলে, যাহারা অভাব ও অবৈচিত্র্যের পীড়নে অকালে বৃদ্ধ হইয়া যায়। কহিলাম—কিসের ব্যথা?

সে কহিল—আমার ব্যাদ্‌নার ব্যারাম।

কহিলাম—ব্যথার ব্যারাম, তয় ভাত খাবা?

সে কহিল—না খাইয়া কর্‌মু কি, কয়্‌ন্‌।

কহিলাম—হাড়িয়া যাইতে পার্‌বা?

—কদ্দূর?

—আমার বাসায়। বেশী দূর না, এই চক্‌বাজার ছাড়াইয়া আর কতটুক্‌।

ততক্ষণ আশেপাশে দুই-চার জন কৌতূহলী দর্শক জুটিয়াছে।

বিনা-টিকিটের মজায় ইহাদের অভাব কোথাও হয় না।

ছাত্রদের এক জন কহিল—সার্‌, বাসায় লইয়া যাইবেন?

কহিলাম—না যাইয়া আর কর্‌মু কি। পকেটে পয়সা আধ্‌গানও নাই।

সে কহিল—পয়সা আমার্‌ডে আছে আমি দি।

কহিলাম—থাউক, ভাতই খাওয়াই। পয়সা দিলে তো খাইবে বিরি।

এক জন দর্শক কহিল—আরে ওডো না মর্দো, ভাবো কি। বাবুর লগ্‌লগ্‌ যাও।

আমি কহিলাম—কি কও, পার্‌বা না হাট্‌তে?

সে কহিল—ঐ যেন্‌ চখের পোল?

—হ।

—পারমু।

—তয় ওডো।

—উডি।

বলিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেঁট হইয়া তাহার কি যেন দু-এক টুকরা কাপড়-টাপড় কুড়াইয়া লইল। তার পর কহিল—চলেন।

হাটিতে আরম্ভ করিয়া কহিল—আমি কোলোম্‌ জোরে হাটতে-পার্‌মু না।

কহিলাম—আচ্ছা, তুমি আস্তে আস্তেই চলো।

আলোয় আসিয়া দেখিলাম বয়স তাহার কচিই—বারো-তেরোর মত। অতি শীর্ণ হাত-পা, কিন্তু মুখটা ফুলিয়া চক্ষু দুইটাকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

ছাত্ররা নদীর পাড়ে চলিয়া গেল। আমি ছেলেটাকে লইয়া বাসার পথে চলিলাম। যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম—নাম কি রে তোর?

সে কহিল—আইজ্ঞা হরিচরণ দাস।

বাসার সম্মুখে আসিয়া হরিচরণ কহিল—এই বাসা আপনার্‌গো?

কহিলাম—ক্যান্‌, তুই চেনো নাকি?

সে কহিল—হ, চিনি। আমি এ বাসায় আরও এক দিন খাইছি।

বাসায় ঢুকিয়া দেখিলাম হরিচরণকে আমি ছাড়া আমাদের পরিবারের সকলেই চেনে।

হরিচরণ খাইতে বসিল। আমি কতকটা তাহার মুখে এবং কতকটা আমার ভাইবোনদের মুখে, তাহার ইতিহাসটা শুনিয়া লইলাম।

হরিচরণের বাড়ী বরিশালের মধ্যেই, পিরোজপুরের দিকে। গ্রামের নামটাও বলিয়াছিল, ভুলিয়া গিয়াছি। সংসারে তাহার বাপ মা ভাই কেহ নাই, বিত্তসম্পত্তিও নাই। থাকার মধ্যে আছে শুধু প্রকাণ্ড একটা পেট, ও সেই পেট-ভরা কৃমি। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য বরিশালে আসিয়াছে।

কহিল—বাবু আপ্‌নে যদি দয়া করিয়া আমারে ভর্ত্তি করিয়া দেতে পারেন হেইলে আমার পেরান্‌ডা বাচতে।

কহিলাম—আমি কইলেই কি ভর্ত্তি করবে?

সে কহিল—হেয়া হয়। ডাক্তার-সাইবেরে আপ্‌নে অ্যাট্টু কইয়া দেলেন্‌ই হইবে।

কে ডাক্তার-সাহেব তাঁহার নামও জানি না। অথচ আমি একটু বলিয়া দিলেই তিনি মুগ্ধ বিগলিত হইয়া যাইবেন, নিজের কথার এতটা ক্ষমতার সন্ধান নিজেই রাখি না। কথাটা বিশ্বাস হইল না, কিন্তু চাটুবাক্যের ক্ষমতা অসীম—প্রীতও হইলাম। কহিলাম—আমি কইলেই ডাক্তার সাইব শোনে না। আচ্ছা, তুই আইজ খাইয়া তো গেলি, দেহি যদি কিছু করোন যায়।

হরিচরণ উঠিয়া আঁচাইয়া আসিল। যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া কহিল—বাবু, আইজ যেন্‌ খাইলাম য্যান্‌ বাচলাম।

কহিলাম—কিন্তু কাইলগো-খিয়া আর তুই খাওনই যোগার করতে পারলি না?

সে কহিল—কমু কি বাবু, কাইল ছফরিয়া-কালে এক বাসায় গেছিলাম এউক্কা ভাত চাইতে। হে বাসার ঠাবইনে দেলে গাইল, আর আপনার মতন এক বাবু একালে মারবে কইয়া লরাইয়া আইলে। ঘেডি ধরিয়া আমারে বাসার বাইরে ঠেলিয়া ফ্যালাইয়া দেলে—রাস্তার উপুর আমি একারে পড়িয়া গেছি, আডুডা ছালিয়া গেছে। হেয়ার পর ডয়েত্তে আর আমি কেওড্ডে খাইতে চাই নায়।

মা কহিলেন—ভাত চাইছো হেইয়্যার লইগ্যা খাওয়াইয়া মারতে আইলো? ক্যান্, ভাত না দিবে না দিবে, মারবে ক্যান?

আমি কহিলাম—মারবে ক্যান হেয়ার আমরা কি বুঝি।

আমার ভাই সুজিত কহিল—ওআ বোঝবা না। ওআরে কয় বীরত্ব।

বোন নিভা কহিল—আচ্ছা, তুই যেদিন আর কোনো-হানে ভাত না পাবি এই বাসায় আইয়া খাইয়া যাইস।

হরিচরণ কহিল—আয়চ্ছা, হেয়া আমু।

বলিয়া তাহার পোঁটলা তুলিয়া লইয়া গুটি গুটি পা ফেলিয়া প্রস্থান করিল।

কিছু দিন কাটিল। হরিচরণ মাঝে মাঝে আসে, খাইয়া যায়। ইহারই মধ্যে এক দিন সে এক দুর্ঘটনা বাধাইল। সন্ধ্যার পর হরিচরণ আসিল, খাইল। তাহার কিছুক্ষণ পরে বাবা বেড়াইয়া আসিলেন। ঘরে ঢুকিতে গিয়া টের পাইলেন, অন্ধকারে কেহ তাঁহার টেবিল হাতড়াইতেছে। বলিলেন—কে?

উত্তর হইল—আমি আইজ্ঞা।

ইতিমধ্যে আমি আলো লইয়া আসিয়াছি। ঘর হইতে হরিচরণ বাহির হইল। নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। আমি কহিলাম—তুই ঘরে ঢুকছিলি ক্যান্?

সে কহিল—দ্যাখতে-আছিলাম একটা বিরি-টিরি যদি থাকে। বলিয়া সুড়সুড় করিয়া প্রস্থান করিল।

আমরা বলিলাম, নিশ্চয়ই চুরি করিতে গিয়াছিল।

মা বলিলেন—থাউক বাপু, আর ভাত দিয়া কাম নাই।

পরদিন সকালবেলা হরিচরণ অমায়িক চিত্তে আসিয়া হাজির। কহিল—আমারে দুগ্‌গা ভাত দিবেন?

কহিলাম—আর দিছি তোমারে ভাত। কাইল মাথা খাইতে বাবুর ঘরে ঢুকছিলি কিয়া?

সে কহিল—ভাব্‌লাম বোলে একটা বিরি যদি পাই।

কহিলাম—অ্যাহোন খাও বিরি। অন্ধকারে বাবুর ঘরে ঢোকছো, বাবু তো ভাব্‌জে তুই চুরি করতেই ঢোকছো, না কি।

সে কহিল—চুরি আমি করি না।

কহিলাম—করো না তো বোঝ্‌লাম। লাগ্‌বে যা তুই চাবি। হেয়া না, তুই অন্ধকারে ঘরে ঢুইক্কা হাতরাবি। তার পর মাইন্‌ষে তোরে চোর ভাব্‌বে না ভাব্‌বে কি?

হরিচরণ কহিল—বাবু রাগ হইছে?

কহিলাম—হইবে না? ভাব্‌জিলাম বাবুরে কইয়া তোরে হাসপাতালে ভর্তি করোন্ যায় নি দেখমু, হেয়া খাইয়া থুইছো। আইজ যা।

হরিচরণ চম্পট দিল।

ইহার পরে আবিষ্কার করিলাম, হরিচরণের সোজা বুদ্ধি না থাক, সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে। অন্ধকারে একা ঘরে ঢুকিয়া টেবিল হাতড়াইতে নাই এ-কথাটা তাহার মনে হয় নাই, কিন্তু বাবুকে চটাইবার পর তাঁহার বাসায় খাইতে হইলে তাঁহার অসাক্ষাতে যাওয়াই যে সমীচীন, এটা সে বোঝে। মাঝে মাঝেই চোখে পড়িত, বাসার বাহিরে সে এদিক-ওদিক করিয়া ঘুরিতেছে বা চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া আছে; এবং আমাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলে কাছে আসিয়া চোরের মত চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবু কি বাসায়?

তিনি বাহির হইয়া যাইবার পরে বাসায় ঢুকিয়া সে ভাত চাহিয়া খাইত। তখন বেলা অনেক, মা ছাড়া আর সকলের হয়ত খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গিয়াছে। এমন অসময়ে আসার ফলে মা অসুবিধায়ও পড়িতেন কম নয়, কিন্তু দরজার বাহিরে একটা অভুক্ত প্রাণী নির্নিমেষ চক্ষু পাতিয়া বসিয়া থাকিলে মানুষ সুস্থ হইয়া ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে পারে না। আমি দুপুরে বাসায় থাকি না

কিন্তু ইহারই মধ্যে মাঝে মাঝে যে দৃশ্য চোখে পড়িত তাহাতে বুঝিতাম হরিচরণ আমার মাতৃদেবীর অন্নে বেশ নিয়মিত ভাবেই ভাগ বসাইতেছে।

আমি দু-এক দিন রাগ করিলাম। বলিলাম—হয় ওকে দিও না, আর না হয় ওর জন্য হিসাব করিয়াই মাছ-তরকারি রাখিও।

মা উত্তর দিতেন, ও কবে আসিবে তাহা তো আগে জানা থাকে না। এক দিন বলিলেন, ও যেদিন খাইবে যদি আগে অন্তত আমাকে বলিয়াও যায় আমাকে এমন অসুবিধায় পড়িতে হয় না।

হরিচরণকে আমি সেকথা বলিলাম। উত্তরে সে শুধু খানিকটা নাকে কাঁদিল। স্পষ্ট জবাবও কিছু দিল না, তাহার বিনা-নোটিশে আসার অভ্যাসও বদলাইল না। বদলাইল কেবল তাহার আসিবার তারিখ। আগে সে মাঝে মাঝে এক দিন আসিত, এখন প্রায় রোজই আসিতে লাগিল। এবং নিয়মিত ভাবেই ঐ অসময়ে।

পৃথিবীতে মানুষের চরিত্রের এই একটা মজা দেখিয়াছি, মানুষ অলস থাকিতে পাইলে আর নড়িতে চায় না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আত্মসম্মান সমস্ত ভুয়া কথা—ও বোধ হয় লক্ষে এক জনের মধ্যেও পাওয়া যায় না। চিরদিন পুঁথিতেই পড়িলাম Man is a rational animal, কাজে তাহার প্রমাণ কচিৎই দেখিয়াছি। চার পাশে যা চোখে পড়ে তাহাতে মানুষকে idle animal ছাড়া আর তো কিছুই বলিতে পারি না। নেহাৎ দেহটাকে টিকাইয়া রাখিতে কিঞ্চিৎ আহারের প্রয়োজন, তাই যেখানে দু-মুষ্টি অন্ন জুটিল, নির্বিচারে নিরহঙ্কারে সেইখানকার মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে তাহার দ্বিধা সঙ্কোচ অপমান-বোধ কিছুই নাই। খাওয়া মিলিতেছে এইটাই তাহার কাছে পরম পুরুষার্থ; তাহার বিনিময়ে পিঠের উপর দিয়া অবহেলা অবজ্ঞা লাঞ্ছনার পদাঘাতে বন্যা বহিয়া গেলেও তাহার ভ্রূক্ষেপ হয় না, যেন ওটা সেই ভিক্ষান্নের উচিত মূল্য মাত্র। এবং ভিক্ষা করিবার এই সহজাত প্রবৃত্তি কোন-না-কোনরূপে বোধ হয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বাঁচিয়া থাকে। যদি কেহ ইহাকে অস্বীকার করিতে পারেন, ভিক্ষান্নের চেয়ে আত্মসম্মানকে বড় করিয়া দেখিয়া, যেখানে ভিক্ষায় সহজে মিলিত সেইখানে ক্লেশ স্বীকার করিয়া অন্ন উপার্জন করিতে ব্যাকুল হন, আমি বলিব তিনিই যথার্থ মানুষ বলিয়া নমস্য।

হরিচরণ অতিমানব নয়। রোগে ও দৈন্যে যে নিঃসহায় শিশু তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে, আসন্ন মৃত্যুর আভাস তাহার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে তবু তাহার পলাইয়া যাইবার উপায় নাই,—তাহার মধ্যে অনন্যসাধারণ সম্ভ্রম-চেতনা ও পৌরুষবীর্য্যের একটা আকস্মিক বিস্ফোরণ দেখিতে আশা করিয়াছিলাম, একথা সত্য নয়। কিন্তু তবু তাহার ভিক্ষা করার মধ্যেও অলস-নির্ভরের ভাব দেখিয়া এক-এক সময় বিরক্তি ধরিতে লাগিল।

এক দিন তাহাকে বলিলাম—তুই আর কোনোখানে খাওন পাও না?

সে রোগস্ফীত বৃহৎ দুইটা চক্ষু মেলিয়া কহিল—কথায় পামু। আমারে কেও ভাত দে না।

তাহার কথা কহিবার একটা নিজস্ব কাঁদুনি সুর ছিল শুনিলেই মনে হইত যেন কি উৎকট একটা যাতনা তাহার দেহের অভ্যন্তরে চলিতেছে। কিন্তু শুনিয়া শুনিয়া অভ্যস্ত হইবার পর বুঝিয়াছিলাম, ওটা যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নয়, ঐটাই তাহার সাধারণ কণ্ঠস্বর। স্বাভাবিক স্বরই তাহার ঐ রকম ছিল, না দয়া উদ্রিক্ত করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই সে অমন করুণ সুরে কথা বলিত, জানি না। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের দিন তাহার সেই করুণ কণ্ঠ আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়, এখন তাহার কাঁদুনি আমার ভাল লাগিত না। কানে গেলেই গা জ্বালা করিত, মনে হইত সমস্তই উহার ন্যাকামি, না হইলে সাধারণ একটা কথাও কি ও সহজ গলায় বলিতে পারে না?

মানুষের মনের উপর মানুষের গলার এই বিচিত্র প্রতিক্রিয়া আরও দেখিয়াছি। যে দিনটির কথা বলিতেছি তাহার কয়েক দিন আগেই একটা অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল। কলেজে একটি ছেলে হঠাৎ আমাকে জানাইল, আর একটি ছেলে কোন ব্যাপারে মহা বিপদে পড়িয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। কাজটা খুব ভয়ানক

কিছু নয়, কিন্তু যে-ছেলেটি আমাকে বলিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। মলিন পরিচ্ছদ, মলিন মুখ, এগুলাকে উপেক্ষা করা যাইত, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, অবস্থা অতি শোচনীয় না হইলে মানুষের গলা দিয়া এমন আকুতি বাহির হইতে পারে না। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক ভাঙা, এবং সবসুদ্ধ এমনই একটা অবশ উচ্চারণ করিয়া সে কথা কহিল, যেন সমস্ত দিন না খাইয়া ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে সে আমার, কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, আর তাহার বাক্‌শক্তি নাই। সত্য কথা বলিতে কি সেই কাতর কণ্ঠের তাড়নায়ই তৎক্ষণাৎ হাতের কাজ ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম, যতটুকু প্রয়োজন ছিল তাহার অনেক বেশী তাড়াহুড়া ছুটাছুটি করিয়া তাহার কাজটি করিয়া দিলাম, এবং পরদিন আবিষ্কার করিলাম সে ছেলেটির কথা বলিবার ধরণই ঐ—স্বরযন্ত্রের কি দোষের ফলে সে যাহা বলে তাহাই মহা বিপন্ন লোকের কাতর আকুতির মত শুনায়। জানিয়া তাহার উপরে একটা তীব্র বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল সে যেন ধাপ্পাবাজি করিয়া আমাকে দিয়া তাহার কাজ হাসিল করিয়া লইয়াছে।

তাহার কথাই হয়ত বা মনে পড়িয়া থাকিবে, হরিচরণের কান্না শুনিয়া অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কহিলাম—কথায় পাবি তো বোঝলাম। কিন্তু মধ্যে মধ্যেও যদি আর কোনোহানে চেষ্টা না করো, একজনে পারে নিত্য নিত্য একটা মাইনষেরে খাওয়াইয়া রাখতে?

হরিচরণ নির্বিকার মুখে কহিল—হেয়া তো খাওয়ান্ কষ্টই বুঝি। বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আর কিছু তাহার বলিবার নাই, আমাকে খুনী করার জন্য যতটু দরকার, আমার কথায় ঠিক ততটুকুই সায় সে দিয়াছে।

কহিলাম—তার পর এই বিলে খাইয়া না-খাইয়া এহানে পরিয়া থাইকাই বা তোর আউগ্‌গাইবে কি? তুই বাবী যা।

সে কহিল—হাসপাতালে যদি আমারে ভর্তি করিয়া দেত্তেন আপনারা।

কহিলাম—হাসপাতালে বোলে তুই ভর্তি হইছিলি?

কথাটা ইহার আগের দিনই বাবার মুখে শুনিয়াছিলাম। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, হরিচরণকে হাসপাতালে ভর্তি করা যায় কিনা। তিনি বলিলেন, হরিচরণ হাসপাতালে ইন্‌ডোর রোগী হইয়া অনেক দিন ছিল। আমার সঙ্গে যেদিন তাহার দেখা, তাহার অল্প আগেই হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়াছে। হয় তাহারা অসাধ্য ব্যাধি বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, আর না হয় সে নিজেই চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন তাহাকে সদ্য সদ্য আবার ভর্তি করানো সহজ তো নয়ই, হয়ত সম্ভবই হইবে না।

হরিচরণও কথাটা অস্বীকার করিল না। কহিল—ভর্তি তো হইছেলাম। আছেলামও দেড় মাস।

কহিলাম—তার পর, অসুখ সারে নায়?

সে কহিল—অসুখ তো একটু সুবিধাও হইছেলে।

কহিলাম—তয়? একারে না সারিয়া আইলি ক্যান?

সে কহিল—কইলে বোলে যাও।

বিশ্বাস হইল না। কহিলাম—অসুখ সারলে না কিছু না, কইলে বোলে যাও? হেয়া কয় ক্যামোনতারা? হেরা ছারুছে না তুই-ই চলিয়া আইছো, ক দেহি ঠিক করিয়া?

হরিচরণের এই গুণটা স্বীকার করিব, স্পষ্ট উত্তর দিতে তাহার সঙ্কোচ বা দ্বিধা ছিল না। প্রথম দিন যে সুরে আমাকে সে বলিয়াছিল খাইছি কাইল সকালে, ঠিক সেই সুরেই বলিল—হাসপাতালে মোডে অ্যামোন-ডুগগা ভাত দে, খাইয়া প্যাড্ ভরে না।

—হেইয়ার লইগ্যা তুই চলিয়া আইছো?

—হ।

ভাল করিয়াছে। কাহাকে দোষ দিব বুঝিলাম না। হরিচরণের দিকটা বুঝি। একে তো নিঃস্ব দরিদ্রের ছেলে, ভাতের ব্যাপারে ইহারা একটু হ্যাংলা হয়। হজম করিবার শক্তিটা থাকে বলিয়াই হউক, পাঁচ রকম ব্যঞ্জন-উপচারের অভাবটাও ভাত দিয়া পূরণ করিতে হয় বলিয়াই হউক, বা কাল অন্ন না-ও জুটিতে পারে এই ত্রাসেই হউক, 'ভদ্রলোক'দের তুলনায় ইহারা ভাত একটু বেশীই খায়। তাহার উপর তাহার পেট চলা কমিতে, সেজন্যও তাহার

লোলুপতা বাড়িবার কথা। ওদিকে হাসপাতালেরও দোষ নাই। সেখানে সে চিকিৎসাধীন রোগী, রোগের তীব্রতা কমিবার আগে তাহাকে ভরপেট সুস্থ লোকের খাদ্য খাইতে দেওয়ার কথা নয়। তাহারা দিয়াছে নিয়ম-মত মাপা খাদ্য; হরিচরণ হয়ত ভাবিয়াছে মরিবই যদি, না খাইয়া শুকাইয়া মরি কেন। ক্ষুধা যখন অসহ্য হইয়াছে সে হাসপাতাল ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে—হয়ত বলিয়া, হয়ত না-বলিয়াই। কিন্তু বলিয়াই আসুক আর না-বলিয়াই আসুক, ফিরিবার রাস্তাটা খোলা রাখিয়া আসে নাই।

সেই কথাই তাহাকে বলিলাম। শুনিয়া সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ভয় আর করমু কি। আমার আছে মরণ কপালে, হেরে ঠেকাইবে কেডা।

* * *

কপালে মরণ তাহার হয়ত ছিল। হয়ত ছিল না। কিন্তু এমন করিয়া চলিলে তাহাকে আর বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে না, ইহাও জানিতাম। তাহার জন্ম আমার মাথাব্যথা খুব ছিল না। পৃথিবীতে মানুষ জন্মে এবং মরে; কত লক্ষ কত কোটি কত জায়গায় ইহারই মত ধীর শান্ত গতিতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহার হিসাব কেহ রাখে না। সেই শতলক্ষকোটি মানবের মধ্যে কত বুকভরা কত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং হয়ত কত মহান্ ব্যক্তিত্বের মুকুল অকালে বিনষ্ট হইতেছে তাহার কথা নাই তুলিলাম—শতলক্ষের মধ্যে এক জনকে বিশেষ করিয়া আমি সেদিন দেখি নাই। কোনদিনই দেখিতে পারি না। হরিচরণ মরিবে, এ চিন্তায় আমি আহত হই নাই। কিন্তু তাহার নিশ্চিত মৃত্যুর ছায়ার চেয়েও তীক্ষ্ণ হইয়া আমার চোখে পড়িয়াছিল তাহার আত্মার, তাহার মনুষ্যত্বের মৃত্যু-বিক্ষোভ। সেইটা আমি সহিতে পারিতেছিলাম না।

প্রথম দিন সে আমার কাছে খাইতে চাহে নাই। বলিয়াছিল ক্ষুধায় কাঁদিতেছে, সেটা শুধুই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে। সেই হরিচরণ এখন প্রত্যহ আমার কাছেই খাদ্য প্রার্থনা করিতেছে—পাইবে না এই কথা প্রকারান্তরে শুনিয়াও আবার প্রার্থনা করিতে লজ্জা পাইতেছে না। অপমান-চেতনার এই অভাবে প্রমাণ পাইতেছিলাম, তাহার মনে অভিমানবোধ কমিয়া আসিতেছে। আমার মতে সেইটাই আত্মার মৃত্যু, আত্মচেতনার মৃত্যু।

কিসের জন্ম এই অবমাননাকে সে গায়ে মাখিত না, আমি আজও বুঝি না। ইহার ব্যাখ্যা একটা আমার বুদ্ধি-মত আন্দাজ করিতে পারি, এই মাত্র। এক হইতে পারে, অন্য কোথাও করুণা চাহিয়া তাহার উত্তরে লাঞ্ছনা পাইয়া, তার পর যেখানে সে করুণা পাইয়াছে সেইখানেই মাটি আঁকড়াইয়া সে পড়িয়া থাকিতে চাহিয়াছে, বন্ধুহীন পৃথিবীতে পরিচিত আশ্রয় ছাড়িয়া আবার নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইতে সাহস করে নাই। অন্যত্র ভাত না পাইলে এইখানে আসিবার নিমন্ত্রণ তাহাকে করা হইয়াছিল। তাই অন্যত্র পায় কিনা সেটা যাচাই করার চেষ্টাও সে আর করে নাই। আর তাহা না হইলে তাহার এই অহৈতুক প্রীতির মূলে ছিল তাহার আলস্য—যেখানে এক দিন ভাত পাইল সেইখানেই আর এক দিনও যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন কষ্ট করিয়া নূতন আশ্রয় খুঁজিবার কথা তাহার মনেই হয় নাই। এইটাকেই আমি আত্মার মৃত্যু বলি।

তখন ইহাই ভাবিয়াছিলাম।

এখন কিছু দিন ধরিয়া আমি নিজে বেকার বসিয়া আছি। উপার্জনক্ষম হইয়াও উপার্জন করি না, তাহার জন্ম চেষ্টাও যে খুব প্রাণপণে করিতেছি এমন নয়; সংসারের টাকায় অক্লেশে খাইয়া এবং ঘুমাইয়া বেড়াইয়া অমায়িক আনন্দে দিন কাটাইতেছি। নিজে আয় না করিয়া এই অপরের আয়ে খাওয়ার মধ্যে আমি লজ্জার হেতু পাই না, কারণ আমি জানি যাঁহাদের আয় তাঁহাদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্ক আছে; আমি আয় করিলেও আমার এবং তাঁহাদের আলাদা তহবিল হইত না।

এখন ভাবি, এই সংসারের অন্নে আমার যে-নিঃসঙ্কোচ দাবি আমি দেখিতেছি, ঠিক এই দাবিই কি হরিচরণও বসাইতে চাহিয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারিব না। আমি জানি না। জানিত এক হরিচরণ নিজে। কিংবা হয়ত সেও স্পষ্ট জানিত না।

কিন্তু, চাহিলেই তো হইবে না। আমার এখানে রক্ত-সম্পর্কের দাবি আছে। সেই সম্পর্ক, সেই দাবি তাহার ছিল না। হইতে পারে, তাহার প্রত্যাশার মূলে ছিল তাহার মানসিক আত্মীয়তা-স্বীকার। নিজের জন তাহার ছিল না, মিষ্ট কথায় সহানুভূতি জানাইবার লোকও ছিল না। তাই যেখানে দুটা সহানুভূতির কথা সে পাইয়াছে সেইখানেই তাহার শিশু-মন বলিয়াছে, এই তো আমার আপনার জন; সেইখানেই অবোধ আগ্রহে সে বাহু মেলিয়া সেই কল্পিত আপনার জনকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়াছে। না করিয়াছে দ্বিধা-সঙ্কোচ, না তাহার জাগিয়াছে প্রত্যাখ্যানের শঙ্কা।

কিন্তু তাহার মনের স্নেহতৃষ্ণা যতই থাক, পৃথিবী কেন তাহার সেই দুরাকাঙ্ক্ষাকে মানিয়া লইবে? আমি কেন মানিয়া লইব? হইতে পারে, এক দিন তাহাকে আমি ক্ষুধায় অন্ন দিয়াছিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া চিরকাল দিতে হইবে, এমন কোন্ কথা আছে? আমি যদি তাহাকে এক দিন ডাকিয়াই খাওয়াইয়া থাকি, সে আমার দয়া। আমার খেয়াল। তাহাতে তাহার নিত্য খাইবার দাবি জন্মায় না। সে দাবি পৃথিবী স্বীকার করিবে না।

আর, দয়াই করি যাহাই করি, সেটা একান্তই আমার নিজের খুশী, আমার অবসর-বিলাস। আমার যখন ইচ্ছা এবং যতটুকু ইচ্ছা দয়া আমি দেখাইব। ইচ্ছা যখন থাকিবে না, দেখাইব না। তাহার উপর জোর খাটাইবার অধিকার তো কাহারও নাই।

প্রথম দিন হরিচরণকে আমি নিজেই ডাকিয়া খাওয়াইয়াছিলাম। দয়া করিয়া নয়। খেয়ালে। অমন কত লোকই তো পথের পাশে অনাহারে পড়িয়া থাকে। ক-জনকে আমি বাসায় ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াই? সে-দিনও যে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলাম সেটা দয়া করিয়া নয়। সে অনাহারে আছে শুনিয়া আমার হৃদয় বিগলিত হয় নাই। তাহার কথার সুরটা শুধু আমার ভাল লাগিয়াছিল। কথার অর্থ আমি দেখি নাই, সে না খাইয়া সেইখানে মরিয়া থাকিলে আমার কিছুমাত্র বহিয়া যাইত না। আমি দেখিয়াছিলাম তাহার কথার সহজ ভঙ্গীটা। সেই ভঙ্গী আমার সাহিত্যিক মনকে স্পর্শ করিয়াছিল। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহার সেই রকম কথা আরও দু-চারটা শুনিব বলিয়া। আর একটু কারণ অবশ্য ছিল। পথের ধার হইতে একটা লোককে অযাচিত ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইয়া দেওয়ার মধ্যে যে আত্মপ্রসাদটুকু থাকে সেইটুকু পাইতে চাহিয়াছিলাম। আমার ইহাতে খরচ নাই, চৌদ্দ-পনর জন লোকের সংসারে একটা শিশুর এক বেলার ভাত অক্লেশে চলিয়া যায়। অথচ আমি সেই এক রতি দয়া দেখাইয়া একটা লোকের কৃতজ্ঞতা কিনিয়া লইলাম—বিনা খরচে এই লাভের ব্যবসা না করে কে? তাহার উপর তখন কলেজে সদ্য চাকরি লইয়াছি। সঙ্গে ছিল আমার দুটি ছাত্র। তাহাদের সম্মুখে সেই দয়াটুকু দেখানোর মধ্যে নিশ্চয়ই ব্যবসাবুদ্ধিও আমার ছিল। তাহারা জানিবে নূতন প্রফেসর এমন দয়ালু লোক, রাস্তার পাশ হইতে অনাথ আতুরকে কুড়াইয়া লইয়া যান নিজের বাড়ীতে খাওয়াইবার জন্য, ইহার মূল্য অনেক। তাহারা দেখিয়া গেল, তাহারা তাহাদের বন্ধু ও সহপাঠীদের কাছে গল্প করিবে, এবং ফলে ছাত্রদের মনে আমার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিবে, এটা তো কম লাভ নয়। আমি জানি, সেদিন ঐ ছেলে দুটি সঙ্গে না থাকিলে আমি হরিচরণকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আনিতাম না। হয়ত দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া চলিয়া যাইতাম, যেমন অনেকে যায়; হয়ত তাহার কান্না কানে না-শুনিয়াই চলিয়া যাইতাম, যেমন আরও অনেকে যায়।

হরিচরণ তাহা বোঝে নাই। আমার ব্যবসাদারিকে সে করুণার স্নিগ্ধতা বলিয়া ভুল করিয়াছিল। ভুল করিয়াছিল বলিয়াই সেই 'করুণা'র ধারা যখন শুকাইয়া উঠিয়াছে, সে টের পায় নাই, বা টের পাইলেও স্বীকার করে নাই। প্রথম দিন ও পরবর্ত্তী দিনের ভাতের থালা হয়ত সমানই ভরা ছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে যে অভ্যর্থনা-বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে তাহার মাধুর্য্য পরিমাণে এক থাকে নাই। হরিচরণ তাহা টের পায় নাই এমন মনে করা কঠিন। শিশুরা ইহা টের পায় বয়স্কদের আগে। কিন্তু টের পাইয়াও সেই ভাতের লোভ সে ছাড়িতে

পায়ে নাই। পেট পুরাইবার আগ্রহে পিঠ শক্ত করিয়া অবহেলার পদাঘাত সহ্য করিয়াছে, প্রতিবাদ করে নাই। ইহারই নাম আত্মচেতনার হ্রাস। ইহারই নাম আত্মার মৃত্যু।

সেই মৃত্যু যাহার মধ্যে ঘটিল, তাহার দৈহিক স্বাস্থ্য ও আয়ু টিকিল বা না-টিকিল, কি যায় আসে তাহাতে? হরিচরণ—আত্মসম্ভ্রমহীন ভগ্নস্বাস্থ্য নির্বান্ধব ভিক্ষুক হরিচরণ মরিলে কাহারও কোন ক্ষতি নাই; বরং লাভ আছে, যদি তাহাতে পৃথিবীর এক কুচি জঞ্জাল সাফ হইয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য একটু বাড়ে। এ রকম করিয়া বাঁচিয়া কি করিবে হরিচরণ?

কিন্তু এই সহজ কথাটাই সে বুঝিতে চাহিত না। উচিত ছিল তাহার আত্মহত্যা করা, সে করিতে লাগিল বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম। যত তাহার স্বাস্থ্য খারাপ হয়, ততই তাহার বাঁচিবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়ে। জীবনের উপরে কি অন্ধ আকর্ষণই যে থাকে মানুষের!

অথচ, কেন যে তাহার এমন উগ্র বাঁচিবার তৃষা ছিল তাহাও তো কোন দিন বুঝিলাম না। জীবনে যাহার কোন উদ্দেশ্য থাকে, কিছু করিবার সংকল্প থাকে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে, সে বাঁচুক—তাহার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, প্রয়োজনও আছে। কিন্তু যাহার সম্মুখে ইহার কিছুই নাই, ভবিষ্যৎ যাহার চক্ষে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার মাত্র, সে কেন বাঁচিতে চায়? তাহাকে কেন পৃথিবী অন্ন দিয়া আশ্রয় দিয়া বাঁচাইয়া রাখে? যে অকর্ম্মণ্য জীব বাঁচিয়া থাকিয়া পৃথিবীকে কিছুই দিতে পারিবে না, তাহার নিজের অন্নের মূল্যটাও পরিশোধ করিয়া যাইবে না, শুধু তাহার রোগক্লিষ্ট দেহের পূতিগন্ধে আর দুঃখ-দুর্ভাগ্যের করুণ বিলাপে বাতাস ভারাক্রান্ত করিয়া চারি পাশের সুস্থ মানুষদের স্বাচ্ছন্দ্যকেই ক্ষুণ্ণ, ম্লান করিয়া তুলিবে, কি প্রয়োজন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার? তাহার চেয়ে যদি সে মরিয়াই যায়, এবং তাহার জড়পিণ্ড দেহটাকে টিকাইয়া রাখিতে যে-অন্নবসনটার অপচয় হইত সেইটা পৃথিবীর সুস্থ সবল মানুষদের কর্ম্মক্ষমতাকে বাড়াইয়া তুলিবার কাজে নিযুক্ত হয়, তবে কি বিশ্বসংসারে খুব একটা অবিচার বা অনাচারের অনুষ্ঠান ঘটে?

কে বিশ্বসংসারের স্রষ্টা বা নিয়ন্তা, এবং হরিচরণদের সৃষ্টি করার খেলায় কি তাঁহার উদ্দেশ্য, জানি না। কিন্তু মুখোমুখি তাঁহার দেখা পাইলে প্রশ্নটা একবার তাঁহাকে করিতাম। নিজে ইহার উত্তর খুঁজিয়া পাই নাই। আমার মনে ইহার যে-উত্তর এক-এক সময় আসে, তাহা উচ্চারণ করিয়া বলিলে পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ ছুটিয়া আসিবে আমার গলা টিপিয়া দিতে। বিধাতার সাক্ষাৎ এক বার পাইলে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতাম, সত্য কোন্‌টা—আমার উত্তরটা, না গলা-টিপুনিটা।

হরিচরণকে দেখিয়া এই প্রশ্ন আমার মনে প্রথম জাগে নাই। তাহাকে দেখিয়া প্রশ্নটা মনে পড়িত। মাঝে মাঝে মনে হইত, ঐ তো উহার অবস্থা; যদি কেহ উহাকে ডাকিয়া, যা-কিছু সুখাদ্য ওর খাইবার ইচ্ছা আছে ভরপেট খাওয়াইয়া, শেষে ওর অজ্ঞাতেই এক ঢোক পটাসিয়ম্ সায়ানাইড্ খাওয়াইয়া দেয়,—সে কি পাপ করিবে, না পুণ্য করিবে? হরিচরণের আত্মা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, না অভিসম্পাত?

ইহার পর কিছু দিন আমি নিয়মিত বরিশালে ছিলাম না। কলেজের কাজটা ছিল কয়েক মাসের জন্য ঠিকা, সেটার মেয়াদ শেষ হইয়া গেল; আমি কিছু দিন এখানে, কিছু দিন ওখানে করিয়া বেড়াইতেছিলাম। মাঝে মাঝে বরিশালে আসিয়া দিন-কয়েকের জন্য ঢুঁ মারিয়া যাইতাম।

ইহারই মধ্যে লক্ষ্য করিলাম, হরিচরণ আর বড় আসে না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে বরিশালেই আছে। কে এক জন নাকি তাহাকে ভরসা দিয়াছেন, আর কিছু দিন গেলে হাসপাতালের লোকেরা তাহার কথা ভুলিয়া যাইবে, তখন তাহাকে তিনি আবার ভর্ত্তি করাইয়া দিবেন। সংবাদটা হরিচরণই মহা উৎসাহে আমাদের বাসায় আসিয়া বলিয়া গিয়াছে, এবং সেই ভরসায় অর্দ্ধাশন-অনশন সহিয়াও শহরের মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া আছে।

কিন্তু শহরে থাকিলেও এ বাসায় সে আসে না। এখানে যে তাহার যত্ন কমিয়া আসিয়াছে সেটা সে এত দিনে টের পাইয়াছিল।

প্রথম যেদিন সে সত্যই তাড়া খাইল, খাইল আমার কাছেই।

সেই দিনই গিয়া পৌঁছিয়াছি। অনেক দিন পরে গিয়াছি, ভাই-বোনেরা অনেক বেলা পর্য্যন্ত বসিয়া গল্প-কোলাহল করিয়াছি, আমাদের নাওয়া-খাওয়া সারা হইতে বেলা প্রায় দেড়টা বাজিয়াছে। সকলের শেষে খাইতে বসিয়াছিলেন মা, আর নিভা। তাহার সকালে কলেজ ছিল, তাড়াতাড়ি আধসিদ্ধ ডাল-ভাত ছুটি মুখে গুঁজিয়া সে কলেজে ছুটিয়াছে, কলেজ হইতে তখনই মাত্র ফিরিয়া খাইতে বসিয়াছে।

খাওয়া অর্দ্ধেক হইয়াছে এমন সময় হরিচরণ আসিয়া হাজির হইল। উঠানের কোণে পা ছড়াইয়া বসিয়া কহিল—আমারে দুগ্‌গা ভাত দিবেন?

মা শুনিয়া কহিলেন—সব্বনাশ, ভাত যা আছিল তো আমরা লইয়া বইছি। ওরে অ্যাহোন কি দি।

নিভা কহিল—ওরে কইয়া দে, রাত্তিরে আইয়া যেন খায়।

আমি হরিচরণকে কহিলাম—এই, ভাত তো নাই।

হরিচরণ কহিল—মোডেও নাই?

আমি কহিলাম—না। দুইডা বাজে, অ্যাহোন কি ভাত থাকে। আর তোরেও কইছি খাবি যেদিন, আগে আইয়া কইস্, হেয়া তুই আবি না। যা, রাত্তিরে আইস্।

হরিচরণ কহিল—আয়চ্ছা।

আমি কহিলাম—অ্যাহোন যা।

হরিচরণ কহিল—যাই।

চলিয়া কিন্তু সে গেল না। সেইখানে পা ছড়াইয়া বসিয়া তাহার সেই একটানা বাঁধা সুরে কাঁদিতে লাগিল—হুঁ উ উ উ।

খানিক পরে নিভা খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। তার পর মাও উঠিলেন। ভাতের থালা অর্দ্ধভুক্ত ফেলিয়া গিয়া আঁচাইয়া আসিলেন।

আমি শুইয়াছিলাম। নিভা আঁচাইয়া ঘরে আসিল, নিজের মনেই কহিল—ধ্যেৎ।

আমি কহিলাম—কি হইল?

সে কহিল—খাওনই আইজ কপালে নাই। খিদায় যায় পেরান।

আমি কহিলাম—মানা করে কেডা খাইতে?

সে কহিল—শোন না? ঐ বিলে বইয়া কান্দলে খাইতে পারে?

বাহিরে হরিচরণ তখনও সমানে সুর টানিয়া চলিয়াছে।

আমি উঠিয়া গেলাম। তাহাকে কহিলাম—এই, তোরে না কইলাম যাইতে?

সে কহিল—হ, হেয়া তো কইছেন।

কহিলাম—কইছেন তয় বইয়া রইছেন কিয়া? মাইনষে খাওনের সময় দুয়ারধারে বইয়া কান্দ্‌বি, কি তোর লজ্জা কেও খাইবে লইবে না?

সে কহিল—খাইবে না ক্যান। আমি কি হেইয়া কইছি।

অসহ্য। ধমক দিয়া কহিলাম—আবার আহ্লাদিয়া আহ্লাদিয়া কথা কয়, শূয়ার! ওঠ! বাইরা!

মা কহিলেন—এই, ও ছ্যামরারে বকো ক্যান্। ওর দোষ কি?

আমি কহিলাম—দোষ কিছু না। উড্‌লি?

নিভা কহিল—এই দাদা, তোর কিছু কইথে হইবে না। বাপু, তোমার ভেট্‌কিতে পিত্ত ঠাণ্ডা।

মা কহিলেন—শোন্, আমাগো খাওয়া তো হইলই না। যে ভাতগুন পাতে রইছে ওরে দি, খাউক।

নিভা কহিল—দূৎ, পাতের ভাত মাইন্‌ষেরে দে ক্যাম্‌নে।

মা কহিলেন—পাতের ছায়া পামু কই। আর ওর আর পাতের—না খাইয়া মরে, আমার পাতের ভাত খাইলে কি ওর জাইত যাইবে?

হরিচরণ তখনও বসিয়াই আছে।

নিভা কহিল—আগে জিগাইয়া লও।

মা কহিলেন—কিরে, খাবি পাতের ভাত? দিমু?

হরিচরণ কহিল—খামু।

আমি কহিলাম—খবরদার, ও ভাত দিতে পারবা না। এই দ্যাখ, তুই ওঠ, নাইলে তোর কপালে দুঃখ আছে।

হরিচরণ কহিল—মায় যে কইলে ভাত দেবে?

আমি কহিলাম—অতো খোরদা ভাত খায় না। ওঠ্ কইতে আছি। আর আবার যদি কোনদিন এ বাসায় আও হেইলে সিধা পিডান খাবি।

হরিচরণ চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে চাহিল। এতক্ষণে বোধ হয় তাহার ধারণা হইল, আমি সত্যই রাগ করিয়াছি, রসিকতা করিতেছি না। তার পর আর এক বার হুঁউঁউঁউঁ করিয়া উঠিল।

আমি কহিলাম—আর ঐ কান্দোন থামা। যা কইতে হয় সিধাসিধি কবি, মরা-কান্দোন কান্দবি না। তোর কান্দোনের ঠেলায় মাইন্‌ষে ভাতের গেরাস মুহে দিতে পারবে না—কি পাইছো কি।

হরিচরণ চুপ করিল। তার পর ধীরে সুস্থে তাহার বোঁচকাবাগুলি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা কহিলেন—খাওয়াইয়া দিস না, দি আনয়া ভাতগুন। যারে রে নিতা, লইয়া আয়।

আমি কহিলাম—না। গেলি তুই?

হরিচরণ নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন—দিতাম ভাত, তোর ক্ষেতি হইত কি! ও ভাত তো নষ্টই হইছে। মইধ্যেখিয়া খালি ওডারে খাইতে দিলি না।

নিতা কহিল—তোর বেবাকই বেশী বেশী।

* * *

এই কথাটাই ইহাদের বুঝানো যায় না। শুধু দয়া-মায়া দেখাইবার প্রশ্ন এ নয়, দয়ামায়া ছাড়াও আরও অনেক কথা ভাবিবার আছে। সংসারে আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা দু-মুঠা খাদ্যের সংস্থান লইয়া জন্মিয়াছি। হরিচরণদের ভাগ্য ভাল, তাহারা খাদ্যের সংস্থান লইয়া জন্মায় নাই, অতএব যখন ইচ্ছা যেরূপে ইচ্ছা তাহাদের উপবাস-তীক্ষ্ণ কণ্ঠের রোদনধ্বনি তুলিয়া আমাদের মুখের সেই অন্নকে তিক্ত বিস্বাদ করিয়া তুলিবার শাশ্বত অধিকার তাহাদের আছে। সেই ক্ষমতা ও অধিকারের তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে।

হরিচরণ দরিদ্র। এই দারিদ্র্য তাহার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল, কি তাহার পিতামাতার পাপের ফল—এ সকল গভীর তত্ত্বালোচনা আমি করিতে চাই না। তাহার কিছু নাই এইটুকুই সত্য; কেন নাই, সে গবেষণা অনাবশ্যক। পূর্ব্বজন্ম পূর্ব্বপুরুষের দোহাই নাই দিলাম—হয়ত এটা তাহার এই জন্মেরই দুর্ভাগ্য। কিন্তু কারণ তাহার যাই হউক, সেই দুর্ভাগ্যের বিলাপে বাতাস ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবার অধিকার তাহাদের আছে, আর শান্তিতে বাঁচিবার অধিকার আমাদের নাই, এইটাই বা কেমন কথা? হরিচরণ দরিদ্র; কিন্তু সেই দারিদ্র্যের জন্ম দায়ী আমি নই। সে রোগগ্রস্ত, সে-রোগ আমার আমার সৃষ্টি নয়। তবে কেন আমি আমার নিজের অন্ন শান্তিতে খাইতে পারিব না, প্রতিটি গ্রাস মুখে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কান্না আসিয়া আমার কানে ঢুকিবে, সেই অন্নের সহিত গ্লানি মিশাইয়া আমার জীবনকেও দুর্বিষহ করিয়া তুলিবে—কেন?

সংসারে আমাদেরও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তাই খাইতে বসিয়া আমরা প্রাণপণে কানে তুলা গুঁজি যেন তাহাদের কান্না কানে না ঢোকে; তাহাদের ঠেলিয়া বহু দূরে সরাইয়া দিই, যেন সে-কান্না আমাদের কান পর্য্যন্ত আসিয়া না পৌছায়।

অনেকে বলেন, কেন, ইহাদের কান্না যদি এতই অসহ বোধ হয়, সে-কান্না থামাইয়া দিলেই তো পার। তোমারই সে প্রতিবেশী—সে অনাহারে থাকিবে আর তুমি তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া পেট পুরিয়া আহার করিবে; এবং তাহার পরও আশা করিবে তাহার দুঃখের ক্রন্দন কানে আসিয়া তোমাকে বিরক্ত করিবে না—এটা তোমার অসঙ্গত আশা। তোমার খাদ্য হইতে তাহাকেও ভাগ দাও—মাছ-মাংস তুমিই খাইও, তাহাকে ডালভাতই দিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাও; সে আর কাঁদিবে না, তোমার মাছ-মাংস তুমি নির্ব্বিঘ্নে খাইতে পারিবে।

কথাটা ভাল। কিন্তু কাজে ইহার অনুষ্ঠান করা কতটুকু সম্ভব? পৃথিবী জুড়িয়া দরিদ্রের মেলা, ইহারা জানে প্রতিটি অন্নসংস্থানশালী ব্যক্তির দুয়ারে নির্ব্বিচারে পাতা পাতিবার অধিকার ইহাদের প্রত্যেকের আছে। কিন্তু আমাদের সেই সংস্থানও তো অফুরন্ত নয়। দুই-

চার জনকে অন্ন দেওয়া হয়ত আমাদের সাধ্যে কুলাইতে পারে, ইহাদের সকলকে অন্ন দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। দুই-চার জনকে অন্ন দিয়া এই অবিরাম রোদনধ্বনিকে শেষ করা যায় না; বরং সেই অন্নের গন্ধ পাইয়া বুভুক্ষুরা আরও বেশী করিয়া দল বাঁধিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ীর সম্মুখে ধরনা দেয়, তাহাদের ক্রন্দন আরও তীক্ষ্ণ, তীব্র হইয়া উঠে। আর ইহাদের সকলকে যদি অন্ন দিতে যাই, সকলের পেট ভরিবার বহু পূর্ব্বেই আমাদের নিজের ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে, তার পর আমাদেরও ইহাদেরই মত ভিক্ষাপাত্র হাতে লইতে হইবে। সে অবস্থাটা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

এই জন্যই বাধ্য হইয়া আমাদেরও আত্মরক্ষার উপায় খুঁজিতে হয়। দ্বারের বাহিরে ইহাদের করাঘাত যতই অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠে, আমরাও ততই অধিকতর যত্নে দ্বারের অর্গল দৃঢ় করি। আকাশে বাতাসে ইহাদের আর্ত্তনাদ যতই তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে, সেই শব্দকে ডুবাইয়া দিবার জন্য আমরাও ততই প্রাণপণ করিয়া নিজেদের আনন্দ-কল্লোলের মাত্রা বাড়াই, গান-নাচ-রেডিও-গ্রামোফোনের কোলাহল তুলিয়া নিজের কানকে নিজেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখি,—যেন উহাদের ক্রন্দন কানে না আসে। আমাদের সেই কোলাহল মানসিক আনন্দের পরিচায়ক নয়, পরিচায়ক দৌর্ব্বল্যের। সেটা আমরা প্রাণের উচ্ছ্বাসে করি না, করি আত্মরক্ষার উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতায়।

হরিচরণরা অসহায়। আমরা যে আরও বেশী অসহায়, সে সন্ধান কেহ রাখে না। বহু পুরুষের অভ্যস্ত আভিজাত্য ও বিলাসের শৃঙ্খলে আমরা বাঁধা। সে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া বাহির হইবার মত শক্তি ও সাহস আমাদের নাই। তাই মানুষের দুঃখে ব্যথা আমাদের মনে যদি বা জাগে, দয়া দেখাইতে আমরা পারি না। সেই দয়াকে এবং দয়া দেখাইবার অক্ষমতাকে যতই গোপন করিতে চাই, নিজেরই উপরে ঘৃণার তাড়নায় বাহিরের আচরণ আমাদের ততই রুক্ষ রূঢ় হইয়া উঠে। আমাদের সেই রূপটাই মানুষের চক্ষে পড়ে। তাহারা জানে, আমরা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর।

ইহার পরে প্রায় দেড় মাস আমি বরিশালে ছিলাম। হরিচরণকে আমাদের বাসায় দেখি নাই। কিন্তু পথে-ঘাটে দেখা দিয়া আমার শত্রুতা করিতেও সে ছাড়ে নাই। টিকিট কাটিয়া সিনেমায় ঢুকিতেছি, সম্মুখে দাঁড়াইয়া হরিচরণ: ড্যাবডেবে দুই চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার চক্ষে অনুযোগ নাই, ভর্ৎসনা নাই, শুধু নিষ্প্রাণ চক্ষে সে আমাকে দেখিতেছে। পথে চলিতে একটা সুন্দর খেলনা চোখে পড়িয়াছে, জানি তাহার আয়ু বেশী ক্ষণ নয় তবু পকেট খালি করিয়া সেইটাকে কিনিয়াছি; দুই পা গিয়াই দেখি, রাস্তার পাশে বসিয়া হরিচরণ তাহার বাঁধা সুরে হুঁউঁউঁউঁ করিয়া কাঁদিতেছে। চকিতের মত মনে হইয়াছে, এই পুতুলটা না-কিনিয়া পয়সাটা উহা.ক দিলেও হইত। কিন্তু তখন পকেটে আর পয়সা নাই, এবং পুতুলটা বিনা অজুহাতে ফিরাইয়া দেওয়াও চলে না। বাসায় গিয়া ছোট্ট বোনটাকে পুতুল দিয়াছি, সে ও তাহার দিদিরা খুশী হইয়াছে। হরিচরণও যে ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিল সে কথাটা তাহাদের বলি নাই। বলিলে হরিচরণের দুঃখ দূর হইত না; অথচ ইহাদের আনন্দে মালিন্য মিশিত। লাভ কি বলিয়া?

ইহারই মধ্যে আবার এক দিন একটা কাণ্ড ঘটিল। বিকালবেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, সঙ্গে একটি আত্মীয়া তরুণী। চকবাজারের রাস্তা পার হইয়া তিনি হঠাৎ বলিলেন, টফি কেন। পকেটে অল্পই পয়সা ছিল, সমস্ত দিয়া টফি কিনিলাম। গোটা-দুই টফি মুখে পুরিয়া বাকিগুলা পকেটে রাখিয়া চলিয়াছি, কালেক্টরির পুকুর-পাড়ে বসিয়া হরিচরণ।

সাধারণতঃ সে পথের পাশে বসিয়াই কাঁদে, মুখ খুলিয়া ভিক্ষা চায় না। এ-দিন একেবারে উঠিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পরম পরিচিতের মত হাত পাতিয়া কহিল—বাচ্চু, একখান পয়সা দিয়া যায়ুন, মুরি খামু।

তার পর একটু থামিয়া আবার কহিল—আইজ আর কিছু খাই নায়।

সে ঠিক সামনেটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, থামিতেই

হইল। পকেটে একটাও পয়সা বাকী নাই। চার-পয়সার-একটা দামের বিলাতী টফি, সে টফির মর্ম সে বুঝিবে না। একটা-দুটা টফি খাইয়া তাহার পেটও ভরিবে না। সেই দামের মুড়ি বা ভাতে তাহার দুই বেলা চলিত, কিন্তু সে হিসাব করিয়া লাভ নাই। তাহাকে তখন খাইতে দেওয়া সম্ভব নয়; একমাত্র উপায় আছে তাহাকে বাসায় যাইতে বলা, কিন্তু সেটাও আর বলিতে ভরসা হয় না। কি করি ভাবিতেছি, এমন সময় সঙ্গিনী রক্ষা করিলেন। বড়লোকের আদুরে মেয়ে, হরিচরণের নোংরা চেহারা ও গায়ের গন্ধে তাঁহার বমি আসিল। নাকে রুমাল চাপিয়া কহিলেন—আঃ, চল না।

অকূলে কূল পাইয়া গেলাম। আমার তিনি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া মাত্র, বান্ধবী প্রেয়সী কিছুই নন। তবু সেই বিশেষ বয়সের মেয়েদের লইয়া পথ চলিবার সময় বাধ্য হইয়াই একটু লেডীজ-ম্যান সাজিতে হয়। হরিচরণকে কি জবাব দিব ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাটাও মনে উঠিতেছিল, সঙ্গিনী কি মনে করিবেন। পকেটে পয়সা নাই, অথচ তাহাকে কিছু না দিলে ইনি হয়ত কৃপণ ভাবিবেন, এই দ্বিধায় পড়িয়াছিলাম; তাঁহার কথাটা দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাইয়া দিল। প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া কহিলাম—যা যাঃ!

বলিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেলাম।

সঙ্গিনী কহিলেন—কি নোংরা!

আমি কহিলাম—যত সব ভ্যাগ্রাণ্ট!

ইহার কয়েক দিন পরে আবার বরিশালের বাহিরে গেলাম। মাসখানেক পরে ফিরিলাম। তখন দেখিলাম, হরিচরণকে আর দেখা যায় না।

বাসায় জিজ্ঞাসা করিলাম—হরিচরণডা নাই রে?

বোন্‌রা বলিল—থাকবে না ক্যান্। আছে।

কহিলাম—বাসায় আয় না?

নিভা কহিল—আইবে মাইর খাইতে?

বুঝিলাম না। কহিলাম—মারলে কেডা হেরে?

নিভা কহিল—মাইনষের অভাব কি। তোমরা বড়লোক, হেরা তো তোমাগো মাইর খাইতেই জন্মিছে।

বিস্মিত হইয়া কহিলাম—কি হইছে ক দেহি?

তার পর কাহিনীটা শুনিলাম।

আমি চলিয়া যাইবার পর হরিচরণ আবার এক দিন আসিয়াছিল। আগের দিনের ঘটনাটা মনে ছিল, নিভা ও মা তাহাকে সেদিন ডাকিয়া ভাত দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন—তুই এই হানে আইয়া খাইয়া যাবি।

হরিচরণ বলিয়াছিল—দাদায় বকপে।

নিভা বলিয়াছে—তোর ভয় নাই, দাদায় এহানে নাই।

আমি নাই জানিয়া হরিচরণ আশ্বস্ত হইয়াছে। তার পর হইতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া খাইয়াও গিয়াছে।

ইহারই মধ্যে এক দিন কি উপলক্ষে বাসায় একটু সমারোহ ছিল। কয়েক জন আত্মীয়-বন্ধুকে খাইতে বলা হইয়াছে, একটু বিশেষ রকম রান্নাবাড়ারও আয়োজন করা হইয়াছে।

বেলা তখন প্রায় বারোটা বাজে, অতিথিদের এক দল খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় হরিচরণ আসিয়া হাজির।

বাহিরের ঘরে অভ্যাগতদের এক জন বসিয়া ছিলেন, মা'র তিনি দূরসম্পর্কে মামা হন। জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি করেন, যেমন দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি তেমনি অশিষ্ট। দেশে থাকেন না, আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও বিশেষ নাই। বাড়ী হইতে কর্ম্মস্থলে যাইবার পথে আগের দিনই আসিয়া আমাদের বাসায় অতিথি হইয়াছিলেন।

হরিচরণকে দেখিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন—এই, এই ছ্যাম্‌রা, ওদিক যাও কই। আইজ রবিবার না। ভিক্ষা পাবি না।

হরিচরণ কহিল—ভিক্ষা না। এউকা ভাত খাইতে আইছি।

তিনি কহিলেন—ভাত খাইতে আইছি কিরে, ভাত লইয়া বইয়া রইছে ওনার লইগ্যা!

হরিচরণ উত্তর দিল না, উঠানের কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া পড়িল। তিনি জলিয়া কহিলেন—আবার বইলি যে? কথা কানে যায় না? যাইয়া!

হরিচরণ কহিল—আমারে আইতে কইছে।

এতক্ষণ অবাধ্যতা সহ্য করা মা'র মামার প্রকৃতি-বহির্ভূত। গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—মাইন্‌ষের তো খাইয়া

লইয়া কম নাই, ওনারে আইতে কইছে। খাইয়া কইতে আছি, খাইয়া।

গর্জ্জন শুনিয়া সুজিত ও নিভা বাহির হইয়া আসিল।

হরিচরণ হঠাৎ এক কাণ্ড করিল, বলিয়া বসিল—দাদায় কই?

এ বাসায় দাদা বলিতে আমাকে বুঝায়। আমার ভয়েই সে ইদানীং বাসায় আসিতে চাহিত না, অথচ নূতনতর বিপদের মুখে কি বুঝিয়া যে আমাকেই অবলম্বন করিতে চাহিল, সেটা আমার কাছে আজও রহস্যে ঢাকা।

নিভা তাহার ইঙ্গিত বুঝিল, কহিল—এই দাদায় বুঝি ওরে আইতে কইছে। তুই বয়, খাইয়া যাবি।

তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা মায়ের মামার সহিল না। তিনি কহিলেন—বইয়া রইলি যে?

নিভা কহিল—ওরে আমরা আইতে কইছি। ভাত খাইবে।

মায়ের মামা একটা কুৎসিত মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন—তোমারগো কি, বাপের পয়সায় খাও, গায় তো বাজে না! রাস্তাখিয়া ভিক্ষুক ধরিয়া আনিয়া ভাত খাওয়াবা—এইয়া করলেই বাপে গেছে।

এই কথা নিভাকে বলিয়া আমরা কেউ পার পাইতাম না। ভাই বোন দু-জনেই চটিয়া লাল হইয়া গেল। অথচ সম্পর্কে গুরুজন এবং বাড়ীতে অতিথি, তাঁহাকে কিছু বলাও যায় না। নিভা একটুক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর দৃঢ়স্বরে হরিচণকে কহিল—তুই বয়।

বলিয়া দুই জনে সোজা গিয়া মা'র কাছে হাজির হইল। কহিল—মা, তোমার মামারে মানা করো।

মা কহিলেন—কি আবার হইছে?

তিনি জানিতেন তাঁহার এই মামাটির একটু অসভ্য রসিকতার অভ্যাস আছে, এবং সেই জন্যই আমরা তাঁহাকে খুব পছন্দ করি না। ভাবিলেন, বোধ হয় সেইরূপই কিছু হইয়াছে। কহিলেন—যদি কিছু কইয়াই থাকে, উত্তর দিস্ না। জানোই তো হের মুখ ঐ রকম।

নিভা কহিল—আমাগো না। হরিচরণডা আইছে, হেরে একারে যা তা কইয়া গাইল দিতে লাগছে, বকতে লাগছে, হেরে না খাওয়াইয়া ছাড়বে না। ক্যান্, হের কি?

মা কহিলেন—হরিচরণ আইছে? একটু বওয়া, না খাইয়া যেন যায় না। নিত্য নিত্য ডাইলভাত খাইয়া যায়, আইজ একটু ভাল জিনিষ আছে, খাইয়া যাউক ছ্যামরা।

অনুজ্ঞা পাইয়া নিভা ও সুজিত লাফাইতে লাফাইতে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সেখানে ততক্ষণ যা হইবার হইয়া গিয়াছে।

তাহারা সরিয়া যাইতেই মা'র মামা একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া হরিচরণের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বলিয়াছেন—বইয়া রইছো—গেলি না!

হরিচরণ উত্তরে বলিয়াছে—বাবু, কাইলগোখিয়া খাই নায়। এউকা পান্তাভাত আনায়ে দেন।

তিনি মুখভঙ্গি করিয়া বলিয়াছেন—পান্তাভাত কিয়া, পায়াস দিবে তোমারে। এই দ্যাখছো নি লাড়ি!

তাহার রক্তচক্ষু দেখিয়া হরিচরণ আর বসিয়া থাকিতে ভরসা পায় নাই। উঠিয়া বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়াছে।

বাড়ীর মধ্যে তখন খাওয়া চলিতেছে, খাদ্যের সুগন্ধে বাড়ী আমোদিত। চাকর তাহার সম্মুখ দিয়া ঝুড়ি-ভর্ত্তি উচ্ছিষ্ট খাদ্য লইয়া গিয়া আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া আসিল। বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া হরিচরণ নাকি আপন মনেই বলিয়াছিল—পরমেশ্বর, পোলাউ-মাংস ফ্যালানি যায়, আর এউকা পান্তাভাতও বোলে নাই।

ইহার পরই মা'র মামা 'কি কইলি' বলিয়া এক লাফে আসিয়া তাহার ঘাড় ধরিলেন, এবং অজস্র গালাগালির সহিত তাহাকে হিড়্‌হিড়্ করিয়া কত দূর টানিয়া লইয়া, এক ঠেলা মারিলেন, হরিচরণ সোজা মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িয়া গেল।

নিভা ও সুজিত যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন হরিচরণ মাটিতে পড়িয়া, উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার কাঁথা-কাপড় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কাপড়ের কোণে কিছু চাল বাঁধা ছিল কোথায় ভিক্ষায় হয়ত পাইয়াছিল, সেগুলা উঠানময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মা'র মামা বিজয়গর্ব্বে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার সমস্তটা মুখ উল্লাসে উদ্ভাসিত, দন্ত বিকাশ করিয়া

কহিলেন—বদ্‌মাইসটা—কয় বোলে পোলাউ-মাংস ক্যালানি যায়! যায় তো হেতে তোর কি রে ছ্যামড়া!

বলিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নিভা ও সুজিত কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হরিচরণ উঠিয়া কাঁথা-কাপড় কুড়াইয়া লইল। চাউলগুলা কুড়াইয়া লওয়া সম্ভব ছিল না, সে চেষ্টাও সে করিল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

স্বাভাবিক কথাই সে না-কাঁদিয়া বলিতে পারিত না। অথচ এইটাই আশ্চর্য্য, মার খাইয়া সে কাঁদিল না, চক্ষু মুছিল না, এক বার পিছন ফিরিয়া ইহাদের দিকে চাহিলও না, নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

আর সে আসে নাই।

শুনিয়া আমি কহিলাম—মামুজানেরে কিছু কইলি না?

নিভা কহিল—কমু কি।

আমি কহিলাম—আমাগো ইচ্ছা আমরা খাওয়ামু হে মারুতে কেডা?

নিভা কহিল—সোমান তোমরা বেবাকটি। নিজে কি কম যাও।

চুপ করিয়া রহিলাম।

সেই দিনই কিন্তু আবার হরিচরণের সাক্ষাৎ পাইলাম।

নদীতে স্নান করিতে গিয়াছি, দেখি, যেখানটায় নামিয়া আমরা স্নান করি তাহার কাছেই চড়ায় উনান খুঁড়িয়া হরিচরণ রান্না চাপাইয়াছে। অপটু হস্তে গর্ত্ত খুঁড়িয়া উনান বানাইয়াছে, কোথা হইতে ভিজা আধ-কাঁচা ডালপালা কুড়াইয়া আনিয়াছে, পাশে একটা কাণাভাঙা মাল্‌সায় করিয়া রান্নার আয়োজন করিয়া লইয়াছে—চাউল আর পচা পচা কয়েক টুকরা আলু, সম্ভবতঃ হাটের পরে সেগুলা কুড়াইয়া পাওয়া।

ভিজা বালির উনান, কাঁচা কাঠ আগুন জ্বলে না, কেবলই নিবিয়া যায় ধোঁয়া উঠে, আর হরিচরণ উবুড় হইয়া পড়িয়া ফুঁ দেয়। বারো বছরের শিশুর সেই ক্ষীণ নিঃশ্বাসে এত দাহিকাশক্তি নাই যে কাঁচা কাঠে আগুন ধরাইবে; তাহা না হইলে শুধু উনানে নয় সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতাতেই বহু কাল পূর্ব্বে আগুন ধরিয়া যাইত।

কিন্তু বেলা তখন সাড়ে বারোটা, এই আগুন জ্বালিয়া চাউল সিদ্ধ হইলে তবেই সে খাইতে পাইবে। তাই দুই চক্ষু জলে ভাসাইয়া হরিচরণ প্রাণপণে কেবলই ফুঁ দিতে লাগিল।

আমি একটা কাঠের গাদার আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার এই যুদ্ধ দেখিলাম। তার পর ঘুরিয়া অনেক খানি দূরের এক আঘাটায় গিয়া স্নান করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

* * *

পরদিন বাড়ী গেলাম। দিন-দশেকের পরে ফিরিলাম। ফিরিতেই নিভা খবর দিল—দাদা সুসংবাদ। হরিচরণডা মরছে।

কহিলাম—সুসংবাদ ঠিকই। মরল ক্যাম্‌নে।

সুজিত ইতিহাসটা জানাইল।

আমাদেরই পাড়ায় এক ভদ্রলোকের মাতৃশ্রাদ্ধ ছিল। সেই উপলক্ষে তিনি উপস্থিত ভিক্ষুকদের যথেচ্ছ-বিতরণ করিয়া খাওইয়াছেন। হরিচরণও খুব ঠাসিয়া খাইয়াছে। উপবাস-শুষ্ক পেটে গুরুভোজন সহে নাই; কলেরা হইয়া পরদিনই মরিয়া গিয়াছে।

শুনিয়া অকারণে মনটা হৃষ্ট হইয়া উঠিল।

* * *

রাত্রে শুইয়া সুজিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুই খাইতে গেছিলি?

সে কহিল—গেছিলাম।

—কি রকম খাওয়াইছিল রে?

সে মুখ তুলিয়া আমার দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর কহিল—খুব ভাল।

আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলাদেশে শিল্পবিস্তার

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম. এ., পিএইচ. ডি.

সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের আগেকার কথা। ১৯০৪-৫ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ রহিত করিবার জন্য এক অভিনব অস্ত্র আবিষ্কার ও প্রয়োগ করিতে বঙ্গবাসীকে শিখাইলেন। এই দিব্যাস্ত্রের নাম সকলেই জানেন—বিদেশী পণ্য বর্জ্জন। সুরেন্দ্রনাথের দক্ষ পরিচালনায় কয়েক বৎসরের মধ্যে বিযুক্ত বঙ্গ পুনরায় সংযুক্ত হইল এবং ১৯১২ সালে স্বয়ং ভারতসম্রাট্ ভগ্ন বঙ্গ সংযোগ দিল্লীর মহাদরবারে ঘোষণা করিয়া বঙ্গবাসীর হৃদয় জয় করিলেন। ইহার পরে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন রাজনৈতিক যুদ্ধাস্ত্ররূপে পরিত্যক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই আন্দোলনের ফলে স্বদেশী পণ্য গ্রহণের মহাব্রত বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী গ্রহণ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ যেদিন বিদেশী পণ্য বর্জ্জন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিলেন তাহার পর দিনই বঙ্গবাসী সবিস্ময়ে দেখিল যে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ ত কেবল কৃষিজাত দ্রব্যই উৎপাদন করে, তাহার শিল্পবাণিজ্য ত বহু দিন লোপ পাইয়াছে, তাহার পরিধেয় বসন সরবরাহ করে ম্যাঞ্চেষ্টার ও জাপানের কলসমূহ। তাহার জন্য চিনি আসে জাভা, সুমাত্রা, মরিসাস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে। লবণ আসে লিভারপুল হইতে। বৎসরে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ কোটি টাকার লোহের জিনিষ, মায় ছুরি, কাঁচি, সূচ, আলপিন আসে জার্ম্মানী, জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা হইতে। দেশলাই আসে জাপান বা সুইডেন হইতে, এমন কি কাপড় কাচা সাবানও ভারতে প্রস্তুত হয় না—পসেজের বার সোপ ব্যবহার করিয়া ভারতবাসী ময়লা পরিধেয় বসন পরিষ্কার করে। কাচ, পোর্সলেন ও এনামেলের জিনিষ আসে বেলজিয়ম জার্ম্মানী হইতে। গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে তখন ব্যবহৃত হইত জাপানী বা বিলাতী হোয়াইট ব্রাদার্সের সিমেণ্ট এবং ইংলিশ বা কন্টিনেণ্টাল মিলের কড়ি, বরগা, রড প্রভৃতি। সর্ব্ববিধ ঔষধ জোগাইত প্রধানতঃ জার্ম্মানী ও ইংলণ্ড; অন্যান্য দেশ হইতেও অনেক ঔষধ আসিত। বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়ার আবাসস্থল, কিন্তু কুইনাইন আসিত বিদেশ হইতে। গায়ে-মাখা সাবান জোগাইত পিয়ার্স কোম্পানী ও সুগন্ধি দ্রব্য আসিত ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশ হইতে। লিখিবার বা ছাপিবার কাগজ বা কালিও বিদেশী। পায়ের জুতার চামড়াও বিদেশজাত। চাউল, ডাইল তরিতরকারি, মাছ ছাড়া প্রায় সব জিনিষই আসিত বিদেশ হইতে।

সুরেন্দ্রনাথের বিদেশীবর্জ্জন আন্দোলন যখন প্রবর্ত্তিত হয় তখন সবেমাত্র বোম্বাইয়ে কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। সেই মোটা কাপড় লইয়া কলেজের ছাত্রেরা বাড়ী বাড়ী ফিরি করিয়া বেড়াইল। স্বদেশী ময়লা ঘোলো চিনি ব্যবহার করাতে সন্দেশ রসগোল্লার তুষারধবল রূপ মলিন হইয়া গেল। বিদেশী লবণ যাঁহারা ছাড়িলেন তাঁহাদিগকে মাদ্রাজের কালো করকচ ব্যবহার করিতে হইল। অসুবিধা পদে পদে হইতে লাগিল। কিন্তু বাঙালীর নজর এখন হইতে পড়িল তাহার শিল্প-দৈন্যের প্রতি এবং এখন হইতে বাঙালী এই দৈন্য দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

কান্তকবি রজনীকান্ত দেশবাসীকে উৎসাহ দিবার জন্য গান রচনা করিলেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

কবি রবীন্দ্রনাথও আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।"

রবীন্দ্রনাথের এই আশীষ-বাণী আংশিক ভাবে সফল হইয়াছে। বাংলার আকাশে বাতাসে এই কয় বৎসর স্বদেশী মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের দেখাদেখি বাংলায় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল স্থাপিত হইল। প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ স্বর্গীয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর এবং স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় বেঙ্গল পটারিস, চামড়ার কল প্রভৃতি স্থাপিত হইল। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষের পরিশ্রমের ফলে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান ফর এড্‌ভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্স মারফত দলে দলে বাঙালী যুবক জাপান, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও আমেরিকায় শিল্প শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সাবানের কল, দেশলাইয়ের কল, সেলুলয়েডের ফ্যাক্টরি প্রভৃতি স্থাপন করিতে লাগিল। বাংলা দেশে স্বদেশী যুগের প্রবর্ত্তন হইল।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বঙ্গদেশের এই স্বদেশী ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হইল। বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে আরও বহু কাপড়ের কল বসিল। এখন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' আর কিনিতে হয় না, এখন মায়ের দেওয়া মিহি কাপড়ই সকলে পরিতে পাইতেছেন। সাহেবেরাও দেশের এই স্বাদেশিকতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে ভুলিলেন না। তাঁহারাও ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাপড়ের কল, শীতবস্ত্রের কল, চামড়ার কল, সিমেণ্টের কল, দেশলাইয়ের কল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া প্রভূত লাভ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে ভারত-সরকার অর্থাগমের জন্য নানাবিধ আমদানি-শুল্ক স্থাপন করিলেন। সেগুলি ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠার বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে। বিদেশী চিনির উপর আমদানি-শুল্ক স্থাপন করাতে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে বহু চিনির কল স্থাপিত হইল। ভারতে এখন বিদেশী চিনি খুব কমই আসে। ভারতে এখন এত সিমেণ্ট প্রস্তুত হইতেছে যে বিলাতী ও জাপানী সিমেণ্টের আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ দিকে জামসেদপুর, হিরাপুর ও কুল্টী প্রভৃতি স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হইল। ভারতে এখন এত ঢালাই লোহা (pig iron) তৈয়ারী হয় যে এদেশে ঐরূপ লৌহের সমস্ত অভাব ত পূর্ণ হইতেছেই, তদুপরি বহু সহস্র টন লৌহ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। ভ্যাক্‌সিন, সিরাম প্রভৃতি বহু ডাক্তারি ঔষধ প্রধানতঃ বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইতেছে। সালফিউরিক, নাইট্রিক ও হাইড্রো-ক্লোরিক অম্ল, এখন এ দেশে প্রস্তুত হয়। সোডা, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য এখনও এ দেশে প্রস্তুত হয় নাই, তবে শীঘ্র হইবার আশা আছে। ঘাটশিলায় খনিজ হইতে তাম্র ও পিত্তলের চাদর প্রস্তুত, মহীশূরের কোলার প্রদেশে স্বর্ণ সংগৃহীত হইতেছে। কুইনাইন, ষ্ট্রীকনিন প্রভৃতি ঔষধ ভারতের ভেষজ হইতে আহৃত হইতেছে। গায়ে মাখা সাবানের জন্য আর বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইতে হয় না এবং কাপড়-কাচা সাবান এখন দেশে সর্ব্বত্র বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। ইলেক্‌ট্রিক পাখা, বল্‌ব, ব্যাটারী প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। এল্‌কোহল, ইথার এখন এ দেশে জন্মিতেছে। প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ ডিপার্টমেণ্ট খুলিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে প্ল্যানিং কমিটি বসিয়াছে। সর্ব্বত্র স্বদেশী দ্রব্য প্রস্তুতকল্পে একটা খুব বড় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁতশিল্প পুনঃ-প্রচলনের বাণী প্রচার করিয়াছেন। আমাদের দেশের কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কৃষিকর্ম্ম করে না। সেই সময় অন্ততঃ তাহারা চরকায় সুতা কাটিয়া নিজেরাই কাপড় বুনিয়া পরিবে বা বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিবে। তিনি অল-ইণ্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া কাটুনি ও তাঁতশিল্পীকে একটি সঙ্ঘবদ্ধ শিল্পে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

গত দুই-এক বৎসরে খদ্দরের প্রসার সমধিক হইয়াছে এবং অনেক লোকে ইহার দ্বারা বাড়ী বসিয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। বেশী দাম ও মোটা কাপড় বলিয়া বেশী লোকে খদ্দর ব্যবহার না করিলেও শিল্পবিস্তারকল্পে



চীনের তরুণ ছাত্র ও বৃদ্ধ অধ্যাপক। এই অধ্যাপক যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, যে-সকল যুবক যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিয়াছে তাহাদের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।





চীন, তালির প্রবেশ-দ্বার। তালি স্বতন্ত্র চীনের বর্তমান অন্যতম শিক্ষা-কেন্দ্র।



ম্যানিলার দৃশ্য, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পক্ষে বর্তমানে আমেরিকার সহিত সম্পর্ক
সম্পূর্ণ ছিন্ন করা [illegible] এখনও তাহার আলোচনা চলিতেছে।

এই খদ্দর-আন্দোলন যে অনেকটা সহায়তা করিয়াছে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে এই খদ্দর-আন্দোলনের একটা বিপরীত ফলও যে দেখা না যাইতেছে তাহা নহে। ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলেন যে হস্তশিল্পই আমাদের একমাত্র কাম্য, মিল-কারখানা দেশের পক্ষে অশুভ। ইঁহাদের সংখ্যা অল্প, এই রক্ষা। প্রায় সকলেই বুঝিতেছেন যে হস্তশিল্পের উন্নতি বাঞ্ছনীয় হইলেও মিল-কারখানা না হইলে দেশের মঙ্গল নাই। জগতের অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞানকে বরণ করিয়া লইতেই হইবে, কলকারখানায় যাহাতে দেশ ছাইয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতেই হইবে। এখন গরুর গাড়ীতে কলিকাতা হইতে দিল্লী লাহোর যাইবার পরিকল্পনা একেবারেই অচল, রেল মোটর চাইই; দিনকতক পরে এরোপ্লেনও চলিবে। আমাদিগকেও ক্রমে সেইগুলি তৈয়ার করিতে হইবে। নহিলে ভারতবর্ষ চিরদরিদ্র থাকিয়া যাইবে।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা প্রকার আধুনিক শিল্পের প্রচলন হইলেও বাংলাদেশে শিল্পোন্নতি খুব বেশী হইয়াছে তাহা নহে। তবে বাঙালী এখন আর নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া নাই। এত দিন বোম্বাইয়ের মিলগুলি বাংলাদেশকে কাপড় যোগাইতেছিল, এখন বাংলায় কাপড়ের কল বসিতেছে এবং বিশ-বাইশটির উপর কল হইতে সুতা ও কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। তাঁতশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে। বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগ ইতিমধ্যে সাত-আট হাজার উন্নত তাঁত বাংলার নানাস্থানে বসাইয়াছেন এবং তাঁত-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য অনেকগুলি শিক্ষকের দল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেশী চিনি এত দিন আসিতেছিল বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে; এখন বঙ্গদেশেই সাত-আটটা চিনির কল বসিয়াছে। লবণ আসিত মাদ্রাজ ও এডেন হইতে; এখন বঙ্গদেশেই লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। কাঁচ, এনামেল ও পোর্সলেনের জিনিষ বাংলা দেশেই তৈয়ারি হইতেছে। ভ্যাক্সিন, সিরাম, সাবান, এসিড, এল্‌কোহল, ইলেক্‌ট্রিক বল্‌ব, ব্যাটারী ও পাখা প্রভৃতি বাংলা দেশে এখন প্রস্তুত হইতেছে। বাঙালী বুদ্ধিমান, কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে সে দুর্ব্বল, শ্রমবিমুখ ও বাড়ী ছাড়িতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, সেই জন্য বাংলায় যত সাহেব মাড়োয়ারী বা বাঙালীর শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে তাহার মজুর প্রভৃতি সবই প্রায় পশ্চিমা বা দক্ষিণের লোক। এমন কি বাংলা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, অ-বাঙালীরাই ছুতার, মুদি, রাজমিস্ত্রী, মজুর, রিক্সওয়ালা এমন কি নাপিত, গোয়ালা, ফলওয়ালা, মাছ-বিক্রেতা, পানওয়ালা, ফেরিওয়ালার কাজ করিয়া অনেক পয়সা রোজগার করিয়া বঙ্গদেশ হইতে তাহাদের স্বদেশে প্রেরণ করিতেছে। বঙ্গদেশে শিল্পবিস্তারের পক্ষে বাঙালীর এই শ্রমবিমুখতা ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য একটা প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায়ের প্রতিকার আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই, তবে বাঙালীর বুদ্ধিমত্তা ক্রমে ইহার প্রতিকার আবিষ্কার করিবে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি আরও একটা নূতন কথা উঠিয়াছে। শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহারকালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশজাত শিল্পকে বাঙালী বাংলার শিল্পের সহিত সমান চক্ষে দেখিবে, না বাঙালী বাংলাজাত শিল্পকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিবে? কথাটা একটু জটিল বটে। বাঙালী এত দিন ভারতবর্ষকে অখণ্ড বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছে, সে কখনও প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। কিন্তু বস্ত্র, শর্করা, লবণ প্রভৃতি বাংলার উদীয়মান শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে বাঙালীকে বাংলাজাত দ্রব্যকে প্রথম স্থান না দিলে বুঝি এখন আর চলিতেছে না। মনে হয় ইহা আত্মরক্ষার অস্ত্র মাত্র, ইহাতে প্রাদেশিকতার গন্ধ নাই। আশা করা যায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বাঙালীকে এবিষয়ে ভুল বুঝিবেন না।

নির্ম্মোক

"বনফুল"

কয়েক দিন হইল বিমল নিজের বাসায় আসিয়াছে নিজের আলাদা একটি চাকরও রাখিয়াছে, কম্‌বাইণ্ড হ্যাণ্ড, রান্নাবান্না হইতে সুরু করিয়া সব কাজকর্ম্মই সে নিপুণভাবে করে। পরেশ-দাই চাকরটি জোগাড় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার পিওন হরেনের ভাই যোগেন। সনাতন রীতি, হাসপাতালের চাকরই ডাক্তারবাবুর বাসায় কাজ করিয়া থাকে। এই সনাতন রীতির ব্যতিক্রম হওয়াতে হাসপাতালের চাকর ভৈরব মনে মনে যৎপরোনাস্তি চটিয়াছিল। এত দিন ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে কাজ করার ওজুহাতে সে হাসপাতালের কাজে ফাঁকি দিত, ডাক্তারবাবুর বাজার-হাট করিয়া দিয়া দুই পয়সা উপরি রোজগার করিত, ডাক্তারবাবুর নিকট কিছু বেতনও পাইত। এই অদ্ভুত ধরণের নূতন ছোকরা ডাক্তারবাবুটি আসাতে সমস্তই ওলটপালট হইয়া গেল। সে বিমলের নামে সুযোগ পাইলেই গোপনে একটু-আধটু নিন্দা করিতে লাগিল। কম্পাউণ্ডার গুপিবাবুও চটিয়াছিলেন। বিমলের কড়া হুকুম অনুসারে তাঁহাকে ঠিক ঠিক সময়ে হাসপাতালে হাজির হইতে হইতেছিল। এ তো বিপদ কম নয়! হাসপাতালে রোগী ঔষধ কিছু নাই, শুধু সেখানে গিয়া সময় নষ্ট করা। সকালবেলায় গঙ্গাস্নান করিয়া পূজা-আহ্নিকটা কোনক্রমে নমোনমো করিয়া সারিয়া ফেলিতে হয়, বৈকালে ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাগদী-পাড়ায়, শুঁড়ি-পাড়ায়, মুসলমান-পাড়ায় ঘুরিয়া চার আনা আট আনা দক্ষিণা লইয়া একটু-আধটু প্র্যাকটিস তিনি করিতেন— তাঁহাকে দুই-চারি আনা পয়সা দিলে হাসপাতাল হইতে দামী ঔষধ ভাল করিয়া 'মন দিয়া' তিনি প্রস্তুত করিয়া দিবেন এই ভরসায় অনেক গরিব লোকই তাঁহাকে ডাকিত—'সেদিনকার ছোঁড়া' এই ডাক্তারটা আসিয়া সমস্তই পণ্ড করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। চৌধুরী মহাশয়কে বলিয়া ইহার একটা বিহিত করার প্রয়োজন গুপিবাবু অনুভব করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় হাসপাতাল-কমিটির এক জন মেম্বার তো বটেনই, অন্যান্য মেম্বারদের উপরও তাঁহার আধিপত্য আছে। ধনী মহাজন তিনি অনেকেরই হাঁড়ির খবর রাখেন। বদিবাবুর মতন 'ছুঁদে' লোকও চৌধুরীকে চটাইতে সাহস করেন না। নানা কারণে চৌধুরী মহাশয় গুপিবাবুর উপর প্রসন্ন। গুপিবাবু তাঁহার বাড়ীর পুরোহিত, অসুখ-বিসুখ করিলে নার্স, প্রতি সন্ধ্যায় পাশাখেলার সহচর এবং সর্ব্বোপরি সুদক্ষ মোসাহেব। সুতরাং কম্পাউণ্ডার হইলেও গুপিবাবু নিতান্ত অক্ষম লোক নহেন, ইচ্ছা করিলে অনেক কিছুই তিনি করিতে পারেন। অনেক ডাক্তার তিনি চরাইয়াছেন! বিমল যদিও মনে মনে গুপিবাবুর বিরুদ্ধভাবটা অনুভব করিতেছিল, কিন্তু সেজন্য তাহার বিশেষ চিন্তা হয় নাই। সে সেদিন সন্ধ্যায় শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিল কি করিয়া হাসপাতালে কিছু ঔষধ জোগাড় করা যায়। ঔষধ না থাকিলে সে চিকিৎসা করিবে কি দিয়া। নন্দী মহাশয়ের বাড়ীতে সেদিন সে যে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিয়া দিয়া আসিয়াছিল তাহাতেই কাজ হইয়াছে, কয়সেপস্‌ লাগাইতে হয় নাই। জগদীশবাবুর চণ্ডীতলার মাটি এবং ভূধরবাবুর হোমিওপ্যাথির কৌটা যে তাহার কৃতিত্বকে খানিকটা হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। চণ্ডীতলার মাটির কথা সে শোনেই নাই। তাহার মনে হইল নন্দী মহাশয়ের নিকট গিয়া হাসপাতালের দুরবস্থার কথা খুলিয়া বলিলে হয়তো তিনি কোন ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন। সে উঠিয়া পড়িল। পরেশ-দাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া এখনই একবার গেলে হয়। কাল সমস্ত দিন হাসপাতালের কাজেকর্ম্মে অবসর পাওয়া যাইবে না। পোস্টাফিসে গিয়া দেখিল পরেশ-দা নাই, তিনি সারস্বত মন্দিরের মাসিক অধিবেশনে

গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন ঠিক নাই। বিমল একাই নন্দী মহাশয়ের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

—আসুন আসুন ডাক্তারবাবু!

নন্দী মহাশয় ঝুঁকিয়া নমস্কার করিয়া বিমলকে অভ্যর্থনা করিলেন।

বিমল উপবেশন করিয়া বলিল—রমেনবাবুর স্ত্রী ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর কোন গোলমাল হয় নি, বেশ ভাল আছে।

ইহার পরই বিমল মনে মনে প্রত্যাশা করিতেছিল যে নন্দী মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। খানিকক্ষণ নীরবতার পর সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন—চা আনতে বলব, না সরবত?

—চা-ই আনতে বলুন।

চায়ের ফরমাস দিয়া নন্দী মহাশয় বলিলেন—এই নিদারুণ গ্রীষ্মে কি করে যে আপনারা চা খান তাই আমি ভাবি। আমার রমেনেরও ঐ, সকাল-বিকেল চা চাই—

চা-পানান্তে বিমল আসল কথাটা খুলিয়া বলিল। সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া নন্দী মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

—তাই নাকি? এই রকম অবস্থা হাসপাতালের?

—একটুও বাড়িয়ে বলছি না আমি।

কিছুকাল নীরব থাকিয়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে নন্দী মহাশয় বলিলেন—আপনার আগে যে ডাক্তারটি ছিলেন অত্যন্ত হুঁশিয়ার লোক ছিলেন তিনি মশাই, শুনতাম ঘরে ব'সে ব'সে ব্যাঙ-খরগোস চিরতেন, জ্যান্ত ধরে ধরে চিরতেন—এদিকে হাসপাতাল একেবারে দেখতেন না, তিনিই ডুবিয়ে গেছেন হাসপাতালটাকে সম্পূর্ণরূপে—

বিমল বলিল—কিন্তু তিনি বিদ্বান্ লোক ছিলেন।

—যে বিদ্যেতে জীবে দয়া করার প্রবৃত্তি লোপ পায় তেমন বিদ্যে শেখার প্রয়োজনটা কি তাই আমাকে বুঝিয়ে দিন!

বিমল বুঝিল, নন্দী মহাশয়কে বুঝানো অসম্ভব। সে-চেষ্টা সে করিল না, মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। নন্দী মহাশয় গড়গড়ার নলে চক্ষু বুজিয়া টান দিতে দিতে বলিলেন—জীবে দয়াটাই হ'ল গিয়ে পরম ধর্ম, সব শিক্ষার মূল কথা।

বিমল বলিল—তা ত ঠিকই! হাসপাতালের গরিব রুগীগুলোকে দেখলে কষ্ট হয়, বিশেষত তাদের যখন একটু ভাল ওষুধ দিতে পারি না, তখন সত্যি বলছি বড় খারাপ লাগে! আপনার দয়ায় হাসপাতালের ইনডোর রুগীগুলো তবু খেতে পায়—

নন্দী মহাশয় চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

বিমল বলিতে লাগিল—কিন্তু ওষুধটা না থাকলে চিকিৎসা করব কি দিয়ে, এমন কি কুইনিন পর্য্যন্ত নেই—

নন্দী মহাশয় চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—ওটা তো শুনেছি ভয়ানক পয়জন, ওটা যত কম খায় লোকে ততই ভাল! ঐ কুইনিন খেয়ে খেয়েই দেশের লোকগুলো আরও জরাজীর্ণ হয়ে গেল মশাই যাই বলুন আপনারা!

বিমল নন্দী মহাশয়ের ধাত বুঝিয়াছিল, কিছু বলিল না।

কানে-কলম-গোঁজা প্রৌঢ় এক ব্যক্তি একটি খেরোর খাতা হস্তে প্রবেশ করিলেন এবং সবিনয়ে বলিলেন—চরণ ঘোষের খাজনাটার দরুনটা কি—

নন্দী মহাশয় অধীর ভাবে উত্তর দিলেন—কত বার বলব এক কথা! বাপ-পিতামহের বিষয়টা কি উড়িয়ে দিতে বল আমাকে দানছত্তর ক'রে!

কানে-কলম-গোঁজা ব্যক্তি নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। যেন কিছুই হয় নাই, নন্দী মহাশয় পুনরায় প্রশান্ত ভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বেশ, মাথায় রইল—আপনার কথাটা, এবারকার মিটিঙে দেখব চেষ্টা ক'রে যদি কিছু করতে পারি। আসল কথা কি জানেন, ট্যাক্স আদায় হয় না। আমাদের যে ঐ ট্যাক্স-কলেক্টারটি আছে অতি হারামজাদা ব্যক্তি সে। লোকের কাছ থেকে দু-চার পয়সা ঘুস-টুস খায়—একটি পয়সা আদায় করে না। অথচ ওর গায়ে হাত দেবার জো নেই—বঙ্কিবাবুর মক্কেলের দালাল উনি।

নন্দী মহাশয় এই পর্যন্ত বলিয়া সহসা থামিয়া গেলেন এবং বলিলেন—কবিরাজের কানে আমার কথাটা যেন না ওঠে দেখবেন, উনি আমাদের পার্টির লোক, ওঁকে চটালে মুস্কিল!

বিমল তাড়াতাড়ি বলিল—আমি কাউকে কিছু বলব না।

নন্দী মহাশয় আরও কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলেন। তাহার পর বলিলেন—কত ডিফিকাল্টি যে মশাই তা বাইরে থেকে বোঝা শক্ত। যাক্ আপনি ভাল লোক যখন এসেছেন, ওষুধ-বিষুধের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

আরও দুই-চারি কথার পর বিমল বিদায় লইল। রাস্তায় একটা সরু গলি দিয়া বিমল আসিতেছিল। আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল। হাসপাতালকে সে যদি ঠিক মত খাড়া করিয়া তুলিতে পারে পসার জমাইতে দেরি হইবে না। ভূধরবাবু এবং জগদীশবাবুর যেরূপ কলের বহর দেখা যাইতেছে, তাহাতে 'ফিল্ড্' তো নিতান্ত ছোট বলিয়া মনে হয় না।...হঠাৎ একটা উন্মুক্ত বাতায়ন হইতে কয়েকটি কথা ভাসিয়া আসিয়া বিমলের কানে প্রবেশ করিল। উৎকর্ণ বিমল দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। অচেনা দুই জন লোক ঘরের ভিতর কথা বলিতেছে।

—হাসপাতালের নূতন ডাক্তারটি ছোকরা হলে কি হয়, ডাক্তার ভাল, একের নম্বর প্রতিবাজ!

—না না, হরেনবাবু ওকথা বলবেন না। ষ্টেশন থেকে একটা বুড়িকে কুড়িয়ে এনে নিজের পয়সা খরচ ক'রে চিকিৎসা ক'রে ভাল তো করেছে। আপনাদের হাসপাতালে তো ওষুধপত্তর কিছু নেই!

—ওসব চাল মশাই! এক চালে বাজি মাৎ করবে ভেবেছে, অত সহজে ভোলবার ছেলে হরেন বোস নয়।

—আমার সঙ্গে অবশ্য এখনও বিশেষ পরিচয় হয় নি, কিন্তু আমার চাকরটা তার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে দেখাতে গিছল, খুব যত্ন করে দেখেছে নাকি, খুব সুখ্যাতি করছিল সে।

হরেনবাবু বলিলেন—মতিলাল ডালিয়াৎ লোক মশাই, গুপিবাবুর কাছে শুনলাম এমন সব প্রেসক্রপ্‌শান করে যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। চাল দেখাবার জন্তে নানারকম বিদ্‌ঘুটে ওষুধের প্রেসক্রপ্‌শান লেখে। সব বুঝি মশাই!

বিমল আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে পথ অতিক্রমণ করিতে লাগিল। এই হরেন বোসই কি তাঁহাদের হাসপাতাল-কমিটির মেম্বার? ইহার কথাই কি পরেশ-দা বলিয়াছিলেন! ভয়ানক লোক তো!

বাড়ী ফিরিয়া বিমল দেখিল স্বয়ং বদিবাবু তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। প্রকাশবাবুর হাতল-ভাঙা চেয়ারটি ভৃত্য যোগেন বারান্দায় বাহির করিয়া দিয়াছে এবং তাহারই উপর বদিবাবু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

—ডাক্তার বাবু নাকি, বেড়িয়ে ফিরলেন বুঝি?

—নন্দী মশায়ের কাছে গিছলাম।

—তাঁর পুত্রবধূটির খবর ভাল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনারই ওষুধে দেখলাম উপকার হয়েছে!

—আপনি কি ক'রে দেখলেন?

স্মিতহাস্ত করিয়া বদিবাবু বলিলেন—রাজা কর্ণের পঞ্চভূতি! চার দিকে চোখ-কান খুলে রাখতে হয়।

বিমল চুপ করিয়া রহিল। বদিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন—আপনি কি খুব ক্লান্ত আছেন?

—না, কেন বলুন তো?

—এক জায়গায় যেতে হবে, একটু দূর আছে।

—বেশ চলুন।

—এখুনি তৈরি?

—তা নয় তো কি?

—বাঃ, এই তো চাই, চলুন।

—কতক্ষণ দেরি হবে?

—ঘণ্টা দুই-আড়াই ওপারে গিয়ে, মোটরে ক'রে মাইল-চারেক। ওপারে সতীশবাবু জমিদার আছেন তাঁদেরই বাড়ীতে।

—কারও অসুখ নাকি?

—অসুখ আছে এক জনের, সতীশবাবুর ভায়ের, এ অঞ্চলের সব ডাক্তারই দেখেছেন কিন্তু জ্বর ছাড়ছে না। প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। তাছাড়া আরও একটা কাজ আছে।

—কি?

—ওঁদের জমিদারীতে একটা ফৌজদারি হয়ে গেছে: একটা লোক মারাও গেছে, তারই পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আজ নাকি পেয়েছেন ওঁরা, তাই আমাকে যেতে লিখেছেন এক বার। মোটর পাঠিয়েছেন, আপনাকে দিয়ে রিপোর্টটা এক বার দেখিয়ে নিতে চাই, কি ভাবে জেরা করলে সুবিধে হবে।

—বেশ চলুন। দাঁড়ান, আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে নি।

রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল বদিবাবুকে বলিল—আমাদের হাসপাতালে ওষুধ কিছু নেই, তার একটা ব্যবস্থা করে দিন আপনি। এই কথা বলতেই নন্দী মহাশয়ের কাছে গেছলাম আমি।

—কি বললেন তিনি?

—তিনি বললেন, আগামী মিটিঙে কথাটা পাড়বেন!

—মিটিঙে পেড়ে তো সবই হবে, টাকা কই, ওষুধের দোকানের ধারই এখনও শোধ হয় নি।

কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর বদিবাবু প্রশ্ন করিলেন—কত টাকার ওষুধ হ'লে চলে আপনার আপাতত?

—কিছুই তো নেই, শ-পাঁচেকের কম হ'লে কি ক'রে চলবে!

—পাঁচ শ টাকা! বলেন কি মশাই?

—কিছুই ওষুধ নেই যে?

—দেখি।

সতীশ বাবুর ভাইকে পরীক্ষা করিয়া তাহার কালাজ্বর বলিয়া সন্দেহ হইল।

সতীশবাবু শুনিয়া বলিলেন—সে কি মশাই, কালাজ্বর শুনেছি আসাম অঞ্চলে হয়, কুলিদের।

বিমল হাসিয়া বলিল—আজকাল সর্ব্বত্রই হয়।

—ভদ্রলোকদেরও?

—হ্যাঁ।

সতীশবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—তাহলে উপায়?

—রক্তটা আজ নিয়ে যাই, পরীক্ষা ক'রে তার পরে ঠিক জানাব।

—রক্ত কি আপনিই পরীক্ষা করবেন? আপনার কি সব যন্ত্রপাতি—

—এর জন্যে যা দরকার তা আমার আছে।

বদিবাবু সস্মিত দৃষ্টিতে সতীশবাবুর দিকে চাহিলেন। বিমলের রক্ত পরীক্ষা করিবার সমস্ত সরঞ্জাম আছে এ কৃতিত্ব যেন তাঁহারই!

সতীশবাবু বলিলেন—সিভিল সার্জ্জন একবার দেখেছিলেন, তিনিও রক্তপরীক্ষার কথা বলেছিলেন, কিন্তু জগদীশবাবু মানা করলেন ব'লে আর হয় নি। বললেন, এমনই শরীরে রক্ত নেই, রক্ত পরীক্ষা ক'রে আবার খানিকটা রক্ত নষ্ট ক'রে লাভ কি? রক্ত নিলে আবার কোন অনিষ্ট-টনিষ্ট হবে না তো? দেখছেন তো কি রকম দুর্ব্বল!

—না, কোন অনিষ্ট হবে না।

বিমলের কথায় যতটা না হউক বদিবাবুর আগ্রহে সতীশবাবু অবশেষে রক্তপরীক্ষা করাইতে রাজি হইলেন।

রক্ত লইবার সময় সমারোহ ব্যাপার পড়িয়া গেল। এক জন মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল, সতীশবাবু ও দুই জনে দুই পাশে দাঁড়াইয়া রোগীকে ভরসা দিতে লাগিলেন, সতীশবাবুর মা পূজার ঘরে গিয়া সভয়ে ঠাকুর-দেবতার শরণাপন্ন হইলেন, বাড়ীর কমবয়সী ছেলেমেয়েরা উৎসুক হইয়া দ্বারপ্রান্তে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর চাকর-দাসীদের মুখেও একটা সশঙ্ক ভাব ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিমলও একটু ঘাবড়াইয়া গেল। রোগীর তো কথাই নাই, তিনি চোখ বুজিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন। ভগবানের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নেই সমস্ত হইয়া গেল, কোনরূপ অঘটন ঘটিল না। বিমল রক্ত লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

সতীশবাবু ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—একটু দুধ খাইয়ে দেওয়া যাক, কি বলেন?

—দিন।

—একটু ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে দেব তার সঙ্গে ?

—ব্র্যাণ্ডি আছে বাড়ীতে ?

সতীশবাবু ও বঙ্কিবাবুর একটা দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। সতীশবাবু বলিলেন—আছে।

—দিন তাহলে এক চামচে।

এ ব্যাপার চুকিয়া গেলে বিমল পোস্টমর্টেম রিপোর্টখানা আদ্যোপান্ত পড়িল এবং কি ভাবে জেরা করিলে বঙ্কিবাবুর সুবিধা হইবে তাহা বলিয়া দিল।

সব চুকিয়া গেলে সতীশবাবুর আগ্রহাতিশয্যে বিমলকে আহারটাও তাঁহারই বাড়ীতে সমাধা করিতে হইল। সতীশবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না, বঙ্কিবাবুও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আহার শেষ করিয়া ফিরিতে বিমলের বেশ দেরি হইয়া গেল। বিমল যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে। এত রাত্রে বাড়ী আসিয়াও কিন্তু বেচারা ঘুমাইতে পাইল না। আসিয়াই শুনিল হাসপাতালে শক্ত একটা রোগী আসিয়াছে। ভৃত্য যোগেন খবরটি দিল। বিমলকে তখনই আবার হাসপাতালে ছুটিতে হইল।

বাউরিদের একটি বউ আপিং খাইয়াছে।

অল্পবয়সী এই মেয়েটির মনে কি, এমন গভীর ধিক্কার হইল যে সে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে! বিমল যথারীতি সমস্ত ব্যবস্থাই করিল, গলার ভিতর দিয়া রবারের নল চালাইয়া ঔষধ দিয়া সমস্ত পেটটা বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া দিল, একটি ইনজেকশন দিল এবং গুপি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কফি কোথাও পাওয়া যাবে ?

—কফি ? আজ্ঞে, না।

—কারও বাড়ীতে নেই ? ঠিক ঠিক, পরেশ-দার কাছে আছে। এই জানকী, যা তো নিয়ে আয় চেয়ে আমার নাম করে।

জানকী চলিয়া গেল।

বিমল তখন বাউরি-বউয়ের আত্মীয়স্বজনকে (অনেকেই আসিয়াছিল) আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রথমে কেহই কিছু বলিতে চায় না। অনেক জিজ্ঞাসা করার পর একটি বৃদ্ধা চুপি চুপি বলিল যে, দুখীরাম অর্থাৎ ঐ মেয়েটির স্বামীই ইহার জন্য দায়ী। বিবাহ হইবার পর হইতে সে সুন্দরিকে অর্থাৎ ঐ বউটিকে কিছু তো কিনিয়া দেয়ই নাই, উপরন্তু উহার গহনাগুলি সব বিক্রয় করিয়া সেদিন জমিদারের খাজনা এবং কাবুলিওলার ধার শোধ করিয়াছে। বেচারি সুন্দরি লুকাইয়া লুকাইয়া সংসার-খরচের টাকা হইতে জমাইয়া দুইটি টাকা অতিকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিল, ইচ্ছা ছিল একটি রঙীন শাড়ী কিনিবে, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় দুখীরা তাহাও ছিনাইয়া লইয়া গিয়া তাড়ি-মদে সে টাকা দুইটি নিঃশেষ করিয়াছে। সুতরাং সুন্দরি আপিং না খাইয়া করিবে কি ? সত্যই তো, শাড়ী কেনার টাকা দিয়া তাড়ি কেনা ভয়ানক অন্যায় কার্য্য। বিমল সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং বলিল যে, কাল দুখীরামকে ডাকাইয়া সে উহার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করিবে।

জানকী কফি আনিয়া হাজির করিল। সুন্দরিকে খানিকটা কড়া কফি পান করাইয়া এবং তাহাকে জাগাইয়া রাখিবার আদেশ দিয়া বিমল বাসায় ফিরিয়া গেল। বাসায় গিয়া দেখিল পরেশ-দা বসিয়া আছেন। হাসিমুখে বলিলেন,—তোমার জ্বালায় তো অস্থির দেখছি, সখ ক'রে এক টিন কফি কিনে রেখেছিলাম, সব শেষ ক'রে দিলে তো ?

—না, আছে এখনো খানিকটা।

—এই নাও আজ সন্ধ্যার ডাকে এসেছে—সম্ভবত 'হার ম্যাজেষ্টিজ' চিঠি—ভাবলাম দিয়ে যাই।

বিমল দেখিল সত্যই মণিমালার চিঠি।

—সন্ধ্যাবেলা কোথায় গিছলে ? সারস্বত মন্দিরের ফেরত এসেছিলাম এক বার।

—একটা কলে গেছলাম, ওপারে।

—জমিয়েছ বল! উঠি এবার, ঘুমোও তুমি।

পরেশ-দা চলিয়া গেলে বিমল মণির চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। অন্যান্য নানা কথার পর মণি লিখিয়াছে, "তুমি অমন একটা বিচ্ছিরি কাগজে চিঠি লিখেছ কেন ? ভাল দেখে প্যাড কিনো একটা। সবাই আমাকে ঠাট্টা করছিল এমন!" বিমল একটু

হাসিল। নিশ্চিন্তও হইল, মণি ভালভাবেই পরীক্ষা দিয়াছে।

মানুষের কপাল যখন খোলে তখন সব দিকেই সব-রকম সুবিধা হয়। সতীশবাবুর ভাইয়ের শেষ পর্য্যন্ত কালাজ্বরই সাব্যস্ত হইল এবং সতীশবাবুর পরিচিত মহলে বিমলের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ও-অঞ্চল হইতে দুই-একটি দুরারোগ্য রোগীও আসিয়া হাজির হইল। বদিবাবু চাটুজ্যে-মহিমায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। হাসপাতালের ঔষধের কিন্তু কোন সুরাহা হইল না। নন্দী মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার পর হাসপাতাল-কমিটির একটা মিটিং হইয়াছিল কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নাই। তাঁহারা এ-সম্পর্কে যে দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি আশাপ্রদ হইলেও আসলে কিছুই নয়। একটি প্রস্তাব এই, হাসপাতাল-কমিটি মিউনিসিপাল কমিটিকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে ঔষধ বাবদ কিছু টাকা হাসপাতালে দেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই যে, সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করা হউক তিনি যেন সদর হাসপাতাল হইতে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ এই হাসপাতালে ঋণ-স্বরূপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মিউনিসিপালটিতে টাকা নাই, সুতরাং প্রথম প্রস্তাবটিতে যে অনুরোধ করা হইয়াছে তাহা পালন করিতে মিউনিসিপালিটি অসমর্থ। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হয়তো কার্য্যকরী হইতে পারিত কিন্তু বিমল শুনিল যে, বর্ত্তমানে যিনি সিভিল সার্জন তিনি নানা কারণে জগদীশবাবুর করায়ত্ত। প্রথমতঃ স্বজাতি, দ্বিতীয়তঃ এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন, তৃতীয়তঃ প্রায়ই তাঁহাকে মোটা টাকার 'কল' খাওয়াইয়া থাকেন। সুতরাং তিনি এমন কিছুই করিবেন না যাহা জগদীশবাবুর স্বার্থহানিকর। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বিমলের যেরূপ নামডাক শোনা যাইতেছে, তাহাতে জগদীশবাবু মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন বইকি। মুখে অবশ্য তিনি বিমলকে সহাস্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে যাহাতে সদর হাসপাতাল হইতে ঔষধ পাওয়া যায় তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন। পরেশ-দা বলিলেন, চেষ্টা উনি অবশ্যই করিবেন, কিন্তু তাহা অন্য প্রকার। পরেশ-দার কথাই ফলিল; কয়েক দিন পরে সিভিল সার্জন উত্তর দিলেন যে, ঋণ দিবার মত বাড়তি ঔষধ সদর হাসপাতাল অথবা তাঁহার নিজের ভাণ্ডারে নাই।

কোন দিকেই যখন আশার আলোক দেখা যাইতেছে না তখন অপ্রত্যাশিত রকম একটা সম্ভাবনার সূচনা লইয়া অমর আসিয়া হাজির। সেদিনের পর অমরের সহিত বিমলের আর দেখা হয় নাই। বিমল ভাবিতেছিল নিজেই এক দিন অমরের কাছে যাইবে। যেদিন দেখা হইয়াছিল তাহার পর দিন অমরের নিজেরই আসিবার কথা ছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া বিমল বলিল—এর নাম বুঝি কাল?

—আমি এখানে ছিলাম না ভাই, কলকাতা গেছলাম।

—কেন, অসুখের জন্যে?

—অনেক টাকা খরচ করেছি সেখানে, কিছু হয় নি, এখন তোমরা যা কর, কলকাতার উপর আর আমার বিশ্বাস নেই, অসুখের জন্যে যাই নি সেখানে।

—হঠাৎ আমাদের ওপর এত বেশী বিশ্বাস হবার মানে?

অমর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—কলকাতার ডাক্তারদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কি জান?

—কি?

—তোমরা খালি প্রাণে মার, আর কলকাতার ডাক্তাররা ধনেপ্রাণে মারেন। অনেক রকম ক'রে দেখেছি ভাই, কিছু হয় নি। আচ্ছা, অনেস্টলি বল তো ভাই সারবে কি না?

বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—সারবে না।

—কখনও না?

—আমার তো মনে হয় না। বড্ড দেরি হয়ে গেছে, গোড়ায় গোড়ায় চিকিৎসা করালেও বা কিছু আশা ছিল। তুই কিছু দিন লুকিয়ে রেখেছিলি, সেইটেই বড় অন্যায় হয়ে গেছে।

অমর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, বসিয়া বসিয়া সিগারেটের ধোঁয়ায় 'রিং' বানাইতে লাগিল। বিমলও চুপ করিয়া রহিল। যোগেন দুই পেয়ালা চা সম্মুখে নামাইয়া দিয়া গেল।

এক চুমুক চা পান করিয়া অমর বলিল—যাক গে, সে যা হবার হবে, এখন আমি যে জন্যে তোর কাছে এসেছি শোন।

—কি?

—আমরা 'বিসর্জ্জন' প্লে করছি, তোকে রঘুপতির পার্ট নিতে হবে। সেবার কলেজে তুই রঘুপতির পার্ট যা করেছিলি চমৎকার!

বিমল ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্লে করিতে হইবে!

—সে কি! কোথায় প্লে হবে!

—ওপারে আমাদের ক্লাবে, আমাদের বাঁধা ষ্টেজ আছে, বাবার এক কালে খুব সখ ছিল কি না—বাবাই ষ্টেজ করিয়ে দিয়েছিলেন।

—আমার কি ভাই রোজ রোজ রিহার্সাল দেওয়া পোষাবে? একটা হাসপাতালের ভার রয়েছে, কখন কি রুগী এসে পড়ে—

অমর কিন্তু দমিবার পাত্র নয়। সে বলিল—বেশ তোমার বাড়ীতেই রিহার্সাল দেব আমরা, এখানেই এসে জোটা যাবে সন্ধ্যের পর—ক-টাই বা পার্ট?

—ফিমেল পার্ট করবার লোক আছে? অপর্ণা কে হবে?

—চমৎকার লোক আছে।

বিমলের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। বলিল—এক কাজ যদি কর ভাই রাজি আছি।

—কি?

—এখানে থিয়েটার দেখবার উৎসাহ কি রকম সকলের?

—খুব।

—পয়সা খরচ ক'রেও দেখতে আসবে? যদি আমরা টিকিট করি?

—আসতে পারে, এক বার আমরা করেছিলাম, আড়াই-শ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল, টিকিট অবশ্য ঘরে ঘরে গিয়ে বিক্রী ক'রে আসতে হয়েছিল—

বিমল উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

—আমি রাজী আছি, এবারও যদি তাই কর। টাকাটা কিন্তু আমার হাসপাতালে দিতে হবে, কিছু ওষুধ নেই ভাই, মহাবিপদে পড়েছি, এদিকে মিউনিসিপালিটির টাকা নেই, ওদিকে ওষুধের দোকানে ধার জমে আছে—

অমরও সোৎসাহে রাজী হইয়া গেল।

বিমল বলিল—আচ্ছা আমিই তোর ওখানে যাব না হয়। আমার বাড়ীতে রিহার্সালের গুলতানি করা ঠিক নয়। ঠিক পাশের বাড়ীতেই একটা শক্ত টাইফয়েড রোগী আছে।

—কালই তাহলে এস, দিন-পনেরর মধ্যে নামাতে হবে বইখানা, আমিও কাল থেকে তাহলে টিকিট বিক্রি করতে লেগে যাই।

—বেশ।

অমর চলিয়া গেল, বিমল একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যদিও আজ অমর বিনুর কথাটা তোলে নাই, তবু বিনুর কথাটা তাহার বার-বার মনে হইতে লাগিল। অমর এ কি নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে!

—ডাক্তারবাবু?

—ভিতরে আসুন।

যাঁহার বাড়ীতে 'টাইফয়েড' তিনিই আসিলেন।

—ভূধরবাবু এসেছেন, চলুন আপনি একবার।

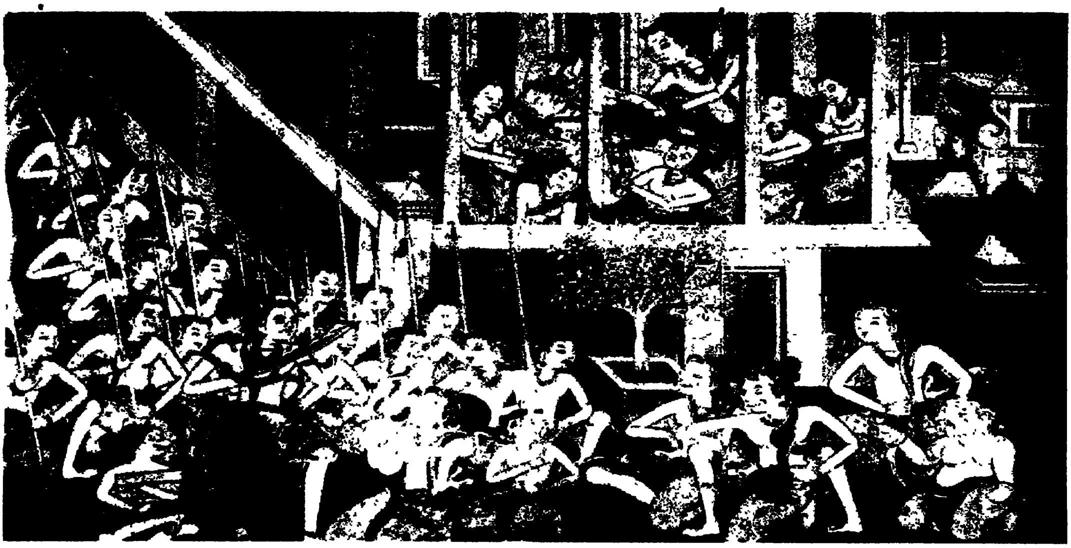
—চলুন, যাচ্ছি।

ভূধরবাবুর সহিত একযোগে বিমল টাইফয়েড রোগীটির চিকিৎসা করিতেছিল। টাইফয়েডের চিকিৎসা করিবার বিশেষ কিছু নাই। জল গ্লুকোজ আর ডিজিটালিস। তবু একটা চিকিৎসার ভড়ং করিতে হয়, ভূধরবাবু লম্বা লম্বা প্রেসক্রিপশন লেখেন, বিমল আপত্তি করে না। মাঝে মাঝে বিমলের ইচ্ছা করে সমস্ত ঔষধপত্র বন্ধ করিয়া দিতে; কিন্তু তাহা করিলে গৃহস্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। ডাক্তারিতে রোগীর অপেক্ষা রোগীর আত্মীয়-স্বজনের

বলিদ্বীপের নৃত্য



উপরে ও মধ্যে : বলিদ্বীপের কবিয়ার-নৃত্যের ভঙ্গী। নীচে : মারিয়োর নৃত্যশিক্ষাদান



বালির গ্রাম্য শিল্পীর আঁকা বালির ইতিহাসের চিত্র



বালির গ্রামের মেয়েরা নারিকেল পাতা ও বাঁশের সাহায্যে বিচিত্র ঝুড়ি প্রস্তুত করিতেছে

দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিতে হয়। পশার জমাইবার ইহাই মূলমন্ত্র।

ভূধরবাবু নাড়ীটা টিপিয়া বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বিমলকে বলিলেন—আপনি দেখুন তো এক বার পাল্‌সটা।

বিমলও দেখিল, সকালে যেমন দেখিয়া গিয়াছিল সেই রকমই আছে, বিশেষ কিছু ইতরবিশেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। জ্বর একটু বাড়িয়াছে, সন্ধ্যার দিকে রোজই বাড়ে, তাই একটু বেশী দ্রুত।

ভূধরবাবু বলিলেন—মকরধ্বজ দেওয়া যাক্, কি বলেন!

মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় মকরধ্বজের বিষয় কিছুই পড়িতে হয় নাই, মকরধ্বজ সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই জানে না। তবে মকরধ্বজের কথা বাল্যকাল হইতে সে শুনিয়াছে, নিশ্চয় ভাল ঔষধ হইবে। এই যে রোজ এত পেটেন্ট ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিতেছে, ইহাদের সম্বন্ধেই বা কি এমন বিশেষ জ্ঞান আছে তাহার। তবু লিখিতেছে, অনেক সময় ফলও হইতেছে!

—কি বলেন বিমলবাবু, মকরধ্বজটা দেওয়া যাক।

—বেশ তো, দিন।

—তাহলে দেখুন, খানিকটা আলোচাল জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিন, তার পর সকাল বেলা সেই জলটা ছেঁকে তার সঙ্গে মকরধ্বজটা বেশ ক'রে মেড়ে, অনেকক্ষণ ধরে মাড়বেন, মাড়াটাই আসল, বেশ ক'রে মেড়ে তার পর চাটিয়ে চাটিয়ে খাইয়ে দেবেন।

রোগীর পিতা শ্রীহর্ষবাবু শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কোন ভয়ের কারণ দেখছেন কি?

—টাইফয়েড রুগীর ভয়ের কারণ সর্ব্বদাই, আটঘাট বেঁধে রাখছি আমরা, কি বলেন বিমলবাবু?

—তা তো বটেই।

ভূধরবাবু উঠিয়া পড়িলেন এবং পকেট হইতে তাঁহার কলের ফর্দ্দ বাহির করিয়া বলিলেন—এখনও তিন জায়গায় বাকী, আর পেরে উঠছি না মশায়।

শ্রীহর্ষবাবু ভূধরবাবুর দক্ষিণা আনিয়া দিলেন। ঠিক পাশের বাড়ী বলিয়া বিমল কিছু লইতেছিল না। শ্রীহর্ষবাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিমল হাসপাতালের দিকে গেল। হাসপাতালে আরও দুই-তিনটি নূতন রোগী ভর্ত্তি হইয়াছে। পুরাতন সেই কালাজ্বর রোগীটি অনেক ভাল আছে,—তাহার পেটে কৃমি ছিল, 'হুক ওয়ার্ম'। কৃমির চিকিৎসা করাতে তাহার পেটের ব্যথাটা কমিয়াছে। বিমল রোজ রাত্রে হাসপাতালের রোগী-গুলিকে একবার দেখিয়া তবে শুইতে যায়। পরেশ-দা'র পরামর্শ অনুযায়ী সে গুপিবাবুর পাশা খেলাটা একেবারে বন্ধ করে নাই—চৌধুরী মহাশয়কে বেশী চটাইয়া ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। যতক্ষণ গুপিবাবু চৌধুরী মহাশয়ের বাসা হইতে না ফিরিয়া আসেন ততক্ষণ ডুলু, সেই অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার ছোকরাটি, ইনডোর রোগীদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার লইয়াছে। এ ব্যবস্থায় বিমল আপত্তি করে নাই, রোগীদের দেখিবার এক জন কেহ থাকলেই হইল। বিমল হাসপাতালে গিয়া দেখিল ডুলু বসিয়া পড়িতেছে। তাহাকে ড্রেসারি পরীক্ষা দিতে হইবে, তাহারই পড়া পড়িতেছে। এ সময়ে বিমল তাহার পড়ায় একটু সাহায্যও করে আজকাল, যে-জায়গাটা বুঝিতে পারে না, বুঝাইয়া দেয়। ডুলু এজন্য খুব কৃতজ্ঞ। বিমল আসিতেই ডুলু উঠিয়া দাঁড়াইল ও বিমলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া রোগী-গুলির আর এক বার খবর লইল। সেই বাউরি-বউটি ভাল হইয়াছে। বিমলকে দেখিয়া সে মাথায় ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া বসিল।

বিমল বলিল—তোমার আর এখানে থাকায় দরকার নেই, তুমি কাল বাড়ী চলে যাও। আবার যেন আপিং-টাপিং খেও না! দুখীয়াকে ডেকে আমি ধমকে দিয়েছি, সে তোমাকে কালই শাড়ী কিনে দেবে।

বধূটি ফিক করিয়া হাসিয়া লজ্জায় মাথা নত করিল। শাড়ী কিনিবার দামটা যে বিমলই দুখীয়াকে দিয়াছে সে কথাটা সে আর বলিল না। দুখীয়াকেও সে মানা করিয়া দিয়াছিল, কথাটা যেন প্রকাশ না পায়। এই গরিব বধূটির তুচ্ছ একটা শাড়ীর সখ মিটাইয়া সে মনে মনে বেশ একটা প্রসন্নতা অনুভব করিতেছিল।

অন্যান্য রোগীদের দেখিয়া বিমল যখন হাসপাতাল

হইতে নামিতেছে তখন বারান্দার অন্ধকার কোণ হইতে একটি দীর্ঘাকৃতি লোক ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া খুব ঝুঁকিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। পরিধানে সামান্য একটি কৌপীন, মাথায় রুক্ষ চুল, লোলচর্ম মুখে এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খুব লম্বা ও খুব রোগা। চক্ষু দুইটি কোটরগত। অন্ধকারে হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়।

—আমার অসুখ করেছে বাবু, আমায় ভরতি ক'রে নেন।

অতি কাতর দৃষ্টি মেলিয়া সে বিমলের দিকে চাহিল।

—কি হয়েছে তোমার?

—জ্বর হয়, বাবু রোজ।

—সকালে আস নি কেন! আচ্ছা এস দেখি।

বিমল ভিতরে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কালরোগে ধরিয়াছে—যক্ষা। ইহাকে হাসপাতালে ভরতি করিয়া কি হইবে! ভরতি করা অনুচিতও, অন্যান্য রোগীদের অনিষ্ট হইতে পারে। তাহাকে সে কথা বলিতে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, সে হাসপাতালের বিছানায় শুইতে চায় না, সে ঐ গাছতলাটায় শুইয়া থাকিবে, তাহাকে যেন দুই বেলা দুটি দুটি খাইতে দেওয়া হয়, আর একটু ওষুধ।

—খেতে পাই না বাবু, খেতে পাই না, খিদের জ্বালায় মরে গেলাম—। অভিভূত বিমল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। লোকটা না ধরিয়া কিছুতে ছাড়ে না। নিরুপায় বিমলকে শেষে ঐ ব্যবস্থাই করিতে হইল। আর কিছু না হোক লোকটা দুই বেলা খাইতে পাইবে তো। কিন্তু কত দিন ধরিয়া সে এমন ভাবে তাহাকে রাখিতে পারিবে, তাছাড়া কয় জনকেই বা সে এমন ভাবে আশ্রয় দিতে পারে! দেশসুদ্ধ সকলেই যে প্রায় ঐ রকম!…রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল ভাবিতে লাগিল যক্ষারোগের শাস্ত্রসম্মত যে-সব বিধান আছে স্যানাটোরিয়ম, ভাল খাবার, স্বাস্থ্যকর স্থান—আমাদের দেশের কয়টা যক্ষারোগী তদনুযায়ী চলিতে পারে। যে হতভাগা-দেশের অধিকাংশ লোক ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতেছে সেখানে—

—বিমল না কি?

টর্চ প্রদীপ্ত করিয়া পরেশ-দা আগাইয়া আসিলেন।

—তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—কেন বলুন তো?

—নন্দী মশায়ের ওখানে গেছলাম, তিনি বললেন যে, তোমাকে দিয়ে ইলেকট্রিসিটির উপকারিতা সম্বন্ধে একটা ছোট প্রবন্ধ লিখিয়ে তাঁকে দিয়ে আসতে।

—ইলেকট্রিসিটির সম্বন্ধে ছোট প্রবন্ধ! কেন?

—উনি বলছেন মিউনিসিপাল মিটিঙে যদি পাস হয় ওঁর প্রস্তাবটা, তাহলে ওঁরা গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে টাকা ধার চাইবেন।

—কিসের জন্যে?

—যাতে মিউনিসিপালিটিতে ইলেকট্রিসিটি হয়। গবর্ণমেণ্ট কিছু টাকা যদি দেয় ওঁরাও সকলে কিছু কিছু দেবেন!

—যে-দেশের লোকে খেতে পাচ্ছে না, হাসপাতালে ওষুধ নেই, সেখানে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কি হবে? হাসপাতালের ওষুধের বেলায় টাকা নেই অথচ—

—আহা, বড়লোকের খেয়াল তুমি বোঝ না।

বিমল কিছু বলিল না, নীরবে পথ চলিতে লাগিল। পরেশ-দাও অকারণে টর্চটা মাঝে মাঝে জ্বালিয়া এদিকে-ওদিকে আলো ফেলিতে লাগিলেন, আর কিছু বলিলেন না।

বিমল বলিল—প্রবন্ধ নিয়ে কি হবে?

—নন্দী মশায় বক্তৃতা করবেন।

—কোথায়?

—মিউনিসিপাল মিটিঙে! বুঝছ না, মিউনিসিপাল বোর্ডে পাস না হলে তো গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করা যাবে না। নন্দী মশায় তোমার প্রবন্ধটা নিয়ে বোর্ডের মেম্বারদের ইলেকট্রিসিটির উপকারিতাটা বোঝাতে চান।

একটু থামিয়া পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—ভবী কিন্তু ভোলবার নয়। মথুরবাবুর দলকে কায়দা করা শক্ত।

—মথুরবাবু কি ইলেকট্রিসিটির বিরোধী?

—ইলেকট্রিসিটির বিরোধী ঠিক নন, নন্দী মশায়ের বিরোধী। নন্দী মশায় যা করবেন মথুরবাবু এবং তাঁর দল ঠিক তার উল্টোটি করবেন।

—মথুরবাবু মানে অমরের বাবা তো?

—হ্যাঁ।

—অমরবাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে তো?

—এক সঙ্গে পড়তাম আমরা।

—মথুরবাবুর সঙ্গে বেশী মাখামাখি করলে নন্দীমশায় আবার না চটে যান।

বিমল বলিল—তা ব'লে তো অভদ্রতা করতে পারি না। তাছাড়া আমি ডাক্তার, কোন বিশেষ দলে আমার নাম না থাকাই ভাল। আমি—

—নমস্কার ডাক্তারবাবু, সঙ্গে উটি কে, ও পরেশবাবু, নমস্কার নমস্কার।

একচক্ষু লণ্ঠনটি তুলিয়া স্টেশন-মাস্টার মহাশয় পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। বর্ত্তুলাকার ভদ্রলোক, মোটা অথচ বেঁটে। বিমলকে বলিলেন—আর এক বার একটু কষ্ট করতে হবে ডাক্তারবাবু, আমার মেজো ছেলেটার গা-ময় ঘামরাত না কি যেন বেরিয়েছে, যদি একটু দেখতেন। আমাদের রেলের ডাক্তার জগুবাবুর যা ব্যবসা-সারা দেখা! একটি রোগ সারতে তো দেখলাম না জগুবাবুর হাতে এ পর্য্যন্ত। ভাগ্যে আপনি এসে পড়েছিলেন তাই আমার মেয়ের পেটের অসুখটা সারল।

—চলুন।

পরেশ-দা বলিলেন—তুমি রুগী দেখে এস তাহলে। আজ কালীবাড়ী থেকে একটু প্রসাদ দিয়ে গেছল, হরেন শুনছি রেঁধেছে বেশ ক'রে, তুমি আমার ওখানেই খেয়ো আজ রাত্তিরে। যোগেনকে মানা ক'রে দিয়েছি রাঁধতে।

বিমল হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন। বিমল স্টেশন-মাস্টারের অনুবর্ত্তী হইল। এ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিমলের কয়েকটি ব্যাপারি রুগী জুটিয়াছিল। স্টেশন-মাস্টার মহাশয় তো প্রায়ই ডাকিতেছেন। যাইতে যাইতে সমস্ত পথটাই স্টেশন-মাস্টার মহাশয় জগুবাবুর নিন্দা করিতে করিতে গেলেন। "মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখে লিখে চিকিৎসার ব্যাপার প্রায় ভুলেই গেছে আমাদের জগমোহন। সার্টিফিকেট নইলেও আবার আমাদের চলে না, জগুকে চটানও মুস্কিল। ইদিকে ভয়ানক কান-পাতলা লোক আবার।"

বিমল বলিল—আপনাদের জগুবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে হবে এক দিন।

—সেদিকে জগু ঠিক আছে, আলাপে মোহিত ক'রে দেবে একেবারে। কেউ এক বার গেলেই হ'ল চা রে জলখাবার রে, জগমোহন মিত্তিরের সেদিকে কোন ত্রুটিটি ধরবার উপায় নেই।

জগু-প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনমানসে বিমল বলিল—আপনি কত দিন থেকে আছেন এখানে?

—তা হয়ে গেল বছর-দুই মশাই, এসে থেকে ভুগছি মশায় ছেলেপিলে নিয়ে, এটা ওঠে তো ওটা পড়ে, আর আমার পরিবার তো রোগের একটি ডিপো বললেই হয়, কি যে ওর হয় নি তাই আমি ভাবি!

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন—কেবল ক্যান্সারটাই হ'তে বাকী আছে বোধ হয়, আর সব হয়ে গেছে! জগু তো টি. বি. ব'লে ডিক্লেয়ারই করেছে, ভূধরবাবু বললেন, ফ্যারিনজাইটিস্‌, জগদীশবাবু বললেন টনসিল খারাপ, আপনি যদি দেখতে চান দেখুন—হয়রান হয়ে উঠেছি মশায়, পারি না আর।

স্টেশন-মাস্টারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিমল ভাবিল বদিবাবুর খবরটা একবার লওয়া যাক। সতীশ-বাবুর ভাইয়ের চিকিৎসা সে করিতেছে বটে, কিন্তু এখনও এক পয়সা পায় নাই। তাঁহারাও দেন নাই, বিমলও চাহে নাই। এ সম্বন্ধে কি করা উচিত সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। বদিবাবু যাহা বলেন তাহাই করা যাইবে। থিয়েটারের কথাটাও বদিবাবুর কানে তোলা উচিত। মথুরবাবুদের সঙ্গে হৃদ্যতার জন্য নয়, হাসপাতালের ঔষধের জন্যই সে এ কার্য্য করিতে রাজী হইয়াছে, তাহা বদিবাবুকে অন্ততঃ জানাইয়া রাখা ভাল। জায়গাটায় যেরূপ দলাদলি তাহাতে বুঝিয়া-সুঝিয়া চলাই ভাল। বুঝিয়া চলিলে এ স্থানে বেশ রোজগার হইবে, বেশ বড়লোকের জায়গা। ভূধরবাবুর কথাগুলো তাহার কানে তখনও বাজিতেছিল, এখনও তিনটে বাকি, আর পারি না মশাই! এই অল্প কয়েক দিনে সে-ও তো এদিকে-ওদিকে দুই-চারিটা রুগী পাইয়াছে এবং সকলেই বিনাপয়সার নয়। হাসপাতালটাকে দাঁড় করাইয়া ফেলিতে পারিলে তাহার পশার জমাইতে দেরি হইবে না। ঔষধ কিছু অবিলম্বে চাই। বদিবাবুর বাড়ী গিয়া বিমল শুনিল যে বদিবাবু এখানে নাই। কংগ্রেসের কাজে বাহিরে গিয়াছেন, তিন-চার দিন পরে ফিরিবেন।

ক্রমশঃ

শিশুশিক্ষা

শ্রীমায়া সোম

শিশু সম্বন্ধে অধিকাংশ পিতামাতা সম্পূর্ণ উদাসীন, তাই তাঁহারা শিশুপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন মনে করেন না, আবার অনেকে এ-বিষয়ে কিছু জানেনও না। তাঁহারা মনে করেন মুক্ত বায়ু, উত্তম আহার ও পোষাকই শিশুদের পক্ষে যথেষ্ট। সময়ে সময়ে সামর্থ্যানুসারে তাঁহারা প্রচুর খেলনা কিনিয়া দেন, কখনও বা গল্প কিংবা ছড়া বলিয়া, আবার কখনও বা তাহাদের পাকামো কথায় সায় দিয়া আনন্দ দিতে চেষ্টা করেন, কখনও বা তাহার অনুসন্ধিৎসাকে দমন করিতে, আবার কখনও বা মিথ্যা স্তোক দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে শিশুদিগের মনোভাব কিরূপ হয়, তাহা বড় চিন্তা করেন না। অনেক সময় তাঁহারা মনে করেন যে, শিশু সব বুঝে না, আমি যাহা ভাল বুঝি তাহাই করিব; এবং নিজেদের ইচ্ছা নিজেদের কর্তৃত্ব ও শাসনের দ্বারা জোর করিয়া তাহাকে বশ করিতে প্রয়াস পান। শিশুর মধ্যে ত্রুটি বা অন্যায় দেখিলে তাঁহারা তাহাকে কখনও বা গালিমন্দ দেন, কখনও বা কড়া শাসন করেন, আবার কখনও বা কিছু বলেন না। এগুলিতে শিশু ক্ষুব্ধ হয়, তাহার মনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, সে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অন্য পথ লইতে চেষ্টা করে।

শিশুর জন্য মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যানুকূল আহার ও পোষাক ছাড়া আর একটি জিনিষের অত্যন্ত দরকার, তাহা হইতেছে মনের আনন্দ। শিশুর পারিপার্শ্বিক তাহার মনোমত হইলে সে তখন নিজকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। শিশু যাহার নিকট ভালবাসা ও সহানুভূতি পায়, তাহাকে সে ভালবাসে, বিশ্বাস করে এবং তাহার নিকট অকপটে মনোভাব ব্যক্ত করে। এই প্রত্যয়ের বীজ শিশু-মনে বপন করিতে পারিলে তাহার নিকট হইতে কাজ আদায় করা কিংবা তাহার দোষ সংশোধন করা কঠিন হয় না। শিশুরা তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করা বা সরাসরি আদেশ দেওয়া বড় পছন্দ করে না বটে, কিন্তু কৌশলে তাহাকে কোন আদেশ দেওয়া হইলে সে তখনই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা করে। সময়ে সময়ে শিশু কাজ করিতে ভালবাসে, আবার কখনও বা সে চুপ করিয়া থাকা পছন্দ করে। সেই সময় সে যাহা জানিতে চায় নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া লয়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। সে মাতৃক্রোড়ে খেলাধুলার মধ্য দিয়াই শিক্ষালাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভ্যাসগুলি ধীরে ধীরে গঠিত হয়। শৈশবই অভ্যাস-গঠনের উপযুক্ত সময়, কেন না এই বয়সে শিশু যাহা শিক্ষা করে তাহার ফল কিয়ৎপরিমাণে স্থায়ী হয়, এই জন্য শৈশবে উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। শিশুদের সাত-আট বৎসর পর্য্যন্ত বিচারবুদ্ধির পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না, কোন বিষয়ের কার্য্য-কারণ নির্ণয়ে তখনও তাহারা অক্ষম। এই জন্য এই বয়স পর্য্যন্ত তাহারা যাহাতে নিজেদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া বহির্জগতের সকল প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিশুরা যাহাতে নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া ও স্পর্শ করিয়া বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার আয়োজন করা আবশ্যক।

ডাঃ মারিয়া মন্তেসরি বলেন, "শিশু কর্ম্মী, শ্রমী এবং ভবিষ্যৎ জগতের স্রষ্টা, শিশু কালে নিজেকে পূর্ণমানবরূপে বুঝিতে পারিবে, তাই এখন হইতে সে নিজের মধ্যে নিজেই সেই মানুষটিকে গড়িতেছে। কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে পূর্ণবয়স্ক মানবের সকল প্রকার অভাব পূর্ণ করিতে, শিশুই কালে সেই সকল অভাব পূর্ণ করিবার একমাত্র উপায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ণবয়স্ক মানব না বুঝিয়া সেই শিশুকে অবহেলা করে এবং নিজের মূর্ত্তিতে তাহাকে গড়িতে চেষ্টা

করে।" ডাঃ মন্তেসরির মতে শিক্ষার সময়ে শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে; এই স্বাধীনতার ভিতর দিয়াই সে তাহার দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে করিতে শিখিবে। শিশুর শিক্ষা-গ্রহণ-ক্ষমতা পরিস্ফুট করাই শিক্ষার কাজ। এই জন্য তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা, আনন্দজনক পারিপার্শ্বিক, ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের অবাধ অবসর দিতে হইবে। শিশুর তিন বৎসরের মধ্যেই তাহার ভবিষ্যৎ স্বভাবের আভাস পাওয়া যায়। কাজেই জাতির, সমাজের, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য শিশুদের এই বয়সে উপযুক্তরূপে মানুষ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ অভিভাবকদিগের সহিত শিক্ষয়িত্রীর শিশুদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ-সুবিধা হয় না। অনেক সময় তাঁহারা শিক্ষয়িত্রী কিংবা স্কুলের সম্বন্ধে কিরূপ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করেন সেই সম্বন্ধে দুই-একটি কথা জানাইতেছি।

সুখময় ভবিষ্যতের আশা লইয়া অভিভাবকেরা প্রতি বৎসর অনেক শিশুকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কয়েক মাস পরেই অনেকের মুখে শুনিয়াছি, "আমার ছেলেমেয়েকে এতদূর পর্য্যন্ত শিখাইয়া স্কুলে ভর্ত্তি করি, এখন দেখি যাহা আমার নিকট শিখিয়াছিল, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে।" আবার কেহ বা বলেন, "আমার ছেলের একটু বুদ্ধি কম, পারে না বলিয়া শিক্ষয়িত্রী তাহার যত্ন লন না" ইত্যাদি। শিক্ষয়িত্রীর নিকট তো সব শিশুর স্থানই সমান। বুদ্ধিমান শিশু অপেক্ষা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু যদি কিছু শিখিতে পারে তাহাতেই যে শিক্ষয়িত্রীর কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা বোধ হয় অভিভাবকরা তত ভাবেন না। শিক্ষয়িত্রীর অক্ষমতা ছাড়া না-শিখিতে পারার অন্য কারণও অনেক সময় থাকে। এক বার একটি চার বছরের শিশু যুক্তাক্ষর শিখিয়া আমার নিকট আসে। কয়েক দিন পর দেখিলাম, তাহার শব্দ বিশ্লেষণ করিবার ধারণা এবং পেশী-সংযোজন (muscular co-ordination) হয় নাই বলিয়া সে লিখিতে পারে না, পাঠেও অমনোযোগী। কিছুদিনের জন্য পাঠ স্থগিত রাখিয়া তাহার যাহাতে পেশী-সংযোজন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। তাহার পর হইতেই সে আনন্দের সহিত সমস্ত কাজই সম্পন্ন করিত। এক দিন তাহার মাতা আমাকে লিখিয়া অনুরোধ করিলেন যে, শিশুটি যেন পাঠ না ভুলিয়া যায়। শিশুর কয়েকটি হাতের কাজ পাঠাইতে ও কারণ খুলিয়া লিখিতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু আর একটি শিশুর মাতাকে আমি সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই। শিশুর উন্নতি যখন দেখা গেল তখন তিনি বিরক্ত হইয়াই শিশুটিকে ছাড়াইয়া লইলেন। হাতের কাজের দ্বারা যে শিশু কোনরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে তাহা তাঁহার ধারণার অতীত; কোন কোন শিশুর নিকট হইতে যে দেরিতে সাড়া পাওয়া যায় তাহা তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন না।

অনেক সময় কোন কোন অভিভাবক শিশুকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার সময় বলেন, "আমাকে বলুন কত দূর শিখাইয়া দিতে হইবে; আপনাদের শিক্ষার ধারা যদি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দেন, তবে আমি বাড়ীতে তাহাকে প্রস্তুত করিয়া দিব; বুদ্ধি আছে, তাড়াতাড়ি শিখিতে পারিবে।" রবার কিংবা কাগজের থলির মধ্যে জোর করিয়া কোন জিনিষ রাখিতে গেলে যেরূপ ছিঁড়িয়া যায়, সেইরূপ শিশুকেও একসঙ্গে অনেক কিছু শিখাইয়া দিলে তাহারও ঐরূপ অবস্থা হয়, কখনও বা ভুলিয়া যায় আবার কখনও বা সব মিশাইয়া ফেলে; ফলে পাঠে বিরাগের সৃষ্টি হয়, ভীত হইয়া সে মিথ্যার আশ্রয় লয়, পরের দেখিয়া নকল করিতে প্রয়াস পায়, ফাঁকি দিতে কিংবা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে, গুরুজনের উপর অশ্রদ্ধা দেখায়। তজ্জন্য সে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হয়, এবং কাঁচা থাকার দরুন পরে সে বোকা বলিয়া পরিগণিত হয়।

শিশুর পাঠের অমনোযোগ সম্বন্ধে অভিভাবকদিগের নিকট জানাইতে উত্তরে দুই-এক জন বলিয়াছেন, "পাঠে মনোযোগ দেওয়াইতে পারি নাই বলিয়াই তো স্কুলে দিয়াছি।" শিশু খেলাধুলার মধ্য দিয়া স্কুলে শিক্ষা করে; কিন্তু যখন সে স্কুলে অমনোযোগী হয়, বাটীতে কোন ত্রুটি থাকে তজ্জন্য যে স্কুলে মন দিতে পারে না। এ-কথা আমরা সকলেই জানি যে অনিদ্রা, অজীর্ণ বা কোন বিষয়ে উত্তেজিত হইলে অথবা কোন কঠিন অসুখ হইবার

পূর্ব্বে কোন কাজে মন লাগে না; সেইরূপ কোন ব্যতিক্রম হইলে শিশুর অমনোযোগ ঘটে। আহার-নিদ্রা ছাড়া পারিপার্শ্বিকও শিশুর শিক্ষায় অন্তরায় হয়। এক বার একটি শিশু সমস্তক্ষণই সকলের নিকট তাহার বাড়ীর পারিবারিক অশান্তির গল্প করিত; এই জন্যই সে পাঠেও মন দিতে পারিত না। আর একটি শিশু সমস্তক্ষণই সিনেমার গল্প করিত। এক দিন সে তাহার বন্ধুদিগের নিকট গল্প করে যে সে তাহার মাতাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার সঙ্গীরা তাহাকে অবিশ্বাস করে এবং তাহার এই কথায় বিরক্ত ও দুঃখিত হয়। শিশুটি নিজেও তজ্জন্য দুঃখিত হয়, কিন্তু সে কি অন্যায় করিয়াছে তাহা ভাল বুঝে নাই। এরূপ একটি গল্প সংক্ষেপে বলিতে উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হয়।

শিশুদের সরাসরি আদেশ না দিয়া বুঝাইয়া বলিলে তাহাদের ত্রুটি কত সহজে সংশোধিত হয় সেই সম্বন্ধে কয়েকটি শিশুর কথা উল্লেখ করিতেছি। জ্যাঠতুত ও খুড়তুত দুই ভাই আমার নিকট পড়িত, তাহাদের বয়সের খুব বেশী তফাৎ ছিল না। এক দিন দেখি, ছোট ভাই স্কুলে আসিয়া তাহার চাকরকে কিছুতেই বাড়ী যাইতে দিবে না। বড় ভাই তাহাকে কোন রকমে প্রবোধ দিয়া চাকরকে বাড়ী যাইবার জন্য ইসারা করিল। কিছুক্ষণ পর চাকরটিকে দেখিতে না পাইয়া ছোট ভাই আবার কাঁদিয়া উঠিল। তখন বড় ভাই বলিল, "চাকর ফটকে বসিয়া আছে, কাঁদিও না।" শুনিয়া আমি উভয়কে বলিলাম "সে বাড়ী গিয়াছে, আবার তোমাদের লইতে আসিবে।" শোনা মাত্র ছোট ভাই দৌড়াইয়া ফটকে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখি বড় ভাই তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সহিত খেলিতেছে। কয়েক দিন পর ঐ শিশুটি বাড়ী যাইবার জন্য বাহানা আরম্ভ করিলে দেখি বড় ভাই তাহাকে বলিতেছে, "এখন খেলিয়া টিফিনের পর বাড়ী যাইব।"

দুই ভাইর মধ্যে এক জন ভাল জিনিষটি দেখিলেই আগে লইত, তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করিয়া তাহার নিজের প্রিয় খাবারটির উপর ভাগ বসাইত। ক্রমেই সে অন্য শিশুর উপর অধিক উপদ্রব করিতে লাগিল। এক দিন সে আর একটি শিশুর খাবার ছোঁ মারিয়া লইয়া এক কামড় দিয়া ফেলিয়া দিল। সে শিশুটির খাবার আর বিশেষ খাবার ছিল না, সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। অপরাধী শিশুটিকে আমি বলিলাম, "তুমি যে ওর খাবার ফেলে দিলে, ও কি খাবে, ওর যে খিদে পাবে?" শুনিয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; আমি আবার তাহাকে বলিলাম, "তোমার খাবার থেকে ওকে একটু খেতে দাও, দেবে কি?" সে আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার প্রিয় খাবার সন্দেশটি তাহার পাতে উঠাইয়া দিল।

সময়ে সময়ে কোন কোন শিশুর এক-এক দিকে এত আসক্তি হইয়া যায় যে সে আর অন্য কাজ করিতে চায় না। কিন্তু সেই সময় যদি তাহাকে বুঝান যায়, তখনই শোনে। একটি শিশু একেবারেই লিখিতে চাহিত না। এক দিন আমি তাহাকে ভাল করিয়া বলিলাম, "দেখ অমুক অমুক বন্ধুরা কত সুন্দর লিখতে পারে, তুমি কত পিছিয়ে আছ।" শুনিয়া সে বলিল, "কাল লিখব"। আমি তাহাকে কয় দিন উপরি উপরি ঐ একই কথা বলি; তাহাতে সে এক দিন বলিল, "বাড়ীতে লিখব"। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার প্রতিশ্রুতি মনে রাখিয়া পর দিন সে আমাকে জানাইল যে সে বাড়ীতে লিখিয়াছিল। আমি তাহার হাতটি লইয়া চুমি দিলাম, তাহা দেখিয়া অপর একটি শিশু আমাকে বলিল, সেও বাড়ীতে লিখে, আমি তাহাকেও একটি দিলাম। তাহার পর হইতে উক্ত শিশুটি রোজ খানিকটা স্কুলে লিখিত।

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া কোন কোন শিশু ক্লাসে থাকিতে চায় না, কেহ কেহ স্কুল, ক্লাস ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া লয়, আবার কেহ বা খেলনা ইত্যাদি লইয়া বাড়ী যাইবার জন্য ফটকে গিয়া বসে, আবার কেহ বা সুযোগ বুঝিয়া পলাইতে চেষ্টা করে। এক বার একটি শিশু ফটক গলিয়া পলাইতেছিল, ধরা পড়িয়া আমাকে প্রথম জিজ্ঞাসা করে, "বল আমাকে মারবে না, বকবে না"। অনুসন্ধানে জানিলাম বাটীতে গৃহশিক্ষক আছে, তাহাকে যে অত্যন্ত ভয় করে, ফলে সে কোন দিনই আসিতে চায় না। ঐ ঘটনার পর হইতে লক্ষ্য করি শিশুটি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ

স্কুলের কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। স্কুলের সম্বন্ধে ভীতিও শিশুশিক্ষায় একটি অন্তরায়। এই প্রসঙ্গে আর একটি শিশুর কথা বলি। এক বার একটি শিশু আমাকে জানায়, "আপনি কিছু জানেন না, মা আরও জানেন, স্কুলে কিছু শেখায় না, আমাকে ছাড়িয়ে নেবেন" ইত্যাদি। শিক্ষয়িত্রীর প্রতি অশ্রদ্ধা শিশুশিক্ষার বিশেষ অন্তরায়। অন্তরায়গুলির সমাধান হইতে পারে একটি মাত্র উপায়ে, শিক্ষয়িত্রী এবং অভিভাবকদিগের সহযোগিতায়। আমাদের দেশের ইহার বিশেষ অভাব। আমাদের শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না, যত দিন পর্য্যন্ত না উহা শিশুদের অভিভাবকদের আন্তরিক সহানুভূতি লাভ করিবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া শিশু-মনোভাব কিরূপে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়, পিতামাতাই সর্ব্বাগ্রে উহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন শিক্ষয়িত্রী তাহার মনোভাব-বিকাশের ধারা বুঝিবার সুযোগ ও অবকাশ পাইতে পারেন না। শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষাপ্রদানের ধারা ও মাতা-পিতার শিক্ষার মধ্যে যদি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে শিশুর শিক্ষাগ্রহণের কার্য্যে বিঘ্নের উৎপত্তি হয়। এই জন্য পাশ্চাত্য দেশে স্কুলে শিশুদের ভর্ত্তি করিবার সময় শিশুর পিতামাতার পারিপার্শ্বিক জীবনের সম্বন্ধে তথ্য জানিয়া লওয়া হয়। ভারতবর্ষের কোন কোন স্কুলেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। শিশু-মনের পূর্ণ বিকাশের সহায়—অভিভাবকদের ও শিক্ষয়িত্রীর মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান এবং আন্তরিক সহানুভূতি। এই যোগাযোগ সম্পূর্ণ হইলেই শিশুরা মানুষ হইয়া দেশের ও দশের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিতে পারে।

বিদেশী পাখী

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

গান গেয়ে উড়ে যায় বিদেশী পাখী
ঘর-ছাড়া মন-ভাঙা,—কি দুখে ডাকি'?
কি যে ভাবে গায় গান   সুর যেন অভিমান,—
ভাঙা শাখা ফেলে যায় অচেনা পাখী?
গান গেয়ে উড়ে যায় বিদেশী পাখী।

রূপ তার নাহি হেরি—রূপ কি আছে?
দূর হ'তে চলে যায়,—এল না কাছে।
কথা কিছু নাহি বলে   গান গেয়ে যায় চলে
দেখা মোরে দিল না যে—শুধাই পাছে;
দূর হ'তে চলে যায়,—এল না কাছে।

ধরণীর সুখদুখ রহিল নীচে—
উড়ে যায় দূরে যায় চাহে না পিছে;
যাহা কিছু মোরা পাই   সব হেথা ফেলে যাই,
তাই যাহা দিয়ে যাই—হয় না মিছে;
ধরণীর সুখদুখ রহিল নীচে।

কান পেতে চেয়ে রই নীল অকূলে,
সুর যেন কি সুবাস অচেনা ফুলে।
ভরে আছে মন মাঝে   স্মৃতিসম যেন বাজে-
গোপনে হৃদয় বলে 'যেও না ভুলে';
সুর যেন কি সুবাস অচেনা ফুলে।

চলে যায় বলে যায় বিদেশী পাখী,
একে একে সব যায় স্মৃতিটি রাখি'।
বড় ব্যথা ভালোবাসা   আরো দুখ যত আশা;
সুরে সুরে সেই ভাষা গাহিল পাখী;
গান গেয়ে উড়ে গেছে বিদেশী পাখী।

শিবায়ন

শ্রীজীবনময় রায়

ভূমিকা

সকাল হইতে শিবনাথ সেদিন বড়ই পাগলামি সুরু করিয়াছে। গরমটাও পড়িয়াছে খুব, তাহাতে পূর্ব্ব রাত্রে বাতাসও একেবারে ছিল না; আবার মশার উপদ্রবও যেন কলিকাতায় সেবার বাড়িয়াছিল। রাত্রে ঘুম হয় নাই; মেজাজটা অমনিতেই ছিল তিক্ত হইয়া। এমন সময় এক হ্যাটকোট-পরা আপিস-যাত্রী ভদ্রলোক আসিয়া শিবনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—এই, রাজেনবাবু বাড়ী আছেন?

শিবনাথের মেজাজটা ত একেই ভাল ছিল না; তাহার উপর ভদ্রলোকের 'এই' বলিবার ধরণ ও কণ্ঠস্বরে সে ভিতরে ভিতরে ফুটিতেছিল। ভদ্রলোকেরও বড় একটা দোষ দেওয়া যায় না। শিবনাথের ছিন্ন অপরিচ্ছন্ন চীরে, তাহার আভিজাত্য ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতই সঙ্গোপন থাকিত। শিবনাথ গোঁজ হইয়া বসিয়াছিল, কোন উত্তর দেয় নাই। উত্তর না পাইয়া ভদ্রলোক আরও এক পা আগাইয়া আসিয়া দ্বিতীয়বার "এই"—বলিতেই সে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; এবং পাড়া ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া তাড়া দিয়া বলিল—আই উইল থ্রো ইউ ইন্‌টু এ লায়ন্‌স্ ডেন্। গুলি ক'রে উড়িয়ে দেব। কোর্ট মার্শাল ক'রে—

চমকিয়া ভদ্রলোক পিছাইয়া গেলেন এবং শিবনাথের চোখমুখের ভাব দেখিয়া দ্রুত সে-স্থান হইতে চম্পট দিলেন।

শিবনাথ কিন্তু তখনই থামিল না। প্রায় আধ-ঘণ্টা বিপুল বিক্রমে চ্যাঁচাইয়া মুখে গ্যাঁজা তুলিয়া অবশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াই বোধ করি আমাদের ঘরটাতে আসিয়া বসিয়া বিড়ি ধরাইল। বোঝা গেল যে এখন বেশ খানিকক্ষণের জন্য সে শান্ত থাকিবে। এই ঘরটি ছিল তার আস্তানা। সে বলিত—এ আমার বার্থ, রিজার্ভ করা।

সে আজ প্রায় বছর বারো আগেকার কথা। কোন্ সূত্রে যে সে প্রথম আসিয়া এখানে মোতায়েন হইল তাহা ঠিক স্মরণ নাই। তবে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ রিজার্ভ-করা বার্থটিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া সে অনড় হইয়া আছে।

এরূপ কিন্তু সর্ব্বদা হয় না। সাধারণতঃ সে শান্ত হইয়া বসিয়া বিড়ি ফোঁকে অথবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়। তখন কে বলিবে যে সে পাগল। তখন কথাবার্ত্তাও যেমন সুসংগত তাহার আচরণও তেমনি ভদ্র ও সংযত।

শিবনাথ ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ভারি গোঁড়া। লড়াইয়ের সময় সে একটা মোটা মাহিনার চাকুরী লইয়া মেসোপোটেমিয়ায় গিয়াছিল। লড়াইয়ের পর ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন পরে তাহার মস্তিষ্কবিকার ঘটে—এবং চাকুরীটি খোয়ায়। লড়াইয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পোষাক ও মেডেলগুলি বহুদিন একটা পুঁটলীতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল—তা ছাড়া কতকগুলি কাগজপত্র সর্ব্বদাই তাহার পকেটে পকেটে ঘুরিত এবং মাঝে মাঝে পেন্সিল চাহিয়া লইয়া কি সব লিখিত। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত মিলিটারি সেক্রেটারীর নিকট একটা জরুরী পত্র পাঠাইতে হইবে তাহারই খসড়া করিতেছে। বুদ্ধি ও রসবোধ তাহার শান্ত অবস্থায় বেশ তীক্ষ্ণ থাকে। কোন ভদ্রমহিলাকে দেখিলে বিড়িটি নামাইয়া লয়। বসিয়া আছে এমন সময় অন্ধকারে কেহ সিঁড়ি নির্ণয় করিতে পারিতেছে না বুঝিতে পারিয়া ফস করিয়া দিয়াশলাই জ্বালাইয়া সাহায্য করে।

সব চেয়ে মজা লাগিত আমাদের, তাহার কথা শুনিতে। অতি বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সে কথাবার্ত্তা বলিত।

ইসলামের চিত্রকলা



আবু সৈদ, বিচারক-সদনে ১২২২ খ্রীষ্টাব্দ

বাগদাদ,
ত্রয়োদশ শতাব্দী
[পঞ্চাশঙ্ক দ্রষ্টব্য]



দর্শকপরিবৃত আবু সৈদ, ক্ষৌরকার বেশে ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দ



আবু সৈদ, দরিদ্র বৃদ্ধার বেশে　　　　১২২২ খ্রীষ্টাব্দ



• ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দ

বোধ করি তাহার প্রতি আমাদের আকর্ষণের ইহাও একটা কারণ হইবে।

একদিনকার ঘটনা বলি। গলির মধ্যে একটা লোক অতি কুৎসিত অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করিতেছিল। লোকটার উপর হঠাৎ চটিয়া গিয়া তাহার গলা টিপিয়া দেয়ালে ঠাসিয়া ধরিয়াছিলাম। শিবনাথ কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে ছাড়াইয়া লইবার উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—আরে, কর কি রাজেন, কর কি? বাতুল হয়েছ তুমি? নরহত্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছ, ছি ছি, এ কী উন্মত্ততা তোমার? ছাড়, ছাড়। রাগ ছুটিয়া গেল এবং বলা বাহুল্য লজ্জা পাইলাম।

স্বদেশীর উত্তেজনায় তখন দেশ থইথই করিতেছে। অনেক বড় বড় বক্তা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিয়াছেন। সেদিন মীর্জ্জাপুর পার্কে বিরাট্ সভায় বক্তৃতা চলিতেছে। মফঃস্বল হইতে লম্বশাটপটাবৃত জনৈক ভদ্রলোক রঙ্গমঞ্চের নায়কের ভঙ্গী ও সুরে বিলম্বিত লয়ে এক আবেগময়ী বক্তৃতা ফাঁদিয়াছেন। এক ঘণ্টার উপর হইতে চলিল কিন্তু তাঁহার বচনবিন্যাস আর নিরস্ত হইতে চায় না। বিরক্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি শিবনাথ সামনেই একটা রকের উপর উবু হইয়া তাহার দুই উন্নত জানুর উপর হস্ত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছে। বিড়িটি পর্য্যন্ত টানিতেছে না। বুঝিলাম কেহ তাহাকে চটাইয়াছে। কাছে গিয়া মোলায়েম সুরে বলিলাম—কি শিবুদা, ব্যাপার কি? এখানে এমন ক'রে—

হাঁড়ির ভিতর হইতে যেন বোমা ফাটিল। হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ব্যাপার? ব্যাপার তোমাদের স্বদেশীর পিণ্ডদান। যত সব নেড়াবুনেকে তোমরাই মাথায় ক'রে এনে মঞ্চে চড়িয়েছ। গাঁয়ে থাকলে এ-সব লোকের কি হ'ত? যাত্রার দলে গিয়ে নারদ সাজতে হ'ত। বলিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল। আমরা হাসিয়া উঠিলাম; শিবনাথ ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না।

প্রভাত বলিল—নাঃ, লোকটা সমঝদার বটে।

মোট কথা, আমরা ছিলাম শিবনাথের এ্যাডমায়ারার। তাহার রসজ্ঞান এবং তাহার অপূর্ব্ব বাক্‌পটুতা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ ত করিয়াছিলই; তাহা ছাড়া যুদ্ধফেরৎ বাঙালী আমাদের কাছে একটা পরম বিস্ময়ের বস্তু ছিল। শিবনাথ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল ও কল্পনার অন্ত ছিল না। কেন যে উন্মাদ হইল অনেক চেষ্টা করিয়াও সে কথা বাহির করিতে পারি নাই।

অবশেষে সাধ্যসাধনাতেও যাহা পাই নাই হঠাৎ এক দিন তাহা হাতে আসিল। আজ তাহা লইয়াই শিবনাথের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি। বস্তুটি একখানি ছোট খাতা—সংক্ষেপে লেখা শিবনাথের আত্মজীবনী। সম্ভবত একেবারে পাগল হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে লেখা। শিরোনামা দেওয়া আছে—শিবায়ন। ইহার পর তাহারই লেখা উদ্ধৃত করিয়া এ কাহিনী শেষ করিব।

১

১২৯৭ বঙ্গাব্দে, মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীতে আমার জন্ম। আমার পিতার বংশ ও পদমর্য্যাদার অহঙ্কার যেমন ছিল অপরিমিত ক্রোধও ছিল তেমনি প্রচণ্ড। সামান্য কারণেই তিনি তাঁহার সেই ক্রোধ আমাদের কয়টি ভাই-বোনের পৃষ্ঠে অজস্রধারে বর্ষণ করিতেন। এই কারণেই হোক বা গ্রহবৈগুণ্যেই হোক বাড়ী হইতে পলায়ন করা আমার একটা ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। এইরূপে এক বার পালাইয়া মনের সুখে বিনা টিকিটে রেল-ষ্টীমার দাবড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম; এবং এক দিন এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পাটনায় গাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বে ধরা পড়িয়া গেলাম।

কিন্তু আমার বোধ হয় অদৃষ্ট ছিল ভাল। বয়স তখন পনরো-ষোলো মাত্র; চেহারাটাও আমার নিজের কৃতিত্বে অর্জ্জন করিতে হয় নাই এবং গলায় একগাছি যজ্ঞোপবীত ছিল। বোধ করি এই সব মিশিয়া প্রবাসী বাঙালী রেলবাবুদের মনে করুণা ও কৌতূহলের সঞ্চার করিয়া থাকিবে; সুতরাং পুলিসের হাতে না দিয়া টিকেট কলেক্টরদের ঘরে লইয়া তাঁহারা আমাকে ভর্ৎসনা, উপদেশ এবং প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন।

অনুকূল মুখোপাধ্যায় বলিয়া এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়

ভদ্রলোক ঐ গাড়ীতেই পাটনায় নামিয়াছিলেন। কিছু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এবং কিছু বা আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন টি. টি. আই. এ-র ঘরে। তাঁহারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বোধ হয় উহারা আমাকে রেহাই দিল। ভদ্রলোক তখন বাড়ী চলিলেন আমাকে সঙ্গে লইয়া। বিদেশে একটি বাঙালীর ছেলে, যে কারণেই হউক, বিপদে পড়িয়াছে ইহা বোধ হয় তাঁহার মনে লাগিয়াছিল।

ভদ্রলোক আগ্রহের সহিত আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। নিজের নাম বলিলাম, কিন্তু পিতার নাম বা আর কিছু বলিলাম না। এই বোধ করি জীবনে প্রথম—আমার পৈত্রিক বংশমর্য্যাদাবোধে বাধিল। যাহা হউক, গন্তব্য স্থানের অভাবে কিংবা হাতে একটি কানাকড়িও ছিল না বলিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার বাড়ী গিয়া অতিথি হইলাম।

ভদ্রলোক অবস্থাপন্ন। বাড়ীটি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত এবং নিতান্ত ছোটও নয়। রহিয়া গেলাম—কিন্তু কেমন করিয়া তাহাই বলি। দু-এক দিন থাকিবার পর পরের ঘাড়ে অকারণে বসিয়া বসিয়া খাইতে আমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। গিয়া বিদায় চাহিলাম।

অনুকূলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যাবে?

না ভাবিয়াই বলিলাম—কাশী।

—বাড়ী যাবে না?

—না।

অনুকূলবাবু খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কি বুঝিলেন জানি না। তার পর হঠাৎ বলিলেন—পড়বে?

প্রশ্নটা আমার মাথায় ঠিক প্রবেশ করে নাই। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

তিনি শান্তস্বরে বলিলেন—যদি পড়াশুনা কর তবে তার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। আমার এখানে থেকেই পড়তে পার; কোন অসুবিধা হবে না।

আবার আমার মর্য্যাদায় বাধিল। বয়সোচিত নির্ব্বোধের মতই বলিলাম—আপনার গলগ্রহ হয়ে থাকব না। আমার ত টাকা নেই।

ভদ্রলোক এবার হাসিয়া ফেলিলেন। তারপর গম্ভীর হইয়া প্রসন্ন কণ্ঠে বলিলেন—না, গলগ্রহ নয়। তুমি খোকাকে পড়াবে আর আমি তোমাকে পড়াব। কোন্ ক্লাসে পড়?

আমি একটু গর্ব্বপূর্ণ বিনয়ের সুরেই বলিলাম—এন্ট্রান্স।

—বটে! বেশ। কাল থেকেই লেগে যাও। খাওয়া-দাওয়ার পর আজই আমার সঙ্গে এস—বইটই সব ঠিক ক'রে কিনে দেব। ওয়ার্ড-মেকিং খেলতে জান?

—জানি।

—কাল দু-বাকস নতুন কিনে দিয়েছি; যাও খোকাকে নিয়ে একটু খেলা কর গিয়ে।

ব্যস, রহিয়া গেলাম। কার্য্যবিনিময়ের নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারেই কখন এক সময় নিঃসংশয় হৃদয়ের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। তার পর চার বৎসর তাঁহার বাড়ীতে রহিয়াছি। নিজের সন্তানকে যেমন করিয়া মানুষ করে অনুকূলবাবু ও তাঁহার পত্নীর নিকট সেই অপত্যস্নেহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। অনাবিল বাহুল্যবর্জ্জিত স্নেহস্পর্শে মানুষের জীবনকে কেমন করিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয় তাহা আমি যেমন করিয়া জানিয়াছি তেমন করিয়া জানিবার সৌভাগ্য কয় জনের হইয়াছে জানি না। মন দিয়াই পড়াশুনা করিতেছিলাম। এমন সময় ঘাড়ে ভূত চাপিল।

এফ. এ. পাস করিয়া বি. এ. ক্লাসে পড়িতেছিলাম। এমন সময় একটি ছেলে আমাদের কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইল। ছেলেটি বয়সে আমার অপেক্ষা ছয়-সাত বৎসরের বড় এবং চালচলনে বয়সের অপেক্ষাও মুরুব্বি ধরণের।

পড়ায় ও খেলায় দুইটাতেই ভাল ছিলাম বলিয়া প্রফেসর ও ছাত্র দুই দলই আমাকে একটু বিশেষ খাতির করিতেন। দীনেশের সঙ্গে ভাব হইল কিন্তু অন্য ব্যাপারে। কলেজে প্রতি বৎসর পূজার ছুটির পূর্ব্বে ছাত্রেরা অভিনয় করিত। দীনেশ এই সব ব্যাপারে আশ্চর্য্য রকমের ওয়াকিফ-হাল ছিল। দানীবাবু হইতে সুরু করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত সকলেরই অভিনয়ের বিশেষত্ব তাহার নখাগ্রে ছিল। শুধু তাহাই নহে। ষ্টার, মিনার্ভা,

বেহুল প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চচালনার নবনব রহস্য সে নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপারের মত করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা সানন্দে দীনেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম। এই সূত্রে বহুদিন পরে আবার সিগারেট ধরিলাম। ক্রমে দীনেশের সহিত অধিকাংশ সময় যাপন করা আমার একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল। রোজ গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে সে তাহার জীবনের অত্যাশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা সকল আমার নিকট বিবৃত করিতে থাকিত আর আমি অবাক হইয়া শুনিতাম। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া তাহার কথা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতাম। এখন ভাবিলে আশ্চর্য্য হই যে সেই সকল অসম্ভব গল্প তখন বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিতাম।

তবে শিশুকাল হইতেই রহস্য সহ্য করিবার মত ধৈর্য্য শিক্ষা জীবনে হয় নাই। আমার চরিত্রের এই বিশেষত্ব দীনেশ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। কারণ লোক চরাইবার বিদ্যায় সে ছিল পাকা চালিয়াৎ।

ফোর্থ ইয়ার ক্লাস শেষ হইয়া আসিতেছে। পূজার ছুটিও ফুরাইল। কলেজে পড়ার চাপ পড়িয়াছে মন্দ নয়। পরীক্ষার হুমকি খাইয়া, কেঁদো-বাঘ-বাঘ-সব ছেলে একেবারে মেনি-বেরাল হইয়া পড়িয়াছে। হাজিরা বহিতে 'p'এরা পিপীলিকা শ্রেণীর মত নিরবচ্ছিন্ন। এ হেন অবস্থায় এক দিন সে কলেজে আসিল ডু-পীরিয়ড দেরি করিয়া—প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসরকে বলিল কোন আত্মীয়ের অসুখ, রাত জাগিতে হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে যথাসময়ে তাহার আস্তানায় উপস্থিত হইয়া জানিলাম পূর্ব্বদিন রাত্রিতেও নাকি সে বাড়ী ছিল না। আগের দিন সন্ধ্যাবেলাও তাহার সহিত বেড়াইয়াছি। কোথাও যাইবার কথা তো শুনি নাই। আত্মীয়ের অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করায় খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—সে অনেক ব্যাপার। কি ব্যাপার তাহা বলিল না—একটু যেন এড়াইয়া গেল। আমিও অভিমান করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহার পরদিন সে আসিলই না। বুঝিলাম ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুতর এবং তাহাই তাহার অনুপস্থিতির কারণ। মনটা খারাপ হইয়া রহিল—অভিমান-টভিমান উড়িয়া গেল এবং কি করিয়া দীনেশের একটু কাজে লাগিব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

নিত্য গঙ্গার ধারে বেড়াইবার সময় সে সর্ব্বদাই সামাজিক এবং লৌকিক সংস্কার লইয়া কথা উঠাইত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য, স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক, সতীত্ব প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা এবং মেরুদণ্ডহীন সমাজের দুর্ব্বলতার কথা অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচ প্রবলতার সহিত আলোচনা করিয়া যাইত এবং আমার স্বভাব-বিদ্রোহী তাজা মনটা সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা বৈপ্লবিক কিছু করিয়া ফেলিবার জন্য লড়াইয়ে মেড়ার মত বুকের ভিতরটায় শিং বাগাইতে থাকিত।

জমি প্রস্তুত হইয়াছিল মন্দ নয়। এমন সময় এক দিন দীনেশ সকাল বেলা আমার পড়িবার ঘরের জানালার নীচে দেখা দিল। দীনেশ আসিলে যে পৃথিবীর আর সমস্তকে দেউড়ির দরজায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে এ সম্বন্ধে আমার বা দীনেশের কাহারও সন্দেহ মাত্র ছিল না। পড়া ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলাম। দেখিলাম দীনেশ বেশ একটু উদ্বিগ্ন—একটু চকিত। তাহার মুখের উপর দুশ্চিন্তার ছায়া সুস্পষ্ট। আমি গেলে, কিছু ক্ষণ সে কোন কথা বলিল না; আমার কাঁধে একটা হাত রাখিয়া আমার চোখের দিকে গভীর ভাবে তাকাইয়া রহিল—যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে শক্তির সঞ্চয় কতখানি তাহারই পরিমাপ করিতেছে, বিপদে আমার মত বালকের উপর ভর দেওয়া চলে কিনা তাহাই বিবেচনা করিতেছে। নিজেকে অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট বলিয়া অনুভব করিলাম—এবং যে কোন রকম বিপদই হউক না কেন দীনেশকে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করিব মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইলাম—মানুষ যাচাই করিতে সে যে ভুল জায়গায় আসে নাই তাহাই যেন নীরবে স্পষ্ট ভঙ্গীতে তাহাকে জানাইয়া দিলাম।

দীনেশ বলিল—শিবু, বড় সমস্যায় পড়েছি। আমার মনে হয় আমাদের জীবনের আজ এক গুরুতর পরীক্ষার দিন। কিন্তু তোমার মত এক জন অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ

ছেলেমাহুষের উপর এত বড় একটা দায়িত্ব চাপাতে আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা অনুভব—

আমি আর বলিতে দিলাম না। বলিলাম—দীনুদা ব্যাপারটা যাই হোক—তোমার সমস্ত বিপদের মধ্যে তোমার দক্ষিণ হস্তের মত লড়াই করবার জন্যে আমি মনকে প্রস্তুত করেছি, অ্যাণ্ড ইউ উইল নট ফাইণ্ড মি ওয়ান্টিং। প্রশংসায় এবং কৃতজ্ঞতায় দীনেশের চোখ যেন আমাকে বারংবার অভিনন্দিত করিতে লাগিল। মনে মনে বেশ একটু গর্ব্ব ও লজ্জা অনুভব করিলাম। দীনেশ আমার দুই কাঁধ ধরিয়া মিনিট খানেক দেখিয়া একটু যাচাই করিবার ভঙ্গীতে বলিল—হ্যাঁ, পারবে তুমি। চল, গঙ্গার ধারে ঐ পাথরটায় গিয়ে বসা যাক। অনেক কথা বলবার আছে, অল্প সময়ে হবে না। বলিলাম—চল।

২

দীনেশ বলিতে লাগিল—যশোর জেলার গোলগাঁ গ্রামে নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ যেমন সদাশয় ও নিষ্ঠাবান তেমনি তেজস্বী। পাড়ার মধ্যে নিতাইচরণের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল কিন্তু ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান। পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মণী ও কয়েকটি মেনি বিড়াল কু-পোষ্য ব্যতীত আর কেহই ছিল না। পাড়ার প্রান্তদেশে এক ঘর মুসলমান, তাহারাও আগন্তুক মাত্র। পরিবারে তিনটি মাত্র প্রাণী—আছের, তাহার বৃদ্ধামাতা ও মাতৃহীনা কন্যা। আছেরের মায়ের অধিকাংশ কাজই ঐ নিতাইচরণের বাড়ীতে; ঝাড়াই-বাছাই, গোয়াল-উঠান নিকানো প্রভৃতি। মেয়েটির বয়স বছর তিনেক। অমন ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে ভদ্রলোকের ঘরেও মেলা দুষ্কর। শিশুকাল হইতেই দুলালী তার ঠাকুমার আঁচল ধরিয়া নিতাই-চরণের বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া আপন মনে খেলাধূলা করে। বড় শান্ত মেয়েটি। দেখিয়া দেখিয়া নিতাইয়ের পত্নীর কেমন মায়া বসিয়া গিয়াছে। দুলালীও তাহাকে দেখিলে বড় খুশী হয়। দিন চলিতেছিল ভালই।

এমন সময় এক গ্রীষ্মকালে হঠাৎ ঐটুকু গ্রামে কলেরার মড়ক দেখা দিল। শূন্যপ্রায় পাড়া একেবারেই শূন্য হইয়া আসিল। আছেরের বৃদ্ধা মাতা দুই দিন ভেদবমি করিয়া চক্ষু বুজিল। যে পারিল পালাইয়া বাঁচিল। নিতাইচরণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাধ্যমত সাহায্য করিতে লাগিলেন। শেষে এক দিন শেষ রাত্রে অত্যন্ত পরিশ্রমে এবং অত্যাচারে তিনিও পড়িলেন। নিতাইয়ের পত্নী চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। গ্রামে একটা ডাক্তার কি বৈদ্য নাই, একলা স্ত্রীলোক কেমন করিয়া যে কি করিবেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। এমন সময় আছের আসিল—তাহার কন্যাকে সকাল বেলা গিন্নিমার কাছে রাখিয়া কাজে যাইবে; নহিলে উপায়ও ছিল না; বাড়ীতে কাহার কাছেই বা রাখিয়া যায়।

নিতাই-গিন্নি একেবারে আছড়াইয়া পড়িলেন—আছের, আমারে বাঁচা বাবা। এই ভোরবেলায় হ'ল, এখন আর কথা কইতি পারে না। তুই একবার ওলপুরীর কবরেজ মশায়রে ডেক্যে আন্‌ বাবা।

আছেরকে আর বলিতে হইল না। তার পর পাঁচ-ছয় দিন ধরিয়া সে যাহা করিল তাহার তুলনা নাই। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ-মুসলমানে ভেদ রহিল না। যমের সঙ্গে যুঝিয়া মুসলমানের সন্তান নিতাইচরণকে ছিনাইয়া আনিল; কিন্তু নিজেকে রাখিতে পারিল না। তিন দিন ছটফট করিয়া সে চোখ বুজিল। মৃত্যুকালে দুলালীর দিকে চাহিয়া উহার চোখ হইতে অসহায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তখন তাহার বাক্‌রোধ হইয়াছে। নিতাই-চরণ কষ্টে তাহার নিকট আসিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। মনের ভাব বুঝিয়া আছেরের হাত ধরিয়া বলিলেন—দুলালীর জন্য ভাবনা ক'রো না বাবা, দুলালী আজ থেকে আমার মেয়ে।

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আছের চোখ বুজিল।

তাহার পর যতদিন নিতাইচরণ বাঁচিয়াছিলেন মেয়ে-টিকে তিনি কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

কিন্তু স্বজনগণের অত্যাচারে তিনি আর বেশী দিন গ্রামে বাস করিতে পারেন নাই। যোৎজমি বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু নগদ সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহাই লইয়া অপরিচিত স্থানে বাস করিবার উদ্দেশ্যে বাঁকীপুরে আসিয়া ছোট একটি বাটী ও সামান্য জমি ক্রয় করেন। সে আজ প্রায় বার-তের বৎসরের কথা। প্রায় তিন বৎসর হয় নিতাইচরণ ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। নিতাইয়ের পত্নী কন্যাটিকে লইয়া কষ্টে দিনাতিপাত করেন। এখন সমস্যা হইয়াছে কন্যাটিকে লইয়া। ষোল বৎসর বয়স অবধি ব্রাহ্মণের কন্যা অবিবাহিত আছে ইহা বরং বাংলার বাহিরে একরকম করিয়া কাটানো যায়, কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে দুলালী যথার্থই সুন্দরী এবং পাড়াটাও ভাল নয়। অর্থাৎ—বলিয়া সে চুপ করিয়া গেল। তারপর বলিল—অথচ মেয়েটিকে হিন্দুর ঘরে বিবাহ দেওয়াও অসম্ভব এবং মুসলমানের ঘরেও বিবাহ সে কিছুতেই করিবে না। বলিয়া সে আবার চুপ করিয়া রহিল।

ইঙ্গিতটা বুঝিলাম। ইতিমধ্যে সব শুব্ধ হইয়া আসিয়াছিল। বিস্তীর্ণ ভাগীরথীর অদৃশ্যবিস্তার বহুদূর হইতে হিন্দুস্থানী মাঝির গান সন্ধ্যার ছায়ার অন্তরালে স্বপ্নের তুলি বুলাইতেছিল। ধীরে ধীরে বলিলাম—তুমি যদি বল তবে আমি বিয়ে করতে পারি। কৃতকার্য্য হওয়ার আনন্দেই বোধ করি একটু জোরের সঙ্গেই হাসিয়া দীনেশ বলিল—পাগলা। সে-কথা থাক, বরং চল্ এক দিন তোকে সেখানে নিয়ে যাই, কি বলিস ?

দীনেশ আমার যৌবনোচিত ঔদার্য্যের দুর্ব্বলতার সন্ধান পাইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু চট করিয়া সে আমাকে দুলালীদের বাড়ী লইয়া গেল না। ইহার পর আরও দু-তিন দিন সে কলেজ কামাই করিল। প্রথমে সে বলিয়াছিল দুলালীর মায়ের অসুখ ; জিজ্ঞাসা করাতে এবার বলিল,—অসুখ মায়ের নয় দুলালীর। তারপর একটু উদাসীন ভাবেই যেন বলিল—তুই ছেলে-মানুষ, গিয়েই বা কি করবি। তা ছাড়া, তোর পড়া-শুনোর ক্ষতি—

এবার আমি জিদ করিলাম—ছাই ক্ষতি হবে। কিচ্ছু হবে না।

অদৃষ্ট !—গেলাম দুলালীদের বাড়ী। বাঁকীপুরের প্রান্তে গঙ্গার ধারে সেটা প্রায় একটা পল্লীগ্রামের মত। বাড়ী-ঘরদোর মন্দ নয়, অন্তত কষ্টে চলিবার মত অভাবের চিহ্ন বড় একটা দেখিলাম না। কিন্তু তখন এ-সব তত আমার চোখে পড়ে নাই। গল্পের প্রধান নায়িকা যে, তাহাকেই দেখিবার জন্য আমার সমস্ত মন তখন চকিত হইয়া আছে। ঘরের ভিতর দুলালীর মাকে গিয়া প্রণাম করিলাম। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছে এবং এই বয়সেও তাঁহার যৌবনের নিঃসংশয় রূপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই।

দেখিলাম আমার আগমনের জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। বলিলেন, এই যে বাবা, এস, বস।

সেদিন তিনি অনেক কথা বলিয়াছিলেন, মাথামুণ্ড তাহার কিছুই প্রায় আমার মনে নাই।

দুলালীকে দেখিয়াছিলাম। সুন্দরী বলা যায় বটে। সদ্য কঠিন পীড়াজনিত রক্তশূন্যতার সহিত একটা উদ্ধত বিদ্রোহীর ভঙ্গী মিশিয়া সেই সৌন্দর্য্য যেন আমার নিকটে আরও মনোরম অথচ অনধিগম্য বলিয়া প্রতিভাত হইল।

দুলালীর মা দুলালীকে বলিলেন—দীনেশের বন্ধু শিবনাথ। প্রণাম কর্।

দুলালী প্রণাম করিল না, একটা নমস্কারও করিল না, শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুলালীর ভাবগতিক দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিলাম। বলিলাম— থাক্ আর প্রণাম করতে হবে না।

দুলালী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া আমার দিকে চাহিয়া একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল। এই প্রথম হাসিতেই প্রায় মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

পরোপকার-প্রবৃত্তি উদ্দাম হইয়া উঠিল। কিছু দিন যাতায়াত করিতে করিতে এইটুকু বুঝিলাম যে এ-বাড়ীতে আর যেই যাক দীনেশ যাওয়া বন্ধ করিয়াছে, এবং আমার আসা কায়েম হইয়াছে।

পরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। কলেজের

কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। মাস দুই যে কি একটা নেশার মধ্য দিয়া কাটিল তা নিজেই এখন মনে করিতে পারি না। দুলালীদের বৈষয়িক কি একটা ব্যাপারে মনে নাই এক দিন দীনেশের সন্ধান লইতে গিয়া দেখি যে সে তল্পী গুটাইয়া উধাও হইয়াছে। মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। দুলালীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—দীনুদা কোথায়?

সে উদ্ধত ভাবে মাথা ঝাঁকিয়া উত্তর দিল—আমি তার কি জানি?

তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করাতে কেমন একটু সুর টানিয়া বলিলেন—কি জানি বাপু! পাড়ার লোকে নাকি তোমার এখানে যাতায়াত নিয়ে কি সব কথা বলেছে—তাই সে বলে যে আমি তোমায় আসতে যেন নিষেধ করে দিই। তা বাবা তুমি আমার পেটের ছেলের মত। কে হতভাগা কি বলেছে তাই কি আমি তোমায় ছাড়তে পারি? এই নিয়ে রাগারাগি ক'রে সে চলে গেছে। আমি অসহায় মেয়ে-মানুষ; তোমরা সকলেই আমাকে ছাড়লে আমি কোথায় ভেসে যাই বল ত?—বলিয়া চোখে আঁচল দিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

দীনেশের উপর মনে মনে চটিয়া গেলাম। কে কোথায় কি বলিয়াছে তাহাই লইয়া এই উৎপাত করিবার মানে কি? কাপুরুষ, এইটুকু মনের বল নাই, আবার লম্বা-চৌড়া কথা বলা আছে। বলিলাম—মা, আপনার মনে যদি 'কিন্তু' না থাকে তবে আমি কখনই আপনাদের ছেড়ে যাব না। তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন,—বাবা, তোমার ঋণ শুধতে পারব না, তুমি আর-জন্মে আমার বাবা ছিলে নিশ্চয়।

তখন বুঝি নাই, কিন্তু এখন স্পষ্ট বুঝিয়াছি, আমাকে ফাঁসাইবার জন্য এ-সব আগাগোড়া একটা সুনিয়ন্ত্রিত অভিনয় মাত্র। কিন্তু আমি মনে মনে কোমর বাঁধিয়াছিলাম।

অভিনয় কেবল এক জন মাত্র করিতেছিল না। সে দুলালী। আমার আগমনে সে যে কিছুমাত্র খুশী হয় নাই, প্রথম হইতেই পদে পদে তাহা আমাকে জানাইয়া দিতে সে ত্রুটি করিত না। আমি যথাসাধ্য তাহার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিতাম এবং সে যথাসাধ্য আমাকে আঘাত করিতে ছাড়িত না; এই ছিল দু-জনের সম্পর্ক। তাহার মাও কন্যাকে আমার প্রতি অনুকূল করিতে যথেষ্ট আয়াস করিতেন; এবং মাঝে মাঝে দীনেশ ও তাহার মা যে এই ব্যাপার লইয়াই গোপনে তাহাকে বুঝাইতেছেন, এমন কি পীড়াপীড়ি করিতেছেন, তাহার আভাসও পাইতাম। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর যেন ইদানীং তাহাকে একটু নরম দেখিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম এবং আমার দুরাশা পুষ্পিত হইতেছিল।

এদিকে আমার ভাবগতিক দেখিয়া তলে তলে সন্ধান লইয়া অনুকূলবাবু ব্যাপারটা কতকটা আঁচ করিয়াছিলেন। উপদেশ-অনুদেশ, অনুনয়-বিনয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া আমাকে যেন আগলাইয়া ধরিলেন। তাহার উপর দেখি, দীনেশটা উপযাচক হইয়া দুলালীদের একটা পরিচয় দিয়া একখানি গোপন লিপি অনুকূলবাবুকে লিখিয়াছে। আমাকে যে-ইতিহাস সে বলিয়াছিল দুলালীদের সম্বন্ধে সেটা না কি একটা বানানো গল্প। লিখিয়াছে: দুলালীর মা তাহারই দূর আত্মীয়া—কর্ম্মদোষে সমাজে তাঁহার স্থান নাই ইত্যাদি। কাহার কর্ম্মদোষে, মাত্র ঐ কথাটাই দীনেশ চাপিয়া গিয়াছিল। দীনেশের কথার এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি নাই; কারণ বঁড়শি তখন গলায় বিঁধিয়াছে।

অনুকূলবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার পত্নী আমাকে অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। অনুকূলবাবুর সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে তর্ক করিয়া নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাইতে লাগিলাম। এবং এক দিন আমার সমস্ত ভবিষ্যতের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া আমায় ক্ষুদ্র জগতের একমাত্র বন্ধু ও আশ্রয় অনুকূলবাবুর গৃহ ত্যাগ করিলাম। পরীক্ষা আর দেওয়া হইল না।

শাশুড়ীর অর্থের সত্যই বিশেষ অভাব ছিল না। পরদিনই কাশী রওনা হইলাম। বিবাহ সেইখানেই হইল। অবশ্য সহজে যে হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

যাহা হউক, বিবাহের পর এক বৎসর বেশ শান্তিতে গেল। দুলালীকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি নাই বটে, তথাপি আমার প্রেমের বন্যায় তাহার চিত্ত যে বিগলিত

হইতে সুরু করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমার কথা আর বলিবার নয়; দুলালীকে আমার নবার্জ্জিত যৌবনের সমস্ত শক্তি দিয়া ভালবাসিয়াছিলাম। তাহার সামান্য আনুকূল্য লাভ করিবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না।

বলিয়াছি, এক পক্ষে আমার কপালটা ভালই ছিল। এক বৎসর না যাইতেই পোস্টাপিসে একটা চাকুরী জুটিয়া গেল। দিন চলিতেছিল মন্দ নয়। শাশুড়ীর অর্থ এবং আমার উপার্জ্জনে মিলিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু দুলালীর শরীরটা বিবাহের পূর্ব্বে সেই যে ভাঙিয়াছিল বহু যত্নেও তাহা যেন আর জোড়া লাগিতেছিল না। তাই বৈকালে নিয়ম করিয়া দুলালীকে লইয়া বেড়াইতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

একদিন অসি হইতে অল্প দূরে তুলসীঘাটের ও পারে রামনগরের বালুচরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। দুলালীর একখানি সুন্দর ছোট হাত তাহার নিরাপত্তিতে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছি। প্রাণে অপরূপ তৃপ্তি। অকস্মাৎ দুলালীর একটা অস্ফুট চীৎকারে চমকিয়া তাহার দিকে চাহিলাম। বিস্ফারিত চোখে সে একদৃষ্টে নদীর মধ্যে চাহিয়া আছে। সেখানে এমন অভিনব কিছুই দেখিতে পাইলাম না। একখানি খেয়ানৌকা—তাহাতে দুইটি মাত্র আরোহী। এক জন মাঝি এবং অপর জন একটি ভদ্রলোক। দুলালীকে একটু ঠেলা দিয়া বলিলাম—কি? কি হয়েছে?

চমক ভাঙিয়া দুলালী অন্য দিকে চাহিল। বলিল—কিছু না। বাড়ী চল, শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না।

ইহার পর দুলালী যেন আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। রাত্রে মাঝে মাঝে উঠিয়া এ-ঘর ও-ঘর ছাতে বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইত। বলিত—ঘুম আসছে না। তুমি গিয়ে শোও। কাল আবার তোমার আপিস করতে হবে।

এক দিন রাত্রে জাগিয়া দেখি দুলালী বিছানায় নাই। চুপ করিয়া পড়িয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণ পরে দুলালী আসিল। হঠাৎ একটা চমৎকার গন্ধে ঘরটা যেন ভরিয়া গেল। গন্ধটা কাঁঠালীচাঁপার। আমাদের পাশের পোড়ো বাড়ীটার বাগানে একটা গ[...] অজস্র ফুটিয়া ছিল। গন্ধটা বোধ করি বাতাসে ব[...] আনিতেছে। দেখিতে আমার ভুল হয় নাই—মা[...] খোঁপা হইতে একটা কিছু খুলিয়া লইয়া সে নিঃশব্দে তা[...] কাপড়ের বাক্সে নিয়া রাখিল। এখন জানি সেটা [...] গোছা চাঁপাফুল। কিন্তু তখন আমি এ-কথা চিন্তাও ক[...] নাই। স্ত্রীলোকের প্রসাধনের কোন দ্রব্য হইবে [...] ভাবিয়াছিলাম। হায়রে প্রেম, তুমিই এমনি অন্ধ ক[...] রাখ!

তার পর এক দিন, মেঝের উপর কুড়াইয়া পাওয়া [...] টুকরা ছিন্ন পত্রখণ্ড আমার স্বরচিত তাসের প্রা[...] অকস্মাৎ চূর্ণ চূর্ণ করিয়া দিল। দুলালী কোন কথ[...] অস্বীকার করিল না। দুলালীর মাকে বলিলাম—জে[...] শুনে আমার এমন সর্ব্বনাশ কেন করলেন?

উত্তর শুনিলাম—কি ন্যাকা বাছা তুমি। আহা কি না জানতে তুমি, শুনি? তখন কি আর জানগ[...] কিছু ছিল? এখন আমারই ঘাড়ে বসে খেয়ে[...] পায়ের উপর পা দিয়ে বড় যে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর অপেক্ষা করিলাম না। সোজা বাড়ী হই[...] বাহির হইয়া গেলাম। আশ্চর্য্য! দুলালীর জন্য তখ[...] বুক ফাটিতেছিল এবং নিজের উপর ক্রোধে [...] নিজকে দংশন করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। মনে হইতেছি[...] ছুট দিয়া এক দিকে কোথাও চলিয়া যাই। ঘুরি[...] ঘুরিতে দশাশ্বমেধ ঘাটে আপিসের একটি বন্ধুর সহি[...] দেখা হইল। সেদিন রবিবার। সে বলিল—চলল[...] ভাই সাগর-পার। আর ফিরি কি না-ফিরি।

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তার মানে?

—মানে, মেসোপটেমিয়ায় যাচ্ছি।

মনে পড়িয়া গেল কিছুদিন হইতেই কনসক্রিপ[...] চলিতেছিল। মেসোপটেমিয়া! মেসোপটেমিয়া! হঠা[...] যেন একটা পথের সন্ধান মিলিল। মেসোপটেমিয়া!

মাথার মধ্যে কথাটা জমিয়া বসিল। দিন দুই গে[...] জোগাড়যন্ত্রে। তার পর একদিন একেবারে বম্বে গি[...] জাহাজে চড়িয়া বসিলাম। সম্মুখে উদার সিন্ধু, উ[...] অনন্ত আকাশ, চতুর্দ্দিকে বিরাট্ ব্যাপ্তি। দুলালীর [...]

মন কেমন করিলে নিজেকে উপহাস করিয়া বলিতাম— কিসের দুলালী? দুলালী আমার কে? মুক্তি, মুক্তি, অবাধ মুক্তি। আবার নূতন জীবন, নূতন পরিবেশ, নূতন বন্ধুবান্ধব, নূতন পরিচয়।

মন আমার যেন দুইটি পক্ষ বিস্তার করিয়া বাধাবিহীন অজানার সন্ধানে উড়িয়া চলিল।

৩

মেসোপোটেমিয়ার রুটিন-বাঁধা জীবন দুলালীর চিন্তার পক্ষে আমার রক্ষাকবচের মত হইয়াছিল। মন্দ কিছু বোধ হইতেছিল না—অন্তত মন্দ বোধ হইতে দিতাম না। খুটিনাটি করিতে করিতেই আপিসের বেলা হইয়া যাইত। আটটা হইতে দশটা আপিস আবার বারটা হইতে চারটা।

বৈকালে কাজকর্ম সারিয়া কখন কখন শহরের দিকে ঘুরিতে যাইতাম—অকারণে এ-দোকানে চকোলেট ওদোকানে সিগারেট কিনিয়া সময় কাটাইতাম।

এক দিন শহরের একটা বিখ্যাত স্টোরে গিয়াছি আবশ্যক কিছু সওদা করিবার উদ্দেশ্যে। জিনিষ বাছাবাছি করিতেছি এমন সময় প্রকাণ্ড একটা জুড়িগাড়ী দোকানের দরজায় আসিয়া থামিল এবং ফেজ মাথায় সাহেবী পোষাক পরা একজন পারসীক ভদ্রলোক আসিয়া দোকানে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম মেসোপোটেমিয়া ইংরেজদের কবলে আসিবার পর ভারতীয়দের মতই ইহারা উঠিয়া পড়িয়া সাহেব বনিবার সাধনায় লাগিয়াছে। লোকটিকে দেখিয়া আরব দোকানী তটস্থ হইয়া উঠিল এবং তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ আদবকায়দায় আগন্তুককে প্রচুর অভ্যর্থনা করিয়া তাহার খিদ্‌মতে লাগিয়া গেল। বুঝিলাম লোকটা নিতান্ত একটা 'কেওকেটা' নয়।

জিনিষ কিনিয়া দাম দিবার সময় একখানি কাগজ অজ্ঞাতে তাঁহার বিপুলায়তন কুরিয়ার ব্যাগের মধ্য হইতে পড়িয়া গিয়াছিল—কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। ভদ্রলোকটি চলিয়া যাইবার পর আমার নজরে প্রথম তাহা পড়িল। কুড়াইয়া লইলাম। প্রথমে ভাবিলাম দোকানদারকে দিয়া দিই, সে অনায়াসে যাহার কাগজ তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু কেমন খেয়াল হইল, কাগজখানা দিলাম না। দোকানীকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ইনি একজন পারসীক ধনী ওমরাহ শ্রেণীর লোক—শহরের বাহিরে এক অট্টালিকায় বাস করেন। ভাবিলাম, এই সুযোগে এখানকার অভিজাত শ্রেণীর সহিত পরিচিত হইবার সুবিধা হইতে পারে।

পরদিন রবিবার—ছুটির দিন। অন্য বারের মত আলস্য ও আমোদে দিন না কাটাইয়া সকালে উঠিয়া যথাসাধ্য প্রসাধন করিলাম। সাহেবী পোষাক না পরিয়া চুনট-করা গরদের ধুতি ও পাঞ্জাবী কাশ্মীরী শাল উড়াইয়া বাহির হইলাম। উৎসবাদিতে পরিবার জন্য এক স্যুট দেশীয় পোষাক সঙ্গে লইয়াছিলাম। ভাবিলাম সাহেবিয়ানায় উহাদের কাছে থই পাইব না। এই ভাল। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় হে?

হাসিয়া উত্তর দিলাম—অভিসারে। বন্ধুরা বিশ্বাস অবিশ্বাসে মিশাইয়া এক প্রকার করিয়া হাসিয়া বলিল— গুড্ লাক।

আমাদের ছাউনি ছিল ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস ও আরও দুইটি ছোট নদীর চতুর্মুখ সঙ্গমে—নাম সাটল অ্যারাব, ইহা পারস্য উপসাগর হইতে অল্প দূরে এবং বসরা শহরের মাইল তিনেক দক্ষিণে। সুবিস্তৃত কূলহীন সাটল অ্যারাবের ধারে ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও খর্জ্জুরকুঞ্জে সাজানো দেশটি আমার মনকে সেদিন কবিত্বরসে পূর্ণ করিতেছিল। দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মাঝে মাঝে কুটীর এবং কুটীরের অঙ্গনে বিদেশী চাষী গৃহস্থের জীবনলীলা সেদিন সকালবেলা বড় মধুর হইয়া আমার নিকট প্রকাশ পাইল। মনে হইল সত্যই এক অভিসারে চলিয়াছি যেন।

মাইল তিনেক অতিক্রম করার পর ঠিকানা ও চিহ্ন অনুসারে যে-বাড়ীর দেউড়িতে আসিয়া দাঁড়াইলাম— নদীর প্রায় ভিতর হইতে লাল পাথরে গাঁথিয়া-তোলা সেটা একটা বিরাট অট্টালিকা। দস্তুরমাফিক কার্ড দিয়া ভিতরে গেলাম। বেহারা আমাকে একটা সুবিস্তৃত কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল। কিন্তু চোখে না দেখিলে তাহার সাজসজ্জা কল্পনাও করা যায় না। যে সাহেবী পোষাক পরা ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া ইউরোপীয় ধরণে

সাজানো একটি বাড়ীর কল্পনা করিয়াছিলাম তাহার চিহ্নমাত্রও এখানে দেখিলাম না। সেই বিপুলায়তন ঘরটাতে ফরাসে তাকিয়ায় গালিচায় চিত্রে ও পুষ্পে মিলিয়া যেন বিলাস ও রঙের ঝরণা বহাইয়া দিয়াছে। মনে হইল যেন মোগল বাদশাহের আমল হইতে আলাদিনের প্রদীপের মায়ায় আস্ত একখানি দরবার-গৃহ উড়াইয়া আনিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। নবেম্বরের মাঝামাঝি, কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিয়া উঠিতেছিলাম। কোথায় যে বসিব তাহা যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। যে ভঙ্গীতে যেমন করিয়া যেখানে বসিলে ঠিক সহবৎ রক্ষা হয় তাহার কায়দা আমাকে কে শিখাইবে? পায়ের ইংরেজী জুতাজোড়াটাও যেন সেই ঘনদূর্ব্বা-কোমল পুরু গালিচাটার উপর একটা মূর্ত্তিমান রসভঙ্গ। প্রকাণ্ড বারো-দুয়ারী ঘরটার দীর্ঘচ্ছন্দী কিংখাপের পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কোন্ দিক দিয়া যে কি ভাবে কাহার আবির্ভাব হইবে তাহা যেন সাব্যস্ত করিতে না পারিয়াই মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পিছন দিকে একটা শব্দ শুনিয়াই হউক বা কাহারও আগমনের কাল্পনিক বোধেই হউক ফিরিয়া দেখি সেই দিনকার সেই ভদ্রলোকটি। দীর্ঘ জোব্বা ও চুড়িদার পায়জামায় তাহার সমস্ত চেহারাটারই একটা বিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মনে হইল জাহাঙ্গীর বাদশাহ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন। তেমনি প্রোজ্জ্বল, তেমনি উন্নত দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, তেমনি গর্ব্বিত মুখের ভাবের মধ্যে দুইটি বিনয়নম্র চক্ষু। বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস যেন সেই চক্ষুর ভাষা।

এক মুহূর্ত্ত সাশ্চর্য্যে আমার মুখের দিকে চাহিয়া পরিষ্কার ইংরেজীতে বলিলেন—"গরীবখানায় মহাশয়ের শুভাগমন হউক। নমস্কার, বেশী ভুল যদি না করিয়া থাকি তবে আপনাকে বোধ হয় কাল স্টোরে দেখিয়াছি। বসিতে আজ্ঞা হউক মহাশয়। আমি কি আপনার কোন কাজে লাগিতে পারি?

বিনয়াবনতিতে গলিয়া গেলাম। বলিলাম—ধন্যবাদ মহাশয়। মহাশয়ের সহিত পরিচয় লাভে কৃতার্থ হইলাম। হাঁ, কাল আমাকেই স্টোরে দেখিয়াছিলেন বটে। কাল দাম চুকাইবার সময় আপনি বোধ হয় অনবধানে এই কাগজখানি ষ্টোরের মেজেতে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। দেখুন ত এটা আপনার কি না?

ব্যগ্রভাবে কাগজখানি হাতে লইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—আঃ হা! ঈশ্বর মহান, করুণাময়। তিনি আপনার কল্যাণ করুন। এই কাগজখানির জন্য কাল হইতে অত্যন্ত উদ্বেগে কাটাইয়াছি। না খুঁজিয়াছি এমন জায়গা নাই। ইহার জন্য আমার ভগ্নী আপনাকে কত না ধন্যবাদ করিবে। ইহা তাহার একটি অত্যন্ত আবশ্যক মূল্যবান দলিল। দয়া করিয়া এই আসন গ্রহণ করুন। আমি আমার ভগ্নীকে ডাকিয়া আনি; তাহার নিজের মুখ হইতে তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনি বসুন, আমি এখনি ফিরিয়া আসিতেছি। বলিয়া আপত্তি করিবার অবসর মাত্র না দিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সহসা একটি বিদেশিনী অভিজাত রমণীর সহিত পরিচিত হইবার ঔৎসুক্যে ও আশঙ্কায় বিহ্বল বোধ করিতে লাগিলাম। কিরূপ ব্যবহার করিলে গোস্তাকী হইবে না, কিরূপ আদবকায়দায় ঐ দেশীয় রমণীকে অভ্যর্থনা করিতে হয় তাহার কিছুই জানি না। এক বার মনে করিলাম পলাইয়া যাই। নিজের ছেলেমানুষিতে নিজেরই হাসি পাইল। ভাবিলাম আমি বিদেশী বই ত নয়; বিদেশীর সকল অজ্ঞতার কসুর মাফ হইবে নিশ্চয়। দেখাই যাক না ব্যাপারটা কত দূর গড়ায়।

অল্পক্ষণ পরেই ভদ্রলোক তাঁহার ভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলেন। কী আশ্চর্য্য রূপ! এমন রূপ আমি জীবনে প্রত্যক্ষ করি নাই। স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণনিভ শুভ্রবর্ণ, তাহাকে বর্ণ না বলিয়া আভা বলিলেই যেন সমীচীন হয়। দীর্ঘায়ত প্রশান্ত নয়ন ঘনপল্লবচ্ছায়ায় কোমল; উন্নত ঋজু তনুদেহের জড়তালেশশূন্য স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গী এবং আলুলায়িত বসনবিন্যাসের অপূর্ব্ব সুষমা আমার নয়ন-মনকে অন্তরে অন্তরে অভিভূত করিয়াছিল। শুনিয়াছিলাম অবগুণ্ঠনের কঠিন শাসনে ওখানকার নারীরা অসূর্য্যম্পশ্যা। কিন্তু বিদেশীর খেয়াতির করিয়াই হউক অথবা ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবেই হউক জাফরাণী রঙের

সূর্য্য ওড়নাটি তাঁহার মস্তকের অর্দ্ধাংশমাত্র আসিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। মেয়েটির বয়স সতের-আঠার হইবে। অর্থাৎ বালিকা-বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছে অথচ পরিপূর্ণ যৌবনের মন্থরতা যখন দেহকে ভারাক্রান্ত করে নাই সেই বয়স।

ভদ্রলোক হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন—আমার বোন সেলিনা। আর ইনিই সেই ভদ্রলোক যিনি তোমার দলিলটিকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই দেখুন, আমি কি রকম স্বার্থপর। নিজের সৌভাগ্যে কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া মহাশয়ের নামটি পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াছি।

যথাসম্ভব অবনত হইয়া ইংরেজীতে অভিবাদন করিয়া নাম বলিলাম।

—মহাশয় ত ভারতবাসী?

—হাঁ, আমি ইংরেজের ফৌজের সহিত আসিয়াছি।

মেয়েটি এতক্ষণ কথা কহে নাই। এইবারে ভাইয়ের দিকে ফিরিয়া সুন্দর উচ্চারণে, পরিষ্কার ইংরেজীতে অনুযোগের সুরে বলিল—আচ্ছা, উনি কি দাঁড়াইয়া থাকিবেন নাকি? তারপর অত্যন্ত সপ্রতিভ সহজ ভদ্রতার সহিত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে বলিল—দয়া করিয়া এইখানে বসুন। বলিয়া নিজেও অদূরে আর একটি আসনে বসিল।

মখমলের একটা তাকিয়া আমার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া এবং নিজে একটি অধিকার করিয়া ভদ্রলোক বসিয়া হাসিমুখে বলিলেন—আমার ভগ্নীটি ভারতবাসীদের একজন ভক্ত। ইংরেজের স্কুলে পড়িয়াও ভারতবর্ষের প্রতি আগ্রহ উহার কমে নাই। লড়াইটা শেষ হইলেই উহাকে লইয়া ভারতবর্ষে বেড়াইতে যাইব। তাই না?

—দেখিও, ভদ্রলোকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া তারপর ভুলিয়া যাইও না যেন। তখন কিন্তু তোমার কোন রাজনৈতিক অজুহাত খাটিবে না, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।

আমি তখনও ঠিক সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই। চমৎকার করিয়া একটা প্রিয়ভাষণের উদ্দেশ্যে বলিলাম—আপনাদের ভারত-প্রীতিতে আমি সত্যই অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করিতেছি।

সে কথায় কান না দিয়া সেলিনা বলিল—আপনি বোধ হয় বাঙালী, না?

তাহার দাদা ও আমি দুই জনেই একটু আশ্চর্য্য হইলাম। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম—চমৎকার! কেমন করিয়া বুঝিলেন?

—আমি বইয়ে পড়িয়াছি যে বাঙালীরা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেন না। আপনার শিরস্ত্রাণ নাই দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম আপনি ভারতবাসী বাঙালী।

তাঁহাদের সরল সহজ আচরণে এতক্ষণে আমার মনের অস্বাভাবিকতা অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছিল। আমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভয়ের ভান দেখাইয়া বলিলাম—আপনি দেখিতেছি প্রায় এক জন ভারততত্ত্বজ্ঞ। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গল্প দিয়া আপনাকে ভুলাইবার উপায় নাই।

কথা শুনিয়া ছোট বালিকার মত সেলিনা একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মনে হইল রৌপ্য-নির্ম্মিত জলতরঙ্গের পর্দায় কে যেন লঘুচ্ছন্দে দ্রুত আঘাত করিয়া গেল।

—না, না, অত কিছু আমি পড়ি নাই। প্রাচ্যের ইতিহাস পড়িতে আমার ভাল লাগে, তাই অবসরমত একটু-আধটু পড়ি। আপনার দেশের গল্প শুনিতে আমার খুব ভাল লাগিবে।

—আমার বোনটি একটি গ্রন্থকীট। বলিয়া স্নেহে ও গর্ব্বে ভদ্রলোক সেলিনার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

এমন সময় দু-তিনটি সুসজ্জিত ভৃত্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্বেত-পাথরের থালায় ফল, মিষ্টান্ন ও কাচপাত্রে নানা রঙের সুগন্ধি সরবৎ প্রভৃতি সাজাইয়া লইয়া উপস্থিত হইল। সেলিনা উঠিয়া ভৃত্যদের হাত হইতে থালাগুলি লইয়া আমার সম্মুখে সেই বিছানার উপরই রাখিতে লাগিল। আঙুর, বেদানা, লকেট, নাসপাতি, পেস্তা, খোবানী, আপেল এবং মিষ্টান্নের প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমি নিতান্ত ক্ষীণজীবী না হইলেও ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। অন্ততঃ দশ-বার জন জোয়ান লোকের খোরাক। ভদ্রলোক সোজা হইয়া বসিয়া দুই হস্ত আমার দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া বিনয়ের সুরে বলিতে লাগিলেন—

দয়া করিয়া গরীবের বাড়ীর এই সামান্য খুদকুঁড়াটুকু গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করুন।

একে আহার গ্রহণ করিবার আদবকায়দা কিছুই জানি না—তারপর কোন্‌টা আগে খাইব কোন্‌টা পরে, কোন্‌টা কিরূপে খাইব—এই সব চিন্তা আমার বিপন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে গোলমাল বাধাইয়া দিল। কি বলিতাম জানি না, কিন্তু লজ্জিত আপত্তির ভঙ্গীতে কি একটা বলিতে যাইতেই সেলিনা সঙ্কুচিত ভাবে বলিল—ও, আপনি বুঝি ব্র্যাহ্‌মিন? অন্যের ছোঁয়া খাইলে আপনাদের ধর্ম্মহানি হইবে? বলিতে বলিতে প্রত্যাখ্যাত আতিথ্যের ক্ষোভেই বোধ করি একেবারে লাল হইয়া উঠিল।

আমি বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম—না, না, সেরূপ কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করি না। এই দেখুন খাইতেছি। বলিয়া কয়েকটি আঙুর তুলিয়া মুখে দিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই দেখিলাম সেলিনার মুখ হাসিতে উজ্জল হইয়া উঠিল; দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আরাম অনুভব করিলাম।

বলিলাম—আমি ব্রাহ্মণ বটে; কিন্তু পুরাতন কালের কুসংস্কার এখন আর মানি না। কিন্তু আমি বলিতে ছিলাম যে, কোনও পুস্তকে কি বাঙালী ব্রাহ্মণকে দানব বলিয়া চিত্রিত করিয়াছে যে এক ডজন লোকের আহার্য্য আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন?

হাস্যে আলাপে কৌতুকে আমাদের পরিচয়টা অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গেল। বিদায়কালে ভদ্রলোক অবসরমত আমাকে আবার আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

সেলিনা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—নিশ্চয় আসিবেন দয়া করিয়া। নদীর ধারে আমার বাগিচা আছে, আপনাকে দেখানো হইল না। আচ্ছা, এক মিনিট অনুগ্রহ করিয়া দাঁড়ান। বলিয়া অতি লঘুগতিতে চলিয়া গেল।

ভদ্রলোক আমাকে আমাদের ক্যাম্পের কথা সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেলিনা ফিরিয়া আসিল দুটি বড় বড় ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ হাতে করিয়া। বলিল—শীতকাল পর্য্যন্ত থাকিলে এর দ্বিগুণ আকৃতির গোলাপ আপনাকে দিতে পারিব।

তারপর আতিথ্যের জন্য উভয়কে বহু বহু ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম। তাঁহারাও দলিলটির জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। মুগ্ধ হইয়াছিলাম বই কি—অভিজাতের অপরূপ সৌজন্য! তাছাড়া···

সেলিনা, সেলিনা, সেলিনা। সমস্ত আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়া ঐ নাম আমার চিত্তকুহরে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। সমস্ত রাস্তাটা আসিলাম যেন বাতাসে ভর করিয়া। ক্যাম্পে আসিয়া কাহাকেও কিছু বলিলাম না। কিন্তু সপ্তাহের বাকী কয়টা দিন আমার নিকট মিথ্যা হইয়া গেল। রবিবারের প্রতীক্ষায় আমি চকিত হইয়া রহিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, রবিবার আসিলে আমার সমস্ত উৎসাহ কেমন এক প্রকার ভয়ে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ভাবিলাম ভদ্রতার খাতিরেই যাইতে অনুরোধ করিয়াছে মাত্র। উপরি-উপরি এমন উপযাচক হইয়া গেলে মনে করিবে কি? নিজেকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া যাওয়া বন্ধ করিলাম। কিন্তু সেলিনার কথায় আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া রহিল এবং এইবার প্রভাতের নবারুণদীপ্তিতে আমার চিত্ত-গগনের শুকতারাটি অস্ত গেল। দুলালীকে একেবারে প্রায় ভুলিয়া গেলাম।

সমস্তটা দিন একপ্রকার ছটফট করিয়া কাটাইয়া বৈকালের দিকে বসরা শহর অভিমুখে রওনা হইলাম। কোন কিছুই কিনিবার আবশ্যক ছিল না। তবু সেই স্টোরে চীনা সিল্কের রুমাল কিনিবার অজুহাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অযথা কতকগুলা অর্থক্ষয় করিতে হইল, কাহারো দর্শন মিলিল না। অবশ্য দেখা যে হইবে এমন কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবু কিসের আশায় যে এই সাত-আট মাইল পথ পর্য্যটনের ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম আজও তাহা বলিতে পারি না।

শহরে সেদিন একটা উৎসব ছিল। দলে দলে লোক সুদীর্ঘ মহার্ঘ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া চলিয়াছে। অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন একটা পথ ধরিয়া চলিলাম। ফিরিবার পথ অধিকতর দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

শহরের প্রায় সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি এমন সময় একখানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী আমার পাশ দিয়া অগ্রসর হইয়া গেল এবং নারীকণ্ঠের "এই থাম, থাম" স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। সে কণ্ঠ অল্পক্ষণ মাত্র পরিচিত বটে, কিন্তু তাহা ভুল করিবার নয়। মোটরটি থামিয়া আমার নিকট পিছাইয়া আসিল। আমার বক্ষের মধ্যে রক্তস্রোত উত্তাল হইয়া উঠিল। নিজেকে সংযত ও সংহত করিয়া সহাস্তে প্রচুর অভিবাদন করিলাম। সেলিনা আজ একাকিনী। বলিল—কই, আপনি ত আজ সকালে আমাদের ওখানে গেলেন না? আমি মনে মনে আপনার জন্ম প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। কৃতার্থ হইয়া গেলাম।

হাসিয়া পরিহাসছলেই বলিলাম—না, বারংবার গিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহস করি নাই।

অল্প একটু আবদারের সুরে সেলিনা বলিল—তা হোক, যে কয় দিন এদেশে আছেন আপনার নিকট হইতে ভারতবর্ষের গল্প শুনিয়া লইব। গল্প শুনিবার আমার ভারী লোভ। আর, আমার বাগিচাও ত আপনাকে দেখানো হয় নাই। আসিবেন ত আগামী রবিবারে?

হাসিয়া বলিলাম—আপনি হুকুম করিলে না যাইবার সাধ্য কি!

—তাহা হইলে আমি হুকুম করিতেছি, আপনি আসিবেন।

মনে মনে গলিয়া গেলাম। উন্মাদ না হইলে আমি নিশ্চয় বুঝিতাম যে ইহা বালিকাসুলভ সরলতা এবং বিদেশীর যে-খাতির ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু মস্তিষ্ক নিশ্চয় তখন আমার বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ মনে মনে এমন নির্ব্বোধ আশাও বোধ হয় করিয়াছিলাম যে এতটা পথ যাইতে হইবে মনে করিয়া সেলিনা হয়ত কতকটা দূর আমাকে গাড়ীতে করিয়া আগাইয়া দিতে চাহিবে। কিন্তু তাহা সে চাহে নাই।

আত্মাভিমানে একটু আঘাত লাগিয়াছিল বৈকি, কিন্তু রবিবার প্রাতে ঠিকমত হাজিরা দিতেও ত্রুটি করি নাই। তাহার পর বহুদিন যাবৎ অনেক মিশিয়াছি; বহু সমাদর ও ভদ্রতা লাভ করিয়াছি; আজ বুঝিতেছি বরাবর একটা বিশিষ্ট ব্যবধান সে রাখিয়া চলিত। অথচ সেই ব্যবধানকে কখনও স্পষ্টতায় রূঢ় হইয়া উঠিতে দেয় নাই।

কিন্তু তাহার প্রত্যেকটি ভদ্রতা, প্রত্যেকটি সহজ হৃদ্যতা, সামান্য একটু আতিথেয়তাকেও আমার বিকৃত মস্তিষ্কের উত্তেজনায় অন্যরূপ করিয়া দেখিতাম। প্রত্যেকটি কথার হৃদয়ঘটিত অর্থ করিয়া লইতাম এবং তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে সর্ব্বপ্রকার সম্ভব অসম্ভব কল্পনাকে পাগলামির উনপঞ্চাশ পবনের পৃষ্ঠে সওয়ার করিয়া দিবারাত্র উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া থাকিতাম।

কী যে চাহিতাম তাহা আমার নিজের কাছেও স্পষ্ট ছিল না। শুধু উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের বায়বীয় কল্পনা স্বপ্নে ও জাগরণে আমার বিমূঢ় মস্তিষ্ককে মথিত করিতে থাকিত।

ইংরেজী বলিবার পক্ষে আমাদের জিহ্বার যে স্বাভাবিক জড়তা তাহা দূর করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া খুঁজিয়া টমিদের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলাম।

ফল হইল এই যে ইংরেজী শিখিলাম কদর্য্য এবং পান করিতে শিখিলাম প্রচুর। কাজকর্ম্ম অবশ্য সামরিক শাসন অনুযায়ী না করিয়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু কাজের মধ্যে টিকিয়া থাকিতে যেন প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। বসরার বিখ্যাত ধনী ওমরাহের ভগ্নীর প্রেমার্থী যে, সে একটা সামান্য দাসত্বের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে ইহা যেন একটা স্বপ্নের পরিহাস। অথচ এই বিসদৃশ ব্যাপারের আসল হাস্যকর দিক্‌টা আমার নিকট স্পষ্ট ছিল না। আমার মনে হইত এ যেন আমার ছদ্মবেশ। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন বংশের কোন রাজপুত্র আমি যেন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছি। সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই মরুস্থানের মধ্যে আসিয়া গোপনে আবিষ্কার করিয়াছি আমার জন্য প্রতীক্ষমানা সর্ব্বভুবনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে। ছদ্মবেশেই জয় করিয়াছি তাহার অনাঘ্রাত পুষ্পকোমল হৃদয়। প্রতীক্ষা করিয়া আছি যেদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া সগৌরবে সেলিনাকে রাণীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিব এবং চন্দ্রসূর্য্যতারা ও নিখিল ভুবন পুলকিত নির্ব্বাক হইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিবে।

সেদিন রবিবার। প্রতিবারের মত সেদিনও ঠিক সময়ে গিয়া আমার বাঞ্ছিত তীর্থে উত্তীর্ণ হইলাম। দেখিলাম সুসজ্জিতা সেলিনা কোমল নারাঙ্গী বর্ণের স্বচ্ছ ওড়নায় তাহার গোলাপী কপোলতল ও দেহার্দ্ধ আচ্ছাদিত করিয়া হেমন্ত শিশিরস্নাত স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাত-কিরণে গাড়ীবারান্দার সম্মুখে হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যদিচ সে বিশেষ করিয়া আমাকেই অভ্যর্থনা করিবার জন্য আজিকার প্রাতে অপেক্ষা করিয়াছিল না; তথাপি তাহাকে এইরূপ অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত কল্পনা করিয়া আমার বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত অব্যক্ত আনন্দে এবং দুরাশায় স্ফুরিত হইতে লাগিল। অগ্রসর হইয়া গিয়া আমার প্রাণের কথাগুলিতে পরিহাসের সুর লাগাইয়া বলিলাম—আজ আপনার সৌন্দর্য্য আমার কল্পনাকেও হার মানাইয়াছে।

কথাটা গায়ে না মাখিয়া সে হাসিয়া বলিল—জানেন আজ আমার জন্মদিন। আমাদের দেশে যদিও মেয়েদের জন্মদিনের কোন মূল্য নাই, তথাপি আমার ভাইয়ের খেয়াল—তিনি বরাবরই এই দিনটিতে আমাকে একটি করিয়া নূতন পরিচ্ছদ উপহার দেন। এই পরিচ্ছদটি কাল পাইয়াছি। কেমন মানাইয়াছে বলুন ত?

—চমৎকার! ঠিক মনে হইতেছে ত্রিদিবের সমস্ত জ্যোতি হরণ করিয়া স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া এইমাত্র দাঁড়াইলেন এবং আপনার অভাবে স্বর্গে এত ক্ষণে অন্ধকার নামিয়াছে। কিন্তু এ কি অন্যায়! আপনার যে আজ জন্মদিন তাহা আমাকে পূর্ব্বে জানান নাই কেন? তাহা হইলে—

—না, না, ওটা আমার ভাইয়ের একটা খেয়াল মাত্র। আচ্ছা চলুন আপনাকে বাগানেই লইয়া যাই। আজ বাগানের সমস্ত ফোয়ারাগুলি খুলিয়া দিতে বলিয়াছি। সকাল বেলা সূর্য্যরশ্মিতে ফোয়ারাগুলিকে দেখিতে আমার ভারি ভাল লাগে।

—চলুন, কিন্তু···। বলিয়া যেন নিতান্ত উন্মনস্ক ভাবেই সেলিনার পাশে পাশে চলিলাম।

বিস্তৃত উদ্যান। তাহার একটা দিক্ গিয়া নদীর মধ্যে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সেই নদীর দিক্‌টায় দু-জনে একটা পাথরের উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। বিরাট ব্যাপ্ত বারিরাশির ওপারের বনরেখা ইহুদী সুন্দরীর ভ্রূলেখার মত সরু হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। প্রভাতের বায়ুস্পর্শে বীচিমালা-পরিশোভিত নদীর চঞ্চল জলস্রোত সূর্য্যকিরণে ঝলিতেছে। ফোয়ারার নিরবচ্ছিন্ন ঝর্ঝর সঙ্গীত ও পত্রের মর্ম্মর ধ্বনিতে মিশিয়া আমার মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরায় মধ্যে রক্তস্রোতকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। স্নিগ্ধমন্দপবনচালিত সিক্ত মৃত্তিকা এবং গোলাপের মিশ্রিত সুগন্ধ আমার বস্তুচেতনার উপর এক প্রকার মাদকতার মোহ সঞ্চারিত করিয়া অন্তরে অন্তরে আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে। এই যে রমণী তাহার অপরূপ রূপলাবণ্যের জ্যোতিতে আকাশ ও পৃথিবীকে প্রাণে ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া আজ এই বিশেষ একটি প্রভাতের পরম ক্ষণটিতে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল আমার জীবনে ইহার কি কোন সুদুর্লভ সার্থকতা নাই? সুন্দর দুটি চক্ষু কি আমার গভীরতম চিত্তকে বিশেষ করিয়া আজ স্পর্শ করিতেছে না? ছন্দোময় দেহ-মাধুর্য্যের লীলায়িত আহ্বান আজ এ কাহাকে যাচ্ঞা করিয়া?

বাহির হইবার পূর্ব্বেই সেদিন বোধ হয় পান করিয়াছিলাম কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায়। বাস্তব জগতের সমস্ত চিন্তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়া এক অপরূপ রূপকথার মায়ালোকে যেন উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। সেখানে "অসম্ভব" বলিয়া কোন স্পর্দ্ধার কথা কেহ উচ্চারণ করে না; কোন সাহসিকতাই সেখানে দুঃসাহস নয়; কোন দুরাকাঙ্ক্ষার বস্তুই সেখানে অপ্রাপ্য নয়।

বিশ্বপ্রকৃতির উদ্ভাসিত সৌন্দর্য্য পরিবেষ্টনের অভ্যন্তরে সেলিনার অপার্থিব রূপের অনতিক্রমণীয় মোহ আমাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। পরিপূর্ণ আবেগকে প্রাণপণে দমন করিয়া বলিলাম—আজ আপনার জন্মদিনে আপনার উপযুক্ত উপহার দিবার শক্তি বোধ হয় বিধাতারও নাই। আজ আমাকে অনুমতি করুন; আপনারই রচিত উদ্যানের একটি গোলাপ আপনাকে উপহার দিয়া ধন্য হইব।

শত চেষ্টা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক রাখিতে

পারিলাম না। চাহিয়া দেখিলাম হাস্যময়ী সেলিনার মুখ অকস্মাৎ যেন ছায়া-গম্ভীর হইয়া উঠিল এবং বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার নিকট হইতে সে এক পা পিছাইয়া সরিয়া গেল।

নদীর দিকে অকারণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। সেলিনা কি করিতেছে তাহা দেখিবারও চেষ্টা করিলাম না। আহত হইয়াছিলাম মর্মান্তিক এবং তাহা সম্পূর্ণ গোপন না করিয়া আংশিক রূপে প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

সেলিনার বালিকাসুলভ চঞ্চল চিত্ত আজিকার আনন্দের দিনে বেশীক্ষণ মৌন হইয়া থাকিতে পারিল না। স্বদেশীয়ের তুলাদণ্ডে বিদেশীর ব্যবহারের যাচাই করা অন্যায়, তাহাতে সেই অত্যন্ত মূল্যবান দলিল-সংক্রান্ত ব্যাপারে যাহার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করি তাহার প্রতি রূঢ়তা প্রকাশের জন্য মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইয়াই যেন বলিল—আপনি ত চায়ের ভক্ত। চলুন আজ নিজে হাতে প্রস্তুত করিয়া আপনাকে চা পান করাইব। ভাইয়ার স্নান নিশ্চয়ই এতক্ষণে শেষ হইয়া গিয়াছে; 'রু'টা ডাকাডাকি সুরু করিয়াছে। স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়াই ভাইয়া উহাকে বীফস্টিক বিস্কিটস খাওয়ান কি না! দেখিয়াছেন রু কে? ওর নাম রুডলফ, আমি বলি রু। একটা চিতাবাঘ যেন। জানেন, সেদিন ওটা আমার দুই কাঁধের উপর থাবা রাখিয়া…সে আপন মনে বকিয়া চলিতেছিল।

কথা বলিতে বলিতে সেলিনা বাগানের আঁকাবাঁকা নানা পথ বাহিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। আমি নীরব মৌন গম্ভীর মুখে তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম। বিস্তৃত বাগান। নানা জটিল পরিকল্পনায় স্তরে স্তরে কেয়ারি করা। কোথাও দ্রাক্ষাকুঞ্জ, কোথাও পাম-তরুশ্রেণী, কোথাও খর্জ্জুরবীথি, কোথাও আবার বেড়ার গায়ে মর্ণিং গ্লোরী, ক্লিমাটিসের কুঞ্জ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাপের বাগান এবং এক-একটা বিরাট অংশ জুড়িয়া মরশুমী ফুল ও চন্দ্রমল্লিকার ক্ষেত্রসকল উৎসুক চিত্তে যেন ভবিষ্যৎ ঐশ্বর্য্যের ধ্যানে নিমগ্ন। ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা এখন যে-স্থান দিয়া চলিতেছিলাম তাহা এই উদ্যানের একটা দূরতম উপান্ত প্রদেশ। নুড়ি ও খণ্ড প্রস্তর দিয়া সাজানো একটা কৃত্রিম ঝরণা ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থানে স্থানে খর্জ্জুর ও পাম-গ্রোভস্ ভেদ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। মৌনতার অস্বস্তি কাটাইবার জন্যই হউক বা রূঢ়তার লজ্জা ঢাকিবার জন্যই হউক সেলিনা আপন মনে বকিয়াই চলিয়াছিল। ঝরণার একটা বাঁকের মুখে আসিয়া সে থামিল এবং ফিরিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—শ্রান্তি বোধ করিতেছেন বুঝি? এমনি ভাবে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ানো আমার সত্যই অন্যায়।

বাধা দিয়া বলিলাম—না না, মোটেই শ্রান্তি বোধ করিতেছি না, বেশ লাগিতেছে।

—তবে চুপ করিয়া আছেন যে?

—আমি ভাবিয়াছিলাম আমার উপহারের কথায় আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু কেন, তাহা আমি ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনি কি দয়া করিয়া সেই প্রথম দিন নিজে হাতে আমাকে দুটি সুন্দর গোলাপ উপহার দেন নাই?

—ওঃ, আচ্ছা, দিন, আপনার ইচ্ছামত একটা ফুল তুলিয়া আমাকে দিন—জন্মদিনে আমার বিদেশী বন্ধুর উপহার। বলিয়া আমার বৈদেশিকতার ছাড়পত্রেই যেন কথাটাকে সহজ করিয়া লইল।

—ধন্যবাদ আপনাকে। এই দিনটি আমার চিরদিন স্মরণে থাকিবে।

—দাঁড়ান, ঝরণাটা পার হইয়া ঐ হলিহক্সের চারা-গুলোর পিছনে একটা চমৎকার গোলাপের ক্ষেত আছে; চলুন সেইটাতে যাই।

—চলুন। বলিয়া মোটামোটা পাথরে পা দিয়া টলিতে টলিতে ঝরণাটা পার হইতে লাগিলাম—পশ্চাতে সেলিনা।

ওপারের মাটিতে পা রাখিবামাত্র পিছনে উ উ…করিয়া একটা তীব্র চীৎকার শুনিয়াই ফিরিয়া দেখিলাম একটি পাথর হইতে পিছলাইয়া আমার পিঠের কাছাকাছি সেলিনা হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইতেছে। চিন্তামাত্র না করিয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া ডাঙায় আনিয়া তুলিলাম। মুহূর্ত্তে আমার সমগ্র উন্মুখ দেহমনকে একটা স্পষ্ট তীব্র বৈদ্যুতিক কষাঘাতে বিমূঢ় করিয়া কে

যেন আমার সমস্ত চেতনা, সমস্ত বুদ্ধি হরিয়া লইল। সমাজ ও বাহ্যজগৎ ভুলিয়া সেলিনাকে আমার বক্ষের মধ্যে চাপিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলাম; এবং তাহার পরের মুহূর্ত্তে নাক-মুখ-চোখের উপর সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতের তীব্র তাড়নায় উৎখাত হইয়া সেলিনাকে মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করিয়া পিছনে হটিয়া গেলাম। স্পষ্ট অথচ চাপা গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—"শয়তান"। সামনে দেখিলাম সেলিনা ক্রোধে ক্রুদ্ধ মার্জ্জারের মত ফুলিতেছে। সেই দিন বুঝি নাই কিন্তু আজ সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি সেলিনা বালিকাও নয়, সংসারানভিজ্ঞ নির্ব্বোধও নয়। চীৎকার করিয়াও সে লোক জড় করিল না—কাঁদিয়াও সে ভাসাইয়া দিল না।

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার ছলে কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই আর একটি তীব্র চাপা তিরস্কারে সে আমাকে একেবারে চুপ করাইয়া দিল—চুপ রও। এখনি, এই মুহূর্ত্তে—এখান হইতে দূর হইয়া যাও; পথের কুকুর! অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিতে চাও? যাও—কুকুর দিয়া ছিঁড়িয়া খাওয়াইলে—বলিয়া সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গীতে হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে দূর হইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল।

লজ্জায়, অপমানে, নখরাঘাতের যন্ত্রণায়, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। সেলিনার শেষ কথাগুলি বজ্রসূচীর মত কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়াছিল। তাহাই আমার পশ্চাতে যেন চাবুক মারিতে মারিতে সমস্ত দিন মরুভূমির তপ্ত রৌদ্রে ঘুরাইয়া মারিল। "পথের কুকুর", পথের কুকুর," "পথের কুকুর"—কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলাম না। ক্যাম্পে ফেরা বোধ হয় অসম্ভব হইয়াছিল। সমস্ত দিন পাগলের মত অনাহারে অপমানে দুশ্চিন্তায় রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম। কেমন করিয়া কখন ক্যাম্পে ফিরিয়াছিলাম বলিতে পারি না। শুনিয়াছি প্রবল জ্বর লইয়া ফিরিয়াছিলাম। তাহার পর তিন মাসের খবর আর কিছুই জানি না। যখন জ্ঞান হইল তখন হাসপাতালে। অস্থিপঞ্জরসার জীর্ণশীর্ণ উত্থানশক্তি-রহিত।

চাকুরির কণ্ট্রাক্ট প্রায় পূর্ণ হইয়াছিল। চলৎশক্তি লাভ করিবার অল্পদিন পরেই গবর্মেণ্ট অপটু বলিয়া আমাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া পাঠাইল। এত দিন যে দুঃস্বপ্নের ঘোরে কাটাইয়াছিলাম তাহার স্বপ্নটুকু কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু ধুয়াটুকু রহিয়া রহিয়া আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের সমস্ত রক্তস্রোতকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল—কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলাম না—"পথের কুকুর"। সর্ব্বদাই একটা কিসের আতঙ্কে আমার দেহমনকে উচ্চকিত করিয়া রাখিত। কে যেন পিছনে আসিতেছে। আমাকে খুন করিবে। কুকুর! কুকুর! আমার পিছনে কুকুর লাগিয়াছে—প্রকাণ্ড চিতাবাঘের মত কুকুর!

দেহ একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল; ভারতবর্ষে আসিয়া কাজে যোগ দেওয়া অসম্ভব হইল। লম্বা ছুটি লইতে হইল।

বোম্বাইয়ের হাসপাতালে আমার খুবই যত্ন হইয়াছিল। তাহাদেরই যত্নে শরীর-মনে কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিতে-ছিলাম। অসুখের মধ্যে সহস্র বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুলালীর কথা মনে হইতে আর চোখ জলে ভরিয়া আসিত। ভাবিলাম আর না, ডাল ভাত খাইয়া থাকিতে হয় সেও স্বীকার, নিজের গৃহাঙ্গন আর পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। সেলিনার নিকট হইতে ধাক্কা খাইয়া আমার মন যে আবার আমার দুলালীকে ফিরিয়া পাইল, ইহাতে আমি বারংবার কৃতজ্ঞচিত্তে বিধাতাকে প্রণাম করিলাম। যাই করুক, দুলালী আমার স্ত্রী। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আবার তাহাকে পাইবার উপায় হইয়াছে। তাহারই স্নেহের ছায়ায় বসিয়া জীবনের বাকী দিন কয়টা শান্তিতে কাটাইয়া দিব।

এই মনে করিয়া কাশী গেলাম।

গিয়া দেখিলাম আমার বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আমি চলিয়া যাইবার এক বৎসর পরে দারুণ ওয়ার-ফিভারে শাশুড়ী পরলোকগমন করিয়াছেন এবং আমার স্ত্রী তাহার ভাইয়ের সঙ্গে পাটনায় গিয়াছেন। ভাইয়ের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দীনেশ চৌধুরী।

অকস্মাৎ বুকের মধ্যে কিসে যেন দংশন করিল।

দুর্ব্বল শরীরের উপর দীর্ঘ ভ্রমণে দেহ এমনিতেই কাতর ছিল; সামলাইতে পারিলাম না—মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর প্রায় এক বৎসর জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দোলায়মান হইয়া হাসপাতালে হাসপাতালে কাটাইলাম।

ইতিমধ্যে চাকুরিটি খোয়াইয়াছি। সঞ্চয়ের সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়া পাটনায় গিয়া দেখি, নিতাই মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীটি ক্রয় করিয়া বছর খানেক হইল অন্য কে এক জন বসবাস করিতেছে। দীনেশের ঠিকানা তাহাদেরই নিকট পাইলাম। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, যাহার নিকট হইতে দীনেশবাবু বাড়ী ক্রয় করাইয়া দিয়াছেন তিনি স্ত্রীলোক বটে—দীনেশবাবুর কাছে শুনেছি তিনি মেডিকেল ইস্কুলে পড়েন।

মেডিকেল ইস্কুলে পড়ে! কে? দুলালী!

মাথায় যেন সব কথা তখন ঠিক করিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। দীনেশ! সেই দীনেশ, আমার স্ত্রীকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দিয়া লইয়া গেল? আমার দুলালীকে? পাষণ্ড দীনেশ—পাইলে উহাকে খুন করিব নিশ্চয়। আবার খানিক পরে অকারণে হু-হু করিয়া কান্না ঠেলিয়া আসিতে লাগিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে দীনেশকে বাহির করিলাম। দীনেশ আমাকে চিনিতে পারিল না; আমি ক্ষেপিয়া উঠিলাম। নিজের চেহারার অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কথা আমার কল্পনায়ও আসে নাই। প্রকাণ্ড একটা ইট তুলিয়া বলিলাম—বার কর শীগ্‌গির আমার দুলালীকে। তুমিই তাকে বের ক'রে এনেছ। বার কর, নইলে এখুনি খুন করব তোমাকে।"

দীনেশ এবারে আমায় চিনিল এবং তাহার স্বভাবসুলভ রঙ্গমঞ্চের ভঙ্গীতে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল—ছিঃ তুই কি পাগল হলি শিবু? দুলালী আমার বোন যে!

—মানে?

—মানে—দুলালীর বাবার নাম নিতাই মুখুজ্যে নয়—পরমেশ চৌধুরী!

—নিতাই মুখুজ্যে নয়?—মিথ্যে কথা। এক কাণাকড়ি আর বিশ্বাস করি না তোমার কথায়। বার কর এখ্খুনি দুলালীকে—সে তোমার নয়, আমার।

—নিজের বাপের নামে কলঙ্কের কাহিনী রচনা ক'রে কেউ বন্ধুকে গল্প শোনায় না শিবু!

—মানে কি, এ-সব কথার?

—মানে, পরমেশ চৌধুরী আমারই বাবা।

বজ্রাঘাত হইলেও এরূপ স্তম্ভিত হইতাম না। দীনেশ নিজেরই বাপের দুষ্কৃতির বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছে! সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল; ছুটিয়া এক দিকে বাহির হইয়া গেলাম।

সমস্ত দিন গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সন্ধ্যার দিকে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের নীচে গঙ্গার নির্জ্জন তীরে গিয়া বসিলাম। সমস্ত দিনের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিতেছিল। তৃষ্ণায় আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। নামিয়া গিয়া প্রাণ ভরিয়া জল খাইলাম। মাথায় মুখে জল দিতে দিতে কতকটা আরাম পাইয়া উঠিয়া আসিয়া কোমল তৃণশয্যায় শুইয়া পড়িয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিলাম। বন্যার মত একাকারী চিন্তার কি কোথাও কূলকিনারা আছে? কুচক্রী দীনেশ ও দুলালীর মায়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধে জিঘাংসায় যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল। এক বার মনে হইল নির্ব্বোধের মত চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়া এখন কাহার উপর রাগিয়া মরিতেছি? অন্তঃকরণ কিন্তু তাহা মানিতে চাহিল না। তথাপি কেবলই মনে হইতে লাগিল নির্ব্বোধ, আমি নির্ব্বোধ, আমি নির্ব্বোধ।

আকাশ তারায় তারায় সমাচ্ছন্ন। শুইয়া শুইয়া মনে হইতে লাগিল যেন প্রকাণ্ড একটা চন্দ্রমল্লিকার ক্ষেত্র। দেখিতে দেখিতে কখন যে সেলিনার কথা ভাবিতে সুরু করিয়াছিলাম তাহা বুঝিতেই পারি নাই। অকস্মাৎ চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল সেলিনার সেই দৃপ্ত ভঙ্গী—"কুকুর, পথের কুকুর"—আর ভাবিতে পারিলাম না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া সে-কাহিনী মন হইতে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল নির্ব্বোধ, আমি নির্ব্বোধ। বহুক্ষণ এই ভাবে পড়িয়া

রহিলাম। আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় অন্তরে অন্তরে একটা আশ্রয় খুঁজিয়া বুলিতেছিল। একটা স্নেহের আশ্রয়।

হঠাৎ এক সময়ে মনে হইল, আমার দুলালী! মনে হইতেই দুলালীর প্রতি আমার অবরুদ্ধ প্রেমের উৎস যেন অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে যেন পথ পাইলাম। ভাবিলাম এই ঠিক হইয়াছে। কি হইবে মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা হিংসাদ্বেষ দিয়া? আমি আর দুলালী—দুইটি অবিচ্ছিন্ন আত্মা; দুই জনে দুই জনকে ভালবাসিব। সমস্ত চরাচরে এর চেয়ে বৃহত্তর সত্য আর কি? এর চেয়ে বৃহত্তর অস্তিত্বের আবশ্যকই বা কি? দুলালীই আমার অনন্ত জীবনের শান্তিময় আশ্রয় হউক।

কল্পনা করিতে লাগিলাম, অনুতপ্ত দুলালী আমার বিরহে তাহার দুর্ব্বহ জীবনের আশ্রয়স্বরূপ জ্ঞানার্জ্জনে মন দিয়াছে। গভীর রাত্রে সুপ্তদীপ প্রকাণ্ড বোর্ডিং-হাউসের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উর্দ্ধে অনন্ত আকাশের তারাগুলিতে তাহার চোখের জলের প্রতিবিম্ব ফেলিয়া এই দুঃস্বপ্নচারী নিষ্ঠুর স্বামীর কথা স্মরণ করিতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া পড়িলাম। রাত তখন দশটা কি এগারটা কি বারটা কিছুই জানি না। দীনেশের বাড়ীর দরজায় গিয়া ঘা দিলাম। অল্পক্ষণ পর একটি লণ্ঠন হাতে দীনেশ বাহির হইল এবং ঐ অবস্থায় অত রাত্রে আমাকে দেখিয়া বিস্ময় ও করুণা প্রকাশ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল। আমি তাহাকে দুই হাতে বাধা দিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম—কোথায় আমার দুলালী? দাও, তাকে এনে দাও আমার কাছে। আমি আর কিছুই চাই না; দীনেশ! এইটুকু কর আমার জন্যে।

শেষের দিক্‌টায় আমার কণ্ঠে বোধ করি একটা মিনতির স্বর বাজিয়াছিল। দীনেশ লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া এবার সম্ভবত সত্য সত্যই সস্নেহে আমার হাত ধরিল। বলিল—শিবু, ঘরের ভিতরে এসো—একটু বিশ্রাম কর'সে।

তাহার আতিথেয়তার প্রয়াসে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম—না, নাঃ, কোথায় তার বোর্ডিং, শীগ্‌গির এক্ষুণি নিয়ে চল আমাকে।

—স্থির হও, শিবু, শান্ত হও। বোর্ডিঙে সে নেই। এসো।

—নেই!

একটা আতঙ্কপূর্ণ সন্দেহে মনটা মুচড়াইয়া উঠিল।

—বেঁচে নেই?

—আছে…। শুনিয়া অকস্মাৎ যেন একটা সর্ব্বনাশ হইতে বাঁচিয়া গেলাম এমনি মনে হইল।

—আছে! বল, বল কোথায়? শীগ্‌গির বল; এইটুকু দয়া কর আমাকে, দীনেশ!

—জানি না সে কোথায়—

—জানো না? তুমি জানো না? মিথ্যে কথা।

—না, ভগবান জানেন, মিথ্যা বলি নি।

—মানে? ছিল না তোমার কাছে?

—ছিল।

—তবে?

দীনেশ চুপ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল। স্পষ্টই দেখিলাম আমার দিকে সে চাহিতে পারিতেছে না। অশেষ উত্তেজনায় ধৈর্য্য হারাইয়া দুই হাতে দীনেশের কাঁধ ধরিয়া প্রবল ঝাঁকি দিয়া বলিলাম—বল, বল শীগ্‌গির কি হয়েছে তার, বল।

দীনেশ আমার এই উত্তেজনায় কিছু মাত্র বিচলিত হইল না। তাহার নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গীতে ডান হাতখানা আমার কাঁধের উপর রাখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—তার কথা আর ভেবো না শিবু; দুলালী তার মায়ের পথ নিয়েছে।

সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।

বাংলা সাহিত্যে আহরণ

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, বাংলা ভাষাটা প্রাকৃতেরই রূপভেদ মাত্র এবং বহুকাল ধরিয়া বঙ্গীয় লেখক ও কবিরা সংস্কৃত অভিধানের সহায়তায় ইহার সংশোধন করিয়াছেন। এই সংশোধন-ব্যাপারে এক দিকে যেমন আমরা সংস্কৃত হইতে অপর্য্যাপ্ত শব্দসম্পদ লাভ করিয়াছি, অপর দিকে তেমনি বহুবিধ খাঁটি মূল্যবান প্রাকৃত শব্দ হারাইয়াছি। এই হারানো শব্দগুলি "ভদ্রলোকের" সাহিত্যে স্থানলাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আমাদের মাঝিমাল্লা, চাষী-মজুর এবং গ্রাম্য শিল্পীদের মুখের বুলিতে এখনও ঐগুলির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে।

সম্প্রসারণশীল বাঙালী জাতির পক্ষে বৃহত্তর সাহিত্যের আবশ্যক হইয়াছে। এই আবশ্যকবোধ গণজাগরণের প্রভাব লইয়া সমাজের প্রত্যেক স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিবে। এখন বাংলা সাহিত্যে গণ-সংযোগের কথাটাই খুব বেশী করিয়া ভাবিতে হইবে এবং গণ-সমাজের প্রাণবস্তুগুলি কোথায় গিয়া বাসা বাঁধিয়াছে সর্ব্বাগ্রে তাহারই সন্ধান লইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে পল্লীসাহিত্যের কল্যাণস্পর্শ আমাদিগকে কিছু গৃহমুখী করিয়া দিয়াছে। গ্রাম্য ছড়া এবং প্রবাদ-গীতিগুলিও এই পর্য্যায়ভুক্ত। এই শ্রেণীর সাহিত্যে পণ্ডিতী অভিধান এবং পণ্ডিতী ব্যাকরণের বিধিনিষেধের স্পর্শ লাগে নাই; প্রাকৃতের সুদৃঢ় কাঠামোর উপর দেশের মাটির ভাষায় এগুলির গঠন হইয়াছে। ইহাদের সহিত গোষ্ঠীগত সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া বৃহত্তর সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন করিতে হইবে।

এ-কাজের জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ ঘুরিয়া শব্দ-সংগ্রহ করা আবশ্যক। প্রাকৃত এবং দেশজ বহু মূল্যবান শব্দ এখন অবধি নিতান্ত অপরিজ্ঞাত' অবস্থায় পল্লীতে পড়িয়া রহিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমি পালাগান সংগ্রহ করিতে গিয়া সমুদ্রাভিসারী এক মাঝি-গায়কের মুখে অপূর্ব্ব জলযুদ্ধের বর্ণনা শুনিয়াছি। কোন সময়ে বঙ্গ-সমুদ্রের 'কালাপান্না' নামক স্থানে আরাকানের মগ এবং এদেশের মুসলমান সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর জলযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সেই মাঝি-গায়ক উক্ত গীতি-কাহিনীর বর্ণনায় প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন নৌবাহিনীর উল্লেখ করিয়াছে। ইহাতে দেখা যায় তখনকার দিনে সৈন্যবাহী বৃহৎ নৌকাগুলির নাম ছিল 'ঘরাব', অগ্র- ও পশ্চাদ্‌- গামী নৌকাগুলির নাম ছিল 'থালু' ও 'ধুম', এবং দূরে দূরে পাহারায় নিযুক্ত হাল্‌কা নৌকাগুলির নাম ছিল 'জলবা'। এখন ঐ জাতীয় কোন নৌকার নাম এ-দেশে আর পাওয়া যাইতেছে না। জলযুদ্ধের অতীত ইতিহাসের সহিত ঐ নৌকাগুলির অশ্রুতপূর্ব্ব নামও কালের অতল তলে ডুবিয়া রহিয়াছে। এ বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

বর্ষাকালে বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক স্থান নদীর জলে ডুবিয়া যায়। গ্রামবাসীর পক্ষে তখন নৌকাই যানবাহনের একমাত্র সম্বল হয়। নৌকার সহিত বাংলার পল্লীজীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত; তাই আমাদের কবিরা এদিকে একেবারে দৃষ্টিহীন হন নাই। বর্ত্তমান গীতি-সাহিত্যে "মাঝি' এবং 'কাণ্ডারী' এই দুইটা শব্দ বেশ পসার জমাইয়া বসিয়াছে। ইহারা উভয়েই অবশ্য ভাবসমুদ্রের যাত্রী। কিন্তু এদেশের প্রকৃত মাঝিমাল্লারা পণ্যবাহী নৌকা বাহিয়াও আমাদের সাহিত্যে পাড়ি জোগাইতে পারে নাই। বাংলার আধুনিক অভিধানে কয় জাতীয় নৌকার নামই বা আছে? নৌকার আঙ্গিক পরিচয় কি সাজসরঞ্জামের কোন চিহ্ন আমাদের লেখার ভাষায় পাওয়া যাইতেছে না।

এখনও এ-দেশের ছোটবড় নদীর সিকতায় শত শত গ্রাম্যশিল্পীর 'বালাম', 'সরেঙা', 'কোঁধা', 'ছুরী' প্রভৃতি

নৌকা এবং কত রকমের সাম্পান প্রস্তুত করিতেছে। এখনও এ-দেশের উপকূলভাগ হইতে হাজার হাজার নৌ-জীবী সমুদ্রযাত্রা করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের শঙ্খনদের মোহানাস্থিত তৈলাদ্বীপে এবং তার আশেপাশে 'গছ' নামক এক প্রকার সুবৃহৎ নৌকা দৃষ্টিগোচর হয়। এই গুলির গঠন-প্রণালীতে প্রাচীন নৌ-শিল্পের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গছ নৌকা তৈয়ার করিবার সময় বর্ত্তমান দিনের শিল্পীরাও কোন রকম লৌহনির্ম্মিত পেরেক ব্যবহার করে না। ইহারা নৌকার তলদেশের সহিত ক্রমশঃ এক একটি সুদীর্ঘ কাঠের ছাপ* যোড়াইয়া দুই দিকে ছিদ্র করিয়া গল্লাক† বেতের দ্বারা সুদৃঢ়রূপে বাঁধিয়া লয়। তৎপর 'খ্যামা' অর্থাৎ ছিদ্রপথগুলি কাঠের ছিপি দ্বারা বুজাইয়া দিয়া থাকে। চট্টগ্রামের পাহাড়ে এক রকম বনজ কাঠ পাওয়া যায়, সমুদ্রের লোনা জলের স্পর্শে ঐ কাঠ ক্রমে ক্রমে ফুলিয়া উঠে। ইহার দ্বারাই ছিপি প্রস্তুত হয়। সুতরাং গছ নৌকার ঐ ছিপি কিছুতেই ছুটিয়া যাইতে পারে না, এবং ইহার দ্বারা ছিদ্রপথগুলি এমনভাবে রুদ্ধ হয় যে বাহিরের এক বিন্দু জলও নৌকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। এক সময় চট্টগ্রাম বন্দর হইতে এই জাতীয় নৌকাগুলি ভারত মহাসাগরের সুমাত্রা ও যবদ্বীপ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিত। গছ নৌকার অগ্রপশ্চাদ্দিকের নানা স্থান এবং উপরিভাগ হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত বিভিন্ন অংশ কত নামেই না পরিচিত হইয়া থাকে। আমরা ঐ গুলির সর্ব্বসমেত আশী রকম নাম পাইয়াছি। ঐ নামগুলির কোন কোন শব্দ দেশজ, কোন-কোনটা আরাকানী; কোন-কোনটি পর্ত্তুগীজদের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ বলিয়াই মনে হয়।

সুবৃহৎ বঙ্গসমুদ্র বাংলার সমুদয় দক্ষিণ সীমা জুড়িয়া রহিয়াছে। দশম শতাব্দীর পর হইতে বহুকাল ধরিয়া আরাকানের মগেরা এখানে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। ইহাদের শত-দাঁড়-বিশিষ্ট নৌকাগুলি এই সমুদ্রের বুকে বিচরণ করিত। ময়ূরপঙ্খী নৌকার হস্তীদন্তনির্ম্মিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া তখনকার মগ রাজারা সমুদ্রবিহার করিতেন। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব্বোপকূলে মগেরা তখন নৌ-যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। দিল্লীর কি বাংলার কোন রাজশক্তি ইহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে পারে নাই। চট্টগ্রাম হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত সমুদয় উপকূলভাগ এবং সামুদ্রিক দ্বীপমালা ইহারা অবলীলাক্রমে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এখনও 'মগের মুল্লুক' কথাটি বাঙালীর কাছে সুপরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মগের মুল্লুকে পর্ত্তুগীজ বণিকেরা উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, এই অঞ্চলে বাণিজ্য অপেক্ষা লুণ্ঠনেই লাভ বেশী। তখন গঞ্জালীস প্রভৃতি জলদস্যুর আবির্ভাবে কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গসমুদ্রের লবণ-সলিলে রক্তলীলার অভিনয় চলিয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক এদিকে অনেক প্রকারের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপক আলোচনার অভাবে ঐগুলি এ যাবৎ সুসম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে নাই।

বাংলার কল্পবিহারী কবি কি চিত্রশিল্পী এই সমুদ্রের দিকে তেমন সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। কেবল প্রাচীন কেচ্ছা-রচয়িতাদের মধ্যে কেহ কেহ ডিঙ্গি সাজাইতে গিয়া ইহার অস্ফুট ছবি আঁকিয়াছেন মাত্র। বাংলা সাহিত্যে বঙ্গসমুদ্রের পরিচয় খুবই কম। মেদিনীপুর হইতে আরাকানের সীমা পর্য্যন্ত ইহার সুবৃহৎ উপকূল ভাগে মাঝিমাল্লারা যে-সব সারি এবং ভাটিয়ালী গান গায়, তাহার মধ্যে আতঙ্কের সুর আছে। ইহাদের কোন কোন পালাগানে জলদস্যুর অত্যাচার এবং নানাবিধ মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর আভাস পাওয়া যায়। এখন পর্য্যন্ত ঐগুলি সম্যক সংগৃহীত হয় নাই।

বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে সুবিস্তৃত পার্ব্বত্য ভূমি। এখানে বছর বছর 'হাতীখেদা' হয়। খেদাগুলি হাতী ধরিবার কেল্লাবিশেষ। গভীর অরণ্যভূমি হইতে খেদাইয়া আনার পর ভীষণ বন্যহস্তীসমূহ কৌশলক্রমে এই কেল্লায় আটকা পড়িয়া যায়; এই জন্য ঐ কেল্লাগুলির নাম খেদা। কোন কোন সময় এরূপ এক একটি খেদায় শতাধিক পর্য্যন্ত বন্যহস্তী ধৃত হইতে দেখা যায়। হাতী-শিকারীদের মধ্যে

* ছাপ—কাঠের সুদীর্ঘ তক্তা। একটার পর একটা এরূপ বহুসংখ্যক ছাপ একত্র জুড়িয়া সুবৃহৎ গছ নৌকা তৈয়ার হয়।

† গল্লাক—এক রকম শক্ত বেত। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়।

কেহ 'চৈক্কাল', কেহ 'পাঞ্জালী' কেহ 'শিকদার' ইত্যাদি আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে। চৈক্কালেরা গভীর বনভূমিতে হাতীর সন্ধান লয়, পাঞ্জালীরা হাতীকে খেদার দিকে তাড়াইয়া আনে এবং শিকদারেরা লৌহ-শিকের সাহায্যে কেল্লা রক্ষা করে। বাংলার পূর্ব্বপ্রত্যন্তশায়ী পর্ব্বতরাজির পাদদেশে কত রকমের শিকারী আছে—তাহারা কি কি কৌশলে ফাঁদ পাতিয়া বন্যজন্তুকে আটকাইয়া রাখে, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলির আকার অবয়ব কিরূপ এ-সব সম্বন্ধে কোন আলোচনা বাংলায় হয় নাই।

আমরা 'শস্যশ্যামলা' বলিয়া মাতৃভূমির বন্দনা করি। আমাদের কবি ধানের ক্ষেতে ঢেউয়ের খেলা দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। ধান লইয়াই বাঙালীর ধনদৌলত; কিন্তু এদেশের মাটিতে কত রকমের ধান জন্মে, তাহার যথার্থ খবর আমরা রাখি না। চট্টগ্রামে যাহাকে 'লেইজ্যা-চিয়ন' ধান বলা হয়; বীরভূমের পল্লী-অঞ্চলে উহা অন্য নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। ত্রিপুরার 'চাপলাশ' ধানের নাম উলটপালট হইয়া হয়ত অন্য কোন দূরবর্ত্তী জেলার পল্লীতে 'শলাপচা' এই আখ্যাও গ্রহণ করিতে পারে। শূন্য-পুরাণে ত্রিশ রকম ধানের নাম দেখা যায়। আমরা এক চট্টগ্রাম জেলা হইতে ১৫৫ রকম ধানের নাম পাইয়াছি। সমগ্র বাংলার মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ধানের স্থানীয় নাম সংগ্রহ করা আবশ্যক। আমাদের পল্লী-রমণীরা কৃষ্ণের শত নামের পুঁথি মুখস্থ করে, তাহাদিগকে ধানের সহস্র নামের বইও পড়িতে দিতে হইবে। এখনও চাষীরা 'ধানবনের' অনেক রকম গান গায়। বহু বৎসর পূর্ব্বে কার্ত্তিক মাসে প্রবল তুফান এবং বন্যায় ধানের ক্ষেত একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখন এ অঞ্চলের চাষীরা ধানের নাম লইয়া খেদের গান গাহিয়াছিল। যথা—

ভাসাই নিল যত ক্ষেতি—'ফেইন্যাবেতী'*
'বীজমালী' 'বালাম'।
'চিন্নাল' 'গিরিং' আর কত কইব নাম।
দেশের মাঝে হৈল কহরক† পরাণ রাখা ভার।
দারুণ তুফান হায় কৈল্ল রে উজাড়।

* 'ফেইন্যাবেতী', 'বীজমালী' 'বালাম', 'চিন্নাল', 'গিরিং' ইত্যাদি ধানেরই নাম।
† কহর—দুর্ভিক্ষ।

এ-সকল ধানের নাম এবং চাষবাস-সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দসমূহ আমদানি করিয়া আমাদের অভিধান ভর্ত্তি করিয়া তুলিতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগে চাষবাসের কথা তখনকার ভাষার উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল,—ডাক ও খনার বচন ইত্যাদিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এখন আবার ঐগুলি নূতন ভাবে গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। চাষবাসের নিম্নোক্ত পর্য্যায়গুলিতে বহু প্রাকৃত শব্দের প্রচলন দেখা যায়।

(১) ভূমির প্রকারভেদ (২) কৃষকের যন্ত্রপাতি (৩) ভূমিকর্ষণ ও চাষের প্রণালী (৪) বীজ বপন ও চারা রোপণ (৫) কৃষিরক্ষার উপায় (৬) জলসিঞ্চন ও সার প্রয়োগ (৭) আগাছা ও পোকা নাশ (৮) শস্য আহরণ (৯) বীজ, শস্য ও খড় রক্ষা (১০) গোমহিষাদির ব্যাধি ও প্রতিকার।

এতদ্ব্যতীত চাষীদের খেলাধূলা এবং আমোদ-উৎসব হইতেও সাহিত্যের বহু উপাদান গ্রহণ করা যাইতে পারে। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে যখন ধান পাকিয়া উঠে তখন তাহারা মনের আনন্দে পালাগান গায়। এইগুলি মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। এরূপ বহু পল্লীগীতি এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষুর অগোচরে রহিয়া গিয়াছে।

এ-দেশে পূর্ব্বে অনেক প্রকার কুটীরশিল্প ছিল; ঐ শিল্পীদের নানা রকম যন্ত্রপাতি ছিল, যন্ত্রগুলির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত হইত। ঢাকার ভুবনবিখ্যাত মসলিন-শিল্পী কি মুর্শিদাবাদের রেশম-শিল্পীর পরিভাষাসমূহ আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য শব্দ-সম্পদ। প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলি 'হরিতালী' কাগজে লিখিত হইয়াছে। এক জাতীয় গ্রাম্য-শিল্পীরাই এ কাগজ তৈয়ার করিত। উহাদের উপাধি ছিল 'কাগজী'। এখনও বাংলার অনেক জায়গায় সেই কাগজীদের বংশধর রহিয়া গিয়াছে। কি কি উপকরণ লইয়া সে-সময় কাগজের মণ্ড তৈয়ার করা হইত, কিরূপ পাত্রাধারে উহা ঢালাই করা হইত, ঐ পাত্র এবং মণ্ডের কত রকম নাম ছিল, তাহা আমাদের কাগজের পৃষ্ঠায় বিশেষ ভাবে লিখিত হয় নাই। বর্ত্তমানে গ্রাম্য শিল্পীদের মধ্যে

শাঁখারীদের ঘাঁটি, কাঁসারীদের কারখানা, কর্ম্মকারের ভাতি, কুম্ভকারের চাক এবং তন্তুবায়ের তাঁত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আমাদের সাহিত্য হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের পারিভাষিক শব্দগুলি প্রাকৃতেরই প্রকৃত বংশধর।

কত রকম ব্যবসায়ের পথ ধরিয়া এ-দেশের কত দরিদ্র লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ছুতার-মিস্ত্রির হাতিয়ারগুলিতে, পটুয়ার রঙের তুলিতে, জেলেদের জাল-বুননিতে এবং তেলীদের তেলের ঘানিতে অনেক রকম দেশজ শব্দের সন্ধান মিলে। কুলীমজুরের কুঁড়ে ঘরে, বরোজের পানের বরে, কি বেপারীদের কেনা-বেচায়ও ঐরূপ শব্দের যথেষ্ট আনাগোনা দেখা যায়। আবার কতকগুলি দেশজ শব্দ মাঝির খেয়াঘাটে, ধোপার পাটে এবং নাপিতের নরুন-কাঁচিতেও বাঁচিয়া রহিয়াছে। গ্রামের 'খেজুরিয়া'রা খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করে, 'গর্জ্জনিয়া'রা গর্জ্জন গাছের তেল নিংড়ায়, গাড়োয়ান গাড়ী চালায়, বেহারা পাল্কী বয়, 'মাটিয়ালেরা' মাটি কাটে এবং 'পাটিয়ালে'রা পাটি তৈয়ার করে। ইহাদের কাজ-কর্ম্মের ভাষায়ও অধিকাংশ দেশজ শব্দের পরিচয় আছে।

পাড়াগাঁয়ের বাঁশের ঘরে চালাভিটি এবং বেড়ার কত প্রকারভেদ দৃষ্টিগোচর হয়। এরূপ ঘরের এক-একটি প্রকোষ্ঠ এক-এক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গৃহস্থের বাড়ীর উঠান এবং আস্তাকুঁড়ের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন নাম আছে। বাড়ীর চারি দিক্ রক্ষার জন্য নানা রকমের ঘেরা ও টেংরা দেওয়া হয়। গ্রামের ডোবা এবং পুকুরের জলাংশ কখনও এক নামে পরিচিত হয় না। পল্লীবাসীর গৃহস্থালীতে কত আসবাবপত্র, রান্নাঘরে কত অবয়বের চুল্লী, হাঁড়ি-সরায় কত রকমারি এবং ঢেঁকিশালায় কত সরঞ্জামাদি রহিয়াছে। এ সকল স্থান হইতে প্রাকৃত শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

কবিরাজী শাস্ত্রে যে-সব লতাপাতার টোটকা ঔষধ এবং অনুপানের ব্যবস্থা রহিয়াছে, স্থানীয় নাম না জানাতে আমরা অনেক সময় সেগুলি চিনিয়া লইতে পারি না। কোন কোন শাকসব্জীর, গাছগাছড়ার, মাছ-তরকারির পশুপাখীর এবং ফলফুলের নামের মধ্যেও স্থলভেদে কিছু কিছু তারতম্য দেখা যায়। একই দ্রব্য বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কলিকাতায় যাহাকে 'লেঠা' মাছ বলা হয়, স্থলভেদে উহা 'টাহি', 'টাকি' এবং 'গড়ই' ইত্যাদি কত নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। কাঠবিড়ালীকে কোন জায়গার লোকে 'চোলা' এবং অন্য কোন জায়গার লোকে 'চোরগোটা'ও বলিয়া থাকে। বাতাবী লেবুর নাম কোথাও 'কম্লাল', কোথাও 'ভরুজা'। শুধু 'ওল' বলিলে চট্টগ্রামবাসীরা কচুজাতীয় ওলকে না বুঝিয়া বেঙের ছাতাকেই বুঝিয়া লয়। 'মরিচ' শব্দটা এ অঞ্চলে লঙ্কারই অর্থ সূচনা করে। আমাদের ভাবী অভিধান সঙ্কলনের সময় এই জাতীয় শব্দগুলির স্থলভেদে বিভিন্ন নামেরও উল্লেখ করিতে হইবে।

বাংলার পল্লীভাষা প্রবাদ-প্রবচনে ভরপুর। এগুলির একটা নৈতিক দিক আছে। কোন কোন প্রবচন সমাজ-শাসনের অমোঘ আইনরূপে গণ্য হয়। যাঁহারা ছন্দ সম্বন্ধে তত্ত্বানুশীলন করিবেন, ছড়াজাতীয় প্রবচনগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। খুব সহজ ও সরলভাবে উপান্ত স্বরের মিল দেওয়াই এ প্রবচনগুলির বিশেষত্ব। যেমন—

হাডর১ নেনা২—
পোদ্দর৩ তেনা৪।

অর্থ—যাহারা হাটের 'নেনা' খায় তাহারা ছেঁড়া কাপড় পরিয়াই থাকিবে, কোন দিনই অবস্থাপন্ন হইতে পারিবে না। এখানে 'নেনা' শব্দটির সহিত 'লাভ' শব্দের বহু তফাৎ।

পরর১ ঘর—
ছেপরে২ ডর।

অর্থ—পরের ঘরে থুথু ফেলারও ভয় বেশী।

আবার কোন কোন প্রবচনে উপান্তস্বরের মিলগুলি ছত্রের প্রথম দিকে আসিয়া অপূর্ব্ব ছন্দের অবতারণা করে। যথা,

---

১ হাডর=হাটের। ২ নেনা=মিথ্যা বলিয়া কেনা দাম হইতে বেশী লওয়া। ৩ পোঁদর=অপাঙ্গের। ৪ তেনা=ছেঁড়া কাঁপড়।

১ পরর=পরের। ২ ছেপের=থুথুকে

কানা গোরুর,
হানা বেশী।

অর্থ—কানা গোরুই খুব জোরে আঘাত দিতে পারে।

বিলর ১ গাছে,
চিলর ২ বাসা।

অর্থ—ধুধু মাঠের গাছে চিলগুলি বাসা নির্ম্মাণ করে।

ফেরৎ ১ পড়ে—
খেরৎ ২ বাজি ৩

অর্থ—সামান্য তৃণে বদ্ধ হইয়াও মানুষ ফেরে পতিত হয়।

মরমে ১ পহির ২
ভরমে ৩ বাড়ী।

অর্থ—জলাংশে পুকুরের পরিচয় এবং ইজ্জতেই বাড়ীর পরিচয় পাওয়া যায়।

এ-সব প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেই পল্লীসাহিত্যের প্রাণের পরিচয় আছে। আমাদের গৃহিণীরা এক সময় এগুলির নজির তুলিয়া গৃহকোণের বধূকে উপদেশ দিতেন এবং শাসন করিতেন। কারণ তখন দেশে অন্য কোনরূপ স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এখনও হাটে, মাঠে এবং ঘাটে কথায় কথায় এ-সকল প্রবচনের উল্লেখ দেখা যায়। অনুস্বার- এবং বিসর্গ- বিহীন সংস্কৃত প্রবচনগুলি বর্ত্তমান বাংলা অভিধানে স্থান লাভ করিয়াছেমাত্র। এ-দেশের খাঁটি প্রবাদ-প্রবচনগুলি সম্পূর্ণ রকমে এ যাবৎ সংগৃহীত হয় নাই।

চাষীর গান ছাড়া এদেশের অভ্যন্তরে আরও অনেক রকমের পল্লীগাথা আছে। অনেকে 'গম্ভীরা'র গান এবং 'ঘাটু' গানের কথা শুনিয়াছেন। 'গাজি' 'জারি', 'হকিয়তী' 'মারফতী', 'মাইজভাণ্ডারী' 'বৈঠখারী, 'হঁওলা', 'ফুলপাঠ', 'বারমাসী' এবং 'ডব' প্রভৃতি বহুজাতীয় গান এখনও বাংলার পল্লী-অঞ্চল মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। এ-সব পল্লীগীতিকার সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

প্রাচীন মুসলমানী পুঁথি এবং কেচ্ছা-সাহিত্য আমাদের ভাষার বিরূপ ছিল না বরং বাংলা সাহিত্যের স্বভাবধর্ম্মের সহিত এগুলির তখন ঐক্য ছিল। আলাওল এবং দৌলতকাজির রচনায় তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। পণ্ডিতী বাংলা এবং মুসলমানী বাংলা উভয়েই প্রাকৃতের দরবারে আগন্তুক। বহুকাল মুসলমানেরা এদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তখন প্রাকৃতের মধ্যে বহু আরবী ও পারসী সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যের পরিপাক-যন্ত্রে ঐগুলি ক্রমে ক্রমে হজম হইয়া গিয়াছে। 'জায়গা', 'জমি', 'হিসাব,' তহবীল,' এবং 'দাবী' 'দাওয়া, প্রভৃতি শব্দ ভাষান্তরিত হইলে আমাদের মুখে কোনদিনই রুচিকর হইবে না।

দলিল-দস্তাবেজের ভাষায় বহু আরবী এবং পারসী শব্দের অধিকার একেবারে কায়েম হইয়া গিয়াছে। বাঙালী আর ইহাদিগকে উচ্ছেদ করিবার নজির তৈয়ার করিতে পারিবে না। বাংলার ভূমিতে দৃঢ়ভাবে ঐগুলির শিকড় প্রবেশ করিয়াছে। দেশে ঘোরতর সাম্প্রদায়িক ঝড় উত্থিত হইলেও ঐগুলি উৎপাটিত হইয়া পড়িবে না। অনেকেই বলিতে চাহেন যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেই বাংলায় গদ্যসাহিত্যের গোড়াপত্তন হইয়াছিল; কিন্তু দলিল-দস্তাবেজের ভাষা ইহারও পূর্ব্ব-অধ্যায়ের সূচনা করে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ-দেশে আসিবার পূর্ব্বে আমরা যে কেবল গান গাহিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতাম এমন নহে; তখনও আমাদিগকে কাজের কথা বলিতে হইত এবং চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ গদ্যে লিখিতে হইত। তখনও আমাদের পূর্ব্বপুরুষের জায়গাজমি ছিল এবং সেগুলিতে তাহাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল। জমিদার প্রজার মধ্যে তখনও বাংলা ভাষায় লিখিত চুক্তিপত্রাদি সম্পাদিত হইত। মোগল আমলের ভূঁইয়া উপাধিধারী শাসকবর্গের দপ্তরখানায় বাংলা ভাষায় লিখিত দলিল-দস্তাবেজ ছিল। আমরা ইশা খাঁ দেওয়ানের নামাঙ্কিত কামানেও বঙ্গভাষার ছাপ পাইতেছি। গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির ঐতিহাসিক দিকে গবেষণা করিতে হইলে দলিল-দস্তাবেজের ভাষার উপর নজর দিতে হইবে। বাংলার অধিকাংশ ভূস্বামীর ঘরে এ-জাতীয় দলিলপত্র সংরক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের আধুনিক সাহিত্যের শিরা-উপশিরা বঙ্গ-ভূমির সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। শিল্পী ও কৃষকেরাই দেশের প্রকৃত অধিবাসী এবং ইহারাই গণ-সমাজের যথার্থ হস্তপদস্বরূপ। বাংলা সাহিত্যের হৃৎপিণ্ডের সহিত এই হস্তপদের যোগসূত্র কোথায়? দেশের এ প্রান্তের সহিত ঐ প্রান্তের, হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের, শহরবাসীর সহিত গ্রামবাসীর ভাববিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান সমস্যা।

---

১ বিলর—সুবিস্তৃত মাঠের। ২ চিলর—চিলের।
১ ফেরৎ—ফেরে। ২ খেরৎ—তৃণে। ৩ বাজি—বাজিয়া
১ মরমে—পুকুরের জলাংশে। ২ পহির—পুষ্করিণী
৩ ভরমে—ইজ্জতে।

পটুয়া সঙ্গীত *

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের সংস্কৃতির ধারা যে সময়ে বালুকারাশির মধ্যে বিলীন হইতে চলিয়াছে, সেই সময়ে জন কয়েক মনীষীর অক্লান্ত চেষ্টায় তাহার লুপ্ত রেখাটি ধীরে ধীরে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। কোনও জাতির ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে আবিষ্কৃত হইতে পারে না, যতক্ষণ তাহার সংস্কৃতি এবং পরিণতির ধারাটির উদ্ধারসাধন না হয়। এই সত্যটি সমস্ত জাতির সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইলেও আমাদের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কারণ আমাদের ইতিহাস নানা কারণে অপরিজ্ঞাত বা অল্পপরিজ্ঞাত। এই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সমস্ত নিদর্শন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমাদের বর্ত্তমান নাগরিক জীবন হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। বহুপ্রাচীন কাল হইতে বাংলার পল্লীর মধ্যেই বাঙালীর প্রাণের স্পন্দন অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। সেই জন্য আমাদের পল্লীসঙ্গীতে, ছড়া ও রূপকথায়, ব্রত ও নৃত্যে, যাত্রা ও কবির গানে বাঙালীর সংস্কৃতির একটি অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ পাওয়া যায়।

'পটুয়া সঙ্গীত' সেই হিসাবে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের একটি মূল্যবান উপাদান যোগাইয়াছে। বীরভূমের পল্লীতে পটুয়াগণ বা চিত্রকরেরা এই সঙ্গীত গান করিয়া কিছু দিন পূর্ব্বেও জীবিকা অর্জ্জন করিত। অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলার এই নিজস্ব সংস্কৃতি লোপ পাইতে বসিয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এইগুলির সংরক্ষণে সহায়তা করিয়া বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বীরভূমের এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের নৃত্যকলা সাধারণ্যে প্রচারিত করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। দেশের পুরাতন সংস্কৃতি সংরক্ষণের ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, তখন শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের নাম সম্ভ্রমের সহিত উল্লিখিত হইবে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পশ্চিম-রাঢ়ের জনসাধারণের মধ্যে যে সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল, তাহারই অপূর্ব্ব নিদর্শন এই পটুয়া সঙ্গীত। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, সঙ্গীত ও চিত্রকলার এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ আমরা অন্যত্র পাই না। আমাদের দেশে ব্যবসায়ের বনিয়াদে জাতিভেদের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তন্তুবায়, স্বর্ণকার, কুম্ভকার প্রভৃতি পুরুষপরম্পরাক্রমে জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে এক দিকে যেমন ব্যবসায়ের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখিয়াছে, তেমনি আবার উন্নতির পথও অনেক সময়ে রুদ্ধ করিয়াছে। জাতিগত ব্যবসায়ে অনেক সময় সংরক্ষণের দিকে বড় বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়। তাহাতে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার অবকাশ বড় বেশী থাকে না। এ-ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ তাহাই হইয়াছে। পটুয়াদের চিত্রে ধারাবাহিকতা এবং গতানুগতিক ভাব যতটা দেখা যায়, ততটা উৎকর্ষ-পারিপাট্য দেখা যায় না। কিন্তু অপর দিকে ইহার মূল্য আছে: পুরাতন সরস মৌলিকতা এবং অকৃত্রিমতা ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। অন্য কোথায়ও তাহা সুলভ নহে।

আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, পটুয়াদের চিত্রসম্পদের কোনও মূল্য নাই। চিত্র হিসাবেও এই পটুয়াদের পটে এমন একটি সজীব, সতেজ, মৌলিক সৌন্দর্য্য ও ভাবব্যঞ্জনার পরিচয় পাওয়া যায় যাহা কলানৈপুণ্যের সুন্দর নিদর্শনরূপে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় এই চিত্রকলা পল্লী-জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপেই অধিকতর মূল্যবান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

পটুয়া সঙ্গীতের আর একটি অভিনবত্ব এই যে, এই চিত্রকরেরা সংস্কৃতি হিসাবে হিন্দু এবং ধর্ম্মে মুসলমান। ইহাদের নাম, আচার, ব্যবহার অনেকটা হিন্দুদের মত। তাহা হইলেও ইহারা মুসলমান সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে। যে-যুগে এই-রূপ সমন্বয় সম্ভব হইয়াছিল, সে-যুগ যে দ্রুত চলিয়া যাইতেছে ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

আমার বাল্যকালে মনে পড়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপ এক পোটোর নিকটে বসিয়া সময় কাটাইয়া দিয়াছি। তার নাম ছিল উমেশ। বাড়ী তার রাঢ়ে এবং জাতিতে সে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিত। আমাদের ঘরেই সে খাইত। তাহাকে ভাল চিত্রকর বলিয়া সকলেই খাতির করিত। পূজার পূর্ব্বে

* শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই সি এস সংকলিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ১৮/০ + ১১৬।

আমাদের অঞ্চলে গিয়া খানকয়েক প্রতিমা চিত্র করিয়া আসিত। অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি প্রতিমার রং করিতে হইত বলিয়া তাহার ব্যস্ততার পরিসীমা ছিল না। আমি যখন তাহাকে দেখিয়াছি, তখন সে অতি বৃদ্ধ। বহুদিন হইতে আমাদের বাড়ীতে প্রতিবৎসর সে আসিত এবং ক্ষিপ্রহস্তে কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাইত। উমেশ রাত্রি জাগিয়া 'চালচিত্তির' শেষ করিত। কেরোসিনের ডিবা বাম হাতে ধরিয়া, নাকের উপর চশমা চড়াইয়া সে ছবির পর ছবি আঁকিয়া যাইত। 'উমেশ এবারে কি আঁকবে?' আমি নাম ধরিয়াই ডাকিতাম। উমেশ বলিত, 'শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ নিখ্‌চি।' 'লেখা' কথাটি আমাদের দেশে ঐ অর্থে অপ্রচলিত। 'এবারে কি হচ্চে?' দশমহাবিদ্যা, রক্তবীজ বধ, ছিন্নমস্তা, রামের রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি সে এমন নিপুণ হস্তে আঁকিত যে সেরূপ আর আমাদের বাড়ীতে হয় নাই। কি অদ্ভুত প্রতিভাবলে কেরোসিনের আলোর আবছায়ায় কেমন করিয়া সে এমন সুন্দর ছবি আঁকিত, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হই। কিন্তু তাহার মুখে কোনও দিন গান শুনি নাই।

আমার বোধ হয় উঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক চিত্র-ব্যবসায় করিত, আর কতকগুলি লোক পট দেখাইয়া ও গান করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। কথা এই যে, সঙ্গীত ও চিত্রের অপূর্ব্ব যোগাযোগ, ইহা নিছক প্রয়োজনের প্রেরণায়, অথবা ইহার মধ্যে কোনও অহৈতুকী কলাপ্রিয়তা ছিল? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা কঠিন। তবে ছবিগুলি দেখিলে রূপসৃষ্টির সাধনলোকের প্রচুর আভাস পাওয়া যায়। কবিতা বা গীতগুলি তাহারই পরিপোষক মাত্র। হিন্দু পুরাণাদিতে এমন ঘটনা অনেক আছে, যাহা চিত্রে রূপায়িত করিতে পারিলে লোকচিত্ত রঞ্জন করিতে পারে। তাহারই অনুরূপ সঙ্গীত সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়াছিল। চিত্রের প্রয়োজনেই সঙ্গীত এবং কাব্য। যে সকল পুরাণ হইতে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা বা শিবচরিত গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির মূলের প্রতি তাদৃশ আনুগত্য দেখা যায় না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, পল্লীসঙ্গীতকে পুরাণের ছাঁচে ঢালিয়া রচনা করিবার চেষ্টা করিলে ভুল করা হইত। পল্লীসমাজের অবচেতনায় যে সুরগুলি প্রচ্ছন্ন আছে, তাহারই দুই-একটি ঝঙ্কার তুলিয়া পল্লীগায়কেরা সহজেই লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন। সেই জন্য পটুয়া সঙ্গীতের শিব পুরাণের মহেশ্বর নহেন, তিনি বাঙালীর ঘরের দরিদ্র স্বামী। কৃষ্ণ বেউড় বাঁশের বাঁকখানি কাঁধে লইয়া রাধিকার ভার বহন করিয়া বেড়াইতেছেন ইত্যাদি। যে সকল ঘটনা নিয়ত পল্লীজীবনে ঘটে, তাহাই এই সকল পৌরাণিক এবং অ-পৌরাণিক পালার ভিতর দিয়া কবিরা প্রকাশ করিয়াছেন। শিব গৌরীকে শাঁখা পরাইতেছেন—চিত্রটি পল্লীজীবনের নিখুঁত ছবি। গৌরী এক বাই (জোড়া?) শাঁখা চাহিতেছেন।

শিব বলিলেন,

রূপো সোনা পর যাঁ আকালে বিচে খাবি
রাঙা উলি শাঁক পুরে কোন্ স্বর্গে যাবি?

গৌরী বলিলেন,

রূপো সোনা পরতে আমার অঙ্গ বেথা করে
রাঙ্গা উলির শঙ্খ পর্‌তে বড় সাধ লাগে।

এই লইয়া শেষে কলহ এবং অভিমানে দুর্গার পিত্রালয়ে যাত্রা। তখন শিবের ভাঙের নেশা ছুটিয়া গেল; নারদকে দেখিয়া বলিলেন, 'ভাগ্নে, এক বার তাকে ফিরাইয়া আন।' নারদ কলহপ্রিয় দেবতা, কাঠিতে কাঠিতে ঠুকিয়া দুর্গাকে বলিলেন, 'কৈলাসে যাস নে; বাপের বাড়ী গিয়া শাঁখা পর গে।' শিবকে আসিয়া বলিলেন, 'মামীকে কার্ত্তিক গণেশের দিব্য দিয়া ফিরিয়া আসিতে বলিলাম, মামী কিছুতেই আসিল না।' যাক্ শেষ পর্য্যন্ত শিব গরুড়কে ডাকিয়া শাঁখ আনিলেন সমুদ্র সেচন করিয়া; বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, শাঁখা তৈয়ার করিতে। সেই শাঁখা লইয়া শিব শাঁখারী সাজিয়া গিয়া শ্বশুরবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব বিপদে পড়িলেন, তিনি ত শাঁখা পরাইতে জানেন না।

এক দুয়োর দুই দুয়োর পেরিয়ে মহাদেব ভাবে মনে মনে
আমি না জানি শঙ্খ পরাইতে শঙ্খ পরাব কেমনে!

দুর্গা আসিলেন,

সোনার খাটে বসে দুর্গা রূপার খাটে পা,
শঙ্খ পরতে বসিল কার্ত্তিক গণেশের মা।

শাঁখারীরা যে সকল বোল বলিয়া আজও শাঁখা পরায়, শিব সেই সব বুলি আওড়াইলেন। শেষে শিবদুর্গার মিলন হইল।

এই সকল গল্পের মধ্যে হিন্দুর দেবদেবীর মানহানি করা হয় নাই। বরং স্বাভাবিক, অকপট, প্রাণবন্ত বর্ণনায় তাঁহারা আমাদের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণলীলায় যে-সব ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যথেষ্ট আদিরসের আমদানি করা যাইত। কিন্তু কবি বস্ত্রহরণ প্রভৃতি পালায় সুরুচির সীমা লঙ্ঘন না করিয়াও বেশ আনন্দের উপাদান যোগাইয়াছেন। 'পটুয়া সঙ্গীতে' ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই সঙ্গীতগুলি দত্ত মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন গায়কের মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। কাজেই পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য্য হইয়াছে। তাহা হইলেও সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়া একটি স্বচ্ছ রসধারা প্রবাহিত হইয়াছে যাহা অনেক স্থলে উপভোগ্য। ছবি ও সুরের সাহায্যে ইহাদের উপভোগ্যতা যে অনেক বর্দ্ধিত হয়, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। সঙ্গীত, কাব্য ও চিত্রকলা এখানে পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে। গ্রন্থকার সুন্দর ভাবে এই কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন, "গীতিকায় যাহা উহ্য, তাহার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে চিত্রে; আবার চিত্রে যাহা উহ্য, তাহার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে গীতিকায়।" বস্তুতঃ আমাদের দেশে সঙ্গীত ও চিত্রকলার এরূপ সংযোগ আর কোথায়ও দেখিতে পাই না।

পাখীর বাসার গঠন-বৈচিত্র্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় মানুষের বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট বাসগৃহের ন্যায় বিভিন্ন জাতীয় পাখীর বাসারও অদ্ভুত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। রৌদ্র-বৃষ্টি ও অন্যান্য উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত মানুষ প্রথমে গুহাবাসী হইয়াছিল। সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনের তাগিদে উন্নততর বিচিত্র বাসগৃহ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাখীদের ঐসব বালাই নাই;



হেরণ নামক বক জাতীয় এক প্রকার পাখীর বাসা। উপরে নীচে দুইটি বাসায় তিনটি করিয়া বাচ্চা বসিয়া আছে

কাজেই তাহারা আবাহমানকাল নিজস্ব সংস্কারবশে একই ধরণে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে। তবে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাদের সংস্কারের উপর যে কম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নহে। তাহার ফলেই হয়তো পাখীর বাসার এত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রাণীজগতের অনেকেই যেমন আত্মরক্ষা এবং বিশ্রামসুখ উপভোগের জন্য কোন-



জোকারে পাখীর বাসা

না-কোন রকমের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাখীরা কিন্তু সেরূপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া বাসা নির্ম্মাণ করে না। তাহারা গাছের ডালে উপবেশন করিয়া অথবা কোন উপায়ে আত্মগোপন করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়া থাকে। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ডিম ও বাচ্চাদের রক্ষার নিমিত্ত বাসা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ বাসাতেই রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে ডিম অথবা বাচ্চাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকে না। মা তাহার শরীর ও ডানার সাহায্যে তাহাদের আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। বাচ্চা বড় হইলে ইহাদের বাসার আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন বাসা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ঐই অস্থায়ী বাসা

নির্মাণের জন্য তাহারা দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। কেহ বৃক্ষকোটরে বাসার স্থান নির্ব্বাচন করে। কেহ গাছের ডালে খড়কুটার সাহায্যে বাসা নির্মাণ করে। কেহ পাখীর পালক দিয়া কেহ বা



কয়েকটি পত্র একত্র জুড়িয়া টুনটুনি পাখী বাসা নির্মাণ করিয়াছে

গাছের পাতা বুনিয়া বাসা তৈয়ারী করে। আবার কেহ বৃক্ষকাণ্ডে অথবা মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাসার পত্তন করে। কাঠঠোকরা, দয়েল, ধনেশ প্রভৃতি পাখীরা বৃক্ষকোটরে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ডিম পাড়ে। ধনেশ পাখীদের মধ্যে আবার অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। ডিম পাড়িবার সময় হইতেই স্ত্রী-পাখীটি বৃক্ষকোটরে আশ্রয় গ্রহণ করে। পুরুষ-পাখীটি তখন কাদামাটি সংগ্রহ করিয়া কোটরের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। কেবল মধ্যস্থলে ঠোঁট প্রবেশ করাইবার মত একটি ছোট ছিদ্র রাখে। বাচ্চারা সবল না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রী-পাখীটি এইভাবে কোটরে আবদ্ধ হইয়া থাকে। পুরুষ-পাখীটি সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া খাবার সংগ্রহ করে এবং ছিদ্র পথে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া স্ত্রী-পাখীটিকে খাওয়াইয়া সজীব রাখে। অনেক স্থলেই অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনাহারের ফলে অবশেষে পুরুষ-পাখীটি মৃত্যু বরণ করিয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় মাছরাঙা পাখী মাটির নীচে শয়ানভাবে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। বয়নকারী পাখীরা পাতা সেলাই করিয়া বা পত্র-তন্তু সাহায্যে বাসা বুনিয়া থাকে। গৃহপালিত হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পাখী আবার বাসা-নির্ম্মাণের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা যেখানে-সেখানে ডিম পাড়িতে ইতস্ততঃ করে না। বহুকাল হইতে মানুষের তত্ত্বাবধানে থাকিবার ফলে পায়রাও বাসা-নির্ম্মাণের ব্যাপারটা ভুলিতে বসিয়াছে। তবে একেবারে ভুলিয়া যায় নাই, কারণ সুরক্ষিত স্থানে বাস করিলেও ডিম পাড়িবার সময় হইলেই দুই-চারি গাছা খড়কুটা যোগাড় করিয়া নামমাত্র একটা বাসা খাড়া করিয়া থাকে। আরও কিছুকাল অধীনতার পর হয়তো ইহাও ভুলিয়া যাইবে।

আমরা সচরাচর যে-সব পাখীর বাসা দেখিতে পাই তাহাতে প্রায়ই কোন গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কতগুলি শুষ্ক খড়কুটা বা কাঠি এলোমেলোভাবে সজ্জিত করিয়া বাসা তৈয়ারী হয় মাত্র। হেরণ বা বক-জাতীয় পাখী গাছের উঁচু ডালে সুবিধামত স্থানে খড়কুটা জড়ো করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসার মধ্যস্থলে পেয়ালার মত গর্ত্তে তিনটি ডিম পাড়িয়া উপরে বসিয়া ডিমে তা দেয়। আমাদের দেশের কাক, চিল, শকুন প্রভৃতি পাখীদের বাসা হেরণের বাসারই অনুরূপ।

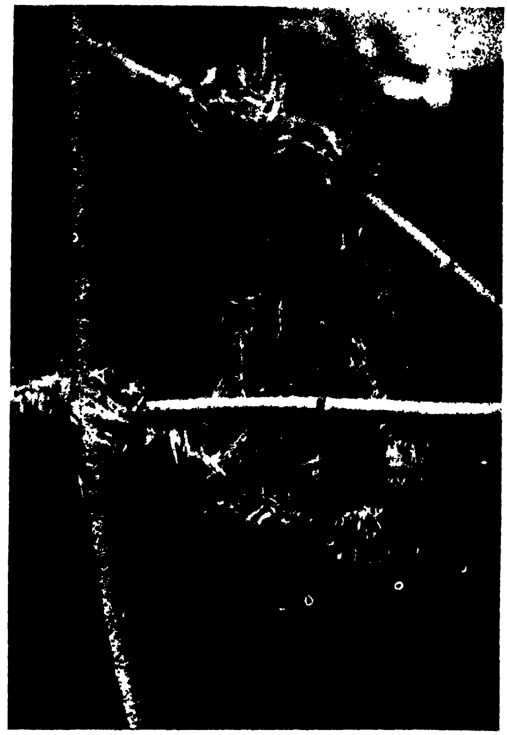
আমাদের দেশের জোকারে পাখী যেরূপ বাসা তৈয়ারী করে তাহা বাহিরের দিকে কতকটা অসংবদ্ধ দেখা গেলেও কাক-চিলের বাসার মত অতটা এলোমেলো নহে। প্রত্যেকটি খড়কুটা ইহারা যত্ন করিয়া বাসার চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া দেয় এবং যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া ভিতরে কোমল গদি নির্ম্মাণ করে। ইহাদের বাসা-নির্ম্মাণে কতকটা নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কুটুম পাখী নামে আমাদের দেশে এক প্রকার পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বাসা নির্ম্মাণে বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়া থাকে। ডিম পাড়িবার সময়

হইলেই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া স্থান নির্ব্বাচন করিতে বাহির হয়। উঁচু গাছের বেশ ফাঁকা জায়গায় এমন একটি শক্ত অথচ সরু ডাল নির্ব্বাচন করে যাহার একটি গাঁট হইতে দুইটি সরু ডাল প্রায় পাশাপাশি ভাবে বাহির হইয়া গিয়াছে। নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি বৃক্ষপত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফালি সংগ্রহ করিয়া দুইটি ডালে দুই প্রান্ত বাঁধিয়া দোলনার মত বাসা নির্ম্মাণ করে। দুইটি ডালের সঙ্গে এমন শক্ত বাঁধুনি দেয় যে, সহজে খুলিয়া লওয়া দুষ্কর। বাসা নির্ম্মাণ শেষ হইলে দোলনার ধারগুলি বেশ করিয়া বুনিয়া মুড়িয়া দেয়। পাখীর পরিত্যক্ত ছোট ছোট পালক বা তুলার মত কোন জিনিষ সংগ্রহ করিয়া এমন ভাবে কোমল গদী তৈয়ারী করে যেন ডিম বা বাচ্চার গায়ে কোন আঘাত না লাগে।

কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝারি গোছের ফিঙে জাতীয় কালো রঙের এক প্রকার পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালক সংগ্রহ করিয়া প্রায়ই চওড়া কার্ণিশের নীচে বাসা তৈয়ারী করিয়া থাকে। থুথু অথবা অন্য কোন আঠালো পদার্থের সাহায্যে পালকগুলি আঁটিয়া ভিতরে ঠিক 'পকেটে'র মত গর্ত্ত রাখিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। দলবদ্ধ ভাবে এক স্থানে বাস করাই ইহাদের স্বভাব। বাসাগুলি একটা আর একটার গায়ে লাগাইয়া তৈয়ারী করিয়া থাকে। হঠাৎ দেখিয়া পাখীর বাসা বলিয়া মনেই হয় না। যেন কতগুলি পালক এলোমেলো ভাবে এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া রাখা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণতঃ পাখীরা ডিম ও বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই বাসা নির্ম্মাণ করে, কিন্তু এমন কতকগুলি পাখী দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বাস করিবার উদ্দেশ্যেই বাসা বাঁধিয়া থাকে এবং এরূপ স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণে তাহারা যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও আবার যথেষ্ট সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির কুঞ্জপাখীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন কোন জাতীয় কুঞ্জপাখী জঙ্গলের একটা স্থান নির্ব্বাচন করিয়া অনেকে মিলিয়া তাহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। মধ্যস্থানে সাধারণ আঙিনার মত একটি স্থান রাখিয়া দেয়। অবসর মত সকলে মিলিয়া সে-স্থানে খেলা করে এবং পুরুষ-পাখীরা



কুটুম পাখীর বাসা

স্ত্রী-পাখীদের মনোরঞ্জনার্থ সে-স্থানে আসিয়া নৃত্য করে। কোন কোন জাতীয় কুঞ্জপাখী আবার মধ্যস্থলে প্রশস্ত আঙিনা ঘেরিয়া গ্যালারীর মত করিয়া গায়ে গায়ে বাসা বাঁধিয়া থাকে। নানা প্রকার সুদৃশ্য পাখীর পালক, উজ্জ্বল কাচের টুকরা, ছোট ছোট সুদৃশ্য শামুক বা ঝিনুকের খোলা সংগ্রহ করিয়া তাহারা বাসার চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া রাখে। অন্য আর এক জাতীয় কুঞ্জপাখী তাহাদের বাসগৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানা জাতীয় রঙীন ফুল, ছোট ছোট সুদৃশ্য ফল এবং রং-বেরঙের পোকামাকড় সংগ্রহ করিয়া আনে। শুষ্ক হইয়া গেলে সেগুলি ফেলিয়া দিয়া

আবার নূতন জিনিষ খুঁজিয়া আনিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করে।

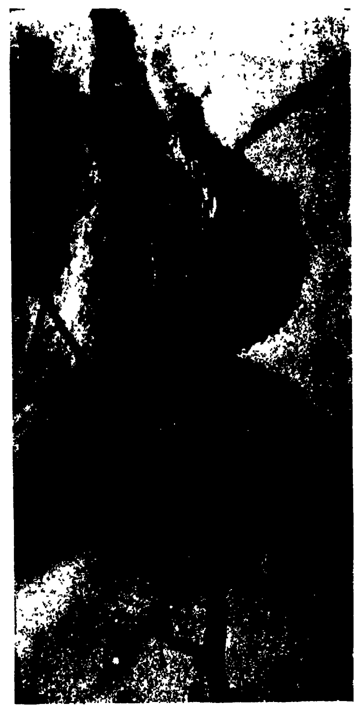


ফিঙে পাখী

দক্ষিণ-আফ্রিকায় এক প্রকার বয়নকারী পাখী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের শত শত পাখী একত্র হইয়া এক ডালে খড়কুটা ও কাদামাটির সাহায্যে বাসা বাঁধে। পরিবার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসার আয়তনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্ষায় জলে ভিজিয়া যখন বাসা ভারী হইয়া উঠে তখন ডাল যত শক্তই হউক না কেন অধিকাংশ স্থলেই তাহা ভাঙিয়া পড়ে। দল ছাড়িয়া সহজে নূতন বাসগৃহ পত্তন করিতে চাহে না বলিয়াই উহাদের এরূপ দুর্গতি ঘটে।

বয়নকারী ফিঞ্চ্ নামে এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় পাখীও এক স্থানে অনেকে মিলিয়া বাসা বাঁধিয়া থাকে। শক্ত সরু ডালের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া লম্বা পত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুর সাহায্যে বিভিন্ন আকৃতির গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করে। অধিক দিন নিরুপদ্রবে বাস করিবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে বাসাটিকে বেশ মজবুত করিয়া গড়িয়া তোলে।

বয়নকারী পাখীদের মধ্যে আমাদের দেশের টুনটুনী পাখীর বাসা-নির্ম্মাণ-কৌশল অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। 'সেলাই' কথাটায় যাহা বুঝায়, পাখীরা ঠোঁটের সাহায্যে সেরূপ কিছু করিতে পারে, ইহা সত্যই অদ্ভুত মনে হয়। টুনটুনী পাখী কিন্তু সত্যসত্যই এরূপ ভাবে সেলাই করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহারা বাস করিবার জন্য বাসা বাঁধে না। বাচ্চা উড়িতে শিখিলেই বাসা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। টুনটুনী ক্ষুদ্রকায় পাখী, প্রায় দুই ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ঠোঁট সূচের মত সূক্ষ্মাগ্র। ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের আড়ালে খুব চওড়া কোন একটা সবুজ পত্র নির্ব্বাচন করিয়া বাসা বুনিতে সুরু করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা পাতা মুড়িয়াই বাসা বাঁধে; তেমন অসুবিধা বুঝিলে সময় সময় দুই-তিনটা পাতারও সাহায্য লইয়া থাকে। গাছের যে-পাতাটির শীঘ্র ঝরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই এবং বাহির হইতে সহজে নজরে পড়িবে না, এরূপ একটি পাতা ঠিক করিয়া প্রথমতঃ সরু ঠোঁটের সাহায্যে তাহার দুই ধারে এবং মধ্যস্থলে



ফিঞ্চ নামক এক জাতীয় পাখীর বাসা

এলোমেলো ভাবে কতকগুলি ছিদ্র করিয়া দেয়। ছিদ্র হইয়া গেলে বাহির হয় সুতা খুঁজিতে। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক সময়েই বড় মাকড়সার জালের শক্ত সুতা

সংগ্রহ করিয়া আনে। তার পর বোঁটার দিকে পাতার ধারের ছিদ্রটির মধ্যে ঠোঁটের সাহায্যে সুতার একটা প্রান্ত প্রবেশ করাইয়া দেয়। পরে তলার দিক হইতে সুতাটাকে টানিয়া বাহির করে। ইহার ফলে অসংবদ্ধ



একটি পত্র জুড়িয়া টুনটুনি পাখী বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে

সুতার বিচ্ছিন্ন অংশগুলির সবই ছিদ্রপথে গলিয়া আসিতে না পারায় প্রান্তভাগে একটা গেরোর মত হইয়া যায়। এই গেরোর জন্য টান পড়িলেও সুতার প্রান্তভাগ বাহির হইয়া আসিতে পারে না। তৎপরে পাতার অপর ধারে সুতাটাকে ঠোঁট দিয়া ছিদ্রপথে ঠেলিয়া অন্য দিক হইতে টানিয়া লয় এবং প্রান্তভাগ ঠোঁট দিয়া একটু ছড়াইয়া চাপিয়া বসাইয়া দেয়। এইরূপে বোঁটার দিক হইতে নিম্নভাগ পর্য্যন্ত পাতাটাকে পিছনের দিকে মুড়িয়া খড়কুটা যোগাড় করিতে বাহির হয়। নারিকেলের বাগরোর পর্দার মত বেষ্টনী হইতেই অনেক সময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুগুলি সংগ্রহ করিয়া সুগভীর পেয়ালার মত বাসা গড়িয়া তোলে। খোল নির্ম্মাণ শেষ হইলে তুলার সন্ধানে বাহির হয়। তুলা অথবা কোমল পালক দিয়া বাসার ভিতরে গদির মত তৈয়ারী করে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলিয়া একযোগে কাজ করে। আবার অনেক সময় এক জন বাসা বুনিতে থাকে, অপরটি মালমশলা সংগ্রহ করিয়া আনে।

আমাদের দেশের বাবুই পাখী বাসানির্ম্মাণে সর্ব্বাধিক নিপুণতার পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা সামাজিক পাখী। সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করে। তাল গাছেই ইহাদিগকে সাধারণতঃ বাসা নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়। এক একটা গাছে সময় সময় পঞ্চাশ-ষাটটা বাসা ঝুলিতে দেখা যায়। অন্যান্য পাখীর বাসার মত ইহাদের বাসাগুলি দেখিতে একরূপ নহে। অনেক স্থলেই বিভিন্ন আকৃতির বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বেশীর ভাগ ভাল বাসাই সাপুড়েদের বাঁশীর আকৃতি-বিশিষ্ট। মনে হয় যেন বড় বড় এক একটা সাপুড়ে বাঁশী



বাবুই পাখী
[লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো]

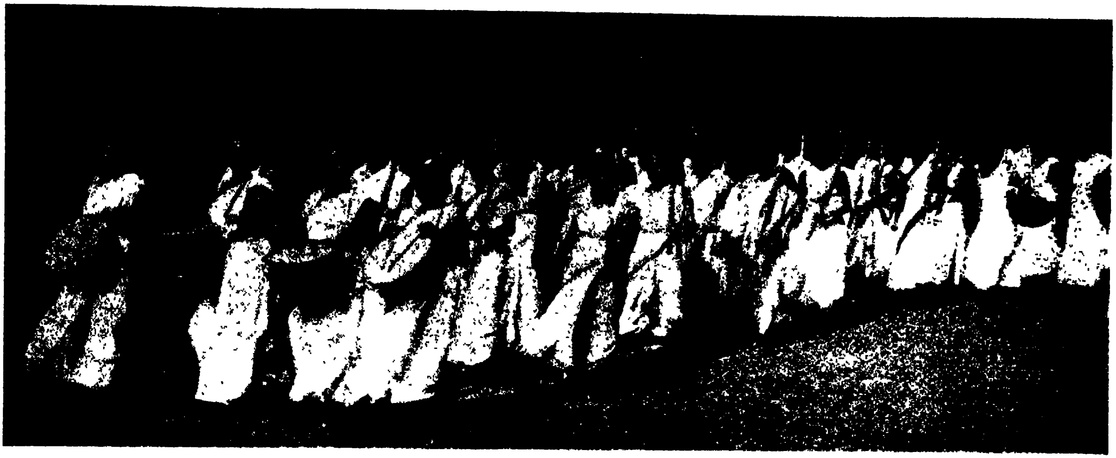
তালপত্রের অগ্রভাগ হইতে ঝুলিতেছে। লম্বা নলের মত বাসার প্রবেশ-পথ নীচের দিকে থাকে। বাসার উপরের দিক সরু, মধ্যস্থল রবারের বেলুনের মত ক্রমশঃ গোলাকার হইয়া নীচের দিকে আবার সরু হইয়া আসে। মধ্যস্থলের স্ফীত অংশের অভ্যন্তরে একপাশে পেয়ালার মত একটি



বাবুই পাখীর ঝুলানো বাসা
[লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো]

গর্ত্ত থাকে। এই গর্ত্তের মধ্যেই বাবুই পাখী সাধারণতঃ তিনটি ডিম পাড়িয়া রাখে। বাচ্চা ফুটিয়া উহার মধ্যেই ঠেসাঠেসি করিয়া অবস্থান করে। গর্ত্তের বিপরীত পার্শ্বে বারান্দার মত ছোট্ট একটু স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বাচ্চাগুলি গর্ত্ত হইতে উঠিয়া আসিয়া সে স্থানেই মল পরিত্যাগ করে। বাসাগুলি লম্বায় দেড়হাতেরও বেশী। এই ধরণের বাসাগুলি তাহারা বাচ্চাদের ব্যবহারের জন্যই নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে একটা বাসার নিম্নভাগ হইতে আর একটা বাসা গাঁথিয়া দুই পরিবার থাকিবার ব্যবস্থা করে। সেই অবস্থায় এক-একটা বাসা প্রায় তিন হাত সাড়ে তিন হাত লম্বা হয়। বাবুই পাখীর বিশ্রামগৃহ বাচ্চাদের বাসা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কোন কোন বিশ্রামগৃহ হয় রবারের বেলুনের মত ডিম্বাকৃতি। ইহার মধ্যস্থলে বেশ বড় প্রবেশ-পথ রাখিয়া দেয়। নীচের দিক সম্পূর্ণ বন্ধ এবং অভ্যন্তরে উপরে নীচে ফাঁকা। এইরূপ বাসার মধ্যে তাহারা সময়ে সময়ে ডিম পাড়িয়াও থাকে। আর এক প্রকারের বিশ্রাম-গৃহের নমুনা অদ্ভুত। ইহা অনেকটা ঘণ্টার মত দেখিতে। ঘণ্টাটি মজবুত বোঁটার সঙ্গে ঝুলিয়া থাকে। অভ্যন্তর-ভাগ সম্পূর্ণ ফাঁকা। ঘণ্টার নিম্নমুখে এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত একটা দাঁড় বুনিয়া দেয়। ইহার উপর বসিয়াই তাহারা বিশ্রামসুখ উপভোগ করে এবং রাত কাটাইয়া দেয়। এই ঘণ্টাকৃতি বাসাও সকলগুলি এক রকমের নহে। এক-একটা এক এক প্রকার আকৃতি ধারণ করে।

যে তাল গাছে বাবুই পাখী বাসানির্ম্মাণ করে তাহার আশেপাশে বহুদূর পর্য্যন্ত সুপারি বা ওই জাতীয় গাছের পাতা আর অবিকৃত দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুপারি পাতার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফালি ছিঁড়িয়া লইয়া আসে। ফিতার মত এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফালির সাহায্যে তালপাতার ডগার প্রায় হাতখানেক উপর হইতে বাসা বাঁধিতে সুরু করে। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর ক্রমশঃই বাসার পরিধি বিস্তৃত হইতে থাকে। তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া একযোগে বোনা আরম্ভ করে। একটি পাখী বাসার ভিতরে অপরটি বাহিরের দিকে থাকিয়া পত্রের তন্তুগুলি সেলাই করিয়া গাঁথিয়া দেয়। বাহিরের পাখীটি ঠোঁটের সাহায্যে ফিতার এক প্রান্ত ভিতরে গুঁজিয়া দেয়; ভিতরের পাখীটি আবার সেই প্রান্ত টানিয়া লইয়া অন্য ছিদ্রপথে বাহিরে ঠেলিয়া দেয়। এই ভাবে উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সাত-আট দিনের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ বাসা গড়িয়া উঠে। তৈয়ারী হইবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত বাসাটা সবুজ এবং ভারী থাকে, কিন্তু শুষ্ক হইতে হইতে ক্রমশঃ রং বদলাইয়া যায় এবং ওজনেও খুব হাল্কা হইয়া পড়ে। ঝুলানো হাল্কা বাসায় ঝড়ের ভয় খুব বেশী। কারণ একটু বাতাসেই বাসা ভয়ানক দোল খাইতে থাকে। ঝড়ের বেগে বাসা ছিঁড়িয়া না গেলেও ওলটপালট হইলেই ডিম অথবা বাচ্চা পড়িয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সংস্কার বশেই হউক অথবা অভিজ্ঞতার ফলেই হউক, মনে হয় যেন এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই তাহারা বাসার ভিতরে খানিকটা কাদামাটি জুড়িয়া দেয়। এই মাটির ভারে বাসাটা অনেকটা স্থির ভাবে থাকে, দোলন কম হয়। বাবুই পাখী বংশানুক্রমে একই গাছে বাসা বাঁধিয়া থাকে এবং সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাসস্থানের চতুর্দ্দিক কলরবে মুখরিত করিয়া তুলে। রাতদিন চেঁচামেচিতে মনে হয় যেন সর্ব্বদা ইহাদের একটা উৎসব লাগিয়াই আছে। আবার ঝগড়া-মারামারিতেও ইহারা কম যায় না। সেই ভীষণ কলরবে মানুষের কান ঝালাপালা হইয়া উঠে।



ব্রতচারী বালিকাগণ কৃত্যালির জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন

নারী-প্রগতি ও ব্রতচারী আন্দোলন

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

বর্ত্তমান নারী-প্রগতির যুগে পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়া ভারতীয় নারী যথেষ্ট উন্নতি করিলেও সাধারণ স্বাস্থ্যের দিক্ হইতে তাঁহারা যে এখনো অনেক পশ্চাতে এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানাবিধ শরীরচর্চ্চার ফলে পাশ্চাত্য রমণী যে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারিণী তাহা ভারতীয় নারীর প্রলোভনের বস্তু হইলেও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সে আজ পর্য্যন্ত কোন সজ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা করিয়াছে বলা যায় না। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় আমাদের মেয়েরা স্বাস্থ্য বিষয়ে নিতান্ত নিম্নস্তরে অবস্থান করিলেও নানাবিধ দেশাচার এবং সংস্কার বশতঃ, উন্মুক্ত স্থানে ব্যায়ামাদি দ্বারা মাতৃজাতির স্বাস্থ্যোন্নতির কোন সুচিন্তিত এবং সমবেত চেষ্টা হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় প্রতীচ্যে স্ত্রীজাতির পুরুষদের মত খেলাধূলায় যোগ দেওয়া বা পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও বিনা ব্যয়ে, বিনা আড়ম্বরে এবং অল্পায়াসে দেশীয় পদ্ধতিতে, দেশের প্রকৃতি-ও সংস্কৃতি-গত আনন্দময় ব্যায়ামক্রীড়াদিদ্বারা স্ত্রীলোকদের শরীর ও মন গঠন করা সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আমাদের দেশীয় লোকনৃত্যগুলির কিছু কিছু সংস্কার সাধন করিয়া ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। নৃত্য এবং সাবলীল অঙ্গসঞ্চালনের মধ্য দিয়া শরীরচর্চ্চার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট পদ্ধতির কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত দত্ত বাল্যজীবনে পল্লীবাসী জনগণের মধ্যে আনন্দ-উৎসবের দিনে নানাবিধ নৃত্য-অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই আনন্দোৎসবের দৃশ্য তাঁহার শিশু-চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু বাল্যে যাহা কেবল উৎসব-আনন্দের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে হইয়াছিল



ব্রতচারী বালিকাগণ "বাংলা ভূমির মাটি" গান করিতেছেন

প্রৌঢ় বয়সে সেগুলির বৃহত্তর উদ্দেশ্য এবং কার্য্যকারিতা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল। তাহার ফলেই ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্ত্তন।

জাতীয় স্বাস্থ্য সংগঠন ছাড়াও ব্রতচারী-প্রচেষ্টার বৃহত্তর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য রহিয়াছে। জাতিগত ও দেশগত ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রী স্থাপনের ব্যাপক উদ্দেশ্য এবং বিশেষ করিয়া ইহার সংস্কৃতিমূলক পরিণতি ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্ত্তককে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। অতি অল্পকালের মধ্যে তাই এ প্রচেষ্টা বাংলার সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও সমাদর লাভ করিয়াছে।

ব্রতচারী নৃত্যের মধ্য দিয়া এরূপ দেশীয় পদ্ধতিতে বালিকা, বয়স্থা ও প্রবীণা সকল বয়সের নারী নিজেদের মধ্যে সরল ও আধ্যাত্মিকভাবে সুষ্ঠু ও সাবলীল অঙ্গসঞ্চালন এবং ছন্দময় ব্যায়াম করিতে পারেন। উন্মুক্ত আকাশতলে আনন্দময় নৃত্যানুষ্ঠানের দ্বারা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্যকরূপে পরিচালিত হয় এবং তজ্জন্য সমভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতি সহজে পুষ্টিলাভ করে। সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টির জন্য ক্ষিপ্রতা, দক্ষতা ও শক্তি বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে মেয়েরা সহজে স্বাস্থ্যবতী, শক্তিময়ী এবং পবিত্রভাবাপন্না হইয়া থাকেন।

ব্রতচারী প্রণালীর নৃত্যগীত বাস্তবিক পক্ষে সাধারণ জাতীয় নৃত্যগীত নহে এবং শরীরচর্চ্চাদ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। যুগ-যুগান্তর হইতে আমাদের দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সকল আনন্দময় নৃত্যানুষ্ঠান দৈনন্দিন কর্ম্ম ও উৎসবের সহিত বিজড়িত ছিল সেগুলিই এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া শিক্ষা-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহাদের সংস্কৃতিগত সার্থকতা রহিয়াছে।

এক কালে পল্লীর উন্মুক্ত আকাশতলে মুক্ত হাওয়ায় সকল বয়সের মেয়েরা নিজেদের মধ্যে এই সকল নৃত্য শিক্ষা ও অনুশীলন করিত। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা কোন বিশেষ অন্তঃপুরের আঙিনায় সমবেত হইয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিত। ইহা ছাড়া নিজ নিজ গৃহেও দৈনন্দিন গৃহকার্য্যসমাপনান্তে বধূগণ নৃত্যগীতের দ্বারা মনের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করিত। বালিকারা বয়ঃপ্রাপ্তা আত্মীয়াদের বা প্রতিবেশিনীদের নিকট এই সকল নৃত্য শিক্ষালাভ করিত। বালক ও যুবকেরা প্রাপ্তবয়স্কদের



মহিলাদের ব্রতচারী-শ্রেণী

উপরে : মহিলা ব্রতচারীদের 'বাংলা ভূমি' গান। মধ্যে : মহিলা ব্রতচারীদের জারি-নৃত্য। নীচে : রাইবেঁশে নাচ



চীন-জাপান যুদ্ধের বলি তরুণ জাপানী সৈনিকদিগকে চন্দ্রমল্লিকা ফুলে শোভিত করা হইয়াছে।



চীন-জাপান যুদ্ধে নিহত জাপানীদের স্মৃতিকল্পে জাপানে প্রার্থনা।



জাপানী রমণীরা সৈনিকদিগকে নানাবিধ উপহার দিতেছে।



নিহত সৈনিকের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি দ্বারা একটি ঘর সাজাইয়া পরিবারে তাহার স্মৃতিরক্ষা করা হইতেছে।

সহিত নৃত্য করিত এবং এইরূপে বংশানুক্রমে এই শিক্ষা চলিয়া আসিত। স্বচ্ছন্দগতিমূলক এই ব্যায়ামক্রীড়াগুলি ঐশ্বর্য্য, জাতি ও বয়সের ব্যবধান দূর করিয়া ব্যষ্টির ও সমষ্টির মধ্যে ঐক্য, সাম্য ও আনন্দের সৃষ্টি করিত।

সকল দেশেই লোক-নৃত্য এবং লোক-সংস্কৃতি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে। দেশের ইতিহাস, শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় এই সকল সঙ্গীত, ছড়া ও নৃত্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। জাতীয় চিন্তা ও ভাবধারা এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের জীবন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ এই লোক-নৃত্য ও গাথাগুলি মানুষের মনে জাতীয়তাবোধ এবং দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তোলে। কিন্তু আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভাব পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগের ফলে এই সকল গাথা ও লোক-নৃত্য প্রভৃতি বিশেষভাবে অবজ্ঞাত হইয়াছে। শিক্ষাভিমানী অভিজাত সম্প্রদায় এবং তাহাদের অনুকরণে মধ্যবিত্তশ্রেণীসমূহ ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও এক সময় লজ্জাবোধ করিতেন। এইরূপে বাংলার শিক্ষিত সমাজ ক্রমে জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছিল। কতিপয় "অর্দ্ধশিক্ষিত" ও "অশিক্ষিত" গ্রামবাসীদের কল্যাণে এই সকল জিনিষ একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। ব্রতচারী নৃত্যের মধ্য দিয়া ইহাদের পুনঃপ্রবর্ত্তনের ফলে বাংলার শিক্ষিত সমাজ বাংলার একান্ত নিজস্ব এবং অতি মূল্যবান যে বস্তুটিকে অবজ্ঞায় দূরে সরাইয়া দিয়া একেবারে হারাইতে বসিয়াছিল তাহাই ফিরিয়া পাইবার সুযোগ লাভ করিল।

কিন্তু শিক্ষিত সমাজের অবজ্ঞার অন্তরালে থাকিয়াও ইহারা নিজেদের স্বভাবজাত বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ইহার কারণ এগুলি দেশের নিজস্ব জিনিষ। দেশের স্ব-ধারা স্ব-ভাবে ইহারা প্রতিষ্ঠিত, দেশের মাটি হইতে ইহাদের উদ্ভব এবং দেশের নাড়ীর সহিত ইহাদের নিবিড় যোগসূত্র রহিয়াছে। তাই বাঙালীর হাতে ইহার কোন বিকৃতি ঘটে নাই। বাংলার একান্ত নিজস্ব এই সকল নৃত্য যে বাংলার ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী একথা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে ব্রতচারী-প্রণালীর ব্যায়াম ও ক্রীড়া সবিশেষ উপযোগী, কারণ ইহা আমাদের মেয়েদের স্বাভাবিক শালীনতা নষ্ট না করিয়া লঘু পরিশ্রমের মধ্য দিয়া শরীর ও মনের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে। দেশের মাটি হইতে উদ্ভূত সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের উপযোগী এই ব্যায়াম-পদ্ধতি একাধারে শারীরিক উন্নতি সাধন করিবে এবং নিজস্ব কলা ও ক্রীড়া-পদ্ধতির প্রতি অনুরাগ জাগাইয়া তুলিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোককে গভীর ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করিতে সহায়তা করিবে।

একখানি ইংরেজী পত্রিকায় কিছু দিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার স্ত্রীলোকদের শরীরচর্চ্চায় ব্রতচারী নৃত্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত মজুমদার বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্রতচারী-প্রচেষ্টাই সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীলোকদের শরীরচর্চ্চার নির্দ্দোষ পথ প্রদর্শন করিয়াছে। ব্রতচারী সম্পর্কিত শরীরচর্চ্চাপ্রণালী আদর্শ-স্থানীয় এবং স্ত্রীলোকদের, বিশেষতঃ ভারতীয় মহিলাদের, পক্ষে বিশেষ উপযোগী। স্ত্রীলোকদের শরীরচর্চ্চা-বিষয়ে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মত এই যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যায়াম বা প্রতিযোগিতামূলক খেলা তাহাদের পক্ষে সবিশেষ ক্ষতিকর এবং ইহা দ্বারা স্ত্রীলোকদের পুরুষের সমকক্ষ করিতে গেলে তাহাদের মধ্যে একটি অস্বাভাবিক শারীরিক গঠন ও মনোবৃত্তির সৃষ্টি করা হয় মাত্র। নারী-দেহের অনুপযোগী ব্যায়াম তাহার স্বাভাবিক কমনীয়তা নষ্ট করিয়া নারীকে কঠোর এবং পুরুষভাবাপন্ন করিয়া তোলে। পক্ষান্তরে ব্রতচারী-প্রবর্ত্তিত দেশীয় ছন্দোবদ্ধ নৃত্যের দ্বারা স্ত্রী-দেহের যে উপকার হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাংলার স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, এই সকল ব্যায়ামের দ্বারা তাহারা দেহের কমনীয়তা, যৌবনের তেজ, শারীরিক শক্তি ও ক্ষিপ্রতা লাভ করিতেছে।

শ্রীযুক্ত দত্ত মেয়েদের জন্য যে ব্রতচারী নৃত্যানুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন সেখানে বর্ত্তমানে বহু শিক্ষয়িত্রী ও বয়ঃপ্রাপ্তা, মহিলা এবং বালিকা ব্রতচারী প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। মাতৃজাতির উন্নতি ব্যতীত দেশের

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর নহে এবং মাতৃজাতি সবল না হইলে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণও সবল হইতে পারে না। জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়ক এই অনুশীলন-শ্রেণীগুলি এইরূপে দেশের পরম উপকার সাধন করিতেছে। এই অনুশীলন-শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে মেয়েদের শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য দেশীয় প্রণালীতে ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত শিক্ষার্থিনীদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। এক দিকে তাহারা যেমন দেশীয় খেলা, ব্যায়ামাদি ও প্রাথমিক শুশ্রূষা শিক্ষা করে, অন্য দিকে দেশের প্রাকৃতিক ভূগোল, পুরাতন কাহিনী, গ্রামোন্নয়নপ্রণালী, খাদ্যতত্ত্ব, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মানিবারণী উপায় প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রতচারী আদর্শ পালন, পঞ্চব্রত অনুসরণ, 'পণ' 'মানা' প্রতিপালন দ্বারা যেমন তাহাদের জীবন গঠিত করিয়া পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য মূল্যবান নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয় তেমনি আবার ব্রতচারী 'মৌজালি'র মধ্য দিয়া দৈনন্দিন জীবনে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলাফেরা, সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করা এবং সহিষ্ণুতা ও ক্ষিপ্রতা লাভ করার বিধিগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে ব্রতচারিণীদের নৃত্যানুষ্ঠান এবং অন্যান্য কার্য্যাবলীর কয়েকটি ছবি প্রকাশিত হইল। বাংলার যাবতীয় নিজস্ব জাতীয় পল্লীশিল্পের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইতে প্রত্যেক ব্রতচারীকে অনুপ্রাণিত করা হয়। শ্রীযুক্ত দত্তের পরিচালনায় এই সুচিন্তিত দেশীয় শিক্ষাপ্রণালী দেশের সমগ্র স্ত্রীজাতির কল্যাণ সাধন করিতেছে ইহাতে সন্দেহ নাই।



নৃত্যশিক্ষায় রত মারিয়ো

['বলিদ্বীপের নৃত্যকলা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

বলিদ্বীপের নৃত্যকলা ঃ 'কবিয়ার' নৃত্য

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

[বালিতে গিয়ে অবাক হলাম সেখানকার সমাজে শিল্পের স্থান কতখানি সহজ হয়েছে তাই দেখে। দেখলাম, বালির হিন্দুরা



বালির গ্রামের বালক-শিল্পী মন্দিরের জন্য পাথরে মূর্ত্তি গড়ছে

এখনও সচল ও প্রাণবান। তারাও ধর্ম্মভীরু জাত, কিন্তু ধর্ম্ম তাদের মনের স্বাভাবিক শিল্পবোধকে নষ্ট করে নি। এখনও গ্রামে গ্রামে শিল্পীরা ছবি আঁকছে—কাপড়ের উপরে, কাগজে বা দেয়ালে। আধুনিক তুলি বা রঙের খবর অনেকেই রাখে না, বাঁশের কঞ্চি নিয়ে কলমের মত একটা দিক কেটে নেয়, তাতে নানা প্রকার সূক্ষ্ম লাইন টানার কাজ চলে, অপর দিকটা থেঁৎলে তুলির মত নরম ক'রে নিয়ে ছবিতে রং বুলায়, রং প্রস্তুত করে নানা বর্ণের পাথর ঘষে। বহু গ্রাম্য শিল্পীর ছবি বর্ত্তমান অনেক আধুনিক ছবির সমান সম্মান লাভের যোগ্য। প্রাচীন পদ্ধতিতে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প অবলম্বনে ছবি আঁকার যেমন চলন আছে তেমনি তাদের বর্ত্তমান প্রতিদিনের জীবনের ছবিও তারা আঁকছে নিজেদের চিত্রকলার ধারা ধারা ও আদর্শটিকে বজায় রেখে। কাঠের ও পাথরের মূর্ত্তি গড়ায়ও এদের ক্ষমতা অসামান্য।

এদেশের মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার স্থাপত্যশিল্পের একটি বিশেষ গৌরবের জিনিষ। বালির মন্দিরগুলি যদি কেউ পরীক্ষা করেন, লক্ষ্য করবেন প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির কতখানি তফাৎ। দক্ষিণ-ভারতের প্রায় সব বিখ্যাত মন্দিরগুলি দেখে আমার একটা ধারণা হয়েছে যে, সে-দেশের যে-কোন দু-একটি বড় মন্দির দেখলে আর অন্যান্য মন্দির ও তার কারুকার্য্য না দেখলেও চলতে পারে। বালির মন্দিরের প্রবেশ-তোরণে কিন্তু কারুকার্য্যের বৈচিত্র্য যথেষ্ট।

বালির শিল্পকলা কোন বিশেষ স্থানে বা পরিবারে আবদ্ধ নয়। প্রতি গ্রামেই প্রতিদিনই তা গড়ে উঠছে। সব সময় মানুষের চাহিদা মেটানোই যে এদের উদ্দেশ্য তা মনে হয় নি। এদের নিজেদের প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিষটিকেও সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকার্য্যের দ্বারা তৈরী করে নেয়।

পৃথিবীর যে-কোন দেশের দরিদ্র গ্রামবাসীদের সঙ্গে তুলনা করলে এ-কথা না বলে পারা যায় না যে, এরা একটা আশ্চর্য্য রকমের স্বভাব-শিল্পী জাত। আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাধারণ ভারতবাসীদের অনেকের চেয়েও এদের রসবোধ অনেক উন্নত, আমার এই রকম মনে হয়েছিল। এদের সমাজে শিল্পের স্থান এত সহজ হয়ে গেছে যে অনেক সময় তারা নিজেরাই অবাক হয় যখন দেখে, বিদেশীরা তাদের নানা প্রকার শিল্পরচনা দেখে অবাক হয়।

বলিদ্বীপের জনসমাজের সঙ্গে শিল্পকলার সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য এই পর্য্যন্ত; এখন নৃত্যকলায় তাদের এই সৃষ্টিশীল শিল্পী-মন কি ভাবে কাজ করছে তার কিছু পরিচয় দিই।]

ঐকথা অনেকেই শুনে থাকবেন যে বালির নৃত্যাভিনয় ও গামেলান সঙ্গীত একান্তভাবেই তাদের সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজনের বিষয়। এ দুটি না হ'লে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না। এ-সব নৃত্য বা নৃত্যাভিনয় ও গামেলান সঙ্গীত অনেক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।



মন্দিরের প্রবেশ-তোরণ, বালি

কোন কোন ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য রকমের পরিবর্ত্তন ও নূতনত্ব এসেছে। তাদের সকল চেষ্টার মধ্যেই সব সময়েই নূতন সৃষ্টির প্রবল ইচ্ছাটাই প্রকাশ পেয়েছে, ক্রমাগত একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি করে তারা খুশী থাকে নি।

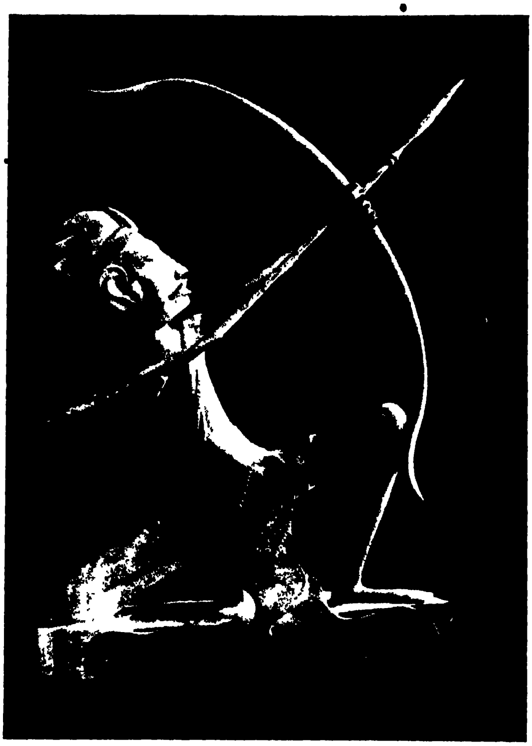
বালির প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যকলা অভিনয়প্রধান। কিন্তু তা ব'লে কেউ যেন মনে না করেন যে বালির নৃত্য দক্ষিণ-ভারতের কথাকলি-মুদ্রাভিনয়ের মত; বরঞ্চ মণিপুরী বা কথক-নাচিয়েদের অভিনয়ের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এরা যতটা সম্ভব দেহের ভঙ্গীর সঙ্গে ভাবের মিল রাখবার চেষ্টা করে। মণিপুরী নৃত্যাভিনয়ের মত অভিনেতারা স্বাভাবিক ভাবে প্রাচীন বালি ভাষায় কথা ব'লে অভিনয় করে। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে পায়ের ছন্দ, হাতের ও দেহের সহজ ভঙ্গীতে এদিক-ওদিক নড়ে চড়ে বেড়ায়। অভিনয়ই এর মুখ্য উদ্দেশ্য, পায়ের ছন্দটা এখানে গৌণ। এমন কি গামেলান সঙ্গীতেরও সেখানে বিশেষ স্থান নেই, তার ব্যবহার খুবই সামান্য।

এই ধরণের নৃত্যকলার পরিবর্ত্তন প্রথম আরম্ভ হয় "লেগং" নাচের ভিতর দিয়ে; এখানে নৃত্যকলা অনেক খানি মুক্তি পেল। সেই সঙ্গে গামেলান সঙ্গীতেরও অনেক পরিবর্ত্তন হ'ল। লেগং নাচ সম্বন্ধে গত সংখ্যায় লিখেছি; এ-নাচে দেহভঙ্গীর সঙ্গে ভাবের একটা মিলন সাধনের চেষ্টা সুরু হয় গামেলান সঙ্গীতকে লক্ষ্য ক'রে। এই নাচের সঙ্গে একটি গল্পের যোগ আছে এবং একে নৃত্যাভিনয়ের দলে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু এ নৃত্যাভিনয়ে অভিনেতারা একেবারেই কথা বলে না। এ নাচের সঙ্গে প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের আকাশ-পাতাল তফাৎ।

যদিও এই পরিবর্ত্তন আজকাল হয় নি, তবুও এ-নাচ বর্ত্তমান চঞ্চল দ্রুতগামী জগতের মানুষের কাছে বিশেষ



গ্রামের মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার, বালি



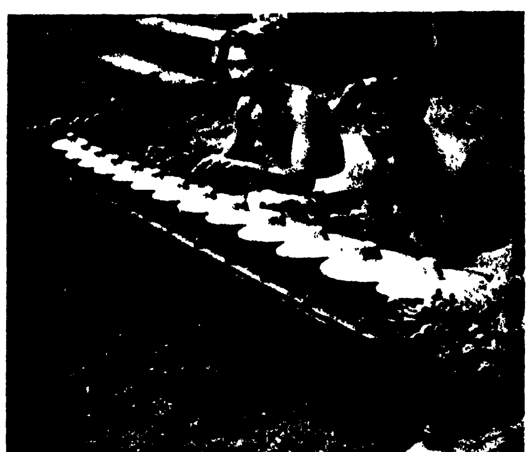
বালির গ্রাম্য শিল্পীর তৈরি মূর্ত্তি

সমাদরের জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বালির একটি শ্রেষ্ঠ নাচ হিসাবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছে।

কিন্তু এ-পর্য্যন্ত এসেই তারা থেমে যায় নি, এর পরেও গামেলান সঙ্গীতে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা চলতে লাগল। এ-দেশে যত প্রকার নৃত্য বা নৃত্যাভিনয় আছে, সেই সব নৃত্যের সময় গামেলান যন্ত্র ব্যবহারের একটা নিয়ম দেখা যায়। কোন নাচে মাত্র চারটি যন্ত্র বাজে। কোন নাচে থাকে কেবল ঢোল, করতাল, বাঁশী ও রবাব। কোন নাচে ঢোল বাজাবার নিয়ম ডান হাতে কাঠি নিয়ে। এই ভাবে বিভিন্ন নৃত্যে বিভিন্ন রকমে গামেলান যন্ত্র ব্যবহার করে। বিভিন্ন নাচে যন্ত্রসমষ্টির সঙ্গীতের বিভিন্ন নাম তারা দিয়েছে। যেমন লেগং নাচের গামেলান যন্ত্রের সংখ্যা প্রায় কুড়িটির উপর; এই যন্ত্রগুলির বাজনার নাম এরা দিল "পেলেগোন্‌গান"। অনেক সময় দেখা গেছে যে-বাজনার সঙ্গে মিলিয়ে নাচ তৈরি হচ্ছে সে-নাচের নামও একই থাকে। তার একটি বড় উদাহরণ হ'ল "গঙ্গ কবিয়ার" বাজনা।

আধুনিক বালি-নৃত্য গামেলান সঙ্গীতের একান্ত অনুগত, সঙ্গীত যে-ভাবে চলবে তাকেও সে-ভাবে চলতে হয়। "গঙ্গ কবিয়ার" বাজনার প্রচলন হ'ল "গঙ্গ গেডে" নামে এক প্রাচীন পদ্ধতির বাজনা থেকে। শোনা যায়, রচয়িতা সেই বাজনার নানা অংশকে বেছে বেছে "কবিয়ার" বাজনার জন্যে সাজিয়ে নিয়েছিলেন, এবং রচয়িতা নিজের বুদ্ধির দ্বারাও অনেক কিছু তাতে যোগ ক'রে দিয়েছিলেন। এই বাজনায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক যন্ত্র এরা ব্যবহার করে, সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশটি। সে-দেশের আর কোন নৃত্যে বা নৃত্যাভিনয়ে এত বাজনা ব্যবহার করতে দেখা যায় না। এই "গঙ্গ কবিয়ার" বাজনার সঙ্গে লেগং নাচের টেকনিককে মেলানোর চেষ্টা হয়েছিল। সেই নাচের নাম "কবিয়ার"ই রাখল। এই নাচ ছোট দুটি মেয়েকে করতে দেখেছি, উত্তর-বালির এক বিখ্যাত গামেলান-দলে, এবং পূর্ব্ব-বালির এক গ্রামে।

এ নাচেও অল্পবয়স্ক বালকবালিকারাই উপযুক্ত ব'লে তারা মনে করে। এ নাচের প্রধান উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হচ্ছে এর সঙ্গে কোন গল্পের প্রয়োজন নাচিয়েরা অনুভব



গামেলান যন্ত্র "রেয়ং"

করে নি। এরা নাচকে সম্পূর্ণ একটি গানের মত ক'রে তৈরি করল, এ নাচের মূল উদ্দেশ্য হ'ল কেবল গামেলান সঙ্গীতকে নাচের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। এই আদর্শেই আধুনিক বালির নৃত্যশিল্প প্রসার লাভ ক'রে চলেছে, প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে এইখানেই তার মূল প্রভেদ। লেগং বা কবিয়ার নাচটি ঠিক কোন্ সময়ে বা কার দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় এ খবর আজকাল কেউ দিতে পারে না, বোধ হয় সে-বিষয়ে পূর্ব্বে কেউ কোন হিসাব রাখবারও প্রয়োজন বোধ করে নি।

গত মহাযুদ্ধের পরে আর একটি নূতন গতানুগতিক নৃত্যপদ্ধতির পুনরাবৃত্তিতে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছিল না। এখন তার মনের সাহসও অনেক বেড়েছে, সে নির্ভয়ে নূতন নৃত্যরচনায় মনোযোগ দিল।

লেগং নাচের "পেলেগোন্‌গান্" সঙ্গীতে আমরা পাই প্রাচীন পদ্ধতির ছায়া। যথা, প্রাচীন পদ্ধতির মত ঢিমা লয়ের বাজনাও মাঝে মাঝে শোনা যায় এবং এর ভিতর দিয়ে মাধুর্য্যের প্রকাশই বেশী ফুটে ওঠে। "গঙ্, কবিয়ার" সঙ্গীত অপেক্ষাকৃত জোরালো। এই শেষোক্ত নাচের গামেলান সঙ্গীতই মারিয়োর নূতন নাচের ভিত্তি।



কবিয়ার নাচের ভঙ্গী

পরিবর্ত্তন এল বালির নৃত্যধারায়। এ নাচের প্রবর্ত্তক মধ্য-বালির একটি গ্রাম্য যুবক, তার নাম মারিয়ো। সে-দেশে সব গ্রামেই নাচের ও গামেলান দল তৈরি করা গ্রামের সমাজের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য; এ বালকের গ্রামে সেই রকম একটি নাচের ও বাজনার দল ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় যখন গামেলান সঙ্গীত ও নাচের অভ্যাস চলত, এই বালকটিও সেখানে যোগ দিত। প্রত্যেক গ্রামেই নাচবাজনা শিক্ষার সুযোগ প্রত্যেকেই পায়, মারিয়ো সে সুযোগ গ্রহণ করেছিল, এবং গ্রামের নাচ-গানের নেতার পরিচালনায় নৃত্যে ও বাজনায় সে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠল।

এই বালক যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন আর

এ-দেশের সব গামেলান সঙ্গীতের রাগিণী বা সুর একটি মাত্র। এই একটি সুরকেই কোন্ দল কত প্রকারে বাজাতে পারে বা বৈচিত্র্য দান করতে পারে সেই চেষ্টাই সুরকার সর্ব্বদা ক'রে থাকে। আমাদের দেশের রাগ-রাগিণী আমরা যখন যন্ত্র-সঙ্গীতে বা কণ্ঠ-সঙ্গীতে শুনি, তখন দেখি, বাজিয়ে বা গাইয়ে দুই লাইনের গৎ বাজানোর পরে কত রকমের ছন্দ, কত রকমের তান, কত রকমের দুরূহ কাজ বাজনায় বা গানে প্রকাশ ক'রে থাকেন। যে যত বেশী এ-ভাবে বৈচিত্র্য আনতে পারে সেই হয় তত বড় গাইয়ে বা বাজিয়ে।

বালির গামেলান সঙ্গীতের পদ্ধতি ঠিক এই ধরণের, যে বৈচিত্র্যের কথা বলছিলাম তা ঠিক এই পথ

ধরেই তারা দেখাবার চেষ্টা ক'রে থাকে। তফাৎ হচ্ছে, কেবল একই বাজনায় যেখানে-সেখানে বিচিত্র রকমের লয়ের পরিবর্ত্তন, যা আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে আমরা দেখি না। "পেলেগোন্‌গান" সঙ্গীতের পর "কবিয়ার" সঙ্গীতই এই দিক থেকে এ-দেশের গামেলান সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করেছে।

সোনালী কাজ-করা চার-পাঁচ আঙুল চওড়া ও পাঁচ হাত লম্বা মোটা কাপড়, কোমর থেকে বুক পর্য্যন্ত খুব টান ক'রে পেঁচিয়ে বাঁধে। মারিয়ো নিজে গায়ে কোন গয়না দেওয়া পছন্দ করে না, কিন্তু তার চেলাদের মধ্যে অনেকেই আজকাল নানা রকমের গয়না ব্যবহার আরম্ভ করেছে। মাথায় থাকে বালি দেশের



গঙ্গ কবিয়ার নাচ

মারিয়োর নূতন রচনায় গামেলান সঙ্গীতের জ্ঞান তাকে অনেক সাহায্য করেছিল। তার মাথায় দিনরাত গামেলান সঙ্গীতের নানা প্রকার ছন্দ, তান-বৈচিত্র্য ঘুরছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ভেবেছে, এর সঙ্গে মিলিয়ে কি ক'রে নূতন উপায়ে নাচ তৈরি করা যায়। এ নাচের নামের কোন পরিবর্ত্তন সে করল না, "কবিয়ার" নামই রাখল। নাচের ধরণে একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন আনল, তা হচ্ছে এই—এ নাচে নাচিয়ে এক জন, নাচের সময় সে কখনও দাঁড়ায় না, মাটিতে পা মুড়ে ব'সে নাচে। অল্প বয়স ও বেশী বয়সের কোন পার্থক্য এ নাচে মারিয়ো রাখল না—যদি শক্তি থাকে সকলেই এ নাচের উপযুক্ত ব'লে গণ্য হবে। নাচিয়ের কাপড় পরার রীতি কাছা-কোঁচা না দিয়ে, এক দিকের আঁচল থাকে অনেকখানি বেরিয়ে; আর একটি

প্রথায় এক রকমের ছোট পাগড়ি, বাতিকের তৈরি, সোনালী কাজ করা। ডান কানে ও মাথায় বড় রঙীন ফুল ব্যবহার করতে দেখা যায়, জবা ফুলের চলনটাই দেখলাম বেশী। অনেকে কোন ফুলই দেয় না। অন্যান্য যে-কোন নাচের সঙ্গে তুলনায় এ নাচের সাজ অতি সাধারণ। এতে পুরুষোচিত দেহ-সৌন্দর্য্য প্রধানত দেখবার বিষয়।

এ নাচে মারিয়ো যাবতীয় পুরুষ-নৃত্যের সুন্দর ভঙ্গীর সঙ্গে লেগং নাচের কলাকৌশলকে মিলিয়ে নিল। এই নূতন নাচের পূর্ব্বে গামেলান সঙ্গীতের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছিল, বিশেষতঃ জোরের দিক থেকে। নাচ তাকেই লক্ষ্য ক'রে গড়ে উঠল; এমন সুন্দর ভাবে মিশে গেল যে নূতন ও অভিনব ব'লে সকলেরই মন আকর্ষণ করল।



বলিদ্বীপের বালিকার নৃত্যভঙ্গী

গামেলান সঙ্গীতের সঙ্গে নাচকে মিলিয়ে দেবার পূর্ব্বে, মারিয়োকে অনেক ভাবতে হয়েছিল যে গামেলান সঙ্গীতের এই নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে কি ভাব প্রকাশ পায়, বা, তা শুনে কি ভাব তার মনে উদয় হয়। সেই ভাবে বিচার ক'রে সঙ্গীতকে সে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করল এবং তার সঙ্গে যেখানে যে-ভাবে দ্রুত, মৃদু, জোরালো, কোমল ইত্যাদি দেহের ও হাতের ভঙ্গী মিলতে পারে সেই ভাবে মেলাল।

এই মিলই মারিয়োর নবপ্রবর্ত্তিত নাচের বৈশিষ্ট্য। যে চেষ্টা আগেকার নাচে আরম্ভ হয়েছিল, সেই চেষ্টা অনেকখানি সফলতা লাভ করল এই নাচের ভিতর দিয়ে। এ নাচ দেখে প্রত্যেকে বুঝতে পারবে যে, গামেলান সঙ্গীতকে প্রকাশ করার জন্যেই এ নাচ তৈরি—সঙ্গীত যেন দেহের ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করছে।

আজ মারিয়ো বয়সে চল্লিশের কাছাকাছি, যুবা বয়সে এই নাচ তাকে দেখাতে হ'ত নিয়মিতভাবে দেশী বিদেশী সকলের কাছে। এই নাচের প্রবর্ত্তক হিসাবে সে আজ সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। আজ পর্য্যন্ত খুব কম বিদেশী সে-দেশে গিয়ে এই নাচিয়ের নাচ না দেখে ফিরেছে। আজকাল নাচের জগৎ থেকে মারিয়ো বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে তার গ্রামের নিভৃত নৃত্যশালায় দেশের বালকদের নৃত্যশিক্ষায় মগ্ন। তার ছাত্রদের সে কখনও হুবহু নকল করতে বলে না, সে বলে, সে কেবল ধরিয়ে দেবে তার পর ছাত্ররা তাদের সামর্থ্যমত যতখানি সম্ভব নূতন রচনা করুক।

মারিয়োর নাচ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তার অনেক শিষ্যের নাচ দেখবার সুযোগও আমি পেয়েছি। দেখলাম তারই কোন ছাত্র অনেক বিষয়ে গুরুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। গুরুর তাতে দুঃখ নেই, সে যা চেয়েছিল তাই সে দেখতে পেয়েছে তার সেই ছাত্রটির মধ্যে। তার এই শিষ্যটির নাম "রাক"। গুরুর পরে সে আজ সে-দেশে কবিয়ার-নাচে বিখ্যাত। অনেক সৌন্দর্য্য সে বাড়িয়েছে এই নাচে। গামেলান সঙ্গীতের সঙ্গে নাচের মিল এর কাছে যেন আরও সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে।

মনে পড়ে যেদিন প্রথম কবিয়ার নাচ দেখি দেনপাশার শহরে। রাত্রিবেলা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আধুনিক কেরোসিনের বাতি জ্বলছে, চারি দিকে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ, বিদেশীও দেখা গেল অনেক। আসরে দেখলাম একটি যুবক সুন্দর ঘন লাল রঙের সোনালী কাজ-করা শাড়ীর মত কাপড় পরে ব'সে আছে চুপ ক'রে। দু-পাশে



দক্ষিণ-বালির গ্রামে এক জন বেলজিয়ান শিল্পীর গৃহে লেখক

গামেলান যন্ত্র, সে মাঝখানে। হাতে আছে বর্মী নাচিয়েদের মত হাতপাখা, একেশী ধরণে কাপড়ে তৈরি। যুবকটি যে ব'সে ব'সেই নাচবে আমি তা মোটেই ভাবি নি। গামেলান সঙ্গীত বাজছিল। আমি শুনলাম সেটা বাজনায় উদ্বোধন সঙ্গীত। বাজনা শেষ হ'ল। অল্প পরেই সশব্দে যেই গামেলান যন্ত্র, ঢোল ও বড় বড় কাঁসার করতালে বাজনা সুরু হ'ল, দেখি শান্তশিষ্ট যুবকটি ডান হাতে পাখাটিকে খুলে ধরেছে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে, বাঁ হাত বাঁ দিকে সোজা টান হয়ে আছে, আঙুলের একটি সুন্দর মুদ্রা। পিঠ সোজা ও বুক টান করে বাঁ দিকে কাত হয়ে ব'সে বড় বড় চোখে সামনে তাকিয়ে কি যেন দেখছে আশ্চর্য্য হয়ে, ডান হাতের পাখাটি থরথর করে কাঁপছে।

হঠাৎ বাজনার সঙ্গে এই ভঙ্গী দেখে আমার মনে হ'ল, যুবকটির দেহের ভিতর দিয়ে বুঝি বিদ্যুৎ খেলে গেল। ধাঁ করে এত দ্রুত এ ভাবে ভঙ্গী ক'রে নাচ সুরু হবে, আমার কল্পনার বাইরে ছিল। বাজনার সঙ্গে এত দ্রুত ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন এ-নাচের একটা বিশেষ গুণ।

গামেলান সঙ্গীতের ভিতর কতকগুলি ছোট বা বড় অংশ আছে, যার তুলনা করা যেতে পারে আমাদের দেশের পাখোয়াজের বা খোলের তালের তোড়া বা পড়নের সঙ্গে। মাঝে মাঝে এই ধরণের বাজনার সঙ্গে নাচিয়ের অতি দ্রুত ভঙ্গী দেখবার মত; এই পদ্ধতিই দর্শকদের মন বিশেষ ক'রে আকর্ষণ করে।

বাজনার নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে নানা ভাবে নাচের ভঙ্গী বদল হ'তে লাগল। মাঝে মাঝে বাঁ হাতে কাপড়ের আঁচলটি বেশ কায়দা ক'রে আঙুলের ডগায় তুলে ধ'রে, আধবসা অবস্থায় তালের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে কয়েক ফুট এগিয়ে এসে ব'সে পড়ল। কখনও আবার এই ভাবেই একই জায়গায় একটি পাক খেয়ে নিল।

এদিকে একই সঙ্গে মুখের ভাবের বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখবার মত। কখনও মনে হচ্ছে যেন কিছু দূরে কি একটা দেখতে পাচ্ছে, যেন স্পষ্ট নয়, ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করছে। কখনও মনে হ'ল, কি দেখে নাচিয়ে যেন অত্যন্ত ভীত, পরক্ষণেই হাসিমুখ, যেন ভয়ের কিছুই নেই, মিছে ভয়। কখনও মনে হ'ল যেন চোখের ইঙ্গিতে কাকে সে কি ইশারা করল, যেন কাউকে ডাকছে। আবার কখনও চোখে মুখে একটা ভাবোন্মত্ততা ফুটে উঠল। এ ধরণের নানা প্রকার অভিনয়ের সঙ্গে হাতে দেহে মাথায় যত প্রকার ভঙ্গী করা সম্ভব তাই সে ক'রে যাচ্ছে। কখনও ডান হাতে পাখাটিকে এমন ভাবে ঘোরাচ্ছে যেন মনে হবে নাচতে নাচতে সে ক্লান্ত, তাই একটু হাওয়া খেয়ে নিল। আর সব সময় দেহে একটা দোলা ও ঘাড়ের কাজ, অর্থাৎ মাথাটিকে বাজনার লয়ে ক্রমাগত এ-পাশে ও-পাশে নাচাবে—আমাদের প্রাচীন নৃত্যশাস্ত্রে যার ব্যবহার কেবল আদিরসাত্মক অভিনয়ের জন্যেই লেখা হয়েছে—বর্ত্তমানে যার পরিচয় আমরা কথাকলি, কথক ও বাইজীদের নাচে পাই; ভারতের বেশীর ভাগ আধুনিক নর্ত্তক-নর্ত্তকীরাও এর চর্চ্চা করেন। গামেলান সঙ্গীত যে ভাবে যত রকমে বাজল, নাচিয়ে ঠিক তাকে লক্ষ্য ক'রে সুন্দর ভাবে মিলিয়ে নেচে গেল।

একটি বাজনার দলে প্রায় পনরটির উপর যন্ত্র থাকে, বাজিয়েরা অভ্যাসে এত পাকা যে কখনও কোন বাজনায় কাউকে একটুও গোলমাল করতে দেখি নি। এই নাচটি শেষ পর্য্যন্ত দেখে আমার মনে হ'ল ইউরোপের আধুনিক ভাব-নৃত্যের দলে একে অনায়াসে স্থান দেওয়া যেতে পারে।

মারিয়ো নাচের সময় কখনও কখনও এমন সব নূতন ভঙ্গীর সৃষ্টি করে যা সে আগে কখনও ভাবে নি। নাচের শেষে সে নিজেও সে-ভঙ্গীর বিষয় মনে আনতে পারে না। তাকে প্রশ্ন করলে সে বলে, নাচের সময় গামেলান সঙ্গীতই যেন তাকে নাচায়, সে যে নিজে নাচছে গামেলান সঙ্গীত লক্ষ্য ক'রে, এ তার মনেও থাকে না।

কয়েক বৎসর হ'ল মারিয়ো কবিয়ার নাচে একটি নূতন পদ্ধতির আমদানি করেছে—এখনো তা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে নি। গামেলান বাজনার যন্ত্রগুলির ভিতর "রেয়ং" নামে একটি যন্ত্র আছে। কাঁসার তৈরি তেরটি ছোট ঘণ্টা, সুরের উঁচুনীচুর উপর নির্ভর ক'রে পর পর সাজানো—দুই হাতে দুটি মোটা কাঠি নিয়ে চার জনে এক

সঙ্গে বাজায়। কাঠগুলির মাথায় দড়ি বা স্যাকড়া পেঁচানো থাকে, তাতে ক'রে কাঠের ও কাঁসার সংঘর্ষে যে রকমের কর্কশ শব্দ হওয়া স্বাভাবিক তা হয় না, মোলায়েম শব্দ হয়। বাজিয়ে দলের রেয়ং যন্ত্রটি ছাড়া আর একটি ঠিক একই ধরণের বাজনা নৃত্য-আসরের সামনে সাজানো থাকে। এই বাজনায় ঘণ্টার সংখ্যা দশটি। এর নাম "ট্রম্‌পং"। নাচিয়ে হাতের পাখাটিকে রেখে আধবসা অবস্থায় নাচের ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে মাটি থেকে দুই হাতে দুটি কাঠি তুলে নিয়ে, সেই বাজনা বাজাতে সুরু করে। কাঠি হাতে নিয়ে নানা ভঙ্গীতে তাকে ঘোরায় ও সেই কাঠির আঘাতে যন্ত্রে নানা প্রকার ছন্দ তোলে। অল্পক্ষণ বাজানোর পর আবার লাফাতে লাফাতে মাঝখানে ফিরে এসে পাখাটি হাতে তুলে নেয়। সকল নাচিয়ের পক্ষে ট্রম্‌পং বাজনা বাজানো সহজ নয়, এতে গামেলান যন্ত্র ও সঙ্গীতের গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই কারণেই সব নাচিয়ে এ পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে পারে নি, সকল নাচিয়ের এদিকে জ্ঞান থাকাও সম্ভব নয়।

বালিতে থাকতে দেনপাশার শহরে মারিয়ো-প্রবর্ত্তিত নাচের এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল, সে-দেশের এক বিশেষ উৎসব-উপলক্ষে। বলিদ্বীপের দশটি নাম-করা গ্রামের দল এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। দেখলাম দশটি গ্রামের দশটি নাচিয়েই কবিয়ার নাচ নাচল, কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের অনেক পার্থক্য, অথচ সকলে একই গুরুর ছাত্র। এই পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম। কোন একটি দল এই নাচকে কোন একটা গল্পের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। মহাভারতের অর্জ্জুনকে নিয়ে গল্পটি নূতন ক'রে তৈরি, সে আমাদের দেশের সঙ্গে মেলে না। কবিয়ার-নাচিয়ে ছিল অর্জ্জুন, আরম্ভ করল কবিয়ার নাচ দিয়ে। গামেলান বাজনার কোন বদল হয় নি। অন্য দলে দেখলাম, গামেলান দলের ভিতর জন কয়েক গাইয়ে প্রারম্ভে অনেক ক্ষণ গান গাইল। নাচের সময় নাচিয়ে গানের ভাবকে অভিনয়ে প্রকাশ করল। কয়েকটি নাচিয়েকে দেখলাম সব সময় নাচের ভিতর দিয়ে প্রেমের অভিনয় করে গেল। দেখলাম, নাচিয়ে বাজিয়েদের কোন এক জনের সামনে গিয়ে নাচে প্রেম-নিবেদনের ভঙ্গী ও অভিনয় করতে লাগল। পরীক্ষকরা শেষ পর্য্যন্ত প্রথম পুরস্কার দিয়েছিলেন তাকে যে এই ভাবের পরিবর্ত্তন না এনে, মারিয়োর পদ্ধতিতে নাচের ভিতর যতটা সম্ভব নূতনত্বের আভাস দিতে পেরেছিল। সেই প্রতিযোগিতায় নাচ দেখে বেশ বুঝতে পারলাম এদের চিন্তাধারার গতি—নূতন রচনা, নব পরিবর্ত্তন করতে এরা কতখানি উৎসুক। আর একটি ঘটনায় এ বিষয়ে মনের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল।

পশ্চিম-বালির জুম্‌রানা নামে এক বড় গ্রামে, মোড়লের পুত্রের বিবাহ, খুব ধুমধাম। বালির হিন্দু-প্রথায় বিবাহের অনুষ্ঠান। গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলেই সন্ধ্যাবেলায় সমবেত হয়েছে। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। প্রাঙ্গণে গ্রামের গামেলান-দল খুব উৎসাহের সঙ্গে বাজাচ্ছে। হঠাৎ শুনি গ্রামের একটি অতি অল্প বয়সের বালক কবিয়ার নাচ নাচছে। তখনই দেখতে গেলাম। শুনলাম, বালকটি কোন শিক্ষকের কাছে কখনও হাতে ধরে এ নাচ শেখে নি। নাচে যারা প্রবীণ ও প্রাচীন তারাও জড়ো হয়েছে বালকের নাচ দেখতে। দেখলাম বালকটি আপন মনে নেচে চলেছে। বাজনার সঙ্গে হয়তো কখনও মিলছে কখনও মিলছে না তাতে গ্রামের দর্শকদের কেউ দুঃখিত নয়। সে যে না-শিখে এ ভাবে নাচতে পারছে এই দেখেই সকলে আনন্দিত। অনেকের মনে বিশ্বাস, ভবিষ্যতে এ বালক তাদের গ্রামের গৌরবের বিষয় হবে।

আমাদের দেশে কেরলের কথাকলি-নাচিয়ে, মণিপুরী নাচিয়েদের অনেকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। উত্তর-ভারতের কথক-নাচিয়েদের অবস্থাও জানি। এই সব প্রাচীন নাচে এ ধরণের স্বাধীনতার প্রশ্রয় দিতে এদের কখনও দেখি নি, বরঞ্চ যথাসম্ভব নিরুৎসাহ করতেই দেখা গেছে। এইখানেই আমাদের প্রাচীন নাচিয়েদের সঙ্গে এ-দেশের গ্রামের নাচিয়েদের মূল তফাৎ।

এ-কথা যখনই মনে হয়েছে তখনই ভেবেছি বালির হিন্দুরা শিল্পকলায় এই স্বাধীন মনোবৃত্তি পেল কোথা থেকে। সকলেই জানেন এদের বর্ত্তমান ধর্ম্ম বা সংস্কৃতি প্রাচীন হিন্দুভারতের কাছ থেকেই পাওয়া, তাই নিয়ে আজও

তাদের সমাজ বেঁচে আছে। অথচ আমাদের দেশের বর্ত্তমান সাধারণ হিন্দুসমাজের সঙ্গে এদের আকাশ-পাতাল তফাৎ। আমাদের দেশে রাজা-মহারাজা, ধনী ও শিক্ষিতদের সাহায্য বা প্রেরণার অভাবেই আমাদের দেশের গ্রাম্যশিল্পীরা মৃতপ্রায়, এই পোষকতা ছাড়া গ্রাম্যশিল্প বাঁচতে পারে না এই ধারণা আমরা সকলেই মনে মনে পোষণ করি। কিন্তু বালির হিন্দুদের তো কোনদিন রাজা-মহারাজা, ধনী বা শিক্ষিতদের সাহায্য বা প্রেরণার প্রয়োজন হয় নি। শিল্পকলার যা কিছু উন্নতি হয়েছে সে কেবল তাঁদের নিজেদেরই চেষ্টায়। এখনও বালিতে যে কয়টি রাজা বা জমিদার আছেন তাঁদের এক জনকেও কোন নাচিয়ে অথবা গামেলান সঙ্গীতের দলকে পোষণ করতে হয় না। নাচের ও বাজনার দল সব গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে, সেখানেই তৈরি হচ্ছে—দরকার হ'লে রাজারা সেই সব গ্রামে খবর পাঠান। জাভা এত নিকটের দেশ, এবং শোনা যায় জাভায় মুসলমান ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তনের সময় জাভার হিন্দুরা এবং জাভার তৎকালীন হিন্দু সংস্কৃতি বালিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। অথচ আজ জাভায় সব শিল্পই ব্যক্তিবিশেষের হাতে এসে ঠেকেছে, সেখানকার সুলতানদের ও ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রেরণায় বেঁচে আছে। বহু শতাব্দী ধরে সে-দেশে এই সব শিল্পের কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে ব'লে কেউ বলতে পারে না; বিশেষ করে নাচ ও বাজনায়।

বিদেশীরা বালির নাম দিয়েছে "ধরার শেষ স্বর্গ"। এই স্বর্গের মোহে প্রতি মাসে এ-দেশে অসংখ্য বিদেশীর আমদানি হয়। তারা প্রশংসা করে সে-দেশের নিসর্গশোভার, তার স্ত্রীপুরুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যের, তাদের শিল্পের ও তাদের নাচের। আমার মনে হয় তার চেয়েও বড় কথা এই যে বালির অধিবাসীরা সহজ শিল্পী, যে শিল্পী-মন নিয়ে তারা প্রতিদিনই নূতন কিছু কল্পনা করছে ও গড়ে তুলছে। বালির সব চেয়ে বড় এবং গৌরবের দিক্ হচ্ছে তার শিল্পসৃষ্টির এই নিত্যনবত্ব।

বিশ্বপ্রীতি

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

আমার চিত্ত-দোলায় দোল দিয়ে যায়,
কে আজিকে দোল দিয়ে যায়!
অচিন দেশের অজানা সুর
বাজিয়ে যে হায়, বাজিয়ে যে হায়!

স্বপন-পুরী দুয়ার খুলে
হাতছানি দেয় দুলে দুলে;
আকুল পবন মনের আগল
খুলতে যে চায়, খুলতে যে চায়!

উদার আকাশ মেলে আঁখি
বারে বারে কয় যে ডাকি—
'সকল ফেলে আমার বুকে
আয় চলে আয়, আয় চলে আয়।'

কুঞ্জবনে কুসুম ফুটে,
পরাণ যে আজ গন্ধ লুটে।
পুষ্পকলি দল মেলে আজ
গন্ধ বিলায়, গন্ধ বিলায়।

সন্ধ্যা আসে মধুর সাজে,
চন্দ্র হাসে হৃদয়মাঝে,
তরুণ অরুণ আজ যে হেসে
মোর পানে চায়, মোর পানে চায়।

হৃদয় নিঝর বাঁধন-হারা
ধায় যে আজি পাগলপারা;
নিঝর-গীতি সাগর-গীতি
এক সাথে যে আজকে মিশায়!

শষ্প-শ্যামল আসনখানি
ভুবন আজি দেয় যে আনি,
শ্যামল তরু নবীন পাতার
মুকুটখানি পরিয়ে দে যায়!

মেঘের রথে আজকে কেন
কে আমারে ডাকছে যেন!
বিশ্ব-প্রীতি কানে কানে
গুঞ্জরিয়া গান গেয়ে যায়!

বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি

শ্রীকমলেশ রায়

—লীলা, শুনে যাও—

—আসছি। একটু...পাঁচ মিনিট...

লীলা ফিরে আসবার আগে বিমলের পরিচয় একটু দিয়ে নিই। লম্বা, দোহারা গড়ন, চোখ দিয়ে বুদ্ধির আলো ঠিকরে পড়ছে। অল্প ক-দিনেই সে এক জন ভাল প্রফেসর ব'লে কলেজে নাম ক'রে ফেলেছে। কিন্তু তার আসল পরিচয়, সে এক জন নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক। কত বিনিদ্র রজনী সে ল্যাবরেটরিতে কাটিয়ে দিয়েছে গবেষণার কাজে; কত দিন তার খাওয়া হয় নি, ভুলে গিয়েছে ব'লে; কত রাতে ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠেছে তার রিসার্চের হঠাৎ-মনে-লাগা পন্থার নোট টুকে রাখতে। এমনি ভাবে মনেপ্রাণে একান্তভাবে সে বিজ্ঞানের এক জন সেবক।

তবে বর্ত্তমানে এতটা হয় না, হ'তে পায় না। এক দিন রাতে অসম্ভব দেরি ক'রে এসে বিমল বলে—তাড়াতাড়ি খেতে দাও, আবার ল্যাবরেটরিতে যেতে হবে। লীলা তার পরিশ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—ইস, কি রকম শুকনো চেহারা হয়েছে সারাদিনের খাটুনিতে, আয়না দিয়ে দেখ তো। বিছানা পেতে রেখেছি, খেয়ে দেয়ে এখুনি শুয়ে পড়। এত খাটলে শরীর টেকে? কী যে কর পাগলামি। এর পর আর কথা চলে না।

কিন্তু সে যাই হোক, এ-হেন বৈজ্ঞানিকের সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী হয়ে লীলা যে চিরকাল শুধুই গৃহস্থালী নিয়ে থাকবে সে-কথা আমাদের মনে করা ভুল এবং সেই ভুল ভাঙবার জন্য বিমলই যে প্রথমে উদ্যোগী হবে, সে-কথা ব'লে দেবার প্রয়োজন নেই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে লীলা ফিরে এল।—কি বলছিলে?

—ভুলে গিয়েছ? কি কথা ছিল, আজ সন্ধ্যে থেকে?

—ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আরম্ভ কর।

লীলা বিমলের কাছে বিজ্ঞান শিখবে। তাকে যে শিখতেই হবে; বিমল এত বড় এক জন বৈজ্ঞানিক, গবেষক!

—বেশ, মন দিয়ে শোন। আর, বুঝতে না পারলে, কি, কোন রকম সন্দেহ মনে হ'লে তখনি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো। বুঝলে?

—আচ্ছা।

লীলাকে কিন্তু একেবারে লেখাপড়া-না-জানা গেঁয়ো মেয়ে মনে করলে অত্যন্ত ভুল হবে। লীলার বাবা এক জন বিলাতফেরত ডাক্তার। কাজেই বৃদ্ধ চিকিৎসক মেয়েকে মূর্খ ক'রে রাখেন নি, সে-কথা বলা বাহুল্য।

বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞা শিক্ষার্থিনীকে গোড়ায় একটু প্রাথমিক বক্তৃতা দেওয়া দরকার, তাতে জিনিষটা অনেকখানি সহজ সরল হয়। নানান প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক কথার পর বিমল বললে,

—এমনি ভাবে ধর্ম্মগত ও সামাজিক কুসংস্কারের বাধা কাটিয়ে বিজ্ঞান ধীরে ধীরে আপনার সত্যের পথ দিগ-দিগন্তে বিস্তৃত ক'রে দিল। তার পরে আমরা বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর নাম পাই।

—দেখ, আজও ধোপা কাপড় দিয়ে গেল না। টেবল-ক্লথটা কী রকম ময়লা হ'য়েছে। কত দিন যে—

—হুঁ, কাল দেবে বোধ হয়। গ্যালিলিওর যে-বছর মৃত্যু হয়, নিউটন সেই বছর জন্মগ্রহণ করেন। নিউটন—

—শোন, সুধাদিকে চেন তো? সুধাদির ছোট ছেলেটি, মিণ্টু, যে-বছর মারা যায় সেই বছর, না সেই মাসেই, তার বোনের একটি ছেলে হ'ল; শিমলায় থাকে তারা। মা'রা সবাই বলে ও-ই মিণ্টু। সত্যি তাই হয় নাকি, বল না?

—যাঃ, তা কি ক'রে হবে? তা হয় না। একটু চুপ ক'রে থেকে বিমল বললে—না, আমি সে-ভাবে কিছু

বলি নি যে গ্যালিলিওই মরে নিউটন হয়ে জন্মেছিলেন। বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিকদের ইতিহাস বলতে গিয়ে কথাটা এসে পড়ল, তাই বললাম।

—আরও দেখ, ঠাকুমা বলতেন মানুষ মরে আকাশের তারা হয়। তা বোধ হয় না, না?—আচ্ছা, তারাগুলো কী?

—সে-কথা পরে আলোচনা করব। বৈজ্ঞানিকরা নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। খুব অদ্ভুত সব ব্যাপার আছে, বলব। কিন্তু আগে গোড়ার কথা শেষ করি।

—লক্ষ্মীটি, একটু দাঁড়াও। ঠাকুরকে ডিমের ডালনাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি,—সেদিন যেটা খেয়ে বলেছিলে 'এত ভাল রান্না তুমি কোথায় শিখলে?'—রান্না জিনিষটা এমন কিছু নয়, দেখিয়ে দিলে ঠাকুরও পারে।...

কিছুক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে বিমল আপন মনে বলে ওঠে—নাঃ, লীলা বড্ড সময় নষ্ট করে। কেন, ঠাকুরই তো বেশ রাঁধে, কী দরকার ছিল এখন রান্না দেখাবার?

লীলা ফিরে এল।—বল তারপর।

—হাঁ, বলছিলাম নিউটনের কথা। নিউটনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। বল তো তিনি কি কি কারণে এত বিখ্যাত? বিমল একটু কৌতুকের হাসি হাসল, কারণ এত সব লীলার জানবার কথা নয়।

লীলা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল—নিউটন এক জন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বিমল হেসে ফেলল—ঠিক বলেছ, নিউটন এক জন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। শুধু তাই নয়, অনেকে বলেন এক হিসাবে তিনি আইন্‌স্টাইনের চেয়েও বড়। কারণ, সে-যুগে তিনি যা করেছেন, তা সম্পূর্ণ নিজ প্রতিভাবলে। কিন্তু আইন্‌স্টাইনের সময় অনেক বড় বড় বিজ্ঞানিকের গবেষণা তাঁকে নানা ভাবে আলোক দান ক'রে সাহায্য করেছে। বল তো আইন্‌স্টাইন কে?

—জার্মান বৈজ্ঞানিক। ইহুদী ব'লে হিট্‌লার তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ফ্রয়েডকেও তাই; এ কিন্তু ভারি অন্যায়—

—আচ্ছা, আচ্ছা, হিট্‌লারের বিচার পরে হবে, এখন আমার কথা শোন—

—এখন আর না, রাত হয়ে যাচ্ছে। খেয়ে এসে বেশ হবে। চল।

খাওয়ার পরে আবার অধ্যাপনা চলল—আজ আর বেশী কিছু বলব না; তোমারও বোধ হয় ভাল লাগছে না। কি ভাবছ চুপ ক'রে?

—না, না, আমার বেশ লাগছে, তুমি বল। ভাল না লাগলে আমি তোমায় বলব। আর, ভাল লাগবে না-ই বা কেন? তোমার এত নাম পড়ানোতে—

—থামো, দুষ্টুমি করে না। হ্যাঁ, কত দূর বলেছিলাম?

—নিউটন, আইন্‌স্টাইন—

—না, না, শুধু নিউটন; নিউটনের কথা আগে।

—দেখ, ভাবছিলাম, বাথরুমের ঐ কোণটা বড় পিছল হয়ে আছে। আজও তো দেখছি পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যায় নি। কত বার যে আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেছি।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার ধোপা মেথর সব কাল আসবে, আমার কথা শোন এখন।

—রাগ করলে?

—না, শোন।—নিউটনের প্রধান আবিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণের তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে টানছে। যেমন, সূর্য্য পৃথিবীকে, পৃথিবী চাঁদকে, আবার পৃথিবীও সূর্য্যকে,—এই রকম সব। পৃথিবীর টানেই গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ে। বুঝেছ?

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ছেলেবেলা গল্পের বইয়ে একটা ছবি ছিল দেখেছি,—নিউটন বাগানের মধ্যে গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন, আর সামনের গাছ থেকে একটা আপেল মাটিতে পড়ছে। নীচে লেখা, 'ফলটি পড়িল কেন'?—সেই কথা বলছ তো?

এতক্ষণে বিমল যেন অকূলে কূল পেল, উৎসাহিত হয়ে বললে—ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝেছ তো?

—দেখ, তোমরা বল 'পৃথিবীর টান', কথাটা অনেকের কাছে শুনেছিও অনেক বার। ছেলেবেলায় প্রথমে শুনি বাবার কাছে। তারপরে দাদা বিলেত যাবার আগে এই সব গল্প করত আমার সঙ্গে—আরও কত দেশ-বিদেশের কথা। কিন্তু দেখ, আমি ঠিক বুঝি না কেন যে তোমরা পৃথিবীর টান বলো।

—আচ্ছা, আমি ঠিক বুঝিয়ে দিচ্ছি। বল তো, সব জিনিষ—মানে, জড় পদার্থ—মাটিতে পড়ে কেন ?

—সব জিনিষ পড়ে না। কই, চাবিটা তো পড়ছে না।

—চাবিটা যে টেবিলের উপর রয়েছে তাই পড়ছে না। ...এই দেখ, পড়ে গেল।

—তুমি ফেলে দিলে, তা পড়বে না ?

—মাটির দিকেই বা পড়ে কেন, পাশের দিকে বা উপর দিকেই বা যায় না কেন ?

—পাখীরা তো উপর দিকেও যায়।"

—আহা, তা নয়। বলছি জড় পদার্থ; পাখীরা কি জড় পদার্থ ? ভুল বুঝতে পেরে লীলা হেসে ফেলল-ঠিক বটে, আমার ভুল হয়েছে। শুধু জড় পদার্থের কথা ধরতে হবে। নাঃ, আমি একটা অপদার্থ। লীলা খিলখিল করে হেসে উঠল।

—আঃ, কী যে কর। মন দিয়ে শোন। চাবিটা কেন পড়ল ?

—বলতে চাও তো 'মাধ্যাকর্ষণ' ? কিন্তু তা কেন ?

—তবে কী ?

—ভারী ব'লে।

—ভারী মানে কি ?—না, এটা শক্ত প্রশ্ন হয়ে গেল ; অন্যভাবে বলি। কোন জড় পদার্থ আপনা থেকে কোন দিকে চলতে ফিরতে পারে না। তবে তারা, ধর—এই চাবি-গোছাটা মাটির দিকে যায় কি ক'রে ?

—তুমি ফেলে দিলে যে !

—কিন্তু আমি তো মাটির দিকে ছুড়ে দিই নি, তবু মাটিতেই পড়ে কেন ? একে তুমি মাটিতে ফেলে দেওয়া বলছ কেন ?

—তাকেই মাটিতে ফেলে দেওয়া বলে, পণ্ডিতমশাই।

বিমল অসহায় ভাবে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে—তুমি কথাটা ঠিক ধরতে পারছ না—

—খুব পারছি। জিনিষ ফেলে দিলে সে মাটিতে পড়বেই ; চিরকাল পড়েছে, আর চিরকাল পড়বেও। কী যে বল, জিনিষকে মাটিতে ফেলে দিলে সে মাটিতে না পড়ে আকাশে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে এমন আজগুবি কথা কেউ কখনো শুনেছে ?

হায় নিউটন, হায় কেপলার ! তোমাদের মাধ্যাকর্ষণের কি লাঞ্ছনা। স্বর্গ হ'তে তোমরা সাক্ষী, কোনও শক্ত কথা বিমল বলে নি, কোন শক্ত অঙ্কও না, তবু কেন লীলা এত অবুঝ হয় ?—বিমলের রক্ত শিরার মধ্যে চন্ চন্ ক'রে ছুটোছুটি করতে লাগল।

—আঃ, মাটির দিকে যাওয়ার কারণটা কী, পৃথিবীর এই বিশেষত্বটা কি, সেটাই আমি বলছি। আর, 'মাটিতে ফেলে দেওয়া' কেন বলছ এক-শ বার ? আমি কি চাবিগোছাকে মাটিতে ফেলে দিচ্ছি, মানে, মাটির দিকে ছুড়ে দিচ্ছি ? আমি তো শুধু পাশাপাশি ঠেলে টেবিল থেকে সরিয়ে দিচ্ছি, এই রকম—এই রকম—এই রকম—

প্রত্যেকটি 'এই রকম' উচ্চারণের সঙ্গে এক-একটি ঝন্ ঝন্ ঝন্ ক'রে তিনটা শব্দ হ'ল ; প্রথমটি চাবিগোছা, দ্বিতীয়টি জলের গ্লাস, তৃতীয়টি কালির দোয়াত।

—এ কি, এ কি, তুমি করছ কি ! উদ্বিগ্ন হয়ে লীলা চেঁচিয়ে উঠল।

আর 'কি করছ' ! বিমল তখন ক্ষিপ্তপ্রায়।

—সামান্য কথাটা বোঝ না। মাটির দিকে এরা যায় কেন ? আকাশের দিকে যায় না কেন ? মা-টি-র দিকে কেন, কেন...?"

—থাম, থাম, মাধ্যাকর্ষণ ! উঃ, সাদা মার্বেলের মেঝেটা কি করলে দেখ তো, আমার ভাল শাড়ীটাও কালি দিয়ে নষ্ট করলে।

বিমল বলে চলল—সামান্য যুক্তি তোমাদের মাথায় ঢোকে না ! কি ছাই লেখাপড়া শিখেছ, লেখাপড়া তোমরা শেখই বা কেন,...ইত্যাদি

এত উত্তেজনার পর ঘরে শোওয়া অসম্ভব। ঝুল-বারান্দায় ইজিচেয়ার টেনে বিমল শুয়ে পড়ল।...কত রাত হয়েছে বলা যায় না। বাহুর উপর কোমল হাতের স্পর্শে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। লীলা বলল—ঘরে এসে শোও, বাইরে হিম পড়ছে। ইস্, তোমার আঙুলগুলো কি রকম ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে ! এস।

সকালে উঠি উঠি ক'রেও বিমল বিছানার মায়া কাটাতে পারছে না। এমন সময় হঠাৎ গুরুভারপতনের শব্দে সে লাফিয়ে উঠে বাইরে এসে দেখে লীলা বাথরুমের মধ্যে অচেতন হয়ে পড়ে আছে ; মুখ ধোয়ার সরঞ্জাম ঘরময় ছিটানো। তাড়াতাড়ি বিমল তাকে কোলে ক'রে বিছানায় শুইয়ে দিল। ভজুয়া পাখা-জল নিয়ে এল দৌড়ে। আঘাত গুরুতর হয় নি। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে পাখার বাতাস করতে অল্পক্ষণেই লীলা চোখ মেলল। নীচু হয়ে ব্যথিত স্বরে বিমল বলল—খুব লেগেছে, না ? কী ক'রে পড়লে ? লীলা—

লীলার চোখে তখনও অস্বাভাবিক ভাব কাটে নি। ক্লান্ত চোখে অস্ফুট স্বরে অসংলগ্ন ভাবে বলল—নিউটন... মাধ্যাকর্ষণ...উঃ...

লীলা আজকাল আগেকার মত বিমলের কাছে শুধুই গান শেখে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন, এম. এসসি.

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কথা বলিতে গেলেই তাঁহার বিরাট প্রতিভার কথা মনে পড়ে। সেই প্রতিভার পরিচয় প্রদান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; তাঁহার চরিত্রের শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মাত্র ইহাতে আলোচিত হইবে।

আচার্য্যদেব এক দিন বসুবিজ্ঞান-মন্দিরের কয়েক জন কর্ম্মীকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের এত অসুখ হয় কেন? আমার ত তোমাদের মত এত অসুখ হয় না। যার লাইফ মিশুন আছে, সেই মিশুন শেষ না হ'তে তার কোন অসুখ হ'তে পারে? আমি জানি আমার যেদিন কাজ শেষ হবে সেদিন আমি আর এই পৃথিবীতে থাকব না।" দেশবাসীর অজ্ঞাত নাই যে এতদ্দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বিস্তার এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের বিজ্ঞান-সাধনার পথ সুগম করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, এই ব্রতসাধনেই তিনি দেহ-মন-প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং ঐকান্তিক সাধনার ফলে তাহাতে আশ্চর্য্যরূপ সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেবের বহুমূত্র রোগ ছিল, এতদ্ভিন্ন কিন্তু অন্য কোন অসুখ-বিসুখ তাঁহার বড় একটা দেখা যাইত না; তবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ কখনও কখনও তাঁহার অবসাদ দেখা দিত। তখন ডাঃ সর্ নীলরতন সরকার আসিয়া কয়েক দিনের জন্য তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা দিতেন। কিন্তু এমনই তাঁহার কর্ম্মপ্রবণতা ছিল যে দুই-এক দিনের বেশী বিশ্রাম লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। ল্যাবরেটরিতে যাইতে পারিতেন না বলিয়া পরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন এবং নিজ শয়নকক্ষে কর্ম্মী-দিগকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। তথায় তাঁহার পূর্ণ বিশ্রামের রকম দেখিয়া কর্ম্মীরা অবাক হইয়া যাইত। দেখিত দেশী-বিদেশী অনেক সাময়িক পত্র, নাটক-নভেল তাঁহার বিছানায় ছড়ান, সেইগুলি পড়িয়া তিনি চিকিৎসক-নির্দ্দিষ্ট পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন। কর্ম্মীদিগকে দেখামাত্রই বলিয়া উঠিতেন, "কি-কি-কি হ'ল?" অর্থাৎ পরীক্ষার কি ফল হইল।

নিজের জীবনব্রত সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়া আচার্য্যদেব স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে খুব যত্নবান্ ছিলেন। আহার-বিহারে তিনি অতিশয় মিতাচারী ছিলেন। তিনি সন্ধ্যার সময় মাঠে গিয়া অনেকক্ষণ মুক্ত বায়ুতে পদচারণ করিতেন, সপ্তাহান্তে দুই-এক দিনের জন্য কলিকাতার বাহিরে চলিয়া যাইতেন, এবং পূজা কিংবা গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশগুলি দার্জ্জিলিং কিম্বা অন্য কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে কাটাইতেন। তিনি সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করিতেন, কিন্তু রাত্রিতে বিশেষ কোন কাজ করিতেন না। মধ্যাহ্নে আহারের পর তাঁহার একটু নিদ্রার অভ্যাস ছিল। তাঁহার বন্ধু রবীন্দ্রনাথের দিবানিদ্রার অভ্যাস নাই। শুনা যায়, এক সময়ে দুই বন্ধু যখন একত্রে শিলাইদহে কিছুদিন নৌকাবিহার করিয়াছিলেন, তখন মধ্যাহ্নের আহারের পর নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক, কবিকে ঐ সময়ের মধ্যে একটি ছোট গল্প লিখিয়া রাখিতে বলিতেন; এবং তিনি নিদ্রা হইতে উঠিলে কবিবর তাঁহার লিখিত গল্পটি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। এইরূপেই নাকি গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পের সূচনা হয়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সাধকোচিত নিষ্ঠা লইয়া তাঁহার সাধনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘজীবনে এই দেশের মধ্যে কত নূতন নূতন আন্দোলনের উদ্ভব ও লয় দেখিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানসাধনা ছাড়িয়া বা কিছু কালের জন্য বন্ধ রাখিয়া তিনি কোন দিন কোন আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। বিজ্ঞানেতর বিষয়ে তাঁহার যে আকর্ষণ ছিল তাহাও তিনি সবল হস্তে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বসুবিজ্ঞান-মন্দিরের এক জন কর্ম্মীর কংগ্রেসের প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি অবসরকালে

কংগ্রেস আপিসে যাইতেন এবং কংগ্রেসের কার্য্যে সহায়তা করিতেন। আচার্য্যদেব তাঁহাকে এক দিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, কংগ্রেসের প্রতি আমার কিছুমাত্র অনাস্থা নাই। তোমার কংগ্রেস ভাল লাগে ত সব ছেড়ে কংগ্রেসের কাজেই লেগে যাও, আর সায়েন্স ভাল লাগে ত সব ছেড়ে সায়েন্সেই লেগে যাও। কিন্তু দুটো করতে গেলে কোনটাই হবে না। একটা নিয়ে থাকতে হবে। দেখ না, আমি সায়েন্সের জন্য সব ছেড়েছি। I was tremendously interested in Bengali literature, I was tremendously interested in the Brahmo Samaj, I was tremendously interested in the education of my nephews, but I gave up everything for the sake of science." (বাংলা সাহিত্যে, ব্রাহ্মসমাজের কাজে…আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য সবই ছেড়েছি)।" বঙ্গসাহিত্যে আচার্য্যদেবের অনুরাগের পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছেন। বাংলা ভাষায় তিনি যে স্বল্প রচনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় তাঁহার লেখনীধারণ সার্থক হইয়াছে, এবং সাধনা করিলে বঙ্গসাহিত্যকে তিনি যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি কিছুকাল বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতিও ছিলেন। তাঁহার নিজের যেরূপ একনিষ্ঠতা ছিল অপরকেও তদ্রূপ একনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দিতেন। বিজ্ঞানমন্দিরের কর্ম্মীদের কত দিন তিনি বলিয়াছেন—I want the whole mind, the undivided mind.

তাই বলিয়া বিজ্ঞানের বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন না। দেশের অধিকাংশ আন্দোলনের সহিত তাঁহার অন্তরের যোগ ছিল। সাধারণ লোকের মত তিনি যে শুধু সংবাদপত্র মারফত এই যোগরক্ষা করিতেন তাহা নহে, বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে সাক্ষাৎমত সমস্ত সংবাদ লইতেন। দেশবিদেশের যত বড় লোক কলিকাতায় আসিলেই এক বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং বসুবিজ্ঞান-মন্দির দেখিতে আসিতেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনায় সহজেই সকল বিষয়ের মর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। ললিতকলার প্রতি আচার্য্যদেবের খুব অনুরাগ ছিল। তাঁহার বাড়ী অথবা বসু-বিজ্ঞান-মন্দির যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। তাঁহার বাড়ীতে প্রাচীন মিশরের চিত্র, অজন্তার চিত্র, বাংলার আধুনিক শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চিত্র এবং আরও কত যে শিল্প-সম্ভার আছে শিল্পজ্ঞানহীনের পক্ষে তাহা স্মরণ রাখাও অসম্ভব। একবার আগরতলায় বাঁশ ও বেতের প্রস্তুত একটি বেড়ার কারুকার্য্য দেখিয়া তিনি এত মুগ্ধ হন যে তদ্রূপ আর একটি আনাইয়া নিজের বসিবার ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখেন।

কোন কাজের সংকল্প করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিতেন। বড়লোক মাত্রেরই বোধ হয় ইহা স্বভাব। সংকল্পিত কার্য্যটি না হইলে বা বস্তুটি না পাইলে যেন সংসার অচল হইয়া যায়। "ঐ এক্সপেরিমেণ্টটার রেজাল্ট জানতে না পারলে কোন কাজ করতে পাচ্ছি না।" "ঐটার জন্য আমার লেখা-টেখা সব বন্ধ হয়ে আছে", ইত্যাদি। সুতরাং সংকল্পকে যথাসম্ভব শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিতেন তবে ছাড়িতেন; কিন্তু কোন একটি কার্য্যকে এক বার করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, পুনঃ পুনঃ সেইটা করিতেন, বা করাইতেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি বার বার করাইতেন, সময়ের ব্যবধানে করাইতেন, আবার বিভিন্ন ঋতুতে করাইতেন। তাঁহার মুখে প্রায়ই শোনা যাইত "বার বার ক'রে যাও", "ক্রমাগত করতে থাক", "পারফেক্ট হওয়া চাই", "nothing short of perfection", ইত্যাদি। কোন বক্তৃতামঞ্চে যে-সকল পরীক্ষা দেখাইবেন স্থির করিতেন অনেক দিন আগে হইতেই সেইগুলি করাইতে আরম্ভ করিতেন। যে কর্ম্মীদের উপর ঐ পরীক্ষাগুলি দেখাইবার ভার পড়িত তাঁহাদের আর অন্য কোন কাজ করিতে হইত না। তাঁহারা সকালে সন্ধ্যায় দুপুরে, রোদে বৃষ্টিতে বিভিন্ন অবস্থায় পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। সুতরাং কোন বক্তৃতা-মঞ্চে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কোন পরীক্ষা অকৃতকার্য্য হইত না। এক বার তাঁহার প্রদর্শিত সবগুলি পরীক্ষার একরূপ নাটকীয় পরিণতি দর্শনে বিস্মিত হইয়া বিলাতের



এক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক আচার্য্যদেবকে বলিয়াছিলেন, "ডক্টর বোস, আপনার অন্ততঃ দু-একটি পরীক্ষা fail করা উচিত, নইলে লোকের বিশ্বাস হবে কেন?" নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলি সম্বন্ধেও তিনি এই নীতিই অবলম্বন করিতেন। কোন একটি যন্ত্রকে পুনঃ পুনঃ ভাঙিয়া গড়িয়া কার্য্যকারিতার দিক হইতে উহাকে যত দূর সম্ভব উৎকৃষ্ট করিতেন। তারপর সৌন্দর্য্যের দিক হইতে আবার উহার সংস্কার আরম্ভ হইত। আর কিছু করিবার না থাকিলে উহাকে আরও 'handy' 'more compact', অন্ততঃ পক্ষে 'portable' করাইতেন। বহু সময় ও শক্তিব্যয়ে নির্ম্মিত জিনিষটাকে ভাঙিয়া ফেলিতে তাঁহার একটুও মায়া হইত না। বাস্তবিক পক্ষে ক্রমাগত ভাঙা এবং গড়া ইহাই ছিল বসুবিজ্ঞান-মন্দিরের নিয়ম।

পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। লিখিবার জন্য তাঁহার একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষ ছিল; তথায় গিয়া লিখিতে বসিলেই নাকি তাঁহার লিখিতে ইচ্ছা হইত। এই গ্রন্থ-প্রণয়ন ব্যাপারেও তাঁহার অধ্যবসায়ের অবধি ছিল না। পাণ্ডুলিপি যেমন যেমন লেখা হইত অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহা টাইপ করাইয়া লইতেন। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে অনেক প্রকার চিত্রের সমাবেশ থাকে—যন্ত্র, বিষয়ভেদে যন্ত্রসমাবেশ, পরীক্ষা-লব্ধ রেকর্ড, গ্রাফ ইত্যাদির চিত্র। বিশেষ সতর্কতার সহিত তিনি চিত্র প্রণয়ন করাইতেন ও নির্ব্বাচন করিনে। লিখিয়া যাইবার পরে পরীক্ষায় কোন নূতন ফল পাইলে লিখিত অংশগুলি আবার নূতন করিয়া লিখিতেন ও টাইপ করাইতেন। আবার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইলেও নূতন করিয়া লেখা ও টাইপ করার প্রয়োজন হইত। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে হয়ত পুস্তকের পত্রসংখ্যার পরিবর্ত্তন হইল, তখন আবার নূতন করিয়া পত্রাঙ্ক দিলেন, চিত্রসংখ্যার পরিবর্ত্তনে নূতন করিয়া চিত্রাঙ্ক দিলেন্। কিন্তু পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনের বহু অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি ইহাতে কিছুমাত্র আলস্যবোধ করিতেন না। এইরূপে বহু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের পর মনঃপূত হইলে তবে পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠাইতেন।

নিজের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি প্রচারের জন্য তিনি অনেক বার ইউরোপে গিয়াছিলেন। সত্যের আবিষ্কার অপেক্ষাও প্রচারে বোধ হয় তাঁহাকে বেশী বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাই তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন—"সত্য গ্রহণের জন্য দুনিয়াতে কেউ হাঁ ক'রে ব'সে নেই।" কাজেই ইউরোপ-যাত্রার পূর্ব্বে তথায় অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইবে জানিয়া তিনি বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াই যাইতেন। Ascent of sap কিংবা Photosynthesis বিষয়ে গবেষণার পর, ইউরোপে গিয়া যে বক্তৃতাগুলি দিবেন তাহারই একটি বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া যাত্রার প্রাক্কালে কলিকাতাতেই এক দিন তাহা প্রদান করেন। বসুবিজ্ঞান-মন্দিরের সভাগৃহে যন্ত্র ও পরীক্ষাদি সহায়ে যথারীতি বক্তৃতা-সমাপন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত সময় লাগল?" শ্রোতৃ-মণ্ডলীর (কেবল বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্ম্মীবৃন্দ) এক জন বলিলেন, "দেড় ঘণ্টা।" আচার্য্য বলিলেন, "তবে ত হ'ল না। বিলাতের লোকের অত সময় নেই; এক ঘণ্টায় বক্তৃতা শেষ করতে হবে।" দুই-এক দিন পরে আবার ঐভাবে বক্তৃতা দিয়া যখন দেখিলেন এক ঘণ্টায় বক্তৃতা শেষ হইয়াছে তখন সন্তুষ্ট হইলেন। দৈবের উপর তিনি বিন্দুমাত্রও নির্ভর করিতে চাহিতেন না। সময় পাইলে তিনি পূর্ব্ব হইতেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া লইতেন; অবশ্য প্রস্তুত না হইয়াও সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোকের আগ্রহের অবধি থাকিত না। তাঁহার প্রতিভামণ্ডিত মুখমণ্ডল, মধুর কণ্ঠস্বর, দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রাঞ্জলভাষায় বুঝাইবার ক্ষমতা, তাঁহার প্রদর্শিত বিচিত্র পরীক্ষাসকল শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। বক্তৃতার সময় শ্রোতৃমণ্ডলীর কাহারও উঠিয়া যাওয়া তিনি অপছন্দ করিতেন। তিনি নিজে কাহারও বক্তৃতা শুনিতে গেলে উহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও উঠিতেন না এবং অপরকেও ঐরূপ করিতে উপদেশ দিতেন।

"গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ"—এই বাক্যের সার্থকতা আচার্য্যদেবের চরিত্রে খুবই দেখা গিয়াছে।

স্বাধীন ভাবে নিজের চেষ্টায় কেহ কিছু করিলেই তাঁহার প্রশংসাভাজন হইত। বসুবিজ্ঞান-মন্দিরে মেরামতী কাজের জন্য নিযুক্ত কণ্ট্রাক্টারও তাঁহার কাছে "খুব লোক", কেননা সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। এক দিন এক তরুণ কথকের কথকতা শুনিয়া তিনি তাহার অজস্র প্রশংসা করিলেন, কিন্তু উক্ত কথকতার মধ্যে অসাধারণ কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না। সামান্য ব্যাপারেও কোন লোকের ধৈর্য্য বা অধ্যবসায় দেখিলে আচার্য্যদেব খুব খুশী হইতেন। এক দিন একটি লোক তাঁহার ফল্‌তার পুকুরে মাছ ধরিবার আশায় ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে। তিনিও যখন যখন বাহিরে আসিতেছেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি হে, কিছু হ'ল ?" "কিছুই না ?" "কোন 'ইণ্ডিকেশ্যন' পাচ্ছ না ?" সেই ব্যক্তিও প্রত্যেক বার "আজ্ঞে না" এই উত্তরই দিতেছে। সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইয়া যখন দেখিলেন লোকটি তখনও বসিয়া আছে তখন তিনি শ্রীযুক্তা বসুজায়াকে বলিলেন, "দেখেছ ? এখনও ব'সে আছে।" শ্রীযুক্তা বসুজায়া এইরূপ অপচেষ্টার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, না, না। সমস্ত দিন এই ভাবে ব'সে আছে। কম কথা নয়।" আবার উৎসাহ-অধ্যবসায়ের বিপরীত ভাব দেখিলে তিনি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কোন কর্ম্মী তাঁহার নিকট বলিয়া ফেলিত যে বাধাবিঘ্নের দরুণ কোন কাজ সম্পন্ন করিতে পারে নাই, তবে হয়ত তাহাকে শুনিতে হইত, "Any fool could say that." বাস্তবিকই ত। যিনি আজীবন পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা ঠেলিয়া পথ করিয়াছেন, যাঁহার নিকট জীবন এবং বাধা একার্থক হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নিকট বাধাবিঘ্নের অজুহাত দেওয়া মূর্খতা ভিন্ন আর কি ?

আচার্য্যদেব এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন যে নিজের পিতার মৃত্যুর দিনেও তিনি কলেজ কামাই করেন নাই। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি তাঁহার বিলাতী মেক্যানিকের কথা বলিয়াছিলেন। এক বার বিলাতপ্রবাস-কালে নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য তিনি তথায় এক জন মেক্যানিক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তির এক দিন মাত্র দেরী হইয়াছিল। দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিল, "Had no sleep last night. Master John was born." পত্নীর প্রসবের দরুন সারারাত তাহাকে হাঙ্গামা পোহাইতে হইয়াছিল। আচার্য্যদেবের মোটর-চালক আচার্য্যদেবের কর্ত্তব্যপরায়ণতা কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এক দিন নিমতলা শ্মশানে এক ব্যক্তির সংকার করিতে করিতে দেখিলাম উক্ত চালক তাহার পিতার মৃতদেহ সংকারের জন্য তথায় উপস্থিত হইল। আমরা সেই দিন কামাই করিলাম; পরদিন শুনিলাম চালক সন্ধ্যায় পূর্ব্বে শ্মশান হইতে ফিরিয়া যথারীতি আচার্য্যদেবকে মাঠে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিল।

আচার্য্যদেবের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালবাসিতেন, বিলাতের লোকের পরিচ্ছন্নতার উচ্চ প্রশংসা করিতেন এবং বলিতেন, "You have no idea of cleanliness", অর্থাৎ তাহাদের তুলনায়। বসুবিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্যানের শোভা দর্শকমাত্রের নয়নমন তৃপ্ত করিত। এই শোভার আগার হইতে যখন অন্য দিকের গৃহস্থ-বাড়ীগুলিতে ঝুলান কাঁথা কাপড় দেখা যাইত তখন তাঁহার অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিত। এই সব "unearthly sights" হইতে উদ্ধার পাওয়া তাঁহার যেন একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরে উদ্যানের সীমানায় বিদ্যার্থীদের গৃহ প্রভৃতি কয়েকখানা বাড়ী তুলিয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেব তাঁহার বেয়ারার প্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "তোকে আমি রাখব না, তোর চেহারা এমন যে তোর দিকে আমি তাকাতে পারি না।" রাগের সময় ঐ লোকটির চেহারার প্রতি তাঁহার বিরাগ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল মাত্র, নতুবা পারতপক্ষে কাঁহারও অন্নের পথ বন্ধ করা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। উত্তরে ঐ লোকটি বলিয়াছিল, "হুজুর আমার কি দোষ ? চেহারার উপর ত আমার হাত নেই। ওটা ভগবান্ যেমন করেছেন তেমনি হয়েছে।" এই উত্তর শুনিয়া আচার্য্যদেব অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং পরে বলিয়াছিলেন, "তাই ত, ওর কি দোষ ? ভগবান যেমন করেছেন তেমনি হয়েছে।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতা ছিল অসাধারণ। সকল সময়ে তাঁহার সম্মুখীন হওয়ার সাহস অনেকেই সঞ্চয় করিতে পারিত না। তাঁহার তিরস্কারে মর্ম্মাহত হইলেও আবার তাঁহার একটি মিষ্ট কথায় লোকে গলিয়া জল হইয়া যাইত। তিনি বলিতেন, "যাদের কিছু হবার আশা আছে, যাদের আমি ভালবাসি তাদেরই গালাগালি করি।" প্রবন্ধকার যখন আচার্য্যদেবের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায় তখন আচার্য্যদেব ষাট বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার তেজস্বিতার কথা বলিতে গিয়া বিজ্ঞানমন্দিরের এক জন পুরাতন কর্ম্মী বলিয়াছিলেন, "এখন আর কি তেজ দেখছেন ? পূর্ব্বে তিনি ছিলেন একেবারে আগুন।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

"ভদ্রলোকের এক কথা"

কথিত আছে, এক জন ভদ্রলোক অপর এক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু টাকা ধার লইয়াছিলেন। পাওনাদার কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে টাকাটা শোধ করিতে বলিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কাল দিব।" যথাসময়ে পাওনাদার উপস্থিত। সেদিনও অধমর্ণ উত্তর দিলেন, "কাল দিব।" এইরূপ কয়েক বার একই উত্তর পাইয়া উত্তমর্ণ বলিল, "আপনি প্রতিবারই বলেন 'কাল দিব'; একটা তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলুন কবে দিবেন।" তখন অধমর্ণ গরম হইয়া বলিলেন, "আমাকে অবিশ্বাস! তারিখ আবার কি? ভদ্রলোকের এক কথা—কাল দিব।"

স্বরাজ সব জাতির জন্মস্বত্ব। যদি তাহা অন্য কোন জাতির হাতে গিয়া থাকে, তাহা ফিরিয়া পাইতে তাহার ন্যায্য অধিকার আছে। তাহার পাওনার দাবী সে যে-কোন সময়ে করিতে পারে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট মার্কুইস্ অব হেস্টিংস্ তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন, এমন এক অনতিদূর সময় আসিবে যখন ইংলণ্ড ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করিবে।* পরে মেকলেও লিখিয়াছিলেন সেদিন ইংলণ্ডের গৌরবের দিন হইবে যখন ভারতীয়েরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উন্নত হইয়া স্বদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চাহিবে।

ভারতীয়েরা তাহা চাহিয়াছে। কিন্তু ব্রিটেন এই চাওয়াটাতে আহ্লাদিত হন নাই, এবং যেদিন তাহারা উহা চাহিয়াছে সেই দিনকে গৌরবের দিন মনে করেন নাই।

কিন্তু গত শতাব্দীর কথা তুলিব না। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ব্রিটেনের নৃপতি ও প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক রাজনীতিক বারবার বলিয়া আসিতেছেন, ভারতবর্ষকে দায়িত্বপূর্ণ গবর্মেণ্ট দেওয়া হইবে এবং তাহার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও মর্য্যাদা ডোমীনিয়নগুলির মত হইবে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতির মত ডোমীনিয়ন স্টেটস পাইবে। কখন কে কি বলিয়াছেন তাহার একটা মোটামুটি তালিকা ১৯৩৫ সালে ইংরেজ শ্রমিক-নেতা জর্জ ল্যান্সবেরি প্রণীত "লেবার্স ওএ উইথ দি কমনওএল্থ্" "Labour's Way With the Commonwealth" নামক পুস্তক হইতে দিব। এখনও সেই একই কথা ব্রিটেনে ও ভারতে ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা বলিতেছেন, "ভারতবর্ষ যথাসময়ে ডোমীনিয়ন স্টেটস পাইবে।" কখন পাইবে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, "যুদ্ধের অবসানের পরে।" তাহার অর্থ হইতে পারে, এক দিন হইতে বহু শত বা বহু সহস্র বৎসর পরে। এই জন্য ভারতীয়েরা এখনই স্বরাজ পাইবার একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখ জানিতে চায়। তাহাতে ব্রিটিশ জাতি যেন ক্রোধবশে বলিতেছেন শুনা যাইতেছে, "আমাদিগকে অবিশ্বাস! ভদ্রলোকের এক কথা—যথাসময়ে পাইবে।"

[২৫শে কার্ত্তিক, ১১ই নবেম্বর লিখিত]

* "A time not very remote will arrive when England will, on sound principles of policy, wish to relinquish the domination which she has gradually and unintentionally assumed over this country, and from which she cannot at present recede. In that hour it would be the proudest boast and most delightful reflection that she had used her sovereignty towards enlightening her temporary subjects, so as to enable the native communities to walk alone in the paths of justice, and to maintain with probity towards their benefactors that commercial intercourse in which we should then find a solid interest." *The Private Journal of the Marquess of Hastings*, May 17th, 1818.

ব্রিটিশ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিশ্রুতির মূল্য

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট কাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে বাধ্য বা বাধ্য নহে, সে বিষয়ে বিনা প্রতিবাদে যে দুটি মন্তব্য পার্লেমেণ্টের হাউস অব কমন্সে ও হাউস অব লর্ডসে করা হইয়াছিল তাহা ল্যান্সবেরি সাহেবের পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তক হইতে অনুবাদ না করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। মন্তব্যগুলি পূর্ব্বে ১৯৩৫ সালে মডার্ণ রিভিয়ুতে অন্ততঃ এক বার উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।

১৬ পৃষ্ঠা হইতে—

The Chairman of the Conservative M. P.'s India Committee, Sir John Wardlaw-Milne, stated in the House of Commons: 'No pledge given by any Secretary of State or any Viceroy has any real legal bearing on the matter at all. The only thing that Parliament is really bound by is the Act of 1919.*

১৬-১৭ পৃষ্ঠা হইতে—

Lord Rankeillour, who was for many years Chairman of Committees and Deputy Speaker in the House of Commons, and so may be assumed to speak with some authority, said that we were bound by the preamble to the Government of India Act of 1919, but by nothing else. And speaking of these pledges he added these words: 'No statement by a Viceroy, no statement by any representative of the Sovereign, no statement by the Prime Minister, indeed, no statement by the Sovereign himself, can bind Parliament against its judgment.'†

সকলেই জানেন, বর্ত্তমানে বলবৎ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে ডোমীনিয়ন স্টেটস কথা দুটির উল্লেখ পর্য্যন্ত কোথাও নাই। সুতরাং এখন ভারত-সচিব এবং বড়লাট সম্পূর্ণ সরল ভাবে ও আন্তরিকতার সহিত ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন স্টেটস দিতে চাহিলেও সর্ব্বময় কর্ত্তা ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য থাকিবেন না। সেই প্রতিশ্রুতি পার্লেমেণ্ট রক্ষা করিতে পারেন, না করিতেও পারেন।

ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন স্টেটস দেওয়া যে পার্লেমেণ্টের অভিপ্রেত ছিল না (এবং এখনও নহে), তাহা ল্যাম্বেরি সাহেবের পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

Neither the Report of the Joint Select Committee, that sat for the greater part of two years during 1933 and 1934, nor the Constitution Bill, at present before Parliament, mentions Dominion status even as a distant goal to be arrived at!

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লীটন ভারত-সচিবকে প্রেরিত একটি সরকারী চিঠিতে যে লিখিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের উভয় গবর্মেণ্টই ভারতীয়দিগকে প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছেন††, আমাদের অনুমান তাহার একটা কারণ অঙ্গীকারগুলি পার্লেমেণ্টে পাস-করান আইন নহে এবং একই প্রতিশ্রুতির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন রাজপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন রকম করিয়াছেন। ল্যাম্বেরি সাহেবের পুস্তক হইতে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর হাউস অব কমন্সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি তর্কবিতর্ক উপলক্ষ্যে (পরে প্রধান মন্ত্রী) বল্‌ড্‌উইন সাহেব ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের দায়িত্বপূর্ণ গবন্মেণ্ট পাইবার উল্লেখ করেন কিন্তু তাহার তারিখ নিকট বা দূর তাহা বলেন নাই। এ-বিষয়ে ল্যাম্বেরি সাহেব লিখিয়াছেন:—

"It is important that it should be noted in this country, as it certainly has been in India, that the words Mr. Baldwin used were 'responsible government': the same words that Mr. Edwin Montagu used in his declaration of August 1917, the words that the Government of India tried to explain away in 1924, and that the Viceroy in 1929, with the full authority of the British Government, declared had implicit in them the attainment of Dominion status." P. 75.

কয়েকটি ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বরের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্র হইতে—

"It is Our further will that, so far as may be, Our subjects, of whatever race and creed, be freely and impartially admitted to office in Our service, the duties of which they may be qualified by their education, ability and integrity to discharge."

ইহা পার্লেমেণ্টারি আইন নহে বলিয়া রাজপুরুষেরা এই অঙ্গীকার পালন করিতে আপনাদিগকে বাধ্য মনে করেন নাই।

অতঃপর স্বরাজের কয়েকটি প্রতিশ্রুতি উদ্ধৃত করি। অবশ্য, সবগুলিতে ঠিক্ স্বরাজসূচক ইংরেজী প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

. . . . . the now famous Declaration made in the House of Commons by the Secretary of State for India, the late Mr. Edwin Montagu, on 20th August, 1917 that 'the policy of His Majesty's Government, with which the Government of India are in complete accord, is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire.'

---

* *Hansard*, 10th December, 1934, Vol. 296, No. 15, p. 142.

† *Hansard*, House of Lords, December 13th, 1934, Vol. 95, No. 8, Col. 331.

†† "Since I am writing confidentially, I do not hesitate to say that both the Governments of England and of India appear to me, up to the present moment, unable to answer satisfactorily the charge of having taken every means in their power of breaking to the heart the words of promise they had uttered to the ear."—From Lord Lytton's Despatch to the Secretary of State for India, dated 2nd May, 1878, quoted in *'Labour's Way With The Commonwealth*, pp. 49-50.

ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনের বিদ্যালয়ে ক্রমশ প্রমোশন পাইবে, কিন্তু বরাবর এবং শেষেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত থাকিবে, ইহাতে এইরূপ বলা হইয়াছে। এই মর্ম্মের কথা বর্ত্তমানে ভারত-সচিবআদিও পার্লেমেন্টে বলিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেস চায় পূর্ণ স্বরাজ, ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ যাহার মধ্যে উহ্য আছে।

১৯১৭ সালের সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ কন্‌ফারেন্সে (Imperial War Conferenceএ) একটি প্রস্তাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বৈদেশিক নীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক সমূহে মত প্রকাশ ও গ্রাহ্য করাইবার এবং পরামর্শ দিবার যথেষ্ট অধিকার ডোমীনিয়নগুলির ও ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে দাবী ও সাব্যস্ত করা হয় কিন্তু সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথা দূরে থাক, ভারতবর্ষের নিজের বৈদেশিক নীতি ও সম্পর্ক বিষয়েও তাহার অধিকার নাই। কংগ্রেস ত অভিযোগই করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের মত না লইয়া তাহাকে বর্ত্তমান যুদ্ধে যোগ দেওয়ান হইয়াছে।

১৯১৮ সালের ৬ই আগস্ট হাউস অব কমন্সের নেতা অস্টেন চেম্বারলেন সাহেব সকল দলের অনুমোদন সহ হাউস অব কমন্সে বলেন :

'This year, apart from the Secretary of State, who sits in the Imperial War Cabinet as one of the British Ministers dealing with imperial affairs, India sits there in her own right. A new recognition has been given to the equality of the status of India and to her right of reciprocal treatment as between the Dominions and India of Great Britain and India and their respective citizens. In these matters, within the last few years, India has leapt suddenly into a place which is equal with other great portions of His Majesty's Dominions.' Pp. 53-54.

একুশ বৎসর আগে হাউস অব কমন্সে সকল রাজনৈতিক দলের সদস্যদের অনুমোদন অনুসারে ঘোষিত হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষ একেবারে লাফাইয়া এমন উচ্চ রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য বড় বড় অংশের সমান! কিন্তু এগুলা যে ফাঁকা কথা, তাহা ত আমরা একুশ বৎসর পরেও দেখিতে পাইতেছি। "ভদ্রলোকের এক কথা"।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুসারে ভারতবর্ষকে যে কন্‌ষ্টিটিউশ্যন বা মূল রাষ্ট্রবিধি দেওয়া হয়, তাহা চালু করিবার প্রারম্ভিক কার্য্য করেন তাৎকালিক রাজ-পিতৃব্য ডিউক অব কনট। তিনি তদুপলক্ষ্যে ১৯২১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী কি বলেন দেখা যাক্।

The new constitution was inaugurated in India by H R. H. the Duke of Connaught, who, on behalf of H. M. the King Emperor, on February 9th, 1921, used these words: 'For years—it may be for generations—loyal Indians have dreamed of Swaraj for their motherland. To-day you have the beginning of Swaraj within My Empire and the widest scope and ample opportunities for progress to the liberty which My other Dominions enjoy.' Pp. 58-59.

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ১৯১৮ সালে অস্টেন চেম্বারলেন সাহেব সকল রাজনৈতিক দলের পার্লেমেন্ট-সভ্যের অনুমোদন সহকারে বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ হঠাৎ এক লম্ফে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য সব বৃহৎ অংশের সমান একটি স্থানে উঠিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার তিন বৎসর পরে মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বরের পক্ষ হইতে ভারতীয়দিগকে বলা হইতেছে তাহারা ঐ অংশগুলির সমান স্বাধীনতার অভিমুখে অগ্রসর হইবার যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছে। তাহা হইলে ভারতবর্ষ বোধ হয় লাফ দিয়া যথাস্থানে পৌছিয়া পরে পিছলাইয়া উল্টা দিকে গিয়া পড়িয়াছিল! ১৯১৮ সালে অস্টেন চেম্বারলেন সাহেব যে অত্যুক্তি করিয়া অপ্রকৃত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ১৯২১ সালে মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বর যে গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরকে উপদেশপত্র দেন (পৃ: ৫৯) তাহা হইতেও বুঝা যায়—কেননা, তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, পার্লেমেন্ট এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহার ফলে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে ডোমীনিয়নগুলির মধ্যে যথোপযুক্ত স্থান পাইতে পারে। যথা—

. . . . . the revised Instrument of Instructions to the Governor-General of India, issued on March 15, 1921, contains these words: 'For above all things it is Our will and pleasure that the plans laid by Our Parliament . . . . may come to fruition to the end that British India may attain its due place among Our Dominions.'

যাহা হউক, অস্টেন চেম্বারলেন সাহেবের উক্তি যথার্থ না হইলেও এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, ১৯২১ সালে ৯ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৫ই মার্চ মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বর এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ যেন পরে ডোমীনিয়নগুলির মধ্যে স্থান পায়। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পার্লেমেন্টের আইন না-হওয়ায় পার্লেমেন্ট তদনুসারে কাজ করিতে কোন বাধ্যতা অনুভব করে নাই; ফলে ১৯৩৫ সালে যখন নূতন ভারত-শাসন আইন প্রণীত হইল তখন ভারতবর্ষ ডোমীনিয়নত্ব পাওয়া বা তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, ডোমীনিয়ন স্টেটস্‌ শব্দ দুটিকে

পর্য্যন্ত ঐ আইনে কোথাও স্থান পাইতে দেওয়া হইল না!

কিন্তু তা বলিয়া ১৯২১ ও ১৯৩৫ সালের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা যে ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্ব পাইবার আশা দিতে ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা যে ক্ষান্ত ছিলেন না তাহা দেখাইতেছি।

The Prime Minister, realizing the unrest and legitimate dissatisfaction in India, said in a public speech in April 1924: 'We know of the serious condition of affairs in India, and we want to improve it . . . . . Without equivocation, Dominion status for India is the idea and the ideal of the Labour Government.'—P. 61.

অতঃপর ১৯২৮ সালের একটি প্রতিশ্রুতি উদ্ধৃত করিব।

Mr. Ramsay MacDonald, then Leader of the opposition, at a conference in London on July 2nd 1928, speaking, it must be assumed, with a full appreciation of the responsibility of his position, used these words: 'I hope that within a period of months rather than years there will be a new Dominion added to the Commonwealth of our Nations, a Dominion of another race, a Dominion that will find self-respect as an equal within this Commonwealh. I refer to India.—P. 64.

ইহার পর কয়েক মাস নহে, এগার বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ডোমীনিয়ন হয় নাই। ১৯২৯ সালে লর্ড আরুইন (এখন লর্ড হালিফ্যাক্স) আবার ডোমীনিয়ন স্টেটসের প্রতিশ্রুতির পুনরুল্লেখ করেন। যথা—

On October 31st, 1929, on his return from England where he had been in consultation with the British Cabinet, the Viceroy explicitly re-affirmed the object of British rule, and said that it was 'implicit in the Declaration of 1917 that the natural issue of India's constitutional progress, as there contemplated, is the attainment of Dominion status.'

আর প্রতিশ্রুতি উদ্ধৃত করিব না। ভদ্রলোকের কথা যে এক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই কথা অনুসারে পার্লেমেণ্টে আইন পাস হইয়া গেলে তবে বুঝিব কিছু একটা পাওয়া গেল। নতুবা এখন যদি পুনর্বার খুব উচ্চপদস্থ কোন কোন ব্যক্তি—উচ্চতম ব্যক্তিরাও—কিছু অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আন্তরিকতায় ও সরলতায় অবিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিব না, কিন্তু আমাদিগকে সংশয়পূর্ণ চিত্তে পার্লেমেণ্টে সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী আইনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

—

"সংখ্যাগরিষ্ঠতার অবাস্তবতা" সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী

গত ২১শে আগস্টের ইংরেজী "হরিজন" পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী সংখ্যাগরিষ্ঠতার অবাস্তবতা বা কাল্পনিকতা ("The Fiction of Majority") সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার একটি অংশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। তাহার শেষ প্যারাগ্রাফে তিনি বলিতেছেন:—

"Consider for one moment what can happen if the English were to withdraw all of a sudden and there was no foreign usurper to rule. It may be said that the Punjabis, be they Muslims, Sikhs or others, will overrun India. It is highly likely that the Gurkhas will throw in their lot with the Punjabis. Assume further that non-Punjabi Muslims will make common cause with the Panjabis. Where will the Congressmen composed chiefly of Hindus be? If they are still truly non-violent, they will be left unmolested by the warriors. Congressmen won't want to divide power with the warriors but will refuse to let them exploit their unarmed countrymen. Thus if anybody has cause to keep the British rule for protection from the stronger element, it is the Congressmen and those Hindus and others who are represented by the Congress. The question, therefore, resolves itself into not who is numerically superior but who is stronger. Surely there is only one answer. Those who raise the cry of minority in danger have nothing to fear from the so-called majority which is merely a paper majority and which in any event is ineffective because it is weak in the military sense.

"Paradoxical as it may appear, it is literally true that the so-called minorities' fear has some bottom only so long as the weak majority has the backing of the British bayonets to enable it to play at democracy. But the British power will, so long as it chooses, successfully play one against the other calling the parties by whatever names it pleases. And this process need not be dishonest. They may honestly believe that so long as there are rival claims put up, they must remain in India in response to a call from God to hold the balance evenly between them. Only that way lies not Democracy but Fascism, Nazism, Bolshevism and Imperialism, all facets of the doctrine of 'Might is Right.' I would fain hope that this war will change values. It can only do so, if India is recognized as independent and if that India represents unadulterated non-violence on the political field."

ভারতীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত সব কাগজ আমাদের নিকট আসে না; যতগুলি আসে তাহার মধ্যেও সবগুলি পড়িবার সময় পাই না। যতগুলি দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে গান্ধীজীর প্রবন্ধটির এই অংশের উপর কোন মন্তব্য দেখি নাই। বাংলায় ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ:—

ক্ষণকালের জন্ত বিবেচনা করুন, যদি ইংরেজরা হঠাৎ চলিয়া যায় এবং শাসন করিতে কোন বিদেশী বলাৎ-অধিকারী জাতি এ-দেশে না থাকে তাহা হইলে কি ঘটিতে পারে। বলা যাইতে

পারে যে, তখন মুসলমান, শিখ বা অন্য পঞ্জাবীরা ভারতবর্ষ দখল করিবে। ইহা খুবই সম্ভব যে, গুর্খারা পঞ্জাবীদের সহকর্মী হইবে। আরও ধরিয়া লউন যে, অপঞ্জাবী মুসলমানেরা পঞ্জাবীদের পক্ষ অবলম্বন করিবে। তখন প্রধানতঃ হিন্দুদের দ্বারা গঠিত কংগ্রেসী দলের কি দশা হইবে? যদি তাহারা তখনও সত্যসত্যই অহিংস থাকে, তাহা হইলে যোদ্ধারা তাহাদিগকে ত্যক্ত করিবে না। কংগ্রেসীরা যোদ্ধাদের সহিত ক্ষমতা ভাগ করিয়া লইতে চাহিবে না, কিন্তু তাহাদিগকে তাহাদের অস্ত্রহীন স্বদেশবাসীদিগকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করিতে দিতেও অস্বীকৃত হইবে। অতএব, ভারতীয় জাতির প্রবলতর অংশ হইতে রক্ষার নিমিত্ত যদি কাহারও ব্রিটিশ শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার কারণ থাকে, তাহা কংগ্রেসীদের এবং কংগ্রেস যে-সব হিন্দু ও অন্যদের প্রতিনিধি তাহাদের আছে। অতএব প্রশ্নটা দাঁড়াইতেছে কে বলবত্তর;—কে সংখ্যায় অধিকতর প্রশ্ন তাহা নহে। এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই কেবল একটি হইতে পারে। যাহারা 'সংখ্যালঘুরা বিপন্ন' এই রব উত্থাপন করে, তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠগণ হইতে তাহাদের কোন ভয়ের কারণ নাই—শেষোক্তেরা কেবলমাত্র কাগজে লেখা সংখ্যায় গরিষ্ঠ, এবং সামরিক হিসাবে দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদের গরিষ্ঠতা সর্ব্বাংশে অকেজো।

"শুনিতে কথাটা স্ববিরোধী মনে হইলেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে, সংখ্যালঘুদের তথাকথিত আশঙ্কার কিছু ভিত্তি কেবল তত দিনই আছে যত দিন দুর্ব্বল সংখ্যাগরিষ্ঠেরা গণতন্ত্রের খেলা খেলিতে ব্রিটিশ বেয়নেটের পোসকতা পায়। কিন্তু ব্রিটিশ শক্তি, যত দিন ইচ্ছা তত দিন, সফলতার সহিত এক পক্ষকে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবে—তাহাদের নাম যাহাই দিউক। এই প্রক্রিয়া বা চা'লটা অসাধুতাপ্রসূত না-হইতেও পারে। ব্রিটিশরা বাস্তবিকই বিশ্বাস করিতে পারে যে, যত দিন প্রতিযোগীদের দাবী উত্থাপিত হইবে, তত দিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে তুলাদণ্ডের সাম্য রক্ষার নিমিত্ত ঈশ্বরের আহ্বানে তাহাদিগকে ভারতবর্ষে থাকিতে হইবে। তবে, কেবল ইহা বলা আবশ্যক যে, ও-পথ গণতন্ত্রাভিমুখী নহে; উহার পরিণতি ফাসিস্তবাদ, নাৎসীবাদ, বলশেভিকবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ—সমস্তই 'জোরই হক' (জোর যার মুলুক তার') মতের ভিন্ন ভিন্ন পল। আনন্দের সহিত এই রূপ আশা করিতে আমার ইচ্ছা হয়, যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ বিবিধ মানব-আচরণের মূল্য বদলাইয়া দিবে। যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীন মানা হয় এবং সেই স্বাধীন ভারতবর্ষ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে অবিমিশ্র অহিংসার প্রতিনিধি (দ্যোতক বা প্রতীক) হয়, তাহা হইলেই এই যুদ্ধ এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিবে।

ইংরেজরা হঠাৎ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে এবং তাহাদের জায়গায় অন্য কোন বিদেশী জাতি ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া শাসন না-করিলে কি ঘটিতে পারে, গান্ধীজী তাহা বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন। তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয় বটে; কিন্তু এরূপ অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা নিতান্ত কম। ইংরেজরা স্বেচ্ছায় হঠাৎ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে না। যদিই বা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের নিজের সামরিক বল বর্ত্তমানে এরূপ নাই যে, ভারতীয়েরা বিদেশী কোন প্রবল জাতির আক্রমণ সে-অবস্থায় প্রতিরোধ করিতে পারিবে।

বিলাতী দু-একটি খবরের কাগজের উক্তি হইতে এবং নেতৃস্থানীয় অল্পসংখ্যক ইংরেজের কথা হইতে এরূপ মনে হয় যে, তাহাদের ঐ সব কথা আন্তরিক হইলে এবং তৎ-সমুদয়ের সমর্থক দল বিলাতে প্রবলতম হইলে ভারতীয়েরা কোন প্রকার সশস্ত্র বা অহিংস সংগ্রাম না করিয়াও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু সে-অবস্থাতে ইংরেজ জাতির ভারতে প্রভুত্ব করিবার লোভ ও ইচ্ছার অবসান হইয়াছে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ঘটিলেও, অন্য সব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবল জাতিরও তখন সেই প্রকার লোভ ও ইচ্ছার অভাব হইবে, এরূপ কল্পনা করা যায় না। অতএব, ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীন থাকিতে হয়, তাহা দুটি অবস্থার বা উপায়ের মধ্যে কোন একটিতে বা কোন একটি দ্বারা হইতে পারে। একটি, পৃথিবীর প্রবলতম যোদ্ধা জাতিকে হটাইয়া রাখিবার মত ভারতবর্ষের শক্তি ও যুদ্ধসজ্জা; দ্বিতীয়, প্রবলতম সব জাতির মতি-পরিবর্ত্তন দ্বারা সকলকে অহিংসাধর্ম্মী করা। দ্বিতীয়টি সমগ্র মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর ও আমাদের মনঃপূত। কিন্তু দুইটিই এখন সুদূরপরাহত মনে হইতেছে।

সে যাহা হউক, গান্ধীজী যাহা বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করা যাক্।

—

ইংরেজপ্রভুত্বমুক্ত স্বাধীন ভারতের অবস্থা

গান্ধীজী বলেন বা অনুমান করেন যে, ইংরেজরা হঠাৎ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলে এবং তাহাদের জায়গায় অন্য কোন বিদেশী জাতির প্রভুত্ব স্থাপিত না হইলে, মুসলমান, শিখ ও অন্য পঞ্জাবীরা ভারতের সর্বত্র প্রভুত্ব বিস্তার করিবে, এবং খুব সম্ভব গুর্খারাও তাহাদের অংশভাগী হইবে। তিনি ইহাও ধরিয়া লইতে বলিতেছেন যে, পঞ্জাবের বাহিরের অন্য ভারতীয় মুসলমানেরাও পঞ্জাবীদের

পক্ষ অবলম্বন করিবে। প্রধানতঃ হিন্দু সভ্য লইয়া গঠিত কংগ্রেসওআলাদের তখন কি হইবে, গান্ধীজী এই প্রশ্ন করিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলেন, তাহারা যদি সত্য-সত্যই তখনও অহিংস থাকে, তাহা হইলে যোদ্ধা ভারতীয়েরা তাহাদিগকে ঘাঁটাইবে না। কংগ্রেসওআলারা তাহাদের সহিত প্রভুত্বের ভাগ বসাইতে চাহিবে না কিন্তু নিরস্ত্র লোকদের ধন বুদ্ধি ও দৈহিক শ্রমকেও যোদ্ধাদিগকে নিজেদের কাজে লাগাইতে দিবে না অর্থাৎ এক্সপ্লয়েট (exploit) করিতে দিবে না।

কিন্তু স্বদেশী বা বিদেশী যে-কোন লোকসমষ্টিই ভারতে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করুক না কেন, তাহা প্রভুত্বনামক শব্দটির জন্য করিবে না, অন্য মানুষকে নিজেদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্ত খাটাইবার জন্য করিবে। সুতরাং যে-যে ভারতীয় লোকসমষ্টি গান্ধীজীর অনুমানে ইংরেজ-বর্জিত ভারতে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপিত করিতে পারে, তাহারা নিরস্ত্র অন্য ভারতীয়দিগকে আপনাদের দাসরূপে বা আজ্ঞাকারীরূপে ব্যবহার করিতে নিশ্চয়ই চাহিবে। কংগ্রেসওআলারা তাহা কি প্রকারে বন্ধ করিতে চাহিবেন? অবশ্য, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা অহিংস আদেশ লঙ্ঘন দ্বারা। কিন্তু তাহা দ্বারা বিদেশী প্রভু ইংরেজদিগকে নিরস্ত করিতে পারা যায় নাই, অভিজ্ঞতা হইতে ইহা দেখা যাইতেছে। দেশী প্রভুদিগকেও নিরস্ত করিতে পারা যাইবে না, আমাদের ধারণা এইরূপ। বিদেশী বা স্বদেশী কাহারও দ্বারা এক্সপ্লয়টেশ্যন বন্ধ করিবার উপায় তাহাদের বুদ্ধির ও হৃদয়ের পরিবর্তন ছাড়া তাহাদের এক্সপ্লয়েট করিবার প্রবৃত্তি নাশ কিংবা, বাহুবল ও অস্ত্রবল দ্বারা তাহা নিবারণ। গান্ধীজী বলিয়াছেন, ইংরেজপ্রভুত্ব হইতে মুক্ত ভারতে কংগ্রেসওআলারা যদি সত্যসত্যই অহিংস থাকে, তাহা হইলে যোদ্ধা পঞ্জাবী গুর্খা প্রভৃতিরা তাহাদিগকে ঘাঁটাইবে না। যদি না-ঘাঁটায়, তাহা হইলেও তাহা তাহাদের মর্জি বা অনুগ্রহ বলিতে হইবে। কাহারও মর্জির বা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকা মনুষ্যোচিত আত্মসম্মানসঙ্গত নহে। আমরা কাহারও অনুগ্রহাধীন হইব না, অথচ কেহ আমাদিগকে ঘাঁটাইবে না, এরূপ অবস্থা দুই প্রকারে ঘটিতে পারে। যাহারা ঘাঁটাইতে পারে, ধর্মবুদ্ধির প্রভাবে যদি তাহাদের ঘাঁটাইবার প্রবৃত্তিই নষ্ট নয়, তাহা হইলে ঘটিতে পারে; কিংবা যদি বাহুবল দ্বারা কেহ নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারে, তাহা হইলেও ঘটিতে পারে। গান্ধীজী এই দুটির মধ্যে কোন উপায়ই নির্দেশ করেন নাই। তাঁহার মত স্বাধীনতাপ্রিয় ও অনুগ্রহজীবিতাবিরোধী ব্যক্তি যে অযোদ্ধাদিগকে যোদ্ধাদের মর্জির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে বলিবেন, এরূপ অনুমানও করিতে ইচ্ছা হয় না।

সংখ্যায় বেশী হইলেই যে বলবত্তর হওয়া যায় না, গান্ধীজী তাহা বুঝেন ও বলিয়াছেন। যাহারা সংখ্যায় বেশী ও গণতন্ত্রের খেলা খেলিতেছে, তাহারা যে ব্রিটিশ বেয়নেটের উপর ধন-প্রাণ-মান রক্ষার জন্য নির্ভর করিতেছে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। সংখ্যালঘুরাই যে সামরিক হিসাবে অধিকতর শক্তিশালী, সুতরাং সংখ্যা-গরিষ্ঠেরা তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে এই ভয় অমূলক, এই ধারণাও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

কেহ স্বয়ং অহিংস হইলেই হিংসায় সমর্থ অন্য কেহ তাহাকে ঘাঁটাইবে না, মনুষ্যেতর জীবজগতে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত বিস্তর দেখা যায়। হরিণ মাংসাশী নহে, হিংসা করে না। কিন্তু তথাপি সিংহ ও বাঘ তাহার প্রাণ বধ ও মাংস ভোজন করে। মনুষ্যজগতেও গান্ধীজীর অনুমানের বিপরীত দৃষ্টান্ত অতীত ও বর্তমান কালের ইতিহাসে প্রচুর। জার্মেনী ও রাশিয়া ইয়োরোপের যে-সব ক্ষুদ্রতর দেশ ও জাতির উপর জুলুম করিতেছে, তাহারা সকলেই জার্মেনী বা রাশিয়া বা অন্য কোন দেশ আক্রমণ করিতেছিল বা তাহার উদ্যোগ করিয়াছিল, এরূপ শোনা যায় না।

গান্ধীজী তাঁহার প্রবন্ধটিতে এরূপ কিছু বলেন নাই যে, ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতবর্ষের কল্যাণের নিমিত্ত সকলকে, বিশেষ করিয়া পঞ্জাবী গুর্খা ও মুসলমানদিগকে, অহিংস ও এক্সপ্লয়েটেশ্যন-বিমুখ করিবার ঐকান্তিক চেষ্টা করিতে হইবে, ও ভারতীয় সৈন্যদলই উঠাইয়া দিতে হইবে; অন্য দিকে তাঁহার মত অহিংসাবাদীর পক্ষে এরূপ দাবী করাও সম্ভব ও সঙ্গত হইত না যে, ভারতবর্ষের

সব অঞ্চলের, সব জাতির ও সব শ্রেণীর ইচ্ছুক ও সমর্থ লোকদিগকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার ও যুদ্ধ শিখিবার সুবিধা ও সুযোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অথচ ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের নিরুপদ্রবে বাস করিবার এই দুটি মাত্র উপায় আছে, তৃতীয় পন্থা নাই।

ভারতবর্ষে ইংরেজপ্রভুত্ব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই দেশের আপেক্ষিক সামরিক শক্তি এখনকার চেয়ে অধিক ছিল। তখন ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশও, কোনও বিদেশীর সাহায্যনিরপেক্ষ ভাবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নানা আততায়ীর সহিত লড়িয়াছিল এবং কখন কখন যুদ্ধে জিতিয়াওছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের একা একার কথা দূরে থাক, সমগ্রভারতবর্ষের সমুদয় দেশী সৈন্যও ইংরেজের সাহায্য ও পরিচালনা ব্যতিরেকে দেশ রক্ষায় এখন অসমর্থ। যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশের কথা ধরা যায়, তাহা হইলে পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি অংশ ছাড়া অন্য কোন অংশ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই নহে। অথচ যে-পঞ্জাব এখন সিপাহী সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র, তাহাও পরাজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল অপঞ্জাবীদিগের দ্বারা। সুতরাং ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতেই সৈন্য পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে সরকারী নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সৈন্যসংগ্রহ সব অঞ্চল হইতে হইলে ভাল হয়। আমাদের বিশ্বাস, দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা অনুসারে সব প্রদেশ হইতেই সৈন্য সংগৃহীত না হইলে ইংরেজপ্রভুত্বমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষও বাস্তবিক স্বাধীন হইবে না, কোন কোন অঞ্চলের লোকদের অধীন হইবে। তাহার প্রতিকার-চিন্তা এখনই করা উচিত। অবশ্য, যাঁহারা ঐকান্তিক অহিংসাবাদী তাঁহাদের পক্ষে ইহা বলাই সঙ্গত হইবে যে, পৃথিবীর এবং তাহার অন্তর্গত ভারতবর্ষের কোনও সৈন্যদল থাকা উচিত নহে, যুদ্ধ করাই অনুচিত। কিন্তু মানবসভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় এই উপদেশ অবহেলিত হইবে। ইহা দুঃখের বিষয়, কিন্তু ইহা বাস্তবের প্রতিধ্বনি।

—

বাঙালী পল্টন

গত মহাযুদ্ধের সময় উনপঞ্চাশত্তম বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল। এ-বিষয়ে জ্ঞাতব্য নানা তথ্য "সৈনিক বাঙালী" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। তাহার পরিচয় অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও বাঙালী পল্টন গড়িবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা সফল হওয়া উচিত। এখানে আমরা হিংসা-অহিংসার কথা আলোচনা করিব না। আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি এই দেশে সৈন্যদল থাকা আবশ্যক হয়—বাস্তবিক দেখিতেছি সৈন্যদল আছে ও তাহার কাজও আছে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতে, সুতরাং বাংলা দেশ হইতেও, সৈন্য সংগৃহীত হওয়া উচিত। যুদ্ধ শিক্ষায় কতকগুলি উপকার হয়, যেগুলির বাঙালীর বিশেষ আবশ্যক। যুদ্ধ শিখিলে দেহ সুস্থ সবল ও দৃঢ় হয়। বাঙালীর তাহা চাই। যুদ্ধ দলবদ্ধতা, দলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, নিয়মানুগত্য এবং ক্ষিপ্রকারিতা শিক্ষা দেয়। বাঙালীর এই শিক্ষা দরকার। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুতি এবং সকল অবস্থায় নির্ভয় থাকা সৈনিকের লক্ষণ। সৈনিক অসৈনিক সকল বাঙালীর এই সৈনিক-ধর্ম্ম-লাভ বাঞ্ছনীয়।

বাঙালী যে দক্ষ কর্ম্মঠ ও সাহসী সৈনিক হইতে পারে, তাহা শুধু সুদূর অতীত ইতিহাস দ্বারা নহে, গত মহাযুদ্ধেও প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাতে অনেক বাঙালী সিপাহী ও অফিসার প্রশংসিত ও পদে-উন্নীত হইয়াছিল। "সৈনিক বাঙালী" বহিটির নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে বাঙালী পল্টন যে গঠিত হইতে পারে ও হওয়া উচিত, তাহা বুঝা যায়।

(১) ভারতীয় সমরবিভাগ বাঙালীকে ভারতীয় পল্টনের মধ্যে একটি স্থান দিয়েছিল।

(২) পল্টনের বিশেষ নাম-করণ হয়েছিল.

(৩) সুদক্ষ সামরিক শিক্ষক বাঙালীকে সামরিক শিক্ষা দিয়েছিল।

(৪) বাঙালীকে সুদূর মেসোপটেমিয়া ও কুর্দিস্থান যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হয়েছিল।

(৫) ভারতবর্ষে, মেসোপটেমিয়ায় এবং কুর্দিস্থানে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ জেনারেলগণ সকলেই বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট পরিদর্শন করে বিশেষ সুখ্যাতি করেছিলেন।

(৬) যুদ্ধশেষে ভারতসম্রাট বাঙালীকে শান্তি-উৎসবে যোগদানের জন্ম নিমন্ত্রণ করে'ছিলেন।

(৭) বাঙালী রেজিমেন্টের জন্য করাচী ডিপো, দমদম ক্যান্টনমেন্ট এবং মেসোপটেমিয়া ও কুর্দিস্থানের সমর-বিভাগ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন।

(৮) প্রতিবৎসর ১১ই নভেম্বর সামরিক কর্তৃপক্ষ কলিকাতা দুর্গ থেকে একটি বন্দুকধারী সৈন্যদলকে কলেজ স্কোয়ারে মৃত বাঙালী সৈনিকদের সম্মান রক্ষার্থ পাঠিয়ে থাকেন।

শান্তির সময়েও মজুদ সৈন্যদল ("standing army") সকল দেশেই আছে। ভারতবর্ষেও আছে। এই স্থায়ী সেনাদলের কাজ আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষা, এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা। যুদ্ধ বাধিলে দরকার মত নূতন সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া সেনাদলকে বৃহত্তর করা হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় এই প্রকারে নূতন ৪৯তম বাঙালী পণ্টন (49th Bengali Regiment) গঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে নবসংগৃহীত সৈন্ত-দিগকে বিদায় দেওয়া হয়, স্থায়ী সৈন্তদল আগে যেরূপ ছিল, সেইরূপই থাকে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের স্থায়ী সৈন্তদলে বাঙালী পণ্টন থাকা উচিত। স্থায়ী সৈন্তদলে পঞ্জাবী গুর্খা প্রভৃতিই থাকিবে, এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম নাই; ভারতবর্ষের সব অংশের লোক ভারতীয় সৈন্ত-দলের ব্যয় নির্বাহার্থ ট্যাক্স দিয়া থাকে—বিশেষতঃ বাংলা ত খুবই দেয়, সুতরাং সব অংশের লোকেরই সৈন্ত হইবার অধিকার আছে—স্থায়ী সৈন্তদলে থাকিবার অধি-কার আছে। পাঠান, শিখ, গুর্খা প্রভৃতি সিপাহীরা যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ করে, তাহা নহে; কখন কখন যুদ্ধ করে, কখন বা বসিয়া বসিয়া বেতন ভোগ করে—অধিকাংশ সময় বেতন ভোগই করে, যুদ্ধ ও বেতন ভোগ এই উভয় কার্য্যই বাঙালী সিপাহীরা করিতে সমর্থ।

"পৃথিবীতে সব সময়ে যুদ্ধ হয় না। কিন্তু তবুও প্রত্যেক দেশেই সৈন্য প্রয়োজন। এমন সৈন্য আছে যারা আজীবন শান্তি ভোগ করেছে এবং পেন্‌শনও ভোগ করেছে কিন্তু জীবনে কখনও যুদ্ধ করেনি অর্থাৎ যুদ্ধ করবার সুযোগ পায় নি।...তবে যুদ্ধের জন্ম সর্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। জীবিকা অর্জন হিসাবে এবং সহজভাবে সৈনিকজীবনকে গ্রহণ করলেই সব সমস্যার সহজ মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। বহু লোকের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা এতে হয়, সেদিক দিয়েও এটা ভাবা উচিত এবং সুযোগ পেলেই তা গ্রহণ করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ।" ("সৈনিক বাঙালী")

সৈনিক বৃত্তির এই আর্থিক দিকটা আমরা সকল সময়ে মনে রাখি না। পেশাদার সৈনিক হইয়া প্রতি বৎসর পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতির লোকেরা অনেক কোটি টাকা পায়। সেই জন্ম সেই সকল অঞ্চলে বেকার সমস্যা বঙ্গের মত সঙ্গীন নহে। গত মহাযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ হইতে যে সাত হাজারের উপর সৈনিক লওয়া হইয়াছিল তাহারা যদি সৈনিকই থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহারা ন্যূনকল্পে মাসিক এগার টাকা বেতন হিসাবে বাৎসরিক মোট ৯,২৪,০০০ টাকা এবং গত কুড়ি বৎসরে এক কোটি চুরাশি লক্ষ আশি হাজার টাকা পাইত। বস্তুতঃ পাইত ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী; কারণ, সকলেই ভাতা পাইতে পারিত এবং দেশী অফিসারের পদে উন্নীত সুবাদার প্রভৃতিরা অধিক বেতন পাইত।

অনেকের কৌতূহল হইতে পারে যে, বাঙালী পণ্টনের সৈনিকদের যোগ্যতা সত্ত্বেও তাহাদিগকে স্থায়ী সৈন্তদলভুক্ত করিয়া কেন রাখা হয় নাই। এ বিষয়ে "সৈনিক বাঙালী" পুস্তকের লেখক সুবেদার মন বাহাদুর সিংহ লিখিয়াছেন:

"আমি এক সময়ে আমাদের কমাণ্ডিং অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাঙালীকে 'রেগুলার আর্মি'তে রাখা হবে কি না। তিনি সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই রাখা হবে যদি তারা চায়। কিন্তু বাঙালী তখন চায় নি—এর জন্যে অবশ্য নেতাদের উদাসীনতা অনেকখানি দায়ী। কয়েক জন ভারতীয় (বাঙালী) অফিসার এ বিষয়ে নেতাদের কাছে কিন্তু দরবারও করেছিলেন—কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন—যুদ্ধই যখন থেমে গিয়েছে তখন পণ্টনের আর দরকার নেই। বাঙালী রেজিমেন্ট গড়ে তুলতে হলে ডাক্তার এস. কে. (শরৎকুমার) মল্লিকের মত উৎসাহী নেতা প্রয়োজন। আশা রইল এক দিন আমার জীবিতাবস্থাতেই আবার বাঙালী রেজিমেন্ট দেখে যেতে পারবো।"

ব্রিটিশ জাতি এখন কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতেছে তাহার বিচার না করিয়া ভারতবর্ষের সেই সকল প্রদেশেরও লোকদের সৈন্তদলে ঢুকিবার চেষ্টা করা ও ঢোকা উচিত যাহারা এখন সৈন্তদলে স্থান পায় না। তাহাদের নিজেদের ও নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্ম ইহা করা আবশ্যক, এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার নিমিত্ত ইহা করা উচিত। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বৈদেশিক, সামরিক ও ভারতীয় নীতি যাহাই হউক না কেন, সেই-

নীতি-নির্বিশেষে হাজার হাজার ভারতীয় নানা রকম সরকারী চাকরী করিয়া থাকে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারী আদর্শ ও সামরিক নীতির কথা তুলিয়া সৈনিকের চাকরী করিতে আপত্তি হওয়া উচিত নহে। প্রাণের ভয়টা আছে বটে; কিন্তু সব সৈন্য যুদ্ধ করে না, যাহারা করে তাহারা সকলে মরে না। এবং সৈনিক না হইলেই যে মানুষ অমর বা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে তাহা নহে।

প্রশ্ন উঠিবে, বাঙালীদের মধ্যে কাহারা সৈনিক হইবে? এ বিষয়ে "সৈনিক বাঙালী" বহির লেখক বলেন:—

"বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী [গত] মহাযুদ্ধে গিয়েছিল একটা ভাবাদর্শে, একথা ঠিক্। কিন্তু বাঙালীকে নিয়ে স্থায়ী সেনাদল গঠন করতে হ'লে বাঙালীর মধ্যে এমন কোন কোন সম্প্রদায় আছে যাদের দিকে দৃষ্টি দিলে একাজ সহজে হতে পারে। নমঃশূদ্র এবং রাজবংশী বাঙালীদের মধ্যে সেনা হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। [বাগদী প্রভৃতি জাতিও উপযুক্ত।—প্রবাসীর সম্পাদক।] মুসলমানদের মধ্যেও কোন কোন শ্রেণী উপযুক্ত। স্থায়ী সেনাদল ভবিষ্যতে এদের দ্বারাই গঠিত হবে আমার বিশ্বাস। তবে মেকানাইজড আর্মির জন্য হয় ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীকেই নিতে হবে।"

সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন বেকার-সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হইতে পারে, এ আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। বেকার লোক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীতেই কেবল আছে এমন নয়। সকল শ্রেণীতেই আছে।

আমরা ভুলিয়া যাই নাই যে, বাঙালী প্রভৃতি বর্ত্তমানে অযোদ্ধা জাতি সিপাহী হইতে চাহিলে যোদ্ধা জাতিদের আপত্তি ও বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী; কারণ, তাহাতে তাহাদের যুদ্ধব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে বেকার অনেককে হইতে হইবে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে আগে প্রধানতঃ কোন কোন প্রদেশের কোন কোন শ্রেণীর লোকই মসীজীবী (কেরানী) এবং বক্তৃতাজীবী (উকীল মোক্তার ব্যারিস্টর শিক্ষক অধ্যাপক) হইত। তাহাদের অসুবিধা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রদেশের ও শ্রেণীর লোকেরা ঐ সকল বৃত্তি ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় অবলম্বন করিতেছে। তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা বা বন্ধ করা হইতেছে না। সৈনিক বৃত্তির বেলাই কেন বাধা দেওয়া হইবে?

—

সৈনিক বৃত্তির সাধারণ সমালোচনা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

বহু সভ্য দেশের শান্তিকামী ব্যক্তিরা ("pacifists") হিংসাত্মক বলিয়া সৈনিক বৃত্তির সমালোচনা ত করিয়াই থাকেন। অধিকন্তু তাঁহারা বলেন, সমগ্র পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক কেবল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকে, ইহাতে মানবসমাজের প্রভূত ক্ষতি হয়। তাহারা কৃষক ও পণ্যশিল্পী হইলে মানুষের আহার্য্য ও অন্যবিধ কত আবশ্যক সামগ্রী উৎপন্ন করিতে পারিত এবং তাহার দ্বারা সমাজের অভাব দূর হইয়া উপকার হইত। তাহারা শিক্ষাদাতা ও নানা উপায়ে চিত্তবিনোদক হইলে মানুষের কল্যাণ ও আনন্দ হইত।

ইহা সত্য কথা। কিন্তু কতক দেশের কতক মানুষ প্রভুত্বলিপ্সা ও হিংসার দ্বারা চালিত হইলে অন্য দেশের লোকদিগকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে হয়। মানবসভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা অনিবার্য্য।

অহিংসা দ্বারা ও প্রেমের দ্বারা প্রভুত্বলিপ্সু হিংস্র লোকদের হৃদয় পরিবর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ, স্থায়ী ও প্রকৃত প্রতিকার, ইহা স্বীকার্য্য। এই উপায়ে বিশ্বাসবান লোকদের ইহাই অবলম্বনীয়। অবশ্য ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভীরু ও হিংসায় অসমর্থ লোকদের অহিংসা অহিংসা নামের অযোগ্য। যাঁহারা সাহসী ও হিংসা করিতে সমর্থ, তাহাদের অহিংসাই প্রকৃত অহিংসা।

—

বিষ্ণুপুরে সুতা ও কাপড়ের কল

গত মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে সুতা ও কাপড়ের আমদানী কমিয়া যাওয়ায় আমাদের দেশে অনেকের লজ্জা রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে সেরূপ অবস্থা আবার উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই যুদ্ধের আরম্ভের সময় ইংরেজ সরকার বলিয়াছিলেন তাঁহারা তিন বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ও হইতেছেন। সম্প্রতি হিটলারের এই দম্ভ উক্তি পৃথিবীতে ঘোষিত হইয়াছে যে, তিনি পাঁচ বৎসর যুদ্ধ চালাইবার হুকুম দিয়াছেন। নূতন নূতন দেশের যুদ্ধে জড়িত হইবার

সম্ভাবনা ঘটিতেছে। বেলজিয়মের রাজা ও হল্যাণ্ডের রাণী মধ্যস্থতার দ্বারা শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা আপাততঃ বিফল হইয়াছে। তাঁহাদের দেশই রণাঙ্গনে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। (১১ই নবেম্বর লিখিত।)

যুদ্ধ যদি না-ঘটিত কিংবা যদি উহা থামিয়া যায়, তাহা হইলেও আমাদের দেশের বস্ত্র প্রস্তুত করা আমাদের কর্ত্তব্য হইত ও হইবে। এই জন্য কোন কোন প্রকার বাধা সত্ত্বেও চালু কলগুলির কাজ যেমন চালান উচিত, প্রারব্ধ মিলগুলির কাজও সেইরূপ যথাসম্ভব আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

বিষ্ণুপুরের সুতা ও কাপড়ের কলের উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আছে। কারখানার ইমারতের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া আসিতেছে। শ্রমিকদের বাসগৃহ এবং কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। যন্ত্রপাতির যোগাড়েও উদ্যোক্তারা তৎপর আছেন।

—

নূতন কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন ও সুযোগ

নানা প্রকার ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির আমদানী যুদ্ধের জন্য কমিয়া গিয়াছে। কোন কোন জিনিষ আমদানী হইতেছেই না। ইহাদের মধ্যে সমস্তই বা প্রায় সমস্তই এদেশে প্রস্তুত হইতে পারে। প্রস্তুতির একাগ্র চেষ্টা আবশ্যক। বাঙালীদের মধ্যে খুব ধনী লোক যে কেহই নাই এমন নহে। বোম্বাই প্রদেশের মত অত বেশী না হইলেও, অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ধনী লোক বঙ্গেও আছেন। তাঁহারা এখন বহুবিধ পণ্যদ্রব্যের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইলে দেশের কল্যাণ হইবে, এবং তাঁহাদেরও ধনাগম হইবে। যাঁহারা ধনী নহেন অথচ ব্যয় অপেক্ষা যাঁহাদের আয় কিছু বেশী তাঁহারা যৌথ চেষ্টা দ্বারা অনেক বড় কারখানা ও কারবার চালাইতে পারেন।

প্রধানতঃ মেজর বামনদাস বসুর জ্ঞানবত্তায় ও পরিশ্রমে ভারতবর্ষীয় ভৈষজিক উদ্ভিদসমূহ সম্বন্ধে যে সুবৃহৎ প্রামাণিক ইংরেজী গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় সংস্করণের* চারি ভল্যুমে এরূপ শত শত গাছগাছড়া বর্ণিত হইয়াছে যাহা হইতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আরও চারিটি ভল্যুমে (বা বাক্সে) বিস্তর উদ্ভিদের ফল ফুল পাতার ছবি দেওয়া হইয়াছে যাহার দ্বারা সেগুলি চিনিবার সুবিধা হয়। যাঁহারা দেশী উদ্ভিদ হইতে ঔষধ প্রস্তুতির বৃহৎ আয়োজন করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এবং চিকিৎসকদের পক্ষে এই গ্রন্থ অত্যাবশ্যক।

অনেক রাসায়নিক দ্রব্য আছে যেগুলি সাক্ষাৎ ভাবে লোকেরা ব্যবহার করে। অন্য অনেক রাসায়নিক দ্রব্য আছে যাহা বহুবিধ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। এইগুলির জন্য অনেক কারখানা আবশ্যক। কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন প্রভৃতির নেতৃত্বে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য সভার অধিবেশন হইয়াছিল। আশা করি কাজও আরম্ভ হইবে।

দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাসমূহের পরিচালকেরা এবং পুস্তকপ্রকাশকেরা কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ও অভাব অনুভব করিতেছেন। যে দৈনিক কাগজগুলির কাটতি বেশী ও যেগুলি রোটারি যন্ত্রে ছাপা হয়, তাহাদের ব্যবহৃত রীলে জড়ান কাগজ এদেশে প্রস্তুত হয় না। তাহা উৎপাদনের চেষ্টা হওয়া উচিত। অন্যবিধ কাগজও আরও অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নূতন কারখানা আবশ্যক। এই জন্য দরকারী সাবয় বা বাবুই ঘাসের চাষ অনেক বাড়ান যাইতে পারে। ইতিমধ্যেই কোথাও কোথাও তাহার আরম্ভ হইয়াছে।

এই প্রকার বহুবিধ কারখানার উল্লেখ করা যাইতে পারে। টাটানগরের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতায় প্রায় এক শত প্রকার দ্রব্য উৎপাদনের কারখানার কথা বলিয়াছিলেন যাহা ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি লইয়া চালান যাইতে পারে।

* *Indian Medicinal Plants*: By Lieut.-Col. K. R. Kirtikar and Major B. D. Basu. Revised, enlarged and brought up to date by Father Caius, S. J., Father Blatter, S. J. and Dr. Mhaskar, 2nd Edition. Dr. L. M. Basu, Allahabad.

পণ্যশিল্পের কারখানায় ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি এ-দেশে অল্পই প্রস্তুত হয়। তাহা নির্মাণই গোড়ার কথা। সে-দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ একান্ত আবশ্যক।

—

লেডী বসুর প্রেসিডেন্সী কলেজকে দানের প্রস্তাব প্রত্যাহার

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, লেডী অবলা বসু প্রেসিডেন্সী কলেজে উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণা-বৃত্তি স্থাপনের নিমিত্ত যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাহার করিয়াছেন। প্রত্যাহারের কারণ এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, তাঁহার দানের এই সর্ত্ত ছিল যে, বৃত্তি বাঙালী হিন্দু ছাত্রেরাই পাইতে অধিকারী হইবে, এবং বাংলা সরকার এই সর্ত্তে দান গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য গত সংখ্যাতেই বলিয়াছি। কোন দাতা যদি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ে শিক্ষার বা গবেষণার উৎসাহ দিতে চান, তাহা হইলে তাহা করিবার তাঁহার ন্যায্য অধিকার আছে। ধার্ম্মিক মোহম্মদ মোহ্সিনের প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে যে কেবল মুসলমানেরাই বৃত্তি পায়, তাহাতে হিন্দুরা কোন আপত্তি করে না—আপত্তি করিলে তাহা অন্যায় হইত।

লেডী বসুর প্রেসিডেন্সী কলেজকে দান যদি কৃতজ্ঞ চিত্তে বাংলা সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইত, তাহা হইলে তাহা সুশোভন হইত। কারণ আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার অধ্যাপকজীবনের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত—পেন্সান লইবার পরেও—প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন।

যাহা হউক, লেডী বসু অন্য প্রকারে উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণায় উৎসাহ দিতে পারিবেন। কোন সাম্প্রদায়িকতা-গ্রস্ত মন্ত্রিমণ্ডল তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না।

—

হের হিটলারের বক্রোক্তি

তার-যোগে খবর আসিয়াছে, হের হিটলার বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন :—

"If Britain started granting her own Empire full liberty by restoring the freedom of India, we should have bowed before her."

"যদি ব্রিটেন ভারতবর্ষকে তাহার স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিয়া নিজ সাম্রাজ্যকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের কার্য্য আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তাহার কাছে মাথা নত করা আমাদের উচিত হইত।"

ব্রিটেনের পক্ষ হইতে একাধিক ব্রিটিশ রাজপুরুষ বলিয়াছেন বটে যে, ব্রিটেন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু তাহা লইয়া বিদ্রূপ করা হের হিটলারের মুখে শোভা পায় না। কারণ তিনি কোন দেশের স্বাধীনতা লাভের সাহায্য করা দূরে থাকুক, স্বয়ং অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন।

ব্রিটেন পাল্টা জবাবে বলিতে পারেন, "আমরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলে তোমার তাহা দখল করিবার চেষ্টা করাটা সহজ হয় বটে।" কিন্তু ব্রিটেন যাহাই মনে করুন বা বলুন, ইহা নিশ্চিত যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটেন যাহা বলিবেন করিবেন বা বলিতে করিতে বিরত থাকিবেন, হের হিটলার তাহা সম্পূর্ণ রূপে নিজের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিবেন।

উভয়পক্ষের কথা কাটাকাটি ছাড়িয়া দি- ঐতিহাসিক যাহা বলিতে পারেন, তাহাতে ব্রিটেনের ·· াযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় ও থাকায় ··টেন ঐশ্বর্য্যশালী ও শক্তিশালী হইয়াছে। তাহাতে ব্রিটেনের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া অন্য কোন কোন দেশ সাম্রাজ্য লাভ ও বৃদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং তাহা একাধিক মহাযুদ্ধের কারণ হইয়াছে। ব্রিটেন এ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন, সাম্রাজ্য শাসন ও সাম্রাজ্য হইতে লাভবান হইবার দৃষ্টান্তস্থল হওয়ায় যেমন অনভিপ্রেত ভাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য অপরের দ্বারা আরব্ধ কোন কোন যুদ্ধেরও পরোক্ষভাবে কারণীভূত হইয়াছেন, তেমনি এখন তিনি যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে রাজী হন, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদ-লোপ গণতন্ত্র-স্থাপন এবং স্থায়ী-শান্তি-প্রতিষ্ঠা তাঁহার দ্বারা যত অধিক পরিমাণে হইবে, তত আর কোন দেশের দ্বারা হইবে না। এই সমুদয় মহৎ

প্রচেষ্টা ও কীর্ত্তির প্রশংসা ও গৌরব তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে।

কিন্তু ইহাও বলা একান্ত উচিত যে, ব্রিটেনকে এই প্রশংসা ও গৌরব পাওয়াইবার নিমিত্ত, অর্থাৎ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার নিমিত্ত, আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করি নাই।

—

জনাব জিন্না সাহেবের সাম্যের দাবী

জনাব জিন্না সাহেব সম্পূর্ণ সাম্যের সর্ত্তে ("On terms of absolute equality") হিন্দু-মুসলমানের একটা বুঝাপড়া বা চুক্তি এবং ঐক্যে রাজী আছেন বলিয়াছেন। কিন্তু এই সাম্যটার মানে খুলিয়া বলেন নাই। বহু সভ্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককে আইনের চক্ষে সম-নাগরিক (equal citizens in the eye of the law) গণ্য করা হয়, অর্থাৎ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে যোগ্যতা সমান হইলে কেবল কাহারও ধর্ম্মের জন্য কাহাকেও কোনও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় না, অথবা কাহাকেও তাহার ধর্ম্মের জন্যই অধিক পছন্দ করা হয় না। এই যে সাম্য, তাহা ভারতবর্ষে মুসলমানদের আছে। বরং ইহা বলিলেই ঠিক হয় যে, ভারত-সরকার এবং ভারত-শাসন আইন মুসলমানদিগকে তাহাদের ধর্ম্মের জন্যই ব্যবস্থাপক সভায় আসন প্রভৃতি নানা বিষয়ে এমন সুবিধা দিয়াছে যাহা হিন্দুদিগকে দেওয়া হয় নাই—তাহারা হিন্দু বলিয়াই সেগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং পুরাপুরি সাম্য যদি মুসলমানরা চান তাহা হইলে তাঁহারা বর্ত্তমানে এইরূপ যে-যে সুবিধা ভোগ করেন, তাহা হইতে বঞ্চিতই হইবেন, অধিক সুবিধা পাইবেন না। এরূপ সাম্য জনাব জিন্না সাহেব নিশ্চয়ই চান না।

ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে মুসলমানদিগকে খুশি করিবার নিমিত্ত অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দুদের শোভাযাত্রা, গান-বাদ্য, প্রতিমা-বিসর্জন প্রভৃতি বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা হয়, কিন্তু মুসলমানদের মহরম প্রভৃতির মিছিল ও বাদ্য আদি নিয়ন্ত্রিত বা বন্ধ করা হয় না। এ বিষয়ে হিন্দুমুসলমানের সাম্য বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু জনাব জিন্না সাহেব তাহা চান না, এরূপ অনুমান নির্ভয়ে করা যায়।

অনুমান করি, তিনি যে সাম্য চান তাহা নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) সমগ্রভারতে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে যত বেশীই হউক, সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা দুটিতে হিন্দু প্রতিনিধি ও মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা সমান হইবে। নিজামের হায়দরাবাদ রাজ্যে হিন্দুরা প্রায় শতকরা ৯০ জন, মুসলমানরা প্রায় শতকরা ১০।১১ জন। তথাপি তথাকার নবঘোষিত শাসনসংস্কার বিধি অনুসারে তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা সমান! এই আজগুবি ব্যবস্থা জনাব জিন্না সাহেবের নজির হইতে পারে।

(২) যে-সব প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশী, তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু প্রতিনিধি ও মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা সমান হইবে; কিন্তু যে-সব প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী সেখানে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা এখনকার মত হিন্দু প্রতিনিধিদের চেয়ে বেশীই থাকিবে।

(৩) সরকারী সমগ্রভারতীয় চাকরী হিন্দু ও মুসলমানরা সমান সমান পাইবে।

(৪) সরকারী প্রাদেশিক চাকরী সম্বন্ধে নিয়ম এই প্রকার হইবে যে, কোন প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় হিন্দুদের চেয়ে কম হউক বা বেশীই হউক, তাহারা কোথাও হিন্দুদের চেয়ে কমসংখ্যক চাকরী পাইবে না—অন্ততঃ সমানসংখ্যক চাকরী পাইবে, কিন্তু কোথাও কোনও সরকারী বিভাগে যদি এখন তাহারা অধিকতর পদে অধিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে সেগুলিতে তাহাদের দাবী বজায় থাকিবে।

(৩) ও (৪) (ক) সংখ্যানুপাতে মুসলমানের প্রাপ্য কোন চাকরীর জন্য ন্যূনতম যোগ্যতাবিশিষ্ট মুসলমানও কোন সময় পাওয়া না গেলে, যত দিন পাওয়া না যায় তত দিন উহা খালি থাকিবে।

(৫) সমুদয় প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা ও পারদর্শিতা যাহাই হউক, মুসলমানদের জন্য শিক্ষার সরকারী ব্যয় এবং ছাত্রদের বৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ অন্ততঃ হিন্দুদের সমান

হইবে; কিন্তু কোথাও এই দুটি জিনিষ মুসলমানদের জন্ম অধিক থাকিলে সেই আধিক্য বজায় থাকিবে।

(৬) পরীক্ষাসমূহে হিন্দু ও মুসলমান পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও উত্তীর্ণের সংখ্যা জনাব জিন্না সাহেব সমান সমান চান কি না, অনুমান করিতে পারিলাম না।

(৭) সমগ্রভারতীয় ও প্রাদেশিক লোকসংখ্যাতেও তিনি উভয় সম্প্রদায়ের সাম্য চান কি না, তাহাও অনুমান করিতে পারিলাম না।

মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকের সময় মুসলমান-দিগকে শাদা চেক দিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং জনাব জিন্না সাহেব যে-অর্থেই হিন্দু-মুসলমানের সম্পূর্ণ সাম্যের দাবী করুন না কেন, গান্ধীজীর তাহাতে সম্মত হওয়া একেবারেই বা সর্ব্বাংশেই অসম্ভব বলা যায় না।

—

যুক্ত প্রদেশে চাকরীতে হিন্দুমুসলমান সাম্য

জনাব জিন্না সাহেব যদি হিন্দু ও মুসলমানদের জন্ম সমান সমান চাকরী চান, তাহা হইলে সব প্রদেশে ও সব স্থলেই যে মুসলমানেরা জিতিবে এমন নহে।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যখন বর্ত্তমান যুদ্ধ বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে বিতর্ক হইতেছিল, তখন (তাৎকালিক) অন্যতম মন্ত্রী ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু, "মুসলমান স্বার্থ বিপন্ন", এই রবের উত্তরে বলেন, ইহা মিথ্যা। সরকারী চাকরীতে মুসলমানদের স্থান সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ডেপুটি কালেক্টরদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন মুসলমান, পুলিস বিভাগে মুসলমান চাকরেদের সংখ্যা শতকরা ষাটেরও উপর।" মনে রাখিতে হইবে, যুক্ত প্রদেশের অধিবাসীদের শতকরা ১৪ জন মুসলমান এবং শতকরা ৮৪ জন হিন্দু, বাকী অন্যান্য সম্প্রদায়।

—

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সম্বন্ধে ভারত-সচিবের উক্তি

কংগ্রেস ভারতবর্ষের নিমিত্ত স্বাধীনতার দাবী করিয়াছেন এবং ব্রিটেন কি কি লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধ চালাইতেছেন তাহা পরিষ্কার ভাষায় বলিতে ভারত-সরকার ও ব্রিটিশ-সরকারকে আহ্বান করিয়াছেন। বড়লাট ও ভারত-সচিব এ বিষয়ে একাধিক বক্তৃতা করিয়াছেন ও বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাহাদের দৈর্ঘ্য ও সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে কোন মাসিকের বিবিধ প্রসঙ্গে সবগুলির সমুদয় প্রধান প্রধান কথারও আলোচনা করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা সম্পাদকের না হওয়াই ভাল। আমরা তাঁহাদের কেবল দুএকটা উক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। এখানে অবান্তর একটা কথা বলি। এখন ব্রিটিশ রাজনৈতিক ও রাজপুরুষেরা এবং জনাব জিন্না সাহেব ও তাঁহার দলভুক্ত লোকেরা ভারতবর্ষে স্বরাজ ও গণতন্ত্র স্থাপনের বিরুদ্ধে যত আপত্তি করিতেছেন, আমরা ২২ বৎসর পূর্ব্বে সেগুলা খণ্ডন করিয়াছিলাম। আমাদের সেই সব বক্তব্য "স্বরাজের উদ্দেশে" ("Towards Home Rule") নাম দিয়া পুস্তকাকারে তিন খণ্ডে একাধিক বার পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। সেগুলি নিঃশেষে বিক্রী হইয়া গিয়াছে।

ভারত-সচিব তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রধান প্রতিনিধি-সভা দুটি, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ; কংগ্রেস হিন্দুদের এবং মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধি। এই উক্তি একাধিক অসত্য কথার সমষ্টি।

কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, পারসী, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক আছেন—শুধু হিন্দু নহে; যদিও ভারতবর্ষে হিন্দুদের সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া হিন্দু কংগ্রেসীরাই সংখ্যায় অধিক। কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধি ইহা যেমন মিথ্যা, উহা সব হিন্দুর প্রতিনিধি ইহাও সেইরূপ মিথ্যা। অগণিত হিন্দু কংগ্রেসের সভ্য নহে, এবং কংগ্রেসবিরোধী হিন্দুও অনেক আছে। হিন্দু মহাসভা সমুদয় হিন্দুর প্রতিনিধি বলিয়া আপনার দাবী ঘোষণা করে। তাহা সত্য না হইলেও উহা যে বিস্তর হিন্দুর প্রতিনিধি তাহাতে সন্দেহ নাই। কংগ্রেস কেবলমাত্র তাহার হিন্দু সভ্যদের প্রতিনিধি নহে; ইহা ভারতবর্ষের নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের

বৃহত্তম অসাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি-সভা। সভ্যসংখ্যায়, দেশের হিতার্থ স্বার্থত্যাগে ও দুঃখবরণে এবং শৃঙ্খলা নিয়মানুগত্য ও শক্তিশালিতায় ইহার সমকক্ষ কোন প্রতিনিধি-সভা এ-দেশে নাই।

কংগ্রেসের সহিত একসঙ্গে মুসলিম লীগের নাম করাও অসঙ্গত। কংগ্রেসের মোট সভ্য সংখ্যা ছাড়িয়া দিয়া যদি শুধু তাহার মুসলমান সভ্যদের সংখ্যাই ধরা যায়, তাহাও মুসলিম লীগের সভ্যসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। কংগ্রেস সমগ্র দেশের ও মহাজাতির স্বাধীনতা ও কল্যাণের জন্ম যে চেষ্টা, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ করিয়াছেন, মুসলিম লীগ কেবল মাত্র মুসলমানদের জন্মও তাহার কণামাত্রও করেন নাই। যে-কোন সম্প্রদায়ের লোক কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারে, কেবল মুসলমানেরা মুসলিম লীগের সভ্য হইতে পারে। মুসলিম লীগ সকল মুসলমানের প্রতিনিধি নহে, এবং মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি-সভাও নহে। শিয়ারা, মোমিনরা, অহ্রররা ইহাকে আপনাদের প্রতিনিধি মনে করে না। মোমিনরা বলে ভারতীয় মুসলমানদের অর্ধেক বা তদধিক মোমিন। শিয়াদের, মোমিনদের, উলেমাদের এবং অহ্ররদের আলাদা আলাদা প্রতিনিধি-সভা আছে। ভারতবর্ষের এগারটা প্রদেশের মধ্যে আটটা প্রদেশে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারেরই প্রণীত ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের নিয়মানুসারে আটটি প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পারিয়াছিল; মুসলিমলীগ একটাতেও পারে নাই। এমন কি মুসলমানপ্রধান উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশেও কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গের ও পঞ্জাবের যে মুসলমান মন্ত্রীরা মুসলিম লীগের সভ্য, তাঁহারা মন্ত্রী হইবার পরে উহার সভ্য হইয়াছেন, পূর্ব্বে নহে।

মুসলিম লীগ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যুক্তি ও অসত্য উক্তির কারণ এই যে, উহা ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠার বিরোধী এবং এরূপ বিরোধিতা ব্রিটিশ প্রভুদের অনুকূল

মানভূমে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রচার চেষ্টা

ছোটনাগপুর উপপ্রদেশভুক্ত মানভূম সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলাভাষার উচ্ছেদের জন্ম যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার প্রতিকারকল্পে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতির মানভূম শাখা হইতে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ ও নিরক্ষর ব্যক্তিগণকে ও বালক-বালিকাদিগকে বিনা ব্যয়ে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হইতেছে। মানভূম বাঙালী সমিতিও এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস মহাশয়ের সাহায্যে ধানবাদে ২৫টি শিক্ষাকেন্দ্র চলিতেছে। রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০টি শিক্ষাকেন্দ্র চালাইতেছেন। শ্রীযুক্ত জগৎ সরকার একটি শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহ করিতেছেন। ধানবাদ গণশিক্ষা পরিষদ এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। ঝরিয়ায় ১০টি শিক্ষাকেন্দ্র চলিতেছে। মানভূমের সদরে ও গ্রামে গ্রামে নিরক্ষরদের মধ্যে বাংলাভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপক চেষ্টা হইতেছে। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তীকে অন্যান্ত জেলায় প্রচারের জন্ম যাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

বঙ্গে বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ

গত ২৬শে কার্ত্তিক কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটস্থিত কমার্শ্যাল মিউজিয়মে বঙ্গীয় মিল-মালিক-সমিতির সম্পাদক শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য "বাংলাদেশে কাপড়ের কল পরিচালনার সমস্যা ও তাহার ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। বঙ্গের রাজস্বসচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সুবিনয়বাবু ভারতবর্ষে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও আদর্শ অনুযায়ী শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বাংলায় বস্ত্র শিল্পের সুযোগ-সুবিধার বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে বাংলায় বর্ত্তমানে প্রতিবৎসরে ৮০ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন। কিন্তু বাংলার কাপড়ের কলগুলিতে এখন বৎসরে ২০ কোটি গজের বেশী কাপড় উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বাংলায় যে আরও বহুসংখ্যক কল প্রতিষ্ঠার সুযোগ রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যাপারেও বাংলার অবস্থা খুব অনুকূল। কেন না বাংলাদেশ কয়লার খনিসমূহের নিকটবর্ত্তী। বাংলার আবহাওয়া কাপড়ের কল পরিচালনার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, এবং এই প্রদেশে শ্রমিকের কোন অভাব নাই।

এই প্রসঙ্গে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পের যে উন্নতি হইয়াছে বক্তা তাহার তথ্য-তালিকা উদ্ধৃত করিয়া বর্তমানে বাংলার কাপড়ের কলগুলি যে সমস্ত অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতেছে তাহা বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বাংলা দেশে কাপড়ের কলগুলি উপযুক্ত মূলধন পাইতেছে না। এ জন্য গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে বাংলায় দেড় শতাধিক কাপড়ের কল রেজেষ্টারীকৃত হইলেও উহার মধ্যে খুব সামান্য-সংখ্যক কলই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছে। এই কারণে বাংলায় বর্তমানে যে ২৮টি কল চলিতেছে, তাহাও আশানুরূপভাবে উন্নতি করিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা দেশে মিল-জাত দ্রব্য বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা নাই। বাংলায় যাহারা কাপড় বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশের স্বার্থ বাংলার বস্ত্রশিল্পের স্বার্থের বিরোধী। অথচ বাংলার কাপড়ের কলগুলিরও এরূপ অর্থ-সঙ্গতি নাই যে তাহারা নিজেরা নিজেদের প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, বস্ত্র-শিল্পের সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে গবেষণা করিবারও বাংলায় কোন ব্যবস্থা নাই। চতুর্থতঃ, বাংলার কাপড়ের কলগুলি দেশের লোকের বিভিন্ন শ্রেণীর রুচি ও প্রয়োজন নির্ণয় করিতে সচেষ্ট নহে। উহার ফলে সকলেই প্রায় এক শ্রেণীর জিনিষ প্রস্তুত করিয়া নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র করিয়া তুলিতেছে। এই প্রসঙ্গে বক্তা শ্রমিকদের বিক্ষোভের ফলে বর্তমানে বাংলার কাপড়ের কলগুলির যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার বিষয়ও উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত তিনি বাংলায় তুলার চাষের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ণনা করেন।

তাঁহার মত এই যে, বাংলায় কাপড়ের কল স্থাপন করিবার সময় স্থান-নির্ব্বাচন, কলের পরিকল্পনা, যানবাহনের সুবিধা, আবহাওয়ার অবস্থা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ভুলত্রুটি অতিক্রম করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। অধিকন্তু কলের খরচা অত্যধিক বৃদ্ধি না করিয়া কলে যাহাতে উপযুক্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য লাভ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ভাবে কাজ করিলে এবং প্রয়োজনীয় মূলধন পাইলে বাংলায় বস্ত্রশিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইবে—উহাই বক্তার অভিমত।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার বক্তৃতায় বাংলার শিল্প সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলেন। তিনি বলেন,

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির উপর রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। বাংলা দেশে শিল্পসম্পদ যথেষ্ট আছে—যেমন পাট, কয়লা ও চা; কিন্তু বাঙালী ব্যবসাবিমুখ; সহজে তাহারা কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাজে হাত দিতে চাহে না এবং যাহাদের টাকা আছে তাহারা ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে সহজে রাজী হয় না। অনেকে মনে করেন যে বাঙালী ব্যবসা করিতে জানে না এবং টাকা নষ্ট করে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এমন অনেক বাঙালী আছেন যাঁহারা ব্যবসায়ে বিপুল সফলতা অর্জন করিয়াছেন, এবং যাঁহারা ব্যর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের ব্যর্থ হওয়ার একমাত্র কারণ সুপরিচালনা ও কর্ম্মদক্ষতার অভাব।

শিল্পবিষয়ে বাঙালীরা যাহাতে সজাগ হয়, তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে সকলকে অনুরোধ করিয়া শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী যে এই বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন।

—

ইংরেজের প্রভুত্ব রক্ষার কৈফিয়ৎ

ভারতবর্ষকে পূর্ণস্বরাজ বা অন্ততঃ আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দিতে ব্রিটেন এখন কেন নারাজ, তাহার একটা কারণ কর্তৃপক্ষ এই বলেন যে, ভারতবর্ষে অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে, তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদিগকে সংখ্যায় বৃহত্তম সম্প্রদায়ের বাস্তব বা সম্ভাবিত অন্যায় আচরণ, অবিচার বা অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংরেজদের ভারতবর্ষে থাকা আবশ্যক; নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে অমিল, ঈর্ষ্যাদ্বেষ, বিরোধ যখন থাকিবে না, তখন ইংরেজরা এই দেশের প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিবেন।

এই কৈফিয়ৎটা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

ব্রিটিশ জাতি যে এখনও ভারতবর্ষের প্রভু, তাহা তাঁহারা বা অন্য কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এই প্রভুত্ব থাকা সত্ত্বেও যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বিধিবদ্ধ অবিচার বিদ্যমান, তাহার একাধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু কেবল একটি দেওয়াই যথেষ্ট। বাংলা দেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। ব্যবস্থাপক সভায়, তাহাদের শুধু সংখ্যার অনুপাতেই যত প্রতিনিধি প্রাপ্য হয়, তাহা হইতে তাহাদিগকে আইনের জোরে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে; অথচ মুসলমানেরা যে-যে প্রদেশে সংখ্যালঘু তাহাদিগকে তথায় তাহাদের সংখ্যানুসারে প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি আইন দ্বারা দেওয়া হইয়াছে। ইহা অবিচার ও অন্যায় আচরণ। সুতরাং ইংরেজের প্রভুত্ব থাকিলেই সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে অন্যায় হয় না বা ভবিষ্যতে হইবে না, কিংবা তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্তই ইংরেজ এদেশে প্রভু হইয়া আছেন ও থাকিবেন, ইহা স্বীকার্য্য নহে।

যাহারা সংখ্যায় কম, তাহাদের সম্বন্ধেই অন্যায় ব্যবস্থা যে অনুচিত তাহা নহে। যাহারা সংখ্যায় অধিকতম, তাহাদের প্রতি অবিচার ও অন্যায় নিবারণ করাও শাসক জাতির কর্তব্য। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ও সমগ্র ভারতবর্ষের বৃহত্তম সম্প্রদায় হিন্দুদিগকে সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের সংখ্যা অনুসারে প্রাপ্য যথেষ্ট-সংখ্যক প্রতিনিধি না দিয়া অনেক কম, প্রতিনিধি দেওয়া

হইয়াছে—তাহাদের প্রতিনিধিসমষ্টিকে সংখ্যালঘু করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত অন্যায়।

অতএব, ইংরেজপ্রভুত্বের অস্তিত্ব অন্যায় ব্যবস্থা নিবারণের নিমিত্ত, ইহা সত্য নহে।

ইংরেজ কি উদ্দেশ্যে প্রভু হইয়া আছেন, তাহা সুবিদিত; তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জনসমষ্টিতে জনসমষ্টিতে অমিল ঈর্ষ্যা দ্বেষ বিরোধ যখন থাকিবে না, যখন সব ভেদ দূর হইয়া সমুদয় ভারতীয় মানুষ একটি মহাজাতির অংশস্বরূপ কেবল ভারতীয় বলিয়া পরিচিত হইবে, তখন ইংরেজরা ভারতবর্ষের প্রভুত্ব ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই ধরণের কথাও বিচার্য্য।

যাঁহারা এই প্রকার কথা বলেন, তাঁহাদের কথা হইতে এই সিদ্ধান্তই করা উচিত যে, ভারতবাসীদের সমুদয় সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত ভেদ ও বিরোধ কমান ও লোপ করা ব্রিটিশ রাজত্বের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য ক্রমশঃ সিদ্ধ হইতেছে—ব্রিটিশ রাজত্ব যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতেছে ভেদ ততই কমাইয়া দিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক কী দেখা যাইতেছে? সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত হিংসাদ্বেষ কমিতেছে, না বাড়িতেছে? নিরপেক্ষ ও সত্যবাদী পর্য্যবেক্ষককে বলিতে হইবে, বাড়িতেছে; এবং বাড়িতেছে রাষ্ট্রবিধির দরুন।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রেরিতব্য প্রতিনিধি নির্বাচনের নিমিত্ত যত ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচকসমষ্টির নাম করিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ১৯১৯ সালের আইনে তত ভেদ ছিল না, তাহা অপেক্ষা অনেক কম ছিল। বর্ত্তমান নির্বাচকসমষ্টিসমূহের নাম যতগুলা মনে পড়িতেছে লিখিতেছি :—

মুসলমান, "সাধারণ" (অর্থাৎ হিন্দু—যদিও তাহারা সম্পর্কে ভাস্থর বলিয়া তাহাদের নাম করা হয় নাই), তপসিলভুক্ত জাতিসমূহ, ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ান, এংলোইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টিয়ান, ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ান, শিখ, আদিবাসী, ইউরোপীয় বণিক্‌সমিতি, দেশী বণিকসমিতি (তাহার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ আছে এবং হিন্দুদের মধ্যেও আবার মাড়োআরীদিগকে স্থলবিশেষে আলাদা ধরা আছে), কারখানা-মালিক, কারখানা-শ্রমিক, জমিদার অর্থাৎ ভূস্বামী, বিশ্ববিদ্যালয়।

অতএব প্রভু ব্রিটিশ জাতি রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে ভেদ ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে অস্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে অধিকতর পরিমাণে স্বীকার করিয়া তাহার স্থায়িত্ব বাড়াইতেছেন। ভেদ আইন দ্বারা স্বীকৃত হওয়ায় নূতন ভেদ যে দেখা যাইতেছে, যাহার চোখ আছে দেখিবার অনিচ্ছা না থাকিলেই সে তাহা দেখিতে পাইতেছে। সবাই জানে, হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের মধ্যে সংহতি বেশী। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও শিয়ারা ও মোমিনরা ব্যবস্থাপক সভায় আলাদা আলাদা প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে চাহিতেছে। ইহা অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না যে, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন জারি হইবার পর হইতে দশ বৎসর শেষ হওয়া পর্য্যন্ত যদি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে এখন যেমন হিন্দুদের মধ্যে "উচ্চজাতি"র হিন্দু ও তপসিলভুক্ত জাতিসমূহের হিন্দুদিগকে ভিন্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে, তখন মুসলমানদিগকেও সুন্নী, শিয়া, মোমিন, আহমদিয়া প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত বলিয়া ধরা হইবে এবং তাহাদের আলাদা আলাদা নির্বাচকমণ্ডল গঠিত হইবে। তখনকার কর্ত্তৃপক্ষ ভারতসচিব ও বড়লাট ভারতীয় নেতৃবর্গকে হয়ত বলিতে পারিবেন, এই সকল ভেদ থাকিতে আমরা ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব ছাড়ি কেমন করিয়া?

কুড়ি বৎসরেরও আগে আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে ও "স্বরাজের উদ্দেশে" নামক পুস্তকে এবং বোধ হয় প্রবাসীতেও এই ঐতিহাসিক তথ্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম যে, কানাডা স্বরাজ (ডোমীনিয়ন স্টেটস) পাইবার পূর্ব্বে তথাকার (ইংরেজ) প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এবং (ফ্রেঞ্চ) রোমান কাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়াইছিল এবং প্রতিবেশীসুলভ বাক্যালাপ ও মিলামিশা পর্য্যন্ত হইত না বলিলেই হয়। কিন্তু যখনই তাহারা স্বরাজ পাইল, অমনি সব বিরোধ থামিয়া গেল। কারণ তাহারা বুঝিল, এখন দেশের হিতাহিতের জন্য চূড়ান্ত দায়িত্ব তাহাদেরই—ঝগড়া

থামাইবার বা বাধাইবার নিমিত্ত তৃতীয় পক্ষ নাই। ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইলে সকল সম্প্রদায়ের ভারতীয়েরাও পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ অপেক্ষা দেশহিতের নিমিত্ত সম্মিলিত চেষ্টা অধিক করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উচ্চতম পদস্থ ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা প্রাদেশিক মন্ত্রীদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ সমগ্রভারতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। এই প্রশংসা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বা তাহাদের স্বার্থের ক্ষতি করে নাই। কংগ্রেস প্রধানতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সভ্য লইয়া গঠিত। ইহা পঞ্চাশের অধিক বৎসরের ইতিহাসে এমন একটি প্রস্তাবও ধার্য্য করে নাই, এমন কোন কাজই করে নাই, যাহা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় এবং সংখ্যালঘুদের পক্ষে অনিষ্টকর। অতএব, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার ও তাহাদের স্বার্থহানি নিবারণের নিমিত্ত ইংরেজের ভারতবর্ষে প্রভু হইয়া থাকা আবশ্যক, এরূপ বলা যায় না।

অন্য দিকে ইংরেজের প্রভুত্ব থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের উপর যে অত্যাচার হইতেছে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত লউন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দু ও শিখরা সংখ্যালঘু। তাহাদের মধ্য হইতে নারী ও পুরুষ হরণ ও হত্যা এবং তাহাদের সম্পত্তি দলবদ্ধভাবে লুটপাট লাগিয়াই আছে। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা এবং তাহাদের উপর অত্যাচার নিবারণ গবর্ণরের একটি বিশেষ দায়িত্ব। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইংরেজ গবর্ণরের দ্বারা এই দায়িত্ব পালিত হইতেছে না।

সমূলক-অভিযোগ-বিশারদ মৌলবী ফজলল হক সাহেব একাধিক বার বলিয়াছেন বটে যে, বিহারে ও যুক্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু মন্ত্রীদের শাসনকালে মুসলমানদের উপর বহু অত্যাচার হইয়াছে। কিন্তু তিনি একটি অত্যাচারও প্রমাণ করিতে পারেন নাই।

জাতিভেদ বিনাশ এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রভৃতি দ্বারা মানুষে মানুষে সামাজিক অসাম্য লোপ ও ঐক্য বৃদ্ধির চেষ্টা ইংরেজ সরকার করেন নাই, ভারতবর্ষের লোকেরাই করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। ইংরেজ প্রভুত্বের অবসানের পরও এই কাজ, যত দিন আবশ্যক, চলিতে থাকিবে।

—

গান্ধীজীর কুৎসার প্রতিবাদ

গান্ধীজীর ব্যক্তিগত চরিত্রের নিন্দা কিছুকাল ধরিয়া বোম্বাই অঞ্চলের কতকগুলা কাগজ করিয়া আসিতেছিল। তাহাতে এক জন অত্যুচ্চপদস্থ ইংরেজও যোগ দেয়। তিনি তাহার কোন প্রতিবাদ ইতিপূর্বে করেন নাই। সম্প্রতি ব্রিটিশ জাতির অন্যতম গোয়েন্দা এডোআর্ড টমসন, গান্ধীজীর চরিত্রের বিরুদ্ধে পার্লেমেণ্টের সভ্যদের মধ্যে কানাঘুষা চলিতেছে, এই কথা লক্ষৌতে ও ওআর্ধায় বলায়, গান্ধীজী "হরিজন" পত্রিকায় লিখিয়াছেন তাঁহার কুৎসাসূচক সমুদয় কথা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি যদি ইহা না বলিতেন, তাহা হইলেও আমরা একটুও বিশ্বাস করিতাম না যে, তাঁহার কুৎসাগুলাতে সত্যের লেশমাত্রও আছে। তাঁহার এই প্রতিবাদ আবশ্যক ও তাঁহার আত্মসম্ভ্রম-সঙ্গত (consistent with his dignity) হইয়াছে কি না, তাহার আলোচনা করিব না। কিন্তু এই প্রতিবাদের একটি সার্থকতা স্বীকার্য্য। তিনি প্রতিবাদ না করিলে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কুৎসাকারীরা বলিতে পারিত, "তিনি তাঁহার অন্য সব নিন্দার বা সমালোচনার জবাব দিয়াছিলেন, কিন্তু এই কুৎসাটার জবাব দেন নাই, অতএব এটা সত্য"; তিনি প্রতিবাদ করায় সেরূপ কুতর্ক করিবার পথ রুদ্ধ হইল। আমাদের এই মন্তব্যের কারণ আছে।

রাজা রামমোহন রায় তাঁহার কুৎসার প্রতিবাদ করেন নাই অতএব তাহা সত্য, এরূপ কথা এখনও শুনা যায়। অথচ তিনি যে কেন তাহা করেন নাই তাহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। যথা, তাঁহার "পথ্যপ্রদান" পুস্তিকার ভূমিকায় লিখিত আছে—

"কিন্তু আমরা বরং তিন কারণে দুর্ব্বাক্যের বিনিময় হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। প্রথমত, যে কেহ উত্তরে কটূক্তি শুনিবার আশঙ্কা না করিয়া আপন অধীন ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি গর্হিত বচন প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার প্রতি উত্তরে কটূক্তি কথনের প্রয়োজন যে তাহার ক্ষোভ ও লজ্জা ও মনঃপীড়া এ সকল না হইয়া কেবল তত্তুল্য নীচত্ব সেই উত্তর প্রদাতার স্বীকার মাত্র হয়, সুতরাং (নীচস্যোচ্চৈর্ভাষাঃ

দুর্জনঃ পরতে ন শোচতে অন্তিঃ। কাকভেকধরশস্যাৎ বদ কোনগমং বিমুক্তে ধারঃ)। দ্বিতীয়ত, বালক ও পশ্বাদির হিতকরণে ও চিকিৎসা সময়ে তাহারা আস্ফালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে ঐ অবোধ প্রাণীর চীৎকারাদির পরিবর্ত্ত না করিয়া দয়ালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতেচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হয়েন না, সেইরূপ আমাদের হিতৈষার বিনিময়ে ধর্ম্ম সংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায় ও দ্বেষ প্রকাশে আমরা রাগাপন্ন না হইয়া ঐ প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছি। তৃতীয়ত, ভাগবতে লিখেন (ঈশ্বরে, তদধীনেষু, বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম, মৈত্রী, কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ) পরমেশ্বরে প্রেম, তাঁহার অধীন ব্যক্তি সকলের সহিত মিত্রতা, মূর্খব্যক্তিদিগে্য কৃপা, ও দ্বেষ্টা ব্যক্তিদের প্রতি উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম হয়, অতএব সাধ্যানুসারে ধর্ম্মসংহারকের প্রতি উপেক্ষাই কর্ত্তব্য হয়।"

—

নারীর সাহচর্য্য ও আনুকূল্যের মূল্য

"কামিনীকাঞ্চন" ত্যাগের উপদেশ অনেক সাধু ব্যক্তি দিয়াছেন এবং স্বয়ং তাহা পালনও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ঐ উভয়ে আসক্তি এবং উভয় সম্ভোগ ত্যাগ করিয়া থাকিলেও নারীর সাহচর্য্য ও আনুকূল্য ত্যাগ করেন নাই। এই সাধুরা কেহ কেহ বিবাহিত, কেহ বা চিরকুমার। পরমহংস রামকৃষ্ণ বাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সাংসারিক অর্থে তাঁহাকে লইয়া ঘর করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সাহচর্য্য ও আনুকূল্য গ্রহণ করিতেন, বহু শিষ্যার সামীপ্য ও সেবাও তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার উপদেশিকা ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ চিরকুমার ছিলেন।" তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা ও অন্য অনেক শিষ্যার মূল্যবান সহযোগিতায় নিজ জীবনব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি রামকৃষ্ণাশ্রিত মণ্ডলীতে নারীর সাহচর্য্য, সহযোগিতা, আনুকূল্য ও দান নানাভাবে স্বীকৃত হইতেছে।

সাধুরা টাকা ছুঁইতে বা পুঁজি করিতে না পারেন, কিন্তু তাহার বিনিময়ে যত সুবিধা পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। নতুবা তাঁহারা আপনাদের কাজ করিতে, এমন কি বাঁচিয়া থাকিতেও, পারিতেন না। তাঁহাদের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের অর্থ কতকটা আক্ষরিক (literal) ভাবে বুঝিতে হইবে।

অন্য সাধু পুরুষদের মত গান্ধীজীরও শিষ্যাদের সামীপ্য ও সেবা স্বীকার কুৎসার কারণ হওয়া উচিত নহে।

—

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্তি

গান্ধীজী ৪ঠা নবেম্বরের "হরিজন" পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অপরকর্ত্তৃক তিক্ত ও কটু কোন কোন মন্তব্যের কারণ হইয়াছে। এই জন্য তিনি ঠিক কি বলিয়াছেন জানা আবশ্যক। সম্প্রতি সর্ সামুয়েল হোর ভারতীয় আলোচনা প্রসঙ্গে পার্লেমেণ্টে যে বক্তৃতা করেন, গান্ধীজী তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে।

"Sir Samuel talks of the Communal Award as a meritorious act of the British Government. I am sorry he mentioned it. I have very bitter memories of the Award which was being hatched during the Round Table Conference time. I am unable to regard it as a proud British achievement. I know how miserably the parties themselves failed. I regard the Award as discreditable for all parties. I say this apart from its merits which do not bear close scrutiny. But the Congress has loyally accepted it because I was party to the request made to the late Mr. MacDonald to arbitrate."

"সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের একটা সুকৃতি বলিয়া সর্ সামুয়েল তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সেটার উল্লেখ করায় আমি দুঃখিত। গোলটেবিল বৈঠকটার সময় যে বাঁটোআরাটাতে তা দেওয়া হইতেছিল, আমার তাহার তিক্ত স্মৃতি আছে। আমি ওটাকে একটা গৌরবজনক ব্রিটিশ-অবদান বিবেচনা করিতে পারি না। আমি জানি পক্ষেরা নিজে কিরূপ শোচনীয় ভাবে ব্যর্থচেষ্ট হইয়াছিল। বাঁটোআরাটাকে আমি (সংশ্লিষ্ট) সকল পক্ষের পক্ষে অখ্যাতিকর মনে করি। সেটার গুণাগুণ বিচার না করিয়া আমি ইহা বলিতেছি তাহা (অর্থাৎ ইহার গুণাগুণ) পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষাসহ নহে। কিন্তু কংগ্রেস ইহা (আমার প্রতি) আনুগত্যসহকারে গ্রহণ করিয়াছে যেহেতু পরলোকগত মিঃ ম্যাকডন্যাল্ডকে সালিসী করিবার অনুরোধে আমি শরীক ছিলাম।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইতেছে, গান্ধীজী বাঁটোআরাটার প্রশংসা করেন নাই।

কংগ্রেস উহা মানিয়া লইয়াছে, ইহা এক দিক দিয়া সত্য, এক দিক দিয়া মিথ্যা। কংগ্রেস বা তাহার কোন কমীটি—নিখিলভারত কমীটি বা কর্মনির্ধাহক কমীটি—উহা কোন প্রস্তাব দ্বারা মানিয়া লয় নাই। এ-বিষয়ে কংগ্রেসের না-গ্রহণ না-বর্জন বুলি অতি পরিচিত। তদ্ভিন্ন, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কংগ্রেস-সভাপতি রূপে বলেন যে, কংগ্রেস স্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণটা অগ্রাহ্য করিয়াছে ("the Congress definitely rejected the Communal Decision")। কিন্তু কংগ্রেস উহা কার্য্যতঃ মানিয়া লইয়াছে, ইহা সত্য। কারণ,

কংগ্রেস তাহার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করে নাই। বিরুদ্ধ আন্দোলন হইয়াছে কংগ্রেস জাতীয় দলের দ্বারা এবং হিন্দু মহাসভার ও মহাসভা-ঘেঁষা লোকদের দ্বারা।

ম্যাকডন্যাল্ড সাহেবকে সালিসী করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল বলাও ঠিক্ সত্য নহে। ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধীজী ও অন্য কেহ কেহ তাহা করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু সকল পক্ষের সম্মতি ও মিলিত অনুরোধ ভিন্ন সালিসী হয় না। সেরূপ অনুরোধ হয় নাই। বাঁটোআরা-বিরোধী বড় বড় কন্‌ফারেন্স গত কয়েক বৎসরে কয়েক বার হইয়া গেল। তাহাতে এবং খবরের কাগজে বার বার বলা হইয়াছে যে, বাঁটোআরাটা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিধারণ মাত্র, সালিসী নিষ্পত্তি নহে। এত দীর্ঘকালের মধ্যে কিছু না বলিয়া এখন ওটাকে য়্যাওআর্ড বলিয়া উল্লেখ—সালিসীর উল্লেখ—গান্ধীজীর পক্ষে অনুচিত হইয়াছে।

তিনি লিখিয়াছেন, "আমি জানি পক্ষেরা নিজে কিরূপ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থচেষ্ট হইয়াছিল।" ভারতীয় তথাকথিত প্রতিনিধিরা মনোনীত হইয়াছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজনীতিকদের দ্বারা, ভারতীয়দিগের দ্বারা নির্বাচিত হয় নাই। যাহারা কোন মতেই ভারতবর্ষের স্বরাজ সম্বন্ধে একমত হইবে না, উক্ত রাজনীতিকরা এই রকম লোকই বাছিয়া বিলাতে আমদানী করিয়াছিল। তাহারা স্বরাজ পাইবার আন্তরিক চেষ্টা কেন করিবে? ব্রিটিশ মুরুব্বিদিগকে খুশি করিতেই তাহারা ব্যস্ত ছিল। সুতরাং তাহারা যে "ব্যর্থচেষ্ট" হইয়াছিল, তাহা স্বাজাতিক ভারতীয়দের লজ্জার বিষয় নহে।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মত এরূপ অত্যাবশ্যক একটি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন এক বৎসরের জন্যও বন্ধ থাকা উচিত নহে। ইহার অধিবেশন যদি কেবল সমগ্র ভারতবর্ষের বাঙালীদের মিলামিশার সুযোগ দিত, তাহা হইলেও ইহা ব্যর্থ বা অনাবশ্যক হইত না। কিন্তু ইহা দ্বারা প্রবাসী বাঙালীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতির সহিত যোগ রক্ষা করেন। অবশ্য এই যোগ রক্ষা ইহার দ্বারা সম্যক্ রূপে সাধিত হয় না, কিন্তু যতটুকু হয় তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবাসী বাঙালীদের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আরও অনেকে করিতে পারিবেন। তাঁহারা বঙ্গের বাহির হইতে রস আহরণ করিয়া তাহা বাংলা সাহিত্যে নিবদ্ধ করিতে পারেন। একটি কারণে, বাংলা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষাকল্পে তাঁহাদের সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। বঙ্গের শিক্ষাবিভাগ দ্বারা বাংলা ভাষার একটা অপভাষা সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছে। বাংলায় অনাবশ্যক আরবী ফারসী শব্দ আমদানী করা হইতেছে। বিদ্যালয়-পাঠ্য বহু পুস্তকে ইহা ঘটিতেছে। তাহার পরোক্ষ প্রভাবও অনিষ্টকর। প্রবাসী বাঙালীরা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ এই অনিষ্টকর প্রভাবের সম্পূর্ণরূপে বাহিরে। তাঁহাদের বঙ্গ-সাহিত্যসেবা এই কারণে মূল্যবান্।

বর্ত্তমান বৎসরে, আমরা যত দূর জানি, এখনও কোথাও প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা হয় নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন জামশেদপুরে অধিবেশনের প্রস্তাব হয়, তখন এই আপত্তির জন্য তদনুসারে কাজ হয় নাই যে, ডিসেম্বর মাসে যখন ছোট-নাগপুরভুক্ত রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে তখন সেই উপপ্রদেশভুক্ত আর একটি স্থানে ঐ মাসের একই সপ্তাহে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন অকর্ত্তব্য। কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশন ডিসেম্বরে না হইয়া মার্চে হইবে। সুতরাং জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের উক্ত বাধা এখন নাই। আশা করি, জামশেদপুর ও টাটানগরের নেতৃস্থানীয় বাঙালীরা এখন এ-বিষয়ে উদ্যোগী হইতে পারিবেন। হাজারীবাগ, পুরুলিয়া, চাইবাসা, ধানবাদ, ঘাটশিলা প্রভৃতি স্থানের বাঙালীরাও এই কার্য্যে সাহায্য করিলে ভাল হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনের তুলনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের ব্যয় অতি সামান্য।

—

ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

ব্রহ্মদেশ প্রবাসী বাঙালী ও অন্য ভারতীয়েরা অনতিদূর

অতীতে ভীষণ বিপজ্জনক অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও যে তথাকার বাঙালীরা আগামী ডিসেম্বরে সাহিত্য সম্মেলন করিবেন, ইহা তাঁহাদের স্বীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আশা করি আগামী অধিবেশন সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইবে। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমরা যাহা বলিয়াছি, ব্রহ্মদেশের বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য।

—

কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাসমূহের পদত্যাগ

কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাসমূহ যে-কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন, সে-কারণে তাঁহাদের পদত্যাগ আবশ্যক হইয়াছিল বা উচিত হইয়াছে কি না তাহা অবশ্যই বিচারসহ ও বিচার-যোগ্য। সে-বিচারে আমরা এখন প্রবৃত্ত হইব না।

যুদ্ধের অবসান হইবার পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে এবং ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কার্য্যতঃ যতটা স্বীকৃত হইতে পারে তাহা স্বীকৃত হইবে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিকট কংগ্রেস মোটামুটি এই দাবী করিয়াছিলেন। তাহা অগ্রাহ্য হওয়ায় কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের আদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিয়াছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপক সভার রীতি অনুসারে, তাহা করিতে তাঁহারা বাধ্য ছিলেন না; কারণ, ব্যবস্থাপক সভাসমূহে কংগ্রেসী সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, এবং নির্বাচকদের মধ্যেও তাঁহাদের নির্বাচকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা এখনই ইস্তফা না-দিয়া স্ব-স্ব পদে আঁকিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন। গবর্ণরেরা তাঁহাদিগকে যুদ্ধে কোন প্রকার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সাহায্যসূচক কিছু করিতে বলিলে তাঁহারা সে অনুরোধ রক্ষা না করিতে পারিতেন। তখন গবর্ণরেরা তাঁহাদিগকে ইস্তফা দিতে বলিতেন, এবং ইস্তফা না-দিলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতেন। তখন গবর্ণরেরা অন্য মন্ত্রীসভা গঠন করিতে অসমর্থ হইতেন (যেমন এখন হইয়াছেন) এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাগুলি ভাঙিয়া দিয়া নূতন সভা গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইত। খুব সম্ভব, তাহাতেও কংগ্রেসেরই জিত অন্ততঃ সাতটি প্রদেশে হইত। তখন কংগ্রেসীদিগকেই আবার মন্ত্রী হইতে বলিতে হইত।

এই সমস্ত ঘটিত, যদি ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত তথাকথিত প্রভিন্স্যাল অটনমী বা প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রকৃত গণতান্ত্রিক আত্মকর্ত্তৃত্ব হইত। কিন্তু চীজটা মেকি, খাঁটি নহে। সেই জন্য সামান্য ঘর্ষণেই তাহার আসল চেহারাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের যাঁহারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা জগতের কাছে ইহা প্রমাণিত হইল যে, ব্রিটেন ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিকেও বস্তুতঃ স্বায়ত্তশাসন দেয় নাই। স্বায়ত্তশাসনের মানে, রাষ্ট্রের কার্য্য পরিচালনে দেশের লোকদের ক্ষমতা থাকা। তাহাদের সেরূপ ক্ষমতা থাকিলে, এক দল মন্ত্রীর পদত্যাগের পর অন্য মন্ত্রীদল গঠনের চেষ্টা হয়, সে চেষ্টা বিফল হইলে ব্যবস্থাপক সভা ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচকদিগকে নূতন সদস্য নির্বাচনদ্বারা নূতন ব্যবস্থাপক সভা গড়িতে বলা হয় যাহার মধ্য হইতে আবার মন্ত্রী পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এখন যাহা ঘটিল তাহার মানে এই যে, প্রদেশগুলির লোকেরা এক বার মাত্র ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচনের অধিকার পাইয়াছিল; এখন সে-অধিকার লুপ্ত। রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্বাহে তাহারা এখন কেহই নহে, গবর্ণরই সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহা স্বৈর একনায়কত্ব, কোন প্রকারের স্বায়ত্তশাসন নহে।

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এখন ইস্তফা না দিয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যদি গবর্ণরদের যুদ্ধসংক্রান্ত কোন আদেশ বা অনুরোধ না মানিয়া ইস্তফা দিতে বাধ্য হইতেন বা পদচ্যুত হইতেন, তাহা হইলে কংগ্রেস যে সাধারণভাবে যুদ্ধ-বিরোধী বা বর্ত্তমান যুদ্ধের বিরোধী কিংবা এই যুদ্ধে ব্রিটিশ-সরকারের সহযোগী হইতে অসম্মত, এইরূপ কোন একটা ধারণা সুপ্রকট হইত। হয়ত কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতারা ব্রিটিশ সরকারের সহিত তাঁহাদের এই বাস্তবিক বা সম্ভাব্য বিরোধ সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। কারণ, গান্ধীজীর মতে, সংগ্রামে (অবশ্য অহিংস সংগ্রাম) প্রবৃত্ত হইবার মত অবস্থায় কংগ্রেস এখন নাই।

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মোটামুটি দুই বৎসর তাঁহাদের পদে

আসীন ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা ভাল কাজ কিছু কিছু করিয়াছেন। নিন্দার্হ কাজ এবং কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত কোন প্রদেশেই হয় নাই বলা যায় না।

সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর অকৃতিত্ব ও ঔদাসীন্য হইয়াছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। তথাকার হিন্দু ও শিখ অধিবাসীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা নাই। অপরাধ (crime) বাড়িয়াছে।

বিহারপ্রদেশের মন্ত্রীরা তথাকার বাঙালীদের সম্বন্ধে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের রিপোর্ট অনুযায়ী কোন কাজ করেন নাই। বিহারপ্রদেশভুক্ত বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি বঙ্গে ফিরাইয়া দিবার যে প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমীটিতে গৃহীত হইয়াছিল, তদনুসারে কোন কাজ বিহারের মন্ত্রীরা করেন নাই। বিহারের বাঙালীরা তথাকার সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও মার্জিতবুদ্ধি লোকসমষ্টির অন্তর্গত। কংগ্রেসের জন্য ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে করিয়াছেন। অথচ বিহারে এক জন বাঙালীকেও মন্ত্রী করা হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় না হইলেও অর্থপূর্ণ বটে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিস্তর লোকের মতে, তথায় হিন্দী শিক্ষা দিবার বিরুদ্ধতার নিমিত্ত সহস্রাধিক লোককে ফৌজদারী সোপর্দ করিয়া দণ্ড দেওয়া একটা অপকীর্ত্তি।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাঘটিত যে-যে কেলেঙ্কারী হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ করিতে চাই না।

যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীরা মুসলমানদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন এবং হিন্দুদের কোন কোন ন্যায্য অধিকার অপহরণ করিয়াছিলেন।

তথাপি ইহা সত্য যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মোটের উপর অনেক ভাল কাজ ও দেশহিতচেষ্টা করিয়াছেন।

—

চীন-জাপান যুদ্ধ

চীন যে শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়ী হইবে, তথাকার প্রধান সেনাপতি চিয়াং কাই-শেক পুনর্বার তাহা বলিয়াছেন। আমাদেরও বিশ্বাস ঐরূপ।

—

রবীন্দ্রনাথের চীনকে সাহায্যের আবেদন

রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত আবেদন প্রকাশিত হইয়াছে।

"কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের সদস্যরূপে প্রত্যাগত ডাঃ দেবেশ মুখুজ্যের নিকট মাদাম সান ইয়াৎ সেন যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। জাপানের দীর্ঘ-কালব্যাপী অভিযানের সর্ব্বধ্বংসী দস্তু হইতে নিরীহ চীনবাসীদের জীবন রক্ষা করা আমাদের সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারত ও চীন এই দুইটি বিরাট দেশের মধ্যে অতীতের মৈত্রীবন্ধনের বিষয় যাঁহারা উপলব্ধি করিবেন, তাঁহারা চীনবাসীদের রক্ষার কর্ত্তব্যও স্বীকার করিবেন। চীনের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার সময় আমাদের ডাক্তারগণ চীনে যে সেবাশুশ্রূষার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য।"

সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে—ডাঃ দেবেশ মুখুজ্যে, ৩১ কালী বাঁড়ুজ্যে লেন, হাওড়া।

আমরা ইহার পূর্ণ সমর্থন করিতেছি।

—

ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অন্যতম বনিয়াদী উক্তি

গত ৭ই নবেম্বর হাউস অব লর্ডসে ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন :—

"The long-standing British connection with India has left His Majesty's Government with obligations towards her, which it is impossible for them to shed by d'sinteresting themselves wholly in the shaping of her future form of government."

ভারতবর্ষের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী সম্পর্কজনিত ভারতের প্রতি অবশ্যকরণীয়গুলির বোঝা ব্রিটিশ সরকার ঝাড়িয়া ফেলা অসম্ভব মনে করেন। উভয় দেশের মধ্যে প্রভুভৃত্য সম্পর্ক আরও দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে বোঝা আরও বাড়িবে এবং সিন্দবাদ নাবিকের স্কন্ধারূঢ় বুড়ার মত হইবে। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা অনেকেই এই শ্বেত মনুষ্যের বোঝার করুণ কাঁদুনী গাহিয়াছেন। ১২১ বৎসর পূর্ব্বেও বড়লাট লর্ড হেস্টিংস লিখিয়াছিলেন :—

"A time not very remote will arrive when England will..........wish to relinquish the domination........from which she cannot at present recede."

এই অনতিদূর ভবিষ্যৎটা ১২১ বৎসর পরেও আসে নাই এবং ইংলণ্ড এখনও প্রভুত্ব হইতে সরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ। লর্ড হেস্টিংসের উক্তির বিস্তৃত বংশাবলী এখনও খুব্‌ মেজাজে ও বহাল তবিয়তে বিরাজমান।

—

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের বেতার বক্তৃতা

গত ৭ই নবেম্বর লর্ড হ্যালিফ্যাক্স লণ্ডনে রেডিওর বক্তৃতায় বলেন :—

"We are fighting in defence of freedom; we are fighting for peace; we are meeting a challenge to our own security and that of others; we are defending the rights of all nations to live their own lives."

এই উক্তিটির প্রথম অংশটি, ভারতবর্ষকে বাদ দিয়া, সত্য ; দ্বিতীয়টি সত্য ; তৃতীয়টিও, 'আদার্‌স্‌' কথাটির পূর্ব্বে 'সাম্‌' কথাটি বসাইলে, সত্য ; চতুর্থটি, ভারতবর্ষকে বাদ দিয়া, সত্য।

—

শিল্পী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের উদ্যোগ

শিল্পী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় এ. আর. সি. এ. মহাশয়ের উদ্যমে তাঁহার স্টুডিয়োতে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগের সূচনা হইয়াছে। আমাদের দেশে জনসাধারণের পক্ষে শিল্পকলার মর্ম্মগ্রহণের ও শিল্পবিষয়ক রুচি সমৃদ্ধ করিবারও সুযোগ যথেষ্ট নাই। ইউরোপে চিত্রাদির প্রদর্শনী প্রভৃতি যেরূপ প্রচুর সংখ্যায় হইয়া থাকে, আমাদের দেশে তাহা হয় না। বার্ষিক প্রদর্শনী যেগুলি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইত, সেগুলিও অনেক ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। সেগুলি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও সাধারণের মধ্যে শিল্পজ্ঞান প্রচারের জন্য আরও অনেক প্রদর্শনী হওয়া আবশ্যক। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের স্টুডিয়োতে ধারাবাহিক ভাবে এইরূপ কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এই স্টুডিয়োতে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের (তাঁহাদের মধ্যে বাংলার অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পী আছেন) অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী, বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযামিনী রায় ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর চিত্রের প্রদর্শনী হইয়াছে। গত মাসে এখানে "আধুনিক শিল্পী"দের একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী হইয়াছে। অবশ্য, এই প্রদর্শনীতে যে-সকল শিল্পীর ছবি ছিল, তাঁহাদের সকলেই বা অধিকাংশই যে "আধুনিক"—বয়সে হউক বা শিল্পরীতিতে হউক—এমন কথা বলা চলে না।

এই প্রদর্শনীটির সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—এখানে অনেক বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা এবং খুব ভাল ছবিও ছিল, কিন্তু কোনটির দামই পঞ্চাশ টাকার ঊর্দ্ধে ছিল না। অর্থের অভাবে যে-সকল শিল্পরসিক ব্যক্তি মূল চিত্র ক্রয় করিতে পারেন না, এই উদ্যম তাঁহাদের প্রতি বিশেষ সুবিচার করিয়াছে।

—

ইয়োরোপে যুদ্ধের অধিকতর বিস্তার-সম্ভাবনা

ইয়োরোপের আরও কয়েকটি দেশ যুদ্ধে জড়িত হইবার সম্ভাবনা। দৈনিক সংবাদ দৈনিক কাগজে দ্রষ্টব্য।

[২৭শে কার্ত্তিক, ১৩ই নবেম্বর, বিবিধ প্রসঙ্গ সমাপ্ত।]

—

কষ্টিপাথর

রেলেটিভিটি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুলনায় সমালোচনাতে
জিভে আর দাঁতে
লেগে গেল বিচারের দ্বন্দ্ব,
কে ভালো কে মন্দ।
বিচারক বলে হেসে
দাঁত জোড়া কী সর্বনেশে
যবে হয় দেঁতো।
কিন্তু সে সুধাময় লোক বিশেষ তো
হাস-রশ্মিতে,
যাহারে আদরে ডাকি, অয়ি সুস্মিতে
পাণিনির শুদ্ধ নিয়মে।

জিহ্বায় রস খুব জমে।
অথচ তাহার সংশ্রবে
দেহখানা যবে
আগাগোড়া উঠে জ্বলি
রস নয়, বিষ তারে বলি।
স্বভাবে কঠিন কেহ মেজাজে নরম,
বাহিরে শীতল কেহ, ভিতরে গরম।
প্রকাশ্যে এক রূপ যার,
ঘোমটায় আর।
তুলনায় দাঁত আর জিভ
সবই রেলেটিভ।
হয়তো দেখিবে সংসারে
দাঁতালো যা, মিঠে লাগে তারে
আর যেটা ললিত রসালো
লাগে নাকো ভালো।
সৃষ্টিতে পাগলামি এই—
একান্ত কিছু হেথা নেই।

ভালো বা খারাপ লাগা পদে পদে উলোটা পালোটা
কভু সাদা কালো হয় কখনো বা সাদাই কালোটা,
মন দিয়ে ভাবো যদ্যপি
জানিবে এ খাঁটি ফিলজফি।

অলকা]

গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেঘ কেটে গেছে আজি এ সকাল বেলায়
এসো এসো তুমি হাসিমুখে এসো
অলস দিনের খেলায়।
স্বপ্ন জমেছে কত আশা নিরাশায়,
তরুণ প্রাণের নিষ্ফল ভালোবাসায়,
দিব আজি তারে অকূলে ভাসায়ে
ভাঁটার গাঙের ভেলায়।
দুঃখসুখের বাঁধনগুলোর
গ্রন্থি দিব খুলে.
ক্ষণেক তবে রব আপন ভুলে।
সুর বেঁধে গিয়ে যে গান হয় নি গাওয়া,
সময় ফুরায়ে যে দান হয় নি পাওয়া,
পূবের হাওয়ায় তারি পরিতাপ
উড়াইব অবহেলায়।
এসো এসো তুমি অলস দিনের খেলায়॥

শ্রীহর্ষ]

শ্রদ্ধার অপচার

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ.

...উন্নত জীবনের ও উন্নত চরিত্রের প্রতি মানবমনে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, মানবসমাজে তাহাই প্রবলতম শক্তি। মানবসমাজ এ শক্তির ক্রিয়াতে যেরূপ উৎক্ষিপ্ত ও উত্তোলিত হয় এমন অপর কোনও শক্তির ক্রিয়াতে হয় না। আপনারা দেখে থাকবেন, কুলিরা একটি দীর্ঘ লৌহদণ্ডের (lever) নীচে কোনও এক বিন্দুতে একখানি বড় পাথর (fulcrum স্বরূপ) রেখে সেই দণ্ডের দীর্ঘ প্রান্তে চাপ দিয়ে, অপর প্রান্তস্থ ভারী মাল সহজেই উত্তোলন করে। বিজ্ঞানে ইহাকে lever (অর্থাৎ উত্তোলন-যন্ত্র) বলা হয়। বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্ বলেছিলেন, Give me a fulcrum and I will lift the world. পৃথিবী-উত্তোলনকারী এমন যন্ত্র (lever) কি সত্যই আছে? আছে। তাহা, মানব-অন্তরে ঈশ্বর-রোপিত এই শ্রদ্ধা-বৃত্তি। মানব-সমাজে এমন প্রচণ্ড শক্তি আর কিছুই নাই।

বর্ত্তমান যুগে মানবের এই নৈতিক ঐকান্তিকতার সম্মুখে একটি বড় সমস্যা উপস্থিত। তাহা এই পবিত্র শ্রদ্ধাশক্তির অপব্যবহার, অপচার অপচয়। মহত্তের প্রতি সম্মানই মানব-সমাজের প্রবলতম শক্তি। এত দিন বুদ্ধ যীশু মহম্মদ চৈতন্য প্রমুখ ধর্ম্মনেতা, সাধুভক্ত, এবং লোকহিতৈষী ত্যাগী পুরুষ ও চরিত্রবান্ মনুষ্যগণই মানবসমাজের পূজা পেয়ে আসছিলেন। নিউটন, সেক্সপীয়র প্রভৃতি যে সকল মানুষ মানবমনকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করেছেন অথবা শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদের দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরাও এত দিন মানুষের শ্রদ্ধা লাভ ক'রে আসছিলেন। কোনও জাতির বা মানবমণ্ডলীর শ্রদ্ধা লাভ কর্‌বার জন্য, তাঁদের স্মরণীয় মানুষের দলভুক্ত হবার জন্য, চরিত্র জীবন অথবা অনুষ্ঠিত কল্যাণকর্ম্ম এর চেয়ে কম দরের হ'লে চল্‌ত না,—ইহাই ছিল এত দিন সাধারণের সম্মান লাভের শাশ্বত নিয়ম।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সে ব্যতিক্রমের বিষয়ে দীর্ঘ বর্ণনা কর্‌বার প্রয়োজন নাই। ইহা বলা যথেষ্ট যে, চলচ্চিত্রের যে সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবন হ'তে চরিত্রের পঙ্কলেপ সারাজীবনে কখনও ধৌত হ'ল না তাদের ছবি ভদ্র পুরুষ ও নারীগণ অবিচারে নিজেদের ঘরে নিয়ে আস্‌ছেন; ক্রমে এখন শিশু-সাহিত্যকে পর্য্যন্ত তাদের ছবি ও জীবন-চরিত আক্রমণ করছে। এ দেশেও দেখ্‌তে পাই, চরিত্রের দিকে দৃষ্টি না রেখে, যাঁরা শুধু সাহিত্যিক কবি অভিনেতা বা জননায়ক, এমন মানুষদিগকে চিন্তাবিহীন জনসাধারণ অবিচারে সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা দান কর্‌তে আরম্ভ করেছে। জনসমাজের যে-পূজা পূর্ব্বে কেবল ধর্ম্মের চরিত্রের ও লোকহিতের প্রাপ্য ছিল, তাহা যখন এইরূপে লিপি-কৌশলের কলা-কৌশলের কিংবা ব্যবসায়ে সফলতার পায়ে ঢেলে দেওয়া হয়, তখন সুস্থ মানবমন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হয়ে থাকৃতেই পারে না। জনসমাজের সম্মানধারাকে এইরূপে নিম্নতর খাতে, কখনও কখনও বা অপবিত্র খাতে প্রবাহিত ক'রে দেওয়া, চরিত্র ও আচরণের দ্বারা যিনি হয়তো সমাজের অশেষ অকল্যাণ সাধন করেছেন এমন মানুষকে পূজার আসনে বসানো ভবিষ্যদ্-বংশীয়দের দৃষ্টির সম্মুখে ইহাদিগকেই আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ রমণীরূপে তুলে ধরা,—ইহার সমান সর্ব্বনাশকর কার্য্য অতি অল্পই আছে। শ্রদ্ধা যেমন মানবসমাজে প্রবলতম শক্তি, শ্রদ্ধার অপচার তেমনি মানবসমাজে প্রবলতম অকল্যাণ। শ্রদ্ধার সুপ্রয়োগে জনসমাজ ত্বরায় উন্নত হয়; শ্রদ্ধার অপপ্রয়োগে জনসমাজ তেমনি ত্বরায় অবনত হয়।...

তত্ত্ব-কৌমুদী]

—

বন্দী-শিবিরে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত

বন্দী-শিবিরে রবীন্দ্রনাথ—শুনিয়া চমক লাগিতে পারে।...

কথাটার সোজা অর্থ এই যে, আমরা শুধু স্থানেই বাস করি না, কালেও বাস করি অর্থাৎ অপরের মনে। যাঁরা জ্ঞানী, গুণী বা কর্ম্মী—তাঁরা তাই তাঁহাদের দেশের সর্ব্বত্রই বাস করেন, যদিও শরীরটা লইয়া বিশেষ স্থানে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাই আমাদেরও সঙ্গী ছিলেন বন্দীশালাতে। পাশের বন্ধুর কাজকর্ম্ম যেমন আমাদের উপরও ভালোমন্দ ফলাফল আনিত, রবীন্দ্রনাথের কাজ ও কাব্যও তেমনি আমাদের বন্দীশালাতে আন্দোলন তুলিত।...

সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। এক ইংরেজী পত্রিকায় খবর বাহির হইল যে, রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের লইয়া একখানি বই লিখিয়াছেন, বইয়ের নাম "চার অধ্যায়"।...বই পড়িয়া কেহ ভাল বলিল, কেহ মন্দ বলিল—..."এই বই রবীন্দ্রনাথের লেখা উচিত হয় নাই, যাদের বিষয় জানেন না তাদের সম্বন্ধে কেন লিখিতে গেলেন? তিনি আমাদের উপর অবিচার করিয়াছেন।"...

এক ভদ্রলোকের কথা সেদিনের চীৎকার ও হট্টগোলের মধ্যে ভালো লাগিয়াছিল। তার সুরও যেমন শান্ত, বক্তব্যের ভঙ্গীও তেমন সংযত ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—এ ভাবে বিচার চলে না। প্রশ্নের যেমন ধর্ম্ম আছে, বিচারেরও তেমনি নীতি আছে। সাহিত্যের দিক দিয়া এর বিচার হইতেছে না, হইতেছে রাজনীতির দিক দিয়া। বিপ্লবীদের এ বইতে উপকার বা অপকার করিয়াছে—এই রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক দিয়া বুঝিতেও যে দূরদৃষ্টির দরকার—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে দৃষ্টি একেবারে আচ্ছন্ন। প্রয়োজনের পরমায়ু বেশী নয়, আজ যা প্রয়োজন কাল তা-ই ভাঙা মৃৎপাত্রের মত পরিত্যক্ত হয়।...বুদ্ধি শান্ত হইতে সময় লাগে, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিলে বিচার অসম্ভব। এ ভাবে আলোচনায় লেখকের উপর যেমন অবিচার হয়, নিজের উপরও তেমনি অবিচার করা হয়।...আর কিছু না হউক অন্ততঃ এটুকু ভাবা উচিত যে, এঁর মত মনীষী আঘাত করিয়া বিপ্লবীদের ভাবনা ও চিন্তাকে সরল করার সুযোগ দিয়াছেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার তেমন আলাপ ছিল না। দেউলী ক্যাম্পে তিনি আসার পর তাঁকে চিনি। চার অধ্যায়ের আলোচনা আমার মনে রেখাপাত করিয়াছিল। সবাই অল্পবিস্তর উত্তেজিত হইয়াছে, কমবেশী temper সবাই হারাইয়াছে, কিন্তু সে-দলের মধ্যে একা এই লোকটিই মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়াছে। অনায়াসে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। ঠিক করিলাম, অবসরমত এঁর সঙ্গে ভালো করিয়া আলাপ করিব।

কথায় কথায় এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠিয়া পড়িল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনার নিজের মত কি?"

"সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার নিজের মত যে, এত বড় লেখক পৃথিবীতে খুব বেশী আসেন নি। আমার পড়াশুনা বেশী নয়, বিদ্যাও কম, আমার নিজের কথাই বলতে পারি যে, এত বড় প্রতিভাবান মনের সংস্পর্শে আমি আসিনি।"

"আচ্ছা, রাজনীতির দিক দিয়ে যদি বিচার করেন, তবে তাঁর স্থান কোথায় হবে?"

উত্তর করিলেন, "জানেনই তো তিনি রাজনৈতিক নেতা নন্। আন্দোলনের জন্ম যে-মানুষ দরকার তা তিনি নন্। রাজনীতি আজ প্রায় আমাদের পূরা মনের মনোযোগ আবদ্ধ করে রেখেছে—এ সত্য। কিন্তু বাংলার যে মন আজ দেখতে পাচ্ছেন, তা বিশেষ করে দুটি মানুষের মানস-রসে পুষ্ট—এক জন বিবেকানন্দ, অপর জন রবীন্দ্রনাথ। জাতির স্রষ্টা হিসাবেও তিনি অমর।...

"রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ের গভীরে তাঁর সত্যতর পরিচয় রয়েছে; আমি তাঁকে দার্শনিক বলি না, কারণ দার্শনিক হবার জন্ম মনীষাই যথেষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু মনীষী নন্, তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি। জীবন সম্বন্ধে তাঁর সত্যদৃষ্টি আছে, তাই প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক কালের সত্য-অন্বেষুর কাছে তাঁর মর্য্যাদা থাকবে। ভারতের যদি কোন বিশেষ mission থাকে, তবে তা জানাবার জন্ম রবীন্দ্রনাথ এক জন অধিকারী পুরুষ।...

"আমার মনে হয়, ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটিতেই বোধ হয় এ-দেশের কথাটি সবচেয়ে পরিষ্কার পাওয়া যায়; এই বহুতে এক ব্যক্ত হয়েছেন, সমস্ততে তিনিই কর্ম্ম-কর্ত্তা; তিনি ভোগ করেন, তাই তিনি ত্যাগ করেন। ভোগের এর চেয়ে চরম পথ আর নাই,—মা গৃধঃ, লোভ কোরো না, এ কার ধন?"

"গান্ধীজীও বলেন, "Many of us believe, and I am one of them, that through our civilisation we have a message to deliver to the world." কিন্তু তিনি তো ভোগের কথা বলেন না।"

"গান্ধীজী সত্যদ্রষ্টা, বিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের প্রতিনিধি। কিন্তু গান্ধীজীর মানসিক গঠন ascetic, তাই morality-র দিকটা প্রাধান্য পেয়েছে। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উপনিষদের উত্তরাধিকারী। কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে দু-জনের একটু তফাৎ আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো জানেন—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। গান্ধীজী বর্ত্তমান সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারেননি, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর সত্য আংশিকতা-দোষ পেয়েছে। Morality-র সঙ্গে বর্ত্তমান সভ্যতার কোন মিল করতে না পেরে গান্ধী এ-সভ্যতাকে অস্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি, তাঁর মধ্যে একটা synthesis আছে। মানুষের বুদ্ধি যে বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে সৃষ্টি করেছে, বুদ্ধির সে দানকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি, পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ সভ্যতা অসম্পূর্ণ, এবং এইখানেই ভারতের বিশেষ missionএর কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।...

"রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য একটু খুঁজলেই তাঁর সত্যোপলব্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে পারবেন। আমি এক সাধককে জানি, 'রামকৃষ্ণকথামৃত' এবং অরবিন্দের 'Lights on Yoga' যত পড়তেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তত পড়তেন। চার অধ্যায়ের তালিকায় এ তিনটিই স্থান পেয়েছিল। গীতা ও গীতাঞ্জলি তিনি পাশাপাশি রাখতেন, প্রয়োজনমত কখনও এটা পড়তেন কখন ওটা পড়তেন। সাধক মানুষ যাঁর লেখায় পাথেয় পেতেন সে লেখার লেখক এদিক দিয়ে নিশ্চয় দীন-দরিদ্র বা আনাড়ী নয়—বুঝতেই পারেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন, এ পথের সন্ধানীরা বলেন—ঐ তাঁর first revelation, অরবিন্দের ভাষায় opening, উপনিষদের ভাষায় আত্মদর্শন বা আবরণ-উন্মোচন। এর মানে কি জানেন,—'আমি জেনেছি তাঁহারে, মহান্তপুরুষ যিনি আঁধারের পারে'।—বলতে পারেন যে, এজন্য রবীন্দ্রনাথ সাধনা করেছেন কিনা? সাধনা আগে হয় না, পরে হয়। সত্যের প্রকাশ যে-কোন কারণে সহসা জীবনে দেখা দেয়, তার পরে সাধনা চলে। এ সত্য-বোধকে স্থায়ী করতে—জীবনকে সে-ছন্দে বেঁধে নিতে। লক্ষ্য নিশ্চয় করেছেন যে, মহাত্মাজী নিজের জীবনকে বলেন an experiment with truth, মহাত্মাজীর যা truth, রবীন্দ্রনাথের নিজের ক্ষেত্রে তাহাই জীবন-দেবতা। জানি না এ আপনার নজরে পড়েছে কিনা।—রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য কবির মত বিষয় নিয়ে কবিতা লেখেন না, নিজের অনুভূতির বিচিত্র গান গেয়ে যান, পরে তার একটা নাম দেন। কেন? সমস্ত গান, কবিতাই ঐ একের মধ্যেই বিধৃত ব'লে।"

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "রবীন্দ্রনাথকে বুর্জ্জোয়া সাহিত্যিক বলা হয়, এ মতবাদ সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

শান্ত স্বরে জবাব দিলেন, "ওটা গালি। আপনারা কখনও বলেন না, বুর্জ্জোয়া scientist, অথচ বুর্জ্জোয়া সাহিত্যিক বলতে আপনাদের দ্বিধা হয় না। Science-এর জাত বা শ্রেণী নাই, এ মানতে পারেন; কিন্তু সাহিত্যের বেলায়ই আপনাদের বুদ্ধি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়, গোঁড়ামি দেখা দেয়। রাজনীতি ও সমাজনীতিতে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তা আপনারা অনায়াসে সাহিত্যেও টেনে আনেন। কবিতাটি বোধহয় জানেন—

কমলবনে কে পশিল হীরার জহরী
নিকষে ঘষয়ে কমল আঁ মরি মরি!"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহিত্য অর্থে আপনি কি বোঝেন তবে?"

"এক কথায় বুঝানো কষ্টকর। তা ছাড়া, সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ

সব ক্ষেত্রেই কঠিন ব্যাপার, এমন কি একপ্রকার অসম্ভবও বলতে পারেন। বিজ্ঞান যদি সত্যসন্ধানী হয়, সাহিত্যকে তবে বলা যায় রসসন্ধানী। মানুষের প্রাণ ধারণ করতে হয়; এ'দিকের প্রয়োজন নিয়ে সমাজনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি মিলে সভ্যতার একটা দিক গড়ে উঠেছে। মানুষ বাঁচে, প্রাণ ধারণ করে—এতেই কি মানুষ পর্য্যাপ্ত, না মানুষের আর কিছু আছে ?"...

তিনি বলিতে লাগিলেন, "নিজের মধ্যে যে সত্যের সন্ধান পায় নাই কিম্বা করে নাই, তার পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়—এই আমার ধারণা। 'চার অধ্যায়' নিয়ে সেদিন আপনারা উত্তেজিত হয়েছিলেন, কিন্তু আপনাদের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি জন্মদিনে যে 'প্রত্যভিনন্দন' বক্সা ক্যাম্পের বন্দীদের পাঠিয়েছিলেন, তা আর এক বার দেখে নেবেন। তখন বুঝতে পারবেন, আপনাদের মধ্যে মানুষের কোন্ পরিচয়কে তিনি দেখতে পেয়েছেন ও সম্মান দিয়েছেন।...

"আপনাদেরই এক জনের কথা বলি যাকে সবাই সম্মান করে থাকেন নেতা বলে। জীবনে, ব্যক্তিগত বা রাজনীতি যে কোন ক্ষেত্রেই হউক, যখন ভয়ানক সময় উপস্থিত হয়, বিশ্বাসের জোর কমে যায়, বুদ্ধিতে পথ পরিষ্কার আর ধরা পড়তে চায় না,—তখন তিনি যে ভাবে শক্তি সঞ্চয় করতেন, শুনলে সত্য বলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না। শক্তি সংগ্রহ করতেন গান গেয়ে, অথচ তিনি গান জানেন না। এই রকম দিনে কতবার যে আমি নিজেই তাকে গুণ্ গুণ্ করে আবৃত্তি করতে শুনেছি,

তোমার আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।

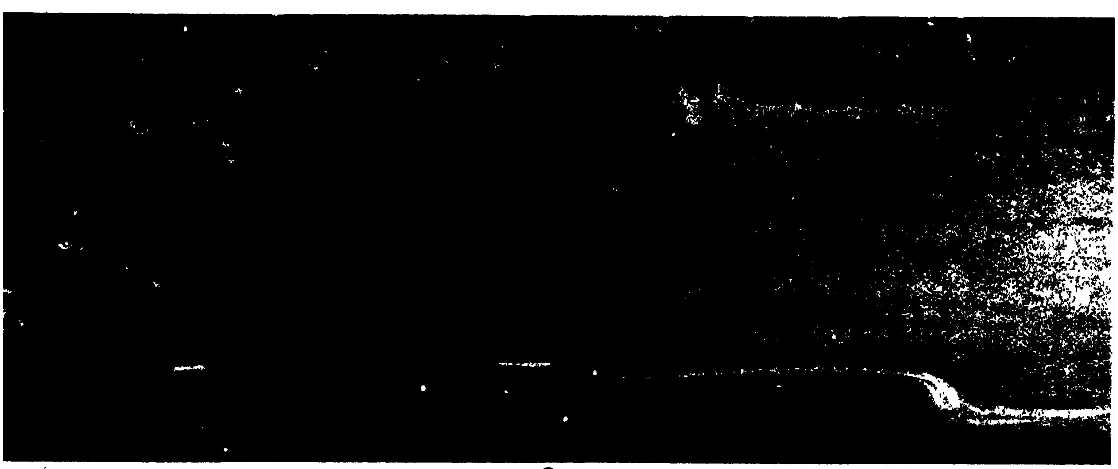
"বিপ্লবের নেতাকে শক্তিরসে যিনি পুষ্ট করতে পারে তাঁর মর্য্যাদা সম্বন্ধে আপনাদের আরও একটু সচেতন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা নিজেরা সাধক নয়, প্রেমিকও নয়, আমরা সত্য-অন্বেষুও নয়—তাই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্য বুঝতে আমরা স্বভাবতই অক্ষম।"...

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিলেন, "এই রাজপুতনায় এসে কার কথা আপনার প্রথম মনে হয়েছিল ?"

"রাণা প্রতাপসিংহের।"

"রাণা প্রতাপের আগে এবং পরে কত লোক রাজপুতনায় জন্মেছে, কিন্তু ঐ লোকটিই শুধু এ-দেশের মানসিক প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিনিধি হয়ে জীবিত আছেন। বাংলার ও ভারতের আজকের সমস্যা আজ বা কাল এক দিন মীমাংসা হবে। তখন এই রবীন্দ্রনাথের নিকট আমাদের সেদিনকার দেশবাসীর আসতে হবে,—দেশের ঐশ্বর্য্যের ও বাণীর সন্ধান নিতে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশ বুঝতে পারে নি, কিন্তু সৌভাগ্যের দিনে জাতির মহৎ ও সত্য প্রয়োজন যখন দেখা দেবে, তখনই রবীন্দ্রনাথকে দেশবাসী বুঝতে পারবে। এ প্রতিভার পরমায়ু যে কত অমিতায়ু তা বুঝতে একটু দৃষ্টি থাকা চাই।"...

[মন্দিরা]



বনস্পতির ছায়ায় শ্রীলাভচাঁদ মেঘানী অঙ্কিত

পঞ্চশস্য

যন্ত্রের সাহায্যে সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারণ

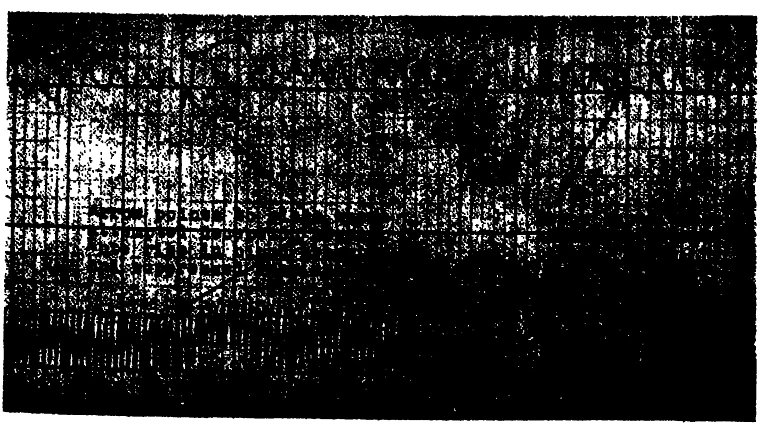
কোনও অপরাধে অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তি সত্য উত্তর দিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য একটি যন্ত্র (পলিগ্রাফ) আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে পুলিশ কর্ত্তৃক কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই যন্ত্রটির মূল কথা এই যে, মিথ্যা কথা বলিবার সময় মনে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবেই, এবং রক্তের চাপ ও শ্বসপ্রশ্বাসের গতিতে এই চাঞ্চল্য ধরা পড়িবে। পলিগ্রাফ যন্ত্রটি এ-ভাবে প্রস্তুত যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষার সময় তাহার রক্তের চাপ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি তাহাতে লিখিত হইয়া যায়।

গত কয়েক বৎসরে এই যন্ত্রের সাহায্যে বহু সন্দেহভাজন ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। তাহার ফলে প্রাপ্ত বিবরণগুলির মধ্যে একটি লিপিবদ্ধ করা গেল। এক জন লোক তাহার মোটরগাড়ীর দস্তানা-কুঠরিতে অনেক টাকা রাখিয়া সেই কুঠরিটি ও গাড়ীর দরজায় চাবি দিয়া কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র যায়। দুই ঘণ্টা পরে ফিরিয়া সে দেখে, তালা ভাঙিয়া কে টাকা চুরি করিয়াছে। কোন এক যুবক এই রাহাজানি করিয়াছে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তাহাকে এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় তাহার রক্তের চাপ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক ভাবেই চলিতেছিল। কিন্তু ঐ চোরাই টাকার কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে দেখা গেল, তাহার রক্তের চাপ ও শ্বাসপ্রশ্বাস দুইই হঠাৎ অস্বাভাবিক গতি ধারণ করিয়াছে। (নিম্নে চিত্র দ্রষ্টব্য)। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে পরীক্ষার ফল সন্দেহভাজন যুবকটিকে দেখানো ও বিস্তারিত বুঝাইয়া দেওয়া হইল—তাহার ফলে সে দোষ স্বীকার করে, টাকাটা ফেরৎ পাওয়া যায়।



হত্যাপরাধে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে পলিগ্রাফ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। বুকে ও হাতে রবারের নল লাগানো হইয়াছে। তাহার রক্তের চাপে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিতে কিছু বৈষম্য ঘটিলেই যন্ত্র তাহা ধরিয়া ফেলিবে।

বলা বাহুল্য, এই যন্ত্র যে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন এমন কথা কেহই বলে না। বিশেষতঃ, অব্যবসায়ীর হাতে পড়িলে এই যন্ত্রের ব্যবহার



মোটর গাড়ী হইতে অর্থাপহারকের রক্তের চাপ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের লিপি। মিথ্যা বলিবার সময় রক্তের চাপ বাড়িয়াছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিতে পার্থক্য ঘটিয়াছে।

ত্রুটিপূর্ণ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু দোষীকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার কাজে এই যন্ত্রটি বিশেষ সহায় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আমেরিকায় গত তিন বৎসরে প্রায় ৪০০০ লোককে এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে; যন্ত্র-লিপি দেখিয়া সন্দেহ হয়, তাহার মধ্যে ৯৭৪ জন মিথ্যা কথা বলিতেছে। এই ৯৭৪ জনের শতকরা ৫৫·১ জন পরে দোষ স্বীকার করে। বাকী যাহারা দোষ স্বীকার করে নাই তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭৪·৭ জন পরে আদালতে অন্য প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাগদাদের ইসলাম চিত্রকলা

প্যারিসে কিছুকাল পূর্ব্বে জাতীয় গ্রন্থভবনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উহার নিজ সংগ্রহভুক্ত প্রাচীন চিত্রিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতির একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে



কাক ও মূষিক

বাগদাদের চিত্রকলার ও পুস্তক-চিত্রণের নিদর্শনই ইহার প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল। তাহার কয়েকখানি চিত্র এখানে মুদ্রিত হইল। এইগুলি হইতে ইসলামী চিত্রকলা সে-সময়ে কতদূর উন্নত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়।

১২২১ খ্রীষ্টাব্দের একটি চিত্রে দেখা যাইতেছে, আবু সৈদ নামক এক ব্যক্তি, তাহার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে এই অভিযোগে এক জন যুবককে বিচারকের নিকট ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। বিচারক যুবকের কথা শুনিয়া অভিযোগ হইতে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন—ইহাতে আবু সৈদ বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে (স্বতন্ত্র মুদ্রিত চিত্র দ্রষ্টব্য)।

১২২২ খ্রীষ্টাব্দের অপর একটি চিত্রে দেখা যাইতেছে, আবু সৈদ দরিদ্র বৃদ্ধা রমণীর ছদ্মবেশ ধরিয়া ও দুই জন বালককে তাহার পুত্র সাজাইয়া বাগদাদের সম্রান্ত কবিদের নিকট নিজের দুঃখ জানাইয়া তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত করিয়াছে (স্বতন্ত্র মুদ্রিত চিত্র দ্রষ্টব্য)।

১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অঙ্কিত চিত্রাবলীতে এই শিল্পধারা আরও উন্নত হইয়াছে দেখিতে পাই। এই সময়ের যে-ছবিগুলি পাওয়া



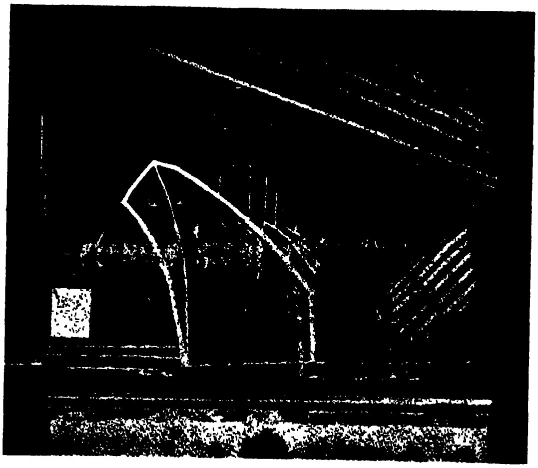
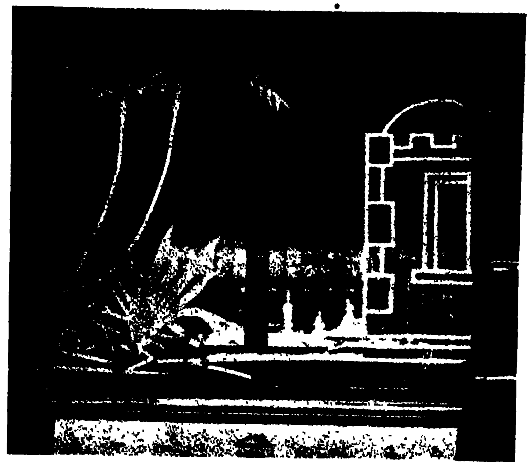
ড্রাগন



নৌকাবিহার

গিয়াছে তাহার চিত্রকরের নামও জানা গিয়াছে—ইব্‌ন্ মাহ্‌মুদ। এই সময়ের একখানি চিত্রে আবু সৈদকে ক্ষৌরকারবেশে দেখিতে পাই,—তাহার চারি দিকে দর্শকবৃন্দ। এই ছবিখানির সূক্ষ্ম কাজ দর্শনীয় (স্বতন্ত্র মুদ্রিত চিত্র দ্রষ্টব্য)। ইব্‌ন্ মামুদের কোন কোন চিত্রে অঙ্কিত বেশভূষার বৈচিত্র্যে তৎকালীন সভ্যতার ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়—যেমন খলিফার অনুচরবৃন্দের ছবিখানিতে (স্বতন্ত্র মুদ্রিত চিত্র দ্রষ্টব্য)।

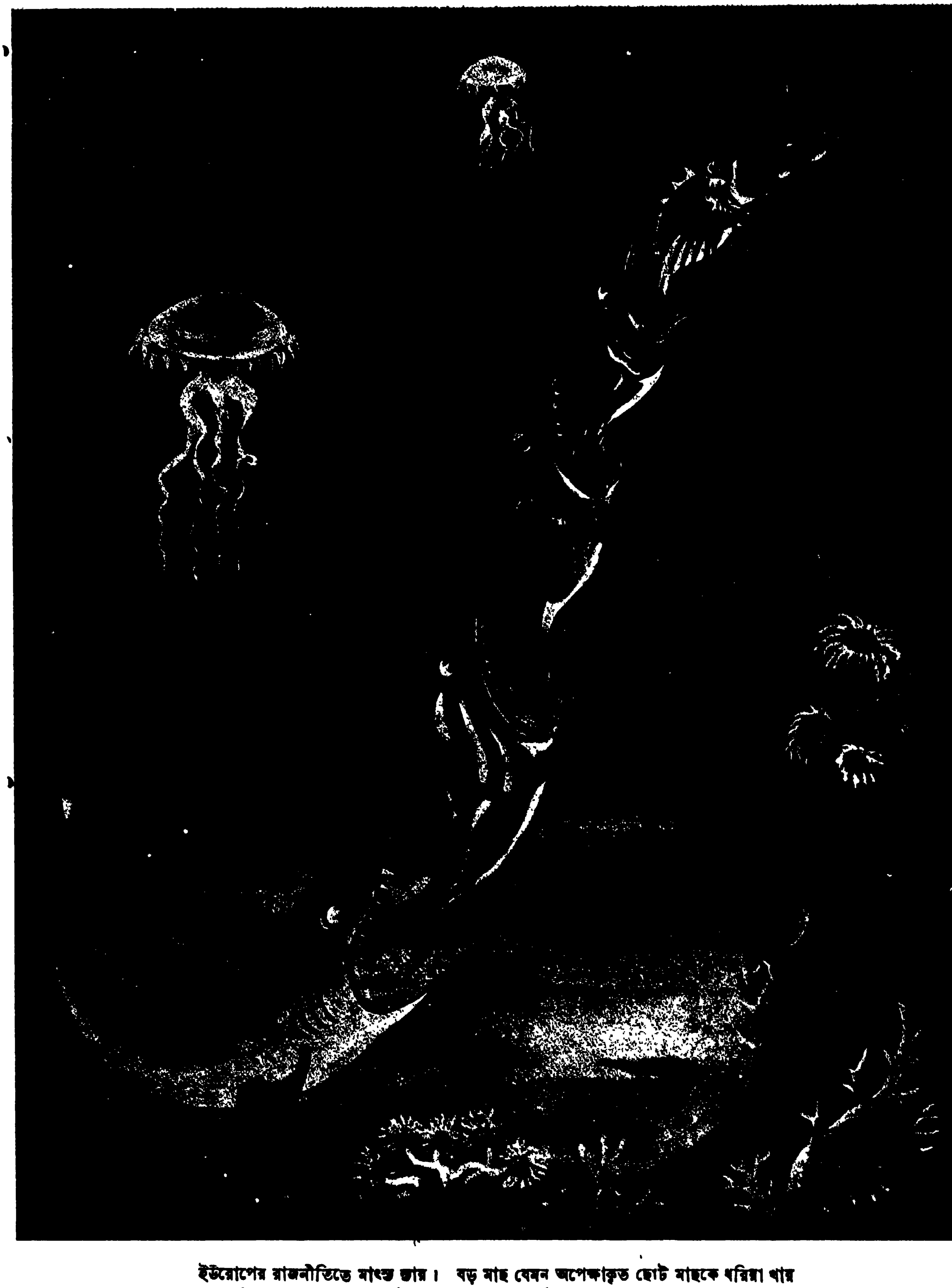
এই সময়কার অঙ্কিত প্রাণীচিত্রগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্যারিসে বিমান-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত দোকানের শার্সিগুলিতে কাপড় আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে ও অন্তরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করানো হইয়াছে।



বিমান-আক্রমণ-আশঙ্কায় লুভর্ মিউজিয়মের মূল্যবান চিত্রাদি নিরাপদ স্থানে সরানো হইতেছে



ইউরোপের রাজনীতিতে মাৎস্য ন্যায়। বড় মাছ যেমন অপেক্ষাকৃত ছোট মাছকে ধরিয়া খায় ইউরোপে তেমনি বড় রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত ছোট রাষ্ট্রকে গ্রাস করিয়া চলিয়াছে।

দেশ-বিদেশের কথা

আড়াই মাসের ফল

শ্রীগোপাল হালদার

প্রায় আড়াই মাস যুদ্ধ চলিবার পরেও যে প্রশ্নটি অনেকেই করেন তাহা এই—"যুদ্ধ কবে আরম্ভ হইবে?" ইহার কারণ যুদ্ধ বলিতে আমরা যে মৃত্যুযজ্ঞের বিভীষিকা এত দিন দেখিয়াছি, এখনো তাহা সত্যই প্রকাশ পায় নাই, খানিকটা তাহার রূপ দেখা গিয়াছে ওয়ারস'তে—সে-শহরটি নাকি অন্তত কিছুকালের মত মানুষের দৃষ্টি হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু একালের যুদ্ধ শুধু অস্ত্রমুখে রণক্ষেত্রে হয় না, সৈন্যের বলপরীক্ষায় তাহার শেষ নয়—এ-যুগের যুদ্ধ "সামগ্রিক" (totalitarian)।

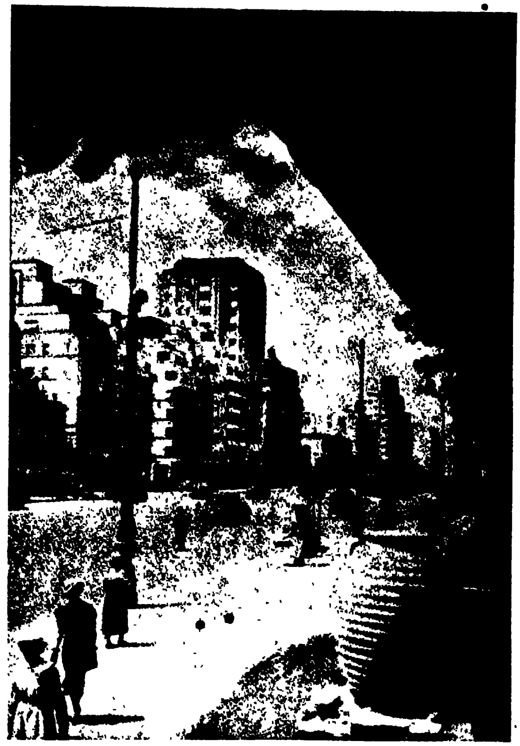
"সামগ্রিক যুদ্ধ"

"সামগ্রিক যুদ্ধে" দেশের সমগ্র জন-সমষ্টিই নিজেদের আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক, সমগ্র প্রচেষ্টার দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনা করে—



রুমানিয়ার রাজা ক্যারল ও রুমানিয়ার যুবরাজ

দেশ বলিতে যাহা কিছু বুঝায়,—তাহার যত জন-সম্পদ ও তাহার যত ধন-সম্পদ,—সবই এই শক্তি পরীক্ষায় নিয়োজিত হয়।



বুকারেষ্টের রাজপথ

তাই, একালের "সামগ্রিক যুদ্ধে" যোদ্ধা শুধু সৈনিকেরা নয়, যোদ্ধা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা; যুদ্ধক্ষেত্র শুধু সৈন্য-সংঘর্ষের সীমাবদ্ধ ভূমিস্থল নয়, তাহা সমগ্রদেশে বিস্তৃত—তাহার নগর, জনপদ, কলকারখানা, সবই যুদ্ধক্ষেত্র; শুধু তাহা নয়, তাহার সমুদ্রপথ, তাহার আকাশপথও উহার অন্তর্গত। অতএব, যুদ্ধলিপ্ত জাতির কেহই যেমন অ-সামরিক (civil) বলিয়া নিস্তার পাইবে না, কিছুই যেমন অ-রক্ষিত (unfortified) বলিয়া গণ্য হইবে না, তেমনি আক্রমণ যে কখন কোথায় দেখা দিবে তাহার নিশ্চয়তাও নাই। তাই, পোল্যাণ্ডের পালা শেষ হইতেই পশ্চিমপ্রান্তে যখন বলপরীক্ষা সমাসন্ন মনে হইতেছিল



রুমানিয়ার তেলের খনি। এই সকল তেলের খনির উপর অনেক দেশের দৃষ্টি আছে।

তখন হঠাৎ উত্তর স্কট্‌লণ্ডের সুরক্ষিত নৌ-ঘাঁটি "স্কাপা ফ্লো"তে ব্রিটিশ রণতরী "রয়েল্‌ ওক্‌" জার্মান ডুবো-জাহাজের টর্পেডো-আঘাতে আট শত নৌ-সৈন্য লইয়া ডুবিয়া গেল ; ফার্থ অব্‌ ফোর্থ ও এডিনবরার উপর জার্মান বোমারু বিমানের আবির্ভাব হইল।

যুদ্ধের বর্ত্তমান প্ল্যান

পশ্চিম সীমান্তে এক দিনের প্রচণ্ড আক্রমণের পরে আবার গতানুগতিক যুদ্ধ চলিয়াছে, ম্যাজিনো ও সিগ্‌ফ্রিড্‌ দুই ক্ষেত্রই অক্ষুণ্ণ। বরং সুইট্‌সারল্যাণ্ডের নিকটে বাস্‌লেতে এবং বেল্‌জিয়াম্‌ ও হল্যাণ্ডের সীমায় জার্মান-বাহিনীর যেরূপ বিপুল সমাবেশ হইতেছে তাহাতে মনে হয় সরাসরি ম্যাজিনো-ক্ষেত্র ভেদ করিবার চেষ্টা না করিয়া জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষগণ বরং আবার এই সব নিরপেক্ষ দেশের নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য করিবে, একেবারে ম্যাজিনো-ক্ষেত্রের পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণ দুই দিক হইতে সমুপস্থিত হইতে চেষ্টা করিবে, এবং এইরূপে মিত্র-শক্তিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিতে চাহিবে। আর ততক্ষণে বেলজিয়াম্‌ ও হল্যাণ্ডের উপকূল হইতে চেষ্টা চলিবে, জলে জার্মান ডুবো-জাহাজ আর আকাশে জার্মান যুদ্ধ-বিমান ব্রিটেনের ধনজন বিনষ্ট করিয়া তাহার সমগ্র জীবনধারা যাহাতে অচল করিয়া তুলিতে পারে। অবশ্য যুদ্ধের এই অদূর প্ল্যানটিই যে কার্য্যত প্রযুক্ত হইবে, এমনও না হইতে পারে—শীতকালের বরফ ও বৃষ্টিতে পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ ঠেকিয়া আছে ; জলপথে ও আকাশপথে নিরপেক্ষদের ঘাঁটিগুলি এত সহজে করায়ত্ত হইবে কিরূপে ? ক্ষুদ্র সুইট্‌সারল্যাণ্ড ও বেল্‌জিয়াম্‌ যুদ্ধ করিয়াই মরিতে চাহিবে, হল্যাণ্ডও সমুদ্রের বাঁধ কাটিয়া জার্মান-বাহিনীর যাত্রাপথ দুর্গম করিয়া তুলিবে। তাহা ছাড়া, অর্থনীতি ও কূটনীতির উপরও যুদ্ধের ভাগ্য নির্ভর করে। বিবিধ দেশের কূটনৈতিক প্রয়াসে জার্মানির কি অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহা বলা যায় না। জার্মান অর্থনীতি কতটা জার্মানির নূতন 'কন্‌টিনেণ্টাল সিষ্টেমে' সুনিবদ্ধ হইবে, তাহাও অনিশ্চিত।

জার্মান জয়

আড়াই মাসে যুদ্ধের ভাগ্য স্থির হয় না। কিন্তু জয়-পরাজয়ের হিসাব লইলে এখন পর্য্যন্ত জার্মানির পক্ষে উল্লসিত হওয়ার কারণ নাই। হিটলার চাহিয়াছিলেন পোল্যাণ্ডের পতনের পরেই যুদ্ধ থামুক, কিন্তু ব্রিটেন ফ্রান্স তাহাতে অস্বীকৃত হইল—পোল্যাণ্ডের পরাজয় তাহারা মানিতে চাহে না, আর মানিতে চাহে না হিটলারের কোনো কথাই। কারণ তাঁহার কথার বিশ্বাস নাই। অতএব জার্মান রাষ্ট্রে হিটলার ও হিটলারী নীতির অবসান না ঘটিলে তাহারা যুদ্ধ থামাইবে না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত হিটলারেরই বা যুদ্ধে কি লাভ হইয়াছে ? তাহার সুবিধার বিষয়গুলি সম্বন্ধেই প্রথমে হিসাব লওয়া চলে—প্রথমতঃ, যুদ্ধে পোল্যাণ্ডের এক ভাগ তাহার করতলগত হইয়াছে,—ডানৎসিগ ও করিডর মাত্র তিনি চাহিয়াছিলেন,

পাইলেন অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ, এখনো তাঁহার সামরিক সুবিধা অক্ষুণ্ণ আছে, জার্মান-বাহিনী অটুট; তাহা আজ পূর্ব-সীমান্ত ছাড়িয়া একটি দিকে; পশ্চিম-সীমান্তে, কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হওয়ায়, জার্মানির এক অভাবনীয় সমর-সুযোগ ঘটিয়াছে—কোনো দিন জার্মানি এমন সুযোগ আর পায় নাই। জার্মান যুদ্ধ-বিমান যতই ভূপাতিত হউক, এখনো প্রবল। জার্মান ডুবো-জাহাজ ডুবিয়া যতটা ক্ষতি হোক্, 'ক্যরেজিয়াস' ও 'রয়েল ওকের' মতো জাহাজ ডুবাইয়া নিজেদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে যথেষ্ট। তাহা ছাড়া, 'এডমিরাল শীর' ও 'ডয়েটশল্যাণ্ট' নামক যুদ্ধ জাহাজদ্বয়ের সাহস ও বিচক্ষণতায় অ্যাটলাণ্টিকের ব্রিটিশ বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং উত্তর-সমুদ্রে জার্মান ডুবো জাহাজের কার্য্যদক্ষতায় এখনো স্কাণ্ডিনেভীয় দেশগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্রিটেনের বাণিজ্যগণ্ডীর মধ্যে গিয়া পড়ে নাই। তৃতীয়তঃ, জার্মান অর্থনীতি এখনো সুদৃঢ়—যুদ্ধকালীন অভাব ঘটিতেছে বটে, কিন্তু এবার এখনো জার্মান গৃহাবদ্ধ (blockaded) হয় নাই, বিশেষ করিয়া রুশিয়ার সহিত ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা থাকায় তৈল ও খনিজ দ্রব্যের অভাব তাহার ঘটিবে না; ইতালির নিরপেক্ষতাও এইদিকে তাহার পক্ষে সহায়ক হইবে, আর স্কাণ্ডিনেভীয় দেশগুলিকে যদি সে হুমকির দ্বারা তাহার বাণিজ্য-গণ্ডীতে আবদ্ধ করিতে পারে তাহা হইলে ইউরোপে এই 'কন্‌টিনেন্‌টাল সিষ্টেমে' ব্রিটেনই একঘরে হইবে। চতুর্থত, কূটনীতিতে জার্মানির সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিজয়—রুশিয়ার সহানুভূতি লাভ—ইহারই ফলে জার্মান-বাহিনী এই পূর্বদিকের সীমানায় আটকাইয়া রহিল না, পশ্চিম দিকে একান্ত চেষ্টা করিতে পারিবে; আর জার্মান অর্থনৈতিক জীবনও যথেষ্ট পুষ্ট হইতে পারিল। মোটের উপর, ইহাই জার্মানির সুবিধার দিক।

জার্মান পরাজয়

জার্মান পরাজয়ের হিসাব লইলে দেখি, প্রথমত, হিটলারের জার্মানির চিরদিনের স্বপ্ন বৃহত্তর জার্মানির পূর্ব-ইউরোপে অভিযান, আজ সে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। রুশিয়ার হাতে সে পূর্ব-ইউরোপ তুলিয়া দিয়া রুশ-সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। তাই, অর্দ্ধেক পোল্যাণ্ড জার্মানীর হস্তচ্যুত হইয়া

রুশিয়ার হস্তগত হইয়াছে, সেখানে সোভিয়েট শাসন চলিতেছে! পূর্ব-বালটিক সমুদ্রের তীরে এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়ায় যে নাৎসী-অনুগত শাসন ছিল তাহার স্থলে আজ সোভিয়েট-অনুগত শাসন স্থাপিত হইয়াছে। ৬০ হাজার সোভিয়েট সৈন্য সেখানে উপস্থিত, সোভিয়েট বিমান ও সোভিয়েট যুদ্ধ-জাহাজও পূর্ব-বাল্‌টিক সমুদ্রে এই সোভিয়েট প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। একমাত্র এই পথে এখনো রুশিয়ার বাধা—ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ড। কিন্তু অনেকটা হার মানিয়াই সেও এই যাত্রার মত হয়ত মান বাঁচাইবে। অন্যদিকে বল্‌কানের জার্মান আধিপত্য, দানিয়ুবের তীরে জার্মান প্রাতষ্ঠার সম্ভাবনা, নিকট-প্রাচ্যে জার্মান অভ্যুদয়ের চির-স্বপ্ন, সবই এইরূপে জার্মানিকে ইতিমধ্যে সোভিয়েটের নিকট বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। বল্‌কান অঞ্চলে যাত্রাপথ সোভিয়েটের হাতে, সেখানেও সোভিয়েট আজ জার্মানির স্থলাভি-বিক্ত—হাঙ্গারি, রুমানিয়া ও কৃষ্ণ সমুদ্র ছুঁইয়া তাহার রাজ্য বিস্তৃত। দ্বিতীয় দফা জার্মানির পরাজয়—সামরিক; আজ নবরাজ্য-সীমানায় রুশ-বাহিনী; তাহার রাজ্যমধ্যে পদদলিত চেক-জাতির ধূমায়মান অসন্তোষ;—তাহার সমস্ত সৈন্য কি এখন পশ্চিম-সীমান্তে আবদ্ধ রাখা সম্ভব? আর, তাহার ক্ষুদ্র নৌ-বলের এক-তৃতীয়াংশ ডুবো-জাহাজ ইতিমধ্যেই সে হারাইয়াছে, এক-একটি বিমান-অভিযানে তেমনি এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধবিমান বিসর্জন দিতে হয়;—তাহা হইলে আর তাহার আকাশ-প্রাধান্য কি অক্ষুণ্ণ আছে, না থাকিবে? তৃতীয় দফায় জার্মান অর্থনীতির কথা। সে অর্থনীতি বহুদিন হইতেই অদ্ভুত বনিয়াদের উপর স্থাপিত। সোনার অভাবে জার্মানির বৈদেশিক বাণিজ্য, দ্রব্যের জন্য দ্রব্যের বিনিময় (barter) করিয়া ব্যবসা চালাইতেছিল, দেশমধ্যে যুদ্ধশিল্পের তাড়নায় তাহার শিল্পবাণিজ্য ফাঁপিয়া উঠিতেছিল, অথচ অন্যান্য ব্যবহার্য্য শিল্পজাতের মত যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয় করিবার জন্য নয়, জমাইবার জন্য, তাহা শেষ হইয়া যায়। সাধারণ শিল্পজাত বিক্রয়ের টাকা ঘুরিয়া আসিয়া আবার সেই শিল্পেরই নূতন উৎপাদনে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু যুদ্ধশিল্পে তাহা হয় না। তাই, এই কারণে এই শিল্পে যে টাকার অভাব পড়ে তাহা মিটাইবার উপায়—হয়

নোট-চালানো (inflation), নয় নূতন ট্যাক্স (.taxation)। গত মার্চ মাসে এই সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিলে জার্মান অর্থনীতির যাদুকর হের শেখ্‌ট্‌ কার্য্য ত্যাগ করেন—তবু নোট বাড়াইতে চাহিলেন না। আজ, যখন নিরপেক্ষ দেশের নিকট হইতে জার্মানি প্রাণধারণের জন্ত জিনিষ কিনিতে চাহিবে তখন কি তাহার দ্রব্য-বিনিময়ের ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে, না হইলে তাহার সোনা আসিবে কোথা হইতে ? আর, নোটের স্তূপের উপরে গড়া তাহার আভ্যন্তরীণ শিল্প-জীবনই বা টিকিবে কিরূপে ? এই জার্মান অর্থনীতি কতদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে—তাহাই এখন দ্রষ্টব্য। তাহা ছাড়া, জার্মান বাণিজ্য একমাত্র উত্তর-সমুদ্রে ও স্থলপথে ছাড়া আজ অচল। চতুর্থত—কূটনীতিতে জার্মানির পরাজয়। রুশিয়ার সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপনে সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু পোল্যাণ্ডে, বাল্‌টিকে, বল্‌কানে তাহার যে পরাজয় ঘটিয়াছে তাহার সীমা নাই। অথচ সোভিয়েট সামরিক সাহায্য করিবে না, অধিকন্তু, এই কারণে সাম্যবাদবিরোধী চক্রের জাপান জার্মানির নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে, নূতন আবে-মন্ত্রিপরিষদ্‌ তাহা গোপন করিতে চাহে না। ফলে ব্রিটেন এশিয়ায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে। আবার ইতালিও জার্মান-সোভিয়েট বন্ধুত্বে যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছে—ইতালির মন্ত্রিপরিষদ হইতে জার্মান-বন্ধুদের বিদায়ে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ফলে, ভূমধ্যসাগরে এখন জার্মানিই বাহির হইতে পারে না, অথচ, ফ্রান্স ব্রিটেন অবাধে বিচরণ করে। অধিকন্তু, তুর্করা সম্প্রতি সোভিয়েট উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ব্রিটিশ-ফরাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর বন্ধন স্থাপন করিল। ইহাতে নিকট-প্রাচ্যে ব্রিটিশ প্রভাব বর্দ্ধিত হইবে ; ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান লইয়া যে প্রাচ্য-গোষ্ঠী রচিত হইতেছে তাহাতে ব্রিটেনের আর কোনো আশঙ্কার কারণ রহিল না। অন্ত দিকে তুর্কীরা দার্দ্দানালিজের প্রণালীপথ ব্রিটিশ রণতরীর জন্ত মুক্ত রাখায় রুমানিয়া এবং গ্রীসও ব্রিটিশ সহায়তা পাইবে। তাই, বল্‌কান অঞ্চলেও ব্রিটিশ প্রভাব বাড়িতেছে, অবশ্য হাঙ্গারি, বুল্‌গেরিয়া, যুগোস্লাভিয়াকে লইয়া ইতালীয় নেতৃত্বই সেখানে এখনো বেশি শক্তিশালী। বর্তমান তুর্ক-ব্রিটিশ ঘনিষ্ঠতা তাই তাহাদের ও সোভিয়েটের চোখে সমানই ক্ষতিকর। আর জার্মানির ইহাতে কি ক্ষতি, পূর্ব্বেই আমরা তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু, জার্মান কূটনীতির নূতন পরাজয় ঘটিয়াছে—আমেরিকার নিরপেক্ষতা-নীতি সংশোধন করিয়া যুদ্ধরতদের অস্ত্রবিক্রয়ে স্বীকৃত



রুমানিয়ার বৃহৎ কলকারখানা

হওয়ায়। ইহার ফলে, যে-শক্তির টাকা আছে, ও যাহার পক্ষে সমুদ্রপথে গতায়াত সহজসাধ্য, সে-ই মার্কিন যুদ্ধাস্ত্র রাশি রাশি কিনিবে—অর্থাৎ জার্মানি বঞ্চিত হইবে। ব্রিটেন ফ্রান্স এখনি হাজার হাজার যুদ্ধ-বিমানের ফরমায়েস দিয়াছে। মোটামুটি, এই হইল জার্মান পরাজয়ের হিসাব।

জয় কাহার ?

আড়াই মাসের এই জয়-পরাজয়ের হিসাবে যাহার সর্ব্বাপেক্ষা লাভ দেখা যায়—প্রকৃত পক্ষে এবারকার যুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত যাহার সম্বন্ধে প্রত্যেকটি সংবাদই সাধারণ মানুষের নিকট চমকপ্রদ হইয়াছে—সে সোভিয়েট রুশিয়া। 'জাতিসঙ্ঘে' বহুদিন পর্য্যন্ত রুশিয়া গণতান্ত্রিক শক্তিদের সৌহার্দ্দ্যের অপেক্ষা করিয়াছিল, মিউনিখে অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াও স্থির রহিয়াছে; তার পর সে আপনার বাস্তব কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিল নাৎসী-বুঝাপড়ার চেষ্টায়। এক দিনে ইউরোপের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইল। সে পরিবর্ত্তন কত বড়—তাহা আজ বল্‌কানে, বাল্‌টিকে, পোল্যাণ্ডে সুস্পষ্ট। চমকিত গণশক্তি এবার যখন তাহার কদর বুঝিতে সুরু করিয়াছে তখন শুভ-সুযোগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—জার্মানিই আপাতত নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইতেছে।

অথচ সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতিই নীতির দিক হইতে এক চুলও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যাঁহারা গত মার্চ মাসের অষ্টাদশ সোভিয়েট কংগ্রেসে ষ্টালিন-ব্যাখ্যাত এই নীতি স্মরণ রাখিয়াছেন তাঁহারা বেশ জানেন যে, তখনি নাৎসীদের রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের কথা ষ্টালিন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায়—এ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সাম্রাজ্যলোভীদের মধ্যেই বাধিবে। তাঁহার মতে, সোভিয়েটের চক্ষে দুই পক্ষই মূলত ধনতান্ত্রিক ও সমতুল্য। তাহার নীতি শান্তি, শক্তি-সঞ্চয়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন।

সম্প্রতি ভিমিট্রিয়েভ ও মলোটোভ এই কথাটিই আবার পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান যুদ্ধে সোভিয়েট নীতি কি হইবে তাহা বুঝা দুঃসাধ্য নয়—দুই বিবদমান



চীনের য়ুনান প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে রেলপথ নির্ম্মাণ



শাখোয়ান, য়ুনান-প্রদেশের প্রধান নগরী কুনমিঙের ২৬০ মাইল পশ্চিমে। সম্প্রতি নির্ম্মিত য়ুনান-ব্রহ্ম পথ এইখান হইতেই প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইয়াছে।



মাংশি, ব্রহ্মসীমান্তের ৮০ মাইল দূরে। এইখানেই চীন ও ব্রহ্মদেশ মিলিত হইয়াছে। শান রমণীগণ কৃষিজ দ্রব্যাদি মাংশির বাজারে লইয়া যাইতেছে।



চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে পথনির্ম্মাণের সময় পার্ব্বত্য পথ পরিষ্কার করা হইতেছে।

জাতির বিবাদের সুযোগে নিজের শিল্প-শক্তি ও সজ্ঞ-শক্তি বৃদ্ধি করা; কাহাকেও সহজে বিজয়ী হইতে সাহায্য না করা। যেন সুদীর্ঘ যুদ্ধে সকলে হৃতবল হইলে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই, জার্মানিকে রুশিয়া সৈন্য-সাহায্য করিবে না, দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া খাড়া রাখবে,—তার পর যেদিন বার্লিনে অবশেষে বিপ্লবের আগুন জ্বলিবে? মধ্যইয়ুরোপে তখন সাম্যবাদ পদার্পণ করিবে।

বর্ত্তমানে যাঁহারা মনে করেন ষ্টালিন সাম্যবাদ বিস্মৃত হইয়াছেন, কিম্বা বর্ত্তমান রুশ-বিজয় চিরন্তন রুশীয় সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর, কিম্বা ষ্টালিনের অভিযান বিপ্লব-বিরোধী নেপোলিয়নিজ্‌ম্ বা দিগ্বিজয়ের সূচনামাত্র—তাহাদের সেই নীতি, সাম্যবাদের বিপ্লবাত্মক আদর্শ ও সাম্যবাদীর বাস্তব-নিষ্ঠা মনে রাখা দরকার।

পূর্ব্ব-ইউরোপের নব-সঞ্চিত রক্তমেঘ মধ্য-ইউরোপেও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে—ইহাই সাম্যবাদী সোভিয়েটের আশা।



কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়ে মন্তেসরি-বিভাগ। শিশুরা জলযোগের আয়োজন করিতেছে।



কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়ে মন্তেসরি-বিভাগ। "শিশুশিক্ষা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পুস্তক পরিচয়

সৈনিক বাঙালী—[49th Regiment] ১৯১৬-১৯২০। সুবেদার শ্রীযুক্ত মন বাহাদুর সিংহ প্রণীত। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲। গ্রন্থকারের ঠিকানা ১ ডি, প্রিয়নাথ ব্যানার্জি ষ্ট্রীট, গড়পার রোড, কলিকাতা। মোটা বোর্ডে বাঁধান। পৃষ্ঠার সংখ্যা ১৫৪। তদ্ভিন্ন ইহাতে স্বতন্ত্র মুদ্রিত নিম্নলিখিত ছবিগুলি আছে :—

কলেজ স্কোয়ারে পরলোকগত বাঙালী সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ, পল্টন গঠনে অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক, বেঙ্গলী ডাবল কম্প্যানী, বেঙ্গলী ডাবল কম্প্যানীর ব্রিটিশ ও ভারতীয় অফিসার ও এন. সি. ও. গণ, বেঙ্গলী ডাবল কম্প্যানীর একটি সেক্শনের বেয়নেট প্র্যাক্টিস্, বেঙ্গলী ডাবল কম্প্যানীর একটি সেক্শনের মাস্কেট্রী ড্রিল, মহিলা কমীটি, ৪৯ সংখ্যক বেঙ্গলী রেজিমেন্টের কতিপয় ব্রিটিশ অফিসার, মেসোপোটেমিয়ার ৪৯ সংখ্যক বেঙ্গলী রেজিমেন্ট ক্যাম্পের একটি অংশ, মেসোপোটেমিয়ার বেঙ্গলী রেজিমেন্টের ভারতীয় অফিসারগণের এক অংশ, বেঙ্গলী রেজিমেন্টের লুইসগান্ সেক্শনের এক অংশ, মেসোপোটেমিয়ায় বেঙ্গলী রেজিমেন্টের সৈন্যদলের এক অংশ, বেঙ্গলী রেজিমেন্টের ভারতীয় অফিসারগণের এক অংশ, লেখক সুবেদার মন বাহাদুর সিংহ।

স্বতন্ত্রমুদ্রিতচিত্রবিশিষ্ট প্রত্যেক বহিতে চিত্রসূচী থাকা উচিত। এই বহিতে তাহা না থাকায় পাতাগুলি সব উল্টাইয়া উপরের তালিকাটি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। সচিত্র বহির কোনখানিতে যদি ভ্রমক্রমে কোন ছবি সন্নিবিষ্ট না হইয়া থাকে, চিত্রসূচীর অভাবে ক্রেতা সেই ভ্রম ও অভাব ধরিতে পারেন না।

পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল।

মানুষ যদি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সকল অবস্থায় অহিংস থাকিয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারে, তাহা অবশ্যই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মানব-সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধ না করিয়া যে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা যায়, হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করা যায়, স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়, এবং অন্য কোন কোন অবস্থাতে বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে মান ইজ্জৎ প্রভৃতি রক্ষা করা যায়, তাহা এখনও কার্য্যতঃ প্রমাণিত হয় নাই; তদ্ভিন্ন, ভীরুতা বা তদ্বিধ অন্য কারণে যে ব্যক্তি হিংসায় অসমর্থ, তাহার অহিংসতা অর্থহীন ও মূল্যহীন। এই জন্য সকল দেশের সকল জাতিরই যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য ও শিক্ষা থাকা আবশ্যক। গত মহাযুদ্ধে সাত হাজারের উপর বাঙালী যুদ্ধে যোগ দিয়া শুধু অতীত কালে নহে, বর্ত্তমানেও যে যুদ্ধ করিতে শিখিতে পারে এবং সাহস ও দক্ষতার জন্য প্রশংসিত হইতে পারে, তাহা কার্য্যতঃ দেখাইয়াছিলেন। এই বহিখানি পড়িলে তাহা বুঝা যায়। ইহা প্রত্যেক পঠনক্ষম বাঙালীর পড়া উচিত। বর্ত্তমানে ইহার প্রকাশ খুব সময়োচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মসাধনে শরীর, ধর্ম্মসাধনের স্থান ও আবেষ্টন, ধর্ম্মজীবনের রথে মন সারথী, পান-আহারে সংযম ও শুদ্ধাচার, রসনা-সংযম বাক্-সংযম—শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত। ২১০-৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই পুস্তিকাগুলি সাধনার সহায়রূপে অধ্যয়নের যোগ্য। অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বলিতেছি।

ড.

সমাজ-বিজ্ঞান (প্রথম ভাগ)। চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

"আন্তর্জাতিক বঙ্গ" ও "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ" নামে দুটি সমিতির আলোচনা থেকে বইখানির উৎপত্তি। আলোচনার বিবরণ নেই, কেবল রচনাই আছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার দুটি সমিতিরই কর্ণধার। তাঁর উৎসাহ, বিজ্ঞাপনের ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য সর্ব্বজনবিদিত। যদিও তিনি নিজে এই বইখানির সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন নি, তবুও এর দোষের ভাগ তাঁর উপরই খানিকটা পড়তে বাধ্য। প্রকাশক লিখেছেন যে লেখকবৃন্দ প্রুফ পর্য্যন্ত দেখতে পারেন নি, অতএব পাঠক-বৃন্দ যেন ক্ষমা করেন। কিন্তু দোষটি অমার্জ্জনীয়, কারণ এই প্রকার দায়িত্বহীনতার জন্য বাঙালী-পাণ্ডিত্যের এবং তার চেয়েও বেশী সমাজতত্ত্ব নামে নতুন বিজ্ঞানের সমূহ ক্ষতি হয়।

এবং তাই হয়েছে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, হুমায়ুন কবীর, বাগেশ্বর দাশ ও বিনয়কুমারের দু-তিনটি লেখা ছাড়া অধিকাংশই অ-বৈজ্ঞানিক। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। "সমাজ বিজ্ঞান কি?" প্রবন্ধটি প্রায় ১৩ পৃষ্ঠার, তার মধ্যে প্রথম দেড় পৃষ্ঠায় সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয় নির্ণীত হয়েছে, আর বাকী সাড়ে এগার পাতা ভরে পরিষদের আলোচনার বিষয়ের তালিকা। তালিকার স্থান, যদি থাকে, পুস্তকের শেষে। তার সাহায্যে পরিষদের বিজ্ঞাপন হয়, জিজ্ঞাসুর সুবিধা হয় না।

বইখানির গুণের মধ্যে খবর ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আগ্রহ, এবং দোষের মধ্যে অযথা তথ্য-সমাবেশ এবং যতটা ভার সয় তার অনেক বেশী সাধারণ-সিদ্ধান্তের অদ্ভুত ভাষায় প্রকাশ প্রথমেই চোখে পড়ে। এর বেশী লিখতে গেলেই সমালোচনা দীর্ঘ ও রূঢ় হবে। আশা করি এক জন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির হাতে দ্বিতীয় ভাগের সম্পাদনা ন্যস্ত হবে।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

উপনিষদ্ রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা—শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ। শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উপনিষদ্ রহস্য-কার্য্যালয়, কৌড়ার বাগান, হাওড়া হইতে প্রকাশিত; তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

গীতার তত্ত্ব সনাতন এবং সার্ব্বজনীন। সেই জন্য বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সাধক নিজ অনুভূতির ভিন্নতা অনুসারে গীতার বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণও এই গ্রন্থে নিজভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার নাম যৌগিক ব্যাখ্যা, কিন্তু ইহা যোগদর্শনের অনুগত ব্যাখ্যা নহে। কেহ কেহ বলেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে

তাহার সম্পূর্ণ রূপক মাত্র এবং কৃষ্ণ অর্জুন ও গীতার উল্লিখিত অন্যান্য ব্যক্তিগণের নাম পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং জীবের অন্যান্য মানসিক বৃত্তির প্রতিরূপ মাত্র। গ্রন্থকারও এই মতই পোষণ করেন; এই মতই তাঁহার মত "জীবকে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিতে যে জ্ঞান-পথের মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহাই গীতা।" এই ভাব সম্মুখে রাখিয়া গ্রন্থকার গীতার আদ্যন্ত যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব। ইহা গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রমাণ। গ্রন্থকারের মতের আলোচনা এস্থলে সম্ভব নহে। তবে যাঁহারা গ্রন্থকারের ব্যাখ্যার সহিত একমত হইবেন না তাঁহারাও ইহা পাঠে তৃপ্তিলাভ করিবেন, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায়।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

চম্পা ও পাটল—প্রিয়ম্বদা দেবী। ৪৬, ঝাউতলা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রসন্নময়ী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত।

বাংলা কবিতা পড়িবার উৎসাহ এবং আগ্রহ যাঁহাদের আছে তাঁহাদের নিকট প্রিয়ম্বদা দেবীর নাম সুপরিচিত। যাঁহারা কাব্যামোদী নহেন তাঁহাদের নিকট প্রিয়ম্বদা দেবী কেন কোনও সুকবির পরিচয় দিতে যাওয়াই পণ্ডশ্রম। কবির এই ক্ষুদ্র অথচ শোভন গ্রন্থখানির দুইটি ভাগ। 'চম্পা' অংশে ষোলটি এবং 'পাটল' অংশে প্রায় পঁচিশটি কবিতা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অলঙ্কার-বাহুল্যবর্জ্জিত সহজ ছন্দের এই নাতিদীর্ঘ কবিতাগুলির তুলনা শেষ-বসন্তের চম্পকের সহিতই করিতে হয়। সৌরভের উগ্রতা ম্লান হইয়াছে অথচ মধুকোষ আপনার ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতা হারায় নাই, এই কবিতাগুলি সেইরূপ পুষ্পেরই সগোত্র। বিশিষ্ট কোন নামের বন্ধনে অধিকাংশ কবিতাকেই বাঁধিবার চেষ্টা না থাকিলেও, তাহাদের রসের নির্দ্দিষ্ট আবেদন কোথাও ব্যর্থ হয় নাই।

জীবনের চরম বেদনাগুলিকে রসের এক অপরূপ রসায়নে বিগলিত করিয়া কবি তাঁহার কাব্যে তাহাদের এমন নিবিড় করিয়া মিশাইয়া দিয়াছেন যে প্রতিটি কবিতাই পাঠকের হৃদয়ে অশ্রুর আবেগের সহিত সৌন্দর্য্যের এক অলৌকিক অনুভূতি জাগাইয়া অভিভূত করিবার ক্ষমতা রাখে। তাবা তাঁহার মিথ্যা বলে নাই:

"তাই বলি অযাচিত আনন্দে ব্যথায়,
হিসাবের হয় নিক কোনো গরমিল—
অশ্রুর স্ফটিক মোর আলোকের মত অনাবিল।"

কয়েকটি কবিতায় হাসপাতালে থাকা কালে রোগক্লান্ত ব্যথাতুর জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির কিছু বর্ণনাও তিনি দিয়াছেন। তাহাতে আধুনিক কবিসুলভ সত্য-বর্ণনার অসুস্থ উগ্রতা নাই, কষ্টকল্পনার নির্জ্জীব দুর্ব্বলতারও লেশমাত্র চিহ্ন নাই। সত্য এবং কবিকল্পনার রসমিশ্রণে ভাষায় যাহা রূপ পাইয়াছে তাহার তুলনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

কবিতাগুলির ভাষার সহজ মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন গ্রন্থটির আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য: "প্রিয়ম্বদার অধিকার ছিল যে-সংস্কৃত বিদ্যায় সেই বিদ্যা আপন আভিজাত্য ঘোষণাচ্ছলে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা কোথাও অতিক্রম করে নি; তাকে একটি উজ্জ্বল শুচিতা দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে অন্যায়াসে গঙ্গা যেমন বাংলার বক্ষে এসে মিলেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে।"

জীবনের যে দুর্লভ অবসরে বহিঃপ্রকৃতির সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সহজে সাধিত হইয়া থাকে, যখন সাধারণ মানব-চিত্তও কবির ভাষার ভিতর আপনার হারা-ভাষা অন্বেষণ করিয়া ফেরে, এই কাব্যগ্রন্থটি রসিক পাঠকবর্গের সেই সকল নিভৃত লগ্নের অকৃত্রিম সাথী হইবার যথার্থই উপযোগী।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্রহ্মপ্রেমসুধাসিন্ধু বা আরাধনাবিমিশ্রিত প্রার্থনাবলী—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত। ২১৪ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা। ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট প্রণেতার নিকট প্রাপ্তব্য।

এই গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫টি প্রবন্ধবিশেষ আছে। ইহাদের কয়েকটির নাম, যথা—(১) নূতন ধরণে পুরাণ কথা, (১৬) জ্ঞানের প্রমাণ প্রেম, (২০) ভেদাভেদতত্ত্ব (৩২) জীবনের সার্থকতা, (৩৮) সমাধি, (৪১) অহেতুকী কৃপা, (৫১) ভেদাভেদ, (৫২) প্রেম সত্য, প্রেমপাত্রও সত্য, (৬১) মাতৃভাবে সিদ্ধি, (৭০) মিথ্যা ও সত্য আমি, (৭৪) প্রেমের আনন্দ, (৭৫) নিষ্ফল ও সফল কর্ম্ম, ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে "সমাধি" নামক প্রবন্ধের কিছু অংশ, যথা—"এই তুমি আমার আত্মা। এই আত্মত্বে আমি তোমার সঙ্গে এক। তোমার সঙ্গে এক বলেই আমি তোমাকে দেখতে পাচ্চি। তোমার দর্শন দিবার জন্যেই তুমি আমাকে এই নিভৃত স্থানে নিয়ে এসেছ। এখানে আর কেউ নেই। অন্ধকার ছাড়া আর কোন বস্তুও নেই। তুমি এই অন্ধকারের জ্ঞাতা এ'র আশ্রয়। এতে তোমার অখণ্ডত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, ভঙ্গ কচ্ছে না। তুমি এই অন্ধকার বোধরূপে প্রকাশ পাচ্ছ। এই বোধ আমার। এই বোধে তুমি আমি এক। কিন্তু এই একত্ব সত্ত্বেও 'তুমি' 'আমি'র ভেদ গেল না। আমি তোমাকে আমার আত্মারূপে জানছি। এমন স্পষ্টভাবে জানছি যে ভাবে আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জানতে পারি নি। তোমার এই অভেদ ভাবের ভিতর আমি অনির্ব্বচনীয় ভাবে ভিন্ন হয়ে আছি। * * * এখন তোমার অহেতুকী কৃপার শরণাপন্ন হই। আমার অন্তর বাহির অধিকার কর, আমাকে সমাধিস্থ করে আমার জীবন সার্থক কর, এই অশান্ত জীবনে তোমার শান্তির রাজ্য স্থাপন কর।" (৫।৪।৩৬)

এই গ্রন্থে এই ভাবেই অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি লিখিত। তত্ত্বভূষণ মহাশয় ১৯১৮ সাল হইতে এইরূপ প্রার্থনা সময় সময় লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী শান্তিময়ী দত্তার এই প্রবন্ধ পাঠে আগ্রহকে উপলক্ষ্য করিয়া তত্ত্বভূষণ মহাশয় এগুলি সাধারণকে উপহার দিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর "রাধা-প্রেমসুধাসিন্ধু" নামক গ্রন্থের নামানুকরণে ইহার নাম "ব্রহ্মপ্রেম সুধাসিন্ধু" রাখা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, বর্ত্তমান সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ বহুলরূপে পরিগৃহীত পাশ্চাত্য ভেদাভেদবাদ বা অনন্ত উন্নতিবাদ অনুসারে সাধকের উপাস্য তত্ত্ব এবং উপাসনাকালে উপাসকের অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত, তাহাই ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই বিষয়টি এতই মধুর ভাবে, এতই চিত্তাকর্ষ ভাবে মার্জিত কথোপকথনের ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, পাঠকালে পাঠকের গ্রন্থকারের ভাবে ভাবিত না হইয়া থাকিবার উপায় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সমন্বয়-চেষ্টায় মধ্যে অকপট সাধক তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের আজীবন দার্শনিক চিন্তার মনোহর মধুময় ফলের আস্বাদন করিতে যাঁহার ইচ্ছা হইবে, এ গ্রন্থ তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবে সন্দেহ নাই।

জীবজগৎ ও জগৎকারণ বিষয়ে ভারতীয় ভেদবাদী অথবা অভেদবাদীর, এমন কি, ভেদাভেদবাদীরও, দৃষ্টিতে এই আলোচ্য ভেদাভেদ-বাদের রসাস্বাদ সম্পূর্ণ তৃপ্তিপ্রদ না হইলেও ইহার নিজস্ব মাধুর্য্য যে, পাঠকমাত্রেরই চিত্ত বিমোহিত করিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। আজ-কাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজে দার্শনিক চিন্তায় বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাব দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, এ সময় এ গ্রন্থ যে তাদৃশ অনেকেরই তর্ক-কর্কশ প্রাণে শান্তিবারি সেচন করিবে তাহা সুনিশ্চিত।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ



নীল কমল

শ্রীনীরদ মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৯শ ভাগ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৪৬ | ৩য় সংখ্যা

জয়ধ্বনি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাবার সময় হোলে জীবনের সব কথা সেরে
শেষ বাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে যাব মোর অদৃষ্টেরে।
বলে যাব, পরমক্ষণের আশীর্বাদ
বার বার আনিয়াছে বিস্ময়ের অপূর্ব আস্বাদ।
যাহা রুগ্ন, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনাছলে
তাহারে করি না অস্বীকার।
বলি বার বার
পতন হয়েছে যাত্রাপথে
ভগ্ন মনোরথে
বারেবারে পাপ
ললাটে লেপিয়া গেছে কলঙ্কের ছাপ;
বার বার আত্মপরাভব কত
দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড করি নত;
কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে
দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে।

মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটি নি করিতে প্রতিকার,
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।
অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারে নি বিদ্রূপ করিবারে,
যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি॥

শ্যামলী
২৬।১১।৩৯



নামকরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেয়ালের ঘেরে যারা
গৃহকে করেছে কারা,
ঘর হতে আঙিনা বিদেশ,
গুরুভজা বাঁধা বুলি
যাদের পরায় ঠুলি
মেনে চলে ব্যর্থ নিদেশ,
যাহা কিছু আজগুবি
বিশ্বাস করে খুবই,
সত্য যাদের কাছে হেঁয়ালি,
সামান্য ছুতোনাতা
সকলি পাথরে গাঁথা,
তাহাদেরি বলা চলে দেয়ালী।

আলো যার মিটমিটে,
স্বভাবটা খিট্‌খিটে,
বড়োকে করিতে চায় ছোটো,
সব ছবি ভুষো মেজে
কালো ক'রে নিজেকে যে
মনে করে ওস্তাদ পোটো,
বিধাতার অভিশাপে
ঘুরে মরে ঝোপেঝাপে
স্বভাবটা যার বদখেয়ালি,
খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ করে মিছে,
সব তাতে দাঁত খিঁচে,
তারে নাম দিব খ্যাকশেয়ালি।

দিনখাটুনির শেষে
বৈকালে ঘরে এসে
আরাম-কেদারা যদি মেলে,
গল্পটি মনগড়া
কিছু বা কবিতা পড়া,
সময়টা যায় হেসে খেলে।
দিয়ে জুঁই বেল জবা
সাজানো সুহৃদ-সভা,
আলাপ-প্রলাপ চলে দেদারই
ঠিক সুরে তার বাঁধা
মূলতানে তান সাধা,
নাম দিতে পারি তবে কেদারী।

শান্তিনিকেতন
৭।৩।৩৯

সংসারী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহেমলতা দেবী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঘর-সংসার কেমনটি ছিল, সংসারের মধ্যে থেকে সংসারী হয়ে কি ভাবে তিনি দিন কাটাতেন, তার দু-একটি চিত্র দেখাতে ও দু-একটি কাহিনী শোনাতে অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছেন। আমি ঐ পরিবারের পুরানো দিনের পুরানো বৌ, পুরানো কথা আমার জানা থাকার সম্ভাবনা। যেটুকু দেখেছি ও স্মরণে রাখতে পেরেছি তারই দু-চারটি খবর তাঁদের অনুরোধে আজ লিখতে উদ্যোগী হচ্ছি।

কবির সংসার-চিত্রে যদি কেউ সুন্দর একটি সুবিন্যস্ত সাংসারিকতার রূপ দেখার আশা করেন তবে তাঁকে হয়তো নিরাশ হ'তে হবে।

সাংসারিক পারিপাট্য ও শ্রীবৃদ্ধি বলতে সাধারণত যা বোঝায়—ঝাড়লণ্ঠন-ঝোলানো বৈঠকখানা, বিলাতী আসবাবে সাজানো ড্রয়িংরুম, পত্নীর গা-ভরা গহনা, আলমারি-ভরা বারানসী, বোম্বাই, রেশমী শাড়ী, বনিয়াদী ঘরের উপযোগী ঘরভরা রূপার বাসন, ব্যাঙ্কে জমানো মোটা সংখ্যার টাকা, ঘরের দেওয়াল কেটে বসানো লোহার সিন্দুকে তাড়া-বাঁধা কোম্পানী কাগজের স্তূপ—এর কোন কিছুই ছিল না কবির কোন দিনও। তেতালায় নিজের শোবার ঘরের পাশে, খোপের মত ছোট একটি ঘর বানিয়ে তাতেই ব'সে কবি লিখতেন। পাশে সেই মাপেরই আর একটি ছোট খুপরী ঘরে ছিল বসার ব্যবস্থা। এরা কবির নিজস্ব রুচির পরিচয় দিত লোকের কাছে।

কৈশোরে কবি নিজের গায়ের আলোয়ান বেচে বই কিনছেন শোনা গেছে, সংসারী হয়ে নিজের সংসারটিকে নূতন আদর্শে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন দেখা গেছে। কবির কন্যারা তৎকালীন প্রচলিত ধারায় লোরেটো, বেথুনে পড়ে নাই, পুত্র সেণ্টজেভিয়ার্স, প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয় নাই। নিজের আদর্শের আবেষ্টনে কবি তাদের মানুষ করতে চেষ্টা করেছেন গোড়া থেকে। কবির সৃষ্ট ভবিষ্যৎ আদর্শ-শিক্ষালয়ের গোড়াপত্তন এদের নিয়ে।

প্রতিভার বরপুত্রদের প্রতিভার প্রভাব ছড়ায় ঘরে-বাইরে সর্বত্র। চলতি ভাবের সঙ্গে লড়াই বাধে তাঁদের পদে পদে। তাঁরা নূতন চোখে দেখেন, নূতন পথ সৃষ্টি করে চলেন, নূতন ভাবের কথাগুলি নূতন ছাঁদে বলেন ব'লে। তাঁদের দৃষ্টিতে যেটি সহজ, সংগত, স্বাভাবিক সাধারণের দৃষ্টিতে সেটি অসহজ, অসংগত অস্বাভাবিক ঠেকে প্রথম প্রথম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি।

কবিরা সাধারণত আদর্শের টানে চলেন। সৃষ্টিধর্মী কবি-জাতটি আদর্শ-সৃষ্টির অনুরাগে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। তাঁদের ঘর-সংসার-পরিবার সেই আদর্শ-অনুরাগের গতিমুখে পড়ে সময়ে সময়ে কতকটা আবর্তিত না হয়ে পারে না। স্থিতিশীল সাংসারিকতা আদর্শবাদীর ধর্ম নয়।

অসংসারী কবি-চিত্তে সংসারসাধনা ও কাব্যরচনা সহজে জোড় খায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও নিজের প্রেরণার তাগিদে গুছিয়ে সংসার করতে পারেন নাই কোনদিন। নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে সেই টানে টেনে নিয়ে ফিরেছেন—এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে। বাসা-ভাঙা কবি বাসা ভেঙেই এসেছেন চিরদিন, স্থায়ী ভাবে একটি স্থানে বাসা বাঁধেন নাই কোন দিনও। ফলে পরিবারবর্গও বাসা বেঁধে বসতে পারে নাই কোন একটি স্থানে কখনও। আজও কবির বাসা-বদলের বিরাম নাই, কাছের লোকে সবাই জানে।

সংগীতের সুরসাধনায় ও কাব্যের ছন্দযোজনায় কবি যেমন বাঁধা পথ অনুসরণ করে চলেন নাই, সংসার-পরিচালনায়ও তেমনি সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বাঁধা পথ ধরে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে চলতে দিতে চান নাই। কবি-পত্নী ছেলেদের দামী পোষাক পরাতে গেলে কবি বোঝাতেন, বড়মানুষীর আওতায় থাকলে ছেলে মানুষ হয় না, অভ্যাসে তার গলদ জমে ওঠে অনেক। তোমার সন্তানরা খুব ভাল করে যাতে মানুষ হয় তারই চেষ্টা করছি। শুনে কবি-পত্নী খুশি হতেন, গৌরব অনুভব করতেন কিন্তু মনে মনে লুকিয়ে থাকত ছেলে-দের সুন্দর সুন্দর দামী পোষাকে সাজাবার সাধ। আশপাশের মানুষদের কাছে সেটি প্রকাশ হয়ে পড়ত দু-এক কথায়। তবে কার্যত তিনি স্বামীর আদর্শই অনুসরণ ক'রে চলতেন।

সাধারণ লোকদের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার জন্য কবি আগ্রহ প্রকাশ করতেন খুব—না পারলে মনে কষ্ট পেতেন ও খেদ করতেন। নিজেকে ভেঙে গড়তে চাইতেন তাদের মত অভ্যাসে অভ্যস্ত করার জন্য। বিদ্যালয়-স্থাপনার পরে ছাত্রদের মধ্যে থাকবেন ব'লে শান্তিনিকেতনের বর্তমান লাইব্রেরি-বাড়ীর এক পাশের একটি ঘরে কবি বাস করেছেন অনেক দিন, খেতেন ছাত্রদের খাওয়ার সারে বসে—এক সঙ্গে একই খাদ্য।

কবি-পত্নী স্বভাবত অতিরিক্ত সাজসজ্জার আদৌ অনুরাগী ছিলেন না, গহনা পরতেন নিতান্ত সামান্য। বড় ঘরের বৌ, তার তুলনায় তিনি সাধারণ-বেশেই থাকতে ভালবাসতেন। উপরন্তু কবির উন্নত রুচির প্রভাব তাঁকে আরো সাদাসিধা ক'রে তুলেছিল।

বিলাস-বর্জন, উপকরণ-বর্জন একমাত্র বুলি ছিল সে-সময় কবির মুখে। মেয়েদের কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে রূপসৃষ্টি, চোখ-ধাঁধানো রংবেরঙের প্রজাপতি প্যাটার্নের সাজসজ্জা ও অলঙ্কারবহুলতার আড়ম্বরের প্রতি ধিক্কার দিতেন কবি প্রতি কথায়, বলতেন—অসভ্য দেশের মানুষরাই মুখ চিত্রির করে। মুখে রং মেখে মেয়েরা কি অসভ্য দেশের মানুষ সাজতে চায়?

আমাদের ধরাধরিতে এক দিন কবি-পত্নী কানে ছুটি দুল ঝোলানো বিরবৌলী পরেছিলেন, হঠাৎ কবি এসে

পড়েন সেই সময় ঘরে, কবির প্রবেশমাত্র লজ্জা পেয়ে তিনি দুই কানে দুই হাত চাপা দিলেন। টানাটানি ক'রে আমরা হাত নামাতে পারলাম না কিছুতেই। তিনি এত কম গহনা ব্যবহার করতেন যে দুটি বিরবৌলী কানে পরেই লজ্জা পেলেন খুব বেশী। সমবয়সী বৌদের সাজতে বলবেন কিন্তু নিজে সাজবেন না এই ছিল তাঁর ভাব। বড় বড় ভাসুরপো ভাগ্নেরা চারি দিকে ঘুরছে—আমি আবার সাজব কি—তাঁর নিজের মুখের কথা।

কবি, পিতার শেষ সন্তান, বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় ও সমবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল তাঁর কয়েকজন।

কবি-পত্নী এক বার সাধ ক'রে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন ব'লে। কবি দেখে বলেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো সোনা পরে—লজ্জার কথা, তোমাদের চমৎকার রুচি। কবি-পত্নী সে বোতাম ভেঙে ওপাল-বসানো বোতাম গড়িয়ে দিলেন। দু-চার বার কবি সেটি ব্যবহার করেছিলেন যেন দায়ে পড়ে। কবির পছন্দ সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র—বুঝতে সময় লাগে।

বিদ্যালয়-সূচনার পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সাবেক বড় কুঠিটিতে কবির পরিবার ও আমরা একত্র বাস করেছি অনেক সময়। গৃহস্থালীর ভার থাকত কবি-পত্নীর তাঁকে গৃহকর্মে সাহায্য করার ভার আমার। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ, ব্যয়ের হিসাব রাখার ভার আমার স্বামীর*। খাওয়া হ'ত চমৎকার, কবি-পত্নীর রান্নার ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুতের বিরাম ছিল না এক দিনও। কবি থেকে থেকে পত্নীকে বলতেন, "নীচে ব'সে লিখতে লিখতে রোজ শুনি, চাই ঘী, চাই সুজি, চিনি চিঁড়ে ময়দা, মিষ্টি তৈরী হবে। যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ, মজা হয়েছে খুব।" আমার স্বামীর নাম করে বলতেন, "সে তো কখনও 'না' বলবে না। যত চাইবে ততই দেবে, তার মত কর্তা ও তোমার মত গিন্নি হ'লেই হয়েছে আর কি, দু-দিনে ফতুর।" কবি-পত্নী ভাসুরপুত্রের (আমার স্বামীর) নাম করে বলতেন, "সে সংসার বোঝে, তার সঙ্গে কাজ ক'রে সুখ, তোমার এদিকে নজর দেওয়া কেন।"

স্নেহাস্পদ বলেন্দ্রনাথ এক বার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সকালে দুধ-জলখাবার খাওয়ার পরে ছেলের দল নিয়ে আমি বেড়াতে বেরোতুম। বলেন্দ্রনাথ সঙ্গে থাকতেন প্রায়ই। আশ্রমের পূর্বধারে কতকগুলো কাঁকর-ঢালা উঁচু মাটির ঢিবি—দেখতে ছোট্ট পাহাড়ের মত—তার উপর চ'ড়ে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়া ছিল ছেলেদের একটা খেলা। বলেন্দ্রনাথ এক দিন ছেলেদের সঙ্গে উঠে নামতে পারেন না। কুঠিতে গিয়ে লোক ডেকে এনে তাঁকে নামাতে হয়। ছেলেরা হেসে লুটোপুটি—বলুকাকাকে, বলুদাদাকে চাকরে ধরে নামাচ্ছে দেখে। তার পর থেকে তিনি কখনও ঢিবিতে ওঠেন নি।

তখনকার দিনে এত হাতে হাতে ক্যামেরা ঘুরত না, কথায় কথায় ফটো নেওয়া হ'ত না, নতুবা ছবি দেখিয়ে পাঠকদের খুশী করে দেওয়া যেত।

আশ্রমের আশপাশ ছিল তখন জনমানবশূন্য, কেবল আমরাই অধিবাসী। সন্ধ্যায় কবি নিজের রচনা পড়ে শোনাতেন। "দেবতার গ্রাস" তার অল্প দিন আগেই লেখা হয়েছে।

কবি-পত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার। ব্যঞ্জনাদির-স্বাদ ও মিষ্টান্নাদির পাক তাঁর হাতে উৎরাত উৎকৃষ্ট হয়ে। কবির জন্য প্রায়ই তিনি ঘরে নানানতরো মিষ্টান্ন তৈরী করতেন নিজের হাতে। চিঁড়ের পুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই তাঁর হাতের এক বার যাঁরা খেয়েছেন তাঁরা আর ভোলেন নাই। নাটোরের ভূতপূর্ব মহারাজা স্বর্গীয় জগদিন্দ্রনাথ রায় কবি-পত্নীর হাতের তৈরী দইয়ের মালপোর ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের সখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ-সম্বন্ধে তাঁর সখ বাড়িয়ে দিত বেশী। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে ব'সে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেক বার। শুধু ফরমাস ক'রেই ক্ষান্ত হতেন না,

* দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র)।—প্রবাসী-সম্পাদক

নূতন মালমসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি সখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব ক'রে বলতেন, "দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।" তিনি চটে গিয়ে বলতেন, "তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।"

সংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে, কাছের লোকে চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারত না। করো চিন্তা, বলো যা খুশি,—কবি নিজের ইচ্ছায় ভর ক'রেই চলেছেন। জন্ম হ'তে অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় শরীর তখন এই সব উপদ্রব সহ্য করেছে অনেকটা অনায়াসে। ঘরের লোকের ধারণা, খেয়ালের বশে কবি স্বল্পাহারে শরীর নষ্ট করছেন; কাজেই এই ব্যাপার তাঁরা উপদ্রব ব'লেই গণ্য করতেন। কবি যে শরীরের উপযোগী খাদ্য না খুঁজে মনের উপযোগী খাদ্য খুঁজে নিচ্ছেন এ-কথা বোঝা যেত না তখন স্পষ্ট ক'রে। ঘরের মানুষ—যাঁদের লক্ষ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি, তাঁরা এমনতরো ঝোঁকালো লোক নিয়ে বেগ পেতেন সর্বদা। স্বল্পাহারের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা অনেক সময় কবি-পত্নীকে বলতাম, "বলুন না কাকীমা কাকামহাশয়কে বলকারক খাদ্য কিছু খেতে।" কবি-পত্নী বলতেন, "তোমরা চেনো না; বললে জেদ আরো বাড়বে; না খেয়ে দুর্বল হয়ে সিঁড়ি উঠতে মাথা ঘুরে পড়ুন আগে, তার পরে নিজেই শিখবেন—কারো শেখানো কথা শোনবার ধাতের মানুষ নন।"

কবি বহু বৎসর নিরামিষভোজী ছিলেন। পত্নী-বিয়োগের পর ঘরে যখন কবি নিরামিষভোজী, এমন কি সময়ে সময়ে অন্নত্যাগ করে শুধু ছোলা ভিজানো, মুগ ডাল ভিজানো খেয়ে দিন কাটান তখন কার্যসূত্রে মাঝে মাঝে কবিকে পতিসরে যেতে হ'ত। কবির শাশুড়ী-ঠাকুরাণী তখন নিজগ্রাম যশোহর জেলার অন্তর্গত ফুলতলা, ছেড়ে পুত্রের কর্মস্থান পতিসরে বাস করতেন। তিনি স্বহস্তে মাছের ব্যঞ্জনাদি রান্না ক'রে জামাতার পাতে দিলে কবি "না" বলতেন না। কন্যা নাই, পাছে তিনি মনে কষ্ট পান ভেবে নিজের ইচ্ছা সেখানে কবি খর্ব করতেন। সঙ্গের ভৃত্য উমাচরণ ফিরে এসে আমাদের কাছে গল্প করত, "এখানে বাবুমশায় খাওয়া নিয়ে এত গোলমাল করেন, পতিসরে কিন্তু শাশুড়ী-ঠাকরুণ যা দেন তাই খান; একটি কথা বলেন না—শাশুড়ী কী না!" ভৃত্যরা খুশী মনে সহজ ভাবে কবির সামনে কথা বলে, কবি সেটা ভালবাসেন চিরদিন। ভয় পেয়ে ভৃত্য কাজ করবে, তিনি আদৌ পছন্দ করেন না।

শান্তিনিকেতন কুঠীর দোতলায় এক দিন বিকেলে চায়ের টেবিলে কবি চা খেতে বসেছেন, ঘরে ভাল মিষ্টি কাকামহাশয়ের জন্যে তৈরী করা হোক বলায় কবি হঠাৎ বলে ফেললেন, "ঘরের মিষ্টি আর আমার দরকার নাই।" বুঝলুম কাকীমার হাতের মিষ্টির কথা মনে পড়ে তাঁকে ব্যথা দিল। অন্তরের ব্যথা খুব চেপে রাখেন কবি, কেমন ক'রে সেদিন কথাটুকু মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়েছিল।

এই বার উপকরণ-বর্জনের পালা। সংসার-সরঞ্জাম সব কিছু ফেলে চলো যে-পথে কবি চলেন সেই পথে কবির সঙ্গে। সংসার-সঙ্গিনীর প্রতি এই ছিল তাঁর আর এক দিকের আর এক ভাবের কথা।

উপকরণের বোঝা বয়ে চলা সম্বন্ধে কবির মনে গভীর বিরাগ ছিল গোড়া থেকে। মনের চেতনা যাঁদের সূক্ষ্ম, উপকরণের ভার তাঁরা সইতে পারেন না, দুঃখ পান তাই নিয়ে। ঘরছাড়া কবি ঘর ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধতে গেছেন কয়েক বার। যাত্রাকালে কবির মুখে এক কথা—উপকরণ আবর্জনা ফেলে যাও, ওদের সঙ্গের সাথী কোরো না। ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিষ—বঁটি, কাটারি, কুরুণী, বারকোষ, কড়া, খুন্তি, হাতার বোঝাটি সঙ্গে যাচ্ছে দেখলেই কবি হুলুস্থুল বাধাতেন। চটেমটে বলতেন "এ-সব জঞ্জাল জড়ো করা কেন?" যেন দুখানি বস্ত্র হাতে নিয়ে বেরোতে পারলেই ভাল হয় কবির মতে।

পথযাত্রায় গৃহস্থালী সরঞ্জাম দু-একটি বেশী সঙ্গে নেওয়ার দিকে মেয়েদের ঝোঁক, পুরুষদের দৃষ্টিতে যেগুলি অনাবশ্যক ঠেকে। বোঝা বাড়াও কেন, পুরুষদের কথা।

সময়কালে অভাবে ঠেকতে না হয়, মেয়েদের ভাব। প্রায় সকল বাড়ীর মেয়েই যাত্রাকালে বাবুদের লুকিয়ে ব্যবহার্য দু-একটি জিনিষ সঙ্গে নিয়ে থাকেন। কবির সংসারেও তার ব্যতিক্রম হ'ত না, কবি-পত্নীও কতকগুলি সরঞ্জাম সঙ্গে নিতেন লুকিয়ে। কৌতুক ক'রে আমাদের কাছে আড়ালে বলতেন "দেখ তো বাপু, এমন লোক নিয়ে কি ক'রে ঘর করা যায়। ফেলে তো যাব সব, এদিকে গিয়েই কিন্তু অতিথি-সমাগমের ধুম পড়ে যাবে। অতিথির কারবার তো কবির কম নয়, তখন আনো মালপো, আনো মিঠাই, ভাজো শিঙাড়া, ভাজো নিমকি, কচুরি, তাও আবার কম হ'লে চলবে না, পাত্র বোঝাই প্রচুর হওয়া চাই। সরঞ্জাম না হ'লে জিনিষ আসবে কোথা থেকে সে-কথা বলে কে।"

কবি আদর্শের টানে নানা সময়ে নানা ভাবে নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে ফেলতে মনে কোন দ্বিধা রাখতেন না। আদর্শপ্রবণতা তাঁকে কোথায় কখন্ কোন্ সংকটে জড়িয়ে ফেলে এ ভাবনা কবি-পত্নীর মনে থাকত। কবি ও কবির পরিবার অভিন্ন; কবি বিপন্ন হ'লে পরিবারটিরও বিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক।

স্বামী-সন্তানের দেহমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা পত্নী ও জননীর স্বাভাবিক ধর্ম। সকল জননী, পত্নীর মনে এই আদর্শ জাগ্রত। সংরক্ষণের পথেই এই আদর্শের গতি। পুরুষ ছড়ায়, নারী কুড়ায়, বাঁচায়। ঘরে বাইরে পুরুষ ও নারীর এই আদর্শ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টিরহস্যের এক বিশেষ অধ্যায়।

কবির মুখে "ফেলো ফেলো ছাড়ো ছাড়ো" শুনে কবি-পত্নী বলতেন, ঘরকন্না ফেঁদে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসার করতে গেলে এক কথায় ফকির সাজা চলে না। পতি-পত্নীর মধ্যে হৃদয়ের ব্যবধান থাকা সম্ভব নয়। একের ভাবে অন্যের যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কবির ভাবে কবি-পত্নী অনুপ্রাণিত না হয়ে পারেন নাই।

পত্নীবিয়োগের পরে কবি পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হন। সম্পত্তি-অধিকারের অল্প কয়েক বৎসর পরেই সমস্ত সম্পত্তি দানপত্রে লেখাপড়া ক'রে ছেলেদের নামে দেবার জন্য কবি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—তার মধ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও ছিল। দলিলাদি তৈরীর আদেশ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। কবির জনৈক নিকট আত্মীয়—ছেলেরা এখন ছোট এখনই এ কাজ করা সংগত হবে না, ইত্যাদি অনেক কারণ দেখিয়ে তখনকার মত কবিকে সে কাজ হ'তে নিরস্ত করেন। বিষয়ের বোঝা নামাবার সেই একান্ত আগ্রহ কবির, আমাদের চোখে এখনও স্পষ্ট হয়ে ভাসছে। নিজের সমস্ত বাংলা পুস্তকের কপিরাইট বিক্রয় ক'রে শান্তিনিকেতন আশ্রমের এক ধারে একটি নারীবিভাগ গড়ে তোলার জন্যও কবি সে-সময় অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। দেওয়ার বেগে কবি তখন অধীর।

সেই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কন্যা রাজবাড়ী যাবে—নিতান্ত সাধারণ সাজে সাধারণ বেশে কবি পাঠিয়েছেন তাকে সেখানে। আত্মীয়েরা বলেছেন, এমন সাজে কবি রাজবাড়ী কন্যা পাঠান যে দেখে লজ্জা করে। কবির উত্তর, "এই বেশে কন্যা আমার স্নেহ-সম্মান যদি না পায়, তবে তেমন সম্মানে কাজ নাই। বেশভূষা যে-সম্মানের যোগ্যতা প্রমাণ করে সে-সম্মান না পাওয়াই শ্রেয়।"

শিক্ষাব্রতী কবি আদর্শ-শিক্ষালয় গঠনে যখন প্রবৃত্ত কবির সহধর্মিণী তখন সহকর্মিনী হয়েছিলেন তাঁর সে-কাজে। ছাত্রদের জলখাবার তৈরীর ভার নিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে। স্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলিকে। বিদ্যালয় আরম্ভের একটি বৎসর শেষ না হ'তেই বিদ্যালয়ের জননী কবি-পত্নীর আয়ু হ'ল শেষ। কবির সংসার ভেঙে দিয়ে তিনি চলে গেলেন অকালে। মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করেছিলেন তার ছাপটি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে পরিবারের সকলের মনে আজও। প্রায় দু-মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন; ভাড়া-করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রূষার ভার কবি এক দিনের জন্যও দেন নাই।

স্বামীর সেবা পাওয়া কত সৌভাগ্যের সাধ্বী নারী মাত্রই জানেন। পত্নীর প্রতি স্নেহ কবির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষ শয্যায় চূড়ান্ত রূপে। তখন ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের সৃষ্টি হয় নাই দেশে। হাতপাখা হাতে ধরে

দিনের পর দিন রাতের পর রাত পত্নীকে কবি বাতাস দিতেন, এক মুহূর্ত হাতের পাখা না ফেলে। ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণীর প্রচলন তখন ঘরে ঘরে; কবির ঘরে তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম।

মায়ের বাড়াবাড়ি রোগের সময় ছেলেগুলিকে রেখে গিয়েছিলেন কবি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে। আচ্ছন্ন অবস্থায় কবি-পত্নী অনেক বার বলতেন, "আমাকে বলেন ঘুমাও ঘুমাও, শমীকে রেখে এলেন বিদ্যালয়ে, আমি কি ঘুমাতে পারি তাকে ছেড়ে! বোঝেন না সেটা!" জননীর শেষ সন্তান শমী তখন শিশু। ছেলেদের সে সময় যত্নে ও সাবধানে রাখার পক্ষে তাঁর বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান, কবি বুঝেছিলেন। মৃত্যুর ছায়া তাঁদের মনে ঘনিয়ে আসবে সেটা যেন কবি সইতে পারতেন না।

সন্তান-স্নেহ কবির অপরিমেয়। প্রথম সন্তান, কন্যাটিকে পিতা হয়েও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরূপে। পত্নীর বয়স ছিল কম, কবি যেন ভরসা পেতেন না প্রথম সন্তানের সম্যক যত্ন পাছে তিনি করতে না পারেন ভেবে। শিশুকে দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো কবি সব করতেন নিজের হাতে, এ-সবই আমাদের চোখে দেখা।

সন ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ (নবেম্বর ২৩, ১৯০২), রবিবার, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক ১১ মাস পরে, মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে কবি-পত্নী পরলোকগমন করেন। আমি সেদিন অসুস্থ, শয্যাশায়ী। নিজে সে সময়ে যেতে পারি নাই, 'রাত্রে আমার স্বামী এসে বললেন, "খুড়ীর মৃত্যু হয়েছে, কাকামশাই একলা ছাদে চলে গেছেন, বারণ করেছেন কাউকে কাছে যেতে।" প্রায় সারারাত কবি ছাদে পায়চারি ক'রে কাটিয়েছেন শোনা গেল। কবির পিতা মহর্ষিদেব তখন জীবিত। পুত্রের পত্নী-বিয়োগের সংবাদে তিনি বলেন "রবির জন্য আমি চিন্তা করি না, লেখাপড়া নিজের রচনা নিয়ে সে দিন কাটাতে পারবে। ছোট ছেলেমেয়েগুলির জন্যই দুঃখ হয়।" ভাগ্যবতী কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবী শ্বশুর স্বামী পুত্র কন্যা জামাতা পরিবেষ্টিত সাজানো সংসার ফেলে গেলেন—কবির সংসার গেল ভেঙে; সেই থেকে নিজের ভাঙা সংসার টেনে নিয়ে চলে আসছেন কবি এ পর্যন্ত।

অসংখ্য ভাঙাচোরার বোঝা বুকে নিয়ে কবির সেই ভাঙা সংসার আজ বিশ্বভারতীর বিরাট পর্বে হ'তে চলেছে পরিসমাপ্ত।

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৬



নির্ম্মোক

"বনফুল"

১

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বনিয়াদী বংশের সন্তান। পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে অক্লেশে মুর্শিদকুলি খাঁর আমল পর্য্যন্ত তাঁহাদের গৌরবময় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা যায়। নানারূপ দলিল, পাঞ্জা, সনন্দ, তরবারি, উষ্ণীষ, ছবি তাঁহাদের গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিয়া এখনও মথুরাবাবুর গৃহ অলঙ্কৃত করিতেছে। মথুরামোহনের পিতামহই সম্ভবতঃ এ-বংশের শেষ মহিমা। তাঁহার বজরা, ঘোড়া, রোশনচৌকি, তাঁহার অমিত বিক্রম, তাঁহার অহেতুক দয়া, তাঁহার আকস্মিক ক্রোধের কাহিনী এখনও এ অঞ্চলে প্রবাদের মত প্রচলিত রহিয়াছে। মথুরামোহনের পিতার সময়ে এ অঞ্চলে প্রথমে রেল-লাইন আসে, সিগারেট আসে, ক্যামেরা আসে। সুতরাং কোট-প্যাণ্টালুন পরিয়া সাহেবী কায়দায় চলা-বলা আহার-বিহার—এইটাই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তিনি নাকি পুরা সাহেব ছিলেন। তাঁহার যে প্রতিকৃতি-খানি রহিয়াছে সেটিও সাহেবী পোষাকে। তাঁহার পরিচ্ছদ, আসবাব, এমন কি অনেক খাদ্যদ্রব্যাদিও নাকি সাহেব-বাড়ী হইতে আসিত। তিনিই নাকি এ-অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথমে বিস্কুট ও পাউরুটি আহার করেন। জনৈক সিভিলিয়ান বন্ধুর সহিত তিনি বিলাতেও গিয়াছিলেন। তাঁহার সাহেবিয়ানা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে বাইনাচ, যাত্রা, দোল, দুর্গোৎসব হইত, বড় বড় তানপুরা লইয়া দিল্লী, লক্ষ্ণৌ হইতে ওস্তাদেরা আসিয়া আসর জমাইতেন। সম্ভবতঃ উভয় প্রকার শালীনতা বজায় রাখিতে গিয়াই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময়েই পৃথিবীর নশ্বরতা সম্বন্ধেও তাঁহার চৈতন্য হয় এবং তিনি সপরিবারে তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতে থাকেন। এত কাল তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না, পশ্চিমে থাকিতে থাকিতে সন্তানসম্ভাবনা হইল এবং মথুরা শহরে মথুরামোহন জন্মগ্রহণ করিলেন।

বিমলের সহিত মথুরামোহনের এক দিন আলাপ হইয়া গেল। থিয়েটারে রিহার্সাল দিবার জন্য প্রথম যেদিন সে ওপারে গেল, সেই দিনই অমরের বাড়ী যাইতে হইল। বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল কল্পনায় সে মথুরামোহনকে যাহা ভাবিয়াছিল আসলে তিনি মোটেই সেরূপ দেখিতে নহেন। বিমল আশা করিয়াছিল দাম্ভিক পরাক্রান্ত ক্ষমতাপ্রিয় এক জন উদ্যতনাসা উগ্রগুম্ফ ব্যক্তিকে দেখিবে, কিন্তু দেখিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক ব্যক্তিকে। মথুরামোহন দেখিতে অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির। পরিধানে থান, গায়ে একটি অতি সাধারণ ধরণের ফতুয়া, পায়ে চটি, কেশবিরল মস্তক, চোখেমুখে একটি স্নেহকোমল মৃদু হাসি, দেখিয়া মনে হয় না যে ইনি কোন নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারেন। অথচ ইঁহারই ভয়ে ওপারের অধিকাংশ লোক সন্ত্রস্ত—বিশেষতঃ মিউনিসিপালিটির মেম্বারেরা। আপাতদৃষ্টিতে লোকটির মধ্যে ভয়ঙ্কর তো কিছুই বিমল দেখিতে পাইল না। খানিক ক্ষণ আলাপের পর মথুরাবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন—তুমি অমরের বন্ধু এ-কথা আগে জানলে তোমাকে এখানে আসতে মানা করতাম আমি।

—কেন?

সহসা তাঁহার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—মাত্র পঁচাত্তর টাকা মাইনেয় কোন ভদ্র সন্তান ভালভাবে থাকতে পারে না। ঐ মাইনেতে যারা টিকে থাকবে তারা ভাল হ'লেও দিনকতক পরে খারাপ হয়ে যাবে। মাইনে ভাল না দিলে কাজ ভাল হয় না, হ'তে পারে না!

বিমল বলিল—সে তো ঠিকই। কিন্তু মিউনিসি-

পালিটির যা অবস্থা তাতে বেশী মাইনে দেবে কি ক'রে! হাসপাতালে ওষুধ পর্য্যন্ত নেই!

—তা তো জানি। আমার মতে হাসপাতাল তুলে দেওয়া উচিত। ওরকম একটা প্রহসন রাখার চেয়ে না রাখা ভাল!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

অমর বলিল—আমরা ক্লাবে এবার টিকিট ক'রে বিসর্জ্জন প্লে করছি। টাকা যা হবে সব হাসপাতালে দেব আমরা!

—ভাল!

মথুরামোহন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর বিমলের দিকে চাহিয়া সহসা বলিলেন—একটা কথা কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার শত্রুপক্ষ। তোমার কোন ত্রুটি পেলে ছেড়ে কথা কইব না আমি!

বিমল বলিল—ত্রুটি হ'তে দেব কেন!

—মাত্র পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাবে, ত্রুটি হ'তে দেব না বলছ কোন্ সাহসে!

মথুরাবাবু কান হইতে রূপার খড়কেটি নামাইয়া লইয়া হাসিমুখে দাঁত খুঁটিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন—আচ্ছা, সে দেখা যাবে!

অমর হাসিয়া বলিল—চল ক্লাবে যাওয়া যাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বিমল উঠিয়া মথুরাবাবুকে প্রণাম করিয়া পুনরায় পদধূলি লইতে গেলে মথুরাবাবু বলিলেন—এই তো এখুনি এক বার প্রণাম করলে, আবার কেন! ও-সব পায়ের ধুলো-টুলো নিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বি অন ইওর গার্ড—

একটু হাসিয়া বিমল ও অমর বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল বলিল—তোর বাবার সম্বন্ধে যে-রকম ভয়াবহ সব গুজব শুনেছিলাম, ভয় হয়ে গিয়েছিল আমার। এত ভাল লোক অথচ সবাই এত ভয় করে কেন বল্ দিকি!

—ভাল লোক বলেই।

—মানে?

—মানে মিউনিসিপালিটিতে উনিই একমাত্র লোক যিনি ঠিক নিয়ম মেনে চলতে চান আর ঘুস নেন না!

—বাকী সবাই?

—বাকী সবাই মিউনিসিপালিটিকে নানাভাবে দোহন করছে!

—বদ্যিবাবুও?

—নিশ্চয়। ওপারে ওঁর অতগুলো বাড়ী, মিউনিসি-পালিটিকে হাতে না রাখলে ওঁর চলবে কি ক'রে? নিজের ইচ্ছেমত প্ল্যান, নিজের ইচ্ছেমত কল, যখন যা খুশী করিয়ে নিচ্ছেন। নিজে তো যা খুশী করিয়ে নিচ্ছেন, নিজের অনুগৃহীত লোকেদের করিয়েও দিচ্ছেন! খুব তুখোড় লোক!

বদ্যিবাবুর নিন্দা শুনিতে বিমলের ভাল লাগিতেছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

বিমলরা চলিয়া গেলে মথুরাবাবু অন্দরে গেলেন। গিয়াই শেফালির সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। শেফালি মথুরা-বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা, বড় আদরিণী। ষোল-সতের বছর বয়স।

—বাবা, বারান্দায় ব'সে কার সঙ্গে কথা বলছিলে, বিমলবাবু, নয়?

—তুই কি ক'রে দেখলি!

—বাঃ, দোতলার জানলা থেকে দেখা যায় না বুঝি বারান্দাটা!

ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া মথুরাবাবুর স্ত্রী বলিলেন—বারান্দাটা দেখা যায় বলেই উঁকি মেরে দেখতে হবে, ধন্য বাবা আজকালকার মেয়ে তোমরা! ভদ্রলোক যদি দেখতে পেতেন!

—দেখতে পেলেই হ'ল! আমি তো কেবল খড়খড়িটা একটুখানি ফাঁক ক'রে দেখেছি।

—কি দরকার তোমার দেখবার মা।

—আমার খুড়শ্বশুরের অসুখ তো উনিই ভাল করেছেন, সেই জন্যে দেখছিলাম কেমন দেখতে লোকটি!

শেফালি হাসিতে লাগিল, মথুরাবাবুও তাহার পানে সস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

—তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটার সর্ব্বনাশ করবে দেখছি!

এক খিলি পান ও কিছু দোক্তা মুখে ফেলিয়া দিয়া সকোপ কটাক্ষে মথুরা-গৃহিণী মথুরাবাবুর পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন—কালই দাঁড়াও বেয়াইকে খবর দিচ্ছি, নিয়ে যান তোমাকে!

—ইস্, আমি যাচ্ছি কি না এখন।

ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে শেফালি বৌদিদির ঘরে গিয়া ঢুকিল। মথুরবাবুও উঠিয়া ধীরে ধীরে বাথ-রুমে গিয়া খিল দিলেন। মথুরবাবুর বাথরুম একটি দেখিবার মত জিনিষ, বলিয়া না দিলে বাথরুম বলিয়া বোঝা শক্ত। দুই-তিন রকমের গদি-আঁটা চেয়ার, একটি সোফা, দেয়ালে নানা রকমের ছবি, এক কোণে একটি আলমারিতে নানা রকম বই, একটি ছোট টেবিলের উপর সব রকমের খবরের কাগজ, নিকটে একটি ছোট মিটসেফের ভিতর চকোলেট, লজেন্স্ প্রভৃতি মুখরোচক টুকিটাকি খাবার, দেয়ালের গায়ে কাঠের একটি সুদৃশ্য শেল্ফ্ তাহাতে তাঁহার প্রিয় কয়েক রকম পেটেণ্ট ঔষধ, আর একটি দেয়ালে চমৎকার একটি ঘড়ি। ঘরের ভিতর হইতেই অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় জানালাটি খুলিয়া দিলেই হইল। মথুরাবাবুর বাথরুম তাঁহার বৈঠকখানা অপেক্ষা বেশী আরামজনক। এই ঘরখানির ঠিক পাশেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট একটি স্নানের ঘরও অবশ্য আছে। মথুরবাবু নির্জ্জনতা ভালবাসেন এবং স্নান করিবার অছিলায় বাথরুমে ঢুকিয়া জনতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করেন। এক বার বাথরুমে ঢুকিলে দুই-তিন ঘণ্টা তিনি বাহির হন না এবং দুই বেলা তাঁহার বাথরুমে ঢোকা চাই-ই। মথুরাবাবু বাথরুমে ঢুকিয়া খিল দিলেন। মথুরাবাবুর গৃহিণী মন্দাকিনী বাথরুমের রুদ্ধ দ্বারের পানে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিয়া আর এক খিলি পান ও আর একটু দোক্তা আলগোছে মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। চশমার খাপ ও মহাভারত-খানি বাহির করিয়া আনিয়া খানিক ক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর আপন মনেই বলিলেন—নিজে আর পড়তে পারি না বাপু, বৌমা, ও বৌমা, কোথা তুমি—

বিনোদিনী পাশের ঘরেই ছিল, বাহির হইয়া আসিল।

—কি মা?

—কি করছ তুমি?

—কিছুই না।

—আচ্ছা, তাহলে মহাভারতের এইটুকু আমাকে প'ড়ে শোনাও তো মা! ঐটুকু হলেই কর্ণপর্ব্বটা শেষ হয়ে যায়। আমি আর পারছি না পড়তে—

বিনোদিনী বসিল ও মহাভারত লইয়া পড়িতে সুরু করিল—

হে মহারাজ! এদিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন তদ্রূপ তুমি শর-নিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে যশস্কর কর্ণবধ-বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। তুমি বহুদিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, এক্ষণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্ব্বে পুরুষপ্রধান যুধিষ্ঠির—

অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে সহসা মন্দাকিনী বলিলেন—আচ্ছা বৌমা, তোমার চুলের এ কি ছিরি! চুলে তেল-টেল দাও না, আজকাল তোমাদের কি যে ফেসিয়ান হয়েছে মা, চুল ভেজাবে না কিছুতে! চুল-বাঁধুনী এসেছিল তো আজ, চুলটা ভাল ক'রে বেঁধে নিলেই পারতে!

বিনোদিনী কিছু বলিল না, লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সেও যে ব্রহ্মচর্য্যের চর্চ্চা করিতেছে এ কথা তো শাশুড়ীকে বলা যায় না।

শাশুড়ী বলিলেন—চল আমিই তোমার চুলটা বেঁধে দি, মহাভারত কাল শুনিয়ো! চল, ওঠ।

বিনোদিনীকে লইয়া মন্দাকিনী উঠিয়া গেলেন।

বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে যখন মন্দাকিনী প্রথম শুনিলেন যে তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপনে একটি কলেজে-পড়া মেয়েকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল! কলেজে-পড়া মেয়ে, না জানি সে কি জাতীয় জীবই হইবে।

কি জাতীয় জীব যে হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও খুব অস্পষ্ট ছিল না। হাই-হীল জুতা-পরা, ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে অবগুণ্ঠনহীনা শিক্ষিতা মহিলা মন্দাকিনী ইতি-পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন এবং দুর্ভাবনাটা সেই জন্যই বেশী হইয়াছিল। কিন্তু বিনোদিনী তাঁহার সে দুর্ভাবনা ঘুচাইয়াছে। অল্প দিনেই মন্দাকিনী বুঝিলেন যে এমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে দুর্লভ। ব্রত-আচার, পূজা-পার্ব্বণ সব বিষয়ে নিখুঁত। যেমন লজ্জা, তেমনি ধীরস্থির। মুখে লক্ষ্মীশ্রী আছে। কিছুমাত্র বিলাসিতা নাই, বরং তাহার প্রসাধন সম্বন্ধে উদাসীনতাই ইদানীং মন্দাকিনীকে পীড়িত করিতেছে!

গঙ্গার ধারেই বিমলের বাসা। ঘাট হইতে বাসা বেশী দূরে নয়। গভীর রাত্রি, চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে। একটি ছোট পানসি আসিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে ভিড়িল এবং পানসি ভিড়িতে অমর ও বিনোদিনী নামিয়া পড়িল।

অমর বলিল—চল বিমলকে জাগানো যাক।

—না, না, কি দরকার, চল, মা যদি জানতে পারেন, ভয়ানক কাণ্ড করবেন।

—কিছু করবেন না, চল না! অনেক দিন পরে বিমল তোমাকে দেখে ভারি খুশী হবে! বলছিল আজ তোমার কথা।

—কি বলছিল?

—বলছিল বিনুকে নিয়ে এস এক দিন আমার বাড়ীতে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র বিমলবাবুকে বিনোদিনীর মনে পড়িল। অমরের সহিত বিমল কয়েক বার বিনোদিনীদের বাড়ীতে গিয়াছিল। বিনোদিনী মনে মনে ভাবিল বিমলবাবু কি এখনও তেমনি লাজুকপ্রকৃতির আছেন নাকি? তখন তো কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিতেন না।

বিমল স্বপ্ন দেখিতেছিল, মণিকে। পরীক্ষা দিয়া মণি যেন বড় রোগা হইয়া গিয়াছে। বিমল এক বোতল কডলিভার অয়েল লইয়া তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে, সে কিছুতেই খাইবে না। বড় দুর্গন্ধ! দুধও খাইবে না, খাইতে ভাল লাগে না।

—ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু—

বিমল বিছানায় উঠিয়া বসিল, তবুও স্বপ্নের ঘোর যেন কাটিতে চায় না। ভাল করিয়া চোখ খুলিয়া দেখিল জানালা দিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া নীরব মাধুর্য্যে সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া দিয়াছে!

—ডাক্তারবাবু—

কপাট খুলিয়া বিমল দেখিল অমর ও বিনোদিনী দাঁড়াইয়া আছে। এও স্বপ্ন নাকি!

৮

যদিও হাসপাতালে ঔষধ নাই তথাপি বিমলের সদয় ব্যবহারের গুণে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিমল লক্ষ্য করিল এখানে গরিব লোকদের ভিতর কালাজ্বর খুব বেশী, অথচ হাসপাতালে তাহাদের চিকিৎসা করিবার মত ইন্‌জেকশনের ঔষধ প্রচুর নাই। অদূর ভবিষ্যতে যে হইবে, তাহারও সম্ভাবনা কম। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সে নিজের প্রথম মাসের বেতনটা ব্যয় করিয়া কালাজ্বরের ইন্‌জেকশন আনাইয়া ফেলিল। লেখালেখি করাতে দরও কিছু সস্তা হইল। কালাজ্বর-রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া এবং চিকিৎসা করিয়া বিমলের সময় ভালই কাটিতে লাগিল। বিমল ভাবিয়া দেখিল যে চাকরি না পাইলে কোথাও না কোথাও তাহাকে ডিসপেনসারি খুলিয়া তো বসিতে হইত এবং অনিবার্য্যভাবে কিছু অর্থব্যয় হইতই। প্র্যাকটিস জমাইবার জন্য প্রথম প্রথম কিছু খরচ করিতেই হয়, সুতরাং এই খরচটা করা এমন কিছু অবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। হাসপাতালের এই দরিদ্র রোগীরা মুক্তকণ্ঠে তাহার নাম চতুর্দ্দিকে বিজ্ঞাপিত করিবে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের জন্যও তো একটা প্রয়োজনীয় খরচ আছে। ব্যবসায়ের দিক্‌ হইতে বিচার করিলে ইহাতে নিঃস্বার্থপরতা অপেক্ষা স্বার্থপরতার আমেজই বেশী ছিল,

কিন্তু চতুর্দিকে ধন্ত ধন্ত পড়িয়া গেল। ইন্‌জেকশন দিয়া অনেক রোগী ভালও হইতে লাগিল।

এক দিন হাসপাতালের কাজ সারিয়া বিমল বাহির হইতেছে এমন সময় এক বুড়ী আসিয়া তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। বুড়ী বিমলের অচেনা নয়, এখানে আসিয়া অবধি বুড়ীকে সে প্রত্যহই দেখিতেছে, রোজ তাহার হাসপাতালে আসা চাই। সে আসিবার আগেও নাকি বুড়ী রোজ আসিত। তাহার অসুখ মাথাধরা, কিছুতেই সারিতেছে না।

—কি চাই তোমার, ওঠ, ওঠ।

—আমাকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে দিন ডাক্তারবাবু।

—কিসের ইন্‌জেকশন দেব তোমাকে ?

—মাথাধরার! কত লোক ইন্‌জেকশন নিয়ে নিয়ে সেরে গেল আমার চোখের সামনে, আমারই কিছু হচ্ছে না—

—ওষুধ খাও, সারবে।

—লাল, নীল, সাদা কত রকম ওষুধই তো খেলাম! ওষুধ খেয়ে কিছু হবে না বাবু—আমাকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে দিন, দোহাই আপনার ডাক্তারবাবু—

—কি মুস্কিল, তোমার তো আর কালাজ্বর হয় নি, কি ইন্‌জেকশন দেব তোমাকে।

—সব অসুখেরই ইন্‌জেকশন আছে, সেদিন ঐ রক্ত-আমাশয় রুগীটা এল, একটা ইন্‌জেকশন দিতেই সেরে গেল!

বুড়ী রোজ হাসপাতালে আসে এবং কোথায় কি হয় লক্ষ্য করে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বিমল তথাপি বলিল—মাথাধরার ইন্‌জেকশন নেই কোন।

বুড়ী কিন্তু মানিল না, বিমলের পিছু লইল। বহুকাল পূর্ব্বে মৃত তাহার স্বামীর উল্লেখ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—সে ম'রে ইস্তক আমার এত হেনস্তা ডাক্তারবাবু! নিজের পেটের ছেলে, এত ক'রে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করলাম সেই এখন দেখে না, বউ নিয়ে উন্মত্ত। বউও জুটেছে একটা ডাইনী, নিজের পেটের ছেলেগুলোকেই পটপট ক'রে খেয়ে ফেললে, ঘরদোর শ্মশান হয়ে গেল আমার! এত লোকের মরণ হয় আমারই কেবল হয় না! যমেরও অরুচি আমি—

বিলাপ করিতে করিতে বুড়ী বিমলের বাসা পর্য্যন্ত আসিয়া হাজির হইল। বিমল তাহাকে আরও দুই-এক বার বলিল যে, তাহাকে দিবার মত ইন্‌জেকশন তাহার নাই। বুড়ী কিন্তু কিছুতেই শোনে না। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—নিজের পেটের ছেলেই যাকে দেখে না তাকে অপরে দেখবে কেন, কিন্তু আপনি শুনেছিলাম ভাল লোক, দয়াধর্ম্ম আছে, তাই সাহস ক'রে—

বুড়ী ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল। নিরুপায় বিমল শেষটা ঠিক করিল খানিকটা জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহারই দুই-চারি ফোঁটা বুড়ীকে ইন্‌জেকশন করিয়া দেওয়া যাক। নাছোড়বান্দা বুড়ী কিছুতেই ছাড়িবে না। বলিল—আচ্ছা ব'স, দিচ্ছি ইন্‌জেকশন!

টেস্ট-টিউবে জল গরম করিতে করিতে বিমলের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। মাইক্রসকোপের কাজের জন্য তাহার কাছে "মেথিলিন ব্লু"র কতকগুলি বড়ি ছিল। ময়দার গুলির ভিতর "মেথিলিন ব্লু"র কয়েকটি গুলি লুকাইয়া বিমল সেগুলি বুড়ীকে দিল এবং জলের ইন্‌জেকশন দিয়া অবশেষে বলিল—এই বড়িগুলোও খেও। বড় কড়া ইন্‌জেকশন! শরীরের সমস্ত বিষ বেরিয়ে যাবে।

বুড়ী খুশী হইয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বুড়ীর সহিত এই প্রবঞ্চনাটুকু করিয়া বিমলের ভারি আনন্দ হইল। ডাক্তারি করিতে করিতে কত প্রবঞ্চনাই যে করিতে হয়! দুঃস্থ লোককে সান্ত্বনা দেওয়াই যখন পেশা তখন প্রবঞ্চনা করিতে হইবে বইকি! কয়টা লোককে সত্য কথা বলিয়া আশ্বস্ত করা যায়!

আহারাদি শেষ করিয়া বিমল আবার হাসপাতালের দিকে রওনা হইল। সাধারণতঃ এ সময়টা সে একটু বিশ্রাম করে, কিন্তু আজ ফিমেল ওয়ার্ডে একটি নিউমোনিয়া রোগিণীকে সে ভর্ত্তি করিয়াছে, তাহার রক্তটা এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। হাসপাতালের গেটে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় তাহার

নজরে পড়িল একটি আধ-বয়সী মেয়ে আধঘোমটা দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার হাতে একটি গামলায় কলাপাতা দিয়া কি যেন ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে।

—কে তুমি?

মেয়েটি মাথার ঘোমটা আর একটু টানিয়া দিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল—আমি বাবু ঠাকুরের পরিবার।

—হাসপাতালের শিবু ঠাকুরের?

—হাঁ।

—গামলাতে ও কি?

মেয়েটি একটু কুন্ঠিত হইয়া পড়িল।

বিমল বলিল—কি আছে ওতে, দেখি ঢাকা খোল তো।

অতিশয় সঙ্কোচভরে মেয়েটি কলাপাতার ঢাকাটা খুলিয়া বলিল—হাসপাতালের রুগীদের দিয়ে যা ভাত বেঁচেছিল তাই নিয়ে যাচ্ছি—

বিমল দেখিল অন্ততঃ চার-পাঁচ জনের ভাত ডাল তরকারি গামলাতে রহিয়াছে।

—এত ভাত বেঁচেছিল? বল কি! মোটে তো দশ-বারো জন রুগী আছে। এস আমার সঙ্গে।

হাসপাতালে ঢুকিয়া অনুসন্ধান করিয়া বিমল স্তম্ভিত হইয়া গেল। শিবুঠাকুরের ভয়ে কোন রোগী প্রথমে কোন কথা বলিতেই চায় না। বিমল অভয় দেওয়াতে অবশেষে সকলেই বলিল যে তাহারা কোনদিনই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের এক-আধ মুঠা দিয়া সমস্তই শিবুঠাকুর প্রত্যহ লইয়া যায়। ভৈরব চাকরও প্রত্যহ তাহাদের অন্নে ভাগ বসায়।

বিমল বলিল—আচ্ছা, ব্যবস্থা করছি।

তৎক্ষণাৎ ভৈরব ও শিবুকে ডাকিয়া বিমল তাহাদের বেতন চুকাইয়া দিল এবং গুপিবাবুকে ডাকিয়া বলিল যে, এক জন নূতন ঠাকুর এবং নূতন চাকর অবিলম্বে চাই। ইহাদের আর রাখা চলিবে না। গুপিবাবু সহজে কোন কথা বলেন না, বলিলেও খুব কম বলেন। চশমার কাঁচের উপর দিয়া ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তিনি সমস্ত ব্যাপারটা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন ও সংক্ষেপে বলিলেন—আচ্ছা, দেখি। চট ক'রে পাওয়া মুস্কিল।

রুকমি আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল—মুস্কিল কিসের, নরু ঠাকুর তো ব'সে আছে, কেষ্টাও ব'সে আছে, ডাকলেই আসবে।

—তুই সব কথায় মাঝখানে ফোড়ন দিস কেন বল ত! আ গেল যা!

জানকীও তাহাকে ধমকাইয়া দিল—তুই বাড়ী যা না!

রাগে গরগর করিতে করিতে রুকমি চলিয়া গেল।

বিমল জানকীকে আদেশ করিল নরু ঠাকুর ও কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া আনিতে, আজই সে তাহাদের বাহাল করিবে।

ফিমেল ওয়ার্ডে নূতন রোগিণীটির রক্ত আনিতে গিয়া বিমল দেখিল সেদিনকার সেই যক্ষ্মাগ্রস্ত ভিখারীটা তাহার বিছানার পাশে মাটিতে বসিয়া একদৃষ্টে মেয়েটার মুখের পানে চাহিয়া আছে।

—তুমি এখানে ব'সে আছ কেন?

গুপিবাবু বলিলেন—এই নিয়ে চার বার হ'ল! এর আগে তিন বার মানা করেছি আমি। সেই থেকে কেবল এইখানে ঘুরঘুর করছে।

বিমল বলিল—যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

লগুড়াহত কুকুরের ন্যায় সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং বটগাছতলাটায় গিয়া বসিল। একটু পরে বিমল রক্ত পরীক্ষা করিয়া যখন ফিরিয়া যাইতেছে, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—বাবু!

—কি?

—ও মেয়েটা কি বাঁচবে?

—তুমি ওখানে গেছলে কেন? আর যেও না।

—আচ্ছা বাবু।

বিমল চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—ও কি বাঁচবে বাবু?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

—আমার অমনি একটি মেয়ে ছিল, বিনা ওষুধে বেঘোরে জ্বরে ছটফট করতে করতে মরে গেছে সে বাবু!

বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল তাহার কোটরগত

চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। বিমল দাঁড়াইয়া পড়িল।

—এ কি বাঁচবে বাবু? একটুও তো জ্ঞান নেই।

—শক্ত ব্যারাম, নিউমোনিয়া হয়েছে।

—আহা, শুনলাম ওর বাপ-মা কেউ নেই!

সত্যই মেয়েটি অনাথা, ওপারের অনাথ-আশ্রম হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। বিমল চলিয়া যাইতেছিল, আবার সে সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিল—আমি ওর কাছে ব'সে যদি একটু হাওয়া-টাওয়া করি তাতে ক্ষেতি কি বাবু?

—না, তুমি যেও না। ফিমেল ওয়ার্ডে পুরুষদের যাওয়া মানা।

সে আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমল বাড়ীতে পদার্পণ করিতে-না-করিতেই শ্রীহর্ষ বাবু—পাশের বাড়ীর সেই ভদ্রলোক যাঁহার ছেলের টাইফয়েড হইয়াছে—তিনি হন্তদন্ত হইয়া হাজির হইলেন।

—পাইখানার সঙ্গে খানিকটা রক্ত বেরিয়েছে যেন মনে হচ্ছে

বিমলের মুখ শুকাইয়া গেল।

—তাই নাকি? চলুন তো দেখি।

গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মুখ আরও শুকাইয়া গেল। সত্যই তো 'হেমারেজ' আরম্ভ হইয়াছে।

—ভূধরবাবুকে খবর দিন।

শ্রীহর্ষবাবু বলিলেন—লোক পাঠিয়েছিলাম, তিনি বাড়ীতে নেই।

—জগদীশবাবুকে খবর দিন তাহলে, আর এই ইন্‌জেকশনটি তাড়াতাড়ি আনিয়ে নিন।

লোক ছুটিল।

বিমল রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিল, নাড়ীর গতি ক্রমশঃই দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। পেটের ভিতর আরও রক্তক্ষয় হইতেছে নিশ্চয়। অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার।

জগদীশবাবুকে যে লোক ডাকিতে গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিল—জগদীশবাবুও বাড়ীতে নাই। বিমল ইন্‌জেকশনের জন্য যে 'সিরাম'টি আনিতে দিয়াছিল তাহাও এখানে পাওয়া গেল না। বিমল শেষে নিজের ব্যাগ হইতে মর্ফিয়া বাহির করিয়া আনিল। মর্ফিয়াও ইহার একটা ঔষধ।

শ্রীহর্ষবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ওটা কি ইন্‌জেকশন দেবেন?

—হাঁ।

—কি ওটা?

—মর্ফিয়া।

—ওটা দিলে তো—

শ্রীহর্ষবাবু বাক্যটা সম্পূর্ণ করিলেন না বটে, কিন্তু অর্থ বুঝিতে বিমলের কষ্ট হইল না। মর্ফিয়া দেওয়াটা বিপজ্জনক কি না তাহাই শ্রীহর্ষবাবু জানিতে চাহিতেছেন। মর্ফিয়া ঔষধটি শক্তিমান ঔষধ, শক্তিমান জিনিষ মাত্রেই নিরাপদ নয়। কিন্তু সে-কথা শ্রীহর্ষবাবুকে বলিলে তিনি আরও ঘাবড়াইয়া যাইবেন। হেমারেজে মর্ফিয়া বহু-কালের সনাতন ঔষধ, বিমল নূতন-কিছু করিতেছে না। তা ছাড়া অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার। বিমল বলিল—ও ওষুধটা যখন পাওয়া গেল না এইটেই দেওয়া যাক, এটাও হেমারেজের একটা ওষুধ। ক্যালসিয়মও একটা দিচ্ছি।

বিমল মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়া দিল। ক্যালসিয়মও দিল। একটু পরেই ছেলেটি ঘুমাইয়া পড়িল।

সে ঘুম কিন্তু আর ভাঙিল না।

রাত্রি আটটা নাগাদ ভূধরবাবু আসিলেন এবং নাড়ী টিপিয়া মুখ-বিকৃতি করিলেন, কিছু বলিলেন না, চলিয়া গেলেন। আর একটু পরে জগদীশবাবু আসিলেন ও মর্ফিয়া দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া এমন একটা মুখভাব করিলেন যাহা অবর্ণনীয়। সে মুখভাবে রোগীর জন্য আফশোষ, বিমলের অজ্ঞতার জন্য অনুকম্পা, রোগীর পিতার জন্য সহানুভূতি এবং তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে না ডাকাতে কি কাণ্ডটা হইল এই ধরণের একটা গর্ব্ব একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিল।

অপ্রস্তুত বিমল বলিল—হেমারেজে মর্ফিয়া দিতে কেতাবে তো লেখে।

—কেতাবে অনেক কথাই লেখে।

জগদীশবাবুর মুখটি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবের ডগাটি বিমলকে যেন ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। কেতাবাতীত অভিজ্ঞতার মহিমা লইয়া জগদীশবাবু চলিয়া গেলেন।

বিমূঢ় বিমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু পরেই ক্রন্দনের রোল উঠিল—নারীকণ্ঠের আর্ত হাহাকার—ওরে বাবা রে আমার ছেলেকে ইন্‌জেকশন দিয়ে মেরে ফেল্লে রে।

সেদিন রাত্রে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল।

রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় ফুলু আসিয়া বিমলের ঘুম ভাঙাইল—হাসপাতালের সেই নিমোনিয়া-রোগীটার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গরমের জন্য ফুলু রোজ আসিয়া হাসপাতালের বারান্দায় একটি ক্যাম্প-খাট বিছাইয়া শয়ন করে, আজও শুইয়াছিল। হঠাৎ ফিমেল ওয়ার্ড হইতে একটা দারুণ চীৎকার শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। সে গিয়া দেখে ঘর অন্ধকারে সেই লম্বা ভিখারী বুড়াটা ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাকে দেখিয়া মেয়েটা ভয়ে চীৎকার করিতেছে। তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়িতেছে দেখিয়া ফুলু শুপিবাবুকেও উঠাইয়াছিল।

শুপিবাবু বিমলকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

বিমল গিয়া দেখিল মেয়েটি মারা গিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ভয়েই হার্ট ফেল করিয়াছে।

ভিখারী বুড়াটা বারান্দার এক কোণে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে।

বিমলের ভয়ানক রাগ হইল। তাহার গালে ঠাস করিয়া একটা চড় মারিয়া বিমল বলিল—বেরিয়ে যাও তুমি হাসপাতাল থেকে—

টাল সামলাইতে না পারিয়া লোকটা পড়িয়া গেল। তাহার পর হইতে আর কেহ তাহাকে হাসপাতালের ত্রিসীমানায় দেখে নাই।

ক্রমশঃ

মায়ামৃগী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

মায়ামৃগী নাম রেখেছ আমার, সেই ভালো ওগো প্রিয়,
দূরে-দূরে রেখো বন্ধু, আমারে—বন্ধন নাহি দিও।
ভালো বে'সেছ, পরিচয় তারি অক্ষয় হয়ে থাক্‌,
জীবন-গহনে দিন কাটে যেন শুনি' ও বাঁশীর ডাক।
বনের ছায়ায় মনের মায়ায় তুমিও থাকিও দূরে,
শুধু বাঁশীখানি চিরদিন টানি' রাখে যেন সুরে-সুরে।

এ মায়ামৃগীর মায়া টুটে' গেলে যে মৃগী পড়িবে ধরা,
ক'দিন চলিবে কল্প-সায়রে তা'রে নিয়ে ঘটভরা?
সোনার সুষমা নিমেষে মিশাবে, যেন শিকারীর শরে,
মৃগমাংসের আদিম গন্ধ মিলায়ে ব্যাধের ঘরে!
সোহাগের সোনা গলায়ে যাহারে রচনা করেছে মন,
বাসনার ফাঁসে ধরিতে তাহারে করো না আকিঞ্চন।

বন্ধু আমার, হের ঐ দূরে আকাশের আঙিনায়
স্বর্ণসায়রে খেলিতেছে ঢেউ নীলে ও নটকনায়;
হের গিরিশিরে তারি নীচে ধীরে রঙে জমে' উঠে কায়া,
আশমানি হ'তে জাফ্‌রানি লাল,—বন্ধু, সবই তো মায়া!
বাঁশরী তোমার বাজাও বন্ধু, দূরে থেকে আমি শুনি,
সুরে সুরে ঘুরে' নামুক মর্ত্ত্যে স্বর্গের সুরধুনী!

থামিও না বাঁশী পরাণ-উদাসী—বাজাও বন্ধু, বাজাও!
তাতাও আমারে, মাতাও আমারে, মজাও আমারে,
সাজাও।
কস্তুরীসম আপন নেশায় আমিও হারায়ে দিশা,
ছুটাব তোমায়, লুটাব তোমায়, মিটাব না শুধু তৃষা;
মোহপাশে তবু বেঁধো না আমারে, ধরা পড়ি যদি ভুলে',
ভুলো না বন্ধু, লীলা আমাদের কল্প-সায়র-কূলে!

অ্যাপ্রেন্টিসের দিন

শ্রীসরলকুমার অধিকারী

পুরু পর্দার ফাঁক দিয়া রাস্তার আলোর সরু একটা ফালি দেওয়ালে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রায় চাঁদের আলোর মতই স্নিগ্ধ নীলাভ সে গ্যাসের আলো। ঘরের মধ্যকার পুঞ্জীভূত অন্ধকারে একটু যেন আলো-ছায়ার দোলা জাগাইয়া তুলিয়াছে, সেখানকার জিনিষপত্রের কিছু কিছু অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে।

কোণের দিকে ছোট একটি লোহার খাটে অঘোরে ঘুমাইতেছে নৃপেন সমাদ্দার। কান পাতিলেই তাহার মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে এবং কান না পাতিয়াও অনায়াসে শোনা যাইতেছে তাহার সাড়ে চার শিলিঙের ঘড়িটার অবিরাম টিক্ টিক্।

মিনিটের পর মিনিট যাইতেছে। বড় কাঁটাটি ঘুরিতেছে উপর হইতে নীচে, নীচে হইতে উপরে। চলে-না চলে-না করিয়া ঘণ্টার কাঁটাটিও চলিতেছে। কেবল স্থির হইয়া আছে সবার ছোট যেটি সে। তাহার উপরই কিন্তু নির্ভর করিতেছে ঘড়িটির সব বৈশিষ্ট্য। তাহার নির্দ্দেশমত রাত্রিশেষে বিশেষ ক্ষণে বিশেষ একটি কাজ করাই ঘড়িটার ধর্ম্ম। কার্য্যটি যাহাতে সুসম্পন্ন হয় সেজন্য তাহার কণ্ঠে আছে কঠিন কর্কশতা।

ঘর্-র্-র্-র্...কি বিশ্রী একটানা একটি শব্দ!

ঘুম ভাঙিয়া যায় নৃপেনের। লাফ দিয়া বিছানা ছাড়িয়া সে উঠিয়া দাঁড়ায়। শব্দটি কিসের, তত ক্ষণে সে বুঝিয়াছে। হাতড়াইতে হাতড়াইতে সর্ব্বাগ্রে সে তাহার কণ্ঠ রোধ করে, তাহার পর দরজার পাশে গিয়া আলোর সুইচটি টিপিয়া দেয়। ঘরে আলোর বন্যা জাগে, মুহূর্ত্তের জন্য চোখ দুটিকে বন্ধ করিতে হয়। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় ছ-টা।

আরম্ভ হয় তাহার দিন, ম্যাঞ্চেস্টারের দিন, ম্যাঞ্চেস্টার কারখানার দিন। চোখের ঘুম তখনও তাহার মিলায় নাই, শীতে শরীর কাঁপিতেছে, কণ্ঠে কটূক্তি আসে, জীবনকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে; তাহার মন বলে, "ভুলিয়া যাও কারখানার কথা, কম্বলের তলায় আর এক বার ঢুকিয়া পড়।" কিন্তু হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ে, দেখে বড় কাঁটাটি আর ছোটটির সঙ্গে প্রতি লাইনে নাই। সে তাড়াতাড়ি কন্‌কনে ঠাণ্ডা স্লিপারে পা ঢোকায়, গায়ে গরম ড্রেসিং-গাউনটি চাপায়। টুথব্রাশ, তোয়ালে, সেফ্‌টি-রেজর—এই সব লইয়া ব্যস্ত হইতে হয়। দাঁড়াইবার সময় নাই, ভাবিবার সময় নাই।

আরও তিনটি বাঙালী ছেলে এ বাড়ীতে থাকে। তাহারা যে যাহার ঘরে ঘুমাইতেছে। ইউনিভার্সিটির ছাত্র তাহারা, দু-আড়াই ঘণ্টা পরে উঠিলেও তাহাদের চলিবে। সমস্ত বাড়ীটি অন্ধকার, নিস্তব্ধ। সুইচ টেপার শব্দ পর্য্যন্ত কানে লাগিতেছে। দরজা খোলা, কাঠের মেঝের উপর দিয়া চলা, সব কিছুতেই যেন অতিরিক্ত শব্দ। বাথরুমের কাচের জানালা দিয়া নৃপেন দেখিতে পায় বাহিরে তখনও গ্যাস জ্বলিতেছে, সম্মুখের গাছগুলিতে যে দু-চারটি পাতা তখনও ঝরিয়া পড়ে নাই, তাহাদের গায়ে আলোর ঝিকিমিকি। রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই চিহ্ন উহাদের গায়ে তখনও লাগিয়া রহিয়াছে।

অনেক ক্ষণ পর-পর একটি মোটরের আওয়াজ পাওয়া যাইতেছিল। এইবার পাওয়া গেল পরিচিত একটি গাড়ীর ঘড় ঘড় এবং তাহার মস্ত বড় ঘোড়াটির পায়ের ক্লপ্ ক্লপ্ শব্দ। ক্-ল-প্ ক্-ল-প্ করিয়া তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিল। তাহার পর পাওয়া গেল এক জনের বুটের আওয়াজ; শুনিলেই বুঝা যায়, ছোট ছেলে একটি এবং সে দৌড়াইয়া আসিতেছে। দরজার কাছে এইবার

বোতলের ঠুংঠুং আওয়াজ পাওয়া গেল। দুধ আসিয়াছে। দরজা তখনও বন্ধ। বাহিরে ছিল আগের দিনের খালি বোতলগুলি, ছেলেটি ভর্ত্তি বোতলগুলি সেখানে রাখিয়া খালি বোতলগুলি লইয়া চলিয়া গেল। আবার চলিতে আরম্ভ করিল গাড়ী—ক্‌-ল-প্‌, ক্‌-ল-প্‌, ক্লপ্‌, ক্লপ্‌। ধীরে ধীরে আওয়াজ মিলাইয়া গেল।

এইবার বুড়ী ল্যাণ্ডলেডীর পায়ের শব্দ পাওয়া যাইতেছে। তিন তলার 'অ্যাটিকে' সে থাকে, সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে। তাহার দ্বিতীয় স্বামীর জীবদ্দশায় কিছু দিনের জন্য সে একটু আয়াসপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় তাহার দেহের এখানে-ওখানে যে মেদ ও মাংস আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল সেগুলিকে কিছুতেই সে আর তাড়াইতে পারে নাই। তাহার পায়ের তলায় পুরনো বাড়ীর ছেঁড়া লিনোলিয়াম-ঢাকা কাঠের সিঁড়িগুলি তাই মচ্‌মচ্‌ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।

বুড়ী বুঝিয়াছে যে নৃপেন উঠিয়াছে। তাহা না হইলে সে দরজায় 'নক্‌' করিত, ডাকিত, "মিঃ শ্যামাডার্‌" !

ঘরে ফিরিয়া নৃপেন দেখিল ঘড়িতে তখন ছ-টা কুড়ি। রাতের পোষাক ছাড়িয়া এবার সে পরিল অন্য পোষাক। টাই পরিতে তাহাকে এক সময় কি ধস্তাধস্তিই না করিতে হইত, আজকাল বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কোট পরিয়া পকেটগুলি একবার সে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, পয়সাকড়ি এবং 'ল্যাচ-কী' লইতে ভুল হইয়াছে কিনা। আলো নিবাইয়া যখন সে নীচেয় নামিল তখন ঠিক সাড়ে ছ-টা। খাবার টেবিলে বুড়ী তখন ব্রেকফার্স্ট সাজাইতেছে। 'গুড-মর্নিং' এবং 'থ্যাঙ্ক ইউ'-এর পালা শেষ করিয়া সে তাড়াতাড়ি খাইতে বসিল। অত সকালে খাওয়া তখনও তাহার অভ্যাস হয় নাই, এই তো মাত্র দেড় মাস হইল সে বিলাতে আসিয়াছে। মোটেই তখন তাহার খাইতে ইচ্ছা হয় না, আর খাইতে হইবে সেই তো এক—ফ্লেক্‌স্‌, দুধ, টোস্ট্‌, ডিম, মার্ম্মালেড্‌, চা—নিত্য ত্রিশ দিন একই জিনিষ! কি একঘেয়েই যে লাগে। কিন্তু উপায় কোথায়? বৈচিত্র্য জিনিষটিকে নিঃশেষে জীবন হইতে উড়াইয়া দিয়া সেখানে একঘেয়েমিকে প্রতিষ্ঠা করিতেই তো এ-দেশে আসা, সেই জন্যই তো যন্ত্ররাজের লীলাভূমিতে আজ এই অ্যাপ্রেন্টিসি; এ-দেশের লোকেদের মতই এক দিন যাহাতে জীবনটা হইয়া উঠিতে পারে—খাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, দিনের কাজ, এমন কি আমোদ-প্রমোদ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে ছাঁচে ঢালা, বাঁধাধরা—যাহাকে বলে 'ষ্ট্যাণ্ডার্‌-ডাইজ্‌ড'।

খাওয়া শেষ করিতে তাহার দশ মিনিটও লাগে না। ইতিমধ্যে বুড়ী লাঞ্চের একটি প্যাকেট এবং একটি আপেল দিয়া গিয়াছে। আর এক বার 'থ্যাঙ্ক ইউ' এবং 'গুড মর্নিং'-এর পালা শেষ করিয়া সে রেন্‌কোটটি গায়ে চাপাইয়া যখন দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল তখন দেখে—সমানে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, সঙ্গে ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া। মন তাহার আবার এক বার কারখানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে চায়।

ঘড়িতে তখন পৌনে সাতটা, রাস্তায় তখনও আলো জ্বলিতেছে। সে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া চলে। দশ মিনিটের মধ্যে তাহাকে আপার ক্রক্‌ ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছাইতে হইবে। ছটা-পঞ্চান্ন মিনিটে সেখানে আসিবে তাহার ট্রাম।

মধ্যে মধ্যে এক-আধটি লোক মাত্র তখন পথে দেখা যাইতেছে। তাহারই মত হয়ত কোন কারখানার যাত্রী। রাস্তার দু-ধারে সারি সারি বাড়ী। সকলেরই প্রায় এক চেহারা। সেই সম্মুখে একটু রেলিং, কালো হইয়া গিয়াছে দেওয়াল, ঢালু স্লেটের ছাদ, উপরে চিমনি। তাহাদের একটির সম্মুখে দেখিল একটি আধাবয়সী মেয়ে এপ্রন পরিয়া সেই সকালে সিঁড়িতে পাথর ঘষিতেছে। মেয়েটির জন্য নৃপেনের মনে একটু দুঃখই হয়—তাহাদের মনে মনে বাহাদুরি দিতেই ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে ভুলিয়া যায় যে তাহার কত মা দিদি বাংলা দেশের কত গ্রামে গ্রামে এমন ভোরেই ঠাণ্ডা জলে ঘর নিকাইতেছে।

লম্বা লম্বা ব্রাশ লইয়া চার জন ঝাড়ুদার রাস্তার একটি মোড়ে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল। সিগারেট খাইতে খাইতে এইবার তাহারা তাহাদের কাজ আরম্ভ করিল। নৃপেন যখন পাশ দিয়া যায় উহাদের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল, 'গুড্‌মর্নিং'। তাহার সঙ্গে আলাপ আছে

বলিয়া নয়, এমনই। হয়ত সকালে কালো মানুষ দেখিয়া তাহার আনন্দ হইয়াছে, মনে করিয়াছে দিনটি তাহার ভাল যাইবে—black for luck, এ ধারণা ইহাদের মজ্জাগত।

ট্রাম তখনও আসিয়া পৌছে নাই। ট্রাম-স্টপের কাছে চার-পাঁচ জন দাঁড়াইয়া ছিল। এক জন তাহাদের মধ্যে নৃপেনের পরিচিত। সে ভারত-ফেরত। ট্রামের জন্য এখানে এমন দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই তাহার আলাপ হয়। দেখা হইতেই সে বলিল, 'নার্স্টি মর্ণিং, ইজ্‌ন্‌ট্‌ইট্‌!' দেখিতে দেখিতে আরও তিন-চার জন আসিয়া জুটিল। তাহাদের মধ্যে মেয়ে আছে, ছোট ছেলেও আছে একটি। দেখিয়া তাহাকে বার-তের বছরের বেশী বলিয়া মনে হয় না, যদিও বয়স তাহার নিশ্চয়ই বেশীই, চৌদ্দ বছরের কম হইলে কোন ছেলে বা মেয়ে কারখানায় ঢুকিতে পারে না। বর্ত্তমানে আন্দোলন চলিতেছে সে বয়স পনর বৎসর করিবার।

ট্রাম আসিয়া গেল। দোতলা ট্রাম। 'কিউ' করিয়া একে একে সকলে উঠিয়া গেল, কতক উপরতলায় কতক নীচেয়। ট্রামে তখনও পর্য্যন্ত লোক তেমন উঠে নাই। কণ্ডাক্টার টিকিট দিবার সময় সবুজ রঙের অন্য একখানি টিকিট দিয়া গেল—'workman's ticket', সেখানি ফিরিবার সময় দেখাইলে ভাড়া কিছু সস্তা হইবে। সাতটার আগে না হইলে এ টিকিট পাওয়া যায় না।

রাস্তার আলো নিবিয়া গিয়াছে। ট্রামখানি ঘুরিয়া-ফিরিয়া এইবার কারখানা-অঞ্চলের পথ ধরিয়াছে। অনেক বড় বড় কারখানা ম্যাঞ্চেস্টারের এই পাড়াটিতে ভীড় করিয়া আছে। রাস্তায় ট্রাম ও বাসের ভীড় ক্রমশঃই বাড়িতেছে। এ ট্রাম অনেক ক্ষণ হইল ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। যত জন বসিবার কথা তাহার বেশী এক জনকেও কণ্ডাক্টার উঠিতে দেয় নাই। অনেকেই তখন ট্রামে কাগজ পড়িতেছে। কণ্ডাক্টার একবার হাঁকিয়া গেল, 'অল্ পর্ট্ টিকেট প্লীজ্!'

ইংলণ্ডের বিখ্যাত একটি ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানীর কারখানা। পনর হাজারের উপর লোক এখানে কাজ করে। শুধু ইংলণ্ড নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহার খ্যাতি। এমন দেশ নাই যেখানে ইহাদের গড়া কোন-না-কোন জিনিষ ব্যবহার না হয়। তাই এখানে কাজ শিখিতে আসে যেমন ভারতের সেন, শর্ম্মা, শম্ভাশিবম্, তেমনই ইরানের শোরাব, স্পেনের আরিয়ো, রাশিয়ার আইভানফ-নিকুটিন, চীনের শু-শি-উ, জাপানের তাকাহাসি-নিশিহারা, আয়ার্‌ল্যাণ্ডের ওডিয়া-ওশিয়া, মিশরের হামিদ-মার্জ্জুক, সিংহলের বিমলসুরেন্দ্র, শ্যামের কোভানন্দ। ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং যাহারা করিতে চায় তাহাদের পেশা, এই কারখানায় ঢোকাটি তাহারা এখনও পর্যন্ত সৌভাগ্যের কথা বলিয়াই মানে, মক্কা-কাশীর মতই পরম তীর্থ এটি তাহাদের পক্ষে।

সাতটা-পঁচিশ তখন। কারখানার সম্মুখে ট্রাম আসিয়া থামিয়াছে। দলে দলে মেয়ে-পুরুষে কারখানায় ঢুকিতেছে। নানা অঞ্চল হইতে ট্রাম-বাস মেয়ে-পুরুষে ভর্ত্তি হইয়া সমানে আসিতেছে। ইহা ভিন্ন আছে—সাইক্লিস্ট মোটর-সাইক্লিস্টের দল, আছে মোটরিস্টের দল, হাঁটিয়াও কম লোক আসিতেছে না। এইটি নর্থ গেট। ইহা ছাড়া আরও দুইটি গেট আছে, সেখানেও এ সময়ে ঠিক একই ধরণের ভীড়। পোষাক দেখিলেই বোঝা যায় কারখানার যাত্রী ইহারা। ময়লা প্যাণ্ট, ওভার-অল গায়ে রেনকোট বা ওভারকোট—মাথায় ক্যাপ ও বোর। হাতে কাহারও কাহারও এক একটি 'কেস্', মেয়েদের হাতেই বেশী। তাহাতে তাহাদের লাঞ্চ ছাড়াও আছে গল্পের বই, বুনিবার উল, হয়ত বা প্রেমপত্রই। পুরুষদের পক্ষে তাহাদের ম্যাক্ বা ওভারকোটের বড় বড় পকেটই লাঞ্চ-প্যাকেটের পক্ষে যথেষ্ট। এখন যত মেয়ে আসিতেছে তাহারা অধিকাংশই হাতে কাজ করে, চেহারায় প্রায় প্রত্যেকেরই আছে একটা কঠোর কাঠিন্য, মুখে রুক্ষতার ছায়া। হয়ত সন্ধ্যার পর ইহাদের চেহারাই অন্য রকম হইয়া উঠিবে—কিন্তু এই সকালে যখন তাহারা তাড়াতাড়ি ঘুম হইতে উঠিয়া মুখে রং মাখিবার সময় না পাইয়া এমনই বাহির হইয়াছে, তখন সে মুখ দেখিয়া শুধু এই কথাই মনে হয় যে, যন্ত্রযুগের আবর্ত্তে পড়িয়া এদেশের মেয়েরা বুঝি আর নারী রহিল না।

বেলা সাড়ে আটটায় সময় কারখানায় আর এক দল আসিবে—আপিসের কেরানী ও ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান, এঞ্জিনীয়ার ইত্যাদির দল। কারখানার জগতে তাহারাই অ্যারিস্টোক্র্যাট। পোষাকে, চেহারায়, এমন কি তাহাদের কথাবার্ত্তায় পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলে। তাহাদের ক্যান্‌টিন পর্য্যন্ত ভিন্ন। সেই দলে যে-সমস্ত মেয়ে থাকিবে তাহারাই জাগাইবে অ্যাপ্রেন্‌টিস্‌দের বুকে রক্তের দোলা, তাহারা হইবে ইহাদের নাচের পার্টনার, হইবে ছবিতে যাইবার সাথী! ভ্যানিটি ব্যাগ তাহাদের সঙ্গের সাথী। এ মেয়েরা পরিবে ব্রাউন রঙের ওভার-অল, আপিসের তাহারা পরিবে সবুজ রঙের। কারখানার প্রজাপতি তাহারাই।

নৃপেন যখন ট্রাম হইতে নামিয়া দেখিল তাহার তখনও পাঁচ মিনিট সময় আছে, তখন সে আর ছুটিবার প্রয়োজন মনে করিল না, জোরে হাঁটিয়া চলিল মাত্র। একটু পরে আসিলে দেখা যাইত দলে দলে লোকে তখন ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে—এ ছুটন্ত অবস্থাতেই পেনি ফেলিয়া খবরের কাগজ তুলিয়া লইয়া যাইতেছে! বেশীর ভাগই ডেলি এক্‌স্‌প্রেস—ডেলি ডিস্‌প্যাচ জাতীয় কাগজ—চমক দেওয়াই যাহাদের মূলমন্ত্র।

গেট পার হইলেই পড়ে কারখানার রেল-লাইন, তাহার পর মোটরের পার্কিং করিবার জায়গা, তাহারও ও পাশে আসল কারখানা। বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না, লোহা ও কাচ দিয়া সমস্ত ঢাকা। রেলগাড়ী ঢুকিবার বড় দরজা তখন বন্ধ—তাহারই মধ্যে কাটা ছোট একটি দরজা দিয়া সকলে ঢুকিতেছে। কারখানার মধ্যে ঢুকিলেই প্রথমে দেখা যায় প্রায় হাজার ফুট লম্বা লম্বা এক একটি 'আইল,' তিনটি তাহার মধ্যে খুব উঁচু উঁচু। দু-পাশে তাহার বিরাটদর্শন সব কলকব্জা, বড় বড় পাওয়ার হাউসের জন্ত তৈয়ারী হইতেছে যে-সব টার্বিন, কনডেন্সার ও জেনারেটার তাহাদেরই সব অস্থিমার কঙ্কাল, বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন অবস্থায়। মাথার উপর যাওয়া-আসা করিতেছে এক-শ টনের ক্রেন, দরকার হইলে তাহারা কাজ করে দুই ক্রেনে জোড় বাঁধিয়া। ইহা ভিন্ন আর যে আইলগুলি সেগুলি দুই-তলা। দুই তলার মধ্যে আছে লম্বা লম্বা স্টোর, সেগুলি দেড়-তলায়। এইটিই প্রধান 'শপ'—ইহা ভিন্ন আরও এমন সাত-আটটি বড় বড় শপ আছে একই কম্পাউণ্ডের মধ্যে।

নৃপেনকে কাজ করিতে হয় উপরের একটি আইলে। উঠিয়া প্রথমে সে বোর্ড হইতে তাহার নামের কার্ডখানি লইয়া 'ক্লক্' করিয়া অন্ত বোর্ডে রাখিয়া দিল। ঘড়ির তলায় একটি ফাঁকে কার্ডখানি দিয়া একটি লিভার টিপিলেই কার্ডের উপরে খটাং করিয়া ছাপ পড়িয়া যায় কত ঘণ্টা কত মিনিটের সময় সে আসিয়াছে। সাড়ে সাতটায় এক মিনিটও পরে যদি কেহ আসে তাহার রোজ কাটা যাইবে এবং বিনা হুকুমে এক ঘণ্টার বেশী দেরি করিয়া আসিলে ফোরম্যান তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিবে। আর দেরি করিয়া আসিলেই সঙ্গীরা 'গুডমর্নিং' না বলিয়া বলিবে 'গুড আফ্‌টারনুন।'

ক্লক করিবার পর সে জামা রাখিবার জায়গায় তাহার রেনকোট এবং কোট খুলিয়া রাখিল। কারখানাতেই সে তাহার ওভার-অল রাখিয়া যায়—সেইটিকে তাড়াতাড়ি পরিতে পরিতেই ইলেক্‌ট্রিক হর্ন গোঁ-ও-ও করিয়া বাজিয়া উঠিল। তখনও পর্য্যন্ত সমানে লোক আসিতেছিল এবং ঘড়ির কাছে খটাং খটাং চলিতেছিল, যাহারা একটু সকাল সকাল আসিয়াছে তাহারা ঐ ফাঁকে কাগজগুলিতে একটু চোখ বুলাইয়া লইয়াছে—বিশেষ করিয়া স্পোর্টিং নিউজের পাতাটায়।

ভোঁ বাজিতেই যে যাহার বেঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাজ আরম্ভ করিল। তিন ফুট উঁচু বেঞ্চ—তাহার উপরে খোপে খোপে নানা মাপের বোল্ট নাট, ড্রয়ারে হাতুড়ি উখো—খোপের সম্মুখে জিনিষ রাখিয়া কাজ করিবার জায়গা, পাশে ভাইস। ফোরম্যানও তখনই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার এলাকায় একটু টহল দিয়া আসিবে। তাহার নীচেয় আছে আণ্ডার-ফোরম্যান এবং তাহারও নীচেয় চার্জ্জহ্যাণ্ড। সে আসিয়া নৃপেনকে এবং অন্ত এক জন অ্যাপ্রেন্‌টিস্‌কে কাজ দিয়া গেল। তাহারা দুই জনে একই কাজ করে। পিস্ ওয়ার্ক, হয়ত একটি সুইচের বা কনট্রোলারের কোন অংশ, তাহাই

হয়ত বা কোন কিছুর। করিতে হইবে অমন হয়ত হাজার কি দু-হাজার। হিসাব আছে ঘণ্টায় কতগুলি করিতে হইবে। বেশী করিতে পারিলে বেশী পয়সা, কমিলে কর্ত্তন। অত্যন্ত নীরস, বিরক্তিকর সে-কাজ। পরিশ্রম খুব বেশী যে কাজে তাহা নয়। হয়ত খানিকটা উখো ঘষা, হয়ত কতকগুলি বল্টু এবং নাট লাগানো, হয়ত বা একটু হাতুড়ির ঘা দেওয়া। কিন্তু এত বেশীক্ষণ ধরিয়া একই কাজ করিতে হয় যে প্রথম প্রথম হাত আড়ষ্ট হইয়া উঠে, ফোস্কাও পড়ে, পিঠের দিকটি বেশ টন টন করিতে থাকে এবং বেকায়দা হইলে হাতুড়ির এক-আধটি ঘাও হাতে লাগে।

হাত তখন তাহাদের সমানে চলিতেছে। সমানে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে করিতে নৃপেনের তখন পা ধরিয়া আসিতেছে, দেহের ভার রাখিতে হইতেছে এক বার এ-পায়ে আর বার ও-পায়ে। মাত্র এক মাস হইল সে কারখানায় ভর্ত্তি হইয়াছে। আট ঘণ্টা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এমন কাজ করা তখনও তাহার অভ্যাস হয় নাই।

জিনিষগুলি তৈয়ারী করিয়া তাহারা একটি টিনের বাক্সে রাখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটি ভর্ত্তি হইয়া উঠিল। লোহা, তামা এবং পিতলের জিনিষ। ওজন বড় কম হয় নাই। সেইটিকে বহিয়া লইয়া যাইতে হইল নীচে স্টোরে। নূতন আর একটি খালি বাক্স লইয়া আসিতে হইল ভর্ত্তি করিবার জন্য।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইতেছে। মনে হইতেছে, সম্মুখের বড় ঘড়িটা যেন বড় আস্তেই চলিতেছে। বারটা বাজিবার তখনও অনেক দেরি।

কাজ করিতে করিতে হঠাৎ নৃপেন শুনিল, খুব মিহি গলায় কে যেন বলিতেছে 'থ্যাঙ্ক ইউ'। দেখিল ফোরম্যানের আপিসের মেয়েটি তাহাকে একখানি চিঠি দিতে আসিয়াছে। মুখে এবং দেহে সে এমনই একটি ভঙ্গী ফুটাইয়া তুলিয়াছে—যাহা দেখিয়া মনে হয় চিঠিখানি লইয়া তাহাকে যেন ধন্য করা হইবে, 'থ্যাঙ্ক ইউ'টি সে আগামই দিয়া রাখিতেছে চিঠি হাত বাড়াইয়া নিতে যে কষ্টটুকু হইবে তাহার জন্য। এ সব বিলাতী ভদ্রতার মুখোসগুলির সঙ্গে নৃপেনের তখনও ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই। সে বেশ একটু অভিভূত হইয়া পড়ে। 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ' বলিয়া সে চিঠিখানি নিতেই মেয়েটি ঘুরপাক খাইয়া চটপট চলিয়া যায় নিজের জায়গায়।

ক্ষয়-ধরা, শুষ্ক চেহারা মেয়েটির। বয়সের আন্দাজ মোটেই পাওয়া যায় না। তাহার উপরে চুলগুলি তাহার ছেলেদের মত করিয়া কাটা। না হাসিলে তাহার মুখের দিকে চাওয়াই যায় না। নৃপেন কিন্তু ভাবে, চমৎকার স্মার্ট মেয়েটি!

চিঠিখানি এক সময় সে খুলিয়া পড়িল। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের চিঠি, আগামী শুক্রবার সে যেন গিয়া 'সেফটি ফার্স্ট'-এর লেকচার শুনিয়া আসে। নৃপেন পাশের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে, লেকচারটি কি রকম। শুনিতে পায় সেখানে কি কি জিনিষ দেখা যাইবে। বিপদজনক হাতুড়ি, গ্রাইণ্ডস্টোন, ইলেকট্রিকের তার ইত্যাদি অনেক কিছু জিনিষ—যাহারা এত দিন বিপদ ঘটাইয়াছে বা ঘটাইতে পারে তাহাদের একটি চমৎকার একজিবিশন। শোনা যাইবে কারখানায় কাজ করিবার সময় কি কি করিতে মানা। তাহার দুর্ঘটনার জন্য কোম্পানী দায়ী, সে জন্য তাহারা চায় বিপদ যাহাতে না ঘটে সেই চেষ্টা সে যাহাতে প্রথম হইতেই করে। সেফটি ইন্‌স্পেক্টরের চেহারাটি নাকি পিকুইকিয়ান। কথা বলিতে বলিতে উহারা দু-জনে হাসিতেছিল, এমন সময় ও-পাশ হইতে এক জন বলিয়া উঠিল, 'এই রবিনসন তোমাদের দেখছে কিন্তু।'

রবিনসন আণ্ডার-ফোরম্যান। শ্যেনদৃষ্টি তাহার সর্ব্বত্র ঘুরিতেছে, বিশেষ লক্ষ্য তাহার অ্যাপ্রেণ্টিসদের উপর। উহারা একটু তফাৎ হইয়া দাঁড়ায়, হাত চালায় একটু জোরে।

বারটা বাজিবার যে আর বেশী দেরি নাই তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারা গেল। ওয়ার্কম্যানদের চায়ের 'ক্যান' তখন দলে দলে বাহিরে চলিয়াছে। এক-এক জন ছোকরা অমন পনর-কুড়িটি ক্যান ট্রেতে করিয়া লইয়া চলিয়াছে। ক্যানে আছে চা-চিনি হয়ত চা ও কণ্ডেন্সড মিল্ক। বাহিরে আছে গরম জলের ট্যাপ—এইগুলি ভরিবার জন্য তখন সেখানে লম্বা কিউ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বারটায় ভোঁ বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে সুরু হইল ক্লকিংয়ের পালা। লম্বা কিউ তখন ঘড়ির পিছনে। তাহার পর এলোমেলো ছুটাছুটি, মেয়ে-পুরুষের স্রোত ক্যান্টনের দিকে। মেয়েরাই বেশী। আপিসের মেয়ে, কলের মেয়ে, এক হইয়াছে তখন। উল্টা দিক হইতে সে স্রোত ঠেলিয়া কাহাকেও আসিতে হইলে অনেক ধাক্কা খাইতে হইবে তাহাদের। অবশ্য সে ধাক্কা ধাক্কা বলিয়া মনে কেহই করিবে না।

মোটরে, সাইকেলে অনেকে এ-সময় বাড়ী চলিয়া গেল। ছেলেমেয়েরা কেহ কেহ গেটের বাহিরের দোকান হইতে 'ফিস অ্যাণ্ড চিপ্‌স্' কিনিয়া আনিতেছে, দু-একটি রোগা রোগা লোকের হাতে তখন দুধের বোতল।

ওয়ার্কম্যানরা অনেকেই বাড়ী হইতে খাবার আনিয়াছে। এ-কোণে ও-কোণে প্রত্যেকেরই নির্দ্দিষ্ট একটি জায়গা আছে, বসিবার জন্য কাহারও আছে একটি কেরোসিন কাঠের বাক্স, কাহারও বা একখানি তক্তা। সেইগুলি পাতিয়া তাহারা ইতিমধ্যে বসিয়া পড়িয়াছে। কোলের উপর ব্রাউন পেপারে তখন তাহাদের মোটা মোটা স্যাণ্ডুইচ, হাতে খবরের কাগজ এবং পাশে ক্যান-ভর্ত্তি চা। কাহারও কাহারও চা শুধু চা-ই, তাহাতে না আছে দুধ, না আছে চিনি।

নৃপেন ইতিমধ্যে এডুকেশন আপিস হইতে হাত ধুইয়া আসিয়াছে। তাহারা স্টাফের অন্তর্গত, ওয়ার্কম্যান নয়, সেজন্য তাহাদের আছে গরম জলের ব্যবস্থা, আছে তোয়ালে, আছে সাবান। কারখানায় খাইতে হইলে তাহারা যাইবে স্টাফ্‌-ক্যানটিনে।

অ্যাপ্রেন্‌টিস্‌দের এ-কারখানায় একটি মোটা লাইন দিয়া দুই ভাগ করা আছে। এক দিকে ট্রেড অ্যাপ্রেন্‌টিস্‌রা —যাহারা কারখানায় ঢুকিবে চৌদ্দ বৎসর বয়সে এবং কাজ শিখিবে একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। তাহারাই হইল কারখানার ভবিষ্যৎ ওয়ার্কম্যান বা মিস্ত্রীমহল। অন্য দিকে সি অ্যাণ্ড্ এস্ সেক্‌শন। তাহাতে ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটেরা, বাহির হইতে আসিয়াছে যে-সব স্পেশ্যাল ট্রেনি তাহারা, স্কুল অ্যাপ্রেন্‌টিস্, ভেকেশন অ্যাপ্রেন্‌টিস্ এই সব। ইহাদের মধ্যেই আছে কারখানার ভবিষ্যৎ স্টাফের দল। ইন্‌স্‌পেক্টর, ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান্ এঞ্জিনীয়ারের দল, হয়ত বা এক আধ জন ডাইরেক্টারই। ট্রেড অ্যাপ্রেন্‌টিস্‌দের মতে এইটি হইল নবাবের সেক্‌শন।

নৃপেনের তখনও খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বাছাবাছি সম্পূর্ণ বজায় আছে। ক্যান্‌টিনের খাওয়া তাহার পছন্দ হয় না। সে বাড়ী হইতে লাঞ্চ লইয়া আসে। তাহার কলের জায়গার কাছে নিরিবিলিতে একটি বসিবার জায়গা ঠিক করা আছে—সেখানে এক লোহার বাক্সে বসিয়া সে তাহার লাঞ্চ শেষ করে। ছ-খানা ডিমের স্যাণ্ডুইচ, একল্‌স্ কেক দু-খানা, আপেল একটি। পেটে জ্বলে তখন তার এমনই আগুন যে সব জিনিষই সুন্দর লাগে, মনে হয় ঐ শুকনো স্যাণ্ডুইচ আরও যদি থাকিত তো ভাল হইত। খাবার-মোড়া কাগজখানি ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলিয়া সে ঘুরিতে বাহির হয়। প্রকাণ্ড বড় তারের একটি ঝুড়ি, খাবার-মোড়া কাগজে কাগজে তত ক্ষণে প্রায় ভর্ত্তি হইয়া আসিয়াছে।

সাড়ে বারটা বাজে তখন। ওখানে অনেকেরই তখন খাওয়া শেষ হইয়াছে। কেহ কেহ তাস খেলিতে বসিয়াছে, কেহ বা কাগজ পড়িতেছে, দু-চার জন চেষ্টায় আছে ঘুমাইবার। অনেকে এখানে ওখানে আড্ডা দিতেও বাহির হইয়াছে।

নৃপেন প্রথমে একটি বেঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কয়েকখানি নক্সা-পত্র লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিল, নূতন ধরণের একটি সুইচ দেখিয়া তাহার ভিতরে জিনিষপত্র-গুলির সঙ্গে একটু পরিচয় করিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর বাহির হইল ঘুরিতে।

বহু জায়গায় দেখিল দেওয়ালে বোর্ড টাঙাইয়া ছেলেয় বুড়োয় 'ডার্ট' খেলিতেছে, ছোট ছোট কয়টি ছেলে একটি বড় প্লেনিং মেশিনের উপরে ক্যারম-বোর্ড পাতিয়াছে, তাসের দল তো এখানে ওখানে আছেই। ক্যানটিন হইতে দলে দলে তখন মেয়েরা ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সব চেয়ে বেশী মেয়ে কাজ করে কয়েল ডিপার্টমেণ্টে, মিটারে এবং অটোমেটিক স্ক্রু কাটিং, পাকিং এবং স্লটিং মেশিনে। অনেক জায়গায় মেয়েরা ইতিমধ্যেই ফিরিয়াছে। গোল হইয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। এক জায়গায় নৃপেন

দেখিল এক জন আর এক জনের চুল আঁচড়াইয়া দিচ্ছে—সিঁদুর পরাইতেছে না এই যা দুঃখ।

নিরালা দু-একটি জায়গায় অল্প-বয়সীরা জোড় বাঁধিয়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছেই—অন্যান্য জায়গাতেও আছে। তাহাদের সেই অতরঙ্গ ভাব, মুখোমুখি চাহিয়া থাকা, গল্প করা এবং হাসির নমুনা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ইহাদের মধ্যে চলিতেছে প্রেমের কূজন, ইহারা যাহাকে বলে কোর্টিং, প্রতিদিন একই জায়গায় ইহাদের এমন দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যাইবে, খাওয়ার পর হইতে একটার ভোঁ পর্যন্ত এই ভাবেই উহারা সময় কাটাইবে, লোকের কাছে পরিচয় দিবার সময় এ বলিবে ও আমার 'গার্ল', ও বলিবে এ আমার 'বয়'। সপ্তাহের শেষে ছবিতে বা নাচে যাইতে হইলে দু-জনেই এক সঙ্গে যাইবে, আগস্ট-হলিডের সময় কোথাও যখন বেড়াইতে যাইবে তখনও যাইবে তাহারা একই জায়গায়। বছরের পর বছর পার হইয়া যাইবে। তাহার পর যেদিন দেখিবে ঘর-সংসার পাতিবার মত একটি অঙ্ক দেখা দিয়াছে ব্যাঙ্কের খাতায়—তখন তাহারা করিবে বিবাহের আয়োজন। বিবাহ হইয়া গেলে মেয়েটি আর কাজ করিবে না। কারখানার অধিকাংশ মেয়েই আকাইয়া আছে এই পরমক্ষণটির জন্য, কবে তাহারা হইতে পারিবে গৃহিণী, হইতে পারিবে সন্তানের জননী। সে-সম্ভাবনা যখন হইয়া আসে সুদূর-পরাহত, নিজের চেহারার জন্যই হোক, কি বয়সের জন্যই হোক, কি অন্য যে কোন কারণেই হোক, তখনই তাহারা সঙ্গ দিতে আরম্ভ করে বহুকে, তখনই তাহারা হইয়া উঠে—'স্পোর্টি সর্ট'।

প্রথম প্রথম কারখানার এখানে ওখানে এসব দৃশ্যে নৃপেন চমকাইয়াই উঠিত। তবে দু-দিনেই তাহার সে-ভাব কাটিয়া গিয়াছে। আজকাল আর সে ইহার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু খুঁজিয়া পায় না।

তখনও একটা বাজিতে দশ-বার মিনিট বাকী। বাহিরে একটু ঘুরিবে বলিয়া সে নীচে নামিল। দেখে তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে এবং উহারই মধ্যে এক দল ছোকরা ওভার-অল পরিয়াই ইয়ার্ডে ফুটবল খেলিতেছে। সে ফিরিয়া আসিল এবং একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া হাজির হইল তাহার নিজের জায়গার কাছেই। আসিবার সময় দু-চার জনের সঙ্গে দেখা হইল—যাহারা তাহার পরিচিত। কেহ বলিল, হা ডিডু—কেহ বা শুধু হ্যালো—কেহ কেহ দোলাইয়া গেল তাহাদের মাথাটা। পাঁচ মিনিট আগেকার ভোঁ তখন পড়িয়া গিয়াছে, ছোট ছোট দলে আড্ডা ধরিয়াছে। সকলেরই গতি তখন দ্রুত। যাহারা ক্লক করিয়া আসে নাই তাহারা তখন ছুটিতেছে।

একটার ভোঁর সঙ্গে সঙ্গে আবার সমস্ত মেশিন চলিতে আরম্ভ করিল, লোহার মেশিন, মানুষ মেশিন—সকলেই।

বেলা তিনটা নাগাদ নৃপেনের হাতের কাজ সব শেষ হইয়া গেল। চার্জহ্যাণ্ড আসিয়া অন্য ছেলেটিকে ওপাশের অন্য এক জনকে সাহায্য করিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল। নৃপেন তখন চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে। অন্য সকলে কাজ করিতেছে সে দেখিতেছে, অথচ সে-ই নিজে কিছু করিতেছে না। তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। দূরে তিন-চার জনে মিলিয়া একটি কাজ করিতেছিল। কাজটিতে অনেক শিখিবার জিনিষ আছে। দেখিল ফোরম্যানও ঐ অঞ্চলেই ঘুরিতেছে।

বিলাতে কারখানার ফোরম্যানদের খুব বদনাম আছে। ব্লু-স্যুট পরা এই লোকগুলির নাকি একমাত্র কাজ হইল লোকজনদের তাড়না করা, ইহাদের মেজাজের তুলনায় নাকি সার্জেন্ট মেজরদের মেজাজও অনেক শান্ত।

এ ফোরম্যানও অবশ্য ব্লু-স্যুটই পরিয়া আছে কিন্তু মেজাজ ইহার মোটেই খারাপ নয়, মুখে সব সময়ই ইহার হাসি লাগিয়া আছে। চৌদ্দ বছর বয়সে এক দিন সে এই কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস হইয়া ঢোকে, তাহার পর ওয়ার্কম্যান, চার্জহ্যাণ্ড, আণ্ডার-ফোরম্যান সব রকমের কাজ করিয়া এখন ফোরম্যান হইয়াছে।

নৃপেন গিয়া তাহাকে যেই বলিল, "আমার হাতে এখন কোন কাজ নেই, আমি ঐ কাজটা একটু দেখতে পারি কি?" ফোরম্যান অনুমতি তো তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে দিলই, উপরন্তু সেখানে গিয়া এক জনকে বলিয়া দিয়া আসিল নৃপেনকে ভাল করিয়া সব কিছু যেন বুঝাইয়া দেয়।

যাহারা কাজটি করিতেছিল তাহারা সকলেই পুরানো



গ্রামের পথে

শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

লোক। শুধু যে এই কারখানায় পুরানো তাহা নয়, এই কাজেও তাহারা পুরানো। এই একই ধরণের কাজ তাহারা হয়ত কত বৎসর ধরিয়া করিয়া চলিয়াছে—যাহার জন্য যেমন তাহাদের কাজের ফিনিশ তেমনই তাহাদের স্পীড। কোথায় কতটুকু ঘা দিবার প্রযোজন, কোথায় কি তার কতটুকু বাঁকাইতে হইবে, কতটুকু কাটিতে হইবে, কতটুকু চাপ দেওয়া প্রয়োজন, সে সমস্তই তাহাদের নখদর্পণে। ইহা ভিন্ন সব চেয়ে যে জিনিষটি নৃপেনকে মুগ্ধ করে সে ইহাদের স্বাস্থ্য, ইহাদের দেহের গঠন। কাজের তালে তালে বাহুর প্রতিটি মাংসপেশী তাহাদের নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। হাত নয় তো, এক-একখানি যেন থাবা, হাতের আঙুলগুলি ঠিক যেন কলার মত, আর কি তাহাতে জোর! দেশে মিস্ত্রিমহলে এমন স্বাস্থ্য এক-আধটি সে যে না দেখিয়াছে তাহা নয়—কিন্তু সে হয়ত দশটিতে একটি। এখানে যে মনে হয় দশটির সব কয়টিই সমান। অবশ্য এখানে হইবে নাই বা কেন, না আছে এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, না আছে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ! অর্থাভাবে উপবাস এদেশে রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ আর তাহাদের খাইতে পাওয়াটাই যে বার্থ-রাইট। নৃপেন তো বিদেশী কিন্তু তাহাকেও করিতে হইয়াছে বেকার ইন্‌সিওরেন্স, হাসপাতাল, ডাক্তার প্রভৃতির জন্য ইন্‌সিওরেন্স—কাজ না থাকিলে সে পয়সা পাইবে, অসুখ হইলে বিনা পয়সায় সে ডাক্তার পাইবে, ওষুধ পাইবে, খাইবার জন্য পয়সা পাইবে। সাধে কি আর আজ ইংলণ্ড হইয়া উঠিয়াছে ওয়ার্কম্যানদের স্বর্গ! তবু কিন্তু ইহাদের কান্নার অন্ত নাই, আরও দাও আরও চাই, এ বুলি ইহাদের থামিবে না।

উহাদের মধ্যে এক জন তাহাকে জিনিষটি বেশ সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিল, তাহার পর সুরু করিল নানান কথা। প্রথমে অবশ্য সেই মামুলি প্রশ্ন, "এ দেশটা তোমার কেমন লাগছে।" নৃপেন একটু ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া বলিল, "বল, বল—যা বলতে চাও খোলাখুলিই বল।" নৃপেন হাসিয়া জবাব দেয়, "দেশ মন্দ লাগছে না, বিশেষ তার মানুষগুলোকে—কিন্তু দেশের বৃষ্টি আর মেঘকে কিছুতেই পছন্দ করতে পারছি নে।" লোকটি হাসিয়া বলে, "তুমি তো সূর্য্যের দেশের মানুষ, তুমি পছন্দ করবে না তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই, আমরা এখানকার লোক—আমরাই পছন্দ করি না এখানকার ওয়েদার। তবে থাকো এখানে কিছু দিন দেখবে সব সয়ে গেছে। তাছাড়া এখানকার গ্রীষ্মকালটা সত্যই খুব সুন্দর।"

লোকটি নৃপেনের নাম জিজ্ঞাসা করিল। শুনিবার পর বারকয়েক চেষ্টা করিল সমাদ্দার উচ্চারণ করিতে, কিছুতেই আয়ত্ত করিতে না পারিয়া শেষে বলিয়া উঠিল, "না ও নাম চলবে না, আমি তোমাকে "গ্যাণ্ডি" ব'লে ডাকব।"

গান্ধীকে ইহারা সকলেই জানে।

চার্জ্জহাণ্ড আসিয়া নৃপেনকে নূতন কাজ দিয়া গিয়াছে। কাজটি আগের মত অত খারাপ নয়, একটু হিসাব করিয়া করা প্রয়োজন। খুব মন দিয়া কাজটি সে করিতেছিল। সময়ের কোন খেয়ালই ছিল না। পাশের ছেলেটির ডাকে তাহার চমক ভাঙিল। তখন পাঁচটা বাজিতে আর তিন মিনিট মাত্র বাকী। সকলের মুখেই তখন ছুটির আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাজ বন্ধ করিয়া তখন তাহাদের যন্ত্রপাতি গুছাইতেছে।

ভোঁ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দাঁড়াইয়া গেল লম্বা কিউ, আবার সেই ক্লকিং। পিছনে পিছনে দাঁড়াইয়া চলিতে চলিতে কত রকমের রহস্যের কথা হইতেছে। একে ল্যাঙ্কেশায়ারী উচ্চারণ, তাঁহার পর ঠাট্টা—নৃপেন তাহার অনেক কিছুই বুঝিতে পারে না। এত দিনে এইটুকু সে শুধু বুঝিয়াছে যে ইহারা বাস্‌কে বলে বুস্, নাম্বারকে বলে নুম্বর। 'ষ্প দি গেব' 'অল্ ফর নওট'—এ সবের হদিস তখনও সে পায় নাই।

বাহিরে আসিয়া দেখিল রাত্রি হইয়া গিয়াছে, রাস্তায় গ্যাস জ্বলিতেছে। আগলখোলা ভেড়ার পালের মত তখন গেট দিয়া লোক বাহির হইতেছে, শৃঙ্খলার কোন ধারই আর তখন তাহারা ধরিতেছে না। অধিকাংশই ছুটিতেছে ট্রাম-বাসের উদ্দেশে। এক মিনিট আগে বাড়ী পৌঁছিলেও তাহারা যেন একটু বিশেষ আনন্দ পাইবে। ছুটিতেছে বেশীর ভাগ মেয়েরাই।

নৃপেনের সম্মুখে ছুটিতে ছুটিতে একটি মেয়ে পায়ে কি বাধিয়া ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেল। নিশ্চয়ই বেশ ভাল

রকমই লাগিয়াছিল—তাহা না হইলে ইংরেজ মেয়ে উঠিতে ঐ কয় সেকেণ্ডও লাগাইত না। কি করি, কি করি—করিয়া শেষ পর্য্যন্ত নৃপেন যখন তাহাকে তুলিতেই গেল তখন দেখে মেয়েটি বেশ ওজনদার, ভাগ্যি অন্য আর একটি মেয়ে হাত লাগাইয়াছিল তাহার সঙ্গে, তাহা না হইলে সে তুলিতেই পারিত না। মেয়েটি উঠিয়া নৃপেনকে খুব ধন্যবাদ দিয়া আবার ছুটিল ট্রামের দিকে।

তিন-চারখানি ট্রাম ভর্ত্তি হইয়া চলিয়া গেল, নৃপেন উঠিতে পারিল না। মেয়েগুলি বেশ পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে গুঁতাগুঁতি করিয়া ট্রামে উঠিতেছে।

ভীড় একটু কমিলে নৃপেন ট্রামে উঠিল। সেই ট্রামেই উঠিল আর একটি ভারতীয় অ্যাপ্রেন্টিস এবং নৃপেনের পাশেই আসিয়া সে বসিল। সে প্রায় দেড় বৎসরের উপরে এখানে কাজ করিতেছে, কাজেই নৃপেনের মত নবাগতদের সঙ্গে বেশ মুরুব্বিয়ানা চালেই কথা কয়, বিজ্ঞের মত উপদেশ দেয়। নৃপেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলতে পার কত দিন আর আমাকে এমন বল্‌টু, নাট টাইট ক'রে দিন কাটাতে হবে?" ছেলেটি জবাব দিল, "নবেম্বরের শেষেই একটা ট্রান্সফার আছে, সেই সময় পর্য্যন্ত। তার মানে আর দিন কুড়ি। তুমি তো তবু ভাল আছ, জান আমাকে প্রথমটা কি করতে হয়েছিল?—তিন মাস ফাউণ্ড্রিতে সমানে বেল্‌চে ঠেলেছি, এতেই এমন করছ—আমার মত হ'লে না জানি কি করতে? গোড়ায় গোড়ায় এমন কাজই ওরা দেয়। খুব মন দিয়ে কাজ ক'রো কিন্তু—ফোরম্যান যেন কখন কোন খারাপ রিপোর্ট না দেয়।"

ফিরিবার বেলায় নৃপেনকে এক বার ট্রাম বদল করিতে হয়। 'চিয়ারিও' বলিয়া 'অল্ সেণ্টস্'এ অন্য ছেলেটির কাছে বিদায় লইয়া সে আপার ষ্ট্রীটে অন্য ট্রাম লইল। সেখানে এল্‌বার্ট স্কোয়ার হইতে প্রায় ভর্ত্তি হইয়াই আসিতেছে। নীচের তলায় লম্বা বেঞ্চিতে সে একটি জায়গা পাইল। তাড়াতাড়িতে প্রথমটা দেখে নাই, এখন দেখিল সে ছাড়া সেখানে একটিও আর পুরুষমানুষ নাই। মেয়ের দল কেহ বা নভেল পড়িতেছে, কেহ বা আয়নায় মুখ দেখিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে আর কেহ বা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। তবে আড়চোখে নৃপেনকে দেখিতেছে তাহারা সকলেই। এক জনের সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে ছিল, সে আর তাহার উত্তেজনা দমন করিতে পারিল না, জোরেই বলিয়া উঠিল, মামি, লুক্ লুক্, দেয়ার ইজ এ ব্ল্যাক্ ম্যান্। নৃপেন তখন ভাবিতেছে—তবু ভাল যে নিগার বলে নাই। একটু পরেই নামিতে পারিয়া সে বাঁচিল।

বাড়ীতে যখন পৌঁছিল তখন তাহার ঘড়িতে পাঁচটা পঞ্চাশ। জানালার পর্দ্দা টানিয়া দিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া ঘরের আলো দেখা যাইতেছে। বৃষ্টি থামিয়াছিল, আবার পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

অন্য ছেলেরাও তত ক্ষণে ফিরিয়াছে। সকলে বসিবার ঘরে জমায়েত হইয়া বসিয়াছে। এক জন তাহাদের মধ্যে পিয়ানোর ধারে বসিয়া রামপ্রসাদী সুরে "আইল্ অব ক্যাপ্রি" গাহিতেছে। ফায়ারপ্লেসে আগুনের শিখা নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে।

হাত ধুইয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার জন্য চা, বিস্কুট কেক্ ঠিক করাই আছে। যাহা কিছু ছিল সব সে শেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পর সে-দিনের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান লইয়া বসিল। দু-পেনীর কাগজ, কিন্তু ভারতীয় ছাত্রেরা এক পেনীতেই পায়।

ঘরে তখন গল্প হইতেছে—

"আরে, অত বাড়াবাড়ি যখন, তখনই আমি জানি। হাওড়া ষ্টেশনে মশাই, ও যত কাঁদে, ওর বউ তত কাঁদে, জাহাজে আসতে আসতে রোজ সকালে, সন্ধ্যেয়, বউয়ের ফটো নিয়ে সে কি উচ্ছ্বাস!—আর দেখুন গে এক বার মিসেস্ রজার্সের বাড়ী, তার বড় মেয়েটাকে নিয়ে কি কাণ্ডই করছে। শ্বশুরের পয়সাগুলো সব ওদের পায়েই গেল। গত ক্রিস্‌মাসে, জানেন, ও পাঁচ পাউণ্ডের প্রেজেণ্টই দিয়েছে ঐ মেয়েটাকে। আর কি তার চেহারা! মরে যাই!..." ইত্যাদি।

নৃপেন জানে না কোন্ হতভাগ্যের কথা হইতেছে। জিজ্ঞাসা করাও ভদ্রতাবিরুদ্ধ। সে শুধু শুনিয়াই যায়।

খাওয়া শেষ হইতে তাহাদের প্রায় আটটা বাজিল। এ-বাড়ীতে খাওয়াটা একটু দেরিতেই হয়। কিন্তু এত

কম পয়সায় এত বেশী খাওয়া—বায়ে বেশী, পরিমাণে বেশী—ম্যাঞ্চেস্টারের বোধ হয় কোন ল্যাণ্ডলেডির বাড়ীতেই হয় না। তাহা ছাড়া সপ্তাহে এক দিন ভাত অথবা খিচুড়ি বুড়ী খাওয়াইবেই। নিজেরা রান্না করিলে তো কথাই নাই—যাহা খুশী করা সম্ভব। আজ বুড়ী খাইতে দিয়াছিল মুসুরির ডালের সুপ, আলু সিদ্ধ, কপি সিদ্ধ, গাজর সিদ্ধ এবং ল্যাম্ব রোস্ট, কলা আর আপেল। সব জিনিষই বেশ অনেকখানি করিয়া। কিন্তু ইহাতেও ছেলেরা সব সময় সন্তুষ্ট হয় না, বুড়ীকে এমন বকুনি দেয় যে দেখিয়া নৃপেনের কষ্ট হয়। অবশ্য ইহাও ঠিক, যে বুড়ীর আপদে বিপদে ইহারা যত সাহায্য করিবে তাহা বুড়ীর আত্মীয়-স্বজনেও করিবে না। বুড়ী সে-কথা ভাল করিয়া জানে বলিয়াই ভারতীয় ছাত্রদের উপর তাহার এত যত্ন, বাড়ীতে ভারতীয় ছাত্র ছাড়া আর কাহাকেও সে জায়গা দেয় না।

পরের দিন বুধবার, মাত্র বেলা বারটা পর্যন্ত কলেজ। ছেলেদের আজ আর তেমন পড়ার তাড়া নাই। এক জনের কেবল জার্মান ক্লাস আছে—সে বসিবার ঘরেই খাতা পেন্সিল আর একখানা মোটা জার্মান ডিক্সনারি লইয়া বসিয়া গিয়াছে।

নৃপেনের একখানি চিঠি লিখিবার ছিল। উপরে গিয়া সেটি শেষ করিয়া আসিতে প্রায় সাড়ে ন-টা বাজিল। মধ্যে এক বার দরজায় ঘণ্টার শব্দ হইয়াছিল। বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখে একটি মেয়ে আসিয়াছে। ওখানকারই একটি ছেলের বন্ধু। পাতলা, ছিপছিপে চেহারা, এত পাতলা যে দেখিলে ভয় হয় বুঝিবা ভয়ানক কোন কিছু অসুখই তার করিয়াছে। নৃপেন ঘরে ঢুকিতেই তাহার সহিত অন্য ছেলেরা মেয়েটির পরিচয় করাইয়া দিল। নৃপেন তখন শুধু ভাবিতেছে, "হায় রে, এত ভাল ভাল মেয়ে আছে এ-দেশে, আর ভারতীয়ের বরাতেই জোটে কিনা এই সব ছাইভস্মের দল।" বিলাতী মেয়ে যখন, হাসিতে ও গল্প করিতে সে ভাল করিয়াই জানে। নানা কথায় আসর জমিয়া উঠিল,—তাহার পর মেয়েটি বাহির করিল এক লুডো খেলার ছক এবং ঘুঁটি। খেলা সুরু হইল।

দল ছাড়িয়া উঠিতে তখন তাহার ইচ্ছা করে না, কিন্তু ঘড়ির দিকে নজর পড়িতেই সে আর থাকিতে পারিল না। "এক্সকিউজ মি" বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। শয্যা তখন তাহাকে ডাক দিয়াছে। ক্লান্তিতে শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। এ্যালার্ম ঘড়িতে দম দিয়া সে যখন আলো নিবাইল, তখন ঠিক সাড়ে দশটা বাজিয়াছে। পাচ মিনিটের মধ্যেই শোনা যাইতে লাগিল, নৃপেন সমদ্দারের নিশ্বাসের শব্দ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতেছে।

কাটিয়া গেল তাহার ম্যাঞ্চেস্টারের একটি দিন। কাজ দিয়া ঠাসা, কিন্তু উদ্বেগহীন, দায়িত্বহীন দিন। যে-দিনের বৎসর তিন-শ পঁয়ষট্টি দিনে হয় না, বৎসর হয় সাত-শ পঁয়ষট্টি দিনে, হয়ত আরও বেশীতে। যাহার জন্য বৎসরান্তেও মনে হইবে মাত্র কাল যেন এই দেশে আসিয়াছি।



"চণ্ডীদাস-চরিতে"র পুথী

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

গত বৎসর শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস আমি কলিকাতায় ছিলাম। সেখানে দুই এক বন্ধুর মুখে শুনি "চণ্ডীদাস-চরিত" জাল সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার পুথীর কাগজ, কালী, অক্ষর, ভাষা, ছন্দ, ভাব, দৃষ্টান্ত, ইত্যাদি সব জাল।

এই কথায় আমি আশ্চর্য হই নাই। কারণ পুথী ছাপা হইবার পূর্বেই কেহ কেহ ইহাকে কৃত্রিম মনে করিয়াছিলেন। বুঝিলাম তাঁহারাই পুনরাবৃত্তি করিতেছেন।

কেহ বালকের ন্যায় তর্ক করিয়াছেন, 'ইহা হইতে পারে না, আমি শুনি নাই, পড়ি নাই।' কেহ কবিকে চান। যথা, "অহে কবি, বল, তুমি এটি কোথায় পেয়েছিলে? তুমি লিখেছ, অমুক বৎসরে চণ্ডীদাস তেত্রিশের কোলে। তুমি কি চণ্ডীদাসের জন্মকোষ্ঠী পেয়েছিলে? তুমি বলছ, তুমি চণ্ডীদাসের আড়াই শত বৎসর পরে তাঁর চরিত্র লিখেছ। তুমি সে চরিত্র কোথায় পেলে?" ইত্যাদি।

উড়া কথার ও বালকের তর্কের উত্তর দিতে পারা যায় না। যিনি চণ্ডীদাস-চরিত বিনীত-চিত্তে পড়িয়া সংশয়ী হইয়াছেন, তাঁহার বিবেচনার নিমিত্ত কয়েকটি প্রকরণ উপস্থিত করিতেছি।

১। পুথীর বৃত্তান্ত

পুথীখানা আছে, আমি বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। সন ১৩২২ সালে বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সে সময়ে এইরূপ পুথী কিংবা এই পুথীর কিয়দংশের নকল ছিল। বহু বৎসর পরে আমার এক বন্ধু এই কথা কলিকাতায় শুনিয়া আসেন। ইহার পর আর এক বন্ধু খুঁজিতে খুঁজিতে এই পুথীর সন্ধান পান। কিন্তু পুথীস্বামী হস্তান্তর করিতে চান নাই। এই সময়ে এক দৈব অনুকূল হইলেন। বাঁকুড়া জেলার দণ্ডধর বাঙ্গালা-সাহিত্য-চর্চা করিতেন। তাঁহাকে এক উকীল বলেন, তিনি চণ্ডীদাসের পুথী আনিয়া দিতে পারেন। সে কথা পুথীস্বামীর কানে যায়। পুথীখানা দেশান্তরিত হইতে পারে, এই ভয়ে তিনি সন ১৩৪১ সালে ('বিজ্ঞাপনে' ভ্রমক্রমে ১৩৪০ ছাপা হইয়াছে) আমার নিমিত্তে আমার বন্ধুর হাতে সঁপিয়া দেন। (১৩৪২ সালের ফাল্গুন মাসের "প্রবাসী" পশ্য)। অতএব যদি পুথী নূতন রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সন ১৩২২ সালের পূর্বে হইয়াছিল।

পুথী হইতে জানিতেছি, ছাতনার এক রাজার আদেশে তাঁহার কবিরাজ উদয়-সেন ১৫৭৫ শকে—ইং ১৬৫৩ সালে অর্থাৎ ২৮৬ বৎসর পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় "চণ্ডীদাস-চরিত" লিখিয়াছিলেন। তিনি চণ্ডীদাসের কতক চরিত ছাতনায় 'জমাদার ঘরে',* কতক বিষ্ণুপুরের রাজ'পেতা'য় (পুরাতন কাগজপত্রে) পাইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি অশ্বপৃষ্ঠে নানা স্থান ঘুরিয়া কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন (২১৫।২ পৃ)। কিন্তু চণ্ডীদাসের জীবনের ৪০ বৎসরের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। উদয়-সেনের পুথী লুপ্ত। সে পুথীর দুই পাতার নকল পাওয়া গিয়াছে। চ-চরিতে অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে। (৮ পৃ, ১৩৯ পৃ)।

উদয়-সেনের প্রপৌত্র, কৃষ্ণপ্রসাদ-সেন ছাতনার আর এক রাজার আদেশে সংস্কৃত পুথী 'আশ্রয় করিয়া' বাঙ্গালা বিবিধ ছন্দে "বাসলী ও চণ্ডীদাস" নামে পুথী লেখেন। কবে, তাহা লিখিত নাই। তাঁহার রাজা বলাই-নারাণ কোন্ শকে রাজা হইয়াছিলেন, সেটা ধরিয়া অনুমান হয় ইং ১৮১৬ সালের নিকটবর্তী কালে অর্থাৎ এক শত বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে।

* জমাদার কি কর্ম্ম করিতেন তাহা জানিতে পারি নাই। বোধ হয় রাজস্বের হিসাব রাখিতেন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বহুদিন হইতে নির্বংশ, শূন্য পাকাঘর পড়িয়া আছে।

বর্তমান পুথী কৃষ্ণ-সেনের হস্ত-লিখিত নয়। ইহার অজস্র বর্ণাশুদ্ধি দেখিলেই এই অনুমান হয়। পুথী কত বৎসরের নকল তাহাও জানা নাই। পুথীর কাগজ, কালী, অক্ষরের ছাঁদ ও শব্দের বানান দেখিয়া অনুমান হয় ৭০।৮০ বৎসরের হইতে পারে।

কৃষ্ণ-সেন লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রপিতামহের সংস্কৃত গ্রন্থ 'আশ্রয় করিয়া' এই বাঙ্গালা পুথী লিখিয়াছেন। সংস্কৃত পুথীর নাম "চণ্ডিদাস-চরিতামৃতম্," বাঙ্গালা পুথীর নাম "বাসলী ও চণ্ডীদাস"। অর্থাৎ দুইটি পুথী মূলে এক, কিন্তু পল্লবে ভিন্ন। 'আত্মসংবাদে' লিখিয়াছেন, তিনি ছয় মাসে 'বঙ্গে অনুবাদ' করিয়াছেন। 'অনুবাদ' শব্দের অর্থ ভাষান্তর নয়। সংস্কৃতে ইহার অর্থ অন্যের উক্তির ব্যাখ্যা, ও বিবৃতির সহিত পুনরুক্তি। পূর্বকালে এই অর্থ বহু প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থের এইরূপ বাঙ্গালা 'অনুবাদে'র অনেক উদাহরণ আছে। এই কারণে কৃষ্ণ-সেন পুথীর অন্য নাম দিয়াছেন। তিনি "কল্যাণী উপাখ্যান" নামে এক নূতন অধ্যায় জুড়িয়া দিয়াছেন (১৮০ পৃ)। ইহা সংস্কৃত পুথীতে ছিল না। এই উপাখ্যান পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় তিনি সংস্কৃত কাব্যে, কোষে ও ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। নানাবিধ ছন্দ রচনায় ও অলঙ্কার প্রয়োগে নিপুণ ছিলেন। কোনও কবি নীরব থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণ-সেনও পারেন নাই। যেখানে সুযোগ পাইয়াছেন সেখানেই কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। চ-চরিতে অনেক গীত আছে। সে সব গীত কৃষ্ণ-সেনের।

অতএব মূল তথ্য ২৮৬ বৎসর পূর্বে সংগৃহীত। বর্তমান আকার ১২০ বৎসর পূর্বে প্রাপ্ত। লিপি ৭০ বৎসর পূর্বে কৃত।

আমি লিপিতত্ত্বে অভিজ্ঞ নই। পুথীখানা কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথীশালার পণ্ডিত শ্রীযুত তারা-প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, ২০।৩০ বৎসরের মধ্যে কিছুতেই নয়। কেহ ৫০।৬০ কিম্বা ৭০।৮০ বৎসরের বলিলেও তিনি অবিশ্বাস করিবেন না। আমি পুথীতে দুই হাতের লেখা দেখিয়াছিলাম। তিনি তিন হাতের লেখা দেখাইয়াছেন।

পুথী জাল বলিলে বুঝি, [১] ইহা উদয়-সেনের সংস্কৃত পুথীর অনুবাদ নহে, [২] ইহা কৃষ্ণ-সেনের রচিত নহে, [৩] ইহাতে বর্ণিত চণ্ডীদাস-চরিত সত্য নহে।

প্রথমে মনে করি, ইহা কৃষ্ণপ্রসাদ-সেনের রচিত নহে। কেহ প্রবঞ্চনার অভিপ্রায়ে উদয়-সেন ও কৃষ্ণ-সেনের নাম দিয়া এই পুথী রচনা করিয়াছে।

পুথীখানা দুই শত পৃষ্ঠার। এত ঘন ঘন লেখা যে পড়িতে চক্ষু পীড়িত হয়। সাধারণ পুস্তকের প্রমাণে ছাপিলে পাঁচ শত পৃষ্ঠার বই হইবে। এত বড় পুথীর আসল কোথায়? পুথীখানা কোন্ বৎসরে কিম্বা কোন্ দুই বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে? কোথায় রচিত হইয়াছে? কে রচনা করিয়াছে? কেন করিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের যুক্তি-সঙ্গত উত্তর না দিয়া স্থিরবুদ্ধি 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' ন্যায়ে জাল বলিতে পারেন না।

পুথী দেখিলেই পুরাতন মনে হয়। ইহার কাগজ, কালী, অক্ষরের ছাঁদ সবই পুরাতন। একখানা পাঁচ শত পৃষ্ঠার বই ধীরে ধীরে পুরাতন ছাঁদে লেখা যেমন তেমন কর্ম নয়। এক জন নয়, তিন জন একত্র হইয়া 'য়' স্থানে 'অ', 'য' স্থানে 'জ', 'ণ' স্থানে 'ন', 'ঈ' 'ঊ' স্থানে 'ই' 'উ', 'ঔ' স্থানে 'ও ও' ইত্যাদি বানান করিয়াছে। কবি অর্থাৎ কল্পিত জালপুথীর নির্মাতা পৃথক্ ব্যক্তি হইতে পারেন, কিম্বা তিনিও এক দক্ষজালিয়াৎ। অতএব দাঁড়াইতেছে, তিন বা চারি প্রতারক এই পুথীর কর্তা! ষট্-কর্ণে মন্ত্রভেদ হয়, অষ্ট-চক্ষুতে কোন কর্ম গুপ্ত থাকে না। এমন সুযোগ বহুভাগ্যে ঘটে। জালিয়াতের দলকে সত্বর ধরিয়া ফেলা কর্তব্য।

২। ভাষা

আমি পুথীখানা দুইবার পড়িয়াছি। টীকা লিখিবার সময় প্রত্যেক বাঙ্গালা শব্দ দেখিয়াছি। কয়েক বৎসর বাঁকুড়া-বাসী হইয়া ছাতনা-অঞ্চলের ভাষা কিছু কিছু শুনিয়াছি। উচ্চবর্ণের শিক্ষিত জনের ভাষা আর সাধারণ লোকের ভাষার মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। সাধারণ লোকের ভাষা হইতে শতাধিক বৎসর পূর্বের লক্ষণ পাওয় যায়। তাহাদের শব্দে, বিভক্তি প্রত্যয়ে এখনও পুরাতনের

লক্ষণ আছে। চ-চরিতে পুরাতন ও নূতনের মিশ্রিত ভাষা থাকিবার কথা। তাহাই আছে।

পুথীর নিকটবর্তী দেশের ও কালের দুই চারিখানা পুথীর ভাষা তুলনা করিলে প্রায় ঐক্য দেখা যাইবে। বাঁকুড়ায় জগৎরাম-রায়ের "রামায়ণ" প্রসিদ্ধ। পশ্চিম-উত্তর ভাগে ইঁহার নিবাস ছিল। এই রামায়ণ ১৬৯২ শকে= ইং ১৭৭০ সালে রচিত। বাঁকুড়ার কবিশঙ্করের "গোবিন্দ-মঙ্গল" বৃহৎ গ্রন্থ, কিন্তু মুদ্রিত হয় নাই। মাণিকরামের নিবাস বর্তমান বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণসীমার সন্নিকটে ছিল। তিনি ১৭০৩ শকে=ইং ১৭৮১ সালে "ধর্ম্মমঙ্গল" লিখিয়াছিলেন। ঘনরামের নিবাস ছাতনা হইতে আরও দূরে ছিল। তিনি মাণিকরাম অপেক্ষা পুরাতন (ইং ১৭১১ সাল)। কিন্তু ভাষা একই।

বস্তুতঃ পদ্যের ভাষা বহুকাল যাবৎ একপ্রকার থাকে। ভারতচন্দ্র ১৬৭৪ শকে=ইং ১৭৫২ সালে "অন্নদামঙ্গল" লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পদ্য পড়িলে মনে হইবে, সে-দিনকার রচনা। যথা,

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি।

"বিদ্যাসুন্দরে"

আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।
খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে।

বর্তমানে ছাতনার উচ্চবর্ণের লোক 'চেয়ে' বলে, অন্য লোক 'চেঞে, চেঞা' বলে। এই 'চেঞা' পুরাতন রূপ। 'চাঞা' আরও পুরাতন। 'চাঞা' ধ্বনিতে চা-যাঁ, 'চেয়ে' ধ্বনিতে চে-য়েঁ। অর্থাৎ 'ইয়া' প্রত্যয় অনুনাসিক। পুথীতে কোথাও অনুনাসিক, কোথাও নয়। সপাদশতবর্ষপূর্বে কৃষ্ণ-সেন কি বানান করিয়াছিলেন, কে জানে। আমরা সত্তর আশি বৎসর পূর্বের লিপিকরের বানান পাইতেছি।

দেশ কাল পাত্র অনুসারে কথাবার্তার ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হয়। রাজা রামমোহন রায়ের দেশের ভাষা অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান সাধু গদ্যে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সে দেশ হইতে ছাতনা বহু দূরে ও উত্তরে। চ-চরিতে এখানে ওখানে দুই চারি পংক্তি গদ্য আছে। যথা, ৬২ পৃ

"এইস্থানে দুই স্লোক পকা কাটা হওাঅ পডা জাঅ নাই। জাহা পডা জাঅ তাহাতে অর্থবোধ না হইবাঅ ত্যাগ করিলাম।"

এখানে 'হওাঅ' 'হইবাঅ' দুই রূপ আছে। প্রথমে 'হইবাঅ' এইরূপ ছিল, পরে 'হওাঅ' হইয়াছে। অর্থাৎ গদ্যটি পুরাতন ও নূতনের সন্ধ্যাকালে রচিত। সেকাল শতবর্ষ পূর্বের বলা যাইতে পারে। গদ্যের 'নাই' শব্দটি মনে হইবে ভূতকালের, কিন্তু তাহা নহে। এটি পূর্বকালের 'নাঞি'। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ-বন্দোপাধ্যায়-সঙ্কলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" গ্রন্থে হুগলী জেলার শতবর্ষ পূর্বের গদ্যের উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে ভাষা কিছু মার্জিত। দূরবর্তী গ্রামবাসী যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সে সকল পত্রের ভাষা লক্ষ্য করিলে বিশেষ দেখা যাইবে। দেশভেদ স্মরণ করিলে চ-চরিতের গদ্য শতবর্ষ পূর্বের বিবেচিত হইবে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে "অঙ্গদের রায়বার" আছে। ইহা নিশ্চয় শতাধিক বৎসর পূর্বে রচিত। কিন্তু ইহার সহিত প্রচলিত কথ্য ভাষার প্রভেদ পাওয়া যায় না। আর, ১২০ বৎসর প্রাচীনও নয়।

কবি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী ব্যতীত ফার্সী শব্দ জানিতেন। সিকন্দর-শাহের দরবারে উজীর, পীর, কাজী, ওমরাহ ইত্যাদি অনেকে বসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সাজাদা-নসীন বসিয়াছেন (৯৯ পৃ)। পুথীতে শব্দটি এত বিকৃত হইয়াছে যে উদ্ধার করিতে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। চ-চরিতে 'ইস্‌লাম' শব্দ আছে, 'ইস্‌লামী' ইহার বিশেষণও রচিত হইয়াছে। আমরা 'মুসলমান' বলি, 'ইস্‌লামী' বলি না। মুসলমানেরা চণ্ডীদাসকে 'বাহগীর' বলিতেন। শব্দটি ফার্সী অভিধানে পাই নাই। দুই মৌলবীও অর্থ বলিতে পারেন নাই। কবি কোথায় শিখিয়াছিলেন, কে জানে। কোন আধুনিক হিন্দু লেখক এমন অজ্ঞাত শব্দ লিখিতেন না। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" 'মজুরিয়া' শব্দ আছে। শব্দটি বর্তমানে অপ্রচলিত।

কেমনে কোথায় শব্দটি প্রথম রচিত হইয়াছিল আমরা জানি না। চ-চরিতে 'দাদু' শব্দ আছে। আমি মনে করিতাম, শব্দটি আধুনিক ও কলিকাতার। পরে অনুসন্ধানে জানিলাম; বাঁকুড়ায় 'দাদু' শব্দ বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কোন্ অঞ্চলে কোন্ শব্দ প্রচলিত, তাহা ছাপা বই পড়িয়া জানিতে পারা যায় না। অগণ্য শব্দ দেশ-ভেদে প্রচলিত আছে। আমি বাঁকুড়ার অনেক শব্দ বুঝিতে পারি না।

৩। ছন্দ

চ-চরিতে নানা ছন্দ আছে। আমার এক বন্ধু মনে করিয়াছেন, কোন কোন ছন্দ আধুনিক, অর্থাৎ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে ছিল না। তিনি বলিতে চান, যে ছন্দ একালে নির্মিত হইতে পারে, সে ছন্দ শতবর্ষ পূর্বে হইতে পারিত না। 'আধুনিক' বলিতে যদি ইংরেজীর অনুকরণ হয় এবং সে ছন্দ চ-চরিতে থাকে, তাহা হইলে বইখানা সে ছন্দ-রচনার পরে নির্মিত, বলিতেই হইবে। ইংরেজীর অনুকরণ না হইলে কবি-প্রতিভার একাল সেকাল নাই। ভারতচন্দ্রে নানা ছন্দ আছে। তিনি সে সব ছন্দ কোথায় পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবপদকর্তারা সকল গীত এক ছন্দে লিখেন নাই। বাউলের ছন্দ, কবির গানের ছন্দ, পাঁচালীর ছন্দ, রামপ্রসাদী ছন্দ, ঝুমুরের ছন্দ, সব এক নয়।

চ-চরিতে যে সব ছন্দ নূতন মনে হয়, সে সব ছন্দ শতবর্ষ পূর্বেও ছিল। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

চ-চরিতে (৭।২ পৃ)

শ্যামা, চাহিনা মা আর স্বরূপ দেখিতে সম্বর রূপ তোর।
সদা, শয়নে স্বপনে ও রাঙ্গাচরণে থাকে যেন মতি মোর।

"রাম-রসায়ন" প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রচিত। ইহার কবি রঘুনন্দন-গোস্বামীর নিবাস. মানকরে (বর্দ্ধমান জেলায়) ছিল। সন ১১৯৩ সালে—ইং ১৭৮৬ সালে জন্ম। বইখানি "বঙ্গবাসী" প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে। ৫৬৭ পৃ,

তবে, তাহারে দেখি হৃদয়ে সুখী যাবৎ বানরগণ।
তারা, গভীর স্বরে হুঙ্কার করে রণে উলসিত মন।

এখানে দুই অক্ষরের একটি শব্দ পৃথক্ ও ছন্দের অতিরিক্ত। চ-চরিতের 'সম্বর' বিপ্রকর্ষণে 'সম্বরণ' পড়িতে হইবে। পদ্যে বিপ্রকর্ষণ সাধারণ।

চ-চরিতে (২৯।২ পৃ)

মাতা কহে যায় রহে বর্ত্তমান অভিমান হেন অন্তরে।
ফুল ফলে তার আরতি কেবল পূজিতে তুরিতে অন্তরে।

জগদ্রামী রামায়ণে (৮৫ পৃ)

ধূলিতে ধূসর ধ্বাঙ্ক কলেবর উচ্চৈস্বর করি কাঁদে।
বহে উর্দ্ধশ্বাস খসে নেতবাস কেশপাশ নাই বাঁধে।

চ-চরিতে (২৯।২ পৃ)

হাসিয়া গিরিজা কন একি মা তুমার পণ
অঘট ঘটনা ঘটায় কেমনে পূজ তবে নারায়ণ
যদি না ছাড়িবে পণ।

জগদ্রামী রামায়ণে (৯৩ পৃ)

কে অবোধ সুধা ত্যজে গরল সবলে ভজে।
অভাগী তনয়ে কাননে পাঠায়ে ধিক ধিক তার কাজে।

চ-চরিতে (১১৬।১ পৃ)

গ্রাসিতে অবনা উথলে সিন্ধু গর্জ্জনে কাঁপে হিয়া।
গণ্ডুষ তরে কুম্ভজ কত তাণ্ডবে তাথিয়া থিয়া।
এড়ি ফুলশর স্মর সদম্ভে লম্ফে কম্পে ধরা।
জাগি উঠে তায় স্মর-নিসূদন-লোচন-দহন-ভরা।

ভারতচন্দ্রের "মানসিংহে"

অখিল ভুবন ভক্ত ভক্ত ভক্তি মুক্তি শর্ম্মদা।
করবিলসিত রত্নদর্ব্বী পান-পাত্র সারদা।
তরুণ কিরণ কমল কোষ নিহিত চরণ চারদা।
ভব নিপতিত ভারতস্থ ভবজলনিধি পারদা।

যে কবি এইরূপ ছন্দে কবিতা লিখিতে পারেন, তিনি কখনও গুপ্ত থাকিতে পারেন না। ইস্কুলের বালকেরা কবিতা ছাপাইতেছে, আর এই কবি গুপ্ত রহিলেন? 'গ্রাসিতে অবনী উথলে সিন্ধু' ইত্যাদি কবিতাটি শুধু ব্যঞ্জনায় নয়, ওজোগুণে চমৎকার। প্রসাদগুণেও চমৎকার। শ্লেষালঙ্কার ছাড়িয়া দিলেও ইদানীর কবিতায় এই দুই গুণের সমাবেশ কদাচিৎ দেখিতে পাই। ছাতনা ও বাঁকুড়ায় এমন কবি আছেন, আমরা অদ্যাপি শুনি নাই।

৪। ইতিহাস

চ-চরিতে এমন স্থানের ও গ্রামের নাম আছে, যে

নাম বর্তমানে অল্প লোকেই জানে। বিষ্ণুপুরের পূর্বদিকে নিবিড় অরণ্যে 'কোড়াসুর গড়' নামে একটা স্থান আছে। এখানে যে পূর্বকালে এক রাজার গড় ছিল বাঁকুড়াবাসী কেহ জানেন কি না সন্দেহ। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাকে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তখন জানিয়াছি লোকে 'কোটেশ্বর' (অর্থাৎ দুর্গেশ্বর) শব্দের অপভ্রংশে 'কোড়াসুর' করিয়াছে। কেহ কেহ 'ডুমনীর গড়' বলে, কিন্তু দেখে নাই। চ-চরিতে এই স্থানের উল্লেখ দুইবার আছে।

আমরা জানি, চন্দননগর ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্বে; এক কালে যে উহা পূর্ব পার্শ্বে ছিল, তাহা বোধ হয় অল্প লোকেই জানে। চ-চরিতে চন্দননগর পূর্বপার্শ্বে।

চ-চরিতে আছে, চণ্ডীদাস রঙ্গনাথপুর নামক গ্রামে কয়েক দিন ছিলেন। গ্রামের নিকটে গঙ্গা, গঙ্গায় এক চর, কাশতৃণে আচ্ছাদিত। লোকে চরটিকে সর্পদ্বীপ বলিত। এখন রঙ্গনাথপুর নামে কোন গ্রাম নাই। কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায়, বর্তমান রঙ্গপাড়া নামক গ্রামের নিকটবর্তী গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হইয়াছে।

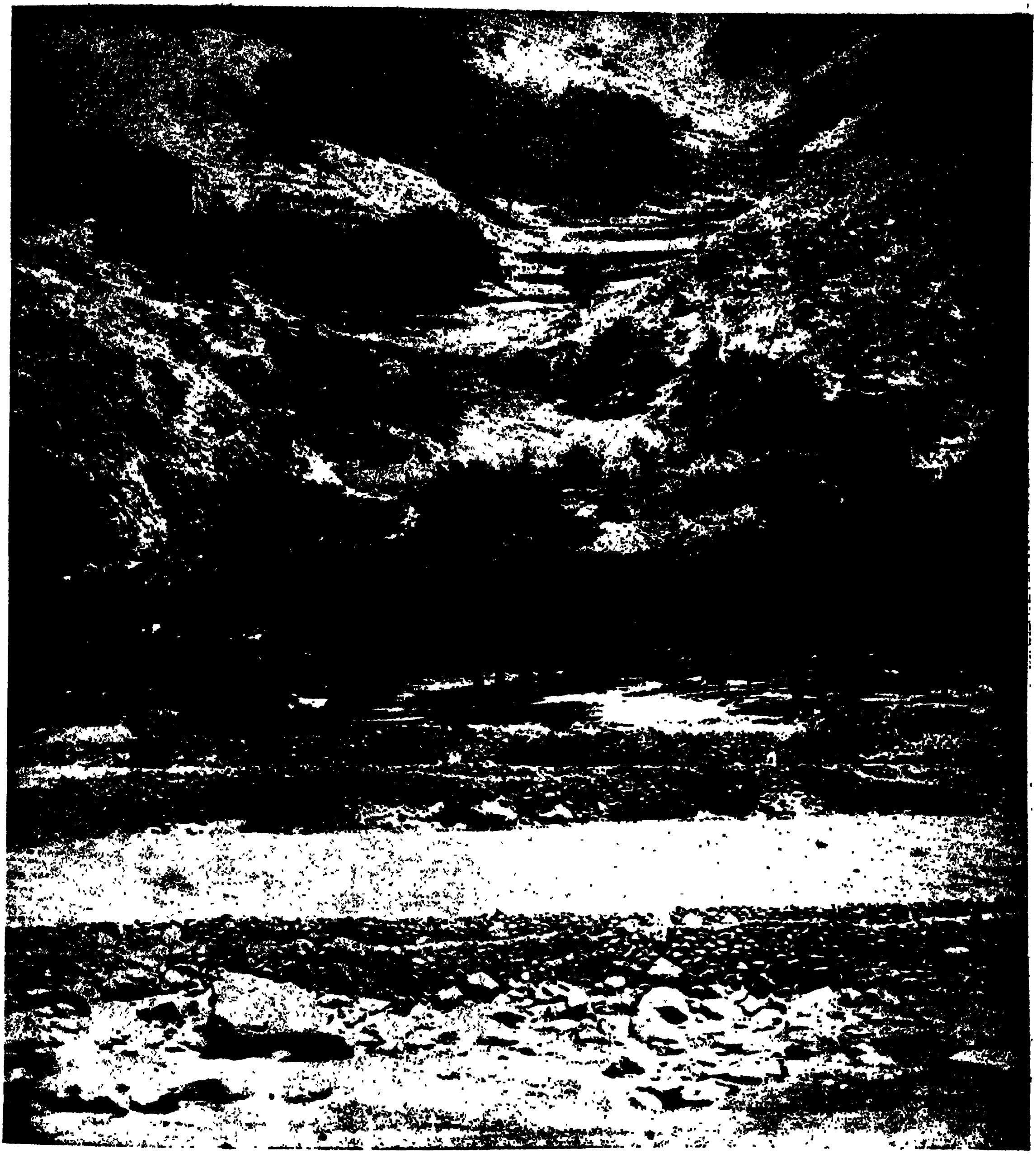
চ-চরিতে আছে দিল্লীরাজ ফিরাজ খাঁ ও পাণ্ডুরাজ শমসুদ্দি (৪০।১ পৃ) মল্লভূম আক্রমণ করিয়াছিলেন। দিল্লীরাজ মহমদি (৪৪।১ পৃ) অত্যাচারী ছিলেন। পাণ্ডুআর সিকন্দর-শাহ ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারে মোল্লা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শাহজাদার কলহ হইয়াছিল, ইত্যাদি একটিও মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই। এ সকল ইতবৃত্ত আধুনিক সাধারণ কবির অজ্ঞাত। হজরত আলী চোরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন (১৩০।১ পৃ)। অনুসন্ধান দ্বারা আধুনিক হিন্দু কবি জানিতে পারেন। অজরের পুণ্যকীর্তিও জানিতে পারেন (১২৪।২ পৃ)। কিন্তু কোন হিন্দুর লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায় না। কবি অবলীলায় আনিয়াছেন। আমার মনে হয়, উদয়-সেন ফার্সী কেতাব পড়িতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য, চ-চরিতে বাসলী দেবী ও দেবীর অনুচর ভৈরব যখন তখন আবির্ভূত হইয়াছেন। বাসলী দেবী কোথাও মেঘের সহিত মিশিয়া কথা কহিতেছেন, কোথাও রণরঙ্গিণী হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরের ঠাকুর মদনমোহন অন্নপাক করিতেছেন, মাথায় মোট বহিতেছেন, চণ্ডীদাসের নিক্ষিপ্ত বাণে তাঁহার বক্ষে ক্ষতচিহ্ন হইয়াছে। সিকন্দর-শাহ সৈন্য দ্বারা চণ্ডীদাসকে পাণ্ডুআয় ধরিয়া আনিয়াছেন, কাফের চণ্ডীদাসকে বধ করা শাহের উদ্দেশ্য ছিল। চণ্ডীদাসকে রক্ষার নিমিত্ত বাসলী দেবী বালিকা-বেশে লছমনী নামে শাহের পালিতা কন্যা হইয়াছেন। এক কুলবধূ যোগিনী সাজিয়া পাণ্ডুআয় উপস্থিত, ভৈরবী-বেশে যুদ্ধ করিতেছেন। কোথায় কোন্ আধুনিক কবির কল্পনা দেবদেবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে? যে দিন হইতে দেবদেবীর প্রতিমা মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইতেছে, ফটো তোলা হইতেছে, সে দিন হইতে তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়াছেন। এখন চ-চরিতের কাহিনী আজগুবি মনে হইবে। কিন্তু শতচেষ্টাতেও আষাঢ়ে গল্পেও প্রবেশ করিবে না।

কবির সংস্কৃত শব্দজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান অসাধারণ। এমন সব সংস্কৃত শব্দ কল্যাণী-উপাখ্যানে প্রয়োগ করিয়াছেন যে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত কোষ ও ব্যাকরণ পুনঃ পুনঃ খুলিতে হয়। আমি এই ক্লান্তিকর কর্ম শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ-সেনের হাতে দিয়াছিলাম। তাঁহার বংশের পুথীতে তাঁহার নাম যুক্ত রাখাও কর্তব্য। তিনি পাণ্ডিত্যে কবির যোগ্য প্রপৌত্র, টীকা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

এ কালের কবি রামায়ণ, মহাভারত ও দুই চারিটা পৌরাণিক উপাখ্যান অবগত আছেন, কিন্তু বোধ হয় দণ্ডীকাব্য, তুলসী-দাসী রামায়ণ, সারলা-দাস-কৃত ওড়িয়া বিরাট-পর্ব হইতে দৃষ্টান্ত তুলিবেন না। কবি একখানা পুরাণ হইতে ভূগোলবর্ণন লইয়াছেন। সে পুরাণ আমার অজ্ঞাত। এক কর্ণাটেশ্বরের উপাখ্যান দিয়াছেন, তাহারও মূল আমার অজ্ঞাত। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার দেশ-ভাষায় 'অঙ্গিক সুন্দর, অলোক সুন্দর' হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত নাগকন্যার উদ্দেশ পাই নাই (১২৭।২ পৃ)। গজনীর মামুদ ও পেচকের কথোপকথন, জটিলের দধিভাণ্ড যে কতকাল হইতে প্রচলিত আছে, কে জানে। আমার বিশ্বাস গত শতবর্ষের মধ্যে রচিত একটা উপাখ্যানও

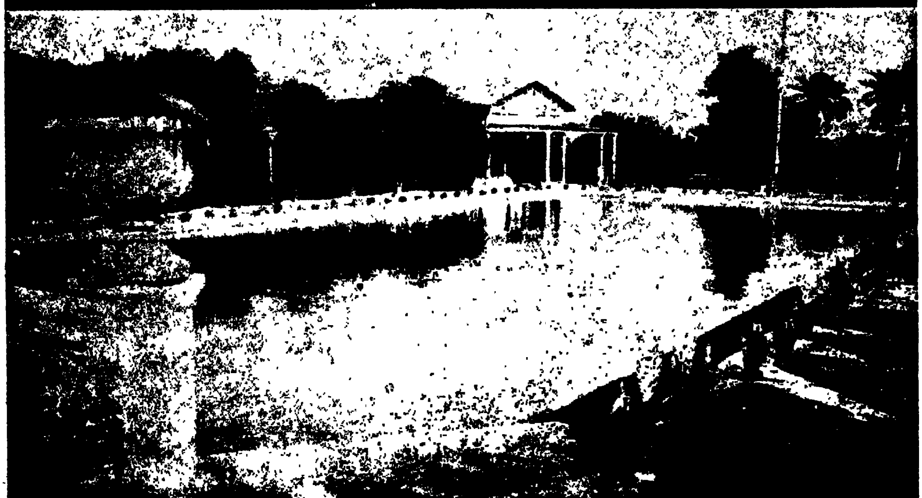
"কাবুলের চিঠি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য



জেলালাবাদের পথে



বাগ-ই-চাহি,
জেলালাবাদ



বাগ-ই-চাহি,
পুরানো সরোবর



জেলালাবাদ,
শিকারী-দল



খাইবার গিরিসঙ্কট



খাইবার গিরিসঙ্কটের পথে উটযাত্রী দল



সীমান্তের জীবনযাত্রা



সীমান্তের দৃশ্য : জল তোলা

জনপ্রিয় ও প্রচলিত হয় নাই। আমরা পুরাতন পুঁজি নাড়াচাড়া করিতেছি।

চ-চরিতে যে সমাজ-চিত্র আছে, তাহা ইদানীর বহু লোকের অজ্ঞাত। রামী রজক-কন্যা, অনাচরণীয়া। সে জন্য নানা স্থানে গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা বিচার নিমিত্ত 'সমাজ' করিয়াছিলেন, 'সভা' ডাকেন নাই। মল্লেশ্বর গোপাল সিংহ চত্রিনা আক্রমণ করিতে গেলেন। কবি স্বচ্ছন্দে লিখিলেন,—লক্ষ নয়, কোটি নয়,—এক অক্ষৌহিণী সৈন্য চলিল। তাঁত্রিক রূপচাঁদের গোঁপদাড়ি ছিল, কিন্তু বিবাহের পূর্বে কামাইতে হইয়াছিল। পুরন্দরের পুত্রের ভুজনা (অন্নপ্রাশন) হইবে, তাঁহার কুলে দোষ পড়িয়াছে, মাথা মুড়াইয়া চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে খোকার ভুজনা হইতে পারিবে না। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর অশ্বত্থ বৃক্ষকে কোল দিতে হয়। নারীর অলঙ্কার কানে কর্ণপূরক (কদমফুল), গলায় চন্দ্রহার শতবর্ষ পূর্বে ছিল, এখন নাই। ইংরেজীর অনুবাদে বলা চলে, বইখানায় আদ্যোপান্ত পুরাতনের হাওয়া বহিতেছে। ইদানীর কোন্ কবির মনে সহজ সরল ভাবে সে কালের রীতিনীতি উদয় হইত? একটা রসীদ, একটা তমসুক জাল করিবার লোক আছে। কিন্তু একখানা পাচ শত পৃষ্ঠার কাব্য, নানা ছন্দে, নানা ইতবৃত্তে, নানা শাস্ত্রীয় আলোচনায় পরিপূর্ণ কাব্য-নির্মাণ গ্রাম্য বা নাগরিক জালিয়াৎ দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না।

৫। কয়েকটি প্রশ্ন

চ-চরিতের এক পাঠক আমাকে কলিকাতায় কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি সংশয়ী, পুরাতন পুস্তকে কেমনে নূতন প্রবেশ করে। কবি সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। আমি কি বুঝিয়াছি, তাহাই বলিতে পারি।

(১) চণ্ডী কহে ক্ষত্রী হয় কায়স্থ যে জন।
জোর করি বলে শূদ্র গৌড়ের ব্রাহ্মণ। (৬৯।১পৃ)

এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে রাত্রিকালে দৈবগতিকে ব্রাহ্মণ-কন্যা রমার সহিত ব্রাহ্মণ-যুবক রূপচাঁদের বিবাহ হইবে। চণ্ডীদাস পুরোহিত আছেন, কিন্তু কে কন্যা সম্প্রদান করে? সেখানে এক কায়স্থ ছিলেন, তিনি আপনাকে শূদ্র বলিয়া জানেন। শূদ্র দ্বিজকন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন না। এই সঙ্কটে চণ্ডীদাস বলিতেছেন, কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত, গৌড়ের ব্রাহ্মণেরা শূদ্র মনে করেন, সেটা ঠিক নয়। প্রশ্ন এই, এই সে দিন হইতে, এখনও চল্লিশ বৎসর হয় নাই, কোন কোন কায়স্থ আপনাকে ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত বলিতেছেন। শতাধিক বৎসর পূর্বে একথা কিরূপে উঠিতে পারে?*

চ-চরিতে রমা-রূপচাঁদের বিবাহ এক প্রধান ঘটনা। পাষণ্ড-দলনের এই দৃষ্টান্ত, উদয়-সেনের পুথীতেও নিশ্চয় ছিল। অতএব কথাটা প্রায় তিন শত বৎসরের পুরাতন। কিন্তু কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত কিনা, এখানে সে বিচার অনাবশ্যক। চণ্ডীদাস অথবা উদয়-সেন তাঁহার নিজের মত দিয়াছেন। মতটা সত্য হউক অসত্য হউক, কিছুই আসে যায় না। বর্তমানে ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন না হইলেও, কবিকে লিখিতে হইত, নচেৎ বিবাহটি অশাস্ত্রীয় হইত। এই ভাবে দেখিলে প্রশ্নটিতে কালাসঙ্গতি থাকে না। বর্তমান আন্দোলনের পর এই ঘটনা বর্ণিত হইলে কবি কথাটা অন্য ভাবে লিখিতেন। 'এইত, এখানে কায়স্থ আছেন, তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন।' দ্রষ্টব্য, 'গৌড়ের ব্রাহ্মণ', 'বঙ্গে'র নয়।

(২) চণ্ডীদাস পাণ্ডুআ হইতে কবে যাত্রা করিয়াছিলেন কবি এক হেঁয়ালি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন।

কর্তা কর্ম যে এক নামেতে ব্যক্ত হয়।
গৃহশূন্য বুদ্ধদেব সেই ঘরে রয়॥
বৎসরের সেই মাস শুক্ল পঞ্চমীতে।
করিলেন যাত্রা প্রভু পাণ্ডুআ হইতে॥ (১৪২।২পৃ)

আমার বন্ধুর প্রশ্ন,—বুদ্ধদেব কোন্ মাসে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত বিশেষভাবে আলোচনা না করিলে বলিতে পারা যায় না। তিন শত বৎসর পূর্বে উদয়-সেন কিরূপে জানিলেন?

* আমি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কায়স্থপাঠশালার অধ্যক্ষ হইয়া প্রয়াগ যাই। ঐ বিদ্যালয় তাহার বহুপূর্বে স্থাপিত। তাহার প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই সেখানে কায়স্থরা আপনাদিগকে দ্বিজ ও চিত্রগুপ্তবংশী ক্ষত্রিয় বলিতেন।—প্রবাসীর সম্পাদক

আমার উত্তর। পূর্বকালে অনেক কবি হেঁয়ালি প্রবন্ধে কালজ্ঞাপন করিতেন। (১৩৩৬ সালের পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে 'কবি-শকাঙ্ক' পশ্য)। এতদ্দ্বারা কবি বিদগ্ধতা প্রকাশ করিতেন, আর লিখিতেন, 'মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে'। শত বৎসর পূর্বেও এই রীতি ছিল। দ্ব্যর্থ বাক্যের সমষ্টিতে প্রহেলিকা। কোন্ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে সেটি নিশ্চয় করা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। ভারতচন্দ্র "অন্নদা-মঙ্গলে"র রচনা-শক জানাইতে লিখিয়াছেন,

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।

ইহার সামান্য অর্থ, ঋষিগণ বেদের আনন্দরস দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিলেন। বাস্তবিক একমাত্র রস আনন্দ, এবং ব্রহ্ম আনন্দঘন কিনা, সে কথা আদৌ বিচার্য নয়। ভারতচন্দ্র সে রস আস্বাদন করিয়াছিলেন কিনা তাহাও চিন্তনীয় নয়। শব্দগুলি সংখ্যা-বাচক, সমুদয়ের অর্থ ১৬৭৪। সেইরূপ চ-চরিতের হেঁয়ালি বুঝিতে হইলে অস্পষ্টার্থ ধরিতে হইবে। প্রোফেসর শ্রীযুত রামশরণ ঘোষ পৌষ মাস এই অর্থ করিয়াছিলেন। আমি ক্লান্তি-বশে ভাবিতে পারি নাই। আমার মনে হয় মাঘ মাস কবির উদ্দিষ্ট ছিল। সংস্কৃত "শিশুপাল-বধ" কাব্যের কবির নাম মাঘ। কাব্যটিও মাঘ-কাব্য নামে খ্যাত; অর্থাৎ কর্তা ও কর্ম এক নামে ব্যক্ত হয়। পূর্বকালে কোন কোন কবি অল্পবুদ্ধি পাঠকদের সংশয় দূর করিতে প্রকারান্তরে একই কাল বলিতেন। এই কবিও সন্ন্যাসী আনিয়া প্রকারান্তরে বলিতেছেন, মাঘ মাস বুঝিতে হইবে। কিন্তু একবার বলিতেছেন বুদ্ধদেব গৃহশূন্য, আবার বলিতেছেন তিনি ঘরে আছেন। ইহার অর্থ এই, বিমুক্ত হইলে লোকে সন্ন্যাসী হয়; বিমুক্ত অবস্থার নাম দশমী। অতএব বুদ্ধদেব গৃহশূন্য অর্থাৎ সন্ন্যাসী দশম ঘরে আছেন। বৎসরের দশম মাস মাঘ মাস। অন্য প্রকারেও এই অর্থ আনা যাইতে পারে। চ-চরিতের বহু স্থানে দেখা যায়, কবি "ত্রিকাণ্ডশেষ" অভিধান অভ্যাস করিয়াছিলেন। এই অভিধানে বুদ্ধদেবের অনেক নাম আছে। এক নাম 'বীতরাগ'। শ্রীমৎ শীলভদ্রের টীকায় ইহার অর্থ, যাহার জন্যে লোকে গৃহত্যাগ করে। উক্ত অভিধানে 'বুদ্ধদেবের আর এক নাম 'দশভূমীশ', যিনি দশভূমির ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি দশতলা গৃহে থাকেন। ইহাতেও দশম মাস আসিতেছে। (প্রকৃত অর্থ যিনি দশ পারমিতার ঈশ্বর।) অতএব গৃহ-শূন্য সন্ন্যাসী পাইলেই হেঁয়ালির অর্থ পাওয়া যায়। তিনি বুদ্ধদেব কি আর কেহ, তিনি সত্য সত্য মাঘ মাসে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন কিনা জানিবার প্রয়োজন নাই। (বস্তুতঃ বুদ্ধদেব-চরিত মতে তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমায় গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।) কবি আর এক স্থানেও (২২৩।১ পৃ) হেঁয়ালিতে শক দিয়াছেন। ইদানীর কোন্ কবি দিতেন?

(৩) আমরা ঐতরেয় আরণ্যকের নামও শুনি নাই। কবি কোথায় শুনিলেন?

ঐতরেয় আরণ্যকে সাধে রহমন।
শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহ হইতে মিলন ॥* (৬২।২ পৃ)

আমাদের দেখিতে হইবে, কথাটা সত্য, না মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয়, তবে বুঝিতে হইবে জালিকের প্রতারণা, যদি সত্য হয়, তবে সাধু পণ্ডিতের কর্ম। আমি ইহার টীকা করি নাই, আরও অনেক শাস্ত্রীয় উক্তির করি নাই। আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে, রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে এদেশে কেহ উপনিষদাদি অধ্যয়ন করিতেন না।* ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করিতেন, কেহবা সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি দুই একখানা পুরাণ পড়িতেন। আমরা ভুলিয়া যাই নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, চৈতন্যদেবকে বহু সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার করিতে হইয়াছিল। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার "স্মৃতিতত্ত্বে" স্থানে স্থানে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে সকল বাক্য গৃহসূত্র হইতে বটে, কিন্তু যিনি একটা সূত্র অধ্যয়ন করেন তিনি আরও কিছু করেন। সে সব পণ্ডিতের কথা ছাড়ি। ভারতচন্দ্র বিষয়ী লোক ছিলেন, তিনি ষড়্দর্শনের সারমর্ম কোথায় পাইলেন? মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কালে পুরাণাদির

---

* রামমোহন রায়ের সমকালে বা তাহার কিছু আগে বঙ্গে সাধারণতঃ কোন উপনিষদাদি পঠিত হইত না, ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার দুই তিন চারি শত বৎসর আগেও কেহ বঙ্গে শ্রুতি অধ্যয়ন করিতেন না, এ রকম বিশ্বাস কাহারও আছে বলিয়া আমি অবগত নহি।—প্রবাসীর সম্পাদক।

বঙ্গানুবাদ ছিল না। তিনি কোথায় শাস্ত্রজ্ঞান পাইয়াছিলেন? আমি বৈষ্ণব শাস্ত্র জানি না। কিন্তু বুঝি, এই শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ নয়। চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কোথায় পাইলেন? ইহার মূল নিশ্চয় কোন উপনিষদ্ হইতে বাহির করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব গোস্বামীগণ কোথাও ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবেন, উদয়-সেনও শুনিয়া থাকিবেন। ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরণ্যক প্রকৃত উপনিষদ্। ইহাতে ব্রহ্ম ও প্রাণ পৃথক্ করিয়া উভয়ের পৃথক্ উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম ও প্রাণ, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ ও রাধা। অবশ্য কোন প্রাচীন উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার নাম নাই। ঐতরেয় উপনিষদ্ নামে একখানি ছোট উপনিষদ্ আছে। তাহাতেও ব্রহ্ম ও জীব ব্যাখ্যাত আছে। চণ্ডীদাসের 'মানুষ' সেই ব্রহ্ম, একথা বহু স্থানে লিখিত আছে। উদয়-সেন অন্য স্থানে নিরুক্তকার যাস্কের মতে বেদোক্ত তিন দেবতার নাম করিয়াছেন। (২৮০।১, ২০৯ পৃ)। এই সকল পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াও বলিতে পারেন, এক জন সামান্য জালিক অর্থলোভে এই কর্ম করিয়াছেন? জালিক অন্যের হাতের অক্ষর ও ছাঁদ নকল করিতে পারে, পাণ্ডিত্য নকল করিতে পারে না। কৃষ্ণ-সেন লিখিয়াছেন, উদয়-সেন সর্বশাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন। তাহারই প্রমাণ পাইতেছি।

(৪) এবার জাগ মা জনম-ভূমি
যাবে কি জনম কাঁদিয়ে। ইত্যাদি (২৪।২পৃ)

বন্ধুর প্রশ্ন, স্বদেশের দুঃখে অশ্রুমোচন শত বর্ষের পূর্বের রচনায় পাওয়া যায় না। এই হেতু তাঁহার সন্দেহ, গীতটি স্বদেশী-আন্দোলনের পরে রচিত।

আমার উত্তর। এই গীতের পূর্বাপর প্রসঙ্গ স্মরণ করিতে হইবে। চণ্ডীদাস গৃহত্যাগী, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তিনি ভয়ে কাশীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার মাতার কাশি-প্রাপ্তি হয়। দেশে ফিরিয়া দেখিলেন গ্রামে দুর্দশার একশেষ, গ্রাম ভস্মীভূত। চণ্ডীদাসের শোক কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। তার পর দেখিতেছি জননী জনমভূমি চণ্ডীদাসকে কোলে লইতে যাইতেছেন, কিন্তু বাসলী জনমভূমির কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিতেছেন,

আয় কোলে আয় মোর আমি যে জননী তোর
কার অঙ্গে এত জোর হয় তোর মাতা।

ইদানীর কোন্ কবির মনে এই ভাব উঠিত? জন্মভূমি মা নহেন, বাসলী মা।

দ্বিতীয় কথা, কবি সহৃদয় না হইলে মর্ম-পীড়া না পাইলে শ্লোকোচ্ছ্বাস আসে না। ভারতচন্দ্রে দেখি তিনি পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত, মাতুলালয়ে পলায়িত, তাঁহার প্রতিপালক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদে কারাগারে বদ্ধ। দুঃখের এত কারণ সত্ত্বেও তাঁহার চোখে একবিন্দু জল পড়ে নাই। মুকুন্দরাম-চক্রবর্তী সাতপুরুষের ভিটা ছাড়িবার সময় কাঁদিয়াছিলেন।

তৃতীয় কথা, 'ইহা হইতে পারে না'—এইরূপ উক্তির মূল দুইটি হইতে পারে। প্রথম মূল, আমরা সদৃশ ঘটনা দেখি নাই, শুনি নাই। ইহা হইতে মূর্খেরা মনে করে, সেরূপ ঘটনা হইতে পারে না। কিন্তু একটু ভাবিলেই বুঝি, বহু ঘটনা না দেখিলে অসম্ভাব্যতা স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় মূল, যে দেশ কাল ও পাত্রে চিত্তের ক্ষোভ জন্মে, সে তিনের একটিরও অভাব হইলে বলি ইহা হইতে পারে না। যদি কারণ বর্তমান থাকে কার্য অবশ্য প্রকাশিত হয়। এখানে কবির দেশ অল্পদিন পূর্বে স্বাধীনতা-বর্জিত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন। কবি কৃষ্ণ-সেন স্বজাতী লছমীনারায়ণের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন। আর তিনি কবিও বটেন। এস্থলে কবির শোক স্বাভাবিক মনে করি। কৃষ্ণ-সেনের পূর্বে কোন কবি দুঃখের গীত গান নাই। কেহ গাহিতে পারিতেন না কি? গাহিতে বাধা দেখিতেছি না। উপস্থিত স্থলে আরও মনে রাখিতে হইবে, কবির জন্মভূমি অপেক্ষা বাসলী দেবী গরীয়সী। বঙ্কিমচন্দ্রে ও স্বদেশী গীতে দেশমাতৃকা শ্রেষ্ঠা। অতএব উভয় ভাবে সাদৃশ্য নাই।

(৫) কেহ কেহ রামীর 'অন্তরতম সুন্দর এস এসহে জীবনস্বামী', (৭৫।২ পৃ), এই গীতের 'অন্তরতম' শব্দ রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে চুরি মনে করিয়াছেন। কিন্তু শব্দটি সংস্কৃত অর্থে প্রযুক্ত। চ-চরিতে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে। গত বৎসর "প্রবাসী"তে এক পাঠক দেখাইয়াছিলেন, রামীর গীতটির অর্থ যোগীজনবোধ্য। ইহার সুর

রবীন্দ্রনাথের গীতে পাওয়া যায় না। অতএব থাকিল একটি শব্দের সাদৃশ্য। কবি আর এক স্থানে (১২৫।১ পৃ) 'অন্তরতম' শব্দ লিখিয়াছেন। অতএব শব্দটি তাঁহার অতি পরিচিত। তথাপি একটা দুইটা পাচটা দশটা সাদৃশ্য দ্বারা একত্ব সাধিত হয় না। হীরা ও কাচে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হীরা ও কাচ এক বস্তু নয়। আর, সংশয়ের সংখ্যা বিশটা হইলেও সংশয়ই থাকে, সিদ্ধান্ত হয় না। সংশয় দশমিক চিহ্নের পরের অঙ্ক, বিশটা অঙ্ক বসাইলেও 'এক' সংখ্যা হয় না। আমি স্বীকার করি চ-চরিতে এমন ভাব ও বাগ্‌ভঙ্গি আছে যাহা শতবর্ষ পূর্বে ছিল কি না, সন্দেহ হইতে পারে। আমি "প্রবাসী"তেও লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সন্দেহের প্রমাণও পাই নাই। নিশ্চিত পুরাতন নীলাচল-তুল্য, অনিশ্চিত সন্দেহ সর্ষপ-সমান। সর্বজ্ঞ না হইলে কেহ বলিতে পারে না, ইহা হইতে পারে না। সম্ভাব্যতার কারণ না পাইলে বলি, ইহা হইতে পারে না। সে কারণ সকলের জ্ঞাত না হইতে পারে।

৬। পুথীখানা অকৃত্রিম

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে যে খণ্ডিত, অসম্বদ্ধ উক্তি অন্য কবিরা করিয়া গিয়াছেন, চ-চরিতে সে সকলের বিবৃতি পাইতেছি, চণ্ডীদাসের মূর্তি আর কল্পনায় গড়িতে হয় না। ২৮৬ বৎসর পূর্বে উদয়-সেন যাহা শুনিয়াছিলেন তাহার শত বৎসর পরেও কবিরা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। দুই একটা দেখাই।

এক কবি লিখিয়াছেন,

নিত্যার আদেশে বাসলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।

কিন্তু নিত্যার আদেশ নয়, নিত্যাদেবী বাসলীর সহচরী। সালতড়া গ্রামে নিত্যার আলয় এখনও আছে। বাসলী ছাতনায়। চণ্ডীদাসও ছাতনায়। কবি ঠিক জানিতেন না।

এক কবি লিখিয়াছেন,

চণ্ডীদাস কহে শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

এই উক্তির অগ্রপশ্চাৎ কিছুই নাই। সে 'মানুষ' যে কে, তাহা আমরা এত দিন বুঝিতে পারি নাই। কেহ 'মহামানবিকতা' বুঝিয়াছিলেন, কেহ দেহী মানুষ বুঝিয়াছিলেন। এখন চ-চরিতে এই উক্তির ব্যাখ্যা ও হেতু পাইতেছি।

একটা কথা আছে চণ্ডীদাস পাষণ্ডদলন করিয়াছিলেন। কে সে পাষণ্ড, কেমনে তাহার মতি পরিবর্তিত হইয়াছিল, আমরা কিছুই জানিতাম না।

আর এক কথা আছে। বিদ্যাপতি ও রূপনারায়ণের সহিত চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছিল। এই কথায় কত বাদপ্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে। এখন জানিতেছি, মিলন-সংবাদ অন্ততঃ ২৮৬ বৎসরের পুরাতন। এ সব কথা ঐতিহাসিক সত্য কিনা, সে বিচার স্বতন্ত্র।

চ-চরিতে এই রকম অনেক উড়া-কথার মূল পাওয়া যাইতেছে। চণ্ডীদাস কোন্ শকে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু আমরা এ যাবৎ সে সব উক্তিতে নির্ভর করিতে পারি নাই। শুধু বিশ্বাস করিতাম, চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্বে ছিলেন, সে এক শত বৎসর কি দুই শত বৎসর তাহা বলিবার উপায় ছিল না। চ-চরিতে দেখিতেছি তিনি ১৩২৪ শকে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। ১৪০৭ শকে চৈতন্য-দেবের জন্ম। অতএব চৈতন্য-দেবের ৮৩ বৎসর পূর্বে চণ্ডীদাস ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই রকম একটা কিম্বদন্তিও ছিল। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি নাই।

পুনশ্চ

বিধুর নিকটে বসি নেত্রপঞ্চবাণ।

এই এক সঙ্কেত অঙ্ক আমরা অবিশ্বাস করিতেছিলাম। ইহার অর্থ ১৩২৫ শক।

বাঁকুড়া 'গেজেটিয়রে' ওমালী সাহেব লিখিয়াছেন, সামন্তভূমের আদি রাজা শংখ-রায় ১৩২৫ শকে ছিলেন। এটি ভুল। হইবে বর্তমান রাজবংশের আদি রাজা ছিলেন। ইনি শংখ-রায় নহেন, হামির উত্তর-রায়। এই যে অঙ্কটি নানা দিক্ হইতে পাইতেছি ইহাতে আর অবিশ্বাস করা চলে না।

বীরভূম নান্নুরে বিশালাক্ষী প্রতিমা নাই, সরস্বতী

প্রতিমা আছে। লোকে সরস্বতীকে বিশালাক্ষী মনে করিতেছে। বিশালাক্ষীর প্রতিমা কত কাল নাই, আমরা জানি না, কিন্তু দেখিতেছি উদয়-সেন ২৮৬ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলেন। ইহার কিছু পূর্বে দ্বিজ চণ্ডীদাস বীরভূম অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের গীত বহু প্রচারিত হইয়াছিল। চ-চরিতে একটি গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। (১৫৬/২ পৃ)। ছাতনার চণ্ডীদাসও দ্বিজ। লোকে দুই দ্বিজের প্রভেদ করিতে পারে নাই, বাসলী-আদেশের চণ্ডীদাস যে অন্য তাহা বুঝিতে পারে নাই।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" চণ্ডীদাস বাসলী বন্দিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা গাহিয়াছেন। ইহা কিরূপে সম্ভবিল, আমি বুঝিতে পারি নাই। মুকুন্দরাম-চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণিয়াছেন, ঘনরাম ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য গাহিয়াছেন, ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে অন্নদার মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাস বাসলীর মাহাত্ম্য বর্ণনা না করিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাধাকৃষ্ণের লীলা-গীত গাইলেন! চ-চরিত পড়িয়া বুঝিতেছি তিনি বাসলীরূপা শক্তি উপাসনা হইতে শিব-শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, প্রকৃতি-পুরুষের মিলন দেখিয়াছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণের কল্পিত মানবীয় লীলায় জীব-ব্রহ্মের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

সূক্ষ্মবুদ্ধি বলিতেছেন এই সকল ঐক্য দ্বারাই বুঝিতেছি, পুথীখানা জাল। জালিয়াৎ বুদ্ধিমান্ মেধাবী ও পরিশ্রমী, কলিকাতায় গিয়া লাইব্রেরীতে বসিয়া চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যেখানে যাহা পাইয়াছিল সব পড়িয়াছিল, আরও অনেক বই পড়িয়াছিল, বিবিধ ছন্দে হাত পাকাইয়াছিল। কিন্তু এই যুক্তি চমৎকার! এটি শাঁখের করাত, 'যেতে কাটে, আস্‌তে কাটে'। যদি দেখ এই গ্রন্থে চণ্ডীদাসের চরিতের সংলগ্ন বৃত্তান্ত আছে, তাহা হইলে বইখানা নিশ্চয় জাল। কারণ, হালের লোক কিরূপে জানিবে? আর যদি দেখ, নাই, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে স্পষ্ট জাল। কারণ হালের জালিয়াৎ সে সব কথা কোথায় পাইবে?

যদি চ-চরিতে নূতন ভাব* কিছু আছে, সে এক আনা হউক, আর দুই আনা হউক। কিন্তু সে কারণে কি পুথীখানা জাল? বাল্মিকী রামায়ণ খ্রীষ্টের সহস্র বৎসর পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধকে তস্কর বলা হইয়াছে। ইহা হইতে রামায়ণ-কাব্য খ্রীষ্টের তিন শত বৎসর পূর্বে আসিতেছে। রামায়ণে রামচন্দ্রের জন্মকুণ্ডলীও আছে। সে খ্রীষ্টের নিকটবর্তী কালের কথা। বাল্মিকী রামায়ণকে জাল বলিতে এ পর্যন্ত শুনি নাই। এইরূপ যুক্তিতে মহাভারত এক প্রকাণ্ড জাল, কৃত্তিবাসী রামায়ণ জাল।

একদা ভগবান্ তথাগত শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া নানা প্রকারে পুরুষের শ্রেণীভেদ করিয়াছিলেন। "হে ভিক্ষুগণ সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে। সেই তিন শ্রেণী কি? অন্ধ, একচক্ষুঃ ও দ্বিচক্ষুঃ।" তিনি পরমার্থ ধরিয়া এই তিন শ্রেণীর লক্ষণ বলিয়াছিলেন। সে সব লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়াও আমরা জানি, অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন, সে পরের কথায় চলে ও ফিরে। সংসারের অধিকাংশ পুরুষ অন্ধ, কিন্তু মনে করে চক্ষুষ্মান্। একচক্ষুঃ পুরুষ দ্রব্যের একটা পাশ দেখিতে পায়, অন্য পাশ পায় না। তাহার সমগ্রতার জ্ঞান হয় না। নৈকট্য ও দূরত্বের জ্ঞানও হয় না, কষ্টে তাহাকে শিখিতে হয়। পুরুষ দ্বিচক্ষুঃ হইলেও তাহার দুই চক্ষু সমান পটু হয় না। কেহ এক চোখে ভাল দেখে, অন্য চোখে দেখে না। আমরা কখনও কখনও রুষ্ট হই, মনে করি সে স্বার্থবশে একচক্ষুঃ হইয়াছে। আমরা ভুলিয়া যাই, তাহার জন্মগত প্রকৃতি এই। কেহ মোহবশে একচক্ষুঃ হয়। সে বুঝিতে পারে না। আমি একচক্ষুঃ কি না জানি না। কিন্তু জানি যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্মহানি হয়।

* 'যাঁহারা চণ্ডীদাস-চরিত জাল, এই অপবাদ দিয়াছেন তাঁহারা কেহই স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করেন নাই, নূতন ভাবগুলি কি, এবং তাহার বা তাঁহাদের বঙ্গসাহিত্যে আবির্ভাব কখন হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় বিচার কিরূপে হইতে পারে?—প্রবাসীর সম্পাদক।

অনুভূতি

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

দুঃখ জিনিষটা যে উপভোগ করা যায় এ-কথাটা যেদিন আবিষ্কার করিলাম, সেদিন দুঃখের আর বেদনাবোধ রহিল না অথবা বেদনাবোধ রহিল, কিন্তু বেদনা উপভোগের উপকরণ হইয়া উঠিল।

আমার মনে হয়, আমি এই সত্যটি সবে সেদিন আবিষ্কার করিলেও ইহা চিরন্তন। কালিদাস হয়ত বিরহ-বেদনা তীব্রভাবে ভোগ করিয়া সহসা বেদনার অন্তরাল দিয়া সুখের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই লিখিয়াছিলেন মেঘদূত। যক্ষের বেদনা যে অমিশ্র বেদনা তাহা কে বলিল?

অবশ্য সব রকম দুঃখের বেলায় এ-কথা বলা চলে না। কারণ এমন দুঃখ নিশ্চয় আছে, যাহাতে সান্ত্বনা নাই, যন্ত্রণার ক্ষণিক বিরামের অবকাশ পর্য্যন্ত নাই। আবার সেই সঙ্গে এমনও আছে, যাহা নিতান্ত সৌখীন, যাহার বাহিরের ছায়াধূসর আবরণের মধ্যে হাস্যোজ্জ্বল সুখ লুকাইয়া আছে। এই দুই জাতীয় বেদনার কথা বলিতেছি না। এমন একটি বেদনাও নিশ্চয় আছে, যাহা প্রকৃতই বেদনা, কিন্তু মনকে বিপরীত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া সেই বেদনাকেই উপভোগ করানো যায়। আমার সাতাশ বৎসর বয়সের এ আবিষ্কার নিজের কাছে নূতন মনে হইলেও নূতন কিছুতেই নয়।

প্রায় মাসখানেক আগে সুলেখার সহিত মনোমালিন্য হইয়াছে। সে-সময়ে ভাবিয়াছিলাম, দোষ সম্পূর্ণ সুলেখার, আমি একান্ত নির্দ্দোষ। আজ এক মাস পরে সুলেখার কাছ হইতে ছিয়ানব্বই মাইল দূরে বসিয়া স্থান ও কালের ব্যবধানহেতু আগাগোড়া ঘটনাটি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেছি। পরিষ্কার বুঝিলাম, আমার অনর্থক জেদই এ অঘটনের মূল। সুলেখার কোন দোষ নাই, ঔচিত্যের বাহিরে এক পা-ও সে যায় নাই।

বিষণ্ণ হইলাম, এবং মুহূর্ত্ত পরে আবিষ্কার করিলাম সেই বিষণ্ণতা আমাকে নিছক বেদনা দান করিতেছে না। বিস্মিত হইলাম, কিন্তু বহু-আবিষ্কৃত সত্যের পুনরাবিষ্কার করিয়া খুশীও কম হইলাম না। এত দিন পরে মনে হইল, সুলেখার সহিত ঝগড়া করিয়া অন্ততঃ একটা সুফল ফলিয়াছে।

অষ্টমীপূজার দিন বেলা প্রায় নয়টার সময়ে। একই ফরাসে দুইটি ব্রিজের আড্ডায় ভগ্নহৃদয়ের সান্ত্বনা খুঁজিবার চেষ্টা বৃথা, কিন্তু কতকগুলি বয়স্ক লোক এই শিশুসুলভ—অন্ততঃ আমার মতে—খেলা লইয়া দিনরাত্রি, দ্বিপ্রহর প্রভাতের ব্যবধান ভুলিয়া যায় কি করিয়া, সে সম্বন্ধে মানসিক গবেষণা করিয়া আনন্দ আছে।

অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কে যেন সত্রাসে এবং নিম্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ করেছে, আমেজ মিঞা এসেছে, দই-মিষ্টিগুলো লুকানো আছে ত?"

বোধ হয় যথোপযুক্তভাবে লুকানো ছিল না, তিন-চার জন শশব্যস্তে উঠিয়া বারাণ্ডার পাশের অস্থায়ী ভাঁড়ার-ঘরের খাটের নীচে গোটাকয়েক ক্যানেস্তারা এবং মাটির হাঁড়ি ভাল করিয়া ঠেলিয়া দিল। তাহার পরে ভালমানুষের মত আসিয়া ফরাসে বসিয়া খেলা দেখিতে আরম্ভ করিল, যেন আমেজ মিঞা, সন্দেশ ও রসগোল্লা, সবগুলি সম্বন্ধেই তাহারা সমান অনভিজ্ঞ।

কৌতূহলী দৃষ্টি উঠান পার হইয়া সদর দরজার বাহিরে নিক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম আমেজ মিঞা তখনও দরজার চৌকাঠ পার হয় নাই। চেহারার বৈশিষ্ট্য আছে, কাজেই বেশ খানিকটা দূর হইতেই নজরে পড়ে; তাছাড়া, বয়সের আধিক্যহেতু মন্থর গতি।

উঠান পার হইয়া সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিতে তাহার সময় লাগিল। কাছে আসিয়া একটি সেলামে প্রায়

কুড়ি জনের কাজ শেষ করিয়া নিস্পৃহ ভাবে সিঁড়ির উপর বসিল।

এক বৎসর পরে আমেজ মিঞাকে দেখিলাম। এক বৎসরে যেন আরও অনেকখানি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, যদিও পঞ্চাশের খুব বেশী বয়স নহে।

আমাদের ধানজমি চাষ করিয়া ফসলের একটি ক্ষুদ্র অংশ লইয়া যাহারা বাঁচিয়া আছে, আমেজ তাহাদেরই এক জন। ইহারা সকলেই মোটামুটি অতি দরিদ্র। নির্লোভ নহে, কিন্তু সৎ। পল্লী-অঞ্চলের ভদ্রশ্রেণীর কলহ বিবাদ ও ষড়যন্ত্রের ধার ইহারা ধারে না। ধারিলে চলেও না। অপরিমিত পরিশ্রম, অর্দ্ধাশন ও ম্যালেরিয়া ইহাদিগকে অধিকাংশ বিষয়েই ভদ্রশ্রেণীর অনুগামী হইতে সাহায্য করে নাই। সুখাদ্য জিনিষটি কালেভদ্রে বাবুদের বাড়ীর পূজাপার্ব্বণেই ইহারা পাইয়া থাকে, কাজেই দুর্গাপূজার কয় দিন যখন এই কদন্নভোজী, স্বাস্থ্যহীন, কৃষ্ণবর্ণ প্রাণী কয়টি সিঁড়ি হইতে ভাঁড়ার-ঘরের দিকে উঁকি দেয়, তখন বড়বাবু-মেজবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া দুই বৎসরের শিশুটি পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেও, আমার একটু অস্বস্তি বোধ হয়। কিন্তু আমি বড়বাবু মেজবাবু ইহাদের কাহারও পদবী পর্য্যন্ত পদোন্নতি লাভ করি নাই, কাজেই ভাঁড়ার-ঘরের জিনিষগুলি যথেচ্ছা দ্বাদশ প্রেতকে বিলাইয়া দিবার অধিকারও হয় নাই।

অধিকাংশ সময়েই তাহাদের উঁকি মারাই সার হয়। পূজার দিনে প্রার্থী কাহাকেও ফিরানো হয় না; কিন্তু তুমি-আমি, বড়বাবু-মেজবাবু, আমরা কষ্ট করিয়া কলিকাতা হইতে পয়সা খরচ করিয়া ম্যালেরিয়ার দেশে গিয়াছি, আমাদের জন্য মিষ্টান্ন আসিয়াছে, তাহা অযথা খরচ করিলে চলিবে কেন? ফিরাইয়া দেওয়া হয় না কাহাকেও, চিঁড়া, তরল দধি, গোটাকয়েক নারিকেলের সন্দেশ, খুব বেশী হইলে একটি রসগোল্লা, ইহা দিয়াই এই রবাহূতদিগকে বিদায় করা হয়। তাহারা প্রতিমা নমস্কার করিয়া সানন্দেই চলিয়া যায়।

কিন্তু এই আমেজ লোকটি নাছোড়বান্দা। বাড়ীর বর্ত্তমান যুগের বড়বাবু-ছোটবাবুদিগকে সে শিশুকাল হইতে দেখিতেছে, কাজেই খুব বেশী আমল দেয় না। তাহার রসনাসংক্রান্ত লোভ একটু অতিরিক্ত। কাহারও চোখে না পড়িলেও সে ক্যানেস্তারা দেখিলেই বুঝিতে পারে তাহার মধ্যে কেরোসিন তেল আছে, না ঘি আছে, না বনগ্রামের কাঁচাগোল্লা আছে এবং ভাঁড়ার-ঘরে দধির ভাঁড় খাটের তলায় রাখিয়া চার-পাঁচখানি শীতল-পাটি দিয়া খাটের নীচের ফাঁক ঢাকিয়া দিলেও তাহার শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

আমেজ লোকটি দেখিতে অত্যন্ত কুশ্রী। খুলনা জেলার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সুরূপ হয় না, কিন্তু আমেজ তাহাদের সকলকে হার মানাইয়াছে। তাহার গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণ, লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশী নয়। উদরের পরিধি অত্যধিক। সকলের উপরে বিরলদন্ত মুখ ও খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি-গোঁফ দেখিয়া প্রথম হইতেই বিতৃষ্ণা আসিয়া যায়।

এগারটা প্রায় বাজে দেখিয়া স্নানের চেষ্টা দেখিতে খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থামের আড়ালে এতক্ষণ অদৃশ্য আমেজও উঠিল।

সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। কারণ কালেভদ্রে যাহারা বাড়ী যায়, তাহাদের সহিত দেখা হইলেই কুশল প্রশ্নের পরের ধাপই হইল পয়সা চাওয়া। বলিলাম, "কি হে আমেজ, খবর কি? ভাল ত?"

আমেজ একটু বিষণ্ণ হাসিয়া বলিল, "ভাল আর থাকি কি ক'রে বাবু, এক ভাবনা যাতি না যাতি আর এক ভাবনা আস্যে জোটে।"

বলিলাম, "সে আর নতুন কথা কি হ'ল? সকলেরই তাই।"

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে কথা কলি' কি চলে বাবু, আমাগো ভাব্না অন্য রহম।"

কথাটা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। স্নানের বেলা হইতেছিল, বলিলাম, "তা তুমি বিকেল বেলা এস, তোমাকে কিছু দেব'খন।"

পল্লীর যে-কোন কৃষাণকে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিবার ইহার চেয়ে ভাল ঔষধ আর নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, আমেজ খুব উৎসাহ দেখাইল না। শুধু স্বীকার করিল, বিকালে আসিবে।

সে ধীরমন্থর গতিতে চলিয়া যাইতেই দেখিলাম, কয়েক জন নিবিষ্টচিত্তে আমাকে লক্ষ্য করিতেছে। বলিলাম, "আপদ গেল ত?"

আমার সম্পাদক খুল্লতাত তাস রাখিয়া বলিলেন, "গেল? গেল মানে? ও ত সবে এল।"

"আহা এ রকম আসা ত রোজই আসে। আনা-কয়েক পয়সা দিয়ে দেব'খন বিকেলে, চুকে যাবে।"

রাঙাদা বলিলেন, "চুকে যাবে?"

"যাবেই ত। তোমাদের রসগোল্লা-সন্দেশের দিকে ও যতই নজর দিক, তাতে আমার হজমের ব্যাঘাত ঘটবে না। আমাকে আর না জ্বালালেই হ'ল।"

মনে হইল, আমি কথাটাকে যত সহজে উড়াইয়া দিলাম, আর কেহ তাহা পারিলেন না। বড়দা খুলনা কোর্টে ওকালতি করেন, তিনি বলিলেন, "ওকে বেশী আস্কারা দিও না। চেনো না ত, শহরে থাকো—"

আশ্বাস দিয়া বলিলাম, "নির্ভয়ে থাকুন, আমি ওকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলব না।"

ক্রিয়াকর্ম্মের বাড়ীতে স্নানাহার করিতে দুইটা বাজিল। খানিকটা ঘুমাইয়া লওয়া চলিত, কিন্তু ভাবিলাম ডাক্তারের বৈঠকখানায় আড্ডা দিয়া দুপুরটা কাটাইয়া দেওয়া যাক।

ডাক্তার গ্রামেরই লোক, দূরসম্পর্কে জ্ঞাতি। বয়সে আমাদের চেয়ে কিছু বড়; যশোহর মেডিক্যাল স্কুল হইতে পাস করিয়া নিজের বাড়ীতেই ডাক্তারখানা খুলিয়াছে। ছুটির দিনে দ্বিপ্রহরে যাহারা নিদ্রার শরণ লইতে ভালবাসে না, তাহারা এইখানে আসিয়া বসে। ডাক্তার গালগল্প করিতে পারে ভালই, এবং তাস খেলিতে জানে না। আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা ইহাই।

ডাক্তারের ঘরে আসিয়া দেখি ডাক্তার হুঁকা হাতে লইয়া চেয়ারে বসিয়া ঝিমাইতেছে। পায়ের শব্দে চক্ষু অর্দ্ধ-উন্মীলিত করিয়া একবার দেখিল, কিন্তু গল্পগুজব সম্বন্ধে কোন উৎসাহ দেখাইল না। সম্ভবতঃ মধ্যাহ্ন-ভোজনটা একটু গুরু হইয়া গিয়াছিল।

ডাক্তারের ঘরের পাশে তিনটি ভাঙা আলমারি সম্বল করিয়া গ্রামের লাইব্রেরি। অগত্যা একখানি বই লইয়া পড়িয়া দুপুরটা কাটানোর চেষ্টা করিলাম। ঘুম আসিল না। কারণ দুপুরে আমার ঘুম আসে না।

বইটার দুই-তিন পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বুঝিলাম পড়া বই, এবং আমিই এক কালে বইখানি লাইব্রেরিকে দান করিয়াছিলাম। তবু পাতা উল্টাইতে লাগিলাম এবং একই সঙ্গে পল্লীপ্রকৃতির মধ্যাহ্ন-উৎসব দেখিতে লাগিলাম।

শরৎকালের পল্লী-প্রত্যূষ খুব সুন্দর নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমার মনে হইল, দুপুর ও বিকালের মধ্যের সময়টুকু এই যোগেশ্বর ঔষধালয়ের বারাণ্ডায় ভাঙা চেয়ারে বসিয়া উপভোগ করার মত শান্ত আনন্দ আর নাই। চোখের সামনে প্রখর রৌদ্র ও নিবিড় ছায়ার মধ্যে লুকোচুরি চলিয়াছে। পানাপুকুরের পাশে রাস্তা জনবিরল, কচিৎ দুই-একটি লোক, একটা কুকুর, অথবা একটা গরু ছাড়া অপর কোন প্রাণীর অস্তিত্ব সেখানে নাই। পাশের আমবাগানে কি যেন একটা পাখী ডাকিতেছে, নাম জানি না; গলার স্বর মিষ্টি নহে, কিন্তু মনে হইল শান্ত প্রকৃতির নিস্তব্ধতার নিবিড়ত্বের পরিচয় দিতে ঐ পাখীটিই পারিতেছে, সুকণ্ঠ কোন পাখী পারিত না।

গোটাকয়েক পাতিহাঁস কোথা হইতে আসিয়া পানা-পুকুরের উপর সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। আমি নিবিষ্ট-চিত্তে বসিয়া দেখিতে লাগিলাম, রৌদ্র ও ছায়া, অসীম শান্তি ও ক্ষণিক অশান্ত পাখীর ডাক, হাঁসের ডানাঝাড়ার শব্দ। আর কিছু মনে রহিল না, কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত সুলেখা নামক যে একটি তরুণী সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়া ছিল, তাহার কথাও না।

ডাক্তার ইতিমধ্যে চেয়ারে-বসা অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হুঁকাটা মাটিতে পড়িয়া, জল গড়াইয়া মাটির মেঝের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

ঠিক এমনি ভাবেই ঘণ্টা-তিনেক কাটিয়া গেল। অন্য দিন দুপুরবেলা ডাক্তারের বাড়ী আড্ডাপ্রয়াসী অনেকের সমাগম হয়, আজ আর কেহ আসিল না। দেখিলাম তাহাতে ডাক্তার ও আমার কাহারও অসুবিধা হয় নাই। ডাক্তার নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতে পারিয়াছে, আমি বিনাবাধায় মধ্যাহ্ন-প্রকৃতির রূপসুধা পান করিয়াছি। যাহারা না

আসিয়াছে তাহারা না আসুক, ভোজনস্নিগ্ধ দেহ লইয়া যত ক্ষণ ইচ্ছা করাসে গড়াইয়া নিক, আমার আপত্তি নাই। এখন নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কোন সঙ্গীর প্রয়োজন আমার নাই।

কখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, খেয়াল করি নাই। ইতিমধ্যে ডাক্তারের ঘুম ভাঙিয়াছে, সে ভূপতিত হুঁকাটি লইয়া নূতন করিয়া তামাক সাজিয়া ঘুমঘোর কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

তাকাইয়া দেখিতেছিলাম। ডাক্তার গোটাকয়েক টান দিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "হবে নাকি?"

মাথা নাড়িলাম। আমি শহরের ছেলে, আমার কাছে সিগারেট আছে। একটা ধরাইয়া বলিলাম, "এইবার বাড়ী যাই।"

ডাক্তার বলিল, "যাবে যাও। তার আগে ঐ লোকটির হাত থেকে বাঁচতে চাও ত চট ক'রে আমার কম্পাউণ্ডিং-রুমে ঢুকে পড়।"

চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমেজ। হাসিয়া বলিলাম, "ওর হাত থেকে পালিয়ে কত দিন বাঁচব? আমি বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।"

আমেজ কিন্তু আমার সহিত প্রথমে কথা কহিল না। ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আর একড়া গুলি দেবা নাকি?" ডাক্তার প্রায় মুখ ভেংচাইয়া বলিল, "দেবা নাকি? কুইনিনের গুলি বিনে পয়সায় আসে? না?"

আমেজ একটুও অপ্রস্তুত হইল না। বলিল, "তা মদ্যি মদ্যি দু-চারডে বিনে পয়সায় দেবা ছাড়া কি! তা আজ দ্যাও একডা, পয়সা পাবানে।"

পয়সা পাওয়ার আশা ডাক্তারের মুখে চোখে দেখা গেল না। সে গজ গজ করিতে করিতে উঠিয়া গিয়া শিশি হইতে স্বহস্তনির্মিত একটি পিল বাহির করিল, অন্ততঃ দশ গ্রেনের।

সবিস্ময়ে বলিলাম, "অত বড় পিল?"

ডাক্তার বলিল, "এ তোমাদের সৌখীন জ্বর নয়, পাঁচ গ্রেনে আটকায় না।"

"তা না আটকাল, কিন্তু অত বড় গুলি গলা দিয়ে ঢুকবে কি ক'রে?"

এইবার ডাক্তার একান্ত কৃপার দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বলিল, "ওর গলায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চ'লে যায়, এ ত একটা কুইনিন পিল!"

পিল লইয়া জলের সাহায্য ব্যতিরেকেই আমেজ অক্লেশে গিলিয়া ফেলিল, একটু মুখবিকৃতি পর্য্যন্ত হইল না।

ডাক্তার চটিয়াই ছিল। এইবার বলিল, "বুঝলে মণীশ, আমার পৌনে চোদ্দ আনা রুগীই এই রকম। এরা ওষুধকে মনে করে সন্দেশ-রসগোল্লা, কুইনিন-মিক্সচারকে মনে করে দই। খালি পয়সা দেবার বেলায়—হুঃ।

অর্থাৎ লোকগুলি এতই হীনচেতা যে, শুধু ডাক্তারকে জব্দ করিবার জন্যই বিনাপয়সায় খানিকটা বিস্বাদ ঔষধ গিলিয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ঔষধের প্রয়োজন কিছু নাই।

ডাক্তার মুখ-হাত ধুইতে বাড়ীর ভিতরে গেল। এত ক্ষণে আমেজ কথা কহিল। বলিল, "বাবু—"

আমি নিঃশব্দে পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলাম।

সে সেদিকে তাকাইল না। বলিল, "আপনার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।"

"কি কথা?" একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম। প্রায় অযাচিত ভাবে যে পকেট হইতে চার আনা বাহির করিয়া দেয়, খানিকটা কৃতজ্ঞতা তাহার নিশ্চয় প্রাপ্য।

আমেজ বার-কয়েক ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমারে গোটাপাচেক ট্যাহা দিতি পারেন?"

নিতান্ত সুস্থদেহ লোক বলিয়াই বিস্ময়ে অচৈতন্য হইলাম না। কিন্তু এতই আশ্চর্য্য ঘটনা, যে বিস্মিত হইতেও ভুলিয়া গেলাম।

বলিলাম, "পাঁচ টাকা? কি হবে? কোথায় পাব?"

আমার শেষ প্রশ্নের জবাব সে দিল না। বলিল, "উকীলবাবু বড় তাগাদা দিতিইলেন।"

"উকীলবাবু? মামলা সুরু করেছ নাকি? ও-সব ঘোড়া-রোগ কেন?"

সে লজ্জিত হইয়া বলিল, "মামলা সুরু আর করবো কোথাখে? ম্যায়েডা গলায় দড়ি দিইল—"

নিজের অজ্ঞাতেই কহিলাম, "গলায় দড়ি দিয়েছিল? মরে গেছে?"

"মলি ত ভালই হ'ত, মরিছে আর কই? বাচ্যেই আছে, আমারে দগ্ধে খাচ্ছে।"

"গলায় দড়ি দিয়েছিল কেন?"

বলিয়াই নিজের নির্বুদ্ধিতে অবাক হইলাম। যেন পল্লীর নিরন্ন স্বাস্থ্যহীন সামর্থ্যহীন রমণী প্রণয়ঘটিত হতাশা লইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছে!

"জামাইডে বদ্, ধর্যো ধর্যো মার দ্যায়, ম্যায়েডা ত পালায়ে পালায়ে আমার কাছে চল্যে আইছে কত বার। সেদিনে আমি মন্দ কইছেলাম, তাইতেই গলায় দড়ি দিইল।"

বলিলাম, "যাক বেঁচে গেছে ত! তাহলেই হ'ল।"

মনে হইল কন্যার জীবিত থাকাটা আমেজের চক্ষে খুব সৌভাগ্যের লক্ষণ নয়। বলিল, "নিজে বাচ্যে গেছে, আমারে মারিছে। পুলিসের টানাটানি, খুল্‌নেয় দোড়োনো, আর উকীলির পয়সা,, এইতিই ত গ্যালাম। সে সব ত চুকিছে, এহনে গোটাপাচেক টাহা নাহলি ত আর উকীলির হাতেই মরি।"

খানিকটা ভাবিয়া দেখিলাম। আমি মাসিক ষাট টাকা উপার্জ্জন করি, এদিক-ওদিক উঞ্ছবৃত্তি করিয়া আরও গোটা-কুড়ি টাকা পাই। বাবা বাঁচিয়া আছেন, বিবাহ করি নাই, কাজেই পাঁচটা টাকা দেওয়া খুব কঠিন নয়। দেওয়া হয়ত উচিতও। কিন্তু কিছু দিন যাবৎ সিগারেটের খরচ বাড়িয়াছে, এক কথায় একটা কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলোদর, খর্ব্বকায় গ্রাম্যলোককে পাঁচটা টাকা দেওয়া চলে কিনা ভাবিতেছিলাম। বলিলাম, "তা বলতে ত পারছি না, তুমি কাল-পরশু নাগাদ এস, চেষ্টা করব।"

এত ক্ষণে তাহার কৃতজ্ঞতার নাগাল পাইলাম। সে কথা কহিল না, শুধু একটা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার দীপ্তিহীন দুই চোখ যে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে, তাহা নজরে পড়িল।

নিজের অতি তুচ্ছ দুঃখটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম। নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল। দুঃখ জিনিষটার বিরাট দৃষ্টান্তের এত নিকটে আসিয়া আর সুলেখার কথা মনে রহিল না। জীবনের অল্প গোটাকয়েক বৎসরের সীমারেখার অভ্যন্তরে যাহা সারাজগৎ বলিয়া ভাবিয়াছি, দেখিলাম, তাহার বাহিরেও জগৎ আছে। সে জগৎ সহসা নজরে পড়ে না, এক বার পড়িলে তাহার বিশালতার কাছে নিজের জগৎ শূন্যে মিলাইয়া যায়।

বাড়ী ফিরিলাম। বড়দা রসিকতা করিয়া বলিলেন, "কি হে, এবার কি কাণ্ড বাধিয়েছিলে? গতবারে ত পথ হারিয়ে সারারাত বনবাদাড় ঘুরে এলে। এবারে কি দুপুর বেলায় অন্ধকারে কিছু ঠাহর হ'ল না নাকি?"

পাড়াগাঁয়ে পথ হারানো আমার একটা ব্যাধিবিশেষ। আমার অসংখ্য দুর্ব্বলতার একটি।

কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম অন্য কথা। বলিলাম, "আচ্ছা বড়দা, আমেজের মেয়ের ব্যাপারটায় আপনি একটু তদ্বির করলে পারতেন! বেচারা গরিব মানুষ—"

বড়দা জ্বলিয়া উঠিলেন। উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "হারামজাদা তোমার কাছে লাগিয়েছে বুঝি? ছোটলোক ত! আমি বলি নি ওকে? ওই ত এর ওর তার পরামর্শ নিয়ে অন্য উকীলের কাছে মরতে গেল। মরুক ব্যাটা! মেয়ের বদলে ওই ঝুলে পড়ুক না!"

কে যেন পাশ হইতে বলিল, "হাতীবাঁধা দড়ি চাই। নইলে ছিঁড়ে যাবে।"

আমেজ যে তাঁহার নামে কিছু লাগায় নাই, একথা বড়দাকে বুঝাইয়া দিলাম। কিন্তু তিনি বুঝিলেন কিনা তাহাই বুঝিতে পারিলাম না।

আমেজ কিন্তু দিনকয়েক দেখা দিল না। পূজার ও বিসর্জ্জনের গোলমালে তাহার কথা মনেই ছিল না। আমার পুরাতন সাথী, অর্থাৎ সুলেখার সহিত মনোমালিন্য

আবার ফিরিয়া আসিয়া মনের মধ্যে বাসা বাঁধিল। আমি বিষণ্ণ বদনে বিষাদ উপভোগ করিয়া চলিলাম।

সুলেখা ও আমার পরস্পরের সম্বন্ধে দুর্ব্বলতার খোঁজ আর কেহ রাখে না। রাখা নিরাপদও নয়, অর্থাৎ আমাদের দু-জনের দিক্ দিয়া। এক-এক সময়ে সন্দেহ হয় আমরা নিজেরাই জানি কিনা।

লক্ষ্মীপূজার দিন সকাল বেলায় ছোটবোন আসিয়া খবর দিল, "সুলেখাদি চিঠি লিখেছে।"

চমকিয়া বলিলাম, "কাকে? আমাকে?"

সে পরমবিস্ময়ে বলিল, "আঃ! তোমাকে কেন, আমার কাছে লিখেছে। তোমার কথাও আছে, এই দেখো না।"

সে সযত্নে চিঠির দুই পাশ ভাঁজ করিয়া মাঝের পাঁচ-ছয় লাইন দেখাইল; যেন বাকী লাইন-কটার সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও কৌতূহল আছে! সুলেখা লিখিয়াছে—

"—মণীশদা আমার 'পরে খুব রাগ করেছে? না? তাকে ব'লো, আমি সেদিন রাগের মাথায় যা-তা বলেছি, তার জন্তে সে যেন ক্ষমা করে। আমার ভারি মন খারাপ হয়েছে। এখানে এলে হাতজোড় ক'রে ক্ষমা চেয়ে নেব।"

বোন ভালমানুষের মত বলিল, "এ-সব কি লিখেছে সুলেখাদি! তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল বুঝি? বল নি ত! যাক্ গে, মা চিঠিখানা চেয়েছিলেন, দিই গে।"

তাহার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া তিন-চার টুক্‌রা করিয়া পকেট রাখিয়া দিলাম, ভবিষ্যতের অগ্নি সংস্কারের জন্ত। সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। সন্দেহ হইল, অরুণাকে যতটা ভালমানুষ ভাবি, ততটা সে নয়।

এত ক্ষণে মনের মধ্যে হাতড়াইয়া দেখিলাম, যে-দুঃখটাকে পরমযত্নে মনের মধ্যে জিয়াইয়া রাখিয়াছিলাম, সুলেখার চিঠির ছয় লাইনের মন্ত্রবলে তাহা কোথায় উবিয়া গিয়াছে। অত্যন্ত অসহায় বোধ করিলাম। দেখিলাম, একটি পোষা দুঃখ মনের স্বাস্থ্যরক্ষায় অনেকটা সাহায্য করে। এখন তাহার একান্ত অনুপস্থিতিতে এবং আকস্মিক অন্তর্ধানে নিরুপায় হইয়া হাত-মুখ ধুইতে পুকুরপাড়ে রওনা হইলাম।

একটা আমের ডাল ভাঙিয়া দাঁতন করিতেছি, এমন সময় দূর হইতে দেখিলাম আমেজ আসিতেছে। যে-কারণেই হউক, সম্ভবতঃ মন খারাপ হওয়ার কারণ মন হইতে দূরীভূত হওয়াতেই তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, এখনও সাতটা বাজে নাই, ইহারই মধ্যে তাগাদা দিতে আসিয়াছে।

সে যে গত কয়েক দিন যাবৎ একেবারেই তাগাদা দেয় নাই, সে কথা মনে পড়িল না।

কাছে আসিয়া নিঃশব্দে একটা সিঁড়ির ধাপের উপর বসিল। আমি সবেগে দন্তধাবন করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে আমেজের মুখের উপর চোখ পড়ায় একটু অবাক হইলাম

আমেজ আরও বুড়া হইয়া পড়িয়াছে, এই ক-দিনেই। গালের মাংস আরও ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু অধিকতর কোটরগত হইয়াছে। বলিলাম, "জ্বর হয়েছিল নাকি?"

সে ঘাড় নাড়িল। আমি মুখটা ধুইয়া লইলাম।

"জ্বর হয় নি ত চেহারা ওরকম হয়েছে কেন?"

সে একটু শ্রান্তস্বরে বলিল, "ম্যায়েডা গলায় দড়ি দিইল—"

অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, "সে ত কোন্ হোসেন শা'র আমলে দিয়েছিল, সে-কথা শুনতে চাচ্ছি না। ভালো কথা, তোমাকে পাঁচ টাকা দিতে পারব না, তিনটে টাকা পারি। চলবে?"

কহিল, "তাই ছান। ম্যায়েডা—"

মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। বলিলাম, "ম্যায়েডা—কি?"

"পরশু গলায় দড়ি দিইল, এবারে মরিছে।"

মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম। সহসা সানন্দে দেখিলাম, আমার একটি প্রিয় দুঃখ অন্তর্হিত হইলেও, আর একটি নূতন পাইয়াছি। যথোপযুক্ত সহানুভূতি দেখাইলাম।

তিনটা নহে, পুরা পাঁচটা টাকা আনিয়া দিলাম। সিগারেট কমাইতে হইবে।

হিন্দুসমাজে নারীর স্থান

শ্রীঅনিলবরণ রায়

অনেকের ধারণা বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে নারীর যে স্থান তাহা চিরকালই এইরূপ ছিল, এই ব্যবস্থাই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনুকূল, হিন্দুর বৈশিষ্ট্য, এ-ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিলেই হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ নষ্ট হইবে। এরূপ ধারণা অজ্ঞান ও তামসিকতার লক্ষণ। তামসিকতাই সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের বিরোধী, নূতনকে সে ভয় পায়, যে পুরাতন চালে সে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার এতটুকু ব্যতিক্রম হইলেই সে "সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার শক্তি তাহার নাই, গতানুগতিক ভাবে নির্ব্বিবাদে নির্ব্ঝঞ্ঝাটে কোনও রকমে জীবনের কয়েকটা দিন কাটাইয়া দিতে পারিলে আর সে কিছুই চাহে না। তাহার এই দুর্ব্বলতা, এই ক্লৈব্যকেই সে বড় বড় পণ্ডিতের মত কথা বলিয়া, শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন করিতে চায়, প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। এই তামসিকতা অতি নিকৃষ্ট গুণ, মানুষকে ইহা ক্রমে নীচের দিকে, অধর্ম্মের দিকে, ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়। সমস্ত হিন্দুসমাজ আজ এইরূপ তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাই কোথাও একটু উন্নতি বা সংস্কারের চেষ্টা হইলেই অমনিই চারি দিকে "গেল গেল" রব উঠিতেছে! হিন্দুকে এই তামসিক অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তি ছাড়াইয়া উঠিতেই হইবে, নতুবা তাহার পরিত্রাণ নাই।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জগতের চরম সত্য সম্বন্ধে হিন্দু যে সকল তথ্য অবগত হইয়াছে, সমাজে স্থূল ভাবে সেই সকল সত্যকেই রূপ দিতে চাহিয়াছে। অত্যুচ্চ অধ্যাত্ম সত্যকে অনুসরণ করিয়া মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপন করিতে হইবে, ইহাই হিন্দু শিক্ষাদীক্ষার মূলকথা। যাহাতে জনসাধারণ এই সত্যের আভাস পায় সেজন্য হিন্দু মুনি-ঋষিগণ নানা রূপকের ছলে, উপমার ছলে সে-সব সত্য বর্ণনা করিয়াছেন, হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, এইরূপ রূপকে পরিপূর্ণ। হিন্দুর সমাজ-জীবনেরও অনেক অনুষ্ঠান এইরূপ রূপক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিন্দুর বিবাহ-অনুষ্ঠানের কথা বলা যাইতে পারে। বর-কন্যা একসঙ্গে সপ্ত পদ গমন করিলেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। এই সপ্ত পদ হইতেছে জীবনের সপ্ত স্তরের রূপক, প্রাকৃত জীবনের স্তর—দেহ, প্রাণ, মন; অধ্যাত্ম জীবনের স্তর—বিজ্ঞান, সৎ, চিৎ, আনন্দ। স্ত্রী ও পুরুষে যখন জীবনের এই সকল স্তরে পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়, তখনই তাহাদের মিলন পূর্ণ হয়, তাহাদের জীবনে পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা সার্থক হয়। বিবাহের সময় দুই জনে একসঙ্গে সপ্ত পদ গমন করিয়া, তাহাদের সেই পূর্ণ মিলনেরই সূচনা করে। কিন্তু আজকাল কয় জন লোক হিন্দু বিবাহের এই প্রকৃত মর্ম্ম বুঝে? হিন্দু আজকাল বিবাহ করে, শুধু দেহের মিলনের জন্য, তাই বিবাহিত জীবনের ভিতর দিয়া পশুত্বের উপরে আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না, দাম্পত্য জীবনে যে অত্যুচ্চ প্রেম ও আনন্দ আছে তাহার কোন সন্ধানই পায় না। অথচ মুখে হিন্দুত্বের বড়াই করিতে কেহই কম নহে।

হিন্দুসমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কও অনেকটা রূপকের মত। জগতের চরমতত্ত্ব পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ হিন্দু যখন যে ভাবে বুঝিয়াছে, সমাজে পুরুষ ও স্ত্রীর সম্বন্ধও অনেকটা তদনুরূপ হইয়াছে। পুরুষ ভগবানের পুংভাব, প্রকৃতি ভগবানের স্ত্রীভাব—এই দুই তত্ত্বের সংযোগেই বিশ্বলীলা চলিতেছে। বেদে এই দুই তত্ত্ব, নৃ ও জ্ঞা, বিশ্বের দেবতত্ত্ব ও দেবীতত্ত্ব, অনেকটা সমপর্য্যায়

ছিল, তাই বৈদিক সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান ছিল প্রায় পুরুষের সমান, স্ত্রী শুধু পুরুষের অনুচরী ছিল না, সখী ছিল, বন্ধু ছিল।

যেমন পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের সহযোগে বিশ্বলীলা চলিতেছে তেমনিই স্ত্রী-পুরুষের সহযোগেই সংসারলীলা চলিবে, তাই বিবাহকে বলা হইয়াছে—সহধর্ম্মচারিণী-সংযোগঃ।

এই সহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃ কথাটিতে বৈদিক যুগে বিবাহের আদর্শটি যেমন প্রকাশিত হয়, বিবাহ, উদ্বাহ, পরিণয়, পাণিগ্রহণ প্রভৃতি কথায় তেমনটি হয় নাই। বিবাহ ও উদ্বাহ শব্দে কন্যাকে পিতৃগৃহ হইতে স্বামিগৃহে লইয়া যাওয়া বুঝায়। তেমনই বিবাহের সময়ে প্রজ্বলিত অগ্নির চতুর্দ্দিকে কন্যাকে লইয়া পরিভ্রমণই পরিণয়। বর যখন কন্যার করগ্রহণ করে তাহাই পাণিগ্রহণ। এ-সবই বিবাহ-অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ অংশ। কিন্তু সহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃ বলিতে স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত জীবনের সমগ্র আদর্শটিকে বুঝায়। প্রথমতঃ, ইহাতে ধর্ম্মকেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই জীবনের আদর্শ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, সকলেই ভগবানের অংশ, সকলের মধ্যেই ভাগবত সত্তা নিহিত রহিয়াছে। দেহ প্রাণ মনই মানুষের সব নহে; দেহ প্রাণ মনের আধারে ভাগবত সত্তার বিকাশ করা, মানব-শরীরে দিব্য অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ করা—ইহাই মানুষের চরম লক্ষ্য এবং যেরূপ আচরণের দ্বারা মানুষ এই চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারে, তাহারই সাধারণ নাম ধর্ম্ম। কিন্তু, স্ত্রী ও পুরুষ কেহই একা একা সেই পূর্ণ আদর্শে পৌছিতে পারে না, পরস্পরের সহযোগে জীবনের বিকাশ করিয়া তবে সেই পূর্ণতম অধ্যাত্মজীবন লাভ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে সহযোগ করিবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষের যে মিলন, তাহাই সহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃ। জগতের কোন্ দেশ, কোন্ সভ্যতা মানব-বিবাহের এত উচ্চ আদর্শ ধারণা করিতে পারিয়াছে ?

এই আদর্শ হইতে আরও বুঝা যায় যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আপন আপন অধ্যাত্মজীবনের বিকাশের জন্য পরস্পরের সহিত স্বেচ্ছায় মিলিত হয়, এই মিলন স্ত্রী ও পুরুষকে নিজে নিজেই করিতে হইবে। পিতামাতার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিলে কখনও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। জীবনের সকল স্তরে কাহার সহিত কাহার মিলনের সম্ভাবনা, তাহারা নিজেরা না বুঝিলে সে মিলন কখনও সার্থক হইতে পারে না। এই জন্য প্রয়োজন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, সুশিক্ষিত হইবে, নিজেদের জীবনের উচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শ সজ্ঞানে উপলব্ধি করিবে, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের যোগ্য সঙ্গী বাছিয়া লইবে, তবেই হইবে প্রকৃত সহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃ। আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক যুগে বিবাহের এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে শিক্ষা ও দীক্ষা পাইত, উভয়েই স্বতন্ত্র ভাবে যজ্ঞাদি করিতে পারিত, ইচ্ছা করিলে অথবা মনোমত সঙ্গী না পাইলে উভয়েই আমরণকাল অবিবাহিত থাকিতে পারিত, এবং বিবাহের সময় উভয়ে উভয়কে সজ্ঞানে সখারূপে গ্রহণ করিত। বেদে বিবাহের যে-সব মন্ত্র আছে তাহা অনুধাবন করিলেই আমরা এই সব নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি। এখানে কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

বর কন্যার সহিত সপ্ত পদ গমন করিয়া বলিতেছে,

সখা সপ্তপদাভব, সখায়ো সপ্তপদা বভূব, সখ্যংতে গমেয়ং, সখ্যাত্তে মা যোষং, সখ্যান্মে মা যোষ্ঠাঃ। সময়াব সঙ্কল্পাবহৈ সং প্রিয়ো রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ ইষমূর্জমভি সং বসানৌ সং নৌ মনাংসি সংব্রতা সমুচিত্তান্যাকরম্॥

"সপ্ত পদ আমার সহিত গিয়া তুমি আমার সখা হইবে। এই যে একসঙ্গে সপ্ত পদ আসিয়াছি, এখন তুমি আর আমি সখা। তোমার সখ্য যেন আমি চিরকাল রক্ষা করিতে পারি, যেন তোমার সখ্য হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন না হই। এস, দু-জনে মিলিত হই। এস দু-জনে একসঙ্গে সঙ্কল্প করি। দু-জনে দু-জনকে ভালবাসিয়া, দু-জনার সহবাসে পরম আনন্দ লাভ করিয়া, পরস্পরের কল্যাণ কামনা করিয়া, সকল ভোগসুখ উভয়ে মিলিত ভাবে ভোগ করিয়া, এস আমরা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের ব্রত-সঙ্কল্প, আমাদের চিন্তা-ভাবনা মিলিত করি।"

এই মন্ত্রটিতে বৈদিক বিবাহের আদর্শ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই মন্ত্র হইতেই বুঝা যায় যে, বিবাহের সময় বর ও কন্যা উভয়েরই বয়স এমন যখন

তাহারা নিজেদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে এবং পরস্পরকে সখারূপে গ্রহণ করিতে পারে। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে এইরূপ মন্ত্র কিছুতেই উচ্চারিত হইত না। পরের ছত্রে ইহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,

তাবেহি সংভবাব সহরেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বৈত্তবৈ।

"এস আমরা এখন জন্ম দিই ; দুই জনার বীজ মিলিত করি, যেন আমরা পুত্রসন্তান লাভ করিতে পারি।"

অতএব, সপ্ত পদ গমন করিয়া যখন বিবাহ সম্পূর্ণ করা হইত তখন তাহারা সন্তানের পিতামাতা হইবার উপযুক্ত।

বিবাহ সম্পন্ন হইলে বধূ যখন স্বামিগৃহে যাইতেছে, তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—

গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাহসো
বশিনী ত্বং বিদথমাবদাসি ॥ ঋগ্বেদ ১০।৮৫।২৬

"গৃহে যাও, সেখানে গিয়া গৃহপত্নী হও। গৃহপত্নীরূপে তুমি সেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালিত করিবে।"

বিবাহের পরেই স্বামিগৃহে গিয়া বধূকে সংসারের কর্ত্রী হইতে হইবে, যজ্ঞকার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে, অতএব বিবাহের পূর্ব্বেই তাহাকে পূর্ণভাবে শিক্ষিতা হইতে হইত। বিবাহের পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকেরা যজ্ঞহোম করিত, লাজ-হোমের নিম্নলিখিত মন্ত্রটি হইতেই তাহা বুঝা যায়—

অর্যমনং নু দেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষত। তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৭

স্বামিগৃহে গিয়া বধূ যখন সংসারের ভার গ্রহণ করিতেছে তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রবাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবেষু। ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪৬

"শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেবর সকলের উপরে তুমি স্নেহশীলা সম্রাজ্ঞী হও।"

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবন আরম্ভ করিবে এক দিন বা তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া। সাধারণ ভাষায় ইহাকে কালরাত্রি বলা হয়। এই সময় স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের মুখ দেখাও নিষিদ্ধ। ইউরোপে বিবাহের পর সঙ্গে সঙ্গেই "হনিমুন," কিন্তু ভারতে স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি, এত প্রলোভনের মধ্যে এই নিবৃত্তি ভবিষ্যৎ জীবনে সংযমের সূচনা করে। বিবাহ যে শুধু ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্য নহে, ইন্দ্রিয়সংযমের ভিতর দিয়াই গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ অধ্যাত্মজীবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, এই কালরাত্রি পালনের দ্বারাই বরকন্যা উভয়েই তাহা উপলব্ধি করে। এই সময়টি গত হইলে যৌন মিলনের সময় বধূ স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলে,

অপশ্যং ত্বা মনসা চেকিতানং
তপসো জাতং তপসো বিভূতম্।
ইহ প্রজামিহ রয়িং ররাণঃ
প্রজায়স্ব প্রজয়া পুত্রকাম।

"তুমি জ্ঞানী, তপস্যায় তোমার জন্ম, তপঃশক্তিতে তুমি পূর্ণ, তোমাকে অন্তরের মধ্যে চিনিয়াছি। তুমি আমায় সন্তান ও ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ কর, পুত্রকাম তুমি, আমাদের সন্তানের ভিতর দিয়া তুমি পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ কর।"

স্বামীর উত্তর,

অপশ্যং ত্বা মনসা দীধ্যানাং
স্বায়াং তনূং ঋত্বিয়ে নাধমানাম্
উপমামুচ্চা যুবতির্বভূয়াঃ
প্রজায়স্ব প্রজয়া পুত্রকামে॥

"গভীর বুদ্ধিমতী তুমি, তোমাকে আমি অন্তরের মধ্যে চিনিয়াছি। তুমি তোমার শরীরে সন্তানের জন্য কামনা করিতেছ। যুবতী তুমি, পুত্রকামা তুমি, এস আমার আলিঙ্গন গ্রহণ কর. আমাদের সন্তানের ভিতর দিয়া তুমি পুনর্জ্জন্ম লাভ কর।"

এই দুইটি সম্বোধন গভীর অর্থপূর্ণ। বর বধূকে এখানে "যুবতী" বলিয়াই সম্বোধন করিতেছে। পুত্রার্থে সঙ্গমের জন্য আহ্বান করিতেছে। স্বামীর গুণ ও শক্তি বিচার করিবার শক্তি স্বামীর ঔরসে গর্ভধারণ করিবার কামনা বধূতে রহিয়াছে। অতএব বৈদিক যুগে বিবাহ যে পরিণতবয়স্ক যুবকযুবতীর মধ্যেই হইত এবং পরস্পর পরস্পরকে জানিয়া বুঝিয়াই নির্ব্বাচন করিয়া লইত, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের স্থান নাই। তবে সে বিবাহ পাশ্চাত্য দেশের যুবক-যুবতীর বিবাহের ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয়-ভোগ এবং সাধারণ সংসারযাত্রা পালনের জন্যই হইত না। সংযম ও তপস্যা ছিল তাহার গোড়ার কথা এবং অত্যুচ্চ অধ্যাত্মজীবন লাভ ছিল তাহার চরম লক্ষ্য।

বিবাহিত জীবনে ধর্ম্মাচরণ করিয়া দম্পতি যাহাতে

ক্রমশঃ অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ করিতে পারে, সে-জন্য বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই সমানভাবে যথোচিত শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেরই দীক্ষা হইত, সকলেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গার্হস্থ্য জীবনের জন্য প্রস্তুত হইত, সকলেই বেদ পাঠ এবং অধ্যাত্ম সাধনা করিতে পারিত। অনেক স্ত্রীলোক চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া অধ্যাত্ম-আলোচনা অধ্যাত্মসাধনা করিত, তাহাদিগকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হইত। স্ত্রীলোকেরাও যে ঋষি হইত, গার্গী-মৈত্রেয়ী-সুলভা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

কালক্রমে সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান অনেক নিম্নগামী হইয়া পড়ে, যে-স্ত্রী ছিল স্বামীর সখী, সহধর্ম্মিণী, সে-ই কার্য্যতঃ স্বামীর দাসীতে পরিণত হয়। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ যখন দাঁড়াইল শুধু পুরুষের ভোগের জন্যই প্রকৃতির লীলা, পুরুষ অনুমতি দেয় ভোগ করে তবে প্রকৃতির সংসার লীলা চলে, পুরুষ সমর্থন না করিলে প্রকৃতি দাঁড়াইতে পারে না, তখন সমাজেও নিয়ম হইল, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। স্ত্রী সম্পূর্ণভাবেই পুরুষের অধীন হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র শিক্ষাদীক্ষা বন্ধ হইল, স্বামীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করা, স্বামীর সংসারে মিশিয়া যাওয়া, স্বামীকেই ইষ্টদেবতা বলিয়া পূজা করা—ইহাই হইল নারীর জীবনের আদর্শ। এই আদর্শ অনুসরণ করিতে হইলে অল্প বয়সেই স্ত্রীলোকের বিবাহ দিতে হয় যেন সে অল্প বয়স হইতে স্বামীর অধীনে থাকিয়া স্বামীর নিকট শিক্ষা পাইয়া সম্পূর্ণভাবে স্বামীর বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতে পারে। তাই নূতন শাস্ত্রবিধান রচিত হইল,

> বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ
> পতিসেবা গুরৌবাসঃ গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়া॥
>
> মনুস্মৃতি ২।৬৭,৬৮

"স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহই বৈদিক সংস্কার; তাহার পক্ষে স্বামীসেবাই গুরুগৃহে বাস এবং গৃহকর্ম্ম করাই তাহার যজ্ঞ।"

এইটি নূতন বিধান, কারণ বৈদিক যুগে পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও উপনয়ন হইত, তাহারাও গুরুগৃহে বাস করিয়া শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিত এবং তাহারাও অগ্নিপালন করিয়া যজ্ঞ করিত। স্মৃতিতেই ইহা স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে।

> পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
> অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা॥
>
> যমসংহিতা

যখন এই নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হইল, তখন কেহ কেহ চেষ্টা করিলেন সেই পুরাতন প্রথা যেন সম্পূর্ণভাবে লোপ না পায়। তাই হারীতসংহিতাতে দেখিতে পাওয়া যায়,

ন শূদ্রসমাঃ স্ত্রিয়ঃ। ন হি শূদ্রযোনৌ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যা-জায়ন্তে। তস্মাচ্ছন্দসা স্ত্রিয়ঃ সংস্কার্য্যাঃ। তাসাং দ্বিবিধো বিকল্পঃ, ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবাহোশ্চেতি। ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নমগ্নি-সংস্কারঃ স্বগৃহেঽধ্যয়নম্ ভৈক্ষচর্য্যা চ। প্রাপ্তৌ রজসঃ সমাবর্ত্তনম্।

"স্ত্রীলোক শূদ্রের সমান নহে। শূদ্রযোনি হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের জন্ম হইতে পারে না। অতএব স্ত্রীলোকের সকল সংস্কার বৈদিক বিধি অনুযায়ী হওয়া চাই। স্ত্রীলোকদের মধ্যে দুই ভাগ আছে, যাহারা ব্রহ্মবাদিনী হইবে এবং যাহারা এখনই পক্ষে বিবাহ করিবে। যাহারা ব্রহ্মবাদিনী হইবে তাহাদের উপনয়ন, অগ্নিসংস্কার, স্বগৃহে অধ্যয়ন এবং ভৈক্ষ্যচর্য্যা বিধেয়। যখন তাহারা যৌবনপ্রাপ্ত হইবে তখন এই সব নিয়মপালন হইতে তাহারা মুক্ত হইবে।"

কিন্তু হারীতাদির এই চেষ্টা সফল হয় নাই, কালক্রমে সকল স্ত্রীলোকেরই উপনয়ন, দীক্ষা, বেদ পাঠ বন্ধ হয়, সকল বর্ণের স্ত্রীলোকেই শূদ্রের সহিত সমান হইয়া যায়। ফলে সমাজের ব্রহ্মতেজ নষ্ট হইয়া যায়, আর ঋষিদের জন্ম হয় না, এ কথা আপস্তম্ব কর্ত্তৃক স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে; ঋষয়োঽবরেষু ন জায়ন্তে।

স্ত্রী প্রথমে হইবে স্বামীর অনুগতা শিষ্যা, স্বামীর নিকটেই সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিবে, ইহাই হইল নূতন ব্যবস্থা, তাই মনুস্মৃতিতে দেখা যায়, স্বামীর বয়স স্ত্রীর অপেক্ষা তিনগুণ বেশী, এই স্মৃতি অনুসারে আট বৎসরের কন্যার সহিত চব্বিশ বৎসরের পুরুষের বিবাহই প্রশস্ত। ক্ষেত্রবিশেষে আরও বেশী বয়সে বিবাহের বিধান মনুস্মৃতিতে আছে। কিন্তু পরাশরসংহিতা আরও বেশী অগ্রসর হইয়াছে, বলিয়াছে যে, কন্যা দ্বাদশ বর্ষ প্রাপ্ত হইলে যদি তাহার বিবাহ দেওয়া না হয় তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষগণকে প্রতিমাসে ঐ কন্যার রজঃ পান করিতে হয়। মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি কন্যাকে

রজস্বলা দেখে তবে তাহাদিগকে নরকে যাইতে হয়। যে-ব্রাহ্মণ এরূপ রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করে তাহাকে সমাজে পতিত হইতে হয়।

এই যে স্ত্রীলোকের বাল্যবিবাহ সমাজে প্রচলিত হইল তাহা যে বৈদিক প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু সাধারণে যদি জানিতে পারে যে, বৈদিক ঋষিগণ এরূপ ব্যবস্থা দেন নাই, নূতন করিয়া এ-সব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইতেছে, তাহা হইলে তাহাদিগকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করান সম্ভব হইবে না তাই নূতন স্মৃতিকর্ত্তারা প্রচার করিলেন যে, এই সব স্মৃতি মনু পরাশর প্রভৃতি মহামান্য বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃকই প্রণীত। ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন শাস্ত্রের শিক্ষক। যখন তাঁহারা ইহা প্রচার করিলেন তখন লোকেও তাহা মানিয়া লইল—এই ভাবেই মনুসংহিতা, পরাশরসংহিতা প্রভৃতির উৎপত্তি, সে-সব বস্তুতঃ ঋগ্বেদাদির ন্যায় সংহিতাও নহে এবং মনু পরাশর প্রভৃতি বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীতও নহে। এই সকল সংহিতার ভাব ভাষা রচনা-প্রণালী অনুধাবন করিলেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এগুলি বৈদিক যুগের বহু পরে রচিত। অথচ আমাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা মনুস্মৃতি, পরাশরস্মৃতিকেই ভারতের সনাতন শাস্ত্র বলিয়া চালাইতে চাহিতেছেন।

তবে এক কালে হিন্দুসমাজে মনুস্মৃতি, পরাশরস্মৃতির যে খুবই প্রভাব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর যখন হিন্দুসমাজ পুনর্গঠিত হয়; তখন এই সকল স্মৃতিই ছিল হিন্দুত্বের অবলম্বনস্বরূপ। শঙ্করাদি আচার্য্যগণ মনুসংহিতাকে খুব উচ্চ স্থান দিয়া গিয়াছেন। আজ মনুসংহিতার যে-সকল ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে খুবই অশুভ ও অনিষ্টকর মনে হইতেছে, সে-যুগে তাহা সেইরূপ ছিল না। মনু-পরাশরে বাল্যবিবাহের যে ব্যবস্থা আছে তাহা যে অমিশ্র অশুভ তাহা নহে। পরিবারই সমাজের ভিত্তি, সেই পারিবারিক জীবনে সুশৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করিতে হইলে স্ত্রীলোকদের বাল্যবিবাহ এক হিসাবে খুবই সুবিধাজনক। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকদের বহু বয়সে বিবাহের ফলে পাশ্চাত্য দেশে সমাজে ও পারিবারিক জীবনে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কেহই মনুসংহিতাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিবেন না। পাশ্চাত্য দেশের অনেক লোকও তাঁহাদের প্রথার বিষময় ফল অনুভব করিয়া হিন্দুর ন্যায় বাল্যবিবাহের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন, "Late marriages give a wrong direction to the sexual propensities in the West."

তবে মনুসংহিতাতে যে ব্যবস্থা আছে, বর্ত্তমান সমাজে তাহাও ঠিকমত অনুসৃত হইতেছে না। বিবাহের উদ্দেশ্যে যে ধর্ম্মাচরণ ও পরিণামে অধ্যাত্মজীবন লাভ এবং সে-জন্য পুরুষের ন্যায় স্ত্রীরও যথোচিত শিক্ষা ও সংযম প্রয়োজন, বেদের এই মূল আদর্শ মনুতেও স্বীকৃত হইয়াছে। তবে, পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, মনুতে ব্যবস্থা হইল যে, পুরুষ রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ও শিক্ষালাভ করিয়া কোনও অল্পবয়স্ক বালিকাকে শিষ্যারূপে গ্রহণ করিবে এবং তাহাকে যথোচিত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া সর্ব্ববিষয়ে নিজের সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত করিয়া লইবে। পাশ্চাত্য দেশে কামের প্রেরণায় যুবক-যুবতী আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয় এবং কিছু দিন যাইতে-না-যাইতেই সে বিবাহ ভাঙিয়া দেয়, ছেলেমেয়েদের দুর্দ্দশার একশেষ হয়, হয়ত স্ত্রীপুরুষ উভয়ের জীবনই চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়; মনুর ব্যবস্থায় এই সব দুর্ঘটনা হওয়া অসম্ভব ছিল। তাই আজও দেখা যায়, আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত সহৃদয় লোকও বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিতে প্রস্তুত নহেন।

কিন্তু মনুসংহিতার সেই ব্যবস্থাতেও ক্রমে গ্লানি প্রবেশ করে। স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স কম হওয়াতে পুরুষদের বিবাহের বয়সও স্বভাবতঃ কমিয়া যায়, পুরুষদের রীতিমত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাও শিথিল হইয়া পড়ে, ক্রমে বধূর শিক্ষার ভার পড়ে শাশুড়ী ও ননদের উপর। স্বামিগৃহে অল্প বয়সে আসিবার পর হইতে তাহাদের উপর শিক্ষার নামে এমন কঠোর শাসন আরম্ভ হয় যে, স্ত্রীলোকদের সমস্ত ব্যক্তিত্ব একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের সত্তার, তাহাদের জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশ হয় না। তাহারা ক্রমে জড়পিণ্ডের মত হইয়া পড়ে,

গতানুগতিকভাবে অতি সঙ্কীর্ণ পারিবারিক জীবন যাপন করা ছাড়া তাহারা আর সমস্ত শক্তি ও প্রেরণা হারাইয়া ফেলে। ইহাতে পারিবারিক জীবনে কতকটা শান্তি হয় বটে, কিন্তু তাহা মৃত্যুর শান্তি। ইংরেজ যেমন ভারতবাসীকে অমানুষ করিয়া দিয়া দেশে শান্তি বজায় রাখিয়াছে, আমাদের পারিবারিক জীবনেও শান্তি ঠিক সেই রকম।

স্ত্রীলোক এইভাবে ক্রমে মনুষ্যত্বের বা'র হইয়া পড়ে। শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত হওয়ায় তাহারা উচ্চ অধ্যাত্মজীবনের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, ফলে এরূপ স্ত্রীর সহবাসে উচ্চ জীবন লাভ করা কোন পুরুষের পক্ষেও সম্ভব নহে। তাই যে স্ত্রী ছিল এক কালে ধর্ম্মাচরণে পরম সহায়, সেই স্ত্রীই হইল নরকের দ্বারস্বরূপ। আচার্য্য শঙ্কর যেমন তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে প্রচার করিলেন যে, পুরুষই সত্য, প্রকৃতি মায়া, মিথ্যা, দুঃস্বপ্ন, তেমনই সমাজেও তিনি নারীকে নরকের দ্বার বলিয়া প্রচার করিলেন; ফলে হিন্দুসমাজে নারীর স্থান খুবই হীন হইয়া পড়িল। আজ আমরা তাহারই ফলভোগ করিতেছি।

পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা ছিল তন্ত্রে। তন্ত্র প্রকৃতিকে পুরুষেরও উপরে স্থান দিয়াছিল তাই তান্ত্রিকরা স্ত্রীলোকগণকে পূজা করিত, প্রত্যেক স্ত্রীলোককে জগদম্বা বলিয়া দেখিত, স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্টকে পরম পবিত্র জ্ঞান করিত। তান্ত্রিকরা যদি সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে নারীর স্থান একেবারে উল্টাইয়া যাইত, নারীই হইত উপরে এবং পুরুষ হইত নীচে। ভারতে স্থানে স্থানে যুগে যুগে যে এরূপ অবস্থা কখনও হয় নাই তাহাও নহে। মহাভারতের যুগেও আমরা দেখিতে পাই বিখ্যাত লোকেরা বাপের নাম অপেক্ষা মায়ের নামেই বেশী পরিচিত; কৌন্তেয়, দেবকীনন্দন প্রভৃতি নাম তাহার দৃষ্টান্ত। যাহাই হউক, ভারতে তন্ত্র যেমন এপর্য্যন্ত কখনও বেদান্তের প্রভাব সম্পূর্ণ ছাড়াইতে পারে নাই, তেমনিই সমাজেও স্ত্রীলোককে গভীর শ্রদ্ধার পাত্র, এমন কি পূজার পাত্র করা তাহাদের যে-আদর্শ, সে-আদর্শও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইবে যে, হিন্দুসভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে পুরুষ ও স্ত্রীর সম্বন্ধ লইয়া সকল প্রকার পরীক্ষাই হইয়া গিয়াছে, আজ সেই সকল সমন্বয়ের দিন আসিয়াছে। যেমন হিন্দুর অধ্যাত্মসাধনায়, হিন্দুর দর্শনশাস্ত্রে উদার সমন্বয়ের প্রয়োজন হইয়াছে, ভারতের সুদীর্ঘ সাধনায় যাহা সার বস্তু আছে তাহা উদ্ধার করিতে হইবে এবং জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম ও সাধনায় যাহা কিছু শিখিবার আছে তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে, তেমনিই সমাজ-জীবনেও ভারতবাসী যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে, বিচিত্রমুখী চেষ্টার ফলে জাতির দেহ-প্রাণ-মন যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার হিসাব লইতে হইবে, পাশ্চাত্য দেশ হইতেও শিক্ষালাভ করিতে হইবে, এই ভাবে এক গভীর উদার সমন্বয়ের উপর অভিনব শক্তিশালী, অপূর্ব্ব গৌরবময় সমাজ-জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। হিন্দুর অধ্যাত্মসাধনায় বর্ত্তমানে যে নূতন বিকাশ হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে নরনারীর সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এ সম্বন্ধে দুইটি জিনিষ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় আবার তন্ত্র খুব উচ্চ স্থান পাইয়াছে। তিনি অধ্যাত্ম-সাধনায় এক নারীর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন, ভগবানের মাতৃমূর্ত্তির উপাসনা করিয়াই তিনি পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং সাধনার অঙ্গ হিসাবে নারীকে জগন্মাতার বিভূতিরূপে তিনি পূজা করিয়াছিলেন। মনুসংহিতা নারীকে অতিহীন চক্ষুতে দেখিয়াছিল, শঙ্কর নারীকে নরকের দ্বার বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় নারীর এই অপবাদ দূর হইয়াছে, নারীই হইয়াছে স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ, গীতার শিক্ষা নূতন আলোকে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকে নীচে স্থান দেওয়া হইয়াছে, শঙ্কর প্রকৃতিকে ছলনাময়ী মায়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, গীতা বলিয়াছে ইহা কেবল প্রকৃতির নীচের অশুদ্ধ রূপ অপরা প্রকৃতি। ইহা ছাড়া প্রকৃতির এক উচ্চতর রূপ আছে, পরা প্রকৃতি। গীতা এই পরা প্রকৃতিকে ভগবানের সহিত প্রায় সমান করিয়া দিয়াছে, ভগবান এই পরমা প্রকৃতিকে ধরিয়াই বিশ্বলীলা

করিতেছেন, এই পরা প্রকৃতি, ভগবানের নিজপ্রকৃতি, প্রকৃতিং মে পরাং, ইহা ভাগবত জ্যোতিঃ, শান্তি, শক্তি ও আনন্দে পূর্ণ। মানুষের মধ্যে নীচের অপরা প্রকৃতির খেলা শুদ্ধ রূপান্তরিত হইয়া যখন পরা প্রকৃতি প্রকট হইবে তখনই তাহার হইবে দিব্য জীবন, তাহাই মানব-জীবনের চরম পরিণতি। প্রকৃতির যেমন দুই রূপ পরা ও অপরা, তেমনিই নারীরও দুই রূপ; যখন সে ইন্দ্রিয় জয় করে নাই, তপস্তার দ্বারা শুদ্ধ ও রূপান্তরিত হয় নাই, তখনই সে কামিনী, তাহাকে লইয়া সাধারণ সংসারধর্ম্ম করা চলে, কিন্তু উচ্চ অধ্যাত্মজীবনের পথে সে প্রতিবন্ধক। এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী বর্জ্জনীয় বলিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ নারীই যখন সংযতা ও শুদ্ধ-চরিত্রা হয়, তখন সে-ই হয় অত্যুচ্চ অধ্যাত্মসাধনার সহায়—শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীসারদা দেবীকে সহধর্ম্মিণীরূপে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। আর নারীর যে নীচের রূপ, কামিনীরূপ, তাহাও কেবল বাহিরের অশুদ্ধতা, মূল স্বরূপে নারী সকল সময়েই জগদম্বার অংশ। সে যতই হীনচরিত্রা হউক, তাহার ভিতরের দেবীত্ব তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, সাময়িক ভাবে ঢাকা থাকে মাত্র—তাই শ্রীরামকৃষ্ণ পতিতাকেও প্রণাম করিয়া বলিতেন, "মা, তুই এখানে এসে দাঁড়িয়েছিস!"

গীতাও বলিয়াছে, স্ত্রীলোক যত অশুদ্ধ ও পতিত হউক না কেন ভগবানে একান্ত ভক্তি দ্বারা দ্রুত শুদ্ধ ও রূপান্তরিত হইয়া পরম সাধ্বী হইতে পারে, উচ্চগতি লাভ করিতে পারে। অধ্যাত্ম সাধনার এই সব মহান্ তত্ত্ব আধুনিক হিন্দুসমাজে নারীকে তাহার যথার্থ গৌরবের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্ত্রীলোককে বেশী বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিয়া শিক্ষাদীক্ষা দিলে, স্বাধীনতা দিলে, বিবাহ-বিষয়ে নির্ব্বাচনের অধিকার দিলেই যে আমরা ভারতের বৈশিষ্ট্য হারাইব বা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িব তাহা নহে। বরং বহুদিনের অত্যাচার ও কঠোর শাসনে আমাদের নারীজাতির মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত যে নষ্ট হইতে বসিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে, এই সব সুযোগ ও স্বাধীনতা এখনই তাহাদিগকে দিতেই হইবে, নতুবা স্ত্রীজাতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিন্দুজাতিরই ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগকে আমাদের স্বধর্ম্ম, আমাদের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া পাশ্চাত্যের আদর্শ, পরধর্ম্ম, গ্রহণ করিতে হইবে না। সে বৈশিষ্ট্য কি? কতকগুলা কুসংস্কার, অর্থহীন, বর্ত্তমানে অনিষ্টকর আচার-ব্যবহারকেই যাহারা ভারতের বৈশিষ্ট্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চান, তাঁহারা ভারতের সত্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিও মানুষের অশ্রদ্ধা উৎপাদন করেন, এবং এই ভাবে ভারতের প্রতি অতিমাত্রায় অন্ধ প্রেমের বশে ভারতেরই বিষম অনিষ্ট সাধন করেন। জীবনের চরম লক্ষ্য, মূল সত্য লইয়াই ভারত ও পাশ্চাত্য দেশের প্রকৃত প্রভেদ। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের মূলসূত্র যৌন ব্যাপার, ইহাই পাশ্চাত্য অভিমত। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ, যাঁহারা ভারতের বৈশিষ্ট্যের কোন সন্ধান রাখেন না বা রাখিতে চান না, স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাদের এক জনের কথাই এখানে তুলিয়া দিতেছি। "এই প্রাকৃতিক আকর্ষণের মূলভিত্তি কি, তাহা ফ্রয়েড যৌন আকর্ষণের দিক্ দিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমারও মনে হয়, প্রকৃতিদেবী সৃষ্টিরক্ষার জন্য যে যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দিয়াছেন এবং তদুপরি যে দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য দিয়া সেই মিলনাকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই যৌন আকর্ষণই charmএর মূলভিত্তি।" স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, সে-সম্বন্ধে ফ্রয়েডের এই মত গ্রহণ করাই আমাদের পক্ষে পরধর্ম্ম। ফ্রয়েডের মতে যে কিছুই সত্য নাই তাহা আমরা বলি না, কিন্তু উহাই সমগ্র সত্য নহে, উহা কেবল সত্যের একটা আংশিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ভগবান্ নিজে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই হইয়াছেন, এবং এই সমগ্র বিশ্বলীলা পুরুষ ও প্রকৃতিরই পুনর্মিলনের লীলা, মানব-সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের ভিতর দিয়া প্রকৃতি-পুরুষের মিলনই বিকশিত হইতেছে। স্ত্রী ও পুরুষের আকর্ষণের, charm-এর, ইহাই নিগূঢ় রহস্য। স্ত্রী ও পুরুষ যখন মিলিত হয়, তখন বংশ রক্ষা করাই তাহাদের মূল লক্ষ্য নহে, পরস্পরের মিলনে আনন্দ উপভোগ করাই তাহাদের মূল লক্ষ্য, এই মিলন উপলক্ষ্যে

জড়প্রকৃতি তাহার বংশরক্ষা-কার্য্যটি সারিয়া লইতে চায়। যে-আনন্দলীলায় এই বিশ্ব বিধৃত, সেই আনন্দই স্ত্রী ও পুরুষকে পরস্পরের দিকে টানিয়া লয়, এই আনন্দের প্রেরণা মানুষের আত্মার অতি গভীর প্রেরণা। কিন্তু অজ্ঞান জীবে এই প্রেরণা প্রকৃতির যৌন প্রেরণার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং ইহাই যত দুঃখ দ্বন্দ্ব অশান্তির মূল। মানুষ যখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবে তখন অন্ধ ভাবে আর প্রকৃতির যৌন প্রেরণায় চালিত হইবে না, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মিলনের যে নানা স্তর আছে; ক্রমান্বয়ে সেই সব স্তরের সন্ধান পাইবে, গভীর হইতে গভীরতর মিলন-আনন্দের সন্ধান পাইবে। তাহাতে দেহের মিলন যে থাকিবে না তাহা নহে, কিন্তু সেটা হইবে একটা নীচের ব্যাপার, আত্মায় আত্মায় পূর্ণ মিলনের যে আনন্দ, দেহের মিলন হইবে তাহারই একটা অভিব্যক্তি মাত্র। সেই অত্যুচ্চ অধ্যাত্মমিলনের আনন্দ লাভ করিতে হইলে প্রথম হইতেই চাই তপস্যা, চাই প্রকৃতির নীচের প্রেরণাগুলিকে শান্ত, শুদ্ধ সংযত করা। হিন্দু নরনারীকে এই অত্যুচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শে শিক্ষা দাও, দীক্ষা দাও, তাহাদিগকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা দাও যেন নিজের নিজের ভাবে তাহারা এই আদর্শের সাধনা করিতে পারে, চারি দিকে এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দাও যেন তাহা এই সাধনার অনুকূল হয়, তাহা হইলেই হিন্দুর আদর্শ, হিন্দুর বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইবে, স্ত্রী-পুরুষ-মিলনের উচ্চতম আদর্শে ভারতই জগৎকে দীক্ষা দিতে পারিবে।

ছুটির দাবি

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছুটি দাও,—ঘুমাবার ছুটি।
নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় ভরা ছুটি রাত্রি শ্রান্তিহরা,
বৃষ্টিঝরা স্নিগ্ধ দিন ছুটি।
কিছু কহিবে না কেহ, বিথারি শিথিল দেহ
লুটাইব শীতল শয়নে।
স্তিমিত প্রকৃতি মম শিয়রে জননীসম
চেয়ে র'বে অতন্দ্র নয়নে।
বেশী নয় দু-দিনের তরে
তোমরা সবাই মোরে ছুটি দাও ক'রে,
ছুটি দাও ঘুমাবার তরে।

ওগো, আমি বড় ক্লান্ত আজ!
কাজ যে সকলি বাকী, নিজে তা জানি নে নাকি?
তবে কেন মিছে দিবে লাজ?
যা বলিবে হিতবাণী, জানি, আমি সব জানি,—
নিরুপায়, অতি নিরুপায়!
ক্লান্ত দেহ গুরুভার বহিতে পারে না আর,—
ভুল বুঝে দুষিয়ো না তায়।
অক্ষমেরে ক্ষমা ক'রো সবে।
জানি তোমাদের কারো ছুটি নাই মরিবারো,—
তবু মোরে ঘুমাতেই হবে।

মিছে ব'লে কারে দেব ফাঁকি?
জনশূন্য দ্বিপ্রহরে রুদ্ধদ্বার ঘরে ঘরে
পথে পথে ফিরিয়াছি ডাকি।
অন্তরে তোমার মত আজো আছে পদাহত
পৌরুষের সুতীব্র ধিক্কার।
দেহে শুধু নাহি বল, চোখে শুধু আসে জল,
বল দেখি কি করিব তার?
ছুটি চাই, তাই ছুটি চাই,—
অতল আলস্যতলে গাহন করিব ব'লে,
তার পরে যা বলিবে তাই।

তার পরে তুলে লব বোঝা।
দৃঢ়চিত্তে চিরদিন শুধিয়া সবার ঋণ
পথ চিনে চ'লে যাব সোজা।
কারো নিন্দা করিব না, কারো ত্রুটি ধরিব না,
বিরলে করিব নিজ কাজ।
বেলাশেষে শান্ত মনে পশ্চিম দিগন্তকোণে
মোর সর্ব্ব-ব্যর্থতার লাজ
রেখে যাব ম্লান রক্তিমায়।
এক দিন হয়তো বা তোমরা দেখিবে শোভা,
পরক্ষণে ভুলিবে আমায়।

মায়া

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

১

আমাদের আশ্রম

তখন সবেমাত্র পুনর্মূষিক হয়ে সুড় সুড় ক'রে আবার আমরা কলেজে ঢুকেছি। স্বদেশীর হিড়িকে আমাদের কারও শিং গেছে ভেঙে অর্থাৎ বাড়ী থেকে মাসহারা বন্ধ হয়েছে, কারও বা কলেজের বৃত্তি গেছে কাটা। সুবিধাবাদী অর্থাৎ 'আপন বাঁচা'র দলে আমরা নই ব'লে হোস্টেলে আমাদের স্থান হয় নি। তা ছাড়া হোস্টেলে থাকবার মত টাকাই বা আমরা পাব কোথায়?

সুতরাং একে একে আমরা অধ্যাপক মনোজবাবুর নীচেকার ঘরগুলিতে এসে একটা ছোটখাটো আশ্রম তৈরি ক'রে বসলাম। সেটা সম্ভব হয়েছিল এই জন্যে যে, মনোজবাবু নিঃসন্তান এবং দার্শনিক। তিনি প্রত্যহ বেদ-উপনিষদ্ পাঠ করেন, গভীর রাত্রে প্রাণায়াম করেন এবং চাকরির খাতিরে অযথা কারও মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা তাঁর নেই।

পরিবারের লোকসংখ্যা বেশী না হ'লেও ছোট বাড়ীতে তাঁর চিত্তনিবেশের ব্যাঘাত ঘটতে পারে ব'লে তিনি বড় রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড এক বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। মফস্বল শহর। নীচের ঘরগুলিতে রাস্তার ছাগল এবং গরু এসে প্রথম প্রথম বেশ আস্তানা ক'রে নিয়েছিল। ছাগল-গরুর জায়গায় আমরা কতকগুলি সংসার-পরিত্যক্ত, দরিদ্র অনাথ ছাত্র এসে আশ্রয় নিলে তিনি আমাদের তাড়াতে পারলেন না। সরকারী চাকরি করলেও আমাদের আশ্রয় দেবার মত সৎসাহস তাঁর ছিল।

মাথা গুঁজবার স্থান তো একটা হ'ল; কিন্তু কি খেয়ে যে মাথা গুঁজে আমরা থাকব তারই কিছু স্থির ছিল না! ছেলে-পড়ান ছিল আমাদের একমাত্র অবলম্বন। যার তাও জুটত না, আর পাঁচ জনে আমরা তার সাহায্য করতাম। তেল অভাবে পড়া হয় নি এমন রাত্রি আমাদের অনেক গেছে।

একটা রাত্রির কথা বলি। কৃষ্ণনগরের রাজকন্যার বিয়ে। সন্ধ্যারাত্রে বড় রাস্তা দিয়ে বিরাট্ শোভাযাত্রা যাচ্ছে। রাজ-জামাতা বাংলা দেশেরই কোনও রাজ-কুমার। একখানা মোটরগাড়ীকে ময়ূরের মতন ক'রে সাজান হয়েছে। ধীরমন্থর গতিতে রাজ-জামাতা যাচ্ছেন সেই মোটরে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল আলোয় দীপ্ত ক'রে। আমরা বেরিয়ে এসে শোভাযাত্রা দেখছিলাম।

নন্তু বললে, "নিখিলদা, দেখেছ, রাজ-জামাতার কি সুন্দর চেহারা!—হাঁ, জামাই যদি আনতে হয় তবে—"

যোগেশ বাধা দিয়ে বললে, "বরকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে আসতে পারিস নন্তু?"

এই সব কাজে নন্তুর চিরদিনই খুব উৎসাহ। সে তাড়াতাড়ি বললে, "খুব পারি, কি জিজ্ঞাসা করব বল্।"

"উনি ক'টা টুইশনি করেন এবং খাওয়া-দাওয়াই বা কোথায় কি ভাবে চলে জিজ্ঞাসা ক'রে আসতে পারিস?"

জিজ্ঞাসা অবশ্য সে করতে পারে নি; কিন্তু জগতে এক শ্রেণীর লোকের প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে যে বেঁচে থাকতে হয়—তাদের না থাকে স্বাস্থ্য, না থাকে অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়, এ-কথা সেদিন সে বুঝতে পেরেছিল। নন্তু এক দিন আমাদের সঙ্গে পড়ত। এখন একটা চাকরি পেয়েছে। সামান্য কেরানীর চাকরি; সুতরাং সে-ই বা কি করতে পারে?

তবু আমাদের উপর তার সহানুভূতির অভাব ছিল না। সেই জন্যেই তাকে ব্যথা দিয়ে আমরা আনন্দ পেতাম।

রাজ-জামাতার শোভাযাত্রা চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে চলে গেলে ঘরে এসে পড়তে বসব ব'লে আলো জ্বালতে গেলাম; কিন্তু বৃথা। কেরোসিনের বোতলটা নেড়ে দেখলাম

এক ফোঁটাও তেল নেই! পয়সার জন্যে বিছানার নীচে হাত দিলাম, বহুকালের একটা ঘষা অচল দুয়ানি ছাড়া হাতে আর কিছুই উঠল না।

বড় দুঃখে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ধ্যেৎ তেরি!

শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর আসে না। কেবল রাজপুত্রের কথা, শোভাযাত্রার কথা, আর আমার অন্ধকার ঘরের কথা মনে পড়ে।

ঢং ঢং ক'রে লাইনের ঘড়িতে বারটা বাজল, একটা বাজল, এবং দুটোও বেজে গেল। একটু তন্দ্রার মত এসেছে এমন সময় শুনতে পেলাম খুট্ খুট্ ক'রে বাইরে থেকে কে যেন খুব সন্তর্পণে আমার ঘরের শেকল নাড়ছে। উঠলাম। আলো জ্বালবার বালাই ছিল না। দরজা খুলে দেখলাম, একটা টিনের সুটকেস হাতে নন্তু। আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, "এত রাত্রে তুই!"

নন্তু তার টিনের সুটকেসটা খুলে বলল, "খাবার নিয়ে এসেছি, রাজবাড়ীর খাবার।"

যোগেশ উঠল, মিতু উঠল, নিখিল তিড়িং করে উঠে একটা খবরের কাগজ পেতে অমনি ব'সে পড়ল। রবি চাটুয্যে (ডাকনাম আলুবাবু) তার দাড়ি-গোঁফহীন খোসা-ছাড়ান আলুর মতন মুখখানা দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে হেসেই খুন।

যোগেশ তার পেশীবহুল হাতের একটা প্রকাণ্ড ঘুসি নন্তুর মুখের উপর তুলে বলল, "হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক?" আমি বললাম, "আর উই নিগার্স্?—সাম্ মেথরস্ অর মুচিস?" ভবানী মুখুয্যে কাপড় পরতে পরতে বেরিয়ে এসে বলল, "পাতা কুড়িয়ে এনেছ আমাদের জন্যে?"

উপরের কোণে মাষ্টারমশাইয়ের ঘর থেকে তখন ওঁকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। চাপা রুক্ষ গলায় নন্তুকে বললাম, "গেট আউট।"

হায় বেচারা নন্তু! কিন্তু এর মধ্যে একটু ইতিহাসও ছিল। কি কারণে ঠিক মনে নেই, রাজবাড়ীর বিবাহ-উৎসবে ওদের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। কিন্তু এই-ই আমাদের দুঃখের কারণ নয়। নন্তু ভাল থিয়েটার করতে পারত। ঐ বিবাহ-উৎসবে ওদের ক্লাবের একটা থিয়েটার হয়। আমরা আশা করেছিলাম দেখতে যাব, কিন্তু কোন প্রকারেই পাস জোগাড় করতে পারি নি। তার পর রাত্রের এক দিকে সেই মহা সমারোহের শোভাযাত্রা আর অন্য দিকে আমাদের দীনহীন অন্ধকার ঘর!

সুতরাং সমস্ত রাগ নন্তুর উপরই পড়ল। নন্তু কিন্তু তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে। আমরা দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আমাদের আশ্রমে কেউ গীতা পাঠ করছে, কেউ কাপড় কাচছে, কেউ জমি কোপাচ্ছে—এমন সময় নন্তু এসে উপস্থিত।

যোগেশ তার কোদালখানা এক পাশে সরিয়ে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "নন্তু, ঋষির দোকান থেকে চা, কেক্ টোষ্ট কি বিস্কুট যা প'রিস নিয়ে আয়—বাজে বকবার সময় নেই এখন।"

নন্তু মুখ নেড়ে বলল, "আমার দায়।"

যোগেশের বি. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স ছিল, বি. টি.-তেও সে ফার্স্ট ক্লাস পায়। এখন সে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন্ ইস্কুল চালাচ্ছে। যদি সে মাষ্টার না হয়ে উকিল হ'ত তবে নিশ্চয় মক্কেল ঠেঙিয়ে অনেক পয়সা আদায় করতে পারত সন্দেহ নেই। যোগেশ বলল, "নন্তু, শোন্।"

নন্তু দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে উত্তর করল, "কি?"

"দেখি তোর পকেট।"

নন্তু পকেট দেখাল।

"ওটা।"

ওটাও দেখান হ'ল।

"জামা খোল্।"

নন্তু জামা খুলে ফেলল।

"দেখি তোর কোমর?"

নন্তু চট্‌পট্ কোমরের কাপড় খুলে দেখাল।

"কত পয়সা এনেছিস বের কর।"

"পয়সা?—পয়সা কোথায় পাব? পয়সা অমনি সস্তা না? এখানে ঐ কোদাল দিয়ে দশ হাত মাটি খুঁড়ে একটা পয়সা বের ক'রে দিতে পার?"

"দেখি তোর কাছার খুঁট।"

"ইয়ারকি পেয়েছ, না!"

যোগেশ নিখিলকে কি সঙ্কেত করল। নিখিল অমনি বাইরে যাবার দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলে। মাষ্টার-মশায়ের জন্ত কোন দুর্ভাবনা ছিল না; কারণ বেলা দশটার আগে তিনি কোনদিন কোন কারণেই ঘুম থেকে উঠতেন না।

তার পর সকলে মিলে ছুটাছুটি ক'রে নন্তকে পাকড়াও করা হ'ল। দেখা গেল, সত্যিই তার কাছার খুঁটে পয়সা বাঁধা—একটা আধুলি।

সেদিন আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, যোগেশ কি ক'রে জানলে যে নন্ত পয়সা এনেছে।

এই জন্তই বলছিলাম, তার উকিল হ'লে ভাল হ'ত। মক্কেল ঠেঙিয়ে পয়সা আদায় করতে পারত।

কিন্ত ঐ রকমই ছিল নন্তর স্বভাব। পয়সাকড়ি হাতে এলে আমাদের কিছু না খাইয়ে সে পারত না।

আর একটি বন্ধু ছিল আমাদের বিমলেন্দু। বিমলেন্দু এখন কোনও কলেজে প্রোফেসারি করছে শুনেছি। আমাদের দু-বেলা নিয়মিত আহার না জুটলেও বাংলা ও ইংরেজী কয়েকখানি নামকরা মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক কাগজ আমরা নিয়মিত কিনতাম। আমরা কিনতাম বললে সত্যের কতকটা অপলাপ হবে—বিমলেন্দুই আমাদের অনেক সময় কিনে দিত।

এই আশ্রমে আমাদের এক কৃষ্টি-সংঘ ছিল। এখানে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি এবং আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা হ'ত। দূরের গ্রামে নদীর ধারে যে মুচি ও বাগ্দী পাড়া ছিল—প্রতি শনি রবি বারে গিয়ে সেখানকার অশথতলায় আমরা অবৈতনিক পাঠশালা বসাতাম।

২

স্বপ্ন?

গরমের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। মাষ্টারমশায় সপরিবারে চলে গেছেন। উপরের ঘরগুলি তালা বন্ধ। আলুবাবু, নিখিল, ভবানী এরাও নেই। কেউ আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে, কেউ বা কলেজ বন্ধ হওয়ায় বার্ষিক পরীক্ষার পরই বাড়ী চ'লে গেছে। সেবার এপ্রিলের মাঝামাঝি বি. এ. পরীক্ষা হচ্ছিল। সুতরাং আমরা-দুই তিনটি পরগাছা তখনও আশ্রমটি আঁকড়ে প'ড়ে আছি। আমাদের তিন জনের আবার পাঠ্য বিষয় এক ছিল না। কারও দর্শনশাস্ত্র, কারও অর্থশাস্ত্র, কারও বা ছিল ইতিহাস।

যে-রাত্রের কথা বলছি তার পরদিন মিতু বা যোগেশের কোন পরীক্ষা ছিল না। ছিল কেবল আমার একার। যোগেশ গেল বিমলেন্দুর বাড়ী একসঙ্গে অর্থশাস্ত্র প'ড়বে ব'লে, আর মিতু গেল নন্তর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। তারা আর সে-রাত্রে ফিরবে না ব'লে গেল। কাউকে বাধা দিলাম না এবং অত বড় বাড়ীতে একা থাকবার জন্তে কোন আপত্তিও মনে হ'ল না।

পরদিনই আমার দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষা। ভিতর এবং বাহির সকল দিকের দরজা বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে স্টিফেন, স্টাউট এবং সালি খুলে বসলাম। বৈশাখ মাস। দুরন্ত গরম। তার উপর মশার অত্যাচার। ঘরে টিকতে পারলাম না। বাইরে উঁচু রোয়াকের উপর মাদুর বিছিয়ে পড়তে বসলাম।

দেখা গেছে, ঠিক পরীক্ষার সময় চোখের পাতায় ঘুম যেমন জড়িয়ে আসে আর কোন সময়ে তেমন আসে না!

রাত্রি তখন দুটো হবে। ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসছে—জোর ক'রে কতক্ষণ চোখ মেলে থাকা যায়? অগত্যা আলো কমিয়ে দিয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়লাম। ইচ্ছা, একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আবার উঠে পড়তে বসব।

বেশ একটু তন্দ্রা এসেছে। মনে হ'ল রোয়াকের পাশ দিয়ে কে যেন চলে গেল! পরক্ষণেই চুড়ির ঝুন্ ঝুন্ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। যেন পরিষ্কার দেখলাম, উঁচু রোয়াকের নীচে দিয়ে তাঁতের ডুরে শাড়ী-পরা একটি সুকেশা তরুণী চ'লে যাচ্ছে। তখনই আলোটি বাড়িয়ে দিয়ে কৌতূহলভরে তার পেছন পেছন গেলাম—কিন্ত কোথায় তরুণী? বাগানের শিউলি গাছটির ছায়ায় এসে আর তাকে খুঁজে পেলাম না! আলো হাতে নিয়ে সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম। সদর দরজা ঠিক তেমনি বন্ধ আছে, খিড়কির দরজাও কেউ খোলে নি!

পাশের আবগারী ইনস্পেক্টরের বাসা থেকে আমাদের ফুলবাগানে অনেক আবর্জ্জনা এবং ছেঁড়া কাগজপত্র ফেলা হ'ত—এই নিয়ে ওদের সঙ্গে একটু মনোমালিন্য হয়। ভাবলাম, এ কি তবে ঐ আবগারী ইনস্পেক্টরের বাড়ীর কেউ?

কিন্তু আমরা ত ওদের শত্রুপক্ষীয়! আর, প্রেমের কবিতা লেখা তো আমাদের কারু অভ্যাস নেই—এটাও ও-বাড়ীর সকলেই জানেন। বুঝতে পারলাম না—মেয়েটি কে, কেন এল, কি ক'রে এল এবং গেলই বা কোথায়! এ স্বপ্ন? মায়া? না মতিভ্রম?

পরীক্ষার পড়া পড়তে গিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নিশ্চয় প্রেমের স্বপ্ন দেখি নি। চোখের উপর একটি এলায়িত-কেশা তরুণী তার চুড়ির শব্দ ক'রে চ'লে গেল এটাই বা মিথ্যা বলি কি-ক'রে।

সাইকলজির বইয়ের পৃষ্ঠা উলটে 'ইলুশন' 'হ্যালুসিনেশন' এমন কি 'সোমনাম্বুলিজম'-এরও আগাগোড়া প'ড়ে ফেললাম, কিন্তু আকস্মিক এই তরুণী-দর্শনের কোন যুক্তিই সেখানে খুঁজে পেলাম না।

৩

মায়া

পরদিন সকালে সনৎ-দা এলেন। সনৎ-দা অকৃতদার বৈষ্ণব, বহু দেশ ভ্রমণ ক'রেছেন এবং খুব ভাল কীর্ত্তন গাইতে পারেন। কাছেই তাঁদের বাড়ী। সনৎ-দার বয়স আমাদের চেয়ে ঢের বেশী হ'লেও আমাদের সঙ্গে ঠিক বন্ধুর মতই ব্যবহার করেন।

সমস্ত শুনে সনৎ-দা বললেন, "এই বাড়ীতে কখনও একা থাকতে আছে? ধন্যি সাহস তোর যা হোক!"

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?"

সনৎ-দা বললেন, "এ-বাড়ী এখন গিড্ডীরাম আগরওয়ালা কিনে নিয়েছে। আসলে এ-বাড়ী ছিল শরৎ বাঁড়ুয্যে উকিলের। শরৎবাবু ছিলেন একটা ডাকসাইটে উকিল। তাঁর বাইরের ঘর সর্ব্বদা মক্কেলে গিস্ গিস্ করত। এই জন্য সংসারের কোনও কিছুতে শরৎবাবুর লক্ষ্য রাখবার অবকাশ মাত্র ছিল না। কিন্তু এক দিন তাঁর সে অবকাশ এসে পড়ল।

গৃহিণী পূজা-আহ্নিক এবং ছুঁৎমার্গ নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন; কাজেই সেদিন রাঁধুনি-ঠাকরুণের অসুখ হওয়ায় রাঁধুনি-ঠাকরুণের মেয়ে মায়া ভাতের থালা নিয়ে শরৎবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হ'লে শরৎবাবু চশমার ভিতর দিয়ে তার অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শন ক'রে বিস্মিত নেত্রে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

মায়া কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না; ভাতের থালাখানি তাঁর সম্মুখে রেখে দরজার পাশে গিয়ে উত্তর করল, "আমি মায়া। মার অসুখ করেছে তাই—"

শরৎবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "হুঁ।"

মায়া দশ বৎসর বয়সের সময় বিধবা হয়েছে। তার পর সে তার মায়ের কাছে এই সংসারে আরও পাঁচটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে: আজ সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে শরৎ বাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

রাত্রি সাড়ে বারটার সময় গৃহিণীর ডাক পড়ল।

গৃহিণী স্বপাকে এবং এক বার মাত্র নিরামিষ বিশুদ্ধান্ন গ্রহণ করেন। তখনও তাঁর রান্না হয় নি। এক ঘটি গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে তিনি শরৎবাবুর ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এসে বললেন, "কি?"

অনেক দিন পরে আজ হঠাৎ শরৎবাবুর মনে হ'ল,—অসম্ভব! এই তাঁর স্ত্রী!

বুঝলেন, তাঁকে কোন কথা ব'লে লাভ নেই। বললেন, "কিছু না, যাও।"

শরৎবাবু তাঁর পুত্র শিবেন্দ্রকে ডাকলেন। শিবেন্দ্র তখন হয়ত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শেলী, কীটস্ কিংবা শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ পড়ছিল। অথবা সে কিছুই পড়ছিল না, বালিশের উপর ভর দিয়ে কবিতা লিখছিল। হয়ত বা সে কবিতাও লিখছিল না—শুয়ে শুয়ে কি ভাবছিল। মোট কথা শরৎবাবুর ডাক সে শুনতে পায় নি।

মায়া ছুটতে ছুটতে এসে তাকে ডেকে দিল। "শিব-দা, শুনছ? শিগ্‌গীর উপরে যাও—বাবা ডাকছেন।"

এত রাত্রে পিতৃদেবের এরূপ আকস্মিক ভাবে ডাকবার কারণ কি বুঝতে না পেরে শিবেন্দ্র ত্রস্তপদে শরৎবাবুর

ঘরের দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, আমায় ডাকছেন ?"

পুত্র শিবেন্দ্র সে-বার বি. এসসি. পাস করেছে। ডাক্তারি পড়বে এই তার ইচ্ছা। শরৎবাবুর যত কিছু দুর্ভাবনা এই শিবেন্দ্রকে নিয়ে।

"তোমার ভর্তি হওয়ার কি হ'ল ?"

"এখনও তার ঢের দেরি—প্রায় দু-মাস।"

"হুঁ। তোমার মা কি করছেন ?"

মায়ের ছায়া-দর্শনও ইদানীং শিবেন্দ্রের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। সর্ব্বাঙ্গে দস্তুরমত গোবরের প্রলেপ ও গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে তবে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব ছিল।

শিবেন্দ্র আমতা আমতা করল, কিছু সঠিক উত্তর দিতে পারল না।

"আচ্ছা, বামুনঠাকরুণের নাকি অসুখ করেছে ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"ক-দিন ?"

"দিন-তিনেক হবে। আজকে জ্বরটা একটু বেশী। প্রায় এক-শ তিন উঠেছে।"

"কে দেখছে ?"

"শচীন ডাক্তার।"

"কি খেতে দিচ্ছে ?"

"বার্লি, ফলটল কিছু।"

"তোমার মার খাওয়া হয়েছে ?"

শিবেন্দ্র হাঁ-না কিছুই উত্তর দিতে পারল না।

শরৎবাবু বললেন, "হুঁ। দেখ, কথাটি হয়ত আমার মনে নাও থাকতে পারে। তুমি বেশ মনে রাখবে—বামুন-ঠাকরুণের অসুখ সারলেই তার মাইনেপত্র চুকিয়ে দিয়ে ওদের যেন ব'লে দেওয়া হয় এখানে আর ওদের আমি রাখতে পারব না। আমার এ-কথার কিছুমাত্র নড়চড় হবে না এও ওদের ব'লে দিও। আর কাল থেকেই এক জন ঠাকুর দেখবে,—যাও।"

শিবেন্দ্রের মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। নীচে আসতেই মায়া সিঁড়ির কাছে এসে তার পথ রোধ করে আস্তে আস্তে বলল, "ইস, মুখখানা যে বেজায় ভারি! বকুনি খেয়েছ বুঝি ?"

তার পর অনেক রাত পর্য্যন্ত তাদের কি সব কথাবার্ত্তা হ'ল। সেদিন, তার পরদিন এবং তার পরদিনও।

দু-জনে পরামর্শ করল, তারা মরবে। একসঙ্গে দু-জনে মরবে।

গভীর রাত্রে তারা ঘরে খিল এঁটে বসল। এক শিশি আর্সেনিক—অথবা মার্কিউরিক সলিউশন, কি ঐ রকম একটা কিছু সম্মুখে রয়েছে। তাতে দু-জনের মরবার মত ওষুধ।

মায়া বলল, "আমায় আগে দাও। কি জানি শেষে যদি না পারি।"

শিবেন গ্লাসে ওষুধ ঢেলে তার হাতে দিল।

উঃ! কি জ্বালা—মায়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। উঃ! শিব-দা, তুমি ও কক্ষনো খেয়ো না—বড্ড জ্বালা!

ধাক্কা লেগে অবশিষ্ট ওষুধটা মাটিতে পড়ে গেল। শিবেনের মরা হ'ল না।

তার পর শিবেন চীৎকার ক'রে বাড়ীসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে দিল। ডাক্তার এল, চিকিৎসা হ'ল, অর্থব্যয়ও হ'ল খুব, কিন্তু মায়াকে কেউই বাঁচাতে পারল না।

শিবেন ডাক্তারি পাস করেছে। পশ্চিম-ভারতের কোথায় প্র্যাকটিস করছে। বিবাহও নাকি করেছে। মায়ার কথা তার হয়ত আর মনেই নেই।

কিন্তু মায়ার আত্মা আজও তার প্রিয়জনের অপেক্ষায় এ-বাড়ীতে নিত্য ঘুরে বেড়ায়।"

সনৎ-দা চ'লে গেলে একটু পরেই যোগেশ এল। রাত্রির ঘটনা তাকে বললাম।

আবগারী ইনস্পেক্টরের ছাদ থেকে প্রায়ই আমাদের একটা কলমের গাছ থেকে আম চুরি যেত। যোগেশ এক দিন দেখে ফেললে, ওদেরই একটি মেয়ে ছাতা দিয়ে আম পেড়ে নিচ্ছে! আকস্মিক ভাবে ধরা পড়ায় মেয়েটি পালিয়ে গেল; কিন্তু ছাতা বেধে থাকল সেই আমের ডালে। যোগেশ নিয়ে এল ছাতাটি পেড়ে এবং সেই অবধি সেটা নির্ব্বিবাদে রয়েই গেছে তার কাছে।

আমার কথা সমস্ত শুনে যোগেশ বলল, "ও কিছু না, স্রেফ ছাতা। ছাতিটি রাত্রিবেলা ওরা চুরি ক'রে ফেরত নিতে চায়!"

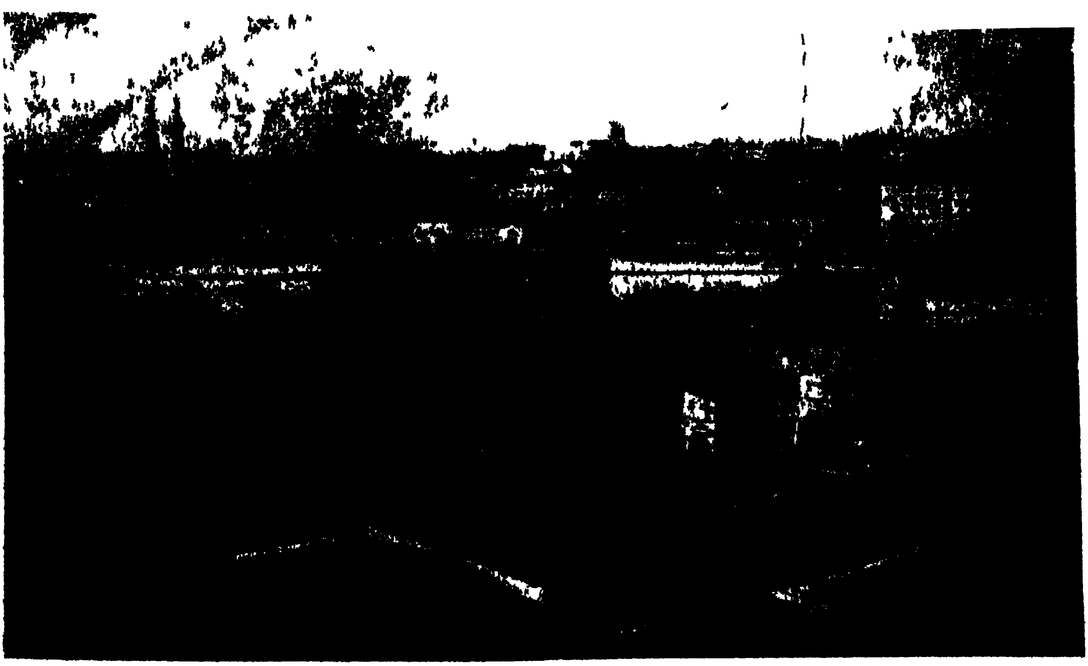
মাষ্টারমশায়ের একান্ত অনুরক্ত ভবানীপ্রসাদ সমস্ত শুনে বললেন, "ও আর কেউ নয়, সাক্ষাৎ গায়ত্রী। প্রত্যহ গভীর রাত্রে মাষ্টারমশাই যে শ্বাস-প্রাণায়াম, আর গায়ত্রী স্তব পাঠ করেন, সেটা কি কিছুই নয় মনে কর ?'

শুনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করি। স্বয়ং গায়ত্রী তাহলে আমাকে দেখা দিয়ে গিয়েছেন!

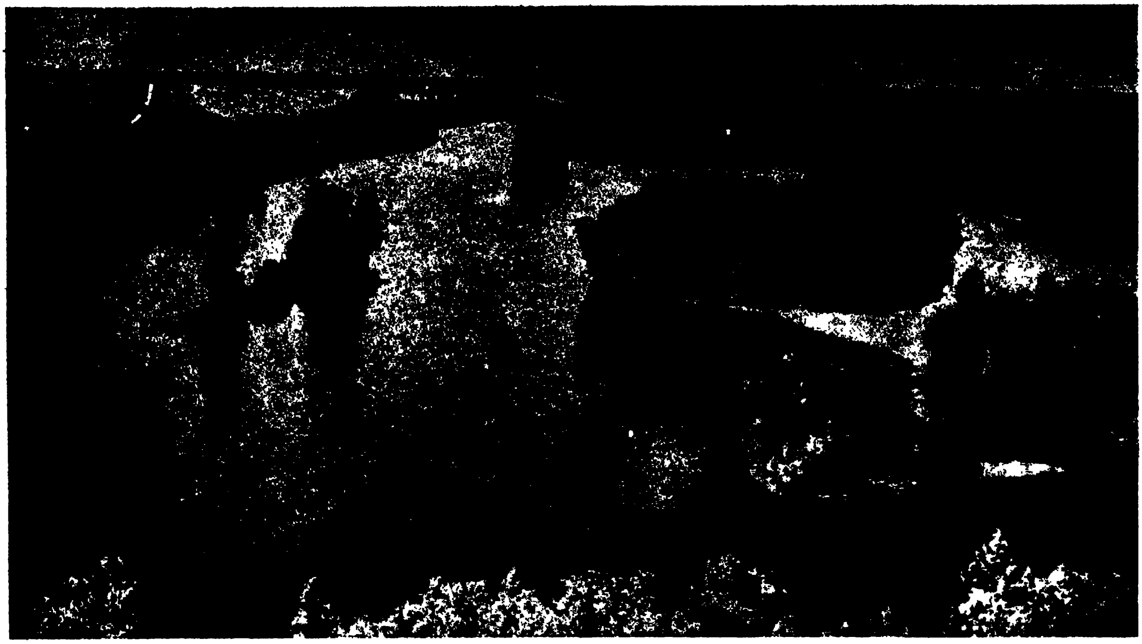
কিন্তু আজও সাধনামার্গের গায়ত্রীর চেয়ে সংসারের অতিবড় কঠোর সত্য মায়ার পরিণাম আমাকে বেশী ক'রে অভিভূত করে।



হেলসিনকি, ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী। বন্দরের একাংশ



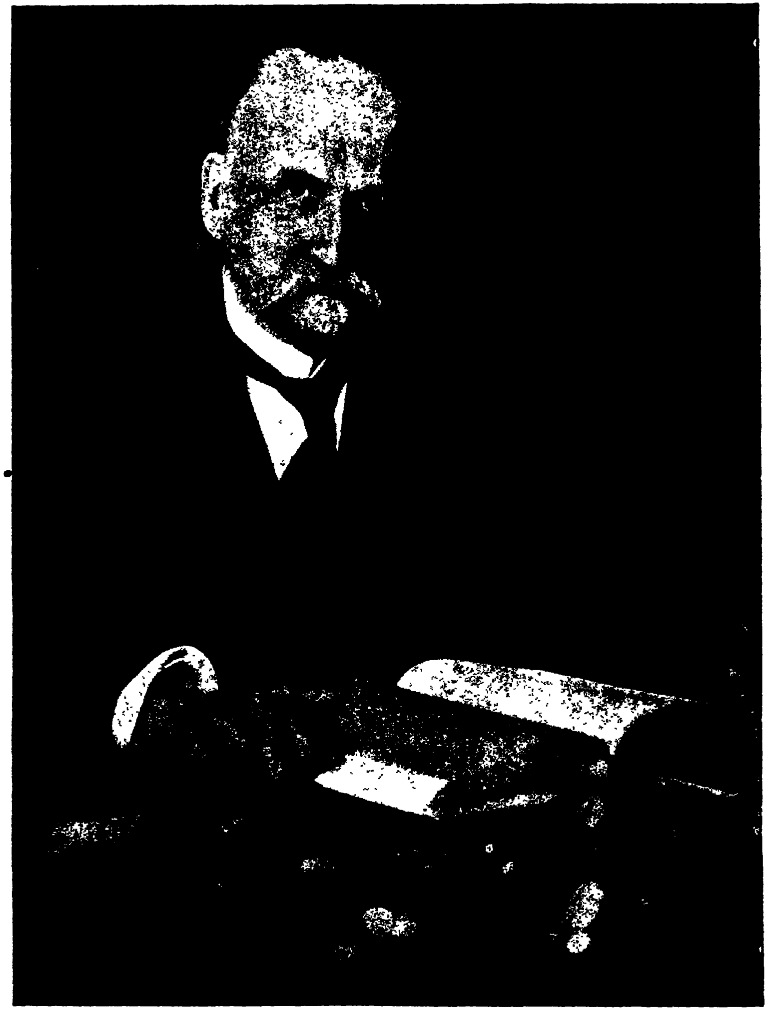
হেলসিনকির বন্দরের অপরার্দ্ধের দৃশ্য
["বিবিধ প্রসঙ্গ" ও দেশ-বিদেশের কথা" বিভাগে রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সংঘর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য]



ফিনল্যাণ্ডের হ্রদ। ফিনল্যাণ্ডে সত্তর হাজারের উপর হ্রদ আছে। এই সকল হ্রদের জন্য সোভিয়েট সৈন্যের অগ্রগতি সমূহ বাধা পাইতেছে।



হেলসিন্‌কির সাধারণ দৃশ্য



ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি কালিয়ো



ফিনল্যাণ্ডে প্রধান রণনায়ক ম্যানারহাইম



ফিনল্যাণ্ডের গি   তরুণীদল



ফি   াণ্ডের শিল্পকলা-নি

কেন এই দুঃখ ?

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এসসি.

এ-দেশে প্রধানত কৃষিজাত ধান, পাট, তিসি, গম, সরিষা, চা প্রভৃতি এবং খনি-আহৃত কয়লা, লৌহ প্রভৃতিই ধনোৎপাদনকারী বস্তু। দেশের শাসন ও উল্লিখিত বস্তু সকলের উৎপাদনে ও ক্রয়বিক্রয়ে যাহারা নিয়োজিত, মোটামুটি তাহারা ছাড়া অন্য সকলেই এদেশে বেকার।

উল্লিখিত কার্য্যসকলের ব্যাপ্তি এই দেশে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, এই হেতুই এ-দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই বৃত্তিহীন। এই বৃত্তিহীনতা এতখানি ব্যাপক যে একমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই ভারতবাসী অধুনা সমাজবন্ধন, পরস্পরের আদান-প্রদান, নীতি ও সাধুতা বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহার আর্থিক জীবনই সর্ব্ব ব্যাপারের নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই দুঃখময় অবস্থা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? দিন দিন লোকসংখ্যাবৃদ্ধি হেতু এবং ধনোৎপাদনের অন্য উপায় না থাকায় তো এই দুঃখ বৃদ্ধিই পাইতেছে। এই প্রশ্নের উপর নানা দিক হইতে আলোকসম্পাতের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ধান ও পাট উৎপাদনে লাভ হয় না। উৎপাদনের খরচ ও ভূমির মূল্যের অনুপাত কষিলে ধান ও পাটের মূল্য আরও বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ধানের দাম চাহিদার অনুপাতে বৃদ্ধি হইবার তেমন কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। পাটের মূল্যবৃদ্ধির জন্য চাঁদপুরে সমবায়-বিভাগের উদ্যম লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া ডুবিয়া যাইবার কথাও মনে পড়িতেছে। পাটের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের আইন কিরূপে ইংরেজ-পরিচালিত পাটকল-ওয়ালাদের সমবেত চেষ্টায় প্রতিহত হইল তাহাও দেখিতেছি।

এই অবস্থায় কৃষিজাত দ্রব্যমাত্রই কি ক্ষতিজনক হইবে? কিন্তু চা কৃষিজাত দ্রব্য, তাহাতে লাভ হয়। পূর্ব্বে কয়েক বৎসর হইতে লাভ তেমন ছিল না। কিন্তু সে ত্রুটি সংশোধিত হইয়া সুদিন ফিরিয়া আসিয়াছে। এবং ইহারই সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, দেশের চা-বাগানগুলির মূলধনের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগের মালিক হইল ইংরেজ।

এ-দেশের শতকরা ৮৭ জন চাষব্যবসায়ে লিপ্ত। কিন্তু দেখা যাইতেছে তাহাদের বৃত্তি যথেষ্ট ধন উৎপাদন করিতেছে না। ইহারই সূত্র ধরিয়া আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, উৎপাদিত বস্তুকে আরও অর্থপ্রসূ করার উপায় না করিতে পারিলে ভারতের এই দুঃখ দূর হইবার উপায় নাই। কারণ এই শতকরা ৮৭ জন লোকের জীবনের রক্ষণ, সেবা ও শিক্ষাদানের বৃত্তি ধারণ করিয়াই বাকী ১৩ জন জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

এ-দেশের কৃষিজাত দ্রব্য যখন আমাদের জীবনযাত্রার সহিত এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত তখন কি ভাবে প্রতি বৎসরের অর্জ্জিত শস্যাদি ব্যয়িত হয় তাহা যাচাই করিয়া দেখা যাক। পাট দিয়া সুতলি, চট, আসন, থলিয়া প্রভৃতি তৈরি হয়। ধানে আহার্য্য চাউল, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আবশ্যক ষ্টার্চ্চ ও বীজতৈল সৃষ্টি হয়। তিসি হইতে যে তৈল হয় তাহাই সেতু, বাড়ীঘর, টিন, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি রং করিতে ব্যবহৃত রঙের দেহ। ছাপার কালির দেহও তিসির তৈল। সরিষার তৈল কোটি কোটি লোকের আহার। অধিকাংশ তৈলবীজের খৈল দুগ্ধদান-কারী গরুর পরম পুষ্টিকর আহার। চা দেশবিদেশের লোকের প্রিয় পানীয়। এতদ্ব্যতীত আরও বহু কৃষিজাত দ্রব্য আছে। প্রসঙ্গত হরীতকীর নাম করা যাইতে পারে, উহা দ্বারা ট্যানিক এসিড প্রস্তুত হয়।

আমাদের ধারণা জন্মিতে পারে যে, উল্লিখিত বস্তুগুলি সব এ-দেশেই তৈয়ারী হইতেছে এবং বহু লোক এই সকল

প্রভৃতির বৃত্তিতে নিয়োজিত। এই ধারণা সত্য নহে। কত কাঁচা মাল প্রতি বৎসর বিদেশে চালান যায় তাহার গড়পড়তা হিসাব এইরূপ—

কৃষিজাত দ্রব্য	কোটি টাকা
পাট	৩৭
তুলা	১৬
তৈল বীজ	১৮
অন্যান্য	৬
	১৫৭ কোটি টাকা

এই সকল কাঁচা মাল বিদেশ হইতে পণ্যে রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া আসে। এই ভাবে যে কাঁচা মাল এ-দেশেই বহু লোককে নিয়োজিত রাখিতে পারিত, এবং প্রায় তিন গুণ মূল্যের দ্রব্যে রূপান্তরিত হইতে পারিত তাহা অন্যত্র প্রেরিত হয়।

ইহারই সূত্র ধরিয়া বিদেশী প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। মুখ ধোয়ার বুরুশ ও দন্তমঞ্জন, চেয়ারের বার্নিশ, ডেকচির অ্যালুমিনিয়ম-পাত, চায়ের বাসন, থালা-বাসন গড়িবার জন্য তামা, পিতল ও পালিস করার যন্ত্র, লিখিবার কালি ও কাগজ, জুতার কালি ও জুতা সেলাইয়ের যন্ত্র, জামার বোতাম ও সেলাইর সূতা ও যন্ত্র, প্রসাধন দ্রব্য, লিখিবার কলম ও পেন্সিল এবং রবার, শিশি-বোতলের ছিপি, চুলের ফিতা, কাঁটা ও চিরুণী প্রভৃতি অধিকাংশ বিলাতী। এই সকল বস্তু তৈয়ারিতেও এ-দেশের বহু লোক নিয়োজিত থাকিতে পারিত।

এ পর্য্যন্ত যে-পথে আমাদের আলোচনা পরিচালিত হইয়াছে তাহাতে বৃত্তিহীনকে বৃত্তিপ্রদানের কি উপায় এই প্রশ্নের উত্তর যেন সহজ হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ বোধ হইতেছে যে এ-দেশে টাটার লৌহের কারখানার মত বহুবিধ বড় বড় কারখানা সৃষ্টি করা হউক এবং তদ্দ্বারা প্রভূত বৃত্তির সৃষ্টি হউক। এই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

টাটার লৌহের কারখানা বিহারের অন্তর্গত জমশেদপুরে অবস্থিত। হাজার হাজার লোক জমশেদপুরে বাস করিয়া কারখানার নানা বৃত্তিতে নিয়োজিত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এক জমশেদপুরে যত চা বিক্রয় হয় বঙ্গ বা বিহারের যে কোন অপর স্থানের ৪৫ লক্ষ লোকেও (তিন জেলায় এত অধিবাসী হইতে পারে) তাহা ক্রয় করে না। জমশেদপুরের অধিবাসীরা প্রায় এই হারেই অপর সকল পণ্য ব্যবহার করে। সুতরাং ইহারই সূত্র ধরিয়া এই যুক্তি আসিয়া দাঁড়াইতেছে যে, দেশে যত বেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে পণ্যের (কৃষিজাত ও অপর) চাহিদা তত বৃদ্ধি পাইবে এবং পণ্যের চাহিদা বাড়িলেই পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং বৃত্তি সৃষ্টির জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন করার যেমন আবশ্যকতা দাঁড়াইতেছে, তেমনি আবার শিল্প-প্রতিষ্ঠানজাত বস্তুর বিক্রয় জন্যও বৃত্তিধারীর আবশ্যক।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আমরা যে ভাবে চালাই তাহাতে বিদেশজাত দ্রব্যাদি পাইবার পথ সহসা রুদ্ধ হইলে আমরা নিত্যব্যবহারে বহু বস্তুই পাইব না। বর্ত্তমান যুদ্ধ হেতু আমদানি রুদ্ধ হইলে এই অবস্থার পরিণাম অতি সত্বর আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইবে। কেবল দেশীয় চাউল ডাল মাছ তরকারি খাইয়া, পর্ণকুটীরে বাস করিয়া, খাগের কলমে মসীতে তালপাতায় লিখিয়া, নৌকা ও গরুর গাড়ীতে চড়িয়া (যদি বা তাহা পাওয়া যায়) দিনযাপন যখন সম্ভব নয় তখন নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য নিজেরা অর্জ্জন করিতে না পারিলে আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা তো রহিয়াই যাইবে।

অনুমান করি যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যখন দেশে দেশে শিল্প-উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা চলিতেছে, দেশকে স্বাবলম্বী ও অন্য দেশের সঙ্গে নির্ম্মাণ-কৌশলে প্রতিযোগী করিবার জন্য উদ্যোগ চলিতেছে তখন এত যুক্তির কি প্রয়োজন ছিল? এ-দেশেও জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনার জন্য কংগ্রেস নানা আয়োজনে নিযুক্ত হইয়াছে, অতএব এ-জন্য যুক্তির আবশ্যকতা কি?

প্রয়োজন এই যে কংগ্রেস গান্ধীজীর অনুশাসনে পরিচালিত এবং যে জওহরলালজী এই পরিকল্পনা-কমিটির সভাপতি তিনি স্বীয় আত্মচরিতে দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তিনি বহু বার গান্ধীজীর মতামত সমর্থন করিতে পারেন নাই; কিন্তু পরিশেষে

গান্ধীজীর প্রভাবে (যুক্তিতে নহে) তিনি স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। গান্ধীজী গান্ধী-সেবাসঙ্ঘ ও নিখিল-ভারত গ্রাম-উদ্যোগসঙ্ঘ প্রভৃতির নিয়ামক। খদ্দর, মধু, সাবান, তৈল, কাগজ প্রভৃতি দ্রব্য কলে তৈয়ারী জিনিষের দুই-তিন গুণ দামে কুটীরশিল্পরূপে তৈয়ারী করিয়া উহা বাজারে বিক্রয় করাই ইহাদের উদ্যোগ। দেশীয় ও বিদেশীয় কলে তৈয়ারী অনুরূপ জিনিষের কম দামে বিক্রয় যখন কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টও আইন দ্বারা রুদ্ধ করিতে-অপারগ তখন কার্য্যকর ব্যবসায় ও বৃত্তি হিসাবে গ্রাম-উদ্যোগের পরিকল্পনা প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অবশ্যই বর্জ্জনীয়। বস্তুত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালী যখন দেশীয় তাঁত প্রভৃতির শিল্পে প্রভূত অর্থক্ষতি দিতেছিল তখন আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলি প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া গেল, ইহা অবশ্যই এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, এবং ইহাও বিস্ময় ও কৌতুককর যে, এই আমেদাবাদের কাপড়ের কলওয়ালারাই বর্ত্তমানে খদ্দর-আন্দোলনের পরিপোষক এবং খদ্দরে অবিশ্বাসী বাঙালীর উপর খড়্গহস্ত।

আমাদের বক্তব্য এই যে, জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনা কমিটির এখন স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করার সময় উপস্থিত যে তাহারা গ্রাম-উদ্যোগের পথ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার জন্য যন্ত্রচালিত কারখানায় পণ্য তৈয়ারীরই পক্ষপাতী। কারণ তাহাদের আয়োজন ও তথ্যানুসন্ধান এই দিক হইতে নিয়ন্ত্রিত না হইলে বৃথা শ্রম ও সময় ক্ষেপণই অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু কংগ্রেস যন্ত্রচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেই যে উহা গড়িয়া তোলা যাইবে এমন সম্ভাবনা কম। সেই কথাটার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

যুদ্ধ ও অন্যান্য উপায়ে ইংরেজ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে। ইংরেজ দেশ-শাসন ও বাণিজ্য দ্বারা ভারত হইতে অর্থ দেশে লইয়া যায়। বস্তুত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রমাণ আছে যে, পলাশীর যুদ্ধের পর এ-দেশ হইতে যে প্রভূত ধন বিলাতে নীত হইয়াছিল তদ্দ্বারা সে-দেশের যন্ত্রাদি ও শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ অবস্থায় ভারতবর্ষ হইতে যত বেশী অর্থ স্বদেশে লইয়া যাওয়া যায় ইংরেজের তাহাই অভিপ্রায় হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং আমাদের শাসক ইংরেজ তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের যতগুলি পথ আছে তাহা সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখার জন্য চেষ্টা করিবে এবং সর্ব্বপ্রকারে আইনের নিগড় বাঁধিয়া রাখিবে, ইহাতে বিচিত্র কি?

কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। গমের আটা সর্ব্বত্র ভোজ্য। বঙ্গদেশে যেমন ধান, পঞ্জাবে তেমনি গম জন্মে। এই গম কলিকাতায় জাহাজ বা মালগাড়ীতে আসে। ভাড়া লাগে মণ প্রতি ১৷৵০ আনা। আর ইংরেজ চাষীর গম অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৷৹ আনা ভাড়ায় কলিকাতায় জাহাজ আনিয়া নামায়। এই বৈষম্য দূর করার জন্য আমাদের আবেদনে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে পঞ্জাবের গম-চাষীর বড় দুঃখ; গমের দাম কমিয়া গিয়াছে, বিক্রয়ও কম।

করাচী হইতে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা ও রেঙ্গুন পরস্পর পণ্য-চলাচলের যতগুলি জাহাজ আছে তাহার অধিকাংশের মালিক বিদেশী। এ-দেশী জাহাজের মালিকদের বাদ দিয়া অন্য সকলে এক সঙ্ঘ করিয়াছে যে তাহাদের জাহাজে যাহারা পণ্য চলাচল করিবে বৎসরান্তে তাহাদের প্রচুর ভাড়া ফেরত দেওয়া হইবে। এই ভাবে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্র হইতে দেশীয় কোম্পানী-গুলকে অপসারণের জন্য (দরকার হইলে কিছু দিন ক্ষতি দিয়াও) এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা রুদ্ধ করিবার কোন আইন করা এ-দেশে সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে হাজি-বিল ও তাহার পরিণতি স্মরণীয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে আসিতেছে। কলিকাতার তুলনায় বোম্বাই ব্যবসায়-প্রধান স্থান। যন্ত্রচালিত পণ্যের কারখানা ঐ অঞ্চলেই বেশী। এজন্য বিদেশীরা কলিকাতার তুলনায় বোম্বাইতে তাহাদের পণ্যের দাম একটু কম করিয়া রাখে যাহাতে বোম্বাইয়ের শিল্প-পরিচালকগণ নিজেরা ঐ সকল পণ্য প্রস্তুতের জন্য উৎসাহ না পায়।

বর্ত্তমানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এক প্রদেশের প্রস্তুত সামগ্রী অন্য প্রদেশে চালান দিবার

কিছু কিছু বিধিনিষেধের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার সহিত প্রাদেশিকতার যে ইন্ধন প্রতিনিয়ত সঞ্চারিত হইতেছে তাহাতে প্রদেশে প্রদেশে পণ্য আদান-প্রদান কঠিন হইয়া ব্যবসায়ে বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিদেশী বস্তু বিদেশ হইতে আসিয়া কোন প্রদেশে প্রবেশের আইনের যে বাধা নাই, এক প্রদেশের পণ্য অন্য প্রদেশে যাইতে সে-বাধা আছে।

লৌহ, চিনি প্রভৃতির কারখানার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট আইনদ্বারা কিছু সহায়তা করিতেছেন সত্য কিন্তু ঐ সকল ব্যবসায়ের প্রসারের সঙ্গে বিদেশীর স্বার্থ কি ভাবে জড়িত তাহার আভাস উহাদের কোটি কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী যন্ত্রাদির প্রতি দৃষ্টি করিলেই উপলব্ধি হয়।

ইউরোপের এই যুদ্ধকালে বহুতর রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানি রুদ্ধ হইয়াছে। ইহার ফলে এই সকল দ্রব্য-ব্যবহারকারী কারখানাগুলি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এ জন্য দেশের শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ নূতন রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠার্থ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা চাহিয়া এই উত্তর পাইয়াছেন যে তাঁহাদের চাহিদা যেন তাঁহারা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজকে জানান এবং গবর্ণমেণ্ট কোন সাহায্য করিবেন না। গবর্ণমেণ্ট আরও সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে যুদ্ধবিরতিকালে পাছে বিদেশী প্রতি-যোগিতায় কারখানা উঠিয়া যায় ইহা বিবেচনা করিয়া যেন নূতন কারখানা গড়া হয়। গবর্ণমেণ্টের এই মনোভাব এই পরাধীন ভারতেই সম্ভব হইল।

এই ভাবে বহুতর উদাহরণ একত্র করিয়া আর লাভ নাই এবং ইহাতে অস্বাভাবিকতাও কিছু নাই। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের স্নেহ না পাইয়াও জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনা কি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে?

জাপান অতি অল্প দিনে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিয়াছে। কিন্তু জাপান স্বাধীন। তাহাদের দেশীয় গবর্ণমেণ্টই তাহাদের দেশের শিল্পবাণিজ্যের আদি প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও নিয়ন্তা। রাশিয়াও অতি অল্প কয়েক বৎসরে শিল্পবাণিজ্যে দেশ গুছাইয়া লইয়াছে। কিন্তু রাশিয়াও স্বাধীন। আমেরিকার "ন্যাশনাল রিকভারী প্ল্যানও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দেখা যায় এই সকল দেশের স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন জন্য সর্ব্বদা আত্মরক্ষামূলক আইনের ও ব্যবস্থার আশ্রয় লইয়াছে। ইহাতে দেশীয় লোকের যে সাময়িক কষ্ট সহিতে হইয়াছে আইন দ্বারা তাহার জন্য জনগণের কণ্ঠরোধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এই ভাবে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সাময়িক দুঃখ গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়াছে। একটি উদাহরণ দিতেছি। রাশিয়া দেখিল প্রতিযোগিতায় পৃথিবীতে টিকিতে হইলে দেশে মোটর গাড়ী চাই। পাঁচ বৎসরে কত মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিতে হইবে তাহার একটা সংখ্যা স্থির হইল। প্রভূত অর্থের বিনিময়ে রাশিয়া আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করিল যে তাহাদের বিখ্যাত কারখানার অনুরূপ যন্ত্র দিয়া রাশিয়াতে উপরোক্ত সংখ্যক মোটর তৈয়ারীর যোগ্যতাসম্পন্ন বৃহৎ একটি কারখানা ফোর্ড গঠন করিয়া দিবেন এবং কয়েক জন রাশিয়ান এঞ্জিনীয়ারকে আমেরিকার নিজ কারখানায় এমন করিয়া কাজ শিখাইয়া দিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা রাশিয়ায় আসিয়া ফোর্ডের এঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে নিজেদের কারখানায় কাজ করিয়া পরে নিজেরাই উহা পরিচালন করিতে পারেন। বিবিধ পণ্য ও সামগ্রীর জন্যই রাশিয়া তখন নানা দেশের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি করিয়াছিল। কিন্তু একযোগে চুক্তির টাকা দিবার সাধ্য তখন রাশিয়ার ছিল না। রাশিয়া টাকার বদলে কয়েক জাহাজ গম আমেরিকায় পাঠাইয়া সে-দেনা শোধ করিয়াছিল। কিন্তু তজ্জন্য স্বদেশে গমের অভাব হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের অনুশাসনে স্বল্পাহারই রাশিয়ানদের সহ্য করিতে হইয়াছিল।

কেবল আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা ও বাণিজ্যে অমনোযোগিতা হেতুই এ-দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও বৃত্তিহীনের বৃত্তি হইতেছে না, এই অভিযোগ যে মিথ্যা তাহা প্রদর্শনের জন্যই আমরা এই আলোচনা করিলাম। শিল্প-বাণিজ্য সহজ নহে, উহাতে অস্বাভাবিক প্রতি-যোগিতা ও অসাধারণ বিধিনিষেধ রহিয়াছে।

শিল্প-বাণিজ্যের এক অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইল মূলধন। কিন্তু স্থায়ী ও নিশ্চিত আয় অভিলাষী,

স্বল্পতুষ্ট ব্রাহ্মণের বিধবাসদৃশ এ-দেশের বিত্তশালিগণ সমুদয় নগদ টাকা গবর্ণমেণ্টের হাতে দিয়া রিক্তহস্ত। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মূলধন সংগ্রহও কঠিন।

এত জাল, এত জটিলতা ছিন্ন করার জন্য স্বাধীনতাই কি আমাদের প্রয়োজন? নতুবা কি দেশের লোক দিন দিন বৃত্তিহীন হইয়া ক্রমশঃ আরও অভাবগ্রস্ত, ম্রিয়মাণ ও উৎসাহহীন হইয়াই পড়িবে?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এ-দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করা অবধি আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না। সুতরাং কংগ্রেস যেটুকু ক্ষমতা (দেশের বাণিজ্য, শিল্পনীতি, টাকার বিনিময়ের হার ও মালের রেলের ভাড়ার উপর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কোন হাত নাই) পাইয়াছে কালক্ষয় না করিয়া তাঁহার সাহায্যেই অগ্রসর হউক। এই ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু তথ্য অদ্যাবধি বহু ব্যক্তিই সংগ্রহ করিয়াছেন। চাই হাতে-কলমে কাজ এবং তাহাতে যে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তাহা উল্লঙ্ঘনের ক্ষমতা অর্জ্জন। অন্যথা বৃথা আড়ম্বর ও কালক্ষেপে আমাদের দুঃখ আরও বর্দ্ধিত হইবে এবং কংগ্রেসের সম্মান ও তাহার কর্ম্মশক্তির প্রতি লোকের বিশ্বাস অলুপ্তিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের বিশেষ স্নেহ না পাইয়াও আমেদাবাদ অঞ্চলে বহু কাপড়ের মিল হইয়াছে এবং বঙ্গদেশে কিছু কিছু রাসায়নিক দেশীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, পরম নৈরাশ্যের মধ্যে ইহাই আমাদের আশার কথা।

মহীয়সী

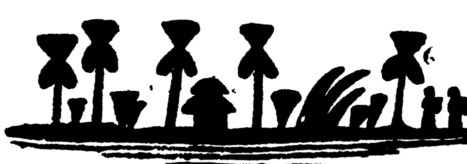
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

বিশ্বের নয়নদলে, তুমি দেবী নিভৃত বন্দিনী
হৃদয়ের আনন্দ নন্দিনী;
কনকের কান্তি কভু, কভু তুমি পল্লবশ্যামলা,
তুমি সৃষ্টি মহাশক্তি, নহ নহ নহ ত অবলা;
উষার নৈঃশব্দ্য ভাঙি বিহঙ্গ-কাকলি কলকলে,
সুর যবে স্রোতধারে, পরস্পরে মিলে ছলছলে,
দক্ষিণের মৃদুমন্দ আন্দোলিত বায়ুসঞ্চরণে,
প্রভাতের পদ্মবনে মধুপের মধু গুঞ্জরণে
পুষ্প-মুঞ্জরণে,
এলে তুমি বাজাইয়া কনক-কিঙ্কিণী
চির অশঙ্কিনী,
বিচিত্র বর্ণের জালে আলোকের মহা ঝর্ণা হোতে
মন্দাকিনী মহাপুণ্য-স্রোতে।

সমুদ্র মন্থন হোতে উঠেছিল লাবণ্যে উর্ব্বশী,
অত্রির নয়নরন্ধ্রে উঠেছিল উল্লসিয়া শশী,
সমগ্র লাবণ্যরাশি আপনার প্রতি অঙ্গে মথি,
কবির হৃদয়-পদ্মে উদ্দীপনী মহাসরস্বতী,
হে সৌভাগ্যবতি!
জন্ম তব, কোন্ শুভ্র কল্পনা জ্যোৎস্নাতে,
কার আল্পনাতে?
তোমার যৌবন ফলে তুমি নিত্য রহ উদাসিনী,
চিরন্তনী ওগো সন্ন্যাসিনি!
আগ্রহে দেখিতে তোমা, বিশ্বের নয়নপদ্মদল,
লাবণ্য পুলকে ভরে, আনন্দের ঔৎসুক্যে সজল;
ধমনী নাচিয়া উঠে কোন গূঢ় সুধা-সঞ্চরণে,
মানস-সরসী কাঁপে, অন্তরের ভাবের স্পন্দনে,
তোমার বন্দনে!

নেত্রে তব লাবণ্য-সমুদ্র করে ক্রীড়া,
বিশ্বের মদিরা !
পুষ্পসম স্পর্শ তব প্রতি অঙ্গ ভরি'
কাঁপিছে শিহরি ;
তবু তুমি নহ শুধু ভোগের সঙ্গিনী
অনন্ত যাত্রার পথে তুমি দেবী চির উৎসুকিনী ।
আলস্য-প্রমোদমত্ত কাপুরুষ ভীরুর স্পর্দ্ধায়,
নারী-হৃদয়ের শ্রদ্ধা, পরাহত, বিক্ষুব্ধ বাধায়,
লজ্জায় ঘৃণায় ।
দুঃখদিনে বাজাও মঙ্গল-শঙ্খ তব
চির অভিনব ।
দুর্গম দুঃসহ ঝঞ্ঝাপথে, তুমি চিরসহযাত্রী,
ভয়মাঝে অভয়বিধাত্রী ।
দুর্গম প্রেমের পথে ছুটে চল তুমি আত্মহারা,
একটি রসের স্রোতে যুক্ত কর সর্ব্ব রসধারা ;
প্রেমের গভীর মন্ত্র নাচে তব আঁখির পল্লবে,
আনন্দ-মঙ্গল-বীণা বেজে ওঠে কণ্ঠের উৎসবে,
অয়ি সুদুর্লভে ।
পুরুষের চেতনারে মুক্ত কর স্রোতে,
অন্ধকার হোতে ।
দাক্ষিণ্যের পূর্ণকুম্ভ হোতে সর্ব্বস্ব করায়ে পান,
একান্তে আপনা কর দান ।
তোমার প্রেমের যজ্ঞে জ্বলিতেছে উর্দ্ধে হোমাশিখা,
আদিম ত্যাগের মন্ত্র দেয় তাহে আপনার লিখা,
প্রেমের অনন্ত আশা হে দেবী, তোমার অদর্শনে,
আপনারে ব্যক্ত করে লোকাতীত স্পর্শের হর্ষণে,
অয়ি সুমর্ষণে !

তোমার রহস্য দেবী তুমি নাহি জান,
আপনারে আন
আপন মুঠার মাঝে, তবু তুমি নিত্য দূরে রহ,
আমার পুষ্পিত অর্ঘ্য লহ ।
কত কবি গেয়ে গেছে কত শত বিরহের গান,
কত বীর ঢালিয়াছে তোমা লাগি হেসে তার প্রাণ ।
সমস্ত পল্লবপুরী হোতে ঝর ঝর বরষায়,
তোমার বিরহ ক্লান্ত ঘনঘোর শ্রাবণ-সন্ধ্যায়,
কি যে গান গায় ।
সূর্য্যমুখী-বর্ণে আঁকা তোমার অঞ্চল,
করে ঝলমল ;
দূর্ব্বার হরিত ক্ষেত্রে পল্লবিত বনে,
শিশিরের সনে,
চিরদিন চিররাত্রি কাঁপে, তোমার মঙ্গল-গাথা,
শেফালিকা-দলে শয্যা পাতা !
কে তুমি জানি না কিছু তাহা, সে আদিম কাল হোতে,
ইঙ্গিতে টেনেছ সর্ব্বলোকে আপনার পুণ্যস্রোতে,
সুখে দুঃখে ত্যাগে সাধনায় দিয়েছ ব্যথার উপহার,
আলোকে নিয়েছ টেনে, দূর করি ঘন অন্ধকার ;
দূর পরপার,
স্বপ্নের মহিমা দিয়ে ঘিরে নিরন্তর,
মানুষেরে আপনার কাছে
কর আবিষ্কার,
হে দেবী, তোমারে নমস্কার



কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭

মামলার রায় বাহির হইল আরও আট মাস পরে। দাঙ্গার মোকদ্দমা—সাক্ষীর সংখ্যা এক শতেরও অধিক, তাহার বিবরণ-জেরা এবং এই দীর্ঘ বিবরণ ও জেরা বিশ্লেষণ করিয়া উভয় পক্ষের উকীলের সওয়াল জবাব শেষ হইতে দীর্ঘ দিন লাগিয়া গেল। দাঙ্গা ঘটিবার দিন হইতে প্রায় তিন বৎসর।

রায় বাহির হইবার দিন গ্রামের অনেক লোকই সদরে গিয়া হাজির হইল। নবীন বাগ্দীর সংসারে উপযুক্ত পুরুষ কেহ ছিল না, তাহার উপযুক্ত পুত্র মারা গিয়াছে, থাকিবার মধ্যে আছে এক নাবালক পৌত্র, পুত্রবধূ ও তাহার স্ত্রী মতি বাগ্দিনী। মতি নিজেই সেদিন পৌত্রকে কোলে করিয়া সদরে গিয়া হাজির হইল। রংলাল কিন্তু যাইতে পারিল না, অনেক দিন হইতেই সে গ্রামে বাহির হওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। অতি প্রয়োজনে বাহির যখন হয়, তখন সে মাথা হেঁট করিয়া চলে; সদর রাস্তা ছাড়িয়া জনবিরল পথ বাছিয়া চলে। আজ সে বাড়ীর ভিতর দাওয়ার উপর গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী বলিল—হ্যাঁ গো, বলি সকালবেলা থেকে বসলে যে! আলুগুলো তুলে না ফেললে আর তুলবে কবে? কোন্ দিন জল হবে—হ'লে আলু আর একটি থাকবে না, সব পচে যাবে।

রংলাল বলিল—হুঁ।

—হুঁ তো বলছ, কিন্তুক রইলে যে সেই বসেই রাজা-রুজিরের মতই। বলিয়া রংলালের স্ত্রী ঈষৎ না হাসিয়া পারিল না।

অকস্মাৎ রংলাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—ভগমান! এত নোক মরছে, আমার মরণ হয় না কেনে বল দেখি! সংসারের কচকচি আর আমি সইতে নারছি। বলিতে বলিতে সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার স্ত্রী অবাক হইয়া গেল, সে কি যে বলিবে খুঁজিয়া পর্য্যন্ত পাইল না। বুঝিতেও সে পারিল না অকস্মাৎ সংসার কোন্ যন্ত্রণায় এমন করিয়া রংলালকে অধীর করিয়া তুলিল! দুঃখে অভিমানে তাহারও চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল।

রংলাল কপালের রগ দুইটা আঙুল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল—মাথা আমার খ'সে গেল। আমি আজ খাব না কিছু। বলিয়া সে ঘরে গিয়া উপুড় হইয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল।

আরও এক জন অধীর উৎকণ্ঠার উদ্বেগে অসহ মনঃপীড়ায় পীড়িত হইতেছিলেন। অতি কোমল হৃদয়ের স্বভাবধর্ম্ম অতি-মমতায়, এখন হইতেই নবীন ও তাহার সহচর কয়জনের জন্য সুনীতি গভীর বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। উৎকণ্ঠার উদ্বেগে তাঁহার দেহমন যেন সকল শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। উনানে একটা তরকারি চড়াইয়া সুনীতি ভাবিতেছিলেন ঐ কথাই। সোরগোল তুলিয়া মানদা আসিয়া বলিল—পোড়া-পোড়া গন্ধ উঠছে যে গো! আপনি ব'সে এইখানে—আর তরকারি পুড়ছে। আমি বলি মা বুঝি উপরে গিয়েছেন। নামান, নামান।

এতক্ষণে সচকিত হইয়া সুনীতি গন্ধের কটুত্ব অনুভব করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চারি পাশে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—ঐ যা, সাঁড়াশিটা আবার আনি নি। আন তো মা মানদা।

মানদা অল্প বিরক্ত হইয়াই বলিল—ওই যে সাঁড়াশি—ওই যে গো। বাঁ-হাতের নীচেই যে গো!

সুনীতি এবার দেখিতে পাইলেন—সাঁড়াশিটার উপরেই বাঁ-হাত রাখিয়া তিনি বসিয়া আছেন।

তাড়াতাড়ি তিনি কড়াইখানা নামাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু হাতেও যেন কেমন সহজ শক্তি নাই, হাতখানা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মানদার সতর্ক সযত্ন দৃষ্টিতে সেটুকুও এড়াইয়া গেল না, সে এবার উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিল—কর্তাবাবু আজ কেমন আছেন মা?

ম্লান হাসি হাসিয়া সুনীতি বলিলেন—তেমনই আছেন।

—বাড়ে নাই তো কিছু, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—না। ক-দিন থেকে বরং একটু শান্ত হয়েই আছেন।

—তবে? মানদা আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল।

সুনীতিও এবার বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—কি রে? কি বলছিস তুই?

মানদা বলিল—এমন মাটির পিতিমের মত ব'সে রয়েছেন যে?

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি বলিলেন—নবীনদের মামলার আজ রায় বেরুবে মানদা! কি হবে বল তো ওদের? যদি সাজা হয়ে যায়— আর তিনি বলিতে পারিলেন না, তাঁহার রক্তাভ পাতলা ঠোঁট দুইটি বিবর্ণ হইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল—কোমল দৃষ্টিভরা চোখ দুটি জলে ভরিয়া বেদনার সায়রের মত টলমল করিয়া উঠিল।

মানদাও একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—সে আর আপনি-আমি কি করব বলুন। মানুষের আপন আপন অদেষ্ট; কপালের লেখন কি কেউ মুছতে পারে মা।

অসহায় মানুষের মামুলি সান্ত্বনা ছাড়া মানদা আর কিছু খুঁজিয়া পাইল না, কিন্তু সুনীতির হৃদয়ের অকৃত্রিম পরম মমতা চিরদিনের মতই আজও প্রবোধ মানিল না। জলভরা চোখে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি বলিলেন—মানুষ মরে যায় বুঝতে পারি মানদা—তাতে মানুষের হাত নেই। কিন্তু এ কি দুঃখ বল্ তো, এক টুকরো জমির জন্যে মানুষে মানুষকে খুন ক'রে ফেললে, আবার তারই জন্যে, যে খুন করলে তাকে রেখে দেবে খাঁচায় পুরে জানোয়ারের মত, কিংবা হয়তো গলায় ফাঁসি লটকে— কথা আর শেষ হইল না, চোখের জলের সমুদ্র গভীরতর বেদনার অমাবস্যার স্পর্শে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—হু-হু করিয়া চোখের জল ঝরিয়া ঝরিয়া মুখ বুক ভাসাইয়া দিল।

মানদার চোখও শুষ্ক রহিল না, তাহারও চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, সে আক্রোশভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তুমি ভেবো না মা, ভগবান্ এর বিচার করবেনই করবেন। ঘরে আগুন লাগবে, নির্ব্বংশ হবে—

বাধা দিয়া সুনীতি বলিলেন—না না, মানদা, শাপ-শাপান্ত করিস নে মা। কত বার তোকে বারণ করেছি বল্ তো!

মানদা এবার সুনীতির উপরেই রুষ্ট হইয়া উঠিল, সুনীতির এই কোমলতা সে কোন মতেই সহ্য করিতে পারে না। ক্রোধ নাই আক্রোশ নাই সে কি মানুষ! সে রুষ্ট হইয়াই সে স্থান হইতে অন্যত্র সরিয়া গেল।

সুনীতি বেদনাহত অন্তরেই আবার রান্নার কাজে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রামেশ্বরের স্নান-আহারের সময় হইয়া আসিয়াছে। সেই ঘটনার পর হইতে রামেশ্বর আরও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন; পূর্ব্বে আপন মনেই অন্ধকার ঘরে কাব্য আবৃত্তি করিতেন, ঘরের মধ্যে পায়চারিও করিতেন, কিন্তু এখন অধিকাংশ সময়ই স্তব্ধ হইয়া ঐ খাটখানির উপর বসিয়া থাকেন, আর প্রদীপের আলোয় হাতের আঙুলগুলি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখেন। কখনও কখনও সুনীতির সহিত কথার আনন্দের মধ্যে খাট হইতে নামিতে চাহেন, সুনীতি হাত ধরিয়া নামিতে সাহায্য করেন। অন্ধকার রাত্রে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে মুক্ত পৃথিবীর সহিত অতি গোপন এবং অতি ক্ষীণ একটি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। আপনার দুর্ভাগ্যের কথা মনে করিয়া সুনীতি ম্লান হাসি হাসেন—তখন চোখে তাঁহার জল আসে না।

পিতলের ছোট একটি হাঁড়িতে মুঠাখানেক সুগন্ধি চাল চড়াইয়া দিয়া, স্বামীর স্নানের উদ্যোগ করিতে সুনীতি উঠিয়া পড়িলেন। এই বিশেষ চালটি ছাড়া অন্য চাল রামেশ্বর খাইতে পারেন না।

অপরাহ্ণের দিকে সুনীতির মনের উদ্বেগ ক্রমশঃ যেন বাড়িয়াই চলিয়াছিল; সংবাদ পাইবার জন্য তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। অন্য দিন খাওয়াদাওয়ার পর স্বামীর নিকট বসিয়া গল্পগুজবে তাঁহার অস্বাভাবিক জীবনের মধ্যে সাময়িক ভাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন, কোন কোন দিন রামায়ণ বা মহাভারত পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন, কিন্তু আজ আর সেখানেও সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আজও তিনি বই লইয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু পড়ার মধ্যে পাঠকের অন্তরের যে তন্ময় যোগ থাকিলে শ্রোতার অন্তরকে আকর্ষণ করা যায়, আপন অন্তরের সেই তন্ময় যোগটি তিনি আজ আর কোন মতেই স্থাপন করিতে পারিলেন না।

একটা ছেদের মুখে সুনীতি আসিয়া থামিতেই রামেশ্বর বলিলেন—তুমি যদি সংস্কৃতটা শিখতে সুনীতি, তোমার মুখে মূল মহাকাব্য শুনতে পেতাম। অনুবাদ কি না—এতে কাব্যের আনন্দটা পাওয়া যায় না।

সুনীতি অপরাধীর মত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আজ তা হ'লে এই পর্য্যন্তই থাক।

রামেশ্বর অভ্যাসমত মৃদু স্বরে বলিলেন—থাক। তার পর মাটির পুতুলের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। সুনীতি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। রামেশ্বর সহসা বলিলেন—অহীন, অহীন কোথায় পড়ে বল তো?

—বহরমপুর মুরশিদাবাদে। এই যে কাল তুমি মুরশিদাবাদের গল্প করলে, বললে—অহীন খুব ভাল জায়গায় আছে; আমাদের দেশের ইতিহাস মুরশিদাবাদ না দেখলে জানাই হয় না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। রামেশ্বরের এবার মনে পড়িয়া গেল। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতে নাড়তে বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ! জান সুনীতি, এই—

—বল।

—এই—মানুষের সকলের চেয়ে বড় অপরাধ হ'ল মানুষকে হত্যা করার অপরাধ। সেই অপরাধ কখনও ভগবান্ ক্ষমা করেন না। মুরশিদাবাদের চারি দিকে সেই অপরাধের চিহ্ন দেখতে পাবে। আর সেই হ'ল তার পতনের কারণ।

সুনীতির চোখ সজল হইয়া উঠিল—নীরবে নতমুখে বসিয়া থাকার সুযোগে সে জল তাঁহার চোখ হইতে মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাঁহার মনে পড়িতেছিল—হতভাগ্য ননী পালকে, হতভাগ্য ধীরেন, তাঁহার ধীরেনকে; চরের দাঙ্গায় নিহত সেই অজানা অচেনা হতভাগ্যকে, হতভাগ্য নবীন ও তাহার সহচর কয় জনকে। তিনি গোপনে চোখ মুছিয়া ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য উঠিলেন, এক বার মানদাকে পাঠাইবেন সংবাদের জন্য।

রামেশ্বর ডাকিলেন—সুনীতি! কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন, রামেশ্বরের কণ্ঠস্বর বড় ম্লান, কাতরতার আভাস তাহাতে সুস্পষ্ট।

সুনীতি উদ্বিগ্ন হইয়াই ফিরিলেন—কি বলছ?

রামেশ্বর কাতর দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—দেখ! আমার—আমার শরীরটা—দেখ আমাকে একটু শুইয়ে দেবে।

সযত্নে স্বামীকে শোয়াইয়া দিয়া সুনীতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন—শরীর কি খারাপ বোধ হচ্ছে?

সে কথার জবাব না দিয়া রামেশ্বর বলিলেন—আমার গায়ে একখানা পাতলা চাদর টেনে দাও তো, আর ঐ আলোটা—ওটাকে সরিয়ে দাও। বলিতে বলিতেই তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন—ঈষৎ উত্তেজিত স্বরেই এবার তিরস্কার করিয়া বলিলেন—তুমি জান, আমার চোখে আলোর মধ্যে যন্ত্রণা হয়, তবু ওটা জালিয়ে রাখবে দপ্‌দপ্ করে।

প্রতিবাদে ফল নাই, সুনীতি তাহা ভাল করিয়াই জানেন, তিনি নীরবেই আলোটা কোণের দিকে সরাইয়া দিলেন, পাতলা একখানি চাদরে স্বামীর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার মন বার-বার বাহিরের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল। ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুনীতি ডাকিলেন—মানদা!

মানদা দিবানিদ্রা শেষ করিয়া উঠানে ঝাঁট দিতেছিল, সে বলিল—কি মা?

—এক বার একটা কাজ করবি মা ?

—বলুন।

—এক বার পাড়ায় একটু বেরিয়ে জেনে আয় না মা—সদর থেকে খবরটবর কিছু এসেছে কি না।

মানদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—এর মধ্যে কোথায় কে ফিরবে গো, আর ফিরবেই বা কেমন ক'রে ? ফিরতে সেই রাত আট ন-টা।

সে-কথা সুনীতি নিজেও জানেন, তবুও বলিলেন—ওরে, বার্ত্তা আসে বাতাসের আগে। লোক কেউ না আসুক—খবর হয়তো এসেছে, দেখ না এক বার। মায়ের কথা শুনলে তো পুণ্যিই হয়।

ঝাঁটাটা সেইখানেই ফেলিয়া দিয়া মানদা বিরক্তি-ভরেই বাহির হইয়া গেল। সুনীতি স্তব্ধ হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল—বাগ্দী-পাড়ায় যদি কেহ কাঁদিতেছে তবে সে কান্না তো ছাদের উপর হইতে শোনা যাইবে। কম্পিত পদে তিনি ছাদে উঠিয়া শূন্য দৃষ্টিতে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছু ক্ষণ পরে তিনি স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, নাঃ কেহ কাঁদে নাই! এতক্ষণে তাঁহার দৃষ্টি সজাগ হইয়া উঠিল, আপনাদের কাছারির সম্মুখের খামার-বাড়ীর দিকে তাকাইয়া তিনি দেখিলেন, একটা লোক ধানের গোলার কাছে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে। লোকটা তাঁহাদেরই গরুর মাহিন্দার; ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন—খড়ের পাকান মোটা বড় দিয়া তৈরি গোলাটার ভিতর একটা লাঠি গুঁজিয়া ছিদ্র করিয়া ধান চুরি করিতেছে। তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, উপরে চোখ তুলিলেই সে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। অতি সন্তর্পণে সেদিক হইতে সরিয়া ছাদের ওপাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। গ্রামের ভাঙা তটভূমির কোলে কালীর বালুময় বুক চৈত্রের অপরাহ্ণে উদাস হইয়া উঠিয়াছে। কালীর ওপারে চর—সর্ব্বনাশা চর! কিন্তু চরখানি আজ তাঁহার চোখ জুড়াইয়া দিল। চৈত্রের প্রারম্ভে কচি কচি বেনাঘাসের পাতা বাহির হইয়া চরটাকে যেন সবুজ মখমল দিয়া মুড়িয়া দিয়াছে। ঘন সবুজের মধ্যে সাঁওতালদের পল্লীটির গোবরে মাটিতে নিকানো খড়িমাটির আল্‌পনা দেওয়া ঘরগুলি যেন ছবির মত সুন্দর। আর পল্লীটি ইহারই মধ্যেই কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! সম্পূর্ণ একখানি গ্রাম। পল্লীর মধ্য দিয়া বেশ একটি সুন্দর পথ, সবুজের মধ্যে শুভ্র একটি আঁকা-বাঁকা রেখা, নদীর কূল হইতে ওপারের গ্রামের ঘন বন-রেখার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। সাঁওতালদের পল্লীর আশেপাশে কতকগুলি কিশোর গাছে নূতন পাতা দেখা দিয়াছে। চোখ যেন তাঁহার জুড়াইয়া গেল। তবুও তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিলেন না। এমন সুন্দর চর, এমন কোমল—এখান হইতেই সে কোমলতা তিনি যেন অনুভব করিতেছেন—তাহাকে লইয়া এমন হানাহানি কেন মানুষ করে ?

নীচে হইতে মানদা ডাকিতেছিল, সুনীতি ত্রস্ত হইয়া দোতলার বারান্দায় নামিয়া গেলেন। নীচের উঠান হইতে মানদা বলিল—এক-এক সময় আপনি ছেলেমানুষের মত অনবুঝ হয়ে পড়েন মা। বললাম—রাত আট ন-টার আগে কেউ ফিরবে না, আর না ফিরলে খবরই বা আসবে কি ক'রে। টেলিকেরাপ তো নাই মা আপনার শ্বশুরের গাঁয়ে যে তারে তারে খবর আসবে।

—সুনীতি! ঘরের ভিতর হইতে রামেশ্বর ডাকিতেছিলেন। শান্ত মনেই সুনীতি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন রামেশ্বর বালিশে ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িতের মত বসিয়া আছেন, সুনীতিকে দেখিয়া স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠেই বলিলেন—অহিনকে লিখে দাও তো, রবীন্দ্রনাথ ব'লে যে বাংলা ভাষার কবি, তাঁরই বই যেন সে নিয়ে আসে। তা হ'লে তুমি পড়বে, তাতে কাব্যের রস পুরোই পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, আর কাদম্বরীর অনুবাদ যদি থাকে। বুঝলে!

সংবাদ যথাসময়ে আসিল এবং শ্রীবাস মজুমদারের কল্যাণে উচ্চরবেই তাহা তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হইয়া গেল। সেই রাত্রেই সর্ব্বরক্ষা দেবীর স্থানে পূজা দিবার অছিলায় গ্রামের পথে পথে তাহারা ঢাক-ঢোল লইয়া বাহির হইল। ইন্দ্র রায়ের কাছারিতে রায় গম্ভীর মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার কাছারির সম্মুখে শোভাযাত্রাটি আসিবামাত্র

তিনি হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া পথের উপরেই দাঁড়াইলেন। শোভাযাত্রাটির গতি স্তব্ধ হইয়া গেল।

রায় বলিলেন—জনার্দ্দন যে আজকাল তোমাদের পক্ষে, এ আমি জানতাম মজুমদার। তার পর নব্‌নেটাকে দিলে লটকে?

মজুমদার বিনীত হাসি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে না, ছ-বছর হ'ল দ্বীপান্তর—আর দু-জনের দু-বছর ক'রে জেল।

রায় হাসিয়া বলিলেন—তবে আর করলে কি হে? এস এস এক বার ভেতরেই এস শুনি বিবরণ। কই শ্রীবাস কই? এস পাল এস।

সবিস্ময়ে মজুমদার বলিল—আজ্ঞে আজ মাপ করুন, পূজো দিতে যাচ্ছি।

—ঢাক বাজিয়ে পূজো দিতে যাচ্ছ, কিন্তু বলি কই হে? চরে বলি হয়ে গেল, আর মা সর্ব্বরক্ষার ওখানে বলি দেবে না? মায়ের জিব যে লক্ লক্ করছে, আমি যে দিব্য-চক্ষে দেখছি।

মজুমদার ও শ্রীবাসের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত বাজনদার ও অনুচরের দল সভয়ে শ্বাসরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রায় আর দাঁড়াইলেন না, তিনি আবার একবার হাসিয়া ছোট্ট একটি "আচ্ছা" বলিয়া আপনার কাছারির ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্তব্ধ শ্রীবাস ও যোগেশ মজুমদার অনুভব করিল—আলো যেন কমিয়া আসিতেছে, পিছন ফিরিয়া মজুমদার দেখিল শ্রীবাসের হাতের আলোটি ছাড়া আর একটিও আলো নাই, বাজনদার অনুচর সকলেই নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে।

ওদিকে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে সুনীতি স্তব্ধ হইয়া দাওয়ার উপর বসিয়া ছিলেন—চোখ দিয়া জল ঝরিতেছিল অন্ধকার আবরণের মধ্যে। তাঁহার সম্মুখে নাতিকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল নবীনের স্ত্রী। সেও নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। বহুক্ষণ পরে সে বলিল—সদরে সব বললে হাইকোর্টে দরখাস্ত দিতে।

সুনীতি কোন মতে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—দরখাস্ত নয় আপীল।

—তাই যদি হয় রাণীমা—তবে আপনকারা ছাড়া আমরা তো কাউকে জানি না!

—কিন্তু খরচ যে অনেক মা, সে কি তোরা জোগাড় করতে পারবি?

নবীনের স্ত্রী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুনীতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তাও পরামর্শ ক'রে দেখব বাগ্দীবউ; অহিন আসুক, আর পাঁচ-সাত দিনেই তার পরীক্ষা শেষ হবে, হলেই সে আসবে।

মতি বাগ্দিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আপনকারা তাকে কাজে জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তুক আমাকে যে আপুনি না রাখলে কেউ রাখবার নাই রাণীমা!

* * *

অহীন্দ্র বাড়ী আসিতেই সুনীতি তাহাকে ইন্দ্র রায়ের নিকট পাঠাইলেন। অসম্ভব জানিয়াও তিনি পাঠাইলেন, মনে গোপন সংকল্প ছিল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় হইলে আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার হইতেও কিছু বিক্রয় করিয়া খরচ সংস্থান করিয়া দিবেন। কিন্তু রায় নিষেধ করিলেন, বলিলেন—খরচ অনেক, শতকের মধ্যে কুলোবে না বাবা। তা ছাড়া—অকস্মাৎ তিনি হাসিয়া বলিলেন—তোমরা আজকালকার কি বলে, ইয়ং মেন, তোমরা ভাববে আমরা প্রাচীন কালের দানব সব, কিন্তু আমরা বলি কি জান ছ-বছর জেল খাটতে নবীনের মত লাঠিয়ালের কোন কষ্ট হবে না। বংশানুক্রমে ওদের এ-সব অভ্যেস আছে।

অহীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রায় হাসিয়া বলিলেন—তুমি তো চুপ ক'রে রইলে, কিন্তু অমল হ'লে একচোট বক্তৃতাই দিয়ে দিত আমাকে! এখন একজামিন কেমন দিলে বল।

এবার স্মিতমুখে অহীন্দ্র বলিল—ভালই দিয়েছি আপনার আশীর্ব্বাদে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় বলিলেন—আশীর্ব্বাদ তোমাকে বার বার করি অহীন্দ্র! মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়—

অহীন্দ্র কথাটা সমাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

রায় বলিলেন—তোমার বাবাকে এবার কেমন দেখলে বল তো?

ম্লান কণ্ঠে অহীন্দ্র বলিল—আমি তো দেখছি বেড়েছে মাথার গোলমাল।

রায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—যাও বাড়ীর ভিতরে যাও, তোমার—মানে অমলের মা এরই মধ্যে চার-পাঁচ দিন তোমার নাম করেছেন।

অহীন্দ্রকে বাড়ীর মধ্যে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী আনন্দে যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। অহীন্দ্র প্রণাম করিতেই উজ্জ্বল মুখে প্রশ্ন করিলেন—পরীক্ষা কেমন দিলে বাবা?

—ভালই দিয়েছি মামীমা আপনার আশীর্ব্বাদে।

—অমল কি লিখেছে জান? সে লিখেছে অহীনের এবার ফার্স্ট হওয়া উচিত।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—সে আমাকেও লিখেছে। সে তো এবার ছুটিতে আসছে না লিখেছে।

—না। সে এক ধিঙ্গি ছেলে হয়েছে বাবা। তাদের কলেজের ছেলেরা দল বেঁধে কোথায় বেড়াতে যাবে, তিনি সেই হুজুকে মেতেছেন। তার জন্যে উমারও এবার আসা হ'ল না।

কিন্তু অকস্মাৎ এক দিন অমল আসিয়া হাজির হইল। আষাঢ়ের প্রথমেই ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘ করিয়া বর্ষা নামিয়াছিল, সেই বর্ষা মাথায় করিয়া গভীর রাত্রে স্টেশন হইতে গরুর গাড়ী করিয়া একেবারে অহীন্দ্রদের দরজায় আসিয়া সে ডাক দিল—অহীন, অহীন!

ঝড় ও বর্ষণের সেদিন সে এক অদ্ভুত গোঙানী! সন্ধ্যার পর হইতেই এই গোঙানীটা শোনা যাইতেছে। অহীন্দ্র ঘুম ভাঙিয়া কান পাতিয়া শুনিল সত্যই কে তাহাকে ডাকিতেছে।

সে জানালা খুলিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

—আমি অমল। ভিজে মরে গেলাম, আর তুমি বেশ আরামে ঘুমোচ্ছ, বাঃ বেশ।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—তুমি এমন ভাবে?

অমল অহীন্দ্রের হাতে ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্। তুমি ফোর্থ হয়েছ।

অহীন্দ্র সর্ব্বাঙ্গসিক্ত অমলকে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় বুকে জড়াইয়া ধরিল। শব্দ শুনিয়া সুনীতি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, সমস্ত শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। চোখ দুটি যেন তাঁহার সমুদ্র—আনন্দের পূর্ণিমায় বেদনার অমাবস্যায় সমানই উথলিয়া উঠে।

অহীন্দ্র বলিল—অমলকে খেতে দাও মা।

সুনীতি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অমল বলিল—না পিসিমা, স্টেশনে এক পেট খেয়েছি, এখন যদি আবার খাওয়ান, তবে সেটা সাজা দেওয়া হবে। বরং চা এক পেয়ালা ক'রে দিন। আর অমল আলোটা আন তো—ব্যাগ থেকে কাপড় জামা বের ক'রে পাল্টে ফেলি। বাড়ী আর যাব না রাত্রে, কাল সকালে যাব।

চা করিয়া খাওয়াইয়া অহীন্দ্র ও অমলকে শোয়াইয়া আনন্দ-অধীর-চিত্তে সুনীতি স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। রামেশ্বর খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া বাহিরের দুর্য্যোগের দিকে চাহিয়াছিলেন—ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে, কিন্তু সে তীব্র আলোকের মধ্যেও নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। বিদ্যুৎ-চমকের আলোকে সুনীতি দেখিলেন গ্রামের প্রান্তে প্রান্তে বিপুল-বিস্তার একখানা সাদা চাদর দিয়া কে যেন কালীর বুক ঢাকিয়া দিয়াছে—ঝড় ও বর্ষণের মধ্যে যে অদ্ভুত গোঙানী শোনা যাইতেছে, সেটা ঝড়ের নয়, বর্ষণের নয়, কালীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন! বন্যা আসিয়াছে!

১৮

আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই এবার কালিন্দীর বুকে বান আসিয়া পড়িল।

এক দিকে রায়হাট অন্য দিকে সাঁওতালদের 'রাঙা-ঠাকুরের চর', এই উভয়ের মাঝে রাঙা জলের ফেনিল আবর্ত্ত ফুলিয়া ফুলিয়া খরস্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আবর্ত্তের মধ্যে কুটিল কল কল শব্দ শুনিয়া মনে হয় সত্য

সত্যই যেন কালী খল খল করিয়া হাসিতেছে। কালী এবার ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিয়াছে।

গত দুই বৎসর কালীর বন্যা তেমন প্রবল হয় নাই, এবার আষাঢ়ের প্রথমেই ভীষণ বন্যায় কালী ফাঁপিয়া ফুলিয়া রাক্ষসীর মত হইয়া উঠিল। বর্ষাও নামিয়াছে এবার আষাঢ়ের প্রথমেই। জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির দিনই আকাশের ভ্রাম্যমাণ মেঘপুঞ্জ ঘোরঘটা করিয়া আকাশ জুড়িয়া বসিল। বর্ষণ আরম্ভ হইল অপরাহ্ণ হইতেই। পরদিন সকাল—অর্থাৎ পয়লা আষাঢ়ের প্রাতঃকালে দেখা গেল—মাঠঘাট জলে থৈ থৈ করিতেছে। ধান চাষের 'কাড়ান' লাগিয়া গিয়াছে। ইহাতেই কিন্তু মেঘ ক্ষান্ত হইল না, তিন-চার দিন ধরিয়া প্রায় বিরামহীন বর্ষণ হইয়া গেল। কখনও প্রবল ধারায়, কখনও বা রিমিঝিমি, কখনও অতি মৃদু ফিন্‌কির মত বৃষ্টির ধারাগুলি বাতাসের বেগে কুয়াশার বিন্দুর মত ভাসিয়া যাইতেছিল। অনেক কালের লোকেও বলিল—এমন সৃষ্টিছাড়া বর্ষা তাহারা জীবনে দেখে নাই। এ-বর্ষাটির না আছে সময়জ্ঞান, না আছে মাত্রাজ্ঞান।

দেখিতে দেখিতে কালীর বুকে বন্যাও আসিয়া গেল ঝড়ো হাওয়ার মতই। এ-বেলা ও-বেলা বান বাড়িতে বাড়িতে রায়হাটের তালগাছ-প্রমাণ উঁচু ভাঙা কূলের কানায় কানায় হইয়া উঠিয়াছে; ভাঙা তটের কোলে কোলে কালীর লাল জল সূর্য্যের আলোয় রক্তাক্ত ছুরির মত ঝিলিক হানিয়া তীরের মত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে খানিকটা করিয়া রায়হাটের কূল কাটিয়া ঝুপ ঝুপ শব্দে খসিয়া পড়িতেছে।

রায়হাটের চাষীরা বলে—কালী জিব দিয়ে চাটছে, রাক্ষুসীর মত। ভাগ্যে আমাদের কাঁকরে মাটি!

সত্য কথা। রায়হাটের ভাগ্য ভাল যে, রায়হাটের বুক সাঁওতাল পরগণার মত কঠিন রাঙামাটি ও কাঁকর দিয়া গড়া! নরম পলিমাটিতে গঠিত হইলে কালীর শাণিত জিহ্বার লেহনে কোমল মাটির তটভূমি হইতে বিস্তৃত ধ্বস কোমল দেহের মাংসপিণ্ডের মত খসিয়া পড়িত। রায়হাট ইহারই মধ্যে কঙ্কালসার হইয়া উঠিত। দুই-তিন বৎসরে কালী মাত্র হাত-পাঁচেক পরিমিত কূল রায়হাটের কোলে কোলে খাইয়াছে। কিন্তু এবার এই বন্যাতেই ইহারই মধ্যে হাত-দুয়েক খাইয়া ফেলিয়াছে—এখনও পূর্ণ ক্ষুধায় খাইয়া চলিয়াছে। ওপারে চরটাও এবার প্রায় চারি পাশ বন্যায় ডুবিয়া ছোট একটি দ্বীপের মত কোন মতে জাগিয়া আছে। চরের উপরেই এখন কালীনদীর খেয়ার ওপারের ঘাট—ঘাট হইতে একটা কাঁচা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে চরের ওদিকের গ্রাম পর্য্যন্ত। সেই পথটা মাত্র একটা যোজকের মত জাগিয়া আছে।

চরের উপর শ্রীবাস পাল যে দোকানটা করিয়াছে, সেই দোকানের দাওয়ায় সাঁওতালদের মাতব্বর কয় জন বসিয়া অলস উদাস দৃষ্টিতে এই দুর্য্যোগের আকাশের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া ছিল। কমল মাঝি, সেই কাঠের মিস্ত্রী রহস্যপ্রবণ ওস্তাদও বসিয়া আছে। জন-দুয়েক নীরবে 'চুটি' টানিতেছিল। শালপাতায় জড়ানো কড়া তামাকের বিড়ি উহারা নিজেরাই তৈয়ারী করে, উহারা বলে 'চুটি'। কড়া তামাকের কটু গন্ধে জলসিক্ত ভারী বাতাস আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই-চারি জন রাহী খেয়াঘাটে যাইতেছে বা খেয়াঘাট হইতে আসিতেছে।

দোকানের তক্তাপোষের উপর শ্রীবাস নিজে একখানা খাতা খুলিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছে। ওপাশে শ্রীবাসের ছোট ছেলে একখানা চাটাই বিছাইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছে, তাহার কোলের কাছে একটা কাঠের বাক্স, এক পাশে একটা তেরাজু—ওজনের বাটখারাগুলি সেরের উপর আধ সের তাহার উপর এক পোয়া তাহার পর আধ পোয়া—এমনি ভাবে আধ ছটাকটিকে চূড়ায় রাখিয়া মন্দিরের আকারে সাজাইয়া রাখিয়াছে। সহসা এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীবাসই বলিল—কি রে সবাই যে তোরা 'থম' মেরে গেলি! কি বলছিস বল্, আমার কথার জবাব দে!

কমল নির্লিপ্তের মত উত্তর দিল—কি বুলব গো, আপুনি যে যা-তা বুলছিস গো!

শ্রীবাসের কপাল একেবারে প্রশস্ত টাকের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত কুঁচকাইয়া উঠিল—বিস্ময়ের সুরে সে বলিয়া উঠিল—আমি যা-তা বলছি! আপনার পাওনাগণ্ডা চাইলেই

সংসারে যা-তা বলাই হয় যে, তার আর তোদের দোষ কি বল্!

সাঁওতালেরা কেহ কোন উত্তর দিল না। শ্রীবাসই আবার বলিল—বাকী তো এক বছরের নয়, বাকী ধর গা যেঁয়ে—তোর তিন বছরের। যে বছর দাঙ্গা হ'ল, সেই বছর থেকে তোরা ধান নিতে লেগেছিস। দেখ কেনে হিসেব করে, দাঙ্গা হ'ল, মামলা হ'ল, মামলাই চলেছে দু-বছর, তার পর নবীনদের ধর গা যেঁয়ে—এক বছর ক'রে জেল খাটা হয়ে গেল। বটে কি না?

কমল সে কথা অস্বীকার করিল না, বলিল—হুঁ সি তো বেটে গো—ধান তো তিনটে হ'ল, ইবার তুর চারটে হবে।

—তবে?

মাঝি এ "তবে"র উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। আবার চুপ করিয়া ভাবিতে বসিল। সাঁওতালদের সহিত শ্রীবাসের একটা গোল বাধিয়া উঠিয়াছে। দাঙ্গার বৎসর হইতেই শ্রীবাস সাঁওতালদের ঋণ দাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ষার সময় যখন তাহারা জমিতে চাষের কাজে লিপ্ত থাকে তখন তাহাদের দিনমজুরির উপার্জ্জন থাকে না; সেই সময় তাহারা স্থানীয় ধানের মহাজনের নিকট হইতে সুদে ধান ধার লইয়া থাকে, এবং মাঘ-ফাল্গুনে ধান মাড়াই করিয়া সুদে-আসলে ধার শোধ দিয়া আসে। এবার অকস্মাৎ এই বর্ষা পড়িয়া যাওয়ায় ইহারই মধ্যে সাঁওতালদের অনটন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অন্য দিক্ দিয়া চাষও আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা শ্রীবাসের কাছে ধান ধার করিতে আসিয়াছে। কিন্তু শ্রীবাস বলিতেছে তাহাদের পূর্ব্বের ধারই এখনও শোধ হয় নাই। সেই ধারের একটা ব্যবস্থা না করিয়া দিলে আবার নূতন ঋণ সে কেমন করিয়া দিবে! কিন্তু কথাটা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিতেছে না, ঋণ স্বীকারও করিতে পারিতেছে না, অস্বীকারও করিতে পারিতেছে না। তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতেছে।

কতকগুলি দশ-বারো বছরের উলঙ্গ ছেলে কলরব করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল—মারাং গাডো, মারাং গাডো। খিক্‌ড়ী! অর্থাৎ এই বড়-বড় ইঁদুর, খেঁকশিয়াল! কথা বলিতে বলিতে উত্তেজনায় আনন্দে তাহাদের চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে; কাল কাল মূর্ত্তিগুলির বিস্ফারিত চোখের সাদা ক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট কাল তারাগুলি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে!

কাঠের ওস্তাদ সর্ব্বাগ্রে ব্যগ্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে বলিল—কুথাকে? ওকারে?

—বানের জলের ধারে গো! ভুঁয়ের ভিতর থেকে গুল্‌গুল্ করে বার হ'ছে গো!

দুই-তিন জনে কলরব করিয়া উঠিল, গোডা ভুগ্যারে-কো চোঁ-চোঁয়তে! অর্থাৎ গর্ত্তের ভিতর সব চোঁ-চোঁ করছে!

এইবার সকলেই আপনাদের ভাষায় কমলের সহিত কি বলা-কওয়া করিয়া উঠিয়া পড়িল। শ্রীবাস রুষ্ট হইয়া বলিল—লাফিয়ে উঠলি যে ইঁদুরের নাম শুনে? আমার ধারের কি করবি ক'রে যা!

ওস্তাদ বলিল—আমরা কি বুলব গো? উই মোড়ল বুলবে আমাদের। আর যাব না তো খাব কি আমরা? তু তো ধান দিবি না বুলছিস! ঘরে চাল নাই—ছেলে-পিলে সব খাবে কি? ওইগুলা সব পুড়ায়ে খাব।

পাড়ার ভিতর হইতে তখন সারি বাঁধিয়া জোয়ান ছেলে ও তরুণীর দল বর্ষণ মাথায় করিয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছে ইন্দুর খেঁকশিয়ালের সন্ধানে। ছেলের দল আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল, সমস্বরেই বলিয়া উঠিল—দেলা-দেলা! চল চল!

বুড়ার দলও ছেলের পিছনে পিছনে ছেলেদের মতই নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।

শ্রীবাসও অকস্মাৎ লোলুপ হইয়া উঠিল, সে কমলকে বলিল—মোড়ল বল্ কেনে ওদের, খরগোস পেলে আমাকে যেন একটা দেয়।

আসল ব্যাপারটা খুবই সোজা, সাঁওতালেরা সেটা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু আসল সত্যের উপরে জাল বুনিয়া শ্রীবাস যে আবরণ রচনা করিয়াছে সেটা খুবই জটিল—তাহার জট ছাড়াইতে উহারা কিছুতেই পারিতেছে না। শ্রীবাস চায় সাঁওতালদের প্রাণান্তকর পরিশ্রমে গড়িয়া তোলা জমিগুলি; সে-কথা তাহারা মনে মনে বেশ

অনুভব করিতেছে, কিন্তু ঋণ ও সুদের হিসাবের আদি-অন্ত তাহারা কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই তিন বৎসরের মধ্যেই তাহাদের জমিগুলি প্রথম শ্রেণীর জমিতে তাহারা পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। জমির ক্ষেত্র সুসমতল করিয়াছে, চারি দিকের আইল সুগঠিত করিয়া কালীর পলিমাটিতে গড়া জমিকে চষিয়া খুঁড়িয়া সার দিয়া তাহাকে স্বর্ণপ্রসবিনী করিয়া তুলিয়াছে। চরের প্রান্তভাগে যে-জমিটা চক্রবর্ত্তী-বাড়ী খাসে রাখিয়া তাহাদের ভাগে বিলি করিয়াছিল, সেগুলিকে পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ জমির আকার দিয়া গড়িয়া ফেলিয়াছে। শ্রীবাসের জমিও তাহারাই ভাগে করিতেছে, সে জমিও প্রায় তৈয়ারী হইয়া আসিল। বে-বন্দোবস্তী বাকী চরটার জঙ্গল হইতে তাহারা জ্বালানীর জন্য আগাছা ও ঘর ছাওয়াইবার উদ্দেশ্যে বেনা ঘাস কাটিয়া কাটিয়া প্রায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের নিজেদের পল্লীর পাশে পাশে আম কাঁঠাল মহুয়া প্রভৃতির চারাগুলি মানুষেরও মাথা ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, সজিনার ডালের কলমগুলিতে তো গত বৎসর হইতেই ফুল দেখা দিয়াছে। বাঁশের ঝাড়গুলিতে চার-পাঁচটি করিয়া বাঁশ গজাইয়াছে—শ্রীবাস হিসাব করিয়াছে এক-একটি বাঁশ হইতে যদি তিনটি করিয়াও নূতন বাঁশ গজায়, তবে এই বর্ষাতেই প্রত্যেক ঝাড়ে পনর-কুড়িটি করিয়া নূতন বাঁশ হইবে।

জায়গাটিও আর পূর্ব্বের মত দুর্গম নয়, শ্রীবাসের দোকানের সম্মুখ দিয়া যে-রাস্তাটা গাড়ীর দাগে দাগে চিহ্নিত হইয়া ছিল, সেটা এখন সুগঠিত পরিচ্ছন্ন রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। রাস্তাটা সোজা সাঁওতাল-পল্লীর ভিতর দিয়া নদীর বুকে যেখানে নামিয়াছে সেইখানেই এখন খেয়ার নৌকা ভিড়িয়া থাকে, এইটাই এখন এপারের খেয়াঘাট। খেয়ার যাত্রীদের দল এখন এই দিকেই যায় আসে। গাড়ীগুলিও এই পথে চলে। রাস্তার এ প্রান্তটা সেই গাড়ীর চাকার দাগে দাগে একেবারে এপারের চক্-আফজলপুরের পাকা সড়কের সঙ্গে গিয়া মিলিয়াছে। ঐ পাকা সড়কে যাইতে যাইতে মধ্যে মধ্যে মুরশিদাবাদের কলাই, লঙ্কা প্রভৃতির ব্যাপারীদের গাড়ী এখানে আসিতে সুরু করিয়াছে। তাহারা কলাই লঙ্কা বিক্রী করে ধানের বিনিময়ে। 'কিন্তু এখানে কলাই, লঙ্কা বেচিবার সুবিধা তাহারা করিতে পারে না, তবে সাঁওতালদের অল্প চড়া দর দিয়া ধান কিছু কিছু কিনিয়া লইয়া যায়। গরু ছাগল কিনিবার জন্য মুসলমান পাইকারদের তো আসাযাওয়ার বিরাম নাই। দুই-চার ঘর গৃহস্থেরও এপারে আসিয়া বাস করিবার সংকল্পের কথা শ্রীবাসের কানে আসিতেছে। বে-বন্দোবস্তী ও-দিকের ঐ চরটার উপর তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ঘাস ও কাঠ কাটিয়া সাঁওতালরাই ও-দিকটাকে এমন চোখ পড়িবার মত করিয়া তুলিল। আবার ইহাদের গরুর পায়ে পায়ে ঘাস ও কাঠবাহী গাড়ীর চলাচলে ঐ জঙ্গলের মধ্যেও একটা পথ গড়িয়া উঠিতে আর দেরি নাই। নবীন ও রংলালদের সহিত দাঙ্গা করার জন্য শ্রীবাস এখন মনে মনে আপশোষ করে। এত টাকা খরচ করিয়া এক শত বিঘা জমি লইয়া তাহার আর কি লাভ হইয়াছে! লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই হইয়াছে বেশী। আজ আর চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে গিয়া জমি বন্দোবস্ত লইবার পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মামলার খরচে তাহার সঞ্চয় সমস্ত ব্যয়িত হইয়া অবশেষে মজুমদারের ঋণ আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। মামলা না করিয়া বাকী চরটা সে যদি বন্দোবস্ত লইত—তবে সে কেমন হইত? আর গোপনে দখল করিবারও উপায় নাই—ছোট রায়, ইন্দ্র রায়ের শ্যেনদৃষ্টি এখানে নিবদ্ধ হইয়া আছে। ইন্দ্র রায়ই এখন চক্রবর্ত্তীদের বিষয় বন্দোবস্তের কর্ত্তা! সে দৃষ্টি, সে নখরের আঘাতের সম্মুখীন হইতে শ্রীবাসের সাহস নাই। সে দিনের সেই সর্ব্বরক্ষাতলার বলির কথা মনে করিয়া বুক এখনও হিম হইয়া যায়। এখন একমাত্র পথ আছে, এই সাঁওতালদের উঠাইয়া, ঐদিকে ঠেলিয়া দিয়া, এদিকটা যদি কোনরূপে গ্রাস করিতে পারা যায়। জমি-বাগান বাঁশ লইয়া এদিকটা পরিমাণে কম হইলেও এটুকু নিখাদ সোনা!

ভাবিয়া-চিন্তিয়া শ্রীবাস জাল রচনা সুরু করিয়াছে। মাকড়সা যেমন জাল রচনা করে, তেমনি ভাবেই হিসাবের খাতায় কলমের ডগায় কালির সূত্র টানিয়া টানিয়া যোগ দিয়া গুণ দিয়া জালখানিকে সম্পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে বলিয়াছে—আমার খাতায় টিপছাপ

দিয়ে বকেয়ার একটা আধার ক'রে নে। তার পর আবার ধান লে কেনে!

একা বসিয়া অনেক ভাবিয়া কমল বলিল—হা পাল মশায়, ইটো কি ক'রে হ'ল গো? আমরা বছর বছর ধান দিলম যি! তুর ছেলে লিলে!

হাসিয়া পাল বলিল—দিস নাই এমন কথা বলেছি আমি?

—তবে? বাকীটো তবে কি ক'রে বুলছিস গো?

—এই দেখ। বোঙাজাতকে কি ক'রে সমজাই বল দেখি। আচ্ছা শোন, ভাল ক'রে বুঝে দেখ! যে ধানটো তোরা নিলি—এই তোর হিসেবই বুলছি আমি। এই দেখ পহিল সালে তু নিলি তিন বিশ ধান। তিন বিশের বাড়ী, মানে সুদ ধর গা বেঁয়ে দেড় বিশ। হ'ল গা বেঁয়ে সাড়ে চার বিশ। বটে তো?

কমল হিসাব-নিকাশের মধ্যে আর ভাল ঠাওর পাইল না—বলিল—হুঁ, সি তো হ'ল।

পাল আবার আরম্ভ করিল—তার পর তু দিলি সে বছর তিন বিশ আট আড়ি পাচ সের। বাকী থাকল বাইশ আড়ি পাচ সের। মানে এক বিশ দু আড়ি পাচ সের। তার ফিরে বছরে তুই নিয়েছিস তিন বিশ চৌদ্দ আড়ি। আর গত বছরের বাকী এক বিশ দু আড়ি পাঁচ সের. দুটো ধরে হ'ল চার বিশ ছ-আড়ি পাচ সের। তার সুদ ধর দু-বিশ তিন আড়ি আড়াই সের।

কমল দিশা হারাইয়া বলিল—হুঁ।

পাল হাসিয়া বলিল—তবে? তবে যে বলছিস, কি ক'রে হ'ল গো! ন্যাকা সাজছিস!

কমল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শ্রীবাস ছেলেকে বলিল—সাজ্‌ তো বাবা কড়া দেখে এক কল্কে তামুক। বাদলে বাতাসে শীত ধরে গেল। কি বলে রে মাঝি—শীত শীত করছে—তোদের কথায় কি বলে?

কমল কোন্ উত্তর দিল না, পালের ছেলে তামাক সাজিতে সাজিতে হাসিয়া বলিল—রাবাং হো রাবাং কানা। নয় রে মাঝি?

পাল কৃত্রিম আনন্দিত-বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলিল—তুই শিখেছিস্ না কি রে? শিখিস্, শিখিস্। বুঝলি মোড়ল—ওকে শিখিয়ে দিস তোদের ভাষা।

কিন্তু কমল ইহাতে খুশী হইল না। সে গভীর চিন্তায় নীরব হইয়াই বসিয়া রহিল। পালের ছেলে তামাক সাজিয়া একটু আড়ালে নিজে কয়েক টান টানিয়া হুঁকাটি বাপের হাতে দিল, পাল দেয়ালে ঠেস দিয়া ফড়াৎ ফড়াৎ শব্দে হুঁকায় টান দিতে আরম্ভ করিল। দূরে চরের প্রান্তভাগে বন্যার কিনারায় কিনারায় শিকারের উত্তেজনায় আত্মহারা সাঁওতালদের আনন্দোন্মত্ত কোলাহল উঠিতেছে। সে কোলাহলের মধ্যে নদীর ডাকও ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আকাশে সীসার আস্তরণের মত দিগন্ত-বিস্তৃত মেঘের কোলে কোলে ছিন্ন ছিন্ন খণ্ড কালো মেঘ অতিকায় পাখীর মত দল বাঁধিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। শ্রীবাস বাহ্য উদাসীনতার আবরণের মধ্যে থাকিয়া উৎকণ্ঠিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কমলের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। কমলকে আপ্যায়িত করিবার নানা কৌশল একটার পর একটা আবিষ্কার করিয়া আবার সেটাকে নাকচ করিতেছিল। পাছে কমল তাহার দুর্ব্বলতাটা ধরিয়া ফেলে। সহসা সে একটা কৌশল আবিষ্কার করিয়া খুশী হইয়া উঠিল এবং প্রচ্ছন্ন ক্রোধে ছেলেকে ধমকাইয়া উঠিল—বলি গণেশ তোর আক্কেলটা কেমন বল দেখি? মোড়লমাঝি ব'সে রয়েছে কখন থেকে—বর্ষাবাদলার দিন, একটুকু তামাকের পাতা একটু চুন তো দিতে হয়! সাঁওতাল হ'লেও মোড়ল হ'ল মান্যের লোক!

গণেশ ব্যস্ত হইয়া তামাকের পাতা ও একটা কাঠের চামচে করিয়া চুন আনিয়া মোড়লের কাছে নামাইয়া দিল। মোড়ল চুন ও তামাক-পাতা লইয়া খইনি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল। এতক্ষণে সে যেন খানিকটা চেতনা ফিরিয়া পাইল, বলিল—ধান যখন নিলম আপোনার ঠেঞে, তখন সিটি দিবো না কি ক'রে বুলব গো মোড়ল

পাল হাসিয়া বলিল—এই! মাঝি, সব বেচে মানুষ খায়, কিন্তু ধরম বেচে খেতে নাই! তোরা দিবি না এ ভাবনা আমরা এক দিনও করি নাই। তোর সঙ্গে কারবার করছি এত দিন, তোকে আমি খুব জানি।

তবে কি জানিস—এই মামলা-মোকদ্দমায় পড়ে আমি নিজে কিছু দেখতে পারলাম না। ছেলেগুলা সব বোকা—ছেলেমানুষ তো! বছর বছর হিসেব ক'রে যদি ব'লে দিত যে মাঝি, এই-এই তোদের সব বাকী থাকল—তবে তো এই গোলটি হ'ত না! আমি এবার খাতা খুলে দেখে একবারে অবাক!

কমল খানিকটা খইনি ঠোঁটের ফাঁকে পুরিয়া বলিল—হুঁ—আমরাও তো তাই হলম গো!

শ্রীবাস ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল—তার জন্যে ছেলেগুলোকে আমি মারতে শুধু বাকী রেখেছি। আবার ক্ষণিক নীরবতার পর সে বলিল—এবার থেকে সূ—ক্ষ্ম হিসেব ক'রে আমি নিজে ব'সে তোদের ঝঞ্ঝাট মেরে দোব। কিছু ভাবিস না তোরা।

কমল বলিল—হুঁ, সেইটি তু ক'রে দিবি মোড়ল।

—নিশ্চয়! এখন এক কাজ কর, তোরা বাপু খাতাতে যে বাকী আছে সেই বাকীর হিসেবে একটি ক'রে টিপছাপ দে। আর কার কি ধান চাই বল, আমি জুড়ে দেখি কত ধান লাগবে মোটমাট। তার পর লে কেনে ধান কালই।

কমল টিপছাপের নামে আবার চুপ করিয়া গেল। টিপসহিকে উহাদের বড় ভয়। ঐ অজানা কালো কালো দাগের মধ্যে যেন নিয়তির দুর্ব্বার শক্তি তাহারা অনুভব করে। খত শোধ করিতে না পারিলে শুধু তো এখানেই শাস্তি হইয়া শেষ হইবে না, মরণের পর 'ভগোয়ানে'র নিকট সাজা লইতে হইবে যে! আরও, খত কেমন করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করে সে তো সে এই বয়সে কত বার দেখিয়াছে! কালো দাগগুলো যেন কালো ঘোড়ার মত ছুটিয়া চলে!

শ্রীবাস বলিল—তোদের তো আবার পূজো-আচ্চা আছে, ধান পোঁতার আগে সেই সব পূজোটুজো না ক'রে তো চাষে লাগতে পাবি না!

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কমল বলিল—হুঁ।

—কি পরব বলে রে একে—নাম কি পরবের?

—নাম বেটে 'বাতুলী' পরব। আবার 'কাদ্‌লেতা' পরবও বুলছে। 'রোওয়া' পরবও বুলে। যারা যেমন মন করে বুলে।

—পরবে কি হবে তুদের?

কমল এবার খানিকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল—'জাহর সারনে'—আমাদের দেবতার থানে গো—পূজো হবে, 'এড়িয়াসিম'—আমাদের মোরগাকে বলে 'এড়িয়াসিম'—ঐ মোরগা কাটা হবে, পচুই মদ দিব দেবতাকে, শাক দিব দু-তিন রকম। তার পরে তুর রাঁধা-বাড়া হবে উই দেবতা-থানে, লিয়ে খেয়ে দেয়ে সব নাচগান করব!

—তবে তো অনেক ব্যাপার রে! তা আমাদিকে নেমন্তন্ন করবি না?

কমল বড় বড় দাঁত মেলিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল, কৌতুক করিয়া বলিল—আপুনি আমাদের হাঁড়ি মদ খাবি মোড়ল?

শ্রীবাস বলিল—তা আমাকে না হয় দোকান থেকে 'পাকি মদ' এনে দিবি।

কমল পশ্চাৎপদ হইল না, বলিল—হুঁ তা দিবো!

হা-হা করিয়া হাসিয়া শ্রীবাস বলিল—না না, ও আমি তোকে ঠাট্টা করছিলাম।

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল—উঁহু সি হবে না। আমি যখুন নেওতা দিলাম, তখুন তুকে উটি লিতে হবে।

—বেশ তা দিস। সে হবে কবে তোদের?

—জল তো হয়েই গেল গো। এই বানটি কমলেই পূজো করব। তার পুরে চাষে লেগে যাব। তা আপুনি ধান দিবি তবে তো হবে!

—বেশ। কাল সবাইকে নিয়ে আয় এসে টিপছাপ দিয়ে দে, পরশু নিয়ে নে ধান। ধান তো আমার এই খানেই আছে।

কমল ম্লান মুখে বলিল—তাই দিবে সব কাল।

গণেশ বলিল—মোড়ল, দোকান নিতে সব সকালে সকালে পাঠিয়ে দিস একটু। আজ তো আবার তোদের অনেক কিছু চাই রে! ইঁদুর খরগোস খেঁকশিয়াল মারলি, মসলাপাতি চাই তো!

কমল হাসিয়া বলিল—হুঁ। বলিতে বলিতে অকস্মাৎ যেন একটা অতিপ্রয়োজনীয় কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল, বলিল—'ডিবরী সুহুম' এনেছিস গো? করঞ্জা সুহুম জ্বলছে না ভাল বাতাসে!

—হাঁ, এক টিন কেরোসিন তেল এনেছি, ব'লে দিস সব—ডিবিয়াও এনেছি। তোর নাতনীর হাতে একটা লণ্ঠন দেখছিলাম মাঝি, ওটা কোথা কিনলি রে?

কমল বলিল—উ উয়াকে রাঙাবাবুর মা দিয়েছে। ভাগে জমি করছে জামাইটো, মেয়েটো উনিদের পাটকাম করছে কি না।

শ্রীবাসের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিল—আচ্ছা তোর নাতজামাই তো কই ধান নেয় না মোড়ল? আবার তোর সঙ্গে পৃথকও তো বটে!

কমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বিয়া দিলেই বেটী পর হয়ে যায় গো! আর জামাইটো হ'ল পরের ছেলে। আমরা বুলছি কি জানিস—এটাঃ হপন বীর সিম বাকো আপনারোয়াঃ—মানে বুলছে জামাইটো পরের ছেলে বনের মুরগীর মত উ পোষ মানে না।

ওদিক হইতে কলরব করিতে করিতে শিকার সমাধা করিয়া সাঁওতালের দল ফিরিতেছিল। পুরুষ নারী ছেলে বাদ বড় কেহ ছিল না। অধিকাংশের হাতেই লাঠি, জনকয়েকের কাঁধে ধনুক, হাতে তীর, খালি হাত যাহাদের তাহারাই রাশীকৃত মরা ইঁদুর, গোটাকয়েক খেঁকশিয়াল, গোটা-চারেক বুনো খরগোস লেজে ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া চলিয়াছে। সেই দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটির হাতে ছিল দুইটা খরগোস, সে অভ্যাসমত দর্পিত উচ্ছল ভঙ্গিতে কমলকে আসিয়া আপনাদের ভাষায় বলিল—এ দুটা রাঙাবাবুকে দিতে হইবে। তুমি বল ইহাদের, ইহারা বলিতেছে দিবে না। রাঙাবাবু ওপারের ঘাটে বসিয়া আছে—আমি তাহাকে দেখিয়াছি।

দলের তরুণীগুলি সকলেই সমস্বরে সায় দিয়া উঠিল—হুঁ হুঁ! হুই নদীর উ-পারে, ব'সে রইছে। আমরা দেখলম। আমাদের রাঙাবাবু!

শ্রীবাসের খরগোস-মাংসের উপর প্রলোভন ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল—হাঁ মাঝি, আমি যে বললাম একটা খরগোসের জন্তে,—আমাকে একটা দে!

কমলের নাতনীই শ্রীবাসকে জবাব দিল, কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল—কেনে তুকে দিব কেনে? তুকে দিব তো আমরা কি খাব?

শ্রীবাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—এ তো আচ্ছা মেয়ে রে বাবা? ওই তো তোরা দিতে যাচ্ছিস রাঙাবাবুকে? তা আমাকে দিবি না কেন?

কমলের নাতনী পরম বিস্ময়ের সহিত একটা আঙুল শ্রীবাসের দিকে দেখাইয়া আপনাদের ভাষায় বলিয়া উঠিল—এ লোকটা পাগলা না ক্যাপা?

মেয়ের দল খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শ্রীবাসের ছেলে গণেশ সাঁওতালী ভাষা বুঝিতে পারে, তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, সে কঠিন স্বরেই বলিয়া উঠিল—এই সারী, যা-তা বলিস না বলছি!

কমলের ঐ নাতনীর নাম সারী; শুক-সারীর সারী নয়—উহাদের ভাষায় সারী অর্থে উত্তম, ভাল। সারী বলিল—কেন বুলবে না? ই কথা উ বুলছে কেনে? রাঙাবাবুর সাথে সাথ করছে কেনে? উ আমাদের জমিদার, আমাদিগে জমি দিলে, আমাদিগে ধান দেয়, তুদের মত সুদ লেয় না!

সারীর কথার ভঙ্গিতে কমলও এবার লজ্জিত হইল, সে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বলিল—উনিকে সবাই খুব ভালবাসে মোড়ল—উনি আমাদের রাঙাঠাকুরের নাতি!

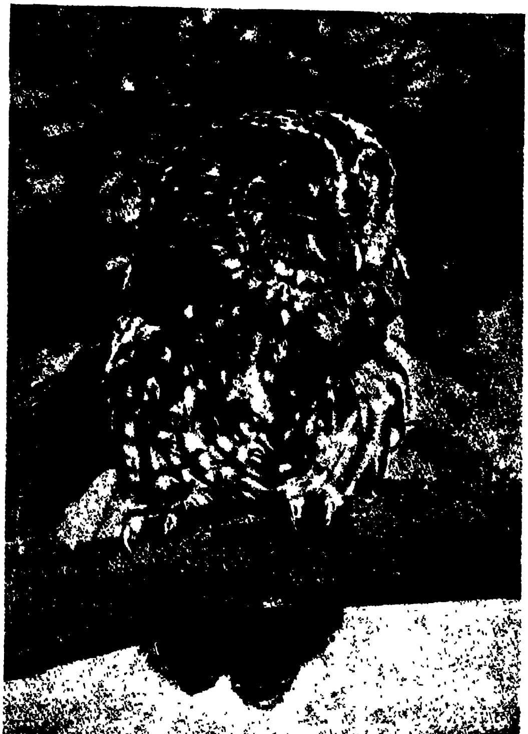
মেয়েগুলি মুগ্ধবিস্ময়ের সুরে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল আপনাদের ভাষায়—তেমনি আগুনের মত রঙ!—আঃ-য়-গো—! বিস্ময়সূচক 'আয় গো' শব্দটির দীর্ঘায়িত ধ্বনির সুর সমবেত কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনির মতই বাজিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

জীবজন্তুর বিশ্রাম

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জীব মাত্রেরই প্রাণধারণের জন্য কোন-না-কোন রূপ পরিশ্রম করিতে হয়। পরিশ্রমের ফলে শক্তির অপচয়জনিত অবসাদ ঘটে। এই অবসাদ দূর করিবার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন। কেবল জীবজগৎই নয়, জড়জগতেও এ-কথা সমভাবে প্রযোজ্য। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফলে ইহা সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৌনঃপুনিক কার্য্যের ফলে জড়পদার্থও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। একখানি ক্ষুরের ফলা ক্রমাগত ব্যবহার করিলে তাহার অবসাদ উপস্থিত হয়; ফলে তাহার তীক্ষ্ণতা হ্রাস পায়। কিন্তু কয়েক দিন ফেলিয়া রাখিলেই তাহার ক্লান্তি দূর হইয়া যায় এবং পুনরায় তীক্ষ্ণতা ফিরিয়া আসে। জড়জগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া ক্লান্তি অপনোদনের নিমিত্ত বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে কে কি ভাবে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা যেমন শুইয়া বসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করি এবং চিৎ, কাত বা উবুড় হইয়া শুইয়া নিদ্রা যাই, আকৃতিপ্রকৃতির পার্থক্যানুযায়ী বিভিন্ন জীব তেমনই বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়া থাকে। আদি জীব 'এমিবা' সাধারণ আলোকে দেহকে বিভিন্ন আকারে পরিবর্তিত করিয়া আহার সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে।



পেঁচার ঘুম



এক পায়ে দাঁড়াইয়া পাখীর বিশ্রাম



সিংহ ও সিংহীর বিশ্রাম

তীব্র আলো অসহ্য বলিয়া তাহার পথ হইতে কেঁচোর মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া যায়। আহারান্তে বিশ্রামের সময় অন্ধকারে একটু শ্লেষ্মাপিণ্ডের ন্যায় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। শীম-বীজের আকৃতিবিশিষ্ট 'প্রোটোজোয়া'রা জলের মধ্যে ভীষণ বেগে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়; কিন্তু অন্ধকারে ইহারা গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করিয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। পুনরায় আলো না-দেখা পর্য্যন্ত এরূপ বিশ্রাম চলিতে থাকে। গ্রামোফোনের হর্নের মত বিরাট্ মুখ হাঁ করিয়া স্টেন্টর সারাদিন আহারে ব্যাপৃত থাকে। অন্ধকার হইবামাত্রই শরীর গুটাইয়া ছোট্ট একটু লবঙ্গের আকার ধারণ করে এবং জলজ লতাপাতায় আটকাইয়া সারারাত বিশ্রাম করিয়া কাটায়। 'ভর্টিসেলা,' 'রটিফেরা' প্রভৃতি যাবতীয় আণুবীক্ষণিক প্রাণীরাই রাত্রির অন্ধকারে শরীর গুটাইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে।

কীটপতঙ্গের মধ্যে জোঁক, কেঁচোও শরীর গুটাইয়া বিশ্রাম করে। কেন্নোও শরীরটাকে অল্প সঙ্কুচিত করিয়া অথবা কুণ্ডলী পাকাইয়া একাদিক্রমে কিছু দিন বিশ্রাম করিয়া থাকে। কতকগুলি প্রাণীর মধ্যে আবার বিশ্রাম বা নিদ্রার অদ্ভুত রীতি দেখা যায়। ইহারা প্রত্যহ কার্য্যান্তে বিশ্রাম তো করেই, তা ছাড়া শীতকালে বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক সময় বিশ্রাম করিয়া কাটাইয়া দেয়।

কাঁকড়া-বিছা রাত্রিবেলায় আহারান্বেষণে বহির্গত হয় কিন্তু দিনের বেলায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করে, আবার সারা শীতকালটা নিশ্চেষ্টভাবে বিশ্রাম করিয়া কাটায়। কোন কোন জাতের মাকড়সা দিনের বেলায় এবং কোন কোন মাকড়সা রাত্রিবেলায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করে। কিন্তু শীতের সময় প্রায় সকলেই ইহারা হাত-পা গুটাইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকে। গরমের সময় সাপ রাতদিন প্রায় সমভাবেই বিচরণ করে; কিন্তু শীত পড়িলেই কেহ কুণ্ডলী পাকাইয়া, কেহ বা গর্ত্তে কিংবা ফাটলে একাদিক্রমে অনেক দিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করে।

শামুক, গুগ্‌লি প্রভৃতি প্রাণীরা অনেকেই সারা বর্ষাকাল ক্রিয়াশীল থাকে। শীতের প্রারম্ভেই খোলার মুখ বন্ধ করিয়া পুনরায় বর্ষাসমাগম পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। কোন কোন জাতীয় কচ্ছপও একাদিক্রমে ছয়-সাত মাসকাল মৃতের মত ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়। বর্ষান্তে ইহারা সকলেই খোলার মুখ বন্ধ করিয়া পাঁকের নীচে চলিয়া যায়। মাটি শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলেও তাহার সহিত মিলিয়া পড়িয়া থাকে। পুনরায় বর্ষাসমাগমে বর্ষণ সুরু হইলেই মাটি ভিজিয়া নরম হয় এবং সহজেই মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসে। বর্ষাকালে ব্যাঙেরাও কর্ম্মশেষে বিশ্রাম গ্রহণ করে;



বাঘ সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছে

কিন্তু শীত আরম্ভ হইলেই গর্ত্তে আশ্রয় লয় এবং সারা শীতকালটা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়।

আমরা যেগুলিকে পোকা বলি, সেগুলি কোন-না-কোন কীটপতঙ্গের বাচ্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহারা সাধারণতঃ কীড়া নামে পরিচিত। পোকা বা কীড়ার একমাত্র কাজ—রাতদিন খাওয়া। দুই-এক জাতীয় পোকা ছাড়া অনেকেরই এই অবস্থায় বিশ্রামের ফুরসৎ নাই। কিছু দিন অনবরত খাওয়ার পর যখন শরীর পরিপুষ্ট হইয়া পুত্তলী বা গুটির আকার ধারণ করে, তখনই হয় তাহাদের পূর্ণ বিশ্রাম। পুত্তলী অবস্থায় তাহারা দিনের পর দিন নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। পুত্তলী হইতে পতঙ্গ রূপ ধারণ করিয়া সাধারণ জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। খাদ্য আহরণের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করে এবং সারারাত্রি বিশ্রাম করিয়া কাটায়। প্রজাপতির এরূপ অবস্থা ঘটে। সাধারণ প্রজাপতিরা দিনের বেলায় ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে এবং রাত্রিবেলায় পিঠের উপর দুই পার্শ্বের ডানা মুড়িয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু মথ-জাতীয় প্রজাপতিরা রাত্রিবেলায় আহারান্বেষণে বহির্গত হয় এবং দিনের বেলায় ডানা মেলিয়া বিশ্রাম করে। উইচিংড়ি, আরশুলা, ঘুরঘুরে পোকাদের ঠিক নিদ্রার মত কোন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। দিনের বেলায় ইহারা দেওয়ালের ফাটলে, গর্ত্তে অথবা কোন কিছুর আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বদাই যেন সজাগ।

জল-মাছি, জল-বিচ্ছু ও জল-কাঠি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জল-পোকারা সারাদিন শিকারান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিয়া অন্ধকার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জলজ লতাপাতার মধ্যে আশ্রয় লয় এবং নীচের দিকে মাথা রাখিয়া হাত-পা ছড়াইয়া মৃতের মত অবস্থান করে।

ফড়িঙেরা সারাদিন শিকার করিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যা-সমাগমের পূর্ব্বেই লতাপাতা আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া থাকে। ডানাগুলি সর্ব্বদাই প্রসারিত করিয়া রাখে। কাঠি-ফড়িং কিন্তু বিশ্রাম করিবার সময় ডানা মুড়িয়া



ট্র্যাপ-ডোর মাকড়সা বিশ্রামের আশ্রয় গর্ত্ত হইতে বাহির হইতেছে



চিড়িয়াখানার মৎস্যাধারে মাছ নিস্পন্দ হইয়া বিশ্রাম করিতেছে

অবস্থান করে। পিপীলিকার কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় তাহারা বুঝি মোটেই বিশ্রাম করে না। কিন্তু সে-কথা ঠিক নয়। তাহারা প্রয়োজনমত বিশ্রাম করিয়া থাকে। যদিও বাসানির্ম্মাণ, খাদ্যসংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে তাহাদিগকে রাতদিনই পরিশ্রম করিতে দেখা যায়, তথাপি দলবদ্ধ ভাবে বাস করে বলিয়া সংখ্যাধিক্য হেতু তাহাদের মধ্যে বদলি প্রথার প্রচলন আছে। কোন একটি শ্রমিক-পিপীলিকা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে সে গর্ত্তের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে এবং আহারাদি সারিয়া চুপ করিয়া এক স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করে। অন্য একটি পিপীলিকা গিয়া তাহার শূন্য স্থান পূরণ করে। কুমোরে পোকারাও খাদ্যসংগ্রহ এবং বাসা নির্ম্মাণের জন্য সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। সন্ধ্যাসমাগমে তাহারা বৃক্ষের ডালে বা কোন কিছুর আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সারারাত নিশ্চলভাবে থাকিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে। কোন কোন জাতের কুমোরে পোকা আবার ঘনসন্নিবিষ্ট ঘাসবনে ঘাসের ডাঁটা কামড়াইয়া ধরিয়া শরীরটাকে পাশের দিকে প্রসারিত করিয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান করে।

অনেকের ধারণা আছে, মাছেরা নিদ্রা যায় না। মাছেরা চোখ বুজিতে পারে না বলিয়া এরূপ ধারণা হইতে পারে। কিন্তু চোখ বুজিয়া নিদ্রা না গেলেও তাহারা সকলেই বিশ্রামপ্রয়াসী। অধিকাংশ মাছই দিনের বেলায় আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রিবেলায় তাহারা ঘাসপাতার আড়ালে অথবা অপর কোন সুবিধামত স্থানে নিশ্চলভাবে থাকিয়া বিশ্রাম করে। কোন কোন মাছ আবার দিনের বেলায় বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া রাত্রি-বেলায় শিকার অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়।

টিকটিকি গাছের ডালে বা দেওয়ালের আড়ালে বসিয়া সারাদিন বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং রাত্রিবেলা শিকার খুঁজিতে বাহির হয়। বহুরূপী কাষ্ঠখণ্ডের মত নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া নিদ্রা যায়। বিশ্রামের সময় কুমীর ডাঙায় উঠিয়া হাত-পা ছড়াইয়া ঠিক মৃতের মত অবস্থান করে।

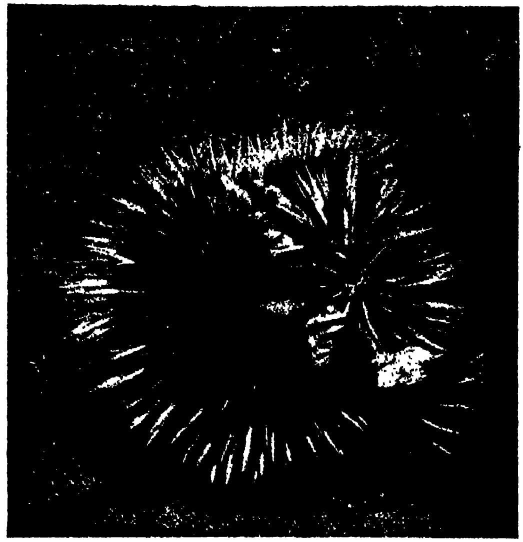
চামচিকা ও বাদুড় দেখিতে প্রায় একই রকমের; কিন্তু উভয়ের বিশ্রামভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চামচিকারা সারাদিন তালগাছের শুষ্ক পত্রের আড়ালে অথবা ঘরের চালের জাফ্‌রির নীচে শুইয়া থাকে, রাত্রিবেলায় বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত হয়। বাদুড়ও চামচিকার মত নিশাচর প্রাণী। দিনের বেলায় ইহারা অনেকে একসঙ্গে মিলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট গাছে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পায়ের নখে ডাল আঁকড়াইয়া মাথা নীচু করিয়া ঝুলিতে থাকে।

পাখীরা সাধারণতঃ ডালে বসিয়া ঘুমাইতে অভ্যস্ত। ঘুমন্ত অবস্থায় নখের মুষ্টি আরও দৃঢ় হইয়া থাকে, সে-জন্য

ডাল হইতে পড়িয়া যাইবার কোনই আশঙ্কা থাকে না। কোন কোন পাখী সুরক্ষিত স্থানে বাস করে বলিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় তাহাদের শত্রুভীতি কম। কিন্তু যাহাদের নিদ্রার গভীরতা বেশী এবং অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করিতে হয়, তাহাদিগকে শত্রুর কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হয়। এই জন্য পেঁচারা বিশ্রামের সময় এমন স্থান



একিডনা, সাধারণ অবস্থায়



একিডনার বিশ্রাম

নির্ব্বাচন করে যেখানে সহজে শত্রুর চোখ পড়ে না। ইহারা বৃক্ষের কোটরে, দেওয়ালের ফাটলেই প্রায় আত্মগোপন করিয়া থাকে, কিন্তু বড় বড় হুতোম পেঁচারা এমন গাছের ডালের উপর বসে যে সেখানকার রং ও পাখীর গায়ের রং প্রায় একই রকম দেখিতে হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রগ-মাউথ নামক পাখীরাও এইরূপ ডালের সঙ্গে শরীরের রং মিলাইয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করে। সারস, বক প্রভৃতি পাখীরা সাধারণতঃ এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করে; অপর পাটি পেটের নীচে গুটাইয়া রাখে। কখন কখন হাঁটু মুড়িয়া ঠোঁট পিঠের উপর পালকের মধ্যে গুঁজিয়াও অবস্থান করে। আমাদের দেশীয় গৃহপালিত হাঁসেরও এরূপ স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রু সহজে আক্রমণ করিতে পারে এই ভয়েই অনেক প্রাণী অদ্ভুত ভঙ্গীতে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করে যাহাতে শত্রু প্রতারিত হয় অথবা তাহাদের অতর্কিত আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটাও অন্ততঃ সামলানো যাইতে পারে। সর্ব্বশরীর শক্ত আঁশে আবৃত ম্যানিস্ নামে বাদামী রঙের এক জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে। তাহারা বিশ্রাম করিবার সময় পিছনের পায়ে গাছের গুঁড়ি আঁকড়াইয়া ধরিয়া সমস্ত শরীরটাকে ডালের মত পাশের দিকে প্রসারিত করিয়া রাখে। হঠাৎ দেখিয়া একটা গাছের ডাল বলিয়াই মনে হয়। প্যাঙ্গোলিন নামে এই ধরণের এক জাতীয় প্রাণী ডালের গায়ে শরীর কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রা যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় একিড্না নামক এক অদ্ভুত পিপীলিকাভুক্ প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সর্ব্বশরীর সজারুর কাঁটার মত কাঁটায় আবৃত। মুখটা পাখীর ঠোঁটের মত লম্বা ও সুচালো। ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহারা শরীর গুটাইয়া পিণ্ডাকার ধারণ করে। শরীর গুটাইবার কালে কাঁটাগুলি কদমফুলের শুঁয়ার মত চতুর্দ্দিকে খাড়া হইয়া থাকে। এ অবস্থায় শত্রু সহজে ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

কোয়ালা নামক অষ্ট্রেলিয়ার ভালুক জাতীয় এক প্রকার প্রাণী গাছের উপরে উঠিয়া নখের সাহায্যে ডাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যায়। কুকুরেরা শীতের সময় কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রা যায়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে শরীর প্রসারিত করিয়া ঘুমাইতেও দেখা যায়। সাধারণ বিশ্রামের সময় শরীরটা ঈষৎ বক্রভাবে রাখিয়া সম্মুখের দুই পা প্রসারিত করিয়া দেয়। ছাগল, গরু প্রভৃতি জন্তরা



বৃক্ষশীর্ষে বিশ্রাম

পা মুড়িয়া অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় মাথা খাড়া রাখিয়া বিশ্রাম করে। কিন্তু ঘোড়ার আবার দাঁড়াইয়া ঘুমানই অভ্যাস। খরগোস, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণী বসিয়া বসিয়াই বিশ্রাম করে। কিন্তু বাচ্চা প্রতিপালন করিবার সময় মা কাত ভাবে লম্বা হইয়া শুইয়া থাকে। বিড়ালেরা সাধারণতঃ বসিয়া বসিয়া বিশ্রাম করে, কিন্তু গভীর নিদ্রার সময় কখনও কখনও কুণ্ডলী পাকাইয়া কখনও বা লম্বা হইয়া হাত-পা ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণীরা সাধারণতঃ আহারের পর বসিয়া বসিয়া অলসতা অনুভব করিলে পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করে। কিন্তু গভীর নিদ্রার সময় শরীর একেবারে প্রসারিত করিয়া দেয়। হরিণেরা নিদ্রা যাইবার সময় শরীরটাকে প্রায়ই কুণ্ডলী করিয়া রাখে এবং সম্মুখের একটা পা প্রসারিত করিয়া দেয়। জিরাফের বিশ্রাম করিবার কায়দা অদ্ভুত। ইহারা পা মুড়িয়া বসিয়া বিশ্রাম করে কিন্তু লম্বা গলাটা পেরিস্কোপের মত খাড়া করিয়া রাখে। উটের শুইবার কায়দা দেখিলে মনে হয় জন্তুটা যেন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সীল-জাতীয় প্রাণীদের বিশ্রামভঙ্গী দেখিলে মনে হয় যেন নেহাৎ অসুবিধায় পড়িয়াই ঐ রকম অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাদের শুইবার ধরণ মোটেই আরামপ্রদ বলিয়া মনে হয় না। শ্বেত ভালুকেরা অনেক সময় হাত-পা পা ছড়াইয়া মৃতের মত পড়িয়া ঘুমায়; কালো ভালুকেরা কাত ভাবে শুইয়া থাকে। হিপোপটেমাস ও গণ্ডারের ঘুমের কায়দাও স্বাভাবিক। ইহারা পা মুড়িয়া মাটিতে মুখ রাখিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে।





তাসের দেশের রাজা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীনন্দলাল বসু

রক্ত

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

দল বেঁধে চলেছি দিনাজপুর। উপলক্ষ বন্ধুর বিয়ে। বন্ধুবর ধরণীধর চলেছে পকেট-ছেঁড়া সিল্কের পাঞ্জাবী চড়িয়ে। ইচ্ছা, বিবাহ নামক গুরুতর ব্যাপারটির প্রতি স্বেচ্ছাকৃত উদাসীনতা প্রদর্শন। সঙ্গে রয়েছে ওয়াটার-প্রুফধারী দীননাথ আর ছত্রধারী বনমালী। এ ছাড়া আরও আছে অনেকে। তাদের নামের তালিকা দিয়ে আর উপসর্গ বাড়াব না।

অভ্যর্থনা-আপ্যায়নের পালা শেষ হ'তে হ'তেই ট্রেন ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ সবাই নীরব। বলবার কিই বা আছে। যারা পরিচিত, তাদের সঙ্গে তো একসঙ্গেই বেরিয়েছি। যারা অপরিচিত, তাদের সঙ্গে আলাপ করবার মত নৈকট্যও তখনও হয় নি। অগত্যা সবাই চুপ।

ওয়াটার-প্রুফ ওরফে দীননাথ পকেট থেকে চলতি সপ্তাহের সাময়িক পত্রিকা বের ক'রে পাতা উল্টাল। বলতে ভুলে গেছি দীননাথ সাহিত্যিক, মানে মাসিক-সাপ্তাহিকের পাতায় তার গল্প-কবিতা নিয়মিত বেরোয়।

কথা বলবার একটা সুযোগ পেয়ে বললাম—কি কাগজ? দেখি।

—সাপ্তাহিক 'মহামানব'। ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি টেনে দীননাথ কাগজখানি বাড়িয়ে দিল।

পাতা উল্টে আমিও সশব্দে হেসে উঠলাম—আরে, এতে যে তোমারই গল্প রয়েছে।

—কি গল্প? কি গল্প? চার দিক থেকে প্রশ্নের ঢেউ গর্জে উঠল।

আমি বললাম—গল্পের নাম 'রক্তের নিশান'; লেখক বাংলার বিখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়।

সুরু হ'ল আলোচনার ঐকতান, নানা ধরণের মন্তব্য। রাইকিশোরীবাবু বললেন—গল্পের নামটি কিন্তু হয়েছে খাসা, 'রক্তের নিশান'। ভিতরে ব্যাপারটা কি বলুন তো দীননাথবাবু।

ওয়াটার-প্রুফ চোখে আনন্দ ও আত্মপ্রসাদের রামধনু এঁকে জবাব দিল—আজ্ঞে, এই শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পরিণতির কথা আর কি। তারাও এক দিন জাগবে, জাগবে এই সব সবহারাদের দল, চাইবে তাদের পাওনা, বিশ্বের আকাশে সেদিন উড়বে রক্তের নিশান।

ছত্রধারী ওরফে বনমালী দিল বাধা—থামো হে বাপু, থামো, এই ট্রেনের মধ্যে আর রক্তের নিশান উড়িও না। মাঝপথে ট্রেন থেমে যেতে পারে।

সকলে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। ওয়াটার-প্রুফ অপ্রস্তুত।

দীননাথ আর বনমালী বন্ধু। তাই রক্ষা। অন্য কেউ হ'লে সাহিত্যের গতিপথে এই আকস্মিক উপলখণ্ডের আবির্ভাবে কি ভীষণ সংঘাতের সৃষ্টি হ'ত বলা যায় না।

যাই হোক, যে নৈঃশব্দ্যের মহাসাগর বেয়ে এতক্ষণ চলছিল যাত্রা, এইবার তার বুকে জাগল কথার দ্বীপ। নানারূপ আলাপ-আলোচনায় ট্রেনের কামরা মুখর হয়ে উঠল। রাইকিশোরীবাবু টপ্পায় সুর দিলেন। কেউ কেউ দুই বেঞ্চির মাঝে রেন-কোটটা বিছিয়ে ব্রীজ খেলতে সুরু করলে। ঠিক খেলা নয়, কলকাতা-দিনাজপুরের মধ্যবর্তী সময়-সাগরের বুকে সেতু গড়বার প্রয়াস।

ট্রেন চলেছে। একঘেয়ে শব্দ। দুই পাশে প্রকৃতির ছায়াছবি। আমাদের গর্বিত অভিযানের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে সব যেন নতমুখে পিছিয়ে যাচ্ছে। পথচারী নরনারী, গাছপালা, খেত-খামার, খরস্রোতা নদী, দূরের দিক্‌চক্ররেখা, মেঘহীন আকাশ—সকলকে পরাজিত ক'রে, পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি আমরা।

চলা। শুধু চলা। কেবল গতি। বিরামহীন গতি। একঘেয়ে। ক্লান্তিকর। ভিতরে মোটামুটি একই নর-নারীর মুখ। কেউ শুয়ে, কেউ ব'সে, কেউ বা আলোচনারত। বাইরে অবশ্য আছে বিচিত্র প্রকৃতি। কিন্তু ট্রেনযাত্রীর কাছে তার একই রূপ। সমগ্র প্রকৃতি পরাজয়ের গ্লানিতে ম্লান, অপস্রিয়মানা, একখানি প্রণামে আত্মনিবেদিতা।

এই ক্লান্তিকর অবসন্নতার সুযোগেই বুঝি দার্শনিকতার ভূত চাপে মানুষের ঘাড়ে। মনে হ'ল, আধুনিক সভ্যতা মানুষকে দিয়েছে দেবতার আসন। প্রকৃতির পঞ্চ-শক্তিকে আয়ত্তে এনে প্রকৃতির বুকেই সে চালিয়েছে অবাধ শাসন। যন্ত্র-দানবকে পাহারা রেখে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চলেছে মানুষের প্রভুত্ব। মানুষ হয়েছে অপরাজেয়।

একটা কর্কশ কণ্ঠের চীৎকারে চমক ভাঙল। ফিরে দেখি, একটা লোক বিচিত্র ভঙ্গীতে ব'কে চলেছে।

গায়ের রং কালো। একটু বেঁটে। রোগাটে, কিন্তু দুর্ব্বল নয়। শক্ত আঁটসাঁট কাঠামোর উপর অল্প মাটি দিয়ে গড়া মূর্ত্তির মত। চোয়াল ও গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম তীক্ষ্ণ। সমস্ত মুখে একটা শক্তির আভাস।

বাঁ-হাতে টিনের একটা রংচটা সুটকেস। ডান হাতে দুই আঙুলের ফাঁকে একটা প্যাকেট। সবুজ সিল্ক-পেপারে মোড়া। লোকটি অবিরাম চীৎকার করছে; ছুরিতে কাটা, দায়ে কাটা, বঁটিতে কাটা, কাচে কাটা, শামুকে কাটা, হঠাৎ আঘাত লেগে কাটা,—যে কোন রকম কাটা হয়,—ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে,—অত্যন্ত জ্বালা করে,—কিছুতেই রক্তপড়া বন্ধ হয় না,—তখন শুকনো ন্যাকড়ায় ক'রে 'রক্তারি মলম' লাগিয়ে দিন,—আশ্চর্য্য ফল পাবেন,—চোখের পলকে রক্ত পড়া বন্ধ হবে,—জ্বালাযন্ত্রণার উপশম হবে;—মনে রাখবেন 'রক্তারি মলম',—ডাক্তার ত্রিনয়ন ত্রিপাঠীর 'রক্তারি মলম,'—রক্ত পড়ার সাক্ষাৎ যম,—বিশ্বাস না-হয় পরীক্ষা করুন—

লোকটার অনর্গল চেঁচানিতে যাত্রীরা সব বিরক্ত হয়ে যে-যার মত মুখ ফিরাবার উপক্রম করেছিল। পরীক্ষার কথা শুনে সবাই কৌতূহলী হয়ে ফিরে তাকাল।

লোকটা পকেট থেকে বের করল বেশ বড় একখানি ধারাল ছুরি। পালিশ-করা চকচকে ফলা। যাত্রীদের চোখেও বিস্ময় উঠল ঝকমকিয়ে।

ছুরির এক টানে লোকটা হাতের কব্জির নীচে খানিকটা চামড়া কেটে ফেললে। দারুণ যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এল মুখ হ'তে। কপালের চামড়া গেল কুঁচকে। রক্তে হাতখানা লাল হয়ে গেল।

—এই দেখুন। ব'লে লোকটা হাতখানা তুলে ধরল। রক্ত ঝরে পড়ছে। তাজা লাল রক্ত। প্রতি বিন্দুতে অসংখ্য রক্তকণিকা। জীবনযুদ্ধের অক্ষৌহিণী সৈন্য।

কামরার চার দিকে এক বার চোখ বুলিয়ে লোকটা বলতে লাগল বক্তৃতার সুরে—এইবারে—এই দেখুন 'রক্তারি মলম'। ডাক্তার ত্রিনয়ন ত্রিপাঠীর আশ্চর্য্য আবিষ্কার। এমনি ক'রে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রক্তের মুখে লাগিয়ে দেবেন। দেখতে দেখতে রক্তের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

সাপের মত তীব্র দৃষ্টি মেলে লোকটি আবার চাইল চার দিক। যাত্রীদের চোখে মুখে বিস্ময় ও সহানুভূতি। লোকটার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র। ডান হাতের দুই আঙুলের ফাঁকের সেই সবুজ সিল্ক-পেপারে মোড়া প্যাকেটটা নানা ভঙ্গীতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লোকটা আবার সুরু করলে—ডাক্তার ত্রিনয়ন ত্রিপাঠীর 'রক্তারি মলম'। গৃহস্থের ঘরে ঘরে, প্রত্যেক লোকের পকেটে পকেটে রাখা উচিত। যদি কারও প্রয়োজন থাকে—

ওপাশ থেকে কে যেন শুধাল—এর দাম কত?

দু-পা এগিয়ে গিয়ে লোকটা জবাব দিলে—'রক্তারি মলম'। প্রকৃত দাম এর অনেক। কিন্তু বহুল প্রচারের জন্য কোম্পানীর কন্সেসন-রেট—এই নমুনার প্যাকেট দু-আনা—মাত্র দু-আনা। যদি কারও দরকার হয় চেয়ে নেবেন। ডাক্তার ত্রিনয়ন—

কর্কশ ভাঙা গলায় লোকটা অশ্রান্ত চেঁচাতে লাগল। কেউ হাতে নিয়ে ফিরিয়ে দিল, কেউ দরদস্তুর করল, কেউ বা এক প্যাকেট কিনল। কামরার এপাশ-ওপাশ পায়চারি ক'রে লোকটা বক্তৃতা দিয়ে চলল।

একটা সামান্য ফেরিওয়ালা। ট্রেনযাত্রীর নিত্যসহচর। এমন অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। তবু লোকটার ভাবভঙ্গীতে কেমন একটু মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার মলম-বিক্রির কায়দা-কৌশলের মধ্যে অনেকখানি নাটকীয়তা আছে তা জানি। জীবিকা-অর্জ্জনের দুরূহ প্রচেষ্টার বেদীতলে অনেকেই অজ্ঞাতে জীবনকে তিলে তিলে বলি দেয়, তাও জানি। কিন্তু প্রত্যহ এমন অনেক অনেক বার নিজ হাতে নিজের রক্তপাত করবার এই ছিন্নমস্তা-নীতি, এ যেন একটু অস্বাভাবিক, অদৃষ্টপূর্ব্ব। চোখের সামনেই তো দেখলাম তাজা লাল রক্ত। প্রতি বিন্দুতে অসংখ্য রক্তকণিকা। জীবনযুদ্ধের অক্ষৌহিণী সৈন্য।

ট্রেনের কামরা এতক্ষণে আবার ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে। সবাই মন দিয়েছে যে-যার কাজে। কেউ শুয়ে, কেউ ব'সে, কেউ বা আলোচনারত। রাইকিশোরীবাবু জানালার উপর মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওয়াটার-প্রুফের চোখ 'মহামানব'-এর পাতায় নিবদ্ধ, হয়ত সে রক্তের নিশান ওড়াচ্ছে মনের আকাশে। ওপাশে ছত্রধারী 'এল. এস. ইন হার্টস্' ডেকে হার্ট ফেল করবার জোগাড়। সবাই অল্পবিস্তর আত্মনিমগ্ন।

হাত তুলে ইসারায় লোকটাকে ডাকলাম। নূতন উৎসাহে তার চোখদুটি জ্বলে উঠল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাতের প্যাকেটটি বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

বললাম—দু-প্যাকেট দাও।

অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব। একসঙ্গে দু-প্যাকেট 'রক্তারি মলম' বোধ হয় সে কখনও বেচে নি। তাড়াতাড়ি স্যুটকেস খুলে ফুঁ দিয়ে ময়লা ঝেড়ে আর একটা প্যাকেট তুলে নিল। সঙ্গে লাগচে বালির কাগজে লেখা একখানি দুমড়ানো বিধান-পত্র। গায়ের ময়লা হাফ-শার্টে প্যাকেটটা ভাল ক'রে মুছে আমার হাতে দিল। বলল—নিয়ে যান বাবু, রক্ত পড়ার অব্যর্থ যম—ডাক্তার ত্রিনয়ন ত্রিপাঠীর—

চার আনা পয়সা তার হাতে দিয়ে বললাম—ব'সো।

কাঁচুমাচু হয়ে লোকটা বসল আমার পাশে। অত্যন্ত জড়সড় ভাব। কিছুক্ষণ আগের দিগ্বিজয়ী বক্তার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

শুধালাম—তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে পতিতপাবন দে।

—বাড়ী কোথায়?

—ফরিদপুর জেলায়।

—এ কাজ আরম্ভ করেছ কত দিন?

—আজ্ঞে, 'রক্তারি মলম'-এর আপিসে কাজ নিয়েছি প্রায় মাস-চারেক হবে।

—তার আগে কি করতে?

—এই ক্যানভাসারিই করতাম। ধরুন, 'অরশনি পাচন', 'ব্যথাবারণ বাতের মালিশ', 'হাঁপানি-হরণ বটি' এমনি কত কি? এই পাঁচ-সাতটা ক'রেই তো আমাদের সংসার চালাতে হয় বাবু।

—এতে কি রকম পাও মাসে?

—সে কথা আর বলবেন না বাবু। এক সময় ছিল, যখন এতে ব্যবসা ছিল। এখন হয়েছে এক-পঞ্চাশটা কোম্পানী, তার ন-শ নিরানব্বই জন ক্যানভাসার। ক্যানভাসার তো ছাই, কেবল নামেরই বাহার। নইলে সত্তর টাকা মাইনে নিয়ে আমি তো চলে এলাম ডাক্তার ত্রিনয়ন ত্রিপাঠীর কোম্পানীতে, আর তোরা হতভাগা অমনি 'অরশনি' কোম্পানীতে লাল বাতি জ্বালিয়ে দিলি। যত সব—

বাধা দিলাম। এ যে কলের পুতুল। এক বার চাবি দিলে আর রক্ষা নেই। কথার তরঙ্গ দেখা দেবে জোয়ার-সমুদ্রে।

—আচ্ছা পতিতপাবন, এই সামান্য টাকায় তোমার চলে কি ক'রে?

এক কথায় পতিতপাবনের চেহারা বদলে গেল। করুণ চোখ তুলে বলল—কই আর চলে বাবু। চলে না ব'লেই তো 'অরশনি' কোম্পানীর তিন বছরের চাকরি ছেড়ে ডাক্তার ত্রিনয়ন ত্রিপাঠীর কাছে চাকরি নিয়েছি। ওষুধটা বাবু চলে ভাল। তাই কমিশন-টমিশনও দু-চার পয়সা হয়। তাছাড়া, ডাক্তারবাবু বড় ভালমানুষ। বিনা পয়সায়ই ছেলেটার চিকিৎসাটা চলে।

—তোমার একটি ছেলে আছে বুঝি ?

পতিতপাবন বিনীত হয়ে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। ওই ছেলেটারে নিয়েই তো মুশকিলে পড়েছি। বার মাস অসুখ লেগেই আছে। ওষুধে-পত্তরে-ডাক্তারে একেবারে নাজেহাল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পতিতপাবন আবার বলতে লাগল—গেল সন ঠিক এই রকম দিনে খোকার ভারি অসুখ হ'ল। ডাক্তার বাবু দেখে বললেন—ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে 'এনিম্মি' হয়েছে। রোজ এক সের ক'রে দুধ খাওয়াতেই হবে। কি করব, স্বামী-স্ত্রীতে ডাক্তার বাবুর পা জড়িয়ে ধরলাম—দোহাই আপনার, একটা বিহিত করতেই হবে। তাঁর দয়ার শরীর। সেই থেকেই ভিজিটটা মাফ ক'রে দিলেন। আর 'রক্তারি মলমে' আমার চাকরির ব্যবস্থা করলেন। এতে অবশ্য তাঁরও লাভ হ'ল। সাত বছর ধরে ক্যানভাসারি করি বাবু। পতিত ক্যানভাসারকে সকল কোম্পানীই চেনে। তবে এখানে কমিশনটা-আসটা আছে, মাইনেটাও ভাল, তাই আছি ঝুলে মা-কালী ব'লে।

আবার বাধা দিলাম—কিন্তু এ যে বড় শক্ত কাজ—

মুখের কথা লুফে নিল পতিতপাবন—শক্ত ব'লে শক্ত। বুকের রক্ত বেচে খাওয়া। এই দেখুন বাবু।

পতিতপাবন বাঁ-হাত ও ডান হাতের আস্তিন বগল পর্য্যন্ত গুটিয়ে দেখাল। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। এখন দেখে চমকে উঠলাম। দুই হাতের সবখানি জায়গা জুড়ে অজস্র কাটার দাগ। কালো কালো সংক্ষিপ্ত সরল রেখায় আত্মহত্যার অলিখিত ইতিহাস।

অনুরোধের সুরে বললাম—এ কাজ তুমি ছেড়ে দাও পতিতপাবন।

—ছেড়ে দিলে সংসার চালাব কেমন ক'রে বাবু ? আমার খোকার দুধের বাবদ মাস গেলে গোয়ালাকেই যে দিতে হয় নগদ ছ-ছটি টাকা। তার পর ঘরভাড়া, মুদির দেনা, জামাকাপড়, তৈ-তৈজস, কত কি !

বুঝি পতিতপাবন অন্য অনেকের মতই নিরুপায়। তবু বললাম—কিন্তু তাই ব'লে এমন ক'রে নিজেকে মেরে ফেলবে ?

পতিতপাবনের ঠোঁটে ম্লান হাসি—আশীর্ব্বাদ করুন বাবু, আমার খোকা বেঁচে থাক, মানুষ হোক। তখন আর আমার ভাবনা কি থাকবে ? পায়ের উপর পা তুলে ব'সে ব'সে খাব আর রক্ত জমাব···

সুখ-দুঃখ, আশা-আশঙ্কার অনেক কথাই পতিতপাবন বলতে লাগল।

হায় রে কথার ফানুষ ! নিজের ভাবের বাতাসে কোন্ আনন্দেই যে ভেসে বেড়াও ! নীচে তোমার অতল সাগর, উপরে অসীম শূন্য !···

* * *

বছর দুই পরে।

হাসপাতাল-ডিউটি শেষ ক'রে একটু তাড়াতাড়ি সেদিন হোষ্টেলে ফিরছি।

—ও বাবু শুনছেন—ও বাবু—

অপরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে এগিয়ে গেলাম। হয়ত কোন অভিযোগ। সন্ধ্যার সময় খাবার আসে নি, কোন্ নার্স খিটখিট করেছে, পাশের রোগীর চীৎকারে সারারাত ঘুমান অসম্ভব, এমনি কত কি।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা শুধাল—আমায় চিনতে পারেন বাবু ?

ভাল ক'রে চাইলাম লোকটার দিকে। জীবনের করুণ প্রহসন। মুখখানি ফ্যাকাসে, একেবারে ছাইয়ের মত সাদা। চোয়াল ও গালের হাড় কুৎসিত ভাবে ফুটে বেরিয়েছে। গাল দুটি গর্ত্ত হয়ে ভিতরে ঢুকেছে। চোখও কোটরগত। কিন্তু অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা তার চাউনিতে। সারা মুখে মৃত্যুর ছায়া।

সহানুভূতির স্বরে বললাম—মনে পড়ছে না তো। কোথায় দেখেছি বল তো তোমায় ?

একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে রোগী বললে—আজ্ঞে আমি পতিত ক্যানভাসার—পতিতপাবন দে। সেই যে বাবু, শিলং মেলে দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে। 'রক্তারি মলম' ক্যানভাস করছিলাম আজ্ঞে।

পতিত ক্যানভাসারকে চিনলাম। বন্ধুর বিবাহ-যাত্রায় ট্রেনে দেখা সেই লোকটার কথা মনে পড়ল। মিলিয়ে দেখলাম, দুটি চেহারার মধ্যে মূল ঐক্য আছে

বটে। তবে কি 'রক্তারি মলম'-এর পরীক্ষায়ই এই পরিণতি!

শুধালাম—কি হয়েছে তোমার?

—আর বাবু, ভুগে ভুগে তো সারা হয়ে গেলাম। প্রথম তো হ'ল টাইফয়েড। এখন এখানের ডাক্তারবাবু বলছেন 'সেকেণ্ডারি এনিমি।'

চমকে উঠলাম—সেকেণ্ডারি অ্যানিমিয়া! তাহলে এত দিন তুমি ছিলে কোথায়?

—আপনাদের এখানেই আছি বাবু। ঐ বড় বাড়ীটায় ছিলাম। আজ এখানে এনেছে।

পতিতপাবনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তবু কপালে হাত বুলিয়ে নাড়ীটা একটু টিপে বলতে বাধ্য হলাম—কোন চিন্তা নেই। এখানে থাকলে ধীরে ধীরে ভাল হয়ে যাবে।

সহজ শান্ত গলায় পতিতপাবন জবাব দিল—বাঁচার মেয়াদ আমার ফুরিয়েছে বাবু, সে ভরসা আর দেবেন না। বড়সায়েব বলে গেছেন কাল, সুস্থ কোন মানুষের রক্ত না হ'লে এ রোগ সারবার নয়। কিন্তু আমার জন্যে আর কে রক্ত দিতে আসবে বাবু? ও আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

মৌখিক সান্ত্বনা এর পরে অচল। মনে সত্যি বড় আঘাত পেলাম। লোকটা শেষ পর্য্যন্ত 'রক্তারি মলমে'র হাতেই মরল। অ্যানিমিয়া…রক্তশূন্যতা…তাজা রক্ত…রক্তারি মলম…মাসে ছ ছ-টাকার দুধ…

তবে কি? আশঙ্কা হ'ল। শুধালাম—তোমার খোকা কোথায় আছে পতিতপাবন?

মুখের ফ্যাকাশে রঙের কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। কিন্তু তার রোগজীর্ণ শরীর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। করুণ চোখ তুলে বলল—খোকা আর নেই বাবু।

বিদ্যুৎ-আলোকিত ঘর যেন অন্ধকার হয়ে গেল। পতিতপাবনের গলা যেন অনেক দূর হ'তে ভেসে এল কানে—সেই 'এনিমি'তেই খোকা মারা গেছে। আমিও যাব। সে জন্য দুঃখ করি না বাবু। কিন্তু খোকার গর্ভধারিণীর যে কি হবে বাবু—

পতিতপাবনের গলা ধরে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য তার সহিষ্ণুতা। অথবা আঘাতে আঘাতে মানুষ বুঝি এমনই হয়। তার দেহে বা মনে কোন উচ্ছ্বাস নেই, তরঙ্গ নেই। আধমরার মত বিছানায় পড়েই কথা কয়টি সে বলল। চীৎকার করল না, বুক চাপড়াল না। শুধু দুই চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

বৈদ্যুতিক আলোয় চোখের জল ঝকঝক ক'রে উঠল। জল তো নয়, রক্ত। তাজা লাল রক্ত। প্রতি বিন্দুতে অসংখ্য রক্তকণিকা। জীবনযুদ্ধের অক্ষৌহিণী সৈন্য!…

কিছু দিন পরেই পতিতপাবন মারা গেল।



আলোচনা

গান্ধীজীর অহিংসা নীতি

আমি 'প্রবাসী'র নিয়মিত পাঠকের মধ্যে এক জন। "বিবিধ প্রসঙ্গে" যুক্তিপূর্ণ, নির্ভীক দেশপ্রেমোদ্দীপক সম্পাদকীয় আলোচনায় অনেক সময় মুগ্ধ হইতে হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে কোন কোন শ্রদ্ধাস্পদ নেতার সম্বন্ধে যে তীব্র কঠোর মন্তব্য বা শ্লেষাত্মক উক্তি প্রকাশিত হয়, তাহাতে দুঃখিত হইতেও হয়।

গত কার্ত্তিক মাসের "বিবিধ প্রসঙ্গে" ১১৯ পৃষ্ঠায় "গান্ধী জয়ন্তী" শীর্ষক মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে, "তিনি অহিংসাকে এত বড় মনে করেন যে, নারীর সতীত্ব রক্ষাকল্পেও আততায়ীর প্রতি সশস্ত্র বা অন্যবিধ বলপ্রয়োগ তিনি বৈধ মনে করেন না" (কথাগুলির নীচের দাগ এই লেখকের।) এই মন্তব্যে স্তুতিচ্ছলে গান্ধীজীর অহিংসা নীতির প্রতি কটাক্ষ বা শ্লেষ রহিয়াছে। ইহাতে যেন ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, নারীর সতীত্ব রক্ষিত হউক বা না-হউক সেদিকে তত লক্ষ্য করিতে হইবে না, চুপ করিয়া থাকিতে হয় থাকিবে, তথাপি আততায়ীকে যেন কোন আঘাত করা না হয়, এই উপদেশ গান্ধীজী দিয়াছেন।

* * *

উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্বাধীনতা বনাম অহিংসা বিষয়ক প্রশ্ন বা হেঁয়ালির (poser) অবতারণা করা হইয়াছে। যে-ভাবে ঐ সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে ধারণা হইবে যে, গান্ধীজীর নীতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বা কার্য্যকরী নহে, বিশেষতঃ মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে, যথা দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন এবং মাতৃজাতির সতীত্বধর্ম্মরক্ষা বিষয়ে। আরও মনে হইবে যে, গান্ধীজীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বা প্রচেষ্টা তত আন্তরিক নহে বা সতীত্বের মূল্যও তাঁহার নিকট অতি অল্প। কোন কোন বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর মিল না থাকায় অনেক সময়েই তিনি গান্ধীজীর উক্তির প্রকৃত অর্থ বা আনুষঙ্গিক ভাব (implications) জানিবার কষ্ট স্বীকার বা অবসর করিতে পারেন না, এবং সেজন্য গান্ধীজীকে সময়ে সময়ে ভুল বুঝিয়া তাঁহার উপদেশের বা কার্য্যের তীব্র প্রতিকূল সমালোচনা করেন। তাই "গান্ধী জয়ন্তী" লিখিতে গিয়াও গান্ধীজীর অহিংসা নীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।

* * *

গান্ধীজীও "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই ঋষিবাণীতে বিশ্বাস করেন; তাঁহার মতে সে বল পাশবিক বল নহে, আত্মিক বল। তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে, আত্মিক বল বা ব্রহ্মবল (তাঁহার কাছে সত্য বা অহিংসা বলই ব্রহ্মবল) সকল বলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই বল সর্ব্বপ্রকার দৈন্য, লাঞ্ছনা, অপমান ও অত্যাচার হইতে সকল লোককে রক্ষা করিতে সমর্থ।

শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা

সম্পাদকের মন্তব্য

মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে কোন ব্যঙ্গোক্তি করা আমার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করি, যদিও তাঁহাকে অভ্রান্ত মনে করি না। আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখি, তাহাতে তাঁহার প্রতি অসম্মান দেখান হইয়াছে, কোন পাঠকের এরূপ ধারণা আমার পক্ষে দুঃখকর।

গান্ধীজী সব সময়ে একই বিষয়ে সমান স্পষ্টার্থ কথা বলেন না;* এই জন্য তাঁহার মতামত ঠিক্ বুঝা সব সময়ে সোজা নহে। তথাপি গান্ধীজী যে নিশ্চয়ই নারীর সতীত্ব রক্ষা চান, দেশের স্বাধীনতাও চান, এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার শিষ্যদিগের বা তাঁহার যে সকল উক্তি লেখকমহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত করা আবশ্যক মনে করিলাম না।

আমি আগে আগে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে আমার বক্তব্য এই ছিল যে, গান্ধীজী অহিংস উপায়ে নারীর সতীত্ব রক্ষা এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা বা পুনর্লাভ চান, অন্য উপায়ে নহে। আমার ধারণা এখনও এইরূপ।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসীর সম্পাদক

---

* যেমন সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও গান্ধীজীর সপ্ততিপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে উপহৃত "Mahatma Gandhi" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি :—

"In some of the most recent issues of *Harijan* the test question, so often put both to men and women over here, has been put to Gandhiji. What must a woman do if she is threatened with violation? Well, what will the Mahatma say? Will he shirk the question? Say he is not a woman and can't answer for them? Or what? How will he answer?

"He answers that a woman may resist, and resist unto death, but not use any other kind of violence." P. 257.

"তিনি [গান্ধীজী] উত্তর দেন যে, আক্রান্তা নারী বাধা দিতে পারেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বাধা দিতে পারেন, কিন্তু অন্য কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করিতে পারেন না।"

এখানে "মৃত্যু পর্য্যন্ত" কথা কটির মানে আক্রান্তা নারীর মৃত্যু পর্য্যন্ত বলিয়া বুঝিয়াছি। আক্রান্তা নারী এরূপ কোন বলপ্রয়োগ করিতে পারেন না যাহাতে আক্রমণকারী হত বা আহত হয়।

পুস্তক পরিচয়

সাহিত্য-পরিচয়—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত। মিত্র ও ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

কবি কাব্য সৃষ্টি করেন, কাব্য-রসিক তার আনন্দ উপভোগ করেন, আর কাব্য-বস্তু ও সেই আনন্দের তত্ত্বচিন্তা ও তত্ত্বনির্ণয় করেন দার্শনিক। প্রাচীন কাল থেকেই এই রকম ঘটে আসছে, দেশে এবং বিদেশে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'সাহিত্য-পরিচয়' আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সেই ধারাই বজায় রেখেছে। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমত ও প্রধানত দার্শনিক। এবং তাঁর 'সাহিত্য-পরিচয়ে'র প্রবন্ধগুলি মুখ্যত কাব্য ও কাব্যানন্দের তত্ত্বের আলোচনা। যাঁরা কাব্যপাঠের আনন্দেই খুশী, তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে কুতূহলী নন—এ গ্রন্থ তাঁদের জন্য নয়। সে কৌতূহল যাঁদের আছে এ বই তাঁদের মন ও চিন্তাকে নাড়া দেবে।

কাব্যের তত্ত্ববিচারে বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা প্রধানত দুটি। এক হচ্ছে বিশ্লেষণের আতিশয্য। কাব্যবস্তুকে বিশ্লেষণ করেই তার তত্ত্ব নির্ণয় করতে হয়, কিন্তু সে বিশ্লেষণ অনেকের, বিশেষত অনেক দর্শন-ব্যবসায়ীর হাতে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ বিশ্লেষণ এমন সব সূক্ষ্মতম তত্ত্বে উত্তীর্ণ হয় যা থেকে আর কাব্যবস্তুতে ফিরে আসা যায় না। হৃৎপিণ্ডের কাজের যে পরিচয় চায় তাকে সমস্ত জড়বস্তুর বিশ্লেষণে পাওয়া যায় প্রোটন ও ইলেকট্রন এ তত্ত্ব শুনিয়ে কোনও লাভ নেই। কাব্যের বিশ্লেষণে যদি কেবল পৌঁছা যায় সমস্ত আর্ট-সাধারণ অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের মধ্যে তবে বিশেষের পরিচয় দিতে তার বৈশিষ্ট্যকেই করা হয় অগ্রাহ্য। এই গ্রন্থের 'ক্রোচে'র বীক্ষা-শাস্ত্র বা এস্থেটিক প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ ক্রোচের মতামতের যে পরিচয় দিয়েছেন পাঠক তার মধ্যে এই অতি-দার্শনিকতার কিঞ্চিৎ নমুনা পাবেন। দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে এক-দেশিকতা। কাব্যের তত্ত্ববিচার কোনও কল্পিত অবস্তুর বিচার নয়, নানা দেশ ও কালের কবিদের প্রতিভা যে বস্তুবিশেষকে সৃষ্টি করেছে, সেই বস্তুর তত্ত্ব-বিচার। এই সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা ক'রে শ্রেণী-বিশেষের কাব্যের ভিত্তিতে কাব্যতত্ত্বকে দাঁড় করাবার চেষ্টা অপ্রতুল নয়। কোনও কাব্যরসিকই সব রকম শ্রেষ্ঠ কাব্যেও যথোপযুক্ত আনন্দ পান না। অন্যান্য রুচির মত এখানেও রুচির পক্ষপাতিত্ব আছে এবং তা স্বাভাবিক। রুচির এই পক্ষপাতিত্ব যখন বিচারবুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ করে, তখনি সব একদেশদর্শী কাব্যতত্ত্বের সৃষ্টি হয়। আর তত্ত্বের খাতিরে বস্তুকে উপেক্ষা করার চেষ্টা বিজ্ঞানের ইতিহাসেও অজ্ঞাত নয়।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মতামতে দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ অতি-দার্শনিকতার হাত এড়িয়েছেন, এবং রুচির পক্ষপাতিত্ব কাব্যরসিক সুরেন্দ্রনাথের তত্ত্ববিচারকে মোহগ্রস্ত করে নি।

লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন যে গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি লেখকের যৌবনের প্রারম্ভ থেকে মধ্য বয়স পর্যন্ত নানা সময়ের লেখা। সেই জন্য কোন একটা বিশেষ মতবাদের চার পাশে আলোচনাগুলি দানা বাঁধে নি। কিন্তু সেটা এ পুঁথির দোষ নয়, একটা আকর্ষণ। এর ফলে লেখকের মতামতগুলি বাইরে থেকে পাঠকের মনকে ঘিরে ধরতে চায় না, নানা দিক্ থেকে নাড়া দিয়ে বুদ্ধিকে সচল ও সক্রিয় ক'রে তোলে।

গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'সাহিত্য-পরিচয়' অবিশেষজ্ঞ পাঠকের পক্ষে কিঞ্চিৎ গুরুপাক। কারণ অনেক রকম কথা অতি অল্প পরিসরের মধ্যে লেখক ব'লে সেরেছেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'অভিনবের ডায়েরি'র মডার্ণাইজড দিঙনাগ, ভট্টনায়ক ও রুদ্রটের বাদানুবাদ থেকে বাঙালী পাঠকের রসের অলৌকিকত্ব তত্ত্বের সঙ্গে মনোজ্ঞ পরিচয় হবে। হালকা সুরের মধ্য দিয়ে লেখক যা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন তা মোটেই হালকা নয়।

কাব্যে কাকে বলে রিয়ালিজ্‌ম আর কার নাম আইডিয়ালিজ্‌ম, এর আলোচনা আছে 'বর্ষাকাব্যের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে এবং সে আলোচনার ফল পরীক্ষা করা হয়েছে মোটামুটি এক রকমের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নানা কবির বিভিন্ন রকমের কাব্যে প্রয়োগ করে। বাল্মীকি থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের দেশের কবিদের বর্ষার কাব্যে রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজ্‌ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাল্মীকির—

> 'ব্যামিশ্রিতং সর্জকদম্বপুষ্পৈঃ নবং জলং পর্বতধাতুতাম্রম্।
> ময়ূরকেকাভিরনুপ্রয়াতং শৈলাপগাঃ শীঘ্রতরং বহন্তি।
> রসাকুলং ষট্‌পদসন্নিকাশং প্রভুজ্যতে জম্বুফলং প্রকামম্।
> অনেকবর্ণং পবনাবধূতং ভূমৌ পতত্যাম্রফলংবিপক্কম্।'

কি রবীন্দ্রনাথের—

> 'ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
> নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
> কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
> দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
> গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
> গরজে গগনে গগনে।'

বাহ্যদৃষ্টিতে রিয়ালিষ্টিক—"যথাস্থিতবস্তুবিষয়ক"। কিন্তু লেখকের কথায়, "বর্ষার সৌন্দর্য্য কবির প্রাণে যে হর্ষস্পর্শের ঝঙ্কার তুলেছে, কাব্যের প্রতি অক্ষরে তা ফুটে উঠেছে।" অর্থাৎ বস্তুর বর্ণনা কাব্য হয়ে উঠেছে কবির চিত্তের অনুভূতি তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে ব'লে। তেমনি—

> 'এমন দিনে তারে বলা যায়,
> এমন ঘন ঘোর বরিষায়।
> এমন মেঘ-স্বরে বাদল ঝর-ঝরে,
> তপনহীন ঘন তমসায়।'

এখানে চিত্তের অনুভূতি কাব্য হয়েছে যে বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ অনুভূতির আবেগ তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে ব'লে। কাব্য বস্তুও নয় অনুভূতিও নয়, বস্তুর অনুভূতির প্রকাশ। এর মধ্যে কোন্‌টার উপর জোর একটু বেশী, কাব্যের বিচারে সেটা খুব বড় কথা নয়।

এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে বাঙালী পাঠক কাব্যতত্ত্বের ও কাব্যরসের এত বহুমুখী আলোচনা পাবেন যার বৈচিত্র্য অসাধারণ। এবং সে আলোচনা 'হিতং' ও 'মনোহারী', অর্থাৎ দুর্লভ। কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ কঠিন,—বুদ্ধির দাঁতের পক্ষে হিতকর।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

তরঙ্গ রোধিবে কে ?—শ্রীদিলীপকুমার রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৩৯০। মূল্য দুই টাকা।

দিলীপবাবুর উপন্যাসের ধারা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকার মুখ দিয়া বইয়ের শেষে এই কথা বলাইয়াছেন :—"...অনেক জিজ্ঞাসু মনই গল্পে আজকাল ও-ধরণের মামুলি প্লটের ছেলে-মানুষি চায় না—চায় অন্তরের আলোর ইতিহাস, গতির কাহিনী, স্বপ্নের উর্দ্ধচারণ..."

ঠিক এই ধরণের প্রত্যাশা লইয়া না পড়িলে বইটির রসগ্রহণ করা শক্ত হইবে।

বইখানি আরও দুইটি বিষয়ে আমাদের সাধারণ নভেল হইতে বিভিন্ন। প্রথমতঃ ইহার ঘটনা-পরিবেশ বাংলা দেশে নয়, প্রতীচ্যের সুদূর এক প্রান্তে—প্রধানতঃ সুইডেনে। আর দ্বিতীয়তঃ, ইহার চরিত্র-গুলি প্রায় সবই শিক্ষিত এবং এক নায়ক ছাড়া সবাই বিদেশী। এই সব কারণে এই বইটির ইন্‌টারেষ্টও সাধারণতঃ আমরা যে সব নভেল হাতে পাই সে সবের ইন্‌টারেষ্ট হইতে ভিন্ন।

বইটির মূলে লেখকের প্রত্যক্ষদর্শনের স্বাক্ষর আছে। তাঁহার অভিজ্ঞতা যেমন প্রচুর, অভিনব, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণশক্তিও তেমনি অব্যর্থ, ফলে ইনটেলেকচুয়াল নভেল হিসাবে বইখানি একটি উচ্চ অঙ্গের জিনিষ হইয়াছে।

তবে এই সঙ্গে আর একটা কথাও বলা দরকার। লেখকের যা শক্তি, তাহার দ্বারাই স্থানে স্থানে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্য এক-এক জায়গায় যুক্তির দ্বন্দ্বে অথবা বিশ্লেষণের দীর্ঘতায় পাঠকের মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। বইয়ের প্রথমাংশে এই দোষ বেশী ; এবং এই দোষ নাই বলিয়াই অর্থাৎ শক্তির সুসমঞ্জস প্রয়োগে দ্বিতীয়ার্দ্ধ একেবারে অনবদ্য। আগাগোড়াই এই সংযম থাকিলে বইটি আরও উপাদেয় হইত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রামায়ণবোধ বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ—শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিশ্র। মূল্য দুই টাকা।

ভক্তির অর্ঘ্যস্বরূপে বিরচিত রামায়ণের নূতন ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণপূর্ণ এই বইখানি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "...সাধনালোকপ্রদীপ্ত 'রামায়ণবোধ' গ্রন্থখানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইহাতে যে মননশীলতার পরিচয় আছে তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য।"

এই মন্তব্যের পর অধিক পুস্তকপরিচয় নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতীয় কাব্য বা ধর্ম্মগ্রন্থের নিয়ত নূতন দিক্ হইতে আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। 'রামায়ণবোধ' পড়িয়া পাঠক এই আলোচনায় গভীরভাবে প্রবৃত্ত হইবেন এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ তত্ত্বে সমৃদ্ধ হইবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অ.

ছাত্র-জীবন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস গুপ্ত। প্রকাশক, শ্রীসুধীর-কুমার পাল, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী ভবন, বগুড়া। মূল্য। আট আনা।

প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় ছাত্রজীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হইতে ছাত্রসমাজের হিতার্থে এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার বক্তব্য ইতিপূর্ব্বে 'নড়াইল কলেজ ম্যাগাজিনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সমীচীন হইয়াছে। স্বাস্থ্য, দিনচর্য্যা, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যবোধ, অহং-বিমুখতা, স্বাবলম্বন, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য—এই সব বিষয়ে লেখক উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, এবং বক্তব্যের মূল্য আছে।

তবে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে এত কথা না লিখিলেও চলিত। যৌন-শিক্ষার ছাত্রজীবনে যে পরম প্রয়োজন, তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু ইহাও গুহ্য বিদ্যা, অপ্রয়োজনে বলিতে গেলে কুৎসিত ঔষধের বিজ্ঞাপনের ন্যায় কাজ করিতে পারে, ইহা আশঙ্কা হয়। অবশ্য লেখক দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় ছাত্রজীবনের যে দোষ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহার প্রতিকার ও চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

রকমারি—শ্রীঅসিতকুমার হালদার। শিশু-সজ্ঞ, ৫, রাম-মোহন রায় রোড, কলিকাতা। মূল্য চার আনা।

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত পঁচিশটি ছড়া ও গান ছোট্ট নোট-বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। ছড়াগুলিতে লেখক বিচিত্র বর্ণে ও সুরে নানান ছোট ছোট ছবি আঁকিয়াছেন। অধিকাংশই বাঙালী ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত ছবি। কবির কল্পনা ও শিল্পী-মন তাহার গায়ে স্বপ্নের যাদুস্পর্শ দিয়া আরও মধুর করিয়াছে।

ছন্দের ও মিলের দুর্ব্বলতায় মাঝে মাঝে কয়েকটি ছড়া যেন নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সমাজে নারীসমস্যা—শ্রীহরিদাস মজুমদার প্রণীত ও সম্পাদিত এবং ৬, মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা, হইতে শ্রীমহাদেব ব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ভূমিকায় ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় ইহার সফলতা কামনা করিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহা পাঠকমাত্রেরই মনের কথা। সমাজে দুর্নীতির প্রসারের জন্য নারী-সমস্যা যে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, গ্রন্থকার তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া নানা উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় এই দুর্নীতি নিবারণে যে দেশবাসীমাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রকাশ যে বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাথমিক জ্যোতিষতত্ত্ব (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং মুঙ্গের (বিহার) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ইহা একখানি ফলিতজ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে ফলিত-জ্যোতিষের সকল বিষয় অতি সরলভাবে লিখিত হইয়াছে। প্রথম আরম্ভের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার ফলিতজ্যোতিষ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; বিশেষতঃ দ্বিতীয় খণ্ডে লগ্নফল কথন, আয়ু ও অরিষ্টকাল জন্মনক্ষত্রফল ও দশানির্ণয়বিধি বেশ সুবোধ্য করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ফলিতজ্যোতিষপাঠার্থী এই গ্রন্থখানি উপভোগ করিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। লেখকের জটিল বিষয় সরল করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা আছে।

বক-ধার্ম্মিক—শ্রীযামিনীমোহন কর, এম্-এ, প্রণীত এবং শ্রীনলিনীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক ২০, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, কালীঘাট, হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থখানি পি. জি. উডহাউসের Money for Nothing হইতে গৃহীত উপাদান লইয়া রচিত নাটক। নাটকখানি দুই অঙ্কে সমাপ্ত, প্রথম অঙ্কে চারিটি দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। ইহার উপাখ্যানে বিশেষ হাস্যরসের অবতারণা হইয়াছে, আধুনিক তরুণী ও তরুণের অদ্ভুত খামখেয়াল ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে এবং নানা জাতীয় জুয়াচোরেরা সরলপ্রকৃতির লোকদিগকে কিরূপ ভাবে প্রতারণা করে, তাহাও ফুটিয়াছে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ, লুসি দত্ত ও কৃতান্ত ডাক্তারের চরিত্র অঙ্কনে। নাটকখানি মোটের উপর সুপাঠ্য হইয়াছে, কিন্তু চরিত্রগুলি বড়ই বিদেশী বলিয়া মনে হয় এবং মাঝে মাঝে হাস্যরসের সৃষ্টি সম্পূর্ণ কষ্টকল্পিত হইয়াছে।

বৃহত্তর সম্ভাবনা—শ্রীবরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। এন. এম. রায়চৌধুরী কোং লিঃ এর পক্ষ হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ইহা একখানি গল্পপুস্তক। ইহাতে বারটি গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কয়েকটি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলি অধিকাংশই মামুলি ঘটনা লইয়া রচিত এবং রচনার ভঙ্গীতেও তেমন কিছু নূতনত্ব নাই। অবশ্য দুই একটা গল্পে (যেমন শিল্পী, অলক্ষ্মী, প্রিয়া ও জননী) লেখক কতকটা ছোট গল্পের আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। ভাষা মাঝে মাঝে সরল, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই গল্পের আখ্যানের তুলনায় ভারাক্রান্ত।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

সঙ্গীত-সংগ্রহ—সঙ্কলক স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ। প্রকাশক স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, বৈদ্যনাথ, দেওঘর।

সংস্কৃত স্তোত্রসংগ্রহগ্রন্থে যেরূপ বিভিন্ন দেবদেবীর স্তোত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান গ্রন্থে সেইরূপ বিভিন্ন দেবদেবী বিষয়ক খ্যাত অখ্যাত সার্ধশত কবির রচিত প্রায় এক সহস্র সঙ্গীত সংকলিত হইয়াছে। সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই বাংলা ভাষায় রচিত—দুই-চারিটি হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় নিবদ্ধ নানা দেবদেবী, অবতার, ধর্ম-প্রচারক, মহাপুরুষ প্রভৃতির মাহাত্ম্যদ্যোতক সঙ্গীত ব্যতীত কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত ও বিবিধ সঙ্গীতও এই দুই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্মভাবের পরিপোষণে এই গ্রন্থ যথেষ্ট সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

উপনিষদের আলো—অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইতিপূর্ব্বে কোন কোন খ্যাতনামা মনীষী উপনিষদের তত্ত্ব ও উপদেশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিন্তু বিস্তৃত। অধ্যাপক সরকার সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন; ইহা উপনিষদ্-পাঠের ভূমিকাস্বরূপ। উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্বসকলের সার লেখক যেরূপ সংক্ষেপে অথচ সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এই ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণের উপনিষদ্‌পাঠে আলোকস্বরূপ হইবে।

এই পুস্তক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, যদি ইহাতে ভাষাগত ত্রুটির দৃষ্টান্ত না থাকিত। স্থানে স্থানে ভাষার গাঁথুনি শিথিল হওয়াতে অর্থও অপরিস্ফুট হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যনির্ণয়ঃ, প্রথম পাদঃ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (বেদান্তভূষণস্য), ৩ পার্শিবাগান লেনস্থ ভবনাৎ শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষেণ প্রকাশিতঃ। মূল্যং রূপ্যকমেকং।

ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা মহামুনি বেদব্যাস একই ব্যক্তি হইলেও তাঁহার সূত্রগুলি বিভিন্ন আচার্য্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যে কে বেদব্যাসের অভিপ্রায় যথার্থভাবে প্রকাশ করিয়াছেন? ইহা বেদান্ত দর্শনের এক জটিল প্রশ্ন। থিব, দাশগুপ্ত প্রভৃতি মনীষিগণের মতে রামানুজ ভাষ্যই বেদব্যাসের সম্মত, ইহা কি সত্য? এই জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্য শ্রীযুক্ত বেদান্তভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের পাঠ ও অধিকরণ-বিভাগ সম্বন্ধেও আচার্য্যগণের গুরুতর মতভেদ আছে, সুতরাং গ্রন্থকার প্রথমেই এই বিষয়ের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই প্রথম পাদে তিনি শঙ্কর হইতে বলদেব পর্য্যন্ত দশ জন আচার্য্যের ধৃত সূত্রগুলির তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, পাঠভেদ অধিকরণের অসঙ্গতি, সূত্রের ক্রমভঙ্গ, অযথা দ্বিধাকরণ বা সংযোজন ইত্যাদি দোষের সংখ্যা শঙ্করের ধৃতসূত্রগুলিতেই সর্ব্বাপেক্ষা কম অর্থাৎ সকল আচার্য্যের সম্মত সূত্রের ও অধিকরণের সংখ্যা শঙ্করভাষ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং শঙ্করের সূত্রপাঠ ও অধিকরণ বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক।

গ্রন্থকার নিজগুরু স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহোদয়ের উপদিষ্ট প্রণালীর সহায়তায় নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি এই প্রণালী অনুসারে সমগ্র ব্রহ্ম সূত্রের সর্ব্বপ্রকার সঙ্গতি বিচার করিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিবেন যে শঙ্করের ভাষ্য শুধু শ্রুতিসম্মত নহে বেদব্যাসেরও সম্মত।

জটিল বিচারবহুল বিষয়সমূহ গ্রন্থকার যেরূপ প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে আমরা বিস্ময় বোধ করিতেছি, কারণ যত দূর জানি, ইহাই গ্রন্থকারের সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম পুস্তক। শুধু আলোচিত বিষয়ের গৌরবে নহে, ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং লঘুতার গুণে ইহা সংস্কৃত ভাষাতে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে গৌরবের স্থান অধিকার করিবে, এবং দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সমালোচক—সকলেরই আদরণীয় হইবে।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

সমালী—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। বরেন্দ্র লাইব্রেরি, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য আট আনা।

'কথা ও কাহিনী' লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ একদা কিশোরদের আবৃত্তি-যোগ্য কবিতার অভাব ঘুচাইয়াছিলেন। তাহার পরে সেই চেষ্টা আরও কেহ কেহ করিয়াছেন। এই বইটি সেদিক্ দিয়া একটি সুচেষ্টা। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, সহজ এবং সুন্দর বিষয়বস্তু লইয়া রচিত,—আবৃত্তির উপযোগী। শিশুদের হাতে দিবার মত বই, কিন্তু বড়রাও ইহা পড়িয়া আনন্দ পাইবে।

ভূমিকাটি ভাল লাগিল না। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগের অতিরিক্ত পাঠ্য বা গৃহপাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেও ইহা তাহাদের জ্ঞানবিকাশের সহায় হইতে পারিবে, এ কথাটা স্বীকার করি, কিন্তু

বইয়ের ভূমিকায় লেখকের মুখে এই ধরণের পরিচয় কবিতায় বইয়ের মূল্য বাড়ায় না, বরং সম্ভ্রম কমাইয়া দেয়।

বইয়ের নামটিও একটু কষ্টাজিত। 'বোকে' কথাটা বিদেশী; কিন্তু 'পুষ্পগুচ্ছ' বা ঐ রকমের কোন একার্থক বাংলা নাম রাখিলে পাঠক সহজে বুঝিত।

প্রবর্ত্তিকা—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। শ্রীগুরু লাইব্রেরি ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মূল্য তিন আনা।

কবিতার বই। এই বইয়ে লেখক বাংলা কবিতার একটি নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছেন। 'কবিতা' ইহার মধ্যে প্রায় নাই, ছন্দটিকে পরিচিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

এই উদ্যম প্রশংসনীয়, কিন্তু ইহার সাফল্যে সংশয় জন্মিতেছে। কবিতা উচ্চারণ করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিয়া দেখা গেল, স্বচ্ছন্দ গতি পাওয়া যায় না।

ভাই,
ধরা মাঝে নাই
মম
স্বদেশের সম
দেশ;
গাহি' তার গান
রাখি তার মান
হয় যেন প্রাণ
শেষ।

এই হইল ছন্দটি। আবৃত্তির মুখে তৃতীয় ছত্রটিতে কি রকম একটা হোঁচট খাইয়া থামিয়া পড়িতে হয়। এই ছত্রটি তুলিয়া দিলে তবেই পড়া সহজ হয়।

আবৃত্তিতে যে ছন্দ বাধা দেয় তাহা লোকে গ্রহণ করিবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ইহার উপরে আবার মুশকিল বাধাইয়াছেন কবি নিজেই, কবিতায় ছন্দপতন ঘটাইয়া।

সদা পালিয়াছ
যত্ন করিয়াছ।
সদা তোরি তরে
মর্ম্ম হা হা করে—

এই রকমের ব্যবহার অনেক দেখিলাম। উচ্চারণের দিক্ দিয়া 'যত্ন' ও 'মর্ম্ম' দুই অক্ষর নয়, যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘস্বর বলিয়া ধরা হইবে। ভূমিকায় ইহাদের লঘুস্বর বলিয়া পড়িবার নির্দ্দেশ দিলেও সে নির্দ্দেশ পাঠক মনে রাখে না, এবং যে-কবির রচনায় এই ধরণের ছন্দের ভুল তাহারা পায়, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নূতন ছন্দ মানিয়া লইতে স্বভাবতই দ্বিধা বোধ করে। এই দিকে আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল।

জোনাকি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মহাকাল কার্য্যালয়, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও লেক বুকষ্টল, ৫১ বি রাসবিহারী এভিনিউ, মূল্য ১৲।

কবিতার বই। মোট বাইশটি কবিতা আছে, প্রত্যেকটিই সুখপাঠ্য। কবিরা তিন জনেই সাহিত্যের আসরে নবাগত। কবিতার মধ্য দিয়া নূতন কথা তাঁহারা প্রায় বলেন নাই, তবু বলিবার সুশ্রী ভঙ্গিতে বক্তব্য একটি স্নিগ্ধ মধুর রূপ পাইয়াছে। কবিতাগুলা একাধিকবার পড়া চলে, এবং পড়িয়া ভাল লাগে। ভূমিকায় কবিরা বলিয়াছেন, 'জোনাকির মতোই শঙ্কিত ক্ষীণ আলোক' লইয়া তাঁহাদের কবিতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এই বিশ্বাসে তাঁহারা বইয়ের নাম জোনাকি রাখিয়াছেন। জোনাকির আলোর ক্ষীণতা ইহাতে আছে কি না পাঠক বিচার করিবেন, কিন্তু জোনাকির আলোর স্নিগ্ধতার সাক্ষাৎ ইহার মধ্যে পাইলাম।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কবিতাগুলি একটি ছাড়া সবগুলিই প্রেমের কবিতা এবং প্রেমের কবিতা হইয়াও সুন্দর। ইহাতে মাধুর্য্য আছে, ন্যাকামি নাই, এবং একটি সুশ্রী সহজ সুরে কবিতা কয়টি রচিত।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্টতর। নরেন্দ্রবাবুর তুলনায় ইনি একটু ধ্বনিবহুল ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী মনে হইল, তবে সেটা বিষয়বস্তুর প্রভেদের জন্যও হইতে পারে। ইঁহার কবিতার মধ্যে দুঃখবাদের সুর আছে—এই যুগে নবীন কবির মুখে আশার সুর শুনিলে অধিকতর আনন্দ পাইতাম।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই সুখপাঠ্য গল্প লিখিয়া প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। কবিতাতেও তাঁহার সেই সহজ সাবলীল ভঙ্গিটি বজায় আছে। 'শবরীর প্রতীক্ষা' সনেটটি বিশেষ করিয়া ভাল লাগিল।

ভাষা ও ছন্দের দখল ইঁহাদের আছে, দেখিবার চক্ষুও আছে। ভবিষ্যতে গতানুগতিক ছাড়িয়া নূতন বার্ত্তা ইঁহারা আমাদের শুনাইবেন এই আশা করিতেছি।

শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত

ভাগবতামৃত—শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল—শঙ্কর কবিচন্দ্র বিরচিত। শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ২১ এম হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত; আকার ডবল ক্রাউন অষ্টাংশিত, পৃ. ৩৮৭; মূল্য আড়াই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের কবি শঙ্কর কবিচন্দ্রকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ কোথাও আক্ষরিক নহে এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধের রচনায় কবিচন্দ্র মূলাতিরিক্ত অনেক বিষয় অবতারণা করিয়া অনুবাদকে এক মৌলিক গ্রন্থের সমান মূল্যবান্ করিয়াছেন। বিদগ্ধমাধব, রসকদম্ব, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দলীলামৃত, গোবিন্দবিজয় প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী হইতে প্রামাণ্য শ্লোকাদির উদ্ধার করিয়া তিনি রাস-পঞ্চাধ্যায়ের অনুবাদে তত্ত্ব ও কাব্যকে যেরূপ সুসমঞ্জসভাবে একত্র করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। বৈষ্ণবধর্ম্মসাহিত্যের অনুরাগী পাঠকগণ ইহা পাঠে আনন্দ লাভ করিবেন। কিন্তু কেবল দশম স্কন্ধে নহে, এই কাব্যের অন্যত্রও কবির কল্পনার মৌলিকতা, ভাষার সরসতা এবং বর্ণনার বৈচিত্র্য পাঠককে মুগ্ধ করে। স্থানাভাববশতঃ কবিচন্দ্রের রচনার কোন নমুনা উদ্ধৃত করা গেল না। কৃষ্ণের বাল্যলীলার অংশটি পড়িলেই আমাদের উক্তির যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন।

কবিচন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঁকুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ ব্যতীতও তাঁহার অন্য পাঁচ খানি গ্রন্থ আছে। অবশ্য এখানি কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এই গ্রন্থ এত দিন হাতের লেখা পুঁথিতেই আবদ্ধ ছিল। কবির পৌত্রের দৌহিত্র-বংশীয় শ্রীমাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের হিতৈষীবর্গের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থের

সম্পাদনে সামান্য কিছু কিছু ত্রুটি থাকিলেও তাহা দুর্জ্ঞেয়ের মধ্যে নহে। ভূমিকায় কবিচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা তথ্যপূর্ণ। কবিচন্দ্রের রচিত ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ মঙ্গলকাব্যগুলির সহিত এক শ্রেণীতে আসন পাইবার যোগ্য, কিন্তু কোন কোন কাব্য অপেক্ষা এক বিষয়ে ইহার উৎকর্ষ দেখা যায়। যেমন বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থে মাঝে মাঝে যেরূপ আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ বর্ণনাদি পাওয়া যায়, কবিচন্দ্র কৃষ্ণের লীলা-বর্ণন প্রসঙ্গেও তেমন কিছুর অবতারণা করেন নাই, অথচ তিনি কোন কাহিনী বাদও দেন নাই। উপস্থিত কাব্য হইতে আমরা তৎকালীন লোকজনের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত জানিতে পারি, যথা নিজ ভাগ্যবতী সপত্নীর নিন্দাপ্রসঙ্গে কোন নারী বলিতেছেন :—

"শাখা ভাঙ্গি পরে মাগী কনকের চুড়ী
দিনে খান দশ পরে তসরের সাড়ী।"—৫০ পৃ.

এই বিলাসবতী মহিলা যিনি দিনে দশ রকমের দশখানা সাড়ী পরিতেন তিনি বসনবৈচিত্র্যপ্রিয় আধুনিকাদের নিন্দাকে অনেক দুর্ব্বল করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীর জীবনে যে ঐশ্বর্য্যের ও ভোগের পরিচয় ছিল তাহা জানিয়া বিস্মিত হই।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

দেহলি—শ্রীহেমলতা দেবী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০। মলাটে সুন্দর একটি ছবি আছে। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৩৫ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকটিতে ছয়টি গল্প আছে—চলাচল, দশমিকা নবমিকা, চন্দ্রমণি, হাটতলা, সুদর্শনের সংসার, ও প্রসাদ। তাহার মধ্যে, চলাচল গল্পটি বড়, পুস্তকটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশব্যাপী।

গ্রন্থকর্ত্রী বহিখানি কথিত বাংলায় লিখিয়াছেন। ভাষা সরল ও সহজ। কোথাও অস্পষ্টতা নাই। আমরা সমুদয় গল্প কৌতূহল ও আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি এবং প্রীত হইয়াছি। বঙ্গের গ্রামগুলি বাংলা দেশের প্রধান অংশ;—সেইগুলিকেই বাংলা দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকখানিতে পল্লীগ্রামের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিবিধ চিত্র আছে। প্রধানতঃ তথাকার নানা রকম মানুষদের কথাই লেখিকা লিখিয়াছেন। এই মানুষগুলির বিচিত্র স্বভাবচরিত্র সব গল্পে পরিস্ফুট হইয়াছে, যেখানে তাহারা থাকে ও চলাফেরা করে তাহাও আমরা যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি এইরূপ মনে হয়। গ্রাম্য জীবনের প্রতি ও সাবেক সংস্কৃতি ও চালচলনের শ্রেষ্ঠ অংশের প্রতি গ্রন্থকর্ত্রীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি এক দিকে যেমন বহিটিতে লক্ষিত হয়, অপর দিকে তেমনি তাহার সহিত নূতন সংস্কৃতি ও জনহিতৈষণার সমন্বয়ীভূত সমাবেশও লক্ষিত হয়। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের প্রকৃত আভিজাত্য, জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতা-জাত সুশিক্ষা ও মননশীলতা এবং ইয়োরোপ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁহার থাকায় এইরূপ কৃতিত্ব তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

নারীদের আর্থিক স্বাবলম্বিতার পথ—যেমন ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীর মেয়েদের দ্বারা ট্যাক্সি চালান—তাঁহার কোন কোন গল্পে অনায়াসে, যেন স্বভাবত, আসিয়া পড়িয়াছে। বি-এ পাস করা পুরুষেরও সেইরূপ কাজও তাঁহার গল্পে স্বাভাবিক মনে হয়।

অনেকে নবজাত ছেলেমেয়ের নূতন ধরণের নাম রাখিতে চান। গ্রন্থকর্ত্রী কয়েকটি সুন্দর নাম উদ্ভাবন করিয়াছেন।

সমাজের মন্দ দিক্‌টা তাঁহার গল্পে একেবারে বাদ পড়ে নাই; কিন্তু তিনি তাহার উল্লেখ এমন ভাবে করিয়াছেন যে, তাহাতে পাঠকের মন প্রলুব্ধ বা কলুষিত হয় না। অথচ বহিটি কোথাও বক্তৃতাভারাক্রান্ত নহে।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা।

এই বৃহৎ অভিধানের ৬২তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। ঐ খণ্ডের শেষ শব্দ "বটুঠাকুর", এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯৭২। সমুদয় সাধারণ গ্রন্থাগারে ও পাঠাগারে, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও উচ্চ-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এবং সঙ্গতিপন্ন লোকদের পারিবারিক গ্রন্থাগারে ইহা রক্ষিত হওয়া উচিত।

দক্ষিণ-ভারত-পথে—শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওআলিস স্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। বহুচিত্র-সংবলিত। চিত্রসূচী থাকিলে ভাল হইত। পুস্তকটিতে শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা আছে। কাপড়ে বাঁধা। ডবলক্রাউন ষোল পেজি ৩০৭+৮ পৃষ্ঠা।

ভারতবর্ষের কেবল উত্তরার্দ্ধ দেখিলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হয় না। কেবল উত্তরার্দ্ধ হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি, ঠিক্ বুঝা যায় না। ভারতবর্ষের ও ভারতীয় সমাজের দোষগুণ, শক্তি ও দুর্বলতা ভাল করিয়া জানিতে হইলে সমগ্র ভারত দেখা আবশ্যক। সমগ্র বিশাল দেশটির প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ও এই উপায়েই হইতে পারে। এই গ্রন্থখানি পড়িলে পাঠকের সেরূপ পরিচয় লাভের ইচ্ছা হইবে। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি ভ্রমণে বাহির হইলে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা আবশ্যক তথ্য তিনি ইহা হইতে পাইবেন।

আচার্য্যের প্রার্থনা। প্রথম ভাগ (১৮৫৭—১৮৭৯ খ্রীঃ)। শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। প্রার্থনানিরত কেশবচন্দ্রের একখানি রঙীন আলেখ্য বিশিষ্ট। ৯৫ নং কলিকাতার কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীটস্থিত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজি ৪০০+১৬+৪ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। মূল্য খুব কম রাখা হইয়াছে।

ইহাতে কেশবচন্দ্রের ৩৬৩টি প্রার্থনা আছে। অধিকাংশ লোক কবিতা লিখিতে পারেন না, কিন্তু প্রকৃত কবিদের অনেক লেখা পড়িলে পাঠকের মনে হয় কবি যেন পাঠকের হৃদয়ের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। সেইরূপ, আমাদের প্রত্যেকেরই নানা দোষত্রুটি অভাব আছে, কি হইলে আমরা আরও ভাল হইতে পারিতাম, আরও আনন্দ পাইতাম, তাহার একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। কিন্তু তৎসমুদয়ের

স্পষ্ট ধারণা না হইলে, অভাব শূন্যতা নীরসতা নিরানন্দ ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। সাধুভক্ত জনের প্রার্থনা-সমূহ এই সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। তৎসমূহের সাহায্যে আমাদের অভাববোধ জন্মিলে আমরা প্রার্থনা-পরায়ণ হইয়া উন্নততর ও অধিকতর আনন্দময় জীবনের অধিকারী হইতে পারি।

কেশবচন্দ্রের প্রার্থনামালা ধর্ম্মজীবনপথের মূল্যবান্ সম্বল।

(১) "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্," (২) "জ্ঞানং সর্ব্বতো মাগিতব্যম্," (৩) নব যুগের নীতি ও ধর্ম্ম—অধ্যাপক শ্রীরজনীকান্ত গুহ প্রণীত। মূল্য যথাক্রমে /০, ৵০, এবং /০ আনা। কলিকাতার ২১১ নং কর্ণওআলিস্ ষ্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

এই পুস্তিকা তিনটি দেখিতে যেরূপ ক্ষুদ্র, তদপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক জ্ঞানের আধার। লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রাদি হইতে যাহা আহরণ করিয়াছেন, নিজ মনন-শক্তি দ্বারা তাহার আলোচনা দ্বারা স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ভগবদ্গীতার একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক, তাহার একাধিক ব্যাখ্যা, এবং শ্লোকটির সদৃশার্থক উক্তি "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" ও "যত মত তত পথ" প্রথম পুস্তিকাটিতে আলোচিত হইয়াছে।

সকল শ্রেণীর সকল প্রকার মানুষের যে সর্ব্বত্র জ্ঞানান্বেষণ আবশ্যক, এই আদর্শ দ্বিতীয় পুস্তিকাটিতে আলোচিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তৃতীয়টিতে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, প্রাচীন ও নবীন নীতি এবং ত্রিবিধ ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

"যে-ধর্ম্ম শুধু তত্ত্ব-বিচারে নয়, কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে অসাম্যকে বিষবৎ বর্জ্জন করে, মৈত্রী যাহার পরম সাধন, এবং মানুষের স্বাধীন বিকাশ যাহার লক্ষ্য,—সেই ধর্ম্মই জাতিতে জাতিতে ঐক্যস্থাপনের উৎকৃষ্ট উপায়।"

"স্বাধীনতা 'সাম্য ও মৈত্রীর কথাও যাহ; ইহার আগেও কথা আছে। ধর্ম্মের সার্থকতা বহিঃপ্রকাশেই নিঃশেষ হয় না। যে প্রেরণা মানুষকে ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনে দেহ মন অর্পণ করিতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহা পুণ্যজীবনের জন্য অতর্পণীয় বুভুক্ষা, hunger for holiness. মানুষ যে দেবতাসম্ভব এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী, তাহার পরিচয় দেয় জ্ঞান পিপাসা ও সৌন্দর্য্যবোধের ঊর্দ্ধে এই শুদ্ধতার আকিঞ্চন। ধর্ম্ম যে-পরিমাণে আত্মাকে ব্রহ্মপ্রকৃতির অনুরূপ করিয়া পুনর্গঠন করিতে সমর্থ, সেই পরিমাণে সত্য। আত্মার জাতসংস্কার, প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন, আকাঙ্ক্ষা-উদ্যমের আমূল সংশোধন, পরমাত্মভাবের অভিমুখে অবিরাম গতি, দ্বিজত্বলাভ—যে-ধর্ম্ম উপাসকের সম্মুখে নিরন্ত এই আদর্শ রাখিয়া তাহাকে পরমসুন্দরের রূপে আকৃষ্ট এবং পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের জন্য আকুল করে, সেই ধর্ম্মই নবযুগের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মেই ভারতের পরিত্রাণ, সেই ধর্ম্মই ভবিষ্যমানবের রক্ষাকবচ—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ
"এই ধর্ম্মের অত্যল্পও মানুষকে মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে।"

গীতা।২।৪০।

"তবুও আমি তাঁহার উপর নির্ভর করিব"—কুমারী এইচ আর হিগেন্সের আত্মজীবনী—শ্রীমথুরানাথ নন্দী বি-এ কর্ত্তৃক অনূদিত। ১০৮ এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

এই বহিখানি যে মহিলার আত্মজীবনী, এক দুশ্চিকিৎস্য ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির জন্য "তাঁহার দক্ষিণহস্ত,—কনুয়ের নীচ পর্য্যন্ত, ও তাহার কিছু কাল পরে, তাঁহার বাম পদ কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। তৎপরে, তাঁহার বাম হস্তেও সেই ব্যাধি দেখা দিয়াছিল, এবং তাহাও রক্ষা করিতে পারা যায় নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরে, তাঁহার দক্ষিণ বাহুর কনুয়ের উপরের যে অংশ ছিল, তাহাও কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এই সকল অত্যধিক ক্লেশকর পরীক্ষার ভিতরেও তিনি আশ্চর্য্য সাহস, ধৈর্য্য ও উপায়োদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার দক্ষিণ বাহু কর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন তিনি বাম হস্তের সাহায্যে লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন কনুইয়ের উপর পর্য্যন্ত বাম বাহুও কাটা হইল, তখন তিনি দুইটি যন্ত্র উদ্ভাবনপূর্ব্বক একটির সাহায্যে দক্ষিণ বাহু দ্বারা লিখিতে এবং অপরটির সহায়তায় বাম বাহু দ্বারা পুস্তকের পাতা উল্টাইতে পারিতেন। এই ভাবে, যে চিকিৎসকের সঙ্গে তিনি বাস করিতেন, তাঁহার সহকারী লেখিকার কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিগত ২৮ বৎসর কাল তাঁহার শারীরিক যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র থাকিলেও, তিনি সকল সময়েই উৎফুল্ল, আনন্দিত এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ থাকিতেন।"

তিনি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বিনী, কিন্তু তাঁহার আত্মজীবনী সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সাম্রাজ্যবাদ কি না

পাথর-বাটি পাথরের কি না, কেহ এই প্রশ্ন করিলে লোকে তাহাকে পাগল বলিবে। কিন্তু ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সে সম্প্রতি এই রকমের একটি কথা প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যবাদী নহে! তিনি ঠিক্ যাহা বলিয়াছেন তাহারই আলোচনা করা যাক্।

গত ২৮শে নবেম্বর পার্লেমেন্টের হাউস অব্ কমন্সে তর্কবিতর্কের সময় শ্রমিক-নেতা মেজর য়্যাটলী ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিকট বহু উচ্চ আদর্শের অনুসরণ দাবী করেন এবং তন্মধ্যে বলেন যে সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার উল্লেখ করিয়া প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব বলেন:

Mr. Attlee had said that Imperialism must be abandoned, but did not say what country he had in mind as practising Imperialism today. If Imperialism means the assertion of racial superiority, suppression of political and economic freedom of other peoples, the exploitation of the resources of other countries for the benefit of the imperialist country, then I say these are not the characteristics of this country, but they are the characteristics of the present administration of Germany.

Whatever may have been the case in the past we have no thought of treating the British Empire on the lines I described. For years it has been the accepted dogma that the administration of the Colonial Empire is a trust which has to be conducted primarily in the interests of the people of the country concerned. We have already undertaken to give free access to the markets and materials of many of our most important Colonies.

তাৎপর্য। মিষ্টার য়্যাটলী বলিয়াছেন সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু তিনি বলেন নাই আজকার দিনে সাম্রাজ্যবাদের কার্যগত অনুসরণ করিতেছে এরূপ কোন্ দেশ মনে রাখিয়া তিনি ওরূপ কথা বলিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ বলিতে যদি বুঝায় কথায় ও কাজে জাতিগত শ্রেষ্ঠতার বিশ্বাসের অনুসরণ, অন্যান্য জাতির রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা দাবাইয়া রাখা, অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী দেশের সুবিধার নিমিত্ত তাহার নিজের কাজে লাগান ও আত্মসাৎ করা, তাহা হইলে আমি বলি এগুলা এই দেশের (ব্রিটেনের) চরিত্রলক্ষণ নহে—এগুলা জার্মেনীর বর্তমান শাসনযন্ত্রের চরিত্রলক্ষণ।

অতীতে যাহাই হইয়া থাকুক, [বর্তমানে] ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে উল্লিখিত রূপ ব্যবহার করিবার কোন ইচ্ছা আমাদের নাই। বহু বৎসর ধরিয়া ইহা একটি অনুমোদিত মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে যে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য আমাদের হাতে ন্যস্ত একটি সম্পত্তি এবং তাহার কার্য তথাকার অধিবাসী লোকদের হিতার্থে নির্বাহ করিতে হইবে। আমরা আমাদের খুব আবশ্যক উপনিবেশগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে অন্য জাতির লোকদিগকে স্বাধীন ভাবে কেনা-বেচা করিতে দিয়াছি।

অল্প কয়েকটি বাক্যের মধ্যে এতগুলি অসত্য কথা বলা ও অসত্যের আভাস দেওয়া বাহাদুরি বটে।

মেজর য়্যাটলী যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেই সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, চেম্বারলেন সাহেব যদি তাহা না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার না-বুঝিবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই অসাধারণ।

সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা মোটামুটি ৪৯ কোটি ৩৩ লক্ষ সত্তর হাজার (৪৯,৩৩,৭০,০০০)। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটির উপর অতএব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের সাত ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগ ভারতবর্ষে বাস করে। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলিতে ভারতবর্ষকে যতটা বুঝায়, অন্য কোন দেশকে ততটা বুঝায় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলিতে ভারতবর্ষকেই প্রধানত বুঝাইবার আরও কারণ আছে। অন্য বড় বড় দেশ ব্রিটেনের অধিকৃত হইয়াছে ভারতবর্ষের উপর অধিকারের জোরে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি সেই সব দেশ এখন আর ব্রিটেনের সম্পত্তি নহে—তাহারা স্বরাট্; ভারতবর্ষের ৩৫ কোটি লোক কিন্তু এখনও ব্রিটেনের দাস এবং তাহাদের দেশ ব্রিটেনের সম্পত্তি।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদনীতি অনুসৃত হয় কিনা দেখা যাক্।

জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আচরণ সাম্রাজ্যিকতার একটি অঙ্গ। সামরিক বিভাগে ভারতীয়েরা নিকৃষ্টস্থানীয়। অল্পসংখ্যক যে ভারতীয় অফিসারেরা সৈন্যদলে আছেন, তাঁহাদিগকে এক জন গোরার উপরও নেতৃত্ব করিতে দেওয়া হয় না। কবে যে সব অফিসার ভারতীয় হইবে, তাহা কল্পনা করিতে ও তাহার একটা আভাস দিতে পর্য্যন্ত প্রভুজাতির প্রতিনিধিরা অসমর্থ।

অ-সামরিক বিভাগে গবর্ণর-জেনার্যাল ইংরেজ, সব গবর্ণর ইংরেজ। 'বিড়ালের ভাগ্যে' এক বার এক লর্ড সিংহ স্থায়ী গবর্ণর হইয়াছিলেন, কিন্তু অধস্তন ও অন্য ইংরেজ রাজপুরুষদের ব্যবহার বরদাস্ত করিতে না পারিয়া তিনি কাজে ইস্তফা দেন।

গবর্ণরের এক্টিনি কোন কোন প্রদেশে কোন কোন ভারতীয় স্বল্প কালের জন্য করিয়াছে বটে, কিন্তু 'পুরা-টিনি' কাহারও ভাগ্যে জুটে নাই, এবং কার্য্যদক্ষতায় ও কার্যকালের দৈর্ঘ্য হিসাবে যোগ্যতর ভারতীয়কে ডিঙাইয়া নিম্নস্থানীয় ইংরেজকে গবর্ণরের ও অন্য বড় কাজের এক্টিনি দেওয়া হইয়াছে, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

কি সামরিক কি অসামরিক উভয় বিভাগে অধিকাংশ উচ্চ বেতনের উচ্চ পদ ইংরেজদের অধিকৃত—যদিও ইহা মোটামুটি সত্য যে সব কাজেরই উপযুক্ত ভারতীয় আছে বা শিক্ষার সুযোগ দিয়া বহু পূর্ব্বেই প্রস্তুত করা যাইত।

রাষ্ট্রীয় এবং বাণিজ্য পণ্যশিল্প যানবাহনাদি আর্থিক ব্যাপারে অধীন জাতির স্বাধীনতা দাবাইয়া রাখা সাম্রাজ্যবাদের আর একটা লক্ষণ। ভারতবর্ষে এই উপসর্গের দৃষ্টান্ত দেওয়া কি আবশ্যক? রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যে আমাদের নাই, তাহা ত সুস্পষ্ট। প্রধানত কংগ্রেস ত **কেবল স্বাধীনতার একটু প্রতিশ্রুতি পাইবার নিমিত্ত** মাথা খুঁড়িতেছেন। স্বাধীনতা পাওয়া ত দূরের কথা।

বাণিজ্য প্রধানত কাহাদের হাতে? যে ইম্পীরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজকে বিশাল রাসায়নিক একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সেটা কোন্ দেশের লোকের? বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং দেশের মধ্যের জলবাহিত বাণিজ্য প্রধানত কাহাদের হাতে? ইংরেজরা এদেশে আসিবার আগে ভারতবর্ষের রেলগাড়ী ছিল না সত্য, কিন্তু কোম্পানীর আমলের গোড়াতেও ভারতবর্ষে হাজারটা বন্দর ছিল এবং অনেক হাজার ছোট বড় জাহাজ ছিল। সেগুলা কেমন করিয়া অন্তর্হিত হইল তাহার ইতিহাস ডিগবী সাহেবের "ঐশ্বর্য্যশালী ভারত" ("Prosperous India") গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষের নৈসর্গিক সম্পদ ব্রিটেন যে নিজের কাজে লাগাইয়াছেন, ব্রিটেনের অসাধারণ ঐশ্বর্য্যই তাহার প্রমাণ। এই যে নিজের কাজে লাগাইবার ক্ষমতা, ইহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত নূতন (১৯৩৫ সালের) ভারতশাসন আইনের পঞ্চম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়টি "(Provisions with Respect to Discriminations, &c.") প্রণীত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতশাসন আইনে এরূপ একটি অধ্যায় ছিল না। স্বশাসক প্রত্যেক দেশের গবর্মেণ্ট ও লোক আপনাদের দেশ ও জাতির বাণিজ্য ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও সংরক্ষণের নিমিত্ত বিদেশী অপেক্ষা স্বদেশী লোকদিগকে কোন-না-কোন সময়ে অধিকতর সুবিধা দিয়াছে বা এখনও দিতেছে। যে কোন সময়ে এরূপ করিবার ক্ষমতা ও অধিকার তাহাদের আছে। পাছে ভারতবর্ষের লোকেরা সামান্য কিছু স্বশাসন ক্ষমতা পাইয়া ঐরূপ কিছু করে, সেই জন্য ভারতশাসন আইনে ঐ অধ্যায়টি যুক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটেন যে সাম্রাজ্যবাদী, তাহা নিঃসন্দেহ, এবং সে বিষয়ে স্থূল কয়েকটি প্রমাণ দিলাম। চেম্বারলেন সাহেব আপনাদের ঘাড় থেকে সাম্রাজ্যবাদের অপবাদের বোঝা নামাইয়া হিটলারের ঘাড়ে চাপাইতে চান। হিটলারের দোষ ক্ষালন বা হিটলারকে অধিকতর মসীলিপ্ত করিবার মাথাব্যথা আমাদের নাই—সে ব্যক্তি ত "স্বখাত সলিলে" নিমজ্জমান। আমরা নিজেদের দুর্গতির বোঝাতেই অবসন্ন ও বিপন্ন।

—

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য সম্বন্ধে মিঃ চেম্বারলেনের উক্তি

সাম্রাজ্যবাদের লক্ষণগুলি নির্দেশ করিবার পর চেম্বারলেন সাহেব ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কার্য নির্বাহের নীতি নির্দেশ করিয়াছেন—চতুরতার সহিত ভারতবর্ষের উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন উপনিবেশগুলির আদি অধিবাসীদের জন্যই সেগুলির কার্য নির্বাহ করা ব্রিটিশ নীতি বলিয়া গৃহীত, ব্রিটিশ জাতি তাহাদের অছি (trustee) মাত্র। এই অছিত্বের মহিমা আমরা বহুবার শুনিয়াছি। ঐ নীতিটার কথাও শুনিয়াছি, কিন্তু উহা মুখে ও কাগজে আছে, আচরণে নহে। তুমি যাহাদের অছি, তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে তবেই অছিত্ব করা যায়, অছিত্ব সার্থক হয়। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে এবং আফ্রিকায় ইউরোপীয় জাতিদের সংস্পর্শে আদিম জাতিদের লোকসংখ্যা শোচনীয় রূপে হ্রাস পাইয়াছে, অনেক জাতি লোপ পাইয়াছে। যাহারা অল্প সংখ্যায় আছে, কোথাও তাহাদের জমীতে ও অর্থাগমের অন্য উপায়ে শ্বেতকায়দের সমান অধিকার নাই। কেনিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে ভাল ভূখণ্ডগুলি ইউরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট;—তাহারা যে শ্রেষ্ঠ জাতি! অথচ মিঃ চেম্বারলেন বলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জাতিগত শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস অনুসারে পরিচালিত নহে!

অছিত্ব এইরূপ।

কোন কোন উপনিবেশে ব্রিটিশ জাতি অন্য স্বাধীন পাশ্চাত্য জাতিদিগকে কেনা-বেচার সুবিধা দিয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে আদিম নিবাসীদের কোন সুবিধা হয় নাই—একটা এক্সপ্লইটিং জাতির জায়গায় অনেকগুলা এক্সপ্লইটিং জাতি জুটিয়াছে মাত্র। অন্য দিকে কেনিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে ভারতীয় বাণিজ্যজীবী ও শ্রমজীবীদিগকে মানবীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া পরোক্ষ ভাবে তাহাদিগকে সেই সেই দেশ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

—

অতিকঠোর কর্তব্য হইতে ভারতের ব্রিটেনকে নিষ্কৃতি দান

গত ২৫শে নবেম্বর চেম্বারলেন সাহেব বর্তমান যুদ্ধে এবং যুদ্ধের অবসানে শান্তি স্থাপনে ব্রিটেনের লক্ষ্য সম্বন্ধে রেডিয়োতে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি অংশতঃ বলেন:—

"We entered the war to defend freedom and establish peace, the two vital principles of our Empire."

"আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং শান্তি স্থাপনার্থ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম—এই দুটি আমাদের সাম্রাজ্যের জীবন্ত নীতি।"

পোল্যাণ্ডের মত একটি অপেক্ষাকৃত ছোট দেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত ব্রিটেন যুদ্ধ আরম্ভ করেন, এবং সেই যুদ্ধে ইংরেজ জাতির প্রত্যহ আট কোটি টাকা খরচ হইতেছে এবং অনেক জাহাজ জলমগ্ন ও মানুষ নিহত হইতেছে—ইংরেজ রাজপুরুষদের প্রমুখাৎ এবং পাশ্চাত্য সংবাদ-বিতরকদের নিকট হইতে ইহা আমরা অবগত হইতেছি। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ছিল বলিয়াই তাহা রক্ষার নিমিত্ত এই অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও বিপৎসঙ্কুল যুদ্ধে ব্রিটেনকে নামিতে হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশের স্বাধীনতা থাকিত, এবং তাহা কোন বিদেশী শত্রু কর্তৃক বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইত, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষাও বহুগুণে ভয়াবহ ও ব্যয়সাপেক্ষ যুদ্ধ ব্রিটেনকে করিতে হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নাই—সে তাহা বিসর্জন দিয়াছে; সুতরাং তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রিটেনকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে না। অতএব দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ অত্যন্ত কঠোর কর্তব্য সাধন হইতে ব্রিটেনকে নিষ্কৃতি দিয়াছে। ব্রিটেনের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

—

ইংলণ্ডেশ্বরের বক্তৃতায় ভারতের অনুল্লেখ

গত ২৩শে নবেম্বর যখন কয়েক দিনের জন্য পার্লেমেণ্টের অধিবেশন স্থগিত হয় তখন ইংলণ্ডেশ্বরের অনুপস্থিতি হেতু তাঁহার বক্তৃতা লর্ড চ্যান্সেলর

কর্তৃক পঠিত হয়। ২৮শে নবেম্বর যখন পার্লেমেণ্টের অধিবেশন আবার আরম্ভ হয়, তখন ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করেন। প্রথমোক্ত বক্তৃতা এবং পরবর্ত্তী বক্তৃতা হইতে দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"The spontaneous decision of our Dominions to participate in the conflict and the valuable help which they are giving and are about to give to the common cause is an encouragement to me."

"My Dominions overseas are participating wholeheartedly and with the most gratifying effectiveness."

তাৎপর্য। "বিরোধে যোগ দিতে আমাদের ডোমীনিয়নগুলির স্বেচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত এবং সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা যে মূল্যবান সাহায্য দিতেছে এবং শীঘ্রই দিবে, তাহা আমার পক্ষে উৎসাহজনক হইয়াছে।"

"সাগর-পারের আমার ডোমীনিয়নগুলি সর্ব্বান্তঃকরণে এবং অধিকতম সন্তোষজনক ভাবে [যুদ্ধে] অংশী হইতেছে।"

ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহার বক্তৃতা দুটিতে ভারতবর্ষের কোন উল্লেখ করেন নাই। ডোমীনিয়নগুলি সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও তাহা বলিতে পারিলেই জগদ্বাসীর সমক্ষে ভারত সম্পর্কে বলিবার মত কথা বলা হইত। কিন্তু সেরূপ বলিলে সত্য কথা বলা হইত না। এই জন্য, তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নির্ব্বাক থাকিয়া যে সত্যভাষিতার পরিচয় দিয়াছেন, ভারতবর্ষ তাহার গুণগ্রাহী।

ব্রিটেন আগে ইয়োরোপ ঠিক করিতে চান

গত ২৮শে নবেম্বর পার্লেমেণ্টের হাউস অব কমন্সে যে বিতর্ক হয়, সেই উপলক্ষ্যে প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব বলেন :

"We have not entered this war with a vindictive purpose and we do not, therefore, intend to impose a vindictive peace. What we say is that first of all we must put an end to this menace, under which Europe has lain for so many years. If we can really do that, if confidence can be established throughout Europe, then, whilst I am not excluding the necessity of dealing with other parts of the world, still I feel that Europe is the key to the situation and if Europe can be settled the rest of the world would not prove so difficult a problem."

তাৎপর্য। "প্রতিহিংসামূলক উদ্দেশ্যে আমরা এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই; অতএব প্রতিহিংসাপূর্ণ শান্তি-সর্ত্ত কাহারও উপর চাপাইবার অভিপ্রায় আমাদের নাই। আমরা যাহা বলি তাহা এই যে, যে বিপদভয় এত বৎসর ইয়োরোপের মাথার উপর ঝুলিতেছে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার আবশ্যকতা আমি বাদ দিতেছি না, তথাপি আমি অনুভব করিতেছি যে সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির কেন্দ্র ইয়োরোপ। যদি আমরা ইয়োরোপের ভয়ের উচ্ছেদ বাস্তবিক করিতে পারি, যদি ইয়োরোপময় নিঃশঙ্কতার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যদি ইয়োরোপ ঠিক্ করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ এত কঠিন সমস্যা রূপে দেখা দিবে না।"

ইয়োরোপের বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থার উদ্ভব কেমন করিয়া হইল, তাহা বিশদ ভাবে বর্ণনা করিতে গেলে একখানা ছোটখাট ইতিহাস ফাঁদিতে হয়। তাহা এখানে করা চলিবে না। অতীতে বেশী দূর না গিয়া এবং অনেকগুলা কারণের উল্লেখ না করিয়া জার্মেনীর অশান্ততা ও দুরন্ততার একটা কারণ বলি।

জার্মেনী ঐশ্বর্য্য চায়, ধনদৌলত চায়। বিস্তৃত উপনিবেশ হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করিয়া কারখানায় তাহা হইতে পণ্য প্রস্তুত করিতে না পারিলে এবং বড় একটা সাম্রাজ্যে তাহার কারখানাজাত জিনিষপত্র বেচিতে না পারিলে জার্মেনী মনোমত ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে না। কিন্তু উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যস্থাপন প্রবল পরাক্রমের ব্যাপার। তাই জার্মেনী আশপাশের প্রতিবেশী দেশ যতগুলি পারিতেছে গ্রাস করিয়া বলী হইতে চাহিতেছে; তাহার পর সে উপনিবেশ দাবী ও সাম্রাজ্য বিস্তার চেষ্টা ফলপ্রদভাবে করিতে পারিবে।

চেম্বারলেন সাহেব আগে ইয়োরোপ ঠিক করিতে চান, পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ পরে ব্রিটেনের মনোযোগ পাইবে। কিন্তু ইয়োরোপ ঠিক করিতে হইলে, যাহাকে লইয়া বর্ত্তমান হাঙ্গামার সৃষ্টি সেই জার্মেনীকে ঠাণ্ডা করিতে হইবে। তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার উপায় দু-রকম—তাহাকে পরাস্ত ও জব্দ করা, কিংবা সে যাহা চায় তাই তাহাকে দেওয়া। কিন্তু চেম্বারলেন সাহেব নিজেই ত বলিয়াছেন, প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় এরূপ শান্তিসর্ত্ত তাহার ঘাড়ে চাপাইবার ইচ্ছা ব্রিটেনের নাই—এবং জার্মেনীকে এক বার পরাস্ত ও জব্দ করিয়া তাঁহারা ত দেখিয়াছেন কাহাকেও চিরতরে অধঃপাতিত রাখা যায় না। সুতরাং দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করা যায় কি না ভাবিতে

হইবে—ভাবিতে হইবে জার্ম্মেনী বর্ত্তমান যুদ্ধে পরাস্ত হইলেও তাহাকে উপনিবেশ দেওয়া যায় কি না। আফ্রিকায় ও এশিয়ায় তাহাকে না-হয় উপনিবেশ দিলেন ধরা যাক্—কেন না এশিয়া ও আফ্রিকার লোকেরা মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে। কিন্তু তাহাকে কি পোল্যাণ্ডের অংশটা রাখিতে দিবেন? অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি রাখিতে দিবেন? তাহা হইলে, ব্রিটেন যে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন বলিতেছেন, সে কথায় সার্থকতা ত ইয়োরোপেও থাকে না। ধরিয়া লওয়া যাক্ যে, জার্ম্মেনী ইয়োরোপে যাহা লইয়াছে তাহা রাখিতে পাইবে এবং এশিয়া ও আফ্রিকাতে উপনিবেশও পাইবে। তাহা হইলে ব্রিটেন যুদ্ধ থামাইয়া দিন না? তাহার পর এই প্রকারে যদি বা জার্ম্মেনীকে ঠাণ্ডা করা যায়, তাহা হইলে রুশিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের মামলার কি হইবে? রুশিয়ার ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবার যে আশঙ্কা অন্যেরা ও আমরা আগে হইতে করিয়া আসিতেছি, সে বিষয়ে কি সতর্কতা অবলম্বিত হইবে?

পাছে পস্তাইতে হয় সেই ভয়ে ইটালী যে উসখুস করিতেছে, তাহারই বা কি ব্যবস্থা হইবে?

আচ্ছা, যে-কোন প্রকারে না-হোক ইয়োরোপ ঠিক করা গেল। ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদগ্রস্ত জাপান সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে?

অতএব দেখা যাইতেছে, বাহুবল অস্ত্রবল দ্বারা, কিংবা উপনিবেশ ঘুষ দিয়া, কিংবা উভয় উপায়ের সমাবেশে ইয়োরোপকে ঠিক্ করা সোজা নয়।

এখন ইয়োরোপের বাহিরের পৃথিবীটা ঠিক্ করার কথা ভাবিয়া দেখা যাক্।

—

ইয়োরোপবর্জ্জিত পৃথিবী "ঠিক্ করা"

ইয়োরোপ বাদ দিলে পৃথিবীর তিনটি মহাদেশ বাকী থাকে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকা। অষ্ট্রেলেসিয়াকেও একটা মহাদেশ বলা যাইতে পারে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েক শতাব্দী আগেই ইয়োরোপের কোন কোন জাতি গিয়া তথাকার দেশগুলি দখল করিয়াছিল এবং তথাকার আদিম জাতিগুলিকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছিল। এখন আর নূতন করিয়া ইয়োরোপের কোন জাতি আমেরিকাদ্বয়ে গিয়া তাহার কোন অংশ জয় করিতে পারে না। যে-সব ইউরোপীয় জাতি আগে আমেরিকাদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশ জয় করিয়াছিল তাহারা এখন আর সে সব অংশের মালিক নহে—অংশগুলি স্বাধীন হইয়া গিয়াছে। কানাডাও নামে মাত্র ব্রিটেনের অধীন, বস্তুত স্বাধীন।

আমেরিকাদ্বয়ের কোন সমস্যায় ইয়োরোপের কোন জাতির হস্তক্ষেপ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সহ্য করিবে না—অন্যান্য আমেরিকান রাষ্ট্রও তাহা সহ্য করিবে না। অতএব আমেরিকাদ্বয়কে "ঠিক্ করিবার" ভার ইয়োরোপকে লইতে হইবে না।

অষ্ট্রেলেসিয়াও আমেরিকাদ্বয়ের মত ইয়োরোপীয়দের দ্বারা প্রায় "ঠিক" হইয়া গিয়াছে—আদিম নিবাসীরা প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে এবং সমস্ত ভূখণ্ড শ্বেতকায়দের দেশে পরিণত হইয়াছে। কোন ইয়োরোপীয় জাতি দ্বারা নূতন করিয়া অষ্ট্রেলেসিয়ার কোন অংশ জয়ের অবসর ও সম্ভাবনা নাই। তবে একটা সমস্যার উদ্ভব অসম্ভব নহে। চীনের ব্যাপার কোন রকমে শেষ হইয়া গেলে জাপানীরা অষ্ট্রেলেসিয়ায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে পারে।

এশিয়ার বড় বড় অংশ পরাধীন—ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা, সাইরিয়া প্রভৃতি। ইংরেজ ও ফরাসীরা মনে করিতে পারে, তাহারা এশিয়ার নিজের নিজের অধিকৃত অংশ আপনাদের অধীন রাখিয়াও জার্ম্মেনী প্রভৃতিকে কোথাও কিছু দিয়া ঠাণ্ডা করিতে পারিবে। কিন্তু ইহা তাহাদের ভুল। ব্রিটেনের বড় সাম্রাজ্য, এবং তাহার নীচে ফ্রান্সের বড় সাম্রাজ্য, আছে বলিয়াই ত জার্ম্মেনীর ও ইটালীর সাম্রাজ্যিকতা উগ্র হইয়া আছে। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিজেদের সাম্রাজ্য বজায় ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অন্যদের ভূমি-ক্ষুধার নিবৃত্তি বা দমন করিতে পারিবে না।

কিন্তু যদি তাহা পারে এরূপ অনুমান করা যায়, তাহা হইলেও এশিয়াস্থিত ব্রিটিশ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের লোকেরা অধীনতায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে

মনে করা মহাভ্রম। ফ্রান্সের অধিকৃত ইন্দোচীনে স্বাধীনতালিপ্সু স্বাজাতিক দল (ন্যাশন্যালিস্ট) আছে, হল্যাণ্ডের অধিকৃত জাভা প্রভৃতিতেও সেরূপ দল আছে; ভারতবর্ষের স্বাজাতিকেরা তাহাদের খবর রাখেন না। আরব স্বাজাতিকদের কথা তবু কতকটা আমরা জানি।

আর, আমরা ভারতবর্ষের লোকেরা ত স্পষ্ট ভাষায় স্বাধীনতার দাবী করিয়াছিই। স্বাধীনতা না পাইলে এই দাবী মিটিবার নয়।

পৃথিবীর যে-সকল জাতি এখন অশিক্ষিত ও অসভ্য এবং পরাধীন, তাহাদের সম্পূর্ণ বিনাশ বা বেশী রকম সংখ্যাহ্রাস না-ঘটাইতে পারিলে তাহারা স্বাধীনতার দাবী করিবেই করিবে; ইয়োরোপীয়েরা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন না।

ব্রিটেন, পোর্টুগ্যাল, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালী, জার্মেনী ইহারা আফ্রিকা ভাগ করিয়া লইয়াছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকা নামে ব্রিটিশ উপনিবেশ হইলেও এখন বাস্তবিক স্বাধীন। রোডেসিয়া প্রভৃতিও ডোমীনিয়ন-স্বাধীনতা চাহিতেছে। মিশর এক রকম স্বাধীন হইয়াছে এবং সেখানে স্বাজাতিকতা খুব প্রবল। ইটালী আবিসীনিয়া দখল করিয়াছে বলে বটে, কিন্তু সেখানে তথাকার স্বাজাতিকেরা এখনও খুব যুদ্ধ করিতেছে। আফ্রিকার অন্যান্য অংশের ভাগাভাগির কিছু পরিবর্ত্তন দ্বারা, কোন কোন টুকরা জার্মেনীকে দিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহার দ্বারা স্থানীয় স্বাজাতিকতার উদ্ভব প্রবলতালাভ বন্ধ করা যাইবে না।

সর্বোপরি শেষ কথা এই: এশিয়া ও আফ্রিকার লোকেরাও মানুষ। তাহারা স্বাধীনতার দাবী এখনই বা পরে করুক বা না করুক, তাহাদিগকে পরাধীন রাখা বা নূতন করিয়া পরাধীন করা ও তাহাদের দেশের নৈসর্গিক সম্পদ হস্তগত করা কোন্ ধর্ম্মনীতির ন্যায়নীতির অনুমোদিত?

পুরোহিততন্ত্র সামন্ততন্ত্র গণতন্ত্র

যে-সকল দেশে এখন গণতন্ত্র (democracy) বস্তুত সম্পূর্ণরূপে বা বহু পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে কোন-না-কোন সময়ে পুরোহিততন্ত্র (theocracy) কিংবা সামন্ততন্ত্র, বা উভয়ই, প্রচলিত ছিল। জাপানে সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। যাহাদিগকে সেই দেশের ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে সেই সামুরাইদের প্রভূত ক্ষমতা এবং অনেক বিশেষ অধিকার ছিল। তাহারা স্বেচ্ছায় তাহা ত্যাগ করায় এবং জাপানের অস্পৃশ্য জাতি "এতা"দের অস্পৃশ্যতা আইন দ্বারা দূরীভূত হওয়ায় তবে জাপানে কতকটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইয়োরোপের বহু দেশে খ্রীষ্টীয় পুরোহিতদের বিশেষ কতকগুলি অধিকার ছিল। ভারতবর্ষের কোন কোন স্মৃতিতে যেমন ব্রাহ্মণরা অপরাধ করিলে তাহার দণ্ড না হইবার বা লঘু দণ্ড হইবার বিধান আছে, ইয়োরোপের খ্রীষ্টীয় দেশসকলেও পাদরীদের অপরাধ সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কেহ গুরুতর অপরাধ করিয়া গির্জ্জায় আশ্রয় লইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা চলিত না।

জার্মেনীতে লুথার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্কার চেষ্টা করায় তদ্দ্বারা পুরোহিততন্ত্রের উচ্ছেদ ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতও হইয়াছিল। ব্রিটেনে অষ্টম হেনরী নিজের প্রথম ও তৃতীয় রিপু চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পোপকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল এবং মঠগুলির সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটেনে পুরোহিততন্ত্রের যে কোন দোষ ছিল না, তাহা নহে। সেখানে পুরোহিতদের ক্ষমতাহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিকতা কতকটা অগ্রসর হইতে থাকে।

ইয়োরোপের অনেক দেশেই অতীত কালে এইরূপ সামন্ততন্ত্রের (feudalismএর) প্রভাব যেমন কমিতে থাকে, গণতান্ত্রিকতার প্রভাবও তেমনই বাড়িতে থাকে। জার্মেনীর দস্যু ব্যারন [illegible]কারীরা (robber barons) নিজ নিজ দুর্গে রাজা[illegible]তা ভোগ করিত ও খাটাইত। ব্রিটেনের ফিউড্যা[illegible] (feudal lord) নামধেয় সামন্তদের ক্ষমতা, এবং আচরণও, অনেকটা জার্মেনীর ব্যারনদের মত ছিল। এখন ব্রিটেনে লর্ড অনেকে আছে, তাহাদের অনেকের ধনমানও আছে, কিন্তু সাবেক সামন্তদের মত ক্ষমতা তাহাদের নাই। থাকিলে, ব্রিটেন যতটা গণতান্ত্রিক হইয়াছে, ততটা হইতে পারিত না।

কারণ, সামন্ততন্ত্রের তিরোভাব ব্যতিরেকে গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয় না।

রুশিয়ার বিপ্লবে যুগপৎ পুরোহিতদের ও অভিজাতদের উচ্ছেদ হইয়াছে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

ইয়োরোপের খ্রীষ্টীয় দেশগুলিতেই যে কেবল পুরোহিততন্ত্রের তিরোভাব ও গণতন্ত্রের আবির্ভাব লক্ষিত হয়, তাহা নহে। মুসলমান রাষ্ট্র তুরস্কেও তাহা লক্ষিত হয়। বিশুদ্ধ ইসলামে পুরোহিত নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলমানপ্রধান দেশসমূহে মোল্লাদের প্রভাব খুব বেশী ছিল বা আছে। কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে গণতন্ত্র স্থায়ী করিবার নিমিত্ত যেমন খিলাফতের উচ্ছেদ করেন সেইরূপ মুসলমান মোল্লা ও ধর্মোপদেষ্টাদের প্রভাবও বিনষ্ট করেন। আগে তুরস্কের সুলতান পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান সমাজের ধর্মনেতা খলিফা ছিলেন। এখন খলিফা কেহ নাই। তুরস্কে এখন কাহারও খলিফা হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন যদি অন্য কোন মুসলমানপ্রধান দেশে কোন নৃপতি খলিফা হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে দেশ গণতান্ত্রিকতার বিপরীত দিকে যাইতেছে। ইরান মুসলমান-প্রধান দেশ, কিন্তু সেখানে ধর্মান্ধতা ও মোল্লাদের প্রভাব নাই। কামাল আতাতুর্ক কেবল যে খিলাফতের এবং মোল্লাদের প্রভাবের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে বিচারের পরিবর্তে আধুনিক পাশ্চাত্য ব্যবস্থাবিজ্ঞানসম্মত আইন প্রণয়ন করাইয়া ও চালাইয়া গিয়াছেন।

—

ভারতবর্ষে গণতন্ত্র স্থাপন

ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকেরা এদেশে গণতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা চান। তাঁহাদের এই আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য। ভারতবর্ষে প্রকৃত গণতন্ত্র কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। তাহার প্রারম্ভিক একটা কাজ ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট দ্বারা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কেবল উত্তরাধিকার-সম্পর্কীয় প্রশ্নের বিচার এখন যে ব্যক্তি যে ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ তাহার ধর্মশাস্ত্র অনুসারে হয় (সে ক্ষেত্রেও গবর্মেণ্ট অসাম্প্রদায়িক ইণ্ডিয়ান সাক্সেশ্যন য়্যাক্ট প্রণয়ন করিয়াছেন)। অন্য সব মামলার মীমাংসা মনুস্মৃতি বা বাইবেল বা কোরান প্রভৃতি অনুসারে হয় না, আধুনিক আইন অনুসারে হয়—তা সে মোকদ্দমা দেওয়ানী হউক বা ফৌজদারীই হউক; এবং এই সকল আধুনিক আইন সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান মুসলমান প্রভৃতি কোন ধর্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। ইহাতে এই ফল হইয়াছে যে, বৈষয়িক ও অন্য লৌকিক বিস্তর ব্যাপারে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের, খ্রীষ্টীয়ান পাদরীর ও মুসলমান মোল্লার কোন হাত নাই; যিনি যে ধর্মেরই লোক হউন, যে জাতেরই হউন, আইন ও বিচার সকলের পক্ষে এক। এই সমতা গণতন্ত্রের একটি লক্ষণ। এখন অবিচার ও পক্ষপাত হয় না, বলিতেছি না; কিন্তু নিয়ম সকলের পক্ষে এক।

কিন্তু গণতন্ত্রের বনিয়াদ পাকা করিতে হইলে রাষ্ট্রের কাঠামো ও গড়ন যেমন গণতান্ত্রিক হওয়া চাই, সমাজের গড়ন ও কাঠামোও তেমনি গণতান্ত্রিক হওয়া আবশ্যক। অ-গণতান্ত্রিক সমাজে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থায়ী হইতে পারে না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলে সমান, প্রত্যেকের এক ভোট ("one throat, one vote")—গণতন্ত্রের ইহাই নিয়ম। এই রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা ছাঁচের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে হইলে সামাজিক সাম্যও চাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হিন্দুসমাজের কথা ধরুন। এমন হইলে চলিবে না যে, ব্রাহ্মণ সকলের চেয়ে বড় জা'ত ও 'আর সব জা'ত তাহার পদধূলি পাইলে ভাগ্যবান, এবং কতক জা'ত এমন যে ব্রাহ্মণের পা ছুঁইয়া ধুলা লইবারও অধিকারী তাহারা নহে;—জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপে ভাঙিতে হইবে। নতুবা গণতন্ত্র কাঁচা থাকিবে। আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক বলিয়াই যে এই কথা বলিতেছি তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত বিঠল রাম শিন্দের প্রস্তাব অনুসারে মহাত্মা গান্ধী জাতিভেদের নিকৃষ্টতম অঙ্গ যে অস্পৃশ্যতা কেবল তাহাই কংগ্রেসের কৃত্যতালিকাভুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি জাতিভেদও ভাঙিয়াছেন। হাজার হাজার ব্রাহ্মণ তাঁহার পায়ের ধুলা লইতেছে, এবং তিনি

জাতিতে গন্ধবণিক হইলেও এক পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচার্য্যের কন্যার সহিত। হিন্দু মিশন বহু অসবর্ণ বিবাহ দিতেছেন, তাহার নেতা স্বামী সত্যানন্দ এই মত অসঙ্কোচে প্রকাশ করেন যে, জাতিভেদ সমূলে ভাঙিতে হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের শেষ যে অধিবেশন খুলনায় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অসবর্ণ-বিবাহ-সমর্থক প্রস্তাব গৃহীত হইয়া রহিয়াছে। পুরোহিততন্ত্র আর এক দিক দিয়াও ভাঙিয়া পড়িতেছে ;—দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা 'সর্বজনীন' হওয়ায় যে-কোন জাতের লোক মন্ত্র পাঠ, অঞ্জলি দান, ভোগ রন্ধন এবং ভোজে পরিবেষণ করিতেছে। অতএব আধুনিক কালে ব্রাহ্মসমাজ সমাজকে কাঠামোতে ও গড়নে গণতান্ত্রিক করিবার যে চেষ্টা আরম্ভ করেন, তাহা ক্রমশ ব্যাপকতর হইতেছে।

মুসলমানদের শাস্ত্র অনুসারে পৌরোহিত্য নাই তাহা আগে বলিয়াছি ; তদনুসারে মুসলমান সমাজে জাতিভেদও (এবং অস্পৃশ্যতাও) নাই ; কিন্তু ব্যবহারে রহিয়াছে। গণতান্ত্রিকতা পাকা করিতে হইলে মুসলমান সমাজে পৌরোহিত্য, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ করিতে হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান সমাজেও এইরূপ অগণতান্ত্রিক যাহা আছে, তাহার লোপ সাধন করিতে হইবে।

আগে ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত হইতে দেখাইয়াছি যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পুরোহিততন্ত্র ও সামন্ত-তন্ত্রের উচ্ছেদ আবশ্যক। ভারতবর্ষেও সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত পুরোহিততন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের লোপ আবশ্যক। পুরোহিততন্ত্রের কথা উপরে বলিলাম। এখন সামন্ততন্ত্রের কথা।

বাংলা বিহার প্রভৃতি প্রদেশে যে সকল জমিদার আছেন, তাঁহারা সামন্ত নহেন। তাঁহারা এক সময়ে তাঁহাদের জমিদারী শাসন করিতেন বটে ; কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ নৃপতিবংশোদ্ভূত নহেন, শাসকবংশোদ্ভূত নহেন। এখন ভারতবর্ষে যে-সকল দেশী রাজ্য আছে, তাহার নৃপতিরা সামন্তে পরিণত হইয়াছেন—যদিও তাঁহাদের অনেকের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বাধীন রাজা ছিলেন। হয়ত যখন ভারতবর্ষে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন দেশী রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু আপাতত এমন একটি মধ্য অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে যাহা গণতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যহীন নহে। ব্রিটেনে রাজা আছেন, অথচ ব্রিটেন যে মোটেই গণতন্ত্র নহে, এমন বলা যায় না। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে সব দেশী রাজ্য আগে স্বাধীন নৃপতির শাসিত স্বাধীন দেশ ছিল, সেই সকল দেশী রাজ্যের নৃপতিরা নিজ নিজ রাজ্যে যদি ব্রিটেনের অনুরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করেন এবং নিজেরা ইংলণ্ডেশ্বরের মত নিয়মতান্ত্রিক ভূপতি (constitutional ruler) হন, তাহা হইলে তাঁহাদের রাজ্যগুলি গণতন্ত্র ভূখণ্ডে পরিণত হইতে পারে। অবশ্য অতিক্ষুদ্র যে-সব দেশী রাজ্য আছে, সেগুলি আধুনিক উন্নত গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর ভার বহনে অসমর্থ ; আমরা যে গণতান্ত্রিক মধ্য অবস্থা অনুমান করিয়াছি, সেই অবস্থাতেও তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না।

—

জনাব জিন্না সাহেবের মুক্তি

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আটটি প্রদেশে পদত্যাগ করায় জনাব জিন্না সাহেব উল্লসিত হইয়া আগামী ৬ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর) মুসলমান সম্প্রদায়কে তাহার স্মারক "মুক্তি দিবস" পালন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা কিরূপ মুক্তি তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা অকৃতকার্য্য হইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন নাই, কেহ তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেয় নাই, ভারতসচিব হইতে আরম্ভ করিয়া গবর্ণর পর্য্যন্ত রাজপুরুষেরা তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সম্মতি পাইলে গবর্ণরেরা এখনই আবার তাঁহাদিগকে মন্ত্রী করিবেন। সুতরাং জনাব জিন্না সাহেব এখনও বলিতে পারেন না যে, আটটি প্রদেশের মুসলমানরা মুক্তি পাইয়াছে। যে-কোন সময়ে তাহাদের "মুক্তি"র পরিবর্ত্তে "বন্ধন" আসিতে পারে।

জনাব জিন্না সাহেব কিংবা তাঁহার কোন মুসলমান সহকর্মী বা অনুচর এ পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতে পারেন নাই

যে, একটি স্থলেও কংগ্রেসী কোন গবর্ন্মেণ্ট মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কংগ্রেসী প্রদেশের মুসলমান মন্ত্রীরা অত্যাচার অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়াছেন। মুসলিম লীগের অভিযোগপূর্ণ পীরপুর রিপোর্ট সর্ব্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। তবু, মুসলমানদের উপর অত্যাচারের সম্পূর্ণ কাল্পনিক অভিযোগটা খাড়া রাখা চাই! বড়লাটের কাছে জিন্না যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার রায় প্রকাশের অপেক্ষাও তিনি করেন নাই। সে ভদ্রতারও তিনি ধার ধারেন না।

জনাব জিন্না সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতি। এই লীগ ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিজের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। অথচ জনমত অনুসারে গঠিত আটটি প্রদেশের মন্ত্রিসভার পদত্যাগে তাহার সভাপতি উল্লসিত। না জানি এই ব্যক্তির অভিলষিত স্বাধীনতা কি পদার্থ! তাঁহার মুক্তি-ঘোষণায় কেবল তাহাদেরই সুখ হইবে, যাহারা ভারতের পরাধীনতা স্থায়ী করিতে চায়।

সুখের বিষয় মুসলিম লীগের সভ্য ও সভ্য নহেন, উভয়বিধ অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ মুসলমান জনাব জিন্না সাহেবের এই অবজ্ঞেয় চা'লের নিন্দা করিয়াছেন।

—

বেকার-সমস্যা

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন আমাদিগকে দেশের কোন্ সমস্যা সকলের চেয়ে অধিক ব্যথা দিতেছে, তাহা হইলে বলিব, বেকার-সমস্যা। ইহা অপেক্ষা গুরুতর সর্বজাতিক, কিম্বা সমগ্রভারতীয়, কিম্বা নিখিল-বঙ্গীয় সমস্যা আছে। কিন্তু বেকার-সমস্যার মত কোনটিই অহরহ এমন পীড়া দিতেছে না। ঘরে বাহিরে—সর্বত্র বেকার যুবকদের প্রাচুর্য্য। তাহারা কাজ করিতে চায়, কাজ পায় না। প্রত্যহ এরূপ যুবকের সাক্ষাৎ পাই বা চিঠি পাই। তাহাদের জন্ম কিছু করিতে পারি না। নিজের শক্তিহীনতা উপলব্ধি করি। বেকার-সমস্যার বহু সমাধান শুনিয়াছি, পড়িয়াছি; নিজেও দুই চারিটা বাৎলাইতে পারি। কিন্তু ক্ষুধিত ও সম্পূর্ণ নিঃসম্বল সমর্থ যুবকদিগকে কি বলিব? তাহাদের সকলের যোগ্যতা এক রকম বা সমান নয়। কিন্তু প্রত্যেকেই কোন-না-কোন কাজের যোগ্য। ন্যূনকল্পে দৈহিক শ্রম করিবার সামর্থ্য এবং সম্মতিও অনেকের আছে। কিন্তু সেরূপ শ্রমের কাজও তাঁহারা পান না।

—

বাংলা প্রদেশের বাহিরে বাংলা শিখাইবার চেষ্টা

নিখিলভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রসার সমিতির গত অধিবেশনে কতকগুলি প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। সেগুলি অনুসারে কাজ হইলে সন্তোষের বিষয় হইবে।

মানভূম ও হাজারীবাগ জিলার মাহাত, বাউরী, সারাক জাতিগুলি বাঙ্গালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাবে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইতেছে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে মানভূমে সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ১৫টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার মল্লিকের সম্পাদকতায় হাজারীবাগেও একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। হাজারীবাগ অঞ্চলে বাঙ্গালা স্কুলের অভাবে দশ হাজার বাঙ্গালা-ভাষাভাষী মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে অন্য ভাষা শিখিতে বাধ্য হইতেছে। এই শাখার উদ্যোগে সেখানে ৩টি প্রাথমিক স্কুল ও কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় সহস্রাধিক ছাত্র ও ছাত্রী বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছে। এই সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন ও বাঙ্গালা ভাষা প্রসারের ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ও মৌলবী রেজাউল করিমকে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

দিল্লীতে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার ও অবাঙ্গালীদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার আগ্রহ বর্দ্ধিত করিবার জন্য শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা ও রোমান হরপে বর্ণ-পরিচয় মুদ্রিত করিবার ভার দিল্লীর শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। তিনি এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিবেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রসারের জন্য নাগপুর, বোম্বাই, কাটিহার, জামসেদপুর এবং জামালপুরে সমিতির শাখা স্থাপনের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জে বঙ্গভাষাভাষীরা যাহাতে বাঙ্গালা শিখে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবার জন্ত এবং অধিকসংখ্যক বাঙ্গালা প্রাথমিক শিক্ষালয় স্থাপনের নিমিত্ত সিংভূম জেলাবাসীদের সহিত পরামর্শ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

, বোম্বাই, দিল্লী ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাগারে বাঙ্গালা পুস্তক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও গ্রন্থকারদিগকে তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সমিতির এই সকল কার্য্যের সৌকর্য্যের জন্য বাঙালীদিগকে বার্ষিক ১৲ টাকা দিয়া সভ্য হইতে এবং অর্থসাহায্য করিতে সমিতি অনুরোধ জানাইতেছেন। ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোডে সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের নিকট সকল বিষয় জ্ঞাতব্য।

—

রাঁচির বালিকা-শিক্ষাভবন

বাংলা প্রদেশের বাহিরে বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষা শিক্ষার ও বাংলা সাহিত্য অনুশীলনের নূতন চেষ্টা করা যেমন আবশ্যক, তদ্রূপ ঐ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে-সকল প্রতিষ্ঠান এখন আছে সেগুলিকেও বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক। রাঁচির বালিকা-শিক্ষাভবন এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। সংস্কৃতির কোন অঙ্গ সংরক্ষণ করিতে হইলে রক্ষয়িত্রী নারীদের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। এই জন্য বাঙালী বালিকাদের বাংলা শিখিবার ব্যবস্থা যেখানে যাহা কিছু আছে সেগুলিকে শুধু যে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে তাহা নহে, তাহাদের উন্নতি সাধন করিয়া চলিতে হইবে।

রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের সময় আমরা তথাকার বালিকা-শিক্ষাভবনের কার্য দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। পরে তাহার বিষয় 'প্রবাসী'তে লিখিয়াওছিলাম। সম্প্রতি তাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত লালমোহন ধর চৌধুরীর চিঠিতে অর্থাভাবে তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহজ্ঞাপক কথা পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন :—

নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বিদ্যালয়টি এখনও টিকিয়া আছে কিন্তু এখন অর্থাভাব এতই তীব্র হইয়াছে যে আর বুঝি বেশী দিন ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি না। প্রবাসে বাঙ্গালী বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতির জন্য উৎসুক থাকিলেও উপযুক্ত অর্থসাহায্য করিয়া যে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানকে জীবিত রাখার বিশেষ আবশ্যক আছে, এ বিষয়ে সচেতন বলিয়া মনে হয় না। নতুবা রাঁচির মত স্থানে এত ভদ্র ও শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাস থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটির অকালে প্রাণ হারাইবার মত অবস্থা হইত না।

রাঁচিতে বাঙ্গালী মেয়েদের নিজেদের জাতীয় ধারা ও সৌষ্ঠব বজায় রাখিয়া শিক্ষালাভের উপযুক্ত অন্য কোন বিদ্যালয় নাই। এই বিদ্যালটি ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের উচ্চশিক্ষালাভের বিশেষ কোন উপায়ই ছিল না। যাঁহারা সমর্থ হইতেন অনেক অর্থব্যয়ে ঘরে গৃহশিক্ষক দ্বারা মেয়েদের পড়াইয়া কলিকাতায় লইয়া গিয়া পরীক্ষা দেওয়াইতেন। তাহাতে খরচও হইত, হয়রানীও কম হইত না। বালিকা-শিক্ষাভবন স্থাপিত হইবার পর গত তিন বৎসরে ৩৪টি মেয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের বাঁকুড়ায় লইয়া গিয়া পরীক্ষা দেওয়াইয়া আনেন। অভিভাবকদের কোন ঝক্কিই লইতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরূপ একটি কল্যাণপ্রদ প্রতিষ্ঠানের দিকে যাঁহাদের মেয়ে পড়ে তাঁহারা ছাড়া অন্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। অর্থাভাবে বাস্‌গাড়ী ভাড়া অনেক বাকি পড়িয়াছে এবং বাস্‌গাড়ী বন্ধ হইলেই বিদ্যালয়ও স্বতঃই বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

আমরা এই প্রতিষ্ঠান হইতে আদিবাসী মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছি। কয়েকটি আদিবাসী মেয়ে এই শিক্ষাভবনের ছাত্রী। গত বৎসর একটি আদিবাসী মেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে আমরা এদিকেও বিশেষ মনোযোগী হইতে পারিতেছি না।

ক্ষুদ্র ও দুঃস্থ লোকদেরই অধ্যুষিত গ্রাম ভিন্ন অন্ত সকল স্থানের সব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় লোকদের পরিশ্রম ও অর্থ-সাহায্যেই পরিচালিত হওয়া উচিত। বাংলা প্রদেশের বাহিরে স্থিত বাঙালীদের প্রতিষ্ঠানগুলি এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে। বাংলা প্রদেশের বাহিরের সব বাঙালীরই অবস্থা অবশ্য সচ্ছল নহে, কিন্তু ইহা বোধ করি সত্য যে, বাংলা প্রদেশের বাঙালীসমষ্টির চেয়ে, তাহার বাহিরের বাঙালীসমষ্টির আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে। সেই জন্য আমরা বঙ্গের বাহিরে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির মত রাঁচির এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ত্তৃপক্ষকে স্থানীয় বাঙালীদের দ্বারে ধন্না দিতে বলিতেছি। তাঁহারা বিশেষ করিয়া গৃহকর্ত্রীদিগের শরণাপন্ন হউন।

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, বাস্‌গাড়ী বন্ধ হইলে বিদ্যালয়টিও উঠিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। রাঁচি শহরটি সুবিস্তৃত; ইহা একটি মাত্র জায়গায় জমাট বসতির শহর নহে। এই জন্য বাস্‌গাড়ী আবশ্যক বটে। কর্ত্তৃপক্ষ বাস্‌গাড়ীটি রাখিতে পারিবেন আশা করি।

একান্তই যদি না পারেন, তাহা হইলেও যে-সব ছাত্রী হাঁটিয়া বিদ্যালয়ে আসিতে পারে, তাহাদিগকে লইয়া বিদ্যালয় চালান যায় কি না দেখিতে হইবে। কোন কোন শহরের দুর্বৃত্ত লোকদের আড্ডা অঞ্চলে মেয়েদের চলাফিরা আশঙ্কাজনক বটে। কিন্তু, আশা করি, রাঁচিতে সেরূপ আশঙ্কা নাই।

—

বাঙালীর ব্যবসাবিস্তারকল্পে ব্যাঙ্ক স্থাপন

অন্যান্য প্রদেশের লোকদের মত বাঙালীদেরও ব্যবসা-বিস্তার আবশ্যক। বরং, বাঙালীদের বেশী আবশ্যক, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, আমরা এ-বিষয়ে পশ্চাৎপদ। আমাদের ব্যবসাবিস্তার শুধু যে বাংলা প্রদেশেই করিতে হইবে এমন নয়; তাহার বাহিরেও করিতে হইবে—যেমন অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা বঙ্গে করিয়াছে। ব্যাঙ্ক না থাকিলে ব্যবসা চালান ও তাহার বিস্তার করা কঠিন। এই জন্য ইহা সন্তোষের বিষয় যে, বাঙালীদের কোন কোন ব্যাঙ্কের শাখা বাংলা প্রদেশের বাহিরেও স্থাপিত হইতেছে। আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে বঙ্গের বাহিরে নাথ ব্যাঙ্কের শাখাস্থাপনের বিষয় লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি ক্যালকাটা কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের একটি শাখা লক্ষ্ণৌতে স্থাপিত হওয়ায় বাঙালীদের ব্যবসাবিস্তার যে চলিতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে। লক্ষ্ণৌ-শাখার উদ্বোধন করেন তদানীন্তন মহিলা-মন্ত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। এই ব্যাঙ্কের লক্ষ্ণৌ-শাখা স্থাপনের পূর্বে যুক্তপ্রদেশে ইহার আরও শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ব্যাঙ্কটি ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার তখনকার পরিচালকগণ ইহা ভাল চালাইতে না পারায়, এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্তকে ইহার ভার লইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় ইহার দ্রুত ক্রমোন্নতি হইতেছে। প্রথম বৎসরের শেষে ইহার মূলধন কেবল ১৩৪২ টাকা আদায় হইয়াছিল এবং ডিপজিটের পরিমাণ ছিল ৭৭০২।৶০। চারি বৎসর হইল হেমেন্দ্রবাবু ইহার ভার লইয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের শেয়ারের মূল্য বাবদে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা এবং ডিপজিটের পরিমাণ নয় লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হইয়াছে। বাংলা, বিহার, আসাম ও যুক্তপ্রদেশে ইহার ৩৬টি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সুপরিচালিত না হইলে ব্যাঙ্কের বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তারে বিপদ আছে। কিন্তু হেমেন্দ্রবাবু প্রবীণ ব্যবসায়ী। উচ্চশিক্ষিত অনেক বাঙালী যুবককে ব্যাঙ্কের কার্যে শিক্ষিত করিয়া তাহাদের সাহায্যে তিনি এই শাখাগুলি পরিচালিত করিতেছেন। এই সকল যুবক এবং বহু মুক্ত "অন্তরীণ"কে শিক্ষা দিয়া তন্মধ্যে যাহাদিগকে সৎ, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনি কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত যুবক এখনও বিনা বেতনে অথবা সামান্য বৃত্তি পাইয়া এই ব্যাঙ্কে কার্য শিক্ষা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, নূতন নূতন কর্মক্ষেত্রে তাহারা নিযুক্ত হইবে। বাঙালীদের পরিচালিত বহু-সংখ্যক ব্যাঙ্কের মধ্যে ৬।৭টি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপসিলভুক্ত। এটি তাহার অন্যতম।

—

সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ ও ব্রিটিশ জনমত

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের অন্যতম শ্রমিক সদস্য কম্যুনিস্ট-ভাবাপন্ন সর্ স্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ আঠার দিন ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ব্রিটিশ জনমত ক্রমশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিত এবং ভারতীয়দের দাবী সম্বন্ধে অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন হইতেছে। তিনি আশা করেন অত্যধিক বিলম্বের পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে ভারতীয়দিগের মতানুযায়ী কাজ করাইতে এবং এই মহৎ জাতিকে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকতা আনিয়া দিতে পারা যাইবে।

এরূপ কথায় কেহ যেন মনে না করেন ভারতের স্বাধীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রিটেনের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডনাল্ড এক বার বলিয়াছিলেন, কয়েক দিনের মধ্যে না হউক, কয়েক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ ডোমীনিয়নে পরিণত হইবে। এদেশ কিন্তু এখনও শুধু যে ডোমীনিয়ন হয় নাই তাহা নহে, ম্যাকডনাল্ডী আমলেই রচিত নূতন ভারতশাসন

আইনে ডোমীনিয়ন স্টেটস কথা দুটা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে আপত্তি হইয়াছিল এবং ঐ আইনে তাহার প্রতিশ্রুতি, এমন কি উল্লেখও কোথাও নাই। যে-সকল ইংরেজ রাজপুরুষ ও রাজনীতিক ভারতবর্ষকে আশা বা প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁহারা সবাই প্রতারক এমন কোন কথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে;—বস্তুতঃ এরূপ ব্যাপক নিন্দা অনুচিত। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের আইন ভিন্ন অন্য কিছুর উপর আস্থা রাখা যায় না, তদ্ভিন্ন কোন প্রতিশ্রুতি মানিতে ব্রিটিশ জাতি ও পার্লেমেণ্ট বাধ্য নহেন —গণতান্ত্রিক ব্রিটিশ রাজনীতির ধারাই এইরূপ। সেই জন্য, বাংলা প্রবাদবাক্যে যেমন বলে, "মনুষ্যবিশেষের বাড়ী ফলার, না আঁচালে বিশ্বাস নেই", সেইরূপ ইহাও সত্য যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পার্লেমেণ্ট আইন করিয়া ও তাহা জারি করিয়া ভারতবর্ষকে কোন রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে না দিতেছে, ততক্ষণ কিছু পাইলাম বা পাইব বলিয়া বিশ্বাস নাই।

—

হক সাহেবের আমলে বঙ্গের মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের দশা

বঙ্গের আইন-সভার নিম্ন কক্ষে প্রশ্নের সরকারী উত্তরে জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান মন্ত্রীরা ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল কাজের ভার লইবার পর হইতে ১৯৩৯ সালের ২৭শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৩৭টা মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের নিকট হইতে ৪৭০৫০ টাকা জমানৎ চাহিয়াছেন। ৩৭এর মধ্যে ৩১টি হিন্দুদের, ৬টি মুসলমানদের, ১টি অন্যদের। ১৪টি ৩০১০০ টাকা জমানৎ দিয়াছিল। বাকী ২৩টি দেয় নাই বা দিতে পারে নাই। ৮৯ জন সংবাদপত্র-সম্পাদক ও মুদ্রাযন্ত্রের মালিক ও রক্ষককে সাবধান করা ও ধমক দেওয়া হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে ৬৩ জন হিন্দু, ২৫ জন মুসলমান এবং এক জন ইউরোপীয়। শেষোক্ত ব্যক্তির ভাগ্য এরূপ বিরূপ কেন?

আইন-সভার উপর কক্ষে প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ জানান যে, এ পর্য্যন্ত প্রেসের সহিত সম্পর্কযুক্ত ৯ (নয়) ব্যক্তির বিরুদ্ধে গবর্ন্মেণ্ট নালিশ করেন। গবর্ন্মেণ্ট পরে দুটা নালিশ প্রত্যাহার করেন, নিম্ন আদালতের বিচারে দুটা ব্যাপারে আসামীরা খালাস পায়, এবং নিম্ন আদালতে যে পাঁচটি মামলায় দণ্ডাদেশ হয় তাহার চারিটি আদেশ হাইকোর্টে আপীলে নাকচ হয়। অর্থাৎ নয়টা নালিশ গবর্ন্মেণ্ট-পক্ষ হইতে এরূপ অসাবধানতার সহিত করা হইয়াছিল যে, তাহার মধ্যে আটটাই বাজে!

কিছু দিন পূর্ব্বে হক সাহেব বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্র দলনের অভিযোগ করেন। বোম্বাই হইতে কড়া জবাব আসায় তিনি বলেন, তোবা, বোম্বাই নয় যুক্তপ্রদেশ। কিন্তু পঞ্জাবের আইসভায় প্রশ্নের উত্তরে জানা যায়, সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্র দলনে অকংগ্রেসী পঞ্জাব-মন্ত্রীরা টেক্কা দিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে অকংগ্রেসী হক্-মন্ত্রীরাও বড় কম যান না।

—

পঞ্জাবে হিন্দু রিক্রুটের সংখ্যা হ্রাস

পঞ্জাবের হোশিয়ারপুর জেলা হইতে সৈন্যদলে সিপাহী করিবার নিমিত্ত 'অ-মুসলমান' রিক্রুট লওয়া হয়। পঞ্জাবের গবর্ণর সম্প্রতি হোশিয়ারপুর শহর দেখিতে গেলে তথাকার জেলা সিপাহী বোর্ড বলেন, বরাবর যত রিক্রুট ঐ জেলা হইতে লওয়া হইত এখন তাহা অপেক্ষা কম লওয়া হইতেছে। উত্তরে গবর্ণর বলেন, মানবজীবনের অন্যান্য বিভাগের মত সামরিক বিভাগেও যন্ত্র মানুষের স্থান অধিকার করিতেছে, এই জন্য এখন আগেকার মত অধিকসংখ্যক সিপাহী ভর্ত্তি করা হয় না; অতএব সৈন্যদল বড় না করিলে, বেশী সিপাহী আর লওয়া চলিবে না; রিক্রুট হ্রাসের দুঃখভাগী শুধু হোশিয়ারপুর নহে। গবর্ণরের এই উক্তি বিচারসহ নহে। সৈন্যদলের যান্ত্রিকতাপাদন (mechanization) সবে দু-বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। তাহা রিক্রুট হ্রাসের একমাত্র কারণ হইলে কেবল দুই বৎসর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান শিখ সব রিক্রুটই সমভাবে কমিত। কিন্তু মুসলমানদের তুলনায় 'অ-মুসলমান' রিক্রুট অধিক হ্রাস গত ২০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। ১৯১৪ সালে সৈন্যদলের ১৯.২ জন ছিল শিখ, ১১.১ জন ছিল পঞ্জাবী মুসলমান। ১৯৩০ সালে হয় শিখ শতকরা ১৩.৫৮, মুসলমান ২২.৬।

তাহার পর 'অ-মুসলমান' আরও কমিয়াছে। গবর্মেণ্ট বোধ হয় মনে করিতেছেন 'অ-মুসলমানগণ' ক্রমশ অধিকতর কংগ্রেসী ও অহিংসাবাদী হইতেছে।

—

"অন্ধকূপ হত্যা" ও হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ

নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা দখল করিয়া বহুসংখ্যক ইংরেজকে একটা ছোট কামরায় বন্ধ করিয়া রাখায় তাহাদের অনেকেই মারা পড়ে, ইংরেজদের ইতিহাসে এই আখ্যান অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত। হলওয়েল নামক এক ব্যক্তি এই আখ্যান রটাইয়াছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে ইহা মিথ্যা মনে করেন, কেহই সম্পূর্ণ সত্য মনে করেন না। তথাপি লর্ড কার্জন ইহাকে ধ্রুব সত্যের মর্য্যাদা দিবার নিমিত্ত কলিকাতার লালদীঘির নিকট একটা স্মৃতিস্তম্ভ বানাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আর কোন ফল হউক বা না হউক, সাক্ষাৎভাবে সিরাজুদ্দৌলার প্রতি এবং পরোক্ষভাবে মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজদের ক্রোধ জাগাইয়া রাখা হয়। অতএব, ঐ স্মৃতিস্তম্ভটা না থাকাই উচিত।

কয়েক মাস পূর্বে হক্ মন্ত্রীদের দ্বারা পুরস্কৃত মৌলানা আক্রম খাঁর সভাপতিত্বে কলিকাতায় নবাব সিরাজুদ্দৌলার স্মৃতি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। অতএব ইহা আশা করা যাইতে পারিত যে, উক্ত মন্ত্রীরা উক্ত নবাবের পক্ষে অপমানজনক স্মৃতিস্তম্ভটা অপসৃত করিবার প্রস্তাবে সায় দিবেন, কিন্তু আইনসভার প্রশ্নের উত্তরে খাজা সর্ নাজিমুদ্দিন এ বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতাহীনতা ও সাহসাভাব ঢাকিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—বোধ হয় 'রসিকতা' করিয়া—স্মৃতিস্তম্ভটাকে সিরাজুদ্দৌলার কলিকাতা-বিজয়ের মনুমেণ্ট মনে করিলেই হয়। ভাল কথা। সেই মর্মের একটা সাইন বোর্ড তাহার গায়ে ঝুলাইয়া দেওয়া হউক। তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ আমরা চাঁদা দিতে ও সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত।

—

বেকার নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য

নানা প্রকার কাজের যোগ্যতাবিশিষ্ট যুবকদিগের নাম রেজিস্টরীভুক্ত করিবার, তাহাদিগকে কর্মখালির খবর দিবার, এবং তাহাদিগের কাজ জুটাইয়া দিবার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বোর্ড আছে। এই বোর্ডের উদ্যোগে ১৯৩৭-৩৮ সালে ৬০ জন, ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯০ জন কাজ পাইয়াছে। যে-যে সওদাগরী আপিসে বা কারখানায় তাহারা কাজ পাইয়াছে তাহার তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, কোন কোন রকমের কাজ ভারতীয়েরা এই প্রথম পাইল, এবং কোন কোন কাজে আগে গ্র্যাজুয়েট বলিয়াই গ্র্যাজুয়েট লওয়া হইত না, এখন লওয়া হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কাজটি সামান্য মনে করিলে চলিবে না। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির চাকরী জুটান বোর্ডের প্রথম বৎসরের কাজ ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর হয় নাই। প্রথম বৎসরে কেম্ব্রিজের বোর্ড পঁচিশ জন, লীড্সের ছয় জন, এডিনবরায় দশ জন, ম্যাঞ্চেষ্টারের দশ জন, অক্সফোর্ডের উনচল্লিশ জন (১৯৩৬ সালে) যুবককে কাজ জুটাইয়া দিতে পারিয়াছিল। তুলনায় কলিকাতার কাজ প্রশংসনীয় হইয়াছে।

—

বঙ্গে আড়াই হাজারের অধিক পুস্তক নিষিদ্ধ

বাংলার আইনসভায় নিম্ন কক্ষে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী খাজা সর্ নাজিমুদ্দিন জানাইয়াছেন, ১৯২০ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত বাংলা-গবর্মেণ্ট ২৩১৯ খানি বহি এবং ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত ২১২ খানি নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন, মোট ২৫৩১। ১৯৩৬এর পর এ পর্য্যন্ত আর কতগুলি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও জানান উচিত ছিল। যাহা হউক, আড়াই হাজারও বড় কম নয়। এত বহি নিষিদ্ধ হওয়াতে বুঝা যায়, দেশে খুব অশান্তি আছে এবং সরকারী মনোভাবও অ-সাধারণ।

খুব অল্পসংখ্যক বহি গবর্মেণ্ট নিষিদ্ধ-তালিকা হইতে কিছু কাল পূর্বে বাদ দিয়াছেন। সেগুলি এখন বিক্রী হইতে পারে। তাহাতে গবর্মেণ্ট বিপর্য্যস্ত হয় নাই।

ভারতবর্ষের স্বরাজযোগ্যতা-প্রতিপাদক সর্বশ্রেষ্ঠ বহি সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবের "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ" ("শৃঙ্খলিত

ভারত") এখনও নিষিদ্ধ। বঙ্গে কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট স্থাপিত হইলে ইহা নিষিদ্ধ থাকিত না।

সর্ ডানিয়েল হামিল্টন

আশী বৎসর বয়সে স্কটল্যাণ্ডে সর্ ডানিয়েল হামিল্টনের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যৌবনকালে ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। যে-দেশে তিনি ধন উপার্জ্জন করেন তাহার হিতৈষী তিনি ছিলেন। বাংলা দেশে সমবায়-প্রচেষ্টা আবশ্যক ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়া নিজের আপিসের দরিদ্র কর্মচারীদের সাহায্যার্থ সমবায় রীতিতে পরিচালিত একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। তাহা এখনও চলিতেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে বিস্তৃত জমি লইয়া তিনি দরিদ্র কৃষিজীবীদের জন্য আদর্শ গ্রাম স্থাপন ও পরিচালনার সঙ্কল্প করেন। গোসাবা সেই সংকল্পসিদ্ধির সাক্ষ্য দিতেছে। সমবায় পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক চালাইয়া কৃষকদের ঋণভার কমাইবার, এবং তাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। ব্যবসা হইতে অবসর লইবার পর তিনি প্রায় প্রতি বৎসর এক বার শীতকালে ভারতবর্ষে আসিতেন।

কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন

কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের আয়োজন বিশেষ উৎসাহের সহিত করা হইতেছে। অনেক ধনী হিন্দু মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতেছেন। সম্পাদক প্রভৃতি কর্মীরা খুব পরিশ্রম করিতেছেন। বন্দোবস্ত সব দিক্ দিয়া ভালই হইবে আশা করা যায়। শুধু বাংলা দেশের নানা স্থান হইতে নহে, অন্যান্য প্রদেশ হইতেও অনেক প্রভাবশালী হিন্দু প্রতিনিধি অধিবেশনে সমবেত হইবেন।

ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় মহাজাতির বাঞ্ছিত স্বশাসন-অধিকার লাভে বাধা দিয়া আসিতেছেন। এই জন্য ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর ও ধর্মসম্প্রদায়ের সমবেত স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা আবশ্যক। কংগ্রেস সেই সম্মিলিত চেষ্টা করিবার নিমিত্ত স্থাপিত হয় এবং এখনও তাহাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। কিন্তু কংগ্রেস মুসলমানদিগকে নিজ দলে আনিবার ও রাখিবার নিমিত্ত হিন্দুর হিত ও স্বার্থের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া আসিতেছেন। হিন্দুর প্রতি বিরূপ ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতশাসন-আইনে হিন্দুদের হানিজনক ও অগৌরবকর যে-যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, কংগ্রেস কার্য্যত তাহা মানিয়া লইয়াছেন। ইহার কুফল বঙ্গে বিশেষ করিয়া লক্ষিত হইতেছে। এই সব কারণে, হিন্দুর হিতসাধনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিন্দু প্রতিষ্ঠান ও তাহার প্রচেষ্টা আবশ্যক হইয়াছে। কংগ্রেস কর্ত্তৃক কার্যত গৃহীত হিন্দুবিরোধী সরকারী ব্যবস্থাগুলা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে হিন্দু মহাসভার কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবার আবশ্যক নাই; বরং কংগ্রেসের সহযোগিতা করাই উচিত। এই জন্য ইহা সন্তোষের বিষয় যে, হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাহার চরম রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্য পূর্ণস্বাধীনতা বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। হিন্দুরা কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা উভয়েরই সভ্য হয়েন, আমরা ইহা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

আগামী অধিবেশনে হিন্দু মহাসভা রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে স্বভাবতই বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তাহা হওয়া আবশ্যক—বিশেষত বাংলা দেশ সম্বন্ধে। কিন্তু সামাজিক নানা বিষয়েও খুব বেশী মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। সেগুলি ভিত্তিগত ব্যাপার। নিজের ঘর সামলাইতে না পারিলে হিন্দু বাঁচিবে না।

নারীরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে কোন নারী অপহৃতা বা ধর্ষিতা না হন তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তদর্থে নারীদিগের দৈহিক মানসিক ও নৈতিক সম্যক্ উন্নতি সাধন আবশ্যক। নারীদের পরিচ্ছদের এবং কোন কোন গার্হস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারী-মাত্রকেই খুঁজিয়া উদ্ধার করিয়া তাঁহাদিগকে সমাজে ভদ্র স্থান দিতে হইবে। দেশের স্বাধীনতা খুব আবশ্যক। কিন্তু স্বাধীনতা ব্যতিরেকেও সমাজ অনেক দিন টিকিতে পারে, নারীরক্ষা ব্যতীত টিকিতে পারে না।

হিন্দুর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধির নিমিত্ত, ন্যায় ও দয়াধর্মের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত এবং সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত বিধবা-বিবাহের সমধিক প্রচলন আবশ্যক।

যুবক ও যুবতীদের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা যথাসম্ভব কমাইতে হইবে। বিবাহ বাড়াইবার নিমিত্ত বেকারের সংখ্যা যথাসম্ভব কমাইতে হইবে এবং অসবর্ণ বিবাহের বাধা দূর করিতে হইবে।

শুধু ন্যায় ও ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই বুঝা যায় যে, অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হওয়া উচিত; এবং উচ্চ জাতি ও নীচ জাতি এইরূপ ভেদ রহিত হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন ইহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, হিন্দুসমাজে কতকগুলি জাতির লোকের সামাজিক যথেষ্ট মর্যাদা না থাকায় ও লাঞ্ছনা হওয়ায় তাহাদের অনেকে অন্য ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এই ধর্মান্তরগ্রহণ এবং তাহার দ্বারা হিন্দুর হ্রাস নিবারণ করিতে হইলে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সাম্য স্থাপন করা দরকার।

—

দিল্লীতে হরিজনদিগের প্রার্থনাভবন

ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং ব্রহ্মদেশে হিন্দুরা পূজা অর্চনা প্রভৃতির জন্য যে-সকল মন্দির নির্মাণ করেন, সাধারণত তাহার নাম শিবালয়, কালীবাড়ী, দুর্গাবাড়ী, চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি রাখা হয়। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে হরিজনদিগের জন্য যে ভগবদারাধনার গৃহের দ্বার মোচন করিয়াছেন, তাহার এরূপ কোন নাম রাখা হয় নাই। প্রার্থনাভবন বা প্রার্থনা-মন্দির বলিয়া সংবাদপত্রে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। বোধ হয় তাহার মধ্যে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই।

—

হক্ সাহেবের কাছে হিন্দুদের অভিযোগ পেশ

হক্ মন্ত্রিমণ্ডল ক্ষমতা পাইবার পর বাংলা দেশে এরূপ আইন হইয়াছে যদ্দ্বারা হিন্দুদের ন্যায্য প্রভাব নষ্ট হইতেছে এবং তাহাদিগের আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা বাড়িতেছে, তাহাদের অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত তাহাদেরই অভিভাবকদিগের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে টাকা দিতে কৃপণতা করা হইতেছে, অথচ মুসলমানদের জন্য টাকার অপব্যয় হইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু ছাত্রদিগকে মুসলমানী কেতাব পড়িতে বাধ্য করা হইতেছে, যোগ্য হিন্দু লেখকদিগের লিখিত উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকাতেও মুসলমান লেখকদের লেখা অপকৃষ্ট পুস্তক নির্বাচিত হইতেছে। নির্বাচিত পুস্তকের শতকরা ৬০খানা এইরূপ। সরকারী চাকরির সকল বিভাগে যোগ্য হিন্দুর দাবী অগ্রাহ্য করা হইতেছে। সাধারণ ভাবে এইরূপ অবিচারের কথা দীর্ঘকাল ধরিয়া খবরের কাগজে প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দুর মন্দির কলুষিত করা, দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙা, প্রতিমা বিসর্জ্জনে বাধা দেওয়া, ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত ও বিবাহ অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় শোভাযাত্রায় বাধা দেওয়া, শবদাহে বাধা দেওয়া, ইত্যাদি ঘটনার কথা বহুবার খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। নারীর উপর অত্যাচার এবং তদ্বিষয়ে পুলিসের অসন্তোষজনক ব্যবহার ইত্যাদি নানাবিষয়ক অভিযোগও কত যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

তাহা সত্ত্বেও বাংলার প্রধান মন্ত্রী হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বা তাহাদের প্রতি অবিচারের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতে হিন্দুদিগকে 'চ্যালেঞ্জ' করেন এবং তদন্ত করিবার ও তদন্তে প্রমাণিত হইলে তাহার প্রতিকার করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। অবিলম্বে অনেক কাগজে অনেক দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতির শেষভাগে নোয়াখালী জেলার হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাহার সমুদয় দফা আমরা আগেই জানিতাম এবং সে বিষয়ে প্রবাসীতে ও মডার্ণ রিভিয়ুতে আগেই লিখিয়াছি।

নেতৃদ্বয় সর্বশেষে বলিতেছেন :

প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে আমরা এই বিবৃতি দিলাম। আমাদের এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে নমুনা মাত্র। ইহা দ্বারা তদন্তের আবশ্যকতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমে নোয়াখালির অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করা হউক। এই সঙ্গে আমরা বলিতে চাই যে, কোন সরকারী কর্ম্মচারী যত উচ্চ পদস্থই হউক না কেন, তদন্তের জন্য তাঁহার নিয়োগে হিন্দু সমাজ সম্মত হইবে না। প্রধান মন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রসচিব অথবা তাঁহারা উভয়ে যত দূর সম্ভব অবিলম্বে আমাদের কাহারও কাহারও সহিত

একযোগে তদন্ত করুন। তদন্তপদ্ধতি তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। আমরা এই তদন্ত কেবল হিন্দু সমাজের স্বার্থের জন্য দাবী করিতেছি না, সমগ্র প্রদেশের সাধারণ স্বার্থের জন্য দাবী করিতেছি।

হক সাহেব চাহিয়াছিলেন একটি মাত্র দৃষ্টান্ত, পাইয়াছেন অনেক। তদন্তটা হয় কিনা, হইলে কখন হইবে, কি প্রকারে হইবে, দ্রষ্টব্য। তদন্ত যদি না-হয়, তাহা হইলে না-হওয়াটাই বা কেমন করিয়া ঘটে, তাহাও দ্রষ্টব্য। না-হইলে, তাহার অর্থ সুস্পষ্ট।

—

কংগ্রেস-সরদারের আত্মসম্মানের জাগৃতি

জনাব জিন্না সাহেব মুসলমানদিগকে যে 'মুক্তিদিবস' পালনের ফতোআ দিয়াছেন, তাহা উপলক্ষ্য করিয়া নিখিলভারত কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী সব্‌কমীটির সভাপতি সরদার বল্লভভাই পটেল একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার শেষে আছে :—

পণ্ডিত জওাহরলালের সহিত আপোষ মীমাংসার পূর্ব্বে মিঃ জিন্না কি উদ্দেশ্যে উক্ত আবেদন প্রচার করিয়াছেন তাহা বুঝা কঠিন। আর যদি মিঃ জিন্না মনে করেন যে, অভিযোগ সত্য বলিয়া তাঁহার ধারণা, তবে বুঝা যাইবে যে, মীমাংসার কথা চালাইবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। তাঁহার আপত্তিকর প্রস্তাব প্রত্যাহার করা না হইলে আত্মসম্মান লইয়া আলোচনা চালান অসম্ভব। একটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের হুমকির মধ্যে আলোচনা চালান কংগ্রেসের মর্য্যাদার পক্ষে হানিকর।" —এ পি

কংগ্রেসের আত্মসম্মান-বোধ জাগিয়া থাকিলে ভাল। বাস্তবিক জাগিয়াছে কি না জানিতে বিলম্ব হইবে না।

—

সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল "সত্যের আবহাওয়া"

রাঁচির হিন্দু ফ্রেণ্ডস য়ুনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে গত কার্ত্তিক মাসে যে সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলিয়াছেন :—

"সত্যের আবহাওয়ার মধ্যেই সাহিত্যের ফুল ফোটে এবং সেই ফুলের শোভা দেখেই জগতের লোকের চক্ষু জুড়ায়। যা কৃত্রিম, কষ্ট-কল্পিত বা অসত্য-প্রসূত, তা সাহিত্যের উদ্যানে শিয়াকুল কাঁটার মত কেবল উপদ্রবের সৃষ্টি করে। এই উপদ্রব হ'তে সাহিত্যকে বাঁচাতে হ'লে একমাত্র উপায় সত্যের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজকাল যে মিথ্যার চাষ করা হচ্ছে, আমি শুধু তার ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হব।"

তিনি ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া দৃষ্টান্তসহ বিস্তারিত কিছু বলিলে তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইত, কল্পনা করিতে চাই না। যত টুকু বলিয়াছেন তাহাই সুধীভির্বিভাব্যম্‌।

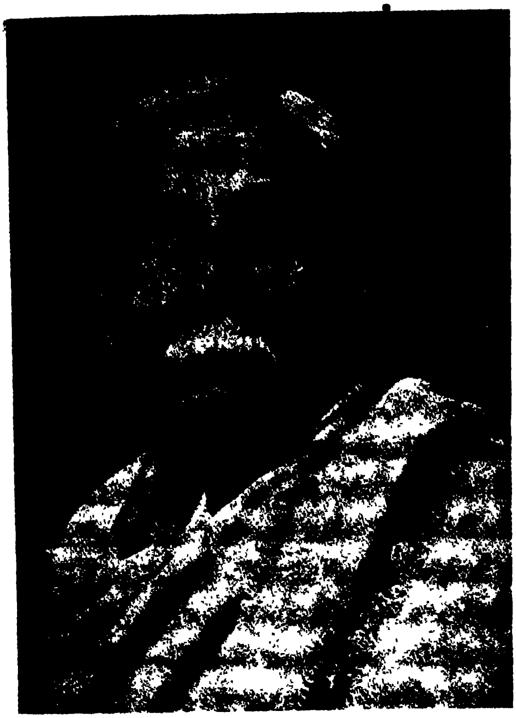
—

দীনেশচন্দ্র সেন

দীনেশচন্দ্র সেন অকালে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন বয়স হিসাবে এরূপ বলা যায় না ;—তাঁহার বয়স মৃত্যুকালে ৭২।৭৩ হইয়া থাকিবে। কিন্তু বৃদ্ধের মৃত্যুকেও তখন অকালমৃত্যু বলিতে হয় যখন কোন প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু হয় কার্যক্ষম থাকিতে থাকিতে। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও বঙ্গের পুরনারী সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। বাঁচিয়া থাকিলে আরও বহি লিখিতেন। এই জন্য তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া প্রথম যশস্বী হন। তাঁহার বহি এই বিষয়ে প্রথম রচনা নহে। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাহা কেবল মুদ্রিত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হয় নাই, বহু পরিশ্রম ও গবেষণা দ্বারা সংগৃহীত অপ্রকাশিত অনেক পুঁথীও অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে ইহা ক্রমশ বৃহদায়তন হইয়াছে। যাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেন, তাঁহারা দীনেশবাবুর সকল মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করেন না, এবং তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিষয়ের আলোচনা এখন ও অতঃপর যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদিগের দীনেশবাবুর বহি না পড়িলে চলিবে না। ইহা তাঁহার পুস্তকের গুরুত্বের প্রমাণ।

তিনি সতী, ফুল্লরা, বেহুলা প্রভৃতি প্রাচীন আদর্শ নারীচরিত্র নূতন করিয়া বাঙালীর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সংগ্রাহিত ময়মনসিংহের লোকগাথাসমূহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়া এবং ইংরেজীতেও তাহার অনুবাদ ছাপাইয়া তিনি বঙ্গীয়



দীনেশচন্দ্র সেন

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞাত একটি দিক্‌ শিক্ষিত বাঙালীর ও জগদ্বাসীর গোচর করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ ফরাসীতে অনুবাদিত হইয়াছে। বৃহত্তর বঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার বৃহৎ পুস্তক বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানা দিকের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি উপন্যাস ও গল্পও কিছু লিখিয়াছিলেন। বঙ্গের চিত্র ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ললিতকলার তিনি অনুরাগী ছিলেন। তাহার নিদর্শন সংগ্রহার্থ তাঁহার বেহালার বাড়ীতে নিজের একটি মুাজিয়ম ছিল। তাঁহার সংগ্রহ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়া গিয়াছেন।

"বড়র পীরিতি"

বাঙালী কবি যে বলিয়া গিয়াছেন,

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।"

তাহা তিনি কেবল ব্যক্তির উদ্দেশেই লিখিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহা এক একটা মনুষ্যসমষ্টি, এক একটা জাতি সম্বন্ধেও স্থলবিশেষে ও সময়বিশেষে সত্য হইতে পারে।

রাশিয়ানরা বড়, না, জার্ম্যানরা বড়, তাহার মীমাংসা না করিয়া মনে করা যাইতে পারে, কোন কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একটা জাতি বড়, অন্য কোন কোন বিষয়ে অন্যটা বড়। এই দুই বড়র মধ্যে পীরিতি জগতে রাষ্ট্র হইয়াছিল। হাতে দড়ি এখনও কাহারও পড়ে নাই। চাঁদের কথা যদি বলেন, পোল্যাণ্ড-চাঁদের ষোল কলার মধ্যে দশটা রুশিয়া পাইয়াছে, ছয়টা জার্মেনী।

অতঃপর পীরিতির আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। তারে খবর আসিয়াছে ফিন্‌ল্যাণ্ড ও রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধে জার্মেনী ও ইটালী ফিন্‌ল্যাণ্ডকে সাহায্য করিতেছে। অবশ্য জার্মেনী তাহা অস্বীকার করিয়াছে। আবার এমন খবরও আসিয়াছে যে, রাশিয়ার সব্‌মেরীন জার্মেনীর জলযানকে আক্রমণ করিতেছে। দেখা যাক, কে কার হাতে দড়ি দিতে পারে।

ভারতবর্ষে "বড়র পীরিতি"

এমন এক সময় ছিল যখন বাঙালীরা ইংরেজের খুব প্রিয় ছিল, খুব চাকরী-চাঁদ ও খেতাব-চাঁদ পাইত। এখন সেই বাঙালীর ভাগ্যে হাতে দড়ি যে পরিমাণে জুটিতেছে, এমন আর কাহারও ভাগ্যে নহে।

রুশিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ

রুশিয়ার ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ করা উচিত হইয়াছে কিনা, সে-বিষয়ে নাকি বিলাতী মাতব্বরেরা একমত নহেন। এদেশেও তাঁহাদের পোঁ-ধরা লোকের অভাব নাই। তা ছাড়া, এদেশে এমন লোকও আছেন যাঁরা মনে করেন রুশিয়া যা করে, তা নিশ্চয়ই ঠিক্‌।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রুশিয়ার যুদ্ধ দু-রকমে আরম্ভ হইয়া থাকিতে পারে। হয় ফিনল্যাণ্ড প্রথমে রুশিয়াকে আক্রমণ করে, নয় রুশিয়া প্রথমে ফিনল্যাণ্ডকে আক্রমণ করে। রুশিয়ার পক্ষ হইতে এইরূপ একটা খবর রটান হইয়াছিল বটে যে, ফিনরাই প্রথমে আক্রমণ করিয়াছিল;

ফিনরা কিন্তু তাহা অস্বীকার করে। তাহাদের এই অস্বীকৃতি সত্য বলিয়া মনে হয়। ইয়োরোপে ফিনদের দুই বিষয়ে প্রসিদ্ধি আছে। ঐ মহাদেশের মেয়েদের যে রূপের প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে একাধিক বার কোন-না-কোন ফিন তরুণী বা কিশোরী মিস্ ইয়োরোপ, ("Miss Europe") "কুমারী ইয়োরোপ" উপাধি লাভ করেন। কবিরা হৃদয়জয়ের যে-সব অভিযান বর্ণনা করেন, তাহাতে এই রকম জয়শ্রী কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক-অভিযানে কাজে লাগে না। অতএব, ইহা ফিনদের আততায়িতার কারণ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ইয়োরোপে যে ওলিম্পিক খেলাধুলা হয়, তাহার দৌড় প্রভৃতি সর্বজাতিক প্রতিযোগিতাতেও একাধিক বার ফিনরা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আধুনিক যুদ্ধ যদি সেকালের মত অনেকটা দৈহিক শক্তির ব্যাপার হইত তাহা হইলে ফিনদের আততায়ী হইবার একটা কারণ পাওয়া যাইত। কারণ দৌড়ে দক্ষতা সেরূপ যুদ্ধে আক্রমণ ও পলায়ন উভয় কার্যেই কাজে লাগে। কিন্তু আজকালকার যুদ্ধ দৈহিক শক্তির ব্যাপার নহে। সুতরাং ফিনরা দৌড়ে ভাল বলিয়া রুশিয়াকে আগেই আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। রুশিয়া ফিনল্যাণ্ডের সহিত কিছু ভৌগোলিক সীমা আদির অদলবদল চাহিয়াছিল। ফিনল্যাণ্ড রুশিয়ার অনেকগুলা প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিল, সকলগুলাতে হয় নাই। ইহা রুশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার ন্যায্য কারণ হইতে পারে না।

রুশিয়া যে অদলবদল চাহিয়াছিল, তাহার নানান্ কারণ থাকিতে পারে। রুশিয়ার সন্দেহ হইয়া থাকিতে পারে যে, তাহাকে কোন বা কোন-কোন শক্তি আক্রমণ করিবে। কিন্তু আপনাকে নিরাপদ করিবার নিমিত্ত অন্য কোন দেশকে অঙ্গহীন, কার্যত পরাধীন, বা দুর্বল করিবার, বা তাহার উপর জবরদস্তী করিবার ন্যায্য অধিকার তাহার নাই। রুশিয়া ফিনল্যাণ্ডের সহিত একটা পাকা পারস্পরিক সাহায্যমূলক সন্ধি করিতে পারিত।

রুশিয়ার দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে যে, রুশিয়া এবং তাহার সর্বাধ্যক্ষ স্টালিন কম্যুনিস্ট হইলেও বস্তুত সাম্রাজ্যিকতাগ্রস্ত, এই জন্য ফিনল্যাণ্ডের নৈসর্গিক সম্পদ অধিকার করিতে চায়। বলা বাহুল্য, কাহারও সাম্রাজ্যিকতা সমর্থনযোগ্য নহে – কম্যুনিস্টদের সাম্রাজ্যিকতাও নহে।

তৃতীয় কারণ এই হইতে পারে যে, কম্যুনিস্ট রুশিয়া বিপ্লবের পর পৃথিবীব্যাপী বিপ্লব ঘটাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিল, সেই লক্ষ্য এখনও ত্যাগ করে নাই, এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত রুশিয়া যেমন ইয়োরোপে তাহার অন্য কতিপয় প্রতিবেশীকে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিতেছে ও করিবার চেষ্টা করিতেছে, ফিনল্যাণ্ডেও তদ্রূপ সেই প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিতেছে। অন্য বহু রাষ্ট্রনৈতিক মতের মত কম্যুনিজ্‌মও একটি রাষ্ট্রনৈতিক মত। এই মত প্রচার করিবার এবং তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে ও ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে কম্যুনিস্ট করিতে চেষ্টা করিবার অধিকার কম্যুনিস্টদের আছে—যেমন অন্য মত প্রচার করিবার এবং ব্যক্তি ও জাতিকে সেই মতে আনিবার অন্যমতাবলম্বীদের আছে। কিন্তু তজ্জন্য বল প্রয়োগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টীয়ান ঐতিহাসিকেরা অনেকে বলেন যে, তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু মুসলমানরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কম্যুনিস্টরা বোমার জোরে কম্যুনিজ্‌ম বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এরূপ ধারণা, উক্তি ও গুজবের প্রতিবাদ তাঁহারা করেন কিনা দেখা যাইবে।

—

ফিনরা কি জিতিবে ?

রুশিয়ার চেয়ে ফিনল্যাণ্ডের জনবল ধনবল দুই-ই কম, সমরসজ্জাও কম। তবে কোন্ সাহসে ফিনরা রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে? বার্নার্ড শ মনে করেন, বিদেশীর সাহায্যের আশায় কিছু করা উচিত নয়; কেন-না বিদেশীর সাহায্য, তিনি মনে করেন, পাওয়া যায় না; সুতরাং রুশিয়ার দাবী মানিয়া লওয়াই ফিনদের উচিত ছিল। এই ঔচিত্যটা অবশ্য ধর্ম ও ন্যায়বুদ্ধি সঙ্গত নহে, বৈবয়িক ও সাংসারিক বুদ্ধি সঙ্গত। কিন্তু কোন জাতি ন্যায় ও স্বাধীনতাকে ধনপ্রাণ অপেক্ষাও বড় মনে করিলে

তাহাকে নির্বোধ বলিতে চাও বল, কিন্তু তাহার কাছে মাথাটা নত—অন্ততঃ মনে মনে, করিতেই হইবে।

ফিনরা জিতিবেই না, এমন বলা যায় না; আপাততঃ ত কয়েকটা সংঘর্ষে জিতিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের এই সাহায্য করিয়াছে বলিয়া তারের খবর আসিয়াছে যে, ফিনদের সাবেক যুদ্ধঋণের সস্ত সস্ত প্রাপ্য কিস্তিটার আদায় আমেরিকা স্থগিত রাখিয়াছে। জার্মেনীর ও ইটালীর সাহায্যদানের সংবাদের উল্লেখ আগে করিয়াছি। এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে, সুইডরা ফিনদের পক্ষে যুদ্ধে নামিয়াছে। আর এক সহায় প্রকৃতিদেবী। শীতের আতিশয্যে জলপথসমুদয় বরফে আচ্ছন্ন হওয়ায় শত্রুসৈন্যের দুরধিগম্য হইতেছে। রাশিয়ানরাও শীতপ্রধান দেশের লোক বটে, কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের শীত তাহারাও বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতিদেবীর এই সাহায্য কিন্তু সাময়িক, গ্রীষ্মাগমে ফিনরা ইহা হইতে বঞ্চিত হইবে। যদি তাহার পূর্বেই তাহারা কাজ হাসিল করিয়া লইতে পারে, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

—

রুশিয়ার ভারত-আক্রমণ উদ্দেশ্যের গুজব প্রচার

জার্মেনী এই গুজব রটাইতেছে যে, রুশিয়া আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ভারত-আক্রমণের বন্দোবস্ত করিতেছে। ইহা একটা 'বনিয়াদী' গুজব—অ-বিশ্বাস্য নহে। কিন্তু ইহা জার্ম্যান "বড়র পীরিতি"র অন্যতম দৃষ্টান্ত হইলেও, বর্ত্তমান সময়ে এই গুজব রটাইবার একটা উদ্দেশ্য অনুমিত হইয়াছে। তাহা এই যে, ব্রিটেন এই গুজবে বিশ্বাস করিলে তাহার সামরিক শক্তি ও যুদ্ধসজ্জা একমাত্র জার্মেনীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইয়া কতকটা রুশিয়ার বিরুদ্ধেও চালিত হইতে পারে। তাহাতে জার্মেনীর কিঞ্চিৎ আসানির সম্ভাবনা।

রুশিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে ব্রিটেন কি করিতে পারে ও করিবে জানি না; কিন্তু রুশিয়ার মত প্রবল আততায়ীকে ঠেকাইবার মত অন্যনিরপেক্ষ সামরিক শক্তি ও সজ্জা আপাতত ভারতবর্ষের নাই। তখন, মহাত্মা গান্ধী না-পারুন, পেয়াদায় ভারতবর্ষকে চূড়ান্ত অহিংসাবাদী বানাইতে পারে।

আমাদের অসহায় অবস্থা ভাবিলে লজ্জিত ও ম্রিয়মান হইতে হয়।

—

বিদ্যাসাগর স্মৃতিসংরক্ষণ সমিতির কার্য

"ভারতের গৌরব পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার জন্মভূমি মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ সমিতি স্মৃতিরক্ষাকল্পে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন, এবং তাঁহার জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে একটি স্মৃতি-মন্দির ও হিন্দু বিধবাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এই জেলার ঝাড়গ্রামে একটি বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন নির্ম্মাণ করিতেছেন।

"মেদিনীপুর শহরেও একটি বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরের একাংশে পাঠাগার ও গ্রন্থাগার স্থাপিত হইতেছে। ঐ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্। আগামী ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে শুভ মন্দির প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। বিশ্ববরেণ্য কবিগুরু পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় অনুগ্রহ-পূর্ব্বক উৎসবের পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।"

মেদিনীপুর জেলার লোকেরা বাঙালীর মুখ রক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত কেহ কিছু না করিলেও তাঁহার স্মৃতি তাঁহার মনুষ্যত্ব, তাঁহার প্রতিভা এবং তাঁহার কৃত বহুবিধ কার্য দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া আছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। বাঙালীরা যদি তাঁহার স্মৃতি সংরক্ষণার্থ কিছু করে, তাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে-জাতির জন্য তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহারা নিতান্ত অমানুষ নহে। মেদিনীপুরবাসীরা এই প্রমাণ দিয়া সমগ্র বাঙালী সমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহারা যে অনুষ্ঠানটির জন্য কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ নাই—তিনিই সর্বাংশে যোগ্য।

হিন্দু বিধবাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ঝাড়গ্রামে যে বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন নির্মিত হইতেছে, তাহা বিশেষ কল্যাণকর হইবে। বিধবাদিগকে শিক্ষা দিয়া শিক্ষয়িত্রীর কাজ ও গৃহশিল্প দ্বারা আত্মনির্ভরশীল করিবার নিমিত্ত এই প্রতিষ্ঠানটি রাখিয়া, যদি সমিতি বালবিধবাদের বিবাহ দিবার স্বতন্ত্র একটি ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিদ্যাসাগর স্মৃতিসংরক্ষণ প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইবে। যে-যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অতীব প্রশংসনীয়। (২৬শে অগ্রহায়ণ লিখিত।)

—

বাংলা রপ্তানী-বাণিজ্যে প্রথম, কিন্তু—

বর্ত্তমান ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে সব চেয়ে বেশী টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ঐ সাত মাসে বাংলা হইতে ৫২৬২৩২৪৩৭ টাকার, মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে ২২০৬৩৭১৯২ টাকার, বোম্বাই প্রদেশ হইতে ২০১৩৪৩৩৪৩ টাকার ও সিন্ধু হইতে ৮৪৮০৮৬১৭ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশ হইতে যে অন্য তিনটি প্রদেশের সম্মিলিত রপ্তানী অপেক্ষাও অধিক রপ্তানী হইয়াছে, তাহার লাভটা বাঙালী কত টুকু পাইয়াছে? এই রপ্তানী বাঙালীর নিজের জাহাজে হয় নাই, রপ্তানীকারক ব্যবসাদার ও এজেণ্ট সম্ভবতঃ এক জনও বাঙালী নহে, জাহাজে মাল বোঝাই করিবার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বাঙালী থাকিলে তাহারা শতকরা কমসংখ্যক, এবং যে-সব জাহাজে মাল যায়, তাহাদের ভারতীয় নাবিকদের (লস্করদের) মধ্যে বাঙালী কয় জন জানি না—অফিসার ত এক জনও বাঙালী নহে, এবং লস্করদের মধ্যে হিন্দু বাঙালী এক জনও নাই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলার বন্দর হইতে যে-সব জিনিষ রপ্তানী হয় তাহার সবগুলা বঙ্গের নহে। তাহার মধ্যে বিহার প্রদেশের, আসাম প্রদেশের মাল আছে, এবং যুক্তপ্রদেশ ও উড়িষ্যা প্রভৃতিরও কিছু আছে।

—

চীন-জাপান যুদ্ধ

ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধায় চীন-জাপান যুদ্ধের খবর বড়-একটা আসিতেছে না। কিছু দিন আগে খবর পাওয়া গিয়াছিল বিদেশ হইতে যুদ্ধের সরঞ্জামাদি মাল পাইবার শেষ সামুদ্রিক বন্দর জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার পর, চীন সৈন্যেরা জাপানীদিগকে পরাস্ত করিয়াছে এরূপ দু-একটা সংবাদ আসিয়াছে। কিরূপ সর্ত্তে রুশিয়া চীনকে যুদ্ধের জন্য আবশ্যক মালপত্র দিতে পারে, তাহারও সংবাদ আসিয়াছে। রুশিয়ার সহিত চীনের এইরূপ সাহায্য পাইবার কি উপায় হইয়াছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। কারণ, রেঙ্গুন বন্দর দিয়া চীন যত অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিত, এখন ব্রিটেন নিজেই ব্যতিব্যস্ত বলিয়া তাহার পরিমাণ কমিবে; চীনকে রুশিয়ার উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইবে। জাপান নিজেই নিজের যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত যতটা করিতে পারে, চীন তত এখনও পারে না।

যুদ্ধে চীনের জয় আমরা চাই।

—

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক চালান শিক্ষা

প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার প্রস্তাব বঙ্গে অনেক বার হইয়াছে; সেদিনও আইন-সভায় হইয়াছিল। কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত হয় না, বা কাজে কিছু করা হয় না। অন্য কোন কোন প্রদেশ এ-বিষয়ে এতটা উদাসীন নহে।

"নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস্ স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বি-এ, বা বি-এস্‌সি পরীক্ষার্থীকে (পুরুষ) বন্দুক চালনায় দক্ষতার প্রশংসাপত্র অবশ্য দাখিল করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা প্রথমে নাগপুরস্থিত কলেজগুলিতে চালু করা হইবে, এবং পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য শহরেও করা হইবে। এই প্রস্তাবটি এখনও একাডেমী অফ আর্টস্ ও ইউনিভারসিটি কোর্টের সম্মতি পায় নাই।" ভারত।

—

আচার্য্য রামদেব

হরিদ্বার কাঙরীর গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য রামদেবের সম্প্রতি ডেরাদুনে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাতিশয় ত্যাগী ও উৎসাহী শিক্ষাব্রতী ছিলেন। শিক্ষাদান

কাযেই তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। তিনি ডেরাদুনে কন্যা-গুরুকুল স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে শুধু ভারতবর্ষের নানা অংশ হইতে ছাত্রী আসে এমন নহে, আফ্রিকাপ্রবাসী কোন কোন ভারতীয়ের কন্যাও শিক্ষালাভার্থ আসিয়া থাকে।

—

জেনিভায় ফিনল্যাণ্ড ও রাষ্ট্রসংঘ

জেনিভা, ১১ই ডিসেম্বর "রাষ্ট্রসঙ্ঘ এসেম্ব্লির অধিবেশনে ফিনিস প্রতিনিধি ডাঃ হলষ্টি সমগ্র সভ্য জাতির নিকট ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জ্ঞাপন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ফিনল্যাণ্ডের প্রতি যে সহানুভূতির ভাব প্রদর্শন করা হইতেছে, তাহাকে প্রত্যক্ষ ভাবে কার্য্যকর করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ দেশের জন্য অবারিত চিত্তে রক্ত ঢালিয়া দিতেছে। আমি আশা করি ফিনিশদিগের প্রতি আপনাদের যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহা আপনারা বিস্মৃত হইবেন না।"

রাষ্ট্রসংঘ এসেম্ব্লীর এই অধিবেশনে নরওয়ের প্রতিনিধি হামব্রো সাহেব সভাপতি মনোনীত হন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন,

"রাষ্ট্রসঙ্ঘের দুইটি সভ্যের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধিয়াছে তাহা বন্ধ করিবার জন্য, মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি।"

"জেনিভা, ১১ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে এই স্থির হয় যে, রাশিয়া ও ফিন্ল্যাণ্ডকে অবিলম্বে সংগ্রাম থামাইবার জন্য এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় তাহাদের বিরোধ মিটমাটের নিমিত্ত আলোচনা চালাইবার জন্য তার প্রেরণ করা হইবে। এবং এই সম্পর্কে উভয় পক্ষকেই উত্তর দানের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইবে।" —রয়টার

লণ্ডন, ১২ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের হেড কোয়ার্টার্স হইতে নিউ ইয়র্ক বেতার কর্ত্তৃক প্রচারিত এক বেতার সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সন্ধ্যা ৭-২০ মিনিট পর্য্যন্ত সোভিয়েট-ফিনিশ বিরোধ সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুরোধের কোনও জবাব মস্কো হইতে রাষ্ট্রসঙ্ঘে পৌঁছে নাই। জেনিভাস্থ আমেরিকার সমালোচক আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহার ফলে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মহলের বিরূপ ভাব আরও প্রবল আকার ধারণ করিতেছে।

—রয়টার

মস্কো ১৩ই ডিসেম্বর

"রাষ্ট্রসঙ্ঘ সোভিয়েট-ফিনিস বিরোধ মিটমাটের জন্য সোভিয়েটের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট অদ্য রাত্রিতে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মঃ মলটোভ গত ৪ঠা ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেলের নিকট যে তার প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতেই ইহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে। উক্ত তারে বলা হইয়াছিল যে, রাশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ কাউন্সিলের বৈঠকে যোগদান করিতে পারে না; কারণ সে ফিন্ল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে নিরত নহে; সুতরাং তাহার মতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কাউন্সিলের বৈঠক আহ্বানের উপযুক্ত কারণ ঘটে নাই।"

—রয়টার

পৃথিবীর অগণিত লোক মনে করে, কম্যুনিস্ট রুশিয়া জড়বাদী। সেটা মহা ভুল। রুশিয়া খাঁটি মায়াবাদী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব মায়া। রুশিয়ার ও ফিন্ল্যাণ্ডের হানাহানি, রক্তারক্তি, হতাহত—কিছুই সত্য নহে; সব মায়া!

—

"দেশ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত"

পুরুলিয়া। ১০ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কালদা, তুলিন এবং রামপুর গিয়াছিলেন। কালদা মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করে। তিনি সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় পুরুলিয়া ফিরিয়া আসেন। সেখানে জুবিলি প্রাঙ্গণে প্রায় দশ হাজার লোক কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেই বিরাট্ সভায় তিনি প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি, থানা কংগ্রেস কমিটি এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় বলেন, "বর্ত্তমান যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হইবে, এবং সম্ভবতঃ পরাধীন দেশগুলি তাহাদের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে। ভারতের স্বাধীনতা জগতে শান্তি আনয়ন করিবে। যদিও আমাদের নেতাগণ—কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ অন্যরূপ বলিতেছেন—তথাপি দেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।" তিনি সমবেত সকলকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে এবং স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে বলেন।

শ্রীযুত বসু সভা হইতেই বরাবর আজমগড় চলিয়া যান।

—ইউ, পি

—

ভাষা অনুসারে বঙ্গের সীমা নির্দ্ধারণ

বঙ্গের কার্জনী অঙ্গচ্ছেদ রহিত করিয়া নূতন যে অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে, তাহার দ্বারা অপেক্ষাকৃত বিরলবসতি, স্বাস্থ্যকর, এবং খনিজ ও আরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ বঙ্গের অনেকগুলি—প্রায় সবগুলি—অংশকে বাংলা প্রদেশ হইতে কাটিয়া লইয়া অন্য দুই প্রদেশের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, বাঙালী জাতির রাষ্ট্রীয় সংহতি হ্রাস করা হইয়াছে, এবং বাঙালী জাতির অধিকতর শিক্ষিত ও সার্ব্বজনিক কার্য্যে উৎসাহী অংশ হিন্দুদিগকে বাংলা প্রদেশে, বিহার প্রদেশে ও আসাম প্রদেশে রাষ্ট্রীয়শক্তিহীন করা হইয়াছে। সুতরাং এই দ্বিতীয় অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ হইয়া আসিতেছে। ব্রিটিশ পক্ষ হইতে বঙ্গের সীমা ন্যায়সঙ্গত ভাবে পুনর্নির্দ্ধারণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে।

কিন্তু পার্লেমেণ্টে বলা হইয়াও আছে যে, পার্লেমেণ্টারী আইন ছাড়া পার্লেমেণ্ট আর কিছু মানিতে বাধ্য নহে। অতএব আমাদের আন্দোলন খুব জোরে চালাইতে হইবে। নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটিতে বঙ্গের বিহার-প্রদেশভুক্ত অংশগুলি বাংলাকে ফিরাইয়া দিবার পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস ঐ প্রস্তাব অনুসারে কাজ করাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং প্রস্তাবটা মূল্যহীন হইয়া আছে। আমাদের আন্দোলন প্রবলতর করিবার আবশ্যকতার ইহাও একটি কারণ। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত বঙ্গের আইনসভায় এ-বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রশংসনীয় ও উচিত কাজ করিয়াছেন।

ভাষা অনুসারে নূতন করিয়া সিন্ধু প্রদেশ গঠিত হইয়াছে, উড়িষ্যা প্রদেশ গঠিত হইয়াছে, অথচ এক-ভাষাভাষী বাঙালীদের দেশটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কূটরাজনীতির অসঙ্গতির ইহা চমৎকার দৃষ্টান্ত।

বাঙালী কি চায়, তাহা একাধিক বিশেষজ্ঞ বাঙালী প্রবাসীতে ও মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রবন্ধের আকারে লিখিয়াছেন, আমরাও লিখিয়াছি। অন্যান্য সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে অনেক লেখা বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। একই কথা বার-বার বলিতে হইবে।

—

বাঙালীর রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক সংহতি

বঙ্গভূমিকে রাষ্ট্রীয় হিসাবে তিন টুকরা করা হইয়া থাকিলেও সমগ্রভারতে যেখানে যত বাঙালী আছেন, তাঁহাদিগকে বাঙালীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা অ-বাঙালী কাহারও ক্ষতি বা অনিষ্ট করিতে চাই না, কিন্তু সর্ব্বত্র ভারতীয় নাগরিকের সমান-অধিকার চাই। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংহতি পুনঃস্থাপন এখন আমাদের সাধ্যাতীত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় সংহতি এই প্রকারে যত টুকু রক্ষিত হইতে পারে, তাহা রক্ষা করা চাই।

সাংস্কৃতিক সংহতি পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতেই হইবে। বাঙালী মহিলা ও পুরুষ যিনি যেখানে আছেন, তাঁহাকে বাংলা বলিতে হইবে, বাংলায় চিঠি লিখিতে হইবে, সাহিত্যিক শক্তি থাকিলে বাংলা গদ্য বা পদ্য বা উভয়ই রচনা করিতে হইবে, বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইবে, বঙ্গের সংগীত ও ললিতকলার অনুরাগী হইতে হইবে, এবং শক্তি থাকিলে স্বয়ং গায়ক বাদক চিত্রকর বা ভাস্কর হইতে হইবে।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

সমগ্রভারতে বাঙালী যাহাতে বঙ্গীয় সংস্কৃতির সহিত যোগরক্ষা করিতে পারেন, তাহার জন্য কিছু করা প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের বাঙালীরাই এ বৎসর ইহার অধিবেশনের জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না। সাধারণতঃ অধিবেশনগুলিতে এক-শ দেড়-শ'র বেশী প্রতিনিধি হয় না; বেশী হইলে ২০০ হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কোন-না-কোন বড় শহরের বাঙালীদের পক্ষে তাঁহাদের থাকিবার খাইবার ব্যবস্থা চারি দিনের মত করা সাধ্যাতীত ছিল মনে হয় না।

—

অবাঙালীদিগকে বঙ্গসাহিত্যের খবর দেওয়া

বাঙালীরা তাঁহাদের সাহিত্যের 'অহঙ্কার' করিয়া থাকেন। বড় বড় লেখকদের নামও তাঁহারা করেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য এখনও যে জীবিত, বর্দ্ধিষ্ণু এবং অগ্রগতিশীল আছে, তাহা অবাঙালীদিগকে জানাইতে বাঙালী গ্রন্থকার ও গ্রন্থপ্রকাশকদিগের উৎসাহ নাই। ইংরেজী কোন মাসিকে তাঁহাদের পুস্তক-সমূহের পরিচয় যদি নিয়মিত রূপে বাহির হয়—যেমন মডার্ণ রিভিয়ুতে ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল প্রতিমাসে গুজরাটী সাহিত্যের পরিচয় বাহির হইতেছে—তাহা হইলে বঙ্গের বাহিরের জগৎ বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার কিছু পরিচয় পাইতে পারে। কিন্তু মডার্ণ রিভিয়ু বাঙালীর কাগজ, সুতরাং গেঁয়ো যোগীর মত উহা বাঙালী গ্রন্থকার ও প্রকাশকদিগের নিকট হইতে ভিখ্ পাইবে না বলিয়া উহার কথা না-বলাই ভাল। অন্য একখানি ইংরেজী কাগজের কথা বলি।

ইহার নাম "দি ইণ্ডিয়ান পী ই. এন" ("The Indian P.E.N")। পী.ই.এন্. সমগ্র পৃথিবীর একটি সাহিত্যিক সভা। পোয়েট্স্-প্লেরাইট্স্, এডিটার্স্-এসেয়িস্ট্স্, এবং নভেলিস্ট্স্—এই ইংরেজী কথাগুলির আদ্যক্ষরগুলি লইয়া পী. ই. এনের নামকরণ হইয়াছে। যে মাসিকটির কথা বলিতেছি, তাহা ভারতীয় পী. ই. এনের মুখপত্র। শ্রীমতী সোফিয়া ওআডিয়া ইহার বিদুষী সম্পাদিকা। ইহাতে প্রতিমাসে ভারতীয় নানা ভাষার নূতন বহির সমালোচনা বা পরিচয় থাকে। বাংলা বহির পরিচয় সামান্যই থাকে। তাহার কারণ বাঙালী গ্রন্থকার ও প্রকাশকেরা বহি পাঠান না। পাঠাইলে যে তাঁহারা আর্থিকলাভবান্ হইবেন, এরূপ

প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের জীবিতত্বের কিছু প্রমাণ অবাঙালীরা পাইবেন তাহা বলিতে পারি।

শ্রীমতী সোফিয়া ওআডিয়ার ঠিকানা :—

"আর্যসংঘ," নারায়ণ দাভোলকর রোড্, মালাবার হিল, বোম্বাই।

—

খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনী

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে প্রদর্শনী খুলিয়া একটি একান্ত আবশ্যক কাজের আয়োজন করিয়াছেন। প্রদর্শনী অল্পদিনস্থায়ী হইবে। ইহার একটি অংশ স্থায়ী ভাবে কোথাও রাখা উচিত প্রদর্শনীটির দ্বারমোচন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

—

যুদ্ধ সম্বন্ধে বঙ্গীয় আইন-সভায় প্রস্তাব

যুদ্ধ সম্বন্ধে বঙ্গীয় আইন-সভার দুই অংশে মন্ত্রীদের ও মন্ত্রিপক্ষীয়দের প্রস্তাবগুলি আলোচিত হইতেছে। প্রবাসীর এই সংখ্যা বাহির হইবার পূর্বে বিতর্ক শেষ হইবে। সংশোধক প্রস্তাবগুলিতে ভারতের স্বাধীনতার দাবী করা হইয়াছে, জনপ্রতিনিধিদিগের মত না-লইয়া ভারতবর্ষকে যুদ্ধে শরীক করায় গবর্মেণ্টের নিন্দা করা হইয়াছে, এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা সম্বলিত রাষ্ট্রবিধি গণপরিষদ্ কর্তৃক প্রণয়নের দাবী করা হইয়াছে। এই সকল সংশোধন সমর্থনযোগ্য।

—

দয়ানন্দ বৈদিক গ্রন্থাগার

কলিকাতার আর্যসমাজ কর্তৃক দয়ানন্দ বৈদিক গ্রন্থাগারের দ্বারমোচন উপলক্ষে সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলেন যে, যদিও তিনি আর্যসমাজী নহেন, তথাপি তিনি আর্যসমাজের শৈক্ষিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাসমূহের গুণগ্রাহী; হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারকল্পে আর্যসমাজ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অনেক হিন্দু যে হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন, তিনি এই অধোগতিতে দুঃখ প্রকাশ করেন। ভারতশাসন-আইনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, উহার কোথাও হিন্দু শব্দটি নাই,—হিন্দুরা 'হিন্দু' নহে, তাহারা অ-মুসলমান, অ-শিখ ইত্যাদি, তাহারা জেনের‍্যাল অর্থাৎ সাধারণ।

—

ভারতীয় ঐতিহাসিক দলিল কমিশন

ভারতীয় ঐতিহাসিক দলিল কমিশনের বর্তমান বৎসরের অধিবেশনে সর্ যদুনাথ সরকার সভাপতি নির্বাচিত হইয়া একটি উপলক্ষ্যোপযোগী বক্তৃতা করেন এবং অনেক লেখক কর্তৃক গবেষণাপূর্ণ অনেক প্রবন্ধ পঠিত হয়। কমিশনের অধিবেশনের পর ঐতিহাসিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষ্যে সেনেট হলে একটি বহু-শিক্ষাপ্রদ ঐতিহাসিক প্রদর্শনী হইয়াছিল।

—

বাঙালীর সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে ভারত সভা

ভারত সভা বঙ্গের নূতন গবর্ণরকে অভিনন্দন প্রদান উপলক্ষে বাঙালীদিগকে সামরিক শিক্ষা দিয়া স্থায়ী রেজিমেণ্ট গঠনের অনুরোধ জানান। শ্রীযুক্ত মন বাহাদুর সিংহের "সৈনিক বাঙালী" পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষে গত সংখ্যায় আমরা ইহার একান্ত প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছি। গবর্ণর বলেন, বিষয়টি ভারত-সরকারের এলাকাভুক্ত; তিনি ইহা ভারত-সরকারকে জানাইবেন।

—

সরকারী আর্টস্কুলে চিত্রপ্রদর্শনী

সরকারী আর্টস্কুলে চিত্রপ্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ইহা ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকিবে। ইহাতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদিগের এবং অন্য অনেকের চিত্র রাখা হইয়াছে।

[বিবিধ প্রসঙ্গ ২৮শে অগ্রহায়ণ সমাপ্ত

কষ্টিপাথর

নারীর কর্তব্য

শ্রীআন্নাকালী পাকড়াশি

পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে,
মনু-পরাশরদের সাধ্য নাই টানে তারে পিছে।
বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ,
খাওয়া-ছোঁওয়া সব তাতে তর্ক করে, বাধে গোলযোগ।

মেয়েরা বাঁচাবে দেশ, দেশ যবে ছুটে যায় আগে।
হাই তুলে দুর্গা ব'লে যেন তারা শেষ-রাতে জাগে;
খিড়কির ডোবাটাতে সোজা
ব'হে যেন নিয়ে আসে যত এঁটো বাসনের বোঝা;
মাজা-ঘষা শেষ ক'রে আঙিনায় ছোটে,
ধড়'ফড়ে জ্যান্ত মাছ কোটে
দুই হাতে ল্যাজামুড়ো জাপটিয়ে ধরে
সুনিপুণ কবজির জোরে,
ছাই পেতে বঁটির উপরে চেপে ব'সে
কোমরে আঁচল বেঁধে ক'ষে।
কুটি কুটি বানায় ইঁচোড়,
চাকা চাকা করে থোড়
আঙুলে জড়ায় তার সুতো,
মোচাগুলো ঘস্ ঘস্ কেটে চলে দ্রুত;
চালতারে
বিশ্লেষণ করে খরধারে।
বেগুন পটোল আলু খণ্ড খণ্ড হয় সে অগুন্তি।
তারপরে হাতা বেড়ি খুন্তি,
তিন-চার দফা রান্না সে
নানা ফরমাসে,
আপিসের, ইস্কুলের, পেট-রোগা রুগীর কোনোটা,
সিদ্ধ চাল, সরু চাল, ঢেঁকিছাঁটা কোনোটা বা মোটা।
যবে পাবে ছুটি
বেলা হবে আড়াইটা। বিড়ালকে দিয়ে কাঁটাকুটি
পান-দোক্তা মুখে পুরে দিতে যাবে ঘুম,
ছেলেটা চেঁচায় যদি পিঠে কিল দেবে ধুমাধুম
বলবে, বজ্জাত ভারি।
তার পরে রাত্রে হবে রুটি আর বাসি তরকারি।

জনার্দন ঠাকুরের
পানা-পুকুরের
পাড়ের কাছটা ঢাকা কলমির শাকে।
গা ধুয়ে তাহারি এক কাঁকে,
ঘড়া কাঁখে, গায়েতে জড়ায়ে ভিজে শাড়ি
ঘন ঘন হাত নাড়ি
খস্ খস্ শব্দ করা পাতায় বিছানো বাঁশবনে
রাম নাম জপি মনে মনে
ঘরে ফিরে যায় দ্রুতপায়ে
গোধূলির ছমছমে অন্ধকার ছায়ে।
সন্ধেবেলা বিধবা ননদী বসে ছাতে,
জপমালা ঘোরে হাতে।
বউ তার চুলের জটায়
চিরুনি আঁচড় দিয়ে কানে কানে কলঙ্ক রটায়
পাড়াপ্রতিবেশিনীর,—কোনো সূত্রে শুনতে সে পেয়ে
হন্তদন্ত আসে ধেয়ে
ও-পাড়ার বোসগিন্নি; চোখা চোখা বচন বানায়ে
স্বামীপুত্র-খাদনের আশা তারে যায় সে জানায়ে।

কাপড়ে জড়ানো পুঁথি কাঁখে
তিলক কাটিয়া নাকে
উপস্থিত আচার্যি মশায়,
গিন্নির মধ্যমপুত্র শনির দশায়,
আটক পড়েছে তার বিয়ে;
তাহারি ব্যবস্থা নিয়ে
স্বস্ত্যয়নের ফর্দ মস্ত,
কর্তারে লুকিয়ে তারি খরচের হোলো বন্দোবস্ত।
এমনি কাটিয়ে যায় সনাতনী দিনগুলি যত
চাটুজ্জে মশা'র অনুমত,
কলহে ও নামজপে ভবিষ্যৎ জামাতার খোঁজে—
নেশাখোর ব্রাহ্মণের ভোজে।
মেয়েরাও বই যদি নিতান্তই পড়ে
মন যেন একটু না নড়ে।
নূতন বই কি চাই? নূতন পঞ্জিকাখানা কিনে
মাথায় ঠেকায়ে তারে প্রণাম করুক শুভদিনে।
আর আছে পাঁচালির ছড়া,
বুদ্ধিতে জড়াবে জোরে ন্যাশন্যাল কাল্‌চারের দড়া।
দুর্গতি দিয়েছে দেখা, বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,
বি. এ. এম. এ. পাস করে ছড়াইছে বীজ
যুক্তি-মানা ঘোর ম্লেচ্ছতার।
ধর্মকর্ম হোলো ছারখার।
শীতলা মায়ীরে করে হেলা;
বসন্তের টীকা নেয়; গ্রহণের বেলা
গঙ্গাস্নানে পাপ নাশে
শুনিয়া মূর্খের মতো হাসে।

তবু আজো রক্ষা আছে, পবিত্র এ দেশে
অসংখ্য জন্মেছে মেয়ে পুরুষের বেশে।
মন্দির রাঙায় তারা জীবরক্তপাতে,
সে রক্তের ফোঁটা দেয় সন্তানের মাথে।
কিন্তু যবে ছাড়ে নাড়ী,
ভিড় করে আসে দ্বারে ডাক্তারের গা ড়ি।
অঞ্জলি ভরিয়া পূজা নেন সরস্বতী,
পরীক্ষা দেবার বেলা নোটবুক ছাড়া নেই গতি।
পুরুষের বিদ্যে নিয়ে কলেজে চলেছে যত নারী,
এই ফল তারি।
মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে পুরুষ যখন ঠাণ্ডা হবে,
দেশখানা রক্ষা পাবে তবে।

বুঝি নে একটা কথা, ভয়ের তাড়ায়
দিন দেখে তবে যেথা ঘরের বাহিরে পা বাড়ায়
সেই দেশে দেবতার কুপ্রথা অদ্ভুত,
সব চেয়ে অনাচারী সেথা যমদূত।
ভালো লগ্নে বাধা নেই, পাড়ায় পাড়ায় দেয় ডঙ্কা।
সব দেশ হ'তে সেথা বেড়ে চলে মরণের সংখ্যা।

বেস্পতিবারের বারবেলা
এ কাব্য হয়েছে লেখা, সামলাতে পারব কি ঠেলা।

অলকা]

বাণীহারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হায় মোর নাহি যে বাণী
আকাশে হৃদয় শুধু বিছাতে জানি।
আমি অমাবিভাবরী আলোকহারা
মেলিয়া তারা
চাহি নিঃশেষ পথপানে
নিষ্ফল আশা নিয়ে প্রাণে।
বহুদূরে বাজে তব বাঁশি
সকরুণ সুর আসে ভাসি
বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি
দিই যে ফিরায়ে,
সে কি তব স্বপ্নের তীরে
ভাঁটার স্রোতের মতো
লাগে ধীরে অতি ধীরে ধীরে।

জয়শ্রী]

পুরনো চিঠি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ সকালে আমরা লণ্ডনে এসে পৌঁছেছি। যে ঠিকানায় আরবারে ছিলুম আসছে সপ্তাহে সেইখানে যাব এখনো সেখানে জায়গা খালি হয় নি। আমরা ওলিম্পিক ব'লে যে জাহাজে চড়ে আটলান্টিক পার হয়েছি সেই জাহাজটা বোধকরি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় জাহাজ। শান্তিনিকেতন থেকে বাঁধ পর্য্যন্ত যতটা ততটা লম্বা হবে। আমরা যে ডেকের ক্যাবিনে ছিলুম সে ডেকটা পঞ্চম তলার ডেক অর্থাৎ তার উপরে থাকে-থাকে আরও চারতলা ক্যাবিন আছে এবং তার নিচেও অনেক তলার ক্যাবিন। এর থেকে বুঝতে পারবে জাহাজটা কত উঁচু। তা ছাড়া শয়নাসন আরাম-বিরাম আহার-বিহারের যে ব্যবস্থা সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ছ-দিন মাত্র মেয়াদ কিন্তু এই ছ-দিনের জন্যে রাজকীয় আয়োজন। এই বিপুল ভোগের বোঝা বহন করে বেড়াবার যে শক্তি তা কল্পনা করলে বিস্মিত হ'তে হয়—কোথাও লেশমাত্র মলিনতা বা শিথিলতার চিহ্নটুকু নেই। এত বড় একটা উদ্যোগ কিন্তু কোনোখানে প্রয়াসের কোনো লক্ষণ বাইরে থেকে দেখা যায় না। আমাদের মস্তিষ্কে হৃৎপিণ্ডে পাকযন্ত্রে যেমন অহরহ একটা বিচিত্র এবং বৃহৎ চেষ্টা চলেছে অথচ আমরা সমস্তকে কেমন অনায়াসে বহন করে নিয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছি এ কতকটা যেন সেই রকম। যে শক্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত ও সচেষ্ট থেকেও আপনাকে সুবিহিত পারিপাট্যের মধ্যে সমাবৃত রাখতে পারে তাকে দেখে মনের মধ্যে সম্ভ্রম জন্মায়; বিশেষত এই জিনিষটা আমাদের দেশে আমরা দেখতে পাই নে। সেখানে শক্তির রথ গোরুর গাড়ির মত, তার সামর্থ্য অল্প, সে চলে কম, সে শব্দ করে বেশি, তার বাহন বেচারা অবিশ্রাম ল্যাজ মলা খায় এবং তার চালকেরও মুহূর্তকাল বিশ্রাম নেই।

আমাদের আশ্রম-বিদ্যালয়ের ললাট থেকে এই কুণ্ঠার কুঞ্চনরেখা এখনো ঘোচে নি। আমাদের ত্যাগের মধ্যে চেষ্টার মধ্যে ক্লেশ রয়েছে; যত দিন আমাদের মধ্যে দীনতা থাকবে তত দিন এই ক্লেশের ভার আমাদের বহন করে চলতে হবে, তত দিন এর চাকার ভিতর থেকে আর্তস্বর শুনতে পাব। কিন্তু তবু এ ক্লেশ স্বীকার করতে হবে; এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নিষ্কৃতির চেষ্টা করলে চলবে না। কেননা চলতে চলতেই তবে চলবার বাধা ক্ষয় হয়। আমাদের আত্মার দীনতা ধনের দীনতার মত নয়, দান করতে করতেই তার দৈন্য হ্রাস হতে থাকে, তার ভার বহন করবার দুঃখটা বহন করবার দ্বারাই দিনে দিনে লঘু হয়ে আসে, বস্তুত শ্রমের দ্বারাই তার শ্রান্তি দূর হয়ে আসে। এইটেই কি আমরা আমাদের আশ্রমের সাধনার ভিতর থেকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই নি? কিন্তু অধীর হলে চলবে না, জীবনের কার্য্য ইমারৎ গেঁথে তোলার মত নয়, কতখানি অগ্রসর হল কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। এমন কি অনেক সময় বিরুদ্ধ আকারে সে আপনাকে প্রকাশ করে,

সেই জন্তে আমি বাইরের দিক থেকে সফলতার বিচার করতে চাই নে; আমি কেবল এই টুকুই দেখতে চাই, আমি যেন সত্য হতে পারি। আমি এই জানি আমার উপর যে দাবি আছে সে আমাকে যেমন করে হোক পূরণ করতেই হবে। এ দাবি অন্যে স্বীকার করছে কি না সে কথা বিচার করতে গেলেই নিজের দায় অন্যের স্কন্ধে চাপাবার দুর্বলতা মনকে পেয়ে বসে। আমার অন্তর্যামীর সঙ্গে আমার যা বোঝা-পড়া আছে তাই আমি জানি—আমি আর কিছুই জানি নে, জানবার চেষ্টা করতে গেলে পদে পদে ভুল বিচার করি, তাতে কেবল অপরাধ বাড়তে থাকে। আমাদের দাবি হচ্ছে কেবল দেবার দাবি—অন্যের কাছ থেকে পাবার দাবি কিছুই নয়—এই কথাটি যেন প্রসন্নমনে অন্তরের মধ্যে জাগরূক রাখতে পারি।

বঙ্গলক্ষ্মী]

যুগ-পরিবর্তন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাজের গভীর পরিবর্তনগুলি অন্তরের থেকে ঘটে। বাহিরের শিক্ষা ও অবস্থার যোগে এই পরিবর্তন ক্রমশ বল পেতে থাকে। প্রথার সঙ্গে অবস্থার ও নবশিক্ষিত চিত্তবৃত্তির অসামঞ্জস্য নিয়ে বেদনাবোধ এইটে হচ্ছে পরিবর্তনের প্রথম সূচনা। স্বভাবতই সাহিত্যের কাজ হচ্ছে এই বেদনাকে প্রকাশ করা। তার ভালোমন্দ বিচার করা বা তার প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করা রসসাহিত্যের কর্তব্য বলে মনে করি নে। দেশের মেয়েরা এখনো রয়েছে সাবেক কালে'। তাদের শিকড় বাঁধা সমাজের গভীরে, এই কারণেই বর্তমান যুগ যখন নড়েচড়ে ওঠে তখন কঠিন টান পড়ে মেয়েদের জীবনে, তারা দুঃখ পায়। সেই দুঃখের কথাই আমার লেখায় অনেক বার প্রকাশ পেয়েছে। এই দুঃখের নিরন্তর আঘাতে সেই চিত্তবৃত্তি ভিতর থেকে আপনি গড়ে উঠবে যা অবস্থান্তরের সঙ্গে আপন সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তুলবে। রাশিয়ায় যা ঘটেছে বা য়ুরোপে যা ঘটে তা সেখানকার মনঃ-প্রকৃতির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নানা বিরোধের মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে উঠছে। আমাদের দেশেও সেইরকম ঘটবে। কিন্তু ঘটবে অনুকরণ করে নয়, নিজের নিয়মে। যা চলে এসেছে তাই চিরকাল চলবে না এইমাত্র জানি, কেননা প্রতিদিন পথ বদলাচ্ছে, দিক্-পরিবর্তন হচ্ছে, কারো সাধ্য নেই কালকে প্রতিরোধ করতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও বৈদিককাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে আজও নূতন পরিবর্তনের জন্ত প্রস্তুত হতে হবে। অনেক রকম পরীক্ষা হবে, কোনোটা টি'কবে, কোনোটা টি'কবে না। তারি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সমাজের সৃষ্টি ক্রিয়া চলবে।

জয়শ্রী]

রাষ্ট্রভাষা-সমস্যা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ.

...রাষ্ট্রভাষার যে ধুয়ো উঠেছে তাতে যেন সত্যের প্রতি জুলুম করবার আশঙ্কা হচ্ছে। লোকের প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে কত শতাব্দী ধ'রে যে-ভাষা যে-দেশে আত্মলাভ করেছে তার দাবী অগ্রাহ্য করবার কথা উঠলেই মনে খটকা বাধে। যদি বলেন যে প্রত্যেক প্রদেশের মাতৃভাষার অনুরাগ বজায় রেখেও একটি রাষ্ট্রভাষা গঠিত হতে পারে, তা হলে সে-কথা সত্য হবে না। কারণ,আমরা এখন যেমন করে ইংরেজী শিখে থাকি, তেমনি ভাবে যদি হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষার চর্চ্চা করি, তা হলে রাষ্ট্রভাষা তাকে বলা চলবে না। কেননা এখনও ভেবে দেখলে বুঝা যায় যে যারা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে, তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা একটা রাষ্ট্রভাষার চলন হতে পারে না। প্রাদেশিক ভাষাকে ডুবিয়ে, তলিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে যদি কোনও ভাষাকে ভারতের একতম ভাষারূপে পরিণত করা যায়, তা হলে অবশ্য 'রাষ্ট্রভাষা' নাম সার্থক হতে পারে। কিন্তু প্রথমত এমন শক্তি কার আছে যে এই অসাধ্য সাধন করতে পারবে? রাজশক্তি পশ্চাতে থাকলেও এ-কাজ সহজ হবে না। অশোকের মত একচ্ছত্র নৃপতিও তা করতে পারেন নি। তাঁর বিভিন্ন দেশের শিলা- ও স্তম্ভ- লিপি দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, তিনিও সমস্ত দেশে এক ভাষা চালাতে পারেন নি। শুধু শুধু আত্মপ্রতারণার দ্বারা আমরা বলক্ষয় করতে উদ্যত হয়েছি।...

আমাদের হিন্দুস্থানী বন্ধুগণ চিরদিন আমাদের প্রতি অনুকূল ছিলেন। আমরা বাঙালীরাও তাঁদের নানাপ্রকারে সাধ্যমত সেবা করে এসেছি। তাঁদের শিক্ষাপ্রচারে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সমাজ-সংস্কারে আমরা এত দিন যথাসাধ্য সহযোগিতা করে এসেছি। কিন্তু এখন আর আমাদের সেদিন নেই। আমাদের প্রতি তাঁরা ক্রমেই শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছেন। যা অবশিষ্ট ছিল, তা এই বাংলা-হিন্দীভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপ বিষাক্ত গ্যাসে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যাবে বলে মনে হয়। কিন্তু কেন? প্রত্যেকেই যে নিজের মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হবে এ ত স্বাভাবিক। তাঁরা হিন্দীভাষার মহিমা কীর্ত্তন করুন, আমরা কান পেতে শুনতে রাজী আছি। যে-ভাষায় সুরদাস, তুলসীদাস, নন্দদাস প্রভৃতি অমর কাব্য রচনা করেছেন, তার প্রশংসায় কে কৃপণতা করবে?...ওঁদের এক অখিল ভারত হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলনে দেখলাম যেন ওঁরা আগে থেকেই লঙ্কা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ফেলেছেন! যাঁরা রাষ্ট্রভাষার পৃষ্ঠপোষক তাঁদের ফতোয়া কিন্তু অন্তরূপ। তাঁরা হিন্দীভাষা ও চান না। তাঁরা চান এমন একটি ভাষা যার অর্দ্ধেক হবে উর্দ্দু আর অর্দ্ধেক হবে হিন্দী। এই নরসিংহ মূর্ত্তি ভারতীয় সাহিত্যের স্ফটিক স্তম্ভ বিদীর্ণ করে কবে আবির্ভূত হবে তা জানি নে। কার বিনাশের জন্ত, সেটাও কালই প্রমাণ করবে।...

দেশ]

ভ্রমণ-সাহিত্য

শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র

আমাদের সাহিত্যে অভাব বিস্তর, ভ্রমণ-রচনার অভাব তাদেরই একটা প্রধান।...আমরা ভ্রমণকাহিনী লিখতে পারি না তার কারণ, আর কোন বিষয়ে না হ'লেও, ভ্রমণের ব্যাপারে আমরা বড্ড বেশী সীরিয়াস। সত্য কথা বলতে কি, ভ্রমণ করতেই আমরা জানি না। শতাধিক বৎসর ধরে কুক্-কোম্পানীর জাহাজ চড়ে জ্ঞানার্থী বা 'অর্থকরী বিদ্যার্থী' যাত্রীরা য়ুরোপে গেছেন এবং একই পথে ফিরে এসেছেন, কিন্তু তাঁদের এ যাওয়া ও আসার মধ্যে খানিকটা রপ্তানি ও আমদানির ভাব ধরা পড়ে— যেন বাক্সবন্দী পার্শেলের চালান হয়ে যাওয়া এবং আসা। স্পষ্টই বোঝা যায়, চোখ এবং কান নামক ইন্দ্রিয় দুটিকে তাঁরা সযত্নে ঢেকে যাওয়া আসা করেছেন, নইলে ভ্রমণ-সাহিত্যের এমন দুর্ভিক্ষ সম্ভব হত না।...

এক হিসাবে আমাদের পর্য্যটকদের দুই ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম দল, যাঁরা Critique of Pure Reason নিয়ে বেরোন; দ্বিতীয় দল, যাঁরা গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরোন। প্রথম দল জ্ঞানান্বেষণে এতই ব্যস্ত থাকেন যে কিছুই দেখবার অবসর পান না। দ্বিতীয় দলও কিছু দেখেন না, কেননা ক্যামেরার কাচের দিকে চেয়ে-চেয়েই তাঁদের সময় কেটেছে। ভ্রমণ ব্যাপারটা প্রথম দলের কাছে হর্বার্ট স্পেন্সারের একটি প্রবন্ধের মতোই শ্রদ্ধেয়, কেননা বাল্যকাল থেকে তাঁরা শুনে এসেছেন যে ভ্রমণ মনোবিকাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ টনিক, বুদ্ধি-বৃত্তির জড়তা ভাঙার পক্ষে কড়া রকমের কফি, এবং কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীকরণের পক্ষে একেবারে চকমকি পাথর। দ্বিতীয় দলের কাছে ভ্রমণ ব্যাপারটা অন্য পাঁচ রকম খরচের মতোই একটা বিশেষ রকমের খরচ, সুতরাং তাঁদের লক্ষ্য আখ থেকে যতটা সম্ভব রস নিষ্কাষণ করে নেয়া। তাই ক্যামেরা আর নোট-বুক নিয়ে তাঁরা সর্ব্বদা ব্যস্ত।...

এঁরাই ফিরে আসেন দেশে, তাঁদের প্রবাসের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন।...এই সব রচনাকেও দুই দলে ভাগ করা যায়, এদের রচয়িতাদেরই মতো। প্রথম বিভাগে পড়ে সেই জাতের লেখা যারা মুখ্যত শেখাতে চায়। এ ধরণের বই পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সুদীর্ঘ তিন-চার শ পাতার অগণিত বাক্যে ও শব্দে এই কথাটাই লেখক জানাতে চান যে, দীর্ঘ প্রবাসের পর তিনি ফিরে এসেছেন ভয়ানক রকম পাণ্ডিত্য এবং ভীষণ রকম উদার-পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে, মনে বিদ্যার আর সুরুচির দুর্লভ, পয়লা-নম্বর বার্নিশ চড়িয়ে; এবং বইখানি তাঁর আর কিছু নয়, দেশের অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত জনগণের জন্য কিঞ্চিৎ জ্ঞান বিতরণের আয়োজন। পদে পদে নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্যের আলোচনায় আর বিদেশী বাক্যে ও উদ্ধৃতিতে এ-জাতীয় বই পঞ্চতপা ব্রহ্মচারীর পক্ষেও ধৈর্য্য ধরে পড়া কঠিন। দ্বিতীয় দলের লেখাকে এক কথায় বলা যায় এক-একটি গাইড-বুক বিশেষ,—তবে, উচ্চাঙ্গের গাইডবুক, সন্দেহ নেই।...

ভ্রমণকাহিনী এক হিসাবে লেখকের আত্মজীবনী ছাড়া কিছু নয়,—সমগ্র না হলেও আংশিক; নতুন দেশ, নতুন মানুষ, শুধু পটভূমিকা। আমি তো মনে করি সেই বইকেই আমরা প্রথম শ্রেণীর ভ্রমণ-রচনা বলতে পারি, যেখানে আমরা পাই একটা নতুন পারিপার্শ্বিকের ভিতর একটা জীবন্ত মানুষের কয়েকটা দিনের ইতিবৃত্ত। নইলে, নিজের কথা ছেড়ে লেখক যদি নিরপেক্ষ ভাবে বিদেশের বর্ণনা দেন, সে-লেখা গাইডবুক হতে বাধ্য, কিম্বা যদি সব ছেড়ে বিদেশলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা লিখতে বসেন, সে-রচনা বক্তৃতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।...

আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য অংশের মতো এ-অংশেরও প্রথম সংস্কার করলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ছিন্নপত্র' 'যাত্রী' 'রাশিয়ার চিঠি' 'জাপানযাত্রীর পত্র' প্রথম খাড়া করল উচ্চাঙ্গের ভ্রমণ-রচনার আদর্শ। এ-বইগুলির মূল কথা বিদেশ নয়, কবি নিজে। এ-বই পড়লে যে রাশ্যা বা জাপান বা জাভার পথঘাট জলবায়ু আমাদের নখদর্পণে এসে যাবে বা সেখানকার সমাজের আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন খুঁটিনাটি আমাদের ওষ্ঠ-প্রান্তকে এসে আশ্রয় করবে, এমন আশা নেই।...কিন্তু এই বইগুলিতে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথকেই,—শিলাইদহ থেকে পিটার্সবার্গ এবং বাটাভিয়া থেকে কিয়োটোর বিচিত্র ও বিভিন্ন পটভূমিতে। কবি ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, অনেক কিছু নতুন ও সুন্দর জিনিষ তাঁর চোখে পড়েছে, অনেক কিছু ভালো লেগেছে, অনেক লাগে নি। কিন্তু যা ভালো লেগেছে এবং যা ভালো লাগে নি দুই-ই গুঞ্জন তুলেছিল কবির মনে, দুই-ই ফুটিয়েছিল সাবানের ফেনার মতো ভাবনার হাল্কা বুদ্বুদ এবং এই গুঞ্জনের রেশ মিলিয়ে যাবার আগে, ভাবনার এই বুদ্বুদ ফেটে হাওয়ায় হারিয়ে যাবার আগে কবি সেগুলিকে ধরে রেখেছেন কাগজে আর কালিতে, চিঠিতে আর ডায়েরির পৃষ্ঠায়।...

রূপ ও রীতি]

ভ্রম-সংশোধন

গত অগ্রহায়ণ মাসের "বিবিধ প্রসঙ্গে" (পৃ. ২৭২, দ্বিতীয় স্তম্ভ, ৩য় পংক্তি) "গত ২১শে আগষ্টের হরিজন" স্থলে "গত ২১শে অক্টোবরের 'হরিজন'" পড়িতে হইবে।

খাদ্য ও পুষ্টি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাষ্ট্রিক অবস্থার উন্নতি উদ্দেশে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভের জন্য আমরা কিছু কাল থেকে প্রাণপণ প্রয়াস করে আসছি। স্বদেশের শাসন-চালনার দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়াতে আমাদের যে দুর্গতি তারই বেদনা আমাদের মনকে সর্বাপেক্ষা পীড়িত করেছে। কিন্তু আমাদের উন্নতির আমাদের আত্মরক্ষার বাধা আমাদের বিনাশের মূলগত আশ্রয়, তাদের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেতনা জড়ত্বে আচ্ছন্ন, কেন না তারা আমাদের চিরাভ্যস্ত। সেই সকল অভ্যাসের সাংঘাতিকতা মুখ্যভাবে আমরা মনেই আনতে পারি নে। বহু কাল ক্রমাগত মমত্বের অন্তরালে তাদের শত্রুরূপে উপলব্ধি করতে পারি নে ব'লেই তাদের নিরবচ্ছিন্ন শত্রুতা এমন সর্বনাশা। সেই অন্তঃশত্রু শত শত বৎসর আমাদের মর্মস্থলে বাসা ক'রে জীবনযাত্রায় আমাদের অকৃতার্থ ক'রে তুলছে, সে থাকে আমাদের দিনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে, নিমেষে নিমেষে আমাদের আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার জন্যে ঝড়ের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা বনস্পতির কাজ, কিন্তু যদি তার শিকড়ে লেগে থাকে উই, তাহলে তার আত্মরক্ষার সমস্যা বাইরে হয় গৌণ, ভিতরে হয়ে ওঠে মুখ্য।

য়ুরোপে বিগত মহাসমরের যখন অবসান হোলো তখন বিজিত জর্মনদের যথোচিত আহারের অপ্রতুলতা নিয়ে মানবহিতৈষী নেভিনসন যে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন অবিকল সেই আক্ষেপই যে আমাদের হয়ে আর কেউ করে না, এমন কি আমরা নিজেও করি নে তার কারণ জগতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূল্য অকিঞ্চিৎকর।

নেভিনসন বলেছিলেন দেহমনের তেজরক্ষার উপযোগী আহার থেকে সম্প্রতি কিছু কাল জর্মনরা বঞ্চিত আছে ব'লে সমস্ত জাতির ভাবী উন্নতির পক্ষে বিষম ক্ষতি ঘটছে। অর্থাৎ খাদ্যের অসম্পূর্ণতা জর্মন জাতির জীবনীশক্তির লাঘবতা ঘটাচ্ছে। আলু রুটি মাংস ও মাখন তারা পুরো পরিমাণে পাচ্ছে না এর ক্ষতি যে কত দূরগামী ও ব্যাপক সেই কথা স্মরণ ক'রে তিনি শঙ্কিত হয়েছেন।

আহার্যের অপূর্ণতাবশত দীর্ঘকাল হ'তে আমাদের প্রাণসম্বলের ক্ষয় হয়েছে এবং নিরন্তর হ'তে চলেছে সে-কথা এত দিন ভুলেছিলুম, কিন্তু আর ভুললে চলবে না। যে-সকল জাতি প্রবল শক্তিমান তাদের সঙ্গে সকল বিষয়েই আমাদের প্রতিযোগিতার সময় এসেছে। জীবিকার ক্ষেত্রে আমরা ছোটোবড়ো সকল দিক থেকে হটে যাচ্ছি। বাইরের সুযোগ সম্বন্ধে বিঘ্নকে দোষ দিয়ে আমরা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা ক'রে থাকি। কিন্তু সেই বিঘ্নের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লড়াই করতে যে পারি নে তার গোড়াকার কারণ আমাদের অপথ্যসংকুল খাদ্য যেটুকু শক্তির জোগান দেয় সে কেবল মানবজগতের বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেপথ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থাকবার মতো, সভ্যতার দুরূহ পথযাত্রায় শক্তি দেবার মতো নয়। তাই দুর্গমের অধ্যবসায়ে কেবলি আমাদের ক্লান্তি আসে, আমরা হার মানি। বুদ্ধির মূলধন আমাদের যথেষ্ট নেই সে-কথা সত্য নয় কিন্তু সেই বুদ্ধিকে অক্লান্ত চেষ্টায় ষোলো আনা খাটাতে যে উদ্যমের প্রয়োজন তাকে রক্ষা করতে পারে পুরুষানুক্রমে যথোচিত খাদ্যসেবন।

অতএব যে-সকল কর্তব্যকে আমরা ন্যাশনাল আখ্যা দিয়ে গৌরব ক'রে থাকি ভোজ্যের উৎকর্ষ সাধন তার মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে। তাই যখন ভারতীয় সকল জাতির খাদ্যবিশ্লেষণ-তালিকায় দেখা যায় বাঙালীর খাদ্য পুষ্টিকরতার গুণে প্রায় সকলের নিচের কোঠায় তখন সে জন্যে লজ্জিত না হয়ে থাকতে পারি নে। বাঙালী জাতিকে কোনো বিদেশী যদি

নির্বোধ ব'লে নিন্দা করত তবে সেই অভিযোগ কখনো আমরা ধৈর্যের সঙ্গে স্বীকার করতে পারতুম না। কিন্তু যে আহারের প্রথা জীবনীশক্তির অনুকূল নয়, যা সমস্ত জাতিকে অক্ষমতার পথে ক্ষয়ের পথে শনৈঃ শনৈঃ নিয়ে চলেছে জেনেশুনেও সেই আত্মঘাতী অভ্যাসকে পরিত্যাগ করতে না পারার মতো মূঢ়তা কি কম ভৎ'সনার যোগ্য।

জেনে শুনে নয় তো কী। আজ বাংলা দেশে কে না জানে যে চোখভোলানো সাদা রঙের মোহে আমরা যে কলের চালের ভাত খেয়ে থাকি তার পরিত্যক্ত অংশই খাদ্য হিসাবে মূল্যবান। চালের সেই ছাল বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। আহার্য সম্বন্ধে যাদের বুদ্ধি সজাগ এবং নির্বাচন-শক্তি সতর্ক তারা আমাদের ভোজ্যের সেই অনাদৃত আবর্জনাকেই সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে। আজ কে না জানে ভাতের ফেনের সঙ্গে বাঙালীর প্রাণশক্তির ধারা প্রতিদিন গড়িয়ে চলে যাচ্ছে রান্নাঘরের নর্দমায়। কিন্তু স্বজাতির আয়ুক্ষয় নিবারণ লক্ষ্য ক'রে নিজেদের অভ্যাসের সঙ্গে রুচির সঙ্গে লড়াই করতে যারা না পারে তারা নিজের বিদেশী শত্রুভাগ্য নিয়ে বিলাপ-পরিতাপ করতে যেন লজ্জাবোধ করে।

এই সকল উদ্বেগের কথা চিন্তা ক'রে জরাক্রান্ত শরীরের বাধা ও সংকীর্ণ অবকাশ সত্ত্বেও আজ খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কীয় প্রদর্শনীতে কলিকাতা পৌরপরিষদের আমন্ত্রণ রক্ষা আমি কর্তব্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছি। এই অনুষ্ঠান এই পরিষদের উপযুক্ত, আমি একে আমার সম্মান নিবেদন করি। ইতি ১৫।১২।৩৯

[কলিকাতা পৌরপরিষদের অনুষ্ঠিত খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কীয় প্রদর্শনীতে পঠিত]

চিত্রপরিচয়

"তাসের দেশের রাজা" ছবিখানি রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" নাটিকার অভিনয় উপলক্ষে অঙ্কিত। "তাসের দেশ" "যেন ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন। দেখলুম ওরা চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলেছে, বুকে পিঠে চ্যাপ্টা। পা ফেলছে খিট খুট খিট খুট শব্দে, বোধ করি চৌকুনী নূপুর পরেছে পায়ে, তৈরি সেটা তেঁতুল কাঠে।" তাসের দেশের লোকদের উৎপত্তি যখন "ব্রহ্মা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেলবেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন পবিত্র সেই হাই থেকে আমাদের উদ্ভব।" "শুভ গোধূলি লগ্নে পিতামহ চার মুখে এক সঙ্গে তুললেন চার হাই।" "বেরিয়ে পড়ল ফস ফস করে ইস্কাবন, রুইতন, হরতন, চিড়েতন।"... তাসদ্বীপবাসীদের "চালটাই আছে চলন নেই।"



মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের অভ্যন্তরে উৎকীর্ণ মূর্তি
শিল্পী শ্রীখগেন্দ্র রায় ও তাঁহার সহকারীগণ কর্তৃক গঠিত

বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে সবত্র-স্মরণীয় বার্তা সর্বজনবিদিত, তারও পুনরুচ্চারণের উপলক্ষ্য বারংবার উপস্থিত হয়, যে মহাত্মা বিশ্বপরিচিত, বিশেষ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয় তাঁরও পরিচয়ের পুনরাবৃত্তির জন্যে। মানুষ আপন দুর্বল স্মৃতিকে বিশ্বাস করে না, মনোবৃত্তির তামসিকতায় স্বজাতির গৌরবের ঐশ্বর্য্য অনবধানে মলিন হয়ে যাবার আশঙ্কা ঘটে, ইতিহাসের এই অপচয় নিবারণের জন্যে সতর্কতা পুণ্য-কর্মের অঙ্গ। কেননা, কৃতজ্ঞতার দেয় ঋণ যে জাতি উপেক্ষা করে, বিধাতার বরলাভের সে অযোগ্য।

যে সকল অপ্রত্যাশিত দান শুভ দৈবক্রমে দেশ লাভ করে, সেগুলি স্থাবর নয়; তারা প্রাণবান, তারা গতিশীল, তাদের মহার্ঘ্যতা তাই নিয়ে। কিন্তু সেই কারণেই তারা নিরন্তর পরিণতির মুখে নিজের আদি পরিচয়কে ক্রমে অনতিগোচর ক'রে তোলে। উন্নতির ব্যবসায়ে মূলধনের প্রথম সম্বল ক্রমশই আপনার পরিমাণ ও প্রকৃতির পরিবর্তন এমন ক'রে ঘটাতে থাকে, যাতে ক'রে তার প্রথম রূপটি আবৃত হয়ে যায়, নইলে সেই বন্ধ্যা টাকাকে লাভের অঙ্কে গণ্য করাই যায় না।

সেই জন্যেই ইতিহাসের প্রথম দূরবর্তী দাক্ষিণ্যকে সুপ্রত্যক্ষ ক'রে রাখবার প্রয়োজন হয়। পরবর্তী রূপান্তরের সঙ্গে তুলনা ক'রে জানা চাই যে, নিরন্তর অভিব্যক্তির পথেই তার অমরতা, নির্বিকার জড়ত্বের বন্দিশালায় নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহিত্যভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন। তার পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথখননের জন্যে বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানা দিক থেকে সে আহ্বান স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে। ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্যসংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানে ইতিহাসে; আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহনরূপে রসসৃষ্টিতে; এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ ক'রে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা। বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে, তার সত্তায় শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছিল।

ভাষার অন্তরে একটা প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে, সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষাসৃষ্টি-কার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুণ্ণ করেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এই জন্য বাংলা ভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনা-বোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাংলা ভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনোটিই অপ্রচলিত হয়ে যায়নি। বস্তুত পাণ্ডিত্য উদ্ধত হয়ে উঠে তাঁর সৃষ্টিকার্যের ব্যাঘাত করতে পারে নি। এতেই তাঁর ক্ষমতার বিশেষ গৌরব। তিনি বাংলা ভাষার মূর্তিনির্মাণের সময় মর্যাদারক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন ধ্বনি-হিল্লোলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিস্তর নূতন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্ব-শক্তি সত্ত্বেও সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃতি-রূপেই রয়ে গেল, বাংলা ভাষার জৈব উপাদানরূপে স্বীকৃত হোলো না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বাংলা ভাষার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয় নি।

শুধু তাই নয়। যে গদ্যভাষারীতির তিনি প্রবর্তন

করেছেন, তার ছাঁদটি বাংলা ভাষায় সাহিত্যরচনা-কার্যের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে। অথচ যদিও তাঁর সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্তের মতো রচয়িতার গদ্যভঙ্গীর অনুকরণে তখনকার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক আপন রচনার ভিত গাঁথছিলেন, তবু সে আজ ইতিহাসের অনাদৃত নেপথ্যে অব্যবহৃত হয়ে প'ড়ে আছে। তাই আজ বিশেষ ক'রে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম ক'রে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। সেই কর্তব্যপালনের সুযোগ ঘটাবার জন্যে বিদ্যাসাগরের জন্মপ্রদেশে এই যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে আমি তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করি। পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করা হয়েছে, তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এই সঙ্গে আমার স্মরণ করবার এই উপলক্ষ্য ঘটল যে, বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার ক'রে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

এখনো আমার সম্মাননিবেদন সম্পূর্ণ হয় নি। সব শেষের কথা উপসংহারে বলতে চাই। প্রাচীন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে বিদ্যাসাগরের জন্ম, তবু আপন বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল আনুষ্ঠানিকতার বন্ধনবিমুক্ত মন। সেই স্বাধীনচেতা তেজস্বী ব্রাহ্মণ যে অসামান্য পৌরুষের সঙ্গে সমাজের বিরুদ্ধতাকে একদা তাঁর সকরুণ হৃদয়ের আঘাতে ঠেলে দিয়ে উপেক্ষা করেছিলেন, অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়ী করেছিলেন আপন শুভ সংকল্পকে, সেই তাঁর উত্তুঙ্গ মহত্ত্বের ইতিহাসকে সাধারণত তাঁর দেশের বহু লোক সসংকোচ নিঃশব্দে অতিক্রম ক'রে থাকেন। এ কথা ভুলে যান যে, আচারগত অভ্যস্ত মতের পার্থক্য বড়ো কথা নয়, কিন্তু যে-দেশে অপরাজেয় নির্ভীক চারিত্রশক্তি সচরাচর দুর্লভ, সে-দেশে নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বিচল হিতব্রতপালন সমাজের কাছে মহৎ প্রেরণা। তাঁর জীবনীতে দেখা গেছে, ক্ষতির আশঙ্কা উপেক্ষা ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বারংবার আত্মসম্মান রক্ষা করেছেন, তেমনিই যে শ্রেয়োবুদ্ধির প্রবর্তনায় দণ্ডপাণি সমাজ-শাসনের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি, সেও কঠিন সংকটের বিপক্ষে তাঁর আত্মসম্মান রক্ষার মূল্যবান দৃষ্টান্ত। দীনদুঃখীকে তিনি অর্থদানের দ্বারা দয়া করেছেন, সে-কথা তাঁর দেশের সকল লোক স্বীকার করে; কিন্তু অনাথা নারীদের প্রতি যে করুণায় তিনি সমাজের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছিলেন, তার শ্রেষ্ঠতা আরও অনেক বেশি, কেননা, তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কেবলমাত্র তাঁর ত্যাগশক্তি নয়, তাঁর বীরত্ব। তাই কামনা করি, আজ তাঁর যে কীর্তিকে লক্ষ্য ক'রে এই স্মৃতিসদনের দ্বার উন্মোচন করা হোলো, তার মধ্যে সর্বসমক্ষে সমুজ্জ্বল হয়ে থাক্ তাঁর মহাপুরুষোচিত কারুণ্যের স্মৃতি।

২৮।১১।৩৯

[মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরে প্রবেশ-উৎসবে পঠিত]



মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরে উৎকীর্ণ মূর্তি

শ্রীখগেন্দ্র রায় ও তাঁহার সহকারীগণ কর্তৃক গঠিত

কাবুলের চিঠি

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম.এ, পিএইচ. ডি.

আফগানিস্থানের সঙ্গে আমাদের যোগ বৈদিক, ব্যবসাগত এবং সীমান্তের সমস্যায় রহস্যমণ্ডিত। কবি ইক্‌বাল বলেছেন আধুনিক জাহাজবাহন সভ্যতার দিনে ভারতবর্ষ তার প্রতিবেশীর সঙ্গে মধ্যযুগের ঘনসান্নিধ্য হারিয়েছে।



লেখকের কন্যা সেমন্তী ও খাঁ আবদুল গফুর খাঁ
শ্রীমীরা চৌধুরী গৃহীত ফটোগ্রাফ

মাটির আত্মিকতা সমুদ্রপথিকেরা ভুবোল। সর্ব্বসহ উটের দল এখনো ঘণ্টা বাজিয়ে খাইবর, বোলনের পর্ব্বতঘূর্ণিত গলিতে চীন বাদাক্‌শান কাবুল কান্দাহার দেশেদের মেওয়া, গালিচা, আতর, চামড়া পৌঁছিয়ে দিচ্ছে লাহোরের দরজায়; মধ্যএশিয়ার ধুলোভরা রোম্যান্স উড়ছে কোয়েটা মুলতানের পথে; কিন্তু আনাগোনার ঠাস বুনোনি কই। হিন্দুকুশ বামিয়ানে গিয়েছিল বৌদ্ধ-শিল্পাশ্রম, বেগ্রামে আজও বেরোচ্ছে কুশান রাজ্য-সংগৃহীত আগ্রা-মথুরার হাতীর দাঁতের কাজ: বেদের আরণ্যকমন্ত্র নেমে এসেছিল ভারতে গোমেল গিরিদ্বার বেয়ে, বাগান-বিলাসী সম্রাট্ বাবর কাবুল হ'তে কাশ্মীর পর্য্যন্ত শ্যামল মণির টুকরো ছড়িয়েছেন পাহাড়ের বুকে। কাবুলিওয়ালা এবং ভারতীয় মোটরমিস্ত্রীর বিনিময়ে সে-মৈত্রী মেলে না। সময় এসেছে নূতন সম্বন্ধের। মোটর-লরি দ্রুত চলে কিন্তু প্রাচীন কারাভানের মতো প্রাণবাহিনী নয়; পেট্রল-পাম্পের ধারে বৈঠক ঘন ঘন বৃংহিতে বাধা পায়। যাত্রায় অবসর নেই সখ্যস্থাপনের, আছে পাশাপাশি কাষ্ঠাসনে বসে তীব্র রাস্তাকে সমবেত সম্ভাষণের ঐক্য। এরোপ্লেনের উড়ো বন্ধনে আফগান ভারতীয়কে কোন্ সূত্রে বাঁধবে তা এখনো বোঝা শক্ত। তারও চেয়ে শক্ত সীমান্ত এবং আরও প্রান্তের রাজনীতিকে বাদ দিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা



সামান্তের সোনক

হবা। মানবিক পরিচয়লাভের জন্যে দুর্গম পথে বেরিয়েছি।

ভোর্থমে আমার স্বাধীন মোটরযাত্রা ঠিক আফগানী মাটির সামনে খতম হয়েছিল; জিনিষপত্র অগ্রগামী; নির্বিছানায় রাত্রিযাপনের প্রত্যুষে ঋজু দীর্ঘ ইংরেজ পাইলটের মুখদর্শন করলাম। বেপরোয়া বেগে মোটর ছুটিয়েছেন কাবুলের দিকে—তাতেও তৃপ্তি নেই, কেননা পেশোয়ার-কাবুল আধ ঘণ্টায় ওড়বার স্মৃতি ভোলা অসাধ্য। এরোপ্লেন রয়েছে আফগান রাজধানীতে, কাল ভোরে মিলিটরি হাওয়াই রেস্-এ তার খেলা: যেমন ক'রে হোক পৌছন চাই। দিনরাত্রি অবিশ্রাম যন্ত্রবিহারে রাজি কি না? একান্ত গরজ আমার সুরু হ'তে জাতীয় উৎসব দেখব—সমস্ত আফগানিস্থানের এই বড়ো ব্যাপার—রাজির কথাই ওঠে না, কিন্তু সতীর্থসৌজন্যের উত্তরে কী বলব? পথের খবর,—গাইড-বুকে দেখো। রসিটা ফোর্ব্স্-এর "নিষিদ্ধ পথ" বইখানি ভ্রমণসাহিত্যে অতুল্য।



বেলুচিস্থানে রেলপথে সুড়ঙ্গ



সীমান্তের বীর

ধরা যাক্ বিদ্যুৎবেগে পার্ব্বত্য সিনেমা দেখছি। ছোট পাহাড়, মেজ পাহাড়, দৈত্য পাহাড়; খদ, লোহাটে পাথর, তাম্রবর্ণী ঝরণা, হঠাৎ সবুজ উপত্যকায় ভেড়ার পাল, চ্যাপটা চৌকো গ্রামঘর, উঃ কী রাস্তা, সুন্দর মুখ বেদুয়িনের দলে, কালো তাঁবু, বুনো ঘোড়া—জেলালাবাদ। খাঁটি আফগান শহর; মধ্যদিনের ইস্পাতী আকাশে তুলে ধরেছে প্রাচীন সরোবর, রুক্ষ সৌধ, আশ্চর্য্য সবুজ বাগান,



ব্রিটিশ-ভারতের শেষ সীমা, আফগান-রাজ্যের প্রান্তে

নিগূঢ় দোকান, বাজার, দুর্গ। নানা বিভঙ্গী উট, ঘোড়া, গিলিম, মাথার টুপি, ছোরার খাপ, রঙীন দাড়ি, সালোওয়ারের বহর; হাসির শব্দ, শিক-কাবাবের গন্ধ, আফগান আতিথ্যের হাওয়া। পথপ্রান্তে বুর্খাবাসিনীর ক্বচিৎ আবির্ভাব, সারি সারি মাটির দেয়াল, উপরে বন্দী গাছের শীর্ষ দুলছে; দরজায় গলিতে লাল-গাল শিশুর জটলা। নব্য আপিস দাওয়াখানা দেখা দিচ্ছে, পাশে পুরনো গম্বুজ। বিশ হাজার লোকের বসতি; নাতিশীতোষ্ণ; ক্ষেতভরা আঙুরের চাষ। আখ্‌রোট বাদাম আনারের বন। বহু পথের চৌমাথা জেলালাবাদ; ঘুরে বেড়াচ্ছে তাজিক, হাজারা, তুর্কোমান, হুরিস্তানী; পস্তভাষী আফগানীর আধিক্য।

সীমান্তের শিন্‌ওয়ারি, মোমন্দ, শফি উপজাতিদের দলও যথেষ্ট দেখতে পাওয়া গেল। আফরিদি ওয়াজিরিও ভারত-আফগান মুল্লুকের অদৃশ্য ভেদ লঙ্ঘন ক'রে নানা ধন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডুরণ্ড-রেখার দুই দিকে এদের বসতি এবং দুই পক্ষের জটিল রাষ্ট্রতন্ত্রে এরা জড়িত, অর্থলোভে বিক্ষিপ্ত, পরস্পরের ঈর্ষাহিংসায় শতখণ্ডিত। নূতন সমাজবিধিতে এদের মেলানোর চেষ্টা নেই। কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, গুহাগহ্বরে অজানা পকেটে বারুদের ধোঁয়ায় তার পরিণাম। সৈন্যশাসন, খাসাদার নীতি, এবং অলক্ষ্য বাজেট-রচনায় সরকারী গর্ব্ব তৃপ্ত হ'তে পারে, অন্নসংস্থানহীন উদ্ধত অশিক্ষিত পর্ব্বতচারীর তীব্রতাও বেড়ে চলবে, এবং দুই রাজ্যের মধ্যে সন্দেহ সংঘর্ষের কাঁটা জেগেই রইল। পাঁচমিশেলি গরীবের দেশ আফগানিস্থান হয়তো আধুনিক রাষ্ট্ররচনায় উপজাতিদের বাঁধবে, কিন্তু সফলতা ঘটবে না সাম্রাজ্যের কর্ত্তারা সহযোগী না হ'লে। চিত্রাল থেকে বেলুচিস্থান কোথাও বড়ো রকম ব্যবস্থার চেষ্টা দেখা দেয় নি—খুদাই খিদ্‌মদগার দলকে ট্রাইবল এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হল না অথচ খাঁ আবদুল গফুর খাঁ-র নেতৃত্বে ভিতর থেকে গড়বার কাজ এগোত। পেশোয়ার-কাবুলের পথে কেবলি চোখে পড়ে বিপুলকায় বিচিত্রবেশীর ক্ষুব্ধ আবর্ত্তন, মরুপাথরে তাদের শক্তি ব্যর্থ হচ্ছে, সঙ্গত হচ্ছে না মানবিক চেষ্টায়। দুই দেশের প্রান্তরাষ্ট্রনীতি একত্র না গড়লে কারো শান্তি নেই।

কম্বল-বোঝাই খচ্চরের শোভাযাত্রা দেখো। চামড়া পাথর তেলের টিন ঝাঁকিয়ে লরি গর্জ্জন ক'রে গেল। ভিতরে প্যাক-করা দুর্দ্ধর্ষ মানুষের ভিড়। থার্মস-বোতল এবং দেহের অভ্যন্তর চায়ে ভর্ত্তি করবার জন্যে থামলাম মাইল সতেরো এগিয়ে, নিম্‌লার উপবনে।



খাইবার পাসের সন্নিকটে দুর্গমালা

প্রাচীন মোঘল বাগানের মধ্যে আধুনিক হোটেল, ফুলের প্রাচুর্য্যে লালিত চিরবাসন্তী পাহাড়তলী। রওনা হয়েছি শ্রীনগরে, ক্রমাগতই চলেছি, মনে হ'ল দীর্ঘ যাত্রার পর সশরীরে স্বর্গলাভ। বেহেস্তের সুধা রিলেটিভিটি মানে; তীব্র তৃষা, ধুলো এবং মরুপথের অবসানে সিরাজের জল ঝরণা, উইলো গাছের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেছিল অপার্থিব। এখানেও তাই। নিমলায় মোটরের টায়ার ফাটল, মেরামতের কাজটা সৌখীন নয়, তবু শ্যামলিম প্রহরটিতে শ্রান্তি পৌঁছয় নি। কাবুল-পেশোয়ারের মুসাফির এইখানে রাত্রিবাস ক'রে পথে নামেন; আমাদের উপায় ছিল না।

শরীরের বেদনা এবং দুরন্ত শব্দের সঙ্গতে যাত্রীর মনে অবচেতনলোক উঠে আসে—যেমন ঝোড়ো এরোপ্লেনে—চৈতন্যে প্রলেপ বুলিয়ে অভাব্য রঙ জ্বলে। তার মধ্যে ভাবনা ও ভাবনার উপাদান, অথচ সামনের টুকরো ছবি চোখ দিয়ে মেশে। কাবুল পর্য্যন্ত এই মিশ্রণে ভেসেছি, খণ্ডালাপ চালিয়েছি, সৃষ্টিজোড়া পাহাড়ের ডগায় প্রশ্ন জেগেছে। তার উপরে খণ্ড চাঁদের আভা, হিন্দুকুশের আবির্ভাব, নিঃশব্দ দুর্গম গাঁয়ের ধোঁয়া। অস্পষ্ট গহ্বরে মোটর উল্টোবার শঙ্কা। ছায়াসচল উট, শৈলচারীর আনাগোনা, দশ হাজার ফুট পাহাড়ে উঠতে এঞ্জিনের আর্ত্তনাদ, তুষারের স্পর্শ। কোহ-ই-বাবা পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি ভোরের দিগন্তে জাগছে, ঘুমন্ত আলো-জ্বালা কাবুল শহর দূর পাদদেশে; কাবুল নদীর উপত্যকায় গাড়ি নামল। ধীরে ধীরে চল্‌লাম গাছ-ঘেরা রাস্তায়; শুল্কের সেপাইসান্ত্রীর ছাড়পত্র নিয়ে গাড়ি ঢুকল লাহোরী দরজায়। উৎসবের বিদ্যুৎমালা তোরণে, রাজপথে শোভিত, সকাল আলোয় চুম্‌কি-বসানো। নিস্তব্ধ শহর; আধুনিক অঞ্চলে ফরাসী ছাঁদের দোকান, রেঁস্তরা, বাজারের দু একটা চায়ের আড্ডায় সামোভার ঘিরে অস্পষ্ট ভিড়। শহর্-ই-নৌ-এর দিকে চললাম; এই দিকটা সম্প্রতি গ'ড়ে উঠছে নূতন সম্রাট্ জাহির শা-র কালে।

সঞ্চয়ন

বিষাক্ত গ্যাসের প্রকৃতি-নির্ণয়

গত মহাযুদ্ধের সময় ইস্‌র্‌ নদীকূলে জার্ম্মান গ্যাস আক্রমণের ফলে ফরাসী জেনারেল জোফ্‌র্‌ মসিয় ক্লিং নামক প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিককে যাবতীয় বিষাক্ত গ্যাস যাহাতে অতি দ্রুত ধরা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন। মসিয় ক্লিং-এর অনুসন্ধানাগার ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে এখন বিমান আক্রমণের প্রতিকারের সহায়ক রূপে প্যারিসের নাগরিকদিগের বিশেষ আশ্রয়স্থল (?) দাঁড়াইয়াছে।

যুদ্ধের ফলে এখন ফ্রান্সের নগরগুলির পথে ঘাটে সকলেরই পিঠে বাঁধা গ্যাসমুখোস দেখা যাইতেছে। এই লক্ষ লক্ষ মুখোসের বিষাক্ত-গ্যাস-প্রতিরোধের ক্ষমতার পরীক্ষা এই বিজ্ঞানাগারেই হইয়াছে।

শত্রুপক্ষ বিষাক্ত গ্যাস ছড়াইলে প্রথমতঃ তাহা কি জাতীয় বিষ তাহা অতি শীঘ্র জানা দরকার। তাহার জন্য এই বিজ্ঞানাগারের সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি মোটর লরীতে স্থাপিত সচল পরীক্ষাগার আছে। তাহার যন্ত্রপাতি এখানে পরীক্ষিত হয় এবং তাহার বৈজ্ঞানিক কর্ম্মচারিগণও এখানেই শিক্ষিত। এই মোটরগুলি দ্রুতবেগে ঘটনাস্থলে পৌঁছাইয়া, নমুনা লইয়া তাহা কি গ্যাস স্থির করিতে পারে। বিষ নির্ণয় হইবার পরে তাহার প্রতিষেধকের ব্যবস্থা ও আহতদিগের যথাযথ চিকিৎসার পথ নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। তাহার জন্য এই পরীক্ষাগারে



গ্যাস পরীক্ষা



ফ্রান্সে গ্যাস-পরীক্ষাগার। এই পরীক্ষাগারে বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রকৃতি নির্ণয় ও প্রতিষেধক নির্দ্দেশ করা হয়।

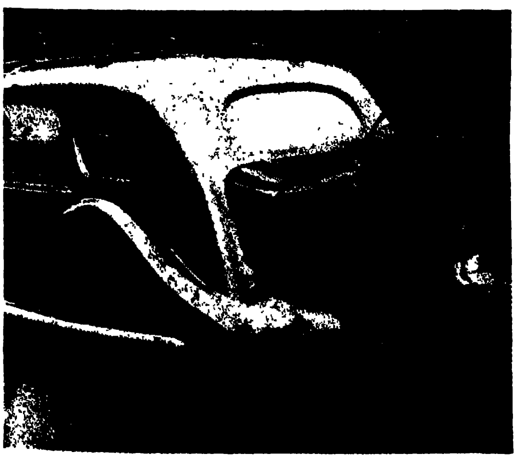
যাবতীয় বিষাক্ত পদার্থ লইয়া অনুসন্ধানের কার্য্যে মসিয় ক্লিং ও তাঁহার সহকারিগণ অক্লান্তভাবে বহু বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিতেছেন। এই পরিশ্রমের ফলে ফ্রান্সে এখন গ্যাস আক্রমণের প্রতীকার সম্বন্ধে অনেকটা স্থির ধারণা হইয়াছে।

ক.

মোটরকারে পেট্রলের বদলি

বর্ত্তমানে ইউরোপে সকল জাতিই সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর হইতে চেষ্টা করিতেছে। কারণ যুদ্ধের সময় মাল আমদানি রপ্তানিতে বহু অসুবিধা, এবং সময় সময় সম্পূর্ণ অসম্ভব। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দুই-তিন বৎসর আগে হইতেই পেট্রল সম্বন্ধে যাহাতে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয়, তাহার জন্য ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পেট্রলের পরিবর্ত্তে আর কোন ইন্ধন সন্তোষজনকভাবে ব্যবহার করা যায় কি না, সেই উপায় খুঁজিতেছে।

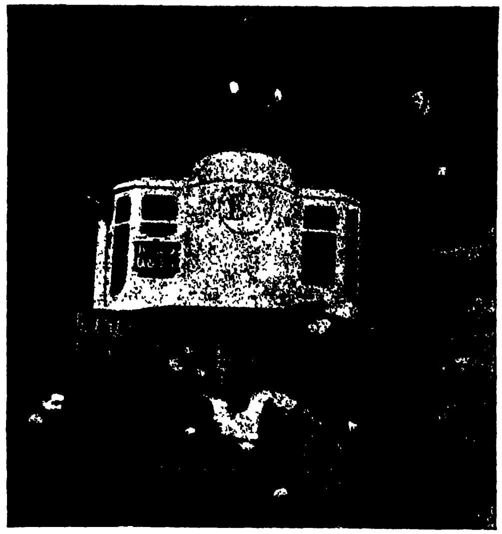
কারণ আধুনিক যুগের যুদ্ধে মোটর ও এরোপ্লেনের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কাজেই অসামরিক অধিবাসিগণের মোটর-যানে ব্যবহারের জন্য কোনো রকম বদলি ব্যবহার করা সম্ভব হইলে দেশের সমস্ত পেট্রল সামরিক কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিভিন্ন জিনিস এই বদলীর কাজে ব্যবহার হইয়াছে। কাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকার গ্যাস পর্য্যন্ত লইয়া



প্যারিসের ট্যাক্সিতে কাঠকয়লা লওয়া হইতেছে

পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। পরীক্ষার ফল কিন্তু খুব সন্তোষ-জনক হইয়াছে বলা চলে না। ১৯৩৭ সালে এই বদলি লইয়া মোটরযান চালানোর চেষ্টা করিয়া ইউরোপের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে সত্তর কোটি টাকা। ১৯৩৮ সালে এই ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে নব্বই কোটি টাকা।

আমেরিকায় মোটরযানে পেট্রলের সহিত সুরাসার (আল্‌কহল্‌) মিশ্রিত করিয়া কাজ চালানোর চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ইউরোপে এই কার্য্যে সুরাসারের ব্যবহার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। কারণ যুদ্ধে বিস্ফোরকের জন্য আল্‌কহলের প্রয়োজন খুব বেশী।



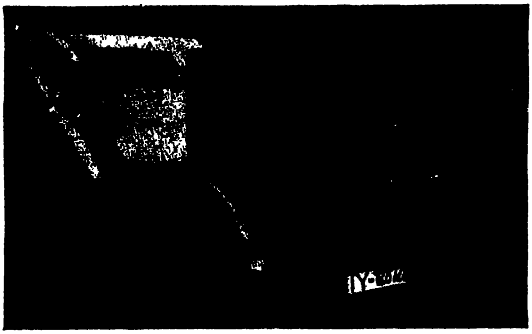
আমেরিকায় কাঠকয়লার গ্যাস-চালিত মোটর

সাধারণ মোটর-গাড়ীতে সুরাসারমিশ্রিত পেট্রল ব্যবহার করিতে হইলে এঞ্জিনের নানারূপ পরিবর্ত্তন দরকার, এবং এই পরিবর্ত্তন ব্যয়সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া যথেষ্ট পরিমাণে আলকহল এখন ইউরোপে উৎপন্ন হয় না। ফ্রান্স ও ইতালী ১৯৩৭ সাল হইতেই আলকহলের ব্যবহার কমাইয়া দিয়াছে, এবং জার্ম্মানীকে বাহির হইতে আল্‌কহল আম্‌দানি করিতে হইয়াছে।

পেট্রলের পরিবর্ত্তে কাঠকয়লা, পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত গ্যাস মোটরে ব্যবহার করার চেষ্টা হইয়াছে। কোনো কোন মোটর গাড়ীতে কাঠ অথবা কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিয়া লইবার বন্দোবস্ত গাড়ীর ভিতরেই রহিয়াছে।

আমেরিকার কারখানায় প্রস্তুত নকল পেট্রলের সাহায্যে পেট্রলের কাজ চালানোর চেষ্টা কিছুদিন যাবৎ চলিয়াছে। সম্ভবতঃ পেট্রলের বদলি হিসাবে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী। কিন্তু সে যাহাই হউক, এখন এই নকল পেট্রল (Hydrogenadet gasoline) সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের পক্ষে অতীব দুর্ম্মূল্য।

পেট্রলের খরচ বাঁচাইবার জন্ম যে-সব নূতন উপায়ের উদ্ভাবনা করা হইয়াছে, তাহাদের সকলের চেয়ে বড় অসুবিধা যে মোটরের সঙ্গে একটি বৃহৎ আকারের তাক জাতীয় জিনিষ



মোটর গাড়ীর পিছনে গ্যাসবাহী গাড়ী

বহন করা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যাত্রীবাহী বাস গাড়ীর পিছনে আর একখানি টানাগাড়ীতে কাঠ অথবা কয়লাজাতীয় ইন্ধন বহন করিয়া চলে। ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালীতে বার্ষিক ৫০,০০,০০০ মনের উপর কাঠ এইরূপে পেট্রলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

এই সকল অসুবিধা বিবেচনা করিয়া মনে হয় পেট্রলের এই সকল বদলী ব্যবহার করার চেষ্টা না করিয়া সোজাসুজি পেট্রল ব্যবহার করাই ভাল। ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ পেট্রলিয়াম ফুরাইয়া গেলে কি করা হইবে, এ সব কথা এখন ভাবিয়া লাভ নাই। কারণ এই জাতীয় পরীক্ষায় বার্ষিক ইউরোপের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, সেই টাকা ইহার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করা যাইতে পারে।

চক্ষুর সাহায্য ব্যতিরেকে দেখিতে পাওয়া নূতন জিনিষ নহে। গত শতাব্দীতেই এই রকম শক্তি চার-পাচ জনের দেখা গিয়াছে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইতিপূর্ব্বে হয় নাই।

দৃষ্টিহীন দর্শনকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম আনিয়াছেন জুলে রোম্যা নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক। নিম্নলিখিত উপায়ে এই পরীক্ষা করা হয়।

এক জন স্ত্রীলোককে প্রথমে সম্মোহিত করিয়া লওয়া হয়, তখন তাহার অবস্থা দাঁড়ায় নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি। এই অবস্থায় তাহার চক্ষু ভাল করিয়া বস্ত্রাবৃত করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পরে শরীরের কোনো কোনো অঙ্গের সামান্য দূরে এক-একটি জিনিস রাখিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। কিছুকাল অভ্যাসের পরে সে ধীরে ধীরে নানা জিনিষের বর্ণ ও আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিতে শেখে। পরীক্ষার সময়ে দেখা যায়, যে এক-এক সময়ে এই শক্তি তাহার বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট, অন্য সময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল। কোনো কোনো সময়ে এই শক্তি এত বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে, যে সাধারণ বড় অক্ষরে লেখা শব্দও সে পড়িতে পারিয়াছে।

'এই পরীক্ষার সময় যাহাতে পরীক্ষার "বিষয়" লোকটি চক্ষু দিয়া বিন্দুমাত্রও দেখিতে না পায়, তাহার জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। কাজেই স্ত্রীলোকটির দেখার কাজ যে সম্পূর্ণভাবে চক্ষুর সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

আর একটি পরীক্ষায় একটি এক-পাশ-খোলা বাক্সের মধ্যে একখানি তাস রাখিয়া বন্ধ দিক পরীক্ষাধীনার চক্ষুর সম্মুখে ধরা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে শুধু কপালের সাহায্যে দেখার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

জুলে রোম্যার মতে মানুষের দেহের উপর চর্ম্মের ঠিক নীচে বহু সংখ্যক স্নায়ুকোষ আছে, যাহা অনেক অংশে সাধারণ চক্ষুর ন্যায়। অভ্যাসের সাহায্যে এই সকল স্নায়ুকোষ দ্বারা দেখিতে পাওয়া অসম্ভব নহে।

কীটপতঙ্গের দেহে অগণিত চক্ষু থাকে, এই সকলের সমবেত শক্তিতে তাহারা দেখিতে পারে। মানবদেহের এই সকল স্নায়ুকোষ অনেকটা এই চক্ষুর অনুরূপ। অবশ্য চর্ম্মের সর্ব্বত্র এই ধরণের স্নায়ুকোষ নাই, কয়েকটি বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ। অঙ্গুলির ও নাসিকার অগ্রভাগের দৃষ্টিশক্তি বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান আছে।

অন্ধের পক্ষে এই উপায়ে দেখা সম্ভব কিনা, তাহা ভবিষ্যতের পরীক্ষার ফল দেখিয়া বলা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যুদ্ধের ফলে দৃষ্টিহীন সৈনিকদের লইয়া পরীক্ষা করিয়া বিশেষ কোনো ফল পাওয়া যায় নাই।

স.

দেশ-বিদেশের কথা

ইউরোপের যুদ্ধ

শ্রীগোপাল হালদার

ইউরোপীয় যুদ্ধের তিন মাস শেষ হইয়াছে—অথচ তেমন কান ব্যাপক বিভীষিকার সাক্ষাৎকার এখনো ঘটে নাই। াবশ্য, এই যুদ্ধের পদে পদে বিস্ময়ের আবির্ভাব হইতেছে। ািম্বর চেম্বারলেন যে ইহাকে বলিয়াছেন, 'সর্ব্বাধিক বিস্ময়কর দ্ধ,' তাহাই এই যুদ্ধের সম্বন্ধে সত্য বর্ণনা। তবে সর্ব্বাপেক্ষা বশী বিস্ময় জোগাইতেছেন একটি দেশ। এই বিস্ময়কর দশটি সোভিয়েট রুশিয়া। প্রথমাবধিই তাহার আচরণ ছিল বিস্ময়াবহ, তাহার নীতি দুর্বোধ্য। আর অতি-সম্প্রতি, ফিনল্যাণ্ড আক্রমণে তাহা যেন সাধারণের চক্ষে আরও বিস্ময়কর, আরও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে জার্ম্মান মাইন-যুদ্ধই সকলকে সচকিত করিয়াছিল—এখন সকলে উচ্চকিত হইয়াছে ফিনল্যাণ্ডের ঘটনায়।

জার্ম্মেনীর মাইন-যুদ্ধ

জার্ম্মেনী গৃহাবদ্ধ হইয়া থাকিবে—এই উদ্দেশ্যে ব্রিটেন তাহার সমুদ্রপথ বন্ধ করিয়াছে। জার্ম্মান জাহাজ সমুদ্রে আর পাড়ি দেয় না—দুই-একখানা যুদ্ধজাহাজ, 'এ্যাডমিরাল শীর' ও 'ডয়েটস ল্যাণ্ড' আটলাণ্টিকে ব্রিটেন ও ফরাসীর জাহাজ ডুবাইতেছে; আর দুই-একটি জার্ম্মান বাণিজ্যপোত এখানে-ওখানে আশ্রয় খুঁজিতেছে। ব্রিটেনের এই সুপরিচিত কৌশল হইতে জার্ম্মেনীর পক্ষে আত্মরক্ষার উপায়—নূতন কৌশলে বোমারু বিমানের সাহায্যে শত্রুর যুদ্ধজাহাজে বোমা নিক্ষেপ করা এবং শত্রুর উপকূলে মাইন পাতা; আর পুরাতন কৌশলে ইউবোট বা ডুবোজাহাজের দ্বারা টর্পেডো নিক্ষেপ অথবা 'মাইন' পাতিয়া ব্রিটিশ বাণিজ্য-জাহাজ ও ব্রিটিশ যুদ্ধ-



রাশিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার সময়কার ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, এ. কে. কাযাণ্ডার। ইঁহার মন্ত্রীসভা সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার পরে পদত্যাগ করিয়াছেন।

জাহাজ ধ্বংস করা। গত যুদ্ধেও এই ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা জার্ম্মেনী করিয়াছে—১৯১৭ সনে ইহাতে ব্রিটেনের গুরুতর ক্ষতিও হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মান কৌশল বিফল হয়। এবার তদপেক্ষা অস্ত্রগুলি ধ্বংসপটু বেশী; জার্ম্মেনীও পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক; অতএব আবার এই চেষ্টাই হইতেছে। ক্ষাপা ফ্লো ও অন্যত্র টর্পেডো আক্রমণ এতদিন চলিয়াছিল। কিন্তু অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে জার্ম্মেনী আন্তর্জ্জাতিক আইন অমান্য করিয়া সমুদ্রের বাণিজ্যপথে সর্ব্বত্র মাইন ভাসাইয়া দিতেছে; তাহাতে শত্রুর ও নিরপেক্ষদের জাহাজ অতর্কিতে আহত হইয়া অতি দ্রুত সমুদ্রতলে তলাইয়া যাইতেছে। মাইনগুলিও আবার নূতন ধরণের—উহারা সমুদ্রতলে থাকে, চুম্বক-শক্তির আধার; আওতার মধ্যে জাহাজ আসিলেই তাহার গায়ে আঘাত করিয়া তাহাকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে। কিছুকাল পূর্ব্বে হের হিটলার বলিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে জার্ম্মেনী এমন এক মারাত্মক বৈজ্ঞানিক অস্ত্র প্রয়োগ করিবে যাহা তাহার বিরুদ্ধে' প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অনেকেই মনে করেন, এই 'চুম্বক-মাইন'ই সেই অস্ত্র—জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে তাহা প্রযোজ্য নয়, কারণ জার্ম্মেনীর জাহাজ গৃহবন্দী।

মোট জাহাজ-ডুবিতে এই তিন মাসে ব্রিটেন ৫৩ হাজার টন পরিমাণ জাহাজ হারাইয়াছে। তাহার সাধারণত ১৫ লক্ষ টন পরিমাণ জাহাজ সমুদ্রে ভাসে। তবে ব্রিটেন ছাড়া ফ্রান্সের জাহাজও ডুবিয়াছে, আর মাইনের আঘাতে এখন নিরপেক্ষদের জাহাজও জলমগ্ন হইতেছে। গত যুদ্ধে ও এই যুদ্ধে ১৯১৪, ১৯১৭ ও ১৯৩৯এর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বরের এইরূপ জাহাজ ডুবির ক্ষতির হিসাব এই :—

ব্রিটেনের ক্ষতি—

এবার ৮২ খানি জাহাজ; ১৯১৭তে ২২৮ খানা; ১৯১৪তে ৪৫

ব্রিটেনের মিত্রদের ক্ষতি—

এবার ১১ খানি জাহাজ; ১৯১৭তে ১৫৮ খানা; ১৯১৪তে ৬

নিরপেক্ষদের ক্ষতি—

এবার ৪৫ খানি জাহাজ; ১৯১৭তে ৭০ খানা; ১৯১৪তে ১২

টনেজ হিসাবে এই ক্ষতির অঙ্ক দাঁড়ায় :

ব্রিটেনের ক্ষতি—

এবার ২৯৮,০৫৬; ১৯১৭তে ৬৪৫,৯০৪; ১৯১৪তে ১৭৪,৯১২

ব্রিটেনের মিত্রদের ক্ষতি —

" ৫৫,৫৮১; ১৯১৭তে ৩৪,৬৬৪; ১৯১৪তে ১০,৭৪৩

নিরক্ষেপদের ক্ষতি—

" ১৫৯,৫৯২; ১৯১৭তে ১১৫,৮৪৯; ১৯১৪তে ১৬,৪০৫

এই মাইন-আক্রমণে সকল দেশই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিরপেক্ষরা বলিতেছেন, 'আমাদের অপরাধ কি যে আমাদের এই দশা ঘটিবে?' জার্ম্মানী হয়ত উত্তর দিবে, 'তোমরা কেন ব্রিটেনের সমুদ্রবন্ধন স্বীকার কর?' এদিকে মাইন-যুদ্ধের পাল্টা জবাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ঘোষণা করিয়াছে, নিরপেক্ষ-



ফিন্‌ল্যাণ্ডের পদত্যাগকারী পররাষ্ট্র-সচিব এর্কো

দের জাহাজেও আর জার্ম্মেনীর আমদানি-রপ্তানি চলিবে না—তাহা ব্রিটেন বাজেয়াপ্ত করিবে। সুইডেন, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইতালী, আমেরিকা ইহাতে আপত্তি করিতেছে—'এ যে আন্তর্জ্জাতিক নিয়মভঙ্গ!' কথাটায় একটু হাসি পায়।

মোটের উপর, এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধ প্রধানত চলিয়াছে একটি ক্ষেত্রেই—সমুদ্র-পথে কে কাহার পথরোধ করিতে পারে? জার্ম্মেনী পূর্ব্ব-ইয়োরোপ লইয়া কি এক গণ্ডী গড়িবে? ব্রিটেনের পৃথিবীব্যাপী পথ রুদ্ধ হইবে?

শান্তির শেষ স্বপ্ন ?

প্রকৃত প্রস্তাবে তথাপি যুদ্ধ এখনো ইউরোপেই সীমাবদ্ধ আছে, পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে ছড়াইয়া পড়ে নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতে পারে, একটু সুবুদ্ধির উদয় হইলে এই সংগ্রামরত জাতি কয়টি নিজেদের সামাজিক স্বার্থহানির ভয়ে এবং নিজেদের এই সভ্যতার প্রাণনাশের আশঙ্কায় এখনো হয়ত এই 'যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলাটা' মিটাইয়া ফেলিয়া একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে পারে। এই সম্ভাবনাটা সম্ভাব্য হইবার পক্ষে প্রধান কারণও একটা ছিল—তাহা গত তিন মাস কালের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে সোভিয়েটের অভাবনীয় আবির্ভাব। আর ইহা তো অত্যন্ত স্পষ্ট, সেই আবির্ভাবে বল্‌কান্‌ ও বাল্‌টিকের তীর হইতে জার্ম্মান আধিপত্য মুছিয়া গেল, মস্কোর মহানায়ক পূর্ব্ব-ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিলেন,—তুর্ক-ইংরেজ সমঝৌতাতে তাঁহার যাত্রা, নিকট-প্রাচ্যের পথে একটু বাধা পাইল বটে, কিন্তু জাপানের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিয়া সেই দানব-মহাবাহিনী এশিয়াখণ্ডের কোন্ প্রান্তে কখন আবির্ভূত হইবে তাহা কে বলিবে? মোটের উপর, সোভিয়েট শক্তির ক্রমপ্রসারে ইংরেজ-ফরাসী কিম্বা জার্ম্মান কাহারও খুশী হইবার কোন হেতু নাই; বরং উভয় পক্ষই প্রমাদই গণিয়াছেন। আশা করা যাইতে পারিত, তাঁহারা একত্র হইয়া এই সোভিয়েট শত্রুর বিরুদ্ধে এক বার এবার দাঁড়াইতেও পারেন—কারণ, সর্ব্বনাশ যে প্রায় সমুৎপন্ন। কিছুকালের মত তাহাতে যুদ্ধ ক্ষান্ত হইত। হল্যাণ্ডের রাজ্ঞী বুইল্‌হেল্‌মিনা ও বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্‌ডের যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব সেইদিকে একটা পথও নির্দ্দেশ করিতেছিল—কিন্তু তাহা উঠিতে-না-উঠিতেই পরিত্যক্ত হইল। হয়ত শান্তির শেষ স্বপ্ন শেষ হইল। অবশ্য যে সাম্রাজ্যলিপ্সা ও বাণিজ্যাধিকার এই যুদ্ধের মূল কারণ তাহা যখন দূরীকৃত হয় নাই, তখন দুই-তিন বৎসর পরেই যুদ্ধ



ফিন্‌ল্যাণ্ডের জগদ্বিখ্যাত সুরকার, সিবেলিয়স

হয়ত আবার পুনরাবির্ভূত হইত—দ্বন্দ্বের মূলনাশ না হইলে এই সমুৎপন্নপ্রায় সর্ব্বনাশও ঠেকাইয়া রাখা চলিত না। সর্ব্ব-শক্র সোভিয়েটের এই অভিযান-দর্শনেও ইউরোপের কুরু-পাণ্ডব একত্রিত হইয়া যে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিলেন না, পারিবেন না—ইহাই তাহার কারণ।

কূটনীতির যুদ্ধ

অতএব, যুধ্যমান কোন পক্ষই যে সোভিয়েটকে এই মহামুহূর্ত্তে বিরোধী করিয়া তুলিতে সাহসী হইবেন না—ইহাও সাধারণ কূটনীতি। কূটনীতির দ্বন্দ্বই এখন পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের বড় ঘটনা। তাই, পূর্ব্ব-পোল্যাণ্ড সোভিয়েট-অধিকৃত হইলে, বলকান-অঞ্চল সোভিয়েট-প্রভাবিত হইলে এবং বালটিকের তীরে সোভিয়েট আবির্ভূত হইলেও, ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের মনোভাব গোপন করিয়াই গিয়াছেন। বরং মিষ্টার চার্চ্চিলের মত সোভিয়েটের শত্রুও আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—ঐসব স্থানে জার্ম্মেনীকে এই ভাবে হটাইয়া দিয়া সোভিয়েট মিত্রশক্তিরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। অপর দিকে মস্কৌতে জার্ম্মান পররাষ্ট্র-সচিব হার্ ফন্ রিব্বেনট্রপ পোল্যাণ্ড ও পূর্ব্ব-ইউরোপের কোন্ কোন্ জাতির ভাগ্য রুশিয়ার হাতে তুলিয়া দিলেন তাহা জানা গেল না, কিন্তু তিনি সাহ্লাদে জানাইলেন, রুশিয়া জার্ম্মেনীকে খাদ্য ও যুদ্ধ-ব্যবহার্য্য সমস্ত উপকরণই বিক্রয় করিবে—সমুদ্র-পথ বন্ধ করিয়া আর জার্ম্মেনীকে এবার কোণ-ঠাসা করা চলিবে না। অধিকন্তু, জার্ম্মান দূতের কথায় এই ইঙ্গিতও লক্ষ্য করা গেল—রুশিয়ার নিকট সামরিক সাহায্যও জার্ম্মেনীর দুর্লভ হইবে না। মিত্রশক্তি উচ্চকিত হইলেন—যে রুশিয়া বৎসরের পর বৎসর তাহাদের দুয়ারে মিত্রতার জন্য ঘুরিয়াছে আজ সেই প্রত্যাখ্যাত শক্তিকে আর অশ্রদ্ধা করিবার উপায় নাই। তুরস্কের সহিত বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করিয়া নিকট-প্রাচ্যে ও বলকানে রুশিয়ার পথরোধ করা গেল; ফিনল্যাণ্ডের বিস্ময়কর 'ঔদ্ধত্যে' তাহার পশ্চিম-যাত্রাও প্রতিরোধ করা সম্ভব হইতে পারে; আর ইতিমধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা-আইন সংশোধন করাইয়া আমেরিকা হইতে মিত্রশক্তিও সহস্রাধিক যুদ্ধ-বিমান, অজস্র যুদ্ধ-ও খাদ্য-উপকরণ ক্রয় করিতে পারিবেন। মিত্রশক্তির এই তিনটি কূটনৈতিক সাফল্য অবজ্ঞেয় নয়—বিশেষ করিয়া আমেরিকার অস্ত্রাগারের দুয়ার যখন এক বার বাণিজ্য-সূত্রে খুলিয়াছে তখন বিশেষরূপেই ইংরেজ-ফরাসীর আশান্বিত হইবার কারণ ঘটিয়াছে।

সোভিয়েটের নীতি

কিন্তু তথাপি প্রশ্ন রহিল—রুশ-জার্ম্মান বন্ধুত্বের সীমা কোথায়? রুশিয়ার কূটনীতি যে ভাবে তিন মাসের মধ্যে জার্ম্মেনী ও জাপানের সঙ্গে বুঝাপড়া করিয়া পৃথিবীর পাকা রাজনীতিকদের সমস্ত বুদ্ধি ঘুলাইয়া দিয়াছে, তাহাতে তাহাকে তুরস্কে বা ফিন্‌ল্যাণ্ডে বাধা দিয়া কতটুকু বিপন্ন করা চলিবে? ভরসা ছিল—সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতি যুদ্ধ-বিরোধী। কিন্তু



ফিন্‌ল্যাণ্ডের রক্ষাকল্পে স্বয়ংবৃত সেবিকাদল

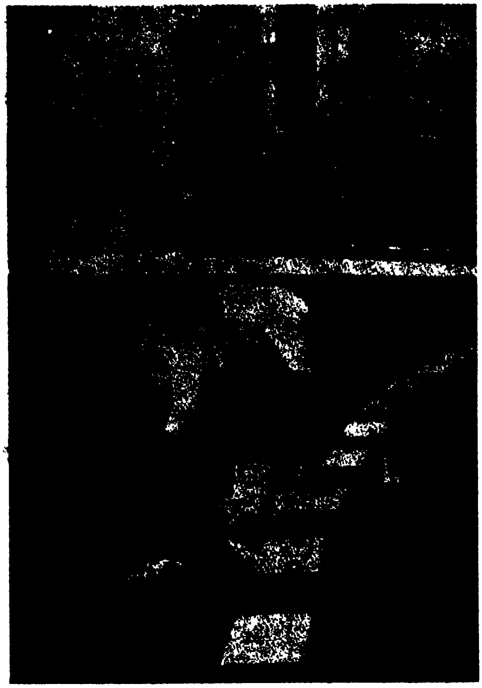
ফিন্‌ল্যাণ্ডে কি হইতেছে? সত্যই কি তবে রিব্বেনট্রপ সেই নীতি টলাইতে পারিয়াছেন?

সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি এই বহুবিজ্ঞদের চক্ষে একটা প্রহেলিকা হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই—পৃথিবী সোভিয়েট সম্বন্ধে এত অল্প বা এত অসত্য সংবাদ পায় যে, সে নীতির মর্ম্মোদ্ঘাটন করা এখন তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইতেছে। না হইলে সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি দুর্ব্বোধ্য নয়। তাহার মূলসূত্র কয়টি বহুবারই আলোচিত হইয়াছে। যথা:—প্রথমতঃ সোভিয়েট পৃথিবীতে ধনিকতন্ত্র তথা সাম্রাজ্যতন্ত্র ধ্বংস ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর। সোভিয়েটের মতে ধনিকতন্ত্রের অনিবার্য্য ফল যুদ্ধ; তাই সোভিয়েট যুদ্ধবিরোধী—এই দ্বিতীয় সূত্র। তৃতীয়ত—বিশ্ববিপ্লবের ফলে সোভিয়েট পৃথিবীতে সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কামনা করে। এই তিন সূত্রকে সফল করিবার পক্ষে তাহার গৃহীত পদ্ধতিও সুপরিচিত; বহু বার তাহা ব্যাখ্যাতও হইয়াছে। মূলত তাহা বাস্তবপন্থী—বাস্তব অবস্থার পরিবর্ত্তনে সোভিয়েটের পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হয়, এইটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। বর্ত্তমান সময়ে সেই পদ্ধতির কয়েকটি সূত্র তবু সুবিদিত: এক, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সোভিয়েট কিছুতেই জড়াইয়া পড়িবে না, সে শান্তি চাহিবে; দুই, প্রতিবেশীদের সহিত সোভিয়েট অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে; তিন, ধনিক-রাষ্ট্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সে নিজ শক্তি অপরাজেয় করিতে চাহিবে; চার, পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র জয়ী করিবার জন্য স্বগৃহে সে সমাজতন্ত্রের সার্থক সংগঠন দেখাইবে; পাঁচ, বিশ্ব-বিপ্লবের মুখ্য দায়িত্ব বিভিন্ন দেশের অবস্থার ও তদ্দেশীয় শ্রমিক-কৃষকের দলের উপর নির্ভর করে; সেদিকে সোভিয়েট আপাতত গৌণ ভাবে সাহায্য করিলেই তাহার মতে বিশ্ব-বিপ্লব সুসম্ভব হইবে। মোটামুটি এই সোভিয়েট নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি মনে রাখা দরকার।

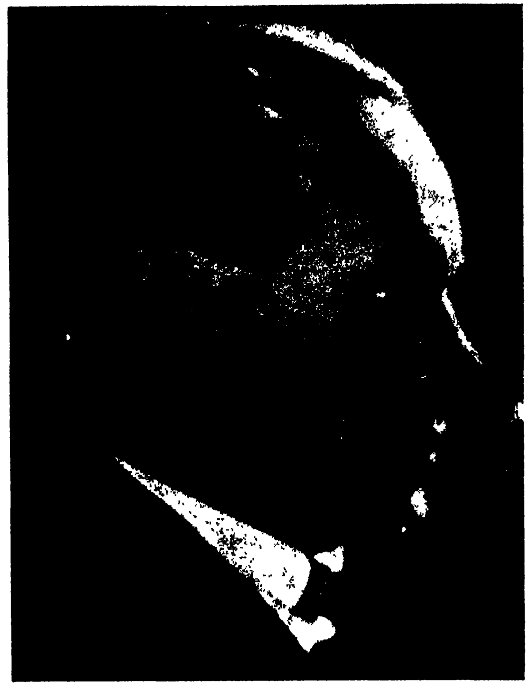
ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ

রুশিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিরোধের কারণ বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি মনে রাখিতে হইবে।

৩৮ লক্ষ লোকের দেশ ফিন্‌ল্যাণ্ড; হ্রদে আর জলাভূমিতে পরিপূর্ণ; একমাত্র উত্তরের পেস্‌টেমো বন্দর ছাড়া অতিশীঘ্রই তাহার সমুদ্রপথ বরফে বন্ধ হইয়া যাইবে। অথচ এই দেশই ফিন্‌ল্যাণ্ড-উপসাগরের চাবিকাঠি হাতে করিয়া বসিয়া আছে, লেনিনগ্রাডের উপরে প্রায় সে প্রতিষ্ঠিত। গত মহাযুদ্ধে ফিনেরা জারের রুশিয়ার বন্ধনপাশ ছিন্ন করে, তখন কুসেনিন প্রভৃতির নেতৃত্বে এক সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ফিন্ অভিজাত শ্রেণী জার্ম্মান সৈন্যাধ্যক্ষদের আহ্বান করিয়া আনে, ফিন্ সেনাপতি ম্যানারহাইমের নেতৃত্বে সাম্যবাদীদের বিতাড়িত করিয়া নিজেদের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯২১ সালে যখন জাতিসঙ্ঘে ফিন্‌ল্যাণ্ডের এই স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় তখন ইউ-



প্যারিসে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রাস্তায় আলোর অভাবের ফলে যে অসুবিধা হইতেছে, তাহা কথঞ্চিৎ দূর করার জন্য ফুটপাথের কিনারায় শাদা রং লাগানো হইতেছে



ফিন্‌ল্যাণ্ডের জগদ্বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ, নুর্মি

রোপের সব জাতিই তাহাতে স্বাক্ষর করে, কেবল স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয় নাই তাহার প্রতিবেশী রুশিয়ার। তাহাকে আহ্বান করার বা জানাইবার প্রয়োজনও কেহ বোধ করে নাই। অথচ লেনিনগ্রাড প্রদেশের দুয়ার সেই পথে; সমস্ত পশ্চিম-ইউরোপে রুশিয়ার সমুদ্রপথ একমাত্র এই; আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ হইতে রুশিয়ার এই অঞ্চল শাসন করা বা বিপন্ন করা সহজসাধ্য; পেস্‌টামো বন্দরের উষ্ণস্রোতের সাহায্যে একই কালে উত্তর-সাগর ও আয়র্লণ্ডে গতায়াত করা চলে। এই বিশ বৎসরের অবসরে সুইডেনের ধনিকতন্ত্রী সরকার ফিন্‌ল্যাণ্ডকে সোভিয়েট-বিরোধী প্রাচীরে পরিণত করিবার জন্য অ্যালাণ্ডদ্বীপে দুর্গ-প্রাকার গঠন করিতেছে, সোভিয়েটের তাহাতে আপত্তি আছে। এই সময়ের মধ্যে আমেরিকা ও ব্রিটেনের বহু অর্থ ব্যবসায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এসব দেশের ধনিকতন্ত্রের স্বার্থ ফিন্‌ল্যাণ্ডে জড়িত। আর সর্ব্বশেষে নাৎসীরাও বেশ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল।



কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের লক্ষ্ণৌ-শাখা উদ্বোধনে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (মধ্যস্থলে), শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী

১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



অরণ্যে সন্ধ্যা

শ্রীপবিত্রোষ সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৪৬

৪র্থ সংখ্যা

রাত্রি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিভূত ধরণীর দীপনেভা তোরণ-দুয়ারে
আসে রাত্রি,
আধা অন্ধ, আধা বোবা,
বিরাট অস্পষ্ট মূর্তি,
যুগারম্ভ সৃষ্টিশালে অসমাপ্তি পুঞ্জ যেন
নিদ্রার মায়ায়।
হয় নি নিশ্চিত ভাগ সত্যের মিথ্যার,
ভালোমন্দ যাচাইয়ের তুলাদণ্ডে
বাটখারা ভুলের ওজনে।
কামনার যে পাত্রটি দিনে ছিল আলোয় লুকানো,
আঁধার তাহারে টেনে আনে,
ভরে দেয় সুরা দিয়ে
রজনীগন্ধার গন্ধে
ঝিমিঝিমি ঝিল্লির ঝননে,
আধদেখা কটাক্ষে ইঙ্গিতে।

ছায়া করে আনাগোনা সংশয়ের মুখোষ পরানো,
মোহ আসে কালো মূর্তি লাল রঙে এঁকে,
তপস্বীরে করে সে বিদ্রূপ।
বেড়াজাল হাতে নিয়ে সঞ্চরে আদিম মায়াবিনী
যবে গুপ্ত গুহা হ'তে গোধূলির ধূসর প্রান্তরে
দস্যু এসে দিবসের রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে যায়।

বিশ্বনাট্যে প্রথম অঙ্কের
অনিশ্চিত প্রকাশের যবনিকা
ছিন্ন করে এসেছিল দিন,
নির্বারিত করেছিল বিশ্বের চেতনা
আপনার নিঃসংশয় পরিচয়।
দিনান্তে সে আচ্ছাদন
বারে বারে নেমে আসে স্বপ্নের সংকেতে,
আবিল বুদ্ধির স্রোতে ক্ষণিকের মতো
মেতে ওঠে ফেনার নর্তন।
প্রবৃত্তির হালে ব'সে কর্ণধার করে
উদ্‌ভ্রান্ত চালনা
তন্দ্রাবিষ্ট চোখে।
নিজেরে ধিক্কার দিয়ে মন ব'লে ওঠে,
নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর,
অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত,
কঠিন মাটির 'পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় করে চলা॥

পুনশ্চ
২৬।৭।৩৯

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯

একা অহীন্দ্র নয়, অমল এবং অহীন্দ্র দুই জনেই প্রাতঃকালে কালিন্দীর ঘাটে আসিয়া বসিয়াছিল। বর্ষার জলে ভিজিবার জন্যই দুজনে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। নদীর ঘাটে আসিয়া কালীর বন্যা দেখিয়া সেইখানেই তাহারা বসিয়া পড়িল। খেয়া-ঘাটের উপরে পথের পাশেই এক বৃদ্ধ বট; বটগাছটির শাখাপল্লব এত ঘন এবং পরিধিতে এমন বিস্তৃত যে বৃষ্টির জলের ধারা তাহার তলদেশের মাটিকে স্পর্শ করিতে পারে না, গাছের পাতা-ঝরা জল স্থানে স্থানে ঝরিয়া পড়ে মাত্র। গাছের গোড়ায় মোটা মোটা শিকড়গুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া চারি পাশে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপরের খানিকটা অংশ অজগরের পিঠের মত মাটির উপরে জাগিয়া আছে, সেই শিকড়ের উপরে বসিয়া তাহারা দুজনে কালীর খরস্রোতের মধ্যে ঢিল ছুড়িতে ছুড়িতে কথা বলিতেছিল। গাছটারই তলায়, তাহাদের হইতে কিছু দূরে, খানদুই গরুর গাড়ী খেয়া-নৌকার অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। বর্ষার বাতাসে গরুগুলির সর্ব্বাঙ্গের লোম খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, গাড়োয়ান দুই জন এবং আর জন কয়েক খেয়ার যাত্রী ভিজা কাঠের আগুনের ধোঁয়ার সম্মুখে উপু হইয়া বসিয়া তামাক টানিয়া কাশিতেছে, গল্প করিতেছে।

বহুদিনের প্রাচীন বট, এই গাছের তলায় বহুবৎসর হইতেই পথের যাত্রীরা এমনই করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। গাছটার নামই 'আঁটের বটতলা'। পথের মধ্যে অপরিচিত পথিকেরা জোট বাঁধিয়া এক স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকে—এই আশ্রয় লওয়াকেই এদেশে বলে আঁট দেওয়া। গাছের তলাতেই একটা গরুর গাড়ীর টাপর বা ছই পাতিয়া তাহারই আশ্রয়ের তলে উপু হইয়া বসিয়া খেয়ার ঠিকাদারও তামাক টানিতেছিল।

আপনার বক্তব্যের উপর খুব জোর দিয়াই অমল কথা বলিতেছিল। সে এবার ধরিয়াছে, অহীন্দ্রকে কলিকাতায় পড়িতে হইবে। অহীন্দ্রের কোন অজুহাতই সে শুনিতে চায় না, সে বারবার বলিতেছে—তোমার মত স্টুডেন্টের পক্ষে মফঃস্বল কখনও উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে না।

কৌতুকভরে অহীন্দ্র বলিল—বল কি?

—নি—শ্চয়! অন্ততঃ তিন ধাপ যে খাটো, সেটা তো প্রমাণিত হয়েই গেছে—তোমার রেজাল্টে।

—মানে?

—ভেরি ইজি! কলকাতায় থাকলে তোমার নাম থাকত সর্ব্বাগ্রে—এ আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-অনুর্ব্বরতা তোমার সায়েন্সে স্বীকৃত সত্য, বীজের অদৃষ্টের ঘাড়ে দোষ চাপানোর মত অবৈজ্ঞানিক মতবাদ নিশ্চয় তুমি পোষণ করতে পার না।

এবার অহীন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর বলিল—তুমি কি আসল কারণটা বুঝতে পার না অমল?

অমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—অনেক কলেজ তোমাকে ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ দেবে, স্টাইপেণ্ড দেবে, হোস্টেল ফ্রি পর্য্যন্ত করে দেবে। তার উপর তোমার স্কলারশিপ থাকবে, সুতরাং তোমার আটকাচ্ছে কোথায়?

অহীন্দ্র গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল—তুমি সবটা বুঝতে পারছ না অমল, তবে তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই। আমাকে মাসে মাসে এবার থেকে মাকে কিছু ক'রে না পাঠালেই চলবে না। নিয়মিত আদায়পত্র তো হয় না, টাকার অভাবে মা অনেক সময় বিব্রত হয়ে পড়েন। আর মাকে আমার রান্না করতে হয়, মানদা ঝি বিনা মাইনেতে

কাজ 'করে, অন্ততঃ এ ছুটো খরচ আমাকে পাঠাতেই হবে।

অমল চুপ করিয়া গেল। কথাগুলির মধ্যে যে একটি বেদনাদায়ক সঙ্কোচ লুকাইয়া আছে, সেই সঙ্কোচে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। প্রাণঢালা অন্তরঙ্গতায় সে অহীন্দ্রের অন্তরঙ্গ, তবুও তাহার মনে হইল এ-কথাটা জোর করিয়া অহীন্দ্রের কাছে শুনিয়া সে অনধিকারচর্চা করিয়াছে। এদিকে ওপার হইতে নৌকাখানা আসিয়া পড়ায় ঘাটটা কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। গাছতলার গাড়ী লইয়া গাড়োয়ানেরা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। শীতার্ত্ত গরু কয়টাকে গাড়ীতে জুতিবার পূর্ব্ব হইতেই ঠ্যাঙাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। চীৎকার সুরু করিয়া দিয়াছে। যাত্রী যাহারা নামিতেছে তাহারাও চীৎকার করিতেছে কম নয়।

ঘাটের ঠিকাদার গরুর গাড়ীর টাপরের ভিতর বসিয়াই পারের পয়সা আদায় করিতে করিতে এক জনের সঙ্গে বিতণ্ডা জুড়িয়া দিয়াছে, একটি ছেলের পারানীর পয়সা লইয়া। লোকটি বলিতেছে—কোম্পানীর র‍্যালে ছেলের জন্ত হাফ-টিকিট, আর তোমার নৌকোতে নাই বললে চলবে কেন হে বাপু? মগের মুলুক পেয়েছ নাকি তুমি?

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান অত্যন্ত সাবধানতার সহিত গরুগুলিকে চালনা করিতে করিতে চেঁচাইতেছিল, অ—ই—, হ—হ! ইদিগেই—ইদিগেই!

নিতান্ত প্রয়োজনীয় সময়ে এমনি কলরবমুখর একটি বিষয়ান্তরের সুযোগ পাইয়া অমল অহীন্দ্র ছুজনেই যেন বাঁচিয়া গেল। হাফ-টিকিট যুক্তিবাদী লোকটির কথায় অকস্মাৎ প্রচুর কৌতুক অনুভব করিয়া অমল বেশ খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিল—ফাইন আর্গুমেণ্ট কিন্তু।

খেয়ানৌকা যাত্রী, গাড়ী বোঝাই করিয়া আবার ওপারের দিকে রওনা হইল। খেয়ার মাঝি লগির একটা খোঁচা দিয়া নৌকাখানাকে তটভূমির সংস্পর্শ হইতে ঠেলিয়া জলে ভাসাইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল—হরি-হরি বল সব! মিঞাসায়েবেরা আল্লা-আল্লা বল!

হিন্দুর সংখ্যাই বেশী ছিল অথবা সবই বোধ হয় হিন্দু ছিল, সমবেত কণ্ঠের একটা উচ্চ কলরোল উঠিল—হরি—বো—ল!

আবার ঘাট নিস্তব্ধ হইয়া গেল। শুধু নদীর আবর্ত্তের কুটিল নিম্ন কল-কল শব্দ একই ভঙ্গিতে একটানা ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ধ্বনি উঠিলেও জনবিরল খেয়াঘাটের উপরে যে ছুই-তিনটি মানুষ বসিয়াছিল তাহাদের অন্তরের স্তব্ধতা সে-ধ্বনিতে ক্ষুণ্ণ হইল না; জনবিরল খেয়াঘাটের শান্ত উদাসীনতার মধ্যে নদীর নিম্নস্বর সুশোভন রূপে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। কানে বাজিলেও মনে ধরা পড়িবার মত ধ্বনি সে নয়।

অমল ও অহীনের মনের বহির্দ্বারে অকস্মাৎ-আসিয়া-পড়া কৌতুক ফুরাইয়া গিয়াছে; আবার তাহারা ছুই জনেই গম্ভীর হইয়া উঠিল। একটা কাঠি দিয়া অমল বালির উপর একটা অর্থহীন চিত্র আঁকিতেছিল. অহীনের দৃষ্টি ছিল নদীর বুকের উপর। অমল সহসা বলিল—আচ্ছা, আমি যদি একটা টুইশনি জোগাড় ক'রে দিই! এক ঘণ্টা দেড়ঘণ্টা পড়াবে, পনর টাকা কি কুড়ি টাকা তাঁরা দেবেন! তা হ'লে তো তোমার আপত্তি থাকতে পারে না?

অমলের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অহীন বলিল—আরও পরিষ্কার ক'রে বল। তুমি কি উমাকে পড়াবার কথা বলছ?

অমলও অহীনের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—তাই যদি বলি।

—পারব না। দৃঢ়স্বরেই অহীন্দ্র জবাব দিয়া বসিল।

এবারও অমল হাসিল, বলিল—জানি। তবু কথাটা ভাল ক'রেই জেনে নিলাম। যাক্, সে কথা আমি বলছি না। আমি বলছি আমার মামাতো ভাইকে পড়াবার কথা। ছেলেটি থার্ড ক্লাসে পড়ছে, তাকে পড়াবার জন্তে তাঁরা মাস্টার খুঁজছেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া লইয়া অহীন্দ্র বলিল—ভাল, রাজী হলাম। তারপর অল্প হাসিয়া বলিল—চল, দেখি তোমার কলকাতা কেমন? মফস্বলের চেয়ে কতখানি উপরে অবস্থান করছেন পরখ ক'রে দেখা যাক।

অমল হাসিয়া বলিল—অনেক, অনেক। অনেক

উপরে আছি, তিন ধাপ নয়—আরও বেশী উপরে। দেখছ না, প্রাইভেট টুইশনির কথা বলতেই তুমি ধ'রে নিলে উমাকে পড়াবার কথা। অর্থাৎ মনে ক'রে নিলে, উমাকে পড়াবার ভানে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই। যে দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে তাতে পুরাকাল হ'লে আমার ভস্ম হয়ে যাবার কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কেন? ধর তাই যদি হ'ত, তাতেই বা ক্ষতি কি ছিল? শ্রম-বিনিময়ে মূল্য নেবে তাতে মর্য্যাদার হানিটা কোথায়? এই হ'ল তোমার মফস্বল-মেণ্টালিটি।

অহীন্দ্র রাগ করিল না, হাসিয়াই বলিল—এ কথায় কিন্তু কলকাতার লোকেরই হার হ'ল অমল। মূল্য অপেক্ষা অমূল্য বস্তুর দাম বেশী, এবং মূল্য না নিলে তবেই সংসারে অমূল্য বস্তু মেলে এ সত্য কলকাতার লোকে জানে না, মফস্বলের লোকেরাই জানে প্রমাণ হচ্ছে।

অমলও হাসিয়া বলিল—বিজ্ঞানের ছাত্রের অযোগ্য কথা বললে অহীন। বৈজ্ঞানিকের কাছে অমূল্য শব্দের অ অক্ষরটা অঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী শূন্য ছাড়া আর কিছুই নয়; যতই উচ্চ মূল্যের বস্তু হোক একটা নির্দ্ধারিত মূল্য সে বের করবেই; সেইটেই তার জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের পরিচয়।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—আমার মূল্য তোমার কাছে তা হ'লে কত, তুমি বলতে পার?

অমল বলিল—তোমার কাছে আমার যত মূল্য সেইটে ইনটু টেন।

—আমার কাছে তো তুমি অমূল্য। অমূল্য ইনটু টেনের ভ্যালু কত বল তো?

—তুমি একটা বোগাস, যত কূটবুদ্ধি তোমার। অমল হাসিয়া এবার পরাজয় মানিয়া লইল।

এতক্ষণে তাহারা সহজ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল, বাহির এতক্ষণে অন্তরে প্রবেশ করিল।

নদীর বন্যা, আকাশের ঘনঘোর মেঘ, স্রোতের নিম্ন কলস্বর, বাতাসের শব্দ-স্পর্শ, ভিজামাটির গন্ধ এতক্ষণে তাহারা স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল। আবর্ত্তকুটিল গৈরিক বর্ণের বিশাল জলস্রোতের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া অমল বলিল—কালিন্দী আমাদের অদ্ভুত, বহুরূপা—রহস্যময়ী! অনেক দিন আগে, ছেলেমানুষ ছিলাম তখন—তখন দেখেছি কালীর বান। আর এই দেখছি।

অহীন্দ্র বলিল—এখানকার প্রবাদ কি জান? এখানকার লোকে বলে—উনি নাকি যমের সহোদরা অর্থাৎ যমুনার কাহিনীটা এর উপর আরোপ করতে চায়। কালিন্দী নাকি যে-বস্তুটিকে গ্রাস করতে বদন-ব্যাদান করেন, তার রক্ষা কিছুতেই নেই। যম এসে সেখানে দোসর হয়ে ভগ্নীর পাশে দাঁড়ান। এক চাষী, তার নাম রংলাল সেই আমাকে বলেছিল। অদ্ভুত বিশ্বাস, বললে—উনি যে-কালে হাত বাড়িয়েছেন সে-কালে রায়হাটের আর রক্ষা নাই।

কালীর তটভূমির ভাঙনের দিকে চাহিয়া অমল বলিল—ওদের সংস্কারের কথা বাদ দিয়েও, কথাটা সত্যি, ভাঙনের দিকে চেয়ে দেখ দেখি!

মৃদু হাসিয়া অহীন বলিল—এদিকে ভাঙছে, ওদিকে গড়ছে। ওপারের চরটা বছর বছর পরিধিতে অল্প অল্প ক'রে বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের কলহ বাড়ছে। গোড়া থেকেই ব্যাপারটা আমি জানি। আমি হলপ ক'রে বলতে পারি অমল, যে, এ গ্রামে—শুধু এ গ্রামে কেন, আশেপাশে এমন লোক নেই, যার লোভ নেই ঐ চরটার মাটির উপর।

চরটার দিকে চাহিয়া অমল বলিল—চরটা কিন্তু সত্যিই লোভনীয় হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া মাটিও বোধ হয় খুব উর্ব্বর।

—খুব উর্ব্বর। রংলাল বলেছিল—ও মাটিতে সোনা ফলে।

—চল এক দিন দেখে আসি। কাল চল।···আরে আরে অত সব চেঁচামেচি করছে কেন? আরে বাপ রে—দল বেঁধে চাপে যে! নৌকোখানা ডুবে যাবে যে!

ওপারের চরের পারঘাটে দল বাঁধিয়া সাঁওতালদের মেয়েরা নৌকায় চড়িতে চড়িতে কলরব করিতেছিল। সেই কলরব এপার পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিতেছে। নৌকা ভরিয়া মেয়ের দল চাপিয়া বসিয়াছে—তাহাদের চঞ্চলতায় নৌকাটা টলমল করিতেছে, আর তাহারা সভয় কৌতুকে

কলরব করিতেছে, এ পার হইতে ঘাটের ঠিকাদার শঙ্কিত হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল—অই—অই—এরা করছে কি যে বাপু? হে-ই! হে-ই!

কিন্তু তাহার কণ্ঠধ্বনি নদীর কল্লোল ভেদ করিয়া ওপারের দলবদ্ধ সাঁওতালদের কলরবের মধ্যে আত্মঘোষণা করা দূরের কথা—বোধ হয় পৌঁছিতেই পারিল না। শেষ পর্য্যন্ত বেচারা কাশিয়া সারা হইল। কাশিতে কাশিতেই সে বলিল—মর, তবে মর তোরা ডুবে। নিক কালী নিক তোদিগে! অসীম বৈরাগ্যের সহিত সে নদীর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া নূতন করিয়া তামাক সাজিতে বসিয়া গেল।

অহীনের মুখে একটি পুলকিত হাসির রেশ ফুটিয়া উঠিল, সে নৌকাভরা সাঁওতালদের মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিল—একটা মজা দেখবে দাঁড়াও।

—হঠাৎ মজাটা কোত্থেকে আসবে?

—ঐ নৌকোয় চড়ে আসছে।

—বল কি? ব্যাপারটা কি?

—আমার পূজারিণীর দল আসছে। আমি ওদের রাঙাবাবু।

অমল মুগ্ধ হইয়া গেল, বলিল—বিউটিফুল। চমৎকার নাম দিয়েছে তো! কিন্তু এ যে একটা রোমান্স হে!

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—রোমান্সই বটে, আবার চরটার নাম দিয়েছে রাঙাবাবুর চর। আমার পিতামহের সাঁওতাল-হাঙ্গামায় যোগ দেওয়ার কথা জান তো? তাঁকে ওদের প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁকে বলত ওরা রাঙাঠাকুর। আমি না কি সেই রকম দেখতে! চোখগুলো খুব বড় বড় ক'রে বলে—তেমুনি আগুনের পারা রং!

ঘাটের ঠিকাদারটি তামাক সাজিতে সাজিতে অহীন্দ্র ও অমলের কথার উপরই কান পাতিয়া শুনিতেছিল; সে আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল—তা আজ্ঞে ওরা ঠিক কথাই বলে বাবুমশায়। আমাদের চক্রবর্ত্তী বাবুদের বাড়ীর মত রং এ চাকলায় নাই, তার ওপর আপনকার রং—ঠিক আগুনের পারাই বটে!

অমল ফিস ফিস করিয়া বলিল—মাই গড! লোকটা আমাদের কথা সব শুনছে না কি?

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল—অসম্ভব নয়। চুরি ক'রে পরের কথা শোনা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

ঠিকাদারটি এবার বাহির হইয়া আসিয়া অহীন্দ্র ও অমলের সম্মুখে সবিনয় ভঙ্গিতে উপু হইয়া বসিয়া বলিল—বাবুমশায়।

অহীন্দ্র বলিল—বল।

—আজ্ঞে। আজ্ঞে বলিয়াই সে এক বার সঙ্কোচভরে মাথা চুলকাইয়া লইল, তারপর আবার বলিল—আজ্ঞে, বাদলের দিন, আমার কাছে সিগরেট তো নাই, তামুকও খুব কড়া, তা বিড়ি ইচ্ছে করুন কেনে!

অমল খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, অহীন্দ্রও ঈষৎ হাসিল, হাসিয়া সে বলিল—না, আমরা বিড়ি সিগারেট তামাক—এসব খাইনে, ওসব কিছু দরকার নেই আমাদের।

লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল—আমি বলি—! কিছুক্ষণ অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া সে আবার বলিল—আজ্ঞে আর একটি কথা নিবেদন করছিলাম।

অমল হাসিয়া ইংরাজীতে বলিল—হোয়াট নেক্স্‌ট? এ গ্লাস অফ ওয়াইন?

লোকটি কিছু বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—আজ্ঞে?

গম্ভীর ভাবে অহীন্দ্র বলিল—কিছু না। ও উনি আমাকে বলছেন। তুমি কি বলছ বল।

হাত দুইটি জোড় করিয়া এবার লোকটি বলিল—আজ্ঞে ঐ চরের ওপর খানিক জমির জন্যে বলছিলাম।

একটি মৃদু হাসি অহীন্দ্রের মুখে ফুটিয়া উঠিল, বলিল—জমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশী আমার দরকার নাই, এই বিঘে দশ-পনেরো।

—এ কথার জবাব তো আমি দিতে পারব না বাপু। আমার মুরুব্বিরা রয়েছেন, তাঁরা যা করবেন তাই হবে।

—আজ্ঞে আমার বিঘে পাঁচেক হ'লেও হবে—লোকটি কাকুতি করিয়া এবার বলিয়া উঠিল—আমি একটি দোকান ওপারে করব মনে করেছি।

—দোকান? দোকান তো একটা আছে ওপারে। শ্রীবাস মোড়ল করেছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমারও ইচ্ছে একখানি দোকান করি। লোকও তো কেবুমে-কেবুমে বাড়ছে! আর চিবাস আপনার গলা কেটে লাভ করে। দরে তো চড়া পাবেন না, মারে ওজনে। সেরকরা আধপো ওজন কম। দু-রকম বাটখারা রাখে আজ্ঞে। এই ধান-চাল নেয় যে বাটখারায় সেটা আবার সেরকরা আধপো বেশী।

অমল এবার বলিল—সেই মতলবে তুমিও দোকান করতে চাও, কেমন?

—আজ্ঞে না। এই আপনাদের চরণে হাত দিয়ে আমি বলতে পারি আজ্ঞে। ও রকম পয়সা আমার গো-রক্ত ব্রহ্মরক্তের সমান। আমি আপনার ষোল আনা ওজন দেব—ষোল আনা পয়সা নেব। বলিয়া সে বুড়া আঙুল ও মাঝের আঙুল দুটি জোড় করিয়া ওজন করিবার ভঙ্গিতে ডান হাতখানি তুলিয়া ধরিল, যেন সে এখনই ওজন করিতেছে। অমল অহীন্দ্র উভয়েই সে ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ওদিকে নৌকাখানা ঘাটের অনতিদূরেই আসিয়া পড়িয়াছে। সাঁওতাল-মেয়েগুলির কলরবের ভাষা স্পষ্ট শোনা যাইতেছে কিন্তু বুঝা যায় না। একে একে কথা কহিতে উহারা জানে না, একসঙ্গে পাখীর ঝাঁকের মত কলরব করে। অহীন্দ্র ঠিকাদারকে বলিল—যাও যাও তোমার নৌকো এসে পড়ল।

পিছন ফিরিয়া নৌকাখানার দিকে চাহিয়া ঠিকাদার বলিল—সব মাঝিন, একজনাও যাত্রী নাই। খেয়াটাই লোকসান! বলিতে বলিতে সে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—জ্বালালে রে বাবা, ঘাট দুটো কেটে, ঝুড়ি-কতক মাটি ফেলে দিয়ে মনে করছে মাথা কিনেছে সব। এই মেঝেন—এই তোরা কি ভেবেছিস বল তো? এমনি ক'রে দল বেঁধে আসবার তোদের কথা ছিল না কি?

ঘাটে নামিয়াই সারী ঠিকাদারের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া বাধাইয়া তুলিল। সে বলিল—আসবে না কেনে? আমরা ঘি, পাড়াসুদ্ধ তিন দিন খেটে দিলম! ই-দিকের ঘাট—উপারের ঘাট ভাল ক'রে দিলম! সারীর পিছনে তাহাদের আপন ভাষায় দলসুদ্ধ মেয়েরা কলরব করিতে লাগিল।

ঠিকাদার বলিল—তাই ব'লে একসঙ্গে দল বেঁধে আসবি না কি? এ খেয়াতে একটা পয়সা নাই! কি, কাজ কি তোদের? এত ঝাঁটা-ঝুড়ি নিয়ে যাবি কোথায় সব?

—বেচতে যাব। ডাওর করলো, ঘরে ধান নাই, চাল নাই, খাব কি আমরা?

প্রত্যেকের কাছেই ঝাঁটা ও ঝুড়ির বোঝা। নানান ধরণের ঝাঁটা, শরপাতার ঝাঁটা, কুঁচিকাঠির ঝাঁটা, কাশ-কাঠির ঝাঁটা—ছোট বড় নানা ধরণের। ঝাঁটাগুলির বাঁধনেরও বিচিত্র ছাঁদ। ঝুড়িগুলিও সুন্দর, এবং নানা আকারের।

ঠিকাদার এবার ঝগড়ার সুর ছাড়িয়া মোলায়েম সুরে বলিল—বেশ। কই, আমাকে খানকয়েক ঝাঁটা দিয়ে যা দেখি।

—পোয়সা—পোয়সা দে! সারী হাত পাতিয়া দাঁড়াইল।

ঠিকাদার কিছুক্ষণ বিচিত্র ভঙ্গিতে নীরবে বর্ব্বর মেয়ে-গুলির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তার পর বলিল—আচ্ছা, যা; তার পর আবার পার কেমন ক'রে হ'স তা দেখব আমি। বলে সেই নায়ে পেরিয়ে নাউরেকে বলে শালা—সেই বিত্তান্ত!

সারী তাহার এই ভয়প্রদর্শনকে গ্রাহ্যও করিল না। ঘাট হইতে উঠিয়া একেবারে অহীন্দ্র ও অমলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পিছনে পিছনে মেয়ের দল। আর তাহাদের মুখে কলরব নাই, চোখে মুগ্ধ বিস্ময়ভরা দৃষ্টি, মুখে স্মিত সলজ্জ হাসি। পরস্পরের গলায় হাত রাখিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে—এমনি ভঙ্গিতেই দাঁড়ানো উহাদের অভ্যাস—পথে চলে, তাও এমনি ভাবে এ উহার গলা ধরিয়া বঙ্কিম ছন্দে হেলিয়া দুলিয়া চলে।

অমল মুগ্ধ হইয়া গেল, বলিল—বিউটিফুল! মনে হচ্ছে অজন্তা অথবা কোন প্রাচীন যুগের গুহার প্রাচীরচিত্র যেন মূর্ত্তি ধ'রে বেরিয়ে এল।

মৃদু হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল—কি রে কোথায় যাবি সব দল বেঁধে?

সারী বলিল—আপানার কাছে এলম গো, আমরা আজ সব শিকার করলাম—তাই আনলম দুটো গুগুড়ে—উইযি তুরা কি বুলিস গো!

পিছন হইতে তিন-চার জন কলরব করিয়া উঠিল—খোরগোস, খোরগোস

রক্তাক্ত খরগোস দুইটা অহীন্দ্র ও অমলের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া সারী বলিল—হুঁ—খোরগোস আনলম—আপোনার লেগে গো!

একটা খরগোসের মাথা স্থূল-ফলা তীরের আঘাতে একেবারে ভাঙিয়া দুইখানা হইয়া গিয়াছে—অন্যটার বুকে গভীর একটা ক্ষত—সে ক্ষত হইতে এখনও অল্প অল্প রক্ত ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

অহীন্দ্র এক বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে রক্তাক্ত পশু দুইটার দিকে চাহিয়া রহিল, এমন রক্তাক্ত দৃশ্যের আবির্ভাবের আকস্মিকতায় সে যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। অমল একটা খরগোসের লেজ ধরিয়া তুলিয়া বলিল—এত বড় খরগোস এখানে পাওয়া যায়?

—হেঁ গো, অনেক রইছে আমাদের চরে। ভারি খারাপ করছে সব। ভুট্টা বরবটি গাছপালার ডগাগুলি কেটে কেটে খেয়ে দিছে। একা সারী নয়, পাঁচ ছয় জনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল। নিজে হইতে বলিবার মত কথা উহারা ভাবিয়া পায় না, প্রশ্নের উত্তরে কথা বলিবার সুযোগ পাইলে সকলেই কথা বলিয়া উঠে।

অমল উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সে অহীন্দ্রকে ঠেলা দিয়া বলিল—চল কাল চরের উপর শিকার করে আসি! বলিতে বলিতে অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, অহীন্দ্রের উজ্জ্বল গৌরবর্ণের মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে, চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, স্বচ্ছ অশ্রুজলতলে কালো তারা দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! অমল শঙ্কিত হইয়া বলিল—এ কি, কি হ'ল তোমার?

অহীন্দ্রের ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল, সে বলিল—ও দুটো সরাও ভাই সামনে থেকে। ও বীভৎস দৃষ্টি আমি সইতে পারিনে।

অমল খরগোস দুইটা তুলিয়া লইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—বাবুর বাড়ীতে দিগে যা।

অহীন্দ্র শিহরিয়া উঠিল, বলিল—না না, না! মা দেখলে সমস্ত দিন ধ'রে কাঁদবেন!

অমল নির্ব্বাক হইয়া গেল, এমন ধারার কথা সে যেন কখনও শোনে নাই। সম্মুখে সমবেত কালো মেয়েগুলির মুখের স্মিত হাসিও মিলাইয়া গেল, অপরাধীর মত সঙ্কুচিত শুষ্ক মুখে নিশ্চল হইয়া তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সারী কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—হা বাবু! খাবি না তবে খোরগোস? আমরা আনলম—আপোনার লেগে!

অহীন্দ্র অনেকটা আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়াছিল এতক্ষণে সে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—এই বাবুর বাড়ীতে দিগে যা! জানিস তো বাবুর বাড়ী? ছোট রায় মশায়ের বাড়ী—ইনি হলেন ছোট রায় মশায়ের ছেলে।

মেয়েগুলি আপনাদের ভাষায় মৃদুস্বরে কল কল করিয়া অমলকে লইয়া আলোচনা জুড়িয়া দিল। অমল অহীন্দ্রের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না, ওরা ও নিয়ে যাক।

অহীন্দ্র বলিল—না। ওরা দুঃখ পাবে।

অমল বলিল—বেশ তা হ'লে তোমাকেও আমাদের ওখানে খেতে হবে।

—খাব।

হাসিয়া অমল বলিল—তা হ'লে তুমি জাপানী বৌদ্ধ?

অহীন্দ্র এবার অল্প একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল—দিনে না, রাত্রে খাব কিন্তু; দিনে রান্না করতে দেরিও হবে, আর মায়ের রান্নাবান্না বোধ হয় হয়েই গেছে।

মেয়েগুলি কথা না বুঝিয়াও এতক্ষণে অকারণে হাসিয়া উৎফুল্ল সহজ হইয়া উঠিল। সারী বলিল—তাই দিব তবে রায় মাশায়ের বাড়ীতে—রাঙাবাবু?

—হ্যাঁ।

মেয়ের দল কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল। অমল বলিল—চল তা হ'লে আমরাও যাই।

ঘাটের ঠিকাদার কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে জোড়হাত করিয়া বলিল—বাবু, তা হ'লে আমার আরজির কথাটা মনে রাখবেন।

২০

সেদিন অপরাহ্নে দুর্যোগটা সম্পূর্ণ না কাটিলেও স্তিমিত হইয়া আসিল। বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে, পশ্চিমের বাতাস স্তব্ধ হইয়া দক্ষিণ দিক্ হইতে মৃদু বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই বাতাসে আকাশের মেঘগুলি দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তর দিকে চলিয়াছে।

ইন্দ্র রায় আপনার কাছারির বারান্দার সামনের দিকে অল্প ঝুঁকিয়া এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিতেছিলেন, দুইটি হাতই পিছনের দিকে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। একটা কলরব তুলিয়া অচিন্ত্যবাবু বাগানের ফটক খুলিয়া প্রবেশ করিলেন—গেল, এই বার পাষণ্ড মেঘ গেল! বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে—আজ ছ-দিন ধ'রে বিরাম নাই জলের! আর কি বাতাস! উঃ, ঠাণ্ডায় বাত ধরে গেল মশাই! এই বার তিনি আকাশের মেঘের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন—এই বার? এই বার কি করবে বাছাধন? যেতে তো হ'ল! 'বামুন, বাদল, বান—দক্ষিণে পেলেই যান'—দক্ষিণে বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে, যাও—এই বার যাও কোথায় যাবে?

রায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—কি ব্যাপার? অনেক কাল পরে যে?

অচিন্ত্যবাবু সপ্রতিভ ভাবে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক দিন পরেই বটে! শরীর সুস্থ না থাকলে করি কি বলুন! অবশেষে কলকাতায় গিয়ে—; অকস্মাৎ অকারণে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—বলুন তো কি ব্যাপার?

চিন্তা-বিভোর মানুষ ভ্রূভঙ্গি করিয়া এক ধারার মৃদু হাসি হাসে, সেই ঈষৎ মৃদু হাসি হাসিয়া রায় বলিলেন—সেটা আবার কি?

হাসিতে হাসিতেই অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—দেখুন, ভাল ক'রে দেখুন, দেখে বলুন! হেঁ হেঁ, পারলেন না তো? বলিয়া আপনার দাঁতের উপর আঙুল রাখিয়া বলিলেন—দাঁত-দাঁত! এই রকম মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত ছিল আমার? পোকাখেকো কালো কালো দাঁত মনে আছে?

এবার ইন্দ্র রায়ের মন কৌতুকবোধে সচেতন হইয়া উঠিল, তিনি হাসিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—তাই তো মশাই, সত্যিই এ যে মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত!

সগর্ব্বে অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—তুলিয়ে ফেললাম! ডাক্তার বললে কি জানেন? বললে, ওই দাঁতই তোমার ডিস্‌পেপসিয়ার কারণ। এখন আপনার পাথর খেলে হজম হয়ে যাবে।

—বলেন কি?

—নিশ্চয়! দেখুন না ছ-মাসের মধ্যে কি রকম বিশাল-কায় হয়ে উঠি! একেবারে যাকে বলে ইয়ং ম্যান! পর-মুহূর্ত্তেই অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জানেন? খাবার-দাবার—মানে, যাকে বলে পুষ্টিকর খাদ্য, সে তো আর এখানে পাওয়া যাচ্ছে না!

রায় বলিলেন—এটা আপনি অযথা নিন্দে করছেন আমাদের দেশের। দুধ-ঘি এ সব তো প্রচুর পাওয়া যায় আমাদের এখানে।

বিষম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে দুধ ও ঘিকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—আরে মশাই কি যে বলেন আপনি, বিশেষ ক'রে নিজে তান্ত্রিক হয়ে, তার ঠিক নেই। দুধ-ঘিই যদি পুষ্টিকর খাদ্য হ'ত তবে গরুই হ'ত পশুরাজ! মাংস—মাংস খেতে হবে—তবে দেহে বল হবে। দুধ-ঘি খেয়ে বড় জোর চর্ব্বিতে ফুলে ষণ্ড হওয়া চলে, বুঝলেন!

রায় হাসিয়া বলিলেন—তা বটে, দুধ-ঘি খেয়ে ষণ্ড হওয়া চলে, পাষণ্ড হওয়া চলে না, এটা আপনি ঠিক বলেছেন।

অচিন্ত্যবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন, অপ্রতিভ ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন—আমিই বোকামি করলাম, আরও কিছু দিন কলকাতায় থাকলেই হ'ত। তা একটা সায়েব কোম্পানীর তাড়ায় এলাম চলে। ভাবলাম, সাঁওতালদের একটা-দুটো পয়সা দিয়ে একটা ক'রে হরিয়াল, কি তিতির, নিদেন ঘুঘু মারার ব্যবস্থা করে নেব। তাছাড়া, এখানে বন্যশশকও তো প্রচুর পাওয়া যায়, সে পেলে না হয় দু-গণ্ডা তিন গণ্ডা পয়সাই

দেওয়া যাবে। শশক-মাংস নাকি অতি উপাদেয় আর অতি পুষ্টিকর—মানে ওরা খায় যে একেবারে ফার্স্টক্লাস ভিটামিন, ছোলা মস্থর—এই সবের ডগা খেয়েই তো ওদের দেহ তৈরি!

রায় বলিলেন—আচ্ছা, আজ আমি আপনাকে শশক-মাংস খাওয়াব—আমার এখানেই রাত্রে খাবেন, নেমন্তন্ন করলাম। চরের সাঁওতালরা আজ ছুটো খরগোস দিয়ে গেছে।

অচিন্ত্যবাবু হাসিয়া বলিলেন—সে আমি শুনেছি মশায়, বাড়িতে ব'সেই আমি তার গন্ধ পেয়েছি।

রায় হাসিয়া উত্তর দিলেন—তা হ'লে সিংহ ব্যাঘ্র না হ'তে পারলেও ইতিমধ্যেই আপনি অন্ততঃ শৃগাল হয়ে উঠেছেন দেখছি। ঘ্রাণশক্তি অনেকটা বেড়েছে।

অচিন্ত্যবাবু অপ্রস্তুত হইয়া ঠোঁটের উপর খানিকটা হাসি টানিয়া বসিয়া রহিলেন। রায় বলিলেন—আসবেন তা হ'লে রাত্রে।

অচিন্ত্য বলিলেন—বেশ। আবার এখন এই ভিজে মাটিতে ট্যাং ট্যাং করে যাচ্ছে কে, তাই আসব! সেই একবারে খেয়ে দেয়ে যাব। অম্বল ভাল হ'ল তো সর্দ্দি টেনে আনব না কি? তাছাড়া আসল কথাই তো আপনাকে এখনও বলা হয় নি। এক্ষুনি বললাম না সায়েব কোম্পানীর কথা? এবার যা একটা ব্যবসার কথা কয়ে এসেছি—কি বলব আপনাকে—একেবারে তিন-শ পারসেণ্ট লাভ; দু-শ পারসেণ্টের তো মার নেই!

সকৌতুকে ভ্রূ দুইটি ঈষৎ টানিয়া তুলিয়া রায় বলিলেন—বলেন কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! খস্‌খস্‌ চালান দিতে হবে, খস্‌খস্‌ বোঝেন তো?

—তা বুঝি;—বেনাঘাসের মূল।

অচিন্ত্যবাবু পরম সন্তুষ্ট হইয়া দীর্ঘস্বরে বলিলেন—হ্যাঁ! সাঁওতাল ব্যাটারা চর থেকে তুলে ফেলে দেয়—সেইগুলো নিয়ে আমরা সাপ্লাই করব! দেখুন এখন হিসেব ক'রে লাভ কত হয়!

রায় কোন জবাব দিলেন না, খানিকটা হাসিলেন মাত্র। অন্দরের ভিতর হইতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল—ঈষৎ চকিত হইয়া রায় চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে; পশ্চিম দিগন্তে অল্প মাত্রায় রক্তসন্ধ্যার আভাস থাকায় অন্ধকার তেমন ঘন হইয়া উঠিতে পারে নাই। গভীর স্বরে তিনি ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন—তারা তারা! তার পর অচিন্ত্যবাবুকে বলিলেন—তা হ'লে আপনি একটু নায়েবের সঙ্গে বসে গল্প করুন—আমি সান্ধ্যকৃত্য শেষ ক'রে নি।

অচিন্ত্য বলিলেন—একটি গোপন কথা বলে নি। মানে, মাংস হ'লেও একটু দুধের ব্যবস্থা আমার চাই কিন্তু। ব্যাপারটা হয়েছে কি জানেন—দাঁত তুলে দিয়ে ডাক্তারেরা বললেন বটে যে, আর হজমের গোলমাল হবে না—আমি কিন্তু মশাই—অধিকন্তু ন দোষায় ভেবে, আফিং খানিকটা ক'রে আরম্ভ ক'রেছি। বুঝলেন, তাতেই হয়েছে কি—ওই গব্যরস একটু না হ'লে আবার ঘুম আসছে না!

রায় মৃদু হাসিয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। এক জন চাকর প্রদীপ ও প্রধূমিত ধূপদানী লইয়া কাছারির দুয়ারে দুয়ারে সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিতেছিল, অন্য এক জন চাকর দুই-তিনটা লণ্ঠন আনিয়া ঘরে বাহিরে ছোট ছোট তেপায়াগুলির উপর রাখিয়া দিল।

সমৃদ্ধ রায়-বংশের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে অন্তত দু-শ বৎসর পূর্ব্বে, হয়তো দশ-বিশ বৎসর বেশীই হইবে, কম হইবে না। তাহারও পূর্ব্বকাল হইতেই রায়েরা তান্ত্রিক দীক্ষায় পুরুষানুক্রমে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। ছোট রায়ের প্রপিতামহ অবধি তন্ত্রের একটা মোহময় প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন; আজও গল্প শোনা যায় অমাবস্যা অষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বপর্ব্বে তাঁহারা শ্মশানে গিয়া জপতপ করিতেন। তাহারও পূর্ব্বে কেহ এক জন নাকি লতা-সাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যুগের প্রভাবে তন্ত্রের সে মোহময় প্রভাব এখন আর নাই, কিন্তু তবুও তন্ত্রকে একেবারে তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইন্দ্র রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তন্ত্রমতে সায়ংসন্ধ্যায় বসেন—তাঁহার গলায় তখন থাকে রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধের উপর

থাকে কালী-নামাবলী, সম্মুখে থাকে নারিকেলের খোলার একটি পাত্র আর থাকে মদের বোতল ও কিছু খাদ্য—মৎস বা মাংস। এক-এক বার নারিকেলের মালার পাত্রটি পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া জপতপ ও নানা মুদ্রাভঙ্গিতে তাহা শোধন করিয়া লইয়া পান করেন, তাহার পর আবার আরম্ভ করেন ধ্যান ও জপ; একটি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক জপ শেষ করিয়া, আবার দ্বিতীয় বার পাত্র পূর্ণ করিয়া ঐ ক্রিয়ারই পুনরাবৃত্তি করেন। এমনি ভাবে তিন বারে তৃতীয় পাত্র শেষ করিয়া তিনি সান্ধ্যকৃত্য শেষ করেন, কিন্তু ইহাতেই তাঁহার দেড় ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা কাটিয়া যায়। তিন পাত্রের অধিক তিনি সাধারণতঃ পান করেন না।

হেমাঙ্গিনী স্বামীর সান্ধ্যকৃত্যের আয়োজন করিয়াই রাখিয়াছিলেন, ইন্দ্র রায় আসিয়া কাপড় বদলাইয়া আসন গ্রহণ করিতেই তিনি গৃহদেবী কালীমায়ের প্রসাদী কিছু মাছ আনিয়া নামাইয়া দিলেন। রায় বলিলেন—দেখ, অচিন্ত্যবাবুকে আজ নেমন্তন্ন করেছি; তাঁর জন্যে দুধ একটু ঘন ক'রেই জ্বাল দিয়ে রেখো। ভদ্রলোক আফিং ধরেছেন, ঘন দুধ না হ'লে তৃপ্তি হবে না।

হাসিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন—বেশ। কিন্তু আর কাউকে নেমন্তন্ন কর নি তো? তোমার তো আবার নারদের নেমন্তন্ন!

—না। রায় একটু হাসিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—আজ তুমি কি এত ভাবছ বল তো?

—নাঃ, ভাবি নি কিছু। রায়ের কথার সুরের মধ্যে একটি ক্ষীণ ক্লান্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল বলিয়া হেমাঙ্গিনীর মনে হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কুণ্ঠিতভাবে হেমাঙ্গিনী বলিলেন—অমল ছেলেমানুষ, সে কাজটা ছেলেমানুষী ক'রেই করেছে; সেটা—

ত্রস্তভাবে বাধা দিয়া রায় বলিলেন—ও কথা উচ্চারণ ক'রো না হিমু; তুমি কি আমাকে এমন সংকীর্ণ ভাব? এই সন্ধ্যা করবার আসনে ব'সেই বলছি হিমু, সত্যিই আমার আর কোন বিদ্বেষ নাই, রামেশ্বর বা তার ছেলেদের উপর। সুনীতির বড়ছেলে রাধারাণীর মর্য্যাদা রাখতে যা করেছে তাতে রাধুর গর্ভের সন্তানের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য আর থাকতে দেয় নি।

হেমাঙ্গিনী চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিতে মন যেন তাঁহার সায় দিল না। রায় হাসিয়া বলিলেন—তা হ'লে আমি সন্ধ্যাটা সেরে নি, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে রান্নাবান্নাটা দেখে দাও বরং ততক্ষণ!

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলেন।

রায় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইষ্টদেবীকে পরম আন্তরিকতার সহিত স্মরণ করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন—তারা, তারা! সবই তোমারই ইচ্ছা মা! তার পর তিনি শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী ভঙ্গিতে আসন করিয়া বসিয়া সান্ধ্যকৃত্য আরম্ভ করিলেন।

হেমাঙ্গিনীর ভুল হইবার কথা নয়। দুর্দ্দান্ত কৌশলী হইলেও ইন্দ্র রায় হেমাঙ্গিনীর নিকট ছিলেন সরল উদার মহৎ। এক বিন্দু কপটতার ছায়া কোন দিন তাঁহার মনোলোকে ছায়াবৃত করিয়া হেমাঙ্গিনীর দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত বা প্রতারিত করে নাই। অমল অহীন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে—এই সংবাদটা শুনিবামাত্র রায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া সামাজিক নিমন্ত্রণ-ব্যবহার বন্ধ না হইলেও ছোট রায়-বাড়ী ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর মধ্যে এ ব্যবহারটা রাধারাণীর নিরুদ্দেশের পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বন্ধই ছিল। সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে দুই বাড়ীই ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী বা আপন আপন পূজক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া সামাজিক দায়িত্ব রক্ষা করিতেন।

তাহার পর অকস্মাৎ যেদিন ইন্দ্র রায়েরই নিয়োজিত ননী পাল চক্রবর্ত্তীদের অপমান করিতে গিয়া রায়-বংশের কন্যারই অপমান করিয়া বসিল এবং সে-অপমানের প্রতিশোধ চক্রবর্ত্তী-বংশের সন্তান মহীন্দ্র তাহাকে হত্যা করিয়া ফাঁসি বরণ করিয়া লইতেও প্রস্তুত হইল—সেদিন হইতে ইন্দ্র রায় যাহা কিছু করিয়া আসিতেছেন সে সমস্ত দানের প্রতিদান হিসাবেই করিয়া আসিতেছেন। অন্ততঃ তাঁহার মনের সেই ধারণাই ছিল। অহীন্দ্র এখানে আসিলে জল খাইয়া যাইত বা অমল চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে কিছু খাইয়া আসিত—তাহার অতি অল্পই তিনি জানিতেন বেশীর ভাগই ছিল তাঁহার অজ্ঞাত। যেটুকু জানিতেন,

স্নেহবুকে শুধু শিষ্টাচার বলিয়াই গণ্য করিতেন। দানের প্রতিদানে তাঁহার দিকের প্রতিদানের ওজনটাই ভারী করিবার ব্যগ্রতায় তিনি চলিয়াছিলেন। আজ যেন তিনি সহসা অনুভব করিলেন যে, এই চলার বেগটা তাঁহার স্বেচ্ছা-আরোপিত বেগ নয়—নিজের ইচ্ছায় নিজের বেগেই তিনি চলিতেছেন না; অপরের চালনায় তিনি চালিত হইয়া চলিয়া চলিয়াছেন। আপনার সমস্ত চৈতন্যকে সতর্ক করিয়া আপনার চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন—আর চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখের দিকে। অদৃষ্টবাদী হিন্দুর মন তাঁহার—তিনি চারি দিকে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—কিন্তু কিছু যেন অনুভব করিলেন; এবং সম্মুখের সমস্ত পথটা দেখিলেন এক রহস্যময় অন্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য। তিনি পিছন ফিরিয়া পশ্চাতের পথের প্রকৃতি দেখিয়া সম্মুখের ঐ অন্ধকারাবৃত পথের প্রকৃতি অনুমান করিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর জীবন্-পথ যেখানেই রায়-বাড়ীর জীবন-পথের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছে সেইখানেই একটা করিয়া ভাঙনের অন্ধকারময় খাত অতল অন্ধকূপের মত জাগিয়া রহিয়াছে!

কিন্তু উপায় কোথায়? দিক পরিবর্ত্তন করিয়া চলিবার কথা মনে হইয়াছে—কিন্তু সেও যে পরম লজ্জার কথা। মনের ওজনে দান-প্রতিদানের পাল্লার দিকে চাহিয়া তিনি যে স্পষ্ট দেখিতেছেন—চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর দানের পাল্লা এখনও মাটির উপর অনড় হইয়া বসিয়া রহিয়াছে—সন্তান সম্পদ সব যে চক্রবর্ত্তী-বাড়ী পাল্লাটার উপর চাপাইয়াছে! সুনীতি অহীন্দ্র গভীর বিশ্বাসের সহিত সকরুণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে তাহাদের পাওনা পাইবার প্রত্যাশায়!

জপ করিয়া শোধন-করা সুরাপূর্ণ পানপাত্র তুলিয়া লইয়া পান করিয়া রায় গভীর স্বরে আবার ডাকিলেন—কালী! কালী! মা! তার পর আবার তিনি জপে বসিলেন। কিন্তু কাছারি-বাড়ী হইতে অচিন্ত্যবাবুর চিলের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আসিতেছিল, লোকটা কাহারও সহিত চীৎকার করিয়া ঝগড়া বা তর্ক করিতেছে। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই আপনাকে সংযত করিয়া প্রগাঢ়তর নিষ্ঠার সহিত সকল ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করিয়া ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

অচিন্ত্যবাবু ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন অমল ও অহীন্দ্রের উপর। সন্ধ্যার পর দুই জনে বেড়াইয়া আসিয়া চা পান করিতে করিতে পলিটিক্সের আলোচনা করিতেছিল। অচিন্ত্যবাবু নায়েবের কাছে বসিয়া অনর্গল বকিতেছিলেন, সহসা চায়ের পেয়ালা পিরিচের ঠুং ঠাং শব্দ শুনিবামাত্র তিনি সে-ঘর হইতে উঠিয়া অমলদের আসরে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। অমল তীব্রভাবে ইংরেজ-রাজত্বের শোষণনীতির সমালোচনা করিতেছিল।

অহীন্দ্র বলিল—পরাধীন জাতির এই অদৃষ্ট অমল, পরাধীনতা থেকে মুক্ত না হলে শোষণ থেকে অব্যাহতির উপায় নেই।

পুতুলনাচের পুতুলের মত অচিন্ত্যবাবুর মুখ চায়ের কাপ হইতে অহীন্দ্রের দিকে ফিরিয়া গেল—সবিস্ময়ে অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—কি! ইংরেজ-রাজত্ব তুমি উল্টে দিতে চাও?

ঈষৎ হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল—চাইলেও সে ক্ষমতা আমার নেই, তবে অন্তরে অন্তরে সকলেই স্বাধীনতা চায় এটা সার্ব্বজনীন সত্য।

তক্তাপোষের উপর একটা চাপড় মারিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—নো নো, নো! বলিতে বলিতে উত্তেজনার চাঞ্চল্যে খানিকটা গরম চা তাঁহার কাপড়ে পড়িয়া গেল, ফলে তাঁহার বক্তব্য আর শেষ হইল না—চায়ের কাপ সামলাইতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

অমল বলিল—আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—উত্তেজিত হব না? সায়েবদের তাড়িয়ে কি রাজত্ব করবে তোমরা বাপু? বলে, ঢেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে চায়! এমন বিচার করবার তোমাদের ক্ষমতা আছে? তোমরা আজ চাকর রাখবে কাল তাড়াবে কুকুরের মত। কই গবর্ণমেণ্টের একটা পিওনের চাকরি সহজে যাক তো দেখি! তার পর বুড়ো হ'ল তো, পেন্সান! এ বিবেচনা তোমাদের আছে?

অমল অহীন্দ্র উভয়েই এবার হাসিয়া ফেলিল।

অচিন্ত্যবাবু চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—হেসো না, বুঝলে, হেসো না। এই হ'ল তোমাদের জাতের স্বভাব, বড়কে ছোট ক'রে হাসা আর ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি করা। ইংরেজ হ'ল আমাদের ভাই—তা'দিগে লাঠি মেরে তাড়িয়ে নিজেরা রাজত্ব করবে! বাঃ বেশ!

অমল এবং হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অচিন্ত্যবাবু এবার অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—তুমি তো অত্যন্ত ফাজিল ছেলে হে! বলি এমন ফ্যাক্ ফ্যাক্ ক'রে হাসছ কেন শুনি?

অমল বলিল—ইংরেজ আমাদের ভাই?

তক্তাপোষের উপর প্রাণপণ শক্তিতে আবার একটা চাপড় মারিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—নিশ্চয়, সার্টেন্‌লি! ইংরেজ আমাদের ভাই, জ্ঞাতি, এক বংশ! পড় নি ইতিহাস? ওরাও আর্য্য, আমরাও আর্য্য। আরও প্রমাণ চাও? ভাষার কথা ভেবে দেখ! আমরা বাবাকে প্রাচীন ভাষায় বলি—পিতা পিতর্, ওরা বলে ফাদার! মাতর্—মাদার। বাবা—পাপা। ভ্রাতা—ব্রাদার। তফাৎ কোন্‌খানে হে বাপু? আমরা ভয় লাগলে বলি হরি-বোল, হরি-বোল, ওরা বলে হরিবল্, হরিবল্! চামড়ার তফাৎটা তো বাইরের তফাৎ হে, আর সেটা কেবল দেশভেদে, জলবাতাসভেদে হয়েছে!

তর্কটা আর অগ্রসর হইতে পারিল না, নায়েব আসিয়া বাধা দিল। বলিল—অচিন্ত্যবাবু, আপনি একটু থামুন মশাই, একটি বাইরের ভদ্রলোক এসেছেন। ধনী মহাজন লোক, কি ভাববেন বলুন তো?

অচিন্ত্যবাবু মুহূর্ত্তে তর্ক থামাইয়া দিয়া ভদ্রলোক সম্বন্ধে উৎসুক হইয়া উঠিলেন, এ-ঘর ছাড়িয়া ও-ঘরে ভদ্রলোকটির সম্মুখে গিয়া চাপিয়া বসিয়া বলিলেন—নমস্কার। মশায়ের নিবাসটি জানতে পারি কি?

প্রতিনমস্কার করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—আমার বাড়ী অবশ্য কলকাতায়, তবে কর্ম্মস্থল আমার এখন এই জেলাতেই। সদর থেকেই আমি আসছি।

—এখানে, মানে, কি উদ্দেশ্যে, যদি অবশ্য—

—আমি এখানে একটা চিনির কল করতে চাই; শুনেছি এখানে নদীর ওপারে একটা চর উঠেছে, সেখানে আখের চাষ ভাল হতে পারে, তাই দেখতে এসেছি জায়গাটা।

অচিন্ত্যবাবু গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বেনার মূলের ব্যবসায়ের পথে প্রতিবন্ধকতা অনুভব করিয়া নীরবে গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন। নায়েব বলিল—আপনি বসুন একটু, আমি দেখে আসি কর্ত্তাবাবুর সন্ধ্যা শেষ হয়েছে কি না।

নায়েব বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—মা!

হেমাঙ্গিনী মাথার ঘোমটা অল্প বাড়াইয়া দিয়া ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—কিছু বলছেন?

—আজ্ঞে, কর্ত্তাবাবুর সন্ধ্যা শেষ হয়েছে?

—তা আর হয়ে থাকবে বৈকি। কোন দরকার আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। একটি ভদ্রলোক এসেছেন, চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর ঐ চরটা দেখবেন। তিনি একটা চিনির কল বসাবেন। আমাদের এখানেই এসে উঠেছেন।

—ও। আচ্ছা আমি খবর দিচ্ছি, আপনি যান। চা-জলখাবারও পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নায়েব চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী চায়ের জল বসাইয়া দিতে বলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। অর্দ্ধেকটা সিঁড়ি উঠিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন মৃদুস্বরে রায় আজ গান গাহিতেছেন—"সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।" তিনি একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন, গান তো তিনি বড় একটা গান না। অভ্যাসমত তিন পাত্র 'কারণ' পান করিলে রায় কখনও এতটুকু অস্বাভাবিক হন না। পর্ব্বে বা বিশেষ কারণে তিন বারের অধিক পান করিলে কখনও কখনও গান গাহিয়া থাকেন। হেমাঙ্গিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সম্মুখে পাত্রপূর্ণ সুরা রাখিয়া রায় মৃদুস্বরে গান করিতেছেন। তিনি বেশ বুঝিলেন সন্ধ্যা শেষ হইয়া গিয়াছে, রায় আজ নিয়মের অতিরিক্ত পান করিতেছেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন—এ কি? সন্ধ্যে তো হয়ে গেছে—তবে যে আবার নিয়ে বসেছ?

মত্ততার আবেশমাখা মৃদু হাসি হাসিয়া রায় হাত দিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বলিলেন—ব'স ব'স। মাকে ডাকছি আমার। আমার সদানন্দময়ী মা! তিনি আবার পূর্ণপাত্র তুলিয়া লইলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—ঐ শেষ কর! আর খেতে পাবে না।

রায় বলিলেন—আজ আনন্দের দিন। চক্রবর্ত্তী-বাড়ী আর রায়-বাড়ীর বিরোধের শেষ কাঁটাটাও আজ মা তুলে দিলেন। আনন্দ করব না? পাঁচ হয়েছে সাতে শেষ করব হিমু—সাত-পাঁচ ভাবা আজ শেষ ক'রে দিলাম।

বলিয়া হেমাঙ্গিনীর মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া আবার গান ধরিলেন—

"সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি!"

ক্রমশঃ

গদ্যকাব্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কতকগুলি বিষয় আছে যার আবহাওয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কিছুতেই সহজে প্রতিভাত হ'তে চায় না। ধরা-ছোঁওয়ার বিষয় নিয়ে তর্কে আঘাত-প্রতিঘাত করা চলে। কিন্তু বিষয়বস্তু যখন অনির্বচনীয়ের কোঠায় এসে পড়ে তখন কী উপায়ে বোঝানো চলে তা হৃদ্য কি না। তাকে ভালো-লাগা মন্দ-লাগার একটা সহজ ক্ষমতা ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে হ'লে সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু রুচি এমন একটা জিনিস যাকে বলা যেতে পারে সাধন-দুর্লভ, তাকে পাওয়ার বাঁধা পথ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। সহজ ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী বলতে পারি যে এই আমার ভালো লাগে।

সেই রুচির সঙ্গে যোগ দেয় নিজের স্বভাব, চিন্তার অভ্যাস, সমাজের পরিবেষ্টন ও শিক্ষা। এগুলি যদি ভদ্র, ব্যাপক ও সূক্ষ্ম বোধশক্তিমান হয় তাহলে সেই রুচিকে সাহিত্যপথের আলোক ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রুচির শুভ সম্মিলন কোথাও সত্য পরিণামে পৌঁচেছে কিনা তাও মেনে নিতে অন্ত পক্ষে রুচিচর্চার সত্য আদর্শ থাকা চাই। সুতরাং রুচিগত বিচারের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে যুগে যুগে তার প্রমাণ পেয়ে আসছি। বিজ্ঞান দর্শন সম্বন্ধে যে মানুষ যথোচিত চর্চা করে নি সে বেশ নম্রভাবেই বলে, মতের অধিকার নেই আমার। সাহিত্য ও শিল্পে রসসৃষ্টির সভায় মতবিরোধের কোলাহল দেখে অবশেষে হতাশ হয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। সেখানে সাধনার বালাই নেই ব'লে স্পর্ধা আছে অবারিত, আর সেই জন্যেই, রুচিভেদের তর্ক নিয়ে হাতাহাতিও হয়ে থাকে। তাই বররুচির আক্ষেপ মনে পড়ে, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ। স্বয়ং কবির কাছে অধিকারী ও অনধিকারীর প্রসঙ্গ সহজ। তাঁর লেখা কার ভালো লাগল কার লাগল না শ্রেণীভেদ এই যাচাই নিয়ে। এই কারণেই চিরকাল ধ'রে যাচনদারের সঙ্গে শিল্পীদের ঝগড়া চলেছে। স্বয়ং কবি কালিদাসকেও এ নিয়ে দুঃখ পেতে হয়েছে সন্দেহ নেই; শোনা যায় না কি 'মেঘদূতে' স্থূলহস্তাবলেপের ইঙ্গিত আছে। যে সকল কবিতায় প্রথাগত ভাষা ও ছন্দের অনুসরণ করা হয় সেখানে অন্তত বাইরের দিক থেকে পাঠকদের চলতে ফিরতে বাধে না। কিন্তু কখনো কখনো বিশেষ কোনো রসের অনুসন্ধানে কবি অভ্যাসের পথ অতিক্রম ক'রে থাকে। তখন অন্তত কিছু কালের জন্য পাঠকের আরামের ব্যাঘাত ঘটে ব'লে তারা নূতন রসের আমদানীকে অস্বীকার ক'রে শান্তি জ্ঞাপন করে। চলতে চলতে যে পর্যন্ত পথ চিহ্নিত হয়ে না যায় সে পর্যন্ত পথকর্তার বিরুদ্ধে পথিকদের একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয়ে ওঠে। সেই অশান্তির সময়টাতে কবি স্পর্ধা প্রকাশ করে, বলে তোমাদের চেয়ে আমার মতই প্রামাণ্য। পাঠকরা বলতে থাকে, যে লোকটা জোগান দেয় তার চেয়ে যে লোক ভোগ করে তারই দাবীর জোর বেশি। কিন্তু ইতিহাসে তার প্রমাণ হয় না। চিরদিনই দেখা গেছে নূতনকে উপেক্ষা করতে করতেই নূতনের অভ্যর্থনার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

কিছু দিন থেকে আমি কোনো কোনো কবিতা গদ্যে লিখতে আরম্ভ করেছি। সাধারণের কাছ থেকে এখনি যে তা সমাদর লাভ করবে এমন প্রত্যাশা করা অসংগত। কিন্তু সদ্য সমাদর না পাওয়াই যে তার নিষ্ফলতার প্রমাণ তাও মানতে পারি নে। এই দ্বন্দ্বের স্থলে আত্মপ্রত্যয়কে সম্মান করতে কবি বাধ্য। আমি অনেক দিন ধ'রে রসসৃষ্টির সাধনা করেছি, অনেককে হয়তো আনন্দ দিতে পেরেছি, অনেককে হয়তো বা দিতে পারি নি। তবু

এই বিষয়ে আমার বহু দিনের সঞ্চিত যে অভিজ্ঞতা তার দোহাই দিয়ে ছোটো একটা কথা বলব, আপনারা তা সম্পূর্ণ মেনে নেবেন এমন কোনো মাথার দিব্য নেই।

তর্ক এই চলেছে গদ্যের রূপ নিয়ে কাব্য আত্মরক্ষা করতে পারে কি না। এত দিন যে রূপেতে কাব্যকে দেখা গেছে, এবং সে-দেখার সঙ্গে আনন্দের যে অনুষঙ্গ, তার ব্যতিক্রম হয়েছে গদ্যকাব্যে। কেবল প্রসাধনের ব্যত্যয় নয়, স্বরূপেতে তার ব্যাঘাত ঘটেছে। এখন তর্কের বিষয় এই যে কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার 'পরে একান্ত নির্ভর করে কি না। কেউ মনে করেন করে, আমি মনে করি করে না। অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত ক'রে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেব। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জবালা-পুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন ক'রে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য ব'লে মেনে নিতে একটুও বাধে নি। উপাখ্যান মাত্র — কাব্য-বিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হ'তে পারেন; কারণ এ তো অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয় নি। আমি বলি, হয় নি ব'লেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হ'তে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হ'ত, তবে হালকা হয়ে যেত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নাম-না-জানা কয়েক জন লেখক ইংরেজিতে গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। এ কথা মানতেই হবে যে সলোমনের গান, ডেভিডের গাথা সত্যিকার কাব্য। এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্ত পদক্ষেপ আছে, তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হ'ত তবে সর্বনাশই হ'ত।

যজুর্বেদে যে-উদাত্ত ছন্দের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তাকে আমরা পদ্য বলি না, বলি মন্ত্র। আমরা সবাই জানি যে, মন্ত্রের লক্ষ্য হ'ল শব্দের অর্থকে ধ্বনির ভিতর দিয়ে মনের গভীরে নিয়ে যাওয়া। সেখানে সে যে কেবল অর্থবান তা নয়, ধ্বনিমানও বটে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই গদ্য-মন্ত্রের সার্থকতা অনেকে মনের ভিতর অনুভব করেছেন কারণ তার ধ্বনি থামলেও অনুরণন থামে না।

একদা কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার 'গীতাঞ্জলি' ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন। এমন কি ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'কে উপলক্ষ্য ক'রে এমন সব প্রশংসাবাদ করলেন যাকে অত্যুক্তি মনে ক'রে আমি কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। আমি বিদেশী, আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোনো চিহ্নই ছিল না, তবু যখন তাঁরা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রস পেলেন, তখন সে কথা তো স্বীকার না ক'রে পারা গেল না। মনে হয়েছিল ইংরেজি গদ্যে আমার কাব্যের রূপ দেওয়ায় ক্ষতি হয় নি, বরঞ্চ পদ্যে অনুবাদ করলে হয়তো তা ধিক্কৃত হ'ত, অশ্রদ্ধেয় হ'ত।

মনে পড়ে একবার শ্রীমান সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম— "ছন্দের রাজা তুমি, অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করো দেখি।" সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল, তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। আমি স্বয়ং এই কাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলুম 'লিপিকা'য়—অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাই নি। 'লিপিকা' লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখি নি। বোধ করি সাহস হয় নি ব'লেই।

কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে, তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছবিচার নেই সে চলে বুক ফুলিয়ে। সে-জন্যেই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার প্রাঞ্জল গদ্যে লেখা চলতে পারে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য,

অভিজাত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনাআপনি উদ্ভব হয়। নটীর নাচে শিক্ষিতপটু অলংকৃত পদক্ষেপ। অপর পক্ষে ভালো চলে এমন কোনো তরুণীর চলনে ওজন রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গীতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে। গদ্যকাব্যের চলন হ'ল সেই রকম—অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।

আজকেই 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় দেখছিলুম কে এক জন লিখেছেন যে, রবিঠাকুরের গদ্যকবিতায় রস তিনি তাঁর সাদা গদ্যেই পেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক বলেছেন যে 'শেষের কবিতা'য় মূলত কাব্যরসে অতিরিক্ত জিনিস এসে গেছে। তাই যদি হয় তবে কি জেনানা থেকে বার হবার জন্যে কাব্যের জাত গেল? এখানে আমার প্রশ্ন এই—আমরা কি এমন কাব্য পড়ি নি যা গদ্যের বক্তব্য বলেছে—যেমন ধরুন ব্রাউনিঙে? আবার ধরুন এমন গদ্যও কি পড়ি নি যার মাঝখানে কবিকল্পনার রেশ পাওয়া গেছে? গদ্য ও পদ্যের ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদান-প্রদান হচ্ছে, তখন আমি আপত্তি করি নে।

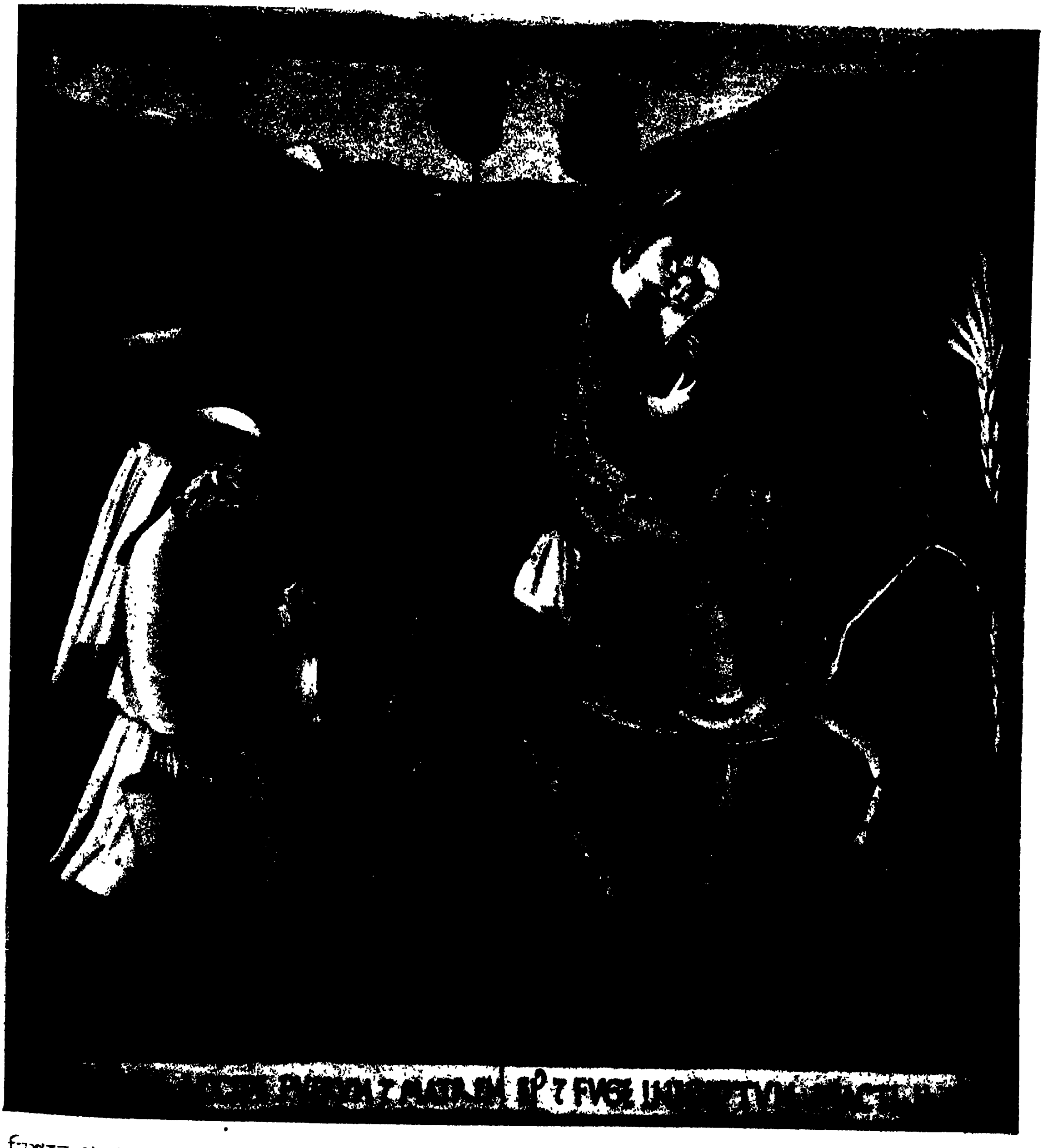
রুচিভেদ নিয়ে তর্ক ক'রে কিছু লাভ হয় না। এই মাত্রই বলতে পারি আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনরূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই; কিন্তু রূপ আছে এবং এই জন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে করি। কথা উঠতে পারে গদ্যকাব্য কী। আমি বলব কী ও কেমন জানি না, জানি যে এর কাব্যরস এমন একটা জিনিস যা যুক্তি দিয়ে প্রামাণ্য নয়। যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্য রূপেই আসুক তাকে কাব্য ব'লে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।

[২৯শে আগষ্ট ১৯৩১ তারিখে শান্তিনিকেতনে কথিত। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত।]

দেখা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

আরো কিছু বাকী বটে, সে আর ক'দিন?
দেখিতে দেখিতে এ তো হয়ে যাবে লীন
অসীম কালের গর্ভে ক্ষীণ আয়ুশিখা
অন্ধকারে জোনাকির আলোর কণিকা।
তবু এরই স্বর্ণবর্ণ ক্ষণদীপ্তি মাঝে
যেমন-তেমন অতি প্রাত্যহিক সাজে
এই যে তোমারে হেরি যত্নে, অনায়াসে,
অসতর্কে, দীর্ঘ কভু, স্বল্প অবকাশে,
এ দেখার শেষ নাই; এর স্মৃতিরেশ
সে যেন গানের সেই আথরবিশেষ
সমে এসে গোড়াকার সেই দুটি কথা,
আবার বাজিয়া উঠে ধ্বনি কলস্রোতা।
এমন অল্পের মাঝে বেশি এতখানি
কোথা পাই? এমন নিকটে থেকে, টানি'
বিচারের সীমা হ'তে বিস্ময়ের পারে
কে এমন দূর হ'তে দূরে মন কাড়ে?
ফিরে ফিরে মনে জাগে স্মিত হাসিরেখা,
নাহি মিটে অন্তরের অন্তহীন দেখা।
স্বল্পআয়ু এ জীবন কিবা তার ক্ষতি—
অনন্তেরে চিনাইল ইহারি তো জ্যোতি!



মিশরে পলায়ন

শিল্পী অ্যাঞ্জেলিকে

খ্রীষ্টের জন্মের পর, ইহুদীদের নূতন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই জনশ্রুতি শুনিতে পাইয়া রাজা হেরড এক হত্যাকাণ্ড সাধন করেন। জোসেফ ও মেরী শিশু খ্রীষ্টের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত দেশত্যাগ করিতেছেন, ইহাই চিত্রের বিষয়।

অহিংসা

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

প্রায় সকল দেশের সাহিত্যেই যুদ্ধের এবং বীরত্বের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। আরিষ্টটল সাহসের (courage-এর) কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও নানা ক্ষেত্রে নানা জাতির সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি মৃত্যুভয়ে ভীত না হওয়াই সাহসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু রোগ বা অন্যপ্রকার আকস্মিক বিপৎপাতে যে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে তাহাতে ভীত না হওয়াকে সাহসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায় না; কেবলমাত্র যুদ্ধে প্রাণভয়ে ভীত না হওয়াকেই সাহসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায়।

রোগে বা আকস্মিক দৈবকারণে যে মৃত্যু ঘটে, সেখানে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করাকে কোনও হিসাবে সাহস বলা যায় বটে, কিন্তু সে সাহসের বিশেষ কোনও মূল্য নাই, কারণ সে সাহসের দ্বারা সেখানে কিছু সাধন করিবার নাই এবং রোগশয্যায় মৃত্যুকে কোনও মহত্ত্বমণ্ডিত মৃত্যু বলা যায় না—কেবলমাত্র যুদ্ধে মৃত্যুকেই যথার্থ গৌরবের মৃত্যু বলা যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করিয়া শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া যে যুদ্ধে অগ্রসর হয়, সেই-ই যথার্থ সাহসী।

গীতায় আঠারটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে সমস্ত গভীর বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে অনেক আধ্যাত্মিক তথ্যের আলোচনা করা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ সমস্ত বাক্যের মূল উদ্দেশ্য অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান।

বলিয়াছেন—নিহত হইলে স্বর্গে যাইবে এবং জয়লাভ করিলে পৃথিবীর রাজা হইবে। ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কোন উচ্চতর আদর্শ নাই। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম্ম। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে ধর্ম্মযুদ্ধ কাহাকে বলে? গীতার অধিকাংশ টীকাকারই এ বিষয়ে নব। রামানুজ বলেন—ন্যায়সঙ্গত কারণে প্রবৃত্ত যে যুদ্ধ তাহাকেই ধর্ম্মযুদ্ধ বলে। শঙ্কর বলেন—প্রজাপালন ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ করা যায় তাহাকেই ধর্ম্মযুদ্ধ বলে।

বেদের মধ্যে হিংসা করিও না—মা মা হিংসীঃ, অর্থাৎ পরস্পরকে হিংসা করিও না—এই উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞে পশুবধেরও বিধান দেখা যায় এবং অহিংসা বাক্যের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বলা যায় যে হিংসার সাধারণ নিষেধ থাকিলেও বৈধ হিংসায় পাপ নাই। অর্জ্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আত্মীয়স্বজনকে বধ করিতে হইবে এই চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে তাঁহার কার্য্য আর্য্যজনোচিত নহে এবং তাহাতে সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া আত্মীয়-হিংসা বা নরহিংসা করিতে হইবে ভাবিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়ার চেষ্টাকে ক্লীবতা ও কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যুদ্ধস্থলে সম্মুখসমরে প্রাণিহিংসা করিলে কোনও পাপ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে যুদ্ধ বৈধ হিংসা। অন্তবিধ বৈধ হিংসায় যেরূপ পাপ হয় না, তেমনই যুদ্ধেও কোনও পাপ হয় না।

রামানুজ যজ্ঞে পশুবধের সহিত যুদ্ধে মনুষ্যবধের তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যুদ্ধে নিহত পশু যেরূপ মৃত্যুর পর দিব্য কলেবর ধারণ করে, যুদ্ধে নিহত মনুষ্যও তেমনই নূতন দেহে স্বর্গারোহণ করে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে যুদ্ধের ও যুদ্ধভূমিতে সাহস প্রদর্শনের ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়। অথচ অধ্যাত্ম-শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সার্ব্বভৌম অহিংসাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই মতেরই পোষকতা

করিতেছে। ধম্মপদে লিখিত আছে যে, বৈর দ্বারা কখনও বৈর দূর করা যায় না।

প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই উভয়জাতীয় শাস্ত্রমতের সঙ্গতি কোথায়? উভয় মতের সামঞ্জস্য করিতে গেলে স্বভাবতঃই মনে হয়, কোনও ব্যক্তি যখন তাহার চরম আদর্শকে লাভ করিতে চায়, তখন অহিংসাই তাহার যাত্রা-পথের একমাত্র সহায়। এই অহিংসা কেবলমাত্র বাহ্য-হিংস্যাবারণ নহে। কিন্তু এই অহিংসা একটি হিংসা-বিরোধী মনোবৃত্তি। ইহা কেবলমাত্র হিংসার অভাব নহে। হিংসাবিরোধী মনোবৃত্তি বলিলে যেমন এক দিকে শান্তি বুঝায় অপর দিকে তেমনই মৈত্রী বুঝায়। মন যখন কোনও বাহ্য প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে বা কোনও প্রাণি-বিশেষের কোনও ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় তখনই তাহাকে হিংসাত্মক মনোবৃত্তি বলা যায়। এমন কি যখন শীতে, উত্তাপে, পীড়ায় মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, এবং ঐ জাতীয় বাহ্য অভিঘাতের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে, তখন তাহাও এক প্রকারের হিংসা। সেই জন্য বাহ্য প্রতিকূলতাকে বিনা বিক্ষোভে গ্রহণ করাকে তপস্যা বলে। আরিষ্টটল যে বলিয়াছেন কেবল মাত্র যুদ্ধে আততায়ী বধের মধ্যেই বীরত্বব্যঞ্জক ক্রিয়াশীলতা ও মহত্ত্ব আছে, তাহা আমার ঠিক বলিয়া মনে হয় না, বরং ইহাই মনে হয় অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তিও যুদ্ধের উন্মাদনায় বাহ্যিক শৌর্য্য দেখাইতে পারে; কিন্তু প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে চিত্তের বিদ্বেষ ও আক্রোশকে যিনি অনায়াসেই দমন করিতে পারেন তাঁহার বীরত্বই যথার্থ বীরত্ব। এই আন্তরিক আত্মসংযম শক্তির প্রাবল্যে সর্ব্বদাই সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে।

মানুষ যখন আততায়ীর বা অপকারীর সমস্ত আক্রমণকে কেবল যে অগ্রাহ্য করে তাহা নহে, পরন্তু সেই আততায়ীর প্রতি নিজের চিত্তকে স্নেহাভিষিক্ত করে তখনই সে যথার্থ অহিংসাব্রতে সিদ্ধিলাভ করে। এই অহিংসার দ্বারা যাহাদের প্রতি অহিংসাব্রত আচরিত হইল তাহাদের মনোভাবের যে পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে একথা নিঃসংশয়রূপে বলা যায় না; কিন্তু যিনি এই অহিংসাবৃত্তি আচরণ করিলেন, তাঁহার চিত্ত যে বাহিরের সর্ব্ববিধ আক্রমণকে ব্যর্থ করিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অহিংসার যথার্থ উদ্দেশ্য আপন অন্তর্বৃত্তির, আপন চিত্তের স্বাতন্ত্র্য, ব্যাপকতা ও মহিমাকে উপলব্ধি করা এবং সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে আপনাকে জয়ী করা।

অহিংসা কোনও কার্য্যসিদ্ধির উপায় নহে। অহিংসা এক দিকে যেমন হননবিরোধী শান্তি, অপর দিকে তেমন চিত্তধাতুর ব্যাপকতায় মৈত্রীর উপলব্ধি। সেই জন্য ইহা আমাদের অন্তরের ধর্ম্ম। ইহা কোনও বাহ্য উপায় নহে। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন, যে অহিংসার দ্বারা অপরকে কোন কার্য্য করাইতে বাধ্য করা যায়। কোন কোন স্থলে অহিংসা বৃত্তির দ্বারা অপর লোকের চিত্তের যে পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সে সমস্ত স্থলে যাহাদের চিত্তে তাদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহারা অনেক পরিমাণে প্রেমপ্রবণ হইয়াই ছিল। কেবলমাত্র বাহ্য আবরণের দ্বারা তাহা ঢাকা ছিল মাত্র, কোন মহাপুরুষের অহিংসাবৃত্তি দেখিয়া তাহাদের পক্ষে সেই বাহ্য কুজ্ঝটিকা দূর হইয়া যায়। যদি কোন স্থলে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবৃত্তির দ্বারা কোন কোন লোকের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে তাহার প্রধান কারণ এই যে, সেই সমস্ত লোকেরা কম বা বেশী স্বভাবতঃই অহিংস ছিল এবং তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু যখনই অহিংসাকে কোনও কার্য্যসিদ্ধির উপায়রূপে প্রয়োগ করা হয় এবং এই অহিংসার পশ্চাতে উপবাসাদি কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা অপরের মনে সামাজিক ভীতি উৎপাদন করা হয়, তখন তাহা হিংসারই নামান্তর। অহিংসার সহিত উপবাসাদির কোনও সম্পর্ক নাই। এইজন্য উপবাসাদির সহিত অহিংসাকে কোনও উপায়রূপে প্রয়োগ করিলে তাহাকে যথার্থ অহিংসধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। যে কোনও বহিরঙ্গ কার্য্যসিদ্ধির জন্য অহিংসাকে উপায়রূপে প্রয়োগ করিলে সেই বহিরঙ্গ কার্য্যটি—তাহা স্বদেশোদ্ধারই হোক বা স্বকার্য্যোদ্ধারই হোক—প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, এবং আত্মার সার্ব্বভৌম ধর্ম্মটি তাহার উপায় হইয়া দাঁড়ায়। আমরা পূর্ব্বে অহিংসার বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছি, যে এই বৃত্তিদ্বারা আমাদের অন্তরাত্মা বাহিরের

সমস্ত আক্রমণকে অনায়াসে তুচ্ছ করিয়া আত্ম-স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতে পারে এবং অপর দিকে মৈত্রীবন্ধনের দ্বারা অন্য মানবের সহিত আপনাকে এক বলিয়া অনুভব করিতে পারে। এই জন্য অহিংসার উপলব্ধি আত্মারই যথার্থ উপলব্ধি। ইহাই আত্মার স্বরূপপ্রকাশ। মানুষ যখন তাহার আপন আত্মাকে কোনও বহিরঙ্গ বস্তুর উপায়স্বরূপ ব্যবহার করে, তখন সে আত্মার অবমাননা করে। কাণ্ট যথার্থ ই বলিয়াছেন, A man is an end unto himself and never a means. কাহাকে কাহাকেও এমন বলিতে শুনিয়াছি; অহিংস থাকিব অথচ দাসত্ব-বিরোধী হইব। দুঃখের বিষয় যে, তাহাদের দৃষ্টিতে এই সূক্ষ্ম কথাটি ধরা পড়ে নাই, যে, আত্মার অহিংস স্বভাবই তাহার যথার্থ স্বাতন্ত্র্য এবং সেই জন্য দাসত্ব-বিরোধিতা তাহার অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম, ও সেই জন্য অহিংসাবৃত্তি ও দাসত্ব-বিরোধিতা এই উভয়কে দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া কল্পনা করা যায় না এবং এ-কথা বলা চলে না যে, দাসত্বের প্রতিকূলতার জন্য অহিংসাবৃত্তিকে উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিব।

শেলি অবশ্য বলিয়াছেন,

And if then the tyrants dare
Let them ride among you there;
Slash and stab and maim and hew
What they like that let them do.
With folded arms and steady eyes
And little fear and less surprise
Look upon them as they stay
Till their rage has died away
Then they will return with shame
In the place from which they came
And the blood thus will speak
In hot blushes on their cheek.

Every woman in the land
Will point at them as they stand
They will hardly dare to greet
Their acquaintance in the street—
And the bold true warriors
Who hugged danger in the wars
Will turn to those who would be free
Ashamed of such false company.

বক্তব্য এই:—অত্যাচারীরা যদি অত্যুৎকোচে ছিন্নভিন্ন করিয়া যায় অথচ তখন তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু না করা হয়, তবে কেবলমাত্র তাহাদের রাক্ষসী হিংসাবৃত্তিদ্বারা তাহারা জনসমাজে এইরূপ ঘৃণ্য হইবে যে, লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিবে না এবং অপর ব্যক্তিরা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া স্বাধীনতাকামীদিগের পথের কণ্টক দূর করিবে। এ ক্ষেত্রে শেলি যে অহিংসাবৃত্তিদ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথ দেখাইয়াছেন, তাহার ক্ষেত্রটি একটি সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ এবং সেখানে এক দল যেমন নৃশংসভাবে অত্যাচারী অপর দল সেইরূপ নিপীড়িত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কাজেই নিপীড়নের দ্বারা যাহাদের মধ্যে সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়, তাহাদের দ্বারাই অত্যাচারীদের দমন করা যায়। এমন কি অত্যাচারীরা নিজেরাও এইরূপ যে, অযথা অত্যাচার করিয়া তাহারা অনুতাপক্লিষ্ট ও লজ্জিত হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এরূপ স্থলে এক দিকে অত্যাচারীরা পাপী হইলেও একেবারে পাপনিমগ্ন নহে, অপর দিকে তাহারা তাহাদিগের পাপের দ্বারা অপর এক দলকে এমন করিয়া ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে যে, তাহারা হয়ত হিংসা দ্বারাই প্রতিশোধ লয়। এই জন্য পরিণামে যাহারা অত্যাচার সহ্য করিল, তাহাদের মঙ্গল ঘটে। কাজেই এখানে দেখা যাইতেছে যে, যদিও এক দল লোক অত্যাচারের প্রতিশোধ করিল না, তথাপি হিংস উপায়ের দ্বারাই অত্যাচারের প্রতিশোধ করিল। কাজেই এখানেও কেবলমাত্র অহিংসাবৃত্তির দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইল না। অতএব আমরা একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে অহিংসাবৃত্তি কেবল যে মাত্র উপায়রূপে ব্যবহার হইতে পারে না তাহা নহে, তাহাকে উপায়রূপে ব্যবহার করিলেও কোনও বিশেষ বিশেষ স্থল ছাড়া তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুনশ্চ এই তথাকথিত অহিংসনীতির মধ্যে দুই দিক দিয়াই হিংসা আছে। এক দিকে অপরের কার্য্য বা উদ্দেশ্যকে বাধা দিবার জন্য বা অপরের নিকট হইতে কিছু আদায় করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে, অপর দিকে অনশনের সহিত যুক্ত থাকায় ইহা আত্মহিংসা

ছাড়া আর কিছুই নহে। যদি কেহ বলেন অমুকে অমুক কার্য্য না করিলে আমি উপবাসী থাকিব এবং শেষ পর্য্যন্ত অনশনে প্রাণত্যাগ করিব, তবে এ নীতিকে অহিংস নীতি বলা যায় না। আত্মহিংসা মহাপাপ—তাহাতে কাহারও অধিকার নাই। যদি ইহা কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয়, তবে সকলেই ইহা অনুষ্ঠান করিতে পারে। কিন্তু সকলে ইহা অনুষ্ঠান করিতে গেলেই এই নীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়। কাহারও নিকট কিছু পাওয়া গেল না বলিয়া, যে পাইল না সে যদি অহিংস অনশনবৃত্তি আরম্ভ করে—এবং সঙ্গে সঙ্গে যে দিতে চাহে না, সেও যদি অনশনবৃত্তি আরম্ভ করে—এবং উভয়েই যদি শেষ পর্য্যন্ত উহা চালাইতে থাকে, তবে উভয়েই ধ্বংস পাইবে এবং সমস্ত দেনা-পাওনার ব্যাপারে ইহা চালাইলে শীঘ্রই সংসার ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। এক জন কিছু দাবি করিয়া অনশন আরম্ভ করিলে অপর এক জন তাহার অনশন ভঙ্গ করাইবার জন্য অনশন আরম্ভ করিতে পারেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে এ নীতি স্ব-বিরোধী। যদি বলা যায় যে এ নীতি কেবল মাত্র কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে কিন্তু সকলের দ্বারা নয় তবে সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠেয় নয় বলিয়া ইহাকে ব্যাপক নীতি বলা চলে না। আবার যাঁহারা এই নীতি ব্যবহার করিয়া সমাজে বা রাষ্ট্রে ফল দেখাইতে চাহেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, সকলেই এই নীতি ব্যবহার করিবেন নহিলে ইহার ফল পাওয়া যাইবে না। এই রূপ কথা বলিয়া সেই সঙ্গে ইহা বলা চলে না যে, কেবল মাত্র ব্যক্তিবিশেষেরই এই নীতি পালনের অধিকার আছে বা কোনও সময় এই নীতি পালন করা যায়, আবার কখনও যায় না বা সে সম্বন্ধে স্থির করিবার কোনও ব্যক্তিবিশেষেরই অলৌকিক ক্ষমতা আছে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, যথার্থ অহিংসবুদ্ধির সহিত প্রচলিত অহিংসবুদ্ধির অনেক পার্থক্য। কিন্তু অহিংসবুদ্ধি যেমন উচ্চজীবনের আত্মপ্রাপ্তির কারণ নিম্নজীবনে সেইরূপ হিংসা বা স্বল্পহিংসা আত্মবিকাশের কারণ। সমস্ত প্রাণিজগৎ পরস্পর হিংসাবৃত্তির দ্বারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়াছে। নিম্নস্তরের মনুষ্যদের মধ্যেও এইরূপ পরস্পরের হিংসাদ্বারা বল-বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই হিংসাবৃত্তি আছে বলিয়াই মানুষেরা যৌথভাবে বাস করে এবং যৌথ-ভাবে অপরের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। যৌথভাবে থাকিতে হইলে পরস্পর নিরন্তর হিংসা করা চলে না, এই জন্য হিংসা স্বল্পহিংসায় পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ অহিংসার দিকে অগ্রসর হয়। এই জন্য দেখা যায় কোনও বিশিষ্ট জাতি বা সমাজের মধ্যে ব্যক্তিরা পরস্পার অহিংস থাকা ধর্ম্মসঙ্গত মনে করে, অথচ বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যে অহিংস নীতি স্বীকার করে না। সমাজের মধ্যেও এমন অনেক স্থলে ঘটে, যখন যে ভাবেই কাজ করা যাক না কেন, হিংসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। শান্তিপর্ব্বে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বুঝাইতে গিয়া একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। গোশালায় গরু বাঁধা আছে এবং এখানে বাঘকে হত্যা করিলে ব্যাঘ্রহিংসা হইবে এবং হত্যা না করিলে গো-হিংসা হইবে। এই জন্য অহিংস নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যেও হিংসার ভাব রহিয়াছে,—যেমন আততায়িনং হন্যাৎ। আক্রমণকারীকে হত্যা করিবে, কারণ তাহাকে আঘাত না করিলে আত্মহিংসা হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জীবনে হিংসাকে বাদ দেওয়া যায় না এবং প্রাকৃতিক নিয়ম হিংসা নীতির স্বপক্ষে। উন্নত স্তরের ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উচ্চপথ উন্মুক্ত করিতে একান্ত অহিংসার যেমন প্রয়োজন তেমনই নিম্নস্তরের জীবন গড়িয়া উঠিবার পক্ষে অহিংসাই প্রবল বাধা।

হিংসা হইতে যে অহিংসাটির উৎপত্তি ঘটে, তাহার রহস্যটি অভিনিবেশযোগ্য। নিম্নস্তরের জীবনের পক্ষে হিংসাদ্বারা বলসঞ্চয় হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উচ্চস্তরের জীবনের পক্ষে হিংসাই মানুষকে দুর্ব্বল ও অক্ষম করে। সমাজের মধ্যে যদি এক ব্যক্তি অপরকে প্রবলভাবে হিংসা করে, তবে সমাজ তাহার দণ্ডবিধান করে। সমাজের সংহত শক্তির নিকট ব্যক্তির শক্তি অক্ষম। কাজেই হিংসাবৃত্তির পরিচালনাদ্বারা কেহ কোনও সুবিধা করিয়া দিতে পারে না। সমাজবিধানের ফলে হিংসাই আপন

অক্ষমতাকে বুঝাইয়া দেয় এবং এই উপায়ে অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব সূচনা করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অহিংসনীতি স্থাপনের যুগ এখনও আসে নাই। কিন্তু এবার যে যুদ্ধ বাধিয়াছে, এইরূপ কয়েকটি যুদ্ধ বাধিলে নিরর্থক পরস্পর হিংসার নিষ্ফলতা বুঝিতে পারিয়া লোকে জাতিগত বিরোধও অহিংস উপায়ে সমাধান করিবে, এবং একটি সমাজের মধ্যে ব্যক্তিদের পরস্পর যে সম্পর্ক থাকা উচিত সমগ্র মনুষ্যসমাজের জাতিবর্গের মধ্যেও যে সেইরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত, ইহা সকলে মানিয়া লইবে। গত যুদ্ধের ফলে এইরূপ একটা প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহার ফলে লীগ অব নেশ্তন্‌স্ উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধিকর্ত্তাদের মনে সন্ধিকালে যে হিংস্র মনোভাব সন্ধিপত্র বিধান করিয়াছিল, তাহার কুফল এখন পর্য্যন্ত সকলকে ভোগ করিতে হইতেছে। যুদ্ধ ঘোরতর বিভীষিকাময় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম এই যে অমঙ্গল হইতেই মঙ্গল এবং মৃত্যু হইতেই জীবন উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের ধ্বংসলীলা যদি সকলের চক্ষু উন্মেষিত করে এবং সকলের মধ্যে এই বুদ্ধি উন্মেষিত করে যে, বিভিন্ন মনুষ্যজাতি এখন যে স্তরে উঠিয়াছে তাহাতে হিংসাদ্বারা তাহারা কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারে না, তবে ভবিষ্যতে যুদ্ধের প্রচার কমিয়া যাইবে বা লোপ পাইবে। হিংসার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান যে, কোনও একটি বিশিষ্ট স্তরে আপনার দোষ, অক্ষমতা, স্বার্থসিদ্ধির প্রতি অযোগ্যতা প্রমাণ করাইয়া দিয়া সকলকে তাহার পথ হইতে নিবৃত্ত করে। এই মহাযুদ্ধের ধূম্ররাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা, যাহারা বাঁচিয়া থাকিব, এই অহিংস জ্যোতির উন্মেষের জন্য প্রার্থনা করিব— আবিরাবির্ম এধি।

পারমিতা

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

সময়ের বালুকা ঝরিছে
ক্ষীয়মান প্রণয়ের আয়ু
শেষ হয়ে এল গোনা দিন
যাবার সময় এবে হ'ল।

তারার মিছিল মিলায়েছে
আর্দ্রবায়ু নিশীথ কাঁপায়
মেঘম্লান বাদর-আকাশে
বিরহের অশ্রু টলমল।

সব কথা সারা হয়ে গেছে
শেষ কথা কই হ'ল বলা
যে-আসঙ্গে আতপ্ত আসব
হিমধারা সেখানে নামিল।

হে ক্ষণিকা তিষ্ঠ ক্ষণকাল
আরবার পিছনেতে চাও
ঝাউবনে শোনো কান পাতি
ভুলে-যাওয়া দিনের মর্ম্মর।

ঝাউবনে মর্ম্মরিছে শোনো
পদধ্বনি বিগত দিনের
অতিক্রমি তারে যাবে কোথা
বাসা তার সত্তার গহিনে।

তুমি মম মানসমঞ্জরী
সিঞ্চিয়াছি হিয়ার রুধিরে
নিজেরে দহিয়া দিনু তাপ
আলো দিনু নিজেরে জ্বালায়ে।

সঞ্চারিণী ধেয়ানপল্লবে
বর্ণদীপ্তা মম কামনায়
মোহ তব ব্যথাবিকম্পন
সুর তব মোর প্রতিধ্বনি।

অতিক্রমি যেতে চাও মোরে
যেতে চাও বাধা কেন দিব
ওতপ্রোত প্রতি পরমাণু
আমার ছায়াতে তব কায়া।

ঝাউবনে কান পেতে শুনি
অপগত দিনের মর্ম্মর
পদধ্বনি আনমনা তব
অবিস্মৃতা অবিস্মরণীয়া।

নির্ম্মোক

"বনফুল"

১

অতি প্রত্যূষে দাঁতন-হস্তে বদিবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

—ডাক্তার বাবু, আপনি একটা ভারি অ-রাজনৈতিক কাজ ক'রে ফেলেছেন।

—কি বলুন তো?

—শুনলাম মথুর মুখুজ্যেদের ক্লাবে গিয়ে আপনি মিশেছেন!

—মিশলেই বা।

বদিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ দাঁতন ঘষিলেন, তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আর কিছু নয়, চালে একটু ভুল হয়েছে! আমাদের সমস্ত জীবনটাই তো একটা দাবাখেলা, চালে ভুল হ'লেই মাৎ হয়ে যেতে হবে! ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি—

বিমল ব্যাপার সমস্ত খুলিয়া বলিল এবং উপসংহারে বলিল—অমর আমার অনেক দিনের বন্ধু, তার অনুরোধ এড়ানো একটু শক্ত, কিন্তু বন্ধুত্বের জন্যে এ-কাজ আমি করি নি, আমি করেছি হাসপাতালের জন্যে। থিয়েটার থেকে শ-দুই আড়াই হ'তে পারে! হাসপাতালে একেবারে ওষুধ নেই যে, আমি আমার নিজের মাইনে দিয়ে ওষুধ কিনে চালাচ্ছি—সবই তো জানেন আপনি!

বদিবাবু এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, এই বার ফতুয়ার পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া বিমলের হস্তে দিয়া বলিলেন—এই নিন।

বিমল সবিস্ময়ে দেখিল পাঁচ শত টাকার একখানি চেক!

—এ কোথা পেলেন?

বদিবাবু কিছু না বলিয়া স্মিতহাস্যে দাঁতন ঘষিতে লাগিলেন।

—আজই ওষুধের অর্ডার দিয়ে দিন।

—টাকাটা পেলেন কি ক'রে?

—বিমল চাটুজ্যের পক্ষে যদি এক মাসের মাইনেটা দিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, বদি চাটুজ্যের পক্ষে পাঁচ-শ টাকা জোগাড় করা কিছু অসম্ভব নয়!

বিমল হাসিতে লাগিল

বদিবাবু বলিলেন—ওটা খুব দামী চাল দিয়েছিলেন আপনি একটা, ভেরি গুড স্ট্রোক—কিচ্ছু বেগ পেতে হয় নি আমাকে, যার কাছে চেয়েছি সে-ই দিয়েছে—

—চাঁদা ক'রে তুললেন নাকি?

—ভিক্ষে! বামুনের ছেলের ভিক্ষে করতে তো লজ্জা নেই! তবে বেশী লোকের কাছে যেতে হয় নি। ওপারের সৌরীনবাবু, জমিরুদ্দিন, হীরালালবাবু, এ-পারের নন্দী-মশায় আর বদি চাটুজ্যে এক-শ টাকা ক'রে দিয়ে দিলাম প্রত্যেকে, মিটে গেল। আপনি একটা রসিদ দিয়ে দিন আমাকে, আর আজই ওষুধের অর্ডার দিয়ে দিন।

—নিশ্চয়ই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বদিবাবু বলিলেন—পাশের বাড়ীর টাইফয়েডটা কি আপনার চিকিৎসাতেই ছিল?

—ভূধরবাবুও দেখছিলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বদিবাবু বলিলেন—মর্ফিয়াটা খুব ডেন্‌জারাস্ ওষুধ নয়?

—আমাদের সব ওষুধই ডেন্‌জারাস্! কিন্তু কি করা যায় বলুন, সিরামটা পাওয়া গেল না, একটা কিছু তো করতে হবে, তাছাড়া মর্ফিয়া তো এর ওষুধই।

বদিবাবু কিছু বলিলেন না, গম্ভীরভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিলেন। ভাবটা যেন আমি তর্ক করিতে চাহি না, কিন্তু মর্ফিয়াটা না দিলেই যেন ভাল করিতেন!

—ওরা কান্নাকাটি করছে না, সব চুপচাপ যে?

—ভোরের ট্রেনে সবাই দেশে চলে গেছে।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—ক'টা রুগী মরল আপনার হাতে ?

বিমল হাসিয়া উত্তর দিল—বেশী নয়, গোটা-তিনেক—

—সহস্রমারী হ'তে এখনও দেরি আছে তাহলে ! আচ্ছা, চলি এখন আমি ! ভাল কথা, ও ব্যাপারটার কি করবেন ঠিক করলেন ?

—কোন্ ব্যাপারটা

—থিয়েটারের ?

—থিয়েটার করতেই হবে।

—করতেই হবে ? না করলে কি হয় ?

—এখন পিছনো অসম্ভব।

—ওষুধের বখেড়া মিটে গেল, আবার ওসব কেন ! আপনাকে নিজেদের দলে টেনে রাখবার জন্যেই নন্দী টাকাটা দিয়েছে।

বিমল হাসিয়া বলিল—আমি তো আপনাদের দলেরই।

—তবু কি দরকার ওঁর মনে একটু ধোঁকা ধরিয়ে দেবার ?

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

বদিবাবু বলিলেন—তাহলে বলি গে নন্দীকে যে থিয়েটার আর আপনি করতে যাবেন না, কি বলেন ?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—মাপ করুন আমাকে, অমরকে কথা দিয়ে ফেলেছি ; বিমল চাটুজ্যের কথার আজ পর্য্যন্ত কখনও নড়চড় হয় নি।

বদিবাবু কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—এ চালটা মন্দ দিলেন না তো, অল রাইট—

মৃদু হাসিয়া বদিবাবু চলিয়া গেলেন।

একটু পরে এক পেয়ালা চা পান করিয়া বিমল বাহির হইল। একটু দূরে গিয়াই নজরে পড়িল পাড়ার রমেশ মোক্তার ও প্রতাপ ডাক্তার তাঁহাদের সনাতন চৌকিটিতে বসিয়া প্রাত্যহিক নিয়ম অনুযায়ী তর্ক জুড়িয়া দিয়াছেন। উভয়েই অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ রমেশবাবুও আর মোক্তারি করেন না, প্রতাপবাবুও আর ডাক্তারি করেন না। প্র্যাকটিসের চূড়ান্ত করিয়া প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে উভয়েই এক দিন একযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া প্র্যাকটিস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—এইরূপ জনশ্রুতি। উভয়েই প্র্যাকটিস-জীবনে সত্য-মিথ্যা, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বিচার করিয়া অকারণ সময় নষ্ট করেন নাই—অবহিতচিত্তে উপার্জ্জনই করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য ব্যাঙ্কে উভয়েরই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ লাখের কোঠায়। চরিত্র দুইটি কিন্তু অদ্ভুত। ইঁহাদের যে বিদ্যাবুদ্ধি অথবা অর্থ আছে তাহা আপাত দৃষ্টিতে বোঝা অসম্ভব। আধ-ময়লা কাপড় পরিয়া নগ্নগাত্র বৃদ্ধ দুটি সকাল-সন্ধ্যা বসিয়া অতিশয় উষ্মাভরে অতিশয় বাজে বিষয়ে প্রতিদিন কেবল তর্ক করেন। প্রতাপবাবু গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার, পাকা গোঁফ-দাড়ি আছে ; রমেশবাবু ঠিক উল্টা, কুচকুচে কালো, বেঁটে এবং মাকুন্দ। গলার স্বরও দুই জনের দুই রকম। প্রতাপবাবুর উদারায় এবং রমেশবাবুর তারায় বাঁধা। তর্কের পদ্ধতি এবং বিষয় বিচিত্র। অথচ দুই জনে পরম বন্ধু।

প্রতাপবাবু হয়ত তাঁহার বাজখাই গলায় বলিলেন—পটলের দরটা কমছে ক্রমশ, কাল দশ পয়সা হয়েছিল।

মিহি অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রমেশবাবু তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিলেন—বাজে কথা, কাল তিন আনা দর ছিল।

—বিশু কি তাহলে মিছে কথা বললে বলতে চাও, বিশু, বিশু—

ভৃত্য বিশু আসিয়া দাঁড়াইল।

—কাল পটলের সের কত ক'রে ছিল ?

—আজ্ঞে দশ পয়সা।

—শুনলে তো, আচ্ছা যা। বিশু চলিয়া গেল।

রমেশবাবু বলিলেন—বাজে কথা, বিশ্বাস করি না। হয়ত পচা বা ছোট জিনিস এনেছে।

—বিশু, বিশু—

বিশু পুনরায় আসিল।

—কাল যা পটল এনেছিস নিয়ে আয় তো।

বিশু পটল লইয়া আসিল, দেখা গেল পটল ভালই।

রমেশবাবু তখন অন্য পথ ধরিলেন। বলিলেন—বিপিনের কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। তোমার বিশু হয়ত অন্য জিনিষে দু-পয়সা মেরেছে, পটলের বেলায় মিথ্যে করে শস্তা দেখিয়ে ভালমানুষ সাজছে! আমার বিপিন—

—তোমার বিপিনটি একটি চোর, ওই ডোবাবে তোমায়।

অতঃপর তর্কের বিষয় আর পটল রহিল না, বিপিন চোর, না বিশু চোর ইহাতে পর্য্যবসিত হইল। তাহার পর ক্রমশঃ সাধুতা কি, অসাধুতা কি, তাহার পর রামায়ণ-মহাভারতের উদাহরণ, ক্রমশঃ বেদ-বেদান্ত—এই ভাবেই রোজ চলে। রোজই একটা তুচ্ছ বিষয় হইতে সুরু হইয়া বিষয়ান্তরে উপনীত হয় এবং ক্রমশ তুমুল হইতে তুমুলতর হইতে থাকে। রমেশবাবু এবং প্রতাপবাবু বাল্যবন্ধু, শৈশবে একসঙ্গে খেলা করিয়াছেন, পাঠশালায় একসঙ্গে পড়িয়াছেন, একসঙ্গেই এক জন ডাক্তারি এবং এক জন মোক্তারি পাস করিয়াছেন, একসঙ্গে একদা গঙ্গাস্নান করিয়া প্র্যাকটিস ত্যাগ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে প্রত্যহ একসঙ্গে বসিয়া তর্ক করেন। কাহারও সঙ্গে কাহারও মতের বিন্দুমাত্র মিল নাই, তথাপি কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া এক দণ্ড থাকিতে পারেন না। ঐ পুরাতন কাঠের চৌকিটিতে উপবেশন করিয়া একটা-না-একটা কিছু লইয়া উভয়ে দিনের পর দিন কলহ করিয়া চলিয়াছেন। লোকে ইহাদের নাম দিয়াছে 'মাণিকজোড়'।

বিমলের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে ইহাদের মৌখিক আলাপ মাত্র হইয়াছে, তাহার বেশী কিছু নয়।

আজ সহসা প্রতাপবাবু বিমলকে ডাকিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু রমেশের বগলের এই ফোড়াটা দেখুন তো পেকেছে কি না?

রমেশবাবু তীব্র প্রতিবাদ করিলেন—কি মুশকিল, আমার ফোড়া আমি বুঝতে পারছি না, বলছি পাকে নি।

—আহা, ডাক্তারবাবুকে দেখতেই দাও না।

—দেখুন, বেশী টিপবেন না যেন।

বিমল দেখিয়া বলিল—প্রায় পেকেছে।

প্রতাপবাবু বলিলেন—ওই দেখ।

রমেশবাবু বলিলেন—প্রায় পেকেছে, আর পেকেছে, এক কথা নয়, দেখব আবার কি?

—আমি বলছি তুমি তোকমারি দাও।

—তোকমারি দেওয়ার অবস্থা এখনও হয় নি, পুঁই পাতায় গরম ঘি লাগিয়ে আরও দু-এক দিন বেঁধে রাখতে হবে।

বিমল বলিল—কেটে দিলেই চুকে যায়।

রমেশবাবু বলিলেন—আপনি সরে যান তো মশায়।

বিমল একটু হাসিয়া পরেশ-দার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। বেশ আছে এই বৃদ্ধ দুইটি। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ হইতে সংসার চলে এবং সময় কাটাইবার জন্য তর্ক আছে, নাইবা থাকিল সে তর্কের মাথামুণ্ড, সময় ত কাটে!

পোস্টাপিসে যাইবা মাত্র পরেশ-দা বলিলেন—এই নাও মণিমালার চিঠি!

পরেশ-দা পুনরায় বলিলেন—খুব যদি উত্তেজিত না হয়ে ওঠ তাহলে ঐ কোণের টুলটায় ব'সে পড়তে পার, হরেন ততক্ষণ চা করুক।

বিমল হাসিয়া বলিল—উত্তেজিত হলেই বা কি?

—টুলটা মজবুত নয়, তাছাড়া কাছেই কালির বোতলটা রয়েছে।

বিমল হাসিয়া টুলটিতে উপবেশন করিয়া পত্রখানি খুলিল।

> ...তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তুমি কিন্তু আমার চিঠির একটি কথারও উত্তর দাও নি, ভাল প্যাডও কেন নি। একটুও ভালবাস না তুমি আমায়। ওখানকার বাড়ীটা কেমন, কিছু লেখ নি, 'বাথরুম' আছে ত? গঙ্গার ঘাট থেকে কত দূর, পাড়াপড়শীরা কেমন লোক, সব লিখো এবার। তোমাদের সিভিল সার্জনের মেয়ে তরঙ্গিণী আমাদের সঙ্গে পড়ত, একসঙ্গেই পরীক্ষা দিলাম এবার। সে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী গেছে, এখন ঐখানেই থাকবে। আমি গেলে এবার তার সঙ্গে দেখা করব, কেমন? আমি কিন্তু এ মাসটা এখানে থাকতে চাই। এ ক'মাস তো পরীক্ষা পরীক্ষা করেই কেটেছে,

সিনেমা-টিনেমা কিছুই দেখা হয় নি। এবার তো কলকাতা থেকে নির্বাসন হবে, তার আগে একটু ফুর্তি ক'রে নেওয়া যাক। তুমি আসতে পারবে কি? এলে বেশ হ'ত। না যদি আসতে পার অন্তত গোটা-কুড়ি টাকা আমাকে পাঠিও, মা বাবার কাছে টাকা চাইতে লজ্জা করে। এত দিন ত ওঁরাই সব খরচ দিয়েছেন, বিয়ে হবার পরও কত টাকা দিয়েছেন, আর কিন্তু নেব না। টাকা তুমি নিশ্চয় পাঠিও। আমার মাকে চিঠি লেখ না কেন তুমি? আমার চিঠি পাওয়া মাত্র তাঁকে ভাল ক'রে একখানা চিঠি দেবে, নইলে তোমার চিঠি আমি চাই না। মা অবশ্য মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু মনে মনে দুঃখিত হন তা বুঝতে পারি। আমাকে খালি খালি চিঠি দাও অথচ আর কাউকে দাও না, এমন লজ্জা করে আমার, মাকে নিশ্চয় চিঠি দিও।

তোমার প্র্যাকটিস ওখানে একটু একটু বাড়ছে শুনে সুখী হলাম। কত টাকা জমালে? আমার কিন্তু একটা জিনিসের শখ আছে, তাবিজ এক জোড়া, সেটা বুড়ো হবার আগেই চাই। দেবে তো?

তোমার বন্ধু অমরবাবুর স্ত্রী বিনোদিনীকে চিনি আমি। লরেটোর মেয়ে, খুব সুন্দরী। ওদের তো "লভ্ ম্যারেজ"—মেয়েদের মধ্যে ওদের দু-জনকে নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। রাগ ক'রো না, কিন্তু তোমার বন্ধুটি লোক মোটেই ভাল নন। বেশী মিশো না তুমি ওঁর সঙ্গে। বিনোদিনী এসেছিল নাকি তোমার বাসায় এক দিন? বেশ চমৎকার দেখতে, নয়? আমার চেয়ে ঢের ভাল। কি কি গল্প করলে তার সঙ্গে লিখো। মেয়েটি লেখাপড়াতেও খুব ভাল। অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছে।

অনেক বাজে কথা লিখে কাগজ ভরালাম। এইবার উঠি, সন্ধ্যের 'শো'তে 'ওয়ে অব অল ফ্লেশ' দেখতে যাব। শুনেছি খুব ভাল হয়েছে নাকি বইখানা। পপি আমার টেবিলের নীচে ব'সে পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে। পপিকে মনে আছে ত? আমার সেই ছোট লোম-ওলা কুকুরটা এমন সুন্দর হয়েছে দেখতে আজকাল। আমি কিন্তু পপিকে নিয়ে যাব, ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না।...

পরেশ-দা বলিলেন—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে যে ভায়া।

বিমল চিঠিটা মুড়িয়া পকেটে রাখিল এবং গম্ভীরভাবে চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া একটা চুমুক দিল।

পরেশ-দা বলিলেন—কি হে অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন, দুঃসংবাদ নাকি কিছু?

—না।

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিমল চা পান করিতে লাগিল। যোগেন বসিয়া চিঠি 'সর্ট' করিতেছিল, সে বিমলের হাতে আর একখানি চিঠি দিল। এখানি একটি পোস্টকার্ড। পিতৃবন্ধু নিবারণবাবু লিখিয়াছেন, "তোমার পৈত্রিক জমির খাজনা প্রায় চল্লিশ টাকা বাকী পড়িয়াছে। টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া খাজনাটা শোধ করিয়া দিও। ভাল ভাল জমি, বাকী খাজনার দায়ে যেন নিলাম না হইয়া যায়।" মণিমালার জন্য অবিলম্বে কুড়ি টাকার এবং অনতিবিলম্বে বাজুর বন্দোবস্ত করিতে হইবে, জমির খাজনার জন্যও চল্লিশ টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুইটি চিঠিরই মর্ম—টাকা চাই। বিমল উঠিয়া পড়িল।

পরেশ-দা বলিলেন—এর মধ্যেই উঠছ যে?

—বাঃ, হাসপাতাল যেতে হবে না, সাতটা তো বাজে।

—হাসপাতালে ওষুধের কিছু হ'ল?

—এই যে।

বিমল পাঁচ শত টাকার চেকটা পরেশ-দা'কে দেখাইল। সমস্ত শুনিয়া উল্লসিত পরেশ-দা বলিলেন—বলেছিলাম তো তোমাকে আগেই, বদ্যিবাবু ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। থিয়েটার আর করছ না তাহ'লে?

বিমল একটু হাসিয়া বলিল—করছি। বদ্যিবাবুকে বলেছি সব।

—তার মানে?

—পরে বলব, আপনি কাজ করুন।

—না, না ব'লে যাও ভাই—পরেশ-দা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। অগত্যা বিমলকে সংক্ষেপে সব কথা বলিতে হইল। সমস্ত শুনিয়া পরেশ-দা বলিলেন—নন্দী কিন্তু চটবে।

—দেখা যাক।

বিমল হাসপাতালে পৌঁছিয়া দেখিল, একমুখ হাসি লইয়া সেই বুড়ী বসিয়া আছে। ইনজেকশন লইয়া তাহার

মাথাধরা সারিয়া গিয়াছে। শরীরের সমস্ত বিষ বাহির হইয়া গিয়াছে—উঃ কি ভীষণ নীল বিষ!

১০

ইলেকট্রিসিটির উপকারিতা সম্বন্ধে ভাল একটি প্রবন্ধ বিমলকে লিখিয়া দিতেই হইল—নন্দী-মহাশয়কে তুষ্ট করিবার আর কোন উপায় সে ভাবিয়া পাইল না। নন্দী-মহাশয় খানিকটা তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু মথুরবাবুর দলকে কিছুতেই বাগাইতে পারিলেন না। শহরে ইলেকট্রিসিটি আনিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট টাকা কর্জ্জ লওয়া হউক—এ প্রস্তাব কিছুতেই পাস হইল না। এই দরিদ্র দেশের পক্ষে ইলেকট্রিসিটি বর্ত্তমান অবস্থায় যে কিরূপ ব্যয়সাপেক্ষ তাহা মথুরবাবু প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন—এদেশে ভগবানের কৃপায় এখনও আলোক অথবা বাতাসের অভাব হয় নাই, এদেশে এখন অভাব অন্নের, শিক্ষার, চিকিৎসার। এদেশের প্রতি ঘরে ঘরে ক্ষুধিত পীড়িত অশিক্ষিত অসহায় লোক যে-অন্ধকারে বাস করিতেছে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়া সে অন্ধকার বিদূরিত হইবে না। ইলেকট্রিসিটি আসিলে বিলাসপরায়ণ দুই-দশ জন ধনীর হয়ত সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই ইহা অসুবিধা ও অশান্তির কারণ হইবে। দরিদ্র জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করিয়া বর্ত্তমানে ইলেকট্রিসিটি আনিবার প্রস্তাব সুতরাং অন্যায় এবং হাস্যকর।

নন্দী ভোটে হারিয়া গেলেন। তিনি আরও ক্লিষ্ট হইলেন যখন তিনি শুনিলেন যে মথুরবাবু নিজব্যয়ে তাঁহার নিজের বাড়ীতে 'ডাইনামো' বসাইতেছেন। নন্দী-মহাশয়ও যে নিজব্যয়ে বাড়ীতে একটা ডাইনামো বসাইতে পারেন না তাহা নয়, কিন্তু এখন বসাইতে গেলে সকলে বলিবে যে তিনি মথুরবাবুর নকল করিতেছেন। প্রাণ থাকিতে তিনি এ অপবাদ সহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি যেমন করিয়াই হউক মিউনিসিপালিটির সাহায্যেই শহরে ইলেকট্রিসিটি আনাইবেন। নিজে বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া একা বৈদ্যুতিক আলো-হাওয়া ভোগ করিব এবং বাকী সকলে দারিদ্র্য-নিবন্ধন কষ্ট পাইবে, মথুরবাবুর মত এত বড় স্বার্থপর নন্দী-মহাশয় নহেন। মুখে না বলিলেও বিমলের উপর নন্দী-মহাশয় মনে মনে একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতে-ছিলেন। নূতন ডাক্তারবাবুটি রোজই নাকি ওপারে গিয়া থিয়েটারের মহড়া দিতেছেন! বদিবাবু তাঁহার চাটুজ্যে-প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া এই লোকটিকে আনিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইতেছে সে খাল কাটিয়া কুমীরই বোধ হয় আনা হইয়াছে। আসিতে-না-আসিতে ছোকরা সোজা গিয়া মথুরবাবুর দলে ভিড়িয়া পড়িল! লোকটি এদিকে কথায়-বার্ত্তায় দেখিতে-শুনিতে ভালই, চিকিৎসাও মন্দ করে না, হাসপাতালের কাজকর্ম্মের সুখ্যাতি সকলেই করিতেছে, রোগীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে—কিন্তু ছোকরা যদি বিভীষণ হয় তাহা হইলে ত বড় মুশকিলের কথা। মথুর মুখুজ্যেদের সঙ্গে এতটা মাখামাখি মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। বিমলের প্রতি নন্দী-মহাশয়ের মনোভাব ক্রমশই হয়ত আরও বিরূপ হইয়া উঠিত, কিন্তু দুইটি কারণে তাহা আর হইল না। মিউনিসিপালিটির ও হাসপাতাল-কমিটির মেম্বার হরেন বোসের উপর নন্দী-মহাশয় চটা। লোকটা কনট্রাকটারি করিয়া হঠাৎ বড়লোক হইয়াছে এবং হঠাৎ বড়লোক হইলে যাহা হয় হরেন বোসের ঠিক তাহাই হইয়াছে। আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইলে আঙুল এবং কলাগাছ উভয়েরই মর্য্যাদা নষ্ট হয়। গরিবের ছেলে স্বল্প-শিক্ষিত হরেন বোস টাকার জোরে হঠাৎ সবজান্তা হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি আর্ট, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য সমস্তই তিনি বুঝিতেছেন এবং সব বিষয়েই অসঙ্কোচে মোসাহেব-মহলে মতামত ব্যক্ত করিতেছেন। যে-বস্তুটি থাকিলে মানুষের সঙ্কোচ হয়, সে-বস্তুটি তাঁহার নাই। তাঁহার অভিমত শিক্ষিত-সমাজে হয়ত গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু শিক্ষিত সমাজকেই কি তিনি গ্রাহ্য করেন? তিনি যাঁহাদের এবং যাঁহারা তাঁহাকে গ্রাহ্য করেন, সেই সমাজে বাহবা পাইলেই যথেষ্ট। বাহবা পানও। লোকচরিত্র সম্বন্ধেও তাঁহার বিচার দ্বিধা-বিহীন। নন্দী-মহাশয় ভণ্ড, বদিবাবু চতুর, মথুরবাবু ঘুঘু, ডাক্তারটা চালিয়াৎ

পোস্টমাস্টার খোসামুদে, জগদীশবাবু অর্থপিশাচ, ভূধরবাবু তুখোড়—সকলের সম্বন্ধেই হরেনবাবুর অভিমত পাকা। তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে তিনি সকলেরই আদি-অন্ত নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছেন। একটি মাত্র লোককে তিনি একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তিনি চৌধুরী-মহাশয়। কনট্র্যাকটারির জন্য মাঝে মাঝে টাকার দরকার হইয়া পড়ে এবং ঐ চৌধুরীই তাঁহাকে সে সময় সাহায্য করেন। অনেক সময় সুদও গ্রহণ করেন না, বিনা হ্যাণ্ডনোটেও দুই-এক বার টাকা দিয়াছেন। এ বাজারে এ রকম লোক বিরল—ইহাই হরেন বোসের ধারণা। হরেন বোসের সহিত বৈকুণ্ঠ চৌধুরীর সুতরাং বন্ধুত্ব আছে এবং এই দুই জনকে কেন্দ্র করিয়া একটি নাতিক্ষুদ্র দলও মিউনিসিপালিটিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দলটি নন্দী-মহাশয় অথবা মথুরবাবুর দলের সহিত একমত নহে, যখন যে-দলে ভোট দিলে নিজেদের সুবিধা হইবে সেই দলেই ইহারা সাধারণতঃ যোগদান করেন। কখনও নন্দী-মহাশয়ের দলে, কখনও মথুরবাবুর দলে, যেখানে যখন সুবিধা। ভোটের লোভে নন্দী-মহাশয় এবং মথুরবাবু উভয়েই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও তাই এ দলটিকে প্রশ্রয় দেন। যুদ্ধে ভোটই যেখানে প্রধান অস্ত্র, সেখানে এতগুলি ভোটের আনুকূল্য পাওয়া কম কথা নহে। বোস-চৌধুরীর দলে কিন্তু কয়েক জন দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক আছেন, নানা ভাবে তাঁহারা নাকি সহজে প্রলুব্ধ হন। নন্দী-মহাশয়ের দলের প্রধান পাণ্ডা বদিবাবু সে খবরটি রাখেন এবং বেগতিক দেখিলে ঐ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক-গুলির দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের বল-বৃদ্ধি করেন। কি ভাবে তাঁহারা প্রলুব্ধ হন তাহা সকলেই জানে, অথচ কেহ কিছু বলে না। আমরাও তাহা ব্যক্ত করিয়া অকারণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে চাহি না। তবে এটা ঠিক কথা, এই দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকগুলি না-থাকিলে বিমলের এখানে আসা সম্ভবপর হইত না। এই বোস-চৌধুরী দলেরই কতকগুলি লোককে গোপনে ভাঙাইয়া বদিবাবু জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই ইলেকট্রিসিটি ব্যাপারেও বদিবাবু যদি আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিতেন কি হইত বলা যায় না, কিন্তু বদিবাবুর নিজেরই ইহাতে অমত ছিল। ভোট দিবার বেলায় যদিও তিনি নন্দী-মহাশয়ের দিকে ভোট দিয়াছিলেন, কিন্তু বোস-চৌধুরীর দল ভাঙাইবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি যে এ কার্য্য করিতে পারেন তাহা এক তিনি এবং ঐ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক কয়টি ছাড়া আর কেহ জানে না। এই লোকগুলি যদিও বোস-চৌধুরী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট কিন্তু নিজেদের তাঁহারা কোন দলের সহিত একীভূত করিতে চান না, নিজেদের তাঁহারা স্বাধীনচেতা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বোস-চৌধুরীর দলই অধিকাংশ সময়ে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দেন বলিয়া সাধারণতঃ এই দলে যোগদান করেন। স্বাধীনচিত্ততার ব্যতিক্রম দেখিলে অন্য দলে যাইতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। মিউনিসি-পালিটির দলাদলির ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। হরেন বোস এবং তাঁহার দল ইলেকট্রিক স্কীমের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন, তাহার কারণ হরেন বোস নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে, এই ইলেকট্রিক কনট্র্যাক্ট তিনি পাইবেন না, পাইবেন রমেন নন্দী, নন্দী-মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই অকর্ম্মণ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে কোন একটা রোজগারের পন্থায় চালু করিয়া দিবার জন্য নন্দী-মহাশয় বহু কাল হইতে সচেষ্ট আছেন। এ কার্য্যে তাঁহাকে আর যে-ই সহায়তা করুক, হরেন বোস করিবেন না তাহা ঠিক।

নন্দী সুতরাং হরেন বোসের উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি অত্যন্ত খুশী হইলেন যখন সেই হরেন বোসই বিমলবাবু ডাক্তারের নামে এই অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হইলেন যে অতি সামান্য দোষে এই ছোকরা ডাক্তারটি হাসপাতালের এত কালের পুরাতন পাচক শিবু ঠাকুর এবং পুরাতন ভৃত্য ভৈরবকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ভৃত্য ভৈরবের জন্য যতটা না হউক, শিবু ঠাকুরের পদচ্যুতিতে হরেন বোসের মর্ম্মাহত হইবার সঙ্গত কারণ আছে বইকি। কারণটি প্রকাশ করিয়া বলিবার মত নহে; কিন্তু শহরের কে না এ কথা জানে! সেই শিবু ঠাকুরের চাকরি গিয়াছে, বিমলবাবু তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে—নন্দী-মহাশয় মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং বিমলের প্রতি তাঁহার অপ্রসন্নতা সহসা যেন খানিকটা কমিয়া গেল। মুখে অবশ্য তিনি হরেনবাবুকে বলিলেন

—তাই নাকি, ছেলেমানুষ কি না, মাথা একটুতেই গরম হয়ে যায়, আচ্ছা আমি বলব ওঁকে। বসুন বসুন—ওরে! ডাব নিয়ে আয়।

হরেনবাবু কিন্তু বসিলেন না, চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই বদিবাবু আসিলেন। তিনি কোর্টে যাইবার বেশে সজ্জিত ছিলেন, আসিয়াই বলিলেন—দেখুন, আমাদের মিটিঙের দিনটা পেছিয়ে দিন, বাজেট-মিটিং, ওটাতে আমার থাকা দরকার—

—আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

—আমি আজ বেরিয়ে যাচ্ছি, থার্ডের আগে ফিরতে পারব না। সদরে দুটো কেসও আছে, তাছাড়া ঐ অঞ্চলে আমার কিছু জমি আছে তা নিয়ে কি সব গোলমাল হয়েছে প্রজাদের সঙ্গে, সেটা মিটিয়ে ফেলতে চাই!

নন্দী-মহাশয় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বাজেট-মিটিঙে বদিবাবু না থাকিলে তিনি একেবারে নিঃসহায়, অথচ মিটিঙের তারিখও বদলানো অসম্ভব, নোটিশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। শেষ মুহূর্ত্তে বদিবাবু এমন সব কাণ্ড করিয়া বসেন!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ও ঠোঁটের উপর তর্জ্জনীটি স্থাপন করিয়া বদিবাবু কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

—তারিখ বদলানো অসম্ভব, তাহলে?

—কি ক'রে হয় বলুন?

—আচ্ছা বেশ, যাতে সেদিন 'কোরাম' না হয় সে ব্যবস্থা আমি ক'রে যাচ্ছি। আপনি চেয়ারম্যান, আপনি না গেলে ভাল দেখায় না, কিন্তু কেবল আপনি যাবেন আমাদের দলের আর কেউ যাবে না। ওপারের সতীশ, জমিরুদ্দিন, হীরালাল ওদেরও মানা ক'রে যাচ্ছি, কেউ আসবে না।

—মথুরবাবুর দলটি তো আসবে?

—ওদেরও দু চার জনকে আটকাবার ব্যবস্থা করছি। ঠিক হয়েছে, মথুরবাবুর দলের জন-চারেক থিয়েটার নিয়ে মেতেছে, আমাদের ডাক্তারও তো আছে ওর ভেতর, ওকেই টিপে দিয়ে যাই রিহার্শাল-ফিয়ার্শাল কোন একটা ছুতোয় আটকে রাখবে এখন ওদের সেদিন সন্ধ্যেবেলায়! ডাক্তার ওদের মধ্যে গিয়ে বেশ জমিয়েছে শুনছি—

নন্দী-মহাশয় ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেটা কিন্তু আমি খুব সুসংবাদ ব'লে মনে করি না।

বদিবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন, চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া পড়িলেন—মনে করেন না মানে?

—মথুরবাবুদের সঙ্গে অত ঢলাঢলি ভাল লাগে না মশাই!

বদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না, ডাক্তার ওখানে গিয়ে এক হিসেবে আমাদের কত সুবিধে হচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না? আমি তো এ যোগাযোগটাকে খুব ভাল ব'লে মনে করি, বিমলবাবু ব'লেই পেরেছেন।

—কি রকম বলুন তো?

—বিপক্ষের শিবিরে নিজেদের একটা স্পাই থাকা মন্দ কি? নন্দী মহাশয় জিনিসটাকে এভাবে একবারও ভাবেন নাই। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নন্দী-মহাশয় রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন—তাহলে কি বলতে চান—

ঘাড় নাড়িয়া বদিবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, ওই। কথাটা কাউকে বলি নি, আপনিও যেন ঘুণাক্ষরে কাউকে বলবেন না, পাঁচ কান হ'লে আবার—! বিমলবাবুকেও বলবেন না যেন—

—না না, পাগল!

—আচ্ছা এবার উঠি তাহলে আমি।

বদিবাবু চলিয়া গেলেন। সামান্য একটি ক্ষুদ্র মিথ্যার প্রভাবে নন্দী-মহাশয়ের মন নির্মেঘ হইয়া গেল, বিমলের উপর তাঁহার যে অপ্রসন্নতাটুকু ছিল তাহা আর রহিল না। বরং তিনি ভাবিতে লাগিলেন—অতিশয় চতুর ছোকরা তো। থিয়েটারের ওজুহাতে বেশ সুড়ঙ্গ কাটিয়া ঢুকিয়াছে! অনির্ব্বচনীয় স্নেহরসে নন্দী-মহাশয়ের চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল।

ইহার প্রায় সপ্তাহখানেক পরে আকস্মিকভাবে একটা ঘটনা ঘটিল। বৈকালে বিমল হাসপাতালে কাজ করিতেছিল। গত রাত্রে ভারি সুন্দর একটা রোগী আসিয়াছিল, তাহারই রক্তের স্লাইডগুলি বিমল আর

এক বার দেখিতেছিল। কাল রাত্রে স্টেশন-মাস্টার মহাশয় এই সাঁওতাল রোগীটিকে পাঠাইয়াছিলেন। লোকটা থার্ডক্লাস একটা গাড়ীতে অজ্ঞান অবস্থায় রক্ত-মাখামাখি হইয়া পড়িয়া ছিল। গাড়ীতে আর কেহ ছিল না। নিশ্চয়ই কেহ ইহাকে খুন করিয়া গিয়াছে, সকলেরই এই ধারণা হইয়াছিল। বিমলও প্রথমে তাহাই ভাবিয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহার গায়ে কোন অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই, রক্ত পড়িয়াছে নাক হইতে। সমস্ত গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। রাত্রেই রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল—ম্যালেরিয়া। সহজ ম্যালেরিয়া নয়, ম্যালিগন্যান্ট্ ম্যালেরিয়া, সাংঘাতিক জিনিস। রাত্রেই সে একটি কুইনাইন ইনজেকশন দিয়া গিয়াছিল, আজ সকালে রোগী উঠিয়া বসিয়াছে। বলিতেছে যে গাড়ীতেই তাহার খুব কম্প দিয়া জ্বর আসে এবং জ্বরের ঘোরে সে অজ্ঞান হইয়া যায়, তাহার পর কি হইয়াছে সে জানে না। সম্ভবতঃ জ্বরের ঘোরে সে বেঞ্চি হইতে পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার ফলেই রক্তপাত ঘটিয়াছে। বিমল উত্তর দিকের বারান্দায় বসিয়া রক্তের স্লাইডগুলি আর এক বার দেখিতেছিল, এমন সময় গুপিবাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু, সিভিল সার্জন আসছেন—

বিমল সিভিল সার্জনকে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই।

উঠিয়া আসিয়া দেখিল খাকি হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরা একটি বাঙালী সাহেব একটি চামড়া দিয়া বাঁধানো সরু বেত আস্ফালন করিতে করিতে জগদীশবাবুর সহিত এই দিকেই আসিতেছেন—তাঁহার গোঁফ দুই দিকে কামানো, কিন্তু পাকা, কানের পাশের চুলেও পাক ধরিয়াছে, চোখে মুখেও বার্দ্ধক্যের সুস্পষ্ট ছাপ, কিন্তু চলনে-বলনে বেশ একটা চটুলতা আছে। বার্দ্ধক্যটাকে অস্বীকার করিয়া একটু যেন বেশী জোরে হাঁটিতেছেন, বেশী জোরে হাসিতেছেন, বেতের সরু ছড়িটাকে একটু বেশী জোরে ঘুরাইতেছেন। বিমল নমস্কার করিতেই জগদীশবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন—ইনিই আমাদের নূতন ডাক্তার, আর ইনি আপনাদের সিভিল সার্জন।

সিভিল সার্জন রিস্টওয়াচটার দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—চলুন আপনার হাসপাতাল দেখি।

ইনডোরে ঢুকিয়া বলিলেন—ইনডোর তো আপনার ভর্ত্তি দেখছি, ছাট্‌স্ গুড্—

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুই-একটা টিকিট দেখিলেন।

—অধিকাংশই কালাজ্বর দেখছি, এ-সব রক্ত পরীক্ষা আপনি নিজেই করেন নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নিজেরই মাইক্রসকোপ আছে।

—ছ্যাট্‌স্ গুড্।

—ম্যালেরিয়া এ-অঞ্চলে কেমন পান? খুব, নয়?

—কালই তো একটা পেয়েছি।

বিমল সাঁওতাল রোগীটির ইতিহাস বলিল এবং স্লাইড দেখাইল, দেখিয়া শুনিয়া সিভিল সার্জন খুশী না হইয়া পারিলেন না। তাঁহার খুশী ভাবটা লক্ষ্য করিয়া জগদীশবাবু বলিলেন—যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন উনি হাসপাতালের জন্যে, আমরা ওঁকে ওষুধ দিতে পারছি না এই হয়েছে এক মুশকিল।

সিভিল সার্জন বলিলেন—এতগুলো কালাজ্বর কেসের ইনজেকশন কোথায় পাচ্ছেন?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিমল বলিল—নিজের পয়সা দিয়ে কিনে দিচ্ছি, কি আর করব! বদিবাবু কিছু টাকা চাঁদা ক'রে তুলে দিয়েছেন, ওষুধ আনতে দিয়েছি কিছু—

সিভিল সার্জন ও জগদীশবাবুর একটা দৃষ্টিবিনিময় হইল।

সিভিল সার্জন বলিলেন—ভেরি গুড্, চলুন আপনার আউটডোর রেজিস্টারটা দেখি।

রেজিস্টারে দেখা গেল রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান।

সিভিল সার্জন তাহার পর বাহির হইতেই এক বার সার্জিকাল আলমারিটাতে উঁকি দিলেন।

—ছুরি-কাঁচিগুলোতে ঠিকমত ভ্যাসিলিন দেওয়া হয় তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ছ্যাট্‌স্ গুড। রবার টিউবগুলো অমন ক'রে না রেখে কেরোসিন ডেপারে রেখে দেবেন। একটি টিনের বাক্স করিয়ে নেবেন, তার মাঝে একটা ফুটোফুটোওলা পার্টিশন থাকবে—নীচে খানিকটা কেরোসিন তেল রেখে দেবেন

আর উপরে ঐ টিউবগুলো। আচ্ছা, কোকেন কতটা আছে দেখি—

কোকেন দেখা ও ওজন করা হইল—ঠিকই আছে।

সিভিল সার্জন গুপিবাবুকে একটা ধমক দিলেন—তোমার নিক্তি এত ময়লা কেন, আজই পরিষ্কার করবে।

—যে আজ্ঞে।

সিভিল সার্জন বাহির হইয়া আসিয়া বিমলকে প্রশ্ন করিলেন—আপনার ইনডোরে কি একটা ফিমেল কেস সম্প্রতি মারা গেছে?

—হ্যাঁ, নিমোনিয়া হয়েছিল।

—হার্টটা ফেল করল শেষকালে বুঝি?

—হ্যাঁ, ভয়ও পেয়েছিল হঠাৎ।

বিমল ভিখারীর ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক বলিল।

সিভিল সার্জন জগদীশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তাহলে বেনামী চিঠিতে যা লিখেছে তা একেবারে মিছে কথা নয়। ওরকম ভিকিরি-টিকিরিকে আর আশ্রয় দেবেন না, আর হাসপাতালে নার্স যখন নেই, তখন রুগীর শুশ্রূষা করবার মত আত্মীয়স্বজন না থাকলে ভর্ত্তিও করবেন না। অনর্থক বদনাম হয়। আপনার নামে এক বেনামী চিঠি গিয়ে হাজির এক দিন আমার কাছে, আচ্ছা আপনার ভিজিটার্স বুকটা বার করুন।

বিমলের কথায়-বার্ত্তায় কার্য্যে সিভিল সার্জন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—বেনামী চিঠি সত্ত্বেও বিমলের প্রশংসাসূচক মন্তব্যই করিলেন। তাহার পর হাত-ঘড়িটা আর এক বার দেখিয়া বলিলেন—জগদীশ চল তোমার কেসটা এবার দেখা যাক্। জগদীশ কেমন যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলিলেন—চল।

উভয়ে চলিয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রে গুপিবাবুর বাসায় বসিয়া হরেন বোস সাগ্রহে সিভিল সার্জনের আগমন-বৃত্তান্ত শুনিলেন, কিন্তু খুব খুশী হইলেন না। বেনামী চিঠি লিখিয়া লোকটাকে জব্দ করা গেল না তো! ক্রমশঃ

কুহেলি-নীলায়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কুহেলি-নীলায় মনে পড়ে দূর
তুষার-দেশের কাহিনী,
ভেসে আসে কোন্ সুদূর জীবন
বাহিয়া স্মিরিতি-বাহিনী।
ধূপছায়া-মাখা ভাঙা জ্যোছনায়
অস্ফুট আলোর স্বপন-মায়ায়
ছায়াছবিসম ভেসে ওঠে ছবি,
ভেসে আসে বন-রাগিণী।

চোখে জাগে কোন্ কল্পলোকের
কুহেলিকাময়ী জ্যোছনা,
কোন্ মায়াবিনী ধূপছায়া রঙে
করিছে স্বপন-রচনা?
কে ছড়ায় আজি স্মিরিতির ফুল,
ছায়া-সুষমায় স্বপনের ভুল?
শীতের সন্ধ্যা নীলকেশে তার,
স্বপন-মুগ্ধলোচনা।

উদ্বোধন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রভাতের উদ্বোধন শান্তিতে, এই শান্তিতে সমস্ত দিনব্যাপী কর্মের ভূমিকা। বিশ্বসৃষ্টিযজ্ঞে যে অগ্নি জ্বলছে তারায় তারায়, তাকে আপন আপন মর্যাদায় নিযুক্ত করেছে অক্ষুণ্ণ শান্তি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি। এই অক্ষরের প্রশাসনে হে গার্গি নিমেষ মুহূর্ত অহোরাত্র অর্ধমাস মাস ঋতু বৎসর বিধৃত হয়ে রয়েছে, নিমেষে নিমেষে কালের তরঙ্গিত গতি নিরন্তর সৃজন প্রলয়ের আবর্তনপর্যায় বিস্তার করছে, কিন্তু বিরাট সমগ্রতায় সে স্থির, বৃহৎ শান্তিতে সে বিধৃত। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তই অনিঃশেষ প্রাণের কেন্দ্র হ'তে নিঃসৃত হয়ে অবিশ্রান্ত প্রাণেই স্পন্দিত হচ্ছে। আকাশে আকাশে কম্পমান অণুপরমাণুসংঘ নিয়ে প্রাণের সৃষ্টি-বিকাশী গতি সমগ্রের বিরুদ্ধে কোথাও উদ্দাম নয়, সে অতিপ্রবল শান্তিতে সংযত। মহাবিশ্বের আধার এই যে শান্তি মানুষের জীবনে এই শান্তিতেই তার আত্মসৃষ্টি তার কর্মসৃষ্টির ধ্রুব প্রতিষ্ঠা। সংসারে আঘাতের পর আঘাত আসে ক্ষতির পর ক্ষতি, পরাভব তখনি হয় যখন শান্তিরক্ষা করতে পারি নে, তখনি জানব ভাঙন এল, কেননা অশান্তি প্রলয়ের বাহন। সংসারে যারা সৃষ্টি করতে অক্ষম সেই সকল নৈতিক পঙ্গুদের লক্ষণ ঔদ্ধত্য, চাঞ্চল্য, উদ্বেগ, ক্ষমার কার্পণ্য, বলপূর্বক আপন প্রভাব প্রকট করবার জন্য অন্যায়পরতা। এই লক্ষণগুলি সৃষ্টিতত্ত্বের বিরুদ্ধ প্রমাণ, এরা নিরন্তর অশান্তি আলোড়িত করতে করতে চরম আত্মঘাতে নিয়ে যায়। এরা রিপু, এদের হাত দিয়ে সাংঘাতিক শান্তি আরম্ভ হয় শান্তিকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে। যুদ্ধের আঘাতে জর্জর য়ুরোপ আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে বাইরে শান্তির উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, ভুলে যাচ্ছে শান্তি অলুব্ধতায়, শান্তি ক্ষমায়, শান্তি দাক্ষিণ্যে, ন্যায়পরতায়, শান্তির উৎস চারিত্রে।

আমাদের এই উৎসবে আমরা শান্তির উদ্বোধন করি। এ কথা যেন মনে রাখি, আত্মসৃষ্টির কার্য আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে প্রতিনিয়ত। মানুষ বিধাতার অসমাপ্ত সৃষ্টি, এই সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করবার ভার মানুষের নিজের হাতে। মানুষের মহত্ত্ব তার আপনার গড়া, মানববিশ্বের সে স্রষ্টা সে বিধাতা। এই সৃষ্টিকার্যের জন্যে প্রত্যহ চাই তার জীবনের নির্মল আকাশে শান্তির উদ্বোধন। তার ধ্যানে আসুক শান্তি, তার কর্মে বিরাজ করুক শান্তি, তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অবিচলিত থাক্ বীরোচিত শান্তি। দুঃখদহনের মধ্যে তার চরিত্র নীহারিকার মধ্যবর্তী নির্নিমেষ নক্ষত্রের মতো শান্তি দীপ্তি বিকীর্ণ করুক। মনে এই মন্ত্র নিঃশব্দে বাজতে থাক শান্তম্ শিবম্।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তি রোষধয়ঃ শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেবঃ শান্তিঃ।

৭ই পৌষ, ১৩৪৬

[শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসবের উদ্বোধন।]

অন্তর্দেবতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুঃখের প্লাবন বইল আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। ইতিহাসের কত স্থায়ী চিহ্ন দিল ভাসিয়ে, সভ্যতার কত পুরাতন সীমানা দিচ্ছে লোপ করে, প্রচ্ছন্ন বর্বরতার আবরণ বিদীর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে তার নগ্ন বীভৎস মূর্তি। স্পর্ধিত হয়ে প্রকাশ পেল তার বিনাশমত্ততার নির্লজ্জ ব্যাজ সমস্ত মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে। মানুষের পীড়িত চিত্ত হ'তে প্রশ্ন উঠছে এমন হয় কেন। ক্রুদ্ধ স্বরে বলছে, বিশ্ববিধানে এই দারুণ অত্যুৎপাতের মধ্যে কল্যাণস্বরূপকে স্বীকার করি কেমন করে।

সংশয়ীদের আমি এই কথা বলি যে, বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে কল্যাণের তত্ত্ব না থাকবে যদি তবে দুঃসহ বেদনার আর্তরবে যুগাবসানের প্রলয়ভেরী বাজে কেন। প্রাণের মধ্যে স্বাস্থ্যের স্বারাজ্য সত্য ব'লেই কি অস্বাস্থ্যের আক্রমণে দুঃখ দেয় না। দুঃখই তো অস্বীকৃতি, স্বাস্থ্যই সত্য ব'লে দেহ তাকে একান্ত স্বীকার ক'রে নেয়; তার জন্যে লড়াই করে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। অস্বাস্থ্য যদি দুঃখ না দিত তাহলেই নিন্দা করতুম প্রাণশক্তিকে প্রবঞ্চক ব'লে।

চারদিকে আজ লড়াই জেগে উঠেছে। কে জাগালে সেই লড়াইকে। বিশ্বের অপমানিত কল্যাণশক্তি। এই অপমান্ বহুকাল ধ'রে সঞ্চিত হয়ে উঠছিল দূর-প্রসারিত প্রতাপের আশ্রয়ে, স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত ঐশ্বর্যের অন্তরালে। রিপুর থেকে রিপুকে জাগাল, লোভের থেকে ঈর্ষ্যাকে। লুঠের মালে ভাণ্ডার যার ভরে উঠেছে সে ততো ভদ্রাণি পশ্যতি, সে বলতে লাগল এতেই তো কল্যাণ, ততঃ সপত্নান্ জয়তি, প্রতিপক্ষদের সে দলিত ক'রে রাখলে, বললে, ঈশ্বর আছেন আমাদেরই দলে, আমাদেরই লুঠের মাল আগলিয়ে; তারপরে সমূলস্তু বিনশ্যতি, বিনাশের ধাক্কা লাগতে থাকল মূলের দিকে। তারপর থেকে আর আরাম নেই, সমস্ত জাতির কলেবর জুড়ে কেবলি সৈন্য জমতে থাকে, অস্ত্র বাড়তে থাকে, মারণের উপকরণ স্ফীত হয়ে ওঠে রক্তবর্ণ বিস্ফোটকের মতো, পরস্পর সন্দেহ এবং দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না; এই সন্দেহ-কলুষিত মন থেকে কণ্টকিত হয়ে উঠতে থাকে পীড়নের কুৎসিত কৌশল, পেষণের কপট চক্রান্ত এবং ভণ্ড ভদ্রতার আত্মগোপন; রাষ্ট্রনীতির মধ্যে প্রবেশ করে অসত্য এবং শাসননীতির মধ্যে অত্যাচার। যুদ্ধ যদিবা থামে অশান্তি থামে না, আগামী ভূমিকম্পের ঘর্ঘর শব্দ ইতিহাসের নিম্নস্তরে দিনরাত্রি ব্যাপ্ত হ'তে থাকে। মানুষের পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের সহজ পথ আজ উত্তরোত্তর দুর্গম ক'রে তোলা হচ্ছে, এবং মানব-সমাজে এই কাঁটার বেড়া দেওয়া অনাতিথ্যের অনাত্মীয়তা যে ক্রমশ প্রবর্ধমান অসভ্যতার প্রমাণরূপে কুশ্রী হয়ে উঠল, অসংকোচে সে কথা মানুষ ভুলে যাচ্ছে। বেদনাহীন এই ভোলাই সব চেয়ে বড়ো দুর্লভ। এই সব মৃত্যু-ভারবাহক দুর্লক্ষণ আর যে গোপন থাকছে না তার কারণই এই যে, ইতিহাসের প্রহরীশালায় কল্যাণধর্মের দণ্ডনীতি উদ্যত। যেমন শরীরে তেমনি সমাজে আত্মরক্ষার একটি সাধনা আছে। সেই আত্মরক্ষা মনুষ্যত্ব রক্ষা, তার সতর্ক উপায় মানুষের নিজেরই শ্রেয়ঃ শক্তিতে। তার কোনো ত্রুটি ঘটলেই মানুষ দুঃখ পেয়েছে এবং সেই দুঃখের প্রান্তে দেখা দিয়েছে মৃত্যু। এই দুঃখ যদি না দেখতুম তাহলে সন্দেহ করতুম বিশ্ববিধানের প্রতি। পৃথিবীতে অনেক জাতি মরেছে, হয় দুর্বলতার অপরাধে, নয় বলদৃপ্ত প্রবলতার পাপে। মৃত্যুসভায় আজও কে কোনো জাতের হিসাব তলব হয় নি তা এখনি বলা যায় না। বর্তমানের সমস্ত সাক্ষ্যের প্রতিকূলেও এমন দারুণ কথা দৃঢ়বিশ্বাসে বলতে পারি কেননা ইতিহাসের রাজকক্ষে ধর্ম জাগ্রত আছেন, বজ্রমুদ্যতং।

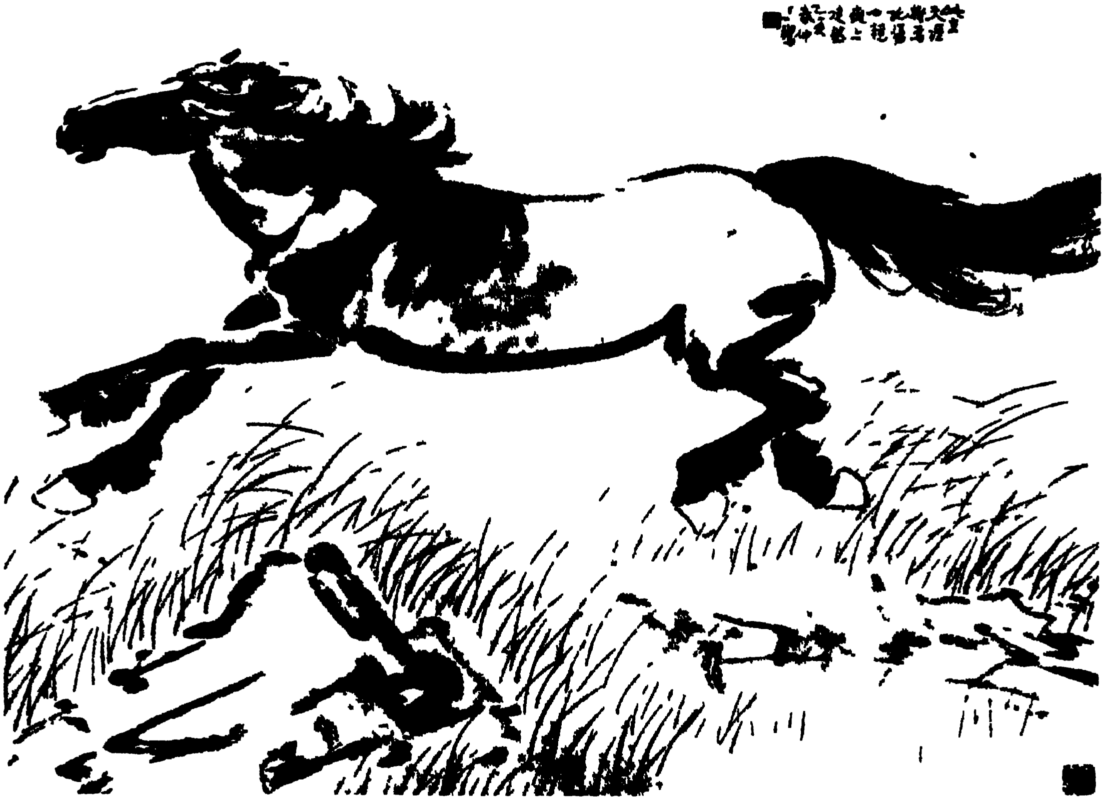


উষার প্রতীক্ষায়

"শান্তিনিকেতনে শিল্পী জু পেয়"
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য
পৃ. ৫৫৩



হ্রদের পাড়



চীনে উচ্চৈঃশ্রবা



জলের সন্ধানে মহিষ

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কল্যাণস্বরূপ বিধাতাকে প্রশ্রয়-লোলুপ শিশুর মতো দয়াময় ব'লে খর্ব করে নি। বলেছে রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং। বলেছে, তিনি রুদ্র, সেই রুদ্রের যে দাক্ষিণ্য, সে বাঁচায় যেখানে আছে সত্য, আছে বীর্য, আছে পবিত্রতা, আছে আপন মানবমহিমায় দৃঢ় বিশ্বাস। সে রুদ্র বলহীনকে ক্ষমা করেন না।

মানুষের সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা, অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তীর্ণ হবার প্রার্থনা। এ দুর্বলের প্রার্থনা নয়, এ মানুষের সব শেষের সার্থকতা, অতি কঠিন সাধনায় সিদ্ধি। এ প্রার্থনায় আছে রুদ্রের প্রবর্তনা মানুষের অন্তর থেকে। এ সহজ নয়। সত্যের পথ দুর্গম পথ।

আমি বিস্মিত হই, লজ্জিত হই, যখন আমাদের সাহিত্যে কখনো কখনো দেখি দুর্বলের অভিমান, সানুনাসিক ক্রোধে বিধাতাকে শাস্তি দেবার হাস্যকর ভঙ্গীতে বলা যে তুমি নেই, কেননা আমি দুঃখ পেয়েছি এবং দেখেছি অন্যকে দুঃখ পেতে। ভুলে যাই আমাদের মন্ত্রে আছে—বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, সেই বরণীয় দেবতার তেজকে ধ্যান করি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করছেন। মন্ত্রগুরু কিন্তু বলেন নি যিনি কোলে ক'রে অক্ষমকে লালন করছেন। যখনি বলা হয়েছে তিনি আমাদের বুদ্ধি পাঠিয়েছেন তখনি বলা হয়েছে আমাদের নির্ভর আমাদের নিজেরই 'পরে। ঐখানে নির্মম শাসনের নিষেধ আছে কাঁদতে যেতে তাঁর দরজায়। এখানে তিনি নিজেকে সরিয়ে রেখে দেন। তিনি সদাশঙ্ক মাতার মতো নিজেকে সর্বদা প্রত্যক্ষ করেন নি ব'লেই আমি তাঁকে প্রণাম করি। তিনি আমার মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধার যোগ্য ক'রে পাঠিয়েছেন, আমাকেই দায়িত্বের গৌরব দিয়েছেন, দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে নেন নি। কাপুরুষকে তিনি হাতে ধরে চালিয়ে বেড়ান না, এমন কি, মৃত্যুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাকে নির্ভয়ে বাঁচবার সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়েছেন। তাই সংসারে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায় যে যারা স্বয়ং ঈশ্বরকেই আপন বিশ্বাসের বাইরে রাখে অথচ যথার্থ সত্যভাবে আপন বুদ্ধির সাধনা করে তারাই যথার্থ আস্তিকতার ফল পেয়েছে। অর্থাৎ তারাই সকল বিষয়ে চরিতার্থ হয়েছে সংসারে, রোগতাপ অজ্ঞতা অপটুতার জন্যে তারা হত্যে দিতে যায় নি দেবতার দ্বারে, মানত করে নি, তারা মেনেছে বুদ্ধিরূপে সেই দেবতাকে যে দেবতা সরস্বতী নয় গণেশ নয়, যে দেবতা মানুষের মনের মধ্যে আত্মশক্তিরূপে তাকে ধন্য করেছে, তাকে বড়ো করেছে, তাকে নিয়ে চলেছে অমৃতের পথে। ক্যান্‌সার রোগের এখনো তারা প্রতিকার খুঁজে পেল না; কিন্তু তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে আপন গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বুদ্ধিশক্তিকে অশ্রদ্ধা করে নি, বলছে, ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, বুদ্ধিরূপে আমার মধ্যে যাঁর আবির্ভাব বুদ্ধিযোগে তাঁরই ধ্যান ক'রে এক দিন আমি আরোগ্যের পথ খুঁজে পাব। কিন্তু ওদিকে কেমন শিশুর মতো কান্না ও কী স্পর্ধা ক'রে বলা আমি মানব না! কে বলেছে তাঁকে মানতে। তুমি না মানার দ্বারা তাঁকে খর্ব করবে! বিশেষ নামে রূপে তাঁকে যে মানে নি তাকে তো তিনি কোনো শাস্তি দেন না। কিন্তু শাস্তি দেন তাকেই যে আপন বুদ্ধিকে না মেনে তাঁর সত্য সন্ধানকে ব্যর্থ করেছে।

এটা কি ভেবে দেখো নি পশুপক্ষী অযাচিত ভাবে পেয়েছে আপন গায়ের কাপড়। মানুষের নগ্নতায় বিধাতা দিয়েছেন পশুপাখির চেয়ে বড়ো সম্মান, কেননা সেই সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা নিজের সঙ্গে তার যোগ সাধন করেছেন ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। কাপড়ের অভাবে যখন দুঃখ পাই তখন এই কথাই কি স্মরণ করবার নয়। এত দুঃখ অন্য কোনো জীবজন্তু পায় না, কেননা প্রত্যেক দুঃখের মধ্যে আমাদের প্রতি ডাক পাড়েন ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। এই ডাক এক জনের প্রতি নয়, সমস্ত জাতির প্রতি। যারা সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে পুরুৎ পাণ্ডার দোহাই পাড়তে ছোটে, তারা নিজের ভিতরকার দেবতাকে লাঞ্ছিত করে বাইরে মরে ব্যর্থ হয়ে পদে পদে।

কিন্তু যে ধী আমাদের অন্তরে আসছে সে কেবল জ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত নয়, তার আর এক রূপ আছে, সে তার শ্রেয়োরূপ, যাকে বলে শুভবুদ্ধি। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া

সংযুনক্তু, তিনি শুভবুদ্ধির দ্বারা আমাদের সঙ্গে এক হয়ে মিলুন। যেমন জ্ঞানগত বুদ্ধি পশুস্বভাবের মূঢ়তায় খর্ব হ'লে প্রাণধারণের নানা প্রকার দৈন্য মানুষকে দুর্ভাগা করে তেমনি পশুস্বভাবে কর্তব্যবুদ্ধির বিকার ঘটালে মানবসমাজকে আঘাত ক'রে অন্তরে বাহিরে সর্বনাশ সাধন করতে থাকে। এখানে রিপুর প্রবর্তনায় আমাদের সেই দেবতাকেই আমরা তিরস্কৃত করি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, তখন আসে মহতী বিনষ্টির দিন। সেই বিনষ্টির অশুভ লক্ষণ আজ দিকে দিগন্তরে দেখা দিয়েছে। যারা ইতিহাসের সদ্যোবিচারের বিতর্কে বিরুদ্ধপক্ষকে দোষ দিয়ে নিজেকেই সাধু ব'লে ঘোষণা করতে চায় তাদের নিজের জবানীর ওকালতিতে তারা যে নিষ্কৃতি পাবে সে সম্ভাবনা নেই। কেননা এ বিচারশালায় দয়খাস্তের নৈপুণ্যে দয়া জাগবে না, প্রশ্রয় নামবে না; এখানে আছেন মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্। যারা প্রলোভনের পথে সিদ্ধিলাভ ক'রে নিজের মদোন্মত্ত অহমিকার পিছনে ফেলে অনাদর করেছে আপন দেবতাকে, তারা অনেক দিন থেকে মনে করেছে বিজ্ঞান তাদের সহায়, উপকরণে তারা সুরক্ষিত, অন্যায়কে উপায় ব'লে অনুসরণ করবার অধিকার তাদের আছে, কিন্তু তারা কালে কালে নিজের ভিতরকার সেই দেবতার প্রেরণা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, তাদের নিজের ভিতরকার দেবতা ক্রমশই আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। বহু দিনের অন্যায়ের ভার নিয়েও ধর্মমন্দিরে যাওয়া চলে এবং প্রার্থনামন্ত্রও মুখে না বাধতে পারে কিন্তু নিজের অন্তরের মধ্যে দেবতার সম্মুখে যেখানে রিপুর যবনিকা পড়ে গেছে সেইখানে প্রবেশপথ দুর্গম হয়ে ওঠে, অবশেষে অন্ধতার নেপথ্যে বিনাশের আঘাত লাগতে থাকে ইতিহাসের মূলে। প্রথমে ধীরে ধীরে অবশেষে এক দিন অকস্মাৎ দুর্দান্ত বেগে।

আমাদের দেশে যাঁরা দুর্বল ক্রোধে নালিশ করতে বসেছেন যে কোনো ঈশ্বর এসে নিজের হাতে তাঁদের দুঃখের অশ্রুজল কেন মুছে দেন নি, তাঁদেরকে উপনিষদের একটি বাণী স্মরণ করাব।

অথ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে, অন্যোঽসৌঽহম্ অন্যো অস্মীতি ন স বেদ, যথা পশুরেব স দেবানাম্।

যে মানুষ উপাসনা করে অন্য দেবতাকে, তিনি অন্য, আমি অন্য যে এমন কথা ভাবে সে তো দেবতাদের পশুর মতোই। মানুষের হয়ে এত বড়ো কথা আর কোন দেশের ধর্মশাস্ত্রে বলতে সাহস করে নি, অথচ আমাদের দেশে পদে পদে এ কথার যেমন অকুণ্ঠিত প্রতিবাদ এমন আর কোনো দেশে দেখা যায় না।

মানুষ আরম্ভ করেছিল আপন জীবন পশুর মতোই অভাবে, অজ্ঞানে, নিরন্তর আশঙ্কায়। সেইটেই যদি সত্য হ'ত তবে আজ পর্যন্ত সেই দশাই হ'ত নিত্য। কিন্তু তার থেকে মানুষকে বার ক'রে আনলে কে। সে কি বাইরে থেকে কোনো বিশেষ নামধারী কোনো দেবতা? পশু-বলির রক্তে তৃপ্ত কোনো অমানুষ সত্তা মানুষকে বর দিয়েছে কি? স্তবমন্ত্রের বদলে কোনো দেবতার কাছ থেকে মানুষ কি পেয়েছে কোনো পুরস্কার? না, মানুষ দেবতার পশু নয়। যে দেবতা মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানুষকে দিয়েছেন সম্মান, মানুষের জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমাজে সভ্যতায় ক্রমশ হয়েছে তাঁরই সমুজ্জ্বল আবির্ভাব। সে সামান্য দুঃখে হয় নি। প্রাণপাত ক'রে আদিম পশুকে শাসন করেছেন যে বীর তিনিই মানুষের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত করেছেন আপন দেবতাকে। সেই আবিষ্কার আজো চলেছে নির্ভীক নির্নিদ্র সাধকপরম্পরায়। যেখানে আমরা অকৃতকার্য, যেখানে আমাদের পরাভব সেখানে আমরা দুঃখ পাবই, প্রশ্রয় পাব না; সেখানে আমাদের দেবতা উপেক্ষিত হয়েছেন, সেখানে যেন আমরা নির্লজ্জের মতো 'অভিমান না করি, দয়ার দাবী না রাখি, বৃথা আস্ফালনে না বলি তুমি নেই। যদি নেই তো সে কার দোষে? কোন্ দুর্বল কোন্ ভীরু তাঁকে আপন জড়ত্বের অন্তরালে রাহুগ্রস্ত করেছে? অবশেষে বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছে গুরুর পায়ে ধরে, পুরুৎকে ঘুষ দিয়ে, কাঁসর-ঘণ্টার কর্কশ শব্দে বধির ক'রে দিয়ে আত্মশক্তিকে। তাই বলি, বৃহদারণ্যকের এই বাণী কখনো যেন না ভুলি যে, "অথ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে, অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি ন স বেদ, যথা পশুরেব স দেবানাম্।" এই কথা মনে

রাখতে হবে যে, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি, মানুষ আপন আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করবার অধিকার পেয়েছে, অতি সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে আরম্ভ ক'রে অতি সূক্ষ্ম মানবচিত্তের রহস্য পর্যন্ত। এ কথা মনে রাখতে হবে "তং হি দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্" আত্মবুদ্ধিতে সেই দেবতার প্রকাশ, এবং আত্মবুদ্ধি দ্বারাই তাঁকে জানতে হবে। উপনিষদের এই কথাটি নিত্য মনে রাখবার— "যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদু স্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্," যাঁরা মানুষে ভূমাকে জানেন তাঁরা জানেন পরমদেবতাকে।• "তং বেদ্যং পুরুষম্ বেদ," আপন আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে আড়ালে রেখে বাইরে ঈশ্বর নেই ব'লে কেউ যেন দৃপ্ত স্পর্ধায় আস্ফালন ক'রে আত্মাবমান না ঘটায়।

মানুষের সংসারযাত্রায় নানা আকারে দুঃখের অভিঘাত যে আসে সেটা বড়ো ক'রে গণ্য করবার নয়; সে আসে হয় কোনো প্রাকৃতিক কারণে, নয় কোনো মানসিক নীতি অনুসারে, দুইই বাহ্য। কিন্তু কত বার দেখা গেল কঠোর শৌর্যের সঙ্গে মানুষ দুঃখকে জয় করছে, অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। সে কোন্ মহাশক্তির সাধনায়? সে শক্তি প্রাকৃতিক নয়, মানসিক নয়, সে আত্মিক। সেখানেই মানুষ আপন দেবতার সঙ্গে যুক্ত। আপনার মধ্যে যখন সেই মহত্ত্বের উপলব্ধি করে তখন সে কোনো ত্যাগে ক্লেশে দীনাত্মার মতো শোক করে না। যদা পশ্যতি অন্যম্ ঈশম্ অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ। ঈশের মহিমা, আত্মকর্তৃত্বের স্বপ্রকাশ মহিমা যে দেখেছে নিজের মধ্যে, তার ভয় কিসের, তার শোক কিসের, সংকটে পড়লে সে কার কাছে কিংবা কার নামে নালিশ করতে যাবে। ঈশের এই মহিমা যারা আত্মার মধ্যে দেখেছে তারাই অকাতরে এবং আনন্দে প্রাণপণ ক'রে, আপনার সমস্ত কিছুকে উৎসর্গ ক'রে মানুষের ইতিহাসকে উত্তীর্ণ করে দেয় সাধারণ জীবধর্মের কার্পণ্য থেকে অমরাবতীতে। তাদের যদি কোনো নালিশের কারণ ঘটে সে তাদের নিজের নামে, তার বেদনা অতি তীব্র। এই সকল বীরেদের যে কখনো পরাজয় ঘটে না তা নয়, কিন্তু সেই পরাজয়ের ঊর্ধ্বে জয়ধ্বজা তৎসত্ত্বেও অবিচলিত থাকে। আমরা ধন্য, মানুষ ধন্য, বাহির থেকে কোনো দেবতা আমাদের চালনা করছেন ব'লে নয়, আমাদেরই অন্তরের দেবতা দুঃখের পর দুঃখের ভিতর দিয়ে আমাদের সম্মানিত করছেন ব'লে। ধন্য মানুষ ধন্য, সে দেবতার পশু নয়, সে দেবতার একাত্ম।

সুষারথি রশ্বানিব যন্ মনুষ্যান্ নেনীয়তে
অভিশুভি র্বাজিন ইব,
হৃৎপ্রতিষ্ঠং যৎ অজিরং জবিষ্ঠং
তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু।

নিপুণ সারথি বল্গা দ্বারা বেগবান অশ্বকে বশীভূত রাখে, তেমনি যা প্রাণীকে কর্মে চালনা করে, যা অজর, বেগবান, হৃদয়স্থিত, সেই আমার মন শুভসংকল্পযুক্ত হোক।

যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যৎ জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু, যস্মান্নঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু।

যা প্রজাদের মধ্যে প্রজ্ঞা চেতনা এবং ধৃতি যা আভ্যন্তরিক অমৃত জ্যোতি, যাকে না হ'লে কোনো কর্ম হয় না সেই আমার মন শুভসংকল্পযুক্ত হোক।

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

আমার ভার লাঘব করি'
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

নম্র শিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে',
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যে-দিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি দাও মোরে সেই কান॥
ভুলব না আর সহজেতে
সেই প্রাণে মোন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ॥
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান্॥

৭ই পৌষ, ১৩৪৬

[শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসবে আচার্য্যের উপদেশ]

সন্তান

শ্রীসুশীল জানা

ভুলো মুঠো মুঠো ধুলো উড়োচ্ছে আকাশের দিকে।

নন্দ ধমক দিয়ে বললে ছেলেকে—এই, চোখে এসে পড়লে কানা হয়ে যাবি যে! ফের ধুলো ঘাঁটে। যাচ্ছি—এই উঠলাম—

কিন্তু নন্দ ব'সে ব'সে স্তিমিত চোখে নির্লিপ্তভাবে তামাক টানতে লাগল। মাঠের পাশে বসে সে আর শ্রীনাথ বুড়ো জিরোচ্ছে, সুমুখে হাল-গরু দাঁড়িয়ে। কঙ্কালসার গরুগুলোর পাঁজরায় খাঁজে খাঁজে ঘামের ধারা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কেউ কেউ ধান বুনে গিয়েছে মাঠে—পাখীদের ভিড় সেখানে, ঠোঁট দুটো সব ফাঁক হয়ে আছে কড়া রোদে। বহু দূরে দূরে খাপছাড়া ভাবে কৃষকপল্লী আর গাছের স্তূপীকৃত ঘন ছায়া—আলোকোজ্জ্বল প্রকাণ্ড আকাশ আর ধূ ধূ মাঠের পাশে কেমন যেন অপ্রয়োজনের নিঃসঙ্গতায় ঝিমিয়ে আছে। বহু দূরে দিগন্তের বনরেখার উপর দিয়ে মেঘের দল ভেসে ভেসে যাচ্ছে উত্তর দিকে।

নন্দ সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। বললে—ক-দিন থেকে আজ মেঘ দেখছি কিন্তু জল তো হচ্ছে না খুড়ো।

আকাশের দিকে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে শ্রীনাথ বললে—ঐ মেঘগুলো ঘুরলেই জল হবে।

—ও আর ঘুরেছে। নন্দ মাঠের দিকে তাকালে। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। পায়ের নীচের কাটলটা পা দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বললে—মা বসুমতী কেমন হাঁ করে আছে দেখ খুড়ো—রাক্ষুসী এবার সব খাবে আমাদের—সব—

তার পর প্রচুর হাসি নন্দর—সম্ভবত নিজের মৌলিক রসিকতায়। তার পর কাশি আর কাশি, তার পর এক ঝলক রক্ত।

মুখ মুছে নন্দ বললে—কাশির জ্বালায় গেলাম খুড়ো—আজ ক-দিন আবার রক্ত উঠতে সুরু করেছে, বৌ তো সেদিন রক্ত দেখে ভয়ে কেঁদে-কেটে সে এক কাণ্ড—নন্দ হাসলে।

কিন্তু শ্রীনাথের কর্কশ কণ্ঠ গাম্ভীর্য্যে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল। বললে—ভয়ের কথা বইকি নন্দ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—এমন কতদিন হয়েছে তোর? ডাক্তারের কাছে যা এক বার।

নন্দ ভয় পেলে শ্রীনাথের কথায়। শ্রীনাথের বাপ মরেছিল ঐ রকম কাশিতে আর রক্ত বমিতে। শ্রীনাথ বললে সব।

ভয়ে ভয়ে এক দিন নন্দ ডাক্তারের কাছে গেল—আর ফিরে এসে গুম হয়ে ব'সল দাওয়ায়। মাঠের দিকে তাকাল নন্দ: সব কেমন ঝাপসা, ধোঁয়াটে। চোখ তুললেই গ্রাম প্রান্তের সেই যে ফুলভরা কৃষ্ণচূড়ার গাছটি স্পষ্ট দেখা যেত কিন্তু আজ এই কড়া রোদেও সেখানে যেন কুয়াসা নেমেছে। ভয়ে ভয়ে চোখ মুছে তাকাল নন্দ—কিন্তু সেই আগের মত। চোখ ঘষে আবার সে তাকাল আরও ব্যাকুল দৃষ্টিতে হতাশ ভাবে দূরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে: কতদূর দেখতে পেত সে দাওয়ায় বসে বসে কিন্তু কবে থেকে পলে পলে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে তার। এক দিন হয়ত ঐ ঘরের সুমুখের মাঠের ধানগাছগুলিও দেখতে পাবে না। তার পর এক দিন এই ঘর, বারুণী, ভুলো—সব অন্ধকারে মিশে যাবে। ডাক্তার তাই তাকে অত সাবধানে থাকতে বললে—শ্রীনাথের কথাগুলো মনে পড়ল। সাপের মত নিস্পন্দ অভিব্যক্তিশূন্য জলজলে দৃষ্টিতে নন্দ ঝাপসা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বারুণী রান্নাঘর থেকে এক বালতি জল এনে হড় হড় ক'রে নন্দর মাথায় ঢেলে দিয়ে হাসিতে উছলে উঠল আর পেছনে ধাবমান নন্দকে আশা ক'রে ছুটে পালাল।

নন্দ কিন্তু ব'সেই রইল। হাত দিয়ে জল মুছতে মুছতে বরং একটু বিরক্ত হয়েই বললে কি যে করিস বৌ ছেলেমানুষের মত—

ক্লান্তিকর বার্দ্ধক্যে নন্দর কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেল।

বারুণী আবার হাসিতে ঝলমল ক'রে উঠল, বললে—, কি করি বল। জল হ'ল না মাঠে আগুন ধরে গেল ব'লে ভাবনায় যার নাওয়া-খাওয়ারও হুঁশ নেই, মাথা গরম হয়ে গেল—তার মাথায় একটু জল ঢেলে দেব না! উনুনমুখো আকাশের মত নই আমি গো। আমি বলে কত লক্ষ্মী বৌ—সবাই বলে—

ছোট মেয়ের পাকা কথার মত মাথা নেড়ে নেড়ে বললে বারুণী—শুনতে বিশ্রী লাগল নন্দর। কিন্তু বিরক্তিকর কিছু একটা বলার আগেই কাশতে লাগল নন্দ—তার পর সেই চিরপরিচিত রক্ত। কড়া রোদে ডাক্তারের কাছে অনেকখানি হেঁটে গিয়েছে সে আর ফিরে এসেছে। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠল সর্ব্বাঙ্গের শিরা-উপশিরার স্পন্দন ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে এল—নন্দ চোখ বুজল। নিরবলম্বভাবে মাথাটাকে একপাশে লুটিয়ে পড়তে দিলে। একটা চরম চেতনাহীন অবস্থার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। এর মাঝে তাড়াতাড়ি ভয়ত্রস্ত বুকটা এগিয়ে এল বারুণীর আর তার নিবিড় দুটো নিটোল হাতও। অনন্ত অননুভূত নূতন আবিষ্কৃত একটা কোমলতার স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গের মুমূর্ষু অনুভূতি দিয়ে মুখ গুঁজে উপভোগ ক'রলে নন্দ: না, সে মরতে চায় না—এমন সুন্দর পৃথিবী—

বারুণী কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে—কেন তোমার এমন হয়। তোমার পায়ে পড়ি—ডাক্তারের কাছে যাও এক বার। কেন তুমি কষ্ট পাও—

ব্যাকুল বারুণী ঘন হয়ে আছে তার সর্ব্ব দেহে: ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। নন্দ সোজা উঠে বসল বারুণীর বেষ্টন দু-হাতে ঠেলে দিয়ে। ডাক্তারের কথা সে কিছুই বললে না: বারুণী তাহ'লে অস্থির ক'রে তুলবে চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু ওষুধের যে দাম চাইলে ডাক্তার—টাকা অত কোথায় পাবে সে? স্নান করতে চলল নন্দ হিসেব কষতে কষতে: বাকী খাজনার নীলাম আর ক্রোক এসেছিল দু সপ্তাহ আগে—আর সপ্তাহ দুই সময় আছে—সূর্য্যাস্তের নীলাম. টাকাটা কিছু কম আছে—যোগাড় ক'রে পাঠিয়ে দিতে হবে। খোরাকী ধান টানাটানি ক'রে চলবে আশ্বিন পর্য্যন্ত—ধান পাকার সময় পর্য্যন্ত নগদ মজুরী খেটে পেট চালাতে হবে—আবার তার শরীরের অবস্থা যে রকম তাতে মহাজনের কাছে হাত পাততে হবে হয়ত। তার উপরে আগামী বছরে যে ধান হবে তার থেকে কবে সেই পাঁচ বছর আগে এক

দুর্ব্বৎসরের কিছু ধার শোধ আছে—মহাজনের কাছ থেকে কবে যে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাবে তার নিশ্চয়তা নেই। অতএব নন্দ বুঝে দেখলে, চিকিৎসা এবং আনুষঙ্গিক ওষুধের দাম কোথাও পাচ্ছে না সে।

বুড়ো শ্রীনাথের বাপের মত দিনে দিনে তিলে তিলে মরতেই হবে তাকে। আমরণ সংসারের চাকা নানান দুর্ভাবনায় আরও কষ্টেসৃষ্টে ঠেলতে হবে তাকে। মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠল নন্দ,—না আর সে পারে না। অসুখ হয়েছে তার—আর সে পারে না। এখনও বারুণী, ভুলো তার দিকে তাকিয়ে আছে কেন! ডুবে মরলে কেমন হয়!

নন্দ ভাবলে, নন্দ ডুবল। কিন্তু এক সঙ্গে অনেক কিছু মনে পড়ে গেল তার ব্যক্তিগত দুঃখ ছাপিয়ে: বহু পরিচিত গ্রামের আনাচ-কানাচ, গ্রামের অনেক চেনা মুখ আর অনেক দিনের বারুণী, সে হয়ত ভাত বেড়ে ব'সে আছে—আর ভুলো ধূলিধূসর—খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত মাটিতেই, ভাঙা ভাঁড়, ছুটো ফুল-লতাপাতা, রং-চটা কাঠের পুতুলটা পড়ে আছে তার পাশে—

হাঁপিয়ে উঠে পড়ল নন্দ। জলের নীচের কল্পনার গ্রাম দিনের কড়া আলোয় বহুদূর থেকে বহুদূরে নিঃশব্দে পড়ে আছে, তাকিয়ে তাকিয়ে নন্দর চোখে জল এল। সব থাকবে শুধু তাকেই চলে যেতে হবে।

বুড়ো শ্রীনাথের ঘরে তৈরি কড়া তামাক আর তার সঙ্গে বহু দুর্ব্বৎসরের বহুবার শোনা ইতিহাসের প্রচণ্ড আকর্ষণ হঠাৎ কমে গেল আজ তার। ঘর ছেড়ে আজ আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হ'ল না নন্দর। ভারি একা মনে হ'ল তার। সকলের মাঝখানে ভারি একা সে—আর সবাই আনন্দে মেতে যেন তাকে অবহেলা করে।

সন্ধ্যে উৎরে গেল।

ভুলো ঘুমিয়ে পড়েছে মাটিতে, তার জন্যে বারুণীকে একটু বকে দিলে নন্দ। তার পর নিজেই ভুলোকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে চলল। বকুনি খেয়ে বারুণী পেছন থেকে উল্টে বিদ্রূপ করলে নন্দর এই হঠাৎ-উথলে-ওঠা দরদ নিয়ে।

বলুক বারুণী। পৃথিবীর তুচ্ছতম কাজটিও যেন নন্দের জন্যে আজ বাকী পড়ে আছে। সে আজ ঘন হয়ে মিশে যেতে চায় সকলের সঙ্গে—সকল কাজের অন্তরালে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল ডাক্তারের সাবধান-বাণী আর শ্রীনাথ বুড়োর সশব্দ ঘোলাটে চোখ: ঘুমন্ত ভুলোর মুখটা যে থুবড়ে আছে তার বিষাক্ত কীটদষ্ট বুকটার উপরে!

নন্দর বেষ্টন থেকে ধপ ক'রে ভুলো পড়ে গেল আর গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল।

বকতে বকতে বারুণী রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বললে, দিলে ছেলেটাকে আছড়ে তো? দেখ দিকিন এখন আমি ওকে থামাই, না রাঁধতে যাই! সব সময় এমন জ্বালাতন কর—তুমি বেরোও ঘর থেকে।

রাগে আর হাসিতে অপূর্ব্ব সুন্দর হয়ে উঠল বারুণী। নন্দ শুধু একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ভুলোকে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল বারুণী—নন্দ দরজার কাছে ব'সে তেমনি ক'রে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষে: বারুণী আড়চোখে যত বার দেখলে তত বারই। তার পর ঠোঁট চেপে হেসে অনাবৃত পিঠটা ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঢেকে দিলে বারুণী, নন্দ তবু তাকিয়ে আছে তার দিকে তবু। অসহায় বারুণীর সমস্ত আবরণ যেন তুচ্ছ হয়ে গেল। ভীরু একটা লজ্জা—স্বতঃ উৎসারিত কেমন একটা সুখানুভূতিতে চোখ বুজে মাথা নীচু ক'রে দুষ্টু ভুলোকে ধমকাতে গিয়ে তার মুখে মুখ চেপে ধরল বারুণী। তরল আদরে আর কোমলতায় কথাগুলি ওর স্পষ্ট হ'ল না—ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে—না, দস্যিপনা করে না। ওই তার কোলে গিয়ে লক্ষ্মী বাবুর মত ঘুমিয়ে পড় তখন তুলে খাওয়াব। কেমন?

কিন্তু ভুলোকে ঠেলে দিয়ে নন্দ চীৎকার ক'রে উঠল। যে গালাগালি দিলে নন্দ, বারুণীর তা অকারণ মনে হ'ল। তার পর আবার খাওয়ার সময় ভুলোকে নন্দর পাতে বসাতে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক খেলে বারুণী, কিন্তু নন্দর এই নূতন মেজাজের কোন কারণ খুঁজে পেলে না বারুণী। শুধু মলিন হয়ে গেল কোন অজ্ঞাত অপরাধের ভয়ে।

রাত্রির মত সমস্ত গৃহকাজ এক সময়ে শেষ হ'ল বারুণীর। নন্দ অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ভুলো শুয়েছে

উলটো দিকে মাথা ক'রে—তার নিজের বিছানা ছেড়ে এসে নন্দর গলার উপরে পা তুলে দিয়েছে—তাকে এক পাশে তার বিছানার দিকে সরিয়ে দিলে। নন্দর ক্লান্ত মস্ত মুখের দিকে তাকাল বারুণী, ভাবলে—কেন ও অকারণে আজ তাকে এত গালাগালি দিলে কি জানি। গুরু অভিমানের গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বারুণী আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

গায়ে গা লেগে ঘুম ভেঙে গেল নন্দর—সোজা উঠে বসল সে। কিছু বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে বারুণীও উঠে বসল সঙ্গে সঙ্গে। ডাক্তারের কথা মনে পড়ল তার: এদের কাছ থেকে দূরে থাকা, বিষবৎ পরিত্যাগ করা —সবই বললে নন্দ, আরও দুটো কটু গালাগালি জুড়ে দিলে আর অন্ধকারে 'দূর দূর' ক'রে ঠেলেও দিলে—শুধু ডাক্তারের কোন উল্লেখ ক'রলে না।

নির্বোধ রুদ্ধ কান্নার আবেগে কথাগুলি বারুণীর জড়িয়ে গেল। বললে—কেন, কি করেছি আমি, কি—

ঠেলা খেয়ে বারুণী যেন লুটিয়ে আরও ঘনিয়ে এল কোন অজ্ঞাত অপরাধের ভয়ে: নন্দ তাকে কোন দিনই যে এমন ক'রে দূরে ঠেলে দেয় নি। বারুণী ফোঁপাতে লাগল।

ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে আসা অবধি নন্দ নিজেকে পৃথিবীর এক প্রান্তে অসহায় ক'রে রেখেছিল, কিন্তু হঠাৎ বারুণীকে যেন আরও বেশী অসহায় মনে হ'ল তার ফোঁপানো কান্নায়। তখন ডাক্তারের কথা বললে নন্দ, বললে অনেক বিধি-নিষেধ আর শ্রীনাথ বুড়োর বাপের কথা, বিশ্রী ছোঁয়াচে রোগের কথা।

—ভারি খারাপ রোগ বৌ—এতে নাকি কেউ বাঁচে না। ভুলোকে দূরে দূরে রাখিস—আর তুইও রক্তটক্তগুলো আর ঘাঁটিস নে। আমি তো মরবই। তুই থাকলি—ভুলোকে মানুষ করবি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ বুজলে নন্দ আর অদূর ভবিষ্যতের ভুলো, বারুণী, এই ঘর, মস্ত পৃথিবী—তার বহু অপরিচিত অংশ যেন সে অন্য কোন গ্রহ থেকে প্রত্যক্ষ দেখতে লাগল। পৃথিবী যেমন চলছিল ঠিক তেমনি চলছে, কেবল নন্দ নেই—তবে তার জন্যে কোথাও কোন অভাবও নেই। তার পর এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল নন্দ—বারুণীর গা লেগে ঘুম তার আতঙ্কে আর এক বারও ভাঙল না। একেবারে ভোরে শ্রীনাথ বুড়োর ডাকাডাকিতে জেগে উঠল সে। পাশের নূতন বিছানায় বারুণী আর ভুলো তখনো ঘুমোচ্ছে।

শ্রীনাথ বললে—এক জন লোক অভাব হচ্ছে রে নন্দ—যেতে পারবি তুই? কেনেলের মাটি কাটা হচ্ছে। প্রসাদ কাল পর্য্যন্ত এসেছিল—আজ আর পারবে না বললে। ক-দিন জ্বরে ভুগেছেও ভারি।

—মানে! দিন তিনেক আগে যে তাকে দেখে এসেছিলাম—নড়বার শক্তি নেই, জ্বরে একেবারে কাহিল ক'রে দিয়েছে আর কাল পর্য্যন্ত খেটে গেছে সে! মরে যাবে যে!

শ্রীনাথ হেসে বললে—শুয়ে থাকলে পেটের জ্বালা কি যায় রে নন্দ—না খাটলে খাবে কি? ওই খেটেই বাঁচতে হবে আর ওতেই মরতে হবে। যাক, বেলা হ'ল—যাবি তুই? তোর শরীর কেমন?

—ভাল। বলে নন্দ শ্রীনাথের দিকে তাকিয়ে হাসলে। তার পর আবার বললে, নীলামের দিন ঘনিয়ে আসছে, খাজনার টাকা কিছু কম আছে—সেটা খেটে-খুটে যোগাড় করতে হবে। শরীরের দোহাই দিলে তো নীলাম রদ হবে না শ্রীনাথখুড়ো। যাব বই কি।

শ্রীনাথের সঙ্গে নন্দ বেরিয়ে পড়ল।

সরকারী খাল শুকনো খটখটে—মাটি ফেটে চৌচির হয়ে আছে। যেতে যেতে নন্দ সেই দিকে তাকিয়ে বললে—খালটা যদি বেশ গভীর করে কেটে দিত—এমন দিনে কেমন হ'ত বল দিকিন! দিব্যি জল থাকত, আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে হ'ত না। আর শুধু খাল কেটেই বা কি হবে—কেনেল তো চড়া; আবার নদীও তো হুঁ হুঁ—

নদীর শোচনীয় অবস্থাটা হাসির ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে নন্দ। বললে—কেনেল ক-ফুট কাটা হচ্ছে—ছ-ফুট না?

—হুঁ। শ্রীনাথ হেসে বললে, উপরে কাগজে কলমে হুকুম আছে হয়ত আট-দশ ফুট। এতে জলের অভাব হবে না কেন। সব চোর। এখানে মজুরি পাই আমরা

রোজ চার-ছ আনা, উপরে হিসাব থাকে অনেক বেশী। মাঝখানে টাকাগুলো উড়ে যায়—কাজ হবে কি ক'রে।

তার পর দু-জনেই নীরবে কেনেলের কাছাকাছি এসে পড়ল। নন্দ বললে—আমি মাটি কাটতে পারব না খুড়ো—আমাকে বইতে দিও।

কিন্তু কিছুক্ষণ মাটি বইবার পর তাও পারলে না নন্দ। হাঁ ক'রে নিশ্বাস নিতে নিতে ধপ ক'রে এসে বসে পড়ল। বললে—মাথায় মাটি নিয়ে আর উপর-নীচ করতে পারছি নে খুড়ো—হাত-পা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে—মাথাটা—

তার পর কাশতে সুরু করলে নন্দ। ব'সে থাকতে আর পারলে না—সেই মাটিতেই শুয়ে পড়ল। শ্রীনাথ নন্দর মুখের কাছে কাপড় ঘুরিয়ে বাতাস দিতে সুরু করল। মজুরের দল কাজ ছেড়ে ছুটে এল।

খবর পেয়ে কন্ট্রাকটর, ওভারসীয়ার বাবু ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এল। নন্দকে দেখে ওভারসীয়ার বাবু দূরে থমকে দাঁড়ালেন—চড়া গলায় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন জানবার জন্যে—নন্দকে এনেছে কে, ও তো ছিল না।

মজুরের দল ঝুঁকে পড়েছিল নন্দর উপরে। ওভারসীয়ার বাবু চীৎকার ক'রে বললেন—ব্যাটারা মরবি সব—মরবি। হারান ডাক্তারের কাছে শুনলুম—ওর থাইসিস হয়েছে আর তোরা সব ওকে নিয়ে কাজকর্ম্ম করছিস! ওর নিশ্বাসেই যে মানুষ মরে যায়! ওকে আনলে কে? যত সব ছোটলোক—

ভোজবাজীর মত মজুরের দল সরে দাঁড়াল—নির্ব্বোধ ভীতার্ত্ত চোখে ওভারসীয়ার বাবুর দিকে সকলে চেয়ে রইল। শুধু শ্রীনাথ বুড়ো তখনও নন্দর উপরে ঝুঁকে কাপড় দিয়ে নাকের কাছে বাতাস করছে।

কিছুক্ষণ পরে নন্দ সুস্থ হয়ে উঠে বসল।

কন্ট্রাকটর এবং ওভারসীয়ার বাবুর সম্মিলিত হুকুমে কেনেলের ত্রিসীমানা থেকে তাকে সত্বর দূর করা হ'ল। সঙ্গে গেল শ্রীনাথবুড়ো আর পেছনে তাকিয়ে রইল অসংখ্য ভীতার্ত্ত কৌতূহলী চোখ। আশ-পাশ থেকে বহু সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল: এমন তোর কত দিন হয়েছে নন্দ? আহা! ভাক্তার দেখা। তাই এত রোগা হয়ে গেছিস! এমন সর্ব্বনেশে রোগ হ'ল তোর রে।

এ সব অসহ্য হয়ে উঠল নন্দর। না, কোন সমবেদনাই সে চায় না। সমস্ত দুর্ব্বলতাকে সে অস্বীকার ক'রে কাঁধ থেকে শ্রীনাথবুড়োর হাতটাকে ঠেলে দিলে। না, কোন সাহায্য সে চায় না। সে অসমর্থ নয়। বললে—তোমার আর আমার সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই খুড়ো—তোমার কাজে যাও।

—অনেকখানি যে যেতে হবে রে—একা যেতে পারবি কেন?

—না না, তুমি যাও। আমি একা যেতে পারব—বেশ পারব।

বাড়ীতে এসে মাটির উপরেই শুয়ে পড়ল নন্দ।

বারুণীর চোখে নেমে এল ভয়। জিজ্ঞেস করলে—কি হ'ল—ওগো—

নন্দ নিরুত্তর। চোখ বুজে পড়ে রইল।

—আবার রক্ত উঠেছে? কেন তুমি গেলে—

সেই সেদিনের মত বারুণীর ব্যগ্র দুটি বাহু, ওর ঘন দেহের অদ্ভুত কোমলতা—কানের খুব কাছে ওর অশ্রুরুদ্ধ ভীরু কণ্ঠস্বর—নন্দ চোখ বুজে অনুভব করলে তার পর চোখ চেয়ে দেখলে: না, বারুণী আজ দূরেই দাঁড়িয়ে আছে—ভীত পাণ্ডুর মুখ। বুঝলে নন্দ, বারুণীও ভয় করে তার অসুখকে, সেও বুঝেছে যে নন্দ আর বাঁচবে না।

ভুলো ছুটে আসছিল নন্দকে দেখে—বারুণী তার হাতটা ধরে ফেললে। বললে—যা, খেলতে যা। এখন দিক করিসনে

ভুলোকে আর কাছে আসতে দেবে না বারুণী—নন্দ বুঝলে—বুঝলে, বারুণীও আর কাছে আসবে না। জগতের সমস্ত পরিচিত মুখ মুহূর্ত্তে বহুদূরে সরে গেল। সকলের অবহেলার বোঝা নিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নন্দ চোখ বুজল আবার নীরবে। বারুণীর কাতরোক্তির কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলে না।

সকলে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে নন্দর দিকে দূর থেকে—এমন কি চৌরু বারুণীও। শিশু তুলো—তাকেও ডাকলে ভয়ে সে ছুটে পালায়। কি ভয় দেখিয়েছে বারুণী তাকে কে জানে। এই দরদী সহৃদয় অবহেলা কোন রকমেই সহ্য করতে পারে না নন্দ। খাজনার টাকা জমানো ছিল—কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। ডাক্তারের কাছে ওষুধ খেয়ে সে বাঁচবেই। তখন বারুণীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবে—আনবার নামও মুখে আনবে না।

ওষুধ নিয়ে এল নন্দ।

ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার মনে হ'ল: মনের ক্লান্তি আর দৈহিক দুর্ব্বলতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তার পর দিন যেন কাশিটাও অনেক কম মনে হ'ল তার; ভোরবেলা উঠে সে গোয়ালের কাছে পায়চারি করতে লাগল। বারুণীকে বললে, দুধ আর গোয়ালাকে বেচব না বৌ।

বারুণী বললে, গোয়ালা টাকা পাবে যে!

নন্দ বিরক্ত হ'ল—উৎফুল্ল মন মুহূর্ত্তে খারাপ হয়ে গেল। কটু কণ্ঠে বললে—আমার গরু, আমার ইচ্ছে, আমি দুধ বেচব না। নন্দ ঝগড়া সুরু করলে—তুই বলবার কে। ক-টাকা পাবে সে? আজই দিয়ে দেব সব।

খাজনার টাকা থেকে গোয়ালারও টাকা শোধ হয়ে গেল। বিবাহিত জীবনে এই প্রথম বারুণী একটা চড় খেয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল আর নন্দ গুম হয়ে ব'সে রইল দাওয়ায়। সে বাঁচবে—কেউ যেন ভেবে উঠতে পারে না। যেন অসহায় পরলোক থেকে নন্দ মস্ত পৃথিবীটাকে দেখতে পেল কুটিলতায়, ছলনায় আর মুখোসে।

শ্রীনাথবুড়ো এসে মনটা আরও খারাপ ক'রে দিলে নন্দর।

শ্রীনাথ বললে—খেয়াল আছে তো—তোর নীলামের দিন আসছে সোমবার। খাজনার টাকাটা এইবার পাঠিয়ে দে।

নন্দ অসহায় ভাবে শ্রীনাথের দিকে তাকাল। তার পর নীরস কণ্ঠে বললে—তোমরা কি চাও খুড়ো, আমি এমনি ভাবে মরে যাই। এমনি বিনা চিকিৎসায়—

শেষের দিকে নন্দর গলা কেঁপে থেমে গেল।

শ্রীনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কি হ'ল তোর?

নন্দ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে রইল। তার পর আস্তে আস্তে বললে—খাজনার টাকা আমি ভেঙে ফেলেছি খুড়ো। ওষুধ কিনেছি।

কিন্তু সরকার তো এ দোহাই শুনবে না। সূর্য্যাস্তের নীলাম যথাসময়েই হবে। নন্দ ঠাণ্ডা মাথায় বুঝল কথাটা। বললে, কি হবে খুড়ো!

গ্রামের যদু দত্ত বড়লোক, মহাজনী কারবার আছে। শ্রীনাথ ভরসা দিলে, টাকা সেখানে মিলতে পারে। শ্রীনাথও সঙ্গে যাবে। কেঁদে কেটে পড়লে হবে। খোদ যদু দত্তকে ধরতে হবে।

কিন্তু নন্দর থাইসিস। যদু দত্ত হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল।

নন্দ তফাৎ থেকে হাউমাউ ক'রে কেঁদে ফেলে বললে, পায়ে ধরছি হুজুর—এ-যাত্রা রক্ষা করুন। ঐ দু-বিঘে আমার সম্বল। যা লেখবার লিখিয়ে নেন—

—থামো বাপধন, থামো। ছোট ভাই বিধুর দিকে তাকিয়ে যদু দত্ত বললে, এমনি ক'রে নিতাই আমাকে মাঠে বসিয়েছে, বিপিন কেশব, মথুরও। অত জমি আর টাকা—সব মাগনায় গেল। খাতক বাঁচান কি সরকারী আইন হ'ল—মহাজনী কারবার বিশ হাত জলে ডুবে গেল। নন্দর দিকে তাকিয়ে বললে, আর এক পয়সা ছোঁয়াচ্ছি নে বাপধন। যাও এখন সরকারের কাছে।

—তারাই তো পেটে মারতে বসেছে হুজুর। সূর্য্যাস্তের নীলাম—এ-যাত্রা বাঁচান—

যদু দত্ত হাসলে, বললে—বোঝ এবার—সরকারের প্রজা হওয়ায় সুখ, না জমিদারের প্রজা হওয়ায় সুখ। রাজা থাকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আর জমিদার তোর ঘরের পাশে—দুটো কথা শুনতে পারে, শোনে—আর যত সব খুনেরা মিলে তোলপাড় লাগিয়ে দিয়েছে—জমিদারী ভাঙো—হেন কর, তেন কর—

দাদাকে উদ্দেশ্য ক'রে বিধু ইংরেজীতে বললে—এই

আমাদের দেশের চাষা—খেতে কুলোয় না, খাজনা দিতে পারে না আরও কত কি—আর ইয়োরোপের চাষীরা ঐ জমিতে সোনা ফলিয়ে নেয় কত দিক দিয়ে। হুঃ—হাসলে বিধু দত্ত। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—বেলা হ'ল, উঠি। তিনটের ট্রেন ধরতে হবে আবার।

—তুই কি আজই যাবি? থাক না ছদিন—

—বাপ রে। খেয়ালী রামের সঙ্গে আজ রাত্রেই দেখা করার কথা। না দেখা হ'লে অনেকগুলো টাকা ক্ষতি হবে দাদা।

—তবে যা যা। পূজোয় বউমায়া সব আসছেন তো রে?

—রক্ষে কর। কাল সন্ধ্যেয় এসেই ঘন ঘন যে রকম হাই উঠতে লাগল—ভাবলুম, এই রে, ধরলে বুঝি কালাজ্বর কি ম্যালেরিয়া। এলে তাদের আর ফিরে যেতে হবে না।

বিধু ঘরের মধ্যে চলল, যদু দত্তও উঠল।

নন্দ ব্যাকুল হয়ে পড়ল হতাশায়, বললে—হুজুর—

তার পর কাশতে লাগল। যদু দত্ত আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠল, আরে ··আরে—ম'লো যা। এই শিব সিং—রাম ··ঘরের মধ্যে একে ঢুকতে দিলে কে! এই উল্লুক—

শ্রীনাথ বুড়ো সঙ্গে গিয়েছিল—সঙ্গেই ফিরে এল নন্দর। নিরুপায় নন্দ তার কাছেই টাকা চেয়ে বসল।

শ্রীনাথ হেসে বললে—কোথায় পাব টাকা? পেট ভরে ছুটো ভাতেরই দেখা মেলে না যে রে।

—আমাদের চাষীদের মধ্যে আর কারুর কাছে আছে জান?

—সকলের অবস্থাই তো জানি—চোখে দেখছি। যার কাছে যা ছিল, খাজনা মিটিয়ে ফতুর হয়ে গিয়েছে সব।

—তবে আর উপায় নেই শ্রীনাথ খুড়ো। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নন্দ বললে, তুমি যাও তা হ'লে। ঘরে এসে নন্দ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে ব'সে রইল। বোকা বারুণীকে সে নিজেই অত্যধিক মাত্রায় ভীরু ক'রে তুলেছে, তবু সে বসতে বসতে শুয়ে পড়ল এবং কাৎরাতে লাগল। আশা ক'রতে লাগল সে: খুব ধীর একটা পদশব্দ আর অন্তত তার কিছু দূরে একটা পরিচিত শঙ্কাভরা কণ্ঠস্বর। কিন্তু বারুণী কি শুনতে পায় না! অনেকক্ষণ কেটে গেল। দীর্ঘদিন রোগে ভোগা রোগীর মত চিঁ চিঁ ক'রে ডাকল নন্দ বারুণীকে নয়, ভুলোকে—ভুলো রে—আঃ ঘরে কি কেউ নেই নাকি! একটু জল—

বারুণী জল নিয়ে এল। নন্দ জলটুকু খেয়ে ফের ধপ ক'রে শুয়ে পড়ে উঃ আঃ করতে লাগল। না, তবু বারুণী ব্যস্ত হ'য়ে ঝুঁকে পড়ল না তার উপরে। অগত্যা নন্দ বললে—জমিটুকু গেল বৌ—টাকার জোগাড় করতে পারা গেল না।

বারুণী শুধু নীরবে ভীরু চোখে চাইলে নন্দর দিকে। টাকাপয়সা সম্বন্ধে কোন কথা ব'লে চড় খাওয়ার ইচ্ছে তার আর নেই। নন্দ যেন বুঝল এই অভিমানী বারুণীকে। তাই সে যেন খোসামোদি ক'রে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—সেদিন তোর কথা না শুনে খাজনার টাকাগুলো খরচ ক'রে ফেললাম রে—গোয়ালাকে দিলাম, ওষুধ কিনলাম—

সমস্ত দোষ আজ নিজের ঘাড়ে নিলে নন্দ, কিন্তু তবু কথা বলে না বারুণী, তবু কাছে আসে না। কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে আছে সে—তবু অনেক দূরে চলে গেল যেন, দেখা যায় না আর তাকে, চোখ বুজে দেখল নন্দ। কিন্তু তবু সে বকর বকর করলে কিছুক্ষণ, বললে—পাঁচ জনে কি মিথ্যে ভয়ই না দেখিয়েছিল। ওষুধ খেয়ে দিব্যি আছি। বলে—এ রোগ সারে না। বাজে কথা যত। কত দিন জ্বর হয়নি বল দেখি—ঐ গরমেই মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল।

সমস্তটা হাসি দিয়ে বারুণীকে বুঝিয়ে দিল নন্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে গলাটা সুড় সুড় ক'রে উঠল—নিশ্বাস বন্ধ ক'রে আপ্রাণ চেষ্টায় সেটা চাপতে লাগল নন্দ। শেষ পর্য্যন্ত পেরে উঠল না। তবু বারুণীর সুমুখে সে কালব্যাধির রক্তাক্ষরগুলি দেখাবে না—বারুণীর সুমুখ থেকে একরকম ছুটে বেরিয়ে গেল।

বারুণীর সমস্ত মাধুর্য্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। একটা ষড়যন্ত্র যেন প্রকাশ হ'য়ে গিয়েছে—এই ভাবে অপরাধী

নন্দ সারাটা দুপুর এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াল, ঘরে টিকতে পারল না, বারুণীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

দেনার দায়ে মহাজনের কাছে যথাসর্বস্ব দিয়ে প্রিয়নাথ গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছে। শোনা যায়, সুন্দরবনের কোন নূতন আবাদী চরে ঘরদোর করেছে। বাস্তুভিটে তার ঢিপি হয়ে গিয়েছে, পরিষ্কার উঠান ঘাস আর আগাছায় ভরে গিয়েছে, চার দিকে নেড়াকাঁটা আর বৈঁচির জঙ্গল।

ডোবার ঘন কালো জলে, নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটুকুর উপরে—নন্দর দূরচারী মনের উপরেও স্তব্ধ অপরাহ্নের নিরবলম্ব নিঃসঙ্গতা গভীর ভাবে নেমে এল। সমস্ত অন্তর তার হুহু ক'রে উঠল: কি যেন ছিল—বড় সুন্দর বড় মায়াময়, কিন্তু কি যেন নেই আজ।

প্রিয়নাথের মত সর্বস্ব খুইয়ে তাকেও চলে যেতে হবে হয়ত কোথায়—এই গ্রাম ছেড়ে, এই পরিচিত পরিধি ছেড়ে—কত দিনের কত সুখদুঃখ কথা-কল্পনার দেশ ছেড়ে। ঘর-দোর তারও ঢিপি হয়ে যাবে, ভুলোর যেখানে খেলাঘর সেখানে আগাছার জঙ্গল হবে, মাথাহীন কাচের পুতুলটা তার কোথায় পড়ে থাকবে—লম্বা নারিকেল গাছটা ঢিপির একপাশে টংটং ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে—গাছের গুঁড়িতে বাঁধা বারুণীর কাপড়ের পাড়টা পচে খসে হারিয়ে যাবে।

পথে শ্রীনাথ বুড়োর সঙ্গে দেখা। শ্রীনাথ বললে—তোর বাড়ী থেকে ক-বার যে ঘুরলাম—কোথায় থাকিস তুই আজকাল?

নন্দ ম্লান হেসে বললে—এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াই। ঘর-দোর সব তো গেল। জান তো, যদু দত্ত আমার সব নীলামে ধরে নিয়েছে। আজ সকালে আবার ব'লে গেল, আমাকে প্রজা রাখবে না। উঠে যেতে হবে।

—অমনি মুখের কথা বললেই হ'ল—প্রজা তোলা কি সোজা ব্যাপার রে। খবর্দার তুই যাস নি।

—তাই না-হয় হবে। নন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, কিন্তু আমি কি ভাবছি জান? সুন্দরবনে চলে যাই—অনেকেই তো গেছে। ওখানে নূতন আবাদী জমি ধরে চাষ-বাস সুরু করব। কি বল?

—গাঁ ছেড়ে চলে যাবি তুই? সুখে-দুঃখে তোর বাপ-ঠাকুদ্দার জীবন এইখানে কেটে গেল—

অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে ছিল নন্দ—শ্রীনাথের কথায় চোখে ওর জল ভরে এল। ভারী গলায় বললে—এখানে থাকব কোথায়—খাব কি? আমার শরীরও যে ভেঙে আসছে। বেশ বুঝতে পারছি—বেশী দিন তো আর বাঁচব না।

শ্রীনাথের কোঁচকানো চোখের কোণে বড় বড় দুটি ফোঁটা জল এসে জমেছিল—টোল-খাওয়া গালের ওপরে ঝরে পড়ল। বুড়োর মুখে কোন সান্ত্বনার ভাষা যোগাল না। নন্দর মত সেও দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভাঙা গলায় শ্রীনাথ বললে—যা হবার হবে নন্দ—ভগবান আছে। তুই যাস নে। পেটের ভাতটা কোন রকমে ভাগে চাষ ক'রে খেটেখুটেও তো যোগাড় হবে রে।

কিন্তু যদু দত্ত সে সুবিধে বড় একটা দিলে না। দত্তদের জমি ভাগে চাষ করে নন্দ। হঠাৎ কোন অজ্ঞাত অনিবার্য্য কারণে সে জমি ছাড়িয়ে নিলে যদু দত্ত।

তবু শ্রীনাথ ভরসা দিয়ে বললে—তুই ভাবিস নে নন্দ। এই গাঁয়ে রায়বাবুদেরও জমি আছে—কোন রকমে করিয়ে দেব। দেখাই যাক না, যদু দত্ত কি করে। ভেবেছে, পেটে মেরে তাড়াবে।

খানিকটা দুর্ভাবনা কেটে গেল নন্দর।

এ-সব কোন কথাই সে আজকাল বারুণীকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করে না; ঘরে সে থাকেও খুব কম। আর বারুণী নীরবে গৃহ-সংসারের কাজ ক'রে যায়—কেমন একটা নিরাসক্তি আর পাণ্ডুর ভয় তাকেও নূতন মানুষ ক'রে তুলেছে। মস্ত একটা মূক ব্যবধান ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠেছে বারুণী আর নন্দর মাঝখানে, এটা বোঝে নন্দ। বারুণীর দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় কৃত্রিম সচেতন

নিস্পৃহতায়। যত ব্যবধান সে সৃষ্টি করে—তত যেন তার লোভ বেড়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় জ'লো মেঘের দলে আকাশ ভরে গেল। ধুলো-উড়নো ঠাণ্ডা বাতাসে নন্দর মন নেচে উঠল আনন্দে হালকা পালকের মত। বীজধানের বস্তা খুলে দেখলে—ধানের গোকহ্‌টার মুখে খড় দিয়ে এল। বারুণীর সঙ্গে কেমন অদ্ভুত ভাবে আস্তে আস্তে কবে থেকে কথার ধারাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে—ভুলোকে মাঝ খানে রেখে অভাব-অভিযোগের কচিৎ দু-একটা কথা হয় হয়ত। আজ কথা বলবার লোকের অভাবে নন্দ ভুলোকেই ডেকে বললে—খুব ভারী জল নামবে—না রে ভুলো?

ভুলো ভয়ে ভয়ে বললে—হুঁ।

জ'লো হাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে নন্দ বললে—আঃ, বাঁচা গেল। চাষ-বাস সুরু হবে এইবার। রায়বাবুদের চড়ার জমিটা কোন রকমে করিয়ে নিতে হবে—ধরব হাতে পায়ে, কেঁদে-কেটে পড়ব। সেই খালধারের জমি—জানিস তো? বেশ ধান হয়।

সন্ধ্যের পর জল নামল কিন্তু রায়েদের জমি ভাগচাষে বন্দোবস্ত করতে যাওয়ার জন্যে শ্রীনাথকে পাওয়া গেল না। জলে ভিজতে ভিজতে শ্রীনাথের ছেলে সাধু সন্ধ্যের পর খবর দিয়ে গেল, বুড়ো মরে গিয়েছে।

—কি রকম! নন্দ থ হয়ে গেল, বললে—আজ সকালে যে দেখলাম, ভাল মানুষ রে!

কিন্তু শ্রীনাথ মরে গিয়েছে। কেনালের মাটি কাটার কাজ হচ্ছে—কাজের শেষে শ্রীনাথ ঘরে ফিরছিল। কিন্তু ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি—হঠাৎ দৈহিক অবসন্নতায় একটু জিরোবার জন্যে পথের ধারে অশথ গাছটার তলে ব'সে পড়েছিল, হাতে কোদাল। বুড়োর সেই বসাই শেষ বসা। সাধু পরে আসছিল। গাছের তলায় অমন সন্ধ্যে-বেলা কে বসে আছে—ডাকাডাকি ক'রে সাড়া না পেয়ে শেষকালে কাছে গিয়ে চিনলে সাধু।

বহুদিনের শ্রীনাথ—আজন্ম বহু স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। সে আর কোন দিনই আসবে না। নন্দর চোখে জলের ধারা নামল।

জল থেমে গিয়েছে কিন্তু আকাশে কালো মেঘের দল অন্ধকার ক'রে আছে। বুড়ো শ্রীনাথের মৃত্যু পল্লীর শব্দহীন গভীর রাত্রিকে যেন ঘন ঘোর ক'রে তুলেছে।

নন্দর চোখে ঘুম নেই। একটা নিরবয়ব অসহায় চেতনার মধ্যে সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। সেও এক দিন এমনি রাতে হয়ত মরে যাবে। গ্রাম ছেড়ে, সমস্ত পরিচিত আবহাওয়া ছেড়ে কোথায় চলে গেল নন্দ নিঃশব্দ অন্ধকারে। এমনি কত দিন কত জন মরে গিয়েছে—তারা যেন সবাই অন্ধকারের অন্তরালে আজ ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে নন্দর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—কোথায় কত দেশে।

কিন্তু বারুণী পাশের বিছানায় হয়ত অকাতরে ঘুমোচ্ছে। পুরানো বারুণী আর নেই, ভাবলে নন্দ।

* * *

ঝাঁকড়া পাকা চুল শ্রীনাথের—ভুরুর চুলগুলোও পাকা, কুঁচকে ঝুলে পড়েছে চামড়া চোখের উপরে। তার মধ্যে থেকে দুটো ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি যেন চোখের উপরে দেখতে লাগল বারুণী। শিয়রের রুদ্ধ জানালাটায় বাতাস গুমরে উঠল, জানালাটা নড়ে উঠল—বারুণীর সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তার মনে হ'ল, নন্দকে যেন ডাকতে এসেছে বুড়ো দত্তদের পুকুরে মাছ চুরি করতে যাওয়ার জন্যে। রুদ্ধ জানালা, তবু যেন তার মনে হ'ল, রেলিং ধরে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে বাইরে—অন্ধকারে এলোমেলো পাকা চুলগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—আর জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি; হিস্‌ হিস্‌ করছে সাপের মত, নন্দ নন্দ।···ঐ তার কাশির শব্দ—উঠোনে যেন পায়চারি করছে তার পায়ের শব্দ—

* * *

নন্দ বললে—কি রে—উঠে এলি যে!

বারুণী বললে—ভয় লাগছেবড্ড। অসহায় কণ্ঠে বললে, কে যেন কাশল—শুনছ না!

—দূর পাগলী, আমি মরে গেলে ঘর করবি কি ক'রে! নন্দ হাসলে, আদরের কোমলতায় কথাগুলি ওর অন্তর থেকে যেন তরল হয়ে বেরিয়ে এল।

বারুণী কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে—ওগো, কেন, কেন তুমি আমাকে—

নন্দ কষ্ট দেয় বারুণীকে কিন্তু সেইটুকু জানাবার আগে কণ্ঠ ওর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল কোঁকড়ানো দেহটা তার অসহায় ভাবে এলিয়ে গেল। নন্দর দিকে। অপরিচিত কষ্টকর দিনগুলো হারিয়ে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সকালে দেখা গেল: বারুণীর শাড়ী থেকে নন্দর কাশির কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ গরম জলে সোডা দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে তুলছে—কোন রকমেই তাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারছে না। নন্দর সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। দুজনেই দুজনের কাছ থেকে লুকোতে চাইলে—এমনি মুখের ভাব।

জল হয়ে গিয়েছে—রায়েদের জমিটা ঠিক-ঠাক করে ফেলতে হবে। নন্দ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিন্তু সেখানেও যদু দত্ত। কি ক'রে খবর পেল! নন্দ আশ্চর্য্য হ'ল।

যদু দত্ত বললে—তুই চাষে খাটতে পারবি? জমিতে ফসল ফলাতে না পারলে কে জমি দেবে বাপধন।

হতাশ হয়ে নন্দ ফিরে এল। সারাটা দিন তার ভাবতে ভাবতে কেটে গেল—কি করবে সে। কোন দিকে কোন উপায় দেখতে পেলে না।

দিন কেটে গেল, রাত্রি এল, তবু নন্দ ভাবছে। বোকা বারুণী তাকে কোন উত্তরেই সন্তুষ্ট করতে পারলে না। শ্রীনাথকে কত বার মনে পড়ল। তার অভাবটা আজ চারদিক দিয়ে অনুভব করলে নন্দ। আজও বারুণী তার কত কাছে, প্রত্যেকটি নিশ্বাস সে অনুভব করছে মুখের উপরে। বারুণী বলে, ভগবান আছে। কিন্তু কোথায় ভগবান?

পোড়া খড়ের গন্ধে সচেতন হয়ে উঠে বসল নন্দ। তাড়াতাড়ি বাইরে গেল। খিড়কির ঝাঁকড়া আমগাছটা—তার পাশাপাশি সবই ঘন কালো অন্ধকারে লাল দেখাচ্ছে।

নন্দ ফিরে এসে বললে—যা ভয় করেছিলাম বউ এতদিন তাই হয়েছে। তুই ভুলোকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যা—রান্নাঘরে আগুন লেগে গেছে।

নন্দর চীৎকারে অনেকে ছুটে এল।

আগুন নিবল কিন্তু তার পর কি করবে নন্দ ভেবে পেলে না। যদু দত্ত আরও কি করবে কে জানে।

হতাশ ভাবে সাধুকে জিজ্ঞেস করলে—কি করি বল তো ভাই।

সাধু শুধু বললে, দত্তরা কত বড়লোক—ওদের সঙ্গে আমরা কি পেরে উঠি রে ক্যাপা। তুলবে বলেছে যখন—তুলে দেবেই।

—তাই ভাবছি, নন্দ বললে, সুন্দরবনে চলে যাই। ওখানে অনেকেই তো যায়।

—চলে যাবি!

সেই পুরানো আন্তরিক আবেদন, কিন্তু এখানে থাকবে কোথায় সে—খাবে কি! নন্দ ভাবলে, সে চলেই যাবে।

কিন্তু বারুণী বললে—একা যাবে তুমি? চোখের কোণে ওর জল টলমল ক'রে উঠল, বললে—কে তোমাকে দেখবে, কে বেঁধে দেবে। থাকবে কোথায়? না না—ফুঁপিয়ে আঁচলে মুখ ঢাকল বারুণী।

—সব ব্যবস্থাই হবে বউ। বারুণীকে বোঝাতে লাগল নন্দ, চাষ ফুরোলেই তো চলে আসব। সব ঠিক-ঠাক ক'রে আসব। তুই ভত দিন তোর ভাইদের কাছে গিয়ে থাক—কোন ভাবনা নেই। অঘোররা শুনি দিব্যি আছে, প্রিয়নাথরাও—

—না না, তুমি যেয়ো না গো—একা—

কিন্তু নন্দ যাবেই। বারুণীর অবোধ কান্নায় পেট ভরবে না। যেখানে হোক একটু ঘর বেঁধে যেতে হবে, ভুলো মানুষ হবে, চাষ-বাস করবে, তার আবার ছেলে-মেয়ে হবে। এর বেশী ভাবেও না নন্দ—এটুকুর ব্যবস্থা তাকে ক'রে যেতেই হবে। কিন্তু শরীরও তার ভেঙে আসছে ক্রমশ। নন্দ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এক মুহূর্তে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়।

যাওয়ার দিন গ্রামের কৃষক-পরিবারের যে যেখানে ছিল নন্দর উঠানে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। গরিব সংসারের অল্পস্বল্প যা জিনিস ছিল সব বাঁধাছাঁদা হয়ে গিয়েছে। বারুণী হাঁড়িকুড়িও নেওয়ার চেষ্টা করেছিল নন্দ সেগুলো সব লাঠি দিয়ে ভেঙেছে। বলেছিল, তার চেয়ে ঘরদুদ্ধ মাথায় করে নিয়ে চল না।

কিন্তু বারুণীকে তো বুঝবে না নন্দ। আবশুক অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি কত জিনিসে ঘর ভরে ছিল—সেই সব জায়গা যেন খাঁ খাঁ করছে, তাকানো যায় না। আজ প্রত্যেকটি জিনিসের সঙ্গে যেন বারুণীর অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে—কোনটাই সে ছেড়ে যেতে চায় না, পারে না।

গোধূলির ধূসর আলো ক্রমশ কালো হয়ে আসছিল। নন্দ তাড়া দিয়ে বললে—বেরো এই বার।

—যাচ্ছ। সন্ধ্যেটা দিয়ে নিই।

—সন্ধ্যে দিবি কিসের জন্তে।

—তুমি যাও তো। বিরক্ত ক'রো না।

সন্ধ্যে দেওয়া শেষ হ'ল বারুণীর।

নন্দ টোলবহুল তোরঙ্গটা মাথায় তোলবার যোগাড় করছিল।

বারুণী বললে, বাপ-ঠাকুদ্দার ভিটে—এত দিন ছিলে, একটা গড় করবে না।

—গড় করব, আচ্ছা করছি। হেসে বললে, এইখানে জন্মেছিলাম কিন্তু মরতে পেলাম না।

সকলের দিকে তাকিয়ে প্রচুর ভাবে হাসতে লাগল নন্দ, তারপর নিতাইয়ের ছেলের দিকে তাকিয়ে বললে—

তুলসীতলা থেকে পিদিমটা নিয়ে পালাস নি কেউ, তোর বারুণী-খুড়ী ওই খেনে সঁঝ্যে দিত। তাকে মনে করিস—বুঝলি? আমাদের ভুলিস নি।

প্রতিবেশী মেয়েদের চোখে জল এল। এক জন বর্ষীয়সী বললে—মাঝে মাঝে আসিস, দেখা ক'রে যাস নন্দ। আর তুইও বউ—বারুণার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল, বললে, লক্ষ্মী মা আমার। চিবুক ধরে ভাঙা গলায় বললে, আমাদের ভুলে যাস নি মা।

বারুণী চোখে আঁচল ঢেকে কম্প্র কণ্ঠে বললে, না না, ভুলব না।

নন্দ বললে—ও এখন ওর ভাইয়ের কাছেই থাকবে—ও তো যাচ্ছে না। আষাঢ় মাসের মেলাতেই দেখা হবে হয়ত সব।

বারুণীর ভাই তাড়া দিলে, চল চল—রাত্রি হয়ে যাবে যেতে।

ওরা চলে গেল।

নন্দর মাথায় টোলখাওয়া রংওঠা সেই তোরঙ্গটা, বারুণীর ভাইয়ের হাতে পোঁটলা—সকলের পেছনে ভুলো, হাতে তার ভাঙা হ্যারিকেনটা টিম টিম ক'রে জলছে।

গাঁয়ের কেউ কেউ সঙ্গে গেল কিছু দূর। মেয়েরা সজল চোখে পথের উপরে দাঁড়িয়ে রইল।

ভুলো বললে—খিদে পাচ্ছে মা—

—হুঁ চল। বারুণী মুখে বললে, কিন্তু এক পাও নড়ল না। নারিকেল গাছটায় ঠেস দিয়ে যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। সুমুখ দিয়ে উচু বাঁধা রাস্তা এঁকে বেঁকে মাঠের পাশ দিয়ে কত দূরে চলে গিয়েছে। ঐ যে তাল গাছটা—যাওয়ার দিন ঐখান থেকে নন্দ ঘুরে তাকিয়েছিল যেতে যেতে। স্পষ্ট মনে পড়ল তার।

—কই চল মা।

—যাই।

অন্তমনস্ক বারুণী দাঁড়িয়ে রইল। বেলা ফুরিয়ে গেল, নেমে এল সন্ধ্যার কালো ছায়া—দূরে গাছের সারি কালো হয়ে উঠল, কালো হয়ে উঠল তার পায়ের নীচের জল। নন্দ আসবে কবে? কত জন খাটতে গেল—ফিরেও এসেছে কেউ কেউ, কিন্তু তার খবর সে কিছুই পেলে না আজও। কোথায় আছে সে? কবে আসবে সে? তাকে মনে পড়ে না একটুও? বারুণীর চোখ দুটি জলে ভরে গেল।

শুধু ভুলোই ছিল দেখবার—জিজ্ঞাসা করবার—বারুণী কাঁদে কেন। কিন্তু সে রাগে মুখ ভার ক'রে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। বারুণী চোখ মুছে ডাকল, চল্ ভুলো—

ভুলো অন্ত দিকে ঝট ক'রে মুখ ঘুরিয়ে বললে, আমি কথা কইব না তো—খিদে পায় না বুঝি আমার?

খিদে! ক্ষ্যাপা ছেলে। মনে মনে বললে বারুণী। একবেলা খেয়েই শেষ পর্যন্ত হয়ত বছরের ভাত কুলিয়ে উঠবে না। বারুণীর ভাইরা শুকনো মুখ ক'রে হলদে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভুলোর দিকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাকালে বারুণী। হাসির মত ক'রে ঠোঁট দুটো ওর তরঙ্গিত হ'ল, বললে—রাগ হ'ল বুঝি বাবুর? আর রাগ করে না। ভুলোকে জোর ক'রে কোলে তুলে নিলে বারুণী, বললে—সন্ধ্যে হ'ল, চল্।

কৃত্রিম হাসিতে মুখ ভরিয়ে ভুলোর মুখের ওপরে তাকাল বারুণী; গম্ভীর ভুলো—ঠিক নন্দর মত—তেমনি চোখ, ঠোঁট দুটির তেমনি বাঁকা রেখা, কোঁকড়ানো মাথার চুল—

—ছেলের রাগ রাগ—

ভুলোকে শীর্ণ বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকে চেপে ধরে চোখ বুজে মুখের উপরে মুখ চেপে ধরল সজোরে বারুণী—বোজা চোখের কোণ বেয়ে টপ টপ ক'রে জলের ফোঁটাগুলি ঝরে পড়ল।

ভুলো জিজ্ঞেস করলে—বাবা কবে আসবে মা?

—আসবে এইবার। খাটতে গিয়েছে—কত টাকা নিয়ে আসবে, তোর নামে জমি কিনবে কত—আজ রাত্রে কিন্তু চাট্টি মুড়ি খেয়ে থাকতে হবে ভুলো—কেমন তো?

না, সেদিকে ভুলোর মন নেই। বললে—আমার নামে জমি কিনবে মা—কত—

—অনেক। আজ কিন্তু—

ভুলো সে সব শুনতে চায় না। দুরন্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে বললে—এই সব—

—হাঁা সব।

যাওয়ার আগে বারুণী ফিরে তাকাল এক বার—পথ যেখানে বেঁকে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে।

বিদ্যাসাগরের মেদিনীপুর

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

মহাপুরুষেরা তীর্থঙ্কর; অর্থাৎ যেখানে তাঁহাদের জন্ম মৃত্যু বা তপস্যার স্থান, সেখানে তাঁহারা একটি বিশেষ পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য দিয়া তীর্থত্ব দান করেন। দুঃখ-দারিদ্র্য হীনতা-অজ্ঞানতায় যখন এই দেশ সমাচ্ছন্ন তখন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আশ্বিন তারিখে মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করিয়া মেদিনীপুরের অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামকে এবং এই মেদিনীপুরকে তীর্থ করিয়া গেলেন।

অযোগ্য ভূমিকে বিদ্যাসাগর এই মাহাত্ম্য দান করেন নাই। আর্য্য ও দ্রবিড় সভ্যতার মিলনের ক্ষেত্র এই মেদিনীপুর। তাই ইহা দুইটি সংস্কৃতির সঙ্গমতীর্থ, প্রয়াগধাম। সাধকের পক্ষে ইহা একটি মুক্তিক্ষেত্র। এই মুক্তির তপস্যায় মেদিনীপুর বহু দুঃখ সহিয়াছে। আজও তাহার সেই তপস্যার শেষ হয় নাই।

ধর্ম্ম সংস্কৃতি বাণিজ্য প্রভৃতি নানা সূত্রে ব্রহ্ম, চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্যাম, যবদ্বীপ, বালি, সুমাত্রাদি প্রাচ্য দেশের সঙ্গে ভারতের মহা যোগক্ষেত্র ছিল এখানকার তাম্রলিপ্তি। ভারতের মধ্যেও উত্তরে এবং দক্ষিণে, আর্য্য ও আর্য্যপূর্ব সংস্কৃতির যোগসূত্র দীর্ঘকাল জোগাইয়াছে মেদিনীপুর।

ধর্ম্মের দিক দিয়া এখানে এখনও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহু অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নিরঞ্জন-পন্থ, যোগ-মত, ধর্ম্মপূজা, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্র এই মেদিনীপুর। জগন্নাথ প্রভৃতি দক্ষিণ-দেশের তীর্থযাত্রার দ্বারপথ বলিয়া এই ধাম রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য, মলুকদাস প্রভৃতি সাধকের চরণস্পর্শে পবিত্র। সন্তদের গ্রন্থে তাহার বিস্তর পরিচয় মেলে। শ্যামানন্দ ও রসিক-মুরারির কথা পরে হইবে। মুকুন্দরামের গুরু বলরাম,

কবিকঙ্কণ, ভাগবতের অনুবাদক সনাতন চক্রবর্ত্তী, পদকর্ত্তা কানুদাস ও গোবর্দ্ধন দাস মেদিনীপুরেরই মানুষ।

স্নেহ ও আশ্রয় দিয়া মেদিনীপুর আবার বহু মহা-পুরুষকে আপন করিয়া লইয়াছে। শিবায়নকার রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ। শীতলার পালা-রচয়িতা নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী ছিলেন কাশীজোড়ার রাজেন্দ্রনারায়ণের আশ্রিত। মহাভারত-রচয়িতা কাশীরাম দাস ছিলেন আওসগড়ের রাজার আশ্রয়ে। দামুন্যার কবি মুকুন্দরাম আশ্রয় পাইলেন ঘাটালের অন্তর্গত আরড়ার রাজার কাছে। ভক্ত কবি বাসুদেব ঘোষ শেষ জীবন তমলুকেই অতিবাহিত করেন। ধর্ম্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম বর্দ্ধমানের লোক। তাঁহার উপরেও মেদিনীপুরের দাবি আছে। দামোদর পণ্ডিতের শিষ্য কানুরাম শ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ী, কাজেই মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীমদ্ অদ্বৈত ও ও শ্রীমন্ নিত্যানন্দের সঙ্গে একত্রে কাজ করিয়াছেন। পরে শ্রীশ্রীনিবাস শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ এই তিন মহাত্মা আসিয়া এই কাজে যোগ দিলেন। শ্যামানন্দের স্থান হইল মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত গোপীবল্লভপুর গ্রামে, থানাও গোপীবল্লভপুর। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে গোপীবল্লভপুরস্থ গোবিন্দজীর মন্দির ও বিগ্রহ পরম সুন্দর। অনেকে বলেন শ্রীবৃন্দাবনের গোবিন্দজীর বিগ্রহ হইতেও এই বিগ্রহ দেখিতে মনোহর। গোপীবল্লভপুরকে সাধারণ লোক গুপ্তবৃন্দাবন বলিয়াই জানে।

শ্যামানন্দ ছিলেন জাতিতে করণ। জাতি হিসাবে করণ বলিয়া শ্যামানন্দ পূজ্য নহেন, পূজ্য তিনি আপন গুণে। মনুর মতে ব্রতভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় জাতির উদ্ভব। টীকাকার কুল্লুক ভট্টও তাহাই বলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে করণের জন্ম (ব্রহ্মখণ্ড, ১০, ১৮)। কোষকার মেদিনীর মতেও তাই। কায়স্থের মত ইঁহাদেরও লিখনবৃত্তি বলিয়া মেদিনীকোষ কায়স্থ অর্থেও করণ শব্দ ধরিয়াছেন। অথচ, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে ও মহাপ্রভুর প্রতাপে বহু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ইঁহাদের শিষ্য। এই জেলাতে যে সব ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই গুরু এই করণ-বংশীয় শ্যামানন্দের সন্তান। জাতিতে করণ হইলেও গুরুর প্রাপ্য সকল সম্মান তাঁহারা ব্রাহ্মণকায়স্থাদি শিষ্য হইতে পান। গুরুর পাদবন্দন প্রসাদ-গ্রহণ না করিলে শিষ্য আর করিল কি? এই সবই কিন্তু ঘটিয়াছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রতাপে।

এই শ্যামানন্দের নাম হিন্দুস্থান, রাজপুতানা, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট প্রভৃতি দেশেও খ্যাত। তাঁহারা শ্যামানন্দকে জানেন "বঙ্গোৎকল" বলিয়া। মেদিনীপুরটি বঙ্গ ও উৎকলের যোগসেতু বলিয়া "বঙ্গোৎকল" কথাটি চমৎকার।

"বঙ্গোৎকল শ্যামানন্দ ভগতি ভাব পরবীণ।"

ভক্ত রসিকমুরারি হইলেন এই শ্যামানন্দেরই শিষ্য। শ্যামানন্দ ও রসিকমুরারির রচনাতে মেদিনীপুরেরই পুণ্য কীর্ত্তি। এই কারণেই গোপীজনবল্লভের রসিকমঙ্গলে মেদিনীপুরের দাবি রহিয়াছে।

রসিকানন্দ ছিলেন রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র। ময়ূরভঞ্জের রাজবংশও এই শ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ের কাছেই এখনও দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এখন এই বংশে নন্দনন্দনদেব গোস্বামী মহাপণ্ডিত ও সাধক গুরু বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। তাঁহার পিতৃব্য এক জন অতিশয় প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। "বাবু" গোস্বামী নামেই তিনি ছিলেন সর্ব্বত্র পরিচিত। বড় বড় মহাপণ্ডিত ও বৈষ্ণব তাঁহার সঙ্গ ও প্রসাদ:লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।

শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকমুরারি। রসিকমুরারির বংশ এখন প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন শুনিয়াছি তাঁহার বংশে দীক্ষাগুরুর কাজ করিতে পারেন এমন পুরুষ কেহ নাই। একটি বিধবাতে আসিয়া এই বংশের শেষ চিহ্ন দাঁড়াইয়াছে। এই বংশের বহু শিষ্য। তাঁহারা এখন গুরুবংশ লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হওয়ায় শ্যামানন্দের শাখার



রাণা প্রতাপসিংহ
চিত্রাধিকারী শ্রীহরিচরণ রক্ষিত মহাশয়ের সৌজন্যে



লেনিনের সমাধি-মন্দির—রুশিয়ার শ্রদ্ধার্ঘ্য

বা তাঁহার শিষ্যগণের প্রবর্ত্তিত অপর কোনো শাখার গুরুদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রসিকমুরারিও জাতিতে করণই ছিলেন।

এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে আর একটু দক্ষিণের মহাপণ্ডিত বিখ্যাত গোবিন্দভাষ্যরচয়িতা বলদেব বিদ্যাভূষণ জাতিতে খণ্ডাইত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে তিনি চারি-সম্প্রদায় মধ্যে ভুক্ত করিবার জন্য সারাজীবনব্যাপী শ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ ও ভাষ্য সারা ভারতময় সমাদৃত।

রসিকমুরারির নিবাস ছিল রোহিণী গ্রামে। এই গ্রামটি মেদিনীপুর জেলার মধ্যে থানা গোপীবল্লভপুরের অন্তর্গত। সুবর্ণরেখা ও দোলং নদীর সঙ্গমস্থলে এই রোহিণী গ্রাম। রসিকের বংশধরগণ পরে সদর মহকুমার অন্তর্গত কেশিয়াড়ী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কেশিয়াড়ী গ্রামের মধ্যেই থানা। এখন এই বংশের শেষ বিধবাটিও এই গ্রামে বাস করেন। ইঁহাদেরও বিস্তর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শিষ্য আছে।

নাভাজী-কৃত ভক্তমালে ৯৫ সংখ্যক ছপপয় কবিতায় শ্যামানন্দ ও রসিকমুরারির সুন্দর বিবরণ আছে। ভক্তমাল মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের সন্ত-সেবা ও উদারতার জয়গান করিয়াছেন। "প্রেম পীযূষ পয়োধি"তে নিমগ্ন এই মহাভক্ত শ্যামানন্দ ও রসিকমুরারি সংসারকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। নাভাজী রসিকের প্রায় সমসাময়িক, হয়তো বা সামান্য বড়। ১৫৮৫-১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি নাভাজী জীবিত ছিলেন। রসিকের জন্ম ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই নাভাজীর লেখার বিশেষ মূল্য আছে।

ভক্তমালের টীকা ভক্তিরসবোধিনীর (১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) রচয়িতা প্রিয়াদাস রসিকমুরারির ভক্তি উদারতা ও দাক্ষিণ্যের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ আমার একটি অভিভাষণে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। (মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ, ৬ই চৈত্র, ১৩৪৩)। কাজেই এখানে আর তাহার পুনরায় উল্লেখ করিতে চাহি না। প্রিয়াদাস সেখানে মেদিনীপুরের রসিকমুরারির অতুলনীয় ভদ্রতার আতিথেয়তার সাধু ও ভক্তদের সেবারও পরিচয় দিয়াছেন।

শ্যামানন্দকে তখনকার কোনো রাজা দুঃখ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় রাজাকে লজ্জিত হইতে হইল। সেই উপলক্ষে রসিকানন্দের অপূর্ব্ব গুরু-ভক্তির পরিচয় পাই। মেদিনীপুরের দাক্ষিণ্য ও উদারতার কথা এই সব বৈষ্ণব-চরিতলেখকেরা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই ভদ্রতা, উদারতা ও বদান্যতা যে এখনও সমভাবেই চলিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করা গেল এবার বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির-প্রবেশ-উৎসবে আসিয়া। এখানকার আতিথেয়তা অতুলনীয়। এত বড় জনতার মধ্যে এমন অপূর্ব্ব সংযম বড়-একটা দেখা যায় না। এখানকার ছাত্রগণের সংযম ও সৌজন্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। বুঝা গেল, নাভাজীর ভক্তমাল ও প্রিয়াদাসের ভক্তিরসবোধিনীতে কিছুই অতিশয়োক্তি হয় নাই।

শুধু বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে, তন্ত্রেরও বড় বড় সাধক ও পণ্ডিত এই মেদিনীপুর জেলায় জন্মিয়াছেন। উত্তর-মেদিনীপুরে বাংলা দেশের তন্ত্রমতের প্রভাব। দক্ষিণ-মেদিনীপুরে উৎকলীয় ও দক্ষিণদেশীয় তন্ত্রমতের সাধনা চলে। উত্তর-মেদিনীপুরে ঘাঁটাল মহকুমায় জোগীখোপ গ্রামে বহু তান্ত্রিক সাধক ও পণ্ডিতের বাস। তাঁহারা আগমবাগীশ-রচিত তন্ত্রসারেরই অনুসরণ করেন। এখানে তন্ত্রের বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রাদির সন্ধান মিলে। দক্ষিণ-মেদিনীপুরে কাঁথি মহকুমায় এগরা থানার মধ্যে শিয়ালসাঁই প্রভৃতি গ্রামে যে তান্ত্রিক সাধনা তাহা দক্ষিণদেশীয়।

বাংলা দেশে যেমন রঘুনন্দনের স্মৃতি, উৎকলে তেমনি প্রবলপ্রতাপান্বিত ভবদেবের স্মৃতি। আচার্য্য ভবদেবের বাড়ী ছিল রাঢ়দেশের সিদ্ধল গ্রামে। রাঢ়ীশ্রেণীতে সাবর্ণ গোত্রে তাঁহার জন্ম। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির ও ভুবনেশ্বরের মহাসরোবর তাঁহারই কীর্ত্তি। অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের গাত্রে শিলালিপিতে ভট্ট ভবদেবের চমৎকার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাদ্বৈতদর্শনে, সিদ্ধান্তে, তন্ত্রগণিতে ভবদেব অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ফলসংহিতায় ও হোরাশাস্ত্রে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বরাহতুল্য। অর্থশাস্ত্রে, আয়ুর্ব্বেদে, অস্ত্রবেদে তিনি নিষ্ণাত। স্মৃতি ও মীমাংসা শাস্ত্রে তাঁহার রচনার

খ্যাতি দিগন্তপ্রসারিত। বাল-বলভী-ভুজঙ্গ এই ভট্ট ভবদেব এখনও উৎকলের ব্যবস্থাদির নিয়ন্তা। মেদিনীপুর জেলাতে তাঁহার অনুবর্ত্তী বহু স্মার্ত্ত ও আচারনিয়ন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মেদিনীপুরের মধ্য দিয়াই রাঢ়ে ও উৎকলে তখনকার দিনে এই সংস্কৃতির যোগ চলিত।

প্রাচীন মন্দির, মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রত্নসম্পদে মেদিনীপুর অতিশয় সমৃদ্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মেদিনীপুর উনিশ মণ পুঁথি দান করিতে পারিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিত এই যুগেও যদি এখানে জন্মগ্রহণ করেন, তবে এখনই বা নিরাশ হইবার হেতু কি?

মেদিনীপুরের উপর দিয়া দুঃখও গিয়াছে বিস্তর। আর্য্য ও দ্রবিড় সভ্যতার সব সংঘর্ষ গিয়াছে ইহারই বুকের উপর দিয়া। বঙ্গ কলিঙ্গ সকল অভিযানেরই দুঃখ ইহাকে সহিতে হইয়াছে। সাগরতীরবর্ত্তী বন্দর ও স্থানগুলিতে মগ ও য়ুরোপীয় দস্যুদের বহু অত্যাচার গিয়াছে। কিন্তু সকল দুঃখের উপরে দুঃখ হইল যখন ভারতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া গেল। পরলোকগত আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি বলেন তাহার পরেই এই বিশাল সামুদ্র বাণিজ্য যাহাদের হস্তগত হইল তাহারাই ধনে-জনে সমৃদ্ধ হইয়া ভারতকে আক্রমণ করিল। দুর্ব্বল ও হৃতগৌরব ভারতবর্ষ সেই আক্রমণ আর ঠেকাইতে পারিল না। তাহার স্বাধীনতা গেল।

তবু কোন দিনই যুক্তিহীন ও হৃদয়হীন জুলুমের কাছে এই মেদিনীপুরের মাথা নত হইতে চাহে নাই। বল্লালী বিধান যখন বাংলা দেশের ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের সামাজিক ব্যবস্থাকে কৌলীন্য-বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে উদ্যত, তখনও মেদিনীপুর তাহা স্বীকার করিতে চাহে নাই। বাংলা দেশেও যাঁহারা এই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, তাঁহারা বাংলা দেশে আর কোথাও আশ্রয় না পাইয়া দলে দলে আসিলেন মেদিনীপুরে। তাঁহারাই মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে তমলুক ও সদর বিভাগে আশ্রয় লইলেন। সেই স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণের দলই এখানকার মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বল্লালী বন্ধন স্বীকার করেন নাই বলিয়া কুলশাস্ত্র ইঁহাদের যথাসাধ্য নিগ্রহ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু ইঁহারা তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। মেলবন্ধন-কর্ত্তা দেবীবর স্বয়ং আসিয়া এই মধ্যশ্রেণীকে প্রসন্ন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন। ভেমোরা প্রভৃতি গ্রাম তাঁহাকে যথেষ্ট সৎকার করিয়াছে কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করে নাই। অবশেষে দেবীবর এখান হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। তাই কুলশাস্ত্রে মেদিনীপুরের মধ্যশ্রেণী বড়ই লাঞ্ছিত। এই মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বড় বড় সব বিদ্বান জন্মিয়াছেন। বিশ্রুতকীর্ত্তি রামেশ্বর ও তাঁহার ভাই রামনারায়ণ তর্করত্ন এই ভেমোরা গ্রামেরই অধিবাসী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভারতের গৌরবের দিনে প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে যোগ রক্ষার একটি প্রধান স্থান ছিল তাম্রলিপ্তি। ভারতের সেই গৌরবের যুগ যখন চলিয়া গেল, যখন সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রে ও লোকাচারে নিষিদ্ধ হইয়া গেল, তখন সেখানকার সমুদ্রগামী বীরপুরুষদের বড়ই দুর্গতি ঘটিল। তাঁহাদের উত্তরপুরুষরাই কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য। কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য দিয়া মেদিনীপুর পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁহারা কি পরমগৌরবময় নিজ নিজ পূর্ব্ব ইতিহাসের খবর রাখেন? পৌরুষের যোগ্য ক্ষেত্রেই পুরুষপ্রবর বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর যে সত্যই কত বড় মহাপুরুষ ছিলেন, তাহা আমরা আজ ধারণাই করিতে অসমর্থ। আমরা আজ এতই ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছি।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, যিনি একটি মাত্র বর্ণও শিক্ষা দেন তিনিও গুরু। পৃথিবীতে এমন বস্তু নাই যাহা দিয়া তাঁহার ঋণ শোধ করা যায়। বিদ্যাসাগর আমাদের সকলকে সকল বর্ণ শিক্ষা দিয়াছেন, আমাদের জ্ঞান উন্মেষিত করিয়াছেন, আমাদিগকে সাহিত্য ও উচ্চ আদর্শ দান করিয়াছেন এবং অন্তরের ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষা দিয়াছেন। তাঁহার ঋণ কি শোধ করা যায়?

শাস্ত্রে আছে, "পিণ্ডং দত্ত্বা ধনং হরেৎ", অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করিলে তবে সে বিত্তের অধিকারী হয়। আমরা বিদ্যাসাগরের সকল চিন্ময় বিত্ত সম্ভোগ করিতেছি, অথচ এত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই। পিতামাতা হইলেন মহাগুরু, তাঁহাদের পরলোকগমনে যত দিন পূর্ণ শ্রাদ্ধ না করা হয়, তত দিন

সুখসম্ভোগের অধিকার থাকে না। ঈশ্বরচন্দ্র আমাদের সবার চিন্ময় গুরু বলিয়া পিতৃবৎ পূজ্য। আমরা এত কাল তাঁহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া তাঁহারই প্রসাদে যত সুখ সম্ভোগ করিতেছি সেই সবই আমাদের নিরয়-হেতু হইয়াছে।

তিনি শুধু বাঙ্গালীদেরই গুরু ছিলেন না, কাশীতে শুনিয়াছি তাঁহার বন্ধু কবি হরিশ্চন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী প্রভৃতি মহাত্মাগণকে মাতৃভাষাতে লিখিবার জন্য তিনি উৎসাহ দিয়াছেন। অন্ধ্রদেশে বীরেশলিঙ্গম পান্তলুকে সেই দেশের বিদ্যাসাগর বলে। বিদ্যাসাগর এক হিসাবে সারা ভারতের জ্ঞানদাতা গুরু।

বিদ্যাসাগর যখন কাশীতে যান তখন তিনি বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শনে যান্ নাই। তীর্থের দানগ্রাহী ব্রাহ্মণের দল তাহাতে তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আপনি কি নাস্তিক? আপনি বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করিবেন না?" তিনি তাঁহার পিতামাতাকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই আমার বিশ্বনাথ, এই আমার অন্নপূর্ণা।" এই কথার উপরে আর আমাদের দেশে কথা চলে না।

অনেকে তাঁহাকে নাস্তিক মনে করিয়াছেন। তাঁহাদের ভগবানের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহাদের ভগবান মন্দিরে ও প্রতিমায় সীমাবদ্ধ। বিশেষ স্থানে, বিশেষ সময়ে, বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানেই তাঁহাদের ভগবদুপাসনা সমাধা করা যায়। ঠাকুরঘরে ও ত্রিসন্ধ্যায় তাঁহারা তাঁহাদের ভগবানকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের সাধনা অতি সহজসাধ্য।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ভগবানকে মন্দিরে বা বিগ্রহে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই যে এত সহজে কাজ সারিবেন। তাঁহার ভগবানকে তিনি দেখিয়াছেন সকল মানবের মধ্যে। তাই দুঃখীর দুঃখে, নারীর বেদনায়, সাঁওতাল প্রভৃতি দীনহীনদের দুর্গতিতে তাঁহার আর কৃত্যের অবধি ছিল না। বিধবার দুঃখ মোচনের জন্য লক্ষাধিক টাকা তিনি ব্যয় করিয়াছেন। দুঃখীর ও দুর্গতের দুঃখ হরণের জন্য, তিনি প্রায় সর্ব্বস্ব দিয়া গিয়াছেন। উপকার করিয়া তিনি কখনও প্রত্যুপকার আশা করেন নাই। উপকৃত বহু লোকই কৃতঘ্নতার দ্বারা তাঁহার ঋণ শোধ করিয়াছেন, তবু নিরন্তর মানবসেবাই তাঁর ছিল ধর্ম্ম। বিরাট্ যে তাঁহার দেবতা, তাই দুঃসাধ্য তাঁহার তপস্যা।

এমন মহাগুরু লাভ করিয়াও আমরা এত কাল তাঁহার প্রসাদই গ্রহণ করিয়াছি, কখনও তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া সামান্য কর্ত্তব্যটুকুও পালন করিবার কথা আমাদের মনে উদিত হয় নাই। তাই অকৃতশ্রাদ্ধ আমাদের এত কাল অশৌচের দিনই গিয়াছে। মেদিনীপুরবাসীরা তাঁহার প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাজ করিলেন। এখন বাংলা দেশ ভরিয়া বিদ্যাসাগরের প্রতি যোগ্যভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপিত হউক। সেই শ্রাদ্ধ যেন মাত্র কথায় ও বাহ্য সমারোহে পর্য্যবসিত না হয়, লোক দেখাইবার জন্য না হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য না হয়। যে-সব দুঃসাধ্য ব্রত তিনি আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন অথচ জীবনে সময়ের অল্পতাবশতঃ তাহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই, তাহাতেই যদি ব্রতী হইতে পারি, তবেই তাঁহার উপযুক্ত শ্রাদ্ধ হইবে। কিন্তু দুশ্চর এই তপস্যা। তবু তাঁহার প্রতি আমাদের যোগ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য গতি নাই। মেদিনীপুরের এই বিরাট্ উৎসব আমাদিগকে এই মহাব্রতে দীক্ষিত করুক।

বিদ্যাসাগরের প্রতি সকলে কিন্তু এমন সমারোহ করিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারেন না। তবু মেদিনীপুরেই দীনদুঃখীর মত কাজ করিবার আদর্শও দেখিয়া গেলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তপস্যা খুব সমারোহে যাঁহারা সাধন করিতে অসমর্থ সেই সব অল্পবিত্ত অথচ মহাপ্রাণ লোক বহু কাল ধরিয়া মেদিনীপুরে লোকচক্ষুর অগোচরে কোথাও কোথাও নিঃশব্দে কাজ করিতেছেন। মেদিনীপুরের উপর দিয়া এত যে দুঃখদুর্গতি গেল তবু এখনও এখানে উৎসাহের অভাব নাই। বিদ্যাসাগরের ভক্তেরা নির্ধন কিন্তু উৎসাহহীন নহেন? এত দিনে তাঁহাদের হৃদয়ের বাসনা হয়তো চরিতার্থ হইবার দিকে চলিল।

মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে কিছু করিবার কথা

বহুদিন হইতে শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিঃসহায় বলিয়া তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। এখন বীরসিংহ গ্রামের দ্বার তীর্থার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হইল। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাশ মহাশয় উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণ। বহুপুরুষ তাঁহারা মেদিনীপুরবাসী। উৎকলে ব্রাহ্মণেরও দাশ উপাধি আছে। ভাগবত দাশ মহাশয় ধনী নহেন, তবে তাঁহাদের একটি বিধবা-বিবাহ সমিতি যোল বৎসর যাবৎ চলিতেছে। শুনিলাম তাঁহারা এ-পর্য্যন্ত ১৭৪টি বিধবার বিবাহ দপ্তরভুক্ত (registered) করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রভাবে চারি দিকে যে চেতনা আসিয়াছে, তাহাতে আরও এমন বহু বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে যাহা তাঁহাদের দপ্তরে ভুক্ত হয় নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইঁহারা কাজ চালাইতেছেন। ব্রাহ্মণ একটির ও কায়স্থ বিধবা একটির মাত্র বিবাহ ইঁহারা দিতে পারিয়াছেন। সদ্গোপশ্রেণীর বিধবা পঁচিশ-ত্রিশটির বিবাহ ইঁহারা দিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীতে বাকী বিবাহগুলি হইয়াছে। ১৯২৩ সাল হইতে অস্পৃশ্যতা নিবারণ সম্বন্ধেও ইঁহাদের কাজ চলিয়াছে।

এখানে একটি দুঃখের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কন্যাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরদিন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মেদিনীপুরে এখন পৌরজনদের পরিচালিত একটিও উল্লেখযোগ্য কন্যাবিদ্যালয় নাই। শুনিলাম নাকি দুই বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কন্যাদের একটি হাই স্কুল ছিল। দুই বৎসর হইল তাহা আনুকূল্যের অভাবে উঠিয়া গিয়াছে। সরকারী যে সাহায্য সেই বিদ্যালয় পাইত তাহা এখন দেওয়া হয় আমেরিকান মিশনের (American Mission) কন্যা-বিদ্যালয়ে। মিশন-বিদ্যালয়টিও যদি শহরের কাছাকাছি হইত তবু কথা ছিল। কিন্তু তাহা শহর হইতে তিন মাইল দূরে আবাস নামক স্থানে। মেদিনীপুরবাসী কন্যাদের তাই সেখানে পড়া-শোনা করাতে বড়ই কষ্ট। গরিব গৃহস্থগণের কন্যারা অর্থাভাবে সেখানে পড়িতেই যাইতে পারে না। বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি মেদিনীপুরে যদি কন্যাদের একটি যোগ্য শিক্ষাস্থান প্রবর্ত্তিত হয়, তবে কন্যাগণের দুঃখে কাতর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেরূপ তৃপ্তি হইবে এমন কি আর কিছুতে হইতে পারে ?

বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-উৎসব যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের অর্থের বা সামর্থ্যের অভাব নাই। এই দিকে যদি তাঁহারা একটু দৃষ্টি দেন, তবে এখানকার একটি মস্ত অভাব দূর হইবে এবং পরলোক হইতে তৃপ্তাত্মা বিদ্যাসাগরের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে।*

* ১৩৩৯, ১৬ ডিসেম্বরে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির-প্রবেশ উৎসবে যোগদান করিবার পরে লিখিত।



সংশোধন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

এ অঞ্চলে ধনঞ্জয়ের বিজ্ঞ-খ্যাতি ছিল। আপদে-বিপদে পরামর্শ লইবার জন্য লোকে দুবেলা তাঁহার চণ্ডী-মণ্ডপে ভিড় জমাইত। জলচৌকির উপর হইতে লাল খেরো-বাঁধানো নাতিবৃহৎ খাতাখানি হাসিমুখে টানিয়া লইয়া ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সুপরামর্শ দিতেন ও আপন দৈনিক অভিজ্ঞতার কথা তাহাতে লিপিবদ্ধ করিতেন। সংসার তাঁহার বড় ছিল না। কিঞ্চিৎ জমিজমার কল্যাণে ও স্কুলমাস্টারি করিয়া তাহা ভাল ভাবেই চলিত।

ইদানীং চাষবাসের অবস্থা মন্দ হওয়াতে চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুবা এক সময়ে তাঁহার খাতার দুই নম্বর উপদেশমালায় লিখিত ছিল:

"পরের দাসত্বই যত অনর্থ বা অসুখের মূল।"

পরে অবশ্য আর্থিক অবস্থা মন্দ হওয়াতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ উপদেশমালার নিম্নরূপ সংশোধন হইয়াছিল:

"কিন্তু সংসারের সুখশান্তি রক্ষার্থে আর্থিক উন্নতির প্রয়োজন আছে। তবে এ চেষ্টা অপ্রবাসী থাকিয়া করাই বাঞ্ছনীয়।"

একমাত্র পুত্রকে বাল্যকাল হইতে কাছে বসাইয়া খাতা খুলিয়া প্রথম উপদেশমালার উপর আঙুল বুলাইয়া বারু-বার আবৃত্তি করাইতেন:

"অঋণী ও অপ্রবাসী না হইলে মানুষের জীবন সুখকর হয় না।"

২

ধনঞ্জয় গত হইলে পুত্র জীবন দেখিল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছাড়া পিতা বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রথম, বিঘা দশেক জমি। সুবৃষ্টি হইলে জোতদারের প্রাপ্য ও জমিদারের খাজনা দিয়া মাসছয়েকের অন্নসংস্থান কোন প্রকারে হইতে পারে। সারা বছর সুশৃঙ্খলে সংসার চালাইবার জন্য পিতা তাহার শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংসারই চলিত, নগদ এক পয়সা জমিত না। জমিবে কি করিয়া? জীবনকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট ব্যয় তিনি করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়, বিধবা ভগ্নী ও জননী।

তৃতীয়, তরুণী পত্নী। ধনঞ্জয় গত হইবার বৎসর খানেক পূর্ব্বে এই শুভকার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং এত অল্পদিনের পাওয়া তরুণী পত্নীর সৌন্দর্য্য-পরিচিতির কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না।

শোকের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে জীবন পিতৃপদ-প্রাপ্তির জন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হইল। কিন্তু এই সময়ে স্কুল-সেক্রেটারীর কোন দূরতম আত্মীয় বি. এ. পাস করিয়া বেকার হইয়া পড়ায় জীবনের এ দাবি টিঁকিল না।

৩

রাত্রিতে রমার সহিত জীবন পরামর্শ করিতে বসিল।

—বুঝলে রমা, দেশ না ছাড়লে অন্ন মেলা কঠিন।

রমা আবদারের ভঙ্গীতে বলিল—এই যে এত লোক দেশে রয়েছেন, তুমি কি বলতে চাও, এঁরা না খেয়ে শুকিয়ে মরছেন?

—তাঁরা একটা না একটা কাজ নিয়ে আছেন।

—তুমিও তাই নাও।

রমার যুক্তিকে কাটিবার জন্য জীবন বদ্ধপরিকর হইল। বলিল—কিন্তু সে-কাজ আমি পারব কিনা—তাও তো দেখতে হবে।

রমা ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল—ইস্,' না পারলেই হ'ল আর কি! তবে বি. এ. পাস করেছ কি করতে?

জীবন মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইল। রমার যুক্তিতে অসারবত্তা যতই থাকুক না কেন জীবনের অর্জ্জিত বিদ্যার প্রতি গৌরব বোধ ত যথেষ্টই ছিল। সামান্ত মানুষ যদি দেশে বসিয়া কায়িক পরিশ্রমে স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিতে পারে, জীবন এ-হেন উচ্চশিক্ষা পাইয়াও কেন বিদেশে যাইবে? কিন্তু অন্তের উপজীব্য কর্ম্মগুলির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া জীবনের মনের আনন্দ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

সে তর্ক তুলিল—ধর, চিনিবাসের মত গরুর গাড়ীর চাকা তো আমি তৈরি করতে পারব না!

স্বামীর পেশী-ক্ষীণ বাহুর পানে চাহিয়া রমা নীরবে শিরশ্চালনা করিল।

—ধর, কেষ্টার মত আগুনের হাপর জ্বেলে ঠনাঠন লোহা পিটতেও পারব না।

শিরশ্চালনে এবারও রমার নীরব সম্মতি পাওয়া গেল।

—কিংবা হরিময়রার মত তাড়ু নেড়ে সন্দেশ তৈরি করতে বা শিঙাড়া-কচুরি ভাজতে পারব না।

রমা এবার ঘাড় নাড়িল না, চোখে ঈষৎ বিস্ময় লাগিয়া রহিল।

জীবন সে বিস্ময়ের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া বলিল—কলেজের শিক্ষা বাইরের জগতের জ্ঞান বাড়ায়, শিঙাড়া-কচুরি ভাজতে শেখায় না, ও শিক্ষা আলাদা।

রমা শুধু বলিল, "তারপর?" বোঝা গেল, ময়রার কার্য্য গ্রহণটিও ঐ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের দ্বারা সে বাতিল করিয়া দিল।

—পারব উড়েদের মত কাঠ চেলাতে, জল তুলতে? রাজমিস্ত্রিদের মত কর্ণিক হাতে করে ঠনাঠন শব্দে ঘর গাঁথতে? না, গোয়ালার মত বাঁক বইতে?

রমা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, না।"

উৎসাহিত জীবন উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল—জেলেদের মত মাছ ধরাও আমার কর্ম্ম নয়। এক দিন জল ঘাঁটলে তার পর দিন ডবল নিউমোনিয়া।

রমার মুখে আতঙ্ক পরিস্ফুট হইল।

—কাদা মেখে কুমোরদের মত হাঁড়ি-সরা তৈরি করা—

রমার আতঙ্কগ্রস্ত মুখের রেখা ঘৃণায় রূপান্তর গ্রহণ করিল। অসমাপ্ত কথার মুখে, 'ম্যাগো' শব্দের দ্বারা এটিও সে বাতিল করিয়া দিল।

—বলতে পার সেকরার কাজ। পরিশ্রম নেই, দিব্যি বসে বসে ঠুকঠাক করা।

রমার মুখচোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঘরের সেকরা হইলে গহনার নিত্যনূতন প্যাটার্নের জন্ত বানি লাগিবে না, মন্দ কি!

জীবন বলিল—এতেও তো কিছু মূলধন চাই। শিক্ষার কথা বাদ দিলাম, না হয় ছমাস ছ-মাস কোথাও কাজ শিখে নিতে পারব, কিন্তু মূলধনের জন্ত তোমার গা খালি করতে হবে হয়ত—

স্বামীর জন্ত এ-ত্যাগ রমার খুব বড় বলিয়া বোধ হইল না। সে বলিল—তা হোক। পসার জমলে এর দুনো গয়না—

জীবন হাসিল—পসার যে জমবেই এমন কি কথা! এই পাড়াগাঁয়েই তো চার জন ভাল সেকরা রয়েছেন, দোকান তাঁদের অনেক দিনের, তবে অনিশ্চিতের পিছনে—

রমা তাড়াতাড়ি বলিল—থাক বাবু সেকরার কাজ, বামুনের ছেলে হয়ে করবে ঠুকঠাক? ছি! একটু থামিয়া বলিল—তার চেয়ে—

—থামলে কেন, বল?

—হয় মাস্টারি, নয় পুরুতগিরি।

—এ-গাঁয়ে মাস্টারি জুটবে না, আগেই বলেছি। আর পুরুতগিরি? জান তো বাবার আদেশ কখনও শূদ্রের বাড়ী যজন-যাজন করবে না। লোকেরই যা অবস্থা, ধর্ম্মকে পয়সা খরচ করে কটা লোক জীইয়ে রেখেছে বল?

—তা হলে উপায়? রমার কণ্ঠে হতাশার সুর।

—উপায় বিদেশ গমন।

—কিন্তু বাবার নিষেধ যে। বলিতে বলিতে রমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল—এক কাজ

কর তাহলে আর তোমায় দেশ ছাড়তে হবে না।

"কি কাজ?" উৎসুক মুখে জীবন প্রশ্ন করিল।

—চাষবাস কর। ভাগে জমি দিলে কতটাই বা ধান ঘরে আসে! মা বলছিলেন কাল যে, তুমি যদি একটু চেষ্টা কর তো কিছু জমি বাড়িয়ে নিয়ে নিজে চাষ-আবাদ করলে—

জীবন ম্লান হাসিয়া বলিল—খুব ভাল কথা। যা বিদ্যে অর্জ্জন করেছি চাষের কাজে না লাগলেও • ও কাজ যে চালাতে পারব না, তা নয়। কিন্তু দেহ? এই পোশাকী দেহে চড়া রোদ আর অবিশ্রান্ত জল সইবে তো? সেবার গ্রীষ্মের বন্ধে মনে আছে? এক দিন জলে ভিজে—'

—না, গো না, তুমি ইস্কুলমাস্টারিই দেখ।

—আহা! তুমি যদি কোন স্কুলের সেক্রেটারি হতে!

—যাও খালি তোমার ঠাট্টা।

জীবন হাসিয়া বলিল—কিন্তু ঠাট্টাই করি আর যাই করি, এই কপালে কি লেখা আছে জান?

—কি?

—প্রবাস বাস।

গ্রীবা বাঁকাইয়া রমা বলিল—বেশ তো, যাও না বিদেশে। কে যেন ওঁকে মাথার দিব্যি দিয়ে থাকতে বলছে এখানে!

ঈষৎ হাসিয়া জীবন বলিল—যেই বলুক, সে যে তুমিও নও—আমিও নই, তা আমরা দু-জনে মনে মনে বেশ জানি।

ক্ষুব্ধস্বরে রমা বলিল—তবে কে?

—বল দেখি কে? মুখ টিপিয়া টিপিয়া জীবন হাসিতে লাগিল।

রমা সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—আর কারও তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই—

ক্রুদ্ধা রমার দুটি হাত নিবিড় আনন্দে পেষণ করিতে করিতে জীবন বলিল—সত্যি রমা, সে মাথা-ব্যথা তোমারও নয়, আমারও নয়। সে মাথাব্যথা আমাদের বয়সের।

"যাও।" বলিয়া বিপরীত দিকে গ্রীবা হেলাইবার পরিবর্ত্তে জীবনের বুকের মধ্যেই সে মাথাটি গুঁজিয়া দিল।

৪

স্বপ্ন আর বাস্তব জগতে চিরকালের সংঘাত। একটি বৎসর এই সংঘাতের মধ্যে কাটিয়া গেল। জীবনদের অবস্থা ক্রমেই নিম্নমুখী হইতে লাগিল। গুটি দশেক ছেলেকে সে বাড়ীতে পড়াইত। আরও গুটি দশেক ছাত্র হইলে মন্দ হইত না, কিন্তু সময় কোথায়? পাড়াগাঁয়ে টিউশনিতে যে পাইকারী রীতি প্রচলিত আছে, প্রথমটা তাহা গ্রহণ করিতে তাহার কিছু দ্বিধা ছিল। কিন্তু বেতন তাহাকে পাইকারী রীতিতেই লইতে হইত। যে কোন ক্লাসের ছাত্রকে দৈনিক দুই বা তদূর্দ্ধ ঘণ্টা পড়াইবার জন্য দেড় হইতে দুই টাকা পারিশ্রমিক লইয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট হইতে হইত। না হইলে, প্রতিযোগিতার বাজারে ছাত্র-দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য।

প্রথম যখন সে টিউশনি গ্রহণ করে তখন জনৈক অভিভাবকের সহিত নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল:

—দেখুন, আমি ভেড়ার গোয়াল বসাব না বাড়ীতে। পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেব ছাত্রদের যাতে তারা ভাল ভাবে পাস করতে পারে।

অভিভাবক বলিয়াছিলেন—তা শিক্ষে আপনি যাই দিন, পাস করতে পারলেই হ'ল। পাসের আন্নায় ভাল মন্দ কি! একটা চাকরি পেলেই হ'ল। মাইনে? থার্ড কেলাসে যদু মাস্টারকে দিতাম, দেড় টাকা। এবার এক কেলাস উঠল, না-হয় আর চার গণ্ডা পয়সা ধরে দেব।

—দেখুন বিদ্যাশিক্ষা শাক-বেগুনের দরের মত কচলাকচলি ক'রে হয় না।

অভিভাবক রাগ করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন, আর আসেন নাই, অন্যত্র তিনি দেড় টাকাতেই মাস্টার পাইয়াছিলেন। এক দিন জীবনকে পথে পাইয়া শুনাইয়া দিয়াছিলেনও—হাঁ, কপালে যার লোকসান নেই,

তারে অন্ন মারে কে! মাসে চার গণ্ডা পয়সা—মন্দ কি!

ঠেকিয়া জীবনকেও শিখিতে হইয়াছিল। ফলে, বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে দশ-বারটি ছাত্র লইয়া সকাল বৈকাল তাহার পাঠশালা বসিত। বিভিন্ন কণ্ঠের কর্ণ-বিদারক ধ্বনিতে দেবী বীণাপাণির হয়ত প্রাত্যহিক কর্ম্মের কিছু ব্যাঘাত ঘটিত, কিন্তু ছাত্রের অভিভাবকবৃন্দ সেই ধ্বনি-মাধুর্য্যে পুলকিত হইয়া উঠিতেন। মাহিনাটা রেট ছিল কিন্তু পাইকারী।

৫

বর্ষার প্রকোপ এবার বেশী, এবং সংস্কার অভাবে চালের ছিদ্রও বাড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীর মধ্যের ঘর দুখানিতে খুঁচি দিয়া লইলেও চলে, কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের আমূল সংস্কার চাই। জলে ভিজিয়া তো ছাত্রেরা মাস্টারের কাছে পাঠ লইতে আসিবে না, নিরুপায়ে রমা হাতের শেষ সম্বল রুলি দুগাছি খুলিয়া দিয়াছে। রুলি খুলিয়া দিয়া ত্যাগের মহিমায় তাহার কচি মুখ-খানির জ্যোতি যে বাড়িয়া গিয়াছে এমন নহে। জীবন তো সেকরার দোকান খোলে নাই, ছাত্র পড়াইতে বসিয়াছে। বর্ষাও বর্ষশেষে আবার আসিবে; পুরাতন খড়ও রৌদ্রবৃষ্টির অত্যাচারে কালো ও ভঙ্গুর হইবে। হস্তান্তরিত রুলি যে আবার সুকোমল করের শোভাবর্দ্ধন করিবে, সে আশা কম।

কিন্তু রুলির দুঃখে নহে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই এক দিন রমা বলিল—হ্যাঁ গা, আসছে বার যদি চাল ছাওয়াতে হয়, তখন কি করবে? কোথায় পাবে টাকা?

পরম নিশ্চিন্ত মনে জীবন বলিল—এ বছর ছাওয়ালাম, বছর দুই আর ওতে খরচ করতে হবে না।

তথাপি কৌতূহলাক্রান্ত স্বরে রমা প্রশ্ন করিল—বছর দুই পরে টাকা কোথায় পাবে?

জীবন ম্লান হাসিয়া বলিল—বছর দুই পরের কথা আজ ভেবে কি লাভ বল? তখনও কি আমার অবস্থা এমন থাকবে?

"কে জানে!"—মুখ ঘুরাইয়া রমা বলিল, "আকাশ থেকে তো টাকার বৃষ্টি হবে না, পাতাল ফুঁড়েও উঠবে না। এই ত ছেলে পড়ানো পয়সা, তখনই বা পাবে কোথায় শুনি?"

—রমা, তুমি যে এই দেড়বছরে এতটা হিসেবী হয়ে উঠেছ তা জানতাম না।

—বেশ, গো, বেশ। ভাল কথা বললাম, না হিসেব-নিকেশ আনলে! কোত্থেকে টাকা আসবে শুনি?

জীবন বলিল—দেশে না উপায় করতে পারি বিদেশে যাব।

—পারবে বিদেশে যেতে?

—কেন পারব না, তোমরা যদি হাসিমুখে যেতে বল—

—ইস, বাবুর—অভিমান দেখ। কেন, কলকাতা কি ন-মাস ছ-মাসের পথ যে হাসিমুখে 'যাও' বলতে পারি না। ভারি ত দূর, দিনে দুবার যাওয়া-আসা চলে!

—আপিস করলে তো যাওয়া-আসা চলবে না, সেখানে থাকতে হবে।

—থাকবে সেখানে। শনিবার শনিবার ও-বাড়ীর ঠাকুরপো যেমন বাড়ী আসেন, তেমনি আসবে।

জীবন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল না। দীর্ঘনিশ্বাসকে সংক্ষিপ্ত করিবার বয়স ও অভিজ্ঞতা দুই-ই তাহার জন্মিয়াছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিল—কিন্তু বাবার আদেশ অমান্য করি কি করে।

রমা গ্রীবা হেলাইয়া বলিল—বাবার খাতা বুঝি আমি দেখি নি? তিনি প্রথমে কি লিখে রেখেছিলেন দু-নম্বর উপদেশমালায়? 'পরের দাসত্বই যত অনর্থের যত অসুখের মূল।' তার পর লিখেছেন, 'কিন্তু সংসারের সুখশান্তি রক্ষার্থে আর্থিক উন্নতির প্রয়োজন আছে।'

জীবন বলিল—তার পর লেখা আছে,—'তবে ও চেষ্টা অপ্রবাসী থাকিয়া করাই বাঞ্ছনীয়।

রমা বলিল—তাই তো তোমায় এত দিন বিদেশে যেতে দিই নি।

জীবন বলিল—না তা নয়। আমার বিদেশ না যাবার মূলে বাবার উপদেশ ছিল উপলক্ষ্য মাত্র, আসল হেতু বয়স।

লজ্জায় লাল হইয়া জীবনের বুকে মাথা গুঁজিবার পরিবর্ত্তে রমা সশব্দে হাসিয়া উঠিল। মাথা দোলাইতে দোলাইতে বলিল—আজ তবে যেতে দিচ্ছি কেন?

—প্রথম অভাব আর্থিক, দ্বিতীয় অভাব—

—কি?

—ওই বয়স। সে তো আর কমছে না।

রমা লজ্জায় মুখ নামাইয়া বলিল, "যাও।"

জীবন তাহার একখানি হাত ধরিয়া অল্প দোলা দিতে দিতে বলিল—যাবই তো। তবে যাবার আগে বাবার উপদেশমালার আর একটু সংশোধন ক'রে দিতে চাই। আন তো দোয়াত-কলম।

রমা কৌতুকভরে দোয়াত-কলম আনিয়া দিয়া বলিল—কিন্তু বেশী সংশোধন করতে হবে না মশাইয়ের।

—না গো, না। আজকালকার দিন হচ্ছে কথা-সংক্ষেপের দিন—অবশ্য লেখার, বলার নয়। ছোট্ট একটি আদি অক্ষর তুলে দেব ঐ উপদেশমালা থেকে।

বলিয়া লাল কালির টান দিয়া একটি অক্ষরে দাগ দিয়া জীবন হাসিল।

রমাও হাসিতে হাসিতে পড়িল "কিন্তু সংসারের সুখশান্তি রক্ষার্থে আর্থিক উন্নতির প্রয়োজন আছে। তবে এ চেষ্টা প্রবাসী থাকিয়া করাই বাঞ্ছনীয়।"

৬

স্বপ্নজগতের স্বরূপ মা, বোন, রমা এবং জীবন বহুদিন হইতেই উপলব্ধি করিতেছে, সুতরাং বিদেশ গমনের দিন ভাবদুর্ব্বল মুহূর্ত্তগুলিতে তেমন প্রাণসঞ্চার হইল না। স্বপ্নজগতের ভগ্নাংশ প্রাণে একটি সূক্ষ্ম বেদনার রেশ ধ্বনিত করিয়া তুলিল, বাস্তব জগতের অনাগত আশা উজ্জ্বল আলোকে বাহিরটা পরমুহূর্ত্তেই ঢাকিয়া দিল। জীবনের আস্বাদ—শুধু ঘরের স্মৃতি নহে, পথের মায়াও দিতে জানে।

তখন চাকুরির বাজারে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয় নাই—পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। জীবন স্বক্ষেত্রে শিক্ষকতাই একটি জুটাইয়া লইল। মাসিক মাহিনা চল্লিশ টাকা, পরে উন্নতির আশা আছে। বাড়ীতে ঘটা করিয়া দেবদেবীর পূজা দেওয়া হইল। বর্ষার-জলধারাকে ভয় করিবার অবস্থা জীবন কাটাইয়া উঠিল।

৭

শনিবার রাত্রিতে হাসিমুখে রমা জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছ?

হাসিমুখে উত্তর দিল—ভাল।

—একটু রোগা হয়ে গেছ।

—আর?

—একটু ফরসাও হয়েছ।

—আর?

—যাও, আর জানি না। কিন্তু এই পুলকমিশ্রিত লজ্জা ক্ষণিকের। পরমুহূর্ত্তেই মুখ তুলিয়া রমা বলিল—আমায় কেমন দেখছ বল তো?

—একটু মোটা।

রমা একটু ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—আর?

—আর একটু কালো।

রাগ করিয়া রমা তক্তাপোষ হইতে উঠিতে গেল, টপ করিয়া জীবন তাহার হাত ধরিয়া বলিল—কিন্তু ফরসা হবার ওষুধ আমার কাছে আছে, দেখবে?

—না, যাও, তোমার খালি ইয়ে—

—সত্যি ইয়ে নয়। এই দেখ। সাবানের বাক্সটা জীবন তুলিয়া দেখাইল।

বর্ষাকালের রৌদ্র-মেঘের মত রমার মুখে আলো-ছায়া ফুটিয়া উঠিল। কহিল—ছিঃ, সাবান মাখব কি করে! লজ্জা করবে না বুঝি?

—সবাই যা মাখে—তাতে তোমারই যত লজ্জা? আর কি এনেছি জান?

—আবার কি?

কাপড়ের বাণ্ডিল খুলিতে খুলিতে জীবন বলিল,—তোমার জন্য একজোড়া ফুলপাড় শাড়ী আনলাম।

উৎফুল্ল স্বরে রমা বলিল—বাঃ, চমৎকার পাড় তো! মা আর ঠাকুরঝির জন্যে না আনলে তো ও কাপড় আমার পরা হবে না।

—ভয় নেই, সে জ্ঞান আমার আছে। এই ওঁদের কাপড়—

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে রমা বলিল—সব ক'টি টাকাই বুঝি খরচ করে বসলে ?

—করলামই বা। কিছু দিলাম দেবতাকে, কিছু বা মানুষকে। শ্রদ্ধা আর ভালবাসা কোনটাকেই তো খাটো করা যায় না।

রমা হাসিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল ? শহরে গিয়ে কথায় যেন আরও শান দিয়ে এনেছ।

৮

মাস ছয়েক পরে আর একটি রাত্রিতে জীবন বলিল—একটু চা কর তো, রমা। বড় ম্যাজ-ম্যাজ করছে শরীরটা।

রমা সাতঙ্কে জীবনের কপালে হাত দিয়া বলিল—কপালটা যেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে।

—উঁহু, চায়ের নেশা বুঝছ না।

—রোজই চা খাওয়া হয় বুঝি কলকাতায়। সকাল বিকেল দু-বেলাই ? তাই ভাত খেতে পার না।

জীবন বলিল—তোমাকেও চা তৈরি করা আর চা খাওয়া শিখিয়ে দিয়েছি তো।

—আমার খাওয়া এই শনিবার আর রবিবার সন্ধ্যায় যা।

—কেন, চা, চিনি, দুধ সবই তো মজুত ঘরে, কেন ক'রে খাও না ? সময় নেই বুঝি ? তবে ? লজ্জা ? তা বলছি ম্যাকে—

—চুপ। যখন বাসায় নিয়ে যাবে তখন দু-বেলা না-হয় তোমার সঙ্গে চা খাওয়া যাবে।

—তোমার শহরে বাস করতে সাধ হয় তাহলে ?

—কেন হবে না! তোমার মুখে গল্প শুনে শুনে শহরের পথ-ঘাট, থিয়েটার-বায়স্কোপ, দোকান-পসার সমস্ত আমার মুখস্থ গো।

—বটে! আচ্ছা বল দেখি মনুমেণ্ট কোথায় ?

—ইস, মাস্টারি আরম্ভ হ'ল! দাঁড়াও আগে চা করে আনি, তার পর একজামিন ক'রো। পাস যদি না করতে পারি তখন—

জীবন বলিল—দাঁড়াও। একটা খুব ভাল প্রাইজ তোমায় দেব তখন। চমৎকার প্রাইজ।

চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল দুই জনের। বাহিরে অন্ধকার রাত্রি। জানালার বাহিরে নক্ষত্রখচিত আকাশের পরিপূর্ণ রূপে সেই অন্ধকার ঘনীভূত। মনের মধ্যে পূর্ণিমার অবারিত আলোই তো বাহিরের অন্ধকারকে ভালবাসিবার শক্তি দেয়।

চকচকে ভেলভেট-কেস হইতে এক জোড়া নূতন প্যাটার্নের সুদৃশ্য রুলি বাহির করিয়া জীবন বলিল—এই তোমার প্রাইজ। দেখি হাত।

অনুজ্জ্বল প্রদীপের আলোয় রমার মুখ ও রুলির পালিশ চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল।

৯

আরও কিছুদিন পরে—জীবন এক দিন বলিল—বছর বছর ঘর মেরামতিতে অনেক টাকা খরচ হয়, মনে করছি, দুখানা কোঠা ঘর তুলব।

রমা বলিল, 'ঘর তুলতে অনেক খরচ যে।'

জীবন বলিল—খরচ এক বারই হবে, বার-বারের ভোগান্তি থেকে তো বেঁচে যাব। মা কি বললেন শুনে ?

—তুমি দেবে টাকা ওঁর আপত্তি হবে কেন। তবে বলছিলেন কি, ও তো চাকরি নিয়ে বিদেশে রইল, ভাগীদার কবছর থেকে ধানের ভাগ কমিয়ে দিয়েছে।

জীবন বলিল—বলেছিলাম মনিরুদ্দিনকে সে-কথা। বলে, দেখছেন তো বাবু, জমির তেজ কমে আসছে; আগে যেখানে বিঘে প্রতি দশ মণ ধান পেয়েছি, এখন সেখানে ভাল বৃষ্টি হ'লেও ছ-মণের বেশী হয় না।

—জমিতে কেন সার দিক না।

—তা না দিলে ঐ ছ-মণ ধানও জন্মাত নাকি! কাগজেও সেদিন পড়ছিলাম—বাংলার জমি দিন দিন অনুর্ব্বর হয়ে পড়ছে। মনে করেছি বিক্রী করে দেব জমি। মিছিমিছি ঘর থেকে খাজনা টেনে মরি কেন! ঐ টাকাতে বরং ঘর দুখানা তুলে ফেলি।

—মা কিন্তু রাজী হবেন না।

—বোঝাতে হবে তাঁকে।

১০

নূতন ঘর ও কোলে ফালি বারান্দায় বাড়ীখানির শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। জমি-বিক্রয়ের টাকাতেই প্রায় সব কুলাইয়া গিয়াছে, ধার যৎসামান্ত চূণের দোকানে ও ইটের জন্ত আছে। জীবন হিসাব করিয়া দেখিয়াছে মাস-মাস কুড়ি টাকা কিস্তিবন্দী করিলে ছয়-সাত মাসে ও-টাকাটা শোধ হইয়া যাইবে।

রমাকে সে প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল—আর মেরে কেটে সাতটা মাস, তার পর—

রমা মাথা হেঁট করিয়া পুলকমিশ্রিত মৃদুকণ্ঠে বলিল—না গো মশাই, সাত মাস পরেও একটা মোটা রকমের খরচ আছে তোমার।

বিস্মিত কণ্ঠে জীবন বলিল, "কিসের খরচ?" পরক্ষণেই স্বাস্থ্যবতী রমার লজ্জারক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিল—সাবান মেখে মেখে দেহের রং তো তোমার দিব্যি ফুটফুটে হয়েছে—যেন গণেশ-জননী।

রমা বলিল—যদি মেয়ে হয়?

—উঁহু, কক্ষণো না। তাহলে রং তোমার এত ফরসা হ'ত না। মুখে চোখে এত শ্রী খুলত না।

—যাও, কি যে বক। প্রদীপের আলোয় সলজ্জা রমাকে দেবীপ্রতিমার মতই মনে হইতেছে।

মুগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া জীবন বলিল—নতুন ঘর হ'ল, আসছে নতুন অতিথি, খরচ তো আমায় করতেই হবে, রমা।

—না, ধার তুমি করতে পারবে না। রমা মিনতি-ভরা অনুনয়ে জীবনের দুটি হাত চাপিয়া ধরিল।

জীবন হাসিয়া বলিল—যে-ধার শোধ হয় না তাকেই বলতে পার ধার, যাতে কষ্ট, তাই মৃত্যু। এ নিয়ে এখন থেকে মন খারাপ ভাল নয়, রমা।

১১

টাকা ধার করিয়া জীবন ঘটা করিয়াই ছেলের অন্নপ্রাশন দিল। চারি দিক জীবনের সুখ্যাতিতে ভরিয়া উঠিল। হাঁ, কৃতী সন্তান বটে। সার্থক বিদ্যাশিক্ষা জীবনের। রমার মনেও আকাশ-কুসুম ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এক দিন সে জীবনকে বলিল—দেখ, তোমার ছেলেকে কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে ফেলে রাখতে পারব না। যত দূর পারা যায়, ওকে শহরে রেখে লেখাপড়া শেখাব আমি।

জীবন বলিল, "নিশ্চয়ই।"

রমা বলিল—তুমি কিন্তু এখনও কৃপণ রয়ে গেছ।

—কেন?

—শহরে বাসা করবার কথা হ'লেই চুপ ক'রে থাক। সবাই তো আজকাল বাসায় থাকেন। না হ'লে এই যে কত কষ্ট ক'রে বারো মাস খাটছ, এতে লাভ? শরীর তো তোমার আধখানা হয়ে গেছে।

একটু হাসিয়া বলিল—যা শুনি খাওয়ার কথা, মেস হোটেলে মানুষ কখনও ছাইভস্ম খেয়ে থাকতে পারে!

—থাকে তো হাজার হাজার মানুষ।

—যাঁদের উপায় নেই, তাঁরা থাকুন। তোমায় আমি থাকতে দেব না।

—আমি বাসা করলে মার মনে কষ্ট হবে না?

—বাঃ রে, মা-ই তো দুবেলা আমায় সে-কথা বলেন, আগে তোমার শরীর, না আগে টাকা?

—আচ্ছা, আর দুটো মাস যাক। দেনাটা শোধ হোক।

—দেনা-দেনা করেই গেলে। চাকরি যখন রয়েছে, তখন দেনা শোধ হবে হেসে খেলে।

১২

দেনা শোধ হইবার অবকাশ মিলিল না। মা এক দিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং দিন সাতেক রোগ ভোগের পর দেহরক্ষা করিলেন। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড হইতে নূতন ঋণ লওয়া সম্ভব হইল না। বাড়ীর দলিলখানি বন্ধক দিয়া জীবন মাতৃদায় উদ্ধার হইল।

মা দেহরক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বাস করিবার সমস্তাটা জটিল হইয়া উঠিল। অল্পবয়সী বধূ ও বিধবা বোন ছোট্ট একটি খোকা লইয়া সপ্তাহের ছয়টি

দিন কি করিয়া যে ভয়ে দুর্ভাবনায় কাটায়—জীবন বাড়ী আসিয়া এক দিনেই তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভয়াবহ খুঁটিনাটি-গুলি স্তব্ধ হইয়া শোনে। শোনে আর রক্ষকবিহীনা ঐ দুটি নারীর অনাগত বিপদ-আপদ লইয়া মাথা ঘামায়। সত্য বটে দেহধারণে মানুষ নীরোগ হইবার আশা পোষণ করে না, কিন্তু এক দিন অতর্কিতে খোকার বা রমার জীবনসঙ্কট পীড়ার বার্ত্তা বহিয়া যদিই জরুরি তার আসে? যদি বিধবা বোনের কোনরূপ মর্য্যাদাহানিকর সংবাদই সে পায়? গ্রামে গ্রামে দুর্বৃত্তদের হাতে নারী-লাঞ্ছনার সংবাদ তো নিত্য সংবাদপত্রে বাহির হইতেছে! রমার সব আশঙ্কাগুলিই তো অমূলক বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। অন্ধকার রাত্রিতে ঘরের কানাচে শুষ্ক পাতার উপর ব্যাঙ লাফাইবার বা কুকুর শেয়াল চলিবার দরুন যে খড় খড় শব্দ হয়—তাহা না-হয় ভীরু মনের প্রতিধ্বনি; ঝাঁকড়া গাছে জ্যোৎস্নার টুকরাকে ঘুমন্ত চোখে সহসা দেখিলে প্রেতভ্রমে আঁতকাইয়া উঠাও বিচিত্র নহে; কিন্তু গ্রামে আজকাল যে চুরি-ডাকাতি হইতেছে বা সেদিন উত্তরপাড়ায় ঐ যে অষ্টাদশী মেয়েটি বীভৎস ভাবে খুন হইয়া গেল—তাহার ক্রমবর্দ্ধমান আতঙ্ককে ঠেকাইবার যে কোন উপায়ই নাই। মুখের সাহসে আর কতটুকু হয়। যে উড়ে চাকরটাকে দুটি টাকা দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে রাত্রিতে শোয়ানো হইতেছে, লোভের মুখে সে-ই যদি কোন দিন বিশ্বাসঘাতকতা করে?

এমনই করিয়া এক একটি মাস যায় আর ভাবনায়, আতঙ্কে জীবন প্রবাসে থাকিয়াও শান্তি পায় না। বলিতে গেলে যে-দেনা সে করিয়াছে তাহা পরিশোধ হইতে কয়েকটি বৎসরই লাগিবে। আরও যে ভবিষ্যতে দেনার পরিমাণ বাড়িবে না—তাহাই বা কে বলিবে? বিদেশের বাসা, খাওয়া-পরা ছাড়া—ডাক্তার-বৈদ্যের খরচই যে কত হইবে কে জানে, জীবন বাস্তুখানির উদ্ধার করিতে পারিবে কি না?

বাড়ীর পাশেই এক দিন ডোমেদের এক বিধবা মেয়েকে দুর্ব্বৃত্তেরা কোথায় লইয়া গেল, দেশে অজন্মার সঙ্গে সঙ্গে চুরির সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। রমা ত্রস্তা হরিণীর মত জীবনের গা ঘেঁষিয়া গল্প করিতেছিল।

—ভগবান জানেন, আমাদের অদৃষ্টে বা কি আছে! হাঁক দিলে একটা লোকও তো এদিকে উঁকি দেয় না।

জীবন শুষ্ককণ্ঠে বলিল—বাসা আমি ঠিক ক'রেই এসেছি, রমা। দিন দুই ছুটিও নিয়েছি—সব গুছিয়ে নাও।

যে পরিমাণে রমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সেই পরিমাণেই জীবন ভিতরে ভিতরে শুকাইয়া উঠিল।

বহুদিনের সাধ আজ তাহার পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু ঋণের ঝঞ্ঝা ও অন্ধকারে সেই নিবু-নিবু দীপশিখাটিকে বুঝি আর বাঁচাইয়া রাখা যায় না!

গভীর রাত্রিতে জীবনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে; আলো পড়িয়াছে রমার ঘুমন্ত মুখে ও তাহার বক্ষোলগ্ন শিশুটির সুঠাম গৌর অবয়বে। মায়ের বুক ঘেঁষিয়া গভীর শান্তিপূর্ণ ঘুমে দেবশিশু মগ্ন, রমার ঠোঁটে পরিতৃপ্তির পাতলা হাসিটুকু লাগিয়া আছে। ওরা কল্পনার শিশু, কল্পনার দোলায় দুলিতে দুলিতে মধুর সব স্বপ্ন দেখিতেছে। জ্যোৎস্নার অন্তরালে রূঢ় যে বাস্তব জগৎ তাহা বুঝি নিদ্রাহীন জীবনের চোখেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে! অস্থির ভাবে সে উঠিয়া বসিল ও পিতার উপদেশমালার খাতাখানি টানিয়া লইয়া ম্লান প্রদীপটি উস্কাইয়া দিয়া পাতা খুলিতে লাগিল।

প্রথম উপদেশমালার লেখাগুলি তাহার মুখস্থ: 'অঋণী ও অপ্রবাসী না হইলে মানুষের জীবন সুখকর হয় না।' হাত বাড়াইয়া কলম লইতে গিয়া তক্তাপোষের কোণে খোঁচা লাগিয়া হাত কাটিয়া গেল। হাতের যন্ত্রণা বিশেষ নাই, কিন্তু অল্প অল্প করিয়া রক্ত গড়াইতে লাগিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া দোয়াতে সে কলম ডুবাইল। বহুদিনকার অব্যবহৃত দোয়াতে কালির লেশ মাত্র ছিল না। অধীর আগ্রহে জীবন চঞ্চল হইয়া উঠিল;—এই মুহূর্ত্তে লেখার পরিবর্ত্তন যে চাই। কোথায় কালি? প্রদীপের আলোয় হাতের রক্তরেখা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, জীবনের সমস্যাও অমনি মিটিয়া গেল।

বহু যত্নে সে লিখিল:

'ঋণী ও প্রবাসী না হইলে মানুষের জীবন ধারণ বর্ত্তমানে অসম্ভব।'

আমাদের দেশের সিনেমা-সমস্যা

শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর মিত্র

বড়দিনের সময় কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথে আলোকোজ্জ্বল সিনেমাগৃহসমূহ এবং ছায়াচিত্রোপভোগী জনতাকে লক্ষ্য করিলে সন্দেহ হয় বাংলা দেশ কি সত্যই দরিদ্র! শুনিয়াছি কলিকাতায় সিনেমার টিকেট কিনিতে গিয়া ভিড়ের চাপে মানুষের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে, মূর্চ্ছা তো প্রায়ই হয়। এই ভিড়ের উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—দু-এক ঘণ্টার জন্য রুদ্ধ-গৃহে পর্দার উপরে একটি উপন্যাসের চলন্ত তর্জমা নিরীক্ষণ করা। ইহারই জন্য অনেকে সপ্তাহে দুই-তিন দিন করিয়া চার আনা হইতে দুই বা ততোধিক টাকা ঢালিতেছেন কিন্তু ইহার বিনিময়ে পাইতেছেন কি? একটু আমোদ মাত্র। তাহাও নির্দ্দোষ আমোদ নহে।

এই অর্থক্ষয় ইত্যাদির পরিবর্ত্তে সিনেমা হইতে আমরা পাইতেছি কি? লাভযোগ্য কিছুই নহে। শিক্ষাপ্রদ চিত্র প্রায় নাই বলিলেই চলে। সমস্তগুলিই নভেলি প্লট্। এই চিত্রগুলির আখ্যানবস্তু এতই অস্বাভাবিক যে এইগুলির সম্বন্ধে দু-একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই সব চিত্রগুলিতে প্রেম বা কামনার স্থান-কাল-পাত্র নাই—যেখানে সেখানে রোমান্‌স্ (romance) চলিতেছে—যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই পরিধান করিতেছে এবং যেখানে সেখানে একটি গান জুড়িয়া দিলেই হইল। যুবক-যুবতীরা পর্দার উপর এই সকল যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা আগ্রহসহকারে দেখিয়া তাহাদের "প্রগতি"র পথ পরিষ্কার করিতেছে। বস্তুত বাংলার সবাক্ চিত্রে যাহা ঘটিতেছে বাঙালীর পারিবারিক জীবনে তাহা ঘটে না। সিনেমায় যে উচুদরের সাহিত্য সৃষ্টি হইবে তাহা অবশ্য আমরা আশা করি না। আমরা এ-কথা জানি যে, সিনেমা সর্ব্বসাধারণের জন্য—সুতরাং সেখানে উচুদরের সাহিত্য সৃষ্টি হয় না - কিন্তু এই ধরণের অস্বাভাবিকতা কেন? এইরূপ কুৎসিত প্রেমের কাহিনী কেন? বিদেশীয় পরিচ্ছদাদির এইরূপ অপটু নকলই বা কেন? আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দর্শকগণ এই সকল বিষয় সম্বন্ধে জোর করিয়া কোন প্রশ্নই তোলেন না—কেহ কেহ হয়তো তুলিয়াছেন, কিন্তু তাহা পরিচালকবর্গ এক কানে শুনিয়া অপর কান দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন।

বিদেশী চিত্রের মধ্যেও যাহা ভাল তাহা আমাদের দেশে খুব বেশী আসে না, কিন্তু ফিল্‌ম্ বহু আসে এবং এই সকল বাজে ইংরেজী চিত্র দেখিতে দর্শকগণ বিনাদ্বিধায় বিদেশীয়গণের হাতে ঘরের পয়সা তুলিয়া দেন। এই সব সবাক চিত্র দেখিয়া কোনরূপ উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। সিনেমা-ফেরৎ ব্যক্তিগণ আলোচনা করেন কাহার পার্ট কিরূপ হইয়াছে বা কাহার মেক্-আপ্ কিরূপ, কিন্তু আর একটু গভীরভাবে অনেকেই ভাবেন না—যাঁহারা ভাবেন তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসেই এক বার দুই বার করিয়া সিনেমা দেখিতে ছোটেন না। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, সিনেমা দেখিতে যাই একটু আমোদের জন্য, তাহার আবার অত শত কি? কিন্তু মন্দের প্রভাব যে সমাজের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর তাহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন কি?

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। এই দুর্ভাগ্যের দৃষ্টান্ত চোখের উপর দেখিয়াও কিরূপে যে এই উৎকট সিনেমা-প্রীতি অবিচল রহিয়াছে তাহা ভাবিতে পারা যায় না। ইহা হইতেই বোঝা যায় দেশের বহুসংখ্যক লোক এখনও নিজের এবং সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই সম্পর্কে সিনেমা-ব্যবসায়ীদের দোষ দিলেই চলিবে না—কেন না লোকে যাহা চাহিবে তাঁহারাও তাহাই চালাইবেন—সকলেই নিজের লাভের উপায় দেখেন, দোষ দর্শকবৃন্দের। তাঁহারাই প্রতিদিন নিজের লজ্জাকর অজ্ঞতা এবং শোচনীয় রুচির পরিচয় দিতেছেন। সিনেমাদ্বারা কত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু তাহার প্রায়

কোনটাই এ পর্য্যন্ত হইতেছে না। কেবল কতকগুলি বিরক্তিকর উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র ছাড়া আর কিছুই বাহির হইতেছে না। হইবেই বা কিরূপে? তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষাপ্রদ এবং সুমার্জ্জিত চিত্রের জন্য জোরের সহিত আবেদন করেন না, তাঁহারা উহাতেই সন্তুষ্ট।

যাঁহারা নিয়মিত সিনেমা দেখেন তাঁহাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ছাত্রদের মধ্যে এই নেশা আশ্চর্য্যভাবে শিকড় বাঁধিয়াছে। আমি কলিকাতায় একটি প্রধান ছাত্রাবাসে থাকিয়া পড়াশুনা করিতাম। ঐ ছাত্রাবাসটি একটি বহির্ভারতীয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং তাহাতে ধনীসন্তান অনেকেই বাস করিতেন। দেখিয়াছি হোস্টেলের নিয়মানুসারে সপ্তাহে এক বার করিয়া রাত্রি নয়টার পর সিনেমা কিংবা নিমন্ত্রণের জন্য ছাত্রদিগকে বিনা কৈফিয়তে ঘণ্টাতিনেকের জন্য ছুটি দেওয়া হইত এবং বহু ছাত্র উহার সুযোগ লইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে রাত্রি জাগরণ করিয়া নয়ন-মন সার্থক করিতেন। ইহাকে তাঁহারা আভিজাত্যের একটি অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। যে সব হোস্টেলে এই সব ব্যবস্থা নাই সেখানে দরোয়ানকে ঘুষ দিয়া ছাত্রগণ কার্য্যোদ্ধার করেন। মেসে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের কোন বালাই নাই। কেন এইরূপ করেন, জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্রগণ কি বলিবেন? বলা বাহুল্য, প্রশ্নকর্ত্তাকে 'আন্‌-এন্‌লাইটেন্‌ড' এইরূপ বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিবেন। দেশের উন্নতি নির্ভর করে ছাত্রদেরই হাতে। তাঁহারা যদি অযথা এইরূপে টাকা-পয়সার অপব্যয় করেন তাহা হইতে অধিকতর আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? শুধু তাহাই নহে তাঁহাদের শিক্ষার সঙ্গে রুচির বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য বি-এ, এম্‌-এ ক্লাসে পড়িতেছেন তাঁহারা কি করিয়া এই কুরুচিপূর্ণ চিত্রগুলি দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন? আমাদের মনে হয় এই সবাকচিত্রগুলি সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়া দর্শকবর্গকে ও পরিচালকবর্গকে এই ক্ষতিকর কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে বলিবার সময় আসিয়াছে। সিনেমাদ্বারা দেশের অনেক উন্নতি হইতে পারে। আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, দর্শকগণ নভেলী প্লটের চিত্র ছাড়িয়া শিক্ষাপ্রদ চিত্রের জন্য আবেদন করুন। তাহা হইলে পরিচালকবর্গ ও দর্শকগণ উভয়েই লাভবান হইবেন।

সিনেমা দেখিবার এই উৎকট নেশা যে কিরূপ পাইয়া বসিয়াছে তাহা আমরা অনেকেই চোখের সম্মুখে দেখিতেছি। মফঃস্বলের শহরগুলিতে এই নেশা অধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রায় প্রত্যেক মফঃস্বল সহরে এমন কি অনেক গ্রামেও আজকাল একটি কিংবা দুইটি চিত্রগৃহে সিনেমা চলিতেছে। শহরগুলির চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির অনেক দরিদ্র কৃষক প্রলোভনে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অনেক বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত ছোট ছোট স্বর্ণদ্রব্য বন্ধক রাখিয়া সিনেমা দেখিতেছেন। ছাত্রছাত্রীদের মানসিক অবনতি তো অনেকেই লক্ষ্য করিতেছেন। কতকগুলি বিখ্যাত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা অভিনেত্রীদের অশোভন চিত্র প্রকাশিত করিয়াও কুরুচির প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমাদের দেশের সিনেমা আমাদের সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিত্রগুলি আমাদের সংস্কৃতিকে অপমানিত করিতেছে। সেদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখিলাম এক জন চিঠি লিখিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলি সবাকচিত্রে যেখানে সেখানে যথেচ্ছভাবে গাওয়া হইতেছে। আমি একটি বিখ্যাত বাংলা চিত্র দেখিতে গিয়াছিলাম—তাহাতে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের একটি সুবিখ্যাত গান সংযুক্ত করা হইয়াছে একটা জঘন্য মাতালের অভিনয়াংশে এবং স্থানটা একটা মদ্যশালা—তাহারই মধ্যে গায়ক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক মর্য্যাদাকে রক্ষা করিতেছেন। আমরা এই দিকে কবিবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমরা অবশ্য সিনেমার বিরোধী নহি। চিত্র ভাল হইলে তাহা দেখিব না কেন? অভিযান, ভ্রমণ-চিত্র প্রভৃতি আমরা আনন্দের সহিত দেখি—উহাতে আমাদের নানা রূপ জ্ঞানও হয়। কিন্তু তাই বলিয়া প্রতিসপ্তাহে নির্বিচারে যে কোন চিত্র দেখা উচিত নহে। যাঁহারা ঐরূপ সিনেমা দেখেন, তাঁহাদের রুচি বলিয়া কোন পদার্থ নাই এবং আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তি একেবারে অল্প নহে বলিয়াই এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

দৈহিক শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রায়ই দেখা যায় যে, সময় নাই অসময় নাই, দেশপ্রেমিক হউন বা না-হউন, বক্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকুক আর নাই থাকুক, প্রত্যেকেই তাঁহার দেশবাসী বালকবালিকা, তথা যুবক-যুবতীদের, দৈহিক চর্চ্চায় মন দিতে বলেন। কিন্তু 'দৈহিক চর্চ্চা' বা অধিকতর ব্যাপকভাবে 'দৈহিক শিক্ষা' বলিতে ঠিক কি বুঝায়, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন না। ফলতঃ দেখা যায় যে, শরীরের আয়তন তথা বলবৃদ্ধি করার দিকেই অধিকাংশ লোকে ঝোঁক দেয়—অত্যধিক বলসঞ্চয় মানসে এই অপরিমিত শরীরবৃদ্ধির ফলে আমাদের কি পরিমাণ যান্ত্রিক (organic) ক্ষতি হইতে পারে, সে-বিষয়ে অনেকেই চিন্তা করিয়া দেখেন না। শরীরের আয়তন বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক বলসঞ্চয় করাই কি আমাদের একমাত্র বা প্রধান উদ্দেশ্য? এই বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের মতাবলী আলোচনা করিলে আমরা দৈহিক শিক্ষার অনুকূলে যে-কয়টি যুক্তি পাই তাহার মধ্যে নীচের তিনটিই প্রধান—

(ক) দৈহিক জীবনের (physical lifeএর) উৎকর্ষের উপর মানসিক ও নৈতিক উন্নতি নির্ভর করে।

(খ) দৌড়-ঝাঁপ, ধরা, ছোঁড়া, ঝোলা প্রভৃতি সহজাত প্রক্রিয়া (fundamental activities) এবং ক্রীড়া-কৌতুকাদি আমাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক প্রবৃত্তিগুলিকে (biological impulses) প্রস্ফুটিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে। উপরিলিখিত প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক শিক্ষার বীজ নিহিত আছে যে, ঠিক ভাবে চালিত হইলে ইহাদের সাহায্যে চরিত্র সংগঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা না হইলে ইহারা নিশ্চয়ই ক্ষতি করে।

(গ) যান্ত্রিক সতেজতা (organic vigour) এবং শারীরিক কৌশল ও ক্ষমতার ক্রমোন্নতি সাধিত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত দৈহিক শিক্ষা সহজাত কর্ম্মবৃত্তির পরিচালনা করিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক প্রবৃত্তিগুলিকে ফুটাইয়া তোলে এবং সুপরিচালিত করে, আমাদের যান্ত্রিক সতেজতা এবং শারীরিক কৌশল ও ক্ষমতা বাড়ায়, এবং আমাদিগকে মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক ভাবে সুশিক্ষিত করিয়া বর্ত্তমান সভ্য জগতের দৈনন্দিন কার্য্যগুলি ঠিক ঠিক মত করিতে শিক্ষা দেয়।

একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজে বুঝা যায় যে, দলাইমলাই (massage), খেলা দেখা প্রভৃতি স্বয়ং-নিক্রিয় কার্য্যাবলী কখন কখন ফলদায়ক হইলেও স্ব-ক্রিয় পরিশ্রমই প্রধানতঃ উপকারী। এই স্ব-ক্রিয় পরিশ্রম আবার কার্য্যের পরিমাণ বা প্রণালীভেদে মোটামুটি চার প্রকার হইতে পারে—

(১) বল লাভের জন্য, যেমন ভার উত্তোলন।

(২) সহন-শক্তি লাভের জন্য, যেমন লম্বা পাল্লার দৌড়।

(৩) কৌশল লাভের জন্য, যেমন খেলাধূলা।

(৪) বেগ বা দ্রুতগতি লাভের জন্য, যেমন অল্প পাল্লার দৌড়।

এই চার প্রকার পরিশ্রমের মধ্যে কোন্‌টি উপকারী এবং কোন্‌টি অনুপকারী ইহার আলোচনা এ-স্থলে না করিয়া সাধারণ ভাবে এটুকু বলা যাইতে পারে যে, শুধু মাংসপেশীর আয়তন বাড়াইয়া, অথবা নানারূপ বাজির কেরামতি দেখাইয়া পরিশ্রমের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু, যে পরিশ্রম করিলে স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এমন একটি যোগ (neuro-muscular co-ordination) সাধিত হয় যে, তাহার ফলে, প্রত্যেক

কার্য্য সহজে ও স্বচ্ছন্দ গতিতে করা যায়, দূষিত দ্রব্য নিষ্কাশনকারী যন্ত্রসমূহ দ্বারা শরীরমধ্যস্থ ময়লা নিয়মিত ভাবে বাহির হয় এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস সাময়িক গুরু পরিশ্রমের পর যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে, তাহাই সার্থক পরিশ্রম।

কিন্তু ইহা হইল দৈহিক পরিশ্রম—দৈহিক শিক্ষা নহে। দৈহিক পরিশ্রম তখনই দৈহিক শিক্ষায় পরিণত হয় যখন উল্লিখিত শারীরিক ও যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক সম্পদ লাভ করি। শেষের গুলি আয়ত্ত করিতে না পারিলে বর্ত্তমান সভ্যজগতে দৈহিক শিক্ষার কোনও ব্যবহারিক মূল্য থাকিতে পারে না। লেখাপড়া শিক্ষা করার উদ্দেশ্য যেমন কেরানী হওয়া নয়, দৈহিক শিক্ষার উদ্দেশ্য তেমনি কলির ভীম তৈয়ারি করা নয়। জ্ঞানার্জ্জন করিতে গেলে প্রথমে লিখিতে ও পাড়তে শিক্ষা করা দরকার, দৈহিক শিক্ষায় প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হইতে হইলে কতকগুলি শারীরিক কৌশল আয়ত্ত করিতে হয়। কিন্তু এগুলি কৌশলমাত্র—আসল জিনিষ নহে। ইহারা প্রাসাদে উঠিবার সোপান বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সোপানকে প্রাসাদ বলিয়া ভ্রম করিলে আমরা স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিব।

দ্বিতীয় কথা এই যে, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-প্রণালীতে যে দুইটি তথ্য সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে তাহা ভুলিলে কোন রকমেই চলিবে না। আমাদের সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, শিশু-শিক্ষার জন্য নহে পরন্তু শিক্ষা শিশুর জন্য, এবং দ্বিতীয়তঃ শিখিবার বিষয় বহু হইলেও শিখিবে এক জনই। সুতরা শিশুকে শিক্ষার উপযুক্ত করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করা পরিবর্ত্তে শিক্ষাকে শিশুর বাহন করিয়া তুলিবার প্রয়া পাওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয় ও ফলপ্রদ, এবং এই প্রচেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে শিক্ষণী বিষয়গুলি—কি মানসিক, কি দৈহিক—বিভিন্নমুখী ন হইয়া পরস্পর-সংবদ্ধ হওয়া একান্তই আবশ্যক।

এ-বিষয়ে শেষ কথা এই যে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সহিত মনুষ্য-প্রকৃতির সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হইবে, শিক্ষা দেওয় ও শিক্ষা করা এই উভয় কার্য্যই তত সহজ হইবে—শিখাইতে ও শিখিতে বেশী আনন্দ পাওয়া যাইবে এব সেজন্য উপদিষ্ট বিষয়টি মনের মধ্যে গাঁথিয়া যাইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত স্বাস্থ্যবান বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে শুধু শারীরিক বল ও কৌশল আয়ত্ত করিলে এবং রোগমুক্ত থাকিলেই চলিবে না, ইহাদের সঙ্গে আরও কিছু লাভ করা দরকার, সেগুলিই অধিকতর মূল্যবান্। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই বলিতে হয় যে, যে-ব্যক্তি অত্যধিক কাজের ভিড়ের মধ্য দিয়াও প্রত্যেক কাজটি সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে এবং পূর্ণ আনন্দ উপভোগের সহিত করিতে পারিবে, তাহাকেই প্রকৃত স্বাস্থ্যবান বলিতে পারা যাইবে। অর্থাৎ এক কথায় যাহার জীবনী-শক্তি (vitality) প্রাণবন্ত হইয়া কাজকে 'খেলায়' পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, সে-ই প্রকৃত দৈহিক শিক্ষার স্বরূপ বুঝিবার ও তদ্দ্বারা শিক্ষিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।



বোমার আক্রমণ হইতে প্যারিসের মূর্ত্তি শিল্পনিদর্শন প্রভৃতি রক্ষার ব্যবস্থা। চিত্রে একটি কলাশালার প্রাঙ্গণস্থ মূর্ত্তিগুলির রক্ষার আয়োজন দেখা যাইতেছে।



নর্ডিক রাষ্ট্রসমূহের রাজা, রাষ্ট্রপতি ও পররাষ্ট্রসচিবগণ

দক্ষিণ দিক হইতে : স্যাণ্ডলার (সুইডেন); কহ্‌ট (নরওয়ে); ডেনমার্কের রাজা; সুইডেনের রাজা; নরওয়ের রাজা;



আধুনিক সমর-রীতি। চিত্রে পোল্যাণ্ডের অ-যুধ্যমান সাধারণ নরনারীদের ঘরবাড়ীর অবস্থা বোমা-নিক্ষেপের ফলে কিরূপ হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে।



আধুনিক সমরসজ্জা। বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলা সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

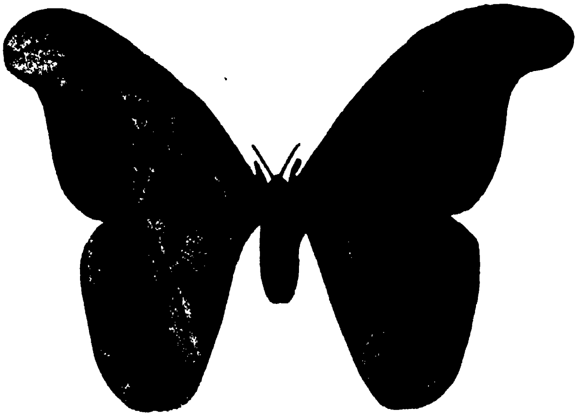


বিচিত্রবর্ণ নিশাচর প্রজাপতি, "সেক্রোপিয়া মথ"

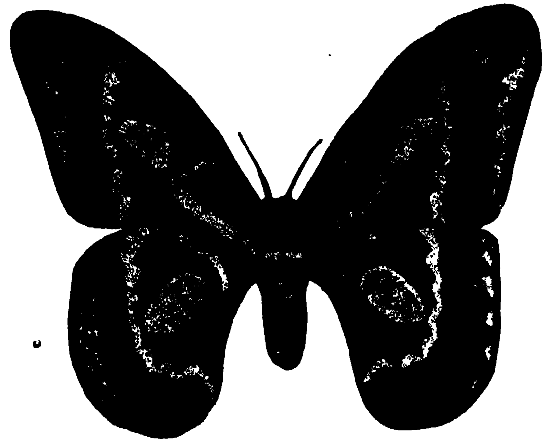
নিশাচর প্রজাপতি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শিশুসুলভ খেয়ালের বশে কিছু দিন মাটির খুরি চাপা দিয়া রাখিবার পর একটা শুঁয়োপোকা ফড়িং হইয়া গিয়াছে, সমবয়সীর এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া বিস্ময় বোধ করিলেও ঘটনাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি নাই। অলক্ষ্যে দৈবাৎ একটা ফড়িং ঢাকনার নীচে চাপা পড়া আশ্চর্য্য নয় এবং কোন গতিকে হয়ত শুঁয়োপোকাটা বাহির হইয়া গিয়াছিল। কোন ঘটনা বোধগম্য না হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বাভাবিক। তথাপি প্রত্যক্ষদর্শীর দৃঢ় উক্তিও একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু কেমন করিয়া এরূপ একটা ঘটনা সম্ভব হইতে পারে? কারণ ফড়িঙের সহিত শুঁয়োপোকার কোন সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরীক্ষার সাহায্যে সত্য মিথ্যা নিরূপণ করা ব্যতীত এ সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তির অন্য কোন উপায় ছিল না, অথচ শুঁয়োপোকা সম্বন্ধে একটা ভয়মিশ্রিত ঘৃণা এই সাধারণ পরীক্ষা সম্পাদন করিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিল। এক বার গাছে চড়িতে গিয়া হাতের নীচে কি যেন নরম নরম বোধ হইল। চাহিয়া দেখি—ভীষণ দৃশ্য। প্রায় চার-পাচ ইঞ্চি লম্বা অসংখ্য শুঁয়োপোকা গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করিয়া গাছের গুঁড়ির খানিকটা অংশ ঘিরিয়া রহিয়াছে। গায়ের রং ঠিক গাছের বাকলের রঙের মত; চট্ করিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। হাত লাগিবামাত্রই সাপের মত ফণা তুলিয়া যেন এক প্রকার অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল। এই বিষাক্ত প্রাণীগুলি পূর্ব্ববঙ্গে 'ছেঙ্গা-বিছা' নামে পরিচিত। ইহাদের শুঁয়োগুলি হাতে বিঁধিয়া কয়েক দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতেই শুঁয়োপোকা সম্বন্ধে একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও ভয় যেন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কাজেই সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ পরীক্ষা করাও হইয়া উঠে নাই। অবশেষে দৈবাৎ



বিরাট-আকৃতি নিশাচর প্রজাপতি, "অ্যাটলাস মথ"



রেশম-উৎপাদক নিশাচর প্রজাপতি, "জরুলা"

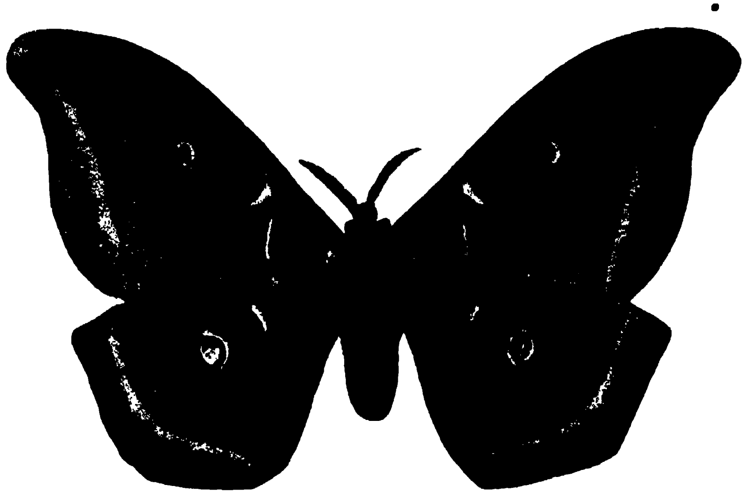
এক দিন প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা কালো রঙের একটা শুঁয়োপোকা নজরে পড়িল। সেটাকে ছোট্ট একটা বাটি চাপা দিয়া রাখিয়া দিলাম। দিন-তিনেক পরে বাটি তুলিয়া দেখি—যেমন শুঁয়োপোকা তেমনই রহিয়াছে। পাত্রটার এক পাশে সে গুটিসুটি হইয়া বসিয়াছিল। ফড়িং হওয়ার কাহিনী সম্বন্ধে অবিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। আরও পাঁচ-সাত দিন কাটিবার পর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। প্রায় মাস-খানেক পরে হঠাৎ এক দিন বাটিটা নজরে পড়ায় তুলিয়া দেখি—অবাক কাণ্ড! শুঁয়োপোকার চিহ্নও নাই। ডানার উপর লাল ও হলদে রঙের ডোরা-কাটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা ধূসর বর্ণের প্রজাপতির মত একটা পতঙ্গ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ধরিবার চেষ্টা করিতেই উড়িয়া গেল। বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলাম। এমন একটা বিদঘুটে শেঁয়োপোকা কেমন করিয়া একটি পতঙ্গে রূপান্তরিত হইল? কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, তবে এটুকু বুঝিলাম যে, শুঁয়োপোকার এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহণ অসম্ভব নহে। তবে শুঁয়োপোকা ফড়িং হয় না, প্রজাপতির মত পতঙ্গের আকৃতি ধারণ করে।

এ ঘটনার অনেক দিন পরে মালদহ জেলার কোন একটি গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় একটা গাছের পাতার গায়ে আমড়ার আঁটির মত একটি গুটি দেখিতে পাইয়া সেটাকে একটা বোতলে ভরিয়া রাখিয়াছিলাম। সকালে উঠিয়া দেখি, ডানায় বিচিত্র ডোরাকাটা প্রকাণ্ড একটা প্রজাপতি বোতলটার মধ্যে ঝটপট করিতেছে। আমরা সাধারণতঃ যেরূপ প্রজাপতি দেখিতে পাই, ইহার চেহারা মোটেই সেরূপ নহে। ডানাগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা ও ভারী। ডানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা। বোতলের অপ্রশস্ত স্থানের মধ্যে ডানা দুটি মুড়িয়া পাকাইয়া গিয়াছিল। আকৃতি বড়ই হউক বা ছোটই হউক তাহাতে বিস্মিত হইবার তেমন কিছু নাই; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হইতেছে, কেমন করিয়া একটা শুঁয়োপোকা বা গুটি হইতে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে।



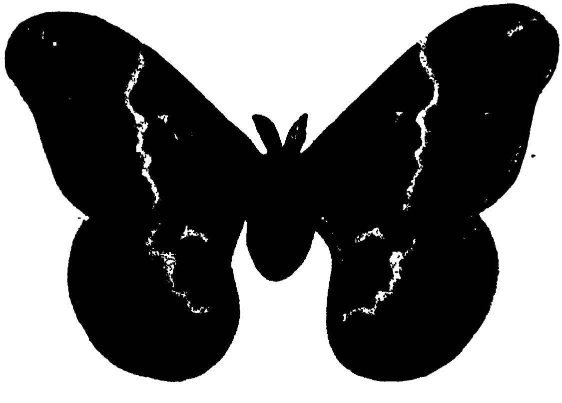
"হেমিলেউকা নেভাডেনসিস", নিশাচর প্রজাপতি

কলিকাতার সন্নিহিত কোন এক পল্লী-অঞ্চলে দুপুর বেলায় এক স্থানে বসিয়া ছিপে মাছ ধরা দেখিতেছি। প্রায় দু-শ গজ দূরে ঝোপের মধ্যে একটা উজ্জ্বল পদার্থের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। নিকটে গিয়া দেখি, ছোট্ট একটা নীলকণ্ঠ ফুলের গাছের পাতার নীচের দিক্ হইতে একটা অদ্ভুত পদার্থ ঝুলিয়া রহিয়াছে। জিনিষটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে কতকটা চিনাবাদামের মত; কিন্তু বর্ণ উজ্জ্বল নীল। পড়ন্ত সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হইয়া সেটা একটা বেলোয়ারি দুলের মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। ইহার গঠন-পারিপাট্য ও রঙের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। জিনিষটা কি বুঝিতে না পারিয়াও কেবল সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই সেটা আনিয়া একটা শিশিতে পুরিয়া রাখিলাম। দুই দিন একই ভাবে ছিল। তৃতীয় দিন ভোরে উঠিয়া দেখিলাম—সে অপূর্ব্ব বস্তুটার খোলস পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তার আর ঔজ্জ্বল্য নাই। পাশেই বিচিত্র বর্ণের একটা প্রজাপতি বাহিরে আসিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে।

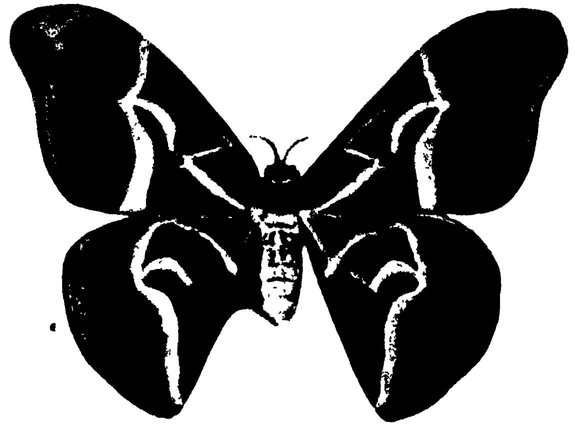


রেশম-উৎপাদক নিশাচর প্রজাপতি, "পলিফেমাস মথ"

পর পর এই কয়টি ঘটনা হইতে প্রজাপতির জন্মের একটা মোটামুটি আভাস পাইলাম বটে, কিন্তু জন্মের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না। এই ঘটনার কিছু দিন পরে শিবপুরের কোন একটি বাড়ীর রান্নাঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন দেওয়ালের গায়ে প্রায় নয় ইঞ্চি লম্বা একটা অদ্ভুত প্রজাপতি দেখিতে পাইলাম। দুই দিকের ডানার উপর পেঁচার চোখের মত উজ্জ্বল গোলাকার নীলবর্ণের দুইটি ছাপ, হঠাৎ মনে হয় যেন অন্ধকারের মধ্যে একটা পেঁচা তাহার গোলাকার চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। অনেক কৌশলে সেটাকে জীবিত অবস্থায় ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। একটা জালের খাঁচায় সেটাকে রাখিয়া দিলাম। কি খায় জানি না, কাজেই খাবার কিছু দেওয়া হয় নাই। দুই দিন পর্য্যন্ত প্রজাপতিটাকে জালের উপর একভাবে ডানা মেলিয়া বসিয়া থাকিতেই দেখিলাম। তৃতীয় দিনে দেখিতে পাইলাম, জালের গায়ে পাশাপাশি ভাবে অসংখ্য ডিম পাড়িয়া রাখিয়াছে। ডিম পাড়িবার দুই দিন পরে প্রজাপতিটা মরিয়া গেল। ডিমগুলিকে সেই ভাবেই রাখিয়া দিলাম। প্রায় মাস-দেড়েক পরে সেই ডিম ফুটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য শুঁয়োপোকা বাহির হইয়া আসিল। তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, শুঁয়োপোকারা প্রজাপতিরই বাচ্চা। এখন কি উপায়ে শুঁয়োপোকা প্রজাপতির রূপ ধারণ করে—ইহাই অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। অবশেষে বিভিন্ন জাতীয় শুঁয়োপোকা কাচের নলের ভিতর পুরিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ঘুরিতে লাগিলাম। ব্যাপারটা এই লক্ষ্য করিলাম যে, কাচের নলে পুরিবার পর শুঁয়োপোকাটা প্রথমে বাহির হইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে শরীর গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। চুপ করিয়া বসিবার পর সাধারণতঃ তিন ঘণ্টা হইতে ছয় ঘণ্টার মধ্যে যে-কোন এক সময়ে মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে দেহের আকৃতি বেমালুম পরিবর্ত্তন করিয়া পুত্তলীর আকার ধারণ করে। কাজেই এই পাঁচ-সাত মিনিট



"প্রমেথিয়া"
রেশম-উৎপাদক নিশাচর প্রজাপতি

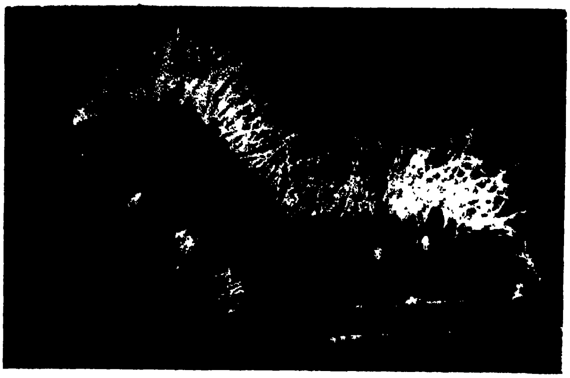


"ফিলোসামিয়া সিন্থিয়া"
রেশম-উৎপাদক নিশাচর প্রজাপতি

সময় পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলেই তাহাদের আকৃতি-পরিবর্ত্তনের কৌশল দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। কাচের নলে শুঁয়োপোকা পুরিয়া যখন তখন লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—হয় শুঁয়োপোকাই রহিয়া গিয়াছে, নয়ত কোন্ ফাঁকে যে দৃষ্টি এড়াইয়া পুত্তলী হইয়া বসিয়া আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কোন কোন জাতের শুঁয়োপোকা রাত্রির শেষ ভাগেই সাধারণতঃ পুত্তলীর আকার ধারণ করিয়া থাকে। অনেক চেষ্টার পর এক দিন শেষ রাত্রিতে লক্ষ্য করিলাম—নিশ্চল শুঁয়োপোকাটা যেন একটু একটু নড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমশঃ নড়াচড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রায় দুই-তিন মিনিট পরে শুঁয়োপোকার ঘাড়ের কাছের খানিকটা অংশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। সেই ফাটা স্থানের ভিতর হইতে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত একটা সাদা পিণ্ডাকার পদার্থ ক্রমশঃ ঠেলিয়া বাহির হইতেছিল। আরও তিন-চার মিনিট অতিক্রান্ত হইতেই নারিকেলী কুলের আঁটির মত সুচালো মুখবিশিষ্ট একটা অদ্ভুত প্রাণী মোচড় খাইতে খাইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। শুঁয়োপোকার সেই বিশ্রী ছালটা এক পাশে পড়িয়া রহিল। খোলসটা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সে দেহের প্রান্তদেশ হইতে একটু সুতায় আটকাইয়া ঝুলিয়া থাকে।

দেখিতে দেখিতে এই পুত্তলী পরিবর্ত্তিত হইয়া একটি সুনির্দ্দিষ্ট আকৃতি ধারণ করে এবং উপরের আবরণে উজ্জ্বল বর্ণ আত্মপ্রকাশ করে। পুত্তলীটি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট-ভাবে দুলের মত ঝুলিয়া থাকে। দশ-বার দিন পরে হঠাৎ পুত্তলীর পীঠের দিক্ চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায় এবং ধীরে ধীরে সেই খোলস হইতে দুই-তিন মিনিট সময়ের মধ্যে প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে। বাহিরে আসিবার সময় প্রজাপতিটি তাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে আকারে অনেক ছোট থাকে। ডানাগুলিও থাকে অতিশয় ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে দেখিতে প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই তরতর করিয়া ডানা বাড়িয়া শরীরের আকৃতি বদলাইয়া যায়। প্রায় এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতে সুরু করে। আমরা অহরহ যে সকল বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি দেখিতে পাই, তাহাদের জন্ম-বৃত্তান্ত মোটামুটি এইরূপ। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় অগণিত প্রজাপতির জন্মঘটনার বৈচিত্র্যও কম নহে।

আমরা সাধারণতঃ দিবাচর প্রজাপতিই দেখিতে পাই, বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হাল্কা ডানাওয়ালা ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির দিবাচর প্রজাপতিরা সারাদিন ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায় এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার বহু পূর্ব্বেই পত্রপল্লবের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ডানা মুড়িয়া বিশ্রাম গ্রহণ করে। কিন্তু নিশাচর প্রজাপতিরা সারাদিন কোন নির্জ্জন অন্ধকার স্থানে ডানা প্রসারিত

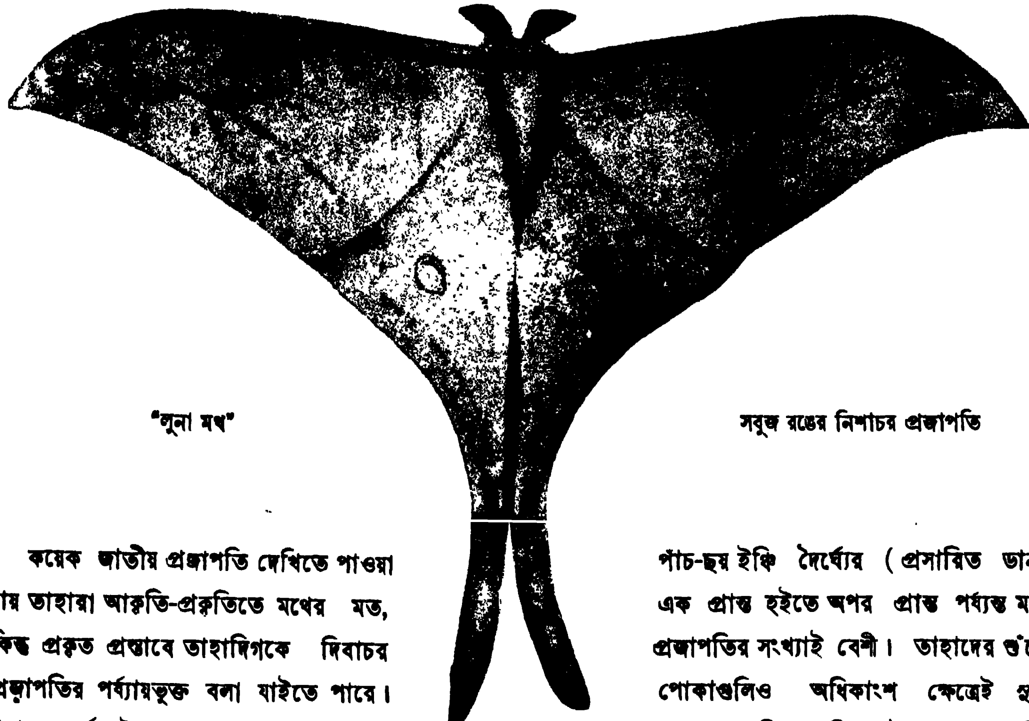


নিশাচর "ইক্লস ইম্পেরিয়্যালিজ" প্রজাপতির বাচ্চা



নিশাচর "রিগ্যালিস" প্রজাপতির বাচ্চা

করিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে এবং গভীর অন্ধকারে আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। ইহারা সাধারণতঃ 'মথ' নামে পরিচিত। মথ বা নিশাচর প্রজাপতিরা সর্ব্বদাই ডানা প্রসারিত করিয়া বসে; কিন্তু দিবাচর প্রজাপতিরা ডানা মুড়িয়াই বিশ্রাম করে। অবশ্য সময়ে সময়ে তাহারা ডানা মেলিয়া রোদ পোহাইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিবাচর প্রজাপতির বাচ্চার গায়ে শুঁয়ো থাকে না; কিন্তু লোমশ শুঁয়োপোকা হইতে সাধারণতঃ মথ-জাতীয় প্রজাপতিই আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য লেজ-ওয়ালা, লোমশূন্য বিচিত্র বর্ণের বড়-বড় শুককীট হইতেও নিশাচর প্রজাপতি বাহির হইয়া থাকে। দিবাচর প্রজাপতি পুত্তলী অবস্থায় কোন কিছুতে ঝুলিয়া বা আটকাইয়া থাকিবার জন্য মাত্র সামান্য সুতা বোনে এবং বিভিন্ন জাতীয় পুত্তলী বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল কাচখণ্ডের মত আকার পরিগ্রহণ করে, কিন্তু নিশাচর প্রজাপতির বাচ্চা পুত্তলী অবস্থায় রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বে মুখ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ লালা নিঃসৃত করিয়া সুতা বোনে এবং সেই সুতায় গুটি তৈয়ারী করিয়া তাহার অভ্যন্তরে পুত্তলী-রূপ ধারণ করিয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। বিভিন্ন জাতীয় নিশাচর প্রজাপতির গুটি হইতেই আমরা রেশম পাইয়া থাকি। নিশাচর প্রজাপতির ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলেই তাহারা গাছের পাতা বা ছাল খাইয়া ক্রমশঃ বড় হইতে হইতে বার-বার খোলস পরিত্যাগ করিতে থাকে। বার-বার খোলস বদলাইয়া পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় উপনীত হইলে দল বাঁধিয়া কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থান করে এবং কিছু দিন পরে সুবিধামত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া মুখ হইতে সুতা বাহির করিয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে একটি ডিম্বাকার আবরণ গড়িয়া তোলে। আবরণটি বেশ পুরু হইলে শরীরের লোমগুলি তুলিয়া লইয়া তাহার একটি আস্তরণ গঠন করে। তার পর চুপ করিয়া অবস্থান করে। কিছু দিন পরে উপরের ছালটা ফেলিয়া দিয়া জলপাইয়ের বীজের মত পুত্তলীর আকার ধারণ করিয়া আবার কিছু দিন নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এক মাস বা দুই মাস আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় বৎসরাবধি এরূপ নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিবার পর প্রজাপতির রূপ ধারণ করিয়া গুটি কাটিয়া বাহির হয়। ইহাদের মধ্যে এমন কয়েক জাতীয় পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের স্ত্রী-পতঙ্গদের নামমাত্র ডানা থাকে। শরীরটা তাহাদের অসম্ভব মোটা—একটুও নড়িতে চড়িতে পারে না। বৎসরাধিক কাল গুটির অভ্যন্তরে কাটাইয়া বাহিরে আসিবা মাত্রই, পুরুষ-পতঙ্গেরা তাহাদের কাছে উড়িয়া আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইবার পর দুই-তিন দিনের মধ্যেই স্ত্রী-পতঙ্গগুলি অসংখ্য ডিম প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাই তাহাদের প্রজাপতি-জীবন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মথেরা সাধারণ প্রজাপতির মতই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।



"লুনা মথ"

সবুজ রঙের নিশাচর প্রজাপতি

কয়েক জাতীয় প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা আকৃতি-প্রকৃতিতে মথের মত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগকে দিবাচর প্রজাপতির পর্য্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। ইহারা সর্ব্বদাই অল্প অন্ধকার অথবা ছায়ার মধ্যেই অবস্থান করে। দক্ষিণ-আমেরিকার পেঁচা-প্রজাপতিই বোধ হয় এই জাতীয় প্রজাপতিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আকৃতির হইয়া থাকে। দিবাচর প্রজাপতিদের মধ্যেও ইহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর প্রজাপতি বিরল। ইহাদের নীচের ডানা দুটির নিম্নতলে পেঁচার চোখের মত বড় বড় দুইটি গোল দাগ থাকে। সন্ধ্যার সময় যখন ইহারা উড়িতে থাকে, তখন তাহাদের বৃহৎ ডানা ও গোলাকার চোখ দুটির জন্য একটা অদ্ভুত প্রাণী বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশেও দুই-তিন ইঞ্চি পরিমাণ এই জাতীয় প্রজাপতির অভাব নাই, শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনে বড় বড় গাছের শিকড়ের আড়ালে অন্ধকারের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, অসংখ্য ধূসর ও কালো রঙের অদ্ভুত আকৃতির প্রজাপতি বসিয়া আছে।

দিবাচর প্রজাপতির মধ্যে সাধারণতঃ আধ ইঞ্চি হইতে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের (প্রসারিত ডানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মাপ) প্রজাপতির সংখ্যাই বেশী। তাহাদের শুঁয়োপোকাগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুদৃশ্য এবং মাঝারি আকৃতির হইয়া থাকে। কিন্তু নিশাচর প্রজাপতিদের মধ্যে ডানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় এক ফুট লম্বা প্রজাপতিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায় এবং চার-পাঁচ মিলিমিটার হইতে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি প্রজাপতির সংখ্যা অগণিত। ইহাদের বড় বড় প্রজাপতির বাচ্চাগুলি প্রায়ই বিরাটাকৃতির হইয়া থাকে। মথ-জাতীয় দুইটি বড় প্রজাপতির বাচ্চাকে পূর্ব্বপৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছবিতে ছোট করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহা হইতেই এই জাতীয় শুঁয়োপোকার আকৃতির ভীষণতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে। নিশাচর প্রজাপতির মধ্যে 'সেক্রোপিয়া,' 'অ্যাটলাস্,' 'ইম্পিরিয়ালিস্' প্রভৃতি প্রজাপতির বিরাট্ আকার বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 'লুনা-মথে'র সুদৃশ্য আকৃতি এবং ডানার স্নিগ্ধ রং বড়ই মনোমুগ্ধকর। এতদ্ব্যতীত 'জরুলা', 'পলিফেমাস', 'প্রমেথিয়া', 'ফিলোসামিয়া সিন্থিয়া' প্রভৃতি মাঝারি আকৃতির সুদৃশ্য নিশাচর প্রজাপতিরা উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদন করে বলিয়া সর্ব্বজনপরিচিত।

পুস্তক পরিচয়

মনোরমা—শ্রীঅমলা দেবী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এই বইখানিতে অনেকগুলি গল্প আছে যা নিষ্ঠুর। তাকে মনোরম বলা যায় না। ফিনল্যাণ্ডের উপর সোভিয়েটের বোমা নিক্ষেপের বিবরণ হৃদয়ভেদী কিন্তু হৃদ্য নয়। তবু প্রতিদিন তীব্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে খবরের কাগজ খুলে দেখি দানবিকতার শল্য মানব ইতিহাসের মর্ম্মস্থলে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছল। মানব-অদৃষ্টের সকল প্রকার অভিজ্ঞতারই সর্বস্বহ হচ্চে সাহিত্য। তার মধ্যে কুশ্রী কদর্যেরও আছে একটা কামরা। তার জন্যে জায়গা থাকে, যদি সে সাহিত্য-পংক্তির যোগ্য হয়, মানবচরিত্রের কলঙ্কের পরিচয়কে বাণীচিত্রে বাস্তবরূপে প্রকাশ করিতে পারে যদি, অকৃত্রিম সৃষ্টিশিল্পীর স্বাক্ষর যদি থাকে তার পরে। এই বইয়ের গল্পগুলি সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। লেখকের নামটি নূতন কিন্তু লেখাটি কাঁচা নয়, সুতরাং সংশয় রয়ে গেল মনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ষোড়শ অধিবেশনের বিবরণী, গৌহাটী, ১৩৪৫।

যথাসম্ভব শীঘ্র এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করিয়া প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গৌহাটী অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তিকাটিতে অধিবেশনের সূচনা হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত সমুদয় বৃত্তান্ত এবং পরীক্ষিত হিসাব দেওয়া আছে। ইহা সন্তোষের বিষয় যে এই অধিবেশনে সমুদয় ব্যয় বাদে ৩০৪৵১০ উদ্বৃত্ত আছে।

মূল সভানেত্রীর অভিভাষণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, এবং সমুদয় শাখা-সভাপতির অভিভাষণগুলির স্থায়ী মূল্য আছে। সেগুলি পড়িলে এখনও শিক্ষালাভ হয়। পুস্তিকাটিতে সভানেত্রী ও সমুদয় সভাপতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি আছে। সম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের পরিচয় এবং ছবিও আছে। আর দুইটি বৃহৎ ছবির মধ্যে একটিতে আছে অধিবেশনের মূল ও বিভাগীয় সভাপতিগণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতি এবং মূল ও বিভাগীয় সম্পাদকগণের ছবি; অন্যটিতে আছে গৌহাটী অধিবেশনের স্বেচ্ছাসেবকদিগের ছবি।

পরিষৎ-পরিচয়—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা। রয়্যাল আটপেজি পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪+২০২+৩৬+১৬। মূল্য আট আনা। এত বড় বহির পক্ষে আট আনা মূল্য খুব কম।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ প্রথমে বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত পরিষৎ সম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় সঙ্কলন গুরু শ্রমসাধ্য ব্যাপার। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কঠিন কাজটি নির্ব্বাহ করিয়া পরিষদের ও শিক্ষিত বাঙালীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা; প্রাপ্তিস্থান শান্তিনিকেতন।

এই বৃহৎ অভিধানটির ৬৩তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। এই খণ্ডের শেষ শব্দ "বলাকী" ও শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২০০৪।

ড.

দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো—প্রথম খণ্ড, ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা। প্রকাশক শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল, ওরিয়েণ্টাল প্রেস, ৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের দেশে ঔৎসুক্য ক্রমশঃ জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইংরেজী না জানিয়া বা ইংরেজী বই না পড়িয়া সে-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার উপায় বাংলায় অল্পই আছে। গ্রন্থকার 'দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো' গ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিয়া তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন। কিছু কাল পূর্ব্বে প্রকাশিত ইহার প্রথম খণ্ডে ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ও সুইটসারল্যাণ্ড, এই তিনটি দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো আলোচিত হইয়াছিল; এই তিনটি দেশেরই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তি লিখিত আইন। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশ ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস (আধুনিক কাল পর্য্যন্ত) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইন ও তাহার প্রয়োগ আলোচিত হইবে। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস এত বিস্তৃতভাবে আলোচনার কারণ "ইংলণ্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন কোন অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান নাই, যাহার পিছনে বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস নাই। এই ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ না করিলে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইনকে সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না।...ইহার বহুলাংশ অলিখিত। আরও দেখা যায় যে, অন্যান্য দেশে যেমন উহার রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইন উহার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া আলোচিত হইতে পারে, ইংলণ্ডে তাহা সম্ভব নহে।..."

এই গ্রন্থমালা পড়িলে পাঠক দেশবিদেশের রাষ্ট্রীয় বিধি সম্বন্ধে বাংলা ভাষার মারফতেই বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। তবে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিবার সুযোগ, অবসর বা শিক্ষা নাই। কিন্তু ঔৎসুক্য বা জ্ঞানের প্রয়োজন যাহাদের কম নহে সেইরূপ সর্ব্বসাধারণেরও উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় ও অল্প পরিসরে দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে আর একখানি গ্রন্থ বা গ্রন্থমালা যদি লেখক প্রকাশ করেন তবে তদ্দারাও আমাদের একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হইবে।

জীবন-প্রবাহ—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ১০ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। সচিত্র। পৃ. ৪১৪। মূল্য তিন টাকা।

লেখক পরহিতব্রত ত্যাগী কর্ম্মী ও নায়ক রূপে সাধারণের নিকট

সুপরিচিত। স্নেহভাজন আত্মীয়ের অনুরোধে জীবনের নানা বিচিত্র সংগ্রামের ও অভিজ্ঞতার কাহিনী এই গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান, পরিবার ও বাল্যজীবনের বর্ণনায় সে-সময়কার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের ভাষায় নানা ত্রুটির মধ্য দিয়াও আবাল্য ভাবব্যাকুল একটি হৃদয়ের পরিচয় পাইতে দেরি হয় না—এই ভাবব্যাকুলতাই তাঁহাকে সারাজীবন নানা কর্ম্ম ও উদ্যোগের মধ্য দিয়া লইয়া চলিয়াছে, কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়াও স্থির হইয়া থাকিতে দিতেছে না। একান্ত ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের অনেক কাহিনীও তিনি নিঃসঙ্কোচে ও সহজে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিয়াছেন; সহজ প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়া যে একটি সরল হৃদয়ের ছবি চোখে পড়ে তাহার গুণে সে-সকল কথা কোন অশ্রদ্ধার ভাব মনে আসিতে দেয় না। সুভাষচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বর্ত্তমানের অনেক প্রখ্যাত দেশকর্ম্মীর সহিত যৌবনে দেশহিতের নানা উদ্যোগের সূত্রে লেখকের যোগের স্মৃতি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইঁহাদের প্রথম যৌবনের সুন্দর দু-একটি ছবি অল্প-পরিসরের মধ্যে এই গ্রন্থে পাই। চাকরি-জীবন, অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, অসহযোগ আন্দোলন, কারাজীবন প্রভৃতি লেখকের নানা অভিজ্ঞতার বিবরণও কম চিত্তাকর্ষক নহে।

গ্রন্থের মূল কাহিনীর সহিত বিশেষ সম্পর্ক না-থাকিলেও একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইল। কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের শেষ জীবনের রাষ্ট্রীয় মতামতের সঙ্গে অনেকেরই মিল ছিল না, সেজন্য দুঃখিত হওয়া চলে; কিন্তু তাহাকে "অধঃপতন" বলিয়া গ্রন্থে বর্ণনা করা শোভনও হয় নাই, সমীচীনও হয় নাই। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহারা জানিতেন যে শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার দেশপ্রেম বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই; মত ও পথ পরিবর্ত্তিত হইলেও জনহিত-চেষ্টায় উদ্যোগ ও চিন্তা হইতেও বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তিনি এক দিনের জন্য নিবৃত্ত হন নাই। তাহাকে ঠিক অধঃপতন আখ্যা দেওয়া যায় না।

বিবাহমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী। নূতন সংস্করণ। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅসিতকুমার হালদার, শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত অঙ্কিত চিত্রাবলীর বহুবর্ণ প্রতিলিপি সংবলিত। মূল্য এক টাকা।

"হিন্দুবিবাহে পতি ও পত্নীর মূলভাবকে মূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছে অর্দ্ধনারীশ্বরের চিত্রে। কেবল ঈশ্বর বা হর, অথবা কেবল নারী বা গৌরী নিজে-নিজে সম্পূর্ণ নহেন—উভয়ের মিলনেই সম্পূর্ণতা আসিয়াছে। উপনিষদের ঋষি এই কথাটাই অন্য ভাবে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন একা, তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, তাই তিনি নিজেকে দুই ভাগ করিলেন, তাহা হইতে হইল পতি ও পত্নী।" হিন্দুবিবাহের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ("আদর্শ" বলাই সঙ্গত, কারণ এই সকল আদর্শ কোন সময়েই আপামর সাধারণ জীবনে সর্ব্বদা গ্রহণ ও পালন করিত, না. এগুলি মাত্র শ্রেষ্ঠ মানুষদের চিন্তার নিদর্শন, বলিতে পারি না; বর্ত্তমানে অন্তত এই সকল আদর্শ ব্যবহারিক জীবনে যে বিশেষ সুপ্রচলিত নহে, তাহা তো নিশ্চিত) অনুসারে বরকন্যার পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য, গৃহিণীধর্ম্ম, গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে হিন্দুর বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে হিতকারী নির্দ্দেশ ও উপদেশ সকল সংকলিত হইয়াছে। তাহার বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া সকলেই এই সংগ্রহের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন।

এই সংকলন হইতেও যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য যত বিশদভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত হইয়াছে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্যের কথা তত বলা হয় নাই; স্বামীর অনুজ্ঞা গ্রহণের, অনুবর্ত্তিনী হইবার জন্য স্ত্রীর প্রতি উপদেশ যে-পরিমাণে আছে, স্ত্রীর অনুকূল হইবার জন্য স্বামীর প্রতি উপদেশ তত নাই; আদর্শের দিক্ দিয়া ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বহিখানি বহিঃসৌন্দর্য্যে ও উপদেশগুলির অন্তর্নিহিত মূল্যে বিবাহের বিশেষ উপযোগী উপহার হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অঙ্কিত সুন্দর চিত্রাবলীতে বহিখানিকে সুশোভিত করিয়া প্রকাশক দুর্লভ সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

মরুযাত্রী—বিমল সেন। প্রকাশক র‍্যাডিক্যাল বুকক্লাব, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০০। দাম বারো আনা।

লেখক অতি অল্প বয়সেই স্বর্গত হইয়াছেন। মরুযাত্রী বইখানি লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিমল সেন সাহিত্যজগতে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ সম্মুখের দিকেই আসিতেছিলেন, ইহাতেই তাঁহার শক্তির নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়। 'মরুযাত্রী' বইখানিতে তাঁহার শক্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট। বাংলা দেশে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের নামে যেসব আজগুবি ব্যাপার চলিতেছে, মরুযাত্রীর মধ্যে এ্যাডভেঞ্চার যথেষ্ট থাকিলেও সে আজগুবিত্ব আদৌ নাই। কিশোর-সাহিত্যে বইখানি সমাদৃত হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

দার্শনিকের প্রেমবিজয়— শ্রীঅজিতনাথ গুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪০৩। মূল্য দেড় টাকা।

আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করিয়া লেখক উপন্যাস লিখিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। এরূপ উদ্ভট কল্পনার উপকথা এ যুগে শিশুরাজ্যেও অচল। লেখক আপন বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখিলে ভাল করিতেন। তাঁহার উপন্যাস ভাল লাগিল না বলিয়া এ নয় যে তাঁহার মতামত ভাল লাগিল না।

কেয়ার কাঁটা—মুক্কিয়া এন. হোসেন। নওরোজ পাবলিশিং হাউস, ৬৩ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৬০। মূল্য পাঁচ সিকা।

এগারটি ছোট গল্পের সমষ্টি এই বইখানি পড়িয়া আমরা খুশী হইয়াছি। গল্পগুলি নবীন রচনার্থীর পক্ষে প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে। সকলের চেয়ে ভাল লাগিল লেখিকা মুসলমান-সমাজভুক্ত হইয়াও অনাবশ্যক ফার্সী ও উর্দ্দু শব্দ প্রচুর পরিমাণে ঠাসিবার চেষ্টা করেন নাই। যেগুলি আসিয়াছে সেগুলি সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে কাব্যের প্রভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 'কালো আঁখি', 'মধু লগন' প্রভৃতি প্রয়োগ গল্পের মধ্যে দুষ্ট প্রয়োগ, এ সম্বন্ধে লেখিকা সাবধান হইবেন।

ব্রতচারিণী—শ্রীহেমমালা বসু। প্রকাশক—শ্রীহেমমালা বসু, ৭২।৬৪ বণ্ডেল রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৬০। মূল্য দুই টাকা।

বইখানির নামের সার্থকতা বুঝিলাম না। একটি পিতৃমাতৃহীনা বালিকা বিবাহের পরেই বিধবা হইল, অলক্ষণা বলিয়া শ্বশুরশাশুড়ী



হাটের পথে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

তাহাকে ঘরে লইলেন না। দাদার সংসারে থাকিয়া সে দাদার উৎসাহে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিল। বউদিদির এটা সহ্য হইল না। তাহার লাঞ্ছনায় গঞ্জনায় সে যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, তখন এক স্নেহময়ী ঠাকুরমা তাহাকে তাহার শ্বশুরালয়ে পৌঁছাইয়া দিলেন। স্বামীহীনা শাশুড়ী ও জা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইলেন। ইহার মধ্যে ব্রতচারিণী নামের কোন হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। প্লটটিও মামুলী এবং দুর্ব্বল, এ লইয়া একটি বড় গল্প লেখা চলিত; উপন্যাস লিখিতে গিয়া লেখিকা ভুল করিয়াছেন।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রশ্ন—শ্রীরাইমোহন সাহা। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। পৃ. ৩৫৩। মূল্য তিন টাকা।

বিজ্ঞানের গবেষণার পর সাহিত্য-আলোচনার অবসর খুবই অল্প থাকে। তবুও "প্রথম প্রশ্ন" নামটির নূতনত্ব দেখে একটু কৌতূহলী হয়েই বইখানা পড়লাম।

লেখক অখ্যাতনামা। কিন্তু তাঁর কলমের মুখে যে বিদ্রোহের দাবাগ্নি জ্বলে উঠেছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য প্রচলিত শাস্ত্র, সমাজ, জাতধর্ম্ম সমস্ত ভেঙে একটা নূতন সমাজ গড়ে তুলতে চান।

প্রকৃতপক্ষে দেশ চায় আজ একটা নূতন জীবন-আদর্শ বা দর্শন, কারণ পুরণো ধারায় চলতে চলতে দেশ এখন দারিদ্র্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। এ অবস্থায় লেখক সমগ্র দেশ ও জাতির কাছে তাঁর বইখানার ভিতর দিয়ে যে প্রশ্ন করেছেন, তা বাস্তবিক খুব সময়োপযোগী হয়েছে।

যদি দেশ তাঁর এই প্রথম প্রশ্নের বাস্তব উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়, তবে দেশের সুখসমৃদ্ধি যে বহুগুণ বাড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ সমাজ-পরিকল্পনা ব্যতীত শিল্পপরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা যেতে পারে না। কারণ তজ্জন্য নূতন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। ভারতবর্ষের শিল্পপরিকল্পনা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষের কল্যাণের জন্যই আমি মনে করি। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ফলে যে শত সহস্র ভেদ-বিভেদ রয়েছে তার ফলে ঐ পরিকল্পনা ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষ বা দলবিশেষের স্বার্থসাধনেই নিয়োজিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী।

তাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করে সমস্ত ক্ষুদ্র আদর্শ, ক্ষুদ্র স্বার্থকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষের স্বার্থের সমন্বয় করা। 'প্রথম প্রশ্নের' লেখক সমগ্র দেশ ও জাতির ভিতর সেই আমূল পরিবর্ত্তন আনবারই প্রয়াস পেয়েছেন।

এখন সে পরিবর্ত্তন আনতে হলেই সকলের আগে প্রয়োজন ভারতবর্ষের প্রত্যেক মানুষকে শুধু মানুষ বলে স্বীকার করা। শুধু স্বীকার করা নয়, রক্তের সঙ্গে রক্ত মিশিয়ে দিয়ে সমস্ত ধর্ম্ম, জাত এবং যথাসম্ভব প্রদেশগত বৈষম্যকে চিরতরে মুছে ফেলা। তাহলে গড়ে উঠবে একটা মহাজাতি—যারা শুধু ভারতবাসী বলেই নিজেদের পরিচয় দেবে।

লেখক তাঁর বইয়ের প্রধান চরিত্র বিপ্লবী পনুর মুখ দিয়ে সেই কথাটাই বলেছেন, "বাংলা তথা ভারতের যৌবন যদি বিশ্বের জয়যাত্রার পথে অগ্রদূত হতে চায় তবে তার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হবে জাতিগত, ধর্ম্মগত এবং প্রদেশগত যাবতীয় বৈষম্যকে মুছে ফেলতে ঘরে ঘরে অবাধ বিবাহ প্রচলন করা, যার ফলে ক্রমে সমাজদেহে রক্তের তারতম্য ঘুচে যেয়ে বয়ে চলবে একটানা একই রক্তের স্রোত—এক স্বার্থ, এক লক্ষ্য আর একই সাধনা নিয়ে।"

লেখক এই কথাটির মূলসূত্র ধরেই তাঁর বইয়ের নায়কনায়িকাগুলির চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

আমি ইদানীং অনেক জায়গায় বলেছি শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের দুঃখের বোঝা অধিকতর ভারী না করে বরং গ্রামকে শহরে পরিণত করে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা যাতে আরও বৃদ্ধি করা যায় সে চেষ্টা করা দরকার।

'প্রথম প্রশ্নে' এই ধরণের একটা পরিকল্পনাও দেখতে পাই। পনুর অসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও সংগঠন-শক্তির একটা বিশেষ ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার "চামারহাটি" গ্রামকে "বিজয় নগর" শহরে পরিণত করার মধ্যে। যেখানে হয়ত এককালে জীর্ণ শীর্ণ খানকয়েক কুঁড়েঘর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না সেখানে পনু গড়ে তুলেছে একটা শহর এবং সে শহরের অধিবাসী ও অধিকারী হয়েছে তারা যারা এককালে নানা জাত ও নানা ধর্ম্মের হলেও সেখানে গিয়ে এক হয়ে গেছে—যেমন স্বার্থে তেমনই আদর্শে। আদর্শ পিছনে না থাকলে শুধু ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় ও অর্থে ঐরূপ হওয়া সম্ভব নয়।

মোট কথা, তরুণ লেখক অতি গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমাজ ও দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে খাঁটি পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন একথা নিঃসংকোচে বলা চলে। তাঁহার সৃষ্টি হয়ত এখন কল্পনামূলক, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে?

শ্রীমেঘনাদ সাহা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত, পৃ. ২৩+৪০৪। মূল্য ৸৵৹ আনা।

এই গ্রন্থে গীতাপাঠবিধি, গীতার ধ্যান, গীতার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি, বিষয়সূচী, এবং শ্লোকসূচী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

মূল শ্লোক বড় অক্ষরে, তন্নিম্নে ক্ষুদ্রাক্ষরে অন্বয়মুখে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, এবং তন্নিম্নে মধ্যমাক্ষরে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় প্রতিপত্রেই ক্ষুদ্রাক্ষরে পাদটীকাও সংযোজিত করা হইয়াছে। অন্বয় ও অনুবাদ শাঙ্করভাষ্যানুযায়ী। পাদটীকামধ্যে শ্রীধর ও মধুসূদনাদির ব্যাখ্যার সহিত তুলনাও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। অপ্রসিদ্ধ দুরূহ শব্দের অর্থ, অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, সমানার্থক শ্লোকের নির্দ্দেশ, প্রভৃতি বহু অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় এই পাদটীকার মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

অনুবাদটি অতি সরল এবং মূলানুগত করিবার জন্য যত্নের কোন ত্রুটি করা হয় নাই। সাক্ষাৎভাবে কেবল মূলের সাহায্যে গীতার অর্থ বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থখানি অতীব উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীমদ্ভগবদগীতা—শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ২৲ টাকা।

এই যোগসিদ্ধ তত্ত্বদর্শী যোগী ও মহাপুরুষের গীতার ব্যাখ্যা অতি সরল ও সুন্দর হইয়াছে। গীতাপাঠক মাত্রেই এই ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

এই গীতার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে মঙ্গলাচরণ, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ধ্যান প্রভৃতি অন্তর্মুখী ব্যাখ্যা আছে। গীতার প্রকৃত মর্ম বুঝিবার পক্ষে আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়তা করিবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

মুক্তির পথে—আবুল হায়াত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির গণসংযোগ সমিতির পক্ষ হইতে প্রচারিত। পৃ. ৩৪। মূল্য এক আনা মাত্র।

পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার বিশেষত্ব আছে। ইহা বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির চেষ্টায় প্রকাশিত। বাংলা দেশের শিক্ষিত মুসলমান-সম্প্রদায়ের মনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি তীব্র বিরাগের ভাব আছে। তাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ করিয়া থাকেন, লেখক একে একে সেগুলিকে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কংগ্রেসই একমাত্র দরিদ্র এবং নিপীড়িত জনগণের মুক্তির আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছে। অতএব সকল মুক্তিকামী মুসলমানের পক্ষে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান করা কর্ত্তব্য।

এরূপ পুস্তিকার যাহাতে বহুল প্রচার হয় এবং প্রতি শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের হাতে ইহা পৌঁছে, আমরা তাহাই কামনা করি। আশা করা যায় বাংলার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি তৎপরতার সহিত এরূপ আরও শিক্ষাপ্রদ পুস্তিকার রচনা ও প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

সুরলোকের সন্ধানে—(সচিত্র, উত্তর-পশ্চিম ও কাশ্মীর ভ্রমণ) শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, বি-এল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৪৪+১৫খানি ছবি।

লেখক একখানি তীর্থযাত্রী স্পেশ্যাল ট্রেনে গয়া, কাশী প্রভৃতি হইয়া কাশ্মীরে গমন করেন। প্রতি জায়গায় দুই-এক দিন করিয়া ছিলেন, মনে হয় কেবল কাশ্মীরে সাত-আট দিনের বেশী অবস্থান করিয়াছিলেন। এরূপ ভ্রমণে যত দূর দেখা সম্ভব তিনি সেই ভাবেই তীর্থস্থানগুলি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর সহিত কিছু কিছু ঐতিহাসিক সংবাদও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১১৪ পৃষ্ঠার পার্শ্ববর্তী চিত্রটি "কাশ্মীরের পথে"র না হইয়া খাইবার-পাসের মত মনে হইতেছে।

যাহাই হউক, বাংলা ভাষায় উপরোক্ত তীর্থপথের বহু বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, এখানিতে কোনও বিশেষত্ব খুঁজিয়া পাইলাম না।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা—শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম.এ, বি.এস-সি। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম, এস-সি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও পরিবর্দ্ধিত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ১ বি, রসারোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বইখানিতে পাঁচটি অধ্যায়, তিনটি পরিশিষ্ট ও বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে। প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত রসায়নশাস্ত্রের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হওয়ায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে নূতন ব্রতী এবং রসায়নশাস্ত্র-শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের প্রধান অসুবিধা এই যে, প্রকৃত অভিজ্ঞতা ব্যতীত কেবল পুস্তকের সংক্ষিপ্ত উপদেশের সাহায্যে সর্ব্বত্র সফলতা অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না। তবে সহিষ্ণু ও উৎসাহী ব্যক্তিরা এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিবেন বলিয়া মনে হয়। রাসায়নিক পরীক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে মিশ্রণের বিভিন্ন পদার্থের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বা অনুপাত নির্ণয় করা, কিন্তু পুস্তকের সর্ব্বত্র পরিমাণ বা অনুপাত নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লোহার জিনিষ এনামেল করা, ক্রশিয়ানস্থ, সোনার রং করা, কাচের উপর লিখিবার কালি প্রভৃতি বিষয়গুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত লেখকের বর্ণনানুযায়ী শিরিষ কাগজ প্রস্তুত করিলে তাহা কার্য্যকরী হইবে কি না সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। কোন কোন বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও অপর কিছু কিছু দোষত্রুটি থাকিলেও বইখানি মোটের উপর ভালই হইয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অনমিতা—শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। পৃ. ২১৩। মূল্য দুই টাকা।

উপন্যাসখানিতে অনেকগুলি চরিত্র ও বহু ঘটনার সমন্বয়, কিন্তু মাত্র একটি ঘটনা আছে যাহাতে মানুষের হীন প্রবৃত্তির স্ফূর্তি দেখা যায়। অমরের অকৃত্রিম বন্ধু অজয় ক্ষণিক মোহে এক দিন বন্ধুপত্নীকে বন্ধুর অসুস্থতার অজুহাতে গৃহের বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত বইয়ের পরিকল্পনা এই ঘটনাটির উপর নির্ভর করিতেছে।

পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠুক এ সবাই চায়, কিন্তু যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন পৃথিবীর (অর্থাৎ সংসারের) রূপ ফুটাইতে হইলে সাদার পাশে পাশে কালোর আঁচড় ফুটাইতেই হইবে। সবাই ভালমানুষ, ভাল বলিতে চায়, ভাল করিতে চায়, সেবার জন্য টাকাকে টাকা জ্ঞান করে না—এই একটানা ভালমানুষির হিড়িকে একটি চরিত্র হইতে অন্য চরিত্রকে চেনা দুষ্কর হইয়া উঠে। একটি অধ্যায় সুরু করিলে তাহার শেষটায় যে কি হইবে সে-সম্বন্ধে কোন কৌতূহল থাকে না, কেন না পরিণতিটা পড়া না হইলেও অগোচর থাকিতে পায় না।

বইখানির আর একটি দোষ এর নাটকীয় আকস্মিকতা। অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় প্রয়োজনানুযায়ী চরিত্রগুলির পরস্পরের দেখা হইয়া যাওয়া। এই রকম একটা ধারণা জন্মিয়া যায় পাঠকের মনে—"যেমন অবস্থা দেখিতেছি এবার লেখক ঠিক কোন-না-কোন রকমে অমুক চরিত্র বা চরিত্রগুলিকে টানিয়া হাজির করিবেন।"—ইহাতে সেই ইনটারেষ্ট নষ্ট হয় যাহা উপন্যাসের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

তবুও লেখক মাঝে মাঝে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দরদ দিয়া দুঃখকে দেখিবার ও তাহার কাহিনী বলিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। জীবনের বৈচিত্র্য যদি আরও ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন তো তাঁহার কাছে ভাল জিনিস আশা করা যায়।

সোমলতা—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী। ভারতী ভবন। ১১ কলেজ স্কোয়ার। মূল্য এক টাকা বারো আনা

লেখক ক্ষুদ্র ভূমিকায় বলিয়াছেন 'সোমলতা' একখানি 'ট্রিলজী'র শেষ খণ্ড, তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত "ময়ূরাক্ষী" এবং "গৃহকপোতী" ইহার আদি

এবং মধ্যম খণ্ড। "সোমলতা" কিন্তু আত্মসম্পূর্ণ ; এ দিকে পূর্ব্ব খণ্ডদ্বয়ের সহিত ইহার যোগসূত্র ধরিতেও কষ্ট পাইতে হয় না।

লেখক যে পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বাংলার সহজিয়াপন্থী বৈষ্ণব জীবনের পরিমণ্ডল। নায়িকা বিনোদিনী সম্প্রদায়গতভাবে এই পরিমণ্ডলের মধ্যে না হইলেও তাহার জীবনে এর প্রভাব খুব বেশী। বইটি তাহার কলঙ্কিত প্রেমের কাহিনী। লেখক নিজেও এই কলঙ্ককে মর‍্যালিষ্টের চক্ষে দেখেন নাই, তাহার নায়িকা বা উপনায়িকারাও একে শঙ্কার দৃষ্টিতে দেখে নাই; রাধার কলঙ্ক যে সম্প্রদায়ের জীবনের মূল উপজীব্য, এমন কি তাই যাহাদের গরবের বস্তু, তাহারা দেখিতে পারে না। মুক্ত দৃষ্টিতে এর যা মাধুর্য্য লেখক দেখিয়াছেন তাহাই সংস্কারমুক্ত লেখনীতে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যে পাঠকের চক্ষে এই সমদৃষ্টির অঞ্জন নাই তাঁহার পক্ষে এ বই পড়া বিড়ম্বনা।

কলঙ্ককেও অগ্রাহ্য করিয়া যে চিত্তবৃত্তি এমন ভাবে নিজের পথ ধরিয়া চলে সে কি প্রেম ?—লেখক কোনও খানে এর সমাধান দিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহার প্রয়োজনও নাই;—এটা প্রেম হোক, মোহ মাত্র হোক, মানব-চিত্তের একটা অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতা মাত্র হোক, ক্ষণিক হোক, বা স্থায়ী হোক, রসজগতে এর মস্তবড় একটা মর্য্যাদা আছে, লেখক সেই দিক দিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন জিনিসটাকে। তাঁহার বইয়ের সুরটি পুরাপুরি বৈষ্ণব সাহিত্যের সুর।

স্বামীগৃহত্যাগ হইতে আবার স্বামীগৃহে ফিরিয়া যাওয়া এই দুইটি ঘটনার মধ্যে বইয়ের কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে। বাংলার সাধারণ অনাড়ম্বর পল্লীজীবনের ছোট ছোট ঘটনায় গল্পের ধারাটি বরাবর অব্যাহত থাকিয়া গিয়াছে। গল্প বলিবার ভঙ্গিটিও বেশ চমৎকার, কোথাও বৃথা বা ক্লান্তিকর বাগবিস্তার নাই।

চরিত্রগুলি ভালই ফুটিয়াছে। শুধু নায়িকা বিনোদিনীর চরিত্রে একটা জিনিস খুঁজিয়া পাইলাম না। লেখক কয়েক জায়গায় কয়েক জনের মুখ দিয়া তাহার চরিত্রে দুর্ব্বলতার পাশে তেজস্বিতা, দৃঢ়তার কথা বলাইয়াছেন। এই তেজস্বিতা, দৃঢ়তার সন্ধান বিশেষ কোথাও পাওয়া গেল না, পূর্ব্ব খণ্ড দুটিতে আছে কি না জানি না। তাহাকে পড়িতেই দেখা গিয়াছে এবং সে পতন বেশ চরম ভাবেই। শেষ দিকে বইয়ের ছাপায় কয়েক জায়গায় গুরুতর দোষ থাকিয়া গিয়াছে। প্রচ্ছদপটের ছবিটি শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের আঁকা।

শ্রীমধুসূদন—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) প্রণীত। ডি এম্ লাইব্রেরী। ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

"শ্রীমধুসূদন" মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন লইয়া একখানি নাটক। আঠার বৎসর বয়স হইতে মৃত্যু অবধি কবিবরের জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত উত্থানপতনের কাহিনী—কতকটা ইতিহাস ও কতকটা কল্পনার সাহায্যে লেখক নাটকখানিতে দেখাইয়াছেন। এত বড় একটা দীর্ঘ সময় এবং সুবিস্তীর্ণ পটভূমিতে স্থানকালের সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভব নয় বলিয়া লেখক সমগ্র নাটকটিকে অঙ্কে বিভক্ত না করিয়া প্রয়োজনমত পাঁচটি বিরতিতে (চরম বিরতি যবনিকা) বিভক্ত করিয়াছেন। দৃশ্য সংখ্যা সপ্তদশ। এই গেল নাটকের বহিরংশের কথা।

আভ্যন্তরিক উৎকর্ষে "শ্রীমধুসূদন" বাংলা ভাষায় একটি অপূর্ব্ব জিনিস হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যতদূর মনে হয় বিভূতি বাবুর 'পথের পাঁচালী'র পর সম্প্রতি অন্য কোন বই পাঠকমহলে এতটা সাড়া জাগায় নাই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন মধুসূদনের কাল তেমনি তাঁহার নিজের জীবন—দুইটিই অতীব বিস্ময়কর জিনিষ। যদি বলা যায় সমসাময়িক কালই মধুসূদনের মূর্ত্তি লইয়া উঠিয়াছিল তো কিছু বেশী বলা হয় না। বনফুলের নাটকে এই কাল আর মানুষ এত স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে লেখনীর দিক দিয়া সেও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। অথচ এমন একটাও জায়গা পাইলাম না যেখানে সমসাময়িক ইতিহাস obtrusive হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক প্রাসঙ্গিক ভাবেই ইতিহাস প্রবেশ করিয়াছে মধুর জীবনে এবং নিতান্ত প্রাসঙ্গিক ভাবেই মধুর জীবন আসিয়া সাময়িক ইতিহাসের গায়ে মিলাইয়া গিয়াছে।

প্রধান চরিত্রগুলি সবই ঐতিহাসিক—মধুসূদনের পিতামাতা ব্যতীত গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গিরিশ ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সব যাঁহারা মধুর জীবনে রশ্মিমাত্রও আলোকসম্পাত করিয়াছেন। সমস্ত চরিত্রগুলিই খুব অল্প আঁচড়ের মধ্যে আপন আপন স্বরূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া জটিল চরিত্র মধুর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ও মধুর নিজের। রাজনারায়ণের মধ্যে ঘটিয়াছে ব্যক্তিগত তেজের সঙ্গে বাৎসল্য স্নেহের, গৌরবের সঙ্গে নৈরাশ্যের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। মধু a chip of the old block; শুধু নবযুগকে পূর্ণতর আলিঙ্গন দিয়া আরও পূর্ণতর ভাবে ফুটিয়াছে। একটি চরিত্রের অপরটির মধ্যে বিবর্ত্তন লেখক অতি চমৎকার ভাবে দেখাইয়াছেন। রাজনারায়ণের চরিত্র যা আঁকিয়াছেন তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা কতটা আমার জানা নাই, তবে মধুর চরিত্র সম্পূর্ণ ই বাস্তব। লেখকের কৃতিত্ব এইখানে যে পাঠকের মনে একটা ছাপ থাকিয়া যায়—ঐ পিতা আর ঐ যুগ—মধুসূদন যাহা হইয়াছিলেন তাহা না হইয়া আর উপায় ছিল না।

মোটের উপর ভাষার ওজস্বিতায়, ঘটনার পরিকল্পনায়, যুগ এবং ব্যক্তিজীবনের যাথার্থ্যে শ্রীমধুসূদন এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন একটা অগ্নিযুগের মিছিল চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তাহার পুরোভাগে মেঘনাদবধের কবি স্বয়ং মধুসূদন—প্রদীপ্ত revolutionary, বিদ্রোহী!

"শ্রীমধুসূদন" মধুসূদনের resurrection, পুনর্জন্ম। মধুসূদন আবার, ভাষায়, বাণীর মন্ত্রে মূর্ত্তি লইয়া উঠিয়াছেন।

মধুসূদনের জীবনের কয়েকটি সময় নাটকে দর্শিত সময়ের সঙ্গে মিলিতেছে না। প্রথম দৃশ্যে মধুর বয়স ১৮ বৎসর দেখান হইয়াছে ; সময়টা ফেব্রুয়ারি ১৮৪৩। জন্ম-তারিখ (২৫ জানুয়ারি ১৮২৪) হইতে ধরিলে, মধুর বয়স এই সময় ১৯ হয়।

পঞ্চদশ দৃশ্যে ভূদেব ভোলানাথকে বলিতেছে—"মধু তাহলে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এল শেষ পর্য্যন্ত!" সময় দেখান হইয়াছে ১৮৬৯।

অথচ মধু ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে ফেরেন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে।

ষোড়শ দৃশ্যে মধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব সময় দেওয়া হইয়াছে ১৮৭৩ খৃঃ। অথচ মধু মারা যান ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

শেষের এই দুইটি সাল প্রেসের অপকীর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক, লেখককে এ-দিকটায় একটু নজর দিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদনের জীবনীর ভিত্তির উপর কথাগুলি লিখিলাম।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতীর অঙ্কুর

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

কিঞ্চিৎ কম চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। এক দিন আপিস হইতে বাড়ীতে আসিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর লিখিত একখানি পত্র পাইলাম। পত্রে তিনি অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছেন, "শান্তিনিকেতনে আমি ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া একটি স্কুল করিয়াছি। তোমার বড় ছেলেটির বয়স কত হইল? যদি আট-দশ বৎসরের হইয়া থাকে, তবে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়ো।"

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রকুমারের বয়স তখন আট কি নয় বৎসর হইবে। কবিবরের পত্র পাঠ করিয়া আমি আমার পিতাকে সেই পত্র পাঠ করিতে দিলাম। তিনি পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, "রবীন্দ্রবাবু ধীরেনকে বোলপুরে পাঠাইতে বলিয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা। কিন্তু আমরা দরিদ্র গৃহস্থ, তিনি রাজা বিশেষ লোক। তাঁহার স্কুলে ধীরেনকে রাখিতে যে ব্যয় হইবে, তাহা তাঁহার পক্ষে নগণ্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে হয়ত সে ব্যয়ভার বহন করা কষ্টকর বা অসাধ্য হইবে। স্কুলের বেতন কত, সেখানে থাকিলে মাসিক কিরূপ ব্যয় হইবে, রবীন্দ্রবাবু তাহা কিছুই লেখেন নাই। আমার মতে তুমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া অগ্রে মাসিক ব্যয়ের খবরটা জানিয়া লও, যদি আমাদের সাধ্যে কুলায় তাহা হইলে পাঠাইতে আপত্তি নাই। তবে ধীরেনকে পাঠাইবার পূর্ব্বে, তুমি এক বার নিজে গিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আসিলে ভাল হয়।"

আমি সেই দিনই কবিবরের পত্রের উত্তর দিলাম, সেই পত্রে আমার পিতার অভিমতও তাঁহাকে জানাইলাম। তিন দিন পরে রবীন্দ্রবাবুর পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি তোমার ছেলেকে পাঠাইতে বলিয়াছি, তুমি খরচের কথা লিখিয়াছ কেন? আমি তোমার সাংসারিক অবস্থার কথা জানি। তোমার ছেলের জন্য এক পয়সাও তোমাকে দিতে হইবে না। তুমি আসিবে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আসিবার পূর্ব্বে আমাকে সংবাদ দিলে স্টেশনে গাড়ী পাঠাইয়া দিব।"

আমি তখন কলিকাতায় একটা সওদাগরী আপিসে কার্য্য করিতাম, ছুটি না পাইলে বোলপুরে যাইতে পারি না, তাই ছুটির জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

সেই সময় চন্দননগরের সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য ৺রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়* আমাদের বাড়ীতে একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি শীঘ্রই এক দিন বোলপুরে যাইব শুনিয়া রাজারাম বাবু বলিলেন, "দ্বিজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় আছে, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে জানা-শুনা নাই। তোমার সঙ্গে গিয়া রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিলে হয়। আমি কবিবরকে সেই কথা লিখিলে তিনি উত্তরে লিখিলেন, "তোমার সঙ্গে রাজারাম বাবু আসিলে গুডফ্রাইডে উপলক্ষে ছুটি পাইয়া রাজারাম বাবুকে লইয়া বিশেষ আনন্দিত হইব।" ইহার কয়েক দিন পরেই আমি রবীন্দ্রবাবুর আমন্ত্রণে বোলপুর যাত্রা করিলাম।

আমরা প্রাতঃকালে স্নান আহার করিয়া ট্রেনে উঠিয়া বেলা প্রায় ৩টার সময় বোলপুর স্টেশনে গাড়ী হইতে

* স্বর্গীয় রাজারাম বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের আদি বাস হুগলী জেলার থানাকুল-কৃষ্ণনগরে। তিনি কৃষ্ণনগর হইতে চন্দননগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় কলিকাতায় প্রথমে যে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, রাজারাম বাবু তাহাতে অন্যতম অধ্যাপকরূপে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিতেন। স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ও রাজারাম বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রাজারাম বাবু ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ঠুংরি প্রভৃতি কণ্ঠসঙ্গীত ও পাখোয়াজ, ডুগি-তবলা, বীণা, সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি যন্ত্র-সঙ্গীত, উভয় প্রকার সঙ্গীতই শিক্ষা দিতেন। চন্দননগরের বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়ক ৺বসন্তলাল মিত্র, তৎকালীন সুবিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা ও গায়ক ৺রামচন্দ্র দত্ত রাজারাম বাবুর ছাত্র ছিলেন।

অবতরণ করিলাম। আমাদের দুই জনের সঙ্গে দুইটা ব্যাগ ছিল, তাহাতে বস্ত্র ও গামোছা প্রভৃতি লইয়াছিলাম। স্টেশনের গেটে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিয়া শান্তিনিকেতন হইতে কোন গাড়ী আসিয়াছে কিনা অনুসন্ধান করিতেছিলাম এমন সময় একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথায় যাইবেন?"

আমরা শান্তিনিকেতন যাইব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমিও শান্তিনিকেতনেই যাইব, আমার সঙ্গে আসুন, ঐ যে শান্তিনিকেতনের গাড়ী।" এই বলিয়া আমাদিগকে লইয়া একখানা বুলক্ ট্রেনের নিকট গমন করিলেন। বুলক্ ট্রেন গো-বাহিত শকট তবে তাহা দরমা-আচ্ছাদিত নহে, ঘোড়ার গাড়ীর মত অথবা শিবিকার মত তক্তাদ্বারা নির্ম্মিত, ভিতরে চার-পাঁচ জন আরোহী অনায়াসে বসিতে পারে। গাড়ীর তলায় ঘোড়ার গাড়ীর মত স্প্রিং থাকাতে অসমতল পথে আরোহীকে ধাক্কা খাইতে হয় না।

আমরা তিন জনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমাদের সহযাত্রী সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন যে, তিনি কলিকাতা হইতে আমাদের সহিত একই ট্রেনে আসিয়াছেন, তিনি রবীন্দ্রবাবুর জমিদারীর এক জন কর্ম্মচারী; রবীন্দ্রবাবু শান্তিনিকেতনে থাকিলে তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসিতে হয়। তিনি স্টেশন হইতে পদব্রজেই শান্তিনিকেতনে যাইতেন, আমাদের সহিত দেখা হওয়াতে তাঁহাকে আর চলিতে হইল না, আমাদের জন্য প্রেরিত গাড়ীতেই তিনি আমাদের সঙ্গে একত্রে গমন করিলেন। স্টেশন হইতে শান্তিনিকেতন বোধ হয় এক ক্রোশ হইবে। আমাদের সহযাত্রী সেই ভদ্রলোক বলিলেন যে, শান্তিনিকেতন যে গ্রামের নিকট অবস্থিত, সেই গ্রামের নাম ভুবনডাঙা। প্রায় আধ ঘণ্টার পর আমরা ভুবনডাঙা অতিক্রম করিয়া গ্রামের উত্তর দিকে মাঠে উপস্থিত হইলে, সেই ভদ্রলোক সম্মুখে অদূরে একটি দ্বিতল সুন্দর অট্টালিকা দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ শান্তিনিকেতন।"

একটা বড় জলাশয়ের পূর্ব্ব ও উত্তর পার্শ্ব দিয়া আমাদের গাড়ী শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকের ফটকে উপস্থিত হইল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র এক জন দ্বারবান গাড়ীর ভিতর হইতে আমাদের ব্যাগ দুইটি লইয়া আমাদিগকে সেই অট্টালিকাতে লইয়া গেল। স্টেশন হইতে যে-ভদ্রলোকটি আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনি আমাদের সঙ্গে না গিয়া অন্য পথে অট্টালিকার পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন।

শান্তিনিকেতন একটি প্রকাণ্ড সুন্দর বাগান, বাগানে নানাবিধ ফলকর বৃক্ষ ও ফুলের গাছ, বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে অট্টালিকা—অট্টালিকা হইতে দক্ষিণ দিকের ফটক পর্য্যন্ত একটি সুন্দর, সরল, বিস্তৃত পথ। পরে দেখিয়াছিলাম যে, বাগানের উত্তর দিকেও ঐরূপ একটি ফটক ও ফটক পর্য্যন্ত পথ আছে। উত্তর দিকের ঐ পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ আমলকী গাছ। বাগানের পশ্চিম ও উত্তর দিকে বিস্তৃত মাঠ, নিকটে গ্রাম নাই। পূর্ব্ব দিকে কিছু দূরে রেলওয়ে লাইন, কিন্তু শান্তিনিকেতন হইতে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ শান্তিনিকেতন উচ্চভূমিতে অবস্থিত, রেলপথ সেই উচ্চভূমি খনন করিয়া প্রায় ২০ হাত নীচে দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলের ভূমি নিম্নবঙ্গের ভূমির মত সমতল নহে, উঁচু নীচু ঢেউখেলান। শান্তিনিকেতনের অগ্নিকোণে, যে-জলাশয়ের ধার দিয়া আমাদের গাড়ী আসিয়াছিল, সেই জলাশয়ের দক্ষিণে ভুবনডাঙা নামক গ্রাম। এই জলাশয়টিকে বাঁধ বলে। ক্রমনিম্ন ভূমির নিম্ন দিকে বাঁধ বাঁধিয়া জলাশয় করা হইয়াছে। এইরূপ জলাশয়কেই বীরভূম জেলাতে বাঁধ বলে।

আমরা দ্বারবানের সঙ্গে অট্টালিকায় নিম্নতলস্থ হল ঘরে প্রবেশ করিলে দ্বারবান একটা টেবিলের উপর ব্যাগ দুইটি রাখিয়া চলিয়া যাইবামাত্র অন্য দ্বার দিয়া এক জন বাঙালী ভৃত্য হলঘরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল যে আমরা তামাক খাই কি না? রাজারাম বাবু তামাক খাইতেন, তিনি ধূমপানের ইচ্ছা জানাইলে ভৃত্য বলিল—ব্রাহ্মণের হুঁকা? রাজারাম বাবু সম্মতি প্রকাশ করিলে ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে তামাক সাজিয়া আনিয়া রাজারাম বাবুর হাতে হুঁকা দিয়া বলিল, আপনারা কূয়ার জলে স্নান করিবেন, না বাঁধে স্নান

করিবেন? আমরা স্নান করিয়া আসিয়াছি শুনিয়া সে বলিল, তবে আপনাদের আহারের স্থান করিতে বলি?

রাজারাম বাবু বলিলেন, আমরা বাড়ী হইতে স্নানাহার সারিয়া আসিয়াছি, সেজন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রবীন্দ্রবাবু কোথায়?

ভৃত্য বলিল, তিনি উপরে আছেন, চারিটার পরই নীচে আসিবেন, এই বলিয়া চলিয়া গেল এবং প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দুইখানা রেকাবিতে কিছু মিষ্টান্ন ও ফলমূল আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, আপনারা মুখে হাতে জল দিয়ে একটু জলযোগ করুন।

রাজারাম বাবু বলিলেন, এখন আবার জলখাবার আনলে কেন?

ভৃত্য বলিল, সেই কোন্ সকালে কলকাতা থেকে আহার করে এসেছেন, আবার রাত্রে নয়টার সময় খাওয়া হবে, একটু জলযোগ না করলে কষ্ট হবে। এই বলিয়া সে আমাদিগকে মুখ-হাত ধুইবার স্থান দেখাইয়া দিলে আমরা মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া জলযোগে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের জলখাওয়া শেষ হইলে রাজারাম বাবু পুনরায় ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন, ভৃত্য রেকাবি দুইখানা লইয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল—বাবু এখনই আসবেন, তাঁর নামবার সময় হয়েছে।

পাঁচ-ছয় মিনিট পরে পার্শ্বস্থ কক্ষে পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, রবীন্দ্রবাবু সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছেন। আমি সেই কক্ষের দ্বারের নিকট অগ্রসর হইলে রবীন্দ্রবাবু আমাকে দেখিতে পাইয়া হাসিমুখে বলিলেন, যোগিন এসেছ? রাজারাম বাবু এসেছেন?

আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকটে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি লইয়া বলিলাম, "হাঁ তিনি এসেছেন।"

রবীন্দ্রবাবু হলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজারাম বাবুকে দেখিবামাত্র হাসিমুখে নমস্কার করিলে রাজারাম বাবুও দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিনমস্কার করিলেন।

আমরা তিন জনে উপবেশন করিলে রাজারাম বাবু বলিলেন, "বোধ হয় পঁচিশ বৎসরের পর আমি আপনাকে দেখিলাম। আমি আপনার বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকটে যখন আপনাদের যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাইতাম, তখন আপনার বয়স বোধ হয় পনর-ষোল বৎসর হইবে।"

রাজারাম বাবু রবীন্দ্রবাবু অপেক্ষা কুড়ি-বাইশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা দুই জনে সেই সেকালের অর্থাৎ রবীন্দ্রবাবুর পনর-ষোল বৎসর বয়সের ও তাহারও পূর্ব্বেকার ঘটনার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আমি নীরব শ্রোতা হইয়া তাঁহাদের আলোচনা শুনিতে লাগিলাম। সেই সেকালে, আদি ব্রাহ্মসমাজে কে সঙ্গীত করিতেন, কে পাখোয়াজ বাজাইতেন, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে সেকালের কোন্ কোন্ সুবিখ্যাত গায়ক আসিতেন, রাজারাম বাবু কোথায় কোন্ কোন্ ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। আমি লক্ষ্য করিলাম, অন্য সময় আমি রবীন্দ্রবাবুর কাছে গেলে তিনি আমার সঙ্গে যেরূপ বিবিধ বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিতেন, সেদিন সেরূপ করিলেন না, আমি যেন তাঁহাদের আলাপ-পরিচয়ের বাহিরে পড়িয়া রহিলাম। আমি বুঝিলাম যে, রাজারাম বাবুর সহিত সেদিন তাঁহার প্রথম পরিচয় বলিয়া তিনি শিষ্টাচারবশতঃ রাজারাম বাবুর সঙ্গেই আগ্রহ সহকারে কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইলেন। বিশেষতঃ সেদিন রাজারাম বাবুর সঙ্গে যে-সকল ব্যক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল, আমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার কৈশোরের যৌবনের বিস্মৃতপ্রায় কোন কোন ঘটনার কথা রাজারাম বাবুর মুখে শুনিয়া যে আনন্দ লাভ করিতেছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম।

বেলা পাঁচটার সময় রবীন্দ্রবাবু গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "এস যোগিন, তোমাকে আমার ইস্কুল দেখাই গে।" এই বলিয়া রাজারাম বাবুকে বলিলেন, "আমি এখানে একটা পাঠশালা খুলেছি, সেই কথা যোগিনকে লিখে ওকে এখানে আসতে বলেছিলেম।"

এই বলিয়া তিনি রাজারামবাবুকে লইয়া অগ্রসর হইলেন, আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম।

বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত একতলা ঘরে আমরা উপস্থিত হইলাম। ঘরটি খুব বড়ও নহে ছোটও নহে, বোধ হয় পনর-যোল হাত দীর্ঘ ও আট-নয় হাত প্রস্থ হইবে। ঘরের মেঝেতে ঢালা বিছানা পাতা, আট-নয়টি বালক সেই বিছানার উপর দুই তিন দলে বিভক্ত হইয়া বসিয়া ছিল। রবীন্দ্রবাবু সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া রাজারাম বাবুকে বলিলেন, "এই আমার পাঠশালা।" দেখিলাম, তিন-চারি জন ভদ্রলোক ছেলেদের পড়াইতেছেন। শিক্ষকগণের মধ্যে আমার পূর্ব্বপরিচিত দুই জন লোককে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। এক জন স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, আর এক জন স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়। দেখিলাম, এক জন পশ্চিম-ভারতীয় ভদ্রলোক কয়েকটি ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার হিন্দুস্থানী বলিয়া মনে হইল, পরে শুনিলাম তিনি সিন্ধুদেশবাসী খ্রীস্টান, তাঁহার নাম মিঃ রেবাচাঁদ। এই তিন জন ব্যতীত আর এক জন বাঙালী ভদ্রলোককে সেখানে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়াতে জানিলাম, তিনি আমাদের চন্দননগরের ডাক্তার হরলাল দত্ত মহাশয়ের জামাতা, নাম বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র নান। কার্ত্তিকবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষক নহেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, সেই জন্য কার্ত্তিকবাবু মাঝে মাঝে আসিয়া দশ-পনর দিন শান্তিনিকেতনে থাকেন, সেই সময় তিনি ছাত্রগণকে রবীন্দ্রবাবুর নির্দ্দেশক্রমে পড়াইয়া থাকেন।

পাছে ছাত্রদের পড়াশুনায় ব্যাঘাত হয়, তাই আমরা কক্ষের এক পার্শ্বে নীরবে বসিয়া রহিলাম। রবীন্দ্রবাবু তিন-চারিটি বালককে ইংরাজী পড়াইতে লাগিলেন। এই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় একটি নূতন ব্যবস্থা দেখিলাম, প্রায় সকল বিষয়ই মুখে মুখে শিখান হইতেছিল, অন্যান্য স্কুলের মত পুস্তকের সহিত ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিলাম না। রবীন্দ্রবাবু এক-একটি বাংলা শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ বলিয়া দিয়া সেই শব্দ ক্রিয়ার সহিত কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, কয়েকটি বালককে লইয়া শিখাইতে লাগিলেন। দেখিলাম, দশ-বার মিনিটের মধ্যেই ছাত্রেরা "আমার বই টেবিলের উপরে আছে" "তোমার হাত-বাক্সের মধ্যে ছিল" প্রভৃতি ছোট ছোট বাক্য ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বালকদিগের খেলিবার ছুটি হইল। অন্যান্য স্কুলে খেলিবার ছুটি হইলে ছাত্রেরা যেরূপ ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি করে, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম না, পার্থক্য এই দেখিলাম যে রবীন্দ্রবাবু ও শিক্ষকগণও ছাত্রদের খেলার সাথী হইলেন; তাঁহারা দৌড়াদৌড়ি না করিয়া, এক স্থানে বসিয়া বালকগণের ক্রীড়া পরিচালনা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন যে, আমার বড় ছেলের বয়স যদি আট-দশ বৎসর হইয়া থাকে, তবে তাহাকে তাঁহার স্কুলে পাঠাইয়া দিলে তিনি আনন্দিত হইবেন। দেখিলাম, ছাত্রদের বয়স আট-দশ বৎসরই হইবে। দুইটি ছাত্রের বয়স বোধ হয় এগার বৎসর হইবে, যেটির বয়স সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, তাহার বয়স বোধ হয় ছয় বৎসর হইবে, শুনিলাম সেটি রবীন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ।

সন্ধ্যার পর বালকগণ স্কুলের বারান্দায় সমবেত হইল। শুনিলাম, সন্ধ্যার পর রবীন্দ্রবাবু বালকগণকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেদিন রাজারামবাবু ছিলেন বলিয়া বোধ হয় বালকগণের সঙ্গীত শিক্ষা বন্ধ রাখিয়া কবিবর রাজারামবাবুর সহিত সঙ্গীত আলোচনা করিতে লাগিলেন। স্কুলে একটি বক্স হার্ম্মোনিয়ম ছিল, রবীন্দ্রবাবু তাহা লইয়া একটি গান করিলেন। গানটি কবির স্বরচিত। তাহার পর তিনি রাজারামবাবুকে একটি গান করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে গানে অভ্যস্ত নই। যে যন্ত্রে সুর বাঁধা থাকে, চাবি টিইপিলে একটা সুর বাহির হয়, সেরূপ যন্ত্র আমি ব্যবহার করি না। আমার মনে হয়, হার্ম্মোনিয়মটা যেন ছেলেদের ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের ছাপান মানের বই, ডিক্সনারি খুলিতে হয় না, বানান দেখিতে হয় না, পাতা উল্টাইলেই উদ্দিষ্ট শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। তানপুরা, সেতার, বীণা, এস্রাজ, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রে সুর বাঁধিয়া লইতে হয়, তাহাতে শিক্ষার্থীদের অতি শীঘ্র সুরবোধ জন্মে, আমার

কোন ছাত্রকে আমি হার্মোনিয়মের সঙ্গে গলা সাধিতে বা গান গাহিতে দিই না।"

রাজারামবাবুর কথা শুনিয়া কবিবর এক জনকে তানপুরা আনিতে বলিলে, আট-দশ মিনিট পরে একটা তানপুরা আনীত হইল, তখন রাজারামবাবু একটি স্বরচিত বাংলা গান করিলেন। তাহার পর প্রায় রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বাংলা ও হিন্দী কয়েকটি গান ও রাগরাগিণী সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলিল।

রাত্রি নয়টার সময় রবীন্দ্রবাবু আমাদের সকলকে লইয়া শান্তিনিকেতনে সেই অট্টালিকায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম যে, যে-হলঘরে আমরা বসিয়াছিলাম, তাহার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় আমাদের ভোজনের স্থান হইয়াছে। আসন ও থালা, বাটি, গ্লাস প্রভৃতি তৈজসপত্র সব এক রকমের। রবীন্দ্রবাবু একটা আসনে উপবেশন করিলে ছাত্রগণ তাঁহার দক্ষিণ দিকে এবং আমরা তাঁহার বাম দিকে উপবেশন করিলাম। রবীন্দ্রবাবু আসনে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে উপাসনা করিলেন। আহারের শেষেও সেইরূপ উপাসনা করিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলে আমরাও আসন ত্যাগ করিলাম। ছাত্রগণ হাত মুখ ধুইয়া স্কুলে চলিয়া গেল, রবীন্দ্রবাবু আমাদিগকে লইয়া সেই হলঘরে গিয়া উপবেশন করিলেন, এক জন ভৃত্য রাজারামবাবুকে তামাক দিয়া গেল।

রাত্রি দশটার সময় আমার নিদ্রাবোধ হইলে রবীন্দ্রবাবু বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "যোগিন, তোমার ঘুম পাচ্ছে। সমস্ত দিন গাড়ীতে এসেছ, শরীর অবসন্ন হয়েছে, তুমি যাও শোও গে।" অনন্তর রাজারামবাবুকে বলিলেন, "আপনারও গাড়ীতে এসে কষ্ট হয়েছে, আপনিও বিশ্রাম করুন, আমরাও একটু পরেই উঠব।" কবিবরের অনুমতি পাইয়া আমরা দণ্ডায়মান হইলে এক জন ভৃত্য হলের পশ্চিম দিকে একটা কক্ষে আমাদিগকে লইয়া গেল। আমরা দেখিলাম সেই কক্ষে দুইটি পৃথক্ শয্যা রচিত হইয়াছে। ভৃত্য দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে রাজারামবাবু আমাকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "যোগিন, একটা বিষয় লক্ষ্য করেছ? আমাদের সঙ্গে আজ রবীন্দ্রবাবুর সাক্ষাতের পর তিনি একবারও আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, আমাদের আহারাদি হইয়াছে কি না, কেন বল দেখি?" আমি এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, "টাকা থাকলেই লোকে বড়লোক হয় না, বড়লোক প্রমাণ হয় ব্যবহারে। তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগকে এমন শিখাইয়া দিয়াছেন যে তাহারাই অতিথি-সৎকার নিখুঁত ভাবে করিতে পারে। রবীন্দ্রবাবু জানেন যে, তিনি না থাকিলেও অতিথি-অভ্যাগতদিগের কোন অসুবিধা বা অতিথি-সৎকারে কণামাত্র ত্রুটি হইবে না।

পরদিন ভোরবেলা, ঢং-ঢং করিয়া ঘণ্টার শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমরা হলঘরে আসিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বদিনের সেই বাঙালী ভৃত্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রবাবু উঠিয়াছেন কিনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "বাবু অনেকক্ষণ উঠেছেন, এখন তিনি স্নান করছেন।" কখন তিনি নিচে আসিবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিল যে রবীন্দ্রবাবু স্নান করিয়া প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হয়েন; ভ্রমণের পর তিনি মন্দিরে উপাসনা করিতে যান, উপাসনার পর স্কুলে যাইবেন। সে জিজ্ঞাসা করিল আমরা এখন স্নান করিব কি পরে স্নান করিব। রাজারাম বাবু বলিলেন, "এত সকালে স্নান করা আমাদের অভ্যাস নাই, আমরা একটু বেড়াইয়া আসিয়া স্নান করিব।"

আমাদের মুখ হাত ধোওয়া শেষ হইলে রাজারাম বাবু বলিলেন, "চল যোগিন, আমরা একটু চারি দিকে ঘুরে আসি।" আমরা স্কুলের কাছে আসিয়া দেখিলাম, বালকগণ ল্যাঙ্গট পরিয়া ধূলিধূসরিত হইয়া দ্বারবানের সঙ্গে কুস্তি করিতেছে। নয়-দশ বৎসর বয়স্ক বাঙালী বালকগণের এক জন প্রাপ্তবয়স্ক বলবান পশ্চিমা পালোয়ানের সহিত কুস্তি দেখিয়া আমরা বিশেষ আমোদ বোধ করিলাম। পাঁচ-সাত মিনিট কুস্তি দেখিয়া আমরা দক্ষিণ দিকের ফটক—অর্থাৎ পূর্ব্বদিন যে ফটকে আমরা গাড়ী হইতে নামিয়াছিলাম, সেই ফটক হইতে বাহির হইয়া ভুবনডাঙা গ্রামের দিকে যাইতে লাগিলাম। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। দেখিলাম আমাদের বাম দিকে, বাগানের সীমানার বাহিরে অসংখ্য ছোট ছোট ঝোপ রহিয়াছে এবং সেই ঝোপের মধ্যে দুইখানি

তৃণাচ্ছাদিত কুটীর রহিয়াছে। একটা কুটীরের দাওয়াতে উপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া আমরা সেই দিকে অগ্রসর হইলে তিনি হাসিমুখে আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, তাই লোকালয়ে বাস না করিয়া এই শালবনে কুটীরে একাকী বাস করি, আর ঐ কুটীরে শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ তাঁহার ভাইকে লইয়া থাকেন।" শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদের ছোট ভাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র, বয়স দশ-এগার বৎসর হইবে।

আমরা যে ছোট ছোট ঝোপ দেখিয়াছিলাম, সেগুলি শালগাছের চারা, অধিকাংশ গাছই কোমর-সমান উচ্চ, দুই-চারিটা তিন হাত সাড়ে তিন হাত উচ্চ হইয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, রবীন্দ্রবাবু এইখানে একটা শালবন তৈয়ারি করিতেছেন। ঐ সকল শালের চারা দূর হইতে আনাইয়া রোপণ করা হইয়াছে। সে শালবন এখনও আছে কি না জানি না; যদি থাকে, তবে এত দিনে গাছগুলি নিশ্চয়ই খুব বড় হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আমরা ভুবনডাঙা গ্রামটি প্রদক্ষিণ করিয়া আবার যখন বাঁধের নিকটে আসিলাম তখন ছাত্রেরা বাঁধে স্নান করিতেছিল, ছোট ছোট ছেলেদের জলাশয়ে স্নান করিবার সময় এক জন শিক্ষক তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন, সেদিন জগদানন্দবাবুকে ছাত্রদের সহিত স্নান করিতে দেখিলাম। উপাধ্যায় মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে বেড়াইতেছিলেন, বেড়াইবার সময় তাঁহার নিকট হইতে শান্তিনিকেতন ও বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইলাম। তিনি বলিলেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নির্জ্জনে ঈশ্বর-চিন্তায় কালযাপনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে কলিকাতা হইতে বহুদূরে নির্জ্জন স্থানে এই শান্তিনিকেতন স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে যে-কোন ভদ্রলোক আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন। শান্তিনিকেতনের সীমার মধ্যে মাদক দ্রব্য সেবন এবং মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য সপ্তাহে দুই-তিন দিন মাংস খাইতে দেওয়া হয়; সেই জন্য রবীন্দ্রবাবু স্কুলগৃহের অব্যবহিত পশ্চিমে শান্তিনিকেতনের সীমার বাহিরে ছাত্রদের জন্য রন্ধনাগার ও ভোজনাগার নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ছাত্রেরা সেইখানেই ভোজন করে, তবে মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনে তাহাদের গুরুদেবের সঙ্গেও আহার করে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রগণ রবীন্দ্রবাবুকে গুরুদেব বলে। উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, স্নানের পর ছাত্রগণ মন্দিরে গিয়া রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে উপাসনা করে, তাহার পর স্কুলে আসিয়া জলযোগের পর পড়াশুনা করে।

বেলা সাতটার সময় ছাত্রেরা শিক্ষকগণের সহিত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপাসনা-মন্দিরে গমন করিল। আমরা অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে আট-দশ জন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে এক জন রাজারাম বাবুকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে রাজারাম বাবু বলিলেন, "আমি আপনাকে ঠিক চিনিতে পারিতেছি না।" সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "কলিকাতার সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। আপনি আমাকে বিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু আমি আমার ওস্তাদজীকে কি ভুলিতে পারি?" সেই ভদ্রলোকের বয়স তখন বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসর হইবে। তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা কলিকাতা হইতে রাত্রির ট্রেনে যাত্রা করিয়া ভোরবেলা বোলপুর স্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে আসিয়াছেন। তাঁহারা কয় জন আসিবেন এবং কোন্ ট্রেনে আসিবেন তাহার স্থিরতা ছিল না বলিয়া পূর্ব্বে কবিবরকে সংবাদ দিতে পারেন নাই।

মন্দিরে শঙ্খধ্বনি (আমার ঠিক মনে নাই শঙ্খধ্বনি কি ঘণ্টাধ্বনি, তবে শঙ্খধ্বনি বলিয়াই মনে হইতেছে) শ্রবণ করিয়া আমরা সকলে মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড হল, উহার প্রাচীর ইষ্টকের পরিবর্ত্তে শার্শীর মত কাচে নির্ম্মিত। হলের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে সারি সারি কুশাসন পাতা, বোধ হয় চল্লিশ কি পঞ্চাশখানা আসন ছিল। মন্দিরের ছাদের উপর এক পার্শ্বে রথের চূড়ার মত একটি অতি উচ্চ লৌহনির্ম্মিত চূড়া আছে। রেলের গাড়ী ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক গভীর খাদের মধ্য দিয়া গিয়াছে বলিয়া, ট্রেনের যাত্রীরা গাড়ী হইতে শান্তিনিকেতনের অট্টালিকা দেখিতে

পায় না, কিন্তু এই চূড়ার উপরিভাগ বোলপুর স্টেশন হইতে দেড় মাইল বা দুই মাইল উত্তরে গাড়ী আসিলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্দিরের বাহিরে পাদুকা উন্মোচনপূর্ব্বক আমরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রবাবু পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, মন্দিরের পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাস্য হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে গায়ক ও বাদকগণ এবং বাম পার্শ্বে ছাত্রগণকে লইয়া শিক্ষকগণ স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। আমরাও নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করিলে পাখোয়াজ ও তানপুরা সহযোগে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইল। মন্দিরস্থ সকলের গাম্ভীর্য্যে ধূপ-ধুনার সৌরভে মন্দিরটি যেন শান্তি ও পবিত্রতার আকর বলিয়া মনে হইতেছিল, ব্রহ্মসঙ্গীতটি যেন সেই শান্তি ও পবিত্রতা বহুগুণে বর্দ্ধিত করিল। সঙ্গীতের পর কবিবর প্রায় দশ-বার মিনিট প্রার্থনা করিলেন। কবিবর মধুর কণ্ঠে গম্ভীর অথচ সুললিত ভাষায় যখন প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন আমার মনে হইল যে, তাঁহার মুখে উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দ যেন আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতে লাগিল। উপাসনার পর আর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইলে উপাসনাকার্য্য শেষ হইল। উহার পূর্ব্বে ও পরে চন্দননগরে এবং কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মসঙ্গীত, উপাসনা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি, এমন কি মাঘোৎসবের সময় মহর্ষির জোড়াসাঁকোর ভবনেও স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা এবং রবীন্দ্রবাবুর মুখে ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সেদিন শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনাতে যোগ দিয়া হৃদয়ে ও মনে যে শান্তি ও পবিত্রতার ভাব জাগরূক হইয়াছিল, মনে হইল যে তাহা অতুলনীয়।

বালকেরা শিক্ষকদের সহিত স্কুলে চলিয়া গেল, রবীন্দ্রবাবু তাঁহার নবাগত অতিথিদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে হলঘরে গমন করিলেন, রাজারাম বাবু, কার্ত্তিকবাবু ও আমরা তিন জনে কথা কহিতে কহিতে অট্টালিকার দিকে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে আমি কার্ত্তিকবাবুকে বলিলাম যে আজ মন্দিরে আমি যে অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি পাইয়াছি, পূর্ব্বে সেরূপ কখনও পাই নাই। রাজারাম বাবু বলিলেন, "সেটা মহর্ষির সাধনার প্রভাব। এই শান্তিনিকেতন মহর্ষির সাধনার পীঠস্থান। তিনি এই স্থানে যে অপার্থিব শান্তি ও পবিত্রতার বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফল কখনও ব্যর্থ হইবে না। ইহা একটি মহাতীর্থ।"

আমরা হলের দ্বারে উপস্থিত হইলে ভৃত্য বলিল, "আপনারা বাঁধে স্নান করিবেন, না কুয়াতলায় স্নান করিবেন?" রাজারাম বাবু বলিলেন যে বহুদিন হইতে তোলাজলে স্নান করিতেছেন, জলে অবগাহন করিয়া স্নান করেন না। রাজারাম বাবু বাঁধে যাইবেন না শুনিয়া আমিও আর বাঁধে গেলাম না, দুই জনেই কুয়াতলায় গিয়া স্নান করিলাম। কুয়াতলায় আর এক জন ভৃত্য উপস্থিত ছিল, সে-ই জল তুলিয়া দিল। স্নানান্তে আমরা সেইখানেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম। আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম পূর্ব্ব দিনের সেই ভৃত্য আমাদের জন্য দুইটা রেকাবিতে মোহনভোগ ও দুই গ্লাস জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমরা জলযোগ করিয়া ইস্কুলে গেলাম। সকালে আটটা হইতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইত। সকালে দেখিলাম ছাত্রেরা পুস্তক লইয়া পড়িতেছে। কোন শিক্ষক অঙ্ক শিখাইতেছেন, কেহ বা ম্যাপ দেখাইয়া ভূগোল পড়াইতেছেন, কেহ বা সাহিত্য পড়াইতেছেন। সেদিন সকালে রবীন্দ্রবাবুকে স্কুলে দেখিলাম না, বোধ হয় তিনি কলিকাতা হইতে সমাগত ভদ্রলোকদিগের নিকটে ছিলেন।

বেলা এগারটার সময় শিক্ষকগণের সহিত আমরা আহার করিতে গেলাম, সেদিন ছাত্রগণ আর আমাদের সঙ্গে গেল না, তাহারা ছাত্রাবাসের পাকশালাতে ভোজন করিতে গেল। আমরা পূর্ব্বরাত্রিতে যেখানে আহার করিয়াছিলাম, সেইখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কবিবর তাঁহার নূতন অতিথিদিগকে লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, প্রত্যেকের অন্ন শ্বেতপ্রস্তরের থালাতে সজ্জিত রহিয়াছে, ব্যঞ্জনের বাটি ও গ্লাসগুলিও শ্বেতপাথরের। পূর্ব্বরাত্রির মত কবিবর ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে কিয়ৎক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে নীরবে মনে মনে উপাসনা করিলেন।

বেলা বারটার সময় রবীন্দ্রবাবু উপরে চলিয়া গেলেন, আমরা হলঘরে বসিয়া নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। আমরা সেইদিন রাত্রির ট্রেনে চন্দননগরে ফিরিব, একথা রবীন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলাম।

সেদিন বৈকালে ছাত্রদের কোন ক্লাস হইল না, সন্ধ্যা হইতে সঙ্গীতচর্চ্চা আরম্ভ হইল। কবিবর ও রাজারাম বাবু উভয়েই গান করিলেন। আমার মনে হইতেছে, রাজারাম বাবুর সেই কলিকাতাবাসী সাকরেদটিও গান করিয়াছিলেন। কবিবর এক বার রাজারাম বাবুকে বলিলেন, "আপনি এখানে থাকিয়া স্কুলে সঙ্গীত শিক্ষার ভার লইতে পারেন নাকি?" উত্তরে রাজারামবাবু বলিলেন, "আমার সংসারে আমি একমাত্র পুরুষ, সেই জন্য আমাকে বাড়ীতে থাকিতে হয়। এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে এখানে থাকিতে পারিলে ত ধন্য হই, কিন্তু থাকিবার উপায় নাই।"

কিয়ৎক্ষণ পরে রবীন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন, "যোগিন, যদি আজই ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আটটার সময় আহারাদি করিয়া লইও, আমাদের সঙ্গে রাত্রি নয়টায় খাইলে আজ আর যাওয়া হইবে না।" তিনি পূর্ব্বেই তাঁহার পাচককে বোধ হয় বলিয়া রাখিয়াছিলেন, কেননা রাত্রি আটটার সময় সেই ভৃত্য আসিয়া আমাকে বলিল, "আপনাদের খাবার দেওয়া হইয়াছে।" আমরা আহার করিয়া রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় লইবার জন্য আবার স্কুলে গেলাম, ভৃত্য আমাদের ব্যাগ দুইটা লইয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। আমি গিয়া কবিবরকে প্রণাম করিলাম, এবং উপাধ্যায় মহাশয়, জগদানন্দবাবু, কার্ত্তিকবাবু প্রভৃতির নিকট বিদায় লইলাম। রাজারামবাবুও সকলের সহিত নমস্কার বিনিময় করিলে, রবীন্দ্রবাবু তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে ফটক পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। দেখিলাম, পূর্ব্বদিনের সেই গাড়ী উপস্থিত রহিয়াছে। গাড়ীর মধ্যে আমাদের ব্যাগ রহিয়াছে। আর এক বার প্রণাম ও নমস্কারের পর আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রের বয়স তখন নয় বৎসর। আমার মুখে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা শুনিয়া আমার পিতা ধীরেনকে শান্তিনিকেতনে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। রাজারাম বাবুও ধীরেনকে বোলপুরে পাঠাইবার জন্য আমার পিতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দিন-পনর পরে আমি আপিস হইতে এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বোলপুরে ধীরেনকে লইয়া গেলাম। যাইবার পূর্ব্বে কবিবরকে পত্র দিয়াছিলাম। বোলপুরে ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলাম যে, আমাদের জন্য শান্তি-নিকেতনের গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। সেই দিনই ধীরেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইল।

ধীরেনকে রাখিতে গিয়া আমি পাঁচ দিন সেখানে ছিলাম। সেই পাঁচ দিনে স্কুলের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলাম। সাধারণ স্কুলে যেরূপ শ্রেণী-বিভাগ থাকে, ঐ স্কুলে সেরূপ শ্রেণী-বিভাগ ছিল না, সকল ছাত্রই সকল শ্রেণীর ছাত্র। যে ছাত্র যে-বিষয়ে যত দূর জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাকে তদনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইত। ধীরেন ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ পর্য্যন্ত গণিত শিখিয়াছিল, বাংলা যে-কোন পুস্তক পড়িতে ও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত কিন্তু ইংরেজীর অক্ষরপরিচয় পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে সে কোন স্কুলে পড়ে নাই, বাড়ীতে আমার পিতার কাছে পড়াশুনা করিত। আমার পিতা সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য করিয়া সে সময় পেন্সন লইয়া বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার এই অভিমত ছিল যে, দশ-বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেরা যদি মাতৃভাষায় শিক্ষা পায়, তাহা হইলে পরে যে-কোন বিদেশীয় ভাষা তাহারা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে। সেই জন্য তিনি আমাদিগকে দশ-এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাংলা স্কুলে পড়াইয়া পরে ইংরেজী স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন। ধীরেনকে কোন বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া স্বয়ং তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধীরেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গিয়া ইংরেজী আরম্ভ করিয়াছিল, সেই জন্য সাত-আট বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের সহিত তাহাকে ইংরেজী পড়িতে হইত। কিন্তু বাংলা, গণিত ও ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের ছাত্রদের সহিত

একত্র পড়িত। সকল ছাত্রের পক্ষেই এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। স্কুলে বার্ষিক ষাণ্মাসিক পরীক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রগণের শিক্ষা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা শিক্ষকগণই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানেন। তাঁহারা যে-ছাত্রকে যে-পুস্তক পড়িবার অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন তাহাকে সেই পুস্তক পড়াইতেন। শিক্ষাবিষয়ে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অনেকটা সেকালের চতুষ্পাঠীর শিক্ষা-প্রণালী অনুসৃত হইত। তবে চতুষ্পাঠীর শিক্ষার সহিত আশ্রমের শিক্ষায় এই প্রভেদ ছিল যে, চতুষ্পাঠীতে প্রত্যেক ছাত্র ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, কাব্য, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের একটি মাত্র অধ্যয়ন করে এবং সেই বিষয়ের পাঠ শেষ হইলে অন্য বিষয়ের পাঠ আরম্ভ করে ; স্মৃতির ছাত্র অলঙ্কার পড়ে না, কাব্যের ছাত্র দর্শন পড়ে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সকল ছাত্রকেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, সঙ্গীত, শিল্পকার্য্য—সকল বিষয়ই প্রত্যেক ছাত্রকেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। কবিবর স্বয়ং ছাত্রদিগকে ইংরেজী, বাংলা ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, জগদানন্দবাবু বিজ্ঞান পড়াইতেন, কার্ত্তিকবাবু ভূগোল পড়াইতেন।

চার-পাঁচ দিন সেখানে থাকিয়া আমি ছাত্রদের দৈনিক কার্য্যক্রম যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা এই :—অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের পর ছাত্রগণকে কুস্তি ও ব্যায়াম করিতে হইত, তাহার পর সূর্য্যোদয়ের সময় স্নান; স্নানের সময় সন্তরণ-শিক্ষা। স্নানান্তে মন্দিরে গিয়া উপাসনা। উপাসনার পর জলযোগ—মোহনভোগ ও দুগ্ধ। তাহার পর বেলা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত পড়াশুনা, এগারটার সময় ভোজন। ভোজনের পর বিশ্রাম, বিশ্রাম অর্থে দিবানিদ্রা বা শয়ন নহে—স্কুলঘরের মধ্যে বসিয়া ক্রীড়া (indoor games), গল্প প্রভৃতি। কয়েক মাস পরে এক বার গিয়া দেখিয়াছিলাম যে এক জন মৃৎশিল্পীকে মধ্যাহ্নকালে ছাত্রগণকে মাটির ফল ফুল পাতা ও পুতুল প্রভৃতির নির্ম্মাণ শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে কাঠের কাজ ও বয়নশিল্প শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ধীরেন স্বহস্তে একখানি গামোছা বয়ন করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। বেলা চারিটার পর পুনরায় জলযোগ, কোন দিন লুচি, কোন দিন চিঁড়ার ফলার বা মুড়ি এবং ঋতু-অনুযায়ী ফলমূল। এই জলযোগের পর আবার কিয়ৎক্ষণ অধ্যয়ন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাত্রগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিত। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত, আবৃত্তি, গল্প প্রভৃতি। ছাত্রগণকে অনুমানে পারদর্শী করিবার জন্য কবিবর অতি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এক দিন দেখিলাম, ছোট বড় ভাঙা ইট আনাইয়া এক স্থানে রাখা হইয়াছে। ইটগুলি কি হইবে জিজ্ঞাসা করাতে কবিবর বলিলেন—"এখনই দেখিতে পাইবে।" সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাত্রদের খেলিবার ছুটি হইলে কবিবর ছাত্রদের লইয়া এক স্থানে উপবেশন করিলেন এবং এক জনের পর এক জন ছাত্রকে ডাকিয়া, এক-একখানা ইটের ওজন কত হইবে, ছাত্রদিগকে আন্দাজ করিতে বলিলেন। ছাত্রগণ যাহা বলিল, তিনি তাহা এক জন শিক্ষককে লিখিতে বলিলেন। তার পর একখানির পর একখানি ইট তৌলদাঁড়িতে ওজন করিয়া ছাত্রগণকে দেখাইয়া দিলেন যে তাহারা যে ওজন অনুমান করিয়াছিল তাহা প্রকৃত ওজন হইতে কত তফাৎ। অন্য এক দিন দেখিলাম, তিনি একটা বল দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সেটা কত গজ দূরে পড়িল তাহা ছাত্রগণকে অনুমান করিতে বলিলেন এবং পরে গজের দ্বারা মাপিয়া দেখাইলেন যে, প্রকৃত দূরত্ব হইতে তাহাদের কথিত আনুমানিক দূরত্বের পার্থক্য কিরূপ। এইরূপে ভারের অনুমান, দূরত্বের অনুমান, সময়ের অনুমান সম্বন্ধে ছাত্রগণের একটা ধারণা হইত।

শিক্ষকগণ যে সকল সময় স্কুলগৃহের মধ্যে বসিয়াই অধ্যাপনা করিতেন, তাহা নহে; এক জন শিক্ষক হয়ত তিনটি ছাত্রকে লইয়া একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়াইতে লাগিলেন, অন্য এক জন শিক্ষক অপর তিন-চারিটি ছাত্রকে লইয়া বাগানের আর এক দিকে অন্য একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়াইতে লাগিলেন। একবার দেখিয়াছিলাম, জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় একটা গাছতলায়

বসিয়া ছাত্রগণের সহিত বিজ্ঞান সম্বন্ধে গল্প করিতেছেন। উদ্ভিদের গাত্রে আঘাত করিলে যে তাহারাও বেদনা বোধ করে, তাহা আমরা কিরূপে জানিতে পারি, সেই সম্বন্ধে তিনি গল্প করিতেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কেও এক বার কবিবরের "পাঠশালায়" গুরুমহাশয়গিরি করিতে দেখিয়াছিলাম।

ধীরেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বোধ হয় দুই বৎসরের কিছু অধিক কাল ছিল। সেই সময়ের মধ্যে আমি পাঁচ-ছয় বার বোলপুরে গিয়াছিলাম। চন্দননগর হইতে ধীরেনই প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গমন করে। তাহার পর আমার মুখে আশ্রমের সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া হুগলীর ভূতপূর্ব্ব উকীল-সরকার ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৺ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এক দিন আমার সঙ্গে বোলপুরে গমন করেন ও রবীন্দ্রবাবুর সহিত পরিচিত হন। ইহার কয়েক দিন পরেই ললিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবনীমোহন এবং এক সহোদরকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার অল্পদিন পরে আমার অন্যতম বন্ধু এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের খুল্লতাত-পুত্র ৺প্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অরুণপ্রকাশকেও আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। অরুণপ্রকাশ এখন লক্ষ্ণৌয়ে একটা কলেজের অধ্যাপক। বঙ্কিম-যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক 'নবজীবন'-সম্পাদক ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অচ্যুতচন্দ্রকে এবং চন্দননগরের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক আমাদের প্রতিবেশী ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গৌরচন্দ্রকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। গৌরচন্দ্র সেখানে শিক্ষা শেষ করিয়া বিশ্বভারতীর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। গৌরচন্দ্র কবিবরের সঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া এখন শ্রীনিকেতনে আছেন। অচ্যুতচন্দ্র বর্ত্তমানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ধীরেনের সতীর্থগণের মধ্যে শ্রীমান্ প্রেমানন্দ সিংহ এখন হাইকোর্টের উকীল ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র অরুণচন্দ্র সেনও ধীরেনের সতীর্থ ছিলেন। ইনি এখন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক। সে সময় আরও যে কয় জন বালক ছিল তাহাদের সকলের নাম মনে নাই এবং কে কোথায় আছে জানি না। কবিবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ এবং কবিবরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র সন্তোষচন্দ্রকে লইয়াই বোধ হয় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একরূপ সূত্রপাত। রবীন্দ্রবাবু ইঁহাদের দুই জনকে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে কবিবর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, বর্ত্তমান শ্রীনিকেতন তাহার ফল। এখনকার প্রায় কুড়ি কি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন 'হিতবাদী'তে কার্য্য করিতাম, সে সময় এক দিন সন্তোষচন্দ্র আমার আপিসে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহার পর এক দিন সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাঠ করিলাম। ধীরেনের ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রম পরিত্যাগের পর সন্তোষচন্দ্র, অচ্যুতচন্দ্র, প্রেমানন্দ এবং আমাদের প্রতিবেশী গৌরচন্দ্র ব্যতীত ধীরেনের সতীর্থগণের মধ্যে কাহারও সহিত আমার আর দেখা হয় নাই। প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে ধীরেনের মৃত্যু হইয়াছে।

ব্রহ্মচার্য্যাশ্রমে ছাত্র বৃদ্ধির সহিত শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক দিন কবিবর আমাকে বলিলেন, "যোগিন, তোমার জানা এমন কোন লোক আছেন, যিনি যৎসামান্য বৃত্তির পরিবর্ত্তে আমার আশ্রমে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন? যদি থাকেন আমাকে পত্র দিও।" সেই সময় চন্দননগরের সুকবি শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ. পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন। আমি কবিবরের প্রস্তাবের কথা তাঁহাকে বলাতে তিনি আনন্দসহকারে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, আমিও রবীন্দ্রবাবুকে পত্রদ্বারা জানাইলাম যে নরেন্দ্রনাথ বোলপুরে যাইতে সম্মত। আশ্রম প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ এক দিন কবিবরকে দর্শন করিবার জন্য আমার সঙ্গে জোড়াসাঁকোতে গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি রবীন্দ্রবাবুর নিকটে অপরিচিত ছিলেন না। কবিবরের বন্ধু ৺শ্রীশচন্দ্র

মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবোধচন্দ্র মজুমদার এবং উপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্রমে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মনোরঞ্জন বাবু এখন সম্বলপুরে ওকালতি করেন।

ছাত্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছাত্রাবাসের প্রয়োজন হয়। আমি শেষ বার যখন বোলপুরে যাই তখন দেখি যে, স্কুলগৃহের পূর্ব্ব দিকে একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সুদীর্ঘ ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইতেছে। তখন প্রাচীর, টালির ছাদ এবং কক্ষতল সম্পূর্ণ হইয়াছিল, জানালায় ও দ্বারে তখনও কবাট লাগান হয় নাই। ছাত্রাবাসটি নির্ম্মিত হইবার পর ছাত্রগণ সেই গৃহে এবং শিক্ষকগণ স্কুলগৃহে থাকিতেন।

এখন, আমার এই তিয়াত্তর বৎসর বয়সে, দুর্ব্বল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং আমার এই রচনার মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটিবিচ্যুতি না থাকাই আশ্চর্য্য। আবার লিখিবার সময় এমন অনেক বিষয় মনে পড়িয়া যায়, যাহা লিখিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে। তবে একটা বিষয়ের উল্লেখ না করিলে আশ্রমের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ধীরেনের মুখে শুনিয়াছিলাম, আশ্রমে এক বার তাহার জ্বর হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর পত্নী সেই সংবাদ শুনিয়া ধীরেনকে ছাত্রাবাস হইতে নিজের কাছে লইয়া যাইবার জন্য এক জন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দেন। জ্বরটা তিন-চারি দিন ছিল, সে-সময় তাহাকে দুধ ও জল-সাবু খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। দশ বৎসরের বালক জলসাগু খাইতে আপত্তি করিলে রবীন্দ্রবাবুর পত্নী তাহাকে কাছে বসাইয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে "লক্ষ্মী আমার, যাদু আমার, এইটুকু খেয়ে ফেল, তাহলে তোমার জ্বর ভাল হয়ে যাবে" প্রভৃতি বলিয়া সাগু খাওয়াইতেন। আশ্রমে কোন বালকের পীড়া হইলে তিনি রোগীকে উপরে আপনার কাছে আনাইয়া স্বয়ং তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। পরবর্ত্তী কালে দেখিয়াছি, ধীরেন যখনই কবি-পত্নীর কথা বলিত, তখনই তাহার নয়নযুগল সজল হইয়া উঠিত।

ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, শান্তিনিকেতনের নৈর্ঋত কোণে, একটি অনতিবৃহৎ কক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামে যে অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল, এখন তাহা "বিশ্বভারতী" রূপ বিশাল বনস্পতিতে পরিণত হইয়া সমগ্র সভ্য জগতের বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতেছে। এক দিন পাঁচ-ছয়টি অল্পবয়স্ক বালককে লইয়া মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ যে-প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, এখন তাহা শত শত ছাত্রছাত্রীপরিবেষ্টিত অধ্যাপকমণ্ডলীর সমবায়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এক জন লোকের যত্ন, আগ্রহ, একাগ্রতা, স্বার্থত্যাগ এবং সর্ব্বোপরি অতুলনীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে যে কত বড় মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, বিশ্বভারতী তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। যদি রবীন্দ্রবাবু কবি, সাহিত্যিক বা সঙ্গীত-রচয়িতা নাও হইতেন তাহা হইলেও তাঁহাকে এই বিশ্বভারতীই জগদ্বিখ্যাত এবং অমরত্ব প্রদান করিত।



আলোচনা

গান্ধীজীর অহিংসা নীতি

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

"গান্ধীজীর অহিংসা নীতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ১৬ই পৌষের 'রাষ্ট্রবাণী'তে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার কতকগুলি মন্তব্যের আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনার সমালোচনা করিতে আমি অনিচ্ছুক। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু বলিতে হইতেছে।

'রাষ্ট্রবাণী'র প্রবন্ধটিতে লেখা হইয়াছে :—

"একজন মহিলা গান্ধীজীর নিকট পরামর্শ চাহেন। তিনি নিজেকে অহিংসার বিশ্বাসী বলেন এবং নির্যাতন বা অপমান আসিলে অহিংস ভাবে তাহার প্রতিকার কিরূপে করা যায় তাহা গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে গান্ধীজী বলেন :

"যে অহিংসা বিকাশের অনুশাসনগুলি মানিয়া চলে, যাহার প্রতিরোধ করার একান্ত ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকল বন্ধন ছিঁড়িতে পারে—তাহাকে অশক্ত করার জন্য যতই বল প্রযুক্ত হউক না কেন। অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাহাকে মরার শক্তি দিবে।

"কিন্তু এই প্রকার বীরত্ব তাহাদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব যাহারা অনুশীলন দ্বারা নিজেদিগকে প্রস্তুত করিয়াছে। যাহাদের অহিংসায় জীবন্ত বিশ্বাস নাই তাহাদের পক্ষে প্রচলিত আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা করা উচিত যাহাতে তাহারা অভদ্র যুবকের অশ্লীল ব্যবহার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।" (হরিজন, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮)

'যে নারীর অহিংসায় জীবন্ত বিশ্বাস নাই তাহাকে স্পষ্ট ভাবে প্রচলিত উপায়ে অর্থাৎ হিংসার বা অস্ত্রের বলে আত্মরক্ষা করিতে গান্ধীজী বলিতেছেন। অথচ ঐ প্রবন্ধ সম্পর্কেই রামানন্দ বাবু গান্ধীজীর মত এইরূপ বুঝিয়াছেন :—

"তিনি অহিংসাকে এত বড় মনে করেন যে, নারীর সতীত্ব রক্ষাকল্পেও আততায়ীর প্রতি সশস্ত্র বা অন্যবিধ বল প্রয়োগ তিনি বৈধ মনে করেন না।"'

'হরিজন' পত্রিকার ইংরেজী বাক্যগুলির অনুবাদ 'রাষ্ট্রবাণী'র।

"যে নারীর অহিংসায় জীবন্ত বিশ্বাস" আছে, গান্ধীজী বলিতেছেন, "অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাহাকে মরার শক্তি দিবে।" পক্ষান্তরে "যে নারীর অহিংসায় জীবন্ত বিশ্বাস নাই তাহাকে স্পষ্ট ভাবে প্রচলিত উপায়ে অর্থাৎ হিংসার বা অস্ত্রের বলে আত্মরক্ষা করিতে গান্ধীজী বলিতেছেন।"

"মরার শক্তি" এবং আত্মরক্ষার শক্তি এক বলিয়া আমি মনে করি না। অহিংসায় বিশ্বাসিনী নারী মরিবেন, তথাপি সশস্ত্র বা অস্ত্রবিহীন দৈহিক বলপ্রয়োগ দ্বারা আক্রমণকারীকে কাবু করিবেন না, কেবল তাহার চেষ্টার প্রতিরোধ (resist) করিবেন—গান্ধীজীর অভিপ্রায় আমি এইরূপ বুঝিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক খুলিয়া আমি কিছু বলিতে চাই না।

আমার এরূপ বুঝিবার কারণ সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-সম্পাদিত Mahatma Gandhi নামক পুস্তক হইতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে রহিয়াছে।

"He answers that a woman may resist, and resist unto death, but not use any other kind of violence."

শেষের "but not use any other kind of violence" কথাগুলির অর্থ আমি এই বুঝিয়াছি যে, আক্রান্তা নারী আক্রমণকারীকে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিবেন না, লাথি কীল চড় চাপড় মারিতে পারিবেন না, কামড়াইতে বা নখাঘাত করিতে পারিবেন না, তাহার সহিত ধস্তাধস্তি করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাঁহার নিজের মৃত্যু পর্য্যন্ত আক্রমণকারীর ইচ্ছায় বাধা দিতে (resist করিতে) পারিবেন। কি প্রকারে বাধা দিতে পারিবেন তাহা অনুমেয়। আক্রমণকারীকে আক্রমণে অসমর্থ করিতে না পারিলে resistanceএর চেষ্টা সফল হয় না। বলপ্রয়োগ (violence) তাহাকে অসমর্থ করিবার উপায়।

উপরে উদ্ধৃত ইংরেজী উপদেশটি অহিংসায় বিশ্বাসিনী বা অবিশ্বাসিনী আক্রান্তা সকল নারীর উদ্দেশেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু 'হরিজন' হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে অহিংসায় বিশ্বাসিনীকে এক প্রকার এবং তাহাতে অবিশ্বাসিনী নারীকে অন্য প্রকার ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। আক্রান্তা নারী কোন্ শ্রেণীর, তাহা তিনি নিজে স্থির করিবেন।

আমি এখনও মনে করি, গান্ধীজী সব সময়ে একই বিষয়ে সমান স্পষ্টার্থ কথা বলেন না; এই জন্য তাঁহার মতামত ঠিক্ বুঝা সব সময়ে সোজা নহে। অবশ্য তিনি জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক অস্পষ্টার্থ বাক্য বলেন, আমি এরূপ কিছু বলিতেছি না।

গান্ধীজীর মতে বলাৎকার-চেষ্টাও "অশ্লীল ব্যবহার" কথা দুটি দ্বারা বুঝায় কি না জানি না।

কোন নারী কোন দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হইলে যদি কাহারও মৃত্যু আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় হয়, তবে দুর্বৃত্তের মৃত্যুই অধিকতর আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়, আক্রান্তা নারীর নহে।

দুর্বৃত্তের হৃদয় ও আচরণ পরিবর্ত্তন কিংবা তাহার মৃত্যু তাহার ও সমাজের পক্ষে হিতকর। দুর্বৃত্তের মৃত্যু তাহার চরম অনিষ্ট নহে, দুর্বৃত্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকা চরম অনিষ্ট।

পুরোহিততন্ত্র ও গণতন্ত্র

শ্রীপ্রদোষবন্ধু দত্ত

গত পৌষ মাসের "বিবিধ প্রসঙ্গে" ৩৯৬ পৃষ্ঠায় "পুরোহিততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, গণতন্ত্র" শীর্ষক আলোচনায় লিখিত হইয়াছে, "জার্মেনীতে লুথার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্কার চেষ্টা করায় তদ্দ্বারা পুরোহিততন্ত্রের উচ্ছেদ ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতও হইয়াছিল। ব্রিটেনে অষ্টম হেনরী নিজের প্রথম ও তৃতীয় রিপু চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পোপকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল এবং মঠগুলির সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটেনে পুরোহিততন্ত্রের কোন দোষ ছিল না, তাহা নহে। সেখানে পুরোহিতদের ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিকতা কতকটা অগ্রসর হইতে থাকে।"

উপরিউক্ত মন্তব্যে পরোক্ষভাবে বলা হইয়াছে যে, তথাকথিত ধর্ম্মসংস্কারের পূর্ব্বে ইউরোপে গণতন্ত্রের লেশমাত্রও ছিল না। ইহাতে যেন ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ইউরোপের সনাতন ভক্তি (Catholic Faith) আর পুরোহিততন্ত্র একই বস্তু। কিন্তু আমাদের দেখিতে হইবে যে, লুথার-প্রবর্ত্তিত তথাকথিক ধর্ম্মসংস্কার কি সত্য সত্যই পুরোহিততন্ত্ররূপ জুজুর উচ্ছেদসাধন আর গণতন্ত্রের সূত্রপাত করিয়াছিল।

গ্রীসার তাঁহার "লুথার" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, স্যাক্সনীর যে সকল সনাতন ভক্ত (Catholic) এবং জুইংলী-পন্থী (Zwinglian) লুথারের মতবাদ মানিয়া না চলিত, তাহাদের শাস্তি ছিল স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসন। অধিকন্তু প্রকাশ্যভাবে তাহাদের মতবাদ প্রচার না করিলেও স্যাক্সনীতে চরমপন্থী অ্যানাব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড (Grisar : *Luther*, V, 592 ; VI, 252.) লুথারের" পর "ধর্ম্মসংস্কারে"র প্রধান পাণ্ডা ছিলেন বোধ হয় ক্যালভিন। তাঁহার প্ররোচনায় কি করিয়া যে মাইকেল সের্ভেটুস্ নামক জনৈক "ধর্ম্মসংস্কারক"ই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অজানা নাই। এই বিষয়ে লুথার ও ক্যালভিনের বন্ধু এবং এক জন নামকরা ধর্ম্মসংস্কারক ফিলিপ ম্যালাঙ্কথন ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালভিনের নিকটে লিখিত এক পত্রে বলেন, "আমি আপনার সহিত একমত। আমার মতে আপনারা এই ভগবদ্বিদ্বেষী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া ন্যায়সঙ্গত এবং বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন" (Grisar : *Luther*, III, 358.) ঐ বৎসরই থিওডোর অব্ বেসা লিখিয়াছিলেন, "ভগবদ্বাক্যের এবং ভক্তসমাজের শাসনব্যবস্থার (ecclesiastical discipline) উচ্ছেদক ভ্রষ্টমতের চেয়ে অধিক গুরুতর অপরাধ আর কি হইতে পারে? খ্রীষ্টান শাসকবর্গ, ভগবানের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর; তিনি তোমাদের হস্তে, তাঁহারই গৌরব করণার্থে তরবারি প্রদান করিয়াছেন। এই সকল মনুষ্যরূপী পশুকে সবিক্রমে আঘাত কর"। (Vacandard : *The Inquisition*, 222-24.) এই সকলই কি পুরোহিততন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষণ? উপরিউক্ত উক্তিসমূহ অ-সনাতন ভক্তদের উক্তি এবং উহা সংগৃহীতও হইয়াছে অ-সনাতনীদের দ্বারা লিখিত পুস্তক হইতে; কাজে কাজেই তাহারা সে সনাতন ভক্তদের পক্ষ টানিয়া এবং পুরোহিততন্ত্রের ধামা ধরিয়া ঐ সকল কথা বলিয়াছেন, সে আশঙ্কা নাই।

দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, আজকাল আমরা পুরোহিততন্ত্র বলিতে যাহা বুঝি, লুথারের "ধর্ম্মসংস্কার"ই তাহার মূল। গণতন্ত্রের সূত্রপাত করা তো দূরের কথা লুথারের ধর্ম্মসংস্কার পৃথিবীতে এক অভিনব পুরোহিততন্ত্র আনয়ন করে। তাহার সহিত গণতন্ত্রের কোন সাদৃশ্যই থাকিতে পারে না। যে-সকল দীক্ষিত সনাতনভক্ত সনাতনভক্ত-সমাজে থাকিয়া তাহারই শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিত, সনাতন পুরোহিততন্ত্র প্রধানতঃ তাহাদেরই শাস্তিবিধান করিত। তাহাও আবার নৈতিক শাস্তি (ex-communication)। অবশ্য সনাতন পুরোহিততন্ত্রে আস্থাবান্ শাসকবর্গ যদি নৈতিক শাস্তি যথেষ্ট নয় মনে করিয়া, ঐ সকল বিরুদ্ধাচারীদিগের দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থাও করিত, তাহা হইলে ঐ কার্য্যের নিমিত্ত পুরোহিততন্ত্রকে বোধ হয় দায়ী করা যায় না। কিন্তু ঐরূপ কার্য্য যে কেবল সনাতনভক্ত শাসকবর্গই করিয়াছিলেন তাহা নহে; উদাহরণস্বরূপ, প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্থানে মনে রাখিতে হইবে যে, সনাতন পুরোহিততন্ত্র যে-অপরাধে কেবল নৈতিক দণ্ডবিধান করিত, তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় সেই অপরাধেই অত্যন্ত গুরুতর দণ্ড হইত। কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারের ফলে যে পুরোহিততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার দৌরাত্ম্যে যে কত অ-ধর্ম্মসংস্কারপন্থী নৈতিক এবং দৈহিক দণ্ড লাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই স্থানেই সনাতন পুরোহিততন্ত্র এবং "theocracy"র প্রভেদ। ধর্ম্মসংস্কারের সময় হইতেই উহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

ব্রিটেনে যে ধর্ম্মসংস্কারের ফলেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, এ কথা ঠিক নহে। ধর্ম্মসংস্কারের ফলে ধর্ম্মসংস্কারের আদি-ভূমি জার্ম্মানীতে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে গণতন্ত্রের কতটা উন্নতি হইয়াছিল, তাহা অ-সনাতনী ঐতিহাসিক হার্নাকের লেখা হইতেই প্রতীয়মান হয়:

"It is an altogether one-sided view, one, indeed, which wilfully disregards the facts, to hail in Luther the man of the new age, the hero of enlightenment and the creator of the modern spirit." (*Lehrbuch der Dogmengsch*, iii, 810.)

আর ব্রিটেনে যে ধর্ম্মসংস্কারের ফলে কি হইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি হইতেই বুঝা যায়:

"The history of the penal laws of Great Britain and Ireland under Henry VIII, Edward VI, Elizabeth, James I, Charles I, Cromwell, Charles II and William III is a history of fines, imprisonment, banishment, torture and death for the practice of the Catholic faith."

ইহাই কি গণতন্ত্রের স্বরূপ ?

ব্রিটেনে গণতন্ত্রের সূত্রপাত হয় ধর্ম্মসংস্কারের বহুযুগ পূর্ব্বে। সেই পুরাতন গণতান্ত্রিকতা ধর্ম্মসংস্কারের ফলে, না দেশাত্মবোধের ফলে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা পাঠকবর্গের বিচার্য্য। ব্রিটেনের ইতিহাস কি এত শীঘ্রই জনবন্ধু জনসাধারণের মুক্তিপত্র "মাগ্নাকার্টা"র উদ্যোক্তা, গণতন্ত্রের আদি পথপ্রদর্শক, পুরোহিত-তান্ত্রিক (?) আর্চবিশপ ল্যাংটনের নাম ভুলিয়া যাইবে? ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে কি গণপরিষদের (House of Commons) স্রষ্টা, "পুরোহিততন্ত্রের ধামাধরা" সাইমন-ডি-মন্‌ফোর্টের নাম মুছিয়া গিয়াছে? তিনিই বোধ হয় "গণপরিষদের জনক" নামের একমাত্র অধিকারী।

পরিশেষে আমি অ-সনাতনী ঐতিহাসিক Henry Hallam-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই আলোচনা শেষ করিতে চাই। তিনি বলেন,

"...Persecution is the deadly original sin of the reformed churches, which cools every honest man's zeal for their cause, in proportion as his reading becomes more extensive." *Literature of Europe*, II, Ch. ii; *Constitutional History*, I, Ch. ii.)

প্রবাসীর সম্পাদকের বক্তব্য

আমি যে লিখিয়াছিলাম, "তদ্দ্বারা পুরোহিততন্ত্রের উচ্ছেদ ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছিল", তাহা যথেষ্ট সাবধানতার সহিত লিখিত হয় নাই। "সূত্রপাত" বলা ভুল। ইয়োরোপের গণতন্ত্রের সূত্রপাত এবং কতকটা প্রতিষ্ঠা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসংস্কারের (Reformation-এর) পূর্ব্বেও তাহা হইয়াছিল।

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মনেতারা আদর্শ পুরুষ ছিলেন, বা তাঁহাদের কাহারও দ্বারা বা কাহারও প্রভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন হয় নাই, বলা আমার অভিপ্রেত ছিল না। আমার বক্তব্য এই যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসংস্কারের (Reformation-এর) ফলে পুরোহিতদের ক্ষমতা কমিয়াছিল এবং "গণতান্ত্রিকতা কতকটা অগ্রসর" হইয়াছিল।

লুথারের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক একমত নহেন, তাহা লেখক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হার্নাকের উক্তি হইতেই বুঝা যায়।

"অন্ধকূপহত্যা" ও হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

অন্ধকূপহত্যা সম্বন্ধে পৌষ মাসের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" লিখিত হইয়াছে "আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে ইহা মিথ্যা মনে করেন, কেহই সম্পূর্ণ সত্য মনে করেন না।" এই ঐতিহাসিকদের, অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ কয়েক জনের, নাম এবং কোন্ লেখায় তাঁহারা ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, জানিতে পারিলে, আমার মত নগণ্য ইতিহাস-পাঠকের উপকার হইবে।

আমার বিশ্বাস স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরেজ ঐতিহাসিক রাহুর গ্রাসমুক্ত শশধরের ন্যায় প্রতিপন্ন" (৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়) করিবার উদ্দেশ্যে, অন্ধকূপ-হত্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য যাহা লিখিয়াছেন, তার বেশী বোধ হয় কেহ লিখেন নাই। তবে আমার ধারণা ভ্রান্ত হইতে পারে। মুরশিদাবাদ নবাব স্কুলের হেডমাষ্টার লিট্‌ল সাহেব ঐ কার্য্যেরই সহায়তা করেন।

অক্ষয়বাবুর লেখার উত্তরে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস —নবাবী আমল' গ্রন্থের পরিশিষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মাত্র বাক্য এখানে উদ্ধৃত করিয়াছি:—"অন্ধকূপহত্যা সম্বন্ধে ইংরেজী, ফরাসী ও ওলন্দাজ দপ্তরের কাগজপত্র ও অন্যান্য সমসাময়িক প্রমাণ মিঃ হিল এত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে অন্ধবিশ্বাসী লোকেও এখন উহা উজ্জ্বলতরভাবে দেখিতে পাইবেন।"

সম্প্রতি History of the Armemians in Calcutta নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সেঠ্ সাহেব সমসাময়িক একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া অন্ধকূপহত্যার সত্যতার আর একটি প্রমাণ দিয়াছেন।

Oxford History of India, Cambridge History, Calcutta—Old and New—এ সব গ্রন্থের নাম করিলাম না, কারণ এগুলি "ইংরেজ" লিখিত ইতিহাস।

যাহা হউক, বিষয়টি সম্বন্ধে ধীর ও নিরপেক্ষভাবে আলোচনা হইলে ভাল হয়। ১৪৬ জন লোক মারা যায়, অথবা ১২৬, অথবা ১২৩, ঘরের মাপ ১৮×২০ না, অন্য রকমের এই সব লইয়া মতান্তরের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে যে অন্ধকূপহত্যা ঘটনাটিই অলীক। কারণ ইতিহাসের অনেক ঘটনা ঐরূপে অলীক প্রতিপন্ন করা যায়।

আজকাল এক শ্রেণীর লোকের কাছে সিরাজ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারই একটি নির্দ্দিষ্ট রূপে চিত্রিত করা রাজনৈতিক কারণে আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। 'প্রবাসী' এইরূপ মনোভাব বর্জ্জিত, ইহা মনে করি বলিয়াই এ সব কথা 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি।

প্রবাসীর সম্পাদকের বক্তব্য

"অন্ধকূপহত্যা" সম্পূর্ণ সত্য বা মিথ্যা, কিংবা অংশত সত্য বা মিথ্যা তাহার বিচার করা আমার উদ্দেশ্যবহির্ভূত।

যাহারা সিরাজুদ্দৌলা-উৎসবের পাণ্ডা তাহাদের মুরুব্বিরা হলওয়েল-স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের বিরোধী—এই ব্যাপারটার উপভোগ্যতা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

শুধু কি মুখের কথা

[রোম্যানকের 'A More Formality' নামক গল্পের অনুবাদ]

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার

মরিয়া হয়ে লীসা বড় একটা ঘরই ভাড়া ক'রে বসে। স্টেনোগ্রাফারি করে যা পায়, টানাটানি তাতে মিটতে চায় না। কিন্তু মাথা গুঁজে থাকতে হবে ত কোথাও। একা থাকার মত ছোট ঘর অনেক খুঁজেও একটা জোটান গেল না। এ ঘরটা বেশ বড়, কিন্তু বিপদ হচ্ছে এখানে শুধু বিবাহিত পরিবারই থাকতে পায়। ঘর বড়, ভাড়াও বেশী। কিন্তু ভাড়া দিয়েই কি ছাই রেহাই আছে? কোন বিবাহিত পরিবার এসে ভাড়া চাইলেই তাকে উঠে যেতে হবে।

এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ লীসার দেখা। তার পরিচিত যুবকও ঘর খুঁজছেন। অনেক দূর থেকে রোজ তাঁকে শহরে আসতে হয়। খুব অসুবিধা। "তুই যদি তাঁকে বিয়ে করিস—" মেয়েটি হাসতে হাসতে বলে—"আরে বিয়ের নামে একেবারে আঁৎকে উঠলি যে? আমি কি সত্যিই তোকে বিয়ে করতে বলছি নাকি, একটা কথার কথা। সুবিধা হবে তাই 'সম্বন্ধ স্বীকার করা। আধখানা ঘর তাঁকে ছেড়ে দিবি। ভাড়াটাও তোর কমে যাবে, আর হুকুম করলেই তোকে উঠতে হবে না। কি এমন কঠিন? দেখ ভেবে। মাথা গোঁজার একটা স্থান হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই ত আর ঘর মেলে না।"

ইচ্ছা করলেই যে ঘর মেলে না, লীসা নিজেই কি তা কম জানে। রাজী হয়ে যায়।

ভদ্রগোছের এক যুবক পরদিন দেখা করতে আসেন। "আমার সর্তের কথাগুলো বোধ হয় শুনেছেন," লীসা বলে।

—হ্যাঁ। এই ঘরের কথাই বোধ হয় হয়েছিল?

—হাঁ। এই ঘর।

ঘরটা সে এক বার ভাল ক'রে চেয়ে দেখে। সামরিক কায়দায় পা ফেলে মোটামুটি একটা মাপও নেয়। মনে মনে কি একটা হিসাব ক'রে লীসার দিকে চেয়ে বলে—কবে থেকে আমি আসতে পারি?

—যেদিন আপনার সুবিধা। কিন্তু আমার সর্তগুলোর কথা শুনেছেন ত?

—আজ্ঞে হাঁ। সে এক রকম…তা একটা কথা… বিয়েটা ত শুধু নামেই, না…?

"না না, সে শুধু নামেই," লীসা তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, "সে ত আমি আগেই বলেছি।"

—বেশ বেশ, আমিও তাই চাই। তবে কি জানেন ঘর বদলাতে বদলাতে এমনি আমার অবস্থা যে সত্যিকারের বিয়ে হলেও হয়ত বা রাজী হয়ে যেতাম।

লীসার দিকে চেয়ে যুবকটি হাসতে থাকে।

"না না, বিয়ে শুধু নামেই।" ত্রস্ত হয়ে লীসা বাধা দেয়।

—ছোট একটা পর্দা আমার আছে তাতেই কাজ চলবে। আর আপনার অসুবিধা না হ'লে বড় পর্দা কিনেও ঘরটা ভাগ ক'রে নেওয়া যেতে পারে। জানালা ত দুটো আছেই।

—না, আপনার ঐ ছোট পর্দাই থাক। বড় পর্দার হাঙ্গামে আর কাজ নেই। বেশী ভাগাভাগি করলে লোকে হয়ত বিয়েটাই সন্দেহ ক'রে বসবে।

পরদিন সে জিনিসপত্র নিয়ে উঠে এল। বিছানা আর পুরনো একটা রং-চটা সুটকেস।

—ঘর ভাড়ার অর্দ্ধেক আমাকে দিতে হবে?

—সেই রকমই ত কথা ছিল।

—বেশ, আর সেই বিয়ের ব্যাপারটা?

—কাল সকালেই হ'তে পারে। কাজে বেরুবার সময় রেজিস্টারের ওখানটা হয়ে গেলেই হবে এখন।…কিন্তু মাফ করবেন আপনার নামটাই এখনও জানা হয় নি।

—বালাসেভ। কিন্তু দেখুন একটা কথা বোধ হয়

আপনাকে আগেই ব'লে রাখা ভাল।…একটি মেয়েকে আমি ভালবাসি সে হয়ত মাঝে মাঝে দেখা করতে আসবে।

কোনমতে কথাটা সে শেষ করে।

"বেশ বেশ, বিকাল থেকে দুপুর রাত পর্য্যন্ত প্রায়ই ত আমার ডিউটি থাকে, আশা করি আপনাদের অসুবিধা হবে না।" লীসা মৃদু হাসে।

"না অসুবিধা আর কি।" বালাসেভ বেশ খুশীই হয়।

* * * *

বিয়ে রেজিস্টারি হয়ে গেছে। স্ত্রীর ভূমিকায় লীসাকে ভালই মানায়। সকালে উঠেই সে স্টোভ জেলে কফি তৈরি করে। বালাসেভ ততক্ষণে মুখ হাত ধুয়ে আসে। প্রথম প্রথম সঙ্কোচ ছিল খুবই। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধের সঙ্কোচও চাপা পড়ে গেছে। পরস্পরের কাছে ওরা অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। দরকার-মত লীসা হয়ত এটা-ওটা এগিয়েও দেয় বালাসেভকে।

আর একটু ঘনিষ্ঠতা হ'তেই—আর দু-জন লোক একসঙ্গে এক ঘরে থাকলে এতটুকু ঘনিষ্ঠতা হয়ই—'আপনি' ছেড়ে তারা এখন 'তুমি' বলে। বালাসেভের ডাকনামটাও লীসা জেনে নিয়েছে।

* * *

"কেমন আছিস রে?" লীসার সেই বন্ধু এক দিন দেখা করতে আসে।

—বেশ ভালই।

—তার পর নূতন লোকটি কেমন?

—বেশ ভদ্র, সঙ্গী হিসাবে বেশ ভালই।

—তা হ'লে দিন সুখেই কাটছে বল।

"সুখে? বলতে চাস কি?" বন্ধুর কথার সুরে লীসা কেমন যেন একটা অর্থ খুঁজে পায়।

—না না, সে সব কিছু না। আলাদা ঘর ভাড়া করার শক্তি নেই…তা ছাড়া শোন্, তাঁর এক জন প্রেমিকাও আছে।

—প্রেমিকা? সে আবার কে?

—হ্যাঁ, তাই।

—তোকে বিয়ে করেছে না? আবার প্রেমিকা কি রে?

—তাতে কি, বিয়ে ভেঙে দেওয়া ত আর এমন কিছু কঠিন নয়, দরকার হলেই ক'রে নেওয়া যাবে।

—তাকেই তবে বিয়ে করে নি কেন?

—বিয়ে ত করবে তাকেই, কিন্তু তারই কি ছাই চালচুলো আছে?

—তা হলে তোর দিকে ফিরেও চায় না বল?

—আমার দিকে চাইবে কেন? বললাম যে একটি মেয়েকে তিনি ভালবাসেন।

—তা হোক, অনেক পুরুষমানুষ আমার দেখা আছে, একটি প্রেমিকা থাকলেই অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে তারা একেবারে উদাসীন হয় না।

—না না, ইনি কিন্তু মোটেই সে-রকম নন। আমিও এতখানি আশা করি নি, বেশ ভদ্র আর বিনয়ী, আবার বাজে সঙ্কোচের বালাইও নেই। বেশ সহজ ব্যবহার। জিনিসপত্র কেনা থেকে খাওয়া-দাওয়া সব ত একসঙ্গেই, কেবল তাঁর প্রেমের ব্যাপারে আমার কৌতূহল নেই, আমাকে নিয়েও তিনি মাথা ঘামান না। তা বিয়ে ব্যাপারটার উপর তুই-ই বা অত জোর দিচ্ছিস কেন? আচ্ছা রেলগাড়ীতে দু-জন মেয়ে পুরুষ এক কামরায় ওঠে না? না, এক কামরায় উঠেছে বলেই তারা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে?—এটা আগের যুক্তি, লীসা শুধু একটু ঘুরিয়ে বলে।

"তা অবিশ্যি ঠিক।" মুখে বললেও বান্ধবীর মনে কোথায় যেন সন্দেহ থেকেই যায়।

—আচ্ছা সে-মেয়েটি এখানে আসে? তোর পেয়ালাতেই ত চা খায়, তোর বিছানাতে বসে?

"না না," ত্রস্ত হয়ে লীসা বাধা দেয়। "আমার জিনিস-পত্র কেউ ছোঁয় না।"

—তুই তাকে দেখেছিস?

—না, সে ইচ্ছাও অবশ্য হয় নি।

—আমি হ'লে কিন্তু এক বার না দেখে ছাড়তাম না, আর সেই দেখার কথাটা তোর এক বার মনেও হ'ল না? আশ্চর্য্যি মেয়ে যা হোক।

—তার আসার কথা থাকলেই আশু আমাকে জানান, আমিও ফেরবার আগে একটা ফোন ক'রে দি।

—আচ্ছা বালাসেভ থিয়েটারে যায় না? কার সঙ্গে যায়? তোকে নিয়ে, না তার সঙ্গেই?

—তার সঙ্গেই বোধ হয়, আমাকে নিয়ে কেন যাবেন, সে কেউ যায় নাকি?

"আমি কিন্তু সব অন্য রকমই ভেবেছিলাম," একটু ক্ষুণ্ণ ভাবেই সে বলে, "খুব হতাশ করলি যা হোক।"

"তার কোন কারণ ছিল না।" লীসা হেসে ওঠে।

* * *

লীসার মনটা খামকাই যেন ভারী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নিজের চেহারাটা যেন আজ নূতন ক'রে চোখে পড়ে। চুলগুলো সব অবিন্যস্ত জীবনে কোনদিন চিরুণী পড়ে নি। নাকটাও তেমন সুবিধার নয়। তবে মুখের রংটা ভালই।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে আটটা বেজে গেছে। এত দেরি ত কোনদিন হয় না। লীসা একটু ভাবনায় পড়ে, গেলেনই বা কোথায়?

খাবার টেবিলটা সে সাজাতে বসে। কেন যেন হঠাৎ খেয়াল হয় নিজের পেয়ালাটা সে গরম জল দিয়ে খুব ভাল ক'রে ধুয়ে আনে। রাত্রে আজকাল তারা একসঙ্গেই খায়। রাত হ'তে চলল দুপুর, অথচ ভদ্রলোকের দেখা নাই। লীসা ভয়ানক বিরক্ত হয়ে ওঠে। লোকটার আক্কেল দেখ, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সে ভাবে, কেন ফোন ক'রে একটা খবর দিলেই ত হয় যে ফিরতে দেরি হবে। হঠাৎ ভাবে রাস্তায় কিছু হয় নি ত? ট্রামে বাসেতে হামেসাই—আর ভাবতে পারে না, ব্যস্ত হয়ে আশুর আপিসে একটা ফোন ক'রে বসে। উত্তর নাই। এত রাত্রে আপিসে কেউ থাকে নাকি? কি করা যায়?

টেলিফোনের চোঙটা ফেলে দুই হাতে সে কপাল টিপে ধরে। আগে ছিল বিরক্তি, কিন্তু ভয়ে দুশ্চিন্তায় এখন তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

সাড়ে বারটায় আশু ফিরে আসে।

"কি ব্যাপার? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?" লীসা দৌড়ে যায়। কণ্ঠের উৎকণ্ঠা গোপন থাকে না, দু-হাতে বুকটা সে চেপে ধরে।

"মরুসিয়ার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল। ঘুরে এলাম একটু।" আশু বলে।

আধ মিনিটের মধ্যেই চুপ ক'রে লীসা শুয়ে পড়ে, কম্বল মুড়ি দিয়ে। সব চুপ।

"রাগ করলে নাকি লীসা? কি ব্যাপার?" আশু জিজ্ঞাসা করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাটা একটু কেঁপে ওঠে, কি যেন অন্যায় ক'রে ফেলেছে।

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে লীসা শুয়ে পড়েছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে, উত্তর দেয় না।

"কি লীসা ব্যাপার কি?" আশু একটু এগিয়ে আসে।

"ব্যাপার কি বোঝ না তুমি?" কম্বলখানা ঠেলে ফেলে এক ঝটকায় সে উঠে বলে, "আবার জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?"

জিব দিয়ে তার বিষ ঝরে। "একসঙ্গে থাকতে হ'লে এতটুকু ভদ্রতা অন্তত আশা করা যায়। কোথাকার যত রাজ্যের বাজে লোকের সঙ্গে তুমি সময় কাটাবে আর ব'সে থাকি আমি রাত জেগে।"

"ছিঃ লীসা, তাকে অপমান ক'রো না। কোথাকার কোন্ বাজে লোক সে নয়—সে আমার স্ত্রী।" অস্বাভাবিক জোর দিয়ে স্ত্রী কথাটা সে উচ্চারণ করে।

"ওঃ তোমার স্ত্রী! আগে শুনেছিলাম প্রেমিকা, এর মধ্যেই স্ত্রী হয়ে গেছে।" কম্বলটা সে গায়ের উপর টেনে নেয়। "শোন, তোমার প্রেমের কাহিনী আমি শুনতে বসি নি," লীসা আবার গর্জ্জে ওঠে। সর্ত্তের কথাগুলো দয়া করে একটু মনে রেখো। যেখানে ইচ্ছা যাকে খুশী তাকে নিয়েই তুমি ফূর্ত্তি কর, কিন্তু দয়া ক'রে সময়-মত খবর একটা দিও।" লীসা আবার কম্বলের মধ্যে ডুবে যায়।

"শোন লীসা," ধীরে ধীরে আশু বলে, "আমিও যে খুব সুখে আছি তা নয়—সে তুমি ঠিক বুঝবে না। এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধ সত্যই আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। এ

নিয়ে মরুসিয়ারও সন্দেহের অন্ত নেই। বিকালটা তোমার ছুটি ছিল বলেই তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করি নি। মরুসিয়াকে নিয়ে সিনেমাতে গেলাম। সেখানে অন্ততঃ মানুষের মত একটু বসা যাবে একই ছবি তিন বার দেখলাম। কোন মতে সময় কাটাতে আশ্রয় চাই।"

"এখন থেকে আমার পেয়ালা আর তোমরা টানাটানি ক'রো না," লীসা আবার মুখ বের করে।

* * *

তাদের জীবনের ধারাই বদলে গেছে। কথাবার্ত্তা লীসা আজকাল খুব কমই বলে। আণ্ড্রেও আগের সে সহজ ভাব হারিয়ে ফেলেছে। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। আহত আত্মাভিমান লীসাকে পাগল ক'রে তুলেছে। আইন-মত সব অধিকারই ত তার, অথচ··· বেশী আর লীসা ভাবতে পারে না।

আণ্ড্রে নূতন একটা পেয়ালা কিনে আনে, লীসা এক বার চেয়ে দেখে। ব্যাপার কি? এখন থেকেই এদের ঘরকন্না সুরু হ'ল নাকি? মনে মনে সে তেতে ওঠে; তা আমার টেবিলে এ উৎপাত কেন?

পাশের ঘরের একটি মেয়ে খুব দরদ দেখিয়ে এক দিন আলাপ করতে আসে।

—জানেন নাকি, আপনি না থাকলেই কে একটি মেয়ে আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসে।

"জানি," লীসা তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, "সে ওঁর বোন, তার সঙ্গে আমার ভাব নেই কিনা তাই।" মেয়েটি যে ওর কথা বিশ্বাস করে না সে তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। "থিয়েটারেও যান উনি বোনকেই নিয়ে, কই আপনাকে ত কোন দিন দেখি না তাঁর সঙ্গে?"

কথাটা এমন ক'রে লীসা কোন দিন ভাবে নি। একসঙ্গে থিয়েটারে যাবার কথাও কোন দিন মনে হয় নি। কিন্তু তাঁরও ত উচিত ছিল অন্ততঃ লোক-দেখানর জন্যও দুই-এক দিন লীসাকে নিয়ে যাওয়া! আর যাবেই বা কেমন ক'রে? তাহলে সেই হিংসুটে মেয়েটা কি আর ওঁকে আস্ত রাখবে? সেই জন্যই হয়ত···এলোমেলো চিন্তায় খেই হারিয়ে যায়।

আণ্ড্রের সেই কথাটা—লীসার পিত্তি একেবারে জলে ওঠে—'মানুষের মত একটু বসতে পাব' 'মানুষের মত একটু কথা বলতে পাব'—মানুষের মত কথা বুঝি শুধু তার সঙ্গেই বলা যায়। সে দেখতেই বা কেমন? কৌতূহলে লীসা যেন ফেটে ছিঁড়ে পড়ে।

এক দিন দেখেও নেয়। খুব সাধারণ একটা মেয়ে—না আছে রূপ, না বুদ্ধির দীপ্তি, ঠোঁটে আবার তার রং লাগান। বয়সও খুব কম মনে হয় না। আণ্ড্রে তার কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, উৎসাহের নিবিড়তায় সে যেন এক নূতন মানুষ। মেয়েটি এক সময় হঠাৎ আণ্ড্রের মুখের দিকে চেয়ে অকারণে হেসে ওঠে, সে হাসিতে আছে গভীর তৃপ্তির কোমল মাধুর্য্য। লীসার চোখ দুটি বিষিয়ে ওঠে। বাজে একটা মেয়ে, ভদ্রলোকের রুচিই বা কি! তাও যদি দেখতে একটু মানুষের মত হ'ত। ঈর্ষা আর ঘৃণায় লীসার মনে জাল বুনে চলে। আমি ঘরে না থাকলেই হতভাগী এসে হাজির হয়, আমার টেবিলে ব'সে আমারই পেয়ালায়—আস্পর্দ্ধা দেখ! রাগে লীসা ফুলতে থাকে।

সপ্তাহে তিন দিন লীসার রাতে ডিউটি। আণ্ড্রেরও তাতে সুবিধা। 'লীসা, রাতে ফেরবার আগে একটা ফোন করে দিও' বেশ সহজ ভাবেই আগে সে বলতে পারত। লীসাও একটু ঘাড় নাড়ত, 'আচ্ছা'। কিন্তু আজকাল সে ভয়ে ভয়ে থাকে, কখন হয়ত ভদ্রলোক সেই কথাই বলতে আসবে। আণ্ড্রেরও কেমন সঙ্কোচ হয়, আগের সে সহজ ভাব সে হারিয়ে ফেলেছে।

আণ্ড্রে আজ অনেকগুলো ফুল নিয়ে এসেছে লীসার জন্যে। অবাক হ'লেও লীসা একটু খুশী হয়।

—লীসা, বিকেলটা আজ তোমার ছুটি, না?

—হ্যাঁ।

—কোথাও বেরুচ্ছ নাকি?

ফুলের অর্থ বুঝতে বাকী রইল না। ঘৃণা আর বিরক্তিতে লীসার মন বিষিয়ে ওঠে।

"না, বিকালটা আজ ঘরেই আছি", লীসার স্বর কঠিন হয়ে ওঠে, "শরীর ভাল না, থাকলে অন্ততঃ ঘরে থাকার অধিকারটুকু আছে।"

"আমি ত আর জোর ক'রে তোমাকে তাড়াচ্ছি নে, শুধু জিজ্ঞাসা করলাম যে—" বিব্রত বালাসেত তাড়াতাড়ি শেষ করে, "আমিই বাইরে যাচ্ছি।"

"কোথায়, সিনেমাতে?" হিংস্র ভাবে লীসা হেসে ওঠে, "মানুষের মত একটু কথা বলতে? বেশ বেশ, আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।"

আণ্ডে জবাব দেয় না। কোটটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

লীসাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ে। সারাটা বিকাল বান্ধবীদের ওখানে আড্ডা দিয়ে ঘোরে।

* * *

"কিরে লী—?" কথাটা আর শেষ করা হয় না, লীসার দিকে চেয়ে সে যেন চমকে উঠে।

"এ তোর কি চেহারা হয়েছে রে?" লীসার সেই বন্ধু ধীরে ধীরে পাশে এসে বসে।

"আর অসহ্য হয়ে উঠেছে ভাই।" লীসা একেবারে ভেঙে পড়ে। "এখন থেকেই ওরা ঘর গোছাতে আরম্ভ করেছে, ঐ দেখ না আমারই টেবিলে এনে পেয়ালা সাজান হয়েছে। সেই হতভাগীকে নিয়ে থিয়েটারে, সিনেমায়—বুড়ী, পেত্নী।"

—তোর তাতে কি? যা খুশী করুক, তোর তাতে ক্ষতিটা কি? এক ঘরের ভাড়াটে বই ত নয়, আজ আছে কালই হয়ত চলে যাবে।

"কাল চলে যাবে?" লীসা ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কে বললে তোকে?"

—বলে নি কেউ, এই আমিই বলছিলাম, যে কোন দিন হয়ত চলে যেতে পারে।

"যখন খুশী যাক্ না চলে, এখানে ব'সে ওসব চলবে না" একটু চুপ ক'রে আবার বলে, "লোকটাকে দেখলেই ঘেন্নায় গা শির শির করে। জানিস ওর রুচির ছিরি—সেদিন দু-জনে বেড়াচ্ছিল, দেখতিস যদি তখন ভাবখানা। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম, একেবারে ভ্রূক্ষেপই নেই।"

"আরে দেখলেই কি আর সব সময় চিনতে হবে নাকি?" বান্ধবী মুচকি হেসে একটু টিপ্পনি কাটে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা লীসা চেপে ধরে। মিনিট খানেক চুপ করে থেকে লীসা আবার রুখে ওঠে, "এদিকে আবার সব দরদী জুটেছেন, এসে বলেন কোন এক মেয়ে নাকি রোজ আণ্ডের সঙ্গে আসে। বলি, সে ওঁর বোন। লোকের চোখে কত দিনই আর ধুলো দেওয়া যায়। যেদিনই বিকালটা আমার ছুটি থাকে তাকে নিয়ে ছোটা হয় সিনেমায়, মানুষের মত একটু কথা বলতে। মানুষের মত কথা ঘরেও ত ফুটো হ'তে পারে, আমি বোকা না হাবা? তাও যদি দেখতে একটু মানুষের মত হ'ত।"

—সেই ত হয়, যে যাকে ভালবাসে—

"সেটা কি মানুষ নাকি? লীসা ধমকে ওঠে—"আর কথার ও বোঝে কি?"

"ভালবাসা এমনিই—তার বিচার নেই, যুক্তিও নেই।" বন্ধু উঠে পড়ে।

* * *

আণ্ডের অসহ্য হয়ে উঠেছে। লীসা কথাবার্তা এক রকম বন্ধই করেছে। এখন সে একাই খেয়ে নেয়। সেই মেয়েটির আসার সম্ভাবনা থাকলে আর বেরুবার নাম করে না। আবার আণ্ডে বাইরে যেতে-না-যেতেই সে বেরিয়ে পড়ে।

"চলে যাও আমার ঘর ছেড়ে।" রাত একটায় ঘরে ফেরায় আণ্ডের এই অভ্যর্থনা—"তোমার এ-সব অভদ্রতার মধ্যে আমি নেই, আজকাল লোকে মুখের উপরই ঠাট্টা ক'রে যাচ্ছে।"

"যাব কোথায়?" আস্তে আস্তে আণ্ডে বলে, "জানই ত যে যেতে পারলেই ত বাঁচি।"

—ওঃ বাঁচ নাকি? বেশ ত বিনয় শিখেছ আজকাল।

—না···মানে···

—থাক, মানে ঢের হয়েছে, আর ব্যাখ্যার দরকার নেই।

পরদিন হুড়মুড় ক'রে আণ্ডে এসে ঘরে ঢোকে। "সে পেয়েছে, সেই একটা খুঁজে পেয়েছে।" কোন মতে কথা শেষ ক'রেই সে হাঁপাতে থাকে। চোখ মুখ তার খুশীতে ভরে গেছে।

"কে পেয়েছে? কি পেয়েছে?" কেন যেন লীসা একেবারে নীল হয়ে ওঠে।

"মরুসিয়া একটা ঘর পেয়েছে, তার ওখানেই উঠে যাচ্ছি। এবার তোমার মুক্তি। আর হ্যাঁ, সেই বিবাহ-বিচ্ছেদ—" জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতেই সে ব'লে চলে—"এক মিনিটের ব্যাপার, কার্ড একখানা রেজিস্ট্রারকে ফেলে দিলেই চুকে গেল, আপিসে যাবারও দরকার হবে না।"

পাথরের মূর্ত্তির মত লীসা দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের ঠিক মাঝখানটায়।

"দেখ তোয়ালেটা ফেলে যেয়ো না।" টান মেরে তোয়ালেটা হঠাৎ আণ্ড্রের গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে।

"ভুলে যেয়ো না এই যে টুথব্রাশ, সাবান, টুথ-পাউডার।" একে একে জিনিসগুলো সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। শেষে সেই নূতন কেনা পেয়ালাটা—আণ্ড্রের পায়ের নীচে খান খান হয়ে টুকরোগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে।

—দেখ কিছু যেন…

কে যেন গলা টিপে ধরে।

সব বাঁধ ভেঙে যায়। বালিশে মুখ গুঁজে সে কি করুণ কান্না, অসহ্য, অসংযত—সে কান্নার ভাষা নেই, হয়ত বা অর্থও নেই।

বড়দিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে,
রাজার দোহাই দিয়ে,
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি ;
ঘাতক সৈন্যে ডাকি'
মারো মারো উঠে হাঁকি'।
গর্জ্জনে মিশে পূজামন্ত্রের স্বর
মানব-পুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন,—হে ঈশ্বর,
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।

শান্তিনিকেতন
বড়দিন, ১৯৩৯



কষ্টিপাথর

রোম্যাণ্টিক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমারে বলে যে ওরা রোম্যাণ্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রং লাগায়েছি প্রিয়ে।
দুয়ার-বাহিরে তব আসি যবে
সুর করে ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।
বসন্ত-বনের গন্ধ আনি তুলে
রজনীগন্ধার ফুলে
নিভৃত হাওয়ায় তব ঘরে।
কবিতা শুনাই মৃদু স্বরে
ছন্দ তাহে থাকে
তার ফাঁকে ফাঁকে
শিল্প রচে বাক্যের গাঁথুনি—
তাই শুনি
নেশা লাগে তোমার হাসিতে।
আমার বাঁশিতে
যখন আলাপ করি মুলতান
মনের রহস্য তব সুর তার করে যে সন্ধান।
যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে,
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ রস
আনি তাঁরি জাদুর পরশ।—
জানি তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে এরে কভু বলে বাস্তবিক?
আমি বলি কখনো না, আমি রোম্যাণ্টিক।
যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
শোধ করি, সে নহে কথায় তাহা জানি
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা,
সেথায় উত্তরী ফেলি' পরি বর্ম্ম,
সেথায় নির্ম্মম কর্ম্ম,
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে।

কবিতা]

গান

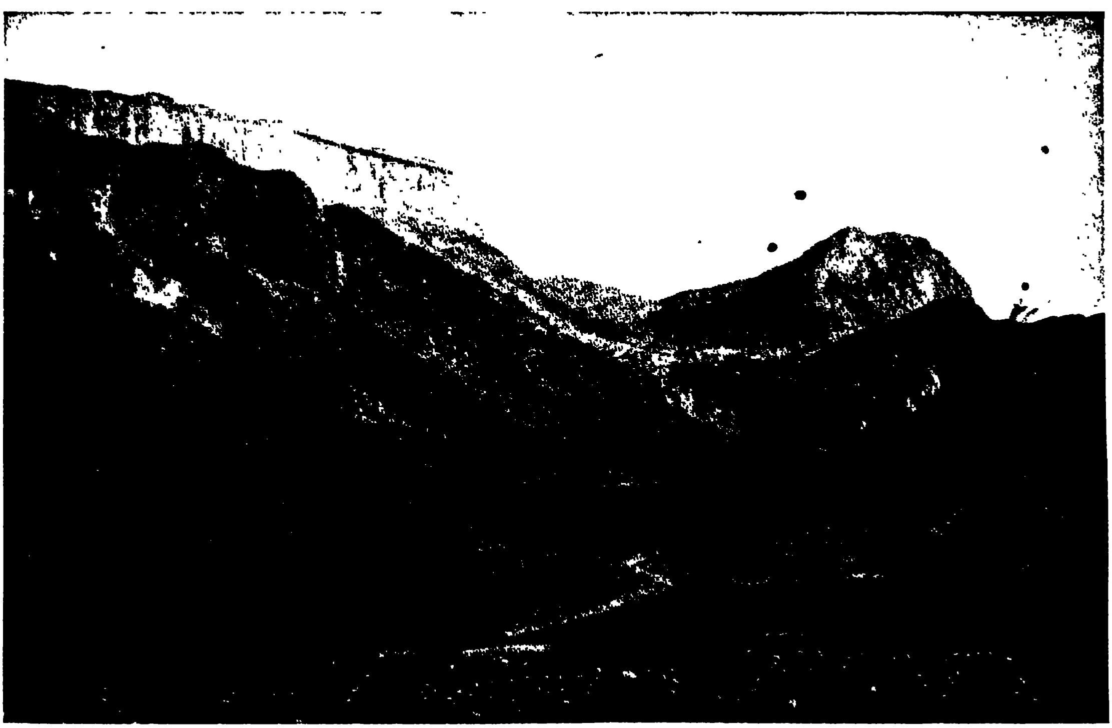
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার
নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের
এই ডানা
মনে মনে।
তেপান্তরের পাথার পেরোই
রূপকথার
পথ ভুলে যাই দূর পারে কোন্
চুপ-কথার,
পারুল-বনের চম্পারে মোর
হয় জানা
মনে মনে।
সূর্য্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি'
মেঘে মেঘে আকাশ-কুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দেশে,
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার
দিই হানা
মনে মনে।

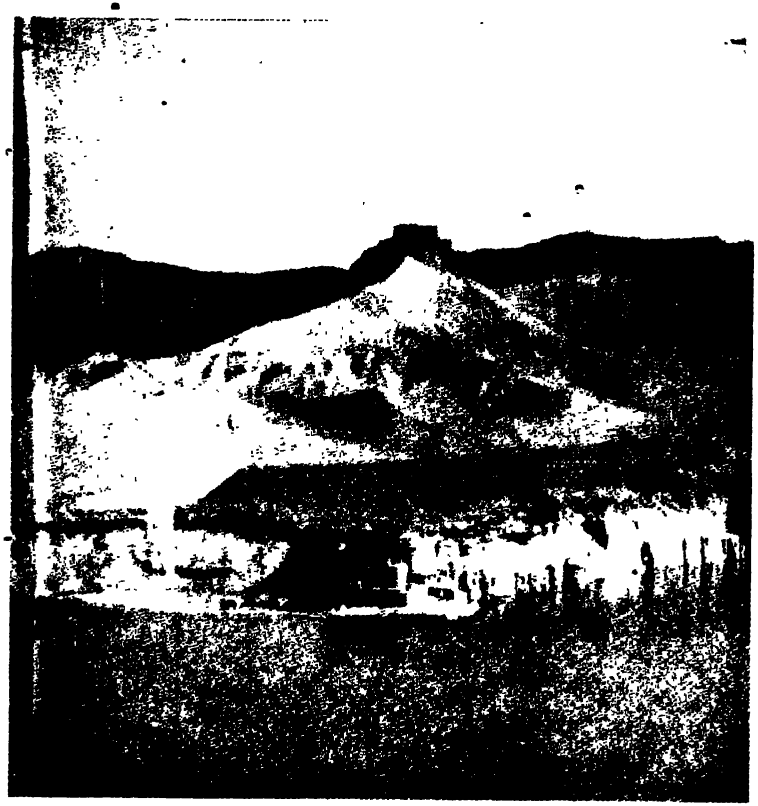
বঙ্গলক্ষ্মী]



হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালা



দোয়াব-ই-মেজ্‌হারি। আফগান-সরকার এখানে একটি পান্থশালা নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইয়াছেন।



শ্চিম হিন্দুকুশ



হিন্দুকুশ

["কাবুলের চিঠি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৫৭]

কয়েকটি অনুবাদ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

অনুবাদ

কমল শৈবালে ঢাকা তবু রমণীয়
শশাঙ্ক কলঙ্কী তবু লক্ষ্মীর সে প্রিয়।
এ নারী বল্কল পা'রে আরো মনোহর,
কী নহে ভূষণ তার যে জন সুন্দর।

মূল

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গম।
ভূয়িষ্ঠং ভব দাক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাকুলস্যাধয়ঃ।

অনুবাদ

সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম,
অপরাধী পতি 'পরে রোষভরে হোয়ো না নির্মম।
পরিজনে দয়া রেখো, সৌভাগ্যে হোয়ো না আত্মহারা,
গৃহিণীর এই ধর্ম; কুলনাশী অন্যরূপ যারা।

মূল

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্।

অনুবাদ

ভালোই করেছ পিক চুপ ক'রে রয়েছ আষাঢ়ে;
মৌনই সেথায় শোভে ভেকেরা যেথায় ডাক ছাড়ে।

মূল

অকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ।

অনুবাদ

কিছুই করে না শুধু সখ্য দিয়ে হরে দুঃখগ্লানি
যে যাহার প্রিয়জন সে তাহার কেমন কি জানি!

মূল

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ
কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তসময়ে প্রাপ্তে
কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ।

অনুবাদ

কাক কালো পিক কালো
বর্ষার সমান তারা ঠিক,
বসন্ত যেমনি আসে
কাক কাক পিক হয় পিক।

বৈজয়ন্তী]

বাংলা দেশেও বাংলা চলতি ভাষা থাকিবে না?
শ্রীপরিমল গোস্বামী

...ভাষাগত পরাধীনতার শৃঙ্খল বাঙালী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নিজ হাতে নিজের পায়ে পরেছে। সেই শৃঙ্খলের উদ্ধত উগ্র শব্দে রাজপথ মুখর।...

এই বাংলা দেশের রাজধানী কলকাতা শহরে বসে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি না। পথে বেরুলেই যাদের সঙ্গে আমাদের কারবার তাদের ভাষায় কথা বলি। তারা সবাই প্রায় হিন্দিভাষী। ট্রামের কণ্ডাক্টর, কোচম্যান, রিকশাওয়ালা, বাড়ীর চাকর, ধোপা, দারোয়ান, ট্যাক্সিড্রাইভার, সবাই। এরা নিজেদের ভাষা দিয়ে বাঙালীকে এদের অধীন করে ফেলেছে।...পাছে তারা মনে করে বাঙালী গাড়োয়ানের ভাষা মুচির ভাষা জানে না পাছে তারা এজন্য হীন মনে করে সেই জন্যে বাঙালী তাদের ভাষায় কথা বলে, তাদের খুশী করে।...

বিদেশীরা এই ভাবে বাংলা দেশে এসে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে—তারা বাংলা ভাষা শিখতে পারছে না, তদুপরি বাঙালী তাদের ভাষায় কথা বলাতে বাংলাভাষীর সংখ্যা ক্রমেই এদেশে কমে যাচ্ছে। আমরা যদি তাদের সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বলি আর তারা যদি তা বুঝতে না পারে তবে ক্ষতি কার?

আসল কথা,...নিজের সম্মান সে [বাঙালী] নিজে রাখতে জানে না বলেই নিজের ভাষার প্রতি—শ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি তার লেশমাত্র মমতা নেই।...বাংলা ভাষার যে একটা বিশেষ রূপ আছে—সাহিত্য যাকে আশ্রয় করে সাহিত্য হয়—সেই রূপের সঙ্গে অনেকের [বাঙালী সাহিত্যযশঃপ্রার্থীর] পরিচয় নেই—তার সন্ধানও কেউ করতে চায় না। শব্দ কি ভাবে সাজালে তা বাংলা ভাষা হয় সেই শব্দ-সংযোজনা বিষয়ে অনেকেই উদাসীন। বাংলা ভাষাতেও যে ইংরেজির মতো ইডিয়ম আছে সে কথা তারা জানে না। সেইজন্যে বাংলা ভাষার যত সাময়িক পত্র আছে...তাদের প্রায় সকলগুলোতেই কোনো না কোনো দিকে এই ভাষাগত শৈথিল্য দেখা যায়,—বিশেষ করে দৈনিক কাগজে। এই দৈনিক কাগজ বাংলা ভাষার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ভাষার সম্প্রসারণ-ক্ষমতা বাড়ুক এটা সকলেরই কাম্য—কিন্তু ভাষার উপর যথেচ্ছাচার কখনও কারও কাম্য হ'তে পারে না। দৈনিক কাগজের এই ভাষা-শৈথিল্য সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করে।

...ইতিমধ্যে হিন্দিভাষার সিনেমা-অভিনয় দলে দলে বাঙালী দেখছে কিন্তু একখানা বাংলা ভাষার সিনেমা-ছবিও বাংলার বাইরে অবাঙালীর কাছে চলে না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তো বাংলা ভাষা একেবারেই ঘৃণ্য। বাংলা ভাষায় গান হয় না একথা লজ্জাহীন বাঙালী বহুকাল ধরে সগৌরবে প্রচার করছে।...

বৈজয়ন্তী]

বিবিধ প্রসঙ্গ

"তোমাদের ভেদগুলা ভুলিয়া যাও"

নাগপুরে একটা ভোজসভায় বড়লাট লর্ড লিনলিথগো তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলেন :—

Nagpur, Jan. 6

"Sinking of differences and the preparation of those conditions and circumstances which would bring about establishment of the Dominion Status is the course of wisdom in the present circumstances, and any help that I am capable of affording to achieve that ideal, will be forthcoming in the greatest measure practicable," said H. E. the Viceroy replying to the toast proposed by Sir Maneckji Dadabhoy to-night.

His Excellency appealed to political leaders to avoid in these delicate political matters too unbending a rigidity, and urged the importance of keeping an open mind for readiness to compromise

তাৎপর্য্য। বড়লাট ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে ভেদ ভুলিয়া গিয়া ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস লাভের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করিতে নেতাদিগকে অনুরোধ করেন। এই সব বিষয়ে অনমনীয় দৃঢ়তা পরিহার করিতে এবং রফার জন্য প্রস্তুত হইতে সকল নেতাকে তিনি অনুরোধ করেন। এই আদর্শ সিদ্ধির নিমিত্ত যত দূর সাধ্য সাহায্য তিনি করিবেন বলেন।

আমরা নেতা নহি। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ আমাদের হৃদয় বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতেছে না, বরং বিরাগের মাত্রা বাড়াইতেছে। আমরা দেখিতেছি, ব্রিটিশ জাতি ও রাজপুরুষগণ যে-সব ভেদ ও তাহার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অথচ আমাদিগকে ভেদ ভুলিতে ও নরম হইতে উপদেশ দিতেছেন। এরূপ উপদেশ সম্পূর্ণ বৃথা এবং আলোচনার অযোগ্য।

বড়লাট যদি সত্যসত্যই আদর্শ অবস্থায় পৌঁছিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চান, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটার—অন্ততঃ বাংলা দেশে প্রযোজ্য তাহার অংশটার—ন্যায়সঙ্গত পরিবর্ত্তন করুন দেখি।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের শৌর্য্য

১৯৩০ সালের লোকসংখ্যা-গণনা অনুসারে ফিন্‌ল্যাণ্ড ৩৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬৭ জন মানুষের বাসভূমি। এই ৩৬,৬৭,০৬৭ জন মানুষ যে-দেশটিতে বাস করে, তাহার মধ্যে ১৭,০৯৯ বর্গমাইল অর্থাৎ শতকরা ১১.৫ ভাগ হ্রদ।

রাশিয়ার (সোভিয়েট রাষ্ট্রের) লোকসংখ্যা ১৯৩২ সালের গণনা অনুসারে ১৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ১০০। অর্থাৎ রাশিয়াতে ফিন্‌ল্যাণ্ডের চেয়ে ১৬ কোটি ২২ লক্ষ বেশী লোক বাস করে।

অতএব রাশিয়ার সহিত ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ দৈত্যের সহিত বামনের যুদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উভয় দেশের জনবলের কথা ভাবিলে এইরূপ মনে হয়।

রাশিয়ার তুলনায় ফিন্‌ল্যাণ্ডের ঐশ্বর্য্যও খুব কম। তাহার যুদ্ধসজ্জা রাশিয়ার তুলনায় এবং রাশিয়া অপেক্ষা ছোট অনেক দেশেরও তুলনায় নগণ্য বলিলেও চলে। অল্প দিন আগে পর্য্যন্ত তাহার এরোপ্লেনের সংখ্যা ছিল ১৫০টা। সবগুলি ফিন্‌ল্যাণ্ডেই প্রস্তুত। সম্প্রতি ইটালী হইতে কতকগুলি আমদানী করা হইয়াছে। কিন্তু রাশিয়ার চারি হাজার বা বর্ত্তমানে ততোধিক এরোপ্লেনের তুলনায় ইহা সামান্য। রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত সমর্থ সব ফিন্‌কে প্রস্তুত হইতে বলিবার পূর্ব্বে ফিন্‌ল্যাণ্ডের সেনাদলে ১৮৪২ জন অফিসার এবং ৩১০০৪ সাধারণ সৈনিক ছিল। এখন কতই আর বাড়িয়াছে? যুদ্ধের জন্য তাহার নৌ-বহরে আছে উপকূলরক্ষী দুটি ৪০০০ টনের জাহাজ, চারিটি কামান-নৌকা (gunboats), সাতটি টর্পেডো-নৌকা এবং পাঁচটি সাব-মেরীন। ইহা যে কত কম তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত রাশিয়ার নৌ-বলের বিস্তারিত হিসাব দেওয়া অনাবশ্যক।

তবে কিসের ভরসায়, কোন্ সাহসে, ফিন্‌রা রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছে? সত্য বটে তাহাদের দেশের শীত অতি প্রচণ্ড এবং তথাকার

হ্রদগুলি শীতে বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ করা কঠিন। এবং বিদেশীদের কিছু সাহায্য তাহারা পাইতে পারে বটে। এ পর্য্যন্ত কিন্তু শুধু সুইডেরাই তাহাদিগকে কিছু সৈন্য দিয়াছে, এবং সুইডেনের লোকসংখ্যাও কেবলমাত্র বাষট্টি লক্ষের কিছু অধিক। ব্রিটেন ও ফ্রান্স হয়ত অর্থসাহায্য করিতেছে ও করিবে; কিন্তু তাহারা নিজেরা যুদ্ধে বিব্রত বলিয়া সৈন্য-আদি ফিন্‌ল্যাণ্ডে বিশেষ কিছু পাঠাইতে পারিবে, মনে হয় না। বার্নার্ড শ এই যুদ্ধের গোড়ায় বলিয়াছেনও যে বিদেশের সাহায্যের ভরসায় যুদ্ধ চালান উচিত নয়, কারণ সে সাহায্য বড়-একটা পাওয়া যায় না।

তাহা হইলে, ফিনরা যে রাশিয়ার ধমকে আত্মসমর্পণ করে নাই তাহা প্রধানতঃ আপনাদের উপর নির্ভর করিয়াই। তাহাদের স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং সাহস তাহাদিগকে দৃঢ় করিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক, এপর্য্যন্ত (২০শে পৌষ) তাহারা অসাধারণ শৌর্য্যের সহিত লড়িয়াছে।

কত সামান্যসংখ্যক মানুষ সতর কোটি মানুষের বাসভূমি রাশিয়ার সহিত সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে স্মরণ করিতে হইবে ফিন্‌ল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৩৭ লক্ষ, ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা ৫২ লক্ষ।

সংখ্যার চেয়ে এক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও সাহস বড়।

—

যুদ্ধে রাশিয়ার আপেক্ষিক দুর্বলতার কারণ

ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে এ-পর্য্যন্ত রাশিয়ার পরাজয়ের একটি কারণ বহুসংখ্যক সেনানায়কের প্রাণদণ্ডে মৃত্যু এবং বিস্তর বুদ্ধিজীবী লোকের নিপাত ও অবনমন। আধুনিক যুদ্ধে জনবল ও দৈহিক শক্তি অপেক্ষা বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক জ্ঞান ও সজ্জা অধিকতর আবশ্যক।

—

স্বাধীনতা-দিবসের প্রতিজ্ঞা

কংগ্রেস যে ১৯২৯ সালে লাহোরের অধিবেশনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাকেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং পূর্ণ-স্বরাজ লাভে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিবার ও করাইবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী "স্বাধীনতা-দিবস" অনুষ্ঠিত হয়। এবার সেই দিনে যে প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হইবে, তাহা আগেকার প্রতিজ্ঞা অপেক্ষা দীর্ঘতর। কিন্তু ভারতীয়েরা কেন স্বাধীনতা চায়, তাহার বিবৃতি আগেকার মত আছে। যথা

"We believe it is an inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and enjoy the fruits of their toil and have necessities of life so that they may have full opportunities of growth.

"We believe also that if any Government deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it. The British Government in India has not only deprived the Indian people of their freedom but has based itself on the exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, culturally and spiritually.

"We believe, therefore, that India must sever the British connection and attain Purna Swaraj or complete independence."

তাৎপর্য্য। অন্য কোন জাতির মত ভারতীয়দেরও স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অধিকার, তাহাদের শ্রমের ফল ভোগ করিবার অধিকার এবং বাড়িবার পূর্ণ সুযোগ পাইবার নিমিত্ত জীবনের আবশ্যক দ্রব্য লাভ করিবার অধিকার আছে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, কোন গবর্মেণ্ট কোন জাতিকে এই অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিলে ও তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিলে, তাহার পরিবর্ত্তন বা বিলোপ সাধন করিবার অধিকার তাহাদের আছে। ভারতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয়দিগকে শুধু যে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু জনসাধারণকে সকল প্রকারে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় করিয়া এই প্রক্রিয়াকেই নিজের ভিত্তি করিয়াছে এবং ভারতবর্ষের আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ধ্বংস সাধন করিয়াছে।

অতএব, আমরা বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের সহিত সম্পর্ক ছেদন করিতে এবং পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতে হইবে।

আগামী ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের অনেক গ্রামে ও নগরে "স্বাধীনতা-দিবস" অনুষ্ঠিত হইবে। অন্য কোন কোন দেশে যে স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব হয়, তাহা তাহাদের স্বাধীনতালাভের দিনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব।

আমাদের "স্বাধীনতা-দিবস" তাহা নহে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লাহোরে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে স্থির হয় যে, পূর্ণস্বরাজ বা স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য। উহা ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ঘোষিত হয়। ঐরূপ ঘোষণা তদবধি প্রতিবৎসর ঐ তারিখে হইয়া আসিতেছে। ইহা স্বাধীনতা-লাভের দিনের স্মারক উৎসব না হইলেও, ইহার গুরুত্ব আছে। এমন সময় ছিল যখন, ভারতবর্ষ যে আবার স্বাধীন হইতে পারে, তাহা অগণিত লোকে কল্পনা করিত না, আশা করিত না, বিশ্বাস করিত না। এখন যে তাহা করে, ইহা কম কথা নয়। সাহস করিয়া বিশ্বাস ও আশা সহকারে যে তাহারা বলে, স্বাধীনতা চাই-ই চাই, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবই, নতুবা নিশ্চিহ্ন হইতে হয় হইব, ইহা কম কথা নয়। তাহা অপেক্ষাও ভরসার কথা এই যে, স্বাধীনতার জন্য হাজার হাজার নরনারী সর্ব্ববিধ দুঃখ বরণ ও ভোগ করিয়াছেন, অনেকে মরণান্ত দুঃখ বরণ ও ভোগ করিয়াছেন।

অতএব "স্বাধীনতা-দিবস" অনুষ্ঠানের আমরা পূর্ণ সমর্থন করি।

"স্বাধীনতা-দিবসে" যে প্রতিজ্ঞাপত্র পঠিত হয়, তাহা ইংরেজীতে লিখিত হইয়া ও ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদিত হইয়া অনুবাদগুলির মধ্যে যেটি যে অঞ্চলের ভাষায়, সেটি সেখানে পঠিত হয়। নূতন প্রতিজ্ঞাটির একটি প্রধান অংশ ইংরেজী ও বাংলায় উপরে দেওয়া হইয়াছে।

—

ভারতীয়েরা কেন স্বাধীনতা চায়

অন্য সকল জাতির মত ভারতীয়দেরও যে স্বাধীনতার অচ্ছেদ্য অধিকার আছে, তাহাদের স্বীয় শ্রমের ফল ভোগ করিবার অধিকার আছে, জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক সব কিছু পাইবার অধিকার আছে—যাহাতে তাহারা বাড়িবার পূর্ণ সুবিধা পায়, এই অতি যথার্থ ও অতি সহজ কথা স্বাধীনতা-প্রতিজ্ঞায় আছে। ইহাও তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যদি কোন গবর্মেণ্ট কোন জাতিকে এই সব অধিকার হইতে বঞ্চিত করে ও তাহাদের উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে সেই জাতির সেই গবর্মেণ্টের পরিবর্ত্তন বা বিলোপ সাধন করিবার অধিকার আছে। ইহাও স্বতঃসিদ্ধের মত সত্য।

তাহার পর, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ দিকে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, "সেই হেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইবে এবং পূর্ণস্বরাজ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে।"

ইহার পর প্রতিজ্ঞাপত্রে পূর্ণস্বরাজ লাভের উপায় ও পন্থা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—বলপ্রয়োগ, হিংসা, সে-পথ নহে; ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ ও বৈধ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া শক্তি ও আত্মনির্ভর লাভ করিয়াছে ও স্বরাজের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, এবং এই পন্থা অবলম্বন দ্বারাই আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবে। আমরাও ইহা প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে করি—যদিও ইহা একমাত্র পথ নহে।

—

স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছার কারণ

বিদেশের কোন জাতি যদি অন্য কোন জাতির দেশ অধিকার করিয়া আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতে থাকে এবং অধিকন্তু অধিকৃত দেশের লোকদের উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে পরাধীন জাতির মনে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা স্বভাবত ও সহজেই আসে। দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে যদি সেই জাতির মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা ও আশা ক্ষীণ হইয়া লুপ্তপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহা জাগাইয়া তুলিবার সকলের চেয়ে সহজ উপায়, তাহাদের যে-সকল অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের প্রতি যে-সব অত্যাচার হইয়াছে, তাহাদের যে-সকল ক্ষতি ও অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের যে অপমান ও লাঞ্ছনা হইয়াছে, এবং তাহাদের পূর্ণ উন্নতির পক্ষে যে-সকল বাধা বিদ্যমান আছে, সেই সমুদয়ের কথা জনগণকে পুনঃ পুনঃ বলা ও স্মরণ করাইয়া দেওয়া। এই জন্য, "স্বাধীনতা-দিবস" উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দোষক্রটির উল্লেখ আবশ্যক।

কিন্তু যদি এরূপ হইত যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ব্রিটেনের

স্বার্থসিদ্ধি না করিয়া কেবল ভারতবর্ষেরই মঙ্গল চাহিত, যদি ব্রিটিশ শাসনে কোন অত্যাচার না-হইত, এবং যদি ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশের ধনের হ্রাস ও স্বাস্থ্যের অবনতি না হইয়া ধন বৃদ্ধি পাইত এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হইত, জনগণের জ্ঞানও বাড়িত, তাহা হইলে কি স্বাধীন হইবার কোন প্রয়োজন থাকিত না? তাহা হইলে কি আমরা কেহই স্বাধীনতা চাহিতাম না? নিশ্চয়ই চাহিতাম। কেন চাহিতাম?

চাহিতাম এই জন্য যে, মানুষ মানুষ, গৃহপালিত পশুর মত নহে। মানুষে ও গৃহপালিত পশুতে একটা প্রভেদ এই যে, গৃহপালিত পশুর যাহা আবশ্যক তাহা তাহার মালিকরা দেয় এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বাস্থ্যের জন্য যাহা করা দরকার তাহা মালিকরা করে, কিন্তু মানুষ নামের যোগ্য মানুষেরা নিজেদের সব ব্যবস্থা নিজেরাই করে। যদি ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক সব ব্যবস্থা ইংরেজরা করিত এবং যদি আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের নাম "ভারতবর্ষীয় মহাজাতি" না হইয়া "ইংরেজদের দ্বারা পালিত নরাকার ভারতীয় গোরুদের সমষ্টি" হইত। এখনও সেই নাম দিলে কতকটা ঠিকই হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক হয় না এই কারণে যে, ভারতবর্ষের অনেক লোক মনুষ্যত্বলাভ সম্বন্ধে সচেতন এবং সেই নিমিত্ত স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। স্বকার্য্য সাধনের সামান্য কিছু অধিকারও ভারতীয়েরা পাইয়াছে।

"স্বাধীনতা-দিবস" উপলক্ষ্যে পঠিত প্রতিজ্ঞাপত্রে যদি এই মর্ম্মের কথাও থাকিত যে, ব্রিটিশ শাসন যদি উৎকৃষ্ট হইত, তাহা হইলেও আমরা স্বাধীনতালাভে যত্নবান হইতাম, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ হইত। •

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের যে-যে অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই। তাহাতে স্বাধীনতার আবশ্যকতাবোধ বিন্দুমাত্রও কমিবে না।

—

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতের আর্থিক অবস্থা

ব্রিটিশ শাসনকালে ইংরেজরা ভারতীয় জনগণের শ্রম ও ধনোৎপাদন-শক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে ধনী হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষীয় জনগণ দরিদ্রতর হইয়াছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ-বিষয়ে ভারতীয়দের পক্ষ হইতে দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বড় বড় বহি এবং অন্য অনেকে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয়দের পণ্যশিল্পসমূহের ও বাণিজ্যের অবনতির স্বরূপ ও কারণ মেজর বামনদাস বসু তাঁহার তদ্বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন।

দারিদ্র্যে বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামসকলের মহা অনিষ্ট হইয়াছে। তাহা শুধু অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নহে। গ্রামগুলি শ্রীহীন হইয়াছে—সেখানে শোভা ও আনন্দ নাই। কারখানা-শিল্পের দ্বারা গ্রামগুলির এই অনিষ্টের প্রতিকার হইতেছে না; কুটীরশিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতি দ্বারা পরোক্ষ ভাবে হইতে পারে।

পণ্যশিল্পের কারখানা ব্রিটিশ রাজত্বে বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহার অধিকাংশ বিদেশীর হাতে। পণ্যদ্রব্য স্থলপথে ও জলপথে, দেশের মধ্যে ও বিদেশে, আনয়ন ও প্রেরণ প্রধানতঃ বিদেশীদের ও বিদেশী গবন্মেণ্টের হাতে গিয়াছে। তাহাতেও দেশ দরিদ্রতর এবং এ-বিষয়ে সামর্থ্যহীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে।

—

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা

ব্রিটিশ শাসনের ঠিক পূর্ব্বে ভারতবর্ষ এই অর্থে স্বাধীন ছিল যে, দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি নৃপতিরা প্রভুত্ব করিতেন, তাঁহারা ভারতবর্ষেরই মানুষ, ভারতবর্ষই তাঁহাদের জন্ম ও নিবাসের ভূমি—তাঁহারা বিদেশী ছিলেন না। দেশের উন্নতি করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা তাঁহারা স্বয়ং করিতেন ও করিতে পারিতেন।

ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে ও প্রথম যুগে ইংরেজের অনধিকৃত অনেক অঞ্চল ইংরেজের অধিকৃত অঞ্চল অপেক্ষা সমৃদ্ধতর ছিল।

ব্রিটিশ শাসনে প্রভেদ এই হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে বিদেশী ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, দেশী রাজ্য নামে অভিহিত অংশগুলিতেও বিদেশী ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে; সমগ্র ভারতবর্ষে চূড়ান্ত ক্ষমতা কোন ভারতীয় মানুষের হাতে নাই। আমরা ইচ্ছা করিলেও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির নিমিত্ত কোন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারি না। এই এই অর্থে ইহা সত্য যে, ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে (it has ruined India... politically)। ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্কালে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনৈতিক যে সচেতনতা বা জাগৃতি ছিল না, এখন তাহা হইয়াছে বটে; কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক এই জাগরণ ঘটায় নাই, তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহা ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ কিংবা অন্য কোন জাতির অধীন না হইয়াও স্বাজাতিক এইরূপ সচেতনতা

তুরস্কে, ইরানে, আফগানিস্থানে, চীনে, জাপানে জন্মিয়াছে। ইহা যুগধর্মের প্রভাবে হইয়াছে।

—

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় সংস্কৃতি

সংস্কৃতি (culture) শব্দটির একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিবার চেষ্টা করিব না। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দেশের সাহিত্য, শিক্ষা, ললিতকলা, সংগীত, নৃত্য, শিল্প প্রভৃতি উহার অন্তর্ভূত।

স্বাধীনতা-দিবসের প্রতিজ্ঞাপত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট সংস্কৃতির দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ("has ruined India ··culturally")। ইহা নিঃসন্দেহ যে, ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের বহু পণ্যশিল্পের ও অন্যবিধ শিল্পের খুব অবনতি এবং কোন কোনটির ধ্বংস হইয়াছে। ইহাও সত্য যে, বঙ্গের (ভারতবর্ষের অন্য সব অংশের বিষয় ভাল করিয়া জানি না) স্বকীয় যাত্রা গান নৃত্য ইত্যাদির অবনতি বা রূপান্তর ঘটিয়াছে। পল্লী-সমূহের সাহিত্য গীতি প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাহা বহু পরিমাণে দেশের দারিদ্র্যবশতঃ। আমরা কিন্তু যত বৎসরের কথা জানি, তাহা ব্রিটিশ আমলের অন্তর্গত। ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হইবার ঠিক আগে সংস্কৃতির এই সকল অঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল জানি না।

সংস্কৃতির যে-অঙ্গ শিক্ষাবিষয়ক এবং সাহিত্যিক, সে-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকে বঙ্গে যত টোল ছিল এখন নিশ্চয়ই তত নাই, এবং সেইগুলি থাকায় দেশে সংস্কৃতের যতটা বিস্তৃত ও গভীর চর্চ্চা হইত, এখন ততটা হয় না। অন্য দিকে ইহাও সত্য যে, সংস্কৃত-সাহিত্য ও পালি-সাহিত্যে যত গ্রন্থ আছে এবং তাহাতে যে ভাবসম্পদ ও চিন্তাসম্পদ সঞ্চিত আছে, তাহার জ্ঞান ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার ঠিক্ আগে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা এখন অনেক বেশী হইয়াছে। ইংরেজ-রাজত্বকালে বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় সাধারণ বিদ্যার্থীদেরও অধিগম্য হইয়াছে। এই অবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। এ-বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের কোনই কৃতিত্ব নাই, বলা যায় না। কিঞ্চিৎ আছে।

ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ইংরেজ-আমলের আগেকার চেয়ে এখন অধিক। এই জ্ঞানবৃদ্ধিবিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট খুব কৃপণতা করিলেও কিছু করিয়াছে।

সংস্কৃত ও পালির পরবর্ত্তী নানা ভারতীয় ভাষার যে-সাহিত্যকে মধ্যযুগের সাহিত্য বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাহার অনুশীলন বাড়িয়াছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় কমে নাই।

ভারতীয় নানা ভাষার আধুনিক সাহিত্যসম্পদ এখন ইংরেজ-আমলের আগেকার চেয়ে যে অধিক হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিদ্যা ও সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শে ও তাহার সংঘাতে ইহার উৎপত্তি, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহা ইংরেজ-আমলে ঘটিয়াছে।

সংগীতের চর্চ্চা ইংরেজ-আমলের ঠিক্ আগেকার চেয়ে এখন বেশী কি না বলিতে পারি না। ভদ্রশ্রেণীর নারীদের মধ্যে সংগীত ও নৃত্যের চর্চ্চা এখন যতটা হইয়াছে, ইংরেজ-রাজত্বের ঠিক্ আগে তদপেক্ষা কম বা বেশী ছিল কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া উচিত।

যত দূর জানা যায়, মৃত ও জীবিত গান-রচয়িতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা অধিক গান রচনা করিয়াছেন। সেগুলি ইংরেজ-আমলেই রচিত হইয়াছে। তিনি "গানের রাজা।" সুতরাং সংস্কৃতির এই অঙ্গের সর্বনাশ হইয়াছে বলা যায় না।

নূতন নূতন নৃত্যেরও উদ্ভাবন হইতেছে।

ভারতীয় চিত্রাঙ্কনের নানা পদ্ধতির পুনর্জন্ম হইয়াছে। নূতন পদ্ধতির আবির্ভাবও হইয়াছে। মূর্ত্তিগঠন-শিল্পের অবনতি হইয়া আবার উন্নতি হইতেছে।

সুকুমার শিল্পের মধ্যে বোধ হয় ভারতীয় স্থাপত্যেরই অবনতি ও ক্ষতি ইংরেজ-আমলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রভাব অতিক্রম করিয়া ভারতীয় পুরাতন ও নবোদ্ভাবিত নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে আগে কিছু বলিয়াছি। সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা (লেখা, পড়া ও হিসাব রাখা) এখনকার চেয়ে আগে অর্থাৎ প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগে ও ইংরেজ-আমলের গোড়ার দিকে অধিক বিস্তৃত ও সহজলভ্য ছিল। কিন্তু আধুনিক বিদ্যার ও তাহাতে উচ্চ শিক্ষার আরম্ভ ও বিস্তৃতি ব্রিটিশ রাজত্বে হইয়াছে। কিন্তু তাহা সামান্য। একমাত্র লণ্ডন কাউন্টি কৌন্সিল শুধু প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত যত খরচ করে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট সর্ববিধ শিক্ষার জন্য সমগ্র ভারতে তত খরচ করেন না।

আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা ব্রিটিশ আমলের ঠিক্ আগে ভারতে ছিল না। এখন সামান্য কিছু হয়।

অতএব, মোটের উপর এ-কথা বলা যায় না যে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নতি ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বা আছে, ইহাও বলা যায় না।

—

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা

"স্বাধীনতা-দিবসে"র প্রতিজ্ঞাপত্রে ইহাও আছে যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আধ্যাত্মিকতা-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ("has ruined India...spiritually")। এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক সত্যতার বিচার করিতে হইলে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানা আবশ্যক। সে-জ্ঞান আমাদের নাই। তবে ইংরেজ-রাজত্বকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তাহা হইতে সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলা যাইতে পারে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার আগে কোম্পানী বাহাদুর অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষা চালাইলে শিক্ষিত লোকদের রুচিপরিবর্ত্তনহেতু বিলাতী নানা পণ্যদ্রব্যের (ও তন্মধ্যে মদ্যের) কাট্‌তি বাড়িবে কিনা, তাহাও জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। মেকলে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন; তাঁহার মতে একটা আলমারীর একটা তাকে রক্ষিত ইউরোপীয় পুস্তকসমূহে যত জ্ঞান সঞ্চিত আছে, সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তাহা নাই। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ফল তিনি এইরূপ হইবে আশা করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা এরূপ কতকগুলি ভারতীয় মানুষ প্রস্তুত করা যাইবে যাহাদের মনটা হইবে ইংলণ্ডীয়, কেবল গায়ের রং ও বাহ্য চেহারাটা হইবে ভারতীয়; সেই জন্য তাহারা ও তাহাদের বংশধরেরা বিদ্রোহী না হইয়া চিরকাল ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবে। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ ও খ্রীস্টীয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়াও অনেক ইংরেজ আশা করিয়াছিলেন।

অতএব, ইংরেজী শিক্ষা ও চাল-চলনের প্রবর্ত্তন দ্বারা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বিনষ্ট না হউক, কতকটা আক্রান্ত ও পরাভূত হইবে, ইহা কোম্পানীর আমলে অনেক ইংরেজ অনুমান করিয়াছিলেন। তবে, এ-বিষয়ে তখনকার ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের এবং ১৮৫৮ সালের পরবর্ত্তী ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুসাধ্য নহে—বিশেষতঃ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা। কিন্তু ফল কি হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ও থিয়সফিক্যাল সমিতি ইংরেজ-রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহাদের কাজ এখনও চলিতেছে। মুসলমানদের মধ্যে ওআহাবি প্রচেষ্টা এবং আহমদিয়া প্রচেষ্টাও ইংরেজ আমলে উৎপন্ন; তন্মধ্যে আহমদিয়া প্রচেষ্টা এখনও চলিতেছে। যুক্তপ্রদেশে যে রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ের পীঠস্থান আগ্রার দয়ালবাগে, তাহারও উদ্ভব ইংরেজ-আমলে। পরমহংস রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যবৃন্দ যে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবর্ত্তক ও প্রাণস্বরূপ, তাহারও আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ইংরেজ-রাজত্বকালে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচারের জন্য রাধাকান্ত দেব প্রমুখ নেতাদের দ্বারা যে ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কোম্পানীর আমলে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এই যুগেই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচারের চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, প্রচার (মাসিক পত্র) যে ধর্ম্মান্দোলনের অঙ্গীভূত, তাহা এই সময়কার। এই সময়ে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, ব্রাহ্মণসভা, সনাতন ধর্ম্মসভা, বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরীতে এই যুগে তাঁহার আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীকে যেমন শিক্ষা-আয়তন, সেইরূপ একটি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানও বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও অন্যবিধ উপায়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকে ভারতীয় রূপ দিবার চেষ্টা একটি আধ্যাত্মিক নবোদ্যম বলা যাইতে পারে। "স্বাধীনতা-দিবস" উপলক্ষ্যে পঠিত প্রতিজ্ঞা-পত্র যাঁহার প্রেরণায়—হয়ত বা যাঁহারই দ্বারা—রচিত, সেই মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার প্রভাবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

এমন লোক কংগ্রেসের মধ্যে ও বাহিরে আছেন যাঁহারা আধ্যাত্মিকতা মানেন না এবং তাহাকে মূল্যহীন মনে করেন। কিন্তু যাঁহারা তাহাকে অলীক ও মূল্যহীন মনে করেন না, যাঁহারা তাহাকে মূল্যবান মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে উপরে উল্লিখিত কতকগুলি বা অন্ততঃ কোন একটি প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক মনে করিবেন। তাহা যদি মনে করেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে বিনষ্ট করিয়াছে, তিনি বলিতে পারিবেন না। তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা যদি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের থাকিয়াও থাকে (ছিল বা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না), তাহা হইলেও সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। কারণ কোন-না-কোন

আকারে, কোন-না-কোন প্রচেষ্টার মধ্যে তাহা বাঁচিয়া আছে।

ভারতে আধ্যাত্মিকতার নূতন আততায়ী

ভারতবর্ষে মার্ক্‌স্‌-বাদ ও লেনিন-বাদ প্রচার ও তদনুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত অনেকগুলি লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বিনাশ করিয়াছে কি না, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়িল যে, মার্ক্‌স্‌-বাদ ও লেনিন-বাদ অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ও মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের পন্থা নির্দ্দেশে সকল প্রকার অধ্যাত্মবাদের বিপরীত। তাহা এক রকম জড়বাদ (যাহাকে ডায়ালেকৃটিক্যাল মেটীরিয়ালিজ্‌ম্‌ বলা হয়)। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার যদি বিনাশ হয়, তাহা হইলে মার্ক্‌স্‌-বাদ ও লেনিন-বাদ দ্বারা হইবে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দ্বারা নহে। আমরা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ওকালতী করিবার জন্য একথা বলিতেছি না, কিন্তু যে-কার্য্যের দায়িত্ব যাহার তাহার ঘাড়েই সেই দায়িত্ব চাপান উচিত বলিয়া বলিতেছি। অবশ্য আজকাল যে গবর্মেণ্ট বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাহা আমাদের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির নিমিত্ত নহে।

মার্ক্‌স্‌-বাদ ও লেনিন-বাদের কোন গুণ নাই, বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিছু গুণ আছে। কিন্তু উহা যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা নহে, ইহা বলিলে উহার প্রতি বোধ হয় অবিচার করা হইবে না, এবং উহার ভক্তেরা তাহা প্রশংসার বিষয়ই মনে করিবেন।

দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষে কি হয়

গত বৎসর ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতির অবস্থা আলোচনা করিবার সময় ডাকে চৈনিক সংবাদ-দান কমীটি (China Information Committee) কর্ত্তৃক প্রেরিত তিনটি বুলেটিন পাইয়াছিলাম। একটি বুলেটিনে একটি প্রবন্ধ আছে, তাহার নাম "চীনের সাংস্কৃতিক সমস্যা" (The Cultural Problem of China)। তাহা হইতে প্রথম প্যারাগ্রাফটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"When two entirely different cultures meet and clash, two things may happen to the one which emerges second best from the contest. First, it may cease to grow and perhaps even to go out of existence, or it may reorientate itself and carry on to a greater future. The latter process requires a great deal of cultural vitality and an abundance of willingness to unlearn andlearn."

তাৎপর্য্য। যখন দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত সংস্কৃতির সাক্ষাৎকার ও সংঘাত ঘটে, তখন এই যুদ্ধে যেটি দ্বিতীয়-স্থানীয় হয়, তাহার সম্বন্ধে দু-রকম ঘটনা ঘটিতে পারে। প্রথম, ইহা আর বাড়ে না কিংবা হয়ত লোপ পায়; কিংবা ইহা নূতন পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে থাকে এবং মহত্তর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। শেষোক্ত পন্থার অনুসরণের জন্য অধিক পরিমাণে সাংস্কৃতিক জীবনী শক্তি এবং ভুলিবার ও শিখিবার ইচ্ছার প্রাচুর্য্য আবশ্যক।"

আমাদের মনে হয়, ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রাণশক্তি এবং ভারতীয়দিগের মধ্যে অনেকের ভ্রম বর্জ্জন ও জ্ঞান অর্জ্জনের স্পৃহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি মরে নাই, এবং সম্ভবতঃ ইহা মহত্তর আকারে পুনরুত্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে বা হইবে।

লোকশিক্ষা-পাঠ্য-গ্রন্থাবলী

বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোক-শিক্ষাপাঠ্য-গ্রন্থমালার নিম্নমুদ্রিত সাধারণ ভূমিকা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

"আমরা পর্যায়ক্রমে লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছি। শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষা-বর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনই মুক্তির পথে অগ্রসর হোতে পারে না। যত সহজে যত দ্রুত এবং যত ব্যাপক ভাবে এই ভার লাঘব করা যায় সেজন্যে তৎপর হওয়া কর্তব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক।

"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্যে প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব জ্ঞানের সেই পরিবেষণকার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। এই কারণে আমাদের গ্রন্থগুলিতে ভাষার আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারা যাবে ব'লে আশা করি নে কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পথ-সঞ্চয়" এবং শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর "প্রাচীন হিন্দুস্থান" প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটির পরিচয় 'প্রবাসী'তে দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টির পরিচয় আগামী সংখ্যায় দেওয়া হইবে। আরও চারিখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যথা—

ভূ-বিবরণ—শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত,
ভূ-গঠন—শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ,
উদ্ভিদ বিবরণ—শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন,
জীব বিবরণ—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন, "গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্যে প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান-চর্চার," ইহা অতি সত্য কথা।

—

শিক্ষিতা বঙ্গমহিলাদের অতি সামান্য বিজ্ঞানচর্চা

বাঙালী মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে চান ও করেন, তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রীই বিজ্ঞানের শ্রেণীতে ভর্তি হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারদিগের ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি এমন হয় যে, ছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান শিখিবার সুযোগ যথেষ্ট নাই, তাহা হইলে সুযোগ বাড়াইয়া দিতে হইবে।

বঙ্গে মহিলাদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার অযথেষ্টতার একটি নিদর্শনের উল্লেখ করিতেছি। বর্তমান জানুয়ারী মাসে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে পঠিত ও আলোচিত হইবার নিমিত্ত গবেষণামূলক যত প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ১৫ (পনর)টি মহিলাদের রচিত। তাঁহারা কেহ বা একাই গবেষণা করিয়া তন্মূলক প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, কেহ বা অন্যের সহযোগিতায় লিখিয়াছেন। এই পনরটি প্রবন্ধের একটিও কোন বাঙালী মহিলার লেখা নহে।

উচ্চ শিক্ষিতা বাঙালী মহিলাদের মধ্যে খুব অল্প মহিলাই যে বিজ্ঞান শিখেন এবং যে সামান্য কয় জন শিখেন তাঁহারাও যে প্রায়ই বিজ্ঞানের চর্চা রাখেন না, সুযোগের অভাব ছাড়া হয়ত রুচি ও প্রবৃত্তির অভাবও তাহার কারণ। এই অরুচি ও অপ্রবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকার কথা মনে পড়ে। কাব্য উপন্যাস গল্প রবীন্দ্রনাথ অনাবশ্যক বা মূল্যহীন বা অল্পমূল্য মনে করেন না। কিন্তু কোন সাহিত্যে তাহারই প্রাচুর্য্য ও আধিক্য থাকিলে তাহার পাঠক লোকসমষ্টির বিজ্ঞান শিক্ষায় ও বিজ্ঞান অনুশীলনে অপ্রবৃত্তির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। এই অরুচি ও অপ্রবৃত্তি বঙ্গীয় মহিলাদিগকে হয়ত বেশী পাইয়া বসিয়াছে, কারণ বাংলা উপন্যাসাদি পাঠ তাঁহারা খুবই করিয়া থাকেন।

আরও দু-একটা কারণে হয়ত বঙ্গের "উচ্চশিক্ষিত" এবং রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত "অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে।" চিত্রাঙ্কণাদি ললিতকলাসমূহের অনুশীলনের, অভিনয় করিবার এবং দেখিবার ও শুনিবার, এবং চলচ্চিত্র দর্শনের নির্বিচারে সর্বব্যাপক নিন্দা কোন বিবেচক ব্যক্তি করিতে পারেন না। গীতবাদ্য নৃত্য চিত্রাঙ্কণ অভিনয় চলচ্চিত্র প্রভৃতি মাত্রই অনাবশ্যক বা অনিষ্টকর নহে। প্রত্যেকেরই কোন কোনটির উপযোগিতা আছে। কিন্তু কোনটিরই অবিচারিত প্রাদুর্ভাব বাঞ্ছনীয় নহে। সেরূপ প্রাদুর্ভাব হইলে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় কবিতা ও গল্প ছড়াইয়া পড়ায় যে কুফলের আশঙ্কা করিয়াছেন, গীতবাদ্যনৃত্যাদির প্রাদুর্ভাবেও সেই কুফলের আশঙ্কা আছে।

—

স্বাধীনতা-দিবসের সংকল্পের গঠনমূলক অংশ

স্বাধীনতা-দিবসের গঠনমূলক অংশগুলির কোনটিই আমরা অনাবশ্যক মনে করি না।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব থাকিলে স্বাধীনতা লাভের সম্মিলিত চেষ্টা করা সহজ হয়, সুতরাং স্বাধীনতা লাভও সহজ হয়। কিন্তু যদি কোন সম্প্রদায় "ঘুষ" না পাইলে সম্মিলিত চেষ্টায় যোগদানের পরিবর্তে অশান্তি

উৎপাদনের চেষ্টাই করে, এবং সেই চেষ্টা হইতে উৎপন্ন অবস্থা প্রভু বিদেশীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল হয়, তাহা হইলে "ঘুষ" দিয়া তাহাদের সদ্ভাব ক্রয় করিবার চেষ্টা করা অনুচিত। এরূপ চেষ্টা সফল হয় না। সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরায় কংগ্রেসের ব্যবহারগত সম্মতি এইরূপ একটি ঘুষ। কোন সম্প্রদায়ের অসদ্ভাবের যৌক্তিক ও ন্যায্য' কোন কারণ উৎপাদন না করিয়া সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ও অন্য সব সম্প্রদায়ের এইরূপ সিদ্ধান্ত (এবং তদনুযায়ী আচরণই) উচিত যে, "অন্যেরা যদি আমাদের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় যোগ দেন ত ভাল, নতুবা আমরা অন্য-নিরপেক্ষভাবে স্বরাজসংগ্রাম চালাইতে থাকিব।"

স্বরাজ পাওয়া যাক্ বা না-যাক্, স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে হোক বা না হোক, অস্পৃশ্যতা দূর করা একান্ত আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। কত কত মনুষ্যেতর প্রাণীকে শুচিবায়ুগ্রস্ত মনুষ্যেরা স্পৃশ্য জ্ঞান করেন, এমন কি অনেকগুলিকে আদরণীয়ও মনে করেন, অথচ অগণিত মানুষকে তাহাদের বংশের জন্য অস্পৃশ্য মনে করেন। এই মূঢ়তা, এই অহঙ্কার, এই অমানুষতা, এই অধর্ম সর্বথা বর্জনীয়। সকলের সহিত সদ্ভাব উৎপাদন ও রক্ষার নিমিত্ত অস্পৃশ্যতা-পরিহার আবশ্যক। তাহার দ্বারা স্বরাজ লাভের **সম্মিলিত** চেষ্টা সহজতর হয়।

খাদির উপযোগিতা এই যে, যাহারা বৎসরের অনেক মাস কর্মহীন ও অলস থাকে, চরকায় সুতা কাটিলে তাহাদের আলস্য দূর হয়, শ্রমের অভ্যাস জন্মে এবং কিছু উপার্জন হয়। তাহার দ্বারা পরোক্ষভাবে স্বরাজ লাভের শক্তি বাড়ে। কিন্তু যাহাদের অন্য কাজ আছে, যাহাদিগকে অন্য কাজে খুব পরিশ্রম করিতে হয়, সুতাকাটা তাহাদের অবশ্যকর্তব্য মনে করি না। যদি কেহ চরকা ভিন্ন অন্য কোন যন্ত্র দ্বারা একই সময়ে অধিক সুতা কাটিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে চরকায় সুতা কাটিতে বলা বা বাধ্য করা অনুচিত। দৈহিক শ্রমের গৌরব আছে। কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবিত ও নির্মিত কলে যে কাজ এক ঘণ্টায় হয়, সেই কাজ দৈহিক শ্রম দ্বারা দশ ঘণ্টায় করাইলে ও করিলে তাহাতে মানুষের গৌরব বাড়ে না, অগৌরব হয়।

পরিচ্ছদের মহার্ঘ্যতা ও অল্পমূল্যতা, আড়ম্বর ও তাহার অভাব সমাজে অনেকের মনে ঈর্ষ্যা ও অবজ্ঞা প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে—বিশেষতঃ নারীসমাজে। সকলে খদ্দর ব্যবহার করিলে, ভ্রাতৃভাব ভগিনীভাব সামাজিক সাম্য ও সদ্ভাব বৃদ্ধির সাহায্য হয়। পরিচ্ছদে ব্যয়বাহুল্যও কমে। কেবলমাত্র খদ্দর ব্যবহার করিলে অনেক সুন্দর মূল্যবান বস্ত্র বয়নের শিল্প নষ্ট হইবে, ইহাও কিন্তু মনে রাখিতে হইবে।

খদ্দরের পক্ষে বলিবার এই সকল কথা আছে। আরও কিছু থাকিতে পারে। ইহাও ঠিক যে, যদি সকলেই চরকায় সুতা কাটিত এবং তাহার দ্বারা হাতের তাঁতে কাপড় বুনাইয়া ব্যবহার করিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষ পরিচ্ছদবিষয়ে স্বাধীন হইতে পারিত;—বস্ত্র, সুতা, তাঁত, চরকা, টাকু, কিছুই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত না। গান্ধীজী বোধ হয় বিশ্বাস করেন যে এই অবস্থা আসিতে পারে ও আসিবে। আমাদের সেরূপ বিশ্বাস নাই। তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা খদ্দরকে স্বরাজলাভের উপায় বলিয়া যত উচ্চ স্থান দেন, আমরা তাহা ত পারিই না, অধিকন্তু মনে করি দেশী মিলে উৎপন্ন কাপড় ব্যবহার করিয়াও দেশকে স্বাধীন করা যায়। ইংরেজ-আমলের আগে দেশে ত কেবল চরকা ও হাতের তাঁতই ছিল। তাহার দ্বারা তখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় নাই, এখন অর্জিতও হইতে পারে না। যে তরবারি দ্বারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, লুপ্ত স্বাধীনতার উদ্ধারও তাহার দ্বারা হইতে পারে। চরকা ও হাতের তাঁতের দ্বারা দেশের স্বাধীনতালোপ নিবারিত হয় নাই। তাহার দ্বারা নষ্ট স্বাধীনতার উদ্ধারেরও আশা করা যায় না।

—

"বাংলার বাহিরে বাঙালীদের এই যে সাহিত্য সম্মেলন"—

আমরা নানা স্থানের সাহিত্যিক ও অন্যবিধ উৎসব ও সভার বৃত্তান্ত পাইয়া থাকি। অধিকাংশ স্থলে সেগুলির উল্লেখ পর্য্যন্ত সময় ও স্থানের অভাবে করিতে পারি না। ধুবড়ী সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবে সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণের কয়েকটি বাক্য চোখে পড়ায় তাহার উল্লেখ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন :—

> সাহিত্য ভৌগোলিক দূরত্বের কোন ধারই ধারে না। ভারতবর্ষে যেখানে যত বাঙালী আছেন তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধনকে এবং সংস্কৃতিগত যোগকে অটুট রেখেছে সাহিত্যের স্বর্ণসূত্র। বাংলার বাহিরে বাঙালীদের এই যে সাহিত্য-সম্মেলন—এই রকম অনুষ্ঠানের বিশেষ সার্থকতা আছে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। বাহিরের সমস্ত দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে বাংলার সাহিত্যই সমস্ত বাঙালীকে একসূত্রে গেঁথে রেখে দেবে, তাদের অন্তরকে একই দুঃখে সুখে তরঙ্গিত করে তুলবে, তাদের হৃদয়কে একই আশার অনুপ্রাণিত এবং একই স্বপ্নে বিভোর করে রাখবে। বাংলাকে এক ক'রে রাখতে হ'লে বাংলা-সাহিত্যে তার অনুরাগকে অম্লান রাখা চাই।

এই সমস্তই সত্য কথা। আমরা কেবল একটি খুঁং

ধরিতেছি।—ধুবড়ী বাংলার বাহিরে নয়, সরকারী বাংলা প্রদেশের বাহিরে বটে। ধুবড়ীর মত অন্য যে-সব অঞ্চল ভৌগোলিক প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত কিন্তু সরকারী বাংলা প্রদেশের বাহিরে, তাহাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে বাঙালী লেখক ও বক্তারা যেন সেগুলিকে বাংলার অন্তর্গত কিন্তু সরকারী বাংলা প্রদেশের বাহিরে বলিয়া অভিহিত করেন, আমাদের এই অনুরোধ।

—

পৌষের সভাসমিতি

পৌষে খ্রীষ্টিয়ানদিগের বড়দিন উপলক্ষ্যে সরকারী ছুটি থাকায় ডিসেম্বরের শেষার্ধে এবং জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বহুসংখ্যক রাষ্ট্রনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন ভারতবর্ষের নানা স্থানে হইয়া গিয়াছে। সেগুলি ভারতীয় জাতির সজীবতা ও মানসিক সক্রিয়তা প্রমাণ করে। সকলগুলির সামান্য বৃত্তান্ত দেওয়াও আমাদের সাধ্যাতীত। 'প্রবাসী' যদি দৈনিক কাগজ হইত, তাহা হইলে তাহা করিতে পারিতাম।

—

বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সংবর্ধনা

গত মাসে হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকরের কলিকাতায় সংবর্ধনা একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি যখন খুলনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াছিলেন, তখনও তাঁহাকে অগণিত জনতা যে সম্মান দেখাইয়াছিল তাহা সম্রাটদেরও লোভনীয়।

—

হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

হিন্দুমহাসভার মুখপত্র সাপ্তাহিক "হিন্দুস্থান" পত্রে হিন্দু মহাসভার গত কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির নিম্নমুদ্রিত চুম্বক দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম প্রস্তাবে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে ও বিনাসর্ত্তে মুক্তির এবং বিদেশে নির্ব্বাসিত সকল ভারতীয়কে ফিরাইয়া আনার দাবী করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানের যে সকল হিন্দুমন্দির মসজিদে পরিণত করা হইয়াছে বা অন্যভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, সেইগুলি হিন্দুগণের হস্তে প্রত্যর্পণ করার দাবী জানান হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে মুস্লিম লীগের উৎসাহে সিন্ধুপ্রদেশের মুসলমানগণ মঞ্জিলগাতে যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং মঞ্জিলগা মুসলমানদের দখলে না দেওয়ার জন্য সিন্ধু-গবর্ন্মেণ্টের নিকট আবেদন জানান হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং উহা রদ করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন করার জন্য হিন্দুমহাসভা সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ভারতের জনগণের নিকট আবেদন জানান। পরবর্ত্তী প্রস্তাবগুলিতে হায়দরাবাদ নিজাম রাজ্যে হিন্দু ও আর্য্যসমাজীদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় হিন্দুমহাসভা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যাঁহারা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়া অশেষ দুঃখ বরণ ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসা করেন। খয়েরপুর রাজ্যে যে হিন্দুবিরোধী শাসন চলিতেছে, হিন্দুমহাসভা তাহার প্রতিবাদ করেন এবং তথাকার হিন্দুদের অভাব অভিযোগের প্রতীকার দাবী করেন। বাংলার হিন্দুদের অধিকার ও স্বাধীনতাহরণ এবং তাহাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য দমনকল্পে বাংলার বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার আইনাদি প্রণয়ন ও শাসনব্যবস্থাদি অবলম্বনের মধ্যে যে প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি প্রকট হইয়াছে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধ ও ভারত-রক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে ভারতে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার উচ্ছেদ, সেনাবাহিনীকে ভারতীয়করণ, টেরিটোরিয়াল সেনাবাহিনী ও ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরগুলির সম্প্রসারণ দাবী করা হয়। পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য একথা হিন্দুমহাসভা পুনর্ব্বার ঘোষণা করিয়া এই দাবী করিয়াছেন যে অবিলম্বে ওয়েষ্টমিনষ্টার আইনে পরিকল্পিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতবর্ষকে দেওয়া হউক। হিন্দুমহাসভা "হিন্দুস্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী" নামক নিজস্ব একটি স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের প্রস্তাব করিয়া ১৮ বৎসর হইতে ৪৫ বৎসর বয়সের সমস্ত হিন্দুকে ঐ বাহিনীতে অবিলম্বে স্বেচ্ছায় যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন। হিন্দুদিগকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করিবার জন্য হিন্দু-সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলনের উপর জোর দিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুসলমানগণ যে রয়াল কমিশনের দাবী করিয়াছেন তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াও মহাসভা এক প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে যদি অনুরূপ কোন কমিশন নিযুক্ত হয়ই, তবে তাহা মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারেরও তদন্ত যেন করে। মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় এক প্রস্তাবে সমগ্র ভারতের স্ত্রী-পুরুষ সকল নাগরিকেরই জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমানাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়গুলি পুনা-চুক্তিতে যে সকল সুবিধা ভোগ করিতেছে ঐ চুক্তি বাতিল হইয়া গেলেও তাহা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অব্যাহত থাকিবে! সমস্ত হিন্দু এক অবিচ্ছেদ্য জাতি হইয়া পরস্পর সংযোগ স্থাপন, ঐক্য; ভ্রাতৃত্ব-বোধ ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের কর্ম্মতালিকা গৃহীত হইয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমার পুনর্বণ্টন ও সংখ্যা গণনার নির্ভুলতার ব্যবস্থার উপর জোর দিয়া সীমান্ত

সম্পর্কে ভারতসরকারের নীতির নিন্দা করা হয়। গোরক্ষার ও হিন্দুর শব ডিসেক্‌শ্যনের প্রথা উচ্ছেদের দাবী করা হয়।

সাধারণ ভাবে এই সমুদয় প্রস্তাবের আমরা সমর্থন করি।

"শুদ্ধি" শব্দটি আমরা পছন্দ করি না। অন্য ধর্মাবলম্বীকে হিন্দু করিবার অধিকার হিন্দুদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমরা হিন্দু ধর্ম্ম যতটুকু বুঝি তাহাতে সকল ধর্মকেই ভগবদুপলব্ধির পথ বলিয়া স্বীকার করা হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাবিক মনে হয়। সুতরাং অন্য ধর্মের মানুষ মাত্রকেই অশুচি মনে করা প্রাজ্ঞ হিন্দুর মনোভাবের বিরোধী মনে হয়।

শবব্যবচ্ছেদ চিকিৎসা শিক্ষার জন্য আবশ্যক। তাহা বন্ধ করিতে হইলে তাহার পরিবর্ত্তে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করা আবশ্যক।

প্রস্তাবগুলির মধ্যে সমাজসংস্কারার্থ কোন সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেখিলাম না।

—

হিন্দুমহাসভার আবশ্যকতা

ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সমগ্র হিন্দুসম্প্রদায়ের উপর—বিশেষ করিয়া বঙ্গের হিন্দুদের প্রতি—অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। কংগ্রেস তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা দূরে থাক্, বরং তাহাতে কার্য্যতঃ সায় দিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুদের ন্যায্য স্বার্থ ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের সমুদয় হিন্দুর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। অন্য দিকে কিন্তু ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, দেশে স্বাধীনতার জন্য এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ রূপ প্রধান ও অত্যাবশ্যক একটি সমাজ সংস্কারের নিমিত্ত কংগ্রেস যাহা করিয়াছেন, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান তাহার তুল্য কিছু করেন নাই। অতএব কংগ্রেসের প্রভাব ও শক্তি যাহাতে কমে এরূপ কিছু করা উচিত নহে। সুতরাং হিন্দুমহাসভাকে বিশেষ বিবেচনা ও বিচক্ষণতার সহিত কাজ করিতে হইবে।

—

সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

হিন্দুমহাসভার গত কলিকাতা অধিবেশনে সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ বঙ্গের দেশী ইংরেজী ও বাংলা সমুদয় দৈনিকে বাহির হইয়াছে। তিনি বিস্তর যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য কথা সংযত ভাষায় বলিয়াছেন।

—

বিনায়ক দামোদর সাভারকরের অভিভাষণ

হিন্দু মহাসভার সভাপতি বিনায়ক দামোদর সাভারকরের অভিভাষণের স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতা প্রশংসনীয়। তিনি কংগ্রেসের যে-সব ভ্রান্তি ও ত্রুটি দেখাইয়াছেন, মোটের উপর তাহার অনেকগুলিকেই ভ্রান্তি ও ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণের সব কথার সহিত হিন্দু-মহাসভার কোন কোন হিন্দু-আচার-নিষ্ঠ নেতাও একমত হইতে পারিবেন না। কিন্তু তাহা হইলেও উহার সমস্তটির বাংলা অনুবাদ পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হওয়া উচিত।

—

হিন্দুরা কাহাকে স্বরাজ মনে করিবে ?

ভারতবর্ষে যাহার জন্ম, এরূপ যে-কেহ ভারতবর্ষের প্রভু হইলেই তাহা স্বরাজ হইবে না, শ্রীযুক্ত সাভারকরের মত এইরূপ। তিনি বলেন :—

"হিন্দুদের নিকট স্বরাজ্য বলিতে একমাত্র সেই রাজ্যই বুঝাইবে যে-রাজ্যে তাহাদের স্বত্ব, তাহাদের হিন্দুত্ব ভারতের বা ভারতের বাহিরের কোন অহিন্দুর প্রভুত্বাধীন না হইয়া স্বতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

"ভারতবর্ষে অনেক ইংরাজ জন্মিয়াছে এবং আরও জন্মিতে পারে। এই ইঙ্গ-ভারতীয়গণ যদি ভারতে রাজত্ব করে তাহা হইলে সেই রাজ্য কি হিন্দুদের রাজ্য হইবে? ঔরঙ্গজেব বা টিপু সুলতান ভারতীয় বংশসম্ভূত ছিলেন। এমন কি তাঁহারা ধর্ম্মান্তরিতা হিন্দুজননীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। সেজন্য কি বলা যায় যে, ঔরঙ্গজেবের বা টিপুর রাজ্য হিন্দুদের স্বরাজ্য ছিল? না। যদিও তাঁহারা দেশজ ভারতীয় ছিলেন, তথাপি তাঁহারা ছিলেন হিন্দুর পরম শত্রু। এই জন্যই শিবাজী, গুরু গোবিন্দসিংহ, মহারাণা প্রতাপসিংহ এবং পেশোয়াদিগকে মুস্লিম আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া প্রকৃত হিন্দুর স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল।"

"সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং সুবিধার কার্য্যকর ব্যাঘাত ঘটাইবার ক্ষমতা মুসলমানদিগকে দিয়া যদি তাহাকে স্বরাজ্য বলা হয়, তবে তাহা অতি অসঙ্গত হইবে। হিন্দুরা রাজা বদল করিতে চাহে না—যেহেতু ঔরঙ্গজেব জন্মিয়াছেন ভারতবর্ষে এবং এডোয়ার্ড জন্মিয়াছেন বিলাতে, সেই হেতু এডোয়ার্ডকে সরাইয়া ঔরঙ্গজেবকে বসাইবার জন্য হিন্দুরা সংগ্রাম করিতে এবং প্রাণ দিতে প্রস্তুত নহে।"

—

"তৃতীয় পক্ষে"র উপর দোষারোপ

কংগ্রেসওআলারা যে অনেকে মুসলমান-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত লোকদের অপকর্মের সব দোষ "তৃতীয়

পক্ষে"র অর্থাৎ ইংরেজদের ঘাড়ে চাপাইতে চান, সে বিষয়ে সাভারকর অনেক স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। তাহার একটা দৃষ্টান্ত লউন।

"সহস্র সহস্র কংগ্রেসী হিন্দু যেন কি একটা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া অতি অলৌকিক রাজনৈতিক ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন। মহম্মদ বীন কাশীম, গজনীর সুলতান, মহম্মদ ঘোরী, আলাউদ্দীন এবং ঔরঙ্গজীবের দল যেন এই 'তৃতীয় পক্ষ' ব্রিটিশের দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল এবং দুর্দ্দান্ত মত্ততার দ্বারা হিন্দু ভারতকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। বিগত এক সহস্র বর্ষ ধরিয়া হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যে অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছিল সে কথা যেন ঠিক নহে, সে কথা যেন ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত। আলি ভ্রাতারা বা মিঃ জিন্না অথবা স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ যেন পাঠশালার ছাত্র আর কি! দুষ্ট ব্রিটিশ ছোকরারা তাহাদিগকে চিনির মণ্ডার লোভ দেখাইয়া তাহাদের প্রতিবেশীদের বাড়ীতেই ঢিল ছুড়িতে উস্কাইয়া দিয়াছে। তাঁহারা বলেন—'ব্রিটিশরা এদেশে আসার পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার কথা কখনও শুনা যায় নাই।' যায়ই ত নাই; কেমন করিয়া যাইবে? তখন ত আর হিন্দু মুসলমানে 'দাঙ্গা' হইত না, হইত অবিরাম যুদ্ধ।"

মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইতই না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে।

—

"নেশ্যন" কাহাকে বলে?

সংস্কৃত ও বাংলা "জাতি" শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সচরাচর উহা ইংরেজী রেস্ (race), কাস্ট্ (caste), নেশ্যন (nation) প্রভৃতি শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহাতে কখন কখন ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হয়।

আমাদের মতে সাভারকর মহাশয়ের "নেশ্যন" সম্বন্ধীয় ধারণা ভ্রান্ত। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তির কিয়দংশের অনুবাদ নীচে উদ্ধৃত হইল।

"নাগপুরে আমার সভাপতির অভিভাষণে আমি সাহস করিয়া সর্ব্বপ্রথম বলিয়াছিলাম যে, কংগ্রেসের আদর্শের মূলেই ভুল রহিয়া গিয়াছে। কেননা কংগ্রেস অজ্ঞতাবশে ধরিয়া লইয়াছেন যে, একভৌমত্ব, এবং একদেশে বসবাস হইলেই একটা জাতি হয়। কংগ্রেসের মতে তাই হওয়া উচিত। এই ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদই ইয়ুরোপ হইতে আমাদের দেশে আমদানী হইতেছিল। এখন সেই ইয়ুরোপই এই ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ ঐ ভ্রান্ত ধারণা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে এবং আমার কথার যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। যাহাদের মধ্যে ঐক্যের কোন বন্ধন নাই, তাহাদিগকে লইয়া ভৌগোলিক নক্সায় জাতি গঠন করিতে গেলে যাহা হয় তাহাই হইয়াছে। ঐরূপভাবে গঠিত জাতি নিপীড়িত এবং বিনষ্ট হইয়াছে—খেলাঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন স্বভাবাপন্ন লোককে লইয়া ভৌগোলিক জাতীয়তার ফস্কা বালুকার ভিত্তির উপর একটা জাতি গঠনের চেষ্টা যে মূঢ়তা, তাহার প্রমাণ পোল্যাণ্ড এবং চেকোস্লোভাকিয়া। যাহাদের ভিতর সংস্কৃতিগত, জাতিগত ও ইতিহাসগত সাম্য নাই, তাহাদের পক্ষে সংঘবদ্ধ হইয়া একটা জাতিতে পরিণত হওয়ার অভিপ্রায়ও সম্ভব নহে। প্রথম ধাক্কাতেই সদ্যিজাত জাতিগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে।"

আমাদের বিবেচনায় নেশ্যনের যে 'একভৌম' সংজ্ঞা ও ধারণা আছে, তাহাই ঠিক্ এবং তাহাই সমগ্র মানবজাতির বাঞ্ছনীয় ভবিষ্যৎ ঐক্যের অনুকূল। কংগ্রেস যে ভারতবর্ষের নানা ধর্মসম্প্রদায় ও রেস্ (race) লইয়া নেশ্যন (মহাজাতি) গড়িতে চাহিয়াছেন, সেই আদর্শ ও প্রয়াস আমরা ঠিক্ মনে করি। কিন্তু কংগ্রেস যে মুসলমানদিগকে দুর্ব্বলতাপ্রসূত ও অন্যায় প্রশ্রয় দ্বারা তাহা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা ভ্রান্ত মনে করি।

সাভারকর পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজের মত সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র ও চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্র গত মহাযুদ্ধে জয়ী মিত্রশক্তিরা কৃত্রিমভাবে জবরদস্তী দ্বারা গড়িয়াছিল, সেই জন্য উহার ভাঙ্গন সহজ হইয়াছে। ভারতবর্ষ ওরূপ কৃত্রিমভাবে গড়া রাষ্ট্র বা দেশ নহে। চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও রেসের (race) লোক ছিল। ভারতবর্ষ এক দেশ। এখানকার হিন্দু ও মুসলমানেরা মূলতঃ ভিন্ন ভিন্ন রেসের (race-এর) লোক নহে। শতকরা নব্বইয়ের উপর মুসলমান ধর্মান্তরিত হিন্দুর বংশধর। এমন কি পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুদেশেরও অধিকাংশ মুসলমান ধর্মান্তরিত হিন্দুবংশজাত। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দু যে যে ভাষায় কথা বলে, মুসলমানও সেই সেই ভাষায় কথা বলে। যে-সব অঞ্চলে উর্দুর চলন আছে, সেখানকার হিন্দুরাও তাহা ব্যবহার করিতে পারে ও করে। নাগরী ও ফার্সী অক্ষর আলাদা বটে, কিন্তু বিস্তর শিক্ষিত হিন্দুও ফার্সী অক্ষর ব্যবহার করে। যদি মান্দ্রাজের তামিল অক্ষর ব্যবহর্তা হিন্দু এবং বঙ্গের বাংলা অক্ষর ব্যবহর্তা হিন্দু এক নেশ্যনের লোক হয়, তাহা হইলে ফার্সী হরফ ব্যবহর্তা এবং নাগরী অক্ষর ব্যবহর্তাও এক নেশ্যন হইতে পারে। ভারতবর্ষের যে সকল ভাষার সাহিত্য আছে, তাহাদের সাহিত্যগুলির প্রধান লেখকদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আছে; তাহার পাঠকদের মধ্যেও উভয়ই আছে। হিন্দুর ও মুসলমানের সংস্কৃতি সংগীতে ও চিত্রাঙ্কণ-বিদ্যায় এক। সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান লোকদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানে অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। মধ্যযুগের

অনেক সাধুসন্তের বাণী হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সম্মিলিত আধ্যাত্মিক প্রভাবের ফল।

সাভারকর পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ঐ দুই দেশের দৃষ্টান্ত চূড়ান্ত প্রমাণ নহে। বিপরীত বলবত্তর প্রমাণ রহিয়াছে। আমেরিকার য়ুনাইটেড্ স্টেটসে (যুক্তরাষ্ট্রে) ইয়োরোপের সকল জাতির লোক এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার বহুজাতির লোক আছে। তাহারা সকলে একধর্মাবলম্বী নহে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দ্বন্দ্বে প্রার্থীদিগকে ন্যূনকল্পে বাটটা ভাষায় প্রচারকার্য চালাইতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভাষা ইংরেজী হইলেও, ঐ তথ্যটি হইতে বুঝা যায় যে, তথায় বহুভাষা প্রচলিত। ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা জাতির লোক ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তর আদিম আমেরিকান জাতি বাস করে। তাহাদের ভাষা, পরিচ্ছদ, ধর্ম প্রভৃতি আলাদা।

এই সমুদয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমেরিকানরা একজাতি এবং পৃথিবীর সমৃদ্ধতম জাতি। শক্তিতে ও শিক্ষায়ও তাহারা পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর জাতি।

রাশিয়ায় ন্যূনকল্পে এক শত "জাতি"র (Nationalityর) লোক বাস করে, এবং সেখানে অন্ততঃ দুই শত ভাষা প্রচলিত। সেখানে কম্যুনিষ্টরা ঈশ্বরে ও কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না, নাস্তিক্য প্রচার করে। কিন্তু নানা ধর্মে বিশ্বাসী লোকও বিস্তর আছে। পরিচ্ছদ-বৈচিত্র্যও খুব। তথাপি সেখানে একটা নেশুন গড়িয়া উঠিতেছে।

প্রাচীন ব্রিটন, স্যাক্সন, ফ্রেঞ্চ, ডেন, জার্মান, ইহুদী প্রভৃতি নানা জাতির লোক লইয়া ইংরেজ জাতি গঠিত। সকলের ধর্ম এক নয়। ব্রিটেনে এখনও তিনটি ভাষা প্রচলিত।

কানাডার নেশুন প্রটেস্টাণ্ট ইংরেজ, ক্যাথলিক ফ্রেঞ্চ, অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতি এবং আদিম বহু আমেরিকান জাতি লইয়া গঠিত।

অস্ট্রেলিয়ান জাতিও নানা ইউরোপীয় জাতির সংমিশ্রণে গঠিত।

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ হিন্দুর দেশ বটে, কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দুর দেশ নহে। হিন্দুদের মত মুসলমানরাও (এবং বহু খ্রীষ্টিয়ান ও বহু অন্য অ-হিন্দুরাও) পুরুষানুক্রমে এদেশে বাস করিতেছে এবং এদেশে ধন উৎপাদন ও ভোগ করিতেছে, এবং তাহাদের পূর্ব্বে তাহাদের হিন্দু পূর্ব্ব পুরুষেরা তাহা করিত। ধর্মান্তর অবলম্বন বা গ্রহণ হেতু তাহারা বেদখল হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানে রাষ্ট্রিক হিসাবে মনোভাবে তফাৎ আছে বটে, কিন্তু সার্বজাতিক আইন (International law) অনুসারে তফাৎ নাই। হিন্দু মনে করেন, একমাত্র ভারতবর্ষই তাঁহার দেশ, তিনি ভারতবর্ষেরই পৌরজন (citizen)। ভারতের মুসলমান মনে করিতে পারেন বটে যে, তিনি আরব, আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক, তুরস্ক, মিশরেরও পৌরজন; কিন্তু সার্বজাতিক আইন তাঁহাকে কেবলমাত্র ভারতীয়ই গণ্য করিবে, উল্লিখিত কোন মুসলমান দেশের নাগরিক বলিয়া তিনি গণিত হইবেন না। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হইবে, তখন মুসলমানদের বা তাহাদের অনেকের এই দ্বিধা-বিভক্ত দেশানুগত্যের (divided loyalty to countryর) পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষানুগত্য স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা তাঁহারা পুরা পৌর অধিকার পাইবেন না।

হিন্দুরা ভারতবর্ষকে তাঁহাদের পুণ্যভূমি মনে করেন, মুসলমানরা তাহা করেন না। ইহাতে শেষোক্তদের ভারতের প্রতি দরদ ও টানের কমতি হয় বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত পৌর অধিকার কম হইতে পারে না। কোন ইংরেজ ইংলণ্ডকে, কোন ফ্রেঞ্চ ফ্রান্সকে, কোন আমেরিকান আমেরিকাকে,... তাঁহাদের পুণ্যভূমি মনে করেন না; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের স্বদেশে অধিকার ও তাহার প্রতি টান কম নহে।

চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মান জার্মেনীর, পোল্যাণ্ডের রুশ রাশিয়ার,...অন্তর্ভূত হইল; ভারতবর্ষ যদি ভারতবর্ষের মুসলমানেরও দেশ না হয়, তাহা হইলে তাহারা কোন্ দেশের অন্তর্ভূত হইবে? সত্য বটে, সাভারকর ভারতবর্ষের অধিবাসী প্রত্যেক অ-হিন্দুকে ব্যক্তিগত ভাবে সকল বিষয়ে প্রত্যেক হিন্দুর সমান অধিকারে অধিকারী বলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে এক প্রকার আগন্তুক বলিয়াছেন এবং তাহারা যেন হিন্দুদের অনুগ্রহে দেশে থাকিতে পাইয়াছে বা পাইবে বলিয়াছেন। যদি তাহাদের প্রত্যেকের সব অধিকার হিন্দুর সমান হয়, তাহা হইলে "দেশটা কেবল হিন্দুর," ইহা কি একটা কথার কথা নয়?

ভারতবর্ষের সব বিষয়ে সমুচিত অগ্রগতি ও উন্নতি ইহার প্রত্যেক অধিবাসীর সম্পূর্ণ আন্তরিক চেষ্টার উপর নির্ভর করে। ইহার আট কোটি মুসলমানকে যদি বলা হয়, দেশটা শুধু হিন্দুর, তাহা হইলে তাহাদের মন ক্ষুন্ন ও বিরক্ত হয়, তাহাদিগকে প্রকারান্তরে বলা হয়, ভারতবর্ষের হিতার্থ তোমাদের কিছু করা অনাবশ্যক, কিছু না করিলেও চলে। ইহা কি দেশের পক্ষে কল্যাণকর?

হইতে পারে যে, ভারতবর্ষের প্রতি অনেক মুসলমানের ও অন্য অ-হিন্দুর অনুরাগ নাই। কিন্তু, দেশটা কেবল মাত্র হিন্দুর বলিয়া তাহাদের অনুরাগ জন্মাইবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া কি তা বলিয়া ভাল? সব হিন্দুরই কি ভারতবর্ষের প্রতি দরদ আছে?

ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুরই দেশ বলিলে তাহা হইতে সমুদয় অ-হিন্দুর মনে যে অসন্তোষ জন্মিবে, তাহা প্রভু ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল।

অনেক মুসলমান চাহিতেছে ভারতবর্ষের কোন কোন অংশের সমষ্টিভূত 'পাকিস্থান' অর্থাৎ মুসলমানের পবিত্র দেশ। সাভারকরের উক্তি তাহাদের ঈপ্সিতের পরোক্ষ সমর্থন তাহারা মনে করিতে পারে। তাহারা বলিবে, "তোমরা বলিতেছ ভারতবর্ষ কেবল তোমাদের দেশ। আচ্ছা, আমরা যেখানে যেখানে দলে পুরু আছি সেখানে সেখানে গ্যাঁট হইয়া বসিয়া থাকিব এবং তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া সমস্তটা কেবল আমাদেরই দেশ পাকিস্থান করিব; দেখি তোমরা কি করিতে পার।" গান্ধীজী ত সিন্ধুর কোন কোন স্থানের আত্মরক্ষায় অসমর্থ সংখ্যায় কম হিন্দুদিগকে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পরামর্শই দিয়াছেন। গান্ধীজীর সমালোচনা করা সহজ, কিন্তু গবর্মেণ্ট ঐ হিন্দুদের ন্যায্য প্রাপ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার না লইলে অন্য কি পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে?

নেশ্যনত্ব ও নেশ্যন গঠন সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা এই "বিবিধ প্রসঙ্গে" বা একটি প্রবন্ধেও হইতে পারে না। সে বিষয়ে অল্প কিছুমাত্র লিখিলাম। যাহা লিখিলাম তাহার বিরুদ্ধে যে-সব আপত্তি হইতে পারে তাহার উল্লেখ ও খণ্ডনের চেষ্টা করিলাম না।

—

সমাজসংস্কার ও স্বাধীনতার অধিকার

যদি কোন দেশের লোকদের মধ্যে কোন সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার থাকে, তাহা হইলে সেই কারণে তাহাদের দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার অধিকার লুপ্ত হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব ও তজ্জনিত নানা কুরীতি ও কুব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেই হেতু আমেরিকার বাহিরের কোন জাতি বলিতে সাহস করে না, "তোমরা নিগ্রোদের প্রতি অত্যাচার কর, অতএব তোমরা স্বাধীনতার অযোগ্য; আমরা তোমাদের দেশ দখল করিব।"

কিন্তু স্বাধীন কোন দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার অধিকার সামাজিক দোষে লুপ্ত না হইলেও, সেই দোষ স্বাধীনতা-রক্ষার শক্তি নষ্ট করিতে বা কমাইয়া দিতে পারে—যেমন ভারতবর্ষে ঘটিয়াছিল।

যে-দেশ স্বাধীনতা হারাইয়াছে, তাহার সমাজে দোষ থাকিলেও তথাকার লোকেরা ন্যায়তঃ স্বাধীনতার দাবী করিতে পারে। আমাদের দেশের সমাজ নিখুঁৎ নহে (ইহা দ্বারা বলিতেছি না যে অন্য কোন দেশেরই সমাজ নিখুঁৎ); তথাপি আমাদের স্বাধীনতার দাবী ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এই দাবী ফলপ্রদ রূপে সাব্যস্ত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার ক্ষমতা কোন কোন সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

লুপ্ত স্বাধীনতার উদ্ধার সশস্ত্র বিদ্রোহ কিংবা অহিংস প্রচেষ্টা দ্বারা হইতে পারে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রচেষ্টা অহিংস। উভয় ক্ষেত্রেই সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টা অংশ-বিশেষের চেষ্টা অপেক্ষা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা অধিক। চেষ্টা সমগ্র সমাজের না হইলে, যাহারা তাহাতে যোগ দেয় না, তাহারা নিষ্ক্রিয় থাকিলে তাহা তবু ভাল; কিন্তু তাহারা শত্রুপক্ষে যোগ দিলে স্বাধীনতাপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা অধিক হয়।

সমাজের কোন কোন অংশের যদি সামাজিক অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে তাহারা সম্মিলিত চেষ্টায় যোগ না দিতে পারে, তাহাতে বাধাও দিতে পারে। হিন্দুসমাজের যাহাদিগকে তপসিলভুক্ত জাতি করা হইয়াছে, সমাজে তাহাদের মর্য্যাদা কম বলিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে বাস্তবিক বা কাল্পনিক প্রলোভন দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জাতি হইতে একটা আলাদা ভাগে বিভক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় আইন সভার তপসিলভুক্ত জাতিসমূহের প্রতিনিধিদিগকে মুসলমান মন্ত্রীরা আপনাদের দলে টানিয়া হিন্দু প্রতিনিধি-সমষ্টিকে আরও দুর্বল করিতে চেষ্টা করিতেছে। হিন্দু সমাজে সকল হিন্দু জাতির (casteএর) মর্য্যাদার বর্ত্তমান তারতম্য না থাকিলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ও মুসলমান মন্ত্রীরা উক্ত রূপ কোন চেষ্টা করিতে পারিত না। ইহা বিবেচনা করিলে জাতিভেদ বিষয়ে হিন্দু সমাজের সংস্কার আবশ্যক, বুঝা যাইবে।

হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী করিতে হইলে আরও অনেক সংস্কার আবশ্যক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্সের খুলনা অধিবেশনে তদর্থে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে তাহা হয় নাই। অবশ্য, সংস্কারের কোন প্রস্তাবই না করিলে অধিক লোকের সায় পাওয়া যায়; কিন্তু এই রূপ সংখ্যাধিক্য দ্বারা কোন প্রচেষ্টার প্রকৃত শক্তি বাড়ে না।

সমাজের কোন কোন শ্রেণীর লোকের সামাজিক ও অন্য অভিযোগ কেবল যে হিন্দুদের মধ্যেই আছে, তাহা নহে; মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতিদের মধ্যেও আছে। তাহাদের মধ্যেও সমাজসংস্কার আবশ্যক।

রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্যই যে সমাজসংস্কার আবশ্যক তাহা নহে। সকলের প্রতি ন্যায্য ও ধর্ম্মানুগত ব্যবহারের জন্যও প্রধানতঃ ইহা আবশ্যক।

—

প্রাচীন ভারতে আকাশ-যান ছিল কি ?

সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "এমন কি, বায়ু-পোত নির্মাণ ও পরিচালন [প্রাচীন ভারতে] অজ্ঞাত ছিল না" ("even the building and wielding of airships was not unknown")। কাব্যে ও পুরাণে পুষ্পকরথের উল্লেখ আছে বটে, যেমন আরব্য-উপন্যাসে আকাশে উড্ডয়নশীল অশ্ব ও গালিচার উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে পুষ্পকরথের অস্তিত্বের অন্য কোন প্রমাণ আছে কি না, এবং কোথাও এরূপ যানের কোন অংশের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে কিনা, আমরা অবগত নহি।

—

লাহোরে হিন্দু নেতা নিহত

হিন্দু মহাসভার গত কলিকাতা অধিবেশনে সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁহাদের অভিভাষণে মুসলমান-সম্প্রদায়-ভুক্ত হিংস্র, গৃধ্নু ও সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত কতকগুলা লোকদের দ্বারা হিন্দু হত্যা, হিন্দুদের সম্পত্তি লুণ্ঠন, হিন্দু পুরুষ ও নারী অপহরণ প্রভৃতি বহু দুষ্কার্যের উল্লেখ করেন। এই অধিবেশনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্যতম হিন্দু নেতা রায়বাহাদুর বেলীরাম ধাব্বন ঐ প্রদেশের শাসন-কার্যের নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থিত করেন, এবং সে বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মহাসভার অধিবেশন শেষ হইবার পর তিনি লাহোর পৌঁছিলে কোন অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্ত তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। সে এখনও ধৃত হয় নাই। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই রূপ অনুমিত হইয়াছে যে, হত্যাকারী মুসলমান।

হত্যাকারী বা হত্যাকারীদিগকে গ্রেফতার করিয়া আদালতে উপস্থিত করা পঞ্জাব-গবর্ন্মেণ্টের একান্ত কর্তব্য। তাহা না করিলে তাঁহারা কর্তব্যে উদাসীন বলিয়া সন্দেহভাজন হইবেন।

এই রূপ হত্যার পশ্চাতে ষড়যন্ত্র থাকিবার সম্ভাবনা। তাহাও উদ্ঘাটিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতায় এবং অন্য নানা স্থানে ধাব্বন মহাশয়ের হত্যার তীব্র নিন্দা করিয়া ও তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া হিন্দুদের সভা হইতেছে। যদি এই হত্যাকাণ্ড কোন মুসলমান বা মুসলমানদের কাজ হয়, তাহা হইলে তাহাদের জানা উচিত যে, ইহাতে হিন্দুরা ভয় পায় নাই ও পাইবে না এবং আপনাদের সৎ ও ন্যায্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবে না। আগেও এরূপ হত্যা হইয়াছে। তাহাতে কোন হিন্দু প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় নাই।

—

চিকিৎসাবিষয়ক উচ্চতম শিক্ষায় ও গবেষণায় ভারতের অবস্থা

বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের গত অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাক্তার শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণায় ভারতবর্ষের অনগ্রসরতা সম্বন্ধে এরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা প্রণিধানযোগ্য। তাহার কয়েকটি পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিতে পারিলে পাঠকেরা আমাদের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কিন্তু স্থানাভাবে আমরা কেবলমাত্র দুটি ছোট প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত করিতে পারিব। এক স্থানে বক্তা বলিতেছেন :—

শিক্ষকের কথা বলতে গিয়ে শিক্ষা-প্রসঙ্গ স্বতঃই মনে পড়ে, আর স্বতঃই দৃষ্টি ছুটে যায় এই ক্রমোন্নতিশীল জগতের পানে। চেয়ে দেখি এই অধঃপতিত জাতি তার এই দুর্দশার মধ্যেও সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে বিশ্বের দরবারে তার যোগ্য আসন অধিকার করেছে। রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, জগদীশচন্দ্র, রামানুজম, রামন্, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, জ্ঞানচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম আজ বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু medical world-এ এই position ক'জনের আছে? অনুসন্ধানের ফলে এক ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাই না। লোকে বলে এটা নাকি হতভাগ্য ভারতের renaissance-এর যুগ—তাই নূতন স্পন্দন, নূতন জাগরণের সাড়া সকল দিকে ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু medical sphere-এ এর সূচনা কোথায়? বহুদিন আগে কবি দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়"। এখন যদিই বা ভারত জাগরণের সাড়া দিয়েছে, তবু এখনও বলতে হয় "medical side-ই শুধু ঘুমায়ে রয়।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :—

University College of Science আছে। সেখানে Postgraduate Training-এর যথেষ্ট সুযোগও আছে এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে ১৯১৬ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত এই পনর বৎসরেই ২৭ জন D. Sc. হয়েছেন এবং এঁদেরই কয়েক জনের তত্ত্বাবধানে তার পরেও এই নয় বৎসরে অনেক D. Sc. এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বেরিয়েছেন। শুধু মাত্র degree-র কথা আমি বলছি না—এই সকল D. Sc. proper training পেয়েছেন এবং এঁদের work Europe-এর লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের কাছে যথেষ্ট সমাদৃতও হয়েছে। কিন্তু medical science-এর অবস্থাটা কি? Post-graduate Degree যা আছে তার জন্যে কোথায় বা training আর

কোথায় বা trainer ! M. D., M. O., M.S. হ'তে গেলে স্বয়ম্ভু হওয়া ছাড়া উপায় নেই !!

আমাদের মনে হয়, চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চতম শিক্ষার এবং গবেষণার যথেষ্ট ব্যবস্থার অভাবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী, তাহার মেডিক্যাল ফ্যাকল্টি দায়ী, নেতৃস্থানীয় চিকিৎসকেরা দায়ী, দেশের ধনী ব্যক্তিরা ও শিক্ষানেতারা দায়ী এবং সর্বোপরি দায়ী গবর্মেণ্ট। বিশ্ববিদ্যালয় যদি বলেন টাকা নাই, তাহা ঠিক্ বলা হইবে না। পরীক্ষার ফী, পুস্তকবিক্রী, সরকারী সাহায্য প্রভৃতি হইতে বিশ্ববিদ্যালয় বহু লক্ষ টাকা পান। সবটাই চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য বিজ্ঞানের ও আর্টসের শিক্ষায় খরচ না করিয়া চিকিৎসার উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণায় একটা অংশ খরচ করা উচিত। গবর্মেণ্টের এবং উপরিলিখিত অন্য সকল পক্ষের এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে।

—

দিল্লীর শেষ মোগল বাদশাহ ও রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে এখনও এদেশে ও বিদেশে বিস্তর অনুসন্ধান করিবার বিষয় আছে। গত বৎসর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার অনেক সরকারী দপ্তরখানায় অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তর দলিল প্রকাশ করেন। তাহাতে রামমোহনের সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা খণ্ডিত হয় এবং সত্য প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকটির শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দর লিখিত ভূমিকাও রামমোহনকে ঠিক্ বুঝিবার একটি উপায়।

এ বৎসর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার, রাজা রামমোহন রায় যে মোগল বাদশাহের দৌত্যকার্যে বিলাত গিয়াছিলেন, তৎসংপৃক্ত মোটামুটি দুই শত দলিল দিল্লীর সরকারী দপ্তরখানা হইতে নকল করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই বৃহৎ পুস্তকটি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মূল্যবান। রামমোহন যে মোগলদের জন্য কি করিয়াছিলেন তাহা ইহা হইতে জানা যায়, অধিকন্তু শেষ মোগলদের ইতিহাসে ইহা নূতন আলোকপাত করে। একাধিক ভারতীয় ও বিদেশী ঐতিহাসিক শেষ মোগলদের বিষয় লিখিয়াছেন। তাঁহারা এই দলিলগুলি সব দেখিয়াছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু অতঃপর যদি কেহ শেষ মোগলদের বিষয় লেখেন বা কোন অগ্রসর ঐতিহাসিক বিদ্যার্থী তাঁহাদের সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি দেখিতে হইবে।

এই গ্রন্থের পৃষ্ঠার আয়তন 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠার সমান। বহু ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ইহার ভূমিকা ৬৬ পৃষ্ঠাব্যাপী। সংকলনকর্তা তাহার লেখক।

ইহার একটি পরিশিষ্টের দলিল হইতে প্রমাণিত হয় যে, রাজারাম শেখ বকৃস্থ নহেন।

—

নোয়াখালির অবস্থা

নোয়াখালির হিন্দুদের নানা অভিযোগের কথা খবরের কাগজে প্রকাশ পাইয়াছে। তৎসমুদয়ের যথাযোগ্য অনুসন্ধান এবং, প্রমাণিত হইলে, প্রতিকারের চেষ্টা অপেক্ষা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী সেগুলা উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন মনে হইতেছে।

নোয়াখালি মহকুমার মুসলমান হাকিমের বদলীর হুকুম সরকারী গেজেটে বাহির হয়। তাহার পর আইনসভার একাধিক মুসলমান সদস্যের তদ্বিরে বদলী স্থগিত আছে ! হাকিমটির জায়গায় কাজ করিবার যোগ্য অন্য হাকিম নাকি পাওয়া যাইতেছে না—তিনি এত বেশী লায়েক ! অথচ তাঁহার উপরওআলা তাঁহার যোগ্যতার বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়াছিলেন কি না আইন-সভায় জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দেওয়া হইয়াছে, এ রকম সব চিঠি গোপনীয় (confidential)। এর মানে যা, তাই !! বঙ্গের মন্ত্রীদের কীর্তি অতুলনীয় হইয়াছে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়াছে।

—

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ

বাংলা-গবর্মেণ্টের ভূতপূর্ব রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক বার প্রধান মন্ত্রীর ও অন্য কোন কোন মন্ত্রীর মতভেদ হইয়াছে। যাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর ও গণতান্ত্রিক, তিনি বরাবর তাহা করাইতে চাহিয়াছেন ; নিজের মত সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে না-পারায় রফাও কখন কখন করিয়াছেন। এবার প্রধান মন্ত্রীর যুদ্ধবিষয়ক প্রস্তাবের সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিকর অংশে সায় দিতে না-পারায় ইস্তফা দিয়াছেন। ঠিক্ করিয়াছেন। এখন তাঁহার যোগ্যতা—বিশেষতঃ ব্যবসাবাণিজ্যবিষয়ক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা—পূরা দেশের কাজে লাগিতে পারিবে। তিনি মন্ত্রী হইয়া দেশের সেবা করিতে পারিবেন ভাবিয়াছিলেন। এখন তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন।

সংখ্যালঘুদের অনুমোদনসাপেক্ষ রাষ্ট্রবিধি !

মৌলবী ফজলল হক বঙ্গের আইনসভায় যুদ্ধসম্পর্কিত যে প্রস্তাব পেশ করেন ও পাস করান, তাহার শেষে আছে যে, সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত রাষ্ট্রবিধি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের সম্পূর্ণ সম্মতি ও অনুমোদনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ("should be based upon their full consent and approval")।

ব্রিটিশ জাতির প্রতীক শুধু সিংহ। হক সাহেব বলিয়াছেন, মুসলিম লীগের প্রত্যেক সভ্য (সুতরাং অবশ্য তিনিও) একাধারে সিংহ ও ব্যাঘ্র। সুতরাং হক সাহেবের দাবী ব্রিটিশ সিংহকে মানিতেই হইবে। অতএব আমরা সময় থাকিতে সভয়ে বলিতেছি, "তথাস্তু। বঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘু; অতএব নূতন রাষ্ট্রবিধির বাংলা দেশে প্রযোজ্য অংশ বঙ্গের হিন্দুদের সম্পূর্ণ সম্মতি ও অনুমোদন অনুসারে প্রণীত হউক।"

—

সাম্প্রদায়িক ভেদবিরোধ সম্বন্ধে ভারত-সচিব

গত ১৪ই ডিসেম্বর হৌস অব লর্ডসে একটা বিবৃতিতে ভারতসচিব বলেন :—

"What we have to aim at is a state of affairs under which the legislator will think of himself as an Indian first and as Hindu or Moslem afterwards. When that has been achieved the greatest stumbling block in the way of India's progress will have been removed."

তাৎপর্য্য। এ রকম একটি অবস্থা আমাদের লক্ষ্যীভূত হওয়া উচিত, যে-অবস্থায় আইন-সভার সভ্যেরা আপনাদিগকে প্রথমতঃ ভারতীয় মনে করিবেন এবং তাহার পরে হিন্দু বা মুসলমান। যখন সেই অবস্থা আসিবে, তখন ভারতবর্ষের অগ্রগতির গুরুতম বাধা অপসারিত হইবে।

কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রবিধির লক্ষ্য এই যে, আইন-সভার সভ্যেরা যেন ভারতীয় (Indian) বলিয়া নির্বাচিত না হইয়া মুসলমান, হিন্দু (থুড়ি! অমুসলমান বা "সাধারণ"), প্রভৃতি বলিয়া নির্বাচিত হয়, এবং আপনাদিগকে ভারতীয় মনে না করিয়া মুসলমান প্রভৃতি মনে করে। ভারতসচিব প্রভৃতি ইংরেজ রাজপুরুষদের প্রণীত রাষ্ট্রবিধিতে ইণ্ডিয়ান (ভারতীয়) কথাটাই নাই। তাঁহাদেরই রচিত আইনটার লক্ষ্য এক রকম, কিন্তু এখন তিনি বলিতেছেন লক্ষ্যটা অন্য রকম হওয়া উচিত। এখন যাহা বলিতেছেন তাহাই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ রদ করিয়া তাহাকে ভিত্তি করিয়া রচিত বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিধির পরিবর্ত্তে ন্যায্য ও গণতান্ত্রিকতাসম্মত নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন করিতে ভারতীয়দিগকে সুযোগ প্রদান করুন; তাহাতে বাধা দিবেন না।

—

শক্তিহীনতার ভানের ন্যাকামি

১৪ই ডিসেম্বরের বিবৃতিতে ভারত-সচিব আরও বলেন :

"We regard it as essential for constitutional advance—by whatever means advance is to be obtained—. that assent of minorities should be secured as far as possible by agreement. But it is not within our power to impose an agreement upon minorities ; that can only be reached by Indians themselves."

তাৎপর্য্য। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষে আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের তাহাতে সম্মতি একান্ত আবশ্যক মনে করি। কিন্তু কোন চুক্তি তাহাদের উপর চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা আমদের নাই:—চুক্তিতে পৌঁছা কেবল ভারতীয়দের নিজেদের দ্বারাই হইতে পারে।

ইংরেজ রাজপুরুষরা গোটা ভারতশাসন-আইনটা নিজে গড়িয়া ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ও অন্য সকলের উপর চাপাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন;—তাহার শক্তি তাঁহাদের ছিল। কিন্তু এখন তাঁহারা বলিতেছেন, ভারতীয়েরা সংখ্যালঘুদিগকে (অর্থাৎ কিনা প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াপন্থী মুসলমানদিগকে) নূতন কোন রাষ্ট্রবিধিতে রাজী করিতে না পারিলে ইংরেজরা রাষ্ট্রবিধির কোন পরিবর্ত্তন করিতে অক্ষম। এই যে তাঁহাদের শক্তিহীনতার ভান, ইহা একটা অদ্ভুত ন্যাকামি। তাঁহারা বেশ জানেন, উক্ত মুসলমানরা ন্যায্য এবং গণতান্ত্রিকতাসম্মত কোন রাষ্ট্রবিধিতে রাজী হইবে না—যেহেতু মালিকের হুকুম সেইরূপ; সেই জন্য এই প্রকার ন্যাকামির দ্বারা রাষ্ট্রবিধির ন্যায্য সংশোধনে নিজেদের অনিচ্ছা সংখ্যালঘুদের অসম্মতির আবরণে ঢাকা দিবার প্রয়াস।

আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু কাহারও উপর কিছু তাহাদের অসম্মতি সত্ত্বেও চাপাইয়া দিবার বিরোধী। রাষ্ট্রবিধি, সম্ভব হইলে সমুদয় ভারতীয় সম্প্রদায় ও শ্রেণীর ঐকমত্য অনুসারে, তাহা সম্ভব না হইলে অধিকাংশের মত অনুসারে গঠিত হওয়া উচিত। অসম্মতি দ্বারা রাষ্ট্রিক উন্নতি বন্ধ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের থাকা উচিত নয়।

—

রাষ্ট্রনৈতিক পারিস্থিতি সম্বন্ধে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি

গত ডিসেম্বর মাসে ৰর্ধায় (Wardhaয়) কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির অধিবেশনে বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহাতে এই মর্ম্মের কথা বলা হয় যে, যত দিন ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ, সমগ্র মহাজাতির (নেশ্যনের) ক্ষতি করিয়াও, বিশেষ বিশেষ সুবিধা ও অধিকারের নিমিত্ত তৃতীয় পক্ষের মুখাপেক্ষী থাকিবে, তত দিন সাম্প্রদায়িক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইবে না। অর্থাৎ কিনা, ব্রিটিশ প্রভুত্ব থাকিতে উহার সমাধান হইবে না। অন্য দিকে ঐ তৃতীয় পক্ষ বলিতেছেন, আগে তোমরা নিজেদের মধ্যে আপোষে একটা মিটমাট ও চুক্তি কর, তাহার পর আমরা সরিয়া পড়িব; অথচ কর্তাদের নানা ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত এরূপ যে মিলন, মিটমাট, মীমাংসা অসাধ্য, বা অতি দুঃসাধ্য!

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি ঠিক কথা বলিয়াছেন।

কংগ্রেস মিলন-চেষ্টা বরাবর করিতেছেন, কিন্তু ঠিক্ পথে নহে।

—

বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুভাষবাবু

বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের প্রস্তাব ও বিবৃতিসমূহে সুভাষবাবু সন্তুষ্ট নহেন। তিনি নানা ভাবে ও ভাষায় বলিয়াছেন, কংগ্রেস-নেতারা কেবল গড়িমসি করিতেছেন, আসন্ন (অহিংস) সংগ্রামের কথা বলিতেছেন, কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন না, বা সংগ্রামের উদ্যোগও করিতেছেন না। তিনি চান সংগ্রামশীলতা ও সংগ্রাম। দেশের লোকেরা, তাঁহার মতে, তজ্জন্য প্রস্তুত কিন্তু নেতারা অ-প্রস্তুত।

দেশ প্রস্তুত কি না সে বিষয়ে আমাদের কোন ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। যদি তাহারা বাস্তবিকই প্রস্তুত, তাহা হইলে তাহা সুসংবাদ।

—

কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ও বঙ্গীয় কংগ্রেস-দল

বর্ত্তমানে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির বিরোধ চলিতেছে। বাংলার কংগ্রেস-ওআলারাও আবার সকলে একমত নহেন, তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি আছে।

অবস্থাটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

—

বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর রঙ্গরস ?

আইন-সভায় বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ফজলল হকের বচন পড়িয়া কথামালার সেই ভেকদের কথা মনে পড়ে যাহারা ডোবায় তাহাদের উপর ঢিল-নিক্ষেপক বালকদিগকে বলিয়াছিল, "তোমাদের যেটা খেলা আমাদের সেটা মৃত্যুবৎ।" 'ভারত' দৈনিকে দেখিলাম :—

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, নোয়াখালীতে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর যে ব্যবহার করিতেছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুদের জমিতে ধান থাকিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত মুসলমানদের ধানের প্রয়োজন থাকিবে ততদিন মুসলমানরা হিন্দুদের জমি হইতে ধান লুঠ করিবে বা বলপূর্ব্বক উহা কাটিয়া লইয়া যাইবে। প্রধান মন্ত্রী আরও বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই মুসলমানরা বলপূর্ব্বক হিন্দুদের জমি হইতে ধান কাটিয়া নিতেছে। প্রধান মন্ত্রীর এই বক্তৃতার উত্তরে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন :—

"আমরা যখন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের উক্ত মন্তব্য পড়িলাম তখন আমরা হতবাক্ হইয়া গেলাম। আমরা ঘুমাইয়া আছি কি জাগিয়া আছি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উক্ত মন্তব্যের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ইহাও বলিতে পারিতেন যে নোয়াখালি এবং অন্যান্য স্থানের ঋণসালিশী বোর্ড এবং তাহাদের কর্ম্মচারীদের আনুকূল্যে হিন্দু মহাজনদের অর্থও লোপ পাইতে পারে। আমরা প্রধান মন্ত্রীকে একটা মাত্র প্রশ্ন করিতে চাই যে, নোয়াখালিতে তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণ হিন্দুদের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে তিনি তাহাদের কার্য্যকলাপ সমর্থন করেন কি না। গুণ্ডাপ্রকৃতির মুসলমানগণ হিন্দুদের উপর অত্যাচার শেষ করিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বী ধনীদের উপরও অত্যাচার চালাইবে—ইহাতে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।" ইত্যাদি।

মৌলবী হক মনে করিতে পারেন তিনি তোফা রঙ্গরস ও ভাঁড়ামি করিয়াছেন, কিন্তু সেটাকে ফতোআ বা হুকুম মনে করিবার মত বিস্তর লোক তাঁহার সহধর্মীদের মধ্যে আছে।

সংখ্যালঘুদিগকে রক্ষা করিবার যে বিশেষ ক্ষমতা গবর্ণরকে দেওয়া আছে, তাহা কি শিকায় তুলিয়া রাখিবার নিমিত্ত ?

—

বঙ্গীয় সমবায়-আইনের খসড়া

বেঙ্গল কো-অপারেটিভ. বিল বা বঙ্গীয় সমবায়-আইনের নূতন খসড়া কিছু কাল পূর্ব্বে আইন-সভায় উপস্থাপিত করা হয়। সেখান হইতে বিচার ও

সংশোধনাদির জন্য উহা একটি সিলেক্ট কমীটিতে প্রেরিত হয়। সম্প্রতি গত ১৯শে ডিসেম্বর সিলেক্ট কমীটির প্রস্তাব সহ বিলটি অ্যাসেম্ব্লিতে পেশ হইয়াছে। ভবিষ্যতে উহার আলোচনা হইবে।

মূল বিলটি যে আকারে পেশ হইয়াছিল তাহাতে সকলেই চমকিত হয়। উহার ধারাসমূহে সমবায়-নীতি ও দেশের অগ্রগতিকে বাধা দিয়া সরকারী প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম করিবার চেষ্টা নগ্নভাবে দেখা দিয়াছিল। বর্ত্তমান সিলেক্ট কমীটির প্রস্তাবসমূহে এই অপচেষ্টার প্রতিকারের কিঞ্চিৎ প্রয়াস আছে; কিন্তু এই সব প্রস্তাব গৃহীত হইলেও এই সমবায় বিলের অনেক অংশই আপত্তিকর থাকিয়া যাইবে।

সমবায়ের একটি মূল কথা এই যে, জনসাধারণ যেন নিজেদের পরিচালন করিবার ভার নিজেরা গ্রহণ করিতে পারে, সরকারের বা প্রভুশক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া না থাকে। এই বিল সেই মূলনীতিকেই উড়াইয়া দিয়া এই দিকেও সরকারী শাসন কায়েম করিতে চায়। ইহাতে সমবায়-সমিতি এবং সমবায়-কর্ম্মীরা হইবে সরকারী কর্ত্তাদের হাতের যন্ত্র। বর্ত্তমানে সমবায়-সমিতিগুলির যে অবস্থা, সমবায়-বিভাগের আওতা তাহাদের উপর যেভাবে পড়িয়াছে বলিয়া শোনা যায়, তাহাতে বর্ত্তমান সমবায়-সমিতিগুলির কার্য্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কোন বিলই উত্থাপন করা উচিত নয়। যে-সব প্রদেশে ভারত-সরকারের ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের সমবায়-আইনের স্থলে প্রাদেশিক সমবায়-আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানেই তাহার পূর্ব্বে এইরূপ অনুসন্ধান হইয়াছে এবং তাহার তথ্যাবলী বিবেচনা করিয়া আইনের খসড়া প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা-সরকারের সে সব বালাই নাই—দেশের সমিতিগুলি কিরূপ চলে না-চলে, কি তাহাদের দরকার, এই সব বিষয়ে কোন প্রকার স্বাধীন ও বেসরকারী কমীটি দ্বারা অনুসন্ধান না করাইয়া তাঁহারা একেবারে নিজেদের উদ্দেশ্যানুরূপ বিল প্রণয়ন করিয়া বসিয়াছেন। এই বিল প্রণয়নের পদ্ধতি যেমন অন্যায়, এই বিলের উদ্দেশ্যও তেমনি ক্ষতিকর। এই বিল আইনে পরিণত হইলে প্রকৃত সমবায়ের ভবিষ্যৎ পথ একেবারে নিরুদ্ধ হইবে, অথচ জনসাধারণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান শিক্ষাক্ষেত্রই হইল সমবায়-সমিতিগুলি। তাই আইন-সভার সদস্যদের দেখা দরকার যাহাতে এই সমবায়-বিরোধী বিল যথোপযুক্তরূপে সংশোধিত না হইয়া গৃহীত না হয়—সমবায়ের মূলনীতিই যাহাতে বিনষ্ট না হয়।

—

সমবায় বিলের 'অসম্মতিপত্র'

সমবায় বিলের বিবরণীর সহিত একটি সুলিখিত, সুযুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ 'অসম্মতিপত্র' (Note of Dissent) দাখিল করিয়াছেন আইন-সভার সদস্য রাজশাহীর শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজশাহীর অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রও তাঁহার সহিত নিজের মতৈক্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা সত্যপ্রিয় বাবুর এই অসম্মতিজ্ঞাপক বিবৃতিটি মন্ত্রীমণ্ডলীকে, আইন-সভার সদস্যদিগকে ও সমবায়-কর্ম্মীদিগকে পাঠ ও বিবেচনা করিতে বলি। উহাতে সমস্ত বিল ও উহার নীতি সম্বন্ধে বিশদ ও মূল্যবান্ আলোচনা রহিয়াছে। অনেক উন্নতিবিধায়ক পথও উহাতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

—

সমবায়-সমিতিসমূহের দায়িত্বের প্রকারভেদ

সমবায়-সমিতিসমূহ সম্বন্ধে একটি বড় প্রশ্ন এই যে, উহারা অসীমদায়িত্বযুক্ত হইবে, না সসীমদায়িত্বযুক্ত হইবে? সমবায়-সমিতিসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—অসীমদায়িত্বযুক্ত (Societies with unlimited liability) এবং সসীম-দায়িত্বযুক্ত (Societies with limited liability)। এই দেশের গ্রাম্য প্রাথমিক সমবায়-ঋণদান-সমিতিসমূহ প্রধানতঃ এবং সাধারণতঃ অসীমদায়িত্বশীল। অসীমদায়িত্ব-যুক্ত সমিতির বিশেষত্ব এই যে, তাহার নিকট হইতে পাওনা প্রয়োজন হইলে তাহার যে-কোন সভ্যের নিকট হইতে আদায় করা যাইতে পারে। গত ৩৫ বৎসরের পরিচালনার ফলে দেখা যায় যে, যে-উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষের সমবায়-সমিতিসমূহে অসীমদায়িত্বের নীতি অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। এই জন্য আজকাল অনেকের মত অসীমদায়িত্বের পরিবর্ত্তে সসীমদায়িত্বের প্রবর্ত্তন করা। শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বাবু এই মত সমর্থন করেন এবং এই মতের সমর্থনে তাঁহার অসম্মতিপত্রে ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের বহু বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাবনার সদস্য শ্রীযুক্ত মৌলবী আজাহার-আলিও এক পৃথক নোটে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, দিল্লীতে গত ডিসেম্বরের অখিল ভারতীয় সমবায়-রেজিষ্ট্রারদের বৈঠকে এই বিষয় আলোচনা হয়। উভয় পক্ষে সমান-সংখ্যক ভোট হওয়াতে সভাপতি সর্ এম-এল-ডারলিং-এর কাস্টিং ভোটে অসীমদায়িত্বের পক্ষ জয়ী হয়। বিচার করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্ত সত্যপ্রিয় বাবুর মতের পরিপোষক ধরা যাইতে পারে।

বাংলা দেশে যে-প্রণালীতে সমবায়-সমিতিসমূহের

হিসাব পরীক্ষিত হয় তাহা যে সম্পূর্ণরূপে অসন্তোষজনক ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এই ব্যবস্থার অযৌক্তিকতা শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বাবু তাঁহার অসম্মতিপত্রে সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার সমর্থনে ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের মিণ্টো অধ্যাপক ডাক্তার জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার যোগীশচন্দ্র সিংহ এবং অন্যান্য অনেকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বাবু বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে কোন প্রকার স্বাধীন এবং সমবায়-বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। যাঁহারা সমবায়-সমিতিসমূহের উন্নতি কামনা করেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে মতভেদের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বাবু প্রস্তাব করেন যে, আইনের নিয়মাবলী (Rules under the Act) প্রণয়নে যাহাতে প্রকৃত সমবায়-নীতি লঙ্ঘিত না হয় তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক। তিনি আরও বলেন যে, সমবায়-সমিতিসমূহের কার্য্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে-সকল বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা সরকারী এবং বেসরকারী কর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

এই বিলের উদ্দেশ্য সরকারী রেজিষ্ট্রারকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তোলা—তাঁহার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সমিতি এবং সমিতির সদস্যগণকে তাঁহার মুখাপেক্ষী করিয়া রাখা। ইহা সমবায়ের মূলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। সত্যপ্রিয় বাবু সমবায়-সমিতিগুলিকে সরকারী কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত করিতে চান। তিনি রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী। যাহাতে সমিতির পরিচালনায় অযথা রেজিষ্ট্রার কখনও সমিতির বা সদস্যদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারেন, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ম্যাকলাগান সমবায়-কমীটি, রয়্যাল কৃষি-কমিশন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রস্তাবানুযায়ী সত্যপ্রিয় বাবু উপযুক্ত রেজিষ্ট্রার নিয়োগ করিবার পক্ষপাতী। এইরূপ, রেজিষ্ট্রারকে পরামর্শদানের জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র ও বেসরকারী পরামর্শদাতা-পরিষদের বা অ্যাড্‌ভাইসরি কমীটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই কমীটির দ্বারা কি সুবিধা হইতে পারে, সে সম্বন্ধে সত্যপ্রিয় বাবু বেশ সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন।

—

সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

১৯৩৯ সালে সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নীট লাভ হইয়াছে ৩৯,৯১,৪৯১ টাকা। তাহা হইতে অংশীদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ বাবদে ৬,৭২,৫২৮ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং শতকরা ২ টাকা হিসাবে তাহাদিগকে বোনাস দেওয়া হইয়াছে ৩,৩৬,২৬৪ টাকা। কর্মচারীদিগকে বোনাস দেওয়া হইয়াছে, ২,২০,০০০ টাকা। এই প্রকার আরও কোন কোন ব্যয় বাদে ৮,০৮,৩০৩ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

গত ৩০শে এপ্রিল যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসর এই জীবনবীমা কোম্পানী ৩,১৪,২৫,৯০০ টাকার নূতন কাজ করিয়াছে। ইহা তাহার আগের বৎসর অপেক্ষা ৭,১৫,৭৭০ টাকা বেশী। এই বৎসর বীমাকারীদিগকে তাহাদের দাবী বাবতে বোনাস সহ ২৫,১৮,২৩১ টাকা দেওয়া হইয়াছে। কাজ চালাইবার খরচ শতকরা ১ টাকা কমিয়া শতকরা ২৮ হইতে দাঁড়াইয়াছে। সকল দিকেই উন্নতি হইয়াছে।

—

যাদবপুর যক্ষ্মা হাঁসপাতাল

বঙ্গে বৎসরে ১৬০০০ রোগীর যক্ষ্মায় মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে আরও অনেকের হয়ত ঐ রোগেই মৃত্যু হয়, কিন্তু তাহা অজ্ঞাত থাকায় গণনার মধ্যে আসে না। এই রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা বিবেচনা করিলে বঙ্গে বহু যক্ষ্মা হাঁসপাতাল থাকা উচিত। কিন্তু আছে কেবল একটি যাদবপুরে এবং তাহার একটি শাখা শশীভূষণ দে হাঁসপাতাল কার্সিয়ঙে। যাদবপুরে প্রায় ১৬০ জন রোগীর স্থান হইতে পারে এবং কার্সিয়ঙে ২৫। আরও ন্যূনকল্পে ২০০ জনের স্থান হওয়া আবশ্যক। বাংলা গবন্মেণ্ট এই হাঁসপাতালে কোন প্রকার সাহায্য করেন না, যদিও তাহা অবশ্যই করা উচিত। গবন্মেণ্ট নিজের কর্ত্তব্য করেন না বলিয়া দেশের লোক এবিষয়ে দায়িত্বমুক্ত হইতে পারেন না, বরং সেই কারণে তাঁহাদের বেশী করিয়া হাঁসপাতালটিকে সাহায্য করা উচিত। আশা করি তাঁহারা তাহা করিবেন। গবন্মেণ্টের উপর চাপ দিবার সুযোগ যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

—

"বাংলা সাময়িক-পত্র"

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে যত বাংলা দৈনিক, অর্দ্ধসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, দ্বিসাপ্তাহিক, পাক্ষিক, ত্রিসাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ বাহির হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকে তাহাদের নাম এবং কিছু কিছু বৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অনেক কাগজের একটি পৃষ্ঠার বা পৃষ্ঠাংশের ফোটোগ্রাফিক চিত্রও দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকটি খুব কৌতূহলোদ্দীপক। ইহা সংকলন করিতে গ্রন্থকর্তাকে বিশেষ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহার ফলে ইহাতে বহু চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক উপকরণও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ২৫০টি কাগজের বৃত্তান্ত আছে। তাহাদের মধ্যে এখনও জীবিত আছে বোধ হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, এবং ধর্ম্মতত্ত্ব, এই তিনখানি। সাবেক কাগজগুলির কোন কোনটির নাম বেশ মজাদার; যেমন 'আক্কেলগুড়ুম'। নূতন নূতন কাগজ এখনও বাহির হইতেছে। যদি নূতন কোন কাগজের কোন প্রকাশক তাহার কি নাম রাখিবেন চট্ করিয়া ঠিক করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি এই বহিখানা দেখিতে পারেন।

এই গ্রন্থে একখানি দৈনিকের উল্লেখ আছে যাহা বাংলা ও হিন্দী দুই ভাষায় বাহির হইত। ইহার নাম 'সমাচার সুধাবর্ষণ'। ইহাই প্রথম হিন্দী দৈনিক। জনৈক বাঙালী ইহা সম্পাদন করিতেন।

—

তুরস্কের ঘোর দুর্বিপাক

ভূমিকম্পে এবং তাহার পর ঝড় ও বন্যায় তুরস্কের হাজার হাজার লোক মারা পড়িয়াছে এবং বহু লক্ষ লোক সর্ব্বস্বান্ত ও আশ্রয়হীন হইয়াছে। মৃতদের আত্মীয়-স্বজনদিগের এবং অপর বিপন্নদিগের দুঃখে আমরা ব্যথিত।

—

শিল্পবাণিজ্যাদির সহায়ক ডিরেক্টরী

শিল্পবাণিজ্যাদি যাহাদের পেশা তাহাদের সহায়ক ইংরেজদের সংকলিত যেমন একাধিক ডিরেক্টরী আছে, বাঙালীদের দ্বারা সংকলিত সেইরূপ ডিরেক্টরী "ইণ্ডাস্ট্রি ইয়্যারবুক এণ্ড ডিরেক্টরী"। ইহাতে নানা প্রকার পণ্য-শিল্পজাত, কৃষিজাত, আরণ্য, খনিজ প্রভৃতি সামগ্রীর উৎপত্তি ও বিক্রয়ের স্থান, নানা স্থানের হাট বাজার ও মেলা, নানা ব্যবসা বাণিজ্য, সমুদয় খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্র, শিল্পশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতির খবর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সব জেলা, মহকুমা ও তহসিলের তালিকা ইহাতে আছে।

মহাজাতি-সদন

অন্য কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেসের নিজস্ব ঘরবাড়ী আফিস আছে, বঙ্গে নাই। এই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা মিউনিসিপালিটির নিকট হইতে নামমাত্র খাজনায় জমি লইয়াছেন। মহাজাতি-সদনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। নির্ম্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে না। কংগ্রেসের সহিত যাঁহাদের মত মিলে, ইহার জন্য তাঁহাদের সাধ্যানুসারে টাকা দেওয়া উচিত। যদি সুভাষ বাবু ও তাঁহার বন্ধুরা মনে করেন যে, মহাজাতি-সদনের ট্রষ্টী নিয়োগ করিলে টাকা সংগ্রহের সুবিধা হইবে, তাহা হইলে ট্রষ্টী নিয়োগ করাই উচিত। এরূপ বক্তব্য দ্বারা সুভাষ বাবুকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা হইতেছে না—আমরা তাহা করি না।

—

প্রাথমিক শিক্ষকদিগের সম্মেলন

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদিগের সম্মেলন এ বৎসরও হইয়া গিয়াছে। ইহা সাতিশয় লজ্জাকর ও শোচনীয় যে, যাঁহাদের হাতে দেশের অধিকাংশ শিশুর শিক্ষার ভার, তাঁহাদের মাথাপিছু মাসিক পারিশ্রমিক ৫।৬ টাকা। সাধারণ গৃহভৃত্য এবং মেথরদেরও বেতন ইহা অপেক্ষা অধিক। অথচ আমরা একটা বড় নেশ্যন হইতে চাই। লাট বেলাট জজ মন্ত্রী প্রভৃতির বেতনের বহর দ্বারা আমাদের বড়ত্ব নির্দ্ধারিত হইবে না, হইবে আমরা শিশুদের শিক্ষকদিগকে অন্ততঃ পেট ভরিয়া খাইতে দি কিনা তাহার বিচার দ্বারা।

—

চীন

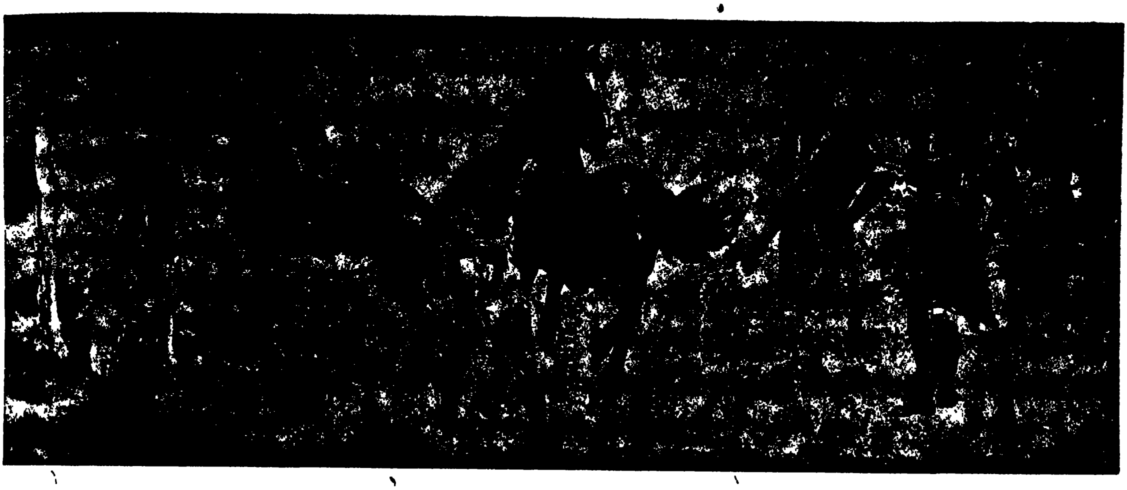
চীনরা যে এখনও মধ্যে মধ্যে জাপানীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতেছে, ইহা সুসংবাদ।

—

রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ইটালী

রাশিয়া যে ফিনল্যাণ্ডকে আক্রমণ করিয়াছিল ইহা আমাদের ভাল লাগে নাই। ফিনরা যে নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিতেছে, ইহা সন্তোষের বিষয়। কিন্তু রাশিয়ার প্রভাব হ্রাস সন্তোষের বিষয় নহে; কারণ রাশিয়ার প্রভাব সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজীবাদীদিগকে কতকটা দাবাইয়া রাখিতেছিল এবং চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের কাজে লাগিতেছিল। ফিনল্যাণ্ডকে ইটালীর সাহায্য-দান এবং ফিন্ল্যাণ্ডকে প্রেরিত ইটালীর সাহায্য জার্ম্মেনী কর্ত্তৃক আটক নূতন অবস্থা ও সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে।

[বিবিধ প্রসঙ্গের লেখা ২৬শে পৌষ সমাপ্ত]



রাজা তিয়েন হেন্‌ ও তাঁর অনুচরবৃন্দ

শান্তিনিকেতনে শিল্পী জ্যু পেয়ঁ

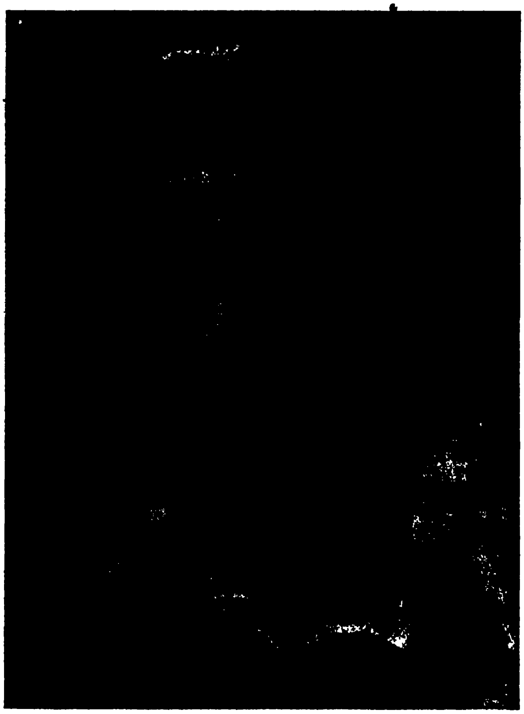
ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

সে প্রায় পনর বছর আগেকার কথা, ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চীনের জাতীয় অতিথিরূপে রওনা হলেন সাংহাই-পিকিঙ্‌ অভিমুখে। সঙ্গে ছিলাম আমরা তিন জন ভারতবাসী—শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও আমি। বিশ্বকবির আশীর্ব্বাদে নব্য চীনের বড় বড় প্রতিষ্ঠানের দরজা আমাদের সামনে খুলে গেল, বিশেষ ক'রে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মজলিস। পরলোকগত কবি ট্‌স্যু সিমো (Tsu Tsimo) ছিলেন আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দোভাষী ; রবীন্দ্রনাথ এঁকে সস্নেহে "সুসীম" নাম দেন। তাঁকে নিয়ে নন্দবাবু ও আমি অনেক চীনা শিল্পীর কাছে ঘুরেছি। তাঁরা নন্দলালের তুলির লিখন মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন। আমরাও অবাক হয়ে দেখেছি ভাষার অতীত সেই ভাষার প্রভাব যেটি শিল্পীর রূপ ও রেখার ভিতর দিয়ে অবাধে সকলের প্রাণ স্পর্শ করে।

বহুকাল পরে এবার ৭ই পৌষের উৎসবে নন্দবাবু আবার ডাক দিলেন দোভাষীর কাজ করতে। তিনি প্রশ্ন করবেন বাংলায়, সেটি ফরাসীতে বুঝিয়ে দিতে হবে কলাভবনের নূতন অতিথি শিল্পী জ্যু পেয়ঁকে, ইনি জবাব দেবেন ফরাসীতে এবং সেটি আবার বাংলা ভাষার মারফৎ নিবেদন করতে হবে নন্দবাবুকে—নেহাৎ মন্দ খেলা নয়! দু-জনই বড় শিল্পী, পরস্পরের কাজ দেখে মুগ্ধ, দু-জনে অনুভব করছেন শিল্পের ক্ষেত্রে চীনকে দরকার ভারতের, ভারতকে দরকার চীনের। রূপের সঙ্গে ভাব, ভাবের সঙ্গে রূপ, কেমন ক'রে মিতালি করে, এমনি কত গভীর প্রশ্ন তাঁদের দু-জনের মনে উঠছে দেখেছি।

সে-সব কথা রেখে এবার দু-চারটে কথা বলি শিল্পী জ্যু পেয়ঁ সম্বন্ধে, কারণ বাংলা দেশের সমজদার-মহলে এঁর শিল্পনিদর্শন শীঘ্র দেখান হবে। বাংলার শিল্পকেন্দ্র কলকাতায় দুটি প্রদর্শনী তিনি দেখে গেছেন। এখন আমাদের পালা তাঁর শিল্পসৃষ্টির ভিতর দিয়ে তাঁকে ধরবার, তাঁকে বোঝবার।

২৬শে মে ১৮৯৪ সালে জ্যু পেঁয় জন্মগ্রহণ করেন অতি দরিদ্র পরিবারে। তাঁর পিতা জ্যু দাৎসন্‌ (Ju Datson) ছিলেন একাধারে পণ্ডিত ও চিত্রকর—



শিল্পী জু পেয়ঁর আঁকা নিজ প্রতিকৃতি

এ রকম যোগাযোগ যে চীনে বিরল নয়, সেটা আমাদের জানা আছে। ১৯১৩ সালে যখন পিতা পরলোক গমন করেন, তখন জু পেয়ঁ বালক মাত্র, অথচ পিতার মত গুরু মিলেছিল, ব'লে সেই বয়সেই চিত্রশিল্পে তাঁর হাত উঠেছিল পেকে। সেই সময়ের ছবি দেখে প্রসিদ্ধ মনীষী কাঙ্ জু-ওয়ে (Kang Ju-wei) (ইনি পণ্ডিতপ্রবর জননায়ক লিয়াঙ্ চি-চাও (Liang Chi-chao)-এর পরামর্শদাতা) জু পেয়ঁকে উৎসাহ দেন এবং কাও চি-ফেঙ্ (Kao Chi-feng) কতকগুলি ছবি প্রকাশিত করে শিল্পীসমাজে তাঁর প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। জু পেয়ঁর আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়। কয়েক বৎসর কঠিন সংগ্রামের পর ১৯১৮ সালে সরকারী বৃত্তি পেয়ে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। প্রথমে প্যারিসের আকাদেমী জ্যুলিয়ঁা (Academie Julien) এবং পরে একল নাসিওনাল্ দে বোজার (Ecole National des Beaux Arts)এ যোগদান ক'রে পাশ্চাত্য চিত্রকলার সাধনায় নামেন। তখন প্রসিদ্ধ শিল্পী আল্‌ব্যের বেনার্ (Albert Besnard) ভারত ভ্রমণ ক'রে ভারতের অনেক ছবি নিয়ে ফিরেছেন এবং অগুস্ত্ রদ্যাঁ (Auguste Rodin) নটরাজের ধ্যানমূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের স্তব গানে মুখর।

প্যারিসের এক জন পাকা ওস্তাদ দাঞনা বুভ্রে (Dagnan Bouveret) ছিলেন জু পেয়ঁর শিক্ষক এবং তাঁকে নিয়ে শীঘ্রই শিক্ষকমহলে সাড়া পড়ে গেল। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় প্যারিসে এই নবীন চীনা শিল্পীর ১৯২৩-২৭ সালের অনেকগুলি প্রদর্শনীতে। ১৯২১ সালে জু পেয়ঁ বার্লিনে আসেন এবং হেয়ার কাম্‌ফ্ (Herr Kampf)-এর মত প্রসিদ্ধ ওস্তাদের সঙ্গ পেয়ে জার্মান-রীতিরও আভাস পান। কাম্‌ফ্-এর প্রসিদ্ধ ভিত্তি-চিত্রে (frescoe) শ্রমিক জীবনের ছবি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখে জু পেয়ঁ নূতন প্রেরণা পান এবং সাধারণ নরনারীর মুখে যে অসীম রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে সেটি প্রতিকৃতি-চিত্রের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ১৯২৭ সালে স্বদেশে ফিরে দুই বৎসর তিনি নান্‌কিঙ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রকলার অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ১৯২৯ সালে বেলজিয়মের রাজধানী ব্রাসেল্‌স্ শহরে তাঁর প্রদর্শনী হয় এবং তার পর কিছুদিন তিনি নান্‌কিঙেই কাজ করেন। ইতিমধ্যে বাধে জাপান ও চীনে সংঘর্ষ, কত অমূল্য শিল্পরত্ন যায় ধ্বংস হয়ে। বিষম দুর্দ্দিনের মধ্যেই চীনের নবজীবনের উন্মেষ জু পেয়ঁ অনুভব করেন, তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে চীনের চিরন্তন দান কোন্‌খানে? চীন-জাতির সেই বিষম অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেই তিনি অনুভব করেন নবজাগরণের দিন এসেছে—ঝরে পড়ে গেল নকলনবীশ শিল্পীদের প্রাণহীন স্বদেশী কায়দাকানুন, উড়ে গেল যত ধার-করা বিদেশী রীতিনীতি। শিল্পজগতে চীনের শাশ্বত দান কি—এই প্রশ্ন যেন গর্জ্জে উঠল জু পেয়ঁর তুলিকায়; নির্ভয়ে তিনি ঘোষণা করলেন—"সুঙ্ (Sung) চিত্রীরা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের যুগ···আমরা চাই আমাদের যুগকে আঁকতে।" এই সময়ে (১৯৩২) প্রাচ্য শিল্পের সমজদার Dagny Carter-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়



চাউ-যুগের মহিলা-কবি—চুয়াঙ্‌ চিউ



বনস্পতি

নান্‌কিঙে; তিনি জ্যু পেয়ঁর পরিবর্ত্তন দেখে অবাক হয়ে লিখেছেন: "এ কি পরিবর্ত্তন! কোথায় গেল সেই ঝাঁকড়া চুল, ভেলভেট কোট ও প্যারিসের উড়ন্ত গলাবন্ধ? পাশ্চাত্য মেকী ম্যানারিজ্‌ম্‌ সব গেছে উড়ে! জ্যু পেয়ঁ পরে আছেন লম্বা চীনে আলখাল্লা! দেখেই মনে হয় মানুষটা যেন আগের চেয়ে হয়েছে বড়, হয়েছে তেজী! নূতন ছবি যত কিছু দেখালেন প্রায় সবই প্রাচীন চীনা রীতিতে আঁকা, কতক একরঙা, কতক অল্প রঙে জমান। মালমশলা তুলি সব সেই চিরন্তন চীনা ওস্তাদদের অথচ সম্পূর্ণ নূতন তাঁর ছবির বর্ণিকাভঙ্গ! এমন একটা আলো-ছায়ার খেলা কোন সেকেলে ছবিতে পাই না, পাওয়া সম্ভবও নয়।" এ যেন প্রাচীন চীনের সঙ্গে আরও একটা নূতন কিছু—নূতন উন্মেষ নূতন প্রাণ। সুং-যুগের রোমাণ্টিক নিসর্গ-চিত্রের (landscape) রঙীন আলো ও অতীন্দ্রিয়



চীনে কাহিনীর চিত্র। বিদ্রোহীরা সদলবলে আত্মহত্যা করবে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করবে না, এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে।
ফটোগ্রাফ : শ্রীশম্ভু সাহা]

প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে জ্যু পেয়ঁ যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঙ্ (Tang) যুগের প্রচণ্ড প্রাণ-সমুদ্রে, তা থেকে কত জীবজন্তু কত লতাপাতা যেন সহজ সরল ছন্দে রূপায়িত হয়ে ভেসে উঠছে। তাদের আছে প্রাণ, শুধু এইটুকুই তাদের পরিচয়। তথাকথিত প্রাচীন শিল্পের মধ্যেই পেলেন জ্যু পেয়ঁ নূতন প্রাণের সন্ধান—যে নূতনকে তিনি খুঁজেছেন পাশ্চাত্য সালঁ (Salon) ও চিত্রশালায়, সে বেরিয়ে এল যেন ঘরের ভিতর থেকে! নবীনে প্রাচীনে এই মিতালির রহস্য ও ইতিহাস জ্যু পেয়ঁ ও নন্দলালের অমর রচনার ভিতর দিয়ে আশা করি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। যে দু-চারটি ছবির নমুনা এই প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া গেল, বিশেষ ভাবে তাঁর ঘোড়ার ছবিগুলির ভিতর দিয়ে জ্যু পেয়ঁ এই ইতিহাসের আভাস দিয়েছেন।

১৯৩৩ সালে জ্যু পেয়ঁ প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে চীনা শিল্পের তত্ত্বাবধায়ক হন। সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ এল তাঁর নিজের নূতন ছবি দেখাবার, পাশ্চাত্য শিল্পী ও সমজদারের ভিড় লেগে গেল তাঁর ব্রাসেল্স, মিলান ও ফ্রাঙ্কফোর্ট-এর প্রদর্শনীতে, খবর পৌছল সুদূর সোভিয়েট রাশিয়াতে এবং সরকারী অতিথিরূপে জ্যু পেয়ঁ মস্কো ও লেনিন-গ্রাডে চীনা শিল্পের প্রদর্শনী ১৯৩৪-এ খুলে দিগ্বিজয়-পর্ব্ব শেষ করলেন। সকলে দেখে অবাক, যেন সেই গত গৌরব-যুগের চীনা ওস্তাদ নূতন রূপ ধ'রে এসেছেন!

অথচ নিজের দেশে যখন তিনি ফিরলেন তখন সংগ্রামের অন্ত নেই; বাইরের সংগ্রামে ধ্বংস হয়ে আসছে দেশ ও কত নব নব জাতীয় প্রতিষ্ঠান, ভিতরের সংগ্রামও কম নয়। দরদী শিল্পী দেখেন সব কিছুরই দাম আছে, দাম নেই যেন শিল্পের ও শিল্পীর! এই মহাপ্রলয়ের যুগেও তবু কি নিষ্ঠা কি বিশ্বাস নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন ভারতের সঙ্গে চীনের শিল্পের মিলন ঘটাতে। বিশ্বকবির উদার আহ্বান, শান্তিনিকেতনের আকাশ-বাতাস, নন্দলালের নিখুঁৎ রুচি ও গভীর সমবেদনা, সব যেন জ্যু পেয়ঁর প্রাণে নব প্রেরণা এনে দিচ্ছে—হয়ত নব নব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে এই অপূর্ব্ব মিলন সার্থক হয়ে উঠবে।

কলাভবনে প্রদর্শনীর পর জ্যু পেয়ঁ অন্যান্য জায়গায় তাঁর ছবি দেখাবেন ও ভারতের শিল্প-উৎসগুলি পরিদর্শন করবেন। তার আগে নব্য চীনের নেতৃস্থানীয় শিল্পাচার্য্য জ্যু পেয়ঁর সামান্য একটু পরিচয় দেওয়া গেল।

কাবুলের চিঠি

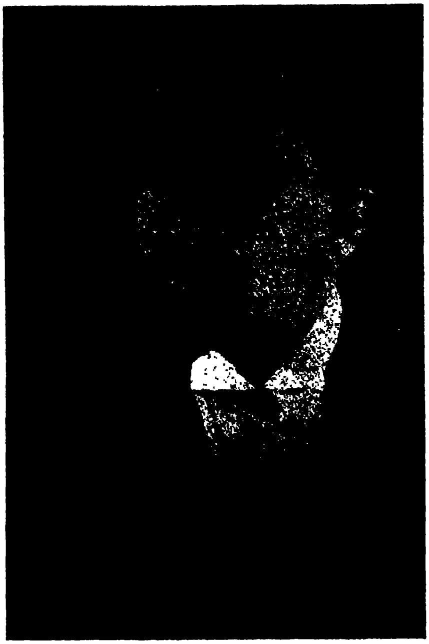
ডক্টর শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

জশন্‌ সুরু হয়েছে: আফগান জাতীয় উৎসব। কুচ-কাওয়াজ, সজ্জিত সৈনিক, পাত্রমিত্রঅমাত্যের চোখ-ঝল্‌সানো সমারোহ। এরোড্রোমের কাছে প্রকাণ্ড মাঠ নিমন্ত্রিত নানা দেশীয় দর্শকে পরিপূর্ণ; বড় রাস্তার ওপারে অগুন্তি স্থানীয় লোকের ভিড়। কামান, বন্দুক, অশ্বারোহী, পদাতিক, চক্রযান সৈন্যবাহিনীর কঠিন স্রোত বইল রাজপথে; তিন ঘণ্টা কাল মারণযন্ত্রের অভিযান দেখছি। রাজা কই? এলিয়টের কবিতাটা মনে পড়ল— নেতা প্রচ্ছন্ন তীব্র জয়যাত্রার আয়োজনে। জাতীয় যুদ্ধপ্রতীকের পিছনে সম্রাট্‌ জাহির শা অদৃশ্য রইলেন বিশেষ একটি তাঁবুতে; পিতার শোকাবহ পরিণামের পর থেকে এই বিধি।

রোদ পড়েছে বল্লমে বেয়নেটে ইস্পাতী টুপিতে; আধুনিক রণডঙ্কায় আকাশকে চুরমার ক'রে সঙ্গৎ। আফগান যোদ্ধার দলকে নূতন টেক্‌নীকে ঢোলাই করা হচ্ছে; শৌর্য্যের নূতন সংস্করণ নিয়েই স্বাধীনতার উৎসব। জর্মন তুর্কী সেনাধ্যক্ষ, ইতালীয় এবং ইংরেজ হাওয়াই রণশিক্ষক ইতস্তত দৃশ্যমান। সেনানীর যন্ত্রবৎ চলন, জুতোর এবং বোতামের মিলিটারি পালিশ, যুদ্ধ-সাজের খাকীত্ব য়ুরোপীয় উৎকর্ষে পৌঁছচ্ছে এই নিয়ে তারিফ শুনলাম; ডিপ্লমাটিক্‌ কোরের সাধুবাদ ইরানী-পস্তু-ফরাসী ভাষায় মুখরিত হয়ে উঠছিল। দু-চারটে এন্টি-এয়ারক্রেফট কামান দেখা দিতে আফগানী মহলে অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য জাগ্‌ল। বিক্ষিপ্ত পার্ব্বত্য রাজ্যে কি ক'রে আকাশরক্ষা হয় জানি না কিন্তু ইনাম বাড়ানোই উদ্দেশ্য। আফগানিস্থান প্রস্তুত; সম্ভব-শত্রুদের এবং উৎসাহী স্বাদেশিককে একই সঙ্গে উদ্যত শক্তির পরিচয় দিয়ে আধুনিক শান্তিরক্ষার এই সাধনা। রাজপিতৃব্য প্রধান মন্ত্রী হাসিম খাঁ বজ্রমুষ্টিতে দেশকে বাঁধছেন; বড়দরের ডিকটেটরদের ইনি সমকক্ষ, এ বিষয়ে য়ুরোপীয় মহলে



সম্রাট্‌ জাহির শা



প্রধান অমাত্য সর্দার হাসিম খাঁ

দ্বিমত নেই। পঞ্চাশোর্দ্ধহাজার সৈন্ত যে-কোনো দেশের তুল্য যুদ্ধ দিতে সক্ষম; সমানসংখ্যক লস্কর মোমন্দ্ প্রভৃতি প্রত্যেক উপজাতির মধ্যেই তৈরি আছে। এই সকল বিষয়ে আমার জ্ঞানের এবং ঔৎসুক্যের সীমা সুস্পষ্ট, তবু বুঝতে পারি আফগান জাতি য়ুরোপীয় স্বাধীন ছোট দেশগুলির নীতি মানছে: প্রবল জোরে একটি ঘুষি মারবার নীতি। কুড়িটি ছোট দেশের ঘুষির জোর বৃহৎ দেশের ঘুষির সমকক্ষ। আফগানিস্থান একা বা রুমানিয়া বা চিলি পারবে না, কিন্তু পাড়ায় বড় ডাকাত নাম্‌লে তুর্কী-ইরান-আফগান দুর্জ্জয় কিল বসাতে পারবে। অপর পক্ষের নীতি ছোট দেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে আঘাত দেওয়া—হলাণ্ড বেল্‌জিয়মকে পৃথক্ না করলে জর্ম্মনীরও সাহসে বাধে—ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিও তাই বুঝে বর্ম্ম এঁটে একজোট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি খেলাতে হবে বৃহৎ সম্ভব-শত্রুদের রাজ্যে। এ বিষয়ে আফগানিস্থান সুদক্ষ হয়ে উঠ্‌ছে যেমন সুইটজরলণ্ড। সুইস রাজ্যের মতো এখানে নানাভাষী লোকসমষ্টিতে পার্ব্বত্য অংশগুলি ভর্ত্তি। এক দেশে প্রায় সবাই খ্রীস্টান, অন্যত্র ইস্‌লামী; ভাষা এবং জাতির বৈচিত্র্য দুই দেশেই। সৈন্তবন্ধনে উপজাতিকে কতটা একত্র করা যায় জানি না; শুনতে পাই তাজিক, হাজারা, উজ্‌বেক, মোমন্দ, শিন্‌ওয়ারি পুরো আফগানী হয়ে উঠ্‌ছে ঐ উপায়ে। ক্যাণ্টন-বিধিতে জাতি এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্য রেখেও আফগান-সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে—সাম্যতান্ত্রিক রাষ্ট্র-বিধানে শক্তির হ্রাস হবে এমন কথা নেই। কী ভাবে দেশ এগোবে জানি না, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হবার দিকে জোর দিয়ে হাসিম খাঁ শুভবুদ্ধি দেখিয়েছেন। ঐক্যের মূল্য বাড়বে যখন ভাবি এই আফগানিস্থান ভেদ ক'রে যুগে যুগে সাসানীয়, তাতার, ব্যাকট্রিয়, গ্রীক, মোঘল আক্রমণকারীর দল হিন্দুস্থানে নেমেছে। বহু জাতি এবং ভাষার বৈচিত্র্য রেখে গেছে তারা এখানকার পাহাড়ে উপত্যকায়—আফগানিস্থান আজ নৃতত্ত্বসন্ধানীর স্বর্গতুল্য—এখন মানবিক সাধনা চাই বিভিন্নকে মেলাবার। সমষ্টিগত রাজনীতি আশু ফলের লোভে ধ্বংসের ভূমিকা পত্তন করে; দস্যুর আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষার জন্তে দস্যুতান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে তোলায় সমূহ পরাজয়। পৃথিবী জুড়ে ছোটবড় রাষ্ট্রকে এই নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। প্রহরণের যোগে প্রহার ঠেকাবার বিধি বেড়ে চলেছে: মানুষের অধিকার কমে গিয়ে অস্ত্রের স্তূপই আকাশে উঠল। সভ্যতার শ্মশানে নরকঙ্কাল কুড়োবার লোকও অবশিষ্ট থাকবে না। এজন্তে ক্ষুদ্র দেশের চেয়ে বৃহৎ রাজ্যসাম্রাজ্যের দায়িত্ব অনেক বেশি, কিন্তু বলদৃপ্তের চোখ খোলে দেরিতে।

'অর্থনৈতিক সংস্কার এবং দেশের উৎকর্ষ-জাগরণের দিকেও হাসিম খাঁর দৃষ্টি কম নয়। জশন্-এর নিমন্ত্রণ আয়োজন উৎসব অজস্রব্যের ফাঁকে ফাঁকে প্রদর্শনীপাড়ার চূড়াগুলি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। নিশানের অরণ্য ভেদ ক'রে নূতন কাবুলী কর্ম্মশালা ঝলমল করছে। মোটরে চলা অসাধ্য, অবশেষে পায়ে হেঁটে ভিড়ে ঢুকলাম। অনেকখানি পথ। লাহোর বা দিল্লীর জনতার চেয়ে চওড়া এবং দীর্ঘতর পুরুষ, কণ্ঠস্বর পরুষতর, পথে নারী-জাতির চিহ্ন আরও কম এইটুকু বিশেষত্ব। সস্তা বিদেশী পণ্যের মরসুম: রুশীয় রুমাল, ডগ্‌ডগে রঙীন; জাপানী



আধুনিক আফগানী সেনাদল

খেলনা, জামাকাপড়; ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বিদেশী বাটার জুতো। রাষ্ট্রচালিত কারখানার জিনিস নিয়েই লোকের উচ্ছ্বাস; সাবান, চিনি, আসবাবপত্র, লোহার সামগ্রী, কাপড়জামা চামড়ার কাজ। লোকের মুখ আনন্দোজ্জ্বল। আটপৌরে স্বদেশী দ্রব্য সৌখীনতার অভাব দূর করছে নূতন জাতীয় পরিচয়ে; সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত আফগান কারিগরি উৎকৃষ্ট কারাকুলি ফর্, পোস্তিন, সস্তা অথচ সুন্দর গিলিম কার্পেট দৃশ্যমান। শিল্প-করা কুলা (নানা জাতীয় টুপি), রেশমের লুঙ্গি, ভেড়ার চামড়ার পরিচ্ছদ, এবং স্তূপীকৃত কম্বলে বাজার ছেয়ে গেছে। কারাকুলি ভেড়ার লোমসুদ্ধ চামড়া য়ুরোপে আস্ট্রাখান্ কোটে পরিণত হচ্ছে—তিন হাজার টাকা দামের কোটও পড়ে থাকে না—সেই চামড়া এবং অজস্রবিধ মেওয়ার বদলে আফগানিস্থানে পশ্চিমী কলকব্জার আমদানি। আফগানী বুঝেছে এতেও চলবে না। উটে ইয়াকে চ'ড়ে, মেওয়া এবং কারুৎ (উষ্ট্রদুধের দই) খেয়ে, কাটঘানের বিখ্যাত ঘোড়া বা কান্দাহারের তাজা আঙুর বেচে দেশোদ্ধার হবে না। তাই মেশিন-খানা (ফ্যাক্টরির আফগানী নাম) বসাবার দিকে ওদের উদ্যোগ; হাসিম খাঁর প্রচেষ্টায় কারিগরিক (industrialised: রবীন্দ্রনাথের কাছে কথাটা পেয়েছি) সভ্যতা স্থাপন চলছে। বাদাকৃশানে খানাবাদে তুলোর চাষ কাপড়ের কল বসল ইটালীয় বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে; জর্মন এঞ্জিনীয়ার রাস্তা ব্রিজ বেতারগৃহ নূতন শহরগুলির কারখানা বানানোতে সাহায্য করছে; ইংরেজ ফরাসী মার্কিন স্থানে স্থানে নিযুক্ত নির্মাণের কাজে। চিনির কল রুশীয় চিনিকে ঠেলে দিচ্ছে, টিন এবং চীনেমাটির বাসন বানাবার ব্যবস্থা তৈরি হ'লে জাপান এবং সোভিয়েট বণিকের প্রভুত্ব আরো কমবে। খনিজ উদ্ধারের ব্যবস্থা চলছে; মার্কিন কোম্পানী ভার নিচ্ছিল, য়ুরোপে আসন্ন যুদ্ধঝড় দেখে হাত গুটিয়েছে। চোখ বুজে পাথরে শুয়ে থাকলে আকাশ হ'তে গিনিসোনা, ওষুধ এবং মোক্ষলাভের উপায় বর্ষণ হবে না; চরখা কেটেও নয়। সুইডেন ছিল শীতজড়ত্বপীড়িত দরিদ্র, তার জলশক্তি বিদ্যুৎ-চালনায় লাগল, কাঠের লোহার সম্পদ উদ্ঘাটিত হ'ল, আত্মপ্রকাশে সমৃদ্ধ সাম্যব্যবস্থায় দেশে নামল নবযুগ। গরিব আফগানিস্থান যদি পথ দেখায় তাহলে হয়তো বিশাল ভারতবর্ষেও ছোঁয়াচ লাগবে; সাম্রাজ্যসুধায় বিভোর কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রমুগ্ধ দেশকর্মীর দল হয়তো হাত এবং মাথার সমবেত সার্থকতা অস্বীকার করবেন না। থাক সে কাহিনী।

আফগানী মুশকিলের মধ্যে প্রধান তাদের অর্থাভাব,—যে-পরিমাণ টাকা ঢাললে মাটির ঐশ্বর্য্য উদ্ধার হয় এবং মুনফা জমে সেই টাকা কোথায়? বিদেশের কাছে ঋণবদ্ধ

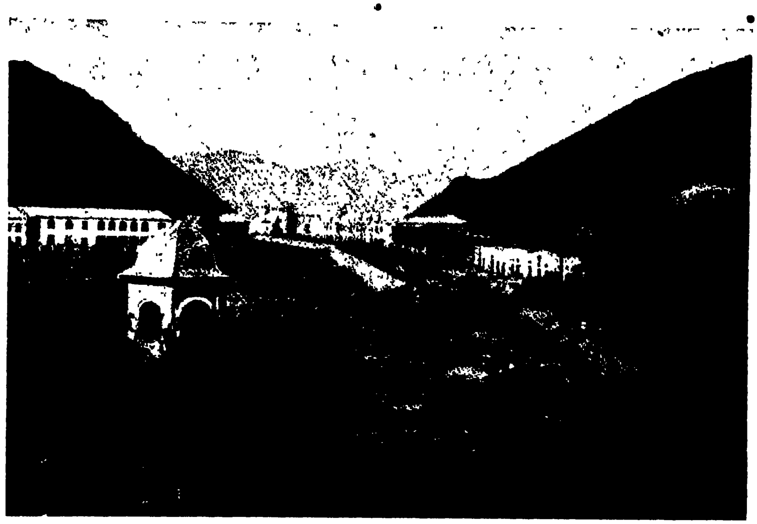


নয়া কাবুল

হয়ে দেশে যান্ত্রিক ব্যবস্থা সুলভ করা হাসিম খাঁর মত নয়। আজকের দিনে প্রবল পররাষ্ট্রের অর্থগ্রহণ করা তার করায়ত্ত হবার উপায় প্রতিবেশী ইরান এ-কথা ঠেকে শিখেছে। স্বতই মনে হয় অন্য প্রতিবেশী হিন্দুস্থানের কথা: অর্থ না হোক যথেষ্টসংখ্যক কর্ম্মী ব্যবসায়ী বিজ্ঞানী কি আমরা পাঠাতে পারব না? য়ুরোপীয় বা মার্কিন বিশেষজ্ঞের চেয়ে আমাদের ভার কম; বিদেশী কর্ম্মীর অর্থক্ষুধার বহর দেখে দরিদ্র আফগানিস্থান শঙ্কিত। আফগানী উচ্চতমদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেছি। ভারতবর্ষের প্রতি তাদের স্বাভাবিক টান কিন্তু আমরা যে-সব প্রতিনিধি পাঠিয়েছি তাঁরা আফগানীর চেয়ে উপরের মঞ্চে বসে য়ুরোপীয় নকল মর্য্যাদা দাবি করেন—ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু প্রতিবেশী-রাজ্যে হিতসাধনের চেয়ে চাকরির চক্রান্তে তাঁদের ঝোঁক। পূর্ব্বেই বলেছি, সুদ-সন্ধানী কাবুলিওয়ালা এবং ভারতীয় লরি-মিস্ত্রীর বিনিময়ে সহযোগিতার দাবী পূরণ হয় না। আফগান রাষ্ট্র আমাদের ব্যবসায়ীর প্রতি অবিচার করেছে; ফল এবং মেওয়ার ব্যাপার নিয়ে ভারতীয় কাগজে আন্দোলন চলেছিল; দুই পক্ষে মৈত্রীর নূতন ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবসায়ের কথাই যখন উঠল, ভেবে দেখা দরকার ধনকুবের ভারতীয় কলপতিদের মনস্তত্ত্ব। শুনতে পেলাম লোহা এবং লোহার জিনিস টাটা কোম্পানীর কাছে কিনতে চাওয়ায় যে চড়া দাম হেঁকেছিল তার অর্দ্ধেক হারে জর্ম্মনীর মাল প্রাপ্য, গাড়ি-মাশুল সব দিয়েও। জর্ম্মন রাষ্ট্র আর্থিক লোকসান ক'রেও স্বার্থ সেধেছে: জাপানী ব্যবসা সম্বন্ধেও এই কথা বলা হয়ে থাকে; কিন্তু কখনই এটা সম্পূর্ণ উত্তর নয়। ভাবতে হবে কতখানি সৌকর্য্যের ফলে এক দেশ অন্যকে অর্থ, বিদ্যা, কর্ম্মী, এবং প্রচুর পরিমাণে সামগ্রী দিতে পারে। বাণিজ্যের পথে রাষ্ট্রিক বুদ্ধি চলে এই কথাটার মর্ম্মার্থ ভারতেরও বোঝা উচিত; দুই পক্ষের রাষ্ট্রিক এবং ব্যবসাগত সাধনা মেলাবার চেষ্টায় দোষ নেই। সর্ব্বপ্রধান অতিক্রম্য বস্তু মানসিক উদ্যমহীনতা, বিদেশীর শাসন তারই লক্ষণবিশেষ। হাসিম খাঁ পাথুরে জড়ত্বকে নড়িয়েছেন—পররাষ্ট্র শক্তির চেয়ে তার ভার কম নয়: আফগানী মুল্লুকে আধুনিক যুগ আনা কী ব্যাপার তা সবাই বুঝবেন।

ফলিত বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যা শেখবার জন্যে এখান থেকে প্রতি বৎসর ছাত্র যাচ্ছে য়ুরোপে আমেরিকায়; ফিরে এসে তারা কেবল চাকরি করে না, অর্জ্জিত বিদ্যায় সহযোগী গড়ে তোলে। ভারতবর্ষে কিছু ছাত্র যায় ডাক্তারি শিখতে; আমাদের দেশে বিজ্ঞান-ব্যবস্থা প্রসারিত হ'লে আফগান বিদ্যার্থী হিন্দুস্থান ছেড়ে দূরে যেত না। এ-কথা স্বীকার করতে হবে, বিদেশে শিক্ষিত ভারতীয় ছাত্রের জ্ঞান বহুল পরিমাণে অপ্রযুক্ত থেকে যায়, চাকরির জাঁতাকলে গুঁড়িয়ে স্বল্পপরিমাণ উদ্বৃত্ত দেশের কাজে লাগে। আফগানিস্থান জর্ম্মনীর চেয়ে দেড় গুণ বড়, কিন্তু

তার কতটুকু অংশ শস্য বা মানুষ বহন করতে পারে। বুদ্ধির প্রয়োগেই মুক্তির উপায় খুঁজে দরিদ্র দেশ নানা ক্ষেত্রে প্রাণশক্তির পরিচয় দিচ্ছে। আমানুল্লা চেয়েছিলেন এক রাতে গড়া কল্পরাজ্য, ভিত্তি বানাবার শক্তি বা ধৈর্য্যের অভাবে তাঁর উদ্যম ব্যর্থ হয়েছিল, রাষ্ট্রিক বাধার চেয়ে সেইটেই গুরুতর কারণ। নূতন আমলে আদর্শকে মাটিতে গাঁথবার চেষ্টা চলেছে দেখে উৎসাহিত হয়েছি। শিক্ষার চাষ স্থরু হয়েছে; যেটুকু ফসল তার সবটাই বিনা মাশুলে জনসাধারণের প্রাপ্য, এ বিষয়ে এরা ভারতের চেয়ে অগ্রগামী। বুর্খাবন্দিনী নারীর দুর্গে শিক্ষা পৌছচ্ছে নার্সিং এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের যোগে—ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন হয়েছে। আফগানীর য়ুরোপীয় স্ত্রী পর্য্যন্ত এখানে জেনানা মানতে বাধ্য; অথচ কাবুলের পথে দেখ জাপানী, ইরানী, তুর্কী, য়ুরোপীয় লেগেশনের নারী স্বচ্ছন্দে ঘুরছেন। এর ফল হ'তে বাধ্য। ইসলাম ধর্ম্মের উদারতা যেখানে নকল মোল্লার অনুশাসনে ভ্রষ্ট সেখানেও জ্ঞানের ক্রিয়া চলছে—ধর্ম্মের সত্য জয়ী হবেই নূতন যুগের কর্ম্মে।



কাবুলের রাজপথ

কাবুলের দ্রষ্টব্য চোখে দেখাই উচিত—তার বিষয়ে লিখে পড়ে কী লাভ? এখানকার আকাশকে বাদ দিয়ে কেমন ক'রে দেখাব বাবরের সমাধি-উদ্যান শহরের প্রান্ত-পাহাড়ে? কাশ্মীরের শালিমার নিশাতের চেয়ে এই বাগানের মাধুর্য্য কম নয়; সামনে কো-হি-বাবার শুভ্র শৈলমালা গৌরব বাড়িয়েছে। কাবুল নদীর উপত্যকায় শ্যামলের ঢেউ, মধ্যে মধ্যে গেরুয়া মাটির বাড়ী; পথের দু-ধারে গাছের বীথিকা, পাহাড়ের ঢালুতে যব, গম, ধানের সোনালি সবুজ মিশেছে নীলাভ ছায়ায়। কাবুলের লোকালয় গিরিপাত্রে বিধৃত। এইখানে চির-বিশ্রাম করতে চেয়েছিলেন বাবর; আগ্রা হ'তে তাঁর দেহ বহন ক'রে আনা হয়েছিল লক্ষ লোকের সমারোহে। বালা-হিসার দুর্গে দর্শকের ভিড়। ইতিহাসের কাহিনী পুঞ্জীভূত ক'রে রেখেছে কাবুলের অপর প্রান্তে। দার-উল-আমান অঞ্চলে নূতন শহরতলী গড়ে উঠছে; য়ুনিভার্সিটি, ম্যুজিয়ম, উচ্চকর্ম্মচারীর উপনিবেশ রমণীয় স্থাপত্যে বিদ্যমান। পনেরো দিনের মেয়াদে দেখবার সময় যথেষ্ট; পাঘ্‌মান কাবুলের পাশেই, উঁচু পাহাড়ে, ফলফুলঝরণায় শোভিত উৎসবের কেন্দ্র। কাবুলের প্রসিদ্ধ অর্ক এবং চিল-সতুন প্রাসাদ চোখে পড়বেই। কানে শোনবার কাজেও ব্যস্ত ছিলাম—লেগেশনগুলিতে যাবার বাধা হয় নি। দরজা খোলবার জাদু আছে অক্সফোর্ডের চাবিতে এবং রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্যের দারুণ অভাবে। মুসাফিরকে কে ঠেকাবে; দুঃখের বিষয় তাকেও আজ তার লক্ষ্মীছাড়া দশা প্রমাণিত করতে হয় পুঁথিপত্রের যোগে। কাবুলের হিন্দু মন্দির এবং বৌদ্ধ স্তুপ চাকারি মিনার অবশ্যদর্শনীয়। সবচেয়ে দেখবার, ভোলবার, স্বেচ্ছায় পথ হারাবার জায়গা পুরোনো বাজার। শিরাজ ডামাস্কাস জেরুজালেমের প্রাচীন ঢাকা বাজারের বহু স্মৃতি ঘনিয়ে এল। ধুলো, আইস্‌-ক্রীম, উগ্র গ্রামোফোন, হিং, কাবাবের গন্ধ, ঘণ্টার শব্দ, অবিশ্রান্ত সুন্দর ঘোড়ার সাজ, চিত্রিত ছেঁড়া গিলিমের পর্দ্দা, মেওয়ার সোনালী স্তূপ, কী আছে, কী নেই, কী না হ'তে পারে এই বাজারে।

এই বার চরিথর হয়ে বামিয়ানের পথে যাত্রা অমু-দরিয়ার দিকে মুখ ক'রে।

সঙ্কলন

রেডিও-চালিত চাঁদমারী এরোপ্লেন

বর্ত্তমান যুগে বোমারু বিমান হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে বিমানবিধ্বংসী কামান নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা শূন্যে লক্ষ্য-ভেদ খুব সহজ ব্যাপার নহে। কারণ আক্রমণকালে এরোপ্লেনের গতি থাকে ২০০।৩০০ মাইল। ইহা ছাড়া বোমা নিক্ষেপের মুহূর্ত্তে এরোপ্লেন সবেগে নীচে নামিয়া আসে। হয়ত কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বোমারু বিমান বিমানবিধ্বংসী কামানের পাল্লার মধ্যে আসিয়া কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া যায়। গুলি মারিয়া এই বিমানকে ভূপাতিত করিতে ঐ কয়েক সেকেণ্ডের বেশী সময় পাওয়া যায় না।



চাদমারী এরোপ্লেন

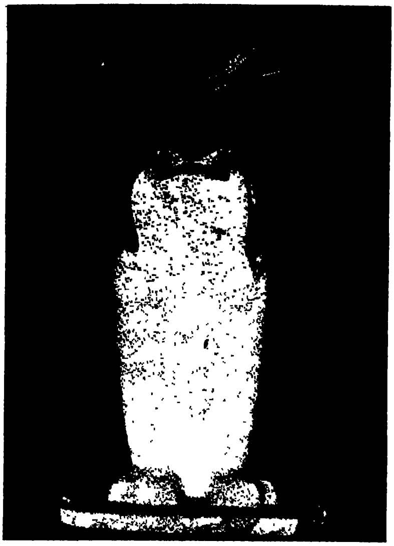
স্থির জিনিষকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোড়া সহজ। কিন্তু দ্রুত বেগে নানাদিকে উড্ডীয়মান এরোপ্লেনকে নামাইতে হইলে যতখানি মহালা থাকা দরকার, সেইটি পাওয়াই এক বিষম সমস্যা। শিকার জন্য সাধারণতঃ একটি এরোপ্লেনের সহিত দীর্ঘ সুতার সাহায্যে এক টুকরা ক্যানভাস বাঁধিয়া দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা সেই ক্যানভাসের টুকরার উপর গুলি মারিয়া লক্ষ্য স্থির করে।

কিন্তু এ উপায়ের অসুবিধা অনেক। চালক এরোপ্লেন যথেষ্ট দূরে থাকিলেও তাহার গায়েও গুলি বিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। তাহা ছাড়া প্রকৃত এরোপ্লেনের সহিত উল্লিখিত ক্যানভাসের টুকরার কোন সাদৃশ্যই নাই এবং যদিবা মহালায় শেষে ক্যানভাসের গায়ে গুলির ছিদ্র দেখা যায়, তবু সেইগুলিতে প্রকৃত এরোপ্লেনেরও কোনো ক্ষতি হইবে কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

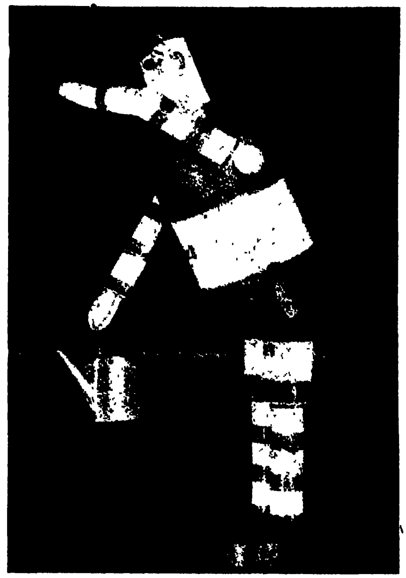
বিনা চালকে রেডিও-চালিত এরোপ্লেনকে চাদমারীতে পরিণত করিয়া এই সকল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই এরোপ্লেনের আকার সাধারণ এরোপ্লেনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।



নকল শিকারী। বন্দুক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, পাখী উড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুক তুলিয়া গুলি করে।



নকল পেঙ্গুইন। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া, শিরঃকম্পন করিয়া দর্শকের চিত্তবিনোদন করে।



তেলের টিনে তৈরি নকল মানুষ। পেট্রলের দোকানে ক্রেতারা আসিলে নমস্কার করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করে।

ইহার পাখা মাত্র ১২ ফুট প্রশস্ত। শিক্ষার স্থানে লইয়া যাইতে একটি সাধারণ মোটর-ট্রাকই যথেষ্ট। ক্যাটাপুল্ট (গুলতি) সাহায্যে এই এরোপ্লেনকে শূন্যে ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়। চালক ভূপৃষ্ঠে থাকিয়া রেডিও-সঙ্কেতের সাহায্যে ইহাকে চালিত করেন এবং সত্যকার আক্রমণকারী এরোপ্লেনের গতিবিধির অনুকরণ করান। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত বোমারু বিমান ধ্বংস শিক্ষার সুযোগ পায়।

মহালা শেষ হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ চালক একটি বোতাম টিপেন, এবং সেই সঙ্গে সুদূর আকাশে এরোপ্লেনের মধ্য হইতে একটি প্যারাশুট বাহির হইয়া ইহাকে নির্বিঘ্নে ভূমিতলে লইয়া আসে। মহালার সময় মারাত্মক ভাবে গুলিবিদ্ধ হইলেও খুব বেশী কিছু আসিয়া যায় না, কারণ মেরামতের খরচ অতি সামান্য। এইরূপ একটি এরোপ্লেনের সাহায্যে বহু শিক্ষার্থীকে বিমান ধ্বংসকার্য্যে শিক্ষিত করিয়া তোলা সম্ভব।

যন্ত্রচালিত নকল মানুষ

যন্ত্রচালিত নকল মানুষ তৈয়ারী করিবার চেষ্টা বহুদিন যাবৎ চলিতেছে। কিন্তু কোনো বিশেষ কাজ চালাইবার জন্য ইহাদের প্রস্তুত করা হয় নাই, শুধু অদ্ভুত কিছু সৃষ্টি করিবার প্রয়াস ছাড়া। এই সব নকল মানুষের ভিতরটা নানা প্রকার যন্ত্র-পাতিতে পরিপূর্ণ। মোটামুটি গত শ-খানেক বৎসর ধরিয়া যত প্রকার আবিষ্কার হইয়াছে; খুঁজিলে তাহাদের অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ ইহার মধ্যেই মিলিবে। অসংখ্য তার, ফটো-ইলেকট্রিক সেল, সুইচ, এমন জিনিষ নাই, যাহা খুঁজিলে ইহার ভিতর না পাওয়া যায়।

অবশ্য প্রকৃতির হাতে গড়া নরদেহের সহিত ইহাদের বিশেষ কিছু সম্বন্ধ নাই, বাহিরের সামান্য একটু সাদৃশ্য ছাড়া।

বর্ত্তমানে এই জাতীয় যন্ত্রকে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগানো হইতেছে। সঙ্গের ছবিগুলি দেখিলে ব্যাপার খানিকটা বুঝা যাইবে। মানুষের অঙ্গভঙ্গীর হাস্যকর অনুকরণ করিয়া ইহারা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে। স.

উষা-স্তোত্র

শ্রীকানাই সামন্ত

নিষ্কলুষা
হে শাশ্বতী উষা,
অয়ি চির-স্বপ্রকাশা অনাদ্যন্ত প্রলয়তিমিরে !
অবিক্ষুব্ধ ক্ষীরোদঅম্বুধিনীরে
কমলার শ্রীচরণস্পর্শকাম কমল যেমন
শতেক সহস্র দল করে উন্মেলন
সর্ব সত্তা মম জাগে তব জ্যোতির্মূর্তি-অভিমুখ।
বিদূরিয়া ক্ষুদ্র দুঃখসুখ
সহস্র জন্মের কামনাকল্পনারাজি
ঝরাইলে আজি
তব আলো-আশীর্বাদ অকৃপণ করে
ঊর্ধ্বতৃষিত ললাটে নয়নে অধরে
অংসে উরসে অন্তরে,
জননী করুণাময়ী,
দিব্য উষা অয়ি !

যাত্রী আমি অতন্দ্র দিবস-নিশা
বর্ষ যুগ যুগান্তর—নীল-শূন্যে-মিশা
তুঙ্গ গিরিশিখর-সন্ধানে।
যেন রে অনন্তনাগ কোথায় কে জানে
দুর্গম বন্ধুর পথখানি
উত্তরিবে শেষ। জানি
পাকে পাকে তার
দিকে দিকে প্রকাশিল অনন্ত উদার
বিশ্বভূমি
দূরে আরো দূরে : নীলাম্বর চুমি'
চূড়ার উপরে চূড়া
দেখা দিল : যুক্তপাণি অপ্সর-অপ্সরা
গাহিছে বন্দনা-গান
শূন্যে শূন্যে পরিভ্রমি : গিরীশ-সমান
সুধা-শুভ্র সে শিখর।
তারো ঊর্ধ্বে, হায়, তারো পর
জাগিছে অনন্ত ধরাধর :
পদতলে সিন্ধু আর ধরা ;
চিরঊর্ধ্বে জ্যোতির্বাস-পরা
জ্যোতিরন্তর্লীনা
জননী গো !

জন্ম জন্ম ভ্রমিলাম, হে দেবী, জানি না
নিঃসীম মাধুরী তব, অন্তহীন বিভা।

হে শাশ্বতী দিবা,
স্বরচিত অজ্ঞান-আঁধারে
তোমারে আবৃত করি' জন্মমৃত্যু-ব্যাকুল পাথারে
দুঃখসুখ-অভিহত
ফিরিলাম কত
ব্যর্থ বাসনায় ব্যর্থ বিরাগানুরাগে।
জড়ের হৃদয়ে ছদ্ম অন্ধকারে জাগে
অমর স্ফুলিঙ্গ তব, কে জানিত আগে।
কে জানিত এ আকাশে
সূর্য শশী তারা মিসি কণিকা প্রকাশে
তোমারি মহিমা।
মানবের রূপকৃতি প্রেম মৈত্রী বীরত্বের সীমা
বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে উদ্ভাসিয়া
তব দূর শ্রীচরণ, তোমাতেই যেতেছে মিশিয়া
ক্ষণপরে।
কে জানিত, দুর্ধর্ষ সমরে
তমিস্র-অসুর-পরাভব
জ্যোতির্ময় দেবসেনা সব
তোমারি নির্দেশে ধায় অভিযান-পথে—
তোমারি প্রেরণে ধায় : জগতে জগতে
সংগ্রাম অশেষ।

'কাজ্ঞি, দেবী, জ্যোতির্বন্যাপ্রবাহপ্রবেশ
আজি তব আবির্ভাব উন্মুক্ত সকল সত্তা ভরি'
সে প্রবাহস্পর্শমাত্রে, মরি,
অয়স হউক সোনা ;—
জড়ত্ব-তন্দ্রিত তনু স্পন্দিত চেতনা
ঘন আনন্দের ;—
হৃদি প্রাণ মন সেই প্রবাহছন্দের
অলোক সংগীতে জাগরূক
আলোকের কমল উৎসুক
ফুটুক ফুটুক
তব শ্রীচরণলোভী। হে আনন্দময়ী,
তোমার সন্তান আমি ;—দানববিজয়ী
তোমার কৃপাণ,
তব সেনা ;—তব চিরউন্নত নিশান :
তুমি—আমি, চিন্ময়ী অয়ি মা,
চির আনন্দময়ী মা !

দেশ-বিদেশের কথা

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ভারতের রঞ্জন-শিল্প

শ্রীভূপেশলোভন সেন

কয়েক মাস পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় ব্যবসায়ে যেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল তেমনই রঞ্জন-শিল্পের দুরবস্থার এক অধ্যায় আরম্ভ হইল। দশ হাজার মাইল দূরে কোথায় যুদ্ধ লাগিয়াছে, তাহার দুঃখকর পরিণতি দেখা দিল আমাদের দেশে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে দূরদেশ হইতে আর রং আমদানি হওয়ার শীঘ্র কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রঞ্জন-শিল্পী কোন কার্য্যেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, রং আমাদের দেশে কোথা হইতে আসে। রঞ্জন-শিল্পের প্রধান উপকরণ আধুনিক কৃত্রিম রং (synthetic dyestuffs)। এই সকল কৃত্রিম রং আল্‌কাতরা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মধ্যে জার্ম্মেনীতেই সর্ব্ববৃহৎ কৃত্রিম রঙের কারখানা আছে। ইহা ব্যতীত ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং জাপানেও নানাপ্রকার রং উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ এ-সব বিষয় সম্পূর্ণ জানিয়াও আজ পর্য্যন্ত অন্ধকারে ডুবিয়া আছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সমস্ত বিদেশজাত রং বহুল পরিমাণে ভারতবর্ষে আমদানি হইত। হিসাবে দেখা যায়,

জার্ম্মেনী	হইতে	শতকরা	১৫	ভাগ	রং	আসে
ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড	,,	,,	২০	,,	,,	,,
জাপান	,,	,,	৪	,,	,,	,,
অন্যান্য দেশ	,,	,,	১	,,	,,	,,

ভারতের প্রায় অধিকাংশ কাপড়ের মিলে যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মেনীর রং ব্যবহৃত হইত। রং সরবরাহের জন্য জার্ম্মান কোম্পানী তাহাদের নিকট চুক্তিবদ্ধ ছিল। এইভাবে সুচারুরূপে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হইতেছিল।

কিন্তু ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা হইবার পরই, স্বভাবতই জার্ম্মেনী 'শত্রু' বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইল এবং সেই সঙ্গে শত্রুপক্ষীয় জিনিসপত্রের উপর কড়া নিয়ম করা হইল। জার্ম্মেনীর যত রং ভারতে আমদানি করা হইয়াছিল ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাহার ভার নিজের তত্ত্বাবধানে লইলেন; এখন পর্য্যন্ত তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী কণ্ট্রোলারের (Controller of Enemy Firms) সতর্ক দৃষ্টিতেই আছে। জার্ম্মেনী হইতে আর কোনও প্রকার রং আমদানি হইতে পারিবে না। ভবিষ্যতে এই বিদেশজাত রঙের বিক্রয় সম্বন্ধেও কঠোর নিয়ম করা হইল; কাজে কাজেই ভারতের রঞ্জন-শিল্পে অনেক বাধা পড়িল। উপযুক্ত পরিমাণ রং না পাওয়া যাওয়াতে ব্যবসায় অতি মন্দ গতিতে চলিতে লাগিল। শুধু যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মান কোম্পানীর সহিত যাহাদের বন্দোবস্ত বা চুক্তি ছিল তাহারাই কেবল স্বল্প পরিমাণে রং ক্রয় করিবার অনুমতি পাইল, কিন্তু তাহার পরিমাণ এত কম যে তাহা দ্বারা দশ ভাগের এক ভাগ প্রয়োজনও নিষ্পন্ন হইতে পারে না—যাহার মাসে এক শত পাউণ্ড রঙের প্রয়োজন তাহাকে দশ পাউণ্ড রংও না দিলে কি করিয়া কাজ করিবে। বিদেশী রঙের উপর চিরদিন নির্ভর করার ইহাই উপযুক্ত শাস্তি। স্বদেশে যদি রং উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে আর এমন দুরবস্থায় পড়িতে হইত না। যুদ্ধ যদি আরও দুই বৎসর ক্রমাগত চলে তবে ভারতের রঞ্জন-শিল্পের দুরবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। যদিও



আধুনিক যুদ্ধ। বোমানিক্ষেপের ফলে ওয়ারসতে ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত—অসহায় বালক পিতামাতার কোন উদ্দেশ না পাইয়া নিরুপায় ভাবে বসিয়া আছে।

নিরপেক্ষ দেশগুলি সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা যায় তথাপি তাহারা প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণ রং সরবরাহ করিতে পারিবে না। যদিও ইংলণ্ডের ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ অনেক আশ্বাস দিয়াছেন তবুও মনে হয় না যে জার্মেনীর অনুরূপ পরিমাণ রং দিতে পারিবেন।

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে জার্মান রঙের কোম্পানীর কার্য্যালয়ে যে-সকল ভারতীয় কর্ম্মচারী ছিল, দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহাদেরও চাকরি নষ্ট হইল। কারণ শত্রু-দেশ সংক্রান্ত কোনও কার্য্যালয় চলতি থাকিতে পারিবে না। তাছাড়া রং আমদানি বন্ধ থাকিলে এবং ব্যবসায় না চলিলে কোম্পানী কি করিয়া চলিবে। এতদ্ব্যতীত, রঞ্জনশিল্পকার্য্যে অগণিত ভারতীয় ব্যাপৃত আছে। রঞ্জন-শিল্পের ফলেই তাহাদের অন্নের সংস্থান হইতেছে। বিদেশজাত রং আমদানি বন্ধ হওয়াতে তাহাদের শিল্পাগারের কার্য্য অপেক্ষাকৃত অধিক কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারই ফলে বহু লোকের চাকরি গিয়াছে।

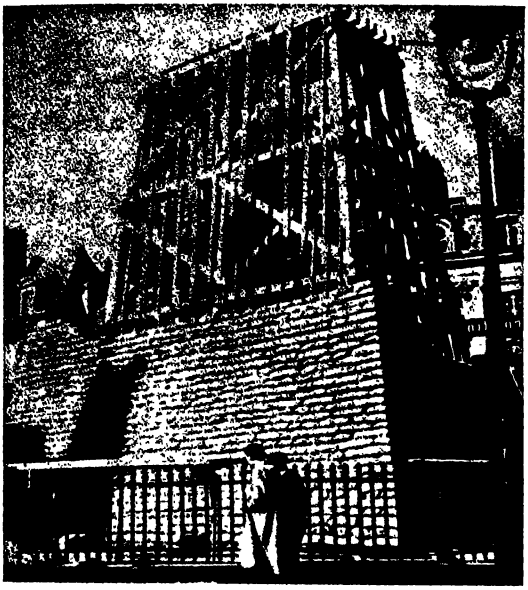
যুদ্ধের আবির্ভাবে যেমন ভারতের শিল্পিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তেমন অন্য দেশে কিছুই হয় নাই। তাঁহারা এই সুযোগে নিজেদের উৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া লাভবান হইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। দিবারাত্র ফ্যাক্টরী চালাইয়া অধিক পরিমাণে রং উৎপাদন করিয়া দ্বিগুণ মূল্যে বিদেশে রপ্তানি করিতেছেন।

রং সম্বন্ধে গবেষণার জন্য জার্মেনীর I. G. Farben-industrie. A-G নামক বিখ্যাত বিজ্ঞানাগারে এক হাজার লোক নিযুক্ত আছে এবং তাহাদের রং তৈয়ারী করিবার কর্ম্মশালায় (Frankfurt. a/Main) ন্যূনাধিক তিন হাজার লোক কাজ করে। যুদ্ধের আগমনে আশা করি তাহাদের কোন দুশ্চিন্তা নাই, কারণ এখন নিশ্চয় এই সকল স্থানে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈয়ারী হইতেছে। কাজেই তাহাদের চাকরি বজায় আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারত-বাসীর কেবল বিপদের উপর বিপদ চলিয়াছে।

আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। রং জার্মান হইতে আমদানি বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে রং আসিতেছে। তথাপি এই সকল

রঙের মূল্য বাজারে প্রচুর বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে শতকরা দশ ভাগের অধিক লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু সময় ও সুযোগ বুঝিয়া ব্যবসায়িগণ মূল্য এত বাড়াইয়াছেন যে বোধ করি শতকরা ৭০ ভাগ লাভ করিতেছেন। যে রং (Sulphur Black) সচরাচর বাজারে পাউণ্ড প্রতি তিন আনা হইতে উর্দ্ধে চারি আনা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইত তাহা আজ ১৸০ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ভাল পাকা সবুজ রং (Indanthren Green), যাহার মূল্য ছিল প্রতি পাউণ্ড বত্রিশ টাকা তাহা এখন এক শত টাকা মূল্যেও পাওয়া দুষ্কর। এত অধিক মূল্যে রং ক্রয় করিয়া রঞ্জন-শিল্পীরা কি করিয়া তাহাদের অঙ্গীকৃত কাজ দাখিল করিবে? এই ভাবে যদি রঙের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তবে কয়েকটি মিলের শিল্পাগার শীঘ্রই বন্ধ হইবে নিঃসন্দেহ। তাহার ফলে কত লোক বেকার হইয়া পড়িবে।

এখনও যদি আমাদের দেশের গণ্যমান্য ধনশালী ভদ্রমণ্ডলী তাঁহাদের উৎসাহে কৃত্রিম রং উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান করিবার উদ্যোগ করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে রঞ্জন-শিল্পিগণ বাঁচিয়া যান। ভারতের মনীষিগণের অন্তরে এই শুভ পরিকল্পনা বহুদিন আগেই জাগ্রত্ হওয়া উচিত ছিল। নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষের পরেই যদি কৃত্রিম রং উৎপাদনের স্বদেশী প্রতিষ্ঠান খোলা হইত তাহা হইলে আজ অসংখ্য ভারতীয়ের এরূপ দুরবস্থা ঘটিত না, অপরের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। এখনও ধনবান্ ব্যক্তিগণ ও নেতৃবৃন্দের সাহায্যে কৃত্রিম রং তৈয়ারী করিবার উদ্যোগ অনায়াসে হইতে পারে। কৃত্রিম রং তৈয়ারী করিবার সকল প্রকার



প্যারিসে বোমা-আক্রমণ হইতে শিল্প-নিদর্শন রক্ষার আয়োজন—চতুর্দ্দশ লুইর মুর্ত্তির বর্ত্তমান অবস্থা

উপকরণই এদেশে আছে। আমাদের দেশে কয়লার খনি আছে; তাহা হইতে আল্‌কাতরা বাহির করিতে কোন কষ্ট নাই। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিকেরও অভাব এদেশে নাই। তাঁহাদের সহযোগিতায় আল্‌কাতরা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অমূল্য কৃত্রিম রং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। স্বদেশী রং প্রস্তুত হইলে এক পক্ষে যেমন রঞ্জন-শিল্প বাঁচিবে তেমনই অন্য দিকে বহু ভারতীয়ের অন্নের সংস্থান হইবে।

[প্রবন্ধটি কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া ইহার কোন কোন তথ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু লেখক মহাশয়ের মূল বক্তব্য আলোচিত হইবার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে—প্রবাসীর সম্পাদক]

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ও নৃত্যের শিক্ষক শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ইতিপূর্ব্বে সিংহল প্রভৃতি নানা স্থানে নৃত্য শিক্ষা করিতে ও ভারতীয় নৃত্য শিক্ষা দিতে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি এই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশ, জাভা ও বলিদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া দেশে



শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

ফিরিয়াছেন। জাভা ও বলিদ্বীপের নৃত্যগীত সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে তিনি তথাকার পোয়ে নৃত্য আলোচনা করেন ও তত্রায় ভারতীয় নৃত্য ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আয়োজন করেন। জাভাতে যোগ্যকর্ত্তা শহরে তিনি বিশিষ্ট অতিথিরূপে অবস্থান করিয়া তথাকার শ্রেষ্ঠ নৃত্যকরদের নৃত্য-কলার পর্য্যালোচনা করেন। বলিদ্বীপেও তিনি অনুরূপ সুযোগ লাভ করেন। এই দুই দেশের সর্ব্বত্রই তিনি ভারতীয় হিন্দুরূপে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। এই দুই দেশে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় চার বৎসর টোকিওতে অবস্থান করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি তথায় 'আর্টস্ অ্যাণ্ড টেকনোকোলজি' স্কুলে দুই বৎসর শিক্ষা লাভ করেন এবং এক বৎসর টোকিওর মিতসুকোশি ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোর্সে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করেন। তিনি তথাকার ভারতীয় ছাত্র সমিতির সম্পাদক ছিলেন। জাপান গবর্ণমেণ্টের

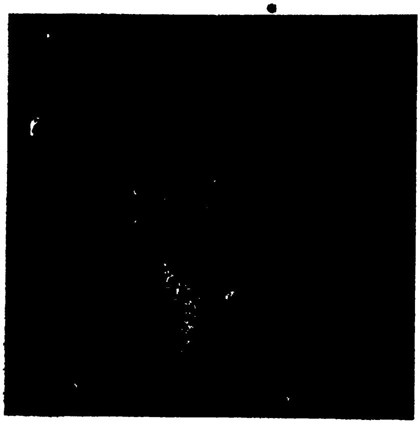


ডক্টর নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

নিকট হইতে তিনি একটি বৃত্তি পাইতেন। শ্রীযুত দত্ত সুরমা উপত্যকা টেকনিক্যাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শান্তিনিকেতনে ম্যানুয়েল ট্রেনিং-এর শিক্ষক ছিলেন।

বঙ্গের বাহিরে বিদ্বান বাঙালী

বেরিলি কলেজের অধ্যাপক এ. কে. ভট্টাচার্য্য মহাশয়



শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত



ডক্টর এ কে ভট্টাচার্য্য

রাসায়নিক গবেষণার জন্য সম্প্রতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এসসি. উপাধি লাভ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ব্রিটিশ-যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. উপাধি পাইয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত নয়া দিল্লীর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানের সংবাদ সম্বন্ধে স্থাপত্যবিশারদ শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানাইতেছেন যে, এই "প্রসঙ্গে একটি ভ্রমপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মন্দিরটি লেখকের পরিকল্পনা অনুসারে এবং তাহার অধিকাংশ লেখকের নিজতত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছে। নক্সাগুলি তাঁহার ছাত্র শ্রীমান মণিলাল রায় কর্ত্তৃক তাঁহার নির্দ্দেশমত অঙ্কিত হইয়াছিল এবং তত্ত্বাবধান কার্য্যে মণিলাল তাঁহার সহকারী ছিলেন। নির্ম্মাণের ভার ছিল শ্রীযুক্ত ভদ্র সিং নামে জৈশল্মেরের এক জন অভিজ্ঞ মিস্ত্রির উপর।"

১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পল্লীকুটির

শ্রীসুধীর মুন্সী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৪৬

৫ম সংখ্যা

সানাই

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সারারাত ধ'রে
গোছা গোছা কলাপাতা আসে গাড়ি ভ'রে।
আসে সরা খুরি
ভূরি ভূরি।
এ পাড়া ও পাড়া হ'তে যত
রবাহূত অনাহূত আসে শত শত
প্রবেশ পাবার তরে
ভোজনের ঘরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ঠেলাঠেলি করে
ব'সে পড়ে যে পারে যেখানে,
নিষেধ না মানে।
কে কাহারে হাঁক ছাড়ে হৈ হৈ,
এ কই ও কই।
রঙিন উষ্ণীষধর
লাল-রঙা সাজে যত অনুচর
অনর্থক ব্যস্ততায় ফেরে সবে
আপনার দায়িত্বগৌরবে।

গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায়,
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়,
রাঙা রাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রং লাগে।
ওদিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমা-ধূম্র হাত
ঊর্ধ্বে তুলি' কলঙ্কিত করিছে প্রভাত।
ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ।
থেকে থেকে রেলগাড়ি মাঠের ওপারে দেয় শিষ।
দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজে।
সমস্ত এ ছন্দ-ভাঙা অসংগতি মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্ভ্রান্তের কাছে,
বুঝিবার সময় কি আছে।
অরূপের মর্ম হ'তে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর মাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত্য লোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।
নামিতে নামিতে এই আনন্দের ধারা
বেদনার মূর্ছনায় হয় আত্মহারা।
বসন্তের যে দীর্ঘনিশ্বাস
বিকচ বকুলে আনে বিদায়ের বিমর্ষ আভাস,
সংশয়ের আবেগ কাঁপায়
সদ্যঃপাতী শিথিল চাঁপায়
তারি স্পর্শ লেগে,
সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী ওঠে যেন জেগে,

চলে যায় পথহারা অর্থহারা দিগন্তের পানে।
কত বার মনে ভাবি কী যে সে কে জানে।
মনে হয় বিশ্বের যে মূল উৎস হ'তে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে
এ রাগিণী সেথা হ'তে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
'যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে
কালের অঞ্জলিপুটে।
প্রথম যুগের সেই ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণরণি',
মনে ভাবি এই সুর প্রত্যহের অবরোধ পরে
যত বার গভীর আঘাত করে
তত বার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ-আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে।
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরকসম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে॥

উদীচী
৪।১।৪০



নির্মোক

"বনফুল"

১১

হরেন বোসের সহিত বিমলের শত্রুতা ত ছিলই, আরও একটি শত্রু বৃদ্ধি হইল। স্টেশন-মাস্টার ঘোষালবাবুর সহিতও সদ্ভাব রক্ষা করা বিমলের পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না। বেঁটে ভুঁড়ি-সর্ব্বস্ব এই লোকটির উপর বিমলের তাদৃশ শ্রদ্ধা গোড়া হইতেই ছিল না। রেলের ডাক্তার জগুবাবুর সহিত আলাপ হইবার পর হইতে বিমল ঘোষালবাবুর উপর আরও চটিয়াছে। ডাক্তার জগমোহন অতি অমায়িক প্রকৃতির ভদ্রলোক, গোলগাল মুখখানিতে সরলতা যেন মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে, সর্ব্বদাই সকলের উপকার করিবার জন্ম ব্যস্ত। অত্যন্ত বেশী ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হয় জগুবাবু তাঁহার ন্যায্য মূল্য কাহারও নিকট হইতে পান না। অতিশয় সুলভ হইয়া তিনি সকলেরই নিকট যেন খেলো হইয়া রহিয়াছেন। জগুবাবুর সহিত দুই-একটি রোগীও বিমল ইতিমধ্যে দেখিয়াছে, ডাক্তার হিসাবে লোকটি মোটেই নিন্দনীয় নহেন, বরং নিরহঙ্কার এবং জগদীশবাবু, ভূধর-বাবুর অপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক। অথচ এই জগুবাবুর নিন্দায় ঘোষাল শতমুখ! রেলের আইন-অনুসারে ঘোষাল বিনামূল্যে জগুবাবুর দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পারেন, কিন্তু সে চিকিৎসা পাইবার জন্ম তাঁহাকে ত দুই মাইল দূরে যাইতে হইবে। হাতের কাছে যখন বিনা মূল্যেই বিমলবাবুকে পাওয়া যাইতেছে তখন আর অত কষ্ট করিয়া লাভ কি। এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তারের নিন্দা করিলে বিমলবাবু হয়ত খুশী হইবেন এই আশায় ঘোষাল সম্ভবতঃ জগুবাবুর নিন্দা করিয়া থাকেন। বিমল সবই বুঝিত, কিছু বলিত না। ঘোষালবাবুর অনেকগুলি সন্তানসন্ততি, সুতরাং প্রায়ই বিমলকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হয়। ঘোষাল-গৃহিণীর যক্ষ্মা হয় নাই—হইয়াছিল কোলাই জ্বর (বি কোলাই ইনফেক্‌শন), ইনজেক্‌শন লইয়া ও ঔষধ পান করিয়া তিনি বিজ্বর হইয়াছেন। সুতরাং বিমলের প্রতি ঘোষালের বিশ্বাস আরও অগাধ হইয়াছে এবং কাহারো সামান্য সর্দ্দিজ্বর হইলেও বিমলের ডাক পড়িতেছে। প্রায়ই বিমলকে হাসপাতালের ফেরত কিংবা হাসপাতাল যাইবার মুখে ঘোষালবাবুর বাড়ী যাইতে হইতেছে। ইহাতে এত দিন বিমল কিছুই মনে করে নাই, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে। বৃষ্টিও বেশ অসাধারণ রকমের। এখানে আসিয়া অবধি এত জোরে, বৃষ্টি বিমল এক দিনও দেখে নাই। মেঘের যেমন গর্জ্জন তেমনি বর্ষণ। এই বর্ষা-সন্ধ্যায় বিমল একা চুপচাপ বসিয়া ছিল। এই বৃষ্টিতে ওপারে রিহার্সাল দিতে যাওয়া অসম্ভব, হয়ত কেহই আজ আসে নাই। সহসা তাহার নজরে পড়িল ঘরের একটা কোণ হইতে জল পড়িতেছে। তোরঙ্গটা ছিল সরাইয়া আনিল এবং যোগেনকে ডাকিয়া একটা বালতি কিংবা গামলা ঐ জায়গাটায় রাখিতে বলিল, সমস্ত ঘরটা তাহা না হইলে জলময় হইয়া যাইবে। যোগেন বলিল যে পাশের ঘরে এবং রান্নাঘরেও নাকি জল পড়িতেছে। ক্রমশঃ দেখা গেল দালানেরও উত্তর দিকটার ছাতে ফাটল, সেখান দিয়া বেশ প্রবলভাবেই জল পড়িতেছে। বাড়ীটা অবিলম্বে সারানো দরকার। কিন্তু হাসপাতালের কাণ্ডের কথা চিন্তা করিয়া সে একটু দমিয়া গেল। নিরুৎসাহ ভাবটা কাটাইয়া ফেলিবার জন্ম সে বলিল—স্টোভে তেল আছে?

—আজ্ঞে আছে।

—একটু জল গরম ক'রে আন দিকি, পরেশ-দার

কফি একটু খাওয়া যাক, দুধও গরম কর এক পেয়ালা, চিনি আছে ত?

—আছে

—কফি খেয়েছিস কখনো তুই?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা খাওয়াচ্ছি তোকে, জল গরম কর তাড়াতাড়ি।

যোগেন মহাউৎসাহে জল গরমের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। মেডিকেল গেজেটখানা খুলিতে গিয়া সহসা তাহার ভিতর হইতে মণিমালার একখানা পুরাতন চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। পুরাতন চিঠি পড়িতে এত ভাল লাগে! মণিমালার চিঠিতে বিশেষ কোন কবিত্ব থাকে না, সাদাসিধা আমি-ভাল-আছি-তুমি-কেমন-আছ গোছ চিঠি, তবু পড়িতে ভাল লাগে। বিমল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানি পাঠ করিতেছে এমন সময় দুয়ার ঠেলিয়া হুড়মুড় করিয়া স্টেশনের পয়েণ্টসম্যান চন্দু আসিয়া উপস্থিত। এক পা কাদা, সর্ব্বাঙ্গ ভিজা, দুই হাতে দুইটি সিক্ত ছাতা!

—বড়বাবু আপনাকে ডাকছেন হুজুর, জলদি।

—কেন?

—খোকা খাট থেকে গিরে গিয়ে বেহোঁস হয়ে গেছে।

—তাই নাকি, বড় বৃষ্টি পড়ছে যাব কি ক'রে?

—বাবু ছাতা পাঠিয়ে দিয়েছেন,—চন্দু ছাতা দেখাইল।

এই বৃষ্টিতে বিমলের বাহির হইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু খোকা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে, না গেলেও নয়। যোগেনকে জল গরম করিতে বারণ করিয়া দিয়া অবশেষে বিমল হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া খালি পায়ে বাহির হইয়া পড়িল। এক জোড়া মাত্র জুতা আছে, সেটাকে ভিজানো ঠিক হইবে না। চন্দু স্টেশনের একচক্ষু আলোটি আনিয়াছিল, তাহারই আলোকে কোনক্রমে বিমল মাস্টার-মহাশয়ের বাসায় গিয়া হাজির হইল। সেখানে গিয়া কিন্তু সে যাহা দেখিল তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল। কোথায় কি, কেহই ত অজ্ঞান হয় নাই! মাস্টার-মহাশয়ও বাড়ীতে নাই, তিনি ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে পাঠাইয়া স্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রটি খাটের উপর হইতে মারামারি করিতে করিতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছিল এবং মাস্টার-মহাশয়ের গৃহিণীর বর্ণনানুযায়ী পড়িয়া যাইবার পর একটু যেন "কেমন কেমন" করিতেছিল। এখন অবশ্য সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, এখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তবু যদি ডাক্তারবাবু একবার উহার নাড়ীটা ও বুকটা পরীক্ষা করিয়া দেখেন! বিমল গম্ভীরভাবে তাহার নাড়ীটা ও বুকটা পরীক্ষা করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল। তাহার যত দূর মনে পড়িল এই মাসেই সে ঘোষাল-বাবুর ওখানে অন্ততঃ দশ বার গিয়াছে। সে পরদিন চল্লিশ টাকার একখানি বিল ঘোষালবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিল। টাকা অবশ্য ঘোষালবাবু দিলেন না। পরেশ-দার অনুরোধে ইহা লইয়া বিমলও আর বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। ঘোষালবাবুর মধ্যে দুইটি পরিবর্ত্তন কিন্তু দেখা দিল, প্রথম তিনি বিমলকে পরিত্যাগ করিলেন, দ্বিতীয় তিনি ভূধরবাবুর ডিসপেনসারিতে মাঝে মাঝে যাতায়াত সুরু করিলেন। তাঁহার মেয়ের জ্বর হওয়াতে ভূধরবাবুই এক দিন আসিয়া দেখিয়া গেলেন এবং বিমল লোকপরম্পরায় শুনিল, ঘোষাল না কি বলিয়াছেন যে পয়সা দিয়া ডাকিতে হইলে ভাল ডাক্তারই তিনি ডাকিবেন, বাজে ডাক্তারকে ডাকিতে যাইবেন কেন! ভূধরবাবু অবশ্য একবারই আসিয়াছিলেন। তাহার পর সাবেক জগমোহনই পুনরায় আসিয়া ঘোষালবাড়ীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিলেন। বিমল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

১২

দেখিতে দেখিতে আরও মাসখানেক কাটিল। এক দিন মহাসমারোহে 'বিসর্জ্জন' নাটক অভিনীত হইয়া গেল। প্রত্যেকের ভূমিকাই চমৎকার হইয়াছিল। অপর্ণার ভূমিকায় আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে অদ্ভুত অভিনয় করিল। পুরুষমানুষে মেয়ের ভূমিকা এত সুন্দর করিয়া অভিনয় করিতে পারিবে বিমল আশাই করিতে পারে নাই। বিমলের নিজের ভূমিকাও চমৎকার হইয়াছিল। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় এ অঞ্চলে আর না কি হয় নাই। মথুরবাবু অভিনয়-রসিক, বিমলের অভিনয়ে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া একটা সোনার পদক তাহাকে

উপহার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ও অঞ্চলের গণ্যমান্য ধনী সকলেরই নিকট অমর টিকিট বিক্রয় করিয়াছিল, সকলেই আসিয়াছিলেন। এই তরুণ ডাক্তারটির পরিচয় লাভ করিয়া সকলেই খুশী হইলেন। মহিলাদের জন্য চিকের আলাদা বন্দোবস্ত ছিল; বিনোদিনী, শেফালি এবং মথুরবাবুর বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা চিকের অন্তরালেই বসিয়া ছিলেন। পর্দা বিষয়ে মথুরবাবু, বিশেষ করিয়া মথুরবাবুর গৃহিণী রীতিমত সনাতনপন্থী। অসূর্য্যম্পশ্যা না হইলেও অলোকম্পশ্যা যে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। পালকি ছাড়া কখনও বাড়ীর বাহির হন না। মোটর আছে কিন্তু তাহা খোলা মোটর বলিয়া তাহাতে মেয়েরা চড়ে না। মথুরবাবু একটি ঢাকা মোটর কিনিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মথুরবাবুর স্ত্রীর তাহাতে নাকি ঘোর আপত্তি। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "আমাদের পালকিই ভাল। পালকি আছে ব'লে তবু কয়েকটা লোক প্রতিপালিত হচ্ছে, মোটর হ'লে ও বেয়ারাগুলোকে তোমরা ত আর রাখবে না! তাছাড়া ও মোটর-ফোটরের চেয়ে পালকিই আমার বেশী পছন্দ।" মহিলা-দর্শকগণের মধ্যে অধিকাংশই পর্দানশীন ছিলেন। বাহিরে চেয়ারে আসিয়া যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিন জন মেমসাহেব ছিলেন, তাঁহারা সদর হইতে মোটরযোগে অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন—পুলিস-সাহেবের স্ত্রী, জজ-সাহেবের স্ত্রী এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী। তাঁহারা অবশ্য বেশীক্ষণ বসেন নাই, খানিক ক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়াছিলেন। বাহিরে চেয়ারে একটি বাঙালী মহিলাও বসিয়া ছিলেন, তিনি একাই ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন। বিমল শুনিল তিনি নাকি সৌরীনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী, কলেজের পাস না হইলেও খুব শিক্ষিতা এবং মার্জ্জিত-রুচি। একটু অতি-আধুনিকতার শুচিবায়ু আছে এবং সেজন্য নাকি সকলের সঙ্গে মিশিতে পারেন না; যখনই যেখানে যান নিজের একটু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলেন। এসব সত্ত্বেও নাকি সুপ্রিয়া সরকার মেয়েটি "কোয়াইট্ টলারেবল্"—জয়সিংহ-বেশে সজ্জিত অমর অন্ততঃ সেই কথাই বিমলকে বলিল। সিভিল সার্জন আসেন নাই, কিন্তু তাঁহার কন্যা ও স্ত্রী নাকি আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা চিকের অন্তরালে বসিয়াছেন বলিয়া মণিমালার বান্ধবী তরঙ্গিণীকে বিমল দেখিতে পাইল না। মথুরবাবুর বাড়ীর কাছেই ক্লাব, সুতরাং তাঁহার সদ্য-বসানো 'ডায়নমো'র সহায়তায় রঙ্গমঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হইয়াছিল। এ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম অভিনয়। এই জন্যই সকলের উৎসাহ আরও বেশী হইয়াছিল;—সুবিধা কত! কিন্তু অসুবিধাটাও খানিক ক্ষণ অভিনয় হওয়ার পর বোঝা গেল—হঠাৎ সব আলো একসঙ্গে নিবিয়া গেল। অগত্যা অভিনয় কিছুক্ষণ বন্ধ রহিল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মেজাজ ও যোগাযোগ ঠিক হইতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল। এমন একটা কলরব উঠিল যে, মনে হইল সব বুঝি পণ্ড হইয়া যায়! নানা রকমের নানা মন্তব্য, নানা গ্রামে নানা রকম শিস চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলেই যখন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ দপ করিয়া আবার সব আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং অভিনয় পুনরায় সুরু হইল। মাঝখানে খানিকটা গোলমাল হওয়াতে একটু রসভঙ্গ অবশ্য হইয়াছিল, কিন্তু অভিনেতাদের অভিনয়গুণে আবার বেশ জমিয়া উঠিতে দেরি হইল না।

অভিনয়ান্তে অমর বলিল—খরচখরচা বাদে ৩১১৷৴১০ বেঁচেছে, এর সবটাই কি তুই চাস?

—নিশ্চয়!

—কেন, তোমার বদিবাবু ত পাঁচ-শ টাকা জোগাড়ই করেছে।

—না, আমার অনেক দরকার টাকার, আমার বাসাটার চার দিক দিয়ে জল পড়ছে, সারাতে হবে।

—সব টাকা দিচ্ছি না, আড়াই-শ তুমি নাও, বাকিটা নিয়ে আমরা সবাই ফূর্ত্তি করি এক দিন। কি বল হে, শরৎ—

শরৎ ছোকরাটি অপর্ণা সাজিয়াছিল। চিরন্তন বখাটে ছোকরা, ম্যাট্রিক পাস করিতে পারে নাই, থিয়েটার করিতে পারে বলিয়া অমরই তাহাকে এখানকার কো-অপারেটিভে একটা চাকুরি জুটাইয়া দিয়াছে। সে

একটু বিনীত অথচ অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে হাঁ সার্।

—অত টাকা নিয়ে কি স্ফুর্ত্তিটা করবি শুনি?

অমর হাসিয়া বলিল—অত টাকা আর কই, ও কটা টাকাতে কি-ই বা হবে, মাঝ থেকে আমার পকেট থেকে গচ্ছা লাগবে আর কি! এক কাজ করলে হয়, সতীশ-খুড়োকেও দলে টানলে মন্দ হয় না, তাঁরই বাগানবাড়ীতে জোটা যেতে পারে।

বিমল এ-সবের নিগূঢ় অর্থ কিছুই বুঝিতেছিল না। সতীশবাবু নামটা কিন্তু তাহার পরিচিত, সতীশবাবুর ভায়ের সে কালাজ্বর চিকিৎসা করিয়াছে, সেই সতীশবাবু না কি! জিজ্ঞাসা করিতেই অমর বলিল—হ্যাঁ সেই।

—তোর খুড়ো হয়?

—হয় বইকি এক সম্পর্কে, আমার বোন শেফালির খুড়শ্বশুর। জ্যোতিষবাবুর ছেলের সঙ্গে শেফালির বিয়ে হয়েছে কি না! ওরা তিন ভাই—জ্যোতিষ, সতীশ, অতীশ। তুই অতীশের চিকিৎসা করেছিলি।

একটু থামিয়া অমর পুনরায় হাসিয়া বলিল—শেফালির বিয়ে হওয়ার আগে থেকেই কিন্তু সতীশবাবু আমাদের খুড়ো, উনিই ত প্রথমে হাতেখড়ি দেন আমাদের! এক হিসেবে গুরুদেবও।

শরৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসি গোপন করিতে করিতে মুখের পেণ্ট তুলিতেছিল।

অমর গম্ভীরভাবে বলিল—খুব মজলিসি লোক আমাদের সতীশখুড়ো, আলাপ ক'রে দেখিস, খুড়োরই বাগানবাড়ীতে গিয়ে জমায়েৎ হওয়া যাবে এক দিন!

এতক্ষণ বিমল লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু এইবার অমর প্রকাশ্য ভাবেই আলমারির পিছন হইতে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বাহির করিয়া খানিকটা পান করিয়া ফেলিল। বিমলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

—ছি, ছি, অমর এ কি!

অমর একটু থিয়েটারি ভঙ্গী করিয়া বলিল—কিছু নয়, কিছু নয়, কিছু কিছু নয়!

তাহার পর বলিল—তুই এখন বাড়ী যা, তিনটে চারটে নাগাদ আমি টাকা নিয়ে তোর ওখানে যাব। তুই যা এখন—

ভোরবেলা নৌকাযোগে নদী পার হইতে হইতে বিমলের কেবল অমরের কথাই মনে হইতে লাগিল। ছেলেটা সত্য সত্যই একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। অমন একটা দুরারোগ্য ব্যাধি শরীরে, তাহার উপর মদ ধরিয়াছে! বেচারী বিনোদিনী! সেদিন গভীর রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে বিনোদিনী ও অমর তাহার বাসায় আসিয়াছিল। বিনোদিনীর জ্যোৎস্নালোকিত মুখচ্ছবিটি বিমলের বার-বার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বিনোদিনী কি এখনও অমরকে তেমনই ভালবাসে যাহার প্রেরণায় এক দিন সে তাহাকে লুকাইয়া বিবাহ করিয়াছিল? অমরের অধঃপতনের কিছু মাত্র ইঙ্গিত কি তাহার অন্তর্যামী মন পায় নাই! সব জিনিষই কি কথায় প্রকাশ করিতে হয়, অকথিত কত জিনিষই ত আমরা এমনিই বুঝিতে পারি। কোথায় যেন সে পড়িয়াছিল ভগবান আমাদের ভাষা দিয়াছিলেন মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য নয়, গোপন করিবার জন্য। উক্তিটা হয়ত অত্যুক্তি, কিন্তু খানিকটা সত্য আছে বইকি উহার মধ্যে। অমর কেমন স্বচ্ছন্দে বিনোদিনীকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। সত্যই ভুলাইতে পারিয়াছে কি? বিমলের কেমন যেন সন্দেহ হয়। পারঘাটে নামিয়া বিনোদিনীর কথাই ভাবিতে ভাবিতে বিমল অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতেছিল এবং অন্যমনস্ক ভাবেই কখন নিজের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল খেয়াল ছিল না, হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল যখন তাহার মেজশালা শুভেন্দু তাহাকে সম্বোধন করিল!

—জামাইবাবু, আমরা এসে গেছি! দিদি, জামাইবাবু এসেছেন!

বিস্মিত বিমল বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেখিল হাতল-ভাঙা সেই চেয়ারটার উপর মণিমালা স্মিতমুখে বসিয়া আছে। বিমল ঢুকিতেই মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইল।

—তোমাকে আশ্চর্য্য ক'রে দেব ব'লে কোন খবর না দিয়েই আমরা এলুম—এসে নিজেরাই বেকুব! মা কিন্তু

বলেছিলেন নয় রে খোকা যে ডাক্তার মানুষ কলে-টলে কোথাও বেরিয়ে গেলে মুশকিলে পড়বি তোরা! ওকি, তোমার মুখে ও-সব কি!

বিমল হাসিয়া বলিল—পেণ্টগুলো ওঠে নি বোধ হয় ভাল ক'রে!

—কিসের পেণ্ট?

—কাল রাত্রে থিয়েটার করতে গেছলাম ওপারে।

—কি থিয়েটার?

—'বিসর্জ্জন'।

—হঠাৎ থিয়েটার! ওপারে কোথায়?

—অমরদের ওখানে।

মণিমালার মুখে নিমেষের জন্য একটা ছায়াপাত হইল।

—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ থিয়েটার?

বিমল অকারণে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, যেন কি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়া সে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। হাসিয়া বলিল—আমাদের হাসপাতালে কিছু টাকার দরকার পড়েছিল, তাই থিয়েটার ক'রে সেই টাকাটা তোলা গেল!

—টিকিট ক'রে হয়েছিল বুঝি?

—হাঁ, দাঁড়াও আমি আগে মুখটা পরিষ্কার ক'রে ফেলি।

বিমল তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িল।

একটু পরে বিমল বাথরুম হইতে বাহির হইতেই মণিমালা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তুমি কি!

—কি?

—ওই চেয়ারে তুমি বসতে, ওই চৌকিতে ওই বিছানায় শুতে!

—স্বচ্ছন্দে।

—ছি, ছি, তোমরা সব পারো। ওই ময়লা গেঞ্জি প'রে রোজ তুমি হাসপাতালে যাও! চাকরটাকে বলতে পার না একটু সাবান দিয়ে দিতে!

চাকরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিমল মিথ্যাভাষণ করিল।

—সাবান তো প্রায়ই দেয়।

—দেয় না আরও কিছু! ছি ছি ঘরদোর কি ক'রে রেখেছ! আজই থামো সব পরিষ্কার করাচ্ছি! পরিষ্কার করাবই বা কি ক'রে, যা বিচ্ছিরি তোমার ঘরের মেঝে, সিমেণ্ট উঠে উঠে গেছে, ফাঁকে ফাঁকে ফাটলে ফাটলে সব যত রাজ্যের ময়লা!

বিমল বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে নিজে যে-সব বিষয়ে মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করে না, সেই সব বিষয় লইয়া এই তরুণীটি ত মহা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তরুণীটি অপর কেহ নহে তাহারই সহধর্ম্মিণী! বারান্দার এক প্রান্তে স্তূপীকৃত জিনিষগুলির প্রতি সে চাহিয়া দেখিল। অনেক জিনিষ আনিয়াছে ত। একটা বড় তোরঙ্গ, একটা চামড়ার সুটকেস, একটা ছোট হাতবাক্স, তাছাড়াও আর একটা অ্যাটাচি-কেস—প্রত্যেকটিতেই বেশ পরিচ্ছন্ন খাকির ওয়াড় পরানো। হোল্ড-অলে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়া বাঁধা বিছানার ফাঁকে যে বালিশটি উঁকি দিতেছে তাহাও বেশ ঝালর-দেওয়া ওয়াড়-পরানো এবং ঝালরের ওধারেও লাল সুতা দিয়া কি একটা কারুকার্য্য করা আছে যেন! ইহা ছাড়া প্রকাণ্ড একটা মাটির হাঁড়িতে কি যেন রহিয়াছে, একটা প্রকাণ্ড পুঁটুলি, কাপড় দিয়া বাঁধা চৌকোণা ও বস্তুটা কি! ওদিকে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ভিতরই বা কি রহিয়াছে। মণিমালার সঙ্গে যে এতগুলো জিনিষ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাহা ত বিমল একবারও ভাবে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কুকুরটা কই, দেখছি না।

—সেটা মিনু কিছুতেই ছাড়লে না, এমন আবদেরে মেয়ে জন্মে দেখি নি কখনো, এমন কাঁদতে লাগলো—

বিমল মনে মনে মিনুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইল।

—ওরে খোকা, খোকা কোথা গেল—

শুভেন্দু সোজা গঙ্গার ধারে চলিয়া গিয়াছিল। গঙ্গায় সার বাঁধিয়া পাল তুলিয়া নৌকা যাইতেছে, অবাক হইয়া সে তাহাই দেখিতেছিল। কলিকাতায় জন্ম, কলিকাতাতেই মানুষ, এই ফাঁকা গঙ্গার ধারটি তাহার ভারি ভাল লাগিতেছিল। যোগেন তাহাকে ডাকিতে গেল।

বিমল বলিল—একটু চা খেয়ে এইবার হাসপাতালে যাওয়া যাক! ওই হাঁড়িটাতে কি আছে?

—সন্দেশ, ভীমনাগের ওখানকার ভাল সন্দেশ। খাও না।

—ওই চৌকোণা জিনিষটা কি বল দিকি?

—ওটা আয়না।

—কেরোসিন কাঠের বাক্সে ওটা কি?

—ওটা একটা সেলায়ের কল, নতুন কিনে এনেছি। তোমাকে কিন্তু মাসে মাসে ওর ইনস্টলমেণ্ট দিতে হবে, বেশী নয় পাঁচ টাকা ক'রে—

—বেশ।

হাসপাতালে গিয়া কিন্তু বিমল একটি দুঃসংবাদ পাইল। কাল রাত্রে সে যখন থিয়েটার করিতে ব্যস্ত ছিল, তখন একটি কলেরা রোগী হাসপাতালে আসিয়াছিল এবং একরূপ বিনা চিকিৎসাতেই মারা গিয়াছে। চশমার কাচের উপর দিয়া তাকাইতে তাকাইতে গুপিবাবু ভালমানুষের মত বলিলেন—আমি ভাবলাম বুঝি সাধারণ ভেদবমি, কলেরা ব'লে অতটা ধরতে পারি নি, পারলে জগদীশবাবু কি ভূধরবাবু কাউকে খবর দিতাম!

অযৌক্তিকভাবে বিমল বলিল—আমাকে খবর দিলেই পারতেন।

চশমার কাচের উপর দিয়া গুপিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ বিমলের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর চক্ষু মিটিমিটি করিয়া বলিলেন—তা কি হয়, আপনি একটা 'মেন' পার্টে ছিলেন।

—একটা ছুটো কলেরা কাজ্ খাইয়ে দিলেও ত পারতেন।

—চাবি যে আপনার কাছে!

বিমল চুপ করিয়া রহিল, সত্যই তাহার বলিবার কিছু নাই।

গুপিবাবুর প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করিবার জন্য সে নিজেই কিছু দিন হইতে আলমারিগুলির চাবি নিজের কাছে রাখিয়াছে। সে আর কিছু না বলিয়া যন্ত্রচালিতবৎ দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি করিয়া যাইতে লাগিল। ঘুমও পাইতেছিল, কাল সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই। বাড়ী ফিরিয়া দেখিল তাহার প্রথম রোগী সেই বুড়িটা—যাহাকে সে স্টেশন হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল তাহার জন্য কয়েকটি হাঁসের ডিম লইয়া সসঙ্কোচে বসিয়া আছে। বিমলকে ডিমগুলি দিয়া সে যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

বিমলের বার-বার কলেরা রোগীটার কথা মনে হইতে লাগিল। আহা, বিনা-চিকিৎসায় মারা গিয়াছে!

বৈকালে অমর আসিল। বিমলের হাতে সে ৩১১৷৴১০ দিয়া বলিল—তখন ঠাট্টা করছিলাম, এ টাকা কি অন্য কিছুতে খরচ করতে পারি!

তাহার পর হাসিয়া বলিল—বাবা তোর জন্যে আজ একটা সোনার মেডেল গড়াতে দিলেন! আর একটা কাজও কিন্তু তিনি করেছেন আজ।

—কি?

—হাসপাতালে কাল রাত্রে একটা কলেরা রুগী নাকি বিনা-চিকিৎসায় মারা গেছে, সে-কথা তিনি রিপোর্ট করেছেন সিভিল সার্জন আর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে!

বিস্মিত বিমল চুপ করিয়া রহিল।

১৩

এই বিপদেও বদ্রিবাবু বিমলকে রক্ষা করিলেন। তাঁহারই পরামর্শ-অনুযায়ী সে কর্তৃপক্ষগণের নিকট জবাবদিহি করিল যে হাসপাতাল-কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তবে সে থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিল এবং ঐ থিয়েটার হাসপাতালেরই সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, শখের জন্য নয়। আরও লিখিল যে, তাহার অনুপস্থিতিকালে হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার ছিলেন, রোগীকে কিছু ঔষধও দেওয়া হইয়াছিল, একেবারে বিনা-চিকিৎসায় মরিয়াছে একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বদ্রিবাবু নন্দী-মহাশয়ের স্বাক্ষরিত অনুমতি-পত্র আনিয়া দিলেন এবং বিমল সেটি তাহার জবাবদিহির সহিত গাঁথিয়া পাঠাইয়া দিল। আরও শোনা গেল স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী নাকি বদ্রিবাবুর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ইহা লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী খানিকক্ষণ বসিয়া থিয়েটার দেখিয়াছিলেন, অভিনয় তাঁহার নাকি ভাল লাগিয়াছিল,

তা ছাড়া একটা সৎকার্য্যের জন্ম যখন হইতেছে! মোট কথা ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গেল, বিমলের কিছুই হইল না।

এই প্রসঙ্গে হরেন বোস সঙ্কোচে চৌধুরীকে বলিলেন—এই ডাক্তার-ছোকরার কেন্দ্রে বোধ হয় বৃহস্পতি আছে, বুঝলেন!

চৌধুরী বলিলেন—সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে নন্দীমহাশয় সহাস্য মুখে বিমলকে বলিলেন—কি রকম ডাক্তারবাবু, পরিচয় পেলেন ত কি রকম কেউটেটি!

বিমল স্মিতমুখে বলিল—আশ্চর্য্য লোক, অথচ ওঁর ছেলেরই অনুরোধে আমি রাজি হয়েছিলাম—

—আশ্চর্য্য লোক নয়, পাজি লোক।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন—অত্যন্ত হারামজাদা ব্যক্তি!

বিমল কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বন্দিবাবুর সঙ্গেও এক দিন দেখা হইয়াছিল। তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন—ওষুধপত্তর ত সব এসে গেল, আর কি, এইবার পাড়ি জমিয়ে ফেলুন! ভূধর আর জগদীশকে চটাবেন না, ওদের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করুন।

—আচ্ছা।

মণিমালা ইতিমধ্যে সংসার গুছাইয়া ফেলিয়াছে। ঠিক মনোমত ভাবে নয়, মোটামুটি। প্রথমেই সে ঐ হাতলভাঙা চেয়ার ও নড়বড়ে চৌকিটাকে সংস্কার করাইয়াছে, সামান্য একটু সারাইয়া বার্নিশ করিয়া কেমন সুন্দর হইয়াছে। ঘরে ঘরে ঝুল ছিল, দালানে পাখীর বাসা ছিল, উঠানের কোণটা একটা আঁস্তাকুড় হইয়াছিল যেন! চায়ের পাতা, ছেঁড়া কাগজ, সিগারেটের খালি বাক্স, কনডেন্সড্ মিল্কের খালি টিন, এঁটোকাঁটা কি না ছিল ওখানে। যোগেনকে দিয়া মণিমালা সব পরিষ্কার করাইয়াছে, পরিষ্কার করাইবার সময় কত বড় প্রকাণ্ড একটা বিছা বাহির হইল! অনায়াসে সাপও থাকিতে পারিত। ওদিককার ঘরটাও কি কম নোংরা হইয়াছিল! যত রাজ্যের পুরাতন খবরের কাগজ, একটা ছেঁড়া বালিশ, কালিহীন একটা শুকনো দোয়াত, আর যোগেনের একটা ময়লা বিছানা! ওইটুকু ছোঁড়া বিড়ি খায় কত, বিড়ির টুকরায় সমস্ত ঘরটা যেন পরিপূর্ণ! যেমন প্রভু, তেমনি ভৃত্য! ও-ঘরটা পরিষ্কার করিয়া মণিমালা যোগেনের শুইবার ব্যবস্থা বাহিরের ঘরটাতে করিয়াছে। বলিয়া দিয়াছে বিছানাপত্র যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, আর বিড়ি খাইয়া যেন ঘরে না ফেলে। নিজের কলটি, আয়নাটি, বাক্সগুলি বেশ সুন্দর করিয়া সাজাইবার পর মণিমালা আবিষ্কার করিয়াছে দুইখানি টেবিল, খান-চারেক ছোট ছোট 'ডিসেণ্ট' চেয়ার, একটি আলনা, একটি ছোট ঘড়ি না হইলে চলিবে না। ওগুলি অবিলম্বে চাই। ছোট ছোট গোটা-দুয়েক তেপায়া, একটি আরাম-কেদারা এবং একটি 'হোয়াট নট' পরে কিনিলেও চলিবে। হ্যাঁ, আর একটা জিনিষ অবিলম্বে চাই—একটা মিট-সেফ্। এ-সব ত গেল আসবাবপত্র। ঘরের দেওয়ালগুলি চুনকাম করানোও দরকার, জানলা কপাটগুলিও রং করাইতে হইবে, মেজেটা আর একবার সিমেণ্ট করাইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। ঘরের তাকগুলাও কি বিশ্রী! উহারই উপর খবরের কাগজ পাতিয়া মণিমালা আপাততঃ চালাইতেছে বটে, কিন্তু গোটা-দুই ভাল কাচের আলমারি তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে।

হঠাৎ কলেরা এপিডেমিক সুরু হইয়া গেল।

হাসপাতালে প্রতি দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা অন্তর রোগী আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে হাসপাতাল ভরতি হইয়া গেল। শেষে বিমল হাসপাতালের সামনের মাঠটায় খড়ের চালা তুলিয়া রোগী রাখিতে সুরু করিল। থিয়েটারের টাকাটা হাতেই ছিল, টাকার জন্ম কাহারও কাছে হাত পাতিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে চালাগুলিও ভরিয়া গেল, সেখানেও স্থানাভাব। যাহাদের হাসপাতালে স্থান দিতে পারিল না তাহাদের বাড়ী গিয়াই বিমল তাহাদের চিকিৎসা করিতে লাগিল। তাহার স্নানাহারের অবসর নাই—কেবল স্যালাইন, 'কাজ' আর ভ্যাকসিন। হুলু এবং গুপিবাবুও খুব খাটিতে লাগিলেন,—

ঢলে প্রাণ দিয়া, গুণিবাবু প্রাণের দায়ে। ঘরে ঘরে মাছির মত লোক মরিতেছে! যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—অসহায় দীনদরিদ্রের দল!

মণিমালা ভয় পাইয়া গেল! তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার স্বামী এ কি করিতেছে! নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখা ত উচিত, একাই সকলকে দেখিতে হইবে তাহারই বা মানে কি। রোজগার হইলেও বা না হয় কথা ছিল, অনর্থক নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এ সব কি কাণ্ড! একটুও ভাল লাগে না তাহার! বিমলকে বলিলে সে কথা শোনে না। সে দিনরাত পাগলের মত ঘুরিতেছে! সবাই যে বাঁচিল তা নয়, অনেক মরিল, অনেক বাঁচিল। এই কলেরা রোগী লইয়াই বিমলের বদনাম হইয়াছিল, ইহাতেই তাহার আবার সুনামও হইল। হাসপাতালের নূতন ডাক্তার বাবুটির সুখ্যাতিতে দেশ ছাইয়া গেল।

ক্রমশঃ

আঁধারের ডাক

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

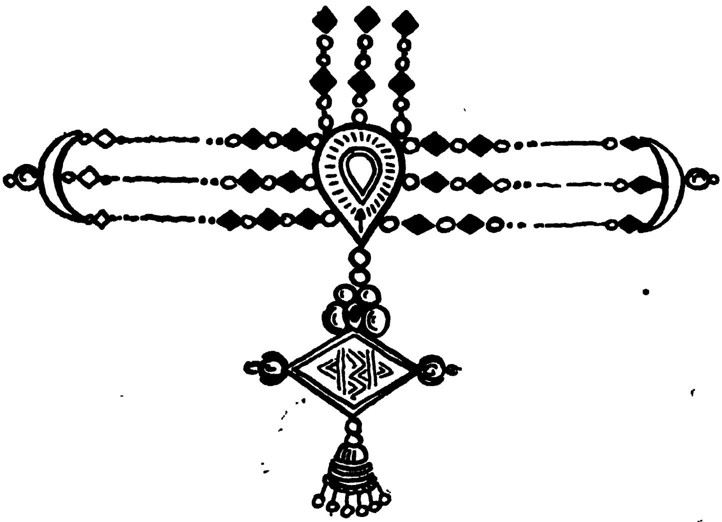
অনন্ত আঁধার মাঝে ফুটেছিনু ক্ষুদ্র প্রাণকণা
দাঁড়ানু আলোর তলে নেচে নেচে টলি',
চলে গেল কোন্ ক্ষণে সে মধুর রঙীন প্রভাত
মধ্যাহ্ন আসিল রৌদ্রে জ্বলি।
ক্ষণিকের মাঝে ওরে বৈকালী আকাশ হ'ল লাল
এলাইয়া কৃষ্ণকেশ সন্ধ্যা এল দুলায়ে আঁচল,
সন্ধ্যারে সরায়ে দিয়া রাত্রি এল, পুনঃ অন্ধকার
খড়্গ হাতে দুলি দুলি নাচিল পাগল।
প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা—ডুবাইয়া কৃষ্ণদেহ তলে
মগ্ন শুধু রাত্রি চরাচর,
রাত্রি, রাত্রি, দীর্ঘরাত্রি—দিবা সে পলকে নিবে যায়
ক্ষুদ্র আলো কাঁপে থর থর।
রাত্রি পুনঃ ডুবে যায়, ভোরে এসে সৃষ্টি রসীমায়
জাগে এসে ঊষা-মরীচিকা,
সে স্বপন কতটুকু? আঁধারের গর্ভে ওঠে শিখা
কৃষ্ণরাত্তি আঁকে মরীলিখা।

সুখস্বপ্ন বসন্তের রঙীন আলোক—নিবে যায়
সব নিবে যায়,
জীবন-সমরক্ষেত্রে অন্ধকার হাঁকাইয়া রথ
ডাকে কাল বলি—আয় আয়।
যাই যাই ওগো, যাই যাই,
হে আলোক, বিদায়, বিদায়,
জীবনের কোন্ ক্ষণে সত্য কিম্বা মিথ্যা জানি নাকো
পেতেছিনু তোমাতে বিশ্রাম,
আজ আঁধারের ডাকে হে স্বর্লোক ভেঙেছে স্বপন
বিদায়, বিদায়, চলিলাম।
অন্ধকারে ওই দূরে প্রাণবহ্নি ঘেরা তমসাতে
চিরন্তন আলো বুঝি গাহে সেথা গান,
মাটির আলোর স্বপ্ন, তোর স্মৃতি আজি মিথ্যা হোক
ওই, ওই অন্ধকারে ডাকে ভগবান্।

উড়িষ্যার অতীত যুগের বস্ত্রালঙ্কার

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

অতীতের সাজসজ্জা অলঙ্কার কিরূপ ছিল জানিতে গেলে সে-যুগের বইগুলি খুলিয়া দেখিতে হইবে। অতীতে বাঙালী নারীদের বস্ত্রালঙ্কার সম্বন্ধে কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন ও গহনার তালিকাও দিয়াছেন। সে-সব তালিকা উদ্ধৃত করিলাম না, পাছে তালিকা পড়িয়া এই যুদ্ধের বাজারে গহনার জন্য তাগাদা আসে! তুলনার জন্য প্রতিবেশিনী উড়িয়া নারীদের পুরাতন বস্ত্রালঙ্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বইগুলি হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।



অলকা ও মথামণি

পঞ্চদশ শতাব্দীর সারলা দাস রচিত মহাভারত। ষোড়শ শতাব্দীর দেবদুর্লভ দাস কৃত রহস্যমঞ্জরী। সপ্তদশ শতাব্দীর বৃন্দাবতী দাসীর পূর্ণতম-চন্দ্রোদয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কয়খানি বই :—রসকল্লোল—দীন কৃষ্ণ দাস ; গোপী ভাষা—জনার্দন দাস ; প্রেমপঞ্চামৃত—ভূপতি পণ্ডিত ; মথুরা মঙ্গল—ভক্তচরণ দাস।

বইগুলির নাম সংক্ষেপে দেওয়া হইবে। শ্রীরাধা ও গোপীদের বর্ণনা থাকায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বইগুলিতে অলঙ্কার বেশভূষার বিস্তারিত বিবরণ পাই। গহনার তালিকা পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া হইল।

কবরী—লোটনী জুড়া—লম্বমান কবরী (র. ক. ৮) গোপীরা কবরীতে বকুল, চাঁপা, মল্লিকা, যুঁই প্রভৃতি ফুল গুঁজিতেন (গো. ভা. ৬)। টাহিআ নামে এক প্রকার ফুলের গহনায় কবরী শোভিত করিতেন। খোঁপার তলায় ঝরাকাঠি (গো. ভা. ১৩) অর্থাৎ কতকগুলি ছোট ছোট ঘণ্টা-গাঁথা হেয়ার-পিন ঝুলিত। খোপি ঝিঞ্জিরী ও চউরি মুণ্ডি—খোঁপার দুই রকম গহনা।

মাথা—অলকা (র. ম. ১৬)—টায়রা। মোতি জালি (পূ. চ. ৮)—মুক্তার জাল। অলকার সহিত ফুলগভা অর্থাৎ ফুলের তোড়া লাগান হইত।

কপাল—ফগুটোপি—লাল টিপ। ঝলক মালী (র. ক. ২২)—ছোট ছোট সোনার পাতা। সিন্দূর ও চন্দনের ফোঁটা কপালে লাগান হইত।

নয়ন—চোখে কাজল পরা হইত (গো. ভা ১৩)

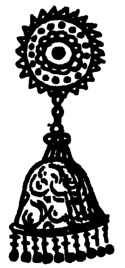


মলকড়ী

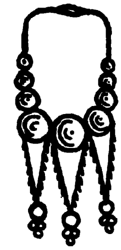


নাতক

কান—মলকড়ী (গো. ভা. ১৩)—উপরের কানের গহনা। চন্দ্রকাসিআ



কাপ ও ঝলকা



পাঞ্চগোটিআ (বর্তমান নাম পঁচিআ)

(গো. ভা. ১৩) ও পগড়ি (গো. ভা. ৬)— তলার গহনা। কাপ (গো. ভা. ১৩)—কান-ফুল। নাউল —ইয়ারিং। ঝলকা—পেণ্ডাণ্ট। পাঞ্চগোটিআ—একত্র সংলগ্ন পাঁচটি গোলক বিশিষ্ট অলঙ্কার। বীরবউলি বা মণিখচিত মকর কুণ্ডল। পূতনা রাক্ষসী কানে ভ্রমরী ফুল গুঁজিত (র. ক. ৪)

নাক—ফাসিআ বা নাসাপুটিআ—নোলক। ফুলগুণা (গো. ভা. ১৮) বা তাটঙ্ক (র. ক. ১) বা নাকচণা (র. ম. ১৭) বা বসণী (নাসারে হেম বসণী—ম. ম. ২)

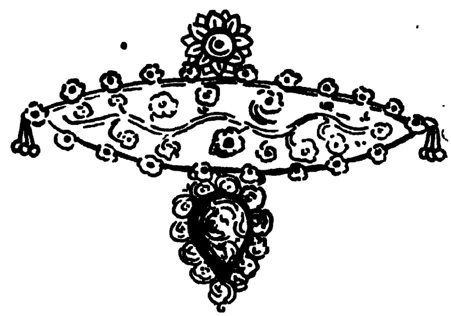


ফুলগুণা

—নানা আকারের নাকছাবি। বেশর—বাঁ নাকের গুণা। নোথ (গো. ভা. ১৩)—নথ। গজমোতি (র. ক. ১৮)। কাব্যতার বর্তুল মোতি (র. ম. ১০)—শুক্রতারার মত উজ্জ্বল মুক্তা। দণ্ডি।

গলা—চাপসরী (গো. ভা. ১৩)—চীক। চন্দ্রহার, হেমহার ও গজমুক্তা হার (র. ক. ১৮) গলায় পরা হইত। পদক—টাকার মালা (গো. ভা. ১৩)। ছেচাকণ্ঠী অর্থাৎ এক প্রকার গোল ফল ও হরীতকীর মালা গাঁথা হইত।

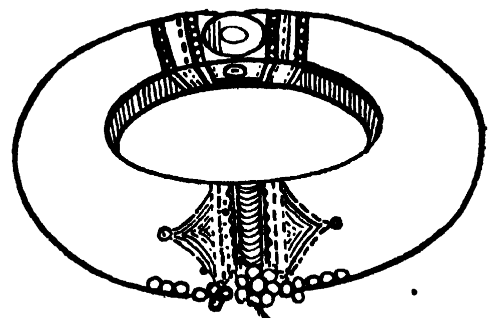
বাহু—কঙ্কণ (র. ম. ১৬)। কেয়ূর বা তাড় ("মুকুট ... তাড় বিদ যে মুহুড়ি"—সভাপর্ব, সারলা বলিল—...) বাহুটি (ম. ম. ২)। বিদ—বাম বাহুর অলঙ্কার। কপূরনলি।



বিদ ও কেতকী

বুক—স্তনের উপর মুক্তামালা (র. ক. ১৮)

হাত—কচটি (র. ক. ১)—রিস্টলেট। রত্নচুড়ি (গো. ভা. ৫)। ডেউঁরিআ—লোহার শাঁখা। রত্ন বলয়া বা খড়ু—সোনার বালা। পইঞ্চ—এক প্রকার মোটা বালা। অতুল—ব্রেসলেট। রত্নমুদি (গো. ভা, ১৩) বা মুহুড়ি বা মুদ্রিকা (পূ. চ. ৮)—আঙটি। বটফল—এক প্রকার রিস্টলেট।

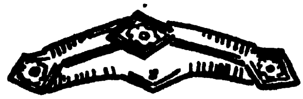


অতুল

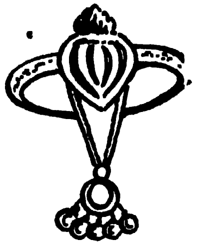
কোমর—ওড়িআনী (র. ম. ১৮) বা মেখলা (পূ. চ. ৮) বা নীবিবন্ধ (গো. ভা. ৫)—কোমরবন্ধ। এখন ইহা সরু হইয়া "অণ্টাসূতা"য় দাঁড়াইয়াছে। কিঙ্কিণী (প্রে. প. ৩)—ক্ষুদ্র ঘণ্টাযুক্ত মেখলা। ঘুঙুর। চন্দ্রহার।

পা—সেকালে নানা প্রকারের নূপুর প্রচলিত ছিল :— যথা, মঞ্জীর (র. ম. ১০) ও হংসক (ম. ম, ১৪)। বলা—ঘুঙুর। পাহড় (গো. ভা, ১৩) ও তোড়র—দুই প্রকারের বলা। পঞ্চম—গোড়ালির উপর পরা হয়। ঘণ্টি (র. ম. ৮) বা ঘাগুড়ি (র. ম. ১৮)—ছোট ছোট ঘণ্টার মালা। পা-পদ্ম—ইন্‌স্টেপের উপর পরা হয়।

মুটিআ—বুড়া আঙুলে পরা হয়। পায় আলতা পরা হইত। চুপুলি—অন্ত সব আঙুলের গহনা।



বলা



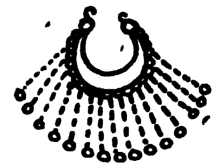
মুটিআ

প্রসাধন—"কুঙ্কুম চন্দন কর্পূর। লেপন সবু শ্রীঅঙ্গর" (পূ. চ. ৮)। গোপীরা স্নানের পূর্বে গায়ে হলুদ মাখিতেন (গো. ভা ৫)। স্নানের সময় মাথায় আমলকী কল বা আরেলা ঘষা হইত (সা. ম. মধ্যপর্ব)। স্নানের পর সুগন্ধ দ্রব্যে দেহ সুবাসিত করা হইত।

বস্ত্র—গোপীরা "সুক্ষীন বসনী" অর্থাৎ সূক্ষ্মবস্ত্র-পরিহিতা ছিলেন। তাঁরা নীলাম্বরী বা নীল ঘন পট (ম. ম. ২৪), পীতাম্বরী বা বসন্ত পতনী (র. ক. ১৮), ও দুকুল (ম. ম. ৯) বা গরদের শাড়ী পরিতেন। শাড়ী চৌদ্দ হাত লম্বা হইত (প্রে. প.—২, ৯)। সেকালে কালো কাঁচল (গো. ভা. ১৩) বা লাল কাঁচল (র. ক. ১৮) দ্বারা বুক ঢাকা হইত। কাঁচলে রূপার জরী বসান হইত।

এই বার গোপী ভাষা (ত্রয়োদশ অধ্যায়) হইতে এক গোপীর বেশভূষার বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইল।

মজ্জন করাই প্রাণনাথকু।
বেশ গাই, মোহর মনকু॥
জুড়া বান্ধিণ করাকাঠি লাই।
খোপি ঝিঞ্জিরী বেড়াইলি তহিঁ।
অলকা গোটিএ মস্তকে দেলি।
নেই করি ফুল গভা খঞ্জিলি।
ফুল পরে দেলি টাহিআ পুণ।
বাস করাই মল্লীগভা জাণ।
সিন্দুর বিন্দু কপোলরে দেলি।
নয়নে রঞ্জন নেই রঞ্জিলি।
কাণ মলকড়ী খঞ্জিলি কর্ণে।
চন্দ্রকাসিআ লগাই বহনে।



চন্দ্রকাসিআ (বর্ত্তমান নাম বাহুলি কাসিআ)



বসরী

নাসারে বসরী গুণা খঞ্জিলি।
তহিঁ পাখে নোথ গোটিএ দেলি।
বেকরে বান্ধিলি পদক মালা।
হেচা কণ্ঠি সঙ্গে হরিড়া বেড়া।
চাপসরী মাল উপরে লাই।
চন্দ্রহার তহিঁ তলে লুলই।
কলা কাঞ্চলা বক্ষস্থলে মোর।
রূপা জরী লাগি অছি তহিঁর।
কলা পীতাম্বরী পাটে পিন্ধিলি।
বাহুরে বাহুটি তাড় লাইলি।
বেনি হস্তে শোহে সুবর্ণ চুড়ী।
মুখ দিশিলা বেহে চম্পাকড়ী।
পাহুড়া নেপুর খঞ্জিলি পাদে।
অঙ্গুঠি মানকরে মুদি খঞ্জে।
অলতা দুই পাদরে যেনিণ।
বেশ হোইলি দুই ঘড়ি জাণ।

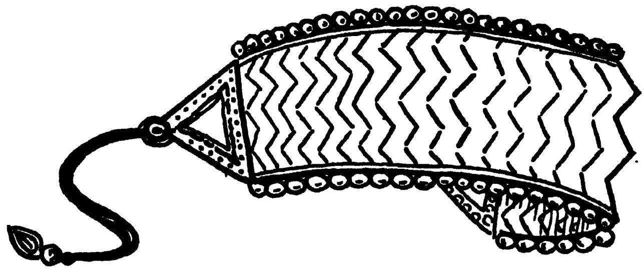
[লাই=লাগাইয়া। নেই করি—আনিয়া। খঞ্জিলি—সুন্দর ভাবে লাগাইলাম। রঞ্জিলি=লেপন করিলাম। লুলই—দোলে। শোহে=শোভে। কড়ি=কুঁড়ি।]

প্রাণনাথ বেচারা যদি খাইয়া-দাইয়া বারটার মধ্যে ঘুমাইয়া থাকে, তাহা হইলে অভিসারিকা গোপীর বেশভূষা শেষ করিতে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

এই সকল পুরাতন অলঙ্কার বাংলা দেশে একেবারে অজানা ছিল না। কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই তুলনা সংক্ষেপে সারিতে চাই।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন—

"খোপা তরয়া ভিড়িয়া বাঁধে লে..."
"কুলে জড়ি বান্ধি কেশ পাশে।"
"আগর চন্দন অঙ্গে মাখী—কাজলে রঞ্জিল দুই আখী।"



বাজুবন্ধ

গোপীচাঁদের গীত—

"খসাইয়া পেলে হার কেয়ূর কঙ্কণ
নাকের বেশর পেলে পায়ের নূপুর।"

ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল—

"তাড় কঙ্কণ বাজুবন্ধ শোভে দশভুজে।"

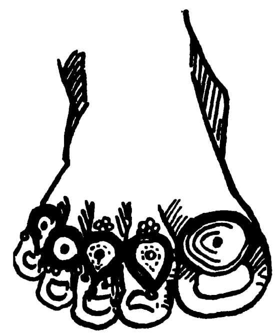
ভবানীদাসের মঙ্গলচণ্ডী—

"কটীতে কিঙ্কিণী বাজে।"

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে স্ত্রীলোকদের বার হাত মেঘডুম্বুর শাড়ী ও কাঁচুলী পরিবার বর্ণনা আছে।

পরিশেষে শ্রীনন্দকিশোর দাস মহাশয়ের কনকলতা উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটি গহনার তালিকা উদ্ধৃত করিব। এগুলিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গহনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। একটি গ্রামের সম্ভ্রান্ত মহিলারা, "মুদি, ঝুন্টিআ, ঘুঙুর, বলা, পা-পদ্ম, পঞ্চম, পাইঘুড়ী (পা'র গহনা), ভেউরিআ, অলকা, কাপ, মলকণ্ঠী, সুণাচান্দ ও সুণামাছি (এই দুইটি বোধ হয় মাথার গহনা), চন্দ্রহার, সাপুআ (বোধ হয় গলার গহনা), খোপি ঝিঞ্জিরি, পইঞ্চ, অতুল, বীরবউলি, 'তাড় ও বেশর" পরিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন।

এই সব গহনা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে বা পল্লীগ্রামে নির্বাসিত হইয়াছে। তাহার কারণ কেবল রুচি-পরিবর্তন নহে। ভাটিয়া ব্যবসায়ীদের কৃপায় উড়িষ্যার



পা-পদ্ম

সোনা উজাড় হইয়া সাগরপারে যাইতেছে। সুতরাং গহনার বাহুল্য যে কমিয়া গিয়াছে ইহা বলা বাহুল্য।

[প্রবন্ধের ছবিগুলি আঁকিয়া দিয়া শ্রীপূর্ণচন্দ্র মহান্তি ও শ্রীঅন্নদাচরণ মিত্র আমদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।]

মেজ বৌ

শ্রীকল্পিতা দেবী

গলির ওপারে বনেদি বংশের দালানবাড়ী। সেখানে লক্ষ্মীর বিদায় নেবার পথে ছাপ পড়েছে সর্বত্র। দাগ-ধরা, স্যাঁতা-পড়া, চুনসুরকি-খসা দেয়াল-পাঁচিল নগ্ন দারিদ্র্যের লজ্জা খুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রোদের চুমুক পান করে দুই পহর বেলায় চারি দিক যখন ঝিমিয়ে পড়ে, দেখা যায় ফাটা খিলেনের ফাঁক দিয়ে পোড়ো বাড়ীর হালছাড়া দশা।

আমার বাসা সামনের বাড়ীতে কোণের ঘরে, পটের উপর তুলি কালি বুলোবার কারবার ফেঁদেছি। যা খুশি তাই করে দিন কাটাবার অধিকার পেয়েছি কিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তির প্রশ্রয়ে। মাধুকরী বৃত্তিই আমার সৃষ্টি-কল্পনার ব্যবসায়। সংসারের পথে-ঘাটে মনটা এদিক ওদিক থেকে টুকরো-টাকরা যা পায় ঝুলি ভরে তাই দিয়ে।

বেছে বেছে এই ঘরটা ভাড়া নিয়েছি। অনেক দিনের বেকার কালপুরুষ দেয়ালগুলোয় মডার্ন্ আর্টিস্টের ছাঁদে ছবি দিয়েছে লেপে, তাতে আভাস পাওয়া যায় নানা রকম, মানে পাওয়া যায় না। একটা নড়নড়ে তক্তপোষে আমার কাজও চলে বিশ্রামও হয়।

যেখানে চারি দিক সুশৃঙ্খল সুপরিচ্ছন্ন সেখানে পারিপাট্যের সুসম্পূর্ণতায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে মন, অকাজে দেয় গা ঢেলে।

তাই গলির এই অনাদৃত ঘর, আর একখানি পূর্ব-ইতিহাস-বিস্মৃত তক্তপোষ উড়ো ভাবনাগুলোকে রাস্তা ছেড়ে দেয়। আবার ওদিকে চলেছে চিকের আড়ালে ঝাপসা মূর্তির চলাচল, তুলিটা তার মোহে পড়ে তার অনুসরণ করতে চায়, বাঁধা পথের বাইরে কুড়িয়ে-পাওয়া ছায়ামণির লোভে।

দিন চলেছে চোখের সামনে। চলতে ফিরতে রূপের আঁচড় লাগিয়ে যায় মনটাতে। ছবি যখন আঁকি জানি নে সে কী যে। রেখার যোগবিয়োগ ঘটতে থাকে একটা কোন্ বে-আইনী চালে। অনর্থক কৌতূহলে চেয়ে দেখি হিজল গাছের আড়ে একটুখানি ছ্যাৎলাপড়া ঘাটের সিঁড়ি পানাপুকুরের পাড়ে। কেউ জল তুলতে আসে, কেউ নাইতে, কেউ মাছ ধরতে। ছেলেরা কানামাছি খেলে, সুকুমার দেহে প্রাণের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তোলে গতির আবর্ত। তরুণীর দল কাঁখে কলসী। ভারমন্থর দেহ চরণ-চিহ্ন রেখে চলে সিঁড়ির পৈঠায়, কলসীর জল উছলে পড়ে, পায়ের ছাঁদ মুছে যায়। দূরে সাদা মেঘের লাইন-গুলো দিগন্তে বনের লাইন খুঁজে চলে।

অপূর্ব ধরণী, ছড়িয়ে দিয়েছে রেখার ঝাঁক। আমার তুলি তার থেকে তুলে নেয় এক-একটা রেখার রূপ যেন অতল থেকে মাছ ধরার মতো ছিপ দিয়ে।

লাল ডুরে শাড়ীতে চাবি-বাঁধা আঁচল কাঁধের উপর দোলে, ফুটে ওঠে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে দেহভঙ্গীর নিবিড় সঙ্গতির ছন্দ। ঝিলের আলো ঝলমলিয়ে ওঠে, মা এসে বসেন শিশু-কোলে ঘাটের ধাপে। আঁৎকে ওঠে শিশু হঠাৎ কোন কালো ছায়ায় চমকে, মা তাকে বুকে আঁকড়ে ধ'রে চাপা আঙুলের সম্মোহনী তার দেহে বুলিয়ে চলেন। অপরাহ্ণের আভা শিশুর মুখে, কাজলটানা চোখ তৃপ্তির ভারে নত। আমার তুলিতে জাগে রোমাঞ্চ, ম্যাডোনার স্বপ্নরূপ দেখতে পাই প্রদোষের ছায়ায় ঘের-দেওয়া। কিন্তু সকলের চেয়ে মায়াবিস্তার করে ঐ চিকে আবছা-করা মানুষ, অস্পষ্টতার বঞ্চনা ভরিয়ে তোলে ছবির চোখে আপন জাদু দিয়ে।

সকালে সদ্যস্নান করে কে দাঁড়ায় ঐ চিক-অন্তরালে। মনে হয় যেন ঘন কেশের গন্ধ উড়ে আসে কাপড়ের সুবাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে।

বেলা বেড়ে চলে। আমার কাচ-ভাঙা জানলার



ইণ্ডিয়ান প্রেস কলিকাতা।

রোদের আলো বাঁকা হয়ে পড়ে, দুপুরে তামার রঙের আকাশে চিলগুলো যায় উড়ে। তুলিটাকে থামিয়ে দিয়ে বসে বসে ভাবি।

বোধ হোলো আঁচল বিছিয়ে শুয়েছে কে, ক্লান্ত দেহ শিথিল দিবসের কাজের শেষে।

এমন সময় দূর থেকে ডাক শুনতে পাই—মেজ বৌ। উত্তরে শুনি—"যাই।" সুরটা যেন পাৎলা মেঘের ভিতর থেকে চাঁদের আলো। তুলিতে রূপ নিতে থাকে মেজ বৌ। বাউল কোন্ অদৃশ্যকে বলে মনের মানুষ—আমার হৃদয়ে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে মনের মেজ বৌ অদৃশ্যলোক থেকে।

আকাশ উপচে উঠেছে আবিরের আভায়। দোলন-চাঁপার গন্ধে মিশে গেছে অবসরের দীর্ঘ বেলা। রাতের কালো আঁচল জড়িয়ে ফেলছে দিনকে।

পরের দিন। রাতের হয়েছে শেষ। ছাতের উপর আলো তখনো স্পষ্ট হয় নি। দীপ হাতে ছায়াময়ী চলেছে, ঢাকা বারান্দার পথে। ক্ষীণ শিখায় দেখা যায় কাঁকন-ঘেরা পেলব দুটি হাত, চলেছে কোন দেবতার উদ্দেশে বাতি জ্বালিয়ে। দেহ-ঘেরা পাৎলা সাড়ি দক্ষিণে-হাওয়ার মতোই ফুরফুরে।

রেখার ধ্যানে ধরেছি তোমাকে চিত্রিতা, আমার রঙের দুর্গে বন্দী তুমি আজ। যে সাধনার গভীর অতলে তোমার রূপের মাধুরী ছায়ার পিছন থেকে দিনে দিনে আপন আহ্বান পাঠিয়েছিল, সাড়া দিয়েছি তাকে, আমার সৃষ্টিতে সে হয়েছে মূর্তিমতী। একদিন তুমিও থাকবে না আমিও থাকব না কিন্তু আমার আত্মাকে বাহন করে তোমার আবির্ভাব চলবে মৃত্যুর পরপারে।

সকালের আলোয় ঘুমভাঙা শহরটা চোখ রগড়াচ্ছে। তার চেহারাটা গত রাতের মদ-খাওয়া দেহের মতো ঢিলে। কাকের ডাকে পাক খেয়ে উঠছে বাতাস। অন্দরমহলে ছায়ালোক ম্লান।

বুড়ি ঝি এল আমার বারান্দায়। বললে, বাবাঠাকুর যেতে হবে ও-বাড়িতে, অক্ষয়তৃতীয়া ব্রতের পারণ। আমাদের মেজ বৌমা ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন।

চমকে উঠলুম। যে মেজ বৌয়ের নিমন্ত্রণ আকাশে, আজ তা এল প্রত্যক্ষে। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করলে। মাথা তুলতে দেখলুম সত্য নয় এই প্রৌঢ়া। এ চিরকালের ভুল। কিন্তু কাকে বলি সত্য?

আমার ধ্যান-সমুদ্রের উর্বশী, স্বয়ম্ভূ তুমি। উদয়াচলের দিকে চেয়ে থাকবে পথিক তোমার শেষ চুম্বনরশ্মির প্রতীক্ষায়।

অভিমানে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ক্ষমা কোরো অভিমান, ক্ষমা কোরো প্রিয়া,
আমার এ প্রেমজ্বালা অনল উগারে,
যাহারে সে স্পর্শ করে, দহে তার হিয়া,
ক্ষণিকের অবহেলা সহিতে না পারে।
যাহারে সে চাহে, তারে করে আত্মদান,
বলি হ[illegible] চাহে তার সম্পূর্ণ হৃদয় ;
কণামাত্র কমে তার নাহি ভরে প্রাণ,
সে চাহে সর্ব্বস্ব ত্যাগ, পূর্ণ বিনিময়।

খণ্ড ছিন্ন প্রেম নিয়া হিয়া না জুড়ায়,
এ হৃদয় চাহে শুধু সর্ব্বত্যাগী প্রাণ,
কোনো দিকে কোনো বাধা মানিতে না চায়,
এ প্রেম তুলেছে তার প্রলয়-নিশান।

পারিবে কি সর্ব্বগ্রাসী এ অনল-মুখে
সমর্পিতে আপনারে অকুণ্ঠিত বুকে?

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২১

চিনির কল ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটির নাম বিমলবাবু। বিমলবাবু পরদিন সকালেই গিয়া চর দেখিয়া আসিলেন। রাত্রের মধ্যে বান অনেক কমিয়াছিল, তবুও চরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তখনও জলে জলমগ্ন; সেই অবস্থাতেই তিনি চরটি দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিলেন। সকলের চেয়ে বেশী খুশী হইলেন তিনি সাঁওতালদের দেখিয়া। ছোট-রায়বাড়ীর নায়েব ঘোষ ছিলেন তাঁহার সঙ্গে, বিমলবাবু ঘোষকে বলিলেন,—অদ্ভুত জাত মশাই এরা, যেমন স্বাস্থ্য তেমনি কি খাটে! আমাদের দেশী লোকের মত নয়—ফাঁকি দেয় না!

ঘোষ মৃদু হাসিয়া বিমলবাবু অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বলিল—তাও অনেক ফাঁকি দিতে শিখেছে মশাই আজকাল। ধীরে ধীরে শিখেছে, বুঝলেন; যখন ওরা প্রথম এল এখানে, তখন একটা লোকে যা কাজ করত এখন সেই কাজ ক'রে দুটো লোকে; দেড়টা লোক ত লাগেই!

বিমল বাবু ব্যবসায়ী লোক, কয়েকটি কলেরই মালিক, শ্রমিক-মজুরদের সংস্রবে তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রচুর, তাহার উপর তিনি উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক; ঘোষের কথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিলেন, বলিলেন—কিন্তু এখনও ওরা এক জনে যা করে সে-কাজ করতে আমাদের দেশী লোক অন্তত দেড়টা লাগে। দুটোই বলতাম, তা আপনার ভয়ে দেড়টাই বলছি।

ঘোষ এবার সন্তোষের হাসি হাসিল, বিমলবাবু তাহাকে ভয় করিয়া কথা বলিতেছেন এটুকু তাঁহার বেশ ভালই লাগিল, হাসিয়া বিমলবাবুর কথা মানিয়া লইয়াই সে এবার বলিল—তা বটে!

বিমলবাবু বলিলেন—চলুন, এক বার ওদের পাড়ার মধ্যে যাওয়া যাক। একটু আলাপ করে রাখা যাক। কল চালাতে হ'লে ওদের না হ'লে তো চলবে না!

শ্রীবাসের দোকানের সম্মুখ দিয়াই পথ, দোকানের সম্মুখে আসিয়াই ঘোষ বলিল—ওরে বাপরে! এই খানেই যে সব ভিড় লাগিয়ে রয়েছিস রে মাঝিরা! কি করছিস সব এখানে?

শ্রীবাসের দোকানে বসিয়া মাঝিরা বাকীর খাতায় টিপ সহি দিতেছিল। শ্রীবাস একটি হুঁকা হাতে বসিয়া সমস্ত দেখিয়া লইতেছিল। ঘোষ ও অপরিচিত বিমলবাবুকে দেখিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি হুঁকাটি রাখিয়া উঠিয়া পথে নামিয়া আসিল, অর্দ্ধনত হইয়া একটি নমস্কার করিয়া বলিল—পেনাম। তার পর, ঘোষমশাই কোন্ দিকে? এই বন্তের মধ্যে? আর এই বাবুটি?

ঘোষ হাসিয়া বলিল—ইনি হলেন কলকাতার লোক, এসেছেন চর দেখতে। এখানে একটা চিনির কল করবেন। তাই এসেছিলাম ওঁকে সঙ্গে নিয়ে। তার পর তোমার ওখানে এত ভিড় কিসের?

—চিনির কল করবেন? বিস্ময়ে শ্রীবাসের চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

—চিনির কলও হবে, সঙ্গে সঙ্গে আখের চাষও হবে। কিন্তু আপনার নামটি কি? দোকানটি কি আপনার? বিমলবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শ্রীবাসের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীবাসের মুখ অসন্তোষে কঠিন শুষ্ক হইয়া উঠিল, সে বলিল—কল কি এখানে চলবে আপনার? এত আখ পাবেন কোথা?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন—কল হ'লে [illegible] আখের চাষ বেড়ে উঠবে। দোকান আপনার খুব [illegible] চলবে দেখবেন। তার পর জমিও বোধ হয় আছে

আপনার এখানে—তাতেও আরম্ভ করুন আখের চাষ। কল আপনাদের অনিষ্ট করবে না—ভালই করবে। ভাল কথা, এখানে এবারেই আমার ইট হবে পনর লাখ। আপনার তো দোকান এই চরের উপরেই—আমার অনেক কুলী আসবে শহর থেকে ইট তৈরি করবার জন্যে, ছ-মাসের মধ্যেই এসে পড়বে, দোকান আপনি বাড়িয়ে ফেলুন।

শ্রীবাসের মুখ ধীরে ধীরে কোমল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে এবার বলিল—তা আপনাদের মত ধনী লোক যেখানে আসবে সেখানে তো দশের অবস্থা ভালই হবে। দোকান আমি হুকুম হ'লেই বাড়াব। আর দেখতে শুনতে যা-হয় সব আমি দেখে শুনে দোব। এই দেখুন এই সব সাঁওতাল সব আমার তাঁবে। আমার কাছেই ধান খায় বছর বছর। এক নেয় এক দেয়। ওদের সঙ্গে খুব সুখ আমার। লোকজন যা দরকার হবে, সব আমি ঠিক ক'রে দোব।

ঘোষ বলিল—আজকে এত ভিড় কিসের হে ?

—আজ্ঞে, আজ ওদের 'রোয়া' পরব। মানে, চাষের জল তো লেগে গেল, তা ধান রুইবার আগে ওরা পুজো-টুজো দেবে। তার পর চাষে লাগবে। তাই সব জিনিসপত্তর নিচ্ছে, আর খোরাকীর ধানও নিচ্ছে।

বিমলবাবু বলিলেন—তাই নাকি, আজ ওদের পর্ব ? তা হ'লে তো বড় ভাল দিনে এসে পড়েছি। বাঃ। কই, ওদের সর্দার কই ?

সাঁওতালদের সমস্ত দলটি নীরবে বসিয়া এক বিচিত্র দৃষ্টি দিয়া বিমলবাবুকে দেখিতেছিল, বিস্ময়, ভয় শ্রদ্ধা, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু সে-দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পাইতেছিল। বিমলবাবুর আহ্বানেও কমল সাড়া দিল না, তাহার প্রকাণ্ড দেহ লইয়া সে খানিকটা নড়িয়া চড়িয়া বসিল মাত্র। শ্রীবাস ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বিমলবাবুকে সম্ভ্রম ও সাঁওতালদের উপর আধিপত্য দুইই একসঙ্গে দেখাইয়া ব্যস্ত ভাবে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলি হে [illegible] কমল মাঝি, কানে তোর কথা ঢুকছে না না কি ? ইদিকে আয়; কতবড় লোক একটা ডাকছেন দেখছিস না !

কমল এবার উঠিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া নত হইয়া প্রণাম জানাইয়া বলিল—কি বলছিন—আপুনি ?

হাসিয়া বিমলবাবু পরিষ্কার সাঁওতালী ভাষার বলিলেন—তুমি এখানকার সর্দার ?

কমল অবাক হইয়া গেল, অদূরে উপবিষ্ট সাঁওতাল-দেরও বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তাহাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠিল,—এই, এই বাবু আমাদের কথা বলছে, আমাদের কথা বলছে ! উ বাবারে !

বিমলবাবু সাঁওতালীতেই বলিলেন—হ্যাঁ তোদের ভাষাতেই কথা বলছি আমি।

কমল ভাঙা ভাঙা বাংলাতে প্রশ্ন করিল—আমাদের ভাষা আপুনি কি ক'রে জানলি বাবু ?

—আমার কাছে অনেক সাঁওতাল কাজ করে। আমার তিনটে কল আছে। কল বুঝিস তো ?

—হঁ-হঁ। আপুনি চলে, খুব ধুঁয়া উঠে—হিস্ হিস্ ক'রে। একটো এই মোটা এই বড় লোহার চোঙা থেকে ধুঁয়া উঠে—গুম্ গুম্ শব্দ উঠে। বয়লা ব'লে—ইঞ্জি বলে—

—হ্যাঁ। বয়লার-এঞ্জিনে কাজ হয় কলে। এখানেও একটি কল করব আমি। তোরা সব কাজ করবি। তার পর—আজ তোদের রোয়া পরব বটে ! নয় ?

কমলের বড় বড় হলুদ রঙের দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল, বলিল—তাই তো করছি গো ! জল তো অনেক হো-য়ে গে-লো। বীজ চারাগুলি বড় বড় হইছে, আর বসে থেকে কি হবে ?

—ঠিক ঠিক। তা—'চিৎ কোপে জম এ-হুঁয়া ?' আজ কি কি খাওয়া-দাওয়া হবে রে ? এঁ্যা ! হাসিয়া কমল এবার নিজের ভাষাতেই বলিল—জেল, দাকা, হাণ্ডি।

—ও তা হ'লে তো আজ ভোজ রে তোদের। মাংস, ভাত, পচুই—অনেক ব্যাপার যে ! কত হাণ্ডি করেছিস ?

সলজ্জ ভাবে কমল বলিল—করলম তা মেলাই হবে গো। মেয়েগুলা খাবে, আমরা খাব, তবে তো আমোদ হবে।

—ঠিক ঠিক। তা বেশ্। এই নে, আজ তোদের পরবের দিন—খাওয়া-দাওয়া করবি। বলিয়া মনিব্যাগ

বাহির করিয়া ব্যাগ হইতে একখানি নোট বাহির করিয়া কমলের হাতে দিলেন। কমল সন্তর্পণে নোটখানির দুই প্রান্ত দুই হাতের আঙুল দিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে নোটখানার ছাপের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিমল বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—'গেল্' টাকা—দশ টাকা পাবি ওটা দিলে!

সমস্ত দলটি এবার কলরব করিয়া উঠিল।

বিমল বাবু হাসিয়া ঘোষকে বলিলেন—চলুন, তা হ'লে এবার। আসি এখন দোকানী মশায়। চললাম রে মাঝি।

কমল বলিল—হঁ-হঁ—আসুন গা আপুনি। খাটব আপোনার কলে আমারা খাটব।

সাঁওতাল-পল্লীর মাঝখান দিয়া পরিচ্ছন্ন মেটে পথটি এই কয় দিনের প্রচণ্ড বর্ষণে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়াই ছিল; তাহার উপর পর্ব্ব উপলক্ষে মেয়েরা পথের উপর ঝাঁটা বুলাইয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীর দুয়ারের মুখে একটি করিয়া মাড়ুলি পড়িয়াছে। আপনাদের উঠানে উঠানে মেয়েগুলি আজ খুব ব্যস্ত। তৎপরতার সহিত কাজ করিয়া ফিরিতেছে। ছোট ছোট মেয়েগুলি আঁচলে ভরিয়া শাক সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। শাক আজিকার পর্ব্বে একটা প্রধান উপকরণ।

চলিতে চলিতে ঘোষ বিকৃতমুখে বার বার জোরে জোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে বলিলেন—উঃ—মদে আজ বেটারা বান্ ডাকিয়ে দেবে। পচুইয়ের গন্ধ উঠছে দেখুন দেখি!

বিমলবাবু বলিলেন—প্রত্যেক বাড়ীতে মদ তৈরি হচ্ছে আজ। পরব কি না! পরবে ওরা কখনও দোকানের মদ কিনে খাবে না। দেবতাকে দেবে কি না; দোকানের মদ হ'ল অপবিত্র। আর তা ছাড়া পয়সাও লাগবে বেশী। মদের কথা বলিতে বলিতেই বিমল বাবুর যেন একটা জরুরি কথা মনে পড়িয়া গেল—কথার স্বরে ভঙ্গিমায় গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলিলেন,—ভাল কথা! এখানে পচুইয়ের দোকান সব চেয়ে কাছে কত দূরে বলুন তো!

ঘোষ বিস্ময় বোধ করিয়াও না হাসিয়া পারিল না। হাসিয়া বলিল—হঠাৎ পচুইয়ের দোকানের খোঁজ? বলিতে বলিতেই ঘোষ বিমলবাবুর মতলবটা অনুমান করিয়া লইল, বলিল—বুঝেছি, মেয়া চাই; মাছ ধরার বাতিক কি—কলকাতার বাবুদের সবারই মশাই! তা আমার বাবুর পুকুরে খুব বড় বড় মাছ—এক-একটা আঠারো সের, বিশ সের, বাইশ সের!

বিমল বাবু বলিলেন—না, মাছ ধরবার জন্যে নয়। আমার কুলী আসবে এখানে। পাগমিল, বক্‌স মোল্ডিঙের লোক তো এখানে মিলবে না! অন্ততঃ ষাট-সত্তর জন কুলি আসবে। পচুইয়ের দোকান কাছে না থাকলে তো অসুবিধে হবে।

বার বার ঘাড় নাড়িয়া ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া ঘোষ বলিল—এ্যা-ই দেখুন, এই নইলে কি পাকা ব্যবসাদার হওয়া যায়! বটে—মশাই বটে! দিষ্টি রাখতে হবে চার দিকে! তা পচুয়ের দোকান আপনার একটুকু দূরেই হবে। ক্রোশ দুয়ের কম নয়। তা হ'লে?

বিমলবাবু পকেট হইতে নোটবই বাহির করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়াই কথাটি নোট করিয়া লইলেন এবং তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন—একটা দোকান স্যাংশন করিয়ে নেব এইখানেই। কল হ'লে তো চাইই। তা আগে থেকেই ব্যবস্থা করে নেব।

পথের ধারেই একটি ঘনপল্লব কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায় কতকগুলি সাঁওতালদের মেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গাছটির গোড়ায় সুন্দর একটি মাটির বেদী, বেদী ও বেদীর সম্মুখের খানিকটা জায়গা গোবর ও মাটি দিয়া অপূর্ব্ব পরিচ্ছন্নতার সহিত নিকানো; বেদীর চারিদিক খড়িমাটির আল্পনা দিয়া চিত্রিত করিয়া তুলিয়াছে। মেয়েগুলি তখনও সম্মুখের নিকানো জায়গাটির উপর খড়িমাটির গোলা দিয়া আলপনার ছবি আঁকিতেছিল; পাখী ও পশুর ছবি, তাহার পাশে পাশে খেজুরের পাতার মত দুই পাশে বিপরীতমুখী বাঁকা বাঁকা রেখা। ঘোষ ও বিমলবাবুর আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল। সারী মেয়েটিও ছিল ওই দলের মধ্যে—সে আগাইয়া আসিয়া বলিল—একটি ধার দিয়ে যা গো বাবুরা! ই-ঠিনে আমাদের পূজা হবেক।

কতকগুলা ছেলে মাথায় ফুলওয়ালা গোটাকয়েক লাল রঙের মোরগের পায়ে বাঁধিয়া দড়ি ধরিয়া বসিয়া

আছে ; মহা উৎসাহ তাদের, আপনাদের ভাষায় অতি-মাত্রায় মুখর পাখীর মত একসঙ্গে কলকল করিয়া বকিয়া চলিয়াছে। ঘোষ বলিল—ওরে বাপরে! এতগুলো মুরগী আজ তোরা খাবি না কি?

সারী বলিল—কেনে, উ কথা বুলছিস কেনে? তুর লোভ হছে না কি?

ঘোষ বৈষ্ণব মানুষ, সে ঘৃণায় থুথু ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—রাম, রাম, রাম! অ্যাঁ, ই হারামজাদা মেয়ে বলে কি গো?

সারী বলিল—তবে তু খাবার কথা বুললি কেনে? উ আমরা দেবতাকে দিবো। কাটব এই দেবতা থানে। তার পরে কুটি কুটি ক'রে একটি মাটিতে পুঁতব—আর সবগুলা রাঁধব। আগে থেকে খাবার কথা তু বুলছিস কেনে?

ঘোষ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—চলুন মশাই, চলুন, আমার গা ঘিন ঘিন করছে!

বিমল বাবু দেখিতেছিলেন সারীকে, চলিবার জন্ত পা বাড়াইয়া তিনি বলিলেন—বাঃ মেয়েটির দেহখানি চমৎকার, tall—graceful—youth personified!

সারী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—কি বুলছিস তু উ সব?

মৃদু হাসিয়া বিমলবাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন, কথার কোন উত্তর দিলেন না। নদীর পারঘাটের পাশেই অপেক্ষাকৃত বড় বড় সাঁওতাল ছেলেগুলি গরু মহিষগুলিকে পরিপাটি করিয়া স্নান করাইতেছিল। কয়টা ছেলে আজও লম্বা লাঠি লইয়া জলের ধারের গর্ত্তগুলিতে খোঁচা দিয়া শিকারের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

* * *

ঘোষ ও বিমলবাবু চলিয়া যাইতেই শ্রীবাস গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে দোকানের সামনে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এখানে চিনির কল হইবে! সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীঘর লোক-জনে ভরিয়া যাইবে। হ্যাঁ—দোকানটা বড় করিতেই হইবে! বর্ষার শেষেই একখানা লম্বা তিনকুঠারী ঘর আরম্ভ করিয়া দেওয়া চাইই! কিন্তু বনিয়াদ ও মেঝেটা পাকা করিলেই ভাল হয়! যে ইন্দুরের উপদ্রব! ঐ ঝাবুর ইট তো অনেক হইবে—পনর লাখ! তাহা হইতেই তো ভাঙাচোরা যাহা পড়িয়া থাকিবে তাহাতে একটা প্রকাণ্ড দালানই তৈয়ারী হইতে পারিবে! আর লোকজনের সঙ্গে—একটু যাহাকে বলে সুখ—সেই সুখ থাকিলে,—সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাসের ঠোঁটের ডগায় অতি মৃদু একটি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই আবার সে গম্ভীর হইয়া উঠিল। আঃ, আরও খানিকটা জমি যদি সে দখল করিয়া রাখিত! জমির দাম হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইবে। দুই-শ আড়াই-শ টাকা বিঘার তো কথাই নাই!

সাঁওতালের দল শ্রীবাসের অপেক্ষাতেই বসিয়াছিল, তাহাদের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। হিসাবের খাতায় টিপছাপ দিবার পর ধান মাপ হইবে। ওদিকে 'বোঙ্গা' পর্ব্বের সমারোহ তাহাদের বর্ব্বর মনকে মুহুর্মুহু আকর্ষণ করিতেছে। তাহারা ক্রমাগত নড়িয়া চড়িয়া বসিতেছিল আর ব্যগ্র দৃষ্টিতে শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার উপর এই আকস্মিক টাকা প্রাপ্তিতে পর্ব্বটা আরও রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। চূড়া—সেই কাঠের পুতুলের ওস্তাদ রসিক সাঁওতালটি দেখিয়া শুনিয়া বলিয়া উঠিল—এ বাবা গো! মোড়লের আমাদের হ'ল কি? ডাঁস মাছিতে কামড়াচ্ছে না কি গো? এমন করে ঘুরছে কেনে? ও সর্দ্দার! তোমার মুখ কি কেউ সেলাই ক'রে দিল নাকি?

কমল এবার ডাকিল—মোড়ল মশাই গো!

শ্রীবাস ঈষৎ চকিত হইয়া বলিল—কি? ও—যাই! সে ফিরিয়া আসিয়া তক্তপোষের উপর বসিল। কমল বলিল, লেন গো—টিপছাপগুলা লিয়ে লেন গো! ইয়ার বাদে আবার ধান মাপতে হবে।

—হুঁ। হিসাবের খাতাটা সম্মুখে টানিয়া আনিতে আনিতেই শ্রীবাসের মাথার মধ্যে একটা কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত খেলিয়া গেল। জমির দাম বাড়িবে টিপছাপ খাতায় না লইয়া একেবারে বন্ধকী দলিল করিয়া লইলে—কিন্তু বর্ব্বরের দল বড় সন্দিগ্ধ! আবার একটা গোঁ ধরিয়া অনবুঝের মত বলিবে—কেনে গো, উটিতে ছাপ কেনে দিব গো! তু যি বুললি—খাতাতে ছাপ দিতে হবে! পরমুহূর্ত্তেই সে দোয়াতটা খাতার উপর

উল্টাইয়া ফেলিল, এবং আঁতকাইয়া উঠিয়া খলিয়া উঠিল—যাঃ—সর্ব্বনাশ হ'ল!

সাঁওতালের দলও অপরিসীম উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল—যাঃ!

শ্রীবাসের ছেলে বাপকে তিরস্কার করিয়া বলিল— কি করলে ব'ল তো! হল তো! যাক—ও পাতাখানা বাদ—

বাধা দিয়া শ্রীবাস অত্যন্ত দুঃখিত ভঙ্গীতে বলিল—উঁহু! এক কাজ কর, বোঁ ক'রে ওপার থেকে ভেণ্ডারের কাছ থেকে ডেমি নিয়ে আয় খান পঁচিশেক। তার পর খাতা বেঁধে নিলেই হবে!

শ্রীবাসের ছেলে গণেশ এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল—তুমি খেপেছ নাকি? ডেমিতে কে কোন্‌কালে খাতা করে, শুনি?

শ্রীবাস দুরন্ত ক্রোধে অদ্ভুত দৃষ্টিতে বিকৃত মুখে নীরবে গণেশের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—তোকে যা করতে বলছি তাই কর। যা এখুনি যা, যাবি আর আসবি। বলিয়া বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল।

সাঁওতালেরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া শ্রীবাসের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, শ্রীবাস গম্ভীর মুখে উঠিয়া বলিল—টিপছাপ পরে হবে মাঝি, গণেশ কাগজ নিয়ে আসুক। ততক্ষণে তোরা আয়, বাখার ভেঙে ধানটা মেপে ঠিক করে রাখ। তোদের সব আজ আবার পরব আছে।

সাঁওতালেরা এ কথায় খুব খুশী হইয়া উঠিল। কমল বলিল—নাঃ মোড়ল বড় ভাল লোক, বিবেচনা আছে মোড়লের।

চূড়া মাঝি ভ্রূ নাচাইয়া বলিল—কিন্তু ভারি বেকুব হয়ে গিয়েছে মোড়ল। কালিটা ফেলে—ছেলের উপর রাগ দেখলি না সব!

চূড়ার ব্যাখ্যায় সকলেই ব্যাপারটা সকৌতুকে উপভোগ করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সত্যই মোড়ল বড় বেকুব হইয়া গিয়াছে!

দেখিতে দেখিতে খড়ের তৈরি মোটা দড়া জড়াইয়া বাঁধা বাখারটা ভাঙিয়া স্তূপাকার করিয়া ধান ঢালা হইল। হস-হাস করিয়া টিন-ভর্ত্তি ধান মাপিয়া মাপিয়া ফেলা হইতে লাগিল। শ্রীবাস ধানের মাপের সঙ্গে হাঁকিতে আরম্ভ করিল—রাম—রাম—রাম—রাম—রাম—রাম—দুই—দুই; দুই-রামে-তিন—তিন!

চূড়া একপাশে বসিয়া একটা কাঠি দিয়া মাপের সঙ্গে সঙ্গে একটা করিয়া দাগ দিয়া সাঁওতালদের তরফ হইতে হিসাব রাখিয়া যাইতেছিল।

২২

এদিকে গ্রামের মধ্যে একটা প্রচণ্ড জটলা পাকাইয়া উঠিয়াছে। সকাল হইতে-না-হইতে গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রটনা হইয়া গেল, ওপারের চরের উপর চিনির কল বসিতেছে। খাস কলিকাতা হইতে এক ধনী মহাজন আসিয়াছেন, তিনি সঙ্গে আনিয়াছেন প্রচুর টাকা, ছোট একটি ছালায় পরিপূর্ণ এক ছালা টাকা! সঙ্গে সঙ্গে রায়-বংশের অন্ত সমস্ত শরিকেরা একেবারে লোলুপ রসনায় গ্রাস বিস্তার করিয়া উঠিল। অপর দিকে উর্ব্বর-জমি-লোলুপ চাষীর দল বাঘের গোপন পার্শ্বচর শৃগালের মত জিভ চাটিতে চাটিতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সর্ব্বপ্রথম নবীন বাগদীর স্ত্রী মতি বাগ্দিনী শিশু পৌত্রকে কোলে করিয়া চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অন্দরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে আরম্ভ করিল।

সংবাদটা শুনিয়া রংলাল বাড়ী ফিরিয়া অকারণ স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া প্রচণ্ড ক্রোধে লাঠির আঘাতে রান্নার হাঁড়ি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল। তার পর স্তব্ধ হইয়া মাটির মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

মনের আক্ষেপে অচিন্ত্যবাবুর সমস্ত রাত্রি ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই। ফলে অতিপুষ্টিকর শশক-মাংস বদহজম হেতু নানা গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভদ্রলোক অন্ধকার থাকিতেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ঢক ঢক করিয়া এক গ্লাস জল ও খানিকটা সোডা খাইয়া মর্ণিং-ওয়াকের জন্ত বাহির হইয়া পড়িলেন। খুব জোরে খানিকটা হাঁটিয়া তিনি সম্মুখে ভরা কালিন্দীর বাধা পাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। ওপারের চরটা অন্ধকারের ভিতর হইতে বর্ণে

বৈচিত্র্যে সম্পদে অপরূপ হইয়া প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে; গভীর তমিস্রাময়ী কালি যেন কমলা রূপে রূপান্তরিতা হইতেছেন।

অচিন্ত্যবাবু লক্ষ্য করিতেছিলেন বেনা ঘাসের গাঢ় সবুজ ঘন জঙ্গল চরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। উঃ, রাশি রাশি খস খস ঐ ঘন সবুজ আস্তরণের নীচে লুকাইয়া আছে! খেয়াঘাটের ঠিকাদার ঠিক এই সময়েই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অচিন্ত্যবাবুকে দেখিয়া সে একটি প্রণাম করিয়া বলিল—আজ আজ্ঞে ভাগ্যি আমার ভাল। পেভাতেই বাম্নণ দর্শন হ'ল। এই ঘাট নিয়ে বুঝলেন কি না, কত যে জাত-অজাতের মুখ সকালে দেখতে হয়! এ কাজ আপনার অতি পাজী কাজ মশায়। তবে দুটো পয়সা আসে, তাই বলি—।

অসমাপ্ত কথা—সে আকর্ণ-বিস্তার হাসিয়া শেষ করিল।

অচিন্ত্যবাবু আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—লাভ এবার তোমার ভালই হবে, বুঝলে কি না! ওপারের চরে কল বসছে, চিনির কল! লোকজনের আনাগোনা দেখতে দেখতে বেড়ে যাবে তোমার।

ঠিকাদার সবিস্ময়ে অচিন্ত্যবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কল? চিনির কল?

—হ্যাঁ চিনির কল! কাল কলকাতা থেকে মস্ত এক মহাজন এসেছে, সঙ্গে একটি ছালা টাকা! আমি নিজের চোখে দেখেছি। কাল আমার ছোট-রায়ের বাড়ীতে নেমন্তন্ন ছিল কি না!

ঠিকাদার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা ই টাকা কে পাবে? চরটা তো চক্রবর্তী বাড়ীরই বলছে সবাই; তা ছোট-রায়মশায়ের বাড়ীতে—?

—ছোট-রায়মশাইই আজকাল ওদের কর্ত্তা যে! উনিই সব দেখাশুনো করছেন যে।

বার-বার ঘাড় নাড়িয়া ঠিকাদার বলিল—বটে, আজ্ঞে বটে! তা দেখলাম কাল, এইখানেই চক্রবর্তী বাড়ীর ছোট্কা আর রায়মশায়ের ছেলে—বসেছিল অ্যানেকক্ষণ; খুব ভাব দেখলাম দু-জনায়। অ্যানেক কথা হ'ল দুজনায়।

—হুঁ। অচিন্ত্যবাবু খুব গম্ভীর হইয়া বলিলেন—হুঁ!... আচ্ছা কি কথা দু-জনের হচ্ছিল বল তো? স্বদেশীর কথা? মানে, সায়েবদিকে তাড়াতে হবে, বন্দেমাতরম, মহাত্মা গান্ধীকি জয়, এই সব কথা হচ্ছিল?

—আজ্ঞে না। আমি তো টুকুচে দূরে ব'সেছিলাম। তবে শুনছিলাম কান বাজিয়ে, কাল কথা হচ্ছিল আজ্ঞে, আমি আঁচে বুঝলাম—কথা হচ্ছিল আপনার—আচ্ছা উমা কার নাম বলেন তো? এই ছোট-রায়ের ঝিউড়ী মেয়ে নয়?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমি তাকে পড়াতাম যে! বলিতে বলিতেই অচিন্ত্যবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিলেন—মেয়েটাকে কলকাতায় পাঠিয়ে ধিঙ্গী করে তুললে! ছোট-রায় বাইরে বাঘ—আর ভিতরে একবারে শেয়াল! বুঝলে কি না, গিন্নীর কাছে একবারে কেঁচো। মেয়েকে যে ভয় করে—তাকে আমি ঘেন্না করি, বুঝলে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ! তা কাল আপনার ছোট-রায়ের ছেলে ঐ চক্রবর্তী বাড়ীর ছোট্কাকে ধরেছিল—বলে তোমাকে তাকে বিয়ে করতে হবে!

—বল কি! অচিন্ত্যবাবু একেবারে তীরের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বার-বার ঘাড় নাড়িয়া উপলব্ধি করার ভঙ্গিতে বলিলেন,—ঠিক কথা! ইন্দ্র রায়ের মতলব এতদিন ঠাওর করতে পারছিলাম না। হু—অহীন্দ্র ছেলেটি যে হীরের টুকরো ছেলে! এবারে ও তোমার ফোর্থ হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে! বটে! ঠিক শুনেছ তুমি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ! বয়সেও যে অ্যানেকটো হ'ল। মানুষ হাঁ করলেই বুঝতে পারি, কি বলবে। তা ছাড়া আপনার, রায়মশায়ের মেয়ের বিয়েরও তো আপনার হ্যাঙ্গামা আছে গো! চক্রবর্তী-বাড়ীর বউ আর রায়মশায়ের বুন। কুলের খুঁত ধরতে তো লোকে রায়মশায়েরই ধরবে!

—ওরে বাপ রে, বাপ রে! এই দেখ, কথাটা একবারে ভুলেই গিয়েছিলাম আমি! তুমি তো ভয়ানক বুদ্ধিমান

লোক! দেখ—তুমি ব্যবসা কর তোমায়, নিশ্চয় উন্নতি হবে! আমার কাছে যাবে তুমি, তোমাকে আমি সঙ্গে নেব। ব'লো না যেন কাউকে, এই খসখসের ব্যবসা। খসখস বোঝ তো?…খস্‌খস্‌ হ'ল বেনার মূল।

—বেনার মূল?

—হ্যাঁ। চুপ কর। সেজ-রায়বাড়ীর হরিশ আসছে।

হরিশ রায় সেজ-রায়বাড়ীর এক জন অংশীদার। সমগ্র রায়-বংশের সিকির অংশের অধিকারী হইল সেজ তরফ, সেজ তরফের এক আনা অংশের অর্থাৎ ষোল আনা সম্পত্তির এক পয়সা রকমের মালিক হইলেন হরিশ রায়। এই এক পয়সা পরিমাণ জমিদারীর অংশ লইয়া ভদ্রলোক অহরহই ব্যস্ত এবং ঐ কাজ লইয়া তাঁহার মাথা তুলিবার অবসর থাকে না। কাগজের পর কাগজ তিনি তৈয়ারি করিয়া চলিয়াছেন। জমিদারীর এক কণা জমি যদি কেহ আত্মসাতের চেষ্টা করে, তবে তাঁহার আয়নার মত কাগজে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবেই!

কানে পৈতা জড়াইয়া গাড়ুহাতে হরিশ রায় একটি দাঁতন-কাঠি চিবাইতে চিবাইতে নদীর ঘাটে আসিয়া নামিলেন। অচিন্ত্যবাবুকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—কি রকম, আজ যে এদিকে?

উদাসভাবে অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—এলাম!

—না, মানে, এদিকে তো দেখি নে বড়!

—হ্যাঁ। বলিয়াই হঠাৎ যেন তিনি আসিবার কারণটা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—চরের উপর কল বসছে কিনা, চিনির কল, সুগার মিল। তাই বলি দেখে আসি ব্যাপারটা কি রকম হবে!

—কল? চিনির কল? হরিশ রায়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।—চিনির কল করবে কে মশাই? এত টাকা কার আছে?

—কাল রাত্রে কলকাতা থেকে মস্ত এক মহাজন এসেছে, সঙ্গে আপনার একটি বস্তা টাকা! আমি আপনার নিজের চোখে দেখেছি। ইন্দ্র রায় মশায়ের ওখানে কাল আমার নেমন্তন্ন ছিল কিনা!

—ইন্দ্র? তা ইন্দ্র চর বন্দোবস্ত করছে না কি?

—হ্যাঁ। উনিই তো এখন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর সব দেখা-শোনা করছেন। বলিয়াই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—হুঁ:—কোনই খোঁজ রাখেন না আপনারা!

হরিশ রায় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—এই দেখুন—এমন খোঁজ নাই যা হরিশ রায়ের কাগজে নাই! বুঝলেন—নবাব মুরশিদ-কুলিখাঁর আমল থেকে থাক, নক্সা, জমাবন্দী, জরিপী খতিয়ান জমা ওয়াশীল—সব আমার কাছে আছে। কি বলব, পয়সা তেমন নাই হাতে, তা নইলে 'চাক-চান্দী' লাগিয়ে দিতাম আমি। আর আপনার অধমও করতে চাই না তাই! যদি একটি কলম আমি খুঁচি, সব ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে। দেখি না, হোক না বন্দোবস্ত! আমরা এতদিন চুপ করেই ছিলাম, বলি—চক্রবর্তীরা আমাদেরই দৌহিত্র, তা খাচ্ছে খাক। কিন্তু এ তো হবে না মশাই!

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—সে আপনারা যা করবেন করুন গে মশাই। চর তো আজই বন্দোবস্ত হবে!

হাসিয়া হরিশ বলিলেন—দেখুন না, বেবাক কাগজ আজ বার করছি। একবারে কড়া-ক্রান্তি—মায় ধূল পর্য্যন্ত মিলিয়ে দেখিয়ে দেব চর কার!

অচিন্ত্যবাবু ঠিকাদারকে বলিলেন—তা হ'লে, তুমি কখন যাবে বল তো? সন্ধ্যেবেলা, কেমন?

হরিশ জলের কুলকুচা ফেলিতে ফেলিতে আপন মনেই বলিলেন—কি আর বলব ইন্দ্রকে! লজ্জার ঘাটে আর মুখ ধোয় নাই। ছি ছি ছি! এতবড় কাণ্ডটার পরেও আবার রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তির দেখা-শোনা করছে! ছি!

অচিন্ত্যবাবু মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেই তো বলছিলাম মশাই, কি খবর আর রাখেন আপনি? মাটির খবর নিয়েই মেতে আছেন আপনি। মানুষের মনের খবর কিছু রাখেন? ইন্দ্র রায় পাকা ছেলে! লজ্জার ঘাটে মুখ ধুয়ে বসে থাকলে ইন্দ্র রায়ের কন্যাদায় উদ্ধার হবে? রায় ঐ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ছোট ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে!

—বলেন কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই বলি আমি। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীকে

ইন্দ্র রায় বাঁধছে। তা ছাড়া রূপে গুণে এমন পাত্র পাবেন কোথায়?

—আরে মশাই, ওদের আর আছে কি?

—নাই, তাই মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে রায় নগর বসাচ্ছেন চরে।

—হুঁ। কিন্তু রামেশ্বরের যে কুষ্ঠ হয়েছে শোনা যায়।

—আজ্ঞে না। সে সব ওঁরা রক্ত পর্য্যন্ত পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছেন। ওটা হ'ল রামেশ্বরবাবুর পাগলামি। আচ্ছা, চলি আমি।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমিও যাব। দন্ত মার্জ্জনা অর্দ্ধসমাপ্ত ভাবেই শেষ করিয়া হরিশ রায় উঠিয়া পড়িলেন। অচিন্ত্য বাবুর সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিলেন—দেখুন না, আমি কি করি। তামাম কাগজ আমি এখুনি গিয়ে বের ক'রে ফেলব। সব শরিককে ডাকব। সকলে মিলে বলব—রায়কেও বলব, মহাজনকেও বলব। চোখে আঙুল দিয়ে সব দেখিয়ে দোব। শোনে ভাল, না শোনে কালই সদরে গিয়ে—দোব এক নম্বর ঠুকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইনজাংসন! করুক না, কি ক'রে কল করবে। কল বসাবে—নগর বসাবে!

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—কল বসলে সর্ব্বনাশ হবে মশাই! রাজ্যের লোক এসে জুটবে—কুলী-কামিন-গুণ্ডা—বদমায়েস সব, চুরি-ডাকাতি, রোগ—সে এক বিশ্রী ব্যাপার মশাই। তা ছাড়া সমস্ত জিনিস হয়ে যাবে অগ্নিমূল্য। গেরস্ত লোকেরই হবে বিপদ।...তার চেয়ে অন্য উপায়ে উন্নতি কর না নিজের! কত ব্যবসা রয়েছে। এই ধরুন গাছ-গাছড়া চালান দাও, খসখস—অচিন্ত্যবাবু সহসা চুপ করিয়া গেলেন।

হরিশ রায় তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—আসুন আপনি, আপনাকেই দেখাব আমি কাগজ। আপনি ইন্দ্রর বন্ধুলোক—কই আপনিই বলুন তো ন্যায্য কথা! আয়নার মত কাগজ—এক নজরে বুঝতে পারবেন। ইন্দ্র না হয় বড়লোক, আমাদের না হয় পয়সা নাই। তাই বলে এই অধর্ম্ম করতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিশ রায়ের বাড়ীতে রায়-বংশের প্রায় সকল শরিকই আসিয়া জুটিয়া গেল। আস্ফালন কটূক্তিতে প্রসন্ন প্রভাত কদর্য্য তিক্ত হইয়া উঠিল। নিতান্ত সন্ততিহীন এক নাবালক-পক্ষের অভিভাবিকা নাগিণীর মতই বিষোদ্গার করিয়া কেবল অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল,—ধ্বংস হবে ধ্বংস হবে! ভোগ করতে পাবে না। অনাথা ছেলেকে আমার যে ফাঁকি দেবে—তার মেয়ে বাসরে বিধবা হবে। নির্ব্বংশ হবে! এই আমি ব'লে রাখলাম।

* * *

ইন্দ্র রায় ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

রায়গোষ্ঠী দল বাঁধিয়া আসিয়া অধঃপতিত আভিজাত্যের স্বভাবধর্ম্ম অনুযায়ী যে কদর্য্য দম্ভ ও কুটিল মনোবৃত্তির পরিচয় দিল তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিশেষ করিয়া রায়বংশের গঞ্জিকাসেবী এক শরিক শূলপাণি যখন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া কদর্য্য ভঙ্গীতে হাত-পা নাড়িয়া বলিল—অ্যাঁঃ, বাবু আমার 'নগর' বসাবেন মেয়ে-জামায়ের লেগে! আর আমরা সব ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখব, না কি?

ইন্দ্র রায় বলিলেন, শূলপাণি, শূলপাণি, কি বলছ তুমি?

রায়ের মুখের কাছে হাত-পা নাড়িয়া শূলপাণি বলিল—আহা হা—ন্যাকা আমার রে, ন্যাকা! বলি, আমরা কিছু বুঝি না—না কি? রামেশ্বরের বেটার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবার কথা আমরা বুঝি না বুঝি?

ইন্দ্র রায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল পায়ের তলায় পৃথিবী বুঝি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! সভয়ে তিনি চোখ বুজিলেন, তাঁহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—গত সন্ধ্যায় উপাসনার সময়ের মনশ্চক্ষে দেখা দৃশ্য। চক্রবর্ত্তী-বাড়ী ও রায়-বাড়ীর জীবনপথের সংযোগ-স্থলে—ভাঙনের অতল অন্ধকূপ!

শূলপাণি কদর্য্য ভাষায় আপন মনেই বকিতেছিল; অন্যান্য রায়েরা আপনাদের মধ্যেই উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করিতেছিল; হরিশ রায় বেশ বুঝাইয়া বলিবার ভঙ্গিতে বলিল—বেশ তো! পাঁচ জনে একসঙ্গে মজলিস ক'রে ব'স; আমি ফেলে দি তামাম কাগজপত্র—একটি একটি

ক’রে—একবারে রুদ্রাক্ষের মালার মত গাঁথা! দেখ, বিচার ক’রে দেখ—যদি সকলের হয় সকলে নেবে। চক্রবর্ত্তী-দের একা হয়—একাই নেবে চক্রবর্ত্তীরা। একা তোমার হয় তুমি নাও, তার পর তুমি দান কর মেয়ে-জামাইকে—নিজে রাখ—যা হয় কর! তখন বলতে আসি—কান দুটো ধরে মলে দিয়ো।

ইন্দ্র রায়ের কানে ইহার একটা কথাও প্রবেশ করিল না। ধীরে ধীরে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া এতক্ষণে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তারা—তারা মা! তার পর তিনি ডাকিলেন—গোবিন্দ! ওরে গোবিন্দ!

গোবিন্দ, রায়ের চাকর। চাকরের সাড়া না পাইয়া তিনি ডাকিলেন—ঘরের মধ্যে কে রয়েছে?

ঘরের মধ্যে ছিল অমল ও অহীন্দ্র। অহীন্দ্র বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্তম্ভিতের মত বসিয়াছিল, আর অমল হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল, বলিল—কুরুকুল চীৎকার করছে, পাণ্ডব-যাদবের মিতালি দেখে। মাই গড!

পিতার স্বর শুনিয়া সে হাসি থামাইয়া বাহিরে আসিতেই রায় বলিলেন—গোবিন্দ কোথায়? এঁদের তামাক দিতে বল তো!

শূলপাণি বলিল—তামাক আমরা ঢের খেয়েছি, তামাক খেতে আমরা আসি নি। আগে আমাদের কথার জবাব চাই!

—কথার জবাব? সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে রায়ের মাথা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল কিন্তু বিপুল ধৈর্য্যের সহিত আত্মসম্বরণ করিয়া কিছুক্ষণ পর বলিলেন—জবাব আমি এখনই দিতে পারলাম না। ও-বেলায় দু-এক জন আসবেন, জবাব দেব আমি।

শূলপাণি আবার লাফ দিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু হরিশ তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল,—থাম তুমি শূলপাণি; ইন্দ্র হ’ল এখন আমাদের রায়গুষ্টির প্রধান লোক, তার সঙ্গে এমন ক’রে কথা কইতে নাই। আমি বলছি।

শূলপাণি সঙ্গে সঙ্গে হরিশের উপরেই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল—যা যা বাঃ—তোবামুদে কোথাকার! তোবামুদি করতে হয় তুই করগে যা! আমি করব না। আচ্ছা, আচ্ছা, কে যায় চরের উপর দেখা যাবে। বলিয়া সে হন হন করিয়া কাছারির বারান্দা হইতে নামিয়া চলিয়া গেল।

হরিশ বলিল—তা হ’লে মামলা-মোকদ্দমাই স্থির ইন্দ্র?

ইন্দ্র রায় বলিলেন—আপনারা আগে আগে গেলে আমাকে রামেশ্বরের হয়ে পেছন পেছন যেতে হবে বই কি!

হরিশ বলিল—তুমি ঠকবে ইন্দ্র। আমার কাছে এমন কাগজ আছে—একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র!

ইন্দ্র রায় হাসিলেন; কোন উত্তর দিলেন না। আবার এক বার আস্ফালন করিয়া সকলে চলিয়া গেল। শূলপাণি তখনও চলিয়া যায় নাই, সে ইন্দ্র রায়ের দারোয়ানের নিকট হইতে খইনি লইয়া খাইতেছিল।

রায় আজ অসময়ে অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—হৈম! আমার আহ্নিকের জায়গা কর তো!

অন্দর হইতে হৈমবতীও সমস্ত শুনিয়াছিলেন, তিনিও আজ দিগ্‌ভ্রান্তের মত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। উমা, তাঁহার বড় আদরের উমা! অহীন্দ্রও সোনার অহীন্দ্র! কিন্তু এ তো কোনদিন তিনি কল্পনা করেন নাই!

স্নান-আহ্নিক শেষে রায় আহারে বসিলেন, হৈম বলিলেন—ওদের কথায় তুমি কান দিয়ো না। কুৎসা করা ওদের স্বভাব।

রায় মৃদু হাসিলেন, বলিলেন—আমি বিচলিত হই নি হৈম।

*   *   *

সন্ধ্যায় তিনি বিমলবাবুকে লইয়া বসিলেন। বাধা-বিঘ্নের সম্ভাবনার কথা সমস্তই বলিয়া বলিলেন—বাধা-বিঘ্ন হবে এ আমি বিশ্বাস করি না। ওদের আমি জানি। তবে সমস্ত কথা আপনাকে আমার বলা দরকার। তাই বলছি। আপনি কাগজপত্র দেখুন—দেখলে সত্যকার আইনের দিকটাও দেখতে পাবেন।

বিমলবাবু কাগজপত্রগুলি গভীর মনঃসংযোগ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তার পর বলিলেন—আমার দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই, আজই দলিল হয়ে থাক।

টাকাকড়ির কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া তিনি অমলকে

পাঠাইলেন সুনীতির নিকট। সুনীতির অনুমোদন লওয়া আবশ্যক। কিছুক্ষণ পর অমল ও অহীন্দ্র দুই জনেই ফিরিয়া আসিল। অহীন্দ্র বলিল—মা বললেন, আপনি যা করবেন তাই তাঁর কাছে শিরোধার্য্য। তবে একটা কথা তিনি বলেছেন—।

রায় হাসিয়া বলিলেন—কি বল!

—নবীন বাগ্দীর স্ত্রী তাঁর কাছে এসেছিল। আর বাগ্দীরাও এসেছিল সঙ্গে। তারা আমাদের পুরনো চাকর। তারা কিছু জমি চায়।

রায় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—ভাল, তাদের জন্যে পঁচিশ বিঘে জমি রেখেই বন্দোবস্ত হবে। কিন্তু চরটা তা হ'লে মাপ করার দরকার। আজ দলিলের খসড়া হয়ে থাক—কাল মাপ ক'রে দলিল লেখা হবে, কি বলেন বিমলবাবু?

বিমলবাবু বলিলেন—তাই হবে।

—তা হ'লে আমি সন্ধ্যা সেরে আসি। রায় উঠিলেন কিন্তু যাওয়া হইল না। বারান্দায় বাহির হইতে দেখিলেন যোগেশ মজুমদার বাগানের রাস্তা ধরিয়া কাছারির দিকে আসিতেছে। মজুমদারের সঙ্গে একজন চাপরাশী। মজুমদার এখন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বিক্রীত সম্পত্তির মালিক—রায়েদের শরিক জমিদার। ইন্দ্র রায় ঈষৎ হাসিলেন, হাসিয়া সম্ভাষণ করিলেন—এস এস মজুমদার এস। কি ব্যাপার? হঠাৎ?

স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের হাসি হাসিয়া মজুমদার বলিল—এলাম আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে।

রায় বলিলেন—শ্রী যে ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে মজুমদার, এখন শুধু চরণই অবশিষ্ট। সুতরাং কথাটা তোমার বিনয় ব'লেই ধরে নিলাম। এখন আসল কথাটা কি বল তো। সংক্ষিপ্ত হ'লে এখনই বলতে পার; সময়ের দরকার হ'লে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমার সন্ধ্যার সময় চলে যাচ্ছে।

মজুমদার বলিল—কথা অল্পই। মানে, আপনি ত জানেন, চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর সেই ঋণটা, সেটা বেনামীতে আমারই দেওয়া। নিলামে সম্পত্তি ডাকলাম—এখনও বাকী অনেক। আজ শুনছি চরটাও বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে। তা আমার কি ব্যবস্থা হবে?

রায় অদ্ভুত হাসি হাসিয়া মজুমদারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কথাটার উত্তর কি আমারই কাছেই শুনবে মজুমদার? চক্রবর্ত্তী-বাড়ী তো তোমার অচেনা নয়!

কথাটার সুরের মধ্যে সূঁচের মত তীক্ষ্ণতা ছিল, মজুমদার সে তীক্ষ্ণতার আঘাতে হিংস্র হইয়া বলিয়া উঠিল—আপনিই যে এখন ও-বাড়ীর মালিক রায়মশাই রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধী—আবার হবু বেয়াই—

রায় গভীরভাবে নিশ্বাস টানিয়া অজগরের মত ফুলিয়া উঠিলেন, বলিলেন—হ্যাঁ, রামেশ্বরের সম্বন্ধীও আমি বটে আবার বেয়াই হবার সংকল্পও করলাম। এখন উত্তরটা আমার শোন, চাকরের কাছে ধার—জানি সে আমার টাকা চুরি ক'রেই আমাকে ধার বলে দিয়েছে—সে যখন ধার বলেই নিয়েছি তখন আমার ভগ্নীপতি—কি আমার ভাবী বেয়াই—কখনও না বলবেন না।

মজুমদার মুহূর্ত্তে এতটুকু হইয়া গেল। রায় বলিলেন—কাল সকালে এস তোমার হ্যাণ্ডনোট নিয়ে। তার পর কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মৃদু ও মিষ্ট করিয়া বলিলেন—ব'স, তামাক খাও! গোবিন্দ! মজুমদার মশায়কে তামাক দাও!

তিনি অন্দরে চলিয়া গেলেন; চলিতে চলিতেই গভীর স্বরে তিনি ডাকিলেন—তারা—তারা মা!

ক্রমশঃ

বিজ্ঞানে কালের ধারণা

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম্. এ., পিএইচ. ডি.

কোন্ অতীত কাল হইতে কালের ধারণা সম্বন্ধে কি দর্শনে কি বিজ্ঞানে কত যে আলোচনা হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ; উহার রহস্যজাল উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা এখনও সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে কিনা বলা যায় না। হিন্দু দর্শনে ও গ্রীক দর্শনে কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল ; সেই প্রাচীন দার্শনিকেরা সকলেই কালকে বাহ্যজগতের নিয়ন্তা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন, তাঁহারা অখণ্ড কালকে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া উহার স্বরূপ বুঝাইতে ও উহার পরিমাপ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানে কালের সম্বন্ধে আলোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহার অনেক পরে। দর্শনের দিক্ দিয়া কল্পনা-জল্পনা হইতে হইতেই যে বৈজ্ঞানিকভাবে কালের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টার আরম্ভ হয়, তাহা নিশ্চিত। দর্শনের ইতিহাসে যে-যুগকে বৈজ্ঞানিক যুগ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং যাহার প্রবর্ত্তক ছিলেন প্রসিদ্ধ শিল্পী ও দার্শনিক লিওনার্দো দা· ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯), সেই যুগেই কাল সম্বন্ধে গবেষণাকে সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার প্রয়াস হইল। লিওনার্ডো বলিলেন—যাহার পরিমাপ হয় না, তাহা জানা যায় না ; যাহার পরিমাপ হয়, তাহাই জানা যায় ; সুতরাং সকল ঘটনাই গতির নিয়মাধীন গণিতের কতকগুলি বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহার মতে কালের ধারণা করিতে হইলে উহার পরিমাপ করা চাই, এবং উহার পরিমাপ করিতে হইলে গতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই ; ইহাই কালের ধারণা ও পরিমাপ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

প্রায় এই সময়ে নিকলাস কোপার্নিকস (১৪৭৩-১৫৪৩) প্রচার করিলেন যে, সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পরিক্রমণ করিতেছে ; অবশ্য, তিনি যে পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা এই মতবাদে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই, তবে তাঁহার এই সিদ্ধান্তে পৃথিবী যে স্থির এবং পৃথিবীই যে জ্যোতিষ্কদিগের পরিভ্রমণ-পথের কেন্দ্র এই মতবাদ বিদূরিত হইল। ইহার কিছু পরেই টাইকো ব্রাহি পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে (১৫৪৬-১৬০১) কালের পরিমাপের উপযোগী নানা জ্যোতিষিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। কিন্তু তিনিও প্রচলিত মতবাদ উপেক্ষা করিয়া সম্পূর্ণরূপে কোপার্নিকসের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিতে পারিলেন না এবং দুই মতবাদের একটা সামঞ্জস্য করিবার অভিপ্রায়ে তিনি প্রচার করিলেন যে সূর্য্য ও চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে আর অন্যান্য গ্রহ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে।

প্রায় এই সময়ে গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪১) টেলিস্কোপের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোপার্নিকসের মতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করিলেন এবং নানা প্রমাণের দ্বারা গতির বৈজ্ঞানিক বিধির উদ্ভাবন করিলেন। তিনি গতি ও কালের স্পষ্টতর সংজ্ঞা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন এবং গণিতের সাহায্যে যে কালের পরিমাপ হয় তাহাও প্রচার করিলেন। গ্যালিলিয়োর মতে সমস্ত গতিরই স্থান বা দূরত্বের মাপ-কাঠি দিয়া পরিমাপ করা যায় এবং কাল গতিরই পরিমাপক। ইহাতে স্থান ও কালের একটা নূতন সংজ্ঞালাভ হইল, কাল আর কেবল গতির পরিমাপ রহিল না, কাল গতি হইতে স্বতন্ত্র অথচ গতির দ্বারা পরিমিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। সুতরাং গ্যালিলিও স্থির করিলেন যে কাল ইউক্লিডের সরল রেখার দ্বারা সূচিত হইতে পারে।

কালের যথার্থ পরিমাপের সুবিধার জন্য কোপার্নিকসের

মতবাদের প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এই জন্য কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) যখন তাঁহার উদ্ভাবিত গ্রহগতির নূতন বিধির সাহায্যে কোপার্নিকসের সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখনই কালের পরিমাপ গণিতের বিধিনিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল।

এই সময়ে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) গতির সাহায্যে কালের ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হইলেন এবং প্রচার করিলেন যে কালের ধারণা কয়েকটি নিয়মিত গতির তুলনায় সম্ভব হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন—সকল গতিই আপেক্ষিক, কারণ বিশ্রাম ও চলিষ্ণুতা আপেক্ষিক শব্দ না হইয়াই পারে না এবং বিশ্বেও কোনও স্থির বিন্দু কল্পিত হইতে পারে না। গতি ও বিশ্রাম কেবল কোনও কিছু নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে এবং সেই হেতু আপেক্ষিক, এবং বিশ্বে এমন কোন সদাস্থির বিন্দু নাই যাহার সাহায্যে নিরপেক্ষ গতি নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়া দেকার্তে আপেক্ষিকতাবাদের মূলসূত্রের পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু কালের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে তিনি ইহা অপেক্ষা আর অধিকদূর অগ্রসর হন নাই। তিনি কাল ও স্থিতিসময়ের (duration) মধ্যে একটা প্রভেদ টানিয়া বলিলেন, কাল কোনও একটা স্থিতিসময়ের কল্পনা করিবার পদ্ধতি মাত্র।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক যুগের আরম্ভ হইল • সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নিউটনের শিক্ষাগুরু অধ্যাপক ব্যারো কালের বৈজ্ঞানিক ধারণাসম্বন্ধে একটি নূতন আলোক সম্পাত করিলেন। তিনি কাল ও গতিকে সমার্থদ্যোতক মনে করিতেন না, এবং ইহাও স্বীকার করিতেন না যে, কালের ধারণা করিতে হইলে গতিকে টানিয়া আনিতে হইবে। তিনি মনে করিতেন যে, কালের ধারা গতি ও বিশ্রাম উভয় হইতেই স্বতন্ত্র। ব্যারো বলিলেন যে, কালের নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে এমন কোন একটি গতিবিশিষ্ট পদার্থ নির্ব্বাচন করিতে হইবে যাহা গতির বিভিন্ন সময়ে স্থিরবেগে সমান সমান পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। তাই তিনি প্রচার করিলেন, কাল আর গতি এক নয়, যদিও কালের পরিমাপকই গতি। তিনি কাল ও গতির সম্পর্ক লইয়া বিশদ আলোচনা করিলেন এবং কালকে গণিতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি বিশিষ্ট মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কাল যে শুধু গতির পরিমাপক ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; তিনিই প্রথমে গণিতের বিধানে কালের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলেন। এই আলোচনার দ্বারা তিনি শুধু যে তাঁহার মনস্বী ছাত্র নিউটনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন, তাহা নহে, তিনি নিউটনের মতবাদের যে সমালোচনা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতাবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারও সূচনা করিয়া দিয়া গেলেন।

অতএব নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) যখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তিনি এই সমস্যা সম্বন্ধে অধ্যাপকের সবটুকু জ্ঞানের অধিকারী হইয়াই অগ্রসর হইলেন এবং সমসাময়িক বিজ্ঞানের গতিকে এমন একটা বেগ দিয়া গেলেন যে তাহা পরবর্ত্তী দুই শতাব্দী ধরিয়া স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিল। নিউটন কালকে দুই ভাবে ধারণা করিলেন,—স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ কাল, আর সাপেক্ষ বা লৌকিক কাল, যেমন মাস, ঘণ্টা প্রভৃতি। তিনি নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র কালকে গণিতের ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী বলিয়া গণ্য করিলেন এবং ইহাকেই তিনি বলিলেন স্থিতিকাল (duration); তাঁহার মতে এই কালের প্রকৃতিই ইহার সমগতিত্ব এবং ইহার সহিত বাহ্যবস্তুর কোনও সম্পর্ক নাই। এইরূপ কাল সদাস্থির, গণিতের ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চয়ই কল্পনা করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহার প্রকৃত কোন সত্তা আছে কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয় এবং আপেক্ষিকতাবাদের ইহাই প্রধান বক্তব্য যে এইরূপ নিরপেক্ষকালের কোন অস্তিত্ব নাই। প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ কালের ধারণায় যে প্রাথমিক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, তাহা নিউটনও স্বীকার করিয়াছিলেন, কারণ তিনিও বলিয়াছিলেন, "হয়ত বিশ্বে এমন কোন সমভাবাপন্ন গতি নাই যাহা কালের যথার্থ পরিমাপক রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।" সুতরাং নিরপেক্ষ কাল জানাও যায় না, পরিমাপ করাও যায় না, এবং মানুষের অনুভব-শক্তির পক্ষে অজ্ঞাতই

রহিয়া যাইবে। যাহা হউক, নিউটন কালের পরিমাপের জন্য অনন্ত শূন্যে ভ্রাম্যমাণ পৃথিবীকে সময়-নির্দ্দেশক ঘটিকাযন্ত্র রূপে গ্রহণ করিলেন। এই কল্পনাও নিউটনের নিরপেক্ষ কালের পরিমাপের পক্ষে একেবারে নির্ভুল হইল না, কারণ ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে পৃথিবীর উপর কার্য্যকরী সমগ্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ঠিক উহার জড়-কেন্দ্রের (centre of mass) মধ্য দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই প্রাথমিক ত্রুটি সত্ত্বেও নিউটনের নিরপেক্ষ কালের ধারণার সাহায্যে প্রকৃত গণনায় যে বৈষম্য দেখা যায়, তাহা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং জ্যোতির্ব্বিদেরা কয়েক বৎসর পর্য্যবেক্ষণ করিলেই ইহা সহজেই বাহির করিয়া ফেলিতে পারেন। এই জন্যই আপেক্ষিকতাবাদের (Theory of Relativity) পক্ষপাতী বৈজ্ঞানিকেরা নিউটনের কালের ধারণার তীব্র সমালোচনা করিলেও গণিতের ক্ষেত্রে উহা পরিত্যক্ত হয় নাই, এমন কি সাধারণ গণিতের গণনার পক্ষে উহা যথেষ্ট উপযোগী বলিয়াই গণ্য হইয়া আসিতেছে।

অবশ্য নিউটনের সমসাময়িক পণ্ডিতেরাও তাঁহার কালের ধারণার সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই; তাঁহারা বলিতেন যে সমস্ত গতিই সাপেক্ষ এবং উহা নিরপেক্ষ হইতেই পারে না। তাঁহাদের মতে এই যে স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ কাল, হয়ত ইহা গণিতের ক্ষেত্রে উপযোগী, কিন্তু একেবারেই অসম্ভব কল্পনা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় উহার কোন অস্তিত্বই নাই। নিউটনের সমালোচকদিগের মধ্যে লিবনিজের (১৬৪৬-১৭১৬) সমালোচনাই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। তিনি বলিলেন—অবশ্য কালের একটা আদর্শ স্বরূপ ধারণা করিবার পক্ষে ইহার উপযোগিতা আছে, কারণ সংখ্যা যেমন গণনীয় দ্রব্য হইতে স্বতন্ত্র, ইহাও তেমনই বাস্তব বস্তুর নিরপেক্ষ, কিন্তু তাহা হইলেও নিউটনের স্বতন্ত্র কাল ও তাহার প্রবহমান ধারা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। তিনি প্রচার করিলেন, কাল সম্পূর্ণরূপে অন্য সম্পর্কযুক্ত ও ধারাবাহিক, ইহাই লিবনিজের কালের ধারণা সম্বন্ধে সম্পর্কবাদ (Relational Theory)। এইরূপে শতাব্দী ধরিয়া নিউটনের নিরপেক্ষবাদের সমালোচনা চলিল এবং যতই কালের পরিমাপ সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধানের প্রয়োজন হইতে লাগিল, ততই ক্রমশঃ কাল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আপেক্ষিকতা-বাদের পৌঁছিবার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

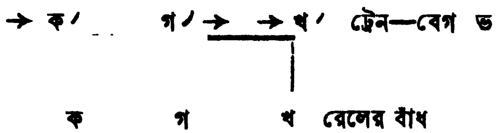
যখনই আমরা কালের পরিমাপ করিতে অগ্রসর হই, তখনই আমাদিগের এমন কিছু বস্তুর আশ্রয় লইতে হয়, যাহার সহিত কালের কোনও বাহ্য সম্পর্ক নাই। আমরা কোনও একটা বিশিষ্ট গতি বা কতকগুলি গতির সাহায্যে কালের ধারণা করিতে চাই। এই ব্যাপারে আমরা অতীতে ও বর্ত্তমানে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছি - বাতির প্রজ্জ্বলন, বালুঘড়ির প্রক্রিয়া, সূর্য্য-ঘড়ির ছায়া, নাড়িকা বা জলঘড়ি, অথবা সাধারণ যন্ত্রঘড়ি; এই সমস্তই গতির সাহায্যে কালের পরিমাপ। এই হিসাবে সূর্য্যই দিনরাত্রি বা ঋতুকাল সমস্তেরই সাধারণ নির্দ্দেশক এবং সেই হেতু কালের পরিমাপক। আবার সৌরজগতের বাহিরে আলোকরশ্মির গতিবেগই কালের নির্দ্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং কালের কোনও অংশকে এই সকল পন্থা ভিন্ন অন্য উপায়ে পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু এগুলিও একেবারে নির্ভুল গণনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই জন্যই দেশ বা কালের পরিমাপ কতকটা (approximate) ন্যূনাধিক অর্থাৎ একেবারে ঠিক হয় না। জ্যোতিষীরা নক্ষত্রকে ঘড়ি কল্পনা করিয়া কালের পরিমাপ আরম্ভ করিলেন; একটি নক্ষত্র একবার মাধ্যাহ্নিকে উদিত হইয়া আবার সেই মাধ্যাহ্নিকে দেখা দেওয়া পর্য্যন্ত যে সময়ের ব্যবধান, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া এই ঘটিকার কল্পনা হইয়াছে। কাজেই একটি স্থির নক্ষত্রকে নির্দ্দেশ করিয়া পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর পরিক্রমণের কালকে অর্থাৎ নাক্ষত্রিক বা সাবন দিনকে কালের পরিমাপ করিবার মাপ ধার্য্য করা হইল। কিন্তু ইহাও তেমন সন্তোষজনক নহে, কারণ ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে নিজ অক্ষের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর দুইটি সম্পূর্ণ পরিক্রমণের সময় একই হইবে।

কালের পরিমাপ ব্যাপারে অন্তর্নিহিত জটিলতা তখনই বিশেষ সুস্পষ্ট হইয়া প্রতীয়মান হয়, যখন আমরা

"সমকালীনতা" (simultaneity) কথাটির আলোচনা করিতে অগ্রসর হই। আমরা দুইটি অনুভূতিকে তখনই সমকালীন বলি যখন উহাদিগকে একই সময়ে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় এবং যখন এই অনুভূতি পর্য্যায়ক্রমিক নয়; দুইটি ঘটনাও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সমকালীন, যখন উহারা যে একসঙ্গেই ঘটিতেছে তাহা আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে অনুভব করি। কিন্তু ব্যাপারটি জটিল হইয়া উঠে তখনই যখন কোন এক স্থলে অনুভূত একটি ঘটনাকে ঘটনাক্ষেত্রের বহুদূরে সংঘটিত কোনও মানসিক অনুভূতির সহিত সমকালীন বলা হয়। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতির্ব্বিদ টাইকো ব্রাহি একটি নূতন নক্ষত্রের আবিষ্কার করিলেন, উহার আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা নিকট স্থির নক্ষত্র হইতে আলোক পৃথিবীতে আসিতেও চারি বৎসর কাটিয়া যায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে ৪০০,০০০ বৎসরে আসিয়া পৌঁছায়। এমন কি সূর্য্যালোকও পৃথিবীতে পৌঁছিতে আট মিনিট অতিবাহিত হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে-সব ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহাদিগকে সমকালীন বলিবার পক্ষে যে অন্তর্নিহিত বাধা রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সমস্ত দেখিয়াই এডিংটন বলিয়াছেন, সমকালীনতা প্রমাণ করিতে যে কোন উপায়ই আমরা অবলম্বন করি না কেন, তাহা কতকটা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হয় (is a convention); দুই ভাবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়:—(১) একটি ঘড়িকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইলেও উহা ঠিক সময় নির্দ্দেশ করিবে, (২) একটি সরল রেখায় আলোকের অগ্রগমনের বেগ উহার পশ্চাদ্ গমনের বেগের সহিত সমান। এ ক্ষেত্রেও এডিংটন বলিতেছেন যে পূর্ব্বোক্ত ধারণার কোনটিই পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, ইহা কেবল বিশ্বে কাল্পনিক সময়-কণাগুলিকে ব্যক্ত করিবার নির্দ্দেশমাত্র।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেলসন আলোক-রশ্মি লইয়া তাঁহার গবেষণা আরম্ভ করিলেন, ইহাতে তিনি ফিজোঁর পরীক্ষিত সিদ্ধান্তগুলির সাহায্য লইলেন। ছয় বৎসর পরে মর্লির সাহচর্য্যে তিনি তাঁহার প্রধান গবেষণাটি পুনরায় পরীক্ষা করিলেন, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মর্লি ও মিলার উভয়ে আরও যত্ন সহকারে এই পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করিলেন। এই সমস্ত গবেষণাই, ১৮৮১ সালে মাইকেলসন যে সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাদেরই সমর্থন করিল। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দুইটি সময়াংশের পরিমাপ ও তুলনা অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থায় সম্পন্ন দুইটি ঘটনার সময়ব্যবধানের পরিমাপ। এইরূপভাবে পরীক্ষাটি করা হইয়াছিল— একটি আলোকতরঙ্গকে ক বিন্দু হইতে খ বিন্দুতে চালিত করা হইল, আবার খ বিন্দু হইতে ক বিন্দুতে ফিরাইয়া আনা হইল, একই সময়ে আলোকরশ্মির সঙ্কেত প্রতি-ফলিত করিবার জন্য দর্পণ ব্যবহার করা হইল। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল কখ ও খক দূরত্ব যাইতে আলোক-রশ্মি যতটা সময় লয় তাহার তুলনা,—(১) যখন কখ রেখাটি নিজ কক্ষে পৃথিবী যেদিকে ভ্রমণ করিতেছে, সেই দিকেই স্থাপিত, (২) যখন কখ রেখাটি পৃথিবী যে দিকে ভ্রমণ করিতেছে, তাহার লম্বভাবে অবস্থিত। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে এই দুই সময়ের মধ্যে প্রভেদ নাই। আলোকের এই সমগতিত্বের উপরই আইন-স্টাইনের সমকালীনতার বিচার নির্ভর করিতেছে। আইনস্টাইন বলিলেন—দুইটি ঘটনা সমকালীন বলিয়া গণ্য হইবে যদি দর্শক উহাদের ক্ষেত্র হইতে সমদূরে অবস্থিত হইয়া দুইটি ঘটনাকে একই সময়ে ঘটিতে দেখিতে পায় বা অনুভব করে। ইহার মূলে রহিয়াছে আলোকের গতিবেগ যে অপরিবর্ত্তনশীল এই ধারণা, অর্থাৎ আলোক-রশ্মি যে সকল দিকে সমান বেগে গমন করিতেছে এই ধারণা। এই ধারণাটি মাইকেলসন ও মর্লির আলোক-তরঙ্গ লইয়া পরীক্ষার ফলসম্ভূত এবং সমকালীনতার বিচারের মূল স্বরূপ। আইনস্টাইন আরও বলেন যে এই সমকালীনতা আপেক্ষিক এবং আদৌ নিরপেক্ষ নয়, এক নির্দ্দেশক ক্ষেত্রের তুলনায় যে ঘটনাগুলি সমকালীন, অন্য নির্দ্দেশক ক্ষেত্র যদি প্রথমটির সম্পর্কে গতিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির তুলনায় সমকালীন নয়। সমকালীনতার এই নির্দ্দেশের উপর

ভিত্তি করিয়া আইনস্টাইন নিম্নলিখিত নিদর্শনের অবতারণা করিয়াছেন—



একটা রেলের বাঁধের উপর ক ও খ দুইটি স্থানে আলোর প্রকাশ হইল, কি করিয়া বুঝা যাইবে উহারা সমকালীন (simultaneous) কি না। ধরা যাউক, একটা খুব দীর্ঘ ট্রেন রেল দিয়া স্থির বেগ (ভ)এর সহিত চিত্রে নির্দ্দেশিত দিকে গমন করিতেছে। ট্রেনের আরোহীরা এই ট্রেনকে নির্দ্দেশক ক্ষেত্র (reference-body) ধরিয়া লইয়া উহার সম্পর্কে সকল ঘটনার স্থান ও কাল স্থির করিবে। তাহা হইলে রেলের লাইনে যে কোন ঘটনা ঘটিবে, তাহা ট্রেনের কোন এক স্থানে অনুভূত হইবে। এখন এই প্রাথমিক নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়া রেলের লাইনে কখ দূরত্ব মাপিয়া একটি সরল রেখা কাটিয়া লওয়া হইল, ক ও খ এর মধ্যপথে গ বিন্দু স্থির করা গেল; এইখানে এক জন দর্শক লাইনের লম্বভাবে দুইটি দর্পণ লইয়া দাঁড়াইল, ইহাতে একই সময়ে ক ও খ-কে প্রতিফলিত দেখা যাইবে। এখন এই দর্শক যদি ক ও খ বিন্দুর আলোকস্ফুরণ একই সময়ে দর্পণে প্রতিফলিত দেখিতে পায়, তাহা হইলে ঐ দুইটি ঘটনা সমকালীন। ইহাতে আসল সমস্যার সমাধান হইল না, সমকালীনতার নির্দ্দেশ হইতেই ইহা স্বীকার করা হইল। প্রকৃতপক্ষে ইহাই বিচার্য্য যে একটি নির্দ্দেশক ক্ষেত্রের সম্পর্কে যে সকল ঘটনা সমকালীন, তাহারা অন্য একটি নির্দ্দেশক ক্ষেত্র যাহা প্রথমটির সম্বন্ধে গতিশীল, তাহার সম্পর্কে সমকালীন কি না। তাহা হইলেই প্রশ্ন হইবে ক ও খ বিন্দুতে আলোকস্ফুরণ রেলের বাঁধ সম্পর্কে সমকালীন বটে, কিন্তু ট্রেনের সম্পর্কেও কি উহারা সমকালীন? আমরা যখন বলি যে ক ও খ বিন্দুর আলোকস্ফুরণ রেলের বাঁধের সম্পর্কে সমকালীন, তাহার অর্থ ক ও খ বিন্দুর আলোকরশ্মি ক ও খ-এর মধ্যবর্ত্তী বিন্দু 'গ'-তে আসিয়া মিলিবে। ধরা যাউক, ক′ ও খ′ ট্রেনের উপর ক ও খ-এর অনুরূপ (corresponding) বিন্দু, আর গ′ ক′ ও খ এর মধ্যবিন্দু। সুতরাং ঠিক যখন বাঁধের উপর আলোক স্ফুরণ হইল, তখন গ বিন্দু গ বিন্দুর অনুরূপ, কিন্তু গ বিন্দু ট্রেনের গতির সঙ্গে সঙ্গে 'ভ' বেগে চলিয়াছে। এখন যদি কোনও দর্শক গ′ বিন্দুতে বসিয়া স্থির থাকিত, ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার গতি না থাকিত, তাহা হইলে গ′ বিন্দু স্থায়ীভাবে গ বিন্দুর অনুরূপ থাকিত এবং ক ও খ বিন্দুতে আলোকস্ফুরণের রশ্মি তাহারই অবস্থানের স্থলে গ′ বিন্দুতে আসিয়া মিলিত। কাজেই এই ক্ষেত্রে ক ও খ বিন্দুতে সংঘটিত ঘটনা দুইটি গ বিন্দু ও গ′ বিন্দু উভয়ের পক্ষেই সমকালীন হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ′ বিন্দুতে অবস্থিত দর্শক ট্রেনের গতিবশে খ বিন্দু হইতে যে আলোকরশ্মি আসিতেছে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, আর ক বিন্দু হইতে যে আলোকরশ্মি আসিতেছে তাহা হইতে সরিয়া যাইতেছে। এই কারণে গ′ বিন্দুতে অবস্থিত দর্শক খ বিন্দুর আলোকস্ফুরণ ক বিন্দুর আলোকস্ফুরণের পূর্ব্বে দেখিবে, এবং ট্রেনের আরোহী দর্শকদিগের নিকট খ বিন্দুর আলোকস্ফুরণ ক বিন্দুর আলোকস্ফুরণের পূর্ব্বে সংঘটিত বলিয়া মনে হইবে। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, যে সকল ঘটনা রেলের বাঁধের সম্পর্কে সমকালীন, তাহারা ট্রেনের সম্পর্কে সমকালীন নয়। কাজেই প্রত্যেক নির্দ্দেশক ক্ষেত্রের (reference-body) সম্পর্কে ঘটনার সময় ভিন্ন অর্থাৎ ঘটনার নির্দ্দেশক ক্ষেত্র বলা না থাকিলে, ঘটনার সংঘটনের সময়ের উক্তির কোন অর্থ হয় না। এই রেলের বাঁধের সাহায্যে সমকালীনতার পরীক্ষা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের বিশিষ্ট বা সীমাবদ্ধ বিধির সাধারণ প্রকাশ মাত্র। ইহাতে সমকালীনতার সহিত পর্য্যায়ক্রমের (succession) ধারণার গোলযোগ হইয়াছে। আইনস্টাইনের সমালোচকেরাও এই কথাই বলিয়াছেন। এই ত্রুটির কথা আইনস্টাইনও বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং ১৯০৫ সালে একটি জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক পত্রে তিনি আপেক্ষিকতাবাদের যে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই রেল-বাঁধের সম্পর্কে পরীক্ষার উল্লেখ

নাই। সেই আলোচনায় আইনস্টাইন লরেঞ্জ (Lorenz)এর গবেষণা ও তাঁহার রূপান্তর সমীকরণ (equations of transformation)এর সাহায্য লইয়াছেন এবং আলোকের গতিবেগ যে সদা স্থির ইহাও মানিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ এই দুই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া সমকালীনতার আপেক্ষিকতা (relativity of simultaneity) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই দুই সিদ্ধান্তই আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের মূলভিত্তি। লরেঞ্জের উদ্ভাবিত সমীকরণ বিধিতে (equations of transformation) সচল ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত ঘটনার সম্বন্ধ-গুলিকে (স্থান ও কালকে) অচল ক্ষেত্রে অনুভূত ঘটনার সম্পর্কে রূপান্তরিত করা হইয়া থাকে। রেল-বাঁধ পরীক্ষার স্থলেও লরেঞ্জের এই রূপান্তর বিধির ব্যবহার করিয়া সচল ট্রেনের সম্পর্কে একটি ঘটনার স্থান ও কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যখন অচল বাঁধের সম্পর্কে সেই ঘটনার স্থান ও কাল আমাদের জানা থাকে। লরেঞ্জের এই গবেষণা হইতে ইহাও স্থির হইল যে, কোন সচল পদার্থের দৈর্ঘ্য সকল দিকে এক থাকে না, ইহার গতির দিকে ইহার দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত হইতে থাকে, অর্থাৎ কোন পদার্থ বিশ্রামের অবস্থায় যেরূপ দীর্ঘ, গতিশীল অবস্থায় সেরূপ নহে, ইহার দৈর্ঘ্যের হ্রাস হইয়া থাকে, এবং যত দ্রুত ঐ পদার্থ গতিশীল, তত অধিক ইহার দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন হইবে। লরেঞ্জের সমীকরণের সাহায্যে আরও প্রমাণিত হইল যে একটি সেকেণ্ডের কাঁটাওয়ালা ঘড়ি অচল ক্ষেত্রে যেমন ভাবে যাইবে, সচলক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা দ্রুত যাইবে, অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় দুইটি সেকেণ্ডের টিক্ টিক্ বাজার মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান, দ্বিতীয় অবস্থায় সেই ব্যবধান কম হইবে। এই দুই সিদ্ধান্ত লরেঞ্জ-ফিজগ্যারেল্ডের রূপান্তর সমীকরণের সাহায্যে প্রাপ্ত ফলাফল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই গাণিতিক সিদ্ধান্ত কখনও ধরা পড়ে নাই, কারণ যে কোনও উপাদান ব্যবহার করা যাউক না কেন, পরিমাপকেরও পদার্থের তুলনায় সঙ্কোচন হইবেই। সেই জন্য এডিংটন বলিয়াছেন, "It must be remembered that the contraction and retardation do not imply any absolute change in the rod or clock. The configuration of events constituting the four dimensional structure which we call a rod is unaltered ; all that happens is that the observer's space and time partitions cross it in a different direction—অর্থাৎ যষ্টি বা ঘড়ির এই যে সঙ্কোচন বা পশ্চাদ্‌গমন বাস্তবিক উহাদের কোনও পরিবর্ত্তন সূচনা করে না, কারণ চার আয়তনের ক্ষেত্রে সংগঠিত ঘটনাবলীর যে চিত্রকে আমরা যষ্টি আখ্যা দিই উহার পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল দর্শকের দেশ ও কালের বিভাগগুলি উহার সহিত পরিবর্ত্তিত দিকে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং লরেঞ্জ-ফিজগ্যারেল্ডের পরীক্ষায় যে সংকোচন অনুমিত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দ্দেশক মাত্র। কাজেই প্রকৃতপক্ষে দৈর্ঘ্যের সংকোচন বা সময়ের হ্রাস বলিবার কোনও কারণ নাই, এবং সমকালীনতার বিচ্যুতিও (dislocation) যথার্থ নহে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের আপেক্ষিকতা বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে কাল একই (one single) এবং অপরিবর্ত্তনশীল।

বিজ্ঞানের পুরাতন ক্ষেত্রে কোনও পদার্থের অবস্থিতির সূচনা করিতে হইলে তিনটি নির্দ্দেশক দিয়াই সূচিত করা হইত, কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানে কালকে আর একটি নির্দ্দেশক ধরা হইল। চতুর্থ নির্দ্দেশক হিসাবে কালের ধারণা ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দালাম্বার্ট (D'Alembert)এর এক বন্ধু তাঁহার নিকট উল্লেখ করেন ; ইহার পর লাগ্রাঞ্জ (Lagrange) ও ফেকনার (Fechner) উহার বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্যালাগুই (Palagui) নামক এক জন হাঙ্গেরিয়াবাসী দেশ ও কাল সম্বন্ধে তাঁহার নূতন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমাদের অভিজ্ঞতায় কোনও ঘটনাই কেবল দেশ বা কাল লইয়া সংঘটিত হইতে পারে না, দেশ ও কাল উভয়ই তাহাতে একত্র সন্নিবিষ্ট ; তাঁহার মতে বিশ্বের ঘটনাবলীর সংস্থানে দেশ ও কাল দুইটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অখণ্ড এক। প্যালাগুইয়ের অভিমতই কালকে চতুর্থ নির্দ্দেশক ধরিতে মিনকোস্কি (Minkowski)কে প্রেরণা দিয়াছিল এবং উহাই আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের

ভিত্তি। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'কালকে এতটা প্রাধান্ত দিলেন মিনকোস্কি, এবং আইনস্টাইনও স্বীকার করিয়াছেন যে কাল সম্বন্ধে মিনকোস্কির এই ধারণা ব্যতীত তাঁহার আপেক্ষিকতাবাদ জন্মলাভও করিত কিনা সন্দেহ।

এই দেশ-কাল সংস্থানে একটি বিন্দুকে অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট স্থানে একটি বিশিষ্ট ক্ষণকেই ঘটনা আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণ অর্থে একটি ঘটনা হইল একটা প্রাকৃতিক সংঘটন যাহা কোন বিশিষ্ট স্থান ও কালের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই দেশ-কাল সংস্থানে দুইটি ঘটনার মধ্যে ব্যবধানের দুইটি উপাদান—প্রথম, স্থান হিসাবে উহাদের দূরত্ব; দ্বিতীয়, কাল সম্পর্কে উহাদের পার্থক্য। এই যে যুক্ত দেশ ও কাল সম্পর্কে দুইটি ঘটনার মধ্যে বিস্তার উহাই তাঁহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বলিয়া গণ্য। মিনকোস্কি ও আইনস্টাইনের এই দেশ-কালের ধারণা গ্যালিলিয়োর প্রদর্শিত কালের ধারণারই অনিবার্য্য পরিণতি।

বিশ্বের গতি ও পরিবর্ত্তনই ঘটনার উদ্ভব সাধন করিয়া কালের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। ঘটনার উত্থান হইতেছে, আবার তিরোধান হইতেছে, সুতরাং কালও স্থিতিশীল নয়, কালের অপরিহার্য্য লক্ষণই উহার ক্রম-পর্য্যায়। আমরা কালকে স্থানের সাহায্যে পরিমাপ করি, কিন্তু স্থান হইতে কাল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। যুক্ত দেশ-কাল সংস্থানের অর্থ এই নয় যে, যাহা বিশিষ্টভাবে কাল-সম্পর্কিত, দেশ তাহার দ্যোতনা করিতে পারে, অথবা যাহা বিশিষ্টভাবে দেশসম্পর্কিত, কাল তাহার সূচনা করিতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সকল পদার্থের দেশ-কাল সম্বন্ধীয় অবস্থানের প্রতি যতটা দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের পৃথকভাবে সংঘটিত বিশিষ্ট পার্থক্যের প্রতি ততটা নয়।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ নির্দ্দেশে বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনায় সকল নির্দ্দেশক ক্ষেত্রই একরূপ, উহাদের গতির অবস্থা যাহাই হউক না কেন। এই নির্দ্দেশ হইতে আইনস্টাইন প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রেই ঘড়িগুলি তাহাদের অবস্থান অনুসারে দ্রুত অথবা ধীরে চলিবে। সুতরাং ঘড়িগুলি যখন নিজ নিজ নির্দ্দেশক ক্ষেত্র অনুসারে নিশ্চল অবস্থায় অবস্থিত, তখন উহাদের সাহায্যে কালের যথার্থ নির্দ্দেশ আদৌ সম্ভবপর নয়।

আপেক্ষিকতাবাদের প্রচারের দ্বারা আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক জগতে কাল সম্বন্ধে একটা যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই দৃষ্ট ঘটনাসমূহের অনুভূতিতে দর্শকের অংশ ও বাহ্য প্রকৃতির অংশ পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন—কোনও পদার্থের অনুভূতি দর্শকের অবস্থান ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেশ ও কালের ধারণা দর্শকের পরিমাপক-মানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং এই মান আবার যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাপ করা হইতেছে তাহাদের বিভিন্ন গতির সাপেক্ষ। এই নিমিত্তই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নূতন দিগ্‌দর্শনে সমকালীনতা, কালের পর্য্যায়ক্রম, প্রভৃতি সম্বন্ধের এমন কোন বাঁধাধরা অর্থ নাই, যাহা বিশ্বের সর্ব্বত্র সমার্থদ্যোতক বা অপরিবর্ত্তনীয়; অপরপক্ষে উহারা নির্দ্দেশক ক্ষেত্রানুসারে পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ।

নূতন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে ম্যাক্সওয়েল হইতে আরম্ভ করিয়া আইনস্টাইন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার দ্বারা নিউটনের নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র কালের ধারণা বর্জ্জিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণ গণিতের ক্ষেত্রে নিউটনের নিরপেক্ষ কাল এখনও আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা রব (Robb) ও এডিংটনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সত্ত্বেও পরবর্ত্তী বহু পণ্ডিতের আলোচনার দ্বারা কালের ধারণাকে যেন কল্পনার রাজ্যে লইয়া আসা হইয়াছে এবং কালের সমস্যা অনেকটা মনোবিজ্ঞানের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

পরীক্ষা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকতেই মহীতোষবাবু উচ্চকণ্ঠে অভ্যর্থনা ক'রে উঠলেন, "আসুন মাষ্টারমশাই আসুন," সম্বর্দ্ধনার ভঙ্গিতে ব্যঙ্গের লক্ষণ সুপ্রকট। শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আজ মাইনে পাওয়ার কথা কিন্তু প্রারম্ভটা ঠিক শুভ ব'লে মনে হচ্ছে না, সতরঞ্চিটার উপর এক রাশ ধুলো জমে রয়েছে, তবু ঝাড়তে গেলে পাছে তা দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিশ্বাসমশায়ের সম্মানের হানি এবং দরিদ্র মাষ্টারের বিলাসিতা সূচিত হয় সেই ভয়ে সধূলি সতরঞ্চির উপরই সবিনয়ে বসে পড়লাম, বিশ্বাস-মশায়ের হৃদয়কে করুণার্দ্র করবার জন্ত কণ্ঠে যথাসাধ্য বিনয় সঞ্চার করে বললাম, "কাল আসতে পারি নি বিশ্বাস-মশাই। পিসীমার অসুখটা আবার বেড়ে পড়ল তাই নিয়েই ছুটোছুটি সারাটা দিন, যাক, মনোরঞ্জন কোথায়, ওদের তো কাল প্রমোশন হওয়ার কথা ছিল," বলেই মুখের মধ্যে জিবটাকে কামড়ে ধরলাম, ইস্ করলাম কি? সাধ ক'রে নিজের বিপদ নিজে ডেকে না আনলেই কি চলত না? শেষের কথাটা আমারই আগে বলার কি প্রয়োজন ছিল?

যা আশঙ্কা করেছি। বিশ্বাস-মশাই মুখমণ্ডল বিকৃততর ক'রে গর্জ্জে উঠলেন, "মনোরঞ্জন কোথায়, ন্যাকামি করতে আসা হয়েছে! আমি তখনই তো বলেছিলুম বাপু তুমি পারবে না, পেটে নোটমুখস্থ বিদ্যা থাকলেই শুধু হয় না, পড়াবার যোগ্যতা থাকা দরকার। তোমার যে তা কিছুমাত্র নেই, তা তোমার মুখ দেখেই টের পেয়েছিলাম, মাসের পর মাস মাইনে গিললে আর ব'সে ব'সে ছেলেটার পরকাল নষ্ট করলে, এই দেখ প্রোগ্রেস-রিপোর্ট, একটা বিষয়েও যদি পাসের নম্বর থেকে থাকে।" বলে আমার নাকের সামনে মনোরঞ্জনের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট এনে ধরলেন, ধৈর্য্য হারালে টাকা-কটাও হারাতে হবে। এক মুহূর্ত্তে বক্তব্যটুকু মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বললাম, "নিতান্ত ছেলেমানুষ। কিই বা বয়স অথচ পড়তে হচ্ছে সেকেণ্ড ক্লাসে, আমরা এ বয়সে ফোর্থ্ ক্লাস ফিফ্থ ক্লাসে পড়তাম, তা ছাড়া যে স্বাস্থ্য, সারাটা বছর তো প্রায় অসুখে অসুখেই কাটল—"

"হুঁ। আচ্ছা দেখ তো মাষ্টার স্কুলের হেডমাষ্টারকে বলে-কয়ে তুলে দিতে পার কি না।"

রিপোর্টে মনোরঞ্জনের অগ্রগতির বিবরণ এবং হেড-মাষ্টারের মন্তব্য পড়বার পর এ নিয়ে তাঁর কাছে আর উপস্থিত হওয়া যায় না। বললাম, "কাজ কি, বয়স তো আর বেশী নয়, তার চেয়ে আর এক বছর এ ক্লাসে পড়ে পাকা হয়ে ওঠাই ভাল।"

বিশ্বাস-মশাই পুনর্ব্বার গর্জ্জে উঠলেন, "বুঝেছি, যেমন বিদ্যাবুদ্ধি, তেমনি সাহস, ইচ্ছায় কি আর ছেলেটা ফেল করেছে? তা পাকা হয়েই উঠুক আর কাঁচা হয়েই উঠুক, তোমাকে দিয়ে আর নয়। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। সারা বছর ব'সে ব'সে টাকা গিললে আর এখন পরীক্ষার সময় ছেলে পাকা হয়ে উঠবে! লজ্জা করে না বলতে? কোন্ মুখে এসেছ আবার? আগে বললেই পারতে আমি পারব না, আমাদ্বারা এ-সব হবে না মশাই!"

সারা বছরের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ইতিহাসটা মনে পড়ল। দোষ শুধু মাষ্টারেরই বুঝি? ছাত্র-পড়াতে এসে সন্ধ্যাটা অবশ্য প্রায়ই ছাত্রের বাবার সঙ্গেই কাটত এবং ভালই কাটত। সারাদিন দু-তিনটি ছাত্র পড়িয়ে এখানে এলে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রের পিতাই আমাকে বেশী আকৃষ্ট করতেন। এসে ছাত্রকে প্রায়ই উপস্থিত দেখতাম না। কিন্তু মহীতোষবাবুকে প্রত্যেক দিনই তাঁর নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখতে পেতাম। প্রথম প্রথম ভাল লাগত না, মনে হ'ত মাষ্টার ফাঁকি দিয়ে যায় কিনা তাই দেখবার জন্ত পাহারা দিচ্ছেন। সে ভাব একটু একটু যে না ছিল তা নয়, দু-ঘণ্টা পড়াবার পর উঠে দাঁড়ালে বলতেন,

"এখনই উঠছ যে মাষ্টার? তোমার ঘড়ি নিশ্চয়ই ফাষ্ট, ব'স, আরও গোটা-দুই অঙ্ক-টঙ্ক দেখিয়ে দাও ছেলেটাকে।" কখনও বা ইংরেজী উচ্চারণের ভুল ধরে বলতেন, "কি যে ইংরেজী পড় আর পড়াও তা তুমিই বোঝ। নিজেই শুদ্ধ ক'রে উচ্চারণ করতে পার না তা আবার ছাত্রকে শেখাবে। পাড়াগাঁয় স্কুল-কলেজ থেকে পাস করেছ নিশ্চয়ই। না হ'লে এমন হয়?"

কোন্ নাগরিক বিদ্যালয়ে বিশ্বাস-মশাই অধ্যয়ন করেছেন সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "আরে পড়াশুনোর তেমন স্কোপ পেলে কি এমন হ'ত? যা শিখেছি সব নিজের চেষ্টায়। আমাদের সময় প্রাইভেট টিউটর-ফিউটর ছিল না, তবু যেটুকু বিদ্যায় যা ক'রে গেলাম তোমরা এম. এ.ই পাস কর আর বি. এ.ই পাস কর তার এক আনাও করতে পারবে না। আমার এক দূর-সম্পর্কের খুড়তুতো ভাই আইন পড়ত। এক দিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন পড়ছিল, আমি গিয়ে উপস্থিত। বললাম—খগেন ল তো পড়িস, কিন্তু উচ্চারণের দিকে ভাল ক'রে একটু লক্ষ্য রাখিস তো। ভগবানের কৃপায় এবারই হয়ত পাস ক'রে বের হবি। কিন্তু প্র্যাকটিস তো করতে হবে? হাকিমের সঙ্গে যখন কথা বলবি, তোর কথাই যে বুঝতে পারবে না, তুই কি বলছিস ইংরেজী না ফরাসী না জার্মান। ছেলেটা সেই থেকে আমার সামনে আর ইংরেজী পড়তে সাহস পেত না। পাস করেছে বটে, কিন্তু কোন দিনই "শাইন" করতে পারবে না, তুমি দেখে নিও।"

বিশ্বাস-মশায়ের গৌরবোজ্জ্বল কর্ম্মময় জীবনের আরও নানা কৃতিত্বের কাহিনী শুনতে শুনতে সন্ধ্যাগুলি নিতান্ত মন্দ কাটত না। ছাত্র-পড়াবার চেয়ে প্রৌঢ়ের এই হাস্যকর দম্ভ আমার কাছে বেশী উপভোগ্য মনে হ'ত, মনোরঞ্জনের দিকে চেয়ে দেখতাম বসে বসে ঢুলছে। এক-এক বার বিবেকের দংশন অনুভব করতাম। বলতাম, "ও কি, ঘুমুচ্ছ যে। করেছ ট্রানস্লেশন প্যাসেজটা?" কিন্তু অনুবাদে মনোরঞ্জনের মন কোন দিনই আকৃষ্ট হ'ত না। পিতার কৃতিত্বের কাহিনী শুনতে শুনতে প্রায়ই সে তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে পড়ত। দেখে বিশ্বাস-মশাই নিজেই বলতেন, "যা যা শুয়ে পড় গিয়ে, ব'সে ব'সে আর ঝিমোতে হবে না। কাল খুব সকালে উঠেই পড়তে বসা চাই কিন্তু।" মনোরঞ্জন বাঁচত এবং আমিও।

তার পর বিশ্বাস-মশাই আবার তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী আরম্ভ করতেন। "বুঝেছ মাষ্টার, কলকাতায় যখন প্রথম আসি, দাঁড়াবার ঠাঁই ছিল না, সঙ্গে যা গোটা-তিনেক টাকা ছিল তা রেলভাড়াতেই গেছে। সহায় নেই, সম্পদ নেই, অনেক খোঁজখবর করবার পর বিষ্টু-খুড়োর ঠিকানা মিলল, বহু অনুনয়-বিনয়ে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হলেন তিনি। সিঁড়ি-ঘরের এক কোণে মাথা গুঁজবার স্থান পেলাম একটু। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমাকে দিয়ে না করাতেন এমন কাজ নেই। বাজার করতাম, খুড়ীমার বাটনা বেটে দিতাম, ছেলে রাখতাম। ঐ খগেনকে আমি কোলে পিটে ক'রে মানুষ করেছি, স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছি—আর সেদিন আমার সামনে চেয়ার চেপে ব'সে রইল এত দেমাক, আরে ল না হয় পাসই করেছিস, কিন্তু বিনা বিদ্যাবুদ্ধিতে যা ক'রে গেলাম তা করতে তোদের সাত জন্ম লাগবে। তার পর বিষ্টু-খুড়ো এক দিন তার দোকানে নিয়ে গেলেন। পুরনো ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি কিনে মেরামত আর রং ক'রে বিক্রি করতেন। কিন্তু মেরামত করতে হ'লে মাথার দরকার। এঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধি চাই, খাঁটি ইউরোপীয়ান সাহেবেদের পর্য্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছে যে হ্যাঁ, বিশ্বাসের মাথা আছে বটে।"

মনে মনে আমিও স্বীকার না ক'রে পারি না যে হ্যাঁ, মাথা ধরাবার মত মাথা তাঁর নিশ্চয়ই আছে। প্রকাশ্যে বলি, "রাত হ'ল, এবার উঠি বিশ্বাস-মশাই।"

আত্মজীবনী বর্ণনায় বিশ্বাস-মশায়ের জোড়া নেই, এদিক দিয়ে তিনি সত্যিই বেশ উপভোগ্য। কিন্তু মাইনে দেওয়ার বেলাতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, বলেন, "এক-একটা পয়সা আয় করতে রক্ত জল ক'রে ফেলতে হয় মাষ্টার, আর তুমি কি পরিশ্রম কর শুনি। মাস অন্তে পনরটি টাকা গুনে নাও, তার পরিবর্ত্তে কতটুকু পরিশ্রম তুমি কর বল দেখি। কাজের মধ্যে তো বসে বসে শুধু গল্প শোনা, পড়ান-শুনান যা হয় তা তো দেখতেই পাচ্ছি।" রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে, "সে দোষ কার? গল্প না

করলেই পারেন।" হ্যাঁ, এর পর থেকে সাবধান হতে হবে। বড্ড বেশী ফাঁকি দিচ্ছ। এর চেয়ে সতীশ মাষ্টার অনেক ভাল ছিল।"

এর পর থেকে মনোরঞ্জনের দিকে মন দিতে চেষ্টা করি। অসম্ভব। ছাত্রভাগ্য আমার চিরকালই মন্দ, কিন্তু এ একেবারে চরম। বাপের মতই মনোরঞ্জনেরও মাথা আছে। প্রকাণ্ড মাথা। কিন্তু সবটুকুই তার পৈতৃক এঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধিতে ভরা। সাধারণ পড়াশুনো সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। এর মধ্যেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরতা সে টের পেয়েছে, বলে, "কি হবে স্যার, এম. এ., বি. এ. পাস ক'রে। রাস্তায় ঘুরে বেড়ান ছাড়া পাস ক'রে আর কি করা যায় আজকাল। আমাদের দোকানে আপনার মতই সেদিন এক গ্রাজুয়েট এসেছিল, বলে যে-কোন কাজ দিন আমি তাই করব।" আর এক দিন ইতিহাস পড়তে পড়তে বলে উঠল, "এই তো স্যার, আপনি যে বলেন লেখাপড়া ছাড়া কিছুই হয় না, কিন্তু এই দেখুন শিবাজীর জীবনী।" আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললে, "এই এইখানে স্পষ্ট লেখা রয়েছে দেখুন, 'শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন', তার মানে আমার মত সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্তও তিনি পড়েন নি। কিন্তু কত বড় একটা রাজ্য গড়ে তুললেন দেখুন দেখি।"

এর পরে আর কি বলবার থাকতে পারে। তবু শিক্ষার পক্ষে শিক্ষকের ওকালতি না করলে চলে না। বলি, "ও-সব আগেকার যুগে চলত মনোরঞ্জন। কিন্তু আজকালকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস না করলে হাতের জল পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয় না, তা জান ?"

"কেন আজকালকার দিনেও যথেষ্ট দেখা যায় এমন। রবিঠাকুর তো মাত্র থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলেন, অথচ কেমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন।"

বিস্মিত হয়ে বলি, "তাই নাকি ?"

বিশ্বাস-মশাই খুব বেশী দিন সতর্ক থাকতে পারেন না। দু-এক দিন পরেই আবার অসতর্ক হয়ে পড়েন, আবার আরম্ভ হয় তাঁর আত্মকাহিনী। কোন্ সাহেব তাঁকে কি প্রশংসাপত্র দিয়েছিল যা আজও তাঁর ক্যাশ-বাক্সে তোলা রয়েছে, কোন্ ন্নার ত্রিশ টাকায় এক যন্ত্র কিনে এক খাঁটি ইউরোপীয়ান সাহেবের কাছে বুদ্ধির কৌশলে তিনি তিন-শ টাকায় বেচেছিলেন, কোন্ সাহেব তাঁর ইংরেজী বলবার কায়দা এবং দ্রুততা দেখে বলেছিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই অনেক দিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ইত্যাদির বিশদ এবং পৌনঃপুনিক বর্ণনায় ছাত্র ও শিক্ষকের মন অধ্যয়ন অধ্যাপনা থেকে পূর্ব্ববৎ তিনি আকর্ষণ ক'রে নিতে থাকেন।

কিন্তু হঠাৎ এক দিন তার মুখেও শুনতে পাওয়া গেল; "না, মাষ্টার, আর ফাঁকি দিও না, মনুর অ্যানুয়াল এসেছে। আমার কাছ থেকে প্রিণ্টিং চার্জ্জ বাবদ চৌদ্দ আনা নিয়েছে আজ সকালে। এ ক-দিন একটু খেটে পড়াও।"

পরীক্ষা এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে অবিশ্বাসী মনুও টের পেয়েছে পরীক্ষা এসেছে। এ কি পরিবর্ত্তন! মনু তার সমস্ত বই আলমারি থেকে বের ক'রে এনে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছে। একধারে কতকগুলি সাদা একসারসাইজ বুক, দোয়াত আর কলম গোটা-দুই। অনুষ্ঠানের কিছুই আর বাকি নেই। ইম্পরট্যাণ্ট প্যাসেজ দাগ দিয়ে দেবার জন্য একটা রঙীন পেন্সিল সযত্নে কেটে রাখা হয়েছে। পরীক্ষার দেরি নেই আর। ঘরে যে-কটি ক্যালেণ্ডার আছে তার সব কটিতে একটি তারিখের নীচে লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রাখা হয়েছে—এ-দিন থেকে পরীক্ষা আরম্ভ হবে। যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই চোখে পড়ে ১০ই ডিসেম্বর। তারিখটা যেন ভুল না হয়। সব. সময়েই মনের মধ্যে খোঁচা দিয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধি যেন জাগিয়ে রাখতে পারে, 'যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।'

পরীক্ষা আসছে। মনুর সেই চটুলতা আর নেই। বিশ্বাস-মশায়ের আত্মকাহিনী চাপা পড়ে গেছে। বইয়ের পাতায় মনু গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করে। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। মাঝে মাঝে চোখ যখন কিছুতেই আর খুলে রাখতে পারে না, নিজেই গিয়ে চৌবাচ্চা থেকে চোখে জল দিয়ে আসে। বলে, "বড্ড ঘুম পায় মাষ্টার-মশাই। ভিনু বলেছিল চা খেলে না কি অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকা যায়, ঘুম

আসে না। চা-টা আজকাল খুব বেশী ক'রে খেতে হবে দেখছি।" পড়তে পড়তে হঠাৎ ব'লে বসে, "পরীক্ষা এসেছে মাষ্টারমশাই, আপনি আরও কিছুক্ষণ থাকুন আজ।"

যেন আমার আরও কিছুক্ষণ থাকা না-থাকার উপরই ওর পরীক্ষায় পাস করা নির্ভর করে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, "আমি আর আধ ঘণ্টা না-হয় থাকলাম, কিন্তু তাতে কি আর হবে বল। সারা বছর কিছু করবে না, এখন—"

অন্য সময় হ'লে মন্টু এর কড়া জবাব না দিয়ে ছাড়ত না, কিন্তু এখন কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করে, "এ ক-দিন পড়লে কি পাস করতে পারব না মাষ্টার-মশাই?" নিজে কোনও ভরসা পাই নে। তবু ভরসা দিতে হয় ওকে, "পারবে না কেন? পড়লেই পারবে।"

কাল ১০ই ডিসেম্বর। কয়েক দিন বাদে বিশ্বাস-মশাই আজ আবার পড়াবার সময় এসেছেন। "কেমন মাষ্টার, কি মনে হচ্ছে তোমার, পারবে তো? খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে-টুজিয়ে দাও। পরীক্ষার ট্যাকটিক্‌সগুলো বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল। যেন কোন রকমে ঘাবড়ে না যায়। এক বার ঘাবড়ে গেলেই আর কিছু লিখতে পারবে না। কিছুতেই ঘাবড়াবি না, বুঝলি বাবা। বুকে বেশ বল রেখে, ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে খুব ফূর্ত্তির সঙ্গে লিখে যাবি। ভয় কি! কাল সকালে উঠে একবার কালীঘাট যাব। মায়ের বাড়ী ডালা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে আসতে হবে। তোমরা তো মাষ্টার আবার নাস্তিক ম্লেচ্ছের দল। কিছুই এ-সব মান না বোধ হয়। যেমন মাষ্টার তেমনি ছাত্র। ও ছোঁড়াটাও তাই হয়ে উঠেছে। গোঁয়ারগোবিন্দ, কারও কাছে কোনদিন মাথা নোয়াবে না। খবরদার, এ-সব ঔদ্ধত্য মোটেই ভাল না। দেবদ্বিজে বিশ্বাস রাখবি সর্ব্বদা। শ্রদ্ধাভক্তি করবি গুরুজনকে। তাঁদের আশীর্ব্বাদের একটা মূল্য আছেই আছে। কি একটা শ্লোক আছে না যে—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী, কি বল মাষ্টার?"

"সে তো ঠিকই।"

"ঠিক নয়? তোমাদের মত বয়স এক দিন আমাদেরও ত ছিল, রক্ত ছিল গরম। কিছুই মানতাম না, কিছুই বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু বয়স আর অভিজ্ঞতা যখন বাড়ে তখন এসব একগুঁয়েমি আর থাকে না। এই ছেলেমানুষি একগুঁয়েমি তোমাদেরও এক দিন যাবে। তখন বুঝবে, তখন স্বীকার করবে যে হ্যাঁ, এক জন আছেন। নাম তাঁর যাই দাও না কেন তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু একথা শেষে বিশ্বাস করতেই হয় যে তিনি আছেন, 'হি ইজ'।"

এই ঐশ্বরিক বক্তৃতা এক বার আরম্ভ হ'লে আর থামবে না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলি, "আমি এবার চলি বিশ্বাস-মশাই, সেই শ্যামবাজার পর্য্যন্ত যেতে হবে।"

"দাঁড়াও, মাষ্টার-মশাইকে প্রণাম করেছিস মন্টু? খুব ভক্তি ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম কর। গুরুর আশীর্ব্বাদের একটা মূল্য আছে, আর যদি কিছু সম্বল না-ও থাকে শুধু গুরুর আশীর্ব্বাদেই তরে যাওয়া যায়, এমনি জোর আশীর্ব্বাদের। ভাল ক'রে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও মাষ্টার যেন মন্টু বেশ পরীক্ষা দিতে পারে।"

কিন্তু মাষ্টারের অমোঘ আশীর্ব্বাদ, বিশ্বাস-মশায়ের ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস, কালীবাড়ীতে পাকা ডালা ও কাঁচা পাঁঠা মানত করা সব ব্যর্থ ক'রে দিয়ে মন্টু পরীক্ষায় ফেল ক'রে বসেছে। আর এ ক-দিন বয়স বাড়ার সঙ্গে বিশ্বাস-মশাইয়ের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিও বহু পরিমাণে বেড়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন, তাঁর ছেলে ফেল হবার জন্য আর কেউ দায়ী নয় পৃথিবীতে। তিনি নন, তাঁর ছেলে নয়, ঈশ্বর নন, একমাত্র মাষ্টারই এর জন্য দায়ী।

বিশ্বাস-মশাই তাঁর শেষ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, "চুপ ক'রে ব'সে রইলে যে বড়? আগে বললেই পারতে যে আমি পারব না মশাই আপনার ছেলেকে পাস করাতে? আমি অন্য ব্যবস্থা করতাম। দেখতাম আমার ছেলে পাস করে কি না, আমি তখনই তো বলেছিলাম তোমার দ্বারা হবে না বাপু। পেটে কি আছে না-আছে মুখ দেখলেই আমি টের পাই। ব'সে ব'সে শুধু টাকা গিলেছ, জোচ্চোর কোথাকার—

কত আর সহ্য করা যায়। তা ছাড়া এ-মাসের মাইনেটা আমার হওয়ার সম্ভাবনা যখন আর নেই, তখন সহ্য ক'রেই বা আর লাভ কি। বললাম, "মিছিমিছি মুখ খারাপ করবেন না বিশ্বাস-মশাই। ভদ্রলোকের মত কথা বলবেন। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, কিন্তু ছেলে আপনার একটি রত্ন, আমি কি করব বলুন?"

"কি বললে কি-কি—"

"কিছু না। ভদ্রলোকের মত এ-মাসের মাইনেটা দিয়ে দিন।"

"মাইনে? আবার মাইনে? লজ্জা করে না চাইতে?"

"লজ্জা কিসের? পরিশ্রম করেছি তার ন্যায্য পারিশ্রমিক দেবেন। লজ্জা বরং আপনারই করা উচিত।"

বিশ্বাস-মশাই এর উত্তরে অত্যন্ত কঠিন একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সাত-আট বছরের একটি কালো রোগা মেয়ে দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে তর-তর ক'রে নেমে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

"কিরে শীতলা?"

"মা ডাকছে মাষ্টার-মশাইকে।"

"মাষ্টার-মশাইকে? কেন মাষ্টার-মশাইকে দিয়ে তার আবার কি দরকার?"

"মা বললে দরকার আছে। চলুন মাষ্টার-মশাই।"

কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করলাম। তাকালাম বিশ্বাস-মশায়ের দিকে।

"যাও শুনে এস। হুকুম যখন এক বার হয়েছে তখন তো আর—"

মেয়েটির পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চললাম।

মাঝারি সাইজের পাশাপাশি কয়েকটি ঘর। তারই একটি ঘরের সামনে মেয়েটি এসে থেমে দাঁড়াল। "মাষ্টার-মশাই এসেছেন মা।" দরজাটা আলগা ভাবে বন্ধ করা ছিল, ভিতর থেকে কে খুলে দিলেন। "এস বাবা ঘরের মধ্যে এস। তুমি তো আমার ছেলের মত। লজ্জা কি!" খুব মৃদু আর চাপা গলা। মনে হ'ল কথাটা বোধ হয় নিজেকেই বললেন। কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টানা, এক বার আমার দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন। বললেন, "বস বাবা এখানে এসে।" কি চমৎকার চোখ, আর কি মিষ্টি কথা বলবার ধরণ! বুঝলাম কেন হুকুম অমান্য করবার ক্ষমতা নেই বিশ্বাস মশায়ের।

তাঁর নির্দ্দেশমত বসলাম গিয়ে ঘরের মধ্যে। তিনি এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে রইলেন। সবুজ রঙের একটা আলো জ্বলছে। ঘরের মেঝেতে বিছানা পাতা। তাতে শোয়ান রয়েছে সারি সারি কয়েকটি নানা আকারের মাংসপিণ্ড। তাঁর নিজের গায়ে মাংস নেই। আছে সাবেকি আমলের ভারী ভারী গহনা। একটু পরে তিনি বললেন, "উনি বুঝি তোমাকে কি সব বলছিলেন না? কিছু মনে করো না বাবা। ওঁর মাথার ঠিক নেই।"

দেয়ালের দিকে চেয়ে বললাম, "না মনে করবার কি আছে।"

"রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, কাকে যে কি বলেন কিছু খেয়াল নেই। তোমার আর কি দোষ, সব আমার ভাগ্য। মা-কালী গঙ্গাকে এত ক'রে ডাকলাম কেউ মুখ তুলে চাইলেন না। ছেলেটা সারাদিন না খেয়ে দরজায় খিল দিয়ে পড়ে রয়েছে। এত ডাকাডাকি সাধাসাধি কিছুতেই দোর খুলল না। পৃথিবীতে ও-ই যেন একমাত্র ফেল করেছে। তুমিই বল তো বাবা, যারা পরীক্ষা দেয় তাদের সবাই-ই কি পাস করে? কেউ পাস করবে, কেউ ফেল করবে এই জন্যই তো পরীক্ষা নেওয়া? তুমি দেখ তো বাবা ডেকে এনে ওকে কিছু খাওয়াতে পার কি না। সারাদিন এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পেটে যায় নি।"

পড়াশুনোর দিকে তেমন আগ্রহ এ-বাড়ীর কারও মধ্যেই লক্ষ্য করি নি। কিন্তু পরীক্ষায় ফেলের কলঙ্ক কি মর্ম্মান্তিক ভাবেই না এঁরা অনুভব করছেন। বাড়ীতে মৃত্যুর মতই যেন ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "মনু কোথায়?"

"এস আমার সঙ্গে" ব'লে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে পাশের ঘরে রুদ্ধ দরজায় মৃদু আঘাত ক'রে ডাকলেন, "মনু ওঠ, তোর মাষ্টার-মশাই ডাকছে তোকে।"

ঘরের ভিতর থেকে কোন সাড়া এল না।

আমি এগিয়ে এলাম, "মনোরঞ্জন, শোন, দোর খোল।"

এবারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না, একটু ভীত হলাম, কোন রকম কিছু ক'রে বসল না তো? কিন্তু সে ধরণের ছেলে তো মনোরঞ্জন নয়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, "ওঠ, শীগ্‌গির ওঠ। তোমার প্রোগ্রেস-রিপোর্ট কোথায়? আর হেড মাষ্টারের বাড়ীর ঠিকানা জান তো? চল আমার সঙ্গে। এখনই তাঁর কাছে যেতে হবে। দেখি কিছু করা যায় কি না।"

মনোরঞ্জন লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিল। "প্রোগ্রেস-রিপোর্ট তো বাবার কাছে।"

হাত ধরে বললাম, "তাই নাকি? আচ্ছা, তাঁর কাছ থেকেই চেয়ে নেব এখন। তাড়াতাড়ি এখনই কিছু খেয়ে নিয়ে চল তুমি আমার সঙ্গে।"

"পরে এসে খাব।"

"না না, কথা শোন, আগে খেয়ে নাও কিছু। দিন, তাড়াতাড়ি কিছু খেতে দিন ওকে। যাও খেয়ে এস। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম এখানে।"

"না, না, দাঁড়িয়ে থাকবে কেন। তুমিও এস বাবা, এস না, লজ্জা কি, ছেলের মতই মনে করি তোমাকে।"

ট্যুইশানটা হয়ত এ-যাত্রা টিকেই গেল।

সেকালের সংবাদপত্র*

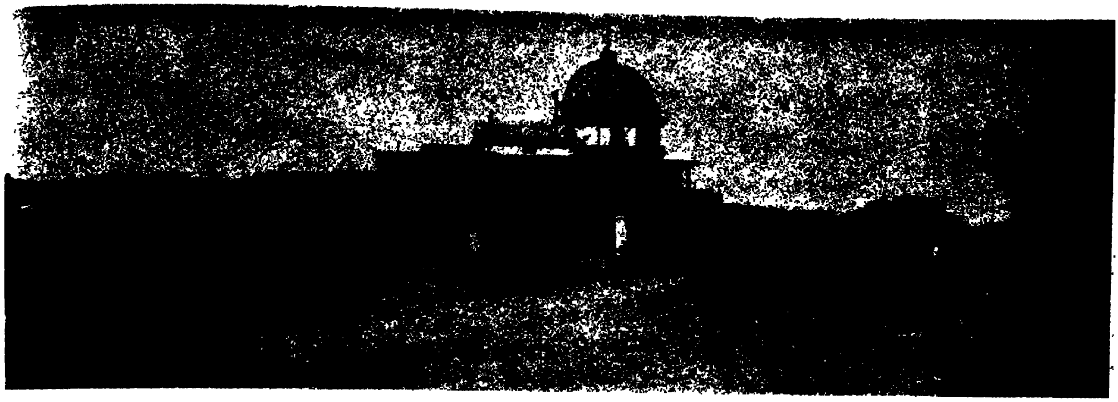
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রজেন্দ্রবাবুর সন্ধানপটুত্ব অসাধারণ। এই অসাধারণতা কেবল তাঁর সংগ্রহপ্রাচুর্যে প্রকাশ পায় নি তার সঙ্গে তাঁর সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির যোগ আছে। বর্তমান সাহিত্যিক বাংলার প্রথম বিকাশের আদ্যভাগ তাঁর সন্ধানের ক্ষেত্র। এখানে চারদিকে যে বিপুল আবর্জনা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তার মধ্যে থেকে কীটদষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করে তিনি বাংলা সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেছেন। এর থেকে বাঙালীর মনের যে পরিচয় পাওয়া গেল দেখতে পাই এখনো তার অনুবৃত্তি চলছে। গদ্যভাষার মধ্যে তখন বাঁধুনি ছিল না কিন্তু প্রবল একটা প্রয়াস ছিল তাকে কথা কওয়াবার জন্য। অস্ফুটবাক্ রচনার কাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠছিল বঙ্গসমাজ। তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল নাট্যাভিনয়, যাত্রা, কীর্তন, কবির গান, কথকতা। কথা কবার দুর্দাম প্রবৃত্তি আজও আছে বাঙালীর। কিছু যার বলবার আছে কিছু যার বলবার নেই সকলের মধ্যেই কথা কইবার অসহ্য অস্থিরতা, ক্রমাগতই কেনিয়ে তুলছে বাণীস্রোত। দৈনিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক কেবলি দেখা দিচ্ছে আর মিলোচ্ছে। আরো একশো বছর যাবে, আরো ব্রজেন্দ্র বাঁড়ুজ্জেকে জন্মাতে হবে কালের আবর্জনার স্তূপ থেকে টেনে আনতে হবে সাহিত্যের স্মৃতির ভাণ্ডারে বাঙালীর চিরাগত মুখরতার সূত্রধারাকে।

তখনকার বাঙালীর চিত্তে নানা দিক থেকে নূতন কালের নানা রকম তাগিদ এসে পৌঁছচ্ছিল—সাময়িক-পত্রের পথচলতি কোলাহলের যে এক-একটা টুকরো এই গ্রন্থের মধ্যে ধরা পড়েছে দূর কালের কিছু ছিন্ন খবর কিছু কথাকাটাকাটি কানে এসে পৌঁছচ্ছে। তাতে বাংলা দেশের তখনকার সময়ের চেহারা যেন পর্দা ফাঁক করে আড়াল থেকে উঁকি মেরে যাচ্ছে, তার মধ্যে কৌতুকের কথা আছে বিস্তর, সেটা কম লাভ নয়।

'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থখানি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্পর্শে যখন থেকে বাঙালীর মন জেগেছে তখন থেকেই অসম্পূর্ণ ভাষার বাধার মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবার প্রবল আগ্রহ নানা-স্থানেই ভিড় করে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। এই বইয়েতে তার পরিচয় পাওয়া গেল।

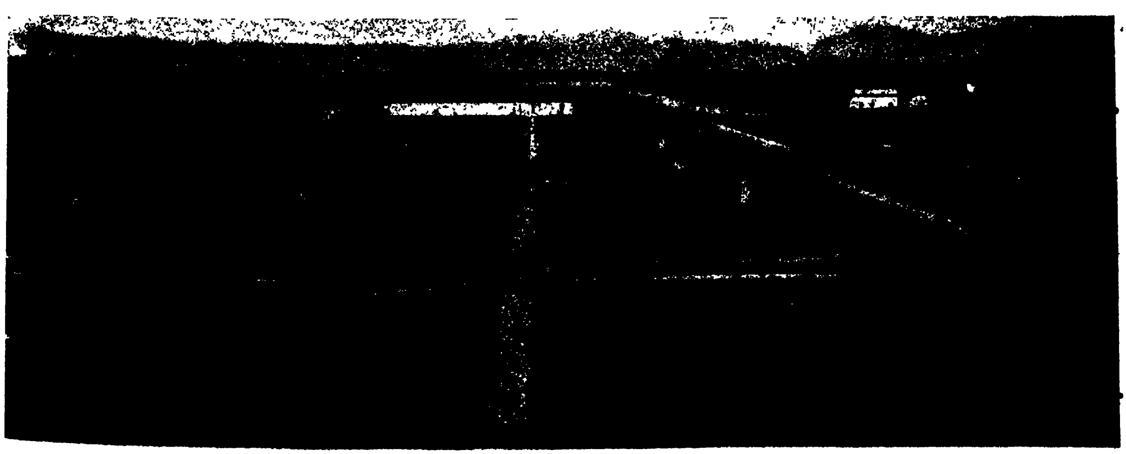
* "বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-৬৭)" ও "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস"—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।



চেহর্-আরী, কাবুল



সম্রাটের অট্টালিকা ও প্রাচীন দুর্গ—অর্ক্‌, কাবুল

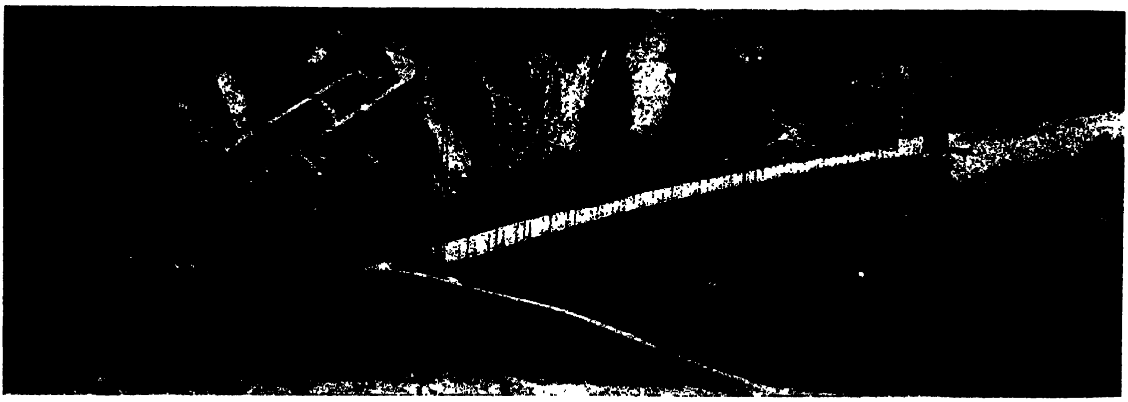


অর্ক-এর বাগান, কাবুল

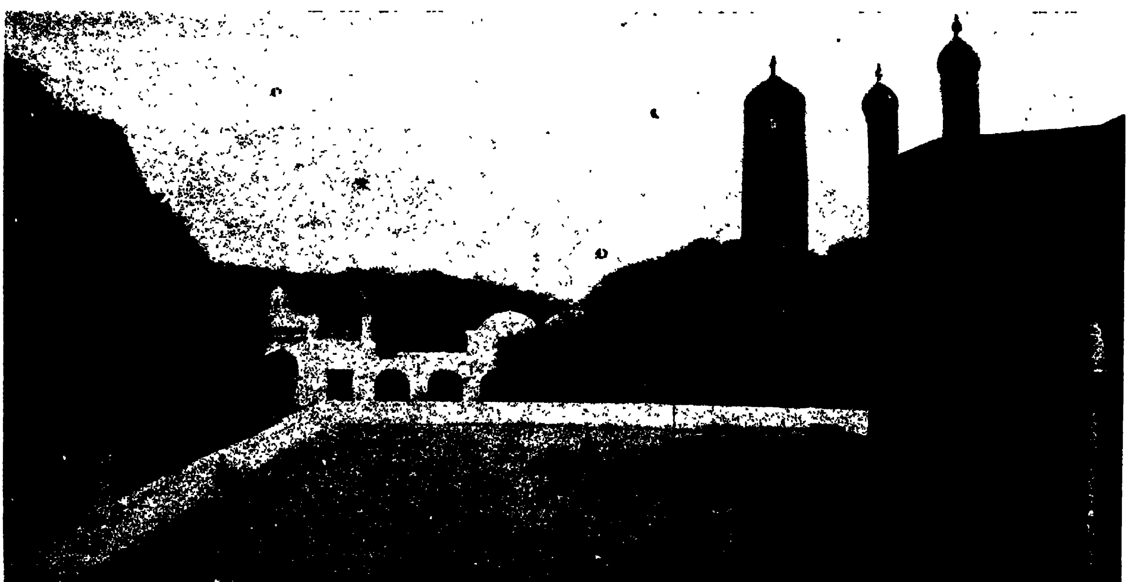
["কাবুলের চিঠি" দ্রষ্টব্য



কান্দাহার



জেলালাবাদের পথে



কান্দাহার

["কাবুলের চিঠি"

শুভযাত্রার ফলাফল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

লম্বা লেফাফাখানা খুলিয়াই কালিচরণ চীৎকার করিয়া উঠিল, "মোক্ষদা—মোক্ষদা, ও মুখী পোড়ারমুখী—"

বেলা বারটা বাজিয়া গিয়াছে। শাশুড়ী গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরবেন। এদিকে আঁশ নিরামিষ দুটি হেঁসেল সামলাইয়া বেলা একটার মধ্যেই কালিচরণকে ভাত দিতে হইবে। কালিচরণ চাকরি করে না, কিন্তু সাহেব-খেঁকানো মেজাজটি তাহার পুরামাত্রায়ই আছে। পিতামহের আমল হইতে একটা ক্লক-ঘড়ি শোবার ঘরে টাঙানো আছে; পিতার শাস্ত্রজ্ঞানের আর কিছু লাভ না করুক, পাঁজি খুলিয়া ঘড়ি মিলাইয়া দিনক্ষণ দেখিয়া কাজ করিতে কালিচরণ ভালবাসে। ত্র্যহস্পর্শ, মঘা, দিক্‌শূল, যোগিনী, বারবেলা ও কালবেলার হিড়িক কাটাইতে গিয়া কতবার যে সে কলিকাতার ট্রেন ফেল করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রবেশিকায় অনুত্তীর্ণ হইবার একমাত্র কারণ, সেদিন দক্ষিণে যোগিনী ও মঘা নক্ষত্র ছিল। এমন অদৃষ্ট যে, ট্রেনের সময়টাও মাহেন্দ্রযোগ নিদেন পক্ষে অমৃতযোগ ঘেঁষিয়াও ছিল না। তেমন অশুভ লগ্নে যাত্রার ফল, যাহারা তিথি-নক্ষত্র মানিয়া চলে, তাহাদের ফলিবে না কি, অহিন্দুর আচরণ যাহাদের তাহাদের ফলিবে? তার পর বাপের মৃত্যু, কয়েক জায়গায় চাকরির নিষ্ফল উমেদারি ও আবেদন-পত্র প্রেরণ ইত্যাদির মূলেও তিথি-নক্ষত্রের কিঞ্চিৎ গোলযোগ বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এ-সব দীর্ঘ কাহিনী থাকুক, সম্প্রতি বেকার কালিচরণ বহু যত্নে পাঁজি দেখিয়া কলিকাতার কোন নূতন আপিসে এক দরখাস্ত ঠুকিয়া দিয়াছিল, শুভলগ্নের ফল হাতে হাতে না ফলিয়া আর যায় কোথায়? সপ্তাহ-পরে লম্বা লেফাফাখানি সেই শুভসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। মোক্ষদা সত্যই পোড়ারমুখী, নহিলে স্বামীর এই উল্লাসধ্বনি তাহার কানে পৌঁছিতেছে না কেন?

কেন যে কালিচরণের রাসভনিন্দিত কণ্ঠ কাহারও কর্ণে পৌঁছায় নাই, তাহার কারণ আর কিছুই নহে। এদিকে বাটনা বাটিতে গিয়া ওদিকে ডাল ধরিয়া পুড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। শাশুড়ীর বড় সাধের মটর ডাল—কাঁচা আম দিয়া রাঁধিতে গিয়াই না ধরিয়া গেল! গঙ্গাস্নান সারিয়া আজ কি তিনি আর জপে বসিতে পারিবেন?

মটর ডালের শোক, মোক্ষদার অপটুতা, নিজের বৈধব্যের সকরুণ সবিস্তৃত কাহিনী লইয়াই আজ তাঁহার সারা দিন কাটিবে। কোন প্রতিবেশিনী সহানুভূতি দেখাইতে আসিলে সেকালের বধূদের (অর্থাৎ নিজের) দশভুজার ন্যায় কর্ম্মক্ষমতা, এ-কালের দুলালী বধূদের অকর্ম্মণ্যতার তুলনামূলক সমালোচনা কিঞ্চিৎ সানুনাসিক স্বরেই হয়ত আরম্ভ করিবেন।

শাশুড়ী আসিতে-না-আসিতে ডালটা আবার চড়াইয়া দেওয়া যায়। অসময়ে দোফলা কাঁচা আম কোথায় মিলিবে? কালিচরণ কি আর নড়িয়া উপকার করিবে? উহার পুরাতন ঘড়িতে একটা বাজিলেই হইল, ভাতের তাগাদা আরম্ভ হইবে।

কালিচরণের হাঁকাহাঁকিতে মোক্ষদা মুখে অমাবস্যার অন্ধকার নামাইয়া চড়া গলায় জবাব দিল, "কি যে আদিখ্যেতা কর ভাল লাগে না। এদিকে বলে ডাল ধরে পুড়ে—"

চীৎকার করিয়া কালিচরণ বলিল, "ড্যাম ইওর ডাল, শোন এদিকে।"

—একটা বাজলেই তো ভাতের তাগাদা আরম্ভ হবে।

—না, না, আজ তোমার ইচ্ছেয় কাজ।

দুয়ারে মুখ বাড়াইয়া বিস্মিতা মোক্ষদা বলিল,

"ঘরে ঘড়ি রয়েছে না? একটার ঘা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পেটের আগুন দাউ দাউ করে জলে উঠবে না?"

হাস্যমুখে কালিচরণ বলিল, "আজ যে অমৃত খেয়েছি, বেলা পাঁচটা বাজলেও খিদে পাবে না গো। এই দেখ।" বলিয়া লেফাফাখানা শয়নঘরের দুয়ার হইতেই বার দুই আন্দোলিত করিয়া হাসিতে লাগিল।

বেকার কালিচরণের মুখে এমন পরিপূর্ণ মধুর হাসি মোক্ষদা বহুকাল দেখে নাই। কতই বা মোক্ষদার বয়স? বড় জোর চব্বিশ হইবে; আট বৎসর হইল মাত্র বিবাহ হইয়াছে। ইহারই মধ্যে বেকার স্বামী ও রুক্ষ মেজাজের বিধবা শাশুড়ী ও পাঁচ বছরের একটি রুগ্না ঘ্যান্‌ঘেনে মেয়ের আওতায় পড়িয়া সকল সাধ-আহ্লাদই তাহার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। নিজের মেজাজটিও তাই এই আওতায় দিন দিন রুক্ষতর হইয়া উঠিতেছে। মোক্ষদা নিজের পরিবর্ত্তন নিজেই বুঝিতে পারে; নিজের উপর রাগ হয় এই অবাঞ্ছিত পরিবর্ত্তনের জন্য; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, দুঃখকে সে হাসিমুখে জয় করিবে—লাঞ্ছনার বিনিময়ে মধুর ব্যবহার দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া প্রশংসা কুড়াইবে, কিন্তু নিজের নিষ্ফল কামনাগুলি কখন যে ঐ প্রতিজ্ঞা ও হাসিকে ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া রুক্ষ আচরণ মণ্ডিত হইয়া অশান্তি-কলহের কালো মেঘে রূপান্তরিত হইয়া যায় তাহার তথ্য মোক্ষদা বুঝিতে পারে না। সে মনের আগুনে পুড়িয়া মরে, বড় জোর চোখের জল ফেলে। কিন্তু দুর্ব্বিনীতা বধূর চোখের জলে শাশুড়ীর বাক্‌পটুত্ব বা স্বামীর ক্রোধের এতটুকুও অপচয় ঘটিতে পায় না।

কালিচরণের সুমিষ্ট হাসির বাতাসে আজ মোক্ষদার প্রাণে সেই সুপ্ত কামনার কল্লোলধ্বনি সহসাই আরম্ভ হইয়া গেল। ধরা ডালের চিন্তা ভুলিয়া উল্লসিত অন্তরে সে শোবার ঘরের দুয়ারের কাছে আসিল ও আনন্দ গদ্‌গদ্ স্বরে বলিল, "কি গা?"

কালিচরণ বলিল, "বল দেখি কি? বলতে পারলে—এক টাকা বকশিশ।"

মোক্ষদা বলিল, "হাঁ, টাকা দিয়ে তুমি রক্ষে রাখছ না!"

কালিচরণ মোক্ষদার কাঁধে একখানি হাত রাখিয়া বলিল, "এতে কি খবর আছে জান? তোমার শাড়ী, গহনা, মার তীর্থদর্শন—"

মুখ ঘুরাইয়া হাসিয়া মোক্ষদা বলিল, "টাকা বুঝি! তা কত টাকা পেলে? কে দিলেন?"

কালিচরণ বলিল, "পাঁজিপুঁথির নিন্দে করতে যে বড়! দেখছ তো, শুভদিনের ফল কখনও অশুভ হয় না। টাকা আবার দেবে কে? বরাত!"

অধীর কণ্ঠে মোক্ষদা বলিল, "ভাল লাগে না তোমার হেঁয়ালি, সব খুলে বল।"

কালিচরণ তথাপি রহস্য করিতে লাগিল, "কি পাড়ের শাড়ী তোমার চাই! ও বাড়ীর বিনোদদার দ্বিতীয় পক্ষের বৌয়ের মত, না কলকেতার চাকরে তোমার অশোক-ঠাকুরপোর রাঙা বৌয়ের মত প্রজাপতি পাড়? কি প্যাটার্নের গহনা?"

—যাও, তোমার রঙ্গ ভাল লাগে না। বেলা একটা বাজে, মা এখুনি ফিরবেন, তুমিও ভাতের জন্যে—

—দুত্তোরি ভাত। ঘড়ির নিকুচি করেছে, দাঁড়াও। কালিচরণ হাসিতে হাসিতে ঘড়ির পেণ্ডুলামটা বন্ধ করিয়া দিল।

—হ'ল তো?

—ঘড়ি যেন বন্ধ করলে, পেটের আন্দাজ ওতে বোধ মানবে তো?

লেফাফা মেলিয়া ধরিয়া খুশিভরা কণ্ঠে কালিচরণ বলিল, "এই সুধা এই মাত্র খেয়েছি, তাতেও যদি খিদে পায়—," মোক্ষদার কাঁধ হইতে হাত উঠাইয়া তাহার গালে একটি সন্তর্পিত টোকা মারিয়া আদর করিয়া কহিল, "এই অমৃত একটুখানি—"

—যাও। বলিয়া চব্বিশ বছরের মোক্ষদা এক মুহূর্ত্তে ফুলশয্যার রাত্রির ষোড়শী বধূতে পরিণত হইয়া গেল।

গঙ্গাস্নান সারিয়া আসিয়া মা-ও সংবাদটা শুনিলেন। মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, "মটরডাল পুড়ে গেছে—যাকগে, তার জন্যে মুখ ভার করে রয়েছ কেন

বৌমা ? কাল থেকেই পেটটা একটু নরম হয়েছে, তবু অনেক দিনের সাধ তাই মটর ডাল রাঁধতে বলেছিলাম। পুড়েছে, আপদ গেছে। আজ কি আর সাধে চান করে ফিরতে এত দেরি হ'ল! পেটের কামড়ানিটা যেন বেড়েছে।"

মোক্ষদা শশব্যস্তে বলিল, "একটু গাঁদাল পাতার ঝোল করে দিই না, মা।"

শাশুড়ী বলিলেন, "না, না, বিধবার খাওয়া—একটু ভাতে ভোতে, এক ছিটে ঘি আর এক ফোঁটা দুধ হ'লেই—," ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তা হাঁরে, কালি, কবে যাত্রা করবি ? মাইনে দেবে কত ?"

কালিচরণ প্রসন্ন মুখে বলিল, "যাত্রা কাল কি পরশু করতে হবে—শুভদিন দেখে। দাঁড়াও।" বলিয়া সিন্দুকের উপর হইতে পাঁজি ও একখানা পুরাতন খবরের কাগজ লইয়া আসিল।

মা উজ্জ্বল মুখে পাঁজির পানে চাহিয়া রহিলেন, বধূ ঘোমটা টানিয়া কালিচরণের বহুদিনের হারানো মূর্ত্তিটিকে দেখিতে লাগিল।

পাঁজি রাখিয়া কালিচরণ খবরের কাগজ খুলিয়া বলিল, "এই শোন কি লিখেছে :

আজকাল চারিদিকে প্রাদেশিকতার ধুয়া উঠিয়া ভারতবাসীকে যে-ভাবে বহুধা বিভক্ত, দুর্ব্বল ও অবসাদ-গ্রস্ত করিয়া দিতেছে—তাহার বিষময় ফল বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। জাতি বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বাভাস বলিয়া অনেকে মনে মনে শিহরিয়াও উঠেন। আমরা তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া বলিতেছি, ভয় নাই। নিখিল-ভারত বেকার-সমস্যা নিবারণী সঙ্ঘের চেষ্টায় দেশব্যাপী এই নৈরাশ্য ও গ্লানিকে দূর করিবার জন্য বিপুল আয়োজন হইতেছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সারা ভারতবর্ষের প্রতিভূ লইয়া এই নিখিল-ভারত বেকার-সমস্যা নিবারণী সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। এই সঙ্ঘ বিরাট একটি কর্ম্মক্ষেত্র গঠনের প্রচেষ্টায় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারত সন্তানকেই নিজ নিজ গুণানুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক শহরে ইহার শাখা কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে। সারা বিশ্বের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই কার্য্যালয়ের যোগ থাকিবে। সুতরাং বুঝুন কি বিরাট আয়োজন হইতেছে। কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ না হইলে ও দেশবাসীর সর্ব্বাঙ্গীণ সহানুভূতি না পাইলে এই বিরাট পরিকল্পনাটি সার্থক হওয়া সম্ভব নহে। সেই জন্য আমাদের বিনীত নিবেদন যে, প্রত্যেক পদপ্রার্থী ব্যক্তি ন্যূনতম পক্ষে এক শত টাকা জমা দিয়া আমাদের তথা বেকার বন্ধুদের সাহায্য করুন। প্রথম দুই মাসের বেতন হইতেই তো এই যৎসামান্য টাকা উঠিয়া যাইবে অথচ কত বড় একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান গঠনের গৌরব আপনাদের থাকিবে। টাকা ইচ্ছা করিলে আবেদন-পত্রের সঙ্গেও পাঠাইতে পারেন, নতুবা চাকরি গ্রহণের পূর্ব্বদিন আপিসে জমা দিতে পারেন। মনে রাখিবেন, প্রত্যেক মাসে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদের জন্য প্রত্যেক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে এবং ক্রমিক নম্বর অনুসারে নিয়োগ-কার্য্য চলিবে। দুই আনার ষ্ট্যাম্প দিয়া আবেদন করিলে বিনামূল্যে আমাদের নিয়মাবলী সম্বলিত 'বেকার নিবারণী' পুস্তিকা পাঠাইয়া থাকি। আশা করি আপনাদের সহৃদয়তা ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না।…

কালিচরণ থামিলে মা বলিলেন, "সব কথা বুঝতে পারলাম না, বাবা। কিন্তু কোন চাকরিই যদি দেবে তো টাকা চায় কেন ?"

কালিচরণ বলিল, "টাকা নইলে অত বড় আপিস চালাবে কিসে ? ভারি তো টাকা! দু-তিন মাসে সুদ সমেত উঠে আসবে। জান, চল্লিশ টাকার নীচের কোন চাকরি ওরা দেবে না।"

মা বলিলেন, "আহা, বাছাদের সুমতি হোক। কানে জল দিয়ে যদি জল বেরোয় তো মন্দ কি। তা বউমার হাতের ক্ষয়া চুড়ি কগাছা বাঁধা দিয়ে কি আর অত টাকা কেউ দেবে!"

টাকার কথা উঠিতেই মোক্ষদা সে-অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়াছিল। স্বামীর অকল্যাণ করিয়া সধবা মানুষের কি আর হাত খালি করা ভাল দেখায় ? বিশেষতঃ এ চুড়ি বিবাহের সময় তাহার বাপ-মা দিয়াছেন।

আরও কয়েক বার সংসারের অসাচ্ছল্যের সময় ঐ চুড়ি বাঁধা দেওয়ার কথা উঠায় অনেক অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। সে-সব স্মরণ করিয়াই কালিচরণ বলিল, "না, না, ও-সব হাঙ্গামায় কাজ নেই। তোমার অনন্ত দু-গাছা বরঞ্চ—"

মা ঈষৎ ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "ঐ তো বিধবার পুঁজি—যদি খোয়া যায়—"

কালিচরণ বলিল, "তাহলে চাকরির আশা ত্যাগ করতে হয়!" কথার শেষে সে একটি নিশ্বাস ফেলিল।

মা বুদ্ধিমতীর মত পরামর্শ দিলেন, "তার চেয়ে বরঞ্চ আমার একগাছা অনন্ত নে, বৌমার আটগাছা চুড়ির মধ্যে চারগাছা নে; তোর রাহাখরচ, খাইখরচ সবই তো লাগবে, এক-শ পঁচিশ টাকা ধার করে আনি।"

কালিচরণ এ-প্রস্তাব সমর্থন করিল।

মোক্ষদাও মুখে আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল, "মার পুঁজিতে হাত দেওয়ার কি দরকার ছিল! আমার হাত খালি করে যদি ভর্ত্তি করে না দিতে পার—সে দোষ তোমারই। দু-গাছা নোয়া পরেও তো সধবার লক্ষণ বজায় রাখতে পারতাম।"

কালিচরণ মা এবং বৌ দুই জনেরই বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া পাঁজি খুলিয়া বসিল। ২৯শে সেপ্টেম্বর আপিসে যোগদানের শেষ তারিখ। আজ হইল ২৬শে। আজ আর কিছু এই অবেলায় যাত্রা করা চলে না। টাকার জোগাড়, বিদেশ-বাসের জন্য কিছু ফরসা জামা কাপড় ও টুকিটাকি জিনিষের জোগাড়—সবই তো করিতে হইবে। তদুপরি অশ্লেষা নক্ষত্র। আগামী কালও তো যাত্রার পক্ষে দিনটি শুভ নহে। মঘা নক্ষত্র। কথায় বলে, "মঘা, এড়াবি ক-ঘা।"

পরশু দিনটি প্রশস্ততর না হইলেও যাত্রা করা চলে। কালবেলা, বারবেলা ইত্যাদি কাটাইয়া এক টুকরা মাহেন্দ্রযোগ যেন রহিয়াছে। যোগিনী দক্ষিণে নাই। ট্রেনের সময়টাও বেশ মিলিয়া যাইতেছে। 'উঠে পাখী না ছাড়ে বাসা'য় যাত্রা করিলে সামান্য যে গণ্ডগোলটুকু আছে, কাটিয়া যাইবে। পরদিন অর্থাৎ তরশু অবশ্য সবচেয়ে প্রশস্ত দিন। না আছে যোগিনীর বালাই, না বা কালবেলা বারবেলার হিড়িক। কিন্তু একেবারে চাকরি-প্রাপ্তির শেষ দিনে যাওয়াটা কি যুক্তিসঙ্গত। যে বেকারের ভিড় ভারতবর্ষে, এ হেন সুবর্ণ সুযোগ কি কেহ হেলায় হারাইতে চাহিবে? 'শুভস্য শীঘ্রম্' এ-কথাটাকে অগ্রাহ্য করাও তো যুক্তিযুক্ত নহে।

"মা, শোন।" কালিচরণ ব্যগ্র কণ্ঠে হাঁকিল।

মোক্ষদা রান্নাঘর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিল, "মা যে বিমলিদের বাড়ী গেলেন—অনন্ত আর চুড়ি নিয়ে।"

"ও", বলিয়া কালিচরণ পাঁজির পাতায় ডুবিয়া গেল।

মা আসিলে বলিল, "যাক, সব দিকেই শুভ যোগাযোগ। টাকাটা ভালয় ভালয় পাওয়া গেল, পরশুই বেরিয়ে পড়ি। আজ এক খুরি দই পেতে রেখো।"

মা হাসিলেন, 'ও-সব লক্ষণের কাজ আর তোকে শেখাতে হবে না, বাবা। কপালে দইয়ের ফোঁটা দেওয়া, পূর্ণঘট আমের ডাল দিয়ে সামনে রাখা, ঠাকুরের পেসাদী ফুল, বিল্বিপত্তর শুঁকিয়ে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দেওয়া, সিদ্ধি দাঁতে কাটা—"

কালিচরণ বলিল, "মোদ্দাৎ ত্রুটি যেন কিছুতে না হয় জান তো, চাকরির বাজার দারুণ মাগ্যি। আর শোন, আমি যেই চৌকাঠের বাইরে পা দেব, অমনি তুমি পেছন থেকে ডাকবে।"

মা গালে হাত দিলেন। বলিলেন, "ও মা সে কি কথা! শুভ কাজে যাচ্ছিস, পেছু ডাকব কি রে?"

কালিচরণ হাসিয়া বলিল, "তুমি খনার বচন কিছুই জান না দেখছি। শোন:

ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভরিতে যায়।
আগু হতে পিছু ভাল যদি ডাকে মায়॥

তুমি মা, তুমি পিছু ডাকলে নির্ঘাৎ ফললাভ।"

একটু থামিয়া বলিল, "আর ওকেও ব'লো ঠিক ঐ

সময়টিতে যেন কলসি কাঁখে করে রায়পুকুরে জল আনতে যায়।"

মা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "বলব।"

কালিচরণ বলিল, "বলব নয়, একটু অভ্যাস করে নাও। ধর—," বলিয়া সে উঠিয়া কয়েক পা চলিয়া আসিয়া বলিল, "এই এতদূর যখন আসব, বাড়ীর বাইরে পা দিই-দিই, তখনই তুমি ডাকবে—তার আগে নয়। আর বাইরে পা দেবার পরই দেখব ও রায়পুকুরে জল আনতে চলেছে।"

মা চিন্তিত মুখে বলিলেন, "তা কি করে হবে! বউ মানুষ, কতক্ষণ কলসী কাঁখে করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে! লোকে বলবে কি?"

—আমি কি পথে দাঁড়াতেই বলছি! ভট্‌চাজদের প'ড়ো বাড়ীটার মধ্যে ভাঙা পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়াবে। ঠিক যেমনি তুমি আমায় পেছু ডাকবে, ও অমনি কলসী কাঁকে আস্তে আস্তে পুকুর পানে যাবে। বুঝলে না? আচ্ছা দাঁড়াও, কলসী একটা দেখি।"

মা বলিলেন, "এই তিনপোর বেলা হ'ল, আগে খেয়ে নে, তার পর ওসব করিস এখন।"

—না, না। কোথায় তোমার বউ, ডাক। এক বার রিহার্সেল দিয়ে নেওয়া যাক।

মা আর কি করেন, রান্নাঘরের পানে চাহিয়া হাঁকিলেন, "অ বৌমা, এক বার বেরিয়ে এস তো। দুয়োরে শেকলটা তুলে দিয়ো।"

রিহার্সেল আরম্ভ হইল।

মাকে প্রণাম করিয়া পা মাপিয়া মাপিয়া কালিচরণ 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। দুয়ারের চৌকাঠ পার হইয়া গেলেও মা ডাকেন না দেখিয়া রাগে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কালিচরণ বলিল, "ডাকলে না? ডাকলে না? না, বুড়ো হয়ে মরতে চললে তবু যদি তোমার আক্কেল হ'ল।"

মা বলিলেন, "কি করি বল, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে একটা বেড়াল ঢুকল। বউমা যদি তরকারিগুলো আদুল রেখে থাকে—সব নৈরেকার করে দেবে।"

—চুলোয় যাক তোমার তরকারি, ডাক। সগর্জনে কালিচরণ বলিল।

রান্নাঘরে শুধু ঠুকঠাক শব্দ হইতেছে। ব্যঞ্জনলোভী বিধবা মায়ের মন ঐ দিকেই পড়িয়া আছে। কয়েক বার তাড়া খাইবার পর মা পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিলেন। বউ তো এক বারের চেষ্টাতেই পাস হইয়া গেল। হাজার হউক বয়স কম, বুদ্ধিমতীও বটে। কলসী কাঁখে লইয়া উহার মৃদু-মন্থর চলনভঙ্গিটি দেখিলেই ধূসর মনে সবুজের ঘন ছায়াপাত হইয়া থাকে। সে চলনকে এক কথায়, কবিত্ব করিয়া বলা যায়, অনবদ্য

আটাশ তারিখে, এত নিখুঁত ভাবে মহলা দেওয়া সত্ত্বেও, কালিচরণ শুভ যাত্রা করিতে পারিল না।

দইয়ের ফোঁটা কপালে পরিয়া, সিদ্ধির কুচা দাঁতে কাটিয়া, দেবতার প্রসাদী নির্ম্মাল্য আঘ্রাণ করিয়া ও মাথায় রাখিয়া, মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া, দেওয়াল-বিলম্বিত তুন্দিলতনু সিদ্ধিদাতাকে চক্ষু চাহিয়া ও চক্ষু বুজিয়া উত্তমরূপে নিরীক্ষণ ও ধ্যান করিয়া, নিজের ও মায়ের 'দুর্গা' ধ্বনির মধ্যে মাপিয়া মাপিয়া পা ফেলিয়া চৌকাঠের দিকে যেমন কালিচরণ অগ্রসর হইয়াছে, অমনই মায়ের পিছু ডাকিবার শুভ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বক্ষণেই দাওয়ায় মুড়ি-ভক্ষণ-রত মেয়েটা 'ফ্যাঁচ' করিয়া হাঁচিয়া ফেলিল। যেমন হাঁচা—সঙ্গে সঙ্গে কালিচরণও স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল।

মা বলিলেন, "ও কিছু নয়, সর্দ্দির হাঁচি। ক-দিন থেকে জল ঘেঁটে ঘেঁটে মেয়েটা—"

কালিচরণ অবরুদ্ধ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল! চীৎকার করিয়া বলিল, "সর্দ্দির হাঁচি! হাঁচি যারই হোক, জান না:

হাঁচি টিক্‌টিকি বাধা
তিন না শোনে গাধা।

আমি কি—!"

মা বলিলেন, "ষাট! ষাট! আমি কি তাই বলছি।"

কালিচরণ চীৎকার করিয়াই চলিল, "হাঁচি! কেন হাঁচি হয়? কেন ওকে জল ঘাঁটতে দেওয়া হয়? কেন অতবড় ধাড়ি মেয়ে জল ঘাঁটে?" বলিতে বলিতে দাওয়ার উপর সশব্দে ব্যাগ ফেলিয়া কালিচরণ ঠাস করিয়া সজোরে মেয়ের গালে একটি চড় কসাইয়া দিল।

প্রথম বৃষ্টিবিন্দুস্পর্শে ছাগী যেমন কর্ণভেদী স্বরে চীৎকার করিয়া উঠে মেয়েটি তেমনই চীৎকারে দাওয়া তথা

পাড়া কাটাইয়া দিল। বউ ওরফে মোক্ষদা কলসী কাঁথে ভট্টাচার্য্যদের ভাঙা প্রাচীরের অন্তরালে মশক-দংশন সহ্য করিয়াও স্বামীর নির্দ্দেশমত অপেক্ষা করিতেছিল। মায়ের পিছু ডাকের পরিবর্ত্তে মেয়ের কর্ণভেদী চীৎকারে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বাহির হইল। একখানা পতনোন্মুখ ইটের ঠোকা লাগিয়া মাটির কলসীটি তাহার সশব্দে ভাঙিয়া গেল।

ওদিকে দাওয়ায় বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়াছে। স্বামী জামা জুতা ইত্যাদি সক্রোধে ছুড়িয়া ছুড়িয়া এদিকে ওদিকে ফেলিতেছে, মেয়েটা চিৎ হইয়া হাত পা ছুড়িয়া কান-ফাটানো রবে চীৎকার করিতেছে, শাশুড়ী দাওয়ায় নিপতিত ফাটা ব্যাগটার কাছে বসিয়া করুণ স্বরে বলিতেছেন, "কর্ত্তার আমলের ব্যাগ, এমনি করে ফেলে গোল্লায় দিলি, বাবা!" আর আঁচলে চোখ মুছিতেছেন; মোক্ষদা কাহারও দিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। পায়ের শব্দ পাইয়া প্রকাণ্ড একটা হুলো বিড়াল কালি বিচিত্রিত মুখে জানালা গলাইয়া লেজ উঠাইয়া লাফ মারিল ও তীর বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মোক্ষদার বার-বার মনে হইতে লাগিল, কাল মেয়েটাকে এক কাপ গরম চা আদা দিয়া গিলাইয়া দিলে হয়তো এই বিপত্তি ঘটিত না। স্বামী কাল সন্ধ্যাবেলায় এক বার যেন সে-কথা বলিয়াছিলেনও, মোক্ষদা গ্রাহ্য করে নাই।

মন-কষাকষি হইলেও শেষের দিনে যাত্রাটি সর্ব্বদিক দিয়াই শুভ বলিয়া বোধ হইল। মেয়েকে কোন প্রতিবেশীর গৃহজাত করা হইয়াছে; মা ঠিক সময়েই পিছু ডাকিলেন, বউও তার অনবদ্য চলনভঙ্গির দ্বারা শুভযাত্রার মধ্যে অনেকখানি মাধুর্য্য সৃষ্টি করিয়া দিল। যথাসময়ে ট্রেন আসিল এবং এক মিনিটও লেট না করিয়া কলিকাতায় পৌঁছিল।

কলিকাতার জনসমুদ্র কালিচরণ ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার দেখিয়াছে। বছর বছর নূতন পথ তৈয়ারী ও কোন কোন পুরাতন পথের বিস্তৃতি বাড়িলেও—এক বার দেখা জায়গাকে খুব অচেনা বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষত মধ্য-কলিকাতা অঞ্চল সেক অঞ্চলের মত নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নহে। ঐ লালদীঘি—ওপারে তার গম্বুজওয়ালা জেনারেল পোষ্টাপিসের ঘড়ি, আর উত্তর দিকের রাইটার্স বিল্ডিঙের প্রকাণ্ড লাল বাড়ীটা তেমনই দাঁড়াইয়া আছে। দক্ষিণের কোণে ডেড-লেটার আপিসের পর সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস। তার পর অবশ্য অনেকগুলি নূতন ইনসিওরেন্স আপিস খুলিয়াছে। পথ তো ভুল হইবার কথা নহে। এইখানেই তো নূতন আপিসের ঠিকানা। নম্বর কালিচরণের মুখস্থ ছিল, মিলিয়াও গেল। তবে আপিসের দুয়ার এখনও খোলে নাই, স্থানটিতে বহু লোক জমিয়াছে। সকলেরই বেশবাস পরিচ্ছন্ন, সযত্নে চুল আঁচড়ানো, চোখে মুখে একটা দারুণ উৎকণ্ঠা। এই যদি নিখিল-ভারত বেকার-সমস্যা নিবারণী সঙ্ঘের অফিস হয় তো নামটি ইহার সার্থক বটে। কারণ, এই একটি আপিসের রুদ্ধ দুয়ারের সম্মুখে বিরাট ভারতবর্ষের বহু জাতি বহু বিচিত্র পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সমবেত হইয়াছে। এ যেন মহামানবের সাগরতীরের এক মহা মিলনের দৃশ্য। জনতা দেখিয়া কালিচরণের উৎফুল্ল ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। প্রতিযোগিতার এই নিদারুণ সংঘর্ষে সে কি নিজের জন্য একটি স্থান সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবে?

বেলা এগারোটা বাজিয়া গেল। জনতা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, ক্রমশঃ চঞ্চল হইতে লাগিল। ব্যাপার কি? আজ তো রবিবার বা ছুটির দিন নহে! অন্যান্য আপিস আলো, পাখা, কেরানী ও চাপরাশী লইয়া রীতিমত সজীব ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

অধৈর্য্য জনতা বহুকণ্ঠে বহু ভাষায় বন্ধ দুয়ারের উদ্দেশে প্রশ্ন ও গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। ট্রাম-বাস বন্ধ হইয়া জনস্রোত ক্রমশঃই উত্তাল হইয়া উঠিতে লাগিল। অদূরে কয়েকজন শ্বেতকায় শান্তিরক্ষককেও দেখা গেল।

কালিচরণ হাঁ করিয়া বাড়ীটার বন্ধ দুয়ারের সম্মুখে চাহিয়া রহিল। একটা লোক মই দিয়া উঠিয়া দুয়ারের মাথায় হাত বাড়াইয়া কি যেন রাখিতেছে। জনতা স্তব্ধ হইয়া লোকটার কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে লাগিল। পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া লোকটা আলো জ্বালিল

এবং কিসে অগ্নি-সংযোগ করিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

সে নামিলে দেখা গেল, প্রজ্বলিত জিনিসটি আর কিছুই নহে—ছোট ছোট দুটি লাল রঙের মোমবাতি ও তাহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্রকায় শ্রীগণেশ-মূর্ত্তি নিম্নশিরে সংস্থাপিত। লোকটা রসিক বটে।

ক্রুদ্ধ জনতা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। ওদিকে শান্তিরক্ষকের দল আসিয়া পড়িল। এখনই মনঃক্ষোভের উপর দেহ-ক্ষোভের আর এক পর্ব্ব আরম্ভ হইবে হয়ত!

পাশের একটা লোক হতভম্ব কালিচরণের জামার প্রান্ত টানিয়া লালদীঘির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল ও বলিল, "গণেশ উল্টেছে কোম্পানী। কত টাকা গচ্চা গেল?"

কালিচরণ বলিল, "টাকা তো দিইনি,—আজ দেব ভেবেছিলাম।"

লোকটা কালিচরণের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "তবে তো ভাগ্যবান পুরুষ আপনি! এই যে এত লোক দেখলেন—প্রায় সবাই দরখাস্তের সঙ্গে অগ্রিম টাকা জমা দিয়েছেন, কি না, চাকরি ফসকাবে না বলে। আরে মশাই, শুঁড়িপাড়ার ঝানু ছেলে হ'য়ে আমিই যে কাল অদ্ধেক টাকা জমা দিয়ে গেছি, বলি চাকরিটা আধপাকা হয়ে থাক। মেলা টাকা পেয়েই তো ওরা এত শীঘ্র গণেশ উল্টেছে, নইলে আর কিছু দিন ব্যবসা চালাত। আরে মশায়, মুষড়ে পড়লেন কেন? টাকা তো আপনার নষ্ট হয় নি। পারেন তো চাকরির চেষ্টা ছেড়ে ঐ টাকায় একটা ছোটখাটো পানের দোকান খুলে বসুন এই শহরে, তাতে লোকসান নেই।'

লোকটি একমনে বকিয়াই চলিয়াছে, কালিচরণ ততক্ষণে ভাবিতেছে শুভযাত্রার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল কিনা।

নাঃ, মেয়েটাকে মারা খুবই অন্যায় হইয়াছে। ঐটুকু মেয়ে সংসারের শুভাশুভ কি-ই বা বোঝে। সে না হাঁচিলে কালই যাত্রা করিতে হইত, আর এই অনন্ত ও চুড়ি বন্ধক দেওয়া এতগুলি টাকা···

সহসা উৎফুল্ল কণ্ঠে কালিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল জামা পাওয়া যায় কোথায় বলতে পারেন? ছোট মেয়ের ফ্রক?"

—সিধে চলে যান। বৌবাজারে কাটা কাপড়ের দোকানে,—হরেক রকম জিনিষ পাবেন। জামা, শেমিজ, শাড়ী যা কিছু দরকার।

কালিচরণের উজ্জ্বল চোখ মুখ ও পায়ের দৃঢ় গতিবেগ দেখিয়া বোধ হইল, সে বুঝি এতক্ষণে ঠিক পথের সন্ধান পাইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের নাট-উপাসনা

শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের ন্যায় জন্মান্তরবাদী। অন্য-লোকবাসী সত্তাদিগের অস্তিত্বে এবং তাহাদিগের মধ্যে ইহলোকের কর্ম্মানুযায়ী অত্যুচ্চ, উচ্চ, অনুচ্চ ও নীচ শ্রেণীস্থ সত্তার অস্তিত্বে তাহাদিগের বিশ্বাস আছে।

ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় এই সকল উচ্চশ্রেণীর সত্তার সাধারণ নাম "নাট"। নিম্নশ্রেণীর সত্তাদিগের সাধারণ নাম "টুছে" বা ভূত।

নাট শব্দ সংস্কৃত নাথ শব্দের অপভ্রংশ; অর্থ প্রভু= দেবতা (অধ্যাপক ডাডসন)। ব্রহ্মদেশীয়গণ নাট শব্দদ্বারা দেবতা বা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সত্তাদিগকেই দ্যোতনা করে। দেবতাগণ নাটশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও ব্রহ্মদেশে দেবরাজ ইন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনও দেবতার পূজার ব্যবস্থা নাই।

অগ্নিবরুণাদি দেবতা মী-নাট, মো-নাট ও ইয়ে-নাট প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীস্থ সত্তার সহিত মিশ্রিত হইয়া

গিয়াছেন। বিহ্‌মা-নাট (ব্রহ্মা) সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও তিনি এখন বিস্মৃত। দেবরাজ ইন্দ্র (তচ্যা=শক্র=ইন্দ্র) তচ্যামিন নামে পরিচিত। তিনি সুমেরু পর্ব্বতে বাস করেন এবং ব্রহ্মদেশের নববর্ষ উদ্বোধনের জন্য বৎসরান্তে একবার মাত্র পৃথিবীতে আগমন করিয়া ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণের অভিনন্দন ও পূজা গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মদেশীয়গণ অন্য যে-সকল নাটের পূজা করে, তাঁহারা ব্রহ্মদেশের স্বেচ্ছাচারী রাজাদিগের দ্বারা নির্ব্বাসিত বা অন্যায়রূপে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শুদ্ধপ্রাণ বীরদিগের পরলোকগত সত্তা। আরব্ধ কর্ম্মজীবন পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহাদিগের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহারা বাসনা-বন্ধন-প্রযুক্ত পৃথিবীতে বা অন্তলোকে বাস করিতেছেন বলিয়া ব্রহ্মদেশীয়দিগের বিশ্বাস। জরাযন্ত্রণাদি-ক্লিষ্ট মানব-দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া, এই সকল সত্তার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ হইয়াছে ও তাঁহাদিগের কর্ম্মশক্তিও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে। সুতরাং এই সকল "বায়ুভূত নিরাশ্রয়" সত্তার জন্য তাহারা বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে; প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধূপ-দীপ, পুষ্প ও ভোজ্যাদি নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে এবং তাহাদিগের বাৎসরিক উৎসবে ব্রহ্মদেশের নানা স্থান হইতে ভক্তগণ সমাগত হইয়া নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি সহকারে তাহাদিগের পূজা করিতেছে।

মহাগীত-মেদনী এবং শোয়ে-পৌঙ্‌-নিদান নামক গ্রন্থে ব্রহ্মদেশের সুপ্রসিদ্ধ ৩৭টি নাটের নাম, তাহাদিগের পূজাবিধি, স্তোত্র এবং তাহার সুর নির্দ্দিষ্ট আছে। এই ৩৭টি নাটের মধ্যে আনাউমিবিয়া, আউঙ্‌-ছোয়ামা-জী, মহাগিরি, টাউঙ্‌-বিওন, শোয়ে-ব্যিন্‌-নাউঙ্‌-ড, ও ম্যিন্‌-বিউ-শিন্‌ সুপ্রসিদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন নাট। শ্রীক্ষেত্র, কাশী, কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে যেমন মহাসমারোহে দেবদেবীর পূজা হয়, ব্রহ্মদেশের নাটদিগের মন্দিরেও সেইরূপ মহাড়ম্বরে তাঁহাদিগের পূজা হইয়া থাকে।

মহাগিরিনাট ব্রহ্মদেশের সুপ্রসিদ্ধ একটি নাট। মহাইয়াজাউইন্‌ গ্রন্থে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ব্রহ্মদেশের উত্তর-ভারতীয় উপনিবেশ টাগাউঙ্‌ রাজ্যে টিন্‌-ডে নামক এক সুদক্ষ লৌহকার ছিল। তাহার অসামান্য দৈহিক শক্তির পরিচয় পাইয়া টাগাউঙ্‌-রাজ তাহার ভগ্নী ডোয়ে-হ্লাকে তাঁহার প্রধান মহিষীর পদে অভিষিক্ত করেন। টাগাউঙ্‌-রাজের এক হস্তী এক দিন মদমত্ত হইয়া রাজপুরীর অধিবাসীদিগকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, টিন্‌-ডে ঐ রাজহস্তীকে ধৃত করিয়া তাহার দন্ত ভাঙিয়া দেয়। টিন্‌-ডের এই শক্তিমত্তায় সন্ত্রস্ত হইয়া টাগাউঙ্‌-রাজ তাহাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহারাণী ডোয়ে-হ্লার অনুরোধে টিন্‌-ডে রাজপ্রাসাদে আগমন করে, কিন্তু রাজপ্রাসাদে প্রবেশের পূর্ব্বেই পুররক্ষীরা টিন্‌-ডেকে রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ এক চম্পকবৃক্ষে লৌহশৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া জীবন্ত দগ্ধ করে। মহারাণী ডোয়ে-হ্লা রাজার এই বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যথিত হইয়া ভ্রাতার চিতাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

অতঃপর টিন-ডে ও ডোয়ে-হ্লা প্রেতাত্মারূপে ঐ চম্পক-বৃক্ষে বাস করিতে থাকেন। টাগাউঙ-রাজ ভীত হইয়া ঐ চম্পকবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়া ইরাবতীতে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে টাগাউঙ-রাজ্য টিন্‌-ডের উপদ্রব হইতে রক্ষা পায় এবং ঐ চম্পকবৃক্ষ ইরাবতী নদীতে ভাসিতে ভাসিতে পাগান নগরে তীর-সংলগ্ন হয়। পাগানে তখন (৩৪৪ খ্রীঃ) তিন্‌লি-চ্যাউঙ্‌ নামক এক নরপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি স্বপ্নাদেশ পাইয়া ঐ চম্পকবৃক্ষটিকে ইরাবতী নদী হইতে উঠাইয়া পুপ্পা পর্ব্বতে (পপা) স্থাপন করেন এবং ঐ প্রেতাত্মাদ্বয়ের বাসের নিমিত্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

টিন্‌-ডের এই প্রেতাত্মাই পরে ব্রহ্মদেশে মহাগিরিনাট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্রহ্মদেশীয়দিগের মতে মহাগিরি জাগ্রত নাট। ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে পুপ্পা পর্ব্বতের এই মহাশক্তিসম্পন্ন নাট আট শত বৎসর কাল ইউরোপের "ডেল্‌ফিক্‌ অর‍্যাকলের" ন্যায় যশ লাভ করিয়াছিল।

পাগান হইতে বিতাড়িত রাজপুত্র চ্যান্‌জিত্তা মহাগিরি-

নাটের অনুগ্রহে সিংহাসন লাভ করেন। ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে তিনি মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ রূপে পরিগণিত। মহারাজ তীবর বংশের প্রতিষ্ঠাতা বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ আলাউঙ্ ফায়া-ও মহাগিরিনাটের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী বীর মহারাজ বোডাফায়া মহাগিরি ও তাঁহার ভগ্নীর দুইটি সুবৃহৎ স্বর্ণমস্তক নির্ম্মাণ করাইয়া দেন (১৮১২ খ্রীঃ)। প্রতি বৎসর নয়ুন মাসে তিনি মহাগিরিনাটের প্রীত্যর্থে বহুমূল্য অলঙ্কার ও ভোজ্যদ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেন।[১] বোডাফায়ার মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় অন্যান্য রাজা ও রাণীগণ মহাগিরিনাটের অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রতি বৎসরই তাঁহাদিগের রাজধানী আভা, অমরপুর ও মন্দালয় হইতে বিশিষ্ট অমাত্যসহ বিপুল উপহার-সামগ্রী পুপ্পা পর্ব্বতে প্রেরণ করিতেন।

এখনও নয়ুন মাসে প্রতি বৎসরই পুপ্পা পর্ব্বতে মহাগিরিনাটের পূজার্থে বিপুল জনসমাগম হয়। তাঁহার সেবকগণ এখনও মহাড়ম্বরে মহাগিরি ও তাঁহার ভগ্নী শোয়েমিয়েহ্না নাটের পূজা করিয়া থাকে। এখনও ব্রহ্মদেশের সুদূর স্থান হইতে ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ তাহাদিগের মানসিক দ্রব্যাদি সহ রক্তবস্ত্রাবৃত এক-একটি নারিকেল মহাগিরির বাৎসরিক পূজায় প্রেরণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে মহাগিরির পূজায় শ্বেত মহিষ ও শ্বেত ছাগ বলি দেওয়া হইত। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হংসবতীর শিন্-বিউ-ইয়েনের আদেশে এই বলি-প্রথা নিষিদ্ধ হইয়া যায়।



টাউঙ-বিওন নাট-ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বর্ণময় মূর্ত্তি

উত্তর-ব্রহ্মদেশে আরও এক সুপ্রসিদ্ধ নাট আছেন। ইনি টাউঙ্-বিওন নাট নামে পরিচিত। ভারতীয় দুই বালক ভ্রাতা জলমগ্ন জাহাজ হইতে এক "বিয়াত্তা"র (কুলার) আশ্রয়ে থেটনের সমুদ্রতীরে ভাসিয়া আসে। থেটনের এক হিন্দু যোগী তাহাদিগকে আশ্রয় দেন। এই যোগীর কৃপায় এই দুই বালক ক্রমে মহাবলশালী হইয়া উঠে এবং নানাবিধ অলৌকিক বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। কয়েক বৎসর পর ঐ যোগীর মৃত্যু হইলে এই দুই ভ্রাতা যোগীর মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া অমানুষিক যোগশক্তি লাভ করে। বিয়াত্তার সাহায্যে তাহারা থেটনে আসিয়াছিল বলিয়া তাহাদের নাম হয় বিয়াত্তা ও বিয়াত্তা-উই।

থেটনের রাজা মনুহা থেটন দুর্গ অজেয় করিবার ইচ্ছায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিয়াত্তা-উইকে হত্যা করিয়া তাহার অস্থিমাংস থেটন দুর্গের ভিত্তিতে সংরক্ষিত করেন।[২]

১। ইংরেজ সৈন্যগণ পাগান জয় করিয়া তত্রত্য ধনাগার হইতে ২। পাউণ্ড ওজনের ঐ দুই স্বর্ণমুণ্ড গ্রহণ করে। পরে রেঙ্গুনের বার্ণার্ড ফ্রি লাইব্রেরিতে উহা রাখা হয়। আঃ বঃ গেজেটীয়ার, দ্বিতীয় ভল্যুম, প্রথম পার্ট, ২০ পৃষ্ঠা।

কিন্তু বার্ণার্ড ফ্রি লাইব্রেরিতে যাহা রাখা হইয়াছে তাহা স্বর্ণমুণ্ড নহে, কাষ্ঠমুণ্ড; ওজনে অন্ততঃ দশ পাউণ্ড।

২। আঃ বঃ গেজেটীয়ার, পৃ. ২০; ভারতীয় ব্রহ্মদেশের ইতিহাস, পৃ. ২৭ দ্রষ্টব্য।



শ্রেষ্ঠ নাট বোড-জি-ঝায়ার প্রাচীন মূর্ত্তি

কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিয়াত্তা পলায়ন করিয়া পাগানের রাজা অনরথের আশ্রয় গ্রহণ করে।

"ক্রুতপদ বিয়াত্তা" প্রত্যহ পাগান হইতে পাঁচ বার পূব্বা পর্ব্বতে গিয়া রাজা অনরথের জন্য চম্পক পুষ্প লইয়া আসিত। এই উপলক্ষে পূব্বা-পর্ব্বত-নিবাসিনী অগ্নিবর্ণা নাম্নী এক বিলুমার (রাক্ষসীর) গর্ভে বিয়াত্তার দুই পুত্র জন্মে। তাহাদিগের রূপ, আকার ও অপূর্ব্ব শক্তিমত্তা দেখিয়া মহারাজ অনরথ তাহাদিগকে তাঁহার পরিচারক রূপে নিযুক্ত করেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, বুদ্ধদেবের দন্ত গ্রহণের জন্য চীনদেশের রাজা উডিবোয়ার রাজ্য আক্রমণ করেন। রাত্রিতে উডিবোয়া প্রহরীবেষ্টিত রাজকক্ষে নিদ্রিত ছিলেন। বিয়াত্তার পুত্রদ্বয় যোগবলে অন্যের অলক্ষিতে ঐ কক্ষে প্রবেশ করিয়া উডিবোয়ার গলদেশে চুনের চিহ্ন রাখিয়া আসে। প্রাতে উডিবোয়া এই চিহ্ন দেখিতে পাইয়া, মহারাজ অনরথের অনন্যসাধারণ শক্তিতে বিস্মিত হইয়া, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন।

এই চীন-বিজয়-যাত্রা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য মহারাজ অনরথ স্থ-টাউঙ-ড নামক এক বুদ্ধমন্দির নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রত্যেক সৈন্য ও অনুচরগণকে এক একখানি ইষ্টক স্থাপন করিতে আদেশ দেন। রাজার অন্যান্য ভৃত্য ও অমাত্যেরা বিয়াত্তার পুত্রদ্বয়ের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া মন্দিরের গাত্রে দুইখানি ইষ্টকের স্থান শূন্য রাখিয়া দেয় এবং বিয়াত্তার পুত্রদ্বয় রাজাজ্ঞা অবহেলা করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করে।

মহারাজ অনরথ তৎক্ষণাৎ এই পুত্রদ্বয়কে ধৃত করিয়া তাহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। সুবৃহৎ দুই শিলাখণ্ডের উপর পেষণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হয়।[৩] এই দুই নির্দ্দোষ বীর যুবকের প্রেতাত্মা টাউঙ্ বিওন গ্রামে বাস করিতে থাকে। মহারাজ অনরথ অতঃপর এই বিশ্বস্ত যুবকদ্বয়ের নির্দ্দোষতার পরিচয় পাইয়া তাহাদিগের বাসের জন্য ঐ গ্রামে এক সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং উহাদিগের সেবার জন্য সুবৃহৎ এক খণ্ড ধান্যক্ষেত্র জায়গীর দেন।

এই দুই প্রেতাত্মা টাউঙ-বিওন গ্রামে শোয়ে ব্যিন্-নিয়াউঙ-ড এবং শোয়ে-ব্যিন্ নীড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ওয়াগাউঙ্ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে ইহাদিগের পূজার্থে টাউঙ-বিওন গ্রামে পাঁচ দিন ব্যাপী এক সুবৃহৎ মেলা হয়। উচ্চ-ব্রহ্মদেশের সকল জেলা হইতে টাউঙ-বিওন-নাটের ভক্তগণ এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে নৃত্যগীতবাদ্যসমন্বিত নৌকায় বিচিত্র-বেশধারী নরনারীগণ এই সময়ে টাউঙ-বিওন গ্রামে আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করে। উৎসবের পাঁচ দিন সমাগত দর্শকগণ পরস্পরের প্রতি শ্লেষ, পরিহাস ও দ্ব্যর্থযুক্ত বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করে।

টাউঙ-বিওন-নাটের অনুগ্রহে অনেক সামান্য ব্যক্তি

৩। টাউঙ-বিওনে এখনও এই দুই খণ্ড শিলা সংরক্ষিত আছে। যাত্রীরা তাহাতে ফুলচন্দনাদি দিয়া নাটভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মাননা করে।



মেমিয়োর মন্দিরে বৃদ্ধ পুরোহিত নাট-স্তোত্র পাঠ করিতেছেন।

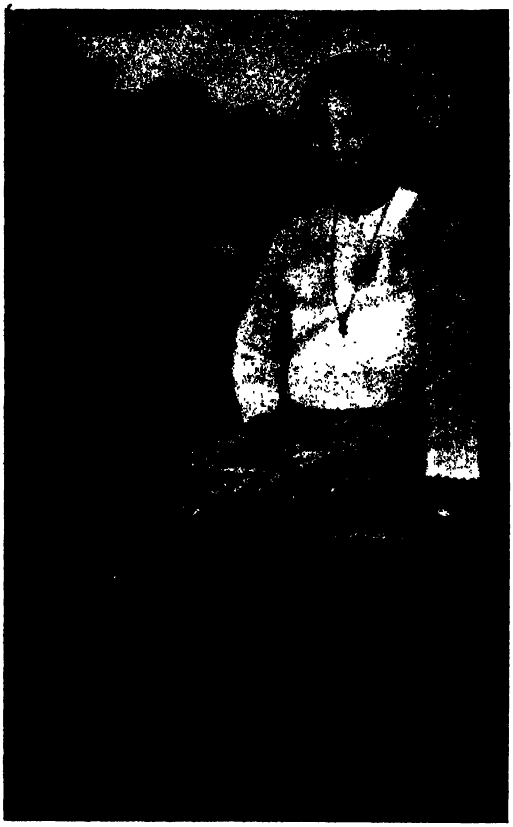
অসামান্য সম্মান ও যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। মেমিয়োর উকীল উচ্যডুন এই নাটের অনুগ্রহে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও বক্তৃতাশক্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচারিত আছে।

টাউঙ্‌বিওন-নাট অবিবাহিত ছিলেন। এই জন্য উচ্চ-ব্রহ্মদেশের অনেক রমণী বয়োজ্যেষ্ঠ নাট শোয়ে-ব্যিন্‌-নিয়াউঙকে পতিত্বে বরণ করিয়া "নাকড" উপাধি গ্রহণ করে। তাহারা অবিবাহিত থাকে না; কিন্তু তাহাদের মন ও হৃদয় নাটকে উৎসর্গ করিয়া তাহারা সংসারধর্ম্ম পালন করে। তাহারা বলে—টাউঙ্‌বিওন-নাট সুন্দর শরীর চাহেন না, সুন্দর হৃদয়ই তাঁহার প্রিয়। কোনও কোনও নাকড, টাউঙবিওন-নাটের আদেশ অনুসারে[৪] তাঁহার সেবাইত-সমিতি হইতে তো-ছাউঙ-মিবিয়া (রাণী) উপাধি প্রাপ্ত হয়। সেবাইতগণ তাঁহাকে শাস্ত্রবিহিত রেশমী পরিচ্ছদ ও নানাপ্রকার আভরণে সজ্জিত করিয়া টাউঙবিওন-নাটের রাণীর পদে অভিষিক্ত করে। এই অভিষেক-অনুষ্ঠানে বহু নাট-ভক্ত ও নাট-সেবক সমাগত হইয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা টাউঙ-বিওন-নাটের স্তুতি পাঠ করে। যথেষ্ট পানভোজনের আয়োজন হয়। শূকর-মাংস ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ভোজ্যই এই নাটকে নিবেদন করা যাইতে পারে।

এই সকল নাট ব্যতীত অন্য এক প্রকার নিয়স্তরস্থ নাট আছে যাহারা গ্রামভূমি, বাসগৃহ, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও মন্দিরাদির অভিভাবক ও রক্ষাকর্ত্তা নাটরূপে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ পুরাতন গ্রামের চতুর্দ্দিকে কাঁটাগাছের বেড়া ও উহার এক প্রান্তে এক বৃহৎ ফাটক আছে। ঐ ফাটকের নিকটে একটি বট, অশ্বত্থ, বা লেটপান্‌ বৃক্ষ রোপিত থাকে। উহার অনুচ্চ কাণ্ডে ঐ গ্রামের রক্ষাকর্ত্তা নাটের জন্য ছোট একটি কাঠের বা বাঁশের মঞ্চ নির্ম্মিত থাকে। গ্রামরক্ষী নাট ঐ বৃক্ষে বাস করে এবং ঐ মঞ্চে তাহার পূজার জন্য পুষ্পপত্রাদিযুক্ত একটি জলপূর্ণ ঘট সংরক্ষিত হয়; গ্রামে কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, গ্রামের নরনারীগণ নৃত্যবাদ্যাদি সহ শোভাযাত্রা করিয়া ঐ বৃক্ষের তলায় আতপান্ন ও মদ্যমাংসাদি প্রদান করে এবং রোগোপদ্রব দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করে। বঙ্গদেশের শীতলা, মনসা, জরহারী বা বুড়ী-মার পূজার ন্যায় এই সকল ব্রহ্মদেশীয় নাটের পূজার জন্যও নির্দ্দিষ্ট বিধি আছে।

কথিত আছে, পূর্ব্বতন বর্ম্মা-রাজাদিগের প্রাসাদ, দুর্গ ও দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণকালে উহার ভিত্তিভূমিতে

৪। নাটদিগের এই সকল আদেশ বিশিষ্ট ভক্তদিগের আবিষ্ট অবস্থায় সেবাইতদিগকে জানান হয়। নাকডগণের এই পবিত্র প্রেম ব্রজের গোপিনীগণের বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত তুলনীয়।



ব্রহ্মদেশের আধুনিক 'চন্থ' জাতীয়া যুবতী

জীবন্ত মনুষ্য প্রোথিত করিয়া তাহার প্রেতাত্মাকে শাশ্বত কাল ঐ পুরী বা মন্দিরের রক্ষী রূপে নিযুক্ত রাখা হইত। ব্রহ্মদেশের এইরূপ নরবলি-প্রথাকে "মিওআডে অনুষ্ঠান" বলে। শ্রীযুক্ত হারভী সাহেবের "ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে" ৩২০ পৃষ্ঠায় এই প্রথার উল্লেখ আছে। সাধারণ গৃহস্থের বাসগৃহ নির্ম্মাণে এইরূপ নরবলির ব্যবস্থা নাই, গৃহরক্ষী নাটের পূজার ব্যবস্থা আছে। ঘরের প্রথম খুঁটি বসাইবার সময়ে কিংবা ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের ভিত্তিতে প্রথম ইষ্টক স্থাপনের সময়ে, মিস্ত্রীরা ঐ খুঁটি বা ভিত্তির নীচে একখণ্ড রক্তবর্ণ বস্ত্র, একটি পান, সুপারি, এক ফানা কলা, একটি নারিকেল এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন রাখিয়া এইন্-ছাউঙ্ নাটের (গৃহ-রক্ষক নাটের) পূজা করে। বস্ত্র, পান-সুপারি ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ঐ ভিত্তির নীচেই সংরক্ষিত হয়; অবশিষ্ট ফল ও মিষ্টান্নাদি নাটের প্রসাদরূপে মিস্ত্রীরা ভক্ষণ করে। ব্রহ্মদেশে যে সকল গৃহনির্ম্মাতা এঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্টার আছেন তাঁহারা সকলেই এই প্রথা অবগত আছেন।

বনে, জলাশয়ে বা প্রান্তরস্থ বৃক্ষাদিতে যে সকল নাট বাস করে, তাহারা কোনও পূজা বা ভোজ্যের আকাঙ্ক্ষা করে না; কোনও উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বা পরিত্যক্ত বাস্তভূমিতে নিজের আনন্দে বাস করে। কাহাকেও একাকী পাইলে নির্দ্দোষ কৌতুক করিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহাদিগকে বিরক্ত না করিলে, কাহাকেও তাহারা বিরক্ত করে না।

যে সকল নিকৃষ্ট প্রেতাত্মা বৃক্ষাদিতে বাস করিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব করে, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য নাট-সয়া (ওঝা)দিগের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ব্রহ্ম



ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব-সীমান্তের অধিবাসিনী প্যাডঙ-জাতীয়া যুবতী

দেশীয়দিগের বিশ্বাস যে নাত্তগণ* উচ্চশ্রেণীর নাটগণের আরাধনা করিয়া এই সকল নীচশ্রেণীস্থ প্রেতাত্মাকে শাসন করিবার ব্যবস্থা করে। বর্ম্মীরা তাহাদিগকে নাট্-ছো (দুষ্ট আত্মা), টচ্ছে (ভূত) স্থিন্-ছা (পিশাচ), আছেই-ভইয়ে (দৈত্য), তবেক্ (দানব) ঔছা-ছাউঙ্ (যক্ষ), বিলু (রাক্ষস) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দিয়াছে।

এই সকল প্রেতাত্মার আকৃতি সম্বন্ধে "স্পিরিট ওয়ার্লড" পুস্তকের গ্রন্থকার উখা লিখিয়াছেন,

"এই সকল প্রেতাত্মাগণ বিড়াল, শূকর, ব্যাঘ্র বা পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যকে ভীতি প্রদর্শন করে। কোনও কোনও ভূতের আকৃতি ঘন কৃষ্ণমেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; লাঙ্গলের ফালের ন্যায় ইহাদের দন্ত; জিহ্বা গোসর্পের ন্যায় বিভক্ত এবং বক্ষোদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; চক্ষু অস্তগামী সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল; কর্ণ ফুঙ্গীদিগের আতপত্রের ন্যায় বৃহৎ, এবং উদর হস্তীদিগের উদরের ন্যায় স্থূল। ইহারা রক্তপিপাসু, মাংসাশী এবং মনুষ্যের অনিষ্ট সাধনে যত্নবান।"

বলা বাহুল্য যে, এই সকল ভূতকে নাট বলা হয় না। বর্ম্মীরা এই সকল ভূত তাড়াইবার জন্য উচ্চশ্রেণীস্থ নাটগণের সাহায্য প্রার্থনা করে।

ব্রহ্মদেশে ভূতপ্রেতদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে উখার পুস্তকে অনেক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তির কথিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেটলমেণ্ট অফিসার ম্যাক্সওয়েল লরী সাহেবও ১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সেটলমেণ্ট রেকর্ডে এই সকল ভূতপ্রেতাদির উপদ্রবপূর্ণ অনেক জমির উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের হিন্দু ঔপনিবেশিক ও আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে যে যে দেবতা ও ভূতাদির পূজা প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রহণের পরেও তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে পূর্ব্ব-পূজিত দেবতা ও ভূতাদির মূর্ত্তিসমূহকে সংরক্ষণ করিতে থাকে। মনস্তত্বজ্ঞ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ কালাপাহাড়ের ন্যায় এই সকল মূর্ত্তি বিনষ্ট না করিয়া শান্তভাবে তাহাদিগকে সদ্ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে থাকেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐতিহাসিকগণ দেখাইয়াছেন—১০৫৯ খ্রীঃ মহারাজা অনরথ শোয়েজিগন-মন্দিরে বুদ্ধদেবের দন্ত ও বুদ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া ঐ মন্দিরের বহির্ভাগে, ৩৭টি নাটমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নাটমূর্ত্তিগুলির পূজার জন্য শোয়েজিগন মন্দিরে বহু বৌদ্ধ নরনারীর সমাগম হয়। বুদ্ধমূর্ত্তির সন্নিধানে এই নাটমূর্ত্তিগুলি সংস্থাপনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মহারাজ অনরথ বলিয়াছিলেন—"নাটদিগের পূজার জন্যও যদি অশিক্ষিত জনসাধারণ শোয়েজিগন মন্দিরে আসে তবুও তাহাদিগকে সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা হইবে।"

খ্রীষ্টান মিশনরীগণ ব্রহ্মদেশীয় নিরীশ্বর বৌদ্ধগণের নাটপূজা ও নাটভক্তগণের অনুষ্ঠানাদি দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,

ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসের ফলে শয়তানের সহচর ড্রাগন, যেমন, ব্যাকাস্ প্রভৃতি দৈত্যগণ ব্রহ্মদেশে নাটরূপে আবির্ভূত হইয়াছে।

কেহ বা লিখিয়াছেন,

মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই ঈশ্বরানুরাগী; বৌদ্ধ ধর্ম্মে ঈশ্বরের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বে অনাস্থার উপদেশে বর্ম্মীদিগের মন বিদ্রোহী হইয়া এই সকল ভূত-প্রেতকে ঈশ্বরের বেদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত স্কাণ্ডিনেভিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া চীন দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচীন দেশের অ্যানিমিজম্, স্পিরিচুয়ালিজম্, স্পিরিট-ওয়ারশিপ এবং অ্যানসেস্ট্রাল ওয়ারশিপ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া ব্রহ্মদেশীয় নাটপূজার অধ্যাত্মতত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশবাসিগণ কিন্তু এ সকল বাক্যে বিচলিত হয় নাই। তাহারা জানে যে তাহারা দেব-দেবতার পূজা এবং সম্মান করিলেও দৈত্য-দানবের উপাসক নহে। ব্রহ্মদেশীয়গণ নাটগণের আরাধনা করে না। • উচ্যাডুন বলিয়াছেন,

ইউরোপে যেমন মৃত মহাত্মাদিগের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের লোক মৃতের সমাধিতে পুষ্প বর্ষণ করে, মৃতের কল্যাণ কামনা করে, বা মার্ব্বেলের মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে, ব্রহ্মদেশের নাটপূজাও অনেকাংশে তদ্রূপ উদ্দেশ্যযুক্ত সম্মাননা। বৌদ্ধোক্ত নির্ব্বাণ সাধনের সহিত ইহার কোনই অসামঞ্জস্য নাই।

সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হারভী সাহেবও এইরূপ মত পোষণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন,

ব্রহ্মদেশের রাজারা তাঁহাদের প্রজাদিগের হৃদয়ে রাজ-সিংহাসন স্থাপন করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের আদেশে নিহত ও নির্যাতিত মহাপ্রাণ মনুষ্যগণ ব্রহ্মদেশীয়দিগের হৃদয়ে রাজ্যেশ্বররূপে বিরাজ করিতেছে। অনরথ বর্ম্মী রাজাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়গণ তাঁহার সমাধি নির্ম্মাণ করে নাই, তাঁহার কোনও মূর্ত্তি গঠিত করে নাই বা কেহই তাঁহাকে পূজাও দেয় না; কিন্তু চ্যাউছে-বাঁধে তাঁহার যে করুণহৃদয়া শান্ রাণী নির্দ্দোষ প্রজাদিগের প্রাণরক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহার সমাধি এখনও ব্রহ্মদেশীয়দিগের ফুলে ও নৈবেদ্যে ভরিয়া যাইতেছে।

মহারাজ অনরথ তাঁহার দুই বিশ্বস্ত ভৃত্যকে বিনাদোষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহারা টাউঙ্-বিওন গ্রামে ব্রহ্মবাসীদিগের শাশ্বত ভক্তি ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছে; আর মহারাজ অনরথ তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই পরিচিত রহিয়াছেন।

টাণ্ডাউঙ্-এর বিশ্বাসঘাতক রাজা বিস্মৃতির গহ্বরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন কিন্তু নিরাপরাধ ঙা-টিন্-ডে ও তাহার ভগ্নী পপা পর্ব্বতে ব্রহ্মদেশের স্মরণীয় ও বরেণ্য হইয়া আছেন।

বিগত এক হাজার বৎসর কাল দুঃখশোকার্ত্ত শত শত নরনারীর কাতর প্রার্থনায় এই নাটদিগের মন্দির মুখরিত রহিয়াছে; ভক্তগণের প্রদত্ত শত শত দীপ ও পুষ্পস্তবকে তাহা বিভূষিত হইতেছে। নানা প্রদেশ হইতে সমাগত সহস্র সহস্র নরনারী নানাবিধ মহার্ঘ্য উপহারসহ এই সকল মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া নাটদিগের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে। ধূপ-দীপ-পুষ্প-সমন্বিত ঐ সকল মন্দিরে ভক্তগণের অলৌকিক উল্লাস ও নিষ্কম্প ভাবাবেশ দেখিয়া বিধর্ম্মীরও মন বিস্ময়াপ্লুত হইয়া উঠিতেছে। এ আরাধনা যদি কুসংস্কার হয়, তবে তাহা মানব-মনের কুজ্ঝটিকাপূর্ণ, মধুর রহস্যময়, কাব্য-কোরাণ-বাইবেল ও বেদান্তের বহিঃপ্রান্তস্থ অমানুষিক সৌন্দর্য্যের কারুকার্য্যময় এক দুর্বোধ্য কল্পনা। বিজ্ঞানের অবোধ্য, জ্ঞানের দুর্নিরীক্ষ্য এবং কল্পনার দুরধিগম্য কতকগুলি পারলৌকিক সত্তার শক্তিমত্তায় অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তিই এই নাট পূজার মূল উৎস।

পাষাণময়ী

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

একটা প্রকাণ্ড বিল:
রাত্রির নিবিড় অন্ধকার।
প্রেতের মত কয়েক জন বেহারা
সেই জলাভূমির কিনারে কিনারে
পাল্‌কি নিয়ে চলেছে—নিঃশব্দে।
তাদের ছায়া পড়েছে সেই জলে—
অসংখ্য বনঝাউ, শাপ্‌লা শালুকে ভরা সেই বিল।

কতকগুলি ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে এল।
পাণ্ডুর চাঁদের আলোয়
একটা ভাঙা মন্দিরের পাশে
অন্ধকার বটতলায় পাল্‌কি থাম্‌ল।

ছায়ামূর্ত্তিদের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলো
প্রসারিত হ'ল।
বধূর মুখ তা'রা দেখবে।
পাল্‌কিতে আছে সেই বধূ।

ছায়াতে, চাঁদের আলোর অস্পষ্টতায়
বধূর গলায় ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠল হীরামুক্তাজহরৎ—
যেমন ঝিক্‌মিক্ করে অমাবস্যার আকাশে
অসংখ্য তারকা।

তার পরে উঠল একটা দমকা হাওয়া
একটা প্রচণ্ড অট্টহাসিতে দীর্ণ হ'ল আকাশ।
বধূর চোখে পলক পড়ে না।
নিরুপম, সুন্দর সেই মুখ,
সমস্ত কপাল ভ'রে মুক্তার মত ঘামের মালা।
ছায়ামূর্ত্তিরা ঘিরে দাঁড়াল সেই মুখ
ঝাউয়ের বনে বাতাসের শব্দের মত তাদের নিঃশ্বাস।

তবু পলক নেই বধূর চোখে—
বোধ হয় প্রাণ নেই তার দেহে।
সেই নির্ব্বাক্ মুখ আর
নিঃস্পন্দ দেহের দিকে চেয়ে
তা'রা অট্টহাসিতে দীর্ণ করল আকাশ।

তথাপি

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

হাজারিবাগের এক নির্জ্জন প্রান্তে অমিয়জীবন আপাততঃ আশ্রয় লইয়াছে। সঙ্গে আসিয়াছে বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য গোপাল। বাংলা দেশের প্রায় সবগুলি স্যানিটেরিয়াম সে একের পর এক ঘুরিয়া আসিয়াছে—সেখানে আর আশ্রয় পাইবার কোন আশা নাই।

অমিয়জীবনের দেহে মরণকীট বাসা বাঁধিয়াছে। অবধারিত মৃত্যু নাকি তার আসন্ন।

দেহে তার প্রচুর রূপ যা সচরাচর চোখে পড়ে না, ব্যবহারেও সে অত্যন্ত অমায়িক—তবুও সাধারণ জনসমাজ তাহাকে চায় না, তাঁহাকে তাহাদের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে ভয় পায়। সাধারণের এই উপেক্ষা অমিয়কে তীব্রভাবে আঘাত করে, তাই সে স্বেচ্ছায় ভ্রাম্যমাণ জীবন বরণ করিয়া লইয়াছে।

নিজের বাড়ীতেও কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব। সকলেই স্পর্শ বাঁচাইয়া চলিতে ব্যস্ত—ঘরে তার আরও ছোট ছোট ভাইবোন আছে যাহাদের বাঁচিবার অধিকার আছে।

মা অনেক কান্নাকাটি করিয়াছেন, অমিয়কে বাধা দিয়াছেন; বাবা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন কিন্তু বাধা দিতে পারেন নাই—কিন্তু গোপাল একেবারে নাছোড়বান্দা। সে সঙ্গে আসিয়াছে।

অমিয়জীবন বাধা দিয়া বলিয়াছিল—তোমার কি মরণের ভয় নেই গোপাল?

গোপাল হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিয়াছিল—মরণের ভয় আবার কার নেই দাদাবাবু, তা ব'লে একলা ত আর তোমায় ছেড়ে দেওয়া যায় না!

তথাপি অমিয়জীবন বলিয়াছিল—কিন্তু কাজটা তুমি ভাল করছ না!

গোপাল বলিয়াছিল—ভালমন্দর কথা যদি বলো তাহ'লে এ বয়সে আর ও নিয়ে টানাটানি ক'রে লাভ নেই, তাছাড়া আমার ভালমন্দর চিন্তা শুধু আমার জন্যই কিনা!

গোপাল সংসার করে নাই।

গোপালের প্রত্যুত্তরে অমিয়র বুক ভরিয়া উঠে। সে তার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত গোপালকে তুলনা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইল। মন তাহার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই নিজের মনকে প্রবোধ দিবার জন্যই বলিল—তোমার কেউ নেই বলেই এতবড় দুঃসাহস করতে পেরেছ। নইলে দেখতেই ত পাচ্ছ আমার মা-বাবাকে পর্য্যন্ত আজ দূরে থাকতে হয়েছে। আমার মত আর সকলে ত ফুরিয়ে যায় নি। তাদের বাঁচতে হবে যে—

গোপাল সম্ভবতঃ অমিয়র মনের খবর রাখে। সে কহিল—তুমি মিছে রাগ করছ দাদাবাবু, নইলে তোমার সুখসুবিধের জন্য কত পয়সা তাঁরা খরচ করছেন—

অমিয়জীবন হাসিল—সুখ এবং সুবিধা···টাকা তাঁরা অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যয় করিতেছেন, সেদিক্ দিয়া কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই, কিন্তু তবুও তার মন ভরিয়া উঠে না কেন! বরং সুতীব্র অভিমান তাহার সহজ বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অমিয়জীবন বুঝিয়াও বোঝে না। পৃথিবীর সবল সুস্থ মানুষ মাত্রকেই সে হিংসা করে। দশজনার মত বাঁচিয়া থাকিতে তার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা—সংসারে তার প্রবল মোহ। নিজের জীবন লইয়া কত রঙীন কল্পনা তার মনের অন্তরালে বিচিত্র রূপ ধরিয়া আনাগোনা করে।

অমিয়জীবন উত্তেজিত হইয়া উঠে, চীৎকার করিয়া ডাকে—গোপাল!

গোপাল অন্য কাজে ব্যাপৃত ছিল, উৎকণ্ঠিত ভাবে ছুটিয়া আসিল, কি—কি হয়েছে দাদাবাবু···

বাতায়ন-পথে ইঙ্গিত করিয়া অমিয়জীবন কহিল—কি সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে যাচ্ছে দেখেছ?

গোপাল যেন হাঁপ ছাড়িয়া কহিল—ও এই কথা! ওরা আমাদের পাড়াপড়শি। আমি চিনি।

অমিয়জীবন একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—তুমি বুঝি ওদের চেন? আলাপ ক'রে নিয়েছ বুঝি?

গোপাল তার প্রশ্নে সায় দিল।

অমিয় একটু হাসিল, কহিল—আমার চেহারা দেখে কেউ বিশ্বাস করে না যে, আমার এত বড় ব্যাধি।

একটু থামিয়া অমিয় পুনরায় কহিল—কাউকে আমি ঠকাতে চাই না কিনা, তাই সব জায়গায় আমি হেরে যাই।

গোপাল একটু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল—এসব তুমি কি বলছ দাদাবাবু?

অমিয়জীবন একটু হাসিয়া কহিল—বলছিলাম ওদের এক দিন নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়ে দিলে কেমন হয়?

গোপাল কহিল—সেটা কি ভাল হবে দাদাবাবু! তাছাড়া ওরাই বা আমাদের বাড়ী খাবে কেন?

অমিয়জীবন মৃদু কণ্ঠে কহিল—খাবে না বুঝি! তা'হলে থাক।

অমিয়জীবনের বঞ্চিত মন হাহাকার করিয়া উঠে। গোপাল আর কথা না বাড়াইয়া প্রস্থানোদ্যত হয়।

অমিয়জীবন পুনরায় ডাকিল—আচ্ছা গোপাল—

গোপাল দাঁড়াইল। অমিয় বলিল—তোমার কোন দিন সংসার করবার ইচ্ছে হয় নি?

গোপাল হাসিল, মাথা নাড়িয়া জানাইল, না—

অমিয়জীবনের একটি নিঃশ্বাস পড়িল, সে কহিল—তুমি যাও গোপাল। আমি বরং একটু বেড়িয়ে আসছি।

গোপাল বাধা দিয়া জানাইল, একলা আবার কোথায় যাবে—অমিয়জীবন একটু হাসিয়া কহিল, ভয় নেই গোপাল, আমি কাছেপিঠেই থাকব।

গোপাল চলিয়া গেল, অমিয়জীবন অন্যমনস্ক ভাবে সেখানেই বসিয়া রহিল। মাথায় মধ্যে তার দার্শনিক চিন্তা। এই ত জীবন, অথচ ইহা লইয়াই মানুষের গর্ব্বের অন্ত নাই। নিজে ত সে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল—তখন তার স্বাস্থ্য ছিল, রূপ এবং রূপা ছিল, তার উপর সে ছিল কৃতী ছাত্র। কানের কাছে নানা ছন্দের নানা ভাবের গুঞ্জন চলিত। বন্ধু-বান্ধবের দল তাহাকে হিংসা করিত, তার নামে মিথ্যা রটনা করিয়া নিজেদের সজ্জন বলিয়া প্রচার করিত। আজ তাহারা কোথায়? তার নিন্দা করিবার জন্যও এক বার কাছে আসে না। কিন্তু এক দিন ছিল যখন সে উহাদের নিন্দা-সুখ্যাতির ঊর্দ্ধে বসিয়া কত রঙীন স্বপ্ন দেখিয়াছে, জীবন-সঙ্গিনী হইতে কে তার উপযুক্ত এই চিন্তায় বিভোর হইয়া উঠিয়াছে···আর আজ···

অমিয়জীবন অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া ডাকিল, গোপাল—

গোপাল পুনরায় ছুটিয়া আসিল, ডাকছিলে দাদাবাবু?

অমিয় কহিল—দেখ ত গোপাল এখানে এসে শরীরটা আমার খানিক সেরেছে না?

গোপাল একমুখ হাসিয়া কহিল, সেরে উঠবে বইকি—

অমিয়জীবন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতাশ কণ্ঠে কহিল—না গোপাল এ রোগ কারুর ভাল হয় না।

কিছু দিন যাবৎ অমিয়জীবনের ছেলেমানুষি যেন সীমা ছাড়াইয়াছে।

গোপাল তাহাকে ধমক দিয়া কহিল—এই সব বাজে কথা শোনাবার জন্যই কি আমাকে বার-বার ডেকে পাঠাবে তুমি!

অমিয়জীবন একটু করুণ হাসি হাসিয়া কহিল—সত্য কথাগুলো শুনতে একটু কটু লাগে গোপাল, নইলে একথা কি তুমি বোঝ না যে, দিন দিন কোথায় গিয়ে আমি পৌঁছচ্ছি।

গোপাল সত্য সত্যই হয়ত ততটা বোঝে না কিন্তু দিনরাত শুধু ঐ একই কথা শুনিতে শুনিতে গোপাল হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

অমিয়জীবন পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল। গোপাল তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল—এর নাম বুঝি তোমার বেড়াতে যাওয়া দাদাবাবু!

অমিয়জীবন মৃদু হাসিয়া কহিল—বড্ড জ্বালাতন করি তোমায়, না গোপাল?

গোপাল লজ্জিত ভাবে প্রস্থান করিল।

অমিয়জীবন পুনরায় তার নিজের কথা ভাবিতে বসিল, দেহে তার দুরারোগ্য ব্যাধি আশ্রয় লইয়াছে বলিয়াই কি সে কাহাকেও কাছে টানিতে পারিবে না? কিন্তু কেন? কেন সে তাহা পারিবে না! আজও তার দেহে স্পন্দন রহিয়াছে, একেবারে অসমর্থ সে নয়, চেতনা তার কাহারও চেয়ে কম নয়। রক্তে তার আজও নৃত্যের সুর বাজিয়া উঠে তবুও কেন সে একেবারে বাতিল হইয়া যাইবে? আত্মীয়স্বজন সকলের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিবে। সে বাঁচিয়া ছিল এ-প্রমাণ সে রাখিয়া যাইবে।

অমিয়জীবন বিবাহ করিয়া সংসার করিবে—সে যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে তার সাক্ষ্য দিবে আর একটি নারীর ব্যর্থতা···অমিয়জীবন হিংস্র হইয়া উঠিল···সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ।

আঃ, কি সুন্দর ছেলেমেয়েগুলি। এই মনোরম সকাল বেলার মতই ওরা শুভ্র। উহারা প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিতেছে। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে ওরা বেগবান্। ওদের বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করে···ভালবাসিতে প্রাণ চায়, কাছে ডাকিতে মন আকুল হইয়া উঠে। কিন্তু ঐ সুন্দর মুখগুলি যখন তার স্বরূপ জানিতে পারিয়া ভয়ে এবং সঙ্কোচে তার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে তখন সে তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবে!

অমিয়জীবন নিজের মনে হাসিয়া উঠিল। তার নিজের ভাইবোনরা যখন দরজার পাশ হইতে ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাদের দাদাকে লুকাইয়া দেখিয়া যাইত সে-দিনের সে-আঘাতও সে সহ্য করিতে পারিয়াছিল আর এ ত নিতান্তই পর। ইহাদের উপেক্ষায় তার কিছুই আসিয়া যাইবে না।

অমিয়জীবন সহসা সজাগ হইয়া উঠিল—খানিক অগ্রসর হইয়া গিয়া ডাকিল—শোন খুকুমণি···খোকাভাই শোন—

যাহারা চলিয়া যাইতেছিল তাহারা দাঁড়াইল।

অমিয়জীবন পুনশ্চ কহিল—তোমাদের বেড়ান হয়ে গেল বুঝি? ও কি! তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন, এস আমার বাগানে। অনেক ফুল দেব।

উহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল।

অমিয়জীবন নিজের হাতে থোপা থোপা ফুল সকলকে বণ্টন করিয়া দিতে লাগিল। অথচ কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও এই ফুলগুলির জন্ত তার কি মমতা ছিল। ছাই ফুল—কতখানি এর মূল্য, অথচ এই সামান্তর বিনিময়ে ওদের মুখে যে স্বর্গীয় হাসির বন্যা বহিয়াছে তাহা অনুপম—

অমিয়জীবনের মধ্যে সহসা চেতনা দেখা দিল, সে ভাবিতেছিল যে, এমন ফুলের মত নরম ছেলেমেয়ে কয়টিকে তার সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া উচিত হয় নাই। তার অভিশপ্ত স্পর্শে হয়তো ওরাও শুকাইয়া যাইবে। এদের কোনদিন আর সে কাছে ডাকিবে না—

অমিয়জীবনের আজ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। ভগবান তাহাকে কেন এমন করিয়া বঞ্চিত করিলেন। পৃথিবীর এই সুন্দর সৃষ্টিকে সে বড় বেশী করিয়া ভালবাসে বলিয়াই কি তার শিরে এ অভিশাপ।

অমিয়জীবনের দুই চোখ ধ্বকধ্বক্ করিয়া জলিয়া উঠে। তার চোখের এই বহ্নিশিখা ভগবানকেই দগ্ধ করিবে কিংবা মনুষ্যসমাজটাকেই ঝলসাইয়া দিবে তাহা বোঝা গেল না।

ছেলেমেয়ের দল কিছুক্ষণ হইল চলিয়া গিয়াছে। গোপাল আসিয়া উপস্থিত হইল, কহিল—সেই থেকে এখানেই বুঝি ব'সে আছ?

অমিয়জীবন অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিল—শরীরটা তেমন সুবিধে ঠেকছে না গোপাল।

গোপাল কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, এক জায়গায় এতক্ষণ ব'সে থাকলে অমন হয়।

অমিয়জীবন অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল, কহিল—ওদের নিজের হাতে ফুলগুলো দিয়ে আমি ভাল করি নি গোপাল—

গোপাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

অমিয়জীবন মৃদু হাসিয়া কহিল—তোমার পাড়াপড়শির ছেলেমেয়েরা একটু আগে এসেছিল কি না!

গোপাল কহিল—তাতে আর হয়েছে কি?

অমিয়জীবন কহিল—জান ত আমার অসুখটা তেমন সুবিধে নয়। কাল থেকে এখানে আসতে ওদের বারণ ক'রে দেব।

কিন্তু পরদিন সকালবেলা ঠিক এই সময়ে অমিয়-জীবনকে রাস্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গেল।

আজ আর ওদের ডাকিতে হয় নাই। অমিয়র সারা অন্তর এক অব্যক্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

অমিয়কে দেখিয়া উহারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ফুলের জন্ত চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

অমিয়জীবন তার গতকল্যের সিদ্ধান্ত ভুলিয়া গেল। তার মধ্যে এক নূতন জীবনস্পন্দন দেখা দিল। এতগুলি টাট্‌কা মানুষ আজ তার অতি সন্নিকটে আসিয়াছে, তার হাত হইতে ফুলের গুচ্ছ লইতেছে। তার জীবনে যে এমনি দিন এক সময় ছিল একথা যেন সে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু···

অমিয়জীবন যেন অকস্মাৎ নিজের সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিল, ছেলেদের মধুর কণ্ঠে কহিল—তোমরা আজ যাও—

যাদের জন্ত সকাল হইতে সে উন্মুখ হইয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাদেরই শেষ পর্য্যন্ত বিদায় করিয়া দিতে হইল। অমিয়জীবনের একটি নিঃশ্বাস পড়িল, এ ছাড়া আর উপায় নাই।

কাল রাত হইতেই তার জ্বর বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু গোপালকে সে কোন কথা বলে নাই। এমন মাঝে মাঝে সে করিয়া থাকে। খামকা উহাকে ব্যস্ত করিয়া লাভ নাই। জ্বর বৃদ্ধি পাইলেই তার মার কথা মনে পড়ে—ভাবে, হয়ত এই সময় মা কাছে থাকিলে সে কতকটা সান্ত্বনা পাইত। অমিয়র ধারণা সকলেই তাহাকে অবহেলা করে, এইখানেই তার বড় বেদনা। যদিও সে অনুভব করে যে, সংসারের কাছে এর চেয়ে বেশী দাবি করার দিন তার ফুরাইয়া গিয়াছে—তথাপি তার বুকের মধ্যে অভিমান গুমরাইয়া উঠে।

তার জীবনের সব কিছুরই অবসান ঘটিয়াছে, নএখ বাঁচিয়া থাকা মানে শুধু প্রাণের স্পন্দনটুকু ধরিয়া রাখার জন্ত। অথচ বাঁচিয়া থাকিতে তার আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই।

অমিয়জীবন গোপালকে ডাকিল—একবার দেখ ত গোপাল চাদরটা ভিজে গেছে যেন।

ইতিমধ্যে তাহাকে শয্যার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

গোপাল শিহরিয়া উঠিল।

অমিয় তাহা লক্ষ্য করিল, কহিল, রক্ত বুঝি?

গোপাল কোন কথা কহিল না।

অমিয় কহিল—তুমি মাকেই বরং একটা খবর পাঠিয়ে দাও। এবারে আর হয়ত বাঁচব না।

গোপাল ভয় পাইলেও মুখে কহিল—তুমি বড় বাজে কথা বল।

অমিয়র ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

গোপাল চাদরটা পাণ্টাইয়া দিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিল। অল্পক্ষণেই অমিয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। গোপাল কতকটা আশ্বস্ত হইল। বিশ্রাম লইতে পারিলেই খানিক সুস্থ হইতে পারিবে। কিন্তু এই সুস্থ হইয়া উঠার যে কত মূল্য একথাও গোপালের জানা, তবু তার সাবধানতার অন্ত নাই এবং সংহস দানের বিরাম নাই। কিন্তু সে একলা মানুষ, কত দিন এমনি করিয়া সামলাইবে। তাছাড়া আজ সে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে, যদি এই ভাবেই দিনের পর দিন চলে···একটা পরামর্শ করিবার মতও লোক নাই। অথচ দু-দিন না দেখিয়া কোথাও খবর পাঠাইতে তাহার মন সরিতেছিল না।

কিছুক্ষণ পরে গোপালকে দেখা গেল পাশের বাংলোয়।

অঞ্জলি কহিল—আঃ তুমি বড় বোকা গোপাল। মানুষের বিপদে মানুষ না দেখলে চলবে কেন। তুমি এখন যাও, আমি বাবাকে নিয়ে একটু পরেই যাচ্ছি।

গোপাল কতকটা হৃষ্টমনে প্রস্থান করিল।

পরদিন রাসবিহারী অঞ্জলিকে বাধা দিয়া কহিলেন—এসব তোমার পাগলামি অঞ্জলি।

অঞ্জলি কতকটা ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—তা হোক বাবা, তা বলে একটা লোক আমাদের চোখের সুমুখে বিপদে পড়েছে এ কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন বাবা।

রাসবিহারী কন্তার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন—ছেলেমানুষি করবার বয়েস এটা তোমার নয়।

অঞ্জলি। পৃথিবীতে তোমার দায়িত্ব এখন কারুর চেয়ে কম নয়। তোমার নিজের সন্তানের কথা ভুলে যাও কেমন ক'রে, এ কথাটা আমি বুঝি না। তার উপর একটা যক্ষ্মা রুগী তাকে নিয়ে—

অঞ্জলি তীব্র কণ্ঠে ডাকিল, বাবা—

রাসবিহারী একটু বিব্রত ভাবে প্রস্থান করিলেন।

এক বছর হয় অঞ্জলি তার স্বামীকে হারাইয়াছে—তাঁরও যক্ষ্মা হইয়াছিল। সে-দিনের সে কথা সে এত সহজে কেমন করিয়া ভুলিবে? আহা বেচারার বাঁচিয়া উঠিবার কি আকাঙ্ক্ষাই না ছিল! স্বামীর কথা অঞ্জলির আবার নূতন করিয়া মনে পড়িল। কত মান, অভিমান, কত অভিযোগ তার সকলের বিরুদ্ধে। একটি মুহূর্ত্তের জন্য কাছ-ছাড়া হইলে কি তার কাঙাল চাহনি! পদে পদে তার সতর্কতার অন্ত ছিল না। স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে গিয়া যে দীন মূর্ত্তিটি তার অন্তরে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহা হয়ত এ জীবনে মুছিবে না। এরা যে কত স্নেহ-কাঙাল এ কথা তো তার জানিতে বাকী নাই।

অমিয়জীবনেরও সেই অসুখ—হয়ত সেও বারে বারে আকুল কণ্ঠে তার আবেদন জানায়…কেহ হয়ত সাড়া দেয় না…

অঞ্জলির সারা অন্তর বেদনায় এবং মমতায় ভরিয়া উঠিল, সম্ভবতঃ এই ব্যাধিটার উপরই তার একটা মর্ম্মান্তিক দুর্ব্বলতা আছে—

এই ঘটনার পরে রাসবিহারীকে মধ্যে মধ্যে অমিয়-জীবনের খবরাখবর লইতে হয়।

অঞ্জলি পিতার অপেক্ষায় থাকে না। সুযোগ এবং সুবিধা মত প্রায়ই সে অমিয়র সহিত গল্পগুজব করে।

অমিয় বলে, জানেন অঞ্জলিদি, এমনি আনাড়ি নিয়েই আমায় দিন কাটাতে হয়। দেখুন এই সামান্য ক-দিনের মধ্যেই ঘর-দোরের শ্রী ফিরে গেছে।

অঞ্জলি একটু হাসিয়া কহিল, কেন আপনার গোপালের কাজকর্ম্ম তো চমৎকার। তাছাড়া এসব কাজ হ'ল মেয়েদের।

অঞ্জলির এ প্রশংসায় গোপাল খুশী হয় না—তথাপি সে তাহাকে অত্যন্ত সমীহ করিয়া চলে। গোপাল লক্ষ্য করিয়াছে যে, অঞ্জলি এ-বাড়ীতে আসিলে দাদাবাবু উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

অমিয়জীবন কহিল,—কিন্তু ওর প্রাণের বড় দিক্‌টাই আপনার চক্ষে পড়ে নি, নইলে দেখতেন সে দিক্ দিয়ে ও কত উদার…কত বড়।

অঞ্জলি একটু হাসিল।

গোপাল হাত-পা নাড়িয়া অমিয়জীবনকে কি ইঙ্গিত করিয়া সরিয়া পড়িল।

অমিয় কহিল—ছেলেবেলা থেকেই গোপাল আমায় কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছে এবং এই নিয়ে ওর দাবির অন্ত নেই।

অঞ্জলি কহিল—বড় স্নেহপরায়ণ লোকটি। সেদিনের কান্না দেখে আমি ত ভাবতেই পারি নি ও আপনার চাকর।

অমিয়জীবন মৃদু হাসিল, আহাম্মক! শুধু শুধু আপনাদের বিব্রত ক'রে তুলেছিল।

অঞ্জলি কহিল, শুধু শুধু মোটেই নয় অমিয়বাবু, আর বিব্রত করার কথা যদি বলেন তাহ'লে নাচার, কারণ বিদেশে বিপদ-আপদ এক দিন আমাদেরও হ'তে পারে…

তাহা হয়ত পারে কিন্তু তাহাতে অমিয়জীবনের মত এক হতভাগ্য তোমাদের কোন কাজেই আসিবে না। সে ভাবিতেছিল যে, এই মিথ্যা গোপনতার বোঝা আর সে বহিবে না, কিন্তু মন বড় দুর্ব্বল। এমন করিয়া কাছে বসিয়া আদর করিয়া বহুদিনের মধ্যে কেহ তাহার সহিত কথা কহে নাই।

অমিয় প্রকাশ্যে কহিল, হাজারিবাগের এই সামান্য ক-টা দিনের স্মৃতি আমার জীবনে অক্ষয় সম্পদ। আজ চার-পাঁচ বছর ধরে বহুদেশ এবং বহু স্যানিটরিয়াম ঘুরে এসেছি কিন্তু কোথাও এমন…

অকস্মাৎ অমিয়জীবন অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল—আপনার ছোট ছোট ভাইবোনদের জন্য অত্যন্ত মায়া, নয় অঞ্জলিদি?

অঞ্জলি বিস্মিত কণ্ঠে কহিল—একথা কেন অমিয়বাবু?

অমিয় কহিল—এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম কিন্তু সে থাক, গোপাল আপনার চা এনেছে।

অঞ্জলি কহিল—চা ত আমি খাই না—অমিয়বাবু।

অমিয় কহিল—আমিও খাই না—ডাক্তারের নিষেধ। প্রাণ চাইলেও মন বাধা দেয়। আর তেমনি হয়েছে শ্রীমান গোপাল, ভুলেও একটা পেয়ালা দেবে না। কিন্তু আপনি খাবেন না কেন?

অঞ্জলি শান্তভাবে একটু হাসিয়া কহিল—না খেয়েও যখন চলে যায় তখন মিছে ঝঞ্ঝাট ক'রে লাভ কি!

গোপাল কিন্তু কথাটা সহজভাবে গ্রহণ করিল না, সে মৃদু কণ্ঠে কহিল—খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে তৈরি ক'রে এনেছি দিদিমণি।

অঞ্জলি হাসিমুখে কহিল—কথাটা তা নয় গোপাল—চা আমি খাই না ব'লেই খাব না, তুমি তৈরি ক'রে এনেছ ব'লে নয়।

অঞ্জলি একটু থামিল এবং অমিয়জীবনের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিল, আজ ত বেশ ভালই আছেন—আমি এখন তাহ'লে উঠছি। কখনও দরকার মনে করলেই ডাকবেন। বিদেশে আমরা পর হ'লেও আত্মীয়, একথা ভুলে যাবেন না যেন।

অঞ্জলি প্রস্থান করিল।

অমিয়র একটি নিঃশ্বাস পড়িল। এ-বিষয় তারও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই আত্মীয়তার সুযোগ আর কত লইবে—কথাটা সে দিনকয়েক ধরিয়াই ভাবিতেছে।

অমিয় গোপালকে ডাকিল, কহিল—অঞ্জলিদিকে এ-বাড়ীতে আসতে নিষেধ ক'রে দিও গোপাল।

গোপাল হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে শুধু বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। অমিয়জীবন কহিল—আমার অসুখের কথাটা তাঁকে জানিয়ে দিও। ওঁরাও ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করেন।

গোপাল কহিল—কিন্তু বিপদে আপদে ওরাই যে আমাদের ভরসা দাদাবাবু।

অমিয়জীবন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, সেই জন্তেই ওদের সর্ব্বনাশ ক'রতে চাঁও বুঝি! ওঁরা বড় ভাল গোপাল, তাই ব'লে ওঁদের অনিষ্ট করা ত আমাদের উচিত হবে না।

গোপালের ইচ্ছা হইতেছিল বলে, যে, এ রোগের সংসর্গে আসিলেই যদি মানুষের ক্ষতি হইত তাহা হইলে সংসার এত দিনে অচল হইয়া পড়িত। কিন্তু এ-সব কথা বলিতে গেলে উল্টা ফল হয়। তাই সে নীরব থাকে, এখনও সে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

অমিয়জীবন পুনরায় অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে করিতে লাগিল।

অঞ্জলির মধ্যে সে যে শান্তসমাহিত ভাব, সেবাপরায়ণ নারীপ্রকৃতি দেখিয়াছে এই শ্রদ্ধার আসন হইতে তাহার বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি সে দেখিতে চায় না। তার মরণব্যাধির কথা জানিতে পারিয়া আর দশজনার মত অঞ্জলিদিও সরিয়া পড়িবে একথা সে ভাবিতে চায় না। অঞ্জলিকে সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে অমিয়জীবনের বুক ভরিয়া উঠে। ইহা যে তার একান্ত কল্পনা একথা সে বোঝে তবু তার মনের দুর্ব্বলতা ঘোচে না।…

অমিয়জীবন সহসা সচকিত হইয়া উঠিল, ডাকিল—গোপাল। গোপাল সাড়া দিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই অমিয়জীবন কহিল, অঞ্জলিদিকে নিষেধ ক'রে আস নি ত?

গোপাল জানাইল—না।

অমিয়জীবন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তুমি আমায় বাঁচিয়েছ গোপাল। আমি ভেবে দেখলাম অঞ্জলিদিকে কিছু না বলাই ভাল, তার চেয়ে ভেবেচিন্তে অন্য ব্যবস্থা করব।

অমিয়জীবন খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল—আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। দিনরাত ভেবে ভেবে আর পারি নে।

সে অবসন্নের মত শুইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিয়া পুনশ্চ গোপালকে ডাকিল।

গোপাল আসিতেই কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া অমিয়জীবন কহিল, শরীরটা আমার এখানে থেকে কিছুতেই শোধরাচ্ছে না। এখানকার হাওয়া আমার সইবে না।

গোপাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমিয়র মুখের প্রতি চাহিতেই সে পুনরায় কহিল, জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও গোপালদা। আজই এখান থেকে যেতে চাই।

গোপাল বিস্মিত কণ্ঠে কহিল—তুমি কি ক্ষেপেছ

দাদাবাবু? আজ বছর কয়েক ধরিয়া তার এমন বহু খেয়ালকে গোপালের প্রশ্রয় দিয়া আসিতে হইতেছে কিন্তু আজ অতীতকেও যেন হার মানাইয়াছে। কিন্তু অমিয়জীবনের এই হঠাৎ মত পরিবর্ত্তনের কোন হেতুই সে অনুধাবন করিতে পারিল না।

অমিয়জীবন হয়ত গোপালের অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়াই পুনরায় কহিল—সত্যি সত্যিই তোমায় বলছি গোপাল—এখানে থাকলে আমি বাঁচব না। এমন এক জায়গায় আমি যাব যেখানে জনমানব নেই।

গোপাল আর বাদানুবাদ করিল না। লাভ নাই বলিয়াই হয়ত করিল না।

খবরটাও বাংলোয় গিয়া যথাসময় পৌঁছিল। অঞ্জলি আসিল, রাসবিহারীও আসিলেন।

অমিয়জীবন তখন গাড়ীতে উঠিয়াছে।

অঞ্জলি গাড়ীর সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া গিয়া কহিল—এখানে স্বাস্থ্যটা কি সত্যই আপনার খারাপ হয়ে পড়েছে অমিয়বাবু, কিন্তু ও বেলা ত কোন কথা বললেন না!

অমিয় মধুর হাসিয়া কহিল—বলবার মত তখন কিছু ছিল না যে অঞ্জলিদি। তবু ত এখান থেকে আমার চলে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করা কিংবা আত্মীয়তা রাখা আমার পক্ষে অন্যায়। আপনারা না জেনে নিজেদের ক্ষতি করতে পারেন কিন্তু আমি জেনেশুনে তা হতে দিতে পারি না। নিজের মনের সঙ্গে এ নিয়ে আমি সব সময়ই যুদ্ধ করি কিন্তু মন বড় দুর্ব্বল, তাই বড় বিভ্রান্ত ক'রে দেয়।

অমিয় একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, আপনারা ত জানেন না আমার কি মরণ-ব্যাধি!

অঞ্জলি মৃদু একটু হাসিয়া কহিল—জানি বৈকি অমিয়-বাবু।

অমিয় বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, জানেন!

অঞ্জলি মধুর কণ্ঠে কহিল—জানি—

অমিয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, আমার আজ বুক ভ'রে উঠেছে অঞ্জলিদি কিন্তু এর পরে আর আমার এখানে থাকা উচিত হবে না—আমার প্রণাম রইল আপনাদের জন্য।...

গাড়ী ততক্ষণে চলিতে সুরু করিয়াছে।

অমিয়র দু-চোখে জল—

অঞ্জলি বিস্মিত চোখে শুধু চাহিয়া রহিল। অমিয়র এতটা উচ্ছ্বাসের কোন সন্ধানই সে পাইল না।



পুস্তক-পরিচয়

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান।—পাটনা বি, এন, কলেজের অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ, পি-এচ ডি, ভাগবতরত্ন-প্রণীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১-৬৩৩, ১-১৪০, /০—২৵০। মূল্য উল্লিখিত নাই।

আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া শ্রীযুক্ত বিমানবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের জীবনচরিতমূলক, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় রচিত যে সকল গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, ভক্ত জন তন্মধ্যে এক বা একাধিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন. তাঁহার মনে কোনও সংশয় উদিত না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যিনি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া তুলনামূলক ভাবে বিচারপূর্ব্বক প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্ত উৎসুক, তিনিই দেখিবেন, উক্ত মহাপুরুষের চরিতগ্রন্থ-সকল প্রায়শই পরস্পর-বিরোধী ঘটনার বিবরণে পূর্ণ। এ পর্য্যন্ত কোনও অনুসন্ধিৎসু কৃতবিদ্য ব্যক্তি, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া, উক্ত গ্রন্থসমূহের বিরোধ ভঞ্জনপূর্ব্বক প্রকৃত সত্যনির্ণয়ে অগ্রসর হন নাই। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া উক্ত অভাব দূরীকরণ পূর্ব্বক সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত চৈতন্যজীবনী নিতান্ত অল্প। অধিকাংশ লেখকই বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের মুখে শ্রুত ঘটনা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কালে জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তন্মধ্যে ব্যক্তি, ঘটনা ও কালগত যথেষ্ট বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক ঐতিহাসিক-সম্মত চৈতন্যচরিতের উপাদান নির্ণয় করা কিরূপ দুঃসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। আলোচ্য গ্রন্থকার এ বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং যুক্তি, বিচার ও প্রমাণের সাহায্যে সত্য ঘটনা নির্ণয়ের জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন, তদ্দারা চরিতকারগণের পরস্পর-বিরুদ্ধভাবে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনারই প্রকৃত কাল ও যাথার্থ্য নির্ণয়ে সহায়তা হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের প্রশংসাই করিলাম। ইহাতে এ কথা মনে করা উচিত হইবে না যে, তাঁহার সমস্ত উক্তি ও সিদ্ধান্তের সহিতই আমরা একমত। এত বৃহৎ ও বিচিত্র তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ সম্বন্ধে তাহা আশা করাও যায় না। গ্রন্থমধ্যে এমন অনেক যুক্তি, উক্তি, বিচারপ্রণালী ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যেগুলি সম্বন্ধে অনেকেই একমত হইতে পারিবেন না। ঐরূপ যে সকল স্থল আমাদের দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইয়াছে, তাহার সবগুলির উল্লেখ ও আলোচনার স্থান এখানে নাই। মাত্র একটি ··· দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

সন্ন্যাস-জীবনে পুরী অবস্থানকালে চৈতন্যদেবের নিকট এক দিন বল্লভ ভট্ট বলেন যে,—

> ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
> লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন।—চৈঃ চঃ, অন্ত্য, ৭ম পরিঃ।

ইহার প্রত্যুত্তরে—

> প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
> বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন।— ঐ

গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "সুতরাং 'স্বামী না মানিলে তারে বেশ্যামধ্যে গণি' বাক্য শ্রীচৈতন্যের উক্তি বলিয়া স্বীকার করা গেল না।"—৪০৭ পৃঃ। তাঁহার যুক্তি এই যে, যেহেতু "শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীধরের কয়েকটি প্রধান প্রধান মত মানেন নাই," সেই হেতু বল্লভ ভট্ট শ্রীধর স্বামীর মত খণ্ডন করিয়াছেন শুনিয়া, চৈতন্যদেব তাঁহাকে ঐরূপ উক্তি করিতে পারেন না। সুতরাং এই উক্তিটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের মন-গড়া।

চৈতন্যদেবের নিকট সাক্ষাৎভাবে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, জীব যদি ক্রমসন্দর্ভ টীকা লিখিতেন, তবে এ যুক্তির কতকটা সারবত্তা স্বীকার করা যাইত বটে; কিন্তু উক্ত টীকা লিখিত হয়—চৈতন্যদেবের তিরোধানের অনেক পরে এবং তিনি সাক্ষাৎভাবে চৈতন্যদেবের নিকট হইতে কোন উপদেশও প্রাপ্ত হন নাই। এরূপ অবস্থায় জীব স্বামি-মত মান্য করেন নাই বলিয়া চৈতন্যদেবও যে, স্বামি-মত মানিতেন না, সেই হেতু চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের উপরে উদ্ধৃত উক্তি যথার্থ নহে, এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। বিশেষত স্বামি-মত অমান্য করিবার পক্ষে উভয়ের টীকা হইতে গ্রন্থকার যে কয়টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে জীব, স্বামি-মত মান্য করেন নাই, এ কথা প্রমাণিত হয় নাই। যথা—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ," ভাগবতের এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন,—"স্বরূপেণ ব্রহ্মতয়া ব্যবস্থিতির্মুক্তিঃ।" জীব বলেন,—"...স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্নাম স্বরূপসাক্ষাৎকার উচ্যতে। স্বরূপং চাত্র মুখ্যং পরমাত্মলক্ষণমেব। রশ্মিপরমাণূনাং সূর্য্য ইব...।" দেখা গেল, শ্রীধর সংক্ষেপে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জীব তাহারই বিস্তার সাধন করিয়াছেন মাত্র। স্বামি-মতের বিরুদ্ধ কোন কথাই তিনি ইহার মধ্যে বলেন নাই। শ্রীধর "স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" বাক্যের অর্থ করিয়াছেন—"ব্রহ্মভাবে অবস্থান"; আর জীব উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পরমাত্মলক্ষণ স্বরূপসাক্ষাৎকার।" ইহার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তবে কি "ব্রহ্ম" ও "পরমাত্মা" এই দুইটি বিভিন্ন নাম দেখিয়াই গ্রন্থকার ভেদ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"—(১।২।১১) এই শ্লোকে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' একই তত্ত্বের পৃথক্ দুইটি নাম মাত্র।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার আরও যে কয়টি মতভেদের দৃষ্টান্ত গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সমস্ত এখানে তুলিয়া দেখান সম্ভবপর নহে। উপরে আলোচিত দৃষ্টান্তটির ন্যায় সেগুলির মধ্যেও আমরা বাক্যগত পার্থক্য ভিন্ন অন্ত কোনও পার্থক্য দেখিতে পাইলাম না। ভাগবতের ৩।২৯।২০ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিগ্রহপূজা বিষয়ে গ্রন্থকার যে উভয়ের মতবৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও যথার্থ নহে; কেন না, "ভগবজ্জ্ঞানাদূর্দ্ধং জাতশ্রদ্ধ...মার্চ্চয়েৎ," উক্ত শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যা জীবও করিয়াছেন। পরন্তু তিনি শেষে বলিয়াছেন যে, 'প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ' সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য নহে; কেন না, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে যাবজ্জীবন পূজা করিবার

বিধান দেখা যায়। সুতরাং এখানেও উভয় টীকাকারের কোন মতদ্বৈধ্য দেখা গেল না। তবে শ্রীধর মাত্র উক্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, শ্রীজীব অপর শাস্ত্রীয় বচনের সহিত সমন্বয় বা বিরোধ পরিহারের চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা শ্রীধরের মত মান্য হয় নাই, এ কথা বলা চলে না। সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত "প্রভু হাসি কহে" ইত্যাদি উক্তিটিকে চৈতন্যদেবের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করার বিপক্ষে গ্রন্থকার যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার মূলে কোন সত্য নাই। এইরূপ কিছু কিছু ত্রুটি ও মুদ্রাকর-প্রমাদ-জনিত ভ্রম গ্রন্থমধ্যে দেখা গেলেও গ্রন্থখানি সুধীজনসমাজে সমাদর লাভ করিবে, ইহা আমরা আশা করি।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

ধাত্রী দেবতা—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, এবং কলিকাতা, ২৫।২ মোহনবাগান রো হইতে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সুপরিচিত। ইহার পূর্ব্বে উপন্যাসও তিনি রচনা করিয়াছেন। ছোটগল্পের সৃষ্টিতে যে শক্তি প্রদর্শন করিয়া লেখক উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, উপন্যাস রচনায় তাহারই সবল এবং সাবলীল বিকাশ দেখিয়া আমাদের সহিত বঙ্গসাহিত্যের পাঠকবর্গও আনন্দ লাভ করিবেন। বর্ণনা, চরিত্রসৃষ্টি এবং গল্পের পরিকল্পনায় উপন্যাসখানিতে যে অভিনবত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমাদের ক্ষণে ক্ষণে সচকিত করিয়া তোলে। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশ ছাপাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধের যে প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়াছে আধুনিক সাহিত্যে তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় কদাচিৎ মেলে। "ধাত্রী দেবতা"র সে পরিচয় সুপরিস্ফুট। "বাংলা দেশের কৃশাঙ্গ কোমল উর্ব্বর ভূমিপ্রকৃতি বর্ত্তমান বিহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্য্যায় মগ্ন।" এই ভূমিপ্রকৃতির সহিত গল্পের নায়ক শিবনাথের মন যেন জড়াইয়া আছে। প্রতিপক্ষ দলের ছেলেদের সহিত দলপতি রূপে বালক শিবনাথের মারামারি, জয়লাভ এবং বাড়ীতে গোপনে হেঁড়োলের বাচ্চা ধরিয়া আনা হইতে উপন্যাসের আরম্ভ এবং আরম্ভ হইতেই এই বালকবীর আমাদের মন জয় করিয়া লয়। কিশোরী গৌরী ও তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অতি স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। স্নেহময়ী মার পাশে নারীসুলভ বিপুল অভিমানে ভরা পিসীমার সুকোমল অথচ দৃঢ়, দৃপ্ত ও মহনীয় চরিত্রটি চমৎকার ফুটিয়াছে। গৌরীর সহিত শিবনাথের বিচ্ছেদের করুণ এবং মিলনের করুণতর কাহিনীটির সহিত মিলিয়া ঘটনার অবাধ প্রবাহ এই চারি শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ উপন্যাসখানিকে প্রচুর ভাবে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। "ধাত্রী দেবতা" বাংলার রসসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে।

প্রাচীন হিন্দুস্থান—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত এবং কলিকাতা, ২১০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। এখানি তাহারই অন্তর্গত। রসসাহিত্যপ্লাবিত বঙ্গদেশে জ্ঞান-সাহিত্যের প্রয়োজন একান্ত। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চারিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে।" ইহার প্রতিকার সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষায়, বিশেষভাবে—বিজ্ঞান-চর্চ্চায়। "শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রই বাংলা দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য।" 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' যে নিজের ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী একাধারে রসরচয়িতা, কথাশিল্পী, কবি ও চিন্তাশীল লেখক। তাঁহার রচনারীতি অনন্যসাধারণ। সেই নিজস্ব ভঙ্গীটি এই গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। 'প্রাচীন হিন্দুস্থানে'র দুটি ভাগ—ভূবৃত্তান্ত ও ইতিবৃত্তান্ত। ইতিহাস যেখানে সাহিত্য হইয়াছে বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ একেবারে দুর্লভ নয়, কিন্তু ভৌগোলিক বিবরণ যে রচনাগুণে সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে, পুস্তকের প্রথম ভাগ তাহার অ-পূর্ব্ব উদাহরণ। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "জিওগ্রাফি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সাহিত্যের নয়; কিন্তু জিওগ্রাফিকে সাহিত্যের ছাঁচে ঢালা প্রয়োজন।" সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গুণ উপভোগ্যতা। কঠিন তথ্যকে সরস সাহিত্যে রূপান্তরিত করা সাধারণ শক্তির কাজ নয়। এই ভূ বিবরণ যে শুধু সাধারণ বুদ্ধির উপযোগী এবং সাধারণের উপভোগ্য তাহা নয়, এ বৃত্তান্ত পাঠে বিশেষজ্ঞের পক্ষেও আনন্দ লাভ সম্ভব। শব্দপ্রয়োগের কৌশলে এবং ভঙ্গিমার মাধুর্য্যে নীরস ও নিরুজ্জ্বল তথ্যগুলিও ক্ষণে ক্ষণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। "আগ্নেয়গিরি হতে যে গলা পাথরের উদগম হয়েছে, তাই হচ্ছে দক্ষিণাপথের মাটি। উত্তরাপথ বরুণ দেবতার সৃষ্টি, দক্ষিণাপথ অগ্নিদেবতার। এই দুই মাটি এক জাতের নয়, এবং এ দুয়ের ধর্ম্ম এক নয়।" গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বৈজ্ঞানিক হাক্সলি বিলাতের শিক্ষাসংস্কারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, জ্ঞানের গভীরতা রচনাকে সহজবোধ্য ও সাধারণের জ্ঞানগম্য করে, অল্প বিদ্যাই বিষয়বস্তুকে সুকঠিন করিয়া তোলে। গ্রন্থের ইতিবৃত্তান্ত অংশে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস মনোরমভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাকথা জানিতে ইহা পাঠকের মনকে উদ্রিক্ত করিবে। 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'পথের সঞ্চয়'। বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষাব্রত সফল হোক।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বিশ্বকর্ম্মকুলচন্দ্রিকা—অথবা বিশ্বকর্ম্মকুলজ পাঞ্চাল ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। পণ্ডিত অমূল্যচরণ শর্ম্মা, শাস্ত্রভূষণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ৪২ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা। পৃ. ১৬+৩৮।

গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে লৌহকার, সূত্রধর, কাংস্যকার, ভাস্কর এবং স্বর্ণকারগণ শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত নহেন, তাঁহাদের আসল বর্ণ ব্রাহ্মণ। আগামী ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদম-সুমারিতে যাহাতে উল্লিখিত জাতিসমূহ নিজেদের জাতি বিশ্বব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞাপন করেন ইহার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন।

লেখকের যুক্তি অনেকস্থলে ক্ষেত্রে সারগর্ভ না হইলেও তাঁহার অন্যান্য প্রমাণগুলি ফেলিবার মত নহে। আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। যদি সকল হিন্দুই আজ ব্রাহ্মণ হইতে চান তাহাতেও আপত্তি করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। স্বামী বিবেকানন্দের সেইরূপ ইচ্ছা ছিল। মহাত্মা গান্ধী বলেন, পরাধীন দেশে সকলেই দাস, সকলেই শূদ্র।" প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকা সম্ভব নয়।

ইহাতেও আমাদের আপত্তি নাই। বস্তুত এই সকল হিন্দু উচ্চনীচ-ভেদ ভুলিয়া এক হন, সকলে সমান মনুষ্যত্ব বা মর্য্যাদার অধিকারী হন, তাহার চেয়ে সুখের আর কিছু নাই। তাহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি—তিব্বত-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী প্রাচ্যতত্ত্বসাগর প্রণীত ও প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ। ১৩৪৪ সাল, পৃ. ১০+৩৮২, মূল্য ২৷৷০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—২৪১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আধুনিক হিন্দুসমাজে সমাজ ও ধর্ম্মাশ্রিত যে-সকল সংস্কার প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে বিবাহই প্রধান। ইহা সমাজস্থিতির মূল বলিয়া ইহাতে নানা বিধি-নিষেধের উদ্ভব হইয়াছে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া বিবাহ বিষয়ে লোকের ভাবনার অন্ত নাই। এই জন্য মনুসংহিতায় 'কুবিবাহ' ও 'দুর্ব্বিবাহ' নিবারণের জন্য বিধান দেখা যায়। অন্যান্য দেশ ও জাতির মত হিন্দুদের মধ্যেও এই যুগ-যুগ-প্রচলিত সামাজিক কৃত্যের মধ্যে নানা কালে নানা বিচিত্র প্রথার উদ্ভব দেখা যায়—ইহার অনেকগুলি সমাজ-ব্যবস্থা ও মানুষের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বে এই সব বিচিত্র প্রথার আলোচনা, তুলনা ও কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা দেখা যায়। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে যে-সব লেখা বাহির হয় তাহার অধিকাংশই প্রাচীন শাস্ত্রবচনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে যে সব দেশাচার ও লোকাচার প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা ও সমালোচনা হয় না।

এই অবস্থায় এইরূপ গ্রন্থ দ্বারা উক্তরূপ আলোচনার বিশেষ সাহায্য হইবে। সুখের বিষয়, এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকার নূতন তথ্য ও অনুসন্ধানের ফল সন্নিবেশিত করিতে পারিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে আসামের সামাজিক নানা বিষয় সম্বন্ধে গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি ঘরে বসিয়া উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। নিজে ঘুরিয়া দেখিয়া ও সমাজের লোকজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শের ফলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। বাংলা দেশেই বিবাহ-পদ্ধতির এমন সব বিচিত্রতা আছে যাহা আমরা জানি না, বাংলা দেশের নিকটবর্ত্তী আসামের কথা আমরা কিছুই জানি না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঘোষ-মহাশয় অতি যত্নে ও পরিশ্রমে এক দিকে বৈদিক কাল হইতে আমাদের শাস্ত্রে যে-সকল উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা এবং সমাজের নানা স্তরে প্রচলিত নানা পদ্ধতির অতি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশ ও আসামের সমাজ যে-সব স্মৃতিগ্রন্থ দ্বারা শাসিত সেইগুলির বচন উদ্ধার করিয়া আচারগুলির মূল্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। তাহাদের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যের কারণ দেখাইয়াছেন। অনেকগুলি আচারের মধ্যে যে রহস্য লুকাইয়া আছে তাহা বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে, গ্রন্থকার আধুনিক নৃতত্ত্বের আলোকে সেগুলির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। এরূপ আলোচনা না হইলে আচারগুলি বুঝিবার কোন সুযোগ হয় না। এই জন্য অধিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টমঙ্গল পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি আচার বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবাহ-সংস্কারের সিদ্ধতা যাহাকে ইংরেজীতে consummation ও সংস্কৃতে নিষ্ঠা বলা হয়, সে সম্বন্ধেও গ্রন্থকারের আলোচনা বিশেষত্বপূর্ণ।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে শাস্ত্র লইয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করিলেও গ্রন্থকার শাস্ত্র নামে পরিচিত যে কোন গ্রন্থকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নাই, তিনি স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আধুনিক যুগে প্রচলিত কতকগুলি ক্রিয়ার দোষ ও অযৌক্তিকতা দেখাইতে সাহসী হইয়াছেন। "সেকালে বর-কন্যার জন্মপত্রিকা প্রস্তুতের, তাহার দ্বারা রাশিগণনাদির, যোটক বিচারের শুভলগ্নে বিশেষতঃ রাত্রিকালে কন্যাসম্প্রদান করিবার প্রথা ছিল না" (পৃ ৩১)। ফলিত-জ্যোতিষের এই প্রভাব ও কুফল সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিস্তৃত আলোচনা খুব জোরালো হইয়াছে এবং ইহাতে অনেকের চোখ ফুটিবে। প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেই গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে যৌবন-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আসামে প্রচলিত বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধেও আলোচনা আছে।

আসাম ও বঙ্গদেশের কয়েকটি জাতি সম্বন্ধে সবিস্তারে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে, যেমন আসামের সাহু এবং বাংলার বৈদ্য। গ্রন্থকারের কোন কোন মন্তব্য কিছু আপত্তিকর বলিয়া মনে হইবে।

গ্রন্থে একই বিষয় দুই-তিন বার আলোচনার জন্য ইহার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। একটু গুছাইয়া লিখিলে পাঠকের পক্ষে সুবিধা হইত। কতকগুলি ভুল লক্ষ্য করা গেল,—"কালিদাসের কাদম্বরীতে" (পৃ ৯৪)। "পাণ্ডুরাজার পত্নী কুন্তী এবং মাদ্রীর গর্ভে ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণের ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি পুত্রোৎপাদনের" (পৃ ১১০)।

এই গ্রন্থ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহপ্রথা ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় হইবে।

শ্রীরমেশ বসু

বিজয়িনী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ ১০৩। মূল্য ১৷৷০।

দেশ-বিদেশে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। কিন্তু এখানে তিনি ডক্টর দাসগুপ্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন নাই, করিয়াছেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তরূপে। যদিও ইতিপূর্ব্বে কতিপয় গ্রন্থে তাঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাইয়াছি, তথাপি এই কবিতার বইখানি খুলিবার পূর্ব্বে মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিলাম, কি জানি, হয়ত, লেখকের পাণ্ডিত্য আমাকে দূরে রাখিয়া দিবে, তাঁহার অন্তর-লোকে প্রবেশ করিতে পারিব না। কিন্তু কয়েকটি কবিতা পড়িতেই সে আশঙ্কা দূর হইল। একটি রসস্নিগ্ধ হৃদয়ের সহজ আহ্বান শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, এখানে দার্শনিক হার মানিয়াছেন, কাব্যলক্ষ্মীই বিজয়িনী। গ্রন্থারম্ভে রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ কবিতাটি মনোরম। আলোচ্য কাব্যে অনেক স্থলে রবীন্দ্র-প্রভাব লক্ষিত হয়; তাবার গভীর ভঙ্গিমায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও পরিস্ফুট। কিন্তু কবির ভাব ও কল্পনা সম্পূর্ণ নিজস্ব। "জোনাকী", "স্মৃতি" এবং "আবিষ্কার"—কবিতা তিনটির সহজ, সুন্দর প্রকাশভঙ্গী বিশেষ করিয়া ভাল লাগিল।

"সূর্য্যমুখী বর্ণে আঁকা তোমার অঞ্চল
করে ঝলমল,
দূর্ব্বার হরিতক্ষেত্রে, পল্লবিত বনে
শিশিরের সনে,
চিরদিন চিররাত্রি কাঁপে তোমার [illegible]
শেফালিকা-দলে শয্যা পাতা"
([illegible])

—কাব্যলক্ষ্মীর অঞ্চল-দ্যুতির আভাস পাইলাম।

দুই-এক স্থানে ভাষা ও ছন্দ ঈষৎ দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইল। অধিকাংশ কবিতাই হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থের বহিঃসৌষ্ঠব সুরুচিসঙ্গত।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



মালাবারের পল্লীশ্রী

শ্রীকোদণ্ডরাম, মান্দ্রাজ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

হিন্দুধর্ম্ম সংহিতা, প্রথম খণ্ড—শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ সাংখ্য সাহিত্য শাস্ত্রী কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা, প্রচারার্থ ১৲ টাকা। ৪০৬ পৃষ্ঠা। গুরুদাস চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

গ্রন্থখানি প্রথম খণ্ড, এবং দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে অনুষ্টুপ ছন্দের ১৫৯৬ শ্লোক আছে। ইহারই মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রায় যাবতীয় কথাই বর্ত্তমানকালোপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আর এজন্য শাস্ত্রীয় সমর্থন প্রদর্শন করিতে কোন ত্রুটিই করা হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তাহা প্রচলিত স্মৃতি-ব্যবস্থার বহু স্থলেই বিরোধী হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আজকাল যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবের প্রবাহ সমাজে চলিয়াছে, তাহাতে তাহাদের এইরূপ অনুকূল সিদ্ধান্তই বা কয়জনে গ্রহণ করিবেন? তবে যে সকল সুবিধাবাদী ব্যক্তি নিজ আচার-ব্যবহার কোনরূপে শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণিত করিতে অভিলাষী হইবেন তাঁহাদের ইহা উপযোগী হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার মত ব্যক্তি হিন্দুর সমাজ-সংস্কারে কত দূর যোগ্য তাহা এক বার চিন্তা করা উচিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। সমাজ-সংস্কারক, আমাদের দেশে যাঁহারা হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সিদ্ধপুরুষ বা অবতার পুরুষ বা দৈবশক্তিসম্পন্ন বেদপ্রামাণ্যবাদী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু গ্রন্থকার কি সেই ভূমিকায় আরূঢ় হইয়াছেন—তাহা আমরা এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। তিনি নিবেদনমধ্যে যেভাবে শ্রীযুক্ত গান্ধীজী এবং শ্রীযুক্ত জহরলালজীকে সমাজ-সংস্কারকের আসনে বসাইয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসেবী কোন হিন্দু অনুমোদন করিবেন কি না সন্দেহ। তিনি যখন "শাস্ত্র পরিবর্ত্তনে"র আবশ্যকতা বোধ করেন, তখন তাঁহার "মত" কত দূর তাদৃশ হিন্দুর গ্রাহ্য হইবে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। শাস্ত্র শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ। তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব, তাহা হিন্দুর দৃষ্টিতে নিত্য। সুতরাং গ্রন্থকারের "মত" কোন্ শ্রেণীর শাস্ত্রসেবী হিন্দু গ্রহণ করিবেন তাহাও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। শাস্ত্র পরিবর্ত্তনের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাই ইতিহাস এবং অভাববশে শাস্ত্রপরিবর্ত্তন নহে। তাহা বিকল্প বিধান বলে বা বেদের অবিরোধী অনুক্ত বিষয়ের স্থলেই হইয়াছে। যাহা হউক, গ্রন্থকারের উদ্যম সাধু এবং উদ্দেশ্যও মহান্। তাঁহার পরিশ্রম ইহাতে অপরিসীম হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার বহুদর্শন ও বিচারপটুতা প্রশংসনীয়। সমাজ-সংস্কারকবর্গের ইহা নিশ্চিত আলোচনা করিবার বস্তু হইয়াছে। ইহাতে বহু বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিযুক্ত কথা আছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

আদি মানুষ—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ বি-এ। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক। সরল ভাষায় গল্পচ্ছলে সভ্য মানবের পূর্ব্বপুরুষ আদিম যুগের মানবের জীবনযাত্রার এক কাল্পনিক অথচ উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনই লেখকের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য প্রচুর পরিমাণে সফল হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিয়া শিশুগণ আনন্দলাভ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃতত্ত্ববিষয়ে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিবে।

মনস্তত্ত্ব ও মনোজয়—রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীসুগেন্দ্রনাথ বসু, ক্যাপ্টেন, আই, এম, এস্। প্রকাশক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। গোলাপ পাব্লিশিং হাউস, ১২ নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে—প্রধানতঃ ভাগবত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি পুস্তকে—ইন্দ্রিয়সংযমের প্রয়োজন ও উপায় সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গে যে-সমস্ত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান গ্রন্থে বারটি পরিচ্ছেদে তাহারই সার সংকলন করা হইয়াছে। বক্তব্য বিষয় বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে যে-সমস্ত উৎকৃষ্ট শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, গ্রন্থকারকৃত বিস্তৃত ব্যাখ্যার সাহায্যে সেগুলি পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকও মুগ্ধ ও উপকৃত হইবেন। বস্তুতঃ, এই সমস্ত শ্লোক সাহিত্যের দিক্ দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ্। এই শ্লোকের সংগ্রহ গ্রন্থ হিসাবেও এই গ্রন্থ সাহিত্যরসপিপাসু ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি উভয়েরই তুল্য আদর লাভ করিবে।

অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে প্লাবিত বর্ত্তমান যুগে এ জাতীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ভাষা আর একটু সরল হইলে এই গ্রন্থ অধিকতর সংখ্যক লোককে আকৃষ্ট করিতে পারিত।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পণ পরিণাম—শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থকার কর্তৃক কাটশালী, পোঃ আঃ পূর্ব্বস্থলী, বর্দ্ধমান, হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

পণ পরিণাম একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। সামাজিক যে-রকম অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে পাত্র একটু শিক্ষিত হইলে বিবাহের বাজারে তাহাকে একটি পণ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত কিছুই মনে করা হয় না এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া সময় সময় যে দারুণ অর্থগৃধ্নুতা জাগিয়া উঠে তাহার পরিণাম অনেক সময়ই হইয়া পড়ে শোকাবহ। লেখক নাটকে এই জিনিসটি দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। নাটকের পরিকল্পনাটি ভাল, তবে সংলাপ মাঝে মাঝে দীর্ঘ এবং অতিরিক্ত পণ্ডিতী ভাষায় হওয়ায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। এক জায়গায় একটি মুখ্য চরিত্র (মোহিত পৃ. ১৯৬) দারুণ শোকের মধ্যেও এমন ভাষার ঝোঁকে পড়িয়া গিয়াছে যে মনে হয় কথা সাজাইবার মোহে পড়িয়া তাহার যেন কাঁদিবার ফুরসৎ নাই। এ জিনিসটা যাত্রার যুগে চলিত, এখন অচল।

বইয়ে আরও একটি দোষ হইয়াছে। পাত্রের ঘরজামাই ভগ্নীপতি জগতের ক্রূর চক্রান্ত লইয়া লেখক যে ট্র্যাজিডীর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা মূল প্রতিপাদ্যের পরিপোষক মাত্র না হইয়া একেবারে আলাদা জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। লেখক এই চরিত্রটি আঁকিতে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তবে বইয়ের সমগ্রতার দিক দিয়া এই জিনিষটার আলাদা হইয়া—কোটা দোষের হইয়াছে। এই ধরণেরই বই নাট্যগুরু গিরিশ ঘোষের 'বলিদান' লেখক দেখিবেন; তাহাতে সমস্ত ঘটনাই সুসংযতভাবে চালিত হইয়া কেমন মূল প্রতিপাদ্যটিকে পুষ্ট করিতেছে।

চরিত্রচিত্রণ, নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি প্রভৃতিতে লেখকের বেশ হাত আছে। উল্লিখিত ত্রুটিগুলির দিকে লেখককে একটু দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দুঃখীরা—শ্রীশকুন্তলা শাস্ত্রী, বেদতীর্থা, এম্ এ, বি-লিট (অঙ্করকর্ত) কর্তৃক ১৭ বেলতলা রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত। প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্ধেক আকারের ৩০০ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকখানিতে বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টর হিউগোর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "লে মিজেরাবল"এর গল্পটি বালক-বালিকাদিগের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। গল্পটি খুব কৌতূহলোদ্দীপক। ইহা স্বর্গত ডক্টর হেমচন্দ্র সরকার অনেক দূর লিখিয়াছিলেন, শেষ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্তা শকুন্তলা শাস্ত্রী তাহা সমাপ্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মূল উপন্যাসটির প্রশংসা করা অনাবশ্যক। বাংলায় যে গল্পটি লেখা হইয়াছে, তাহার ভাষা সরল ও বালক-বালিকাদের উপযোগী। অবশ্য, অধিকবয়স্ক লোকেরাও ইহা উপভোগ করিবেন।

বিশ্বপরিচয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চম সংস্করণ, পৌষ ১৩৪৭। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকটির পরিচয় আমরা আগে কয়েক বার দিয়াছি। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ দুই বার ছাপা হইয়াছিল। পঞ্চম সংস্করণ গত পৌষ মাসে ছাপা হইয়াছে। সুতরাং ইহা সওয়া দুই বৎসরে ছয় বার ছাপা হইল।

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থে যে সকল ত্রুটি লক্ষ্যগোচর হয়েছে সে সমস্তই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনগুপ্ত বিশেষ মনোযোগ করে সংশোধিত করেছেন—তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।"

এই পুস্তকে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক ও ভূলোকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে শুধু যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে, তাহা নহে। কবি-ঋষির বাণীও আছে। যেমন—

"নাক্ষত্র জগতের দেশকালের পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি, এ কথা মানতে হবে বিশ্বে সকলের চেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জানছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম ক'রে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব-ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছ-ঘেঁষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুর্গমিয়ের বৃহৎ ও দুরধিগম্য রন্ধ্রের হিসাব সে রাখছে—এর চেয়ে আশ্চর্য্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি কালে কী জানি অন্য কোনো লোকে আর কোনো চিত্তকে অধিকার ক'রে আর কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি না। কিন্তু একথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।"

পুস্তকটিতে কয়েকটি স্বতন্ত্র মুদ্রিত ছবি আছে। তাহার একটি সূচী থাকা আবশ্যক। নতুবা গ্রন্থটীর ক্রটিতে কোন বহিতে কোন ছবি না থাকিলে তাহার অভাব ধরা পড়িবে না।

রবীন্দ্র-রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬৬৪+।৶০ পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠার আকার দৈর্ঘ্যে প্রবাসীর সমান, প্রস্থে এক ইঞ্চি কম। মূল্য ৪।০, ৫।০, ৬।০, ও ১০৲ টাকা। উৎকৃষ্ট পুরু ও মসৃণ কাগজে পরিপাটী রূপে মুদ্রিত। সাতটি সুন্দর ছবি আর্ট কাগজে সুমুদ্রিত। তদ্ভিন্ন কবির স্বহস্তলিখিত "মানসী"র একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিও দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে কবির তাৎকালিক হস্তাক্ষরের সহিত বর্তমান হস্তাক্ষরের প্রভেদ বুঝা যাইবে। দ্বিতীয় খণ্ডে চিত্রসূচী দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রত্যেক খণ্ডেও তাহা থাকিবে বুঝা যাইতেছে। ইহা আবশ্যক।

কবির বিরাট রচনাবলীর খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের এই একটি সুবিধা পাঠকেরা উপলব্ধি করিবেন যে, তাঁহারা তাঁহার গদ্য ও পদ্য রচনাগুলি কালক্রমানুসারে অধ্যয়ন করিয়া যাইতে ও তাঁহার প্রতিভার অভিব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। একটি খণ্ডের অধ্যয়ন শেষ করিতে করিতে আর একটি আসিয়া উপস্থিত হইবে।

যাঁহারা আগে তাঁহার গ্রন্থাবলী পড়েন নাই, ইহাতে তাঁহাদের সুবিধা হইবে; যাঁহারা আগে পড়িয়াছেন তাঁহারা নূতন করিয়া পড়িবার আনন্দ পাইবেন—তাঁহার রচনা নিত্যই নব। কেহ ইচ্ছা করিলে প্রত্যহ কিছু গদ্য ও কিছু কবিতা পড়িতে পারেন। চিত্ত বিনোদন এবং গভীর চিন্তন উভয়েরই উপযোগী রচনা রচনাবলীতে আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কড়ি ও কোমল, মানসী, বিসর্জন (নাটক), রাজর্ষি (উপন্যাস), এবং চিঠিপত্র ও পঞ্চভূত (প্রবন্ধ)। শেষে গ্রন্থপরিচয় ও বর্ণানুক্রমিক সূচী আছে।

ছবিগুলির মধ্যে পুরশ্চিত্র "শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। তাহার পর জ্যেষ্ঠা কন্যা শিশু মাধুরীলতা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শিশু রথীন্দ্রনাথ সহ রবীন্দ্রনাথ, বিলাতে রবীন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্রী বালিকা শ্রীইন্দিরা দেবী ও ভ্রাতুষ্পুত্র বালক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ রবীন্দ্রনাথ, জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, এবং যৌবনে রবীন্দ্রনাথ। ছবিগুলি শুধু যে দেখিতে ভাল লাগে তাহা নহে, অধ্যয়নের যোগ্যও বটে। পুরশ্চিত্রটিতে কবির যৌবনকালের প্রতিভা-উদ্ভাসিত পরুষতাবিহীন পৌরুষ-ব্যঞ্জক মুখশ্রী লক্ষ্য করিবার বিষয়। জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের আলেখ্যে জয়সিংহের চরিত্রের ব্যঞ্জনা আছে।

আত্মচরিত—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী। তৃতীয় সংস্করণ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য কাগজের মলাট ২।০ টাকা, কাপড়ে বাঁধান ৩৲ টাকা। পুস্তকটিতে প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্ধেক আকারের ৮০+৫২৮ পৃষ্ঠা আছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে নিম্নলিখিত পুরুষ ও মহিলাদিগের আলেখ্য আছে:—গ্রন্থকার (আনুমানিক ১৯০৪ সালে), পিতা হরানন্দ

ভট্টাচার্য্য, মাতা গোলোকমণি দেবী, জ্যেষ্ঠ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, গ্রন্থকারের প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী ও দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনী, ডাঃ উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী জগন্মোহিনী দেবী, গ্রন্থকার ও প্রকাশচন্দ্র রায়, দুর্গামোহন দাস, দুর্গামোহন দাসের পত্নী ব্রহ্মময়ী, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রন্থকার (১৮৮৮ সালে বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে), মিস্ সোফিয়া ডবসন কলেট, জেমস মার্টিনো, উইলিয়াম টি ষ্টেড, সাধনাশ্রমের কয়েক জন পরিচারক ও সহায়ের সঙ্গে গ্রন্থকার (১৮৯৫), গ্রন্থকার (১৮৯৮), গ্রন্থকার (আনুমানিক ১৯১৪ সাল)।

গ্রন্থখানির বর্ত্তমান সংস্করণের স্বত্ব গ্রন্থকারের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা অবন্তী ভট্টাচার্য্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়াছেন।

যাঁহারা আধুনিক বাঙালী জাতিকে গড়িয়াছেন, ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে প্রধান এক জন। তিনি প্রধানতঃ ধর্ম্ম, সমাজসংস্কার, শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার সাধন, এবং অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতি সাধন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। ভারতসভা স্থাপনের মধ্যে তিনি ছিলেন। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ও সকল দিকে উন্নতি সাধনের যে ব্রত বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি উৎসাহী ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার দীক্ষাদাতা ছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়। যখন বিনা বিচারে কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নির্ব্বাসিত হন, তখন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সভায় সভাপতিত্ব করিতে কোনও রাজনীতিক সম্মত না হওয়ায় ধর্ম্মোপদেষ্টা শিবনাথ রাজী হইয়া দৃঢ় ও সংযত প্রতিবাদব্যঞ্জক অভিভাষণ পাঠ করেন।

এই আত্মচরিত ১৯০৮ সালের ৫ই জুন পর্য্যন্ত। গ্রন্থকারের জীবনের বাকী নয় বৎসরের কথা ইহাতে নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় যদি রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রেও তিনি প্রসিদ্ধ নেতা হইতে পারিতেন। তাঁহার তদনুরূপ বুদ্ধি, জ্ঞান, আত্মোৎসর্গ, নিঃস্বার্থতা, সাহস, বাগ্মিতা, লিপিপটুতা ও স্বদেশপ্রেম ছিল। তিনি সাহিত্য-সৃষ্টিতেই মনোনিবেশ করিলে তাহাতেও অসাধারণ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন। তিনি যে-সকল উপন্যাস, কবিতা, জীবনচরিত, প্রবন্ধ ও ব্যাখ্যানের রচয়িতা তাহা হইতেই তাঁহার সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই "আত্মচরিত"ও তাহার অন্যতম প্রমাণ। ইহা উপন্যাসের মত কৌতূহলোদ্দীপক, চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য।

এই গ্রন্থে এক জন মানুষের মত মানুষের দেখা পাইয়া আমরা ধন্য হই।

ইহাতে গ্রন্থকারের সমসাময়িক বহু প্রচেষ্টার কিছু কিছু বৃত্তান্ত প্রসঙ্গক্রমে আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁহার জননী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উইলিয়ম ষ্টেড, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, জেমস মার্টিনো, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ষ্টপফোর্ড ব্রুক, কর্ণেল অলকট, ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রাজনারায়ণ বসু, শিশিরকুমার ঘোষ, প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির যে-সমুদয় উল্লেখ ও আখ্যায়িকা এই গ্রন্থে আছে, তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের যুগটি বুঝিতে বিশেষ সাহায্য করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধীয় আখ্যানগুলি পড়িলে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

ড.

শ্যামা নৃত্যনাট্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার সম্পাদিত ও শ্রীসুশীলকুমার ভঞ্জচৌধুরী-কৃত স্বরলিপি সহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' কবিতা—"রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন্ চোর"—কবিতা সর্ব্বজনপরিচিত। এই কবিতাটিতে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ একটি নৃত্যনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। এখন অনেক পরিবর্দ্ধিতাকারে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত অংশেই সুরযোজনা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক অনেক শ্রেষ্ঠ গান এই গ্রন্থে আছে। এই নৃত্যনাট্যের যে সুচারু অভিনয় কলিকাতায় ও অন্যত্র শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ করিয়াছিলেন সেই উপলক্ষ্যে ইহার অনেক গান বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে, যেমন,

"মায়াবন-বিহারিণী হরিণী
গহন স্বপন সঞ্চারিণী
কেন তারে ধরিবারে করি পণ, অকারণ।..."
"জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা, হে গরবিণী।..."
"ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে
শুধু তোমারে জানি, ওগো সুন্দরী।..."
"নীরবে থাকিস সখী ও তুই নীরবে থাকিস।..."
"এসো এসো এসো প্রিয়ে।..."

গানগুলির স্বরলিপি প্রকাশিত হওয়ায় সংগীতশিক্ষার্থীদের গানগুলি শিখিবার বিশেষ সুযোগ হইল।

পূর্ণের সাধনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ যুগকে বলে বৈজ্ঞানিক যুগ। বিজ্ঞানবুদ্ধির পরিচালনায় মানুষের মন আজ এসে পড়েছে প্রাকৃত জগতে অপরিসীম বাস্তবলোকে।

এক দিন মানুষের বাসা ছিল জটিল অরণ্যে। তার মধ্য দিয়ে পরস্পর দেখাশোনা যাতায়াতের রাস্তা ছিল দুর্গম বাধাগ্রস্ত। গাছে পালায় জড়িত- বিজড়িত হয়ে আকাশের মুক্ত রূপ ছিল আচ্ছন্ন। রৌদ্রালোক খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে গহনে প্রবেশ ক'রে ঘন ছায়ার মধ্যে আশঙ্কা বিস্তার করত। এমন অবস্থায় মানুষ স্বভাবতই ছিল পরস্পর থেকে বিযুক্ত, এবং অপরিচিত আগন্তুকদের প্রতি সন্দেহপরায়ণ ও হিংস্র।

মানুষের মনও তার বাসস্থানের অনুরূপ ছিল। তার ভাবনা-চিন্তা ছিল জটিল বাধায় ছায়ান্ধকারে আবিল। তার বিশ্বজগতের ধারণা ছিল অনেকখানিই কল্পনা দিয়ে গড়ে তোলা, সবই যেন স্বপ্নের সৃষ্টি। সেই কল্পনা যতই অদ্ভুত অস্বাভাবিক ও বিকৃত হ'ত ততই তার সত্যতা সম্বন্ধে প্রত্যয় মনে চিহ্ন দিত জোরের সঙ্গে। আকস্মিক প্রাকৃতিক .ঘটনাগুলি কোনো দৈবশক্তির খেয়াল থেকে অযৌক্তিক ভাবে দেখা দিয়েছে, আর সেগুলি যে আমাদেরই দণ্ডপুরস্কাররূপে বিহিত এ ছাড়া আর কোনো কারণ তারা ভাবতেই পারত না। অথচ অধিকাংশ সময়েই এই দৈবী খেয়ালের মধ্যে সাধুতা-অসাধুতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যেত না; তা নিয়ে কেউ প্রশ্নও করত না; বস্তুত ন্যায়-অন্যায়বিচারনিরপেক্ষ যথেচ্ছাচারেই দেবতার দায়িত্ববিহীন শক্তি কল্পনায় সম্ভ্রম জাগাত বেশি ক'রে। এই জন্যে নিষ্ঠুর-অসাধু সংকল্পের পরে দেবতার সমর্থন কামনা করতে তার কোনো লজ্জাই ছিল না। দস্যু আপন নরঘাতক দস্যুবৃত্তির সফলতা চেয়েছে দেবতার দ্বারে, মিথ্যুক তার মিথ্যাকে জয়যুক্ত করবে আশা করেছে দেবতার সহায়তায়। জীবনযাত্রা সর্বদাই অনিশ্চিত আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত। এই রকমে প্রকৃতির কাছে মানুষের ছিল নিত্য অপমানিত অবস্থা, আর ছিল দেবতার কল্যাণ ইচ্ছায় অনাস্থা। নিষ্ঠুরকে নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানেই পরিতৃপ্তি দেওয়া যায় এই কথা মনে জেনে মানুষ আপন পূজার্চনাকে করেছিল রক্তপঙ্কিল, সে রক্ত আজো মোছে নি। নিজের দেহমনকে যতই দুঃসহ দুঃখে পীড়িত করা যায় ততই দেবতার প্রসন্নতা সুলভ হয় দেবচরিত্র সম্বন্ধে এই ছিল তাঁদের গর্হিত বিশ্বাস, সে বিশ্বাসের আজো সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় নি। দেবতা অকারণে পীড়নপ্রিয় এবং ঈর্ষান্বিত এই ধারণা দৃঢ় হয়েছিল প্রাকৃতিক ঘটনায় বারংবার অপ্রতিহার্য বিপৎপাত দেখে এবং সেই সকল অপঘাতের মধ্যে শ্রেয়োনীতির কোনো পরিচয় না পেয়ে। এ কথা মানুষ ভুলেছিল প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ব্যবহার বুদ্ধির, ধর্মানুষ্ঠানের নয়। যে যোগ আমাদের মাঝে তার সঙ্গে আমাদের আচরণ যদি বুদ্ধিমূলক না হয় যদি হয় অন্ধ ভক্তিমূলক তাহলে অকারণ বিভীষিকার ভিত্তিকে পাকা ক'রে তোলা হয়। মানুষের অবুদ্ধির পরিবেষ্টনে জগৎ তার কাছে ভয়সংকুল হয়ে উঠেছে। সে পদে পদে আপন অদৃশ্য শত্রুকে দেখেছে বিশেষ বারে, বিশেষ লগ্নে, বিশেষ গ্রহে, বিশেষ বাহ্য লক্ষণে এবং সেই শত্রুতার প্রতিকার কল্পনা করেছে এমন কোনো প্রক্রিয়ায় যার মধ্যে কোনো অর্থ নেই, বুদ্ধির কোনো বিচার নেই। শাঁখঘণ্টা বাজিয়েছে বধিরতার কাছে, ছায়াকে তাড়না করেছে শিশুর মতো বিশ্বাসে। তার কৃত্য-অকৃত্য শুচি-অশুচি মঙ্গল-অমঙ্গলের কল্পনা যুক্তির উপর নির্ভর ক'রে নয়, বিশ্বময় অনিয়মের অন্ধ প্রভাব সন্দেহ ক'রে।

অবশেষে যে-সব দেশ সভ্যদেশ ব'লে আজ পরিচিত সেখানে প্রবেশ করলে বিজ্ঞানের উদ্বোধন। অবশেষে এক দিন মূঢ়তার বন্দীশালার মায়াপ্রাচীর মানুষকে আর বাধা দিতে পারল না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে

মানুষের সত্য ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। মনের এত বড়ো পরিবর্তন তখনি সম্ভব হ'ল যে মুহূর্তে মানুষ প্রমাণ পেয়েছে বিশ্ববিধানে কার্যকারণের নিয়ম-শৃঙ্খলায় কোনো ব্যতিক্রম নেই। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এইখানেই হ'ল নির্ভরযোগ্য যোগ। সে বুঝেছে এই যোগ কোনো অলৌকিক শক্তির প্রসাদের অপেক্ষা করে না। এইখানেই মানুষের অভয়, তার বিশ্বজয়ের পথ। এখন থেকে জানা গেল জীবনযাত্রায় যাঁরা জ্ঞানের বিশুদ্ধ সাধনাকে সম্মান দিয়েছেন "তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি" তাঁরা বিশ্বনিয়ন্তাকে সকল স্থান থেকেই প্রাপ্ত হয়ে তার সঙ্গে যোগে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। এই যোগ আপন বুদ্ধির যোগ—জলে স্থলে শূন্যে সর্বত্র প্রবেশাধিকারে মানুষের বুদ্ধিধর্মের জয়। ভয়ের লোভের অক্ষম দুর্বলতার অন্ধকার গুহা থেকে কোনো কাল্পনিক দেবতা উপদেবতার অপচ্ছায়া অস্বাভাবিক মূর্তি ধ'রে বুদ্ধির আলোককে আর কোনো দিন আচ্ছন্ন করতে পারবে না; প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার মানুষের জানার সত্যতা দ্বারাই অনুকূল হবে, স্তবে তুষ্ট কোনো দেবতার ইচ্ছাকৃত অনিয়ম ঘটানোর দ্বারায় নয়। প্রকৃতির ক্ষেত্রে এই জানার সত্য পথেই ক্রমশই মানুষের শক্তি করছে মুক্তিলাভ। তাই সমস্ত সভ্যদেশে সত্য প্রণালীতে প্রকৃতিকে জানার এই অধ্যবসায় প্রবৃত্ত রয়েছে নিরন্তর। দূর হয়ে গেছে সম্মোহনের প্রতি দুর্বল ভীরু বুদ্ধির বিশ্বাস।

কেবল ভারতবর্ষে আমাদের রক্তের মধ্যে এমন একটা মূঢ়তা আছে যে শিক্ষাসত্ত্বেও প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে নিয়মের অমোঘতার প্রতি বিশ্বাস আমরা দৃঢ় রাখতে পারি নে, অন্ধ সংস্কার আমাদের বুদ্ধিকে পরিহাস করতে থাকে জাদুর প্রলোভন দেখিয়ে। তাকেই আমরা সনাতন ধর্মবিধান ব'লে মনে করি, জানি নে এই হ'ল ছদ্মবেশধারী নাস্তিকতা।

অথচ উপনিষদে বলছেন, যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ, অর্থাৎ আপনা হতে আপনি যাঁর উদ্ভব তিনি নিখিল বিশ্বের অর্থ সকল বিধান করেছেন যথাযথ নিয়মে নিত্যকাল থেকে নিত্যকালের জন্ত। হঠাৎ কিছুই হচ্ছে না। এই যে নিত্যকালের যথাতথ্য নিয়ম এই কথাই তো আধুনিক বিজ্ঞানের। এই যথাতথ নিয়মের মধ্যেই তো মানুষের বুদ্ধির যোগ সত্য। অথচ ভারতবর্ষ জুড়ে ঘরে ঘরে শত শত নিরর্থক অনুষ্ঠান এই যথাতথ শাশ্বত বিধানের প্রত্যহ প্রতিবাদ করছে। পঞ্জিকার পুঁথিতে তার লজ্জা পুঞ্জীভূত।

এই যেমন বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে যোগে নিয়মের জগতে বুদ্ধিধর্মের মুক্তি তেমনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যোগে তার আর এক পরম মুক্তির অপেক্ষা আছে। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রথম থেকেই মানুষকে পথে অপথে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে জোরজবরদস্তির উপর একটা বিকট বিশ্বাস আছে। এই জন্যে পুরাকালের চিকিৎসা-প্রণালীতে ঝাড়ফুঁকের উপসর্গ নিয়ে ওঝার উপদ্রব ছিল নিদারুণ। এক কালে মানুষের তেমনি বিশ্বাস ছিল, এবং এখনো সে বিশ্বাস সম্পূর্ণ যায় নি যে দেহপ্রকৃতিকে পীড়িত ক'রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিকৃত ক'রে মনকে কষ্ট দিয়ে আত্মাকে তার গোপন গুহা থেকে যেন ছিনিয়ে আনা যেতে পারে।

একদা নিজের বিশেষ প্রয়োজনে বিশ্বব্যাপারের বাঁক ফিরিয়ে দেবার চেষ্টায় জাদুক্রিয়ার উপর যখন মানুষের নির্ভর ছিল তখনি আধ্যাত্মিক সাধনাতেও বাহ্যানুষ্ঠানের কৃচ্ছ্রসাধ্যপ্রণালীর উপর তার বিশ্বাস ছিল দৃঢ়।

অবশেষে তার থেকে মানুষের ছাড়া পাবার দৃষ্টান্ত বুদ্ধদেবের জীবনে দেখেছি। তপস্যায় কৃচ্ছ্রসাধনকে তিনি অস্বীকার করলেন। তেমনি ভারতবর্ষে জ্ঞানীরা এ কথা বললেন যে যথার্থ সাধনা উপকরণে নয়, কষ্টদায়ক কোনো প্রণালীতে নয়, সে সাধনা সত্যে ত্যাগে দয়ায় ক্ষমায়। এই সমস্ত চারিত্রগুণের সর্বপ্রধান ধর্ম এই যে এরা মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়, নইলে এদের আর কোনো অর্থই নেই। এই মিলনের সাধনাই মানুষের ধর্মসাধনা। অন্য সকল বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান মানুষের চার দিকে সম্প্রদায়ের গণ্ডি টেনে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে। এই হচ্ছে মানবধর্মের বিরোধিতা। মহাভারতে বলেছেন—ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা—জলে ডুব দিয়ে কখনো অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না। যদি বলি, হয়, তাহলে

মানুষের সর্বজনীন শাশ্বত বুদ্ধিকে অস্বীকার ক'রে একটা সংকীর্ণ দলগত অভ্যাসের ক্ষুদ্র সীমায় নিজেকে বদ্ধ করি। এই অবুদ্ধির সীমাতেই এসে পড়ে দলীয় অহমিকা। এখানে মানবধর্ম হয় অপমানিত, সর্বমানবের সঙ্গে মেলবার এখানে পথ থাকে না। কিন্তু পুরাণে যেখানে বলেন ক্ষমাই তীর্থ দয়াই তীর্থ সেখানে বাধা যায় ভেঙে, সেখানে পৃথিবীর সব মানুষের বুদ্ধির এবং ভাবের সমর্থন পাওয়া যায়। বুদ্ধির বিকারে সাম্প্রদায়িক আচারের অনর্থকতায় মানুষকে ঠেকিয়ে রেখে যেমন পদে পদে হিংস্র বিরোধের সৃষ্টি ক'রে তোলা হয়, তেমনি বিপদের সৃষ্টি ঘটতে থাকে যেখানে শ্রেণীগত স্বার্থ ও অহংকার মানুষকে বিভক্ত করে। তাই আজ দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতির ক্ষেত্রে যে-বিজ্ঞান বুদ্ধিযোগে মোহমুক্ত ক'রে মানুষকে রক্ষা করেছে সেই বিজ্ঞানই নিদারুণ উদ্যোগে মানুষকে বিনাশ করতে উদ্যত, যখনি মানুষের ঐক্যধর্মে বিকার ঘটল।

প্রাচীন ভারতে শ্রেণীভেদ ছিল কিন্তু তার মাঝে মাঝেই মনের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে ঐক্যবুদ্ধির অনুশাসন। একের উপলব্ধিকে আর কোনো দেশেই কোনো ধর্মেই এমন জোরের সঙ্গে উপলব্ধি করে নি, বলে নি সকলের মধ্যে যে আপনাকে জানে সে-ই আপনাকে সত্য ক'রে জানে।

আজ বিজ্ঞানে জানছে সকল রূপের মধ্যে আছে একই শক্তিরূপ, তেমনি যাঁরা আত্মজ্ঞানী তাঁরা জানছেন একই আত্মরূপ সকল আত্মার মধ্যে।

মানুষের সমাজে বড়ো ছোটোর শ্রেণী বেঁধে এক দলকে অবজ্ঞা ক'রে তাদের জীবনকে হেয় করব না এমন সংকল্প বৈদিক কবির লেখায় দেখা গেছে। তাঁরা বলেছেন "তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস" তারা কেউ বড়ো নয়, কেউ ছোটো নয়, "সুজাতাসো জনুষঃ"—জন্মকাল থেকেই মানুষ সুজাত। "অজ্যেষ্ঠাস অকনিষ্ঠাস এতে সংভ্রাতরো বাবৃধুঃ সৌভগায়"—এরা সকলে ভাই ভাই, সৌভাগ্যলাভের চেষ্টা করছে। সকলের প্রতি অবজ্ঞাহীন মিলনশক্তিই এদের সৌভাগ্য-লাভের পন্থা। "এবাং সুদুঘা পৃশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভ্যঃ।" এই যারা সকলের সঙ্গে এক হয়েছে এদের জন্যেই প্রকৃতি পয়স্বিনী, এরা মরুৎ, এরা কাঁদে না, এদেরই জন্যে সুদিনের পর সুদিন আসে। এর থেকেই বোঝা যায় আমাদের জন্যে ভারতে সুদিন আর আসে না কেন। এর থেকেই বোঝা যায় য়ুরোপে বারংবার মানুষের মধ্যে এমন বিশ্বঘাতী হানাহানি কেন। য়ুরোপে সৌভাগ্যকে অনেক দিন থেকে নিজের ভাগে অপরিমিত বেশি ক'রে ঘের দিয়ে নেবার চেষ্টা দেশে দেশে চলে এসেছে। সেই সৌভাগ্যের বাঁটোয়ারা নিয়ে তার আজ কান্নার দিন এল। ভাগ্যের ত্রুটি খণ্ডাবার জন্যে মানুষ যখন নিজের শক্তি ও স্বভাবের মধ্যে উপায় সন্ধান না ক'রে ছুটে যায় বাইরের দিকে, মন্ত্র-পড়া সন্ন্যাসীর পায়ে ধরে, দেবালয়ের প্রাঙ্গণে মানৎ করতে ছোটে, তাতেই আপন ভয়ার্ত অবুদ্ধি প্রকাশ করে, তেমনি পাশ্চাত্যে দেখতে পাই অশান্তির দ্বারা পীড়িত হ'লে সেখানকার মানুষ মানতে চায় না যে, অন্তরে কোনো এক জায়গায় মানবধর্মকে পীড়ন করা হয়েছে, মানে না, ওরা ছিন্ন করেছে লোভে মোহে মানবাত্মার ঐক্যসূত্র, তাই তারা স্বভাবের শোধন চেষ্টা না ক'রে একটা রাষ্ট্রিক যন্ত্রের কাছে দোহাই পাড়তে থাকে। তখন তাতে প্রকাশ পায় আধুনিক কালের যন্ত্রবিশ্বাসী মনের নির্বোধ পৌত্তলিকতা। পুরাতন অভ্যাসের বর্বরতা বশত এ কথা বুঝতে ওদের বিলম্ব হবে যে মানুষের বিশ্বাত্মবোধ যত দিন অপূর্ণ থাকবে তত দিন বাইরের কোন বিশেষ ব্যবস্থাচালিত কারখানায় শান্তি গড়ে তোলা যাবে না। অথর্ববেদ কামনা করেছেন "সমানী প্রপা" এক হোক তোমাদের পানের জায়গা, "সহ বোঽন্নভাগঃ" একত্রে ভোগ করো তোমাদের অন্নভাগ, "সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি" এক যোগের বন্ধনে তোমাদেরকে যুক্ত করি। যজুর্বেদ বলছেন, "যথেমাং বাচং কল্যাণীং আবদানি জনেভ্যঃ", এই যে আমার কল্যাণী বাণী এ আমি বলছি সকল মানুষের জন্য। বিশেষ সুবিধে বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধ হ'তে পারে দলবিশেষের জন্যে, সেও কিছু কালের মতো—কিন্তু কল্যাণ সকলকে মিলিয়ে—"ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায়", ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র বৈশ্য সকলেরই জন্যে, কাউকেই অনধিকারী ব'লে অসম্মানিত ক'রে নয়, মঙ্গলবাণী "স্বায় চারণায়" নিজের জন্যে অন্যের জন্য।

গীতায় বলেছেন "সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র" একতে যিনি

সর্বত্র দেখেন, "ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং" তিনি নিজের দ্বারা নিজেকে আঘাত করেন না। য়ুরোপে যুধ্যমান জাতির প্রত্যেকে অন্যকে মারছি মনে স্থির করেছে, কিন্তু মারছে সে নিজেকে। যে পক্ষেরই জিত হোক্ এই নিজেকে নিজে আঘাত থামবে না। পরকে মারার আত্মঘাত বার-বার জেগে উঠবে। এদিকে ভারতবর্ষে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে অসম্মানের আঘাত ক'রে নিজের প্রতি আঘাতকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখছে। আমরা "আত্মহনো জনাঃ" আমরা দীর্ঘকাল তমসাবৃত লোকে রয়ে গেলুম আত্মঘাতের পাপে। আশ্চর্যের এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতের কল্যাণীবাণী ঐক্যবাণী সকলের চেয়ে অশ্রদ্ধা পেয়েছে ভারতবর্ষে।

আমাদের শাস্ত্রে যোগের কথা বারংবার পাই। কী পতঞ্জলি কী বৌদ্ধশাস্ত্র এই যোগের পথ নির্দেশ করেছেন করুণায় মৈত্রীতে—অর্থাৎ এই যোগ সকলের সঙ্গে প্রেমের যোগে। প্রেমের সাধনা তো শূন্যতার সাধনা হ'তেই পারে না। এ হ'ল সকলের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধির সাধনা। মানুষকে ছেড়ে কোনো দেবতাকে পাওয়ার কথা এ নয়, এ নয় পৃথিবীকে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গের দিকে তাকানো। এ পারমার্থিক বটে, কেন না এ স্বার্থিক নয়, এর পরম অর্থ সকল মানুষকে মিলিয়ে নিয়ে। মানুষের এই আত্মপ্রকাশের যোগসাধনা কোনো একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্তর্গত নয়, এ আমাদের প্রতিদিনের। এ তপস্যা অরণ্যের নয়, গিরিকন্দরের নয়, এ নয় মানুষের সঙ্গবর্জনের তপস্যা। এ যে সহজ স্বাভাবিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়ে বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে যোগে বাধা দেয় জ্ঞানের মূঢ়তায়, আর বিশ্বাত্মার সঙ্গে যোগে বাধা দেয় প্রেমের বিকারে, কাম ক্রোধ লোভে, অহংকারে ঈর্ষায়। এই দুই যোগের দ্বারা মানুষের সম্পূর্ণতা, তার প্রতিমুহূর্তের প্রকাশে জ্ঞানে আর প্রেমে।

এই জীবনব্যাপী নিত্য যোগসাধনার বাধা যে-সকল রিপু তাদের জটিল শিকড় আমাদের স্বভাবের অনেক গভীরে চলে গেছে। তার কতক থাকে প্রত্যক্ষে, অপ্রত্যক্ষে থাকে অনেকখানি। তাদের আঘাত অনেক সময়ে অতর্কিত। তাই শুভসংকল্পে ভুল হয়, অন্যমনস্ক হই, হুঁচট খাই পদে পদে। মনের আলস্যে হার মেনে অনেক সময়ে হাল ছেড়ে দিই। সেই পরাভবের সময় কী ক'রে নিজেকে চেতিয়ে তুলব সেই প্রশ্ন মনে উদ্বেগ আনে। আমি জানি নে কোনো বাহ্য প্রক্রিয়া, জানি নে এক জাল থেকে মনকে টানতে গিয়ে আর কোনো অস্বাভাবিক জালে তাকে জড়িয়ে রাখার কী উপায়। আমি কেবল জানি মনের উপর বাণীর প্রভাব। কেন না বাণী মনের একান্ত আপন জিনিস। যে-বাণী মানুষের সার্থক উপলব্ধির বাণী, প্রাণধর্ম আছে তাতে, তাই সে মনের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে স্বভাবতই। তেমন বাণী আমরা পেয়েছি আমাদের ঋষিদের কাছ থেকে, তাঁদের পরিপূর্ণ জীবনের ফলস্বরূপে। এ বাণী আমরা নির্বাচন ক'রে নিতে পারি নিজের স্বভাবের বিশেষ প্রবর্তনা থেকে। যে গুরু আমাদের অন্তরের বেদীতে আছেন তিনিই এই বাণীযোগে আমাদের সত্যমন্ত্র দিতে পারেন। কোনো এক শুভক্ষণে আমি পেয়েছি আমার জীবনের মন্ত্র শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। আমি চেষ্টা করি এই মন্ত্র আমার চিত্তের কুহরে ধ্বনিত ক'রে রাখতে। অশান্তি বাইরে উদ্যত হয়ে ওঠে, মনকে বলতে বলি, শান্তম্। অশান্তি যতই উগ্রমূর্তি ধরে আসুক এক দিন মরীচিকার মতো তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রলয় আপনিই আপনাকে লয় করতে করতে চলে, বাকি থাকে শান্তম্। শান্তির সেই চরম জয়পতাকাই নিখিল জগতের চূড়ায়—সেই শান্তই সত্য, নইলে বিশ্ব যেত বিলীন হয়ে। ছোটো ছোটো বিলীয়মান সীমার মধ্যেই বড়ো ক'রে দেখি অশিবকে—বিরাটের মধ্যে সে না হয়ে যায়। যত কিছু ভাগ বিভাগ বিচ্ছেদও তাই। ছোটো ছোটো সংসার সীমার মধ্যে তারা এসে পড়ে নানা অশিব রূপ ধ'রে। অতএব অশান্তি ও অমঙ্গলের সঙ্গে আমাদের নিত্যসংঘাত ঘটেই। তাদের সম্পর্কীয় সমস্যা নিয়ে সংসারে সর্বদাই আমাদের কর্তব্য স্থির করতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তকে যদি বিরাটের ভূমিকায় দেখি তাহলে মনকে কিছুতে অভিভূত করতে পারে না। তাহলে বিহ্বল হই নে দুর্বলতায়। তাহলে সমস্ত কর্তব্যকে ধৈর্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারি, ক্ষমা সহজ হয়, উদ্বেগ

যায় দূর হবে। তাহলে অনিত্যকে নিত্য এবং মায়াকে সত্য ব'লে গ্রহণ করি নে, তাহলে সংসার অত্যুক্তি দ্বারা আমাদের চিত্তাকে পরিমাণভ্রষ্ট করতে পারে না। আর অদ্বৈতকে, পরম এককে, যদি সকল সত্যের মধ্যে মূল সত্য ব'লে স্বীকার করতে মন অভ্যস্ত হ'তে পারে তাহলে মৈত্রীভাবনা সহজ হয় আনন্দময় হয়।

আমরা উপদেশ পেয়েছি "যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ", যা কিছু কাজ করবে তা অসীমকে সমর্পণ করবে। সেই অসীমের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সমস্ত কাজ থেকে হীনতা যাবে, ঈর্ষা যাবে, অহংকার যাবে। তারা পরিবেষ্টিত হবে শান্তির দ্বারা। তারা ব্যর্থ হলেও মনকে অবসাদে অভিভূত করবে না।

ওঁ দৃতে দৃংহ মা, মিত্রস্য মা চক্ষুষা
সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা
সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।

শরীর জরায় জীর্ণ। আমাকে দৃঢ় করো। জগতের সকল প্রাণী আমাকে মিত্রের চক্ষে দেখুক। আমি সকলকে দেখি মিত্রের চক্ষে। আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখি মিত্রের দৃষ্টিতে।

উদীচী
১ মাঘ, ১৩৪৬

[শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসবে আচার্য্যের অভিভাষণ। ১১ই মাঘ

ব্যর্থ অন্বেষণ

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

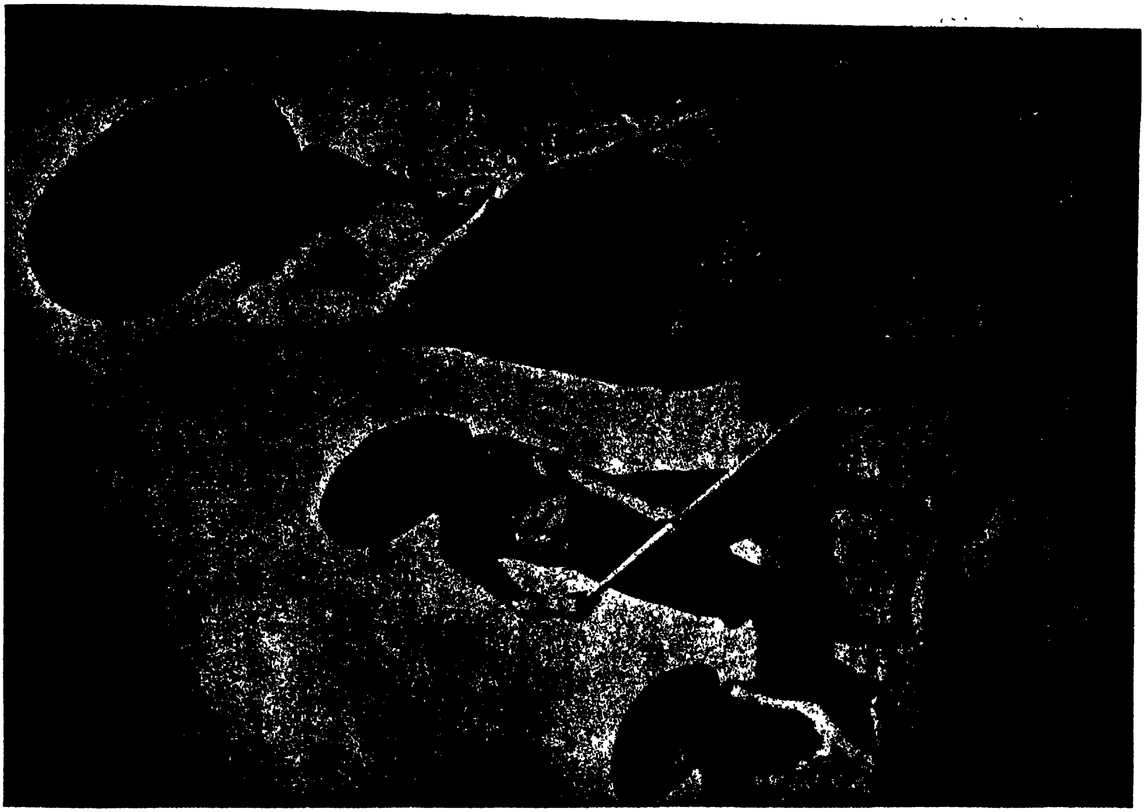
জীবন-নদীতে খুঁজে ফিরি যে গো
তোমার মিলন-শঙ্খ,—
আঁধার সলিলে ডুবে মরি শুধু
তুলি মুঠি মুঠি পঙ্ক।
যুগ যুগ ধরি মানব-যাত্রী
চলিয়াছে চাহি মিলন-রাত্রি,
চলার শেষে কি পাবে এক দিন
তোমার শীতল অঙ্ক?
আঁধার সলিলে ডুবে মরি শুধু
তুলি মুঠি মুঠি পঙ্ক।

মিলন-পাগল করেছে আমারে
মিলন-পিয়াসী চিত্ত,
কি এক মদিরা পান করি যেন
প্রভাতে ও সাঁঝে নিত্য।
দিবসের কাজ করে যে ক্ষুব্ধ,
নিশীথের বাঁশী করে গো লুব্ধ,
সারা অন্তর খুঁজে ফিরে মোর
পরাণের নব বিত্ত।
কি এক মদিরা পান করি যেন
প্রভাতে ও সাঁঝে নিত্য।

আঁধারের মাঝে নয়ন আমার
দিশা খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত,
স্তব্ধ দুপুরে স্মৃতির আঘাত—
প্রভাতে যে মধু করি সঞ্চিত,
দিনশেষে হই যেন বঞ্চিত;
সীমার মাঝারে ঘুরে মরি শুধু
অসহায় পথভ্রান্ত।
জীবন-নদীতে অশ্রু-তুফান
করে সৈকত শ্রান্ত।

জ্যোৎস্না-মাখান নভোনীল যেন
করিবারে চায় সখ্য,
ধরণীর আছে যত কোমলতা
করে যেন মোরে লক্ষ্য;
শুধু চেয়ে থাকি ব্যথিত চক্ষে,
ভাব মূরছায় এ মোর বক্ষে,—
এমনি ক'রে কি যাপিয়াছে নিশি
অভাগা বিরহী যক্ষ?
ধরণী মাঝারে যত ফুল ফুটে
করে যেন মোরে লক্ষ্য।

নদী-পরপারে চেয়ে চেয়ে মোর
বিরহে হৃদয় দীর্ণ।
জাগরণ-ক্ষীণ অবসাদভারে
হয় তনু-মন শীর্ণ।
চক্রবাকীর হবে না প্রভাত,
আশা-নিরাশায় লয়ে সংঘাত?
আঁধার মাঝেই মরণ-নদীতে
হবে বুঝি অবতীর্ণ?
তোমারে খুঁজিয়া কাটিবে জনম,







চীনের নূতন চরখা। পূর্ব্বে যে চরখা ব্যবহৃত হইত ইহাতে তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ সূতা কাটা যায়



চীনে নবগঠিত শিল্প-সমবায় হইতে উন্নত ধরণের এই চরখা প্রচলনের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে

নব্যাবিষ্কৃত রামমোহন রায়-প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা'

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮১৪ সনের মাঝামাঝি সময়ে রামমোহন রায় কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন এবং শাস্ত্রচর্চ্চায় বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিবার অবসর পান। এই সময় বাংলা দেশে "বেদান্ত-শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য" ছিল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮১৫ সালে 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার'* প্রকাশ করিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ' সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয়, রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন :

বেদান্ত গ্রন্থ অর্থাৎ বেদান্ত সূত্র। ইহার অন্য নাম ব্রহ্মসূত্র, শারীরক মীমাংসা বা শারীরক সূত্র। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমাপ্ত এই ভারতবর্ষে যদবধি ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তদবধি আর্য্যদিগের মধ্যে ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে একটা বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঋষিগণ ঐ দুই বিষয়ের বিস্তর বিচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞান পক্ষীয় ছিলেন। তিনি যে সকল বিচার করিয়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায় তিনি ঐ সকল বিচারোবোধক কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়া যান। বহু কালের পর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করেন। ঐ সকল সূত্রে এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত তাহার ব্যাখ্যানে বা ভাষ্যে বেদব্যাসের সমস্ত ব্রহ্মবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উক্ত বেদান্তসূত্র গ্রন্থের ঐরূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া প্রথমে ঐ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাস মতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং লোকমান্য শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার পক্ষে উহা ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল।

কিন্তু কেবলমাত্র বাংলা অনুবাদসহ বেদান্তসূত্র প্রকাশ করিয়াই রামমোহন ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ১৮১৮ সালে শাঙ্কর ভাষ্য—'শারীরক মীমাংসা' বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই সংবাদ এত দিন পর্য্যন্ত আমাদের অবিদিত ছিল। সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে সরকারী দপ্তরখানায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নথিপত্র দেখিবার সময় আমি এই সংবাদটি প্রথম জানিতে পারি।

THE

BENGALEE TRANSLATION

OF THE

VEDANT,

OR

RESOLUTION

OF ALL THE

VEDS;

THE MOST CELEBRATED AND REVERED WORK

OF

BRAHMINICAL THEOLOGY,

ESTABLISHING THE UNITY

OF

The Supreme Being,

AND

THAT HE IS THE ONLY OBJECT OF WORSHIP.

TOGETHER WITH

A PREFACE,

BY THE TRANSLATOR.

CALCUTTA.

FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO.

1818.

১৮১৫ সালে মুদ্রিত 'বেদান্ত গ্রন্থে'র আখ্যা-পত্রের প্রতিলিপি। ইহাই রামমোহন রায়ের সর্ব্বপ্রথম বাংলা গ্রন্থ।

কোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এখানে মূলতঃ এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন।

---

* অনেকে 'বেদান্তসার' পুস্তকের প্রকাশকাল ১৮১৬ সাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহা ১৮১৫ সাল বলিয়া গণ্য করিবার সঙ্গত কারণ আছে। 'বেদান্তসারে'র ইংরেজী অনুবাদ—*Translation of an Abridgment of the Vedant* ১৮১৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় (১ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখে *The Government Gazette* ইহার সমালোচনা করেন)। এই ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের পূর্ব্বে যে 'বেদান্তসার' বাংলায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ ইংরেজী অনুবাদ-পুস্তকের ভূমিকায় আছে।

১৮১৮ সালের প্রথম ভাগে রামমোহন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে একখানি পত্র লেখেন ; পত্রে তাঁহার নবপ্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা'র কতকগুলি খণ্ড কলেজ-লাইব্রেরির জন্য ক্রয় করিবার অনুরোধ ছিল। তখন ছাপার হরফে মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না ; পুস্তক-মুদ্রণও বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। এই কারণে কলেজ-লাইব্রেরির উপযোগী কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাহার কতকগুলি খণ্ড ক্রয় করিয়া লেখককে উৎসাহিত করিতেন।

কলেজের সেক্রেটরী রামমোহন রায়ের পত্রখানি কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ পাদরি উইলিয়ম কেরীকে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন। উত্তরে, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ তারিখে কেরী যে পত্রখানি লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

To Captain Lockett,

Secretary to the College Council.

Sir,

I have delayed replying to your Note of June 21st accompanying a letter from Ram Mohun Raya, requesting to know whether the College Council will purchase a few copies of the Vedanta Durshuna lately published by him, because there was no copy of the work sent with it by which I could ascertain what particular work on the Vedanta Philosophy it is that he has published.

Since that, Ram Mohun Raya has presented me with a copy of it which enables me to report upon it with certainty. The title of the work is SAREERIKA MEEMANGSA. It is a work of great and deserved celebrity, and is considered as a scarce work. There is a copy of a work entitled Soreerika Bhashya in the College Library, which is a comment upon the . Doctrines of the Soreerika Meemangsa, but as this work itself is not in the College Library, I recommend the purchase of, at least, ten copies of it, especially as if the higher branches of Hindoo Philosophy should at any time be studied in the College, this must be one of the principal works used in that study.

September 29th, 1818. I am, etc.

Wm. Carey.*

কেরীর পত্রে গ্রন্থখানির নাম জানিতে পারিলেও, এত দিন পর্য্যন্ত রামমোহন কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা'র কোন সন্ধানই পাই নাই। সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের দুইটি খণ্ড দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি যে লল্লূলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্রে † মুদ্রিত এবং ১৭৪০ শক বা ১৮১৮ সালেই প্রকাশিত, তাহার উল্লেখ গ্রন্থের পুষ্পিকায় এই ভাবে দেওয়া আছে :—

"চত্বারিংশদধিকসপ্তদশশতশকে শ্রীমল্লল্লূলালশর্ম্মকবিনা সংস্কৃতযন্ত্রৈরঙ্কিতমেতৎ।"

---

* College of Fort William Proceedings.—*Home Miscellaneous No. 565*, pp. 155-56.

এই গ্রন্থের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ৮৲। কলেজ-কাউন্সিল ইহার ১০ খণ্ড ৮০৲ মূল্যে ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

কেরীর এই পত্রখানি আমি ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধে (পৃ. ৭৫৮-৫৯) সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করি।

† ১৮০৬-৭ সালে মীর্জ্জাপুর ত্রিলোচনঘাট-নিবাসী বাবুরাম নামে এক জন সারস্বত ব্রাহ্মণ খিদিরপুরে সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। দেশীয় লোকদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন ; তাঁহার মুদ্রাকর ছিল মদন পাল নামে এক জন সদ্গোপ। এই মুদ্রাযন্ত্রে প্রথমে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ মুদ্রিত হইত।

১৮১৪-১৫ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্রজভাষার মুন্শী (১৮০২ সনে মাসিক ৫০৲ বেতনে নিযুক্ত) লল্লূলাল কবি নামে এক জন গুজরাটী ব্রাহ্মণ বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে (১৮১৪ সনের জুন মাসে 'কিরাতার্জ্জুনীয়' ছাড়া বাবুরামের যন্ত্রে তৎপরবর্ত্তী কালে মুদ্রিত অপর কোন পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই)। লল্লূলালের ছাপাখানাও সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল, এবং পূর্ব্বোক্ত মদন পালই তাহার মুদ্রাকর ছিল। সংস্কৃত বা হিন্দী পুস্তক ছাড়া বাংলা পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থাও লল্লূলাল করিয়াছিলেন। তাঁহারই মুদ্রাযন্ত্রে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রথম আচার্য্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রথম গ্রন্থ 'জ্যোতিষসংগ্রহসার' ১৮১৭ সনের জানুয়ারি মাসে মুদ্রিত হয়। লল্লূলালের সংস্কৃত যন্ত্র পটলডাঙ্গায় অবস্থিত ছিল।

সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত দুইখানি 'শারীরক মীমাংসা'রই আখ্যা-পত্র (টাইটেল-পেজ) না থাকায় উহা যে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এত দিন অজ্ঞাত ছিল। আখ্যা-পত্র মোটেই ছিল কি না এবং থাকিলেও রামমোহন রায়ের নাম ছিল কি না, এ-কথা জোর করিয়া বলা যায় না; কারণ, তাঁহার সর্ব্বপ্রথম বাংলা গ্রন্থ—'বেদান্ত গ্রন্থে'র আখ্যা-পত্রেও তাঁহার নাম নাই। সুতরাং নাম না থাকিলেও, ১৮১৮ সালে প্রকাশিত এই 'শারীরক মীমাংসা'ই যে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ তারিখের পত্রে কেরী কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ আছে বলিয়া মনে করি না।

এইবার গ্রন্থখানি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

গ্রন্থখানি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত; রয়েল আকারের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম পৃষ্ঠার অনুলিপি দিতেছি:—

বে। প্র॰ প্র। ভা। ১

ওঁ তৎসৎ॥ চিদাত্মনে নমঃ॥ যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসস্তদ্বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিষয়েঽধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং। তথাপ্যন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্যেতরেতরাবিবেকেনাত্যন্তবিবিক্তয়োর্ধর্ম্মধর্ম্মিণোর্মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যাঽহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ॥ আহ কোঽয়মধ্যাসো নামেতি উচ্যতে স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তং কেচিদন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি। কেচিত্তু যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহণনিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অন্যেতু যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনামাচক্ষতে। সর্ব্বথাপিতু অন্যস্যান্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি। তথাচ লোকেঽনুভবঃ। শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি।...

গ্রন্থখানি চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত। শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ॥

সমাপ্তমিদং শাস্ত্রং॥ * ॥ * * * * । * ।

। * ।••। • । ওঁ তৎসৎ । * । * । * । ওঁ তৎসৎ । * । * । * । * ।

রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ছাপার হরফে মুদ্রিত আর কোন ব্রহ্মসূত্র ও শাঙ্কর ভাষ্য আমি দেখি নাই।

বর্ত্তমান বর্ষে প্রদত্ত বিজ্ঞানে নোবেল-প্রাইজ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ছয় জন বৈজ্ঞানিককে এবার পাঁচটি নোবেল-প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে তিন জন জার্ম্মান—দুই জন রাসায়নিক এবং এক জন জীবতত্ত্ববিদ্। কিন্তু বর্ত্তমান জার্ম্মান গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন জার্ম্মানকেই নোবেল-প্রাইজ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না। যাহা হউক, বর্ত্তমানে যে-সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় নোবেল-প্রাইজ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পদার্থ-বিজ্ঞান

আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই. ও. লরেন্স ১৯৩৯ সালের জন্য পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল-প্রাইজ লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। 'সাইক্লোট্রন' নামক এক অপূর্ব্ব যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলেই তিনি এই সম্মানের অধিকারী হইলেন। দড়ির এক প্রান্তে একটি ভারী ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে ঢিলটি যেমন ভীমবেগে ছুটিয়া গিয়া লক্ষ্যস্থলে আঘাত করে; এই যন্ত্র সাহায্যে কতকটা অনুরূপ উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থকে বিপুল গতিশক্তিসম্পন্ন করিয়া ছুড়িয়া

দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাস্তব ক্ষেত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটি ঢিলকে এরূপ অসম্ভব গতিশক্তিসম্পন্ন করার বিষয় বৈজ্ঞানিকদের নিকট অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইত। কিন্তু এই যন্ত্রসাহায্যে অধ্যাপক লরেন্স তাহাই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। এই যন্ত্রসাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে তিনি প্রায় এক শত পঞ্চাশটি নূতন স্বতোবিকিরণকারী পদার্থ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং কৃত্রিম উপায়ে রেডিয়ামের অনুরূপ পদার্থ উৎপাদন করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই পদার্থগুলিকে চিকিৎসা-বিদ্যায় প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে।

সাইক্লোট্রন আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ। একটি সাধারণ তথ্য হইতে কিরূপে এমন একটি বিরাট্ জটিল যন্ত্রের গঠন সম্ভব হইয়াছে তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই যন্ত্র নির্ম্মাণের মূল তথ্য প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল পূর্ব্বেও জানা ছিল, তথাপি ইহা নির্ম্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। তড়িতাবিষ্ট একটি কণিকার উপর চুম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রভাব কিরূপ, তাহা একটি পুরাতন আবিষ্কার। তড়িতাবিষ্ট একটি কণিকার উপর একই ক্ষেত্রে একই সময়ে বৈদ্যুতিক ও চুম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করিলে তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইবে, লরেন্স ইহা দেখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। সাধারণ গাণিতিক হিসাবেই তিনি দেখিতে পাইলেন—ইহার ফল অসাধারণ। যান্ত্রিক অসুবিধাজনিত কোন বাধা না পাইলে সেই তড়িতাবিষ্ট কণিকাটি অসীম শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। যান্ত্রিক অসুবিধার জন্য বাস্তবক্ষেত্রে কণাটিকে অসীম শক্তিশালী করা সম্ভব না হইলেও তাহার শক্তি যেরূপ বর্দ্ধিত করা যায় সেরূপ আর কোন উপায়েই করা সম্ভব ছিল না। এই যন্ত্রসাহায্যে তড়িতাবিষ্ট কণিকাটি কিরূপে বিপুল শক্তি অর্জ্জন করে, এক্ষণে সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্তির সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল—প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্রই সাইক্লোট্রনকে পরমাণু চূর্ণ করিবার যন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেন ইহা এক প্রকার যাঁতা-কল। কতকগুলি পরমাণু ইহার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে সেগুলি যেন ডালের মত চূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। সাইক্লোট্রনের আকৃতি দেখিয়া এরূপ একটা ধারণা হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সাইক্লোট্রন তড়িতাবিষ্ট কণিকার শক্তি বৃদ্ধি করিবার যন্ত্রবিশেষ। তড়িতাবেশশূন্য কোন কণিকার উপর সাইক্লোট্রনের কোন প্রভাব লক্ষিত হয় না। সাইক্লোট্রনের ভিতর হইতে পরমাণু চূর্ণিত হইয়া বাহির হইয়া আসে না; কিন্তু পরমাণুকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ইহারই সাহায্য লওয়া হয়। কিরূপে ইহা সম্ভব হয়? তড়িৎ দুই প্রকার—ধন-তড়িৎ ও ঋণ-তড়িৎ। বিষমগুণসম্পন্ন তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সমগুণসম্পন্ন তড়িৎ পরস্পরকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। অর্থাৎ ঋণ-তড়িৎ ধন-তড়িৎকে আকর্ষণ করে এবং ঋণ-তড়িৎকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। বিভিন্ন তড়িৎ-সম্পন্ন দুইটি ফলককে পাশাপাশি রাখিলে উহাদের মধ্যস্থলে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হইবে। এখন দুইটি ফলকের মধ্যস্থলে যদি একটি ধন-তড়িৎ কণিকা ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে ফল কি হইবে? ধন-তড়িৎ-সম্পন্ন ফলকটি কণিকাটিকে দূরে ঠেলিয়া দিবে, কিন্তু ঋণ-তড়িৎ-সম্পন্ন ফলকটি উহাকে আকর্ষণ করিবে। ফলে কণিকাটি ঋণ-তড়িৎ ফলকটির প্রতি বেগে ধাবিত হইবে। বেগে ধাবিত হইবার ফলে ইহার গতির মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলেই বুঝা গেল, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে একটি তড়িতাবিষ্ট কণিকার কেমন করিয়া শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে। তড়িৎক্ষেত্রের মত তড়িতাবিষ্ট কণিকার উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব একই রকমের নহে। চুম্বককে ঘিরিয়া একটি চুম্বক-ক্ষেত্র অবস্থান করে; চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণী শক্তির মাত্রা বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু একই প্রকারের দুইটি চুম্বক পাশাপাশি রাখিলে উহাদের মধ্যস্থিত চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণী শক্তি সর্ব্বত্রই প্রায় সমান দেখা যায়। এইরূপ একটি চুম্বক-ক্ষেত্রে কোন তড়িতাবিষ্ট কণিকা প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার পথ বৃত্তাকারে বাঁকিয়া যায়। ধন-তড়িৎকণা যেদিকে বাঁকিবে, ঋণ-তড়িৎকণা তাহার

বিপরীত দিকে বাঁকিয়া থাকে এবং বৃত্তাকার পথের ব্যাস কণাটির গতি ও ভারের উপর নির্ভর করে। কণাটির গতি যত বেশী হইবে, ইহার পথের ব্যাসও ততই বর্দ্ধিত হইবে। ভার বেশী হইলেও ব্যাসের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু চুম্বক দুটির আকর্ষণী শক্তি বাড়াইয়া দিলে কণাটির পথের ব্যাস হ্রাস পাইবে। কারণ কণাটির উপর চুম্বকের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহাকে অধিকতর দ্রুতগতিতে বাঁকাইয়া দিবে। ফলে বৃত্তটি ছোট হইয়া পড়িতে বাধ্য। গতির সহিত কণার বৃত্তাকার পথ রচনার আরও অদ্ভুত সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তড়িতাবিষ্ট কণিকা চুম্বক-ক্ষেত্রে যে-বৃত্ত রচনা করে তাহার পরিধি গতির সহিত বৃদ্ধি পায়। অপেক্ষাকৃত অল্পগতি-সম্পন্ন কণিকা অধিকতর গতিসম্পন্ন কণিকা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বৃত্তে পরিভ্রমণ করিবে। আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ক্ষুদ্রতর বৃত্তে পরিভ্রমণকারী কণিকার একটি বৃত্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে যে-সময় লাগিবে, বৃহত্তর বৃত্তে ভ্রমণকারী কণিকাও ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই বৃত্তটি ঘুরিয়া আসিবে। অর্থাৎ একটি তড়িতাবিষ্ট কণিকার গতির মাত্রা যতই হউক না কেন, চৌম্বক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে সর্ব্বদা একই সময় লাগিবে। কিন্তু কণিকাটির তড়িতের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে অথবা চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণী শক্তি বাড়াইয়া দিলে সম্পূর্ণ একটি বৃত্ত রচনার সময় কমিয়া যাইবে।

এইরূপ একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের একত্র সমবায়ে সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। উপরে ও নীচে দুইটি চুম্বক রাখিয়া তন্মধ্যে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রে অর্দ্ধগোলাকার ফাঁপা খাঁতার মত দুইটি পাত্র পাশাপাশি স্থাপন করা হয়। এই দুইটি অর্দ্ধ-গোলকের একটি ধন-তড়িৎ এবং অপরটি ঋণ-তড়িৎ সম্পন্ন। বৃহৎ একটি ফাঁপা খাঁতাকে মাঝামাঝি কাটিয়া দুই ভাগে ভাগ করিলে যেরূপ হয়, যন্ত্রের নমুনা কতকটা সেইরূপ। অর্দ্ধ-গোলাকার ফাঁপা খাঁতা দুইটির মধ্যস্থলে একটু ফাঁক রাখিয়া একই সমতল ক্ষেত্রে মাটির সহিত সমান্তরালে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য আবদ্ধ পাত্রে স্থাপন করা হয়। উপরিউক্ত অর্দ্ধ-গোলাকার খাঁতা দুইটির মধ্যস্থিত ফাঁকা জায়গায় যদি ধনতড়িতাবিষ্ট একটি কণিকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণের ফলে ইহা একটি বৃত্তাকার পথ অবলম্বন করিবে এবং ধন-তড়িৎসম্পন্ন অর্দ্ধবৃত্তাকারে খাঁতা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঋণ-তড়িৎসম্পন্ন খাঁতার দিকে আকর্ষিত হইবে। ফলে কণিকাটির গতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ কণিকাটি ঋণ-তড়িৎসম্পন্ন খাঁতার ফাঁপা স্থানের মধ্যে একটি অর্দ্ধবৃত্ত রচনা করিয়া উহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিবে। কণিকাটির গতি হইবে এখন অপর দিকস্থ ধন-তড়িৎসম্পন্ন খাঁতাটির দিকে। কিন্তু এই খাঁতাটি ধন-তড়িৎসম্পন্ন থাকায় কণাটিকে বিপরীত দিকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কণিকাটি ঋণ-তড়িৎসম্পন্ন খাঁতার ঠিক কিনারায় আসিয়া উপস্থিত হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যান্ত্রিক কৌশলে ধন-তড়িৎসম্পন্ন অপর খাঁতাটিকে ঋণ-তড়িৎসম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়। ফলে কণিকাটি বিকর্ষিত না হইয়া অপর খাঁতাটি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাতে তাহার গতিবেগ আরও বৃদ্ধি পায় এবং গতি বৃদ্ধি হইলেই তাহার রচিত বৃত্তের পরিধিও বাড়িয়া যায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বার-বার উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার ফলে কণাটি ক্রমশঃ বৃহত্তর বৃত্ত পরিভ্রমণ করিয়া কুণ্ডলীর মত পথে ছুটিতে থাকে। কণিকাটির গতির মাত্রা বাড়িতে বাড়িতে যখন তাহার বৃত্তের পরিধি খাঁতার পরিধির সমান হইয়া আসিবে তখন খাঁতার এক পাশের গর্ত্ত দিয়া ভীম বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। এই বিপুল গতিসম্পন্ন ডিউটন ছুটিয়া আসিয়া কোন পদার্থকে আঘাত করিলে তাহার কতকগুলি পরমাণু নিশ্চয়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে এবং তাহাদের কেন্দ্রীয় পদার্থের রূপান্তর সংঘটিত হইবে। ডিউটন আহত পদার্থের কেন্দ্রীনের সহিত মিলিত হইয়া নূতন এক প্রকার যৌগিক কেন্দ্রীনের সৃষ্টি করিবে। কাজেই এই যন্ত্রসাহায্যে পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থকে বিপুল শক্তি-সম্পন্ন ডিউটনরূপে ব্যবহার করিয়া কৃত্রিম উপায়ে স্বতো-বিকিরণকারী পদার্থ প্রস্তুত অথবা এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইয়াছে। চুম্বক-ক্ষেত্রটি কণিকাটিকে সর্ব্বদা একটি বৃত্তাকার পথে চলিতে বাধ্য

করিতেছে, আবার তড়িৎক্ষেত্রটি প্রতি পূর্ণবৃত্ত ভ্রমণে দুই বার করিয়া কণিকাটির গতিবেগ একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি করিতেছে, কাজেই চৌম্বক ক্ষেত্র এবং ধাঁতা দুটির পরিধি যত বিস্তৃত করা যাইবে কণিকাটিকে ততই অধিকতর গতিশীল করান সম্ভব হইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে চৌম্বক ক্ষেত্র যদৃচ্ছা প্রসারিত করিবার অসুবিধা অনেক, কাজেই কণিকাটিকে অভাবনীয় শক্তিসম্পন্ন করা সম্ভব হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে মনে হইতে পারে, সাইক্লোট্রনের কার্য্যাবলী অতি সহজেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা নহে। কারণ ঠিক সময়মত ধাঁতা দুইটির তড়িতাবেশ পরিবর্ত্তন করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। সাইক্লোট্রনের ধাঁতা দুটির ব্যাস প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি। এক-একটি অর্দ্ধ-গোলকের ধাঁতার পরিধি প্রায় পঞ্চাশ ইঞ্চি। একটি কণিকা যদি সাইক্লোট্রন হইতে আলোর গতির এক-দশমাংশ অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬০০ মাইল বেগ প্রাপ্ত হয়, তবে ধাঁতার অভ্যন্তরে একটি অর্দ্ধবৃত্ত রচনা করিতে ইহার মাত্র ·০০০০০০৩ সেকেণ্ড সময় লাগিবে। এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে ধাঁতার তড়িৎ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তারহীন তড়িৎবার্ত্তার যান্ত্রিক কৌশলের অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে আমেরিকায় প্রায় ত্রিশটি সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি ইতিপূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছে। ইউরোপ, কোপেনহেগেন কেম্ব্রিজ এবং লিভারপুলে এক-একটি সাইক্লোট্রনে কাজ চলিতেছে। প্যারিস, জুরিক, ষ্টকহল্‌ম, লেনিনগ্রাড এবং চারকো প্রভৃতি স্থানে এক-একটি সাইক্লোট্রনের নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে। জাপানে একটি সাইক্লোট্রনে কাজ হইতেছে এবং আর একটি নির্ম্মিত হইতেছে। জার্ম্মেনীতেও দুইটি সাইক্লোট্রন নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

রসায়নশাস্ত্র

কাইজার উইলহেল্ম ইনষ্টিটিউটের হাইডেলবার্গের ভেষজতত্ত্ব-সম্পর্কিত গবেষণাগারের ডিরেক্টর অধ্যাপক রিচার্ড কুন্‌কে রসায়নশাস্ত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবেষণার জন্য ১৯৩৮ সালের নোবেল-প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে। উইলস্টেটারের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে তিনিই যে সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্র, তাঁহার প্রথম জীবনের কার্য্যাবলী হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। 'এন্‌জাইম' সম্বন্ধে তিনি অনেক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। ক্যারোটিনয়েড্‌স্‌, ফ্ল্যাভিনস্‌, ভিটামিন এ এবং বি, সম্বন্ধে অতি উচ্চাঙ্গের গবেষণার জন্য তিনি এই পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছেন বর্ত্তমানে তিনি স্বাভাবিক রঞ্জক পদার্থ সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর তথ্যাবলী উদ্‌ঘাটন করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'ক্রিপ্টোজ্যান্থিন' 'রডোজ্যান্থিন,' 'রুবিক্স্যান্থিন', 'স্যাফ্রন্' এবং 'গ্যাজাক্রিন' প্রভৃতির উপাদান ও রাসায়নিক সংগঠন সম্বন্ধে অভিনব তথ্যাবলী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চিংড়ির শরীর হইতে তিনি 'এ্যাষ্টাসিন্' নামক এক প্রকার রঞ্জক পদার্থও পৃথক্ করিয়াছেন।

গাজর হইতে প্রাপ্ত 'ক্যারোটিন' নামক এক প্রকার রঞ্জক পদার্থের গবেষণার ফলে তিনি অতি মূল্যবান্ আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হন। সাধারণ 'ক্যারোটিন' হইতে তিনি আল্‌ফা, বিটা ও গামা এই তিন প্রকারের 'ক্যারোটিন' পৃথক্ করিতে সমর্থ হন এবং পরীক্ষার ফলে দেখিতে পান যে, বিটা ক্যারোটিনের সঙ্গে ভিটামিন এ-র অতি নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যে ভিটামিন এ-র পরিবর্ত্তে বিটা-ক্যারোটিন ব্যবহার করিলে ইহা শরীরাভ্যন্তরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হইতে পারে। তার পরে তিনি দেখিতে পাইলেন—'ক্যারোটিন'ই যে কেবল ভিটামিন এ-তে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা নহে, 'ক্রিপ্টোজ্যান্থিন' নামে রঞ্জক পদার্থও খাদ্য দ্রব্যে ভিটামিন এ-র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিকগণের নিকট এত দিন যাহা একটা মহাসমস্যার বিষয় ছিল, ১৯৩৭ সালে তিনি কৃত্রিম উপায়ে সেই ভিটামিনএ প্রস্তুত করিয়া রসায়নশাস্ত্রের গবেষণায় যুগান্তর আনয়ন করেন। ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীর উপর পরীক্ষায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইল যে, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত

ভিটামিন এ ও স্বাভাবিক ভিটামিনের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই।

অধ্যাপক কুনের ভিটামিন২ এবং ফ্ল্যাভিন্ রসায়নশাস্ত্রের এক অপূর্ব্ব আবিষ্কার। দুধ হইতে ছানা এবং চর্ব্বি পৃথক্ করিয়া লইলে ঘোলের মধ্যে এক প্রকার সবুজাভ রং দেখিতে পাওয়া যায়। কুন্ এই রঞ্জক পদার্থ পৃথক্ করিয়া ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীর উপর পরীক্ষার ফলে দেখিতে পাইলেন, ইহা ভিটামিন২ জাতীয় পদার্থ। তিনি ইহার নাম দিলেন 'ল্যাক্টোফ্ল্যাভিন'। আরও অধিক পরীক্ষায় তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, উহা নূতন ধরণের এক প্রকার স্বাভাবিক রঞ্জক পদার্থ। তৎপরে তিনি ডিম, লিভার ও মূত্রাশয় হইতেও অনুরূপ রঞ্জক পদার্থ পৃথক্ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কুন্ কৃত্রিম উপায়ে ল্যাক্টোফ্ল্যাভিন উৎপাদন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহা আইসো-য়্যালোক্সেজিন' ও 'রিবোজ' নামক পদার্থের সমবায়ে গঠিত। ল্যাক্টোফ্ল্যাভিন এক প্রকার হলুদ ও জরদ রঙের মিশ্র পদার্থ। ইহাই জলীয় মিশ্রণকে সবুজাভ রং প্রদান করে। ইহা প্রোটিন-জাতীয় পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া 'হলদে এনজাইম' নামক পদার্থ গঠন করে। অধ্যাপক কুন্ কৃত্রিম উপায়ে দানাদার ভিটামিন৬ও প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কাইজার উইলহেল্ম ইনষ্টিটিউটের বাইওকেমিষ্ট্রির ডিরেক্টর অধ্যাপক এ. বুটেন্যান্ট এবং জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-রসায়নের অধ্যাপক এল. রুজিকা, এই দুই জন বৈজ্ঞানিককে রসায়নশাস্ত্রে যৌন-হরমোন্ আবিষ্কার ও কৃত্রিম উপায়ে তাহা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ১৯৩৯ সালের নোবেল-প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে।

১৯২৯ সালে বুটেন্যান্ট এবং ডয়েসি প্রায় সমকালেই স্বাধীন ভাবে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মূত্র হইতে 'থিলিন' অথবা অয়েষ্ট্রোন নামে এক প্রকার দানাদার হরমোন্ পৃথক্ করিতে সমর্থ হন। তৎপরে তাল-জাতীয় ফলের শাঁস হইতেও এই পদার্থ উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি 'কর্পাস লিউটিয়াম' হইতে 'প্রোজেষ্টারোন' নামে এক প্রকার স্ত্রী-যৌন-হরমোন পৃথক্ করেন। ইহা নিষিক্ত ডিম্বকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংলগ্ন রাখিয়া বৃদ্ধি করিবার সহায়ক জরায়ু-পর্দ্দার পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এই বৎসরেই তিনি সয়াবিন হইতে প্রাপ্ত 'ষ্টিগমাষ্টেরল' হইতে কৃত্রিম উপায়ে এই হরমোন প্রস্তুত করিয়া তাহার রাসায়নিক উপাদান ও গঠন নিরূপণ করেন। তিনি পুরুষের মূত্র হইতে 'য়্যাণ্ড্রোষ্টেরোন' নামে পুং-যৌন-হরমোন ও অন্যান্য কতকগুলি যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন। ইহার পর প্রায় তিন মাসের মধ্যেই ডেভিড এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ ষণ্ডের অণ্ডকোষ হইতে 'টেষ্টোষ্টেরণ' নামে অধিকতর কার্য্যশক্তিসম্পন্ন এক প্রকার পুং-যৌন-হরমোন প্রস্তুত করেন। বুটেন্যান্ট কৃত্রিম উপায়ে এই জিনিস উৎপাদন করিয়া তাহার রাসায়নিক গঠন ও সংস্থান নিরূপণ করেন।

'য়্যাণ্ড্রোষ্টেরন' 'প্রেজেষ্টেরোন'-জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত হইতে পারে অর্থাৎ পুং-যৌন-হরমোন স্ত্রী-যৌন-হরমোনে পরিবর্ত্তন এবং 'য়্যাণ্ড্রোষ্টেরনে'র সহিত 'কর্টিকোষ্টেরন'-জাতীয় পদার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ক বুটেন্যান্টের গবেষণা জৈব-রসায়নে এক নব যুগের সূচনা করিতেছে।

আলোচনা

নয়া দিল্লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

শ্রীমণিলাল রায়

মাঘের 'প্রবাসী'তে নয়া দিল্লীর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে উক্তি করিয়াছেন আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। আমি তাঁহার সহকারীরূপে উক্ত মন্দিরের কাজ করি নাই। মন্দিরের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপরই ছিল। চন্দ্র সিং নামে এক জন মিস্ত্রী মন্দিরে অল্পকাল মাত্র কাজ করিয়াছিল। মন্দিরের কাগজপত্রে কিছু কাল তাহার নাম আছে বটে, কিন্তু শ্রীশবাবুর নামগন্ধ মন্দিরের কোন কাগজপত্রে নাই। এতৎসঙ্গে মন্দির-কর্তৃপক্ষের অভিমতের নকল ও বাংলা অনুবাদ পাঠাইতেছি।

[এ-বিষয়ে আর কোন বাদপ্রতিবাদ ছাপা হইবে না।
—প্রবাসীর সম্পাদক]

—

ভারতবর্ষে এঞ্জিনীয়ারিঙের উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণা

শ্রীঅমূল্যধন দেব, বি. ই.

গত মাঘ সংখ্যা প্রবাসীর ৫৪৬ পৃষ্ঠায় চিকিৎসা-বিষয়ক উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণা সম্বন্ধে উদ্ধৃত বক্তৃতা ও সম্পাদকীয় মন্তব্য ভারতীয় এঞ্জিনীয়ারদের পক্ষেও সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য ও প্রণিধানযোগ্য। আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক মতামত যেভাবে প্রচার হয়, অন্য কোন বিষয়ই সেই রকম প্রচারিত হয় না। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি বা ধর্ম্মমূলক আলোচনা ও উন্নতিসাধন যাঁহাদের ব্রত তাঁহাদের নিকট হইতে চিকিৎসা বা এঞ্জিনীয়ারিং-বিষয়ক কোন প্রচেষ্টা কামনা করা সমীচীন নহে। আইনজ্ঞ বা রাজনীতিবিদের ও সাধারণ আলোচনা বা বক্তৃতায় ইহা সীমাবহির্ভূত। ভারতবর্ষের কোন রাষ্ট্রীয় পরিষদ্ বা সভা বা শাসনপরিষদে কোন এঞ্জিনীয়ার নাই। গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে, কমিউনিকেশন ও পূর্ত্ত-বিভাগ, আই-সি-এস বা আইনজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত। ইহার কারণ, হয় এঞ্জিনীয়ারিং অপেক্ষা পলিটিক্স বেশী দরকারী, নতুবা রাজনীতিজ্ঞদের এঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে সহজ জ্ঞানও আছে। এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে জননায়ক, বক্তা বা প্রচারক না থাকার দরুনই বোধ হয় তাহাদের এই অবস্থা। যাহা হউক, সংক্ষেপে দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াই এ-বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত উপাধির মধ্যে এম্-ই (Master of Engineering) ও ডি-এসসি (Engineering) উপাধি আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ এম্-ই বা ডি-এসসি উপাধি পাইবার বা কোন গবেষণা করিবার সুযোগ পান নাই। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এঞ্জিনীয়ারিঙে অনারারি ডি-এসসি দেওয়া হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কোন সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বি-ই উপাধি লাভের পর ট্রেনিং পাওয়া (বিশেষতঃ মেকানিক্যাল গ্রাজুয়েটদের) যে কি অসুবিধা তাহা স্থানাভাবে এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাব প্রদেশে এ-বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের রিপোর্ট ফলপ্রসূ ও কার্য্যকরী হইলে অন্যান্য প্রদেশও ইহা বিবেচনা করিতে পারেন। ভারতীয়দের যোগ্যতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যোগ্যতা লাভ করিবার সম্যক্ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে কি না।

(২) ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুরূপ Institution of Civil Engineers, এঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। আমাদের নেতারা হয়ত অবগত নহেন যে ভারতীয় উপাধিধারী এঞ্জিনীয়ারের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত নহে। আমরা associate membership-এর প্রার্থী হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে অথচ বিলাতের কোন সাধারণ এঞ্জিনীয়ারিং-প্রতিষ্ঠান হইতে পাস করিলেও বিনা পরীক্ষাতেই এসোশিয়েট মেম্বর হওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের Institution of Engineers (India)-এর সদস্য হইতে হইলে আমাদের কোন পরীক্ষা দিতে হয় না। তাহারা ভারতীয় এঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী মান্য করে। মর্য্যাদা হিসাবে Institution of Engineers (India) ও বিলাতের Institution of Civil Engineers একই। কারণ উভয়েই রয়াল চার্টার পাইয়াছে। তবে ভারতীয় উপাধি বিলাতে স্বীকৃত না হইবার কারণ কি? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. ই. পাঠ্যতালিকার সঙ্গে বিলাতের লণ্ডন বা গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকার তুলনা করিলে দেখা যায় আমাদের অধিকসংখ্যক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। কোন স্বেচ্ছা-গৃহীত বিষয় নাই। বিলাতে অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে কয়েকটা (সাধারণতঃ ৩টি) বাছিয়া লইতে হয়। পাঠ্যপুস্তকও সাধারণতঃ একই বা একই রকম মানের। থিয়োরেটিক্যাল শিক্ষা হিসাবে এদেশে

বেশী অপেক্ষা কম পড়ান হয় না। পাশ নম্বর শতকরা পঞ্চাশ। তা ছাড়া agrotat বা external degree এই সব ফাঁকি নাই। তথাপি যদি রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় উপাধি উপেক্ষা করা হয় তবে রাজনীতিবিদ্‌রা ইহার প্রতিকার করুন, আর যদি মান নীচু বলিয়া পরিগণিত হয় তবে তাহা উচ্চ করিবার ব্যবস্থা হউক। ছাত্রাবস্থায় শুনিয়াছিলাম যে আমাদের তৎকালীন অধ্যক্ষ (মিঃ ম্যাকডনাল্ড) যাহাতে বি. ই. উপাধি Institution of Civil Engineers কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং যাহাতে এখানে বি. ই. পরীক্ষা পাস করিয়া সরাসরি বিলাত গিয়া পোষ্টগ্রাজুয়েট ট্রেনিং ও গবেষণার জন্য যোগ্য বিবেচিত হওয়া যায়, তজ্জন্য তিনি নাকি চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলাফল জানি না। যাহা হউক, ইহা অধ্যক্ষ হিসাবে ছাত্রদের জন্য প্রচেষ্টা; ভারতীয়দের কলঙ্ক দূর করিবার জন্য ভারতবাসীর প্রয়াস নয়। ব্রিটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিল যাহাতে এম-বি উপাধি মান্য করে তজ্জন্য অনেক আন্দোলন ও পরিশেষে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল হইয়াছে। ভারতীয় এঞ্জিনীয়ারিং উপাধির জন্য কি উপায় অবলম্বন করা সঙ্গত?

যুদ্ধ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

পুরানো সে ফটোখানা রয়েছে টেবিলে।
—মনে পড়ে গেল, শুধু প্রভুরে সেবিলে
সংসারে শান্তি না র'বে সব দিকে
যা-কিছু দু-এক পাঁতি দিতে হবে লিখে।
রাত বাজে সাড়ে দশ; ঘুমাবার মুখে
লিখে দেব,—পত্রিকা পড়া'যাক চুকে।
দিনে নেই অবসর, রাতে যদি মিলে
খবরের কাগজেই নেয় সেটা গিলে।
মোটা হেড লাইনের ধাক্কার ঝড়ে
খবরের প্যারাগ্রাফে মন ঝুঁকে পড়ে।
তুমি আমি নেই সেথা, অফিস কি বাসা,
পুরুষ নারীকে নিয়ে নেই কাঁদা হাসা।
জাতে জাতে আড়াআড়ি, জমায় খবর
যখন জাঁকিয়ে ওঠে শ্মশান কবর।
কাগজটা পড়ে থাক, এই বেলা ওঠো,
সঘনে ইসারা করে ঐ দেখ ফোটো।
আরাগুয়া বন্দরে "গ্র্যাফ্ স্পে" আটক!
নব অভিমন্যু—সে জমাক নাটক!
আজ আর মন দেওয়া চলে না কাগজে!
সিগ ফ্রিড্ ম্যাজিনোতে মজুক যে মজে।
ও সকল বড়ো কথা বড়ো বড়ো ঘরে
ভারহীন সারবান পাঠকের তরে!
আমাদের ছোটোদের কেজো সংসারে
ছোটো ছোটো ঘটনাতে ঠাসা একেবারে!
নিজেদেরি কত আছে ব্যাপার জরুরি;
আমাদের অবসর 'সময়ের চুরি'!
ফিনদেরে সাজা দিতে তেড়ে আসে রুষ্
তারো বড়ো তাড়া ঘরে,—সবে হোলো হুঁষ

চিঠি তুমি লেখ নি সে কত দিন আজ!
তোমার এ নীরবতা 'গুলি' নয় 'বাজ'!
উঠে মনে হঠাৎ এ ছোটো ঘটনাটি
পত্রিকা-পড়া আজ করে দিল মাটি!
দূরে থেকে আড়াআড়ি যা করেছ শুরু,
হিটলারি পাঁয়তাড়া চেয়েও এ গুরু!
লিখি বসে এই রাতে সে খবরই আমি,
ধরো এ ঘরোয়া রণে এ টেলিগ্রামই!
এ দিকের ঘটনা যা বুঝতেই পারো!—
তুমি নেই, ঘুম নেই, রাত বাজে বারো!
সঙিনের খোঁচা ও কি? ও কি শুনি?—বোমা?
আঁৎকে বোলো না তুমি—"ওমা, কি হোলো মা!"
তার মানে, বাঘা শীত, চারদিকে মশা;
বলি তবে সে খবর তোমারো কি দশা!—
হয়তো বা ব'লে দেবে সবি তা বানানো,
যুদ্ধের খবরের মহিমা সে,—জানো?

শোনো তবে—খাওয়া-দাওয়া সারা হ'ল কবে,
পান খেয়ে ঠোঁটখানি টুকটুকই হবে!
খোকনেরে ঘুম থেকে তুলে টেনেটুনে
দুধটুকু জ্বাল দিয়ে তোলা সে উনুনে
খাইয়ে মুছায়ে মুখ শোয়ালে আবার।
আর কোনো কাজ নেই বাইরে যাবার।
তামাকটি সেজে দিলে শ্বশুরে তোমার
পা মুছে, বিছানাতলে মশারির ধার
গুঁজে নিলে; শুতে যাবে লেপের তলায়,
দেখে নিলে হারছড়া আছে তো গলায়!
মৃদু ডেকে বলছেন মাতা ঠাকুরাণী—
বৌমা, দুপুরে কাল লিখো চিঠিখানি;

আলোচনা

নয়া দিল্লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

শ্রীমণিলাল রায়

মাঘের 'প্রবাসী'তে নয়া দিল্লীর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে উক্তি করিয়াছেন আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্ত তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। আমি তাঁহার সহকারীরূপে উক্ত মন্দিরের কাজ করি নাই। মন্দিরের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপরই ছিল। তন্ত্র সিং নামে এক জন মিস্ত্রী মন্দিরে অল্পকাল মাত্র কাজ করিয়াছিল। মন্দিরের কাগজপত্রে কিছু কাল তাহার নাম আছে বটে, কিন্তু শ্রীশবাবুর নামগন্ধ মন্দিরের কোন কাগজপত্রে নাই। এতৎসঙ্গে মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষের অভিমতের নকল ও বাংলা অনুবাদ পাঠাইতেছি।

[এ-বিষয়ে আর কোন বাদপ্রতিবাদ ছাপা হইবে না। —প্রবাসীর সম্পাদক]

—

ভারতবর্ষে এঞ্জিনীয়ারিঙের উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণা

শ্রীঅমূল্যধন দেব, বি. ই.

গত মাঘ সংখ্যা প্রবাসীর ৫৪৬ পৃষ্ঠায় চিকিৎসা-বিষয়ক উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণা সম্বন্ধে উদ্ধৃত বক্তৃতা ও সম্পাদকীয় মন্তব্য ভারতীয় এঞ্জিনীয়ারদের পক্ষেও সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য ও প্রণিধানযোগ্য। আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক মতামত যেভাবে প্রচার হয়, অন্ত কোন বিষয়ই সেই রকম প্রচারিত হয় না। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি বা ধর্ম্মমূলক আলোচনা ও উন্নতিসাধন যাঁহাদের ব্রত তাঁহাদের নিকট হইতে চিকিৎসা বা এঞ্জিনীয়ারিং-বিষয়ক কোন প্রচেষ্টা কামনা করা সমীচীন নহে। আইনজ্ঞ বা রাজনীতিবিদের ও সাধারণ আলোচনা বা বক্তৃতার ইহা সীমাবহির্ভূত। ভারতবর্ষের কোন রাষ্ট্রীয় পরিষদ্ বা সভা বা শাসনপরিষদে কোন এঞ্জিনীয়ার নাই। গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে, কমিউনিকেশুন ও পূর্ত্ত-বিভাগ, আই-সি-এস বা আইনজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত। ইহার কারণ, হয় এঞ্জিনীয়ারিং অপেক্ষা পলিটিক্স বেশী দরকারী, নতুবা রাজনীতিজ্ঞদের এঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে সহজ জ্ঞানও আছে। এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে জননায়ক, বক্তা বা প্রচারক না থাকার দরুনই বোধ হয় তাহাদের এই অবস্থা। যাহা হউক, সংক্ষেপে দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াই এ-বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত উপাধির মধ্যে এম্-ই (Master of Engineering) ও ডি-এসসি (Engineering) উপাধি আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ এম্-ই বা ডি-এস্সি উপাধি পাইবার বা কোন গবেষণা করিবার সুযোগ পান নাই। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এঞ্জিনীয়ারিঙে অনারারি ডি-এসসি দেওয়া হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কোন সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বি-ই উপাধি লাভের পর ট্রেনিং পাওয়া (বিশেষতঃ মেকানিক্যাল গ্রাজুয়েটদের) যে কি অসুবিধা তাহা স্থানাভাবে এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাব প্রদেশে এ-বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের রিপোর্ট ফলপ্রসূ ও কার্য্যকরী হইলে অন্যান্য প্রদেশও ইহা বিবেচনা করিতে পারেন। ভারতীয়দের যোগ্যতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যোগ্যতা লাভ করিবার সম্যক্ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে কি না।

(২) ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুরূপ Institution of Civil Engineers, এঞ্জিনীয়ারীং সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। আমাদের নেতারা হয়ত অবগত নহেন যে ভারতীয় উপাধিধারী এঞ্জিনীয়ারের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত নহে। আমরা associate membership-এর প্রার্থী হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে অথচ বিলাতের কোন সাধারণ এঞ্জিনীয়ারিং-প্রতিষ্ঠান হইতে পাস করিলেও বিনা পরীক্ষাতেই এসোশিয়েট মেম্বর হওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের Institution of Engineers (India)-এর সদস্য হইতে হইলে আমাদের কোন পরীক্ষা দিতে হয় না। তাহারা ভারতীয় এঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী মান্য করে। মর্য্যাদা হিসাবে Institution of Engineers (India) ও বিলাতের Institution of Civil Engineers একই। কারণ উভয়েই রয়াল চার্টার পাইয়াছে। তবে ভারতীয় উপাধি বিলাতে স্বীকৃত না হইবার কারণ কি? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. ই. পাঠ্যতালিকার সঙ্গে বিলাতের লণ্ডন বা গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকার তুলনা করিলে দেখা যায় আমাদের অধিকসংখ্যক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। কোন স্বেচ্ছা-গৃহীত বিষয় নাই। বিলাতে অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে কয়েকটা (সাধারণতঃ ৩টি) বাছিয়া লইতে হয়। পাঠ্যপুস্তকও সাধারণতঃ একই বা একই রকম মানের। থিয়োরেটিক্যাল শিক্ষা হিসাবে এদেশে

বেশী অপেক্ষা কম পড়ান হয় না। পাশ নম্বর শতকরা পঞ্চাশ। তা ছাড়া agrotat বা external degree এই সব ফাঁকি নাই। তথাপি যদি রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় উপাধি উপেক্ষা করা হয় তবে রাজনীতিবিদ্‌রা ইহার প্রতিকার করুন, আর যদি মান নীচু বলিয়া পরিগণিত হয় তবে তাহা উচ্চ করিবার ব্যবস্থা হউক। ছাত্রাবস্থায় শুনিয়াছিলাম যে আমাদের তৎকালীন অধ্যক্ষ (মিঃ ম্যাকডনাল্ড) যাহাতে বি. ই. উপাধি Institution of Civil Engineers কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় এবং যাহাতে এখানে বি. ই. পরীক্ষা পাস করিয়া সরাসরি বিলাত গিয়া পোষ্টগ্রাজুয়েট ট্রেনিং ও গবেষণার জন্য যোগ্য বিবেচিত হওয়া যায়, তজ্জন্য তিনি নাকি চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলাফল জানি না। যাহা হউক, ইহা অধ্যক্ষ হিসাবে ছাত্রদের জন্য প্রচেষ্টা; ভারতীয়দের কলঙ্ক দূর করিবার জন্য ভারতবাসীর প্রয়াস নয়। ব্রিটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিল যাহাতে এম-বি উপাধি মান্য করে তজ্জন্য অনেক আন্দোলন ও পরিশেষে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল হইয়াছে। ভারতীয় এঞ্জিনীয়ারিং উপাধির জন্য কি উপায় অবলম্বন করা সঙ্গত?

যুদ্ধ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

পুরানো সে ফটোখানা রয়েছে টেবিলে।
—মনে পড়ে গেল, শুধু প্রভুরে সেবিলে
সংসারে শান্তি না র'বে সব দিকে
যা-কিছু দু-এক পাঁতি দিতে হবে লিখে।
রাত বাজে সাড়ে দশ; ঘুমাবার মুখে
লিখে দেব,—পত্রিকা পড়া'যাক চুকে।
দিনে নেই অবসর, রাতে যদি মিলে
খবরের কাগজেই নেয় সেটা গিলে।
মোটা হেড লাইনের ধাক্কার ঝড়ে
খবরের প্যারাগ্রাফে মন ঝুঁকে পড়ে।
তুমি আমি নেই সেথা, অফিস কি বাসা,
পুরুষ নারীকে নিয়ে নেই কাঁদা হাসা।
জাতে জাতে আড়াআড়ি, জমায় খবর
যখন জাঁকিয়ে ওঠে শ্মশান কবর।
কাগজটা পড়ে থাক, এই বেলা ওঠো,
সঘনে ইসারা করে ঐ দেখ ফোটো।
আরাগুয়া বন্দরে "গ্র্যাফ্ স্পে" আটক!
নব অভিমন্যু—সে জমাক নাটক!
আজ আর মন দেওয়া চলে না কাগজে!
সিগ ফ্রিড্ ম্যাজিনোতে মজুক যে মজে।
ও সকল বড়ো কথা বড়ো বড়ো ঘরে
ভারহীন সারবান পাঠকের তরে!
আমাদের ছোটোদের কেজো সংসারে
ছোটো ছোটো ঘটনাতে ঠাসা একেবারে!
নিজেদেরি কত আছে ব্যাপার জরুরি;
আমাদের অবসর 'সময়ের চুরি'!
ফিনদেরে সাজা দিতে তেড়ে আসে রুষ্
তারো বড়ো তাড়া ঘরে,—সবে হোলো হুঁষ।

চিঠি তুমি লেখ নি সে কত দিন আজ!
তোমার এ নীরবতা 'গুলি' নয় 'বাজ'!
উঠে মনে হঠাৎ এ ছোটো ঘটনাটি
পত্রিকা-পড়া আজ করে দিল মাটি!
দূরে থেকে আড়াআড়ি যা করেছ শুরু,
হিটলারি পাঁয়তাড়া চেয়েও এ গুরু!
লিখি বসে এই রাতে সে খবরই আমি,
ধরো এ ঘরোয়া রণে এ টেলিগ্রামই!
এ দিকের ঘটনা যা বুঝতেই পারো!—
তুমি নেই, ঘুম নেই, রাত বাজে বারো!
সঙিনের খোঁচা ও কি? ও কি শুনি?—বোমা?
আঁৎকে বোলো না তুমি—"ওমা, কি হোলো মা!"
তার মানে, বাঘা শীত, চারদিকে মশা;
বলি তবে সে খবর তোমারো কি দশা!—
হয়তো বা ব'লে দেবে সবি তা বানানো,
যুদ্ধের খবরের মহিমা সে,—জানো?

শোনো তবে—খাওয়া-দাওয়া সারা হ'ল কবে,
পান খেয়ে ঠোঁটখানি টুকটুকই হবে!
খোকনেরে ঘুম থেকে তুলে টেনেটুনে
দুধটুকু জ্বাল দিয়ে তোলা সে উনুনে
খাইয়ে মুছায়ে মুখ শোয়ালে আবার।
আর কোনো কাজ নেই বাইরে যাবার।
তামাকটি সেজে দিলে শ্বশুরে তোমার
পা মুছে, বিছানাতলে মশারির ধার
গুঁজে নিলে; শুতে যাবে লেপের তলায়,
দেখে নিলে হারছড়া আছে তো গলায়!
মৃদু ডেকে বলছেন মাতা ঠাকুরাণী—
বৌমা, দুপুরে কাল লিখো চিঠিখানি।

জানিয়ো খুকিরে ওরা গেছে দেখেশুনে,
কথা একরূপ ঠিক, বিয়ে ফালগুনে।
খোকার আসাই চাই যে করেই হোক্।
ছুটি কি দেবে না এতে অফিসের লোক?
মেজোটা যে কলেজের স'বে না কামাই!
এ কাজ আমরা তবে কেমনে নামাই!
ছোটোটা যা আছে ঘরে তারো ইস্কুল!
কি দিয়ে কি করি ভেবে পাই না যে কূল!
পাঁচ নয় দশ নয় একটা তো মেয়ে!
জানিয়ো জরুরি এটা সব কিছু চেয়ে!
একটু শুনিয়ে নিয়ো লিখেটিকে শেষে।—
ঐ দেখো, ছেলেটা যে ফের ওঠে কেসে!
মাঝে মাঝে রাতে জেগে এ দারুণ শীতে
এত ক'রে বলি ওর গায়ে লেপ দিতে,
ওরে দেখা দূরে থাক্ নিজেরে কে দেখে!
ফল তার না ফলে কি যায় একে একে!
জ্বর গিয়ে আমাশয়, পরে এই কাশি!
একটা না একটা সে লেগেই, কি রাশি!
রাখো মা, গরম ক'রে এনে দি মালিশ!
রোদে কাল দিয়ো তুমি তোষক বালিশ।
খাওয়া-দাওয়া বুঝে-সুঝে কিছু কোরো বাছ;
গা মুছেই স্নান সেরো, বাদ পুঁটিমাছ।
খোকনেরে একটুকু রেখো চোখে-চোখে,
বাসি পিঠে, কাঁচা কুলে কি ঝোঁকাই ঝোঁকে!
ছুটাছুটি হুটোপুটি এখানে সেখানে
পিছে পিছে ঝিঙ্গি, সে কি হাঁকডাক মানে?
কি দস্যু ছেলে, বলে, আমি নাকি "বুঞ্রী"!
মিশ্রী মুড়িকে বলে "মিচ্ছি" ও "মুঞ্রী"!
সে-লোভে দিগম্বর ফেরে দিনরাত!
হাতটা বাঁ-হাতে ধ'রে পাতে ডান হাত!
কাকুতি-মিনতি আগে, ক্রমে চড়ে সুর
লিখে দিয়ো হয়েছে কি গুণী পুত্তুর!
যা বলো, আমার ছেলে ছিল না এমন!
ঐ দেখো খোকনের কথাতেই মন!
শোও তুমি মালিশটা আসি আমি নিয়ে;
ভুলো না মা, লিখে দিয়ো ফালগুনে বিয়ে।

যেমন পাগল ছেলে তেমনি মা তার,
কি যে বলো চিঠিফিটি, কাজ নেই আর!
সে কি হয়, কাজ করে, কাজই তার আগে,
তাই সে লেখে না চিঠি, তা ব'লে কি রাগে?
এবারে না হয় কিছু হয়েইছে দেরি!
যুদ্ধে অমন নাকি হয় অনেকেরই।
ডাকে দেরি হয়, বাড়ে জিনিষের দাম!
কত কি সে থাক্, তুমি লিখে দিয়ো খাম!"
এই ব'লে মা আমার কাজে গিয়ে চুপ!
কাকে কি বা বলা! সাড়া নাই কোনোরূপ!
আমি বসে বেশ দেখি, চোখে আসে ঘুম,
বাড়ির চারিটি ধার নিরব নিঝুম।
ইংরেজ জার্মানী! কি লড়াই মাগো!
—এই ভেবে তুমি ও বা এই রাতে জাগো!

এ চিঠির উত্তর নাই বা পেলাম
যুদ্ধে অভাবে "বাড়ে জিনিসের দাম!"
ভগবান্ সুবুদ্ধি দিয়ো যেন মাকে,
চিঠি না দেওয়ার দোষ যুদ্ধেই ঢাকে!
না ঢাকে তো তা-ও ভাল,—চলুক লড়াই!
থেকো তুমি রাগ ক'রে, আমি কি ডরাই?
যুদ্ধ সে যুদ্ধই হোক না ঘরোয়া,
বলে রাখি, আমি কারো করি না পরোয়া।
বাঙালীর বল বুলি বজ্রেরো বাড়া!
ছন্দে বারুদ ভ'রে দেব হেন তাড়া!
কামান বিমান বোমা চুম্বক মাইন
ব্রিটিশী সাঁজোয়া গাড়ি, সাঁঝবাতি আইন,
মার্কিনি মাঝে-পড়া বাগাড়ম্বরও,
ইতালির নিরবতা,—যা নিয়েই লড়ো
হেরে গিয়ে ছেড়ে দিতে হবে মনোভূমি
যে-পোল্যাণ্ড কেড়ে নিয়ে আঁকড়েছ তুমি!
চিঠি প'ড়ে "আহা অহো!" অথবা "কি ছাই!"
এ-কিছু না-ব'লে উঠে সাধ্য যে নাই!
সুখ্যাতি করো আর দাও শত গাল
মন তো সে আমারেই দিবে কিছুকাল?
ওই হোলো; গোল এক তাতে যদি মেটে!—
জগতে অশান্তির রাত যায় কেটে!
আমি দেখি দেরি নেই, আসে অকলুষা
শান্তির আভাময়ী সুদিনের উষা॥

কাবুলের চিঠি

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

বসন্তকালের নাম এখানে বাহার, ফুলের ধ্যানে রুক্ষ পাহাড় ছেয়ে যায়। এসেছি তামুজ, অর্থাৎ গ্রীষ্মের মুখে; গৃহস্বামিনীর পরিচর্য্যায় আমাদের কাবুলের কোণটিতে এখনো বসোরার গোলাপ এবং পশ্চিমী ফুল ধরে আছে। চলেছি হিমন্ত বামিয়ানের পথে, উঁচু নীচু পাহাড়ের নানা ঋতু দ্রুত অতিক্রম করতে হয় মোটরযাত্রীকে। চরিখর। কাবুলের পর প্রথম এই শহর মজার-ই-সরিফের বড়ো রাস্তায়। কোহিস্তানের গবর্ণর এখানে থাকেন, পুরোনো কপিশ-রাজ্যের ভগ্নচিহ্ন কাছেই বেগ্রাম পল্লীতে। সেখানে গিয়েছিলাম ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক মঁসিয় এবং মাদাম আকাঁ্যা-র নিমন্ত্রণে। তাঁরা প্রতিবৎসর এসে খনন-কাজে প্রবৃত্ত হন, বহু প্রাচীন মূর্ত্তি, মুদ্রা, কুশান-স্মৃতিফলক আবিষ্কার করেছেন। ঘোরবন্দ্ এবং পান্‌শির্ নদীর সঙ্গমে হিন্দুকুশপাদবর্ত্তী প্রাচীন ভারত-সভ্যতার ছবি মনে জাগল; যারা এই ছবিকে উদ্ধার করবার কাজে আত্মনিয়োগ করছেন তাঁদের তপঃকর্ম্মকে শ্রদ্ধা জানাই। তুঁতের অরণ্য আঙুর-ক্ষেত পাশে রেখে আবার ঢুকলাম চরিখরের বাজারে; মার্কিন এক সহযাত্রী কোথা হ'তে উৎকৃষ্ট সবুজ চা নিয়ে এলেন, ছোট ছোট নীল পাত্রে আমরা পান করলাম। সামোভার, জাপানী খেলনা, রুশীয় চিনির পিরামিডে দোকান ভর্ত্তি; চারদিকে মুসাফিরের স্রোত বইছে।

পাহাড়ের পালা। শিবর্-পাস তুষার ছড়ানো; দশ হাজার ফুট উঠে রেডিয়েটর জমবার উপক্রম। খানিক বাদেই কঙ্কালকঠিন তৃণতরুহীন দগ্ধ পাথরের সারি।



জলপ্রপাত, কাবুল

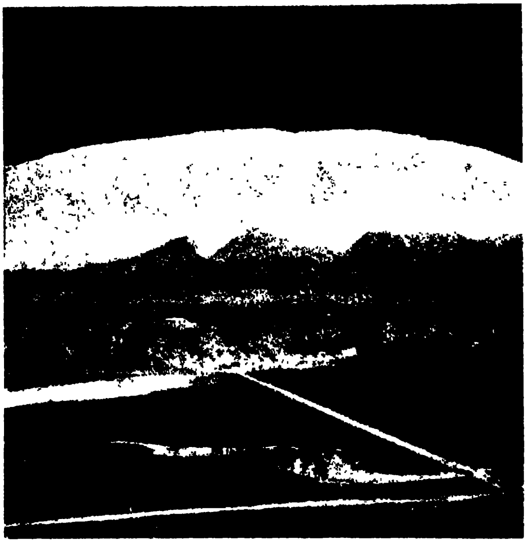


বামিয়ানে বুদ্ধমূর্ত্তি, অদূরে পল্লীর প্রাণলীলা

ভয়ঙ্কর দেশ। চতুর্দ্দিকেই দৈত্যমূর্ত্তি পাহাড়, ভ্রূকুঞ্চিত পাহাড়, উর্দ্ধনাসা শিঙ-তোলা পাহাড়। বুক জ'মে পিণ্ড হ'তে চায়; প্রাণই অবান্তর, নিশ্চল অস্তিত্বের ছায়া ফেলে জমাট লাল পৃথিবী ত্রিশূল তুলেছে। হাতের কাছেই—অন্তত চোখের কাছে—হিন্দুকুশের শুভ্র শৃঙ্গমালা। হিন্দুকুশেরই অংশ কোহ্-ই-বাবা; ভারতীয় ককেসস্ নামে এই সমগ্র গিরিবংশের অন্য পরিচয়। শা ফোলাদি (১৬,৮৭০ ফুট), কোহ্-এর সাদা দেয়াল উঠেছে বামিয়ান্‌পথের অনতিদূরে; হিন্দুকুশের উর্দ্ধতম কীর্ত্তি প্রতিবেশী চিত্রালে, তিরিচ্-মীর শীর্ষ ২৫,৪২৬ ফুট উঁচু। নদী-মাতা ("অমু-দরিয়া") যাবার পথ শৈলকুটিল; উটের কারাভানের উপযোগী, যন্ত্র-শকটের প্রতি আবর্ত্তনেই সঙ্কট। কলবাহিনী শত্রুসভ্যতাকে ঠেকাবার প্রধান অস্ত্র আফগান পথ বা পথের অভাব, এবং দুর্দ্ধর্ষ মনুষ্যত্ব। অমু-দরিয়ার ওপারে দৈত্যরাজ্য, তার আছে কল; আফগানের আছে প্রকৃতি। প্রাকৃতিক এই দুর্গ ভেদ করা সহজ মানুষের কর্ম্ম নয়—সামান্য পথিকবৃত্তি ক'রেই তা বুঝেছি—হয়তো শক্ত মানুষের পক্ষেও দস্যুবৃত্তি সাংঘাতিক হ'তে পারে। হিন্দুকুশের পাস্ অতিক্রম ক'রে আলেকজান্দার কাবুল নদী পৌঁছলেন এবং সংহারের অভিযানে পঞ্জাব পর্য্যন্ত এগোলেন। শুনতে পাই ১৩০,০০০ সৈন্য ছিল তাঁর সঙ্গে। ক'জন বাড়ি ফিরেছিল তার হিসেবে সংখ্যার স্থানে শূন্য। আফগান পাহাড় এবং মাক্রান্ তটের মরু-ধূলোয় আক্রমণকারীর উদ্ধত বল্লম এবং রক্তনিশান উষ্ণীষের খোঁজ মিল্‌বে না। জয়ী হয়েও তারা অবলুপ্ত, প্রকৃতির কাছে হেরেছে। অথচ বাহিরের মৈত্রীধারা আফগানিস্থানের অন্তরে প্রবেশ ক'রে চিরন্তন র'য়ে গেল। চীন—মেডিটরেনিয়নে একদা যাতায়াত করেছে প্রাচীন রেশমি-রাস্তার বণিক; পথের একটি শাখা গিয়েছিল "মধ্যপথ" (বামিয়ান) উপত্যকার বুক দিয়ে। সেইখানে এলেন ভারতীয় বৌদ্ধশিল্পী জ্যোতির দীক্ষা নিয়ে। পাহাড় নীচু করল মাথা, মানুষের হৃদয় গেল খুলে, আফগান প্রকৃতির বাধা রইল না। ১৭৩ ফুট উঁচু পাথরে খোদাই হ'ল বুদ্ধমূর্ত্তি; মানুষের অভাবনীয় শক্তির পরিচয়।

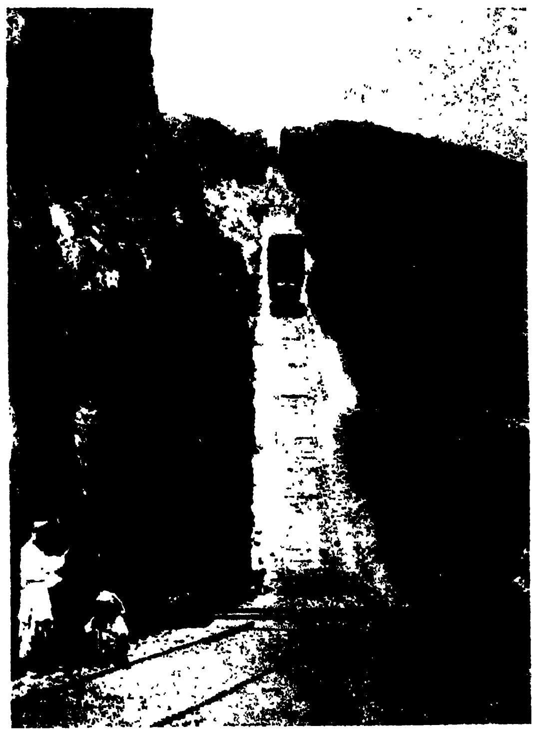


বামিয়ানে পর্ব্বতগাত্রে বৌদ্ধ মঠের অবশেষ-চিহ্ন



বামিয়ান উপত্যকা

শিয়াগড়, চহর্‌-দে, শির্খ্‌-আলি, শিবর্‌ পার হয়ে পথ ঢুকেছে সুম্বল্‌-এর শৈলগহ্বরবেষ্টিত সরু ফালিতে। বল্‌খ্‌ (ব্যাক্‌ট্রিয়া) এবং রুশ-আফগান সীমান্ত খেমা-খেসার-এর পথ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁ-দিকে চল্‌লাম। গেরুয়া সন্ধ্যা নাম্‌ল। জোহাক্‌ দুর্গ পাশে রেখে মোটর নাম্‌ল অকসরই নদীর শাখায় লালিত বামিয়ান্‌ উপত্যকায়। ঘন সবুজ ঢালু ক্ষেতের ধারে ধারে গুহা এবং মঠের চিহ্নস্তূপ। মাটির রঙে, সবুজে পাহাড়ের নীল এবং তুষার শুভ্রতায় অপরূপ দৃশ্য। বামিয়ান পল্লী। দীর্ঘদিনের ক্লান্তি কন্‌কনে শীতের হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ফরাসী প্রেরণায় তৈরি সুন্দর অতিথিশালা, ছোটো একটি পাহাড়ের উপরে; সেইখানে ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফিরলাম গুহার ধারে। সায়াহ্নিক চন্দ্র উঠ্‌ল। বুদ্ধের বিরাট্‌ পদতলে আলো এসে পড়েছিল, মাথার অনেকটা ভেঙে গেছে, সব মিলে এখনো জাগ্রত সাধনার প্রতীক নির্নিমেষ চেয়ে আছে। বহুদূর পর্য্যন্ত রূপোলি কুহেলিকায় আচ্ছন্ন প্রাচীন এবং নূতন পৃথিবীর দিগন্ত; গুহার সামনে দাঁড়িয়ে সত্তার প্রকাণ্ড একটা ঢেউ বুকে লাগ্‌ল। যুগযুগান্তের হানাহানি চেষ্টা ক্লান্তি সংগ্রাম সন্ধান আনন্দের সম্মিলিত প্রাণস্রোত ব'য়ে চলেছে, কিছু আভা এসে পৌঁছচ্ছে অস্পষ্ট চেতনার জলে; সকলের উপর পূর্ণচন্দ্রের করুণাময় দৃষ্টি। দলে দলে যাত্রী দেখে গেছে এই পরম শান্তির মূর্ত্তি পাথরের গায়ে; তারা নেই কিন্তু শ্রদ্ধার হাওয়া এখনো চতুর্দ্দিকে নিবিড় হয়ে আছে। পুঞ্জীভূত স্মৃতি ভেদ ক'রে দূরে মুদির দোকানে আলো জ্বলছে; ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠেছে গো-চারণের মাঠে। যেখানে হিউয়েন্‌-সাঙ্‌ দেখেছিলেন সমৃদ্ধিশালী নগরী, বৌদ্ধ মঠ উপনিবেশ সংঘারামের উপাসকবৃন্দ, লোকোত্তরবাদিন্‌ এবং মহা-সংঘিকের মোক্ষসাধনার তীর্থ, সেখানে আজ নীরব পল্লীর প্রতীক্ষা।



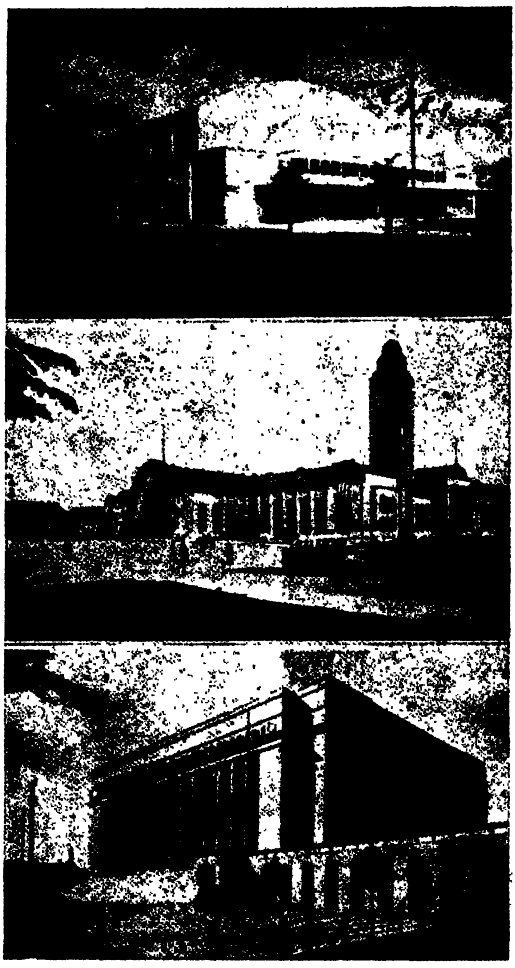
কোয়েটার পথে রেলপথ

পাহাড়ের উপর বরফ জলজল করছে। শীতের রাত্রের শূন্যতা গ্রামের ঘরে ঘরে পরিব্যাপ্ত; নিভৃত পথ দিয়ে মেহ্‌মানখানায় ফিরলাম।

সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির স্বরূপ ও ফিনল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রুশ-জার্ম্মান চুক্তি বর্ত্তমান যুগের কূটনৈতিক ইতিহাসে একটি বড় রকমের বিস্ময়। গত বৎসর ২৩শে আগষ্ট



হেলসিনকি সঙ্গীতসদন
রেলওয়ে ষ্টেশন
পার্লেমেণ্ট সৌধ

তারিখে মস্কৌ শহরে রুশিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহার পূর্ব্বে প্রায় চারি মাস যাবৎ এক দিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্য দিকে সোভিয়েট রুশিয়া এই দুই পক্ষের মধ্যে পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তির উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। এ চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—সকলের একযোগে জার্ম্মানীর রাজ্যবিস্তার-স্পৃহাকে ঠেকানো। যখন জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় তখনও কিন্তু ব্রিটিশ ও ফরাসী সমর-বিভাগের প্রতিনিধি সোভিয়েট সমর-বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা চালাইবার জন্য মস্কৌ শহরে উপস্থিত! এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে রুশ-জার্ম্মান চুক্তি অকস্মাৎ সংঘটিত হওয়ায় অধিকতর বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে সর্ব্বত্র। অন্যবিধ পরিমণ্ডলে এরূপ চুক্তি সম্পন্ন হইলে এতটা বিস্ময়ের হয়ত কারণ থাকিত না।

কি অবস্থার মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহা কৌতূহলপ্রদ হইলেও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করিব না। রুশ-জার্ম্মান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতেই জগতে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সকলে অবগত আছেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগষ্ট। পরবর্ত্তী ৩১শে আগষ্ট রুশ প্রধান-মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মোলোটোভ সুপ্রীম কৌন্সিলে এই চুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া বলেন,—

"অবস্থা যেরূপ তাহাতে সোভিয়েট-জার্ম্মান চুক্তির আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা কঠিন। ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগষ্ট—এই তারিখটি ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে। ইউরোপের ইতিহাসে (এবং শুধু ইউরোপের নয়) ইহা একটি নূতন যুগের সূচনা করিবে।"

ইহা যে একটি নূতন যুগেরই সূচনা করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই চুক্তি সম্পাদনের পরেই বিগত ১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মান-বাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। পক্ষকালের মধ্যেই জার্ম্মানীর ধ্বংস-অভিযান পোল্যাণ্ডের কেন্দ্রস্থল স্পর্শ করে। সোভিয়েট রুশিয়া তখন আর

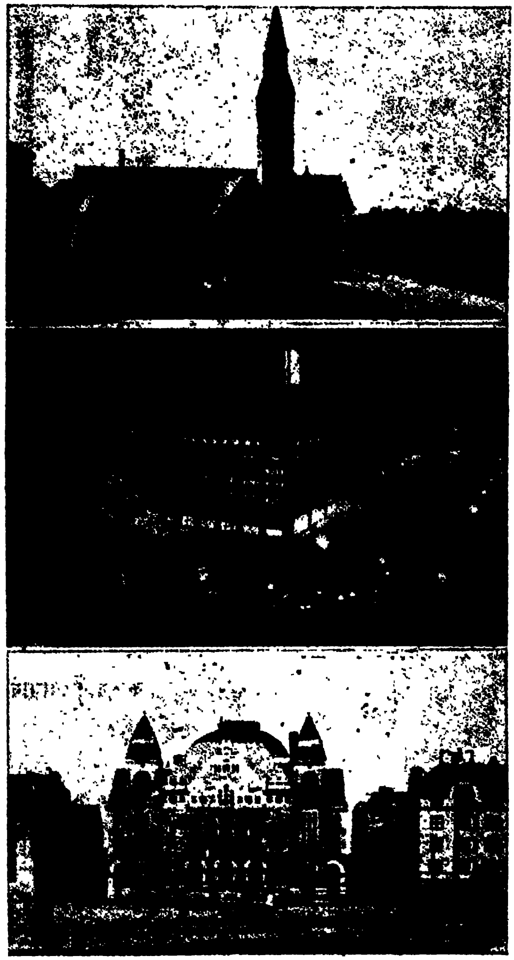
স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে পারে নাই। পূর্ব্ব-পোল্যাণ্ড সে অধিকার করিয়া বসে। পোল্যাণ্ড এইরূপে ইউরোপের মানচিত্র হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। সোভিয়েট রুশিয়ার নূতন মূর্ত্তিও তখন বিশ্ববাসীর নিকট ধরা পড়ে।

চীনের প্রধান সহায় সোভিয়েট রুশিয়া। মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে রুশ-জাপান সংঘর্ষ বহু বৎসরের পুরাতন। উভয়ের মধ্যে এই সময় হইতে পুরাতন বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা সুরু হইয়াছে। সম্প্রতি জাপান ও রুশিয়ার মধ্যে একটি বাণিজ্য-চুক্তিও হইয়া গিয়াছে। চীন-জাপান সংগ্রামে চীনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় রুশ সাহায্যের আশা অতঃপর ক্ষীণতর হইয়া পড়িবে।

ভের্সাই সন্ধিতে যে কার্জ্জন-লাইন পোল্যাণ্ডের পূর্ব্ব সীমা ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পরবর্ত্তী রিগা-চুক্তিতে তাহা আরও সরাইয়া দেওয়া হয়। ফলে রুশ-অধ্যুষিত খানিকটা অঞ্চল পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব-পোল্যাণ্ডে রুশিয়া অধিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্ব্ব ভ্রমের আংশিক সংশোধন হইয়াছে, অনেকে এই বলিয়া রুশিয়ার দোষ ক্ষালন করিতে চান। উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, রুশিয়াও যে জার্ম্মানীর মত নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার অছিলায় পররাজ্য হরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবারে তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। মঃ মোলোটোভের গত ৩১শে অক্টোবরের বক্তৃতায়, রুশিয়ার উদ্দেশ্য আগে যদি বা বুঝিতে বাকি ছিল, আর সে অবকাশই রহিল না। মঃ মোলোটোভ সুপ্রীম সোভিয়েট কৌন্সিলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন,—

"Certain old formulas, formulas which we employed but recently and to which many people are so accustomed, are now obviously out of date and inapplicable. We must be quite clear on this point, so as to avoid making gross errors in judging the new political situation that has developed in Europe···In the past few months such concepts as 'aggressor' and 'aggression' have acquired a new and concrete connotation, a new meaning. It is not hard to understand that we can no longer employ these concepts in the sense we did, say, three or four months ago."

মোলোটোভ মহোদয়ের বক্তৃতায় সোভিয়েট রুশিয়ার বর্ত্তমান পররাষ্ট্রনীতির স্পষ্ট রূপ পাওয়া যাইতেছে। তিনি বলেন যে, কোন কোন পুরাতন 'ফরমূলা' বা ধারা—যাহা



হেলসিনকি ন্যাশন্যাল মিউজিয়ম
বৃহত্তম দোকানঘর
ন্যাশন্যাল থিয়েটার

আমরা এতকাল ব্যবহার করিয়াছি এবং যাহাতে অনেকেই অভ্যস্ত, এখন অচল ও অপ্রযুজ্য। এ সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক, নচেৎ ইউরোপে বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে না। গত কয়েক মাসের মধ্যেই 'পররাজ্য আক্রমণ' ("aggression") বা 'পররাজ্য আক্রমণকারী' ("aggressor") কথাগুলি নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে।



রুশিয়ার বোমায় আক্রান্ত হেলসিনকি

এখন বুঝা কঠিন নয় যে, গত তিন-চার মাসে এ কথাগুলি যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এখন আমরা সে অর্থে আর প্রয়োগ করি না।

ইদানীং সোভিয়েট রুশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির কতখানি পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে তাহা সম্যক্ বুঝিবার জন্য আরও দুইটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। একটি মোলোটোভের পূর্ব্ববর্ত্তী পররাষ্ট্র-সচিব মসিয় লিট্‌ভিনফের, আর অন্যটি রুশ-ডিক্টেটর মঃ ষ্টালিনের। লিট্‌ভিনফ মহোদয় জেনিভায় রাষ্ট্র-সংঘের বৈঠকে ১৯৩৭, ২১শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যাকালে 'অ্যাগ্রেসন' সম্বন্ধে বলেন,—

"An aggression remains an aggression whatever the formula beneath which it is disguised. No international principle can ever justify aggression, armed intervention, the invasion of other States and the violation of international treaties which it implies."

অর্থাৎ, "'অ্যাগ্রেসন' 'অ্যাগ্রেসন'ই। পররাজ্যে অভিযান চালানো বা স্বেচ্ছামত আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধি ভঙ্গ করা—ইহা কোন মতেই মানিয়া লওয়া চলে না।

আজ ইহার কি পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়াছে!

মাত্র নয় মাস পূর্ব্বে, ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসে মঃ ষ্টালিন পররাষ্ট্রনীতি-প্রসঙ্গে বলেন,—

"We stand for peaceful, close, and friendly relations with all the neighbouring countries which have common frontiers with the Soviet Union. That is our position, and we shall adhere to this position so long as these countries maintain like relations with the Soviet Union and so long as they make no attempt to trespass,

directly or indirectly, on the integrity and inviolability of the frontiers of the Soviet Union."

অর্থাৎ "সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে সমান-সীমানা-যুক্ত প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আমরা শান্তিপূর্ণ, ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার পক্ষপাতী। আমাদের এই 'পজিশন', আর ইহাতে আমরা ততদিন দৃঢ় থাকিব যতদিন উহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে অনুরূপ সম্পর্ক রক্ষা করিবে, এবং যত দিন উহারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ইহার সার্ব্বভৌমতা অস্বীকার বা নির্দ্দিষ্ট সীমানা উল্লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা না করিবে।"

মোলোটোভের ভাষায়, এ-সব এখন পুরনো বুলি।

মোলোটোভ তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত বক্তৃতায় আরও বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানী এখন আর 'অ্যাগ্রেসর' রাষ্ট্র নহে। তবে কি এতকাল জার্ম্মানী যে ভাবে পররাষ্ট্র আত্মসাৎ করিতে লিপ্ত হইয়াছিল সোভিয়েট রুশিয়াও তাহাই বর্ত্তমানে করিতেছে বলিয়া এই রকম অর্থভেদ ঘটিয়াছে? এই বিখ্যাত বক্তৃতাটিতেই তাহা সুপরিস্ফুট। পোল্যাণ্ড সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, ভের্সাই সন্ধির 'কুৎসিত সন্তান' পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মান-বাহিনী ও রুশ-বাহিনী এক আঘাতেই নিপাত করিয়া দিয়াছে। পোল্যাণ্ডকে পুনর্জীবিত করিবার কথা এখন উঠিতেই পারে না। এইরূপ একটা উদ্দেশ্য লইয়া বর্ত্তমান সংগ্রাম চালান একেবারেই অসঙ্গত।

নিজ নির্বিঘ্নতা রক্ষার ওজুহাতে পররাষ্ট্র আক্রমণ ও অধিকারই যাহাদের বর্ত্তমান নীতি তাহাদের পক্ষে ইহা অসঙ্গতই বটে!

সোভিয়েট রুশিয়ার নজর লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও ফিনল্যাণ্ড এই চারিটি রাষ্ট্রের উপর আগে হইতেই ছিল। ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ আলোচনা যে-সব কারণে বানচাল হইয়া যায় তাহার মধ্যে একটি হইল—এক কথায় এই বাল্‌টিক রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের উপর তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করাইবার জন্য জিদ। এক দিকে জার্ম্মানী, অন্য দিকে রুশিয়া—কাজেই নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে ইহাদের নিরপেক্ষ না থাকিয়া উপায় নাই। তাই ইহারা তখন রুশিয়ার প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে সন্ধি হইয়া যাওয়ায় উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। রুশিয়া ও জার্ম্মানীতে ছিল এত কাল বিরোধ, তাই নিজ স্বাধীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহারা একরূপ নিঃসন্দেহ ছিল। রুশ-জার্ম্মান সন্ধির তৃতীয় প্রত্যক্ষ ফল হইল উক্ত চারিটি রাষ্ট্রের প্রথম তিনটির উপর রুশিয়ার স্বাধীনতা-পরিপন্থী প্রস্তাব। রুশিয়াকে নিজ নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার জন্য, উহাদের বন্দরসমূহে ও অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্য, বিমান- ও নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করিতে দিতে হইবে। লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া এ প্রস্তাবে রাজী হইয়াছে। কারণ এ করা ছাড়া এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তিনটির হয়ত উপায়ান্তর ছিল না।

ফিনল্যাণ্ডের নিকটও যে সে ঐরূপ দাবি জানাইয়াছে মোলোটোভের উক্ত বক্তৃতা হইতে সাধারণ্যে তাহা প্রথম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই বক্তৃতার কিছু পূর্ব্বেই সোভিয়েট রুশিয়া তাহার প্রস্তাব ফিনল্যাণ্ডের নিকট পেশ করে। উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে যখন আলোচনা চলিতেছিল তাহার মধ্যেই মোলোটোভ ঐ বক্তৃতায় বলিয়া বসেন যে, ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখিতে হইলে তাহার প্রস্তাবে তাহাকে সম্মত হইতেই হইবে। তখনই যদিও রুশিয়ার মতলব বুঝা গিয়াছিল তথাপি আরও কিছু কাল উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে আপোষ-আলোচনা চলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রুশিয়া তাহার দাবিতে অটল থাকায় আলোচনা ফাঁসিয়া যায়। তাহার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান ফিন-রুশ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

ফিনল্যাণ্ডের উপর রুশিয়ার দাবির বহর এত দিনে বোধ হয় অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন। ইহার দক্ষিণে বাল্‌টিক সাগর ও ফিনিশ উপসাগর। এই দিক দিয়া রুশিয়ার লেনিনগ্রাডে গমনাগমনের পথ। এই দুইটির কর্তৃত্ব করিতে পারিলে লেনিনগ্রাড তথা উত্তর-পশ্চিম রুশিয়ার নির্ব্বিঘ্নতা সম্বন্ধে সে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারে। ইহা করিতে হইলে যেমন বাল্‌টিক সাগরতীরের লিথুয়ানিয়া প্রমুখ রাষ্ট্রত্রয়কে হাতের মুঠায় পুরা আবশ্যক তেমনি ফিনল্যাণ্ডকেও স্বমতে আনয়ন করা প্রয়োজন। যদি আপোষে সম্ভব হয় ক্ষতি নাই, যদি তাহা না হয় তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়াও এইরূপ করা হইবে। এই মনোবৃত্তি

দ্বারা পরিচালিত হইয়াই আজ রুশিয়া ফিনল্যাণ্ডের উপর চড়াও হইয়া বসিয়াছে।

যাহা হউক, ফিনল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হ্যাঙ্কো বন্দরে ও ডাগো দ্বীপে রুশিয়া নিজ নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করিয়া গোলন্দাজবাহিনী মোতায়েন করিতে চাহে। ফিন উপসাগরের কয়েকটি দ্বীপ এবং দক্ষিণ-ফিনল্যাণ্ডের আরও কয়েকটি শহরে প্রয়োজনবোধে বিমান- ও সৈন্য- ঘাঁটি বসাইবার জন্য দাবি করে। ফিনল্যাণ্ডের সীমান্ত হইতে লেনিনগ্রাড মাত্র বিশ মাইল দূরে। কারেলিয়ান যোজকের উপর ইহা অবস্থিত। ফিন-সীমান্ত এই যোজকের উপর হইতে বহু পশ্চাতে সরাইয়া লইতে বলে সে ফিনল্যাণ্ডকে। এ অঞ্চলের সীমানা নূতন করিয়া স্থির করিবারও তখন প্রস্তাব জানায়। উত্তরে উত্তর-মহাসাগরে ফিনল্যাণ্ডের একটি মাত্র বন্দর পেসামো রিবাকি উপদ্বীপের অর্দ্ধেকটা পাইয়াছে ফিনরা, আর এ বন্দরটি এখানেই অবস্থিত। রুশিয়া এই বন্দরটি সমেত রিবাকি উপদ্বীপের ফিন অংশটুকুও চাহিয়া বসে। এই সব দাবির পরিবর্ত্তে সে ফিনল্যাণ্ডকে সোভিয়েট কারেলিয়ার কিছু অংশ দিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে! কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে এ সব দাবি স্বীকার করিয়া লওয়া তাহার যে আত্মহত্যারই সামিল। চেকোস্লোভাকিয়ার দৃষ্টান্ত সে ভুলিবে কেমন করিয়া?

কি আয়তন, কি জনসংখ্যা কোন দিক দিয়াই রুশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের তুলনা হয় না। লিথুয়ানিয়া প্রমুখ বালটিক রাষ্ট্রত্রয়ের চেয়ে এ বড় বটে, কিন্তু রুশিয়ার কাছে ইহা দাঁড়াইতেই পারে না। ফিনল্যাণ্ডের আয়তন গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ডের সমান; কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র আট ত্রিশ লক্ষ! আর রুশিয়া জুড়িয়া আছে ইউরোপ ও এশিয়া দুই মহাদেশের উত্তরার্দ্ধ। তাহার লোকসংখ্যা প্রায় আঠার কোটি। তাহার সৈন্যবল ফিনল্যাণ্ডের চেয়ে প্রায় সহস্রগুণ বেশী। প্রবলের উত্তাপে দুর্ব্বল পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে ইহাই হয়ত স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু এই স্বাভাবিক রীতির যখন ব্যত্যয় ঘটে, তখনই লোকের দৃষ্টি ঐ অস্বাভাবিক বিষয় বা অবস্থার দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। রুশ-ফিন যুদ্ধে বিশ্ববাসী কম বিস্মিত হয় নাই। বিশাল রুশ-বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক ফিন সৈন্য যেমন দৃঢ়তা ও বীরত্বের সঙ্গে ইদানীং লড়িতেছে এবং লড়িয়া রণকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে তাহাতে এ-জাতির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। হয়ত পোল্যাণ্ডের মত বা আবিসিনিয়ার মত শীঘ্রই তাহাকেও তাহার স্বাধীন সত্তা হারাইয়া ফেলিতে হইবে, তথাপি তাহার বীরত্বের কথা বহুদিন পর্য্যন্ত লোকে ভুলিতে পারিবে না।

ফিনল্যাণ্ড সম্বন্ধে অনেকেরই জ্ঞান হয়ত সামান্য। ফিন ভাষায় এদেশটির যে নাম তাহার মানে 'সহস্র হ্রদের দেশ'। বস্তুতঃ হ্রদ ও জলা ভূমিতে এ দেশটি ভরপুর। এখানে হ্রদ ষাট হাজারেরও উপর। নৈসর্গিক অবস্থা এখানকার অধিবাসীদিগকে সুন্দরের উপাসক করিয়া তুলিয়াছে। তাই এখানে কবি ও সাহিত্যিকের এত প্রাচুর্য্য। গত বৎসর (১৯৩৯) এখানকার একজন নামজাদা সাহিত্যিক—ফ্রান্স্ এমিল সিলান্‌পা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। শুধু সাহিত্য নহে, বিজ্ঞান এবং কারু ও চারু শিল্পেও এদেশটি উন্নত।

ফিন জাতি খুব সাহসী ও বলিষ্ঠ বলিয়া ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যদিও ইহারা ভোগ করিতেছে মাত্র গত বাইশ তেইশ বৎসর যাবৎ, তথাপি পূর্ব্বেও, পরাধীন থাকা কালেও, স্বাধীন বৃত্তিগুলি স্ফুরণের অনেক সুযোগ লাভ করিয়াছিল। ফিনরা ছয় শত বৎসর থাকে সুইডেনের অধীন। সুইডেনের শিল্প ও সংস্কৃতি ইহারা ষোল আনা গ্রহণ করে। দেশ-শাসনে ফিনদের অধিকার বরাবর স্বীকৃত হইয়াছিল। ফিনল্যাণ্ড লইয়া সুইডেন ও রুশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ চলে বহুদিন। শেষে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করে। রুশিয়া-ভুক্ত হইলেও সে ইহাকে একটি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রদেশ রূপে গ্রহণ করে। এখানে জারের প্রতিনিধি থাকিতেন বটে, কিন্তু ফিনদের ডায়েট বা পার্লামেন্ট দেশ-শাসনের ব্যবস্থা করিত। রুশ সম্রাট্ দ্বিতীয় নিকলাস ১৮৯৯ সালে ডায়েটের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিয়া দেন। রুশ-জাপান-যুদ্ধের কালে রুশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডে যে ব্যাপক শ্রমিক-বিদ্রোহ ঘটে তাহার ফলে ফিনরা আবার তাহাদের ক্ষমতা ফিরিয়া পায়। ১৯০৬ সালে ডায়েট পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু দুই

বৎসর এ ব্যবস্থা চলিবার পর আবার ফিনদের দুর্দ্দিন দেখা দেয়। এবারে ডায়েটের সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল। মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, শিশুমঙ্গল, জীবনবীমা, প্রভৃতি জনহিতকর আইনগুলিও তখন আর বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই।

কিন্তু মহাসমরের মধ্যেই রুশ-বিপ্লব ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডেরও বরাত ফিরিয়া গেল। ১৯১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর সমগ্র ফিন জাতির মুখপাত্র-স্বরূপ ফিনিশ ডায়েট স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। বিপ্লবী রুশিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ্চ যে ব্রেষ্ট-লিটভস্ক সন্ধি হয় তাহাতে ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ইহার পর ১৯১৯ সালের ১৭ই জুলাই ফিনল্যাণ্ডে রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠিত হইল। এ কার্য্যে যে পুরুষ-প্রধানের কৃতিত্ব সকলের আগে স্মরণীয় তাঁহার নাম ব্যারণ কার্ল এমিল গুস্তভ ম্যানারহাইম। ফিনল্যাণ্ডের ওয়াশিংটন বলিয়া তিনি সেখানে পূজিত। তিনি পূর্ব্বে ফিন-বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধেও তিনি ফিন-বাহিনীর পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার বয়স এখন বাহাত্তর বৎসর।

নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েট রুশিয়া সকলেই একে একে এই রিপাব্লিক স্বীকার করিয়া লইল। ফিনল্যাণ্ড ক্রমে লীগ্-অব-নেশন্‌স্ ও ইহার কৌন্সিলের সভ্য হয়। গত ১৯৩২ সালে সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে সে একটি "Non-Aggression Pact" বা অনাক্রমণাত্মক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আগামী ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ইহাঁর মেয়াদ। ইহা বাতিল করিতে হইলে পরস্পরকে ছয় মাস পূর্ব্বে নোটিশ দিবার কথা। সোভিয়েট রুশিয়ায় এখন পুরাতন নীতি অচল, তাই বোধ হয় সে ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ছয় মাস অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। ফিনল্যাণ্ডকে এখন অনেকেই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, দক্ষিণ-আমেরিকার কোন কোন রিপাব্লিক ফিনল্যাণ্ডে সৈন্য, রসদ ও রণসম্ভার প্রেরণ করিতেছে। কিন্তু বিশাল রুশিয়ার বিরাট আয়োজনের সম্মুখে তাহার পক্ষে যুঝা কতদিন সম্ভব হইবে বলা কঠিন।

সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির বর্ত্তমান মারমূর্ত্তি দেখিয়া পৃথিবীতে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে খুবই। তাহার নিজের কথায়ই প্রকাশ, জার্ম্মানীকে সে এখন আর কোন দোষ দিতেছে না। যত দোষ জার্ম্মান প্রতিপক্ষীয়দের। তাহারাই এখন তাহার মতে 'অ্যাগ্রেসর'। তাহার কথার ব্যঞ্জনা খুলিয়া বলিলে বলিতে হয়, ব্রিটেন ও ফ্রান্সই এখন তাহার মতে 'অ্যাগ্রেসর' রাষ্ট্র। তাহার এই ব্যাখ্যা এবং ইহার পশ্চাতে যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইতেছে তাহা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মনে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। নরওয়ে, সুইডেন, রুমানিয়া হইতে গ্রীস পর্য্যন্ত বলকান রাষ্ট্রগুলি, তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তান—এই মুসলমান রাষ্ট্রগুলি এবং পূর্ব্বে মহাচীনও রুশিয়ার এই কার্য্যে ভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। ফিনল্যাণ্ডের জয়-পরাজয়ের উপর ইহাদের অনেকেরই ভাগ্য নির্ভর করিবে।



পল্লীসেবা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক সময়ে আমি যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম আমার সুযোগ হয়েছিল কিছু কাল এক পল্লীতে এক চাষী গৃহস্থের ঘরে বাস করবার। আমি শহরবাসী হলেও সেখানকার পল্লীতে আমার কোনো অসুবিধা হয় নি, আমি আনন্দেই ছিলুম। সেই সময়ে ইংলণ্ডের পল্লীবাসীদের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছিলুম। দেখেছিলুম তারা সব সময়েই অসন্তুষ্ট, গ্রামের ভিতর তাদের চিত্তের সম্পূর্ণ পুষ্টি নেই, তারা কবে লণ্ডনে যাবে এই জন্ম দিনরাত্রি তাদের উদ্বেগ। জিজ্ঞাসা করে বুঝলুম, য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত আয়োজন, শিক্ষা, আরোগ্যবিধান প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থা সংহত বড়ো বড়ো শহরে, এই জন্ম শহর গ্রামবাসীর চিত্তকে আকর্ষণ করে, গ্রামে তারা বোধ করে বঞ্চিত।

তবে য়ুরোপে শহর ও গ্রামের এই যে ভাগ তা প্রধানতঃ পরিমাণগত, শহরে যা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় গ্রামে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় না।

য়ুরোপে নগরই সমস্ত ঐশ্বর্যের পীঠস্থান, এটাই য়ুরোপীয় সভ্যতার লক্ষণ। এই জন্যই গ্রাম থেকে শহরে চিত্তধারা আকৃষ্ট হয়ে চলছে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে হবে যে শহর ও গ্রামের চিত্তধারার মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, যে-কেউ গ্রাম থেকে শহরে যাবামাত্র তার যোগ্যতা থাকলে সেখানে সে স্থান লাভ করতে পারে, শহরে নিজেকে বিদেশী মনে করবার কোনো কারণ ঘটে না। এই কথাটা আমার মনে লেগেছিল। আমাদের সঙ্গে এর প্রভেদটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

এক দিন আমাদের দেশের যা কিছু ঐশ্বর্য যা প্রয়োজনীয় সবই বিস্তৃত ছিল গ্রামে গ্রামে, শিক্ষার জন্য আরোগ্যের জন্য শহরের কলেজে হাসপাতালে ছুটতে হ'ত না। শিক্ষার যা আয়োজন আমাদের তখন ছিল তা গ্রামে গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। আরোগ্যের যা উপকরণ জানা ছিল তা ছিল হাতের কাছে, বৈদ্য-কবিরাজ ছিলেন অদূরবর্তী, আর তাঁদের আরোগ্য-উপকরণ ছিল পরিচিত ও সহজলভ্য। শিক্ষা আনন্দ প্রভৃতির ব্যবস্থা যেন একটা সেচনপদ্ধতির যোগে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল; একটা বড় ইমারতের মধ্যে বদ্ধ ক'রে বিদেশী ব্যাকরণের নিয়মের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের পরিচালিত করবার রীতি ছিল না। সংস্কৃতি-সম্পদ যা ছিল তা সমস্ত দেশের মনোভূমিকে নিয়ত উর্বরা করেছে—পল্লী ও শহরের মাঝখানে এমন কোনো ভেদ ছিল না যার খেয়াপার করবার জন্য বড়ো বড়ো জাহাজ প্রয়োজন। দেশবাসীর মধ্যে পরস্পর মিলনের কোনো বাধা ছিল না, শিক্ষা আনন্দ সংস্কৃতির ঐক্যটি সমস্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।

ইংরেজ যখন এদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে তখন দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাগের সৃষ্টি হ'ল। ইংরেজের কাজ-কারবার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংহত হ'তে লাগল, ভাগ্যবান কৃতীর দল সেখানে জমা হ'তে লাগল। সেই ভাগেরই ফল আজ আমরা দেখছি। পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে, দুয়ের মধ্যে ভাবের কোনো ঐক্য নেই, মিলনের কোনো ক্ষেত্র নেই, দুয়ের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।

এই বিচ্ছেদেরই নিদর্শন দেখেছিলুম যখন আমাদের ছাত্ররা এক সময় গোলামখানায় আর প্রবেশ করবেন না ব'লে পল্লীর উপকার করতে লেগেছিলেন। তারা পল্লী-বাসীদের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে নি, পল্লীর লোকেরা তাদের সম্পূর্ণ ক'রে গ্রহণ করতে পারে নি। কী ক'রে মিলবে? মাঝখানে যে বৈতরণী। শিক্ষিতদের দান পল্লীবাসী গ্রহণ করবে কোন্ আধারে? তাদের চিত্তভূমিকাই যে প্রস্তুত হয় নি। যে জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত

মঙ্গলচেষ্টার বীজ নিহিত সেই জ্ঞানের দিকেই পল্লীবাসীদের শহরবাসীদের থেকে পৃথক্ করে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো দেশে পল্লীতে শহরে জ্ঞানের এমন পার্থক্য রাখা হয় নি, পৃথিবীর অন্যত্র নবযুগের নায়ক যাঁরা নিজেদের দেশকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলছেন তাঁরা জ্ঞানের এমন পংক্তিভেদ কোথাও করেন নি, পরিবেশনের পাত্রা একই। আমাদের দেশে একই ভাবে যে সমস্ত দেশকে অনুপ্রাণিত করা যাবে এমন উপায় নেই। আমি তাই যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো ক'রে যা হয় একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড বিভেদ একে দূর ক'রে জ্ঞানবিজ্ঞান কি পল্লী কি নগর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, সর্বসাধারণের কাছে সুগম ক'রে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূতপ্রেতওঝা তাদের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্য শিক্ষার একটুখানি যে-কোনো রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এ রকম অসম্মান যেন গ্রামবাসী-দের না করি। এই অসম্মান জন্মায় শিক্ষার ভেদ থেকে, মন অহংকৃত হয়, বলে, ওরা চালিত হবে আমরা চালনা করব, দূর থেকে উপর থেকে। এর ফলে অনেক সময় শিক্ষিত পল্লীহিতৈষীরা চাষীদের কাছে এমন সব বিষয়ে মুখস্থ-করা উপদেশ দিতে আসেন হয়ত যে বিষয়ে চাষীরা তাঁদের চেয়ে ভালোই জানে। এর একটা দৃষ্টান্ত দিই।

এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে শিলাইদহে আলুর চাষ বিস্তৃতভাবে প্রচলন করব। আমার প্রস্তাব শুনে কৃষি-বিভাগের কর্তৃপক্ষ বললেন যে আমার নির্দিষ্ট জমিতে আলুর চাষ করতে হ'লে এক-শ মণ সার দরকার হবে ইত্যাদি। আমি কৃষি-বিভাগের প্রকাণ্ড তালিকা অনুসারে কাজ করলুম ফসলও ফলল কিন্তু ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের কোনোই সামঞ্জস্য রইল না। এ-সব দেখে আমার এক চাষী প্রজা বললে, আমার 'পরে ভার দিন বাবু—সে কৃষি-বিভাগের তালিকাকে অবজ্ঞা ক'রেও প্রচুর ফসল ফলিয়ে আমাকে লজ্জিত করলে।

আমাদের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞান যে নিষ্ফল হয়, অভিজ্ঞতা যে পল্লীবাসীর কাজে লাগে না, তার কারণ আমাদের অহমিকা, যাতে আমাদের মিলতে দেয় না, ভেদকে জাগিয়ে রাখে। তাই আমি বারংবার বলি, গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না, যে-শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে। সেটা যদি শুধু শহরের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তবে তা কখনো সার্থক হ'তে পারে না। মনে রাখ্‌তে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার, গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক্ দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি, কিন্তু এ ছাড়া কোনো পথও নেই। নূতন যুগের দাবী মেটাতেই হবে।

আমরা নিজেরা অক্ষম, আমাদের সাধ্য সংকীর্ণ তবু সেই স্বল্প ক্ষমতা নিয়েই এই ক'খানি গ্রামের মধ্যে আমরা একটা আদর্শকে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছি। বহু বৎসর অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে আমরা গ্রামবাসীদের অনুকূল করেছি। ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত, আমাদের সামনে যে বড়ো আদর্শ বড়ো উদ্দেশ্য আছে তার কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই, এই মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরূক রাখতে পারি।

৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

[শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে কথিত অভিভাষণের অনুলিপি]

হঠযোগ ও রাজযোগ

শ্রীঅনিলবরণ রায়

শরীর ও প্রাণের সংযোগে আমাদের অন্নময় কোষ বা স্থূল দেহ গঠিত; মানুষের মধ্যে প্রকৃতির সমুদয় ক্রিয়ার ভিত্তি হইতেছে এই শরীর ও প্রাণের সমন্বয়। হঠযোগের লক্ষ্য হইতেছে এই দুইটিকে বশীভূত করা।

জড় পৃথিবীতে যখন vital force অর্থাৎ প্রাণশক্তির প্রথম আবির্ভাব হয় তখন হইতেই জড়ের সহিত প্রাণের নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলিতেছে। প্রাণ জড়কে ধরিয়া নানারূপে নিজেকে প্রকট করিতে চাহিতেছে, এই ভাবে অসংখ্য প্রকারের জীবকোষ এবং তাহাদের সমবায়ে নানা উদ্ভিদ, জন্তু এবং শেষ পর্য্যন্ত মানবের বিকাশ হইয়াছে। অন্য দিকে জড় চাহিতেছে প্রাণের এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে, তাহার নিজস্ব নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, নিঃসাড় শান্তিতে ফিরিয়া যাইতে। যেখানেই প্রাণের উপর জড় জয়ী হইতেছে সেইখানেই মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। প্রাণও অনবরত জীবন সৃষ্টি করিয়া মৃত্যুর সহিত তাল রাখিয়া চলিতেছে। প্রকৃতির নিরন্তর চেষ্টা হইতেছে এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করা এবং এ বিষয়ে সে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে। বৃক্ষের মধ্যে এবং কোন কোন জন্তুর মধ্যে জড় ও প্রাণের মিলন বহুকাল স্থায়ী হইয়াছে; আর মানুষের যে স্বল্প পরমায়ু তাহার মধ্যেই প্রকৃতি অন্নময় কোষ, মন ও আত্মার অনেক ঐশ্বর্য্য বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং ইহা হইতেই মানবের অপূর্ব্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির এই কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। মানুষ বয়সের সহিত ভিতরে যত বিকশিত হয়, যত জ্ঞানে বিজ্ঞানে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহার স্থূল শরীর তত ক্ষীণ হইয়া আসে এবং শেষ পর্য্যন্ত আর প্রাণশক্তির কার্য্যকে ধরিয়া রাখিবার তাহার সামর্থ্য থাকে না, সে ভাঙিয়া পড়ে, এবং ইহাই হইতেছে মৃত্যু। বর্ত্তমানে মানুষ সাধারণতঃ স্থায়ী যৌবন এবং এক শত বৎসরের বেশী পরমায়ু আশা করিতে পারে না— এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তাহার সমস্ত লীলাখেলা সমাপ্ত করিতে হয়। সাধারণ মানুষ প্রকৃতির এই বিধানেই সন্তুষ্ট, কিন্তু হঠযোগী ইহার উপরে উঠিতে চাহিয়াছে এবং অনেকখানি কৃতকার্য্যও হইয়াছে।

পৃথিবীতে জড় ও প্রাণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে এক দিন এই দ্বন্দ্বের শেষ হইবে, পৃথিবীতেই অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে, এই স্বপ্ন মানুষ অনেক দিন হইতেই দেখিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্গসঁ তাঁহার Creative Evolution পুস্তকে আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে এমন এক দিন আসিবে যখন প্রাণ সম্পূর্ণভাবে জড়ের উপর জয়ী হইবে, কিন্তু কি ভাবে ইহা হইবে তাহার কোন আভাস তিনি দিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা দেহ ও প্রাণের উচ্চতর সমন্বয় সাধন করিয়া জীবন ও যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার অনেক রকম প্রয়াস করিতেছেন। কিন্তু ভারতের প্রাচীন হঠযোগীরা এই বিষয়ের মূলতত্ত্বটি ধরিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে বিশ্বে প্রাণশক্তির সীমা নাই, অন্ত নাই। মানুষ এখন এই অসীম প্রাণশক্তির সামান্য মাত্রই গ্রহণ করিতে, ধারণ করিতে পারে। হঠযোগীর উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের দেহকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা যেন তাহা নিজেকে বিশ্বের অফুরন্ত প্রাণশক্তির দিকে খুলিয়া দিতে পারে এবং নিজের মধ্যে তাহা গ্রহণ করিতে পারে।

হঠযোগীর প্রধান প্রক্রিয়া হইতেছে আসন ও প্রাণায়াম। আসনের সংখ্যা চৌষট্টি, তাহাদের মধ্যে পদ্মাসন, ভুজঙ্গাসন, ময়ূরাসন, শীর্ষাসন প্রভৃতি কয়েকটি হইতেছে প্রধান। সাধারণ মানুষের দেহ চঞ্চল ও অস্থির,

বিশ্বপ্রাণস্রোত হইতে যে-সব প্রাণশক্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মানুষ যে সে-সবকে গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারিতেছে না, ফেলিয়া দিতেছে, এই শারীরিক অস্থিরতাই তাহার প্রমাণ। হঠযোগী আসন অভ্যাস করিয়া এই অস্থিরতা দূর করেন এবং দেহকে অসাধারণ স্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করেন। এই অভ্যাসের দ্বারা মানুষ মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকেও অনেকখানি জয় করিতে পারে। ইহা ব্যতীত নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা হঠযোগী শরীরকে সকল প্রকার ময়লা ও ক্লেদ হইতে মুক্ত করেন, যেন প্রাণায়াম অভ্যাসের সমস্ত বাধা দূরীভূত হয়। এইবার একটি প্রক্রিয়ার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে ধৌতি। প্রাতঃকালে যোগী ঈষদুষ্ণ জল প্রচুর পরিমাণে পান করেন, তাহার পর একটি কচি কঞ্চি বা বস্ত্রখণ্ড পাকস্থলী পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া সেই জল বমি করিয়া ফেলেন। হঠযোগী প্রত্যহ প্রাতঃকালে এইরূপ বমন করেন, পাকস্থলীতে অজীর্ণ খাদ্য, পিত্ত প্রভৃতি কত ময়লা সঞ্চিত হইয়া থাকে এই বমন হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপে গুহ্যদ্বার দিয়া জল টানিয়া লইয়াও হঠযোগী অন্ত্র পরিষ্কার করেন। এই সব প্রক্রিয়ার দ্বারা শরীর নির্ম্মল হইলে হঠযোগী প্রাণায়াম অভ্যাস করেন এবং এইটিই হইতেছে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। দেহের মধ্যে প্রাণশক্তির প্রধান ক্রিয়া হইতেছে শ্বাসপ্রশ্বাস, ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই যোগী প্রাণকে বশীভূত করেন।

প্রাণায়ামের দ্বারা হঠযোগী দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। প্রথমতঃ, ইহা দ্বারা দেহের সিদ্ধিলাভ হয়। অনবদ্য স্বাস্থ্য, স্থায়ী যৌবন এবং অসাধারণ দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। সাধারণতঃ দেহরক্ষার জন্য প্রকৃতির যে-সব প্রয়োজন যোগী তাহাদের অনেকগুলি হইতেই মুক্ত হন। অন্যপক্ষে প্রাণময় কোষে যে কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে প্রাণায়ামের দ্বারা তাহা জাগ্রত হয় এবং যোগীর পক্ষে নূতন নূতন চৈতন্যের স্তর খুলিয়া যায়, যোগী নানারূপ অসাধারণ শক্তি লাভ করেন এবং সাধারণ শক্তিসকলও তাঁহার মধ্যে বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

হঠযোগের সিদ্ধিগুলি খুব চমকপ্রদ। কিন্তু ইহার দোষ হইতেছে, এই যোগ সাধনায় এত শক্তি ও সময় দিতে হয় যে মানুষকে তাহার সাধারণ জীবনযাত্রা হইতে সরিয়া যাইতে হয়, আর দুই-চারি জন লোক ঐরূপ শক্তি লাভ করিলেও সাধারণ মানবজাতির কোন লাভই হয় না। কঠিন সাধনা দ্বারা হঠযোগ কয়েক জন লোকের পক্ষে যাহা সম্ভব করিয়াছে, প্রকৃতি এক দিন সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই তাহা সহজ ও সাধারণ জিনিষ করিয়া তুলিবে, প্রকৃতির সেই কার্য্যে যাহাতে আমরা ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা সাহায্য করিতে পারি তাহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে সকল প্রকার সাধনার জন্যই শরীরের স্বাস্থ্য ও শক্তি প্রয়োজন, শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য আমরা প্রয়োজনমত হঠযোগ হইতে সহজ প্রণালী কিছু গ্রহণ করিতে পারি। বিশেষ করিয়া শরীরকে সকলরকম ময়লা ও ক্লেদ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য হঠযোগীর যে সাবধানতা আমরা তাহা অনুসরণ করিতে পারি। ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন আহার সম্বন্ধে সংযম পালন, কারণ শরীরের অধিকাংশ বিষ ও রোগই আহারের অনিয়ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কত অল্প আহারে আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে তাহা অনেকেই জানেন না—অভ্যাসের বশে অনাবশ্যক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা দেহকে নানা রোগে বা অপ্রয়োজনীয় মেদে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন। প্রাণায়াম ঠিক মত করিতে পারিলে স্বাস্থ্য-রক্ষার অনেক সাহায্য হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রাণায়াম ছাড়িয়া দিলেই শরীর সাংঘাতিক ভাবে ভাঙিয়া পড়িতে পারে। অতএব যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু সন্ন্যাসী হইবেন না তাঁহাদের পক্ষে এই সব অভ্যাস না করাই ভাল।

রাজযোগের উদ্দেশ্য উচ্চতর। শরীরের সিদ্ধি নহে, পরন্তু মনের মুক্তি ও সিদ্ধি, হৃদয়ের উৎকর্ষসাধন, চিন্তা ও চৈতন্যের সকল প্রক্রিয়াকে সংযত করা—ইহাই হইতেছে রাজযোগীর লক্ষ্য। তিনি প্রথমেই দৃষ্টি দেন চিত্ত বা মানস চৈতন্যের উপরে। হঠযোগী যেমন দেহকে স্থির ও শুদ্ধ করিতে চান, রাজযোগী তেমনিই প্রথমে

চান চিত্তকে স্থির ও শুদ্ধ করিতে। মানুষের সাধারণ চৈতন্য হইতেছে বিক্ষোভময়, দ্বন্দ্বপূর্ণ, কবির ভাষায়—

লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
না জানি কখন ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল পাথারে।

মানুষের অন্তর-রাজ্যে শৃঙ্খলা নাই, মানুষ সেখানে রাজা হইয়াও তাহার কর্ম্মচারীদের বশ, প্রজাদেরই বশ, ইন্দ্রিয়ের অধীন, কাম ক্রোধ লোভের অধীন। এই যে বশ্যতা, অধীনতা, ইহা দূর করিয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। তাই রাজযোগের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হইতেছে যম ও নিয়ম, প্রাণ মনের উচ্ছৃঙ্খল অভ্যাসগুলি দূর করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে সদ্ অভ্যাস দৃঢ়ীভূত করা*। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে যম বলে। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচটিকে নিয়ম বলা হয়।

সত্যকথন অভ্যাস করিয়া সকল প্রকার অহংমুখী বাসনা-কামনা বর্জ্জন করিয়া, অপরের অনিষ্ট করা হইতে বিরত থাকিয়া, শুচিতা অবলম্বন করিয়া, মানসরাজ্যের যিনি প্রকৃত অধীশ্বর সেই ভাগবত পুরুষে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করিলে হৃদয় ও মনের শুদ্ধ, প্রসন্ন, স্বচ্ছ অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ইহা হইতেছে কেবল প্রথম ধাপ। ইহার পর মন ও ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ প্রক্রিয়া সকলকে সম্পূর্ণভাবে শান্ত করিতে হইবে, যেন অন্তর-পুরুষ এই সব বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধতর চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে পারে এবং পূর্ণতম সিদ্ধি ও আত্মজয়ের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে। তবে রাজযোগী ভুলিয়া যান না যে মনের সাধারণ ত্রুটিগুলির মূল হইতেছে স্নায়ুমণ্ডলী ও শরীরের প্রতিক্রিয়ার বশ্যতা। সেই জন্য তিনি হঠযোগী হইতে আসন ও প্রাণায়াম পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তবে সে-সবকে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ও সরল করিয়া লন। এই ভাবে তিনি হঠযোগের জটিলতা বর্জ্জন করিয়া তাহার মূল পদ্ধতির সাহায্যে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলেন। ইহা সিদ্ধ হইলে রাজযোগী অস্থির মনকে সম্পূর্ণভাবে শান্ত করিতে এবং ধ্যান ও ধারণা অভ্যাসের দ্বারা মনকে একাগ্র করিয়া সমাধি লাভ করিতে অগ্রসর হন।

সমাধির অবস্থায় মন তাহার সাধারণ সীমাবদ্ধ ক্রিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উচ্চতর চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে; বাহিরের চৈতন্যের বিক্ষোভ আর তাহাকে স্পর্শ করে না, জীব তখন অতিমানস স্তরে নিজ প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যোগী যে কেবল সমাধি অবস্থাতেই উচ্চতম লোকোত্তর জ্ঞান লাভ করেন তাহা নহে, জাগ্রত অবস্থাতেও তিনি যাহা জানিতে চান তাহা জানিতে পারেন এবং বাহ্যজগতেও অধ্যাত্ম শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। এই ভাবে যোগী যে কেবল অন্তরকেই জয় করিয়া স্বরাজ্য লাভ করেন তাহা নহে, বাহ্যজগৎকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া সাম্রাজ্য লাভ করেন।

রাজযোগের দুর্ব্বলতা হইতেছে এই যে, ইহা অস্বাভাবিক সমাধির অবস্থার উপরে অত্যধিক ভাবে নির্ভর করে এবং মানুষকে সাধারণ জীবন হইতে সরাইয়া লয়। অন্যপক্ষে গীতা যে যোগের শিক্ষা দিয়াছে তাহাতে মানুষ সাংসারিক জীবনে থাকিয়া কর্ম্মের ভিতর দিয়াই অধ্যাত্ম চেতনা লাভ করিতে পারে এবং ঐ চেতনার দ্বারা মানুষের সাধারণ জীবন ও কর্ম্মকেই দিব্য ভাবে রূপান্তরিত করিতে পারে। তবে গীতা রাজযোগের শক্তিও স্বীকার করিয়াছে এবং গীতার সাধনায় রাজযোগ কিরূপে সহায় স্বরূপ হইতে পারে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। গীতা বলিয়াছে, সকল প্রকার যোগ ও যজ্ঞই হইতেছে পরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার এক-একটি পন্থা, সকলের দ্বারাই সত্তার শুদ্ধি সাধনে সহায়তা হয়। তবে গীতা যে পন্থা দেখাইয়াছে, তাহাতে সকল যোগের সমন্বয় হইয়াছে, তাহার দ্বারা অন্যান্য সকল যোগেরই ফল লাভ করা যায় অথচ তাহা সাধন করিবার জন্য অন্যান্য যোগের ন্যায় সংসার ও কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইতে হয় না।

---

* রাজযোগের অষ্ট অবস্থা—
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ?

খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল, গত ১০ই জানুয়ারী বোম্বাইয়ে বড়লাট ওরিয়েণ্ট ক্লাবের বক্তৃতায় ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রনৈতিক যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া লইবার নিমিত্ত গান্ধীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এ বিষয়ে বহু কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল। সেই সাক্ষাৎকার হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে গান্ধীজী ও বড়লাট উভয়ের সম্মতিক্রমে নয়াদিল্লী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী যে কম্যুনিকে বা জ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া হইল।

বড়লাটের আমন্ত্রণে অদ্য গান্ধীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া খুব মৈত্রী সহকারে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয় এবং সমস্ত অবস্থা নিঃশেষে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। গান্ধীজী প্রথমেই স্পষ্ট করিয়া জানান যে তিনি কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির নিকট হইতে কোন ক্ষমতা পান নাই, তিনি কেবলমাত্র নিজের অভিমতই ব্যক্ত করিতে পারেন এবং তাঁহার কথায় ওআর্কিং কমীটির কোন বাধ্য-বাধকতা থাকিবে না।

বড়লাট কতকটা বিস্তারিত ভাবে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাব বিবৃত করেন। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট আন্তরিক ভাবে ইচ্ছা করেন যে, ভারত যত শীঘ্র সম্ভব ডোমীনিয়ন শাসনাধিকার লাভ করুক, এবং তদুদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত, বড়লাট প্রথমতঃ এই কথার উপর বিশেষ জোর দেন। তৎসম্পর্কে যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, তন্মধ্যে কোন কোনটি যে অত্যন্ত জটিল ও শক্ত, তাহার এবং বিশেষতঃ ডোমীনিয়ন অধিকার লাভের পর দেশরক্ষার বিষয়টির দিকে তিনি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়লাট স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেন যে, সময় উপস্থিত হইলেই বিভিন্ন দল এবং স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীর সহিত পরামর্শক্রমে সমস্ত ক্ষেত্র পর্য্যালোচনা করিতে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। মধ্যবর্ত্তী কাল যত দূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিতেও যে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট অত্যন্ত আগ্রহান্বিত এবং তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত, এ কথাও বড়লাট স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেন। অতঃপর বড়লাট, বড়োদাতে তিনি যে উক্তি করিয়াছেন, তৎপ্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, যাহা এক্ষণে স্থগিত রাখা হইয়াছে, সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রবর্ত্তন করিলেই অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হইবে এবং তাহাই ডোমীনিয়ন শাসনাধিকার ন্যূনতম সময়ে লাভের সোপান।

তিনি আরও বলেন যে, গত নবেম্বর মাসে তিনি যে পন্থায় ও যেরূপ ভিত্তিতে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই পন্থা এখনও উন্মুক্ত আছে এবং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট অবিলম্বে ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছেন। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সম্মতিক্রমে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ডোমীনিয়ন স্বায়ত্ত শাসন যাহাতে শীঘ্র অর্জ্জিত হইতে পারে, তাহার এবং যুদ্ধের পরে যাহাতে সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পুনরায় যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত আছেন।

যেরূপ মনোভাব লইয়া এই সমস্ত প্রস্তাব করা হইয়াছিল, মহাত্মা সেই মনোভাবের গুণগ্রাহিতা প্রকাশ করেন ; কিন্তু ইহা স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, তাঁহার মতে বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ সমস্ত প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেসের দাবী পূর্ণ হয় না। তিনি প্রস্তাব করেন, এবং বড়লাটও এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, যে, তাহা সমাধানের উদ্দেশ্যে আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখাই ভাল। —এ, পি,

যাহা পূর্ব্বে অস্পষ্ট ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া লইতে হইলে নূতন কিছু বলা আবশ্যক হয়। কিন্তু বিজ্ঞপ্তিটিতে বড়লাটের কথার যে তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এমন কিছু ত দেখিলাম না যাহা তিনি আগে বলেন নাই। সুতরাং অবিশদকে এই সাক্ষাৎকার দ্বারা বিশদ করাইয়া লওয়া গান্ধীজীর উদ্দেশ্য বলিয়া খবরের কাগজে যাহা লেখা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ কি প্রকারে হইল বুঝিলাম না। অবশ্য বিজ্ঞপ্তিটাতে যাহা নাই এমন যে-সব কথা গান্ধীজী ও বড়লাটের সহিত হইয়াছিল, তাহাতে মহাত্মাজী ব্যাপারটার অস্পষ্ট দিকটা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন এবং সেই জন্যই হয়ত বলিয়াছেন এখন আলোচনা স্থগিত থাক। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তিটিকে ইংরেজীতে যে "কম্যুনিকে" (জ্ঞাপনী) বলা হইয়াছে, তাহা না বলিয়া "ক্যামুফ্লাজ্" (ছদ্মাবরণী) বলিলে চলিত কিনা, বিবেচনা করা আবশ্যক। (৬ই ফেব্রুয়ারী, ২৩শে মাঘ।)

—

শাসক ও শাসিতদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক শ্রমবিভাগ

'গত ৬ই জুন বড়লাট নাগপুরে একটি ভোজসভায় বলেন :—

"Sinking of differences and the preparation of those conditions and circumstances which would bring about establishment of the Dominion Status is the course of wisdom in the present circumstances, and any help that I am capable of affording to achieve that ideal, will be forthcoming in the greatest measure practicable."

His Excellency appealed to political leaders to avoid in these delicate political matters too unbending a rigidity, and urged the importance of keeping an open mind for readiness to compromise.

তাঁহার এই কথাগুলির উপর কিছু মন্তব্য আমরা মাঘের 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আরও দু-একটা কথা বলা আবশ্যক। কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে,

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ-গুলি চাপা দিয়া (বা ভুলিয়া গিয়া) ডোমীনিয়ন শাসনাধিকার লাভের উপযোগী অবস্থা প্রস্তুত করাই বিজ্ঞোচিত বলিয়া তাহাই করিতে বড়লাট নেতাদিগকে অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রনৈতিক এই সব ব্যাপারে অনমনীয় দৃঢ়তা পরিত্যাগ করিয়া রফার জন্য প্রস্তুত হইতেও তিনি নেতাদিগকে অনুরোধ করেন।

ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু ভেদ ছিল ও আছে, এবং এরূপ সমস্ত ভেদই যে একমাত্র ভারতেরই বৈশিষ্ট্য তাহা নহে। ভারতহিতৈষী ভারতীয়েরা অনিষ্টকর ভেদগুলি লুপ্ত করিবার বা কমাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায় তাহার উপর সরকারী ছাপ মারিয়া সেগুলিকে স্থায়িত্ব দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সেগুলির লোপ বা হ্রাসের কি চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন তাহা তাঁহারা বলুন। যাহা আগে ছিল না এরূপ ভেদের সৃষ্টিও তাঁহারা করিয়াছেন। অতএব, ব্রিটিশ শাসকবর্গ এবং ভারতীয় শাসিতবর্গের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক শ্রমের বিভাগ যেন এইরূপ হইয়াছে মনে হয় যে, শাসকেরা ভেদগুলাকে জিয়াইয়া রাখিবেন ও অ-ভেদের জায়গায় স্থলবিশেষে ভেদের প্রবর্ত্তন করিবেন, এবং শাসিতেরা ভেদগুলার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন।

বড়লাট নেতাদিগকে অনমনীয় দৃঢ়তা পরিহার করিতে বলিয়াছেন। কংগ্রেস-নেতারা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাকে কার্য্যত স্বীকার করিয়া যথেষ্ট নমনীয়তা দেখাইয়াছেন। আর কতটা নমনীয়তা ও নতি শাসকেরা চান? বস্তুতঃ এই নমনীয়তার আতিশয্যই কংগ্রেসী জাতীয় দলকে ও অ-কংগ্রেসী হিন্দুদিগকে অনমনীয় দৃঢ়তার একান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি করাইয়াছে।

—

কোন ব্যক্তি-বিশেষের অঙ্গীকার পালনে পার্লেমেণ্ট বাধ্য নহে

গত ১০ই জানুয়ারী বোম্বাইয়ের ওরিয়েণ্ট ক্লাবের বক্তৃতায় বড়লাট লর্ড লিনলিথগো বলিয়াছিলেন :—

"As to the objective there is no dispute. I am ready to consider any practical suggestion that has general support, and I am ready, when the time comes, to give every help that I personally can. His Majesty's Government are not blind—nor can we be blind here—to the practical difficulties involved in moving at one step from the existing constitutional position into that constitutional position which is represented by Dominion Status.

"But here again I can assure you that their concern and mine is to spare no effort to reduce to the minimum the interval between the existing state of things and the achievement of Dominion Status.

"The offer is there. The responsibility that falls on the great political parties and their leaders is a heavy one, and one of which they are, I know, fully conscious."

ইহাতে বড়লাট বলিতেছেন, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ যে ডোমীনিয়নত্ব সে বিষয়ে কোন বিবাদ নাই; এক লাফে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উক্ত আদর্শে পৌছার যে-সব বাধা আছে তদ্বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ও ভারত-গবর্ন্মেণ্ট অন্ধ নহেন; কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ও তিনি বর্ত্তমান অবস্থা ও ডোমীনিয়নত্বের অবস্থার মধ্যে কালের ব্যবধান যতটা কমাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন; ইত্যাদি।

ডোমীনিয়নত্বই যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রিক আদর্শ, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই মতভেদ আছে। ভারতের বহু রাষ্ট্রিক নেতা ও অন্য রাষ্ট্রনৈতিক পূর্ণ-স্বাধীনতাকেই আদর্শ মনে করেন; কেহ কেহ ডোমীনিয়নত্বকে রাষ্ট্রিক অগ্রগতির পথের একটা পান্থশালা মনে করেন; অনেকে আবার তাহা মনে না করিয়া ভারতীয়দিগকে পূর্ণ-স্বরাজরূপ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করিবার উহা একটা উপায় কিংবা তাহাতে উপনীত হইবার একটা বাধা মনে করেন; এবং কেহ কেহ অবশ্য উহাকেই আদর্শ মনে করেন।

কিন্তু এই সব মতভেদ নাই যদি মনে করা যায়, তাহা হইলেও বড়লাট যে ডোমীনিয়নত্ব দিবার অঙ্গীকার করিতেছেন, যে প্রদান-প্রস্তাব (offer) রহিয়াছে বলিতেছেন, পার্লেমেণ্ট যে তাহা বস্তুতঃ দিবেন তাহার স্থিরতা কি? এই প্রশ্ন দ্বারা বড়লাটের উক্তির অকপটতা ও আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে না। গান্ধীজীর মতন অন্যেরাও তাঁহার উক্তি অকপট মনে করিয়াও ঐ প্রশ্ন করিতে পারেন। তাহার কারণ বলিতেছি।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন-আইন ডোমীনিয়নত্বকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক লক্ষ্যীভূত করা হইয়াছিল, বহু ব্রিটিশ রাজপুরুষ ইহা বলিয়াছেন। তাহার পর কুড়ি বৎসর অতীত হইয়াছে। সেই সময়ের মধ্যে কয়েক বার, ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন করা হইবে, এইরূপ কথা একাধিক রাজপুরুষ বলেন—কিন্তু কখন্ হইবে তাহা অবশ্য বলেন নাই। তাহার পর যখন ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইন প্রণয়নের চেষ্টা হইতেছিল এবং তাহার খসড়া পার্লেমেণ্টে আলোচিত হইতেছিল, তখনও এই প্রসঙ্গ একাধিক বার উত্থাপিত হয়। কিন্তু পার্লেমেণ্ট ১৯৩৫ সালের আইনে ডোমীনিয়নত্বের নামগন্ধও কোথাও রাখেন নাই। তাহার উল্লেখের কথা উঠিয়াছিল কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞাতসারে তাহা করা হয় নাই। সুতরাং যে প্রতিশ্রুতি কুড়ি বৎসরেও পালিত হইল না, বরং যাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত ১৯৩৫ সালের আইনে যত্নসহকারে বর্জ্জিত হইল, তাহা যে ভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে তাহার প্রমাণ কোথায়?

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইন জয়েণ্ট সিলেক্ট কমীটির রিপোর্টের ফল। লর্ড র‍্যাঙ্কেলার কমীটিকে বলিয়াছিলেন, পার্লেমেণ্ট বড়লাটের কথা নাকচ করিয়া দিতে সমর্থ। ঐ রিপোর্ট যখন পার্লেমেণ্টে আলোচিত হইতেছিল তখন উহার নিম্ন কক্ষে বিনা প্রতিবাদে এই মত ব্যক্ত হয় যে, কোন ভারত-সচিবের বা কোন বড়লাটের কোন প্রতিশ্রুতির এই বিষয়টির সম্বন্ধে আইনানুযায়ী বলবত্তা নাই, পার্লেমেণ্ট কেবল তাহার নিজের ১৯১৯ সালের আইন দ্বারাই বাধ্য। হাউস্ অব লর্ডসে বিনা প্রতিবাদে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর মত প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, পার্লেমেণ্টকে তাহার মতের বিরুদ্ধে বড়লাটের, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধির, ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীর, এমন কি ইংলণ্ডেশ্বরেরও কোন বিবৃতি বাধ্য করিতে পারে না।* ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্ব দেওয়া ১৯৩৫ সালে যে পার্লেমেণ্টের অভিপ্রেত ছিল না, ঐ সালের ভারতশাসন-আইনে তাহার সম্বন্ধ অনুল্লেখই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এখন যদি পার্লেমেণ্টের সুমতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে পার্লেমেণ্টে

* Lord Rankeillour told the Joint Select Committee in regard to Lord Irwin's Declaration and its effect:

"Those were the words of the Viceroy. They can be over-ruled by Parliament."

This point was also emphasised by the Chairman of the Conservative M. P.s' India Committee, Sir John Wardlaw-Milne, M. P., speaking in the House of Commons in December, 1934, when the report of the Joint Select Committee of both Houses of Parliament was under discussion, in these words:

"No pledge given by any Secretary of State or any Viceroy has any legal bearing on the matter at all. The only thing that Parliament is really bound by is the Act of 1919."

In the House of Lords debate Lord Rankeillour went even further. Speaking there, on 13th December 1934, he said:

"No statement by a Viceroy, no statement by any representative of the Sovereign, no statement by the Prime Minister, indeed no statement by the Sovereign himself, can bind Parliament against its judgment."

একটি স্বাধীন বা সংশোধক আইন দ্বারা নির্দিষ্ট একটি সময়ে (সালে ও দিনে) তাহা দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। "এখন যুদ্ধের সময়ে বড় আমরা ব্যস্ত" বলিয়া ওজর করিলে চলিবে না। কারণ, যুদ্ধের সময়েই পার্লেমেণ্ট ব্রিটেনের নিমিত্ত জরুরি আইন পাস করিতেছেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির ক্ষমতাসংকোচক আইন করিতেছেন।

পার্লেমেণ্টে আইন পাস করা আবশ্যক এই জন্য যে পার্লেমেণ্টই ব্রিটিশ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাধারী এবং পার্লেমেণ্ট ব্রিটেনের রাজারও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে বাধ্য নহেন—অন্য কোন ব্যক্তির ত নহেনই।

—

গান্ধীয় ও প্রাগ্‌গান্ধীয় রাজনীতি

গত ১লা মাঘের 'রাষ্ট্রবাণী' পত্রিকায় "রাজনীতি ও ধর্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি দেখিলাম।

"গান্ধীজীর পূর্বে রাজনীতি ছিল রাজনীতিই—অর্থাৎ কূটনীতি, ধূর্তের নীতি, মিথ্যাশ্রয়ীর নীতি। রাজনীতিতে লক্ষ্য লাভ করাই একমাত্র বিচার্য ছিল। সৎ অসৎ কি পথে সে লক্ষ্যে পহুঁছিতে হইবে তাহা লইয়া রাজনীতিকের মাথা ঘামাইবার দরকার ছিল না।"

গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে পৃথিবীতে আর যত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রাজনীতিক হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বিষয় অবগত নহি, সুতরাং তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের রাজনৈতিক কথায় ও কাজে ধূর্ত ও মিথ্যাশ্রয়ী ছিলেন কি না বলিতে পারি না। ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের কোন কোন রাজনীতিকের মতের, উক্তির, ও আচরণের বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও অ-ধূর্ত ও সত্যাশ্রয়ী বলি, তাহা হইলে তাহা 'রাষ্ট্রবাণী'র লেখক বিশ্বাস না-করিতে পারেন। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে তাঁহাকে গান্ধীজীরই সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে বলিতে পারি। আমাদের ধারণা, দাদাভাই নওরোজী মহাশয়ের এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের প্রতি মহাত্মা গান্ধী বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত এবং ইঁহারা উভয়েই গান্ধীজী রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে রাজনীতিক হইয়াছিলেন। কয়েক মাস পূর্বে দাদাভাই নওরোজীর যে বৃহৎ জীবনচরিত বিলাতে প্রকাশিত হইয়াছে, গান্ধীজী তাহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকা পড়িলেই ভারতবর্ষের দাদা ও ভাইয়ের প্রতি গান্ধীজীর মনের ভক্তিভাব বুঝা যাইবে। গোখলে মহাশয়ের সম্বন্ধে গান্ধীজী কি মনে করেন, 'রাষ্ট্রবাণী'র লেখক তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন।

ব্যক্তিবিশেষ যত বড়ই হউন, তাঁহার প্রতি ভক্তি অন্য সকলের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিচারের কারণ স্থায়তঃ হইতে পারে না।

—

ভারতবর্ষের "চতুর্বিধ সর্ব্বনাশ"

স্বাধীনতা-দিবসে যে প্রতিজ্ঞা কংগ্রেসীদিগের দ্বারা পঠিত হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক সর্বনাশ করিয়াছে। এফ জী জেমস্‌ নামক জনৈক ইংরেজ মান্দ্রাজে একটি বক্তৃতায় উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় এবং তাহা মহাত্মা গান্ধীর চোখে পড়ায় তিনি ৩রা ফেব্রুয়ারীর 'হরিজন' কাগজে তাহার জবাব দিয়াছেন। জবাবটি ২৮শে জানুয়ারী লিখিত। মিঃ জেমসের প্রতিবাদের ও গান্ধীজীর তাহার উত্তরের আলোচনা আমরা করিব না। উত্তরটির কেবল একটি কথা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। গান্ধীজী লিখিয়াছেন :

"It should be remembered that this part was in the original and has stood without challenge all these ten years."

তাৎপর্য্য। "মনে রাখা উচিত যে, এই (চতুর্বিধ-সর্বনাশ-বিষয়ক) অংশটি মূল প্রতিজ্ঞায় ছিল এবং এই দশ বৎসর ধরিয়া ইহা বিনা প্রতিবাদ ও সমালোচনায় বিদ্যমান আছে।"

গান্ধীজীর এই কথাটি ঠিক্ নয়। তিনি ত সব কাগজ দেখেন না, তাঁহার সেক্রেটরীও সব কাগজ দেখিয়া তাঁহাকে সব কাগজের দ্রষ্টব্য সব অংশ কাটিয়া দেখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দেন না। অতএব এরূপ কথা না বলিলেই ভাল হইত। আমরাও অন্য সব কাগজ দেখিতে পাই না ও পারি না, নিজের সম্পাদিত কাগজেও অন্যের লেখা দূরে থাক্‌ নিজের অনেক লেখা সম্বন্ধেও বিস্মৃতি ঘটে। অনেক আগে স্বাধীনতা-দিবসের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া-

ছিলাম কিনা মনে নাই। কিন্তু ১৩৪৫ সালের ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে উহার আংশিক বিরুদ্ধ আলোচনা করিয়াছিলাম মনে আছে; বর্ত্তমান ১৩৪৬ সালের মাঘ সংখ্যাতেও তাহা করিয়াছি। কিন্তু এই লেখাগুলি বাংলায়,—গান্ধীজীর চোখে পড়িবার কথা নয়।

ইংরেজী মডার্ন রিভিয়ুর বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী সংখ্যা ১৯৩৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর প্রকাশিত ও ডাকে প্রেরিত হয়। সম্ভবতঃ ইহা কিংবা ইহার সম্পাদকীয় অংশ মহাত্মাজীর সেক্রেটরী তাঁহাকে দেখান নাই। ইহাতে স্বাধীনতা-দিবসের প্রতিজ্ঞার বিস্তারিত সমালোচনা আছে। কোন কংগ্রেসী নেতা এই সমালোচনার সমালোচনা করেন নাই। ইহার আগেও কোন বৎসর আমরা হয়ত মডার্ন রিভিয়ুতে স্বাধীনতা-দিবসের প্রতিজ্ঞার সমালোচনা করিয়া থাকিব, কিন্তু তাহা মনে নাই।

গান্ধীজী মিঃ জেমসের প্রতিবাদের যে উত্তর 'হরিজনে' দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোন মন্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং গান্ধীজীর প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। আমরা 'প্রবাসী'তে ও মডার্ন রিভিয়ুতে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। কেবল আমাদের এই সিদ্ধান্তের পুনরুল্লেখ করিতেছি যে, ইহা সত্য নহে যে, ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সর্বনাশ হইয়াছে। ইহাও পুনঃ পুনঃ বলা আবশ্যক মনে করি যে, ব্রিটিশ রাজত্বে যদি ভারতীয়দের কোন দিকেই সর্বনাশ বা ক্ষতি না হইত, তাহা হইলেও আমাদের স্বাধীন হইবার চেষ্টা করা ও স্বাধীন হওয়া আবশ্যক হইত। সুতরাং স্বাধীন হইবার প্রতিজ্ঞার পূর্ণ সমর্থন আমরা করি।

—

সম্পাদক স্টেড্ ও ভারতীয় একবিধ আধ্যাত্মিকতায় ব্রিটেনের সুবিধা

প্রসিদ্ধ মাসিক রিভিয়ু অব রিভিয়ুজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক পরলোকগত উইলিয়ম টি স্টেড্ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বন্ধু ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় যখন বিলাত যান, তখন উভয়ের বন্ধুত্ব হয়। তাঁহার 'আত্মচরিত' বহিতে স্টেড সাহেবের সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যান আছে। একদিনকার আহারের পরের একটি আখ্যান এই :—

আহারের পর আমি আসামের কুলিদের অবস্থা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি চেয়ারে বসিয়া বলিতেছি, ষ্টেড্ ঘরের এধার হইতে ওধারে বেড়াইতেছেন, এবং "তার পর", "তার পর" করিতেছেন। ইহা লইয়া একটা হাসাহাসি উপস্থিত হইল। আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি যে আমাকে জুয়লজিক্যাল গার্ডেনের বাঘের কথা স্মরণ করাইতেছ। একটু বসো না।" ষ্টেড্ বলিলেন, "I cannot make my mind sit down" ("আমি আমার মনকে বসাইতে পারি না"।) আমি হাসিয়া বলিলাম, "আধ ঘণ্টা বসিবে, তাও পার না? আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে চল, আমি দেখাইয়া দিব, আমাদের দেশের সাধুরা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ধ্যানে বসিয়া আছেন।" ষ্টেড্ করতালি দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। আমি ভাবিতাম, এত কোটি মানুষকে আমরা কি করিয়া জিনিয়া লইলাম? এত দিনের পর বুঝিলাম, তোমরা চোখ মুদিয়া থাকিয়াছ, আমরা পশ্চাৎ হইতে মারিয়া লইয়াছি।" ইহা লইয়া খুব হাসাহাসি চলিতে লাগিল।

ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিতে পারিবেন, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সর্বনাশ না করিয়া উহার বর্ধন-চেষ্টা করাতেই ইংরেজদের লাভ!

—

ভারতীয় মুসলমানদের বংশ-পরিচয়

ভারতীয় মুসলমানেরা যে অধিকাংশ স্থলে ধর্মান্তরগ্রাহী হিন্দুর বংশ হইতে উদ্ভূত, এই সত্য কথা বলিলে তাঁহারা অনেকেই চটিয়া যান। অবশ্য কেহ কেহ চটেন না। যাঁহারা চটেন, তাঁহারা বলেন যে, বার-বার মুসলমানদিগকে তাহাদের উৎপত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কী লাভ হয়? আমরা বলি, তাঁহারা ইহা মনে করিয়াও ত খুশি হইতে পারেন যে, হিন্দুরা নিকৃষ্টজাতীয় বলিয়া বাদশাহ নবাব ওমরা ও ভূতপূর্ব্ব বিজেতা জাতির লোকদের সহিত জ্ঞাতিত্ব স্থাপন দ্বারা বড় হইতে চাহিতেছে, এবং ইহা মনে করিয়া হিন্দুদিগকে সকৌতুক কৃপার চক্ষে দেখিতে পারেন। চটিবার কি প্রয়োজন?

মুসলমানেরা যে বংশ-পরিচয়ে চটেন, অল্প দিন আগে তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যথা—

MORADABAD, *Jan.* 31

"Can it serve any useful purpose to remind the Indian Muslims, as Mahatma Gandhi has

done, that they are converts from Hindus ?" asks Sir Raza Ali in the course of a statement to the press. Sir Raza says that to begin with the statement is not quite correct. What about wave after wave of hardy enterprising Muslims who settled in India during several centuries. In any case Mahatma Gandhi and his followers must know that Islam is not a social system but the greatest democratic religion to which the distinction between converts and old adherents is totally unknown.—A. P. I.

তাৎপর্য্য। খবরের কাগজে প্রেরিত একটা বিবৃতিতে সর্ রাজা আলি বলিতেছেন, মহাত্মা গান্ধী যেরূপ বলিয়াছেন যে, ভারতীয় মুসলিমরা ধর্মান্তরিত হিন্দু, তাহা বলিয়া কোন কেজো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কি ? প্রথমতঃ, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অনেক শতাব্দী ধরিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত বহুসংখ্যক দৃঢ়কায় উদ্যমশীল বিদেশী মুসলমান যে ভারতবর্ষে আসিয়া আড্ডা গাড়েন, তাহাদের কথা কি বলিবেন ? আর, যাই হউক, মহাত্মা গান্ধীর ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের জানা উচিত যে ইসলাম একটি সামাজিক পদ্ধতি নহে, ইহা একটি মহত্তম গণতান্ত্রিক ধর্ম যাহাতে প্রাচীন বিশ্বাসীদের এবং ধর্মান্তর হইতে ইহার গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রভেদ অজ্ঞাত।

তাহা বুঝিলাম এবং মানিয়া লইতেও আপত্তি করি না। কিন্তু প্রশ্ন এই, যদি ঐ প্রভেদটা নাই-ই, যদি উভয়বিধ মুসলমানই সমান, তাহা হইলে কাহাকেও ধর্মান্তরিত হিন্দুবংশোদ্ভব বলিলে চটেন কেন ?

বস্তুতঃ বিষয়টি সম্মানের বা অসম্মানের, খুশির বা রাগের ব্যাপার নহে, ইতিহাসের ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের ব্যাপার। ইংরেজরা ত হিন্দু নহে; তাহাদের নৃতত্ত্ববিদেরা এবং সেন্সসের ইংরেজ কর্তারা বলেন যে, পঞ্জাবের দিকের অধিকাংশ মুসলমানও ধর্মান্তরিত ভারতীয় হিন্দুর বংশজাত; ভারতবর্ষের অন্য অংশের ত বটেই।

সর্ রাজা আলি বলিতে চান, আফগানিস্থান, ইরান, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি হইতে আগত মুসলমানদের বংশেই প্রধানতঃ ৭৭,৬৭৭,৬৪৬ ভারতীয় মুসলমানের উদ্ভব। আমরা ইরান, ইরাক, তুরস্ক, আফগানিস্থান, আরব দেশ, সীরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মোট লোকসংখ্যা হুইটেকার্স পঞ্জিকায় দেখিলাম পাঁচ কোটি। তাহার মধ্যে অমুসলমানও কিছু আছে। এই সব দেশ হইতে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কিছু মুসলমান ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ধরিলাম। কিন্তু উহাদের জনসমষ্টির বেশীর ভাগ লোকই ঐ সব দেশেই থাকিয়া গিয়াছিল। সেই বেশীর ভাগ লোকদের বংশবৃদ্ধি হইয়া এখন দাঁড়াইয়াছে পাঁচ কোটিতে এবং অল্প যে-অংশ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহাদেরই বংশ বিস্তার লাভ করিয়া হইয়াছে আট কোটি মানুষ। বিশ্বাসযোগ্য বটে!

যদি বিদেশাগত মুসলমানদের বংশেই সব বা অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে ইরান, আফগানিস্থান, তুরস্ক প্রভৃতি মুসলমান দেশগুলি হইতে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী এবং বিলম্বে বিজিত বাংলা দেশেই অন্য সব ভারতীয় প্রদেশ অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী হইল কি করিয়া ? ইঁহাদের পূর্বপুরুষেরা ঐ সব বিদেশ হইতে কি এরোপ্লেনে ভারতের পশ্চিম ও উত্তরের প্রদেশগুলি ডিঙ্গাইয়া বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ?

—

ডোমীনিয়ন ষ্টেটস ও স্বাধীনতা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কানাডা প্রভৃতি যে উপনিবেশগুলি ডোমীনিয়ন বলিয়া বিদিত, সেগুলি আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রিক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন; ব্রিটেন তৎসমুদয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। যুদ্ধ ব্যতীত বৈদেশিক অন্য সব ব্যাপারে তাহারা স্বাধীন। যুদ্ধ সম্বন্ধেও তাহাদের এই স্বাধীনতা আছে যে, ব্রিটেন কোন দেশের সহিত যুদ্ধ করিলে ডোমীনিয়নগুলি নিরপেক্ষ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহারা ব্রিটেনের শত্রুকে সাহায্য করিতে পারে না, ব্রিটেনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না, এবং ব্রিটেনের কোন মিত্রের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারে না।

ডোমীনিয়নগুলি যাহা করিতে পারে না, এখন সেরূপ কিছু করিবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা ভারতবর্ষের নাই। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাষ্ট্রিক ব্যাপারসমূহে তাহাদের যে প্রভূত স্বাধীনতা, অধিকার ও ক্ষমতা আছে, ভারতবর্ষ তাহা পাইলে এই দেশের অনেক উন্নতি হইতে পারে। ওয়েস্টমিনস্টার স্ট্যাটুট অনুসারে ডোমীনিয়নগুলির ব্রিটেন হইতে স্বতন্ত্র হইবার অধিকারও আছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষের পক্ষে ডোমীনিয়ন

স্টেটস বাঞ্ছনীয় ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু অন্য একটা দিক্‌ও আছে।

ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্য দেশ। ইহার প্রধান প্রধান ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি—সাহিত্য, ললিতকলা, পরিচ্ছদ, রীতিনীতি—ব্রিটেন হইতে পৃথক; ভাষাসমূহ এবং ইতিহাসের ধারাও পৃথক্‌। ইহা ব্রিটেনের উপনিবেশ নহে; ব্রিটিশ প্রভুত্বে ও প্রভাবে ইহার কিছু কু ও সু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিলেও ইহা প্রধানতঃ ব্রিটেনের গড়া জাতির অধ্যুষিত ব্রিটেনের গড়া দেশ নহে। ইহার পক্ষে ব্রিটেনের ডোমীনিয়নত্ব প্রাপ্তি পৃথিবীর ও ইহার নিজের ইতিহাসের স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের পরিণতি নহে। পূর্ণ স্বাধীনতাই সেরূপ পরিণতি। অবশ্য ডোমীনিয়ন স্টেটসের পথেও সেই পরিণতিতে পৌঁছা যায়। কিন্তু সে পথে বাধাও আছে।

দাতার নিকট হইতে যাহা দানস্বরূপ পাওয়া যায়, দাতা সেই প্রদত্ত বস্তুর পরিবর্ত্তন করিতে পারে এবং দানের সময় দানের সর্ত এরূপ করিতে পারে যাহাতে বস্তুটি এখন যেরূপ মূল্যবান মনে হইতেছে সেরূপ মূল্যবান না থাকিতে পারে।

ডোমীনিয়ন স্টেটস ও ওয়েস্টমিনস্টার স্ট্যাটুট ব্রিটিশ জাতির, তাহাদের ঔপনিবেশিকদের ও ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের কৃতি। ইহা তাহারা এমন ভাবে পরিবর্তন করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত ও বর্ধিত কিন্তু আমাদের স্বার্থের হানি হইতে পারে।

আমরা এরূপ একটি জিনিষ চাই, যাহা কোনও বিদেশী আইন-সভা বা (ব্রিটেনের ইম্পীরিয়াল কন্‌ফারেন্সের মতন) মন্ত্রণাসভার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। অবশ্য পৃথিবীর সব বা অধিকাংশ রাষ্ট্রের, কিম্বা সব বা অধিকাংশ গণতন্ত্রের মন্ত্রণাসভায় আমাদের সহযোগিতায় যাহা স্থির হইবে, তাহা মানিয়া লইতে আমাদের আপত্তি হইবে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমুদয় ডোমীনিয়নগুলিতে ক্ষমতা আছে ইউরোপীয়-বংশের লোকদের। তাহারা খ্রীষ্টিয়ান। তাহাদের ভাষা সাহিত্য সভ্যতা সংস্কৃতি পরিচ্ছদ রীতিনীতি ইউরোপীয়। তাহা সত্ত্বেও ডোমীনিয়নগুলির কোন কোনটিতে ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার ইচ্ছা দেখা যায়। আয়ার্‌ নামে বিদিত আইরিশ ফ্রী স্টেট ব্রিটেনের সহিত পূর্ব সম্বন্ধের সমুদয় চিহ্ন ক্রমে ক্রমে লোপ করিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে সে ব্রিটেনকে সাহায্য করিতেছে না। দক্ষিণ-আফ্রিকার বুঅরেরা ডচ্‌-বংশজাত। তাহাদের একটি বড় দল ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকাকে একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে। কানাডাতে যে হঠাৎ পার্লেমেণ্টের সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট জন-আদেশ পাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহার মূলে যুদ্ধে যোগ দেওয়া না-দেওয়া বিষয়ে মতভেদ আছে অনুমান করা যাইতে পারে।

একাধিক ডোমীনিয়নের বিস্তর লোক, প্রধান সকল বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের সদৃশ হইয়াও যখন ব্রিটেন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায়, তখন বুঝিতে হইবে ব্রিটেনের সহিত ডোমীনিয়নত্ব সম্পর্ক তাহাদের কিছু অসুবিধা ও অস্বস্তির কারণ। ভারতবর্ষের লোকেরা কোন দিকেই ইউরোপীয় বা ইউরোপীয়বৎ নহে। সুতরাং ব্রিটিশ-ডোমীনিয়নত্ব তাহাদের অধিকতর অসুবিধা ও অস্বস্তির কারণ হইতে পারে অনুমান করা কঠিন নহে।

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বম্‌ আত্মবশং সুখম্‌। পরবশ যাহা তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ যাহা তাহাতেই সুখ।

ডোমীনিয়ন স্টেটস্‌ আমাদিগকে অনেকটা আত্মবশ করে বটে এবং তাহা সুখের কারণ হইতে পারে, কিন্তু ঐ মর্য্যাদাটার প্রাপ্তিই পরবশ বলিয়া যথোচিত সুখের কারণ হইতে পারে না।

তত্ত্ববোধিনী সভার শতবার্ষিকী হইল না

১৮৩৯ সালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত হয়। ইহা মোটামুটি কুড়ি বৎসর কাজ করিয়াছিল। সেই সময়কার প্রায় সব প্রসিদ্ধ ও কৃতী বাঙালী ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। ইহা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি এবং বাংলা দেশে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চার বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল। ধর্ম্মসংস্কার ইহার যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য

ছিল, তাহার সহিত অনেকের সহানুভূতি না-থাকিতে পারে—যদিও হিন্দুশিরোমণি ভূদেব মুখোপাধ্যায় এ বিষয়েও ইহার কার্য্যের সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার জন্য শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেরই ইহার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য আমরা 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছিলাম যে, ইহার শতবার্ষিকী স্মৃতিসভা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইল না।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও তৎসম্পর্কিত অন্য কোন কোন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সুব্রাহ্মণ মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ" দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। তাহাতে আছে—

"যে সময় কলিকাতার ধনশালী বাবুরা এই রূপে ('শীল্‌স্ কলেজ' ও অন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা) স্বধর্ম্ম রক্ষার চেষ্টা করেন, সেই কালে কয়েক জন ইংরেজীতে কৃতবিদ্য যুবা পুরুষ খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত ইংরেজীতে লিখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। মিসনারী সাহেবেরাও তজ্জন্য উত্তেজিত হইয়া ঐ সকল বিরুদ্ধ মতের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অপর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'ও এই সময়ে বিশিষ্টরূপে আপন বল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তখন ইহার সভ্য-সংখ্যা* আট শতের অধিক হইয়াছিল। এই প্রদেশে বেদবিদ্যা প্রবিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে চারিটি ব্রাহ্মণ সন্তান ঐ সভার ব্যয়ে বারাণসীতে বেদাধ্যয়নার্থ প্রেরিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী উৎসাহশীল যুবকদল মিসনারীদিগের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মের প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐ সময় হইতেই এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের বৃদ্ধির পরিণাম হইল। ইহার পরেও কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্বে ছেলেরা ইংরেজী পড়িলেই খ্রীষ্টান হইবে বলিয়া যে প্রকার ভয় ছিল, ঐ সময় অবধি সেই ভয়ের হ্রাস হইতে লাগিল।"—৪৫ পৃষ্ঠা।

ভূদেব ইহার কারণও বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"এরূপ হইবার বিলক্ষণ কারণই রহিয়াছে। ইংরাজদিগের সংস্রবাধীন এতদ্দেশীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থায় অনেক দোষ আছে বলিয়া বোধ হইতেছিল। উহার সকলগুলিই যে দোষ নয়, পরন্তু এতদ্দেশীয়দিগের বিশেষ উপযোগী তাহা সে সময়ে কোন পক্ষই যুক্তিমুখে দেখিতে পান নাই। অপর কতকগুলি দোষ যাহা হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ সংশোধিত হইয়া যাইতেছে। অপর কতকগুলি—স্বজাতিবিদ্বেষ দলবন্ধনে অক্ষমতা প্রভৃতি প্রকৃত প্রস্তাবে সংশোধনীয় দোষ—এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। সে যাহা হউক, ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়া সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ জন্মে। সুতরাং যতদিন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে উল্লিখিত দোষসমূহের পরিহার হইতে পারে না, তাবৎকাল যে-ধর্ম্মের শাস্ত্রানুসারে ঐ সকল দোষ সংরক্ষিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহা বিদ্বেষের পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন প্রকারে একবার দৃষ্ট হয় যে, জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়াও সামাজিক দোষের সংশোধন হইতে পারে, তবে জাতীয় ধর্ম্ম স্বভাবতই মানুষের শ্রদ্ধা এবং গৌরবের আস্পদ হইয়া থাকে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' কর্ত্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশীয় লোকের সামাজিক দোষ সংশোধনের প্রতিবন্ধক নয়—অথচ উহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে ঐ ধর্ম্মপ্রণালী বৈদিক শিক্ষার প্রাচীন ব্যবস্থাদির উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন যুবকদিগের যে মনোরম হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?"—৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা।

ইহার পর ভূদেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে "প্রধানতম কার্য্য" সম্বন্ধে তখনকার এবং এখনকার কৃতবিদ্য বাঙালীদিগের ধারণা সম্বন্ধে প্রভেদ বুঝা যাইবে।

"তাৎকালিক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীমাত্রেরই অন্তঃকরণে স্বদেশীয় সামাজিক দোষ সংশোধন করাই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম কার্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ইহা সেই সময়ের 'ভারতবর্ষীয় সভা'র কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়। 'ভারতবর্ষীয় সভা'র প্রকৃত উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি এবং ব্যবস্থা-সম্পৃক্ত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তত্তদ্বিষয়ে দেশীয় জনগণের অভিপ্রায় প্রচার করা; কিন্তু সভা ঐ সময়ে আপনাদিগের একমাত্র প্রচারকার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা একজন সুপ্রীম কোর্টের ইংরেজ উকীলকে আপনাদিগের সভাপতি করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং কখন রাজধানী পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিতেছিলেন, কখনও পুলিশের দোষানুসন্ধান করিতেছিলেন, আর কখন বা বিধবা বিবাহের উপায় বিধান, কখন বহুবিবাহ নিবারণ, কখন স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলতঃ 'ভারতবর্ষীয়' এবং 'তত্ত্ববোধিনী' সভার আনুপূর্ব্বিক ক্রমে কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হয় যে, যতদিন 'তত্ত্ববোধিনী সভা' বল প্রকাশ করিতে না পারিয়াছিলেন, তাবৎকাল 'ভারতবর্ষীয় সভা'ও আপন প্রকৃত কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতে পারেন নাই।

---

* ইঁহাদের সকলের নাম কোথাও পাওয়া যায় কি? প্রবাসীর সম্পাদক।

কিন্তু হার্ডিঞ্জ সাহেবের অধিকার কালের মধ্যেই এই উভয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল।

"'তত্ত্ববোধিনী সভা' নব্য দলের ধর্ম্মপ্রণালী সংস্থাপিত করিলেন, এবং একজন সুবিজ্ঞ বাঙ্গালী* (*বাবু রামগোপাল ঘোষ) 'ভারতবর্ষীয় সভা'র সভাপতি হইয়া রাজকার্য্য বিষয়েই সভার স্থির দৃষ্টি জন্মাইলেন। সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, এদেশীয় লোকেরা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, আর ইঁহারা যাহা করিতে পারেন তাহাও অপরের অনুকৃতি মাত্র হয়। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এবং 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' (সভা) এই দুইটিই অপরের সহায়তা অথবা অনুকৃতির ফল নহে। ঐ দুই সভার দ্বারাই হিন্দুসমাজের ভাবী পরিবর্ত্তসমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় মিসনরিদের সহিত অনুক্ষণ সংঘর্ষে হিন্দুসমাজে যে ধর্ম্মসম্বন্ধে ও আচার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তাহার ফলেই সনাতন হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দু আচার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে, হিন্দুয়ানী যে কোন প্রকার প্রকৃত সংস্কার বা উন্নতির বিরোধী নহে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। আবার 'ভারতবর্ষীয় সভা'র অনুষ্ঠিত পথেই দেশময় রাজনৈতিক সভা সকল স্থাপিত হইয়া এদেশীয় লোকদিগকে রাজকার্য্য সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অভিজ্ঞ করিতেছে। কিন্তু এই দুই প্রধান কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্র সহায়তার অপেক্ষা করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল বিষয়ে যাহা করা উচিত, তৎকালে তাহাই করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্ত্ত সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবেই ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।" ৪৬-৪৮ পৃষ্ঠা।

—

কালীপ্রসন্ন সিংহ শতবার্ষিকী

আগামী ২রা মার্চ ১৮ই ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মশতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন করিতেছেন জানিয়া প্রীত হইলাম।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ ও বিনামূল্যে দান করিয়াছিলেন এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লিখিয়াছিলেন, সাধারণতঃ কৃতবিদ্য লোকেরাও তাঁহার সম্বন্ধে ইহার বেশী বড় কিছু জানেন না। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "কালীপ্রসন্ন সিংহ" সম্বন্ধে যে ছোট পুস্তকটি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সিংহ মহাশয় সম্বন্ধে সত্য ধারণা জন্মিবে। বহিখানি ছোট, ৬৪ পৃষ্ঠা পরিমিত, কিন্তু কলেবর অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক অধিক। পুরাতন সংবাদ-পত্র ও অন্যান্য আকর হইতে গ্রন্থকার সিংহ মহাশয় সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংকলন করিয়া বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে উপহার দিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বহিখানিতে একটিও বাজে কথা নাই। এই জন্য অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ মানুষটিকে জীবিতবৎ পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন ত্রিশ বৎসর মাত্র বাঁচিয়াছিলেন। সেই স্বল্প কালের মধ্যে তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

তাঁহার বাল্যজীবনের বৃত্তান্তের পর গ্রন্থকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বহুতথ্যপূর্ণ বিবরণ লিখিয়াছেন :—

বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, সাময়িক-পত্র পরিচালন, পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা, বদান্যতা—শিক্ষা-বিষয়ক দান, সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দান, সংবাদপত্রাদির জন্য অর্থ ও মুদ্রাযন্ত্র দান, দুর্ভিক্ষে দান, জনহিতকর কার্য্যে দান, সমাজসংস্কারার্থ দান—বিচারকের পদে কালীপ্রসন্ন।

গ্রন্থকার উপসংহারে লিখিয়াছেন :—

তাঁহার হৃদয়ের উদারতা, ও স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ, ও শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য ও সমাজসংস্কারে তাঁহার দূরদর্শিতা ও অধ্যবসায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে চিরদিন আমাদের স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

ইহা সত্য কথা।

—

বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানে বুঝাপড়া

কাগজে খবর বাহির হইয়াছিল যে, বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক্ সাহেব কয়েক জন কংগ্রেসী নেতা ও হিন্দুমহাসভার নেতৃস্থানীয় সভ্যের সহিত গোলটেবিল বৈঠক দ্বারা বঙ্গের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানচেষ্টা করিবেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার ও ব্যারিস্টর বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরযুক্ত একটি বিবৃতিও খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। বৈঠক ১০ই ফেব্রুয়ারি আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু পরে খবর বাহির হয় যে, ১০ই আরম্ভ হইবে না, কখন হইবে তাহা পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

[পরে কাগজে দেখিলাম, ২৪শে ফেব্রুয়ারী বৈঠক আরম্ভ হইবে।]

যথোচিত সমাধান হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। তাহা করা সহজসাধ্য নহে, কিন্তু অসাধ্যও নহে। তবে, তাহা করিতে

হইলে হিন্দুদের সম্বন্ধে ন্যায্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সভাপতিত্বে শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লার কলিকাতার বাড়ীতে যে সভা হয়, তাহাতে বঙ্গের হিন্দুদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, যদিও বাঙালী হিন্দুরা বাংলা প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তথাপি তাহারা কৃত্রিম "ওজনবৃদ্ধি" ("weightage") চায় না, শিক্ষা ও সার্বজনিক কর্মোৎসাহে শ্রেষ্ঠতার জন্য এবং অধিকতর ট্যাক্স প্রদাতা বলিয়াও ব্যবস্থাপক সভায় কিছু বেশী আসন চায় না, কেবল তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে যতগুলি আসন প্রাপ্য তাহাই চায়; কিন্তু তখন মুসলমান নেতারা এই অতি ন্যায্য প্রস্তাবেও রাজী হন নাই।

হিন্দুর ন্যায্য স্বার্থ বলি দিয়া কোন সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চাই, সরকারী চাকরীতে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে যোগ্যতমের নিয়োগ চাই, শিক্ষাক্ষেত্রে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে ছাত্রবৃত্তি বণ্টন চাই এবং শিক্ষালয়ে সাহায্যদানও অসাম্প্রদায়িক ভাবে হওয়ার দাবী করি। ঋণসালিসী সম্বন্ধীয় আইন, কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন, প্রভৃতি দ্বারা হিন্দুদের ক্ষতি করা হইয়াছে। সেগুলি রদ হওয়া চাই।

আড়াই বৎসর আগে কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ যদি বঙ্গে কোআলিশ্যন মন্ত্রিসভা গঠনে মত দিতেন, তাহা হইলে বঙ্গের দুঃখ-দুর্দশা যত হইয়াছে, কোন কোন দিকে তাহা অপেক্ষা কম হইত। কিন্তু কংগ্রেস অন্যত্র সেরূপ মন্ত্রিসভা গঠনে মত দিলেও বঙ্গে মত দেন নাই।

—

অত্যাচরিতগণকে গৃহত্যাগ উপদেশ দান

সিন্ধুদেশে স্থক্কুরে ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহে দুর্বৃত্ত মুসলমানেরা বহু হিন্দুকে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করিয়াছে এবং স্ত্রীলোকদের চরম অপমান করিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সরকারী যথোচিত ব্যবস্থা ছিল না। গান্ধীজী এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে, হিন্দুরা যদি সেখানে অহিংস উপায়ে বা সশস্ত্র উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের নিজ নিজ ভিটামাটি চাষের জমী ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া উচিত। সিপাহী দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা তিনি চান না, কেননা তাহা হইবে ব্রিটিশ সামরিক সাহায্য গ্রহণ ("British military aid")। কিন্তু এই সিপাহীদের বেতনাদি, গোরা সৈন্যদের বেতনাদিও, ভারতীয়েরাই দেয়। সিন্ধুদেশে "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সেখানে নাকি জাতীয় গবর্মেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে, এই জন্য উক্ত ব্রিটিশ সামরিক সাহায্য লওয়া চলিবে না। এই অপূর্ব্ব যুক্তির সমর্থন করিতে ও গুণগ্রহণ করিতে আমরা অসমর্থ।

শত শত লোক অন্যত্র জমীজায়গা, ঘরবাড়ী, নূতন করিয়া সংসার পত্তনের টাকা পাইবে মহাত্মাজী ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ গিয়ানা, ফিজি, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি হইতে যে-সব শ্রমিক দেশে ফিরিয়া আসে, তাহাদিগের অনেককেই মাটিয়াবুরুজে পচিতে হয়, তাহারা কোথাও ঠাঁই পায় না। মহাত্মাজীর বোধ হয় একথা মনে ছিল না।

কোন স্থানে অত্যাচরিত ব্যক্তিরা, বা যাহাদের উপর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা আছে তাহারা, যদি অহিংসা নীতির বলে বা বাহুবলে ও অস্ত্রবলে আত্মরক্ষা করিতে না পারে, এবং গবর্মেণ্টও যদি তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা না করে, তাহা হইলে তাহাদের অন্যত্র উঠিয়া যাওয়া উচিত এবং এরূপ উঠিয়া যাওয়ায় কাপুরুষতা নাই, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু খুব কমসংখ্যক লোকেরও, এক জন লোকেরও রক্ষার নিমিত্ত সরকারী ব্যবস্থা কেন হইবে না, সরকারী ব্যবস্থার দাবী কেন হইবে না, বুঝিতে পারি না। তথাকথিত জাতীয় গবর্মেণ্ট প্রদেশগুলিতে হইয়াছে বলিয়া প্রজাদেরই প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে প্রতিপালিত কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের সিপাহীদের সাহায্য পাইবার প্রজাদের অধিকার লোপ পায় নাই।

ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, অত্যাচরিতেরা নিজ নিজ বাসভূমি ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইলে বদমায়েসরা আস্কারা পাইয়া আরও দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিবে।

এখানে ইহা অবশ্যস্মর্তব্য ও অবশ্যবক্তব্য যে, মুক্তুর ও তাহার নিকটবর্তী গ্রামসমূহের সব মুসলমান বদমায়েস নহে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন আক্রান্ত হিন্দুকে আশ্রয় ও অন্যবিধ সাহায্য দিয়াছিলেন। ইঁহাদের ব্যবহার অতীব প্রশংসনীয়।

—

ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবে ও কংগ্রেসের দাবীতে বিশেষ পার্থক্য

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকারের পর যে কম্যুনিকে বা জ্ঞাপনী বাহির হয় ৬ই ফেব্রুয়ারী তাহা দেখিয়া আমরা কিছু মন্তব্য প্রকাশ করি। তখন ব্যাপারটা বেশ ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই বলিয়া আমরা জ্ঞাপনীটিকে ছদ্মাবরণী বলিয়াছিলাম। তাহার পরদিন, ৭ই ফেব্রুয়ারী, গান্ধীজীর বিবৃতি হইতে কিছু বুঝা গেল, আবরণ কিছু উন্মোচিত হইল। মহাত্মাজীর বিবৃতির সারমর্ম গোড়ায় যে কথাগুলিতে আছে তাহা এই :—

কংগ্রেসের দাবী ও বড়লাটের প্রস্তাবের মধ্যে মূল পার্থক্য হইল এই যে, বড়লাটের প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকারই ভারতের অদৃষ্ট চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস ইহার ঠিক বিপরীতটি চাহিতেছে। কংগ্রেসের বক্তব্য হইল যে, ভারতবাসিগণ বাহিরের হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজেরাই ভারতের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করিবে, ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের পরীক্ষা। যত দিন এই পার্থক্য দূর না করা হয় এবং ভারতকে নিজ গঠনতন্ত্র রচনা ও রাষ্ট্রের মর্য্যাদা নির্ণয় করিতে দিবার সময় হইয়াছে, ইহা যত দিন ব্রিটেন স্বীকার না করে, তত দিন ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে কোনরূপ শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক আপোষের কোনও সম্ভাবনা আমি দেখি না। এই পার্থক্য দূর করিলে এবং ব্রিটেন পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিলে দেশরক্ষা, সংখ্যালঘু, রাজন্যবর্গ এবং ইউরোপীয়গণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির সমাধান মিলিবে।

কংগ্রেসের দাবী এবং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট যাহা দিতে চান তাহার মধ্যে প্রভেদ ত আগে হইতেই জানা ছিল। ইহা জানিবার নিমিত্ত মহাত্মাজীর বড়লাটের সহিত দেখা করিবার আবশ্যক ছিল না।

আনন্দবাজার পত্রিকার ও হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের নিজস্ব সংবাদদাতা ৬ই ফেব্রুয়ারী নয়া দিল্লী হইতে ঐ দুই কাগজে যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন তাহাতে কিছু নূতনত্ব আছে। তবে তিনি যে সূত্রে যাহা জানিতে পারিয়াছেন তাহা নির্ভরযোগ্য হইলেই সংবাদগুলির মূল্য আছে, নতুবা নাই। তিনি লিখিয়াছেন :

নয়াদিল্লী, ৬ই ফেব্রুয়ারী

যতদূর জানা গিয়াছে, ওয়েষ্টমিনষ্টারী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের সময় লইয়াই মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাটের মধ্যে আপোষ সম্ভব হয় নাই। প্রকাশ, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য গ্রহণযোগ্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিলে এবং ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনমূলক গঠনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দিলে গান্ধীজী কংগ্রেসকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিতে সম্মত ছিলেন। দেশরক্ষাসম্পর্কিত প্রস্তাব তিনি বিশেষ আলোচনা করেন নাই ; তিনি নাকি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, মূল অবস্থাটি স্বীকার করিয়া লওয়া হইলে. দেশরক্ষা ও অন্যান্য সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি সহজেই সকলের পক্ষে সন্তোষজনক ভাবে মীমাংসা করা যাইবে।

আরও প্রকাশ, মহাত্মাজী ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণ করিবার এবং গণপরিষদ্ দ্বারা নিজ গঠনতন্ত্র রচনার অধিকার স্বীকার করিয়া লইবার দাবী করেন। তদুত্তরে তাঁহাকে নাকি বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবেই ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তবে ভারতীয় জনসাধারণ এবং রাজন্যবর্গ মিলিয়া যথাসম্ভব সর্ব্বসম্মত গঠনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে। ইহাতে মহাত্মাজী পরিতৃপ্ত হন নাই, তাই পরবর্ত্তী কোন সময় পর্য্যন্ত আলোচনা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

স্বাধীনতার সার অংশ পাইলে মহাত্মাজী তাহা লইতে রাজী হইবেন ইহা অনেক আগেই তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন। এবং ডোমীনিয়ন ষ্টেটাসে যে ঐ সার অংশ অনেকটা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে সংবাদদাতার প্রেরিত খবর অনুযায়ী আলোচনা ও অবস্থা ঘটিয়া থাকিলে তাহা নূতন সংবাদ বটে।

—

অগণিত স্থানে স্বাধীনতা-দিবসের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা সভায় স্বাধীনতা-দিবসের প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত ও গৃহীত হয়। এত জায়গায় এই অনুষ্ঠান হইয়াছিল যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উহার বৃত্তান্ত এখনও দৈনিকসমূহে বাহির হইতেছে। ইহা সন্তোষের বিষয়। যে পরিমাণে আমরা কথাগুলি কলের মত উচ্চারণ না করিয়া আন্তরিক বিশ্বাস ও অনুভবের সহিত তাহা করিব এবং প্রতিজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণে স্বাধীনতা নিকটতর হইবে।

প্রতিজ্ঞার অন্তর্গত চরখা ও খাদি সম্বন্ধীয় অংশ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। কংগ্রেসীরা এবং সংবাদপত্রসমূহ সাধারণতঃ "চতুর্বিধ সর্ব্বনাশ" সম্বন্ধে. আমাদের বাংলা

ও ইংরেজী মন্তব্য কার্য্যতঃ বিবেচনার অযোগ্য মনে করিয়া থাকিলেও, সে বিষয়েও মতভেদ আছে। কিন্তু এই উভয়বিধ মতভেদ স্বাধীনতাকে ও স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াকে বিন্দুমাত্রও কম প্রয়োজনীয় প্রমাণ করে না।

—

নোয়াখালির হিন্দুদের উপর অত্যাচারের পুনরভিযোগ

খবরের কাগজে এবং আইন-সভায় ও অন্যত্র বক্তৃতায় এইরূপ অভিযোগ একাধিক বার করা হয় যে, নোয়াখালির হিন্দুদের উপর নানাবিধ অত্যাচার হইয়াছে। অভিযোগ-সমূহের তদন্তের দাবীও করা হয়। তদন্ত এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কেবল হইয়াছে এই যে, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আইন-সভায় একটি বক্তৃতায় অভিযোগগুলি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। সেই বক্তৃতাকে উপলক্ষ্য করিয়া এবং তাহার উত্তরে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি দীর্ঘ বিবৃতি দৈনিক কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে শুধু সাধারণ ভাবে অত্যাচারের অভিযোগ করা হয় নাই, বহু দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে এবং খাজা নাজিমুদ্দিনকে অনেকগুলি চোখা প্রশ্নও করা হইয়াছে। তদন্তের দাবী পুনর্ব্বার করা হইয়াছে। খাজা সাহেবের আগেকার বক্তৃতায় তদন্তের দাবী উড়িয়া যায় নাই। তিনি আবার একটা বক্তৃতা করিলেও পুনরুত্থাপিত দাবী উড়িয়া যাইবে না। নিরপেক্ষ প্রকাশ্য তদন্ত চাই। মন্ত্রীরা তদন্তের ব্যবস্থা করুন। গবর্ণর বাহাদুরও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা শিকায় তুলিয়া না রাখিয়া স্মরণ পালন ও প্রয়োগ করিলে প্রশংসাভাজন হইবেন।

বিবৃতির শেষ কিয়দংশ দৈনিক "ভারত" হইতে নীচে উদ্ধৃত হইল।

কোন অঞ্চলস্থিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার অক্ষমতা সম্পর্কিত গুরুতর অভিযোগ কোন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আনা হইলে, সেই গবর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মন্ত্রী যে তদন্ত করিতে অসম্মত হইতে পারেন, তাহা আমরা ভাবিতেই পারি না। এইরূপ ক্ষেত্রে তদন্তে অসম্মতির অর্থই হইতেছে নিজের নিন্দাবাদ নিজেই করা।

আমরা মনে করি নোয়াখালীতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সেইরূপ অবস্থায় শুধু তদন্তের দাবী উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইলেই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা হয় না; অত্যাচরিতদের দুর্গতি দূরীকরণার্থ দেশের সর্ব্বত্র হইতে যাহাতে সাহায্য আসিতে পারে, তজ্জন্য জনমতকে জাগ্রত করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন হিন্দুদিগের রক্ষার ভার হিন্দুর উপরই ন্যস্ত করেন, যেন এই কাজে তাঁহারা হিন্দুদের বাধা না দেন। আমরা মনে করি, উপদ্রুত অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র রাখা সম্পর্কে বিধানাবলীর কঠোরতা হ্রাস করিয়া হিন্দুদিগকে উহা রাখিবার অনুমতি দিলেই এই কাজ করা হইবে। নিশ্চয়ই যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিরাপত্তা ও বৈধ অধিকার রক্ষায় অক্ষম হইয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাহারা এই অনুগ্রহটুকু দাবী করিতে পারে।

স্বাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বি, সি, চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে আরও বলেন :—

হিন্দু-মুসলিম মতানৈক্য সমস্যার সমাধানকল্পে একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য প্রধান মন্ত্রী উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই একটি স্থায়ী ও সম্মানজনক আপোষের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু ব্যাপার হইতেছে ইহাই যে শুধু মাত্র মিষ্ট এবং আশ্বাসবাণীতে পরিস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন সাধন হইবে না। হিন্দুদের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে—বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দ্বারা যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুদের অন্তঃকরণ তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগকে যদি 'একটি পরিষ্কার শ্লেটে' অঙ্ক কষিতে হয়, তাহা হইলে বহু দাগকে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা নহে, কার্য্যের দ্বারা আমরা অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তন দেখিতে চাই। গোল টেবিল বৈঠক আহ্বানের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরেও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হিন্দুদের অভিযোগ সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত মতামত প্রকাশের ব্যাপারে এখনও ভারতশাসন-আইনের প্রয়োগ অব্যাহতরূপে চলিতেছে। নোয়াখালী-সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। অবিলম্বে এই সমস্ত ব্যাপারের অবসান হওয়া সঙ্গত। নোয়াখালীর ব্যাপার আজ নিখিল বঙ্গীয় সমস্যারূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রিসভা এবং তাহার সমর্থকবৃন্দ জোরপূর্ব্বক ঘোষণা করিতেছেন যে, নোয়াখালীতে অস্বাভাবিক ব্যাপারের কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। আমরা দৃঢ়তার সহিত ইহার নিন্দাবাদ করিতেছি এবং বলপূর্ব্বক এইরূপ ঘোষণার প্রচেষ্টা আর যাহাতে না হয়, সেই জন্য দাবী জানাইতেছি। শান্তি ঐক্য এবং ন্যায়ের নবযুগ প্রবর্ত্তনে প্রকৃতই যদি আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া থাকি, তাহা হইলে সততা এবং সাহসের সহিত সত্য ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইবে।

স্বাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

—

কংগ্রেসী ঝগড়া

বাংলা দেশের কংগ্রেসীদের মধ্যে একাধিক দল অনেক আগে হইতেই ছিল। তাঁহাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও ঝগড়া চলিতেছে। আবার, নিখিলভারত কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সহিতও এক দল বাঙালী কংগ্রেসীর তর্কবিতর্ক

ও ঝগড়া চলিতেছে। খবরের কাগজে বহু বিবৃতি-কাটাকাটিও চলিতেছে। আমরা দুঃখিত চিত্তে দেখিতেছি কিন্তু পড়িয়া উঠিতে পারিতেছি না।

মহাজাতি-সদনকে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির লক্ষ টাকা দান সম্বন্ধে মতভেদ ও তর্কবিতর্ক হাইকোর্টে মোকদ্দমায় পরিণত হইয়াছে।

—

অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স

ইয়োরোপের যুদ্ধে এক পক্ষে ব্রিটেন থাকায় তাহার লাঙ্গুলে বাঁধা ভারতবর্ষও যুদ্ধনিরত দেশ হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় সরকারী নানা রকম খরচ বাড়িয়াছে। সেই ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ভারত-গবন্মেণ্ট নূতন ট্যাক্স বসাইবেন। ট্যাক্সটা বসিবে নানাবিধ শিল্পবাণিজ্যে যে অতিরিক্ত লাভ হইবে তাহার উপর। অতিরিক্ত লাভের শতকরা পঞ্চাশ টাকা সরকার লইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই ট্যাক্সের প্রতিবাদ বহু বণিক-সমিতি করিয়াছেন, নয়া দিল্লীতে আইন-সভাতেও প্রতিবাদ হইয়াছে। হইবারই কথা।

ট্যাক্সটা বসাইবার কারণ এই বলা হইয়াছে, যে, যুদ্ধে ভারত-সরকারের খরচ খুব বাড়িয়াছে ও বাড়িবে, তাহার জন্য টাকা চাই। কিন্তু ব্রিটেনের সহিত জার্ম্মেনীর যুদ্ধে ভারতবর্ষকে যে টানা হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষের মত না লইয়া করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগ দিতে চায় কি না তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল না, অথচ যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত খরচ হইতেছে বলিয়া তাহাকে অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হইবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। সত্য বটে, ইহা সর্ব্বসাধারণকে দিতে হইবে না, বড় বড় কারখানা-মালিক ও ব্যবসাদারদিগকে দিতে হইবে। কিন্তু তাহারা জিনিষের দাম বাড়াইয়া ট্যাক্সটা ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে না কি?

অতিরিক্ত যুদ্ধব্যয় যে হইবে, তাহার উপর ভারতীয় জনসাধারণের বা উক্ত ট্যাক্সদাতাদের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নাই ও থাকিবে না। টাকা যাহারা দিবে ব্যয়নিয়ন্ত্রণ তাহারা করিতে পারিবে না, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে।

সাধারণতঃ সামরিক ব্যয় যত হয় তাহার ফলে খুব বেশী লাভবান হয় উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি অঞ্চল, অথচ সামরিক ব্যয়ের টাকাটা উঠে সমগ্র ভারতবর্ষে সংগৃহীত ট্যাক্স হইতে। প্রস্তাবিত অতিরিক্ত ট্যাক্স ও তাহার ব্যয় সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ইহা আর একটা অন্যায়।

এই অতিরিক্ত-লাভ-ট্যাক্স বসিলে নূতন নূতন কারখানা ও ব্যবসাতে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা টাকা খাটাইতে ইতস্ততঃ করিবে—নূতন কারবারে তাহারা টাকা অবাধে ফেলিবে না। ইহা দেশের শিল্পবাণিজ্য বিস্তারের প্রতিবন্ধক হইবে।

যুদ্ধের জন্য যেমন কোন কোন শিল্পবাণিজ্যে অতিরিক্ত লাভ হইবে, সেইরূপ অন্য কতকগুলিতে লোকসান বাড়িবে। অতএব, সরকার যেমন লাভের ভাগ চান, সেইরূপ লোকসানেরও অংশী হওয়া সরকারের উচিত। যাহাদের ক্ষতি হইবে তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্যও একটা আইন হওয়া উচিত।

বিলাতী অতিরিক্ত-লাভ-ট্যাক্স এদেশে ওরূপ ট্যাক্সের নজীর হইতে পারে না। কারণ যুদ্ধ করা না-করা এবং যুদ্ধব্যয় সম্বন্ধে তাহাদের মতামত দিবার অধিকার আছে, আমাদের নাই।

—

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিকী

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বরাহনগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি তথাকার কলের শ্রমিকদের সকল প্রকার দুঃখদুর্গতি মোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রমিকেরা যাহাতে কলের মালিকদিগের নিকট হইতে উপযুক্ত বেতন পায় এবং যাহাতে তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে না হয়, তাহার চেষ্টা তিনি করিতেন। সেই চেষ্টা যাহাতে সফল হয়, তাহার নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহাদিগকে একঘেয়ে কঠোর শ্রম করিতে হয়, কোন প্রকার নেশা করিয়া একটু আরাম ও আমোদের লালসা তাহাদের প্রবল হয়। এই কারণে কলকারখানার শ্রমিকরা অনেকে মদ খাইতে অভ্যস্ত

হয়। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগরের শ্রমিকদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস নির্মূল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, অন্য সকল রকমেও তাহাদিগকে সচ্চরিত্র ও সুনীতিপরায়ণ হইতে উপদেশ দিতেন। তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, লাইব্রেরি ও ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সঞ্চয়ী করিবার নিমিত্ত সেভিংস ব্যাঙ্ক খুলিয়াছিলেন, এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত ধর্ম্মোপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তিনি "ভারত শ্রমজীবী" নামক একখানি মাসিক কাগজ ছাপাইতেন ও সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিতেন। তাহার অনেক হাজার গ্রাহক হইয়াছিল—কেহ বলেন ৮।১০ হাজার কেহ বলেন ১৫ হাজার। তখনকার কথা দূরে থাকুক, বর্ত্তমান সময়েও শ্রমজীবীদের জন্য ওরূপ মাসিক পত্র নাই।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল শ্রমিকদের কল্যাণের জন্যই চেষ্টা করেন নাই; বিধবা নারীদের হিতার্থও নিজের শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্য আশ্রম স্থাপন করিয়া তাঁহাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাহাতে স্বাবলম্বিনী হইতে পারেন, তিনি তাঁহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতেন। যাঁহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের বিবাহের চেষ্টাও করিতেন।'

তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। সমুদয় ধর্ম্মের সত্যের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁহার উদার ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস অনুসারে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "দেবালয়" নামক ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্য পরিচালিত হয়।

তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী কলিকাতায় ও বরাহনগরে গত মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

—

কৃত্তিবাস-স্মৃতি-উৎসব

৩০শে মাঘ শ্রীপঞ্চমী বলিয়া ফাল্গুনের এই প্রবাসী ১লা ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে। ২৮শে মাঘ রবিবার। সেই হেতু এই সংখ্যার ছাপার কাজ সত্বর শেষ করিতে হইবে। কৃত্তিবাস-স্মৃতি-উৎসবের তারিখ ২৮শে মাঘ। অতএব ইহার বৃত্তান্ত যদি কিছু লিখিতে হয় তাহা চৈত্রের প্রবাসীতে লিখিতে হইবে। শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে ফুলিয়া গ্রামে এবারেও যে এই উৎসবের আয়োজন হইয়াছে তাহা সন্তোষের বিষয়।

—

খাদ্যের বিচার

'আমাদের দেশে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে। খাদ্য বিষয়েও নানা সংস্কার আছে। এমন লোক আছেন, যাঁহারা কোন প্রকার আমিষ দ্রব্য ভোজন পাপ মনে করেন। অন্য অনেকে আছেন কোন কোন মাংস ভোজন যাঁহাদের ধর্ম্মমতে নিষিদ্ধ, অপর কোন কোন মাংস ভোজন বৈধ। আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যের আপেক্ষিক পুষ্টিকারিতার বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইতে পারে, হওয়া উচিতও বটে—বিশেষতঃ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। কিন্তু এদেশে আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য ও ভিন্ন ভিন্ন মাংস সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার থাকায় শিক্ষালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকে অমুক মাংস সুখাদ্য, এরূপ না-লেখাই ভাল। তাহাতে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিবার ও অপরের সংস্কারে আঘাত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

ইংরেজরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী। মানুষের খাদ্য কোন মাংসই তাঁহাদের ধর্ম্মমত অনুসারে নিষিদ্ধ নহে। তাহাদের দেশে বেকন এণ্ড এগ্‌স্ উপাদেয় প্রাতরাশ বিবেচিত হয়। তাহারা ভারতবর্ষের শাসক। কিন্তু তা বলিয়া তাহারা সরকারী বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে ইহা লেখায় নাই যে, লবণাক্ত শুষ্ক বরাহমাংস ও ডিম্ব অতি সুখাদ্য। তাহা লিখাইলে খ্রীষ্টিয়ান, সাঁওতাল ও শিখদের আপত্তি হইত না, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের আপত্তি হইত। সেইরূপ যদি লেখা হয় গোমাংস অতি সুখাদ্য, তাহা হইলে খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদের আপত্তি হইবে না, কিন্তু হিন্দু ও শিখদের প্রাণে আঘাত লাগিবে। অতএব প্রভুত্ব-ক্ষমতাশালী হইয়াও ইংরেজরা যাহা করায় নাই, অনুগ্রহপ্রাপ্ত অল্প ক্ষমতা পাইয়া অন্য কাহারও সেরূপ

করা উচিত নয়। তাহাতে লাভ কিছুই হয় না, জাতীয় ক্ষতি প্রভূত।

—

ঢাকেশ্বরী মিলে ধর্ম্মঘট

আমরা কোন মিলেই ধর্ম্মঘটের পক্ষপাতী নহি। শ্রমিক ও ধনিকে মতভেদ ও বিবাদ আপোষে আলোচনা দ্বারা মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা শক্তির শেষ সীমা পর্য্যন্ত করা উচিত। যেখানে শ্রমিক ও মিল-মালিকেরা এক-জাতীয় সেখানে মিটমাট অপেক্ষাকৃত সহজেই হওয়া উচিত। ঢাকেশ্বরী মিল বাঙালীদের, ইহার সব কর্ম্মচারী ও শ্রমিক বাঙালী। এখানে শ্রমিক নেতারা মিটমাটে সম্পূর্ণ মন দিলে এবং মালিকেরাও সেই চেষ্টা করিলে ফললাভ হওয়াই উচিত। ঢাকেশ্বরী মিল লাভজনক কারখানার একটি সুদৃষ্টান্ত। ইহার কর্তৃপক্ষ বঙ্গে কাপাসের চাষের চেষ্টাও খুব করিতেছেন। ইহার কাজে কোন প্রতিবন্ধক উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়।

ইহার শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষ কাহাকেও দোষী করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই।

—

বঙ্গে পানীয়-জল-সমস্যা সমাধান চেষ্টা

গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইতে না-হইতে বঙ্গের নানা স্থানে জলকষ্ট উপস্থিত হয়—বিশেষতঃ পানীয় জলের। অন্য ঋতুতেও যে ভাল পানীয় জল সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, তাহা নহে। ফলে মানুষ ও গবাদি পশুর প্রভূত কষ্ট হয় এবং নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। শোনা যাইতেছে, বাংলা-সরকার সমগ্র প্রদেশটির পানীয় জল সরবরাহের একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করিবেন যাহার ব্যয় হইবে দেড় কোটি টাকা। এই টাকা ঋণ লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইবে। তাহা হইলে বঙ্গের খুব উপকার হইবে।

—

পশ্চিম-বঙ্গের অরণ্যানী

কোন দেশের বা অঞ্চলের অরণ্য কাটিয়া নষ্ট করিলে তাহার অনেক জমীর উপরকার উদ্ভিদ-পুষ্টিদায়ক স্তর বৃষ্টিতে ক্রমশঃ ক্ষয় পায় এবং জমী অনুর্ব্বর হয়, বন্যার আধিক্য হয়, অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে, এবং তথাকার অধিবাসীদের জ্বালানি কাঠ এবং গৃহ ও আসবাব নির্মাণের কাঠ দুষ্প্রাপ্য হয়। এই সব কুফল নিবারণের জন্য আইন করা আবশ্যক হয়। পশ্চিম-বঙ্গে এইরূপ অরণ্যধ্বংস অনেক জায়গায় হইয়াছে। প্রতিকার কি হইতে পারে, অনুসন্ধানপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে রিপোর্ট দিবার নিমিত্ত বাংলা-সরকার ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে একটি কমীটি নিযুক্ত করেন। কমীটি রিপোর্ট দিয়াছেন। কমীটির চেয়ারম্যান ছিলেন বর্দ্ধমান ডিবিজনের কমিশনার এবং তের জন সভ্যের মধ্যে তিন জন ছিলেন সরকারী কর্মচারী, দশ জন বেসরকারী লোক। রিপোর্টটি বিবেচনা করিয়া জমিদার ও প্রজা কাহারও অনিষ্ট যাহাতে না হয় এরূপ একটি আইন প্রণীত হইলে দেশের কল্যাণ হইবে। অরণ্যানী সংরক্ষণ এবং যে-যেখানে অরণ্য নষ্ট হওয়ায় কুফল হইয়াছে সেখানে আবার আরণ্যবৃক্ষরোপণ করিবার নিমিত্ত বিহারে আইন হইয়াছে। তাহার সুফল ও কুফল বিবেচনা করিয়া গুণ রক্ষা ও দোষ পরিহারপূর্ব্বক বঙ্গের আইনটির মুসাবিদা হওয়া উচিত।

—

রুশিয়ার ভারত আক্রমণ আশঙ্কা

ব্রিটেনের পক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত কয়েক বার বলা হইল যে, রুশিয়া ভারত-আক্রমণ উদ্দেশ্যে আফগানিস্থানের কিংবা ইরানের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে, এই গুজব মিথ্যা। তাহা হইলেই ভাল! কিন্তু বার-বার প্রতিবাদের অর্থ ও প্রয়োজন কি?

—

পোল্যাণ্ডে বাঙালী অধ্যাপক

পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওআর্স তে অবস্থিত পিলসুদ্স্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হিরন্ময় ঘোষাল জীবিত আছেন ও তাঁহার কোন বিপদ ঘটে নাই জানিয়া সুখী হইয়াছি। যখন জার্মানরা পুনঃপুনঃ বোমাবর্ষণ করিয়া ঐ নগর ধ্বংস করে, তিনি তখনও পলায়নের চেষ্টা করেন নাই। তিনি 'প্রবাসী'র হিতৈষী। ইহার বিবিধ প্রসঙ্গের একটি চয়নিকা প্রস্তুত করিতে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন।

—

ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবসম্বন্ধে গান্ধীজীর বিলাতে তার

লণ্ডন, ৮ই ফেব্রুয়ারী

'ডেলী হেরাল্ডে'র নিকট নিজের স্বহস্তে এক তারে গান্ধীজী বলিয়াছেন, বড়লাটের সহিত তাঁহার আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং স্বাজাতিক ভারতের মধ্যে এখনও বিস্তৃত ব্যবধান বিদ্যমান। যাহা ব্রিটিশ সরকার দিতে চান, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে।

গান্ধীজী লিখিয়াছেন, "বাস্তবের দাবী এই যে, ভারতবর্ষই তাহার নিজের প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করিবে, ব্রিটেন নয়। অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিতে হইলে ব্রিটেনের পক্ষে ন্যায়পরায়ণ হওয়া প্রয়োজন। ইহার অর্থ এই যে, গণপরিষদ বা উহার সমতুল্য কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচিত হওয়া উচিত। ডোমীনিয়নগুলি ও ভারতের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। ভারতের ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেই ভাবেই তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া রাখা উচিত যে, প্রত্যেকটি সমস্যা ব্রিটেনের নিজের সৃষ্টি।"

উপসংহারে গান্ধীজী বলিয়াছেন, "ব্রিটেন যখন একটা প্রবল চেষ্টায় ভারতবর্ষের উপর তাহার নীতিবিগর্হিত আধিপত্য ত্যাগ করিবে, তখন ব্রিটেনের নৈতিক জয় নিশ্চিত হইবে; দিনের পর যেমন রাত্রি আসে, তেমনি ভাবে জয় আসিবে; কারণ, সমগ্র জগতের বিবেক-বুদ্ধি তখন তাহার পক্ষে থাকিবে। এখন যেরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেরূপ কোন সাময়িক ব্যবস্থা দ্বারা ভারতবর্ষের হৃদয়ে বা বিশ্বের বিবেকে সাড়া জাগান যাইবে না।" —রয়টার

গান্ধীজী অল্প কথায় ভারতীয় স্বাজাতিকদিগের বক্তব্য বিশদভাবে বলিয়াছেন।

—

ভারতীয়দিগকে লইয়া বিমানবাহিনী গঠন

নয়াদিল্লী, ৮ই ফেব্রুয়ারী

ভারতের বৃহত্ত্ব, জনসংখ্যা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের বিমান-বহর শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় যুবকগণকে বৈমানিকের কার্য্যে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দান ও ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি অকজিলিয়ারী (সহায়ক) এয়ার ফোর্স গঠনের জন্য সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়া স্যর রেজা আলীর উত্থাপিত একটি প্রস্তাব অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বিনা ডিভিজনে গৃহীত হয়।

স্যর রেজা আলী বলিয়াছিলেন যে, প্রস্তাব সম্বন্ধে ডিভিজন দাবী করা হইলে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের নিরপেক্ষ থাকিয়া প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত। দেশরক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ওগিলভি ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য এবং গৃহীত হইয়াছেও। কিন্তু সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের সময় মিঃ ওগিলভি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও আর্থিক অনটনের কথা তুলিয়াছিলেন সুতরাং বিমানবাহিনী গঠিত হওয়া অপেক্ষা না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক মনে হইতেছে।

—

পোল্যাণ্ডে নাৎসী নিষ্ঠুরতা

পোল্যাণ্ডে নাৎসী জার্ম্যানদের নিষ্ঠুরতার বৃত্তান্ত দৈনিক কাগজে মধ্যে মধ্যে বাহির হইতেছে। পাঠকেরা তাহা পড়িয়াছেন। পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

—

অন্ধ বালিকার কৃতিত্ব

শ্রীমতী সাবিত্রী রায় চৌধুরাণী নাম্নী একটি অন্ধ বালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অন্ধ বালিকাদের মধ্যে বঙ্গে বোধ হয় তিনিই প্রথমে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। অন্ধ বালক সম্প্রতি এবং আগেও কেহ কেহ এই পরীক্ষায় ও উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এক জন এম্-এ পাস করিয়া কলেজে অধ্যাপকতা এবং অন্য এক জন বালিকা-বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারি করিতেছেন।

অনেক অন্ধ নানাবিধ কারুকার্য্য ও ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, কেহ কেহ সঙ্গীতপটুতা দ্বারা স্বাবলম্বী। অন্ধ হইলেই অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে এমন নয়। তবে, তাহারা শিক্ষা না পাইলে স্বাবলম্বী হইতে পারে না। তাহাদের শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা বঙ্গে নাই। বেহালার বিদ্যালয়টি বেশ ভাল। কিন্তু বঙ্গে শিক্ষার্থী অন্ধ বালকবালিকা যত আছে, ইহাতে তাহাদের স্থান হয় না, হইতে পারে না।

—

শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবার উদ্যম

শ্রীনিকেতনের গত বার্ষিক উৎসবের দ্বিতীয় দিনে স্বাস্থ্যসমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর বিনোদবিহারী সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবা-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। বীরভূমের মত দরিদ্র জেলাতেও কাজ যেরূপ হইয়াছে, তাহা সমৃদ্ধতর ও বৃহত্তর জেলাগুলির অনুকরণীয়।

গ্রামবাসিগণ সমবায় প্রণালীতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সস্তায় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন, ইহা আমাদের উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই সম্পূর্ণ নহে। প্রত্যেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়ার কারণগুলি দূর করিবার জন্য ক্রমাগত সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই হইল আমাদের প্রধান লক্ষ্য। গ্রামবাসীদের মধ্যে যদি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান উন্মেষিত না হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট হইতে যত অর্থই ব্যয় করুক না কেন, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। সেই জন্য যে ঋতুতে রোগ কম থাকে, সেই সময় সমিতির ডাক্তারগণ গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্যজ্ঞান প্রচারে বিশেষ মনোযোগ দিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। এ বিষয়ে আমরা বার বার চিকিৎসকদের নিকট নির্দ্দেশ দিয়াছি। গত বৎসর স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে পল্লী-সমিতির সভ্যগণের চেষ্টায় নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি হইয়াছে—

(১) ড্রেন মেরামত—১২৫৮৩ গজ, প্রায় সাত মাইল, (২) রাস্তা মেরামত—৩,৩১৪ গজ (২ মাইল), (৩) ডোবা-ভরাট—৬টি, (৪) পুকুর পরিষ্কার—৫০টি, (৫) কেরোসিন ছিটান—৪ মণ ১ সের, (৬) কুইনাইন খাওয়ান—৪ পাঃ, ১২ আঃ ৩ ড্রা, ৩৭ গ্রেন, (৩৬,৬৯৭), (৭) স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা—৪০টি, (৮) ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতা ১৪টি, (৯) জঙ্গল পরিষ্কার—১৫ বিঘা।

উপসংহারে কালীমোহন বাবু বলেন :—

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, স্বাস্থ্যের সহিত অন্নের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক গ্রামে যে সকল জঙ্গল রহিয়াছে, তাহা বিনষ্ট করিয়া সেই স্থানে প্রত্যেক গৃহস্থ যাহাতে ফলের বাগান এবং সজ্জীর চাষে মনোযোগী হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা একান্ত আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে শ্রীনিকেতন হইতে গ্রামে গ্রামে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।

এই জিলায় অসংখ্য সেচের পুষ্করিণী ভরাট হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে তাহাতে একহাঁটু জল থাকে এবং জঙ্গল হয়। তাহাতে প্রচুর মশা জন্মাইয়া ম্যালেরিয়ার বিস্তার করে। এই সকল সেচের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিলে অন্ন এবং স্বাস্থ্য দুয়েরই ব্যবস্থা হইবে।

কালীমোহনবাবুর কার্য্যবিবরণ পাঠ সমাপ্ত হইবার পর শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য-সমিতিগুলির উপকারিতা ও সেগুলি বাঁচাইয়া রাখিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় এই প্রচেষ্টার যথোচিত প্রশংসা করেন। গ্রামবাসী বহু ব্যক্তি আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।

—

উত্তরপশ্চিম সীমান্তে উপদ্রব

উত্তরপশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় লোকদের দ্বারা ব্রিটিশ-অধিকৃত স্থানসমূহের হিন্দু ও শিখদের উপর নরহত্যা, লুণ্ঠন, পুরুষ ও নারী হরণ প্রভৃতি অত্যাচার পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর প্রবলতম জাতিদের সহিত যুদ্ধে পাল্লা দিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা উপজাতীয় কতকগুলা লোককে সায়েস্তা করিতে অসমর্থ, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। তাহারা যে কেন সায়েস্তা হয় না, সে বিষয়ে অনুমান করিয়া লাভ নাই। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, শিখ-রাজত্বকালে তাহারা সায়েস্তা ছিল।

—

ভেষজ-বিদ্যা কলেজে প্রতিশ্রুত দান বাংলা পাইল না

বোম্বাইয়ের ডাক্তার আঙ্কলেসেরিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে ভেষজ-বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য একটি কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলা-সরকারকে দুই লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলা-সরকার এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুব বিলম্ব করায় তিনি বোম্বাই সরকারকে তাঁহার পরিকল্পনা বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বাংলা-সরকারের অবহেলার জন্য কলিকাতা এই দানের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতের প্রথম ভেষজ-বিদ্যা কলেজ প্রতিষ্ঠার সুবিধা ও গৌরব হইতে বঞ্চিত হইতে যাইতেছে। জানা গিয়াছে যে, বোম্বাই-সরকার ডাক্তার আঙ্কলেসেরিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী কলেজ স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বাংলা-সরকার কর্ত্তৃক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি ডাঃ আঙ্কলেসেরিয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন।

বাংলার মন্ত্রিসভায় যাঁহারা সংখ্যায় বেশী ও অধিকতর প্রভাবশালী তাঁহাদের এরূপ কলেজ স্থাপনে উৎসাহ দেখাইবার কোন কারণ দেখা যায় না। ইহার দ্বারা তাঁহাদের নিজের, তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদের এবং নিজ সম্প্রদায়ের কোন সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধি হইত না।

—

সিনেমা ও সুনীতি

সিনেমা দ্বারা শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে, বিজ্ঞান ও অন্য নানা বিষয়ে জ্ঞান বাড়ান যাইতে পারে, এবং নির্দোষ

চিত্তবিনোদনও হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ স্থূল রকমের আমোদ দিবার আয়োজনই সিনেমায় করা হয়। তাহাও অনেক সময় অনাবিল নহে। এই নিমিত্ত, সিনেমায় যে-সকল চিত্র প্রদর্শিত হয়, তাহার নৈতিক দিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

আমেরিকায় লোকদের সকল বিষয়েই উদ্যোগিতা আছে। এক দিকে যেমন তথাকার হলিউড সিনেমা-চিত্র-প্রস্তুতি বিষয়ে নামজাদা, সেইরূপ খারাপ চিত্র দ্বারা যাহাতে জাতীয় চরিত্র কলুষিত না হয়, সেদিকেও সেখানকার অনেক লোকের প্রখর দৃষ্টি আছে। কুফল নিবারণের জন্য বৃহৎ বৃহৎ সমিতি আছে। আমেরিকায় অনেক রোম্যান ক্যাথলিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সিনেমায় মন্দ চিত্র দেখে না।

আমাদের দেশে গবর্মেণ্টের বা দেশের নেতাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি নাই। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্র ফেডারেশনকে, ছাত্র ধর্ম্মঘটকে ভয় করেন, দুর্নীতিকে মনে মনে না-পছন্দ করিলেও তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে পারেন না। দৈনিক কাগজগুলি এ বিষয়ে যথেষ্ট দেশহিত করিতে সমর্থ। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন না।

মান্দ্রাজের গার্ডিয়ান নামক কাগজে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের দর্শনযোগ্য, অভিভাবকদের সহিত অপ্রাপ্তবয়স্কদের দর্শনযোগ্য, এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের দর্শনযোগ্য চিত্রের তালিকা বাহির হয়। কলিকাতায় এবং অন্যত্রও এইরূপ তালিকা কোন কোন কাগজে বাহির হইলে উপকার হয়।

গত মাঘ মাসে করাচীর জেলা মাজিস্ট্রেট হুকুম দিয়াছেন যে, চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে সিনেমা ও থিয়েটারে এবং জনতার আমোদ-প্রমোদের স্থানে যাইতে পারিবে না; ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাহাদের ধাত্রী বা পরিবারস্থ কোন বয়স্কলোক থাকিলে তাহারা যাইতে পারিবে।

এই রকম আদেশ দ্বারা বাঞ্ছিত ফল কতটা পাওয়া যাইবে, তাহার আলোচনা এখানে করিব না। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে সকল প্রকার কুপ্রভাব হইতে রক্ষা করা যে একান্ত আবশ্যক, সে-বিষয়ে জাতিধর্ম্ম-নির্বিশেষে সমুদয় গৃহস্থের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

—

আমেরিকায় যৌগিক ব্যায়াম প্রদর্শন

শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ যৌগিক ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর গোস্বামী এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীযুক্ত প্রামাণিক আমেরিকায় তাঁহাদের যৌগিক নানা প্রক্রিয়া দেখাইয়া দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তাঁহারা যে-সকল প্রক্রিয়া দেখান, তাহা কেবল বিস্ময়কর নহে। স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং বহু রোগের চিকিৎসাও তদ্দ্বারা হইতে পারে।

—

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত ডক্টর শান্তিময় মৌলিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিতেছেন। পৃথিবীর সমুদয় প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা হওয়া উচিত। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য তাহার যোগ্য।

—

নয়াদিল্লীর চিত্রশালার বঙ্গীয় বিভাগ

নয়াদিল্লীতে তথাকার ললিতকলা-সমিতির উদ্যোগে যে ভারতীয় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার বঙ্গীয় অংশ নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয় কলিকাতার বিখ্যাত লাহা-পরিবারের চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার বংশের এবং তাঁহার নিজের চিত্রকলায় আত্মনিয়োগের যোগ্য কার্য্য হইয়াছে। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও অর্থনীতির গবেষক ও তত্তদ্বিষয়ে উৎসাহদাতা শ্রীযুক্ত ডক্টর বিমলাচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত ডক্টর সত্যচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার নাম শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহাও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া যশস্বী হইলেন।

—

যুক্তপ্রদেশে শিক্ষাসম্মেলনের বঙ্গভাষা-শাখার অধিবেশন

গত বড় দিনের সময় লক্ষ্ণৌতে অখিল ভারত শিক্ষা-সমিতির পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন এবং যুক্ত-প্রাদেশিক মাধ্যমিক শিক্ষাসমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই উভয় অধিবেশনের সংশ্রবে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ অপরাপর শাখা-সম্মেলনের সহিত একটি বাংলা-শাখা সম্মেলনেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশীয় মাধ্যমিক শিক্ষা-সমিতির কর্ম্মসচিব রায় সাহেব অধ্যাপক দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় উক্ত শাখার সম্মেলনের সভাপতির এবং শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার লাহিড়ী সম্পাদকের কাজ করেন। তাঁহারা উভয়ে সারগর্ভ ও মননশীলতার পরিচায়ক বক্তৃতা করেন। সম্মেলনে নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। এই প্রদেশের যে সকল বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইতে পারে সেই সব বিদ্যালয় বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীগণের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে এই সভা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে।

২। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা পুনর্নির্দ্ধারিত হউক।

৩। হিন্দী ও উর্দ্দুর ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাকেও পরীক্ষার মাধ্যম বলিয়া গ্রহণ করা হউক।

৪। এই প্রদেশে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে মাতৃভাষাকে আবশ্যিক বিষয় করা হউক।

৫। উচ্চ বিদ্যালয়ের মাতৃভাষার শিক্ষকদিগকে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া হউক ও তাঁহাদের সহিত বেতন ও পদমর্য্যাদায় বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদিগের যে একটা পার্থক্য রহিয়াছে তাহার বিলোপ সাধনের জন্য এই সভা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া আগামী বৎসরের জন্য কমিটি গঠিত হয়:—

শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য, বেঙ্গলীটোলা হাইস্কুল, কাশী; শ্রীযুক্ত যোগেশপ্রসাদ সেন, এ-বি কলেজ, কাশী; শ্রীযুক্ত রাধারমণ চক্রবর্ত্তী, এ-বি কলেজ, এলাহাবাদ; শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এংলো সংস্কৃত স্কুল, লক্ষ্ণৌ; শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার লাহিড়ী, বেঙ্গলীটোলা হাইস্কুল, কাশী (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত শোভা বসু, বালিকা বিদ্যালয় কলেজ, কানপুর; শ্রীযুক্তা প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ বালিকা বিদ্যালয়, কাশী।

এই সমুদয় প্রস্তাব সকল প্রকারে সমর্থনযোগ্য।

—

"উদ্ভিজ্জ" ঘৃত

বাজারে ভেজিটেবল (উদ্ভিজ্জ) ঘী বলিয়া যে জমাট তেল বিক্রী হয়, তাহা সকল স্থলেই উদ্ভিজ্জ কিনা বলা যায় না, কিন্তু তাহা, দামে সস্তা হইলেও, খাদ্যদ্রব্য হিসাবে যে খাঁটি ঘীর কাছ দিয়াও যায় না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি যদি সেই সব তথাকথিত ঘী শুধু উদ্ভিজ্জ ঘী বলিয়াই বিক্রী হইত তাহা হইলে বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু ঐ সব "ঘী" খাঁটি ঘৃতে ভেজাল দিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হওয়ায় বড় অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। এই কারণে ঐ সকল জিনিষের উৎপাদকেরা যাহাতে উহার রং প্রকৃত ঘৃতের রং হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দিতে বাধ্য হয়, তাহার জন্য আইন হওয়া উচিত। শরীরের পক্ষে অনিষ্ট-কর নহে এরূপ রং উহাতে মিশান যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় আইনসভা ও প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের এই বিষয়টিতে মন দেওয়া আবশ্যক।

—

মোটর চালাইবার নিমিত্ত গ্যাসের ব্যবহার

বাঙ্গালোরের ভারতীয় সায়েন্স ইনষ্টিটিউটের বর্ত্তমান ডিরেক্টর ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ঢাকায় যখন রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন তখন তাঁহার সহকর্ম্মী অন্য এক জন অধ্যাপকের সহযোগিতায় মোটর গাড়ী চালাইবার জন্য গ্যাসের ব্যবহার করা যায় কিনা তদ্বিষয়ে গবেষণা করিয়াছিলেন। সেই গবেষণার সাহায্যে বিলাতে আরও গবেষণা হইয়াছে। তাহার ফলে মোটর গাড়ী চালাইতে গ্যাসের ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে। তাহাতে পেট্রল অপেক্ষা খরচ অনেক কম হইবে।

—

কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা

কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে, মানুষের যাহাতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বাড়ে, শুধু এইরূপ গবেষণাই যে হয়, তাহা নহে; এরূপ গবেষণাও হইয়া আসিতেছে যাহার দ্বারা মানুষের নানা শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয় এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়সাধ্য হয়। এরূপ

অনেকগুলি গবেষণা ও আবিষ্কারের সংবাদ সম্প্রতি দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে।

—

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের রজত জুবিলি

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার রজত জুবিলির আয়োজন হইতেছে। সেই উপলক্ষ্যে নানা দিকে ইহার বহু কৃতিত্বের বিষয় শিক্ষিত সমাজের গোচর হইবে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা গবেষণাবৃত্তি প্রভৃতি স্থাপন দ্বারা ইহার কার্য্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির সাহায্য করিলে দেশের হিত ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

বিজ্ঞান কলেজে, বসুবিজ্ঞান মন্দিরে, ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভা গৃহে বাংলায় সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারের সাহায্য হয়।

—

চাষের জমী বিক্রী সম্বন্ধে আইন

যাহারা নিজের হাতে চাষ করে, চাষ যাহাদের কৌলিক বৃত্তি, জমী তাহাদের হাত হইতে এরূপ লোকদের হাতে যদি যায় যাহারা নিজেরা চাষ করে না, ভাগে জমী বিলি করিয়া বা মজুরি দিয়া অন্যের দ্বারা চাষ করায়, তাহা হইলে যাহারা স্বাধীন কৃষিজীবী ছিল তাহারা ভূমিশূন্য ক্ষেত-মজুর, কলকারখানার মজুর, রাস্তাঘাটের বাজারের মজুর, ইত্যাদিতে পরিণত হয়। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। অন্য দিকে ইহাও ঠিক্ যে, ঐ রকম সব মজুরেরও প্রয়োজন আছে। তাহা হইলেও যাহারা স্বাধীন কৃষক ছিল, তাহাদের মজুরে পরিণত হওয়া অবাঞ্ছনীয়।

এই জন্য, যাহারা স্বয়ং কৃষক তাহাদের জমী অকৃষক যাহাতে কিনিতে না-পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে আইন হইয়াছে, বঙ্গেও হইবার কথা উঠিয়াছে। এরূপ কোন আইনের কোন বিধির দোষগুণ আলোচনা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল একটি সাধারণ নীতির উল্লেখ এখানে করিব।

ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে শিল্প কৃষি ব্যবসা বাণিজ্য কেবল বৈশ্যদের করিবার কথা। কার্য্যতঃ কখনও পূর্ণমাত্রায় এই নিয়ম পালিত হইত কি না বলা যায় না। কিন্তু দেখিতেছি, বহু কাল হইতে বৈশ্য ছাড়া অন্য লোকেরাও চাষ কারিগরী ব্যবসাবাণিজ্য করিতেছে। আবার বৈশ্যেরাও সরকারী চাকরী ওকালতী মোক্তারী ব্যারিষ্টারী অধ্যাপকতা শিক্ষকতা ডাক্তারী ইত্যাদি করিতেছে। ইহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত কোন আইন হয় নাই, হওয়া উচিত একথাও কেহ বলেন না। অর্থাৎ বৃত্তিগত জাতিভেদ যে ভাঙিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতেছেন না, করিতেছেন না, বৃত্তিগত জাতিভেদ রক্ষা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টাও কেহ করিতেছেন না।

কেবল কৃষকদিগকেই চাষের জমী রাখিতে দেওয়া হইবে, চাষের জমী বিক্রী করিতে হইলে কেবল তাহাদিগকেই বিক্রী করা চলিবে, এরূপ আইন করিলে কৃষক বলিয়া একটি জাতির ("caste"এর) সৃষ্টি করা হইবে না কি? খ্রীষ্টিয়ান ইংরেজরা এবং মুসলমানরা বলেন, তাঁহারা জাতিভেদের বিরোধী। কিন্তু এই যে নূতন জাতিভেদের সৃষ্টির আয়োজন হইতেছে, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে তাহার বিরুদ্ধে ত কেহ কিছু বলিতেছেন না?

হিন্দু ও ব্রাহ্ম নেতাদের মধ্যে অনেকে "ব্যাক টু দি ল্যাণ্ড" ("আবার চাষবাসে লেগে যাও"), এই নীতির সমর্থন করেন। তাহার অর্থ, যে-সব পরিবারের লোকেরা স্বহস্তে চাষ করিত না, করে না, তাহাদেরও কতক কতক লোককে চাষী হইতে বলা। আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু অকৃষক যদি চাষের জমী না পায়, তাহা হইলে "ফিরে চাও মাটির পানে" পরামর্শের অনুসরণ ত হইতে পারে না।

বড় বড় ভূখণ্ড ট্রাক্টরের সাহায্যে না চষিলে হয়ত অনেক স্থলে কৃষি লাভজনক হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের চাষীদের এক এক গৃহস্থের এত টাকা ও জমী নাই যে, তাহারা ট্রাক্টর ক্রয় ও ব্যবহার করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন ও শিক্ষিত ভদ্রলোকে যে তাহা পারে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত কিছু কাল পূর্ব্বে মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে লক্ষ্ণৌর অধ্যাপক ডাঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

দিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তটি মানভূম জেলার। কিন্তু যাঁহারা কুলক্রমানুসারে চাষী নহেন, তাঁহারা যদি চাষের জমী না পান, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ কি প্রকারে হইতে পারে?

বিষয়টির আর একটি দিক্ অনুধাবনযোগ্য। যাঁহাদের কৌলিক বৃত্তি চাষ, যাঁহারা স্বয়ং নিজের হাতে চাষ করেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের বাড়ীর ও বংশের লোকেরা উপার্জ্জনের আর কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন না, এরূপ আইন নাই, এরূপ আইন করিবার প্রস্তাবও নাই। তাঁহারা চাষ ছাড়া যে-কোন কাজ করিতে পারেন, অনেকে করেনও। কিন্তু, অন্য দিকে যাঁহারা বংশতঃ চাষী নহেন, চাষ যাঁহাদের কৌলিক পেশা নহে, তাঁহাদিগকে জমী না-দিবার ব্যবস্থা করিয়া যে-কোন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করিবার যে-স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের থাকা উচিত এবং চাষীদের যে-স্বাধীনতা আছে ও রক্ষিত হইতেছে, সেই স্বাধীনতা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে।

এই বঞ্চনা জ্ঞানকৃত ও ইচ্ছাকৃত যদি না হয়, তাহা হইলেও ইহা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান। প্রধানতঃ বেকার তথাকথিত শ্রমিক-নেতারা স্বয়ং বুর্জোআ হইয়াও যেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোআ রব তুলিয়া যেরূপ একটা অভিযান চালাইতেছেন, স্বয়ংগৃহীতনামা কৃষকদরদীরাও সেইরূপ অভিযান চালাইতেছেন। উভয় অভিযান সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং দেশের সকল শ্রেণীর লোকদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন যাঁহাদের উদ্দেশ্য।

এই উভয় অভিযানের ফল কি হইবে, এখন তাহা বলা কঠিন।

জা'ত কৃষক যে বস্তুতঃ কাহারা বটে কাহারা নয়, তাহা চিরতরে বাঁধিয়া দেওয়া যায় কি না ও দেওয়া উচিত কি না বিবেচ্য।

—

শ্রীনিকেতনে প্রাক্তন-ছাত্র-সম্মেলন

শ্রীনিকেতনের উৎসবে এক দিন প্রাক্তন-ছাত্র-সম্মেলন হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার অভিভাষণের তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া হইল।

ভক্তির দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয় এবং প্রীতিদ্বারা অর্জ্জিত জ্ঞান বিলাইয়া দিতে হয়। অর্জ্জিত জ্ঞানকে কর্ম্ম ও সেবাতে নিযুক্ত করিতে পারিলেই জ্ঞানার্জ্জন সার্থক হয়। গাছের জীবন মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত। গাছ মূল দ্বারা রস গ্রহণ করে, ডালপালা দ্বারা অর্জ্জিত জিনিষ ছড়াইয়া দেয়।

আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষা হইয়াছে পুস্তককেন্দ্রী কিন্তু পূর্ব্বে ছিল গুরুকেন্দ্রী। মুদ্রিত পুস্তক ও তাহার নানা প্রকার নোট ছাত্রকে গুরু হইতে ছিন্ন করিয়াছে। গুরুর সহিত ছাত্র কোন সম্পর্ক না রাখিয়াই শিক্ষা সমাপ্ত করে, সুতরাং না হয় গুরুর সহিত যোগ, না হয় বিদ্যার সহিত। জলে না নামিয়া কেবলমাত্র বই পড়িয়া যেমন সাঁতার শিখা অসম্ভব সেইরূপ গুরু ধরাইয়া না দিলে কেবলমাত্র পুস্তকের সাহায্যে জ্ঞান অর্জ্জন অসম্ভব

পূর্ব্বে এই দেশে ছাত্ররা গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, সুতরাং গুরুর সান্নিধ্যে থাকিয়া গুরুর প্রতি স্বতঃই শ্রদ্ধা জাগিত, ঘনিষ্ঠ যোগ হইত উপনিষদে আমরা দেখি পূর্ব্বে লোকে পরিচয় দিত গুরুর পরিচয়, কেবলমাত্র নিজের গুরুর পরিচয়ই নয়, তাঁহার পূর্ব্বগামীদেরও। এইরূপে নানা বিদ্যার ধারার সমন্বয়ে এক মহাবিদ্যার সৃষ্টি হইত। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাও গুরুকেন্দ্রী, সুতরাং এখানকার ছাত্র ও শিক্ষকের যোগ ছিন্ন হইতে পারে না।

বিদ্যালয় ছাড়িয়া দূরে গেলেই বিদ্যালয়ের প্রতি প্রেম উপলব্ধি করা যায়। গর্ভস্থ সন্তান মায়ের মুখ দেখিতে পায় না, মায়ের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরই মায়ের মুখ তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। নৌকা ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া যাহারা গুণ টানে তাহাদের সহিত নৌকার যোগ ছিন্ন হয় না, বিদ্যায়তনের সঙ্গে প্রাক্তন ছাত্রদের যোগও সেইরূপ।

ছাত্ররা বিদ্যালয়ের ধ্বজাবহনকারী। এক দল ছাত্র বাহির হইবার সময় অন্য দলের নিকট ধ্বজা দিয়া যায়, এইরূপে বিদ্যালয়ের সকল সময়ের ছাত্রদের সহিত যোগ থাকে।

—

ভারতরক্ষা আইনের প্রতিবাদে ছাত্রসমাজের বিক্ষোভ

ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে বাংলার নানা স্থানে বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ও অনেক ছাত্রের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে গত ২৬শে মাঘ কলিকাতায় প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী শোভাযাত্রা ও সভা করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। পুলিস ইহাতে কোন বাধা দেয় নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র

ফেডারেশ্যনের নির্দেশ অনুসারে শোভাযাত্রা ও সভার ব্যবস্থা হয়। ছাত্রদের দাবী, যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক। এই দাবী ন্যায্য।

—

মেয়েদের নানাবিধ ব্যায়াম ও খেলা

মেয়েরা আজকাল যে নানাবিধ ব্যায়াম ও খেলা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। ছেলেদের ব্যায়াম ও ক্রীড়া আদিতে যেমন, মেয়েদেরও সেইরূপ প্রত্যেকের স্বাস্থ্য, শক্তিসামর্থ্য, ও প্রয়োজন অনুসারে ব্যায়াম ও খেলা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। নতুবা কঠিন ও দীর্ঘকালব্যাপী দৈহিক শ্রমে অনেকের অনিষ্ট হইতে পারে। প্রত্যেকের বয়স, স্বাস্থ্য, শক্তিসামর্থ্য, এবং প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুযায়ী ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা করা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেলায় অধিকতর আবশ্যক। কারণ, কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালে এবং যৌবনে বালিকাদের যে দৈহিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। এই হেতু, তাহাদের জন্য এরূপ ব্যায়াম ব্যবস্থাপিকা ও নিয়ন্ত্রী থাকা আবশ্যক যাঁহাদের এ বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে।

—

ব্রতচারী

ব্রতচারী প্রচেষ্টা শুধু খেলাধূলার ব্যাপার নহে, ইহার অন্য দিকও আছে। কিন্তু ইহার যে দিকটির সহিত ব্যায়াম ও ক্রীড়ার সাদৃশ্য ও সংযোগ আছে, তাহারও বিশেষত্ব আছে। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কোন ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতা নাই। হার-জিতের সঙ্গে কিছু রেষারেষির আবির্ভাব অনিবার্য্য। কিন্তু ব্রতচারী নৃত্য প্রভৃতিতে কোন রেষারেষি নাই। ইহাতে সমগ্র দলের সিদ্ধিলাভই প্রত্যেকের লক্ষ্য। নৃত্য বলিলেই প্রচলিত নাচের বিলাসবিভ্রম ও হাবভাবের কথা লোকের মনে আসে। ব্রতচারী নৃত্যে সেরূপ কিছুই নাই। ইহা সম্পূর্ণ সুরুচিসঙ্গত ও হিতকর।

বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত থাকায় আমাদের বালিকা ও মহিলাদের অনেকেরই মধ্যে একটা জড়সড় ও আড়ষ্ট ভাব দেখা যায়। আজকাল মেয়েদের মধ্যে স্কুলকলেজে শিক্ষালাভের প্রচলন হওয়ায় ইহা ছাত্রীদের মধ্যে কমিতেছে, কংগ্রেসী আন্দোলনেও ইহা কিছু কমিয়াছে। তথাপি ইহা বহু পরিমাণে আছে। ইহার দরুন, অন্তঃপুরের বাহিরে আসিলেই মহিলাদের কার্য্যশক্তি ও সপ্রতিভতা যেন হ্রাস পায়। কার্য্যশক্তি ও সপ্রতিভতা সম্বন্ধে বাঙালী মেয়েদের ও মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি মেয়েদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বাঙালী মেয়েরা বাল্য, কৈশোর ও যৌবন কাল হইতে খোলা জায়গায় নানাবিধ ব্রতচারী অনুষ্ঠানে যোগ দিলে তাঁহাদের আড়ষ্টতা দূর হইবে এবং তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি ও সপ্রতিভতা বাড়িবে, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশ কত নিরানন্দ ও আমাদের জাতীয় জীবন ও সামাজিক জীবন কিরূপ নিরানন্দ ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে, ঐরূপ জীবনে অভ্যস্ত থাকা বশতঃ আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু স্বাধীন ও সমৃদ্ধিশালী দেশের অনেক বিচক্ষণ লোক এদেশে আসিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহা কিছু আমাদের জীবনে অকলুষ স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিতে পারে, তাহা এই কারণে বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে নারীজীবন পুরুষদের জীবনের চেয়েও একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন। তাহাতে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ আরও আবশ্যক। নানাবিধ ব্রতচারী অনুষ্ঠান তাহা করিতে সমর্থ।

—

মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় ও কলেজ

এমন সময় কিছু কাল আগেও ছিল যখন বালিকা বধূরা স্বামীর আগ্রহে—কেহ কেহ বা নিজের আগ্রহেও, গোপনে লেখাপড়ার চর্চা করিতেন, এবং তাহা জানাজানি হইলে গঞ্জনা সহিতেন; পিতৃগৃহে বা শ্বশুরালয়ে তাঁহাদের কাহারও নামে চিঠি আসিলে তাহা নিন্দার—ন্যূনকল্পে কল্পনা-জল্পনার—বিষয় হইত। কাহারও কাহারও চিঠি আসিত কোন নাবালক ভাই, দেবর বা তদ্রূপ কাহারও নামে। এখন আর সেদিন নাই। নানা কারণে মেয়েরা

এখন লেখাপড়া শিখিতেছে, বিদ্যালয়ে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেছে—যদিও যথেষ্ট সংখ্যায় নহে। মেয়েদের শিক্ষার চাহিদা বাড়ায় তাহাদের জন্ম এমন সব বিদ্যালয়—এমন কি কলেজও—প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যাহারা এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সরকারী শিক্ষা-বিভাগের অনুমোদন পায় নাই। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মেয়েদের জন্য যথেষ্ট বিদ্যালয় ও কলেজ বঙ্গে নাই। কিন্তু তা বলিয়া যে-কেহ বালিকা-বিদ্যালয় বা মহিলা-কলেজ খুলিবেন, তাঁহার শিক্ষালয়েই মেয়েদিগকে পাঠাইতে হইবে এমন নয়। কোথাও মেয়ে পাঠাইবার আগে অভিভাবকদের তন্ন তন্ন করিয়া দেখা উচিত, শিক্ষালয়টিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কিরূপ, শিক্ষা কেন কাহারা, ঘরবাড়ীটিতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভব্যতা (decency) রক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ, এবং সর্বোপরি দ্রষ্টব্য ছাত্রীদের উপর চারিত্রিক কোনও কুপ্রভাব যাহাতে না পড়ে সুপ্রভাবই পড়ে, তাহার ব্যবস্থা কি প্রকার। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও সরকারী শিক্ষাবিভাগেরও কোন শিক্ষালয়কে অনুমোদিত করিবার পূর্ব্বে এই প্রকার অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক।

এইরূপ সাবধানতা অবলম্বিত না হইলে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে সুফল না হইয়া কুফল হইবারই সম্ভাবনা ঘটিবে।

—

মক্তব মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্রদের পড়িতে বাধ্য হওয়া

এইরূপ অভিযোগ খবরের কাগজে অনেক বার দেখিয়াছি যে, সাধারণ বিদ্যালয় না থাকায় কোথাও কোথাও হিন্দু ছাত্রেরা মক্তব মাদ্রাসায় পড়িতে বাধ্য হইতেছে। সেদিন একটি দৈনিকে এক জন পত্রপ্রেরক ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—কোথায় কত মুসলমান ও কত হিন্দু ছাত্র পড়ে তাহার সংখ্যাও তিনি দিয়াছেন।

মক্তব মাদ্রাসার বাংলা পাঠ্যপুস্তক ২১ খানা আমরা দেখিয়াছি। সেগুলার ভাষা ও লিখিত বিষয় এরূপ যে, তাহা কোন ক্রমেই হিন্দু বালকদের পাঠযোগ্য নহে;—মুসলমান বালকদেরই যে পাঠযোগ্য তাহা অবশ্য বলিতেছি না।

কোন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিতে যাহাতে আঘাত লাগে, এরূপ অবস্থায় তাহার বালকবালিকাদিগকে ফেলা গবর্ন্মেণ্টের উচিত নহে। যেখানে কেবল মক্তব মাদ্রাসা আছে, সেখানে সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন কর্তৃপক্ষের অবশ্যকর্ত্তব্য। টাকা নাই বলিলে চলিবে না। রাজস্বের শতকরা ৭০।৭৫ ভাগ হিন্দুরা দেয়, অথচ শিক্ষার ব্যবস্থা তাহাদের ছেলেমেয়েদের জন্ম হইবে না, ইহা অন্যায়। টাকা যদি না থাকে, তাহা হইলে মুসলমানের জন্ম মক্তব মাদ্রাসা, হিন্দুর জন্ম হিন্দু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না করিয়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্ম সাধারণ বিদ্যালয় হউক। বস্তুতঃ, সকলের জন্ম সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপনই শ্রেয়ঃ। কেহ ছেলেমেয়েদিগকে ধর্মশিক্ষা দিতে চান, বাড়ীতে দিবেন। তবে যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় স্থাপনই সরকারী নীতি হয়, তাহা হইলে স্থির করা হউক সরকারী খাজাঞ্চীখানায় কোন্ সম্প্রদায় কত খাজনা ও ট্যাক্স দেয়, এবং শিক্ষাবিষয়ক মঞ্জুরী টাকা হইতে সেই অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্ম টাকার বরাদ্দ করা হউক। আমরা সাম্প্রদায়িক শিক্ষালয় ও সাম্প্রদায়িক শিক্ষা চাই না; কিন্তু তাহা দেওয়াই যদি সরকারী পলিসি হয়, তাহা হইলে সকল সম্প্রদায়ের জন্মই ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

—

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মদিন

ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক শত বৎসর পূর্বে ৩০শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কোষ্ঠী দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী জানাইয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের নিজের কিছু অপ্রকাশিত রচনা এবং তাঁহার সম্বন্ধে অন্ত কাহারও কাহারও কিছু রচনা আমরা চৈত্রের প্রবাসীতে মুদ্রিত করিব।

—

"সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বনাশ"

ইংরেজ রাজত্বে যে আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক-

থাকিত তবে সে কেবল পশুর ন্যায় শুধু আপনাকেই বাঁচাইতে চেষ্টা করিত এবং আপন শিশুসন্তানকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিত, পরস্পরকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিত না। পরস্পরকে কামনা করে বলিয়াই পরস্পরের শক্তি ও পরস্পরের বুদ্ধি মিলিত হইয়া প্রত্যেক মানুষকে শক্তিশালী করিয়াছে। পরস্পরের সঙ্গে মিশিবার জন্য মানুষ ভাষা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পরস্পরের সাহায্যে এই ভাষা প্রত্যেক মনুষ্যসমাজে বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করিয়াছে। এই যে মানুষের পরস্পরের মঙ্গল কামনা—পরস্পরের সঙ্গ কামনা—তাহা অতি আদিম কাল হইতেই কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক ও জীবদ্দশার সঙ্গী বা সঙ্গিনীগণের প্রতি আকর্ষণে ও তাহাদের মঙ্গলকামনায় ব্যক্ত হইত, তাহা নহে। মানুষের সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাই যে মানুষ অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপন অমরত্বের অভিব্যক্তি করিয়াছে। এই জীবনে যে-জ্ঞান সঞ্চিত হইল, যে-ধন সংগৃহীত হইল তাহা ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের নিকট পৌঁছাইবার জন্য মানুষের যে আর্তি, তাহা সর্ব্বপ্রাণী হইতে মানুষকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ভাষা-দ্বারা পরস্পরের সহিত কথা কহিয়াই মানুষ সন্তুষ্ট হয় নাই, মানুষ প্রস্তরে, তাম্রপত্রে, লৌহনিধানে, খোদিত ইষ্টকে, বৃক্ষত্বকে ও বৃক্ষপত্রে আপনাদের সঞ্চিত জ্ঞান অতি যত্ন সহকারে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দিগের জন্য উপহারস্বরূপে প্রেরণ করিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সিদ্ধকবিও একটি কবিতা লিখিয়া একটি অতি তরুণ অপক্ক-বুদ্ধি ব্যক্তিকে শুনাইয়া তাহা তাঁহার ভাল লাগিল জানিলে সুখী হ'ন—একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আমার কাজ অপরের কাছে ভাল লাগিল—ইহাতে আমার অসীম সন্তোষ। কেহ এখানে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এই যে মানুষের আপনাকে দশের নিকট প্রীতিভাজন করিবার চেষ্টা ইহা মানুষের আত্মপ্রেম মাত্র। উপনিষদ্ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়—ন বা অরে মৈত্রেয়ি সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি 'আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। অর্থাৎ আমি আমাকে চাই বলিয়াই সকলকে চাই। কিন্তু আমার মনে হয়, ঐখানে যদি যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিতেন, 'ন বা অরে মৈত্রেয়ি আত্মনস্তু কামায় আত্মা প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বস্য—কামায় আত্মা প্রিয়ো ভবতি—তবে এই উভয় বাক্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখিতে পারিতাম না। আমার কোন্ আত্মাকে চাই বলিয়া বিশ্ব আমার নিকট প্রিয় হইয়াছে? আত্মা শব্দের একটি অর্থ দেহ। এই দেহ আমাদের জান্তব আত্মা এবং ইহা জন্তু-সাধারণ। জন্তুও দেহের মঙ্গলকামনা করে, মানুষও এই দেহের মঙ্গল কামনা করে। কিন্তু এই দেহের মঙ্গলকামনায় বিশ্ব-ভুবনের মঙ্গলকামনা কখনও সুসিদ্ধ হইতে পারে না। বড়জোর এই দেহের উপকরণ হিসাবে যে সমস্ত পরিবার-বর্গ আমাদের চারি দিকে রহিয়াছে তাহাদের মঙ্গলকামনা কিংবা আমার স্বজাতির মঙ্গলকামনা পর্য্যন্ত বুঝাইতে পারে। যে-আত্মার কামনায় বিশ্বভুবনের কামনা সিদ্ধ হয় সে-আত্মা দেহ নয়, কিংবা কেবলমাত্র দেহোপকরণে তৃপ্তিবিধান করা যায় সেই জীবও নহে। যখন আমরা আমাদিগকে অতীত ও অনাগত সমগ্র নরসমাজের অনাদি অনন্ত অসীম হৃৎকমলের মধ্যে অজর অমৃতরূপে প্রস্ফুটিত দেখি তখনই আমার কামনায় বিশ্বভুবনের কামনা, চিরন্তন অখণ্ড আত্মার কামনা পরিতৃপ্ত হয়। বিশ্বভুবনের আত্মার সহিত আমাকে অখণ্ড করিয়া দেখিতে পারি বলিয়াই আমি সেই বিশ্বভুবনের প্রীতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি। এই যে বিশ্বভুবনের প্রীতির জন্য আমার ব্যাকুলতা ইহা কামগন্ধহীন, এখানে আমরা আমাদের নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা আমাদের প্রাণিজীবনের সুবিধা সুযোগ চাই না। আমরা শুধু চাই বিশ্বভুবন আমার দানে আমার গানে আমার কার্য্যে আমার কুশলতায় প্রীতিলাভ করুক। কবি তাঁর আপন মনের আনন্দে লেখেন কবিতা, সে কবিতা তিনি চান দশ জনকে শোনাতে। নিজে যেমন আনন্দ পেয়েছেন কবিতা লিখতে, তেমনি বা ততোধিক প্রীত হন শুনতে যে আরও দশজন প্রীত হয়েছেন। সে প্রীতিতে তাঁর কোনও জৈব সুযোগ-সুবিধা নাই—তার মূল উৎস আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ আত্মাতে যাহা থাকে। আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে যে অতীত অনাগত বিশ্বভুবনের আত্মা প্রসন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছেন তাহার পরিচয় এইখানেই যে, বিশ্বভুবনের

প্রসাদের মধ্য দিয়া আমার প্রসাদের মূল্য ও পরিচয় আমি লাভ করিতে চাই।

এ কথাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কেউ হয়ত এমন কথা বলিতে পারেন যে হয়ত কোনও কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এই রকম ভাবের আত্মকামনাবিহীনরূপে বিশ্বের প্রীতিকামনা বা আত্মপ্রসাদের মধ্য দিয়া বিশ্ব-প্রসাদের আমন্ত্রণের মন্ত্র উচ্চারিত হইতে পারে কিন্তু ইহা যে সর্ব্ব মনুষ্যসাধারণ তাহা কি করিয়া বলিব? কিন্তু মানুষের সম্পর্কে কোনও কথা প্রাত্যক্ষিক বস্তুর ন্যায় অসংশয়িত ভাবে প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু একথা বলা যায় যে মানুষের চরম পরিণতিতে যদি বিশ্ব-প্রসাদের মধ্য দিয়া আত্মপ্রসাদের ধারার অনুসন্ধান সফল হইয়া থাকে তবে একথা স্বীকার করিতে হয় যে সেই গতি লাভ করার জন্যই মানুষের মন প্রধাবিত হইতেছে। মানুষ যখন পাথরের ফলা ছুঁড়িয়া ও শরপ্রয়োগের দ্বারা পশুবধ আরম্ভ করিয়াছিল তখনই সে বর্ত্তমান মেসিনগানের ও বোমার অনুসন্ধানে লিপ্ত হইয়াছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ যে জিঘাংসা-বৃত্তির দ্বারা ও যে আত্মরক্ষার অন্তঃপ্রেরণায় মানুষ শরশল্য আবিষ্কার করিয়াছিল সেই বৃত্তিদ্বয়েরই চরম পরিণতিতে মানুষ উদ্ভাবন করিয়াছে তাহার আগ্নেয়াস্ত্র। যে-মনোবৃত্তিতে মানুষ বহু শ্রম স্বীকার করিয়া আপনাদের বুদ্ধির ইতিবৃত্ত, চরিত্রের ইতিবৃত্ত প্রস্তরে অঙ্কিত করিয়াছে সেই বৃত্তির যথার্থ উৎস হইতেছে সমগ্র মানুষের সঙ্গলাভের স্পৃহা ও সর্ব্ব মানুষের বক্ষে আপনার জন্য একটি নীড় রচনা করিবার প্রবল আগ্রহ। তার সঙ্গে জড়িত থাকিতে পারে স্পর্দ্ধা, জড়িত থাকিতে পারে আত্মাভিমান, কিন্তু স্পর্দ্ধা ও আত্মাভিমানকে মানুষ চিরন্তন করিয়া রাখিতে চায় না। চিরন্তন করিয়া রাখিতে চায় সে, তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যে-শক্তি তাহাকে। শক্তি মানুষের প্রিয়, মানুষের নিকট আমরা প্রিয় হইতে চাই—আমাদের শক্তির পরিচয়পত্রে। বুদ্ধি মানুষের প্রিয় তাই চিরন্তন মানুষের কাছে আমরা প্রিয় হইতে চাই আমাদের বুদ্ধির প্রমাণপত্রে। মানুষের কল্যাণ, মানুষের মহত্ত্ব মানুষের কাছে প্রিয় তাই আমরা ব্যাখ্যান করিতে চাই—আমাদের চরিত্রের মহত্ত্ব, আমাদের কল্যাণ কীর্ত্তি। এই মনোবৃত্তির মধ্যে হয়ত অনেক পঙ্ক ক্লেদ থাকিতে পারে কিন্তু সেই সমস্ত পঙ্ক কালিমা ভেদ করিয়া যে একটি শ্বেত শুভ্র কমনীয় মৃণালদণ্ড দেদীপ্যমান সূর্য্যালোকের দিকে উর্দ্ধস্ফুরদগভস্তি হইয়া ছুটিয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বং বেদ, সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি ; সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

কি অর্থে ঋষিরা এই সমস্ত বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারি না। এই সমস্ত বাণীর দ্বারা হয়ত তাঁহারা কোনও সমাধিলভ্য দার্শনিক তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা এই জিনিসটি আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে আমাদের প্রত্যেকের চিত্তবৃত্তির সমস্ত আতানে-বিতানে, তার সংগঠনে, তার স্পৃহা ও কামনায়, তার আদর্শের সন্ধারণে, তার সৌন্দর্য্যোপলব্ধিতে, তার রসোপলব্ধিতে, তার আনন্দে আহ্লাদে, তার চরম ও পরম গতির নির্দ্ধারণে, সভ্যজগতের প্রত্যেক মানুষ অতীত ও বর্ত্তমানের সমস্ত সভ্যসমাজকে ব্যক্ত করিয়া ভবিষ্যৎ মানব-সন্ততিদের সহিত এক মহাযাত্রার স্রোতে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। এই যে মনুষ্যসমাজের চিত্ত আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে ইহাকে বর্জ্জন করিয়া আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যখনই অনুসন্ধান করিতে যাই তখনই যেন ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসি। শিল্পে, সাহিত্যে, কল্পনায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, আদর্শে, বাণিজ্যে, লোকব্যবহারে, আমাদের চিত্তের যে প্রকৃতির পরিচয় পাই, তাহার মধ্যেই অতীত ও বর্ত্তমান সমগ্র মানবজাতির চিত্তের স্বভাবকে অঙ্কিত দেখিতে পাই। এই বিশ্বাত্মা হইতে আমাদের আত্মাকে যখন আমরা বিযুক্ত করিয়া দেখিতে যাই তখন মনে হয় যেন আমাদের কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। এই জন্যই সমস্ত বিশ্বমানবের চিত্তকে আমরা নিরন্তর আমাদের মধ্যে পাইতেছি এবং এই জন্যই সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। এই জন্যই ঈশোপনিষদ্ বলিয়াছেন 'যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।' যিনি সর্ব্বচিত্তকে আপনার চিত্তে সন্নিবিষ্ট দেখেন এবং যিনি সর্ব্বচিত্তের মধ্যে আপনার গতিকে প্রত্যক্ষ দেখেন এবং সর্ব্বচিত্তকে আপন আত্মা বলিয়া মনে করেন তিনি যথার্থ জ্ঞানী। কোনও দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধান না করিয়াও একথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, আজকার দিনের সভ্যজগতের আত্মার যে পরিচয় আমরা পাই তাহার মধ্যেই সমস্ত প্রাচীন যুগের মানব অশরীরীভাবে বাস করিতেছে এবং একটি অখণ্ড মানবচিত্ত সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। যেমন একটি সাগরের জলের আস্বাদের মধ্যে সপ্ত সাগরের জল মিলিত রহিয়াছে, তেমনি একটি মানবচিত্তের মধ্যে আমরা সর্ব্ব মানুষকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ যদি এতই ঘনিষ্ঠ, তবে মানুষের সঙ্গের জন্য যে আমাদের চিত্ত লোলুপ হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই, কিন্তু তথাপি

দেখিতে পাই যে বিবাহবাসরে রাত্রি জাগিয়া, নিমন্ত্রণ সভায় গালগল্প করিয়া, অবসর সময়ে বন্ধুর বাড়ীতে পরচর্চা করিয়া বা বৃথা-চর্চা করিয়া কিংবা দশজনের সহিত হৃড়হিল্লোর করিয়া যখন সময় কাটাই, তখন মানুষের সঙ্গ বলিয়া সেখানে যাহা পাই তাহাতে অবসাদ আনে, এবং অন্তরের প্রচ্ছন্ন মানুষটি যেন তাহার যথার্থ সঙ্গের অভাবে নিরাহারে শীর্ণ ও নিদ্রালু হইয়া উঠে। সাধারণতঃ দশের সহিত মিলিত হইয়া আমরা মানুষের যে সংস্পর্শটুকু পাই, সেটুকু যেন তাহার একান্ত বহিরঙ্গ স্পর্শ। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি একান্ত বহিরঙ্গ সভ্য পুরুষ আছে যাহাকে আমরা বেশ-বিন্যাস করিয়া সুদৃশ্য ও শোভন করিয়া বহিরঙ্গনে নিমন্ত্রণ সভায় পাঠাইয়া থাকি। আমাদের অন্তরের মধ্যেই যে ক্ষুধিত পুরুষ বিশ্বমানবের সঙ্গের জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন—তাঁহাকে আমরা বহিরঙ্গনে পাঠাইতে ভয় পাই। আদিম কাল হইতেই দেখা যায় যে এক দিকে যেমন মানুষ মানুষকে চায়, অপর দিকে তেমনই মানুষের নিকট হইতে মানুষ সকলের চেয়ে বেশী ভয় পায়। মানুষের মধ্যে রহিয়াছেন এক দিকে সর্ব্বব্যাপী পুরুষ, অপর দিকে রহিয়াছে তেমনই জিঘাংসাময় আদিম পশু। আমাদের বুদ্ধি ও চেতনা এক দিকে প্রেরণা পাইতেছে পরম কল্যাণের ভূমি হইতে, বিশ্বমানবের মিলনের ভূমি হইতে, বিশ্বমানবের ঐক্যের ভূমি হইতে, অপর দিকে সে প্রেরণা পাইতেছে মানুষের জান্তব প্রকৃতি হইতে—যে-প্রকৃতি কেবল চায় বিশ্বের বিরুদ্ধে কেমন করিয়া সে আপনাকে বাঁচাইবে। মানুষ ভয় পায় যে সে আপনাকে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিলে তাহার সেই ক্লিন্নতা দশের কাছে ধরা পড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে তাহার জান্তব স্বার্থ ব্যাহত হইবে। তাই মানুষ ভাষা ব্যবহার করে আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য নয়, আপনাকে গোপন করিবার জন্য এবং অপরকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য নিরন্তর যে চেষ্টা করে তাহাতে আপনাকেই ছলনা করে। এই জন্যই সঙ্গবহুল মনুষ্যসমাজে আমাদের আত্মা সঙ্গিবিহীন হইয়া কাঁদিয়া উঠে। যে-ব্যক্তি নিরন্তর ছলনার জালে আপন গভীর অন্তরপুরুষকে একান্তভাবে এমন করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে যে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চেষ্ট নিস্পন্দ ও সংজ্ঞাবিহীন করিয়াছে, তাহার মনে হয়ত এ ক্ষুধা জাগে না। বহির্মুখী স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিত্ত নিরন্তর অপরের চিত্তের সহিত দোল খাইয়া ফিরিয়া এমনি যাযাবর-স্বভাব হইয়া উঠে যে কোথাও যে তাহার শান্তি ও প্রতিষ্ঠার নীড় আছে তাহা সে ভুলিয়া যায়। নিরন্তর সঙ্গ চিত্তের মধ্যে বহির্মুখী আসক্তি ও জান্তব তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে। বাড়াইয়া তোলে বহিরঙ্গ জিনিসের প্রতি লোভ, তাহার অপ্রাপ্তির দুঃখ এবং ক্রোধ, এবং তাহার ফলে বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আত্মা অন্নময় কোষে বিতাড়িত হয় এবং এমনি করিয়া মূঢ়তার মহাগহ্বরের মধ্যে নিমগ্ন হয় এবং অন্তরপুরুষের জ্যোতিটি জটিল ধূমের মধ্যে মলিন ও বিলীন হইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্র বলেন—'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধো বিজায়তে, ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ'। বহিরঙ্গ যে উপায়ে মানুষ মানুষের সহিত মিশিয়া থাকে তাহা প্রায়শ জান্তব লালসায় ও জান্তব অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ। ঈর্ষা, ঘৃণা, লোভ, দ্বেষ, অভিমান—ইহারাই বহিরঙ্গ রঙ্গমঞ্চে নাট্যলীলা করিতে থাকে। বাহিরের দিক্ দিয়া মানুষের সহিত মানুষের যে সাম্য সেটা প্রথমত এই জান্তব বৃত্তির সাম্য মাত্র। জান্তব বৃত্তির নিরন্তর অনুশীলন না করিলে সেই বৃত্তির দ্বারা মানুষের সহিত মিশিতে পারা যায় না। সাধারণতঃ মানুষের সহিত যাহা কিছু আলোচনা ঘটে তাহার প্রায় অধিকাংশই মানুষের জান্তব অভাব ও অভিযোগ, মানুষের কামনা ও লালসা লইয়া। তাই এইরূপ সঙ্গের দ্বারা আমাদের জান্তব বৃত্তি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

একথা অবশ্য আমি বলিতে চাহি না যে, মানুষের জান্তব বৃত্তির দ্বারা তাহার অনুশীলন ও পরিমার্জ্জনের দ্বারা মানুষের সঙ্গে যে ঐক্য ও মিলন ঘটিয়া থাকে তাহার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা বিস্মৃত হইলে চলে না যে কেবল মাত্র সেই বৃত্তির মধ্যেই ডুবিয়া থাকিলে মানুষের অন্তরপুরুষের ক্ষুধা কিছুতেই মিটিতে পারে না। মানুষ এক দিকে যেমন মনুষ্য অপর দিকে সে জন্তুসাধারণ। এই জন্য জান্তব ক্ষেত্রে মনুষ্য যেমন পরস্পরের সহিত মিশিতে চায়, তেমনই তাহার এমন একটি ক্ষেত্র থাকা উচিত যেখানে অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান মানুষের মধ্য দিয়া যে 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত' এই মহামন্ত্রের জাগরণ চলিয়াছে তাহার মধ্যেও সে জাগ্রত হইবে। আমাদের সকলের চিত্তের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে আমাদের নিজের স্বরূপকে জানিবার জন্য ও মনুষ্য হিসাবে মনুষ্যকে জানিবার জন্য মানুষের ইতিহাস, মানুষের বিকাশের পদ্ধতি, মানুষের মধ্যে যাহা কিছু কমনীয়, যাহা কিছু মধুর আছে, তাহাকে জানিবার জন্য যে জিজ্ঞাসা সময়ে অসময়ে আত্মপরিচয় দেয় তাহারই অনুসন্ধানে যদি আমরা আমাদিগকে নিয়োজিত না করি, তবে আমাদের অন্তরপুরুষ বিশ্বভুবনের মধ্যে তাহার যে পরিচয় রহিয়াছে ও তাহার আপনার মধ্যে আপনার যে পরিচয় রহিয়াছে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া হাহাকার করিয়া উঠিবে ও আপন মর্য্যাদা হইতে ভ্রষ্ট হইবে। বিশ্বপ্রকৃতি আমাদিগকে চারি দিকে পত্রে, পুষ্পে, নির্ঝরিণীর ঝঙ্কারে, পাখীর গানে

বর্ণের বিচিত্রতায়, শৈলশ্রেণীর উদাত্ত মহত্বে, সর্ব্বদা যে মহাপ্রাণ শক্তির অভিব্যঞ্জনায় আমাদের চিত্তভূমিকে প্লাবিত করিতে চেষ্টা করিতেছে, বহিরঙ্গ জান্তব সঙ্গের মধ্যে নিরন্তর ডুবিয়া থাকিয়া আমরা সেই আলোকের সম্মুখে এমন যবনিকা রচনা করি যে, আমাদের অন্তরগৃহ অন্ধকার-নিমগ্ন হয় এবং আমাদের অন্তরপুরুষ সঙ্গিহীন হইয়া রোদন করে।

নির্জ্জনতায় আমাদের বহিঃপ্রাঙ্গণে যে স্তব্ধতার সৃষ্টি করে তাহা অসাড়তা নয় তাহা কোলাহল-নিবৃত্তি মাত্র। অন্তর্লোকে যে সূক্ষ্ম বীণার তার নিরন্তর আপনাকে স্পন্দিত করিতে চেষ্টা করিতেছে, বাহিরের কোলাহল নিবৃত্তি না হইলে তাহার সে রাগিণী শোনা যায় না এবং আমরা নিজেকে নিজের সঙ্গ দিতে পারি না ; অপরকে সঙ্গ দিতেই যদি সমস্ত সময় ব্যয়িত হয় তবে অন্তরকে সঙ্গ দিবার উপায় কি ? বাহিরের সঙ্গে কেবল আসে দ্বন্দ্ব অভিঘাত, দ্রুত-গতি ও ছলনা। চেতনা শক্তির নিত্য উদ্বোধে, নিত্য প্রচোদনায়, বিশ্বমানবের আত্মার সহিত সম্মিলনে যে অমৃতময়ী সৃষ্টি প্রক্রিয়া মানুষের জীবনকে যুগযুগান্তের মধ্যে মৃত্যুহীন করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে আবরণ করিলে বাঁচিব কেমন করিয়া ? সমস্ত পৃথিবীর ধন-সম্পদ দিয়া কি করিব যদি আমাদের অমৃত ধর্ম্মাত্মার সাক্ষাৎকার না পায় ? আমাদের উপনিষদ্ বারংবার যে অমৃতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অর্থ কেবল মৃতের অভাব নয় তাহার অর্থ জীবন-স্বরূপ। একটি প্রস্তরখণ্ডকেও আমরা অমৃত করিতে পারি ; কারণ প্রস্তর কখনও জীবিত ছিল না। যাহা জীবিত ছিল না তাহার কখনও মৃত্যুও হইতে পারে না, কাজেই প্রস্তরকে অমৃত বলিলে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু অমৃত অর্থে আমরা বুঝি মৃত-বিরোধী ধর্ম্ম। নিরন্তর যাহা চারি দিকের আবেষ্টন হইতে রস সংগ্রহ করিতেছে ও আপনাকে সেই রসে সিক্ত করিয়া নবতর কল্যাণতর সত্তার উদ্ভাবন করিতেছে তাহাকেই বলা যায় জীবন। আমাদের অন্তরাত্মার রহস্যই এই যে তাহা সর্ব্বদাই অমৃত, অর্থাৎ সর্ব্বদাই জীবনধর্ম্ম। অতীত, বর্ত্তমান সর্ব্বমানুষের আত্মা ও চারি দিকের প্রকৃতির শোভা-সম্পদই তাহার আবেষ্টন। এই আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া ইহা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া আমাদের আত্মা নানা অনুভূতিতে প্রচুর হইয়া, স্নিগ্ধ হইয়া যখন আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়, তাহাই আমাদের আত্মার সৃষ্টি। আমাদের উপনিষদ বলেন যে একক আত্মা আপনার সঙ্গ-কামনায় আপনার মধ্যে তপস্যা করিয়া, আপন জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অহং বহুস্যাম্ আমি আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিব ইহাই আত্মার সৃষ্টি-সাধনা।। তাই শাস্ত্র বলেন—আত্মা এব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ গতিরাত্মৈব চাত্মনঃ। রসাবেশে আত্মা যতক্ষণ সৃষ্টি করিতে না পারিবে, ততক্ষণ কোন বহিরঙ্গ সংগ্রহে তাহার সঙ্গী জুটিতে পারে না। যাহার চিত্ত আপনার মধ্যে বিকাশের সাড়া পায় এবং যাহার অন্তরের দলগুলি প্রোদ্ভিন্ন হইয়া উঠিবার জন্য অন্তরের আলো অনুভব করে, সে তাহারই অন্তরাবেশে তাহার উপযোগী আবেষ্টনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সে আবেষ্টন অনেক পরিমাণেই আমাদের অন্তরের আবেষ্টন। আমাদের অন্তরের মধ্যে যে নিরন্তর ভাবধারা স্পন্দিত হইয়া উঠে আমরা তাহার যথার্থ পরিচয় লইতে চেষ্টা করি না। তাহারা আপাততঃ যে বাহিরের পরিচয় সঙ্গে করিয়া আনে সেখানে তাহারা বিচ্ছিন্ন। তাহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি বলিয়াই তাহাদের পরস্পরের মধ্য দিয়া বিশ্বের যে পরিচয় আমাদের নিকট সর্ব্বদা ব্যঞ্জিত হইতেছে আমরা তাহা ধরিতে পারি না, তাহাদের বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখি বলিয়াই তাহাদের পথে প্রান্তরে ফেলিয়া দিতে দ্বিধা বোধ করি না। শিশু মূল্যবান কাচের বাসন পাইলে, টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিতে তাহার আমোদের অন্ত থাকে না ; কিন্তু যে উহাদের মূল্য জানে সে তাহা পারে না। একথা সত্য আমাদের ভাবধারার সহিত, আমাদের চিত্তের সৃষ্টির সহিত পরিচিত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নহে। অতীত কাল হইতে বিশ্বমানব তাহার সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এ পরিচয়ের শেষ নাই। নিরন্তর আত্ম-সৃষ্টির দ্বারা আমরা আমাদের সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিতেছি। আত্মা যেমন অনন্ত,—তার সৃষ্টিও তেমনি অনন্ত। মানুষ তাহার আত্মপরিচয়ের ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছে তাহার অনন্ত গ্রন্থে এবং স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তাহার ইঙ্গিত দিতেছেন শ্যামল নারিকেল তালীপুঞ্জ, তরল শিশিরবিন্দু-সমাচ্ছন্ন দূর্ব্বাদলরাজিতে, কলবাহি-নির্ঝরিণী-স্রোতে, কুজ্ঝটিকাসমাচ্ছন্ন শৈলশিখরে, তুষার-কিরীটি উত্তুঙ্গ গিরিমালায়, পাখীর গানে, পতঙ্গের বর্ণচ্ছটায়। যে রহস্যে তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই রহস্যেই তিনি মানুষের মনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের শাস্ত্র বলেন—যাবন্তো লোকে, তাবন্তঃ পুরুষে, যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে। বিশ্বভুবন তিনি পল্লবিত করিয়াছেন নানা পত্রজালে ; তেমনই মানুষের চিত্তও পল্লবিত করিয়াছেন। সেই পল্লবের পরিচয় আমরা পাই, শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে। এই উভয় লোক হইতে বিশ্বমানব ও বিশ্বেশ্বর নিরন্তর আমাদের কাছে তাঁহাদের সঙ্গ প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইখানে যদি আমাদের সজীব চিত্ত লইয়া আমরা প্রবেশ করিতে পারি তবে আমাদের আত্মপরিচয় আমাদের কাছে সুলভ হইয়া উঠিতে পারে। আমাদের প্রত্যেক ভাবধারার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেক সৃষ্টির সঙ্গে বিশ্বাত্মার আত্মবিকাশের

পরিচয় অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এই পরিচয়ের মধ্যে যতক্ষণ প্রবেশ করিতে না পারি ততক্ষণ বিশ্বমানবের সঙ্গে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় সহজ হয় না। অথচ আমরা এই বিশ্ব-মানবেরই একটি অংশ। বিশ্বপ্রকৃতিরই একটি বীজ। বিশ্বমানব হইতে ও বিশ্বপ্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যখনই আমাদিগকে দেখিতে চাই তখনই দেখি যে আমাদের কোন পরিচয় নাই। আষাঢ়ের জলধারা যতক্ষণ ঝর ঝর করিয়া ঝরে ততক্ষণ তাহা কেবলমাত্র বিন্দুর ক্রমধারা; কিন্তু সেই ধারা যখন মাটিতে পড়িয়া নির্ঝরিণীর সহিত মিশিয়া নদীপথে সাগরে উপনীত হয়, বাষ্প হইয়া আকাশে উড়িয়া যায় ও পুনরায় জলধারায় নিপতিত হয় তখন তাহার এই ইতিহাসের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। পরিচয় পাই কেমন করিয়া আপন ইতিহাসকে সুসম্পন্ন করিতে গিয়া এই জলধারা বিশ্বের প্রাণশক্তিকে অঙ্কুরিত করিয়া পত্র, পুষ্প, ফলের শোভায়, প্রাণের, জীবনের দীপ্তিতে বিশ্বের মঙ্গল শক্তিরূপে কাজ করিতেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কর্ম্মবশতঃ মানুষের সহিত আমাদের সংঘটন হইয়া থাকে—তাহা এক দিকে যেমন বহিরঙ্গ, অপর দিকে তেমনি অতি স্বল্প ও ক্ষণধ্বংসী। বিশ্বমানবের সহিত আমাদের পরিচয়ে আমাদের যে সঙ্গ ঘটে তাহা ভূমা। আমাদের শাস্ত্র বলেন—যো বৈ ভূমা, তৎ সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি। এই ভূমার পরিচয়ের জন্য আমাদের চিত্ত নিরন্তর ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। আমরা তাহার নিকট নিরন্তর ক্ষুদ্রকে ধরিয়া দিতে চাই বলিয়া আমাদের চিত্তের ক্ষুধা মিটে না। আমাদের চিত্ত যতই উপবাসে শীর্ণ হইয়া এই ভূমা সঙ্গের জন্য লোলুপ হইয়া উঠে ততই আমরা আমাদের সঙ্গি-হীনতার কথা অনুভব করি এবং আপাতরম্য অতি তুচ্ছ সঙ্গের দ্বারা সেই ক্ষুধা মিটাইতে চেষ্টা করি। আমাদের শাস্ত্র বলেন—বিশ্বাত্মা ভূত ভাবনা—অর্থাৎ বিশ্বের যিনি আত্মা, অতীত অনাগত মানবের বোধি-চিত্তকে যিনি ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন—তিনিই আমাদের চিত্তকে ভাবিত করিতে পারেন, অর্থাৎ উজ্জীবিত করিতে পারেন, তাঁহার আপন পরিচয় তাহার নিকট উদ্বোধিত করিতে পারেন। গায়ত্রী বলেন—বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। সেই বরণীয় ভর্গো বা তেজকে আমরা ধ্যান করি—যাহা আমাদের বুদ্ধিকে প্রচোদিত করিবে। শাস্ত্র আমাদিগকে কেবলমাত্র বুদ্ধিকে ধ্যান করিতে বলেন নাই, বুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে বরণীয় তেজ আমাদের বুদ্ধিকে চালিত করে—সেই তেজকে আমরা ধ্যান করি। সেই তেজ এক দিকে যো দেবোঽপ্সু বনস্পতিষু—যাহা হইতে বিচ্যুত হইলে, অগ্নির অগ্নিত্ব, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব বিনষ্ট হয়, যিনি অগ্নির মধ্যে থাকিয়া অগ্নিকে সংযত করেন, যিনি বায়ুর মধ্যে থাকিয়া বায়ুকে সংযত করেন—যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো, যমগ্নির্ন বেদ আবার যিনি আমাদের চক্ষুতে থাকিয়া, আমাদের কর্ণে থাকিয়া, আমাদের মনে থাকিয়া, আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়মিত করিতেছেন, যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, যিনি মনের মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করেন অথচ মনের দ্বারা যাহাকে জানা যায় না—শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনঃ, যদ্ বাচোঽবাচং যো প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ, যন্মনসা নমনুতে, যেনাহুর্মনোমতম্—সেই অনাদি অনন্ত সৃষ্টির বীজ আমাদের ভিতরে বাহিরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে আমাদের ভাব-ধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আমরা সেই দেবতারই সঙ্গ সর্ব্বদা লাভ করিতেছি—

ইহ চেদাবেদীৎ অথসত্যমস্তি ন চেদ ইহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।

সহস্র লোকের সাথে, প্রাত্যহিক আবর্জ্জনা মাঝে,
এ প্রাণ ফুৎকারে ফেরে, শতলক্ষ বঞ্চনার কাজে,
চপল আলস্যভরা লীলাময় প্রমোদ হিল্লোলে,
হাস্য পরিহাসে মুক্ত উচ্ছ্বসিত অধীর কল্লোলে,
আননে আননে দীপ্ত, বিচ্ছুরিত নয়ন ভঙ্গীতে,
কটাক্ষ বিদ্যুৎ ধারে আভরণ কঙ্কণ সঙ্গীতে;
মেলামেশা হেসে চলে মানুষে মানুষে প্রতিদিন,
ফেন ভঙ্গে ঢেউ উঠে' পরস্পরে করে' আনে ক্ষীণ;
নিরন্তর কেড়ে আনি' গুহাহিত অন্তরের ধনে,
বিলাস প্রমোদ মাঝে কীর্ণ করি বাহির প্রাঙ্গণে।
হেসে হেসে ছুটে যাই আপনা বঞ্চনা করি ছলে,
উপবাসে শীর্ণ আত্মা, কাঁদে শুধু নয়নের জলে;
আপনারে ছিন্ন করি যোগাইতে আসুর ভক্ষণ,
আপন গহ্বরে চিত্ত অন্ধকারে করিছে ক্রন্দন,
ঊর্ণনাভ সম চিত্ত নিত্য চাহে আপন বিস্তার,
বিশ্বমানবের চিত্ত যেথা করে পক্ষের প্রসার;
অনাদি অনন্ত কালে দিগন্তে উড়িয়া যেতে চায়,
পক্ষ তার ছিন্ন হয়ে' ঝিকিমিকি ধূলায় মিশায়;
মানুষের সঙ্গ বলে যাহা দিয়ে করি প্রবঞ্চনা,
সেথায় মানুষ নাই, আছে তার শুধু আবর্জ্জনা;
বিশ্বের কমলদলে যেথা দেব করিছে নিবাস,
সেথায় ফুটিতে চাহি' চিত্ত মোর ফেলিছে নিঃশ্বাস।
অনাদি মানবচিত্ত যেথা ছোটে বিকাশের পথে,
অনন্ত তরঙ্গ মাঝে আনন্দের চঞ্চলিত স্রোতে,
ফুল ফল লতা যেথা শ্যামলিত ভূধর কানন,
নির্ঝরিণী মুখে গাহে নিরন্তর আপন স্বপন,
নিভৃত চিত্তের মাঝে, যেথা বাজে বীণার বেদনা,
মানুষের প্রীতিসূত্র যেথা করে সৌন্দর্য্য রচনা,
বিশ্বমানবের সঙ্গে যেথা পাই চিত্তের আস্বাদ,
আপন প্রসাদ মাঝে পাই যেথা বিশ্বের প্রসাদ,
সেই মহা স্বর্গপুরে মহা বিশ্ব সঙ্গীতের মাঝে,
প্রবুদ্ধ এ চিত্ত যেন আনন্দেতে নিরন্তর রাজে।

পঞ্চশস্য

সেক্সপীয়রের নূতন পরিচয়

সুদূর অতীতের গর্ভে যাঁহাদের অস্তিত্ব বিলীন হইয়াছে এমন লেখক, কবি অথবা শিল্পীদের সম্বন্ধে বাদানুবাদ সম্ভব এবং স্বাভাবিক। হোমার বলিয়া সত্যই কেহ ছিলেন কিনা, বাল্মীকির পিতৃদত্ত নাম কি ছিল, অথবা কালিদাস বিক্রমাদিত্য অথবা ভোজ, কোন্ রাজার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এ সকল তর্কে ঐতিহাসিকের লাভ থাকিলেও সাধারণ রসগ্রাহী পাঠকের



আর্ল অব অক্সফোর্ডের ছবির অংশ



"অ্যাশবোর্ণ" সেক্সপীয়র ছবির অংশ

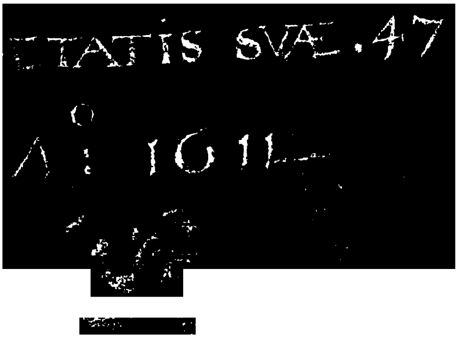
বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু আজ যদি হঠাৎ কেহ বলিয়া বসে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মোটেই মেঘনাদবধ লিখেন নাই, মেঘনাদবধ লিখিয়াছিলেন রামকৃষ্ণপুরের মহারাজা, ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া, তাহা হইলে খানিকটা সাড়া পড়িয়া যাওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

সেক্সপীয়রের নাটকসমূহ সেক্সপীয়র নিজেই লিখিয়াছিলেন, না ফ্রান্সিস্ বেকন লিখিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে এক কালে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে আর এক জন দাবিদার জুটিয়াছেন, এডওয়ার্ড ভেয়ার ডি ভেয়ার, অক্সফোর্ডের সপ্তদশ আর্ল।

অ্যাভন নদীর উপরে ষ্ট্রাটফোর্ড নামক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৫৬৪ সালে যে উইলিয়াম সেক্সপীয়র জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধতন কোনো পুরুষেই পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল না। সমসাময়িক কাগজপত্র ঘাঁটিলে দেখা যায়, তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য নানা প্রকার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, যথা—কসাইগিরি, মহাজনী প্রভৃতি। এ-সব কাজে নিযুক্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে যোগ থাকা এক জন লোকের পক্ষে অসম্ভব হয়ত নয়, কিন্তু এমন এক জনের পক্ষে হ্যামলেট, ম্যাক্‌বেথ, কিং লীয়ার প্রভৃতি প্রগাঢ় দার্শনিক তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বপূর্ণ নাটক রচনা সম্ভব কিনা, তাহাই বিবেচ্য। সেক্সপীয়র লেখাপড়া আদৌ জানিতেন কিনা, সে বিষয়েও নাকি সন্দেহের অবকাশ আছে। অধিকাংশ নাটকেই ইংলাণ্ডের বাহিরের ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি-সম্বন্ধে যে জ্ঞান ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট, তাহাই বা তিনি পাইলেন কোথা হইতে? জীবনে এক বারও ত তিনি ইংলাণ্ডের বাহিরে পা দেন নাই।

আর্ল অব অক্সফোর্ডের দাবি সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলার আছে। তিনি সারা ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইউরোপের বিভিন্ন ভাষা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, যে জ্ঞান ষ্ট্রাটফোর্ডের এক অশিক্ষিত পরিবারের সাধারণ যুবকের পক্ষে থাকা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আর্ল অব অক্সফোর্ডই যদি হ্যামলেট প্রভৃতির প্রকৃত লেখক হন, তাহা হইলে উইলিয়াম সেক্সপীয়র নামে নিজের লেখা চালানোর উদ্দেশ্য তাঁহার কি থাকিতে পারে? একটি বিশেষ কারণ থাকা সম্ভব। এলিজাবেথের যুগে নাট্যকার,





সেক্সপীয়রের "অ্যাশবোর্ণ" চিত্রের এক অংশের রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে গৃহীত চিত্র। চিত্রকর কর্ণেলিয়াস কেটেলের নামের আদ্যক্ষর, C. K. অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

অভিনেতা ও কবিসমাজের বিশেষ আদর ছিল না। কবি ও কাব্য, অভিনেতা ও নাটক, সবই ছিল সমাজের নিম্নস্তরের জিনিষ, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাব্যের আদর করিলেও কাব্যচর্চ্চা ছিল পরম লজ্জার বিষয়। ফলে ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপনের চেষ্টা।

যত দিন নাট্যকারের প্রকৃত পরিচয় লইয়া গবেষণা রসগ্রাহী সমালোচক ও ঐতিহাসিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তত দিন বিশেষ কিছু আসিয়া যায় নাই। কিন্তু আজ সহসা বৈজ্ঞানিকের অনধিকারচর্চ্চার ফলে ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিঃ চার্লস্ ব্যারেল নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ এই দিকে খুব বেশী নজর দিতে আরম্ভ করেন। সেক্সপীয়রের প্রচলিত কয়েকখানি ছবির দিকে প্রথম তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

অধিকাংশ চিত্রেই সেক্সপীয়র যে পোষাক পরিধান করিয়া আছেন তাহা তৎকালীন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের বেশ। বর্ত্তমান যুগে যেমন বিলাতী সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তি ও প্রধানতম ডিউকের বেশের মধ্যে প্রথমদৃষ্টিতে কোনো ইতরবিশেষ নাই, সে সময়ে তাহা ছিল না। অভিজাত সমাজের বেশ সাধারণ লোকের পরার অধিকার ছিল না, অন্যথায় শাস্তিভোগ করিতে হইত।

কেহ কেহ ধরিয়া লইয়াছেন সেক্সপীয়রের ছবিগুলি রঙ্গমঞ্চের বেশে আঁকা। কিন্তু সে সময় রঙ্গমঞ্চের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, যথা রিচার্ড বারবেজ, বেন জন্‌সন্, নেড আলিন, ইঁহারা কেহই রঙ্গমঞ্চের পোষাকে চিত্রিত হন নাই, সকলেরই সাধারণ ভদ্রলোকের বেশ।

ওয়াশিংটনের "ফলজার সেক্সপীয়র" লাইব্রেরিতে রক্ষিত সেক্সপীয়রের যে চিত্রখানি "অ্যাশবোর্ণ সেক্সপীয়র" নামে খ্যাত, সেইখানিকে ভিত্তি করিয়া গবেষণার সৃষ্টি। অক্সফোর্ডের সপ্তদশ আর্লের যে ছবিখানি এখানে দেওয়া হইল, তাহার সহিত এই ছবির মুখাবয়বের বিশেষ সাদৃশ্য।

কিন্তু শুধু খানিকটা সাদৃশ্য দিয়াই যদি ব্যাপারটা শেষ হইত, তাহা হইলে কিছু আসিয়া যাইত না। কারণ ফ্রান্সিস বেকনের সহিতও সেক্সপীয়রের যথেষ্ট সাদৃশ্য। একাধারে দুই জন লোকের আদি ও অকৃত্রিম সেক্সপীয়র হওয়া ত আর সম্ভবপর নয়।

কিন্তু "অ্যাশবোর্ণ" চিত্রের রঞ্জন রশ্মি ও অতি-লাল আলোক সাহায্যে গৃহীত ফটোগ্রাফে কয়েকটি জিনিষ ধরা পড়িয়াছে, যাহা কোনোমতেই উপেক্ষা করা চলে না। আপাততঃ বিনা আপত্তিতে এই কয়টি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে—

১। ছবিখানির উপরে জুয়াচুরী চলিয়াছে অর্থাৎ আসল ছবির উপরে নূতন রঙের প্রলেপ দিয়া কয়েকটি অংশ ঢাকিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য; জোর করিয়া তুলিয়া দেওয়া কপাল, ও গলায় চারিদিকের বেষ্টনীর আকার পরিবর্ত্তন।

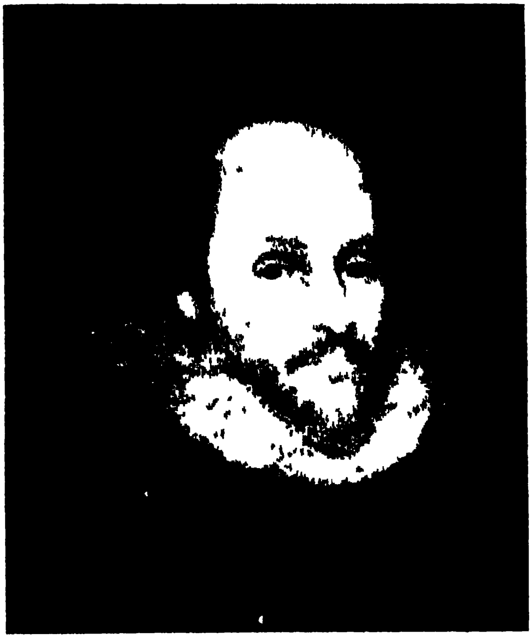
৩। আসল ছবির বাঁদিকে উপরে যেখানে প্রকৃত শিল্পীর নাম ও কবির পারিবারিক চিহ্ন ছিল, তাহা বদলাইয়া নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে ÆTATIS SVÆ. 47

A °: 1611

যাহাতে ছবিখানি যে সেক্সপীয়রের এ বিষয়ে লোকের সন্দেহ না থাকে। চিত্র দ্রষ্টব্য।

৩। প্রকৃত শিল্পীর নাম C. K., অর্থাৎ কর্ণেলিয়াস্ কেটেল।

ছবির বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে যে অঙ্গুরী আছে, তাহার উপর একটি বরাহের মুখ অঙ্কিত আছে। আর্ল অব অক্সফোর্ডের শীলমোহরও বরাহচিহ্নিত।



"অ্যাশবোর্ণ' সেক্সপীয়রের "ইনফ্রা-রেড" ছবি
উঁচু কপাল ও গলবেষ্টনীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্যণীয়।

অবশ্য ইহা হইতে এইমাত্র প্রমাণ হয়, যে, যে ছবিখানিকে এতদিন সেক্সপীয়রের বলিয়া সকলে জানিয়া আসিয়াছে, তাহা সেক্সপীয়রের নহে, অক্সফোর্ডের সপ্তদশ আর্লের আলেখ্য এবং এইটুকুর উপর ভিত্তি করিয়া ধরিয়া লওয়া চলে না, যে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড-অন্‌-অ্যাভনের যে লোকটি এতদিন ধরিয়া ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন, সে-ব্যক্তির খ্যাতির কোনো ভিত্তি নাই।

কিন্তু সে যাহাই হউক, অক্সফোর্ডের একখানি চিত্র সেক্সপীয়রের বলিয়া চালানোর মধ্যে কাহার স্বার্থ? কারণ যে জুয়াচুরী ধরা পড়িয়াছে তাহা বহু বৎসর আগের এবং রঞ্জনরশ্মি ও অতিলাল আলোর সাহায্য ব্যতীত এ জুয়াচুরী ধরা পড়িবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

হয়ত ভবিষ্যতের গবেষণায় এদিকে আরও কিছু আলোকপাত হইতে পারে। কিন্তু মনে হয়, বোধ হয় না হইলেই ছিল ভাল।

স.

—

তিব্বতের নূতন দলাই লামা

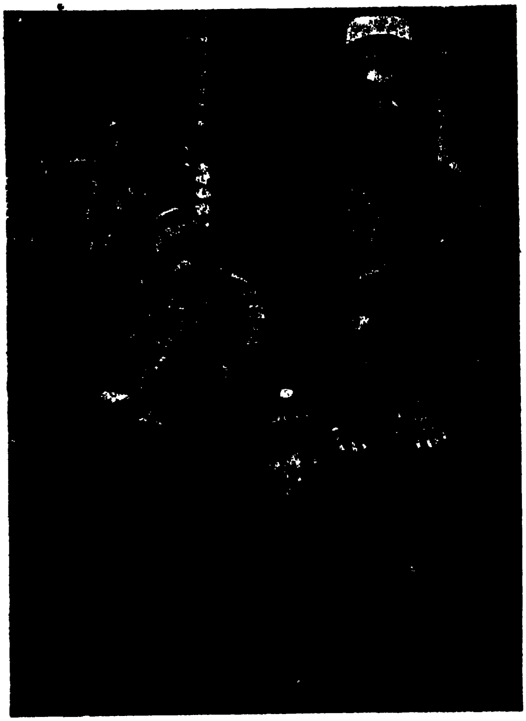
তিব্বতীদের মতে তাহাদের মহাগুরু দলাই লামার মৃত্যু নাই; তাঁহার এক দেহের বিনাশ ঘটে বটে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার আত্মা নবজাত কোনো শিশুর মধ্যে আশ্রয় লয়। বিশেষ চিহ্ন ও শুভ লক্ষণ দেখিয়া এই নবজাতককে দলাই লামা বলিয়া চিনিয়া ও মানিয়া লওয়া হয়, তিনিই দলাই লামার পদে অধিষ্ঠিত হন, আবার তাঁহার দেহত্যাগের পর আত্মা অন্য দেহে আসন লয়।

১৯৩৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ত্রয়োদশ দলাই লামার দেহত্যাগ ঘটিলে নূতন দলাই লামার সন্ধানের প্রয়োজন হয়। ত্রয়োদশ লামা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই কর্ত্তব্য নূতন দলাই লামাকে সন্ধান করিয়া বাহির করা। তিনি এক দিন দিব্যদৃষ্টিতে তিব্বতের উত্তর-পূর্ব্বে চৈনিক প্রদেশ কোকনরের অন্তর্গত তারেবৃহ্‌সুর নাম, ও তথাকার একটি বিশেষ গৃহ দেখিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন এই তারেবৃহ্‌সুরই কোনো নবজাত শিশুর মধ্যে দলাই লামার আত্মা দেহপরিগ্রহ করিয়াছে। শত শত লামা এই শিশুর সন্ধানে বাহির হইলেন। অবশেষে কোকনরের রাজধানীতে বিশেষলক্ষণযুক্ত এক শিশুর সন্ধান মিলিল। সন্ধানকারী দলের যিনি নায়ক ছিলেন তাঁহার গলায় ছিল ত্রয়োদশ লামার উপহার একগাছি মালা, এই শিশু মালাটি দেখিয়াই সেইটির জন্য হাত বাড়ায়, সন্ধানকারীরা ইহাকে একটি বিশেষ শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করে। ইহা ছাড়া আরও



নূতন দলাই লামা

শুভ লক্ষণ অনেক দেখা যায়। প্রথমে শুভলক্ষণযুক্ত কুড়ি-একুশ জন শিশুকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল ; তাহাদের মধ্য হইতে এই ভাবে বাছাই করা হয় :—একটি টেবিলে নানারূপ জিনিষ সাজাইয়া রাখা হয়, ত্রয়োদশ লামার ব্যবহৃত পাঁচটি দ্রব্যও তাহার সহিত মিশাইয়া রাখা হয়। ঐ কুড়ি-একুশটি শিশুকে টেবিলের কাছে লইয়া গেলে তাহাদের কেহ কেহ ত্রয়োদশ লামার ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মধ্যে এক-আধটি লইবার জন্ম ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। কিন্তু তায়েবৃহ্‌সুর শিশুটি পূর্ব্ববর্ত্তী লামার ব্যবহৃত পুরা পাঁচটি দ্রব্যই বাছিয়া লয়। এই শিশুই যে দলাই লামার প্রকৃত উত্তরাধিকারী, এই ব্যাপারে সে-বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়।



নূতন দলাই লামার পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ

এই শিশুটির পিতামাতা অমিশ্র তিব্বতী, যদিও অনেক দিন চীনাদের সঙ্গে বসবাস করিয়া চীনা ভাষা শিখিয়াছে, তাহাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী চীনা ধরণের। নূতন দলাই লামা পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কর্ম্মভার প্রতিনিধি ও পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

তিব্বতের অনেক অনুষ্ঠানের ন্যায় দলাই লামার নির্ব্বাচন-অনুষ্ঠানেও বিদেশীয় প্রবেশ নিষেধ। লাসার প্রধান মঠে দেড় শত বৎসর ধরিয়া এক স্বর্ণপাত্র রক্ষিত আছে। নির্ব্বাচনযোগ্য শিশুদের নাম কাগজে লিখিয়া আড়ম্বর সহকারে তাহার মধ্যে রক্ষিত হয়। চারিদিকে মন্ত্রোচ্চারণ হইতে থাকে, ধূপদীপ জ্বলিতে থাকে, পাত্র হইতে একটি কাগজ তুলিয়া লওয়া হয় ; সেই কাগজের টুকরাতে যাহার নাম লেখা আছে তিনিই হইবেন নূতন লামা। বলা বাহুল্য, সর্ব্বাপেক্ষা শুভ লক্ষণযুক্ত যে শিশু তাহারই নাম-লেখা কাগজটিই উঠিবে।

গুপ্ত.

মহিলা-সংবাদ

কানপুরের বালিকা বিদ্যালয়ের (ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের) অধ্যক্ষ শ্রীমতী শোভা বসু যুক্তপ্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের (যুক্ত প্রদেশের শিক্ষকদের সমিতির) সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।



শ্রীমতী শোভা বসু

দেশ-বিদেশের কথা

জাপানের সঙ্কট

গোপাল হালদার

সঙ্কট মূলত চীনের, কিন্তু জাপানও যে তাহাতে জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৎসর আড়াই পূর্ব্বে, ১৯৩৭এর জুলাই মাসে চীনস্থ জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে পিকিংএর নিকটে চীনা সৈন্যদের একটা সজ্ঘর্ষ বাধে—এইরূপ সজ্ঘর্ষ পূর্ব্বেও এক-আধটুকু হইয়াছে, জাপান সেইরূপ সজ্ঘর্ষ সূত্রে চীনের উপর নিজের অধিকার আর একটুকু প্রসারিত করিয়া লইয়াছে, চীনের কুয়োমিংতাং দলের নিরুপায় নায়ক সেনাপতি চিয়াং কাই-শেক তখন বাধ্য হইয়া তাহা সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু সেইবারের সজ্ঘর্ষের ফলে জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষরা যখন নূতন দাবি উপস্থিত করিলেন, চিয়াং কাই-শেক তাহাতে সম্মত হইলেন না, চীনারা বাধা দিতেই প্রস্তুত হইল। জাপানীরাও বাধা দূর করিতে সচেষ্ট হইল। সজ্ঘর্ষ এইরূপ অবস্থায় যখন বাড়িয়া চলিয়াছে তখন জাপান আর দেরি না করিয়া উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশই করতলগত করা স্থির করিল। কারণ, চিয়াং কাই-শেকও নূতন করিয়া চীনা বাহিনী ও চীনা রাষ্ট্র গঠন করিতেছিলেন, তাঁহার সেই সংগঠন সুসম্পূর্ণ হইলে জাপানের পক্ষে চীনের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা সুসাধ্য হইবে না। অতএব, জাপান কালহরণ না করিয়া তাড়াতাড়িই চীন অধিকার শেষ করিতে চাহিল। কারণ, চীন তখনও কলহে খণ্ডিত, দুর্ব্বল, অসহায়; আর জাপানের ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই; তাহার সৈন্যশক্তি প্রচুর আর অস্ত্র-আয়োজনে সে পৃথিবীতে অন্যতম অগ্রগণ্য শক্তি। ঝড়ের মত প্রচণ্ড আঘাতে সে চীনকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া দেখিতে-না-দেখিতে চীনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিবে এই তাহার আশা।

সঙ্কট কিরূপ

আড়াই বৎসর পরে দেখা গেল মরণাহত চীন মরে নাই, বিজয়ী জাপান এখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। "চীনের ঘটনা"টা ক্রমশই দীর্ঘায়ত হইয়া পড়িয়াছে—সেই সূত্রে জাপানের সঙ্গে পৃথিবীর বড় বড় শক্তিদের কূটনৈতিক মতান্তর ঘটিতেছে, জাপানের সৈন্যদল চীনের বিস্তৃত রণক্ষেত্রে মৃত্যুর কবলে পড়িতেছে, আর স্বগৃহে জাপানের ঐশ্বর্য্য, তাহার ব্যবসাবাণিজ্য, সবই এই সুদীর্ঘ 'ঘটনার' ফলে ক্রমশই ব্যাহত হইতেছে। এইটিই জাপানের সঙ্কট—"চীনের ঘটনা"টা মিটিল না। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় যুদ্ধও আসিয়া পড়িল;—তাহাতে জাপানের পক্ষে কোনো গুরুতর ক্ষতি নাই—নিরপেক্ষ জাপান আপনার নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চীনে বরং চাপিয়া বসিতেই পারিবে, নির্ব্বিবাদে একটা হাতে-ধরা নূতন চীনা তাঁবেদার রাজ্য গড়িয়া তুলিতেও পারিবে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও রহিয়াছে যুদ্ধে নিরপেক্ষ—আর জাপানের এই 'চীনা নীতি' সে বাধা দিতেই চায়। তাহা ছাড়া, ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে জাপানের নূতন করিয়া আপনার মিত্রামিত্র স্থির করা প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। জাপানী রাজনীতিতে এই কারণেও একটা ছোটখাট সঙ্কট দেখা দিল।

চীনে অচল অবস্থা

চীনে জাপান একটা অচল অবস্থার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই এই আড়াই বৎসরেও একটা কূলকিনারা সে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এমনি দেখিতে মনে হইবে—চীনে জাপানই তো বিজয়ী। সত্য বটে মুকডেন হইতে ক্যাণ্টন আর সাংহাই হইতে হাংকাউ এই বিস্তৃত প্রদেশের উপরে আজ জাপান কর্ত্তা; চীনা নদীপথ, বন্দর ও রেলপথ জাপানের হাতে—অর্থাৎ চীনের বাহির হইবার পথ মাত্র আজ য়ুনানের দিকে বর্ম্মার মধ্য দিয়া আর মঙ্গোলিয়ার বা চীনা তুর্কিস্থানের দিকে রুশিয়ার দুয়ার দিয়া। যে চীন আজ চিয়াং কাই-শেকের হাতে তাহা নিতান্তই অনুন্নত প্রদেশসমূহের সমষ্টি। যেমন করিয়া বাংলা ও গঙ্গা-উপকূলস্থ প্রদেশ হস্তগত করিবার পর উহার ধনে-জনেই ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষ অধিকার সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, জাপানের পক্ষে এই সমৃদ্ধ প্রদেশগুলির সহায়ে তেমনি করিয়াই সমস্ত চীনে আপন অধিকার স্থাপন করা কঠিন হইবে না। বিশেষত, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যের মত চীনে ও জাপান তাঁবেদার চীনা সরকার গড়িয়া চীনের একটা দল হাত করিয়া লইতে সচেষ্ট। জাপানের এইসব হিসাবে ভুল নাই, শুধু ঠিকে মিলিতেছে না এই জন্য যে, যে চীনা প্রদেশগুলি জাপানীদের অধিকৃত সেখানেই জাপানের 'অধিকার' বিশেষ দৃঢ় নয়। জাপানী সমর-ঘাঁটির বাহিরে পা দিলেই, শহর ছাড়াইয়া একটু অগ্রসর হইলেই, আর জাপানের অধিকার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জাপানী সৈন্যেরা উপস্থিত না থাকিলেই চীনারা আর জাপানকেও মানে না, তাহাদের হাতের চীনা-পুতুলদেরও তোয়াক্কা রাখে না। আবার, এইরূপ অভ্যন্তরীণ প্রদেশ-সমূহে চীনা গরিলা সৈন্যরা খণ্ড জাপানী সৈন্যদলকে বড়ঝঞ্ঝা আক্রমণ করিয়া ধ্বংসও করিতেছে। তৃতীয় কারণ এই যে অনধিকৃত খাঁটি চীনা অঞ্চলে বৃহত্তর চীনাবাহিনী প্রস্তুত হইতেছে, তাহাদের উন্নততর যুদ্ধোপকরণ জুটিতেছে আর যুদ্ধের পদ্ধতিতেও এই কয় বৎসরের অভিজ্ঞতায় এই

চীনারা অনেক উন্নতিও করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের জাপানী অভিযানগুলির ব্যর্থতা তাহাদের নিকট চীনা বাহিনীর যুদ্ধশক্তির প্রমাণ দিল। জাপান চাহিল চীনকে সংগ্রামে নিঃশেষ করিতে—ইয়াংসি নদীর কূলে কূলে জাপানী বাহিনী অগ্রসর হইতেই এপ্রিল মাসে চ্যাংশার নিকটে চীনা বাহিনী তাহাদের প্রত্যাক্রমণে একেবারে পর্যুদস্ত করিল। মে মাসে উত্তর-চীনকে চুংকিং হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা হইল—সেখানে সাম্যবাদী সৈন্তদল রহিয়াছে—হুপের পার্ব্বত্য প্রদেশে এক লক্ষ জাপানী সৈন্তের মধ্যে ১০হাজার কি ২৫ হাজার হতাহত হইল—জাপান পরাভূত হইয়া গেল। শান্সীতে ও সাম্যবাদী অষ্টম বাহিনীর হস্তে এই দশাই জাপানের ঘটিয়াছে—এদিকে বারেবারে "আগুন-বোমায়"ও চুংকিং অবনত হইল না। তাই সমরক্ষেত্রেও জাপানের বিজয় আর তেমন সুনিশ্চিত নয়। ইহার কারণ—চীনেরা নিজেরা এখন অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছে এবং সোভিয়েটের নিকট হইতে প্রচুর অস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতেছে। অবশ্য, এই সব অনুন্নত প্রদেশে জাপানের অতি উন্নত যুদ্ধাস্ত্র আনয়ন করা বা প্রয়োগ করা দুঃসাধ্য ইহাও জাপানের একটি অসুবিধা। চীন বাহির হইতে যাহাতে অস্ত্র ক্রয় করিতে না পারে তাহাই জাপানের চেষ্টা। তাই চীনা বন্দর জাপানের হাতে। সে ফরাসী ইন্দো-চীনের পণ্যও বন্ধ করিয়াছে; বন্ধ হয় নাই চীন-বর্ম্মার পথ আর রুশিয়ার দ্বার।

চীনা বন্দরে ও নদীপথে অবশ্য বিজয়ী জাপান বাণিজ্যের একচ্ছত্রাধিকারও প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়—তাহা হইলে উহার লাভেই বাকী চীন জয়ও চলিবে। কিন্তু সেখানে বাধা তাহার পাশ্চাত্য শক্তিরা—বিশেষ করিয়া ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স। চীনের দুর্দ্দিনে তাহার বাণিজ্যকেন্দ্রে ইহারা নিজেদের আস্তানা গড়িয়া বসিয়াছে—সেই সব আন্তর্জ্জাতিক এলাকায় এখনো বাণিজ্যের ও ঐশ্বর্য্যের জোয়ার ঠিক বহিতেছে। পূর্ব্বেকার (১৯২১) ওয়াশিংটন চুক্তি অনুযায়ী জাপানও এই 'মুক্ত দ্বার' সংরক্ষণে প্রতিশ্রুত। কিন্তু প্রকারান্তরে আজ জাপান তাহা ভঙ্গ করিতেই সচেষ্ট—না হইলে এই অঞ্চলে তাহার ব্যবসায় একচ্ছত্র হইবে না। কিন্তু এই সব শক্তিকে একেবারে বিদূরিত করাও সহজ নয়।

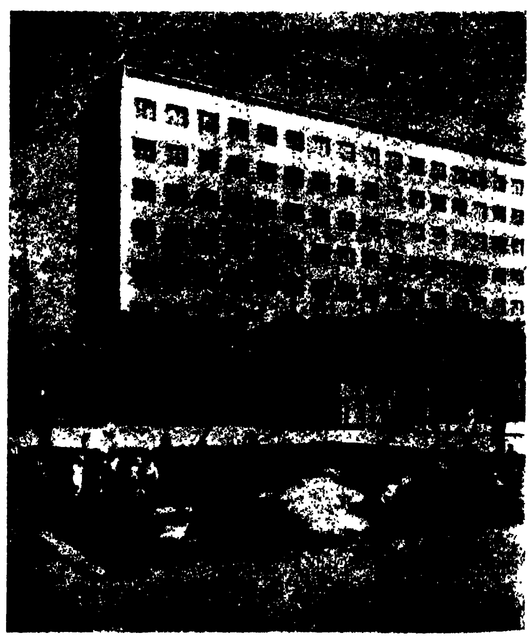
ইউরোপ আজ বিপন্ন হইলেও এশিয়ায় এখনো ইহারা স্বার্থ ছাড়িয়া দিবে, এমন নয়। নিজেদের বাণিজ্যনাশের ভয়ে এই পাশ্চাত্য শক্তিরা তাই চিয়াং কাই-শেককে পরোক্ষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। বিজিত অঞ্চল জাপানী বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জাপান সেই সব অঞ্চলে চার রকমের নূতন মুদ্রা চালাইতেছে—জাপানী ইয়েনের সঙ্গে তাহা বাঁধা। কিন্তু অন্য মুদ্রার সহিত বিনিময়ে তাহার দর মোটেই স্থায়ী নয়। জাপানের এই মুদ্রা প্রচলনে বাধা হইয়া দাঁড়াইল এই সব পাশ্চাত্য বাণিজ্যনায়কেরা—তাহারা পুরানো চীনা ডলারকে নিজেদের আস্তানায় ও ঘাঁটিতে টিকাইয়া রাখিল, নিজেদের বাণিজ্যের বাহন করিয়া আছে ইহাতেও জাপানের ইয়েন-গোষ্ঠী বা ইয়েন-আধিপত্য-পরাহত হইতেছে।

জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

এইরূপে চীন জয় সুসাধ্য না হইয়া জাপানের পক্ষে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, আর এই অচল অবস্থার ফলেই জন্মিয়াছে জাপানে সঙ্কট। এত দীর্ঘ সংগ্রামের কথা সে ভাবেও নাই—এত সৈন্যনাশের জন্য, এত অর্থক্ষয়ের জন্য, এমন কি এইরূপ আন্তর-রাষ্ট্রিক জটিলতার জন্যও সে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল না। "ঘটনা"টা আরম্ভ করিয়া দেন জাপানী সমর-নায়কেরা—বাড়াইয়া তুলিয়াছেনও তাঁহারা; কিন্তু এবার তাঁহারা চুকাইয়া ফেলিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে সে-পথ বন্ধ। এই কথা তাহারাই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা ভালো করিয়া বুঝিয়াছেন। তাই, চেষ্টা চলিয়াছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।

কিন্তু সেখানেও এখন পর্য্যন্ত জাপানী রাজনীতিকদের প্রভাব বেশী নয়, বরং এই জাপানী সমরনীতিকদেরই প্রভাব বেশী।

আধুনিক কালে উন্নত দেশগুলিতে সমরাধ্যক্ষরা যুদ্ধ করেন, কিন্তু সন্ধিবিগ্রহাদি নীতি স্থির করেন রাজনীতিকরা। অবশ্য, তাই বলিয়া সেনা-নায়কদের যে রাজনীতিতে প্রভাব কম থাকে মোটেই তাহা নয়। বোধ হয়, পুঁজিপতিদের পরেই থাকে সেনাপতির স্থান। কিন্তু জাপানের বেলা একটা গোল বাধিয়া



হেলসিনকির একটি পাব্লিক স্কুলের এক অংশ। ফিনল্যাণ্ডে নিরক্ষরতা একরূপ লোপ পাইয়াছে বলা চলে।

গিয়াছে—দেশটার মধ্যযুগীয় ক্ষাত্রপ্রাধান্ত লুপ্ত হয় নাই। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে রাজনীতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাহারা সাধারণ কৃষক-মজুরদের কিছুই উপকার না করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এমনভাবে করিল যে, তাহার প্রতিক্রিয়ায় ক্ষাত্রপ্রাধান্তই বাড়িয়া গেল। রাজনীতিকদের অপেক্ষা জাপানী সমরনীতিকরা জনসাধারণের বেশী বিশ্বাস-ভাজন—আর, ইহারা সাম্রাজ্যপ্রসারে বদ্ধপরিকর। ইহাদেরই কাজ মাঞ্চুকুও পত্তন—উত্তর-চীনে জাপানের প্রসার। এই সার্থকতায় আবার এই জাপানী পররাষ্ট্রনীতি মুখ্যত ইহাদের অধিকারেই পড়িল। যদি বা কখনো জাপানী রাজ-নীতিকরা ইতস্তত করেন, এই জাপানী সামরিক দল আপনা হইতেই নিজেদের নীতি চালাইয়া যান। এই জবরদস্ত নীতির প্রধান পরিচালক হইলেন চীনস্থ "কোয়াণ্টু বাহিনীর" সৈন্যাধ্যক্ষগণ। অপরাজেয় বলিয়া ইহাদের গর্ব্ব আছে; আর নীতি হিসাবে স্বভাবতই ইহারা শক্তিবাদীর দলে—সাম্যবাদের বিপক্ষে, অর্থাৎ ফাসিজমের অনুরাগী, তাই ইতালি ও জার্মানীর পক্ষপাতী; আবার জাপানী বাণিজ্যপ্রসারের পক্ষপাতী হইলেও ইহারা জাপানী বণিক-চালিত রাজনীতিক দলের বিরোধী, আবার চীনে জাপানী সাম্রাজ্য যাহারা বাধাস্বরূপ, স্বভাবতই তাহাদেরও বিরোধী—অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স বা মার্কিন রাষ্ট্রের শুভমুগ্ধ নয়। ইহাদের পরিচালনায় 'চীনের ঘটনা' যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব করিয়াছে তাহাও তাহা হইলে সহজেই বুঝা যায়—ইহারা মূল নীতির দিক হইতে এবং চীনকে পরোক্ষ সহায়ক হিসাবে সোভিয়েটের শত্রু হইবে; ইতালি-জার্মানীর সহিত দল বাঁধিবে। তাহাই দেখা দেয় রোম-বার্লিন টোকিও অক্ষে। আবার দেখা গেল, ইহারা ঠিক ঐ নীতির হিসাবে এবং চীনের জাপানী স্বার্থের খাতিরে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব রাখিতে উদ্‌গ্রীব হইল না।

এই দুই দিকেই কিন্তু জাপানী রাজনীতিকরা আবার এই সমরনীতিকদের বাধা দিবে,—কারণ রাজনীতিকরা বণিক-চালিত, তাহারা চায় বাণিজ্যপ্রসার। জাপানের বাণিজ্য-স্বার্থ প্রধানত চীনের সহিত;—চীনাদের শত্রু করিয়া তাহার বহুরূপে ক্ষতি হইতেছে। দ্বিতীয় সম্পর্ক মার্কিনের সহিত,—চীন অভিযানে তাহাও হ্রাস পাইতেছে। তৃতীয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত—সেখানেও চীন-যুদ্ধের জন্য বাজার ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। অতএব, এই রাজনীতিকদের চেষ্টা কোনরূপে এইসব জাতির সহিত সুসম্বন্ধ স্থাপন করা, এবং ইহাদের প্রতিপক্ষদের সহিত সমরনীতিকদের সম্পূর্ণরূপে জুটিতে না দেওয়া।

প্রাচ্য-মিউনিখ

এই চেষ্টাটাই সমরনীতিকরা করেন, গত জুলাই-আগষ্টে। তাঁহারা সাম্যবাদবিরোধী জাপান-জার্মানী-ইতালীর বন্ধুত্বকে



ফিনল্যাণ্ডের আধুনিক কলকারখানা। গত কুড়ি বৎসরে ফিনল্যাণ্ডে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ২৪২ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও শ্রমিকদের বেতন আড়াই গুণ বাড়িয়াছে।

সামরিক বন্ধুত্বে পরিণত করিতে চান। বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী অ্যাডমিরাল য়োনাই (তখন নৌ-সচিব) ও পররাষ্ট্রসচিব মিষ্টার আরিতা এই চেষ্টা ব্যর্থ করেন। মন্ত্রণায় যাহা হইল না, রণক্ষেত্রে তাহার চেষ্টা হইল তখন কোয়াণ্টু বাহিনীর কাজ। প্রথমত তাঁহারা বহির্মঙ্গোলিয়ার সীমানায় সোভিয়েটের সহিত সজ্ঘর্ষ বাধাইয়া জাপানী মন্ত্রীদের ইতালি ও জার্ম্মানীর নিকটতর করিবার চেষ্টা করিলেন। দ্বিতীয়ত, কাউলুং (হংকং) ও কোয়াংগু (আময়) প্রভৃতি আন্তর্জ্জাতিক ঘাঁটিতে জাপানী নৌ-সৈন্য নামাইয়া, সাঙ্ঘাই এ চাপ দিয়া এবং সর্ব্বপ্রধান টিয়েনশিন বন্দর অবরোধ করিয়া ও সেখানকার ইংরেজদের সর্ব্বরকমে অপমানিত করিয়া ইহারা চাহিলেন—ব্রিটেন-ফরাসীর বিরোধী জার্ম্মানী-ইতালির বন্ধুত্ব জাপানের পক্ষে আরও কাম্য করিয়া তুলিতে। অবশ্য এই পাশ্চাত্যদের বিরুদ্ধে অভিযানে ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অন্য একটি—এইভাবে ব্রিটিশ ও ফরাসীকে চাপ দিলে তাহারা নিজেদের স্বার্থের দায়ে চিয়াং কাই-শেককে চাপ দিবে জাপানের কথামতো জাপানী সন্ধিতে সম্মত হইতে। সুদূর প্রাচ্যে একটি মিউনিখের অভিনয় হইবে। তাহা হইলে, যাহা জাপানের প্রধান উদ্দেশ্য—"সুদূর প্রাচ্যে নব-নিয়ম প্রতিষ্ঠা"—অর্থাৎ জাপানী আধিপত্য স্থাপন—তাহা সিদ্ধ হয়, "চীনের ঘটনা"ও চুকিয়া যায়, আবার জাপানের সঙ্কটের সমাধান হয়।

ইউরোপীয় ও জাপানী পররাষ্ট্রনীতি

কিন্তু এমনি সময়ে জার্ম্মান-সোভিয়েট চুক্তিতে এই জার্ম্মানীর বন্ধুর সাম্যবাদ-বিরোধী বনিয়াদ ধ্বংস হইয়া গেল। সোভিয়েটে ও জার্ম্মানী হইল বন্ধু—এখন কি জাপান করিবে সোভিয়েটের শত্রুতা, ব্রিটেন-ফরাসী আমেরিকার বিরোধিতা? জাপান চিন্তিত হইল। আর, ঠিক এই সময়েই আবার বহির্মঙ্গোলিয়ার সোভিয়েট-বিরোধী প্রয়াস এক বিপুল পরাজয়ে পর্য্যবসিত হইল। অতএব বুঝা গেল, নূতন করিয়া জাপানী পররাষ্ট্রনীতি ঢালিয়া সাজিতে হইবে। হির্যানুমার মন্ত্রিপরিষদ বিদায় লইলেন—আসিলেন ২৮শে আগষ্ট আবে মন্ত্রিপরিষদ। তাড়াতাড়ি সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি হইল (১৫ই সেপ্টেম্বর); ব্রিটেন ও ফরাসীর উপর আর জাপান চাপ দিল না। ইহাদের বন্ধু করিয়াই এই প্রাচ্য-মিউনিখ সম্ভব হইবে—হয়ত ইহাই ছিল আশা। এদিকে ক্রমেই কিন্তু দেখা গেল জার্ম্মানী ও সোভিয়েট বন্ধুত্ব একই কালে রক্ষা করা যায়—ইতালীর বন্ধুত্বে তো কথাই নাই। অতএব, পুরানো বন্ধুত্বের সঙ্গে এখন সোভিয়েটকে পাইলে জাপানের অনেক সুবিধাই হয়—বন্ধুত্ব জমিলে সোভিয়েট হয়ত চীনকে আর সাহায্য দিবে না, এমন কি চীনের লাল ফৌজও হয়ত নিষ্ক্রিয় রহিবে—তখন 'চীনের ঘটনা' মিটাইতে আর দেরি কি?

কিন্তু কোনো দিকেই আবে মন্ত্রিমণ্ডল বিশেষ সফলকাম হইলেন না। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানাইল চীনের ব্যাপারে তাহারা রুষ্ট; জাপানের সঙ্গে ত্রিশ বৎসরের বাণিজ্য-চুক্তি এবার (২৬শে) শেষ করিয়া তাহারা দিতেছে—এমন কি জাপানে অস্ত্রবিক্রয়ও তাহারা বন্ধ করিতে পারে। জাপানের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার কথা—নূতন সঙ্কট। এদিকে দেশে আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হইল—চাউল দুর্মূল্য। সাধারণ লোকে ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে মূল্যবৃদ্ধিতে দুঃস্থ। আবে মন্ত্রিমণ্ডল বিদায় লইলেন—আসিলেন (১৪ই জানুয়ারী) য়োনাই। তাঁহার

নীতি পরিষ্কার—চীনের ঘটনা মিটানো; তাঁহাদের চীনা রাজ্যকেও পুষ্ট করা; আর পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে বুঝাপড়া করা। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপানী উষ্মা জ্বলিয়া উঠিল। জাপানী জাহাজ "আসামা মারু"র ২১টি জার্ম্মানকে তদুপরি ব্রিটেন ধরিয়া রাখায় সে ক্রোধে প্রায় বহ্নিমান্। সন্দেহ হয়—ইহা কিসের সূচনা। অবশ্য, এই দিক হইতে আশার কথা জাপানী সোভিয়েট বন্ধুত্বও হইল না। কেন? সোভিয়েট চীনকে বলি দিতে চায় না কিন্তু চীনের ঘটনাও তো চুকিল না—জাপানী সঙ্কট রহিয়া গেল।

—

রেঙ্গুনে নিখিল-ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীনারায়ণচন্দ্র মজুমদার

গত বড়দিনের অবকাশে রেঙ্গুনে নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পঞ্চাহব্যাপী উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সম্মেলনের সভাপতি ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের ভাষায়, "কি জনসমাগমে, কি প্রবন্ধসম্ভারে, কি উদ্যোগে-আয়োজনে ও শৃঙ্খলায়, সে কোন বিষয়েই এই সম্মেলন বাংলায় বা বাংলার বাহিরে এই জাতীয় সম্মেলনের তুলনায় গৌরব অনুভব করিবে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ সাহিত্যালোচনা হইলেও ইহা ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালী জনসাধারণের সামাজিক মিলনকেন্দ্রও বটে এবং এই সম্মেলন এই উভয় উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ সফল করিয়াছে।" সম্মেলনের সম্পাদক ডাক্তার বিনয়শরণ কাহালী, এম্. বি. মহাশয় ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণের অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে সম্মেলনের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

গত ২৫শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সিটি হলে মূল সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলর উ টিন টুট মহাশয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন,

এই শুভ অনুষ্ঠানে আমার কেবলই মনে হইতেছে যে যদি আপনাদের ঐশ্বর্য্যময়ী বঙ্গভাষা আমার জানা থাকিত তাহা হইলে আপনাদিগকে সেই প্রাচীন মহিমময় ভাষাতে সম্বোধন করিতাম।·· সৌভাগ্যের বিষয় ব্রহ্মদেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ও বঙ্গের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পের সাহায্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় করাই এই শাখার মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্রহ্মদেশে বাংলা সাহিত্য প্রচারকার্য্যে এই শাখা নিজকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করিয়াছে এবং আমি ভরসা



নিখিল-ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের মূল সভাপতি, বিভাগীয় সভাপতিগণ ও কর্ম্মীবৃন্দ

রাখি যে এই পরিষদ অচিরেই বাংলা ভাষার প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও নূতন পুস্তক সমূহকে ব্রহ্মভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করিবেন। বর্ত্তমানে এই আন্তর্জ্জাতিক বিবাদ ও প্রতিযোগিতার দিনে জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের পথ হইতেছে পরস্পরকে বিশিষ্ট রূপে জানা এবং পরস্পরের সংস্কৃতির সম্যক্ উপলব্ধি করা। আমরা ব্রহ্মদেশে বাংলা সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ অনুরাগী—কারণ বাংলা যে ভৌগোলিক হিসাবেই ব্রহ্মদেশের প্রতিবেশী তাহা নয়, ইহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধও অতি নিকট। আমি ও আমার স্ত্রী ভারতে সুখময় প্রবাসকালে বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছি যে ভাষা ও পরিচ্ছদে বাহিরের পার্থক্য থাকিলেও সংস্কৃতি ও ভাবধারায় বাংলার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ অতি নিকট। ব্রহ্মবাসী আমরা সর্ব্বদাই বাংলা ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী, কারণ এই ভাষা সেই পালি অথবা মাগধী ভাষার সাক্ষাৎ সন্তান যে ভাষাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছে। বাংলা ভাষার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমি এ-কথা বলিব যে এই ভাষার সহিত আমার যে পরোক্ষ পরিচয় আছে তাহাতে আমাকে এই ভাষার প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছে। যদি বাংলা ভাষা অধ্যয়নের সুযোগ থাকিত তবে সেই ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী পড়িয়া আমি পুরস্কৃত মনে করিতাম।

অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার স্বাগত অভিভাষণে সাহিত্য ও জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা করেন।

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাঁহার অভিভাষণে বলেন,

প্রবাসী বাঙালীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে, পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার প্রভাবে ভারতের নানা প্রদেশে আমরা ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সমস্ত প্রদেশের সংস্কৃতির সহযোগে নূতন সৃষ্টির দিকে কখনও যত্নবান হই নাই। বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইলেও যে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের কোন সৃষ্টি হইতেছে না ইহা মনে করা অসঙ্গত। ব্রহ্মদেশও ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ধারা গ্রহণ ও রক্ষা করিতেছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব্বেই ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা সমুদ্রপথে মালয়, ইন্দোচীন, জাভা প্রভৃতি স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। এই যুগে যে ভারতের সঙ্গে এই প্রদেশের দৃঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রদেশের প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ছিল উত্তর-ভারতীয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরও প্রচলন ছিল; তাহা তাহার প্রাচীন মন্দির ও শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়া এই দেশের অধিবাসীরা একটি বিরাট সংস্কৃতি গড়িয়া তোলেন। অভিধর্ম্মের আলোচনায় তাঁহারা এক সময়ে বৌদ্ধজগতে এমন খ্যাতি অর্জন করেন যে বহুকাল ধরিয়া নানাদেশ হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা অভিধর্ম্ম আলোচনার জন্য এই দেশে আসিতেন। এই দেশের রাজাদের

উৎসাহে ও আনুকূল্যে এখানে সাহিত্য ও সুকুমার শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে। সেই সংস্কৃতি এ দেশের লোক এখনও বিস্মৃত হয় নাই। কারণ স্বাধীন জাতীয় জীবনের স্মৃতি ইহাদের মনে এখনও জাগরূপ আছে। প্রবাসে বাঙালীকে এই দেশের মাটির রস আহরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই দেশের জাতির সঙ্গে সহজ সরল সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এ দেশের সংস্কৃতি হইতে নিজেদের উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহাকে নূতন শিল্প সৃষ্টির পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

২৬শে ডিসেম্বর সাহিত্য-শাখার অধিবেশন হয়। শ্রীসুরুচি রায় সাহিত্য-ভারতী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যশাখার নিম্নলিখিত রচনাগুলি পঠিত হয়।

বাংলার লিরিক কবিতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—শ্রীসাবিত্রী গুপ্তা; ব্রহ্মানারদ সংবাদ—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস; দিবাস্বপ্ন—শ্রীনির্ম্মলেন্দু সেনগুপ্ত; ভারতের মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসমরেন্দ্র দত্তরায়; বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের দান—শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য; জাগো বীর (কবিতা)—শ্রীবিমলেন্দুবিকাশ সরকার।

এই দিন জোগন নাট্যসমাজ শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর "ঘৃতং পিবেৎ" নাটক অভিনয় করেন।

২৭শে ডিসেম্বর অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিজ্ঞানশাখার অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয় আলোকচিত্র সহযোগ ধান্য ও ধান্যের পুষ্টি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

বিশুদ্ধ গণিতের কথা—অধ্যাপক মন্মথনাথ ঘটক; বর্মায় বারিপাত—শ্রীউৎপলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ; বাঙ্গালীর যোগ্য খাদ্য—শ্রীগণেশ মৈত্র; ছেলেমেয়েদের অপরিপুষ্টির পরিমাপ—শ্রীনীহাররঞ্জন চৌধুরী; মানবের ক্রমবিকাশ—অধ্যাপক শৈলেশচন্দ্র গুহ।

ঐ দিন রাত্রে জুবিলি হলে বাঙালী ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক "দেবতার ডাক" অভিনীত হয়।

২৮শে ডিসেম্বর শ্রীসুরেশপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইতিহাস ও অর্থনীতি শাখার অধিবেশন হয়। অভিভাষণে সভাপতি মহাশয় বহু প্রাচীন সভ্যতার উত্থানপতন-কাহিনী বিবৃত করিয়া বিশ্বসভ্যতায় ভারতের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এই সভায় পঠিত হয়।

ব্রহ্মে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রহ্মের কয়েকটি রাজার নাম ও নগরের ইতিবৃত্ত—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির ধারা—শ্রীদেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, বর্মার বিত্তে বাংলার ভাগ—শ্রীসতীশচন্দ্র বৈদ্য; বঙ্গ-ব্রহ্মীয় সমাজ গঠনের সমস্যা—শ্রীজ্যোতিবরঞ্জন বড়ুয়া, প্রাচীন প্যু জাতি—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দাস; বঙ্গ-ব্রহ্ম ইতিহাসের তৃতীয় উল্লাস—শ্রীকৈলাসচন্দ্র আচার্য্য।

ঐদিনই শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে দর্শন-শাখার অধিবেশন হয়। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এই সভায় পঠিত হয়।

প্রগতি যুগধর্ম—স্বামী শ্যামানন্দ, বৌদ্ধ দর্শনের কয়েকটি কথা—শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির; কুসংস্কার ও ধর্ম—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, বর্ত্তমান ভারতীয় চিন্তাধারার বিষয়ে কয়েকটি কথা—অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ বসু; শান্তি ও পাশ্চাত্য নব্যদর্শন—শ্রীকৈলাসচন্দ্র আচার্য্য, আধ্যাত্মিকতার দার্শনিক মর্ম—শ্রীমধুসূদন দে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মৈত্র

ক্যালকাটা কেমিক্যালের শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মৈত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাধিকামোহন বৃত্তি লাভ করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপ গিয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও জার্মেনীর বড় বড় প্রসিদ্ধ কারখানায় তিনি এসেন্সিয়াল অয়েল, অ্যারোমেটিক কেমিক্যালস (Essential oils and aromatic chemicals) সাবান-শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন।

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বাঙালীর মধ্যে ক্রীড়া ও শরীরচর্চা প্রচলনে এক জন প্রবর্ত্তক [illegible] নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী [illegible] [illegible] ও সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। শেক্সপীয়রের অনেক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যেও তিনি অন্যতম ছিলেন।

ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এসসি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি কিছুকাল আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইসচ্যান্সেলারের কার্য্যও করিয়াছিলেন।

ডক্টর গোপেশ্বর পাল

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের মনোবিদ্যা-বিভাগের অধ্যাপক শ্রীগোপেশ্বর পাল সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এসসি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল—ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্বের অনুভূতি। তিনি নয় বৎসর যাবৎ বহু পরীক্ষা করিয়া এই বিষয়ে এক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।



শ্রীগোপেশ্বর পাল

এই আবিষ্কারের ফলে এযাবৎকাল প্রচলিত হ্বেবার-ফেক্‌নর সূত্রের (Weber-Fechner's law) সংশোধনের প্রয়োজন হইবে। তাঁহার প্রবন্ধ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিশেষজ্ঞদের (Drs. Fernberger, Myers and Bartlett) দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে ও তাঁহাদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

কষ্টিপাথর

প্রার্থনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নব জীবনের যাত্রার পথে দাও দাও এই বর
হে হৃদয়েশ্বর,
প্রেমের বিত্ত
পূর্ণ করিয়া রাখুক চিত্ত,
যেন সংসার মাঝে
দক্ষিণ মুখ রাজে,
সুখে পাই তব ভিক্ষা,
দুখে পাই তব দীক্ষা,
মন ক্ষুদ্রতা করুক মুক্ত,
নিখিলের সাথে হোক সে যুক্ত,
শুভ কাজে যেন না আনে ক্লান্তি।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বঙ্গলক্ষ্মী]

প্রাচীন ভারতে রাজার অন্নপানীয়ে বিষপরীক্ষা

প্রাচীন কালে রাজবৈদ্যকে কেবল রাজার চিকিৎসাকার্যের জন্যই ব্যাপৃত থাকিতে হইত না। রাজা যখন যুদ্ধযাত্রা করিতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া রাজাকে শত্রুপক্ষের প্রযুক্ত বিষ হইতে রক্ষা করিবার ভার রাজবৈদ্যের ছিল। কেন না শত্রুপক্ষ রাজাকে এবং রাজার সৈন্যসামন্তগণকে বিনাযুদ্ধে কৌশলে বিনাশ করিবার জন্য রাজা যে পথ দিয়া যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিতেন সেই পথ; যে সকল জলাশয়ের জল পান করিতেন সেই সকল জলাশয়ের জল, যে সকল খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতেন সেই সকল ভোজনদ্রব্য, এবং বিশ্রান্ত হইয়া যে সকল বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেন, সেই সকল বৃক্ষের ছায়াকে, এমন কি রাজার অন্নব্যঞ্জনাদি পাকের জন্য ব্যবহার্য ইন্ধন বা জ্বালানি কাঠ ও অশ্ব প্রভৃতির খাদ্যদ্রব্য সকলকেও দূষিত বা বিষাক্ত করিয়া রাখিত। রাজার সন্নিহিত রাজবৈদ্যকে এই সকল দ্রব্যকে রাজার বা রাজ-অনুচরগণের ব্যবহারের পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইত এবং দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইলে, উহাদিগকে শোধিত করিয়া ব্যবহারযোগ্য করিয়া দিতে হইত।

রাজার অন্নপানীয় যাহাতে শত্রুপক্ষ বা বিদ্বিষ্ট ভৃত্য কর্তৃক বিষাক্ত না হইতে পারে, তাহার জন্য রাজা যথোচিত ব্যবস্থা তো করিতেন-ই, অধিকন্তু তিনি আর এক জন বৈদ্যকে অন্নপানীয় প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য তাঁহার পাকশালার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিতেন। ইনিও রাজবৈদ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেন। তাঁহার নিকট ভোজ্য, পানীয় প্রভৃতি পরীক্ষার উপকরণ এবং বিবিধ প্রকার বিষনাশক ঔষধসকলও থাকিত।

রাজার অন্নপানীয় বিষাক্ত কিনা পরীক্ষার জন্য পাকশালাধ্যক্ষ বৈদ্যের আদেশে, কাক, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, হংস, জীবজীবক, শুক, শারিকা ও ময়ূর প্রভৃতি পক্ষী এবং মর্কট ও পৃষত নামক মৃগ প্রভৃতি সযত্নে রাজভবনে প্রতিপালিত হইত। ইহাদের দ্বারা রাজার অন্ন-পানীয়াদির পরীক্ষা এবং রাজভবনের শোভাবর্ধন—উভয়ই হইত।

এক্ষণে রাজার অন্নপানীয় বিষসংযুক্ত কিনা তাহার পরীক্ষা পাক-শালাধ্যক্ষ যেরূপভাবে করিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় উল্লিখিত হইতেছে। এই পরীক্ষায় মূল্যবান্ কোন যন্ত্রের আবশ্যক ছিল না।

বিষাক্ত অন্ন পরীক্ষা যথা—(১) রাজার অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য হইতে কিয়দংশ মক্ষিকা ও বায়স প্রভৃতি পক্ষীদিগকে প্রথমে খাওয়াইয়া দেখা হইত। যদি উহা ভক্ষণ করিয়া মক্ষিকা ও বায়সাদি মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহা হইলে উহা যে বিষযুক্ত তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণীকৃত হইত। অথবা—

(২) ভোজ্যদ্রব্যের কিয়দংশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি অত্যন্ত চটচট করিয়া শব্দ এবং ময়ূরের কণ্ঠের মত তীব্র উজ্জ্বল শিখা নির্গত হইত কিংবা অগ্নিশিখা বিচ্ছিন্ন ও তাহা হইতে তীক্ষ্ণ ধূম নির্গত হইত এবং সে ধূম সহসা উপশমিত না হইত, তাহা হইলে উহা বিষসংযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইত। তদ্ভিন্ন,—

(৩) বিষসংযুক্ত অন্নাদি দর্শন করিলে চকোরের চক্ষুর বর্ণ ভিন্নরূপ করিত এবং—

(৪) বিষাক্ত অন্নাদি দর্শন করিলে জীবজীবক পক্ষীর মৃত্যু (৫) কোকিলের স্বরবিকৃতি (৬) ক্রৌঞ্চের মত্ততা (৭) ময়ূরের উদ্বেগ ও রোমাঞ্চ (৮) শুক ও সারিকার চীৎকার (৯) হংসের বিকট আর্তনাদ (১০) ভৃঙ্গরাজের নিনাদ (১১) পৃষত নামক মৃগের অশ্রুবিসর্জন ও (১২) বানরের মতভেদ হইত।

শ্রীভারতী]

প্রগতি-সাহিত্য

শ্রীশুভেন্দু ঘোষ

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ, বিশেষতঃ বিগত মহাসমরের পর হ'তে মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা দিয়েছে; বাস্তব জীবনের নানান অভিজ্ঞতা মানুষকে তার জীবনদর্শন বদলে ফেলতে বাধ্য করেছে, তার রুচির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, রসানুভূতির নূতন বিষয়বস্তু উপস্থিত করছে। বর্তমানের অনিশ্চয়তা ভেদ ক'রে নূতনের অভীকায় ফুটে উঠছে; মানুষের মনে নূতন আশা ও নূতন বিশ্বাসের সঞ্চার হচ্ছে। যে সাহিত্যে জীবনের এই জয়যাত্রা রূপায়িত, তারই নামকরণ হয়েছে প্রগতি-সাহিত্য।

সাম্যবাদের দেশেও বাস্তব জীবনের অভিনব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটা নূতন সাহিত্য গড়ে উঠেছে। নূতন ভাব ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী আঙ্গিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বিষয়বস্তুতেও অভিনব রুচির পরিচয় মিলছে; নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন সমালোচনারীতি দেখা দিচ্ছে।

কিন্তু প্রগতি-সাহিত্যের নামে যা কিছু চলছে, তাকেই খাঁটি জিনিষ মনে করলে ভুল হবে; কারণ এর কতক আদৌ সাহিত্য নয় কতকগুলির সর্বাঙ্গে অতি-আধুনিকতার ছাপ থাকলেও, সেগুলিতে ফুটেছে আধুনিক যুগের প্রগতিটা নয়, পুরোনো যুগের উচ্ছিষ্ট বীভৎস বিকৃতিটা। প্রগতি-সাহিত্যে সমাজের এই বিকৃতির দিক প্রতিফলিত হবে না, তা নয়। বিকৃতিও সত্য, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী সত্য সমাজের প্রাণশক্তির স্ফূর্তি। জীবনের নিকষেই সত্যাসত্যের অন্তিম পরীক্ষা হতে পারে, তাই বিকৃতিকে যখন বিকৃতি বলে চেনা যায় না, জীবনের প্রকৃতির ছদ্মবেশে সেটা যখন দেখা দেয়, তখন তার চেয়ে অসত্য আর কি হতে পারে।

সাহিত্যিকার অনুভূতি ব্যতীত সাহিত্য হয় না, সুতরাং রাজনৈতিক মতামত যদি অনুভূতিতে রূপান্তরিত না হয়ে সরাসরি সাহিত্যে প্রবেশের চেষ্টা করে তবে অনর্থই ঘটে, এমন ক'রে প্রগতি-সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না। প্রগতি-সাহিত্যের কাজ সমাজের বৈপ্লবিক পরিবেষ্টনে মানবচিত্তে যে বিচিত্র রস উদ্ভূত হয়, তাকে রূপায়িত করা। এরূপ পরিবেশে যে অনুভূতির উদ্ভব, সেটা ব্যষ্টিগত না হয়ে সমষ্টিগত হওয়ার দরুণ প্রগতি-সাহিত্য অব্যর্থ ভাবে বাস্তবপ্রধান হয়ে ওঠে। যে বিচিত্র 'সামগ্রিক' অনুভূতি মানুষকে বিপ্লবের অভিমুখে ঠেলে নিয়ে যায়, বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে সেগুলির রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে প্রগতি সাহিত্যকে পদে পদে বাস্তব জগতের উপর নির্ভর করতে হয়; মানুষের চিন্তা, হৃদয়াবেগ প্রভৃতি এ সাহিত্যে সার্থকতা পায় বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে। অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, বাস্তবের, বিশেষ ক'রে, কুৎসিত অথবা করুণ বাস্তবের একটা চিত্র ধরতে পারলেই সাহিত্য বাস্তব সাহিত্য হয়ে ওঠে, হয়তো বা প্রগতি সাহিত্যও হয়ে যায়। এঁদো গলি, ঘেয়ো কুকুর, কাঁকড়ার খোলা প্রভৃতির সঙ্গে দুঃস্থ, দীন মানুষের বীভৎস কাতরতার ছবি আঁকলেই সে সাহিত্য প্রগতি-সাহিত্য হয়ে ওঠে না। সকল সাহিত্যকার সাহিত্যের, বিশেষ করে প্রগতি-সাহিত্যের কাজ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য বাধা-বিপত্তি আঁকা নয় না, -এ সবের মধ্যেও মানুষের আত্মার আশার দুর্জয় অভিযানকে অরূপ দেয়; জীবনের জয়যাত্রার চিত্র আঁকে। সকল মহৎ সাহিত্যে যে উপলব্ধি রূপায়িত, সে উপলব্ধি 'সামগ্রিক' (collective) মানুষের নির্জ্ঞান মনের; এই জন্যেই তার শ্রেণী-চরিত্রকে মননের বড় কথা মনে করা ভুল।

অলকা]

বাংলার খনিজসম্পদ ও বৈজ্ঞানিক শিল্প

শ্রীনির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের মধ্যে রাণীগঞ্জের উচ্চশ্রেণীর কয়লায় সর্বাধিক অধিক পরিমাণে উদ্বায়ী ধূম (V latiles) ও তৈলজাতীয় পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে। সেই কারণে এই স্থানের কয়লা হইতে অধিক মাত্রায় গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই উদ্বায়ী ধূম হইতে আলকাতরা, বেঞ্জল অর্থাৎ পেট্রলজাতীয় তৈল, অ্যামোনিয়া, ন্যাপথেলিন প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার উৎপন্ন হইতে পারে। রাণীগঞ্জের উচ্চশ্রেণীর এক টন কয়লা হইতে বিশ-বাইশ গ্যালন আলকাতরা, তিন-চারি গ্যালন বেঞ্জল (পেট্রল), সাত আট সের অ্যামোনিয়ম সালফেট, ৪০০০-৫০০০ কিঃ ফুট গ্যাস ও প্রায় পনর হন্দর (৭৫./°) কোক্‌ কয়লা উদ্ধার করা যায়। এই আলকাতরা পুনরায় উত্তপ্ত করিলে নানাপ্রকার লাইট অয়েল, মিডল অয়েল ও পিচ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

কয়লার উদ্বায়ী ধূম হইতে এই সমুদয় পদার্থ বর্তমানে অপসারিত না হওয়ার ফলে কি পরিমাণ মূল্যবান বস্তুর অপচয় হইতেছে তাহা অনেকের ধারণাতীত। বাৎসরিক হিসাব করিলে দেখা যায়, প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ গ্যালন তৈলজাতীয় পদার্থ, পনর লক্ষ গ্যালন বেঞ্জল ও ক্রিয়োজোট তৈল বাইশ হাজার টন অ্যামন সালফেট, প্রায় বত্রিশ হাজার টন পিচ ও বহু পরিমাণ গ্যাস উদ্ধার করা সম্ভব হইত। কিন্তু এই উচ্চশ্রেণীর কয়লা যথাতথা—নানারূপ কলকারখানায়, তাপোৎপাদনকারী বয়লারে ও বাষ্পীয় শকটে আজ ব্যবহৃত হইতেছে ও তৈলজাতীয় পদার্থবাহী উদ্বায়ী ধূম আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডল দূষিত করিতেছে এবং মানবের কোন হিতকর কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে না।

এই সকল পদার্থের নিত্যপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্তমান সভ্যজগতে সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। পেট্রলের ন্যায় বেঞ্জল ব্যবহার আজ যথেষ্ট প্রচলিত। বাংলার কৃষিকার্যে অ্যামোনিয়ম সালফেট সার পদার্থের বহুল প্রসার অবশ্যম্ভাবী। আলকাতরা হইতে লাইট অয়েল, মিডল অয়েল ও ক্রিয়োজোট অয়েল প্রভৃতি পদার্থের উদ্ধার হইলে তাহা আমাদের নানাপ্রকার কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। অবশিষ্ট পিচ (pitch)-এর ব্যবহার পথপ্রস্তুতকার্যে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। আলকাতরা (Tar) হইতে নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে যে আরও নানাবিধ বস্তু ও গন্ধদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা আজ বিজ্ঞান সমাজে নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

* এই জাতীয় সমুদয় পদার্থই আজ বিদেশ হইতে আমদানি হয়।

ভারতবর্ষ]

১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।



আকাশগঙ্গা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৪৬

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাদ্ধ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খেঁদু বাবুর এঁধো পুকুর মাছ উঠেছে ভেসে ;
পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।
আপনি এল ব্যাকটিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই,
হাঁসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল ভয় নাই।
সে বলে সব বাজে কথা, খাবার জিনিস খাদ্য ;
দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশ জনারি শ্রাদ্ধ।
শ্রাদ্ধের যে ভোজন হবে কাঁচা তেঁতুল দরকার,
বেগুন মুলোর সন্ধানেতে ছুটল ন্যাড়া সরকার।
বেগুন মুলো পাওয়া যাবে নিলফামারি বাজারে,
নগদ দামে বিক্রি করে তিন টাকা দাম হাজারে।
ঝুমকাতে লোক পাঠিয়েছিল বানিয়ে দেবে মুড়কি,
সন্দেহ হয় ওজনমতো মিশলো তাতে গুড় কি।
শর্ষে যে চাই মণ দু-তিনেক ঝোলে ঝালে বাটনায়,
কালুবাবু তারি খোঁজে গেলেন ধেয়ে পাটনায়।
বিষম খিদেয় করল চুরি রামছাগলের দুধ,
তারি সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গম ভাঙানির খুদ।

ঐ শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি।
দেশবিদেশে শহর গ্রামে গলা-কাটার ধুম কী।

খাঁচায়-পোষা চন্দনাটা কড়িঙে পেট ভরে,
সকাল থেকে নাম করে গান হরে কৃষ্ণ হরে।

বালুর চরে আলুহাটা, হাতে বেতের চুপড়ি,
খেতের মধ্যে ঢুকে কালু মূলো নিল উপড়ি।
নদীর পাড়ে কিচির মিচির লাগাল গাঙ্‌শালিখ।
অকারণে ঢোলক বাজায় মূলো-খেতের মালিক।
কাঁকুড়-খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে মুচিপাড়ার লোকরা।
পাটনাতে নীলকুঠির গঞ্জে খেয়া চালায় পাটনি,
রোদে জলে নিতুই চলে চার পহরের খাটনি।
কড়াপড়া কঠিন হাতে মাজা কাঁসার কাঁকন—
কপালে তার পত্রলেখা উল্কিছাপের আঁকন।
কুচো মাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে—
মেছুনি তার সাতগুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।
ওপারেতে খড়্‌গপুরে কাঠি পড়ে বাজনায়
নিতাই মুন্‌সি হিসেব ভোলে জমিদারের খাজনায়।

রেডিয়োতে খবর জানায় বোমায় করলে ফুটো,
সমুদ্দুরে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ দুটো।

খাঁচার মধ্যে ময়না থাকে, বিষম কলরবে
ছাতু ছড়ায়, মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে।

হুইস্‌ল্‌ দিল প্যাসেঞ্জারে সাঁতরাগাছির ড্রাইভার।
মাথায় মোছে হাতের কালি সময় না পায় নাইবার।
ননদ গেল ঘুঘুডাঙায় সঙ্গে গেল চিন্তে,
লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাঠাই কিনতে।

লিলুয়াতে খইয়ের মোওয়া চার ধামা হয় বোঝাই,
দাম দিতে তার টাকার থলি মিথ্যে হোলো খোঁজাই।
ননদ পরল রাঙা চেলি পালকি চড়ে চলল।
পাড়ায় পাড়ায় রব উঠেছে গায়ে হলুদ কল্য।
কাহারগুলো পাগড়ি বাঁধে, বাঁদি পরে ঘাগরা,
জমাদারের মামা পরে শুঁড়তোলা তার নাগরা।
পাঁড়েজি তাঁর খড়ম নিয়ে চলেন খটাৎ খটাৎ,
কোথা থেকে ধোবার গাধা চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ।
খয়রাডাঙার ময়রা আসে কিনে আনে ময়দা।
পচা ঘিয়ের গন্ধ ছড়ায়, যমালয়ের পয়দা।

আকাশ থেকে নামল বোমা রেডিয়ো তাই জানায়,
অপঘাতে বসুন্ধরা ভরল কানায় কানায়।

খাঁচার মধ্যে শ্যামা থাকে ছিরকুটে খায় পোকা,
শিষ দেয় সে মধুর স্বরে, হাততালি দেয় খোকা।

হুইসিল বাজে ইস্টিশনে, বরের জ্যাঠামশাই
চমকে ওঠে, গেলেন কোথায় অগ্রদ্বীপের গোঁসাই।
সাঁৎরাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল সাঁতার,
হায় রে কোথায় ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁথি মাথার।
মোষের শিঙে বসে ফিঙে ল্যাজ দুলিয়ে নাচে,
শুধোয় নাচন সিঁথি আমার নিয়েছে কোন্ মাছে।
মাছের ল্যাজের ঝাপট লাগে শালুক ওঠে দুলে,
রোদ পড়েছে নাচনমণির ভিজে চিকন চুলে।
কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে ডাকল কোলা ব্যাঙ,
খড়্গপুরের ঢাকে ঢোলে বাজল ড্যাডাং ড্যাঙ।
কাঁপছে ছায়া আঁকাবাঁকা কলমি পাড়ের পুকুর,
জল খেতে যায় এক পা-কাটা তিনপেয়ে এক কুকুর।
হুইস্‌ল্ বাজে, আছে সেজে পাইকপাড়ার পাত্রী।
শেয়ালকাঁটার বন পেরিয়ে চলে বিয়ের যাত্রী।

গ্যাঁ গোঁ করে রেডিয়োটা, কে জানে কার জিত,
মেশিনগান-এ গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিৎ।

টিয়ের মুখের বুলি শুনে হাসছে ঘরে পরে,
রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।

দিন চলে যায় গুনগুনিয়ে ঘুমপাড়ানির ছড়া,
শান-বাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁখের ঘড়া।
আতাগাছের তোতাপাখি, ডালিমগাছে মৌ,
হীরে দাদার মড়মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বৌ।
পুকুরপাড়ে জলের ঢেউয়ে দুলছে ঝোপের কেয়া,
পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।
খোকা গেছে মোষ চরাতে খেতে গেছে ভুলে,
কোথায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে।
আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে,
কলম আমার বেরিয়ে এল বহুরূপীর বেশে।
আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে,
আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের শেওলা-ঘেরা নায়ে।
কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড় পুতুলের বিয়ে,
বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে।
ছাইয়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার খেঁকি কুকুর,
পান্তিহাটে বেতো ঘোড়া চলে টুকুর টুকুর।
তালগাছেতে হুতোমথুমু পাকিয়ে আছে ভুরু,
তক্তিমালা হড়ম বিবির গর্দাতে সাত পুরু।
আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয় দানোয় পাওয়া।
ভাগ্যলিখন ঝাপসা কালির নয় সে পরিষ্কার।
দুঃখসুখের ভাঙা বেড়ায় সমান যে দুই ধার।
কামারহাটার কাঁকুড়গাছির ইতিহাসের টুকরো
ভেসে চলে ভাঁটার জলে উইয়ে ঘুণে ফুকরো।
অঘটন তো নিত্য ঘটে রাস্তাঘাটে চলতে,
লোকে বলে সত্যি নাকি, ঘুমোয় বলতে বলতে।

সিন্ধুপারে চলছে হোথায় উলটপালট কাণ্ড,
হাড় গুঁড়িয়ে বানিয়ে দিলে নতুন কী ব্রহ্মাণ্ড।
সত্য সেথায় দারুণ সত্য, মিথ্যে ভীষণ মিথ্যে,
ভালোয় মন্দে সুরাসুরের ধাক্কা লাগায় চিত্তে।
পা ফেলতে না ফেলতেই হতেছে ক্রোশ পার।
দেখতে দেখতে কখন যে হয় এসপার ওসপার॥

উদয়ন
১৬।২।৪০

প্রশ্নোত্তর

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[আশ্চর্য্য পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তরুণ মন অভিভূত হয় অথচ নবোদ্গত বিচারশক্তি জাগিয়ে রাখে। প্রশ্ন ঠিক তৈরি হয় নি, জান্‌বার বেদনাক্লিষ্ট আলোড়ন দেখা দিয়েছে এ রকম অবস্থায় কাকে জিজ্ঞাসা করা যায় কোথায় আছি? নিজেকে এবং সমস্তের প্রচ্ছন্ন আধারকে। মনস্বী যাঁরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে দুর্গমপথিক ব'লে খ্যাত তাঁদের দিকেও মনের টান আছে; স্কুলের ছেলে সৃষ্টিজোড়া ধাঁধাঁর উত্তরে তাঁদের স্বাক্ষর চেয়েছিল। মানস খাতায় অটোগ্রাফ সংগ্রহের বৃত্তি এর মধ্যে আছে কিন্তু তারও মূলে দেখি সাধারণ মানুষের যৌগিক দাবী শ্রেষ্ঠ মানুষের কাছে, স্বীকৃতির চেষ্টায়। নিভৃত গ্রামের দিগন্তে আমরা কল্পনায় দেখতাম রবীন্দ্রনাথকে, জগদীশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথকে; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নামও উজ্জ্বল ছিল। পাড়াগাঁয়ের মাঠ পেরিয়ে তাঁদের কাছে চিঠিতে উপস্থিত হয়েছি এবং অন্তরের উদ্বেগে সমুদ্রপারেও বিশেষজ্ঞদের দ্বারে ধাক্কা দিয়েছি। বহু বৎসর কেটে গেছে কিন্তু প্রশ্নগুলি চিরন্তন এবং উত্তরের মধ্যে উপলব্ধির মূল্যও তাই। দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকীতে তাঁর একখানি পুরোনো চিঠি উপস্থিত করলাম এই ব্যক্তিগত ভূমিকা দিয়ে কেননা শুধু জ্ঞানের নয়, এর মধ্যে করুণার মাধুর্য্য আছে। যে-কোনো পত্র-লেখককে সতীর্থ জেনে সংশয়ের দিনে তার পাশে এসে দাঁড়ানো মহাপুরুষের সাধ্য। প্রশ্নগুলির স্বরূপ উত্তরের মধ্যেই নিহিত।—শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
1 July, 1916

সাদর নিবেদন

আপনার ২৯শে জুন তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার সকল কথার সবিস্তরে উত্তর দিতে আজ পর্য্যন্ত কেহ পারিয়াছেন কিনা তাহা আমি জানি না। আমি তাহার সম্বন্ধে যাহা সার বুঝি তাহাই সংক্ষেপে বলি;—বোধ করি তাহাতে আপনার আকাঙ্ক্ষা কতকটা মিটিতে পারিবে।

(১)

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

(২)

যাহার যে অবস্থা, তাহা কতক পরিমাণে তাঁহার অনুকূল, কতক পরিমাণে প্রতিকূল।

(৩)

এইরূপ অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া মনুষ্য নিতান্ত পশুবৎ অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্য হইতে সভ্যতর অবস্থায় ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনো অগ্রসর হইতেছে।

(৪)

অগ্রসর হইতেছে কিসের জোরে? নৌকা অগ্রসর হয় কিসের জোরে? দাঁড়ের জোরে এবং বায়ুর জোরে। মনুষ্য অগ্রসর হইতেছে আত্মার প্রভাবে এবং পরমাত্মার প্রসাদে। বায়ু অদৃশ্য—দাঁড় দৃশ্য; তেম্নি পরমাত্মার প্রসাদ অব্যক্ত—আত্মপ্রভাব ব্যক্ত। আত্মপ্রভাব কি?—না,—আত্মশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি।

(৫)

মনুষ্য যদি আত্মশক্তির উপরে অবিশ্বাস করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইত—তুফানে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিত—তাহা হইলে মনুষ্য, হয়, অনেক কাল পূর্ব্বে মারা পড়িত, নয়, বংশপরম্পরাক্রমে পশুদিগের ন্যায় মোহান্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

(৬)

ফলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য হাল ছাড়িয়া দ্যায় নাই—সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হয় নাই—ঈশ্বরদত্ত আত্মশক্তিকে কাজে খাটাইতে বিরত হয় নাই। বিজ্ঞান-বীরেরা আত্মশক্তি খাটাইয়া দূরতম নক্ষত্রগণের গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন, অদৃশ্য পরমাণু অপেক্ষা কোটিগুণ সূক্ষ্মতর তাড়িতাণুর (Electronএর) গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন; জীবশরীরের মধ্যে ব্যাধি-জনক এবং আরোগ্যজনক জীবাণুদলের মধ্যে যেরূপ সংগ্রাম চলিতেছে তাহার গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন। ধর্ম্মবীরেরা আত্মশক্তি খাটাইয়া ইন্দ্রিয়সংযম এবং রিপু-দমনাদি করিয়া আত্মার নিগূঢ় তত্ত্বসকলের গুপ্ত সমাচার অবগত হইয়াছিলেন। ইঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, আত্মা পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় সুখদুঃখের মধ্যে থাকিয়াও সুখদুঃখ হইতে নির্লিপ্ত। আত্মার দর্শন পাওয়ার গুণে ইঁহাদের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

(৭)

প্রতিকূল অবস্থা মনুষ্যের প্রসুপ্ত ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইয়া তোলে—এই হিসাবে প্রতিকূল অবস্থাও অনুকূল অবস্থারই আর এক মূর্ত্তি। প্রতিকূল অবস্থা যদি না থাকিত, তবে মনুষ্যের ইচ্ছাশক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিত।

আত্মশক্তির উদ্দীপন যে, কত বড় মঙ্গল, তাহা আমরা জানিয়াও জানি না। আমাদের কোনো অভাবই থাকে না। আপনার চৈতন্য না জানিলে যেমন অন্যের চৈতন্য জানা যায় না—তেমনি আপনার আত্মশক্তি না জানিলে পরমাত্মার আত্মশক্তির নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান জানা যায় না। আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে, কত বড় মঙ্গল তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে পরমাত্মার আত্মশক্তি—অর্থাৎ জগৎব্যাপারে যে শক্তি খাটিতেছে সেই ঐশীশক্তি—কত বড় মঙ্গল তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

(৮)

আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে, কত বড় মঙ্গল, উহা যতক্ষণ না পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ততক্ষণ বুঝিতে পারা সম্ভবে না।

(৯)

গীতাশাস্ত্রে আছে "উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানং। নাত্মানং অবসাদয়েৎ॥" আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে—আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না।

একবার যদি রাশি রাশি প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে আত্মশক্তিকে রীতিমতো উদ্দীপন করিয়া তুলিতে আমি পারি বা তুমি পার, তবে দেখিতে পাইবে যে, জাগ্রত আত্মশক্তির ন্যায় মঙ্গল জগতে আর কিছুই নাই। তাহা সকল রোগের মহৌষধ। তা শুধু না—আমার আপনার আত্মশক্তি কত বড় মঙ্গল তাহা জানিতে পারিলে পরমাত্মার আত্মশক্তি যে, কত বড় মঙ্গল তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে না। আমাদের আপনার আত্মশক্তিকে আমরা যদি মনে করি যে, তাহা অতি সামান্য বস্তু—তাহা থাক্; আত্মশক্তি যেমন ঘুমাইতেছে ঘুমাক্; এখন আমার অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয় তাহারই চেষ্টা দেখা যাক্—কতকগুলি টাকা সংগ্রহ করা যাক্, আগে, আত্মশক্তিকে জাগাইবার চেষ্টা দেখা যাইবে তাহার পরে—হীরাকে যদি আমরা মনে করি কাচের বেলোয়ারি—তবে আমরা আপনারই বা কি, আর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই বা কি—কিছুরই মধ্যে আর-কিছুই দেখিতে পাইব না; সবই আমাদের নিকটে অসার এবং অপদার্থ বলিয়া মনে হইবে। আমাদের আপনার আত্মা কত বড় মঙ্গল তাহাই যদি আমরা না বুঝিতে পারি—তবে পরমাত্মা কত বড় মঙ্গল তাহা আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব?

ফাল্গুনীর নব যুবকেরা কিরূপ পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহা আমি জানি না, যেহেতু আমি ফাল্গুনী পড়ি নাই। আপনার যেরূপ ব্যাকুলতা হইয়াছে—তাহাতে সাধনের পথ অবলম্বন করাই আপনার কর্ত্তব্য। আমি আপনি সাধনের পথে ততটা অগ্রসর হই নাই যে, অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি। মোটামুটি বলিতে পারি এই যে, Huxley, Mill প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর পরিবর্ত্তে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সাধন সম্বন্ধে অনেক সময় সার উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নির্ম্মোক

"বনফুল"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

ছয় মাসের মধ্যে দেখিতে দেখিতে বিমলের প্র্যাক্‌টিস জমিয়া উঠিল। সব দিক্ দিয়াই সুবিধা হইয়া গেল। হাসপাতালে ঔষধের অভাব নাই, রোগী অনেক আসিতেছে এবং তাহাদের মুখে মুখে বিমল ডাক্তারের নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নন্দী মহাশয় এবং বদিবাবু তো বিমলের পক্ষে আছেনই, হাসপাতাল-কমিটির অন্যান্য সদস্যগণও তাহার উপর প্রসন্ন হইতেছেন। এমন কি হরেন বোস এবং চৌধুরী মহাশয়েরও উগ্রভাবটা যেন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। আর কিছু নয়, ইংরেজীতে যাহাকে বলে "ট্যাক্‌ট্" অর্থাৎ লোক পটাইবার ক্ষমতা তাহা যে বিমলের যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর অবকাশ নাই। কোন রকমে চৌধুরী মহাশয়কে আয়ত্ত করিতে পারিলেই যে হরেনবাবুও তাহার আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িবেন, তাহা বিমল বুঝিয়াছিল। এক দিন সুযোগও ঘটিয়া গেল। চৌধুরী মহাশয়ের ছোট নাতিটি পীড়িত হইয়া পড়িল। বছর-দেড়েক বয়স। ভয়ানক জ্বর। সাধারণতঃ জগদীশবাবুই চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে অসুখ হইলে দেখেন, এবারও তিনি দেখিতেছিলেন। কিন্তু বিমলের সৌভাগ্যক্রমে শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতে লাগিল। জগদীশবাবু শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—বিমলবাবুর মাইক্রসকোপ আছে, ওঁকে ডেকে রক্তটা এক বার পরীক্ষা করিয়ে নিন। সুবিধে যখন রয়েছে—

সিভিল সার্জনের সহিত জগদীশবাবুর গোপনে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা অজ্ঞাত, কিন্তু আজকাল জগদীশবাবু প্রায়ই বিমলের মাইক্রসকোপের সাহায্য লইতেছেন। প্রবীণ চিকিৎসক জগদীশবাবু আর একটা কথাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বোধ হয়। চিকিৎসা-ব্যাপারে দায়িত্বটা যত ভাগাভাগি হইয়া যায় ততই মঙ্গল। তিনি রক্তপরীক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় হরেন বোসের সহিত এ-বিষয়ে পরামর্শ করিতে করিতে বড় দেরি করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাও বিমলের পক্ষে ভারি সুবিধাজনক হইল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকিলে বিমল হয়ত আসিয়া রক্তই পরীক্ষা করিত এবং কিছুই পাইত না। কিন্তু দেরি করিয়া ডাকার ফলে ডিপথিরিয়ার লক্ষণসমূহ বেশ প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, বিমল রক্ত পরীক্ষা না করিয়া গলা পরীক্ষা করিল এবং গলা হইতে একটা 'সোয়াব' লইয়া দেখিতেই ডিপথিরিয়া ধরা পড়িল। গ্রহ যখন প্রসন্ন হন এমনই হয়। সৌভাগ্যক্রমে ডিপ্‌থিরিয়ার প্রতিষেধক 'সিরাম'ও সে সম্প্রতি ডাক্তারখানায় আনাইয়াছিল। এত দামী ঔষধ এ সব হাসপাতালে সাধারণতঃ থাকে না, তবু যদি কখনও দরকার পড়ে এই জন্য বিমল দুইটা টিউব আনাইয়া রাখিয়াছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে সেগুলি কাজে লাগিয়া গেল। চৌধুরীর নাতি যখন ভাল হইয়া গেল তখন গদগদ চৌধুরী বিমলকে বলিলেন—এ ঋণ আমি কখনও শুধতে পারব না ডাক্তারবাবু, তবু আপনার পারিশ্রমিক কত দিতে হবে, সেটা অনুগ্রহ ক'রে বলুন।

বিমল হাসিয়া বলিল—আপনার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেব কি! কিছু দিতে হবে না আপনাকে।

—না, না, এত মেহনৎ করলেন আপনি।

—কিছু না, এটা তো আমার কর্ত্তব্য করেছি মাত্র। সবার কাছেই কি আর পয়সা নেওয়া চলে, আপনারা হলেন ঘরের লোক—

'—না না, সেটা—

বিমল কিন্তু এক পয়সা লইল না। চৌধুরী-বিজয় সম্পূর্ণ হইল।

জগদীশবাবু সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ভারি পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—আমি তো বললুম চৌধুরী মশায়, মাইক্রসকোপের সাহায্য নইলে আপনার নাতির ব্যায়রামটি ধরা পড়বে না! কেমন, বলি নি আমি?

তাঁহার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটি কাঁপিতে লাগিল।

বিমল স্মিতমুখে জগদীশবাবুর মুখের পানে চাহিল এবং বলিল—আমি তো মাইক্রসকোপে দেখে তবে ধরলুম, আপনি তো না দেখেই অনেকটা বুঝতে পেরেছিলেন, আপনাদের চোখই আলাদা, আপনাদের মত এক্‌স্‌পীরিয়েন্‌স্‌ হ'তে ঢের দেরি এখন আমাদের—

তাহার পরদিনই জগদীশবাবু বিমলকে আর একটি রক্ত পরীক্ষা করিতে দিলেন এবং বিমলও একটি টাইফয়েড কেসে এক রকম অকারণেই তাঁহাকে "কনসালটেশনে" অর্থাৎ পরামর্শ করিবার ওজুহাতে ডাকিল। একেবারে অকারণে নয়, রোগীটি শাঁসালো, একটু ধুমধাম করিয়া চিকিৎসা না করিলে হাতছাড়া হইয়া যাইত। জগদীশবাবু আসিয়া সিভিল সার্জনকে ডাকিবারও ব্যবস্থা করিলেন।

সিভিল সার্জনের সহিতও বিমলের বেশ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। প্রথমতঃ এই উদ্যমশীল যুবক ডাক্তারটিকে প্রথম দিন হইতেই তাঁহার বেশ ভাল লাগিয়াছে—এই মৃতপ্রায় হাসপাতালটিকে ছোকরা নিজ চেষ্টায় পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে তো! দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার কন্যা তরঙ্গিণীর সখী ইহার স্ত্রী। মণিমালাকে লইয়া বিমল এক দিন তরঙ্গিণীর সহিত দেখাও করিয়া আসিয়াছে। বিমলকে দেখিয়া তরঙ্গিণী, তরঙ্গিণীর মা সকলেই খুব খুশী। সিভিল সার্জনের মনেও কেমন যেন একটা বাৎসল্যভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, সুবিধা পাইলেই বিমল তাঁহাকে 'কল' দিতেছে। সেদিনই তো একটা অপারেশনের জন্য আহ্বান করিয়া তাঁহাকে প্রায় দুই শত টাকা পাওয়াইয়া দিল। সুতরাং অনিবার্য্যভাবে সিভিল সার্জন মহাশয় বিমলকে সুচক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

মনিবরা সকলেই যখন, সুপ্রসন্ন তখন আর ভাবনা কি! হাসপাতাল-কমিটির মেম্বারদের বাড়ীতে বিনা-পয়সায় দেখিলেই তাঁহারা খুশী থাকেন। তা ছাড়া বিমল ইঁহাদের নিকট পয়সা লইবেই বা কিরূপে, জগদীশবাবু, ভূধরবাবু কেহই ইঁহাদের নিকট এক পয়সা গ্রহণ করেন না। যদিও ইঁহারা সকলেই বড়লোক, ফী দিয়া ডাক্তার ডাকিতে সক্ষম, কিন্তু এখানকার রেওয়াজই এমনই দাঁড়াইয়া গিয়াছে! বিমল কেন শুধু শুধু সেই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করিতে যাইবে! মোট কথা বিমলের প্র্যাকৃটিসের পথ মোটেই আর দুর্গম রহিল না। পুষ্পাকীর্ণ না হইলেও কণ্টকাকীর্ণ যে রহিল না তাহা ঠিক।

পারঘাটার নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া বিমল সেদিন বেশ একটু উত্তেজনাভরেই গিয়া ওপারে দামী মোটরটিতে আরোহণ করিল। বাঘমারির জমিদারবাবু সৌরীন্দ্র-মোহন বসুর বাড়ী হইতে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। সৌরীনবাবু এ অঞ্চলের এক জন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার, বেশ শিক্ষিত এবং ধনী। সৌরীনবাবুর বাড়ীতে বিমল এই প্রথম যাইতেছে। কি অসুখ এবং কাহার অসুখ কিছুই জানা নাই, সৌরীনবাবু কেবল একবার যাইতে লিখিয়াছেন। বাঘমারি গ্রামটি প্রায় বারো মাইল দূরে। মোটরে চড়িয়া বসিতেই কেতাদুরস্ত ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিল। নিঃশব্দ গতিতে গাড়ী ছুটিতে লাগিল। বারো মাইল পথ অতিক্রম করিতে অবশ্য বেশী সময় লাগিল না। মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরেই গাড়ী প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা এক অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া গাড়ী-বারান্দার নীচে থামিল। বিমল গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিল একটু দূরে ডিম্বাকৃতি তৃণাবৃত 'লনে' একটি ছোট টেবিলকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি মহিলা এবং দুই জন পুরুষ আরাম-কেদারায় বসিয়া রহিয়াছেন। ড্রাইভার বলিল—আপনি হুজুর ঐখানেই যান, বাবুসায়েব ঐখানেই রয়েছেন।

বিমল অগ্রসর হইল। বিমলকে আসিতে দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া এক জন ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও

বিমলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। এ ভদ্রলোকটিকে বিমল ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। খুব ফরসা চেহারা, গালের দুই দিকে বেশ বড় জুলফি, সুলালিত এক জোড়া কালো কুচকুচে গোঁফ, আরক্ত চক্ষু দুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত।

—আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু বসুন।

প্রৌঢ় সৌরীনবাবুকে বিমল চিনিত, তিনিও সেখানে বসিয়া ছিলেন। বিমল তাঁহাকে নমস্কার করিল। তিনি মোটা সিগারটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন—আসুন, ঐ আপনার রুগী—সিগার মুখে দিয়াই তিনি উপবিষ্টা একটি মহিলাকে দেখাইয়া দিলেন। সুপ্রিয়া সরকারকে বিমল আগেই চিনিতে পারিয়াছিল।

—কি হয়েছে ওঁর?

সুপ্রিয়া বলিলেন—কিছুই হয় নি। অসুখ আমার নয়—অসুখ এঁদের—

অপর যে মহিলাটি বসিয়া ছিলেন তিনি সুপ্রিয়ার জননী ভগবতী দেবী। তিনি বলিলেন—ঐটেই ওর প্রধান অসুখ, ওর ধারণা ওর কিছু হয় নি, অথচ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

জুলফিদার যুবকটি বলিলেন—এক মিনিট বসুন ডাক্তারবাবু, আমি এখনি আসছি—

তিনি চলিয়া গেলেন। সৌরীনবাবু সিগারে একটা টান দিয়া ঠোঁট দুইটি ঈষৎ ফাঁক করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহার কালো দাঁতগুলির ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। তিনি সহসা সমস্ত ধোঁয়াটা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—আবার আপনাদের থিয়েটার হচ্ছে কবে, পুজোর সময় হবে না কি?

বিমল হাসিয়া বলিল—কি জানি, আমার সময় হবে না বোধ হয়, আর—অমরও তো দেশোদ্ধারে মেতেছে, সকলেই কাজের মানুষ হয়ে উঠলে মুশকিল!

সুপ্রিয়ার মা কি যেন একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। সৌরীনবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং চুরুটে বৃহৎ একটা টান দিয়া সুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন—বউদিদি চটছে, বুঝলি সুপ্রিয়া!

সুপ্রিয়ার মা কিছু না বলিয়া টেবিলের উপর হইতে তাঁহার অসমাপ্ত উলের সোয়েটারটা তুলিয়া লইয়া বুনিতে সুরু করিয়া দিলেন।

সৌরীনবাবু তাঁহার পূর্ব্ব উক্তির সমর্থন করিয়া পুনরায় বলিলেন—সবাই কাজের মানুষ হয়ে উঠলে পৃথিবীতে টেঁকা মুশকিল! অকেজো লোকেদের আলসেমির দৌলতেই পৃথিবীটা বাসযোগ্য—এ কথাটা সবাই ভুলতে বসেছে এই ইউটিলিটির যুগে, আমরা ক্রমাগতই ভুলে যাচ্ছি যে মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার পথে এই ইউটিলিটি-বাদ প্রধান অন্তরায়, এ-কথা তুমি স্বীকার কর না বউদি?

বউদিদি সোয়েটারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন—বুঝতেই পারছি না তোমার কথা, বাংলা ক'রে বল।

সৌরীনবাবু বলিলেন—ইউটিলিটির বাংলা কি সুপ্রিয়া?

—উপযোগিতা।

—ও ভারি খটমট হ'ল; কেজোমি বললে কেমন হয়?

সুপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন—ওটাও শ্রুতিমধুর হ'ল না।

—তা হ'ল না বটে, কিন্তু কেজোমির সঙ্গে পেজোমি কথাটার চমৎকার মিল আছে। আর আমার বিশ্বাস আমরা যতই ইউটিলিটির দিকে ঝুঁকছি ততই পাজি হয়ে উঠছি!

সুপ্রিয়ার মা বলিলেন—তা হ'লে তোমার মতে কাজের মানুষ মাত্রেই পাজি লোক, তোমার মতন ইজি-চেয়ারে ঠেস দিয়ে ব'সে ব'সে সিগার-ফোঁকাটাই ভাল লোকের লক্ষণ!

সুপ্রিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। যাহাকে 'ডেকোরাম্' অর্থাৎ শোভনতা-জ্ঞান বলে, তাহা যদি মায়ের একটু আছে! চটিয়া গেলে তিনি অবলীলাক্রমে স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া যাহা মুখে আসে বলিয়া বসেন। আর কাকাবাবুটিও কুটুস্ কুটুস্ করিয়া কথা বলিয়া মাকে চটাইতে পাইলে আর কিছু চান না। মা যেদিন হইতে সোয়েটারে হাত দিয়াছেন, সেই দিন

হইতেই কাকাবাবু কেজোমির বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে মন্তব্য করিতেছেন।

সৌরীনবাবু বলিলেন—কাজের মানুষ মাত্রেই পাজি লোক এ কথা আমি বলছি না, কিন্তু যে-সব মানুষ কাজ ছাড়া আর কিছু জানে না এবং না-জানাটাকে গৌরবের ব'লে মনে করে, তাদের সম্বন্ধে আমার কেমন যেন একটু সন্দেহ হয়!

—কি সন্দেহ হয়?

—সন্দেহ হয় যে তারা ছদ্মবেশী মশা, মাছি, ছারপোকা, শকুনি, বাঘ, ভালুক অর্থাৎ নিছক একটা প্রাণী, বেঁচে থাকবার জন্তেই কেবল ছটফট করছে—ঠিক মানুষ নয়!

—অর্থাৎ অকেজো লোকই ঠিক মানুষ তোমার মতে!

সৌরীনবাবু সিগারে একটা টান দিয়া বলিলেন—ঠিক তা নয়, নিছক প্রাণী হিসেবে টিকে থাকবার জন্তে যে বাঁধা পথ আছে সেই পথ ছেড়ে যে যতটা বিপথে যেতে পারে সে-ই ততটা মনুষ্যধর্ম্মী। মানুষ ছাড়া অন্য কোন জানোয়ার বিপথে যেতে পারে না। মানুষই গান গায়, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, থিয়েটার করে। মনের আনন্দে সে এত কাল এই সব বাজে কাজ ক'রে এসেছে। কিন্তু ইদানীং নিছক এই আনন্দটুকুর জন্যই আর সে এ সব করতে প্রস্তুত নয় দেখা যাচ্ছে। আজকাল আমরা গান গাই, ছবি আঁকি, কবিতা লিখি, থিয়েটার করি আনন্দের জন্তে নয়—পয়সার জন্তে, সব কিছুকেই কাজে লাগাবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি আমরা। তুমি ঐ যে সোয়েটারটা বুনছ ওটা নিছক শিল্পচর্চ্চা নয়, তুমি বুনছ আমার শীতনিবারণের জন্তে—

সুপ্রিয়ার মা বলিলেন—তাতে ক্ষতি কি!

—সব কিছুই উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠলে কেমন যেন লাগে। প্রত্যেক কাজের পেছনে একটা মতলব আছে মনে হ'লে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয়। মনে হয় জীবন ধারণ করা মানে এক দল প্যাঁচালো মতলববাজ লোকের সঙ্গে ক্রমাগত মোকদ্দমা করা! ব্যাপারটা হয় তো তাই-ই, কিন্তু অবস্থাটা সুখের নয়—

এই বলিয়া তিনি সিগারের ছাইটি ঝাড়িয়া আর একটি টান দিলেন। সুপ্রিয়া অনেকক্ষণ আগেই তাহার হাতের বইখানি খুলিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছিলেন, সুপ্রিয়ার মা-ও এ কথার কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না। বিমল চুপ করিয়া ভাবিতেছিল অদ্ভুত লোক তো ইঁহারা! যাঁহার অসুখের জন্ত তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন তাঁহার কোন অসুখই নাই এবং এতক্ষণ ধরিয়া যে-সব কথাবার্ত্তা চলিতেছে তাহার সহিত অসুখের কোন সম্পর্কও নাই। আশ্চর্য্য ব্যাপার! নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সৌরীনবাবু পুনরায় বলিলেন—অথচ মজা এই যে আমরা সেই সব মানুষের সঙ্গই পছন্দ করি যারা এই সব বাজে কাজে মজবুত। এই যে বিমলবাবুকে আজ ডাকা হয়েছে এটা তাঁর ডাক্তারি নৈপুণ্যের জন্তে ততটা নয় যতটা তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্ত। সুপ্রিয়া এঁর অভিনয় দেখে খুশী হয়েছিল, সম্ভবতঃ সেই জন্তেই ইনজেকশন দেবার জন্তে এত লোক থাকতে এঁকেই ডেকে আনা হ'ল!

সুপ্রিয়া বই হইতে মুখ তুলিলেন এবং ভ্রূলতা ঈষৎ আকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—এত বাজে কথাও বলতে পারেন কাকাবাবু।

সৌরীনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—হীরালাল আমার নাম দিয়েছে বৈজিক-সম্রাট্, অবশ্য বাজে কথার জন্তে নয়, আমি ভাল বেজিক খেলতে পারি ব'লে!

জুলফি-সমন্বিত ভদ্রলোকটি কতকগুলি কাগজ হস্তে এবং আর এক জন ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে আসিয়া হাজির হইলেন। পিছনে দুই জন চাকর চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতিও আনিয়া সাজাইতে লাগিল। জুলফি-সমন্বিত ভদ্রলোকের নাম সুধীর এবং তাঁহার সঙ্গে যিনি আসিয়াছিলেন তাঁহার নাম সুব্রত। সুধীর সুপ্রিয়ার দাদা এবং সুব্রত সুপ্রিয়ার স্বামী। বিমল পরিচয় পাইয়া সুব্রতবাবুকে নমস্কার করিল। মনে মনে বিস্মিত হইল—অতিশয় জীর্ণশীর্ণ ভদ্রলোক তো। চোখের জ্যোতি তীব্র, গালের হাড় দুইটা উঁচু হইয়া আছে, নাকটা খড়্গের মত। পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও পাঞ্জাবী, পায়ে সুদৃশ্য একজোড়া চটি। তিনি কলিকাতার নামজাদা দুই-তিন জন

ডাক্তারের নাম করিয়া বলিলেন—ওঁদের সবাইকে একসঙ্গে ডেকে দেখিয়েছিলাম, ওঁরা দেখে শুনে এই ব্যবস্থা করেছেন। রিপোর্টগুলো দাও তো সুধীর—

বিমল রিপোর্টগুলি উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিল, বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। সব রকম পরীক্ষাই হইয়াছে কিন্তু কোনটাতে তেমন কিছু পাওয়া যায় নাই। বিমল সুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল—এ সব থেকে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, আপনার কষ্টটা কি ?

বই হইতে মুখ তুলিয়া সুপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন—বললাম তো, কিছুই না!

সুব্রতবাবু বলিলেন—মাঝে মাঝে যে 'প্যালপিটেশন' হয় সেটা কি তাহ'লে 'মিথ্' ?

সৌরীনবাবু তাঁহার কাঁচাপাকা বাবরিটি এবং ধূম-পক্ব গুম্ফটি গুছাইয়া ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া বলিলেন—ইংরেজী 'মিথ' এবং বাংলা মিথ্যার মধ্যে যে একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, আশা করি সুব্রত তুমি সে অলীক সাদৃশ্যের সুযোগ নিচ্ছ না। যদি নিয়ে থাকো তা হ'লে দুঃখিত হও। তোমরা ব'স, আমি একটু টেনিস-কোর্টটা তদারক ক'রে আসি। হীরালালরা হয়ত এসে পড়বে এখুনি, কালকে নেটটা যা ক'রে টাঙিয়েছিল! আমাদের হরিচরণকে এবার পেন্সন দেওয়া দরকার হয়েছে—

সৌরীনবাবু উঠিয়া পড়িলেন।

ভগবতী দেবী সোয়েটার হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—চা-টা খেয়ে যাও।

—একটু ঠাণ্ডা হোক, গরম চা খাবার বয়স গেছে।

একটু দূরে টেনিস-কোর্ট, সেখানে চাকরেরা নেট টাঙাইতেছিল—সৌরীনবাবু সেই দিকে চলিয়া গেলেন। ভৃত্য টেবিলে চা পরিবেশন করিতে লাগিল।

বিমল প্রশ্ন করিল—আপনার প্যালপিটেশন হয় বুঝি ?

সুধীরবাবু এতক্ষণ কথা বলেন নাই, তিনি বলিলেন—হজমও হয় না ভাল, ডাক্তার রায় হজমের জন্যে এই সব প্রেসক্রাইব করেছেন।

বিমল বলিল—দেখেছি। বেশ ভাল ওষুধ ওগুলো, খাচ্ছেন ?

ভগবতী দেবী বলিলেন—তাহলে আর ভাবনা কি! কি ভাগ্যি যে ইনজেকশন নিতে রাজি হয়েছে।

বিমল বুঝিল তাহার বিশেষ কিছু করিবার নাই। কলিকাতার ডাক্তারের ফরমায়েস অনুযায়ী জার্মানির একটা পেটেন্ট ঔষধ তাহাকে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া ইনজেকশন করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। তাহার ডাক্তারি বুদ্ধির সাহায্য ইহারা চান না।

বিমল বলিল—বলুন তাহলে ইনজেকশনটা শেষ ক'রে ফেলা যাক—

সুপ্রিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনার ভাল ছুঁচ আছে তো, জগদীশ ডাক্তারের যা ভোঁতা মরচে-পড়া ছুঁচ, সেই ভয়ে তাঁকে আর ডাকি নি।

বিমল হাসিমুখে মিথ্যা কথা বলিল—আপনি জানতেও পারবেন না!

সুব্রতবাবু বোধ হয় সুপ্রিয়ার উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে চা পান করিতে লাগিলেন। গেট দিয়া আর একটি মোটর প্রবেশ করিল। সুধীরবাবু উঠিয়া পড়িলেন, তাঁহার চা পান শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিমল ও সুব্রতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমার আর কোন দরকার নেই তো ?

—না।

—আমি তা হ'লে একটু টেনিস খেলি গিয়ে, হীরালালবাবুরা এলেন।

ভগবতী দেবী বলিলেন—ঠাকুরপোও তা হ'লে আর এল না চা খেতে! বিয়ে না করলে পুরুষমানুষগুলো যেন কি এক রকম হয়ে যায়।

বিমলের দিকে চাহিয়া সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন—আপনার বিয়ে হয়েছে তো ?

—অনেক দিন।

ইনজেকশন-পর্ব্ব নির্ব্বিঘ্নেই হইয়া গেল।

সুপ্রিয়া হাসিমুখে বলিলেন—চমৎকার আপনার হাত তো!

বিমল গম্ভীর ভাবে বলিল—হাত নয় কপাল!

একটু থামিয়া আবার বলিল—কি বই পড়ছিলেন ওটা তখন ?

—আলডুস হাক্‌সলির 'ক্রোম ইয়েলো'।

—চমৎকার বই।

—নয় ? এঁরাই আমার সঙ্গী, ওই দেখুন না।

বিমল দেখিল আধুনিক, অতি-আধুনিক নানাবিধ পুস্তকরাজি সুপ্রিয়া সরকারের আলমারির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। অধিকাংশই উপন্যাস এবং অধিকাংশেরই নাম পর্য্যন্ত বিমলের জানা নাই।

সুব্রতবাবুর অসন্তোষ ভাবটা কাটিয়া গিয়াছিল বোধ হয়। তিনি বলিলেন—ক্রমাগত প'ড়ে প'ড়ে চোখটাও নষ্ট করবে তুমি।

সুপ্রিয়া বলিলেন—আচ্ছা তোমরা সবাই আমার স্বাস্থ্যের উপরই বিশেষ ক'রে এত নজর দিয়েছ কেন বল দেখি ! দেখুন তো ডাক্তারবাবু, স্বাস্থ্যটা কার বেশী খারাপ, আমার, না ওঁর ?

বিমল স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—আপনি কি বরাবরই এই রকম রোগা ?

—হ্যাঁ।

—মোটা অবশ্য তুমি কোন কালে ছিলে না কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে তুমি দিন-দিন আরও রোগা হয়ে যাচ্ছ !

—না, না, পাগল ! উঠছেন নাকি ডাক্তারবাবু ?

বিমল বলিল—হ্যাঁ চলি এবার, নমস্কার !

সুপ্রিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—তিন দিন পরে আবার দেখা হবে, এ ইনজেকশনগুলো না দিলে তো আপনাদের শান্তি নেই !

বিমল হাসিয়া বাহির হইয়া আসিল। সুব্রতবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। খানিকক্ষণ নীরবতার পর সুব্রতবাবু সহসা প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা আমার স্ত্রীর অসুখটা কি বলুন তো ?

—বিশেষ কিছু নয়, হার্টটা একটু দুর্ব্বল বোধ হয়।

—এ ইনজেকশনগুলো দিলে উপকার হবে ?

—ইনজেকশনটার নাম তো খুব বাজারে। আমি এর আগে কখনও ব্যবহার করি নি।

সুব্রতবাবু আর কিছু বলিলেন না।

চলিতে চলিতে টেনিস-কোর্টের কাছাকাছি আসিতে সৌরীনবাবু হীরালালবাবুর সহিত বিমলের পরিচয় করাইয়া বলিলেন—ইনিও অদূর ভবিষ্যতে আপনার স্মরণাপন্ন হচ্ছেন !

বিমল নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সৌরীনবাবু পুনরায় বলিলেন—এমন মধুর রুগী আর পাবেন না আপনি। আজকাল কত পার্সেণ্ট হে ?

হীরালালবাবু হাসিয়া বলিলেন—দশ।

মোটাসোটা গোলগাল হীরালালবাবুর চিবুকের নীচে চর্ব্বির বাহুল্য একটা দেখিবার মত জিনিস। দশ পার্সেণ্ট সুগার !

হীরালালবাবু বলিলেন—আসুন এক দিন আমার ওখানে বিমলবাবু।

—আচ্ছা।

বাড়ী ফিরিয়া বিমল দেখিল মণিমালা প্রায় প্রায়োপবেশন করিবার উপক্রম করিয়াছে ! এরূপটা যে ঘটিতে পারে বিমলও তাহা প্রত্যাশা করে নাই ; হারু স্যাকরার তো নামডাক খুব ! এখানকার সকলে তো উহাকে দিয়াই গহনা গড়ায়।

ঠোঁট ফুলাইয়া মণিমালা বলিল—তোমার কথায় এখানে গড়াতে দিলাম, একবারে ছাই হয়েছে তাবিজ !

—কই দেখি ?

মণিমালা তাবিজ-জোড়া আনিয়া তাচ্ছিল্যভরে বিমলের হাতে দিয়া বলিল—এই দেখ তোমার হারু স্যাকরার কীর্ত্তি !

—কেন, এ তো বেশ হয়েছে।

—বেশ না ছাই ! এর নাম কি পালিশ ?

—খারাপটা কোন্‌খানে তা তো বুঝতে পারছি না।

সত্যই বিমল বুঝিতে পারিতেছিল না !

—না, খারাপ নয় ! ম্যাটম্যাট করছে ;—তরঙ্গিণী গড়িয়েছে কলকাতা থেকে কেমন চমৎকার।

—এও তো বেশ হয়েছে, দেখি পর তো ?

বিমল স্বয়ং পরাইয়া দিতে গিয়া একটু বিপন্ন হইল। কোথায় কি ক্লিপ আঁটিতে হয় তাহা তাহার জানা নাই।

—তুমি ছাড় আমি পরছি।

তাবিজ পরিয়া হাত দুইটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মণিমালা দেখিতে লাগিল।

বিমল বলিল—সুন্দর হয়েছে তো?

—ছাই!

তাহার পর তাবিজ খুলিতে খুলিতে মণিমালা বলিল—তোমার কেমন একটা জিদ চড়ে গেল ওই হরি স্যাকরাকে দিয়েই করাবে।

—আচ্ছা, কাল ওকে ডাকিয়ে ব'লে দিচ্ছি আমি, ভাল ক'রে ক'রে দেবে। ও বলেছে পছন্দ না হ'লে ফেরত নেবে—

—ডাক্তারবাবু—। বাহিরে কে যেন ডাকিতেছে।

—কে?

বিমল বাহিরে গিয়া দেখিল দুলু।

—কি খবর?

—হাসপাতালে একটা শূয়োরে-চেরা লোক এসেছে। বুনো শূয়োরে তার পেটটা চিরে দিয়েছে একেবারে।

—চল যাচ্ছি।

বিমল গিয়া দেখিল একটা আঠারো-উনিশ বছরের যুবক বন্যবরাহের দন্তাঘাতে মৃতপ্রায়। পেটের অন্ত্রগুলো সব বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। এই মফস্বলের হাসপাতালে ইহার সুচিকিৎসা হওয়া অসম্ভব। সদরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মরিবে। অপটু হস্তে এবং অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা লইয়াই বিমল যতটা পারিল করিল। অন্ত্রগুলাকে ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া শাস্ত্র-অনুযায়ী যতটা পারিল পরতে পরতে পেটটা সেলাই করিয়া দিল। এমনিই তো মরিত—যদি বাঁচে!

ক্রমশঃ

বিদায়

শ্রীকানাই সামন্ত

আজি এ যামিনীশেষে,
হে বন্ধু, যাব পথের প্রবাহে ভেসে
অচেনা সুদূর দেশে।
মনে রেখো না, রেখো না মোরে।

প্রভাতপ্রসূন প্রতিদিন ভালোবাসিবে, বন্ধু, তোরে।
অচেতন পথে শিহরি উঠিবে, ওরে,
কনক-অরুণ ধূলিকণাগুলি নূতন কী চেতনাতে
তোর প্রতি পদপাতে।

বন্ধু আমার, অনুদিন অনুখন
ক্রন্দসী হৃদি করে বুঝি ক্রন্দন
তোমারি কারণে অকারণ অনুরাগে
প্রাণে প্রাণে তাই কানে-কানে-কথা জাগে—
হৃদয়ে তোমার লাগে
সুদূর দীর্ঘশ্বাস।
বন্ধু গো, সেই নিরাকার নিশ্বাস
চির-প্রণয়ের অচির সঙ্গ, অঙ্গ বুঝিবা আমি।

বন্ধু, বিদায়কামী
সাশ্রুনয়নে চাহিব না এই অচির চৈত্রযামী
যখন পোহাবে, ওরে।

বিদায়, বন্ধু, বিদায়, মিনতি তোরে
মনে রেখো না, রেখো না মোরে।

মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দিবার পূর্ব্বে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা দূর হইতে পড়িয়া তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাহার পরে যখন মহর্ষিদেবের শ্রাদ্ধ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তখন পিতৃশ্রাদ্ধরত এই সৌম্য মহাত্মাকে প্রথম দেখিয়া মনে মনে প্রণাম করিলাম। ইংরেজী ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগ দিতে আসিয়া ইঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। এখন যাহা লিখিতেছি তাহা প্রধানতঃ আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে। পুরাতন ঘটনা সাল তারিখ প্রভৃতি আমার জানা থাকিবার কথা নহে। নিতান্ত প্রয়োজন বশত অন্যের লেখা হইতে তাহার উল্লেখ মাত্র করিব।

শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বভাগে বনস্পতিবেষ্টিত 'নীচু বাংলা' নামক বাড়ীতে তিনি তখন বাস করিতেন। বাড়ীটি ছিল ছায়াচ্ছন্ন শান্তস্নিগ্ধ, যেন একটি আশ্রম। সেখানে তিনি পশুপক্ষী কাঠবেড়ালী প্রভৃতি জীবের সঙ্গে গভীর মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। অথচ দিনরাত্রি গভীর তত্ত্ববিদ্যার ধ্যানধারণায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইত। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম তাঁহার যে পরিচয় তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদি পড়িয়া পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে তিনি স্বয়ং অনেক বড়।

১২৪৬ সালের ২৯শে ফাল্গুন তাঁহার জন্ম। কাজেই আমি যখন তাঁহাকে শ্রাদ্ধবাসরে প্রথম দেখি তখন তাঁহার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর। যখন তাঁহার কাছে আমি উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম তখন তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর।

তাঁহার শেষজীবনের সঙ্গেই আমাদের পরিচয়। তাঁহার প্রথম জীবনে তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা কি ভাবে হইয়াছিল তাহার বিশেষ খবর আমরা পাই নাই। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি টোলের পণ্ডিতদের কাছেই তিনি প্রধানতঃ তাঁহার শিক্ষা লাভ করেন। মহর্ষির বাড়ীটি তখন নানা জ্ঞানী ও গুণী মহাপুরুষের সমাগমে একটি জীবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ছিল। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা চলিয়াছিল। টোলের পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষালাভ করাতে তাঁহার হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত টোলের পণ্ডিতদের ধাঁচের হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্কুল-কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি তিনি জানিতেন না, জানিতে পারিলেও কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

তাঁহার বাল্যবন্ধুদের মধ্যে স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম সকলেই জানেন। কৃষ্ণকমল তখনকার দিনের এক মহা পণ্ডিত ছিলেন। বিহারীলালের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা গভীর ভাবে চলিত। তবে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, যদিও রাজনারায়ণ বসু বয়সে অনেক বড় ছিলেন। এই দুই মনখোলা বন্ধুতে যখন আলাপ চলিত তখন নাকি হাস্যের রোলে বাড়ী ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইত। এই রাজনারায়ণের কথাই তিনি তাঁহার গুম্ফ-আক্রমণ কাব্যের প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছেন—

> প্রবীণ সাধুর সঙ্গে, বিপ্র যুবা বিনা ভঙ্গে
> বহুকাল সখ্যডোরে বাঁধা।
> বয়সের যে অনৈক্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য
> সে অনৈক্যে প্রীতির কি বাধা।

এই সব বন্ধুর সঙ্গে প্রগাঢ় প্রীতির যোগ থাকা সত্বেও এক দিকে তিনি চিরদিন আপনার একটি স্বতন্ত্র ধ্যানলোকেই বিরাজ করিতেন। যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়াছেন তিনি তাঁহার এই ধ্যানলোকস্থিতির কথা ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

তাঁহার যেমন মানবপ্রীতি ছিল তেমনি তাঁহার আপনার-মধ্যে-আপনি-সমাহিত ভাব ছিল, এই উভয়ের মধ্যে কোথাও বিরোধ বা অসঙ্গতি ছিল না। উঠা-নামার

দারুণ বিরোধ যেমন বিরাট্ হিমালয়েই মানায়, ক্ষুদ্র আর কিছুতেই মানাইতে পারে না, তেমনি তাঁহার মধ্যেই এইরূপ নানা বিরোধ একটি অপূর্ব্ব সুসঙ্গতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে এমন একটি মহত্ত্ব ছিল যে নানাবিধ বিরোধ সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্র সকলেরই মন হরণ করিত।

কখনও কাহারও প্রতি তাঁহার কোনো বিদ্বেষ আমরা দেখি নাই। কাজেই তাঁহার প্রতিও কেহ বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারিতেন না। সত্য সত্যই তিনি ছিলেন অজাতশত্রু।

এক দিকে তিনি ছিলেন শিশুর মত সরল আর এক দিকে তিনি এক জন মহা তত্ত্বজ্ঞানী। গভীর ভাবে তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন, প্রাচীন গ্রন্থের কোনো স্থানে তাঁহার একটু জিজ্ঞাস্য যেই উপস্থিত হইল, আর অমনি তিনি আমাদের না ডাকাইয়া নিজেই আসিয়া উপস্থিত। শেষের দিকে তিনি এতটা হাঁটিতে পারিতেন না, তখনও তিনি রিক্শতে উঠিয়া নিজেই চলিয়া আসিতেন। আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বত্র যাইবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই একটি রিকশ প্রস্তুত রাখিতেন।

এক বার রাত্রি প্রায় এগারটার সময় একটি শ্লোকের অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার একটু সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি ভৃত্য মুনীশ্বরকে লইয়া রিক্শতে চলিয়া আসিলেন। মুনীশ্বর হয়তো তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল, "এত রাত্রিতে যাইবেন না। তাঁহারা এখন শুইয়া পড়িয়াছেন।" তিনি সে নিষেধ শোনেন নাই। আমি তাঁহার আসিবার সাড়া পাইয়াই বাতিটি উজ্জ্বল করিয়া পড়িবার স্থানে তৈয়ার হইয়া বসিলাম। তিনি আমাকে সেখানে দেখিয়াই ভৃত্যকে বলিলেন, "দেখিলে, এখনো ইঁহারা কাজ করিতেছেন! যাঁহারা জ্ঞানের তপস্বী তাঁহাদের কি আর নিদ্রা বা আলস্য থাকে?"

তাঁহার এক পুত্র (এখন পরলোকগত) কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও সপরিবারে তখন আশ্রমে থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী সুকেশী দেবীর কাছে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসিতেন। এক দিন তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "কৃতীবাবুর বাড়ী লইয়া চল।" ভৃত্য ভাল শুনিতে পায় নাই, মনে করিল "ক্ষিতিবাবুর বাড়ী।" আমার বাড়ীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ আসিয়া আমার স্ত্রীকেই মনে করিলেন তাঁহার বৌমা সুকেশী দেবী। বলিলেন, "বৌমা, আজ তোমার বাড়ীর সবই দেখি ওলটপালট করিয়া রাখিয়াছ!" কিছুক্ষণ পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাস্যের উচ্ছ্বাসে সব সারিয়া লইলেন।

নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক সময় তাঁহার ভৃত্যদের বলিতে ভুলিয়া যাইতেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেও সব সময় হঠাৎ বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার ভৃত্যেরা বুঝিতে পারিয়া তখনই একটা ব্যবস্থা করিয়া দিত এবং তিনিও তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রসন্নতায় সকল ত্রুটি ভাসাইয়া দিতেন।

বেশভূষা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রচলিত লোকাচার প্রভৃতির কোনো ধার ধারিতেন না। শীতের সময় হাতে ঠাণ্ডা লাগে, দস্তানা পরিতে বড় হাঙ্গাম, তাই তিনি মোজা হাতে বাঁধিয়া সকালে পদক্ষেপ গুনিয়া গুনিয়া বাগানে পাদচারণ করিতেন।

মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন উঠিলে, নিজে আসিতে না পারিলে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়া পাঠাইতেন। সেই পত্রে প্রায়ই মজার মজার কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেন। কখনও নিজের নামটা না লিখিয়া পাখীর ছবি আঁকিয়া দিতেন। দ্বিজ অর্থে পক্ষীও হয়। কখনও কখনও সেই পাখী আবার তৃষার্ত্ত হইয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পিপাসিত চাতকের মত দর্শনবারি প্রার্থনা করিতেছে এইরূপ সব মজার ছবি থাকিত। তাহাতে বুঝা যাইত ব্যাকুলভাবে তিনি আমাদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন। এই সব বিষয়ে তাঁহার সৌজন্যের আর অন্ত ছিল না। এই সব চিত্রের নমুনা তাঁহার রেখাক্ষর পুস্তকে দেখা যাইবে। রেখাক্ষর গ্রন্থটি হরফে ছাপা নহে তাঁহার হস্তলিপির ও চিত্রের হাফটোন-করা প্রতিলিপি।

তাঁহার এক মস্ত কাজ ছিল নানা রকম গণিতের হিসাব করিয়া কাগজের বাক্স রচনা। তাহাতে গঁদ বা আঠা ব্যবহার করা হইত না। হিসাবমত মুড়িয়া মুড়িয়াই নানা আকৃতির বিচিত্র সব বাক্স তৈয়ার করিতেন। সকল বন্ধুবান্ধবকে এইরূপ বাক্স উপহার

দিয়া তাঁহার কি আনন্দ! আশ্রমের ছেলেরা অনেক সময় তাঁহার কাছে এইরূপ বাক্স চাহিত। বাক্স তৈয়ারী করিতে বহু পরিশ্রম। তবু ছেলেদের হাতে এই বাক্স দিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত তৃপ্ত হইত।

এদিকে তাঁহার এই শিশুভাব অথচ তাঁহার প্রবন্ধাদিতে ও দার্শনিক আলোচনায় কি গভীর জ্ঞানের পরিচয়! তাঁহার গল্প পত্র লেখাতে, কথাবার্ত্তাতে চমৎকার সব রসিকতা থাকিত। তাঁহার 'আর্য্যামি ও সাহেবিআনা' প্রবন্ধে যেমন গভীর তত্ত্বকথা তেমনি চমৎকার সরস রসিকতা। "শুন্দ-আক্রমণ কাব্য," "সেরা মালি" প্রভৃতি কবিতায় রসিকতার ছড়াছড়ি। এক-এক দিন হঠাৎ এই যুগের কথা বলিতে গিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "অনেকেই এখন N. P. P. অর্থাৎ না-পড়ে পণ্ডিত।" বলিয়াই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাস খুলিয়া যাইত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার যৌবন-বয়সে যে কৌতুকনাট্য রচনা করিতেন এবং গুণবাবুদের বৈঠকখানা সেই রিহার্সালে যে সরগরম থাকিত তাহার পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'তে (পৃঃ ৯৪)।* তাঁহার এই রসিকতায় ও আনন্দ-রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের ও ধ্যানময় জীবনের কোনো বিরোধ তাঁহার জীবনে দেখা যায় নাই।

তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান কথা ছিল তাঁহার স্বদেশপ্রীতি। এই দেশের প্রাচীন জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার একটি অগাধ ভক্তি ছিল। যৌবনে দেশের দুঃখে তিনি ক্রমাগত ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিতে চাহিতেন কি করিয়া দেশের দুঃখ দুর্গতি অধীনতা প্রভৃতি দূর হয়। হিন্দুমেলার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই হিন্দু-মেলাই পরে জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস প্রভৃতির গোড়াপত্তন করিয়াছে। দেশের স্বাধীনতার কথা উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি পরিহার করিয়া হৃদয়ের উন্মাদনার দ্বারাই চালিত হইতেন। শেষ বয়সে তাঁহার এই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

বিলাতী কিছুই তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই তাঁহার প্রথম জীবনের প্রবন্ধাদিতেও তখনকার ইঙ্গবঙ্গদের প্রতি তীব্র আক্রমণ আছে। তাঁহার সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা—

> বিলাতে পালাতে ছটফট্ করে নব্য গৌড়ে,
> অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে।...

তাঁহার অন্তরের গভীর বেদনার সাক্ষ্য দেয় এই সব রসিকতা।

সাহেব-সুবাদের সম্পর্কও তিনি সহিতে পারিতেন না। পিয়ার্সন সাহেব, এণ্ড্রুজ সাহেব প্রভৃতি মহাত্মারাও অতিকষ্টে তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। এক দিন কি কথায় তিনি তাঁহাদিগকে তীব্র এমন কিছু বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাঁহার পৌত্র (অধুনা পরলোকগত) দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "Dinoo, your grandfather is terrible." কিন্তু পরে ক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার গভীর প্রীতি হয়। এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁহাকে একটি বহুমূল্য ওভারকোট দিয়াছিলেন। তাহা তিনি গায়ে না দিলেও সর্ব্বদা চেয়ারে পাতিয়া বসিতেন। তাঁহার গায়ে দিবার জন্য তাঁহার খোদ-পছন্দ মত জামা ছাড়া আর কিছুই চলিত না। বিলাতী সাহেবেরা যে আমাদের দেশের দর্শনাদি বিষয়ে অন্যায় মুরুব্বিয়ানা করেন তাহাও তাঁহার ছিল অসহ্য।

দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার এমন একটি ব্যাকুলতা ছিল যে যখন শুনিলেন মহাত্মা গান্ধী এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ আনিবেন তখন তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই আন্দোলনের কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি ছিলেন ভাবজগতের লোক, হাতে-কলমে কাজ করার মত তাঁহার প্রকৃতি কখনই ছিল না। তখন "এক বৎসরের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা" তাঁহাকে এমন পাইয়া বসিয়াছিল যে ৩১শে ডিসেম্বরে মধ্যেই ভারতের স্বাধীনতা—এই কথাতে পূর্ণ সায় দিতে না পারাতে তিনি শেষ জীবনে আমার ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়ের উপর অত্যন্ত রুষ্ট ছিলেন। আমরা মহাত্মাজীকে খুবই শ্রদ্ধা করি, তবু

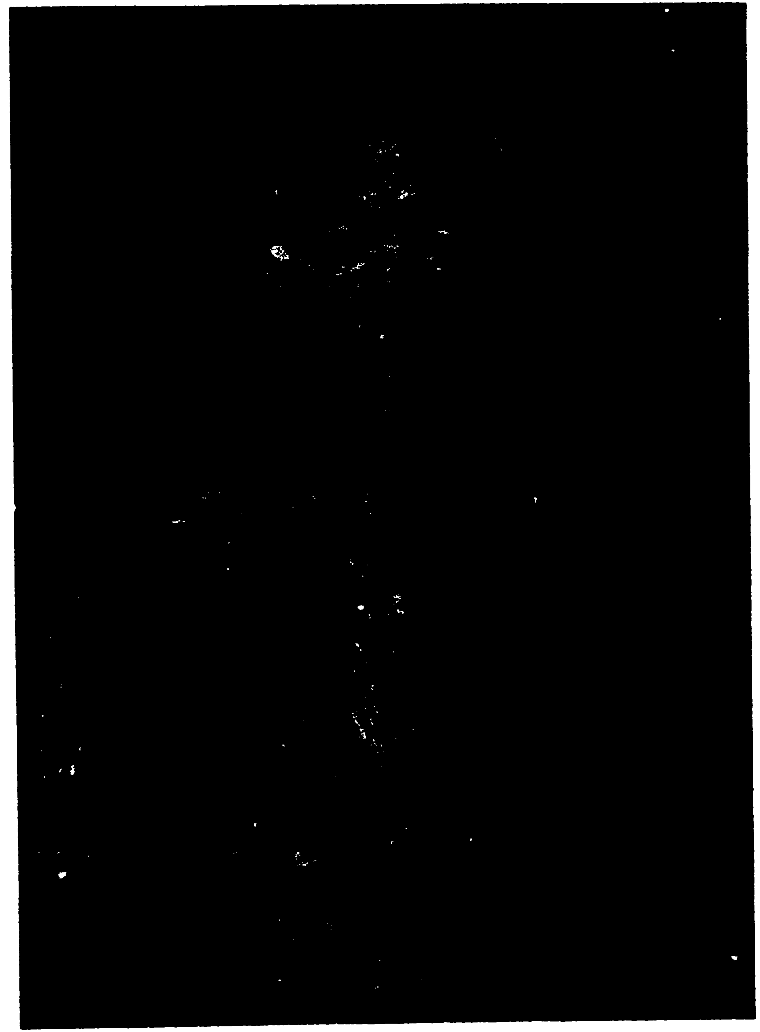
* জীবনস্মৃতিতে যে কৌতুক-গীতিটির উল্লেখ আছে ("ও কথা আর বোলো না আর বোলো না বলচ বঁধু কিসের ঝোঁকে") সেটি দ্বিজেন্দ্রনাথের নয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এইরূপ লিখিত আছে।



দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ



বর্মা ...াল৷ র ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর সি. ঘ রেড্ডী
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী গঠিত মূর্ত্তি



জি. টি. বোগ, মাদ্রাজের গবর্ণরের প্রধান পরামর্শ
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী গঠিত মূর্ত্তি

কেন আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ সম্ভব নহে বলি তাহাই আমাদের অপরাধ। কেহ কেহ চরকা না কাটিয়াও চরকার প্রচণ্ড সমর্থন করিতেন, আমরা তাহা পারিতাম না, তাহাও আমাদের ছিল মস্ত অপরাধ।

তখনকার দিনের আন্দোলনে যাঁহারা নির্বিচারে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের অনেকেরই মতামত আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা বহু মতভেদ সত্ত্বেও মহাত্মাজীর প্রতি এখনও গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। দ্বিজেন্দ্রনাথ যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন তবে হয় তিনি নিজ মতামত আমূল পরিবর্ত্তন করিতেন নয়তো তাঁহার প্রিয়াপ্রিয়জন সম্বন্ধে স্বীয় বিচারকে আগাগোড়া অদলবদল করিতে বাধ্য হইতেন।

ভারতের প্রতি তাঁহার ভালবাসা এত গভীর ছিল যে তাহার জন্য তিনি অসম্ভবকেও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই জন্য অনেক সময় তাঁহার অতিশয় স্নেহাস্পদ ছোট ভাই শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গেও তাঁহার বিলক্ষণ মতের প্রভেদ ঘটিত এবং তাঁহার এইরূপ ঐকান্তিক একাগ্রতার সুযোগও তখনকার দিনে অনেকে লইয়াছিলেন। কিন্তু তবু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার এই ব্যাকুল স্বদেশভক্তি তিনি বহন করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ মাত্রেরই প্রতি তাঁহার মৈত্রী ছিল অপরিমাণ, সকলকেই তিনি এই রকম বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার পক্ষে সংসারে কোনো কাজ করা ছিল একান্ত অসম্ভব। তাঁহার ভৃত্যদিগকে তিনি কাণ্টের দর্শনের সমালোচনা পড়িয়া শুনাইতেন। শুনিয়াছি যখন তিনি স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য লেখেন তখন তারাদাসীকে তিনি তাহা পড়িয়া শুনাইতেন। বৃদ্ধা শুনিত আর ঝিমাইত, মাঝে মাঝে ঠাকুর-দেবতার কথা মনে করিয়া হাতজোড় করিয়া নমস্কার জানাইত।

তাঁহার এই সরল শ্রদ্ধার সুযোগও যে কেহ কেহ গ্রহণ করিতেন না তাহাও নহে। শুনিয়াছি তাঁহার প্রথম জীবনে তাঁহাদের বাড়ীতে এক জন আসিতেন তাঁহাকে সকলে "ফিলজফার" বলিয়া ডাকিতেন। তিনি নানা ওজুহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে অর্থ লইতেন। এক বার ফিলজফার এমন একটা দুঃখের কথা জানাইলেন যে তাহাতে বহু অর্থ সাহায্য করিতে হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে তো অর্থ থাকিত না। অগত্যা তিনি বহু মুদ্রা ব্যয়ে সদ্য বিলাত হইতে আনীত তাঁহার নিজ ব্যবহারের ত্রিচক্রযান (tricycle)খানি তাঁহাকে দান করিলেন। তখনকার দিনে দ্বিচক্রযান হয় নাই এবং ত্রিচক্রযানও দুর্ম্মূল্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্য ব্যায়াম বিশেষ কিছু না থাকাতে ঐ ত্রিচক্রযানটি তাঁহার একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল। অন্যেরা কোনো মতে ঐ যানটি ফিলজফারের কাছ হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন।

শান্তিনিকেতনেও দেখিয়াছি পশু পাখী কাঠবেড়ালী কুকুর বেড়াল প্রভৃতির উপর তাঁহার কি প্রীতি। পাখীগুলি তাঁহার গায়ে আসিয়া বসিত, তাঁহার হাত হইতে খাইত। কাঠবেড়ালী তাঁহার কোলের উপর হইতে খাদ্য বাহির করিয়া খাইত, তাঁহাকে সঙ্কোচ করিত না। আমরা আসিলেই দৌড়িয়া পলাইত। শালিক পাখীগুলি তাঁহার টেবিলের উপর বসিয়া তাঁহার কলম চশমা লইয়া নাড়াচাড়া করিলে তিনি তাহাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন। পাখীদের জন্য কত ছড়াই তিনি বাঁধিয়াছিলেন! এক বার একটি শালিক পাখী খেলা করিতে করিতে তাঁহার চোখে আঘাত করাতে তিনি কয়েক দিন কষ্ট পান। পশুপক্ষীর সঙ্গে তাঁহার মৈত্রীভাবের আর অন্ত ছিল না। কাজেই তাহাদের সব অত্যাচার তিনি সহিতেন, কখনও তাহাদিগকে তাড়াইতে দিতেন না।

ছোট ছেলেপিলেদের সঙ্গে তাঁহার সরল হৃদয়ের একটি স্বাভাবিক যোগ ছিল। তিনি তাহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। নিজে খাইতে বসিয়া ভৃত্য মুনীশ্বরের ছেলেদের আপন হাতে খাওয়াইয়া দিতেন। মুনীশ্বর বাধা দিতে গেলেও তিনি তাহা মানিতেন না। আশ্রমের ছেলেরাও যাহারা তাঁহার এই স্বভাবের কথা জানিত তাহারা মাঝে মাঝে তাঁহার প্রসাদলাভ করিত। এক বার একটি ছেলে তাঁহার নিকটস্থ একটি গাছে উঠিয়া ডাল ভাঙিয়া ফেলে। বৃক্ষটির শাখাভঙ্গে দুঃখিত হইয়া ছেলেটিকে তিনি তিরস্কার করেন। হঠাৎ বালকটির দিকে চাহিয়া তাহার কাতর মুখ দেখিয়া অন্তরে তিনি এমন ব্যথা পাইলেন যে তাহার পর নিজে তাহাকে ডাকিয়া

গায়ে হাত বুলাইয়া মিষ্টান্নাদি খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন, "মধ্যে মধ্যে তুমি আসিয়া আমার কাছে খাইও। খাওয়া দেখিতে আমি বড় ভালবাসি।"

জীবনের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার যতই মতভেদ হউক তবু ছোট ভাইয়ের প্রতি তাঁহার স্নেহের আর সীমা ছিল না। ৭ই পৌষে, ১লা বৈশাখে মন্দিরে উপাসনার পর, যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বড়দাদার কাছে যাইতেন তখন তাঁহার সেই স্নেহ-উচ্ছ্বাস যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই আমার কথা বুঝিবেন। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ যে অশেষবিধ মহিমায় পূর্ণ তাহা তিনি বহু পূর্ব্বে আপন "যৌতুক না কৌতুক" কবিতার পরিশেষে বলিয়া গিয়াছেন—

শর্ব্বরী গিয়াছে চলি! দ্বিজরাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।—কাব্যমালা, পৃ. ৫০

নিষ্প্রয়োজন হইলেও এখানে তাঁহার একটি প্রভাত-বর্ণনা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

স্নিগ্ধ অতি এই কাল নাহি কোন গোলমাল
নিস্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়,
ঝোপ ঝাপে অন্ধকার, নভস্থল পরিষ্কার
লতাপাতা হিমবিন্দুময়।
পরপারে যায় দেখা, যেন এক চিত্রলেখা
পশ্চিম দিগন্তে নভসীর।
গাছে গাছে একাকার মাঝে মাঝে রহে আর
দেবালয় প্রাসাদ কুটীর।
শাখা পত্র দুলাইয়া জলপুষ্প ফুলাইয়া
বুলাইয়া মাঠ ময়দান
মৃদুমন্দ বায়ু বহে মনে মনে দ্বিজ কহে
আহা কি সুন্দর এই স্থান।
—কাব্যমালা, "বরাহনগর উদ্যানে", পৃ. ১১০, ১১১।

তাঁহার চরিত্রের মধ্যে সকলের উপরে হইল তাঁহার একটি অনাসক্ত ভাব। হংসের মত তিনি জলে বাস করিতেন, অথচ তাঁহার পাখা কখনও ভিজিত না। ইহাকে ইংরাজীতে বলিতে গেলে aloofness বলিতে হয়। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও তিনি বহু দূরে। আমাদিগকে ছোট ছোট পত্র লিখিয়া তিনি দিনের মধ্যে বহুবার পাঠাইতেন, তাহাতে অনেক সময় তিনি "দ্বিজ" কথার পক্ষী অর্থ ধরিয়া পত্রের নীচে একটি পক্ষী চিত্রিত করিয়া দিতেন, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেই হিসাবে তিনি ছিলেন "হংস" বা "পরমহংস"। নীর-ক্ষীর হইতে হংস নীর বাদ দিয়া ভাল অর্থাৎ ক্ষীরই গ্রহণ করে, মলিন জলে থাকিয়াও হংস মলিন হয় না, সংসারে আসিয়াও সে মানসসরোবরের দিকে চাহিয়া বাসা বাঁধে না। তেমনি তিনিও সংসারে থাকিয়াও ছিলেন অসংসারী। মন্দ বাদ দিয়া ভালটুকু গ্রহণ করাই ছিল তাঁহার স্বভাব। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও তাঁহার মত পরমহংস কমই দেখা যায়।

এই জন্য নানা ভাবে তাঁহাকে সংসারের দায়িত্ব দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। তাঁহার উপর জমিদারীর ভার দিতে পারা যায় নাই। সকলকে তিনি এত বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার মত লোকের পক্ষে বিষয় চালান ছিল অসম্ভব। তাই তাঁহার পুত্র পরলোকগত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই ছিলেন তাঁহার অভিভাবক। এই অনাসক্ত ভাবের জন্য সংসারের সুখ-দুঃখ শোক-তাপ কখনও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। পালে যদি বাতাস লাগে তবে নৌকাকে কোনো ঢেউই টলাইতে পারে না।

তাঁহার মৃত্যুর মত সহজ মৃত্যু বড় একটা দেখি নাই। ১৩৩২ সাল, ৩রা মাঘ। সকালে উঠিয়া ঠাণ্ডা জলে নিত্য-অভ্যস্ত স্নান-উপাসনা সারিয়া সকালে কিছু জলযোগ করিলেন। তার পর কেমন শীত অনুভব করিতে লাগিলেন। গিয়া দেখিলাম তাঁহার একটু সর্দ্দিজ্বর হইয়াছে। সে দিনও তিনি নিত্যকর্ম্ম সবই করিলেন। দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছিল। তাঁহার লেখার কাজ অন্যের করিয়া দিতে হইত। তবু তাঁহার প্রুফ দেখার কাজ প্রভৃতি যথারীতি করিলেন। দুধ ও ফলের রস মাত্র খাইলেন। বৈকালে জ্বরটা একটু বাড়িয়াছে দেখা গেল, ফুসফুসেও একটু দোষ পাওয়া গেল। রাত্রেও ফলের রস মাত্র খাইলেন। পরদিনের স্নানের জন্য জল তুলিয়া রাখিতে বলিলেন। কিন্তু সে স্নান আর করা হইল না।

রাত্রি তিনটায় ডাক পড়িল। গিয়া দেখি শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত মুখে একটি শান্ত বিশ্রামের

ভাব। ক্রমে চারিটার সময় তিনি পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া গেলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেও তিনি মুণ্ডক উপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা" কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেন। মৃত্যুদিনেও তিনি একটি কবিতা রচনা করেন, তাহার শেষ কয় পংক্তি দেখিলে বুঝা যায় তাঁহার মৃত্যুর কথা তিনি আগেই বুঝিয়াছিলেন কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে তাঁহার আর ভয়ের হেতু কিছুই ছিল না।

তোমার আনন্দে করি ধ্রুবতারা ভাসাই তরণী।
দুর্দ্দিনে পাইলে ভয় তুমি হও দিনমণি।
মাথায় করি লব যবে তুমি পাঠাইবে মরণ।
মরণে সে ডরে না কভু রহে যে ধরি চরণ॥

—ভারতী, মাঘ ১৩৩২, পৃ. ৬৪৮।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার চরিত্রের মধ্যে অদ্ভুত রকমের বিরোধের সমাবেশ ছিল। তিনি এক দিকে ছিলেন ধ্যানলোকের মানুষ, অথচ তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেখা যায় মনুষ্য-চরিত্রের বিষয়ে আশ্চর্য্য তাঁহার অনুভূতি। তাঁহার চমৎকার সরস রসিকতাগুলি দেখিলে মনেই হয় না যে তিনি এক জন ধ্যানলোকবাসী অনাসক্ত যোগিপুরুষ। তাঁহার ধ্যান এত বিশাল ছিল যে সেই ভাবের সঙ্গে রক্ষা করিয়া কোনো কাজ সমাধা করিয়া তোলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই তাঁহার বড় বড় সব লেখাই প্রায় অসমাপ্ত। তাঁহার প্রথম দিকের স্বপ্নপ্রয়াণ ও তত্ত্ববিদ্যা তিনি সমাপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার সার সত্যের আলোচনা, হারামণির অন্বেষণ, গীতাপাঠ কিছুই তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সব কাজের ধ্যানরূপটিই তাঁহার এত বিরাট্ ছিল যে কাজে তদনুরূপ করিয়া তোলা কিছুতেই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

কায়াযোগের সঙ্গে তাঁহার কতকটা যে পরিচয় ছিল তাহা আমি জানিতাম। তিনি নিজেও কোনো কোনো শ্বাসক্রিয়া করিতেন। ঔষধাদিতে তাঁহার কখনও বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার অসুখবিসুখও বড় একটা হইত না। তাঁহার পরলোকপ্রয়াণের নয়-দশ বৎসর পূর্ব্বে এক বার তাঁহার খুব অসুখ হয়। তখনও তিনি কিছুতেই ঔষধ খাইবেন না। তাঁহার কুইনাইন খাওয়া প্রয়োজন। তিনি বলিলেন, "আমার অসুখ না হয় ঔষধে সারিবে কিন্তু ঔষধ সারিবে কিসে?" অনেক সাধ্যসাধনায় দুই-এক মাত্রা ঔষধ খাইয়াই তিনি ছাড়িয়া দিলেন। তবে তিনি সারিয়া উঠিলেন। তাহার পরও প্রায় দশ বৎসর সুস্থভাবে বাঁচিয়া রহিলেন।

সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "জানেন, আমার জীবনে কখনও অসুখ-বিসুখ বড় একটা হয় নাই। একবার আমার স্কন্ধদেশে বাতের ব্যথা হয় তাহা আমি মনন-ক্রিয়ার দ্বারাই দূর করিয়া দিয়াছিলাম। স্নানাদি কিছুই বন্ধ করি নাই। ঔষধ তো স্পর্শই করি নাই।"

মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতেন। তাঁহার মত ছিল, "শরীর ক্ষিতি-অপ্-তেজ-বায়ু-ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বে রচিত। পঞ্চতত্ত্বের সঙ্গে যোগের সামঞ্জস্য হইলেই রোগ দূর হয়। তাহা করিতে যে জানে না সে ঔষধ নামে বিষ সেবন করিতে বাধ্য হয়। তাহার রোগ সারিলেও ঔষধ সারে না।"

যোগ ও তন্ত্রের কায়াসাধনায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কতকটা তাঁহার জানাও ছিল। তবে তিনি সবই ধ্যান-দৃষ্টির দ্বারা দেখিতেন এবং ধ্যানযোগেই তাহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঠিক যোগী বলিতে যাহা বুঝায় তিনি তাহা ছিলেন না। তাঁহার ভাব-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যোগিভাবও গভীর ভাবে বিদ্যমান ছিল। সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার সম্বন্ধ ছিল ধ্যান ও ভাবের দ্বারা, দেহের সম্বন্ধের দ্বারা নহে।

তাঁহার প্রতিভা ছিল বিরাট। সেই প্রতিভার অজস্রতার পরিমাণ নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় মেলে। স্বপ্নপ্রয়াণ ও রেখাক্ষর গ্রন্থ লেখার সময় কত চমৎকার সব কবিতা যে বসন্তের শুষ্ক পত্রের মত তিনি চারি দিকে ঝরাইয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন তাহার হিসাব কে করিবে? অনেক সময় তাঁহার বাতিল করা কবিতাগুলিই ছিল বেশী সুন্দর! সঞ্জীবচন্দ্রের কথা লিখিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যে লিখিয়া-ছেন, "তাঁহার প্রতিভার অজস্রতা ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না।"—এই কথা দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও খাটে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও ভারতী পত্রিকার সম্পাদকতা

সুযোগ্যভাবে দীর্ঘকাল তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির কাজও তিনি কিছু কাল করিয়াছেন। ১৯১৪ সালে ২৭শে চৈত্র তারিখে কলিকাতা টাউন হলে যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হয় তাহার সভাপতি ছিলেন তিনি। "নানা চিন্তা" নামক তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তাহা "সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ" রূপে বাহির হইয়াছে।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থাবলী নানা খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। "প্রবন্ধমালার" মধ্যে এই কয়টি প্রবন্ধ আছে—

(১) মুখ্য ও গৌণ। (১২৮২ সাল)
(২) কাল্পনিক ও বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক। (১২৮৫)
(৩) সোনার কাটি রূপার কাটি। (১২৯১)
(৪) সোনায় সোহাগা। (১২৯৫)
(৫) নব্য বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি ও গতি। (১২৯৫)
(৬) আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা। (১২৯৭)
(৭) সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা।
(৮) বাবুর গঙ্গাযাত্রা।

"নানা চিন্তা" নামে সংগ্রহ-গ্রন্থে আছে—

(১) সাধনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।
(২) বিদ্যা ও জ্ঞান।
(৩) সাধনের সত্য।
(৪) আর্য্য ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত এবং সংঘাত।
(৫) সভাপতির অভিভাষণ।
(৬) সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ।
(৭) উপসর্গের অর্থ বিচার।
(৮) দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব।

তাহা ছাড়া তাঁহার পুরাতন ও নূতন আরও কতকগুলি গ্রন্থের নাম করা যায়।

তত্ত্ববিদ্যা (জ্ঞান কাণ্ড, ভোগকাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড)। তাহার ইংরাজী অনুবাদ Ontology।

হারামণির অন্বেষণ।

(এই গ্রন্থের অন্তর্গত ত্রিগুণ রহস্য প্রবন্ধটি ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান মন্দিরের একটি চাবীবিশেষ)।

রেখাক্ষর বর্ণমালা।

ইহার মধ্যে দুই-একটি স্থান উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন। রেখাক্ষরের দৃষ্টান্তের জন্য চমৎকার সব কবিতা—

আর্ ত দিলে "আর্ত"এ ছাড়িবে "আর্ত্ত" রব।
আর্-ম চাপাইলে পিঠে র'বে না গর্দ্দভ"—পৃ. ৬৯

ন-ঙ-ম প্রধান যুক্তাক্ষরের পদাবলী—

আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার।
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর।
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি।
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি।
কালিন্দীর কূলে বসি কান্দে গোপনারী।
তরঙ্গিনী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী।
আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে।
সিন্ধিকাটি খুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে।—পৃ. ৮২

ষ-প্রধান যুক্তাক্ষরের পদাবলী—

কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট্র পথে হাটে।
শুষ্কমুখ রাধিকার দুষ্পেখে বুক ফাটে।
কৃষ্ণ বলি ভ্রষ্ট বেণী বক্ষে ধরি চাপি।
ভূপৃষ্ঠে লুটায়ে পড়ে মর্ম্মদাহে তাপি।
কষ্টে বলে অষ্ট সখী শোয়াইয়া কোলে।
চিন্তা করিও না রাই কৃষ্ণ এল' ব'লে।
এত বলি হাহু করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা কারে পোছে।
দুষ্ট বধে পূরে নাই কৃষ্ণের অভীষ্ট।
অদৃষ্টে অবলাবধ আছে অবশিষ্ট। পৃ. ৮৩, ৮৪

পুরাতন ভারতী পত্রিকায় যখন রবীন্দ্রনাথের "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে" ইংরেজী সমাজের প্রশংসাসূচক লেখা বাহির হয়, তখন প্রতিবাদ স্বরূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রত্যেক বারেই প্রাচীনপন্থী ভারতীয় ভাবের মতামত প্রকাশ করিতেন। সেই বাদ-প্রতিবাদ উপভোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত "একটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর" প্রবন্ধে তিনি এই দেশের জাতিভেদের মধ্যে যাহা কিছু ভাল তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার কতকগুলি কবিতা পরে কাব্যমালা নামে বাহির হয়। কাব্যমালায় আছে :—

(১) যৌতুক না কৌতুক
(২) শুক আক্রমণ কাব্য
(৩) মেঘদূত
(৪) সোনা মানি

(৫) অস্থির বাসনা
(৬) বাসন্তী পদাবলী
(৭) তেতালার দুপুর রাত্রি
(৮) বরাহনগর উদ্যানে
(৯) পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম।

সার সত্যের আলোচনা ও গীতাপাঠের কথা আগেই বলা হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতেই তাঁহার প্রতিভার একটা পরিমাণ পাওয়া যায় না, তাঁহার রচনার চেয়ে তাঁহার প্রতিভা ছিল অনেক বড়।

দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার একটা স্বাভাবিক গভীর প্রবেশ ছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে কান্টের দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের যোগাযোগ লইয়া তিনি গভীর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সার সত্যের আলোচনায়, হারামণির অন্বেষণে, গীতাপাঠে তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টির গভীরতা আমরা বুঝিতে পারি।

পিথাগোরসের দর্শন আলোচনা করিতে করিতে এক দিন তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখুন পিথাগোরসের মধ্যে যে lentil.(কলাই) খাওয়া নিষেধ আছে, নিশ্চয় তাহা ভারতীয়। বেদের মধ্যে নিশ্চয় কোথাও তাহার উল্লেখ আছে।"

আমি কহিলাম, "এই কথা আমি কাশীতে কাঠক-সংহিতায় ও মৈত্রায়ণী সংহিতায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়।"*

বই দুখানি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তখন ছিল না। অথচ তিনি প্রমাণ দুইটি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেই রাত্রিতেই আমি কলিকাতা গেলাম এবং পরদিন গ্রন্থ দুখানি আনিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম।

ন মাষাণামশ্নীয়াদ্ অমেধ্যা বৈ মাষাঃ।
—যজুর্বেদ, কাঠকসংহিতা, ৩২, ৭

ন মাষাণাম্ অশ্নীয়াদ্ অযজ্ঞিয়া বৈ মাষাঃ।
—যজুর্বেদ, মৈত্রায়ণী সংহিতা, ১, ৪, ১০

অর্থাৎ, "মাষকলাই খাইবে না, মাষ যজ্ঞের অযোগ্য।"

* Vedic Index নামক পুস্তকখানি তখনও হাতের কাছে পাই নাই।

হিরাক্লিটাসের মধ্যে অগ্নি সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি দেখিয়াই বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ইহা বেদে আছে।" পরে দেখা গিয়াছে তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। প্রাচী প্রতীচী উদীচী দেখিয়া বলিলেন, দক্ষিণেরও এইরূপ একটি নাম নিশ্চয় আছে। "অবাচী" শব্দটা না জানিয়াও তিনি তাহা ঠাওর করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

এই ঠাওরের শক্তিটা তাঁহার ছিল অসাধারণ। বেদের ও উপনিষদের মধ্যে তিনি এমন মর্মস্থানে প্রবেশ করিতে পারিতেন যে অন্তরের এই আলো না থাকিলে শুধু ভাষ্যাদির সহায়তায় সেখানে পৌঁছা অসম্ভব। প্রাচীন কালের ভাষ্যকারদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অসীম অথচ তাঁহার নিজের "ঠাওর" করিবার শক্তিটিও ছিল অসাধারণ। বুদ্ধদেবের কথায় তিনি "আত্ম-দীপ" ছিলেন।

তাঁহার গীতাপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই ধ্যানের মধ্যে ডুবিয়া তিনি জ্ঞানের মর্মস্থলে পৌঁছিতে পারিতেন। ত্রিগুণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে অপূর্ব্ব আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানের মর্মস্থলে পৌঁছিবার একটি অতুলনীয় পথ উদ্ভাসিত হইয়াছে। ঠিক এই ভাবে শাস্ত্রের মর্মস্থলে পৌঁছিবার পন্থা পূর্ব্বে আর কেহই দেখান নাই।

বিচারের সময় কি সূক্ষ্ম বিচারই তিনি করিয়াছেন অথচ স্বদেশকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কার, আচার প্রভৃতি সবই তিনি নির্বিচারেই ভালবাসিয়াছিলেন। এত বড় বিচারপরায়ণ দার্শনিক হইয়াও যে এই দেশের ভাল মন্দ সবই তিনি এমন নির্বিচারে অনায়াসে মানিতে পারিয়াছেন তাহাই বিস্ময়কর।

দর্শন গণিত ও কাব্য এক জাতীয় জিনিষ নহে। তবু এই তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার যে প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সব্যসাচী বলিলেও ছোট করিয়া বলা হয়।

গণিতেও তিনি প্রচলিত চিহ্ন ও লিঙ্গগুলি (symbol) মানেন নাই। নিজের রচিত চিহ্নাদির দ্বারা কাজ করিয়াছেন। কাজেই য়ুরোপে পণ্ডিতেরা তাহার তারিফ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা লইয়া ব্যবহার করিতে পারেন

নাই। সেগুলি ভাল ভাবে সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। হয়তো তাহাতে গণিত বিষয়ে কোনো নূতন আলোক পাওয়া যাইতে পারে।

Boxometry বা কাগজের বাক্স রচনাতেও তাঁহার গাণিতিক প্রতিভা কম প্রকাশিত হয় নাই। এই বিষয়ে তিনি একটি শাস্ত্রই রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার উপযোগিতা কি আছে জানি না, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় মেলে।

বাংলা রেখাক্ষর তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহাতে যে সব কবিতা তিনি লিখিয়াছেন ও ফেলিয়া দিয়াছেন তাহাও অতুলনীয়। তাঁহার এই রেখাক্ষরও যতটা আদৃত হওয়া উচিত ছিল ততটা আদৃত হয় নাই। তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পাইয়াছে অন্যে। এখনও বাংলা লঘুলেখনকুশল ইন্দ্রবাবু তাঁহার পদ্ধতিতেই বাংলা বক্তৃতা লিখিয়া থাকেন।

তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অথচ তাঁহার রচনাপ্রণালী ছিল চমৎকার প্রাকৃত বা বাংলা। অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াও পণ্ডিতী দোষে তিনি দুষ্ট হন নাই। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে তিনি দেখাইয়াছেন প্রচলিত বাংলা অভিধান হইতেছে সংস্কৃত অভিধানের অনুবাদ মাত্র—চলিত কথোপকথনের শব্দের প্রতি তাহাতে কিছু মাত্র শ্রদ্ধা নাই (নানা চিন্তা, পৃ. ১৮৭-১৮৮)। নানা দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পণ্ডিত হইয়াও প্রাকৃত বাংলার প্রতি এমন গভীর অনুরাগ অতিশয় বিরল।

সংস্কৃত ছন্দে বাংলাতে সুন্দর কবিতা লিখিবার নমুনা তিনি দেখাইয়াছেন—অবশ্য প্রায়ই তাহা রসিকতার উদ্দেশ্যেই রচিত।

সঙ্গীতেরও তিনি সমজদার ছিলেন, যদিও তিনি গান করিতেন না। সুন্দর সুরে অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁহার রচিত। সাধারণ সমাজের একাদশ সংস্করণের (১৩৩৮) ব্রহ্মসঙ্গীত গ্রন্থে তাঁহার রচিত ২৫টি গান পাইলাম। তাহার মধ্যে অকূল ভবসাগরে, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, অনুপম মহিমপূর্ণ ব্রহ্ম, এক প্রথম জ্যোতি, কর তাঁর নাম গান, জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী, দীনহীন ভকতে, সব দুখ দূর হইল, প্রভৃতি গান এখনও খুব সমাদৃত।

বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি অতি গভীর ছিল। তাঁহার উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধটি (নানা চিন্তা, পৃ. ২৩৯) দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

অন্য ভাষা হইতে বাংলাতে অনুবাদ করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার মেঘদূতের অনুবাদ (কাব্যমালা, পৃ. ৬৬) ও পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম (ঐ, পৃ. ১১৩) তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহার অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য পুরাপুরি বজায় থাকিত অথচ যত দূর সম্ভব মূল হইতে অর্থ ও ব্যঞ্জনা ভ্রষ্ট হইত না। এইরূপ অনুবাদ করা যে কত কঠিন তাহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু তিনি এই কাজে ছিলেন অতুলনীয়। এমন মৌলিক ধ্যানমগ্ন মানুষের পক্ষে এই কাজ কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহাই ক্রমাগত মনে জাগে।

তাঁহার এত রকমের কৃতিত্ব দেখান গেল বটে, তবু ইহাতেও তাঁহার বিরাট্‌প্রতিভার ঠিক পরিমাণটি বুঝা গেল না। এত বড় তাঁহার মনীষা, তবু আর এক দিকে তিনি একেবারে সংসার-অনভিজ্ঞ শিশুর মত সরল। তাঁহার লেখার মধ্যে বুদ্ধিবিচারের কি তীক্ষ্ণতা, হাস্যপরিহাসের কি সরসতা, অথচ তিনি সবই দেখিয়াছেন তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিতে। বাস্তব জগতে তিনি ছিলেন যেন একটি অনাসক্ত সরল শিশুর মত সহজ।

তাঁহার চরিত্রের মধ্যে এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের যেরূপ মিলন ঘটিয়াছে সাধারণতঃ আমরা এই সংসারে সেরূপ বড় একটা দেখিতে পাই না।

শিশুদের মতই সরল ও সহজ ছিলেন বলিয়া তিনি শিশুদের অন্তরের দরদটুকু বুঝিতেন। শিশুদের তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। শিক্ষার জন্য তাহাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি পীড়িত করা তাঁহার মতে ছিল অন্যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বাল্যকালে রাত্রিতে পড়িতে শ্রান্তি বোধ করিতেন তখন 'বড়দাদা" তাঁহার নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ মুক্তি মিলিত। তার পর ঘুম যে কোথায় পলাইত তাহা বলাই কঠিন (জীবন-স্মৃতি, পৃ. ৩৪)।

সেই সব কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "যদি

আমার শিক্ষার ভার বড়দাদার হাতে থাকিত তবে আরও অনেক বেশি স্বাধীনতা পাইতাম, অনেক দুঃখ-দুর্গতি এড়াইতে পারিতাম, এবং আরও পরিপূর্ণতর শিক্ষা পাইবার সুযোগ ঘটিত।"

প্রাচীন কালের কথা বলিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ শিশুর মতই আনন্দ পাইতেন। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পূর্ব্বে নৌকায় যাওয়া যাইত। চিৎপুর রোডের ধার দিয়া নৌকার মত খাল ছিল। তাঁহাদের বাড়ীর কাছে দুইটি শাঁকো থাকায় ঐ পাড়ার নাম হয় জোড়াসাঁকো। তাঁহাদের বাড়ীতে বৎসরের ধান নৌকাতে আসিয়া গোলাবাড়ীতে থাকিত, ঢেঁকিশালে চাউল হইত। কলের জল ছিল না। সমুদ্রের নোনা জল আসিবার পূর্ব্বে জালা জালা গঙ্গাজল নৌকা করিয়া আনিয়া একটি বৃহৎ অন্ধকার ঘরে রাখা হইত। সারা বৎসর সেই জল ব্যবহৃত হইত। খুব পরিষ্কার শুচি হইয়া সেই জল ঐ ঘর হইতে বাহির করিতে হইত। সেই ঘরটা ছিল একটা রহস্যময় স্থান। বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনের বাহুল্য, কুটুম্ববহুল সংসারে ক্রিয়াকর্ম্মে প্রাচীন-কালোচিত আচার-ব্যবহার; এই সব কথায় তিনি যেন সেই যুগের স্বপ্ন দেখিতেন। বর্ত্তমান কলিকাতার খুব কম খবর তিনি জানিতেন। এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, হেদোর কাছ দিয়া চিৎপুর পথের সমান্তরালে যে পথটি হইয়াছিল তাহার দুই দিকে তখন ততটা বসতি হয় নাই। হয়তো এতদিনে হইয়া থাকিবে।" তিনি খবর রাখিতেন না যে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের পরও বহু সমান্তরাল পথ রচিত হইয়াছে, তবু স্থানাভাবে কলিকাতাকে ক্রমাগত উত্তর হইতে দক্ষিণে সরিতে হইয়াছে। কলিকাতায় যখন ঘোড়ার গাড়ীও বিশেষ হয় নাই, ছাতাওয়ালারা ছাতা ধরিয়া লোককে রৌদ্র বৃষ্টিতে লইয়া যাইত, তখনকার কথাও তিনি উৎসাহের সহিত বলিতেন।

যাঁহাদের জীবন কর্ম্মবহুল তাঁহাদের জীবনচরিতে বর্ণনযোগ্য নানাবিধ বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর মানুষ নহেন। তাঁহার চরিত-কথায় মধ্যে নানাবিধ বর্ণনীয় বিচিত্র ঘটনা পাইবার উপায় নাই। তিনি এক জন ধ্যানপরায়ণ গভীর চিন্তাশীল মানুষ। কাজেই তাঁহার দিনচর্য্যা জানিতে অনেকের ঔৎসুক্য থাকিতে পারে মনে করিয়া তাঁহার বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য মুনীশ্বরকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার কাছে অনেক কথা শুনিলাম। মুনীশ্বর বলিল,

আমি বহু দিন এই বাড়ীতে আছি। মহর্ষিদেব জীবিত থাকিতেই যখন আমার খুব অল্প বয়স তখন আমি তাঁহাদের বাড়ীতে বাহিরের কাজে আসিয়া যোগ দেই। বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই নামেই সাধারণত পরিচিত ছিলেন) দুই-এক বার আমার সেবা পাইয়া খুশী হন এবং আমাকে তাঁহার কাজে ডাকিয়া লন। মহর্ষি জীবিত থাকিতেই তিনি অনেক সময় সিংহ বাবুদের রায়পুরে (বীরভূম জেলায়, বোলপুরের নিকটে) গিয়া থাকিতেন, মহর্ষিদেবের পরলোকের পরেও তিনি সেখানে চলিয়া গেলেন। তাহার পর নীচু বাংলার এই বাড়ী তাঁহার পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তৈয়ার করান। সেখানেই তিনি বাকী জীবনটা কাটাইয়া দেন।

নীচু বাংলায় পূর্ব্বে মহর্ষিদেব থাকিতেন। সে বাড়ী ভাঙিয়া যাওয়ায় নূতন বাড়ী তৈয়ার করিতে হয়। মহর্ষির সময়কার কয়েকটি বট ও আমলকী গাছ তখনও ছিল। দ্বিপুবাবু আম প্রভৃতির নানা রকম কলম ও গোলাপ বেলী চামেলী প্রভৃতি ফুলের বাগান করেন। বাগানে কাঠবেড়ালী অনেক ছিল। বড়বাবু তাহাদের দেখিতে ভালবাসিতেন। নিজে যে ছাতু মাখিয়া খাইতেন তাহার ভাগ দিয়া কাঠবেড়ালীদের বশ করিলেন। ঐ খাদ্য খাইতে কতকগুলি কাকও আসিতে লাগিল। তার মধ্যে একটি কাক ছিল খোঁড়া। বড়বাবু তাহাকে বড় স্নেহ করিতেন। ক্রমে সে তাঁহার টেবিলের উপর আসিয়া বসিত। অন্য কাকরাও তাহাই করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের উৎপাত অসহ্য হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই ঐ সব আশ্রিত জীবজন্তুদের তাড়াইতে দিতেন না।

একবার একটি শালিক পাখীর কচি ছানা মাটিতে পড়িয়া যায়। আমি তাহাকে পালন করি। কিছু দিন পরে তাহার পাখনা হইল। বড়বাবু দেখিতে পাইয়া তাহার জন্য গাছে হাঁড়িতে বাসা করাইয়া দিলেন। ক্রমে মেলা শালিক পাখীও জুটিল। আমরা তাড়াইতে চাহিলে বড়বাবু রাগ করিতেন। কিন্তু পাখীগুলি আমাদের দেখিলে আপনিই পলাইত। মানুষের মন ওরা বেশ বুঝিতে পারে।

বড়বাবুর নিদ্রা ছিল বড় অল্প। রাত্রি ১১টার আগে শুইতে যাইতেন না। তাহাতেও মাঝে মাঝে কিছু একটা ভাব মনে আসিলে উঠিয়া টেবিলে লিখিতে বসিতেন। শেষের দিকে বিছানায় বসিয়াই লিখিতেন। তার পরে রাত্রিতে উঠিয়া লিখিতে কষ্ট হইত তখন আমাদিগকে মুখে মুখে দুই একটা কথা লিখিয়া রাখিতে বলিতেন।—বানান করিয়া কথাগুলি লেখাইতেন। পরদিন দিনের

বেলায় সেই সূত্র ধরিয়া লিখিতেন। এক-এক দিন লিখিতে লিখিতে ভোর হইত, স্নানের সময় হইয়া যাইত। স্নানের সময় হইয়াছে জানাইলে বলিতেন, "তাইতো ভোর হ'ল!"

ভোরবেলা অন্ধকার থাকিতেই তিনি স্নান করিতেন। খুব ঠাণ্ডা বাসি জলে স্নান করিতেন। শীতকালেও এই নিয়মের অন্যথা হইত না। আধ ঘণ্টা প্রায় টবে বসিয়া থাকিতেন। ঘটি করিয়া মাথায় জল ঢালিতেন। শেষের দিকে যখন নিজে পারিতেন না তখন আমরা স্নান করাইয়া দিতাম। স্নানান্তে গামছায় ও শুষ্ক গামছায় গা খুব ঘষিতেন। তাহার পরেই দুইটি কমলা লেবুর রস খাইতেন। সর্দ্দি হইলে দইয়ের জলের মধ্যে আদার রস ও পাতিলেবুর রস মিশাইয়া খাইতেন। আর কোন ঔষধ খাইতেন না।

তাহার পরে তিনি বেড়াইতে যাইতেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক দূরে যাইতে পারিতেন। রেলের লাইন, তালতোড়, পারুলডাঙা, সুরুলের শালবন, গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত যাইতে পারিতেন। শেষের দিকে এতটা পারিয়া উঠিতেন না। একেবারে শেষের দিকে বাহিরে বেড়ান ছাড়িয়াই দিতে হইয়াছিল।

বেড়াইতে গিয়া এক এক সময় তিনি গরীব সাঁওতালদের পল্লীতে যাইতেন। তাহাদের সহজ উৎসব দেখিয়া তাঁহার সরল মনে বড় আনন্দ হইত। এক বার তিনি তালতোড়ের এক সাঁওতাল পাড়ায় গিয়া দেখেন একটি বিবাহের উৎসব চলিয়াছে। তাহারা বড় দরিদ্র, তবু আনন্দের অবধি নাই। পরদিন প্রাতঃকালে কয়টি টাকা আমাদের কাছে চাহিয়া লইয়া তাহাদিগকে দিয়া আসিলেন।

বেড়াইয়া আসিয়া সকালে তিনি চা খাইতে বসিতেন। তখন ছোলা-ভিজান অল্প কিছু, ছোট আদার কুচি, কাঁচা মূলা একটু খাইতেন। ছাতু ও খেজুর-সিদ্ধ তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিল। জিঞ্জার বিস্কুট চায়ে ভিজাইয়া খাইতেন। এণ্ড্রুজ সাহেব যখন আসিতেন তখন ক্রীম ক্রেকার বিস্কুট মাঝে মাঝে খাইতেন। মোটের উপর খাদ্য খুবই কম খাইতেন। কখনও তিনি নিয়মিত খাদ্যের মাত্রা অতিক্রম করিতেন না। অল্প দুধ ও মিষ্ট দিয়া খুব ভাল চা তিনি খাইতেন, চা প্রায় তিন বারে এক এক পেয়ালা করিয়া তিন পেয়ালা খাইতেন। শেষের দিকে চায়ের মাত্রা কমাইয়া প্রতিবারে আধ পেয়ালা করিয়া খাইতেন।

চা খাইবার পর ৭টা ৭৷৷টার সময় তিনি পড়াশুনা করিতে বসিতেন।

প্রায় ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া মধ্যাহ্নভোজনে বসিতেন। খুব অল্প ভাত খাইতেন, ডাল তরকারি নাম মাত্র খাইতেন। ঘন দুধের সঙ্গে একটু ছাতু ও ছয়-সাতটি সিদ্ধ খেজুর মাখিয়া একটু খাইতেন। মাঝে মাঝে তাহাতে কলাও যোগ দিতেন। কিন্তু তাহা আধখানা কলারও কম। এক-এক দিন তিনি খিচুড়ি খাইতেন। খিচুড়ি তিনি খুব ভাল বাসিতেন। এক-এক দিন আমার রান্না মোটা রুটি ও অড়হর ডাল খাইতেন। কিন্তু খাইতেন খুব কম। কলিকাতার ভাল সন্দেশ হইলে এক-এক দিন একটু ভাঙিয়া খাইতেন। আহারের পর আরাম-চেয়ারে বসিয়া বসিয়া একটু সময় বিশ্রাম করিতেন। খবরের কাগজ কখনও নিজে পড়িতেন না। লোকের মুখে দেশের খবর শুনিতে ভালবাসিতেন। দেশে দুঃখ দুর্গতি ও অত্যাচার হইতেছে শুনিলে তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইতেন।

অপরাহ্নে পড়াশুনা করিয়া পাঁচটা কি ছয়টার সময় সান্ধ্যভোজন করিতেন। তখন দুইখানি কি তিনখানি লুচি খাইতেন। খেজুরে গুড় পাইলে লুচির সঙ্গে খাইতে খুব পছন্দ করিতেন। ডাল তরকারি সামান্য খাইতেন। আলু ডুমো ডুমো করিয়া সাদা ভাজিয়া দিলে অল্প খাইতেন। এই সময় ভাল সন্দেশ পাইলে কখনও কখনও একটু খাইতেন। নচেৎ আমি মিছরির রসে নরম ছানার মুড়কি করিয়া দিতাম, একটু খাইতেন। খাবার পর তখনও চা খাইতেন। ইহাই তাঁহার দিনের শেষ ভোজন।

রাত্রিতে পড়াশুনা করিয়া দশটার সময় এক বার চা খাইতেন। ১১টার কাছাকাছি শুইতেন। মাঝে যখন লিখিবার নেশা তাঁর পাইয়া বসিত, তখন এক-এক দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লিখিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে লিখিয়া পড়িয়া ও চিন্তা করিয়া রাত কাবার করিতেও দেখিয়াছি।

মাঝে মাঝে তাঁহার কাগজের বাক্স করিবার তাগিদ আসিত, তখন দিনরাত্রি শিশুর মত ঠিক মাপমত বাক্স-রচনার কাজে তিনি ব্যস্ত। আর কোনো দিকে লক্ষ্য নাই। ঠিকমতটি না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সোয়াস্তি নাই।

ফল প্রায়ই সরবৎ করিয়া খাইতে ভালবাসিতেন। আঙুর, ফুটি, বেল প্রভৃতি ফলের সরবৎ খাইতেন। পিচ কখনও এমনিও খাইতেন কখনও সরবৎরূপে। আম খুব ভাল হইলে এক চামচ মাত্র খাইতেন। শশার রস আকের রস খাইতে ভালবাসিতেন। পেঁপে কখনও কখনও অল্প খাইতেন। কাঁঠালের রস করিয়া দিলে ঘন দুধের সঙ্গে বৎসরে এক-আধ দিন খাইতেন। দইয়েরও সরবৎ খাইতেন। এত খাবার কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু নানা দিনে নানা রকম খাইতেন। প্রতিদিন মোটমাট খুব অল্পই খাইতেন।

আমার ছেলেদের ডাকিয়া আনিয়া তিনি খাওয়াইতেন। ইহাতে বাড়ীর কেহ কেহ দুঃখিত হইতেন, আমিও ছেলেদের উপর রাগ করিতাম। কিন্তু তিনি নিজে-তাহাদিগকে খোঁজ করিয়া আনাইতেন, পশু-পাখীদেরও ডাক পড়িত। তাঁহাকে বাধা দিতে পারে এমন সাধ্য কার?

তামাক তিনি খাইতেন। কলিকাতার ভাল সুগন্ধি তামাক তাঁহার জন্ত দিপুবাবু আনাইতেন। খুব চিন্তা করিবার সময় অনেকক্ষণ গড়গড়াতে তামাক খাইতে থাকিতেন।

তখন শান্তিনিকেতনে লোকজন কমই আসিতেন। সাধু সন্ন্যাসী কেহ তাঁহার কাছে আসিলে তিনি আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেন। যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া কিছু দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিতেন। শিবনারায়ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে অনেক আলোচনা ও তর্ক চলিত। কি বিষয় লইয়া তাহা আমরা জানি না। নিতান্ত বাজে সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার কাছে আসিলে রিক্ত হাতে ফিরিয়া যাইতেন না।

ভোরে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে শয়নকালে তিনি ধ্যান ও জপ করিতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় নির্জ্জন কালে তিনি শ্বাসের ক্রিয়াও কিছু করিতেন। ধ্যানের সময় তাঁহার কাছাকাছি কেহ গোলমাল করিত না। গোলমাল করিলেও তিনি শুনিতে পাইতেন না। তাঁহার ধ্যান অতিশয় গভীর ছিল।

তাঁহার ভৃত্যের কাছে প্রাপ্ত এই বিবরণটির দ্বারা আমরা তাঁহার প্রতিদিনের জীবনযাত্রার একটি চিত্র পাই।

মৎস্যের পক্ষে যেমন সাঁতার শিখিতে হয় না, জলের মধ্যেই জন্মিয়া জলেই সহজে মৎস্য বিচরণ করে, তেমনি ধর্ম্মের একটি আবহাওয়ার মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষির সাধনাই তাঁহার ধর্ম্মসাধনাকে এত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ দিয়াছিল। তাঁহারই প্রস্তুত সাধনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের সাধনা সহজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ধর্ম্মকে বাহিরে প্রচার করিবার মত বোধ হয় তাঁহার প্রকৃতি ছিল না। ধর্ম্ম তাঁহার পক্ষে সহজ সরল জীবনের বস্তু, তাহা দেখান যায় না প্রচার করাও যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার মন ছিল ধ্যানময়। যোগ ও তন্ত্র মতের আত্মসমাধিই তাঁহার পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। এই সব বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে গিয়া দেখিয়াছি, আপনাকে কোনো মতে জাহির করিতে তিনি কিরূপ সঙ্কুচিত ছিলেন।

যে সত্যের সাক্ষাৎকার পাইলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় বিদূরিত হইয়া যায়, কর্ম্মের সকল বন্ধন আপনি মুক্ত হইয়া যায় সেই সাক্ষাৎকার এক বার তিনি পাইয়াছিলেন যৌবনে। আর এক বার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি সেই সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন। এই সাক্ষাৎ পাইয়া দ্বিজ তিনি যেন নূতন তৃতীয় জন্ম লাভ করিলেন। তাই তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি দ্বিজের ত্রিজত্ব বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়া তাহার সাক্ষ্য দিয়া গেলেন।

…দেখা দিলে যেই নয়নে মোর বাঁধা পড়ি গেল দিঠি।
যত কিছু ছিল মনের সাধ নিমেষে গেল মিটি।
পাষাণে অঙ্কুর বীজ করুণা ধারায় তব।
ত্রিজ হ'ল দ্বিজ এ দীন জনম লভিয়া নব।

জীবনযাত্রার প্রারম্ভে যে উপলব্ধি তাহাতে পাইয়াছিলেন ইহলোকের দীক্ষা। জীবনের অন্তভাগের উপলব্ধিতে পাইলেন পরলোকের দীক্ষা। প্রথম দীক্ষায় প্রাপ্ত-দ্বিজত্ব দ্বিজেন্দ্রনাথ এই অন্তিম দীক্ষায় পাইলেন ত্রিজত্ব। জন্ম-মরণের মধ্যে যে সব মিথ্যা ব্যবধান তাহা সেই দিনই তাঁহার কাছে মিথ্যা হইয়া গেল।

এমন মানুষের পক্ষে মৃত্যুভয় থাকা অসম্ভব। দিনের কর্ম্ম অবসানে যেমন সহজে লোকে আপন বিশ্রাম-মন্দিরে প্রবেশ করে তেমনি তিনি মৃত্যুজননীর কোলে গিয়া শয়ন করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কেহই তাঁহাকে সংসারের কর্ম্মে লিপ্ত করাইতে পারেন নাই। তবু 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ও আদি ব্রাহ্মসমাজের কাজ তাঁহার হাতে আসিয়াপড়ে। সেই কাজ তিনি যথাসম্ভব পালন করিয়াছেন। সমস্ত 'ব্রাহ্মধর্ম্ম'খানি তিনি অতি সুললিত বাংলা পদ্যে রূপান্তরিত করেন। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারাও "পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম" পুস্তকখানি পড়িলে পরম আনন্দ লাভ করিবেন।

তিনি ধর্ম্ম বিষয়ের সহিত সংস্কৃত ও জ্ঞান সাধনাকে মিলাইয়া উপাদেয় সব প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার

(১) সাধনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য
(২) বিদ্যা এবং জ্ঞান
(৩) সাধনের সত্য
(৪) আর্য্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের ঘাত প্রতিঘাত
(৫) দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব

প্রভৃতি প্রবন্ধ ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে অনেক নূতন সত্য মনের মধ্যে জাগ্রত করে। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শান্তিনিকেতনে থাকিয়া দেখিয়াছি জীবনের শেষভাগে মন্দিরে বসিয়া তিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিতে একেবারেই পারিতেন না। সেখানে ভগবানের নাম লইতে গেলেই তিনি স্তব্ধ হইয়া যাইতেন। এক বার আমাদের সকলের আগ্রহে

তিনি বাধ্য হইয়া মাঘোৎসবে মন্দিরে উপাসনা করিতে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার উপাসনা হইল আত্মসমাহিত যোগভাব, কাজেই এইরূপ উপাসনা করিতে গিয়া তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল দেখিলাম তাঁহার সমস্ত শরীর কদম্ব-কোরকের মত বিকশিত ও নির্ধূম দীপের মত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বসিয়া তিনি উঠিয়া আসিলেন। আমরা সেদিন এমন একটি চিন্ময় পূর্ণতার ছবি প্রত্যক্ষ করিলাম যে কেহই আর বাঙ্ময় উপদেশের কোনো অভাব অনুভব করিলাম না।

ভক্ত মহাত্মাদের চারিটি লক্ষণ সাধক রবিদাসের বাণীতে দেখিতে পাই। তাঁহারা ভাগবত যোগানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এবং তাহা পাইয়া জীবনের সকল সুখ-দুঃখকে প্রিয়তমের প্রসাদরূপে জানিয়া সমস্তই আনন্দে গ্রহণ করেন। আপনার অন্তরস্থিত ভাব ও আদর্শকে জীবন ও কর্মরূপে রচনা করিয়া তাঁহারাও একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া যান। অবশেষে জগজ্জননীর সকল শ্রান্তিহরণ মৃত্যুক্রোড়ে শ্রান্ত শিশুর মত সহজে চরম তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিয়া পরম চরিতার্থতা লাভ করেন।

পিয় প্রসাদ সুখ দুখ গহে জোগ আনন্দ সমাহিঁ।
ভাবরূপ রবি রচে মাতু সঙ্গ মৃতু জাহিঁ।—রবিদাস, সাধকলক্ষণ।

জীবন ভরিয়া তিনি সুখ-দুঃখে ছিলেন অনাসক্ত। নিশ্চয়ই তাঁহার জীবনের মর্ম্মমূলে এমন একটি ভাগবত প্রেম ছিল যে সবই তিনি প্রিয়তমের প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তিনি কর্মরচনার দ্বারা নূতন সৃষ্টি করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার ধ্যানরসিক জীবনটিই তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রজ্জবজীর মত তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বলা যায়—কোনো কোনো সাধক বাহিরের কোনো কলা বা সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টি না করিয়া আপন জীবনটিকেই একটি পরম সুন্দর রচনার মত সৃষ্টি করিয়া তোলেন—

ধ্যান ভরি কোই সংত জন রচৈ জীবন মাহিঁ।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কেমন করিয়া তাঁহার ধ্যানময় জীবনের অবসানে মাতৃক্রোড়ে তৃপ্তি-শান্তি-ব্যাকুল শিশুর মত তিনি মৃত্যুরূপা জগজ্জননীর কোলে গিয়া আপনাকে বিলীন করিয়া দিলেন।

জন্মদিনের চিঠি

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনু দাদাজি চিরজীবেষু
অবতরণিকা
পাইয়া যে দিন সাধের নাতি
ফুলিল দাদার বুকের ছাতি
সেই দিন আজ দেখা দিয়েছে।
দিনু দাদাজির গুণ অসীম
গানে তানসেন, আকারে ভীম
চিরজীবী হয়ে থাকুক্ বেঁচে।
নিমন্ত্রণপত্র
আনন্দ দিয়ে দাদার নয়নে
দলবল সাথে বসিবে ভোজনে
রবি যবে বসিবে পাটে।
মিটাইব সাধ তোমায় হেরি
শুভকাজে হেন ক'র না দেরি
কহিনু তোমায় সাঁটে।
যতদিন বাঁচি বরষ বরষ
এমনি সুদিনে পজাইবে রস
নীরস শরীরে মোর
ইহারি আশায় দাদা এ তব
বছরের পর বছর নব
থাকিবে হরষে ভোর।

[দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত]

নবযুগের কাব্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উনিশ খ্রীস্টশতকে আধুনিক কালের পাঠশালায় আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের যখন চেহারা দেখলুম তখন দেখা গেল তার রাস্তা পাকা ক'রে বাঁধানো। সকল দেশের দিকে সে খোলা। সে পথে আমাদের মনের চলাফেরা বাধা পেল না। যে সকল আনন্দতীর্থের দিকে তার নির্দেশ ছিল আমরা সহজেই তাকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলুম। বড়ো বড়ো তীর্থযাত্রী যাঁরা এই পথকে প্রশস্ত করতে করতে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়েছিল। অবশেষে এমন বিপর্যয় যে হঠাৎ আসতে পারে যাতে করে সেই বিশ্বপথ ও যানবাহনের পরিবর্তনে আমরা একটা অপরিচয়ের দুর্গমে এসে পড়ব তা মনে করতে পারি নি।

কিন্তু সেই সনাতনী সীমানার মধ্যে মাঝে মাঝে আবহাওয়ার বদল যে লক্ষ্য করিনি তা নয়। ইংরেজি সাহিত্যে আলেকজাণ্ডার পোপ যে-ঋতুর বাহন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সে-ঋতুর নন। এই বদল মনেরই বদলের অনুবর্তী। প্রাকৃত জগৎ এবং মানস জগৎকে দুই যুগের কবিরা ভিন্ন চেহারায় দেখেছেন তাই ছন্দ ও ভাষা আপনিই বদলিয়েছে তার প্রকাশভঙ্গী। আমরা সেই অধুনা-উপহসিত ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যের দান গ্রহণ করেছি, দীক্ষা পেয়েছি তারই কাছ থেকে। সেই অনুসারে যা সুন্দর যা মহৎ তাকে সন্ধান করেছি বিশেষ ভাবে বিশেষ স্থানে, বিশেষ অনুষ্ঠানে তার জন্যে আসন পেতেছি।

এমন সময় য়ুরোপে প্রকাণ্ড এক যুদ্ধে মস্ত একটা সামাজিক ভূমিকম্প ঘটল। বিশ্বের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের ভূমিকা যেন বদলে গেল। রূঢ় হ'ল ভাষা, যে সকল আবরণের দ্বারা আচরণের প্রসাধন করা হ'ত তার সম্বন্ধে একটা অসহিষ্ণুতা দেখা দিল।

আজ পর্যন্ত প্রসাধনের দ্বারা মানুষ আপনার একটা পরিচয় নিজের চেষ্টায় রচনা করে এসেছে। নিজের নগ্নতার উপরে পরিয়েছে শিল্পের উত্তরীয়। অর্থাৎ মানুষের যে স্বরূপ প্রকৃতিদত্ত, তার উপরে সে স্থাপন করেছে নিজের রচনা। সে যা ইচ্ছা করে, সেটাকেও করেছে আপন প্রকাশের অঙ্গ। মানুষ স্বয়ং কী এবং মানুষ কী চায় এই দুইয়ে মিল করিয়ে তবেই মানুষ আপনাকে সম্পূর্ণ ব'লে জেনেছে ও জানিয়েছে। এই জন্যেই ইতিহাসে যাঁরা মহাপুরুষ ব'লে গণ্য তাঁরা কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক, আর অনেক পরিমাণে আমাদের ভাবের সৃষ্টি। পূজা করবার একান্ত প্রয়োজন আছে মানুষের, সেই প্রয়োজন ব্যস্ত হয়ে রয়েছে আপন শিল্প-উপকরণ নিয়ে। ভক্তিক্ষুধাতুর মানুষ ইতিহাসের বাস্তব মূর্তির উপরে রং চড়িয়ে আপনাকে ভুলিয়ে কত অনৈসর্গিক প্রতিমা বানাচ্ছে তার সংখ্যা নেই। শুধু পূজা করা নয়, রস-উপভোগের আকাঙ্ক্ষা মানুষের প্রবল। তাই তার উপভোগের বিষয়কে সে দোষমুক্ত সুসংগতি দিয়ে রুচির অনুকূল করতে চায়। যে অন্ন তার প্রাণরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক, তাকে কেবলমাত্র আপন ক্ষুধা মেটাবার তাগিদে পশুর মতো যেমন তেমন করে মানুষ খেতে পারে না। যে-ক্ষুধা প্রকৃতিদত্ত তার আশুনিবৃত্তি সংবরণ ক'রে মানুষ তার উপরে স্বরচিত শিল্পের শোভনতা বিস্তার করে। অন্নের সামনে নিজেকে একান্ত ক্ষুধিত ব'লে চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে তার সম্পূর্ণ উপভোগের ব্যাঘাত ঘটে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির উপকরণকে অপরূপতা দেবার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে উপভোগের যে আবরণ সৃষ্ট হয়েছে তারই শ্রেষ্ঠতা বিচার ক'রে তার আজাতিক সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিচার হয়ে থাকে। যৌনবৃত্তি মানুষের একটি আদিম প্রবল প্রবৃত্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু যে মানুষ সেই বৃত্তিকে দৈহিক ক্ষুধা মেটাবার ঐকান্তিক অসংযত পথে চালনা করে সে নিন্দনীয় হয় কেবল নীতির আদর্শ থেকে

নয় উপভোগের উৎকর্ষ বিচারে। এই সব আদিম প্রবৃত্তির মুখ্য ভাষাকে গৌণ ছন্দে ঢালাই ক'রে মানুষ তাকে অলংকৃত করে। বুভুক্ষাকে শরীরের শাসন থেকে নিয়ে আসে মনের রাজ্যে, কাম রাজবেশ ধরে প্রেমের, তবেই সে দিতে পারে পূরো আনন্দ, যা ক্ষুধাতৃপ্তির চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষ আপনাকে এবং আপনার চারদিককে আদিকাল থেকেই বানিয়ে তুলছে আপন আনন্দলোক সৃষ্টির জন্যেই। এই বানিয়ে তোলা তার স্বধর্ম—সে সৃষ্টিকর্তা। যেটাকে বলা যেতে পারে কৃত্রিম সেটা থেকে তার স্বভাবেরই প্রমাণ হয়।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পাষাণ-প্রকৃতির উপরে মাটির স্তরের আবরণ প্রকাশ করেছে নানা বর্ণের নানা রসের ফুল ফল ফসল। এই স্তরে সে যে বিচিত্র রূপ নিয়েছে তা সর্বজনের। বসন্তে গিয়েছি চীনদেশে, বহু সমুদ্র পার হয়ে গেছি দক্ষিণ-আমেরিকায়। প্রত্যেক জায়গায় ফুলফলপল্লবের আছে কিছু প্রভেদ, কিন্তু তার উপরে আছে সৌন্দর্যের সর্বজনীনতা। যেখানেই গেলুম বিশ্ব-প্রকৃতিতে নানা আকারে একটা চিরপরিচয় দেখা দিল। সেটাই তার আবরণে। মানুষের মধ্যেও তাই, আতিথ্যের রূপভেদ, কিন্তু সমস্তটার মধ্যে যেখানে আছে সৌজন্যের সর্বজনীনতা সেখানে বিদেশের মধ্যেও স্বদেশকে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য সৌজন্যের এই আবরণ মানুষের আপন সৃষ্টি, এইখানেই আমরা সকলে মিলি, এই আবরণের মধ্য দিয়েই দূরকে কাছে পাওয়া যায়।

বালক-বয়সেই ইংরেজি সাহিত্যের আঙিনায় যাওয়া-আসা শুরু করেছি। ভাষার আভিধানিক বেড়াটা যেমনি পার হয়েছি অমনি ওখানকার ফলের বাগান থেকে ফল পাড়বার আনন্দে বেলা কেটেছে। যেটুকু বাধা পেয়েছি তাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি বরঞ্চ ঔৎসুক্য বাড়িয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের পথে এই যে সর্ব-জনীনতার আহ্বান পেয়েছিলুম একে সমতলতা বললে অসংগত হবে। এর মধ্যে বাঁকচোর উঁচুনিচু যথেষ্ট ছিল। লেখকদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্যের অভাব ছিল না। কিন্তু রূঢ়ভাবে কোনো দেউড়ি থেকে কোনো দ্বারী ঠেকিয়ে রাখে নি।

সেদিন গেল, এখন নতুন যুগ এসেছে। যে সাহিত্যে চলাফেরা অভ্যস্ত ছিল সেখানে হঠাৎ দেখি রাস্তা খুঁজে পাই নে। আমি বিদেশী ব'লেই যে আমাকে এই রকম ধাঁধাঁ লাগিয়েছে তা নয়, আমার কোনো কোনো ইংরেজ বন্ধুকেও জিজ্ঞাসা ক'রে খবর পেয়েছি তাঁদের পক্ষেও এই আধুনিক কাব্য সহজবোধ্য নয়।

একটা কথা কানে এল, এখনকার কবিতা অবচেতন-তত্ত্বে-পাওয়া কবিতা। অবচেতন মনের লীলা খাপছাড়া অসংলগ্ন। অর্থের সংগতি ঘটায় যে মন সে সেখানে অনেকখানি ছুটি নিয়েছে। এই অর্থের সংগতিতেই আনে সর্বজনীনতা, যেখানে এই সংগতিসূত্র ছিঁড়ে গেছে সেখানে প্রত্যেক মানুষের মন আপন প্রাইভেট পথের পাগ্‌লা পথিক। এখানকার রাস্তাঘাট নিয়ে গোলমাল ঠেকবার কথা।

অথচ আর্ট যেহেতু সায়ান্স নয় সেই জন্যে তার মর্ম-কথাটার স্বাতন্ত্র্য ঐকান্তিক। তার থেকে আনন্দ পেতে হলে অত্যন্ত বিশেষ করে তার আপন দেউড়িতেই যেতে হবে। সায়ান্সের মতো কোনো সাধারণতত্ত্ব তার তত্ত্ব নয়।

কবি কিংবা আর্টিস্টের এই স্বাতন্ত্র্য, যাকে ইংরেজিতে বলে uniqueness, এর গভীর ভিত্তি অবচেতন মনে তাতে সন্দেহ নেই। ভিত্তি হতে পারে কিন্তু সমস্তটাই যদি নিছক অবচেতনার কীর্তি হয় তাহলে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না।

অবশ্য স্বপ্ন জিনিসটা যে একেবারে ধোঁওয়া, তা নয়, প্লাবনের মাঝে মাঝে এক-এক টুকরো খাপছাড়া ডাঙা উঠে পড়ে। সেই সব অপ্রত্যাশিত দৃশ্য মনকে বিশেষ-ভাবে টানে তার একটা প্রমাণ ছেলে ভোলাবার ছড়া। অনেক চেষ্টাকৃত সাহিত্যের আয়ু পেরিয়ে সেগুলো আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে। তারা সব অদ্ভুত স্বপ্নের বানানো কিন্তু রস আছে তাদের মধ্যে, নইলে মানবশিশু ভোলে কী নিয়ে।

খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলা বেঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে,
খোকা বলে পাখিটি কোন্ বিলে চরে,
খোকা ব'লে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।

এ স্বপ্নরূপ বানানো সহজ নয়। সব অসম্ভব ছবি, কিন্তু ছবি। বোধ করি অসম্ভব ব'লেই উজ্জ্বল হয়ে চোখে ঝলক মারে—অর্থসংগতির দরকার নেই। পাখি হয়ে খোকা বিলে চরে বেড়াচ্ছে, তার মাছ ধরবার অন্যায় বাধা ঘটাচ্ছে ছুটো প্রাণী—চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এইটেতেই ওর রস।

এই অবচেতনী কল্পনার অসংলগ্নতার আঙ্গিক কাব্যে ব্যবহার করা চলতে পারে যদি ঠিকমতো তার ব্যবহার হয়। যদি এই প্রণালীতে বিশেষ একটা ছবি ফুটে ওঠে, বিশেষ একটা রস জাগে মনে। কাব্যের সেই বিশেষত্বকে উপেক্ষা করা চলবে না।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব প্রচার হওয়ার পর পাশ্চাত্য জগতে অবচেতনের যেন একটা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। সাহিত্যে এর বেগ আর রোধ করা যায় না। এই অপ্রকাশ ভূগর্ভের জিনিসকে নানারকম প্রকাশের ব্যবহারে লাগানো চলছে। ইতিপূর্বে কাব্যে অবচেতনী কল্পনার প্রভাব ছিল না যে তা নয় কিন্তু সে ছিল যেন নেপথ্য থেকে। এখন সে এসেছে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে। আধুনিক সাহিত্যে ও আর্টে তার এই প্রকাশ্যতার বিশেষ একটা কাজ বিশেষ একটা দান আছে ব'লে ধরে নিতে হবে নইলে বলতে হবে তার আবির্ভাব একটা উপদ্রব; বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে এত বড়ো একটা অভিযোগ আনতে সাহস হয় না।

বর্তমান সাহিত্যে আমার অনভিজ্ঞতা আমি কবুল করি। তাই আমি খুঁজি এমন কোনো পথচারীকে যিনি এ পথের পথিকদের ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, আধুনিক সাহিত্যে যাঁর পরিচয় বই-পড়া পরিচয় নয়, যিনি কাছের থেকে নবীন কবিদের মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছেন। সভ্যসৃষ্টির শিল্পবিকাশের আবহাওয়ায় যাঁর চিত্তে আপন মজ্জার ভিতর থেকে প্রকাশের চেষ্টা সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কাছ থেকে এই নতুন ঋতুর ফুল-ফসলের সত্য খবর পাবার আশা করা যায়। অর্থাৎ এটা জানা চাই তাঁর মধ্যে যে প্রভাব এসেছে সেটা অব্যবহিত, সেটা দূরের থেকে নকলের উত্তম নয়।

অমিয় চক্রবর্তীর "খসড়া" এবং "এক মুঠো" বই ছুটি পড়তে বসেছি এই বিশ্বাস মনে নিয়ে। ইংলণ্ডে যাঁরা এই নূতন সাহিত্যের কর্ণধার অমিয় আজ অনেক দিন ধ'রে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পেয়ে এসেছেন। নূতন কালের কোন্ প্রেরণা কোন্ বেদনা এই সব কবিদের সৃষ্টিকে প্রাণবান করেছে কাছে থেকে তিনি তা জেনেছেন, এবং তার প্রবর্তনা তাঁর নিজের মনের মধ্যে এসে কাজ করেছে। এই প্রবর্তনায় যদি তাঁকে রচনার ক্ষেত্রে নিয়ে আসে তবে সে তাঁকে কেবল বাইরের আঙ্গিক গড়িয়ে ছাড়বে না, তাঁর ভিতরের কথা এই রূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবে। এই জন্যে আর্টের যে বিকাশ আমার অপরিচিত তাঁর কবিতার মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অনুসরণ করেছি।

কিছুকাল আগে আমি যখন মংপু পাহাড়ে ছিলুম, অমিয়র "চেতন স্যাকরা" কবিতাটি হঠাৎ আমার চোখে পড়ল। আমার দৃষ্টিশক্তি এখন ক্ষীণ এবং শরীর ক্লান্ত এই জন্যে ধারাবাহিক বই পড়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে। তাই পথচল্তি পথিকের খাপছাড়া দৃষ্টিতে আমার কাছে নূতন অভিজ্ঞতার বিষয় বিচিত্র স্বাদ এনে দেয় অকস্মাৎ। এ অবস্থায় টুকরো থেকে সমগ্রের পরিচয় আমাকে নিতে হয়—খুব যে ভুল করি তা বোধ হয় না।

এই কবিতাটি পড়ে অমিয়কে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটা এখানে উদ্ধৃত করলে আমার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হবে।

"তোমার এই লেখাটি আধুনিক কাব্যের একটি সেরা নিদর্শনরূপে দেখা দিয়েছে। কবিতা রচনায় যথেচ্ছ শৈথিল্যের ভঙ্গীতে যাকে সহজ দেখতে হয় সে আবর্জনা, কিন্তু যথার্থ যা সহজ তাই দুঃসাধ্য। তোমার এই লেখায় সেই দুরূহ সহজ আপন অনায়াসের প্রতীতি নিয়ে দেখা দিয়েছে।

পাহাড়ে আছি তাই একটা পার্বত্য তুলনা মাথায় আসছে। দূরে গিরিশিখরের নীলিমার আভাস থেকে দেখা যাচ্ছে শুভ্র রেখায় নির্ঝরের বিশ্বযাত্রা, সে স্বচ্ছ, সে নির্মল, সূক্ষ্ম আলোয় ছায়ায় রচিত তার উত্তরীয়, তার কলধ্বনি দূর থেকে কানে পৌঁছয় না, মনে পৌঁছয় তার অশ্রুত কল্লোল। এইখানে প্রতীকরূপে দেখতে পাই দূর পুরাতনকালীন আমাদের রচনার ধারা। এর যা রস তা ভোগ করেছি অনেক দিন, পরিবেষণও করেছি, একে অবজ্ঞা কোরো না। কেননা যদি রসাত্মকতাকে কাব্যের ধর্ম বলা হয় তবে এ রসেরও বিশেষত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে। তবে কিনা এইখানেই শেষ নয়। সেই ঝরনা নেমে এল নিম্নভূমিতে, অনেক কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে হ'ল নানারঙা। কত ভাঙাচোরা কত ধসে-পড়া জিনিস সে টেনে নিয়ে চলেছে ; কত আওয়াজ মিলছে তার কলস্বরে, যার সঙ্গে তার সুরের মিল নেই, হয় তো ধোবার গাধা চেঁচিয়ে উঠছে তার তীরের ডাঙায়। কোথাও বুদ্‌বুদপুঞ্জ উঠছে ফেনিয়ে, কোথাও বালি, কোথাও কাদা, কোথাও সহরের আবর্জনা, সমস্ত কিছুকে আত্মসাৎ করে তার ধারা, তার চলমান রূপ। কিছুই তাকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না, তুচ্ছতা তাকে পরিহাস করে কিন্তু প্রতিরোধ করে না। মনে ভেবে দেখলুম সৃষ্টির এই সর্বগ্রাহী লীলারূপকে কিছু কিছু যাচাই না করে নেওয়া আমার অভ্যস্ত নয়। এইটেতেই বোধ করি আমাদের সেকালের সাবধানী শুচিতা, যেটাকে তোমরা আভিজাত্যবুদ্ধির শৌখিনতা ব'লে হেসে থাকো, বলো বুর্জোয়া। তা হোক কিন্তু তুমি যে ভূতলচারিণী স্রোতস্বিনীর পরিচয় দিয়েছ তার সঙ্গে আমার দূরবিহারী নির্ঝরের কোথাও একটা মিল আছে তো। মিল নেই পাঁকে-বোজা এঁদো ডোবার সঙ্গে। কেননা সে একেবারে বোবা, একেবারে অন্ধ, প্রাণধারার নাড়ীর গতির সঙ্গে তার নিশ্চল রুগ্ন পঙ্গুতার কোনো-খানে যোগ নেই। একেই যদি আধুনিক কাব্যের চলৎস্রোতে ভাসিয়ে আনতে হয় তাহলে অপেক্ষা করতে হবে "ভরা বাদর মাহ ভাদরের"। বর্ষার প্লাবন বয়ে যাক পঙ্কপিণ্ডের উপর দিয়ে, চিংড়ি মাছের বাসাগুলোয় বিপ্লব ঘটিয়ে, পিছল ঘাটে এঁটো বাসন মাজার ঝংকারে ঝংকারে কল্লোল মিলিয়ে, উছলে-ওঠা ঢেউগুলোতে গোয়ালঘরের গোবরগাদা লেহন করে, পিঠে পিঠে মাথা রাখা মোষ-গুলোকে পঙ্কক্লিন্ন জলে অবগাহনের তৃপ্তি দিয়ে। এই সমস্ত কিছুর সঙ্গেই মিল করে থাকবে বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশ, মেঘের গর্জন, আর ঝিমঝিম বৃষ্টি। এই পেঁকো বন্যায় আকাশে ঘোলা জল ছিটিয়ে কবির ছন্দ যেন অনায়াসে নৃত্য করে উলঙ্গ শিশুর মতো। বুড়োবয়সের স্পর্ধিত নগ্নতা চীৎকার স্বরে নিজের আধুনিকতা ঘোষণা ক'রে অবিমিশ্র পঙ্কসভায় নাচতে যদি আসে তাহলে পুলিসে খবর দেওয়া দরকার হবে।"

অমিয়কে যা লিখেছি তার মোদ্দা কথাটা এই যে আমাদের সকল অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন অনেক কিছু মিশতে থাকে যাকে আমরা ইচ্ছে করে সরিয়ে রেখে দিই ; কিন্তু আমাদের অবচেতন মন তাকে গ্রহণ করে, সব জড়িয়ে নিয়েই আমাদের উপলব্ধির বাস্তবতা। আমাদের অনুভূতিতে সেই অগোচরের দান যদি ঠিকমতো ভাবে গ্রহণ করতে পারি, তার সহযোগে যদি একটা অনুভূতিকে বিশেষ রসে উদ্বোধিত করা সম্ভব হয় তাহলে কাব্যের যুগযুগান্তর নিয়ে তর্ক করার দরকার হয় না। বেশের বদল করেও যদি কাব্যই আবির্ভূত হয় তবে তাকে অভ্যর্থনা করতে কুণ্ঠিত হব না। 'ঝসড়া' বইটিতে "হাঁসপাতাল" ব'লে যে কবিতা বেরিয়েছে তার লেখার ছাঁদ একেবারেই আমাদের ধরণের নয় কিন্তু তার মধ্যে যে একটি অনুভূতির রহস্যময় ছবি দেখা দিয়েছে তাকে আদর ক'রে মেনে নিতে হবে। কেননা ঠিক এই ছবির বিশেষ রসটা অন্য কোনো ভঙ্গীর মধ্যে প্রকাশ পেতে পারত না।

"ঘুম" ব'লে একটা কবিতা দেখলুম। যে বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন ক'রে তার অনুভূতি সে আমার কাছে অত্যন্ত নতুন ব'লে ঠেকল। বিশ্বকে কবি বিরাট ঘুমের ভূমিকায় দেখছেন। কালের প্রাঙ্গণে নিখিলের চলাফেরা হচ্ছে কিন্তু তার চৈতন্য নেই। সে যেন একটা চলনশীল ঘুমের মতো। মনে প্রশ্ন ওঠে ঘুম ভাঙবে যখন তখন থাকবে কী। প্রলয় কি রূপহীন গতিহীন শুভ্র শূন্যতা?

ভালোমন্দর ভেদহারা একটা নিঃশব্দ না, যার কোথাও কোনো জবাবদিহি নেই? মহানিদ্রাসাগরের মধ্যে অসংখ্য রূপের যে সব আবর্তন দেখা যায় তারা যাচ্ছে তলিয়ে এই ঘুমের অচেতন তলায়। এদিকে অমরতার নানা উপাধি, যা ঘুমের চেয়ে সত্য নয়—উঠছে মেলাচ্ছে লোকালয়ে লোকালয়ে, ইতিহাসের পাতায় পাতায়, যে পাতা কীটে কাটছে নিমেষে নিমেষে। উপাধি মাথায় নিয়ে চলেছেন কেউ বা মানুষ-খুন-করা অমর নামধারী, কেউ বা ছড়া-বানানো অমর, কোনো রূপসী মুগ্ধ মনের বিহ্বলতার অমরী। অকূল ঘুমের তরঙ্গ দোলায় দুলতে দুলতে হাসছেন মহাকাল, এই সব ভাসমান ফেনাগুলোর উদ্গত অহমিকার দিকে তাকিয়ে। "ঘুম" কবিতা থেকে আমি যা বুঝলুম সেটাই একমাত্র অর্থ কি না জানি নে—কেননা অর্থস্পষ্টতার প্রতি কবির মমতা নেই। এই কবিতাগুলি পড়লে ছায়াপথের সঙ্গে তুলনা মনে আসে, এখানে স্পষ্ট এবং অস্পষ্টের মেলা বসে গেছে। যেখানে অস্পষ্টতার আবরণ সুন্দরীর ঘোমটার মতো বিশেষ রস প্রকাশের সহায়তা করে সেখানে তাকে কবিত্বের খাতিরে মেনে নিতে পারি' কিন্তু যেখানে বাণী তার চেয়ে দুর্গমতায় পৌঁছেছে সেখানে মার্জনা করতে পারব না। কেননা যে বচন একেবারেই বোধগম্যতার বাইরে সেখানে যিনি বলছেন তিনিই একমাত্র বক্তা এবং তিনিই একমাত্র শ্রোতা, সাহিত্যের সর্বজনীন সভায় তাঁর স্থান নেই। এর মধ্যে সংকটের কথা এই যে বোধগম্যতার রাস্তা আমার কাছে বন্ধ ব'লেই যে অন্যের কাছেও বন্ধ তার নিশ্চয়তা নেই। সাহিত্যের এই রহস্য চিরদিনই রহস্য থেকে যাবে—এই তর্কের মধ্যে আমরা সকলেই চলে এসেছি, আঘাত পেয়েছি আঘাত করেছি।

বসন্ত আসবে আসবে করছে, বাতাসে শীতের আমেজ আছে। সামনে সকাল বেলার কাঁচা-সোনা-রঙের রৌদ্রে পাণ্ডুবর্ণ আকাশের গায়ে য়ুকলিপ্টসের ঝালর-দোলানো পাতাগুলো ঝিলমিল ক'রে উঠছে। এরি মধ্যে মধ্যে পাখির কিচিমিচি। টবে অনেক দিনের প্রত্যাশিত বেগনি রঙের ক্যামেলিয়া এইবার ফুটে উঠল ব'লে। বাঁধানো চৌবাচ্চায় জলের ধারে সোনালি মাছের খবর নিতে এসেছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে বক। এই সমস্ত নিয়ে এক নিরবচ্ছিন্ন প্যাটার্নে সাজিয়ে তোলা আমার সকাল বেলা। এই ফর্দ থেকে ঐক্যবিলাসী মন কতই কী কী অবান্তরকে বাদ দিয়েছে একটু ভেবে দেখলে তার দিশে পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ ধ'রে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছিল গোরুর গাড়ির, অবশেষে কাছাকাছি এসে হুড়মুড় করে ঢেলে দিলে এক বোঝা ইট। বাগানের ওপারে আধখানা তৈরি পাঁচিল। যতক্ষণ মন ছিল বাগান উপভোগে, ততক্ষণ এটা একেবারে খেয়ালের মধ্যেই আসে নি। তারপরে বেস্পতিবারে হাটে যাবার পথে মাছওয়ালা একটা বড়ো টুকরো রুইমাছ এনেছে ঝুড়িতে, হাত নেড়ে বললুম দরকার নেই। আমার বাগানঘেরা সকালবেলাতে এ কোনো চিহ্নই দিল না। ঝাঁট দিতে এসেছিল মেথর কাঁকরের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে, কখন এল কখন গেল সেটা ঠাহরের মধ্যে নেই। হঠাৎ এক সময়ে মনে হ'ল মধুপুর যেতে হ'ল মোটরে আসানসোল পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি ধরাই সুবিধে। এরি মধ্যে নেপথ্যবাসী মন বলে উঠছে, হালসিফি, ফরওয়ার্ড ব্লক, চেম্বরলেনের ছাতা। এক মুহূর্তের জন্যে চোখে পড়ল একটা কাক রান্নাঘরের আঁস্তাকুড় থেকে একটা কী আমিষের আবর্জনা নিয়ে জামগাছের ডালে বসে চঞ্চু দিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করছে। তার পরেই চোখ ফিরল টবের দিকে, দেখলুম আরো দুটো কুঁড়ি ধরেছে ক্যামেলিয়ার ডালে। এই সকাল বেলার ছবিতে আপন স্বভাব অনুসারে আমার সচেতন মন অনেক কিছু বাদ দিয়ে আলপনা কেটেছে। অবচেতন মন যা-তা আঁকজোক পাড়ে কিন্তু রেখা-রঙের সমন্বয় ক'রে ছবি আঁকে না। হাল আমলের কবি হয়তো পণ করেন আঁকজোক কিছুই বাদ দেব না, তাতে যেখানে সেখানে নানা আঁচড়ে ছবির ঐক্যকে যদি অস্পষ্ট করে দেয় সেও স্বীকার। এটা খানিকটা বিজ্ঞানী বুদ্ধি। বিজ্ঞান আর্টের মতো শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়—যা কিছু আছে তাদের সমান দাম দিয়ে মেনে নেবার দিকে তার ঝোঁক। আর্টের মধ্যে আছে সম্ভোগের দাবি, আর সায়ান্স সব কিছুকে নির্বিচারে টেনে আনে। আধুনিক যুগের প্রকাশতত্ত্বে আছে এই

ছন্দের মিল। তার নমুনা এই ছুটি বইয়ের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়। একটি যেমন "সংসার" কবিতায়; বহু টুকরো নিয়ে এর মধ্যে যে একটা গুচ্ছ বেঁধেছে, তার মধ্যে ভাবনা বেদনা স্মৃতি জড়িয়ে গেছে যেমন তেমন ভঙ্গীতে। সাবধানতা নেই কিন্তু একটা মর্মকথা আছে। এর এই অসাবধান নৈপুণ্যে আঁজলা ভরে ওঠে অনেক কিছুতে। ওর পরের কবিতার নাম "আরোগ্য," কত সহজ, ছোটো কয়েকটা টুকরোয় কী রকম অনলংকৃত সম্পূর্ণতা। "দরজা" কবিতা পড়ে দেখবার মতো। একটুখানি মনে পড়ে আমার নিজের কবিতা "স্বপ্ন," সেই জন্যেই এর স্বাতন্ত্র্য এমন প্রবল ক'রে মনে লাগে, এ আরেক যুগের ভাষা, আরেক যুগের দৃষ্টি। এ সদর রাস্তার ধূলিধূসর কবিতা, এ পরিচ্ছন্ন সভাগৃহের নয় পড়ে দেখো খসড়ায় "চায়ের বেলা"। ছেঁড়া সুতোর শিল্প। দেখো "পুষ্পদৃষ্টি," বিজ্ঞানের রোমান্স, ধরা পড়েছে কয়েকটি সহজ লাইনে, বকুনির অংশ অত্যন্ত অল্প। "যৌগিক" কবিতায় বিপুল বিচিত্র মাটির উপর চারদিকে জড় ও জীবনের মেলামেশায় যে আওড় লেগেছে ছু-চারটে হালকা কথায় তার ছবি ফুটেছে, এই স্বল্পবাক্ বিশেষত্বেই এর রস। কালো জলে পরিচিত বন্দরের দিকে জাহাজ ভেসে চলেছে কেমন তার একটা ইঙ্গিত। সমুদ্রের নীল কারখানা, লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চাকা উঠছে পড়ছে, পৃথিবীকে বানিয়ে তোলবার মজুরি চলছে দিন-রাত্রি, এ বিরাট কলের ধোঁওয়া নেই, আগুন আছে চাপা, ডাইনামো চোখে পড়ে না,—জাহাজের মালেক প্রকৃতির কারখানা-ঘর থেকে নিরুদ্ধ বেগ চুরি করে এনে তার বাঁধন খুলছে নিজের প্রয়োজনে। স্বার্থে স্বার্থে লেগে যাচ্ছে মাতামাতি। কবি দেশবিদেশের দিগন্তের হাতছানি দেখে এসেছেন, কেবলমাত্র কলকাতা শহরের গলি-ঘুঁজির নয়। দরকার নেই তার গেঁয়ো রসের গাজিয়ে ওঠা তাড়ি জোগাবার।

আরো অনেক কিছু নির্দেশ করবার আছে। সময় নেই, জায়গা নেই। আমার সম্পর্কীয় একটা অপবাদ শুনেছি যে আমার নিজের ছাঁদের কবিতা ব্যূহ বেঁধে আছে বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে। তারি বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অসহিষ্ণুতা প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। সেই বিদ্রোহ জয়ী হোক এ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। তাই আমি আনন্দ পেয়েছি অমিয়চন্দ্রের কাব্যে তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে। এই স্বাতন্ত্র্য সংকীর্ণ পরিধি নিয়ে নয়। এ নয় কেবল যৌন রসভোগের উদ্বেলতা,' এ নয় আঙ্গিকের বিস্ফোরণে ভাষাকে উলটপালট ক'রে দেওয়া। অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম রহস্য আছে এর মধ্যে,—বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে আছে এর সঞ্চরণ।



কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩

শীত-জর্জ্জর শেষ-হেমন্তের প্রভাতটি কুয়াশায় ও ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চরটার কিছুই দেখা যায় না। শেষরাত্রি হইতেই গাঢ় কুয়াশা আসিয়াছে। তাহার উপর লক্ষ লক্ষ ইট পুড়িতেছে—সেই সব ভাটার ধোঁয়া ঘন বায়ুস্তরের চাপে অবনমিত হইয়া সাদা কুয়াশার মধ্যেই কালো কুণ্ডলী পাকাইয়া বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। বিপুল-বিস্তার দুধে-ধোঁয়া পাতলা একখানি চাদরের উপর কে যেন খানিকটা কালি ফেলিয়া দিয়াছে। তীক্ষ্ণ শীতল কুয়াশার কণাগুলি মানুষের মুখে, চোখের পাতায়, চুলের উপর আসিয়া লাগিতেছে, তাহার সঙ্গে কয়লার গন্ধ এবং কয়লার কুচি।

ইহার মধ্যেই বিমলবাবু, কলিকাতার কলওয়ালা মহাজন, চরের উপর একটি বাংলো তৈয়ারী করিয়া বাসা গাড়িয়া বসিয়াছেন। কল-তৈয়ারী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাজ খুব দ্রুতবেগে চলিতেছে। এখানকার লোকে কাজের গতি দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া পড়িয়াছে। এমন ধারা দ্রুতগতিতে যে কাজ হইতে পারে এ ধারণাই তাহারা করিতে পারে না। এ যেন বিশ্বকর্ম্মার কাণ্ড,—এক রাত্রে প্রান্তরের উপর প্রকাণ্ড নগর গড়িয়া ওঠার মত ব্যাপার!

বিমলবাবু বাংলোর বারান্দায় একখানা ইজি-চেয়ারের উপর বসিয়া চা পান করিতেছিলেন এবং কুয়াশার দিকে চাহিয়া ছিলেন। কুয়াশার মধ্যে কোথা হইতে বাষ্পের জোরে বাজানো বয়লারের বাঁশী ভোঁ-ভোঁ শব্দে বাজিয়া উঠিল। একটা ভার্টিকাল বয়লারও ইহার মধ্যেই বসানো হইয়াছে; বয়লারের জোরে নদীর গর্ভে একটা পাম্প চালাইতেছে। সেই জল হইতে ইট তৈয়ারীর কাজে এবং বাড়ী-তৈয়ারী কাজে প্রয়োজন মত জল সরবরাহ হইতেছে। পাইপ বিমলবাবুর বাংলোর চলিয়া আসিয়াছে, এবং প্রয়োজনমত এখানে ওখানে কলের মুখ লাগাইয়া যখন যেখানে ইচ্ছা জল লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাংলোর সম্মুখেই একটা পাকা ইন্দারাও হইয়া গিয়াছে। ইন্দারার চারি পাশে বাগানে নানা রকমের মরসুমী ফুল ও তরিতরকারি গাছ। বারান্দার ধারেই একটা জলের কলের মুখ—সেখানে একটি প্রশস্ত সান-বাঁধানো চাতাল ও একটি চৌবাচ্চা। সেই চাতালে বসিয়া সারী, সাঁওতালদের সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি, বসিয়া বাসন মাজিতেছে। বিমলবাবুর বাসায় সারী ঝিয়ের কাজ করে। কুয়াশা এত ঘন যে বিমলবাবু সারীকেও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। মনে হয় কুয়াশার একটা পুঞ্জ যেন ওখানে জমিয়া আছে। এই কুয়াশার মধ্যে কোথাও শূন্যমার্গে অবিরাম কর্ণির ও ইটের ঠুং ঠাং শব্দ উঠিতেছে। আর উঠিতেছে লোহার উপর লোহার প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ—চারি দিকের মুক্ত প্রান্তর বাহিয়া শব্দটা সন্‌সন্‌ শব্দে ছুটিয়া চলিয়া দিগন্তে বিপুল শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা ধীরে ধীরে কাটিতেছিল। কয়লার ধোঁয়া মাটির বুক হইতে শূন্য মণ্ডলে ভাসিতে আরম্ভ করিল। বিমলবাবু সারীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন, সারীর মাথায় মরসুমী ফুলের সারি, ইহারই মধ্যে সে কখন ফুল তুলিয়া চুলে পরিয়াছে। বিমলবাবু রাগের ছলনা করিয়া বলিলেন—আবার তুই ফুল তুলেছিস?

সারী শঙ্কিত মুখে বিমলবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সারীর মত উচ্ছল চঞ্চল বর্ব্বরাও বিমলবাবুকে ভয় করে,—অজগরের মুখের অদূরবর্ত্তী জীবের মত যেন অসাড় হইয়া যায়। এই চর ব্যাপিয়া বিপুল এবং অতিকায় কর্ম্মসমাবেশের সমগ্রটাই যেন বিমলবাবুর কায়ার

ধৃত,' মানুষের দেহ লইয়া তিনি যেন তাহার জীবাত্মা। তাঁহার সম্পদ, কর্মক্ষমতা, গাম্ভীর্য্য, তৎপরতা—সব লইয়া বিমলবাবুর একটা ভয়াল রূপ তাহারা মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করে। এবং ভয়ে স্তব্ধ হইয়া যায়।

সারীর ভয় দেখিয়া বিমলবাবু একটু হাসিলেন, তার পর পাশের টিপয়ের ফুলদানি হইতে এক গোছা মরসুমী ফুল লইয়া সারীকে ছুড়িয়া মারিলেন, বলিলেন—এই নে!

সারী ফুলের গোছাটি কুড়াইয়া লইয়া শঙ্কার সহিতই একটু হাসিল, তার পর বলিল—সেই কাপড়, তুমি কিনে দিবি না?

—দেব, দেব।

—কোবে দিবি গো?

—আচ্ছা আজই দেব। তুই এখন ভিতরে গিয়ে সব পরিষ্কার ক'রে ফেল; ছুই সরকার-বাবু আসছে!

কুয়াসা এখন প্রায় কাটিয়া আসিয়াছে; বাংলোর মুখ হইতে সোজা একটা পাকা প্রশস্ত রাস্তা কারখানার দিকে সোজা চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া আসিতেছিল শূলপাণি রায়—রায়-বংশের সেই গঞ্জিকাসেবী উগ্রমেজাজী লোকটি। শূলপাণির সঙ্গে জন দুয়েক চাপরাসী; শূলপাণি আস্ফালন করিতেছিল প্রচুর। শূলপাণিই বিমলবাবুর সরকারবাবু। তাহার উগ্র মেজাজ ও বিক্রম দেখিয়া তিনি তাহাকে 'লেবার-সুপারভাইজার'—বাংলা মতে কুলী-সরকারবাবু নিযুক্ত করিয়াছেন। শূলপাণি কুলীদের হাজরি রাখে, তাহাদের খাটায়, শাসন করে; মাসিক বেতন বারো টাকা।

শুধু শূলপাণিই নয়, রায়হাটের অনেকে এখানে চাকরি পাইয়াছে। ইন্দ্র রায় বিমলবাবুর কৌশল দেখিয়া হাসিয়াছিলেন, মুগ্ধ হইয়া হাসিয়াছিলেন। মামলা-মোকদ্দমার সমস্ত সম্ভাবনা চাকরির খাঁচায় বন্ধ করিয়া ফেলিলেন এই বিচক্ষণ ব্যবসায়ীটি। মজুমদার এখন বিমলবাবুর ম্যানেজার, অচিন্ত্যবাবু অ্যাকাউন্ট্যান্ট, হরিশ রায় গোমস্তা। আরও কয় জন রায়-বংশীয় এখানে কাজ পাইয়াছে। ইন্দ্র রায়ের নায়েব ঘোষের ছেলেও এখানে কাজ করিতেছিল—ইন্দ্র রায় নিজেই তাহার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি বিমলবাবু দুঃখের সহিত তাহাকে নোটিশ দিয়াছেন, কাজ তাহার সন্তোষজনক হইতেছে না।

শূলপাণি চীৎকার করিতে করিতেই আসিতেছিল;—হারামজাদা, বেটারা, সব শূয়ারকি বাচ্চা—

বিমলবাবুর কপালে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন—আস্তে। তারা তো এখানে কেউ নেই!

শূলপাণি অর্দ্ধদমিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে না। ঐ বেটা সাঁওতালরা—

—হ্যাঁ। কিন্তু হয়েছে কি? ব্যাপারটা কি? আস্তে আস্তে বল।

শূলপাণি এবার সম্পূর্ণ দমিয়া গিয়া অনুযোগের সুরে বলিল—আজ্ঞে কেউ আসে নি আজ।

—আসে নি?

—আজ্ঞে না।

—হুঁ। বিমলবাবুর কপাল আবার কুঁচকাইয়া উঠিল।

শূলপাণি উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল—হুকুম দেন, গলায় গামছা দিয়ে ধরে আনুক সব!

বিমলবাবু মুখ বাঁকাইয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন—রায়-সাহেব, এটা তোমার পৈত্রিক জমিদারী নয়। এটা হ'ল ব্যবসা। এতে গলায় গামছা চলবে না। না এসেছে, নেই। কাজ আজ বন্ধ থাক। বিকেল বেলা সব ডাকবে এখানে, আমার কাছে। এক বার শ্রীবাস দোকানীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে, জরুরী দরকার। আর হ্যাঁ—কাল রাত্রে লোহাগুলো সব এসে পৌঁছেছে?

—আজ্ঞে না। এখনও দু-বার লরী যাবে তবে শেষ হবে। লরী তো জোরে যেতে পারছে না! ইষ্টিশানের রাস্তায় ধুলো হয়েছে এক হাঁটু আর মাঝে মাঝে এমন গর্ত্ত—

—মেরামত করাও; নিজেদের লোক দিয়ে জলদি মেরামত ক'রে নাও। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মুখ চেয়ে থাকলে চলবে না। তাদের সেই বছরে একবার মেরামত—তাও কবিলুটের মত মাটি কাঁকর ছিটিয়ে দিয়ে। লরী যখন ষ্টেশন যাবে তখন ইটের কুচি বোঝাই দিয়ে দাও। যেখানে যেখানে গড়কা পড়েছে, ঢেলে দিক সেখানে।

তার পর কয়েক লরী কাঁকর দিয়ে মেরামত করাও। বুঝলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, যাও তুমি এখন।

শূলপাণি একটি নমস্কার করিয়া শান্তশিষ্ট ব্যক্তির মতই চলিয়া গেল। তাহার মত পত্রিকাসেবীর আজন্ম-অভ্যস্ত উগ্র মেজাজের কড়া তারও কেমন করিয়া বিমলবাবুর সম্মুখে শিথিল মৃদু হইয়া যায়। আসে সে আস্ফালন করিতে করিতে কিন্তু যায় সে দম-দেওয়া যান্ত্রিক পুতুল-মানুষের মত।

বিমলবাবু ডাকিলেন—সারী !

সারী আসিয়া নীরবে চকিত দৃষ্টি তুলিয়া দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ আলোকে দেখা যায় সারীর নিটোল স্বাস্থ্যভরা দীর্ঘ দেহখানি আর সে তৈলাক্ত অতি-মসৃণতায় প্রসাধিত নয়, রুক্ষ প্রসাধনের একটি ধূসর দীপ্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুপরিস্ফুট। পরনে আর তাহার সাঁওতালী মোটা শাড়ী নাই—একখানা ফুলপাড় মিলের শাড়ী সে পরিয়া আছে। বর্ব্বর আদিম জাতির দেহে অপরিচ্ছন্নতার একটা কদর্য্য গন্ধ থাকে—কিন্তু সারী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেও সে গন্ধ আর পাওয়া গেল না।

বিমলবাবু বলিলেন—আবার সব তোদের পাড়ার লোকে গোলমাল করছে নাকি ?

সারী শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিল—আমি ত্রি জানি না গো ! উয়ারা তো বললে না আমাকে !

—তবে সব খাটতে এল না যে ?

সারীর মুখে এবার সঙ্কুচিত একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল, আশ্বস্ত কণ্ঠে সে বলিল—কাল আমাদের জমিদারবাবু—উই যি রাঙাবাবু—উয়ার শশুর হবে যি—ওই রায়বাবু সিপাই পাঠালে যি। বললে—জমিগুলা চষতে হোবে, কলাই বুনবে, সরষা বুনবে, আলু লাগাবে, আর ধানগুলা কাটতে হোবে'!

বিমলবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—আপন মনেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—ড্রোনস অফ দি কাণ্ট্রি ! ইডিয়টস ! দি জ্যামিণ্ডারস !

সারী শঙ্কিত হইয়া উঠিল—শঙ্কায় ছায়া, তাহার কালো মুখের সাদা চোখ দুটিতে রাত্রির আকাশের চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়ার মত ঘনাইয়া আসিল। বিমলবাবু কি বলিলেন সে যে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না ! তবু ভাল যে সম্মুখে এখন 'হাঁড়িয়া'র বোতলটা নাই !

বিমলবাবু বলিলেন—সকলে তো চাষ করে না, তারা এল না কেন ?

—উয়াদিগে ধান কাটাতে লাগালে ! সারীর কণ্ঠস্বর ভীত শিশুর মত।

—ধান কাটতে লাগালে ? পয়সা দেবে, না দেবে না ?

—না। বেগার লিলে। উয়ারা যি জমিদার বটে—রাজা বটে।

—হুঁ ! বিমলবাবু গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর উঠিয়া মোটা চেস্টারফিল্ড কোটটা গায়ে দিয়া বলিলেন—ছড়িটা নিয়ে আয়।

সারী তাড়াতাড়ি ছড়িটা আনিয়া বিমলবাবুর হাতে দিল, বিমলবাবু এবার প্রসন্ন হাসি হাসিয়া সারীর কপালে আঙুলের একটি টোকা দিয়া ক্ষিপ্রপদে রাস্তার উপর নামিয়া পড়িলেন।

কুয়াশা কাটিয়া এখন রৌদ্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। চরখানাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে আকাশলোকের দিকে উদ্ধত ভঙ্গিমায় উন্নত একটা অর্দ্ধসমাপ্ত ইটের গড়া চিম্‌নী। সেইখানেই ঠুং ঠাং কর্ণির শব্দ উঠিতেছে। ওদিকে আরও একখানা সুসমাপ্ত বাংলো। ওটা আপিস-ঘর। একটা লোহার ফ্রেমে গড়া আচ্ছাদনহীন শেড।

এতক্ষণে সারীর মুখখানি ঈষৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল; বিমলবাবু খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলে সে স্বচ্ছন্দ সহজ হইয়া জলসিক্ত অঙ্কুরের মত জাগিয়া উঠিল। গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে সে কাজ আরম্ভ করিল, নিজেদের ভাষায় গান—

"উঃ বাবা গো—এই জঙ্গলের ভিতর কি আঁধার আর কত গাছ ! এখানে সাপও চলিতে পারে না ! এই জঙ্গলের বাদেই নাকি 'রামেচারের' সেই সূর্য্যঠাকুরের শোবার ঘর পর্য্যন্ত লম্বা ডাঙা—সেখানে বসতি নাই—

পাখী নাই! তুমি আমাকে এখানে ফেলে যেয়ো না— ওগো ভালবাসার লোক!"

সারী এখন বিমলবাবুর বাংলোয় কাজ করে, এই-খানেই সে বাসও করিতেছে। কয়টা মাসের মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে অনেক।

বিমলবাবু এখানে আসার কিছু দিনের মধ্যেই সারী অনুভব করিল—অজগরের অদূরস্থ শিকারের যেমন সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া যায়, সেও যেন তেমনি অবশ হইয়া যাইতেছে! চীৎকার করিয়া আপন জনকে ডাকিয়া সাহায্য চাহিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার হইল না। সম্পদ, গাম্ভীর্য্য, কর্ম্মক্ষমতা, প্রভুত্ববিস্তারের শক্তি, তৎপরতা প্রভৃতি বিচিত্র ছাপে চিত্রিত সুদীর্ঘকায় অজগরের মতই ভয়াল বিমলবাবু! অজগরের মুখের মধ্যে সারী অচেতন পশুর মত ধরা পড়িল। তাঁহার কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে কাহারও প্রতিবাদ করিবার সাহসও হইল না। আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়া গেল—সাঁওতাল-পল্লীর সকলেই এক দিক হইয়া সর্দ্দার কমল মাঝি ও সারীর স্বামীকে একঘরে করিল; অথচ তাহারাই রহিল বিমলবাবুর একান্ত অনুগত। কিছুদিনের মধ্যেই সারীই নিজে পঞ্চ জনের কাছে 'সাকমচারী'র—অর্থাৎ বিবাহচ্ছেদের প্রার্থনা করিল। সামাজিক আইনমত তাহারই জরিমানা দিবার নিয়ম; চাহিবার পূর্ব্বেই সে এক শত টাকা 'পঞ্চে'র সম্মুখে নামাইয়া দিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই এক দিন সকালে দেখা গেল—বুড়া কমল মাঝি, তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী এবং সারীর স্বামী রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সাঁওতাল-পাড়ার সর্দ্দার এখন চূড়া মাঝি—সেই কাঠের পুতুলের ওস্তাদ। সর্দ্দার মাঝির জমি শ্রীবাস পাল দখল করিতেছে, তাহার নাকি বন্ধকী দলিল আছে।

সারী এখন বিমলবাবুর বাংলোয় কাজ করে, বাংলোর সীমানার মধ্যেই আউট-হাউসে থাকে। বেশভূষার প্রাচুর্য্য দেখিয়া সারীর সখীরা বিস্মিত হইয়া যায়।

এক-এক দিন দেখা যায় গভীর রাত্রে সারী ভয়ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইতেছে, তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছেন বিমলবাবু, হাতে একটা হাণ্টার!

গান গাহিতে গাহিতে সারী কাজ করিতেছিল; ঘরের দেওয়ালের গায়ে টাঙানো প্রকাণ্ড আয়নাটার কাছে আসিয়া সে কাজ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। চুলটা এক ধার ঠিক করিয়া লইল, এক বার হাসিল—তার পর সহসা দেহখানি দোলাইয়া হিল্লোল তুলিয়া সে নাচিতে আরম্ভ করিল।—"জঙ্গলের ভিতর কি আঁধার আর কি ঘন গাছ!"—

* * *

বাংলোর সম্মুখ দিয়া পথটা সোজা চলিয়া গিয়াছে; সুগঠিত পথ ইটের কুচি ও লাল কাঁকর দিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সরল রেখার মত সোজা, তেমনি প্রশস্ত—অন্ততঃ তিনখানা গাড়ী পাশাপাশি চলিতে পারে। কুয়াশায় অল্প ভিজিয়া রাঙা পথখানির রক্তাভা যেন গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলো হইতে খানিকটা আসিয়াই পথের দু-পাশে আরম্ভ হইল সারি সারি খড়ের তৈয়ারী কুঁড়ে ঘর। অনেক বিদেশী কুলী আনিতে হইয়াছে; রাজ-কর্ম্মায় ইট পাড়া, ইটের ভাটা দেওয়া, কলের লোহা-লক্কড়ের কাজ এদেশের অনভিজ্ঞ অপটু মজুর দিয়া হয় না। ঐ কুলীদের সাময়িক আশ্রয় হিসাবে ঘরগুলি তৈয়ারী হইয়াছে। ওপাশে ইহার মধ্যেই কুলীদের স্থায়ী বাসস্থান আর প্রায় তৈয়ারী হইয়া উঠিল, পাকা ইটের লম্বা একটা ব্যারাক—ছোট ছোট খুপরী ঘর—সামনে এক-এক টুকরা বারান্দা।

কুলীদের কুটীরগুলি এখন জনবিরল, বয়লারের ভোঁ বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই প্রায় কাজে চলিয়া গিয়াছে; থাকিবার মধ্যে কয়েকটি প্রায়-অক্ষম বৃদ্ধবৃদ্ধা আর উলঙ্গ অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলের পাল। বৃদ্ধ মাত্র কয়েক জন—তাহারা উপু হইয়া ঘোলাটে চোখের অলস অর্থহীন দৃষ্টি সম্মুখে মেলিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধা কয়েক জন জটলা পাকাইয়া রৌদ্রের আশায় বসিয়া পরস্পরের অপরিচ্ছন্ন মাথা হইতে উকুন বাছিয়া নখের উপর রাখিয়া নখ দিয়া টিপিয়া মারিতেছে, আর মুখে করিতেছে—হুঁ। ঐ হুঁ না করিলে নাকি উকুনের স্বর্গলাভ হইবে না। মধ্যে মধ্যে দুর্দ্দান্ত চীৎকার করিয়া ছেলের দলকে গাল দিয়া ধমকাইতেছে,

'—আরে বদমাসে-হারামজাদে, তেরি কুছ না করে হায—

—ই-হারামজাদী বুঢ়্টী,—তেরি দাঁত তোড় দেঙ্গে হাম। বলিয়া ছেলের দল দাঁত বাহির করিয়া ভ্যাঙচাইয়া দিতেছে। একটা বুড়ী একটি ক্রন্দনমানা শিশুকন্যাকে আদর করিতেছিল—

"এ হামার বেটী রাণী, সাতপরানী, বেটা লাঙাড়, পুতা কানি"—বেটী হামার ভাগ্‌মানী!—এ—এ—এ! অর্থাৎ ও আমার রাণী মেয়ে, তার সংসারে সাতটি প্রাণী, তাহার মধ্যে পুত্রটি খোঁড়া, পৌত্রটি কানা; আহা—আমার বেটী বড় ভাগ্যবতী।

বিমলবাবু তাহার আদরের ছড়া শুনিয়া হাসিলেন। বৃদ্ধা মেয়েটিকে বলিল—আরে, আরে, চুপ হো যাও বেটিয়া, মালিক যাতা হ্যায়—মালিক! আরে—বা-প-রে!

বয়স্ক ছেলেগুলি বিমলবাবুকে দেখিয়া শান্ত হইয়া দাঁড়াইল, ছোট ছোট হাত তুলিয়া সেলাম করিয়া বলিল—সেলাম মালেক!

বিমলবাবু ছোট্ট একটি টুকরা হাসি হাসিয়া কেবল ঘাড় নাড়িলেন। কয়টা অল্পবয়স্ক শিশু পরম আনন্দভরে এ উহার মাথায় পথের ধুলা ঢালিয়াই চলিয়াছে। একটা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশু বিচিত্র খেয়ালে পথের ধুলার উপরে শুইয়া ধপ ধপ করিয়া ধূলার উপর পিঠ আছড়াইয়া ধুলার রাশি উড়াইয়া আপন মনেই হাসিতেছিল। ধুলার জন্য বিরক্ত হইয়া হাতের ছড়িটা দিয়া বিমলবাবু তাহাকে একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন—এই!

ছেলেটা তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিয়া বলিল—সেলাম মালিক!

হাসিয়া বিমলবাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন। বিমলবাবু পিছন ফিরিতেই ছেলেটা জিভ কাটিয়া দাঁত বাহির করিয়া কদর্য্য ভঙ্গিতে তাঁহাকে ভ্যাঙচাইয়া দিল, তার পর আবার লাফ দিয়া পথের ধূলায় পড়িয়া ধুলার উপর পিঠ ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল—আলবৎ করেঙ্গে—আলবৎ করেঙ্গে, ই—ই—ই—বলিয়া আবার এক বার ভ্যাঙচাইয়া দিল।

কুলী-বস্তি পার হইয়াই কারখানার পত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

এ দিকের চরটাকে আর সে চর বলিয়া চেনাই যায় না। সে বেনাঘাসের জঙ্গল আর নাই, চরের ওদিকটা এক বারে খুঁড়িয়া ফেলিয়া আবার সমান করিয়া ফেলা হইয়াছে; লালচে পলিমাটি এদিকটায় তক তক করিতেছে, মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে দূর্ব্বা ও মুথো ঘাসের পাতলা আস্তরণ টুকরা টুকরা সবুজ ছোপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারই মধ্যে বড় বড় চতুর্ভুজ আঁকিয়া লাল কাঁকরের অনেকগুলি রাস্তা এদিক ওদিকে চলিয়া গিয়াছে। বড় রাস্তাটা এখানে আসিয়া সুদীর্ঘ-শালগাছের মত যেন চারি দিকে সোজা সোজা শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে।

এমনি একটা চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের উপর প্রকাণ্ড একটা টিনের শেড তৈয়ারী হইতেছে। মোটা মোটা লোহার কড়ি ও বর্গায় ছাঁদিয়া বাঁধিয়া কঙ্কালটা আর শেষ হইয়া আসিয়াছে। শেডের চালের উপর কুলীরা কাজ করিতেছে, লোহার উপর প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা দিতেছে সেই উপরে দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে। লোহার উপরে হাতুড়ির আঘাতের প্রচণ্ড শব্দ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া দুই তিন দিক হইতে প্রতিধ্বনিতে আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

একটা লরী হইতে লোহার কড়ি-বর্গা নামানো হইতেছিল। স্টেশন হইতে লোহালক্কড় এই লরীতেই আসিতেছে। লোহার একটা স্তূপ হইয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রপাতিও অনেক আসিয়া গিয়াছে, নানা আকারের যন্ত্রাংশ পৃথক পৃথক করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। এক পাশে পড়িয়া আছে দুইটা বিপুলকায় ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার—নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের মত। এই সব লোহালক্কড় ও যন্ত্রপাতিগুলিকে মুক্ত রোদ-বাতাসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই ঐ টিনের শেডটা তৈয়ারী হইতেছে। একেবারে মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ জমির উপর কলের বনিয়াদ খোঁড়া হইয়াছে। ঠিক তাহারই মধ্যস্থলে চিমনীটা তৈয়ারী হইতেছে। একেবারে ওপাশে লাল ইটের লম্বা কুলী-ব্যারাক। ব্যারাকটার ছাদ পিটিতে পিটিতে এ-দেশেরই কামিনেরা পিটনী কোপার আঘাতে তাল রাখিয়া এক সঙ্গে গান গাহিতেছে।

বিমলবাবু একের পর একটি করিয়া কাজের তদারক করিয়া ফিরিলেন। ফিরিবার পথে বাংলোয় আসিয়া না উঠিয়া শ্রীবাসের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীবাসের ছেলে গণেশকে আর সে গণেশ বলিয়া চেনাই যায় না। চৌকা ঘর কাটা রঙীন লুঙ্গী পরিয়া, ঘাড় একেবারে কামাইয়া চৌদ্দ-আনা-দুই আনা ফ্যাশানে চুল ছাঁটিয়া, গায়ে একটা পুলওভার পরিয়া গণেশ একেবারে ভোল পাল্টাইয়া ফেলিয়াছে। দোকানেরও আর সে চেহারা নাই। পাকা মেঝে, পাকা বারান্দা, দোকানে হরেক রকমের জিনিস। লোহার তারের বাণ্ডিল, পেরেক গজাল, গরুর গাড়ীর চাকার হালের জন্য লোহার পাটি, লোহার শলি, গরুর গলার দড়ির পরিবর্ত্তে লোহার শিকল, জানালায় দিবার জন্য লোহার শিক—মোট কথা লোহার কারবারই বেশী। অদূরে একটা গাছের তলায় এক জন পশ্চিম দেশীয় মুসলমান একটা গরুকে দড়ি বাঁধিয়া ফেলিয়া পায়ে নাল ঠুকিতেছে। কয়েক জন গাড়োয়ান তাহাদের গরুগুলি লইয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার ধারে এক-একটা ইঁট পাতিয়া পশ্চিম দেশীয় নাপিত চুল ছাঁটিতে বসিয়াছে। গণেশ বেচিতেছিল লোহার তার; একটি সাঁওতালের মেয়ে কিনিতেছে। গণেশ বলিতেছে—আরে বাপু, আলনা করবার জন্য যে নিবি, তা, ক-হাত চাই সে মাপ এনেছিস্?

মেয়েটি ভাল বুঝিতে পারিতেছে না, বলিতেছে—মাপ কি বুলছিস্ গো?

—কি বিপদ! ছোট হ'লে তখন করবি কি? তখন এসে আবার কাঁউমাউ করবি।

—হঁ। কি কাঁউমাউ করলম গো?

—কি বিপদ! কাপড় টাঙাবার জন্যে আলনা করবি তো?

—হঁ।

ঠিক এই সময়েই বিমলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন। গণেশ ব্যস্ত হইয়া তার ফেলিয়া আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—হুজুর! তাড়াতাড়ি সে একখানা লোহার চেয়ার আনিয়া পাতিয়া দিল; বিমলবাবু বসিলেন না, চেয়ারখানার উপর একটা পা তুলিয়া দিলেন, বলিলেন—শ্রীবাস কোথায়?

—আজ্ঞে, বাবা এখনও আসেন নি। কাল ওপারে বাড়ী—

—হঁ! তুমিই শোন তা হ'লে। মাঝি বেটারা আবার গোলমাল করতে আরম্ভ করেছে। ভিতরের ব্যাপারটা একটু খোঁজ নাও দেখি! শুনছি—ইন্দ্র রায় নাকি সব বেগার ধরেছেন। আসল কথাটা আমাকে জানিয়ে আসবে।

বিমলবাবু ফিরিলেন।

আপিসে বসিয়া বিমলবাবু ডাকিলেন—যোগেশবাবু!

যোগেশ মজুমদার আসিয়া দাঁড়াইল, বিমলবাবু বলিলেন, শ্রীবাসের হ্যাণ্ডনোটটা—আপনার দরুন যেটা—সেটার বোধ হয় তিন বছর প্রায় হয়ে এল, না?

যোগেশ মজুমদার ফৌজদারী মামলার সময় শ্রীবাসকে ঋণ দিয়াছিল, তাহার দরুণ হ্যাণ্ডনোটটা বিমলবাবু কিনিয়াছেন?

মজুমদার বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর তামাদীর সময় হয়ে এল। তা ছাড়া, আপনার নিজেরও দুখানা হ্যাণ্ডনোট—

—সে থাক। এখন এইটের জন্যেই একটা উকীলের নোটিশ দিয়ে দিন।

বিমলবাবু নিজেও শ্রীবাসকে ঋণ দিয়েছেন দুই বার। মজুমদার বলিল—ওকে ডেকে—

বাধা দিয়া বিমলবাবু বলিলেন—না। ঠিক প্রণালী মত কাজ ক'রে যান। এর পর যা কথা হবে, সে উকীলের মারফতেই হবে। উকীলকে আমাদের সর্ত্তটা জানিয়ে দেবেন, চরের এক-শ বিঘে জমিটা ন্যায্য মূল্যেই আমি পেতে চাই।

মজুমদার বলিল—যে আজ্ঞে।

বিমলবাবু বলিলেন—আর এক কথা। এক বার ইন্দ্র রায়ের কাছে আপনি যান। তাঁকে বলুন যে, আমার শরীর খারাপ ব'লেই আমি যেতে পারলাম না। কিন্তু

তিনি যে জমিদার স্বরূপে সাঁওতালদের বেগার ধরছেন, এতে আমার আপত্তি আছে। ওরা আমার দাদন খেয়ে রেখেছে। আমার দাদন-দেওয়া কুলী বেগার ধরলে আমার কাজের ক্ষতি হয়। বুঝলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা—তা হ'লে আপনি যান ওঁর কাছে। মজুমদার চলিয়া গেল। বিমলবাবু কাগজ-কলম লইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরই এক জন চাপরাসী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, বলিল—এসেছে!

মুখ না তুলিয়াই বিমলবাবু বলিলেন—নিয়ে আয়।

আসিয়া প্রবেশ করিল যে ব্যক্তি, সে এখানকার নূতন মদের দোকানের ভেণ্ডার। লোকটি একটি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বিমলবাবু চাপরাসীটাকে বলিলেন—যা তুই এখান থেকে।

চাপরাসীটা চলিয়া গেল। বিমলবাবু বলিলেন—দেখ, আমার জন্তেই তোমার এ দোকান।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ে কৃতজ্ঞতায় শতমুখ হইয়া বলিয়া উঠিল—দেখেন দেখি—দেখেন দেখি, হুজুরই আমার মা-বাপ—

—হ্যাঁ। বাধা দিয়া বিমলবাবু বলিলেন—হ্যাঁ। একটি কাজ তোমাকে করতে হচ্ছে। সাঁওতালদের মাথায় একটা কথা তোমাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। কৌশলে! বুঝেছ?—দরজাটা ভেজিয়ে দাও।

২৪

মজুমদার এই দৌত্য লইয়া ইন্দ্র রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইবার কল্পনায় চঞ্চল হইয়া পড়িল। ইন্দ্র রায়ের দাম্ভিকতা-ভরা দৃষ্টি, হাসি, কথা সুতীক্ষ্ণ শায়কের মত আসিয়া তাহার মর্মস্থল যেন বিদ্ধ করে। আর তাহার নিজের বাক্যবাণগুলি যত শাণ দিয়া শাণিত করিয়াই সে নিক্ষেপ করুক, নিক্ষেপ-শক্তির অভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে নতশির হইয়া রায়ের সম্মুখে যেন প্রণত হইয়াই লুটাইয়া পড়ে। তবে এবার পৃষ্ঠদেশে আছেন সক্ষম রথী বিমলবাবু, বিমলবাবুর আজিকার এই বাক্য-শায়কটি শুধু সুতীক্ষ্ণই নয়—শক্তির বেগে তাহার গতি অকম্পিত এবং সোজা! মজুমদার একটি সভয় হিংস্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নানা কল্পনা করিতে করিতেই সে চর হইতে নদীর ঘাটে আসিয়া নামিল। চরের উপর নদীর মুখ পর্য্যন্ত রাস্তাটা এখন পাকা হইয়া গিয়াছে, কালির বুকেও এখন গাড়ীর চাকায় চাকায় বেশ একটি চিহ্নিত রাস্তা রায়-হাটের খেয়াঘাটে গিয়া উঠিয়াছে। ওপার হইতে মজুর-শ্রেণীর পুরুষ ও মেয়েরা দল বাঁধিয়া চরের দিকেই আসিতেছে। কলের ইমারতের কাজেই ইহারা এখন খাটে, আগের চেয়ে মজুরিও কিছু বাড়িয়াছে। কতক-গুলি চাষীও বেগুন, মূলা, শাকসব্জী বোঝাই ঝুড়ি মাথায় চরের দিকে আসিতেছে। রায়হাটের চেয়ে জিনিষপত্র চরেই এখন কাটতি হয় বেশী, চরের মিস্ত্রী-মজুরেরা দরদস্তুর করে কম, কেনেও পরিমাণে বেশী। এপারে যাহারাই আসিতেছিল তাহারা সকলেই মজুমদারকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইল, মজুমদারই এখন কলের ম্যানেজার। রায়হাটের ঘাটে আসিয়া মজুমদার বিরক্ত হইয়া উঠিল—পথে এক হাঁটু ধুলা হইয়াছে। চারি পাশে দীর্ঘকালের প্রাচীন গাছের ঘন ছায়ার মধ্যে হিম যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। পথের উপর মানুষ-জনও নাই। মজুমদার চরের ম্যানেজারীত্বের গৌরবের গোপন অহঙ্কার নির্জ্জনতার সুযোগে প্রকাশ করিয়া ফেলিল—বেশ জোর গলাতেই, আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল—মা-লক্ষ্মী যখন ছাড়েন, তখন এই দশাই হয়! হুঁঃ—অতি দর্পে হতা লঙ্কা—অতিমানে চ কৌরবাঃ।

পথের দুই পাশে প্রাচীন কালের নৌকার মত বাঁকানো চালকাঠামো-যুক্ত কোঠা ঘরগুলির দিকে চাহিয়াও তাহার ঘৃণা হইল। বলিল—হুঁঃ, কি সব জঘন্য চালকাঠামো! সেকালের কি সবই ছিল কিম্ভুতকিমাকার! যত জবরজঙ—হাতীশুঁড়—পরী—সিংহী—এই দিয়ে আবার বাহার করেছে! ঘর করবে বাংলা চাল—সোজা; একেবারে পাকা দালান ঘরের মত!

মোট কথা রায়হাটের সমস্ত কিছুকে ঘৃণা করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া ইন্দ্র রায়ের সম্মুখীন হইবার মত মনোবৃত্তিকে সে দৃঢ় করিয়া লইতেছিল।

নায়েব-সেরেস্তার সম্মুখে একখানা সেকেলে ভারী কাঠের চেয়ারে বসিয়া ইন্দ্র রায় জমিদারী কাজকর্ম্মের তদারক করিতেছিলেন। নায়েব ঘোষ তক্তাপোষের উপর একটি সেকেলে ডেস্কের উপর খাতা খুলিয়া দেখিয়া রায়ের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল। তাহার পাশে ঘোষের ভাইপো কতকগুলি খাতা লইয়া বসিয়া আছে। ঘোষের ভাইপোকে রায় চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। মনের গোপন ইচ্ছা—এইবার তিনি ধীরে ধীরে চক্রবর্ত্তীদের সংস্রব হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন।

মজুমদার ঘরে ঢুকিয়াই নমস্কারের ভঙ্গিতে প্রণাম করিয়া বলিল—এক বার মুখুজ্জে সায়েব আপনার কাছে পাঠালেন।

বিমলবাবু এখানে মুখার্জ্জী সাহেব নামেই খ্যাত হইয়াছেন, বাবু নামটা তিনি অপছন্দ করেন, বলেন, ওটা গালাগালি। চরের কুলী কামিন ও রায়হাটের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে তিনি মালিক, হুজুর। কর্ম্মচারী ও অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সাধারণের নিকট তিনি মুখার্জ্জী সাহেব।

ইন্দ্র রায়ের পাশে আরও খান তিনেক চেয়ার খালি পড়িয়াছিল, মজুমদার তাহার কথার ভূমিকা শেষ করিয়া ঐ চেয়ারগুলার দিকেই দৃষ্টি ফিরাইল; ইন্দ্র রায় সাদরে সম্ভাষণ জানাইয়া, ঘোষের তক্তাপোষের দিকে আঙুল দেখাইয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া বলিলেন—ব'স, ব'স।

মজুমদার একটু ইতস্তত করিয়া তক্তাপোষের উপরেই বসিল। রায় তাঁহার অভ্যস্ত মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন—কি সংবাদ তোমার মুখার্জ্জী সাহেবের, বল!

—আজ্ঞে!—মাথা চুলকাইয়া যোগেশ মজুমদার বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল—আজ্ঞে আমাকে যেন অপরাধী করবেন না—

ইন্দ্র রায়ের ঠোঁটের প্রান্তে যে হাসির রেখাটুকু ফুটিয়া উঠে, সেটা অভিজাতসুলভ অভ্যাস-করা একটা ভঙ্গি মাত্র, হাসি নয়; মজুমদারের বিনয়ের ভূমিকা দেখিয়া কিন্তু রায় এবার সত্য সত্যই একটু হাসিলেন। বুঝিলেন, অস্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বে মজুমদারের এটি প্রণাম-বাণ প্রয়োগ! রায় হাসিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—দূত চিরকালই অবধ্য; তোমার ভয় নেই—নির্ভয়ে তুমি মুখার্জ্জী সাহেবের বক্তব্য ব্যক্ত কর।

রায়ের কথার সুরে অর্থে মজুমদার তাঁহার শক্তি অনুমান করিয়া আরও সংহত এবং সংযত হইয়া উঠিল, আরও খানিকটা বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল,—তিনি নিজেই আসতেন! তা তাঁর শরীরটা—; মজুমদার ভাবিতেছিল কোন্ অসুখের কথা বলিবে!

—শরীরটায় আবার কি হ'ল তাঁর? প্রশ্ন করিয়াই রায় হাসিলেন, বলিলেন—চালুনীতে যে-কালে সরষে রাখা চলছে যোগেশ, সে কালে শরীরে যা হোক একটা কিছু হওয়ার আর আশ্চর্য্য কি? তোমার শরীর কেমন?

লজ্জার সহিত মজুমদার বলিল—আজ্ঞে, আমি ভালই আছি।

রায় বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে সুরু করিয়া বলিলেন—ভাল কথা, শরীর তো সুস্থই আছে, এইবার সরল অন্তঃকরণে স্পষ্ট ভাষায় বল তো—মুখার্জ্জী সাহেবের কথাটা কি? বাঁ হাতে গোঁফে তা দেওয়াটা রায়ের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের একটা বহিঃপ্রকাশ।

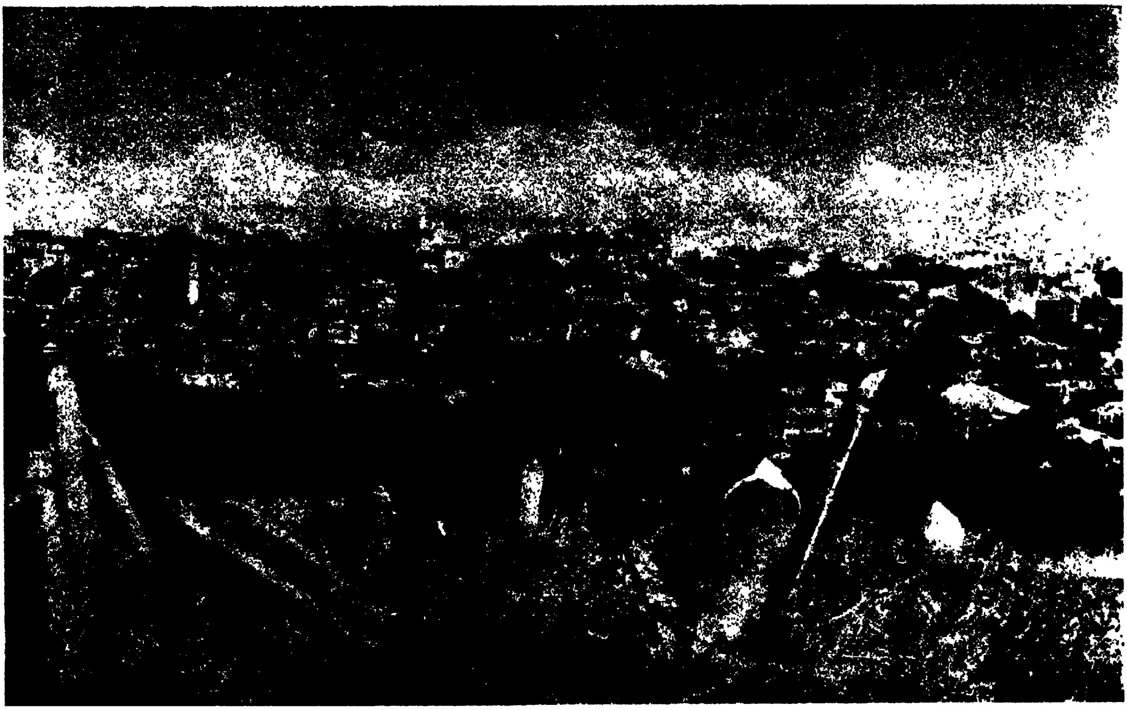
মজুমদার প্রাণপণে আপনাকে দৃঢ় করিয়া বলিল—বেশ গাম্ভীর্য্যের সহিতই আরম্ভ করিল—কথাটা চরের সাঁওতালদের নিয়ে। মানে—উনি সাঁওতালদের সব দাদন দিয়ে রেখেছেন। শ্রীবাসের কাছে ধানের বাকী বাবদ কারও বিশ, কারও পঁচিশ, দু-এক জনের চল্লিশ টাকাও ধার ছিল। শ্রীবাসের প্যাঁচালো বুদ্ধি তো জানেন, সে আবার ডেমিতে টিপছাপ নিয়ে বন্ধকী দলিল পর্য্যন্ত করে নিয়েছিল। যোগেশ একটু থামিল।

রায়ের গোঁফে তা দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মুখ-চোখ ধীরে ধীরে চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল।

মজুমদার কোন সাড়া না পাইয়া বলিল—মুখার্জ্জী সাহেব সেটা জানতে পেরেই শ্রীবাসকে ডেকে ধমক দিয়ে তার টাকা দিয়ে খতগুলি কিনে নিলেন। সাঁওতালদের বললেন, তোরা খেটে আমাকে শোধ দিবি। মজুরী থেকে দৈনিক এক আনা হিসেবে কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন তিনি।



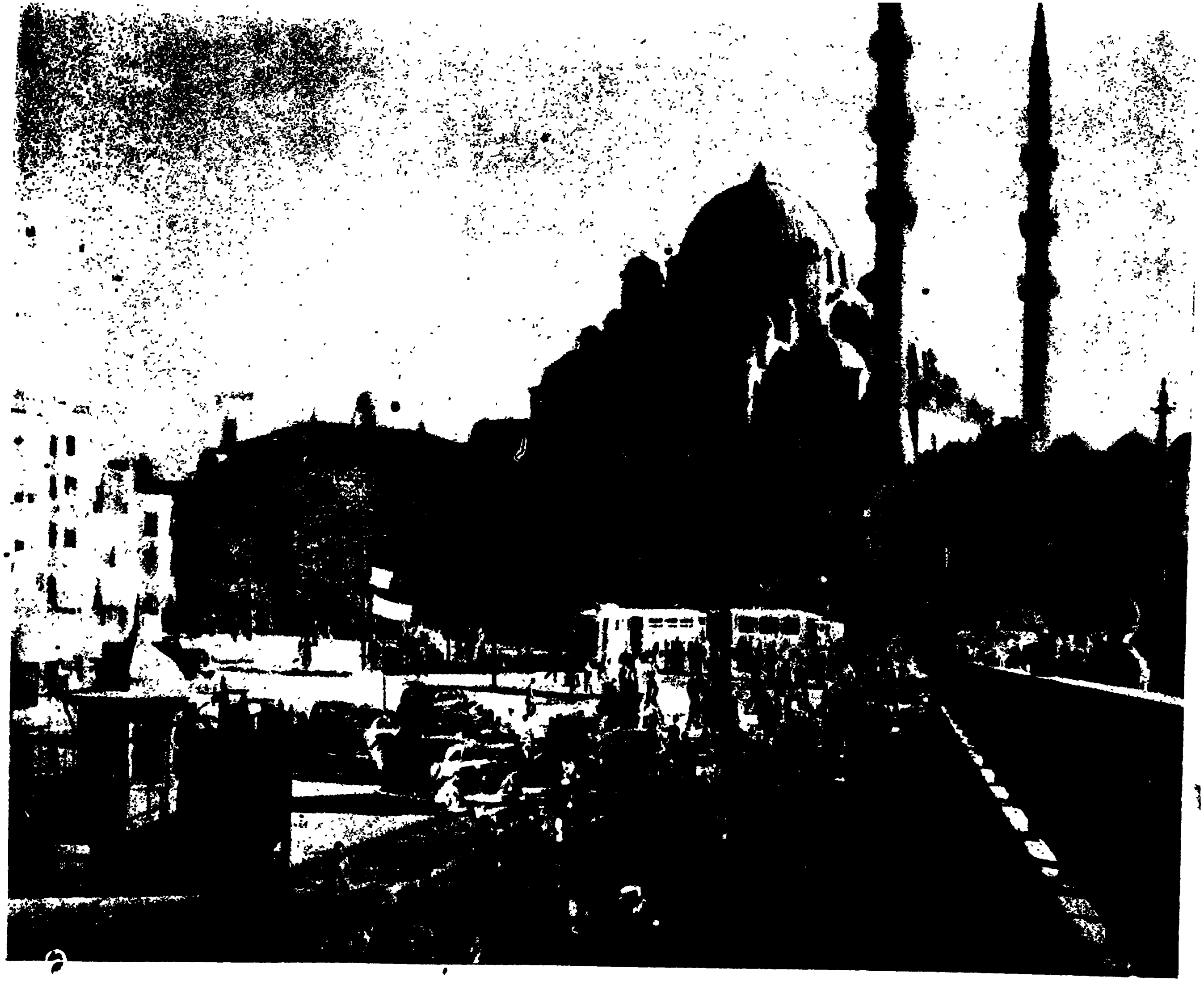
ইজমির বা স্মার্ণার দৃশ্য, পাগস পর্ব্বত হইতে



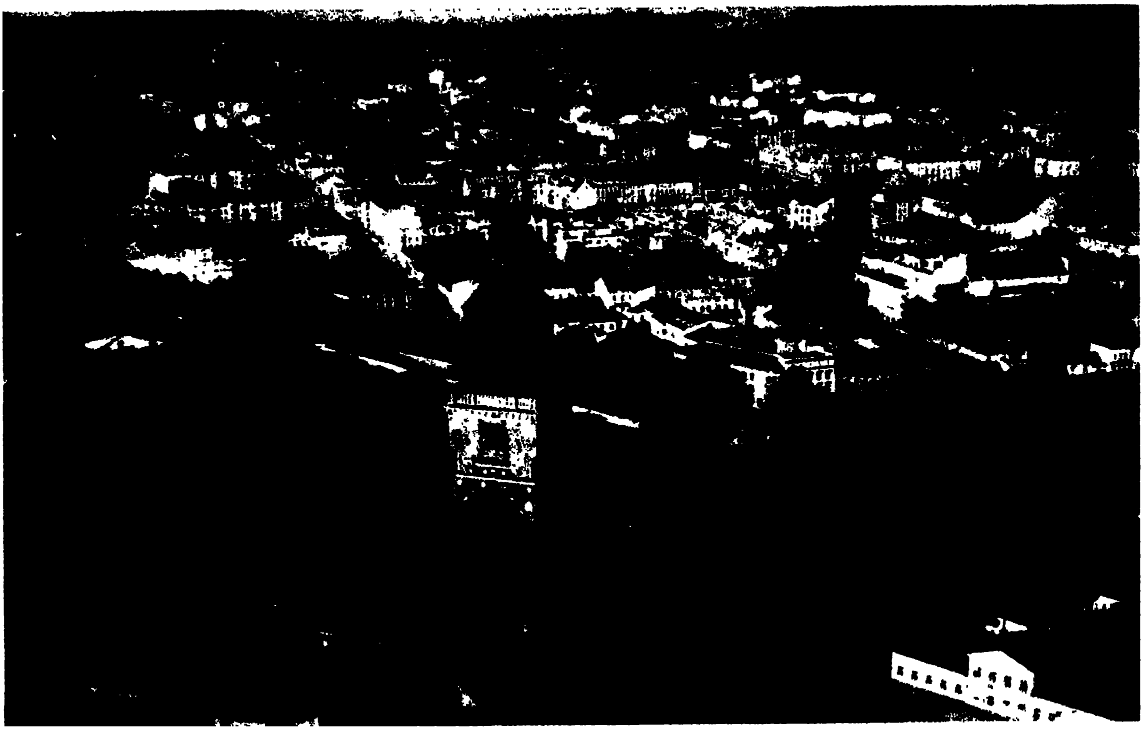
কনস্টান্টিনোপলের পুরাতন অঞ্চল



বাইজান্টাইন কনস্টান্টিনোপলের ভগ্ন প্রাচীন প্রাকার



ইস্তাম্বুল—জগদ্বিখ্যাত য়েনি জামি মসজিদের দৃশ্য



ফিনল্যাণ্ডের প্রাচীন রাজধানী টুর্কু-শহর—প্রচলিত নাম ওবো শহর



কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩

শীত-জর্জ্জর শেষ-হেমন্তের প্রভাতটি কুয়াশায় ও ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চরটার কিছুই দেখা যায় না। শেষরাত্রি হইতেই গাঢ় কুয়াশা আসিয়াছে। তাহার উপর লক্ষ লক্ষ ইট পুড়িতেছে—সেই সব ভাটার ধোঁয়া ঘন বায়ুস্তরের চাপে অবনমিত হইয়া সাদা কুয়াশার মধ্যেই কালো কুণ্ডলী পাকাইয়া বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। বিপুল-বিস্তার দুধে-ধোঁয়া পাতলা একখানি চাদরের উপর কে যেন খানিকটা কালি ফেলিয়া দিয়াছে। তীক্ষ্ণ শীতল কুয়াশার কণাগুলি মানুষের মুখে, চোখের পাতায়, চুলের উপর আসিয়া লাগিতেছে, তাহার সঙ্গে কয়লার গন্ধ এবং কয়লার কুচি।

ইহার মধ্যেই বিমলবাবু, কলিকাতার কলওয়ালা মহাজন, চরের উপর একটি বাংলো তৈয়ারী করিয়া বাসা গাড়িয়া বসিয়াছেন। কল-তৈয়ারী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাজ খুব দ্রুতবেগে চলিতেছে। এখানকার লোকে কাজের গতি দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া পড়িয়াছে। এমন ধারা দ্রুতগতিতে যে কাজ হইতে পারে এ ধারণাই তাহারা করিতে পারে না। এ যেন বিশ্বকর্ম্মার কাণ্ড,—এক রাত্রে প্রান্তরের উপর প্রকাণ্ড নগর গড়িয়া ওঠার মত ব্যাপার!

বিমলবাবু বাংলোর বারান্দায় একখানা ইজি-চেয়ারের উপর বসিয়া চা পান করিতেছিলেন এবং কুয়াশার দিকে চাহিয়া ছিলেন। কুয়াশার মধ্যে কোথা হইতে বাষ্পের জোরে বাজানো বয়লারের বাঁশী ভোঁ-ভোঁ শব্দে বাজিয়া উঠিল। একটা ভার্টিকাল বয়লারও ইহার মধ্যেই বসানো হইয়াছে; বয়লারের জোরে নদীর গর্ভে একটা পাম্প চালাইতেছে। সেই জল হইতে ইট তৈয়ারীর কাজে এবং বাড়ী-তৈয়ারী কাজে প্রয়োজন মত জল সরবরাহ হইতেছে। পাইপ বিমলবাবুর বাংলোর চলিয়া আসিয়াছে, এবং প্রয়োজনমত এখানে ওখানে কলের মুখ লাগাইয়া যখন যেখানে ইচ্ছা জল লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাংলোর সম্মুখেই একটা পাকা ইন্দারাও হইয়া গিয়াছে। ইন্দারার চারি পাশে বাগানে নানা রকমের মরসুমী ফুল ও তরিতরকারি গাছ। বারান্দার ধারেই একটা জলের কলের মুখ—সেখানে একটি প্রশস্ত সান-বাঁধানো চাতাল ও একটি চৌবাচ্চা। সেই চাতালে বসিয়া সারী, সাঁওতালদের সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি, বসিয়া বাসন মাজিতেছে। বিমলবাবুর বাসায় সারী ঝিয়ের কাজ করে। কুয়াশা এত ঘন যে বিমলবাবু সারীকেও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। মনে হয় কুয়াশার একটা পুঞ্জ যেন ওখানে জমিয়া আছে। এই কুয়াশার মধ্যে কোথাও শূন্যমার্গে অবিরাম কর্ণির ও ইটের ঠুং ঠাং শব্দ উঠিতেছে। আর উঠিতেছে লোহার উপর লোহার প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ—চারি দিকের মুক্ত প্রান্তর বাহিয়া শব্দটা সন্‌সন্ শব্দে ছুটিয়া চলিয়া দিগন্তে বিপুল শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা ধীরে ধীরে কাটিতেছিল। কয়লার ধোঁয়া মাটির বুক হইতে শূন্য মণ্ডলে ভাসিতে আরম্ভ করিল। বিমলবাবু সারীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন, সারীর মাথায় মরসুমী ফুলের সারি, ইহারই মধ্যে সে কখন ফুল তুলিয়া চুলে পরিয়াছে। বিমলবাবু রাগের ছলনা করিয়া বলিলেন—আবার তুই ফুল তুলেছিস?

সারী শঙ্কিত মুখে বিমলবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সারীর মত উচ্ছল চঞ্চল বর্ব্বরাও বিমলবাবুকে ভয় করে—অজগরের মুখের অদূরবর্ত্তী জীবের মত যেন অসাড় হইয়া যায়। এই চর ব্যাপিয়া বিপুল এবং অতিকায় কর্ম্মসমাবেশের সমগ্রটাই যেন বিমলবাবুর কায়ার

মৃত, মানুষের দেহ লইয়া তিনি যেন তাহার জীবাত্মা। তাঁহার সম্পদ, কর্ম্মক্ষমতা, গাম্ভীর্য্য, তৎপরতা—সব লইয়া বিমলবাবুর একটা ভয়াল রূপ তাহারা মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করে। এবং ভয়ে স্তব্ধ হইয়া যায়।

সারীর ভয় দেখিয়া বিমলবাবু একটু হাসিলেন, তার পর পাশের টিপয়ের ফুলদানি হইতে এক গোছা মরসুমী ফুল লইয়া সারীকে ছুড়িয়া মারিলেন, বলিলেন—এই নে!

সারী ফুলের গোছাটি কুড়াইয়া লইয়া শঙ্কার সহিতই একটু হাসিল, তার পর বলিল—সেই কাপড়, তুমি কিনে দিবি না?

—দেব, দেব।

—কোবে দিবি গো?

—আচ্ছা আজই দেব। তুই এখন ভিতরে গিয়ে সব পরিষ্কার ক'রে ফেল; হুই সরকার-বাবু আসছে!

কুয়াসা এখন প্রায় কাটিয়া আসিয়াছে; বাংলোর মুখ হইতে সোজা একটা পাকা প্রশস্ত রাস্তা কারখানার দিকে সোজা চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া আসিতেছিল শূলপাণি রায়—রায়-বংশের সেই গঞ্জিকাসেবী উগ্রমেজাজী লোকটি। শূলপাণির সঙ্গে জন দুয়েক চাপরাসী; শূলপাণি আস্ফালন করিতেছিল প্রচুর। শূলপাণিই বিমলবাবুর সরকারবাবু। তাহার উগ্র মেজাজ ও বিক্রম দেখিয়া তিনি তাহাকে 'লেবার-সুপারভাইজার'—বাংলা মতে কুলী-সরকারবাবু নিযুক্ত করিয়াছেন। শূলপাণি কুলীদের হাজরি রাখে, তাহাদের খাটায়, শাসন করে; মাসিক বেতন বারো টাকা।

শুধু শূলপাণিই নয়, রায়হাটের অনেকে এখানে চাকরি পাইয়াছে। ইন্দ্র রায় বিমলবাবুর কৌশল দেখিয়া হাসিয়াছিলেন, মুগ্ধ হইয়া হাসিয়াছিলেন। মামলা-মোকদ্দমার সমস্ত সম্ভাবনা চাকরির খাঁচায় বন্ধ করিয়া ফেলিলেন এই বিচক্ষণ ব্যবসায়ীটি। মজুমদার এখন বিমলবাবুর ম্যানেজার, অচিন্ত্যবাবু অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, হরিশ রায় গোমস্তা। আরও কয় জন রায়-বংশীয় এখানে কাজ পাইয়াছে। ইন্দ্র রায়ের নায়েব ঘোষের ছেলেও এখানে কাজ করিতেছিল—ইন্দ্র রায় নিজেই তাহার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি বিমলবাবু দুঃখের সহিত তাহাকে নোটিশ দিয়াছেন, কাজ তাহার সন্তোষজনক হইতেছে না।

শূলপাণি চীৎকার করিতে করিতেই আসিতেছিল;—হারামজাদা, বেটারা, সব শূয়ারকি বাচ্চা—

বিমলবাবুর কপালে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন—আস্তে। তারা তো এখানে কেউ নেই!

শূলপাণি অর্দ্ধদমিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে না। ঐ বেটা সাঁওতালরা—

—হ্যাঁ। কিন্তু হয়েছে কি? ব্যাপারটা কি? আস্তে আস্তে বল।

শূলপাণি এবার সম্পূর্ণ দমিয়া গিয়া অনুযোগের সুরে বলিল—আজ্ঞে কেউ আসে নি আজ।

—আসে নি?

—আজ্ঞে না।

—হুঁ। বিমলবাবুর কপাল আবার কুঁচকাইয়া উঠিল।

শূলপাণি উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল—হুকুম দেন, গলায় গামছা দিয়ে ধরে আনুক সব!

বিমলবাবু মুখ বাঁকাইয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন—রায়-সাহেব, এটা তোমার পৈত্রিক জমিদারী নয়। এটা হ'ল ব্যবসা। এতে গলায় গামছা চলবে না। না এসেছে, নেই। কাজ আজ বন্ধ থাক। বিকেল বেলা সব ডাকবে এখানে, আমার কাছে। এক বার শ্রীবাস দোকানীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে, জরুরী দরকার। আর হ্যাঁ—কাল রাত্রে লোহাগুলো সব এসে পৌঁচেছে?

—আজ্ঞে না। এখনও দু-বার লরী যাবে তবে শেষ হবে। লরী তো জোরে যেতে পারছে না! ইষ্টিশানের রাস্তায় ধুলো হয়েছে এক হাঁটু আর মাঝে মাঝে এমন গর্ত—

—মেরামত করাও; নিজেদের লোক দিয়ে জলদি মেরামত ক'রে নাও। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মুখ চেয়ে থাকলে চলবে না। তাদের সেই বছরে একবার মেরামত—তাও হরিলুটের মত মাটি কাঁকর, ছিটিয়ে দিয়ে। লরী যখন ষ্টেশন যাবে তখন ইটের কুচি বোঝাই দিয়ে দাও। যেখানে যেখানে গর্ত পড়েছে, ঢেলে দিক সেখানে।

তার পর কয়েক লরী কাঁকর দিয়ে মেরামত করাও। বুঝলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, যাও তুমি এখন।

শূলপাণি একটি নমস্কার করিয়া শান্তশিষ্ট ব্যক্তির মতই চলিয়া গেল। তাহার মত গঞ্জিকাসেবীর আজন্ম-অভ্যস্ত উগ্র মেজাজের কড়া তারও কেমন করিয়া বিমলবাবুর সম্মুখে শিথিল মৃদু হইয়া যায়। আসে সে আস্ফালন করিতে করিতে কিন্তু যায় সে দম-দেওয়া যান্ত্রিক পুতুল-মানুষের মত।

বিমলবাবু ডাকিলেন—সারী!

সারী আসিয়া নীরবে চকিত দৃষ্টি তুলিয়া দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ আলোকে দেখা যায় সারীর নিটোল স্বাস্থ্যভরা দীর্ঘ দেহখানি আর সে তৈলাক্ত অতি-মসৃণতায় প্রসাধিত নয়, রুক্ষ প্রসাধনের একটি ধূসর দীপ্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুপরিস্ফুট। পরনে আর তাহার সাঁওতালী মোটা শাড়ী নাই—একখানা ফুলপাড় মিলের শাড়ী সে পরিয়া আছে। বর্ব্বর আদিম জাতির দেহে অপরিচ্ছন্নতার একটা কদর্য্য গন্ধ থাকে—কিন্তু সারী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেও সে গন্ধ আর পাওয়া গেল না।

বিমলবাবু বলিলেন—আবার সব তোদের পাড়ার লোকে গোলমাল করছে নাকি ?

সারী শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিল—আমি সিং জানি না গো! উয়ারা তো বললে না আমাকে!

—তবে সব খাটতে এল না যে ?

সারীর মুখে এবার সঙ্কুচিত একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল, আশ্বস্ত কণ্ঠে সে বলিল—কাল আমাদের জমিদারবাবু—উই যি রাঙাবাবু—উয়ার শশুর হবে যি—ওই রায়বাবু সিপাই পাঠালে যি। বললে—জমিগুলা চষতে হোবে, কলাই বুনবে, সরষা বুনবে, আলু লাগাবে, আর ধানগুলা কাটতে হোবে!

বিমলবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—আপন মনেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—ড্রোনস অফ দি কান্ট্রি! ইডিয়টস, দিজ জ্যামিণ্ডারস!

সারী শঙ্কিত হইয়া উঠিল—শঙ্কার ছায়া, তাহার কালো মুখের সাদা চোখ দুটিতে রাত্রির আকাশের চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়ার মত ঘনাইয়া আসিল। বিমলবাবু কি বলিলেন সে যে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না! তবু ভাল যে সম্মুখে এখন 'হাড়িয়া'র বোতলটা নাই!

বিমলবাবু বলিলেন—সকলে তো চাষ করে না, তারা এল না কেন ?

—উয়াদিগে ধান কাটাতে লাগালে! সারীর কণ্ঠস্বর ভীত শিশুর মত।

—ধান কাটতে লাগালে ? পয়সা দেবে, না দেবে না ?

—না। বেগার লিলে। উয়ারা যি জমিদার বটে—রাজা বটে।

—হুঁ! বিমলবাবু গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর উঠিয়া মোটা চেস্টারফিল্ড কোটটা গায়ে দিয়া বলিলেন—ছড়িটা নিয়ে আয়।

সারী তাড়াতাড়ি ছড়িটা আনিয়া বিমলবাবুর হাতে দিল, বিমলবাবু এবার প্রসন্ন হাসি হাসিয়া সারীর কপালে আঙুলের একটি টোকা দিয়া ক্ষিপ্রপদে রাস্তার উপর নামিয়া পড়িলেন।

কুয়াশা কাটিয়া এখন রৌদ্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। চর-খানাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে আকাশলোকের দিকে উদ্ধত ভঙ্গিমায় উন্নত একটা অর্দ্ধসমাপ্ত ইটের গড়া চিমনী। সেইখানেই ঠুং ঠাং কর্ণির শব্দ উঠিতেছে। ওদিকে আরও একখানা সুসমাপ্ত বাংলো। ওটা আপিস-ঘর। একটা লোহার ফ্রেমে গড়া আচ্ছাদনহীন শেড।

এতক্ষণে সারীর মুখখানি ঈষৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল; বিমলবাবু খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলে সে স্বচ্ছন্দ সহজ হইয়া জলসিক্ত অঙ্কুরের মত জাগিয়া উঠিল। গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে সে কাজ আরম্ভ করিল, নিজেদের ভাষায় গান—

"উঃ বাবা গো—এই জঙ্গলের ভিতর কি আঁধার আর কত গাছ! এখানে সাপও চলিতে পারে না! এই জঙ্গলের বাদেই নাকি 'বামেচারের' সেই সূর্য্যঠাকুরের শোবার ঘর পর্য্যন্ত ধুধু ডাঙা—সেখানে বসতি নাই—

পাখী নাই! তুমি আমাকে এখানে ফেলে যেয়ো না—ওগো ভালবাসার লোক্!"

সারী এখন বিমলবাবুর বাংলোয় কাজ করে, এই-খানেই সে বাসও করিতেছে। কয়টা মাসের মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে অনেক।

বিমলবাবু এখানে আসার কিছু দিনের মধ্যেই সারী অনুভব করিল—অজগরের অদূরস্থ শিকারের যেমন সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া যায়, সেও যেন তেমনি অবশ হইয়া যাইতেছে! চীৎকার করিয়া আপন জনকে ডাকিয়া সাহায্য চাহিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার হইল না। সম্পদ, গাম্ভীর্য্য, কর্ম্মক্ষমতা, প্রভুত্ববিস্তারের শক্তি, তৎপরতা প্রভৃতি বিচিত্র ছাপে চিত্রিত সুদীর্ঘকায় অজগরের মতই ভয়াল বিমলবাবু! অজগরের মুখের মধ্যে সারী অচেতন পশুর মত ধরা পড়িল। তাঁহার কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে কাহারও প্রতিবাদ করিবার সাহসও হইল না। আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়া গেল—সাঁওতাল-পল্লীর সকলেই এক দিক হইয়া সর্দ্দার কমল মাঝি ও সারীর স্বামীকে একঘরো করিল; অথচ তাহারাই রহিল বিমলবাবুর একান্ত অনুগত। কিছুদিনের মধ্যেই সারীই নিজে পঞ্চ জনের কাছে 'সাকমচারী'র—অর্থাৎ বিবাহচ্ছেদের প্রার্থনা করিল। সামাজিক আইনমত তাহারই জরিমানা দিবার নিয়ম; চাহিবার পূর্ব্বেই সে এক শত টাকা 'পঞ্চে'র সম্মুখে নামাইয়া দিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই এক দিন সকালে দেখা গেল—বুড়া কমল মাঝি, তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী এবং সারীর স্বামী রাত্রির অন্ধকারের মুখে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সাঁওতাল-পাড়ার সর্দ্দার এখন চূড়া মাঝি—সেই কাঠের পুতুলের ওস্তাদ। সর্দ্দার মাঝির জমি শ্রীবাস পাল দখল করিতেছে, তাহার নাকি বন্ধকী দলিল আছে।

সারী এখন বিমলবাবুর বাংলোয় কাজ করে, বাংলোর সীমানার মধ্যেই আউট-হাউসে থাকে। বেশভূষার প্রাচুর্য্য দেখিয়া সারীর সখীরা বিস্মিত হইয়া যায়।

এক-এক দিন দেখা যায় গভীর রাত্রে সারী ভয়ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইতেছে, তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছেন বিমলবাবু, হাতে একটা হান্টার!

গান গাহিতে গাহিতে সারী কাজ করিতেছিল; ঘরের দেওয়ালের গায়ে টাঙানো প্রকাণ্ড আয়নাটার কাছে আসিয়া সে কাজ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। চুলটা এক বার ঠিক করিয়া লইল, এক বার হাসিল—তার পর সহসা দেহ-খানি দোলাইয়া হিল্লোল তুলিয়া সে নাচিতে আরম্ভ করিল।—"জঙ্গলের ভিতর কি আঁধার আর কি ঘন গাছ!"—

* * *

বাংলোর সম্মুখ দিয়া পথটা সোজা চলিয়া গিয়াছে; সুগঠিত পথ ইটের কুচি ও লাল কাঁকর দিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সরল রেখার মত সোজা, তেমনি প্রশস্ত—অন্ততঃ তিনখানা গাড়ী পাশাপাশি চলিতে পারে। কুয়াশায় অল্প ভিজিয়া রাঙা পথখানির রক্তাভা যেন গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলো হইতে খানিকটা আসিয়াই পথের দু-পাশে আরম্ভ হইল সারি সারি খড়ের তৈয়ারী কুঁড়ে ঘর। অনেক বিদেশী কুলী আনিতে হইয়াছে; বাস্ত-কর্ম্মায় ইট পাড়া, ইটের ভাটা দেওয়া, কলের লোহা-লক্কড়ের কাজ এদেশের অনভিজ্ঞ অপটু মজুর দিয়া হয় না। ঐ কুলীদের সাময়িক আশ্রয় হিসাবে ঘরগুলি তৈয়ারী হইয়াছে। ওপাশে ইহার মধ্যেই কুলীদের স্থায়ী বাসস্থান আর প্রায় তৈয়ারী হইয়া উঠিল, পাকা ইটের লম্বা একটা ব্যারাক—ছোট ছোট খুপরী ঘর—সামনে এক-এক টুকরা বারান্দা।

কুলীদের কুটীরগুলি এখন জনবিরল, বয়লারের ভোঁ বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই প্রায় কাজে চলিয়া গিয়াছে; থাকিবার মধ্যে কয়েকটি প্রায়-অক্ষম বৃদ্ধবৃদ্ধা আর উলঙ্গ অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলের পাল। বৃদ্ধ মাত্র কয়েক জন—তাহারা উপু হইয়া ঘোলাটে চোখের অবস অর্থহীন দৃষ্টি সম্মুখে মেলিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধা কয়েক জন জটলা পাকাইয়া রৌদ্রের আশায় বসিয়া পরস্পরের অপরিচ্ছন্ন মাথা হইতে উকুন বাছিয়া নখের উপর রাখিয়া নখ দিয়া টিপিয়া মারিতেছে, আর মুখে করিতেছে—হুঁ। ঐ হুঁ না করিলে নাকি উকুনের স্বর্গলাভ হইবে না। মধ্যে মধ্যে দুর্দ্দান্ত চীৎকার করিয়া ছেলের দলকে গাল দিয়া ধমকাইতেছে,

—আরে বদমাসে-হারামজাদে, তেরি কুছ না করে হাম—

—ই-হারামজাদী বুঢ্‌ঢী,—তেরি দাঁত তোড় দেছে হাম। বলিয়া ছেলের দল দাঁত বাহির করিয়া ভ্যাঙচাইয়া দিতেছে। একটা বুড়ী একটি ক্রন্দনমানা শিশুকন্যাকে আদর করিতেছিল—

"এ হামার বেটী রাণী, সাতপরানী, বেটা লাঙাড়, পুতা কানি"—বেটী হামার ভাগ্‌মানী!—এ—এ—এ! অর্থাৎ ও আমার রাণী মেয়ে, তার সংসারে সাতটি প্রাণী, তাহার মধ্যে পুত্রটি খোঁড়া, পৌত্রটি কানা; আহা—আমার বেটী বড় ভাগ্যবতী।

বিমলবাবু তাহার আদরের ছড়া শুনিয়া হাসিলেন। বৃদ্ধা মেয়েটিকে বলিল—আরে, আরে, চুপ হো যাও বেটিয়া, মালিক যাতা হ্যায়—মালিক! আরে—বা-প-রে!

বয়স্ক ছেলেগুলি বিমলবাবুকে দেখিয়া শান্ত হইয়া দাঁড়াইল, ছোট ছোট হাত তুলিয়া সেলাম করিয়া বলিল—সেলাম মালেক!

বিমলবাবু ছোট্ট একটি টুকরা হাসি হাসিয়া কেবল ঘাড় নাড়িলেন। কয়টা অল্পবয়স্ক শিশু পরম আনন্দভরে এ উহার মাথায় পথের ধুলা ঢালিয়াই চলিয়াছে। একটা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশু বিচিত্র খেয়ালে পথের ধুলার উপরে শুইয়া ধপ ধপ করিয়া ধুলার উপর পিঠ আছড়াইয়া ধুলার রাশি উড়াইয়া আপন মনেই হাসিতেছিল। ধুলার জন্য বিরক্ত হইয়া হাতের ছড়িটা দিয়া বিমলবাবু তাহাকে একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন—এই!

ছেলেটা তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিয়া বলিল—সেলাম মালিক!

হাসিয়া বিমলবাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন। বিমলবাবু পিছন ফিরিতেই ছেলেটা জিভ কাটিয়া দাঁত বাহির করিয়া কদর্য্য ভঙ্গিতে তাঁহাকে ভ্যাঙচাইয়া দিল, তার পর আবার লাফ দিয়া পথের ধুলায় পড়িয়া ধুলার উপর পিঠ ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল—আলবৎ করেছে—আলবৎ করেছে, ই—ই—ই—বলিয়া আবার এক বার ভ্যাঙচাইয়া দিল।

কুলী-বস্তি পার হইয়াই কারখানার পত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

এ দিকের চরটাকে আর সে চর বলিয়া চেনাই যায় না। সে বেনাঘাসের জঙ্গল আর নাই, চরের এদিকটা এক বারে খুঁড়িয়া ফেলিয়া আবার সমান করিয়া ফেলা হইয়াছে; লালচে পলিমাটি এদিকটায় তক তক করিতেছে, মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে দূর্ব্বা ও মুথো ঘাসের পাতলা আস্তরণ টুকরা টুকরা সবুজ ছোপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারই মধ্যে বড় বড় চতুর্ভুজ আঁকিয়া লাল কাঁকরের অনেকগুলি রাস্তা এদিক ওদিকে চলিয়া গিয়াছে। বড় রাস্তাটা এখানে আসিয়া সুদীর্ঘ-শালগাছের মত যেন চারি দিকে সোজা সোজা শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে।

এমনি একটা চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের উপর প্রকাণ্ড একটা টিনের শেড তৈয়ারী হইতেছে। মোটা মোটা লোহার কড়ি ও বর্গায় ছাঁদিয়া বাঁধিয়া কঙ্কালটা আর শেষ হইয়া আসিয়াছে। শেডের চালের উপর কুলীরা কাজ করিতেছে, লোহার উপর প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা দিতেছে সেই উপরে দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে। লোহার উপরে হাতুড়ির আঘাতের প্রচণ্ড শব্দ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া দুই তিন দিক হইতে প্রতিধ্বনিতে আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

একটা লরী হইতে লোহার কড়ি-বর্গা নামানো হইতেছিল। স্টেশন হইতে লোহালক্কড় এই লরীতেই আসিতেছে। লোহার একটা স্তূপ হইয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রপাতিও অনেক আসিয়া গিয়াছে, নানা আকারের যন্ত্রাংশ পৃথক পৃথক করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। এক পাশে পড়িয়া আছে দুইটা বিপুলকায় ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার—নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের মত। এই সব লোহালক্কড় ও যন্ত্রপাতিগুলিকে মুক্ত রোদ-বাতাসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই ঐ টিনের শেডটা তৈয়ারী হইতেছে। একেবারে মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ জমির উপর কলের বনিয়াদ খোঁড়া হইয়াছে। ঠিক তাহারই মধ্যস্থলে চিমনীটা তৈয়ারী হইতেছে। একেবারে ওপাশে লাল ইটের লম্বা কুলী-ব্যারাক। ব্যারাকটার ছাদ পিটিতে পিটিতে এ-দেশেরই কামিনেরা পিটনী কোপার আঘাতে তাল [illegible] সঙ্গে গান গাহিতেছে।

বিমলবাবু একের পর একটি কর্য্যিয়া কাজের তদারক করিয়া ফিরিলেন। ফিরিবার পথে বাংলোয় আসিয়া না উঠিয়া শ্রীবাসের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীবাসের ছেলে গণেশকে আর সে গণেশ বলিয়া চেনাই যায় না। চৌকা ঘর কাটা রঙীন লুঙ্গী পরিয়া, ঘাড় একেবারে কামাইয়া চৌদ্দ-আনা-দুই আনা ফ্যাশানে চুল ছাঁটিয়া, গায়ে একটা পুলওভার পরিয়া গণেশ একেবারে ভোল পাল্টাইয়া ফেলিয়াছে। দোকানেরও আর সে চেহারা নাই। পাকা মেঝে, পাকা বারান্দা, দোকানে হরেক রকমের জিনিস। লোহার তারের বাণ্ডিল, পেরেক গজাল, গরুর গাড়ীর চাকার হালের জন্য লোহার পাটি, লোহার শলি, গরুর গলার দড়ির পরিবর্ত্তে লোহার শিকল, জানালায় দিবার জন্য লোহার শিক—মোট কথা লোহার কারবারই বেশী। অদূরে একটা গাছের তলায় এক জন পশ্চিম দেশীয় মুসলমান একটা গরুকে দড়ি বাঁধিয়া ফেলিয়া পায়ে নাল ঠুকিতেছে। কয়েক জন গাড়োয়ান তাহাদের গরুগুলি লইয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার ধারে এক-একটা ইট পাতিয়া পশ্চিম দেশীয় নাপিত চুল ছাঁটিতে বসিয়াছে। গণেশ বেচিতেছিল লোহার তার; একটি সাঁওতালের মেয়ে কিনিতেছে। গণেশ বলিতেছে—আরে বাপু, আলনা করবার জন্য যে নিবি, তা, ক-হাত চাই সে মাপ এনেছিস্?

মেয়েটি ভাল বুঝিতে পারিতেছে না, বলিতেছে—মাপ কি বুলছিস্ গো?

—কি বিপদ! ছোট হ'লে তখন করবি কি? তখন এসে আবার কাঁউমাউ করবি।

—হঁ। কি কাঁউমাউ করলম গো?

—কি বিপদ! কাপড় টাঙাবার জন্যে আলনা করবি তো?

—হঁ।

ঠিক এই সময়েই বিমলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন। গণেশ ব্যস্ত হইয়া তার ফেলিয়া আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—হুজুর! তাড়াতাড়ি সে একখানা চেয়ার আনিয়া পাতিয়া দিল; বিমলবাবু বসিলেন না, চেয়ারখানার উপর একটা পা তুলিয়া দিলেন, বলিলেন—শ্রীবাস কোথায়?

—আজ্ঞে, বাবা এখনও আসেন নি। কাল ওপারে বাড়ী—

—হঁ! তুমিই শোন তা হ'লে। মাঝি বেটারা আবার গোলমাল করতে আরম্ভ করেছে। ভিতরের ব্যাপারটা একটু খোঁজ নাও দেখি! শুনছি—ইন্দ্র রায় নাকি সব বেগার ধরেছেন। আসল কথাটা আমাকে জানিয়ে আসবে।

বিমলবাবু ফিরিলেন।

আপিসে বসিয়া বিমলবাবু ডাকিলেন—যোগেশবাবু!

যোগেশ মজুমদার আসিয়া দাঁড়াইল, বিমলবাবু বলিলেন, শ্রীবাসের হ্যাণ্ডনোটটা—আপনার দরুন যেটা—সেটার বোধ হয় তিন বছর প্রায় হয়ে এল, না?

যোগেশ মজুমদার ফৌজদারী মামলার সময় শ্রীবাসকে ঋণ দিয়াছিল, তাহার দরুণ হ্যাণ্ডনোটটা বিমলবাবু কিনিয়াছেন।

মজুমদার বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর তামাদীর সময় হয়ে এল। তা ছাড়া, আপনার নিজেরও দুখানা হ্যাণ্ডনোট—

—সে থাক। এখন এইটের জন্যেই একটা উকীলের নোটিশ দিয়ে দিন।

বিমলবাবু নিজেও শ্রীবাসকে ঋণ দিয়েছেন দুই বার। মজুমদার বলিল—ওকে ডেকে—

বাধা দিয়া বিমলবাবু বলিলেন—না। ঠিক প্রণালী মত কাজ ক'রে যান। এর পর যা কথা হবে, সে উকীলের মারফতেই হবে। উকীলকে আমাদের সর্ত্তটা জানিয়ে দেবেন, চরের এক-শ বিঘে জমিটা ন্যায্য মূল্যেই আমি পেতে চাই।

মজুমদার বলিল—যে আজ্ঞে।

বিমলবাবু বলিলেন—আর এক কথা। এক বার ইন্দ্র রায়ের কাছে আপনি যান। তাঁকে বলুন যে, আমার শরীর খারাপ ব'লেই আমি যেতে পারলাম না। কিন্তু

তিনি যে জমিদার স্বরূপে সাঁওতালদের বেগার ধরছেন, এতে আমার আপত্তি আছে। ওরা আমার দাদন খেয়ে রেখেছে। আমার দাদন-দেওয়া কুলী বেগার ধরলে আমার কাজের ক্ষতি হয়। বুঝলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা—তা হ'লে আপনি যান ওঁর কাছে। মজুমদার চলিয়া গেল। বিমলবাবু কাগজ-কলম লইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরই এক জন চাপরাসী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, বলিল—এসেছে !

মুখ না তুলিয়াই বিমলবাবু বলিলেন—নিয়ে আয়।

আসিয়া প্রবেশ করিল যে ব্যক্তি, সে এখানকার নূতন মদের দোকানের ভেণ্ডার। লোকটি একটি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বিমলবাবু চাপরাসীটাকে বলিলেন—যা তুই এখান থেকে।

চাপরাসীটা চলিয়া গেল। বিমলবাবু বলিলেন—দেখ, আমার জন্যেই তোমারি এ দোকান।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ে কৃতজ্ঞতায় শতমুখ হইয়া বলিয়া উঠিল—দেখেন দেখি—দেখেন দেখি, হুজুরই আমার মা-বাপ—

—হ্যাঁ। বাধা দিয়া বিমলবাবু বলিলেন—হ্যাঁ। একটি কাজ তোমাকে করতে হচ্ছে। সাঁওতালদের মাথায় একটা কথা তোমাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। কৌশলে। বুঝেছ ?—দরজাটা ভেজিয়ে দাও।

২৪

মজুমদার এই দৌত্য লইয়া ইন্দ্র রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইবার কল্পনায় চঞ্চল হইয়া পড়িল। ইন্দ্র রায়ের দাম্ভিকতা-ভরা দৃষ্টি, হাসি, কথা সুতীক্ষ্ণ শায়কের মত আসিয়া তাহার মর্ম্মস্থল যেন বিদ্ধ করে। আর তাহার নিজের বাক্যবাণগুলি যত শাণ দিয়া শাণিত করিয়াই সে নিক্ষেপ করুক, নিক্ষেপ-শক্তির অভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে নতশির হইয়া রায়ের সম্মুখে যেন প্রণত হইয়াই লুটাইয়া পড়ে। তবে এবার পৃষ্ঠাংশে আছেন লক্ষ রথী বিমলবাবু, বিমলবাবুর আজিকার এই বাক্য-শায়কটি শুধু সুতীক্ষ্ণই নয়—শক্তির বেগে তাহার গতি অকম্পিত এবং সোজা! মজুমদার একটি সভয় হিংস্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নানা কল্পনা করিতে করিতেই সে চর হইতে নদীর ঘাটে আসিয়া নামিল। চরের উপর নদীর মুখ পর্য্যন্ত রাস্তাটা এখন পাকা হইয়া গিয়াছে, কালির বুকেও এখন গাড়ীর চাকায় চাকায় বেশ একটি চিহ্নিত রাস্তা রায়-হাটের খেয়াঘাটে গিয়া উঠিয়াছে। ওপার হইতে মজুর-শ্রেণীর পুরুষ ও মেয়েরা দল বাঁধিয়া চরের দিকেই আসিতেছে। কলের ইমারতের কাজেই ইহারা এখন খাটে, আগের চেয়ে মজুরিও কিছু বাড়িয়াছে। কতক-গুলি চাষীও বেগুন, মূলা, শাকসজী বোঝাই ঝুড়ি মাথায় চরের দিকে আসিতেছে। রায়হাটের চেয়ে জিনিষপত্র চরেই এখন কাটতি হয় বেশী, চরের মিস্ত্রী-মজুরেরা দরদস্তুর করে কম, কেনেও পরিমাণে বেশী। এপারে যাহারাই আসিতেছিল তাহারা সকলেই মজুমদারকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইল, মজুমদারই এখন কলের ম্যানেজার। রায়হাটের ঘাটে আসিয়া মজুমদার বিরক্ত হইয়া উঠিল—পথে এক হাঁটু ধুলা হইয়াছে। চারি পাশে দীর্ঘকালের প্রাচীন গাছের ঘন ছায়ার মধ্যে হিম যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। পথের উপর মানুষ-জনও নাই। মজুমদার চরের ম্যানেজারীত্বের গৌরবের গোপন অহঙ্কার নির্জ্জনতার সুযোগে প্রকাশ করিয়া ফেলিল—বেশ জোর গলাতেই, আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল—মা-লক্ষ্মী যখন ছাড়েন, তখন এই দশাই হয়! হুঃ—অতি দর্পে হতা লঙ্কা—অতিমানে চ কৌরবাঃ।

পথের দুই পাশে প্রাচীন কালের নৌকার মত বাঁকানো চালকাঠামো-যুক্ত কোঠা ঘরগুলির দিকে চাহিয়াও তাহার ঘৃণা হইল। বলিল—হুঃ, কি সব জঘন্য চালকাঠামো! সেকালের কি সবই ছিল কিম্ভূতকিমাকার! যত জবরজঙ্—হাতীশুঁড়—পরী—সিংহী—এই দিয়ে আবার বাহার করেছে! ঘর করবে বাংলা, চাল—সোজা; একেবারে পাকা দালান ঘরের মত!

মোট কথা রায়হাটের সমস্ত কিছুকে ঘৃণা করিয়া ব্যক্ত করিয়া ইন্দ্র রায়ের সম্মুখীন হইবার মত মনোবৃত্তিকে সে দ[illegible]ছিল।

নায়েব-সেরেস্তার সম্মুখে একখানা সেকেলে ভারী কাঠের চেয়ারে বসিয়া ইন্দ্র রায় জমিদারী কাজকর্ম্মের তদারক করিতেছিলেন। নায়েব ঘোষ তক্তাপোষের উপর একটি সেকেলে ডেস্কের উপর খাতা খুলিয়া দেখিয়া রায়ের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল। তাহার পাশে ঘোষের ভাইপো কতকগুলি খাতা লইয়া বসিয়া আছে। ঘোষের ভাইপোকে রায় চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। মনের গোপন ইচ্ছা—এইবার তিনি ধীরে ধীরে চক্রবর্ত্তীদের সংশ্রব হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন।

মজুমদার ঘরে ঢুকিয়াই নমস্কারের ভঙ্গিতে প্রণাম করিয়া বলিল—এক বার মুখুজ্জে সায়েব আপনার কাছে পাঠালেন।

বিমলবাবু এখানে মুখার্জ্জী সাহেব নামেই খ্যাত হইয়াছেন, বাবু নামটা তিনি অপছন্দ করেন, বলেন, ওটা গালাগালি! চরের কুলী কামিন ও রায়হাটের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে তিনি মালিক, হুজুর। কর্ম্মচারী ও অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সাধারণের নিকট তিনি মুখার্জ্জী সাহেব।

ইন্দ্র রায়ের পাশে আরও খান তিনেক চেয়ার খালি পড়িয়াছিল, মজুমদার তাহার কথার ভূমিকা শেষ করিয়া ঐ চেয়ারগুলার দিকেই দৃষ্টি ফিরাইল; ইন্দ্র রায় সাদরে সম্ভাষণ জানাইয়া, ঘোষের তক্তাপোষের দিকে আঙুল দেখাইয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া বলিলেন—ব'স, ব'স।

মজুমদার একটু ইতস্তত করিয়া তক্তাপোষের উপরেই বসিল। রায় তাঁহার অভ্যস্ত মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন—কি সংবাদ তোমার মুখার্জ্জী সাহেবের, বল!

—আজ্ঞে!—মাথা চুলকাইয়া যোগেশ মজুমদার বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল—আজ্ঞে আমাকে যেন অপরাধী করবেন না—

ইন্দ্র রায়ের ঠোঁটের প্রান্তে যে হাসির রেখাটুকু ফুটিয়া উঠে, সেটা অভিজাতসুলভ অভ্যাস-করা একটা ভঙ্গি মাত্র, হাসি নয়; মজুমদারের বিনয়ের ভূমিকা দেখিয়া কিন্তু রায় এবার সত্য সত্যই একটু হাসিলেন। বুঝিলেন, অস্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বে মজুমদারের এটি প্রণাম-বাণ প্রয়োগ! সেই হাসিটি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—দূত চিরকালই অবধ্য; তোমার ভয় নেই—নির্ভয়ে তুমি মুখার্জ্জী সাহেবের বক্তব্য ব্যক্ত কর।

রায়ের কথার সুরে অর্থে মজুমদার তাঁহার শক্তি অনুমান করিয়া আরও সংহত এবং সংযত হইয়া উঠিল, আরও খানিকটা বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল,—তিনি নিজেই আসতেন! তা তাঁর শরীরটা—; মজুমদার ভাবিতেছিল কোন্ অসুখের কথা বলিবে!

—শরীরটায় আবার কি হ'ল তাঁর? প্রশ্ন করিয়াই রায় হাসিলেন, বলিলেন—চালুনীতে যে-কালে সমুদ্রে বাঁধা চলছে যোগেশ, সে কালে শরীরে যা হোক একটা কিছু হওয়ার আর আশ্চর্য্য কি? তোমার শরীর কেমন?

লজ্জার সহিত মজুমদার বলিল—আজ্ঞে, আমি ভালই আছি।

রায় বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে সুরু করিয়া বলিলেন—ভাল কথা, শরীর তো সুস্থই আছে, এইবার সরল অন্তকরণে স্পষ্ট ভাষায় বল তো—মুখার্জ্জী সাহেবের কথাটা কি? বাঁ হাতে গোঁফে তা দেওয়াটা রায়ের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের একটা বহিঃপ্রকাশ।

মজুমদার প্রাণপণে আপনাকে দৃঢ় করিয়া বলিল—বেশ গাম্ভীর্য্যের সহিতই আরম্ভ করিল—কথাটা চরের সাঁওতালদের নিয়ে। মানে—উনি সাঁওতালদের সব দাদন দিয়ে রেখেছেন। শ্রীবাসের কাছে ধানের বাকী বাবদ কারও বিশ, কারও পঁচিশ, দু-এক জনের চল্লিশ টাকাও ধার ছিল। শ্রীবাসের প্যাঁচালো বুদ্ধি তো জানেন, সে আবার ডেমিতে টিপছাপ নিয়ে বন্ধকী দলিল পর্য্যন্ত করে নিয়েছিল। যোগেশ একটু থামিল।

রায়ের গোঁফে তা দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মুখ-চোখ ধীরে ধীরে চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল।

মজুমদার কোন সাড়া না পাইয়া বলিল—মুখার্জ্জী সাহেব সেটা জানতে পেরেই শ্রীবাসকে ডেকে ধমক দিয়ে তার টাকা দিয়ে খতগুলি কিনে নিলেন। সাঁওতালদের বললেন, তোরা খেটে আমাকে শোধ দিবি। মজুরী থেকে দৈনিক এক আনা হিসেবে কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন তিনি।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

খ্রীষ্ট-জননী

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

বাইবেলে বর্ণিত আছে, খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে দেবদূত গেব্রিয়েল মেরীকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে খ্রীষ্ট তাঁহার সন্তানরূপে আবির্ভূত হইবেন।
এই সংবাদ শ্রবণে মেরীর মনোভাব চিত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

রায় নীরবে চিন্তাভারাতুর দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া চাহিয়াছিলেন অদৃষ্টলোকের সন্ধানে কিছু দেখা যায় না! কিন্তু অনুভব তিনি স্পষ্ট করিলেন যে জীবনপথ যেন অতি উচ্চ পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়াছে, সঙ্কীর্ণ পথ, পাশ ফিরিয়া গতি-পরিবর্ত্তনের উপায় নাই। গতি পরিবর্ত্তন করিতে গেলে—তাঁহারই পাশের যাত্রী—যে তাঁহারই হাত ধরিয়া চলিয়াছে—পঙ্গু রুগ্ন রামেশ্বর—তাহাকেই পাশের খাদে ঠেলিয়া ফেলিতে হয়। সে ফেলিতে গেলে তাঁহাকেও পড়িতে হইবে এ পাশের অতল অন্ধকারে—অধোগতির তমোলোকে! কৃতঘ্নতার নরকে!

মজুমদার বলিয়াই গেল—এখন ধরুন, এই সব দাদনের কুলী যদি আপনি আটক করেন—তা হ'লে কি ক'রে চলে বলুন!

চিন্তাকুলতার মধ্যেও কথাগুলি রায় শুনিতেছিলেন, তিনি এবার স-প্রশ্ন ভঙ্গিতে ঘোষের ভাইপোর দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি ব্যাপার রাধারমণ?

রমণ বলিল—আজ্ঞে, আটক কেন করতে যাব। তবে এখন ধান কাটার সময়, মাঝিরা আমাদের খাসের জমির ধান কাটছিল না, তাই তাদের কাটতে হুকুম দেওয়া হয়েছে। তার পর ধরুন—অগ্রাণের শেষ সপ্তাহ হয়ে গেল—এখনও রবি-ফসল বুনলে না ওরা, কেবল কলেই খেটে যাচ্ছে; সেই জন্তেই বলা হয়েছে যে আগে এ সব কর, তার পর তোমরা যা করবে, কর গে।

মজুমদার প্রতিবাদ করিয়া একটু চড়া সুরে এবার বলিয়া উঠিল—যারা ভাগীদার নয় তাদেরও আপনারা বেগার ধরেছেন খাসের জমির ধান কাটবার জন্তে!

রায়, রমণের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—বেগারও ধরা হয়েছে বুঝি?

রমণ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মজুমদার বলিয়া উঠিল—ধরা হয়েছে এবং আপনার নাম নিয়ে ধরা হয়েছে। আপনার নাম না নিলে সাহেব আমাকে পাঠাতেন না, বেগার উঠিয়ে নিতেন। সাঁওতাল-পাড়ায় সকলেই বললে—আমাদের জমিদারবাবুর হুকুম—রায় হুজুর হুকুম দিলে—বেগার দিতে হবে! কথার সঙ্গে সঙ্গে একটি শ্লেষভরা হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তে রায়ের মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বুজিয়া স্থির ভাবে বসিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তারা—তারা! মা! সে কণ্ঠস্বর ধীর, এবং প্রশান্ত; সারা ঘরটা যেন থম থম করিয়া উঠিল! পরমুহূর্ত্তেই রায় নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। সজাগ হইয়া বাঁ হাতে আবার গোঁফে তা দিতে দিতে রায় বলিলেন—তার পর!

মজুমদার শঙ্কিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে!

হাসিয়া রায় বলিলেন—এখন মুখার্জ্জী সাহেবের বক্তব্যটা কি?

—আজ্ঞে বেগার নিতে গেলে আমাদের কি ক'রে চলে বলুন? তা ছাড়া, ভেবে দেখুন—বেগার প্রথাটাও হ'ল বে-আইনী।

—ও! আইন এখন কোম্পানীর। না? কথাটা আমার স্মরণ ছিল না! দাঁড়ুনে আইনটা অবিশ্যি কোম্পানীর—সুতরাং ওটা চলবে!

মজুমদার কথাটার সম্যক্ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিত ভাবেই বলিল—আজ্ঞে?

—তোমার মুখার্জ্জী সাহেবকে ব'লো, তিনি বুঝবেন, তুমি বুঝবে না। আরও ব'লো আমাদের জমিদারীর সনন্দ বাদশাহী আমলের,—বেগার ধরার অভ্যেস আমাদের অনেক দিনের। কেউ ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায়? বেগার আমরা চিরকাল ধরে আসছি—ধরবও।

তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন—দরকার হ'লে তোমার মুখার্জ্জী সাহেবকেও বেগার দিতে হবে হে! চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে কাজকর্ম হ'লে ওঁকেও আমরা কোন কাজে লাগিয়ে দেব। কাজ তো নানা ধারার আছে!

মজুমদার সুযোগ পাইয়া চট্ করিয়া বলিয়া উঠিল—কাজ তো হাতের কাছে, আপনি ইচ্ছে করলেই তো লেগে যায়। উমা মায়ের সঙ্গে অহীনবাবুর বিয়েটা এইবার লাগিয়ে দিন।

রায় হাসিয়া এবার বলিলেন—ছেলেমেয়ে থাকলেই বিয়ের কল্পনা হয় মজুমদার, পাত্রপক্ষ-পাত্রীপক্ষ তো করেই [illegible] আবার পাড়াপড়শীতেও পাঁচ রকম

ভাবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ভগবানের হাতে—ভগবানের দয়া যদি হয় তবে হবে বইকি। সে হ'লে তুমি জানতে পারবে সকলের আগে। যেই অহীনের শ্বশুর হোক তাকে আশীর্ব্বাদের সময় তোমাকে একটা শিরোপা দিতেই হবে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বহুকালের প্রাচীন কর্ম্মচারী তুমি।

শব্দার্থে 'শিরোপা' 'প্রাচীন কর্ম্মচারী' শব্দগুলি ক্ষুরধার—মজুমদারের মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইবার কথা। কিন্তু রায়ের কণ্ঠস্বরে সুরের গুণ ছিল আজ অন্যরূপ; আঘাত করিবার জন্য ব্যঙ্গ-শ্লেষে নিষ্ঠুর গুণ টানিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি ছিল না; অদৃষ্টবাদী মনের দৃষ্টি আপনার ইষ্টদেবীর চরণপ্রান্তে নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি কথা বলিতেছিলেন। মজুমদার আজ আহত না হইয়াও সে সুরের কোমল স্পর্শে বিচলিত এবং লজ্জিত না হইয়া পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সেও এবার অকৃত্রিম সরলতার সহিতই বলিল—আজ্ঞে বাবু, এই চরের সাঁওতালদের ব্যাপারটা কি কোন রকমে আপোষ করা যায় না?

রায় বলিলেন—কার সঙ্গে আপোষ যোগেশ? বিমলবাবুর সঙ্গে? রায় হাসিলেন।

মজুমদার বলিল—লোকটি বড় ভয়ানক বাবু! ধর্ম্ম-অধর্ম্ম কোন কিছু মানেন না। আর লোকটির কূটবুদ্ধিও অসাধারণ।

রায় আবার হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

মজুমদার বলিল—সর্দ্দার মাঝির নাতনী ওই সারী মাঝিনের ব্যাপারে আমরা তো ভেবেছিলাম সাঁওতালরা একটা হাঙ্গামা বাধাবে বুঝি! কিন্তু এমন খেলা খেললে মশায় যে কমল আর সারীর স্বামীই হ'ল দেশত্যাগী, আর সমস্ত সাঁওতাল হ'ল বিমলবাবুর পক্ষ। তারা কথাটি কইলে না। আর কি জঘন্য রুচি লোকটার!

রায় বলিলেন—ওতে আর ভয় পাবার কি আছে মজুমদার! ও খেলা আমাদের পুরনো হয়ে গেছে। আগেকার কালে কর্ত্তারা ওদিকে ভীষণ খেলা খেলে গেছেন। এ খেলা ব্যবসায়ীর পক্ষে নূতন। মা লক্ষ্মীর কপালই ওই, পিছনে পিছনে অলক্ষ্মী ঢুকবেই—বাণিজ্য-লক্ষ্মীর ঘরে সতীন ঢুকেছে অলক্ষ্মী। যাক গে, ও কথাটা বাদই দাও।

মজুমদার আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—ঝগড়া-বিবাদটা না হ'লেই ভাল হ'ত বাবু।

—ঝগড়া-বিবাদ? রায় গোঁফে তা দিয়া হাসিয়া বলিলেন—ঝগড়া-বিবাদ করতে তা হ'লে মুখার্জ্জী সাহেব বদ্ধপরিকর, কি বল?

—হ্যাঁ—তা—মানে যে রকম সুরে কথা বললেন—ভাবভঙ্গি দেখে আমার যা মনে হ'ল তাতে—; মজুমদার ইঙ্গিতে কথাটা শেষ করিয়া নীরব হইয়া গেল।

রায় বলিলেন—জান তো, আগেকার কালে যুদ্ধের আগে এক রাজা আর এক রাজার কাছে দূত পাঠাতেন; সোনার শেকল আর খোলা তলোয়ার নিয়ে আসত সে দূত। যেটা হোক একটা নিতে হ'ত। তা তোমার মুখার্জ্জী সাহেবকে ব'ল—খোলা তলোয়ারখানাই নিলাম—শেকল নেওয়া আমাদের কুলধর্ম্মে নিষেধ, বুঝেছ!

কথা বলিতে বলিতে রায়ের চেহারায় একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল; ব্যঙ্গহাস্যে মুখ ভরিয়া উঠিয়াছে—গোঁফের দুই প্রান্ত পাক খাইয়া খাইয়া খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টিই হইয়া উঠিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। উৎফুল্ল, উগ্র সে দৃষ্টির সম্মুখে সব কিছু যেন তুচ্ছ, কপালে সারি সারি তিনটি বলীরেখা অবরুদ্ধ ক্রোধের বাঁধের মত জাগিয়া উঠিয়াছে।

মজুমদার আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, একটি প্রণাম করিয়া সে বিদায় হইল।

রায় বলিলেন—ঘোষ, একখানা নতুন ফৌজদারি আইনের বইয়ের জন্যে কলকাতায় লেখ দেখি, আমাদের অমলের মামাকেই লেখ—সে যেন দেখে ভাল বই যা, তাই পাঠায়। আমাদের খানা পুরনো অনেক দিনের।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যেই খানিকটা পায়চারি করিয়া বলিলেন—এক পা যদি বিরোধের দিকে এগোয়, সঙ্গে সঙ্গে কাটিং-এ বুকে বাঁধ দিয়ে যে পাম্প বসিয়েছে মুখে সেটা বন্ধ করে দাও। চর বন্দোবস্তির সঙ্গে নদীর কিছু নেই।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্র রায় ডাকিলেন—হেমাঙ্গিনী!

কণ্ঠস্বর শুনিয়া হেমাঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন, স্বামীর এমন কণ্ঠস্বর হেমাঙ্গিনী অনেক দিন শোনেন নাই, দ্রুতপদে তিনি উপরে আসিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—এই বয়সে এতকাল পরে অসময়ে আবার আরম্ভ করলে? ছি!

অর্থাৎ মদ। হেমাঙ্গিনীর তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি প্রতারিত হয় নাই। রায় চিন্তা করিতে করিতে এক পাত্র কারণ পান করিয়াছেন।

রায়ের মুখ থমথমে হইয়া উঠিয়াছে—সদ্য ঘুম-ভাঙা ব্যক্তির মত। রায় হাসিলেন, বলিলেন—বড় চিন্তায় পড়েছি হিমু! সামনে মনে হচ্ছে অগ্নিপরীক্ষা!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—মুখ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন কোন সুখবর পেয়েছ।

—না না হিমু, চরের কলের মালিকের সঙ্গে দাঙ্গা বাধবে বলে মনে হচ্ছে। লোকটা আজ শাসিয়ে লোক পাঠিয়েছিল। তোমায় একবার সুনীতির কাছে যেতে হবে। ব্যাপারটা তাকে জানানো দরকার। বলবে কোন ভয় নেই তার, আমি দাঁড়িয়ে আছি সামনে!

* * *

মজুমদার ভারাক্রান্ত মন লইয়াই সংবাদ দিতে চলিয়াছিল। নদীর ঘাটে আবার যখন সে নামিল তখন ওপারে বয়লারে বারোটার ছুটির সিটি বাজিতেছে। কলরবে কোলাহলে চরটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এপার হইতে চরটাকে বিচিত্র মনে হয়। কালিন্দীর কালো জলধারার কূলে সবুজ আস্তরণের মধ্যে রাঙা পথের ছক, নূতন ঘরবাড়ী, মানুষের চাঞ্চল্য কোলাহল, কুলীদের গান—অদ্ভুত! চরটা যেন চঞ্চলা কিশোরীর মত কালিন্দীর জলদর্পণের দিকে চাহিয়া অহরহ প্রসাধনে মত্ত।

এ পারে রায়হাট নিস্তব্ধ; সমস্ত গ্রামখানা প্রাচীন কালের গাছে গাছে আচ্ছন্ন—গাছের মাথায় রাশি রাশি ধুলা—কয়খানা প্রাচীন কালের দালানের পুরাতন ভাঙা চিলেকোঠা কেবল গাছের উপরেও জাগিয়া আছে। ও পারের চরের তুলনায় মনে হয় যেন কোন লোলচর্ম্মা পলিতকেশা জরতী ঘোলাটে চোখের স্তিমিত অর্থহীন দৃষ্টিতে পরপারের দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ নির্ব্বাক বসিয়া আছে।

মজুমদার প্রত্যক্ষ ভাবে এমন করিয়া না বুঝিলেও, ভারাক্রান্ত মনে ব্যথা পাইল। সে যখন গিয়াছিল তখন ইন্দ্র রায় ও চক্রবর্ত্তীদের উপর ক্রোধবশতঃ রায়হাটকেও ঘৃণা করিয়াছিল—কিন্তু ফিরিবার পথে ইন্দ্র রায়ের সহৃদয়তার উত্তাপে তাহার মন হইয়াছে অন্যরূপ—সে এবার রায়হাটের জন্য বেদনা অনুভব করিল। মাথা নীচু করিয়াই নদীর বালি ভাঙিয়া সে চলিয়াছিল; সহসা তীক্ষ্ণ চিলের মত গলায় কে তাহাকে বলিল—কি রকম? কি হ'ল মশায়? কি বললে চামচিকা পক্ষী—আড়াই হাজারী জমিদার?

মজুমদার মাথা তুলিল, সম্মুখেই চর হইতে ফিরিতেছিল অচিন্ত্যবাবু, হরিশবাবু, শূলপাণি। প্রশ্নকর্ত্তা তীক্ষ্ণকণ্ঠ অচিন্ত্যবাবু। অচিন্ত্যবাবু বিমলবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর হইতেই ইন্দ্র রায়ের নামকরণ করিয়াছেন—চামচিকা পক্ষী, আড়াই হাজারী জমিদার। মজুমদার বলিল—ছি অচিন্ত্যবাবু, রায়মশাই আমাদের এখানকার মানী লোক—

শূলপাণি আসিবার পূর্ব্বেই গাঁজা চড়াইয়া আসিয়াছিল, সে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—মানী লোক! কে হে? ইন্দ্র রায়? মরে যাই আর কি! বলি আমরাও তো জমিদার হে—আমরাই বা কিসে কম?

মজুমদার বলিল—দেখ শূলপাণি, বাজে [illegible] ব'কো না। দেখ, তুমি মুখার্জ্জী সায়েবের তাঁবেদার—আর রায় হলেন তোমার সায়েবের জমিদার।

অচিন্ত্যবাবু এক কালে চাকুরীজীবী ছিলেন—মজুমদার তাঁহার অপেক্ষা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এ-জ্ঞান তাঁহার টনটনে—তিনি ধাঁ করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—কি বললেন রায় মশায়?

—বলবেন আর কি! [illegible] বলবার তাই বললেন। বললেন—বেগার ধরা আমাদের অনেক কালের অভ্যেস, ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায়! তার পর হাসতে হাসতেই

বললেন অবিশ্যি যে, এ তো সাঁওতাল—চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে কাজ হ'লে তোমাদের সায়েবকেও বেগার ধরব হে! কাজ তো অনেক রকম আছে।

অচিন্ত্যবাবু পরম বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—পাগল তা হ'লে! কিন্তু এইবার রায় ঠকবেন। জমিদারী আর সায়েবী বুদ্ধিতে অনেক তফাৎ! মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে এইবার রায় অপমান হবেন।

মজুমদার বলিল—না না, ও কথাটা ঠিক নয় হে!

—মানে?

—আজ যা বললেন, তাতে বুঝলাম ও বিয়ের কথাটা ঠিক নয়। বললেন আমাকে—ও ছেলেমেয়ে থাকলেই কথা ওঠে যোগেশ—কিন্তু তা হ'লে কি তুমি জানতে পারতে না? চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পুরনো কর্ম্মচারী তুমি! তবে ভগবানের ইচ্ছে হয় হবে!

—আপনার মাথা! অচিন্ত্যবাবু প্রচণ্ড অবজ্ঞাভরে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—আপনার মাথা। আমি নিজে জানি—কথা উঠেছিল। রায়ের ছেলে অমল অহীন্দ্রকে পর্য্যন্ত ধরেছিল। এখন আসল ব্যাপার—রামেশ্বরবাবু আর ও বাড়ীর মেয়ে ঘরে ঢোকাবেন না। এ যদি না-হয় আমার কান দুটি কেটে ফেলব আমি।

হরিশ রায়ের চোখ দুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল! ভ্রূদুটি ঘন ঘন নাচিতে আরম্ভ করিল, ঘাড়টি ঈষৎ দোলাইয়া সে বলিয়া উঠিল—এ্যাই ঠিক কথা! অচিন্ত্যবাবু ঠিক বলেছেন!

শূলপাণি বার-বার ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হুঁ-হুঁ, সে বাবা কঠিন ছেলে—রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী আর কেউ নয়। তারপর হি-হি করিয়া হাসিয়া অদৃশ্য ইন্দ্র রায়কে সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গভরে বলিল—দাও বাবা, দাও, মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে চরের ওপর নগর বসাও।

কথাটা মজুমদারেরও মনে ধরিল, ইন্দ্র রায়ের সহৃদয়তায় যে সাময়িক কোমলতা তাহার মনে জাগিয়াছিল—কুয়াশার মত সেটা তখন মিলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

হরিশ রায় চুপি চুপি বলিল—এই দেখ, আমাদের জ্ঞাতি হ'লে হবে কি? ছোটরায়-বাড়ীর ওই মেয়েগুলো যাকে বলে 'বংশগত—তাই। আমার কাছে রায়-বংশের কুর্সীনামা আছে—দেখিয়ে দোব, প্রতিপুরুষে ওদের এই কেচ্ছা, বুঝেছ!

সেই দু-পহরের রৌদ্র মাথায় করিয়া নদীর বালির উপরেই তাহাদের মজলিস জমিয়া উঠিল; সকলেরই মনোভাণ্ডে পরনিন্দার রস রৌদ্রতপ্ত তাড়ির মতই ফেনাইয়া গাঁজিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা না-হইতেই কথাটা গ্রামময় রটিয়া গেল।

ছোটরায়বাড়ীতে কথাটা আসিয়া কাছারি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া গেল; ইন্দ্র রায় কাছারিতে ছিলেন না, অন্দরে নিয়মিত সন্ধ্যা-তর্পণে বসিয়াছিলেন; কথাটা শুনিলেন রায়ের নায়েব ঘোষ। পথের উপর দাঁড়াইয়া অতিমাত্রায় ইতরতার সহিত রায়-বংশের নিঃস্ব নাবালক-টির অভিভাবিকা উচ্চকণ্ঠে কথাটা ঘোষণা করিতেছিল। ঘোষের সর্ব্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরিয়া গেল, কিন্তু উপায় ছিল না, ঘোষণাকারিণী স্ত্রীলোক! রায়কে কথাটা শুনাইতেও তাহার সাহস হইল না। সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রায়ের সান্ধ্য উপাসনা তখন অর্দ্ধসমাপ্ত; দ্বিতীয় পাত্র কারণ পান করিয়া তিনি জপে বসিয়াছেন। মনে মনে ইষ্টদেবীকে বারবার ডাকিতেছিলেন, মা আমার রণরঙ্গিণী মা! ধনী মুখার্জ্জীর সহিত দ্বন্দ্ব-সম্ভাবনায় বহুকাল পরে গোপন উত্তেজনা-বশে তাঁহার আজ ঐ রূপ ওই নামটিই কেবল মনে পড়িতেছে!

সহসা বাড়ীর উঠানে কাংস্যকণ্ঠে কে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—হায় হায় গো! মরে যাই, মরে যাই! আহা গো! 'পিঁড়ি পেতে করলাম ঠাঁই, বাড়াভাতে পড়ল ছাই।' দিলে তো চক্রবর্তীরা নাকে ঝামা ঘষে! হয়েছে তো! নাবালক শরীককে ফাঁকি দেওয়ার ফল ফলল তো!

রায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—পরক্ষণেই আপনাকে তিনি সংযত করিলেন—প্রশান্ত মুখে ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

নীচে হেমাঙ্গিনীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া ভঙ্গি

সহকারে নাবালকের অভিভাবিকাটি তখনও বলিতেছিল— তাই বলতে এলাম, বলি এক বার বলে আসি। আমার নাবালককে যে ফাঁকি দেবে ভগবান তাকে ফাঁকি দেবে!

হেমাঙ্গিনী ব্যাপারটার আকস্মিকতায় এবং রূঢ়তায় যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তিনি শঙ্কায় বিস্ময়ে অভিভূত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—কি বলছ তুমি?

বিধবা ইতর ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—আ মরে যাই! কিছু জানে না কেউ! বলি চক্রবর্তী-বাড়ীর রাঙা বর জুটল না তো মেয়ের কপালে! দিয়েছে তো চক্রবর্তীরা হাঁকিয়ে। আঃ হায় হায় গো! ফস্কে গেল এমন সুযোগ! অকস্মাৎ তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত রূঢ় হইয়া উঠিল—যা, চর ঢুকিয়ে দিগে চক্রবর্তীদের বাড়ীতে! মেয়ে-জামায়ের জন্যে নগর বসাচ্ছে! আঃ হায় হায়! সে যেমন নাচিতে নাচিতে আসিয়াছিল তেমনি নাচিতে নাচিতেই চলিয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী চৈতন্যহারা মাটির পুতুলের মতই বসিয়া রহিলেন। উপর হইতে গভীর ধীরে কণ্ঠের ধ্বনি ভাসিয়া আসিল—তারা, তারা মা! সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনির ঝঙ্কারে সুগভীর হইয়া বাজিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পর সিঁড়ির উপরে খড়মের শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা-উপাসনার পর রায় বিশেষ প্রয়োজন না হইলে নীচে নামেন না। আজ রায় নীচে নামিলেন, হেমাঙ্গিনী কিন্তু তবুও সচেতন হইয়া উঠিতে পারিলেন না। রায় নীচে নামিয়া ডাকিলেন—হেম! এ ডাক তাঁহার আদরের ডাক!

হেমাঙ্গিনী তবু সাড়া দিতে পারিলেন না। রায় বলিলেন—ওঠ। উঠে একখানা ভাল কাপড় পর দেখি! আমার শালখানাও বের ক'রে দাও।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হেমাঙ্গিনী এবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রায় বলিলেন—একটু শীগ্‌গির কর হেম, মাহেন্দ্রযোগ খুব বেশীক্ষণ নেই।

হেমাঙ্গিনী এতক্ষণে প্রশ্ন করিলেন—কোথায় যাবে? হাসিয়া রায় বলিলেন—মা আমার আজ অনুমতি দিয়েছেন হেম। যাব রামেশ্বরের কাছে, উমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে! ভাল কাপড় পর একখানা, আমার শালখানাও দাও।

হেমাঙ্গিনীর মুখ এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সোনার উমা—সোনার অহীন্দ্র তাঁহার!—

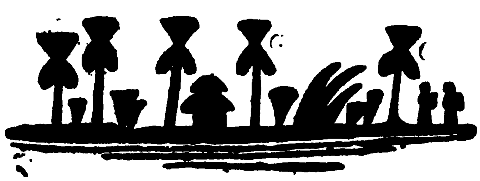
চাকর চলিয়াছিল আলো লইয়া, চাপরাসী ছিল পিছনে।

সুদীর্ঘ কাল পরে ইন্দ্ররায় চক্রবর্তী বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া ডাকিলেন—কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল—রামেশ্বর, রামেশ্বর!

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মতই একটা ধ্বনি ভাসিয়া আসিল—কে, কে, কে! বিচিত্র সে কণ্ঠস্বর।

উত্তর দিলেন—আমি ইন্দ্র!

ক্রমশঃ



দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী*

নাপিতানী-মিলন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে আমি বাঁকুড়া হইতে একখানি পুথি পাইয়াছি, তাহাতে দীন চণ্ডীদাসের অনেকগুলি পদ আছে। পুথিখানি তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র পুরুলিয়ার উকিল শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত। ইহার কতকগুলি পদ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩৪৬ সন ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষৎ-পত্রিকায় যে পালাটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম কপালী-মিলন। অর্থাৎ কপালী বেশে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কৃষ্ণ কখনও বাজিকর-বেশে, কখনও মালিনী, কখনও দোকানী-বেশে রাধিকার সহিত সাক্ষাতের প্রয়াসী। এই জন্য এই পালাগুলির সাধারণ নাম—স্বয়ং-দৌত্য। ইহার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে ভগবান্ স্বয়ং সময়ে সময়ে ভক্তের নিকট নানা ছদ্মবেশে উপস্থিত হন। যাহা হউক, এই 'কপালী-মিলন' পালাটি সম্পূর্ণ নূতন; অন্য কোথায়ও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। কিন্তু নাপিতানী-মিলন একটি পুরাতন পালা। বিষয়-বস্তু আর কিছুই নহে; কৃষ্ণ রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নাপিতানী সাজিয়াছেন। বিষয়বস্তু পুরাতন হইলেও, এই পালাটি সম্পূর্ণ নূতন। নাপিতানী-মিলন স্বয়ং-দৌত্যের পদ হিসাবে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় (৩য় শাখা ১ম পল্লব)। এই পদগুলি নীলরতনবাবুর সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস' গ্রন্থেও আছে। কিন্তু নিম্নধৃত পদগুলির সহিত তাহার একটি পদেরও মিল নাই।

পদকল্পতরু ও 'চণ্ডীদাস' গ্রন্থের নাপিতানী-মিলনের ব্যাপার সংক্ষেপে এই: একদিন রসিকচূড়ামণি নাপিতানীর বেশ ধরিয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন এবং নাপিতানী পরিচয় দিয়া শ্রীমতীকে অলক্তক পরাইলেন। নায়ক কর্তৃক নায়িকার চরণে অলক্তক পরানো ব্যাপার পুরাতন কাব্য রসে অপরিজ্ঞাত নহে:

> বিবুধৈরসি যস্য দারুণৈরসমাপ্তে
> পরিকর্মণি স্মৃতঃ।
> তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং চরণং
> নির্মিতরাগমেহি মে।
>
> —কুমারসম্ভব, ৪র্থ সর্গ

যথারীতি যাবক পরাইয়া তাহার ধারে ধারে শ্যামচন্দ্র নিজের নাম লিখিয়া দিতে ভুলিলেন না। কিন্তু নাপিতানী তাহার পারিশ্রমিক চাহিয়া বড় গোল করিয়া বসিল। সখী আসিয়া বলিলেন যে, নাপিতানী অপেক্ষা করিতেছে, সে বেতন না পাইলে যাইবে না। শ্রীমতী তখন তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সে কত চাহে? তাহার উত্তরে চতুর নায়ক জানাইয়া দিলেন যে তিনি রাধিকার স্পর্শসুখের প্রার্থী। ইহাই নাপিতানী-মিলনের কাব্যরস। দুইটি পদে এই চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের, অপরটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। অথচ এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের বলিয়া দাবী করা হইতেছে।

নিম্নের দশটি পদের মধ্যে আটটি চণ্ডীদাসের ও একটি দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায়। এই পালার মর্ম: নায়ক নাপিতানীর বেশে মহলে প্রবেশ করিয়া শ্রীমতীকে যাবক পরাইতেছেন। (ঠিক কি ভাবে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না, কারণ গোড়ার পদগুলি পাওয়া যাইতেছে না।) নিপুণ শিল্পীর মত তিনি আলতা পরাইতে পদে নানা লতাপাতা, হংস

---

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত পদাবলী কোন্ চণ্ডীদাসের, সে বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করিতেছি না। প্রবাসীর সম্পাদক।

মীন প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়া দিতেছেন। শ্রীমতী অলসের ভরে অনঙ্গমঞ্জরী নামা সখীর অঙ্গে হেলন দিয়া ঘুমাইলেন। সখীরা তাঁহাকে শীতল চামর দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। নিদ্রাভঙ্গে রাধিকা পদে বিচিত্র চিত্রাঙ্কন দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি নিজের গলার মণিময় হার উন্মোচন করিয়া নাপিতানীর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।

নবিন কিসোরি রাজার কুমারি
হার লঞা নিজ করে।
নাপিতানি গলে দিলা কুতুহলে
মনের আনন্দ সরে।

('মন সরে', 'মনের সরে', 'সুখের সরে', 'মনের আনন্দ সরে'—এই কবির কবিতায় অনেক ব্যবহৃত দেখা যায়। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী ৩৮৫—৩৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) নাপিতানী মালা উপহার পাইয়া খুশী হইল। তখন সে বলিল যে যদিও সে নীচ ও দরিদ্র, তথাপি তাহার মনে সাধ হইতেছে যে সে কিছু প্রতিদান দেয়। শ্রীমতীর সম্মতি পাইয়া ছদ্মবেশী নায়ক নিজের কণ্ঠের হেমময় হার তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। তখন শ্রীমতী বুঝিলেন এ আর কেহ নহে, কৃষ্ণই বটে।

পরশে জানিল কপট কান
কত ভেল তার অমিয় স্নান
জানল হৃদয় ভিতর আন
দোঁহে দোঁহা ভেল ভোরি তে (?)।

এখন সমগ্র পালাটি উদ্ধৃত হইতেছে :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

সন ১০৭৪ সাল

* * *

সুনাইব সব বিবরন।
আগেতে জাবক পর সুন মোর এ উত্তর
বস্ত্র ফিরি উলটি বদন।
সুনিয়া সুন্দরি রাই ফিরিয়া বসিল তাই
জাবক পরায় কুতুহলে।
লিখন করল তাথে বিচিত্রের তুলি হাথে
নখের লিখন লিখি ভালে।
দশ নখে লিখি তার যেমত পুষ্প প্রায়
বকুল কদম্ব মনোহর।
চার পাসে পাড়ি লতা তাথে দিগু করে পাতা
শুখ পাখি তাহাতে সুন্দর।
করের চৌদিক ধারে লিখি অতি মনোহরে
কুসুম চাম্পা পুষ্প আদি।
ধারে ধারে মিন তন্থু লিখনে লিখিল পুনু
নানা রেখ জথা আদি বিধী।
হস্তের লিখন দেখি রাধিকা হইলা সুখি
ভাল২ তুসিলা তথাই।
পুনরূপি পদযুগে জাবক পরাই রাগে
চণ্ডীদাস তন্থু গুনগাই।৩১১।

বেলয়ার।

ধরিয়া যুগল চরন রাতুল
জাবক দিছেন রেখা।
চৌদিকে বেড়িয়া দিলা সোভালিয়া
দেখিতে না হয় দেখা।
দিয়া দুইবার কৈল সার ধার
আর রঙ্গ মখি করে। (?)
নাপিতানি ভালে চরণ নেহারি
জাবক না দিল হেলে।
করে অনুমান নাপিতানি সন
দিলাও জাবক পায়।
দেখিতে না পাই কিবা হল্য বলে
তটস্তে রহিল ঠায়।
দিল কি না দিল জাবক রঞ্জন
তাহাই ভাবএ রামা।
মনে হয় মোর দিয়াছি জাবক
তাহাই ভাবত স্থামা।
একে সে রাতুল চরন জুগল
তাহাতে জাবক সাজে।
চরণে জাবকে এ দুই সমান
তেঞি সে বুঝিল কাজে।
দিয়াছি জাবক রেখায় সঞ্চার
দেখিতে লাগিল পুন।
জেবা অবসেস লেখত হরস
সেই সে সুখড়ধনি।
লেখি হংস জোড়ে তার ধারে ধারে
লেখিল সফরি কত।
নানা পুষ্পলতা বিকসিত পাতা
কুসুম লিখিল জত।
শ্রীহস্ত পাইতে রসিক নাগরি
আলিস হইল চিতে।
অনঙ্গ মঞ্জরির অঙ্গ হেলা দিয়া
ঘুমিল সেই সে ভিতে।
আলসে অবস হই কলেবর
ঘুমিল সুন্দরি রাই।
আর সহচরি সিতল চামর
সঘনে চালিছে তাই।
চণ্ডিদাস কহে নাপিতানি ভালে
বিচিত্র লিখন লেখি।
তবে রসবতি নবিন যুবতি
[illegible] দেখি।৩১২।

রাগ সিন্ধড়া।

সহচরিগণে সিতল চামর
ঘুমাঞি কিসোরি রাধা।
জাবক রঞ্জিয়া লিখন লেখিয়া
পুরিল মনেরি সাধা।
বৈঠল সুন্দরি রাই মুখ হেরি
সুখের নাহিক ওর।
দেখিতে দেখিতে মনের মানসে
আপনি হইলা ভোর।
রাধার অঙ্গের রূপ মনোহর
ভেদিয়া রঙ্গের ছটা।
সরুয়া বসন উপরে মদন (?)
উঘটি রূপের ঘটা।
নাসার বেসর ছুলিছে সুন্দর
অধরে মুকুতা ফল।
বেসর মুকুতা লম্বিয়া পড়িছে
জেন করে চল চল।
ঘুমাএ সুন্দরি রাজার কুমারি
অচেতন হেন বাসি।
মধুর মধুর মন্দ মৃদু মৃদু
অমিয়া সুন্দরি হাসি।
ঘুমে অচেতন রাজার নন্দিনি
দেখিল নারানি পসি।
তবু নাহি ছাড়ে বদন চন্দ্রিমা
মধুর মধুর হাসি।
রাধার অঙ্গের ছটা মনোহর
দেখি নাপিতানি মোহে।
আপন বসন ভুসন সকল
দেখল আপন দেহে।
অনঙ্গ মঞ্জরি সেহ নব রামা
আপনাকে গোর দেখে।
চণ্ডিদাস কহে অপরূপ রূপ
মোহিত জগত লোকে।৩১৩।

রাগ শ্রী।৩।

কি রূপ লখিল নএ।
কিএ কাঁচসনা কিএ গোরচনা
কিএ সৌদামিনি হএ।
কিএ সে কেতকি চম্পকবরণি
রূপ নিরখন নএ।
বর চামস্কর (?) জেমত কেশর
বিজুরি অধিক দ্যুতি।
কিবা নিরখিব এ দুই নয়নে
কন রূপ গতি রিতি।
শ্রীমুখ নিরখি সেই নাপিতানি
মরমে হইলা চল।
ঘুমাএ কিসোরি আপনা বিসরি
জগত করিয়া রঙ্গ।

বসি নাপিতানি মনেং গণি
কহে সহচরি আগে।
কেমত ধরনে নবিন কিসরি
উঠিয়া বসিয়া জাগে।
সুনিঞা অনঙ্গ মঞ্জরি তখন
কহেন জুবতি পাসে।
চরন সেবন করিএ জতন
এই রাহে প্রতিআসে।
চণ্ডিদাস কহে সুনহ মঞ্জরি
করহ চরন সেবা।
তবে সুকুমারি রাজার ঝিআরি
উঠিব সুনিব জেবা।৩১৪।৪।
তবে সে অনঙ্গ মঞ্জরি কহেন
আনন্দ মঞ্জরি পাসে।
তুমি সে আসিয়া বৈঠহ ধরিআ
বৃকভানু ধনি কাছে।
আনন্দ মঞ্জরি গিয়া রাই ধরি
বৈঠল আনন্দে তাঅ।
দেখিআ মোহিত মিলা অদ্ভুত
দিন চণ্ডিদাসে গায়।

রাগ বাড়াড়ি।

অনঙ্গ মঞ্জরি চরন সেবন
করেন আনন্দ মনে।
উঠিল কিসোরি রাজার কুমারি
চাহিলা চকিত পানে।
আনি সহচরি জোগাইল বারি
ধুইল শ্রীমুখ চন্দ।
চাহিলা আপন চরন যুগলে
দেখি মনে লাগে ধন্দ।
দেখিয়া বিচিত্র জাবক রঞ্জন
লিখন কতেক লেখা।
বিস্ময় ভাবিলা মনের ভিতরে
পাখিগণ পাতা সাখা।
হেরিতে ২ হেন লয় চিতে
কি দিব ইহারে দান।
রাজার কুমারি না বোলে ফুকারি
মনে নাই লাগে আন।
সুন নাপিতানি নায়্যার ঘরনি
কুথা না সিখিলি এহ।
আপন গিআনে না দেখি নয়ানে
এমত না জানে কেহ।
ভালং বলি ফুসিল সুন্দরি
হরস হই [য়া] চিতে।
মনিময় হার কাড়িয়া গলার
লইলা তাহারে দিতে।

আগে রাসি লহ হার মনোহর
গলাতে পরাঞ্যা দিএ।
তবে সুখি হঙ বড় সুখ পাঙ
মনের মানস হিএ।
নবিন কিসোরি রাজার কুমারি
হার নিঞা নিজ করে।
নাপিতানি গলে দিলা কুতুহলে
মনের আনন্দ সরে।
আপুনি উঠিঞা হার গলে দিয়া
কহেন মধুর বাণী।
চণ্ডীদাসে কহে আর কথা মিলে
বুঝিতে অদ্ভূত শ্রেনি।৩১৮।৫

রাগ রাহিরি।

নিতুই২ তুমি আসিবে এখানে।
কহিব মাএ আগে এই বেবরনে।
এনখ রঞ্জন তুমি আমারে করিবে।
বারেং সুভদিনিই আসিবে।
ভাল২ বলিয়া তুসিল নবরামা।
জানিল২ তোর প্রেমরস সিমা।
কহেন উত্তর তবে তাঁয়ার ঘরনি।
আমার গলাতে হা[র] দিলে হেন মুনি।
তুমি রাজ সুকুমারি আমি নাপিতানি
কহিতে বাসিএ ভয় সুন বিনোদিনী।
জাসনে মরম হএ কিবা জাতি কুল।
পিরিতে মজিল মন কিবা তুর্ল্য মুল।
পিরিতি অমুল্য হএ জার নাহি সিমা।
পিরিতি পরেস মুনি কে জানে মহিমা।
আন২ কাজ জত দেখহ জগতে।
বিকাইল কতজনা দারুন পিরিতে।
তুমি রাজকন্তা হয় আমি নাপিতানি।
তোমার আগেতে রামি কি কহিতে জানি।
কহ২ জেবা বল তাহারি করিব।
তোমার বচন ভাসা হৃদএ ধরিব।
চণ্ডিদাস কহে সুন অদভুত বানি।
পরশে বাড়ল সুখ হএ জানাজানি।৩১৯।

রাগ করুনাতুড়ি।

রাই তোমার পিরিতি গেল জানা।
তুমি রসবতি নারি পিরিতির অধিকারি
তুহুমনি বেদ অগনানা।
তুমি সে রাজার ঝি তোমারে বলিব কি
সকল গোচরী তোহে আছে।
পিরিতি অমুল্য ধন রাখিতে পারএ কম
এক নিবেদন মোর আছে।

কিবা করে জাতিকুলে পিরিতি পরেসমুনি
শুন ধনি রাজার নন্দিনী।
জাসনে জাহার ভাব তাসনে তাহার লাভ
প্রেম ভাবপরেব বাখানি।
তুমি গু(কু)মারি ধনী তাহে রাজনন্দিনী।
কি দিব তোমারে হেন(ল)এ।
কহিতে একটি বানি চিত্তে কিছু ভয় মানি
কহিতে ইহাতে কীছু হএ।
হেম মনি দিলে দান অমুল্য রতন খান
গলাতে পরাই কুতুহলে।
আমি কিবা দিব ধনি ইহা মনে অনুমানি
নাপিতানি ঘনে রিহা বলে।
মোর এক নিবেদন তাহাতে করহ মন
মোর গলে আছে এক হার।
পদক গাঁথিয়া মালা চৌদিগ করএ আলা
এ তিনে তোলনা নাহি জার।
হয় তআর(থি) চিতে এই হার গলে দিতে
জেবা বল রাজার কুমারি।
হাসিঞা নবিন গুরি ঘনে নাপিতানি হেরি
চণ্ডিদাসে জাএ বলিহারি।৩২০।

রাগ ধানসি।

শুনহ রমনি সুন্দরি রাই।
হার করে লঞা শ্রীমুখ চাই।
লেহ মনোহর কনক মালা।
বাড়িব কতেক রসের খেলা।
মুচকি হাসিএ কহেন বানি।
দেখি আগে আস্য তুরিতে তুমি।
দেখিতে কনক হেমের হার।
তবেত সে গলাতে রাখিব ভাল।
পরেস মুনির পদক গাঁথা।
হেম মনিমঅ কি তার কথা।
অমুল্য যাহার নাহিক মুল।
হারের মহিমা অপার দুর।
দেখিয়া শুন্দরী কহেন তায়।
তুমি সে কিসের কাঙ্গাল তায়।
হেন হেমমনি জাহার ঘরে।
সে নহে রাকের সমান সরে।
আমি নাপিতানি গরিব হঙ।
তুমি [রা]জ কন্তা তো সম নহ।
তোমাতে আমাতে পিরিতি মিলে।
তেঞি দিতে চাহএ হার গলে।
রাই কহে তার উত্তর ভাব।
জাসনে জাহার পিরিতি লাব।
হাসিয়া শ্রীমুখ কহেন বেরি।
লয়্যা হেরি হার গলাতে পরি।

সেই নাপিতানি আগেতে হয়্যা।
হরসে দিলা সে গলাতে লয়্যা।
চণ্ডিদাস দেখি সুখিত চিতে।
কতেক সন্ধান জানেন রিতে ।৩২১।৭।

পাইঞা শ্রীঅঙ্গ পরস ধনি
কতনা পাইলা অমিঞা শ্রেনি
রসে জেন ভাসি সায়র কুলে=
মর্ত্ত সদা রস গাইতে।
পরসে জানিল কপট কান।
কত ভেল তার অমিঞা স্নান
জানল হৃদয় ভিতর আন
দুঁহে দুঁহী ভেল ভোরিতে।
ধরিয়া কপট নাগরির বেশ
তুহুঁ সে ঐছন না জানি লেস
গুপথ (?) বেকত ঐছন কাজ
জন নহ কেহ লখিতে।
ভাল হল্য তুহ কপট কেলী
দুহেঁ দুহুঁ ভেল অবস মেলি
হৃদয় হৃদয় ভেলহি আস,
বাকল পরান বিহ্বিতে।
একথা বেকত নাহিক হএ
রাখিহ মরম সরম ভয়এ
ঐছন পরম কেহ না জান
রাখিহ নিজহি চিন্তে।
দুহে দুহে ভেল মরম বোল
নয়নে নয়নে ভেলহ ভোর
বদন বদন রসের বোল
দুহুঁ দুহুঁ ভেল গুনতে।
নব পরিচএ দুহুঁক সঙ্গ
বাড়ল ও নব রসের রঙ্গ
সনমত হাথি (...) লভায়
পড়ল অনঙ্গ সাহিতে (?)।
চণ্ডিদাস কহে কে বোল হর্স
দুহে দুহ ভেল অবস পর্স
আনহুঁ সঙ্কেতে না ভেল সঙ্গ
রেখল দরস মোহিতে ।৩২২।

এই পদগুলিতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে :

১। পদগুলির ক্রমিক সংখ্যা—৩১১ হইতে ৩২২। মাঝের কয়েকটি পদ (৩১৫—১৭) নাই। দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদটিতে ক্রমিক সংখ্যা নাই। তাহা হইলেও, দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীই ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র পুথিতেও ক্রমিক সংখ্যা ধরিয়া দেওয়া আছে। এই জন্যই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সম্পাদিত 'দীন চণ্ডীদাসে' এই ক্রমিক সংখ্যাগুলি নাই। তাঁহার গোষ্ঠদাসের (? বঙ্গং দৌত্য) পদগুলি আরম্ভ হইয়াছে ১০৪৫ হইতে। পুথিতে তিনি ১০৪৫ হইতে ১০৫১ পদ পাইয়াছেন। কিন্তু তাহার পরে আর ২০টি পদ তিনি অন্যত্র হইতে সংকলন করিয়া নষ্ট পদগুলির স্থান পূরণ করিয়াছেন। কারণ তাঁহার প্রাপ্ত পুথিতে ১০৫১ পদের পরেই ১০৮০ পদ রহিয়াছে; কাজেই বুঝা যায় যে ২৮টি পদ পাওয়া যাইতেছে না। মণীন্দ্রবাবুর ১০৫১ পদে তৈল হরিদ্রা সহ নায়কের ছদ্মবেশ-গ্রহণের সঙ্কেত আছে। কাজেই তিনি মনে করিয়াছেন যে ইহার পরেই 'নাপিতানী-বেশ' হওয়া সঙ্গত। কিন্তু আমার এ পুথিতে ক্রমিক সংখ্যা ৩১১ হইতে আরম্ভ। অথচ দীন চণ্ডীদাসের অন্য পালার পদ আমার এই পুথিতে ২৬৪০ পর্য্যন্ত পাইতেছি। (মণীন্দ্র-বাবু ২০০১ পর্য্যন্ত সন্ধান পাইয়াছেন।) এ পুথিখানি মোটেই 'বিরাট' নহে। পৃষ্ঠাঙ্ক ৩২; এখনকার খাতার মত করিয়া মাঝে সেলাই করা। এখানে সমস্যা এই যে, যদি মণীন্দ্রবাবুর পালা দীন চণ্ডীদাসের হয়, তবে এ আবার কোন্ চণ্ডীদাসের? একই চণ্ডীদাস দুইটি স্বতন্ত্র পালা একই বিষয়ে লিখিবেন, ইহা অসম্ভব না হইলেও, ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা বাধিত হইতেছে।

২। দীন চণ্ডীদাসের কাল অভ্রান্ত ভাবে নির্ণয় করা যায় নাই। মণীন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকে শুধু এইমাত্র বলিয়াছেন যে, দীন চণ্ডীদাস চৈতন্যের পরবর্ত্তী কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধারণার হেতু এই যে দীন চণ্ডীদাসের পদে চৈতন্য-প্রভাব লক্ষিত হয় এবং উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধ মাধব প্রভৃতি গ্রন্থের প্রভাবও সুস্পষ্ট। আমার এই পুথিতে স্পষ্ট ভাবে ১০৯৪।৯৫ সন লিখিত আছে। অতএব দীন চণ্ডীদাস ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাই সিদ্ধ হয়। কত পূর্ব্বে তাহা অবশ্য বলা যায় না।

৩। ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বের বৈষ্ণব কবি গৌরচন্দ্রিকা সম্বন্ধে একটিও পদ লেখেন নাই, ইহারই বা কারণ কি? মণীন্দ্রবাবু বলেন, হয়ত লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি সমস্তই হারাইয়া গিয়াছে। এ শুধু অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমার এই সংগ্রহে গৌরচন্দ্রিকা আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের ভণিতায় নহে। সংগ্রহকর্ত্তা কি

চণ্ডীদাসের একটিও গৌরচন্দ্রিকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না? ইহার কারণ কি? নীলরতনবাবুর সংগৃহীত গ্রন্থে দীন চণ্ডীদাসের অন্যূন ৩৪টি পদ রহিয়াছে। মধ্যে একটিও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ নাই। আমার এই সংগ্রহেও নাই। ইহা হইতে এ অনুমান অসঙ্গত যে দীন চণ্ডীদাস গৌরচন্দ্রিকার ধার ধারেন নাই? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে চৈতন্যের প্রভাবযুক্ত চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ দেখিলেই যে তাহা আমরা দীন চণ্ডীদাসের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিব এরূপ যুক্তি কখনও সমীচীন হইতে পারে না। যে-কবি চৈতন্যের প্রভাবপুষ্ট, তাঁহার পক্ষে গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধীয় গীত রচনা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এমন হওয়া খুবই বিচিত্র যে তাঁহার রচিত একটিও গৌরচন্দ্রিকা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, অথচ তিনি চৈতন্যের ভাবধারায় সুস্নাত। বাঁকুড়ায় এক সময়ে যে 'চৈতন্যবর্জ্জিত' সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল—তাহাদিগকে সহজিয়াই বলি বা যে নামেই অভিহিত করি—তাহাও অমূলক অনুমানমাত্র নহে।

৪। দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস যে অভিন্ন ব্যক্তি, এইরূপ অনুমানও যুক্তিসহ নহে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু যে পুথি হইতে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একটি স্থলেও দ্বিজের উল্লেখ নাই। নীলরতন-বাবুর গ্রন্থে দ্বিজ ও দীন উভয়েই বিদ্যমান। বাঁকুড়ার এই একখানি পুথিতেও (বিমলাবাবুর) দ্বিজের নাম পাইতেছি না। যদি দীনের পদের মধ্যে দ্বিজের, এবং দ্বিজের পদের মধ্যে দীনের পদ থাকিত, তাহা হইলে লেখকের অনবধানতার দোহাই দিয়া ইহাদের একাত্মতা প্রমাণ করা যাইতেও পারিত। কিন্তু যতগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দীন চণ্ডীদাসকে দ্বিজ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি মনে না করিয়া উপায় নাই।

ভোলানাথ দাশের গল্প

সম্বুদ্ধ

মাছের গল্প অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু আমি এক বার যা একখানা মাছ দেখিয়াছিলাম, তাহার কথা বলিলে তোমরা বিশ্বাস করিবে না।

দৌলতখাঁয় যে-বার বড় বন্যা হয়, সেই বার। অত বড় বন্যা আর হয় নাই এদেশে। দৌলতখাঁ শহরে চৌদ্দ হাত জল হইয়াছিল—মানুষ-গরু কত যে মরিল কত যে ভাসিয়া গেল তাহার আর হিসাব নাই। অথচ আশ্চর্য দেখ, অত বড় যে বন্যা, আমাদের এ-সব দিকে কিন্তু মোটেই জল বাড়ে নাই। বাড়িবে কি, এদিকের সমস্ত জল যেন টানিয়া শুকাইয়া গেল। পরপর দুই-দুইটা জোয়ারই মোটে ফিরিল না—সমস্ত জল ঠেলিয়া গিয়া দৌলতখাঁয় উঠিল। লোকে বলিল, আমাদের জোয়ার চুরি হইয়া গিয়াছে।

ক-দিন থাকিয়া বন্যার জল আবার নামিয়া গেল, তার পর আরম্ভ হইল মহামারী। জ্বর আর অতিসারে দেশ যেন একেবারে ধোয়াইয়া লইয়া গেল। আর গন্ধ—যত মানুষ গরু আর মাছ মরিয়াছে তাহার পচা গন্ধে জীবন বাহির হইয়া যায়, নিশ্বাস লইবে কাহার সাধ্য!

যাক, বন্যা-টন্যা তো থামিল। তখন ভাবিলাম, মামার বাড়ীর এক বার খবর লইয়া আসিতে হয়—ঠিক কেমন আছে-না-আছে। চলিলাম মামারবাড়ী। সেখানে গিয়া দেখিলাম, সকলে ভালই আছে, ওদিকে মহামারীটা লাগে

নাই। মামা বলিলেন, আসিয়া ভালই করিয়াছ, আমরা চিন্তায় মরিতেছিলাম তোমাদের ওখানে কি অবস্থা হইল।

আমি বলিলাম, না, আমরা ভালই আছি, চিন্তা করিবেন না।

আমি তো সেই দিনই বাড়ী ফিরিব, মামা কিছুতেই আসিতে দিলেন না। বলিলেন, আসিয়াছিস, আজকের দিনটা থাকিয়া যা। বাড়ীর মাছ-ভাত তো আছেই, মামার বাড়ীর ডাল-ভাত না হয় খাইয়াই গেলি একটা দিন।

ঠিক হইল, সেদিন থাকিয়া পরদিন ফিরিব।

খাইতে বসিয়া দেখি, খালি ভাত আর ডাল, মাছের গন্ধও নাই। মামী পাতের কাছে ঠিক বসিয়া আছেন। আমি একটু ঠেস দিয়া বলিলাম, এই ঠিক ব্যবস্থা করিয়াছেন। চার দিকে অসুখ-বিসুখ, এখন কিছু দিন মাছ-মাংস না-খাওয়াই ভাল।

মামী বলিলেন, আর ভাল আমার কপাল। মাছের বংশও নাই, ছেলেপিলেগুলা মাছ ছাড়া খাইতে পারে না, তাহারা না-খাইয়া না-খাইয়া রোগা হইয়া গেল।

আমি তো তাঁহাকে চিনি, রোগা যে হয় হউক, জিনিস খরচ না-হইলেই তাঁহার স্বর্গ। বলিলাম, তাহা হইলে মাছ দেন না কেন তাহাদের?

মামী বলিলেন, দিব তো বুঝিলাম, না-থাকিলে দিব কোথা হইতে?

আমি বলিলাম, আপনাদের বাড়ীতে মাছ নাই কি?

মামা বলিলেন, সেকথা আর বলিও না। প্রাণে মরি নাই, কিন্তু বন্যায় আমার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। পুকুরে মাছ বলিতে আর কিছু বাকি রাখে নাই।

আমি শুনিয়া ভাবিলাম, বন্যার জল বাড়িয়া হয়তো মাছ বাহির হইয়া গিয়াছে। তার পর শুনিলাম, তাহা নয়। বন্যার জলে ভাসিয়া নাকি পুকুরে কুমীর আসিয়া ঢুকিয়াছে।

কুমীর ঢুকিয়াছে, সে কি কথা! আমি বলিলাম, কুমীর আসিল কোথা হইতে?

মামা বলিলেন, কি জানি। দিন-দুই খুব জল বাড়িয়াছিল, পুকুর খাল সমুদ্র একাকার। সরকারী রাস্তার উপর দিয়া পর্যন্ত জল চলিয়াছে; আমার যে এমন উঁচু বাড়ী, আমারও উঠানে এক হাঁটুর বেশী জল হইয়াছিল। সেই জলের সঙ্গে বেটা কি করিয়া আসিয়া পুকুরে পড়িয়াছে। পড়া শক্তও তো কিছু না, পুকুরের গায়েই যখন বড় খাল। কি বলিব, মাছের বংশ আর নাই, সমস্ত খাইয়া সারা করিয়া ফেলিয়াছে। ক-বছরে পুকুরে প্রায় দশ-বারো হাজার মাছ ছাড়িয়াছি, তাহার একটা ঘাউও আর দেখিতে পাই না।

আমি বলিলাম, কিন্তু পুকুরে কুমীর, এ তো সর্ব্বনাশের কথা। কবে কোন্ ছেলেপিলেকেই লইয়া যায়, না কি—এ কুমীর মারিবার চেষ্টা করেন নাই?

মামা বলিলেন, আর চেষ্টা! বন্যার ধাক্কা সামলাইতেই সকলে অস্থির, যে যাহার ভাঙা ঘরবাড়ী মেরামত করিয়া কূল পাইতেছে না। কুমীর মারিতে আসিবে এমন সময় আছে কার?

আমি বলিলাম, অন্যে না আসে, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিতে হইবে।

মামা বলিলেন, কি ব্যবস্থা করিব বল! আমি ক-দিন হাঁস দিয়া বঁড়শি ফেলিয়াছি, বঁড়শি খায় না। থানায় খবর দিলে পুলিস আসিয়া মারিয়া দেয়, কিন্তু বঁড়শিতে না আটকাইয়া তাহার গায়ে গুলি করিতে সাহস হয় না। বাড়ীর সঙ্গে পুকুর, কে জানে গুলি খাইয়া শেষে যদি বাড়ীর মধ্যেই আসিয়া ঠেলিয়া উঠে? এখন উপস্থিত ও পুকুরে সকলের যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি। দেখি যদি নিজেই বাহির হইয়া যায়।

আমি বলিলাম, দেখা যায়?

মামা বলিলেন, তাহা কেন যাইবে না। মাঝে মাঝেই তো ভাসান লয় কি না। অনেকেই দেখিয়াছে।

আমি বলিলাম, কত বড় কুমীর?

মামা বলিলেন, সমস্তটা গা তো একেবারে দেখি নাই, পিঠটা জলের উপর জাগে, সেইটুকুই দেখিয়াছি। তবু আন্দাজে যা বুঝি লেজ লইয়া অন্তত সাত-আট হাতের কম হইবে না।

আমি বলিলাম, এটিকে না দেখিয়া যাওয়া যায় না। আবার যদি ভাসে, আমাকে একটু ডাকিবেন তো।

সেদিন সারাদিনে আর কুমীর ভাসিল না। আমি ...-বার করিয়া গিয়া গিয়া পুকুর-পাড়ে ঘুরিয়া আসিলাম। ...ক, পরদিন আমার বাড়ী ফেরার কথা। ইহার ...ধ্যে না ভাসিলে আর দেখা হইল না ভাবিয়া আমার ...ন খারাপ হইয়া গেল।

কিন্তু ঈশ্বর আছেন। দুপুরবেলা খাইতে বসিয়াছি। ...মার ছোট ছেলেটি আসিয়া বলিল, ভোলা দাদা, ...াসিয়াছে।

মামা বলিলেন, খাইতে বসিয়াছে, এখন যাইবে কি। ...তো ভাসেই, অন্য সময় দেখিবে।

আমি বলিলাম, নাঃ, একটু দেখিয়াই আসি।

হাত ধুইয়া আমি উঠিয়া গেলাম। পুকুর-পাড়ে গিয়া দেখি, সত্যই সে জীব ভাসিতেছে। মাঝ-পুকুরে, জলের ঠিক সমান সমান হইয়া কালো খুঁটির মত একটা দেহ, পিঠের খানিকটা মাত্র দেখা যায়। পিঠের মাঝখানে একটা বড় কাঁটা খাড়া হইয়া আছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেটা এক-এক বার কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহা ছাড়া আর তাহার নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নাই।

মামাতো ভাইটি বলিল, ঐ রকম করিয়া নাকি একসঙ্গে দুই-তিন ঘণ্টা ধরিয়াও ভাসিয়া থাকে, ঢিল ছুঁড়িলেও নড়ে না। কুমীরের পিঠ সই করিয়া সে ছোট্ট একটা ঢিল ছুঁড়িয়াও দেখাইল। ঢিলটা কুমীরের ঠিক পিঠে লাগিয়া সেখান হইতে ছিট্‌কাইয়া জলে পড়িল, তবুও কুমীর নড়িল না।

দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে খট্‌কা লাগিল। পিঠের উপরে কাঁটা, আবার ঢিল খাইয়াও নড়ে না—এ কেমন কুমীর! ভাল করিয়া নজর করিয়া তাহাকে দেখিতেছি, এমন সময় মামা খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া আসিলেন। আমাকে বলিলেন, ও এখন অনেক ক্ষণ আছে—তুই যা, খাইয়া আয়।

আমি বলিলাম, যাইতেছি। কিন্তু মামা, আপনার সঙ্গে আমার একটু পরামর্শ আছে। খাইয়া আসি।

খাইয়া উঠিয়া আবার পুকুরপাড়ে গেলাম। কুমীর তখন ডুব দিয়াছে। আবার যদি ভাসে, মনে করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু সে আর ভাসিল না। তখন আর কি করি, ফিরিয়া ঘরে আসিয়া বসিলাম। মামা বলিলেন, কি শ্রীমান্‌ হইল দেখা?

আমি বলিলাম, দেখিলাম। আচ্ছা মামা, বঁড়শি তো খায় নাই শুনিলাম। পুকুরে জাল দিয়া দেখিলে হইত না?

মামা বলিলেন, যেমন তোমার কথা। জালে কুমীর থাকিবে কেন? জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া যাইবে।

আমি বলিলাম, কুমীর জালে থাকে না, ঠিক কথাই। কিন্তু এ যদি কুমীর না হইয়া অন্য কিছু হয়?

মামা বলিলেন, তাহার মানে? তুমি কি বল এটা কুমীর নয়?

আমি বলিলাম, ঠিক তাই। এটা কুমীর নয়।

মামা বলিলেন, কুমীর নয় তবে কি?

আমি বলিলাম, আমার সন্দেহ হইতেছে এটা কোনরকমের একটা খুব বড় মাছ। কি মাছ আমি বলিতে পারিব না, কিন্তু কুমীর যে নয় সে কথা আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি।

মামা বলিলেন, বুঝিলে কেমন করিয়া?

আমি বলিলাম, পিঠ দেখিয়া। কুমীরের পিঠে মাছের মত খাড়া কাঁটা থাকে না। আর ঢিল খাইয়াও রাগ করে না, এমন বৈষ্ণব কুমীরের কথা কোনদিন শুনিয়াছেন?

মামা বলিলেন, সেটা মন্দ বল নাই।

আমি বলিলাম, তার পর, পুকুরে আজ হাঁস নামিয়াছে দেখিলাম।

মামা বলিলেন, তাহার কোন অর্থ নাই। হয়তো কুমীরের আজ ক্ষুধা নাই। ক্ষুধা না থাকিলে সে হাঁসকে তাড়া করিবে কেন?

আমি বলিলাম, সে তাড়া নাই করিল। কুমীর হইলে হাঁসেরাই গন্ধ পাইত, পুকুরে নামিত না।

আমার কথা মামার মনে ধরিল। তিনি অনেক ক্ষণ ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, কিন্তু এত বড় মাছের কথা তো কখনও শুনি নাই। এ যে একেবারে আশ্চর্য কাণ্ড!

আমি বলিলাম, সে তো যা হইবার হইয়াছে, এখন ইহাকে ধরিবার ব্যবস্থা করুন। পুকুরের সমস্ত মাছ যখন খাইয়াছে, আমরা না-হয় এইটাকেই খাই।

মামা বলিলেন, পাগল হইয়াছ! এতবড় মাছকে মানাইবার মত জাল পাইব কোথায়?

আমি বলিলাম, পাইব, শূয়ার-ধরা বেড়াজাল। তাই দিয়া ধরিব।

মামা বলিলেন, তাহা হইলেও এ জানোয়ারকে কায়দা করা পাঁচ-সাত-দশ জনের কর্ম নয়। মানুষ পাওয়া যাইবে না। আর ধরিলেও এত বড় মাছ খাইয়া ফুরাইতে দুইটা গ্রামের লোক লাগে। পচামাছের গন্ধেই সারা হইব, কলেরা লাগিবে।

আমি বলিলাম, কিন্তু সে যাহাই বলুন, আমিও ভোলানাথ দাশ। আমি যখন বলিয়াছি, এ মাছ না খাইয়া নড়িব না।

মামা বলিলেন, সেই কথাটা সিধাসিধি বলিলেই হয়, বাড়ীর মধ্যে তোকেও একখানা ঘর তুলিয়া দিই। মাছ না খাইয়া নড়িবে না যদি সাব্যস্ত করিয়া থাক তবে ঐখানেই স্থিতি কর। নহিলে ও মাছও ধরিয়া খাইয়াছ বাড়ীও আর গিয়াছ!

আমি বলিলাম, দাঁড়ান না দেখি। একটা মাছ ধরিতে পারিব না, পুরুষ হইয়া জন্মাই নাই?

বাড়ী ফেরা স্থগিত রহিল। সে রাত্রে আমার আর ঘুমও হইল না—চিন্তায় চিন্তায়ই কাটিল। সকালে উঠিয়া মামা বলিলেন, কি রে, তোর মাছ ধরা হইল? মশলা বাটিতে বলি?

আমি বলিলাম, বলুন না। বুদ্ধি আমি ঠিক করিয়াছি।

মামা বলিলেন, বুদ্ধি আর কি—জলে নামিয়া লেজটা কামড়াইয়া ধর।

আমি বলিলাম, প্রায় সেই রকমই। কিন্তু তাহার আগে আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

মামা যেন একটু অবাক হইলেন। বলিলেন, তুই কি সত্যই কোন ফন্দি ঠাওরাইয়াছিস নাকি?

আমি বলিলাম, সত্যই না তো কি! আমাকে তো জানেনই, এক বার যাহা করিব বলি না করিয়া ছাড়ি না। সে যাক, এখন আমার কথাটা শুনুন।

মামা বলিলেন, কি, বল?

আমি বলিলাম, প্রথম কথা হইতেছে, এত বড় মাছকে আস্ত ধরা যাইবে না। সে-রকম জালও নাই, সে মানুষও নাই। আর ধরা যদি বা যায়, আপনি যা বলিয়াছেন—সত্যই কলেরা লাগিবে। তার চেয়ে আমি ঠিক করিয়াছি, মাছকে আস্ত ধরিব না। মাছ যেমন আছে তেমনই থাকিবে, আমরা শুধু খাইবার মত খানিকটা মাছ কাটিয়া আনিব।

মামা বলিলেন, পাগলের যেমন কথা। তাই নাকি আনা যায়!

আমি বলিলাম, কেন যাইবে না। দুম্বা ভেড়া দেখেন নাই?

মামা তবু বুঝিতে চান না। কেবলই বলেন, মাছ মরিয়া যাইবে, পচিয়া পুকুর খারাপ হইবে।

অনেক কষ্টে তবে তাঁহাকে বুঝাইলাম, মাছের গা সহজে পচে না, মাছের কোনই ক্ষতি হইবে না। আর অত বড় জন্তু, তাহার পিঠের গাদার মাছ মোটে সিদ্ধই হইবে না, এক পেটির মাছ ছাড়া তাহার সকলই অখাদ্য। আমাদেরও পেটির মাছই কাটিয়া আনিতে হইবে।

মামা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, সকলই মানিলাম। কিন্তু কাটিবে কে?

আমি বলিলাম, সে জন্য আপনার চিন্তা নাই, যাহা কিছু ব্যবস্থা আমিই করিব। আপনার সঙ্গে শুধু একটি কথা, পুকুরের জলটা কিন্তু আমি দিন কয়েকের জন্য নষ্ট করিয়া দিব। আগে হইতে একটু কাবু করিয়া না লইলে ও মাছের গায়ে হাতই দেওয়া যাইবে না।

মামা আবার তাহাতে রাজি হন না, পুকুর তাঁহার প্রাণ। বলিলেন, সে হইবে না, জল নষ্ট করিলে চলিবে কেন?

আমি বলিলাম, না চলিবার কি আছে—পুকুরের

মাছ তো এমনিই শেষ হইয়া গিয়াছে।" আর পুকুর বেশী দিন বন্ধও থাকিবে না তো—সামনে পূর্ণিমার জো, কলটা খুলিয়া দিলেই হইল। গোটা তিন-চার জোয়ার খাইলেই জল আবার ঠিক হইয়া যাইবে।

মামীটির আমার এক গুণ, কৃপণ তবু লোভটুকু আছে তাঁহার ষোল আনা। মাছের নাম শুনিয়া তিনিও আমার পক্ষ লইলেন। শেষকালে মামা আর না পারিয়া বলিলেন, আমি আর কি বলিব, যা ভাল বোঝ কর।

জানই তো, কাজ করিতে বসিয়া ঝিমানো আমার স্বভাব নয়। আমি সেই সকাল বেলায়ই বাড়ীসুদ্ধ ছেলেকে কাজে লাগাইয়া দিলাম। কাছাকাছির মধ্যে যেখানে যত 'হুরমই' গাছ ছিল, ন্যাড়ামুড়া করিয়া সমস্ত পাতা আর ফল আনিয়া তাহারা উঠানে টাল দিল—উঠানের অর্ধেক জুড়িয়া সে একেবারে পাতার পাহাড়। তার পর উঠানের পাশে উনান খুঁড়িয়া বড় বড় চাড়িতে করিয়া সেই পাতা আর ফল সিদ্ধ চড়ানো হইল। আমিও ওদিকে বাজারে গিয়া কিছু সাজসরঞ্জাম কিনিয়া আনিলাম।

পাতা সিদ্ধ হইলে, সন্ধ্যাবেলায় সেই সমস্ত জল ছাঁকিয়া পুকুরে ঢালিয়া দিলাম। দিয়া সে-রাত্রের মত খাইয়া ঘুমাইলাম। আর কিছু করিবার নাই, এখন যা করার কাল সকালে।

খুব ভোরে উঠিয়া পুকুর-পাড়ে গেলাম। পাড়ের উপর কিছুদূর পর্যন্ত জলের দাগ দেখিয়া বুঝিলাম মাছের বাছা রাত্রে বেশ একটু দাপাদাপি করিয়াছে।

ক্রমে বেলা হইল, পুকুরের উপর রৌদ্র পড়িল। রৌদ্রের তাত বেশ বাড়িলে পুকুরের মাঝখানে মাছটি ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল। এতদিন তাহার কেবল পিঠটাই মানুষের চক্ষে পড়িত, তাহার মাথা বা লেজের চেহারা কেহ দেখে নাই। এবার তাহার মাথা জলের উপরে জাগিয়া উঠিল দেখিলাম, মেঘলা দিনে কইমাছ যেমন করিয়া জল চিবায়, এ মাছও সেইরকম ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছে আর জল চিবাইতেছে। আর সে মাথা কি! যেন একটা বিশমনি চাউলের মট্‌কি। মুখ দিয়া জল ছাড়িতেছে যেন পাম্প দিয়া তোড়ে জল ঢালা হইতেছে।

অনেক ক্ষণ মাছটা ভাসিয়া ভাসিয়া খাবি খাইল; তার পর এক বার ডুব দিল। তার পর আরও কিছুক্ষণ পরে একেবারে চিৎ হইয়া ভাসিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম এইবার সময় হইয়াছে। মাছেরা অজ্ঞান হইলে তবেই চিৎ হইয়া ভাসে। ঐ-যে হুরমই পাতার জল পুকুরে ফেলিয়াছিলাম, তাহাতে ক্লোরোফর্মের মত কাজ করিয়াছে।

আমি আর দেরি না করিয়া জলে নামিয়া পড়িলাম। সাঁতার দিয়া একেবারে গিয়া মাছের উপরে চড়িয়া বসিলাম।

মাছের পেটির জায়গাটা তখন জলের উপরে জাগিয়া উঠিয়াছে, সাদাসাদা আঁইশগুলা রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে যেন একখানা নূতন টিনের পাত। আমি দুই দিকে দুই পা ঝুলাইয়া দিয়া মাছের উপর সওয়ার হইয়া বসিলাম। বসিয়া বড় একখানা ছুরি দিয়া মাছ কাটিতে আরম্ভ করিলাম।

উঃ, সে কি আঁইশ! যেমন একেকটা শুরার মত বড় বড়, তেমনই শক্ত, যেন লোহা। অতি কষ্টে টানাটানি করিয়া কয়েকখানা আঁইশ তুলিয়া ফেলিলাম, তার পর সেই জায়গা দিয়া মাছের গায়ে ছুরি বসাইলাম। বাপ, যা শক্ত মাছ সেকথা আর কি বলিব। ছুরিতে ধার দিয়া ক্ষুরের মত করিয়াছি, তবু যেন তাহার গায়েই বসিতে চায় না। দুই হাতে ধরিয়া চাপিয়া ছুরি চালাইতে চালাইতে আমার হাতে ফোস্‌কা উঠিবার যোগাড় হইল।

তবু যা হোক কষ্টেস্টে মাছ তো খানিকটা কাটিয়া উঠাইলাম; মাছ কাটিয়া যে ফাঁক হইল সেই ফাঁক দিয়া জমাট চর্বিও কিছু কাটিয়া লইলাম। মাছটাছ ভাল করিয়া পট কাপড়ে বাঁধিয়া লইলাম। এই বার পাড়ে ফিরিবার পালা।

এখন যদি ভাল মানুষের মত পাড়ে উঠিয়া আসি,

* [illegible]

কোন্ গোলই হয় না। আমাকে দিল ভুতে ঠেলা। মাছটার গায়ে কাটিয়া যা করিলাম, পুকুরের বাঁধা জল, যদি সত্যই ঘা না শুকায়, বা রক্ত না থামে! একটু ঔষধ না লাগাইয়া দিয়া যাওয়া যায় না।

টিংচার আইডিনের শিশি আমি সঙ্গে করিয়া লইয়াই গিয়াছিলাম। ছুরিটাকে পাড়ে ছুঁড়িয়া দিয়া আমি ট্যাঁক হইতে শিশি বাহির করিলাম, তার পর ছিপি খুলিয়া সেই কাটামুখে আইডিন ঢালিয়া দিলাম।

তার পরই কি যে হইল আমার স্পষ্ট ধারণা নাই। মনে হইল যেন আমার নীচে মাছ, পুকুর সমস্ত তোলপাড় করিয়া একটা ভূমিকম্প হইতেছে। তার পর আচমকা আমার গায়ে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি লাগিল। গুলিবাঁশ হইতে যে ভাবে গুলি ছোটে, ঠিক সেই ভাবে আমিও শূন্যে ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া এক দিকে ছুটিয়া গেলাম; তার পর কিসে যেন মাথা ঠুকিয়া অজ্ঞান হইয়া গেলাম।

জ্ঞান হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে। মাছের ঝাপ্‌টায় ছিট্‌কাইয়া গিয়া একটা নারিকেল গাছের গায়ে আছড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাগ্য ভাল তাই হাড়গোড় কিছু ভাঙে নাই।

মাছটাও কিন্তু সেই সঙ্গেই উধাও হইল। আইডিনের কামড়ে সে চট্‌কা ভাঙিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিল, সেই ঝাঁকানিতে আমি ছুটিয়া পাড়ে আসিয়া পড়িয়াছি। শুনিলাম, তার পরই নাকি মাছ আরেক লাফ দিয়া একেবারে জল ছাড়িয়া শূন্যে উঠিয়াছে, এবং সেই লাফের চোটেই পুকুর হইতেও বাহির হইয়া গিয়াছে। পুকুরের গায়েই বড়খাল, মাঝখানে হাত ছয়-আটেক মাত্র জমি। সে জমি একলাফে ডিঙাইয়া মাছ গিয়া বড়খালে পড়িয়া, পড়িয়াই সোজা দৌড়। মামা বলিলেন, গোটা মাছটাকে নাকি একটা উপুড়-করা জেলেডিঙির মত দেখিতে হইয়াছিল।

পরদিন খবর পাইলাম, নদীর মুখে নাকি সে মাছের সঙ্গে একখানা ডিঙিনৌকার ধাক্কা লাগিয়াছিল। নৌকাখানা খালে ঢুকিতেছিল, এক গুঁতায় তাহাকে উল্‌টাইয়া দিয়া মাছ নদীতে নামিয়া গিয়াছে।

আমার কোঁচড়ে বাঁধা মাছটুকু ঠিকই ছিল। কিন্তু সে মাছ কাহারও ভোগে লাগিল না। কত কাঠ পোড়াইয়া নুন দিয়া সোডা দিয়া কত রকম করিয়া তাহাকে জ্বাল দেওয়া হইল,—মাছ মোটে সিদ্ধই হইল না। কপালে লেখা ছিল, দুর্ভোগই সার।

সেই মাছের ক-টা আঁইশ আমি রাখিয়া দিয়াছিলাম। অনেককে দেখাইয়াছি, কেহ বলিতে পারে নাই মাছটা কোন্ জাতের। এক বার শুধু এক বুড়া জেলে দেখিয়া বলিয়াছিল, সেটা মহাশোল মাছ। মানস সরোবরে নাকি সে-মাছের জন্ম, ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসিয়া দুই-একটা মাঝে মাঝে এদিকে আসিয়া পড়ে, উপরে ময়মনসিংহের দিকে কচিৎ কখনও ধরাও পড়ে। তাহার কথা সত্য কিনা জানি না, কিন্তু হইতেও পারে। অতবড় মাছ হিমালয় পর্বত ছাড়া আর জন্মাইবেই বা কোথায়।





প্রত্যাবর্তন

শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রস্তাবিত জমি-হস্তান্তর আইন

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম. এ.

গত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে কতকগুলি বিল প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি বিল অকৃষক প্রজাদের অধিকার সম্বন্ধে। এ ব্যাপারে আবার একটি বিল এসেছে কেন্দ্রীয় আইন-সভায়। কিন্তু যদিও এ বিলগুলির গুরুত্ব খুবই বেশী, তবুও আর একটি যে বিল প্রকাশিত হয়েছে কৃষকদের জোতজমা হস্তান্তর সম্পর্কে, ফলাফলের দিক্ দিয়ে বিচার করে দেখলে সে বিলটির ফলও কম সুদূরপ্রসারী হবে না। বিলটি বেসরকারী এবং সে-হিসেবে এটি এখনই পাস হবে এ রকম সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব কম নয়, এবং ঠিক এই কারণেই এ ধরণের কোনও সরকারী বিল আসাও আশ্চর্য্য নয়—সেই জন্য এ বিষয়টির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাংলায় জমি-হস্তান্তরের অধিকার দেওয়ায় কৃষকেরা বহু সময় দরকার হলেই জমি বেচে ফেলে বা বহু সময়ে বেচে ফেলতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষকদের হাত থেকে অকৃষকদের হাতে জমি চলে যাচ্ছে এবং যারা সত্যিকারের চাষী তারা ক্রমশঃ ভূমিশূন্য হয়ে পড়ছে। এই ব্যাপারটি বন্ধ করার জন্যেই এই বিল'প্রণয়ন। বিলটিতে বলা হয়েছে,

(১) আইনটি সারা বাংলায় প্রযোজ্য এবং যে জমি বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের আমলে আসে সেই জমিগুলো সম্বন্ধে আইনটি খাটবে, (২) কোন রায়ত তার জমি কোন জমির মালিক, মধ্যস্বত্বাধিকারী, জোতদার বা অকৃষকের কাছে বিক্রি করতে পারবেন না। যিনি সত্যিকারের চাষী নন এবং নিজে হাতে জমি চাষ করেন না তিনিই অকৃষকের পর্য্যায়ভুক্ত। এবং তাঁদের জমি কেনার অধিকার নেই। তবে এই নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে—যথা (ক) কোন মালিক, মধ্যস্বত্বাধিকারী বা জোতদার যদি সেই গ্রামে বাস করেন এবং তাঁর মোট খাস জমির পরিমাণ এই নবক্রীত জমি সমেত ১০০ বিঘার বেশী না হয় তা হলে তিনি জমি ক্রয়ের অধিকার পাবেন। (খ) কোনও মালিক, মধ্যস্বত্বাধিকারী বা জোতদার, ব্যাপারি বা বসতবাড়ীর জন্যে যদি ৫ একরের বেশী জমি না চান বা (গ) কোনও অকৃষক বসতবাড়ীর জন্যে যদি ৫ একরের বেশী জমি না চান বা (ঘ) কোনও লোক বা কোম্পানী বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষবাস করবার জন্য বা অন্য কোন জনহিতকর কাজের জন্য জমি চান এবং এই ব্যাপারটিতে যদি জেলার কালেক্টরের সম্মতি থাকে (ঙ) ফ্যাক্টরি স্থাপনের জন্য যদি ৫০ বিঘার অনধিক জমি চান (চ) বা কোন অকৃষক যদি জাতি হিসাবে কৃষকের তিন পুরুষের মধ্যে হন তাহলে এঁরা জমি পেতে পারেন। (৩) প্রত্যেক জমি বিক্রির দলিলেই ক্রেতা যে অকৃষক ন'ন বা কোনও না কোনও ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়েন এরূপ স্বীকৃতি থাকবে এবং যদি বিক্রির ছয় বছরের মধ্যেও এই স্বীকৃতি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তা হলে বিক্রয় রদ হয়ে নূতন করে নীলাম হবে এবং এই আইনে যাঁদের কেনবার অধিকার আছে তাঁরাই কিনতে পারবেন। আবার এই নীলামেও যদি একই দোষ থাকে তাহলে ছয় বৎসরের মধ্যে ধরা পড়লে, এই নীলামও রদ হয়ে যাবে এবং যিনি নীলামের দোষ ধরিয়ে দিতে পারবেন তিনি নীলামলব্ধ টাকার অর্দ্ধেক পাবেন। (৪) পরিশেষে বলা হয়েছে যদি নীলামের সময় আইনতঃ অধিকারীদের মধ্যে কেউ না ডাকেন বা তাঁদের সর্ব্বোচ্চ ডাকে ডিক্রিদারের পাওনা টাকা শোধ না হয় তাহলে আদালত ছয় বৎসরের অনধিক কালের জন্য পাওনাদারের হাতে জমি ছেড়ে দিতে পারবেন।

এই ভাবে অকৃষকদের হাতে জমি যাওয়া বন্ধ হ'লে কৃষকদের উন্নতি হবে, বিল-প্রণয়নকারী এই রকম মনে করেন। বিলটি ১৯৩৯ সালের হলেও বিলের সমস্যাটি বহুকালের। সেজন্য বিলটির আলোচনার আগে পিছনে তাকানো প্রয়োজন।

২

সারা ভারতবর্ষে গত কয়েক বৎসরে প্রজাস্বত্ব-আইনের যে-সব সংশোধন হয়ে গেল, তার মধ্যে প্রায় সব কয়টির মধ্যেই একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রজাদের যে সকল অধিকার আইনতঃ স্বীকৃত না হ'লেও বাস্তবিক প্রাপ্য এবং বহুক্ষেত্রে তারা পেয়েও আসছিল, সেই অধিকারগুলিকে আইনতঃ স্বীকার

করে নেওয়া হয়েছে। যুক্তপ্রদেশে চাষীদের বহু ক্ষেত্রে জমি-হস্তান্তরের অধিকার ছিল না—তারা সে অধিকার পেয়েছে, তাদের ফসল ক্রোকের ব্যবস্থা ছিল—সে ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছে। বিহারেও বহু ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। বাংলায় ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংশোধন হয়েছে তাতে সেলামী বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, আবওয়াব গ্রহণ দণ্ডনীয় হয়েছে এবং চাষীদের বহুপ্রকার অধিকার সুদৃঢ় করা হয়েছে, অগ্রক্রয়ের অধিকার লোপ করা হয়েছে। ফলে জমি-হস্তান্তরের সুবিধা দেওয়া হয়েছে প্রচুর। কাজেই চাষীদের অধিকার তাতে বজায় হয়েছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের আর এক সর্ব্বনাশের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে বহু জমি অকৃষকদের হাতে চলে যাওয়া বিচিত্র নয়। সেই জন্য এ ধরণের বিল মোটেই সময়ের অনুপযোগী নয়।

কিন্তু এই সমস্যা পঞ্চাশ বছর আগেও ঠিক এমনই ছিল এবং যখন ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয় তখনও এ সমস্যার যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল। সে সময় এর সমাধান করা হয়েছিল প্রজাদের হস্তান্তরের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে। সে সময় যখন হস্তান্তরের অধিকার দেবার কথা হয়েছিল, তখন কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সর্ রিচার্ড গার্থ তাঁর স্মারকলিপিতে লিখেছিলেন—

আমি স্বীকার করি যে জমি বিক্রির অধিকার দিলে জমির দাম বাড়বে। কিন্তু এতে যে কৃষকদের কল্যাণ হবেই এমন কোন কথা নেই। বরং এই অধিকার দিলে শ্রেণীগত ভাবে কৃষকদের উচ্ছেদসাধনের সহায়তা করা হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাঁর কথার মূল্য সে সময় অনেকে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু কৃষকদের শ্রেণীগত ভাবে জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এবং আইনতঃ না হ'লেও কার্য্যক্ষেত্রে এ রকম হস্তান্তর চলিত থাকার ফলে জমিদারেরা বহু অত্যাচার করতেন, সেই জন্য চাষীদের হস্তান্তরের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং ক্রমশঃ দৃঢ়তর হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে জমি-বিক্রির কোনও ব্যবস্থা হয় নি। পঞ্জাবে যখন এই সমস্যা প্রবল হয়েছিল তখন ১৯০০ সালে ল্যাণ্ড অ্যালিয়েনেশুন আইন পাস হয়। তার ব্যবস্থা[illegible] কতকটা এই [illegible] রণের। কিন্তু তাতে সাময়িক ভাবে জমি-হস্তান্তরের বহু রকম বন্দোবস্ত আছে। সেখানে প্রজাদের জমিদারের [illegible] ছে নিজের স্বত্ব অবাধে বিক্রয় করার অধিকার দেওয়া হ[illegible]। তাছাড়া সাময়িক ভাবে বন্ধক রাখবার জন্য হস্তান্তরের ব্যবস্থাও আছে। পাওনাদার টাকা আদায়ের জন্য জমির দখল নিতে পারেন; অথবা চাষীই জমির দখলে থাকবেন কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সুদ ও আসল কিস্তিমত দিতে না পারলে পাওনাদার ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি নিয়ে জমি দখল করতে পারেন; বা লিখিত দলিলের সাহায্যে পাওনাদারকে জমির মালিক স্বীকার ক'রে নিয়ে দেনদার [illegible] দ্বারা দেনা শোধ করতে পারেন। এ ছাড়া আরও ব্যবস্থা আছে। বাংলার বিলটিতে এ ব্যবস্থা-বৈচিত্র্য নেই।

১৯২৮ সালে যখন কৃষি-কমিশন এই আইনটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন, তখন তাঁরা জেনেছিলেন যে আইনটির ফল মোটের উপর ভালই হয়েছে, এবং অন্ততঃ ৩,২৭,০০০ একর জমি অকৃষকদের হাত থেকে কৃষকদের হাতে ফিরে গেছে। তাঁরা আরও বলেছিলেন যে এ রকম আইনে ফল ভাল হওয়াই সম্ভব এবং এ বিষয়ে আলোচনার সময় এসেছে—যদিও পরে তাঁরা স্পষ্টই স্বীকার করেছিলেন যে, যদি চাষীদের আরও শিক্ষিত না করতে পারা যায়, তাহলে কোনও আইনের সাহায্যেই তাদের রক্ষা সম্ভব নয়। কারণ তারা নিজেদের ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কৃষি-কমিশনের কথা মেনে নিলে এই আইনটির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

৩

কিন্তু এত কারণ থাকা সত্ত্বেও আইনটি সম্পূর্ণতঃ এমন কি অনেকাংশেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথমতঃ এই বিলটি যে আকারে এসেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। কলিকাতার কোনও সুপ্রসিদ্ধ উকিল এই বিলটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

The bill is so loose in its conception and ludicrous in its drafting that it is perhaps not to be taken seriously.

এত দূর না গেলেও একথা নিঃসংশয়েই বলতে পারা যায় যে [illegible] সংশোধন প্রয়োজনীয়। উদাহরণ-

যেতে পারে 'জাতি সম্পর্কে কৃষকের তিন পুরুষের মধ্যে' এ কথাটির ঠিক তাৎপর্য্য কি তা সব সময় ধরা যায় না। কিন্তু যে-সব অকৃষক পূর্ব্বে থেকে এক শত বিঘার বেশী জমির মালিক হয়ে আছেন তাঁরা এ আইনের মধ্যে পড়বেন না, যাঁরা নূতন কিনতে চাচ্ছেন তাঁরাই এর মধ্যে পড়বেন। এর ফলে বহু ক্ষেত্রে ঠিক ন্যায় বিচার হওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। তা ছাড়া বাংলায় যে-সব অকৃষক জমিবন্ধকী ইত্যাদি কারবার করেন, তাঁদের পক্ষে এই ধারাটি বিশেষ কার্য্যকরী হবে ব'লে মনে হয় না। তাঁদের সমস্ত পরিবারের মোট এক শত বিঘার বেশী জমি থাকবে না, কি মাথা-পিছু এক শত বিঘার বেশী থাকবে না, এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। যদি মাথাপিছু এক শত বিঘা জমি থাকার অনুমতি হয়, তা হ'লে মহাজনেরা সহজেই তাঁদের পরিবারের প্রতি লোকটির নামে আলাদা কারবার ক'রে দিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যবসা চালাতে পারেন এবং ফলে বহু কৃষকের জমিই নিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু যদি পরিবারপিছু এক শত বিঘা জমির কথাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লেও নিস্তার নেই। এ পর্য্যন্ত বাংলার নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বহু ক্ষেত্রেই নিজেরা জোত-জমি কিনে ভাগ-চাষে চাষ করিয়ে তাঁদের স্বল্প আয়ের কিছু আয়তন বৃদ্ধি করেছেন, এবং বহু সময় এখনও তাঁদের বিপদে-আপদে জমির উপর নির্ভর করতে হয়। যদি পরিবারপিছু এক শত বিঘার অনধিক জমি ভোগের নির্দ্দেশ দেওয়া হয় তা হ'লে এই নির্দ্দেশের ফলে বহু বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট জমি পাওয়াই কঠিন হয়ে উঠবে। তাই শুধু নয়, বহু একান্নবর্ত্তী পরিবারের পৃথক্ হয়ে যাবার আশঙ্কাও কম নয়। তা ছাড়া যদি কেউ নীলামের খুঁত ধরিয়ে দিতে পারেন, তিনি নীলাম-লব্ধ টাকার অর্দ্ধেক পাবেন—এ নীতির কোনও সমর্থন পাওয়া শক্ত। এ রকম উৎসাহ দেওয়ার ফলে যদিও কোন কোন সময় অন্যায় নীলাম ধরা পড়তে পারে, তা হ'লেও এই উৎসাহে মোকদ্দমা এবং মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাওয়া আশ্চর্য্য নয়। তার পর ফ্যাক্টরির জন্য জমি দেওয়া হয়েছে মাত্র পঞ্চাশ বিঘা। অনেক সময় মাঝারি ফ্যাক্টরিগুলির জন্যও পঞ্চাশ বিঘার বেশী জমি দরকার হয় এবং এক্ষেত্রে আমাদের শিল্পপ্রসারের বাধা হবে সন্দেহ নেই। শহরের ধারে যে-সব জমির মালিক অকৃষক তাঁদের কাছ থেকে বেশী জমি সংগ্রহ করা আইনতঃ সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু যেখানে গ্রামের মধ্যে ফ্যাক্টরি স্থাপনের চেষ্টা চলছে সেখানে এই আইনে বিশেষ অসুবিধা হবে সন্দেহ নেই। চিনির কলগুলির স্বকীয় আখের চাষ থাকলে খরচ বহু কম হয়, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু যদি এই আইন বলবৎ হয় তা হ'লে এ রকম কোনও জমি সংগ্রহ অসম্ভব হবে এবং তার ফল ভাল হবে ব'লে মনে হয় না।

কিন্তু ব্যাপারটির এইখানেই শেষ নয়। এই দোষগুলি বর্ত্তমান আইনটির কিছু সংশোধন করলে হয়ত আর না থাকতে পারে, কিন্তু এর কতকগুলি ভিত্তিগত দোষ আছে। বর্ত্তমান অবস্থায় জমি-হস্তান্তর সম্বন্ধে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম করা সঙ্গত কি না এই জিনিষটিই এখনও বিচারের অতীত হয় নি। অকৃষকের হাতে জমি যাওয়া হয়ত বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে বর্ত্তমানে চাষীদের এক জমি ছাড়া ঋণ-সংগ্রহের অন্য কোনও সম্বল নেই। বাংলার ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটী বলেছিলেন যে সব সময়েই মহাজনেরা যে চড়া হারে সুদ কেবল অন্যায় ভাবে নেন তা নয়—হয়ত কোনও কোনও সময় নিতে বাধ্য হন—এবং এর কারণ হচ্ছে কৃষকদের ঋণ পাওয়ার সম্বল কম। কথাটা চিন্তনীয়। কারণ যদি সরকার হ'তে ঋণ দানের ব্যবস্থা না করা হয় এবং ঋণদান যদি ব্যক্তিবিশেষের হাতে থাকে তা হ'লে সাধারণ লাভক্ষতির হিসাবে টাকা-আদায়ের সম্ভাবনা কম হ'লে সুদ বেশী হবেই এবং টাকা না-দিতে পারলে বন্ধকী জমি বিক্রি হয়ে যাবেই। এ ক্ষেত্রে বাঁধাবাঁধি নিয়ম হ'লে চড়া হারে সুদ বা বন্ধকী জমি কিনে নেওয়া বন্ধ হবে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে টাকা ধার পাওয়াও বন্ধ হবে। কৃষি-কমিশনও স্বীকার করেছিলেন যে, যেখানে ল্যাণ্ড অ্যালিয়েনেশন অ্যাক্ট অন্য দিকে বেশ ভাল কাজ করেছে, সেখানেও এই অসুবিধা দেখা গিয়েছে। বাংলায় চাষীদের ঋণদান সম্বন্ধে নানা রকম আইন হওয়ার

স্থানবিশেষে চাষীদের পক্ষে বিপদ-আপদের সময়েও টাকা সংগ্রহ করা যে বিশেষ কঠিন হয়ে উঠেছে সে কথা অস্বীকার করা চলে না। সরকারী ভাবে একথা স্বীকৃত হয়েছে। এর সঙ্গে যদি বন্ধকের একমাত্র জিনিস জমি সম্বন্ধেও এ আইন হয় তা হ'লে চাষীদের পক্ষে ঋণসংগ্রহ করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। সেই জন্ম যদি সরকার বা আইন-সভা শুধু এই আইনটি পাস করেই কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে মনে করেন তাহ'লে চাষীদের প্রতি যে-দরদ দেখানো হবে সে-দরদের প্রকৃত দাম কিছু নেই, তার অধিকাংশই ভুয়া। যদি চাষীদের সত্যিকারের কোনও উন্নতি চাই তা হ'লে তাদের বর্ত্তমানে ধারের সমস্ত ব্যবস্থা বন্ধ ক'রে দিলেই হবে না—প্রয়োজন-মত সরকারী তহবিল হ'তে স্বল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন একতরফা ব্যবস্থা হিতজনক হবে না—একথা প্রত্যেকেই বুঝবেন। সেই কারণে এ সমস্যার সমাধানের জন্ম আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষাকৃত ব্যাপক হওয়া দরকার; তা না হ'লে এর প্রকৃত সমাধান নেই।

৪

এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা থেকে আর একটু দূরে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এ আইনের মূলগত তাৎপর্য্য কি? বর্ত্তমান যুগে 'চলতে দাও' নীতির পরিবর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র বহুপরিমাণে অর্থনৈতিক এবং সমাজ-জীবনের ভার গ্রহণ করেছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বুলি আজকাল অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেই জন্যে ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ আজ প্রয়োজনীয়। কিন্তু কৃষি এবং শিল্প ব্যবস্থাও রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুরূপ হ'তে বাধ্য এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থাগুলিকে যেমন ধনিকতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রী এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা চলতে পারে, কৃষিব্যবস্থাও ঠিক সেই রকম দুই ভাগে পড়ে। বহু সমৃদ্ধিশালী দেশে কৃষিতে ধনিকতন্ত্র খুব সাফল্যের সঙ্গে চলেছে। কানাডার প্রত্যেক জায়গায় 'মালিক চাষী'দের প্রাধান্য। তারা নিজেরাই জমির মালিক, জমিদার কেউ নেই, এবং তাদের অধীনে দিনমজুর ছাড়া অন্য কোনও স্বত্বাধিকারী নেই এবং প্রত্যেক চাষীরই জমি বহুশত একর। এক্ষেত্রে এই ধনিকতন্ত্র যে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে চলেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। আবার ইংলণ্ডে জমির প্রত্যক্ষ অধিকার রাষ্ট্রের নয়। কিন্তু দু-চার জন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের মতে তাতে কোনও ক্ষতি হয় নি, কারণ সেখানে জমিদারেরা যত স্বল্প সুদে মূলধন সরবরাহ করতে পারেন অন্য কেউ তা পারেন না। কিন্তু অপর দিকে সোভিয়েট তন্ত্র বা এমন কি ডিক্টেটরী শাসন-ব্যবস্থায় যেখানে কোনও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আছে, সেখানে চাষীদের যা খুশী চাষ করার অধিকার নেই—চাষের সমস্ত ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করার ভার রাষ্ট্রের উপর। তাতে অল্প সময়ের মধ্যে চাষের যে উন্নতি হয়েছে তা শুধু যে বহু সময় বিস্ময়কর তাই নয়, তার ব্যবস্থা আরও যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয়। জগতে ধনিকতন্ত্রের ভিত্তি দুর্ব্বল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে-সব দেশে এত দিন পর্য্যন্ত কৃষি বা অন্য বিষয়ে 'চলতে দাও' নীতি চলে আসছিল, সেখানেও রাষ্ট্র বহু পরিমাণে নাড়াচাড়া সুরু করেছে। ইংলণ্ডে, অষ্ট্রেলিয়ায় বহু নূতন নূতন আইন এর প্রমাণ। আমাদের দেশেও ঠিক সেই অবস্থা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে, আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছি সত্য, কিন্তু এদেশের বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা ধনিকতন্ত্রের পর্য্যায়েও বহু স্থানে পৌঁছয় নি। কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ছাপ সুপরিস্ফুট। কাজেই সমাজবিবর্ত্তনের এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে যাওয়ার মধ্যে অন্য দেশের তুলনায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তাতে যে কোনও অসুবিধা হ'তে বাধ্য এমন কোনও কথা নেই। তবে আমরা যখন এ রকম আইনগুলি প্রণয়ন করি, তখন সেগুলির সার্থকতা যে কেবল একটি সমস্যার সমাধানে নয় সে কথা স্মরণ রাখা উচিত, কারণ কোনও সমস্যাই অদ্বৈত নয় এবং ঐ আইনগুলি এই সমাজ-বিবর্ত্তনের বাহ্য প্রকাশ। কোনও কোনও জায়গায় সমাজ-শরীরের উপর এই সাময়িক অস্ত্রোপচারের ফলে দূষিত ক্ষত উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন চাষীদের নিকট হ'তে ঋণ-আদায় সম্বন্ধে যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হয়েছে, কিন্তু তার ফলে চাষীদের ঋণ পাওয়ার যে-অসুবিধা হয়েছে সে-অসুবিধা দূর করার ভার রাষ্ট্র এখনও উপযুক্ত ভাবে নিতে পারে নি। কাজেই শুধু নেতিবাচক আইনে সাময়িক অস্ত্রোপচারের বেশী কিছু আশা করা চলবে না। তাই যাঁরা আমাদের এই বহুদুর্ভাগ্যনিপীড়িত দেশের কিছু উপকার করতে চান, তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সমাজ-শরীরের নব কলেবর অত্যন্ত প্রয়োজন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা কেবল নেতিপন্থায় সম্ভব নয়—এর জন্যে কোনও ব্যাপক পরিকল্পনা এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন এবং তা অনতিবিলম্বেই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পক্ষ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

দেখ, ওঠ, ওঠ—নূতন বধূ নীলিমা শেষরাত্রে স্বামীকে ঠেলা মারিয়া জাগাইয়া দিল। অন্নদাপ্রসাদ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, শুধাইল—কি হয়েছে নীলি?

নীলিমা বলিল—আমার কেমন ভয় করছে।

অন্নদা সান্ত্বনার ও জিজ্ঞাসার সুর মিশাইয়া বলিল—ভয় কিসের?

—বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

—কি বল তো?

বধূ বলিতে লাগিল—যেন কে আমার শিয়রের কাছে বসে ছিল; ঘুম ভেঙে গেল; আবার ঘুমলাম—আবার তাকে দেখলাম, লাল শাড়ী-পরা, গায়ে ফুলের গহনা, যেন সে-ও এক নূতন বউ!

অন্নদা পরিহাস করিয়া বলিল—ওঃ তাহলে নিজেকেই দেখেছ?

বধূ বলিল—না, তার মুখে যেন কত দুঃখের চিহ্ন, এমন বিষণ্ণ চোখ আমি দেখি নি।

এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্নদাপ্রসাদের মুখ কালো হইয়া গেল কিন্তু প্রদীপের স্তিমিত আলোকে তাহা নীলিমার চোখে পড়িল না। স্বামী বলিল—কিছু ভয় নেই লক্ষ্মীটি—আমি আছি, ঘুমোও। ভীত নীলিমা স্বামীর বুকের কাছে আশ্রয় লইয়া শুইয়া পড়িল।

দিনের বেলায় এ-বিষয়ে আর কেহ কোন কথা তুলিল না; বাড়ীতে নূতন গোটাদুই চাকর ছাড়া তৃতীয় আত্মীয়স্বজন কেহ না থাকাতে স্বভাবতই এ-বিষয়ে কাহাকেও বলিবার সুযোগ নীলিমার ছিল না।

কিন্তু রাত্রিতে আবার নীলিমা জাগিয়া উঠিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল—ওগো শুনছ, ওঠ, ওঠ।

—আবার কি হ'ল? অন্নদাপ্রসাদ জাগিয়া উঠিল।

—সেই স্বপ্ন আবার দেখেছি।

—কি বল দেখি। অন্নদাপ্রসাদ আগের রাতের ঘটনা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিল।

বধূ বলিল—লাল শাড়ী আর ফুলের গহনা পরা কে এক জন যেন আমার শিয়রের কাছে—

নীলিমার মুখের অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যকে পূরণ করিয়া অন্নদাপ্রসাদ বলিল—চুপ ক'রে বসে ছিল। এই তো—তা থাকুক না।

নীলিমা বলিল—না, আজ সে কথা বলেছে।

—কথা? অন্নদা চমকিয়া উঠিল।—কি কথা?

—সে বলছিল, আমাকে ঠেলা মেরে, তোর জায়গায় যা, এখানে কেন?

অন্নদাপ্রসাদ এবারে সত্যই চমকিয়া উঠিল। এমন সময়ে ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল—অজ্ঞাতসারে তাহারা পরস্পরের কাছে সরিয়া আসিল; আর সেই শীতের রাত্রেও দু-জনের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমিতে লাগিল—অন্ধকার বলিয়া কেহ দেখিতে পাইল না।

স্বামী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—ও কিছু না। অমন হয়ে থাকে।

—কেন হয় বল না?

অন্নদা আর কিছু বলিবার পাইল না, তাই বলিল—আচ্ছা কাল বুঝিয়ে দেব। সে শুইয়া পড়িল—বধূ তাহার কোল ঘেঁষিয়া শুইল।

প্রবীণ পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে অনুমান করিতে পারিয়াছেন যে নীলিমা অন্নদাপ্রসাদের দ্বিতীয় পক্ষের বধূ। প্রথম পক্ষের বধূ শ্রীলেখা তিন বছর ঘর করিবার পরে কয়েক মাস আগে মারা গিয়াছে। অন্নদার পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু না করিবারও কোন কারণ ছিল না; তাহার বয়স সবে সাতাশ; সন্তানাদি নাই, প্রচুর টাকাকড়ি আছে। শেষে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সে নীলিমাকে

বিবাহ করিয়া ফেলিল। কন্যাপক্ষ অনুমান করিতে পারে নাই যে অন্নদার দ্বিতীয় পক্ষ; কেমন করিয়া পারিবে! সাতাশ বছর বয়স বিবাহের পক্ষে বেশী নয়—আজকালকার বিচারে কিছু কমও হইতে পারে। কথা যখন উঠিল না, অন্নদাও চাপিয়া গেল; শুধু তাই নয়, পাছে দ্বিতীয় পক্ষ জানিয়া নীলিমা ব্যথা পায়, তাই সে বিবাহের পরে দেশে না ফিরিয়া পশ্চিমের এক শহরে চলিয়া গেল; আর শ্রীলেখার চিহ্ন যত দূর সম্ভব মুছিয়া ফেলিল; চিঠিপত্রগুলি ছিঁড়িল; ফটোগুলি পুড়াইল; তাহার ব্যবহৃত শাড়ী জামা গরিবদের বিলাইয়া দিল। সে ভাবিয়াছিল কখন হয়ত কথায় কথায় নীলিমাকে শ্রীলেখার কথা বলিবে—কিন্তু এই ঘটনার পরে তাহা আর সম্ভব বলিয়া মনে হইল না।

সেদিন দুপুরবেলা অন্নদা রোদে বসিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল আর নীলিমা প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ খুলিয়া কাপড়চোপড় রোদে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। নীলিমা কতকগুলি শাড়ী ও ব্লাউজ বাহির করিতে করিতে বলিল—দেখ, অন্য কোন দিকে তোমার দৃষ্টি নেই, কিন্তু বিয়ের আগেই এতগুলো শাড়ী কিনতে গেলে কেন?

অন্নদা হাসিয়া বলিল—কবে যুদ্ধ বেধে যায়—তখন তো আবার চড়া দামে কিনতে হ'ত।

—কিন্তু ব্লাউজ যে এতগুলো করিয়ে রেখেছ বোকার মত, যদি আমার গায়ে ছোট হ'ত, কি বড় হ'ত!

অন্নদা পুনরায় হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল—কিন্তু ছোটও হয় নি, বড়ও হয় নি, ঠিকই হয়েছে তো!

—তা হয়েছে বটে! নীলিমা ভাঁজ খুলিয়া একে একে বস্ত্রাদি রোদে দিতে লাগিল।

না হইবারই কথা! শ্রীলেখা আর নীলিমা দু-জনে প্রায় এক মাপেরই। এ সমস্তই শ্রীলেখার; তবে তাহাতে ব্যবহারের কোন চিহ্ন নাই বলিয়া, আর দামও অনেক, অন্নদা সেগুলি পরিত্যাগ করে নাই।

নীলিমা কৌতূহল ও আবদারের সুরে শুধাইল—আচ্ছা কি ক'রে তুমি আমার ঠিক মাপটি জানলে?

অন্নদা বলিয়া ফেলিল—তা জান না, বিয়ের আগে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম—

কিন্তু কথাটা হঠাৎ-দেখা সাপের মত দু-জনকেই চমকাইয়া দিল; স্বামী অস্বস্তি বোধ করিল, বধূর রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া গেল।

সে বলিল—আচ্ছা এই যে আমি রাতের পর রাত ঐ একই স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি, এর কোন প্রতিকার করবে না?

অন্নদা বলিল—স্বপ্নের আর প্রতিকার কি? আর তোমার কিছু ক্ষতিও তো হচ্ছে না।

নীলিমা বলিল—আমার কি মনে হয় জান—অন্নদার বুক কাঁপিয়া উঠিল—মনে হয় এ বাড়ীতে কোন প্রেত বাস করে; সে চায় না যে আমি এখানে থাকি, তাই ক্রমাগত বলে, এখানে কেন? তোর জায়গায় যা! তার পরে একটু থামিয়া বলিল—আচ্ছা বাসাটা বদলালে হয় না!

অন্নদা কথাটাকে চাপা দিবার জন্য বলিল—আচ্ছা দেখা যাবে।

২

অবস্থা ক্রমে অধিকতর সঙ্কটজনক হইতে লাগিল। নীলিমার ঘুমাইবার উপায় আর রহিল না। একটু ঘুম আসিয়াছে কি, অমনি সে ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—ওগো, শুনছ, আবার সেই মূর্ত্তি! অন্নদা কতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে? অল্পক্ষণ পরেই সে ঘুমাইয়া পড়ে—নীলিমা স্থির করে, সে আর ঘুমাইবে না, বাকি রাতটুকু জাগিয়া কাটাইবে;—কিন্তু ক্রমে জাগরণও অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

নির্জ্জন ঘর, নিঃসঙ্গ প্রহর; স্তিমিত দীপের আলোয় দেয়ালে কিম্ভূত সব ছায়া পড়ে; চোখ বন্ধ করিলে সেই শাড়ী-পরা মেয়েটাকে মনে পড়িয়া যায়; চোখ খুলিয়া থাকিলে দেয়ালের চটা-ওঠা রেখাগুলা ক্রমে রক্তে মাংসে পূরিয়া সজীব হইয়া উঠিতে থাকে।

দক্ষিণ দিকের দেয়ালে ওটা তো ছায়া! কিন্তু নড়িতেছে কেন? না, নড়িবে কেন? কি আশ্চর্য্য,

এমন ভাবে দেয়ালের চটা উঠিয়াছে, ঠিক একটা মেয়ে-মানুষের চেহারা সৃষ্টি করিয়াছে! শাড়ীটা যেন লাল! নড়িতেছে নাকি! স্বপ্নে-দেখা সেই মানুষ!

নীলিমা চমকিয়া উঠিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরে—অন্নদা-প্রসাদ লাফ দিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করে—কি আবার স্বপ্ন দেখলে নাকি?

নীলিমা বলে—আমি তো ঘুমোই নি।

—তবে?

—সে যেন এসেছিল।

—কে?

নীলিমা ভয়ে ভয়ে বলে, পাছে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা, সে শুনিতে পায়—স্বপ্নে-দেখা সেই মেয়েটা।

এমন সময়ে হয়ত প্রদীপটা নিবিয়া যায়, দুই জনে অন্ধকারে বসিয়া ঘামিতে থাকে। নীলিমা বলে—চল বাসা বদলাই। অন্নদা শুষ্ককণ্ঠে বলে—আচ্ছা।

৩

অবশেষে বাসা বদলানোই স্থির হইল। অনেক খুঁজিয়া মনের মত একটা বাসা মিলিল, আগামী কাল সেখানে উঠিয়া যাওয়া হইবে। নীলিমার মন অনেক হাল্কা হইয়া গেল, বহুদিন পরে তার মুখে হাসি দেখা দিল। সারাদিন সে খাটিয়া জিনিষপত্র গুছাইল, বাঁধা-ছাদা করিল, কাল সকালবেলাতেই যাহাতে বাসা ছাড়িতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিল—এমন কি অন্য দিন সন্ধ্যাবেলা আসন্ন শয্যার কথায় মনে পড়িয়া যে আতঙ্ক উপস্থিত হইত, সে-ভাবটাও কমিয়া গেল; বিছানায় শুইতেই তাহার ঘুম আসিল। অন্নদা তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

আজ শেষ রাত্রি। নীলিমা স্বপ্ন দেখিল সেই মেয়েটি লাল শাড়ীতে ফুলের গহনায় সাজিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিল।

নীলিমা বলিল—তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি—আমাকে আর বিরক্ত করিও না।

সেই মেয়েটি বলিল—বাসা ছাড়িলেই কি আমাকে ছাড়িতে পারিবে?

—নয় কেন?

—আমার জায়গা যে অধিকার করিয়া বসিয়াছ!

নীলিমা শুধাইল—তোমার জায়গা! সে আবার কি?

মেয়েটি বলিল—যদি জানিতে চাও, ওঠ। স্বপ্ন-চালিত নীলিমা উঠিল।

সেই মেয়েটি বলিল—বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে চল।

নীলিমা যন্ত্রের মত বাহিরে আসিল, শুধাইল—কোথায় যাইতে হইবে?

—আমার পিছনে পিছনে এস।

তাহাকে অনুসরণ করিয়া নীলিমা চলিল। সে ঘর ত্যাগ করিল: আর একটা ঘরও ছাড়িয়া আসিল; তার পরের ঘরে মেয়েটি থামিল—নীলিমা থামিল।

মেয়েটি বলিল—ওই টেবিলের ছোট দেরাজে একটা চাবি আছে, খোলো।

নীলিমা দেরাজ খুলিয়া চাবি লইল। এখন এই ঘরটাতে তাহাদের তোরঙ্গ, বাক্স প্রভৃতি থাকিত।

মেয়েটি বলিল—ঐ হাতবাক্সটা খোলো।

নীলিমা বলিল—ও হাতবাক্স আমার স্বামীর, আমি কখনও খুলি না।

মেয়েটি বলিল—যদি সব জানিতে চাও তবে খোল।

নীলিমা যন্ত্রের মত খুলিয়া ফেলিল।

—ঐ ডালাখানা তোল।

নীলিমা তাহাই করিল।

—এইবারে ঐ কাগজগুলা সরাও।

নীলিমা সরাইল।

—ঐ দেখ একখানা বড় খাম। ওখানা বাহির করিয়া লও।

নীলিমা বাহির করিল।

—এবার বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি যথাস্থানে রাখ।

নীলিমা সেইরূপ করিল।

তখন মেয়েটি বলিল—এইবারে দেখ খামখানার ভিতরে কি আছে?

নীলিমা একখানা পুরু কাগজ বাহির করিয়া ফেলিল।

মেয়েটি বলিল—ওখানাতে কি আছে দেখ।

এইখানে নীলিমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে দেখিল তাহার হাতে একখানা ছবি—রক্তাম্বরা, ফুলসজ্জায় সজ্জিতা, বধূবেশিনী সেই স্বপ্নে-দেখা মেয়েটির ফটোগ্রাফ! এক মুহূর্ত্ত মাত্র। তার পরেই চীৎকার করিয়া উঠিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া সশব্দে মেঝের উপরে পড়িয়া গেল।

সেই শব্দে অন্নদাপ্রসাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল; দেখিল পাশে নীলিমা নাই; নানারূপ শঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। কোথায় গেল সে? নাম ধরিয়া ডাকিল—কেহ উত্তর দিল না। তখন মনে হইল—এই মাত্র একটা শব্দ শুনিল—কিসের শব্দ? সে আলো লইয়া এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল বাক্স রাখিবার ঘরের মেঝেতে নীলিমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। অন্নদাপ্রসাদের মুখে কথা বাহির হইল না। কিন্তু এমন করিয়া থাকিলে তো চলিবে না। সে জল আনিয়া তাহার মাথায় দিল—পাখা লইয়া বাতাস করিল; নাম ধরিয়া ডাকিল, অনেক চেষ্টার পরে নীলিমার মূর্চ্ছা ভাঙিল, জ্ঞান ফিরিল।

সে শুধাইল—তুমি কে?

অন্নদা বলিল—আমি অন্নদা।

নীলিমা শুধু বলিল—ও।

অন্নদা শুধাইল—তুমি এখানে এলে কি ক'রে?

সে বলিল—সেই মেয়েটি নিয়ে এসেছে।

—কোন্ মেয়েটি?

—সেই যাকে স্বপ্নে দেখেছি।

অন্নদা বলিল—ও সব বাজে! তুমি স্বপ্ন দেখে এখানে চলে এসেছ!

নীলিমা দৃঢ়ভাবে বলিল—স্বপ্ন নয়! তার পরে নিজকেই যেন প্রশ্ন করিল—ছবিখানা কোথায়?

অন্নদা বলিল—ছবি! কিসের ছবি?

নীলিমা বলিল—সেই মেয়েটির—সেই এক মুখ, এক সাজ!

সে এদিক-ওদিক তাকাইতে দেখিতে পাইল অদূরে ছবিখানা পড়িয়া আছে; মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার সময়ে হাত হইতে ছিটকাইয়া গিয়াছিল। সে ছবিখানা তুলিয়া লইয়া বলিল—এই মেয়েটিকেই আমি প্রতিরাত্রে স্বপ্নে দেখি। আজ সে আমাকে বলেছিল, এ বাসা ছাড়লেই আমাকে ছাড়তে পারবে না। তখন সে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে তোমার হাতবাক্স থেকে এই ছবি বার করতে বাধ্য করল। তার পরে বলল—এবারে দেখ। তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি যাকে এত দিন স্বপ্নে দেখেছি—এ ছবি তারই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে অন্নদাকে জিজ্ঞাসা করিল—এ ছবি তোমার বাক্সে এল কি ক'রে?

অন্নদা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া বলিল—বিছানায় চল, সব বলব।

বিছানায় গিয়া অন্নদাপ্রসাদ সব স্বীকার করিল। প্রথম পক্ষের পত্নীর কথা শুনিয়া নীলিমা দুঃখিত হইল না, বরঞ্চ সে স্মৃতি যাহাতে নীলিমাকে ব্যথিত না করে সে জন্য কত সঙ্কোচে অন্নদা সব দিক্ বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে জানিয়া স্বামীর প্রতি ভক্তি বরঞ্চ বাড়িল।

অন্নদা বলিল—আমি শ্রীলেখার সব স্মৃতি মুছে ফেলেছিলাম, কেবল ঐ ফুলসজ্জার সাজে তোলা ফটোগ্রাফখানা নষ্ট করি নি। কিন্তু আমার বিস্ময় লাগে! তুমি তার খোঁজ জানলে কি ক'রে?

নীলিমা বলে—সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নইলে আমি কি জানতাম ওটা ওখানে আছে?

অন্নদা বলে—সে কথা ঠিক। শুনেছি সোমনাম-বুলিজমে এমন হয়।

* * *

পরদিন তাহারা সে বাসা ছাড়িয়া গেল। তাহাদের পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস আর জানি না।

আলোচনা

অহিংসা

শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা

মাঘের প্রবাসীতে প্রকাশিত অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের 'অহিংসা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি হিংসার, কি অহিংসার, শ্রেয়ত্ব প্রতিপন্ন করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন, "...হিংসাবৃত্তি আছে বলিয়াই মানুষেরা যৌথভাবে বাস করে...প্রাকৃতিক নিয়ম হিংসানীতির স্বপক্ষে।...নিম্নস্তরের জীবন গড়িয়া উঠিবার পক্ষে অহিংসাই প্রবল বাধা।" দলবদ্ধভাবে থাকার গোড়াকার ইতিহাসে হিংসাবৃত্তির প্রভাব স্বীকার করিয়া লইলেও (যদিও আধুনিক নৃতত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা স্বীকার করেন না) বর্ত্তমান মানবসমাজগঠনের ভিত্তি কি হিংসা? পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে, সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ ঘটিবে এবং আত্মবিকাশের সুবিধা হইবে ইহাই সমাজগঠনের মূলনীতি নয় কি? সকল মানুষের পক্ষে হিংসাই আত্মবিকাশের অন্তরায়। অহিংসা আত্মার ধর্ম্ম। অহিংসাকে আশ্রয় করিয়াই আত্মপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। প্রবন্ধলেখক মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, অহিংসার উপলব্ধি আত্মার যথার্থ উপলব্ধি এবং ইহাই আত্মার স্বরূপ প্রকাশ।

অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম হিংসার পক্ষে। প্রাচ্য মনীষিগণ হিংসার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং অহিংসাকে সনাতন ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানং চ সতাং ধর্ম্মো সনাতনঃ।"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব

পাশ্চাত্য সুধীগণও প্রাকৃতিক নিয়মে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা উন্নতি সাধনের ধারাই দেখিয়াছেন এবং সামাজিক জীবনের সহিত হিংসার কোন সামঞ্জস্য হইতে পারে না এ কথাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। অধ্যাপক হোয়াইট-হেড তাঁহার বিখ্যাত "Science and the Modern World" নামক পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—

"Those organisms are successful which modify their environments so as to assist each other. This law is exemplified in nature on a vast ...".

The Gospel of Force is incompatible with a social life. By *force*, I mean *antagonism* in its most general sense. (Italics mine.)

অধ্যাপক মহাশয় গান্ধীজীর অহিংসবাদ অনশনের সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত এইরূপ ধরিয়া লইয়া ইহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অনশন অহিংসার সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত নয়। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, চিত্তশুদ্ধির উপায়-রূপে, ধ্যানের সহায়করূপে, অনশন-ব্রত গ্রহণ করা যাইতে পারে। উচ্চমনা ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আত্মীয়স্বরূপ, অন্তরঙ্গ বন্ধুতুল্য ব্যক্তিগণের অন্যায় কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অনশন-ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের নিজেদের দৌর্ব্বল্য বা ত্রুটি বশতঃ অন্যায় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে এবং ইহার সংশোধনের জন্য তাঁহারা অনশন-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'স্বকার্য্যোদ্ধারে'র জন্য অনশন কোনক্রমেই চলিতে পারে না।

"...Fasting for the sake of personal gain is nothing short of intimidation and is a result of ignorance."—*Young India*, Sep. 30, 1926.

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে সমাজের দণ্ডবিধানের ফলে লোকে অহিংসার শ্রেয়ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শাসনের ভয়ে অহিংস হওয়া বহুনিন্দিত অহিংসবাদের অহিংসার নিকৃষ্টতম সংস্করণও নহে, ইহা কাপুরুষতার নামান্তর এবং হিংসারই রূপান্তর মাত্র। অহিংসবাদে কাপুরুষতার স্থান নাই।

আমরা অহিংস হইব অপরের ভয়ে নহে, অহিংসা আমাদের স্ব-ভাব, স্ব-ধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া। আত্মবিকাশের জন্য, স্বরূপ প্রকাশের জন্যই অহিংস হইব, রাজশাসন বা সমাজশাসনের জন্য নয়, যুদ্ধের দান হিসাবেও নয়। অহিংসার পথ বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ বলিয়াই গ্রহণ করিব, অন্য কোন কারণে নহে।

শ্যামানন্দের জাতি ও নিবাস

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর

মাঘের 'প্রবাসী'তে পণ্ডিত শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন "বিদ্যা-সাগরের মেদিনীপুর" প্রবন্ধে শ্যামানন্দের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"শ্যামানন্দের স্থান হইল মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত গোপীবল্লভপুর গ্রামে।...শ্যামানন্দ ছিলেন জাতিতে করণ।...শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিক মুরারি।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথায় ডাঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"শ্যামানন্দ ছিলেন জাতিতে সদ্গোপ। ইঁহার নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে।...বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে শ্যামানন্দ তাঁহার ধনী শিষ্য রসিকানন্দের বিশেষ সহায়তা পাইয়াছিলেন।"

এই উভয় শ্যামানন্দ একই ব্যক্তি এবং খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিরাজমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাঃ সেন শ্যামানন্দকে সদ্গোপ বলিয়াছিলেন। পরলোকগত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনও শ্যামানন্দকে সদ্গোপ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও এত দিন তাহাই জানিতাম। জাতি যাহাই হউক না কেন, ধর্ম্মগুরু হিসাবে তিনি বঙ্গদেশ ও তাহার বাহিরের অনেক প্রদেশে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা বাদে, বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের জন্যও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সকল কারণে শ্যামানন্দের বাসস্থান ও জাতি সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

ধর্ম্মপ্রচারের দিক্ দিয়া শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য তাঁহার অপেক্ষা বেশী কাজ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত সেনের মতে তাঁহার নাম রসিকমুরারি এবং ডাঃ সেনের মতে রসিকানন্দ।

প্রত্যুত্তর

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

মেদিনীপুরের বৈষ্ণবদের কাছে এইবার গিয়া শ্যামানন্দের জাতি ও নিবাস সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি। শ্যামানন্দ "করণ"ই হউন বা "সদ্গোপ"ই হউন তাহাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। আমাদের ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য যে এই সব বর্ণজাত লোকও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতাপে সর্বলোকগুরু হইতে পারিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও ইঁহাদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

রসিকানন্দ ও রসিকমুরারি এই উভয় নামই আমরা হিন্দী ভক্তচরিতে পাই। এই বিষয়ে মেদিনীপুরের সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে ইতিপূর্ব্বে আরও এক বার কিছু বলিয়াছি।

ভক্তদের জাতি ও বসতি আমাদের পক্ষে গৌণ। তাঁহাদের বাণী ও উপদেশই আমাদের কাছে মুখ্য কথা। বিশেষজ্ঞেরা এই বিষয়ে যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা আমরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিব। সুকুমারবাবুর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। তাঁহার লিখিত "সদ্গোপ" পরিচয়ও আমি জানি, ধারেন্দা-বাহাদুরপুরও আমি জানি। তবু এবার বৈষ্ণবদের কাছে যাহা শুনিয়াছি তাহা লিখিয়াছি। ইহাতে হয়ত আলোচনার পক্ষে সুবিধাই হইবে।

এই বিষয়ে আমরা অনেক খোঁজখবর হিন্দী গ্রন্থ হইতে পাই। তাহাতে ভুলভ্রান্তিও থাকিতে পারে। মোট কথা, আমরা সত্যের বিরোধী নহি, যাহা সত্য সিদ্ধান্ত হইবে তাহাই আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

ভারতীয় মুসলমানদের বংশ-পরিচয়

শ্রীদয়াময় মুখোপাধ্যায়

ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে "ভারতীয় মুসলমানদের বংশপরিচয়" সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিলাম। ঐ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শনে' যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য।

"মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগ মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব ধর্ম্মবল। এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক—কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।"
—বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, 'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় ভাগ, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৩২৬-৩২৭।

বাংলার সম্বন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও খাটিবে ইহা বলা বাহুল্য।

বর্ত্তমান বর্ষে বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২

রসায়ন

কৃত্রিম উপায়ে যৌন-হরমোন উৎপাদন এবং তাহাদের রাসায়নিক সংগঠন সম্বন্ধে অপূর্ব্ব আবিষ্কারের জন্য অধ্যাপক বুটেন্যাণ্ট এবং জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-রসায়নের অধ্যাপক রুজিকা সম্মিলিত ভাবে রসায়ন-শাস্ত্রে ১৯৩৯ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক বুটেন্যাণ্টের আবিষ্কার-বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অধ্যাপক রুজিকার আবিষ্কারের বিষয় এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। ১৯৩১ সালে অধ্যাপক বুটেন্যাণ্ট কর্ত্তৃক পুং-যৌন-হরমোন য়্যাণ্ড্রোষ্টেরন (রাসায়নিক উপাদান—কার্ব্বন ১৯ হাইড্রোজেন ৩০ অক্সিজেন ২) এবং তদনুরূপ অন্যান্য যৌগিক পদার্থ উৎপাদনের পর অধ্যাপক রুজিকা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ৫০,০০০ লিটার মূত্র হইতে মাত্র ২৫ মিলিগ্রাম হরমোন বাহির করিতে সমর্থ হন। তৎপরে তিনি তাঁহার পরীক্ষাগারে এপি-ডিহাইড্রোকোলেষ্টেরল হইতে কৃত্রিম উপায়ে এই পদার্থ উৎপাদন করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের বিস্ময় উদ্রেক করেন। তিনি কেবল এই পদার্থ উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ১৯৩১ সালে অধ্যাপক বুটেন্যাণ্ট য়্যাণ্ড্রোষ্টেরনের যে রাসায়নিক সংগঠন নিরূপণ করিয়াছিলেন, তিনি এই কৃত্রিম যৌন-হরমোনের রাসায়নিক সংগঠন নির্দ্ধারণ করিয়া বুটেন্যাণ্টের পরীক্ষালব্ধ ফলের নির্ভুলতা প্রমাণিত করেন।

১৯৩৫ সালে তিনি কোলেষ্টেরল হইতে হাইড্রো-আইসো-য়্যাণ্ড্রোষ্টেরন (রাসায়নিক উপাদান—কার্ব্বন ১৯ হাইড্রোজেন ২৮ অক্সিজেন ২) নামে এক প্রকার পুং-যৌন-হরমোন উৎপাদন করেন এবং ইহাকে টেষ্টোষ্টেরনে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হন। এতদ্ব্যতীত তিনি য়্যাণ্ড্রোষ্টেরন ও টেষ্টোষ্টেরন হইতে আরও এমন কতগুলি শক্তিশালী পদার্থ আবিষ্কার করেন যাহা পুরুষজাতীয় প্রাণীর বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক ঝুঁটি বা তজ্জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে স্বাভাবিক পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

কৃত্রিম উপায়ে যৌন-হরমোন উৎপাদন ব্যতীত পলিটারপিন্‌স্ ও পলিটারপিনয়েড্‌স্ এবং রাসায়নিক সংগঠন সম্পর্কিত তাঁহার গবেষণাসমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে।

ভেষজবিজ্ঞান

বেলজিয়মের ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজতত্ত্বের অধ্যাপক কারনেইলি হেয়্যান্সকে শারীরতত্ত্ব-বিষয়ক অপূর্ব্ব পরীক্ষাকৌশল এবং ভেষজতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় অতি মূল্যবান গবেষণার জন্য ১৯৩৮ সালের নোবেল পুরস্কার প্রদান করিয়া সম্মানিত করা হইয়াছে। শরীরের রক্তসঞ্চালন-প্রক্রিয়া কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কি ভাবে জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে—বহুকাল হইতেই শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট ইহা একটি মহা সমস্যার বিষয় ছিল। দেহাভ্যন্তরস্থ রক্তবহা-নাড়ীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে তাহা বাহির হইতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তিনি রক্তসঞ্চালন-প্রক্রিয়ার অনেক অজ্ঞাত তথ্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছেন। শরীরের ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জটিল যন্ত্রসমূহ কি উপায়ে বাহিরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বাহ্যিক, মানসিক ও আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য বিধান করে, বহুকাল হইতে বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় মস্তিষ্কের সর্ব্বাধিক বিস্তৃত স্নায়ু 'ভ্যাগাস' এবং কেন্দ্রীয় 'ভাসো-মোটরে'র কার্য্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল;

কিন্তু রক্তচাপ-নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। প্রোফেসর হেম্যান্সই 'ক্যারোটিড সাইনাসে'র রক্তচাপ-নিয়ামক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্য্যাবলীর বিষয় পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত করেন। রক্তবহা-নাড়ী 'ক্যারোটিড আর্টারী' যেখানে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে সেই স্থানের একটি বিস্ফারিত অংশকে 'সাইনাস্ ক্যারোটিকাস্' বলা হয়। জার্ম্মেনীতে হেরিং এবং কচ্ ইহা আবিষ্কার করেন। স্পেনীয় শারীরতত্ত্ববিদ্ ডি ক্যাস্ট্রো 'ক্যারোটিড্ সাইনাসে'র গঠনকৌশল ও তন্তুসংস্থান-বিষয়ক অতি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিরূপণ করেন। এই 'ক্যারোটিড সাইনাসে'র কোন্ কোন্ অংশ শরীরের রক্তসঞ্চালন এবং শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রক্রিয়া-নিয়ন্ত্রণে কিরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে অধ্যাপক হেম্যান্স তাহা অপূর্ব্ব পরীক্ষাকৌশলে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি রক্তসঞ্চালন-নিয়ামক ব্যবস্থা-সম্পর্কে ভেষজতাত্ত্বিক ও জৈব প্রক্রিয়ার আরও অনেক বিষয়ে আলোক সম্পাত করিয়াছেন। অনেক দিন হইতেই তিনি তাঁহার পিতা জে. হেম্যান্সের সহিত সম্মিলিত ভাবে এ সম্বন্ধে বিভিন্নরূপে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। বর্ত্তমানে জীবনতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় তাঁহার পিতার ও তাঁহার নিজের কতকগুলি সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিয়া তিনি এই উচ্চ সম্মানের অধিকারী হইলেন।

এলবারফেল্ডের বেয়ার কোম্পানীর চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক গার্হার্ড ডোমাক ভেষজতত্ত্বে এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য এবার ১৯৩৯ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি মাত্র অল্প-কয়েক বৎসর যাবৎ বৈজ্ঞানিক সমাজে সুপরিচিত হইয়া থাকিলেও ইতিমধ্যেই ব্যাক্‌টিরিয়া-সৃষ্ট ব্যাধির প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন। ১৯০৬ সালে পোল আর্লিক কর্ত্তৃক স্যালভার্সান্ আবিষ্কৃত হইবার পর শরীরাভ্যন্তরস্থ জীবাণু ধ্বংস করিবার কোন উপায় উদ্ভাবনের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রোটো-জোয়া-জাতীয় জীবাণু ধ্বংসের কয়েক প্রকার প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হইল সত্য, কিন্তু ব্যাক্‌টিরিয়া-জাতীয় জীবাণু নষ্ট করিবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অনেক দিনের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর ১৯১৮ সালে লেভি এবং মরগেনরথ নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় দেখিতে পাইলেন যে, সিন্‌কোনাসার হইতে প্রাপ্ত ইথাইল্ হাইড্রোকিউপ্রিন্-প্রয়োগে ইঁদুরের দেহস্থিত নিউমোনিয়া-উৎপাদক ব্যাক্‌টিরিয়া কিয়ৎপরিমাণে ধ্বংস হইয়া যায়। তার পর সেই বৎসরেই হাইডেল্‌বার্গার-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ হাইড্রোকিউপ্রিনের সহিত অন্যান্য যৌগিক পদার্থসহযোগে অধিকতর শক্তিশালী জীবাণু-ধ্বংসী ভেষজ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। বিশেষতঃ শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারক হইবে না অথচ ব্যাক্‌টিরিয়াও ধ্বংস হইবে, এরূপ কোন যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। তার পর আরও কিছু দিন বৈজ্ঞানিকদের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্যাক্‌টিরিয়া-সংক্রামিত ব্যাধির প্রতিষেধক আবিষ্কার করা ভেষজ-বিজ্ঞানের সাধ্যায়ত্ত নহে।

কিন্তু ১৯৩৫ সালে ডোমাক প্রকাশ করিলেন যে, প্রোন্‌টোসিল্ নামে এক প্রকার লাল বর্ণের রঞ্জক পদার্থ প্রয়োগে ইঁদুরের দেহস্থিত ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্ জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৯৩২ সালে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে তাঁহার সহকর্ম্মীদের দ্বারা এই রঞ্জক পদার্থ উৎপাদিত হয় এবং ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্ জীবাণু দ্বারা ভীষণরূপে আক্রান্ত ইঁদুরের উপর তিনি ইহা প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহারা অতি সহজেই রোগমুক্ত হইয়া থাকে। রোগাক্রান্ত ইঁদুরের অন্ত্রাভ্যন্তরস্থ আবরণীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যাক্‌টিরিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রোন্‌টোসিল্-প্রয়োগের ৪৮ ঘণ্টা পরে অন্ত্রাভ্যন্তরে তিনি ব্যাক্‌টিরিয়ার চিহ্নমাত্র দেখিতে পান নাই। জার্ম্মেনী, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বহু গবেষণাকারী প্রোন্‌টোসিল্-পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল লাভ করিয়া ডোমাকের আবিষ্কারের নির্ভুলতা প্রমাণ করিয়াছেন। লেভাডিটি, ভাইস্‌ম্যান্ এবং সর্ব্বশেষে কোলব্রুক বিভিন্ন

রকমে পরীক্ষা করিয়া ডোমাকের আবিষ্কার সমর্থন করিয়াছেন। ডোমাক স্বয়ং বহু রোগীকে প্রোন্‌টোসিল্ প্রয়োগ করিয়া নিরাময় করিয়াছেন। এমন কি নিজ কন্যাকে তিনি ইহা প্রয়োগ করিয়া ষ্ট্রেপ্টোকক্কাসের গুরুতর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। সূচ ফুটিয়া তাঁহার কন্যা ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস ব্যাক্‌টিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। উপর্য্যুপরি অস্ত্রোপচারের ফলেও যখন সে আরোগ্যলাভ করিতে পারিল না তখন ডোমাক তাহাকে প্রোন্‌টোসিল্ খাওয়াইয়া সে যাত্রা আরোগ্য করিয়া তোলেন।

প্রোন্‌টোসিল্ আবিষ্কারের পর কৃত্রিম উপায়ে এই জাতীয় আরও কতকগুলি যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং অধিকতর শক্তিশালী প্রতিষেধক যৌগিক পদার্থ উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। ভবিষ্যতে যে এই জাতীয় আরও কত কি আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? ডোমাক একটি অনাবিষ্কৃত পথের সন্ধান দিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে এই পথ প্রশস্ততর হইয়া উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। শীঘ্রই হয়ত দেখিতে পাইব—এই পথে ব্যাক্‌টিরিয়া অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর ভাইরাস্-সংক্রামিত ব্যাধির প্রতীকারের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এক পদার্থ কিরূপে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়?

যন্ত্র-জগতের বিস্ময় সাইক্লোট্রোনের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, এই অদ্ভুত যন্ত্র-সাহায্যে এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করা যাইবে এবং ইতিমধ্যেই কতকগুলি স্থায়ী পদার্থকে ক্ষণস্থায়ী স্বতোবিকিরণকারী পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইয়াছে। কি উপায়ে পদার্থের এই রূপান্তর সংঘটিত হইতে পারে তাহা বুঝিতে হইলে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

এমন এক সময় ছিল যখন লোকে বিশ্বাস করিত যে, পরশমণির সংস্পর্শে নিকৃষ্ট ধাতু উৎকৃষ্ট ধাতুতে রূপান্তরিত হইতে পারে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের কিছু অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই এ-ধারণা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কোন পদার্থকে চূর্ণ করিতে করিতে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে হয় যখন আর তাহাকে ভাগ করা চলে না। এই ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণিকার নামই পরমাণু। কিন্তু সেই অবস্থায়ও তাহার গুণের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। অর্থাৎ সোনা চূর্ণ করিলে সোনাই থাকিয়া যায়, লোহা চূর্ণ করিলে লোহাই পাওয়া যায়। অতঃপর বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের উপাদান অবিভাজ্য পরমাণু সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এক নূতন রহস্যের উদ্ঘাটন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, এই অবিভাজ্য পরমাণু প্রকৃত প্রস্তাবে অবিভাজ্য নহে। প্রত্যেকটি পরমাণু তড়িৎ-প্রভাবান্বিত কতকগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকার সমবায়ে গঠিত। ধন-তড়িৎসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় পদার্থের চতুর্দ্দিকে ঋণ-তড়িৎসম্পন্ন কতকগুলি কণিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সৌরজগতের অনুরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এই অদৃশ্য পদার্থই এক একটি পরমাণু। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের এই তড়িতাবেশযুক্ত কণিকার সংখ্যা বিভিন্ন রূপ, এবং দেখা গেল যে মানুষের হাতে এমন কোন ক্ষমতা নাই যাহার সাহায্যে তাহারা পরমাণুর এই কণিকাগুলিকে স্থানচ্যুত করিতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের এমনই স্বভাব যে তাঁহারা কিছুতেই নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারেন না। অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য তাঁহারা নানা ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও বৈজ্ঞানিকদের যখন ধারণা ছিল যে, পরমাণুকে কোন ক্রমেই পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত করা সম্ভব নহে, সেই সময়ে একটা বিস্ময়কর আবিষ্কারে তাঁহাদের এত কালের ধারণাকে ওলটপালট করিয়া দিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম নামক দুইটি ভারী পদার্থের স্বতোবিকিরণ-ক্ষমতার বিষয় আবিষ্কারই পদার্থবিজ্ঞানে এক নব যুগ আনয়ন করে। কোন পদার্থের স্বতোবিকিরণ-ক্ষমতা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সেই পদার্থ ধীরে ধীরে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হইতেছে। স্বতোবিকিরণকারী পদার্থের পরমাণুর সূক্ষ্ম কণিকাগুলি যথাক্রমে প্রতি মুহূর্ত্তে চঞ্চল হইয়া ওঠে এবং ভীমবেগে বিস্ফুরিত হইয়া আল্‌ফা-কণিকা (তড়িতাবিষ্ট হিলিয়ম পরমাণু) অথবা বিটা-কণিকা রূপে (আলো-কণিকার পরিমাণবিশিষ্ট অতি দ্রুতগামী ইলেকট্রন) ছুটিয়া

বাহির হইয়া যায়। এই বিস্ফোরণের ফলে নূতন স্বতোবিকিরণকারী পদার্থের উৎপত্তি ঘটে।

কতকগুলি বিভিন্ন অবস্থায় পদার্থের এরূপ রূপান্তর সংঘটিত হইয়া থাকে। এই উপায়ে যত রকমের স্বতোবিকিরণকারী পদার্থের উৎপত্তি হয় তাহারা একই নিয়মে বিভিন্ন গতিতে নিজে নিজেই ভাঙিতে থাকে।

কাজেই ইহা হইতে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ বিস্ময়কর এক নূতন জগতের সন্ধান পাওয়া গেল, যেখানে অহরহই তাহাদের ভাঙাগড়া চলিতেছে এবং তাহার ফলে বিপুল শক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে। ইউরেনিয়ম, থোরিয়ম ও তাহা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য পদার্থ ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় অন্যান্য মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ অধিকাংশ মৌলিক পদার্থই চিরস্থায়ী। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে এই স্থায়ী মৌলিক পদার্থগুলিকেও অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করা যায় কি না ইহাই তখন বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করিতে হইলে তাহাদের পরমাণুর গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, নচেৎ আন্দাজে কোন পন্থা অনুসরণ করা সম্ভব নহে। এই বিষয়ে গবেষণার ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রাদারফোর্ড পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ এক কেন্দ্রীয় পদার্থের অস্তিত্ব অনুমান করেন। বিভিন্ন পরীক্ষা ও গবেষণায় এই অনুমানই অবশেষে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে ধন-তড়িৎসম্পন্ন ক্ষুদ্র একটু কেন্দ্রীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে। তাহার বস্তু-পরিমাণ সমগ্র পরমাণুটির বস্তু-পরিমাণের প্রায় সমান। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় এক-একটি অখণ্ড সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহার কেন্দ্রীয় পদার্থে আনুপাতিক কত ইউনিট ধন-তড়িৎ রহিয়াছে তাহাই ঐ সংখ্যা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। হাইড্রোজেনকে এক ধরিয়া ক্রমশঃ ইউরেনিয়ম পর্য্যন্ত ৯২ সংখ্যা এই রূপেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে কোন একটা পরমাণুকে রূপান্তরিত করিতে হইলে তাহার তড়িতাবেশ বা বস্তু-পরিমাণ উভয়কেই অথবা যে-কোন একটিকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অথচ কেন্দ্রীয় পদার্থ বিপুল শক্তি দ্বারা পরমাণুর সহিত আবদ্ধ। যদি ইহা অপেক্ষা বিপুলতর শক্তি সংহত করিয়া তাহার উপর প্রয়োগ করা যায় তবেই অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা। এরূপ বিপুল শক্তি সংহত করিয়া প্রয়োগ করিবার কৌশল এত দিন বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাত ছিল। বিশেষতঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর অভ্যন্তরে ধাক্কা দিয়া কেন্দ্রীয় পদার্থকে বিপর্য্যস্ত করিতে তদনুরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঢিলেরও প্রয়োজন। স্বতঃ-বিকিরণকারী পদার্থ হইতে বিক্ষিপ্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেগবান্ আল্‌ফা-কণিকাই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া স্থির হইল। যদি স্বতোবিকিরণকারী পদার্থ হইতে অসংখ্য আল্‌ফা-কণিকা প্রচণ্ডবেগে অনবরত ইতস্ততঃ এক খণ্ড পাতলা ধাতবপত্রের উপর আঘাত করিতে থাকে, তবে কোন একটি কণিকা পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রীয় পদার্থের গা ঘেঁষিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে পারে অথবা দুই-একটি কেন্দ্রীয় পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেও পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈজ্ঞানিকেরা এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই পরীক্ষার ফলে আশ্চর্য্য সফলতা অর্জ্জন করিলেন। ১৯১৯ সালে লর্ড রাদারফোর্ড আল্‌ফা-কণিকার সাহায্যে নাইট্রোজেন গ্যাসকে অন্য পদার্থে পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। আল্‌ফা-কণিকা নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হয় এবং একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীন সৃষ্টি করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহা ভাঙিয়া দ্রুতগামী প্রোটন-কণিকা নির্গত হইতে থাকে এবং গ্যাসকে অক্সিজেনের ১৭ সংখ্যক স্থায়ী আইসোটোপে রূপান্তরিত করে। এই উপায়ে প্রায় ডজনখানেক হাল্কা পদার্থকে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইল। এক পদার্থ অপর পদার্থে রূপান্তরিত হইবার সময় কেন্দ্রীয় পদার্থের বিস্ফোরণের ফলে প্রোটন-কণিকা জিঙ্ক-সালফাইডের পর্দ্দার উপর আঘাত করিলে ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দুর উৎপত্তি হয়। কতগুলি প্রোটন-কণিকা নির্গত হইল, এই আলোক-বিন্দু গণনা করিয়াই তাহা জানা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে অবশ্য অতি উন্নত ধরণের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসাহায্যে এই সংখ্যা-গণনা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

আণবিক সংঘর্ষের ফলে পরমাণুর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে। উইলসনের মেঘ-প্রকোষ্ঠের সাহায্যে তাহাদের গমনপথ পর্য্যন্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইয়াছে।

পদার্থের রূপান্তর ঘটাইবার জন্ম ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত আল্‌ফা-কণিকাকেই ঢিলরূপে ব্যবহার করা হইত। কিন্তু ১৯৩১ হইতে ৩৩ সালের মধ্যেই পরমাণু ভাঙিবার জন্ম নূতন ধরণের ঢিলের সন্ধান পাওয়া গেল। ১৯৩১ সালে এণ্ডারসন 'পজিট্রন' (ধন-তড়িতাবিষ্ট ইলেকট্রন) আবিষ্কার করেন এবং ১৯৩২ সালে চাড্‌উইক তড়িতাবেশ-শূন্ম নিউট্রন-কণিকার সন্ধান পান। ১৯৩৩ সালে কুরি-জলিও কৃত্রিম উপায়ে স্বতোবিকিরণকারী পদার্থ উৎপাদন করেন। পরমাণুর সহিত সংঘর্ষ ঘটাইতে এই তিন প্রকারের ঢিলই সুলভ এবং কার্য্যকরী। প্রথমোক্ত দুই প্রকারের ঢিল ব্যবহার করিয়া ১৯৩২ সালে কক্‌ক্রফট্ এবং ওয়ালটন্ কৃত্রিম উপায়ে এক পদার্থকে অন্ম পদার্থে রূপান্তরিত করিবার পন্থা প্রদর্শন করেন। তৎপরে আল্‌ফা-কণিকা, প্রোটন, নিউট্রন অথবা ডয়টারনের সাহায্যে শতাধিক স্বতোবিকিরণকারী পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন নিউট্রনই এরূপ স্বতঃবিকিরণকারী পদার্থ উৎপাদনে অধিকতর কার্য্যকরী, নিউট্রনের কোন তড়িতাবেশ না থাকায় অনায়াসে ইহারা কেন্দ্রীয় পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এমন কি খুব ভারী পদার্থের কেন্দ্রে প্রবেশ করিতেও ইহাদের কোন অসুবিধা ঘটে না। এই জন্মই অতি সহজে ইহারা পদার্থের রূপান্তর ঘটাইতে পারে। এক ধাতুকে অন্ম ধাতুতে রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টায় অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে হইলে ব্যাপক পরীক্ষা-কার্য্যের প্রয়োজন। এই কার্য্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন প্রচুর ঢিলের প্রয়োজন। বেরিলিয়মের সহিত আল্‌ফা-কণিকার সংঘর্ষ ঘটাইয়া প্রচুর পরিমাণে নিউট্রন-ঢিল পাওয়া যাইতে পারে। হাইড্রোজেন এবং ডয়টেরিয়মের ভিতর দিয়া তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করিলেও প্রচুর পরিমাণে প্রোটন ও ডয়টারন ঢিল পাওয়া যাইতে পারে। তবে ইহাদিগকে অধিকতর বেগবান্ করিতে হইলে তড়িৎ-ক্ষেত্রের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। সাইক্লোট্রন যন্ত্র এই উদ্দেশ্ম সাধনে অপূর্ব্ব সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে।

পদার্থের ভাঙাগড়ার সময় যে বিপুল শক্তি বাহির হইয়া আসে তাহাকে কাজে লাগানো যায় কি না, এ সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। দুই উপায়ে এই শক্তিকে কাজে খাটানো যাইতে পারে। প্রথমতঃ এমন কতকগুলি দৃঢ় ধাতব পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে যাহার ভিতর দিয়া সংঘর্ষকারী কণিকাগুলি ভেদ করিয়া বাহিরে না আসিতে পারে। যে-স্থলে পরমাণুর সংঘর্ষ ঘটানো হইবে তাহার চতুর্দ্দিকে পেঁয়াজের খোসার মত স্তরে স্তরে এই ধাতব পত্রের বেষ্টনী দিতে হইবে। এগুলির বাহিরে আবার রেডিয়েটরের মত জলস্রোত প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাহিরের পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাতাসের স্রোত প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া এমন কোন এঞ্জিন ব্যবহার করিতে হইবে যাহা বর্ত্তমান যে-কোন এঞ্জিন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ভেদকারী কণিকাগুলিকে এইরূপ পরিবেষ্টনীর সাহায্যে আবদ্ধ করিতে না পারিলে তাহাদের সংঘর্ষে নানা প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। বিশেষতঃ যাহারা কাজ করিবে, এই কণিকার আঘাতের ফলে তাহাদের রক্তহীনতা প্রভৃতি গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ স্বতোবিকিরণকারী ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ হইতে আঘাতকারী কণিকাগুলি ছুটিয়া আসিয়া যদি টাংষ্টেন বা ঐরূপ কোন শক্ত পদার্থ নির্ম্মিত ঢালের উপর পতিত হয় তবে ক্রমশঃ তাহা অতিমাত্রায় গরম হইয়া উঠিবে। তাহার উত্তাপে বাষ্প উৎপাদন করিয়া যে-কোন ধরণের বাষ্পীয় এঞ্জিন চালাইয়া কাজ আদায় করা যাইতে পারে।

স্বর্গ হইতেও—

শ্রীতারাপদ রাহা

কথায় কথায় কবিতা বলা মাধবীর এক রোগ।

দেবীনগরের বাঁক ছাড়াইলেই সূর্য্যোদয় হইল। মাধবী তাপসের কানের কাছে মুখ রাখিয়া অস্বচ্ছ কণ্ঠে গাহিল,

জাগো, প্রিয়তম, জাগো—জাগো—

তাপস অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে মাধবীর দিকে চাহিয়া আবার চোখ বুজিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

মাধবী গাহিল,

সজনী তোমার প্রেম-কাঙালিনী, সখা, জাগো—

এইবার তাপস সত্য সত্যই চোখ মেলিল।

আরও অস্ফুট কণ্ঠে মাধবী গাহিল,

হের—বিহঙ্গী সোহাগে জাগায়—

তাপস এইবার মাধবীর মুখ হাত দিয়া চাপা দিয়া বলিল—পাগল, মাঝিরা কি মনে করবে!

—বয়ে গেল, ওরা আমাদের চেনে না কি! তুমি ওঠ, দেখ কি সুন্দর সূর্য্যোদয় হয়েছে! এত আনন্দ হচ্ছে আমার, আমি না গান গেয়ে থাকতে পারছি না। মাধবী আবার সুর করিয়া কহিল,

বেণুবনের মাথায় মাথায়
রঙ লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়,
কোথায় যে যায় ভেসে—

তাপস হাসিয়া বলিল—এটা যে তোমার ওরিজিন্যাল হ'ল না, রবীন্দ্রনাথ থেকে চুরি করলে—বঙ্গসাহিত্যে এটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি আমার আছে!

—বয়ে গেল! মাধবী আবার গাহিল—

মাটির প্রেমে আলোর রাগে
রক্তে আমার পুলক লাগে—

—তুমি কি সত্যি পাগল হ'লে না কি?

—হয়ত তাই! তোমাকেও পাগল ক'রে দেব আমি। তুমি উঠলে না কেন? আমি সেই কখন থেকে জেগে ব'সে আছি। সূর্য্যোদয়ের আগে এখানকার দৃশ্য কি অপূর্ব্ব!

—তুমি প্রাণ ভরে দেখ, এ সব দৃশ্য আমি অনেক দেখেছি। কুমারের তীরে তীরেই আমার জীবনের কৈশোর আর যৌবনের প্রথম দিনগুলি কেটেছে। বলিতে বলিতে তাপসের মুখে চোখে একটা গভীর রহস্য ঘনাইয়া আসিল—

—কাছেই কালিনগরের কাছারিতে থেকে আমি চার বছর লেখাপড়া করেছি' এখানকার পথঘাট, হাট-বাজার সব আমার চেনা।

মাধবী তাহা জানে। কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বামী তাহার মানুষ হইয়াছে, এ খবর সে রাখে। কালিনগর হইতে সাড়ে তিন মাইল হাঁটিয়া স্বামী তাহার মাগুরার স্কুলে পড়িতে যাইত—এ কথা মাধবী অনেক দিনই শুনিয়াছে। নিজের চেষ্টায় বড় হইয়াছে বলিয়াই স্বামীকে মাধবী আরও বেশী করিয়া ভালবাসে। যে-যে জায়গায় তাপসের বাল্যকাল কাটিয়াছে, পুণ্যলোভী তীর্থযাত্রীর মত মাধবীর নিকট সেগুলি পরম আকর্ষণের বস্তু। কালিনগর দেখিবে বলিয়া মাধবী তাই কোন্ প্রভাত হইতে জাগিয়া বসিয়া আছে। তাপসের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মাধবী একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িল, পাছে সে স্বামীর মনে কষ্ট দেয়! অতি সাবধানে মাধবী মিনতি করিয়া বলিল—কালিনগর এলে আমায় ব'লো গো; কালিনগর দেখব ব'লে আমি কখন থেকে জেগে ব'সে আছি।

ঘুমের জড়তা তাপসের চোখ-মুখ হইতে এখনও কাটে নাই। মৃদু হাসিয়া সে বলিল—কালিনগর আমরা কখন্ ছেড়ে এসেছি।

মাধবী সে-কথা বিশ্বাস করিতে চায় না—ছেড়ে

এসেছি অমনি বললেই হ'ল! নৌকা কতক্ষণ ছেড়েছে—এর মাঝেই—, তুমি ভুলে গেছ জায়গা!

তাপস হাসিল—জীবনের চার-চারটে বছর কেটেছে আমার সেই জায়গায়, ভুলব অমনি বললেই হ'ল!··· নদীর পশ্চিম তীরে পাড়ের গা ঘেঁষে একটা বটগাছ দেখেছ? সেখানেই পুবের তীরে একটা ভাঙা কুঠী?

মাধবী বলিল—একটা বটগাছ দেখেছি বটে, তবে নদীর তীরে নয়, নদীর জলে মাথা ডুবিয়ে একটা বটগাছ স্নান করছে বটে!

—আহা! বটগাছটা তাহ'লে নদীর ভাঙনে পড়ে গেছে। ঐ গাছের ঝুরিতে দোলনা খাটিয়ে আমরা দোল খেতাম। ছুটির দিনে স্নানের বেলা আর বিকালে খেলার শেষে ঐখানে আমাদের ছোটদের মেলা বসত। পাশেই ছিল ফুটবলের মাঠ।

মাধবী উৎসুক হইয়া শুনিতে লাগিল।

—এক বার ঐখানে আমাদের চড়ুইভাতি হয়েছিল। আঠারখাদা মাগুরা থেকে পর্য্যন্ত ছেলে এসে আমাদের সে চড়ুইভাতিতে যোগদান করেছিল।

মাধবী বলিল—আহা, আগে যদি বলতে!

—কেন, কি করতে?

—আগে জানলে আমি দিনের বেলা এসে, মাগুরা থেকে চাল ডাল নিয়ে এসে এখানে চড়ুইভাতি করতাম, আর তুমি ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে তাদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসতে।

তাপস হাসিয়া বলিল—তাদের অনেকে হয়ত আমায় এখন চিনতেই পারবে না, চিনতে পারলেও হয়ত আর আগেকার মত মিশতে পারবে না।··· যেদিন যায় সে আর ফেরে না, এই যে নদীর স্রোত চলেছে, দেখছ ত!

মাধবী সত্যই নদীর স্রোতের দিকে তাকাইয়া দেখিল। নৌকার তলার আঘাতে জলের বুকে মধুর শব্দ উঠিতেছে। জলের ছোট্ ছোট বিন্দুগুলি এদিকে ওদিকে মুক্তাঝুরির মত ছিটাইয়া পড়িতেছে। মাধবী প্রথম খানিকটা তাকাইয়া দেখিল, তার পর নৌকার কিনারায় বসিয়া ধীরে ধীরে জলে পা নামাইয়া দিল।

—উঁহু,—তাপস মানা করিল।

—কেন? বেশ লাগছে!

—তা লাগুক, পা তুলে নাও।

—কেন?

—কুমীর আছে, পা কেটে নেবে।

মুহূর্ত্তে মাধবীর মুখ ভয়ে পাংশু হইয়া গেল, সে দ্রুত পা উঠাইয়া গুটাইয়া জড়সড় হইয়া বসিল।—বাপ রে, আগে বলতে হয়, এমন সুন্দর জল!

—না, না, কুমীরটুমীর নেই এখানে, সে-সব নোনা জলে থাকে, খুলনা-নড়াইলের ওদিকে। আমাদের কুমারের জলকে তুমি সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে পার। ছেলেবেলা কত সাঁতার কেটেছি আমরা।

—তবে পা তুলতে বললে কেন?

—রাঙা পা দেখে—!

মাধবী ভ্রূকুটি করিল।

তাপস হাসিয়া বলিল—এর নাম জান ত?

—কি?

—কুমার।

—তা'তে কি?

—তোমার নাম?

—মাধবী।

—তবে? মাধবীর রাঙা পা দেখে, কুমারের যদি লোভ হয়, তা হ'লে শ্রীমান্ তাপস দত্তের অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ কি?

—ফাঁকি দিয়ে আমার পা তোলালে, তবে ছাড়লে!

তাপস মাধবীর কাণ্ড দেখিয়া প্রথমে প্রাণ খুলিয়া খানিক হাসিল, তার পর বলিল—না মাধবী, তুমি পড়ে যাবে বলে আমার ভয় করে—শুধু এই!

মাধবী সে কথার কোন জবাব না দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল; তার পর কিছুই যেন হয় নাই, এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিল—নাও, এখন উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, চা খাবে।

তাপস উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া ঠিক হইতে লাগিল। মাধবী ততক্ষণ টিফিন-বাক্স খুলিয়া গরম চা-ভর্ত্তি ফ্লাস্ক, রুটি, মাখন, জ্যাম, পেয়ালা, ডিশ, রুটি-কাটা ছুরি সব একে একে বাহির করিতে লাগিল।

যে-মাঝি নৌকার সামনে বসিয়া দাঁড় টানিতেছিল, সে এই সব অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল: মা-ঠাকরুণ, ঐ বোতলটায় কি?

—ওতে চা আছে।

—ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি?

—না, ওতে রাখলে গরম থাকে।

মাঝি আবার দাঁড় টানিতে লাগিল।

মাধবী রুটি কাটিয়া জ্যাম মাখন মাখাইয়া তাপসকে দিল, নিজে লইল, তার পর ফ্লাস্ক হইতে চা ঢালিল। পেয়ালায় গরম চায়ের ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল।

মাঝি দেখিয়া বলিল—আচ্ছা কল ত!...ও মিঞা ভাই!

হালে যে বসিয়াছিল সে উত্তর দিল—কি রে করিম, ডাকিস্ ক্যান্?

—এদিক আ'সে ছাখো, গরম পানিতি কেমন ধুঁয়ো বেরোচ্ছে!

নদী সেখানে সোজা। মাঝি হাল বাঁধিয়া মাচার উপর দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যই গরম চায়ে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। তার পর যখন শুনিল—কাল দুপুরে এই চা তৈরি করা হইয়াছে তখন তাহাদের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

দুই জনকে সামনে অমনি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মাধবী এক বার স্বামীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল, তার পর মাঝিদের বলিল—খাবে মাঝি, গরম চা আর রুটি?

মাঝিরা এ ওর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

মাধবী চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিল—দাঁড়াও, আমাদের চা খাওয়াটা হয়ে যাক, তার পর তোমাদের দিচ্ছি,...নইলে আমাদের জুড়িয়ে যাবে!

—হাঁ, মা-ঠাকরুণ, আপনারা খায়ে নেন।

চা খাওয়া শেষ হইলে মাধবী মাঝিদের জন্ত আবার নূতন করিয়া রুটি কাটিল, জ্যাম মাখন মাখাইল। মাঝিদের জলখাবার গ্লাসে গরম চা ঢালিয়া দিল।

মাঝিরা খাইয়া বলিল—বড় ভাল খালাম, মা-ঠাকরুণ, রুটিতে বড় তার হইছে, রুটিতি মাখাইছেন এ দেখ্যতা কি?

—এ এক রকম আচার।

—বড় ভাল আচার ত! তা আপনারা শ্রীকোল কোন্ বাড়ী যাবেন?

মাধবী স্বামীর দিকে তাকাইল।

তাপস বলিল—মধু দত্তের বাড়ী, চেন? দক্ষিণপাড়া। তিনি এখন বেঁচে নেই, তাঁর ছেলে তাপস দত্ত, তিনিও বাড়ী থাকেন না,...বোধ হয় চিনবে না। বাড়ীতে কেবল মধু দত্ত মশায়ের এক বিধবা বোন আছেন।

—আজ্ঞে বাবু চিনি, আমাগারে বাড়ী গয়েসপুর যে, নদীর এপার ওপার। ঐ যে বিধবা বোনের কথা কলেন, উনি নদীতি চান করতি আসেন। আর ঐ যাঁনার কথা কলেন, তাপসবাবু—না কি—তিনি বিলাত গেছেন, তিনি নাকি এক মেম বিয়ে করিছেন। তাঁর বিধবা পিসী কত কাঁদেন। ছেলে লায়েক হইছে, তা পিসীকে তত্ত্বতাল্লাস করে না।

মাধবী ও তাপস পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া মৃদু হাসিল। তার পর তাপস মাঝিদের উদ্দেশ করিয়া বলিল—আমিই সেই তাপস দত্ত, আর ইনিই আমার সেই মেমসাহেব।

মাঝি দুই জন শুনিয়া প্রথম অবাক হইয়া কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর এক জন বলিল—আজ্ঞে তা'লে লোকে যা বলে তা ত সত্যি নয়...ইনি ত মেম না, আমাগারে দেশেরই ভদ্রঘরের মেয়ে, তবে হাঁ—খ্রীষ্টিত, আর ছিমছাম আছে...মেমেগারেই কাছাকাছি গা'র রং বটে!

মাধবী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

মাঝি বলিল—তা বাবু, অনেক দিন দেশে আসেন না, তাই চেনা-পরিচয় নেই, না হ'লে—

তাপস সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল।

মাঝি বিনীত ভাবে বলিল—তা বাবু এখন বেতন পাওয়া হচ্ছে কত?

—হু-শ।

—তা ত হবিই. বিলেত ঘুরে আসা হইছে.—একে বারে

সাত সমুদ্দুর তের নদী!...তা পিসীমাকে এবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান, বাবু, বড় কান্নাকাটি করেন।

—তিনি যেতে চান না, আমি ত নিতেই চাই!...মাসে মাসে খরচ পাঠাই তাঁকে।

—তা ত পাঠাবেনই, হাজার হলিও কত বিদ্যে আপনার পেটে!

মাঝিরা আবার নৌকা বাওয়া আরম্ভ করিলে মাধবী অনুযোগ করিয়া কহিল—এইবার শুনলে ত, পিসীমা কেমন কান্নাকাটি করেন, তুমি এত দিন আমায় শুধু ফাঁকি দিয়েছ। এবার আর আমি তোমার কথা শুনছি নে। নিজে এসেছি, নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, তবে ছাড়ব।

তাপস শুধু বলিল—আচ্ছা।

নৌকা চলিতে লাগিল। বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। দুই-এক ঘাটে দেখা যাইতে লাগিল—গৃহস্থের দুই-একটি বউ ঘোমটা দিয়া কলসী-কাঁখে জল লইতে আসিয়াছে। নৌকার মধ্যে অদ্ভুত বেশভূষাধারী মাধবীকে তাহারা ঘোমটার ফাঁকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। মাধবীর বেশ কৌতুক বোধ হইতে লাগিল। কোথাও বা জেলেরা মাছ ধরিতেছে। তাজা মাছগুলি ধরা পড়িয়া লাফাইতেছে—রৌদ্রে তাদের রূপার মত গা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। নদীর পাড়ের গর্ত্ত হইতে এক ঝাঁক গাঙশালিক উড়িয়া গেল। মাছরাঙা পাখী উপর হইতে ছোঁ মারিয়া জলে ডুব দিতেছে—বিচিত্র তাদের রং। মাধবী নৌকার বাহিরে বসিয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

তাপস ছইয়ের ভিতর বসিয়া আর একটা সিগারেট ধরাইল।

যে মাঝি দাঁড় টানিতেছিল সে বলিল—মা-ঠাকরুণ, একটা গীত গান—

মাধবী তাপসের দিকে তাকাইল।

তাপস হাসিয়া বলিল—তোমাকে গান গাইতে বলছে; প্রভাতে তোমার যে কবিত্ব জেগে উঠেছিল—ওরা ধরে ফেলেছে, এইবার ঠেলা বোঝ!

মাধবী মাঝির দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—তোমাদের এখানকার মেয়েরা গান গায়, মাঝি?

দাঁড় টানিতে টানিতে মাঝি বলিল—হাঁ মা-ঠাকরুণ, গায়—তবে আপনার মত অমন স্বদেশী গান গা'তি পারে না।

—আমি ত স্বদেশী গান গাই নি, মাঝি!

—না, আজকালকার গান—আপনার মত গা'তি পারে না।

তাপস ও মাধবী দুই জনেই হাসিতে লাগিল।

—তবে কি গান গায় তারা?—মাধবী জিজ্ঞাসা করিল।

—বিয়ে টিয়ে হ'লি মা-ঠাকরুনরা গীত গায়—বিয়ের গীত:—

> অতি সুন্দর রাম রে,
> রামের কি দিয়ে সাজাব?
> মালী বাড়ীর মুকুট এনে রামেরে সাজাব—
> অতি সুন্দর রাম রে—

এই সব গান আর কি! হাজার হ'লিও আপনার মত কি তারা গা'তি পারে—আপনি ইংরেজী পড়া মেয়ে!

পাড়াগাঁয়ের বিয়ের গানটা মাধবীর কানে কবিতার মত শুনাইল। সে স্বপ্নাতুর চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

তাপস হাসিয়া বলিল—পাড়াগাঁয়ে আমাদের বিয়ে হ'লে আমাদের বিয়ের সময়ও এই গান শোনা যেত। গায়ে-হলুদের সময় ওরা এই গান গায়।

তাপসের মুখের দিকে মুখ রাখিয়াই মাধবী বলিল—চমৎকার!

—আমাদের পাড়াগাঁয়ের প্রেমে পড়ে গেলে তুমি দেখছি।

—সত্যিই তাই।

গাঙ-না'লের কাছাকাছি আসিয়া নদীর দুই তীরে মাঠ দেখা গেল। সবুজ রঙের আকের ক্ষেত, সোনার রঙের ধানের ক্ষেত, সরিষার ক্ষেতে হলুদ রঙের মেলা, তাহার মাঝে চাষী আর রাখাল ছেলেদের আনাগোনা দেখিয়া মাধবী মুগ্ধ হইয়া গেল।

গাঙ-না'লের কুটীর ঘাটে কয়েকটি ভদ্রঘরের বউ কলসী লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছে; তাহারা সকলেই প্রায় মাধবীর সমবয়সী। নিটোল স্বাস্থ্য, সুঠাম গঠন তাহাদের। জলের মধ্যে যেন কয়েকটি জীবন্ত পদ্মের মত দেখাইতেছে। মাধবী তাহাদের দেখিয়া উল্লাসে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তাপসের দিকে চাহিয়া সে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইল—দেখ দেখ এরা কি সুন্দর দেখতে—

তাপস হাসিয়া বলিল—তুমিই প্রাণ ভরে দেখ, আমি দেখতে গেলে ওরা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে দেবে।

মাধবী বলিল—সত্যিই! এখনও ওরা ঘোমটা দেয়!

—তা দেয়।

—আমার কিন্তু ইচ্ছে করছে ওদেরই মত কলসী ভাসিয়ে গলা-জলে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে স্নান করি।

—পারবে না, ডুবে যাবে।

—সাঁতার জানলেও?

—সাঁতার জানলে অবশ্য নয়, তবে তুমি ত সাঁতার জান না!

মাধবী কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল—জানি না—কি রকম? কলেজ স্কোয়ারে মেয়েদের সাঁতারের প্রতিযোগিতায় আমি রীতিমত প্রাইজ পেয়েছি!

তাপস হাসিতে লাগিল—এ সে-সাঁতারের কথা হচ্ছে না—পাড়াগাঁয়ে যে সমাজে এই সব বউয়েরা মানুষ হয়েছে সে এক সমুদ্রবিশেষ। সেখানে তুমি কিছুতেই স্থলকূল পাবে না।

—স্থলকূল পাবে না—তুমি দেখে নিও, দু-দিনের মধ্যে সবাইকে কেমন আপন করে নেব!

তাপস হাসিয়া বলিল—যাদু জান না কি তুমি!

—ঠাট্টা নয়, তুমি দেখে নিও। তুমি চাকরি থেকে অবসর নিলে তোমার গাঁয়েই আমরা ফিরে আসব!

তাপস মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে—দুপুরের কাছাকাছি কাজলীর বাঁকে আসিয়া চারি দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মাধবী বলিয়া উঠিল—ঠিক এই রকম একটা জায়গা দেখে আমি ছোট্ট একটি বাড়ী করব।

তাপস বলিল—আর ঘণ্টাখানেক পরে দেখবে আমাদের গ্রাম এর চেয়েও সুন্দর।

—সত্যি?

—উত্তরে কুমার, তীরে তার নীলকর সাহেবদের ভাঙা কুঠী, দক্ষিণে দিগন্তপ্রসারী মাঠ, মাঠের বিলে পদ্মকুমুদের সমারোহ, নরম মাটির রাস্তার দু-ধারে বাঁশবন, কাঁঠাল-বাগানের মাঝে মাঝে খণখড়ে ছাওয়া মেটে ঘর। এ দৃশ্য দেখে তুমি মুগ্ধই হবে, তবে—

—তবে-টবে নয়, আমাদের এই গ্রামে ফিরে আসতেই হবে, কিছু টাকা আমার হাতে দিও, দেখো বছর-কয়েকের মধ্যেই গ্রামকে আমি একটা আদর্শ গ্রাম ক'রে তুলব।

—পন্থাটা কি রকম হবে শুনি?

—প্ল্যান সব আমার ঠিক করা আছে।

—যথা?

—রাস্তাঘাট সব মেরামত ক'রে, জঙ্গল পুড়িয়ে, গ্রামকে স্বাস্থ্যকর, সুন্দর ক'রে তোলা হবে, গ্রামের নিরক্ষর চাষীদের—লেখাপড়া-না-জানা গ্রামের মেয়েদের নিয়ে তাদের সুবিধামত বিভিন্ন সময়ে ক্লাস খোলা হবে—তাতে শেখান হবে—কৃষি, শিল্প, ধাত্রীবিদ্যা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান—এ সব, আরও কত কি।

—কে শেখাবে এ-সব?

—কেন—আমি।

—আমি কি করব?

—তুমি রবে মোর পরমারাধ্য, আমি আচার্য্যা হব।

—এই যে কবিতা সুরু হ'ল! কিন্তু বুড়ো বয়সে কি তখন আর এ-সব কাব্যি ভাল লাগবে। যারা দেশের কাজ করতে চায় তারা যৌবনেই করে। রক্তের জোর থাকতে থাকতেই তারা কাজে নেমে পড়ে। এখন যদি তুমি তোমার আশ্রমটি সুরু করতে, তা হ'লে না-হয় এক দিন ছদ্মবেশে আমি—

মাধবী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে এখনও হ'তে পারে। ব্যাঙ্কে

আমার নামে বাবা যে টাকা রেখেছেন তা থেকে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে আমি তোমার পৈতৃক ভিটার কাছে কয়েক বিঘা জমি কিনে নেব, সেখানে আমার স্বপন-কুটীর গড়ে তুলব, ছুটি-ছাটাতে তুমি বাড়ী আসবে, কবে ছুটি হবে ক্যালেণ্ডারের সেই লাল তারিখের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি দিন গুনব—

—আমার আসবার দিন তুমি সাজবে না?

মধুর হাসিয়া মাধবী বলিল—সেদিন আমি—কবরীতে দেব কনক চাঁপার কলি।

—আর?

—কণ্ঠে পরিব মতিয়া-বেলের মালা—

—কি কাপড় পরবে সেদিন?

—আমি—শেফালি-বৃন্ত নিঙাড়ি নিঙাড়ি রাঙায়ে পরিব শাড়ী।

তাপস হাসিয়া বলিল—আর যদি আমি না আসি, তবে মান ক'রে—চলে—যা-বে—বাপের বাড়ী?

দুই জনেই হাসিতে লাগিল।

তাপস বলিল—তোমার বাপের বাড়ীর 'জিমি'র মত একটা কুকুর পুষবে না তুমি?

—না, কুকুর নয়—একটা হরিণ আর একজোড়া ময়ূর থাকবে।

—এ যে রীতিমত একটা আশ্রম হয়ে উঠল,—শকুন্তলার দুটি সখীও থাকা চাই—অনসূয়া প্রিয়ংবদা?

—তাদের ত তুমি দেখেই এলে—নদীর ঘাটে কলসী ভাসিয়ে স্নান করছে। দুপুরের কাজকর্ম্ম সেরে ওরাই সব আমার মধ্যাহ্নের সাথী হবে, গল্পগুজবের ভিতর দিয়ে ওদের আমি গ্রামের কাজের উপযোগী ক'রে তুলব।

—সন্ধ্যায় আমার কথা ভাববে বোধ হয়?

—বা রে, আমার নাইট স্কুল আছে না, গ্রামের নিরক্ষর চাষী-মজুরদের ছেলেমেয়ে তখন আমার কাছে পড়তে আসবে যে!

—তবে আমার কথা ভাববে কখন?

—নিশীথে যখন কুমারের বুকে নামিবে চাঁদের ছায়া—বেণুবন-মাঝে উতলা পবন কাঁদিয়া ফিরিবে হায়! তখন—

সম্মুখে চাহিয়া তাপস বলিল—তখন যা হয় তুমি ক'রো, কিন্তু এখন আপাততঃ সব গোছগাছ ক'রে নাও আমাদের উঠতে হবে এবার। ঐ, ঐ আমাদের গ্রাম দেখা যায়, ঐ ভাঙা কুঠী, তার পর ঐ রায়েদের আমবাগান, তার পর ঐ বাবলাগাছের নীচে আমাদের বাড়ীর ঘাট।

মাধবী সহসা উৎফুল্ল হইয়া জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিয়া গেল। হোল্ড-অলে বিছানা উঠিল। পেয়ালা রেকাবি টিফিন-বাক্সে উঠিল। সুটকেস খুলিয়া আয়না চিরুণী তোয়ালে বাহির করিয়া মাধবী প্রসাধন শেষ করিল। মাধবীর মুখে চোখে আনন্দ ধরে না। সুটকেস হইতে একটা কাগজে-মোড়া বড় প্যাকেট বাহির করিয়া সে তাপসের দিকে দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল—তুমি এটা দেখতে পাবে না কিন্তু—

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাপস সেটা মাধবীর হাত হইতে কাড়িয়া খুলিয়া ফেলিল: একখানা ঠাস-বোনা মিহি মটকার থান।

—কি হবে?

—কি দুষ্টু! সব তাতেই তোমার কাজ? ওটা পিসীমার প্রণামী কাপড়।

তাপস কথা না বলিয়া মাধবীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

—কি রাগ করলে?

—এতে কি আমার রাগ করবার কথা!

নৌকা ক্রমে ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই মাঝির মাথায় জিনিষপত্র দিয়া মাধবী ও তাপস নৌকা হইতে নামিল। কাপড়ের প্যাকেটটা মাধবী নিজের হাতে লইল, প্রথম প্রণামের সময়ই পিসীমার হাতে দিবে। নৌকা হইতে ডাঙায় নামিয়া মাধবী যখন জুতা পরে, তাপসের এক বার মনে হইল বলে, জুতাটা না-হয় এখন না পরলে, হাতে ক'রে নাও, কিন্তু মুখে বাধিয়া গেল: কলেজে-পড়া বড়লোকের মেয়ে, খালি পায়ে চলে নাই কোন-দিন!

ঘোষেদের বাড়ীর পাশ দিয়া আঁকাবাঁকা পথে বাড়ীর সুমুখে আসিয়া তাপস মাধবীকে বলিল—তুমি একটু পাছে এস, আমি আগে যাই!

আজ প্রায় তিন বৎসর পরে তাপস বাড়ী আসিল।

কাঁঠাল-গাছের পাশ দিয়া উঠানে পা দিয়াই ডাকিল —পিসী!

অমনি একটা কান্নার রোল মাধবীর কানে আসিয়া পৌঁছিল: ওরে বাবা রে, এত দিন পরে তোর জন্মদুঃখী পিসীর কথা মনে পড়ল রে! তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে আমার দুটো চোখ ক্ষয়ে গেল রে!

—পিসী চুপ কর, অমন ক'রে চেঁচিও না, মাঝিরা সঙ্গে আছে, বউ সঙ্গে আছে—মাধবী,...এক্ষুনি এসে পড়বে!

—অ্যাঁ, বউকে সঙ্গে এনেছিস্—রাক্ষুসী বউ, ডাইনী, খৃষ্টানী। সেই ত আমার এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে!

তাপস চাপা গলায় বলিল—তুমি শুধু শুধু অমন চেঁচিও না, সে ত খৃষ্টান নয়,—হিন্দু।

—হাঁ—হিঁদু!

—ফের যদি চীৎকার কর তবে এখনই আমি আবার নৌকায় চড়ে বউকে নিয়ে চলে যাব। বউ নিজে ইচ্ছে ক'রে এসেছে, তাকে আদর ক'রে ঘরে নাও—অনর্থ বাধিয়ো না বলছি।

প্রায় সমস্ত কথাই মাধবীর কানে গিয়া পৌঁছিল। একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

একটু পরেই তাপস ডাকিল—মাধবী!

—হাঁ।

—এস।

মাধবী এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্র লইয়া দুই মাঝি উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। পিসীমা একদৃষ্টে ডাইনী বধূটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

—জিনিষপত্তর কো'হানে রাখব মা-ঠাকরুণ।

—ঐ উত্তরের ঘরের বারান্দায় রাখ।

তাপস বলিল—মাধবী, এই আমার পিসীমা, প্রণাম কর।

হীল-উঁচু জুতা পরা, আধা মেমসাহেবী পোষাকপরা এই মেয়েটির দিকে পিসীমা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। মাধবী যখন মটকার থানখানা লইয়া পিসীমার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে গেল, পিসীমা তখন বলিলেন—ঐখান থেকেই হবে মা, তোমরা রেলে-বাসে এসেছ—আমি এখন স্নান ক'রে রান্নাবাড়া করছি!

প্রণাম-নত মাধবী এক বার তাপসের দিকে তাকাইল। তাপস বলিল—উনি এখন ছুঁতে মানা করছেন, ঐখান থেকেই প্রণাম কর।

পরম ভক্তিভরে মাধবী পিসীমার পায়ের নিকটে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। মটকার থানখানা পিসীমার পায়ের নিকটেই রাখিল।

পিসীমা বলিলেন—ওখানা এখন উত্তরের ঘরের আড়ার উপর তুলে রাখ, পরে নেব।

তাপসের মনে হইল, পিসীমার মন যেন একটু নরম হইয়াছে। শহরের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে মাধবী যে এত নতি স্বীকার করিতে পারে তাহাও তাপস কোনদিন ভাবে নাই।

নিজেদের জিনিষপত্র উত্তরের ঘরে গুছাইয়া, বাড়ীর ঝি পাঁচীর মায়ের সঙ্গে মাধবী কুমারে স্নান করিতে গেল। তাপস একটু পরে যাইবে—একসঙ্গে যাওয়া ভাল দেখায় না।

তাপসকে একা পাইয়া পিসীমা আবার কাঁদিতে বসিলেন—তিন-তিনটে বছর তোকে দেখি না বাবা, ঐ ডাইনী বউ তোকে যাদু ক'রে রেখেছে, বুকের পাঁজর গুঁড়ো ক'রে এই জন্যে তোকে মানুষ করেছিলাম!

—অযথা বউকে দোষারোপ ক'রো না পিসী, তুমি ত জান, এত দিন আমি বিদেশে কাটিয়ে এলাম।

—প্রায় ছয় মাস ত তুই দেশে ফিরেছিস!

—হাঁ, এসেছি, কিন্তু এসে চাকরি-বাকরি কিছু জোগাড় ক'রে নিতে হবে ত! ফিরে এলেই শ্বশুর চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন,—ছুটি না পেলে ত আসতে পারি না। তিনি টাকা না দিলে বিলেত যাওয়াও আমার হ'ত না, চাকরি ঠিক করে না দিলে চাকরিও আমার এত দিন জুটতো না। আমাদের কি কোন মুরুব্বির জোর আছে, তুমি সবই বোঝ ত!...

পিসী কোন উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

—আর আমি যেন আসতে পারি নি চাকরির জন্যে, তুমিও ত যেতে চাও নি! যাবার জন্যে তোমাকে আমি

ত কতবার চিঠি লিখেছি—চাকরি পাওয়ার পরেই ত আমি আলাদা বাসা করেছি।

পিসীমা কান্নার মাত্রা বাড়াইয়া বলিলেন—তিন কাল গেল বাবা, এখন শেষকালে আমি ঐ খৃষ্টান মাগীর হাতে খাই!

—ও ত খৃষ্টান নয়, আর তুমি ওর হাতের রান্না খেতে যাবে কেন?—ঠাকুর আছে ত!

—ঠাকুর-চাকর নিয়ে তোমরা সুখে আহ্লাদে থাক, আমার ও সব খৃষ্টানী চাল পোষাবে না।

—খৃষ্টান খৃষ্টান করছ কেন,—বলছি ত ওরা খৃষ্টান নয়, খাঁটি হিন্দু।

—হাঁ, খাঁটি হিঁদু,—যত সব বিধবার কাণ্ড!

—তোমার বউ ত বিধবা নয়,—ওর মা ছিলেন বাল-বিধবা। বোস সাহেব হিন্দুমতেই তাঁকে বিয়ে করেন। আর এক বিয়ে তাঁর এত ছেলেবেলায় হয়েছিল যে, সে কথা তার মনেই নেই।…আর আজকাল ও সব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। বিধবা-বিবাহ প্রাচীন কালে খুবই চলত, তা ছাড়া ঈশ্বর বিদ্যাসাগর আজকাল ওটা চালু ক'রে দিয়ে গেছেন, ও নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না।

—মন খারাপ হয় বাপু, তা আমি কি করব বল। তা ছাড়া ওর বাপের বাড়ীতে ত অখাদ্য কুখাদ্য খুবই চলে।

দূরে পাঁচীর মা'র সঙ্গে মাধবীকে দেখা গেল। তাপস পিসীকে ইঙ্গিতে জানাইল—ও আসছে, ওর সামনে যেন এ সব কথা বলতে যেও না। তোমার এখানে তুমি ওকে থাকতে দেবে না জানি; দু-দিনের জন্য এসেছে, দু-দিন বাদেই চলে যাবে, বাজে কথা ব'লে ওর মনে কষ্ট দিও না। একটু ভাল মুখে কথা ব'লে দেখো—কেমন লক্ষ্মী বউ ও, অত বড়লোকের মেয়ে এতটুকু দেমাক নেই--ওকে নিয়ে ঘর করলে তুমি সুখী হ'তে পারতে! ভাগ্যে নেই তোমার—কি করবে বল।

মাধবী আসিয়া গেল।

পিসীমার মন বোধ করি একটু নরম হইয়াছে। মাধবীকে বলিলেন—যাও মা, উত্তরের ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে রান্নাঘরের বারান্দায় এস, কিছু মুখে দাও, নইলে পিত্তি পড়বে। আমার রান্নার কিছু দেরি হবে; তার পর তাপসের দিকে চাহিয়া বলিলেন—যা, তুইও এইবার স্নান ক'রে আয়।

মধ্যাহ্নভোজনের পর মাধবী অবশ্য উত্তরের ঘরে বিশ্রাম করিল, কিন্তু অপরাহ্ণেও তাহাকে শয্যা ত্যাগ করিতে দেখা গেল না। পিসীমাই চা করিয়া দিলেন। চা খাইবার পর তাপস বলিল—একটু যাবে বেড়াতে? দক্ষিণের মাঠটা তোমাকে এক বার দেখিয়ে আনতাম!

মৃদু হাসিয়া মাধবী বলিল—না, আজ থাক; আজ বড় ক্লান্ত লাগছে আমার।

পিসীমার সঙ্গে দু-একটা কথা অবশ্য মাধবীর হইল, কিন্তু আলাপ তেমন জমিল না। সন্ধ্যায় তাপস একটু বেড়াইয়া আসিয়া দেখিল—মাধবী হ্যারিকেন জ্বালিয়া একখানা ইংরেজী নভেল পড়িতেছে। তাপস বলিল—যাও না—পিসীমার রান্নার একটু সাহায্য কর গিয়ে।

ম্লান হাসিয়া মাধবী বলিল—কাল করব।

পরদিন ভোর হইতেই তাপস বলিল—আজ মাধবী রান্না করবে, পিসী—তোমার আজ ছুটি, এত দিন হাড়ভাঙা খেটেছ, এখন দু-দিন একটু জিরোও।

পিসীমা অবাক্ হইয়া বলিলেন—বউমা ইস্কুল-কলেজে পড়া মেয়ে, রান্না করবে কি গো,—রান্না আবার শিখেছে নাকি কোন দিন?

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল—স্কুলে রান্নারও আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে পিসীমা,—বাড়ীতেও আপনার ছেলের জন্য দুই-এক পদ আমি প্রায়ই রাঁধি।

পিসীমা যেন তত খুশী হইলেন না, বলিলেন—বেশ, রাঁধো।

তাপস মাধবীকে গোপনে শিখাইয়া দিল, পিসীমার জন্যে কয়েকখানা আলুর চপ ক'রো—অবশ্য ঘিয়ে ভাজা। আর খাঁটি দুধের ছানা করে তা দিয়ে ডালনা করো।

মাধবী ম্লান হাসিয়া বলিল তোমাকে শেখাতে হবে না, কি কি রাঁধতে হবে সে সব প্ল্যান করা আছে আমার।

পাঁচীর মাকে সঙ্গে লইয়া মাধবী সেদিন একটু সকাল সকালই স্নান করিতে গেল। ঘাটে আরও কয়েকটি বউ আসিয়াছে। মাধবী সেদিন পথে যেরূপ দেখিয়াছে, সেইরূপ কলসী ভাসাইয়া তাহারা স্নান করিতেছে। তীরে এক জন আধাবয়সী বিধবা মাটি দিয়া কলসী মাজিতেছেন।

মাধবীর ইচ্ছা হইল, তাহাদের সহিত ভাব করে। এরাই ত তাহার অনসূয়া প্রিয়ম্বদা। যে-বউটি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে ছিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মাধবী বলিল—তোমার নামটি কি ভাই,—কোন্ বাড়ী তোমাদের ?

বউটি অস্ফুট স্বরে কি যেন বলিয়া ঘোমটা দিল। অন্যান্য বউগুলি মুচকি হাসিয়া তীরের দিকে চাহিয়া ঘোমটা দিল।

যিনি তীরে বসিয়া কলসী মাজিতেছিলেন, তিনি তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—তোরা উঠবি না লো, কখন এসে জলে পড়েছিস—উঠবার নাম নেই।

বউগুলি এইবার ত্রস্ত হইয়া উঠিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

মাধবীর মনটা নিরুৎসাহ হইয়া গেল : কলসী মার্জ্জন-রতা বিধবা প্রৌঢ়া বিড় বিড় করিয়া কি যেন অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

স্নান করিয়া ঘরে গিয়া মাধবী সেদিন পিসশাশুড়ীর জন্য রাঁধিতে বসিল। তাপস মাঝে মাঝে গিয়া কি রান্না হইতেছে, খোঁজ লইতে লাগিল। মাধবী বলিল—আজ তোমাকে একেবারে নিরামিষ খাইয়ে ছাড়ব।

—বেশ ত!

রাঁধিতে রাঁধিতে মাধবীর মনের মেঘ অনেকটা কাটিয়া গেল। পিসীমার জন্য সে আলুর চপ্, ছানার ডালনা, মোঁচার ঘণ্ট, বেগুনি, পটলের দম অনেক কিছু রাঁধিল। কিন্তু তাপসের খাওয়া হইলে যখন সে পিসীমাকে খাওয়াইবার জন্য ডাকিতে গেল, তখন পিসীমা মাধ্যাহ্নিক সন্ধ্যার পর শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। মাধবী নিকটে গেলে তিনি দুই-একবার উ-উ করিয়া বলিলেন—কে, বউমা!

—হাঁ, ভাত বেড়েছি, আপনি খেতে আসুন।

—আমি ত কিছু খেতে পারব না মা, পেটব্যথায় একেবারে মরে যাচ্ছি।...তাপসের খাওয়া হয়েছে ?

—আজ্ঞে, হাঁ।

—তা'হলে তুমি খেতে ব'সো গিয়ে।

—উঠে আপনি একটুখানি মুখে দিয়ে আসুন, আপনার জন্যই এত ক'রে রাঁধলাম!

—আজ ত আমি কিছুতেই খেতে পারব না, যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি; তুমি রাগ ক'রো না, লক্ষ্মী!...তাপস খেয়েছে, তুমি খাবে, ওতেই আমার খাওয়া হ'ল।

মাধবী কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল—তাহার পর ধীরে ধীরে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না; তাপসকেও সে কিছু বলিল না, সে ত ও-ঘরে থাকিয়াও সমস্তই শুনিয়াছে, কিছু করিবার থাকিলে সে-ই করিত।

মাধবীর মনটা আবার অবসন্ন হইয়া পড়িল। রান্না করিতে গিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য শুধু সে একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। বিকালে চা খাইবার পর তাপস বলিল—চল গ্রামটা তোমায় একটু দেখিয়ে আনি, বিশেষ ক'রে দক্ষিণের মাঠটা!

—চল।

তাহারা যখন রাস্তার বাহির হইল তখন রাস্তায় লোকচলাচল সুরু হইয়াছে। দক্ষিণপাড়ার মেয়েরা সব কলসী-কাঁখে রাত্রির জন্য জল আনিতে কুমারে যাইতেছে। বউরা ঘোমটার ফাঁকে আড়চোখে অদ্ভুত বেশভূষাধারী মাধবীকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। এ যেন অতিদূরের মানুষকে অতি দূর হইতে দেখা। মাধবীর ইহা তেমন ভাল লাগিল না। ইহার চেয়ে কেহ যদি তাহাকে পথের মাঝে সভ্যতা-বিগর্হিত রীতিতে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিত, তোমার নামটা কি ভাই,—তাহা হইলে পথের মাঝেই মাধবী তাহাকে জড়াইয়া ধরিত।

রায়চৌধুরীদের কাছারির সম্মুখে চৌমাথায় কয়েক জন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল, তাপসকে দেখিয়া তাহাদের এক জন বলিয়া উঠিলেন—তাপস যে!...এত দিন পরে দেশের কথা মনে পড়ল?...ইনি বৌমা বুঝি ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তাপস আগাইয়া গিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রণাম করিল।

—থাক্, থাক্,...আহা সুখী হও,...আজ বাপ যদি বেঁচে থাকত...কত কষ্ট ক'রে গেছে বেচারা!

মাধবী অন্য দিকে মুখ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। তাপস তাহাকে ইসারায় ডাকিয়া ইহাদের প্রণাম করিতে বলিল।

পাড়াগাঁয়ের রীতিতে পাছে ত্রুটি হইয়া যায়, মাধবী তাই বিশেষ নত হইয়া পায়ে হাত দিয়া ইহাদের প্রণাম করিল।

—থাক্, থাক্, সুখী হও…পথের মাঝে!…একেই বুঝি তুমি পড়াতে, তাপস?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বিধাতার যোগাযোগ, নইলে তোমার বাপের সাধ্য ছিল কি…

মাধবীর মুখ দেখিয়া মনে হইল—ইহাদের কথাগুলি সে তেমন পছন্দ করিতেছে না, তাপস তাই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে, আমরা তা হ'লে এখন আসি,…বেলা পড়ে এল,…গ্রামটা ওকে এক বার…

—আচ্ছা, আচ্ছা—

অল্প দূর অগ্রসর হইতেই তাপস ও মাধবী শুনিতে পাইল—তাহাদের মধ্য হইতে কে এক জন বলিতেছে—দেমাক দেখ না,…বউকে নিয়ে সাহেবীয়ানা করতে বেরিয়েছেন!…আরে বাপু, বাপ ত তোর এই রায়-চৌধুরীর কাছারিতে বিশম্ভর চৌধুরীর গাড়ু-গামছা টেনে গেছে,…চাল মারবি শহরে যা,…এখানে তোদের নাড়ীনক্ষত্তর সব আমরা চিনি…

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাপস দেখিল—মাধবীর নয়ন-কোণ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তাপস একটিও কথা না বলিয়া মাটির দিকে মুখ করিয়া চলিতে লাগিল।

দক্ষিণের মাঠে আসিয়া প্রথমেই পড়িল 'সবরের মার' বটগাছ! এক অতি বিরাট্‌কায় বটগাছ তাহার অসংখ্য ডালপালা মেলিয়া ঝুরি নামাইয়া এক ভয়ঙ্কর দৈত্য প্রহরীর মত যেন মাঠকে পাহারা দিতেছে। তাপস তাহার মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিল—এইখানে আমরা ছেলেবেলায় খেলতাম, ঝুরিতে ঝুরিতে বাঁধন দিয়ে দোল খেতাম,…এর ছায়ায় ব'সে ঘুড়ি ওড়াতাম।

শুনিয়া মাধবী একটু হাসিল।

—মাঠ দেখ।

মাধবীর সঙ্গে সঙ্গে তাপসও আর এক বার তার চিরপরিচিত মাঠের দিকে তাকাইয়া দেখিল: দূরে—পূর্ব্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, মাঠের পর মাঠ দিয়া চক্রবালরেখায় মিশিয়াছে। চক্ষুকে বিশেষ নিপীড়িত করিলে শুধু একটা চক্রাকার শ্যামরেখা দেখিতে পাওয়া যায়। মাঠের বুকে সোনার ধানের, যব গম মটর মসুরের শ্যামশোভার তরঙ্গ, সরিষার ফুলের রঙের ফুলঝুরি।… তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছিল—পশ্চিম আকাশ হইতে একটা সোনালি ধারা সমস্ত মাঠকে প্লাবিত করিয়া দিতেছিল।

আগেকার মন থাকিলে মাধবী হয়ত পাগলের মত কয়েক কলি কবিতা আওড়াইয়া ফেলিত। কিন্তু এখন শুধু নীরবে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

তাপস এক বার জিজ্ঞাসা করিল—কেমন?

মাধবী শুধু বলিল—চমৎকার!

সূর্য্যাস্ত হইল।

সূর্য্যাস্তের পর তাহারা ভিন্ন পথে বাড়ী ফিরিতেছিল গ্রামের মাঝ দিয়া পথ। ঘরে ঘরে সব সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বাঁশবনের মাঝ দিয়া তাপস মাধবীকে লইয়া নিরালা পথের বাঁক ঘুরিতেছিল, এমন সময় সম্মুখে পড়িয়া গেল এক প্রৌঢ়া বিধবা।

—কে,… ওমা, তাপস যে!…সঙ্গে কে?—বউমা?

—পিসীমা, ভাল আছেন?—তাপস প্রণাম করিল দেখাদেখি মাধবীও প্রণাম করিল।

—বেঁচে থাক, সুখী হও।

প্রৌঢ়া বলিলেন—তা বাবা, আমাদের কথা একবারে ভুলে গেছ, বড়লোকের জামাই হয়েছ এখনি, এখন কি আর মনে থাকে?

—না পিসীমা, ভুলি নি কাউকেই,…সবে ত কাল এসেছি। ওর শরীরটা ভাল ছিল না, তাই কাল আর বেরই নি, আজ একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।

—তা আমাদের বাড়ী একটু হয়ে যেতে হবে বাবা!… সৈরভী কাল বলছিল বটে!…ও স্নান করতে গিয়েছিল, বললে, পিসী, তাপস-দা বাড়ী এল, নৌকোতে তাঁকে

দেখলাম, সঙ্গে বউদি রয়েছে বোধ হয়!...শুনে দাদা ত' একেবারে অস্থির : বউকে দেখবার জন্তে একেবারে পাগল!...উঠতে ত পারেন না, কোনও রকমে ঘর ছেড়ে বারান্দা, আর বারান্দা ছেড়ে ঘর,—কি কাল রোগেই ধরল বাবা, এক অঙ্গ একেবারে পড়ে গেছে...

—জ্যাঠামশায়ের অসুখ!

—হাঁ বাবা, তোমাকে আর তোমার বউকে দেখবার জন্তে একেবারে—

—চলুন, দেখে যাই।

তাপস ও মাধবী প্রৌঢ়ার পিছু পিছু চলিল।

প্রৌঢ়া বলিয়া চলিলেন—সৈরভীকে তোমাদের ঘরে নেবার জন্যে তোমার পিসীর কি পীড়াপীড়ি!...দিলে বেশ ভালই হ'ত, তোমার পিসী আর আমি ছেলেবেলার সই,—তোমার বাবা ছিল আমাদের খেলার সাথী... সৈরভীকে দিলে বেশ ভালই হ'ত,...কি করব, দাদার কিছুতেই মত হ'ল না। এখন ত পক্ষাঘাতে প'ড়ে,... কোথায় গেল সে সব জিদ্!...হাঁ বাবা, তোমার জানাশুনা একটা ছেলে, তোমারই মত ভাল চাকুরে—দেখে দিতে পার সৈরভীর জন্যে··

তাপস বলিল—আচ্ছা দেখবো।—বলিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। মাধবীর এতক্ষণ পরে একটু ভাল বোধ হইতেছিল। তাহার কৌতুক বোধ হইতেছে: সে সৈরভীকে দেখিতে পাইবে—যাহার সহিত তাপসের বিবাহের কথা হইয়াছিল।

বাড়ীতে গিয়াই প্রৌঢ়া হাঁকিলেন—সৈরভী, ও সৈরভী, এই দেখ্ তোর তাপস-দা আর বউদি এসেছে, তুই পারলি নে, এই দেখ আমি ধ'রে নিয়ে এলাম!

একটি পুরু মেটে দেয়াল-দেওয়া ঘরের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল—কে?

প্রৌঢ়া বলিলেন—দাদা, তাপস আর তার বউ এসেছে।

—বসতে দাও, তেল মালিশ হ'লে আমি আসছি।

পনর-ষোল বছরের একটি ফর্সা ছিপছিপে মেয়ে মাথা নীচু করিয়া আসিয়া বারান্দায় একটা শতরঞ্চ বিছাইয়া দিয়া গেল। মাধবী তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। লজ্জায় মেয়েটির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মেয়েটিকে দেখিয়া মাধবীর বেশ লাগিল: এই তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল! মেয়েটি উহাদের বসিতে দিয়াই পিতৃসেবা-নিরতা মায়ের কাছে কি যেন শুনিয়া আসিল: তাহার পর আর কোন দিকে না তাকাইয়া সোজা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সেখানে বাসন-নাড়ার শব্দ শোনা গেল। জলখাবারের আয়োজন হইতেছে বুঝিয়া মাধবী তাপসের দিকে চাহিল।

তাপস বলিল—পিসীমা, জ্যেঠামশায়কে একবার প্রণাম ক'রে আমরা উঠি, রাত্রি হয়ে এল।

—ব'সো বাবা, ব'সো, কত দিন পরে এলে, বউমা সঙ্গে আছেন, একটু কিছু মুখে দিয়ে যেতে হয়!

ঘর হইতে শব্দ হইল—ওদের এখানেই না-হয় পাঠিয়ে দাও, আমার মালিশ শেষ হ'তে দেরি হবে।

তাপস ও মাধবী দুই জনেই গিয়া জ্যেঠামশায় ও জ্যেঠাইমাকে প্রণাম করিল।

তক্তাপোষের পাশেই একটা মোড়া ছিল—তাহা দেখাইয়া জ্যেঠা মহাশয় বলিলেন—ব'সো।

তাপস বারান্দা হইতে শতরঞ্চি আনিয়া পাতিয়া লইল। তাপস ও মাধবী দুই জনেই বসিল।

জ্যেঠা মহাশয়—রসিকলাল বসু মাধবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোমার নাম কি, মা?

—মাধবী।

—মাধবী!—বেশ! ওগো, আলোটা একটু এগিয়ে দাও না, ভাল ক'রে মুখখানা দেখি!

গৃহিণী প্রদীপের সলিতা বাড়াইয়া মাধবীর মুখের কাছে আগাইয়া দিলেন। মাধবীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

সৈরভী এই সময় দুইখানি রেকাবিতে নারিকেল-কোরা, চিনি, দুধের সর ও দুটি করিয়া কলা আনিয়া তাপস ও মাধবীর সুমুখে দিল।

বসু-গৃহিণী বলিলেন—খাও মা, খাও,—আজকাল সবাই প্রায় একসঙ্গে বসেই খায়, বিশেষ তুমি ত কলকাতার মেয়ে!

মাধবী বসু-মহাশয়ের মুখের দিকে এক বার তাকাইয়া

দেখিল: তাঁহার রোগজীর্ণ মুখে চোখ দুটি যেন অস্বাভাবিক রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া বসু-মহাশয় বলিলেন—আমাদের সৈরভীর চেয়ে একটু বেশী ফর্সা নয়?···তা সৈরভীও কলকাতায় থাকলে, কলের জল গায়ে পড়লে এর চেয়ে···

—তোমাদের উপাধি কি মা?

মাধবী বলিল—আমার বাবা বোস্।

—তোমরাও কুলীন দেখছি, তা তোমাদের আর কুলীন মৌলিক কি?···তোমার বাবা শুনেছি সাহেবসুবো মানুষ,···তোমরা কি আর বংশটংশ মান?

মাধবী একটু চিনির সহিত নারিকেল-কোরা মুখে দিতে দিতে তাপসের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

—আমাদের সৈরভীর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে ওর পিসীর কত ঝুলোঝুলি: ছেলে তার বিদ্বান্!···আরে ছেলে বিদ্বান্ হ'লে কি হবে!···ও সব শহর-টহরেই চলে। এর নাম পাড়াগাঁ!···এখানে সমাজ-সামাজিকতা আছে।··· কুলীনের ঘরের মেয়ে তুই নিবি, তোর বংশটা কি!··· বাপ ত গেছে চৌধুরীবাবুর গাড়ু-গামছা টেনে,···আর ঠাকুরদা!···আমারই বাপের এক পানসী নৌকো ছিল— তারই গুন টেনে আর দাঁড় বয়ে বয়ে তাঁর সারাটা জীবন গেল! বলিতে বলিতে বসু-মহাশয়ের চোখ দুটি হিংস্র শ্বাপদের মত প্রদীপের স্তিমিত আলোকের মধ্যেও জ্বলিয়া উঠিল। মাধবীর মুখ হইতে দুধের সর মাটিতে পড়িয়া গেল। আহত ব্যাঘ্রের মত গর্জিয়া উঠিয়া তাপস বলিল—এমনি ক'রে অপমান করবেন বলেই কি আমাকে বাড়ীতে ডেকে আনা হয়েছে? সৈরভীর বিয়ে দিতে পারেন নি, সেই ঝাল ঝাড়তে চান আমার উপর?

বসু-মহাশয় উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে এক হাতে ভর দিয়াই উঠিতে চেষ্টা করিলেন: খবরদার ছোটলোকের বাচ্চা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বলেছিলি—বলেছিলি তোর বংশের কথা বোস-সাহেবের কাছে? এ সব জেনে-শুনে মেয়ে দিয়েছেন তোকে?···জুচ্চুরি করিস নি তুই,···বল না বুকে হাত দিয়ে? ফাঁকি দিয়ে পরের মেয়ে বিয়ে ক'রে পরের টাকায় বিলেত ঘুরে এসে এখন ফুটানি করা হচ্ছে,···এখনও দক্ষিণপাড়ার তোর জ্ঞাতিগোত্র-সব 'চাই বরফ', 'চাই ল্যাংড়া আম' ব'লে কলকাতায় ফেরি ক'রে বেড়ায়,···এক দিন নিমন্ত্রণ করিস তোর শ্বশুরের বাড়ীতে!

বসু-গৃহিণী স্বামীর মুখে চাপা দিয়া বলিলেন—কি সব পাগলের মত ব'কে যাচ্ছ? ভদ্রলোকের মেয়ের সামনে এ সব কি?

সৈরভীও লজ্জাসঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া বাপের মুখ বন্ধ করিতে ছুটিয়া আসিল।

তাপস ও মাধবী তৎক্ষণাৎ মুখে জল দিয়া উঠিয়া পড়িল।

তাহারা বাড়ীর বাহির হইতেই মাধবীর আঁচলে টান পড়িল, ফিরিয়া দেখে সৈরভী। সৈরভী কাঁদিয়া মাধবীর হাত ধরিয়া বলিল—কিছু মনে করবেন না আপনি, একটা কোন জোগাড়-যন্তর করতে না পেয়ে বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে···

মাধবী সৈরভীর হাতে একটু চাপ দিয়া একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, তাহার পর দ্রুত তাপসের পাশে আগাইয়া গেল।

সারাপথ দুই জনের কোন কথাই হইল না।

বাড়ী ঢুকিবার পূর্ব্বে মনে হইল, পিসীমা কাহার সহিত যেন কথা কহিতেছেন: পুরুষের কণ্ঠস্বর। দুই জনেই থমকিয়া দাঁড়াইল। তাপস একটু পরেই বলিল, ভট্চায-মশায়।

—কে?

—পুরুতঠাকুর মশায়।

অসঙ্গত হইলেও কাঁঠালগাছের আড়ালে থাকিয়া দুই জনেই তাঁহাদের কথা শুনিতে চেষ্টা করিল।

ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া পিসীমা বলিতেছেন—তাহলে দোষ নেই আপনি বলছেন।

বারান্দায় জলচৌকিতে বসিয়া পুরুতঠাকুর বলিতেছেন—না দিদি, দোষ নেই—আমি বলছি। শ্রদ্ধা ক'রে যে যা দেয় তাই পরা যায়···এ তো বেটার বৌ··· এমন কি যদি কোন খ্রীষ্টান বা যবনেও শ্রদ্ধা ক'রে কোন শুদ্ধবাস দেয় তা অনায়াসে পরা যায়—এ কথা শাস্ত্রে আছে।

মাধবীর পায়ের নীচে হইতে মাটি যেন সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। সে তাপসের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিল—আমার দেওয়া সেই থানের কথা হচ্ছে!

হয়ত তাপস ভাবিতেছে: মাধবী আর তাহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিবে না!...কিন্তু সে কি অপরাধ করিয়াছে?...নিজের চেষ্টায় বড় হইতে যাওয়া কি পাপ!

সেই দিনই শেষরাত্রে কুমারের বুকে স্বচ্ছ তিমিরে একখানা পানসী নৌকা দেখা গেল। পানসীখানা নদীর ভাটি যাওয়ার দিকে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। নৌকার ছইয়ের ভিতর স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া মাধবী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছে: কল্লোলিনী ঝরণা আজ নীরব হইয়া গিয়াছে। তাপসও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতেছে। কি ভাবিতেছে—কে জানে! কুমারের বুকে শুইয়া হয়ত তাহারা দুই জনেই কুমারের জলধারার কথাই ভাবিতেছে: এই যে অবিশ্রান্ত জলধারা তীব্র গতিতে সমুদ্রের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহাকে কি কোন মতেই আবার উৎসে ফিরিয়া লইতে পারা যায়?...মানুষের জীবনধারার সহিত ইহার কি কোন সাদৃশ্য নাই?... মাধবী তাহা হইলে তাহার স্বামীকে লইয়া এমন নীতি-বিরুদ্ধ স্বপ্ন দেখিয়াছিল কেন?

রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। মাধবীর দুই চোখের কোণ দিয়া দুইটি শীর্ণ জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাপস তাহা নিজ হাতে মুছিয়া দিয়া বলিল: কত দুঃখই তোমায় দিলাম, মাধবী!

মাধবী স্বামীর একটা হাত নিজের মুঠির মধ্যে আনিয়া বলিল—তোমার ত দোষ নেই,...তুমি ত আসতেই চাও নি, আমিই জোর ক'রে—

মাধবী আবার কাঁদিল।

তাপস আবার তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—আর বোধ হয় তুমি আমায় তেমনি ক'রে ভালবাসবে না!

—পাগল!...আরও বেশী ক'রে বাসব।...তুমি নিজের চেষ্টায় এত বড় হয়েছ!

মাধবী সত্য কথা বলিল কি না কে জানে!

শ্রীকমলরাণী মিত্র

ভুবনে ভুবনে যত সুধা আছে জমা,
নয়নে আমার ততই তৃষ্ণা আছে;
যত আলো, গান, মাধুরী অমৃতসমা,
তত বিহ্বল-মত্ততা বুকে নাচে।
যেন মনে হয় কামনার শেষ নাই
যেন মনে হয় তৃষাও তৃপ্তিহারা,
যেন মনে হয় উধাও ছুটিয়া যাই
নিখিল-গগনে জীবনোচ্ছল-ধারা

জানা-অজানায় উন্মাদ অভিসারে,
কণ্টক-পথে, পুষ্পিত উপবনে,
অমারাত্রির দুরন্তম পরপারে
পরমানন্দ যেখানে স্বপ্ন বোনে।
এত বড় তৃষা এ ত মিটিবার নয়—
সুধা তবু বলে, 'আমি আছি, আমি আছি';
তাই গান গেয়ে গাহি অমৃতের জয়,
তাই বুকভরা-পিপাসা নিয়েও বাঁচি।

পুস্তক পরিচয়

সাংখ্যপরিচয়—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ বি-এল, বেদান্তরত্ন। মূল্য ১৷৹ টাকা। পৃ. ৩৬২।

গ্রন্থখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আহ্বানে পরিষদ্-মন্দিরে সাংখ্য সম্পর্কে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা অবলম্বনে 'ব্রহ্মবিদ্যা'য় প্রকাশিত বারটি প্রবন্ধের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকার। ইহাতে উপক্রম ভাগে ছয়টি প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড—পুরুষ নামক ভাগে আটটি প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড—প্রকৃতি নামক ভাগে ছয়টি প্রবন্ধ এবং উপসংহারভাগে তিনটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির নামকরণ হইতেই বুঝা যায় গ্রন্থখানি কত দূর সারগর্ভ হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম, যথা—১। সাংখ্য নামের নিরুক্তি, ২। সাংখ্য মতের প্রাচীনতা, ৩। সাংখ্যীয় দুঃখবাদ, ৪। সাংখ্যের পুরুষ, ৫। প্রকৃতিলয়, ৬। সাংখ্যের পুরুষবহুত্ব, ৭। পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর, ৮। প্রকৃতির স্বরূপ, ৯। ত্রৈগুণ্য, ১০। প্রকৃতির পরিণাম, ১১। সাংখ্যের স্বতঃ-পরিণাম, ১২। দ্বৈতে অদ্বৈত ইত্যাদি।

গ্রন্থখানি পড়িয়া মনে হইবে গ্রন্থের নাম যে 'সাংখ্য পরিচয়' রাখা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সার্থকই হইয়াছে। সাংখ্য সম্বন্ধে এক স্থলে এত জ্ঞাতব্য কথা, বোধ হয় অন্য কোন ভাষার কোনও গ্রন্থেই নাই। বেদান্তরত্ন মহাশয়ের বিষয়-বিন্যাসের অসাধারণ নিপুণতা এবং নানা দিগ্‌দর্শন ইহার প্রতি ছত্রে প্রকটিত হইয়াছে। ইহা সাধারণ শ্রোতা—পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেরই যে বোধগম্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত মিলিত করিয়া ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনা করায় বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের ইহা যেমন প্রভূত উপকার সাধন করিবে, তদ্রূপ বঙ্গভাষার ইহা যে একটি অমূল্য সম্পদমধ্যে গণ্য হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। প্রত্যেক শাস্ত্রানুশীলনকারীর ইহা অবশ্য-পাঠ্য।

কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের মনে হয়, এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র হওয়া আবশ্যক। কারণ তাহাতে—১। সাংখ্য মতের অনুকূলে কত দূর বলা যাইতে পারে, ২। বেদের শব্দরূপেই নিত্যত্ব এবং ৩। সাংখ্যের বৈদিকত্ব ও অবৈদিকত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি বেদান্তরত্ন মহাশয় পুনরায় যদি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমাদের সমাজ নিশ্চিতই অধিকতর লাভবান্ হইবে। আরও মনে হয়—"দ্বৈতে অদ্বৈত" এই প্রসঙ্গটি গ্রন্থান্তরে থাকিলে সাংখ্যপরিচয়ের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। 'সাংখ্যপরিচয়' পড়িয়া যদি সাংখ্য-মতে অনাস্থা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সাংখ্যপরিচয় গ্রন্থ দ্বারা সাংখ্য-মতের উপর সুবিচার করা হইল না বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ যে ভূমিকার উপর দণ্ডায়মান হইলে সাংখ্য-মতের উৎপত্তির আবশ্যকতা অনুভূত হয়, সেই ভূমিকা সাধারণ বুদ্ধির অনেক উপরে অবস্থিত। সাংখ্য-মার্গ অনুসরণ করিলে শেষে বেদান্তের সহিত ইহার পার্থক্য আছে কি না ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া পড়ে। এই চিন্তায় সাংখ্যপরিচয় সহায়তা করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়।

প্রেমধর্ম্ম—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল, বেদান্তরত্ন। পৃ. ৪৪২; মূল্য ২৷৹ টাকা।

ইহাতে উপক্রম ও উপসংহার ভিন্ন তিনটি খণ্ড আছে। তাহাতে ১। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা, ২। সগুণ নির্গুণ, ৩। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য, ৪। উহাদের সমন্বয়, ৫। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ৬। দার্শনিক ভিত্তি, ৭। বৈষ্ণব-দর্শন, ৮। ভক্তি ও প্রেম বৈধী ৯। ভক্তি ও প্রেম রাগানুগা, ১০। রতির তারতম্য, ১১। স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্ব, ১২। পূর্ব্বরাগ, ১৩। অভিসার ও সঙ্গম, ১৪। মান ও মানান্ত, ১৫। মাথুর, ১৬। মাথুরের পর মিলন, ১৭। মহা মিলন, ১৮। গোপীপ্রেম, প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "যাঁহারা রাসলীলার আস্বাদন করিতে চান, এই প্রেমধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের পরিচয় প্রার্থনীয়।"

এই প্রেমধর্ম্ম গ্রন্থখানি বস্তুতঃ প্রেমমার্গী বৈষ্ণবের প্রেমকথায় পর্য্যবসিত নহে। ইহাতে গ্রন্থকারের প্রেম সম্বন্ধে নিজস্ব প্রকটিত হইয়াছে। হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান, বৈষ্ণব অবৈষ্ণব—সকলের নিকট হইতে এই প্রেমধর্ম্মে কুসুমরাজি চয়ন করা হইয়াছে। এই জন্য ইহাতে গ্রন্থকারের নিজস্ব যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। যে সকলের হয়, সে যেমন কাহারও নিজস্ব হয় না, অথচ তাহার নিজস্ব থাকে, ইহাও তদ্রূপ হইয়াছে। জ্ঞানী কর্ম্মী ভক্ত সকলেই দেখিবেন—ইহাতে আমারই কথা রহিয়াছে, কিন্তু কেহই ইহার সর্ব্বাংশে একমত হইতে পারিবেন না। কেহই তাঁহাদের নিজ নিজ নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা ইহাতে পাইবেন না, কিন্তু তথাপি ইহাতে "সকলের মধ্যে সত্যদর্শননিষ্ঠা" সুস্পষ্ট পরিস্ফুট। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা মাত্রই গোঁড়ামি বলিয়া বুঝেন, তাঁহাদের নিকট ইহা পরম উপাদেয় বলিয়া বোধ হইবে। তত্ত্ববিন্যাসসম্প্রদায়ের লক্ষ্য ইহাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। "সগুণ নির্গুণ ও বৈষ্ণবদর্শন" প্রসঙ্গে বিরোধ-তত্ত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে, একের বৈচিত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে—কিন্তু বিরোধ-অস্বীকারে অবাধিত বিশেষজ্ঞান কি করিয়া সম্ভব হয়—এই জাতীয় আশঙ্কা লিপিকৌশলের গুণে মনে উদিত হইবার অবকাশই পায় না। কত শাস্ত্র কত মত-মতান্তর মন্থন করিয়া যে এই গ্রন্থখানি রচিত, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। চূড়ান্ত দার্শনিকতার সঙ্গে অগাধ প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব মিলন এই গ্রন্থে দেখিবার বিষয়। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা পাঠ্য।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের রাজ্যশাসন-প্রণালী—শ্রীশিশিরকুমার বসাক সাহিত্যভূষণ। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাচীন হিন্দু রাজ্যশাসন-প্রণালী সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠক ইহা পাঠ করিয়া অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। পুস্তকের ভাষা সরল হইলেও স্থানে স্থানে তেমন সুস্পষ্ট বা সুসঙ্গত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে:—"বৈদিক সাহিত্যে এরূপ উল্লেখ আছে যে প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র বা একাধিপত্য সাম্রাজ্য একচেটিয়া ছিল না। মহাভারতেও রাজা ছাড়া 'ষ্টেটে'র উল্লেখ আছে।" (পৃ. ৬)।

যজুর্ব্বেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধপদ্ধতি—শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম-এ সংকলিত। প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনশর্ম্মা, পি. ৭১, ল্যান্সডাউন রোড্ একস্‌টেন্‌শন্, বালীগঞ্জ, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের প্রকৃত আশয় ও তাহাতে ব্যবহৃত মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশেষ কোন জ্ঞান না থাকায় বর্ত্তমানে হিন্দুর ধর্মকৃত্যগুলি প্রাণহীন আচার মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে হইলে এই সকল ধর্মকার্যের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন ও তাহাদের পদ্ধতির বিস্তৃত ও বিশদ বিবরণ প্রণয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক। সন্তানের নামকরণাদি সংস্কার, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি নব নব অভ্যুদয়কালে অবশ্যকরণীয় হিন্দুর অন্যতম প্রধান ধর্মকার্য আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের প্রকার আলোচ্য গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রগুলির আকারের নির্দেশ ও বঙ্গানুবাদ থাকায় আলোচনা করিবার ও বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে ও পরিশিষ্টে প্রতি খুঁটিনাটি অনুষ্ঠান সরল ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশেষজ্ঞের সুবিধার জন্য বিভিন্ন মতবাদের আলোচনাও করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। তবে ৪৮ পৃষ্ঠায় সন্ধির আবশ্যকতা সম্বন্ধে ও ১৭৮ পৃষ্ঠায় অধিবাসের অর্থ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

অন্যান্য ধর্মকৃত্য সম্বন্ধেও এইরূপ গ্রন্থ সংকলিত হওয়া দরকার। তাই গ্রন্থকারের প্রতিশ্রুত নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া ও উপনয়নের এইরূপ পদ্ধতির জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

আধুনিক বাংলা গল্প—শ্রীপ্রেমেন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত। প্রগতি-সাহিত্য-ভবন, কলিকাতা। মূল্য ৩৲। পৃ. ৩৩৮।

আজকাল আধুনিকতার জয়গান সর্ব্বদাই শুনি। বাংলা দেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই জয়গান প্রায়ই বিদেশী সাহিত্যের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। মনে হয়, বৈদেশিক সাহিত্যের প্রত্যেক নূতন রীতি বা ভঙ্গী সম্বন্ধে আমরা যতটা আগ্রহ প্রকাশ করি, দেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে তাহার চতুর্থাংশও করি না। এইরূপ সঙ্কলন-গ্রন্থ নূতন বঙ্গসাহিত্যকে চিনাইয়া দিবার কাজে অনেকটা সাফল্য লাভ করিতে পারে।

এই সংগ্রহ-গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, মণীন্দ্রলাল বসু, মনোজ বসু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী এবং ৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের মোট ছাব্বিশটি গল্প আছে। সকলের রুচি একরূপ নহে, সুতরাং নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। আমাদেরও সকল গল্প সমান ভাল লাগে নাই; কিন্তু অধিকাংশই ভাল লাগিয়াছে। নূতন বঙ্গসাহিত্যে যে অনেক সুন্দর জিনিষের সৃষ্টি হইতেছে, এই সংগ্রহ-গ্রন্থ পড়িয়া তাহা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করা যায়। শৈলজানন্দ এবং প্রেমেন্দ্রের সূক্ষ্ম রসবোধ, পর্য্যবেক্ষণ এবং শিল্প-কৌশল প্রতিভার পরিচায়ক। নবীন লেখকদের অনেকেই গতানুগতিকতার জের টানিয়া চলিতে চাহেন না। অন্নদাশঙ্করের গল্পে বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি আছে। অন্যান্য লেখকেরাও সকলেই খ্যাতনামা; তাঁহাদের রচনা তাঁহাদের খ্যাতির অনুকূল। কেবল, প্রবোধকুমারের গল্প-দুইটি সুনির্ব্বাচিত হয় নাই বলিয়া মনে হইল। লেখকদের পরিচয় মোটের উপর সুলিখিত।

কল্পাস্তিকা—শ্রীঅসিতকুমার হালদার। প্রকাশক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ. ডি. টি. (লণ্ডন); পি. ৭৯ স্কীম ৮ সি (পার্ক সার্কাস) বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এখানি ৫১ পৃষ্ঠার ছোট কবিতার বই। আরম্ভে শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "কল্পাস্তিকা নূতন ধরণের কাব্য-প্রচেষ্টা।... গুহাবাসী প্রতীকের ভাষা আর জনসাধারণের ভাষা এক নয়। প্রতীকের ভাষার আদি অর্থ ভিন্ন তার রূপ ফোটে না। ইতিমধ্যে শব্দার্থের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটেছে, তার বাহন-শক্তি আজ ক্ষুন্ন, তাই কল্পাস্তিকার শব্দ দুরূহ।" কবিতাগুলিতে সহজ ভাবাবেগ অপেক্ষা মননশীলতার এবং সযত্ন-সাধনার পরিচয় বেশী। কাব্যলক্ষ্মীর ইহাও একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। চিত্র-কর-কবির প্রতীক-চিত্র স্থানে স্থানে উপভোগ্য। 'কালের ক্ষুধা' শীর্ষক কবিতার দার্শনিকতা বড়ই রূঢ় হইয়া দেখা দিয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাবেয়া—শ্রীহেমলতা বসু। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১৷০।
প্রকাশক—সুরেশচন্দ্র দাশ, এম.এ.।

ইহা ষোড়শ সর্গে সমাপ্ত একটি কথাকাব্য। কাব্যখানি সুপাঠ্য।

কল্পনীড়—শ্রীমনোরঞ্জন রায়, বি.এ.। মূল্য দশ আনা।
প্রাপ্তিস্থান—মঙ্গলশঙ্খ পুস্তকাগার, পোঃ বকুলতলা, যশোহর।

ইহাতে কয়েকটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা আছে।

সুর-সুবাস—শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। দাম আট আনা।
প্রকাশক—শ্রীনিতাইচরণ সেন, বি-এ, ১৮।১ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"সুর-সুবাস সঙ্গীত পুস্তক। সুধী পাঠকগণ দোষগুণ বিচারের সময় কথাটি মনে রাখিবেন তাঁদের কাছে এই আমার সানুনয় প্রার্থনা।"

সুর-তাল যোগ করিলে এই গানগুলির কি বাণীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইবে, পুস্তক পড়িয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না—তবে খুব বেশী ইতরবিশেষ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যথার দান—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মূল্য এক টাকা। গ্রাম—আনামপুর, পোঃ বাওয়ালী, জেলা ২৪-পরগণা।

কাব্যখানি সচিত্র—অর্থাৎ লেখকের একখানি ছবিও সঙ্গে আছে। কবিতাগুলিই কি যথেষ্ট নয়!

অতনু—শ্রীগৌরপ্রিয় দাশগুপ্ত। মূল্য এক টাকা। যোগাযোগ পাবলিশার্স, 'অলকাপুরী', ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

লেখকের লিখিবার শক্তি আছে—কবিতাগুলি সরস ও সুন্দর।

কলহংস—শ্রীসুরেশ বিশ্বাস। মূল্য ১।০। ১এ, রাজা বসন্ত রায় রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

সহজ সরল সুরের সুখপাঠ্য কবিতা।

সাঁঝের মায়া—সুফিয়া এন হোসেন। মূল্য ১৲। প্রকাশক—বেনজির আহমদ, ৬৩ কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহু কবিকল্পের জনতার মধ্যে লেখিকা সত্যকার কবি। স্বকীয় অনুভূতির বৈশিষ্ট্য কবিতাগুলির ভাষায় ও ছন্দে বিরাজমান। কবিতাগুলি শুধু সুপাঠ্য নয়—কাব্যরসিকের অবশ্যপাঠ্য।

পল্লী-সংস্কার—শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য। মূল্য পাঁচ সিক। বরেন্দ্র লাইব্রেরি, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সমস্যামূলক উপন্যাস; পাঠে আনন্দের চেয়ে উপকারের সম্ভাবনা বেশী।

কামিখ্যের ঠাকুর—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত। মূল্য এক টাকা। চক্রবর্ত্তী সাহিত্য ভবন, বজবজ।

গল্পের বই—ছয়টি গল্প আছে। আমার নিজের ভাল লাগিয়াছে—কিন্তু তাহা নজির বলিয়া গ্রহণ করিতে বলি না; আবিশ্বাসী পাঠক পড়িয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কাশ্মীরের কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, প্রণীত। গোল্ডকুইন এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ৮০। পৃ. ৩০+১৩ খানি প্লেট।

বইখানির ছাপা ভাল, অনেকগুলি ছবিও আছে। উপহার দিবার উপযুক্ত বই। বর্ণনায় বৈশিষ্ট্য নাই, কিন্তু কাশ্মীর-যাত্রীদের উপযোগী যথেষ্ট খবর আছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

হিন্দু স্ত্রীলোকগণের সম্পত্তিতে অধিকার-বিষয়ক আইন—শ্রীবিনয়েন্দ্রপ্রসাদ বাগচী, এম্-এ, বি-এল্, প্রণীত। ৬৫ পৃ.। মূল্য এক টাকা।

ডাক্তার দেশমুখ কর্ত্তৃক আনীত হিন্দু স্ত্রীলোকগণের সম্পত্তিতে অধিকার-বিষয়ক আইন ইং ১৯৩৭ সালের ১৮ নং অ্যাক্ট স্বরূপে বিধিবদ্ধ হইলে দেশমধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। সাড়া পড়িয়া যায় দুই কারণে—প্রথম ইহা দ্বারা হিন্দুর সনাতন সামাজিক ব্যবস্থার উলটপালট হইল; দ্বিতীয়তঃ ইহার বিধান-গুলি অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য, জায়গায় জায়গায় মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত; আর বিধানগুলি এরূপ ভাষায় লিখিত যে একই বিধানের দুই বা তিন প্রকার পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা করা যায়। তজ্জন্য সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ইং ১৯৩৮ সালের ১১ নং অ্যাক্ট দ্বারা ইহার সংশোধন করেন।

সংশোধিত আইনের বিধানও জটিল। ইংরেজী ভাষা যাঁহারা সম্যক্‌রূপে জানেন না এইরূপ হিন্দু স্ত্রীলোকেরা হিন্দু আদর্শ কি ও তাঁহাদের এই আইন প্রণীত হইবার পূর্ব্বেই কতখানি অধিকার ছিল এবং এখনই বা তাহার পরিবর্ত্তে কতখানি বাড়িল; এবং অন্যান্য দেশে ও অন্যান্য ধর্ম্মমত ও আইন অনুসারে স্ত্রীলোকদের আস্থা কিরূপ, তাহা অল্পের মধ্যে এই পুস্তক হইতে জানিতে পারিবেন। বিনয়বাবু আইনের জটিল বিধান সম্বন্ধে নজির-সম্বলিত মতামত প্রকাশ দ্বারা নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন। ইহাতে অনেকের সুবিধা হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

শ্রীমদ্ভগবদগীতা—শ্রীউমেশচন্দ্র গুহ বি-এল সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান— বরদাভবন, পোঃ চকবাজার, চট্টগ্রাম। মূল্য ।০ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সরল বাংলা কবিতায় গীতার অনুবাদ। ইহাতে গীতার মূল শ্লোকগুলি নাই। দুর্ব্বোধ্য শব্দের টীকা প্রত্যেক পৃষ্ঠার নিম্নভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকটিকে আমরা অল্পবয়স্কদিগের উপযোগী বলিয়া মনে করি।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

শিশুমনের চলচ্চিত্র—শ্রীমতিলাল দাশ। শিবসাহিত্য কুটীর, ২৬৮ এ, হ্যারিসন রোড। মূল্য ১৲ টাকা।

উপন্যাস। বেশ ঝরঝরে ভাষায় শৈশব-জীবনের অভিজ্ঞতার উপর কল্পনার রং ফলাইয়া বইখানি লেখা। ঘটনা তুচ্ছ হইলে ক্ষতি হয় না যদি শিল্পী সেই তুচ্ছতার সঙ্গে ভূমার যোগটি আবিষ্কার করিয়া পাঠকের দৃষ্টির সামনে ধরিতে পারেন, চলমানের মধ্যে শাশ্বতের সন্ধান দিতে পারেন। লেখক সে-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

জায়গায় জায়গায় ঘটনার উপর মন্তব্যের আতিশয্যে পাঠকের গতিবিলাসী মন একটু বাধা পায়। এদিকটায় একটু সংযম থাকিলে ভাল হইত।

জীবনের চলস্রোতে—শ্রীমতিলাল দাশ। শিবসাহিত্য কুটীর, ২৬৮এ, হ্যারিসন রোড। মূল্য ২৲ টাকা।

পশ্চিমের নূতন আলোক এবং উন্মাদনার মধ্যে আমাদের যে-সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে, লেখক মুখ্যত সেই নব্যসমাজ লইয়া উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। নায়িকা ইন্দিরা এই সমাজের স্বৈরাচারের মধ্যে বাড়িয়া উঠিলেও প্রাচীনের আদর্শকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রহিল এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই আদর্শের বেদীতলেই নিজের জীবন উৎসর্গ করিল। নূতন-পুরাতন লইয়া তাহার মনের মধ্যেকার বিপ্লবটি লেখক বেশ ভাল ভাবেই ফুটাইয়াছেন। লেখার ভঙ্গীটিও ভাল, তবে এক এক জায়গায় বইয়ের 'চরিত্র'দের ঠেলিয়া উপদেষ্টা-মূর্ত্তিতে লেখক নিজে বড় সামনে আসিয়া পড়িয়াছেন। এই সব স্থানে পাঠকের একটু ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

মনীষা—শ্রীমতিলাল দাশ। শিবসাহিত্য কুটীর, ২৬৮এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

উপন্যাস। নিতান্ত মামুলী প্লট, তাহার উপর সব চরিত্রগুলি ভাল ভাবে ফুটিবার অবসর পায় নাই। মনোরমা নামে যে চরিত্রটি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহাকে নায়ক নিরঞ্জনের প্রণয়লাভের জন্য একটা চক্রান্তের সরিক করা হইয়াছে। অথচ শেষ পর্যন্ত পড়িয়া দেখা গেল মেয়েটি এ-ধরণের নয়। ফলে চরিত্রটির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। মোটের উপর বইখানি পড়িয়া নিরাশ হইতে হইল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দেশপ্রাণ শাসমল—শ্রীপ্রমথনাথ পাল। সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। সচিত্র, পৃ. ২৪০। মূল্য আড়াই টাকা।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অকালমৃত্যুতে মেদিনীপুর জেলা ও বাংলা দেশ এক জন তেজস্বী দৃঢ়মনা দেশহিতব্রত ত্যাগী কর্ম্মী ও নেতাকে হারাইয়াছে। স্বাধীনতার আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার জনসাধারণ যে এত ত্যাগস্বীকার করিতে পারিয়াছে, তাহার অনেকখানির মূলে আছে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কর্ম্মশক্তি। এই গ্রন্থে সেই বীর দেশনায়কের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক সাময়িক রাষ্ট্রীয় দলাদলির কথা ও বিতর্কের বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা না-করিয়া বোধ করি উপায় ছিল না; কারণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বীরেন্দ্রনাথকে দলাদলির অনেক বাধা ও আঘাতের মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছিল; অনেক রাষ্ট্রীয় নেতা প্রতিষ্ঠারক্ষার জন্য বিরুদ্ধ দলের সহিত অনেক সময় সন্ধি স্থাপন করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ বরং নেতৃত্ব হারাইতেও প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও সকল সময়ে এইরূপ রক্ষা করেন নাই। সুতরাং তাঁহার জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া এ-সব বাদ দিবার উপায় ছিল না। তবে গ্রন্থকার যে বলিতে চাহিয়াছেন, বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যত দলাদলি হইয়াছিল সে সবই তিনি উচ্চবর্ণ ছিলেন না বলিয়া, ইহা অতিরঞ্জিত বোধ হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী দলের কেহ কেহ ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু বিরুদ্ধতার মূল কারণটা নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মতের অনৈক্য।

বীরেন্দ্রনাথের "স্রোতের ফুল" ও অন্যান্য রচনাও সহজলভ্য হওয়া উচিত।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

উদগাতা—শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত। শ্রীনৃসিংহচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. কর্ত্তৃক ১২১-এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৩২। মূল্য ।০

আলোচ্য বইখানিতে বিভিন্ন ছন্দে রচিত কয়েকটি খণ্ড কবিতা আছে। কবির মনে যখন যে ভাব উদয় হইয়াছে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সব সময় যে ছন্দের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে তাহা নয়।

স.

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও শান্তিনিকেতন হইতে বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড আট আনা, ডাকমাশুল এক আনা। শান্তিনিকেতনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই বৃহৎ অভিধানের ৬৪তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "বাড়" এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২০৩৬।

ইহা সমুদয় কলেজের উচ্চ বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে এবং সাধারণ ও পারিবারিক পুস্তকালয়ে রক্ষিত হওয়া উচিত। ইহার পরিচয় অনেক বার দিয়াছি।

ড.।

পিতৃসত্য

জাপানী কাহিনী

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন মাস আগে শত্রুসৈন্য দুর্গদ্বারে হানা দিয়াছে।

যুদ্ধ যখন সুরু হয় তখন শরৎকাল—চন্দ্রমল্লিকার ঋতু। এখন শীত—পাহাড়ের উপর 'প্লাম' ফুল ফুটিয়াছে, তবুও যুদ্ধের বিরাম নাই।

সমুচ্চ প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত সুদৃঢ় দুর্গ। বর্মপরিহিত যোদ্ধৃবৃন্দ নিরন্তর বর্শা ও ধনুর্বাণ হস্তে সর্বত্র সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত। মাঝে মাঝে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে।

দুর্গের মধ্যে যোদ্ধার অভাব নাই—অভাব খাদ্যের। দিনে দিনে মাসে মাসে সঞ্চিত খাদ্য ফুরাইয়াছে—এখন দারুণ দুরবস্থা, কাহারও অর্দ্ধাশন কাহারও বা অনশন।

দুর্গাধিপতি সামন্তরাজ সাতোমি মহা ফাঁপরে পড়িলেন। সত্বর একটা ব্যবস্থা প্রয়োজন। শত্রুসেনার শৌর্যবীর্যকে তিনি ভয় করেন না—ভয় করেন তাহাদের নায়কের প্রখর বুদ্ধিকে ও তাহার সৈন্য-পরিচালন-দক্ষতাকে। সমস্তই ঐ একটি লোকের উপর নির্ভর করিতেছে। উহাকে নিপাত করিতে পারিলেই শত্রুর পরাজয় নিশ্চিত।

কিন্তু কি উপায়ে? মরিয়া হইয়া তিনি পণ করিলেন—যে-কেহ সেই পরম শত্রুকে সংহার করিতে পারিবে তাহারই হস্তে তিনি তাঁর স্নেহের দুলালী রূপসী কন্যাকে অর্পণ করিবেন।

* * *

এক দিন অপরাহ্ণে আকাশ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, অবরুদ্ধ ক্ষুধার্ত সৈনিকের হাড়ে কাঁপুনি তুলিয়া অতি শীতল বাতাস বহিতে লাগিল, অবশেষে সন্ধ্যাগমে তুষারপাত সুরু হইল। ক্রমে ক্রমে তরুশীর্ষ দুর্গপ্রাকার পরিখা ও চারি পাশের প্রান্তর সমস্তই মায়াময় শুভ্র আস্তরণে আবৃত হইয়া একাকার হইয়া গেল।

সামন্তরাজের একটি শিকারী পোষা কুকুর ছিল—তার নাম য়্যাৎসুবুসা। সেই অতিকায় কুকুরটি যেমন প্রভুভক্ত, তেমনি সুদর্শন ও শক্তিশালী। দুর্যোগের মধ্যে অলক্ষিতে সে কোথায় অন্তর্ধান করিল কেহ জানিল না।

পরদিন প্রভাতে সাতোমি পার্ষদগণের সঙ্গে সভায় পরামর্শে বসিয়াছেন। সকলেরই মত, যদি মরিতে হয় তবে সম্মুখসমরে বীরোচিত মৃত্যুই শ্রেয়—এরূপে বিবরবদ্ধ ইঁদুরের মত অনাহারে মরা বীরের ধর্ম নহে! অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শত্রুসেনাকে আক্রমণ করাই কর্তব্য।

এমন সময়ে কোথা হইতে য়্যাৎসুবুসা সহর্ষে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত। দীর্ঘকেশবিলম্বিত রক্তাক্ত এক নরমুণ্ড তার মুখে। সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল সে মুণ্ড আর কাহারও নয়—সে-মুণ্ড সাতোমির পরম শত্রুর।

বহুকাল পরে দুর্গাভ্যন্তরে বিপুল জয়ধ্বনি উঠিল এবং সেই ধ্বনিকে অনুসরণ করিয়া উন্মুক্ত দুর্গতোরণের মাঝ দিয়া সাতোমির সজ্জিত সেনাদল বন্যাস্রোতের মত অপ্রতিহত বেগে বাহির হইয়া শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একে নায়কের অভাব, তদুপরি আকস্মিক অতর্কিত আক্রমণ—শত্রুদল বেশীক্ষণ যুঝিতে পারিল না, অচিরে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

* * *

দেশে সুখশান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন, প্রভুভক্ত যে কুকুরটির সাহায্যে ইহা সম্ভব হইল সে হইয়া উঠিল সামন্তরাজের চক্ষুশূল। তাহাকে আর তিনি কাছে ডাকেন না, আদর করেন না—তাহাকে দেখিলেই নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িয়া যায়, অমনি য়্যাৎসুবুসার প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় মন ভরিয়া উঠে। মনে হয় কি কুক্ষণেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম!

রাজার দেখাদেখি পাত্রমিত্র পার্ষদবর্গও কুকুরটিকে হেনস্থা করিতে লাগিল। ক্রমে ভৃত্যেরাও তাহাদের

সঙ্গে যোগ দিল। তাহাকে দেখিলে সকলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। দিনে দিনে অবজ্ঞা অনাদর অনাহারের মধ্যে দিয়া কুকুরটি বুঝিতে লাগিল তাহাকে কেহই দেখিতে পারে না। প্রকাশহীন দুঃখে ম্রিয়মাণ ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া সে আত্মগোপন করিয়া নিঃসঙ্গ ফিরিতে লাগিল।

নিরপরাধ অ-বাক্ আশ্রিত প্রাণীটির এই অহেতুক শাস্তি দেখিয়া রাজনন্দিনী ফুসের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। তাহার মনে হইল মানুষের নিষ্ঠুরতা অকৃতজ্ঞতা অবিচারের যেন সীমা নাই! আর তার পিতা, যাঁহাকে সে এত ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তাঁরই বা এ কি আচরণ! ভাবিতে লজ্জা হয়!

সামুরাইয়ের (ক্ষত্রিয়ের) মুখের কথার মূল্য কি কম! একবার উচ্চারিত হইলে তাহা আর ফিরাইয়া লওয়ার জো নাই! পিতা পণরক্ষায় পরাঙ্মুখ হইলে সন্তানকেই পিতৃসত্য পালন করিতে হইবে! আশ্রিতকে সকলে ত্যাগ করিয়াছে বলিয়াই আমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না! এই ভাবিয়া রাজনন্দিনী কুকুরটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পালনের ভার গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইল।

এক দিন ফুসে ও য়্যাৎসুবুসাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। প্রীতিপ্রতিমা দুহিতার অদর্শনে রাজার অধীরতার সীমা নাই। তাহাকে সন্ধান করার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল, কিন্তু দীর্ঘকাল নিকটে দূরে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোন ফল হইল না। কন্যার শোকে রাজা যতই পীড়িত হইতে লাগিলেন, কুকুরটির উপর ততই তাঁর ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। ওই হতভাগাই যত নষ্টের মূল!

* * *

কত জনপদ গিরিনদী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ফুসে চলিয়াছে—তার অনুগমন করিতেছে য়্যাৎসুবুসা। পিতার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিয়াছে দুহিতা কৃচ্ছ্রসাধনের দুর্গম পথে। সহায়সম্বলহীনা ভিখারিণীর মত, তবুও তার মনে উদ্বেগ আশঙ্কা নাই, কারণ অন্তরে সে লইয়াছে ভগবান্ বুদ্ধের শরণ। শরণাগতকে প্রভু ত্যাগ করেন না, ইহা সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

এক গিরিগুহায় তাহারা আশ্রয় লইল। কুকুরটি ফুসেকে চোখের আড়াল করে না—ছায়ার মত অনুক্ষণ তার পাশে-পাশে থাকে। রাত্রে কঠিন শিলাশয়নে ফুসে যখন তার তপঃক্লিষ্ট শ্রান্ত তনু এলাইয়া দেয়, সে তখন গুহামুখে বিনিদ্র প্রহরায় বসিয়া থাকে, আবার দিবাভাগে যখন সে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গিরিপাদমূলে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায় তখনও কুকুরটি তার অনুগমন করে। ভিক্ষালব্ধ অন্নে দুজনের ক্ষুধা নিবারণ হয়।

প্রতিদিন ফুসে শুচিস্নাত হইয়া তথাগতের ধ্যানে বসে—কুকুরটি তাহারই পাশে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে। সে প্রার্থনা করে পিতার জন্য আর য়্যাৎসুবুসার জন্য। বলে—প্রভু, এই সাহসী প্রভুভক্ত প্রাণীটির দেহে আত্মার সঞ্চার কর! ইহাকে জন্মমৃত্যুর জটিল জাল থেকে উদ্ধার কর! গ্রহণ কর ইহাকে তোমার অপার করুণার আশ্রয়ে, কারণ ইহাকে সকলে ত্যাগ করিয়াছে!

এইরূপে দিন যায়। ক্রমে এমন হইল ফুসে যখন তদ্গতচিত্তে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিত বা সূত্র আবৃত্তি করিত, তখন পার্শ্বে-উপবিষ্ট য়্যাৎসুবুসার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিত এক অপার্থিব ভাব—মনে হইত সে যেন সমস্তই বুঝিতে পারিতেছে—তপস্যার মহিমা তাহাকেও যেন স্পর্শ করিয়াছে—ইতর প্রাণী মানুষের উন্নত চেতনার প্রান্তে গিয়া যেন পৌঁছিয়াছে!

* * *

একদা প্রভাতে সাতোমির এক বিশ্বস্ত অনুচর বন্দুক-হস্তে শিকারে বাহির হইয়াছে। গিরিপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল; অদূরে এক গুহামুখে দেখিতে পাইল একটি কুকুর নতশিরে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। দেখিয়াই চিনিল—ও-ই ত তার প্রভু সামন্তরাজের পরম ঘৃণার পাত্র! উহারই জন্য তিনি কন্যাকে হারাইয়াছেন—উহারই জন্য তাঁর সুখশান্তি নষ্ট হইয়াছে! উহাকে নিপাত করাই শ্রেয়—দারুণ ক্রোধে প্রভুভক্ত অনুচরের মনে চকিতে এই চিন্তার উদ্রেক হইল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুক তুলিয়া য়্যাৎসুবুসাকে লক্ষ্য করিয়া সে ঘোড়া টিপিল। তার পর ছুটিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল।

দেখিল য়্যাৎসুবুসা মরিয়াছে। কিন্তু তাহার বিগত-প্রাণ দেহের পাশে ও কোন্ নারীর মৃতদেহ? ভয়ে ও বিস্ময়ে লোকটা স্তব্ধ হইয়া গেল। বন্দুক-ছোড়ার সময় সাতোমির অনুচর দেখিতে পায় নাই কুকুরের আড়ালে তার প্রভুকন্যা রাজনন্দিনী ফুসে বসিয়া ছিল।

* * *

পিতৃসত্যপালিকা তাপসী কন্যাকে প্রভু বুদ্ধ গ্রহণ করিলেন এবং আমাদের বিশ্বাস, সে-কন্যার আশ্রিত প্রাণীটিও নিশ্চয়ই প্রভুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই!

দূরের গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুদূরের পানে-চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি
মন সেই আঘাটায় তীর্থপথগামী
যেথায় হঠাৎ-নামা প্লাবনের জলে
তটপ্লাবী কোলাহলে
ওপারের আনে আহ্বান,
নিরুদ্দেশ পথিকের গান।
ফেনোচ্ছল সে-নদীর বন্ধহারা জলে
পণ্যতরী নাহি চলে,
কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ ছায়া-ভাসানের খেলা
খেলাইছে এবেলা ওবেলা॥

দিগন্তের নীলিমায় স্পর্শ দিয়ে ঘেরা
গোধূলিলগ্নের যাত্রী মোর স্বপনেরা।
নীল আলো প্রেয়সীর আঁখিপ্রান্ত হতে
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে;
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে
অজানার অতি দূর পারে॥

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে;
আজিও চলেছি তার টানে।
বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরারে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে॥

ওগো দূরবাসী
কে শুনিতে চাও মোর চিরপ্রবাসের এই বাঁশি,—
অকারণ বেদনার ভৈরবীর সুরে
চেনার সীমানা হতে দূরে
যার গান কক্ষচ্যুত তারা
চিররাত্রি আকাশেতে খুঁজিছে কিনারা।
এ বাঁশি দিবে সে মন্ত্র যে মন্ত্রের গুণে
আজি এ ফাল্গুনে
কুসুমিত অরণ্যের গভীর রহস্যখানি
তোমার সর্ব্বাঙ্গে মনে দিবে আনি
সৃষ্টির প্রথম গূঢ়বাণী।
যেই বাণী অনাদির সুচিরবাঞ্ছিত
তারায় তারায় শূন্যে হোলো রোমাঞ্চিত,
রূপেরে আনিল ডাকি
অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃসীমা আঁকি ॥

উদয়ন
২২শে ফাল্গুন ১৩৪৬



শিবের নৃত্যমূর্ত্তি

শ্রীরমেশ বসু

১

শিব হিন্দুর কাছে মহাদেব। তাঁহার কথা হিন্দুর শাস্ত্রে ও পুরাণে, শিল্পে ও সাহিত্যে, ব্রত ও উৎসবে যুগ যুগ ধরিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহাকে ঘিরিয়া যে-সব কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাঁহার বহু রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। রুদ্র ও দক্ষিণ, অশান্ত ও শান্ততম এই দুইটি প্রধান অভিব্যক্তি। হিন্দুর ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মকর্ম্মের অনেক অংশ শিবের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও অনুরঞ্জিত। শিব আদিদেব, ভূতনাথ; তাঁহার অষ্টবিধ মূর্ত্তির মধ্যে পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—তাঁহারই বিভূতির এক একটি রূপ। আশুতোষ রূপে তিনি হিন্দুর উচ্চনীচ সকলের প্রিয়। তাঁহার আদিম রুদ্রতা ও প্রলয়-রূপের প্রখরতা হিন্দুর মনের মাধুরী মিশিয়া কল্যাণ-সুন্দর শ্রী ধারণ করিয়াছে। শিব মহাযোগী, তিনি হিন্দুর আধ্যাত্মিক আদর্শ। এক দিকে তিনি কামান্তক, অন্য দিকে তিনিই উমাপতি। এক দিকে তিনি ভিক্ষুক শ্মশানবাসী, অন্য দিকে তিনিই ত্রিভুবনেশ্বর ও সিদ্ধিমুক্তি-দাতা। তিনি ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ। এইরূপে শিবের সংহারমূর্ত্তি, অনুগ্রহমূর্ত্তি, দক্ষিণামূর্ত্তি, কঙ্কালমূর্ত্তি, ভিক্ষাটন-মূর্ত্তি, কল্যাণসুন্দর মূর্ত্তি, গঙ্গাধর ও নীলকণ্ঠ মূর্ত্তি, অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি, হরিহর মূর্ত্তি এবং লিঙ্গমূর্ত্তি প্রভৃতি কত যে রূপ কল্পিত হইয়াছে তাহার অন্ত নাই। নানা শৈব সম্প্রদায় তাহাদের দেবতাকে নানা বিচিত্র ভাবে ধ্যান করে, নানা অদ্ভুত ভাবে তাঁহার পূজা করে।

২

কিন্তু শিবের বহু প্রকারের রূপের মধ্যে নৃত্যরূপের একটি বিশিষ্টতা আছে। শিব মহাযোগী মহাদেব হইয়াও যে নাচেন এই কল্পনায় নূতনত্ব আছে। শিবের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের এবং নৃত্যের ঘনিষ্ঠ যোগ। শিবই অন্যান্য অনেক বিদ্যার মত এই দুইটি বিদ্যারও আদি উপদেষ্টা। নৃত্যের মধ্য দিয়া এবং নৃত্যের রূপকের গাম্ভীর্য্যে শিবের যেন একটি মহান্ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। নৃত্যকে হিন্দুশাস্ত্রে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় নৃত্যের স্থান স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যান্য শিল্পের মূল প্রেরণায় নৃত্যের প্রভাবের কথাও প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, যেমন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। শিবের নৃত্য লাস্য অর্থাৎ বিলাস-নৃত্য নয়। ইহা আধ্যাত্মিক, ইহা তাঁহার যোগীরূপের এক প্রকার প্রকাশ। এমন কি, নৃত্যশাস্ত্রের যে রূপ কল্পিত হইয়াছে তাহাতে শিবের বিশিষ্ট লক্ষণগুলিই প্রধান, যেমন আমরা সূত্রধার মণ্ডনের গ্রন্থে দেখিতে পাই—

> নৃত্যশাস্ত্রং সিতং রম্যং মৃগবক্ত্রং জটাধরম্।
> অক্ষসূত্রং ত্রিশূলঞ্চ বিভ্রাণং তৎ ত্রিলোচনম্।
>
> —দেবতামূর্ত্তিপ্রকরণ, ৪।১৩

এই শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় নৃত্যশাস্ত্রের মূর্ত্তির জটা, তিন চোখ ও ত্রিশূল থাকে, এইগুলি ত শিবের নিজস্ব লক্ষণ।

নটরাজ শিবের নিজের মন্দিরেই যে নৃত্যমূর্ত্তি স্থাপিত হইত তাহা নহে, মাতৃকাদের মন্দিরে তাঁহাদের সঙ্গেও ঐরূপ মূর্ত্তি স্থাপনের বিধান ছিল—

> ভৈরবং কারয়েত্তত্র নৃত্যমানং বিকারণম্।
>
> —দেবতামূর্ত্তিপ্রকরণ, ৮।৭৬

৩

শিবের নৃত্যমূর্ত্তির উদ্ভব কি করিয়া হইল সে সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী চলিত আছে। এই সব পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে মিল নাই, নানা গ্রন্থে নানা অবস্থায় নৃত্যের কথা পাওয়া যায়। যেমন, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে

আমরা দেখিতে পাই, দক্ষযজ্ঞের সময় শিব এক প্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন—

> দক্ষযজ্ঞে বিনিহৃতে সন্ধ্যাকালে মহেশ্বরঃ।
> নানাঙ্গহারৈর্নর্ত্ত লয়তালবশানুগঃ॥
>
> —নাট্যশাস্ত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ২৩৪ শ্লোক

কূর্ম্মপুরাণে পাওয়া যায় নর-নারায়ণ ঋষির আশ্রমে যোগতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া শিব বলিয়াছেন—

> সোঽহং প্রেরয়িতা দেবঃ পরমানন্দ-সংশ্রিতঃ।
> নৃত্যামি যোগী সততং যস্তদ্বেদ স যোগবিৎ॥

এবং শুধু উপদেশ না দিয়া নানা প্রকার নৃত্য দেখাইয়াছিলেন—

> এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ যোগিনাং পরমেশ্বরঃ।
> ননর্ত্ত পরমং ভাবমৈশ্বরং সম্প্রদর্শয়ন্॥

তামিলদেশের পুরাণে এরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে যে এক বার ঋষিদের আশ্রমে ক্রুদ্ধ ঋষিদের দ্বারা প্রেরিত বাঘকে বিনষ্ট করিয়া উহার চর্ম্ম পরিয়াছিলেন। ইহার পর ঋষিদের প্রেরিত সাপকে ধরিয়া গলায় মালা করিয়া লইয়াছিলেন।

এই সব পৌরাণিক কাহিনী অবশ্য বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। বৈদিক রূপক ও কাহিনী পুরাণের যুগে একটা বিশেষ আকার গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু শিল্পে আমরা বহুদিন কোন নৃত্যমূর্ত্তির সন্ধান পাই না। শিবের সর্ব্বপ্রাচীন মূর্ত্তি যাহা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হয় মুখলিঙ্গের গায়, যেমন গুডাইমল্লমে, অথবা কুষাণ-রাজাদের মুদ্রায়। এই সময় হইতে একমুখ বা বহুমুখ লিঙ্গ দেখা যাইতে থাকে, তাহার গায়ে নানা কারু-কার্য্যযুক্ত শিবের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। এইগুলিতে বা নচনা, ভূমরা, খো প্রভৃতি স্থানে ভারশিব ও বাকাটক যুগের ও পরের লিঙ্গস্তম্ভের উপর অপূর্ব্ব শিবমূর্ত্তি শিল্পিত হইয়াছে। কিন্তু কোথাও নৃত্যপর মূর্ত্তি নাই। গুপ্তযুগেও কোনরূপ নটরাজ মূর্ত্তি দেখা যায় না। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রস্তাবনায় শিবের অষ্টবিধ রূপের উল্লেখ আছে। তাঁহার অন্যান্য কাব্যেও শিবের অন্যান্য কাহিনী কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু নৃত্যরূপের কোন উল্লেখ নাই। হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে শিবের পূজা খুব প্রচলিত ছিল, তাঁহার সভাকবি বাণভট্টের গদ্যকাব্যগুলিতে শৈবসমাজের অনেক কথা আছে, তাহাতে শিবের অষ্টরূপের উল্লেখ আছে, কিন্তু নটরূপের কোন কথা নাই।

ইহার পরবর্ত্তী যুগে পশ্চিম-ভারতের গুহামন্দির-গুলিতে সর্ব্বপ্রথম নৃত্যমূর্ত্তি দেখা যায়। এলিফ্যান্টা, ইলোরা, বাদামী প্রভৃতি স্থানেই প্রথম এইরূপ মূর্ত্তি মিলে। এইগুলি চালুক্য রাজাদের সময়ের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতাব্দীর। এই মূর্ত্তিগুলি পাথরের এবং শিল্প হিসাবে অনবদ্য।

দক্ষিণ-ভারতের পল্লব-রাজাদের সময়ে অমরাবতীর শিল্পধারার প্রভাব দেখা যায়। নটরাজের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ স্থান চিদম্বরমের মূল মন্দির পল্লব-রাজাদের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ইহার সর্ব্বপ্রাচীন অংশ যাহা মূলস্থান নামে পরিচিত সেখানে কোন মূর্ত্তি নাই। ঐ স্থানের অন্যান্য মন্দির, 'সভা' ও মূর্ত্তিগুলি পরবর্ত্তী কালের। ইহার পরে তামিল সাহিত্যের স্তোত্র যুগ, সে সময়ে রচিত শিব-স্তোত্রগুলিতে চিদম্বরমের উল্লেখ পাওয়া যায়। পল্লবদের পরে পাণ্ড্য, চোল ও বিজয়নগরের রাজাদের সময়েই নটরাজ মূর্ত্তি অত্যন্ত প্রচলিত হয়। ইহা শৈবাগমের প্রভাবের ফল। এই সময় হইতে ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিই বেশী দেখা যায়। এই-গুলি উৎসব-মূর্ত্তি, অর্থাৎ উৎসবের সময় যে দেবযাত্রা বা মিছিল বাহির হইত, তাহাতে এইগুলি লইয়া যাওয়া হইত।

এই সম্পর্কে একটি কথা বলা দরকার যে পুরাণের মধ্যে (যেমন, মৎস্যপুরাণে) নৃত্যমূর্ত্তির বর্ণনা থাকিলেও আমরা খ্রীষ্টীয় সাত-আট শত বৎসর পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন মূর্ত্তি পাই না বা সমসাময়িক সাহিত্যে কোন উল্লেখ পাই না। সুতরাং পুরাণের ঐ সব বচন প্রাচীন কিনা তাহা বিবেচ্য।

৪

ভারতবর্ষের নানা অংশে শিবের পূজা সমান ভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু নটরাজ মূর্ত্তি সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রচলিত ছিল কিনা বলা যায় না, কেননা সব জায়গায় ঐরূপ মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় পশ্চিম-ভারতে, দক্ষিণ-ভারতে,

উড়িষ্যায় ও বঙ্গের বিক্রমপুর-ত্রিপুরা অঞ্চলে নৃত্যমূর্ত্তির প্রসার ছিল। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণেই নটরাজের প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য বেশী। মাদ্রাজ-অঞ্চলের বহু প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রেই নৃত্যমূর্ত্তি ছিল বা আছে। চিদম্বরম্, গঙ্গাই-কোণ্ডচোলপুরম্, টেঙ্কাশি, তাঞ্জোর, কাঞ্চী, বেলুর, নল্লুর, মাদুরা প্রভৃতি বহু স্থানে পাথর ও ধাতুর নৃত্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ চিত্রশালায় এইরূপ মূর্ত্তির সংগ্রহ খুব বড়। দক্ষিণ-ভারত হইতে অনেক মূর্ত্তি ভারতের অন্যত্র ও বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। এত বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া এত অধিক মূর্ত্তি আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। আর নটরাজ সম্বন্ধে এত স্তোত্র ও গ্রন্থ আর কোথাও পাওয়া যায় না। শৈবাগমে শিবের নৃত্যের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহার ফলেই বোধ হয় দক্ষিণ দেশে এইরূপ মূর্ত্তির আধিক্য হইয়াছিল।

দক্ষিণ-ভারত হইতে সহজেই নৃত্যমূর্ত্তি সিংহল পর্য্যন্ত গিয়াছে। সিংহলের পোলোন্নারুয়া নামক স্থানে নটরাজ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির শিল্পকার্য্যে দ্রাবিড় দেশের ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। ডাঃ কুমারস্বামীর মতে এগুলি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আগেকার।

আগে মনে করা হইত নটমূর্ত্তি দক্ষিণ-ভারত ছাড়া অন্যত্র প্রচলিত ছিল না, কিন্তু এখন সে মতের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে উত্তর-ভারতের বহু স্থানে ঐরূপ মূর্ত্তির পূজা হইত। কোথাও কোথাও মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু মন্দিরের নাম বা স্থানের নামের সঙ্গে ঐরূপ মূর্ত্তির সংযোগ সূচিত হয়, যেমন উড়িষ্যায় নাটকেশ্বর, বাংলায় নাটেশ্বর। দক্ষিণের তুলনায় উত্তর-ভারতে নটরাজ মূর্ত্তির সংখ্যা কম হইলেও একেবারে নগণ্য নয়। উড়িষ্যার নানা স্থানে কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কোণারক, ভুবনেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিঙে এইরূপ মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। উড়িষ্যা হইতে সংগৃহীত একটি অপূর্ব্ব নটরাজ মূর্ত্তি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে স্থান পাইয়াছে। কোণারকে নিরাকার মঠ নামে অবধূত সম্প্রদায়ের একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই মঠের পশ্চিম দিকে পাথরের তৈয়ারী একটি শিবমন্দির আছে, উহা নাটকেশ্বর বলিয়া খ্যাত। এখন এই মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই, উহা নাকি নিকটস্থ একটি গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে। উড়িষ্যায় প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলি পাথর দ্বারা নির্ম্মিত।

বাংলা দেশের বিক্রমপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলে কয়েকখানি নৃত্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি পাথরের তৈয়ারী। এই মূর্ত্তিগুলির কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। বিক্রমপুরে রামপালের সংলগ্ন বা নিকটবর্ত্তী বল্লালবাড়ী, শঙ্করবন্ধ, রাণীহাটী, কলিকাল, চুরাইন প্রভৃতি স্থান হইতে অভগ্ন বা ভগ্ন অবস্থায় কয়েকখানি মূর্ত্তি উদ্ধার করা হইয়াছে। রামপালের কাছে একটি গ্রামের নাম নাটেশ্বর। এখানে কোন মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু নাম হইতেই মনে হয় এখানেও নৃত্যমূর্ত্তি ছিল। ওখানে যে মন্দির ছিল তাহা 'দেউল' শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতেই বুঝা যায়। ত্রিপুরা জেলার ভারেল্লা গ্রামে আবিষ্কৃত একটি লিপিযুক্ত নৃত্যমূর্ত্তি ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী আলোচনা করিয়া একটি নূতন রাজার নাম পাইয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিটি ভগ্ন। এই জেলার নাটঘর নামক গ্রামে এখনও নটরাজ মূর্ত্তি পূজিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের নিকট জানিতে পারা গেল তিনি চুঁচুড়ার নিকটে অতি জীর্ণ নটমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন।

কাশীতে একটি ভগ্ন নটরাজ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কানিংহাম বহু পূর্ব্বে বুদ্ধগয়ার কাছে একটি নৃত্যশীল মহাকাল বা শিবের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন।

নটরাজ মূর্ত্তি যে ভারতের সীমার বাহিরেও প্রচলিত ছিল তাহার পরিচয় আমরা বহির্ভারতের কোথাও কোথাও পাই। ইন্দো-চীনের অন্তর্গত প্রাচীন চম্পা রাজ্যের মধ্যে মাইসন মন্দির-শ্রেণীর একটি অংশে ভগ্ন নটরাজ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

৫

নটরাজ মূর্ত্তির বিষয় লইয়া এ-পর্য্যন্ত যে আলোচনা হইয়াছে তাহার ইতিহাসও কৌতূহলোদ্দীপক। নটরাজের মূর্ত্তি ও তত্ত্ব লইয়া দেশে-বিদেশে এবং পণ্ডিত-অপণ্ডিতের দ্বারা যত আলোচনা হইয়াছে এরূপ বোধ হয় আর কোনও হিন্দু দেবতার

সম্পর্কে হয় নাই, অবশ্য কৃষ্ণকে বাদ দিয়া। নটরাজের তাণ্ডবনৃত্য যে রসিক ও ঐতিহাসিক সমাজে একটা সাহিত্য-তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বোধ হয় নটরাজের প্রেরণাতেই হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি উদ্দিষ্ট অর্ঘ্য স্বরূপ। প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে সুপ্রসিদ্ধ পূর্ত্তিতত্ত্ববিদ টী. এ. গোপীনাথ রাও নটরাজের সম্বন্ধীয় আলোচনার মালমশলা সংগ্রহ করেন। তাহাই ব্যবহার করিয়া ডাঃ কুমারস্বামী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে গোপীনাথ রাও নিজেও তাঁহার প্রামাণিক গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করেন। এই আলোচনার ঢেউ পাশ্চাত্য দেশেও গিয়া লাগে। সেখানে প্রথম নটরাজের অভ্যর্থনা হয় অত্যন্ত বিরূপ ভাবে—কেহ কেহ বলেন ইহা বর্ব্বর শিল্পের পরিচায়ক। এইরূপ যখন অবস্থা তখন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভাস্কর রোঁদা এই মূর্ত্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, তিনি শিল্পী হিসাবেই ইহার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করেন। তাহার পর হইতেই পাশ্চাত্য সমাজে নটরাজ গৌরবের আসন পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীও দাক্ষিণাত্যের ধাতুমূর্ত্তিগুলির আলোচনায় নটরাজের ব্যাখ্যা করেন। হ্যাভেল ও রোদেন্‌স্টাইন্‌ এই মূর্ত্তির রহস্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বাংলা দেশে প্রথম ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৩১৮ সালের "ভারতী"তে একটি প্রবন্ধে বলেন যে উত্তর-ভারতে কোথাও এই মূর্ত্তি দেখা যায় না, দক্ষিণ-ভারতে শুধু চিদম্বরমে এইরূপ মূর্ত্তি আছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই কথার প্রতিবাদ করেন ও একটি ভগ্ন মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করেন এবং বাদানুবাদ চলিতে থাকে। "প্রবাসী"তেও কয়েকটি প্রবন্ধে দেখান হয় যে বঙ্গদেশে এরূপ মূর্ত্তি প্রচলিত ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশও নটরাজের দেশ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

৬

পুরাণে ও শিল্পশাস্ত্রে যেরূপভাবে নটরাজের মূর্ত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য একটি তালিকা দেওয়া, অর্থাৎ উহা শিবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আভরণ-পরিধান এবং অঙ্গভঙ্গির নামের সমষ্টি মাত্র। তাহাতে ভাব-যোজনার কোন অবসর নাই। এমন চমৎকার বিষয়বস্তু শ্রেষ্ঠ কবির কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার সদ্ব্যবহার খুব বেশী হয় নাই। দক্ষিণ-ভারতের শৈব-আগম-গ্রন্থগুলিতে নটরাজের যে ধ্যান ও বর্ণনা আছে তাহাতে কিছু কিছু সাহিত্যরস থাকিলেও দার্শনিকতার চেষ্টাই বেশী। এক দিকে শিল্পশাস্ত্র ও অন্যদিকে আগম এই দুইয়ের বহির্ভূত গ্রন্থেও কোথাও কোথাও আমরা নটরাজের আবাহন দেখিতে পাই, তাহা যেখানে সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে সেখানে উপভোগের বস্তু বলিয়া গণ্য করা যায়। বিশেষ করিয়া স্তোত্র-সাহিত্য নটরাজের বর্ণনায় এমন একটি সৌন্দর্য্যের দিক্‌ দেখাইয়াছে যাহা সাধারণত সাহিত্যে দেখা যায় না। স্তোত্রে গাম্ভীর্য্য ও শান্তভাবই আমরা আশা করি, কিন্তু নটরাজের স্তোত্রে আমরা ভাষা ও ভাবের এমন একটি গতিবেগ অনুভব করি যাহা আমাদের মনকে ও দেহকে নৃত্য-তালে জাগাইয়া ও মাতাইয়া তোলে। আগমের দার্শনিক তত্ত্বের কঠোরতার মধ্য দিয়া সময় সময় জগৎ-কাব্যের মূল-ছন্দের আভাস ফুটিয়া উঠে।

ভারতের প্রাচীন যুগে প্রচলিত গল্পগুলির এক সংগ্রহের নাম "কথা-সরিৎ-সাগর"। ইহার রচয়িতা কাশ্মীরের সোমদেব ভট্ট। তিনি তাঁহার গ্রন্থের কথা-পীঠের আরম্ভেই শিবের সন্ধ্যানৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রিয়ং দিশতু বঃ শম্ভোঃ শ্যামঃ কণ্ঠো মনোভুবা।
অঙ্কস্থপার্বতীদৃষ্টি-পাশৈরিব বিবেষ্টিতঃ॥
সন্ধ্যানৃত্যোৎসবে তারাঃ করেণোদ্ধূয় বিঘ্নজিৎ।
শীৎকারশীকরৈরন্যাঃ কল্পয়ন্নিব পাতু বঃ॥

—কথা-সরিৎ-সাগর—১ম লম্বক, ১ম তরঙ্গ, ১ম ও ২য় শ্লোক

একটি শিব-তাণ্ডব স্তোত্র প্রচলিত আছে যাহা রাবণের দ্বারা রচিত বলিয়া কথিত হয়। এই স্তোত্র কাশীতে বিশ্বনাথের সন্ধ্যাকালীন আরতির সময় গীত হয়। ইহার ছন্দ ও ভাষা নৃত্যের বর্ণনায় কিরূপ উপযোগী তাহা ইহা পড়িলেই বুঝা যায়।

জটাটবী-গলজ্জল-প্রবাহ-পাবিত-স্থলে
গলেঽবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গতুঙ্গমালিকাম্।



নটরাজ, মাদ্রাজ

চিত্র শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে



নটরাজ, বিক্রমপুর

ঢাকা মিউজিয়ম



নটরাজ
উড়িষ্যা
ব্রিটিশ মিউজিয়ম



নটরাজ, বিক্রমপুর

চিত্র শ্রীযোগেন্দ্র গুপ্তের সৌজন্যে



নটরাজ
গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম্
চিত্র শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে

ডমড্ডমড্ডমড্ডমন্নিনাদবড্ডমর্বয়ং
চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবং শিবঃ ॥
জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী
বিলোলবীচিবল্লরী বিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে
কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥

এই স্তোত্রের ভাব ও ভাষায় আমাদের প্রাচীন কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকরের একটি অতি চমৎকার কবিতা আছে।

বাংলার প্রাচীন রাজা বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্র-শাসনের গোড়াতেই অর্দ্ধনারীশ্বরের বন্দনায় সন্ধ্যাতাণ্ডবের যে-শ্লোক আছে তাহা সাহিত্যগুণসম্পন্ন—

সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সন্বিধানবিলসন্নান্দী-নিনাদোর্দ্মিভির্নির্মর্যাদ-
রসার্ণবো দিশতু বঃ শ্রেয়োর্দ্ধনারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈর্ণাট্যারম্ভরসৈ-
র্জয়ত্যভিনয়দ্বৈধানুরোধশ্রমঃ ॥

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আগমের বচনে বা ধ্যানে শিব যে বিরাট্ বিশ্ব-নাট্যের কেন্দ্রস্থল চিদম্বরমের নটন-সভায় জীবের মুক্তিরঙ্গ প্রদর্শন করেন তাহাই কীর্ত্তিত হয়। এইরূপ একটি ধ্যান ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রকাশ করেন—

লোকানাহূয় সর্ব্বান্ ডমরুকনিনাদৈর্ঘোরসংসারমগ্নান্।
দত্বাভীতিং দয়ালুপ্র্ণতভয়হরং কুঞ্চিতং পাদপদ্মম্।
উদ্ধৃত্যেদং বিমুক্তে রয়নমিতি করাদর্শয়ন্ প্রত্যয়ার্থম্।
বিভ্রদ্ বহ্নিং সভায়াং কলয়তি নটনং যঃ স পায়ান্নটেশঃ ॥

ডাঃ কুমারস্বামী কতকগুলি তামিল শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন, সেগুলির ভাব এইরূপ—

১। সব জায়গায় তাঁহার রূপ : শিব-শক্তি সর্ব্বব্যাপী ;
সব জায়গায়ই চিদম্বরম্, সব জায়গায় তাঁহার নৃত্য।
২। তিনি জলে, স্থলে, অগ্নিতে, বায়ুতে ও ব্যোমে
নৃত্য করেন,
এইরূপেই নটেশ চিরদিন তাঁর সভায় নৃত্য করেন।
৩। আকাশ তাঁর শরীর, আকাশের কৃষ্ণ মেঘকে তিনি
পায়ে দলন করেন,
আট দিক্ তাঁর আট হাত,
তিনটি আলো তাঁর ত্রিনয়ন,
এইরূপে তিনি আমাদের দেহ-সভায় নৃত্য করেন।
৪। যখন নটেশ তাঁহার ডমরু বাজান,
সবাই সে নাট দেখিতে আসে ;
যখন তিনি নাট সম্বরণ করেন
তখন তিনি শান্ত হন ও একাকী অবস্থান করেন।

আধুনিক সাহিত্যে নটরাজের নৃত্যের মত কাব্যের উপযোগী ভাব আমাদের কবিদের প্রেরণা জোগায় নাই। শুধু রবীন্দ্রনাথে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তিনি হিন্দুর পৌরাণিক রূপক ও কল্পনাগুলি অনেক স্থলে কাজে লাগাইয়াছেন, বিশেষ করিয়া নটরাজের ভাবে ভাবিত হইয়া কয়েকটি অনুপম কবিতা ও সঙ্গীত আমাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার বহুকাল আগে লেখা "হে রুদ্র বৈশাখ" ও পরে "আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে" ইত্যাদিতে প্রাচীন ঝড়ের দেবতার রূপ-বর্ণনা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তার পর "প্রলয় নাচন নাচলে যবে, নটরাজ, হে নটরাজ" গানটি তাঁহার একটি অপূর্ব্ব দান। সৃষ্টির বিচিত্র লীলা যে এক নটরাজের নৃত্যতালের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে তাহা তিনি তাঁহার "নটরাজ-ঋতু-রঙ্গশালা"র গানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

৭

এইবার আমরা শিল্পের দিক্ হইতে শিবের নৃত্যমূর্ত্তি-গুলির মোটামুটি আলোচনা করিব। অনেক দিন পর্য্যন্ত যে-সব মূর্ত্তি লইয়া আলোচনা চলিয়াছে সেগুলি সবই দক্ষিণ দেশের। ডাঃ কুমারস্বামী বা গোপীনাথ রাও শুধু ঐ অঞ্চলের মূর্ত্তির বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোপীনাথ রাও তাঁহার বিরাট্ গ্রন্থে বাংলার মূর্ত্তির কোন উল্লেখ করেন নাই বা চিত্র প্রকাশ করেন নাই। বাংলা দেশের মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে নানা সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। সুখের বিষয় কয়েক বৎসর হইল ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা চিত্রশালায় রক্ষিত মূর্ত্তিগুলির সম্বন্ধে যে-গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে বাংলার নটরাজ মূর্ত্তিগুলির আলোচনা করিয়াছেন ও চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখিত হওয়ায় বাংলার বাহিরে বাংলার নৃত্যমূর্ত্তিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

নৃত্যশিল্প যে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে আদৃত হইত তাহা আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী যুগে যখন এ বিষয়ে সূত্র ইত্যাদি রচিত হইয়াছিল



নৌকাবাহনে নৃত্যপর শিব, ভুবনেশ্বর
ফটোগ্রাফ শ্রীনির্ম্মলকুমার বসুর সৌজন্যে

তখন ইহা অত্যন্ত উন্নত ও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের নাম তাণ্ডব লক্ষণম্। উহাতে শিবের প্রেরণায় তণ্ডুমুনির দ্বারা ভরতকে উপদেশ দিবার কথা আছে। এই স্থানে একটি কথা বলা দরকার যে সাধারণতঃ আমরা "তাণ্ডব" কথাটি যে চণ্ড-নৃত্য বা প্রলয়-নৃত্য অর্থে ব্যবহার করি তাহা ঠিক নয়। "তাণ্ডব" অর্থ নৃত্যশাস্ত্রের আদি উপদেষ্টা তণ্ডুর বিধান অনুসারে যে নৃত্য হইত তাহা। তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে করণ ও অঙ্গহারগুলির ব্যাখ্যায় বুঝাইয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় ১০৮ প্রকার করণ ও ৩২ প্রকার অঙ্গহার নৃত্য ব্যাপারে ব্যবহৃত হইত। হস্ত পদ ইত্যাদি দ্বারা যে ভঙ্গি ফুটান হয় তাহার মূল মাত্রা ও সেগুলির নানা সমবায়ের নাম করণ ও অঙ্গহার। তাণ্ডব-নৃত্যের এই করণ ও অঙ্গহার প্রাচীনকালে নাট্যের পূর্ব্বরঙ্গ হিসাবে দেখান হইত। এইগুলি যে শুধু পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত তাহা নহে, কেননা চিদম্বরমে পরবর্ত্তী যুগের গোপুরমে যে ১০৮টি করণ ভাস্কর্য্যে দেখান হইয়াছে তাহা স্ত্রীলোকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত। পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থে যে লেখা আছে তাণ্ডব পুরুষের নৃত্য, লাস্য স্ত্রীলোকের নৃত্য তাহা স্বীকার করা যায় না, কেন না চিদম্বরমে স্ত্রীলোকের দ্বারাই তাণ্ডব নৃত্য দেখা যাইতেছে। এই নৃত্যগুলি সকলের জন্য। অবশ্য শিব যে এই নৃত্যের অভিনয় করিতেন তাহা আমরা শৈবাগমগুলি হইতে বিশেষ করিয়া জানিতে পারি। তিনি নৃত্যের দেবতা, কাজেই এই সব নৃত্য তাঁহার পক্ষে প্রযোজ্য। নাট্যশাস্ত্রে কতকগুলি করণ ও অঙ্গহার শিবের বিশেষ প্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

একটি নৃত্য আছে যাহা শিবের দ্বারা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত। তাহা রুদ্র নৃত্য। ইহার একটি বিশেষ নাম আছে—নাদান্ত। এই নাদান্ত নৃত্যেই রুদ্রের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়। এই নৃত্যে যে 'করণ' অনুষ্ঠিত হয় তাহা ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুসারে "ভুজঙ্গত্রাসিতম্"। এই ভঙ্গিটি নটরাজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া একটি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। নটরাজের নৃত্যকে শুধু তাণ্ডব-নৃত্য না বলিয়া শিব-তাণ্ডব বলিলেই ঠিক নাম দেওয়া হয়। মাদ্রাজের যে নটরাজ মূর্ত্তি সমস্ত পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা এই ধরণের মূর্ত্তি।

শিবের আর একটি নৃত্যের নাম "সন্ধ্যা-তাণ্ডব"। পূর্ব্বে প্রাচীন সাহিত্য হইতে যে-সব শ্লোক উদ্ধার করা গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় ইহা রুদ্রের নৃত্য নয়। ইহা নাকি হিমালয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই নৃত্যে বোধ হয় পার্ব্বতীও যোগ দিয়াছিলেন। বল্লাল সেনের তাম্রশাসনে ও অর্দ্ধনারীশ্বরের সন্ধ্যা-তাণ্ডবের কথা আছে। সোমদেব ভট্টের কথা-সরিৎ-সাগরেও যে সন্ধ্যা-নৃত্যোৎসবের উল্লেখ আছে তাহাও বিনাশের নৃত্য নয়,

আবেশের নৃত্য বলিয়াই মনে হয়। এই ভাব সাহিত্যে যেরূপ দেখা যায় শিল্পে সেরূপ দেখা যায় না। এ পর্য্যন্ত বোধ হয় একখানি সন্ধ্যা-তাণ্ডব মূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হয় নাই। 'সন্ধ্যা-তাণ্ডব' শব্দের অর্থ সন্ধ্যাকালীন নৃত্য এইরূপ মনে করা হয়।



নটরাজ, মাদ্রাজ
মাদ্রাজ মিউজিয়ম

নৃত্যমূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান মৎস্যপুরাণ, শিল্প-রত্ন, অংশুমদ্ভেদাগম, পূর্ব্বকারণাগম, উত্তরকামিকাগম, প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই বিধানগুলি যে কাজের বেলায় সকল মূর্ত্তির সঙ্গে মিলে তাহা বলা যায় না। হাতের সংখ্যা এবং আভরণ-প্রহরণাদি ঠিক শাস্ত্রীয় বচনের অনুসারে মূর্ত্তিগুলিতে পাওয়া যায় না। মৎস্যপুরাণ অনুসারে শিব বৈশাখরেচিত ধরণে নৃত্য করেন, কিন্তু আগম অনুসারে শুধু ভুজঙ্গত্রাসিত ভঙ্গি দেখা যায়। নৃত্যরত শিবের হাত চার, ছয়, আট, দশ বা বার দেখা যায়। ডাঃ কুমারস্বামী দুই হাতযুক্ত মূর্ত্তির কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই। কোন কোন মূর্ত্তিতে সুধু দুইটি চোখ আছে। শিবের পায়ের নীচে দলিত অপস্মার-পুরুষ দক্ষিণ-ভারতের অনেক মূর্ত্তিতে দেখা গেলেও সব জায়গায় দেখা যায় না। শিবের বহু হাত থাকিলেও নৃত্যে তিনি পঞ্চানন নহেন, একটি মাত্র মুখ মূর্ত্তিতে পাওয়া যায়।

শিবের হাতে নানা মূর্ত্তিতে ডমরু, খেটক, খড়্গ, ত্রিশূল, অগ্নি, ধ্বজ, কপাল, শক্তি, দণ্ড ইত্যাদি দেখা যায়। প্রধান দুইটি হাত গজহস্ত, বা কটক হস্ত ভঙ্গিতে থাকে। অন্যান্য হাতের কোন কোনটি বিস্ময়, অর্দ্ধচন্দ্র, প্রবর্ত্তিত, সূচি ইত্যাদি মুদ্রা প্রকাশ করে। শিবের মাথায় জটা-মুকুট, হাতে সর্পবলয়, ডান কাণে নক্রকুণ্ডল, বাম কাণে পত্রকুণ্ডল উরসসূত্র, কটিসূত্র, ইত্যাদি থাকে। কোন কোন মূর্ত্তিতে শিবের সঙ্গে কালীও নৃত্য করেন। দুর্গা ও গঙ্গাও থাকেন এমন কি গণেশকে দেখা যায়। দেব-নৃত্যে সঙ্গী-সাথীরা নৃত্য ও বাদ্য করে। কখনও কখনও বটগাছও থাকে।

দাক্ষিণাত্যে নাদান্ত মূর্ত্তি খুব বেশী প্রচলিত ছিল



নটরাজ, ইলোরা

ঐ দেশের আগমগুলিতে নয় রকমের নৃত্যের কথা পাওয়া যায়। এই নয়টির মধ্যে কোন কোনটি প্রায় অন্যটির মত, একটু রকমফের মাত্র। শৈবাগমে উল্লিখিত হয় নাই এমন নৃত্যও মূর্তিগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান হইতে গোপীনাথ রাও এই রকমের কতকগুলি মূর্তির চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় নৃত্যমূর্তিতে ভুজঙ্গত্রাসিত (নাদান্ত নৃত্যে), স্বস্তিকাপসৃত, কটিসম, ললিত, ললাট-তিলক, চতুর, তলসংস্ফোটিত প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রোক্ত 'করণ'গুলি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বাংলা দেশের নৃত্যমূর্তিগুলির কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। এখানকার কোন মূর্তিতে প্রভামণ্ডল নাই। এখানকার সব মূর্তিই বৃষের উপর দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে। এমন কি নাদান্ত-নৃত্যের বেলায়ও শিব বৃষের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। দাক্ষিণাত্যের মত কোন মূর্তিতেই পায়ের তলে অপস্মার-পুরুষ নাই। আর একটি বিষয়ে বাংলা মূর্তিগুলির বিশেষত্ব হইতেছে যে ইহার সবগুলিই ঊর্দ্ধলিঙ্গ। শুধু নটরাজ মূর্তি নয়, অর্দ্ধনারীশ্বর ও অন্যান্য মূর্তিও এইরূপ।

বাংলা দেশে আরেক প্রকারের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যাহাতে দুইটি প্রধান হাতে বীণা দেখা যায়। ইহাকে ডাঃ ভট্টশালী দ্বিতীয় প্রকারের নটরাজ বলিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে তিনি বীণাধারী কোন নৃত্যমূর্তির উল্লেখ কোন গ্রন্থে পান নাই। দাক্ষিণাত্যে শিবের এক প্রকার মূর্তি আছে যাহার নাম "বীণাধর দক্ষিণামূর্তি", তাহাতে চারিটি হাত থাকে এবং তাহা নৃত্যমূর্তিই নয়। বাংলা দেশে প্রাপ্ত বৃষারূঢ় বীণাহস্ত মূর্তির পরিচয় সূত্রধার মণ্ডনের গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে—

বীরেশ্বরশ্চ ভগবান্ বৃষারূঢ়ো ধনুর্ধরঃ।
বীণাং হস্তে ত্রিশূলঞ্চ বাণং চৈব প্রকারয়েৎ।
বীরেশ্বরস্ত রূপং তু মাতৃণামগ্রতো ভবেৎ।
—দেবতামূর্তিপ্রকরণ, ৮।৭৭-৭৮

বীরেশ্বরস্ত ভগবান্ বৃষারূঢ়ো ধনুর্ধরঃ।
বীণাহস্তং ত্রিশূলঞ্চ মাতৃণামগ্রতো ভবেৎ।
—রূপমণ্ডন, ৫।৭৩

সুতরাং মনে হয় বাংলা দেশের এই ধরণের মূর্তিগুলি বীরেশ্বরের। ইহা যে নৃত্যমান তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে।

উড়িষ্যার মূর্তিতেও বিশেষত্ব আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে যে মূর্তিটি আছে তাহা অতি সুন্দর। ইহাতে দক্ষিণের মত অপস্মার-পুরুষ নাই, আবার বাংলার মত বৃষের উপর দাঁড়ান নহে। ভুবনেশ্বরের একটি মূর্তিতে ভৈরবকে নৌকার উপর নৃত্যের ভঙ্গিতে দেখান হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের নাদান্ত মূর্তিতে একটা গতির ভাব ফুটান হইয়াছে, তাহাতে শিবের জটা ও উরস্‌সূত্র ঘূর্ণি-নৃত্যের বেগে উড়িতেছে। উত্তর-ভারতের মূর্তিতে এই ভাব নাই। দাক্ষিণাত্যের ঐরূপ মূর্তি ঘিরিয়া একটি প্রভামণ্ডল দেওয়া হয়, তাঁহা হইতে বহু অগ্নিশিখা জ্বলিতে থাকে। এই দুই অঞ্চলের অন্যান্য ধরণের মূর্তি (যেমন ললিত ও চতুর নৃত্যের) তুলনা করিলে উত্তর-ভারতের শিল্পের উৎকর্ষ বুঝিতে পারা যায়। উড়িষ্যায় ও বাংলায় শিল্পীরা এই শেষোক্তগুলিতে একটা অপূর্ব্ব ভাব যোজনা করিয়াছেন যাহা দক্ষিণ-ভারতে সব সময় দেখা যায় না।

৮

নটরাজের যত মন্দির ছিল বা এখনও আছে তাহাদের সকলের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের চিদম্বরমের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা

প্রসিদ্ধ। এই মন্দির অতি প্রাচীন এবং ইহার চারি দিকে বহু কাল ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজগণ নানা মন্দির সভা ও গোপুরম্ তুলিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন মূল-মন্দিরটি কাঠের, সুতরাং ইহা যে অত্যন্ত প্রাচীন তাহা সহজেই বুঝা যায়। এখানকার গর্ভগৃহকে 'রহস্য' বলা হয়। ইহাই মূলস্থান। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই মূল-মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। শিবের 'আকাশ' রূপ বুঝাইবার জন্য, 'রহস্য' স্থানটি একেবারে উন্মুক্ত, ইহার উপর ছাদ নাই। এখানে শুধু বেলপাতা রাখা হয়। এইরূপে আকাশ-রূপীকে শূন্যতা দ্বারা বুঝাইবার প্রয়াসে বৈশিষ্ট্য আছে এবং ভারতবর্ষে আর কোথাও এরূপ ব্যবস্থা আছে কি না জানা নাই। প্রাচীন কালে এই স্থানের নাম ছিল তিল্লৈ এবং ইহা বনভূমি ছিল, ব্যাঘ্রপুরও ইহার একটি নাম। পরে ক্রমে মন্দির নির্ম্মিত হওয়ার পর নাম হয় চিদম্বরম্। প্রাচীন লিপিতে ছিড়্‌ডম্বলম্, সংস্কৃতে চিদম্বরম্।



নটরাজ, মাইসন, ইন্দো-চীন

এখানকার মন্দিরসমূহ দাক্ষিণাত্যের প্রতাপশালী পল্লব, পাণ্ড্য, চোল এবং বিজয়নগরের হিন্দুরাজাদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালের অর্থাৎ পল্লবদের সমসাময়িক লেখ পাওয়া যায় নাই, তবে প্রাচীন সাহিত্যে মন্দিরের সঙ্গে তাঁহাদের সংস্পর্শের কথা আছে। চোলদের সময় হইতেই মন্দিরগাত্রে লেখমালা দেখা যায়। মানুষের নৃত্যে যেমন সভা বা আসর লাগে, সেইরূপ নটরাজের নৃত্যের জন্যও কয়েকটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল, সেগুলির নাম—চিৎসভা, কনক-সভা, নৃত্যসভা, দেবসভা এবং রাজসভা। এখানে বহু স্তম্ভযুক্ত কয়েকটি মণ্ডপ আছে, একটি মণ্ডপে এক হাজার থাম আছে। কোন কোন রাজা মন্দিরের গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে তাঁহারা মন্দির সোনায় মুড়িয়া দিয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পরবর্ত্তী-পল্লবদের এক জন রাজা নাট্যশাস্ত্রের ১০৮টি করণ কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য চিদম্বরমের পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোপুরমের গায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিগুলির নীচে নাট্যশাস্ত্রের বচনও উৎকীর্ণ ছিল। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ৯৩টি উদ্ধার করা গিয়াছে। ভরতের গ্রন্থে করণগুলি যে ভাবে সাজান হইয়াছে এখানে ৬০টি ঠিক সেই ভাবেই সাজান, বাকীগুলি উল্টাপাল্টা হইয়া গিয়াছে। তাণ্ডবের এই করণগুলি এখানে স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, পুরুষ দ্বারা নয়।

৭

ভারতবর্ষ জীবনের সকল দিকই স্বীকার করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে রূপকের দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহা হইতে আধ্যাত্মিক রস ও প্রেরণা লাভের চেষ্টা করিয়াছে। নৃত্যের মধ্য দিয়াও আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত করিবার সুযোগ খুঁজিয়াছে। লৌকিক নৃত্যের ভঙ্গিগুলি যখন শিবের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তখন সেগুলিতে বিশ্বনাট্যের লীলাই প্রকাশিত হয়। শিবের সংস্পর্শে বস্তুগুলি

বাস্তবতা ও তুচ্ছতার সীমা ছাড়াইয়া উঠে—সেগুলি রূপক হইয়া যায়। জটা, চোখ, সাপ, হাড়ের মালা, ডমরু, অগ্নি, পাশ প্রভৃতি সব কিছু শুধু ভাব ফুটাইবার উপকরণ। তাঁহার পায়ের নীচে দলিত দেহ, তাঁহার বাহন, মূর্ত্তি ঘিরিয়া যে প্রভামণ্ডল, সব কিছুই ভাবপূর্ণ। শিবের রুদ্র-মূর্ত্তির সংহার-কার্য্যের স্থানে দার্শনিকেরা পঞ্চকৃত্য অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহের সমাবেশ করিয়াছেন। মানুষের চিত্তরূপ আকাশে তিনি এই সব লীলা করেন।

ভারত-চিত্তের এমন একটি শক্তি আছে যাহাতে উহা দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। তাই আমরা দেখিতে পাই নটরাজে যোগ ও নৃত্যের সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। এই দুই ভাবের দ্বন্দ্ব তাহাকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। অনেক জাতি সৃষ্টির মূলে দ্বন্দ্ব দেখিয়াছে, যেমন ইরাণে ও প্যালেস্টাইনে, কিন্তু ভারতের কাছে এই দ্বন্দ্বই ছন্দ হইয়া উঠিয়াছে—নটরাজের নৃত্যলীলা তাহার প্রকাশ। ভারতের শিল্পীই দর্শনকে রূপে ফুটাইতে পারিয়াছে।

ঠিকুজি

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমের সমাধিমন্দিরে খঞ্জ পঙ্গু কতদিন
বিস্মৃতির রচেছে পাহাড়,
সোনার সূর্য্যেরা আর রূপার চাঁদেরা গেল
অতীতের খোলে নি তো দ্বার।
সন্ধ্যার গভীর গুহা সর্ব্বভুক রাক্ষসের অনন্ত ক্ষুধাতে
বিভীষিকাময়,
যে-জীবনে উল্লাসের অনন্ত আহ্বান ছিল
পেয়েছে তা স্তব্ধতার ভয়।

তোমার এ দেহখানি সমাধিমন্দির
কত মৃত দিন-রাত-প্রহরের ভস্মস্তূপে ভরা,
মুহূর্ত্তের মৃত্যু দিয়ে যে-জীবন করেছি সুন্দর
এক দিন গ্রাসিবে তা জরা।
অরণ্যের দীর্ঘশ্বাসে উর্ব্বরা পৃথিবীময়
যৌবনের স্রোত
উত্তেজিত হৃদয়-স্পন্দন,
সায়াহ্নের শালবনে সুমধুর ক্লান্তির মৌনতা
জ্যোৎস্নায় কুমারী বন্ধন।

নবীন দক্ষিণ-ঝড়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের
সীমার স্তব্ধতা
ভাসাবার মন্ত্র কে শিখাবে?
চেতনার রুদ্ধদ্বারে অতিথি মৃত্যুর ডাকে
বাজিছে শিকল;
ছায়াঢাকা পথ খুঁজে পাবে?
সভ্যতার ওঠাপড়া, সমুদ্রের ওঠাপড়া, শালবনে
মধুর ইসারা

সোনার মুকুটে যারা গেঁথেছিল পাখীর পালক
চলে গেল কোন্ পথে তারা?

শেষ ক'রে দাও তবে গান, শেষ ক'রে দাও।
অনন্ত যৌবন যদি দিগন্তের অনন্ত শিখায়
পায় তার চরম স্বাক্ষর:
তবে শেষ ক'রে দাও।
মহাকাল জটিল জটায় যে ঠিকুজি করেছে রচনা
সহজ ভীষণ,
বেদুইন দিনশেষে উড়ে-আসা পাখীর পালকে
নাই প্রয়োজন।

আমাদের নীল শিরা, স্নায়ু-ঘেরা এ জীবন
জটার জটিলে
হারাবে তো পথ;
আকাশের গঙ্গা নিয়ে পৃথিবীতে
কোনো দিন আসিবে না
সেই ভগীরথ।
মরণ-সমুদ্রকূলে জীবনের অস্তরবি কম্পমান
সোনালি সন্ধ্যায়,
হে সূর্য্য, সোনার সূর্য্য, হীরার আকাশ
আর রূপার চাঁদেরা
বিদায় বিদায়।

সহজ ভীষণ এই রুক্ষ আকাশে দেখি
আমাদের ঠিকুজি রচনা।
আজিকার গানগুলি বৈশাখের রুক্ষ ঝড়ে
কোনোদিন যাবে না তো চেনা!

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড় জ্যাঠামশায়

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখনকার দিনে গুরুজনদের ছিলেন তিনি বড়দাদা, পাড়াপড়শী সকলের বড়বাবু এবং আমাদের জোড়াসাঁকোর ছেলেমেয়েদের তিনি বড় জ্যাঠামশায়। তখন নাম ধ'রে এ-বাবু সে-বাবু ডাকার রীতি ছিল না।



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (মধ্যে উপবিষ্ট); মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ (মহর্ষির বামে দণ্ডায়মান); দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ (মহর্ষির দক্ষিণে); দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র দিনেন্দ্রনাথ (মহর্ষির বামে উপবিষ্ট)। ফটোগ্রাফ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

সেই আমাদের ছেলেখেলার বয়স। সেকালের তাঁর চেহারা কালো চুল, কালো গোঁফ, ফিট গৌরবর্ণ, দাড়ি নেই, শালের জোব্বা গায়ে—এই মনে আছে।

মাঝে মাঝে বালকদল ও-বাড়ীর তেতলায় তাঁর ঘরটায় উঁকি দিতেম—মস্ত একটা অর্গান, একটা ফ্লোট বাঁশী, লেখার টেবিল, খাতাপত্র। ঘরের একধারে মস্ত একখানা খাট, তার চার খাম্বায় চারটে পরী, ছত্রির উপরে একটা পাখী দুই ডানা মেলিয়ে যেন উড়ি উড়ি করছে। খাটখানা রাজকিষ্ট মিস্ত্রি গড়েছিল কর্ত্তা-দিদিমার ফরমাস মাফিক। যখন গড়া শেষ হয়েছে তখন কে বললে, "কর্ত্তামা চালের উপরে চিল বসিয়েছ যে?" "চিল কেন শুকপাখী!" সেই খাট বিয়ের দিনে উপহার বড় জ্যাঠামশায় পেয়েছিলেন জানি। অনেক দিন পর্য্যন্ত খাটখানা ও-বাড়ীতেই ছিল—এখন আর দেখতে পাই নে।

বড়বাবুর হাসি পাড়া-মাতানো! যারা শুনেছে, তারা শুনেছে—হাসি-সমুদ্র যেন তোলপাড় করছে, থামতেই চায় না।

এই সময় 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লেখা ও শোনানো চলেছে—

করিয়া জয় মহাপ্রলয়, বাজিয়া উঠিল বাজনা নানা ;
তালবেতাল দিতেছে তাল ধেই ধেই নাচে পিশাচ দানা।

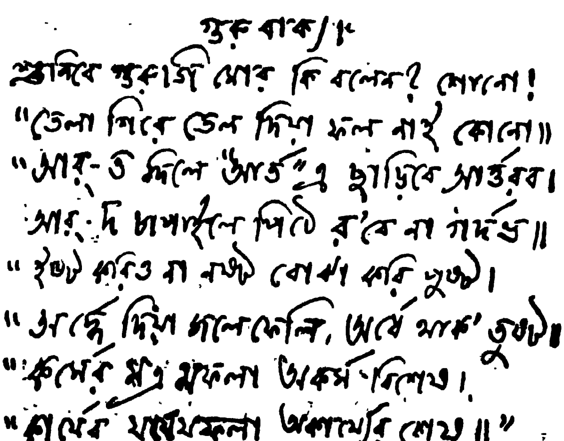
আবার—

গাধায় চড়ি, লাগায় ছড়ি
অদ্ভুত রস কিম্পুরুষ।
দুটি অধরে হাসি না ধরে
লম্বা উদর বেঁটে মানুষ।

এগুলো ছড়ার মত মুখে মুখে আউড়ে চলেছি। বাংলা ভাষায় এমন স্বচ্ছন্দতা আর কোন কবিতায় পাই নে।

বড় হয়ে জ্যাঠামশায়ের বক্তৃতা সে আর এক ব্যাপার। "আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা"র জলদগম্ভীর ধ্বনি ও ভাষার মাধুর্য্য লোকের মনকে একেবারে দু-তিন ঘণ্টার মত মুগ্ধ করে রাখত। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত এবং বালকসুলভ সরলতা ও মন-ভোলা অবস্থা বন্ধুজনের কাছে তাঁকে প্রিয়তর করেছিল। তখনকার রীতি বড়দের কাছে ছেলেদের ঘেঁষা অপরাধ—সুতরাং আমরা নিজেদের বাঁচিয়ে চলতেম।

ছবি আঁকার দিকে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। কুমার-সম্ভবের ছবি, শকুন্তলার ছবি সব আর্টিস্টদের দ্বারা আঁকিয়ে আমার পিসিমাদের উপহার দিয়েছিলেন। সেইগুলো


গুরুবাক্য।
শুনিবে গুরুজি মোর কি বলেন? শোনো!
"তেলা শিরে তেল দিলে ফল নাই কোনো॥
"আর্-ও দিলে 'আর্ত'-এ ছাড়িবে আর্তরব।
আর্-ও দি চাপাইলে পিঠে র'বে না গর্দভ॥
"ইচ্ছা করিও না নষ্ট বোঝা করি তুচ্ছ।
"অর্দ্ধ দিয়া ফেলাফেলি, অর্দ্ধ রাখ তুচ্ছ॥
"কর্ম্মের মর্ম্ম সুফলা অকর্ম্ম বিশেষ।
"কার্য্যের মর্ম্মফলা অকার্য্যের শেষ॥"

দ্বিজেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর-নিদর্শন। রেখাক্ষর বর্ণমালা হইতে।



দ্বিজেন্দ্রনাথ
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গঠিত ব্রোঞ্জ প্রতিকৃতির ছাপ হইতে

তখনকার আর্ট স্টুডিওর নমুনা। বঙ্কিমবাবু সূর্য্যমুখীর ঘরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে অনেকগুলো সেই ছবির কথা আছে।

কথায় কথায় এক দিন বড় জ্যাঠামশায় বললেন, "দেখ, আমি আর্টিস্টদের ছবি ফরমাস দিলেম কুমারসম্ভব থেকে বেছে বেছে, তারা যখন এঁকে আনলে, দেখি 'ইয়ে' করতে 'ইয়ে' ক'রে এনেছে।" বলেই অট্টহাস্য। খানিক চুপ ক'রে থেকে বললেন, "তুমি মেঘদূতের যে ছবি এঁকেছ তা দেখেছি, ইউরোপীয়ান আর্টিস্টদের মত গোটা-কতক মাস্টারপিস্ আঁকতে পারো তো বুঝি!"

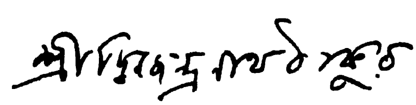
'প্রবাসী'তে 'চিত্রবড়জ' লিখছি, জ্যাঠামশায়ের কেমন লাগে জানবার ইচ্ছে হ'ল। খাতা উল্টে-পাল্টে দেখে বললেন, "সাধারণ লোক ভালোই বলবে, কিন্তু পণ্ডিতের হাতে পড়লেই গেছ!" বলেই অট্টহাস্য।

বয়সের পারে প্রায় এখন পৌঁছেছি। অনেক সেকালের কথা মনে আসে, মুখে মুখে অনেক কথা শোনাতে পারি—লিখতে গেলে সব কথা কলমে সরতে চায় না।

শ্বশুরমহাশয়

শ্রীহেমলতা দেবী





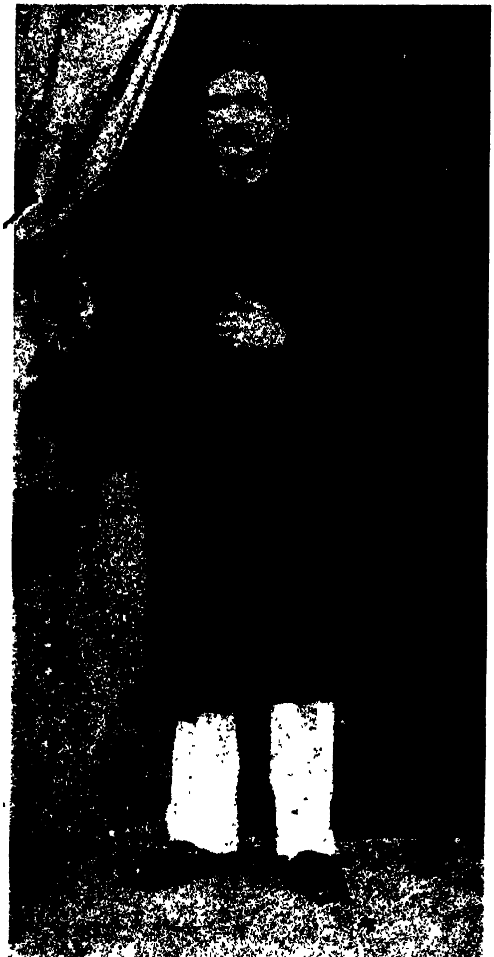
পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয় কি ধাতের মানুষ ছিলেন এক কথায় তাঁর সম্যক চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পারা সহজসাধ্য নয়। তাঁর অসাধারণত্ব, গুণ ও শক্তির খণ্ড পরিচয় চারি দিকে ছড়িয়ে আছে এত বেশী যে সেগুলিকে একত্র শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত করে তোলা এক জনের পক্ষে অসাধ্য কাজ। যিনি যে ভাবে যখন তাঁকে দেখেছেন নিজের নিজের মনের দৃষ্টিতে তাঁর যে রূপ যখন তাঁদের কাছে যেমনটি প্রতিফলিত হয়েছে সেইটুকু যদি তাঁরা নিজের ভাবে ফুটিয়ে লেখেন তবে সেই খণ্ড পরিচয়গুলি একত্র হয়ে একটি সমগ্রতার রূপ নিতে পারে।

শ্বশুরমহাশয় যে ধাতের মানুষই হোন না কেন তিনি যে সকল দিকে ষোলো আনা খাঁটি মানুষ ছিলেন এতে কোনো ভুল নাই। তাঁর ঈশ্বরভক্তি ছিল খাঁটি, পিতৃভক্তি ছিল খাঁটি, ভাইদের ও সন্তানদের প্রতি স্নেহ ছিল খাঁটি। স্বদেশপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি ও জীবপ্রীতি ছিল তাঁর খাঁটি। দার্শনিক তত্ত্বের বিচার ও বিশ্লেষণে অনুরাগ ছিল খাঁটি। কাব্যে প্রীতি ও বাংলা ভাষার প্রতি দরদ ছিল খাঁটি। ভাষার এলোমেলো আলগা ব্যবহার সইতে পারতেন না একটুও।

তিনি সেজেগুজে বসে বাইরের ঠাট বজায় রাখতে জানতেন না আদৌ। সাজিয়ে কথা বলতে পারতেন না একটিও, তাই ঠকত না কেউ তাঁর কথায় ও কাজে কখনো।

তাঁর প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ধ্যানপরায়ণতা। যেন সহজাত সংস্কারের মতো ধ্যানের অভ্যাসটি ছিল তাঁর আয়ত্তীভূত—এটি অনন্যসাধারণ। অতি সহজে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। অন্তরে তিনি ধ্যানী মানুষ কিন্তু বাহিরের কথা কাজ ও ভাব ছিল ছেলেমানুষের বাড়া। আবদারে ছেলেমানুষের প্রতিমূর্ত্তি, অসহিষ্ণুতার অবতার বললে তাঁকে অত্যুক্তি হয় না। যখন যে জিনিস চাই সেই মুহূর্ত্তে সেটি না পেলে বাড়ীর কারো রক্ষা ছিল না, হুলুস্থূল বাধিয়ে তুলতেন তদ্দণ্ডে। শিশুপ্রকৃতি শ্বশুরমহাশয়ের শখ ছিল সামান্য, তাই চাওয়াও ছিল তাঁর যৎসামান্য। খাতা-কাগজ, কলম-পেন্সিল, খানকতক তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থ, কাগজের বাক্স তৈরীর জন্য রাশখানেক ব্রাউন পেপার। এই ছিল তাঁর চাওয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তাঁর দিনযাত্রার এরাই ছিল সঙ্গী।

জ্যামিতির অনুশীলন ছিল তাঁর মস্তিষ্ক খাটানোর একটি দৈনন্দিন কাজ। জ্যামিতির মাপ ও হিসাব অনুসারেই তিনি বাক্স তৈরীর কাগজগুলি ভাঁজ করতেন। সুতরাং বাক্স তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্যামিতির অনুশীলন করাও হ'ত। জ্যামিতির হিসাব জড়িত থাকত ব'লেই সহজে কেউ বাক্স তৈরী শিখে উঠতে পারত না। জিওমেট্রির নামানুসারে তিনি বাক্স তৈরী কাজের নাম রেখেছিলেন "বক্সোমেট্রি" এই ছিল তাঁর শখের একটা ব্যাপার। আর একটি শখ ছিল বাংলায় সাঙ্কেতিক অক্ষর (শর্টহ্যাণ্ড) সৃষ্টি করা। এই কাজের সূত্রে তিনি



যৌবনে দ্বিজেন্দ্রনাথ

ছড়ার মতো যে-সব কবিতা লিখে গেছেন সেগুলি বাংলা ভাষায় একটি অপূর্ব্ব জিনিষ। নমুনাস্বরূপ ল বর্ণের দুই ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল—

শিল্লীবধূ ফুলঝুমারী
আলতা পরি পায়
ফকা পেড়ে হলদে সাড়ী
বাগিয়ে পরে গায়
যেই শুনিল পাকী এল
অমনি তাড়াতাড়ি
ভেঙিবাজী দেখতে গেল
বেলফুলের বাড়ী।

ছড়ার আকারের সেই কবিতাগুলি তিনি যে কত বার কত রকমে পরিবর্ত্তন করেছেন বলে শেষ করা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর এই শখ মেটে নি। তিনি রেখাক্ষর সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। ভবিষ্যতে হয়ত সেগুলি কাজে লাগতেও পারে যদি কেউ বাংলায় সাংকেতিক অক্ষরের প্রচলন ও উন্নতি করতে চান।

শ্বশুরমহাশয়ের বালকোচিত স্বভাবের বহুল দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এখানে দু-একটির উল্লেখ করি। হঠাৎ হুলুস্থুল হাঙ্গামা, চেঁচামেচি, গোলমালের শব্দ শোনা গেল। চাকররা ছুটোছুটি করছে, শ্বশুরমহাশয়ের চশমা পাওয়া যাচ্ছে না। তলব এল আমার কাছে, বাবামশায় ডাকছেন শীঘ্র আসুন, তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালুম সামনে। দেখেই বললেন, চাকরদের কাণ্ড দেখ বৌমা, আমার জিনিসপত্তর কিছুই গুছিয়ে রাখবে না, সামলাবে না কোনো কিছু, কেবল উপরের দিকে চোখ তুলে শিবনেত্র হয়ে ঘুম লাগাবে। টেবিলে হাত ঠুকছেন আর বলছেন আমার চশমাটা কোথায় গেল হাতড়ে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, বল তো এখন আমি কি করি, কি ক'রে লিখি, কি ক'রে পড়ি, চশমা নইলে আমার এক দণ্ড চলবে না। চাকরদের কাণ্ড—দামী চশমাটা আমার হারিয়ে ফেলল, খোঁজ তো তুমি এক বার যদি পাও। কাগজপত্তর খাতা ইত্যাদি উল্টে পাল্টে অনেক খোঁজা গেল, কোথাও চশমা নেই। শেষে বাবামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, চশমা তাঁর চোখেই লাগানো রয়েছে। সেদিকে কারো নজর পড়েনি এতক্ষণ, তাঁরও সেটা খেয়াল ছিল না। মাথা হেঁট করে বললুম, বাবামশায় চশমা আপনি চোখেই পরে আছেন। তাই নাকি—ব'লে হাত দিয়ে চশমাটা ঠিক জায়গায় রয়েছে দেখে উচ্চৈঃস্বরে হাসি আরম্ভ করলেন। হাসির চোটে ঘণ্টাব্যাপী চেঁচামেচির ঝাঁজ মুহূর্ত্তে কর্পূরের মতো গেল উবে। খুশির হাল্কা হাওয়ায় ঘর উঠল ভরে। বললেন, আচ্ছা যা হোক! তোমাকে ব্যস্ত করে তুললুম, যাও সংসারের কাজকর্ম্ম দেখ গে। যাই হোক তুমিই তো শেষ পর্য্যন্ত চশমাটা খুঁজে বার করলে—ব'লেই আবার হাসি।

ভোরে স্নান করা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস।

জ্বর হয়েছে আগের দিন তাপযন্ত্রে উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রী উঠেছে। সকলেই ব্যস্ত, বাবামশায় নিশ্চিন্ত, কবিতা আওড়াচ্ছেন, আমাকে ধরে বসিয়ে কবিতা লেখাচ্ছেন বেপরোয়া ভাবে। ভোরের সময় স্নানটা সামলাতে হবে সকলের সেই দিকে চিন্তা, নিষেধ করা চলবে না, তাহ'লে জিদ বাড়বে। রাতে চাকরকে বলে রাখা হ'ল, দেখিস যদি ভোরে স্নানের জন্য উদ্যোগী হন তাড়াতাড়ি খবর দিস, এসে পড়ে যদি থামান যায় চেষ্টা করা যাবে। যথাসময়ে স্নানে উঠছেন, গতিক বুঝে তাড়াতাড়ি চাকর এল লুকিয়ে খবর দিতে। মানুষের সাড়া পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে জলভরা প্রকাণ্ড বড় একটি টবের মধ্যে ঝুপ করে গিয়ে ব'সে পড়লেন বাবামশায়, পাছে লোক এসে স্নানের বিঘ্ন ঘটায় ভেবে। স্নানশেষে কম্বল মুড়ি দিয়ে অভ্যস্ত নিয়মে খোলা বারান্দায় গিয়ে বসলেন যেন অসুখের চিহ্নমাত্র নেই শরীরে এমনিতর ভাবখানা। আমাদের মুখের ভীত ও চিন্তিত ভাব দেখে বললেন রোগের জন্যে ভাবো কেন, আমি নিজের চিকিৎসা নিজে খুব ভাল জানি। বদ্যি ডেকে নাড়ী টেপাবার কোন দরকার নেই। ঔষধপথ্য সব আমার নিজের মতে চলবে। যাও খিচুড়ি তৈরি কর গিয়ে। চায়ের পেয়ালা বসাবার এক নূতনতর কায়দা ছিল বাবামশায়ের—এক খণ্ড কাঠের মাঝখানটা গর্ত্ত করে তাতেই পেয়ালা বসানো থাকত। পিরীচের উপর পেয়ালা রেখে চা খেতেন না কোনো দিন। ভালো-লাগার এই সব নূতনত্ব ছিল তাঁর সকল ব্যাপারে। ভোরের বেলা বেড়াবার সময় পা ফেলতেন সংখ্যা গুণে। সেই সময় সামনে গিয়ে কেউ কোনো কথা ব'লে সংখ্যা গণনায় বাধা ঘটালে চটেমটে ব'লে উঠতেন, জ্বালালে দেখছি, আবার গোড়া থেকে গুণতে হবে। কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের, এ সময় আসিস্ কেন?

দু-বেলা খাবার সময় একটা না একটা গোলযোগ লেগেই থাকত। কখন কি খুঁৎ বেরোয় ভয়ে সকলকে তটস্থ থাকতে হ'ত। মোচার ঘণ্ট মুখে দিয়ে গরম-মশলার গন্ধ পেলেই হুলুস্থুল—কোথা থেকে কতকগুলো মাথা-ঘসা বেঁটে মোচার ঘণ্টে ঢুকিয়েছ। কিছু জান



দ্বিজেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী সর্ব্বসুন্দরী দেবী

না কি করে রাঁধতে হয়। লেখাপড়া শিখেছ সব মাথা আর মুণ্ডু। আমার ঠাকুরমা দিদিমা কি রকম মোচার ঘণ্ট রেঁধে খাইয়েছেন তেমনটি আর খেলুম না। তোমরা তেমন চক্ষেও কখনো দেখ নি।

বৈকালে গরম লুচি ভেজে সামনে এনে দিয়েছে। লুচিতে হাত ঠেকিয়েই বললেন, এ কি লুচি, ঘি চপচপ করছে লুচির সারা গায়ে, আমার হাত সুদ্ধ নষ্ট হ'ল ঘি লেগে। লুচির প্লেট আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, যাও জল দিয়ে লুচি ভেজে আনো। ঘি দিয়ে বুঝি আবার

লুচি ভাজে। লুচির প্লেট হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে চাকরকে ঘি দিয়ে লুচি না বেলে দুটি শুকনো ময়দা দিয়ে বেলে লুচি ভেজে আনতে বলা হ'ল। চাকর ভেজে নিয়ে এল লুচি। এবার ঠিক হয়েছে দেখা গেল। লুচির গায়ে ঘি লেগে নেই একটুও। লুচি দেখে বাবামশায় খুব খুশি, বললেন, এই তো ঠিক হয়েছে দেখলে জল দিয়ে ভেজে কেমন হ'ল। খাওয়ার শেষে আস্তে আস্তে গল্পছলে বলতে হ'ল, ফুটন্ত গরম জলে কাঁচা ময়দা বেলে ছেড়ে দিলে ময়দার কাই হয়ে যাবে, লুচি হবে না। ঘিয়েতেই লুচি ভেজে এনেছে সামান্য একটু রকমফের ক'রে। বাবামশায়ের তখন হুঁস হ'ল, বললেন, তাই তো, গরম জলে ময়দা দিলে গুলে কাই হয়ে যাবে তো বটেই। আচ্ছা কাণ্ড আমার, কি বলতে কি বলি, তোমাদিকে জালিয়ে মারি। তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর—ব'লেই সেই পাড়া-জাগানো হাসি আবার সুরু হ'ল।

এই ভাবের শ্বশুর নিয়ে সংসার করতে হয়েছে আমাদিকে। আত্মভোলা-মানুষের মর্ম্মকথা বোঝা গিয়েছে এই সব মানুষের সংস্পর্শে এসে। একটা বিষয়ে নিবিড় তন্ময়তা অন্য পাঁচটা বিষয়ে অন্যমনস্ক ক'রে রাখত বাবামশায়কে সকল সময়। ধ্যানপরায়ণ চিত্তের এটি বাহ্য লক্ষণ বলা যেতে পারে। লক্ষ্য বস্তুর প্রতি অনুরাগের ঐকান্তিকতাতেও এরূপ ঘটে থাকে। সূক্ষ্মতত্ত্ববিচারে তাঁর মন কখনো অসতর্ক হ'ত না। নিখুঁৎ ভাবে তিনি তত্ত্বনির্ণয়ে পারদর্শী ছিলেন। আশ্চর্য্য তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। যে ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁর সঙ্গে থেকেছে, মিলেছে সেই এ কথার সত্যতা জানে।

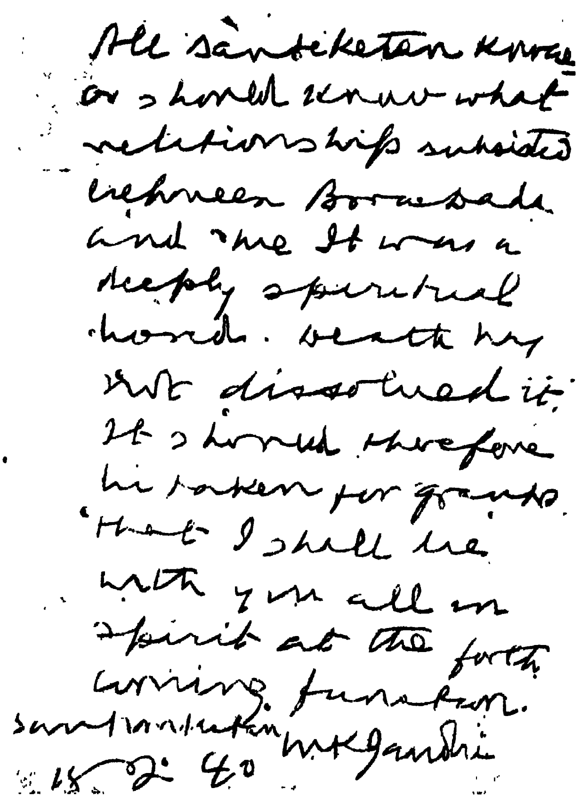
এই গভীর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন অসাধারণ পণ্ডিত পত্নী-বিয়োগে কি নিদারুণ মর্ম্মব্যথা পেয়েছিলেন, সেই সময়ে তাঁর রচিত দু-একটি গানে তার নিদর্শন পাওয়া যায়—

"গভীর বেদনা, অস্থির প্রাণে, করহে আমারে শান্তি দান"

গানটি তাঁর ঐ সময়ে রচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত গ্রন্থের একটি সংস্করণে উক্ত গানটি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের ব'লে নির্দ্দেশ করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গানটি পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয়ের রচিত।

অসংসারী শ্বশুরের সংসারে সংসার করেছি আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে। কর্ত্তৃত্বস্পৃহাশূন্য কর্ত্তার ঘরে বাস করেছি নিজের কর্ত্তা নিজে হয়ে।

মৃত্যুর বছর-দুই আগে তিনি নিয়ত ভগবৎচিন্তায় ডুবে থাকতেন। আলাপ করতেন কেবল ভগবদ্বিষয়ে। দেহান্ত হয় তাঁর ১৩৩২ সালের ৪ঠা মাঘ। ঐ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, তিথি অমাবস্যা, সকাল ৭-১৯-১৫ সেঃ মধ্যে অন্তরে তিনি একটি ঐশ্বরিক আবির্ভাব উপলব্ধি করেন। যেন দেহের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল, আত্মা অনুভূত হলেন, দেহ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে। সেই দিন জানলুম, ঈশ্বরপরায়ণ জ্ঞানবৃদ্ধ স্বভাব-শিশু, বিষয়ভোলা প্রকৃতির-কোলঘেঁসা একান্ত সরল মনের আশ্চর্য মানুষ বাবামহাশয়।



শান্তিনিকেতনে ২৯শে ফাল্গুনে অনুষ্ঠিত দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধীর পত্র

চিঠিপত্র

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
২১ চৈত্র

ভাই সত্তু,

তোমার চিঠি পাইয়া বাঁচিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম—আমি যেমন কলিকাতার রোগশয্যা হইতে "হিজ্‌লি সে আয়া" অবস্থায় শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলাম—তুমি হয়তো সেইরূপ অবস্থায় রাঁচিতে উপনীত হইয়াছ। আমি political horizon হইতে একমুষ্টি ঘনমেঘাঞ্জন চাঁচিয়া লইয়া অত্র সম্বলিত পাঠাইতেছি—ইহাতে হয়তো তোমার চক্ষু ফুটিবে। আমি সপ্তাহ পূর্ব্বে গান্ধীকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছি এই সঙ্গে তাহারো নকল পাঠাইতেছি।

তোমার বড়দাদা

My most revered friend Mr. Gandhi

I wish with all my heart that you will go on, unflinchingly, in your work of helping our misguided people to overcome *Evil* by *Good*. At times it seems to me that the penance and fasting which you enjoin are not quite the things that are necessary. But on second thought I find that we are not competent to judge the matter aright from our standpoint. You are deriving your inspiration from such a high source that, instead of calling in question the appropriateness of your sayings and doings, we ought to thankfully recognize in them the fatherly call of providence full of divine wisdom and power.

May God be your shield and strength in this awful crisis.

Your affectionate old Barodada
Dwijendranath Tagore

এই চিঠিখানা যখন আমি লিখিয়াছিলাম তখন ছাপার কাগজের বর্ত্তমান সংবাদটা আমি পাই নাই।

[গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত]

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত কর্ত্তামহাশয় বোধ হয় বাটি আসিবার মনঃস্থ করিয়াছেন। ইত্যবসরে জমিদারি সংক্রান্ত সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া থাকা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। এই জন্য কটকের জমিদারী সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জানিবার আবশ্যক হইয়াছে তাহার জন্য নায়েবকে লিখিয়াছি। অন্যান্য জমিদারী সম্বন্ধেও ঐরূপ আবশ্যকমতে কাগজপত্র তলব করিতেছি।

বালকদিগকে আমি যে প্রণালীতে পড়াইতেছি তাহাতে যদি জমিদারী কাছারির কার্য্যে মনোযোগ দিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হয়, তথাপি সেই অল্প ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমি প্রত্যহ তাহাদিগকে রীতিমত পড়াইতেছি। কিন্তু তাহাদের পড়াইয়াও এত সময় থাকে যে জমিদারী কার্য্যের বিশেষ কোন ত্রুটি হইতে পারে না। এখানে তোমরা যখন আসিবে তখন প্রত্যক্ষ দেখিবে দেখিয়া যদি তোমাদের মনোনীত না হয় তবে তোমরা যেরূপ বলিবে তাহাই করিব। পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত কর্ত্তামহাশয়কেও লিখিয়াছি তিনি কি আদেশ করেন তাহারও প্রতীক্ষা করিতেছি। সেদিন বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্কুল বিষয়ে কথোপকথন করাতে তিনি আমার শিক্ষাপ্রণালীর সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। এ বিষয়ে গুণু চিন্তিত হইও না। শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া তোমার যদি হৃদ্‌বোধ না হয় তবে আমি, যাহা বলিবে তাহাই করিব।

মেলা, পরিপাটিরূপে সমাধা হইয়া গিয়াছে। রোস্তমজির বাগানে হইয়াছিল। প্রবেশের টিকিট ।০ ধার্য্য হইয়াছিল। লোকসমারোহ যেমন তেমনি তবে কিছু কম হইয়াছিল। জ্যোতির নাটক কিরূপ হইয়াছে দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত আছি। আমার কবিতার স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহার বিশেষ কারণ মেলার হাঙ্গামা।

All right here Billiard খেলিবার অবকাশ হয় না—কি করি Never mind. শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

[জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত]

জ্যোতি,

স্কুলে বালকেরা টেঁকিতে পারিল না, আমি দুই প্রহর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত এবং পণ্ডিত সকাল বেলায় তাহাদিগকে পড়াইতেছি-ছেন। তাহাদের স্কুল অপেক্ষা ভাল পড়া হইতেছে। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত ইংরেজের উৎকণ্ঠা !

মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা ! এখন ভারতবর্ষ স্বাধীন নয়। কিন্তু ইংরেজরা এই দেশকে স্বাধীন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলে ভারতবর্ষ নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে কি না, সেই চিন্তা মধ্যে মধ্যে দরদী ইংরেজদিগকে ব্যাকুল করিয়া থাকে। সম্প্রতি এই রকম দরদী এক ইংরেজ আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইনি অধ্যাপক বেসিল ম্যাথ্যুজ্। লণ্ডনের ঈস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশ্যনের গত ৫ই মার্চের অধিবেশনে ইনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন :—

"আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ স্বাজাতিক (Nationalist) ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহাদের (অর্থাৎ ইংরেজদের) দুটি বক্তব্যও আছে। প্রথমতঃ, ব্রিটেন যখন অভূতপূর্ব সঙ্কটে পড়িয়াছে তখন তাহাকে গণ-অভ্যুত্থানের হুমকি দেখাইয়া নিজের দাবী জানান ন্যায়সঙ্গত নহে; দ্বিতীয়তঃ, মিঃ গান্ধী যদি নিশ্চিতরূপে বুঝেন যে, ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিলে তাহা রক্ষা করা যাইবে, শুধু তাহা হইলেই ভারতের স্বাধীনতার দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে।"

যে-সব ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখিতে চান না, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ব্রিটেনকে ভারতবর্ষের দাবী জানাইবার প্রশস্ত সময় কখন্ ? যখন ব্রিটেন সুখে শান্তিতে থাকেন তখন পদানত ভারতের কথা কানে তুলেন না; বিপদের সময়, যেমন গত মহাযুদ্ধের সময়, ভারতের কথা কানে তুলিয়া কিছু আশ্বাস দিলেও বিপদ কাটিয়া যাইবার পর জালিয়ানওআলা-বাগের কাণ্ড ঘটে ও রাউলেট আইন বিধিবদ্ধ হয়। অতএব, আমরা আমাদের আরজি কখন্ পেশ করিব, জানিতে চাই।

আর, এ কথাও সত্য নহে যে, শুধু ব্রিটেনের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়াই এবং তাহাকে ভয় দেখাইয়া আমরা আমাদের দাবী আদায় করিতে চাই। ব্রিটেন এই যুদ্ধ করিতেছেন জগতে সকলের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, শান্তির স্থায়িত্ব বিধান করিবার নিমিত্ত—এই কথা বলিয়াছেন। ব্রিটেনের এই কথায় সাহস পাইয়া আমরা বলিতেছি, "তাহা হইলে আমাদেরও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করুন, আমরাও ত জগতের মধ্যেই বাস করি।" আমাদের এই দাবীর সোজাসুজি উত্তর না দিয়া ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা নানা ওজর-আপত্তি করিতেছেন। ইহাতে আমাদের সন্দেহ বাড়িতেছে। মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস হইয়াছে, এই যুদ্ধ বিশ্ব-স্বাধীনতার জন্য নহে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নিরঙ্কুশ করিবার নিমিত্ত। ব্রিটেন এই যুদ্ধে আমাদের সমর্থন ও সাহায্য চান এই কারণ দেখাইয়া, যে, তিনি বিশ্ব-স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছেন। সেরূপ কোন কারণ না দেখাইয়া যদি বলিতেন, "তোমরা আমাদের দাস, সুতরাং তোমাদের ধন প্রাণ মান আমাদের পায়ে ঢালিয়া দাও," তাহা হইলেই যে আমরা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিতাম তাহা নহে, ছাড়িয়া দিতাম না; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতাম অন্য প্রকারে ও ভাষায়। এখন যে প্রকারে ও ভাষায় তাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহা ব্রিটেনের, "বিশ্ব-স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছি", এই ঘোষণার ফল—হুমকি নহে।

অধ্যাপক বেসিল ম্যাথ্যুজের দ্বিতীয় কথার ভঙ্গীতে মনে হয়, পাছে ভারতীয়েরা স্বাধীন হইলে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না-পারে সেই আশঙ্কাতেই ইংরেজরা আমাদিগকে অ-স্বাধীন করিয়া রাখিয়াছেন! কোন বীরপুরুষ কোন গৃহস্থের ধনসম্পত্তি অধিকার করিয়া ঠিক এই ভাবেই তাহাকে বলিতে পারে, "তুমি আগে প্রমাণ কর যে তোমার ধনসম্পত্তি দস্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, তবেই তোমাকে তাহা ফেরত দিব।"

যাহা হউক, তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া যাউক যে, আমরা আত্মরক্ষায় সমর্থ নহি বলিয়াই ইংরেজরা

আমাদের প্রভু ও রক্ষক হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা এক শত বৎসরের অধিক কাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন যে আমাদিগকে স্বাধীন হইতে দেওয়া হইবে। তাঁহাদের এখনকার কথা হইতে বুঝিতেছি, আমরা আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইলে তাঁহারা আমাদিগকে স্বাধীন হইতে দিবেন না। কাজে কাজেই আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে, আমরা ইংরেজদের শাসনকালে উত্তরোত্তর আত্মরক্ষায় অধিকতর সমর্থ হইতেছি কি না।

যখন ইংরেজরা প্রথম প্রথম আমাদের দেশ অল্প অল্প করিয়া দখল করিতে আরম্ভ করেন, তখন আমরা ভারতীয়েরা তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে কখন জিতিয়াছি, কখনও বা হারিয়াছি। শেষে, অবশ্য, ছলবল ও কৌশলের প্রতিযোগিতায় আমরা পরাজিত হই। তাহার একটা প্রধান কারণ, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পরস্পর অ-মিলন ও বিরোধিতা (যাহা এখন রাজকীয় ব্যবস্থার গুণে পুনরাবির্ভূত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে)।

মোট কথা, ইংরেজ-আমলের আগে এবং তাহার প্রথম অবস্থায় ভারতীয় কোন কোন রাজশক্তি কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য না-লইয়াও ইংরেজদের সমকক্ষতা করিতে পারিয়াছিল। তখন ইংরেজরা পৃথিবীর প্রবলতম জাতি না হইলেও অন্যতম প্রবল জাতি ছিল। এবং তখন তাহাদের রণসজ্জা অস্ত্রশস্ত্র কাহারও চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল না। ভারতীয়েরা এরূপ একটা জাতির সহিত সমকক্ষতা করিয়া কখন কখন জিতিয়াছিল।

আর এখন? এখনও ইংরেজদের রণসজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্র অন্য কোন জাতির চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, ভারতবর্ষের গোরা সৈন্যদের সজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্রও তদ্রূপ; কিন্তু সিপাহীদের সজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্র গোরাদের সমান নহে, এবং উচ্চপদস্থ সেনানায়কেরা সবাই ইংরেজ, ভারতীয় নায়কেরা নিম্নপদস্থ, এবং শুধু অল্পসংখ্যক সিপাহীদেরই নেতা। সিপাহী-যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত কিন্তু দেশী নায়কেরা অনেকে গোরা ও সিপাহী উভয়েরই নেতৃত্ব করিতেন। ভারতবর্ষের নিজের শক্তিতে আত্মরক্ষার সামর্থ্যের মানে সিপাহীদের ও দেশী অফিসারদের ভারত-রক্ষার সামর্থ্য। কিন্তু তাঁহারা পদমর্য্যাদা সজ্জা অস্ত্রশস্ত্র এবং অভিজ্ঞতায় গোরা ও ইংরেজ অফিসারদের সমান নহেন। ইংরেজ-রাজত্বে ভারতবর্ষের সৈন্যদলে কেবল সিপাহী এবং কেবল ভারতীয় অফিসার থাকিবে, এরূপ অবস্থা কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না। মোটের উপর ইংরেজ-আমলের আগে ও গোড়ার দিকে ভারতীয় যুদ্ধবল তখনকার বিদেশী জাতিদের তুলনায় যেরূপ ছিল, এখন সিপাহী ও দেশী অফিসারদের আপেক্ষিক যুদ্ধবল তাহা অপেক্ষা কম। বিদেশী যুদ্ধবল এবং ভারতীয় এই যুদ্ধবলের আপেক্ষিক অসাম্য কমিতেছে না। ইংরেজ-রাজত্ব থাকিতে ইহা কমিবে না। সুতরাং ইংরেজ-প্রভুত্ব থাকিতে আমরা যখনই স্বাধীনতা চাহিব, তখনই ইংরেজরা বলিবে, "তোমরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ।" অতএব, তাহাদের বিবেচনায় আমাদিগকে তাহাদের রাজত্বে চিরকাল অসমর্থ ও তাহাদের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে। তাহাদের বিবেচনায় আপনাদিগকে অক্ষম জানিয়াও আমাদিগকে তাহাদের রাজত্বকালে কখন-না-কখন স্বাধীনতা-লিপ্সু হইতে হইবে। যখনই স্বাধীনতা-লিপ্সু হইব, তখনই যখন এই কথা উঠিবে, তখন এখন এই স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টাকে অসাময়িক বলা চলে না।

ভারতবর্ষে সৈনিক হইবার লোকের অভাব নাই। তাহার প্রাকৃতিক সম্পদও প্রচুর। সুতরাং যুদ্ধে যে-কোন জাতির সমকক্ষতা করিতে ভারতবর্ষ সমর্থ। যুদ্ধই যে স্বাধীনতারক্ষার এক মাত্র উপায় তাহা নহে। বিদেশী অনেক ক্ষুদ্র দেশ ও জাতি স্বাধীন আছে, যুদ্ধ না-করিয়াও স্বাধীন আছে। সুতরাং বিশ্বাসে ও সাহসে ভর করিয়া আমাদের স্বাধীন হওয়াই উচিত। ব্রিটেনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বাধীন হইবার শক্তি যদি ভারতবর্ষের থাকে, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করিবার শক্তিও তাহার থাকিবে।

—

স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে ভারত-সচিব

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বিলাতী সাণ্ডে টাইমসের প্রতিনিধিকে, অবশ্য পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে, দর্শন দিয়া ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারতবর্ষের দাবী সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলেন। তাহার কিয়দংশের তাৎপর্য এই:—

"আমি সন্দেহ করি না যে ভারতীয়েরা আপনারাই আপনাদিগকে শাসন করিতে চায়; কিন্তু আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও, বিশ্বাস করি না যে তাহারা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের পরিধি হইতে ভারতবর্ষের দূরে চলিয়া যাইবার কথা ভাবিতেছে বা ইচ্ছা করিতেছে। এই পাগলা দুনিয়ায় তাহারা স্থলে ও জলে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ব্রিটেনের শক্তি তাহাদিগকে যে রক্ষা করিতেছে, তাহারা তাহার এত বেশী গুণগ্রাহী যে, ওরূপ চিন্তা তাহারা করিতে পারে না।"

ভারত-সচিব চতুরতার সহিত "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য" না বলিয়া "ব্রিটিশ কমনওএল্‌থ্‌" বলিয়াছেন, যদিও ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের অধীন, কোন অর্থেই কমনওএল্‌থের অন্তর্গত নহে।

ভারতীয়েরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইতে চায় কি না, সে বিষয়ে কোন ভোট লওয়া হয় নাই। সুতরাং যে ভারত-সচিবের ভারতীয় অভিজ্ঞতা বড় বড় চাকরো, রাজারাজড়া ও অনুগ্রহপ্রার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ, তিনি ভারতীয় জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা বেশী জানেন, মহাত্মা গান্ধীর মত নেতারা বেশী জানেন না, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্থলে ও জলে (আকাশে এখনও নহে) রক্ষা করিতেছেন জানি, তাহার দামটাও সুদ সমেত আদায় করিতেছেন জানি। কিন্তু ভারত-সচিব কি চান যে, চিরকালই ভারতবর্ষ এইরূপ পরের পাহারায় থাকিবে? পাহারা দিবার ক্ষমতাও কি চিরকাল ব্রিটেনের থাকিবে? আর, ব্রিটেন ভারতবর্ষে কী রক্ষা করিতেছেন? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ত রক্ষা করিতেছেন না, তাহার ব্রিটিশ-অধীনতাই রক্ষা করিতেছেন। ইহাও অবশ্য সত্য যে, ব্রিটেন ভারতবর্ষকে যুদ্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক নানা দুঃখকষ্ট হইতে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাহার মূল্যস্বরূপ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন ও পেন্সান এবং ইংরেজ বণিক, কারখানার মালিক ও জাহাজমালিকদের প্রভূত লাভ ভারতবর্ষ হইতে লইতেছেন; সর্বোপরি চাহিয়াছেন এবং, লজ্জার বিষয়, বহু পরিমাণে পাইয়াছেন, ভারতবর্ষের 'গোলামী। দাসত্বের মূল্যে আমরা "রক্ষা" চাই না। এই "রক্ষা" আমাদিগকে নির্বীর্য্য, ভীরু, অলস, অমানুষ করিয়া রাখিতেছে, ইহাও ভুলিতে পারি না।

ভারতবর্ষ আত্মরক্ষায় সমর্থ হউক, ব্রিটেনের যদি এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে ব্রিটেন ভারতবর্ষকে অনেক আগেই ডোমীনিয়নত্ব দিয়া নিজের সামরিক শক্তি বাড়াইবার স্বাধীনতা দিত। ভারতবর্ষের নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ব্রিটেনের ইচ্ছার অধীন রাখার দ্বারাতেই বুঝা যাইতেছে, এ বিষয়ে ভারতবর্ষ পূর্ণমাত্রায় নিজের পায়ে দাঁড়ায়, ইহা ব্রিটেনের অভিপ্রেত নহে।

ইহা জানা কথা এবং ভারত-সচিবের কথা হইতেও বুঝা যায় যে, যত দিন ভারতবর্ষ ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবে ব্রিটেন শুধু তত দিনই তাহাকে জলে স্থলে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির সাহায্য দিবে। কিন্তু ইহা কি ন্যায়সঙ্গত? গত মহাযুদ্ধে ব্রিটেন বেলজিয়মকে সাহায্য করিয়াছিলেন, বিনিময়ে তাহার দাসত্ব চান নাই। বর্ত্তমান সময়ে পোল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য করিতেছেন, বিনিময়ে তাহাদের দাসত্ব চান নাই। বেলজিয়ম, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড—কেহই ইংরেজদের ধনদৌলত ও সাম্রাজ্য-শক্তি অর্জনে সেরূপ কাজে লাগে নাই ও সাহায্য করে নাই, ভারতবর্ষ যেরূপ করিয়াছে। তজ্জন্য আমরা ব্রিটেনের কাছে কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারি না, করি না; কিন্তু যাহারা ব্রিটেনের জন্য কিছু করে নাই তাহারা ব্রিটেনের যে আনুকূল্য পাইয়াছে, ব্রিটেনের শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত ভারত তাহা কেন পাইবে না, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

ভারতবর্ষের সামরিক শক্তি এখন বা ভবিষ্যতে যাহাই হউক, অন্যান্য অনেক দেশের মত আমাদের দেশ নানা দেশের সহিত চুক্তি ও সন্ধি স্থাপনাদি দ্বারাও কতকটা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। সুতরাং ভারত-সচিব, অধ্যাপক বেসিল ম্যাথ্যুজ্‌ প্রভৃতি দরদী বন্ধুরা, ব্রিটেন আমাদের রক্ষক না থাকিলে আমাদের কি দশা হইবে, ভাবিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন যেন না-করেন।

—

সাংস্কৃতিক যোগসূত্র কি স্বাধীনতার অন্তরায়?

ভারত-সচিব সাণ্ডে টাইমসের প্রতিনিধিকে যে-সব

কথা বলেন তাহার মধ্যে অন্য কয়েকটি মন্তব্য সম্বন্ধেও কিছু বলিতে চাই। তিনি বলেন,

(তাৎপর্য্য)। ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের লোকদের মধ্যে কেবল বাণিজ্যিক জড়পদার্থ সম্বন্ধীয় যোগসূত্র নহে, মানসিক যোগসূত্র বা বন্ধন আছে। তাহা রূঢ়তা ও কঠোরতা সহকারে নষ্ট করিলে উভয় জাতিরই গুরুতর ক্ষতি হইবে।

যাঁহারা আজ কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁহারা অনুপ্রাণনার জন্য ইংরেজী সাহিত্যের ও ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার নিকট ঋণী।

ব্রিটেন ও ভারতের শাসক ও শাসিত বা প্রভু ও দাসের সম্পর্ক লুপ্ত হইলেও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের যোগসূত্র থাকিতে পারে। পৃথিবীর যে-সকল দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নহে, তাহাদের সহিতও ব্রিটেনের ঐরূপ আদান-প্রদান আছে। সাংস্কৃতিক সম্পর্কও ব্রিটেন এবং ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-বহির্ভূত বহু দেশের মধ্যে আছে।

এখন যে উপনিবেশগুলি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সেগুলি এক সময় ব্রিটেনের অধীন ছিল। তাহাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা ব্রিটেন ও ইয়োরোপ হইতে প্রাপ্ত। তথাপি তাহারা স্বাধীন হইয়াছে। তাহাতে তাহাদের ও ব্রিটেনের বাণিজ্য বা সংস্কৃতির কোন ক্ষতি হয় নাই। ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্যসমূহ এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা ব্রিটেন বা ইয়োরোপ হইতে প্রাপ্ত নহে। আমেরিকার যাহাদের সহিত ব্রিটেনের ও ইয়োরোপের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তাহারা তাহার খাতিরে স্বাধীনতা-লাভ-চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই; পরন্তু স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। আমাদের সহিত পাশ্চাত্যের যোগ ঘনিষ্ঠ নহে এবং আমাদের পাশ্চাত্যের নিকট ঋণও মজ্জাগত নহে। সুতরাং আমাদিগকে ঐ "যোগ" ও "ঋণে"র খাতিরে স্বাধীনতা-লাভ-প্রয়াস হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলা অসঙ্গত ও হাস্যকর।

আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত ব্রিটেনের সর্ববিধ সম্পর্ক বহু-শতাব্দীব্যাপী; তথাপি আয়ার্ল্যাণ্ড প্রায় স্বাধীন হইয়াছে।

কংগ্রেস-নেতারা এবং অন্য শিক্ষিত ভারতীয়েরা ইংরেজী সাহিত্য ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা হইতে কিছু অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু জাপান, চীন, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতির লোকেরাও কিয়ৎ পরিমাণে তাহা করিয়াছে। তাই বলিয়া কি তাহাদিগকে ব্রিটেনের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে?

"মহত্তম ঐক্যবিধায়ক প্রভাব"

লর্ড জেটল্যাণ্ড আর একটা অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইংরেজী ভাষা ভারতবর্ষে "মহত্তম ঐক্য-বিধায়ক প্রভাব" ("the greatest unifying influence")। ঐ ভাষার অতি সামান্য জ্ঞানও ভারতবর্ষে যাহাদের আছে, তাহাদিগকেও গণনার মধ্যে আনিলেও, ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে মোটামুটি শতকরা তিন জন ইংরেজী জানে, এবং ফিরিঙ্গীরা ও ভারতপ্রবাসী ইংরেজরা তাহাদের অন্তর্গত। বাকী ভারতীয়েরা কি পরস্পরের সহিত কোন প্রকার ঐক্য অনুভব করে না? বস্তুতঃ ইংরেজদের ভারতবর্ষে আসিবার বহু বহু শতাব্দী আগে হইতে ভারতবর্ষের লোকদের একটি মজ্জাগত ঐক্যবোধ ছিল ও আছে। ভারতবর্ষের কেদার বদরী হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত, জ্বালামুখী নাথদ্বার দ্বারকা হইতে গঙ্গাসাগর কামাখ্যা পর্য্যন্ত তীর্থনিচয়ে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের জলে গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু ও কাবেরীকে সন্নিহিত হইবার আহ্বানে তাহার বাহ্য পরিচয় রহিয়াছে।

—

রুশিয়ার ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ

আমেরিকার শিকাগো শহরের "য়ুনিটি" কাগজের সম্পাদক জন্ হাইন্স হোম্স্ (John Haynes Holmes)। তিনিই প্রথমে মহাত্মা গান্ধীকে জগতের মহত্তম পুরুষ বলেন। তিনি গণতান্ত্রিকতার পূর্ণ সমর্থক, এবং রুশিয়ারও খুব বন্ধু ছিলেন তৎকর্ত্তৃক ফিন্ল্যাণ্ড আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। তিনি তাঁহার "য়ুনিটি" কাগজে ফিন্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে লেনিনের নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এখনও যাঁহারা রুশিয়ার ফিন্ল্যাণ্ড আক্রমণের সমর্থক, তাঁহারা এগুলি পড়িবেন। অনুবাদ দিলাম না।

"The class-conscious proletariat, true to their program, are for the freedom of Finland, as well as of other non-sovereign nationalities, to separate from Russia .....The bourgeoise are carrying on the same tsarist policy of subjection, of annexation. For Finland was annexed by the Russian Tsars as the result of a deal with Napoleon, the strangler of the

French Revolution. If we are really against annexation, we must come out openly for Finland's freedom.... It is not by violence that we should draw [this people] into union with the Great Russians."

These words were written in *Pravda*, on May 15, 1917, by Nicolai Lenin.

—

রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ডের সাহিত্যাচার্য্য পদবীসম্মান দিবার প্রস্তাব

রয়টার তারে খবর পাঠাইয়াছেন, ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যাচার্য্য উপাধি দিবেন স্থির করিয়াছেন। এই সংবাদে আমরা অবশ্য দুঃখিত হই নাই, কিন্তু উল্লসিতও হই নাই। অক্সফোর্ড খুব প্রাচীন ও বড় বিশ্ববিদ্যালয় বটে, কিন্তু যাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া সভ্যজগৎ সাহিত্যাচার্য্য বলিয়া সানন্দে স্বীকার করিয়া আসিতেছে, তাঁহাকে এত দিন পরে সাহিত্যাচার্য্য উপাধি দেওয়া কৌতুকজনক ব্যাপার।

মনে পড়ে, অনেক বৎসর আগে যখন বোম্বাইয়ে এক পারসী ধনিকের টাকায় ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজ চলিত, তখন তাহার ইংরেজ সম্পাদক একটি সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, কবি রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানপ্রদর্শনার্থ ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি দিবেন এইরূপ একটা কথা উঠে, কিন্তু এক জন ভারতীয় ব্যক্তি কবির বিরুদ্ধে গোপনে (অর্থাৎ খবরের কাগজে কিছু না লিখিয়া বা প্রকাশ্য বক্তৃতা না করিয়া) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্যাপকদিগকে ও ফেলোদিগকে অনেক কথা বলায় প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইণ্ডিয়ান ডেলী মেলের ঐ সংখ্যা এখন আমাদের নিকট নাই, এবং কাগজটি উঠিয়া গিয়াছে। নতুবা উক্ত ভারতীয়ের নামধাম সহ ঐ কাগজের কথাগুলি উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। এখন অক্সফোর্ডের কর্তৃপক্ষ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন। সেই জন্য, যাহাতে লোকে তাঁহাদিগকে বেকুব না ঠাওরায় তাহারই উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ওআশিংটন আর্ভিঙের রেপ ভ্যান উইঙ্কল বহুবৎসরব্যাপী নিদ্রার পর জাগিয়া দেখিয়াছিল, দুনিয়াটা বদলাইয়া গিয়াছে। অক্সফোর্ডের ডনেরাও নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলেন, "তাই ত, আমরা যাঁহাকে সাহিত্যাচার্য্য বলিয়া মানি নাই অন্য সবাই ত তাঁহাকে মানিতেছে; অতএব তাঁহাকে তাড়াতাড়ি উপাধিটা দিয়া ফেলা যাক।"

ঐ উপাধি পাওয়া না-পাওয়ায় কবির কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

—

মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীকে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বেও গান্ধীজী বিশ্বভারতীর অর্থাভাব দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ফলও হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে গান্ধীজী যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার চেষ্টায় বিশ্বভারতী ভবিষ্যতে আরও আর্থিক আনুকূল্য পাইবে। তিনি বিশ্বভারতী-দর্শনকে তীর্থদর্শন বলিয়াছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের ও তাহার প্রতিষ্ঠাতার স্বাজাত্য ও সর্ব্বজাতীয়ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু বাংলা দেশের কল্যাণের নিমিত্ত স্থাপিত হয় নাই, সমগ্র ভারতবর্ষের কল্যাণার্থ পরিচালিত হইতেছে—সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল ইহার উদ্দেশ্য বলিলে ভুল হয় না। সুতরাং যে-কোন স্থান, যে-কোন দিক্ হইতে ইহার পুষ্টিসাধনার্থ আনুকূল্য আসিতে পারে, এবং তাহার আশা করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান যে দেশ প্রদেশ বা অঞ্চলে অবস্থিত, তথাকার লোকেরাই স্বভাবতঃ তদ্দ্বারা অধিকতর সংখ্যায় ও অধিকতর উপকৃত হয়। তাহার সুবিধা তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ না করিলে তাহার জন্য তাহারা দায়ী। কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যাহা আদর্শ তদনুসারে তাহা চালাইতে হইলে আধুনিক কালে বহু অর্থের আবশ্যক। তাহা, প্রতিষ্ঠানটি যে প্রদেশে অবস্থিত, তথাকার লোকদেরই অধিক পরিমাণ দেওয়া উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশ্বভারতী বাংলা দেশে অবস্থিত হইলেও এবং ইহার প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা বেশী হইলেও, মহর্ষি ও কবিকে ছাড়িয়া দিয়া ইহা আর্থিক আনুকূল্য পাইয়াছে প্রধানতঃ

অ-বাঙালীদের নিকট হইতে। ইহা বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। বাঙালী কেহই কিছু টাকা বিশ্বভারতীকে দেন নাই, এমন নয়; কিন্তু বাঙালীদের দান সামান্ত। আমরা অহঙ্কার করিবার সময় বিশ্বভারতীকে বাঙালী জাতির কীর্ত্তির ফর্দে ধরি; তাহার কারণ তাহাতে কোন খরচ হয় না—প্রশংসা খুব সস্তা দান, বিশেষতঃ যখন তাহা আত্মপ্রশংসার রূপান্তর।

যে-সকল বাঙালী ও অন্ত অধ্যাপক অল্প বেতনে বিশ্বভারতীর আন্তরিক সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা মূল্যবান্।

রবীন্দ্রনাথ একদা সুভাষবাবুকেও বিশ্বভারতীর পার্শ্বে ও পশ্চাতে দাঁড়াইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তখন সুভাষবাবু কবিকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, বিশ্বভারতীর মধ্যে সত্য যাহা তাহা অবশ্যই টিকিবে। কবি বোধ হয় এই তত্ত্ব অনবগত ছিলেন না।

—

বাঙালী মুসলমানদের বিজ্ঞান শিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্ত্তন সভায় তাহার ভাইস্-চ্যান্সেলার খান বাহাদুর আজিজুল হক মুসলমান ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন :—

> অতঃপর তিনি মুসলেম ছাত্রগণের উচ্চ শিক্ষার সমস্তার কথা আলোচনা করেন। গত ১০ বৎসরের হিসাব হইতে তিনি দেখাইয়াছেন যে গত দশ বৎসরে গড়ে মাত্র ৯৬ জন মুসলেম ছাত্র আই. এস্‌সি. পরীক্ষা পাস করিয়াছে অথচ হিন্দু ছাত্র পাস করিয়াছে বৎসরে গড়ে ১৬৪৫ জন। মুসলমান বি. এস্‌সি. :৮, হিন্দু বি. এস্‌সি ৫০১ জন। গত ছয় বৎসরে মোট ১৪ জন মুসলমান ছাত্র এম. এস্‌সি. পাস করিয়াছে, সেই স্থলে হিন্দু পাস করিয়াছে ৬৫০ জন। মুসলমান ছাত্রগণ যাহাতে অধিক সংখ্যায় বিজ্ঞান পড়ে তাহার জন্ত অবিলম্বে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

তাহা নিশ্চয়ই করা উচিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান-সাপেক্ষ সরকারী চাকরীগুলিরও শতকরা ৫০টি এখন মুসলমানদের ন্তায্য প্রাপ্য বটে কি?

—

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির একমাত্র প্রস্তাব

পাটনায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির যে একমাত্র প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, প্রকাশ রামগড় কংগ্রেসে কেবল সেই প্রস্তাবটিই উপস্থাপিত হইবে। তাহার অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল।

> ইউরোপীয় যুদ্ধ এবং তৎসংক্রান্ত ব্রিটিশ নীতির ফলে যে গুরুতর এবং সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া, এই কংগ্রেস, নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটি এবং কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি কর্ত্তৃক গৃহীত যুদ্ধকালীন অবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন ও সমর্থন করিতেছে। ভারতে জনসাধারণের সম্মতি ব্যতিরেকে ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছে এবং এই যুদ্ধে ভারতীয় সম্পদ শোষণ করার যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, এই কংগ্রেস তাহাকে ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক ও অপমানজনক বলিয়া মনে করে। আত্মসম্মানশীল ও স্বাধীনতাপ্রিয় কোনও জাতি তাহা সমর্থন বা বরদাস্ত করিতে পারে না।
>
> ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সম্প্রতি যে ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে এবং ভারতের এবং এশিয়ার ও আফ্রিকার অন্তান্ত দেশের জনসাধারণকে শোষণ করার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এই যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন।
>
> এইরূপ অবস্থায়, ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে কোনও প্রকারেই কংগ্রেস এই যুদ্ধে পক্ষভুক্ত হইতে পারে না। কারণ এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যই হইতেছে—সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বজায় রাখা। অতএব এই কংগ্রেস গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্ত ভারতীয় সৈন্ত প্রেরণ এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্ত ও সমরসম্ভার সংগ্রহ কোনক্রমেই অনুমোদন করে না। কংগ্রেস উহার ঘোরতর প্রতিবাদ করে।
>
> ভারত হইতে যে সৈন্ত ও অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে, তাহা ভারতের স্বেচ্ছাকৃত দান নহে। কংগ্রেসকর্ম্মিগণ এবং যাঁহারা কংগ্রেস দ্বারা প্রভাবান্বিত তাঁহারা যুদ্ধপরিচালনায়, সৈন্ত, অর্থ অথবা সমরসম্ভার দ্বারা সাহায্য করিতে পারেন না।
>
> কংগ্রেস এতদ্দ্বারা পুনরায় ঘোষণা করিতেছে যে পূর্ণ স্বাধীনতা অপেক্ষা কম কিছু ভারতের জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। ভারতের স্বাধীনতা কদাচ সাম্রাজ্যবাদের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোর অন্তর্গত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অথবা অন্ত কোনও শাসনপদ্ধতি ভারতের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য। উহা কোনও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন জাতির মর্য্যাদার সহিত সমঞ্জসীভূত নহে। ঐরূপ শাসন-ব্যবস্থায় ভারতকে বহু প্রাকারে ব্রিটিশ রাজনীতির এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন থাকিতে হইবে। একমাত্র ভারতের জনসাধারণই, প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটের ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত গণপরিষদের মধ্যস্থতায়, নিজেদের শাসনতন্ত্র যথাযথভাবে গঠন করিতে এবং জগতের অন্তান্ত রাষ্ট্রের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ স্থির করিতে সমর্থ।
>
> কংগ্রেসের আরও অভিমত এই যে, সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের জন্ত কংগ্রেস পূর্ব্বাপর যেমন প্রস্তুত ছিল, ভবিষ্যতেও সেইরূপ প্রস্তুত থাকিবে। তবে গণপরিষদের মধ্যস্থতা ভিন্ন স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব হইবে না। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা অথবা কোনও বিষয়ে মতভেদ স্থলে সালিশ ব্যবস্থার দ্বারা উক্ত পরিষদে যত দূর সম্ভব স্বীকৃত সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকিবে। এতদ্ভিন্ন অন্ত কোনও বৈকল্পিক ব্যবস্থায় শেষ মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা নাই।
>
> ভারতের শাসনতন্ত্র স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কংগ্রেস ভারতকে খণ্ডিত করার বা তাহার জাতীয়তা বিচ্ছিন্ন করার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে

কংগ্রেসের লক্ষ্য এমন এক শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করা, যেখানে প্রতি দলের ও প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে উন্নতির পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে গ্যারান্টি থাকিবে এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচারের উচ্ছেদ সাধনে ন্যায়ানুগত সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে।

দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের এবং বিদেশী সংরক্ষিত স্বার্থের ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বাধা সৃষ্টির অধিকার কংগ্রেস স্বীকার করে না। ভারতের দেশীয় রাজ্যেই হউক অথবা প্রদেশসমূহেই হউক, সার্ব্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতেই থাকিবে। অন্যান্য স্বার্থ জনসাধারণের মূল স্বার্থের অধীন হইবে। দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, কংগ্রেসের মতে উহা ব্রিটিশেরই সৃষ্টি। সুতরাং ভারতের বিদেশীশাসনমুক্ত স্বাধীনতা ঘোষণা ভিন্ন সে সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসাও হইতে পারিবে না। ভারতের জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী নহে, এমন সকল বিদেশী স্বার্থ সংরক্ষিত থাকিবে।

যুদ্ধের সহিত ভারতকে সম্পর্কশূন্য করিবার উদ্দেশ্যে এবং বৈদেশিক প্রভুত্ব হইতে ভারতকে মুক্ত করার সঙ্কল্প দৃঢ়ভাবে প্রকাশের জন্য, যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই সকল প্রদেশ হইতে কংগ্রেস মন্ত্রিগণকে সরাইয়া লইয়া আসিয়াছে। এই ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতিই হইবে আইন-অমান্য আন্দোলন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান-সমূহ এ সম্বন্ধে প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে অথবা অবস্থা-পরম্পরায় বাধ্য হইয়া সঙ্কট-উপস্থাপন ক্রততর করার প্রয়োজন হইলে, কংগ্রেস দ্বিধাশূন্যভাবে আন্দোলন আরম্ভ করিবে। কংগ্রেস গান্ধীজীর এই ঘোষণার প্রতি কংগ্রেসকর্ম্মিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কংগ্রেসিগণ নিয়মশৃঙ্খলা কঠোরভাবে পালন করিতেছেন এবং স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাক্যনির্দ্দিষ্ট গঠনমূলক কার্য্য যথাযথ সম্পন্ন করিতেছেন, এই সকল বিষয় চূড়ান্তভাবে জানিতে পারিলে, গান্ধীজী আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারেন।

কংগ্রেস জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ও সেবা করে। সমগ্র জাতিকে বন্ধনমুক্ত করাই কংগ্রেসের মুক্তি-সংগ্রামের উদ্দেশ্য। সুতরাং কংগ্রেস এই আশা পোষণ করে যে, সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায় কংগ্রেসের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিবে। এ, পি

গণপরিষদের আহ্বান, গঠন, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর আপেক্ষিক প্রতিনিধি-সংখ্যা, তাহার কার্য্যপ্রণালী, তাহার সিদ্ধান্ত সমগ্র জাতিকে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করাইয়া কার্য্যকর করিবার শক্তি তাহার থাকিবে বা হইবে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা কংগ্রেসী প্রস্তাবটি হইতে জন্মে নাই। কংগ্রেসীরা গান্ধীজীর আদর্শ অনুসারে নিয়মনিষ্ঠা ও গঠনমূলক-কার্য্য-নিরত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাকে বিশ্বাস করাইতে পারিবেন কি না, অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। সুতরাং তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেসের আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। প্রস্তাবটির অন্যান্য অংশের, প্রায় সমস্ত অংশের, আমরা সমর্থন করি।

আমরা খাদি অনাবশ্যক বা মূল্যহীন মনে করি না; কিন্তু চরখার সুতা ও হাতের তাঁতে খাদি উৎপাদনরূপ গঠনমূলক কার্য্য স্বরাজসংগ্রামের নিমিত্ত কেন অপরিহার্য্য প্রভৃতি বিবেচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু দক্ষিণপন্থী বামপন্থী ও অন্যবিধ সকল কংগ্রেসীদের অহিংস হওয়া, নিয়মানুবর্ত্তী হওয়া এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা যে অহিংস-স্বরাজ-সংগ্রামের জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এই গুণগুলি কংগ্রেসীদের মধ্যে এখন যথেষ্ট পরিমাণে নাই, তাহাও দেখিতেছি। স্বরাজ-সংগ্রাম আরম্ভ করিলেই তাঁহাদের মধ্যে এগুলির স্বতঃ-আবির্ভাব হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের নাই।

সুভাষবাবুর দলের লোকেরা এবং অন্য কেহ কেহ মনে করেন, প্রস্তাবটিতে যে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্পষ্ট চরম ও চূড়ান্ত কথা বলা হইয়াছে তাহা সুভাষবাবুর রফাবিরোধী আন্দোলনের ফল। তাহা অসম্ভব নহে—অন্ততঃ আংশিক ভাবে। কিন্তু তাহাই যে আংশিক ভাবেও কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির দৃঢ়তার কারণ, ইহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

—

বাংলার জেলাসমূহে লিখনপঠনক্ষম লোকের হার

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ ইদ্রিস আমেদ মিঞা প্রশ্ন করেন, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জানাইবেন কি—(ক) বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় লেখাপড়া-জানা লোকের হার কত? এবং (খ) অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জেলাসমূহে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তবে তাহা কি?

মাননীয় মিঃ এ কে ফজলুল হক—

(খ) তিনটি জেলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসর হইতে আরও ৫টি জেলায় এই শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইতেছে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র সমগ্র প্রদেশে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে।

(ক) বাংলার প্রত্যেক জেলায় লেখাপড়া-জানা লোকের শতকরা হার সম্বলিত একটি বিবৃতি দাখিল করা হইয়াছে। বিবৃতিটি নিম্নরূপ:—বর্দ্ধমান ১২·৩, বীরভূম ৮·১, বাকুড়া ৯·৯, মেদিনীপুর ১১·৫, হুগলী ১৬·০, হাওড়া ২০·৭, চব্বিশ-পরগণা ১২·৭, কলিকাতা ৪৩·২, নদীয়া ৬·৯, মুর্শিদাবাদ ৬·৩, যশোহর ৭·৬, খুলনা ৯·৯, রাজশাহী ৭·৭, দিনাজপুর ৭·৪, জলপাইগুড়ি ৫·৬, দার্জিলিং ১২·৬, রংপুর ৬·৯, বগুড়া ১১·৩, পাবনা ৭·০, মালদহ ৩·৮, ঢাকা ১০·৯, ময়মনসিংহ ৭·১, ফরিদপুর ৯·১,

বাখরগঞ্জ ১৪৮, ত্রিপুরা ৯৩, নোয়াখালী ১৩২, চট্টগ্রাম ১০৪, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ৫০।

যে-যে জেলায় লিখনপঠনক্ষমদের শতকরা হার সকলের চেয়ে কম, সেই সেই জেলাতেই সর্বাগ্রে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। তাহা হইয়া থাকিলে ভাল, নতুবা অচিরে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সকল জেলার জন্যই অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

—

নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা

বালকবালিকাদের নিমিত্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। শুধু সমুদয় বালক-বালিকাদিগকে লিখনপঠনক্ষম করিয়া দেশের নিরক্ষরতা দূর করিতে চাহিলে তাহাতে ৭০।৮০ বৎসর লাগিবে। তাহার পূর্ব্বে এখনকার নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যু হইবে না।

অনেক ছাত্রছাত্রীর সম্মুখে কয়েক মাস অবকাশ। তাঁহারা নিরক্ষর পুরুষ ও নারীদের শিক্ষা দিলে নিজেদের ও শিক্ষার্থীদের প্রভূত উপকার হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্‌স্টিটিউটের এই বিষয়ে উদ্যম প্রশংসনীয়।

—

বাঁকুড়ায় নিরক্ষরতা

লিখনপঠনক্ষমতা সম্বন্ধে কোন জেলারই কৃতিত্ব প্রশংসনীয় নহে। সর্বত্রই শিক্ষাবিস্তারের প্রবল, নিয়মিত, ও সাগ্রহ চেষ্টা আবশ্যক। বাঁকুড়ায় নিরক্ষরতার উল্লেখ করিবার কারণ, ইহা এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় না হইলেও নিন্দনীয় বটে এবং ইহা প্রবাসী-সম্পাদকের নিজের জেলা। কিন্তু অন্য একটি কারণে ইহার উল্লেখ করিতেছি।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের বাঁকুড়ায় তিন দিন যাপন উপলক্ষ্যে দেখিয়াছি, বাঁকুড়ার ছাত্র ও ছাত্রীগণ অসাধারণ ভিড়ের মধ্যে পূর্ণ শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছে, পুলিসের সাহায্য বিন্দুমাত্রও আবশ্যক হয় নাই, লওয়াও হয় নাই। আমরা কোথাও এক জন পাহারাওআলা দেখি নাই। যাহারা এরূপ কাজ করিতে পারিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বস্তু আছে, তাহারা অপদার্থ নহে। আমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগকে বাঁকুড়ায় (শহরের ও গ্রামসমূহের) নিরক্ষরতার অপবাদ দূর করিতে আশার সহিত অনুরোধ করিতেছি। লোকশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেনের সহিত বাঁকুড়ায় কাহারও কাহারও এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও এ বিষয়ে কাহাকেও কাহাকেও কিছু বলিয়াছেন। এ বিষয়ে যিনি যাহা কিছু জানেন, সেই পুঁজি লইয়াই কাজে প্রবৃত্ত হউন, এবং অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে ও তাহা কাজে লাগাইতে থাকুন।

বাঁকুড়া জেলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও অন্য বোর্ডগুলি এবং মিউনিসিপালিটি কয়টি সম্ভবত এ-বিষয়ে কিছু করিতেছেন। আরও কিছু কিন্তু দরকার।

—

বাঁকুড়া জেলা ইস্কুলের শতবার্ষিক উৎসব

বাঁকুড়া জেলা ইস্কুল ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান ১৯৪০ সালে ইহার শতবার্ষিক উৎসব হইবে স্থির হইয়াছে। তাহার নিমিত্ত সাধারণ কমীটি ও কার্য্যনির্বাহক কমীটি নির্বাচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে ইহাদের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় সম্পাদক। এই ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রেরা যিনি যেখানে আছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

—

বাঁকুড়ায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে কখনও বাঁকুড়া যান নাই; সম্প্রতি গিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য স্থানে গেলে, কোন কোন স্থানে—যেমন মেদিনীপুরে—তাঁহার বক্তৃতাদি কার্য্যকলাপের যেরূপ বিস্তারিত বৃত্তান্ত অনেক বাংলা দৈনিক কাগজে বাহির হইয়া থাকে, তাঁহার বাঁকুড়া গমন দর্শন ও সেখানে তিন দিন অবস্থিতির সেরূপ বিবরণ কোন দৈনিকে দেখি নাই। এই জন্য 'প্রবাসী'তে সামান্য

সেইরূপ কিছু বৃত্তান্ত দিতে হইতেছে। কারণ প্রবাসী-সম্পাদকের জন্মস্থান, বিদ্যালয়ের শিক্ষার স্থান, ও নিবাস বাঁকুড়া।

বাঁকুড়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও বর্দ্ধমান ডিবিজনের অস্থায়ী কমিশনার শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রকুমার হালদারের পত্নী রবীন্দ্রনাথের স্নেহাস্পদা শ্রীমতী উষা হালদারের নিমন্ত্রণে কয়েকটি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কবি বাঁকুড়া গিয়াছিলেন। তাঁহারাই তাঁহার বাঁকুড়া-প্রবাসকালে তাঁহার আরাম ও স্বাস্থ্যের অনুকূল সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতিথিদের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়াছিলেন।

কবি বোলপুর হইতে খানা জংশন পর্য্যন্ত রেলওয়েতে আসেন। তাহার পর তাঁহাকে মোটরে বাঁকুড়া পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার পথপ্রদর্শক ছিলেন অক্লান্তকর্ম্মী ডাক্তার পার্ব্বতীচরণ সেন। বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে যে গবেষণা হইতেছে, ডাক্তার সেন তাহার সুদক্ষ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী। তাঁহার নিষ্ঠা ও কর্ম্মিষ্ঠতার জন্য রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

খানা জংশন হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত পথে, যেখানে-যেখানে লোকে খবর পাইয়াছে সেখানেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভিড় করিয়াছিল। রাণীগঞ্জে জনতা এত বেশী হইয়াছিল যে, মোটর ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। রাণীগঞ্জে তাঁহাকে মোটরসমেত দামোদর পার করা হয়—কতক নৌকার উপর, বাকী অংশ বালুকাস্তীর্ণ নদীগর্ভের উপর দিয়া। রাণীগঞ্জের অপর দিকে মেজিয়া গ্রামের ঘাট। সেখানে তথাকার ও অন্য অনেক গ্রামের লোকেরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার গাড়ী দেখিবামাত্র শঙ্খধ্বনি ও "কবিগুরুর জয়" ধ্বনি বার-বার উত্থিত হয়। তাঁহারা সেখানে তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু গাড়ী হইতে নামাওঠা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর বলিয়া বাঁকুড়া পৌঁছিবার আগে কোথাও তাঁহাকে নামান হয় নাই। বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটির সভাপতি ও অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিসাধন দত্ত, তাহার সম্পাদক অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ মেজিয়াতে উপস্থিত ছিলেন এবং কবি রাণীগঞ্জ পৌঁছিবার আগে হইতে তাঁহাকে দামোদর পার করিবার বন্দোবস্ত পরিদর্শন করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রকুমার হালদার ও শ্রীমতী উষা হালদার "হিল হাউস" নামক কুঠিতে কবির অভ্যর্থনা-সম্বর্দ্ধনাদির বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের কন্যা কল্যাণীয়া লক্ষ্মীকে কবিকে প্রত্যুদ্গমন করিবার নিমিত্ত মেজিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মেজিয়া বাঁকুড়া হইতে সাতাশ আটাশ মাইল।

এই পথের অনেক জায়গায় গ্রামবাসীরা পত্রপুষ্প-শোভিত তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে-যেখানে পথ ঠিক গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে, সেখানে অনেক গৃহ আম্র-পল্লবাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। অনেক স্থানে গ্রামবাসীরা সারি বাঁধিয়া রাস্তার দুই দিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মেজিয়া ও বাঁকুড়ার মধ্যপথে এক জায়গায় নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অগণিত মহিলা ও পুরুষগণ তাঁহাকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছিলেন। মহিলারা দর্শন ও প্রণাম করিবার নিমিত্ত এরূপ ভিড় করিয়াছিলেন যে, মোটরের দরজা বন্ধ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক স্বতঃউদীরিত কবিত্বপূর্ণ ভাষায় তাঁহাকে ক্ষণেকের জন্য অবতরণ করিয়া গ্রামটিকে ধন্য করিতে বারবার বলিতে লাগিলেন; বলিলেন, "আমরা শতবর্ষ আপনার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি, শেষে যদি আসিলেন একবার পায়ের ধূলা দিবেন না?" কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যে পথশ্রমে অবসন্ন কবিকে মোটর হইতে নামান উচিত বা সম্ভবপর বোধ হইল না। গ্রামবাসিনী মহিলা ও গ্রামবাসী পুরুষদিগের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারা গেল না।

অবশেষে সাতাশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কবির মোটর বাঁকুড়া পৌঁছিল। তাঁহার অচিরে-শুভাগমন-বার্ত্তা প্রচারার্থ আগেই, দামোদরে তাঁহার মোটর দেখিতে পাইবামাত্র, এক জন বার্ত্তাবহকে মোটরে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পত্রপুষ্পখচিত কয়েকটি তোরণে অলঙ্কৃত, উভয় দিকে পল্লব পূর্ণঘট ও কদলীবৃক্ষে শোভিত গৃহ-শ্রেণীর মধ্য দিয়া ও শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান শত শত মহিলা ও পুরুষের জয়ধ্বনিমুখরিত রাঙা মাটির পথ বাহিয়া ধীরে ধীরে কবির মোটর অগ্রসর হইয়া ছিল

হাউসে প্রায় ২টার সময় পৌঁছিল। বহু জনতা সত্ত্বেও কোথাও বিশৃঙ্খলা হয় নাই। ইহার প্রশংসা বাঁকুড়ার ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্য। যাঁহারা তাহাদের উপর সকল বন্দোবস্তের ভার দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিশ্বাস সার্থক হইয়াছে।

হিল হাউসের বারাণ্ডা এবং কবির শয়ন ও অভ্যর্থনার কক্ষের মেঝে সুন্দর আলিপনায় অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

১৭ই ফাল্গুন কবি বাঁকুড়া পৌঁছেন। সেই দিন অপরাহ্ণে হিল হাউসে মহিলারা তাঁহার সম্বর্ধনা করেন। কয়েক জন মহিলা ও কয়েকটি বালিকা তাঁহার উদ্দেশে লিখিত কবিতা পাঠ করেন। মধ্যে মধ্যে কবির রচিত কয়েকটি গান গাওয়া হয়। তাহার পর কবি তাঁহাদিগকে যাহা বলেন, তাহাতে বাঙালী নারীদের প্রতি তাঁহার মমতা ও করুণা সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়। শেষে তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া নিজের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, কিন্তু গান করিতে রাজী হন নাই। মহিলাদের সভা কিছু দীর্ঘকালব্যাপী হইয়াছিল। ততক্ষণ কুঠির সুদীর্ঘ বারাণ্ডায় বিস্তর ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। কবিকে তাহা জানান হওয়ায় তিনি বাহিরে আসেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং আর একটি নিজের কবিতা আবৃত্তি করেন।

বাঁকুড়ার প্রদর্শনী খোলা কবির বাঁকুড়া-আগমনের অন্যতম উপলক্ষ্য ছিল। ১৮ই ফাল্গুন প্রাতে তিনি এই কার্য্য সমাধা করেন। তাহার পূর্বে, প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে বৃহৎ মণ্ডপটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে কয়েকটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। মণ্ডপে যে উচ্চ মঞ্চে কবিকে বসান হয়, তাহাতে অভিনন্দন-প্রদাতা সকলের বসিবার ব্যবস্থা শ্রীমতী ইলা দেবীর প্রস্তাব ও উপদেশ অনুসারে করা হয়। প্রথমে পৌরজনের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরিসাধন দত্ত অভিনন্দন পাঠ করেন। পরে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এবং বাঁকুড়া শিক্ষা সম্মিলনীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে আর দুটি অনুষ্ঠান হয়।

কথাশিল্পনিপুণা শ্রীমতী ইলা দেবী কবিকে মাল্য ও চন্দন প্রদান করেন এবং পরিষদের নিদর্শনী (badge)—রেশমী কাপড়ে মুদ্রিত বংশীর ছবির নীচে চণ্ডীদাসের বাণী "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—কবিকে পরাইয়া দেন। তাহার পর বাঁকুড়ার জেলা-জজ কবি শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে স্বরচিত একটি কবিতার সুন্দর আবৃত্তি করেন।

বিষ্ণুপুরের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ করও একটি কবিতা পড়িয়াছিলেন।

উত্তরে কবি দীর্ঘ একটি বক্তৃতা করেন। তাহার পর ক্লান্তি সত্ত্বেও অনুরুদ্ধ হইয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। প্রদর্শনীক্ষেত্রে যাইবার ও সেখান হইতে আসিবার পথে এবং মণ্ডপে খুব ভিড় হইয়াছিল, কিন্তু ছাত্রদের সুবন্দোবস্তে কোন বিশৃঙ্খলা হয় নাই।

১৯শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ প্রাতে প্রসূতি ও শিশুদের কল্যাণবিধায়ক একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহা শ্রীমতী উষা হালদার প্রমুখ বাঁকুড়ার মহিলাদের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে। কবি এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

অতঃপর প্রদর্শনী-মণ্ডপে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দিত করা হয়। শ্রীমতী উমা গুহ অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ এইটির রচনার প্রশংসা করিয়াছেন। অভিনন্দনপত্র পঠিত হইবার পর তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে তিনি ছাত্রদিগকে খুশি করিবার চেষ্টা করেন নাই, যাহা গণনায়কেরা অনেকে করিয়া থাকেন। তাহাদের এবং দেশের ও জাতির কল্যাণার্থ উচ্চারিত অনেক কঠোর সত্য তাঁহার বক্তৃতায় ছিল। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা তাহাতে বিন্দুমাত্রও "বিক্ষোভ প্রদর্শন" করে নাই—নীরবে সকল কথা শুনিয়াছিল। কবি পরে এই লেখককে বলিয়াছিলেন, "ছাত্রছাত্রীরা আমার কথায় ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে।" আমাদের বোধ হয়, তাহারা ক্ষুণ্ণ

হয় নাই, তাঁহার সব কথা কল্যাণকর উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পরোক্ষ প্রমাণ, তাঁহার বক্তৃতার শেষে তাঁহাকে তাহাদের পক্ষ হইতে শ্রীমতী উমা গুহের তাঁহাকে কবিতা পড়িতে অনুরোধ। উমা তাঁহাকে একটি গদ্য কবিতা পড়িতে বলেন। কবি ইহাতে প্রীত হইয়া এই লেখককে বলিয়াছেন, "ইতিপূর্বে কেহ কোন সভায় আমাকে গদ্য কবিতা পড়িতে বলে নাই।"

ছাত্র-সভার কাজ হইয়া যাইবার পর কবিকে বাঁকুড়া-সম্মিলনীর মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতাল দেখাইতে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি তাহা দেখিয়া অতীব প্রীত হইয়াছেন।

অপরাহ্নে কবির দর্শনলাভের জন্য এক দিন পুরুষদের নিমিত্ত ও এক দিন মহিলাদের নিমিত্ত ব্যবস্থা করা হয়। মহিলাদের নিমিত্ত ব্যবস্থা হয়, হিল হাউসের হাতায়। তাঁহারা একে একে প্রণাম করিয়া যান। পুরুষদের জন্য ব্যবস্থা হয় হিল হাউসের নিকটবর্ত্তী বাঁকুড়া জেলা-স্কুলের ক্রীড়াক্ষেত্রে। কবি বলিয়াছেন, এরূপ ভিড় তিনি কোথাও দেখেন নাই।

কবি কয়েক জন মুক্ত "অন্তরীনে"র, বহু ছাত্রের, কতিপয় অধ্যাপকের, এবং অন্য অনেকের সহিত লোক-শিক্ষা ও অন্যবিধ লোকহিতকর কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এই লেখক বাঁকুড়ায় কবির সমুদয় বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহার শ্রুতিলিখনের অভ্যাস না থাকায় পাঠকদিগকে বক্তৃতাগুলি উপহার দিতে পারিল না।

কবি বাঁকুড়া জেলার দারিদ্র্যের কথা অবগত আছেন। তাহার গ্রামে থাকিয়া গ্রামের সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল।

১৯শে ফাল্গুন দুপর রাত্রে তিনি বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে কলিকাতা যাত্রা করেন। তখন অনেকে বাঁকুড়ার শূন্যতা অনুভব করেন।

বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষৎ

"বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষৎ নামে একটি পরিষৎ গঠিত হইয়াছে। অনতিবিলম্বে ১৮৬০ সালের ২১ আইন মতে ইহা রেজেষ্ট্রিকৃত হইবে। স্বনামধন্য আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার সভাপতি, সুলেখিকা শ্রীমতী ইলা দেবী ইহার সহকারী সভানেত্রী এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম্ এসসী ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ. ইহার কর্ম্মসচিবদ্বয় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত বহু সাহিত্য-অনুরাগী ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ ইহার সভ্য হইয়াছেন।"

এই পরিষদ্ চণ্ডীদাস-স্মৃতিমন্দির স্থাপন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

"এই স্মৃতিমন্দিরে পুরাকৃতি-ভবন, গ্রন্থাগার, কলাশালা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ থাকিবে। পরিষদ্ রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি করিবেন। গ্রামে গ্রামে, পুঁথী, মূর্ত্তি, ইষ্টকলিপি, শিলালিপি প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য কর্মীর দল প্রেরিত হইবে এবং সেগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার সুব্যবস্থা হইবে। সেগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ব্যবস্থাও হইবে। ভূমি সংগ্রহ হইলেই সেখানে মাসে মাসে পদাবলী কীর্ত্তন হইবে ও চণ্ডীদাস-দিবসে মেলা বসান হইবে।"

"চণ্ডীদাস-স্মৃতিসৌধের নির্ম্মাণকল্পে শ্রদ্ধেয় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় ১০০১৲ (এক হাজার এক) টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তাঁহার এই সদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সভার শ্রীযুক্ত এ, পি, রায় ও শ্রীমতী রায় ২৫১৲ টাকা এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা-জজ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ১০১৲ টাকা, বাঁকুড়া জেলা-জজ শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস ও শ্রীমতী ইলা দেবী ১০১৲, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার ঘোষাল, কলিকাতা ৫১৲, অধ্যাপক জিতেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১৲, অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৲ দিবার প্রতিশ্রুতি জানান। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।"

এবার বাঁকুড়া বিবিধ প্রসঙ্গের অনেক জায়গা লইয়াছে, এই জন্য বারান্তরে বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষৎ ও চণ্ডীদাস স্মৃতিমন্দির সম্বন্ধে সমর্থনসূচক আরও অনেক কথা লিখিব।

ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের জন্মোৎসব

শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার জন্মোৎসব ফুলিয়ায় হইতেছে। ইহার জন্য এই পরিষৎ বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন। রামায়ণপাঠ ও রামায়ণের গান শ্রবণের আনন্দ ও কল্যাণ বাঙালীর এরূপ অস্থি-মজ্জাগত হইয়াছে, যে, তাহা আমরা অনেক সময় অনুভব করি না ও প্রকাশ করিতে পারি না। কিন্তু সেই হেতু তাহা অবাস্তব বা কাল্পনিক নহে।

কৃত্তিবাস-উৎসবে গত বৎসর অপেক্ষা এ-বৎসর লোক

কিছু বেশী হইয়াছিল, কিন্তু যথেষ্ট হয় নাই—যদিও ঈস্টার্ণ-বেঙ্গল রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই উৎসবে যোগ দিবার লোক বাড়িবে আশা করি।

এবার উৎসব-ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়গৃহে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুরাতন ও নূতন অনেক মুদ্রিত পুস্তক ও চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। পরে হস্তলিখিত পুঁথিও সংগৃহীত হইবে। যবদ্বীপের প্রাচীন প্রাম্বানান্ মন্দিরের প্রস্তর-প্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ ৩৪ খানি ছবির ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীর দ্বারমোচন করেন, নদীয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট লোকপ্রিয় শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে। উৎসব-সভায় সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল। তাঁহাদের অভিভাষণ ভিন্ন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। এক জন মুসলমান কবি যাহা পাঠ করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকগুলি মনোজ্ঞ কবিতা পঠিত হয়।

ভবিষ্যতে মেলা, রামায়ণের পালা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা হইবে এইরূপ আশা আছে।

—

সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণ-চেষ্টা

রাষ্ট্রীয় শক্তি যাহাদের হাতে আছে, অনেক দেশে তাহারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস করিবার বা হরণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে; নতুবা তাহাদের ইচ্ছামত কাজ করায় বাধা জন্মে। তাহাদের অজুহাত এই যে, কাগজগুলা অন্যায় বা মিথ্যা সমালোচনা করে, লোক-দিগকে অকারণ উত্তেজিত করে, অসত্য সংবাদ ছাপে, ইত্যাদি। অবশ্য সমালোচনা সঙ্গত বা অসঙ্গত, সত্য না মিথ্যা, উত্তেজনা যাহাতে হয় তাহা বাস্তব না কাল্পনিক, প্রকাশিত সংবাদ সত্য না মিথ্যা, তাহার বিচারক রাজপুরুষেরাই, ইহা উহ্য!

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস বা হরণের এই চেষ্টার প্রতিবাদ সকল দেশে স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিরা করিয়া থাকেন। এদেশেও করা হয়।

এদেশে রাজপুরুষ ছাড়া, যাঁহারা গণনেতৃত্বের দাবী করেন তাঁহাদের পক্ষ হইতে অনেকটা সরকারী অজুহাতের মত অজুহাতে কতকগুলি—বিশেষ করিয়া একটি—কাগজকে জব্দ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান জার্ন্যালিস্টস্ এসোসিয়েশনও ইহার দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার আগে ইহার বিরুদ্ধে কয়েক জন দৈনিক-সম্পাদকের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গের বাহিরে অনেক সংবাদপত্র ও নেতা ইহার নিন্দা করিতেছেন।

সরকারী বেসরকারী সকল পক্ষেরই মনে রাখা আবশ্যক যে, সমালোচনা মানুষকে ঠিক পথে থাকিতে সাহায্য করে এবং স্তুতি অপেক্ষা নিন্দা শ্রবণ কম হিতকর নহে।

—

সম্পাদকীয়প্রবন্ধহীন সংবাদপত্র

বাংলার মন্ত্রীদের পক্ষ হইতে হুকুম হয় যে, হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডে যে-সব সম্পাদকীয় লেখা আগামী তিন মাস বাহির হইবে, তাহা সরকারী সংবাদপত্র-পরামর্শদাতাকে দেখাইয়া ছাপিতে হইবে। হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড এই অপমানকর সর্ত্তে রাজী না-হইয়া সম্পাদকীয় লেখা বাদ দিয়া প্রত্যহ বাহির হইতেছে। ইহাতে তাহার আত্মসম্মান বজায় আছে, কোন ক্ষতিও হয় নাই। সম্পাদকীয় মত সম্পাদকীয় স্তম্ভ ছাড়া কাগজের অন্যত্র অন্য ভাবে বাহির হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ তাহা হইতেছেও।

যে-প্রবন্ধটির জন্য, মন্ত্রীদের মতে, হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের উপর এই হুকুম হইয়াছে, আমরা তাহা পড়ি নাই, সুতরাং তাঁহাদের অভিযোগের সত্যাসত্যতার বিচার করিতে পারি না। যে উপায় তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের লোকমত তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে।

—

"হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড"-কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধী যে বেসরকারী অপচেষ্টা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদকারী সম্পাদকদিগের বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের তদানীন্তন সম্পাদক ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন। এই অপরাধে (?) ঐ কাগজের কর্তৃপক্ষ উহার সম্পাদকীয়

কাজের ভার তাঁহার হাতে আর থাকিবে না, এই আদেশ দেন। ধীরেন্দ্রবাবু তাহাতে ঐ কাগজের সংশ্রবই ত্যাগ করিয়াছেন—ঠিকই করিয়াছেন।

সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের ও সম্পাদকের অধিকার কি কি, সে বিষয়ে আমরা এক্ষেত্রে কোন আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি না। আমরা দেখিতেছি, ধীরেন্দ্রবাবু যে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্পাদিত হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের সম্পাদকীয় লেখা নহে। সেই কাগজে তিনি যাহা লিখিবেন, যদি ইহা মানিয়া লওয়া হয় যে তাহা উহার কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ মনোমত হওয়া উচিত, তাহা হইলেও ইহা মানিয়া লওয়া যায় না যে, উহার সম্পাদক অন্যত্র অন্য উপায়ে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। এই কারণে আমরা হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশের সমর্থন করি না।

—

শান্তিনিকেতনে গান্ধীজী

শান্তিনিকেতনে গান্ধীজী বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। কিছু দেখাশুনার কাজও করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে অনেক সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে; যাহা হয় নাই ও তাহার মধ্যে আমরা যাহা জানি তাহা প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না,—যদিও প্রকাশ করিলে গান্ধীজীর বা অন্য কাহারও অগৌরব বা ক্ষতি হইত না।

গান্ধীজীর বয়স ৭০এর উপর। কিন্তু, দেখিলাম, তিনি চলাফিরা করেন দ্রুত, কাজ করেন দ্রুত। কাজ করেনও অনেক। এই শক্তি কোথা হইতে আসে?

তিনি মিতাহারী, সংযমী, দৈহিক ও মানসিক অপচয় ও ক্ষয় যাহাতে না-হয় তাহার সর্ববিধ উপায় তিনি অবলম্বন করিয়া থাকেন। ভগবানে বিশ্বাস তাঁহাকে চিত্তবিক্ষোভ ও অবসাদ হইতে রক্ষা করে।

তিনি আগেকার মতই পরিহাসরসিক আছেন।

বোলপুর স্টেশনে তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যর্থ চেষ্টা কয়েক জন লোক করিয়াছিল, কিন্তু সর্বসাধারণ নানা প্রকারে তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়াছিল।

যাঁহারা তাঁহার সহিত একমত নহেন, যাঁহারা তাঁহার মতকে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর মনে করেন, তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস বৈধ ও ভদ্র উপায়ে প্রকাশ করিবার অধিকার তাঁহাদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু অভদ্র আচরণ সর্বথা ও সর্বদা নিন্দনীয় ও পরিহার্য। শত্রুর প্রতিও অভদ্র আচরণ গর্হিত।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা সার্বজনিক কর্মী (puklic men), তাঁহারা যত্র তত্র সর্বত্র সার্বজনিক কর্মী নহেন। সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে যদি "বিক্ষোভ প্রদর্শন" করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যখন সার্বজনিক কর্ম করিতে যাইবেন ও করিবেন, তখন তাহা করাই সঙ্গত। গান্ধীজী এরূপ কোন কাজে শান্তিনিকেতন যান নাই—রাজনৈতিক কাজ বা আলোচনাতে ত নহেই। সুতরাং সেই উপলক্ষ্যে "বিক্ষোভ প্রদর্শনে"র ব্যর্থ চেষ্টাটা দেশকালোচিত ত হয়ই নাই, বস্তুতঃ মাঠে মারা গিয়াছে।

—

মালিকান্দার পথে ও মালিকান্দায়

মালিকান্দায় এবার গান্ধী-সেবাসংঘের সম্মেলন বা মন্ত্রণাসভা হইয়া গিয়াছে। মালিকান্দা যাত্রার পথে ও সেই গ্রামে "বিক্ষোভ প্রদর্শন"টা খুবই হইয়াছে—এবং অভদ্র ও গর্হিত রকমের হইয়াছে। কংগ্রেসীরা অনেকে শিয়ালদহ স্টেশনে ও মালিকান্দা যাতায়াতের পথে মারপিট করিয়াছিল। আমরা এসব লজ্জাকর ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী নহি। উভয় পক্ষের কাগজ পড়িয়া আমাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, গুণ্ডামি বামপন্থী দক্ষিণপন্থী উভয়েই করিয়াছিল। কোন্‌-পক্ষীয় গুণ্ডারা সংখ্যায় বেশী বা "গুণ (?) অনুসারে" ("in order of merit" (?)) প্রধান ছিল বলিতে পারি না। কোন দলেরই নহেন আমাদের বিশ্বাসভাজন এমন এক জন কংগ্রেসী লিখিয়াছেন যে, গান্ধীজীর তথাকথিত অনুচর অনেক হিন্দুস্থানী যে অনেক বাঙালীকে মারিয়াছিল, তাহা গান্ধীজীকে জানান হইয়াছে।

মালিকান্দায় "বিক্ষোভ প্রদর্শন" অত্যন্ত লজ্জাকর ও দুঃখকর রূপও ধারণ করে। যথা, ঘরে আগুন লাগান, ছোরা মারা। এই প্রকার বিক্ষোভকেরা অহিংস স্বরাজ-সংগ্রাম চালাইবার যোগ্য কি প্রকারে বিবেচিত হইতে পারে, জানি না।

ইহা নিশ্চয়, যে-কারণেই হউক বাংলা দেশে গান্ধী-বিরোধিতা আছে। তাহা অনুগ্র ও উগ্র দুই রকমেরই। বিরোধিতা প্রকাশ করিবার অধিকার গান্ধীজী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহার প্রকাশ হইতে তিনি শিক্ষণীয় যাহা তাহা উপলব্ধিও করিয়া থাকিবেন।

মালিকান্দায় গান্ধী-বিরোধিতা যেমন প্রকাশ পায়, গান্ধীজীর অনুবর্তিতাও সেইরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। গান্ধী-সেবাসংঘ-সম্মেলনের নিমিত্ত ত্রিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ব্যয় বাদে আঠার হাজার টাকা সংঘের কাজের জন্য গান্ধীজীর হাতে দেওয়া হইয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূর হইতে তাঁহার দর্শনপ্রার্থী বহু লোক

আসিয়াছিল। তিনি মালিকান্দা হইতে চলিয়া আসিবার পূর্বে যে সভা হয়, তাহাতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার নিমিত্ত ত্রিশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

কোন দলভুক্ত নহেন এরূপ এক জন প্রকৃত দেশসেবক কংগ্রেসী মালিকান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'প্রবাসী'র সম্পাদককে লিখিত একখানি ব্যক্তিগত চিঠিতে অনেক দুঃখের ও লজ্জার কথা লিখিয়াছেন। একটি এই :—

"আসিবার সময় শেষরাত্রে রাণাঘাটে কতকগুলি ছেলে তাঁহার (গান্ধীজীর) জানালার পাশে তারস্বরে স্লোগ্যান (slogan) দিতে লাগিল। কস্তুরী বাঈয়ের তখন জ্বর। কাতর স্বরে তিনিও নিবেদন করিলেন চীৎকার না করিতে। কেহ শুনিল না। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ—তাঁহার রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবারও কি অধিকার নাই? দেশসেবার প্রায়শ্চিত্ত কি এতই কঠিন? অন্ধকারে পাষাণের মত নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম বাংলার শোচনীয় অধোগতির কথা। আমাদের সংস্কৃতি গেল কোথায়?" ইত্যাদি।

লেখকের চিঠির শেষ বাক্যগুলি হইতে কিছু সান্ত্বনা লাভ করা যায়। যথা—

"আনন্দের বার্তা একটু আছে। বাংলা দেশের নারী জাতি এখনও ঠিক আছে। মালিকান্দায় পল্লীর ভগিনীরা আমাদিগকে ছয় দিন স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। প্রতিদিন তিন বার খাওয়া, আর এক এক বারে হাজার জন। বাংলা দেশের বাহির হইতে আসিয়াছিলেন যাঁরা, তাঁদের চিত্তকে গলাইয়া দিয়াছে আমাদের মেয়েদের কল্যাণহস্তের শুশ্রূষা।"

—

গান্ধী-সেবাসংঘের কর্মীদের রাজনীতি বর্জন

গান্ধীজীর উপদেশ অনুসারে গান্ধী-সেবাসংঘের কর্মীদিগকে অতঃপর রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে। বস্তুতঃ সংঘকে এখন তিনি এক প্রকার উড়াইয়াই দিলেন বলিতে হইবে। সংঘের কেবল একটি কমীটি ও তাহার কতিপয় সভ্য রহিলেন, সাধারণ বহুসংখ্যক অপর যে সভ্য ছিলেন তাঁহারা সংঘভুক্ত রহিলেন না।

রাজনীতি বর্জনের উপদেশের কারণ ও সংঘ ভাঙিয়া দিবার কারণ গান্ধীজী যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাগজে বাহির হইয়াছে। পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। শিক্ষার বিস্তার, কুটীরশিল্পের বিস্তৃতি ও উন্নতি, পল্লীগ্রামসমূহের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও রোগীদের চিকিৎসা ও সেবার কাজ—এইরূপ কাজ যাঁহারা করিতে চান, তাঁহাদের সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত সম্পর্ক রাখা যে ক্ষতিকর বা অনুচিত, তাহার একটা কারণ আমাদের এই মনে হয় যে, সাধারণ মানুষদের পক্ষে এক রকম কাজে আত্মোৎসর্গই ভাল; রাজনৈতিক প্রচেষ্টা মাত্রেই মন্দ নহে, যাঁহাদের ইচ্ছা তাঁহারা সেরূপ প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত থাকিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা যদি আবার অন্য কাজও করিতে চান, তাহা হইলে রাজনীতির নেশা উত্তেজনা ও তাহাতে প্রসিদ্ধ ও প্রশংসিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকায় তাঁহারা তাহাতেই বেশী মন দিবেন, অন্য কাজটি উপেক্ষিত ও অবহেলিত হইবে। অতএব যাঁহারা রাজনীতি করিতে চান তাঁহারা রাজনীতিই করুন, অন্য কাজ করিতে চান অন্য কাজই করুন; দুইটাই করিবার চেষ্টা করিবেন না।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলি। গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম ও শান্তির জন্য গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি পৌঁছিলে অন্যান্য কথার মধ্যে কবি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন রাজনীতি ছাড়িয়া দিয়া শান্তিতে থাকিতে। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, রাজনীতি ছাড়িয়া দিলে তাঁহার আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন থাকিবে না। উভয়ের কথা সম্পূর্ণ বা অংশতঃ পরিহাসাত্মক, কিংবা উভয়েই পুরাপুরি গম্ভীর ভাবে ঐ ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানি না, তাহার আলোচনা করিব না। কে কি অর্থে রাজনীতি শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও জানি না। কিন্তু উভয়ের কথাগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি বাংলা সাপ্তাহিক রবীন্দ্রনাথের উপকারার্থ রাজনীতির মূল্য ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দীর্ঘ লেকচার ঝাড়িয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে, গান্ধীজী নিজে রাজনীতি বর্জন না করিলেও গান্ধী-সেবাসংঘকে রাজনীতি ছাড়াইয়াছেন এবং কংগ্রেসীরা "গঠনমূলক" কার্য না করিলে এবং অহিংসা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রমাণ না দিলে তিনি তাঁহাদের নেতৃত্ব করিবেন না বলিয়াছেন। "গঠনমূলক" কাজগুলি রাজনীতিপদবাচ্য নহে, এবং বামপন্থী ও দক্ষিণ-পন্থীদের রাজনীতির সহিত হিংসা ও হট্টগোল যেরূপ জড়িত, তাহাতে তাঁহাদিগকে অহিংস ও নিয়মানুবর্তী হইতে বলা তাঁহাদের-আচরিত-রাজনীতি বর্জন করিতে বলার সমতুল্য।

—

বালীগঞ্জে হিন্দুজনসভায় গৃহীত প্রস্তাবত্রয়

গত ২৩শে ফাল্গুন বালীগঞ্জে হিন্দুজনসভায় সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল।

১। বাংলার বিভিন্ন জেলার হিন্দু প্রতিনিধি ও কলিকাতার হিন্দু নাগরিকগণের এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বিপন্ন

বাঙালী হিন্দুর সর্ব্বাঙ্গীন আত্মরক্ষাকল্পে একটি সুনিয়ন্ত্রিত রক্ষী দল গঠন করা হউক এবং ১৫ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক প্রত্যেক হিন্দু এই রক্ষীদলভুক্ত হউন।

২। বাংলার নানা স্থানে ক্রমাগত অধিকসংখ্যক দেবমন্দির ও বিগ্রহের লাঞ্ছনা ও নারীহরণ ও ধর্ষণের জন্য উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হইয়া এই সম্মেলন উহার প্রতিকারকল্পে এই প্রস্তাব করিতেছে যে বাংলার বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী বোর্ড গঠিত হউক :—

(ক) এই বোর্ড বিভিন্ন স্থানের দেবমন্দির ও বিগ্রহের লাঞ্ছনা ও নারীহরণ ও ধর্ষণের সংবাদ সংগ্রহ ও তদন্ত করিবার ব্যবস্থা করুন।

(খ) উক্ত বিষয়ক মামলা-মোকদ্দমাগুলি বিনা অর্থব্যয়ে হিন্দু উকীল মোক্তারগণের দ্বারা করিবার বন্দোবস্ত করুন।

৩। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে বাংলার বিপন্ন হিন্দুর আত্মরক্ষার্থ যে মিলন-মন্দির কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, এই সম্মেলন তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছে; এবং বাংলার গ্রামবাসী নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা স্ব স্ব গ্রামে হিন্দু-মিলনকে স্থাপনপূর্ব্বক সঙ্ঘের বঙ্গীয় হিন্দু মিলন-মন্দিরের সহিত যুক্ত করিয়া লউন।

যেরূপ স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে, সেই রূপ কাজ যে একান্ত আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা দেশে যখন ব্যায়ামের নিমিত্ত বহু সমিতি স্থাপিত হয়, তখন সেগুলিকে সন্দেহ ও আশঙ্কার চক্ষে দেখা হইত, এখনও যে হয় না তাহা বলা যায় না। তথাপি সেগুলি আবশ্যক বলিয়া যেমন সমর্থনযোগ্য, সেইরূপ রক্ষী-বাহিনীও সমর্থনযোগ্য, যদিও তাহার সম্বন্ধেও নানা কথা উঠিবে। কিন্তু রক্ষা ত চাই। হিন্দুরা আপনাদিগকে রক্ষা না করিলে অন্য কে রক্ষা করিবে? কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, রক্ষীদল দ্বারা রক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক ও অস্থায়ী অবস্থা। স্থায়ী শান্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সদ্ভাবের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে এই শ্রদ্ধা ও সদ্ভাবের উপযুক্ত হইতে এবং পরস্পরকে জানিতে হইবে।

"ব্রিটিশ বেয়নেট প্রকৃত শান্তির অন্তরায়"

বোম্বাই, ৯ই মার্চ্চ

কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর ক্ষমতা ব্রিটিশ বেয়নেটের সাহায্যেই রক্ষা পাইয়াছিল, এই মন্তব্য সমর্থন করিতে আমি আদৌ অসুবিধা বোধ করিতেছি না, অদ্যকার "হরিজন" পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

এক জন পত্রলেখক মহাত্মাজীকে লিখিয়াছেন, "ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট যেদিন দেশকে রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবেন, সেইদিন সর্ব্বদলীয় কোন গবর্ন্মেণ্ট না থাকিলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পথই প্রশস্ত হইবে।" ঐ পত্রে আরও বলা হইয়াছে যে "আপনার অহিংস নীতি কংগ্রেসকে মন্ত্রীত্বের গদীতে রাখে নাই, আপনার ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড প্রভাব এবং ব্রিটিশ বেয়নেটই তাহা রাখিয়াছে।"

পত্রলেখকের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন, "আমার ব্যক্তিত্বের প্রভাব নির্ব্বাচনে জয়লাভে হয়ত কিছু সাহায্য করিয়া থাকিবে। কিন্তু মন্ত্রীদের গদীতে রাখার ব্যাপারে ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ব্রিটিশ বেয়নেটই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।"

মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন যে, "ইহার প্রতিকার সর্ব্বদলীয় গবর্ন্মেণ্ট নহে। কারণ ইহা জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত গণতন্ত্র-মূলক গবর্ন্মেণ্ট হইবে না। ইহা হইবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের গবর্ন্মেণ্ট। এই গবর্ন্মেণ্ট-কেও ব্রিটিশ বেয়নেটের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। ব্রিটিশ বেয়নেট সরাইয়া না লইলে দেশে মানবের কাম্য কোন শান্তি আসিতে পারে না। দাঙ্গার আশঙ্কাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে এবং অহিংস নীতি যদি আদৌ জাতীয় জীবনের একাংশ হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিপদের মধ্য হইতেই অহিংসা জন্ম লাভ করিবে। প্রতিদিন ইহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে যে, যত দিন ব্রিটিশ বেয়নেট দেশের জনসাধারণের স্বাধীন মনোভাবকে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিবে, তত দিন সত্যিকারের ঐক্য আসিবে না। যে শান্তি চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা কবরের শান্তি। স্বাধীনতার মূল্য যদি দাঙ্গা হয়, আমার মনে হয় সেই দাঙ্গা সাদরে বরণীয় হইবে। কারণ সেই অবস্থা হইতেই আমি প্রকৃত শান্তি আনিবার সম্ভাবনা কল্পনা করিতে পারি। বর্ত্তমান অবাস্তব অবস্থা হইতে তাহা সম্ভব নহে। এক দিকে দাঙ্গা এবং অপর দিকে ব্রিটিশ বেয়নেট এই উভয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র পথ অকপটভাবে অহিংস নীতি গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত এবং দেহাবসানের পরও ইহার সম্ভাবনা ও শক্তির উপর আমার বিশ্বাস থাকিবে।"—এ পি

"চিত্রাঙ্গদা" ও "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য

"চিত্রাঙ্গদা" ও "চণ্ডালিকা" এই দুটি নৃত্যনাট্যের অভিনয় আমরা একাধিক বার দেখিয়াছি। সম্প্রতি বাঁকুড়াতেও দেখিয়াছি। উভয় নাট্যেরই অভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। শান্তিনিকেতনে গান্ধীজী "চণ্ডালিকা"র অভিনয় দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই নাট্যটি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী এবং ইহা দ্বারা হৃদয় নিম্নস্তর হইতে আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। সকল মানুষের মধ্যে যে সাধারণ মানবত্ব রহিয়াছে, ইহা হইতে তাহা উপলব্ধ হয়।

আইন অমান্য কখন করা হইবে

বোম্বাই, ৯ই মার্চ

মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার "হরিজন" পত্রে "কখন?" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হইল :—

"আমি দেশকে আইন অমান্য করিতে আহ্বান করিব কিনা ইহা কেহ জিজ্ঞাসা করেন না; প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করেন, কখন্ আমি দেশকে আইন অমান্য করিতে আহ্বান করিব। প্রশ্নকারীদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত ধীর-মস্তিষ্ক সহকর্মী, অল্পদিনের মধ্যেই সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, তাঁহাদের নিকট ইহা ব্যতীত ওআর্কিং কমিটির পাটনা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের আর কোন অর্থ নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দেশ কিংবা দেশের যে অংশ এ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়াছে সেই অংশ অপেক্ষা করিয়া এবং দোটানায় থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য যে-কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, দেশে এরূপ লোকের সংখ্যা এত অধিক, ইহা চিন্তা করাও উৎসাহপ্রদ।

"আমি প্রশ্নকারীদের উৎসাহের প্রশংসা করিলেও তাঁহাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিতেছি যে, তাঁহারা যেন অধীর না হন। প্রস্তাবে এরূপ কিছু নাই যদ্দ্বারা বিশ্বাস জন্মিবে যে, বর্ত্তমান আবহাওয়া আইন-অমান্য আরম্ভ করিবার উপযোগী। কংগ্রেসের ভিতর যখন এত অধিক পরিমাণে হিংসা ও বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে, তখন আইন-অমান্য আরম্ভ করা আত্মহত্যার সমতুল্য হইবে। কংগ্রেসসেবিগণ যদি আমার কথার উপর পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা গুরুতর ভুল করিবেন। কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অহিংসা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা বর্ত্তমান, এ বিষয়ে যে পর্য্যন্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবে, সে পর্য্যন্ত আমি ব্যাপক আইন-অমান্য আরম্ভ করিতে পারি না এবং করিব না। গঠনমূলক কার্য্যতালিকা অর্থাৎ সুতাকাটা ও খাদি-বিক্রয় বিষয়ে ঔদাসীন্যকে আমি অবিশ্বাসের সুস্পষ্ট লক্ষণ বলিয়া মনে করি। এইরূপ যন্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের জানা উচিত যে, আমি তাঁহাদের দলের লোক নহি। যদি আবশ্যক পরিমাণ অহিংসা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা লাভের কোন আশা না থাকে, তাহা হইলে আমাকে নেতৃত্ব-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ হইবে।

"আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতে চাই যে, আমাকে সময়ের পূর্ব্বেই তাড়াহুড়া করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিতে বাধ্য করা যাইবে না। যাঁহারা মনে করেন যে, আমি তথাকথিত বামপন্থীদের তাড়নায় বা চাপে আইন-অমান্য আরম্ভ করিব, তাঁহারা গুরুতর ভুল করেন। আমি দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীর মধ্যে এরূপ কোন পার্থক্য করি না। উভয়েই আমার বন্ধু ও সহকর্ম্মী। যিনি দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীর মধ্যে পার্থক্য কতকটা নিশ্চিত ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন তিনি সাহসী ব্যক্তি। কংগ্রেসসেবিগণ এবং অতিরিক্ত ব্যক্তিগণ ইহাও জানিয়া রাখুন যে, যদি সমগ্র দেশ আমার বিরোধী হয়, তাহা হইলেও সময় আসিলে আমি একাকীই যুদ্ধ করিব। অপরাপর লোকদের অহিংসা ব্যতীত অপর অস্ত্র আছে কিংবা থাকিতে পারে, আমার পক্ষে অন্য কোন পন্থা নাই। যেহেতু আমি রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংস সমরকৌশলের উদ্ভাবনকারী, সেইহেতু আমি অন্তর হইতে আহ্বান অনুভব করা মাত্র যুদ্ধ করিতে বাধ্য।

"এই কৌশলের অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব এই যে, কখন সংগ্রাম আরম্ভ হইবে তাহা আমি কখনও পূর্ব্বে জানিতে পারি না। যে কোন সময়ে উহার আহ্বান আসিতে পারে। ইহাকে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ বলিয়া বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই। অন্তরের আহ্বান সহজবোধ্য প্রচলিত শব্দ। প্রত্যেকেই কোন কোন সময়ে অন্তরের আহ্বানে কাজ করিয়া থাকে। এইরূপ কাজ সর্ব্বদাই নির্ভুল না হইতে পারে। কোন কোন কাজের সম্বন্ধে অপর কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে।

"অনেক সময়ে আমার মনে হয় যে, কংগ্রেস যদি আমাকে ভুলিতে পারিত তাহা হইলে ভাল হইত। আমি সময় সময় ইহা নিশ্চয়ই অনুভব করি যে, জীবন সম্বন্ধে আমার মতামত অদ্ভুত বলিয়া আমি কংগ্রেসে একজন খাপ-ছাড়া মানুষ। কংগ্রেস ওদেশের ব্যবহারে লাগিতে পারে আমার এরূপ বিশেষ গুণপনা যাহাই থাকুক না কেন, তৎসমুদয় হয়ত আমি কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইলে আরও উৎকৃষ্টভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু আমি জানি যে কলে কিংবা বলে এই বিচ্ছেদ সংঘটন করা যায় না। উহাকে যদি আসিতে হয়, তবে উহার সময় হইলে আসিবে। কংগ্রেসসেবীদের জানা উচিত যে, আমার ক্ষমতার সীমা আছে। তাঁহারা যদি আমাকে দৃঢ় ও অনমনীয় দেখেন, তাহা হইলে যেন ব্যথিত কিংবা বিস্মিত না হন। আমি যখন বলি যে, ব্যাপক আইন-অমান্য আরম্ভ করিবার সর্ত্তসমূহ পূরণ করা না হইলে আমি কাজ করিতে অক্ষম, তখন তাঁহারা আমাকে বিশ্বাস করুন।" —এ, পি

—

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরের এই বৎসরের পারিতোষিক বিতরণ-কার্য্য শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ার সভানেত্রীত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার অভিভাষণে তিনি নারীধর্ম্মে মাতৃত্বের যথাযোগ্য উচ্চস্থান এবং সন্তানধর্ম্মে আচরণগত মাতৃভক্তির যথোচিত উচ্চস্থান নির্দ্দেশ করেন। ছাত্রীদের দ্বারা মূক অভিনয়গুলি সুন্দর হইয়াছিল। তাহার একটির ফোটোগ্রাফ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

—

যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ

গত ২৫শে ফাল্গুন জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের

সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠান শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে উপাধিপত্র প্রদত্ত হয়। তাহার পর দত্ত মহাশয় তাঁহাদিগকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করেন। পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি আলেখ্যের আবরণ উন্মোচিত হয়।

এই বৃহৎ স্বাবলম্বী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গের গৌরব এবং ভারতে অনতিক্রান্ত। ইহার সম্বন্ধে দেশের লোকদের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তার আবশ্যক। সর্ রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ দানবীরগণ ইহাকে বহু লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার তাহা অপেক্ষাও অধিক টাকা আবশ্যক। কারণ যান্ত্রিক শিক্ষা নিত্য নব-উদ্ভাবিত যন্ত্র সংগ্রহ ও অন্য বহু যন্ত্র উদ্ভাবন সাপেক্ষ বলিয়া বহু ব্যয়সাধ্য।

ইহার সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানের পর "প্রতিষ্ঠাতা দিবস" শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার দু-একটি মন্তব্য উপরে দেওয়া হইয়াছে।

—

"হুগলী ব্যাঙ্কের প্রশংসনীয় উদ্যম"

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে হুগলী ব্যাঙ্কের বেলুড় শাখা খোলা উপলক্ষ্যে ব্যবসাবাণিজ্য-সম্বন্ধীয় সুপরিচালিত সাপ্তাহিক 'আর্থিক জগৎ' "হুগলী ব্যাঙ্কের প্রশংসনীয় উদ্যম" নাম দিয়া যে-সব মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কের সুযোগ গ্রহণ করার অভ্যাস গঠিত না হইলে কোন দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে না। আমাদের দেশে অল্পআয়বিশিষ্ট জনসাধারণের ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখা এবং চেকের মারফত লেনদেন করার অভ্যাস নাই—সুযোগও অল্প। কাজেই অল্পআয়সম্পন্ন জনসাধারণ যাহাতে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখে এবং চেকের মারফতে লেনদেনে অভ্যস্ত হয় তদ্বিষয়ে আমাদের দেশের ব্যাঙ্কপরিচালকগণের চিন্তাভাবনা করা আমরা বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। সম্প্রতি হুগলী ব্যাঙ্কের বেলুড় শাখা উদ্বোধন কালে উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি, এন্ মুখার্জ্জী এম-এল-এ যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহাতে এইরূপ একটি নূতন পথের ইঙ্গিত রহিয়াছে। মিঃ মুখার্জ্জী বলেন যে, সাত বৎসর পূর্ব্বে উত্তরপাড়াতে হুগলী ব্যাঙ্কের প্রথম শাখা স্থাপিত হয় এবং এই কয়েক বৎসরে উত্তরপাড়ার ১৯ শত অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৬০ জনই ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিতে উৎসাহ বোধ করিয়াছে এবং আমানতকারীদের অনেকেই বর্ত্তমানে চেক দ্বারা ধোপা, গয়লা এবং ভৃত্যের বিল মিটাইয়া দিতেছে। গত বৎসর উক্ত শাখার আমানতকারিগণ ১৭ লক্ষ টাকার ১৩ হাজার চেক কাটিয়াছে এবং তাহাদের পক্ষ হইতে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সাড়ে সাত লক্ষ টাকার ৫ হাজার চেক সংগৃহীত হইয়াছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে উক্ত উত্তরপাড়া শাখা ব্যাঙ্কের যে উৎসব হয়, তাহাতে আমি প্রথম সর্বসাধারণের মধ্যে তাহার "ব্যাঙ্ক-মুখিতা"-উন্মেষ চেষ্টার কথা জানিতে পারি। সেই সময়ে আমাদের দেশের লোকদের যে বহু কোটি টাকা ডাকঘরে গচ্ছিত থাকে, তাহার কথা ভাবিয়া বালীতে ও নবদ্বীপে সে বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলাম। সেইরূপ কিছু নীচে লিখিতেছি।

—

ডাকঘরে গচ্ছিত টাকা ভারত-কল্যাণে অব্যবহৃত

ডাকঘর-সমূহের সেভিংস ব্যাঙ্কে এবং তাহার ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় বাবতে ভারতবর্ষের অল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত লোকদের কত কোটি টাকা যে গচ্ছিত থাকে, সে-বিষয়ে দেশের লোকদের সাধারণতঃ কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। সেই জন্য তদ্বিষয়ক কিছু তথ্য নীচে দিতেছি। ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের গচ্ছিত টাকার হিসাব ভারতবর্ষের টাকার সঙ্গে মিলাইয়া দেখান হয়। তাহার পর হিসাব আলাদা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের টাকা ভারতবর্ষের তুলনায় সামান্য।

ক্যাশ সার্টিফিকেটের ও সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা বৎসরের শেষে গবর্মেণ্টের হাতে যত ছিল, তাহাই দেখাইব, প্রথম কত দেওয়া হয় ও কত উঠাইয়া লওয়া হয়, স্থানাভাবে তাহা দেখাইব না। অঙ্কগুলিতে কমার আগের সংখ্যা কোটি-জ্ঞাপক, কমার পরবর্তী সংখ্যা লক্ষ-জ্ঞাপক।

ডাকঘরের ক্যাশ সার্টিফিকেটের টাকা

বৎসর।	টাকা।
১৯২৯-৩০	৩৫,০০
১৯৩০-৩১	৩৮,৪৩
১৯৩১-৩২	৪৪,৫৮
১৯৩২-৩৩	৫৫,৬৪
১৯৩৩-৩৪	৬৩,৭১
১৯৩৪-৩৫	৬৫,৯৬
১৯৩৫-৩৬	৬৫,৯৮
১৯৩৬-৩৭	৬৪,৪০
১৯৩৭-৩৮	৬০,২১
১৯৩৮-৩৯	৫৭,৫৭

ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা

বৎসর।	টাকা।
১৯২৯-৩০	৩৭,১৩
১৯৩০-৩১	৩৭,০২
১৯৩১-৩২	৩৮,২০
১৯৩২-৩৩	৪৩,৬৫
১৯৩৩-৩৪	৫২,২৫
১৯৩৪-৩৫	৫৮,৩০
১৯৩৫-৩৬	৬৭,২৫
১৯৩৬ ৩৭	৭৪,৬৮
১৯৩৭-৩৮	৭৭,৫৬
১৯৩৮-৩৯	৮১,৯৪

ডাকঘরের ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনিবার নিমিত্ত এবং তাহার সেভিংস ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ের নিমিত্ত দেশের লোক ক্রমশঃ কত বেশী বেশী টাকা গবর্মেণ্টের হাতে দিতেছে, তাহা উপরের তালিকা দুটি হইতে জানা যাইবে। তাহারা অধিকাংশ স্থলে অল্পবিত্ত লোক। তাহারা ইহার জন্ম সামান্ত কিছু সুদ পায় বটে এবং টাকাটা নিরাপদ থাকে। কিন্তু ভারতীয় মহাজাতি ইহা হইতে অন্য কোন সুবিধা পায় না। সুবিধা পায় ইংরেজ বণিকেরা। অল্প সুদে ভারত-সচিবের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া তাহারা ব্যবসাবাণিজ্যসূত্রে ভারতের ধন শোষণ করে। গরীব আমাদের টাকাই আমাদের শোষণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে ডাকঘরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় ও সেভিংস ব্যাঙ্কে সঞ্চয় উভয় খাতে ব্রিটিশ সরকারের হাতে গরীব আমরা রাখিয়াছিলাম ১৪১,৫১,০০,০০০ (এক শত এক চল্লিশ কোটি একান্ন লক্ষ) টাকা! এই প্রভূত অর্থ ভারতের দেশী ব্যাঙ্কগুলিতে থাকিলে, অর্থের মালিকরা সুদ পাইতেন, অধিকন্তু ব্যাঙ্ক-সমূহে যাহা গচ্ছিত থাকিত তাহা দেশের লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটিত, এবং ব্যাঙ্কগুলিও কিছু মুনফা অর্জন করিতেন।

এইরূপ সুফল লাভের জন্ম আবশ্যক দেশী ব্যাঙ্কগুলির সততা ও স্থায়িত্বে দেশের লোকদের বিশ্বাস উৎপাদন, অল্পবিত্ত লোকদেরও ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস জন্মান, এবং ব্যাঙ্কগুলির অল্প টাকার হিসাব খুলিতে রাখিতে ও অল্প টাকার চেক ভাঙাইতে সম্মতি। শেষোক্ত কাজগুলিতে ব্যাঙ্কের পরিশ্রম বাড়ে কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা বা দায়ঝুঁকি বাড়ে না। হুগলী ব্যাঙ্ক যে এই শ্রমসাধ্য কাজের ভার লইয়া দেশহিতের একটি নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। এই পথের পথিক যে এই ব্যাঙ্কই থাকিবেন, এমন নয়; অন্যান্য কোন কোন ব্যাঙ্কও এই চেষ্টা করিবেন এরূপ আশা আছে। কিন্তু সকলেরই নির্ভরযোগ্যতা গোড়াকার কথা।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী "হরিজন" পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি উহাকে অত্যন্ত অনিষ্টকর মনে করেন এবং উহার উচ্ছেদ চান। কিন্তু কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি ঐ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন ও যাহা করেন নাই তাহার সমর্থন করিতে গিয়া তিনি (বিশ্বাস করিতে চাই, অজ্ঞাতসারে ও অনভিপ্রেত ভাবে,) ওআর্কিং কমীটির পক্ষে কিছু 'বিশেষ ওকালতী' ('special pleading') করিয়াছেন মনে হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "কোন কয়েদীর তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত দণ্ডবিধায়ক রায় গ্রহণ বা বর্জনের কথা উঠে না. সে যদি বলে, উহা আমি চাই না, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার ভ্রম ভাঙিবে।" সত্য কথা। কিন্তু কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির অবস্থা ঠিক দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মত ছিল না। কমীটির সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত অংশতঃ গ্রহণ বা অ-গ্রহণের দুটা সময় ও সুযোগ আসিয়াছিল। কমীটি বলিতে পারিতেন, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রচিত ভারতশাসন-আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভ্যপদপ্রার্থী কংগ্রেসীরা কেহই হইবে না, তাহারা উহার সহিত সংস্রব রাখিবে না। কমীটির এরূপ নির্ধারণের সুযোগ ছিল, কিন্তু কমীটি কংগ্রেসীদিগকে ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, কমীটি ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনান্তে বলিতে পারিতেন, যদিও কংগ্রেসী সভ্যেরা অধিকাংশ প্রদেশের ব্যবস্থাপক-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন না। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বা অ-গ্রহণ তাঁহাদের স্বেচ্ছাধীন ছিল। কিন্তু তাঁহারা গ্রহণেরই অনুমোদন করেন। কংগ্রেসীদের ব্যবস্থাপক সদস্য. নির্বাচিত হওয়া বা মন্ত্রী হওয়া ভাল বা মন্দ হইয়াছিল, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে, নির্বাচন ও মন্ত্রিত্বগ্রহণ উভয়ই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্মিত ভারতশাসন বিধির অংশ, সেই অংশের সহিত সংস্রব রাখা না-রাখা কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির স্বেচ্ছাধীন ছিল, এবং কমীটি সংস্রব রাখাই স্থির করেন। কোন কয়েদীর জেলবিধির সহিত সংস্রব রাখা না-রাখার সে স্বাধীনতা থাকে না, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত যে দ্বিবিধ স্বাধীনতা কংগ্রেস কমীটির ছিল।

অতএব গান্ধীজীর তুলনাটা ঠিক হয় নাই।

তাঁহার এ উক্তিও ঠিক নহে যে, বাংলা দেশ সিদ্ধান্তটাকে যতটা গ্রহণ ও অ-গ্রহণ করিয়াছে, ওআর্কিং কমীটিও ততটা করিয়াছে—যদিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, কমীটি সিদ্ধান্তটার বিরুদ্ধে বঙ্গের মত আন্দোলন করেন নাই। কমীটির পক্ষে একটা কথা বলা যাইত যাহা গান্ধীজী বলেন নাই,—কমীটি জাতীয় কারণ দেখাইয়া ("on national grounds") সিদ্ধান্তটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে বঙ্গের কংগ্রেসীদিগকে অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহারা কংগ্রেস জাতীয় দল গঠন করিয়া বঙ্গে এমন আন্দোলন করিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র তাঁহাদেরই মনোনীত প্রার্থীরা ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিতে পারিয়াছিল। বঙ্গের বক্তব্য এই যে, বঙ্গের কংগ্রেসীরা সিদ্ধান্তটার বিরুদ্ধে যেরূপ আন্দোলন করিয়াছিলেন, অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেসীদেরও তাহা করা উচিত ছিল, তাহা না করা গর্হিত হইয়াছে।

যে-যে-উপায়ে সিদ্ধান্তটা নাকচ হইতে পারে, তাহার মধ্যে গান্ধীজীর মতে বিদ্রোহ একটি। এ সম্বন্ধে কংগ্রেস জাতীয় দলের বিবৃতিতে লেখা হইয়াছে যে, যদি পূর্ণ স্বরাজ বিনা বিদ্রোহে পাওয়া যাইতে পারে (যেমন গান্ধীজী এখনও আশা করেন), তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটাও বিনা বিদ্রোহে নাকচ হইতে পারে। ইহা সত্য কথা।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটা সম্বন্ধে আমরা অনেক বৎসর ধরিয়া এত কথা লিখিয়াছি যে আর ও বিষয়ে লিখিতে ইচ্ছা হয় না—বাধ্য হইয়া কিছু লিখিতে হইল।

"নোয়াখালির হিন্দুদের প্রতি উপদেশ"

নোয়াখালিতে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারের যে-সকল অভিযোগ হইয়াছে তাহা গান্ধীজীর গোচর করা হইয়াছে। সে বিষয়ে তিনি "হরিজন" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এই :—

নোয়াখালিতে ব্যাপকভাবে গুণ্ডামি করা হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত কোন গবর্মেণ্ট এরূপ গুণ্ডামি দমনের ব্যবস্থা করিতে পারে না। প্রত্যেক নর-নারীর নিজেরই তাহা করিতে হইবে। গবর্মেণ্ট বড়জোর অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার পর অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে পারেন। দণ্ডবিধানের ফলে সে অপরাধ হইতে লোকে বিরত হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা অপরাধ নিবারণ করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আত্মরক্ষা হিংসাও নহে, অহিংসাও নহে। আমি বরাবরই অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষা করিবার উপদেশ দিয়া থাকি; কিন্তু আমি স্বীকার করি যে, হিংসার সাহায্যে আত্মরক্ষার ন্যায় অহিংস আত্মরক্ষাও শিক্ষণীয় বিষয়। অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহা হইলে হিংসাত্মক উপায় অবলম্বনে ইতস্তত করা অনাবশ্যক।

"জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত কোন গবর্মেণ্ট এরূপ [ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত] গুণ্ডামি দমনের ব্যবস্থা করিতে পারে না," ইহা আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দুর্বৃত্তের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা বা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া কোন গবর্মেণ্টেরই সাধ্যায়ত্ত না হইতে পারে (সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় নহি), কিন্তু ব্যাপকভাবে আচরিত সংঘবদ্ধ গুণ্ডামি দমনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত গবর্মেণ্ট করিতে পারে, অন্য রকমের গবর্মেণ্টও পারে এবং তাহা করা সর্ববিধ গবর্মেণ্টের একান্ত কর্তব্য।

আমাদের দেশেই গুণ্ডা আছে, অন্যত্র নাই, এমন নয়। অথচ "জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত" গবর্মেণ্ট আমেরিকায়, কানাডায়, ব্রিটেনে, ফ্রান্সে, হল্যাণ্ডে, সুইডেনে,... থাকিলেও, সে-সব দেশে নোয়াখালিতে যেরূপ গুণ্ডামির অভিযোগ হইয়াছে তাহার মত ব্যাপকভাবে গুণ্ডামি লাগিয়াই আছে বা ছিল, বর্ত্তমান বা অতীত ইতিহাসে এরূপ দেখা যায় না। তাহার কারণ, সেই সব দেশে ওরূপ গুণ্ডামি দমনের ব্যবস্থা দরকার মত হইতে পারে ও হয়।

বাংলা দেশের গবর্মেণ্টকে "জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত গবর্মেণ্ট" মনে করা ও বলা মহা ভ্রম। এই গবর্মেণ্ট বাস্তবিক ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট। তাহার 'পরামর্শদাতা' কোন মন্ত্রীই জাতিধর্মনির্বিশেষে "জনসাধারণ" কর্তৃক নির্বাচিত নহেন, কোন কোন সম্প্রদায়ের নির্বাচকদিগের দ্বারা নির্বাচিত। যদি কোথাও কোন ধর্মসম্প্রদায়কে ও তাহার পৃষ্ঠপোষক বিদেশীদিগকে ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ আসন কায়েমি ভাবে দেওয়া হয়, এবং যদি ঐ সকল আসনে উপবিষ্ট সদস্যেরা মনোযোগী না হন, তাহা হইলে সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়ের উপর ব্যাপকভাবে আচরিত গুণ্ডামির অভিযোগের তদন্ত না হইতে পারে, এবং তদ্রূপ গুণ্ডামি যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও তাহা দমনের ব্যবস্থা না হইতে পারে; মহাত্মাজী যদি এইরূপ কথা লিখিতেন তাহা হইলে সমালোচনার কারণ থাকিত না।

আমাদের আশঙ্কা হয়, মহাত্মাজী যে-প্রকার মত যে-ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা ব্যাপকভাবে আচরিত গুণ্ডামির অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত না করিবার বা তাহা প্রমাণিত হইলেও দমন না করিবার একটা অজুহাতের কাজ করিতে পারে।

প্রত্যেক নরনারীর আত্মরক্ষা একান্ত কর্তব্য, তাহা অহিংস বা "হিংস" যে উপায়েই হউক। মহাত্মাজী যে "হিংস" উপায়ও অবলম্বনীয় মনে করেন, ইহা এক্ষেত্রে সন্তোষের বিষয়।

মহাত্মাজীর আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"গয়া কংগ্রেসে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কংগ্রেসকর্ম্মীরা আত্মরক্ষার্থ বল প্রয়োগ করিতে পারেন, আমি নিজে কখনও এই প্রস্তাব সমর্থন করি নাই।"

আত্মরক্ষার বা দুর্বল ও অত্যাচরিত ও আক্রান্তের রক্ষার নিমিত্ত বলপ্রয়োগ মাত্রকেই আমরা হিংসা মনে করি না।

—

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী

ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন শান্তিনিকেতনে হইয়াছে। গান্ধীজী যখন কিছু দিন আগে শান্তিনিকেতনে আসেন তখন এই আয়োজনের বিষয় অবগত হন। এই উপলক্ষ্যে তিনি যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিলিপি 'প্রবাসী'র বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি এক বার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন, তিন বৎসর (১৩০৪-০৬) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির কার্য্যও করিয়াছিলেন। পরিষদ্ তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিবেন স্থির করিয়াছেন। পরিষদ্ যে "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই চরিতমালায় দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি জীবনীও বাহির হইবে।

তিনি কবি ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন, মানবপ্রেমিক সাধুপুরুষ ছিলেন, স্বদেশভক্ত স্বাধীনতাপ্রিয় মনীষী ছিলেন, সর্ব্বজীবে মৈত্রী তাঁহার ছিল। তিনি যাহা কিছু লিখিয়া ও বলিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অংশতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও যথেষ্ট পরিব্যক্ত হয় নাই। শান্তিনিকেতনে যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে 'প্রবাসী'র বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের প্রবন্ধে। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর ও অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধও তাঁহাকে চিনিতে সাহায্য করিবে। পূর্ব্বে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার পৌত্র স্বর্গত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখিয়াছিলেন। আমরাও কিছু লিখিয়াছিলাম। ভবিষ্যতেও তাঁহার সম্বন্ধে আরও লেখা বাহির হইবে। আমরা দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ্ সাহেবকে তাঁহার বিষয়ে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি সানন্দে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি পীড়িত হইয়া হাসপাতালে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘজীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন সাময়িকপত্রে অগণিত কবিতা প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি বাংলা ভাষার সম্পদ। তাহার কিয়দংশ মাত্র বিভিন্ন সময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। সবগুলি এখন পাওয়া যায় না। তাঁহার পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতামহের অনেকগুলি গদ্য ও পদ্য রচনা সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা প্রকাশিত হইবার পরও দ্বিজেন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন সব রচনাও দিনেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার সমগ্র রচনার একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়া উচিত। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যরূপে তিনি যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন সেগুলিরও অবশ্য এই সংগ্রহে স্থান পাওয়া চাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ হয়ত এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন বা হইবেন। তাহা হইলে কাজটি সুনির্বাহিত হইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের পুস্তক ও প্রবন্ধাদির একটি সূচী প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহার পুস্তক-পুস্তিকাদি কাহারও সংগ্রহে থাকিলে ব্রজেন্দ্রবাবুকে সে বিষয়ে জানাইলে কাজটি শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবে।

—

বাঁকুড়া সম্মিলনীর মেডিক্যাল স্কুল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি তিন দিন বাঁকুড়ায় থাকা কালে বাঁকুড়া সম্মিলনীর মেডিক্যাল স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া প্রীত হইয়া তিনি নিম্নমুদ্রিত মত প্রকাশ করেন।

আজ প্রাতঃকালে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল পরিদর্শনের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষদের প্রসাদবঞ্চিত এই হিতানুষ্ঠানটিকে বাঁকুড়ার গৌরব-স্থান বলিলে অল্প বলা হয়, বস্তুত ইহা বাংলা দেশেরই একটি মহতী কীর্তি। যাঁহাদের অজস্র ত্যাগ ও কৃতিত্বের উপরে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা সমস্ত দেশের সাধুবাদের যোগ্য, কারণ ইহা কর্ম্ম-সফলতার নহে, মহৎ দৃষ্টান্তের মূল্যে মূল্যবান। ইতি

৩।৩।৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

অনুন্নত শ্রেণীসমূহের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

গত ২৬শে ফাল্গুন অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির সদস্য এবং অন্য কয়েক জন মহিলা ও

ভদ্রলোক সমিতির সভাপতি সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়কে শিবনাথ স্মৃতি-মন্দিরে অভ্যর্থনা করেন। তদুপলক্ষ্যে জলযোগের ব্যবস্থাও ছিল। সর্কার মহাশয়ের পিতামহ স্বর্গত প্যারীচরণ সরকার মহোদয়ের ইংরেজী ফার্ষ্ট বুক অব রীডিং প্রভৃতি ছয়খানি বহি পড়িয়া সেকালের অগণিত ছাত্র লেখাপড়া শিখিয়াছিল। ইহা তাঁহাকে জানাইয়া তিনি যে শিক্ষাবিস্তারকার্যে সর্বপ্রকার আনুকূল্য করিবেন, এইরূপ স্বাভাবিক আশা প্রকাশ করা হয়। তিনি সমিতির কর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা করিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। সরকারী ও বে-সরকারী সাহায্য যথেষ্ট না-পাওয়া সত্ত্বেও যে সমিতি দুই শতাধিক বিদ্যালয় চালাইতেছেন, তাহা ইহার কর্মীদের আগ্রহ ও নিষ্ঠার ফল তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করেন। তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমবেত মহিলা ও ভদ্রলোকদের সহিত আলাপ করায় সকলে প্রীত ও আপ্যায়িত হন।

—

রামগড়ে নানা সম্মেলন

রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন ত হইতেছেই এবং তাহার প্রদর্শনীও বসিতেছে। তদ্ভিন্ন সেখানে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁহার দলের "রফা-বিরোধী সম্মেলন" হইবে। যে "কৃষাণ-সম্মেলন" হইবে, কাগজে দেখিলাম তাহার সহিত "রফা-বিরোধী সম্মেলনে"র সম্পর্ক নাই। আরও কোন কোন সম্মেলন হইতে পারে। দেশে যত রকম দলের যত রকম মত আছে, তাহা প্রকাশিত হওয়া উচিত। প্রকাশ করিবার স্বাধীনতাও সকল দলেরই থাকা উচিত। কিন্তু একই জায়গায় একই সময়ে এতগুলি দলের সম্মেলন অ-সম্মেলনে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে। হট্টগোল নিশ্চয়ই হইবে। তদপেক্ষা অবাঞ্ছনীয় কিছু না হইলেই মঙ্গল। সকল দলের কর্তৃপক্ষই মালিকান্দার ঘটনাবলী হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

—

বঙ্কিম-ধাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে সমর্পণ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নৈহাটী কাঁটালপাড়ায় তাঁহার যে বৈঠকখানা-গৃহে বসিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিতেন গত ২৬শে ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে সেই সুসংস্কৃত বৈঠকখানা বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে সমর্পিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন এবং স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। কলিকাতা হইতে প্রায় তিন শত সাহিত্যিক ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

উক্ত বৈঠকখানা-গৃহ সংস্কারের অভাবে ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইলে উক্ত বৈঠকখানা-গৃহের এক-চতুর্থাংশের মালিক বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ অংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে দান করেন। কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন ইতিপূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের অপর তিন দৌহিত্রের নিকট হইতে যে ত্রিচতুর্থাংশ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা পরিষদকে দান করেন। পরে সাধারণের অর্থসাহায্যে ঐ বৈঠকখানা-গৃহের আমূল সংস্কার করা হয়।

এই কাজটির দ্বারা বাঙালী জাতির মুখরক্ষা হইয়াছে। পরিষদ্ বা অন্য কেহ যদি এই প্রকারে যথাসময়ে উদ্যোগী হইয়া কলিকাতার বিদ্যাসাগর-ভবনটিকে জাতীয় তীর্থস্থান রূপে রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে উপযুক্ত কাজ হইত। কেন তাহা হয় নাই, তাহার কারণ নির্দেশ ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করিব না।

—

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-সম্মেলনের ব্যর্থতা

বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক যে ঐক্য-সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্যের সার্থকতা সম্পর্কে নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া কয়েক জন বিশিষ্ট হিন্দু প্রতিনিধি বিবৃতি দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাই বাংলার সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূল কারণ। সুতরাং এই বিষয়টি বৈঠকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা না হইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কিছুতেই সম্ভব হইবে না। কিন্তু বৈঠকে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহারা মুসলমান সদস্যবৃন্দের যে মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস লীগের নির্দেশ না পাইলে বৈঠকে বাঁটোয়ারা সম্পর্কে আলোচনায় তাঁহাদের আপত্তি থাকিবে। এমতাবস্থায় সম্মেলনের উদ্দেশ্য যে ব্যর্থতাতে পর্য্যবসিত হইবে, প্রতিনিধিবৃন্দ তাহাই নিঃসংশয়ে আশঙ্কা করেন

প্রধানতঃ সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি হইতে "নৈরাশ্যের" কারণ বুঝা যায়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিবৃতিতেও তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। আমাদের এরূপ দুটা বৃহত্তর আয়োজনের অভিজ্ঞতা থাকায় আমরা কিছুই আশা করি নাই, সুতরাং নিরাশও হই নাই। সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না করিয়া যদি কেহ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের আশা করেন, তাহা হইলে তিনি আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছেন।

—

কর্পোরেশ্যন নির্বাচনে কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভার ঐক্যের অবসান

কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা সম্মিলিত ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করিবেন, এইরূপ স্থির হয়। এই সিদ্ধান্ত টিকিল না। কেন, জানি

না। কংগ্রেসের পৌর-হিতৈষণা ও হিন্দুমহাসভার পৌরহিতৈষণা, এই উভয় ধারার সঙ্গম এক্ষেত্রে হিতকর হইতে পারিত।

—

রয়্যাল সোসাইটির নূতন সদস্য

বিলাতের রয়েল সোসাইটি শ্রীযুক্ত কে, এস, কৃষ্ণন্‌কে এফ, আর, এস উপাধি দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ভারতে এই উচ্চসম্মান লাভ করেন ডাঃ রামানুজম, সর্ জগদীশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক রামন, ডাঃ মেঘনাদ সাহা এবং ডাঃ বীরবল সাহনী।

ডাঃ কৃষ্ণন্ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৌবাজারের বিজ্ঞানানুশীলন সভার মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক।

—

আফগানিস্থানের দিকে রুশিয়ার রাস্তা বিস্তার

রয়টার এই সংবাদ দিয়াছেন যে, রুশিয়া আফগানিস্থানের দিকে রাস্তা বিস্তার করিতেছে। আবার রয়টারের দোসর এসোসিয়েটেড্ প্রেস সংবাদ রটাইয়াছেন যে, উত্তরপশ্চিম সীমান্তের লক্ষাধিক আফ্রিদি রুশিয়ার আক্রমণে বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব মাভৈঃ।

—

সর্ মির্জা ইস্মাইলের পরামর্শ

মহীশূরের দেওয়ান সর্ মির্জা ইস্মাইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় অভিভাষণ প্রদানার্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি মুসলমান ছাত্রদের সভায় বাংলা দেশে একটিমাত্র প্রধান ভাষা ও সাহিত্যের অস্তিত্ব যে কত বড় সুবিধা তাহা বলেন এবং সেই ভিত্তির উপর হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সদ্ভাব গড়িয়া তুলিতে বলেন।

—

পহেলা বৈশাখের উৎসব

কলিকাতায় ও বাংলার সমুদয় জেলায় পহেলা বৈশাখ ব্যায়াম প্রদর্শনাদি দ্বারা সম্মিলিত উৎসব করিবার উদ্যোগ হইতেছে, ইহা সন্তোষের বিষয়।

—

রেলওয়ে বজেট, বাংলার বজেট, ভারতের বজেট

রেলওয়ে বজেট, বাংলার বজেট ও ভারতের বজেটের বহু ন্যায্য সমালোচনা হইতেছে। কিন্তু কর্তাদের ইচ্ছায় কর্ম। তাঁহাদের ইচ্ছা হইলে তাঁহারা রেলের ভাড়া বাড়াইবেন ও নূতন ট্যাক্স বসাইবেন। সমুদয় ছাঁটাই প্রস্তাবও তাঁহারা ব্যর্থ করিতে পারেন।

—

দমননীতির প্রাদুর্ভাব

কিছু দিন হইতে দমননীতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের ও বঙ্গে আশ্রফুদ্দীন আহমদ চৌধুরীর গ্রেপ্তার তাহার আধুনিক দৃষ্টান্ত।

—

সরস্বতী-পূজার বিস্তার ও বিদ্যানুরাগবৃদ্ধি

অনেক বৎসর হইতে বাংলা দেশে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সরস্বতী-পূজা খুব অধিক সংখ্যায় হইতেছে, অন্য কোন প্রদেশে এত হয় না। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে যে, বাঙালীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিদ্যানুরাগী হইতেছেন। সর্বভারতীয় স্টাটিসটিক্সে প্রকাশ, মোট জনসংখ্যার শতকরা যত জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালয়ে যায়, তাহার সংখ্যা বঙ্গে সর্বোচ্চ নহে, অন্য কোন কোন প্রদেশে তদপেক্ষা বেশী। বঙ্গের টাকায় এবং বাঙালীর প্রদত্ত সুযোগে ডাঃ রামন্ রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হইলেন, নোবেল প্রাইজ পাইলেন, ডাঃ কৃষ্ণন্ রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হইলেন, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ দেশে বিদেশে বিখ্যাত হইলেন। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় না যে, বাঙালীদের মধ্যে বিদ্যাভক্তি খুব বাড়িয়াছে।

—

বিচারক কালীপ্রসন্ন সিংহ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালীপ্রসন্ন ১৮৪০ সালের প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ এবং ১৮৭০ সালের জুলাই মাসে পরলোকগমন করেন। এই স্বল্প কালের মধ্যে তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন - যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রচারিত 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' পুস্তকে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্রের একটি দিকের কথা, কিছু নূতন উপকরণের সাহায্যে, আলোচিত হইবে।

১৮৬৩ সালে কালীপ্রসন্ন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস অব দি পীস নিযুক্ত হইয়াছিলেন।* তিনি এই কার্য্য কিরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

৬ জুন ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়:—

> টেরিটীর বাজার অপরিষ্কৃত থাকাতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বর্দ্ধমানাধিপতির ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন, যত দিন উহা পরিষ্কৃত না হইতেছে প্রতিদিন তাঁহাকে ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

'সোমপ্রকাশ' পুনরায় ২৯ আগষ্ট ১৮৬৪ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশ করেন:—

> কলিকাতার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ আজি কালি পুলিষের কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন। গত ১৬ ই আগষ্ট তিনি যে কয়েকটী মকদ্দমার বিচার করিয়াছেন, তাহার দুটী দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম। ৮ জন দোকানদার কৃত্রিম বাঁটখারা ব্যবহার করাতে তাহাদিগের প্রত্যেকের ২৫ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট আক্ষেপ করিয়াছেন, ধূর্ত্ত দোকানদারেরা এক এক দ্রব্যে দুই গুণ লাভ করিয়া থাকে। লোকে যথার্থ মূল্য দিয়া এরূপ প্রবঞ্চনা ও ক্ষতি সহ্য করিবেন কেন? পুলিষের ইনস্পেক্টরগণ ইহার অনুসন্ধান রাখেন না বলিয়া তিনি ক্ষুব্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। ওজন ও মাপের জুয়াচুরি প্রায় সর্ব্বত্রই সমান, দণ্ডবিধিতেও ইহার এক বৎসর মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন বাবু বারান্তরে এরূপ অপরাধীর দণ্ড বাড়াইয়া দিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বিচারকার্য্যে সুনামের জন্য কালীপ্রসন্ন কয়েক বার অস্থায়ী ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যও করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স সাহেবের পদে দুই মাস কার্য্য করিবার জন্য যুবক কালীপ্রসন্ন পুলিস-কমিশনার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ৩১ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন:—

> Baboo Kally Prossunno Sing has bees requested by the Commissioner of Police to officiate for Mr. Dickens, the Southern Division Magistrate, for two months. It is but bare justice to the Baboo to say that he has taken the shine out of all the Honoraries of Calcutta, whether European or native, and the public spirit which he is exhibiting by thus employi his leisure for the benefit of the public is indeed entitl to high commendation.

৩ জুন ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে জানা যায়, "কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্রান্সন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া বিচারালয়ে আসিতে অশক্ত হওয়ায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন এবং ব্রান্সন সাহেবের নিয়োগের পূর্ব্বে সিংহ মহাশয় ঐ পদে কিছু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন।"*

বিচারকার্য্যে কালীপ্রসন্নের অপক্ষপাতিতার পরিচয় বিরল নহে। ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশ করেন:—

> ডেলি নিউসের একজন পত্র প্রেরক বলেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট একদিন মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচার কালে হেলথ আফিসর ডাক্তার টনিয়র সম্মুখে ছিলেন; ডাক্তার টনিয়র বলিলেন নেটিবদিগের সাক্ষ্য বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথায় কালীপ্রসন্ন বাবু বলেন, অনেক মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা আমার নিকট উপস্থিত হয়, অতএব আমি কোন মিউনিসিপ্যাল আফিসরের কথা শুনিয়া তাহার বিচার করিব না। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিদিগের সাক্ষ্যও আমি অগ্রাহ্য করিব না। সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় সাক্ষিদিগের কথা যত দূর বিশ্বাস

---

* "আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনরারী মেজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।"—'সোমপ্রকাশ,' ৪ মে ১৮৬৩।

* "সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী"—'ভারতবর্ষ,' ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ৪৫৪।

করি, সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোকের কথা তত দূর বিশ্বাস করিব। একটুকুও ন্যূন করিব না।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' বিচারক কালীপ্রসন্নের সহৃদয়তা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

A blind beggar was the other day brought up before Baboo Kaliprossonno Singh, Honorary Magistrate, on a charge of begging for alms in the Streets. The appearance of the man at once excited the sympathy of the Magistrate who far from punishing him gave him a donation of 2 Rs. out of his own pocket and promised him a monthly relief of one Rupee. A letter to the Secretary of the District Charitable Society was also directed to be written. We wish however the Magistrate had shown some sense of his displeasure to the over-zealous Police Officer, who hauled up a blind man for begging.

কালীপ্রসন্নের সূক্ষ্ম বিচারে সাহেবই হউক আর বাঙালীই হউক কোন অপরাধীরই নিষ্কৃতি পাইবার উপায় ছিল না। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' (২০ আগষ্ট ১৮৬৪) সত্য সত্যই লিখিয়াছিলেন :—

. . . Baboo Kali Prosono has become since his accession to the Honorary Magisterial bench of Calcutta a terror to Bengalee Villains and European rogues.

কালীপ্রসন্ন যে আদালতের বিচারাসনেই আইনের প্রয়োগ করিতেন এমত নহে, আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য অবসরসময়েও যে চিন্তা করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের গ্রন্থাগারে *The Calcutta Police Act* নামে কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি ইংরেজী পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৮; ইহার কথা এত দিন আমাদের অজ্ঞাত ছিল। পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

THE CALCUTTA POLICE ACT. Containing Act No. IV. of 1866 B.C. together with the Sections of the Indian Penal Code referred to therein, an abstract statement of the offences and the Penalties attached thereto, and an alphabetical Index, &c. &c. With the Amended Act. Compiled By KALI PRUSUNNO SINGH. *Honorary Magistrate and Justice of the Peace for the town of Calcutta. One of the Municipal Commissioners for the Suburbs of Calcutta with the powers of a magistrate.* Calcutta: Printed and Published for Babu Shib Chunder Bose at J. G. Chatterjea & Co.'s Press. No. 68, Pottuldunga, College Street. 1866. *To be had at the Calcutta Police Court. Price One Rupee.*

এই পুস্তকের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন যাহা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরেজী রচনার নিদর্শনস্বরূপ এখানে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

PREFACE.

In editing the new Police Act, I beg to inform the public that I have inserted all the Sections of the Indian Penal Code referred to in the clauses of the section XXVI of this Act, have prepared an abstract statement of all the offences and penalties attached thereto, and have introduced the limits of the Port and Town of Calcutta, and the Amended Act.

If my brother Honorary Magistrates find facilities in dispensing justice with accuracy by the aid of these few pages, thus laid before them, I shall feel my labor amply rewarded.

In conclusion, I cannot refrain from acknowledging my best thanks to my friend, BABOO PRANKISSEN GHOSE, Interpreter to the magistrate of the northern Division of Calcutta, for the valuable assistance he has rendered me in compiling this work.

KALI PRUSUNNO SINGH.

Calcutta, Police Court.
The 7th June, 1866.



হুগলী ব্যাঙ্কের বেলুড় শাখা উদ্বোধন। [বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

পঞ্চশস্য

বিচিত্র প্রাণী

এই বিপুলা পৃথ্বীতে সহজ নিরীহ মানুষ ও গৃহপালিত বা চিরাভ্যস্ত পশুপাখী ছাড়া, আরও কত রকমের প্রাণী যে আছে, সে-সম্বন্ধে অস্পষ্ট একটা ধারণা মনে জাগে ছুটির দিনে চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে গিয়া। অতীতে আরো কত বিরাটদেহ, বিচিত্র-প্রকৃতি ও বিকটদর্শন প্রাণী পৃথিবীতে জলে স্থলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, জাদুঘরে কঙ্কালাবশেষ দেখিয়া তাহাদের আকারপ্রকার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি। এখন তাহারা অবলুপ্ত। তবু এখনও পৃথিবীর নানা স্থানে অরণ্য-ভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইলে কত বিচিত্র প্রাণীর যে দেখা মেলে, তাহার ইয়ত্তা নাই।



কাঠবিড়ালীর লড়াই

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলে সুরিনাম, অসাধারণ প্রকৃতির ও বিচিত্রদর্শন বহুবিধ প্রাণীতে পরিপূর্ণ একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলকে প্রাণীতত্ত্ব-রসিকদের স্বর্গভূমি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মের পক্ষ হইতে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রাণীতাত্ত্বিক স্যাণ্ডার্সন এই স্থান পরিদর্শন করিয়া নানাবিধ প্রাণীর সন্ধান করিতে গিয়াছিলেন—তিনি এ সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। সেই বিবরণী হইতে কয়েকটি প্রাণীর চিত্র ও তাহাদের বিচিত্র স্বভাবের কিছু পরিচয় সংকলিত হইল।



এই প্রাণীটির স্বভাব অতি শান্তশিষ্ট, কিন্তু ইহার দাঁতের জোর এত অধিক যে অবলীলাক্রমে লোহা বাঁকাইয়া ও কাটিয়া ফেলিতে পারে।



ভয় পাইলে এই প্রাণীটি পুলিশের বাঁশীর মত শব্দ করে। কাঁকড়া ইহার প্রিয় খাদ্য।



সুরিনামের সজারু

কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বিচিত্র পশুপাখীর লীলাস্থল এই অঞ্চল। স্যাণ্ডার্স’ন এই অঞ্চলের প্রাণীবৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, প্রাণীতত্ত্বের এত বিচিত্র নিদর্শন এই দেশে আছে যে এক শত প্রাণীতাত্ত্বিক অনন্ত কাল ধরিয়া আলোচনা করিলেও আলোচ্য বিষয়ের শেষ হইবে না। এখানে তাহার মধ্যে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করা গেল।

স্যাণ্ডার্স’ন এক জাতের গুবরে পোকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের বুকে দুইটি সবুজ আলোক দেখা যায়—ইচ্ছামত এই আলো তাহারা নিষ্প্রভ করিতে বা সম্পূর্ণ নিবাইতে পারে। এ ছাড়া তাহাদের পেটে একটি উজ্জ্বল হরিদ্রাভ আলো জ্বলে—সাধারণতঃ উড়িতে আরম্ভ করিবার সময় এই আলো জ্বলিয়া থাকে—নিবিবার পূর্ব্বে বাতিটি সাধারণতঃ তিন বার, জ্বলিয়া উঠে।

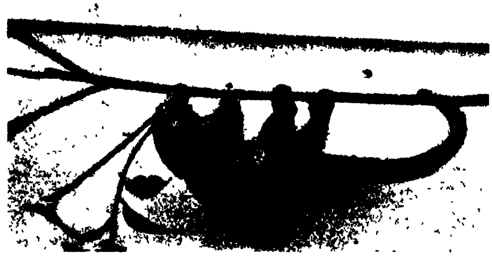
সুরিনামের অরণ্যে একরূপ বাঁদরের খুব প্রাদুর্ভাব—ইহারা ক্ষণে ক্ষণে একরূপ গর্জ্জন করিয়া থাকে, স্যাণ্ডার্স’ন তাহাকে সিংহ-গর্জ্জনের সহিত তুলনীয় বলিয়াছেন। দিনরাত্রি তাহাদের এই গর্জ্জনে (স্যাণ্ডার্স’নের হিসাবে প্রায় সওয়া দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর তাহারা এইরূপ চীৎকার করিয়া থাকে) অরণ্যভূমি ধ্বনিত।



এই পাখীটিকে স্পর্শ করিলেই গোঁ গোঁ করিতে থাকে, উত্তেজিত হইলে কুকুরের মত শব্দ করিতে থাকে। ইহার চোখের ব্যাস এক ইঞ্চি, মুখ ছয় ইঞ্চি চওড়া।

রক্তপায়ী ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ও এই অঞ্চলে বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

বিচিত্র প্রাণীর প্রসঙ্গে আমেরিকার এক জন ফটোগ্রাফারের শখের কথা উল্লেখ করি। ইনি আমেরিকার এক মরু-অঞ্চলে কুটির বাঁধিয়া আছেন, এই অঞ্চলের নানা প্রাণীর সহিত ভাব করিয়া নানা ভঙ্গিতে তাহাদের, ফটোগ্রাফ লওয়াই ইঁহার কাজ। এই



নিশাচর পিপীলিকাভুক—ভয় পাইলে অশ্রুবর্ষণ করে, ধরা পড়িলে বিলাপধ্বনি করিতে থাকে।

খানে কেহ যেন বন্দুক ছুঁড়িয়া বা অন্য কোন প্রকারে পোষমানা প্রাণীদের ভয় না দেখান, এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। সকাল-বেলা উঠিয়াই তাঁহার প্রথম কাজ, এই প্রাণীগুলিকে খাবার দেওয়া; সেই খাবার লইয়া যখন তাহারা কলহ করে তখন তিনি নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে তাহাদের ছবি তোলেন। কাঠবিড়ালীদের খাইতে দিবার জন্য তিনি একটি জায়গা ঘিরিয়া দিয়াছেন, সেটি দেখিলে যেন মনে হয় মুষ্টিযুদ্ধের একটি আখড়া। তাহাদের লড়াইয়ের তিনি যে ছবি তুলিয়াছেন তাহা দেখিয়া মানুষের মুষ্টিযুদ্ধের ভাব মনে আসে।

গুপ্ত

তুরস্কের অভ্যুদয়

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

চার মোটরযুক্ত বিরাট এরোপ্লেনে ইস্তানবুল হইতে আঙ্কারা মাত্র দুই ঘণ্টার পথ। আকাশ-পথের রৌদ্রের ঝলকের মধ্যে চলিতে চলিতে আনাটোলিয়া চোখের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। সুদূরব্যাপী অধিত্যকার এই



প্রাচীন আংকারা—মসজিদ



আধুনিক আংকারা—স্বরাষ্ট্রসচিব-ভবন

জনমানববিরল বৃক্ষগুল্মহীন ঝঞ্ঝাবাত-তাড়িত প্রান্তর দেখিয়া মনে হইল ইহাই কষ্টসহিষ্ণু দৃঢ়কায় কৃষিজীবী তুর্ক জাতির উপযুক্ত বিচরণভূমি। পর্ব্বতময় মরুমালার মধ্যে মধ্যে কে যেন অস্ত্রাঘাত করিয়া ছোট ছোট উপত্যকার সৃষ্টি করিয়াছে, সেগুলি শস্যশ্যামল এবং সেচ-নালীর জ্যামিতিক নক্সায় সুশোভিত। ক্ষেতের সীমানা চেনার ও দেবদারুর সারিতে সজ্জিত এবং তাহার শেষ প্রান্তে প্রস্তর ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত ঘরবাড়ীতে ভরা ছোট ছোট গ্রাম রহিয়াছে। ক্রমেই এই গিরিমালা পার্ব্বত্য নদীর গভীর খাদে খণ্ড খণ্ড হইয়া পৃথক হইয়া পড়িল, দুই-চারিটি গ্রাম তাহার সীমায় দেখা দিল এবং তাহার পর দূরবিস্তীর্ণ কর্ষিত ক্ষেতে ভরা মালভূমি দেখা দিল। ক্ষেতগুলি পীতবর্ণ খড়ের আঁটিতে ভরা, তখন ফসল-কাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। ক্রমেই ক্ষেতের সারি বাড়িতে লাগিল ও তাহার পর এই সমস্ত উর্ব্বর উপত্যকার মাঝে ঠিক যেন চক্ষের নিমেষে একটি অতি প্রশস্ত, অতি সুন্দর জনপদ দেখা দিল। মনে হইল যেন বহুদূরব্যাপী মরুপথের শেষে এক বিশাল ওয়েসিসে আসিয়াছি। এরোপ্লেন নীচে নামিতে আরম্ভ করিল, বৃক্ষমালার মধ্যে অসংখ্য নূতন সৌধপ্রাসাদ দেখা গেল, সমস্তই অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে সাজান, তাহার কেন্দ্রে দুইটি খড়্গাকার পর্ব্বত-শিখর। এক প্রাচীন দুর্গের দ্বার, প্রাকার, প্রাচীর ও মীনারে পাহাড় ছাইয়া আছে। তাহার আশেপাশে অতি পুরাতন ঘরবাড়ীর ভিড়। নীল আকাশে মেঘের টুকরা রৌদ্রে উজ্জ্বল, তাহার সামনে এই পার্ব্বত্য দুর্গের কঠোর রেখাবলী এক মায়াপুরীর আলেখ্যের মত দেখাইতেছিল।

এরোপ্লেনের গতি মন্দ হইল। নীচের ময়দানের সেচ-নালীর আঁকাবাঁকা রেখা, তাহার মধ্য দিয়া সরল

ভাবে নূতন রাজপথ—এই সকলের উপর ঘুরিয়া ক্রমে আঙ্কারার এরোড্রোমে উপস্থিত হইল।



তুরস্কের সিবাস অঞ্চল। ভূমিকম্পে এই অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়াছে।

* * *

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর গাজী মুস্তাফা কেমাল তাঁহার নূতন রাষ্ট্রের রাজধানী যখন আঙ্কারায় স্থাপন করা ঠিক করিলেন তখন এই নগরী সভ্যজগতে অপরিচিত ছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কদের নূতন সংগঠনে এখানে সম্মেলন হইয়াছিল বটে, কিন্তু জগতে আঙ্কারা বা "এঙ্গোরা" কেবলমাত্র এক প্রকার অতি মসৃণ দীর্ঘ লোমযুক্ত ছাগলের জন্যই খ্যাত ছিল। অনেক কারণে তখন আঙ্কারা নূতন জাতি-গঠনের কেন্দ্ররূপে গৃহীত হয়। ইস্তাম্বুলে অর্থাৎ তখনকার কনষ্টান্টিনোপলে সে-সময়ে মিত্রপক্ষের বিজয়ী সেনাদল ও রাজনীতিবিদগণ একটি "খেলার রাজত্ব" সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষায় ব্যস্ত, প্রাচীন কালের যত কুসংস্কার, যত প্রগতির পথের কাঁটা তাহারা সযত্নে কুড়াইয়া সেখানে একত্র করিতেছিল। পুরাতন শিক্ষাদীক্ষা দানের জন্য আধুনিক জ্ঞানহীন ধর্ম্মান্ধ মৌলবীর দল সেখানে দলবদ্ধ, এক কথায় ইস্তাম্বুল তখন পিছু হাঁটায় ব্যস্ত, ভবিষ্যতের কথা সেখানে বলা অরণ্যে রোদন। অধিকন্তু ইস্তাম্বুলে প্রতি পদে গ্রীস ও ফ্রান্সের ছাপ দেখা যায়, তুর্ক জাতির শ্লাঘা বা গৌরবের চিহ্ন অতি অল্পই। নূতন রাষ্ট্রের সূচনা, নূতন জাতি গঠনের পক্ষে যাহা কিছু প্রতিকূল তাহার সবই সেখানে উপস্থিত। সুতরাং আঙ্কারাই নূতন রাষ্ট্রকেন্দ্র-রূপে নির্ব্বাচিত হইল। তাহার পর প্রায় বিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এবং মুস্তাফা কেমালের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কিরূপ প্রখর ছিল তাহা পদে পদে প্রমাণিত হইয়াছে।

আঙ্কারায় কেন্দ্র স্থাপনের আর একটি কারণ ছিল। আধুনিক জাতীয়তাবাদ তাহার অস্তিত্বের কারণ দর্শাইবার জন্য ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বের অধ্যায় খুঁজিয়া প্রমাণ বাহির করে। নব্য তুর্ক জাতিও এই অত্যাধুনিক ন্যায়ের ব্যতিক্রম করে নাই। যেমন ফাসিষ্ট ইটালী তাহার বহির্জগতে অধিকার স্থাপনের চেষ্টা প্রাচীনতম রোমের ইতিহাস ধারা দ্বারা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া দাবী করিতে চাহে, সেইরূপে নব্য তুরস্কের এই ইস্তাম্বুল ছাড়িয়া আঙ্কারায় রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থাপন করারও অতি প্রাচীন নজীর আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঊষাকালে দুইটি প্রবল ও অতিসভ্য জাতির কৃষ্টি বিস্তারের পরিচয়ের সম্প্রতি লুপ্তোদ্ধার হইয়াছে। ইহারা দক্ষিণ-ইরাকের সুমের জাতি ও আনাটোলিয়ার হিটাইট জাতি। ঐ দুই জাতির কথিত ও লিখিত ভাষা আধুনিক তুর্ক ভাষার স্বজাতীয়। আধুনিক ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সৌধমালায় সুসজ্জিত, উদ্যান ও সুবিন্যস্ত পথঘাটে অলঙ্কৃত এই আঙ্কারা ঐ চল্লিশ শতাব্দী পূর্ব্বের হিটাইট জাতীয় রাজধানীর ভিত্তিস্থলের উপরেই স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে একাদিক্রমে হিটাইট, ফ্রিজিয়ান, ক্রুসেডর, সেলজুক, তাতার ও মুঘল সকলেই নগরী স্থাপন, লুণ্ঠন, ধ্বংস এবং পুনর্গঠন করিয়া গিয়াছে। মুঘল বা মোঙ্গল জাতীয় অটোমান তুর্কদের প্রথম সুলতান এর্টোগ্রলও এখানেই প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন।

এখানে শাসনকেন্দ্র স্থাপনের প্রথম ও অতি গুরুতর বাধা, বৃক্ষগুল্মের অভাব। এই শুষ্ক দেশে আদিম অরণ্যের উৎপত্তি ও বিনাশ বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, তখনকার মানুষ যাহা কাটিয়াছে তাহার পুনরুজ্জীবনের কোন ব্যবস্থা করে নাই। অরণ্যধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দেশ বৃষ্টিহীন ও তৃণশস্যবিরল হইয়া প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। অথচ উদ্ভিদ-বিহীন, শুষ্কধূলিবালুবাহী ঝড়ে বিধ্বস্ত প্রান্তরে নূতন নগর স্থাপনা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আত্ম-উদ্যমে বিশ্বাস

এবং অশেষ পরিশ্রম ও অনেক অর্থব্যয়ের ফলে নবীন তুর্ক জাতি এখানে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। এখানে ষোল বৎসরের অধ্যবসায়ের ফলে কেবল যে রাজপথের দুই ধার সুন্দর বৃক্ষমালায় শোভিত, শুধু যে নগরের চতুর্দ্দিক ফলে ফুলে তৃণগুল্মে শ্যামল হইয়াছে তাহা নহে, এই সমস্ত অঞ্চলে উর্ব্বর ভূমি ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে এবং জলবায়ুরও এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে আগেকার অধিবাসিগণ এই আঙ্কারা যে সেই আঙ্কারা তাহা স্বীকার করিতেও ইতস্তত করে। ইহার সবই যে নূতন তাহার প্রমাণ প্রত্যেকটি উদ্যান, প্রত্যেকটি বৃক্ষকুঞ্জ একই ভাবে বিন্যস্ত এবং চারিদিকেই নবরোপিত চেনার ও একেসিয়া বৃক্ষের ছড়াছড়ি। ক্ষেত-খামার সেচনালীর প্রায় সকলই নূতন ধরণের, চাষের প্রথাও আধুনিক। এক কথায় নূতন রাষ্ট্র এ-দেশে কৃষির ও বৃক্ষগুল্মরোপণের ক্ষেত্রে এক অভিনব বিপ্লব আনিয়াছে।

প্রশস্ত রাজপথ, বৃক্ষমালা, স্মারক-মূর্ত্তি, সৌধমালা, পুষ্পোদ্যান, মোটর-বাস, এরোপ্লেন ইত্যাদিতে দেশ সাজাইয়া দেওয়া নবীন তুর্কের শ্লাঘার কারণ সন্দেহ নাই। সঙ্কীর্ণ গলিঘুঁজির দুই ধারে কাঠের ঘরবাড়ী, পথে গাধা ও উটের দলের সারি চালাইয়া চলিয়াছে চাষীর দল, তাহাদের মলিন বস্ত্র শুষ্ক মুখ,—পীয়ের লোটির ভ্রমণ-বৃত্তান্তের এই প্রাচীন ছবির কোনও নিদর্শন আজ আঙ্কারায় পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই দরিদ্র মলিন বস্ত্রধারী চাষীর বদলে এখন যাহারা রহিয়াছে তাহারা আগেকার মতই পরিশ্রমী, নির্ভীক, বলিষ্ঠ এবং নম্রস্বভাব। লক্ষ লক্ষ তুর্ক সৈন্যদল দশ বৎসর ব্যাপী অবিরাম পরাজয়, যুদ্ধবিগ্রহের প্রকোপ ও শত্রুর অত্যাচার-অপমান সহ্য করার পর আতাতুর্ক ("তুর্ক-পিতা") গাজী মুস্তাফা কেমালের নেতৃত্বে জাতীয় স্বাধীনতা স্থাপনের পর অস্ত্র ছাড়িয়া নিদারুণ পরিশ্রম ও অদ্ভুত ধৈর্য্যের সহিত নূতন রাষ্ট্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। আজিকার সৌধ সেতু-প্রাসাদমালা, আজিকার মোটর রেল এরোপ্লেন যানবাহন সকলই ঐ অতি দরিদ্র, অতি পরিশ্রমী ধীরস্থির বলিষ্ঠ চাষী সৈন্যের অসীম ধৈর্য্য ও প্রচণ্ড শৌর্য্যের ফল। এই অঞ্চলে যে কোন ইয়োরোপীয় যায় সে-ই শোনে ও দেখে যে এই আনাটোলীয় চাষীদিগের মত সরল বিশ্বস্ত ও সৎ লোক পৃথিবীর অন্য কোথাও এক স্থানে এত বেশী দেখা যায় না। আজ ধীরে ধীরে এই কৃষকদিগের অবস্থা উন্নত হইতেছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বের পঁচিশ বৎসর ইহারা দারিদ্র্য ও কষ্টের অন্তিম সীমায় ছিল বলিলেও হয়।

* * *

স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়ী হইবার পর মুস্তাফা কেমালের ভবিষ্যৎ-কল্পনায় কি কর্ম্মসূচী আছে তাঁহার এক বিশেষ বন্ধু এই প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, "আমার আন্তরিক ও একান্ত ইচ্ছা যে আমি দেশের শিক্ষামন্ত্রী হইয়া জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করি।" তখন দেশের শতকরা আশী জন লোক নিরক্ষর, অজ্ঞান ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। তুর্ক জাতির অধিকাংশ তখন ৩২,০০০ হাজার ছোট-বড় গ্রামে বাস করিত এবং গ্রামে প্রায় সকলেই কঠোর পরিশ্রমের ফলে অতি কষ্টে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিত। সুতরাং এই জাতিকে শিক্ষাদানের সমস্যা ছিল অসম্ভব জটিল। তুর্ক-পিতা কেমাল নিজেদের অবস্থা ও শক্তি বুঝিয়াই সেই সমস্যা পূরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগত সৈন্যদলের মধ্যে অল্পবয়স্ক ও বুদ্ধিমান যত সৈনিক ছিল তিনি তাহাদের রাষ্ট্রের খরচে শিক্ষাদান করিলেন। লেখা-পড়া, সাধারণ আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান এবং জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ইহাদিগকে শিখানো হইল। সামরিক শিক্ষার শৃঙ্খলা ও কঠোর কষ্টসহিষ্ণুতা তাহাদের তো ছিলই। তাহার পর ইহাদের আদেশ করা হইল, নিজ নিজ গ্রামে গিয়া সামরিক অভিযানের মত এই শিক্ষার অভিযান করিতে। এই সকল তরুণ সৈনিক নিদারুণ দারিদ্র্য ও বিষম পরিশ্রম বরণ করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে এই দেশ, যাহা কত শত শত বৎসর যাবৎ অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল, অবশেষে সভ্যতার পথে বহুদূর অগ্রসর হয়, স্বাধীনতার আদর্শে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্ক জাতির অভ্যুদয়ের পথ যে অপরিসীম সমস্যাজালে আবৃত ছিল আধুনিক শিক্ষাদানের দ্বারা মুস্তাফা কেমাল তাহা মোচন করিয়া দিলেন।

সমস্ত দেশের যে কি উন্নতি এই ষোল বৎসরে হইয়াছে তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করাও প্রায় অসম্ভব। পূর্ব্বেকার দাসত্বমূলক রাজ্যশাসনতন্ত্র, তাহার পর দেশে অরাজকতা এবং যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে অশেষ দুর্গতি—এই তিন কারণে বিশ বৎসরের মধ্যে তুর্কদেশ অসীম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। দেশ যে কখনও স্বাধীন হইবে সে আশাও লোপ পাইয়াছিল। বহু লক্ষ সৈন্য নিহত, শত সহস্র সৈন্য বন্দী, দেশের উর্ব্বর ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন অঞ্চলের অধিকাংশ মিত্রশক্তি-দলের সেনার অধিকারে, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় যোদ্ধা পার্ব্বত্য দেশে লুকাইয়া স্বাধীনতার ক্ষীণ আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছে—এই ছিল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শেষের অবস্থা। চার বৎসর প্রাণপণ যুদ্ধের পর, মুস্তাফা

কেমালের অদম্য পুরুষকারের ফলে, দেশের জাতীয় অবস্থা ফিরিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১০ই অগষ্টের সেভ্‌র্‌ সন্ধিপত্রে পরাজিত তুর্ক জাতির দাসত্বের ব্যবস্থা এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাইয়ের লসান সন্ধিপত্রে বিজয়ী স্বাধীন তুর্কদিগের জন্য নূতন ব্যবস্থা, এই দুইটি মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় ঐ চার বৎসরে কি অসাধ্য সাধনই তুর্ক-পিতা কেমাল ও তাঁহার বীর, সহিষ্ণু ও সুশৃঙ্খল সন্তানগণ করিয়াছিলেন। গত মহাযুদ্ধে পরাজিত জাতিদিগের মধ্যে একমাত্র তুর্কই উন্নতশির হইয়া লসান সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল।



দারার বেকিরে আতাতুর্কের ভবন

তুর্ক জাতির অবস্থার এই অলৌকিক পরিবর্ত্তনের মূলে এক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। গত বিশ বৎসরের গতি দেখিয়া এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির স্থিতি, প্রগতির বা অধোগতির পরিমাণ দেখিয়া, নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রই বলিতে বাধ্য যে গত মহাযুদ্ধের পরে যে-সকল বিরাট রাষ্ট্রনায়ক পৃথিবীর নানা দেশের ভাগ্যচালনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মুস্তাফা কেমালের স্থান উচ্চতম স্তরে—বোধ হয় সর্ব্বোচ্চে। অন্য দেশ বা জাতির উপর অত্যাচার না করিয়া, নিজের দেশে দমননীতি না চালাইয়া, আর কোনও দেশ স্বাধীনতা, সাম্য ও কৃষ্টির পথে এত অল্পদিনে এতটা অগ্রসর হয় নাই। ইহা সত্য যে তুর্ক জাতি এখনও সভ্যতার চরম সোপানে উঠে নাই, কিন্তু সামান্য ষোল বৎসর পূর্ব্বে সে কত নীচে ছিল তাহা জানিলে তুর্কের প্রগতির পরিমাণ বুঝা যায়। তুর্ক-পিতা কেমালের মহাপ্রয়াণের পরও তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় দেশের দৃঢ় স্থিতি তাঁহার আদর্শের শাশ্বতত্ব প্রমাণ করে।

স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়লাভ করার অব্যবহিত পরেই মুস্তাফা কেমাল আঙ্কারায় জাতীয় মহাসভার সম্মুখে নিম্নলিখিত রাষ্ট্রীয় আদর্শগুলি উপস্থিত করেন—

১। দেশের সীমার মধ্যে দূরতম অঞ্চলে পর্য্যন্ত, জাতির সমৃদ্ধি ও ভাগ্যপরিবর্ত্তনের জন্য যাবতীয় কার্য্যের আরম্ভ এবং সর্ব্বব্যাপারে স্বাবলম্বন এবং স্বকীয় শক্তি সামর্থ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর।

২। দেশের লোককে উদ্দাম বেহিসাবী প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তীকরণ।

৩। সভ্য বহির্জগতের সঙ্গে সাম্য ও সখ্য স্থাপন এবং অন্য সকল জাতির সহিত পারস্পরিক মনুষ্যোচিত উদার ও ভদ্র ব্যবহারের প্রচলন।

এই আদর্শ রক্ষায় তুর্ক জাতি কতটা সফল হইয়াছে তাহাই ঐ জাতির ও উহার নেতার বিরাট পৌরুষের ও সত্যকামিতার পরিচয়। পুরাতন অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন দেশ ও নূতন দেশের সংগঠনের জন্য যাহা কিছু বর্জ্জন করা প্রয়োজন, যাহা কিছু প্রবর্ত্তনের যোগ্য, সকলই সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে দেশকে প্রস্তুত করা হইল। দেশকে জানান হইল, নূতন রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও সভ্যতার অভিনবতম দানের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে; সভ্যতার পথে তুর্ক জাতিকে এখনও বহুদূর অগ্রসর হইতে হইবে, অতএব যে পথে ও যে ভাবে দ্রুততম গতিতে আদর্শে নিশ্চিত পৌছান যাইবে সেই পথ ও সেই ব্যবস্থা এখন হইতে স্থির করা প্রয়োজন। জাতীয় প্রগতির সম্মুখে যাহা কিছু বাধারূপে ছিল সে সকলই দৃঢ়তার সহিত বর্জ্জন করা হইল। এইরূপে রাজতন্ত্র ত্যাগ, প্রজাতন্ত্র গঠন; জনরাষ্ট্রের প্রচার, খিলাফৎ বিনাশ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পৃথক ক্ষেত্র নির্দ্দেশ, পাশ্চাত্য বেশ, বিশেষতঃ টুপি পরিধান প্রবর্ত্তন, মোল্লা-দরবেশদিগের জমায়েৎ উচ্ছেদ, পাশ্চাত্য পঞ্জিকার প্রবর্ত্তন, নূতন শাসন-আইন স্থাপন, পর্দ্দার উচ্ছেদ, রোমান অক্ষরে লিখন ও তুর্কি ভাষায় নেমাজের প্রার্থনাদির প্রচলন—একে একে সবই হইল। এই সকল নূতন মত নূতন



তুরস্কে ভূমিকম্প

প্রথার প্রবর্ত্তনে শান্তির পথই লওয়া হইয়াছিল; কিন্তু পুরাতনের প্রতি মায়াবশতঃ বা অন্ধবিশ্বাসের প্রভাবে প্রগতির পথে কোন বাধা উপস্থিত হইলে দেশের নেতারা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত সে বাধা দূর করিয়াছিলেন, মিথ্যা দয়ামমতা দেখান নাই। তুর্ক জাতির পতনের সময় দেশের জনতার মধ্যে জাতীয়তাবাদ, ভাষা, কৃষ্টি বা রাষ্ট্রনৈতিক কোনও সাধারণ বন্ধন ছিল না, ছিল কেবলমাত্র ইসলাম-ধর্ম্মের বন্ধন, যাহার প্রভাবে সাম্রাজ্যে মেকী একতা দেখা যাইত। সেই সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর নূতন রাষ্ট্র গঠনের অন্তরায়গুলির মধ্যে প্রধানতম দাঁড়াইল সেই দল যাহারা ধর্ম্মের নামে সমাজ ও দেশের সকল ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিয়া জাতিকে অধঃপাতে প্রবৃত্ত করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতেছিল। ইহাদের ক্ষমতা চূর্ণ হওয়ায় ও ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র সুস্পষ্টরূপে পৃথক করায় তুর্ক জাতির অভ্যুদয়ের পথ সরল হইয়া গেল। মুস্তাফা কেমাল এই সকল ব্যবস্থা করার পূর্ব্বে সমস্ত দেশ ঘুরিয়া, বিশেষজ্ঞদিগের পরামর্শ লইয়া, প্রত্যেকটি প্রশ্ন পৃথক ভাবে ও বিশদ রূপে বিচার করিতেন, তাহার পর রাষ্ট্রসভায় কার্য্যপন্থা স্থির করা হইত। কোন বিষয়ে এক বার সিদ্ধান্ত হইলে কোনও বাধাবিঘ্ন, বা সংস্কার তাহার গতি রোধ করিতে পারিত না। যাঁহারা পূর্ব্বেকার ইসলাম-জগতে ধর্ম্মবিশ্বাসের স্থান ও অধিকার জানেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, যে-জাতি পূর্ব্বকালে পঞ্চশতাব্দী যাবৎ ইসলামের প্রবলতম রক্ষী ছিল তাহার পক্ষে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের অধিকার ছিন্ন করিয়া পৃথক করা কত বড় দুঃসাধ্য সাধন, মোল্লা-দরবেশদিগের অধিকার বিলোপ কিরূপ প্রচণ্ড বাধার অতিক্রমণ।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র পৃথক করায় স্বাধীন ইসলাম-জগতে তুর্কদিগের গৌরবের কোন হানি হইল না। বরঞ্চ সা'দাবাদ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের পরে প্রতিবেশী ইসলাম-রাজগণ ক্রমেই তুর্কজাতির পথই অবলম্বন করিতেছেন। ইরাণে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রায় তুরস্কের মতই হইয়াছে, আফগানিস্থান দ্রুত সেই পথে চলিয়াছে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশও ধীরে ধীরে ঐ দিকেই যাইবে বা যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। সা'দাবাদ সন্ধির পর তুর্ক জাতি যে পুনরায় ইসলাম-জগতের শীর্ষস্থানে আসিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে তুরস্ক দেশের রেলপথ সবই বিদেশীর হস্তগত ছিল। বিদেশীর রেলপথ দেশের উপকারের জন্য বা দেশের অধিবাসীদিগের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বলা বাহুল্য। বিদেশীগণ রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য প্রথমতঃ অত্যধিক খরচপত্র করিয়া তাহার চড়া হারের সুদের জন্য ও মূল টাকার কিস্তিবন্দী ব্যবহার

জন্য তুর্ক-সাম্রাজ্যের নিকট নানা প্রকার সুবিধাজনক অধিকার ও রাজকোষ হইতে গ্যারান্টি আদায় করেন। তাহার পর ঐ রেল চালানোও বিদেশী বণিকের সুবিধার জন্যই করা হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় দেশরক্ষা বা দেশবাসীর জীবনপথ সরল করার কোনও কার্য্যে ঐ রেলপথগুলি আসে নাই; কেবল দরিদ্র দেশবাসী-দিগের ও দেশস্থ রাজকীয় অধিকারের খনিজ, কৃষি, অরণ্য ইত্যাদি সম্পদ সহজে ও অল্পমূল্যে বিদেশে লইবার পথ পরিষ্কার করা হয়। যে যে স্থানে বিদেশীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায় সে-সকল স্থান হইতে নিকটতম নৌ-বন্দর পর্য্যন্ত রেলপথের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করা হয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চল পূর্ব্বেকারই মত দুর্গম রাখা হয়। জার্মান-নির্ম্মিত বাগদাদ ও মক্কাভিমুখী রেলপথ-দ্বয়ের যেটুকু পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই দুইটিতেই এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

নূতন ব্যবস্থায় ইয়োরোপীয় কর্তৃক তুর্ক দেশের সম্পদ গ্রাস করার উপায় সকল বন্ধ করা হইল। সুতরাং দেশে বহুদূরব্যাপী নূতন রেলপথ ও মোটর-পথ নির্ম্মাণে বিদেশীর সাহায্য লওয়া অসম্ভব হইল; কিন্তু দরিদ্র স্বাবলম্বী তুর্ক অধিকতর দারিদ্র্য স্বীকার করিয়া রেল ও রাজপথ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিল। এই উদ্যমের ফলে এই ষোল বৎসরে নূতন তুরস্কের সকল প্রদেশ এখন রেলপথদ্বারা যুক্ত হইয়াছে এবং সেই সকল রেলপথ ক্রমে প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত তুর্ক রাষ্ট্রের যোগ স্থাপন করিতেছে।

রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, যন্ত্রশিল্প ইত্যাদিরও প্রসার বাড়িতেছে, যাহার ফলে তুর্ক জাতি এখন বর্দ্ধিষ্ণু এবং উন্নতশীল জাতি বলিয়া পরিচিত।

[পেয়ের ইসাকের ফরাসী হইতে]



ইন্দুমতীর স্বয়ংবর

চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষামন্দিরের উৎসবে ছাত্রীদের মূকাভিনয়ের একটি দৃশ্য

[বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য]

দেশ-বিদেশের কথা

ছয় মাসের শেষে

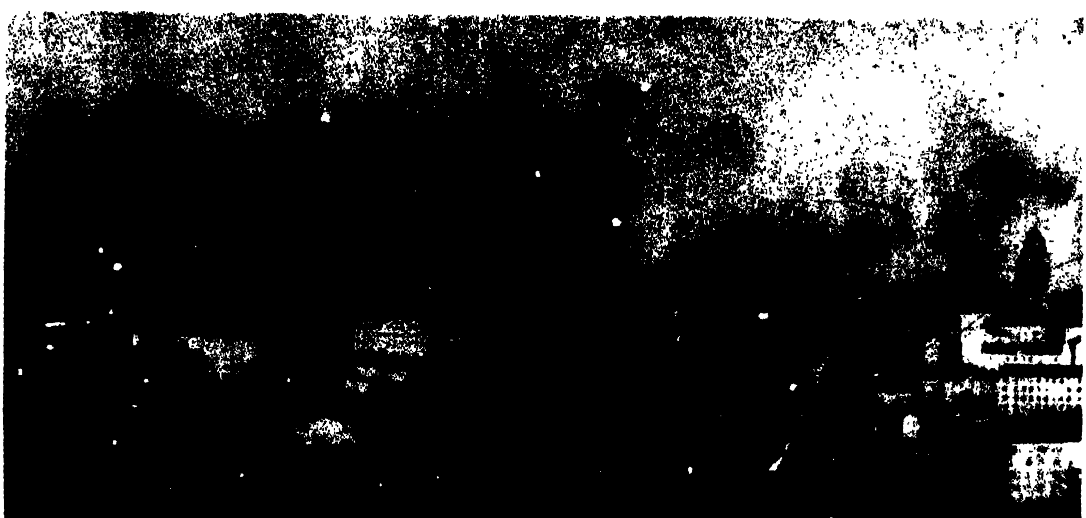
শ্রীগোপাল হালদার

ছয় মাস হইল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এই ছয় মাসে যুদ্ধের আসল রূপ এখনো প্রকাশ পায় নাই; শীতের শেষে ইউরোপে এইবার সত্যকারের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে,—ইহাই সকলের ধারণা। কিন্তু এই ছয় মাসে ইউরোপের যুদ্ধ যে একটি নূতন ক্ষেত্রে উন্নীত হইতে চলিয়াছে, দিনে দিনে তাহার আভাসও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের কেন্দ্রভূমিতে হিট্‌লারের পার্শ্বেই কি শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ, ফরাসী প্রভৃতি শক্তিপুঞ্জের শত্রুরূপে ষ্টালিনকে দেখিতে পাইব? এই ছয় মাসে এই প্রশ্নটিই রূপ গ্রহণ করিয়াছে! যুদ্ধের প্রথম ছয় মাসের শেষে ইহাই হয়ত সর্বাপেক্ষা বড় কথা।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের রাহুগ্রাস

পোল্যাণ্ডের পরে ফিন্‌ল্যাণ্ডের দিকে সোভিয়েট রুশিয়ার বাহিনী অগ্রসর হইয়া যায়—কেন, সে তর্কের শেষ নাই। কিন্তু তাহার ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স এই মিত্রশক্তি রুশিয়ার মিত্রতার আশা পরিত্যাগ করিল। দেখিতে-না-দেখিতে জেনেভার রাষ্ট্রসঙ্ঘ জীয়াইয়া উঠিল—মাঞ্চুকু, আবিসিনিয়া, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া যাহা পারে নাই ফিন্‌ল্যাণ্ড সে অসাধ্যসাধন করিয়া ফেলিল—পররাজ্যগ্রাসী বলিয়া এই প্রথম রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সদস্য সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইল। যুদ্ধান্তের পৃথিবীতে সোভিয়েট ছাড়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ আর কোনো পররাজ্যাপহারীর সন্ধান পায় নাই।

সোভিয়েট-রাহুগ্রাস হইতে ফিন্‌ল্যাণ্ডকে মুক্ত করিবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যগণ কে কি করিয়াছেন, বলা দুঃসাধ্য; তবে



সোভিয়েট বোমায় আক্রান্ত হেলসিনকি

যতই আশঙ্কা করা যাউক, দেশ-কাল-পাত্রের অপূর্ব্ব যোগাযোগে মোটের উপর ফিন্‌ল্যাণ্ডের পূর্ণগ্রাস হয় নাই। গত তিন মাস পর্য্যন্ত সোভিয়েট্ রুশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের অল্পাংশই কবলিত করিতে পারিয়াছে—উত্তরে পেট্‌সামো বন্দর ও তাহার নিকেলের খনি সে অতি শীঘ্রই আয়ত্ত করে, কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে দেশ দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহার সন্ধ-ক্ষেত্র হইতে বোথ্‌নিয়া উপসাগরে পৌঁছিবার চেষ্টা সার্থক হয় নাই; ক্যারোলিয়া-হ্রদের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তেও সোভিয়েটের তীব্র আক্রমণ আশানুরূপ ফলদান করিয়াছে কিনা, বলা অসম্ভব; আর ম্যানারহাইম-দুর্গরেখার গণ্ডী-বিনাশ যে যে-কোনো বাহিনীর পক্ষেই বহু আয়াসসাধ্য তাহা সর্ব্বজন স্বীকৃত। অতএব, সোভিয়েটের বীরত্বগর্ব্ব পৃথিবীর চোখে যেন ম্লান হইতে বসিয়াছিল। কিন্তু, ফিন্‌-রাষ্ট্রের প্রাণপণ প্রয়াস সত্ত্বেও অবশেষে ম্যানারহাইম্-দুর্গরেখা আর দুর্ভেদ্য রহিল না। প্রায় পনের মাইল জুড়িয়া ক্যারোলীয় যোজকের উপরে একের পশ্চাতে আর, এইরূপে সুগঠিত এই দুর্গম দুর্গরেখা। সেই পনের মাইল প্রশস্ত রেখা ভেদ করিয়া, কোইভিস্‌টো শহর দখল করিয়া, সোভিয়েটের বিপুল বাহিনী এখন ভীপুরী বা ভাইবোর্গ নগর অধিকার করিয়াছে (৩রা মার্চ্চ?)। ফিন্‌ল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসেঙ্কি অবশ্য এখনো দূরে—অন্তত ৬০।৭০ মাইল—মধ্যভাগে আরও দুর্গম পথ, সুরক্ষিত অঞ্চল; আর ইতিমধ্যে ভীপুরীর পিছনেও নূতন রক্ষীরেখা গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ভীপুরী রেলপথের কেন্দ্র; দক্ষিণ-ফিন্‌ল্যাণ্ডের দুয়ার; আর দক্ষিণ-ফিন্‌ল্যাণ্ডই ধনে-জনে সমস্ত ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রাণ। ভীপুরী হইতে সোভিয়েটের চেষ্টা হইতে পারে—ঘুরিয়া ম্যানারহাইম-দুর্গরেখার পশ্চাদাক্রমণ—দুই দিকে প্রচণ্ড আঘাতে সেই রেখাকে ও তাহার সৈন্যদলকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলা। ফিন্‌-সেনাপতিরাও রণকুশল; পূর্ব্বাহ্নেই এই আক্রমণের কথা ভাবিয়া তাঁহারা এই পার্শ্ব-পথ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইতেছেন আর উত্তরের পেট্‌সামো রণাঙ্গনে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া সেদিকে সোভিয়েটকে ব্যাপৃত করিতে চাহিতেছেন—ইতিমধ্যে যদি মার্চ্চের তুষারপাত আরম্ভ হয় তাহা হইলে প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে ফিন্‌-রাষ্ট্রের আয়ু আরও একটু দীর্ঘ হইয়া যাইবে ইহাই তাঁহাদের আশা।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে ব্রিটেনের সাহায্য

কিন্তু আপনার পুণ্যে ফিন্‌ল্যাণ্ডের আর যে বেশী দিন টিকিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা ফিন্‌রাও বুঝে, তাহাদের বন্ধুরাও জানে। তাই, বিপন্ন ফিন্‌-রাষ্ট্রনায়কেরা মুখ চাহিয়া আছেন তাঁহাদের বন্ধুদের। দেশ-বিদেশ হইতে ধন-জন ও রণসম্ভার আসিতেছে বটে, ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধক্ষেত্র বহু দেশের স্বার্থের পরীক্ষা যেন ক্রমশই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়,

আরও সৈন্য চাই, আরও অর্থ চাই, আরও কামান-বিমান সবই চাই—আবার চাই তাহা অনতিবিলম্বে। এইবার ফিন্‌-রাষ্ট্রের বন্ধুদের সত্যসত্যই চিন্তার কথা—তাহারা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া পড়িবে, না, এই বেসরকারি সাহায্য দিয়াই তৃপ্ত রহিবে?

ইতালি, ফরাসী, ব্রিটিশ, আমেরিকা প্রভৃতি নানা দেশ নানা ভাবে এ-পর্য্যন্ত ফিনল্যাণ্ডে সাহায্য দান করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই ব্রিটেন ১৫০ ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কামান ও ১০০ কলের কামান পাঠাইয়াছে, গোলাবারুদ পাঠাইয়াছে প্রচুর। আর ৫০,০০০ হাজার ছুঁড়িবার বোমা, ২২টি ফিল্‌ডগ্যান ও তদুপযোগী বিমানধ্বংসী কামান, হাউইট্‌সার ও ৬ ইঞ্চি কামানও ফিন্‌দের ব্রিটেন দিয়াছে; আর দিয়াছে ১৪৪ খানা বিমান। ফরাসীরাও ভারী কামান পাঠাইয়াছে—ম্যানারহাইম-রক্ষীরেখা তাহা স্থাপন করাতে সুবিধাও হইয়াছে। ব্রিটেন হইতে এখন চলিল ৩,০০০ স্বেচ্ছাসৈনিক।

মোটের উপর, প্রায় ৫০ হাজারের বিভিন্ন জাতীয় সৈনিকের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ফিন্‌রা পাইয়াছে, কিন্তু ফিনদের এখনি প্রয়োজন ১ লক্ষ সৈনিকের এবং তাহাদের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের। কাজটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফৎ চলিতে পারে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ভাবে অন্যান্য জাতিদের সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রতে হয় না, অথচ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণও করা হয়। এই কৌশল কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে বাধা কি, বুঝা যায় না। হয়ত মৃতপ্রায় রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এই উদ্দেশ্যেও 'সবল' করা সহজ নয়, কিম্বা হয়ত বিভিন্ন দেশের সোভিয়েট-বিরোধী মত এতই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা এবার একযোগে প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অবতরণই এখন যুক্তিযুক্ত মনে করে। ব্রিটেনের ভূতপূর্ব্ব যুদ্ধমন্ত্রী হোর বেলিশা সেদিন 'নিউজ অব দি ওয়ার্ল্‌ড' পত্রে এই মতটিই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্ট ও সবল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

সোভিয়েট আক্রমণ

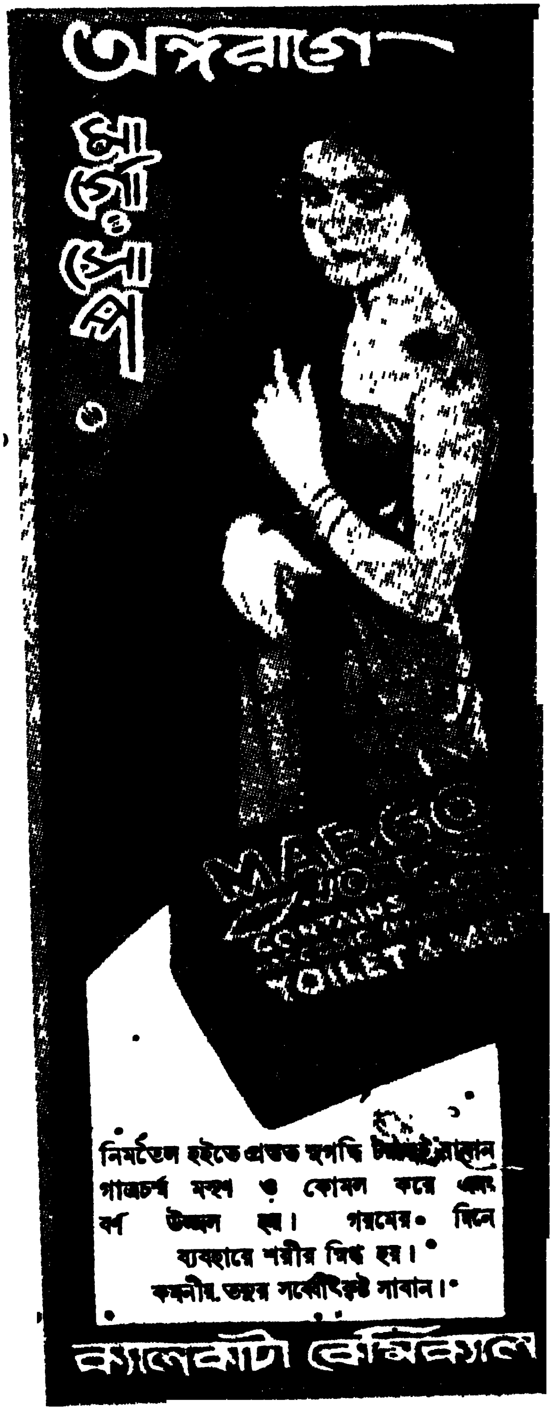
কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক ও সেনানায়কেরা এ বিষয়ে এতটা উৎসাহের পরিচয় দিতেছেন না। সত্য বটে ভীপুরীর পরেও সোভিয়েটবাহিনীকে বাধা দেওয়া যায়,—আর যতই সোভিয়েট-বাহিনী অগ্রসর হইবে, ততই তাহাদের বাহিনী-রেখা বিস্তৃত হইবে এবং সে রেখাকে ছিন্ন ও খণ্ড করিবার সুযোগও বাড়িবে। তাহা ছাড়া ফিনল্যাণ্ডের পথ রুদ্ধ হইলে জার্ম্মানীর পক্ষে সুইডেনের খনির লৌহ মিলা দুর্ঘট হইবে, রুশিয়ার তৈলও সহজপ্রাপ্য হইবে না, বাল্‌টিক ও কৃষ্ণ-সাগর, দুই সমুদ্রের

তীর হইতেই শত্রুপক্ষীর ছায়া অপসারিত হইবে, নরওয়ে সুইডেন, ডেন্মার্ক মিত্রশক্তির মিত্রস্থানীয় নিরপেক্ষতা ভোগ করিতে পারিবে—আর ইহাদের উত্তরস্থ বন্দর কবলিত করিয়া সোভিয়েট আটলাণ্টিকে বাহির হইবে, সে সম্ভাবনাও থাকিবে না।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রিটেন এখনো এইরূপ ফিন-যুদ্ধের অংশীদার হইয়া বসিতে দ্বিধাগ্রস্ত। তাহার কারণ এই যে, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় পথে ফিনল্যাণ্ড রক্ষা সহজ ব্যাপার নয়। আর, সুমেরু-সমুদ্রের পথে ছাড়া ফিনল্যাণ্ডে এখন মিত্রশক্তির পক্ষে সাহায্য পৌঁছানোও সুসম্ভব নয়। ফিনল্যাণ্ডের উপকূলে সোভিয়েটের কামান বসিলে আর সমুদ্রে জার্মান ও সোভিয়েট ডুবো জাহাজ টর্পেডো ও মাইনের জাল পাতিয়া বসিলে—ব্যাপারটা গত বারের যুদ্ধের গ্যালিপোলির আক্রমণের অনুরূপ এক শোচনীয় অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি হইবে না। অবশ্য, নরওয়ের ও সুইডেনের পথ আছে। কিন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ রাষ্ট্রগুলি কি মনে করে, কে জানে,—ফিন্ল্যাণ্ডের পরেই তো সোভিয়েটের ছায়া ইহাদের উপর পড়িবে। তথাপি ভয়ে হউক ভরসায় হউক, ইহারা এই যুদ্ধে নিজেদের দেশের উপর দিয়া বিদেশীয়দের যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিবে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হুকুম যখন আছে, তখন পথ জোর করিয়া লইতে মিত্রশক্তির আপত্তি নাই—তবে ততটা তাহারা অগ্রসর হইতে চায় না—সত্যসত্যই জবরদস্তি না হউক, জবরদস্তির মত দেখাইবে যে। তাহা ছাড়া, এই ভাবে সোভিয়েট আক্রমণের অর্থ তো শুধু ফিনল্যাণ্ডেই যুদ্ধ নয়—তাহার অর্থ যুদ্ধ ভারতের ইরাকের শিয়রে, যুদ্ধ মধ্য-প্রাচ্যের সীমান্ত জুড়িয়া, যুদ্ধ নিকট-প্রাচ্যের তুর্কদের দুয়ারে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে বল্কান ও দানিয়ুবীয় রাজ্যগুলির সীমায়—যুদ্ধক্ষেত্র এইরূপে বিস্তৃত করিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে কি লাভ?

বল্কানী আয়োজন

লাভ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই বটে, কিন্তু ফিন্ল্যাণ্ডের পরে যদি রাশিয়ার সত্যসত্যই তেমন বিশ্রামের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে আবার বল্কানের দিকে তখন তাহার দৃষ্টি পড়িতে পারে, এ ভয় সকলেরই আছে। তাই, এখন রুশিয়া যখন উত্তরে ব্যাপৃত, তখনি দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের শক্তিগুলি নিজেদের রক্ষার আয়োজন করিতে উৎকণ্ঠিত। আর সোভিয়েট-বিরোধী শক্তিগুলিও বিভিন্ন সীমান্তে নিজেদের বল সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট। বল্কান্ অঞ্চলের দীর্ঘ জটিল আত্মদ্বন্দ্বের ইতিহাস জটিল হইয়াছে এই কৃষাণ-বহুল জাতিদের আর্থিক দুর্গতিতেও প্রত্যেক দেশে পাশাপাশি খণ্ড খণ্ড নানাজাতীয় সংখ্যালঘিষ্ঠদের অবস্থিতিতে জটিলতাকে জটিলতর করিয়াছে। এই অঞ্চলে বৈদেশিক শক্তিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও বৈদেশিক শক্তিদের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় রুমানিয়ার অনেক খনিতেই ব্রিটিশ টাকা খাটিতেছে; অথচ রুমানিয়ার আর্থিক জীবনের উপর, তাহার শস্যের উপর, তৈলের উপর, অন্যান্য কাঁচা মালের উপর পড়িয়াছে জার্মানির দাবী। আবার বুল্গেরিয়া ও হাঙ্গেরি যুদ্ধশেষে



পাশমানের রাজ্যখণ্ড হারাইয়া রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়ার নিকট হইতে তাহা আদায় করিতে চায়। বল্কান্-স্বার্থ তাড়না বল্কান্ কলুষিত ছোট হইল ইহাদের সেই দুর্বা ঠেকানো। তেমনি সুরক্ষিত হাঙ্গেরিয়া, বুলগেরিয়ার সহমর্মী হইল সুরক্ষিত জার্মানী ও ইতালি। এদিকে সমস্ত বল্কান ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উপর মুসোলিনির প্রাধান্য বিস্তারের লোভ। আবিসিনিয়ার জের মিটিলেই আলবেনিয়া উদরস্থ হইল—তুরস্ক গ্রীস সচকিত হইয়া উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছিল—তাহাদের ভরসা দিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন ব্রিটিশ ফরাসী। এমনি করিয়া ঐ বল্কান্ মুলুকে নিজেদের দ্বন্দ্বও শেষ হয় না, আর জার্মানী, ইতালী, ব্রিটেন-ফ্রান্সের কূটনৈতিক দ্বন্দ্বও শেষ হয় না।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্র আবার আবির্ভূত হইল সোভিয়েট রুশিয়া—বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার 'দক্ষিণী [illegible]' যেন জার-যুগের 'স্লাব-সংহতির' আভাস দেখিয়া উৎসাহিত হইল, রুমানিয়া এবার সোভিয়েটের নিকট বেসারবিয়া হারাইবার ভয় করিতে লাগিল—জার্মান বিভীষিকার স্থান গ্রহণ করিল সোভিয়েট রুশিয়া, বলকানের চোখে ও বলকানী-কারবারী বৈদেশিকদের চোখে। মনে হইল, বলকানের বলশেভিক হইতে আর বেশী দেরী নাই।

কিন্তু সোভিয়েটের প্রধান পরাজয় ঘটিল যখন তুর্ক পররাষ্ট্র-সচিব সারাজগলু সোভিয়েট-সখ্য দৃঢ়তর করিতে না পারিয়া ব্রিটিশ-ফরাসী সখ্যসূত্র দৃঢ়তর করিলেন। ব্যাপারটা ইতালির পক্ষেও অসুবিধাজনক—এই অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রভাব এত বাড়িতে দেওয়া তাহার মনঃপূত নয়। ইতালি যুগোস্লাভিয়া ও হাঙ্গেরীকে আদর করিয়া নিজের মতামত জারি করিতে লাগিল—আর স্পষ্ট জানাইল, বল্কান্ তাহারই বিশেষ আওতা, অন্য শক্তিদের নয়; তবে এই বলকান্ দেশগুলির কোনো একটা ব্লক বা দল গঠনেও তাহার মত নাই। এইবার [illegible] প্রস্তাব তথাপি বলকান-বন্ধুত্বের একটা ঐক্য [illegible] চেষ্টা করিল—কিন্তু তাহার স্পষ্ট রাজনৈতিক ফল কিছু হয় নাই। অন্য দিকে রুমানিয়ার জার্মানীর দাবী বাড়িতেছে এবং তুরস্ক ও সমস্ত নিকট প্রাচ্যে মিত্রশক্তি এমনি রণসজ্জায় সজ্জিত যে সকলেই এই অঞ্চলে একটা বিশেষ আশঙ্কা করিতেছে। সে যুদ্ধ ঘটিতে পারে কৃষ্ণসাগরের তীরে—তাহার লক্ষ্যস্থল হইবে সোভিয়েট-জার্মান শক্তি।

কিন্তু এই ভাবে যুদ্ধ-সীমান্ত বিস্তৃত করা কতটা সমীচীন হইবে, সে বিষয়ে মিত্রশক্তি সুনিশ্চিত নয়। সুনিশ্চিত হইতে পারে যদি ইতালির সহিত একটা সেইরূপ মন-একতা হয় যদি বুঝাপড়া হয় জাপানের সহিত—আমেরিকার সহিত তো প্রায় আছেই।

ছয় মাস পরে যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা হইতেছে, সেদিক হইতে দেখিলে মনে হয়—ইহা নির্ভর শুধু যুদ্ধ-রতদের উপর করে না, ইহা নিরপেক্ষদের উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে।

পরলোকে বাঙালী ব্যবসায়ী

সুপরিচিত কাগজ-ব্যবসায়ী হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অল্পবয়সে কাগজ-ব্যবসায়ী জন্



হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

ডিকিন্সনের আপিসে কর্মগ্রহণ করেন ও কর্মকুশলতার জন্য কোম্পানীর বাজার শাখার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি এইচ. কে. ঘোষ. অ্যাণ্ড কোং নামে নিজ ব্যবসায় আরম্ভ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীদুর্গা কটন মিলেরও তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ও উহার অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত